

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



আষাঢ়—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ভাগবত-ধর্ম্ম

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

ভাগবত-ধর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তগণের আচরিত ধর্ম্ম। অথবা শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত ধর্ম্ম। ইহাই মানব ধর্ম্ম। তথাপি প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কথঞ্চিৎ পার্থক্য এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ভারতের অন্যতম রহস্য-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবদ্ভক্ত-গণের অসংখ্য প্রসঙ্গ রহিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন, এই নববিধা ভক্তির—"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ। সুতরাং ভক্তের আচরণে ও নিষ্ঠায় পার্থক্য স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন রাজর্ষি বিষ্ণুভক্তের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তেমনই আবার একজন অতি দরিদ্র ভক্তের কথাও উপেক্ষিত হয় নাই। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থাবলম্বী ও সন্ন্যাসী সকলেই যাহাতে এই ধর্ম্মের আচরণ করিতে পারেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বহু বিচিত্র পন্থা বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ধর্ম্ম ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের আচরণীয় ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্মের কোন কোন অঙ্গের আচরণ সকলের পক্ষে সহজ, এমন কি সম্ভবপরও নহে। তাহারই দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।

যে প্রস্থানত্রয়ের উপর আর্য্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, স্মৃতিপ্রস্থান তন্মধ্যে অন্যতম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আচার্য্যগণের নিকট স্মৃতি নামে পরিচিত। গীতার অনুশাসন জীবনে সুন্দর, সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, জগতে এরূপ নর-নারী দুর্লভ। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পদ্মনাভ-মুখ-নিঃসৃত গীতার মহাবাণী শুনিয়া অবধি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এইরূপ ভক্তের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু তপস্যার পর তিনি জানিতে পারেন, ব্রজবনের আভীর যুবতীগণ এই ধর্ম্মের আচরণে সমর্থা হইয়াছিলেন। বেদব্যাস অত্যন্ত শ্রদ্ধারা সঙ্গে এই

গোপীগণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসেরও ভক্ত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাদের কথাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার সুকঠিনতর অনুশাসন—এমন কি সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগের মহাবাণীও ইঁহাদের আচরণে অতি মধুরতর সৌন্দর্য্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। শ্রীভগবান গীতা-কথন কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যে আমাকে যেরূপে ভজনা করিবে, আমি তাহাকে সেইভাবেই ভজনা করিব। গোপীগণের মধুর রসের উপাসনা তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করিয়াছিল। তিনি নিজ মুখে তাঁহাদের নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই ঋণ আজিও পরিশোধিত হয় নাই। স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা দিয়াই গোপীগণ শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই ভালবাসার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ সংসার, সমাজ এমন কি স্বজনগণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বিদ্রোহের আরও আখ্যান আছে। এইরূপ বিদ্রোহে শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, সকলেরই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ দিতেছি, শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে গিয়া প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাটের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিলেন যে দুইটি বালক, তাঁহাদের একজন প্রহ্লাদ, অপরজন ধ্রুব। এই বিদ্রোহের পদ্ধতিও অভিনব। স্মরণাতীতকালে যে সাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আজিও তাহার প্রয়োজনীয়তা অন্তর্হিত হয় নাই। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের কালাতীত মাহাত্ম্য। ভাগবত-ধর্ম্ম সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই সত্য। যাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই দুইজন সম্রাটের নাম—হিরণ্যকশিপু ও উত্তানপাদ। দুইজনেই প্রবলপরাক্রান্ত, কিন্তু দুইজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। হিরণ্যকশিপু দুর্দ্ধর্ষ, হিংস্র, অত্যাচারী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানবর্জ্জিত। উত্তানপাদ প্রজাপালক, সজ্জন, কিন্তু স্ত্রৈণ। প্রহ্লাদ এবং ধ্রুব আপন আপন সাধনায় ইহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ নূতন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন দেশে অপর কাহারো জীবনে এই ধর্ম্ম আচরিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পর্ব্বত পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন, মদমত্ত হস্তীর পদতলে পেষণের আদেশ দিয়াছেন, প্রহ্লাদ নির্ব্বিকার। প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সম্রাটের আদেশে বিষপানও করিয়াছেন। পিতার যে কোন আদেশ তিনি অবিচারিতচিত্তে অক্ষুব্ধ অন্তরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও প্রহ্লাদ সম্রাটের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। অবশেষে সম্রাট আপনার হিংসা-বিষে আপনি বিনষ্ট হইয়াছেন। অহিংস থাকিয়াও প্রহ্লাদ এই হত্যা নিবারণ করিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনার বহু বহু দিন পরে মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ঐ পুরাতন দৃশ্যের অংশ বিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। এই দৃশ্যের অভিনেতা বাঙ্গালী ভক্ত-সাধক ব্রহ্মহরিদাস। এই সিদ্ধ সাধক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিনাম ত্যাগ করাইবার জন্য তদানীন্তন সুলতান-নিয়োজিত একজন মুসলমান বিচারক হরিদাসের প্রতি বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। জহ্লাদ তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে জনাকীর্ণ বাজারের সম্মুখে লইয়া গিয়া অজস্র বেত্রাঘাত করিয়াছে, বেত্রাঘাতে তিনি হতচেতন হইয়াছেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও হরিনাম পরিত্যাগ করেন নাই। আততায়ী তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছে, স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার হতচেতন দেহ শান্তিপুরে আসিয়া তীর লগ্ন হইয়াছে। আচার্য্য অদ্বৈত সযত্ন শুশ্রূষায় হরিদাসের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা গান্ধী এই ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ভাগবত-ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম ক্লীবের ধর্ম্ম নহে। এই ধর্ম্মের আচরণে পৌরুষের প্রয়োজন।

ধ্রুবের সাধনা অন্যরূপ। তাঁহার তপস্যায় উত্তানপাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং পরিণামে সকলেরই মঙ্গল হইয়াছে। ধ্রুব পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতার স্নেহলাভ করিয়াছেন। ভগবদারাধনার ধ্রুবলোকে তাঁহার আসন চির সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের নিকটেই শ্রীমদ্ভাগবত প্রামাণ্য শাস্ত্র! আচার্য শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক,

শ্রীমধ্ব এবং শ্রীবিষ্ণু স্বামী সকলেই গ্রন্থখানিকে শ্রীভগবানের দ্বিতীয় প্রকাশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই চারি সম্প্রদায়ের সুপণ্ডিত ভক্তগণের রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা ও ভাষ্য আছে। আচার্য্যগণ নিজ নিজ অনুভূতি-অনুরূপ ভাগবত-ধর্ম্মকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। শিষ্য-পরম্পরা আচার্য্যগণের আচরণের অনুসরণ করিয়াছেন; স্বীয় গুরুর আদর্শের আলোকে জীবনের গতিপথ চিনিয়া লইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ সমর্থিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীরামানুজের একজন অত্যন্ত দরিদ্র শিষ্য ছিলেন। ভিক্ষান্নই তাঁহার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল। শিষ্যের পত্নী ছিলেন পরমাসুন্দরী, পতির দারিদ্র্য তাঁহাকে দিনেকের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। অতি আনন্দেই দম্পতির দিন কাটিত। এই শিষ্যের একজন প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী প্রতিবেশী ছিলেন। শিষ্যপত্নীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং লালসায় পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টারও তাহার ত্রুটী ছিল না। কিন্তু দেব-ভোগ্য-ভোজ্যের প্রলোভন, মহার্ঘ বসন ভূষণের প্রলোভন, অপরিমেয় অর্থের প্রলোভন, কোন প্রলোভনই শিষ্য-পত্নীকে বিচলিতা করিতে পারে নাই। সুখের সংসারে এই একটী অসহনীয় অশান্তি, তথাপি পতিপত্নী উভয়েই তাহা উপেক্ষা করিতেন।

দম্পতির একান্ত আকাঙ্ক্ষা গুরুদেবের পদধূলিগ্রহণ, একবার অন্তত একটী দিনের অন্তও তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তাঁহার পদ যুগলে আত্ম সমর্পণ। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইয়া যায়। গুরুদেব কোথাও একাকী যান না। তিনি যেখানেই যান শতাধিক শিষ্য তাঁহার অনুগমন করেন। সেই তো এক বিশেষ সমস্যা! আচার্য্য একাকী অথবা একজনমাত্র সেবক সঙ্গে লইয়া শুভাগমন করিলে যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার সেবার ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু শতাধিক শিষ্যের ভোজ্য-সংগ্রহ—।

অন্তর্য্যামী আচার্য্য শিষ্য-দম্পতির অভিপ্রায় জানিয়া একদিন বহু সেবক সহ তাহার কুটীরে শুভাগমন করিলেন। শিষ্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, একাকিনী শিষ্যপত্নী কুটীরে। তিনি গুরুদেবের শুভাগমনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উদয় হইল, গুরুদেবের সেবার কি ব্যবস্থা হইবে? অন্তরে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা শিহরণ, আর তিলার্দ্ধ বিলম্বেরও অবসর নাই। রমণী সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রতিবেশী শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—আমাকে শতাধিক লোকের ভোজনের উপযুক্ত উত্তম উত্তম ভোজ্য বস্তু পাঠাইয়া দিন্‌, আমি অদ্যই সন্ধ্যায় গিয়া আপনার নিকট দেহ সমর্পণ করিব। আনন্দে-অধীর শ্রেষ্ঠী ভারে ভারে ভোজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন'; সেই সঙ্গে যুবতীর উপযুক্ত উত্তম বসন ভূষণ। দরিদ্র শিষ্যের গৃহে মহোৎসব সুরু হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নে ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুল-মুষ্টি লইয়া শিষ্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে ফিরিয়া গুরুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিলনা। প্রণাম বন্দনার পর কুটীর-মধ্যে গিয়া রন্ধনের আয়োজন দেখিলেন। কিরূপে এই রাজোচিত উপচার সংগৃহীত হইল পত্নীর নিকট সমস্ত শুনিলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—ধন্যা তুমি, তুচ্ছ দেহদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া গুরুদেবের পূজার উপচার সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকেও ধন্য করিয়াছ। তোমার মত সহধর্ম্মিণী পাইয়া শুধু আমি নয়, আমার কুল পবিত্র এবং জননীও কৃতার্থা হইয়াছেন।

নির্ব্বিঘ্নে স-শিষ্য গুরুদেবের ভোজনাদি সমাধা হইয়া গেল। শিষ্য-দম্পতি প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। শ্রেষ্ঠী-প্রদত্ত বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া শিষ্য-পত্নী শ্রেষ্ঠী গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল প্রকোষ্ঠে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শ্রেষ্ঠী এই মনোরমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুন্দরীর আগমনে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। প্রকোষ্ঠে যেন বাসন্ত পৌর্ণমাসীর উদয় হইল। সুন্দরীকে দেখিবামাত্র স-সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুক্ত করে কহিলেন—মা তুমি আসিয়াছ, আমি এতক্ষণ ধরিয়া তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পরমারাধ্য গুরুদেবের সেবার তো কোন ত্রুটী ঘটে নাই। তোমার এই অকৃতি সন্তানকে আদেশ কর, অতঃপর কি উপায়ে আমি তোমাকে পরিতুষ্ট করিব। শিষ্যপত্নী অভিভূত অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পতির পদপ্রান্তে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

অধুনাতন শিক্ষিত সভ্য সমাজ এই ঘটনাকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবেন জানি না। কিন্তু আমরা জানি—এই আচরণ ভাগবত-ধর্ম্মের অনুমোদিত। বর্ত্তমানে সন্ন্যাসী গুরুর অভাব নাই। ইহাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক সমাজের কি উপকার হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। শিষ্যগণের আচরণ দেখিয়া তো মনে হয় না যে তাঁহাদের হৃদয়ের কোনরূপ শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অথচ যাঁহাদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দুইজন কৌপীন-সম্বল সন্ন্যাসী বাঙ্গালার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। সে এক অভিনব বিপ্লব।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে বাঙ্গালায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল, ভাগবতী দেবানন্দ পণ্ডিতের বিবরণ হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালায়, শুধু বাঙ্গলায় নয়—সর্ব্বভারতে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নিজ মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই অপরূপ প্রেমময় পুরুষোত্তম শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার এক অত্যন্ত দুর্দ্দিনেই তিনি এই সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবদ্‌প্রেম এবং মানবপ্রেম এক অপূর্ব্ব আধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। ব্যক্তি, জাতি, দেশ-ভগবান, সবাইকে ভালবাস, সে ভালবাসা অকপট এবং স্বার্থ-গন্ধহীন হইলে তবেই না সার্থক হইবে। মানুষকে ভাল না বাসিলে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। অধম দুর্গত দুরাচার বলিয়া মানুষকে ঘৃণা করিলে ভগবানকেই ঘৃণা করা হয়, শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও তাঁহার সহযোগী প্রেমোদ্দাম শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাবে অতি-বড় পাপীদেরও হৃদয়েরপরিবর্ত্তনঘটিয়াছে। অতি বড় দুরাচারীও সাধুরূপে সমাজে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরশমণির আর স্পর্শের অপেক্ষা করিতে হয় নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ পরশমণির নামগুণ গান করিয়াই কত লৌহ কাঞ্চন হইয়া গিয়াছে।

সমাজের রূপান্তর ঘটাইতে হইলে, ব্যক্তির তথা জাতির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে ভাগবত-ধর্ম্মের বহুল প্রচার আবশ্যক। দেশ হইতে কথকতা লোপ পাইয়াছে। কথক সম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটিয়াছে। একজন মাত্র লোক, বড় জোর কাহারো সঙ্গে একজন মাত্র সেবক। দক্ষিণা দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা। একমাস ধরিয়া গ্রামে আছেন এবং সন্ধ্যা হইতে তিন ঘণ্টাকাল গ্রামের আপামর সাধারণকে মাতাইয়া রাখিয়াছেন। দেশে ইহাদের বংশলোপ পাইয়াছে। কত আখ্যান কত উপাখ্যান। আর বাচন ভঙ্গী যেমন সুন্দর, তেমনই সুমিষ্ট। তাহার এমনই প্রভাব—নরনারী এখনই হাসিতেছে, এখনই কাঁদিতেছে! এই কথক ঠাকুরদের আর দেখিতে পাই না। সমাজে ইহাদের অদ্ভুত প্রভাব ছিল। ইহাদের প্রভাবে মানুষ পাপ হইতে দূরে থাকিত, পুণ্যানুষ্ঠানে প্রলুব্ধ হইত। বৃক্ষরোপণ, কূপ-খনন, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। লোকে কথায় কথায় সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিত না।

এই যে সরকার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু আইনের সাহায্যে কতটুকু অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইয়াছে? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রভাবে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত সমাজে বাস করিয়াও ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ভুঁইমালিকে মোহান্ত পদবী-দানে সম্মান দিয়াছে। কোন্ মন্ত্র বলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, আজিকার মানুষ তাহার অনুসন্ধান করে না। জনগণকে সচেতন করিতে হইলে, গণসংযোগ রক্ষা করিতে হইলে, সমাজ তথা জাতিকে সুগঠিত করিতে হইলে এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার জীবন-ভাষ্যের আলোকে ভাগবত-ধর্ম্মকে আপন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য, সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।



গল্প

পাঁচ

সঙ্কর্ষণ রায়

খোকন সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে—এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। বীথিকা সব সময় ভয়ে ভয়ে আগলে রাখে। ঘরের মধ্যে এক একদিন আটকে রাখে। অস্থির হ'য়ে খোকন বন্ধ দরজার কাছে এসে তীব্র আপত্তির সুরে চেঁচায়। বীথিকা বলে, কেমন জব্দ! মার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খোকন তার নতুন ওঠা দাঁত তিনটি বের ক'রে হাসে। হাসি যেন আর থামতে চায় না।

দাপাদাপি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে খোকন যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে অপূর্ব মমতায় ভ'রে যায় বীথিকার বুক। কোন অনন্ত থেকে একে সে সৃষ্টি করেছে? সুদূর স্বর্গের আলো যেন জীবন্ত হ'য়ে জুড়েছে তার কোল—তার মন-প্রাণ, জীবন-যৌবন।

শেল্‌ফে স্তূপীকৃত—কাগজপত্রগুলোতে ধূলো জমেছে। পরিষ্কার করা আর হয় না। এক রত্তি খোকন, অথচ তার সহস্র চাহিদা—সময় কই তার? টাইপ-করা কাগজ-পত্রের নীচে অনাদৃত অবহেলায় প'ড়ে থাকে স্ট্যাটিস্টি-ক্যাল ও ম্যাথমেটিক্যাল জার্নালগুলি—ক্যালকুলাসের বই।

এক এক সময় খোকন শেল্‌ফের তক্তা ভর দিয়ে দাঁড়ায়—তার ছোট্ট হাতের নাগালের মধ্যে যা কিছু আসে সব ধরাশায়ী হয় নিমেষে। বীথিকা ছুটে এসে বলে, ওমা-কী হবে। আমার রিসার্চের কাগজপত্র!

খোকন ততক্ষণে কতগুলো কাগজ তুলে···মুড়েছে—মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে হাসে।

বীথিকা বলে, আবার হাসি হচ্ছে! হ্যাঁরে দুষ্টু ছেলে? তোর জন্যে কী আমার কাজকর্ম সব শিকেয় তুলে রাখতে হ'বে নাকি?

রূপকের কাছে খোকনকে টেনে এনে বীথিকা বললে, ছেলেটাকে একটু সামলাও তো—আমি আর পেরে উঠছি নে।

রূপক তখন ক্লাসের নোট তৈরী করছিল—মাথা নেড়ে সে বললে, এখন নয়—খুব ব্যস্ত।

বীথিকা রেগে বলে, আর আমার বুঝি কাজ নেই! সারাদিন ছেলটাকে ঘাড়ে ক'রে বেড়ালেই চলবে? নাও না গো একটু ওকে।

রূপক মুখ তুলে দেখে, খোকন হাসছে।

দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এই হাসির ইঙ্গিতেই কী ফুল ফোটে—পূর্ব-আকাশে আলোর তরঙ্গ বাজে?

তার মনে প'ড়ে যায় তখনকার কথা—যখন রিসার্চ করে জীবনটা কাটাবে ভেবেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল কখনো ঘর বাঁধবে না—শুষ্ক কঠিন পথে একা একা চলার প্রত্যয় ছিল মনে। তখনকার নীরস পথচলায় আত্মবিস্মৃত, চোখ তুলে কখনো দেখে নি নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেসে চলা। খোকনের মুখের হাসিকে সে হয়তো তখন দেখতে পেত মেঘের শুভ্রতায়—ভোরের দিগন্তের স্বর্ণলেখায়।

ক্লাসের নোট তৈরী করা আর হয় না রূপকের।

দুপুর। দৌরাত্ম্যে ক্লান্ত খোকন দোলনায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল বীথিকা। তার অনে·· দিনের সাধ—সংখ্যাতত্ত্বের জটিলতার খানিকটা জট খোলা—বড় বড় বিজ্ঞানীদের পাশে ঠাঁই পাবার দুরাশা—হঠাৎ খোকনের দিকে নজর পড়ে। এক রাশ চাঁপা ফুল যেন ছড়িয়ে আছে দোলনাটিতে। আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে তার মমতার আশ্রয়ে—আর মুখপানে চেয়ে ফুটে উঠেছে পলে পলে। তার না-মেটা সব সাধ মেটাবে বুঝি ঐ কচি মুখের হাসিটুকু দিয়ে।

জার্মানি থেকে তাপস চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে। জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত তাদের যুগ্ম প্রবন্ধ নিয়ে নাকি অনেক আলোচনা হ'য়েছে স্থানীয় সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মহলে। ঐ প্রবন্ধের পর আরও প্রবন্ধ লেখবার জন্য ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু বীথিকা নির্বিকার কেন? তার সহযোগিতা ছাড়া তাপস কিছুই লিখতে পারছে না।

বীথিকা মনে মনে হাসে। তাপসের সঙ্গে ক্যালকুলাস করত—কত বছর আগেকার কথা! তাপস কিন্তু শুধু অঙ্ক ক'ষে তৃপ্ত হয় নি। বীথিকা তখন স্বপ্ন দেখত—অঙ্ক কষে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তাপসও দূরে সরে গেছে। তারপর কী ক'রে কাছে এল—দু'জনে মিলে কতগুলি মামুলি ফর্মূলা দিয়ে জেনারেলাইজেশন করেছে—আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তা চমক লাগাবার মত। তাপসের ঔৎসুক্যে সে প্রবন্ধের খসড়াটি পাঠিয়ে দিয়েছিল তার কাছে। তাপস খসড়াটি দেখিয়েছে বন্ য়ুনিভার্সিটির কার্ল স্যালহাউজেনকে। স্যালহাউজেনের উৎসাহে খসড়াটি থেকে সে দাঁড় করিয়েছে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। সবাই প'ড়ে চমৎকৃত হ'য়েছে হয়তো—কিন্তু কী আছে ওতে! কী হ'বে ঐ অন্তঃসারশূন্য প্রবন্ধটির জের টেনে?

খোকন ঘুমোয়। সমস্ত পৃথিবী জেগে আছে তার শিয়রে। নতুন জীবনকে স্বাগত জানায় পুরোনো পৃথিবী। এমন অসহায়—অথচ রিক্ততার আড়ালে কী অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে এসেছে সঙ্গে! ভিক্ষুকের মত আসে নি মায়ের স্নেহ ভিক্ষা করতে। কচি মুখের ঐ হাসিটুকুর দাম কে দেয়। তাঁর বুক-উজাড়-করা স্নেহ ঢেলে দিয়েও সে দিতে পারে নি।

রূপক বলে, তাপস চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে—দু' ছত্র লিখে জবাব তো দিতে পার।

বীথিকা বলে, কী জবাব দেব! জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালে আর একটি প্রবন্ধ লিখতে তো আমি পারব না।

কেন পারবে না? তোমাদের ঐ প্রবন্ধ প'ড়ে যেন কোন ম্যাথমেটিশিয়ানের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এর পর কী। চুপ ক'রে থাকলে সবাই সন্দেহ করবে—তোমাদের নীরবতা তোমাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট ক'রে তুলবে না?

অন্তঃসারশূন্যই তো। প'ড়ে তুমি বোঝো নি। বীথিকার মুখে-চোখে চাপা হাসি ঝিলিক দেয়।

রূপক বীথিকার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, প'ড়ে বুঝেছি যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। অন্ততঃ পক্ষে আর একটি প্রবন্ধ অনায়াসে লিখে ফেলতে পার।

খোকন তখন তার মস্ত ডল পুতুল নিয়ে খেলা করছিল—তার দিকে তাকিয়ে বীথিকা বললে, লিখি কী করে! সেদিন বাজারের হিসেব লিখছিলাম—খোকন কলমটা আঁকড়ে ধরল। ওরে ও দুষ্টু ছেলে, ওটা কী খাবার জিনিস!

খোকন তখন পুতুল ছেড়ে মায়ের আঁচল মুখে পুরেছে।

খোকনের মুখ থেকে আঁচল ছাড়িয়ে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বীথিকা বললে, হ্যাঁরে খোকন, যা হাতের কাছে পাস তা'ই তুলে মুখে পুরিস—ঐ তো মোটে তিনটি দাঁত আছে—ভেঙ্গে যদি যায়, তখন কী হবে!

খোকন হি হি ক'রে হাসে।

অনেক ঝর্ণার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস—ভোরে প্রথম আলোর রহস্য—পাগল-পারা নদী—স্তব্ধ ফুলের বিকাশ—সব এসে মিশেছে সে হাসিতে।

জীবন মহাদেশের সঙ্গে যোগসূত্র—সবার মাঝে বেঁচে থাকার আনন্দের স্বাদ—এমন নিবিড় ক'রে অনুভব করে নি কখনো বীথিকা। সবার মাঝে সঞ্চয়ন ক'রেও সে ছিল একা; আজ আর সে একা নয়। খোকন এসে তাকে মিশিয়ে দিয়েছে সকলের প্রাণবন্যার ছন্দে। জগতের আনন্দযজ্ঞে যে তারও নিমন্ত্রণ আছে সে খবর এনে দিয়েছে তাকে।

কোন দুরাশার পিছনে ব'য়ে যাচ্ছে তাপসের নিষ্ফল পত্রপ্রবাহ! এতও চিঠি লিখতে পারে। বীথিকার ইচ্ছে হ'ল তাকে লিখে দেয় যে তার চিঠি পড়ার সময় নেই। পরক্ষণে মনে হয়, আহা থাক। চিঠি লিখছে—হয়তো ওতেই ওর আনন্দ।

তাপস কী তাকে ভালবাসে? তা' বাসুক না। মনের

মধ্যে আশ্চর্য এক প্রসার অনুভব করে বীথিকা—সব কিছুর প্রতি নিবিড় করুণ মমতা—আকাশের মত যেন তার সীমা পরিসীমা নেই। তার স্নিগ্ধ মাতৃত্বের আশ্বাস দিয়ে সবাইকে আগলে রাখবার সাধ।

তাপস লেখে, আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই আমার। তোমার অসহযোগিতা আমার এখানকার পালা শেষ ক'রে দিয়েছে। এরপর কোথায় যাব জানিনে।

বীথিকার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এ তো সে চায়নি। সবাইকে সে কাছে টানতে চায়। বনস্পতির মত ছায়ার আশ্বাস দিতে চায় সে তৃষিত তাপিত প্রাণে।

চিঠি লিখবে সে তাপসকে। লিখবে, ফিরে এস আকাশ থেকে নেমে এস মাটিতে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অর্থহীন পথের পুঁথির পাঠোদ্ধারে আর কাজ নেই।

কিন্তু চিঠি লেখার কাগজ খুঁজেও পাচ্ছে না। আমার একটা লেটার-প্যাডও নেই!

খোকন হাত বাড়িয়ে কালির শিশি উল্টে দিয়েছে—কালির কালিমায় কালো হ'য়ে উঠেছে খোকনের মুগ্ধ মুখখানা।

বীথিকা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ছুটে এসে বলে, এখন আমি যাই কোথা! একটু চোখের আড়াল করেছি আমি, হ্যাঁরে খোকা, অমন চাঁদপানা মুখখানায় কালি না মাখিয়ে বুঝি সুখ নেই!

খালি কালির শিশির দিকে চেয়ে খোকন একটু হাসে।

এক ফোঁটা কালি নেই শিশিতে। ফাউন্টেনপেনও শূন্য। রূপক বাড়ি ফিরলে কালি আনিয়ে তারপর চিঠি লিখবে।

রূপক সেদিন বাড়িতে ফিরে বললে, তোমাদের সেই প্রবন্ধটার ওপর প্যারিসের একটি কাগজে রিভিউ বেরিয়েছে।

খোকনের চোখে কাজল পরাতে পরাতে নির্লিপ্ত-কণ্ঠে বীথিকা বললে, কী লিখেছে?

নিয়ে এসেছি কাগজটা—প'ড়ে দেখ।

পড়ব কখন? দুষ্টু ছেলেটা কী পড়তে দেবে! বল না কি লিখেছে।

যা' লিখেছে আমিও ঠিক হজম করতে পারি নি। তোমাদের প্রবন্ধটা আমাকে আবার পড়তে হ'বে।

সকৌতুকে বীথিকা চোখ তুলে বললে, এমন কী লিখেছে গো!

লিখেছে, থিয়োরী অব্ নাম্বার্সের যে ব্যাখ্যা তোমরা করেছ তা' নাকি অভূতপূর্ব। এমন মৌলিক ব্যাখ্যা নাকি আগে কেউ করেনি। লিখেছেন ডক্টর পেরাঁ। তলিয়ে বিচার না ক'রে হঠাৎ কিছু লেখেন না তিনি।

বীথিকা চমকে ওঠে। রূপকের মুখের সামনে হত-বুদ্ধির মত চেয়ে থাকে।

রূপক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, আমার কিন্তু এতটা মনে হয়নি। এ সব নিয়ে সারাটা জীবন কাটল—অথচ বুঝতে পারিনি। আবার প'ড়ে দেখতে হ'বে তোমাদের প্রবন্ধটা।

বীথিকা বললে, আবার প'ড়ে দেখতে হ'বে কেন? তুমি যা' বুঝেছ ঠিকই বুঝেছ। কোথাকার কে ডক্টর পেরাঁ—ও সব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে, তোমার জন্য পুলি-পিঠে ক'রে রেখেছি—খাবে চল। তারপর খোকনকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাব আজ। নতুন প্যারাম্বুলেটারটা ব্যবহার করাই হ'ল না।

সেদিন অনেক রাত্রে ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সের বুলেটিনটি নিয়ে রূপকের লেখবার টেবিলে এসে বসল বীথিকা টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে। খোকন তার দোলনায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রূপকও ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ঘুমন্ত রূপককে ঠিক খোকনের মত অসহায় মনে হয়। তেম্নি দুর্বল। খোকনের মতই তার মমতার আশ্রয় খুঁজছে যেন।

পেরাঁর রিভিউটি ফরাসীতে লেখা—ইংরেজী অনুবাদও দেওয়া আছে। মামুলি সমালোচনা নয়—রীতিমত প্রবন্ধ। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে বীথিকা। অতবড় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্! অঙ্কের মাপে নিক্তিতে ওজন-করা সমালোচনা—কোথাও কোন আবেগের উচ্ছ্বাস নেই। অথচ পড়তে গিয়ে আবেগের তরঙ্গ ওঠে তার মনে। প্রবন্ধের উপসংহারে পেরাঁ বীথিকা ও তাপসের যুক্ত-প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—আসন দিয়েছেন তাদের শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্‌দের পাশে।

বীথিকা ব'সে রইল টেবিলের ওপর টেবিলল্যাম্পের

আলোর বৃত্তের দিকে চেয়ে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল ছায়াপথের বিস্তারের পাশে কালপুরুষ জ্বল জ্বল করছে। অসীম রহস্যের সঙ্কেত যেন তারার আলোর স্পন্দনে! সুদূরের হাতছানি যেন ছায়াপথের শুভ্র রেখায় আঁকা। কোথায় ফ্রান্স! কত দূরে! প্রফেসার ডক্টর পেরাঁর অভিনন্দন নয়—যেন সুদূর নীহারিকার আকর্ষণ। তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

পরক্ষণে দোলনায় খোকনের দিকে তার নজর পড়ে। দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে খোকনের মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার সব সুখ-দুঃখ মন্থন করা বুকের ধন—আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের রহস্য যেন মাটিতে নেমে এসেছে।

বীথিকা রান্নাঘরে ব'সে তরকারী কুটছিল। খোকন তার পেছনে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

রূপক এসে বললে, তোমার একটা চিঠি—প্যারিসের ছাপ-মারা।

বীথিকা অবাক হ'য়ে বলে, কে আবার লিখল ?

গামলায় রাখা জলে হাত ধুয়ে আঁচল দিয়ে হাত মুছে বীথিকা বললে, দেখি চিঠিটা।

খামের ফ্ল্যাপ ছিঁড়ে বীথিকা দেখল চিঠি—লিখেছেন ডক্টর পেরাঁ। তাপসও তার যুগ্ম-প্রবন্ধের উল্লেখ ক'রে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। তা' ছাড়া তিনি লিখেছেন যে ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সের পক্ষ থেকে তাকে একটি গবেষণা-বৃত্তি দিতে চান। তাপসকেও দিয়েছেন তিনি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা তাপস ও সে ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে।

মায়ের কাঁধ ধ'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল খোকন বার বার। অবশেষে সে হাল ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রূপকের পায়ের কাছে এসে মুখ তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসে—রূপক তাকে কোলে তুলে নেয়।

চিঠিটা অনেকবার পড়ল বীথিকা। ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স—মাথার ভেতরটাতে কী রকম যেন তোলপাড় ক'রে ওঠে। মুখ তুলে সে তাকাল রূপকের দিকে। রূপকের কোলে খোকন। খোকনের মুখে রূপকের আদরই যেন বেশি ফুটে ওঠে। আগে কখনো লক্ষ্য করেনি।

খোকন হাসছে। রূপকও। বীথিকায় বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে ওঠে!

রূপক বললে, কে চিঠি লিখেছেন বীথি ?

কাঁপা গলায় বীথিকা বললে, ডক্টর পেরাঁ। চিঠিটা প'ড়ে শোনায় সে।

রূপকের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে বললে, আজই জবাব দিয়ে দাও যে স্কলারশিপটা তুমি নেবে।

রূপকের মুখের দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বীথিকা বললে, নিতে বলছ তুমি ?

বলছি বৈ কি! এত বড় একটা সুযোগ! ডক্টর পেরাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়।

বীথিকার চোখ দুটি জলে ভ'রে আসে—সে বললে, কিন্তু কী করে যাব! আমার খোকন—

খোকন আমার কাছে থাকবে। পারবি নে খোকন তোর মাকে ছেড়ে থাকতে ?

বীথিকা উঠে দাঁড়িয়ে রূপকের কোল থেকে খোকনকে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, ও কী বলছ তুমি! এক মুহূর্ত ওকে চোখ ছাড়া করতে পারি নে—আর তুমি কিনা—

বীথিকার গলার স্বর ধ'রে আসে।

তাপস চিঠি লিখেছে, মনে পড়ে বীথি, তোমাদের বাগানে বসে তুমি ক্যালকুলাস কষছিলে—চোখ তুলে চেয়ে দেখ নি তুমি—জিনিয়া, কসমস ও ডালিয়ার সমারোহ—আকাশ থেকে মুক্তার মত ঝ'রে-পড়া সন্ধ্যাগুলি। তুমি তখন বলেছিলে অঙ্ক কষেই তোমার জীবন কাটাবে। ক্যালকুলাসের ফর্মুলা ডিঙ্গিয়ে তোমার নজরও পড়ত না আমার দিকে—ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সে পুরোনো সে সব দিনের মত আবার তোমার অঙ্ক কষার সাথী হ'তে চাই। আপত্তি কোরো না লক্ষ্মীটি। চটপট ডক্টর পেরাঁকে জানিয়ে দাও যে স্কলারশিপটা তুমি নেবে।

আকাশে তারাগুলি জায়গা বদলায়—দূরের বাড়ি-গুলোর মাথায় কালপুরুষ ওঠে। বৃহস্পতি তখন পশ্চিম দিকে চ'লে পড়েছে। আকাশজোড়া অদ্ভুত একটা গতির

স্পন্দন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব করে। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ঐ দূর আকাশের তারার দিকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

ফ্রান্স—প্যারিস—তার কত বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—বিদেশে যাওয়া—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণা করা।

কিন্তু খোকনের ছোট্ট দুর্বল হাতের মুঠি তাকে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছে। তাকে নির্দয়ভাবে মুচড়ে সরিয়ে নিয়ে সে চলে যাবে। ভাবতেও মনে মনে শিউরে ওঠে বীথিকা।

রূপক একদিন য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে বীথিকাকে বললে, তোমার হ'য়ে ডক্টর পেরাঁকে আমি লিখে দিলাম যে স্কলারশিপটা তুমি নিচ্ছ।

বীথিকা চমকে উঠে বললে, সে কী! তোমাকে তো আমি বলেছি যে আমি যেতে পারবো না। তবু—

এত বড় একটা সুযোগ হেলায় নষ্ট করতে নেই বীথি। আমি জানি তুমি নিজে থেকে কখনো যেতে চাইবে না। তাই আমাকেই লিখে দিতে হ'ল।

বীথিকা ধরা গলায় বললে, যেতে চাই নে, তবু জোর ক'রে পাঠাবে?

বীথিকার অশ্রুসিক্ত মুখখানা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে রূপক বললে, যেতে চাও না এমন তো নয়। আমি লক্ষ্য করেছি ডক্টর পেরাঁর চিঠিখানা বার বার ক'রে পড়ছ তুমি।

বীথিকা কিছু বলতে পারল না।

বীথিকার মা এসে বললেন, খোকন আমার কাছে থাক্ না—দুটো বছর বই তো নয়। এমন একটা সুযোগ যখন পেয়েছিস—আর জামাইয়েরও খুব ইচ্ছে—

বীথিকার পাসপোর্ট ও ভিসার বন্দোবস্ত ক'রে ফেলে রূপক। টিকিটও কেনা হ'য়ে যায়।

বীথিকা বললে, তোমার রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে—সাত তাড়াতাড়ি আমাকে এ দেশ থেকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচ। কেন বল তো? আমি কী তোমার চক্ষুশূল হয়েছিলুম?

রূপক বললে, আমার চোখ খুলে দিয়েছ বীথি। এত বছর ধ'রে যা' কিছু আমি করেছি সব ভুল, সব গোঁজামিল—এখন বুঝতে পেরেছি। অথচ আবার গোড়া থেকে শুরু করবার উৎসাহও নেই, সময়ও নেই। কিন্তু তুমি ঠিক রাস্তা ধরেছ—ডক্টর পেরাঁর মত আমারও তাই মত। যা' আমি করতে পারিনি তুমি তা' করবে—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমার ব্যস্ততা।

এয়ার ফ্রান্সের প্লেনটা অনেক রাতে ছাড়ল। খোকন তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত খোকনকে বুকে চেপে ধ'রে কান্না চাপতে পারেনি বীথিকা।

অন্ধকারের বুকে নিঃসীম শূন্যের মধ্যে পাড়ি দেয় এয়ার ফ্রান্স ইণ্টারন্যাশন্যালের প্লেন। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে বীথিকা শূন্য দৃষ্টিতে। নিরেট কালো আঁধারের বিপুল বিস্তারের ওপারে কোথায় সেই অবোধ শিশুর মুখের হাসি!

মাস ছয়েকের মধ্যেই তাপস ও বীথিকা খুব নাম ক'রে ফেলেছে। ডক্টর পেরাঁ ওদের কাজে খুব খুশি। ওদের গোটা দুয়েক প্রবন্ধ ইতিমধ্যে ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

রিসার্চের মধ্যে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে বীথিকা। তাপস তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না।

ডক্টর পেরাঁ তার নিষ্ঠায় চমৎকৃত। তাঁর তত্ত্বাবধানে আর যে সব ছাত্রছাত্রী গবেষণা করছে তারাও স্তম্ভিত। কে একজন একদিন বলেছিল, ভারতীয় ঋষিমুনিদের তপস্যার গল্প শুনেছি। মিসেস কী সেই ঐতিহ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন?

আর একজন বললে, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ওঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে রিসার্চ যেন ওঁর আগে কেউ কখনো করেনি।

তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি কোলেং!

কোলেং বলে, হিংসে হ'বে কেন? রিসার্চের বাইরের জীবনকে যে জানল না—এ্যাকাডেমীর রিসার্চ হলে ঘাড় গুঁজে অঙ্ক কষে কষে যার দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—তাকে হিংসে করতে যাব কোন দুঃখে? ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। বেচারী!

বেচারীকে একবার আমাদের রাতের কফির আড্ডাতে টেনে নিয়ে এস না কোলেং।

কোলেৎ মুচকি হেসে বললে, সে কী আমার মত মেয়েমানুষের কাজ? তুমিই ব'লে দেখ না পল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় এ্যাকাডেমী ভবন থেকে বেরিয়ে আসছে বীথিকা—পল তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে আলাপ করি।

বীথিকা মুখ তুলে হেসে বললে, বেশ তো।

পল তার সঙ্গে হাঁটতে হাটতে বললে, আপনার পেপারগুলো আমি পড়েছি—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি। তাপসের সঙ্গে আলোচনা করেছি—কিন্তু সে-ও ঠিক বোঝাতে পারেনি। আপনার কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইব ভেবেছিলাম—কিন্তু আপনি যা' ব্যস্ত, হয়তো সময় করে উঠতে পারবেন না।

সলজ্জ হেসে বীথিকা বললে, এমন কী আর ব্যস্ত! অনায়াসে সময় ক'রতে পারবো।

আগ্রহের সুরে পল বললে, আসুন না আমাদের কাফেতে আজ। রোজ রাত্তিরে আমরা ওখানে একত্র হই। মারিয়া, কোলেৎ, লুইজি, জন, রবার্টো ও আমি—তাপসও মাঝে মাঝে আসে। একমাত্র আপনি ছাড়া ডক্টর পেরাঁর ছাত্রছাত্রীরা সবাই ওখানে আসে।

একটু ইতস্তত করে বীথিকা পলের সঙ্গে যেতে রাজি হ'ল।

কাফেতে ওরা গিয়ে পৌছতেই কোলেৎ রবার্টোর কানে কানে বললে, এক শ' ফ্রাঙ্ক ধার দিতে পার—রবার্টের সঙ্গে পল বাজি জিতেছে—ওকে দিতে হ'বে।

রবার্টো আশ্চর্য হ'য়ে বললে, কিসের বাজি!

বীথিকাকে আমাদের কফির আড্ডাতে নিয়ে আসা নিয়ে। আমি বলেছিলাম—পল কিছুতেই ওকে আনতে পারবে না। পল তাই এক শ' ফ্রাঙ্ক বাজি রাখল।

দিন কয়েক বাদে কোলেৎ পলকে বললে, বীথিকা যে কফির আড্ডায় রীতিমত মক্ষীরাণী হ'য়ে উঠল। তোমরা ছেলেরা ওকে নিয়ে যা আদেখলে-পনা শুরু করেছ তাতে মনে হচ্ছে যেন এর আগে তোমাদের আড্ডায় কোন মেয়ে আসে নি।

পল বললে, হিংসে হচ্ছে নাকি?

একটু একটু হচ্ছে বৈ কি। ঐ দেখ না রবার্টো কী রকম হাঁ ক'রে বীথিকার কথাগুলো গিলছে। আর রবার্টের দিকে কী রকম কটমট ক'রে তাকাচ্ছে মারিয়া—এক্ষুণি বুঝি ভস্ম করে ফেলবে।

শূন্যের সঙ্গে একের অন্বয় করতে চেয়েছিল বীথিকা—দেড় বছর ধরে ডক্টর পেরাঁর অধীনে তা' নিয়ে গবেষণা করেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ কফিখানার নৈশ বৈঠকে আবিষ্কার করেছে পাঁচ জনের একজন হওয়ার আনন্দ। সংখ্যার সংজ্ঞা অন্বেষণের পিপাসাকে অতিক্রম করে পাঁচ-জনের সাহচর্য উপভোগের নেশা।

প্রথম প্রথম দু' তিন দিন অন্তর অন্তর বীথিকার চিঠি আসত। খোকন সম্বন্ধে ব্যাকুলতা চিঠির প্রায় সবখানি জুড়ে থাকত। খোকন কেমন আছে—কত বড় হয়েছে—ক'টা দাঁত উঠেছে—এই সব প্রশ্ন প্রতি চিঠিতেই। প্রতি মাসে খোকনের ছবি পাঠাতে লিখত। কাজের বিষয় কিছুই লিখত না। অবশ্য ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সের বুলেটিন মারফত রূপক তার কাজের বিষয়ে সব খবর পেত। এই ছাড়া ডক্টর পেরাঁর কাছ থেকেও জানতে পারত। ডক্টর পেরাঁ তাকে লিখতেন যে বীথিকার মত এমন মৌলিক গবেষক কখনো তিনি দেখেন নি।

কিন্তু ক্রমশঃ চিঠি লেখার ব্যাপারে বীথিকার শৈথিল্য প্রকাশ পায়। মাসে দু' একখানার বেশি চিঠি আর লেখে না—রূপকের অনেকগুলো চিঠির জবাব দু'চার ছত্রে আসে। রূপক পড়ে বুঝতে পারে যে দায়-সারা ভাবে লেখা।

দেড় বছরের খোকন নতুন কথা বলতে শিখেছে। আধো আধো স্বরে ডাকে, বা-ব্বা, দি-দ্দা! রূপকের মনে হয় যেন দিনের প্রথম আলো ফোটার বিস্ময়ের মত তার প্রথম কথা বলা।

রূপক খোকনকে বুকে চেপে ধ'রে বলে, বল তো মা।

খোকন চুপ ক'রে তার ডাগর ডাগর চোখ মেলে বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকে। পরক্ষণে হি হি ক'রে হাসতে শুরু করে—সে হাসি যেন থামে না।

জেনেভার কোন্ এক ইয়ুথ কন্ফারেন্সে সভানেত্রী করেছে বীথিকাকে—তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে—খবরের কাগজে ছবিও ছেপেছে। এক গাদা তরুণ-তরুণীর মাঝখানে বীথিকা—রূপকের মনে হ'ল যেন আর সে বীথিকা নয়।

খোকনকে ছবিটা দেখিয়ে রূপক বললে, এই ঢ্যাখ্ তোর মা।

ছবিটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে খোকোন খবরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হ'ল। রূপক কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলে, ও কী হচ্ছে—দুষ্টু ছেলে!

মহাভারতের পথে পথে

নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৩ ॥

রাধা হাউস। আশ্রমের অনেকগুলি বাড়ির মধ্যে এটি একটি। এই বাড়িতে শ্রীমতীরা থাকেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা তামিল ভাষায় কলকল করতে করতে দল বেঁধে এগিয়ে এল। নিজেরাই কাড়াকাড়ি করে সঙ্গের মালপত্তর নিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠিয়ে দিল। শ্রীমতী দেখি স্বয়ংসিদ্ধা, প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে সকলকে বেঁধে ফেলেছেন সহজেই, ভাষা বা জাতি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

খবর পেয়ে দোতালা থেকে নেমে এলেন তাঁর শ্বশুরমশায়। মুখে শিশুর সারল্য। মানুষ বৃদ্ধ হলেই যে সুন্দর হয় তাঁকে না দেখলে তা বোঝা যেত না। একগাল হেসে বলে উঠলেন—মা এসেছ, আর কোনো ভাবনা নেই।'

শ্রীমতী পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি নিজের নাম বলতেই তিনিও নামটি বললেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

সুরেনবাবু বললেন—'আপনি তৎক্ষণ স্নান-খাওয়া সেরে ফেলুন। আমি এখন আশ্রমে যাচ্ছি। শ্রীঅনিলবরণের সঙ্গে কখন আপনার দেখা হবে আসার সময় খবর নিয়ে আসব।'

স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা-গরম দুরকম জল ছিল। দুদিনের পরে বেশ তৃপ্তিতে স্নান করা গেল। তারপরে ভব্য-সভ্য হয়ে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। গরম ভাত, মাখন, আলুভাতে, আর পর্য্যাপ্ত ইলিশ মাছ। বাংলায় ফিরে গেলাম নাকি!

শ্রীমতী পরিবেশন করতে করতে বললেন—'টাটকা মাছ। বাবা নিজে খান না, তবে আমাদের জন্যে বাজার থেকে আনেন। সাগর থেকে সদ্য ধরে বাজারে আনে বিক্রী করতে। ব'ঙলাদেশের মেয়ে তো, ইলিশ পেলে অন্য মাছ রুচবে কেন বলুন?'

'তাতো বটেই। কিন্তু এতো মাছ খাই কি করে?'

'গল্প করতে করতে যে কদিন থাকেন খেয়ে নিন। এক মাস তো দক্ষিণ ভারত ঘুরে বেড়াবেন, এর মধ্যে আর কোথাও মাছ খেতে পাবেন না।'

'যে কদিন থাকব এখানেই খাব?'

'শুধু খাওয়া কেন আপনার অসুবিধা না হলে থাকতেও পারেন।'

'ভাবছি, আমার এতো সুবিধা না শেষ পর্য্যন্ত জুলুমে দাঁড় করিয়ে ফেলি আপনাদের কাছে। সেই ট্রেণ থেকে যা শুরু করেছি....'

'একটা কিছু তো করছেন। আপাতত খাওয়াটা সেরে ফেলুন।'

সুরেনবাবু আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

'জানেন, আপনার কথা আশ্রমে বলে এলাম। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। আমি ওপরে আছি। তিনটের সময় দু'জনে আশ্রমে যাব।'

বিশ্রাম নিতে শেষ পর্য্যন্ত ইচ্ছে করল না। বিশ্রামের মনটি কলকাতায় ছেড়ে এসেছি। এখন শুধু দেখা-শোনা আর সঞ্চয় করা। আলস্যে কাটালে এদেশের আলোর রূপটি দেখা যাবেনা।

ওপরে সুরেনবাবুর কাছে গেলাম।

তিনি তখন তাঁর লাইব্রেরীতে বসে নিজের লেখা বইয়ের প্রুফ দেখছিলেন। এই বয়সে একটুও ক্লান্তি নেই। কী পরিশ্রম না করেন! কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতীর কাছে শুনেছিলাম, ভোর চারটে থেকে রাত প্রায় এগারো-বারোটা পর্য্যন্ত এইভাবে তিনি আশ্রমের কাজ করে থাকেন। আশ্রমের কাজই তাঁর দিনচর্য্যার অঙ্গ। তবে আশ্রমিক হয়ে থাকলেও তাঁরা আশ্রম থেকে খাওয়ার খরচ নেন না।

আমাকে দেখে সুরেনবাবু প্রুফ দেখা বন্ধ রেখে গল্প শুরু করলেন।

বললেন—'দেখুন না, ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলাম। এখন বাংলায় বই লিখছি, আর অনুবাদকের কাজ করছি।'

হাসিমুখে জবাব দিলাম—'বহুমুখী প্রতিভা থাকলে আর শ্রীঅরবিন্দের কৃপা হলে সবই সম্ভব হয়।' তারপরে আমার আগ্রহ দেখে তিনি তাঁর বইগুলো দেখালেন।

এ পর্য্যন্ত পাঁচ ছ'খানি বই তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে 'মানব জীবনের আদর্শ' 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের ভূমিকা' 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শন-প্রথম ভাগ' বই তিনখানি আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। শ্রীঅরবিন্দের 'দি লাইফ ডিভাইন (১ম ভল্যুম্)' গ্রন্থখানি সাধারণের উপযোগী সহজ-বোধ্য বাংলায় তিনি লিখেছেন—দিব্যজীবন বার্ত্তা (১ম খণ্ড)' নামে তাঁর সেই গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপার কাজও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'যোগসমন্বয়ের তত্ত্ব'র ওপরে তিনি একখানি বই লিখেছেন। নাম দিয়েছেন 'পূর্ণযোগ'—এটিও আপাতত যন্ত্রস্থ।

বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখলাম। কতো দুরূহ তত্ত্ব কী সহজেই না তিনি লোকলোচনের সামনে তুলে ধরেছেন! বহু মনীষী আর নামী পত্র-পত্রিকাও তাঁর সেই প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

সুরেনবাবু তাঁর 'মানব জীবনের আদর্শ' আর 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শন (১ম ভাগ)' বই দুখানি আমাকে উপহার দিলেন। বললেন 'আর কোনো বইয়ের বাড়তি কপি আপাতত আমার কাছে নেই।' একটা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলে উঠলেন—'ঠাকুরকে দেওয়ার মতো শক্তি আমার কী-ই বা আছে! আমার সকল শ্রম তো আশ্রমের জন্যে—আমার গ্রন্থস্বত্ব তাই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমকেই দিয়ে দিয়েছি।'

খানিকক্ষণ পরে বললাম—'আমার কিছু লেখা ছিল। কিন্তু তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সাধনাবিষয়ক তো নয়ই। তাই কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিনা সেগুলো আপনাকে দেওয়ার যোগ্য কিনা!'

'সে কী কথা! নিশ্চয়ই দেবেন। সাহিত্য সৃষ্টি কি সোজা কথা!'

'সাহিত্য হয়েছে কিনা জানিনা। তবে যদি আপনার সময় হয়তো পড়ে দেখবেন। এই বলে আমার 'শরৎচন্দ্রিকা' আর 'পরিক্রমা' বই দুটি দিয়ে বললাম—'আরও একটি বই আমার ছিল কিন্তু আসার সময় সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি।'

বই দুটো দেখতে দেখতে বললেন'—কিছুদিন এখন আছেন তো?'

'ইচ্ছে তো হয়। কিন্তু দুটো দিনের বেশী কিছুতেই থাকা যাবে না।'

'তা হলে দুটো দিন আমার এখানেই থাকুন। এরই মধ্যে আশ্রমের যতটা সম্ভব আপনাকে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি করব।'

॥ ৪ ॥

সমগ্র পণ্ডিচেরী এলাকার অর্ধেকের কিছু কম অঞ্চল নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যোগাদর্শ ও দিব্যচেতনার সাধনশিক্ষায় নিয়োজিত এই আশ্রম। বর্তমানে শ্রীমায়ের পরিচালনায় পনেরোটি দেশের বারোশ' মানুষ এখানে আশ্রমিক হয়ে সেই সাধনায় ব্যাপৃত আছেন।

আশ্রমের অনেকগুলি বাড়ি। বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রমিকরা থাকেন। মূল আশ্রম-ভবনে শুধু শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা, আশ্রম সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং শ্রীঅনিলবরণ রায় থাকতেন। শ্রীঅরবিন্দের মহানির্বাণলাভের পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় আশ্রম থেকে চলে গেছেন। মূল আশ্রমে এখন আছেন শ্রীমা, শ্রীনলিনীকান্ত ও শ্রীঅনিলবরণ। অবশ্য দিনের বেলায় কাজে-কর্মে আশ্রমিক ও ভক্ত দর্শকে আশ্রম সব সময় পূর্ণ থাকে। প্রতিদিন ভোর ছটা পনেরোর সময় অলিন্দে দাঁড়িয়ে শ্রীমা পনেরো মিনিটের জন্য সকলকে দর্শন দেন। তার পরে সারা দিনে-রাতে আর তিনি কাউকে দর্শন দেন না। দোতলায় নিজস্ব কক্ষে সাধনে ও ভজনে ডুবে থাকেন। অথচ আশ্চর্যের কথা—আশ্রমের এতগুলো মানুষ ও নিত্যনৈমিত্তিক রাজসূয় যজ্ঞের মতো এতো বড় বিরাট যজ্ঞশালা—ঐ এক অতিমানবীর অলৌকিকতায় না কী নিঃশব্দে নির্বিবাদে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে চলেছে!

সুরেনবাবুর সঙ্গে বিস্ময়াবিষ্ট মনে সেই সব কথা চিন্তা করতে করতে মূল আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কেমন এক পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ পবিত্র সুরভি প্রাঙ্গণে আসতেই পাওয়া গেল। প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে অঙ্গন পর্যন্ত ফুলের গাছ। দ্বারের কাছে আশ্রমের অফিস আর গ্রন্থাগার। ওদিকের অঙ্গনে শ্রীঅরবিন্দের সমাধি। শুনলাম, সমাধিগর্ভে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরশিরে শায়িত আছেন। মহাসমাধিবেদী ফুলে আর ফুলের স্তবকে ঢাকা পড়েছে—একটা সূচীশব্দশূন্য নৈঃশব্দ্য। সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ভক্তের দল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে মহাসমাধিবেদীমূলে প্রণাম করে সুরেনবাবুর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দোতলার যে ঘরটিতে দেহরক্ষা করেছিলেন সেই ঘরটি দেখলাম। ওপাশে প্রার্থনাসভার 'হল'। অনেকে তখন আসন করে বসে নীরবে প্রার্থনা করছিলেন। পেছনে সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত'র কক্ষ। ওপরের ঘরে শ্রীমা।

সুরেনবাবু সংবাদ নিয়ে জানলেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে চারটের আগে দেখা করা যাবে না। বললেন 'চলুন যাই দেখি শ্রীঅনিলবরণের সঙ্গে দেখা হয় কিনা।' চলতে চলতে বললেন—'আচ্ছা আগে কি ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?'

'আজ্ঞে না। এখানে আসব শুনে কলকাতায় এক কাগজের সম্পাদক ওঁকে চিঠি দিয়েছিলেন আমার ঠিকানা দিয়ে। তারপরে উনি আমাকে সরাসরি একটা চিঠি দিয়ে জানান—আমি আশ্রমে এলে এখানে থাকা-খাওয়া বা দেখাশোনায় সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।'

গ্রন্থাগারের ওপরতলার একটি ঘরে শ্রীঅনিলবরণ থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন ঘরে ছিলেন। সুরেনবাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আশ্রমের কাজে চলে গেলেন। বললেন—'আপনি ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন, পাঁচটার পরে গেটে আবার দেখা হবে।'

শ্রীঅনিলবরণ খাটে আধোশোয়া অবস্থায় কথা বলছিলেন। তাঁর শিয়রের কাছে একটি চেয়ার ছিল। সেইটিতে বসতে বলে জিগ্‌গেস করলেন 'কোথায় উঠেছেন এখন? আমার চিঠির জবাবে আপনার পত্র আমি পেয়েছি।'

'সুরেনবাবুর কাছে উঠেছি। কিন্তু আমার যা প্রোগ্রাম তাতে আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও পুরো দুটি দিনও এখানে থাকতে পারছি না। এরই মধ্যে দেখাশোনার ব্যবস্থা আপনি দয়া করে ক'রে দিন।'

'কাল সকালে আশ্রমের সমস্ত এলাকা আপনি দেখবেন। গাড়ি এবং তার অন্যান্য ব্যবস্থা সুরেনবাবুই করে দেবেন। অতি সজ্জন মানুষ উনি। কাছাকাছি যা-যা দেখবার আজ ঘুরতে-ঘুরতে দেখে নিতে পারেন। আপনারা লেখকমানুষ, খোলা মনে সব কিছু দেখুন, কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে যখন খুশি আমার কাছে আসুন, বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। নানা লোকের নানান ধারণা। কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন কি আমার মধ্যে বা আমাদের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন? অতি সাধারণ মানুষ মশাই। শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায় শ্রীমার নির্দেশে শুধু কর্ম করে চলেছি, সমাজ সেবার চেষ্টা করছি।'

অত বড় মানুষটির এমনি নিরহঙ্কার খোলা-মেলা মনের উজ্জ্বল রূপটি মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর অমূল্য সময় জুড়ে আশ্রম সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে নিলাম।

বললেন—'আশ্রমে অনেক রকমের কাজ কর্ম আছে। প্রত্যেক আশ্রমিককে তার পছন্দ মাফিক যে কোনো একটা বেছে নিয়ে তার জন্যে অন্তত একতৃতীয়াংশ সময় দিতে হয়। কারো স্বাধীনতায় বাধ দেওয়া হয় না। কয়েকটা নিয়ম শুধু এখানে খুব কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। রাজনীতি, ধূমপান, মদ আর যৌন-সম্ভোগ, আশ্রমিকদের

মধ্যে এই চারটী বিষয় একেবারে নিষিদ্ধ। ছোট-বড় যুবা বৃদ্ধ সকলেরই স্বাস্থ্যের ওপর যত্ন নেওয়া হয়, প্রায় প্রত্যেকেই ব্যায়াম করেন, শরীর-চর্চার জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও আপনি দেখতে পাবেন। মিউনিসিপ্যালিটি যে জল দেয় সেটিকে আশ্রমের নিজস্ব ফিল্টারে পুনরায় শোধন করে নিয়ে আশ্রমের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া চিকিৎসার জন্য ভালো বন্দোবস্ত আছে—হোমিওপ্যাথি এ্যালোপ্যাথি দু'রকম ব্যবস্থা। কেমিক্যাল আর ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, সার্জারি, নার্সিং, দন্তবিভাগ, অঙ্গসংবাহন—সব ব্যবস্থাই রয়েছে। আশ্রমের নিজস্ব ফটোগ্রাফি আর প্রেস সার্ভিস আছে। তেরোটি ভাষায় ছাপার কাজ চলছে, ফ্রেস্কো আর ব্লক প্রিন্টিং এখানেই হয়। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন, শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রীমা'র লেখা সতেরোটি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে আশ্রমিক ও দেশ-বিদেশের মানুষের জন্য। আশ্রমের প্রকাশন বিভাগে এই সমস্ত বই পাওয়া যায়। এছাড়া এখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বার্ষিক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক—একাধিক পত্রিকাও আছে। আশ্রমের সাহিত্য পরিষদ থেকে 'যাত্রী' নামে একখানি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রচারিত হয়ে থাকে। বিরাট গ্রন্থাগারও আছে। প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, হায়ার-সেকেণ্ডারি স্কুল, কলেজ এবং শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ও এখানে চলছে। বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশ্রমের নিজস্ব ডাক-ব্যবস্থা আছে—'ব্যুরো সেন্ট্রাল' হচ্ছে আশ্রমের কেন্দ্রীয় অফিস—ওখানে যাত্রীদের নাম রেজেষ্ট্রী করে তাদের থাকা-খাওয়া ও ট্রেণ-বাসে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা যায় আসন-সংরক্ষণাদি করে দেওয়া হয়। গোলকুণ্ডা ভবন, নিউ গেষ্ট-হাউস, প্রভৃতি চারটি অতিথিশালা আছে। আশ্রম স্বয়ংপূর্ণ। এর বিভিন্ন অত্যাবশ্যক বিভাগ ছাড়াও কৃষি, শিল্প ও কারিকরী ব্যবস্থা, কুটীর-শিল্প এবং অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ব্যবস্থাও আছে। আশ্রমের এই সমস্ত বিভাগের কাজকর্মের নির্ধারিত সময়-সূচী হচ্ছে—সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এবং বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত।'

বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ তথ্য দিয়ে শ্রীঅনিলবরণ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

বললাম—'অনেক কিছু জানলাম। একটা কথা, আশ্রমের সমগ্র সময়সূচী কেমন একটু যদি বলেন ?'

একটু হেসে উত্তর দিলেন—'বেশ তো শুনুন। সকালে ছ'টা পনেরোয় অলিন্দে শ্রীমা'র দর্শন। ছটা পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতটা ব্রেকফাষ্ট। এগারোটা পনেরো থেকে সাড়ে বারোটা লাঞ্চ। বিকেল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ থেকে ছটা এবং রাত্রি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে সাপার। বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত খেলাধুলো। জিমনাষ্টিক মার্চ সাতটা পনেরোয়। একাগ্র মনঃসংযুক্তি বা ধ্যান সাতটা পঁয়তাল্লিশে। এছাড়া বৃহস্পতি আর রবিবার সাতটা পঞ্চাশের সময় প্রার্থনা শুরু হয়ে থাকে।'

আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ করে প্রণাম সেরে নিচে নেমে এলাম।

আশ্রমের অফিসের সম্মুখে গেটের ডিউটিতে তখন এক ভদ্রলোক ছিলেন। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে অতি আপনজনের মতো কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—'আসুন আসুন, বসুন ঐ চেয়ারটায়। সুরেনদা একটু পরেই এখানে আসবেন। তাঁর কাছে আপনার সব পরিচয় আমি পেয়েছি।'

কী পরিচয় তিনি আমার পেয়েছেন জানিনা, তবে পরিচয়ে জানলাম তিনি শ্রীঅতুলচন্দ্র দে। আশ্রমিক। সুরসিক। সাহিত্যপ্রীতি যথেষ্ট আছে এবং তাঁর একটী স্বাভাবিক গুণ মানুষের সঙ্গে মুহূর্তেই অন্তরঙ্গ হয়ে যান।

অতুলবাবুর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় ছাতা হাতে এক প্রবীণ ভদ্রলোক আশ্রমে ঢুকলেন। পাতলা-পাতলা লম্বা চুল। মুখে প্রশান্তির আমেজ। দেখলেই মনে হবে, ইনি বিশেষভাবে রস-দগ্ধ। এখন প্রাণ-মাতানো হাস্যরসিক মুখ খুব কমই দেখেছি।

অতুলবাবু তাঁকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। 'নলিনীদা, এই দেখুন, আপনাদের স্বগোত্রীয় একজনকে পেয়ে গেছি। ইনি বাঙালি—যাবেন সাহিত্য সম্মেলনের ডেলিগেট হয়ে।' দুজনকে আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললাম—ওঁর স্বগোত্রীয় হওয়ার সমকক্ষতা আমার নেই। তবে ওঁর 'হাসির অন্তরালে' ওঁর 'দাদাঠাকুর' পড়ে আমার নাড়ি ছেঁড়ার দাখিল হয়েছিল।'

হাসিমুখে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার বললেন—'ভাগ্যিস, নাড়িটা ছেঁড়েনি, তাই দেখা হল।'

নলিনীবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ রসালাপ হ'ল। 'দাদাঠাকুর' এবং তাঁর গুণপনার কথকঠাকুর শ্রীনলিনীকান্তর প্রশংসা করে এক ভদ্রলোক 'সম্মেলনী'তে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই সংখ্যাটি আমার কাছে ছিল। নলিনীবাবু খুশী হলেন পত্রিকাটি পেয়ে।

তখন অপরাহ্ন হয়ে এসেছে। আশ্রম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে সমুদ্র তীর পর্যন্ত গেলাম।

তীরের কাছেই এখানকার কমিশনারের অফিস। নিয়মতান্ত্রিক ফরাসী প্রতিনিধি এখনো একজন আছেন পণ্ডিচেরীতে। তিনি এখানেই থাকেন। আশ্রমের বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ খাবারের ব্যাপার বলে আশ্রমের বেকারীর পাঁউরুটি তিনি ব্যবহার করেন, তাঁর বাসভবনের সম্মুখে সশস্ত্র ফরাসী পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সমস্ত সরকারী অফিসও নাকি এদিকটায়।

সমুদ্র তীর। বিশাল সাগর উন্মত্ত গর্জনে কল-কল্লোল তুলেছে। বিস্তৃত বেলা-ভূমি থেকে পাথরের বাঁধুনি দিয়ে তার ওপরে কংক্রিটের 'পেভমেন্ট' করে দেওয়া হয়েছে। চওড়া 'পেভমেন্টের মাঝে-মাঝে ফুলের 'বেড'। মাঝে-মাঝে ফ্লোরেসেন্ট আলো। সুবিস্তৃত প্রলম্বমান সমগ্র সমুদ্রবেলা এইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। পেভমেন্টের গা ধরে পিচ দিয়ে তৈরী মোটর চলাচলের প্রশস্ত রাজপথ। ফরাসীদের শিল্পীমন ও সৌন্দর্য-বোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ওদিকে সাগরতীর থেকে গেঁথে তোলা অর্ধচন্দ্রের আকারে গড়া আশ্রমের আর একটি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ—সমুদ্র সন্তরণের স্নানের সুন্দর জায়গা।

পেভমেণ্ট দিয়ে চলেছি। সাগরের টানে অনেক ছেলে-মেয়ে জড় হয়েছে এদিকে। মাতাল হাওয়ায় আর সাগরের কানাকানিতে বিবাগী করে দিয়েছে মনকে। দাঁড়িয়ে পড়ে সাগরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। অনেক অনেকক্ষণ।

তারপরে ফিরে এলাম রাধা-হাউসে। রাত আটটায় আশ্রমের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে কবি নিশিকান্ত'র পরিচালনায় আশ্রমের ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' অভিনয় করবেন। সুরেনবাবুর সঙ্গে গিয়ে অভিনয় দেখলাম। অভিনয় মন্দ লাগল না। দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেছিল। এখানেই অন্যতম আশ্রমিক শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি নলিনীবাবুর মতোই আমুদে মানুষ।

ব্যবস্থামতো ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রীমা'কে দর্শন করতে গেলাম সুরেনবাবুর সঙ্গে।

শ্রীঅনিলবরণ প্রমুখ অনেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। সূচীশব্দশূন্য নীরবতা।

সহসা শ্রীমা অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। কী শান্ত সৌম্য উদাস উজ্জ্বল চোখ। প্রসন্নদৃষ্টিতে নিচে সমাগত সকলকে একবার দেখলেন। তারপরে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন সম্মুখে। কোন্ দূর দিগন্তে। নিথর নিশ্চল হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। সহসা পেছনের কক্ষে মিলিয়ে গেলেন।

চোখ মুছতে-মুছতে ফিরলাম।

সুরেনবাবুর সঙ্গে আশ্রমের রন্ধনশালা ও খাওয়ার ঘর দেখতে গেলাম।

বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এক অভিনব কর্মপ্রেরণায় ছেলেমেয়েরা নীরবে মেসিনের মতো গতিতে কাজ করে চলেছে। সকালে এখানে বরাদ্দ-মাফিক রুটি দুধ আর কলা দেওয়া হয় সকলকে। কলার ঘরে গিয়ে কলা-চর্চার ব্যবস্থা দেখে একেবারে 'থ'। কাঁদি কাঁদি কলায় ঘর বোঝাই। কয়েকজন সেই কলা বাছাই করে পটাস-পারম্যাঙ্গানেণ্টে ধুয়ে খাওয়ার-ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওদিকে বাসন-মাজার ডিপার্টমেণ্টে উচ্ছিষ্টগুলো শ্রেণীগতভাবে এক একটি জায়গায় জড় হচ্ছে। অন্যদিকে থালা-বাটি-চামচও শ্রেণীগতভাবে এক একটি আলাদা পটাস পারম্যাঙ্গানেণ্টের জলভরা চৌবাচ্ছা থেকে ধুয়ে নিয়ে রাখা হচ্ছে। তারপরে পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে সেগুলি মুছে রাখা হচ্ছে। শুনলাম, খাওয়ার ঘরে একসঙ্গে হাজার লোককে খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে ; পেছনে রন্ধনশালায় তখন রাজসূয় আয়োজন। ভাত-ডাল-তরকারীর অতিকায় হাণ্ডা আর হাতা-খুন্তিগুলি দেখবার মতো !

বাসায় ফিরে তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সেরে আটটা নাগাদ মূল-আশ্রমে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ-সমাধিতে প্রণাম করে গেটের অফিসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুরেনবাবু ব্যবস্থা করেছেন আগেই। সাড়ে আটটায় সময় এখান থেকে আশ্রমেরই একজন আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ দেখাতে নিয়ে যাবেন।

ডিউটিতে তখন অতুলবাবু ও আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। অতুলবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীঅনিলবরণের গানের তিনি স্বরলিপি রচনা করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর অনেক স্বরলিপি ছাপা হয়েছে।

তিনকড়িবাবু তখন আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—'এঁর নাম দিলীপবাবু। ইনি আজ আপনাদের গাইডের কাজ করবেন।'

যথাসময়ে গাড়ি এল। আশ্রমের নিজস্ব মোটর। দু'জন বাঙালী ভদ্রলোক, আমি আর একজন জার্মান ট্যুরিষ্ট—চারজনে মিলে দিলীপবাবুর সঙ্গে মোটরে গিয়ে উঠলাম।

প্রথমে এলাম ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে। খেলাধুলা ও চারশো মিটারের দৌড়ের ব্যবস্থাসম্পন্ন সুন্দর মাঠ ; শ্রীমা আগে এখানে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করতেন। এরই লাগোয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণের বিরাট একটা পুল।

তারপরে গেলাম ব্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা ডিপার্টমেণ্টে। বাজনার বহু সরঞ্জাম দেখা গেল। একটি ছেলে তখন শিক্ষকের কাছে ব্যাণ্ড বাজানো শিখছিল।

সেখানে থেকে গেলাম পটারী বিভাগে। কুঁজো, জাগ, ফুলের টাব ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, মেসিনে পোড়ানো হচ্ছে। এখানে এক ধরণের সুন্দর চুণ তৈরী হচ্ছে। এই জাতীয় চুণ নাকি তাজমহল গড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

তারপরে গেলাম কৃষি বিভাগ দেখতে। মূল আশ্রম থেকে বিভিন্ন বিভাগ বেশ দূরে দূরে। কৃষিবিভাগে প্রচুর ধানের জমি। জাপানী-প্রথায় ধানের চাষ চলেছে। গরুর খাওয়ার একজাতীয় ঘাসও চাষ করা হচ্ছে। কাছেই প্রকাণ্ড আকের ক্ষেত। পাম্পিং ব্যবস্থায় জল তুলে প্রায় একশ' একরের মতো ধানের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া বহুরকমের ফলমূল আর শাক-সব্জীর চাষ দেখা গেল। বাগানে প্রচুর নারকেল গাছ। অনেক নারকেল জড় রয়েছে। শুনলাম, আশ্রমে নাকি দৈনিক সত্তরটা করে নারকেল লাগে।

তারপরে গেলাম পোল্‌ট্রি বিভাগে। বিভিন্ন রকমের হাঁস মুরগী আর অনেক রকমের পাখী রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ডিম-সংরক্ষণ, প্রজনন ও চিকিৎসাব্যবস্থা চালানো হচ্ছে এখানে।

এবার ডেয়ারী বিভাগে এলাম। দুটি ডেয়ারী আছে আশ্রমের। দুটোতে মিলিয়ে প্রায় পঞ্চান্নটি মোষ, আর প্রায় পাঁচশো গোরু-বাছুর আছে। কী পিছলে পড়া ঢলঢলে চেহারা! রামছাগলের চেয়েও বড় একটি ছাগল দেখি নির্বিকারভাবে শুয়ে। ও বোধ হয় রাবণ-ছাগল!

চলতে চলতে দিলীপবাবু বললেন—ডেয়ারীতে যা দুধ পাওয়া যায় তাতে কুলোয় না। দৈনিক চোদ্দ-পনেরো মণ করে দুধ আশ্রমে লাগে। তাই বাইরে থেকে কিছু দুধ কিনে শোধন করে নেওয়া হয়।' এখানে

একটা কুয়োয় আপনা-আপনি জল উঠছে—ইলেকট্রিক পাম্পে সেই জল ডেয়ারীর কাজে লাগানো হচ্ছে।

ডেয়ারীর লাগোয়া ছোট নদী। গাছে-পালায় সুন্দর দৃশ্য। তীর থেকে নদীজলের খানিক দূর পর্যন্ত মাচার মতো করে একটি ঘাট বাঁধা রয়েছে। ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। জলের মধ্যে জেলিফিস্ খেলা করছে। দেখতে অনেকটা ছোট্ট ছোট্ট খরগোসের মতো। এই মাছ দেখতে ভালো লাগে। খাওয়া যায় না।

নদীর মধ্যে দুটো দ্বীপ দেখা গেল। আশ্রমের নিজস্ব জায়গা। ওখানে অনেক ক্যাজুরিনা গাছ লাগানো হয়েছে আশ্রমের জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করার জন্যে।

মোটরে চলার পথের পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খৃষ্টানদের সমাধির স্থান। বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার শহর এলাকায় ফিরে এলাম। গাড়ি এসে দাঁড়াল আগের রাতের দেখা সেই প্রেক্ষাগৃহের সামনে। ড্রামা-হল। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। দু'হাজার আসন আছে হলের মধ্যে। প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এখানে নাটকও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা হয়।

সমুদ্রতীর ধরে চলতে চলতে আশ্রমের ছাপাখানায় এলাম। বিরাট প্রেস। সেখান থেকে 'এক্‌জিবিশন হল'। এখানে ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তারপরে গেলাম প্যারেড স্পোর্টস-গ্রাউণ্ড। এর মধ্যে বক্সিং ও রেষ্টলিংয়ের ব্যবস্থাপনা, টেনিস ও বাস্কেট-বলখেলার সুযোগ রয়েছে। এক বছর আগে শ্রীমা এখানে রোজ টেনিস খেলতে আসতেন।

তারপরে গেলাম মহিলা পরিচালিত তাঁতের বিভাগে। সুন্দর সুন্দর শাড়ি, শুজ্‌নি, রুমাল আর গামছা তাঁরা তৈরী করেছেন, দেখা গেল।

তারপরে শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থাগার। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ি।

শান্ত নীরব পরিবেশ।

অঙ্গনের এক ধারে পাথরের মতো কী একটা যেন রাখা হয়েছে। দিলীপবাবু বললেন—'একটা গাছ ফসিল হয়ে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। পণ্ডিচেরীর কোনো এক জায়গায় ওটা পাওয়া গিয়েছিল।'

হলের মধ্যে গেলাম। প্রচুর বই। সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শোনা গেল, নানা বিষয়ের প্রায় পনের হাজারের মতো বই এখানে রাখা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। একজায়গায় দেখলাম শ্রীমা'র স্বাক্ষর বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। নোবেল প্রাইজের সমতুল্য এক পুরস্কার জাপান থেকে শ্রীমাকে দেওয়া হয়েছিল—সেটিও রয়েছে। আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকেও তাঁকে বিভিন্ন উপহার ও স্মারক দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সযত্নে রাখা হয়েছে। জাপান, জাভা ও বলিদ্বীপের সংস্কৃতির বিভিন্ন সংগ্রহও দেখলাম। এছাড়া বহির্ভারতের শ্রেষ্ঠ 'পেন্টিংস'ও বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দোতালায় বহু প্রাচীন পুঁথি আর পাণ্ডুলিপি। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির মোটা মোটা বই থরে থরে সাজানো—অনেকেই তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কেউ কেউ নিবিষ্টভাবে তার থেকে নোট নিচ্ছেন। দেয়ালের গায়ে পুরাতন পণ্ডিচেরীর একটা বড় ছবি টাঙানো, তার নিচে লেখা: "Our town is called Pondicherry or Puducherry which means the New Town. But it is really quite ancient. We do not know exactly how old it is From what is written on the stones of the temple of Vedapuri, that is a city of Knowledge, it was a centre of culture, the seat of a university. The patron of the city was the great sage Agastya. Where you now study your lessons, once upon a time little boys chanted Vedic Hymns or recited Panini's Sutras."

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইদানীংকার নামটি হচ্ছে "শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার অব এডুকেশন।" এম-এ এবং এম্‌-এস্‌সি পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে। নিজস্ব ল্যাবরেটরী ও আছে।

গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে একটি সুদৃশ্য পার্ক ছাড়িয়ে ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে ল্যাবরেটরীতে উপস্থিত হলাম।

ল্যাবরেটরী ঘরটি বেশ বড়। আলমারিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু সংগ্রহ। নানান জায়গা থেকে আনা। কোলার স্বর্ণখনি থেকে অপরিশুদ্ধ কাঁচা স্বর্ণপিণ্ডও এনে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ল্যাবরেটরীর উপযোগী আধুনিক সাজ-সরঞ্জামও রয়েছে। অনেক ছাত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

পাশেই আর একটি ঘর। দিলীপবাবু বললেন—'একসময়ে শ্রীঅরবিন্দ এই ঘরেই ছিলেন। এখন ওটি ছেলেদের উপাসনার ঘর।'

ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাড়িতে গেলাম। দিলীপবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখালেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল শিক্ষা-ব্যাপারের বহু সংবাদ। প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ ক্লাস তথা কারিকরী শিক্ষা, গান-নাচ, নার্সিং শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা—বিভিন্ন ক্লাস মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো পনেরো। শিক্ষক-অধ্যাপকের সংখ্যা একশো ষাট। পাঠ্য-বিষয় অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। একজন ছাত্র বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বা বিভিন্ন পাঠ্য বিভাগের প্রত্যেকটি ক্লাসে ভর্তি হতে পারে, প্রত্যেকটি বিভাগের জন্যে পৃথকভাবে পরীক্ষা দেয়, কোনো একটি বিষয়ে ফেল করলে সেই বিভাগে তৈরী হয়ে আবার পরীক্ষা দিতে পারে। সমগ্রভাবে ফেল হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তাই এখানে চালু নেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো।

শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও এখানে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে গঠিত হয়নি। ছাত্রদের বইপত্তর বিনামূল্যে দেওয়া হয়। জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে বাছাই করা মেধাবী ছাত্রগণকে বিনাখরচায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে। বোর্ডিংয়ের খরচ হিসেবে ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক একশো টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বেরিয়ে কুটীরশিল্প বিভাগের বিভিন্ন কারুকলা দেখলাম। তারপরে বেকারী বিভাগে গেলাম। বেকারীর পাশে

ময়দার কল। বেকারীতে মেসিনে রুটি তৈয়ারীর ব্যবস্থা। দিনে প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড রুটি তৈরী হয়। তারপরে লণ্ড্রী। মেসিনে দিনে এক হাজার করে কাপড় কাচা হয়। মেসিনে ডাল-কড়াই ভাঙার ব্যাপারও দেখলাম।

তারপরে গেলাম অটোমোবাইল বিভাগ। বিরাট ব্যাপার। আশ্রমের অনেকগুলো যানবাহনের গাড়ি আছে। সমস্তই এখানে থাকে। সারাই ও মেরামত হয়। এরই লাগোয়া বালতি-কড়াই ইত্যাদির কারখানা। চারদিকে অনেক যন্ত্রপাতি ইলেক্‌ট্রিকে চলছে।

তারপরে গেলাম ওয়ার্কশপে। প্রচুর মেশিনারি। যন্ত্রের বিকট শব্দ উঠছে। কাঠের আর ষ্টীলের তৈরী বহু জিনিষ রয়েছে।

মোটরে করে মূল আশ্রমে যখন ফিরে এলাম তখন বেলা বারোটা। মাথার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ঝিঁঝিঁ-ট তার। দিলীপবাবু ক্লান্ত। ভদ্রলোক সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে থেকে খুবই পরিশ্রম করলেন। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে রাধা-হাউসে ফিরে গেলাম।

তারপরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম।

বিকেল প্রায় ছ'টা হবে—আশ্রমের অফিসের সামনে বসে অতুলবাবুর সঙ্গে গল্প বলছি এমন সময় খেলার মাঠ থেকে খেলাধুলো করে আশ্রমের সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মশায় ফিরলেন। পরণে হাফপ্যান্ট। কাঁচাপাকা চুল। শুনলাম, এই বয়সেও দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি নাকি প্রথম হয়েছেন! অতুলবাবু গিয়ে আমার কথা বলতেই তিনি ফিরে এসে লাইব্রেরী ঘরে বসলেন। প্রাথমিক পরিচিতি-পর্ব শেষ হওয়ার পরে তিনি হাসিমুখে কিছুক্ষণ গল্প করলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপরে তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কক্ষে গিয়ে শ্রীমা'র আশীর্বাদপূত হাতের ফুল একটি নিয়ে এলাম।

খানিক পরে এলেন শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিল্পাচার্য। তান্ত্রিক। সাহিত্যিক। এখন এখানেই থাকেন। পরিচয় হল। সাহিত্য-কর্ম বিষয়ে খানিকক্ষণ গল্প হল। তারপরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কবি-সন্দর্শনে চলেছি এবার। কবি শ্রীনিশিকান্ত। আশ্রমের যে বাড়িটায় তিনি থাকেন সেটি কবিজনোচিত আবাসভূমি বটে, গাছেপালায় ছায়াময় শান্ত পরিবেশ। চারদিকে অজস্র ফুলগাছ।

সাড়া পেয়ে কবির ভগিনী আমায় ঘরে নিয়ে বসালেন। খানিকপরে এলেন কবি। পরিচয় হল। কবি ভারি উদাসী আত্মভোলা। শিশুর সরলতা তাঁর চোখে-মুখে। নরম সুরেলা গলায় কথা বলতে-বলতে ডুবে যান তারই মধ্যে। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছেন। কবির বোন তাঁর এই পাগল দাদাটিকে আগলিয়ে চলেন। কবির জন্মস্থান বসিরহাট-টাকী। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাই তিনি। রবীন্দ্রনাথ নিশিকান্তকে আদর করে 'চাঁদ-কবি' বলে ডাকতেন।

কবির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হল। 'দেশ'-পুজোসংখ্যায় এবারে 'পুজোর চিঠি' নামে তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা বেরিয়েছে। কবির সেকালের শান্তি-নিকেতন জীবনের বিচিত্র ঘটনা, আর সে সময়ের আশ্রমের রূপ সম্বন্ধে ভিত্তি করে কবিতাটি লেখা। ভারি মনোজ্ঞ। আমার অনুরোধে কবি স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন কবিতাটি।

কবির সঙ্গ-ছাড়া হতে খুবই বেজেছিল সেদিন।

সন্ধ্যা সবে শেষ হয়েছে। অতুলবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ সমুদ্রতীরে বেড়ালাম। তারপরে তিনি নিয়ে গেলেন দু'নম্বর ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে। বৃদ্ধ যুবা ছেলে মেয়ে সকলে এখানে দলবেঁধে ব্যায়াম করছেন। কঠিন ব্যায়াম। যান্ত্রিক ব্যায়ামও চলেছে। শ্রীঅনিলবরণও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, দেখলাম।

অনেকেই জড় হয়েছেন শরীরচর্চা দেখতে। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আমাকে পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

এখানেই ছিলেন স্বনামধন্য বাঘাযতীনের পুত্র শ্রীতেজেন মুখোপাধ্যায়। অতুলবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করালেন। তেজেনবাবু পুত্র-পরিবার নিয়ে আশ্রমেই থাকেন। তিনি আমাকে আরো কয়েকদিন এখানে থাকার কথা বললেন। ইচ্ছা কি আমারও কম। কিন্তু অক্ষমতার দুঃখ জানিয়ে এবারকার মতো বিদায় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

আনন্দ-বেদনায় রাত কাটল প্রায় অতন্দ্রভাবে।

ভোর সাড়ে চারটা। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। পথের মায়া প্রখর। টান তার সুদূরপ্রসারী। পণ্ডিচেরী ছাড়তে হবে এখুনি। বাসের সময় বাঁধা। চনমন্ করে উঠল মনটি। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে যাব!

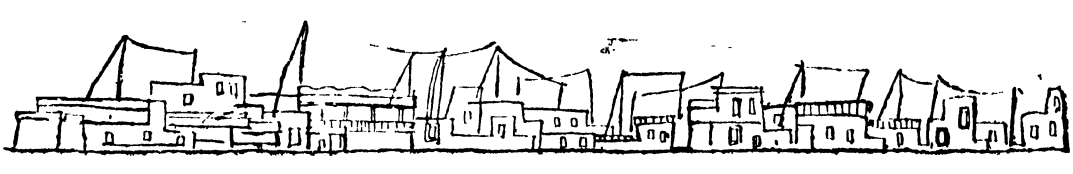
সুরেনবাবু আর তাঁর পুত্রবধূ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে অপেক্ষা করছে রিক্সাওয়ালা।

কিছু বলতে পারলাম না। শুধু করজোড়ে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম।

ঝাপসা হয়ে গেছে চোখ। জীবনভর শুধু অপেক্ষা-প্রতীক্ষা। জীবনটা কি শুধু প্রতীক্ষায় দুঃসহনীয় হয়ে কাটিয়ে দিতে হবে।

টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। ছবি নয়। পাশাপাশি দুটি জীবন্ত আশা-ভরসা। দুটি মহাজীবনের আলো তাবৎ আঁধার-জীবনকে আলোর স্বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীমা।

সাহস পেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।



গৃহস্থালীর হাল

কালীচরণ ঘোষ

স্বাধীনতালাভেপর রতবর্ষ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ...রী প্রচার মারফত শুনিতে শুনিতে চলিতেছে, ই...কটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার সাধারণ ...্য আছে, সেই প্রশ্ন মনকে আলোড়িত মূলে...তেছে। কাহারও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় ক...কথা সত্য নহে। আর কাহারও হউক বা না যাহারা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছে, তাহারা এ পুরুষ কেন এক পুরুষের মত রসদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আত্মীয়স্বজন নিকট-বন্ধুদের ও তাঁহাদের আত্মীয় মহলের সরকারী মহলে না হক, ধনী-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এক একটা 'গতি' হইয়াযাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারী কণ্ট্রাক্ট যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের অবস্থা সকলেরই কাম্য। প্রায় প্রতি ব্যয়-সাধ্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ক্রয়ে যে ত্রুটি সরকারী পরীক্ষা বিভাগ হইতে প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাতে এই ব্যাপারের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়নে যাঁহারা কুঞ্জের কাছে ঘোরাফেরা করিতেছেন তাঁহাদের গৃহস্থালীর পরিকল্পনার ভিত যে পাকা হইতেছে, তাহাতে দ্বিমত হইবার কারণ নাই। চোরা-বাজার, কালো-বাজার, ভেজাল, উৎকোচ প্রভৃতি আজকাল সবই মানিয়া লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। শ্রীগোবিন্দ-বল্লভ পন্থ মহাশয় পার্লামেণ্টে জোর গলায় বলিলেন যে (corruption) সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে যে দুর্নীতির কথা বলা হয় তাহা অতিরঞ্জিত। সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নীতি-দমন বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল, তাহাতে পাঠক-মাত্রই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ প্রত্যেকেই জানে প্রতি শতে একটি বা তাহারও কম ঘটনা এই দপ্তরে প্রেরিত হয়। তাহা ছাড়া তাহাও সরকারী চাকুরিয়ারা যতটা পারে রাখা-ঢাকা করিয়া কাজে অগ্রসর হয়।

কথা হইল তাহাদের লইয়া—যাহারা যতদূর সম্ভব সং-ভাবে উপার্জ্জিত বাঁধা আয় দ্বারা কায়ক্লেশে নিজের এবং পোষ্যদের ভরণপোষণ করে। কোথাও অতিকষ্টে অতিরিক্ত ক্লেশ করিয়া কয়েকটা টাকা উপার্জ্জন করে; তাহাও সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার কথা। কোটি দুই-চার যে সমর্থ উপার্জ্জনক্ষম বেকার আছে, তাহাদের এবং তাহাদের উপর যে হতভাগ্যরা নির্ভর করিয়া আছে—যাহাদের আয়—ব্যয়ের প্রয়োজনের সহিত বৃদ্ধি পায় না—যাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চাপ দিয়া আয় বাড়াইতে পারে না—ইহারা এবং এইরূপ আরও লক্ষ লক্ষ লোকের কথা ভাবিবার কোনও লক্ষণ নাই। যাহাদের কপালে দুর্ভোগ লেখা আছে, তাহাদের ভাবনা তাহারাই ভাবে।

বড় দায়-দড়ায় বিব্রত হয় না বা হইতেহয় না, এরূপ লোক খুবই কম আছে। কিন্তু যাহারা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে ভাবিয়া কূল কিনারা পায় না, তাহাদের সংখ্যাই বেশী এবং তাহাদের দুর্গতি দিনের দিন চরমে উঠিতেছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর যে সমানে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার সমস্যা আজ স্বল্পবিত্ত লোকদের বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে; মনে হয় ভাল করিয়া প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহারা হারাইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ছাড়া হঠাৎ কোন দ্রব্য বাজার হইতে কখন উধাও হইবে—তাহাই নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিতেছে। সকালে উঠিয়া যখন দেখা যায় হয় কয়লা, নয় চাউল, নয় চিনি, নয় তৈল অথবা ইহাদের একাধিক দ্রব্য এক সঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে না, তখন গৃহস্থের অবস্থা লিখিয়া বলা সম্ভব নয়। মালের দর ষোলো আনা হইতে ছাব্বিশ আনা হইয়াছে, গোপনে ক্রয় বিক্রয় চলিতে থাকে—বাজারে মাল নাই বলিলে সরকার তাহা অস্বীকার করে; দর চড়িয়াছে বলিলে খাদ্য-মন্ত্রী সংখ্যাতত্ত্ব সাহায্যে তাহা অচিরে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারেন; তাঁহার ধারণা সংখ্যা-সাহায্যে মন্ত্রীদের পেট না ভরিলেও জনসাধারণ উহা পাইয়া ঘাবড়াইয়া যায় এবং পেটের ক্ষুধা সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া গেলে পেট ভরিয়া যাওয়ার সমতুল্য হয়।

গত দুই বৎসরের মধ্যেই দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২০ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন ; আমাদের অর্থ-মন্ত্রী অবশ্য মরিলেও মর্য্যাদা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলিয়াছেন, "দর বাড়িল ত কি হইল? লোকের আয় ঐ অনুপাতে বা তদপেক্ষা বেশী হারে বাড়িয়াছে। সুতরাং এই অতিরিক্ত ব্যয় তাহার দিতে কোনও কষ্ট নাই। ইহা আর যাহাই হউক, হৃদয়হীনতার একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাঁধা আয়ের লোকের শতকরা কুড়ি অংশ আয় কিভাবে বাড়িয়াছে, তাহা মোরারজী দেশাই মহাশয় জানেন। যাহাদের জমি হইতে বিচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা খেসারতের টাকা পায় নাই। অনশনে যাহাদের দিন যাইতেছে, তাহাদের নিকট এই উক্তি নিতান্ত মারাত্মক পরিহাস বলিয়া মনে হইবে। দরবৃদ্ধি কথাটা আমার রচিত নয়; সরকারী হিসাব ইহা প্রকাশ করিতেছে। তাহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনার কাঠামো লইয়া আলোচনাকালে এই মূল্য বৃদ্ধির কথা মানিয়া লইয়া মোট ব্যয়ের হিসাব করা হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাজারের হিসাব লইতে গেলে, গৃহস্থের পক্ষে গড়ে ইহা অপেক্ষা দাম বেশী পড়িয়া যায়। চাউল, চিনি, গম প্রভৃতি যখন বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়, তখন যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় তাহার হিসাব কেহ ধরে না। ইহার একটা না একটা যে সকল সময়ই উপদ্রব বাধাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও নিকট অবিদিত নয়; গভর্ণমেণ্টের কাছে ত নয়ই। কিন্তু তাহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছে। সম্প্রতি এক সঙ্গে চাল, কাপড় ও চিনির যে অসম্ভব চড়া দর চলিল তাহার সম্বন্ধে প্রতিকার করিবার মধ্যে খুব কতগুলা প্রচার পত্রিকা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চাবুকের রক্তাক্ত দাগের উপর যদি হাতে তৈল ও লবণ লইয়া কেহ ক্ষত স্থানে প্রলেপ দ্বারা যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করে তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, বর্ত্তমানে সরকারের পক্ষে সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সহানুভূতির কথা সেইরূপ শুনাইতেছে। এক কথায় "জ্বালার ওপর পালার বাড়ী" বলিলে হয় ত মনের তিক্ততা কতকটা প্রকাশ পায় মাত্র। যদি সাধারণ বাঁধা আয়ের সৎ-গৃহস্থকে বিব্রত করিয়া তাহার যন্ত্রণা শতগুণ অসহনীয় কিছুতে করিয়া থাকে—তাহা নিয়ত দ্রব্যমূল্যের ...দ্ধি এবং তাহার প্রধান কারণ গভর্ণমেণ্টের অর্থ নৈতিক নী...

এতদিন সাধারণ পণ্য মূল্য-বৃদ্ধি ... লোকের ক্লেশ কেবল কথার মারপ্যাচে উড়াইয়া দে... ইতেছিল। দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কষ্ট স... স্বীকার করিতে হয়; অনুন্নত দেশের মঙ্গলের ... ত্যাগ এক মাত্র পথ। মানুষের সহন ক্ষমতা কতট... ই হিসাব কেহ লয় নাই; লওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না বে-সরকারী অতিলোভী কারবারী আছে, যাহারা কেবল নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারে। নিম্নতম পাঁচ-সাত-দশ পুরুষের বসিয়া খাইবার সঙ্গতি জমা করিয়া রাখিয়া যাইতে সচেষ্ট যখন কালো-বাজারীকে পথের নিকতটম আলোক-স্তম্ভে লটকাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা পণ্ডিত জহরলাল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হয়, যে সরকার কালোবাজারী মূনাফা-খোরদের সাজা দিয়া সায়েস্তা করিবার পথ বাছিয়া লইতেছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে নানা জরুরী আইন, ধীর আইন বিধিবদ্ধও করা হইয়াছে।

ইহারা দোষী সন্দেহ নাই। সাধারণ লোক ইহা দমন করিবার ভার লইলে হয়ত কাজ অতি দ্রুত সুসিদ্ধ হইত। তাহা হয় নাই; তাহাদের বাপ মা সরকারের উপর ভার দিয়া নীরবে সব যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। যখন মনে ভাবে ইহার জন্য সরকার একাই বারো আনা দায়ী, তখন তাহার আর বলিবার কিছু থাকে না।

এবার বোধ হয় 'কাণে জল ঢুকিয়াছে।' কারণ তৃতীয় পরিকল্পনায় সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকার মত খরচ করিতে হইবে, এখন কেবল দর চড়িয়া গেলে অসুবিধা হইবে বলিয়া সরকারী মহলে দরের উচ্চতর গ্রাম বন্ধ করিবার রব উঠিয়াছে। দ্রব্য মূল্য হ্রাস করিবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের বাধা কতখানি, তাহার হিসাব লওয়া সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন। যে সকল নিত্য-ব্যবহার্য্য সাধারণ দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রস্তুত হয়, লোকে আশা করে, তাহার দাম কম পড়িবে। এ পোড়া দেশে তাহা হয় না। কারণ অন্যান্য দেশে সেই সকল শিল্পপণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অনেক সময় কম পড়িয়া থাকে। যাহা হোক, যে দরেই হোক—মাল উৎপাদনের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের লোলুপ দৃষ্টি এবং বজ্র-

মুষ্টি আসিয়া দেখা দেয়। একটি সাধারণ পণ্যের কেবল-মাত্র উৎপাদন শুল্ক কত ...রিমাণ গভর্ণমেণ্ট লইয়া থাকে তাহার হিসাব নিমে ...ওয়া হইল :—

লক্ষ টাকা হিসাবে

পণ্য	১৯৫৮-৫৯ আসল	১৯৫৯-৬০ পরিবর্ত্তিত	১৯৬০-৬১ বাজেট
	৫৭'৪০	৪৩'০০	৪৩'০০
...সিন	৪'১৫	৬'১০	৬'২৫
	৫২'২৭	৭৭'৩৬	৪৬'৪০
...দেশলাই	১৯'২৬	১৮'০০	১৮'০০
লৌহ ইস্পাত	৭'২৯	১০'০০	১২'০০
টায়ার টিউব	৭'১৬	১০'৫০	১০'৫০
পেট্রোল	৩২'৫০	৩৬'০০	৩৮'৭৫
তামাক	৪৯'০৯	৪৩'৭৪	৪৩'৭৪
দালদা (বনস্পতি)	৩'৮৬	৫'০০	৫'২৫
চা	৪'৭১	৭'৬৫	৭'৬৫
সিমেণ্ট	১৩'৯১	১৬'৫০	১৭'৫০
জুতা	১'০৫	১'১০	১'১৪
কাগজ	৮'৭৮	৭'৫০	৭'৭৫
তৈল (উদ্ভিজ্জ)	১০'০২	১৩'০৯	১৩'০৯
লবণ (সেস্)	—	—	—
কয়লা („)	৩'২৫	৩'২৫	৩'৭৫
মোটর স্পিরিট	৩২'৫২	৩৬'০০	৩৮'৭৫
কফি	১'৩৪	১'৩৫	১'৩৫

ইত্যাদি ইত্যাদি—

সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বা নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত বা বহনের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পণ্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি কারণ অনুধাবন করিতে কষ্ট হয় না।

ইহার এই খানেই শেষ নয়। এই সকলের মধ্যে আবার যাহা না হইলে লোকের চলেনা, এমন বস্তু বাছিয়া বাছিয়া তিনটির উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স (additional duty) আছে। নিম্নে হিসাব দেওয়া হইল :—

লক্ষ টাকা হিসাবে

	আসল	পরিবর্ত্তিত	বাজেট
চিনি	৬'৭৯	১২'৯০	১২'৯০
বস্ত্রাদি	৫'২২	২০'৪৯	২০'৪৯
তামাক	৪'১১	৭'৩০	৭'৩০

সকল প্রকার উৎপাদন শুল্কের মোট পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে ৩১৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে!

এ কীর্ত্তনের আরও বাকী আছে। ঘরে তৈয়ারী করিয়া নিস্তার নাই, বাহির হইতে আমদানী করিলে ত কথাই নাই, কয়েকটি নির্ব্বাচিত পণ্যের আমদানী শুল্কের হিসাব হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে :

আমদানী শুল্ক

লক্ষ্য টাকা হিসাবে

	১৯৫৮-৫৯ আসল	১৯৫৯-৬০ পরিবর্ত্তিত	১৯৬০-৬১ বাজেট
মশলা	৭৮	৮০	৮০
তামাক	১'৬৮	১'৬০	১'৬০
কেরোসিন	৯'৯০	১০'০০	১১'৫০
লোহালক্কড়	৭'৫৯	৮'৫০	৮'০৯
কাগজ মণ্ড দিঃ	২'৪৩	২'৫০	২'৫০

ইত্যাদি, ইত্যাদি—

আমদানী শুল্ক হইতে ১১৮ কোটি ৩৫ লক্ষ, উপরন্তু রক্ষণ-শুল্ক হইতে ২২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা (১৯৬০-৬১) আয় হইবে। ইহার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই, সাধারণ পণের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে কেবল ট্যাক্সের দায় কতখানি তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

রপ্তানি শুল্কের বিষয় উল্লেখ করা হইল না, কারণ তাহার সহিত সাধারণ লোকের ব্যবহারের পণ্য মূল্যের সহিত সম্পর্ক নিতান্ত অল্প।

উৎপাদন শুল্ক সম্বন্ধে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সরকারী বাজেটে যাহা দেখানো হয় প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আদায় করা হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—১৯৫৯-৬০ বাজেটে যেখানে উৎপাদন

শুল্ক ২৮৫·০২ কোটি ধরা ছিল, সেখানে আদায় হয় ৩১০·১৩ কোটি টাকা।

উৎপাদন শুল্কের মধ্যে আরও 'রস' আছে। বাজারে মাল ছাড়িবার আগে সরকারী হিসাব হইয়া যায়। তাহার উপর ট্যাক্স আদায় হয়। এই ট্যাক্স দেওয়া এবং ক্রেতার নিকট হইতে পাওয়ার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান থাকে, তাহার ব্যাজ এবং কোথাও বা অনাদায় সব টাকাই পণ্যের দরের উপর চড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতেও শেষ ক্রেতা বা ব্যবহারকারীকে কিছু যে দণ্ড দিতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ট্যাক্সের ইহা এক দিক। সাক্ষাৎ সরকারী রাজস্ব হিসাবে ট্যাক্স কেমন বাড়ে, তাহার অন্ততঃ একটার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যৌথ মূলধনের কারবারেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এমনকি যত টাকা সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আছে তাহা অপেক্ষা বে-সরকারী মূলধন খাটিতেছে অনেক বেশী। এই যৌথ মূলধনের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সামান্য পরিমাণ হইলেও বহু টাকা খাটিতেছে। উপার্জ্জনক্ষম অবস্থায় দু-দশ টাকা করিয়া শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, ইহার মধ্যে আবার অনেক টাকা বিদেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নূতন কারবার গঠনের সাহায্য হিসাবে দিয়াছে এবং লোকসান হইয়া গিয়াছে। বার্দ্ধক্যে যা-হয় বিশ-পঞ্চাশ টাকা লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড হিসাবে পাওয়া গেলে উপকার হইবে, এই আশা ছিল। কিন্তু সরকারী শ্যেন দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, একে একে সব বড় কারবার কুক্ষিগত করিতেছে এবং যৌথ কারবারের ডিভিডেণ্ডের উপর লোভের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে কোম্পানীর ট্যাক্স বাবদ ৭৮ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল, ১৯৬০-৬১ বাজেটে তাহা নূতন ট্যাক্সের চাপে ১৩৫ কোটি টাকা হইবে। ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ শতকরা ৩০।৪০ টাকা হ্রাস পাইবে। ইহার কতকটা আয়কর বিভাগ হইতে ফেরত পাইবার কথা; কিন্তু কয়জন এই দরখাস্ত করিতে জানে; পল্লীর দিক হইতে সদরে এই দরখাস্ত করিতে আসিতে, তদ্বির-তদারক করিতে এবং জবাবদিহির হাঙ্গামা এড়াইতে শতকরা ৮০।৮৫ জন লোক দরখাস্তই করিবে না। আর সরকারের তহবিলে টাকা জমা দেওয়ার সহজ পথ আছে। তাহা ফেরত পাওয়া যে যায় না, বা পাইতে হইলে যে খাট-খড় পোড়াইতে হয়, তাহার কথা বিস্তারিত লিখিয়া লাভ নাই।

এখন আছে সেল্‌স্ বা বিক্রয়-কর। চাউল, তৈল প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ বাদ দিলে আর সব পণ্য—এই সর্ব্বগ্রাসী ট্যাক্সের আমলে আসিতে হয়। প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আয়ের অঙ্ক প্রতি বৎসর স্ফীততর হইতেছে। পণ্য মূল্য বৃদ্ধির ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ ইহা হইতে মুক্তি নাই। তাহা ছাড়া আয়করের সহিত ইহার হিসাব মিটাইতে দোকানী ব্যবসায়ীকে কিরূপ নাজেহাল হইতে হয় তাহা সরকার যে জানে না তাহা নহে। এরূপ ক্লেশ দিয়া সরকার অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারী যে বেশ মজা অনুভব করে তাহা দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে অর্থবিভাগের কোনও বড় কর্ম্মচারী একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন।

সরকারী খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বিদেশী মালের আমদানী ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বহু কোটি টাকা মূল্যের মাল দুই তিনবার আসিতেছে। আনীত মালের প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহা পুরাতন দরে বিক্রয় করা হইতেছে। যে কাজ দশ বৎসর পরে আরম্ভ হইবে বা আরম্ভ হইতে পাঁচ বৎসর বিলম্ব আছে, তাহার জন্য মাল আমদানী করা হয়। অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, শিশু ও রোগীর খাদ্য, ক্ষুর, ক্ষুরের ব্লেড প্রভৃতি আনিতে দেওয়া হয় না। ফলে প্রাপ্য জিনিষের যে অসম্ভব দর বাড়ে, তাহা বক্তৃতার দ্বারা হ্রাস করা যায় বলিয়া বাতুলে বিশ্বাস করিবে, অপরে নহে।

যে সকল পণ্যের বহু বিক্রয়, গভর্ণমেণ্ট ক্রমে তাহাতে ব্যবসা সুরু করিয়া দিয়াছে এবং ক্রমেই সকল বড় ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আছে। এই সকল ব্যবসা বহু লোকের অন্ন সংস্থান করিত; কিছু কিছু লাভ করিতে ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিত। একই ব্যবসারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায়, জিনিষের দর পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত কারবারে ব্যয় সঙ্কোচের একটা আপ্রাণ চেষ্টা থাকিত। এখন ষ্টেট-ট্রেডিং অর্থে সবাই সরকারী চাকুরিয়া, কাজ না করিয়া মাস শেষে মাহিনা পাওয়া যায়, নানা ছুটির এবং ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বোপরি বে-হিসাবী

কাজ করিয়া লোকসান ক...লে ক্ষতিপূরণ করিতে ত হয়ই না, উপরন্তু অপরাধী ...ব্যস্ত করিবার লোক বাহির করা ...কা-শুঁকি করিয়া কাটাইয়া দিতে যায় না। সবই গা...ব্যবসায় কোনও দ্রব্যের দাম কম পড়ে পারে। সরক...স্ প্রভৃতি যান-বাহন পরিচালনায় নিজেরা না... উপর... না পারিয়া অপরাপর বে-সরকারী বাস্ ...াভ কর্...র উপর চাপ দিয়া তাহাদেরও ভাড়া বাড়াইতে কে...য়া হইয়াছে।

...পতি হইতে আরম্ভ করিয়া লাট, ক্ষুদে লাট, বড় রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলের জন্য ব্যয় বাড়িতেছে। ...াহা পারে দর বাড়াইয়া যায়। তাহার উপর সরকারী যোগ্যতা এবং ট্যাক্স প্রভৃতি কারণে দ্রব্য মূল্য বাড়ে। ...াবার সেই কারণে সরকারী কর্ম্মচারী হইতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চাপ দিয়া আয় বাড়াইয়া লয়। দেশের মধ্যে আয়ের তারতম্য লোপ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সকল সময় কৃষি, কারখানার মজুর, শ্রমিকদের উচ্চতর পারিশ্রমিকের দাবী নির্ব্বিচারে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। টাকা যাহারা পায় বা যাহারা দিতে উৎসাহ দেয়, তাহাদের সহিত কলহ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা কোথায়, তাহা অর্থনীতিশাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ আছে বলিয়া কেহ জানে না।

ট্রেণের যাত্রী-ভাড়া ও মালের মাশুল, মাল-বহনের জন্য লরীর তেলের দাম প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইলে মালের দামের উপর তাহার বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টী সরল হইবার কথা। গভর্ণমেণ্ট নিঃশব্দে টাকায় মাত্র পাঁচ নয় পয়সা মালের উপর রেলের মাশুল বৃদ্ধি করিলেন; অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা খরচ বাড়িল। এক কাপড়ের কথাই ধরিলে বুঝিতে হইবে—কেবল তৈরী কাপড় মিল হইতে স্থানান্তরে যাওয়ায় কথা নয়। তুলা, রং, মাড়, মিলের যন্ত্রপাতি, লুব্রিকেশনের তেল, কয়লা প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষের পাঁচ টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। ইহার মোট কথা ইহাতে কাপড়ের দাম হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া দেখিতে পারে।

অতিরিক্ত ট্যাক্স সাহায্যে বাজারে যে অবস্থা দাঁড়াইতে পারে তাহার সুযোগ লইয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে সকল ব্যবসায়ী মালের দর বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় বাজারে মালের সরবরাহ কম থাকায় এই অবস্থার সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু চড়াদরের জন্য মালের কাট্‌তি কম হইলেও বাজারে কোনটাই পড়িয়া থাকে না। কারণ পণ্যের ব্যবহারও নানামুখী হইয়া পড়িতেছে। এ সময় এক শ্রেণীর লোকের হাতে টাকা জমা হইতেছে এবং তাহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত বাজারে বড় ক্রেতারূপে দেখা দিতেছে। যাহাদের অর্থাভাব তাহারা দুঃখকষ্টে কাল যাপন করিতেছে। কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতার টাকার অভাব নাই। ট্যাক্স, ঋণ, দান প্রভৃতি উপায়ে টাকা টানিয়া লইবার পর, তাহার যন্ত্র অপরিমিত টাকা বা নোট সৃষ্টি করিতেছে। ভাণ্ডারে সেই মূল্যের মহার্ঘ্য ধাতু মজুত রাখিয়া নোট চালাইবার আপদ চলিয়া গিয়াছে, বিদেশী এ টাকা লইবে না; তাহাকে স্বর্ণ দিয়া তুষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু দেশের মধ্যে অবাধ নোট চালু করার কোনও বাধা নাই। এই নোট বাজারের কি অবস্থা করিতেছে। তাহা গভর্ণমেণ্ট জানে না তাহা নহে। সাধারণ লোকের সুবিধা অসুবিধায় বেদরদী, হৃদয়হীন হইলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। এখনও ইহার পূর্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৬০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া বাজারে দেওয়া হইবে। যে সকল আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

ইহার পর পণ্যমূল্য হ্রাস করিয়া সাধারণ লোকের দুঃখ লাঘব করা হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এক ধূম্রজালের সৃষ্টি করিতেছে। নানা কমিটি প্রভৃতি নূতনরূপে আবির্ভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানপাপী গভর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছে তাহা করিয়াই যাইবে। পথিপার্শ্বে কুকুর চাৎকার করিলে হস্তী-যুথের অগ্রগমনের পথে বাধা সৃষ্টি হয় না।



শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা

সমর দত্ত

স্বাধীন ভারতে শ্রমিক কল্যাণ করে নানা ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। নতুন নতুন আইন পাশ ক'রে এখন শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, নিম্নতম মজুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে, ভবিষ্যৎ স্বার্থ রক্ষার জন্য বীমার ব্যবস্থা হয়েছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করা হয়েছে, শ্রমসাধ্য কাজে শিশু শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত নিয়োগ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক ও প্রসূতি-কল্যাণ অথবা ঋণমুক্তি সম্পর্কিত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের অভাবে, নিরক্ষরতায়, অত্যল্প মজুরীর জন্য শ্রমিকরা জীবন্ম ত হয়ে আছে। শ্রমিক তথা জনসাধারণের জীবনের মান-উন্নয়ন এবং আশানুরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাধন যে সময়সাপেক্ষ, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের জাতীয় আয় ছিল ৯১১০ কোটি টাকা, মাথা পিছু আয় ছিল—বার্ষিক ২৫৪৲ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হ'লে জাতীয় আয় বেড়ে গিয়ে১০,৮০০ কোটি টাকা এবং মাথা পিছু আয় বার্ষিক ২৮১৲ টাকায় দাঁড়ায়। এই ভাবে পাঁচ বছরের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১৮৲ টাকা এবং মাথা পিছু আয় শতকরা ১১৲ টাকা বাড়ে। আশাকরা যায় ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হ'লে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ টাকা এবং মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ টাকা বেড়ে যাবে। এমনি করে রাষ্ট্রপরিকল্পিত বিভিন্ন দেশোন্নয়ন কার্য্যের সার্থক সমাধান সাধারণ মানুষের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যে আনুকূল্য প্রদর্শন ক'রবে। কিন্তু যে যাই বলুক, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পশ্চাদপটে জনসাধারণের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সহজে হয় না। নানা আইন পাশ ক'রে তথাকথিত কল্যাণকর ব্যবস্থা ক'রে ছেঁড়া কাপড়ের মত ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের উপর রিপু কাজ চালান হচ্ছে। বড় দুঃখের কথা, শিল্পোৎপাদনের বনিয়াদ যারা—যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কল-কারখানা চালাচ্ছে, যারা রক্ত এবং ঘর্ম্ম বিন্দুর বিনিময়ে জাতীয় সম্পদ উৎপাদন করছে, এই স্বাধীন দেশেও সেই শ্রমিক শ্রেণী তাদের মনিব তথা সমাজের উপরতলার বাবুদের কাছে অস্পৃশ্য ও অপাঙক্তেয়। তাই শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতার লেশমাত্র নেই, আছে শুধু এক অবিরাম সংগ্রামের সম্পর্ক। শ্রমিকরা কল-কারখানা ও শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন সংস্থার অংশীদার এবং এ সমস্ত সম্পত্তিতে যে তাদের অধিকার আছে এই সত্য কথাটা মেনে নিতে আজও মালিক শ্রেণী অসম্মত। তাই চলেছে এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং সেই কারণেই 'শিল্পে শান্তি রক্ষা কর' এই ধ্বনিতে কেউ দিচ্ছেনা সাড়া। দেহের মধ্যে রোগ পুষে রেখে হাওয়া বদলাতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল, অশান্তির মূল কারণ জীইয়ে রেখে শান্তি প্রা... ...ও তেমনি অর্থহীন।

ইং ১৫।৮।৫১ তারিখে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় 'Human... ons in Indian Industry' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ডাঃ ... দাস লিখেছেন :—

"Workers feel that they are not part of the mana... ement and must defend themselves against it. What should be well integrated and co-operative units are split into warring factions".

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পশ্চাদপটে এই "warring factions" এর সমস্যা দূর করা সম্ভব—যদি শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের ন্যায় সঙ্গত ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়—যে সুযোগটা ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার অবশ্য এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। সরকারী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার আগে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের নানা দেশে এই নতুন পদ্ধতি কেমন ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং কতটা সাফল্য লাভ করেছে আশাকরি সে সম্বন্ধে একটু আলোক পাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যুগোশ্লোভিয়া—১৯৫০ সালে এই দেশে একটি আইন চালু হয় এবং এই আইন শ্রমিকদের কল কারখানার কাজ তত্ত্বাবধান করবার ক্ষমতা দেয়। আইনটির সর্ত্ত অনুসারে প্রত্যেক শিল্পোদ্যোগে (Industrial enterprise) একটি শ্রমিক মন্ত্রণা সভা (Workers Council) ও একটি ব্যবস্থাপক সভা (Management Committee) গঠিত হয়। শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগণই এই মন্ত্রণাসভা (Council) গঠন করে। মন্ত্রণা সভার সদস্য সংখ্যা শিল্প-সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্ম্মের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। মন্ত্রণাসভার সভ্যগণের কার্য্যকাল এক বছর এবং এক বছরের মধ্যে তাঁরা আটবার আহুত সভায় মিলিত হয়ে আরব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। প্রয়োজনবোধে আটবারের বেশীও সভা আহুত হয়। শিল্প সম্বন্ধীয় কাজের হিসাবপত্র অনুমোদন, লভ্যাংশ বিতরণ, আয়কর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ, কর্ম্মীদের কাজ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দায়িত্ব মন্ত্রণা সভার উপর ন্যস্ত। মন্ত্রণা সভা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করে। ব্যবস্থাপক সভার আয়তন ক্ষুদ্র এবং ক্ষমতাও অল্প। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রণা-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগ। ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকাল এক বৎসর। নূতন নির্ব্বাচন কালে বিদায়ী সভার কিছুসংখ্যক সদস্য বিনা নির্ব্বাচনে নব নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারেন। দৈনন্দিন কার্য্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মন্ত্রণাসভার উপরই অর্পিত।

— বহিরাগতের মন্ত্রণা সভা অথবা ...স্থাপক সভার সভ্য হবার অধিকার নেই।

পশ্চিম জার্ম্মানী—গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম-জার্ম্মানীতে শিল্প পরি... ...য় শ্রমিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১৯৫১ ... ১৯৫২ সালে দুটি আইন পাশ করে এই নীতি (শিল্প পরিচা... শ্রমিকের অংশ গ্রহণ) এই রাষ্ট্রে প্রচলন করা হয়। ১৯৫১ স... আইন শ্রমিক-মালিকের যৌথ পরিচালনার ভিত্তিতে শিল্প (Industrial undertaking) গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। অঙ্গী...ম অঙ্গীকারে (undertaking) এক হাজার অথবা প্রয়োজন-...থ তদুর্দ্ধ শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। কর্ম্ম পরিচালনার জন্য একটি ...বিধায়ক পরিষদ (Board of supervisors) থাকে। পরিষদে ...ভ্য সংখ্যা ১১জন। এর মধ্যে শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচজন এবং শ্রমিক প্রতিনিধি পাঁচজন। অবশিষ্ট আর একজন সদস্য শেয়ার হোল্ডার ও শ্রমিক সজ্য কর্তৃক যুক্তভাবে নির্ব্বাচিত হয়ে পরিষদে আসেন। তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের মূল কর্তব্য কর্ম্ম পরিচালনার নীতি নিদ্ধারণ করা, নির্ধারিত নীতির ব্যবহারিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব একটি অধীনস্থ পরিষদের উপর ন্যস্ত। এই অধীনস্থ পরিষদের সভ্যসংখ্যা তিনজন। এর মধ্যে একজন কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধি। বৃহৎ শিল্প অঙ্গীকারগুলি ১৯৫১ সালের আইন ঘোষিত উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। অন্যান্য শিল্প সংস্থাগুলি পরিচালিত হয় ১৯৫২ সালের আইন অনুসরণে। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের আইনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, শেষাক্ত আইন অনুসার তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের শ্রমিক প্রতিনিধি সংখ্যা পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হ'তে পারবে না। অবশ্য খনি এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। এই দুটি শিল্পে শ্রমিক প্রতিনিধি সংখ্যা শেয়ার হোল্ডারদের সংখ্যার সমান। ১৯৫২ সালের আইন সোস্যাল কমিটি (Social committee), পার্সোন্যাল কমিটি (Personnel committee) ও ওয়ার্কস্ কমিটি (Works committee) ইত্যাদি গঠনের ক্ষমতা দেয়। এই কমিটি-গুলি সম্পূর্ণরূপে শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। প্রথম দুটি কমিটির কাজ কর্ম্মচারীদের সামাজিক বিষয়ে এবং কর্ম্মরত শ্রমিকের প্রাত্যহিক সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে দেখাশুনা করা। তৃতীয়টির কর্তব্য কাজের ঘণ্টা এবং ঐরূপ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ফ্রান্স—শ্রমিক ও মালিকের যুক্ত উদ্যোগে ফ্রান্সে বিভিন্ন শিল্পের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। যদি কোন বে-সরকারী শিল্প-সংস্থায় ৫০ জন অথবা তদুর্দ্ধ কর্ম্মী নিযুক্ত হয়, তাহলে আইন অনুসারে সেই সংস্থায় একটি কর্ম্ম পর্ষদ (works committee) গঠিত হয়। পর্ষদের সভ্য সংখ্যা গৃহীত কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে পরিবর্তন সাপেক্ষ। শিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দের মধ্যে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কর্ম্ম পর্ষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। কর্ম্মচারীদের বাসস্থান, ক্যানটিন (canteen), প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ঋণদান ইত্যাদি ব্যবস্থার দায়িত্ব কর্ম্মপর্ষদকে পালন করতে হয়। এ ছাড়া উৎপাদন, শিল্প-সংগঠন ও লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়েও কর্ম্ম-পর্ষদের মতামত প্রকাশের এবং পরামর্শ দেবার ক্ষমতা আছে। ফ্রান্সে রাষ্ট্র-আয়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। জাতীয় সম্পদে পরিণত প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যে প্রাথমিক বিভাগ, তা হোলো সাধারণ শাসন বিভাগ (General Administrative Body)। পরবর্ত্তী বিভাগ, বোর্ড অফ ডাইরেকটার্স (Board of Directors)। শেষোক্ত বিভাগ, কর্ম্ম-পর্ষদ (works committee)। প্রতিটি বিভাগের শ্রমিক-সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়ন গুলিরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার আছে। রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাঙ্ক শিল্পের জন্য একটি সংস্থা আছে, যার কাজ জাতীয় লগ্নী সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রণা দেওয়া। এই জাতীয় লগ্নী মন্ত্রণা সভার (National Credit Council) মূল উদ্দেশ্য—লগ্নীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা এবং লগ্নীর সংগঠনমূলক ব্যবস্থা করা। এই মন্ত্রণা সভার সভ্যসংখ্যা ৩৮ জন। এর মধ্যে ৭ জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসদস্যবিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। এই দেশের প্রধান চারিটি ব্যাঙ্ক এইভাবে একটি ১২ জন সভ্যবিশিষ্ট পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই পর্ষদের সভ্য সংখ্যার মধ্যে ৪ জন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, ৪ জন ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট ৪ জন সরকারী প্রতিনিধি।

যুক্তরাজ্য—যুক্ত রাজ্যেও শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা উল্লেখনীয়। এখানেও যৌথ পরিষদীয় (Joint Committee) ব্যবস্থা প্রচলিত এবং সরকারী সমস্ত শিল্প সংস্থায় এই যৌথ পরিষদীয় ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ব্যবস্থা ইচ্ছাধীন। যুক্ত পরিষদের সভ্য সংখ্যা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যরক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা যৌথ পরিষদের কাজ।

শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে যুক্ত-রাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও মেহনতী মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। যুগোশ্লোভিয়ায় এই ব্যবস্থার প্রচলনে জাতীয় সম্পদ উৎপাদন বেড়েছে, শ্রমিকদের কর্ম্মনৈপুণ্যের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হয়েছে এবং কাঁচামালের অপচয় বহু পরিমাণে কমে গেছে। পশ্চিম জার্ম্মানীতে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও সম্প্রীতি দেখা দিয়াছে। অধিকতর পারিশ্রমিক, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং নানা রকম কল্যাণকর-ব্যবস্থার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর জীবনধারণের মান উন্নত হয়েছে। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থার প্রচলনে কয়লা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বেড়ে গেছে। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক-গণের উৎপাদন শক্তির (Labour Productivity) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের শিল্প শ্রমিক এক বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ

হয়েছে এবং এমনি ভাবে ঐ দেশগুলিতে শিল্পে শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

যে কথাটার উল্লেখ আগেই করেছি যে, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের জাতীয় সরকার অগ্রণী হয়েছেন—সেই কথাটায় এখন ফিরে আসা যাক্। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে নয়া-দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লেবার কনফারেন্সের (Labour conference) পঞ্চদশ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে দেশের শ্রমিক-শ্রেণী শিল্প-পরিচালনায় সাফল্য লাভে সমর্থ হয় কি না দেখবার জন্য এক পরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থা করা হোক। এই ব্যবস্থা অনুসারে ৫০টি নির্ব্বাচিত শিল্প সংস্থায় যৌথ ব্যবস্থাপক পরিষদ (Joint Council of Management) স্বেচ্ছামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক্ এবং নবগঠিত যৌথ ব্যবস্থাপক পরিষদ কর্তৃক ঐ সমস্ত শিল্প সংস্থার কাজ পরিচালিত হোক্। এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ঐ অধিবেশনেই একটি সাব-কমিটি (Sub-Committee) গঠিত হয়। ঐ সাবকমিটির চেষ্টায় ৩০টি সংস্থা উপরোক্ত পরীক্ষামূলক ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৫৮ সালে মে মাসে নৈনিতালে ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সের (Indian Labour Conference) ষোড়শ অধিবেশনে এই সাব-কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তা থেকে জানা যায় যে, যৌথভাবে শিল্প পরিচালনার কাজ বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ষ্টাণ্ডিং লেবার কমিটির Standing Labour Committee সপ্তদশ অধিবেশনে ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারী লাল নন্দার বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে, ৩০টি সংস্থা যৌথ ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠনে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল—তাদের মধ্যে মাত্র ১০টি সংস্থায় তা গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে আর একটা কথাও জানতে পারা যায় যে, যে কয়টি সংস্থায় পরিকল্পনাটি শ্রমিক মালিক দুই তরফ থেকে আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে সেই সংস্থাগুলিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে শিল্প পরিচালনায় অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় শিল্প শ্রমিকের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে কতটা সাফল্য লাভ করবে সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রয়োজন এবং সুযোগ মানুষকে সকল অবস্থার সম্মুখীন হবার উপযোগী করে তোলে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ ১২ই মার্চ্চ 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ডিরেক্টর শ্রীজাহাঙ্গীর গান্ধীর নিম্নলিখিত বক্তৃতার অংশ বিশেষ উল্লেখনীয়:—

দেশের সমৃদ্ধির জন্য মানুষ তার স মত কাজ করিবে ইহাই যদি আমরা চাই, তাহা হইলে প্রত্যেকটি কর্ম্মচা যাহাতে মনে করতে পারে যে সে একটি উদ্যোগের অংশীদার সেইভাব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।.........কর্ম্মচারীদিগকে উৎপাদন কর্ম্মের দার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং কর্ম্মচারীগণ যে মানুষ এবং দের উদ্ভাবনী বুদ্ধি আছে একথা মানিয়া লইতে হইবে।.........জামে দিগকে কারখানা পরিচালনার কাজে যুক্ত করার পরীক্ষা শ্রমিক-হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ হইয়াছে।

সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি সহযোগিতা, সদিচ্ছা, আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পরিকল্পনাটি প্রচলিত হয় তাহলে শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা যে নিশ্চয় সার্থক হয়ে উঠবে টাটা কোম্পানীর সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আছে—যে ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ (এঁরা বহিরাগত নন) পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দিয়ে সার্থক করে তুলতে প্রস্তুত।

আরো একটা কথা এবং সেই কথাটা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করি। দেশ স্বাধীন হবার পর কয়েকটি বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ হোলো, কিন্তু শিল্প এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার ঘোটলনা। আমাদের দেশে নয়, পাশ্চাত্যের বহু ধনতান্ত্রিক দেশেও এ একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়করণের পরেও ইউরোপে বহু শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয় নি। এই জন্য শিল্পের জাতীয়করণ অথবা রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে আবার চিন্তা সুরু হোলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতায় থাকার সময় যে লেবার পার্টির (Labour Party) সিদ্ধান্ত অনুসারে যুক্ত-রাজ্যে বৃহৎ শিল্পগুলির এক তৃতীয়াংশ জাতীয়করণ হয়েছিল এখন সেই লেবার পার্টিই বলছে যে বিশেষ বিবেচনা এবং সতর্কতা অবলম্বন না করে শিল্পের জাতীয়করণ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। ফাউরিয়র (Fourier), ফিচেট (Fitchet), প্রুধোঁ (Proudhan), রবার্ট ওয়েন (Rubert Owen), জি, ডি, এইচ, কোল (G.D.H. Cole,) সিড্‌নি ওয়েব্ (Sydney Webb) প্রমুখ ব্যক্তিগণের মত একালের সমাজ-তাত্ত্বিকগণও এই কথাটি এখন উপলব্ধি করেছেন যে শুধু জাতীয়করণেই শিল্প এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার সম্ভব নয়, সম্ভব যদি জাতীয়-করণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-আয়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এইদিক থেকেও বিচার করে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র-আয়ত্ত বিভিন্ন শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীকে সুযোগ দিয়ে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বিশেষ বিবেচনাযোগ্য ব'লে মনে করি।

গল্প

এইক্ষণে

নিখিল সুর

শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে দেখেই এলাম। রান্নাঘরে প্রকশি দেওয়া অসহ্য হয়ে ওঠার তাগিদেই হোক, আর মরা গাঙে বানের মত আমার দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ, বিরস শুকিয়ে-ফাটল-ধরে-যাওয়া মনটাকে সরস করবার দুর্বুদ্ধির তাগিদেই হোক বা স্বর্গগত মা-বাবার একমাত্র মধ্যমণিরূপে বংশের গভীর অন্ধকার খুপরির ম্রিয়মান বাতিকে প্রদীপ্ত করার গুরুদায়িত্বের প্রভাবেই হোক—আমি দারপরিগ্রহ করব স্থির করলাম।

বিকেলে দেখতে গিয়েছিলাম মেয়েটিকে। খোঁজ দিয়েছিল আমার জনৈক মুখ-পরিচিত বন্ধু। ঘটকও বলতে পারি। স্বার্থে কি নিঃস্বার্থে জানিনা, তবে অনেকদিন ধরে মেয়েটিকে দেখবার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল বার বার। কোন আত্মীয়তা আছে নাকি মেয়েপক্ষের সঙ্গে, এ প্রশ্ন করায় কপট নির্লিপ্ততা মিশিয়ে উত্তর দিয়েছিল—না—আত্মীয় নয়। পাকিস্থানে একই গ্রামে বাড়ী ছিল। আর তাছাড়া এতো তোমার শহর নয় যে নীচের তলার ভাড়াটিয়া, ওপর তলার ভদ্রলোকের নাম জানবে না। সেখানে এক গ্রামে বাস করছি—মানে দাদা, ভাই, আত্মীয় সব।'

বোশেখ মাসের চোখ ঝলসানো রোদটা তখনও দেয়াল তাতিয়ে ঘরের ভেতরটা অগ্নিকুণ্ড করে রেখেছিল। ঘরের একটি মাত্র দরজা। বাইরে গরম হাওয়ার তাণ্ডব নৃত্য চলছিলো, তাই ওই একটিমাত্র দরজাকেও বন্ধ করে অগ্নিকুণ্ড ঘরটাকে অন্ধকূপ করে রেখেছিলাম। হাওয়াটা দরজায় আছড়ে পড়ে বার বার আবেদন জানাচ্ছিলো খুলে দেবার জন্য। কিন্তু আমি নির্ব্বিকার ছিলাম, কারণ দুর্জ্জনের বিনয়ভাব কপটতার মুখোস। এতে যার সহানুভূতি ঝরে সেই মরে। আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম খাটের ওপর। মাথাটা ছিল একপাশে ঢিপি করা বিছানার ওপর। খাপরার ছাদ। তারই ফাঁক দিয়ে যে একরত্তি আলো প্রবেশ করছিলো ঘরের ভেতর—তাতেই একটা নভেলে মনোনিবেশের চেষ্টা করছিলাম বাতাসের আবেদন অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তবুও জ্বালা আছে। থুতনির কাছে একটা ঘামাচি অকারণে বিড় বিড় করে উঠলো। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে বইটার শক্ত মলাটের এক কোণ দিয়ে তাকে সমূলে নাশ করলাম। এবারে রোমস বুকের মাঝখানটা শির শির করে উঠলো। বইটা একপাশে রেখে ঘাড় উঁচু করে তাকালাম। ঘন কালো লোমে ঢাকা হাড় জিরজিরে বুক। মাঝখানটা বেশ গর্ত্ত। মনে হল বন্ধুর অঞ্চলের এক নদী। নদীই ঠিক। ঘন কালো লোমের জঙ্গলকে যেন দু'ভাগে ভাগ করে এগিয়ে চলেছে। পুষ্ট হয়েছে গলার নোনা ঘামে। আমি ঘাড় উঁচু করতেই স্রোতের বেগ বেড়ে গেল।

এমনি যখন নিজের বুকের ওপর নোনাজলে পুষ্ট স্রোতস্বিনীকে দেখছিলাম একান্ত হয়ে—তখন চমকে উঠেছিলাম দরজা ধাক্কানর শব্দ শুনে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম এ বাতাসের আবেদন নয়; নিশ্চয় কারো কড়া তাগাদা। আমার অনুমানই ঠিক। দরজা খুলে দেখি চৌকাঠের ওপারে জানলার শিকের মত বাঁকা, পানের ছোপ লাগান কতকগুলো দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বন্ধুবর। আশ্চর্য্য হবার কথা আমার। এই মাথা-ভাঙ্গা রোদে—অনুকূল চিন্তা এল মনে সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলাম ঘটকালির নেশা।

এত কথা, এত কিছু ভাবছি এখন। এইক্ষণে। শুয়ে শুয়ে। রাত আর কতই বা হবে। বোধহয় দশটা। কাঁটায় কাঁটায় না হলেও কাছাকাছি। তবে এখনও টাটা কোম্পানীর পিলে চমকানো ভোঁ শুনতে পাইনি। গ্রীষ্মের রাত। এবারে দশটা বাজলে 'বি' শিফ্ট্ অর্থাৎ দুটো দশটায় ঘামে ভেজা ক্লান্ত মানুষগুলো বেরিয়ে আসবে কার-

থানা থেকে। ওরা না যাওয়া পর্য্যন্ত এ রাত শুদ্ধ হবে না। দশটা বাজবে। ওদের ভারী বুটের তলায় লোহার নাল আর রাস্তার পাথরের ঘর্ষণে দু'একটা আগুনের ফুল্‌কি ছুটবে, বেরিয়ে আসবে বিরক্তিকর খটাস্ খটাস্ শব্দ; পাশের বাড়ী সদ্য-রিটায়ার-করা বুড়োটা হাঁপানির বেলায় কাসবে, থুথু ঢালবে শব্দ করে, হাঁপাবে, নিমগাছটার শালিকগুলো অনাবশ্যক চেঁচাবে খানিকটা—তারপর শান্ত হবে এ রাত। রাতে আর খাইনি। মেয়ে-ওয়ালারা বড্ড বেশী খাইয়ে দিয়েছে। হাসি পেল বড়। অন্যান্য কাজে লোকে কার্য্যসিদ্ধি হবার পর ঘুস দেয়। অন্ততঃ এই নিয়ম। কিন্তু এ কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত খালি ঘুস। না, বড় খাইয়েছে। পেটটা বুঝি কেমন করছে। পাশ ফিরে শুলাম। আহা রে! বুড়ো কুকুরটা রোজকার মত আজও বসে আছে ড্রেনের ওপারের ওই স্ল্যাবের ওপর। কিন্তু আজ যে আর কিছু নেই ওর জন্য। অনেকদিন পর ব্যতিক্রম ঘটলো ওর প্রাপ্যে।

চোখ দুটো আমার বুজে আসছে। বেশবুঝতে পারছি। তবে গাঢ় ঘুমের পরশে নয়। এই মুহূর্ত্তেরই চিন্তা ভাবনার হঠাৎ পাল্‌টি খাওয়া একটা রূপ আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় জানি না। তবে স্মৃতির অন্ধকারে মনে হয়। আমিও ছুটছি, কিন্তু ওর নাগাল পাচ্ছি না—তাই বোধহয় চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় থমকে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, সেই ঠাণ্ডা পাথরের মত ভারী রাতটার সামনা-সামনি। বড্ড নিকষ কালো মনে হয়েছিল সে রাতটিকে। ঘৃণা, আকণ্ঠ ঘৃণায় বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল সারা মুখ। যেন পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা পচা ঢেঁকুর। আমার, মার দুজনার মধ্যে।

ভেতরের মানুষ দুটো, বেশ মনে পড়ছে, ঘরের ঘোলাটে আলো জানলাহীন বন্ধ খোপের মত ঘরখানির গুমোট আবহাওয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আমাদের দু' জনকেই তারা ছোট নিষ্ঠুর দেখে ভয় পেয়েছিল। ওপরের মানুষদুটো বোধহয় নেশা করেছিল; হিংসা আর স্বার্থের অদৃশ্য হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল পরস্পরকে বুঝতে। তাই লঘু-গুরু মানে নি, মা-ছেলের সম্পর্কের বাছ বিচার না করে তাকে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোস এঁটে দিয়েছিল মুখে।

সে রাতের স্মৃতিটা সিমেণ্ট চটে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো ঘরের মেঝে হয়ে মনে এখনও টিকে আছে। আজ এই ক্ষণে অতীতের দিকে পাশ ফিরে তাকাতে নজরে পড়ল।

আজকের মত সেদিনও ওই কুকুরটা অনাহূত অতিথি হয়ে বসেছিল ওই স্ল্যাবটার ওপর। আর সেদিনও ব্যতি-ক্রম ঘটেছিল ওর প্রাপ্যে। সময়টা ছিল শীতকাল। জানলা-বিহীন দরজাটা একটু ফাঁক করা ছিল। বাইরে ঝন্‌ঝনে ঠাণ্ডা হাওয়া দাপাদাপি করছিলো অশান্ত শিশুর মত। কুকুরটা বসেছিল চুপচাপ। লক্‌লকে লালায় ভেজা লাল জিভটা ছিল বের করা। বোধহয় খুব ক্ষিদে পেয়েছিলো, বার বার চাটছিলো মুখের চারপাশ। অনেকক্ষণ থাকবার পর ধৈর্য্য হারিয়ে উঠে এসেছিল বারান্দার ওপর। প্রসাদ জুটবে কিনা সেই কৌতূহলটা শেষ বারের মত মেটাবার জন্য দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের দু'জনকে কিছুক্ষণ দেখেছিলো। কিন্তু ঘরের দুটি প্রাণীকেই আপদমস্তক লেপে ঢাকা দেখে ঝাঁজিয়ে উঠেছিলো। বেচারা পরে নিশ্চয় ভেবেছিলো, কেন কৌতূহল মেটাতে গেলাম। আশা নিয়ে সারা রাত ঘরের দিকে মুখ করে স্ল্যাবের ওপর বসে থাকলেও বোধহয় ক্ষিদেটা অমন ঝাঁপিয়ে পড়ত না। আশাটা শারীরিক বিপর্য্যয়ের সময়ও সাহায্য করে। তাই যে মুহূর্ত্তে সে আশাহত হয়ে নিশ্চিত জানতে পেরে-ছিল যে আজ রাতে অভুক্ত থাকতে সেই মুহূর্ত্তে ক্ষিদেটাও ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত পেটে ঢুঁ মেরেছিলো সজোরে, আর সে কেঁদে উঠেছিল ঝাঁজিয়ে।

একখানা পায়রার খোপের মত ঘর। এই রকম ঘর-গুলিই 'বস্তি' নাম সার্থক করেছে। যাই হোক আমাদের মা ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। তবে অতিথি এলে বড় লজ্জায় পড়তে হয়। বিশেষ করে লজ্জায় ফেলে ওই একমাত্র দরজাটি। অতিথিরা অসাবধানতাবশতঃ ঘরে ঢুকতে গেলেই সে সুযোগ গ্রহণ করে। নিঃশব্দে তাঁর মাথাটি ঠুকে দিয়ে সম্ভাষণ জানায়। আমার চোখ মুখ লজ্জায় কুঁচকে যায়, আর সে নিঃশব্দ হাসিতে লাল হয়ে ওঠে। বোধহয় প্রতি-শোধ নেবার আনন্দের হাসি। প্রতিশোধ এইজন্যে যে, মানুষের থেকে তার অবয়ব যেন খাটো করা হয়েছে।

মা শুয়ে আছেন দরজার গোড়ায় খাটিয়া পেতে। দৃশ্যটা চোখে পড়ছে। আমি তারপরে আর একখানা খাটিয়ায়।

হ্যারিকেনের আলোটা খুবই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। নিবেও নিবছে না। সম্ভবতঃ কিছুক্ষণ আগে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে এই ঘরে, সেই কুৎসিত অভিজ্ঞতাটা ওর প্রাণে বার বার শিউরে উঠছে। ভয়ে নিবতে পারছে না। মা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন ওপাশ ফিরে। তাঁর মেদ-বহুল ভারী শরীরটা নিঃশ্বাসের তালে ওঠা-নামা করছে। এতক্ষণ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়। কুকুরটা তখনও বিশ্রীভাবে ফুঁপিয়ে চলেছে। বুঝি মায়ের কান্নার রেশটা টেনে চলেছে। অদ্ভুত লাগছে কান্নাটা। যেন দূর থেকে ভেসে-আসা করুণস্বরের একটা বেসুরো গান। কখনও থামছে, কখনও ভেসে আসছে। কখনও আস্তে, কখনও বা জোরে।

ঘরের ওকোণটায় রয়েছে কেরোসিন কাঠের একটা সেল্ফ। ওতে লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি ছত্রিশকোটি দেবতা না হোক, অন্ততঃ ছত্রিশটা দেবতার পট রয়েছে সাজানো। অন্ধকার-প্রায় ঘরটাতে বিড়ালের চোখের মত রেডিয়াম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা দুটো জ্বল জ্বল করছে। ঘরের এই দুটি প্রাণীর হিংসায় ভীষণ হয়ে যাওয়া ভুতুড়ে স্পর্শে ওরা যেন আরও জ্বলজ্বল করছে।

অথচ সকালে ডিউটি যাবার সময়কার কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে, মিঠে রোদ মেশান সে দিনটার স্চনার মধ্যে—সে রাতের কোন আভাষ ছিল না।

জন্মের তিন মাস পরে বাপ্‌কে খেয়েছিলাম। খেয়েছিলাম কিনা জানি না, তবে মা ও আত্মীয়রা রেগে গেলে ওই কথাই বলত। বয়স কম হয়নি। যৌবনের অগুন্তি প্রলুব্ধকর জোয়ারের ঢেউ বার বার হৃদয়ের তটে আছাড় খেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পাড়ী জমাবার সাজগোজ করছে অন্য কোথাও। অর্থাৎ জীবন-সূর্য্য আরেকবার রক্তিম হতে চলেছে। যেখান থেকে উদয় হয়েছিল সেই অজানা দেশের দিকে একটু একটু এগুচ্ছে। তবুও দারপরিগ্রহ করিনি। আর এই উদাসীনতাই যত ঘোলাটে আবর্ত্তের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু কারণেও কারণ থাকে অনেক সময়। আমি খেয়েছিলাম বাবাকে—আর বাবা বুঝি আমার জীবনের সব রস চুষে পান করে গিয়েছিলেন—মাথায় পাহাড় প্রমাণ ধানের বোঝা দান করে। যে বয়সে খেলাধূলোর মধ্য দিয়ে অন্যান্য সবাই জীবনকে উপভোগ করে, সে বয়সে চাকরীর দুর্বিসহ সময়-গুলির মধ্য দিয়ে জীবন আমাকে ভোগ করেছিল, তাই লেখাপড়া হয়নি। চোদ্দ বছর বয়সে উপার্জ্জনের আশায় ঢুকতে হয়েছে চাকরীতে। এত বছর চাকরী করলাম, কিন্তু ধানের বোঝা তেমনি অটল অনড় হয়েই আছে। আর সে পাহাড়কে তিলে রূপান্তরিত করবই বা কি করে। যৎসামান্য আয় থেকে এইবার শুধতে গেলে সংসারের অনটন অনেকদিন বেড়ে যায়। ঠিক ফোলানো বেলুন টিপে ধরার মত। মাঝখান থেকে শুধু সুদটা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। যেন অনেক সেবার ফলে গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রের মত একে লালন্ করতে হবে সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, ছায়া ঘরে বেড়ে ওঠা লতানীর মত। যদিও এ ঋণের কোন দলিল নেই, তবুও অস্বীকারের উপায় নেই। বিবেক প্রহরীর নিষেধোদ্ধত।

এর ওপর মায়ের খোলা হাত। সৌভাগ্যক্রমে নিজের, দু'সম্পর্ক আর পাতানো সম্পর্ক মিলে মামা ও মাসী আছে প্রায় এককুড়ি। তাদের অগতির গতি হচ্ছেন মা। হাতে পাতে উভয় দিক দিয়ে তাদের দিতে হবে। আর তারও ওপর মায়ের তীর্থের নেশা। মামা মাসীর বাড়ী আর তীর্থ মিলিয়ে মায়ের সময় চলে যায়। মাসে একটি হপ্তা বাড়ী থাকেন কিনা সন্দেহ। আমাকে শরণাপন্ন হতে হয় হোটেলের দরবারে। এর ওপর মায়ের পুত্রবধূর মুখ দর্শনে অগাধ ইচ্ছা। প্রথমে নিজে—পরে আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে তাগাদা করে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা আর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার অসহ্য লাগতো। এই সময় আত্মহত্যার মত খেলো-নাটকীয় একটা কিছু করবার প্রবল লোভ মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করেছে। পর্ব্বতচূড়ায় উঠে চারিদিকে চেয়ে মানুষ যে শূন্যতা অনুভব করে এ তা-ই। এতখানি পথ ছিল দুর্গম, ছুঁচলো কালো পাহাড়ী পাথরের আঘাত। কষ্টে যন্ত্রণায় মাখামাখি অভিজ্ঞতা। কিন্তু আর উঠবার সাধ নেই। জীবনকে আর অভিশপ্ত করে তুলবো না অন্ততঃ নিজের হাতে। অদৃষ্ট যা দিয়েছে সেটাকেই চাপে চাপে একেবারে মিশিয়ে দিতে হবে মাটির সঙ্গে। তাই স্থিরপ্রতিজ্ঞ আমি। ভোগ না করে জীবন কাটালে তত লাগবে না, কিন্তু ভোগের সঙ্গে

যন্ত্রণা টেনে এনে জীবনকে আরও করুণ কঠোর করে তুলবো না।

ডিউটি যাবার সময় সেদিন সকালে মা বার বার করে সময় মত বাড়ী ফিরে আসবার জন্য বলেছিলেন। আমিও বুঝেছিলাম মায়ের মতলব। এমনি করে অনেক ভাবী শ্বশুরের হাত থেকে নিজেকে এড়িয়েছি। ইচ্ছে করে ফিরলাম রাত আটটায়। মায়ের অবাধ্য হতে হবে তাই তাঁর মনস্তুষ্টির আশায় আসবার সময় কিনেছিলাম একটা গরম স্কার্ফ।

ঘরে ঢুকবার আগে মনে হল যেন স্কার্ফটা ঠোঁট টিপে হাসছে। ও বোধহয় জানতো—মধুর এই ছবিটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। স্নেহ-বাৎসল্য-মমতার টানে বাঁধা এই দুটি মানুষ একটু পরে হিংস্র নেকড়ের মত কুৎসিত ভাবে জ্বলজ্বল চোখে পরস্পরের দিকে তাকাবে, আর হাপরের মত হাঁপাবে।

দৃশ্যটা চোখে ভাসছে এখনো। মনে করবার জন্য চোখ বন্ধ করে অন্ধকার খুঁজবার প্রয়োজন হ'চ্ছে না। সব যেন দেখতে পাচ্ছি। ভারী জুতোয় ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দ তুলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠের ওপর আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মা অপ্রস্তুতের মত ঘরের ভেতর আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। ধনুকের মত ভুরু দুটো বেঁকে বিরক্তি-মাখা একটা তেতো স্বর আমার গলা চিরে বেরিয়ে এল—ও কী মা, আমার সুটকেস হাতড়াচ্ছ কেন? অপ্রস্তুত ভাবটা ততক্ষণে মায়েরও কেটেছে।

'দেখছি, কোন মুখপুড়ি আমার কপাল পুড়িয়েছে, কোন মুখপুড়ীর সোহাগে আমার মান সম্মানকেও কুকুরের মত লাথি মার্‌তে পারিস্। মুখের পেশী কঠিন, জিভটাকে ছুরির মত ধারালো করে মা বলেছেন।

সেই মুহূর্ত্তে আমারও কী জানি কী হয়েছে; মাতৃত্ব-টানে মুখোস মনে হয়েছে। একটানে ছিঁড়েছি সে মুখোস। দেখেছি একটা স্ত্রীলোক—যার দিকে চেয়ে সমস্ত শরীর রী-রী করে উঠেছে। সব দিক থেকে নিঃস্ব এই স্ত্রীলোকের কাছে কোনদিন কিছু চাইতে পারব না, চাইলেও দেবার মত কিছু নেই। শণের নুড়ি চুল, আর চামড়া ঝুলে পড়া হাত দুটির দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলে উঠেছে—বুড়ী, তুমি সেই মুখপুড়ী।

পলকে মায়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখেছি। কি—কি বললি?

—তুমি সেই মুখপুড়ী, অন্য কেউ না।

দেখেছি একেবারে নুয়ে নেতিয়ে পড়বেন মাটিতে। কিন্তু না। ধীরে ধীরে মা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বীভৎস দৃষ্টি মেলে, জীবনের সমস্ত ঘৃণা তাঁর কুঞ্চিত মুখের চামড়ার ফাঁকে রেখে এক-পা এক-পা এগিয়ে এসে সোজা আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন—আমি!

তীব্র, ঝাঁঝালো গলায় বলেছি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। তুমি আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ। মায়ের প্রতি সন্তানের যে দাবী, তা থেকে নিজেকে চিরদিন দূরে দূরে রেখেছ। দু'টো দিন বুকের দুধ দিয়ে চাকুরীতে ঢুকিয়েছ। নিজে ঘুরেছ তীর্থে—আমার কাঁধে ধানের বোঝা চাপিয়ে। দুনিয়ার লোককে রেঁধে খাওয়াও, অথচ আমাকে তুমি ক'দিন রেঁধে খাইয়েছ বলতে পার? এর ওপরও আমাকে দিয়ে সখ মেটাতে চাও? আমার বিয়ে দিতে চাও? শুধু তাই নয়, আবার সন্দেহ? হীন, নীচ মেয়েলোকের মত! মা হঠাৎ বলে উঠেছেন—ছিঃ, ছিঃ—তুই এতটা নেমে গেছিস? আমি না তোর—

বুঝতে পেরেছি—মা একা কান্নায় লুটিয়ে পড়বেন। কিন্তু তখন বুকের ভেতরটা গ্রীষ্মের খরতাপে ফেটে যাওয়া মাটির মত চৌচির হয়ে ফাটছে। উদ্ধত, উন্নত, উদ্যত ভঙ্গিতে দাঁড়াতে বলেছি—নেমে গেছি? আমি না তুমি?

হ্যারিকেনের শিখাটা দপ্ দপ্ করছিলো। এখুনি বোধহয় চিমনিটা ফেটে গিয়ে ঘরটা ভুতুড়ে অন্ধকারে ঢেকে যাবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন, ওই আলোটা আরো জোরে জ্বলে উঠুক। আমি আহুতি দেব। ইচ্ছা-বাসনা, সুখ-স্বপ্ন সব ছুঁড়ে দেব ওই আগুনে। কিন্তু হল না তা। ভীষণ শব্দ করে হঠাৎ দপ্ করে আলোটা স্তিমিত হয়ে গেল।

মা তার দু'দিন পরে তাঁর গুরুর আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। গভীর দুঃখের বোঝা বুকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন জানি। কিন্তু এখন ভাবি একটা কথা। মা সেদিনের রাতটাকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। সে রাতের নিকষ কালো অন্ধকার কোনদিন মুছে ফেলতে চাননি। কিন্তু ভোরের মৃদু আলোতে সূর্য্যদেবের আরাধনা করবার সময়-

কার সেই আলোতেও যদি একবার চোখ খুলতেন তাহলে অনেক কিছু দেখতে পেতেন, বুঝতে পারতেন। তখন নিজেকেই ধিক্কার দিতেন, বুঝতে গিয়ে লজ্জা পেতেন।

দেখতেন, কারখানার আগুনে মুখ পুড়িয়ে আসা আমার মায়ের আয়ের খামটী যার ওপর চাপানোর ম্লান আঁচড়ে লেখা আছে একশ দশটাকার অঙ্কটা; আমার মাথায় খাঁড়ার মত ঝোলায় হাজার কয়েক টাকার ঋণ, পায়রার খোপের মত একটি ঘর—যা পশুরও বাসের অযোগ্য, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে হোটেলে খাওয়া অপুষ্ট হাড়-জিরজিরে আমার এই দেহ; আমার এই অসহায় করুণ রোগ নিশ্চয় ওঁর চোখে পীড়া দিত। পুত্রবধূ আনার মায়েদের এই সহজাত আকাঙ্ক্ষাটা সঙ্গে সঙ্গে ভিত্তি শুদ্ধ নড়ে।

বেশী না, শুধু আর একটিবার যখন তাঁর এই ছেলেটিকে আদর করে মাথাটা কোলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে দুটি পাকা চুল আমার মাথায় চিক্‌চিক্ করে উঠত তখন কুণ্ঠাভরে, নিজের নারীত্বের ভাবনা দিয়ে আর একটি মেয়েকে ভাবতে গিয়ে কি তিনি আমার মত সমস্ত সাধ-আহ্লাদ আগুনে আহুতি দিতেন না!

হঠাৎ কে যেন হিস্ হিস্ করে বলে উঠলো। এই মুহূর্তে এইক্ষণে। আমি শুনলাম, আড়ষ্ট স্পন্দনহীন হয়ে। নীচ, স্বার্থপর! এ ভাবনা এখন কোথায় গেছে? যে বিচারবুদ্ধি দিয়ে মাকে বিচার করছো, সে বিচার-বুদ্ধি এখন কোথায় গেছে? বয়সের কোঠায় এক ধাপ এগিয়েছে না পেছিয়েছে?"

স্পষ্ট বুঝলাম, এ বিবেকের কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সারা মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। জোর করে এক ধমকে আবার নিজেকে নির্ব্বাসিত করলাম একান্ত জীবনে। ঘটক বন্ধুর অপেক্ষায় না থেকে তাকে চিঠি লিখতে বসলাম, আমার মেয়ে পছন্দ হয়নি—অতএব বিবাহের কথা অবান্তর।

আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা ও ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের ভূমিকা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম্-এ

আমাদের দেশে মুনাফাবাজি জিনিষটা নূতন নয়। অনেক বছর ধরে মুনাফাবাজি—জাতীয় জীবনে একটা গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এটা দূর করার জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে বহুবার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। সরকার ও এটা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবু ও শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত মুনাফাবাজি কমেনি। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এই মুনাফাবাজির দরুণ পঙ্গু হয়ে পড়ছে। যখনই কোন অত্যাবশ্যক পণ্যের ঘাটতি দেখা যায় তখনই ক্রমাগতভাবে দাম চড়তে থাকে। এমন কি, যদি ক্রেতা জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য বাজারে পণ্য সরবরাহ করা হয় তাহলেও পণ্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করার জন্য নানাভাবে আয়োজন চলে। অবশ্য কেবলমাত্র আমদানীকারীরা এই ধরণের কৌশল গ্রহণ করেন একথা বলা ঠিক নয়। সুযোগ পেলে এবং পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তাহলে রপ্তানীকারীরাও এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন না।

কিছুদিন আগে শ্রীনবল এইচ টাটা এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করে-ছেন যে, আমাদের দেশে বস্ত্রের মূল্য বেড়ে যাবার জন্য প্রধানতঃ মজুত-দার এবং ফাটকা-বাজরা দায়ী। সম্প্রতি আমদানী-উপদেষ্টা-পরিষদের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী শ্রীটাটার অভিমত সমর্থন করেছেন। অবশ্য বস্ত্র ছাড়া আরো অনেক-গুলো পণ্যের দাম বিশেষভাবে বেড়ে গেছে—যেমন পারদ, মোটর ষ্টার্টার এবং মোটর গাড়ীর অংশ। শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মতানুসারে কয়েকজন আমদানীকারী তাঁদের নিজেদের সংযত করতে অসমর্থ হয়েছেন। তাই বলে এঁরা একেবারে মুনাফা অর্জ্জন করবেন না এমন কথা তিনি বলেন নি। আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা হল, আমদানীকারীদের অর্জ্জিত মুনাফা যুক্তিসঙ্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈনন্দিন বাজার দরের সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় জানেন, স্বল্প সরবরাহ কয়েকটা আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকার সচেতন নন একথা বলা চলে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেই মূল্য বৃদ্ধির নিন্দা করেছেন এবং এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন না।

কোন কোন ভারতীয় ব্যবসায়ীর ধারণা, এখন ভারতের বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন সম্পর্কীয় পরিস্থিতি তেমন উদ্বেগজনক নয়। এই ধারণা একে-বারে ভুল একথা বলা ঠিক নয়। তবে জটিলতা এখনও আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে জটিল অবস্থার পরিবর্তন হবে কিনা বলা শক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন, ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমদানীযোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সরকারী নীতি শিথিল করার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য শ্রীশাস্ত্রী কেবলমাত্র এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসের কথা বলে ক্ষান্ত হননি। যা'তে কোনপ্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, সেজন্য তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—নিকট-ভবিষ্যতে সরকারী নীতি শিথিল করার অনুকূলে সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না এবং সরকার বিশেষ করে ভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করে চল্‌বে।

প্রচারিত খবর থেকে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অর্থদপ্তরের সাথে পরামর্শ করে শিল্প এবং ব্যক্তিগত পণ্য আমদানী লাইসেন্স বছরের ভিত্তিতে মঞ্জুর করার বিষয় বিবেচনা করে দেখছেন। তবে যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরাতনের পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হবে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার একটা খবরদারী সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। কখন এই সংস্থা গঠন করা হবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। বিষয়টি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। যাতে রপ্তানী আমদানী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দোষ ত্রুটি নিবারণ করা সম্ভবপর হয় এবং তাড়াতাড়ি কার্য্য সম্পাদনের পথ যা'তে প্রশস্ত হতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার খবরদারী সংস্থা গঠন করতে চাইছেন।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রপ্তানী উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির সাথে ভারতের তিন হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানীর যে লক্ষ্য রয়েছে—সে লক্ষ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অতিক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। গত বছর নাকি ছয় শত ছাব্বিশ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, একমাত্র কোরীয় যুদ্ধের বছর ব্যতীত এর আগে এত বেশী রপ্তানী নাকি আর কখনও হয়নি। তবে চা রপ্তানীর ক্ষেত্রে দশ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা কম অর্জ্জিত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রচারিত খবর থেকে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এমন কয়েকটা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হবে যেগুলো প্রচুর সম্ভাবনাময়। শ্রীশাস্ত্রী নিজেও এই ধরণের আভাষ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কেও তিনি আভাষ দিয়েছেন। রপ্তানী-উন্নয়ন-উপদেষ্টা পরিষদের সাম্প্রতিক সভায় ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতের বস্ত্রকলগুলোকে তাদের কোটা অনুসারে যে কোন প্রকার আঁশের তুলা আমদানী করতে দেওয়া হবে এবং বস্ত্রকলগুলোকে উৎসাহদান পরিকল্পনার কোনপ্রকার অন্যথা হবার সম্ভাবনা নেই। এছাড়া ভারত থেকে পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ইত্যাদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কয়লা রপ্তানী অব্যাহত থাকবে। আরো বলা হয়েছে, তৈল এবং খইল রপ্তানীর লাইসেন্স আবার বৈধ করা হবে এবং এর মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। শ্রীশাস্ত্রীর পক্ষে অভিমত হল, বর্তমান বছরে ভারতের পক্ষে গত বছর অপেক্ষা পঞ্চাশ কোটি টাকা রপ্তানী বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। এখন যে ধরণের অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে সে ধরণের অগ্রগতি যদি বজায় থাকে—তাহলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত রপ্তানীর দ্বারা সাত শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করতে সমর্থ হবে। শ্রীশাস্ত্রী মনে করেন, এমনভাবে রপ্তানী বৃদ্ধি করা দরকার, যার ফলে আগামী বছরগুলোতে প্রত্যেক বছর একহাজার কোটি টাকার মত আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা সম্ভবপর হতে পারে। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, গত বছর বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতকে ৫৩ কোটি টাকার মত ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছে। গত বছরের আগের বছর ঘাটতির পরিমাণ ছিল দুশত ছিয়ানব্বই কোটি টাকা। এই ঘাটতি গতবছর দুশত তেতাল্লিশ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অবশ্য গতবছর আমদানীর পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে, মোট আটশত উনসত্তর কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মিত্ররাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে সে সাহায্যের দ্বারা এই ঘাটতির অনেকখানি অংশ পূরণ করা হয়েছে।

শ্রীনেভিল ওয়াদিয়া বলেছেন, ভারতীয় বস্ত্রকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। এর পিছনে নাকি দুটো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হল—বর্দ্ধিত বেতন বিল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তুলার ঘাটতি, এই দুটো কারণবশতঃ খরচ খুব বেড়ে গেছে। শ্রীমদনমোহন রুইয়া—ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি—বলেছেন, সূতীবস্ত্র বেতন বোর্ডের তরফ থেকে এমন সব সুপারিশ করা হয়েছে যেগুলো গৃহীত হলে সূতীবস্ত্রের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী-শিল্পের খরচ বেড়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেবে। কাজেই এই ধরণের ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক নজর রাখা দরকার। শ্রীরুইয়ার ব্যক্তিগত অভিমত হল, যে সব দেশ ভারতীয় পণ্য ক্রয় করেন কেবলমাত্র সে সব দেশের পণ্য আমদানী করা উচিত। প্রকাশিত খবর থেকে মনে হয়, যে সব দেশের নিজেদের বস্ত্রশিল্প নেই সে সব দেশে যাতে ভারতের তৈরী কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায় কেন্দ্রীয় সরকার সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট। তাই আমদানীকারীদের উৎপাদন মূল্য এবং বিপণন সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ দিবার কথা বলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি তাঁর দপ্তরকে বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে পরামর্শ করে আগামী পাঁচ ছয় বছরের জন্য এমন একটা সামগ্রিক রপ্তানী পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন যার ফলে উন্নততর ভিত্তিতে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে। পরিকল্পনাটি হবে প্রধানতঃ পণ্য এবং দেশভিত্তিক। যদি শেষ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে সরকার এবং শিল্পগুলোর পক্ষে উৎপাদন, মূল্য, পরিবহন ইত্যাদি ব্যাপারে অন্যান্য সমস্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

শ্রীজে ডি কে ব্রাউন হলেন এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের

সভাপতি ; তিনি বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, চা এবং পাটজাত দ্রব্যের খরচ এর মধ্যে বিশেষভাবে বেড়ে গেছে অথচ চা এবং পাটজাত দ্রব্য বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের মুখ্যপণ্য। কাজেই তাঁর মতানুসারে এগুলোর ব্যয় কমান দরকার। তাছাড়া বৃটেনে নাকি ভারতীয় চায়ের আমদানী শতকরা পঁচাত্তর ভাগ থেকে পঞ্চাশ ভাগে নেমে গেছে। এর কারণ হল সিংহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবশ্য চা-শিল্পের প্রতিনিধিরা আশা করছেন, আগামী মাসগুলোতে চা-এর রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই নাকি রপ্তানীর পরিমাণ ভালর দিকে গেছে। কলকাতার দি ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

"Mr. Lal Bahadur Shastri had, in the circumstance such a reasonable record to show for the country's imports and exports in 1959 that discussions in the two Advisory Councils were relatively free from attempts to fix blame for inevitable shortcomings. The high level of earnings from exports last year, of Rs. 626 crores was achieved by improved sales of several commodities (excepting tea which declined by Rs. 10 crores) ; this has at least provided a basis for optimism on which the Government can plan to increase exports by another Rs 50 crores this year and raise total earnings to Rs 700 crores in 1961 with more Indian goods sold abroad against rupee accounts maintained by foreign countries and with improved prospects in western Europe (the weakest spot all along) as a result of the Lall delegation's work. These targets are not unreasonable, though they, depend on the continuance of the general revival in world markets which gave the good results secured last year". এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় আমদানী এবং রপ্তানী (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এই বিলের দ্বারা সরকারের উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিলটি সম্পর্কে যখন বিতর্ক চলছিল তখন শ্রীমহাবীর ত্যাগী বলেছিলেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতে যে লাভ হবে সে লাভের কিছুটা অংশ ক্রেতা এবং উৎপাদকরা যা'তে পেতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শুধু তাই নয়। তিনি আরো বলেছেন, এই লাভের কতটা অংশ রাষ্ট্রীয় ট্রেডিং কর্পোরেশন গ্রহণ করতে পারবেন সেটা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। লোকসভার কংগ্রেস সদস্য শ্রী এল আর আচার এই মর্ম্মে অনুরোধ জানিয়েছেন, সরকার যেন দেশীয় শিল্পগুলোকে রক্ষা এবং আমদানী-নিয়ন্ত্রণ উভয় ব্যাপারেই ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের কথা মনে রাখেন।

শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী—তিনি মনে করেন, সর্ব্বস্তরে বিভিন্ন দ্রব্যের দর নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া বর্ত্তমানে হয়ত সম্ভবপর হবে না। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, দরটা নির্দ্দিষ্ট করে দিতে পারলে ভাল হত। সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত বিবৃতিগুলো আলোচনা করলে মনে হয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমলে মূলধনী খাতে প্রচুর অর্থ লগ্নী করা হবে। তাই আগামী কয়েক বছর পর্য্যন্ত আমদানী বাণিজ্যে সমতা বিধান সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে এ মর্ম্মে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আমদানী এবং রপ্তানীর মধ্যে ব্যবধান যা'তে খুব বেশী না হয় সেজন্য চেষ্টা করা হবে। আরো বলা দরকার সরকার এজন্য রপ্তানীর বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। বর্ত্তমানে নাকি বৈদেশিক মুদ্রা যথাসম্ভব বাঁচাবার জন্য যতদূর সম্ভব প্রকৃত ব্যবহারকারীদের আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। দি ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলছেন "Import policy has now achieved some measure of stability, and a judicious rationing of the allotted foreign exchange has prevented acute shortage of raw materials, with the value of imports this year remaining almost the same as in the earlier year, industrial production increased by 6. 4. 1., but this position was gained at the expense of capital goods ; when investment in the private sector revives, as it must soon, the same proportions cannot be maintained in the allotment of foreign exchange between the two. The decline in steel imports may provide some room for adjustment without cutting down on raw materials ; the Government cannot, however assume that all needs of capital goods can be met if they are, as at present, restricted to those which can be imported against aid or private investment from abroad. The ordinary consumer has little to hope for in all this, though he may draw such comfort as is warranted by Mr. Shastri's exportations to the import trade to sell at fair prices. Paper, drugs and sugar are cases in which corrective action through imports has not been possible, and mere repetition of warnings seems of little use."

আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, আমাদের দেশে এমন কয়েকজন আমদানীকারী আছেন যাঁরা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জনের

লোভ সম্বরণ করতে পারেননা। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এঁদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁরা ঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত নন, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁদেরও প্রতিপত্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ কোন কোন পণ্যের মাধ্যমে এঁরাও অতিরিক্ত মুনাফা লুকিবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এঁদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যে সব পণ্যের ব্যবসার মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জনের চেষ্টা দেখা যাবে সরকার সে সব পণ্য ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অথবা কোনও এজেন্সী মারফৎ আমদানী করতে বাধ্য হবেন। অবশ্য ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ পণ্য আমদানী করলেই সমস্যার সমাধান হবে কিনা সেটা ভালভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। সম্প্রতি এই কর্পোরেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ননী তোলা দুধের গুঁড়া আমদানী করছিলেন, কারণ এই জিনিষটা নিয়ে অতিমুনাফা চলছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কর্পোরেশন আমদানী কৃত দুধের গুঁড়া পুরাতন আড়ৎদার এবং পাইকারদের মারফৎ বাজারে বিলি করতে লাগলেন। সে মুহূর্ত্তে এর দাম বেড়ে যেতে লাগল। চিনির ক্ষেত্রেও একই জিনিষ দেখা গেছে। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ বাহির থেকে চিনি আমদানী করেছিলেন। এর কারণ হল এই যে, সে সময় চিনির দর অত্যন্ত চড়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আমদানীর পর ও চিনির দাম কমেনি। বরঞ্চ ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন যে চিনি আমদানী করেছিলেন সে চিনির দাম আরো বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে, যে ক্ষেত্রে চিনির দাম অত্যন্ত চড়ে যাবার দরুণ সরকার ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ চিনি আমদানী করতে লাগলেন সেক্ষেত্রে চিনির দাম কেন আরো চড়ে গেল। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের পড়তা খরচ কম ছিল। তবে আমদানীকৃত চিনি বিক্রী করার সময় সর্ব্বদা ভারতীয় বিক্রীত চিনির দরের কথাই বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের উচিত ছিল—ন্যায্য মুনাফা রেখে আমদানীকৃত চিনি বিক্রী করে দেওয়া। শেষ পর্য্যন্ত পুরানো আড়ৎদারদের হাতের চিনি ছেড়ে দেওয়া হল। যা'তে ভারতীয় বিক্রীত চিনির দরের সাথে সামঞ্জস্য থাকে মাল ছাড়ার সময় কেবলমাত্র সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ সব আড়ৎদারই ভারতে উৎপন্ন চিনির সাহায্যে অতি-মুনাফা অর্জ্জনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই আবার যখন আমদানীকৃত চিনি এঁদের হাতে গিয়ে পড়ল, তখন স্বভাবতঃ চিনির দর আরো চড়ে যেতে লাগল।

আমাদের মনে হচ্ছে, মুনাফা-বন্ধের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ করলে কর্তব্য সম্পাদিত হবেনা। তাই বলে আমরা একথা বলছিনা, মুনাফাবাজদের সতর্ক করে দেবার সময় সরকার সদিচ্ছা-প্রণোদিত হননি, কিম্বা সরকারের সতর্কবাণীর পিছনে আন্তরিকতা নেই। আমরা বলতে চাইছি কেবলমাত্র সদিচ্ছা থাকলে চলবে না। সদিচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে—তা না হলে ফল শুভ হবেনা। এজন্য দরকার একটা উপযুক্ত কার্য্যসূচী। আরো একটা বিষয়ে সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। অর্থাৎ শিল্প এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে একই ধরণের নীতি চালু করা বাঞ্ছনীয়। যদি নীতির পার্থক্য ঘটে তাহলে দেশের সর্ব্বত্র এমন সব কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যেগুলো নিঃসন্দেহে দেশ, জাতি, এবং সমাজের স্বার্থবিরোধী এবং যেগুলো দমন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়বে।

স্বপ্ন

শ্রীকৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য

ছোট বেলায় স্বপ্নে কত এঁকেছিলাম ছবি
বড় হয়ে হ'ব আমি মস্ত বড় কবি।
ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক
কিংবা হ'ব দার্শনিক
না হয় দেশের নেতা।
মস্ত বড় ব্যবসাদার
কিংবা হব জমিদার
জীবনেতে আমি পাব সফলতা।
জগদীশের মত হ'ব, কিংবা হ'ব টাটা
লেনিন কিংবা কামাল-পাশা
না হয় জাতির পিতা।
অবন ঠাকুর যেমন আঁকে
আঁকবো তেমন ছবি
কিংবা আমি হ'ব যেমন শরৎ না হয় রবি।

যৌবনেরি শেষ প্রান্তে এসে
যখন বসে ভাবি
তখন আমি শুধুই দেখি
দিয়ে গেছি কেবল ফাঁকি।
স্বপ্ন আর কল্পনাতে, এঁকেছি যা ছবি
বাস্তবে তা শূন্য হ'ল সব হয়েছে ডুবি।
সারা জীবন ভেবেই গেছি
করিনিকো কিছু
সারা জীবন ঘুরেই গেছি
মরীচিকার পিছু।
স্বপ্ন সে যে স্বপ্ন শুধু
মিথ্যা যত কল্পনা
কর্ম্ম-বিনা জীবন পথে
সাধন করা সাধ্য না।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমরা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম তখন গান্ধীজী আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ স্বাধানতার একটা উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছিলেন। সেই চিত্রে আমরা দেখেছিলাম, স্বাধীন ভারতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই মুক্ত—বিশেষ ক'রে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত। স্বাধীন ভারতের ছবির মধ্যে আর একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। সেটা হচ্ছে মানুষে মানুষে ধনগত সাম্য! স্বাধীনতা যদি মেকি না হয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা হয়, তবে তার মধ্যে ধনী আর নিঃস্ব ব'লে দুটো পৃথক পৃথক শ্রেণী কখনো থাকতে পারে? মহানগরীর আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাগুলির ছায়ায় নোংরা পর্ণকুটীরগুলিতে দুর্ভাগা শ্রমজীবীরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে—স্বাধীন ভারতবর্ষ এমন একটা বিসদৃশ অবস্থাকে একদিনের জন্যও সহ্য করতে পারেনা। দেবী স্বাধীনতা কখনো এমন একটা বৈষম্যকে এক লহমার জন্যেও বরদাস্ত করতে পারেন—যেখানে গোটাকয়েক ধনীদের মুঠোর মধ্যে রয়েছে দেশের জমি, খনি এবং কলকারখানাগুলি—আর কোটী কোটী অর্দ্ধ-উলঙ্গ অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষ হা-অন্ন হা-অন্ন ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানের প্রেতমুর্ত্তির মতো? তাই গান্ধীজী বারম্বার আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছিলেন, অর্থনৈতিক সাম্য হচ্ছে স্বাধীনতার প্রাণ। পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্নকে সত্য ক'রে তুলতে হলে—যারা মালিক-শ্রেণীর তাদের নামিয়ে আনতে হবে নীচুতে, আর যারা সর্ব্বহারা তাদের ওঠাতে হবে সম্পদের আলোয়—যেখানে খাওয়া-পরার দুঃখ বলতে কিছু নেই।

এই গৌর চন্দ্রিকার প্রয়োজন ছিল খাদির মূল্যকে বোঝাবার জন্যে। কেন আমরা খাদি শিল্পের উন্নতির এবং প্রসারের জন্যে এত আগ্রহশীল হবো? কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এবং সমতার মন্দিরে উঠবার প্রথম সোপানই হচ্ছে খাদি। খাদির সমগ্র তাৎপর্য্য আমাদিগকে বুঝতে হবে। স্বদেশী মনোভাব বলতে বুঝায়, বেঁচে থাকবার জন্যে যা কিছু দরকার সেগুলি নিজের দেশে উৎপন্ন করবার সুদৃঢ় সংকল্প। শুধু তাই নয়, জীবন-যাপনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির উৎপাদন হওয়া চাই গ্রামবাসীদের পরিশ্রম এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় করে। আমাদের খাদ্য-সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ঘর-বাড়ী তৈরীর উপকরণগুলি গ্রামেই উৎপন্ন হবে—এর মধ্যে চলতি সব কিছুরই বিপর্য্যয়। এতদিন ধরে গোটা কয়েক শহর লাখো লাখো গ্রামের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করে এসেছে। স্বদেশী মনোভাব আমাদের অন্তরে বাসা বাঁধলে এর ঠিক উল্টোটি হবে, অর্থাৎ আমাদের গ্রামগুলি অর্থনীতির দিক দিয়ে হবে বহুল-পরিমাণে স্বাবলম্বী।

হাতে-কাটা সুতোয় হাতে-বোনা কাপড়কেই খদ্দর বলে। এমন একদিন ছিল যখন খদ্দরই জাতির লজ্জা নিবারণ করতো। শুধু কি ভারতেই সেদিন খদ্দর ব্যবহৃত হোতো? ভারতে তৈরী মসলিন সুদূর সমুদ্রপারে রপ্তানী হ'য়ে বিদেশিনীদেরও বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করতো। সেদিন আমাদের ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম ছিল সত্যিই শান্তির নীড়। গ্রামের লোকেদের খাওয়া-পরার তো অভাব ছিল না। লাঙলের ফালে অন্নপূর্ণা সহাস্য বদনে উঠে আসতেন, আর চরকায় এবং তাঁতে হোতো গ্রামবাসীদের লজ্জা নিবারণ। পল্লীগুলি ছিল প্রাণ-চঞ্চল এক একটী মৌচাকের মতো।

তারপরে এলো পঙ্গপাল তুঙ্গদ্বীপ থেকে। অর্থ-লালসায় অন্ধ হ'য়ে বৃটিশ বণিকেরা আমাদের বস্ত্র শিল্পকে দিলে তচ্নচ্ ক'রে। বস্ত্রশিল্প ছিল গ্রাম্য শিল্পগুলির মধ্য-মণি। ওর মধ্যে ছিলো গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। সেই প্রাণকেন্দ্র বির্য্যাপস্ত হ'য়ে গেলে গ্রাম কখনো বাঁচে? বস্ত্র-শিল্পের অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাই পল্লীতে পল্লীতে শুকিয়ে গেল জীবনের ঝরণা। পল্লীবাসীদের চোখে মুখে রইলোনা বুদ্ধির দীপ্তি, জীবনে রইলো না আনন্দ। চিত্তে প্রসন্নতা থাক্লে তবেই না বুদ্ধির উন্মেষ হয়।

আজকের দিনে সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন হচ্ছে পল্লী-

সভ্যতাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা। কেন? কারণ প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রাণের উৎস। সূর্য্যালোকের এবং নির্ম্মল বাতাসের অভাব হ'লে আমরা কি মৃত্যুর দিকেই আগিয়ে যাইনে? জনাকীর্ণ শহরগুলির আবহাওয়ায় আমাদের জীবন কি দিনে দিনে সত্যিই বিষিয়ে যায় না? জীবনের উৎস যেখানে—সেখানকার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে প্রাণের দুরন্ত গতিবেগ আমরা হারিয়ে ফেলবো—এতো স্বাভাবিক। সেই জন্যই তো রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে একমাত্র গান্ধী ভারতীয় সভ্যতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে—যেখানে সূর্য্য কার্পণ্য করে না আলো দিতে, যেখানে তারার আলো, মাটির গন্ধ, আর বাতাসের মধু, যেখানে রয়েছে আনন্দ-সুষমা এবং স্বাস্থ্যের লাবণ্য। তাই আমাদের দেশের মানুষগুলির স্বাস্থ্যের এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে আমাদিগকে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা শহরের দিকে ধাওয়া না ক'রে গ্রামেই বসবাস করে।

এখানেই পুনরায় খাদির কথা আসে। গ্রামে যে মানুষ বসবাস করবে—সে তো হাওয়া খেয়ে সম্ভব নয়। গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলের কুলি হতে যায় কেন? নিশ্চয়ই বাঁচবার তাগিদে, জীবনের ডাকে। কুটীর শিল্পগুলি যেখানে মৃত বা মৃতেরই সামিল, সেখানে মানুষ থাকবে কেমন করে? তাইতো জাতির জনক শুধু পল্লী জীবনকে গৌরব দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, পল্লী জীবনে গ্রামবাসীরা যাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে সে জন্যে খাদি শিল্পের উপর এতটা জোর দিয়েছিলেন। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ব'লে আমরা যে এতটা সোরগোল করি, সেই ধর্ম্ম-জীবনও কি খালি পেটে সম্ভব? খালি পেটে কিছুই সম্ভব নয়। যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারক্লিষ্ট,সে দেশে ভগবানও একটীমাত্র মূর্ত্তিতেই দেখা দিতে সাহস পান—আর সেই মূর্ত্তিটী হোলো অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। ভারতের মহাশ্মশানে নিরন্ন শিবেরা আজও বিচরণ করছে যেন জীবন্ত এক একটি নরকঙ্কাল। অন্নপূর্ণা ছাড়া কে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে? খাদি মানে কুটীর শিল্পগুলির মধ্যমণি—যাকে আশ্রয় ক'রে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হবে ঘরে ঘরে।

খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—পরমহংসদেবের এ কথার অনুধাবন করলে কোন সিদ্ধান্তে গিয়ে আমরা পৌছাই? নিশ্চয়ই কর্ম্মবাদের মধ্যে। তাইতো বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে কর্ম্মবাদের শঙ্খধ্বনি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা যত সহজ—সেই স্বাধানতাকে সত্য ক'রে তোলা অর্থাৎ দারিদ্র্যকে দেশ থেকে তাড়ানো তত সহজ নয়। প্রচুর অন্ন, প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন করে সকলকে সেই প্রাচুর্য্যের অংশীদার করতে পারলে তবেই আমরা দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি। আর প্রচুর সম্পদ ফলানো পরিশ্রম-সাপেক্ষ। খাদি শিল্প এই শারীর শ্রমের প্রতীক। চরকার গুঞ্জনের মধ্যে নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং অর্থাৎ সর্ব্বদা তুমি কর্ম্ম করো—ভগবদ্গীতার এই মহামন্ত্রেরই জয়গান। খাদি শিল্পকে আশ্রয় ক'রে গান্ধীজী চেয়েছিলেন একটা কর্ম্মবিমুখ জড়প্রায় জাতিকে তামসিকতার কবল থেকে উদ্ধার করতে। সমাজের সম্পদ সৃষ্টির জন্যে আমরা কর্ম্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তি যদি কিছু না-কিছু উৎপাদনাত্মক শ্রম করি, তবে সেই সর্ব্ব-জীবন শ্রমের দ্বারাই শুধু সকলের ভরণ-পোষণ সম্ভব। মন্ত্রবলে ও না, স্লোগানের দ্বারা ও না।

আরও একটা কারণে খাদি শিল্পের উপরে গান্ধীজী এতটা জোর দিয়েছিলেন, আর গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় সরকার ও এত জোর দিচ্ছে। কারণটা হচ্ছে, আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক গ্রামেই বাস করে থাকে। এই গ্রামবাসীদের পরিশ্রমের উপরে জাতির সমস্ত শক্তি—না, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করে। এই কারণেই একটা জাতির গ্রাম্যজীবন যতক্ষণ সতেজ থাকে ততক্ষণ সেই জাতির কিছুতেই মার নেই। গ্রামগুলি যখন জীবনের গতিবেগ হারিয়ে ফেলে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তখনই বুঝতে হবে জাতির অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। একটা দেশের মুষ্টিমেয় মহানগরী গুলির সৌধরাজি দিয়ে কখনোই তার উন্নতির বিচার করা চলে না। যেখানে গ্রামের চাষীরা চাষবাস এবং কুটীরশিল্পগুলিকে আশ্রয় ক'রে পল্লী-জীবনে সন্তুষ্ট আছে সেখানে বুঝতে হবে জাতি সতেজ আছে। পক্ষান্তরে যেখানে জীবনের সন্ধানে চাষীরা কাতারে কাতারে গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে চলেছে, শহরের পানে, সেখানে সত্যিই আশা করবার কিছু নেই। যে দেশে চাষীদের মনে এসেছে গ্রাম্য-জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং এই বিতৃষ্ণার ফলে তারা হয়েছে শহরমুখী সেই

দুর্ভাগা দেশের মহানগরীগুলির রূপচ্ছটায় আমরা যেন প্রলুব্ধ না হই। সে দেশ মাকাল ফলের মতোই অন্তঃসার-শূন্য এবং শুধু দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায় বাহিরের বর্ণচ্ছটায়।

আর্থিক স্বাধীনতার মতো আর্থিক সাম্যও খাদি শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য। খাদি মানে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কুটীরে কুটীরে চরকায় উৎপন্ন হচ্ছে রাশীকৃত সুতা, আর সেই সুতায় ঘরে ঘরে বোনা হচ্ছে কাপড় তাঁতকে আশ্রয় ক'রে। খদ্দর যখন ব্যবহার করি—অর্থ যায় দরিদ্র তাঁতীর এবং কাটুনির ঘরে। গ্রামের নিঃস্ব বেকারেরা কাজ ক'রে পায় কাজের মজুরি, আর মজুরি মানেই তো অন্ন। খদ্দর নিরন্নকে দেয় অন্ন। পক্ষান্তরে কলের কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হলেও মিলের ধুতি কেনা মানে—মিলমালিকদের তেলামাথায় আরও তেল ঢালা। মিলতো শহরে। মিলের কাপড় কিনলে শহর পায় টাকা, গ্রাম হয় বঞ্চিত। আগেই তো বলেছি, পল্লী শিল্পগুলিকে জাগিয়ে তোলা বিশেষ দরকার—জীবন্মৃত গ্রামাঞ্চলকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্যে। গ্রাম যদি মরে যায় শহর কখনও বাঁচতে পারে ?*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

দ্বিজেন্দ্র স্মরণে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

নব প্রতিভার চির উন্মেষে যে জাতি আজিকে
ভারতে মহান,
স্মরণীয় তাঁরা, বরণীয় আজও মহামানবের
চির সে প্রধান,—
বিমল প্রতিভা, সঙ্গীতে যার কাব্য কাননে অরূপ ছবি,
কোথা বাংলার প্রিয় সুরকার দরদী মায়ের চারণ কবি।

নূতন ছন্দে, নবীন ভাষায় ব্যথিত জাতির বেদনা চুমি'
কণ্ঠে মিলায়ে স্বরগের ভাষা গাহিলে জননী জন্মভূমি,
অতীত মথিয়া জাগালে প্রাণে সে অভিনব এক
গরব স্মৃতি,
সুর ঝংকারে কাঁপায়ে বিশ্ব নিঃস্ব পরাণে
জাগিছে নিতি।

আবেগ আকুল অধীর হিয়ায় দেশ-জননীর স্বপন গাঁথা,
দেশের গরিমা, দশের গরব, সোনার ভুবনে আসন
পাতা,
ইতিহাস আজ জীবনের মাঝে ছন্দেও সুরে হয়েছে লীন,
সুর আলেখ্য দুঃখ দুর্বার, বিচিত্র কাহিনী অন্তহীন!
পরাধীনতার দুর্বহ জ্বালা স্বাধীন দেশের মুক্তি গান,
মেবার পাহাড়, শিখর ঘিরিয়া আকাশে বাতাসে
কম্পমান

রাজপুত নারী শৌর্য্যে বীর্য্যে বীরাঙ্গনা বিশ্বময়,
জহরব্রতের অগ্নি আহবে জিনিয়াছে যাঁরা মৃত্যুভয়!
নূতন যুগের হে চিরসেবক বেজেছে বিষাণ কালের তূর্য্য,
জাতির আজিকে ঘোর দুর্দিন ডুবিছে অকূলে প্রভাত সূর্য্য,
রাণা প্রতাপের বংশ কোথায় ? কোথায় রাঠোর দুর্গাদাস!
উদয়গিরির শৈল শিখরে মর্মবীণার শেষ নিঃশ্বাস!

কোথা চাণক্যের কূটরাজনীতি শা-জাহানের আর্তনাদ,
সিংহাসনের আসন লাগি' ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, বিসংবাদ,
নূরজাহানের জগৎ-জ্যোতিঃ কল্পলোকের অলীক কথা,
অশ্রুহাসির সঙ্গীতে যার সুখ দুঃখের বিচিত্রতা,
এক ইতিহাস ঘুরে ফিরে আসে
শতাব্দী হতে শতাব্দী পরে,
কবির লেখনী ইঙ্গিতে তার আভাষ জানায় যুগান্তরে,
মর্মবেদনা, গরিমা জাতির বিরাট বিপুল তপস্যার,
যুগে যুগে জাগে মানুষের প্রাণে সৃষ্টি অসীম দুর্নিবার!
আজিকে তোমায় অন্তর ভরি' স্মরিব শুধুই বারংবার
অশরীরী বাণী ঝঙ্কৃত হোক, সঙ্গীতে নব আর একবার,
দেশের দশের কল্যাণ লাগি' মূর্ত হোক সে অবিরাম,
স্মৃতির বাসরে রেখে যাই শুধু
আজিকার মোর লক্ষ প্রণাম।

সংস্কৃত-নাটকম্

"নিষ্কিঞ্চন—যশোধরম্"

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিতম্
অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত

[ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বহু বৌদ্ধগ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীযশোধরা সম্বন্ধে "নিষ্কিঞ্চন-যশোধরম্" নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। যশোধরা তাঁর একমাত্র পুত্রকেও সাত বৎসর বয়সে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—তাঁর মতে, সন্ন্যাসীর পুত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সন্ন্যাস। রাজা শুদ্ধোদন যশোধরাকে রাজ্যের শাসনভার দিতে চাহিলে তিনি অস্বীকার করলেন। এভাবে শ্রীযশোধরা ধর্মের নিমিত্ত স্বামী, পুত্র, রাজ্য এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তজ্জন্যই গ্রন্থকার নামকরণ করেছেন—"নিষ্কিঞ্চন-যশোধরম্"।

ডক্টর চৌধুরীর পরম বিদুষী পত্নী ব্রহ্মবাদিনী ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী উক্ত গ্রন্থের সুললিত বঙ্গানুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ থেকে রাহুলের সন্ন্যাসদান বিষয়ক অঙ্কটা এখানে মুদ্রিত হলো। ভা, স,]

(স্থান—রাজোদ্যান। কাল প্রভাত)

রাহুল—মাতঃ! কে উনি দূরে ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে যাচ্ছেন? তাঁকে দর্শনমাত্রেই যে আমার মনে গভীর আনন্দ হচ্ছে। মাতঃ! আমার মন তাঁর দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হচ্ছে। সেজন্য আমার সত্যই জানতে ইচ্ছা করছে যে, কে উনি।

যশোধরা—পুত্র, শোন। ইনিই ত তোমার পিতা।

সুকুমার তনু শাক্যকুল-ভানু
পুণ্যধন-সুলক্ষণ।
কল্যাণ মধুর সর্বজনেশ্বর
এই তব পিতা, ছিল।
"শীল-সুশীতল "সমাধি"-বিমল
বোধিতরুতলে বুদ্ধ।
বিশ্ব জন-বন্দ্য অতুল অনিন্দ্য
এই তব পিতা, শুদ্ধ।
মৃগাঙ্ক বদন গজেন্দ্র-গমন
সবিতা ভুবনপাতা।
কাঞ্চন-চরণ রূপ রসঘন
এই তব পিতা, ত্রাতা॥
চামর-চিহ্নিত ছত্র-চক্রাঙ্কিত
রস পাদপদ্মযুত;
ইন্দ্রধনুসম কম ভ্রূভঙ্গিম
এই তব পিতা, পূত॥
ভ্রূ-মধ্যনিহিত শুভ্রোর্ণ (১) শোভিত
চত্বারিংশদ্দন্ত-যুক্ত।
সুনিল-নয়ন সুরক্ত-রসন
এই তব পিতা, মুক্ত॥
ভিক্ষু পরিবৃত মুনি মহাব্রত
তারাবৃত চন্দ্র-স্মিত।
ত্বরা করি যাও এই ভিক্ষা চাও
"পুত্রে ধন দাও, তাত!" (২)

যশোধরা—পুত্র! তুমি এখন যাও, পিতার নিকট পুত্রের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি প্রার্থনা কর।

[সশিষ্য বুদ্ধদেবের প্রবেশ]

রাহুল—(পিতার উদ্দেশ্যে)

পূজ্যপাদ পিতঃ! মাতা আমাকে বলেছেন যে, যেহেতু একমাত্র পুত্রই পিতার উত্তরাধিকারী, সেহেতু আমিও শীঘ্রই আপনার সম্পত্তি লাভ করব। পিতঃ! আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার বা সম্পত্তি দান করুন, কৃপা করে।

বুদ্ধদেব—সম্পত্তিতে অধিকার? আশ্চর্য! তোমার মাতাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে এসো। কারণ, আমি ত বীতরাগ সন্ন্যাসী,

---

(১) 'ঊর্ণা' বা লম্বা কেশ। বুদ্ধদেবের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল এই যে, তাঁর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে একটী বৃহৎ, শুভ্র কেশ দোদুল্যমান থাকত।

(২) শাক্যকুমারোহি কর-সুকুমারো
লক্ষণ সংযুত সুপুণ্য শরীর।
জনকল্যাণ মধুর সর্বেশ্বর
এষ হি পিতা তে ধন্যো নরবীর॥
* * *
শ্রামক শ্রমণ বেষ্টিত মুনীন্দ্রো
নীল পথে যাতি তারা শোভিচন্দ্রঃ।
যাহি ত্বরিতং ব্রূহি তাতং "রাজেন্দ্র
পুত্রায় দেহি দায়ং শাক্যকুলেন্দ্র।"

আমার কোনো জাগতিক ধন সম্পত্তিই নেই—যা' আমি তোমাকে দান করতে পারি। সেজন্য, দায়াধিকার বা আমার সম্পত্তি লাভ করতে এরূপ ত্বরা করছ কেন?

রাহুল—আজন্ম মাতা আমাকে এই শুভ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, কর্তব্য বিষয়ে বিলম্ব করা কর্তব্য নয়। বেশ, আপনি যদি সন্ন্যাসীই হন ত, আমার সন্ন্যাসধনেই পূর্ণ অধিকার আছে। আমার জননী বলছেন যে, এই সন্ন্যাসধনই আপনি আমাকে প্রসন্নচিত্তে দান করুন।

যশোধরা—নয়নমণি পুত্র! তুমি অতি সুন্দর কথা বলছ। তোমার কল্যাণ হোক। আমার শিক্ষা আজ সার্থকতম হল। এই শিশু বয়সেই তোমার প্রজ্ঞার পূর্ণ স্ফুরণ দেখে আমি আজ পরম কৃতার্থা। ভগবন্! প্রাণপ্রতিম পুত্রের এই প্রথম ও শেষ ইচ্ছা করুণা করে, পূর্ণ করুন।

বুদ্ধদেব—সুমঙ্গলে? কিন্তু তোমার একমাত্র সন্তানকে এই ভাবে সন্ন্যাস-গ্রহণে কেন উদ্বুদ্ধ করছ? বংশের একমাত্র সন্তান ত্যাগ-প্রভাবলম্বী ভিক্ষু হলে, রাজ্যেরই বা কি হবে এবং তুমিই বা কি নিয়ে জীবনধারণ করবে? কল্যাণি! তুমি পুনরায় চিন্তা করে দেখ।

যশোধরা—জীবননাথ! চিন্তার আর আমার কিছুই নেই। আপনি যে মুহূর্তে সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনার সহধর্মিণী আমিও ত ঠিক সেই মুহূর্তেই সংসার ত্যাগ করেছি, রাজপ্রাসাদে থেকেও অরণ্যে বাস করছি, রাজপুত্রবধূ হয়েও ভিক্ষুণী হয়েছি। আমার আর পুত্রই বা কি, আর রাজ্যই বা কি? আমার একমাত্র ভরসা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগল।

বুদ্ধদেব—নির্মলে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তোমার সর্বথা শুভ হোক।

[করুণ বিলাপরত রাজা শুদ্ধোদনের প্রবেশ]

শুদ্ধোদন—হে কঠোরহৃদয় পুত্র! তুমি কি করেছ? আমি শুনতে পেলাম যে, তুমি নাকি সপ্তমবর্ষীয় রাহুলকেও সন্ন্যাসধর্মে, ভিক্ষুব্রতে দীক্ষিত করবে। একথা কি সত্য? কিন্তু এরূপ কুসুম-বালককে কোনোদিন সন্ন্যাসধর্মে উদ্বুদ্ধ করা উচিত নয়। পুনরায়, রাহুলের অভাবে যশোধরাই রাজসিংহাসনের অধিকারিণী। কিন্তু তিনি কঠোর পতিব্রতা—রাজধর্ম বা সংসারধর্ম কোনোটাই পালন করবেন না। সেক্ষেত্রে, একমাত্র রাহুলই আমার সিংহাসনের অধিকারী। সেজন্য, তাকেও যদি তুমি আজ দীক্ষা দাও, তাহলে শাক্য-রাজবংশ সমুচ্ছন্ন চিরদিনের জন্য হয়ে যাবে। তাহলে, এই কি তোমার কর্তব্য?

বুদ্ধদেব—মহারাজ! আপনিই বলুন, এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য? বস্তুতঃ, যার মাতা স্বয়ং যশোধরা, সে ত জন্ম থেকেই "সন্ন্যাসী" হয়ে আছে। না' ত, কেন এই বালক সমস্ত ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করে,' সন্ন্যাস-ধর্মকেই বরেণ্য বলে' আজ গ্রহণ করছে? আর এক কথা এই যে, আপনি ত যশোধরাকে আমার চেয়েও বেশী ভাল জানেন। যদি তাঁর একবার এ বিষয়ে মন হয় ত তার ব্যতিক্রম হবে না, সুনিশ্চিত। মাতা স্বয়ং পুত্রের সন্ন্যাস কামনা করছেন, পুত্রও স্বয়ং সন্ন্যাস ভিক্ষা করছে। সে ক্ষেত্রে, আমি তা প্রতিরোধ করব কিরূপে?

যশোধরা—পূজনীয় স্নেহসাগর পিতৃদেব; আপনি কৃপা করে ধৈর্য অবলম্বন করুন, ক্ষান্ত হোন। আপনি রাহুলকে দেশের রাজা করতে অভিলাষী। কিন্তু রাজাধিরাজ ভগবান তাকে যে রাজ্যের আজ অধীশ্বর করবেন, তার ঐশ্বর্যের নিকট পার্থিব সকল রাজ্যের ধনসম্পদই ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সম্রাট পিতার নিকট থেকে সাধারণ ধনরত্নপূর্ণ সাম্রাজ্য ত সকল রাজ-পুত্রই সাধারণ নিয়মানুসারে লাভ করছেন। কিন্তু, পিতঃ! আজ আপনি এই রাজপুত্রকে সেই অনুপম মহাধনই তার বিশ্ববিজয়ী রাজচক্রবর্তী পিতার নিকট থেকে লাভ করতে অনুমতি দিন, যা অনন্ত, অসীম, অজর, অমর, অক্ষয়।

শুদ্ধোদন—মাতঃ! যশোধরে! পূর্বেও বহু বার যেমন, এবার ঠিক তেমনি, তুমিই আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মলিত করে দিলে। প্রজ্ঞাধন্যা কন্যা আমার! তুমি জননী হয়ে যখন একমাত্র প্রাণপ্রতিম সন্তানকে এইভাবে বিশ্বহিতার্থে দান করলে, তখন আমিই বা সেই পুণ্য ব্রতে বাধাস্বরূপ হব কেন? বস্তুতঃ—

মাতা যার স্বয়ং গোপিকা
পিতা যার তথাগত বুদ্ধ।
সপ্তমবর্ষীয় পুত্রধন
সেই হবে সন্ন্যাসে প্রলুব্ধ॥

পুত্র। যা' আমার দুহিতা ইচ্ছা করেছে, তাই হোক্। তবে তোমা[র] নিকট আমার একটী মাত্র প্রার্থনা—জননীর অঞ্চলনিধি এরূপ স্বল্পবয়[স্ক] বালকদের তুমি আর দীক্ষা দিও না। সকল জননীই ত বিশ্বজন[নী] যশোধরা নন—পুত্র-বিরহে তাঁদের সেই প্রাণ-বিদারণকারী আর্তনা[দ] আমি সহ্য করতে পারব না, বৎস!

বুদ্ধদেব—পূজ্যপাদ পিতৃদেব! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কি[ন্তু] আপনি স্বয়ং যা' বল্লেন - যশোধরা ও রাহুল জগতে অসাধারণ, অতু[ল]নীয়। সেজন্য, আপনাদের অনুমতিক্রমে রাহুল আজ শুভ ত্যাগ-ধ[র্মে] দীক্ষিত হোক।

ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ সারিপুত্ত, মৌগ্‌গলায়ন! তোমরা এই পুত্রকে সং[ঘে] দীক্ষাদান কর। [প্রস্থান]

সারিপুত্ত—বৎস রাহুল! আজ ভগবান আমার উপর যে গুরু[ভার] অর্পণ করলেন তাতে আমি নিজেকে পরম কৃতার্থ বলে মনে কর[ছি।] বস্তুতঃ যদিও এই ভার অতি গুরু, তবুও আমার নিকট তা' আজ কুসু[মের] ন্যায় লঘু বলে বোধ হচ্ছে। কারণ, যে অমর, অভয়, অরুণ ধর্ম[ে] আমরা বিচরণ করি, যে সহজ, সুভগ, সুন্দর, পুণ্যাচরণই আমা[দের] জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই ধর্ম পথে, সেই পুণ্যাচরণে তুমি যে শিশুকালেই প্রবেশাধিকার লাভ করলে, তা' মনে করেই আমার মন [আজ] উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। আমার মধ্যে এই ধর্ম এই আচরণ প্রকৃষ্ট[…]

ান করবার শক্তি আছে। সেজন্য, ভগবান্ তথাগতের শুভাশীর্বাদে ়ী দীক্ষাদাতা আমিও ধন্য, দীক্ষাগ্রহীতা তুমিও ধন্য, দীক্ষাদান ও ধন্য।

মোগ্গলায়ন—সত্য। বস্তুতঃ—

আলোক দানে ধন্য তপন
কল কূজনে বিহগগণ।
মধু ক্ষরণে ধন্য প্রসুন
সুবাস প্রদানে চন্দন ॥
ধন্য ধরায় সুনীল ঘন
বারি বর্ষণে বারিবাহন।
ধন্য সব বস্তু গুণ বিষগুণ
নিজ ধন করি, পরে দান ॥

ার পক্ষে—

নয়ন ধন্য আলোক স্নানে
শ্রবণ ধন্য মধুর গানে।
নাসিকা ধন্য সুরভি ঘ্রাণে
রসনা ধন্য সুধা স্বাদনে ॥
ত্বক্ ধন্য শীতল স্পর্শনে
স্বস্বভাবে ধন্য ত্রিভুবনে।
দাতা ও গৃহীতা একতানে
পরস্পর মধুর মিলনে ॥

ই ভাবে, ধর্মের বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েই পরম ধন্য, কারণ উভয়েই ম শান্তি আস্বাদন করেন।

বৎস! আজ সর্বপ্রথম তোমার জননীর পরমপূত পদরজঃ মস্তকে গ্রহণ কর।

রাহুল—মাতাকে বন্দনা করি, গুরুকে বন্দনা করি, অন্যান্য গুরুজনদের বন্দনা করি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদে আমি যেন কৃতার্থ হই।

যশোধরা—প্রাণধন। সর্বথা তোমার কল্যাণ হোক্। (ভিক্ষুদ্বয়ের প্রতি)। আপনারা কৃপা করে আমার জীবন সর্বস্ব এই পুত্রকে আশীর্বাদ করুন।

সারিপুত্ত—বিশ্বজননী যশোধরে! স্বয়ং বিশ্বজননী-স্বরূপিণী আপনি যার জননী, সেই পরম সৌভাগ্যবানের আপনার আশীর্বাদের পরে আর অন্যদের আশীর্বাদের প্রয়োজন কি? আমরা কেবল এই প্রার্থনাই করছি, এই নবীন ভিক্ষু চিরায়ুষ্মান্ হ'য়ে, ধর্ম ও সঙ্ঘের পরম কল্যাণ সাধন এবং পরমা শান্তি লাভ করুক।

ভগবানের আদেশ অনুসারে আমি নামতঃ এই পুত্ররত্নের মন্ত্রগুরু, কিন্তু আপনি তার শাশ্বত অদ্বিতীয় জীবন-দীপ। আপনারই প্রভাব চিরভাস্বর হয়ে ত্রিভুবন আলোকিত করে রাখ্বে। জননীর শুভাশীর্বাদই তার চির কল্যাণের কারণ হবে।

রাহুল—আদরিণি জননি! আপনার শ্রীপাদারবিন্দে সহস্র কোটি প্রণাম। আপনার অতি বিমল শীতল পদধূলি আমার মস্তকে প্রদান করুন।

যশোধরা—শাশ্বত বিশ্বদীপ ভগবান্ তথাগতের কল্যাণধর্মের পথ তোমার জন্য চিরকাল কুসুমাকীর্ণ সুরভিমোদিত হয়ে থাকুক।

স্রোতের ঢেউ

শ্রীহরিহর শেঠ

নিজের দোষ দুর্ব্বলতা বিষয় যিনি অজ্ঞ তিনি দুর্ভাগা।

* * *

সন্দিগ্ধমনা ও কান-পাতলা লোকদের অনেক সময় অকারণে মানসিক ান্তি ব্যাহত হয়ে থাকে।

* * *

গোপনে অপকর্ম্মরত ব্যক্তিদের চাল-চলন কথাবার্ত্তায় যে একটা ৈতিকতার পরিচয় দিবার ভাব দেখা যায়, সাধারণ লোকের মধ্যে া থাকে না।

* * *

একটা কথা আছে চোরের মায়ের বড় গলা। সমাজে গোপনে াপ কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও বড় গলা।

সংসারী বা সমাজে যিনি নিজেকে একেবারে অভ্রান্ত ধারণায় বলেন তাকে অনেক সময়ই ভুগতে হয়।

* * *

বিবেকই মানুষের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ।

* * *

সংসারি লোকের পক্ষে যখন সহ্য করবার শক্তি লোপ পায় বা কমে যায়, তখন সংসার ত্যাগ করে কোথাও বাস করার সুযোগ-সুবিধা থাকলে তাহা গ্রহণ করাই ভাল।

* * *

আত্ম-প্রবঞ্চনা প্রতারণা আর মনুষ্যত্ব বলি দেওয়া একই কথা।

অন্যায় বুঝেও যার প্রতিবাদ করা বা বলা চলে না সে হতভাগা।

* * *

সাধুর বেশ দেখেই মনে মনে তাকে সাধু সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়, তবে তাকে অশ্রদ্ধা করাও উচিৎ নয়।

* * *

যেখানে অস্বাভাবিকের সমর্থন, সেখানেই প্রায় কোন গোপন উদ্দেশ্য লুকান থাকে।

* * *

দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে যিনি সংসার করতে যান তাঁর সাফল্য অনিশ্চিৎ।

* * *

পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই যে মানসিক দুর্ব্বলতা হতে মুক্ত হবেন এমন নিশ্চয়তা নাই।

* * *

আপদ কালে বৃদ্ধের পরামর্শ মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে অযাচিত পরামর্শ কি বিপদে কি সম্পদে বর্ত্তমান সময়ে দিবার জন্য আগ্রহান্বিত না হওয়াই শ্রেয়।

* * *

বয়স বা সম্বন্ধের অভিমান নিয়ে বর্ত্তমান যুগে যে বৃদ্ধ সংসার থেকে শান্তির প্রত্যাশায় থাকেন, অনেক সময় তাকে ভুগতে হয়।

* * *

বার্দ্ধক্যে দেহ ও মনের অবস্থা কি হয় প্রৌঢ়ও যুবকদের জানা না থাকিবারই কথা, সংসারে এ কথা বৃদ্ধদের অনুক্ষণ মনে রাখা দরকার।

* * *

মানুষের চারিত্রিক সংযমের যেমন আবশ্যক, সমাজেও সংসারে বাক্যের সংযমও তার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

* * *

মানুষের ক্রোধ, বিরক্তি ঘৃণার উদ্রেক হিসাব করে হয় না, কিন্তু সংসারে থেকে ইহার বহিঃপ্রকাশ হিসাব করে করতে পারলেই ভাল হয়।

* * *

যা ঠিক স্বাভাবিক নয়, যেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে, সে ক্ষেত্রে অনুসন্ধান না করে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়।

* * *

সমাজে ও সংসারে একের অন্যায়ের প্রতিশোধে অন্যায়ের আশ্রয় লওয়া ঠিক কাজ নয়।

* * *

সংসার ক্ষেত্রে বার্দ্ধক্যে জীবনকে ভার মনে করে বিড়ম্বনা বলে মনে করেন না, এমন সৌভাগ্যবান খুব কমই দেখা যায়।

* * *

ইচ্ছাকৃত দোষ ত্রুটি চাতুরী ধরাপড়ার পরও যিনি স্বপক্ষে ওকালতি করেন বা করবার চেষ্টা করেন তাঁর অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছেই।

* * *

খ্যাতিপন্ন লোককে কর্ত্তব্যে অবহেলা, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে যদি দেখা যায়—প্রায়ই সে ক্ষেত্রে কোন লুকান স্বার্থ থাকে।

* * *

পরমুখাপেক্ষী নয় এরূপ অপকর্ম্মরত—বিশেষ যদি তাদের পাপকর্ম্ম প্রচারিত থাকে—তাদের স্পর্দ্ধা অসীম।

* * *

মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের মাপকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী উপাধি বা দান খয়রাতের বহরে নয়।

* * *

যে লোক লিপে উত্তর দিতে নারাজ তাকে সন্দেহ করবার কারণ থাকে।

* * *

অনেক কিছু পেয়েও তার সঙ্গে যদি মিষ্ট কথা না থাকে, তবে সে পাওয়াও গ্রহীতার দুঃখের কারণ থেকে যায়।

* * *

ঘরের কথা অর্থাৎ ঘরের কুৎসা নিন্দার কথা—এমন কি কারও দুর্ব্বলতার কথা ঘরের বাহিরে প্রকাশে অনিষ্টই হতে পারে।

* * *

সাংসারিক জীবনে মনুষ্য-উদ্ভূত দুঃখ কষ্টের দাগ কিসে মিলিয়ে যায় সে চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়, বরং বিপরীতই দেখা যায়।

* * *

ক্রোধ, অভিমান, হিংসা এইগুলিই সংসারে শান্তির প্রধান অন্তরায়।

* * *

সংসারে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা রক্ষা কল্পে কর্ত্তা গৃহিণীর সুবুদ্ধি, সহনশীলতা, সুদৃষ্টি ও প্রচেষ্টা যতটা সহায়ক হতে পারে এত আর কিছুতে সম্ভবে না।

* * *

সংসারে কোথায় কি সূত্রে দূরত্বের ব্যবধান বৃদ্ধি হয় তা জানা সত্ত্বেও কর্ত্তা গৃহিণীর তা রোধের চেষ্টা যদি না থাকে, সেখানে যত সম্পদই থাক, শান্তির আশা দুরাশা মাত্র।

* * *

কাজের বিনিময়ে যেখানে অন্ন সংস্থান বাঁধা আছে সে স্থান অপেক্ষা উপরি কার্য্যে যেখানে সামান্যও পাওয়া যায়, দেখা যায় সেই স্থানেই কদর বেশি।

*

সাধারণের জানা শুনা চলতি অসুখ ছাড়াও বার্দ্ধক্যে এমন সর্ব্ব ব্যাধি

উপস্থিত হয়, যার নামও জানা যায় না, বলেও পরকে ঠিক বুঝান যায় না।

* * *

কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশ সেবাই যাঁরা চরম পথ করে নিয়েছেন, সেই পথ ধরবার জন্ম তাঁদের অনেক বাঁধা পথের আশ্রয় নিতেই হয়।

* * *

কর্ত্তৃত্বভার যার উপর অর্পিত থাকে, তার পক্ষে পরিজনবর্গ বা অধীনস্থ সকলের মনোমত হওয়া বহু ভাগ্য সাপেক্ষ।

* * *

যে বৃদ্ধ তাঁর পুরাতন দিনের সমাজ ও নীতির পথ ছাড়তে নারাজ, এখনকার দিনে তাঁর পক্ষে সংসার সমাজ থেকে ছেড়ে থাকতে পারলেই ভাল হয়।

* * *

নিজের বয়োধিক্যের কথা, সম্পর্কের গুরুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আজকের দিনে এই তিনটি না ভুলে যিনি সংসার করবেন, তাঁর ভোগাভোগ এক রকম নিশ্চিৎ।

* * *

আন্তরিকতার উপর অন্যায় সন্দেহ সহ্য করা বিশেষ ক্লেশদায়ক।

* * *

সংসারে বৃদ্ধের দেহ ও মনের অবস্থা চিন্তা করে সকলের কাছ থেকে আবশ্যকানুরূপ ব্যবহার বা শ্রদ্ধা পাবার আশা যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা করে থাকেন, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নৈরাশ্যের অনলে দহিতে হয়।

* * *

দেশ কাল পাত্র ভুলে গিয়ে যিনি সংসার করতে যান তাঁর সাফল্য অনিশ্চিৎ।

* * *

যেখানে অস্বাভাবিকের সমর্থন সেখানে প্রায়ই কোন গোপন উদ্দেশ্য লুকান থাকে।

* * *

কাজ অপেক্ষা উদ্দেশ্য দেখে লোককে বিচার করা অধিকতর বিধেয় হলেও, অনেক ক্ষেত্রে তা হয় না।

* *

বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান যাঁদের—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, নচেৎ সুখ দুঃখ সব সময় যে নিজের হাতে তা নয়।

* * *

অনাবশ্যকে বা কোন অসুবিধায় অধিকার ভোগ না করতে পারা সহজে সহ্য করা যায়, কিন্তু অপরের স্বার্থজনিত হলে তা সহ্য করা ক্লেশদায়ক।

আশা

শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

হৃদয় যমুনা পূর্ণ কাণায় কাণায়
স্বপ্ন তোমার শিহরণ তোলে মনে,
দূর সাগরের বার্তা যেন গো জানায়
বকের পাঁতি সহসা সংগোপনে।

অনেক পথের সচল গতির ধারা,
বন্ধ ঘরের অন্ধকারের মায়া
লক্ষ্যবিহীন উদাস চোখের তারা,
আলতোভাবে ছড়ায় যেন ছায়া।

হাজার রাতের নীরব আবিলতা
আকাশ তারায় হারিয়ে-যাওয়া ভাষা,
প্রদীপ হাতে বধূর আকুলতা
আমার মনে জাগায় ধীরে আশা।

নিভৃতে তার জাল বুনেছি আপন হাতে
রূপকথা নীল ছন্দে গানে বারংবার,
হৃদয় ভরে রেখেছি আকাংখাতে
বিহ্বলতা আমার মনে কী দুর্বার।





নির্ঝর নিস্বনে

মাধবী তোমার সেদিনের কথা আজিও কি মনে পড়ে
হারিয়েছিলাম সেই যে দুজনা কিছুক্ষণের তরে ॥

সে এক পাহাড় অঘ্রাণ রোদে নিরালা সেই দুপুর,
প্রপাতের ধ্বনি প্রতিধ্বনি মিলে সে এক ধ্রুপদী সুর,
শালবন ঘিরে উত্তর হাওয়া মুখরিত মর্মরে
কী সুগম্ভীর মন্ত্র-মধুর মৃদঙ্গ রব করে ॥

পাহাড় চূড়ায় নিজেরে মাধবী কত বড় মনে হয়
ভীরু হৃদয়ের ভীরু সাধগুলি মাথা তোলে নির্ভয়।
তুমি হেসে এক পাথরের পরে লিখিলে প্রীতম নাম,
তারি কোল ঘেঁসে আমিও আমার প্রিয়া-নাম লিখিলাম,
নির্বাক দোঁহে কী পুলকে মোহে মুখোমুখি হাত ধরে
সব ভাষা বুঝি নীরব সেখানে গভীর জলের স্বরে ॥

কথা—গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়   সুর ও স্বরলিপি—পঙ্কজকুমার মল্লিক

II ম দ র্স - | - দ ণ ঋ´ I র্স - ণর্স ণ | দ - - - I দ ণ দ প | - ম প ম I
মা ধ বী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ সে দি নে র ০ ০ ০ ক

গ - - - | - গ ম - I ম প দ ণ | ধ ণ র্স ঋ´ I ণ র্স - - | - - - - I
থা ০ ০ ০ ০ তো মা র আ জি ও কি ০ ০ ম নে প ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০

ণ র্স ণ দ | প ম প ধ I ণ - - - | ণ ধ ণ র্স I ণ - - - | - - - - I
হা রি য়ে ছি লা ম সে ই যে ০ ০ ০ ০ ০ দু জ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্স ঋ´ জ্জ´ জ্জ´ | জ্জ´ ঋ´ র্স ণ I র্স - - - | - - - - II
কি ছু ০ ক্ষ ণে র ত ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্স দ - ণ | প - - - I র্স - ণ ণ | দ দ দ - I - - - - | প দ প স I
সে এ ক পা হা ০ ০ ড় অ ০ ঘ্রা ণ ০ রো দে ০ ০ ০ ০ ০ নি রা লা সে

প ম গ - | - - - - I গ প প প | প ণ - ণ I র্স ণ র্স ধ | ধ র্স - - I
ই হু পু ০ ০ ০ ০ র প্র পা তে র ধ্ব নি ০ প্র তি ০ ধ্ব নি মি লে ০ ০

র্স - র্সণ - | দ দ ণ ঋ I র্স - - - | - - - - I র্স - ণ - | দ - দ দ I
সে ০ এ ০ ক ঙ্ক প দী সু ০ ০ ০ ০ ০ ০ র শা ল ব ০ ন ০ ঘি রে

দ প ণ দ | - প ম - I ধ - - প | ণ - - - I ধ ণ র্স ঋ´ | - - র্স ঋ´ I
উ ০ ত্ত র ০ হা ওয়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মু খ রি ত ০ ০ ০ ০

র্ম - র্স জ্ঞ´ | জ্ঞ´ ঋ´ ঋ´ জ্ঞ´ I ঋ´ র্স - - | - - - - I ন্ - - - | - র্স ঋ´ ন্ I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ম র্ ম রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ ০ সু গ ম্

স - - - | - - - - I স ম ম - | - ম প জ্ঞ I ম ণ - ণ | - - ণ ণ I
ভ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ম ন্ ০ দ্র ০ ০ ম ধু র মৃ দং ০ গ ০ ০ র ব

ণ র্স - ণ | র্স ণ দ - II
ক রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞ´ জ্ঞ´ - র্র | র্স - - - I ণ র্স প - | - - - - I দ র্স র্স র্র | জ্ঞ´ - - - I
পা হা ড চূ ড়া ০ ০ য় নি জে রে ০ ০ ০ ০ ০ মা ধ বী ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞ´ র্ম র্ম র্ম | জ্ঞ´ - র্র র্র I র্স - - - | - - - - I র্স র্স ণ ণ | দ - - - I
ক ত ০ ব ড় ০ ম নে হ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভী রু হৃ দ য়ে ০ ০ র]

র্স ণ - দ | - প ম - I ম প ম গ | - - - - I গ প - প | ম - জ্ঞ - I
ভী রু ০ সা ধ গু লি ০ মা থা তো লে ০ ০ ০ ০ মা থা ০ তো লে ০ নি র্

স - - - | - - - - I র্স র্স র্স র্স | - - র্স - I ণ র্স ণ - | দ - দ দ I
ভ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ তু মি হে সে ০ ০ এ ক পা থ রে ০ ০ র প রে

দ ণ ণ - | - - জ্ঞ জ্ঞ I ম দ দ - | - দ ণ ণ I ণ - - - | র্স র্র জ্ঞ´ - I
লি খি লে ০ ০ ০ তু মি লি খি লে ০ ০ প্রী ত ম না ০ ০ ০ ০ ০ ম ০

র্র জ্ঞ´ - র্র | জ্ঞ´ র্র জ্ঞ´ - I র্র জ্ঞ´ র্র র্স | ঋ´ - - - I র্স ঋ´ ঋ´ জ্ঞ´ | ঋ´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ ঋ´ I
তার ই ০ কো ল ঘেঁ সে ০ আ মি ও আ মা ০ ০ র প্রি য়া না ০ ০ ম লি খি

সঁ - - - | - - - - I স - ঋ - | - জ্ঞ ঋ - I সঁ - - - | - - - - I
লা ০ ০ ০ ০ ০ ম ০ নি র্ বা ০ ০ ক দোঁ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঋঁ - জ্ঞঁ ঋঁ | সঁ - জ্ঞঁ ঋঁ I সঁ - - ণ | সঁ র্ জ্ঞঁ - I - - র্ জ্ঞঁ | র্ সঁ ণ - I
কী ০ পু ল কে ০ মা ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মু খো ০ মু খি ০

সঁ ঋঁ জ্ঞঁ ঋ | সঁ - - - I সঁ সঁ - ণ | দ - প ম I গ প - - | - - - - I
হা ০ ত ধ রে ০ ০ ০ স ব ০ ভা ষা ০ বু ঝি নী র ০ ০ ০ ০ ০ ব

গ প - - | - - ম ঋ I স - - - | - - - - I স ম - ম | ম দ - দ I
নী র ০ ০ ০ ব সে খা নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গ ভী ০ র জ লে ০ র

দ স - - | - - - - II II
স্ব রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

নারী ও আদর্শ

শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী

আজ দেশজোড়া দুর্গতির দিনে কেবলই মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা, যখন—"তুমি বীর প্রসবিনী হও" এই ছিল ভারত নারীর শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পতিপরায়ণা ভারতনারীর ক্রোড় শোভা করিত—বীরপুত্র আর অমিততেজা তনয়া। ভারতমাতা ছিলেন সেদিন জগতের মাঝে মহিমাময়ী সাম্রাজ্ঞী। শক্তিরূপা জননীর দশ হস্তে দশপ্রহরণ, অসুর-দলনী মায়ের দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ—জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে মা শোভা পাইতেন—সকল বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করিয়া পবিত্র বেদগানে মুখর ভারতে সেদিন নামিয়া আসিয়াছিল স্বর্গের অমৃত।

ঋষি বশিষ্ঠের পার্শ্বে দেবী অরুন্ধতী শোভা পাইতেন আপন মহিমায়। জ্ঞানের ভাস্বর বর্ত্তিকা হস্তে দাঁড়াইতেন গার্গী, মৈত্রেয়ী ঋষিগণের পার্শ্বে। সতী সাবিত্রীর তেজের কাছে পরাভব মানিত যমরূপী মৃত্যুর অপরাজেয় শক্তি। সীতা দময়ন্তীর পবিত্র প্রভাব কালের বক্ষে আজিও অক্ষয় হইয়া আছে।

আর ঐ সেদিনও কি ছবিই না দেখিলাম—জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড পার্শ্বে অগ্নির মত পবিত্র উজ্জ্বল কাহার রূপচ্ছটা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া ঐ ললনাকুল? জগতে আর কোথাও এমন তো দেখি নাই—বিস্ময়ে স্তব্ধ জগত দেখিল সেদিন—রাণী পদ্মিনী রাজপুত রমণীগণসহ সতীত্ব রক্ষায় জাতি ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রক্ষার জন্য জ্বলন্ত পাবকে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছেন। অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দেখিয়াছি সেই যুগে মাতা-ভগ্নী স্বাধীনতা সমরে ছুটিয়াছেন—বীরপুত্র ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধনুকে শর সন্ধান করিতেছেন।

তারপর কত শতাব্দী কাটিয়া গেল। সাধনার শক্তি বিস্মৃত আত্মকলহে রত নির্ব্বীর্য্য ভারত ছাইয়া গেল পরাধীনতার গভীর অন্ধকারে। মায়ের সেরূপ আর চিনিবার উপায় নাই—দারিদ্র্যপীড়িতা, লাঞ্ছিতা, ভারত-মায়ের দীনামূর্ত্তি দেখিয়া আর মনে পড়ে না মায়ের সেই রাজরাজেশ্বরী বেশ। অকস্মাৎ, এই দুর্য্যোগের দিনে কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুৎতের মত দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল কার ঐ তেজোদৃপ্ত মুর্ত্তিখানি? পরাধীনতার কাল মেঘের বুকে একবার বিদ্যুৎপ্রভা হানিয়া মিলাইয়া গেল—ঐ দেখ

অশ্বপৃষ্ঠে উজ্জ্বল অসি হস্তে আসীনা রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের দৃপ্ত মূর্ত্তিখানি। তারপর ?—উঃ কি অন্ধকার।

বীরপ্রসবিনী জননী যাহার—সে কখনও বৈরীপদভার সহিবার জন্ম জন্মগ্রহণ করিবে না। তাই অচেতন ভারতকে সচকিত করিতে দরকার বীরপ্রসবিনী জননীর। ভগিনীগণ, আজ আর শুধু প্রবৃত্তির পঙ্কিল হাওয়ার মাঝে ব্যর্থ দৃষ্টিতে বসিয়া বসিয়া পবিত্র জীবনদীপ খানি নিভিতে দিলে চলিতেছে না। দুঃখ-দৈন্ত-নির্য্যাতনের মাঝে পুত্র, কন্যা, ভ্রাতাগণের সহিত রোগে শোকে কাতর—এমনি করিয়াকি অসহায়ভাবে জীবন প্রদীপখানি নিভিতে দিবে ? ভগিনীগণ একবার সেই গৌরবময় অতীতদিনের কথা স্মরণ কর—তোমাদেরই অন্তরে সুপ্ত আছে সেই মহিমা—ঐ শান্ত নিবিড় কৌতুকোজ্জ্বল চাহনির মাঝে লুকাইয়া আছেন শক্তিরূপা, ঐশ্বর্য্যময়ী, মহেশ্বরী, মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী স্বরূপিনী মায়ের পূর্ণ ছবিখানি। সাধারণ বলে ভারতে একদিন যাহা মূর্ত্ত হইয়াছিল আজও আবার তাহা সম্ভব। ভারতের আকাশে, বাতাসে, সলিলে, ধূলিকণা-মাঝে যে পবিত্র মহিমা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মিশিয়া আছে—সাধনার বলে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে জীবনের মাঝে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমনির, রাণী ভবানীর জীবনে বাঙ্গালী মেয়ের যে বিপুল আত্মবিকাশের একটি ধারা ফুটিতে চাহিয়াছিল তাহার প্রেরণা তোমাদের জীবন-কে মহিয়সী করিতে চাহিতেছে। একটি শান্তোজ্জ্বল পবিত্র তেজোময় মহিমা যেন বঙ্গনারীর জীবনকে ঘিরিয়া আত্ম-প্রকাশ চাহিতেছে।

মানুষের জীবনে মিশিয়াছে সৃষ্টির দুইটি ধারা। একটি প্রবৃত্তির বা সৃষ্টির সহজ প্রেরণায়, জীব-জগতের অপর প্রাণীদের মত বশীভূত করিয়া চালাইতে চাহিতেছে মানুষকে অন্ধগতিতে। আর একটি হইতেছে একটি উচ্চ মহান আদর্শের আলোক, যাহা মানুষের অন্তরের কোন গোপন উৎস হইতে বাহির হইয়া মানুষের এই সহজ প্রবৃত্তি-মলিন জীবনধারাকে রূপান্তরিত করিয়া সৃষ্টি করিতেছে নব নব সভ্যতা—মানুষকে করিয়া তুলিতেছে সত্য, সৌন্দর্য্য ও শক্তির পূজারী। যাঁহার ঋষি দৃষ্টিতে জীবাণু জগতের অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগতের মহান কল্যাণ সাধন করিতেছে সেই ফরাসী বৈজ্ঞানিক মনীষী পাস্তুর (Pasteur) সত্যই বলিয়াছেন "ধন্য সেই জীবন—যাহার অন্তরে জাগিয়াছে ভগবানের আলো, একটি মহান্ আদর্শ, আর যিনি সেই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন জীবনে ("Blessed is he, who carries within himself a God, an ideal and who obeys it)। "উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ।"

আত্মার পূণ্যপূত আদর্শের আলোকে নীচের এই অবসাদময় জীবনধারাকে উপরের দিকে তুলিয়া ধরিতে, রূপান্তরিত করিতে, গীতায় ভগবান স্বয়ং উপদেশ দিয়া-ছেন। জীবনে আদর্শকে ফুটাইয়া তোলাই যেন হয় আমাদের সকলের সাধনা।

আদর্শের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। কোন উচ্চ-লোকের প্রেরণা অন্তরের গোপন উৎস হইতে নিঃসরিত হইয়া বিচিত্র ছন্দে ঝঙ্কৃত করিতেছে বিভিন্ন জীবনকে—সূর্য্যের আলোকের মত নানা বর্ণে রাঙাইয়া তুলিতেছে বিভিন্ন আধারকে। নীচের মলিনতায় শুধু প্রবৃত্তির ধারাতে জীবনখানিকে ঢাকিয়া ফেলিতে না দিয়া সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও শিক্ষায় জীবনকে ভরাইয়া তুলিতে তুলিতে দেখা দিবে জীবনে আদর্শের আলোক। সেই আলোকে পথ চিনিয়া চলিলে জীবনে নামিয়া আসিবে স্বর্গের অমৃত। পুরুষ ও নারী যখন আদর্শের আলোকে উভয়ে যাত্রা করিবেন জীবনের পথে, সেদিন অপূর্ব্ব শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিবেন একে অপরকে। নারী দেখিবেন পুরুষের মাঝে তাঁহার হৃদয়-দেবতাকে, আর নারীর মাঝে পুরুষ দেখিবেন মহিমাময়ী দেবীকে। উভয়ের সে মিলন সেদিন ভবিষ্যতের বিরাট সৃষ্টিকে জন্ম দিবে—প্রেমের স্বর্গীয় নাম সার্থক হইবে।



অন্তরীক্ষ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

টেক অফ-এর পরে আর মিহির মুখ তোলে নি। ঘাড় নীচু করে ফাইলের পাতায় মনোনিবেশ করেছিল। আকাশ-যানে উঠতে তার বরাবরের আপত্তি। এতদিন নানা ছুতোয় এড়িয়ে এসেছে। শরীরের দোহাই দিয়ে, মাঝপথে অন্য ষ্টেশনে নামবার অছিলায়। এবারও সে ধরণের আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সুবিধা হয় নি।

উডবার্ণ সায়েব নিজে ফাইলটা হাতে তুলে দিলেন। পাইপচাপা ঠোঁট একটু ফাঁক করে বললেন, মিটার, ফাইলটা কলকাতার অফিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। তুমি এয়ারে চলে যাও। আমি টিকেটের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।



মিহির মিত্র চোখের সামনে কুসুমিত সর্ষে ক্ষেত দেখল। খোদ ডিরেক্টরের হুকুম। না বললেই অন্নজলের ব্যবস্থাও বরবাদ হয়ে যাবে। কোন ওজর কানে তুলবে না। শরীর খারাপ বললে সোজা কোম্পানীর ডাক্তারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। স্টেথস্কোপের সঙ্গে কারসাজি চলবে না।

নিরুপায় মিহির সাণ্টা-ক্রুজ থেকে প্লেনে চাপল। বেছে বেছে দরজার কাছের সিটে বসল। মনে মনে ভাবল, বেগতিক দেখলেই দরজা খুলে নেমে পড়বে। তারপরই মনে পড়ে গেল, নামবে তো, কিন্তু কোথায়?

ফাইল থেকে একবার শুধু মিহির মুখ তুলেছিল। পাইলটের সহকারী একটা কাগজের চিরকুট ধরেছিল তার চোখের সামনে। তাতে লেখা we are flying over western Ghat.

কাগজ থেকে চোখটা মিহির তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল। সবাই মিলে যেন ষড়যন্ত্র করেছে। যা সে ভুলতে চায়, বার বার সেটাই তুলে ধরে মনের সামনে। সিটে বসে একমনে মিহির ভাবছিল, প্লেনে নয়, খালি এক মোটরকোটরে সে বসে আছে। একটু পরেই নির্বিঘ্নে জনবহুল ক'লকাতায় পৌঁছে যাবে। সামনে খোলা ফাইলের পাতার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল শুধু পরিবেশ ভোলার আশায়। কিন্তু বৃথা। ফাইলের নোটগুলো ঘুরপাক খেয়ে আকাশযানের ধ্বংসাবশেষের রূপ নিচ্ছিল—লাল কালির আঁচড়গুলো যেন লেলিহান অগ্নিশিখা। পেট্রল ট্যাঙ্ক ভস্মীভূত হ'চ্ছে।

চোখ বন্ধ করে দৃশ্যান্তর ভাবতে গিয়েই মিহির চমকে উঠল। মোটরের তলায় ইঁটের টুকরো পড়লে যেমন গাড়িটা দুলে ওঠে, তেমনি প্লেনটাও দুলে উঠল।

সর্বনাশ। সারা দেহের রক্ত মিহিরের মুখে এসে জমল। দ্রুত মনের পটে ভেসে উঠল স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মুখ। বত্রিশ বছরের একটা জীবনের পরিসমাপ্তি প্রস্তরাকীর্ণ ওয়েষ্টার্ণ ঘাট গিরিচূড়ায়। কেউ খোঁজ পাবে না ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের। গলে, পরে হয়ত মাটির স্তূপে পরিণত হবে। জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবে।

আবার একটা ধাক্কা। শক্তহাতে মিহির সিটের হাতল ধরল। কুলগুরুর চেহারাটা মনে আনার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না। কেবল নিজের রক্তাক্ত দেহটাই ভেসে উঠল চোখের সামনে।

কি কারণে উডবার্ণ সায়েবের কথা শুনতে গিয়েছিল। ডিরেক্টর তো নয়, শনি। মিহির মিত্রের নিয়তি।

অস্ফুট একটা চিৎকার করে দিতে গিয়েই মিহির চমকে চোখ খুলল। কপালে কার একটা হাত এসে পড়েছে। ঈষদোষ্ণ মখমল-কোমল হাত।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিহির অনেকক্ষণ চেয়ে রইল—ভদ্রতা ভুলে।

Are you feeling giddy? মৃদু, সুরেলা কণ্ঠস্বর। প্রথমেই মিহিরের চোখে পড়ল দুটি আয়ত নয়ন, তারপর রক্তিম ওষ্ঠাধর, কাল চুলের স্তূপ। তন্বী সুগঠিত এক নারীদেহ।

চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল। ততক্ষণে প্লেনের দোলানী থেমে গেছে। তবু মেয়েটি কপাল থেকে হাত সরায়নি।

আতঙ্কভাব কমে যেতেই একটু একটু করে মিহিরের মনে পড়ল। কাচের ওপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে সব কিছু স্বচ্ছ হাওয়ার মতন।

দীপা? মিহিরের গলায় কৌতূহল আর আবেগ।

কপালের ওপর রাখা হাতটা একটু যেন কেঁপে উঠল, তারপর কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্য আরোহীদের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে ফিস ফিস করে বলল, মিহির? তুমি?

মিহির ঘাড় নাড়তে যাবার মুখেই আবার বিপদ। প্লেনটা দুলে উঠল। সিটের ওপর মিহির কাত হয়ে পড়ল।

দীপা, দীপালী রায়—মিহিরের পাশের খালি সিটের ওপর বসে পড়ল। অসঙ্কোচে একটা হাত রাখল মিহিরের ওপর, তারপর মৃদু হেসে বলল, তোমার এই বুঝি Maiden flight?

এ কথার মিহির কোন উত্তর দিল না। তার মনে হল দীপা শুধু হাসলই না, কণ্ঠেও যেন বিদ্রূপের সুর মেশাল। মিহিরের অসহায়তার সুযোগে ব্যঙ্গ করতে চাইল। কে জানে পুরোনো দিনের প্রতিশোধ কিম্বা! কতদিন হবে? কত বছর? মনে মনে মিহির একবার হিসাব করল। বছর দশেক তো নিশ্চয়। সেদিনের স্বপ্ন-

বিত্ত বাপের কৃশাঙ্গী এক কিশোরীর সঙ্গে আজকের উগ্র-প্রসাধন-মাখা এয়ার-হোস্টেসের মিল খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। জীবন পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে দীপা দেহটাও যেন বদলে ফেলেছে। সেদিনের সঙ্কোচ, ভীরুতা সব কিছু ফেলে এসেছে পিছনে।

মিহিরদের বাড়ীরই ভাড়াটে। পিছনের অংশে থাকত দীপালীরা। বার বোন, এক ভাই, মা নেই। ঠুলিপরা ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মতন চাকরী-সম্বল বাপ। আর সে এমন চাকরী যে মাসের পনেরো দিন পরেই লোকের দ্বারে দ্বারে হাত পাতা শুরু হত। পাওনাদারের ভীড় জমে যেত বাড়ীর দরজায়। এক গর্ত কেটে আর এক গর্ত বোজানোর দুরূহ সাধনা বলত। শুধু আশ্চর্য কাণ্ড, মাইনেটা পেয়েই দীপার বাবা বাড়ীভাড়াটা মিটিয়ে দিতেন।

ভাড়ার টাকাটা দীপা নিয়ে আসত। মিহিরের বাপের কাছে যেত না, ধীর পায়ে মিহিরের পড়ার ঘরে ঢুকত। আস্তে আস্তে টাকাগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলত, একটা রসিদ দাও।

মিহির মাঝে মাঝে হাসত। বলত, আমার কাছে কেন? ভাড়ার টাকা বাবার কাছে দিয়ে এস।

বেণীশুদ্ধ মাথাটা সবেগে নেড়ে ভয় মেশানো গলায় দীপা বলত, আমার ভয় করে। তোমার বাবা যা গম্ভীর।

ভীতু মেয়ে কোথাকার? মিহির দীপার পিঠে হাত রেখেছে—এদিক ওদিক দেখে খুব সন্তর্পণে।

কিন্তু ভীরু যে কে বেশী, তার প্রমাণ কিছুদিন পরেই পাওয়া গিয়াছিল।

দুজনেরই অলক্ষে ভাল-লাগা কেমন করে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছিল এতদিন পরে মিহিরের মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে, বাইরে থেকে বাড়ী ফেরার সময় দরজার গোড়ায় দীপা দাঁড়িয়ে থাকত। চোখা-চোখি হলেই মুচকি হাসত। তারপর শুধু হাসিতে আর মন উঠত না। চিঠির টুকরো হাত বদল করত। সংসারকে ঘুম পাড়িয়ে দীপা সোজা ছাদে চলে আসত। চিলে-কোঠায় মিহিরের ঘর। অনেক রাত অবধি দুজনে আবোল তাবোল বকত। ভবিষ্যত নীড় রচনার নিরর্থক জল্পনা। সব বাধা, সব আগল—মিহির ভেঙে চুরমার করে দেবে। দীপা শুধু কয়েক ঘণ্টার সঙ্গিনীই নয়, জীবন-সঙ্গিনীও হবে।

এত কথা বলেছে বটে মিহির, কিন্তু সঙ্গে বুঝেছে রাশ-ভারি বাপের সামনে এসব প্রতিশ্রুতি কুয়াশার মতন মিলিয়ে যাবে। চাকরি একটা মিহির করে—কিন্তু সে চাকরির জোর এত নয় যে সংসারের বাঁধন সে ছিঁড়তে পারবে—বড়লোক বাপের আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও ঠাঁই বদল করতে পারবে, দীপাকে নিয়ে।

দীপা কিন্তু অত তলিয়ে ভাবেনি। অতটা ভাবার বয়সও তার ছিল না। সরল মনে বিশ্বাস করেছিল দুজনে—যখন দুজনের সান্নিধ্য প্রত্যাশা করে তখন কোন বাধাই বাধা নয়।

তা ছাড়া দীপার নিজের সংসারের ওপর কোন আকর্ষণ ছিল না। ওর অভাবে ভাইবোনদের সাময়িক হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু সে কষ্ট দূর হ'তেও দেরী হবে না। মাকে ছাড়া যেমন ভেবেছিল প্রথমে সংসার অচল হবে, দুর্যোগের কালো মেঘ ভেঙে পড়বে গোটা সংসারের ওপর—কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। সব অভাব, সব অনটনই ছিল, কিন্তু সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়নি। মানুষগুলো বে-সামাল পানসীর যাত্রীদের মতন জল ছেঁচে ছেঁচে ঠিক সংসার চালিয়ে চলেছে।

একদিন ছন্দপাত হ'ল। দীপার লেখা একটা চিঠি মিহিরের টেবিলের ওপর এক বইয়ের ভাঁজে ছিল, মিহিরের ছোট বোন ঘর ঝাড়তে এসে সেটা আবিষ্কার করল। তিলমাত্র দেরী নয়, সে চিঠি মিহিরের মায়ের হাতে পৌছল। সেখান থেকে বাপের কাছে।

মিহির অফিসে। এই ঝড়-ঝাপটার কিছুই সে জানতে পারল না। বাড়ী ফিরে এইটুকু দেখল আবহাওয়া থম-থমে, সবাই যেন খুব গম্ভীর। দরকারী কাজ সব হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সবাই নির্বাক কলের পুতুল। ছোট ছেলেপুলেরাও সন্ত্রস্ত।

জানতে পারল ক্লাব থেকে ফেরার পথে। এমনই একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মিহির ফিরছিল, হঠাৎ পার্কের কাছে বাধা।

এই শোন।

মিহির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রেলিং ঘেঁসে দীপা

দাঁড়িয়ে আছে। দুটো চোখে বিদ্যুতের দাহ। আঁচলটা কোমরে জড়ান।

ফুটপাথে নয়, পার্কে বেঞ্চে পাশাপাশি বসে মিহির সব কথা শুনল। মিহিরের বাপ বলেছেন—দীপার বাপকে নিজের স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ভাষায়—সাতদিনের সময় দিয়েছেন বাড়ী ছেড়ে যাবার। তারপর মিহিরের মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন দীপাকে নিজের ঘরে। সেখানে শুধু মিহিরের মাই নয়, বাড়ীর অন্য সব স্ত্রীলোকেরাও ছিলেন। সেই বন্ধ ঘরে হেনস্তার কথা বলতে বলতে দীপা চোখে আঁচল চাপা দিল। কি হবে? কি বিহিত করবে মিহির? এ অপমানের কালি মুখে লেপে কি করে দীপা বাঁচবে?

ক্লাবে সাজাহান নাটকের মহলা চলছিল। মিহিরের যশোবন্ত সিংহের পার্ট। রাজপুত বীরের শৌর্যের কিছুটা বুঝি সংক্রামিত হল বাঙালী প্রেমিকের মনে।

জোর গলায় মিহির বলল, আমরা চলে যাব কোথাও। এমন বাড়ীতে আমি থাকব না। একটু থেমে মৃদু গলায় বলল, যে বাড়ীতে তোমার অপমান হয়।

সজোরে মিহিরের একটা হাত দীপা নিজের দুটো হাতে চেপে ধরল—আমাকে তুমি বাঁচাও। এ শুধু আমার অপমান নয়, ও আমাদের ভালবাসার অপমান। মুখ বুজে এ আমরা সহ্য করব?

মিহির নয়—যশোবন্তসিংহই আবার গর্জন করে উঠল, কখনই নয়।

সেই রাত্রেই ঠিক হ'ল, সামনের শনিবার পার্কের এই বেঞ্চে দীপা অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে একটা বাসার খোঁজ করবে মিহির। শহরতলী, বস্তি যেখানে হোক। শুধু দুজনের মাথা গোঁজবার মতন একটা আস্তানা।

আশ্চর্য, বাড়ীতে মিহিরকে কেউ একটি কথাও বলল না। মিহিরও কথা বলার চেষ্টা করল না। যদি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কালভুজঙ্গেরই দর্শন মেলে?

ভরপেট খাওয়ার পর, কোমল দুগ্ধধবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিহির আবার সব কিছুর বিচার করল। গৃহের এই নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে কোথায় ঘুরবে মিহির? বাপ হয়তো ত্যাজ্যপুত্র করবেন, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে বাড়ির লোকের সঙ্গে। পথে ঘাটে পরিচিত লোকদের সঙ্গেও লুকোচুরি খেলতে হবে। শুধু দীপার মতন সামান্য একটা মেয়ের জন্য এ বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া অর্থহীন।

মন ঠিক করে যখন ঘুমের চেষ্টা করল মিহির, তখন তার মস্তিষ্ক-কোষ যশোবন্তসিংহের পৌরুষভাব থেকে একেবারে মুক্ত।

শনিবার মিহির বাড়ীতে বলল, এক বন্ধুর বাড়ী ধানবাদ যাচ্ছে। ফিরবে সোমবার সকালে।

তখনও দীপারা বাড়ী ছাড়ে নি। তবে দীপার বাবা খোঁজা-খুঁজি করছেন। করিৎকর্মা লোক। ঠিক কিছু একটা জুটিয়েও নেবেন।

অফিস থেকে মিহির সোজা ধানবাদ গেল। কোন বন্ধু-বান্ধব সেখানে নেই। ষ্টেশনের কাছে এক হোটেলে উঠল। সারাটা রাত কিন্তু ঘুমাতে পারল না। ছটফট করল বিছানায়।

নির্জন পার্কে অপেক্ষারত কোন কিশোরীর চিন্তায় নয়, কেবল মনে হল সোমবার ফিরে গিয়ে দীপার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ইতিমধ্যে দীপার বাপ একটা আস্তানা খুঁজে নিতে যেন সক্ষম হয়।

এ ব্যাপারের অনেক পরে একবার দীপার সঙ্গে মিহিরের দেখা হয়েছিল। হাওড়া ষ্টেশনে। পলকের জন্য চোখাচোখি। কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই দীপার দুটি চোখের ঘৃণা আর শাণিত বিদ্রূপের ক্ষুরধার ঝিলিক মিহিরের চোখ এড়ায় নি।

বেসামাল প্লেনটা এবার ঠিকভাবে চলেছে। মিহির সোজা হয়ে বসল। দীপার দিকে চেয়ে বলল, কি ব্যাপার, তুমি এখানে? প্রশ্নটা করেই মিহির বুঝতে পারল—এমন একটা প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না।

দীপা হাসল। বলল—স্থলে, জলে সুবিধা করতে পারলাম না, তাই অন্তরীক্ষে উঠেছি।

দীপার উত্তর শুনে মনে হল, মিহিরকে ধরার জন্যই যেন স্থল, জল, অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তুলেছে। নাকি, মাটির বাঁধন ছেড়ে আকাশে উঠেছে সমাজের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে। সে সমাজ মিহির আর দীপাকে কাছাকাছি আসতে দেয় নি। অর্থনীতিক ভিত্তি যে সমাজের প্রাণ।

কিছুক্ষণ কাটল। অল্প কিছুক্ষণ। মিহিরের মনে

হ'ল অনেকটা সময়। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই খবরের কাগজে মগ্ন। দু একজন নিদ্রার কোলে।

সে রাতে কিন্তু আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি—খুব আস্তে আস্তে প্রায় অস্ফুট গলায় দীপা বলল।

মিহিরের মনে হ'ল আবার যেন প্লেনটা দুলে উঠল। শুধু দোলা নয়, মাধ্যাকর্ষণের বিপুল টানে যেন ধরিত্রীর দিকে নেমে চলেছে।

আড়চোখে একবার দীপার সীমন্তের দিকে মিহির চোখ বোলাল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজকালকার মেয়েদের বোঝাও খুব মুস্কিল। খুব শীর্ণ সিঁদুরের রেখা। কাছ থেকেও চোখে পড়ার নয়। ফাঁপানো চুলের ফাঁকে হয়তো আছে সিঁদুরের টান, হয়তো নেই। দীপার কণ্ঠস্বরে মনে হল শুধু সে রাতটাই নয়, আজও, এখনও পর্যন্ত যেন মিহিরের অপেক্ষায় রয়েছে দীপা।

সেদিন একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম, মানে অফিসের একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল—কলকাতার বাইরে।

দীপার দিকে নয়, অন্য দিকে চেয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে মিহির কথাগুলো বলল।

কথাগুলো বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনটা আছড়ে পড়ল বায়ু তরঙ্গের ওপর। মনে হল অন্তরীক্ষের দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন মিহিরের অসত্য ভাষণে। মিথ্যাচারী মানুষের ওপর আস্থা হারিয়েছেন।

মিহির আবার হেলান দিল সিটের ওপর। খুব আস্তে বলল, মানে, ভেবে দেখলাম—বাবা মা অসুখী হন, এমন কাজ করাটা ঠিক হবে না। শুধু নিজেদের সুখের আশায় তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয়।

দীপা একটা হাত বাড়িয়ে মিহিরের হাত ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। বোধ হয় মানুষটাকে ছুঁতেই ঘৃণা হ'ল। উঠে পড়ল আসন থেকে। দু'একজন যাত্রীর হাত থেকে খবরের কাগজ ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো তুলে দিল। এক বৃদ্ধা চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়েছিল, হাত বুলিয়ে দিল তার মাথায়।

এদিকে আসতেই মিহির চেঁচিয়ে উঠল, দীপা।

দীপার সারা মুখে রক্তের ঝলক। কাণ্ডজ্ঞান নেই মিহিরের। নাম ধরে কখনও ডাকতে আছে ওভাবে। অন্য যাত্রীরা কি মনে করবে? যেদিন এমন একটা ডাকের জন্য দীপা উন্মুখ হয়েছিল, সেদিন ডাকে নি মিহির। কাপুরুষের মতন পিছিয়ে গিয়েছিল।

তবু দীপা কাছে এল। ঝুঁকে পড়ল মিহিরের দিকে। বলল—কি, কষ্ট হচ্ছে?

কোন দুর্ঘটনা হবে না তো? মিহিরের গলায় উৎকণ্ঠার ছোঁয়াচ। হাসল দীপা। ঘাড় নেড়ে বলল,তোমার আমার দেখা হওয়া ছাড়া আর কোন দুর্ঘটনা আপাতত ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্লেন এয়ার পকেটের মধ্যে পড়েছে, তাই ওরকম হয়েছিল। ভয়ের কিছু নেই।

কি কুক্ষণে যে প্লেনে চাপতে গেলাম। মিহির অর্ধস্বগতোক্তি করল। দীপা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল মিহিরের দিকে। ভয়-পাওয়া বিশীর্ণ দুটি গণ্ড, পাংশু অধর, বিস্ফারিত দুটি চোখ। বুঝি ভাবল, এমন একটা মানুষকে অবলম্বন করে ঘর বাঁধতে গেলে পদে পদে অসুবিধাই হ'ত। পুরুষকে সব দেওয়া যায়,কাপুরুষকে নয়।

এও হতে পারে। দীপা মনে মনে ভাবল। হয়তো মিহির ভাবছে প্লেনে না উঠলে আর ফেলে-আসা নাছোড়বান্দা মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত না। পুরনো দিনের জের টানতে হত না। এ ভারি লজ্জা। মেয়েছেলের এর চেয়ে বেশী লজ্জা আর কিছুতে নেই। যেচে প্রেম আর কেঁদে সোহাগ। কেন কাছে টেনে নিল না তার কৈফিয়ৎ-চাওয়া। বিশেষ করে এতদিন পরে। দীপা মিহিরের দূরে গেল কাছ থেকে। একটু পরেই ফিরে এসে দাঁড়াল। হাতে কফির কাপ।

নাও, এটা খেয়ে নাও। শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে।

হাত বাড়িয়ে মিহির শুধু কফির কাপে নয়, দীপার একটা হাতও আঁকড়ে ধরল। মুখে বলল, তুমি একটু বসো না পাশে।

দীপা হাসল। বলল, পরে, আমার বুঝি তোমার পাশে বসার চাকরি?

বলার ভঙ্গিতে মনে হল, যেন বলতে চেয়েছিল, শুধু তোমার পাশে বসার চাকরি আর পেলাম কোথায়?

তবু দীপা বসল। মিহির কফির কাপটা শেষ করতে হাত বাড়িয়ে শূন্য কাপ ডিস নিল, তারপর বলল, বিয়ে থা করেছ নিশ্চয়?

মিহির ঘাড় নাড়ল। তা করেছে। পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি? তোমার কি মনে হয়? দীপা ভ্রূ-দুটো তুলল। ধনুকের আকারে। এখনও তোমায় পাবার তপস্যা করছি?

মিহির বিব্রত হ'ল। এত সোজাসুজি, এভাবে দীপা কথাটা বলবে তা ভাবে নি।

যে অফিসে চাকরি করছিলে সে অফিসেই আছ?

মিহির কি একটা ভাবছিল। প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল, হ্যাঁ।

মনে মনে পাশাপাশি দুজনকে মিহির দাঁড় করিয়েছিল। দীপা আর সুমিতা। বেশে-বাসে আচারে-আচরণে একজন উগ্র আধুনিকা, আর একজন পরিমিত-সজ্জা, মিতবাক। একজন অন্তরীক্ষের জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড, আর একজন গৃহকোণের দীপশিখা।

বৌ কেমন হয়েছে? ঝুঁকে পড়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল।

ভালই, বলতে গিয়েই মিহির মুস্কিলে পড়ল। আবার দুলছে প্লেনটা। যদিও খুব আস্তে, তবু বিশ্বাস নেই। অবলম্বনহীন শূন্যে সব কিছুই সম্ভব।

দীপার দিকে মুখ ফিরিয়ে মিহির উত্তরটা বদলাল। বলল, তোমার মত মোটেই নয়। সেদিনের ভুলের জন্য আজও আমার আপসোশের অন্ত নেই। তোমাকে হারানোর ব্যথা যে আমার পক্ষে কতখানি—

মিহির কথাটা আর শেষ করল না। প্লেন অনেকটা স্থির হয়েছে। দীপাকে এত কথা বলার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই।

তুমি? তুমি বিয়ে করেছ? মিহির জিজ্ঞাসা করল।

কোন উত্তর না দিয়ে দীপা উঠে পড়ল। কোনের দিকে একটা যাত্রী কি বুঝি চাইছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আবার মিহিরের পাশে বসল। বলল, কি বলছিলে তখন?

বলছিলাম—বিয়ে করেছ?

করেছি, দ্বিধাহীন গলায় দীপা উত্তর দিল, একজন নেভাল অফিসরকে বিয়ে করেছি। কাপুরুষদের ওপর ঘৃণা ধরে গিয়েছিল।

মিহির বাইরে চোখ ফেরাল। পাতলা সাদা একটা মেঘপিণ্ড জানলার কাছে ঘোরাফেরা করছে। দীপার কথা শেষ হয়নি। মিহিরের কানে বাকি কথাগুলোও গেল।

আজ তার এরোড্রোমে আসার কথা। আজ থেকে আমি মাস দুয়েকের ছুটিতে যাচ্ছি। আমরা দুজনে।

দীপার কথায় মিহিরের মনে পড়ে গেল। টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। সুমিতা আসবে ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে। তাদের সামনে আবার সোহাগ দেখিয়ে দীপা কথা না বলতে আসে। যা পেয়ে সুমিতা তিলকে তাল করবে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, মন-কষাকষির পালা। একবার মাটিতে নামতে পারলে আর দীপাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।

কি ভেবে মিহিরও বলল, সুমিতাও আসবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে। সুমিতা, সুমিতা কে? দীপা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল। কিন্তু প্রশ্ন করেই থেমে গেল। উত্তরটা মিহিরের মুখেই লেখা রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দীপা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। আবার কেঁপে উঠল প্লেন। লাল অক্ষরে লেখা ফুটে উঠল, Tighten your belts.

দুটো হাতই মিহিরের ভীষণ কাঁপছে। কিছুতেই বেল্টটা আঁটতে পারল না। বারবার ফসকে গেল।

নীচু হয়ে দীপা বেল্টটা এঁটে দিল। নরম কোঁকড়ান চুলের গোছা মিহিরের গালে ঠেকল। শরীরে শরীরে ছোঁয়াছুঁয়ি, শিহরণের আমেজ—মুখ তুলে দীপা বলল, এইবার আমরা নামছি।

দীপার কথার ভাবে মনে হ'ল, মাটিতে নয়, যেন রসাতলেই নেমে চলেছে দুজনে।

দীপা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল পাইলটের ঘরের দিকে।

প্লেন মাটি ছুঁল। সুমিতা এসেছে ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মিহির হাত-মুখ নেড়ে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ যাত্রার মারাত্মক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। রঙ ফলিয়ে। মোটমাট মিলিয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ট্যাক্সির আশায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ল।

থামের পাশে দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গালের রুজ আরো রক্তিম আরো ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর রেখা। চুলেরও সযত্ন-বিন্যাস।

কিন্তু একটু এগিয়েই মিহির থেমে গেল। দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। মোছবার দীপা কোন চেষ্টাই করছে না। এখনই যে সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে মুছে যাবে, সে খেয়াল নেই।

বুঝতে পারল মিহির যে নেভাল অফিসরটি আসে নি। কিন্তু তার জন্য এত চোখের জল? হয়তো কোন কারণে আসতে পারে নি। তার কাছে যেতে আর দীপার বাধা কিসের?

কিংবা, মিহিরের আচমকা কথাটা মনে পড়ল। নেভাল অফিসর হয়তো কোন দিনই আসবে না। শুধু মনের গোপনে যার সৃষ্টি, সে কেমন করে আসবে বাস্তবের রূপ ধরে।

ফিরে এল মিহির। কঠিন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এসব সস্তা মনোবিলাসের কোন মানে হয় না। কার জীবনে কে এল না, সে হিসাব রাখার দায়িত্ব তার নয়। শক্ত হাতে মিহির ছেলে মেয়ের দুটো হাত আঁকড়ে ধরল।

সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি হিসাবে আমাদের দেশে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সুরকার হিসাবেও তিনি যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠদের একজন ছিলেন একথা নিয়ে বোধহয় বেশী আলোচনা হয়নি। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর "স্মৃতিচারণ"-এ ঠিকই বলেছেন যে সংগীত সমাজে সুরকার বলতে আজকে যা এবং যতোখানি বোঝায়, আগের দিনে সে রকম ধারণা করবার মত অবস্থা সমাজে তৈরী হয়নি এবং কোন সুরকারের যথার্থ মর্যাদা সম্বন্ধে লোকের মনে কোন জিজ্ঞাসা জাগেনি। তখনকার দিনে সমাজে যে ধরণের গান চলতো—তা সে লোকগীতই হোক বা কোন উঁচু আদর্শ-ঘেঁষা গানই হোক—তার ভিত্তি ছিল তৎপূর্বকালে প্রচলিত গানের রীতি ও ধারা। গানকে বিচিত্র করবার জন্য নিশ্চয় কেবল উৎসাহের অভাব ছিল না, কিন্তু তাকে নিত্য নতুন সুরে ও ছন্দে সাজিয়ে, প্রচলিত রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে (বর্জন করে না, বরং গ্রহণ করেই) ব্যক্তিগত প্রতিভার ছোঁয়ায় একটা স্বতন্ত্র উজ্বল কিছু সৃষ্টি করবার অর্থাৎ গতানুগতিকতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে চলবার দিকে সে রকম একটা আগ্রহ ছিল না এবং এ বিষয়ে চিন্তাও করতেন না সে যুগের সঙ্গীত-শিল্পীরা। এক আধ জন ক'রে থাকলেও সুরকার ব'লে কোন সংজ্ঞার বা সুরকারদের কোন ধারায় অথবা গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন এখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা পাই আমাদের দেশের সুরকারের মিছিলের পথিকৃৎ হিসাবে। কিন্তু সে কালে এখনকার মত ঘরে ঘরে সংগীতের চর্চা হ'ত না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এবং বৈঠকীগণের আসরের সংস্পর্শে এসে বা কলের গানের ছিটেফোঁটার কৃপায় মনে গান-বাজনা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচার বিশ্লেষণের উন্মেষ হচ্ছে এমন লোকেরও সংখ্যা তখন বেশী নয়। তাই সুরকারের সৃষ্টি যে সংগীত জগতের কতো বড় দান, সে বিষয়ে সাধারণ শ্রোতার মন সচেতন ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁর দেশবাসীকে তাঁর সুরের ডালি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন তখন এবং তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সমাজে তাঁর রচিত গানের চর্চা এবং প্রচলন বহুলভাবেই ছিল। তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত গান তাঁর রচিত নাটকে স্থান পেয়ে বাংলার নাট্যমঞ্চের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয়েছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ সব গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেত এবং শ্রোতা ও গায়ক সকলেরই কাছে ঐ সব গান সমান প্রিয় ছিল। যুগের পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে নতুন নাটক পুরাতনের স্থান অধিকার করতে থাকে, তাই পুরাতন নাটকের গানগুলিও শ্রোতাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মে কোন জিনিষের জনপ্রিয়তা চিরদিন সমান থাকে না। কিন্তু মানুষের মূল্য বিচারে যে বস্তুর মধ্যে সার সত্য নিহিত আছে তার দাম কখনো কমে না। দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের মধ্যে, তাঁর রচনা-কৌশলের মধ্যে, প্রেরণা ও অভিব্যক্তির মধ্যে, সৃষ্টির বিচিত্র ভঙ্গীর মধ্যে পাওয়া যায় এই সার সত্যের সন্ধান—যা না থাকলে গান যুগোত্তীর্ণ হতে পারে না, কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। পৃথিবীতে সকল সৃষ্টিই সময়ের অথবা সমসাময়িকতার বেষ্টনী দিয়ে বেশ খানিকটা সীমাবদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ-মাতানো স্বদেশী গান বা দেশাত্মবোধক গান যেমন 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ভারত আমার' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', এক সময়ে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতো, অভিভূত করতো। গানের নিজস্ব শক্তি ও প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য হ'লেও একথা ও সত্য যে—সে দিনের সে যুগটাও ঠিক এই রকম গানের উপযুক্ত ছিল। আজকে হয়তো রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ নতুন করে জাগিয়ে তোলবার জন্য এই সমস্ত গান সে দিনকার মত উদ্দীপনা আনবে না—কারণ যুগ পাল্‌টে গিয়েছে, সেই স্বাধীনতার সংগ্রামের দিন আজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত গানের ছত্রে ছত্রে এবং সুরের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে দৃঢ়তা, যে আত্মপ্রতিষ্ঠা, যে পৌরুষ এবং প্রেম, সার্থক রচনা-কৌশল প্রকাশ করছে তা সর্বযুগের সর্বকালের জন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমস্ত গান যে তাঁর পরবর্ত্তীকালের সুরকারদের কাছে এক বিশেষ উত্তরাধিকারের এবং আদর্শের কাজ করেছে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

প্রকৃত সুরকারদের ভিতরে অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্ততঃ বিশেষ গুণ এই যে, তাঁদের প্রত্যেকটি রচনা একটা স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রচনা পৃথক বলে মনে হবে। প্রায় সব মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু সুর থাকে; তাঁদের কেউ কেউ কখনো কখনো গানে সুর দিয়ে নিজেদের রচনাশক্তির পরিচয়ও দিয়ে থাকেন এবং অনেকের রচনা সুখশ্রাব্যও হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এই কারণে কেউ আর সুরকার বলে পরিচিত হতে পারেন নি। সুরকার তাঁকেই বলা যেতে পারে যাঁর মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা আছে, কোন অসাধারণ শক্তি আছে—যা নিজের উচ্ছ্বলতায় বহুভাবে বহুসংখ্যক রচনার মধ্য দিয়ে বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে লোকের আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই শক্তি চেষ্টা করে লাভ করবার নয়, এ জন্মগত সংস্কার। সুরকার সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করে চলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিশে থাকে অবচেতন সংস্কারের আবেদন। মগজের পরতে পরতে সঞ্চিত গচ্ছিত রাখা কতো-কালের-শোনা, কতো রকমের স্মরণোজ্বল অথবা বিস্মৃত ধূসর মূর্চ্ছনাকে টেনে আনা হয়—তা কি বলে বোঝান যায়? শিক্ষা ক'রে শেখা বিদ্যার সঙ্গে শুনে অর্জন-করা অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান ক'রে নিজের কল্পনা, প্রেরণা, রুচি এবং বিচারকে কাজে লাগিয়ে তবেই সৃষ্টি

করেন সুরকার তাঁর সুর। অথবা ব্যাপারটিকে উল্‌টিয়ে নিয়ে বলতে পারা যায় যে সুরকারের কল্পলোকের গঙ্গোত্রী থেকে সুরের সুরধুনী আপনা থেকেই নির্ঝরিত হয়। এই বিশেষ শক্তি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই থাকে। ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে প্রতিভাকে পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পিছনে তাঁর ব্যক্তিত্বে সব সময়ে কাজ করে চলেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, পৌরুষ, কোমলতা, দেশাত্মবোধ ও ভক্তি তাঁর শিল্পী-জীবনের সমস্ত রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, একথা আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের নানা কাহিনী থেকে বুঝতে পারি। কিন্তু যে কথা বলা হয়েছে, তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের গানগুলি, প্রত্যেকটি যেন এক একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য নিয়ে, পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, রূপ নিয়ে, নতুন নতুন মাধুর্য নিয়ে শ্রোতাদের অনুভূতিতে স্পন্দন তোলে, ছন্দ জাগায়, রসের প্লাবন আনে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের প্রকৃত আস্বাদ পেতে হ'লে, তাকে বুঝতে হ'লে এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, সুগায়কের মুখে তাঁর গান শুনে রসোপলব্ধি ক'রে তবে সেই সুরের তাৎপর্য গ্রহণ করা যায়, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। তাঁর গান যেমন নানা রস, নানা ভাব ও চিন্তাকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে, সেই সব গানের সুরও এই সব রস, ভাব ও চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলে তাঁর সমগ্র রচনাকে বিচিত্র ও সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। একটা সুবিধা দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল—একে ঠিক সুবিধা না ব'লে talent বা প্রতিভাই বলা উচিত। আমাদের দেশে সুরকারের সংস্কৃতি বেশী পুরাণো না হ'লেও প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের বড় বড় কবিদের, তাঁদের নিজেদের রচিত পদে নিজেদেরই সুর যোজনা ক'রে গান গাইতে দেখা গিয়েছে, মীরা, সুরদাস প্রভৃতি ভক্ত কবিরাও গান করেছেন এই ভাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল এবং দিলীপকুমার এঁরা সবাই গায়ক। কবি গায়ক হ'লে পরে এবং সুরকার শক্তির অধিকারী হ'লে পরে তাঁর রচনার প্রসাদ গুণ আরো বৃদ্ধি পায়, যা হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের বেলায়। তাঁর বিভিন্ন রসের কয়েকটি গান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তাঁর গানের সুর তাঁর গানের বাণীর ভাব, ছন্দ ও প্রকৃতির সঙ্গে কী রকম সুন্দর ও সুসঙ্গতভাবে মিশে গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গান স্মরণ করা যাক!

দেশাত্মবোধক গান—

যে দিন সুনীল জলধি হইতে, বঙ্গ আমার জননী আমার, ভারত আমার, ধনধান্য পুষ্পে ভরা, মেবার পাহাড় ইত্যাদি গানগুলি তাদের অন্তরস্পর্শী তেজস্বিতার জন্য বিখ্যাত। গানগুলি সুরের দিক দিয়ে খুবই সরল ও অনাবশ্যক অলঙ্কার বির্বজিত, যে জন্য সম্মেলক গানের উপযুক্ত। এই গানগুলিতে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুকরণ নেই, মূর্ছনাগুলি কোন না কোন রাগের আকৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু সব গানগুলি পাশ্চাত্য কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের ধাঁজে পরিবেশিত হ'বার আশ্চর্য যোগ্যতা রাখে।

প্রেম সঙ্গীত—

মলয় আসিয়া, এ জীবনে মিটিল না, আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায়, আমি সারা সকালটি, আর একবার ভালবাস, হৃদয় আমার গোপন করে ইত্যাদি গানগুলি সুদক্ষ গায়কদের গাইবার উপযুক্ত গান। রাগে ও তালে দখল না থাকলে এ সমস্ত গানের মর্যাদা রাখা যায় না। আজকের রাগ-প্রধান গানের পথ-প্রদর্শক এই সব গান।

প্রকৃতি:

নীলগগন চন্দ্রকিরণ, ঘনতমসাবৃত, আজি বিমল নিদাঘ, আয়রে বসন্ত, আমরা এমনি এসে, আইল ঋতুরাজ, আঁধার জোয়ার আসে, সুরেও ছন্দে এই সব গান পুরাণো হবার নয়।

ভক্তি:

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে, আজি তোমার চরণে জননী, আর কেন মা ডাকছ আমায়, চরণ ধরে আছি পড়ে, এবার তোরে চিনেছি মা, ইত্যাদি গানের সুরে যে অপার্থিব প্রেমের ও ভক্তির অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় আজকের দিনের সুরকারদের সুরে তা দুষ্প্রাপ্য। কারণ বোধহয় এই যে, অন্তরে ভক্তি না থাকলে কৃত্রিম মূর্চ্ছনায় তা প্রকাশ করা যায় না।

কীর্ত্তন:

ওকে গান গেয়ে, ছিল বসি সে ইত্যাদি গান উচ্চাংগ কীর্ত্তনের আঙ্গিকে ভরা।

এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গান অনেক শীর্ষে ভাগ করা যায়। বিশুদ্ধ সংগীতের পর্যায়ের গান ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত হাসির গানগুলির এমন চমৎকার সুর দিয়ে গেছেন—যা একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্টি এবং যা পরবর্ত্তীযুগের হাস্যরসের সুরকারদের পথের সন্ধান দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে মাঝে মাঝে বিলাতী ছাঁদ দেখা যায়। কিন্তু দেশী রাগের চালেও তাঁর হাসির গান আছে যেমন "প্রাণ রাখিতে সদাই", টপ্‌পার চালে সুন্দর গান "বুড়োবুড়ি"; লোকগীতের চালে অনবদ্য রচনা "কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ"।

সুরকারের একটি বিশিষ্টগুণ যেমন তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্যে কিছু না কিছু নূতনত্ব, একের থেকে অন্যের বিভিন্নতা—তেমনি সমষ্টিগত ভাবে তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটা মূল ঐক্যের সূত্র পাওয়া যাবে এও আর একটা গুণ। এই ঐক্য Monotony নয়; সুরকারের স্বকীয়তারও ব্যক্তিত্বের ছাপ। মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এই রকম একটা ঐক্যের সূত্র পাওয়া যায় যা তাঁর রচনাকে সমগ্রভাবে অন্যান্য সুরকারদের রচনা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। বিশ্লেষণ করলে পরে হয়তো একাধিক কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সব রকম গানের মধ্যে ব্যঞ্জনার স্পষ্টতা ও তেজস্বিতা বোধহয় এই ঐক্যের সূত্র গাঁথতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে বুঝতে হ'লে, স্থান-কাল-পরিবেশের পটভূমিকে বাদ দেওয়া চলে না। অন্যদিকে, জনপ্রিয়তাকে একমাত্র মানদণ্ড বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়, রচনার বহুলতাকেও নয়। সব দিক বিচার করে দেখলে পরে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের দেশের সুরকারদের একজন শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করতে হয়।

সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

'সাহিত্য' শব্দটি আজকের নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'সাহিত্য' কথার উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়—"হিতের সহিত বর্ত্তমান যে—'সহিত', তারই ভাব সাহিত্য। সাহিত্য একটি শিল্প এবং সমস্ত শিল্পেরই উদ্দেশ্য -"To aim at some good." অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মতে—"good that is really good and not conventionally good." রবীন্দ্রনাথের অভিমত—সাহিত্য অর্থে সঙ্গ বা সহযোগ ; অর্থাৎ কবি ও পাঠক মনের পারস্পরিক একাত্ম। প্রাচীন আলংকারিকেরা রবীন্দ্রনাথেরই সমর্থক।

কবি মন শুধু বস্তুধর্মী মন নয়। সেটি ব্যাপ্তিশীল, উদার ও বৃহৎ মন। সে মন সংবেদনশীল। বাইরের জগত সেই সংবেদনশীল মনে প্রবেশ ক'রে কবির অন্তর্লোকে একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করে। সাহিত্য যেমন প্রকাশধর্মী, কবির শিল্পী মনও তেমনি বিশেষ আংগিকের মাধ্যমে প্রকাশমুখী। কাব্যপ্রতিভার বিশেষ ধর্ম স্বতঃস্ফূর্ত্ততা এবং আন্তরিকতা। এর অপর একটি লক্ষণ—'কল্পনা'। কল্পনা দ্বিবিধ—গ্রহণধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী। কবির কল্পনা সৃষ্টিধর্মী 'কাণ্ডকল্পনা' (aesthetic imagination)। সে কল্পনা একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে আত্মপ্রকাশ করে।

অপরপক্ষে পাঠক মন হবে সহৃদয়, সামাজিক বা সমঝদার। কিন্তু রসপিপাসা যতক্ষণ না জাগবে ততক্ষণ পাঠকের পক্ষে সহৃদয় হওয়া সম্ভব নয়। এ-রকম পাঠক না হ'লে কাব্যই ব্যর্থ। কবি-চিত্তের সাথে 'তন্ময়ীভবনযোগ্যতা' আসতে পারে কেবলমাত্র কাব্যানুশীলনের মাধ্যমে। কবি ও পাঠকমনের এই যোগাযোগকে 'সাধারণীকৃতি' বলা হয়।

মানব জীবনের রূপায়নই সাহিত্য। মানুষ নিসর্গরাজ্যে বাস করে। প্রকৃতির রাজ্যের সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান। তাই বাস্তব জীবনের সাথে প্রকৃতির সংমিশ্রণে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় সাহিত্যের চত্বরে। বিজ্ঞান সত্যকে অনুসন্ধান করে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে ; কিন্তু সাহিত্যের সত্য দানা বাঁধে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে। সেখানে আমাদের শুধু দেখতে হবে যে কবির উপলব্ধ সত্য—সম্ভাব্য-সত্য কিনা।

কল্যাণ-সাধনের সচেতন প্রয়াস লেখকের থাকবে না। স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে সে-কল্যাণ সাধিত হবে। সত্য হবে শিবময় বা কল্যাণকর। 'সৎ' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। অস্ ধাতু শতৃ=সৎ। অতএব সৎ' অর্থে যাহা বিদ্যমান। যা রয়েছে তা অসুন্দর হ'লেও তাকে যদি একটা কাব্য-মূল্য দান করতে পারি তবেই কাব্য সৃষ্টি হবে সার্থক এবং তাকে আমরা অসুন্দর বলবো না। চরমভাবে উপলব্ধ যে সত্য তা কল্যাণকর হবেই।

সৌন্দর্যতত্ত্ব হচ্ছে পাশ্চাত্যতত্ত্ব। 'Kant' বলেন—দ্রষ্টার মনের একটা অনুভূতিই সৌন্দর্য। 'Hegel' বলেন—পরমসুন্দর ব্রহ্মেরই রূপায়ন এই বিশ্ব। সাধারণ বস্তুর মধ্যে যখন পরমসুন্দরকে উপলব্ধি করতে পারবো তখনই সেটি হ'য়ে উঠবে সুন্দর।

বস্তুসত্তা অবদমিত হ'লেই আবির্ভূত হয় সচ্চিদানন্দময় সত্তা। তা থেকে উদ্ভূত উপভোগ্য রসোপলব্ধিই 'ট্র্যাজেডি'। সাহিত্যের ট্র্যাজেডি করুণরসপ্রধান হ'লেও পাঠক মনে অলৌকিক বা ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ দান করে।

কাব্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ—(ক) বিষয়ী প্রধান (Subjective) (খ) বিষয়প্রধান (Objective)। মতান্তরে—(১) দ্রুতিকাব্য ও (২) দীপ্তিকাব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে শেষোক্ত শ্রেণীবিভাগই বিচার্য।

হৃদয় দিয়ে যাকে গ্রহণ করা হয় অথবা চিত্ত যেখানে বিগলিত হয় সেই ভাবপ্রধান কাব্যকে দ্রুতিকাব্য বলা হয়। এতে রসবোধ জাগ্রত হয়। এর দুটি অংগ—রসোক্তি এবং স্বভাবোক্তি। রসোক্তিতে চিত্তের প্রচণ্ড আবেগ অনুভূতি হয়, আর স্বভাবোক্তি শান্তরসাশ্রিত। অপরপক্ষে বুদ্ধি দিয়ে যাকে গ্রহণ করা হয় অথবা অর্থের প্রাধান্যই যেখানে মুখ্য, সেই বাক্‌চাতুর্যবহুল কাব্যকে দীপ্তিকাব্য বলা হয়। এতে রম্যবোধ জাগ্রত হয়। এরও দুটি অংগ—গৌরবোক্তি এবং বক্রোক্তি।

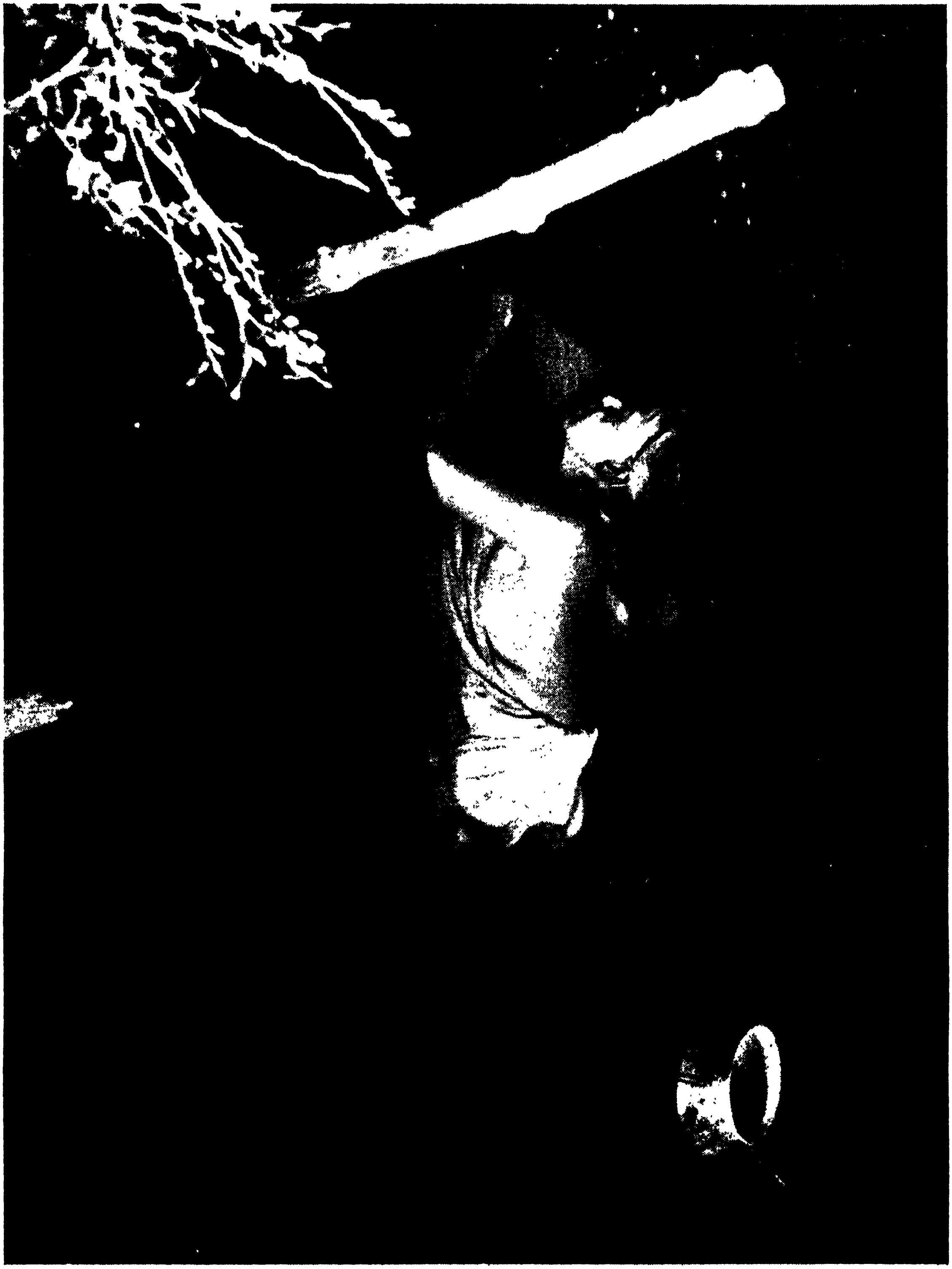
তারপর ভাষা। ভাষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—অর্থময় (গদ্য) এবং ভাবময় (পদ্য)। কিন্তু কাব্যের ভাষা হবে 'অর্থময়-ভাবময়'। সে—ভাষায় থাকবে পদলালিত্য এবং ধ্বনিঝংকার। দ্বিতীয়তঃ বিশিষ্ট প্রয়োগ-কৌশলে যে চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হয় তাকেই বলা হয় কাব্যের অলংকার। সার্থক অলংকারে কবির বক্তব্য হৃদ্য হওয়া চাই। তৃতীয়তঃ কবির শিল্পবোধ থাকা চাই। কোন্ কাঠামো বা কি আংগিকের মাধ্যমে কবিতাটিকে উপস্থাপিত করা হবে—সেই বোধই শিল্পবোধ।

কাব্যের আত্মা কোথায়? কাব্যের মূল্য যেমন বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না, তেমনি ছন্দের উপর বা অলংকারের উপর কাব্যের আত্মা নির্ভর করে না। কাব্যের অখণ্ড ব্যঞ্জনা বা দ্যোতনাই (উচ্চতর কোন অর্থের ইংগিত) কাব্যের প্রাণ। এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। এই ব্যঞ্জনা রসের ব্যঞ্জনা। ভাবাবেগ যদি মনকে বিগলিত করতে পারে, সেই স্থায়ী ভাবের নামই রস। এই রসের ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা বা প্রাণ।—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" যা আস্বাদন করা যায় তাই রস। "আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ।" ব্রহ্ম রসস্বরূপ।—"রসবৈস।" রস উপভোগ করাই ব্রহ্মকে বা ভূমানন্দ জগতের আনন্দকে উপভোগ করা।



‘সম্মুখে শান্তি পারাবার’—

ফটো : রমেন বাগচী



ডক্টর সুধীর দাশগুপ্ত বলেছেন—রস আস্বাদনই কাব্য—সৃষ্টির শেষ কথা নয়। রস উপভোগের ভেতর দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দ উপভোগ সেইটিই কাব্য সৃষ্টির বড় কথা।

অতএব দেখা যায় ভাবপ্রধান কাব্যের ফলে সৃষ্ট হয় রসবোধ—আর দীপ্তিগুণ বা বুদ্ধিগুণবিশিষ্ট কাব্যে জাগে রম্যবোধ বা পরমানন্দলাভ। এই আনন্দ সৃষ্টিই কাব্যসৃষ্টির মূলকথা।

এখন সমস্যা হচ্ছে সাহিত্যে যুগবিভাগের। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখা দিয়েছে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যুগস্রষ্টা। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগ অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-যুগ রবীন্দ্রোত্তর যুগের সংজ্ঞা কি? 'রবীন্দ্রোত্তর' কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় অথবা শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিককে আমরা কোন্ যুগের কবি বলবো? বিশেষ প্রণিধান ক'রে দেখা গেছে প্রথম মহাযুদ্ধকেই এই উভয়-যুগের সীমারেখা বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল রবীন্দ্র-যুগ এবং পরবর্ত্তী-রবীন্দ্রোত্তর যুগ। রবীন্দ্র যুগটি সবদেশেই ছিল গ্রহণের যুগ। মানুষের মনে তখন প্রশ্ন, সন্দেহ বা দ্বিধা ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকট এবং ব্যাপক হ'ল জিজ্ঞাসার যুগ। তখন কাব্যের ক্ষেত্রে ছিল রাজা-রাজড়াদের একচেটিয়া প্রভাব; কিন্তু এখন কাব্যের বিষয়বস্তুতে সাধারণের কথাও প্রবেশলাভ করেছে। দরিদ্র বা সাধারণ মানুষেরও যে একটা জীবনসত্তা থাকতে পারে তা আজকের দিনের কাব্যে স্বীকার করা হয়েছে। তাই কাব্যের দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অর্থাৎ ভাববিলাস বা কল্পনাবিলাসমুক্ত কবিতাই রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্য। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

কবিগুরুর 'পূজারিণী' কবিতার মর্মকথা

বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় কাব্যভারতী

পূজারিণী কবিতার ভাব-মাধুর্য্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। মগধের রাজা বিম্বিসার প্রেমাবতার বুদ্ধের শরণাগত হন। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত রাজার অনুসরণে মগধের বহু নরনারীর মধ্যে বুদ্ধানুরাগ বিস্তৃতি লাভ করে এবং রাজ্যে চিরাচরিত বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ভগবান বুদ্ধের এক কণা পাদনখের উপর রাজপুরীর উদ্যান মধ্যে এক মনোহর স্তূপ নির্মাণ করেন। রাজ-অন্তপুরের রমণীগণ প্রতি সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে স্তূপপাদমূলে আরতি করতেন। পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে অজাতশত্রু মগধরাজ্যে পুনরায় বেদবিহিত হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। উৎপীড়নে ও অত্যাচারে রাজ্যময় রক্ত-স্রোত প্রবাহিত ক'রে তিনি বৌদ্ধধর্মকে সাম্রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'লেন। তাঁর কঠোর আদেশে রাজ-অন্তপুরে বুদ্ধদেবের স্মৃতিমূলে আরতির প্রথা রহিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকারীদের উদ্দেশ্যে মৃত্যু-দণ্ডের বিধান প্রচারিত হ'ল। কঠোর-হৃদয় রাজার কঠোরতম আদেশ সকলেই শিরোধার্য করতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু এক রাজ-অন্তঃপুরচারিণী পরিচারিকা অন্তরে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠল—সে শ্রীমতী, 'বুদ্ধের দাসী'। পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে রাজপুরনারীদের সে একে একে আহ্বান জানাল, প্রাণভয়ে কেউই তাতে সাড়া দিল না। পরিশেষে সে একাকিনীই বৌদ্ধস্তূপে "শেষ আরতির শিখা" জ্বেলে বেদীমূলে আত্মদান ক'রল। এই করুণ ও মর্মস্পর্শী আখ্যানবস্তুকেই কীর্তিমান শিল্পী নিপুণ তুলিকায় গৌড়জনের কাব্যপিপাসু অন্তরে সযত্নে এঁকে রেখে গিয়েছেন। আজ এই কাহিনীর প্রাণসত্তা প্রসঙ্গ নিয়েই আমরা আলোচনা ক'রব।

আলোচ্য কাহিনীটিতে মৃত্যুঞ্জয়ী শরণাগতি, মর্মস্পর্শী আত্মোৎসর্গ, স্বৈরাচারের প্রতি চরম আঘাত, কর্তব্য কর্মে অবিচল নিষ্ঠা প্রভৃতি কতিপয় মানবধর্মের দুর্লভ সমন্বয় সমাধান হয়েছে বলা চলে। জীবনে যে ধর্মবিশ্বাস বা জ্ঞানকে একমাত্র ও পরমসত্য ব'লে মানুষ মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তার অবমাননা কোনও সময়েই সহ্য করা উচিৎ নয় এবং প্রকৃত সত্যসন্ধ চিত্ত অবশ্য তা' কখনও সহ্য করতে পারে না। প্রয়োজন হ'লে প্রাণপাত ক'রে হ'লেও সে-অন্যায় রোধ করা কর্তব্য। আর জীবনে সত্যের প্রতি যদি যথার্থই অনুরাগ থাকে তবে সেই সত্যানুভূতি দেহের অনু-পরমাণুতে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে আত্মোৎসর্গ করতেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সত্যদ্রষ্টা কবি এই দার্শনিক মহাসত্যকে তাঁর পূজারিণী কবিতার মাধ্যমে আমাদিগকে পরিবেশন করেছেন এবং আলোচ্য কবিতার এটাই হ'ল মর্মকথা।

শ্রীমতী ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও বৌদ্ধদর্শনকে হৃদয়ে পরম ও চরম সত্য রূপে গ্রহণ করেছিল। রাজার কঠোর আদেশ বা মৃত্যু-দণ্ডের ভয় তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। সত্যের আকর্ষণও আলোক তার বিবেককে পথ দেখিয়ে অমর মৃত্যুর বাঞ্ছিত লোকে পৌঁছিয়ে দিল। তাই আমরা দেখি, রাজ রোষের উদ্যত দণ্ড মাথায় নিয়ে সে একাকিনী গিয়েছিল ইষ্ট পাদমূলে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করতে। অত্যাচার এসে শ্রীমতীর দেহ ভূলুণ্ঠিত ক'রল সত্য। কিন্তু

তার অন্তরের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও সত্যনিষ্ঠা বলকে অতিক্রম ক'রে চিরকালের জন্য অম্লান সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে রইল। রাজোদ্যানের পবিত্র বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে শারদ-রাত্রির নিভৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে শ্রীমতীর মহিমময় জীবনের অবসান ঘটল। এই আত্মত্যাগের পশ্চাতে কোনও জন সমর্থন নেই, উৎসাহের তূর্যনিনাদ নেই, এমন কি জগতে ও জনসমাজে তার এই আত্মদান প্রহরীবেষ্টিত লৌহ যবনিকা ভেদ ক'রে প্রচারিত হবে কি না, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া এ সংবাদ প্রচারিত হ'লেও তা সত্যিকারের শ্লাঘ্য ব'লে সুধিসমাজে বিবেচিত হবে কি না তাও শ্রীমতীর জানা নেই। তা যাই হোক্ হিংসার খড়্গাঘাতে অহিংসার পীঠস্থান সেই দাসীর রক্তে কলঙ্কিত হ'ল। তবে এটাও ঠিক যে, পুণ্যবতীর পবিত্র রক্তধারা ভগবান বুদ্ধের শুভ্র শিলাস্তূপ অভিষিক্ত ক'রে সার্থক হ'ল।

সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মাহুতি ও হিংসার বেদীমূলে অহিংসার আত্মত্যাগ জগতে দুর্লভ হ'লেও একেবারে অলভ্য নয়। সংসারক্ষেত্রে আমাদের নানারূপ ছল-বল-কৌশল অবলম্বন করে চলতে হয়। আমরা অধিকাংশ সময়ই বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতে পারি না। তার এক মাত্র কারণ এই যে, যাকে বা যে মনোবৃত্তিকে একবার আদর্শ ব'লে গ্রহণ করি তাতে সর্বক্ষণ আত্মস্থ হয়ে থাকতে পারি না। জীবনে সত্যকে একবার মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারলে, সমগ্র জীবদ্দশায় সেই সত্যানুভূতির চেয়ে শ্রেয়ঃ বা প্রেয় তার দ্বিতীয় কিছুই থাকে না। শ্রীমতীর আত্মত্যাগেও ঠিক এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে' বলতে পারি। আবার এটাও ঠিক যে, সত্যের যাঁরা পূজারী—কর্তব্যের পথে তাঁরা চিরকালই নিঃসঙ্গ পথচারী। সংসার মরুর উত্তপ্ত বালুকারাশি তাঁদের নগ্ন পায়ে হেঁটেই চিরদিন অতিক্রম করতে হয়। নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল জীবন যাত্রায় সত্যরূপী বিবেক-ধর্মই তাঁদের একমাত্র সঙ্গী ও পাথেয়। মিত্রবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধ, বিরুদ্ধবাদীদের ক্রুর চক্রান্ত, স্বজনবর্গের ভৎর্সনা, এমনকি সম্মিলিতভাবে সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধাচরণ, তাঁদের অগ্রগামিতাকে রোধ করতে সমর্থ হয় না। সমস্ত জীবনব্যাপী বিরুদ্ধতার সংঘাতে মাটির দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে, তথাপি মনে ক্লান্তি আসেনা—যতই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, হৃদয়ের বল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্রীমতী অর্ঘ্যখানি নিয়ে পুরনারীদের সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান, কেউ তাঁর সঙ্গিনী হয়ে অবধারিত মৃত্যুকে বরণ করতে ইচ্ছুক হ'ল না। এই (নির্বোধোচিত?) মরণপণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য কেউ তাকে তিরস্কার করল, কেউ করল অনুরোধ, আর কেউ বা ক'রল অনুযোগ। শ্রীমতী নিজের সংকল্পে অটল, কেউ তার গতি রোধ করতে পারে নি। মগধের রাজ-অন্তঃপুরে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজকীয় উদ্যানে সারা-রাত্রির তরল অন্ধকারে এক পুণ্যক্ষণে জনৈকা অখ্যাতনামা অন্তঃপুর-চারিণীর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল বিবেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে। লোক-চক্ষুর অগোচরে একান্ত সঙ্গোপনে করুণাবতার বুদ্ধের স্মৃতিপাদপীঠে এক উপেক্ষিতা পরিচারিকার আত্মদানের মহিমময় অনুষ্ঠান সংঘটিত হ'ল—সে-দিন কেউ তাতে সমবেদনা জানাতে বা পরমচরিতার্থতার প্রশংসাবাণী শোনাতে অবকাশ পায় নি। মহাকালের নিষ্ক্রিয় প্রহরী তার অনবদ্য আত্মোৎসর্গের সাক্ষী হয়ে রইল মাত্র। শ্রীমতীর সেই বিদ্রোহী আত্মা অজাতশত্রুর ক্রুর অভিসন্ধি ব্যর্থ করে বিবেকবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘোষণা করল, তা যুগ-যুগান্তের কালের সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও সর্বত্র বিচরণ করবে।

সর্বকালের সর্বজাতির ধর্মগুরু ও দরদী রাষ্ট্রনেতা'দের জীবনেও শ্রীমতীর আত্মত্যাগের নিষ্ঠুর সত্য ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষ্য বহন করছে। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা দুঃখ ও প্রেমের সম্মিলিত স্রোতে অবগাহন ক'রে সত্যের পতাকা হস্তে মিথ্যা লোকাচারের ঘন তমিস্রা ভেদ করে লোক-যাত্রার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ ঈশা ক্রুরতম হিংসার কাঠগড়ায় আত্মবলি নিষ্পন্ন ক'রে অন্তরের সত্যকে অগণিত নরনারীর অন্তরে প্রমাণিত ক'রে মৃত্যুকে মহান করলেন। তাঁর রক্তলিপ্ত কাষ্ঠময় পুণ্য-প্রতীক দ্বিসহস্র বৎসরের সর্বপ্রকার তামসিকতার উর্দ্ধে আজও সগৌরবে বিরাজ করছে। অর্দ্ধ-পৃথিবীর দুঃখ-তাপক্লিষ্ট নরনারী সেই প্রতীকের তলদেশে আশ্রয় লাভ ক'রে আলোকের সন্ধান করছে। ইসলাম জগতের সর্বশেষ নবী মোহম্মদের জীবনেও সত্য-প্রতিষ্ঠার এই ঐতিহাসিক পরীক্ষা বহুবার বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। মগধের রাজোদ্যানে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এক শারদ-সন্ধ্যায় এক অখ্যাত পরিচারিকার সেই গৌরবোজ্জ্বল আত্মাহুতি আমাদের অবচেতন মনকে এক অপূর্ব সাগ্নিকতার আলোড়িত করছে—যুগে যুগে সর্ব জাতির ইতি-হাসেই অনুরূপ আদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের উপেক্ষিত বা অনাবিষ্কৃত পৃষ্ঠাগুলির সন্ধান করলেই এই উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হবে। যাঁরা জাগতিক সর্ববিধ স্বার্থবুদ্ধি উপেক্ষা করে বিবেকের অনুমোদিত ধর্ম বিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্য বিদ্বেষ ও অত্যাচারের যুপ-কাষ্ঠে আত্মবলি দান করেছেন, তাঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বকালেই মানবতার ভাস্বর আদর্শ। তাই স্বচ্ছন্দে বলা চলে, যিনি সত্যের পথে, প্রেমের পথে চলবেন, তিনি শুধু লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতই হবেন না, একদিন হৃতসর্বস্ব হয়ে হয়ত পথে ঘুরে বেড়াবেন, নয়তো বা আকস্মিক কারণে প্রাণ হারাবেন। এই দারুণ নিগ্রহকে অঙ্গীকার করেই তাঁকে সত্যের ধ্বজা উঁচিয়ে ধরতে হবে। বুদ্ধের অহিংসা, যীশুর ক্ষমা, শ্রীচৈতন্যের প্রেমে যাঁর বিকাশ—সেই মহামানব গান্ধীজিও নিষ্ঠুরতম হিংসার আঘা-তেই প্রাণ হারালেন। সত্যের আলোক-বর্তিকা নিয়ে যাঁরা চলেন মানবজাতি ও সমাজকে জ্যোতির রাজ্যে পৌঁছিয়ে দিতে, তাঁদের জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয় আত্মাহুতির মধ্য দিয়েই—এটাই জগতের নিয়ম।

যেমন ঘন তমসার মাঝে তড়িতের ঔজ্জ্বল্য অধিকতর দীপ্তিমান বলে প্রতীতি জন্মায়—আঁধারের বুকেই আলোর খেলা চমকপ্রদ মনে হয়, ঠিক তেমনি ক্রুরতার পাশাপাশিই ক্ষমাসুন্দর ভাবটিও অধিকতর পরিস্ফুট হয়। কবি-সম্রাট অজাতশত্রুর নৃশংসতার বীভৎসমূর্তি এরূপ সিদ্ধহস্তে আঁকতে সমর্থ হয়েছেন যে, শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গের প্রেরণার

দৃশ্যটি যেন চির-সজীবতার স্পর্শ লাভ করে সার্থক হয়েছে। ভাব-শিল্পীর এই পটুতা উচ্চাঙ্গ কাব্যকলার নিদর্শন। শ্রীমতীর আত্মত্যাগের পশ্চাতে যে বিভীষিকার ক্রুর বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করছে তাও মানব মনকে শোকাচ্ছন্ন করে ক্ষণেকের তরে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।

আলোচ্য কবিতার মধ্যে দিয়ে কবিগুরু পরমতসহিষ্ণুতার গূঢ় তত্ত্বও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃত ধার্মিক কখনও অপরের ধর্ম-মতে আঘাত করেন না। বরং অপরের বিশ্বাসে কুসংস্কার বা যথার্থ ত্রুটি থাকলে তা যুক্তি বিচার দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন মাত্র। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখি, বৈদিক ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম —অনুরাগ নয়—বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিধর্মীর বিদ্বেষই তাঁর রোষ বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। আরও পরিস্কার ক'রে বলতে হয়, হিন্দুয়ানীর ছদ্মবেশে বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষই স্ববৃত্তি চরিতার্থ করেছে মাত্র। বিজাতীয় মনোভাবের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতনই করা যায় মাত্র, কিন্তু সেই ধর্মবিশ্বাসকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে সে ভাবে কখনই লুপ্ত করা যায় না। অজাতশত্রু বৌদ্ধগ্রন্থরাজি হোমানলে আহুতি দিয়ে নিজের জিঘাংসাবৃত্তিই চরিতার্থ করলেন, আর বৌদ্ধ-বিশ্বাসীদের নিপাত ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের সবে মাত্র অঙ্কুরিত অবস্থায় কঠিনতম আঘাত হেনেও তিনি বুদ্ধের আত্মার বাণীকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ ক'রে দিতে পারেন নি। আজ তাই দেখি সেই ক্ষুদ্র বোধিদ্রুম অনন্ত শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সসাগরা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃতি লাভ ক'রে অগণিত তাপদগ্ধ নরনারীকে সুশীতল ছায়া দান করেছে। ভগবান বুদ্ধের অশরীরী বাণী শ্রীমতী প্রভৃতি ও তাদের উত্তরসাধক-সাধিকাদের অন্তরের অণুতে-রেণুতে মিশে মূর্তরূপ পেয়েছিল। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সেই সব মূক চিন্তাধারা মুখর হয়ে আজ মানব জাতির অন্তরতম প্রদেশে স্পন্দন জাগিয়ে অজাতশত্রু ও তার অনুগামীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাই দেখি অত্যাচারের দ্বারা লোকের দেহের উপর আধিপত্য করা যায়, কিন্তু তাঁহার মন জয় করা যায় না। উৎপীড়নের ভয়ে হৃদয়ের সত্যানুভূতি কোন কালেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নি। বান্দা শিরই দিয়েছিলেন ঔরঙ্গ-জীবকে, 'সার' কখনই দেননি। নীজের হুমকিতে সেণ্ট্ পল দেহকেই শত্রু হস্তে অর্পণ করেছিলেন, ঈশার বাণীকে কলঙ্কিত করেন নি। তাই কবি যেন আমাদিগকে এই ইঙ্গিতই পরিবেশন করছেন,—সত্য ও মৈত্রীমন্ত্রের যে অনলশিখা এতকাল শ্রীমতী অন্তরের নিভৃততম কোণে রাজ-অন্তঃপুরের প্রতিকূল আবহাওয়ায় পোষণ ক'রে আসছিল, আজ তা অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌছে তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে, প্রকাশ্যে লোক চক্ষুর গোচরে অনির্বাণ রেখে অমর লোকে চলে গেল।

কবি যেন আলোচ্য কবিতায় ইচ্ছা ক'রেই শ্রীমতীর মরদেহ ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যের যবনিকা টেনে দিলেন। অথচ আমরা যেন সেই জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। মনে হচ্ছে যেন কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেল। সেই অপূর্ণ পদ পূরণের ভার কবি যেন পাঠকের উপর ন্যস্ত ক'রেই কাব্য-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে সরে দাঁড়ালেন। চেকফীয় রীতির এই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য কবিগুরুই আমাদের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

ইষ্টকরাজি পর পর সাজিয়েই সৌধ নির্মিত হয়, কিন্তু যে সুবর্ণ মিশ্রিত উপকরণ সহযোগে সৌধের সর্বাঙ্গ গেঁথে দেওয়া হয়, তা ব্যস্ততঃ চিরদিন লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। ইষ্টক ইষ্টকালয়ের সর্বগাত্রে ওতঃ-প্রোতঃ হয়ে আছে, ওকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখাতে গেলে সৌধটি ভেঙ্গে যায়। তদ্রূপ কবিতাটির ছন্দে ছন্দে একটি অব্যক্ত সুরের ব্যঞ্জনা পাঠকের কর্ণে অনুক্ষণ বাজতে থাকে, যা বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে কবিতার ভাব-মাধুর্য অঙ্গহীন হয়ে যায়। তবে কবি আমাদিগকে একেবারে সেই স্থূল ভাবেও বঞ্চিত করেন নি। নেপথ্য থেকে অতি মৃদু কণ্ঠে তিনি শুনিয়েছেন সেই অব্যক্তের ব্যক্ত ইঙ্গিত—'আমি বুদ্ধের দাসী'।

স্বতঃই এই জিজ্ঞাসা মনকে আলোড়িত করে যে, এক অখ্যাতা অবহেলিতা পরিচারিকার জীবনে কি ক'রে এত বড় আত্মত্যাগের প্রেরণা জেগে উঠল। তদুত্তরে কবি বলেন—শ্রীমতী ছিল 'বুদ্ধের দাসী', এটাই তার প্রথম ও শেষ পরিচয়।

এই দাস্য বা আনুগত্যের সম্যক্ বিকাশই শ্রীমতীকে দেবীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বস্তুতঃ মনঃপ্রাণ ইষ্টের পাদপদ্মে সমর্পণ করতে পারলে জীবের জীবনে অধিকতর কোনও প্রেয় বা কাঙ্ক্ষেয় সামগ্রী জগতে থাকতে পারে না। পার্থিব সকল প্রকার ভোগ লালসার প্রলোভন, এমন কি সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু জীবনকে তুচ্ছ ক'রেও সে তার ইষ্টের প্রীতি বিধান করতে চায়। যে অবস্থায় সাধকের জীবন তদ্‌গত হয়ে যায়, নিজস্ব সত্তা ব'লে তার আর পৃথক অস্তিত্বের বোধও থাকে না। তার অস্তিত্বকে সে প্রভুর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ মনে ক'রে থাকে মাত্র। জীবনকে সে তখন ধারণ ক'রে থাকে সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের—সেই বহু প্রতীক্ষিত পুণ্য-মুহূর্তটির পথ পানে চেয়ে। আসন্ন লগ্নে অধীর আগ্রহে সমস্ত অঙ্গে এখন সে এক পুলকের শিহরণ বোধ করে; চরম আহ্বানের সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলেই তার দেহ-মন এক অভূতপূর্ব উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠে, আর অভীপ্সিতের প্রতি একাত্মবোধই তাকে এ-ধরণের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা দিয়ে থাকে।

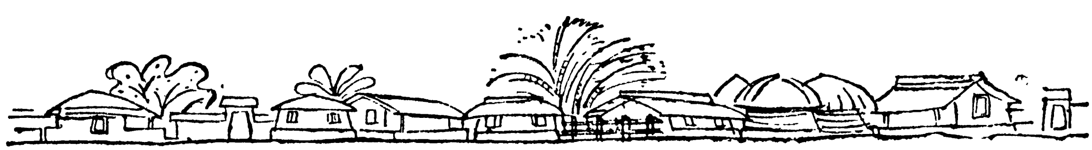
সাধককে আত্মোৎসর্গের এই অধিকার লাভের জন্য তপস্যা করতে হয়—অর্থাৎ নিজকে তৈরী করতে হয়। সেই জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও উদগ্র কামনা, এবং মনুষ্য জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য আকুল প্রয়াস। ইষ্টের ইচ্ছার নিকট সেইজন্য সাধকের আপন সত্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করতে হয়। অশ্রদ্ধার দান যেমন মানুষ দূরের কথা, এমন কি শেয়াল-কুকুরেও প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে না, ঈশ্বরও তাই জীবের চিত্তশুদ্ধি না হ'লে সেবকের আত্ম বলিদানেও তৃপ্তি লাভ করেন না। সে-জন্য জীবকে নিরন্তর আত্মবিচার আত্মানুশীলন বা শ্রদ্ধা ভক্তির অনুরক্তির দ্বারা উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। সম্যক্ আত্মশুদ্ধি না হলে আত্মোৎসর্গের মহান অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয়। যে

আত্মত্যাগ কাম-ক্রোধ-ঈর্ষাদি ষড়রিপুবর্জিত তাকে মাত্র ঈশ্বর গ্রহণ করেন, তারই নাম আত্মবলিদান। অন্যথা আত্মবিসর্জন আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র, যা' জগতের যাবতীয় নীতিশাস্ত্রের ও মানবজাতির বিবেক-ধর্মের অনুশাসনেও চিরকালই অতীব নিন্দিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গরূপ কর্ত্তব্য পালনে রিপুপরবশ্যতা বা অহমিকার নাম গন্ধও নেই। একদিকে দেখি—রাজার আদেশ লঙ্ঘন করা অশাস্ত্রীয়, এই মৌলিক অনুশাসনের অবাধ্যতার জন্য,—এই দুর্বিনীত আচরণের জন্য শ্রীমতী রাজাদেশ পালন না করতে পেরে যেন অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করছে। অর্ঘ্যরচনার প্রারম্ভ থেকে স্তূপমূলে নিবেদনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, সর্বক্ষণ ধরে, শ্রীমতীর অন্তরে অনুনয় ও কাতর প্রার্থনার সংমিশ্রিত ভাবযুগল প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে। আবার অপর দিকে দেখি, রাজাজ্ঞার বিরোধী, নিষিদ্ধ আচরণের জন্য সঙ্কোচ ও ক্ষমাভিক্ষার ভাব তুল্যরূপে আচরণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ক্ষীণতম আবেদনও জানালো না। শুধু নিজের অবাধ্য আচরণের সমর্থনে কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে জানালো—'আমি বুদ্ধের দাসী'। অর্থাৎ রাজার আদেশের চেয়েও বুদ্ধপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত অন্তরের অনুশাসনই তার নিকট অধিকতর পালনীয়। সে অজাতশত্রুর প্রজা এবং আনুগত্য ও অর্থের বিনিময়ে আজ সে রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকা, কিন্তু সে যে আবার বুদ্ধের সেবাদাসীও বটে ; মনপ্রাণ সে ঐ পাদপদ্মেই সমর্পণ করেছে, এবং ঠিক তখুনি আবার ৺প্রভুর সেবার সময় সমাগত। কাজেই শ্রীমতী আজ সত্যই নিরুপায়। ইষ্টের অর্ঘ্য তাকে দান করতেই হবে—এর ফলাফল যা-ই হোক না কেন।

তাই আমরা সবদিকের সূক্ষ্মবিচারেই দেখতে পাই শ্রীমতীর এই আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সামান্যতম গৌরব অর্জনের ইচ্ছাটুকুও পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। যেন বিধাতার ইঙ্গিতকেই সে কার্যে পরিণত করতে যাচ্ছে। ফলাফলও যেন তার বিচার করার অধিকার নেই, শুধুমাত্র সময়োচিত কর্তব্যের নির্দেশেই মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়ে মরণের পানে ছুটে চলেছে। আজ বহু প্রতীক্ষার সামগ্রী তার নিকট ধরা দিতে এসেছে—মৃত্যু আজ তার বিরহ-বিধুর চিত্তকে প্রিয়তমের রাজ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সারথ্য করতে এসেছে। সে যে এতোদিন স্তূপ-পাদ মূলে প্রভুর আরতি করেছে আজ সেই আরতির অর্ঘ্য গ্রহণ করতে স্বয়ং প্রভু আসছেন মৃত্যু রথে আরোহণ করে। এই অপার আনন্দ আজ সে একা উপভোগ করে কিরূপে তৃপ্তি পেতে পারে? এর ভাগ বিশ্বজনাকেও দিতে হবে। তাই শ্রীমতী ঘরে ঘরে গিয়ে পুরনারীদের প্রত্যেককে প্রাণের আকুলতা সহকারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে স্তূপমূলে সমবেত হবার জন্য। কিন্তু কাউকেও সে আজ তার চরম সৌভাগ্যের অংশীদার করতে সমর্থ হ'ল না। জীবনব্যাপী কঠোর কর্তব্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজ সে দিব্যদৃষ্টির অধিকারিণী হয়েছে। শ্রীমতী যেন দেখতে পাচ্ছে, মৃত্যুরূপী দিব্যরথ তার অপেক্ষায় অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। বিরহকাতর শ্রীমতী রাধিকার ভাষায় আমাদের শ্রীমতীও যেন আজ মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাতে চায়—'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান'। তবে প্রভেদ এইযে, বিরহ-বিধুর শ্রীরাধা মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন, আর আমাদের শ্রীমতীকে স্বয়ং মৃত্যুই পুর্ণ রথে চেপে বাঞ্ছিত ধামে পৌঁছিয়ে দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন। জীবনের কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়ে কিংবা ইষ্টের কঠোর পরীক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে প্রভুর সান্নিধ্য কামনার জন্য মৃত্যুকে নিজে আহ্বান করে নি। মৃত্যুর কাল-যবনিকাই যে কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তির প্রশংসাপত্র মঞ্জুর করতে পারে না, তা শ্রীমতী ভালভাবেই জানে। তাই কর্ত্তব্যকর্মের বোঝা লঙ্ঘন করবার প্রয়াসও তার নেই। বরং কর্ত্তব্য নিজেই তাকে পথ ছেড়ে মহামুক্তি প্রদান করলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ আজ সমস্ত উদার পরিবেশ থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নিতান্ত খণ্ড, ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে রাখতে চায়। তাই পদে পদে ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতে সামাজিক জীবনযাত্রা বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এই বিষ-বাষ্পের জ্বালায় মানুষ ব্যক্তিগত শান্তি যতই হারাতে বসছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ততই করুণ উন্মত্ততা পরস্পর হানাহানি ক'রে বীভৎস চীৎকারে উদার আকাশের নির্মল প্রশান্তি ক্ষত-বিক্ষত করছে। আর সেই ধূসার-মান নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে লোকযাত্রা অনন্ত দুর্গতির চক্রে আবর্তিত হয়ে ফিরছে। আজ এই ঘোর তমসায় কে সত্যের আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে যাত্রাপথের প্রদর্শক হবে! এই গুরু কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে যেমন বীরত্বের গৌরব, আত্মত্যাগের মহিমা ও পরার্থসেবার আত্ম-তৃপ্তি আছে, ঠিক তেমনি আছে প্রতি পদক্ষেপে আত্মপ্রচারের বাসনা, স্বার্থসিদ্ধির তাড়না ও সর্বশেষে আত্মবিলোপের আশঙ্কা। এই কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্মানের রাজমুকুট হ'লেও কণ্টকের মুকুটও বটে। তা ধারণ করতে গিয়ে শির রক্তাক্ত হয়ে উঠে। অন্ততঃ আমরা জানি ঈশ্বরপুত্রের তো তা-ই হয়েছিল। বহুবিধ নির্যাতনে আজ পৃথিবী রক্তাক্ত হয়ে আছে, আজ সভ্যতার মুখোস পরে কায়দা-দুরস্ত আধুনিকতা পদে পদে মানবের বিবেকধর্মকে সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মাধর্মের সংঘর্ষণের সন্ধিক্ষণে শ্রীমতীর ন্যায় আত্মোৎসর্গকারী মহাপ্রাণরাই আবির্ভূত হয়ে বিধাতার ইঙ্গিতকে বাস্তব রূপ দিয়ে থাকেন।

ভাবরাজ্যের অমর নায়ক তথা বিশ্বকবি 'অবদান শতক' স্তবক থেকে যে অপরূপ পুষ্পটি চয়ন ক'রে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে ধন্য হয়েছেন, আমরাও তাঁরই সাধনারই পীঠভূমি 'মহা-মানবের সাগর-তীরে' দাঁড়িয়ে আজ পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যবাসরে কবি-গুরুর শততম জন্মদিনে তাঁর অমর আত্মার আবাহন করছি "পূজারিণী"র নৈবেদ্যের পসরা নিবেদন ক'রে।




দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন !
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী
RP.164-X52 BG

গল্প

প্রতিদান

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

থানা স্বাস্থ্য-কেন্দ্র। গ্রামের বাইরে অনেকখানি জমি জুড়ে কয়েক বছর হোল গড়ে উঠেছে হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ডাক্তারের বাসাবাড়ী, অফিস, কম্পাউণ্ডার, নার্স, মেথর আরো অনেকের কোয়াটার্স। প্রায় বিশ বিঘা জমি জুড়ে গড়ে উঠেছে যেন ছোট একটা সহর, কারণ এর আশে-পাশে আর পাকাবাড়ি নেই। চারধারে অনেকগুলি ছোট ছোট সিমেণ্ট-স্তম্ভ দিয়ে এর সীমানা চিহ্নিত করা হোয়েছে। একধারে জেলাবোর্ডের বড় রাস্তা, একধারে মস্ত বাগানওয়ালা দু'তিনটি পুষ্করিণী, অপর দুধারে ধানের ক্ষেত। সরকারী নিয়ম অনুসারে সমস্ত জমিটাই স্থানীয় লোকের দান কোরতে হোয়েছে—জমিটা ছিল গ্রামের জমিদারদের। তাঁরাই এখানে বহুপূর্ব্বে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা কোরে চালিয়ে আসছিলেন—তখন তাঁরা গ্রামে থাকতেন। তারপর এলো সহরের আকর্ষণ, জমি আর জমিদারীর মায়া এলো কমে, সহরের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল জমিদার-বাড়ীর কর্ত্তাদের। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে কর্ত্তাদের কেউ কেউ জমিজমা, গৃহদেবতার সেবাপূজা দেখতে আসতেন, এখন আর তাও বন্ধ হোয়ে গেছে—তাঁদের গ্রামের বাড়ী তালা-বন্ধ পড়ে থাকে। একজন কর্ম্মচারী বাইরের একটী ঘরে থাকে, আর জমিজমা ও স্থানীয় কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করে। গ্রামের দেবসেবা, টোল, বালিকা বিদ্যালয়—এসব অবশ্য এখনও বন্ধ হয় নি। কোলকাতা থেকে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য এখনও জমিদার বাড়ীর কর্ত্তা পাঠান।

গ্রামে যখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা উঠলো, গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর কোলকাতা গিয়ে জমিদার হরিশচন্দ্র রায়কে জানালেন—বিশ বিঘা জমি ও কিছু অর্থ সাহায্য দিলে গ্রামে বিশটি বেডওয়ালা একটী হাসপাতাল হোতে পারে।......তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের চেয়েও উন্নত ধরণের চিকিৎসার এবং নার্সের সুবিধা গ্রাম-বাসীরা পেতে পারেন। পূর্ব্বের চিকিৎসালয়ের গৃহটী সমেত তার সংলগ্ন দশ বিঘা ডাঙ্গা জমি এবং তার দুধারের ভালো চাষের জমি আরো দশ বিঘা—মোট বিশ বিঘা জমি জমিদার হরিশবাবু সরকারের হাতে দান করেন। তার পরই গত পাঁচ ছয় বছরে গড়ে উঠেছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র। হাজার হাজার লোক আজ এর সাহায্যে নিত্য নানাভাবে উপকৃত হোচ্ছে।

সম্প্রতি এই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের একদিকের সীমা-স্তম্ভ সরকারী আমিন সরিয়ে পাশের অপর কয়েকটা চাষের জমির বুকে পুঁতে দিয়ে গেছে। দানপত্রের দলিল অনুযায়ী নাকি ঐ জমিগুলিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে। হরিশবাবুর কর্ম্মচারী এ সংবাদ কোলকাতায় জানান। তিনি হুকুম দিলেন—দলিলের চৌহদ্দী নিয়ে সরজামিনে তদন্ত কোরে দিন। কিছুদিন পর কর্ম্মচারী জানান—স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও তার কর্ম্মচারীরা জরীপের জন্য তাকে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সীমানায় ঢুকতে দিতে রাজী নয় বা তারা এ বিষয়ে কোন সহযোগিতাও কোরবে না। তারা বলে, সরকারী আমীন তাদের যে সীমানা চিহ্নিত কোরে গেছে তাই তাদের জমি এবং এ বিষয়ে কিছু করার থাকলে সদরে গিয়ে কর্ত্তাদের বলা-কওয়া করুন।

অগত্যা এক শনিবার সন্ধ্যায় হরিশবাবু গ্রামে এলেন। রবিবার সন্ধ্যায় কোলকাতায় ফিরবেন, তাই সন্ধ্যার মুখেই চা খেয়ে একটী কালো বুশ্-শার্ট গায়ে দিয়ে তিনি একলাই বেরিয়ে পোড়লেন—তাঁর কোন জমির বুকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন সীমানা এলো দেখতে। কর্ম্মচারীকে পাঠালেন

পাশের গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকতে—যাতে তাঁকে ব্যাপারটার ভার দিয়ে যেতে পারেন।

তার কর্ম্মচারীকে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সীমানায় ঢুকতে দেয়নি ডাক্তার। প্রকৃত পক্ষে তাকেই তারা ঢুকতে দেয়নি, তাই হরিশবাবু কেন্দ্রের বাইরের সীমানা দিয়ে ধীরে ধীরে জমিগুলির মাঝে এসে দাঁড়ালেন। মনে পোড়ছিল হরিশবাবুর অতীতের কথা। ত্রিশ বছর আগে তিনি কি এ ভাবে আসতে পারতেন? কত কর্ম্মচারী, চাপরাশী, অনুগত প্রজা তাঁর সঙ্গে থাকতো যখন তিনি জমি দেখতে আসতেন। সাহস হোত ঐ বিদেশী ছোকরা-ডাক্তার বা তার কর্ম্মচারীদের হরিশ রায়ের লোককে অপমান কোরতে? কুকুর দিয়ে খবর দিলে এরা সেলাম কোরতে কোরতে হাজির হোত কাছারীতে। তারই দান-করা জায়গায় আজ তারই প্রবেশ নিষেধ। আশ্চর্য, নিজেরই কিন্তু কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে তাঁরই দান-করা জমিতে পা রাখতে। তার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ীটাও আজ যেন ব্যঙ্গ কোরে বোলছে—তুমি কেউ নও—অথচ দীর্ঘদিন ধোরে হরিশবাবুই তাকে রক্ষণাবেক্ষণ কোরে এসেছেন। এই ত জগৎ! হরিশ-বাবু ভাবছেন—আর ধীরে ধীরে কেন্দ্রটীর বাইরের সীমানা দিয়ে জমির ওপর এগিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বোলতেন, মাটী কারু বাপের নয়—মাটী দাপের, সত্যই ত তাই। আজও আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় নাই, এ জমি আমি বিক্রি করি নাই, দান কোরেছি—অথচ সেই দান-গৃহীতারা আজ আমারই প্রবেশ নিষেধ কোরেছে এখানে? গত পাঁচ বছরে যে সব লোক এই কেন্দ্রে চাকরী নিয়ে এসেছে তারা হয়ত আমায় চেনে না, কিন্তু আমার দানটাও তারা মনে রাখে নি?

হঠাৎ সামনের একটা বাড়ী থেকে একটি কুকুর সন্ধ্যার শান্তি দীর্ণ কোরে ঘেউ ঘেউ কোরে উঠলো। হরিশবাবু তার ডাকে বুঝলেন কুকুরটা এলশেসিয়ন। সৌখীন অবস্থাপন্ন ছাড়া এ কুকুর পোষা শক্ত। আন্দাজে বুঝলেন, বাড়ীটা ডাক্তারের। তিনি কেন্দ্রের সীমানা চিহ্নটি ভাল কোরে দেখে নিয়ে একটু বাইরে সরে এলেন। ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বলেছে, তবু মাঠের বুকে পথ দেখা যায়।...

কয়েকপা এগিয়েছেন এমন সময় কে হেঁকে উঠলো "কে, কে ওখানে?" হরিশবাবু থমকে দাঁড়ালেন? স্পর্দ্ধা লোকটার। কে তিনি? কি উত্তর তিনি দেবেন? হরিশ রায়ের কি এখানে তার নিজের পরিচয় দিতে হবে? যে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাকে চেনে, যাঁর দানে ও দাক্ষিণ্যে যারা নানাভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ, আজ সেখানে তাঁকে নিজের পরিচয় দিতে হবে এক বিদেশী চাকরের কাছে? নিরুত্তরে পা বাড়ালেন। হঠাৎ কুকুরটা বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এলো চীৎকার কোরতে কোরতে এবং তাঁর পথ আগলে হিংস্র ভঙ্গীতে ঘেউ ঘেউ কোরতে লাগলো। আবার প্রশ্ন এলো কর্কশ কণ্ঠে "কে, কে ওখানে?" আশপাশের বাড়ীগুলি থেকেও দু একজন মুখ বাড়াল। সন্দিগ্ধ, সন্ত্রস্ত সুরে প্রশ্নবান বর্ষিত হোল "কে, কে হে? শালা কথা কয়না।" ওষ্ঠাগত উত্তর ফিরে গেলো, সম্ভাষণ শুনে আর উচ্চারিত হোল না। তারই দত্ত জমির ওপর বসবাসকারী এই লোকগুলো আজ তাঁকে চোর ভাবছে! তিনি সমস্ত উপেক্ষা কোরে নিরুত্তরে এগিয়ে এলেন ডাক্তারের বাড়ীর দিকে—আলোয় এলে হয়ত এরা ভুল বুঝে লজ্জিত হবে। ভেতর থেকে ডাক্তার ভীত-কণ্ঠে বলে উঠলো "ব্যাটা উত্তর দেয় না, এগিয়ে আসে যে! গুণ্ডা—ধর ধর।" গুণ্ডা চীৎকার কোরে লাফিয়ে উঠলো হরিশবাবুর বুকে। তিনি হাত দিয়ে একটা ঝাঁকি দিতেই কুকুরটা পোড়ে গেল, কিন্তু দ্বিগুণ ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পোড়লো হরিশবাবুর ওপর। পাশের বাড়ীর লোকগুলি কিছুক্ষণ এই হিংস্র পশুর আক্রমণের খেলা উপভোগ কোরলে উল্লাসের সঙ্গে। যখন দেখলো লোকটা মাটীতে পোড়ে আর্ত্তনাদ কোরছে—আর গুণ্ডা তাকে ক্ষত বিক্ষত কোরছে তখন ডাক্তারের চাকর এগিয়ে এসে কুকুরটাকে সরিয়ে নিলো।

একজন লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসতেই কম্পাউণ্ডার শিউরে উঠলো, ডাক্তারবাবু শীগ্গির আসুন। ভয়ানক কামড়েছে, রক্ত পোড়ছে। লোকটা বেহুঁস হোয়ে গেছে ডাক্তার দরজা থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন—"বে[illegible] হোয়েছে। শালা আজ সন্ধ্যার মুখেই এসেছে। গ্রামটাকে কদিন ধরে জ্বালিয়ে তুলেছে। মরুক, লোকগুলো দুদিন নিশ্চিন্তে ঘুমুবে।"

যখন সকলে ধরাধরি করে হরিশবাবুর বেহুঁস দেহটা

ডাক্তারের সামনে নিয়ে এলো তখন ডাক্তারও চোমকে উঠলো। গুণ্ডাটা যে এমন নৃশংস ভাবে কামড়াতে পারে তা ডাক্তারেরও কল্পনার বাইরে। হরিশবাবুকে ডাক্তারের বাড়ী থেকে হাসপাতালের টেবিলে আনা হোল।

গ্রামে রটে গেল গত ক'দিন ধোরে যে চোরটা সন্ধ্যা থেকেই উপদ্রব কোরে বেড়াচ্ছিল, ডাক্তারের কুকুর তাকে ঘায়েল কোরেছে। হাসপাতালের দিকে ভাড় চললো—উৎসুক, উৎফুল্ল গ্রামবাসী, লোকটাকে সনাক্ত কোরতে। দারোগাও চোললেন তাদের সঙ্গে—ডাক্তারকে কি ভাবে পুরস্কার দেওয়া যায় তাই আলোচনা কোরতে কোরতে। দারোগার পেছন পেছন গ্রামের প্রবীণ ও নবীনেরা অনেকে হাসপাতালের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন, গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ একসঙ্গে চীৎকার কোরে উঠলেন, "সর্ব্বনাশ। এ যে বাবু, জমিদারবাবু।" দারোগা প্রশ্ন কোরলেন "হরিশবাবু? ইনি?" তারা ঘাড় নেড়ে জানাল "হঁ্যা"। ডাক্তারের হাত থেকে হরিশবাবুর হাতটা পড়ে গেল টেবিলে।

চারণের গান

গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

১

গাওরে আজি রুদ্র-চারণ
অগ্নি-মন্ত্রী বীরের গান,
যাদের "অনুশীলন" ব্রতে,
দেশ আজিকে স্বাধীন প্রাণ॥
আজি সেই দিন, যেদিন ভারতে
শস্ত্রের গণ-অভ্যুত্থানে,
"অনুশীলন" আর বিপ্লবী যতো
মিলেছিল "রাসবিহারী" সনে।
সাধনা তাদের হয়নি বিফল,
দেশ-স্বাধীন ভাঙ্গিয়া শিকল,
রাজ্য লোভীরে করেছে বিকল
শহীদের বলিদান॥
গাওরে আজি রুদ্রচারণ অগ্নিমন্ত্রী বীরের গান

২

ভুলোনারে ভাই দেশের মানুষ
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ কুলে,
দেশ-মাতাকে পূজিল যারা
হৃদি রক্তের শ্রদ্ধা-ফুলে,
তাহারা ত্যাগের মহান দধিচী,
দুর্জ্জয় বীর "সব্য-সাচী"
"গীতার" মন্ত্রে উঠিত নাকি
শহীদ শক্তিমান।
(গাওরে আজি রুদ্রচারণ
অগ্নিমন্ত্রী বীরের গান)

৩

আমি যে চারণ প্রণাম জানাই
অনুশীলনের সেবক দলে,
প্রণাম জানাই যতো বিপ্লবী
অগ্নি-সেনার চরণ-তলে,
যুগ-যুগ ধরি হিমালয় গিরি,
সাক্ষী রহিবে, তোমাদেরে স্মরি,'
উর্ম্মি-মালা তোমাদেরে বরি'
ধরিবে বীরের তান॥
গাওরে আজি রুদ্র-চারণ
অগ্নি-মন্ত্রী বীরের গান।



বর্ষামঙ্গল

উপানন্দ

দিনে গেছে অসহ্য গরম। কর্ম্মে বসেনি মন, তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ চাতকের মত চেয়ে থেকেছে আকাশ পানে। শীর্ণা নদী। জলহারা দীঘি সর্ব্বত্র গোবি-সাহারার মত রুক্ষ মরুরূপ। মাঠ চষে চষে শ্রান্ত কৃষাণ। মরীচিকার মত দূর প্রান্তর ভূমি। সূর্য্যোদয়ের মঙ্গলাচরণ হোতে না হোতে গ্রীষ্মের রৌদ্র রুদ্র রূপ দেখে কিশলয় আর্ত্তনাদ করে ওঠে। চলন্ত দিনরাত্রির উষ্ণ আবহাওয়া দুঃসহ। দীর্ঘ নারিকেলবীথির পত্রগুলি স্থির, নিষ্কম্প। অরণ্যের নেই সজীবতা। রিক্ত মৃত্তিকা রৌদ্র দগ্ধ। ভৈরবের বেশে এসেছে বৈশাখ, তার তপস্যার হোমানলে আহুতি দিয়ে গেল না কাল্‌বৈশাখী। নিজের তপে তপ্ত হয়ে গেল বৈশাখ রোষকষায়িত নেত্রে, না করে গেল সৃষ্টি, না পুরাতন জীর্ণ জঞ্জাল উড়িয়ে দিয়ে পথ রচনা করে গেল সৃষ্টির। চেরাপুঞ্জি থেকেও অন্ততঃ এক খণ্ড মেঘ এদিকে উড়ে এসে ক্ষণ মুহূর্ত্ত বর্ষণ-মুখর করবে এই ছিল প্রত্যাশা। সে আশা হয়নি পূর্ণ। ফলের সময়, ছিলনা ফুলের বাহার। বাগানে ঘুরে ঘুরে কাট্‌লো দিন দুপুর বেলায়। সকরুণ ঘুঘুর ডাকে মন হয়েছে উদাসী। বেলা পড়ে এসেছে, তবু গরম কাটেনা। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্তের সমারোহ দেখা গেল, গাহন করতে জলে নেমেও পাওয়া গেলনা শীতলতা। বাঁশবেতসের কুঞ্জে ডেকে উঠে পাখী। উড়ে চলে গেল বলাকারা দূর দিগন্তে। পঙ্কশয্যায় শুয়ে আছে পল্লীরাণী—প্রান্তরের বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের পরিবেশে কার যেন মেঠো বাঁশী বেজে ওঠে! ঘর্ম্মাক্ত দেহ। মানুষ স্নিগ্ধতার কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধূলি বিকীর্ণ পথ। নিস্তরঙ্গ নদীতে চলেছে বিলাসীদের নৌকা-বিহার। বায়ুহীন তপ্ত রাত্রি, চোখে নেই ঘুম। কবি গেয়ে উঠলেন।

কোন্ বেদনার বুঝি নারে
হৃদয় ভরা অশ্রু ভারে
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠ হার।

মৌমাছি গুন্ গুন্ করে ওঠে ছায়াম্লান সন্ধ্যাতটে। তরুর অন্তর সুরে বেদনার পরিমণ্ডল। প্রাচীন মন্দিরের চূড়ায় বটের ডালে বসেছে নীড়ে-ফেরা পাখীর দল। পত্রমর্ম্মর মানুষের অন্তরে গান হয়ে উঠতে পারছে না, বারি বিন্দুর অভাবে তৃণগুল্ম মৃত প্রায়। সূর্য্যাস্তের ওপার থেকে এলো নক্ষত্রপুঞ্জ, এলো চাঁদ। এদের কোন সান্ত্বনা প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠে না। প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী গুলিকে এরা আমাদের শুনিয়ে যায়,—তবু আনন্দ কোথায়? শুধু স্মৃতি-রোমন্থন।

গত কাল জ্যৈষ্ঠের বিদায়ী তামসী রাত্রি নিয়ে এলো এক খণ্ড কালো মেঘ—যখন চাঁদহারা ক্ষণে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঝল্‌মল করছিল আকাশে। ওর আবির্ভাবে সুরু হয়ে গেল মৌসুমী বায়ুর আন্দোলন। বনস্পতি উঠ্‌লো দুলে। আজ বর্ষার মঙ্গলাচরণ, মেঘোৎসবের লগ্ন এলো। ঘাসের ফুল থেকে সুরু করে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবারই যেন চঞ্চলতা। দিক্ বলয়ের মাঝে কে যেন গেয়ে উঠ্‌ছে মেঘমল্লার সুরে—'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।'

আজ নেই সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা, আকাশের আজ মেঘকজ্জল অলঙ্করণ। দুঃসহ গ্রীষ্মের দিন রজনীর দহন জ্বালার হোলো অবসান। কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।'

সত্যই কবিচিত্তকে ময়ূরের মত নৃত্য করে তোলে বর্ষা। এই বর্ষাকে অবলম্বন করে মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য,

গ্রন্থ মেঘদূত লিখেছিলেন, তাতে উদ্বেলিত হয়ে আছে চির-মানবের হৃদয়ের ভাব অনুভাব, বিচিত্র অনুভূতি আর আবেগ।

বাংলার বর্ষা ধরণীতে অতুলনীয়। বাঙ্গালীর মন বর্ষাকাব্যের অনুকূল। বাঙালী জীবনে বর্ষার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। দূর অতীতের স্বপ্ন অপূর্ব হৃদয় অনুরণিত হয়ে ওঠে।

বাংলার গীতিকাব্যে বর্ষাকে যেমন নিবিড় করে পাই এরূপ নিবিড়তা সংস্কৃত কাব্যে পাইনা। ইংলণ্ডের কবিরা তেমন করে বর্ষাকে রূপ দিতে পারেন নি, তাই সমৃদ্ধিশালী ইংরাজী সাহিত্যে একে পূর্ণ ভাবে পাওয়া গেল না, তারও কারণ আছে। বর্ষার বিশিষ্ট রূপ, তার স্বতন্ত্র মহিমা ইংলণ্ডে বিরল। অন্য ঋতুর মধ্যে বর্ষা দেখা দিয়ে চলে যায় সঙ্কুচিত লাজনম্র বধূর মত।

এমি বর্ষার দিনে ঠাকুরমাদের রূপকথা শোনা যায়। কবি বলছেন—

'ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন

লুটেছে ঐ ঝড়ে

বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর

কাহার পা যে পড়ে।'

আকাশে মেঘের মৃদঙ্গ ধ্বনি, তারি সাথে দিকে দিকে কীর্ত্তনের সমারোহ, বিদ্যুতের শিহরণ—আর দেয়া ডাকে গুরু গুরু। মাটির বুকে সব তৃণদলের উৎসবে যোগ দেবে কদম্ব কেয়া জুঁই চামেলি। বর্ষার টুপুর টুপুর মধুর সুরে মনোবীণায় ওঠে ঝঙ্কার। দূর দেবালয় থেকে ভেসে আসে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি। হাজার হাজার বছর ধরে এমিভাবেই বর্ষা নেমে আসে, সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেও মানুষ আজও বর্ষার স্বপ্নজালে নিজেকে জড়িয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে - প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের পট ভূমিকা রচনা করবার জন্যে আসে বর্ষা—নিয়ে আসে সত্যশিবসুন্দরের রথযাত্রার মাঝে অন্তরাত্মার জয়যাত্রা। তাই বর্ষা আমাদের কাছে এত সুন্দর সুমধুর। এসো বর্ষামঙ্গলে যোগদান করি। ঐ শোনো কবি-কণ্ঠ হোতে ধ্বনিত হচ্ছে—

গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে

উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে,

নিখিল চিত্ত-হরষা।

ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

সুন্দরবনের বাঘ

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ

বন্দুক ছোঁড়াটা ঠিক হয় না। দলে পোড়ে মাঝে মাঝে পাখীটা, ঝুনো নারকেলের পাশে কচি ডাবের কাঁদিটায় বা বিলের ধারে মাছের আশায় ব'সে থাকা বকের ঝাঁকে বন্দুক ছুঁড়ে দু'একটা শিকার যে করিনি তা নয়। কিন্তু তাই বোলে সুন্দরবনে শিকারে যাবো এমন কথা অবশ্য কোনদিন ভাবিনি। চুপি চুপি পা ফেলে ঝোপ-ঝাড়ে, খালের আশে-পাশে ঘুঘু, বক, ডাক, পানকৌটির খোঁজ করা হেতো। যদিবা কোনটাকে দেখতে পাওয়া যেতো, কিন্তু কাছে যেতে না যেতে বা বন্দুক নিয়ে তাক্ করতে না করতে 'ফুড়ুৎ' কোরে উড়ে যেতো। ক্ষেত খামারের চাষীদের কিন্তু এরা ভয় খায় না—কেমন ডেকে ডেকে গান গেয়ে এখেনে ওখেনে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বন্দুকধারী শিকারী দেখলেই ওরা চিনতে পারে তাই তাক্ করার আগেই বা গুলির আওয়াজ শুনলেই ওরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়।

সেবার অনেক চেষ্টার পর একটা ঘুঘুর দিকে তাক্ করে গুলি ছুঁড়েছিলাম। পাখীটা পড়লো না—উড়ে গ্যালো। তবে যে ডালে বসেছিলো সেই ডালটির ডগাটি ভেঙ্গে নীচেয় পড়েছিলো। বন্দুক ছোড়ার এই রকম কায়দাটা দেখে শিকারী বন্ধুরা হেসে ভীষণ লুটোপুটি খেয়েছিলো। একটা টোটার দাম তো কম নয়—শুধু শুধু টোটা নষ্ট ক'রে বন্ধুদের আর ক্ষতি করি কেন! তাই একটু হেসে বন্দুকটা শঙ্করের হাতে দিয়ে বলেছিলাম, "ধর শঙ্কর! তোর বন্দুক—মিছি মিছি শুধু টোটাই নষ্ট হোলো—"

শঙ্কর হেসে বলেছিলো, "টোটার মায়া করলে কি শিকার কোরে আনন্দ হয়—"

বন্দুক ছোঁড়ার এই রকম বিদ্যে নিয়ে এদের সংগে চলেছি সুন্দরবনে শিকার ক'রতে। কি শিকার করা হবে, কোন জঙ্গলে নামা হবে—নৌকোর ভেতরে বোসে জল্পনা-কল্পনা করা হচ্ছে। হঠাৎ নৌকাটা গ্যালো স্থির হোয়ে। হালের মাঝি পেছন থেকে ব্যস্ত হোয়ে বোলে উঠলো, "দাঁড় লাগা—দাঁড় লাগা—"

আমি অবাক হোয়ে গেলাম। নৌকোর ভেতর থেকে শঙ্কর জিজ্ঞেস করে, "কি হ'য়েছে মাঝি? কি হোয়েছে?"

বুড়ো মাঝি কোন উত্তর না দিয়ে নৌকোর জাগ্রত দেবী কাঠবুড়ীকে নমস্কার কোরে গঙ্গার জলে পাঁচটি পয়সা ফেলে দিয়ে বিড় বিড় কোরে কি মন্ত্র বল্লে। তারপর কাঠ-বুড়ীকে আবার প্রনাম কোরে জোরে বোলে উঠলো, "দরিয়ার পাঁচ পীর"—অন্য মাঝিরা এক সংগে বলে উঠলো,

"বদোর—বদোর!" এ ভাবে পাঁচ পীরের নাম তিনবার করা হোলো।

মাঝিদের এভাবে পাঁচ পীরের নাম করতে দেখে আমাদের গা'টা যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। বাইরে এসে যা দেখলাম তা কোন দিন দেখিনি। গঙ্গার প্রায় মাঝামাঝি আমাদের নৌকো ভাসছে। পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর, আর পূব দিকে ২৪ পরগণা। এতদূরে তীর দু'টোকে শুধু দু'টো কালো রেখার মতন মনে হচ্ছিল। চারদিকে শুধু জল আর জল। জল যেন ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হোলো এই বুঝি সমুদ্র। বুড়ো মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, "এ জায়গাটা কি?"

বুড়ো মাঝি জলের দিকে কি যেন দেখতে দেখতে বলে, "জায়গাটা বড় খারাপ। ডায়মণ্ডহারবার থেকে প্রায় ২৫।২৬ মাইল এসে পোড়েছি। সামনে ঐ যে কালো মোটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন—ওটা হ'চ্ছে একটা দ্বীপ। ওর নাম হোচ্ছে ঘোড়ামারা দ্বীপ। ঐ দ্বীপের দু'পাশ দিয়ে এই বিশাল হুগলী নদী বোয়ে যাচ্ছে। বাঁ-দিকের ধারাটি কাকদ্বীপের পাশ দিয়ে মুড়ি গংগা নাম নিয়ে সাগরে মিশেছে। ডান দিকের ঐ বিশাল ধারাটিকে বলা হয় হুগলী নদী। আর এই জায়গাটিকে বলা হয় 'বারতলা।' এখানে বড় বড় ঘুর্ণি আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখেনে এত ঘুর্ণি কেন?"

বুড়ো মাঝি বললে, "সামনে ঘোড়ামারা দ্বীপ থাকায় আর বাঁ-দিকে ডান্-দিকে অনেকগুলি বড় বড় চর থাকায় ভাঁটা আর জোয়ারের জল বাধা পেয়ে বড় বড় ঘুর্ণির সৃষ্টি করে। তাই তো দেখছি, নৌকা যাতে ঘুর্ণিতে না পড়ে।"

শিকারী শঙ্কর বন্দুকটা নামিয়ে বলে, "দেখো মাঝি, নৌকো যেন ঘুর্ণিতে না পড়ে।"

বুড়ো মাঝি বলে, "কোন ভয় নেই বাবু—জল দেখে আমরা সব বলতে পারি—তবে জায়গাটা একটু খারাপ কিনা।"

ঘণ্টা খানেক পরে নৌকো ঘোড়ামারা দ্বীপের উত্তর-দিক বরাবর ভেসে চোলেছে। গঙ্গায় জোয়ার এসে গ্যাছে। জলস্রোতের কুল কুল শব্দ আর তীরের ওপর আছড়ে-পড়া ঢেউ ভাঙার ঝুপ-ঝাপ শব্দ নির্জন দ্বীপটিকে যেন সজীব কোরে তুলেছে।

সন্ধ্যে হোয়ে গ্যাছে। কালো দ্বীপটির মাঝ থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা আলো জলে উঠলো। সমুদ্রগামী জাহাজকে গুপ্ত চড়া আর ভাঙ্গা থেকে সাবধান করার জন্ত দূরে দূরে বয়ার ওপর আলো ঝিক্-মিক্ কোরে উঠছে। বুড়ো মাঝি বললে, "এই দ্বীপটি হচ্ছে সাগর থানার এক নম্বর ইউনিয়ন।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করে, "এখেনে বাঘ টাগ আছে?" বুড়ো মাঝি বলে, "অনেক আগে ছিল—এখন নেই। জঙ্গল কেটে অনেক লোক বাস করছে। ভাল ধানের চাষ হয় এখেনে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কুমীর-টুমির?"

মাঝি বলে, "কুমীর হাঙ্গর মাঝে মাঝে যে দেখা যায় না তা নয়—তবে এই দ্বীপের দক্ষিণদিকে লোহাচড়া গাঙে দু'একটা দেখা গেছলো।"

শঙ্কর নৌকার ভেতর থেকে বন্দুকটা নিয়ে এসে গলুইয়ে ঠেস দিয়ে বোসে প্রশ্ন করে, "তাহলে বাঘ, হরিণ, কুমীর, সাপ, এসব কোথায় দেখা যাবে?"

বুড়ো মাঝি তখন একটু হেসে কি যেন ভাবলো। তারপর আমাদের সকলের দিকে চেয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে বললে, "বন্দুক দিয়ে বাঘ মারা যায় বটে, তবে অনেক সময় নিজেও মরতে হয়। সুন্দরবোনের মানুষখেগো বাঘ বড় ভয়ঙ্কর। কোন দিন বাঘ শিকার করেছেন?"

শঙ্কর বলে, "পালামৌ, হাজারিবাগে দু'একটা চিতে-বাঘ মেরেছি—"

বুড়ো মাঝি বন্দুকটা নামিয়ে রেখে বলে, "তাহলে বাবু, সুন্দরবোনের বাঘ মারতে যাবেন না। এরা যেমন চালাক, তেমন সাহসী। মানুষের গতিবিধি এরা লক্ষ্য কোরতে যেন ওস্তাদ। পথের ধারে লতাপাতায় মিশিয়ে এমনভাবে শুয়ে থাকবে যে আপনি বুঝতেই পারবেন না। তারপর আপনাকে একবার দেখা দিয়ে সোরে পড়বে। আপনি ভাববেন বুঝি, বাঘ ওখেনেই কোথায় লুকিয়ে আছে—কিন্তু তা নয়—"

শঙ্কর বিস্ময়ে বলে ওঠে, "তাই নাকি? তাহোলে কোথায় যায়?"

বুড়ো মাঝি তামাক খেতে খেতে বললে, "অনেক দূর ঘুরে আপনাদের ফেরার পথে ওৎপেতে থাকবে—নয়তো

যে পথ দিয়ে আপনারা এগোবেন সেই পথের এক জায়গায় ঘাপ্‌ছি মেরে শুয়ে থাকবে—নর-খাদক কিনা—বড় ধৈর্য্য এদের।"

বুড়ো নিস্কুমাঝির কথাগুলো শুনে থ' হয়ে যায়। বাঘ-মামার এসব ফন্দি ফিকির তো তার জানা ছিল না। তাই বেশ হেসে বোলে ওঠে, "তাহলে মাঝি—বাঘ মারার সময়ে কিন্তু তোমাকে আমাদের সংগে থাকতে হবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা মাঝি, জঙ্গলে না ঢুকে বাঘ, কুমীর দেখা যায় না ?"

বুড়ো মাঝি বল্লে, "সে রকম দ্বীপেরও অভাব নেই বটে, তবে অতদূরে সমুদ্রের মাঝে ঘুরে ঘুরে যাওয়া যায় না। তবে কাঁকড়ামারির চরে বাঘ, হরিণ দেখা যায়, জম্বুদ্বীপে কুমীর সাপ দেখা যায়—আর—"

শঙ্কর বাধা দিয়ে বলে, "ওখেনে যেতে ক'দিন লাগবে ?"

বুড়ো মাঝি বলে, "হাওয়া আর স্রোত ঠিক থাকলে একটা ভাঁটায় জম্বুদ্বীপে নেমে যাওয়া যায়, আর জম্বুদ্বীপ থেকে একটা জোয়ারে কাঁকড়ামারি চরে পৌছান যায়।"

চা খাবার পর ঘোড়ামারা দ্বীপে নামতে চাইলাম। মাঝিকে সংগে কোরে খাশিমারা গ্রামে বেড়িয়ে এলাম। গ্রামবাসীরা খুব যত্ন করলেন। তাদের লাইব্রেরি, স্কুল দেখা হলো। বেশ একটা আনন্দ পেলাম সবাই। ফিরে আসছি নৌকায়। তীরে এসে দেখি জোয়ারে সব তীর-টাই প্রায় ডুবে গেছে। নমেন তো নামতে চায় না। বলে কুমীর আছে। বুড়ো মাঝি বুঝিয়ে বোলতেও বিশ্বাস করে না। এমন সময় দূরে একটা কাঠের মতন কি যেন ভেসে উঠল। মনে হোলো বুঝি কুমীর। আমরা তখন কি করবো বুঝতে পারলাম না। শঙ্কর বন্দুকটা তাক কোরে মাঝির পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাঝি ও প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে, বল্লে, "ও কিছু না—জোয়ারের জলে একটা গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। পূর্ণিমার গণে আপনাদের ক'লকাতার দিকে বান হয়, আর এখেনে জলটা খুব বেড়ে ওঠে। কোন ভয় নেই আমার পেছন পেছন আসুন।"

নৌকোটা যেখেনে বাঁধা ছিল সেখেনে অবশ্য জল ওঠেনি। আমরা কোন রকমে কোথাও বা হাঁটু জল, কোথাও বা হাঁটুর ওপর জল ভেঙ্গে স্রোতের টানে সাবধানে মাঝির পেছন পেছন এগিয়ে চললাম। জামা কাপড় কিছুটা ভিজিয়ে নৌকোর কাছে উঠে পড়লাম।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। নৌকোর মৃদু দোলায় ঘুমটা কখন যে গাঢ় হোয়ে উঠেছিল তা খেয়াল ছিল না। মাঝিদের কথা-বার্তায় ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো। চেয়ে দেখি ভোরের আকাশ ফরসা হোয়ে আসছে। বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

অকুল সমুদ্র। ঘোড়ামারা দ্বীপ বহু পেছনে মিলিয়ে গ্যাছে। ডান দিকে মেদিনীপুরের কোন চিহ্ন নেই—বাঁ-দিকে সাগর দ্বীপকে একটা অস্পষ্ট রেখার মতন দেখাচ্ছে। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে পূর্বদিকে কলসীর মতন সূর্যটি হঠাৎ যেন জল থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লো। সমুদ্রে সূর্য ওঠার দৃশ্য অপূর্ব।

মাঝে মাঝে অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। ভাঁটার সময় এগুলো জেগে ওঠে আবার জোয়ারের জলে ডুবে যায়। তখন কোথায় যে সে সব দ্বীপ ডুবে থাকে তা অকুল সমুদ্রের ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

ক্রমে ক্রমে নৌকাটি সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা একটা কালো দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললো। বুড়ো মাঝি আঙুল দেখিয়ে বল্লে, ঐটি হ'চ্ছে জম্বুদ্বীপ।

বঙ্গোপসাগরের ওপরে সাপে-ভরা এই জম্বুদ্বীপ। প্রাচীন সাহিত্যে ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বলা হোতো। তার সংগে এর কি কোন যোগ ছিল ? গণ্ডোয়ানা রাজ্যের ধ্বংসের সংগে জম্বুদ্বীপ ও কি বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে ? এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হোয়ে পোড়েছিলাম, হঠাৎ নমেনের 'সাপ!—সাপ!' চিৎকারে চমক ভেঙ্গে গ্যালো।

নৌকোটা এসে পড়েছে জম্বুদ্বীপের উত্তর ধারে। এমন গভীর আর ঘন জঙ্গল কখনো দেখিনি। একটা ছোট খাল দ্বীপের ভেতর থেকে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে এসে সাগরে পড়েছে। খালের কাছে একটা বড় সাপ মানুষের চীৎকার শুনে বানের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। হঠাৎ শঙ্করের বন্দুকের আওয়াজে আমরা চোম্‌কে উঠলাম। কি ব্যাপার ? শঙ্কর সাপটাকে মারলো না—বাঘ দেখে গুলি ক'রলো ? নৌকোর পেছন থেকে শঙ্কর

দাঁড়িয়ে উঠে বোলে ওঠে, "হাঁসপাখী মেরেছি—এদিকে আসছে—কে ধরে আনবে ?"

বুড়ো মাঝি অন্য মাঝিদের সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিতে বারণ করে দিলো। কারণ এসব দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে কুমীর থাকা খুব স্বাভাবিক। কাজেই হাঁসপাখীকে ধরে আনা হোলো না—নৌকোটাকে তাড়াতাড়ি ফেরানো গ্যালো না।

তখন শঙ্কর বলে ওঠে, "তীরেতে নেমে একটু দেখলে হয় না ? যদি দু'একটা বাঘ পাওয়া যায়।"

বুড়ো মাঝি বললে, "অমন চিন্তাই করবেন না। শুধু কি বাঘের ভয়—নানারকম বিষাক্ত সাপ ঐ জঙ্গলের মাঠ থেকে গাছের ডগায় ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আমি বল্লাম, "তাহোলে ঐ খালটা দিয়ে ভেতরে একটু যাওয়া যায় না ?"

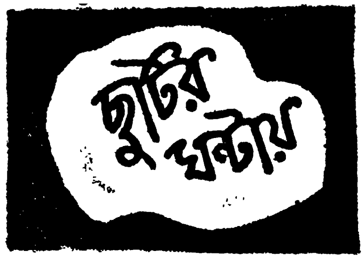
বুড়ো মাঝি বল্লে, "তাও ভাল নয়। এখেনে মানুষ নেই—আনকোরা মানুষের গন্ধ পেলে ঐ সরু খালের মধ্যে এই নৌকায় উঠতে বাঘ মোটেই ভয় পাবে না—ঐ দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার।"

চেয়ে দেখি খালের ওপারে ডাঙ্গা থেকে একটু নীচের জলের মধ্যে প্রায় পাঁচ সাতটা কুমীরের ঝগড়ায় খালের জল তোলপাড় হ'য়ে যাচ্ছে।

শঙ্কর ও হরেন কুমীরদের লক্ষ্য কোরে পরপর চার-বার গুলি ছুঁড়লো। গুলির আওয়াজের সংগে সংগে সারা বনের জন্তু জানোয়ারের বিকট চিৎকার শোনা গ্যালো। খালের জল ঘোলা কোরে পাগলের মতন চারদিকে ছুটতে লাগলো।

বুড়ো মাঝি খুব ব্যস্ত হোয়ে বোলে উঠলো, "নৌকো সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে চল্—" এই কথা বোলে ছুটে এসে নিজেই পালের দড়িটা ঘোরাতে লাগলো।

কুমীরগুলোর কোনটা ডাঙ্গার দিকে, কোনটা বা খালের ভেতরের দিকে,আর দু'তিনটে আমাদের নৌকোর দিকে আসতে লাগলো। শঙ্কর ও হরেন বুদ্ধি কোরে তেড়ে আসা কুমীরদের ওপর পরপর গুলি চালায়। এর-পর কুমীরদের আর হাথা গ্যালো না। তারা পালিয়ে গ্যালো কি মরে গ্যালো তা ঠিক বোঝা যায়নি। ক্রমশঃ



চিত্রগুপ্ত বিরচিত

এবারে তোমাদের আরো কয়েকটি মজার খেলার কথা জানাচ্ছি। অন্যান্য খেলাগুলির মতো, এসব খেলার কায়দাকানুন ভালোভাবে শিখে আয়ত্ত করে নিয়ে লোকজনের সামনে ঠিকমতন দেখাতে পারলে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে তোমরা !

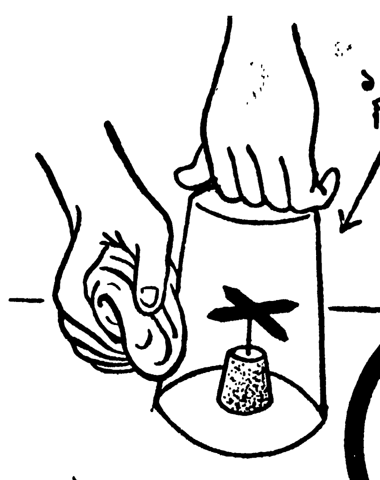
বিদ্যুতের খেলা :

প্রথমেই বলি—বিদ্যুতের খেলার কথা। এ খেলার জন্য সরঞ্জাম চাই—একটি কাঁচের গেলাস, একটি বোতলের 'কর্ক' (Cork) বা ছিপি, এক টুকরো কাগজ, একটি বড় আলপিন অথবা ছুঁচ, এক টুকরো পশমী-কাপড়, আর একখানি কাঁচি।

এসব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, কাঁচি দিয়ে কেটে ঐ কাগজের টুকরো থেকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে একটি 'ক্রশ-চিহ্ন' (Cross) তৈরী করো। তারপর ঐ 'কর্ক' বা ছিপির মাথায় ছুঁচ কিম্বা বড় আলপিন গেথে, সেই আলপিন বা ছুঁচের উপরের ডগায় কাগজের তৈরী 'ক্রশটিকে' বসিয়ে দাও। এবারে ঐ কাঁচের গেলাসটিকে উনুনের আঁচে বেশ করে তাতিয়ে নাও। এভাবে তাতানোর দরুণ গেলাসটি যখন বেশ খট্‌খটে-শুক্‌নো হবে, তখন সেদিকে ঐ 'কর্কের' মাথায় আঁটা 'ক্রশটির' উপরে চাপা দাও। এরপর ঐ পশমী-কাপড়ের টুকরো দিয়ে কাঁচের গেলাসটির গা ঘষলে দেখবে—ভিতরকার ঐ কাগজের 'ক্রশটি' আস্তে আস্তে ঘুরতে সুরু করবে...অর্থাৎ, গেলাসের বাইরের দিকে যেখানে পশমী-কাপড় ঘষছো, ভিতরের কাগজের 'ক্রশের'

ফলাটি আপ্‌না-থেকেই ঠিক তার বিপরীত-দিকে ঘুরে যাবে।

কেন এমন হয়, জানো?…গেলাসের কাঁচের গায়ে পশমী-কাপড় ঘষার দরুণ যে বৈদ্যুতিক-প্রবাহের সৃষ্টি হয়—তারই ফলে এ ব্যাপার ঘটে!

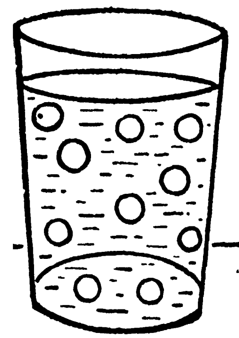


এইভাবে গেলাসের গায়ে গরম কাপড় ঘষতে হবে



ন্যাপ্‌থলিনের গুলির নৃত্য-লীলা:

এবারে শোনো, আরো একটি আজব খেলার কথা! এ খেলাটির জন্য দরকার—কাঁচের একটা বড় জল-পাত্র (Jar) বা গেলাস, গোটাকতক ন্যাপ্‌থলিনের গুলি, একটা বড় চামচ আর একটা ছোট চামচ, খানিকটা 'ভিনিগার' (Vinigar) বা 'সিরকা', একপাত্র পরিষ্কার জল আর খানিকটা 'বাইকার্‌বোনেট্‌ অফ্‌ সোডা' (Bicarbonate of Soda) অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে গরহজম বা অম্লশূল হলে সাধারণতঃ মানুষে যে গুঁড়ো-সোডা খায়—সেই জিনিষ!



এবারে বড় কাঁচের পাত্রে জল ভরে, সেই জলে বড় চামচের ক' চামচ 'ভিনিগার', আর ছোট-চামচের দু'তিন চামচ 'বাইকার্‌বোনেট অফ্‌ সোডা' মিশিয়ে বেশ ঘেঁটে গুলিয়ে নাও। খুব আস্তে আস্তে গুলে নিতে হবে…দ্রুত তালে ঘাঁটালে গাঁজ্‌লা উঠবে—তাতে কাজ হবে না। খানিকক্ষণ ঘাঁটাবার পর, 'সোডার' গুঁড়ো, 'ভিনিগার' আর জল ভালোভাবে মিশে গেলে, পাত্রের জলে 'ন্যাপ্‌থলিনের' কতকগুলো 'গুলি' ফেলে দাও। ফেলবামাত্রই 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলি' জলের তলায় তলিয়ে যাবে। কিন্তু, একটু পরেই দেখবে—সেগুলি একে একে উপরে ভাসবার পরেই, এই সব 'গুলি' আবার জলের নীচে তলিয়ে যাবে। এমনিভাবে অনবরত জলের মধ্যে 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলির' ডোবা-ভাসা আর ভাসা-ডোবার নৃত্য-লীলা চলবে!

কেন এমন হয়—বলতে পারো? শোনো, তাহলে এ লীলার রহস্য।…'ন্যাপথলিনের গুলি' জলে ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ে 'কার্ব্বন্‌ ডায়োক্সাইড' বাষ্পের (Gas) খুব ছোট-ছোট বুদ্বুদ্‌ জমতে থাকে—সোডা-লেমনেডে যেমন জমতে দেখি! এইসব বাষ্পের বুদ্বুদ বেলুনের মতো 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলিদের' ঠেলে উপরে ভাসিয়ে তোলে। কিন্তু উপরে ওঠবামাত্র, এ সব বুদ্বুদ বাতাসে মিশে মিলিয়ে যায়, তখন নিজের ভারে 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলি' আবার জলের নীচে তলিয়ে যায়। নীচে ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এইসব 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলির' গায়ে অজস্র নূতন বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়—সেই সব বুদ্বুদের ঠেলায় 'গুলি' আবার উপরে ভেসে ওঠে এবং ভেসে ওঠবামাত্র এ সব বুদ্বুদও বাতাসে মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ, জলের মধ্যে 'ন্যাপ্‌থলিনের গুলির' এই 'ডুবে-যাওয়া আর ভেসে-ওঠার' ক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকে, যতক্ষণ না এসব গুলি বেমালুম জলে গলে যায়। এরই ফলে 'ন্যাপথলিনের গুলির' এই বিচিত্র নৃত্য-লীলা! তবে এ-ব্যাপারে 'ন্যাপথলিনের গুলি' যেন বিলকুল-মসৃণ

ডায়োক্সাইডের' জন্ম 'বাইকারবোনেট অফ্ সোডা' থেকে! 'ন্যাপথলিনের গুলি' যদি মসৃণ হয়, তাহলে এ-বাষ্প 'ন্যাপথলিনের গুলির' গায়ে থিতুতে পারবে না···ফলে, 'গুলিও' সুষ্ঠুভাবে উপরে ভেসে উঠতে পারবে না। তাই, জলে ফেলবার আগে 'ন্যাপথলিনের গুলির' গা ভালো-ভাবে কোনো খরখরে-জিনিষের উপর ঘষে অমসৃণ করে নেওয়া দরকার।

এখন নাও, এই দুটি মজার খেলা তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দেখো!

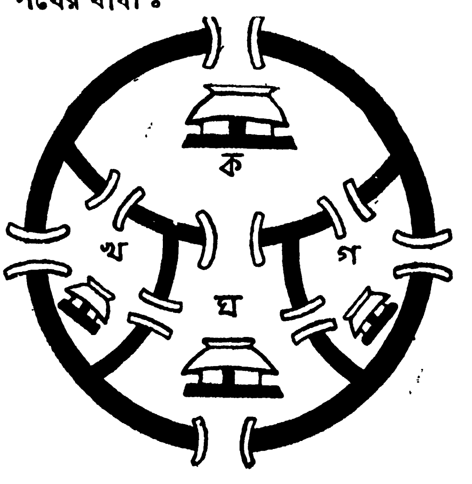
ধাঁধা আর হেঁয়ালী

১। বুদ্ধির ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষরে নামটি তাহার
　　পথের লোককে ডাকি,
মাঝের অক্ষর কেটে দিলে
　　ছালের গায়ে রাখি।
শেষের অক্ষর তুলে নিলে
　　কামড় লাগায় বড়,
বলতে পারো, কি এ কথা···
　　দেখি কেমন দড়!

—কুণাল মিত্র

২। পথের ধাঁধা ঃ



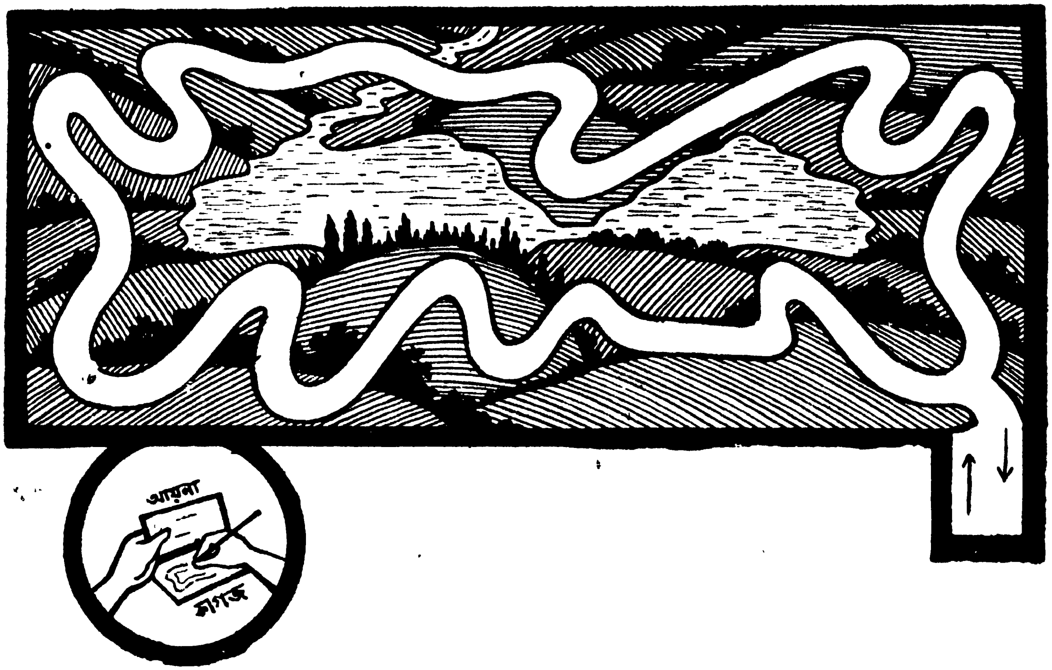
ছবিতে দেখছো—চারটি 'চর'—'ক', 'খ', 'গ' আর 'ঘ' ···এই চারখানি 'চর' নিয়ে ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের চারিদিক ঘিরে নদী···সে নদীর শাখা-প্রশাখা বয়ে যায় এই সব 'চরগুলির' মধ্যে দিয়ে। ছবিতে যে কালো রেখাগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি হলো—এই সব নদী আর তার শাখা-প্রশাখার চিহ্ন। এই সব নদীর রেখার উপরে নয়টি যে বেড়ার চিহ্ন দেখছো—সেগুলি হলো সাঁকো··· এই সাঁকো পার হয়ে গ্রামের লোকজন 'এ-চরে' 'ও-চরে' পরস্পরের বাড়ী যাতায়াত করে। গ্রামের একটি চরে' থাকেন কান্তিবাবু···তিনি রোজ অন্য 'চরে' তাঁর বন্ধু শান্তিবাবুর বাড়ী বেড়াতে যান···এবং এমনই তাঁর খেয়াল যে, সেখানে যেতে তিনি নদীর উপরকার নয়টি সাঁকোর প্রত্যেকটি মাত্র একবার করে পার হয়ে যাবেন—কোনো সাঁকোই দু'বার পার হবেন না!

বলতে পারো—এইভাবে এক 'চর' থেকে অন্য 'চরে' যাবার জন্য কান্তিবাবু কোন কোন পথে প্রত্যেকটি সাঁকো মাত্র একবার করে পার হয়ে কত রকমে তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে যেতে পারেন? গ্রামের চারটি 'চরের' মধ্যে যে কোনো দু'টি 'চরে' কান্তিবাবুর আর শান্তিবাবুর বাড়ী ধরে নিয়ে—এ সমস্যার মীমাংসা করো!

৩। চোখের হেঁয়ালী ঃ

পরের পাতায় ছবিতে দেখবে একটি পাহাড়ী পথ। এই ছবির মাথার দিকে খাড়াভাবে একটি আয়না ধরো। তারপর কাগজে ছাপা এই ছবির দিকে না তাকিয়ে, শুধু সামনের ঐ আয়নার দিকে চেয়ে—অর্থাৎ আয়নায় ছবির প্রতিলিপিটি দেখে, ছবিতে আঁকা পথের বাঁ দিক থেকে বরাবর পেন্সিল চালিয়ে এগিয়ে চলে ডান-দিকের প্রান্ত-সীমায় আবার সঠিক-নির্ভুলভাবে ফিরে আসতে পারো কিনা পরখ করে দেখো। তবে হুঁসিয়ার, ছবিতে আঁকা পথের বাইরে যেন পেন্সিল না সরে যায়!

—ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়



জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তর

(১) শাদায় আর কালোয় মিলিয়ে মোট ১১৬টি ত্রিভুজ আঁকা রয়েছে।

(২) 'ক' আর 'খ' দুটি লাইনই আকারে সমান। 'ক' লাইনের কোণ দুটি বাইরে ছড়ানো, আর 'খ' লাইনের কোণ দুটি ভিতরে দোমড়ানো বলেই চোখের দৃষ্টির বিভ্রম ঘটে। তাই মনে হয়, 'ক' লাইনটি বুঝি 'খ' লাইনের চেয়ে আকারে দীর্ঘ। আসলে কিন্তু এ দুটি লাইনই সমান-ছাঁদের। ভালোভাবে মাপজোপ নিয়ে দেখলেই এ ধাঁধার মীমাংসা হয়ে যাবে।

(৩) ডালনা।

যারা নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে তাদের নাম :—

২ নং ও ৩ নং ধাঁধার নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে—কুমারী তৃপ্তিরাণী মাইতি (মেদিনীপুর), বীণা মুখোপাধ্যায় (ভাটপাড়া) এবং দিলীপ ও ভারতী গঙ্গোপাধ্যায় (পুরী)।

শুধু ৩ নং ধাঁধার নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে—চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর) এবং মালা, দীপা, ডলি ও মনি (জামসেদপুর)

১নং ধাঁধার কেহই সঠিক উত্তর দিতে পারে নি।

মেঘোৎসবে

বৈভব

যে গান বাজে বাদল রাতে
ঝর ঝরানি গানে
সে গান কেন বাজাও তুমি
আমার পরাণে ?

ওই, কাজল কালো মেঘের মাঝে
আমার আলো হারিয়ে গেছে
তাই তো হৃদয় আপনি বাজে
বাজের তানে তানে
প্রাণের সুর বাজে আমার
বাদল রাতের গানে।

ভৈরবের রুদ্র সুরে
রোদন ঝরে পড়ে
ঘরে আমার হৃদয় পুরে
অচল ওঠে নড়ে।
ফণীর মতো কেঁপে কেঁপে
সুর শোনে সে রাত্রি ব্যেপে
ভোর আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপন নিয়ে কানে
জাগাও তুমি জাগাও তাকে
দিনের আলোর গানে

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



[illegible]

ডাঃ নবগোপাল দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পঁচিশ

দুর্নীতি কমাতে হ'লে সবচেয়ে আগে দরকার জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন এবং সক্রিয় করা। অবশ্য, বাংলাদেশের জনমত সরকারী মহলে এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্নীতির উপস্থিতি সম্বন্ধে খুবই সচেতন, হয়ত বা একটু অস্বাভাবিকভাবে সচেতন। কিন্তু চেতনাই একমাত্র প্রতিরোধক নয়, চেতনার সঙ্গে থাকা চাই নৈতিক সাহস এবং সক্রিয়তা। সাহসের পরিচয় অনেক পেয়েছি, কিন্তু সক্রিয়তার অভাব আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি।

সাহস এবং সক্রিয়তা এই শব্দ দুটোর একটু বিশদ্ ব্যাখ্যা করা দরকার। সাহসের কথা আসে দুর্নীতি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করায়, কর্তৃপক্ষ অবহিত না হ'লে আইন সভার সদস্যদের কাছে বা সংবাদপত্রে তা' পেশ করায়। আর সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দুর্নীতির অস্পষ্ট অতিরঞ্জিত কাহিনী বিশ্লেষণ করে তার মাঝ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং প্রমাণযোগ্য অভিযোগগুলো উপস্থাপিত করা হয়।

বাংলাদেশের বিধান সভার প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই বিরোধীপক্ষ দুর্নীতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকেন। কয়েকটি অধিবেশনে আমি দর্শক হিসেবে উপস্থিতও ছিলাম। আমি দেখেছি, যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে তার অধিকাংশই এত ব্যাপক এবং অপরিস্ফুট যে তা' অমূলক বা অতিরঞ্জিত প্রমাণ করতে সরকারী পক্ষকে একটুকু পরিশ্রম করতে হয়নি।' ফল হয়েছে এই যে, এই সব অভিযোগের মধ্যে খানিকটা সত্যতা থাকলেও ব্যাপকতা ও অত্যুক্তির প্রবাহে তা' ঢাকা পড়ে গেছে।

অবশ্য বিরোধীপক্ষের অসুবিধা অনেক। তাঁরা অভিযোগ উপস্থাপিত করেন নানা উড়ো খবরের উপর নির্ভর করে। সে সব খবর যে কতদূর সত্যি তা' যাচাই করে দেখবার মত সুযোগ এবং সুবিধা তাঁদের নেই। তবু আমার মনে হয়েছে, একটু শ্রম স্বীকার করলে তাঁরাও এমন সব তথ্য উপস্থাপিত করতে পারবেন—যার জবাবদিহি করতে সরকারী পক্ষকে রীতিমত হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ত। আমি সবচেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম যে একজন তীক্ষ্ণধী প্রাক্তন-মন্ত্রী প্রায় একবৎসরকালীন সরকারী দপ্তরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অভিযোগগুলো সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করতে পারলেন না। দুর্নীতি বিভাগের সচিব হিসেবে আমি যে সব গলদের কথা জানতাম তা তাঁরও অজানা থাকবার কথা নয়, অথচ তাঁর চার্জসীটে অতি অকিঞ্চিৎকর দু'একটা ঘটনা ছাড়া বড় রকমের দুর্নীতির specific উল্লেখ খুবই সামান্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক মুন্দ্রা প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার কেনার ইতিহাস কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। শ্রীযুত ফিরোজ গান্ধী যে নৈপুণ্যের সঙ্গে লোকসভায় এই ব্যাপারের প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন তা' সত্যি প্রশংসনীয়। অকাট্য কতকগুলো তথ্য তিনি পেশ করতে পেরেছিলেন বলেই না প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত নেহরু বিচারপতি চাগলাকে তদন্তের ভার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে যে বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা জনসাধারণ এখনও ভোলেনি। এই আলোক-সম্পাতের impact যে বহুদূরপ্রসারী হয়েছে তা' নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

আমার মনে হয় বাংলা দেশের বিরোধী পক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনেক সময়ই উপস্থাপিত

করেন পলিটিক্যাল খেলার একটা অংশ হিসেবে। কিন্তু তাতে স্থায়ী কোন ফল হয় না, দুর্নীতি এতটুকু কমে না, খবরের কাগজে এবং চায়ের আড্ডায় খানিকটা হৈ চৈ হয় মাত্র।

এর জবাবে হয়ত বলা হবে, আইন সভাগুলোয় সরকার পক্ষের যে brute majority রয়েছে তাতে কিছুতেই তাঁদের টনক নড়বে না। বিরোধী পক্ষ যদি অকাট্য প্রমাণও উপস্থাপিত করেন তবু সরকারপক্ষ নির্ব্বিকার থাক্‌বেন। কারণ তাঁরা জানেন যে party whip এর সাহায্যে স্বপক্ষে comfortable majority জোগাড় করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

এই যুক্তির মধ্যে খানিকটা লজিক হয় ত আছে, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে এর সত্যতা আমি মেনে নিতে রাজী নই। সরকার পক্ষ তদন্ত করতে রাজী হ'ন্ বা নাই হ'ন্, যে কোন দায়িত্ববোধসম্পন্ন বিরোধী পক্ষের সদস্যের উচিত—প্রকাশ্যে অভিযোগ করবার আগে তা যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে নেওয়া। এতে একদিক দিয়ে তাঁদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়বে, অপর দিক দিয়ে সরকারীপক্ষও আজ না হয়, দু'দিন বাদে, জনমতের সাম্‌নে মাথা নীচু করতে বাধ্য হবেন।

ছাব্বিশ

দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন এবং সক্রিয় করে তোল্‌বার ব্যাপারে খবরের কাগজগুলোর একটা মস্ত বড় দায়িত্ব রয়েছে। দুর্নীতিদমন বিভাগে আমার এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বল্‌তে পারি যে, বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো এই দায়িত্ব মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছে এবং এখনও করছে।

যাঁরা দুর্নীতির পোষক বা যাঁরা জেনে-শুনেও স্বীকার করতে চান্ না যে সরকারের কাঠামোয় দুর্নীতি রয়েছে, তাঁরা অবশ্য বলবেন যে বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো অধিকাংশ সময়ই sensationalismএর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, সংবাদের যথার্থ যাচাই করবার স্পৃহা বা চেষ্টা তাদের নেই, বিশেষ করে সংবাদটা যদি সরকারকে হেয় বা অপদস্থ করতে সাহায্য করে।

" বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলো সম্বন্ধে এই অপবাদ [illegible] নই। বিদেশী খবরের কাগজ দেখবার এবং পড়বার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হয়, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে অনেক বিদেশী খবরের কাগজের তুলনায় আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো বেশী দায়িত্ববোধসম্পন্ন। ইংরেজীতে যাকে বলে yellow journalism তার নিদর্শন আমাদের দেশে খুবই কম, বিশেষ করে দৈনিক কাগজগুলোয়।

আমি বরং বলব যে আমাদের দেশের কাগজগুলো আজও ডিমক্রেসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান যে কত উঁচু স্তরের তা অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ আছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী যুগেও তারা তাদের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। নির্ভয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে সরকারের রীতিনীতি কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করে তারা জনমতকে করে রেখেছে সক্রিয়, সুস্থ এবং সবল। আজকের যুগে, যেখানে সরকারী প্রোপাগাণ্ডা বট গাছের শিকড়ের মত দেশের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি সংস্থায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে, বেসরকারী, স্বাধীন এবং নির্ভীক সংবাদপত্রের প্রয়োজন যে কত বেশী তা' বলা যায় না।

দুর্নীতির ব্যাপারে বাংলাদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজ খুবই সাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং এখনও দিচ্ছে। জনসাধারণের উপর এই কাগজগুলোর প্রভাবের খবর সরকার জানেন, তাই আমি অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছি যে এদের পৃষ্ঠায় সরকারী মহলের দুর্নীতির কোন খবর প্রকাশ হলেই সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। চাঞ্চল্য আরও গভীর হ'ত, যদি খবর অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নির্ভুল থাকত।

আমার মনে পড়ে, একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, আমার অফিসারেরা যদিও যথাসম্ভব গোপনে তদন্ত করছেন—তবু রিপোর্টারেরা মোটামুটি ব্যাপারটি জেনে নিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই একটি দৈনিক কাগজে বড় বড় হেড লাইন্‌এ নিজস্ব সংবাদদাতার খবর প্রকাশিত হ'ল।

রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ সে কি হৈ চৈ! আমাকে প্রশ্ন করা হ'ল, খবরটা leak করল কেন এবং কি ভাবে। আমি জবাব দিলাম, উপযাচক হয়ে আমাদের দপ্তরের কেউ সংবাদদাতাকে খবরটা দেননি।' তবে রিপোর্টারেরা অন্ধ

নন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে ডাঃ দাসের অফিসারেরা কয়েক দিন ধরে ক্রমাগতঃ সেই প্রতিষ্ঠানে আনাগোনা করছেন। আমাদের অফিসারেরা মৌনী থাক্‌তে পারেন, কিন্তু যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের মুখে কাপড় চাপা দেওয়া সহজ নয়। রিপোর্টারেরা যদি এই সব সাক্ষীদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করেন আমি তার কি করতে পারি ?

বলা বাহুল্য আমার এই জবাবে কর্ত্তৃপক্ষ খুসী হ'তে পারেন নি। বলেছিলেন, অত্যন্ত অন্যায় এবং অশোভন ব্যাপার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, আমাদের দিক থেকে যথাসম্ভব সতর্কতা আমরা অবলম্বন ক'রে থাকি এবং ভবিষ্যতেও করব, কিন্তু রিপোর্টারদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা আমাকে সরকার দেননি', কাজেই আকারে ইঙ্গিতে আমায় leakageএর জন্য দায়ী করাও equally অন্যায় এবং অশোভন।

চাঞ্চল্যের আসল কারণ এই যে রিপোর্টারের যে খবর বেরিয়েছিল তা' মোটামুটি সত্য ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার এবং দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তিনি ছিলেন সরকারের একজন পেটুয়া কর্ম্মচারী। খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ডাঃ দাসের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিদ্বেষ-ভাব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, আগেই বলেছি leakage আমার দপ্তর থেকে হয়নি। তবে সরকার যদি মনে করেন খবরটা আগাগোড়া অথবা প্রধানতঃ বানানো—তাহ'লে সেই মর্ম্মে তাঁরা অনায়াসে প্রেস্ নোট দিতে পারেন।

—প্রেসনোটএ যে কোন লাভ হবে না তা' আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সরকারী প্রেসনোটএ জনসাধারণের আস্থা খুবই কম।

—কিন্তু তা' ত হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যদি আমরা অর্থাৎ সরকার যদি জোরগলায় বলতে পারি যে খবরটা ভিত্তিহীন।

—ঐখানেই ত মুস্কিল। বাংলা দেশের পাব্‌লিকই যে সরকারের বিরুদ্ধে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ যে দেখছি ভয়ানক এক পরিস্থিতি। বাংলা দেশের পাবলিক্‌এর যদি সরকার সম্বন্ধে এতটুকু আস্থা না থেকে থাকে, সরকারী ইস্তাহারে যা' বলা হবে সেটা যদি তারা আগে থেকেই মিথ্যাভাষণ এবং সাফাই-গাওয়ার নামান্তর বলে ধরে নেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে সরকারের রীতিনীতির মধ্যে গভীর গলদ রয়েছে।

দুঃখের বিষয় এই দিকটায় কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ নজর নেই। সরকারের কথা পাব্‌লিক্ বিশ্বাস করে না কেন কর্ত্তৃপক্ষ যদি একটু তলিয়ে দেখতেন—তাহ'লে বুঝতে পারতেন যে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পাব্‌লিক্‌এর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারের ক্রমবৃদ্ধিমান্ ঔদাসীন্য।

আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল তার পরিবেষ্টনীতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করতাম—পাব্‌লিকএর সঙ্গে সংযোগ রাখতে। তাদের অভাব-অভিযোগ তদন্ত করা বিষয়ে আমি আমার সময় বা শক্তি ব্যয় করতে কখনও কার্পণ্য করিনি ব'লেই বোধ হয় জনসাধারণের আস্থা আমি যে পরিমাণে পেয়েছিলাম, খুব কমসংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারীর ভাগ্যে তা জুটে থাকে।

খবরের কাগজের roleএর কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ছে। রিপোর্টারেরা বাইরে থেকে মোটামুটি খবর সংগ্রহ করে অনেক সময়ই চেষ্টা করতেন আমার কাছ থেকে confirmation পেতে। এক বছর দুর্নীতি দমন বিভাগে থাকাকালে অনেক রিপোর্টারই আমাকে টেলিফোন্ করেছেন, জানতে যে—অমুক জায়গায় অমুক ব্যাপার হয়েছে বা অমুক কর্ম্মচারী বা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আমরা দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছি বলে যে গুজব রটেছে, তা সত্যি কিনা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাকে বল্‌তে হয়েছে, আমাকে মাপ করবেন, সরকারী কর্ম্মচারী হিসেবে আমি কোন কথা বল্‌তে অসমর্থ। আমাদের conduct rulesএ বলে যে এসব ব্যাপারে প্রেসের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখা অত্যন্ত নিয়মবিরুদ্ধ এবং গর্হিত কাজ।

নাছোড়বান্দা একজন রিপোর্টার তবু বলেছেন, আমি আপনাকে কোন Secret প্রকাশ করতে বল্‌ছিনা, ডাঃ দাস। যা' জানবার তা' আমরা আপনার সাহায্য ছাড়াই

জেনে নিয়েছি। আপনাকে শুধু প্রশ্ন কর্‌ছি, যা' জেনেছি তা' মোটামুটি সত্যি ত ?

—হ্যাঁ বা না কোন কথাই আমি বল্‌ব না, কমলবাবু।

কমলবাবু অম্‌নি লুফে নিয়েছেন আমার এই সহজ, স্পষ্ট জবাব। বলেছেন, বুঝতে পেরেছি, স্যার। ব্যাপারটা তাহ'লে মিথ্যে নয়।

ব'লেই টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, যাতে আমি প্রতিবাদ কর্‌বার অবসর না পাই।

সাময়িকভাবে বিরক্তিবোধ কর্‌লেও মনে মনে আমি কমলবাবুর এবং তাঁর মত আরও অনেকের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা না করে পারিনি'। কোন রিপোর্টার বা প্রতিনিধির সঙ্গে চাক্ষুষ কথা বলতে আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতাম বলেই বোধহয় তাঁদের এই জাতীয় Subterfuge এর আশ্রয় নিতে হ'ত।

চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর এঁদের কয়েকজন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, চাকুরীতে থাকা কালে আপনি ত আমাদের অস্পৃশ্যের মত এড়িয়ে চল্‌তেন, ডাঃ দাস। এখন আশা করি আমরা আর অপাংক্তেয় থাক্‌বনা।

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, আপনারা Fourth estate হ'লে কি হয়, আপনাদের ক্ষমতা আর তিন estate এর একত্রিত ক্ষমতার চেয়েও বেশী। তাই আপনাদের বরাবর ভয় ক'রে চল্‌ব।

সাতাশ

দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যাপারে প্রেসের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বল্‌তে পারি যে অনেক সময় আমার রিপোর্টের উপর কর্ত্তৃপক্ষ action নিতে বাধ্য হয়েছেন যখন প্রেসে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে: যদ্দুর জানি, ডাঃ দাস তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছেন, কিন্তু সরকার কোন action নিচ্ছেন না কেন ? ...দু'জন পদস্থ অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল যখন খবরের কাগজে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। আরেকজন অফিসারকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ কর্‌তে হয়েছিল, প্রেসে আমার দপ্তরে রিপোর্ট নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল ব'লে।...আমি একথা বল্‌ছিনা যে প্রেসে আলোচনা না হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন থাক্‌তেন, কিন্তু এটাও সত্যি যে খবরের কাগজের আন্দোলন তাড়াতাড়ি একটা decision নিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক সময়ই বাধ্য করেছে।...এই কারণে প্রেসের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।

প্রেসের খবরে অনেক সময় অতিরঞ্জন হয়ে থাকে, এটা সত্যি। কিন্তু তার জন্য সরকার অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী। বাংলার মন্ত্রীপর্ষদ যদি প্রেসের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখেন এবং মাসে অন্ততঃ একটা প্রেস-কন্‌ফারেন্স ডাকেন, যেখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবার অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে, তাহ'লে প্রেসের সহযোগিতা তাঁরা অনেক ভালভাবে পেতে পারেন। নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী যে জাতীয় প্রেস-কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করেন সেই জাতীয় কন্‌ফারেন্স কলকাতায়ও করা উচিত।

কিন্তু শুধু কন্‌ফারেন্স ডাকলেই প্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। কন্‌ফারেন্স শুধু পথপ্রদর্শক মাত্র। প্রেসের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেতে হ'লে যিনি কন্‌ফারেন্স address কর্‌বেন (সাধারণতঃ মুখ্যমন্ত্রী) তাঁকে হতে হবে অত্যন্ত কলাকুশলী। কোন প্রতিনিধি হয়ত ধৃষ্টতাসূচক প্রশ্ন করবেন। তাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে সমূহ বিপদ। তাছাড়া সব সময় তাঁকে মনে রাখতে হবে যে প্রেসের পক্ষ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাব্‌লিক্‌এর প্রতিনিধি, মন্ত্রীপর্ষদের গুণগান না ক'রে তাঁর উচিত হবে পাব্‌লিক্‌এর অভাব অভিযোগের সন্তোষজনক এবং না-এড়িয়ে-যাওয়া জবাব দেওয়া। অথচ এই সাধারণ কথাগুলো অনেক মহারথাই ভুলে যান্।

দুর্নীতি দুর করার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা পেতে হ'লে প্রতি দপ্তরে এমন একজন পদস্থ অফিসারকে নির্দ্দিষ্ট করা দরকার যাঁর কাছে পাব্‌লিক্‌এর যে কেউ অভাব অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই অফিসারটিকে হতে হবে সততা এবং ধৈর্য্যশীলতার প্রতীক। তাঁর নিরপেক্ষতা, নৈতিক সাহস এবং দৃঢ়তা বিষয়ে কারো যেন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। দপ্তরের অধিকর্ত্তার তিনি হবেন দক্ষিণ-বাহু, দপ্তরের যে কোন বিভাগ পরিদর্শন কর্‌বার এবং কি ক'রে সেই

বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি সহজ ও দ্রুতগতি করা যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই অব্যাহত।

সরকারী অনেক দপ্তরে আজকাল পাব্লিক রিলেশন্স্ অফিসার নামে একজন কর্ম্মচারীকে দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁদের পাবলিক রিলেশন্স্ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে সরকারী ইস্তাহার, প্রচারপত্র বা পুস্তিকা বিতরণে। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শান্তভাবে শোনাটাও তাঁরা সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করেন। এই জাতীয় পাব্লিক রিলেশন্স্এ সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি ত হয়ই না, বরং সৃষ্টি হয় সরকারের দিক থেকে অভিমান (যে সরকারের সাধু প্রচেষ্টার মর্য্যাদা পাব্লিক দিতে জানে না), আর জনসাধারণের দিক থেকে সঞ্চারিত হয় বিক্ষোভ (যে মুখে ডিমক্রেসীর বড়াই করলেও সরকার মনে মনে এখনও রয়েছে ঘোরতর ব্যুরোক্রাটিক)।

দুর্নীতিদমন বিভাগে আমার অভিজ্ঞতার কথা আবার বলছি। প্রেসের সঙ্গে যদিও কোন সংস্রব আমি রাখিনি'—জনসাধারণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। আগেই বলেছি, দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার নিয়েই আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে—যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্ আমি দেখা করতে প্রস্তুত আছি, এই সর্ত্তে যে দুনীতির বিশদ খবর দর্শনপ্রার্থীকে দিতে হবে। আরও বলেছিলাম যে আমার দপ্তরের চরম কাজ হচ্ছে সরকারী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোয় moral tone উন্নত করা। এই কঠিন কাজে যদি খানিকটাও সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে আমাকে পেতে হবে পাবলিক্এর শ্রদ্ধা, দুর্নীতি দূর করব আমার এই সংকল্প সম্পর্কে তাদের প্রত্যয়।

আমি জানতাম যে বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু বৎসরব্যাপী (মুসলিম লীগ আমল থেকে এর সুরু হয়েছিল) সরকারী ঔদাসীন্য, সহানুভূতির অভাব দেখে দেখে এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে যে সরকারের কোন কর্ম্মচারীর প্রতিশ্রুতিকেই তারা সীরিয়াস্ভাবে গ্রহণ করে না। তাই আমি আমার সংকল্প প্রচার করেই ক্ষান্ত হইনি', যতদূর সম্ভব তা কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল এই যে প্রথম কয়েক সপ্তাহের সংশয় (scepticism) কেটে যাবার পর আমার দপ্তরের কাজে পাব্লিক্এর কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব্ব সহায়তা পেয়েছিলাম। আমার sincerity সম্বন্ধে দেশের অগুণ্তি নর-নারীর গভীর বিশ্বাস আমাকে দিয়েছিল অদ্ভুত একটা প্রেরণা, একটা শক্তি, যার উপর নির্ভর করে আমি অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

আমার প্রতি পাব্লিক্এর এই প্রত্যয় মাঝে মাঝে আমাকে রীতিমত অভিভূত করে ফেল্ত। তার দু' একটা টুক্রো টুক্রো অধ্যায় মনে পড়লে আজও কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ জলে ভরে আসে। ক্রমশঃ

সন্ধান

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

আঁধার ভেদিয়া ফুটে আকাশেতে আলো,
সে আলোকে যাহা দেখি তাই লাগে ভালো।
মৃত্তিকার বক্ষ ভেদি ছুটে আসে জল,
সে জলে শরীর মন করে সুশীতল।
বনমাঝে মধুমাখা পাখীদের গান
বহি আনে সুধাস্পর্শ জুড়াইয়া প্রাণ।
গাছে গাছে ফুল-ফল, সুনিবিড় ছায়া
রচি দেয় মনোমাঝে ব্যথাভরা মায়া।
ঘর ছাড়ি লোক চলে আঁখি ছলছল,
কত লোক ফিরে ঘরে আনন্দ-চঞ্চল।
পত্র-পুষ্প, তরুলতা কত কথা জানে,
সবাই ডাকিয়া বলে—চাহ উর্দ্ধপানে।

পথ রচি, স্নেহে ডাকি জন্ম জন্ম ধরি,
কোথায় লুকায়ে আ হে দয়াল হরি!



গ্যালারীর দর্শক ঃ

স্যুট্…স্যুট্…স্যুট করো! মারো বল গোলে… সোজা!…মারো…মারো…

মাঠের খেলোয়াড় ঃ

বটে!…মারবো না!…খেলছি আমি…সারা মাঠ ছুটে মরছি আমি…আমার পায়ে বল—আর, আপনারা দেবেন হুকুম!…



সেখানে ওখানে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

হল ঘরখানা বেশ বড়। কিন্তু বৃহত্তের তুলনায় আসবাব-পত্র সামান্য—“গোটা ছয়েক সোফা, নিচু একটি গোল টেবিল, তাকে ঘিরে খান তিনেক বেতের চেয়ার”—এত বড় ঘরকে ভরে তুলতে পারে নি। দেয়ালগুলিও ফাঁকা। খান দুই গ্রুপ-ফোটো বেশ উঁচুতে টাঙানো। চেয়ারে বসে উৎপল চেহারাগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পেলনা। উত্তর দিকের দেয়ালে গিরিশৃঙ্গমালার নির্জনতা আর গাম্ভীর্য নিয়ে একখানি ক্যালেণ্ডার স্থির হয়ে রয়েছে। দুমাস আগে মার্চ শেষ হলেও পাতাটা তখনও ছেঁড়া হয়নি।

চাকর এসে পাখাটা খুলে দিয়ে গেছে—আর গোটা দুই জানলা। তবু যেন গরম কাটতে চায়না। আকাশে মেঘ আছে বলে গুমট আরো বেড়েছে। তাপ আছে, আলো নেই। বেলা সবে চারটে, তবু মনে হয় সন্ধ্যা নামল বলে।

মিনিট পনের ধরে উৎপল এই ঘরের মধ্যে বসে আছে। ছোকরা চাকর বলে গেছে, মিসেস রায়কে খবর দিয়েছি, আপনি বসুন। তিনি এখুনি নেমে আসবেন। আমায় খবর দিয়ে সে যে কোথায় চলে গেছে তার আর পাত্তা নেই। হয়তো গেটের কাছে আম গাছটার নিচে কয়েকটি লোক নিবিষ্ট মনে তাস খেলছে—এ বাড়ির চাকরটিও তাদের মধ্যে মিশে রয়েছে।

দ্বিতীয় বার খবর পাঠাবার মত কেউ নেই। তাছাড়া বার বার তাগিদ দেওয়া ভদ্রতাও নয়। বিশেষ করে উৎপল সেন যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—তিনি একজন মহিলা। তৈরী হবার জন্যে তাঁকে সময় দিতে হবে। কিন্তু দোতলা থেকে নামতে কি পনের বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগা উচিত? বিধবা মহিলা—এমন কি প্রসাধন করবেন? বেশ-বাস বদলাবেন!

অবশ্য এমনো হতে পারে—মিসেস রায় এখনো হয়তো ঘুম থেকে উঠেন নি। এই বিকেল বেলাতেও তিনি হয়-তো দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় নিমগ্ন। সেই মগ্নতা থেকে তাঁকে ডেকে তুলবার সাহস কারো হয়নি—এমনো হতে পারে। তাহলে উৎপলকে যে আরো কতক্ষণ দেরি করতে হবে তার ঠিক নেই। ভদ্রমহিলা উঠবেন, বাথরুমে ঢুকবেন, হাতমুখ ধোবেন, সাজসজ্জা পাল্টাবেন—তারপর নেমে এসে সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। উৎপল বড় বেশি এগিয়ে ভাবছে। অতখানি আশা করবার মত কি কিছু আছে? মিসেস রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু মূল প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদিও উৎপল মিসেস রায়দের দলীয় এম, এল, এর সুপারিশ চিঠি এক-খানা নিয়ে এসেছে, কিন্তু এমন চিঠি তিনি কত পেয়েছেন তার ঠিক কি। একটু শুধু ভরসার কথা, দ্বিতীয় ক্যাণ্ডি-ডেট কেউ আসেনি। এই মুহূর্তে অন্তত কাউকে দেখা

াচ্ছে না। অন্যান্য অফিসে—স্কুলে রয়েছে যেমন একটা পাষ্টের জন্যে একশ কখনো বা হাজার প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে—এখানে তেমন লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ভীড় হলেও হতে পারত। বাংলা দেশে লেখকের সংখ্যা তো কম নয়। যাঁরা লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাদের সংখ্যা আরো বেশি। সেই সংখ্যা গরিষ্ঠদের সঙ্গেই উৎপলের প্রতিযোগিতা হবার কথা ছিল। কিন্তু এঁরা বোধ হয় কাজটির জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি। উৎপলের অন্তত চোখে পড়েনি। তার পৃষ্ঠপোষক জীবনবাবুও তাই বললেন। কাগজে অ্যাডভারটাইজ করা হয়নি। জানাশোনা লোকের ভিতর থেকে মিসেস রায় নিজেই পছন্দ করে কাউকে বেছে নেবেন। অবশ্য বেছে নেওয়ার ভার ভদ্রতা করে তিনি জীবনবাবুর উপরই দিয়েছেন। কিন্তু এমন ভদ্রতা তিনি আরো কতজনের সঙ্গে করেছেন তার ঠিক কি।

কাজটা অবশ্য সাময়িক—পরলোকগত সতীশঙ্কর রায়ের একখানি জীবনী লিখে দিতে হবে। ক ফর্মার বই হবে, দয়া করে ওরা কত পারিশ্রমিক দেবেন, থোক টাকাটা একসঙ্গে দিয়ে দেবেন—নাকি কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, সে সব কিছুই উৎপল জানেনা। জীবন কাকা শিখেয়ে দিয়েছেন, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়োনা। মিসেস রায়ের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ো। তাতেই লাভ হবে। তুমি যদি ওকে ইমপ্রেস করতে পারো তাহলে সুবিধেজনক চাকরি-বাকরি তিনি নিজেই ঠিক করে দেবেন। ওদের নিজেদেরই দু-তিনটে কনসার্ণ আছে, তাছাড়া সরকারী মহলে এখনো ওঁর বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি। অবশ্য সতীশঙ্করবাবু বেঁচে থাকতে যেমন ছিল তেমন নেই, তাহলেও বেশ আছে। মিসেস রায় মুখের কথাটি খসালে, কি দুকলম লিখে দিলে এখনো অনেকের অনেক রকম উপকার করে দিতে পারেন। কিন্তু সহজে বলতে চাননা, লিখতে চান না। উৎপল জিজ্ঞাসা করেছিল—কারো জন্যেই কিছু করেন না?

জীবনবাবু জবাব দিয়েছিলেন—'করবেন না কেন। দরকার হলেই করেন। আগে অনেক করেছেন। বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা করে দিয়েছেন। ছেলেমেয়ের টিউটরের ক্লার্কের কাজ জুটেছে। পারিবারিক ধোপা নাপিত থেকে শুরু করে উকিল ডাক্তার, গুরু পুরোহিত, হাল আমলেই প্রাইভেট সেক্রেটারী—সবারই কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। যার যেমন যোগ্যতা, যার যেমন দাবি। তুমি যদি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারো—।'

উৎপল মনে মনে ভেবেছিল—যোগ্যতা প্রমাণ করা আর দাবি প্রতিষ্ঠা করা কি এক? কিন্তু জীবনী লেখার কাজটা যদি শুধু প্রবেশপত্র হয়—এ পত্র যেমন তেমন করে লিখলে চলবেনা।

সেই ছোকরা চাকরটি আবার ফিরে এল। উৎপলের দিকে চেয়ে বলল, 'আসুন।' উৎপল বলল, 'মিসেস রায়—।'

ছেলেটি বলল, 'তিনি অফিস ঘরে আছেন।'

অফিস! এখানে আবার অফিসও আছে নাকি? উৎপল ভেবেছিল এটা শুধু মিসেস রায়ের বাসগৃহ। স্বামীর শোকে যা একটু বনবাসের চেহারা নিয়েছে। কিন্তু এই পুরোন দোতলা বাড়িটার মধ্যে একটি অফিসও রয়েছে শুনে উৎপলের কৌতুহল বাড়ল। অফিস যদি থাকে তাহলে একেবারে অফিস অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের পদের জন্যে আবেদন করলে ক্ষতি কি। কাজ নেই তার ঠিকে লেখক হয়ে।

লোকটির পিছনে পিছনে উৎপল লম্বা করিডর পার হয়ে আর একখানি ঘরে এসে ঢুকল। এ ঘরখানি আকারে ছোট। শেলফ আলমারি চেয়ার টেবিল সাজানো। দিনের আলো মেঘে ঢাকলেও ঘরের বিদ্যুতের আলো অনাবৃত। কিন্তু এসব উৎপলের প্রথমে চোখেই পড়লনা। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে একটি অকম্পিত দীপশিখা তাকে অপলক করে রাখল।

অনুরাধা বললেন—'বসুন। মহিলা সমিতির সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা শেষ করতে একটু দেরী হয়ে গেল।

মৃদু মিষ্ট স্বর। মুখে স্মিত হাসি।

উৎপল তাঁর সামনের চেয়ারে বসল।

কত হবে মহিলাটীর বয়স। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ যে কোন একটি সংখ্যার সঙ্গে ওঁর বয়ঃক্রম নির্দিষ্ট করে বেঁধে রাখা যায়। কিন্তু উৎপলের মনে হল, ভাবতে ভালো লাগল—তিরিশের এপারেই আছেন অনু-

রাধা; উৎপলও এখনো ওপারে পা দেয়নি। ভাবতে ভালো লাগল দুজনে একই পারের।

অনুরাধা দেবী যে সুন্দরী তা জীবনবাবুর কাছ থেকে উৎপল আগেই শুনে এসেছিল, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে যে এত দীপ্তি আর দৃঢ়তা আছে তা ধারণা করতে পারেনি।

'আপনি জীবনবাবুর কাছ থেকে এসেছেন?'

উৎপল বলল 'হ্যাঁ।'

অনুরাধা বললেন, 'তিনি ফোনে সবই বলেছেন। মিঃ রায়ের বায়োগ্রাফি আপনি তাহলে লিখতে রাজী আছেন?' একটু থেমে বললেন, 'মানে আপনি কি পারবেন?'

উৎপল বুঝতে পারল—প্রথম প্রশ্নটি অসাবধানে করে ফেলেছিলেন অনুরাধা, দ্বিতীয়বারে সতর্ক হয়ে উৎপলের সম্মতি আছে কিনা এই জিজ্ঞাস্যকে পরমুহূর্তেই উল্টো দিক থেকে তার ক্ষমতার সম্বন্ধে সংশয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন।

উৎপল লক্ষ্য করল অনুরাধার বয়স যাই হোক, অবয়বে তন্বী। ঋজুতা কাঠিন্যের তুলনায় লাবণ্য কম। খ্যাতিমান ধনবানের স্ত্রীর শরীরে মেদের আধিক্য থাকবার কথা ছিল। তা নেই। আধুনিক হিন্দু বিধবার পরিধানে আজকাল থান থাকেনা, অনুরাধারও নেই। পরণে কালো পেড়ে মিহি তাঁতের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ—একহাতে কালো ফিতেয় বাঁধা ঘড়ি, আর এক হাত একেবারে আভরণ হীন, কানে কি গলায়ও কিছু পরেননি অনুরাধা। মাথায় প্রচুর চুল। কিন্তু কবরী রচনায় তাঁর তেমন মনোযোগ আছে বলে মনে হয়না। চুলগুলিকে টেনে শক্ত শাসনে বেঁধে রেখেছেন। কিন্তু রূপবতীকে এই কঠিন সংযমও যেন বেশ মানায়। শকুন্তলাকে যেমন মানিয়েছিল গাছের বাকলে। অবশ্য শকুন্তলার সঙ্গে মিসেস রায়ের মোটেই তুলনা চলে না। ওঁর মধ্যে নমনীয়তা কম! রমণীয়তাকে ইচ্ছা করেই হ্রাস করেছেন অনুরাধা? না কি' কঠিন বৈধব্যবৃত্তিই এমন রুক্ষতা এনেছে? ইনি কি একবার থান, নিরামিষ আর আতপান্ন?

এতসব ভাববার আগেই উৎপল অবশ্য তাঁর কথার জবাব দিয়েছে 'পারব বলেই তো আশা করি।' অনুরাধা সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলেছেন, 'আপনি সময় করতে পারবেন কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। দুখানা নভেল লিখেছেন, আর গল্প যেন কতগুলি?'

স্মিতমুখে অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাতলা রক্তাভ দুটি ঠোঁট। লিপষ্টিকের ক্ষীণ প্রলেপ আছে কি? নেই বলেই মনে হয়। যিনি গয়না পরেননি, যত্ন করে চুল বাঁধেননি, তিনি কি আর লিপষ্টিক ছুঁয়েছেন? বলা যায় না। কার কোনদিকে অভিরুচি, কার কতখানি শুচিতা—আর শুচিবায়ুতা—বলবার উপায় নেই।

পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সুগঠিত ছোট শুভ্র দাঁতের সারিও চোখে পড়েছে উৎপলের। ওঁর দাঁতগুলিই সবচেয়ে সুন্দর। দাঁতগুলি দেখলে মনে হয়না এতখানি রুক্ষতা, কাঠিন্য আর চাতুর্য ওঁর মধ্যে আছে। মনে হয়, মিসেস রায়েব মুখোস পরে রয়েছেন অনুরাধা। তাঁর সরু ভুরুর নিচে কালো আয়ত্ত দুটি চোখ দেখেও উৎপলের তাই মনে হচ্ছিল। মিসেস রায় যা নন—তাই যেন তিনি হতে চাইছেন, দেখাতে চাইছেন। একটি গৃহস্থ সাধারণ বধূকে হঠাৎ কে যেন দেশনেত্রীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর মিসেস রায় সচেতনভাবে সতর্ক হয়ে তাঁর ভূমিকার অভিনয় করে যাচ্ছেন। তাই কোথায় যেন একটি কৃত্রিমতার ছাপ থেকে যাচ্ছে। যেমন তাঁর কথার ভিতর থেকে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ-ভঙ্গি মাঝে মাঝে ফুটে বেরোচ্ছে। উৎপলের মনে হল এর চেয়ে যদি তিনি মাদারিপুরের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন, ওঁর কথা আরো স্বাভাবিক আর মিষ্টি শোনাত। মিসেস রায়ের কণ্ঠস্বরে মাধুর্য আছে। স্বর যাঁর মধুর, কথা বলবার ভঙ্গি যাঁর নয়নাভিরাম, তাঁর ভাষার দোষ ভেসে যেতে কতক্ষণ লাগে। উচ্চারণের ত্রুটি কানে ধরা পড়লেও মন ধরে রাখেনা।

গল্পের সংখ্যা নিয়ে যে একটু ঠাট্টা করলেন অনুরাধা, উৎপল তা গায়ে মাখলনা। হেসে জবাব দিল, 'যতই লিখে থাকি আপনি বোধহয় কিছুই পড়বার সময় পাননি।'

অনুরাধা বললেন 'তা কেন। অত নিরক্ষরা কেন ভাবছেন আমাদের। কিছু কিছু অবশ্যই পড়েছি। তবে সব—' অনুরাধা একটু হাসলেন। সব পড়া হয়ে ওঠেনি। স্কুল কলেজে যখন ছিলাম কী গোগ্রাসেই না সব গিলেছি। একখানা বই হাতে পেলে যেন স্বর্গ পেতাম। আর আজ—। মিঃ রায় ও শেষ কবছর বেশি কিছু পড়তে পারতেন না।

অথচ পড়বার জন্যে ছটফট করতেন। কিন্তু কাজ আর কাজ। এখন আমি নিজেও টের পাচ্ছি। অথচ তিনি যা করেছেন আমাকে তার কতটুকুই বা করতে হয়, কতটুকুই বা আমার সাধ্য।' অনুরাধা একটু চুপ করে রইলেন।

উৎপলও কোন কথা বললনা। এবার মিসেস রায়ের মুখে লাবণ্যের ছোপ লেগেছে। শরীরে কাঠিন্যের বদলে নারী-সুলভ লালিত্য এসেছে। কীর্ত্তিমান স্বামীর স্মৃতি বিধবা স্ত্রীর মনে আবেগের উদ্রেক করবে—এতো স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব মুহূর্ত্তে সদ্য-পরিচিত শ্রোতাকে বড় বিব্রত হতে হয়। তার বলবারও কিছু থাকে না, করবারও কিছু থাকে না। অথচ কিছু না বলাটাও অশোভন মনে হয়।

কিন্তু উৎপলকে কিছু বলতে হলনা। অনুরাধাই ফের কথা বললেন। একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'মাফ করবেন। আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ, অথচ আপনাকে এত কথা বলছি—.'

উৎপল বলল, 'তাতে কী হয়েছে। এভাবে আপনি যত বলবেন ততই আমার পক্ষে সুবিধে।'

অনুরাধা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তার মানে ?'

'মানে আমার লেখার পক্ষে সুবিধে হবে। মিঃ রায়ের একটি পুরো চরিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে।'

অনুরাধা এবার হাসলেন, 'তাই বলুন। একেই বলে প্রফেসন্যাল ম্যান। হ্যাঁ, টার্মস সম্বন্ধে এবার কথা-বার্ত্তা বলতে হয়।'

উৎপল বলল, আমি আর কী বলব ! ওটা জীবনবাবু—

অনুরাধা স্মিতমুখে বললেন "জীবনবাবু সে দায়িত্ব নেবেন কেন ? ওটা আমাদেরই ঠিক করে নিতে হবে। আপনি কোন সংকোচ করবেন না। আপনি বলুন। আপনার পরিশ্রমের যা দাম তা না দিলে চলবে কেন।' অনুরাধা একটু হাসলেন—"তা ছাড়া এ হল আমার সখ। সখের জিনিস পছন্দ মত হলে—।"

কথাটা তিনি অন্য প্রসঙ্গে বললেন 'আমি বিখ্যাত আর্টিষ্টকে দিয়ে ওঁর একখানা অয়েল পেন্টিংও করিয়েছি। ভিতরের ঘরে আছে। আপনাকে দেখিয়ে আনব। আর উনি বেঁচে থাকতেই ওঁর একজন বন্ধু ওঁর বাষ্টও করে দিয়েছিলেন। স্কাল্পটর হিসাবে তাঁর ও খ্যাতি আছে। তিনি একটা পয়সাও নেননি। অবশ্য মিঃ রায় অন্যভাবে পুষিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বরং নিজে ঠকবেন, কিন্তু অন্য কাউকে ঠকাবেন না এই ছিল তাঁর প্রিন্সিপল। তিনি সাধ্য মত দেবেন কিন্তু পারত পক্ষে নেবেন না এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। অবশ্য শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসার দানের কথা আলাদা।

মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত মিসেস রায়ের এই স্তব উৎপল মুগ্ধের মত শুনে যেতে লাগল। মুগ্ধের মত—কারণ মিসেস রায় শুধু দেখতেই রূপবতী নন, শুনতেও মধুরা। তাঁর কণ্ঠ শুনে মনে হয় তিনি গান জানেন। না জানলেও ক্ষতি নেই। তাঁর কথাগুলিই গানের মত। স্তব গান। সে স্তব যার উদ্দেশ্যেই রচিত হোক কিছু এসে যায় না। গাছ হোক পাথর হোক দেবতা হোক দেশ-নেতা হোক কিছু ক্ষতি নেই। শুনতে মধুর হলেই হল। ফুলের কাছে সৌন্দর্য্য ছাড়া উৎপল কিছু চায় না, পাখির কাছে শুধু সুধাকণ্ঠ। মিসেস রায় এই মুহূর্তে একই সঙ্গে ফুল আর পাখি।

অনুরাধা ফের টার্মসের কথায় এলেন 'আপনার যদি এতই সংকোচ তাহলে আমিই বলি। রয়্যালটী বেসিসে যদি হয়—তাহলে আমি টোয়েন্টি পার্সেণ্ট—পর্যন্ত—। আশা করি এতে আপনার ঠকা হবে না।'

উৎপল বলল—থাক থাক ওসব কথা পরে হবে—।

অনুরাধা হাসলেন 'পরে নয় উৎপলবাবু। এই স্থূল কথাগুলি আগে শেষ করে রাখাই ভালো। আর যদি আপনি চান মাসে মাসে কিছু কিছু করে—। তাতে যদি আপনার সুবিধে হয়—। জীবনবাবু আমাকে সেইরকমই যেন আভাস দিয়েছিলেন।'

উৎপল মুখ নীচু করে ভাবল—জীবনবাবু তাহলে কিছুই বলতে বাকি রাখেননি। তার দুর্দশা ও বেকার দশার কথা বোধ হয় সবই মিসেস রায় জানেন। 'হ্যাঁ মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টেই আমার পক্ষে সুবিধে হয়।'

মুখ ফুটে কথাটা উৎপল এবার বলেই ফেলল। অনুরাধা হাসলেন, কাজ করবেন আপনি। আপনার সুবিধেই আমাকে দেখতে হবে। মাসে মাসে তাহলে কত—ধরুন পঞ্চাশ—।

উৎপল অস্ফুটস্বরে বলল 'পঞ্চাশ !'

মুহূর্তের মধ্যে উৎপলের চোখের সামনে ফুল আর পাখির যুগ্মরূপ দারুময়ী দোকানদারিণীতে পরিবর্তিত হল।

উৎপল বলল—পঞ্চাশ কি বলছেন !

অনুরাধা সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন। হেসে বললেন, 'ও আপনার বুঝি আরো কিছু বেশী দরকার? বেশ তো, আপনার টাকা আপনি নেবেন, আমার তাতে আপত্তির কি আছে। ইচ্ছে হলে আপনি সবটাই—আমাকে তো দিতেই হবে। দুদিন আগে আর পরে। কিন্তু একসঙ্গে সব নিলে আপনারই বোধহয় বেশি অসুবিধে হবে। টাকাটা খরচ হয়ে গেলে কাজকে মনে হবে বেগারখাটা। তাহলে বলুন কীভাবে নিলে আপনার সুবিধে হয়। না না, এবার আপনি বলুন। বারবার আপনার কাছে হার মানতে পারবনা উৎপলবাবু।'

দ্বিধা করে আর লাভ নেই। উৎপল এবার সরাসরি বলে ফেলল, 'একশ টাকা।'

অনুরাধা বললেন, 'একশ !' মনে মনে কি যেন একটু হিসাব করলেন, তারপরে হেসে বললেন, 'বেশ। তাই হবে। কত সময় লাগবে বলুন তো! আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তিনচার মাস হলেই বোধহয় চলবে, কি বলুন। আমার ঠিক আইডিয়া নেই। আমাদের সেই আর্টিষ্ট বন্ধু সুজিত নন্দী দুমাস সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু লিখতে কত সময় লাগবে? কাজটা আমি একটু তাড়াতাড়ি চাই। কতদিন লাগবে বলুন তো? আপনার স্পীড কেমন? একটা গল্প লিখতে আপনাদের কদিন লাগে?'

উৎপল হেসে বলল, 'তার কি কিছু ঠিক আছে? কোন গল্প তিনদিনেও হয়, আবার কোন গল্প তিনমাসেও শেষ হয়না।

অনুরাধা ও হাসলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় আনাড়ি। উপন্যাসের কথা জিজ্ঞেস করলে আপনি নিশ্চয়ই বলবেন—কোন উপন্যাস সাতদিনেও শেষ হয়, আবার কোন উপন্যাস সাতবছরেও অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু আপনি তো আমাকে গল্পও লিখে দিচ্ছেন না, উপন্যাসও লিখে দিচ্ছেননা। একটি জীবনী লিখবেন। একজন কর্মবীরের জীবনী। এখানে কল্পনার অবকাশ কম। যতদূর পারি তথ্য আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দেব। আর কিছু কিছু অবশ্য আপনাকে নিজেও খুঁজে নিতে হবে। আমাদের লাইব্রেরীতেই আপনি অনেক জিনিস পাবেন। আবার কোন কোন মেটেরিয়ালের জন্যে আপনাকে বাইরেও যেতে হবে। সব জোগাড় হয়ে গেলে আপনি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবেন। হাতের কাছে সব জড়ো করে নিয়ে আমরা মেয়েরা যেমন রাঁধতে বসি।'

উৎপল একটু হাসল—ঠিক বলেছেন। লেখার সঙ্গে রান্নার তুলনাটা বেশ চলে। পাকা রাঁধুনীর হাতে শুকতো আর শাকচচ্চড়িও উপাদেয় হয়ে ওঠে।'

অনুরাধা বললেন 'তাই বলে আপনাকে শাকচচ্চড়ি কিন্তু রাঁধতে হবেনা। আপনি পোলাও মাংসের যথেষ্ট উপাদান পাবেন।'

কথাটা বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন অনুরাধা।

বিধবার পক্ষে অত উল্লাসের সঙ্গে পোলাও মাংসের কথাটা বলা হয়তো তাঁর নিজের কানেই অশোভন শোনাল! তাছাড়া উৎপল কথাটাকে কোন অর্থে কী ভাবে নেয় সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হতে পারলেন না। তাই নিজের কথার নিজেই ব্যাখ্যা করলেন।

'মানে মিঃ রায়ের জীবনে অনেক ঘটনা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আছে। তাঁর কর্মময় জীবনে একটিদিনও তিনি চুপ করে বসে থাকেননি। আপনি যদি তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবন থেকে যে কোন একটি দিন বেছে নিয়ে তার ইতিবৃত্ত লেখেন আপনার একটি বড় উপন্যাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওর বায়োগ্রাফি আপনি কী ভঙ্গিতে লিখতে চান?'

উৎপল বলল, 'এখনো কিছু ভেবে দেখিনি।'

অনুরাধা বললেন, 'আর যাই করুন, শুধু তথ্য আর গবেষণার ভারে বোঝাই করা একটা নীরস জীবনী যেন লিখতে যাবেন না। ও ধরণের বই পণ্ডিতেরা পড়েন, তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনাও করেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তা ছুঁয়েও দেখেনা। আমি চাই এ অসাধারণ মানুষটির জীবন বৃত্তান্ত সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হোক। কারণ তিনি ছিলেন জনসাধারণের বন্ধু।

বেল টিপলেন অনুরাধা। সঙ্গে সঙ্গে একটি রোগা কালো মত মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

অনুরাধা বললেন, 'চা হয়েছে পদ্মা?'

সে বলল, 'হ্যাঁ দিদিমণি।'

তাহলে নিয়ে এসো, দেরি করছ কেন?'

পদ্মা একটি ট্রে হাতে নিয়ে ফের ঘরে ঢুকল। তাতে দু-কাপ চা আর একটি প্লেটে একখণ্ড পাম কেক্ রয়েছে।

অনুরাধা চা আর প্লেটটি উৎপলের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বললেন 'খান।'

উৎপল বলল, 'আবার এসব কেন?'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'এসব আর কি।' এই তো সব। খান, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। বক্ বক্‌ও কম করিনি। কিন্তু কাজটা আপনাকে আজই ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই। এর পরে হয়তো এত সময় আর পাব না।'

উৎপল চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার সাহচর্য্য আমার সব সময় দরকার হবে। মিঃ রায়ের জীবনের কথা আপনি যতখানি জানেন।'

অনুরাধা বললেন, 'আপনাকে তার চেয়েও বেশি জানতে হবে। তবে তো লিখতে পারবেন। 'হ্যাঁ আমার ইচ্ছে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-টবন্ধ নয়, আপনি বরং উপন্যাসের ভঙ্গিতেই লিখবেন। আর লেখাটা সুখপাঠ্য হওয়া চাই। লোকে যদি নাই পড়ল, তাহলে লিখে লাভ কি। ছবি যদি লোকে নাই দেখল, নাই বুঝল, তাহলে এঁকে লাভ কি। কিন্তু আপনার বই ভঙ্গিতেই শুধু উপন্যাস হবে, স্বভাবে নয়। আজকাল উপন্যাস বলতে যা বোঝায়—সে সব কিছু যেন আপনার লেখায় না থাকে। আগে আগে লোকে যেমন প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ করত, মঠ উৎসর্গ—সুন্দর শুভ্র পবিত্রতার প্রতীক—আমিও তাই করতে চাই। আপনি আমার জন্যে একটি গ্রন্থমঠ প্রতিষ্ঠা করে দিন।'

'মা, মা!'

পর্দা ঠেলে বছর দশেকের একটি ছেলে ঘরে ঢুকল। দেখতে একটু মোটা। কিন্তু বেশ সুদর্শন। বয়সের তুলনায় বেশ বড়-সড়।

'বেড়াতে যাবে না মা?'

অনুরাধা তার দিকে স্নিগ্ধ বাৎসল্যে হেসে তাকালেন, বললেন, 'বাপি, দেখছনা কাজ করছি।'

ছেলে বলল, 'কোথায় কাজ। কথা বলছ তো শুধু। গল্প করছ।'

অনুরাধা উৎপলের দিকে হেসে তাকিয়ে বললেন, 'কথা শুনুন আমার ছেলের। বিশু, তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে কথার মত কথা বলাও একটা কত বড় কাজ। এখানে কে বসে আছেন জানো?'

বিশু মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

অনুরাধা তরল কৌতুকের সুরে বললেন, 'একজন মস্ত লেখক। এই তো তুমি এক ফোঁটা ছোট্ট মানুষটি আছ, উনি ইচ্ছা করলে তোমাকে নিয়ে মস্ত বড় একখানা বই লিখে ফেলতে পারেন।'

বিশু ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'ঈস, আমাকে নিয়ে লিখবেন না আরো কিছু। উনি তো বাবাকে নিয়ে লিখতে এসেছেন।

অনুরাধা তেমনি কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি কী করে জানলে?'

বিশু বলল, 'পদ্মাদির কাছে শুনেছি।'

অনুরাধা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে পদ্মার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গিয়ে গল্প-টল্প করো। আমি আসছি। কাজ সেরে এক্ষুনি আসছি।'

বিশু বলল, বেড়াতে নিয়ে যাবে তো?'

অনুরাধা বললেন, 'যাব'—এখন তুমি বাইরে যাও তো। যা বলছি শোন।

এবার একটু শাসনের সুর মেশালেন অনুরাধা।

বিশু বাইরে চলে গেল।

অনুরাধা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আগের কথার সূত্রটি ফিরিয়ে এনে বললেন, 'মনুমেন্ট নয় মঠ। সুন্দর ছোট, শান্ত পবিত্র। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে দেখেন নি এ ধরণের মঠ?'

উৎপল বলল, 'দেখেছি।'

অনুরাধা বললেন, 'আমার বড় ভালো লাগে। আমার বাবার একটি মঠ আছে আমাদের গ্রামে। সামনে নদী। বাঁধানো ঘাট, জল পর্যন্ত নেমেছে। গাঁয়ের বউরা সেই ঘাট থেকে জল নিত—বেশ মনে আছে। মাঝে মাঝে দু একজন

সাধু সন্ন্যাসী সেই মঠের মধ্যে গিয়ে বসতেন। আবার রোদে তেতে কি ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে হাটুরে চাষী আর জেলের দল সেই মঠের মধ্যে গিয়ে মাথা গুঁজত। ছোট মঠ। কজনকেই বা জায়গা দিতে পারে। তবু লোকে গিয়ে ভিড় করত।'

অনুরাধা একটু থামলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমার মনে হয় সাহিত্যের কাজও অনেকটা এই মঠের মত। মিনার মনুমেণ্ট সবাই গড়তে পারে না, প্রতিষ্ঠা করারও সকলের সাধ্য নেই। কিন্তু চেষ্টা যত্ন করলে ছোট ছোট মঠ মন্দির অনেকেই হয়তো গড়ে তুলতে পারেন। যারা নদীর ভিতর দিয়ে নৌকো বেয়ে যাবে তারা দূর থেকে তার শোভা দেখবে। আবার ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে যারা কাছে আসবে—সেই মঠের মধ্যে তাদের কিছুক্ষণের জন্যে একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্বাস, একটু আশ্রয়ও মিলবে। কী বলুন?'

এ ধরণের কথা অনুরাধার মুখ থেকে সে আশা করে নি। যদিও জীবনবাবু বলেছেন—মিসেস রায় উচ্চশিক্ষিতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী। কিন্তু এসব তো বুদ্ধির কথা না।

উৎপল বলল, সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার যখন এমন চমৎকার ধারণা আছে, আর তা বেশ গুছিয়ে বলতেও পারেন, আপনার স্বামীর কথা আপনি নিজেই লিখুননা।'

অনুরাধা একটু হাসলেন, 'আমি লিখব? তবেই হয়েছে? আমাদের দৌড় ওই চিঠিপত্র আর ডায়েরি পর্যন্ত। তাও আগে আগে লিখেছি। এখন নিরক্ষরার সামিল। চলুন ওঠা যাক।'

'কোথায়?'

উঠতে যে হবে উৎপল যেন সে কথা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল। এবার মনে হল অনুরাধা তার বিদায় নেওয়ার ইঙ্গিত করছেন।

উৎপল লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি কি তাহলে কালই আসব!,

অনুরাধা হেসে বললেন, 'কাল মানে! আজকের কাজতো এখনো শেষ হয়নি। বসুন। কাল আমি অন্য সব ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আজ আপনি আসছেন বলে আমি আর কারো সঙ্গে কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখিনি। কিন্তু কালতো আর তা পারব না। চলুন ওঁর সেই ছবি, মূর্তি আর লাইব্রেরীটা আপনাকে দেখিয়ে আনি।'

উৎপল বলল, 'চলুন।'

অনুরাধাও এবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন; তারপর ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন, 'উপাদানের অভাব নেই। আপনি কী নেবেন, কতখানি নেবেন, তা আপনার ওপরই নির্ভর করে। একজনের জীবন পাঁচ দিক থেকে পাঁচ রকম করে লেখা যায়। আপনি কী লিখবেন তা আপনার দেখার ওপর লেখার উপর নির্ভর করে। কি বলুন, তাই না?'

উৎপল সায় দিয়ে বলল, 'তাতো বটেই।'

ঘরের বাইরে বিশু কিন্তু অপেক্ষা করছিল। দুজনে বেরোতেই সে বলে উঠল, 'মা, আমি যাব।'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'আমরা অনেক দূর যাচ্ছি। ওই লাইব্রেরী ঘরে।'

বিশু তবু বলল, 'আমি তোমাদের সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে যাব।'

অনুরাধা বললেন, 'বেশ চল।'

তারপর উৎপলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে—আমার জন্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। ভুল বলেছিলাম। আমার জন্যে না, আমার এই ছেলের জন্যে। আপনি অক্ষরে অক্ষরে যে মঠ গড়ে তুলবেন তার প্রতিষ্ঠাতা আমি নই, আমার এই ছেলে। কথাটা মনে রাখলে আপনার কাজের পক্ষে সুবিধে হবে।'

উৎপল এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বিশুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ভালো নাম কি? বিশ্বনাথ?'

বিশু আপত্তি করে বলল, 'বিশ্বনাথ কেন হবে! আমার নাম শ্রীবিশ্বরূপ রায়।'

অনুরাধা বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ওর বাবা নাম কেটে মাঝখানে রূপ বসিয়ে দিয়েছেন।'

উৎপল বলল—রূপ শুধু মাঝখানে কেন হবে? আদি অন্তে মধ্যে—ওর সর্বাঙ্গে রূপ।'

হল ঘরের পাশ দিয়ে প্যাসেজ। যেতে যেতে অনুরাধা ফিরে তাকালেন। ততক্ষণে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় উৎপল তাঁকে যেন আর একবার নতুন করে দেখল।

অনুরাধা স্মিতমুখে উৎপলের কথার জবাব দিলেন, গুণের ছিটেফোঁটা কোথাও নেই।'

উৎপল একথার কোন জবাব দিল না। মুখের ভাষায় ছেলের রূপের প্রশংসা করেছে, চোখের দৃষ্টিতে তার মায়ের রূপকে অভিনন্দন জানাল।

অনুরাধা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আসুন, এগোন যাক।'

ক্রমশঃ

শ্বাশুড়ীর শিক্ষা

ভাই বকুলফুল,

বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছ। কথাটার সোজা-সুজি উত্তর আমি দেবো না। একটা ঘটনা লিখছি তার থেকেই বিচার করো বউ ভাল না মন্দ।

তপু তো কি কাণ্ড করে বিয়ে করলো তা শুনেইছো। কাউকে জানানো নেই কিছু না, হঠাৎ সাদা-সিধে বিয়ে করে বসলো আমার উপর রাগ করে। আমার কত সাধ ছিল ব্যাকপাইপ বাজিয়ে তপু ঘোড়ায় চড়ে বৌ আনবে। উনি তা আমায় জুড়িগাড়ী চেপে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল শুনি? ছেলে বেকে বসলো ও ভাবে বিয়ে সে করবে না—আমরা নাকি সেকেলে। সেকেলে বৈ-কী! আটান্ন বছর বয়সে কি একেলে থাকবো নাকি?

যাই হোক, বউ দেখে আমি সেকেলে মানুষ, কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। দেখলুম বউ আমার ওপর এক বিঘৎ ঢ্যাঙা (আজকাল ঢ্যাঙা হওয়া নাকি সুন্দরের লক্ষণ), ময়লা রঙ (এটাও আজকাল চলে), একটু রোগাটে—যাকে আধুনিকারা 'সিলিন' না কি বলে ইংরিজিতে—তাই। গলার স্বর অবশ্যি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ মিষ্টি। গান-টানগুলো বাবা-মা খুব চর্চ্চা করিয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি অসুখ থেকে তখন সবে সেরে উঠছিলেন। খাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ খিট্‌মিট্‌ করেন। সব খাবার-দাবারই ওর পানসে লাগে! আমি একেবারে তিতো বিরক্ত হয়ে ঝালের ঝোল রেঁধেছিলুম—আজ খান খাবেন নয় তো এবার থেকে রান্না করাই ছেড়ে দেবো।

বৌ-মা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ওঁর খাবার থালাটা ধরে দিলুম বিছানার পাশের টেবিলে। উনি ঝোল মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছি, ছি, কি লজ্জা বলতো ভাই বকুলফুল, নতুন বৌমার সামনে। উনি আরও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"পঁয়ত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও রুগির পথ্য রাঁধতে শিখলে না?"

আমি চোখের জল ফেললুম। পাশের ঘরে গিয়ে বৌমাকে বললুম—'কি রকম খিটখিটে মানুষটি দেখেছো তো? পারবে তো ঘর করতে মা?' বৌমা হাসল। তারপর কাচু-মাচু মুখ করে বললো 'একটা কথা বলবো?'

'বলো।'

'কাল আমি রাঁধবো বাবার তরকারী?'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম—

'বলো কি বৌমা, রান্না-বান্না জানো কিছু?'

'হু, আমার মা তো অনেক রকম রান্না আমায় শিখিয়েছেন।'

পরদিন আমি গেলুম কালীঘাটে পুজো দিতে, আর বউমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসলো। তপুকে লিষ্টি করে দিল বাজার থেকে কি সব আনতে। বাড়ি ফিরে দেখি এলাহি কাণ্ড, রান্না ঘরের ভোলই পাল্‌টে গেছে—সব সাজানো গুছানো। উনুনের পাশে একটা নতুন কেরোসিন ষ্টোভ। এর মধ্যেই পাঁচখানা তরকারী সারা, উনুনে ভাত ফুটছে। তরকারীর রং দেখে জিজ্ঞেস করলুম—বাঃ এমন রং বার করলে কি করে বৌমা?' বৌমা কিছুটি না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। বুঝলুম মার কাছে শেখা গুপ্ত মন্তর আছে, বলবে না।

ওঁকে প্রথমে ঝোল ভাত দেওয়া হ'ল কি বলেন দেখার জন্য। প্রথম গ্রাসেই মুখে হাসি ফুটলো—'বাঃ, আজ রান্নাটা যেন অন্য রকম লাগছে।' বউমা একে একে পাঁচটা তরকারী ধরে দিল। উনি চেঁছে-পুঁছে সব খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলে বললেন, 'এত খেয়ে ফেললাম—একটু জোয়ানের আরক দাও তো গো।'

বউমা বাধা দিল—'না না ওসব খাওয়ার দরকার নেই। আমার বাবা তো আপনার চাইতেও বড়, কিন্তু বাবাকে ওসব খেতে হয় না। আমার মা বাবার সব রান্নাই একটু হাল্‌কা করে 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধেন। আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই 'ডাল্‌ডা'য় হয়।

'কি বললে বাছা?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'ডাল্‌ডা' বনস্পতি? তা' আমাদের লুচি-টুচি তো ভাজি আজকাল। ডিমের আমলেটও ওতেই হয়। আর কি বলে—সুজির হালুয়াও।'

'শুধু জলখাবার কেন মা, আজকাল তো অনেক বাড়িতেই সব কিছু 'ডাল্‌ডা'য় রান্না হয়। আজ যে পাঁচটা তরকারীই 'ডাল্‌ডা'য় রেঁধেছি, তাতে কি স্বাদ খারাপ হয়েছে?

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'না, না, বরং খুব ভাল হয়েছে। বউমার কাছ থেকে 'ডাল্‌ডা'র তাক্‌যাগ্‌গুলো জেনে নাওতো গো।'

বউমার গুপ্ত মন্তরটি জেনে নিয়ে খাসা রান্না করছি। আজকাল উনি সেরে উঠেছেন। খেতেও পারছেন প্রচুর। বউমা যে শুধু শ্বশুরকে বশ করছে তা-ই নয়, চিরকেলে খুঁৎকাড়া শ্বাশুড়ীও বশ মেনেছে! কি বল ভাই, বউ মন্দ না ভাল?

হ্যাঁ, আর মাথা খাও ভাই বকুলফুল, তোমার ঐ খিট্‌-খিটে বুড়োকে আমার বউমার 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধা রান্না খাইয়ে দেখ একবার—হাতে-নাতে ফল পাবে।

তোমার বকুলফুল সই

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

(১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী)

সুলতান মামুদ মির্জ্জা সমরকন্দে পলায়নের পর তাঁর প্রধান প্রধান আমির আমার কাছে আগে থেকেই তাঁদের আগমনের বার্ত্তা জানিয়ে রমজান মাসে আন্দেজানে উপস্থিত হন। তৈমুর রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী আমি কুস্মনের আসনে বসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হই। থামজে সুলতান, মেহেদি সুলতান ও মামক সুলতানকে নিয়ে প্রবেশ করতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাই। আসন থেকে নেমে এসে তাঁদের আলিঙ্গন করি এবং আমার ডান পাশে গালিচার ওপর তাঁদের বসাই।

সুলতান হোসেন মির্জা হিসার দুর্গ অধিকারের জন্য দুর্গের কাছাকাছি আস্তানা গাড়লেন। দুর্গ অধিকারের জন্য দিবারাত্র অবিশ্রান্তভাবে গোলাবর্ষণ, সুড়ঙ্গ পথ খনন, নানাস্থানে কামান স্থাপন ইত্যাদি কাজে তিনি ব্যস্ত রইলেন। চার পাঁচ জায়গা থেকে সুড়ঙ্গ পথ খনন করা হয় এবং একটা পথ নগর-ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অবরুদ্ধ নগরবাসীরা ব্যাপারটা জানতে পেরে অপর দিক থেকে গর্ত্ত খুঁড়ে ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। অবরোধকারীরা বুঝতে পেরে সুড়ঙ্গের মুখ ও পাশ বন্ধ করে দেয়। সেই ধোঁয়ার জাল বেরোবার রাস্তা না পেয়ে আবার এই দিকেই ধাওয়া করে। তখন অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের নিজেদেরই সৃষ্ট ধোঁয়ায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। যাহোক, তারা কলসী কলসী জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়। আর একদিন এক দল দক্ষ যোদ্ধা বিদ্যুৎগতিতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে একদল শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধা করে।

উত্তর দিকে যেখানে মির্জ্জা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সেইখান থেকে অনবরত গোলা নিক্ষেপ চলছিল দুর্গের দিকে। গোলার আঘাতে দুর্গের একটা অংশ চূড়াসমেত ঠিক রাত্তিরের নমাজের সময় ভেঙ্গে পড়ে। একদল উৎসাহী সেনা তখনই দুর্গ সরাসরি আক্রমণের জন্য মির্জার অনুমতি চায়। মির্জা কিন্তু রাত্রির ঘন অন্ধকারে আক্রমণ সমীচীন হবে না বলে তাদের অনুমতি দেন না। প্রভাতের পূর্ব্বেই দুর্গের ভগ্ন স্থান মেরামত করা হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে—আর সরাসরি আক্রমণ করার সুযোগ হয় না। দুই আড়াই মাস ধরে দুর্গ অধিকারের জন্য সুড়ঙ্গ-খনন, দুর্গ প্রাচীর টপকানোর চেষ্টা, গোলাবর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

সুলতান হুসেন মির্জা যখন বুঝলেন যে দুর্গ জয়ের আশা নিস্ফল হতে চলেছে এবং শীগ্‌গিরই বৃষ্টি সুরু হবে বলে সেনাদলও ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েছে, তখন তিনি শান্তি স্থাপনের একটা প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের কথা শুনে মহম্মদ বিরলাস্ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে অবরোধকারীদের পক্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করলেন। চুক্তি হলো—সুলতান মামুদ মির্জার বড় মেয়ের সঙ্গে সুলতান হুসেন মির্জার ছেলের বিয়ে দিয়ে স্থায়ী শান্তি আন্‌তে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে যতগুলো সম্ভব গায়ক আর বাজনদার সংগ্রহ করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর সুলতান হিসার থেকে ফিরে কুন্দজের দিকে চললেন।

এই রমজান মাসেই সমরকন্দে তেরখান্‌দের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বৈসানঘর মির্জ্জার আচরণের জন্যই তেরখানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর দহরম মহরম ছিল হিসারের সর্দ্দারদের এবং সেনাদের সঙ্গেই বেশী। সমরকন্দের সর্দ্দারদের ও সেনাদের ওপর তাঁর আস্থা ছিল খুব কম। সেখ আবদাল্লা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার এবং প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মির্জার এমন ভাব ও মেলামেশা ছিল যে দেখে মনে হতো—এরা প্রণয়াসক্ত যুবকযুবতী। এই ব্যাপারে তেরখানের সম্ভ্রান্ত আমিররা এবং সর্দ্দাররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তারা সুলতান আলি মির্জাকে রাজা বলে ঘোষণা করে। বাইসনঘর মির্জাকে বন্দী করার জন্য তারা অগ্রসর হয় সমরকন্দের দিকে। তিনি তখন ছিলেন সমরকন্দের নতুন বাগান বাড়ীতে। সেইখানে তারা কৌশলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ভৃত্য এবং দেহরক্ষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে আসে। বাইসনঘর মি । ও সুলতান আলি মির্জাকে এক জায়গায় রাখা হয়।

অপরাহ্নের নমাজের সময় বিদ্রোহীরা পরামর্শ করে গুরুতর সঙ্কল্প করে যে বাইসনঘর মির্জাকে 'গরসেরাইয়ে' পাঠাতে হবে। বাইসনঘর মির্জা ব্যাপার কি হতে চলেছে বুঝতে পেরে একটা ছুতা করে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের উত্তর পূর্ব্বদিকের একটা কক্ষে চলে যান। তেরখান্‌রা দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। এই কক্ষের পেছনের দিকে একটা দরজা ছিল—যার মধ্য দিয়ে বাইরে যাওয়া যেত। দরজাটা ইটের পর ইট সাজিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। তরুণ রাজা কয়েকখানা ইঁট সরিয়ে বাইরে বেরোবার পথ করে নেন এবং সেই ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর গড়খাইয়ের উপরের সাঁকো দিয়ে পার হয়ে এসে দুর্গ-প্রাচীরের ওপর কোনও রকমে উঠে লাফ দিয়ে বাইরে পড়েন এবং কোনওক্রমে ছুটতে ছুটতে খাজেখাঁর বাড়ীতে পৌঁছে যান। যারা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল তারা কিছুক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করে দেখে যে মির্জা পালিয়েছে।

যখন বিদ্রোহীদের নেতা তেরখানকে ধরে নিয়ে আসা হয় তখন বাইসেনঘর মির্জা ছিলেন আমেদ হাজির বাড়ীতে। তাকে দু'একটা

প্রশ্ন করা হয়—যার কোনও সদুত্তর সে দিতে পারেনি। যে কাজে সে লিপ্ত হয়েছিল—তা স্বীকার করার মত কাজ নয়। তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। দণ্ডের কথা শুনে তার মনোবল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রাণভয়ে সে একটা স্তম্ভ আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না। তাকে মৃত্যুদণ্ড নিতেই হলো।

সুলতান আলি মির্জ্জাকে 'গব্‌সেরাইয়ে' নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হ'লো। সেখানে তার চোখ দুটি জ্বলন্ত শলাকায়—বিদ্ধ করা হবে। তাইমুর যে কয়েকটি প্রাসাদ তৈরী করেন তার মধ্যে 'গব্‌সেরাই' একটি। এটা সমরকন্দের দুর্গনগরের মধ্যেই অবস্থিত। এই প্রাসাদের বিশেষত্ব এই যে—তাইমুর বংশের কেউ রাজা হলে এই প্রাসাদেই তাঁর অভিষেক হয়। আর যে ব্যক্তি রাজ্যলাভে ব্যর্থ হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাকেও এই প্রাসাদেই সেই দণ্ড নিতে হয়। সুতরাং সুলতান আলিকে এই প্রাসাদে পাঠানোর অর্থ কি—তা বুঝতে কারও দেরী হলো না অর্থাৎ তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুলতান আলিকে 'গব্‌সেরাই'য়ে আনা হলো এবং তার চোখে শলাকা-বিদ্ধ করাও হলো। কিন্তু শলাকা-বিদ্ধকারীর নিপুণতার অভাবেই হোক কিংবা ইচ্ছাকৃতই হোক—তাঁর চোখের কোনও ক্ষতি হলো না। একথা অবশ্য তিনি প্রকাশ করলেন না। তিনি কোনও রকমে খাজা ইয়াকহিয়ার বাড়ীতে পালিয়ে এলেন। সেখান থেকে গোপনে চলে গেলেন বোখারার তেরখানদের কাছে। এই সময় থেকে মাননীয় খাজা আবিদুল্লার দুই পুত্রের মধ্যে শত্রুতা সুরু হলো। তাঁর বড় ছেলে হলেন বড় ভাই বাইসনঘর মির্জার ধর্ম্মগুরু এবং ছোট ছেলে হলেন ছোট ভাই সুলতান আলির ধর্ম্মগুরু। কয়েক দিন পরই খাজা ইয়াহিয়ার বোখারায় চলে এলেন।

বাইসেনঘর মির্জ্জা এক সৈন্যদল গঠন করে সুলতান আলি মির্জার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বোখারার দিকে অগ্রসর হলেন। এই সংবাদ আন্দেজানে আমার কাছে এসে পৌঁছলো সাওয়াল মাসে। আমি তখনই সৈন্য নিয়ে সমরকন্দ জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। সুলতান হুসেন মির্জা হিসার থেকে চলে আসবার পর সুলতান মাহুদ এবং খসরু সা আর কোনও বিপদের কারণ নাই দেখে সমরকন্দ আক্রমণের ইচ্ছা তাদের মনে জেগে উঠ্‌লো। সুলতান মামুদ সমরকন্দ অধিকার করার জন্য অগ্রসর হলেন। খসরু সা তাঁর ভাই ওয়ালিকে পাঠালেন সুলতান মামুদের সঙ্গে। তিন চার মাস সমরকন্দ তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। এই সময় সুলতান আলির পক্ষ থেকে খাজা ইয়াকহিয়ার আমার কাছে উপস্থিত হন। তাঁর প্রস্তাব ছিল আমার ও সুলতান আলির মধ্যে যেন সহযোগিতা স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাব এমন সুন্দরভাবে উত্থাপন করলেন যাতে আমার সুলতান আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার আর কোনও বাধা থাকলো না। আমি তখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমরকন্দের দিকে চৌদ্দ মাইল এগিয়ে যাই। সুলতান আলিও বিপরীত দিক থেকে তাঁর সৈন্য নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য সেই দিকে এগিয়ে কোহিক নদীর ধারে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ঘোড়ার পিঠে বসেই আমাদের আলোচনা হয়। আলোচনা শেষ করার পর শীত ঋতু আসন্ন দেখে, আর সমরকন্দে খাদ্যশস্যের অভাব হবে বিবেচনা করে আমি আন্দেজানে ফিরি এবং সুলতান আলি বোখারায় চলে যান।

(১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী)

সুলতান আলির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় স্থির হয় যে গ্রীষ্মকালে তিনি বোখারা থেকে এগিয়ে আসবেন, আর আমি যাব আন্দেজান থেকে —সমরকন্দ অবরোধ করবার জন্য। এই চুক্তি অনুসারে আমি রমজান মাসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম—দুই তিন'শ' সেনাকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম। বাইসেনঘর মির্জা আমাদের অভিযানের খবর পেয়েই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সেই রাত্রেই আমার সেনারা তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করে। শরবিদ্ধ করে অনেককে তারা হত্যা করে। অনেককে বন্দী করে এবং তাদের জিনিষ-পত্র লুঠ করে নেয়। দুই দিনের মধ্যে আমি সিরাজ দুর্গে পৌঁছিলে, দুর্গের অধিনায়ক আমার হাতে দুর্গ সমর্পণ করে। পরদিন সকালে ইদের নমাজ পড়ে সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হয়ে যাই। সেইদিনই তিন চার শ' লোক আমার কাছে আসে এবং আমার কাজে যোগ দেয়। তারা বলে যে বাইসেনঘর মির্জা যখনই পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখনই তাঁর পক্ষ তারা ত্যাগ করে এবং দেশের রাজা অর্থাৎ আমার অধীনে কাজ করার জন্য এখানে চলে এসেছে। শেষে অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম যে বাইসেনঘর মির্জার কাছ থেকে চলে আসবার সময় তারা সিরাজ দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েই এসেছিল। কিন্তু এখানে এসে দুর্গের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা দেখে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়া ভিন্ন তাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

যখন আমি কারাবুলাকে বিশ্রামের জন্য আসি সেই সময় অনেক মোগলকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আনা হয়। তারা যে সব গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছিল—সেই গ্রামবাসীদের ওপর অবশ্য অত্যাচার করেছিল। কাসিম বেগের হুকুমে তাদের মধ্যে দুই তিন জনকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, যাতে ভয়ে আর কেউ এমন কাজ ভবিষ্যতে না করে। চার পাঁচ বছর পর আমার বিপদের সময় যখন আমি মাসিহাতে খানের কাছে যাই তখন কাসিম বেগ তাঁর এই কাজের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল মনে করেন।

কারাবুলাক থেকে অগ্রসর হয়ে নদী পার হয়ে ইয়ামের কাছে বিশ্রাম নিই। সেই সময় আমার কয়েকজন প্রধান বেগ্ বাইসেনঘর মির্জ্জার কিছু সৈন্যকে নগরের প্রমোদ ক্ষেত্রে আক্রমণ করে। এই খণ্ডযুদ্ধে সুলতান আমেদ তাম্বল গলায় বর্শবিদ্ধ হয়ে আহত হন। কিন্তু তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি। খাজা কিলানের বড় ভাই প্রধান কাজি খাজেবাদ মোল্লাও গলায় তীর বিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অশেষগুণসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষিত লোক

তাঁর ব্যসন ছিল। গীতবাদ্যেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে সম্মান করে চলতেন। তাঁর ওপর শীলমোহর রক্ষার ভার ছিল। যখন আমরা ইয়াম নগরপ্রান্তে পৌঁছাই, তখন একদল বণিক এবং জনসাধারণ নগর থেকে বেরিয়ে শিবিরের বাজারে কেনাবেচা সুরু করে। একদিন বিকেলের নমাজের পর একটা গণ্ডগোল সুরু হয় এবং ঐ সব মুসলমানদের জিনিষপত্র লুঠ হয়ে যায়। আমি আদেশ দিই যে এই লুঠের ফলে যার যার জিনিষ খোয়া গিয়েছে কাল সকালের মধ্যে তাদের তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আমার সেনাদের শৃঙ্খলাবোধ এমন ছিল যে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লুঠের মাল জিনিষের মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়—এমন কি একটা সুতোর টুকরো কিংবা একটা ভাঙ্গা সুঁচও বাদ যায়নি।

সেখান থেকে এগিয়ে এসে ইউরেটখানে নামি। সমরকন্দের ছয় মাইল পুবে এই জায়গা। এখানে আমি ছিলাম চল্লিশ পঞ্চাশ দিন। এই সময়ে নগর-ময়দানে আমার লোকেদের ও নগরবাসীদের মধ্যে অনেকবার লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে একদিন ইব্রাহিম বেগচিকের মুখে তরবারির আঘাত লাগে। তারপর থেকে তার নাম হলো মুখ কাটা ইব্রাহিম। আর একদিন খিয়াব-ন্ নদীর সাঁকোর ওপর আবুল কাসেম খুব জমক দেখিয়ে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আর একদিনের লড়াইয়ে মিরসা লাঠি চালনার ব্যাপারে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তরবারির আঘাতে ঘাড়ে এমন চোট খান যে তাঁর ঘাড়ের অর্দ্ধেক ফাঁক হয়ে যায়। তবে তাঁর ভাগ্যের জোরে ঘাড়ের শিরাগুলো ছিন্ন হয়নি।

যে সময় আমরা ইউয়েটখানে ছিলাম সেই সময় সহরের অধিবাসীরা চক্রান্ত করে একজন লোককে গোপনে আমাদের কাছে পাঠায়। সে বলে যদি আমরা রাত্রে প্রেমিকগুহার ধারে আসি তাহলে সহর আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই কথায় আমরা অশ্বারোহণ করে মোঘাক নদীর সাঁকোর উপর দিয়ে অগ্রসর হই এবং সেখান থেকে কয়েকজন বাছাই-করা অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক সৈন্যকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দিই। আমার সৈন্যরা সহরবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝবার আগেই চার পাঁচজন সৈন্যকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে সকলকেই হত্যা করে।

যতদিন আমরা এই জায়গায় ছিলাম সমরকন্দের নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা শিবির প্রাঙ্গণে জমায়েত হতো। দেখে মনে হতো জায়গাটা একটা সহরের রূপ ধারণ করেছে। সহরের বাজারে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় তার সবই এই শিবিরক্ষেত্রে কেনা যেত। কিছুদিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাদের সমস্ত দেশ, দুর্গ, পাহাড়, সমতলভূমি সবই আমাকে সমর্পণ করেছিল। কিন্তু সমরকন্দ সহরটির অধিকার তারা ছাড়েনি।

একদল সৈন্য উরগাট্ দুর্গ সুরক্ষিত করছে খবর পেয়ে আমি ইউরেট্ থেকে শিবির তুলে নিয়ে সেই দুর্গ জয় করবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। সে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখে তারা খাজা কাজির মধ্যস্থতায় দুর্গটি আমার হাতে সমর্পণ করে। তারা বশ্যতা স্বীকার করবার পর আবার আমি সমরকন্দ অধিকার জন্য সেই দিকে ফিরে যাই।

এই বছরেই সুলতান হোসেন ও বদিয়া-এজ্-জেমানের মধ্যে যে বিরোধ এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষের রূপ নিল।

সুলতান হোসেন একদিক দিয়ে আর বদিয়া-এজ-জেমান আর এক দিক দিয়ে অগ্রসর হলেন। দুই পক্ষের সৈন্য বাল্খের উপত্যকায় মুখোমুখি হলো। প্রথম রমজানের দিন বুধবারে আবুল হাসান এবং সুলতান হোসেনের কয়েকজন বেগ একদল সৈন্য নিয়ে লুঠের মতলবে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে বদিয়া-এজ্-জেমানের সৈন্যদের বিধ্বস্ত করে দেয়। এটাকে ঠিক ন্যায়-যুদ্ধ বলা না গেলেও তারা কয়েকজন তরুণ অশ্বারোহী সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসে। সুলতান হোসেন তাদের প্রত্যেককে শিরচ্ছেদ করবার আদেশ দেন। এইটি তাঁর একমাত্র নৃশংসতার দৃষ্টান্ত নয়। প্রত্যেকবার যখনই তাঁর কোনও পুত্র বিদ্রোহী হয়েছে এবং পরে পরাস্ত হয়েছে, তিনি তাঁর বিদ্রোহী পুত্রের সাহায্যকারী অনুচরদের—যারা তাঁর হাতে ধরা পড়েছে তাদের—শিরচ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন। কেন তিনি এমন আদেশ দিয়েছেন? ন্যায় কিন্তু তাঁরই দিকে। এই মির্জ্জারা পাপ কাজে এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় এমন ডুবে থাকতো যে তাঁদের বাবা যিনি জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ রাজা ছিলেন—তাঁর আগমন সংবাদ পেয়েও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ভয়ে ভীত না হয়ে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম শুভ দিন উপেক্ষা করেও তারা সুরাপান ও উচ্ছৃঙ্খল আমোদে বিভোর হয়েছিল। এটা বোঝা উচিত যে এরূপ আচরণ ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়। এটাও ঠিক যে যারা এমন নীচ প্রকৃতির—তারা প্রথম আঘাতেই ধরাশায়ী হয়।

বদিয়া-এজ জেমান কয়েক বৎসর আস্তেরাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময় তাঁর তরুণ অশ্বারোহী সেনারা খুব জমকালো পোষাক পরতো। তাঁর অস্ত্র সম্ভার বিপুল ছিল। তাঁর সৈন্যরা পরতো স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত পোষাক। তাঁর আসবাব পত্র ছিল বহু মূল্যের এবং অশ্বও ছিল অগণিত। এ সবই এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পার্ব্বত্য পথ দিয়ে পলায়ন করতে করতে এক দুর্গম চড়াই পথে তিনি উপস্থিত হন এবং অতিকষ্টে সেই পথ অতিক্রম করেন। এই সময়ে তাঁর অনেক অনুচর মারা যায়।

এই পরাজয়ের পর বদিয়া-এজ্-জেমান খুব বিপদে পড়েন। তাঁর ধনবল জনবলের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কয়েকজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য—যারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল—তাদের নিয়ে খসরুসার কাছে উপস্থিত হলেন। খসরু সা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর জন্য যা কিছু করার দরকার তা করলেন। তাঁর জাঁকজমকপ্রিয়তা এমন ছিল যে তাঁর সঙ্গে যে সব ঘোড়া, উঁট, তাঁবু এবং নানারংমের অস্ত্রশস্ত্র এসেছিল সে সব দেখে সকলেই স্বীকার করলেন যে তাঁর সুসময়ে যেমন জাঁকজমক ছিল এই দুঃসময়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি, শুধু যেগুলো সোনারূপোয় মোড়া ছিল সেগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

কুলবের সমতল ভূমিতে একটি উদ্যানের পশ্চাৎভাগে আমরা শিবির স্থাপন করলাম। এই সময় সমরকন্দের সৈন্য ও নাগরিকরা দলেদলে সহর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। আমাদের লোকজন বিপদের আশঙ্কা না করে অসতর্ক থাকায় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই শত্রুপক্ষ সুলতান আলিকে ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য করে তাকে বন্দী করে সহরে নিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আমরা সেখান থেকে সরে এসে কোহিক পাহাড়ে শিবির স্থাপন করি। সেইদিনই সৈয়দ ইউসুফ বেগ সমরকন্দ থেকে চলে এসে আমার সঙ্গে শিবিরে দেখা করে এবং আমার অধীনে কাজ গ্রহণ করে। সমরকন্দবাসীরা আমাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যেতে দেখে ভেবেছিল যে আমরা বুঝি পালিয়ে যাচ্ছি। তারা সসৈন্যে নগর থেকে বেরিয়ে মির্জ্জার সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আমি আমার সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিলম্বে শত্রুপক্ষের সৈন্যব্যূহের দুই পাশে আক্রমণ করতে আদেশ দিই। আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। শত্রু পরাজিত হ'লো। অনেক শত্রু সৈন্য ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অশ্ব থেকে নামিয়ে এনে বন্দী করা হলো। তাদের মধ্যে মহম্মদ মিস্‌কিন্ ও হাফেজ দিলদাই ছিল। হাফেজ দিলদাই তরবারির আঘাতে আহত হয়। তার হাতের মাঝের আঙুল কাটা যায়। মহম্মদ কাসিম নাবিরাকেও বন্দী করা হয়। আরও অনেক প্রধান কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট সেনাপতিদেরও বন্দী করে আনা হয়। নিম্নশ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে দেওয়ানা নামে একজন তাঁতিকে এবং আর একজনকে যার ডাক নাম ছিল বিল্‌মাহুক—বন্দী করা হয়। তারা নানা গণ্ডগোল পাকানো, দাঙ্গা বাধানো আর পাথর ছুঁড়ে মারার কাজে প্রধান পাণ্ডা ছিল। আমার পদাতিক সৈন্যদের প্রেনিক গুহায় বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসাবে তাদের শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়।

সমরকন্দবাসীদের এবার নিশ্চিত পরাজয় হলো। এই সময়ের পর তারা আর নগরের বাইরে এসে আক্রমণ করেনি। ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছিল যে আমার সৈন্যরা নগর পরিখার ধারে পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল এবং নগর প্রাচীরের কাছ থেকেই অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে এল।

সূর্য্যের তেজ তখন কমে এসেছে। শীত ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে। আমি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করলাম। স্থির হলো—সমরকন্দ নগরবাসীরা যখন অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং আল্লার দয়ায় যখন শীগগির এই নগর অধিকার করতে পারবো, তখন এই উন্মুক্ত স্থানে দারুণ শীতে অসুবিধা ভোগ না করে এখানকার শিবির তুলে নিয়ে নিকটবর্ত্তী কোনও দুর্গে শীতকালীন আস্তানা গাড়া হোক। সেখান থেকে যদি পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তা'হলে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আগেই তা করা যেতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য খাজা দিদার দুর্গই উপযুক্ত মনে হলো। শিবির তুলে নিয়ে খাজা দিদার দুর্গের সম্মুখে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাইসেনঘর মির্জ্জা সাতমাস অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পরও মনে করেছিল যে সে তার দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আর কোনও উপায় না দেখে হতাশ হয়ে দুই তিনশ ক্ষুধার্ত্ত ও প্রায় নগ্ন হতভাগ্য সঙ্গীদের নিয়ে খসরু সার আশ্রয় লাভের জন্য দুর্গ ছেড়ে চলে গেল।

বাইসেনঘর মির্জ্জার সমরকন্দ থেকে পলায়নের সংবাদ আমার কাছে পৌছতে দেরী হলো না। আমি তৎক্ষণাৎ সমরকন্দ দখলের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পরেই সমর কন্দের প্রধান প্রধান নাগরিক ও বেগমের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তাদের পেছনে ছিল তরুণ অশ্বারোহী সৈন্য। তারা সকলেই আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছিল। নগরদুর্গের কাছে এসে রোস্তান সরাইয়ে আমরা অশ্ব থেকে অবতরণ করি। আল্লার দয়ায় রবি-উল-আউল মাসের শেষে সমরকন্দ নগর ও সমস্ত দেশ আমার সম্পূর্ণ দখলে আসে।

জন-অধ্যুষিত পৃথিবীতে যত নগর আছে সমরকন্দের মত এমন সুন্দর নগর আর কোনটিই নয়—থাকলেও খুব বেশী নাই। দুর্গের চার দিকে যে প্রাচীর আছে তার দৈর্ঘ্য মেপে দেখবার জন্য হুকুম দিলাম। দেখা গেল এর পরিমাপ পাঁচ মাইল।

সমরকন্দ ও তার উপকণ্ঠে অনেক প্রাসাদ আর উদ্যান আছে, সেগুলো তাইমুরের সময় তৈরী। এখানে 'গক সরাই' নামে চারতলা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে এখানে। এর মধ্যে একটি লোহা ফটকের কাছে রমণীয় মসজিদ। এটি দুর্গ প্রাচীরের মধ্যেই পাথর দিয়ে তৈরী; হিন্দুস্থান থেকে পাথর খোদায়ের কারিগর এনে এই মসজিদ তিনি তৈরী করান। এই মসজিদের অলিন্দের উপর ভাগে এমন বড় হরফে কোরাণের কয়েকটি বয়াত খোদাই করান যে দুই মাইল দূর থেকেও সেই লেখা স্পষ্ট পড়া যায়। এই মসজিদ বাড়ীটি খুব বড় এবং অত্যন্ত জমকালো। সমরকন্দের পুব দিকে দুইটি বাগান। একটির নাম 'সাচ্চা' আর একটির নাম 'মনোলোভা'। প্রথমটি থেকে যে রাস্তা বেরিয়ে এসেছে তার দুই ধারে দেবদারু গাছ। আর একটির মধ্যে আছে এক বিরাট প্রাসাদ। হিন্দুস্থানে তাইমুরের যুদ্ধের দৃশ্যের কতকগুলি চিত্র আছে এই প্রাসাদে। যাকে বলা হয় করুণা নদী—তারই তীরে একটি পাহাড়। সেই পাহাড় ঘেঁসে আর একটি বাগান—যার নাম 'খুদে পৃথিবী'। আমি যখন দেখি তখন এ বাগান ধ্বংসের মুখে, দেখবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সমরকন্দের দক্ষিণে আর একটি বাগান-নাম 'সমতল'। সমরকন্দের কিছু নীচে দুইটি উদ্যান—একটির নাম 'উত্তর' আর একটির নাম 'স্বর্গ'। সমরকন্দের প্রস্তর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যাবে 'কলেজ' ভবন। তাইমুরের পৌত্র মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা এই কলেজ স্থাপন করেন। তাইমুর এবং তাঁর অন্যান্য বংশধর যাঁরা সমরকন্দে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের সমাধি এই কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যেই আছে।

সমরকন্দ দুর্গ প্রাচীরের মধ্যেই উলুগ বেগ নির্ম্মাণ করেন দুইটি বড় অট্টালিকা—একটি মহাবিদ্যালয়, আর একটি কনভেন্ট—সোলিনা মেলিভিদের আশ্রয়ের জন্য। কনভেন্টের দরজা এমন বিশাল যে কোথায়ও এমন আর দেখা যায় না। মহাবিদ্যালয় ও কনভেন্টের পাশেই কতকগুলি সুন্দর স্নানের ঘর। নানা রকমের পাথরের ছক কাটা নক্সায় স্নানের ঘরের মেঝে মোড়া। সমরকন্দের মধ্যে এমন সুন্দর স্নানের জায়গা আর নাই।

কলেজ ভবনের দক্ষিণে একটি মসজিদ। এই মসজিদকে বলা হয় 'বাঁকা মসজিদ'। কারণ এই মসজিদ বাঁকানো তক্তা দিয়ে তৈরী এবং তাতে নানা কারুকার্য্য ও ফুলের নক্সা আছে। মসজিদের দেওয়াল ও ছাদ একই ভাবে সাজানো।



মেয়েদের কথা

প্রাচীন ভাস্কর্য্যে রমণী-বীরত্বের ইতিহাস

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বত্র-সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। যোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কামনা কেহ করিবে না।" বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালার নারী-প্রগতির দিনে সেকালের রমণী সমাজের এক বিস্মৃত ইতিহাস দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিলে অতীতের আদর্শ নয়ন-গোচর হইবে না। ব্রত-কথা, পল্লী-কবিতা, প্রাচীন সাহিত্য, বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের বিবরণ প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালার নারী সমাজের যে অতীত ইতিহাস অবগত হওয়া যায় তাহাতে বঙ্গ রমণীর শৌর্য্য বীর্য্যের অনেক পরিচয় জানিতে পাওয়া যায়; তাহা যে কোনো দেশেরই রমণী সমাজের গৌরব বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বঙ্গরমণীর শৌর্য্য কাহিনী শুধু কবি-কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ নহে; সমসাময়িক প্রশস্তিতে কীর্ত্তিত এবং কঠিন শিলার বক্ষেও উহা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম নামক স্থানের "খেলার গড়" ও "চন্দ্ররেখাগড়" নামক ভগ্নপ্রায় দুর্গের অভ্যন্তরে একখানি জীর্ণ গৃহের কোণে নীল প্রস্তরের গাত্রে আজিও এক অশ্বারূঢ়া নারী-মূর্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় (১)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক এই মূর্ত্তি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন "বঙ্গ দেশের দুর্গ প্রাচীরে ভাস্কর যে বিনা কারণে অশ্বারূঢ়া রমণী মূর্ত্তি খোদিত করিবে তাহা মনে হয়না" (২)। পাবনা শহরের নিকটবর্ত্তী এক ধ্বংসস্তূপ মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকখানি প্রস্তর-গাত্রে অসিধারিণী রমণী মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে (৩)। পাহাড়-পুরের যে বিশাল মন্দির আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালা, তথা ভারতের ইতিহাসে নূতন আলোক পাত করিয়াছে তাহাতেও বঙ্গরমণীর শৌর্য্যের পরিচয় অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই সুবিশাল মন্দির গাত্রে আজিও রথ-চালনাকারিণী রমণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। খোদিত মূর্ত্তিশিল্প ইহাও সূচিত করে যে সেকালে রাজকুমারীও অসিধারণ করিতে কুণ্ঠিতা ছিলেন না (৫)। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মুক্তেশ্বর মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যের বিবরণ দিবার সময় লিখিয়াছেন "একটি মহিলা, এক দণ্ডায়মান হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন এবং সম্মুখস্থ এক অসিবর্ম্মধারী অসুরের বিরুদ্ধে তাঁহার তরবারি উন্মুক্ত (৬)। পাহাড়পুরের খোদিত মূর্ত্তি শিল্প আজিও তীর ধনুক ও যেড়্যাধারিণী রমণী মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করে (৭)। পাবনা শহরের উপকণ্ঠস্থ কালাচাঁদপাড়ায় অবস্থিত "জোড় বাংলা" নামক মন্দির গাত্রে আজিও অসি ও ধনুকধারিণী রমণীর মূর্ত্তি পোড়া মাটির ফলকে উৎকীর্ণ জানিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ৩১ নং চিত্রে উৎকীর্ণ একটি খিলানের নিম্নভাগে প্রহরায় নিযুক্ত অস্ত্রধারিণী রমণীগণকে দেখিতে পাওয়া যায় (৮)। ফরিদপুর জেলার ফুলকুড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত একটি মূর্ত্তির

১। A list objects of Antiquarrian Interest in the Lower Province of Bengal—Bengal Secretariat Press—p 17; মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু—৩৫৯ পৃঃ

২। বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—৪৫ পৃঃ

৩। পাবনাজেলার ইতিহাস—রাধারমণ সাহা—১ম খণ্ড ৬ পৃঃ

৪। Annual Report of the Archaelogical Survey of India—1926-27.

৫। বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—১৩১ পৃঃ

৬। ভারতী—১৩১৮, আষাঢ়—২২০ পৃঃ

৭। বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার—১৭৯ পৃঃ

৮। ভারতবর্ষ ১৩৪৮, ভাদ্র—৩২৯ পৃঃ

পাদদেশে দুইটি অশ্বারোহিণী শরনিক্ষেপরতা স্ত্রীমূর্ত্তি (৯) অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার বেৎনা গ্রামে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি যুদ্ধরতা রমণী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (১০)। জলপাইগুঁড়ি শহরের পাণ্ডাপাড়ায় কষ্টি প্রস্তরে খোদিত একটি অসিধারিণী রমণী মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে যে সকল খোদিত প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলক আছে তাহার কয়েকটিতে রমণী বিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে দেখা যায় "মেয়েরা নানাভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে।···পুরুষ ও স্ত্রী বাদ্যকরগণ ও তাহাদের বাদ্যযন্ত্র,······অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত পুরুষ ও নারী, ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথারোহী যোদ্ধা,···মৃত জন্তু লইয়া পদক্ষেপকারিণী শবর রমণী—এইরূপ অসংখ্য দৃশ্য শিল্পী খোদাই করিয়া রাখিয়াছে" (১১) সুন্দরবন অঞ্চলের কুতুবদিয়াতে "দুইটী ধানুকী কন্যা শরাঘাতে রত" এরূপ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (১২)।

খণ্ডগিরির "রাণী গুম্ফাতে"—অদ্যাপি রমণীর অসি-ধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় অঙ্কিত রহিয়াছে। গুহার গাত্রে চতুর্থ চিত্রে পুরুষ ও রমণীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে। বীরাঙ্গনা বর্ম্মে চর্ম্মে সুসজ্জিতা; হস্তে শত্রু নিপাত করিবার জন্য অসি উদ্যতা (১৩)। রাণীগুম্ফার ষষ্ঠচিত্রে রমণী কর্ত্তৃক শিকার করিবার দৃশ্য খোদিত রহিয়াছে। এই চিত্রে রাজকুমারী দ্রুতধাবমান হরিণের প্রতি শর নিঃক্ষেপ করিতেছেন দেখা যায় (১৪)। "গণেশ গুম্ফার" খোদিত চিত্রসমূহেও রমণী বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সে চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে, বৃক্ষতলে অবসর বিনোদনকালে রমণী শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভীতা না হইয়া তিনি অসি হস্তে আক্রমণকারীকে বাধা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন (১৫)। ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে যে সকল যুদ্ধাভিযানের চিত্র খোদিত রহিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে পদাতিক সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিত, তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তীযুথসমূহ অগ্রসর হইত (১৬)। এই সকল খোদিত পুরুষ ও রমণী মূর্ত্তি, তাহাদের কামনা ও বাসনার প্রতিচ্ছবিরূপে জীবন্ত হইয়া আমাদের নয়ন সম্মুখে বীরত্বের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয় (১৭)। সেকালের এই সকল চিত্র সখের চিত্রকরের অঙ্কিত কাল্পনিক চিত্র মাত্র নহে; উহা মরণ যজ্ঞের মুক্ত বেদীর উপর রমণীর আত্ম প্রতিষ্ঠার জীবন্ত আলেখ্য?

বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত কঠিন প্রস্তরে খোদিত অষ্টভূজা বা দশভূজা মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি আজিও জনসাধারণের ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। সে মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে—"সিংহবাহিনী দেবী সদ্য-নিহত মহিষের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত অসুরের সহিত যুদ্ধে নিরত; তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, খেটক, শর, খড়্গ, ধনু, পরশু, অঙ্কুশ, নাগপাশ প্রভৃতি আয়ুধ" (১৮)! এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রমাণ করে যে, সেকালে বাঙ্গালার রমণীগণ শৌর্য্যে-বীর্য্যে যে সকল বীর কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, শিল্প-কলাতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গালার জন-সমাজে সেকালের বিজয়ী যুগের নব-জীবন সংস্পর্শে যে ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে মাতৃমন্ত্রের উপাসক বাঙ্গালী মাতৃমূর্ত্তিতে দেবীত্ব আরোপ করিয়া হস্তে নানাবিধ আয়ুধ দান করিয়া তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ মূর্ত্তির তুলনা নাই। ইহা

৯। ভারতবর্ষ—১৩৪৮, ফাল্গুন—২৭০ পৃঃ
১০। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—১৪৯ পৃঃ
১১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদি পর্ব্ব—৭৮২ পৃঃ
১২। বঙ্গশ্রী—১৩৫৫, বৈশাখ—৩৭৯ পৃঃ
১৩। The Prince and the princess each armed with swords and oblong shields engaged in combat" —orissa—W. W. Hunter—p 185
১৪। The sixth is the hunt.·········the princes shooting at a bounding antelope—Hunter orissa-১০৮
১৫। The third is the battle······the lady and her suiter fight with oblong sheilds and swords—Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter—vol II—p 186.
১৬। বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
১৭। Hunter orissa—vol I—p 170.
১৮। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—১৫৯ পৃঃ

বঙ্গবীরাঙ্গনার বাহুবলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া দাবী করিতেছে। সেকালের বঙ্গ-রমণী "যাহাকে ধরিত, তাহাকে কেমন করিয়া ধরিত, কেমন করিয়া পদদলিত করিত, কেমন করিয়া আত্মপ্রাধান্য সুসংস্থাপিত করিত, তাহার ভাবসামগ্রী লইয়াই যেন সেকালের মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি গঠিত। সে ভাব অপরাজিতা মহাশক্তির মহাভাব, উদ্যমে, অধ্যবসায়ে, অকুতোভয়তায়, অসঙ্কোচে অনন্য-সাধারণ" (১৯)।

স্বর্গতঃ ঐতিহাসিক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রাক্-বীর আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্ব ভারতে অভিযান করিয়া হঠাৎ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করার কাহিনী উল্লেখ করিয়া এক অভিনব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —"আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্ভবতঃ হিন্দুরা একটা পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত করিয়া জাতীয় গৌরবের স্মৃতিরূপে এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন···সকলেই জানেন আলেকজান্দার মহিষের শিং শিরস্ত্রাণরূপে ব্যবহার করিতেন। ইনিই কি চণ্ডীর কথিত মহিষাসুর (২০)?" প্রবীণ ঐতিহাসিকের এই অনুমান সত্য কিনা তাহা ভবিষ্যতই নির্দ্ধারণ করিবে।

এ দেশের পুরাণসমূহে রূপকছলে যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক্-দিগের সহিত ভারতীয় সংঘর্ষের কিছুটা আভাষ আছে বলিয়াই মনে হয়। ভারতের হিন্দুশক্তি কোন বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করিবার জন্য আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধভাবে একত্রিত হইয়াছিল—চণ্ডী কথিত "মহিষাসুর বধ" কাহিনীর মধ্যে এইরূপ কোন সত্য নিহিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। "মহিষ" শব্দটি বেদে যেমন মহিষ-পশু অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তেমনই সায়নাচার্য্য কোন কোন স্থানে (ঋগ্বেদ ৮।১২।৮) "মহিষ" শব্দটি মহান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে মহিষাসুর অর্থে মহান্ অসুর। দেবী হয়ত মূলে মহান্ অসুর মর্দ্দন বা পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই মহিষাসুরমর্দ্দিনী—পরবর্ত্তীকালে রূপক স্থলে পশু-মহিষের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারই ইঙ্গিত করিয়া স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রশ্ন করিয়াছেন—"ইনিই কি চণ্ডীর কথিত মহিষাসুর?" অধ্যাপক শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও প্রশ্ন করিয়াছেন—"চণ্ডীর কাহিনীর পশ্চাতে কি বহু প্রাচীন কালের কোনও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল?" চণ্ডী কাহিনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাহিনী ছিল কিনা, থাকিলে তাহা কি ছিল তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যে এই চণ্ডী কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া নানা প্রকারে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার নমুনা পরবর্ত্তী ভারতীয় সাহিত্য সমূহে দেখিতে পাই।···প্রচলিত মতে আমরা দেখি, চণ্ডী কাহিনীর উৎপত্তি স্থলের সম্ভাবনা দুইটী অঞ্চলে ধরা হয়। এক উজ্জয়িনী অঞ্চলে, অপর বাঙলা দেশে। গুরুগোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডী-চরিত্রে' দেখিতে পাওয়া যায় চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে এই রাজকন্যাই রাজ্য পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডীই রাজার একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের খুব খ্যাতি ছিল। একদিন রাজকুমারী চণ্ডী নদীতীরে তর্পণাদির জন্য যাইতেছিলেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া ব্যাঘ্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং অসুরগণকে নিহত করিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহিনী কোথায় পাইলেন? 'চণ্ডী সপ্তসতী'কে অব-লম্বন করিয়া নিজের কবি-কল্পনায় কি তিনি এই লৌকিক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন? 'চণ্ডীর' কাহিনীর পশ্চাতেও কি বহু প্রাচীন কালের এইরূপ কোনও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল (২১)? গ্রীক্ অভিযানকালে পূর্ব্ব-ভারতের নারী সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্বের বিবরণ হইতেই যেন এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে। কালিদাস

১৯। মহিষমর্দ্দিনী—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সাহিত্য, ১৩২০, কার্ত্তিক—১৪৭ পৃঃ

প্রভৃতি কবির লেখায় রমণীরা যে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বীরবেশে শরীর-রক্ষীর কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। মুদ্রারাক্ষসেও সেইরূপ বর্ণনা আছে। গ্রীক্ বিবরণী হইতেও এদেশে নারী সৈন্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। মৌর্য্যযুগের পাটলীপুত্রের বর্ণনায় মৃগয়াকালীন সম্রাটের ৫০,০০০ যুবতী সেনার শরীর রক্ষার কাহিনী সেইযুগের কৃষ্টির দ্যোতক বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্ত্তী কালে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বনবর্মদেবের তাম্রশাসনে "মহল্লক প্রৌঢ়িকা"-নাম্নী নারী সৈন্যের অস্তিত্বের কথাও এই বিবরণীর পরিপোষক মাত্র। 'রিয়াজ-উস-সানাতিনেও বাঙ্গালাদেশে নারী সৈন্যের অস্তিত্বের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মাতৃতান্ত্রিক পূর্ব্ব-ভারতের আদিম কৌম সমাজের অন্তর্গত নারী সৈন্য-বাহিনীই যে আলেকজান্দারের পশ্চাদপসরণের অন্যতম কারণ এবং নারী-সৈন্য বাহিনীর অধীনেত্রীই যে ছিল ধর্ম্মনায়ক গুরুগোবিন্দসিংহ-কথিত উজ্জয়িনীর রাজকন্যা চণ্ডী, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী বলিয়া বর্ণিত কোন কোন স্থান বাঙ্গালা দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনী-উড্ডিয়ান-উড্ডীন, নামে একটি রাজ্য যে এককালে দক্ষিণ-বঙ্গেই—(গ্রীক কথিত গঙ্গারাষ্ট্র অঞ্চলে অবস্থিত ছিল তাহা আধুনিক তথ্যানুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে (২২)। ব্যাঘ্র-বাহন দক্ষিণ রায় তো বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। দেবীর পূজা যে পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরিত হইয়া দেবতার পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিবে? এই সম্ভাবনা অস্বীকার করিতে একটু দ্বিধা হয় বৈকি ?

প্রতীচ্যের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডারের বিজয় কাহিনী উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের কাব্যে, নাটকে, সাহিত্যে—তাহার ইতিহাস পুরাণে পর্য্যন্ত, কেহ গ্রীক্ অভিযানকে লিপিবদ্ধ করিয়া উহার যথাযথ মর্য্যাদা প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিল না। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' বর্ণিত (চণ্ডী—সপ্তশতীতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া) চণ্ডী কর্ত্তৃক 'মহান্' অসুর মর্দ্দনের কাহিনীর মধ্য-দিয়াই হিন্দুগণ যেন আলেকজাণ্ডারের পরাজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া রমণী বিক্রমের স্মৃতি সানন্দে ও ভক্তিভরে পূজা করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই মনে হয়। এই অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতেই হইবে। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে বঙ্গরমণীর পরাক্রম উদ্যমে, অধ্যবসায়ে, অকুতোভয়তায় অনন্য-সাধারণ বলিয়াই পরিচিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মাতৃপূজা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। "বাংলার বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—এ দেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠাবেশী; মধ্যযুগেও তাহাই ছিল।............আদিম ভৌম সমাজে তো ছিলই, বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন।.........নারীকে শক্তি স্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা—সৃষ্টি রহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা............বিশেষ ভাবে বাংলার সৃষ্টি(২৩)। প্রাচীন বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়—মাতৃপূজা বাঙ্গালার আর্য্যগণ প্রথমে স্বীকার করেন নাই। বণিকদিগের মধ্যে উহা প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়াছিল এবং প্রথমে মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল (২৪)। যে করিয়াই হক—শেষ পর্য্যন্ত সারা বাঙ্গালায় উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর কত মন্দিরে, কত দেউলে, কত শিল্পে, শুধু বাঙ্গালাদেশ কেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি পৃথিবীর নানা দেশে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের নানাদেবমন্দিরে যেমন মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তেমনি শ্যাম, কম্বোজ, জাভা, সুমাত্রার নানাস্থানেও এই মূর্ত্তির পরিচয় লাভ ঘটে।

সেন-নরপতি বল্লালসেনের সমসাময়িক লোচন-পণ্ডিত তাঁহার "রাগ তরঙ্গিণী" গ্রন্থে "তুম্বুরা নাটকের" উল্লেখ করিয়াছেন। এই তুম্বুরা নাটকের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই; তবে মনে হয় কোন বিশেষ নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কিত ছিল এই তুম্বুরা নাটক। লোচন এই গ্রন্থ হইতে

২২। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত; বাঙ্গালীর ইতিহাস ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদি পর্ব্ব।

২৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদিপর্ব্ব—৮৫২-৫৩ পৃঃ

২৪। বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন—২য় খণ্ড—৯৭৩ পৃঃ

কিছু কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন। একটি উদ্ধৃতিতে আছে—

ইন্দুস্থানং সমারভ্যং যাবদ্দুর্গা মহোৎসবম্।
প্রাতগায়ন্ত দেশাখ্যো ললিতঃ পট মঞ্জরী॥

এই যে শুক্লপক্ষের (দেবীপক্ষ) সূচনা হইতে দুর্গা মহোৎসব পর্য্যন্ত প্রাতঃকলে দেশাখ, ললিত ও পটমঞ্জরী রাগে গান গাওয়া—এযেন একান্তই বাঙ্গালীর দুর্গাপূজার আগের কয়েকদিনের আগমনী গান এবং রাগগুলিও সেই দিক হইতে লক্ষ্য করিবার মত। এই ভাবে দুর্গামহোৎসব ত আর কোথাও হয় না বা হইত না! সেই জন্যই মনে হয় গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি প্রাচ্যদেশ—বিশেষ-ভাবে গৌড়বঙ্গের কথাই যেন বলিতেছেন (২৫)।

ইতিহাসে জানা যায়, বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেখানে নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। "চণ্ড-কৌশিক" নাটক মহীপালদেবের বিজয় কাহিনীকে স্মরণীয় করিবার জন্য, আর্য্য ক্ষেমীশ্বর কর্তৃক বিচরিত ও নটগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়া যে সমর কাহিনীর স্মৃতি পুজা করিয়াছিল, সেই সমরের ফলে বাঙ্গালীর নিকট কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। "তুম্বুরা নাটক" গ্রন্থে দুর্গামহোৎসব-কালীন গীতগুলিও এইরূপ কোন প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে কিনা তাহা কে বলিবে? যাহা হউক, বঙ্গরমণীর এই গৌরব কাহিনী এখন বিস্মৃত বটে,কিন্তু সুনিপুণ ভাস্কর কঠিন শিলা তক্ষণ করিয়া জননীর বীরমূর্ত্তির যে প্রমাণ রাখিয়াছেন—কাল এখনও তাহা ধ্বংশ করিতে পারে নাই। বিস্তৃত বঙ্গের নানা অঞ্চল হইতে সেই বীর-কীর্ত্তির জাজ্জ্বল্য প্রমাণ এখন শিল্পকলারূপে আবিষ্কৃত হইয়া দেশ বিদেশের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বঙ্গমাতার চরণে অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছে।

২৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদি পর্ব্ব—৭৬৬ পৃঃ



হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

৭

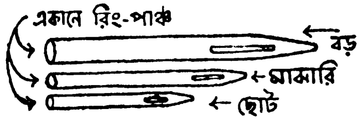
এবারে মোটামুটিভাবে চামড়ার কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি দরকারী বিষয় জানিয়ে আমাদের এ আলোচনা শেষ করবো।

'লেসিং' (Lacing) বা 'ফিতা-বোনার' কাজের মতো, 'পাঞ্চিং' (Punching) বা 'চামড়া-সেলাইয়ের জন্য ছিদ্র-রচনা' করাও এ কারুশিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ। চামড়ার উপরে সুষ্ঠুভাবে ছিদ্র-রচনা করতে হলে প্রয়োজন —'স্প্রিং-পাঞ্চ' (Spring Punch) কিম্বা 'একানে রিং-পাঞ্চ' (Individual Ring Punch) যন্ত্র। এ দুটি সরঞ্জামের কথা আগেই জানিয়ে রেখেছি—চামড়ার কারু-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে। এইসব সরঞ্জামের সাহায্যে চামড়ার উপরে কিভাবে পরিপাটি ছিদ্র-রচনা করা যায়, আপাততঃ একটা মোটামুটি আভাষ দিই।

অভিজ্ঞ কারুশিল্পীদের মতে, ছুঁচ ফুঁড়ে চামড়া সেলাইয়ের চেয়ে, 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রের সাহায্যে পরিপাটিভাবে চামড়ার বুকে প্রয়োজন মত 'ছিদ্র' (Punch Hole) রচনা করে নিয়ে 'লেসিং' বা 'ফিতা-বোনার' কাজ করাই ভালো। কারণ, ছুঁচ দিয়ে চামড়ার বুকে 'ছিদ্র' রচনা করলে সে জায়গাটি উঁচু এবং অপরিচ্ছন্ন ধরণের হয়—তাছাড়া ছিদ্রের আশ-পাশের চামড়াও বিপরীত-দিকে ঠেলে ওঠার দরুণ শিল্প-সামগ্রীটিরও সৌষ্ঠব-হানি করে অনেক-খানি। কিন্তু 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রের সাহায্যে 'ছিদ্র' রচনা করলে, 'ছিদ্রের' জায়গার বাড়তি-চামড়াটুকু বেমালুম ছাঁটাই হয়ে

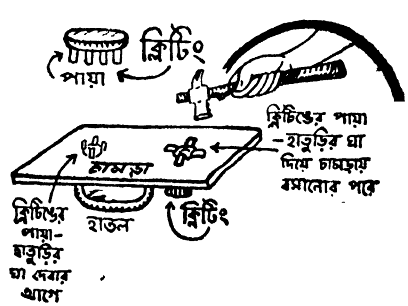
যায় বলেই শিল্প-সামগ্রীটিকে আগাগোড়া বেশ পরিপাটি-ভাবে সেলাই করা চলে। গত বৈশাখ সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন বলেছি, তেমনিভাবেই 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রটি দিয়ে হাতের কাজের চামড়াটির উপরে 'ছিদ্র' রচনা করতে হবে। 'স্প্রিং-পাঞ্চিং' (Spring punch) যন্ত্র দিয়ে চামড়ার বুকে 'ছিদ্র' রচনা করতে হলে, গোড়াতেই 'লেসিং'এর গর্ত্ত ছোট কিম্বা বড়—কোন্ সাইজের হবে, সেটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। তারপর ঐ 'স্প্রিং-পাঞ্চ' যন্ত্রের ছুঁচালো 'ছিদ্র-ছাটবার মুখটিকে' (Punch-hole-cutting Point) ছোট, বড় বা মাঝারি, প্রয়োজন মত ছাঁচে 'ছিদ্র-রচনার' (Hole Punching) ব্যবস্থানুযায়ীভাবে বসিয়ে নিয়ে হাতের কাজের চামড়াটিতে সুষ্ঠু-ধরণে 'গর্ত্ত' (Punch hole) বানাতে হবে। 'ছিদ্র-রচনা' (Hole-Punching) করবার সময়, 'স্প্রিং-পাঞ্চ' (Spring-Punch)-যন্ত্রের মুখের ভিতরে 'গর্ত্তের চিহ্ন-আঁকা' চামড়ার টুকরো-টিকে ভালো করে বসিয়ে রেখে যন্ত্রের হাতলে জোরে হাতের চাপ দিলেই নিখুঁত এবং সমান-ধাঁচের 'লেসিঙের-গর্ত্ত' (Lacing holes) বানানো যাবে। তবে, 'একানে রিং-পাঞ্চ' (Individual ring punch) ব্যবস্থা কিন্তু তেমন নয়। 'একানে রিং পাঞ্চ' (Individual ring punch) হলো—ছোট, বড়, মাঝারি বিভিন্ন ধরণের 'ছিদ্র-মুখ' বসানো আলাদা-আলাদা কয়েকটি গোল আকারের বড়-বড় পেরেকের মতো চেহারার লোহার কাঠি। চামড়ার বুকে গোল-মুখওয়ালা এই সব লোহার কাঠি বসিয়ে হাতুড়ীর মৃদু ঘা দিয়ে প্রয়োজন মত ছোট, বড় অথবা মাঝারি আকারের 'ছিদ্র-রচনা' (Hole-punching) বা 'পাঞ্চিং' এর কাজ করতে হয়। তবে এ-ধরণের 'পাঞ্চিং'এর কাজে মেহনৎ আর সময় দুইই লাগে 'স্প্রিং-পাঞ্চে' কাজ করা এর চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক এবং সময়ও নষ্ট হয় কম। চামড়ার উপর 'পাঞ্চিং' করবার সময় কারু-শিল্পীকে বিশেষ হুঁশিয়ার থাকতে হবে—প্রত্যেকটি ছিদ্র (punch-holes) যেন পরিপাটি-নিখুঁত ধরণের হয়। এ কাজে ত্রুটি ঘটলে, চামড়ার জিনিষটিরও শ্রী-হানি ঘটবে অনেকখানি। প্রসঙ্গক্রমে, শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্ম চিত্রের সাহায্যে 'স্প্রিং-পাঞ্চ' (Spring Punch) আর 'একানে রিং পাঞ্চ' (Individual Ring Punch) ব্যবহার করে চামড়ার বুকে কি-পদ্ধতিতে ছিদ্র রচনা হয়, তার একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো।





'লেসিং' আর 'পাঞ্চিং'এর মতোই, 'ক্লিটিং (clitting) অর্থাৎ চামড়ার সামগ্রীতে 'বক্‌লস্' (Buckles), আংটা (Rings) লাগানো এবং 'বাটনিং' (Button fitting) অর্থাৎ চামড়ার জিনিষপত্রে বোতাম বসানোর কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সে বিষয়েও মোটামুটি একটু আভাস জানিয়ে রাখি।

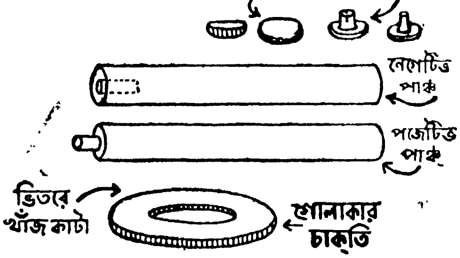
বাজারে নানা ধরণের 'ক্লিটিং' পাওয়া যায়। তবে, চামড়ার সামগ্রীর হাতল, আংটা প্রভৃতি বানানো কাজে যে-ধরণের 'ক্লিটিং' ব্যবহার হয়, সেগুলির মাথা হয় চ্যাপ্টা-ছাঁদের এবং সে-মাথার তলায় থাকে দুই বা তার চেয়ে বেশী ঈষৎ-দীর্ঘ লম্বা ধরণের ক'টি 'পায়া'। ক্লিটিং এর উপর-



কার চ্যাপ্টা-ছাঁদের অংশটিকে চামড়ার বাইরের দিকে বসিয়ে, 'পাঞ্চ করা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঈষৎ-দীর্ঘ' ঐ পায়াগুলিকে নীচে অর্থাৎ চামড়ার অন্দর-দিকে প্রবেশ করিয়ে উল্টোভাবে এ সব 'পায়ার' কিনারাগুলিকে আগা-গোড়া ভালো করে মুড়ে দিতে হয়। তারপর সেই মুড়ে-দেওয়া 'পায়াগুলিকে' হাতুড়ীর মৃদু ঘা দিয়ে ঠুকে-ঠুকে

বসিয়ে চামড়ার বুকে পাকা-মজবুতভাবে এঁটে দিলেই ক্লিটিংএর পর্ব্ব শেষ।

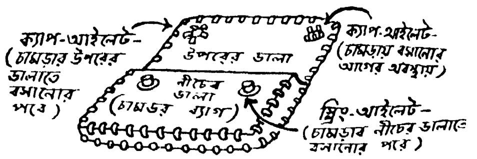
চামড়ার জিনিষপত্রে বোতাম বসানোর পদ্ধতি কিঞ্চিৎ আলাদা-ধরণের! এ কাজের জন্য কয়েকটি বিশেষ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। চামড়ার জিনিষপত্রে সচরাচর যে-ধরণের বোতাম লাগানো হয় সেগুলির চেহারা কতকটা জামায়-বসানোর টীপ-কল (Press Botton) বা টেপা টুপির মত ধাঁচের—সেটি হলো উপরের ডালার অংশ··· চামড়ার জিনিষের বাহির দিকে থাকে এবং অন্যটির চেহারা, দেখতে কতকটা ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত 'ক্লিটিং-বোতামের' অনুরূপ···এটি আসলে বোতামের নীচের অংশ··· চামড়ার ভিতর দিকে অর্থাৎ 'অন্তরের' দিকে থাকে। এ সব বোতামের টুপির মতো উপরাংশের নাম—'ক্যাপ্-আইলেট' (Cap-Eyelet) এবং নীচের ডালার অংশটিকে বলা হয়—'স্প্রিং-আইলেট' (Spring Eyelet)!



চামড়ার উপরে বোতাম বসাতে হলে, বিশেষ ধরণের 'ডাইস্' (Dice) বা ছাঁচের প্রয়োজন। এই 'ডাইসটির' তিনটি অংশ থাকে···প্রথম অংশ—পিতলের তৈরী চ্যাপ্টা গোলাকার একটি চাকতি···সে-চাকতির একদিক হয় সমান এবং অন্য দিকে থাকে নাতি-গভীর গোল-আকারে কাটা একটি খাঁজ, দ্বিতীয় অংশটি হলো—প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা পিতলের একটি 'দণ্ড' বা 'রড্' (Rod)···সে 'রডে'র মুখে থাকে ⅛ ইঞ্চি গভীর একটি ছিদ্র···'ডাইসের' এ জিনিষটির নাম 'নেগেটিভ পাঞ্চ' (Negative punch); 'ডাইসের' তৃতীয় অংশটির নাম হলো—'পজেটিভ পাঞ্চ' (Positive punch)···এটিও ইঞ্চি তিনেক লম্বা। আরেকটি পিতলের 'দণ্ড' বা রড্ (Rod)···এ 'রডের'ও মুখ ⅛ ইঞ্চি লম্বা এবং সরু, তবে সে-মুখে অন্য 'রডের' মতো ছিদ্র থাকে না···পেরেকের মতোই ভরাট হয় তার সরু মাথাটি!

সাধারণতঃ চামড়ার জিনিষপত্রের ছাঁটাই (Cutting), নক্সা-চিত্রণ (Modelling), রঙ-লেপন (Colouring), 'ফিতা-সেলাই' (Lacing) প্রভৃতি অন্যান্য সব কাজ সেরে নেবার পর বোতাম বসানোর পালা। বোতাম-বসানোর কাজ খুব সাবধানে করা চাই···এ-কাজে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে চামড়ার জিনিষটিতে দাগ ধরার ও অসুন্দর দেখানোর সম্ভাবনা আছে। চামড়ার জিনিষ-পত্রে, যেখানে বোতাম বসাতে হবে, সেই জায়গাটি গোড়াতেই পেন্সিল কিম্বা 'ট্রেসারের' মৃদু চাপ দিয়ে চিহ্নিত করে নেওয়া প্রয়োজন···চিহ্নটি এমনভাবে রচনা করতে হবে যে চামড়ার উপরকার ও নীচেকার ডালা দুটির বাইরে এবং ভিতরে—উভয় দিকেই তার সুস্পষ্ট নিশানা মেলে। এবারে ঐ নিশানা-চিহ্নের জায়গায় বোতামের 'ক্যাপ্-আইলেটের' মাপ-অনুসারে 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রের সাহায্যে গোল-ধরণের ছিদ্র রচনা করতে হবে। তারপর ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চামড়ার উপরকার 'ডালার' নীচের দিক থেকে বোতামের 'ক্যাপ্-আইলেটের' নিম্নাংশটিকে পরিয়ে দিয়ে, সেটির যেটুকু অংশ ছিদ্রের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে তার উপরে 'ক্যাপ্-আইলেটের' 'টুপির-ছাঁদের' অংশটিকে পরিপাটিভাবে বসিয়ে দিতে হবে। এভাবে বসানোর পর, 'টুপির-ছাদের' অংশটিকে 'ডাইসের' গোল খাঁজ-কাটা প্রান্তভাগে চিৎ করে বসিয়ে 'ক্যাপ্-আইলেটের' চ্যাপ্টা মুখের উপর 'পজিটিভ পাঞ্চের' 'রড্' বা দণ্ডটিকে সোজাভাবে রেখে ঘা মেরে ঠুকে দিলেই বোতামের 'ক্যাপ্' এবং 'আইলেট' দুটি অংশকেই বেশ কায়েমীভাবে একত্রে জোড়া দেওয়া যাবে। এরপর চামড়ার নীচেকার ডানার 'পাঞ্চ'-করা ছিদ্রটিতে বোতামের অপর অংশ অর্থাৎ 'স্প্রিং-আইলেট্' (Spring Eyelet) বসাতে হবে। চামড়ার বুকে এটিকে বসানোর পদ্ধতি হ'লো উপরোক্ত 'ক্যাপ-আইলেট' আঁটবার পদ্ধতিরই অনুরূপ। তবে, 'ক্যাপ্-আইলেট' পরানোর সময় যেমন 'ডাইসের' 'পজেটিভ পাঞ্চ' এবং পিতলের গোল-চাকতির খাঁজ-কাটা প্রান্তটিকে ব্যবহার করতে হয়, 'স্প্রিং-আইলেট' বসানোর সময় তেমনি 'ডাইসের' 'নেগেটিভ

পাঞ্চ' এবং ঐ গোল-চাকতির 'খাঁজ না-কাটা' সমান দিকটি ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্য রেখা-চিত্রের সাহায্যে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া হলো।



'টিপ-কল' বোতামের (press button) বদলে চামড়ার তৈরী জিনিষপত্রে অনেকে 'জিপ্ ফাষ্টনার্' (Zip Fastner) ব্যবহার করেন— তাই চামড়ার জিনিষে 'জিপ্-ফাষ্টনার্' সেলাই করার বিষয়েও মোটামুটি আভাস দিয়ে রাখি।

বাজারে নানা ধরণের 'জিপ্' কিনতে পাওয়া যায়। মাপমত আকারের 'জিপ্' সংগ্রহ করে এনে চামড়ার জিনিষে সেলাই করবার আগে যে জায়গায় সেটিকে বসাতে হবে, সেই জায়গাটুকু পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করে নিতে হবে। তারপর সে জায়গাটির চামড়ার নীচের অংশে ময়দা বা গঁদের আঠা দিয়ে 'জিপ্-ফাষ্টনারের' দুপাশে কাপড়ের ফিতা-বসানো যে দুটি প্রান্ত থাকে, সেগুলিকে বেশ টান্ করে বসিয়ে, ভালোভাবে সেঁটে দিতে হবে। চামড়ার গায়ে কাপড়ের তৈরী ফিতা দুটিকে পাকাপাকিভাবে সেঁটে দেবার পর, মজবুত ছুঁচ-সূতোর সাহায্যে 'জিপ্-ফাষ্টনারটিকে' কারু-শিল্প-সামগ্রীটির উপর গেঁথে সেলাই করতে হবে। এ কাজ করবার সময় খেয়াল রাখা দরকার—'জিপ্টি' যেন ঢিলাভাবে কিম্বা আঁকা-বাঁকা অপরিচ্ছন্ন ধরণে সেলাই করা না হয়। ঢিলা-সেলাই করা না হয়। ঢিলা-সেলাই হলে, পরে ব্যবহারের সময় নিয়ত-টানাটানির ফলে, 'জিপের' সূক্ষ্ম দাঁতগুলি আলগা থাকার দরুণ বে-লাইন হয়ে আটকে যাবার সম্ভাবনা। চামড়ার জিনিষে 'জিপ' লাগাতে হলে, যে জায়গায় সেটিকে বসানো হবে, তার দুপাশের চামড়াতেই 'জিপের' চেয়েও অন্ততঃপক্ষে $\frac{1}{8}''$ কিম্বা $\frac{1}{2}''$ ইঞ্চি মাপের জায়গা বেশী করে রাখাই নিয়ম।

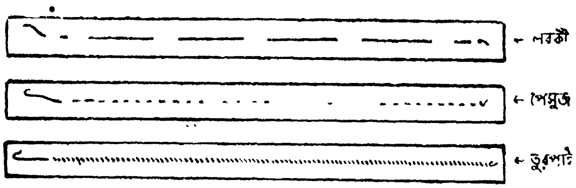
চামড়ার কারু-শিল্প সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা করেছি, শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট হবে বলে বিশ্বাস। আপাততঃ হাতে-কলমে এ সব বিষয়-গুলির নিয়মিত চর্চ্চা করলে তাঁরা নিজেরাই চামড়ার কারু-শিল্পের নানান্ সৌখীন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় সুন্দর-সুন্দর জিনিষপত্র তৈরী করতে পারবেন। কাজেই এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা না করে, বারান্তরে চামড়ার কারু-শিল্পের অন্যান্য বহু বিচিত্র বিষয় অর্থাৎ 'এম্বসিং' ((Embossing), 'পোকারের কাজ' (Poker Work), 'বাটিকের' কাজ (Batik Work), 'জেসোর' কাজ (Gesso Work), 'গিল্টির' কাজ (Gilding), 'ল্যাকারিঙের' কাজ (Lacquering) প্রভৃতি বিভিন্ন অভিনব পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

দেশী সেলাই

সুলতা মুখোপাধ্যায়

কাপড়ের টুকরো কেটে, সেগুলিকে নানান্ ছাঁদে সেলাই করা বিশেষ একটি কারু-শিল্প। সে সম্বন্ধে এ-আসরে ইতিপূর্ব্বেই অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তবে, সে সব ধরণের সেলাই বেশীর ভাগই হলো বিলাতী পদ্ধতি অনুসরণে। আজ তাই আমাদের দেশের বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ দেশী সেলাইয়ের পদ্ধতির কথা জানাচ্ছি। এ সব সেলাই আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত হলেও, এদের নামগুলি কিন্তু শুনতে বিদেশী-ধরণের। কারণ, এ নামগুলির বেশীর ভাগই এসেছে আরবী, ফারসী প্রভৃতি মুসলমানী ভাষার প্রতিশব্দ থেকে। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে কিম্বা অন্য কোনো দেশী-ভাষায় এসব প্রতিশব্দের কোনো সন্ধান মেলে না। তাই অনেকের ধারণা, প্রাচীন আমলে আমাদের দেশে কাপড় কেটে জামা সেলাইয়ের রেওয়াজ ছিল না তেমন। তবে বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের বুকে সূচী-কার্য্যের বিচিত্র আলঙ্কারিক-নক্সা বানানোর ব্যাপারে সেকালের কারু-শিল্পীরা যে বিশেষ পটু ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আজকের দিনেও। কাজেই এ-ধারণা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া চলে না। অনেকে যুক্তি দেখান যে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাই এখানে ছাঁট-কাট-সেলাই করা জামা পরবার রেওয়াজ কম। তাছাড়া সূচী-কার্য্য যাঁদের পেশা, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এমন কি আজো ভারতের নানা অঞ্চলের হিন্দু দর্জ্জী-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সকলেই সূচী-শিল্পের কাজ-কর্ম্মে এইসব বিদেশী প্রতি-শব্দগুলি নিত্য-ব্যবহার করে থাকেন।

যাই হোক, আপাততঃ ঐতিহাসিক গবেষণা মুলতুবী রেখে ছুঁচ দিয়ে কাপড়ের উপরে বিচিত্র ফোঁড় তুলে দেশী সেলাইয়ের বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলি।



উপরের রেখা-চিত্রে 'লবকী', 'পেসুজ', 'তুরপাই' প্রভৃতি যে ক'টি দেশী ধরণের সেলাইয়ের কাজের নমুনা দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে মোটামুটি পরিচয় দিই।

'লবকী' সেলাইয়ের কাজে দুটি আলাদা-আলাদা কাপড়ের টুকরোকে দু'তিন আঙুল তফাতে-তফাতে ছুঁচ দিয়ে সুতোর লম্বা-ফোঁড় তুলে একত্রে জোড়া লাগানো হয়। এভাবে কাপড় দুটিকে জোড়া দেবার পর, তাইতে অন্যরকম সেলাইয়ের কাজ করা চলে। এ সেলাইয়ের উদ্দেশ্য হলো—কাপড়ের টুকরো দুটিকে একত্রে 'টাঁকা' দিয়ে সমানভাবে এঁটে রাখা—যাতে, পরে অন্য রকম সেলাইয়ের সময় এতটুকু সরে না যায়। এভাবে সুতোর 'টাঁকা'-সেলাই দিয়ে কাপড়ের টুকরো এঁটে রাখবার বদলে, অনেকে 'আলপিন' দিয়েও কাপড় দুটিকে 'টেঁকে' রাখেন। তবে, নিপুণ সূচী-শিল্পীদের মতে 'আলপিনের' চেয়ে 'লবকী' সেলাই দিয়ে কাপড়ের টুকরো সেঁটে রাখাই ভালো—বিশেষ সেলাইয়ের কলে কাজ ক'রতে বসলে! সূচী-শিল্পী মহলে 'লবকী' সেলাইয়ের আরো দুটি নাম ব্যবহার করা হয়—'লঙ্গড়' এবং 'খিলনী'। এ ধরণের সেলাইয়ের কাজে প্রতিবারে সাধারণতঃ হাত দেড়েকের বেশী লম্বা সুতো নেবার রীতি। এর চেয়ে দীর্ঘ সুতো ব্যবহার করলে, সেলাইয়ের সময় সে-সুতোয় গিঁট পড়বার এবং কাজেরও অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। কোনো কারণে বেশী লম্বা সুতো ব্যবহার করতে হলে, সুতোটিকে 'লাটিম' বা 'গুলি' থেকে ছিঁড়ে ছুঁচের গর্তে পরিয়ে নিয়ে তার শেষপ্রান্তে একটি 'গিঁট' বেঁধে দিতে হবে। তারপর সুতোর সেই 'গিঁট' দেওয়া প্রান্তটি বাঁ হাতে বেশ টান করে নিলেই, 'গিঁট' পড়বার ততটা আশঙ্কা থাকবে না!

'পেসুজ' সেলাইয়ের রীতি হলো—কাপড়ের বুকে ঈষৎ তফাৎ অন্তর সুতো-পরানো ছুঁচের মুখটিকে বরাবর সমান লাইনে ও সমান-ছাঁদে একবার নীচে এবং একবার উপরে ছোট-ছোট ফোঁড় তুলে সেলাই করা। আমাদের দেশে কাঁথা-সেলাইয়ের সময় মেয়েরা যে-ধরণের সুতোর ফোঁড় তুলে কাজ করেন—সেটি হলো 'পেসুজ' পদ্ধতি। 'পেসুজ' সেলাইয়ের কাজ উপরে এবং নীচে—উভয় দিকেই করা চলে। সমান লাইনে 'পেসুজ' সেলাইয়ের কাজ করতে হলে, গোড়াতেই কাপড়টিকে ভাঁজ করে লাইনের দাগটিকে সুস্পষ্ট-ধরণে ছকে নিতে হবে, না হলে সেলাইয়ের সময় সুতোর ফোঁড়গুলি অসমান হবার আশঙ্কা থাকে।

'তুরপাই' সেলাইয়ের কাজের প্রচলন—বিছানার চাদর, পর্দ্দা, আসবাবপত্রের ঢাকা প্রভৃতি নানান্ কাপড়ের জিনিষের 'কোণ' বা 'মোড়াই' (মুড়ি) রচনার জন্য। এ সেলাই করবার সময় কাপড়ের প্রান্তগুলিকে গোড়াতেই নিখুঁতভাবে সমান লাইনে ভাঁজ করে নেওয়া প্রয়োজন। তারপর উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাই করতে হবে। 'তুরপাই' পদ্ধতিতে দুটি কাপড়ের টুকরোকে একত্রে সেলাই করতে হলে, প্রথমে কাপড়ের 'দরজ' অর্থাৎ 'জোড়' যতখানি চওড়া রাখা প্রয়োজন, সেই মাপ-অনুসারে তলার পাট থেকে উপরের পাটটিকে সরিয়ে 'লবকী' সেলাই দিয়ে 'টেঁকে' নিয়ে সেটিকে আবার 'পেসুজ' প্রথায় সেলাই করতে হবে। তারপর তলার বড় পাটটিকে মুড়ে কাপড়ের 'দরজ' (বাইরের দিক) আগাগোড়া সমান চওড়া লাইনে রেখে কাপড়ের ভিতর দিকে সুতোর ছোট-ছোট ফোঁড় তুলে ভাঁজের উপরে 'তুরপাই' সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। ভালভাবে 'তুরপাই' সেলাইয়ের কাজ করতে পারলে, কাপড়ের বাইরের দিকে (দরজ) সুতোর ফোঁড় ফুটে বেরুবে না, শুধু কাপড়ের ভিতর দিকেই (ভাঁজ) সেলাইয়ের ছোট-ছোট ফোঁড় নজরে পড়বে। সেলাইয়ের কল আবিষ্কার হবার আগে, 'দাওন' (ইংরাজী Down) অর্থাৎ 'সেলাইয়ের কাপড়ের নীচের অংশে' 'তুরপাই' সেলাইয়ের রেওয়াজ ছিল এবং আজও দামী মিহি-সুতোর কাপড়ের উপর, কলে ভালো সেলাই হয় না বলে, দর্জ্জীরা আদ্ধি, মলমল প্রভৃতি মিহি কাপড়ে নিপুণ হাতে 'দাওন-তুরপাই' সেলাইয়ের কাজ করে মোটা দক্ষিণা ও প্রচুর প্রশংসা পেয়ে থাকে। 'তুরপাই' সেলাই, হাতে যতখানি নিখুঁত-ধরণের হয়, সেলাইয়ের কলে তেমন হয় না কারণ, কাপড় যত মিহি হবে, সে-কাপড়ের 'মোড়াই' তত সূক্ষ্ম-সরু এবং গোল-ধরণের হবে। কলের সেলাই খুব সূক্ষ্ম হয় না—তাই হাতে-করা 'তুরপাই' সেলাই আজও এত সমাদর লাভ করে।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি বিশেষ ধরণের দেশী সেলাইয়ের পদ্ধতি জানাবার বাসনা রইলো।

বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতায় বিস্ময়ের কারণ নেই। যাদের এই আশা ও ধারণা আছে যে, জগতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে এবং হবে, তারা অবশ্যই ঐ সম্মেলনের ব্যর্থতায় দুঃখিত হবে। কিন্তু বাস্তববোধ নিয়ে সমস্যার আলোচনা করলে বোঝা যায়, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক মীমাংসা হোক, এটা যেমন একান্তভাবে মানবতার দিক থেকে বাঞ্ছনীয়, কাজে তা হওয়া বর্তমান অবস্থায় তেমনি অসম্ভব। পৃথিবীর যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, এখনকার আন্তর্জাতিক জটিলতা তার চেয়ে ভয়াবহ। শান্তি কাম্য হলেও এখন দীর্ঘকাল তা প্রাপ্তির কোন আশা মানবজাতির ভাগ্যে নেই। তার কারণ বুঝতে পারলেই পারি মহানগরীতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার রহস্য বোঝা যাবে।

বহুদিন ধরে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ, অনেক আন্তর্জাতিক শক্তিপরীক্ষার পর আজকের পৃথিবী সুস্পষ্টভাবে দুটি প্রবল শক্তিগোষ্ঠীকে পরস্পরের সম্মুখীন করেছে। প্রায় সমস্ত মানবজাতি এই দুই শক্তিশিবিরের অন্তর্ভুক্ত। গত দুই বিশ্বযুদ্ধে যুধ্যমান শক্তিগোষ্ঠীগুলির আদর্শ ও বাস্তব প্রয়োজন-গত প্রভেদ এত গুরুতর ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেন ও জর্মনির মধ্যে কিম্বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা-ব্রিটেন ও জর্মনি-জাপানের মধ্যে সে-বিপুল মতবাদ ও আদর্শগত প্রভেদ বা জীবনযাপন পদ্ধতির তারতম্য ছিল না, যা আজ ইঙ্গমার্কিন আর রুশ-চীনের মধ্যে বর্তমান। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যদি ইঙ্গমার্কিন শক্তিগোষ্ঠী পরাস্ত হয়, তবে তার অর্থ হবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ-সাধন ; যদি রুশ-চীন পরাজিত হয়, তবে তার অর্থ হবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের বিলুপ্তি এবং মস্কো ও পিকিঙের কেন্দ্রীয় সরকার দুটির অধী বিরাট সাম্রাজ্যদুটির বিচ্ছিন্নীকরণ। সুতরাং উভয়পক্ষই একটা জীবন-মরণ সংগ্রামের দৃঢ় মনোভাব নিয়ে দণ্ডায়মান : কেউ প্রতিপক্ষকে সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে চায় না। কাজে কাজেই কিছুদিন কপট দ্যূতক্রীড়ার পর বিংশ শতকের তৃতীয় কুরুক্ষেত্র অনিবার্য। যে-সব পারিপার্শ্বিক কারণ ও সমস্যাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্ভবপর করেছিল, সে-সবই এখন অনেক বেশি প্রবল আর জটিল-কুটিল-পন্থবাহী। এমন অবস্থায় দু'পক্ষেরই পরিষ্কার কথা এই যে, আলোচনা চলুক, কিন্তু বারুদ শুকনো থাক। আমরা তাই শান্তি প্রার্থনা করব এটা ধরে নিয়ে যে, তা কখনই পাওয়া যাবে না।

সমগ্র বিশ্ব অধিকারের জন্যে স্বপ্ন দেখার অভ্যাস এবং তা কাজে পরিণত করার সাধনা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বার-বার দেখা গেছে। বর্তমানে মার্কিন ও সোভিএট শক্তি সে-আশায় এত বেশি উদ্যমী ও কর্মতৎপর, যার সঙ্গে পূর্ববর্তী কোন জাতির প্রচেষ্টার কোন তুলনা হয় না। নানা কারণে বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীও নানা সময়ে সমস্ত পৃথিবী একটা সাম্রাজ্যে পরিণত হোক, এমন আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব যুগের কথা ছেড়ে দিলেও মধ্যযুগের দান্তে থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালে এইচ. জি. ওএল্‌স্‌, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষীরা একাধিকবার এই আশা পোষণ করেছেন যে, সারা দুনিয়া একটি অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হলে যুদ্ধবিগ্রহ চিরকালের মতো থেমে যেতে পারে। এঁদের এই দুর্বল মনোবৃত্তি থেকে ক্রমশঃ "যুদ্ধ শেষ করার জন্যে যুদ্ধ" কথাটার উদ্ভব হয় ; অর্থাৎ, খুব একচোট বড় যুদ্ধ করার পর সারা পৃথিবীতে একটা নতুন এবং নিখুঁত বিশ্ববিধানের উদ্ভব হয়ে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারণাকে অন্য অনেক দিক থেকেও ব্যঙ্গ করে বিখ্যাত অলডাস হাক্সলি একদা প্রসিদ্ধ Brave New World লিখেছিলেন। কমিউনিষ্ট মহল্লাও একই ভাবে সোভিএট বিশ্ব গঠনের স্বপ্ন দেখে এসেছে। দুনিয়ার সার্বভৌম অধিপতি হবার জন্যে এখন এই দুই গোষ্ঠী বদ্ধপরিকর, যদিও দু'পক্ষই মুখে এই রকম আস্ফালন করে যে, শান্তিপূর্ণভাবেই আদর্শবাদের দ্বারা একে অপরের দলের অন্যান্য শক্তি-গুলিকে জয় করে নেবে, সহজেই বোঝা যায়, দুই শিবিরের অধীন পর-পদানত শক্তিগুলি দুই পক্ষ প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত না হলে কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারে না। আদর্শবাদের লড়াই খানিক দূর পর্যন্ত ঠাণ্ডা-ভাবে অগ্রসর হতে পারে ; কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা সামরিক পন্থায় গৃহীত হবে, সে-বিষয়ে ইতিহাসের ছাত্রের মনে সংশয় থাকা উচিত নয়।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে স্তালিন এক উপপত্তি প্রচার করে বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ও সুপ্রয়োগ হলে এখনও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যেই আরো মহাযুদ্ধ বাধতে পারে যখন কমিউনিষ্ট শক্তিরা "দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে তফাতে।" ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যু না হলে এবং জর্মনিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে সময় থাকতে রুশিয়া অগ্রণী হলে হয়তো বিশ্বশক্তির এমন পরিচালনা ঘট্‌তে পারত, যাতে করে তা সম্ভবপর হলেও হতে পারত। কিন্তু ১৯৬০ সালের পরিবর্তিত প্রতিবেশে তেমন কিছু আর হতে পারবে না। তার জন্যে রুশ-নেতা ক্রুশফ বিশেষভাবে দায়ী। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, পূর্ব জর্মনির সঙ্গে পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমানা পরিবর্তন বিনা যুদ্ধে হতে পারবে না। তাঁর নিজের ভাষায়, "যুদ্ধের দ্বারা যে সীমারেখা বদল করা হয়েছে, আর এক যুদ্ধ ভিন্ন তা পরিবর্তিত হবে না।" শীর্ষ সম্মেলনের আগে এই বক্তৃতা দেওয়া হয় ; সম্মেলনের পরের বক্তৃতায় জর্মনদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ফেটে পড়েছে। এর পরও যারা শীর্ষসম্মেলনের সাফল্য আশা করে, তারা নিদারুণভাবে ভ্রান্ত। জর্মন সমস্যার

না হলে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য হতে পারে না।

আমাদের দেশে অনেকে এখনও বোঝেন না যে, জর্মন-সমস্যাই শীর্ষ সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমস্যা ; পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন, তার প্রয়োগ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিরোধ, নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা, সামরিক শক্তিজোট ভেঙে-দেওয়া—এ সবের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত মাত্র তখনই সম্ভবপর হবে যখন সমস্ত জর্মনকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে সমবেত হতে দেওয়া হবে। পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ এবং সোভিএট এলাকার মধ্যে সমস্ত জর্মন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যদি ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ভৌগোলিক পরিমাপ অনুসারে একটি মাত্র রাষ্ট্রে একত্র হতে দেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সব জর্মন এবং শুধু জর্মনদের নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ফিখটে মোটকে-বিসমার্ক হিটলার-পরিকল্পিত অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ একীকৃত জর্মনি গঠন সম্পূর্ণ না হলে বর্তমান অবস্থারকোন পরিবর্তন হবেনা। ততদিন মাঝে মাঝে বৈঠক বসবে এবং প্রহসনমূলক প্রয়াসের পর জর্মনদের বাধা দানের ফলে শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ভারতে অনেকের ধারণা, বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার জন্যে চীনারা বহুল পরিমাণে দায়ী ; প্রসঙ্গত, ক্রুশফের উপর মাও-সে-তুঙের চাপের কথা বারবার শোনা গেছে। চীনারা শীর্ষ বৈঠকের সাফল্য চায়নি একথা ঠিক ; কিন্তু জর্মন সমস্যায় মৌলিক মতভেদই শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ ; আর ইউ-২ বিমান ? ওটা বৈঠক ভেঙে দেওয়ার ছুতো মাত্র।

রুশ-চীনের বাড়বাড়ন্ত দেখে ইঙ্গমার্কিন আজ নিতান্ত সন্ত্রস্ত, এ সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। পূর্ব-জর্মনি থেকে উত্তর-ভিএত্‌নাম পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন সুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় ৯০কোটি লোক আজ কমিউনিষ্ট সর্বনিয়ন্ত্রক শাসন পদ্ধতির অধীনে ; এদের বিপুল উৎপাদন শক্তি ও শ্রমসামর্থ্য ক্রমাগত সোভিএট দুনিয়াকে অমিতবিক্রম করে তুলছে। এই এলাকার প্রচুর কাঁচা মাল যখন শিল্পবিস্তারের দৌলতে অফুরন্ত সমরশক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সৃষ্টি করবে, তখন ইঙ্গমার্কিনের মহা দুর্দিন। তাদের one world বা অখণ্ড বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ার খোয়াব দেখা তো ছুটে যাবেই, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হবে। এ-বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে তাদের অখণ্ড জর্মনির সাহায্য প্রয়োজন। সেই কারণেই ক্রুশফ পূর্ব জর্মনির সঙ্গে আলাদা চুক্তি করে দুই জর্মনিকে স্থায়ীভাবে আলাদা করে রাখতে চান। নিরপেক্ষ নিরস্ত্র জর্মনি হলেও-বা কথা ছিল, কিন্তু মিত্রপক্ষীয় সশস্ত্র তাতে-আবার অখণ্ড জর্মনিকে রুশিয়া কখনও বিনা যুদ্ধে গড়ে উঠতে দেবে না, দিতে পারে না। তার অর্থ, মস্কোর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা থেকে অ-রুশ সমস্ত এলাকার বিচ্ছেদ বা সোভিএট ইউনিঅনের ক্রমিক বিলুপ্তি। ক্রুশফ এতে কখনও রাজি হবেন না। অতএব মাস ছয়েক বাদেও শীর্ষমিলন সাফল্যমণ্ডিত হবেনা।

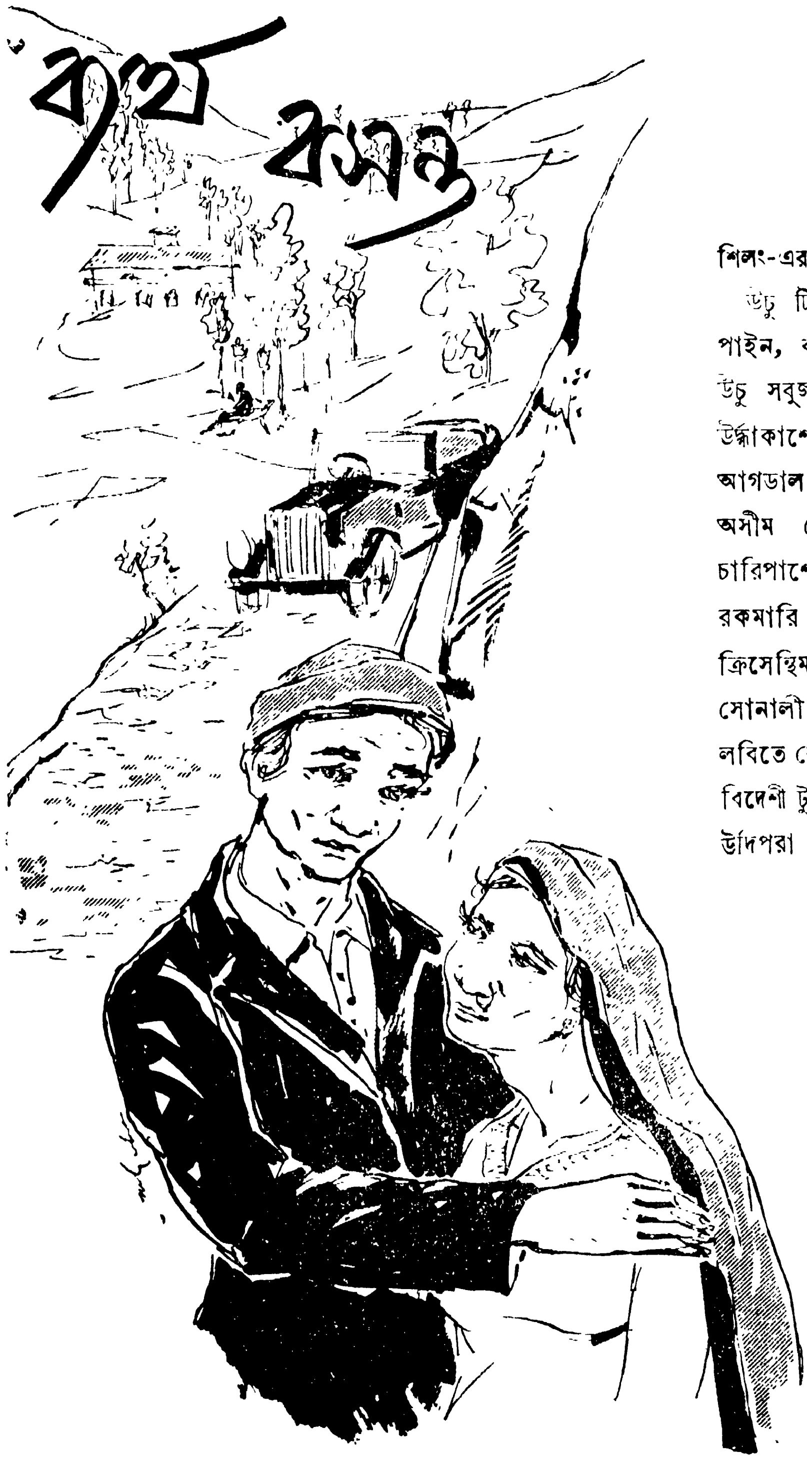
ক্রুশফের কথা যদি মিত্রপক্ষ মেনে নেন, তাহলে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা কত দূর ?—এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, কোন মানবিক ন্যায়নীতি অনুসারে জর্মনদের সম্পর্কে ক্রুশফের ব্যবস্থায় সায় দেওয়া চলে না। জর্মনি যদি নিরপেক্ষ এবং নিরস্ত্রও হয়, তাহলেও ক্রুশফ বা রুশ কর্তৃপক্ষ জর্মনির যে বিস্তীর্ণ এলাকা পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সোভিএট ইউনিঅনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা ফিরিয়ে দেবেন না ; তার প্রমাণ, রুশের তথাকথিত মিত্র পূর্ব জর্মনিকেও সুদেতেন এলাকা, দান্তসিক প্রুসিয়া, মেমেল প্রভৃতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি ; ভারতীয় পাঠক কল্পনা করতে পারেন কি যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবিখ্যাত প্রুসিয়া রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে আর জর্মনসমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? সুতরাং রুশপ্রস্তাবিত নিরপেক্ষ নিরস্ত্র তথাকথিত অখণ্ড আসলে খণ্ডিত জর্মনির প্রস্তাবে মার্কিন-ব্রিটেন-ফ্রান্স-পশ্চিম জর্মনি কেউ রাজি হয়নি, হওয়ার কথাই ওঠে না। বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন না দিয়ে এ-কথা কেউই বলতে পারেন না যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিশ্বমানবের আছে, খালি জর্মনদের ছাড়া। অথচ, একখানি ইউরোপীয় মানচিত্র খুলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ক্রুশফ সেই কথাই সগর্বে প্রচার করছেন ; সমস্ত প্রকৃত পূর্ব জর্মনিকে তিন ভাগ করে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং সোভিএট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে আসলে মধ্য জর্মনিকে পূর্ব জর্মনি বলে চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইক ও আদেনাউআর ভালোই করেছেন।

এই হল শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ।

পৃথিবীর অন্য অংশে নেহরু ও নাসের আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে যে চেষ্টা করেছেন, তা প্রশংসনীয়। আরব জগৎ ও মধ্যপ্রাচ্যে এর শুভ প্রতিক্রিয়া হবে। নেহরু একথা বুঝতে পেরেছেন যে, শীর্ষ বৈঠক ফেঁসে যাওয়ার পরিণাম হল আন্তর্জাতিক জগতে অশুভ প্রতিক্রিয়া ; কিন্তু এ-বৈঠক যে ব্যর্থ হবে, এ-কথা তিনি আগে বুঝতে পারেননি বলে ১৮ই মে কাইরোতে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষককে বিস্মিত করে। রুশ-চীনের মিলিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে, ব্রিটিশ কমনওএল্‌থ্‌ ও সাম্রাজ্য এবং মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যে, ইঙ্গমার্কিন জর্মনি ও জাপানের সাহায্য নিতে বাধ্য। এমন অবস্থায় শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হবেই। সময় থাকতে আমাদের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী মশাই এ-সব দিকে লক্ষ্য না রাখলে ভারতের চীনাহস্তে নিগ্রহ অনিবার্য। নাসের এ-সম্বন্ধে সতর্ক বলেই চীনের সঙ্গে তাঁর তীব্র মনোমালিন্য চলেছে।

জর্মনির মতোই জাপানের বন্ধুত্বও ইঙ্গমার্কিনের একান্ত কাম্য। আর, সেই কারণেই চীন ও রুশের তাতে প্রবল আপত্তি। জাপানের কিশি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জাপমার্কিন মৈত্রী চুক্তির জন্যে যে বিক্ষোভ চলেছে, তা থেকে বেশ দেখা যায় যে, মস্কো ও পিকিং এই চুক্তিকে ভালো চোখে দেখছে না এমন-কি ক্রোধে-ক্ষোভে কতকটা উন্মাদের মতো আন্দোলন করছে। ২০শে মে পিকিঙের ৩০ লক্ষাধিক লোকের সভা থেকেও তা বেশ প্রমাণিত হয়। কিন্তু জাপানের সঙ্গেও ইঙ্গমার্কিন মৈত্রী অপ্রতিরোধ্য। চীনকে রুখতে হলে জাপানকে নিতান্ত দরকার।

আইক ক্রুশফের দ্বারা বিশেষভাবে অপমানিত হয়েছেন। এ-সম্পর্কে যে বিশটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে তিনি চিঠি লিখেছেন, ভারত তাদের অন্যতম। ঐ চিঠির মর্ম মার্কিন সরকার গোপন রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। অন্য কোন সরকার অবশ্য ইচ্ছানুসারে তা প্রকাশ করতে পারেন। পত্রের মর্ম যাই হোক, ভারতসীমান্তে চীনের উদ্যম এখনো আরো বৃদ্ধি পাবে, এটা বুঝে ভারতকে দ্রুত নতুন বন্ধু সংগ্রহ করতে হবে। মার্কিন এবং মার্কিনের বন্ধুরূপে জর্মনি ও জাপানের সঙ্গে ভারতকে শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তাতে লজ্জার কোন কারণ নেই। এই সংগ্রামকুটিল জগতে যদি মার্কিন ও রুশের মতো শক্তিশালী জাতকেও সামরিক মৈত্রী করতে হয়, তাহলে ভারতের মতো দেশের তা অবশ্য করণীয় এবং তাতে ভারতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে না, যেমন ন্যাটো আর ভার্শাভা শক্তিদের হয়নি বলে ধরা হয়।



শিলং-এর নাম-করা হোটেল .

উঁচু টিলার উপর চারিদিকে বড় বড় পাইন, বার্চ এপ্রিকট গাছের জটলা'—উঁচু সবুজ গাছগুলো সোজা উঠে গেছে ঊর্দ্ধাকাশে' সকালের গাঢ় কুয়াসায় ওদের আগডাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় না—আকাশের অসীম যেন হারিয়ে গেছে। লনের চারিপাশে কেয়ারি-করা রাস্তার ধারে রকমারি ডালিয়া, জিনিয়া, মেরিগোল্ড, ক্রিসেন্থিমামের ভিড়। লাল-হলুদ—সোনালী বেগুনী নানা রংএর বাহার। লবিতে যেন রং এর মেলা বসেছে। দিশী বিদেশী ট্যুরিষ্টদের ভিড়। ব্যস্তসমস্ত হয়ে উর্দিপরা বেয়ারা-বয়-বাটলারের দল ঘুরে বেড়ায়। হাসির শব্দ উঠছে, দাপাদাপি করছে কয়েকটি বিলেতী লালমুখোদের বাচ্চা। চারিদিকে হাসি আর আনন্দের স্রোত। শীতের কড়া আমেজে ভ্রমণ-কারীর দল শীতের কয়েক-প্রস্থ পোষাকের উপর বর্ষাতি চাপিয়ে গাড়ী-ট্যাক্সিতে

শক্তিপদ রাজগুরু

উল গল্‌ফব্যাগ, ফ্ল্যাস্ক ভর্তি পানীয় ইত্যাদি নিয়ে উঠছে। একটার পর একটা গাড়ী এসে থামছে গাড়ী বারান্দায়। হল্লোড় করে উঠছে এক একটি দল। ভাটিয়া, গুজরাটি, পাঞ্জাবী—দিশী বিলিতি বহু বিচিত্র জাতের সমাবেশ।

শুধু আনন্দ আর অকারণেই হাসি। সমতলভূমিতে পিছনে ফেলে এসেছে সব চিন্তা ভাবনা।

অরুণ চুপ করে লবিতে বসে আছে। গাঢ় কুয়াসার আমেজ কেটে আসছে, ধীরে ধীরে চোখের উপর ফুটে ওঠে পর্বতসীমা, গাছের মাথা থেকে জমাট কুয়াসা সরে যাচ্ছে, ঘোমটা খুলছে রহস্যময়ী শৈল-সহর।

হঠাৎ গাড়ীবারান্দায় কিসের গোলমাল শুনে এগিয়ে আসে কয়েকটি সাহেব মেম—একখানা বিবর্ণ পুরোনো মডেলের গাড়ী দেখে আর উঠতে চায় না, মনের ফূর্তির সঙ্গে এ গাড়ীর সুর মেলেনি'—ড্রাইভার ছোকরাও সাতবার সেলাম করে আগ বাড়িয়ে ওদের মালপত্র তুলতে আসেনি।

কেমন যেন বেয়াড়া লাগে সাহেব পুঙ্গবের। অবজ্ঞার সঙ্গে বেয়ারাকে হুকুম করে—ইস গাড়ী নেহি। বড়া গাড়ী লাও। ইন গুড কন্‌ডিশন।

ড্রাইভার ছোকরা নেমে এসে জবাব দেয়—ইজ ইট ইন ব্যাড কনডিশন? আইসে ইট ইজ মোষ্ট রিলায়েবল কার ইন শিলং।

সাহেবও উঠবে না। ষ্টাণ্ড থেকে এতদূর এসেছে পেট্রল পুড়িয়ে—সেও ছাড়বেনা। তার এক কথা—ইউ মাষ্ট পে মাই চার্জ।

এক পাঞ্জাবী পুরুষ ঠোটের বাঁকাতে পাইপটা টানছিল, কায়দাটা বোধ হয় বিলেত থেকেই শিখে এসেছে। উপর-পড়া হয়ে সেই মন্তব্য করে—অল থ্রোট-কাট।

সাহেবও সায় দেয়—চিট।

গর্জে ওঠে ছোকরা—সাট আপ।

হোটেলের বয়, বাবুরা লোকজন ভিড় করেছে। ওদের সব কথার জবাব দিচ্ছে একা ওই ড্রাইভার ছোকরা। হোটেলের সুনাম বিপন্ন; সাহেবও দেবে না, ছোকরাও কম নয়। শেষমেষ হোটেল থেকে বারোআনা পয়সা

হঠাৎ অরুণ এগিয়ে গেল—চলো, লেবং-এ যায়েগা। ছোকরা ড্রাইভার ওর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আপাদমস্তক। কি ভেবে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিল গাড়ীতে।

সাহেবের লালমুখ তামাটে হয়ে উঠেছে। লবিতে দাঁড়িয়ে তখনও সে হোটেলের কর্মচারী, বয় বেচারাকে দাবড়াচ্ছে।

ড্রাইভার ছোকরা চুপ করে গাড়ী চালাচ্ছে। উত্তেজনার ছায়া তখনও ওর মুখ থেকে মুছে যায়নি। নির্জন সকালের আবছা আঁধারে লেকের পাশ দিয়ে মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ীটা, দূরে গভর্ণর হাউসের সেন্ট্রী বদলের বিউ-গল বাজছে। পর্বতের গায়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে সুরটা।

—মেরেলো রেঁস্তোরা।

ছোকরা পিছন ফিরে চাইল এক নজর, একটু এগিয়ে গিয়ে ডানহাতে ছোট একটা মোচড় মেরে মরেলোর প্রশস্ত হাতায় ঢুকলো।

—লেবং যাবেন বললেন? পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করে অরুণকে।

—একটু চা খেয়ে নিই, এসো তুমিও। আপত্তি আছে?

হাসে ছোকরা—না।

একটু অবাক হয়েছে সে। পাইন লজের বোর্ডার সাহেবের সঙ্গে একটেবিলে বসে চা খেতে কেমন ইতস্তত করে। ওকে এক টেবিলেই বসাল অরুণ।

জাতে খাসিয়া, নাম বললো টেডিয়ার। চেহারায় পাহাড়ী ছাপ একটু আছে। তবে নাক চোখ তীক্ষ্ন। বুদ্ধির ছাপ তাতে প্রকট। পাতলা ছিপছিপে শরীর, কোটটা একটু বড় আর বিবর্ণ। বোধ হয় পুরোনো দোকান থেকে কেনা। এককালে ভালোদিন সে দেখেছে তা ওর কাঁটা-চামচ ধরবার কায়দা দেখে অনুমান করে—অনুমান করে ওর চোখের দৃষ্টিতে। নইলে আত্মসম্মানে ঘা লাগতে অমনি রুখে দাঁড়াতে পারতো না।

—সিলেটের কলেজে পড়তাম। বাংলা ভালোই জানি।

কয়েকমিনিটের পরিচয়, রুদ্ধমুখ যুবকটি কয়েক মিনিটের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সকালের প্রসঙ্গটা বলে—পয়সার জন্য নয়, কোশ্চেন অব প্রেষ্টিজ। জানেন না ওদের। হাড়েহাড়ে চিনেছি আমরা। মানুষকে মানুষ ভাবে না এখনও।

একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—আপনার ঘরে এসে অযথা কেউ আপনাকে অপমান করলে নিশ্চয়ই আপনি খুশী হবেন না, আমিও হইনি।

খাসিয়া পাহাড়ের কোন সিয়েমের নেতা ছিল ওর বাবা। কয়েকটা টিলা—পাহাড় বন, বিস্তীর্ণ উপত্যকা, ঝর্ণা আর কিছু ঘোড়া ওদের সম্পত্তি। ছোট হোক তবু রাজবংশীয়।

আস্তে আস্তে সব হারিয়ে আজ টেডিয়ারকে নামতে হয়েছে পথে, পুরোনো একখানা ট্যাক্সি কিনে চালাচ্ছে।

করুণ সেই ইতিহাস। ওর বুকে সেই অন্যায় বঞ্চনার জ্বালা।

—খাসিয়া হিলস্ আমাদের মাতৃভূমি, সেখানে আজ খাসিরা, জয়ন্তীরাই বেগারস্, ওরাই করেছে, ওদের জাত। তারপর থেকেই চলে আসছে ওই ধারা। বদলায় নি।

উর্বর পাহাড়। একটু চেষ্টাতেই এখানে হয় প্রচুর ফসল। কমলানেবু, চা-এর বাগানের জায়গা। সমস্ত এলাকাই টি-প্ল্যাণ্টারস্‌দের হাতে চলে গেছে, গড়ে উঠেছে বিরাট চা বাগিচা, হইডেল ষ্টেশন। রাস্তা ও ছবির মত ভিলা। পর্বতনন্দনরা ছেঁড়া ধুন্দুরি জামাগায়ে খালিগায়ে নোংরা বস্তীতে শূয়োর মুরগীর সঙ্গে একত্রে বাস করে। শিলং সহরের সাহেবী এলাকায় যেন তাদের প্রবেশ নিষেধ।

শীতের অতলে ও ধিকিধিক জ্বলছে সেই অগ্নিজ্বালা। পর্বতের পর পর্বত মিলি সেই জ্বালা বুকে চেপে অসীম স্তব্ধতার স্বপ্ন দেখে।

শিলং সহরে, পাইন লজে ওদের দুঃখের কথা কোথাও ফোটেনি। ফোটেনি এর প্রশস্ত রাজপথে; চারিদিকে ভ্রমণকারী আর কার-কারবারী লোকের ভিড়; মুখে ওদের হাসির আভা। ঝর্ণা ঝরে ফূর্তির। কদিনই দেখছে সন্ধ্যার পর শৈলশিখরের স্বজন। আশমানের তারা ফুল ফোটার মত কালো অতন্দ্র লেবং পিকের গায়ের টিলার আলো জ্বলে মিট মিট করে, আকাশের গায়ে ছড়ানো কতকগুলো তারা, আবছা আঁধারে ঘুরে বেড়ায় দেহফিরির পসারিণী, দোকানের সো কেসে ঝকঝক করে বিলেতী মদের পশরা। ট্রাক্সি ছোটে বেগে।

তাদের হোটেলেও হুল্লোড় দাপাদাপি বেড়ে ওঠে, রাত অবধি চলে পানপর্ব, হৈ চৈ। এখানে পা দিয়ে ওরা যেন মনুষ্যত্বের ছায়াটুকুকে পেড়ে ফেলে। টেডিয়াররা সেই অমানুষদেরই দেখছে অহরহ।

সেই পশুত্বের যজ্ঞে ইন্ধন যোগায় শিখরিণী নগরী, আর সুন্দরী উপত্যকা।

ওদের কামনার আগুনে টেডিয়ায়ের জাত বলি হয়েছে, সর্বহারা হয়ে গেছে তারা। পুড়ছে আজও তিলেতিলে।

টেডিয়ারের কথায় লজ্জা পায় অরুণ—ওই হোটেলে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না?

রাত্রের কথাগুলো ভাবছে অরুণ; টেডিয়ারই বলে ওঠে—অন্য হোটেলে আসুন—ভালো বাঙ্গালী হোটেল আছে।

পুরোনো বন্ধু ওখানকার টিবি হস্‌পিটালের ইনচার্জ ডাঃ হাজরার ওখানে গিয়ে মুগ্ধ হয় অরুণ। শিলং সহর আর লেবং পিক মিশে গেছে ক্রমনিম্ন হয়ে, পাশ দিয়ে পর্বতশ্রেণী নেমে গেছে অজানা রহস্যময় গর্জের দিকে; ঘন সবুজ পাইন বন আর মেঘ জড়াজড়ি করে দৃষ্টিরোধ করেছে। বাতাসে নীচেকার ঝর্ণার সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে—আছড়ে পড়ছে শিলাস্তরে।

—এসো অরুণ, বহু খোরাক পাবে এখানে তোমার লেখার।

সারা শিলং সহরটাকে লেবং পাহাড় যেন দয়া করে ঠাঁই দিয়েছে ওর পায়ের কাছে, স্তরে স্তরে রং-বেরং এর ভিলা উঠে গেছে ওর কোমর পর্য্যন্ত; যে কোন মুহূর্ত্তে ওই বিশাল পর্বতশ্রেণী—ওগুলো যেন ছিটকে ফেলে দেবে অতল ধ্বংসের মধ্যে—চূরমার করে দেবে। বাতাস কাঁদে জিরি জিরি পাইন বনের পাতায়। সাদা দীর্ঘ তার্পিণ গাছের খোলস ঝরছে ওর তেলতেলে গুঁড়ির ঊর্দ্ধে—সাদা ফুলগুলো আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পাহাড়টার বুকে পায়ে চলা পথ কোন বনে হারিয়ে গেছে, নেমে আসছে সবুজের বুক চিরে রূপালা ঝর্ণা।

চারিদিকে প্রকৃতির মুক্ত অবাধ দান। বাতাসে মিশেছে ঝর্ণার চঞ্চল নৃত্যছন্দ, কমলা ফুলের উদগ্র সৌরভে আশ্বিনের হলুদ রোদমাখা বাতাস মেতে উঠেছে। তারই মাঝে উইপিং-উইলো গাছের নীচে ডেকচেয়ারে মেয়েটিকে দেখে অরুণ। সুন্দর ফর্সা রং, রোগের ছোঁয়ায় ওর মুখে রক্তশূন্য একটু বিবর্ণ আভা। দুচোখের চাহনিতে নীরব থমথমে কান্না। ডাঃ হাজরাই পরিচয় করিয়ে দেয়—আমার বন্ধু, বাংলাদেশের একজন নাম-করা লেখক অরুণ বসু!

—নমস্কার। ছোট্ট একটি মিষ্টি ভঙ্গীতে দুহাত এক করে প্রণতি জানায় যেন কোন বিয়োগ-বিধুর উপন্যাসের একটি মিষ্টি চরিত্র।

উইলো গাছের ছায়া পড়েছে সযত্নে ছাঁটা ঘাসের গালিচায়'—নাম-না-জানা অসংখ্য ফুলের চুয়োচন্দন ছিটানো আলপনা আঁকা মাঠটা। লীনা জোসেফ মুখ তুলে চাইল অরুণের দিকে।

—দেখে যান লিখবেন। শুধু পাহাড় আর সৌন্দর্য্যই এখানে সব নয়, এর অন্তরে যে অগ্নিজ্বালা আছে সেটাও যেন ফুটে ওঠে। ব্যর্থ করুণ বহু ইতিহাস।

কি বলতে গিয়ে থেমে গেল মেয়েটি। ডাঃ হাজরাই বলে—যে কদিন আছো এসোনা—ও এইবার বি-এ দিচ্ছে। ইংরেজীটা একটু দেখিয়ে দাও। সেরে উঠেছে, বেচারা বি-এ পাশ না করে বিয়ে করবে না—কি বল লীনা?

হাসছে মেয়েটি—মৃদু সলজ্জ হাসির আভা ওর মুখে চোখে।

নার্স এগিয়ে আসছে—লীনা উঠে দাঁড়াল। ওয়ার্ডে ফিরতে হবে। ডাঃ হাজরা বলে ওঠে—একটি খাসিয়া ছেলেকে ও ভালবাসে; বেশ রোমান্টিক ব্যাপার। একটা আশা আর আনন্দের স্বপ্নে ও দিনরাতই মেতে আছে। পড়ছে তবু রোগের কথাটা ভুলে থাকতে, আমিও মত দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় এসে ঠেকেছে একটা ধোঁয়াচ্ছন্ন মেঘের আভাস। হলুদ রোদ মুছে গেছে। আলো-ছায়া আর হাসি-কান্নায় রাজ্যি। এই নীলনির্ধুম আকাশে গাঢ় সোনা রোদের উদার হাসি, অষ্ট্রেলিয়ান পাইনের বনে ——— পাখী ডাকছে। আখরোট গাছের পাতা ঝরছে টুপ-টাপ—মাটি আকাশ বাতাসে প্রাণের স্পন্দন।

বুকে টেনে নাও—বাতাস অণুপরমাণু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। হঠাৎ এ জগতে ভাসতে ভাসতে এল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, ঢেকে গেল মুছে গেল আলো। অসীম কান্নার সুর জাগে বনে বনে। বৃষ্টি ধারায় নেচে ওঠে চঞ্চল ঝর্ণা।

বৃষ্টি জোরে নেমেছে বড়বাজারের কাছ অবধি আসতেই। বর্ষাতি আর ছাতায় যেন বাধা মানে না। মুষল ধারায় বৃষ্টি। হঠাৎ পাশেই গাড়ী একখানা ব্রেক কসে দাঁড়াল। টেডিয়ার কোত্থেকে ফিরছিল অরুণকে দেখে দাঁড়িয়েছে।

—উঠে আসুন।

বর্ষাতি ছাতা দিয়ে জল ঝরছে।

—কোথা যাচ্ছো?

টেডিয়ারই তার গাইড। জবাব দেয়—বৃষ্টিতে শিলং পিক দেখবেন চলুন। চার্মিং।

—এই বৃষ্টিতে?

—লেখক মানুষ। শুধু কি পর্বতে রোদের খেলাই দেখবেন। মেঘের কান্নাও দেখুন। টেডিয়ার পরিচয় জেনে ফেলেছে। বাংলামুলুকে থেকে একটু বখে গেছে যেন। গান গাইছে গুণ গুণ স্বরে।

নির্জন পিচে-ঢালা চড়াই বেয়ে উঠে চলেছে গাড়ীটা। বৃষ্টি ঝরছে পাইন বনে। নীচের উপত্যকায় নজর চলে না। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ এসে ঠেকেছে। বৃষ্টির মাঝেই জীর্ণ ছাতা মাথায় দিয়ে পিঠে ফুলকপি—গাজরের বেসাতি নিয়ে খাসিয়া বস্তী থেকে ওরা চলেছে বড়বাজারের দিকে।

—এ মাম্মা!

টেডিয়ারের উচ্ছল হাসিতে ওরাও যোগ দেয়।

কয়েকটা পাথর খাড়া করে খাসিয়া বস্তীর সমাধি ক্ষেত্র—বাতাস কমলালেবু ফুলের তীব্র জাগর গন্ধে অতন্দ্র হয়ে উঠেছে। কান্না-ভরা প্রকৃতি। কেন জানে না অরুণ—আজ সকালের দেখা সেই লীনার কথা মনে পড়ে। অমনি থমথমে ডাগর দু চোখের অসীম দৃষ্টি যেন মিশে আছে বর্ষণমুখর আকাশ সীমায়, ব্যর্থকান্না আর বুককাঁপা দীর্ঘশ্বাস ওই দৃষ্টিধোয়া পাইন বনের মর্মরে। গোঁ গোঁ শব্দে টপ গিয়ারে উঠে চলেছে গাড়ীটা খাড়া চড়াই বেয়ে। সিটে

যেন বসা যায় না—সোজা খাড়া পাহাড় শক্তহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ক্ষিপ্র গতিতে মোচড় মারছে—গাড়ী ঘুরপাক খেয়ে উঠছে শৈলশিখরে।

কান্নার প্রহর ঢাকা পৃথিবী ওই আকাশ বনানী। দুঃখের ঘন বরষায় দেখা জগৎ। সব যেন অস্পষ্ট কুহেলী ঢাকা। দূরে স্তরে স্তরে চলে গেছে পাহাড় সীমা, উপরের আকাশে অমনি পুঞ্জ পুঞ্জ ক্রমনিম্ন মেঘ, দূর-দিগন্তের কোলে এক হয়ে গেছে। ওরই পারে টেডিয়ার হারানো-অতীতের সন্ধান করে। এখানে দাঁড়িয়ে তাদের সিয়েমের দূর পাহাড় শ্রেণী দেখা যায়—আবছা একটি রেখার সঙ্কেত, উপত্যকার নাম দিয়েছে ওরা হ্যাপী ভ্যালী, চায়ের বাগিচা কমলালেবুর ক্ষেতের সবুজে রুথ পর্বত সীমা আজ সেজে উঠেছে। এককালে সেই ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায় মানুষ হয়েছিল সে—আর ও কারা। তাদের বাড়ীর উপর উঠেছে চা-এর গুদাম।

খামারে আজ কমলালেবুর প্যাকিং ঘর।

সব আছে—নেই তারা। আর সেই চঞ্চল মেয়েটি। মিশনারী স্কুলে পড়তো লিম্পা। হাসি খুসি একটি মেয়ে। টেডিয়ারের নর্ম সহচরী। ছুটিতে টেডিয়ার আসতো সিলেট থেকে; সে কদিন আর তাদের পাত্তা মিলতো না। দুজনে উপত্যকায় পাহাড় পর্বতে বনে বনে ঝরণার ধারে ঘুরতো। ষ্ট্রবেরী, পিচ ফলের সন্ধানে। রকমারি ফুলের মেলা—পাহাড় উপত্যকা রঙ্গীণ হয়ে উঠতো। টেডিয়ারের মন ভরে না। বলতো—সবচেয়ে সেরা ফুল তুই লিম্পা।

—ধ্যাৎ। সলজ্জ হয়ে উঠতো লিম্পার নিটোল আপেল-রাঙ্গা গাল। পাশ করবার আগেই লিম্পার বাবা কোন চা বাগানে চাকরী নিয়ে চলে গেল জমি-জারাৎ আর এক চা-কোম্পানীকে বেচে। লিম্পা অসীমে হারিয়ে গেল। নির্জনে একাই ঘুরে বেড়ায় টেডিয়ার।

টেডিয়ারের বাবাও বিপদে পড়েছে। পাহাড়ীদের দলপতি সে। অন্য সকলে স্বপ্ন দেখে টাকার। নোতুন চা-বাগান হবে—মেলা টাকা দেবে তাদের—চাকরীতে। প্ল্যাণ্টাস সাহেবরা চাপ দিতে থাকে, উপত্যকা টিলা বন বিক্রী করতে। 'সিয়েম' বুড়ো কি তবু টলে না। বিদেশীকে বেচবেনা এ জমি।

হঠাৎ টেডিয়ার সিলেটে খবরটা পেয়ে চলে আসে। বাবা মারা গেছে—কেমন রহস্যজনক মৃত্যু। কোন হদিশই মেলে না বুড়োর। বোধ হয় কোন বন্য জন্তুতে হত্যা করে টেনে নিয়ে গেছে, রক্তাক্ত কাপড়-চোপড় মাত্র পড়ে আছে।

স্তব্ধ হয়ে যায় টেডিয়ার। এর কিছুদিন পরই ওরা উপত্যকা ছেড়ে চলে এল। কিনে নিয়েছে সব কিছু গোল্ডেন টি কোম্পানী। ওরা ভেঙ্গে ফেলেছে ওদের কাঠের সাজানো বাড়ী, বসতি। কেটে ফেললো আবাল্যের সঙ্গী সেই বার্চ পাইন ফার গাছের বন। উপড়ে ফেললো তার শৈশবের কৈশোরের স্মৃতিঘেরা ভিটেটুকু।

কান্নার প্রহর। ঝিমঝিম বৃষ্টি ঝরছে জনহীন শিলং পিকে। গাড়ীর জানলা বন্ধ করে বসে আছে দুটি প্রাণী। লেবং পিক থেকে পাহাড়টা সোজা চলে এসেছে…শিলং পিক অবধি, একটানা বিস্তৃতি—কোথায় দৃষ্টি ঠেকে না।

বিয়ে করেছো টেডিয়ার?

টেডিয়ার ওর দিকে ফিরে চাইল। সিগারেটটার বুক পুড়ছে। পাতলা হয়ে আসছে মেঘের যবনিকা।

মনে করতে চায় না টেডিয়ার সেই দিনগুলো। লিম্পাকে হঠাৎ দেখেছিল সে অনেক দিন পর শিলংএর বাইরে একটা জীর্ণ খাসিয়া বসতির লাল-কাদা ঢাকা পথে।

পাহাড়ের কোলে নুয়ে পড়েছে ঘরখানা, একটা ঝরণার ধারে পাথর ফেলে কাপড় কাচছে কারা, একদল হতদরিদ্র জীর্ণ-পোষাক-পরা খালি-পা খাসিয়া ছেলে বই বগলে নামছে একটা স্কুল ঘর থেকে, তাদের পিছনে পিছনে ক্লান্ত পদক্ষেপে আসছে লিম্পা। শীর্ণ চেহারা—সেই স্বাস্থ্য, প্রাণস্পন্দন কোথায় হারিয়ে গেছে। সহসা চেনা যায় না—এ যেন অন্য কোন লিম্পা। হাঁপাচ্ছে চড়াই ভাঙ্গতে। শরীরের শেষ রক্ত কণিকাটুকু যেন ক্লান্তিতে গালে গিয়ে ছোপ লাগিয়েছে।

তবু টেডিয়ারের চিনতে দেরী হয় না। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ, হাসি কণ্ঠস্বর, ওর চোখের চাহনি তার খুব চেনা।

—তুমি এখানে? গাড়ী থামিয়ে তিন লাফে চড়াই ভেঙ্গে উঠে সামনে এসে দাঁড়ায় টেডিয়ার—যেন পথ আটকে না ফেললে এখুনিই লিম্পা আবার কোন অসীমে উধাও হয়ে যাবে।

থমকে দাঁড়াল লিম্‌পা। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে, তার সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে।

—টেডিয়ার!

ওর হাতটা ধরে সামলে নেয়।…টেনে আনে তাকে খাসিয়া বসতির একপ্রান্তে—টিলার গায়ে নড়বড়ে একটা কাঠের ঘরে। বসতি থেকে তাকে থাকবার জায়গা দিয়েছে দয়া করে।

বাঁচবার ব্যর্থ এ প্রচেষ্টা। জীর্ণ পাইন তক্তার ফাঁক দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে, ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়া আর বৃষ্টি। পাইন গাছের পাতা ঝরে গেছে। দূর পাহাড়ের মাথায় সাদা তুষারের আস্তরণ। আগুন জ্বলছে আংটায়। সেই ম্লান আগুনের আভায় দেখে টেডিয়ার নিঃস্ব রিক্ত লিম্‌পার দু-চোখে অশ্রুধারা।

—আমার সব লুঠ করে নিয়ে ওরা পথে ঠেলে দিয়েছে টেডিয়ার। আমার চরম অপমান করেছে ওরা।

বাবা মারা যাবার পর সে টি-এষ্টেটের আতঙ্কময় দিনগুলোর কথা মনে করতে আজও শিউরে ওঠে অসহায় মেয়েটি। শীতে কাঁপছে ব্যর্থ কোন নারী। অত্যাচারী টি প্ল্যান্টার্স' ওর সব লুট করেও যেন তৃপ্ত হয়নি। প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে লিম্‌পা একলা এই নিদারুণ দৈন্য আর অপরিচয়ের আঁধারে। কাশির ধমকে কেঁপে ওঠে ওর জীর্ণ দেহখানা, দু-হাতে মুখ ঢেকে কাশছে লিম্‌পা, টেডিয়ার বেদনাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

নিঃসঙ্গ একক টেডিয়ার, জীবনকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়, হঠাৎ পথের বাঁকে আজ বাঁচবার সন্ধান পেয়েছে। তার ও একটা কর্তব্য আছে—আশা আছে।

ও—ডাক্তার দেখাচ্ছো?

হাসে লিম্‌পা—এ রোগ সারে না। তা ছাড়া বেঁচে কি হবে বলতে পারো? বেঁচে তো দেখলাম এতটা দিন।

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে, কান্নার চেয়েও করুণ সেই হাসি।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে টেডিয়ার, আজ সেও বাঁচতে চায়। ফিরে পেতে চায় সেই হারানো স্মৃতির দিন—তা হয় না লিম্‌পা। আমি সব ব্যবস্থা করবো। তুমি সেরে উঠবে।

—তুমি!

টেডিয়ার এগিয়ে আসে, ওর কঠিন হাতে তুলে নেয় লিম্‌পার অসহায় নরম হাতখানা, হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লিম্‌পা টেডিয়ারের বুকে।

মেঘমুক্ত আকাশে ফুটে উঠেছে তারার রোশনী। রাত হয়েছে অনেক।

টেডিয়ার আজ বাঁচবার স্বপ্ন দেখে। লিম্‌পা সেরে উঠছে, দুজনে আবার ঘর বাঁধবে। দুজনে বাঁচবে দুজনকে কেন্দ্র করে।

দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে টেডিয়ার, গাড়ীখানাকে ঝেড়ে-মুছে কি যত্ন করে রেখেছে। এরই রোজগারে তার সব হবে। মদ কাই খাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়েছে আগেকার ইয়ার দোস্তি। অবাক হয়ে যায় অনেকেই ওর ব্যবহারে। স্রেফ বদলে গেছে টেডিয়ার।

…জবাব দিলে না! ৭

কি ভাবছিল টেডিয়ার। অরুণের ডাকে চমক ভাঙ্গে। মেঘমুক্ত আকাশে ফুটে উঠেছে নীল রোদ, চারিদিকের উপত্যকা ভরে উঠেছে। ঝলমল করছে রোদ। পাইন বনে মাধুর্য্যের আভা। খাসিয়া বস্তীর ভেড়াগুলো চরছে যেন সবুজ ঘাসের বুকে এক মুঠো যুঁই ফুল ছিটোন—ওদের গলার ঘণ্টা বাজে টিং টিং। দূর বাতাসের মর্মরে ভেসে আসে ঘণ্টা ধ্বনি—আর রাখাল বাঁশীর সুর।

হাসে টেডিয়ার অরুণের কথায়।

—বিয়ে করবো এইবার; নেমন্তন্ন করলে আসবেন তো?

—নিশ্চয়ই।

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণকারীর দল যেন ওৎ পেতেছিল, একযোগে শিলং পিকের উপর আক্রমণ চালায়। গাড়ীর পর গাড়ী নামছে—এসে থামছে। ক্যামেরা, ষ্টোভ, ফ্লাস্ক, লাঞ্চ-বাস্কেট বের হচ্ছে। কলরব কাকলি আর রকমারি স্কার্ফ'—শাড়ীর রং—মেলা বসে যায়, রং বাহারের।

—চলুন, ফেরা যাক। বিরক্ত হয়ে টেডিয়ার গাড়ী নিয়ে নামতে থাকে নীচের দিকে।

কিছুদিনের মধ্যে লীনা পড়াশোনায় বেশ এগিয়ে গেছে। খুব বুদ্ধিমতী। ছাত্রীটিকে কেমন ভাল লাগে অরুণের, ওর ঐকান্তিক আগ্রহ দুরন্ত রোগের বাঁধনেও বাধা মানেনি। হাজরার লাইব্রেরী ঘরে বই-পত্র নাড়াচাড়া করতে করতে জবাব দেয়।

—পাশ আমাকে করতেই হবে। নইলে একা আমার স্বামীর রোজকারে শিলং সহরে চলবে না।

হেসে বলে অরুণ—কে সেই ভাগ্যবান! বিয়ের আগেই যার জন্যে এত ভাবছো লীনা ?

উত্তেজনার বশে কথাটা বলে ফেলে নিজেই লজ্জায় পড়ে লীনা। মুখ নীচু করে ফুলদানির ফুলগুলো নাড়া-চাড়া করতে থাকে, ক'দিনেই সেরে উঠেছে। গালের কাছে এসে পড়েছে একটা লাল মেরিগোল্ড ফুল। তারই আভা ওর গালে।

বাঁচবার স্বপ্ন দেখে সে। মুখ তুলে চাইল। বলে ওঠে—একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো। পুরুষ জাতটার উপর ঘৃণা এসেছিল। লোভী পিশাচের দল। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। মানুষ তাদের মধ্যেও আছে।

আজ ভালবাসার স্বপ্নভরা চোখে সে দেখেছে পৃথিবীকে, সবই তার কাছে সুন্দর।

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করি—শরীরের দিকে নজর দাও। পড়াশোনার জন্য শরীরের কথা ভুলোনা। দুটোই দরকার।

উদ্যত একটা কাশির বেগ সামলাবার চেষ্টা করে লীনা। দুচোখে কেমন আতঙ্কের জমাট ছায়া, সেই হাসি নিমেষের মধ্যে মুছে গেছে। বাঁচবার সমস্ত আশা আনন্দকে ওই সর্বনাশা কাশি যেন টিপে পিষে মেরে ফেলতে চায়; আতঙ্কিত হয়ে উঠে হাঁপাচ্ছে লীনা।

আজ পড়া থাক, বিশ্রাম নাও গে।

অরুণ জোর করে নিরস্ত করে তাকে।

কদিন ধরে বৃষ্টি নেমেছে। একটানা বৃষ্টি। সারাদিনে সূর্য্যের দেখা নেই। মধ্যবেলায় মাথার উপরে একবার চিকমিক তার অস্তিত্ব, আবার দুপুর থেকে নামে বৃষ্টি চারিদিক অন্ধকার করে। ক্ষেপে উঠেছে পাইনবন আর পাহাড়ী ঝর্ণা। সাদা দৈত্যের মত আকাশ ছোঁয়া তাপণ গাছের মসৃণ কাণ্ড বয়ে জল ঝরে—টিলার বেড়ার গায়ে সবুজ স্কোয়াসা লতায় ফলগুলো দুলছে। কাঁপছে পাইন বার্চ বন—বারবার ঝরছে বৃষ্টি।

দুপুর থেকে আলো জ্বালতে হয়, ম্লান বিষণ্ণতায় মিট কদিন টেডিয়ারকে দেখিনি, হাজরার ওখানেও যায়নি। বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি চাপিয়ে কনকনে শীতে জনহীন পথে পা দিল অরুণ।

ঝর্ণার সাঁকোটার নীচে দিয়ে হু হু করে গৈরিক জলধারা পাথরে উদ্দাম নৃত্য তুলে ছুটে চলেছে বিডন-ফলসএর দিকে। কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘস্তর লেবংপিকের গায়ে বাসা বেঁধেছে—ঢেকে রেখেছে চূড়া থেকে। শূন্য রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে অরুণ চেষ্ট হাসপাতালের টিলার দিকে। উইপিং উইলো গাছের লম্বা দোদুল্যমান ডালগুলো ঘিরে যেন শোকের তমসা নেমেছে—বৃষ্টি ঝরছে ওর গা বেয়ে।

ডাঃ হাজরা ওই বৃষ্টির মধ্যেই ওয়ার্ডে চলেছিল—অরুণকে দেখে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায়। ঢালু পথ বেয়ে চলেছে ওরা—বারান্দায় লোকজনের ভিড়; নার্স ডাক্তাররা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করছে।

—এসো।

ডাঃ হাজরার সঙ্গে চলেছে অরুণ। দোতালার কোণের দিকে একটা ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। লাল কম্বল ঢাকা পড়ে আছে লীনার শীর্ণ দেহ, নাকের কাছে অক্সিজেন ফানেল লাগানো। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে অচেতন দেহটা। অবাক হয়ে যায় অরুণ টেডিয়ারকে এখানে দেখে।

—লিম্‌পা। ডাকছে ওকে টেডিয়ার। এ যেন অন্য মানুষ।

দুর হতে কোন আহ্বান ভেসে আসে। লিম্‌পা স্বপ্ন দেখছে—হারানো অতীত আবার ঘিরে এসেছে—ঘিরে এসেছে ছায়াঘন উপত্যকায় সে আর টেডিয়ার। সবুজ উপত্যকায় ভেড়ার পাল চরছে, তাদের ডাক আর গলার ঘণ্টার সুরেলা শব্দ মিশেছে রাখালিয়া বাঁশীর পাহাড়ী-সুরের সঙ্গে—পাইন-বনে কাঁপে শোঁ শোঁ হাওয়া। তারই ছায়ায় ছায়ায় চলেছে চঞ্চল একটি কিশোরী কোন রূপকথার দেশে।

—লিম্‌পা!

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে সেই দূরের বাঁশী। উদার উন্মুক্ত নীল আকাশ ছুয়েছে পর্বতসীমা, আলোকভরা সেই

পৌঁছে না; অনেক-অনেক দূর সেই পথ। লীনা সেই অসীমে হারিয়ে গেল।

নাকের সামনে থেকে অক্সিজেন ফানেলটা খুলে দেয় নার্স, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কঠিন পাথরের মত ঋজু সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার, ব্যর্থ হয়ে গেল তার সব চেষ্টা; আলো ঢেকে নেমেছে হতাশার নিবিড় অন্ধকার।

কাঁদছে টেডিয়ার। অসহায় সে কান্না।

সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। চুপ করে বের হয়ে এল বারন্দায়। উইলো গাছের ঘনপাতায় তখনও কান্নার মত জল ঝরছে—সমস্ত শিলং সহর মেঘের আঁধারে অবলুপ্ত হয়েছে। বাদল মেঘের কান্না আর বাতাসে ক্রন্দসীর দীর্ঘ-শ্বাস শুধু জেগে আছে।

গল্প এইখানেই শেষ করা যেত; কিন্তু গল্পের চেয়ে বাস্তবে বহু বিচিত্র অনেককিছু ঘটে। শিলং থেকে চলে আসবে অরুণ—কেন জানে না কেমন বিশ্রী লাগছিল এই শৈলশিখর। আবার রোদ উঠেছে—গাঢ় সোনা রংএর রোদ,ফুল আর পাখীর ভীড়। আবার বসন্ত আসে—বারবার মনে পড়ে লীনাকে এমনি বসন্তবেলায়। ব্যর্থ হয়ে সে কেঁদে ফিরে গেল।

অরুণ হঠাৎ খবরটা শুনে চমকে ওঠে, কৌতুহল বশে সেও হাজির হয় সেখানে। সতীফল্‌সের ওদিকে খাড়া পাহাড় থেকে ছিটকে পড়েছে গাড়ী সমেত টেডিয়ার; কোন যাত্রী ছিল না। কয়েকশো ফিট নীচে ছিটকে পড়েছে—গাড়ী সমেত মরেছে একাই।

মাংসপিণ্ডের একটা বিকৃত স্তূপ। পুরোনো গাড়ীটা চুরমার হয়ে গেছে। চারিদিকে এসেছে কৌতুহলী জনতা। কোন মন্তব্য করে অন্য এক ট্যাক্সি চালক।

বেহেড মাতাল হয়ে গাড়ী চালালে এমনি হয় স্যার।

ওরদিকে মুখ তুলে চাইল অরুণ। ওরা চেনে না টেডিয়ারকে—অরুণ চিনতো, টেডিয়ার মদ খেতো না—মদ সে খায়নি। তবু টেডিয়ার মরেছে যে।

গাছ থেকে ফুল ঝরে। তার বর্ণ গন্ধ ফুরিয়ে গেলেই ঝরে যায় সে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম।

টেডিয়ারও তাই ঝরে গেল।

জীবন প্রভাতে

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

নিশি কি হলো ভোর,
পাখী কি ডেকেছে?
নিভে কি গেলো তারা,
রাতি যে জেগেছে!

আমি ও তুমি ছিনু,
জাগিয়া দু-জনে,
মুখর প্রাণ-পাখী,
নীরব কূজনে

কি সুরে সারা রাতি
জাগায়ে রেখেছে।

সারাটি নিশি-জাগা,
স্বপনে সে তো ঘুম্,
বাসর ভেঙ্গে গেলে
রহিবে স্মৃতি চুম্!
সে-স্মৃতি-বেদনার
দিন কি এসেছে?



থ্রম্বসিস্ ও এম্বলিসম্

ডাঃ ওয়াল্টার থেইমার

বর্ত্তমান কালের সবচাইতে ভীতিপ্রদ রোগ বলতে Thrombosis-র নামই আগে মনে আসে। বিশেষ করে সার্জিক্যাল অপারেশনের পরিণাম হিসাবে। রক্তবাহী নালীর মধ্যে ঘনীভূত রক্ত-চাপ বা thrombus যখন ভাসতে ভাসতে অল্প-পরিসর রক্ত-নালীর মধ্যে আটকা পড়ে এবং অবরোধের সৃষ্টি করে তখনই হয় বিপদের সূচনা। Embolism নামে পরিচিত প্রক্রিয়ার এইটাই হচ্ছে সত্যকারের বিপদজনক অবস্থা। সুতরাং thrombosis-র ক্ষেত্রে দু'টি সুস্পষ্ট অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রথম অবস্থায়, রক্তের চাপ বাঁধা এবং তারপর এই রক্ত-চাপের, রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হওয়া ও অল্প-পরিসর রক্তনালীর মধ্যে অবরোধ সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় অবস্থাটি বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের পক্ষে খুবই বিপদজনক।

পূর্ব্বেও যে thromboses এবং embolismর দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু চিকিৎসকগণ সাম্প্রতিককালে অপারেশনের পরই এই নূতন উপসর্গের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এর পিছনে কোন 'প্যাথলজিক্যাল' প্রক্রিয়া আছে—যার সঙ্গে রক্তবাহী নালীর গাত্রের উপর কোন নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার বিক্ষোভের সম্পর্ক আছে। এই বিক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বোঝা যায় নি। তবে মনে হয় যে বর্ধনশীল স্নায়ুতন্ত্রের সহিত এর কোন রকমের যোগ আছে। এই জন্য Thrombo -embolism রোগের এইবৃদ্ধিকে 'managerial disease' নামে পরিচিত রোগের অংশ হিসাবে ধরা হচ্ছে। Managerial disease হচ্ছে অত্যধিক পরিশ্রমজনিত সাধারণ ক্ষতি, উদ্বিগ্নতা ও অতিরিক্ত তৎপরতার ফলে যার উৎপত্তি। আর খাওয়া দাওয়ার অনিয়মতা একে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং কারণস্বরূপও বলা চলে।

গত তিন বৎসর যাবৎ Tubingen's বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিকের প্রফেসর ডিক্ এবং মাটিস্ বহু রোগীর উপর অপারেশনের পরে embolism-র প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে গবেষণা করেছেন। এই দুই চিকিৎসক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, Thrombo-embollsm-র সহিত সংগ্রামের জন্য prophylactic পন্থা অনুসরণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়, বিশেষ করে পূর্ব্ব হইতে ঘনীকরণ-নিরোধক প্রয়োগ। Tubengen-এ এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে যে সাফল্য লাভ হয়েছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একবিন্দু রক্তের ঘনীকরণ খুব সহজেই পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। প্রথমে দেখা যায় একটি সাদা জাল খুব দ্রুতভাবে গঠিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা এবং thrombocytesগুলি আবদ্ধ হচ্ছে। ক্ষুদ্র রক্ত প্ল্যাটেলেটসগুলিও এই ঘনীকরণ প্রক্রিয়ার সহিত যুক্ত। এই জাল, fibrin দ্বারা গঠিত। এই fibrin আবার fibrinogen-র পূর্ব্ব লক্ষণরূপে রক্তের মধ্যে নিহিত রয়েছে। রক্তের ঘনীকরণ বা চাপ গঠন একটি খুবই জটিল প্রক্রিয়া। বর্ত্তমান অবস্থায় যা জানা গেছে তাতে প্রায় বিশটি বিভিন্ন কারণের ফলে ইহা সম্ভব হয়। এই কারণের একটি হচ্ছে ক্যাল্‌সিয়াম্। রক্তবাহী নালীর গাত্রে thrombus-র "মাথার" প্রথম আবির্ভাব হয়। এই "মাথা" প্রধানতঃ বিচ্ছিন্ন thrombocytes নিয়ে গঠিত। তারপর রক্ত এবং fibrin-র সংমিশ্রণে তৈরী হয় এর "ল্যাজ"। এই 'ল্যাজ', 'মাথার' উপর গঠিত হয় আর রক্ত-প্রবাহের সহিত রক্তবাহী নালীর গাত্র থেকে thrombus-র ছিঁড়ে অন্যত্র ভেসে যাওয়ার আসল কারণই হল এই 'ল্যাজ'। একটি ছোট thrombus বহু বৎসর ধরে শান্ত ভাবে আপন জায়গায় বসে থাকতে পারে। তার দ্বারা কোনরূপ বিপদের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিপদের সূচনা তখনই হয় যখন thrombus রক্তপ্রবাহের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকে। emboli নামে পরিচিত এই ভ্রাম্যমান thrombiকে যথোপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে বিনষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু prophylaxis-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। Tubengen গবেষকগণ thromboses সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন তা শুধু মাত্র সত্যকার thromboses সম্বন্ধীয় রোগ সম্পর্কে। ধমনীর প্রদাহ, varicose knots প্রভৃতি রোগের উপসর্গ thromboses-র অনুরূপ হলেও এগুলির উৎপত্তি রক্ত-নালীর নিকটে বা গাত্রে প্রদাহ। সেজন্য এই রোগগুলি Tubengen গবেষকগণের গবেষণার আওতার মধ্যে আসে না। সত্যিকারের thrombus-র উৎপত্তি হয়

সার্জ্জিক্যাল অপারেশনের ফলে বা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট ক্ষতের থেকে বেশ দূরে কোন জায়গায়। কিন্তু প্রায়শঃই thrombus রক্তপ্রবাহের স্রোত যেখানে মন্থর সেইরূপ জায়গা পছন্দ করে—যেমন, পায়ের শিরাগুলি এবং পেটের তলদেশের অংশ। ইহার 'ল্যাজে'র বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান নিদান-শাস্ত্রবিৎ Virchow বহুদিন আগে বলেছেন যে Thromboses-র ক্ষেত্রে তিনটি উপাদান বর্ত্তমান থাকবেই, রক্ত ঘনীকরণ প্রবণতার বৃদ্ধি, রক্ত-প্রবাহের গতির মন্থরতা এবং নালী-গাত্রে কোন ক্ষত।

Thrombus-র দ্রুত বিনাশের জন্য একেবারে শুরুতে রোগ নির্ণয় আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহা খুবই শক্ত। সাধারণতঃ thrombus চোখে পড়ে তখনই, যখন আক্রান্ত স্থলে বেদনা অনুভব করা যায়, স্ফীতি ঘটে এবং গায়ের তাপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময়ও thrombus সাধারণতঃ ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টার পুরাতন। আসলে কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত thrombus-র বিচরণের প্রথম ঘণ্টাটিই হচ্ছে সবচেয়ে বিপদজনক সময়। সুতরাং যখন উপরোক্ত উপসর্গের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশু বিপদ কেটে গেছে। আবার একটি অভ্রাম্যমান thrombus, যেটি কোনরূপ embolism বা রক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করেনি, তার পক্ষেও পরবর্ত্তিকালে রক্ত নালীতে গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি করা এবং কোন ব্যক্তিকে পায়ের পক্ষাঘাতে পঙ্গু করা সম্ভব। যা'হক, embolism-ই হচ্ছে আশু বিপদের কারণ। Thrombus যখন রক্ত নালীর মধ্য দিয়ে ভেসে চলে তখন এর উপস্থিতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র তখনই এর উপস্থিতি ধরা পড়ে যখন embolism-র সৃষ্টি হয়।

থ্রম্বসিসের কোনরূপ মৌলিক প্রতিষেধক সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এর গভীরতম কারণ নির্ধারণ সম্ভব হচ্ছে। তবুও Virchow-র কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ, রক্তপ্রবাহের গতির মন্থরতা, খুবই উল্লেখযোগ্য। রোগী বহুদিন শয্যাশায়ী থাকলে পায়ের রক্ত চলাচলের শিথিলতা আসে, আবার কয়েকদিন পরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাযায়। হাত এবং বাহুর রক্ত চলাচলের মন্থরতা আসে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই। সেজন্য অপারেশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব রুগী যাতে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয় সেই চেষ্টা করাই সব চাইতে যুক্তি-সংগত। Prophylaxis-র আসল উদ্দেশ্য হল রক্ত-ঘনীকরণে বাধা সৃষ্টি।

যেহেতু রক্ত ঘনীকরণের কয়েকটি উপাদান লিভারের মধ্যে উৎপন্ন হয় সেজন্য thrombosis রোগের গবেষক ডাঃ Morawitz, ১৯৩৪ সালে সুপারিশ করেন যে লিভারে অল্প (অনিষ্টকর নয় এরূপ) আঘাত হানা prophylaxis হিসাবে কার্য্যকরী করা যেতে পারে। এই মত অনুযায়ী কাজ করে বৈজ্ঞানিকগণ 'heparin' ও 'dicumarol' এই ঔষধ দু'টি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দুইটি ঔষুধই রক্ত-ঘনীকরণ-নিরোধক হিসাবে শ্রেষ্ঠ। 'হেপারিণ ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকসন' দেওয়ামাত্র তৎক্ষণাত কয়েকঘণ্টার জন্য রক্তঘনীকরণ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 'Hepar' শব্দ থেকে এই ওষুধের নামকরণ হয়েছে, hepar হচ্ছে ল্যাটিন ভাষায় লিভারের বৈজ্ঞানিক নাম, এবং বাস্তবিক, লিভার থেকেই এই ওষুধ তৈরী হয়। এর কার্য্যকারিতা রক্তঘনীকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের উপর বিস্তৃত। প্রথমতঃ ইহা রক্তঘনীকরণের উপাদানের অগ্রদূত prethrombin-কে নিবারণ করে। এর অন্য কোন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় না। অপর পক্ষে 'dicumarol' কার্য্যকরী হয় লিভারের উপর, ফলে লিভারে সাময়িক 'narcosis' সৃষ্টি করে, যার জন্য কিছুক্ষণের জন্য prothrombin গঠন সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ফল লাভ করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এখন রক্ত ঘনীকরণ নিরোধক ব্যবহারের ফলে রক্ত-মোক্ষণ হতে পারে। এবং সেজন্য Counter-indications আছে। ডাঃ ডিক্ এবং মার্টিস প্রত্যেকটি বিভিন্ন কেসের দোষ গুণ খুব সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁরা এ'কথাও বলেছেন যে রক্তমোক্ষণ, embolism অপেক্ষা অনেক সহজে আয়ত্তে আনা যায়। আর counter-indications-কে দমিত করে রাখা উচিত।

Tubengen বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিকে thromboses-র 'প্রফিলেক্সিস' হিসাবে রক্ত ঘনীকরণ নিরোধক প্রয়োগের ফলে রোগ সংখ্যা যেখানে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি তদপেক্ষা এক-অষ্টমাংশ হ্রাস পেয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, একদল রোগীকে রক্ত ঘনীকরণ নিরোধক দেওয়া হয় এবং অন্য আর এক দল রোগীকে ইহা দেওয়া হয় না। যে দলকে এই নিরোধক দেওয়া হয় না সেখানে ৫০টি Thromboses কেস infract (রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতাবশত 'টিস্যু'তে ক্ষত) ব্যতীত দেখা যায়। অপরপক্ষে যেখানে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে সে দলে মাত্র ৪টি thromboses কেস দেখা যায়। আবার প্রথমোক্ত দলে (যেখানে নিরোধক ব্যবহৃত হয়নি) দেখা যায় ২৭টি ফুসফুসে infract, ১৭টি মারাত্মক ফুসফুসে embolism। কিন্তু প্রতিষেধক ব্যবহৃত দলে মাত্র ৫টি ফুসফুসে infract আর ২টি মারাত্মক ফুসফুস embolism দেখা যায়। অচিকিৎসিতদলে মোট thromboses এবং embolism-এ আক্রান্তের সংখ্যা হয় ৯৪ জন,এবং প্রতিষেধক ব্যবহৃত দলে রোগাক্রান্তের সংখ্যা হয় মোট ১১ জন।



ফলিত জ্যোতিষে শনির প্রভাব

উপাধ্যায়

শনি সৌরজগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী, প্রাচীনেরা এই কথাই বলে গেছেন। এই গ্রহের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বিশদ ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। শনির দুইটী ক্ষেত্র—মকর ও কুম্ভ। তুলা এর তুঙ্গ বা উচ্চস্থান ২০' মেষ এর নীচস্থান ২০'। কুম্ভ এর মূলত্রিকোণ এখানে গ্রহ অত্যন্ত হৃষ্ট-চিত্তে থাকে এবং বলবান হয়। এক একটি রাশি পরিভ্রমণ করতে এর ২ বছর ৬ মাস লাগে। শনির বক্রগতির কাল ১৮৪ দিন। গ্রহটী শুষ্ক, এর প্রতিকূল দশায় জানু ও উরুদেশে পীড়াদিজনিত দুঃখভোগ। এর দশা ও অন্তর্দ্দশা ভোগ কালে শরীর শুষ্ক হয়। গ্রহদের দুইটী দল আছে। শনির দলে আছে বুধ, শুক্র, রাহু, প্রজাপতি (ইউরেনাস বা হার্সেল) আর রুদ্র (প্লুটো), এর বিপক্ষ দল হচ্ছে রবির। রবির দলে আছে চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, কেতু আর নেপচুন বা বরুণ। শনি দুঃখের কারক কঠোর তপস্বী। শনির আধিপত্যে মানবের ধর্ম্মভাব প্রচলিত মত-বিরোধী হয়, এজন্যই এ‌কে ম্লেচ্ছের কারক বলা হয়। শনি তন্ত্র সাধনার পক্ষে অনুকূল। এই গ্রহের নবম বা পঞ্চমে স্থিতি বা দৃষ্টি থাকলে অথবা শনি প্রব্রজ্যার কারক হোলে জাতক প্রথম অবস্থাতেই শক্তি সাধক হয়ে ওঠে, আর তার কেবল লক্ষ্য থাকে কিভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা ম্লেচ্ছত্ব অর্থাৎ জ্ঞান ও সিদ্ধির দ্বারা শৌচ ও অশৌচের অতীত অবস্থা লাভ করতে পারে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কুণ্ডলীতে পঞ্চমাধিপতি বুধ শনির ক্ষেত্রে কুম্ভলগ্নে ও লগ্নাধিপতি শনি বুধের ক্ষেত্র কন্যায় অবস্থিত। নবমাধিপতি তুঙ্গী শুক্র ও লগ্নাধিপতি শনি পরস্পর পূর্ণদৃষ্টিতে আবদ্ধ। শনি পঞ্চমভাব ও দশম ভাবকে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে। সুতরাং শনি লগ্নাধিপতি হয়ে পঞ্চমপতি বলবান শুভযুক্ত নবমপতির সহিত সম্বন্ধ করায় জাতককে উচ্চ শ্রেণীর কঠোর তপস্বী করেছে। অবশ্য তিনি বাহ্যতঃ অনেক পরিমাণে লোকাচার রক্ষা করতেন বটে কিন্তু তাঁর হৃদয় অন্যান্য পরমহংসের মত অতি উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ ছিল।

শনি মৃত্যুর কারক। অষ্টমস্থান নিধনস্থান। অষ্টমস্থান চররাশি, অষ্টমাধিপতি চররাশিগত, শনি চররাশিগত হয়ে চরনবাংশে অবস্থিত হয়, তা হোলে জাতকের বিদেশে বা বন্ধ প্রভৃতি শূন্যস্থানে মৃত্যু হবে! অষ্টম স্থান স্থিররাশি, অষ্টমাধিপতি স্থির রাশিগত, শনি স্থির রাশিগত বা স্থির নবাংশে থাকে তা হোলে জাতকের স্বগৃহে বন্ধু দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মৃত্যু হবে। এইভাবে অষ্টমস্থান দ্বিস্বভাব রাশি হোলে তার স্বগৃহে মৃত্যু হয় না। গৃহ থেকে বাইরে পথের মধ্যে মৃত্যু হয়।

শনি সৃজনী শক্তি কারক—সময় নির্ণায়ক। আত্মনিগ্রহ এর মূলগত ভাব। স্বাস্থ্য ও আয়ুকারক গ্রহ। রাত্রিজাত ব্যক্তিগণের পিতা। শমশিল্প ও যন্ত্রশিল্প শিক্ষার অনুকূল। মানুষকে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী করার পক্ষে এই গ্রহের কারকতা আছে। শনির দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক ভাবে সম্যক পরীক্ষা আবশ্যক। সাধারণতঃ বৃহস্পতির দৃষ্টি শুভ কিন্তু এর অবস্থান নয়। অনুরূপভাবে বিচার করলে দেখা যায় শনির অবস্থান শুভ, কিন্তু দৃষ্টি নয়। ব্যবসায়, রাজনীতি, লোকালবোর্ড, পৌরপ্রতিষ্ঠান, এসেম্ব্লি, পার্লামেন্ট প্রভৃতি যেখানে প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা অর্জ্জনের অবকাশ আছে সেখানে রবি ও শনির দৃষ্টি সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। রবি ও শনির সহাবস্থানে সম্মান ও পার্থিব সাফল্য হোতে পারে, মানুষ নিজের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও বুদ্ধি বলে স্বোপার্জ্জিতশালী কৃতীব্যক্তি হয়। এর মধ্যে রবি প্রবল হোলে সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যে জাতক ব্যর্থ হয়। রবি এবং শনি অশুভ দৃষ্টি সম্বন্ধ হেতু জ্যেষ্ঠ সন্তানের ক্লেশ দায়ক বা অনিষ্ট কারক হয়। চন্দ্র ও শনির সহাবস্থান অতীব উত্তম। ষ্ট্যালিনের রাশিচক্রে ষষ্ঠস্থ শনি ও চন্দ্রের মীনরাশিতে সহাবস্থান তাঁর সাফল্য-গৌরব ও অপরিসীম প্রতিষ্ঠা এনেছিল। শনি ও চন্দ্রের পারস্পরিক অশুভ দৃষ্টি অকর্ম্মণ্যতা, বিশৃঙ্খলতা ও কষ্টভোগ আনে। জাতকের আচার ও আচরণ অপরিণামদর্শী হয়। সে ধূর্ত্ত, অমনোযোগী, বেয়াদব, দুর্ব্বল ও অলস হয়। সে এলোমেলো ভাবে কাজ করে। তার আত্মনির্ভরশীলতা নেই, সে ভীরু। ভুল বোঝাবুঝির দরুণ মনোমালিন্য ঘটে, কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। সাধারণতঃ সে ঘরে থাকতে চায় না। শনি ও বুধের পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ সর্ব্বদাই শুভ।

জাতক অত্যন্ত ব্যবহারিক ও সংগঠক, আত্মসংযমের দিকে তাঁর

ঝোঁক। শনি ও বুধের সহাবস্থান হোলে জাতক মিতব্যয়ী ও হিসেবী হয়। সময়ে সময়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব হেতু উৎসাহ ভঙ্গ হবে। শিক্ষকের পক্ষে এ যোগ মঙ্গল দায়ক। শনি ও বুধের সহাবস্থান পীড়িত হোলে আত্মহত্যাপ্রদ হয়।

এই রকম যোগে জনৈক স্ত্রীলোক স্বামীকে বিষ খাইয়েছিল কিন্তু আদালতের বিচারে খালাস পায়। তার চরাশিক্রে কন্যায় শনি ধনুতে অবস্থিত ছিল, বুধ থেকে ১২০ অংশ দূরে প্রত্যক্ষ স্নেহ দৃষ্টিতে।

শনিও শুক্রের দৃষ্টি সম্বন্ধ সাধারণতঃ শুভ নয়। শনি ও শুক্রের সহাবস্থান মিশ্রফলদাতা এবং পারিবারিক শান্তির অনুকূল নয়। সিংহে দশম স্থানে শনিও শুক্রের সহাবস্থান হেতু কোন কবির জীবনে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও প্রণয় ভঙ্গ ঘটেছিল। শনি ও শুক্রের অশুভ দৃষ্টি সম্বন্ধ হেতু সুখহানি ঘটে। জীবনে দেখা যায় অসাফল্য। পিতার স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে কষ্ট ভোগ হয়, জাতক মায়ের স্নেহানুগত্য লাভ করে, তাকে বহু দায়িত্বও ঝুঁকি নিতে হয়। বিবাহ বিলম্বে হয় অথবা সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্যহানি ও দুর্ভাগ্য নির্দ্দেশ করে। জনৈক ভদ্রলোকের কুম্ভে শনি ও সিংহে শুক্র ছিল। ৫২ বৎ বয়সে তিনি হঠাৎ নিঃসম্বল হয়ে পড়েন আর ৫ বছর পরে দেহত্যাগ করেন। জনৈক মিথুন লগ্নের শেষ অংশে জাত ব্যক্তির শনি ২৩' ডিগ্রীতে তুলায় শনি আর শুক্র ১৫' ডিগ্রীতে মেষে ছিল, আর চন্দ্র ছিল কর্কটে। এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হত্যা করে।

ইন্‌সিওরেন্সের অর্থ লোভে জনৈক স্ত্রীলোক তার স্বামী, ঠাকুরমা, আর ভাইকে বিষ খাইয়েছিল। তার জন্মলগ্ন ছিল বৃষ, শনি মীনে আর শুক্র কন্যায় ছিল। শনি এবং মঙ্গলের সুসমঞ্জস বা শুভদৃষ্টি বিনিময় অত্যন্ত শুভ, যেহেতু নানাপ্রকার দুঃখ বিপদঃঅতিক্রম কর্‌বার শক্তি সুদৃঢ় হয়। জাতক আত্মকেন্দ্রিক হয় না। যে কোন কিছু আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধিৎসু, সংগঠক, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও নিয়মানুবর্ত্তী হয়। শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি সম্বন্ধ ভালো হোলেও নানাকষ্ট ভোগও করায়, যা জীবনে কোন দিন ভুল্‌তে পারা যায় না।

শনি মঙ্গলের সহাবস্থানে প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ে আত্মদান ও অজস্র কষ্টভোগ নির্দ্দেশ করে। জনৈকা মহিলার স্বামী তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। জাতিকার কোষ্ঠীতে কুম্ভে শনি ও মঙ্গল একত্র ছিল, আর সিংহে ছিল রবি। মুশোলিনীর রাশিচক্রে চন্দ্র, শনি ও মঙ্গল একত্র ছিল। শনি ও মঙ্গলের পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ খুব খারাপ নয়। জাতক দয়ালু ও ভদ্র হয়। নির্দ্দয় ভাব আধ্যাত্মিক কঠোরতা ও আত্মসংযম দেখা যায়। মতে বা আচরণে অনিশ্চিত ভাব, আলস্য ও স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়। স্বরভঙ্গের আশঙ্কা ও কষ্ট। আন্ত্রিক জ্বর ও দগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

শনি বৃহস্পতির দৃষ্টি সম্বন্ধ শুভ। সৌরি গুরুপূর্ণ দৃষ্টি যোগে মানুষ সমাজের বহু উর্দ্ধে উঠে সম্মান লাভ কর্‌তে পারে। জাতক ধার্ম্মিক ও সংরক্ষণশীল। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ যোগ আত্মহত্যা নির্দ্দেশক হয়েছে হয়। কোপার নিকাস সিংহলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর রাশিচক্রে বৃহস্পতির অশুভ দৃষ্টি সম্বন্ধ হোলে নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, চাঞ্চল্য ও দোলায়মান মন হয়। শনি যোগ কারক হোলে জাতকের ৩৮ বৎসরের পর বা মতান্তরে ৪২ বৎসর পরে ভাগ্যোদয় হয়, জলে বা উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা।

এই গ্রহ দুর্ব্বল হোলে মানুষ জড়, স্থবির ও পঙ্গু হয়। ক্যালসিয়ামের অভাব হেতু নানাপ্রকার ব্যাধি হয়। বাযুরোগে, বাতব্যাধি, অজীর্ণ, দন্ত ও স্নাযুরোগ প্রভৃতির কারক এই গ্রহ। শনি দুঃখ, বাধা বিপত্তিও ঝঞ্ঝাটের কারক। শনি যে ভাবে থাকে সেই ভাবের দুঃখ সৃষ্টি করে। চাকরি, কৃষিকার্য্য স্পেকুলেশন, লৌহ বা কয়লার ব্যবসায়, তিল ও ধান চাউলের ব্যবসা প্রভৃতি এর প্রভাবে ঘটে। শনি ক্ষীণ চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হোলে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বলেন, শনি একা উন্নতি কারক হোলে জাতক বৃদ্ধ বয়সের আগে উন্নতি কর্‌তে পারে না।

বেসি লিও বলেন—"His mission is to draw the soul by means of matter out of matter, by means of sorrow out of sorrow, by means of pain to that Peace which passeth all understanding."

শনির প্রিয়—মহিষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বিড়াল, উলুক, গোধা, কূর্ম্ম, সর্প, কোলা ব্যাং, গৃধ্র, হাড়গিলা, কালপেঁচা, বাদুড়, কাক, ডোমকাক প্রভৃতি। এদের মধ্যে শনি গ্রহের শক্তি সমধিক আছে। এরা পাপ গ্রহের জীব হওয়ায় সকল অশুভ ফল সূচক। স্বপ্নে এবং যাত্রাকালে এদের দর্শনে অশুভ ফল ফল্‌তে দেখা যায়। রবি চন্দ্র মকরে, কুম্ভে বা তুলারাশিতে থাক্‌লে কিম্বা পূর্ণচন্দ্র চিত্রা, স্বাতী, রেবতী নক্ষত্রে থাক্‌লে শনি বলবান হয়।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম ফল। ভরণী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম। অশ্বিনী জাতগণের নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালো যাবে যদিও মাঝে মাঝে শারীরিক কষ্ট বা দৈহিক বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা আছে। পিত্তপ্রকোপ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রঙ্কাইটিসের আশঙ্কা আছে। পারিবারিক কলহ ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সামান্য বিরোধ যোগ আছে। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও আয়বৃদ্ধি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক, তবে স্বত্ব বা অধিকার নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হোতে পারে। টাকাকড়ি লেন দেন, জিনিষ

নানা অসুবিধা ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধ উত্তম। মাসটী স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রণয়ে সাফল্য, অবৈধ প্রণয় ও কোর্টশিপে আনন্দলাভ। ভ্রমণ, পিক্‌নিক, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সম্ভব। অবিবাহিতা-গণের পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। রেস খেলায় লাভের অপেক্ষা লোকসান।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা জাতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগশিরাগণের পক্ষে মধ্যম এবং রোহিণীজাতগণের পক্ষে অধম ফল। শারীরিক অসুস্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায়ই উদরশূল ঘট্‌বে। যাদের হৃদ্‌রোগ, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। চক্ষুপীড়ার আশঙ্কা। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ব্যাহত হবে না। সামান্য কলহ মধ্যে মধ্যে হোতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে মাসটি উত্তম নয়—অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে' অর্থের অনাটন হবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে সময়টী কষ্টপ্রদ। জমি গৃহ প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ হবে না। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী নৈরাশ্যজনক, বিনা দোষে কষ্ট ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সময় মোটের ওপর মন্দ যাবে না। মাসটী মহিলাদের স্বার্থহানি কারক। এমাসে তাদের কোন প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। প্রণয়ের ক্ষেত্রে কলহ ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর হোলে বিপন্নতা, বন্ধু বিচ্ছেদ ও পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতারিত হবে। ব্যয়াধিক্য হেতু দাম্পত্য কলহ। রেসে না যাওয়াই ভালো।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে অশুভ। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা নেই। রক্তের চাপ বৃদ্ধি মারাত্মক পীড়া না হোলেও শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা থাক্‌বেই। পারিবারিক ঐক্যের ব্যাঘাত ঘট্‌বে না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হোতে পারে। আর্থিক লাভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, নূতন বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কর্ম্মের বিস্তৃতি ও সাফল্য। মাসটী স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটের ওপর মন্দ নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা, পুরুষের আনুগত্য, প্রণয়ে প্রীতি ও সাফল্য, এবং পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যারা অধ্যয়ন করছে, তাদের পক্ষে শুভ। সাহিত্যিকাদের পক্ষে মাসটী উত্তম। নূতন বিষয়ে গবেষণা বা অধ্যয়নে সাফল্য। ভ্রমণ। প্রণয়ী লাভের সুযোগ। শিল্প কলায় সুনাম। বেতার প্রতিষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীতের পরীক্ষার্থীরা সাফল্য-মণ্ডিত হবে। জিনিষপত্র ক্রয় বা ঋণদান অনুচিত। বিদ্যার্থীদের ফল উত্তম। রেসে ক্ষতি।

কর্কট রাশি

পুষ্যাশ্রিতগণের ফল অধম। পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা জাতব্যক্তির ফল উত্তম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সাধারণ ভাবে সাফল্যলাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সুখস্বচ্ছন্দতা ও বন্ধু লাভ। স্বজন বিরোধ মধ্যে মধ্যে ঘট্‌বে। পারিবারিক অশান্তি কিছু পরিমাণে দেখা যায়। এমাসে অপরের পরামর্শ না নিয়ে নিজের বিবেক সম্মত কাজ করলে উপকৃত হবার সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা খারাপ হবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। চাকুরি জীবীদের পক্ষে শুভ। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি ও সম্মান লাভ যোগ আছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম এবং কর্ম্মের অবস্থা সন্তোষ জনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক, সামাজিক ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত, দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কর্ম্ম সম্পাদন ব্যতীত দুঃসাহসিকতার দিকে দৃষ্টি আবৃত করাই বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিশেষ সাফল্য লাভ। মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিগণের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। সাফল্য, আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, উত্তম সঙ্গ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সুযোগ আছে। শত্রুজয় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ব্যয়বৃদ্ধি এবং আকস্মিক মামলা মোকর্দ্দমা। স্বাস্থ্য মোটামুটি। দুর্ঘটনায় বিপত্তি বা আঘাত প্রাপ্তি, ভ্রমণে ক্লান্তি। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক কলহ। আর্থিক ব্যাপারে উন্নতির যোগ আছে। স্পেকুলেশনে লাভ ও লোকসান দুই-ই হবে। রেসে আশাতীতলাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘ ভ্রমণ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের যোগ আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী সন্তোষ জনক। পদমর্য্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিস্তৃতিলাভ, বৃত্তিজীবীর কর্ম্মের প্রসারতা ও শ্রীবৃদ্ধি যোগ আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্য-বিধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য লাভ। জনপ্রিয়তা ও প্রভাব প্রতিপন্ন সমাজের সমাদর লাভ, কর্ম্মে লাভ ও পারিবারিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি। কোর্টসিপ ও প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে অসাধারণ সাফল্য, অবৈধ প্রণয়ে ও নানাপ্রকার লাভ। অবিবাহিতগণের সন্তোষজনক বিবাহ। শিক্ষিতা বেকার মহিলারা কর্ম্মলাভ কর্‌বে। মঘা নক্ষত্রাশ্রিতাগণের যৌন পিপাসা বৃদ্ধি হোতে পারে।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের সর্ব্বোত্তম সময়। চিত্রার ফল মধ্যম। হস্তাজাতগণের নিকৃষ্ট সময়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গোলযোগ থাক্‌বেই। উদরশূল, চক্ষুপীড়া, অম্ল অজীর্ণ দোষের ভয় আছে। আঘাত প্রাপ্তি ও তজ্জনিত ক্ষতাদির যোগ আছে। অল্পবিস্তর পারি-বারিক অশান্তি, কলহ ও উদ্বেগ থাক্‌বেই। শত্রুজয়, কর্ম্মে সাফল্য, বিলাসবাসন দেবাদির বৃদ্ধি, সুখ সম্ভোগ, যশ প্রভৃতি সূচিত হয়। আর্থিক

সমস্যা আয় বা লাভের অভাব জনিত হবে না, হবে ক্রমাগত নানাপ্রকার ব্যয়ের চাপ হেতু। বাজার দরেরও অত্যন্ত ওঠানামা চল্‌বে, এজন্যে স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ কর্‌লে ক্ষতির সম্ভাবনা। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ সম্পত্তিলাভ। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশানুরূপ নয়, নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়, অর্থলগ্নী করা বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে যে উন্নতি প্রতীক্ষা কর্‌ছে সেটী এমাসে হবে না, পরবর্ত্তীমাসে অথবা তার কিছু পরে হবে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্য চাকুরিজীবীর সাফল্য যোগ এমাসে রয়েছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সংস্রবে বহু সুযোগ সুবিধা লাভ ঘটবে কিন্তু নিজের অবিবেচনা দোষ, অপরিমিত সুখ সম্ভোগ লালসা, অসতর্কতা বা ভাব প্রবণ জনিত ভ্রান্তিমূলক কার্য্য, অপব্যয় প্রভৃতি বিবাদের কারণ হবে, ফলে প্রণয় ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। মেলামেশায় সর্বদা সংযত সতর্কভাব আবশ্যক। অবিবাহিতাগণের পক্ষে বিবাহের যোগাযোগ আশা করা যায়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। রেস খেলায় কিছু লাভ হবে।

তুলা রাশি

চিত্রা ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত গণের পক্ষে উত্তম, স্বাতীর পক্ষে অধম। এমাসে বেশীর ভাগ সময় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন ও অপ্রিয় ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। দুষ্টলোকের প্ররোচনায় বিপন্ন হবার সম্ভাবনা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, দুঃসংবাদ ইত্যাদি দেখা যায়। মোটামুটী সাফল্য, সম্মান, উন্নতি, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি ইত্যাদি শুভ ফল। নিজেরও সন্তান সন্ততিদের পীড়া, অতিরিক্ত উত্তাপে কষ্ট, রক্তের চাপবৃদ্ধি, হজমের দোষ। পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে গোলযোগ হেতু পরিবারবর্গের সহিত মনোমালিন্য। ব্যয়াধিক্য হেতু অর্থের অনাটন ঘটবে। স্পেকুলেশন ও রেসখেলা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। স্বত্বাধিকার নিয়ে যে মামলা পূর্ব্বে সুরু হয়েছে এমাসে তার নিষ্পত্তি ঘটবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী অতীব লাভজনক বিশেষতঃ যারা ইঞ্জিনীয়ারিং, নির্ম্মাণাদি, গবেষণা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত তাদের বিশেষ সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা।

বাড়ী ও অফিসের জন্য ক্রয়াদি কার্য্যে স্ত্রীলোকের লাভ হবে। তা ছাড়া গান বাজনা, নৃত্যাদি ব্যাপারে আনন্দ। কোর্টসিপ ব্যাপারে আশাতীতলাভ। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মসাধনায় উন্নতি। অবৈধ প্রণয় ও যৌনস্পৃহাই যাদের লক্ষ্য, তারাও আনন্দ, আর নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা পাবে। রান্নাঘরে রন্ধনলীলা নারীর সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা আঘাত তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে। সদ্যপরিচিত কোন

যাওয়া অনুচিত, বিপত্তির আশঙ্কা আছে। স্ত্রীলোকের আয় বৃদ্ধি যোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায় না।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিতের পক্ষে নিকৃষ্ট। চৌর্য্যভয়, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, স্বজন বিয়োগ আত্মীয়ের সহিত কলহ প্রভৃতি সূচিত হয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যোগ। স্বাস্থ্যের অবনতি বা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পীড়া ঘটবে না। সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রীর পীড়াদি সূচিত হয়। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলতা অক্ষুন্ন থাক্‌বে। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। নিজে সচেষ্ট হোলে আয় বৃদ্ধি করতে পারবে। স্পেকুলেশন ও রেসখেলা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্য ও কর্ম্মপ্রাপ্তি। যাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে, এমাসে সাফল্য লাভ করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা আশাতীত উন্নতি করবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে অবিবাহিতা গণের বিবাহ হবার যোগ আছে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ। কর্ম্মী নারীদের পক্ষে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যে সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিদ্যারর্থী পক্ষে মাসটী সন্তোষজনক।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম এবং মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। মূত্রাশয়, গুহ্য প্রদেশ ও পাকস্থলীতে পীড়া বা বেদনার সঞ্চার হোতে পারে, গৃহহোতে দূরে অবস্থিত আত্মীয় স্বজনের দুঃসংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। আত্মীয় স্বজনও বন্ধুগণের সহিত মনান্তর। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোতে পারে। জয়বৃদ্ধি, অপ্রত্যাশিত ভাবে মামলা মোকর্দ্দমার সূচনা, স্ত্রীলোকও বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে ক্ষতি। আর্থিক ক্ষেত্র আশানুরূপ নয়। গভর্ণমেন্টের প্রতিকূল কার্য্য কলাপের দরুণ বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর ভাগ্যে অসুবিধা ভোগ, চাকুরিজীবীরা ও নানা অসুবিধায় দিন যাপন কর্‌বে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। আশাভঙ্গ, প্রণয়ভঙ্গ, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এজন্যে সংসারের কার্য্য ব্যতীত বাহিরে গমনাগমন, মেলামেশা বা সামাজিক উৎসবে যোগদান অনুচিত। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং শ্রবণাজাতগণের পক্ষে অধম। এ মাসটী মিশ্রফলদাতা। জনপ্রিয়তা,মানসিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি সূচিত হয়। মামলামোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। উদরাময়, আমাশয়, অজীর্ণ প্রভৃতি [illegible] দুর্ঘটনা পারিবারিক অশান্তির

যোগ আছে। আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা অনুকূল নয়। লাভ ও ব্যয় দুইই ঘটবে। বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। স্পেকুলেশনে কিছুটা সাফল্য, রেসে না যাওয়াই ভালে— বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। রেসে কিছু লাভ হোলেও শেষে ক্ষতির সংখ্যা বেশী হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা,ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। ঝড় ও বন্যার প্রকোপে মারাত্মক ক্ষতি হবার ও সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। অপরিমিত পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক অবস্থা অনুকূল। যারা ঘর সংসার নিয়ে আবদ্ধ, তাদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা নেই। এ মাসটীতে স্ত্রীলোকের পক্ষে বাসা বদল, পেশা পরিবর্তন, অলঙ্কারাদি বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সঙ্গীত শিল্পকলা সাহিত্য প্রভৃতি চর্চ্চায় উত্তম ফল লাভ আশা করা যায়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে শতভিষাশ্রিতগণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শুভ। পিত্ত ও বায়ুপ্রকোপ ব্যতীত স্বাস্থ্যহানির যোগ বা পীড়াদি নেই। পূর্ব্ব থেকে চিকিৎসিত ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য যোগ আছে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়ে শুভ আর সর্ব্বপ্রকার উত্তম বা প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে। প্রথমার্দ্ধে সামান্য কলহ, অসন্তোষ, বাধা বিপত্তি আসতে পারে, শত্রু দ্বারা উৎপাড়িত হবারও যোগ আছে, এতদসত্বেও উত্তম অবস্থা, জনপ্রিয়তা, ভ্রমণ, সুসংবাদপ্রাপ্তি, বন্ধুমিলন প্রভৃতি ঘটবে। এ মাসটী উত্তম হওয়ায় যে সব পরিকল্পনা করা হবে, অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি সুন্দর রূপ নেবে। দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে অর্থনিয়োগ অনুকূল। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে অর্থপ্রাপ্তি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। এমাসটী চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। পদোন্নতি, সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা সর্ব্বোত্তম। আয়বৃদ্ধি ও আশাতীত লাভ। এ মাসে স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার আশাপূর্ণ হবে। জনকল্যাণকর প্রতি-ষ্ঠানের কাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অতীব উত্তম পরিস্থিতি, অবৈধ প্রণয়েও বিশেষ সাফল্য। অধ্যাত্ম সাধনায় শক্তি লাভ। চাকুরিজীবীরা উপরওয়ালার অনুগ্রহ পাবে। যে কোন প্রচেষ্টাতেই এমাসে স্ত্রীলোকের সাফল্য হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। উত্তর-ভাদ্রপদাশ্রিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট ফলভোগ করবে। পিত্তপ্রকোপজনিত অশান্তি ঘটবে না কিন্তু স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য হবে। কিছু সাফল্য ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, যোগ্যতার জন্য মর্য্যাদা বা পুরস্কার লাভ, বিলাসিতা প্রভৃতি সম্ভব, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা হেতু উদ্বেগ। প্রতারণার জন্য ক্ষতি। এমাসে নগদ টাকার টান পড়বে। স্পেকুলেশন রেস বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি ও উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উল্লেখযোগ্য নয়, আশানুরূপ অর্থ হবেনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখা যায় না, মোটামুটিভাবে মাসটি অতিবাহিত হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে আংশিক বাধা। অর্থাগমের সুযোগ। আয় বৃদ্ধি। সন্তানাদির পীড়া। সম্মান ও প্রতিপত্তি। সৌভাগ্যোদয়। স্ত্রীলোকের প্রণয়ভঙ্গ যোগ। ব্যয়, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন

দেহের শীর্ণতা। শিরঃপীড়া, বেদনা সংযুক্ত পীড়া। ধনাগম, ভগ্নীর সহিত মনোমালিন্য। মাতার স্বাস্থ্যহানি। সন্তানসন্ততির পীড়া। দাম্পত্য প্রণয় সুখ। সন্তানের বিবাহযোগ। স্ত্রীলোকের প্রেমবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুনলগ্ন

উল্লেখযোগ্য পীড়ার আশঙ্কা। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। ধনভাব উত্তম। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, সদ্বন্ধু লাভ। সন্তানাদির স্বাস্থ্য ভালো। পত্নীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। কর্ম্মলাভ, পদোন্নতি। গৃহ-সংস্কার যোগ। ভূসম্পত্তি ক্রয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কর্কট লগ্ন

পীড়াদি কষ্টভোগ। ব্যয় বাহুল্য। আর্থিকোন্নতি যোগভঙ্গ। ধর্ম্ম সাধনায় বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম.

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায়না। ব্যয়াধিক্য, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। ঋণযোগ, সহোদর বিরোধ, মিত্রাদির সাহায্যে অর্থলাভ। সন্তানস্থানের ফল ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাম্পত্য কলহ—এমন কি সাময়িক বিচ্ছেদ, ভ্রমণ, বিদ্যার্থীর পক্ষে কিছু শুভ ফল।

কন্যালগ্ন

দেহভাব শুভ। মানসিক উদ্বেগ। সন্তানের ফল শুভ। স্ত্রীর হৃত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার। চাকুরীর স্থলের ফল সন্তোষজনক। আয়বৃদ্ধি। ভাগ্যোন্নতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল শুভ হোলেও গণিতশাস্ত্রের ফল আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্র শুভ, প্রণয়ের ক্ষেত্রে বাধা।

তুলালগ্ন

শারীরিক অবস্থা মধ্যম। ধনাগম। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ। স্বজনবিরোধ, শত্রুবৃদ্ধি যোগ। শুভকার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাভঙ্গ ও উন্নতির পথে বাধা। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ। স্ত্রীলোকের অবৈধ প্রণয়াসক্তির সম্ভাবনা।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক অবস্থা মন্দ নয় কিন্তু মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ধনাগম, ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায়, পত্নীর হৃৎপিণ্ড ও পাকাশয়ের দোষ। বন্ধুর সাহায্য লাভ, শত্রুবৃদ্ধি, যশোলাভ, অবিবাহিত ও অবিবাহিতার বিবাহ সম্ভাবনা, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধফল, স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা।

ধনুলগ্ন

শ্লেষ্মা প্রকোপ। স্বাস্থ্যের অবনতি। ভ্রাতার সহিত মতবিরোধ। সন্তান সন্ততির শুভফল লাভ। মাতার দৈহিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা। স্ত্রীলোকের প্রণয়ভঙ্গ যোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে উন্নতি।

মকরলগ্ন

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, অর্থাগমের যোগ। সদ্বন্ধু লাভ। সম্ভব স্থলে সন্তান লাভ বা সন্তানের বিবাহ। পত্নীপীড়া। স্ত্রীলোকের আশাভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, সংস্কৃত শাস্ত্রের ফল আশানুরূপ নয়। বিদেশ ভ্রমণ। মাতার স্বাস্থ্যহানি।

কুম্ভলগ্ন

অধ্যাত্মসাধনায় উন্নতিলাভ, শারীরিক কষ্ট, শত্রুবৃদ্ধি, সহোদরের সাহায্যে শুভকর্ম্মানুষ্ঠান, চাকুরির ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, দাম্পত্যপ্রণয় সুখ, স্ত্রীলোকের পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক মর্য্যাদা লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভফল।

মীনলগ্ন

দেহভাবের ক্ষতির আশঙ্কা, পাকযন্ত্রের পীড়া, দন্তরোগ, ব্যয়াধিক্য, সন্তান লাভ, কর্ম্মক্ষেত্রে মর্য্যাদা লাভ, শত্রুহানি, চাকুরির ক্ষেত্র মন্দ নয়, আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে সাফল্য। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ ফল।



ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আঘাত মানুষকে আচ্ছন্ন করে। অন্ধ করে। অভয় কিছু-দিন যেন কেমন একটি অবোধ ঘোরের মধ্যে রইল। যদিও বাইরে থেকে সেটা ধরা পড়ল না। যে এল, সকলের সঙ্গেই কথা বলল। সব রকম কথাই বলল। পাড়ায় এবং বাইরে যাওয়া-আসা করল। দেখা করল চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে। সে বুঝল, ভামিনী-খুড়ির সাধ মেটে না তাকে যত্ন করে। খুড়ি তাকে দশ ব্যঞ্জনে রান্না করে খাওয়াল। শুধু আপন নয়, যেন বড় সম্মানীয় মানুষ অভয়। এত সমনা অভয়ের। তবু সে আরো চেয়ে খেল। ভামিনীর আয়োজিত সব আয়েস ভোগ করল। যদিও তাতে সে অভ্যস্ত নয় কোনোদিন। শুধু একা ভামিনী নয়, সুরীনও তার সঙ্গে আছে। দুজনে যেন পাল্লা দিয়ে, অভয়ের খাওয়া শোয়া বসার ত্রুটি দূর করতে ব্যস্ত। অন্য সময় হলে অভয় হেঁকে ডেকে এ ব্যবস্থাকে ভাঙত। এতে যে তার বড় অস্বস্তি। একেবারে অনভ্যস্ত। কিন্তু এখন সে খেয়াল করল না।

ছেলেটা চিনতে শিখল অভয়কে। যদিও ভরসা পুরোপুরি পেল না কাছে যাবার। আড়ষ্টতা থেকেই গেল। কারণ অভয়ের দিক থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যেন নতুন দেখা হয়নি এ ছেলের সঙ্গে। যেন জন্ম থেকে চেনা, তাই ভাব করার ব্যস্ততা নেই। ইচ্ছে হ'লে আদর করে। কখনো বা সামনে বসে থাকে। ছেলে আপন মনে খেলা করে।

গিনি ব'লে মেয়েটি ভামিনীর কাজে-কর্মে সব সময়েই প্রায় এ বাড়িতে থাকে। মেয়েটির নাকি বাপ-মা আছে বর্দ্ধমানের কোন গ্রামে। কিন্তু খেতে দিতে পারে না। তাই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে চলে এসেছে মালীপাড়ায়। এখানে নাকি ভাতের অভাব নেই। কিন্তু গতিক যে সুবিধের নয়, সেকথা বলেছে ভামিনী অভয়কে। সরাসরি দেহজীবিনীদের ঘরে যদিও গিনিকে পাঠানো হয়নি, আত্মীয়টির সেটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। অবিশ্যি লোকের কাছে বলছে, বিয়ে থা দেবে। যেন ছেলে ছড়াছড়ি যাচ্ছে গিনিকে বিয়ে করার জন্য। গ্রামে যার দুটি মোটা ভাতের সংস্থান হয়নি, মালীপাড়ায় যেন তার ভাত বাড়া থাকে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলে হবে কী। পাড়ার লোকে জেনেছে। একে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া। দশরকম কাজের ফরমায়েস ক'রে, কেবলি গিনিকে রাজুবালাদের পাড়ায় পাঠানো। ইতিমধ্যে কে কে নাকি গিনির গায়ে হাত দিয়েছে। যেন হাঁসমুরগীর ছানার ওপর শেয়ালের থাবা পড়েছে চুরি করে। প্রস্তাব করেছে নানানরকম। হেঁকে ডুকরে চীৎকার করে গিনি পাড়া মাথায় করেছে। আত্মীয় মামা আর মামী বলেছে, ও ছুঁড়িরও একটু বাড়াবাড়ি আছে। পাড়ার এক দল ঠোঁট উল্টে হেসে চুপ করে থেকেছে। আর একদল বলাবলি না ক'রে পারেনি। যারা পারেনি, তাদের মধ্যে প্রধান বোধহয় ভামিনী। সে নাকি বলেছে, অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিসের, তা তো বুঝিনে বাপু। বেচবে, না হয় ভাড়া খাটাবে, এ রাজ্যে তার জন্য বাধা দেবার কে আছে? আইন আছে কাঁড়ি কাঁড়ি, রক্ষে করবার লোক নেই। তা বয়স তো মাত্র চোদ্দ-পনের। দুটো বছর যাক্—তা'ছাড়া ও লাইনের আর এখন আছে কী? বেবুশ্যে ব'লে নাম কিনতে হল, এদিকে পেট ভরল না।

বারো মাস রোগ। আর রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে চোর বাটপাড়ের রক্ষিতা হ'য়ে থাকতে হয়। ফরাসডাঙার বারোভাতারিরা কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছে? চিরকাল কি তার গন্ধ থাকবে হাতে? এককালে নাকি তাদের দবদবা দেখে গৃহস্থদের বুক টাটিয়েছে। এখন কুকুরেও কাঁদে না। শরীর নিয়ে তো সেই মাছ-বাজারের দরাদরি। তার জন্য এত লোভ, এত লালসা কিসের? কত বা পয়সার স্তূপ হবে তাতে গিনির মামামামীর। মেয়েও পরী হুরী নয়। বয়সটা কাঁচা। তাই বা কদিন থাকবে? তার চেয়ে লালন পালন কর। দেখ সত্যি সত্যি বিয়ে থা' দিতে পার কিনা। সংসারে এমন ছেলেও তো তাদের সমাজে আছে, একটি মেয়ে পেলে বর্তে যায়। এনে নিয়ে খেয়ে সংসার করতে পারে। বিয়ে না হোক, কারুর ঘর করতে লাগতে পারে। শকুনের আড্ডায় না পাঠালে নয় এখুনি?

তা' ছাড়া গিনিকে বুঝি একটু ভালই বেসে ফেলেছে ভামিনী। মেয়েটিকে একেবারে হেজে পচে মরতে দিতে চায়নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, না হয় আমারই পাত কুড়িয়ে খাবি গিনি। তেমন বুঝলে পালিয়ে আসবি এখানে। আধপেটা তো খেতে পাবি।

নিমি বেঁচে থাকতেই গিনিকে এই পরোয়ানা দিয়েছিল ভামিনী। নিমি মারা যাবার পর, গিনি ছাড়া একদণ্ড কাটতে চায় না তার। তবে সুরীন এ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে চায়নি। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ করতে চায়নি সে। মনে মনে যদিও অসহায় মেয়েটির জন্য কষ্ট পেয়েছে, ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভেবেছে, তার কতটুকু ক্ষমতা আছে রক্ষা করবার।

কিন্তু হার মেনেছে ভামিনীর কাছে। এমন ভাবে হার মেনেছে যে তারপরে আর বিশেষ কথা বলতে পারে নি। গিনির মামাও চটকলেই কাজ করে সুরীনের সঙ্গে। একদিন বুঝি দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছিল ভামিনীর নাম করে। গিনিকে কেন ভামিনী মামামামার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিচ্ছে। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ ভাল নয়।

কথাটা সত্যি। সুরীন একেবারে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল ভামিনীর সঙ্গে। বলেছিল, তোর এসবে মাথা

ভামিনী চুপ ক'রে ছিল। সুরীনের রাগ তাতে কমেনি। বলেছিল, নিজেকে রক্ষে করতে পেরেছিলি তুই? তোকে রক্ষে করতে পেরেছিল কেউ?

কথাটা লেগেছিল ভামিনীর। সে একেবারে চুপ করেছিল। তারপরে যখন সুরীন আবার তার রাগ ভাঙাতে গিয়ে, ভালভাবে বলতে গিয়েছিল—তখন ভামিনী বলেছিল, রক্ষে করবার ক্ষমতা নেই জানি। চেষ্টা করতে দোষ কী? একেবারে ও-লাইনে গিয়ে উঠলে, কী হাল হয়, তা তো জানি।

—কী চেষ্টা করবি তুই শুনি?

ভামিনী তবু চুপ ক'রেছিল। তারপরে বলেছিল, গিনির সাত পাক ঘুরিয়ে বে' হবে, তেমন কথা ভাবিনে। আমি নিজে যত মুখপুড়িই হই, তবু আমার মতন কপালও যদি ছুঁড়িটার হয়।

—তোর মতন কপাল?

সুরীন অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল ভামিনীর দিকে। ভামিনী বলেছিল সলজ্জ ব্যথায়—সাত পাকের বে' দেখেছি, লাইন কাকে বলে, তাও জেনেছি। জীবনে এক চিমটি পুণ্যি না থাকলে এমন মানুষ পেতুম?

সুরীন কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কার কথা বলছিস তুই?

সে কথার কোনো জবাব দেয়নি ভামিনী। তার চোখের কোণে জল দেখা দিয়েছিল। আপন মনে বলেছিল, বেবুশ্যের সুখ দূরের কথা, এর কাছে সাত পাকের বে'র কোনো দাম আছে? আমার যেন জন্মো জন্মো বে' না হয়। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মে যেন আমি এমনটি চিরকাল পাই।

সুরীন বুঝতে পেরেছিল তখন ভামিনীর কথার মর্মার্থ। সহসা ভামিনীর জন্য তার মনটা টন্‌টনিয়ে উঠেছিল। তবু একটি ব্যথিত-আনন্দে ভরে উঠেছিল মনটা। কিন্তু মুখে বলেছিল, এ তুই আর আনতে কুড় আনলি। সব তাতেই তোর বেশী বেশী।

বলে কিন্তু ভামিনীর হাতখানি টেনে নিয়েছিল কোলের ওপর। ভামিনী বলেছিল, বেশী বেশী বলব কেন? যা সত্যি, তার আবার কম বেশী কী? রাজুর

কত বড় গেরস্থের মেয়ে ছিল, বে-থা সব হয়েছিল, তবু কপালে একটা ঠাঁই জুটল না। পেটে একটু-আধটু বিদ্যেও আছে। আমাদের মতন আকাট নয়। মেয়েটা আজ ফেটে মরছে, জ্বলে মরছে। চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে। যেন আগুন জ্বলছে অষ্টপোহর। ওখানে থাকতে পারছে না। পালাতে পারছে না। খালি মদ আর মদ। আমি তো বুঝি, কী চেয়েছিল ও?

তারপর সহসা সুরীনের কোলের ওপর থেকে হাতটি সরিয়ে এনে, তার পায়ে রেখে বলেছিল, গিনিকে তাড়িয়ে দেবার কথা তুমি বল না। মেয়েটা নিজের ইচ্ছেয় যতদিন আসে যায় আসুক।

সুরীন বলেছিল, আমি সবই বুঝি রে ভামি। কিন্তু লোকের সঙ্গে বিবাদে আমার বড় ভয়। নইলে, অন্যায্য তো তুই কিছু বলিসনি।

গিনির সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এ সব কথাই ভামিনী অভয়কে বলেছিল। কিন্তু অভয় যেন শুদ্ধ সমুদ্র। তার ঘোর কাটল না। ওপরের তরঙ্গটা তার ছদ্মবেশ মাত্র। সে বোঝা না বোঝা, শোনা না শোনার মত ঘাড় নাড়ল। হুঁ হাঁ দিল। বলল, তাই তো খুড়ি, এ কি অবিচার সংসারে বল দিকিনি।

যেন মুখস্থ করা কথা। ফিরে যদি ভামিনী জিজ্ঞেস করে, কী বিষয়ে অভয় এ কথা বলছে? অভয় বলতে পারবে না। অথচ গিনিকে রোজই দেখল অভয়। অভয়ের সামনে কাজকর্ম করে। কথাবার্তা বলে। একটু বুঝি কিশোরী-কৌতূহলেই, কখনো কখনো লুকিয়ে দেখে আড়াল থেকে। অভয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে পালায়। গিনি তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, আরো ঘনিষ্ঠ হতে চায়।

কিন্তু অভয়ের সাড় হল না। কোনো সাড়া এল না তার ভিতর থেকে। ভিতর দুয়ারে আচ্ছন্নতা তাকে যেন অনুভূতিহীন করে রাখল।

রাজুবালা বুড়ি এল ছানিপড়া চোখ নিয়ে। মালীপাড়ার যাবৎ মেয়ে আর পুরুষেরা—এল না শুধু সুবালা। সে কথাও স্মরণে এল না অভয়ের। অথচ সে সকলের সঙ্গে কথা বলল। এমন কি, অনাথ এসে কত কথা বলল। বাইরে টেনে নিয়ে গেল। যদিও অনাথের কথার মধ্যে কী একটি অভিযোগ যেন ধ্বনিত হল অভয়ের বিরুদ্ধে। যে কারণে হয় তো গণেশ দেখা করল না অভয়ের সঙ্গে। কিন্তু অভয়ের সে সব খেয়াল রইল না।

তার ভিতরের পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকারের মধ্যে এক বিচিত্র মৌনতা। সে যে শক্তি চেয়েছিল, মোরে চাহিবারে দাও শকৃতি, সেকথা তার ভিতরের সব মৌনতার মধ্যে মিশে গিয়েছে। যে শক্তি সে চেয়েছিল, সে তো জীবন-ধারণের বাহ্যিক শক্তি নয়। অন্তরের ভিতরের শক্তি। কারণ নিমি তাকে অপরাধী করে গিয়েছে, সেটাই শুধু বড় কথা নয়। নিমি-হীন জীবন বইবারও শক্তি চাই।

মনে মনে অনেকবার জীবনের পিছন ফিরে তাকিয়েছে অভয়। পিতৃপরিচয়হীন, দেহোপজীবিনীর সন্তান। ভূমিহীন ক্রীতদাস। সে কেন অন্তরের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে এত অসহায় হয়ে পড়ে। নিমির ভালোবাসা মুক্তি খোঁজার জটিল যুদ্ধে কেন টেনে আনল তাকে এ সংসার?

তারপরে তার শুদ্ধতার তুষারে প্রথম উত্তাপ এল বাহ্যিক দিক থেকেই। জীবনচৌধুরী বললেন, জীবনের ওঠানামায় পড়েছ বাবা। সোজা পথ তোমার হারিয়েছে। লড়, লড়ে যাও। পেটের ধান্দা তো আছে, সেইদিকের ব্যবস্থা দেখ। বেঁচে থেকে, কাজ ক'রে যাও। অর্থাৎ গান তৈরী কর।

বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন চৌধুরী মশাই। এ জেলার মন্ত্রী-উপমন্ত্রী থেকে সকলেই মান্য করেন তাঁকে। শাসন ক্ষমতার মধ্যেও ছিলেন এ অঞ্চলের। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন এখন। বললেন, দেখ, আমি যে-দলের লোক, তাদের সঙ্গে আমার বনল না। নতুন দলে যাবার আর আমার বয়স নেই। সারা জীবন রাজনীতি করে এখন দেখছি কিছু সুখসর্বস্ব ভোগী মানুষ শাসনের ক্ষমতায় ক্ষেপে উঠেছে। তুমি দল কর, যা-ই কর, লড়ে যাও। একলা তো লড়া যায় না। কিন্তু আসল ক্ষমতা চাই। সে ক্ষমতা আশ্চর্য জিনিষ। বক্তৃতা দেবার মত জিনিষ সেটা নয়। জানবে, রাজনৈতিক নেতা লোকটি কারখানার মাথার চিমনীর মত। যাকে সব সময় সবখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু সে আসল নয়। যোগাযোগটা আছে বটে সব কিছুর সঙ্গে, কিন্তু ভিতরটাই সব। ওখান-

টাকে শক্তিশালী করতে হবে। লড়াই আমরা করেছি, জিত আমাদের হয়নি। কারণ ভিতরটা শক্ত হয়নি। ওই শক্তিটা চাই বাবা। তোমরা হচ্ছ সেই শক্তির বাহক। খুব গান বাঁধ, খাঁটি গান। এ ব্যবস্থাকে ভাঙো। বাইরে নয়, মানুষের ভিতরে শক্তি যোগাতে হবে।

এত সব কথা বুঝল না অভয়। কিন্তু অনুভব করল এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। আর কানের কাছে বাজতে লাগল সবচেয়ে বেশী, পেটের ধান্দার কথা। তাই তো, এমন হাত পা' গুটিয়ে বসে আছে কেমন ক'রে অভয়। সংগ্রাম তাই স্মৃতির সঙ্গে ও। নিমিকে ভোলা যাবে না। এ সংসার নিমি-ময় করতে হবে।

তার দৃষ্টি ফিরল আশে-পাশে। সহজ দৃষ্টি। দেখল, সে সুরীন খুড়োর বোঝা হয়ে উঠেছে। যদিও সে বোঝা ভালবাসার। কিন্তু বোঝা তো ভালবাসারও ভাল নয়। ছেলেকে বুকে নিয়ে ভাবল, ওর খাওয়া-পরার দায় নিতে হবে। চাকরি তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এপারের চটকলে আর কোনোদিন চাকরি পাওয়াও যাবে না। যদি পাওয়া যায়, গঙ্গার ওপারে, অচেনা জায়গায় পাওয়া যেতে পারে।

শক্তি নিজেকেই আহরণ করতে হবে। কেউ দেবে না। নিজের সাহস থাকলে, অপরের সাহস সাহায্য করে। সে নিমিকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি মরবার সাহস আদায় করেছিলে। আমাকে বাঁচবার সাহস আদায় করতে হবে।

যেন, একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।

অভয়ের পরিবর্তন সকলের চোখে পড়ল। তার হাসি কথাবার্ত্তার ভাব বদলে গেল। তার গান শোনা গেল। ছেলের সঙ্গে ভাব হল খুব। গিনির সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে গিনি লজ্জা পায়। পালায়। কিন্তু অভয় ডাকে। হেসে ঠাট্টা করে কথা বলে। রোজই কাজের ধান্দায় ওপারে যাতায়াত শুরু করল। কিন্তু ভরসা বড় কম। দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল।

ভামিনী একদিন একটি পশমী কাপড়ের ব্যাগ অভয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখ কী আছে। তোমার বউ, শাশুড়ি এটি রেখে গেছে।

অভয় খুলে দেখল, প্রায় সাত আট ভরি সোনার অলঙ্কার। একটি বাঁধা-রাখা হাত-বড়ি, গুটি তিনেক আংটি আর কানের দুল। খুচরো-খাচ্‌রা মিলিয়ে শত খানেক নগদ টাকা।

দেখে শুনে বুকের মধ্যে একটা ফিক্ ব্যথার মত লাগলেও, সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পেল। তার যে এত আছে, এতখানি কেউ রেখে গিয়েছে, জানত না।

সুরীন বলল, কাজ যদি না পাওয়া যায়, একটা দোকান টোকান খুলেই না হয় বস। দুজনে মিলে দেখা-শোনা করব।

অভয় বলল, দাঁড়াও খুড়ো, এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়লে হবে না। ওপারের নর্থ মিলে একটা কিছু হ'য়ে যেতে পারে।

ভামিনী বলল, কাজের ধান্দা কর, ক্ষতি নেই। দোকান একটা করলে, আখেরের কাজ হতে পারে। আমি আর তোমার খুড়ো, দুজনেই দেখাশোনা করতে পারব। আর বলছিলুম কি, ঘরটা তো বড়। খা খা করছে। একটা বে' থা'—

অভয় হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, এটা মন্দ বলনি খুড়ি। পাত্রী কি তোমার গিনি?

—কেন, মেয়ে কি আমার খারাপ?

—না, খুব ভাল তোমার মেয়ে। কিন্তু নিয়ম কানুন ব'লে তো একটা কথা আছে।

আমি একটা আধবুড়ো ব্যাটাছেলে। ওইটুকুনি মেয়ে নিয়ে করব কী?

—ওইটুকুনি দেখলে?

—বেশ, না হয় বড়ই হল। কিন্তু তুমি কি বিশ্বেস কর খুড়ি, আমি আবার বে' করব?

—দোষ কী? আধ-বুড়ো বল আর যা বল, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। নিমির জন্যে মন আমারও টাটায়। সংসারের নিয়মকানুনগুলোন তো ছেড়ে কথা কয় না।

তবু অভয় খুব হাসল। হেসেই বলল, তা' হয় না খুড়ি।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল, সংসারের নিয়ম-কানুনের কথা বললে খুড়ি। জানি, তার যন্ত্রণা আর জ্বালা জানি। কিন্তু সে নিয়ম আবার কেমন করে পেঁচিয়ে ধরবে আমাকে জানি না। জানতেও চাইনা। তোমার গিনির জন্য ছেলে দেখার ব্যবস্থা আমি করব।

এর পরে আর ভামিনী কিছু বলতে পারেনি। আর আশ্চর্য, এসব কথা বলতে গিয়ে অভয়ের চোখের সামনে কেবলি সুবালার মুখ ভেসে উঠছিল। তার চেয়ে আশ্চর্য-তম ব্যাপার, যতবারই সুবালার কথা মনে পড়ল ততবারই মনে হ'ল, নিমির মরণের মধ্যে কোথায় যেন সুবালার দায় রয়ে গিয়েছে। একটা চাপা বিদ্বেষ অভয়ের বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। সুবালা যেন একটি অদৃশ্য হাত দিয়ে নিমিকে মৃত্যুর হাতছানি দিয়েছিল। ক্রমশঃ

নূতন ধরণের ইলেক্ট্রিক গাড়ী

গাড়ী চলবে, কিন্তু শব্দ হবেনা, ধোঁয়া বেরুবে না, এমন কি 'গিয়ার' পর্য্যন্ত বদলাতে হবে না—এ কথা ভাবতে বেশ আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু এই গাড়ীর বাস্তবরূপ পেতে বোধহয় আর বেশী দেরী নেই। আগামী কালের সব গাড়ীই হয়তো 'গ্যাসোলিন বা পেট্রলের পরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। এর পরিচালন পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

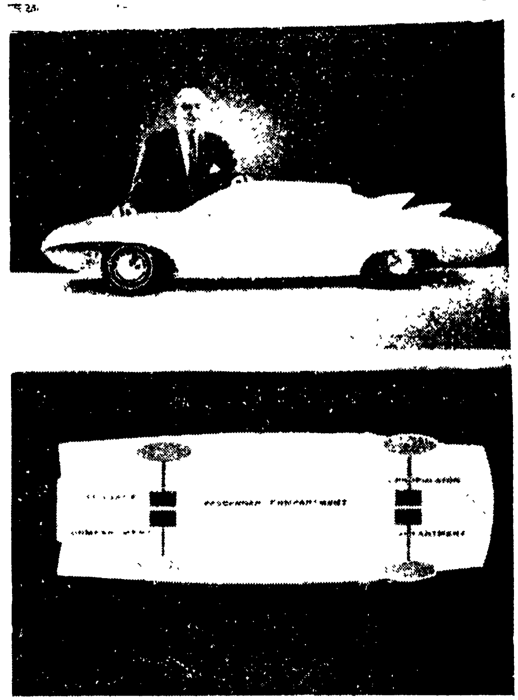
আমেরিকার জেনারাল্ ইলেক্‌ট্রিক কম্পানীর রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীর ডাঃ হেরম্যান-এ-লিয়েভাফ্‌স্কি বলেছেন যে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক গাড়ীর প্রচলন হবে। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে ষ্টোরেজ ব্যাটারী চালিত ইলেক্‌ট্রিক গাড়ী প্রচলিত হয় কিন্তু এই গাড়ীর ব্যাটারীর প্রায়শঃই পুনঃ পুনঃ চার্জ্জের দরকার হয় এবং তার ফলে এই গাড়ীর প্রচলন ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়।

Chrysler Corporation একটি ইলেকট্রিক গাড়ী নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এই গাড়ীটির নাম Cella 1 দেওয়া হয়েছে। উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারিং অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা এই গাড়ীটির থেকে লাভ করা সম্ভব হবে, সেজন্য তাঁরা এই গাড়ীটির নাম দিয়েছেন 'আইডিয়া কার্।'

এই গাড়ীর পরিচালন প্রণালী 'ফুয়েল্ সেল্' দ্বারা পরিচালিত হবে। এই 'ফুয়েল সেল'ই হচ্ছে এই গাড়ীর অন্তর স্থল। এর থেকে প্রত্যেক চাকার মোটরে ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহ হবে। ফুয়েল সেল্ একটি অভিনব পরিকল্পনা, রাসায়নিক পদার্থ সমূহ থেকে সোজাসুজি ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদনের ক্ষমতা এর আছে এবং বর্ত্তমান কালের যে কোন শ্রেষ্ঠ 'পাওয়ার প্লান্টে'র চাইতে অনেক বেশী পারদর্শিতার সঙ্গেই এই কাজ সম্পাদন করতে পারে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'ফুয়েল সেলে' তার মৌলিক রাসায়নিক পদার্থসমূহের সরবরাহ থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা নিঃশব্দে এবং নিপুণভাবে ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করবে। এখনকার মোটর গাড়ীর ব্যাটারিগুলির যেমন পুনরায় চার্জ্জের প্রয়োজন হয়, এ' ক্ষেত্রে তার আর দরকার হবেনা।

ফুয়েল সেল্ কিন্তু একেবারে অপরীক্ষিত পরিকল্পনা নয়। অনেকদিন ধরে অনেক বড় বড় কম্পানী এই



"আইডিয়া কার্" Cella I-এর মডেল্

সম্পর্কে পরীক্ষা কার্য্য চালাচ্ছেন। প্রায় ২০টি আমেরিক্যান কম্পানী, মোটর বোট্ থেকে আরম্ভ করে 'Space travelling earth satellites' প্রভৃতির কার্য্যে এই ফুয়েল সেল্-কে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন।

এখন 'ফুয়েল সেল্' বলতে আমরা কি বুঝি। এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। ফুয়েল সেল্ একটা ব্যাটারির মত জিনিস, কিন্তু এর পরিচালন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর দুটি 'electrode' আছে,এই electrodes দু'টি তথাকথিত electrolyte-এর মধ্যে নিমগ্ন আছে। Electrolyte

হচ্ছে তরল পদার্থ যেটি ইলেকট্রীক কারেণ্ট সঞ্চালিত করে। যখন একটি electrode-এ হাইড্রোজেন এবং অপরটিতে অক্সিজেন দেওয়া হয় তখন একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সংঘটন হয়। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে জলের সৃষ্টি হয়। এবং এই প্রক্রিয়ার সময় নেগেটিভ, চার্জ্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রিসিটি এসে হাইড্রোজেন electrode-এ জমা হয়।

'ফুয়েল সেল্' যদি ইলেকট্রিক মোটরের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহ'লে হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড্ থেকে ইলেকট্রীক কারেণ্ট মোটরে সঞ্চালিত হয়ে অক্‌সিজেন্ ইলেকট্রোডে ফিরে আসবে। যদি যথেষ্টসংখ্যক cell পর পর সংযুক্ত করা যায়, যার ফলে প্রতিটি cell অপরগুলিকে তার শক্তি যোগাতে পারবে তাহ'লে মোটরকে চালু করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ইলেকট্রীসিটি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সরবরাহ থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত cell-গুলি শক্তি উৎপাদন করতে থাকবে।

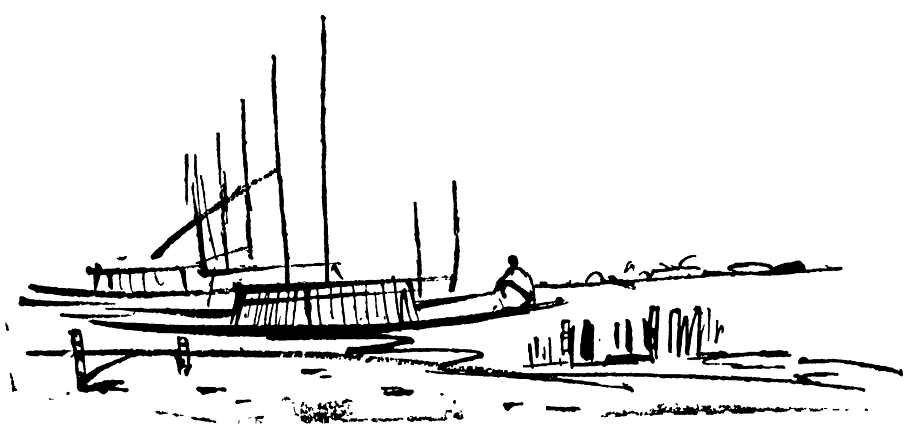
হাইড্রোজেনের বদলে অন্য রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করা চলতে পারে। এই সম্পর্কে যুক্ত-রাষ্ট্রে বিশেষভাবে গবেষণা চলছে। মোটর গাড়ীর জন্য ফুয়েল সেল্ থেকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে; প্রথমতঃ, বিশ্রী এবং ক্ষতিকর ধোঁয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ, দ্বিতীয়তঃ, নিঃশব্দে গাড়ী পরিচালনা; তৃতীয়তঃ, ৭৫ থেকে ৮০ পার্সেণ্ট ইলেকট্রীসিটি উৎপাদনের ক্ষমতার জন্য পরিচালনে মিতব্যয়িতা; চতুর্থতঃ, গাড়ী যখন ট্রাফিক্ সংকেতে বা ভীড়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে তখন 'ফুয়েল' লাগবে না।

অভিনব টাইপরাইটার

মানুষের মুখের দশটি কথা উচ্চারণ মাত্র সাড়া দেয়, এই রকম একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে—যন্ত্রটির নাম ফোনেটিক টাইপরাইটার। প্রিন্সটনের আর-সি-এ লেবরেটরিজের ডাঃ হ্যারি এম, অলস্রেন এই যন্ত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, "এমন দিন শিগ্‌গিরই আসছে যখন, আমরা যেমন মানুষ-কে হুকুম করে কাজ করাই, তেমনি যন্ত্রকেও হুকুম দিয়ে কাজ করাতে পারব।" হিসাবপত্রের ব্যাপারে এই যন্ত্র বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

বেতারযোগে মিনিটে ৪৮০০ টি শব্দ প্রেরণের ব্যবস্থা

ন্যাশনাল্ ব্যুরো অফ্ স্ট্যাণ্ডার্ডস জানিয়েছেন যে, বেতারবার্ত্তা প্রেরণের একটি নূতন পন্থা আবিস্কৃত হয়েছে। বর্ত্তমানে টেলিটাইপ যোগে যে গতিতে বার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে তার তুলনায় ৮০ গুণ অধিক দ্রুত গতিতে বার্তা প্রেরণ করা যাবে। এই পন্থায় প্রতি মিনিটে ৪৮০০টি শব্দ প্রেরণ করা সম্ভব হবে।



সাময়িকী

বর্ষারম্ভ—

ভারতবর্ষের বয়স ৪৭ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৪৮ বৎসর আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে আমরা ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা চারণ-কবি স্বর্গত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। আজ মাসিক-পত্রে প্লাবিত দেশে সে দিনের অবস্থার কল্পনা করাও কঠিন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও কর্মশক্তি ভারতবর্ষের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিচালনা ভারতবর্ষ-কে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া জলধর সেন মহাশয় শ্রম ও সততার সহিত ভারতবর্ষকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে ভারতবর্ষ যে সকল লেখক, পাঠক, উৎসাহ-দাতা ও অনুগ্রাহকের সাহায্য লাভ করিয়া পুষ্ট ও ধন্য হইয়াছে, আমরা তাঁহাদের কথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, পূর্ববর্তী সকলের আশীর্বাদ যেন আমাদের কর্মশক্তি দানে ভারতবর্ষকে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর জীবন দানে সমর্থ করে। আমরা যেন তাঁহাদের কৃপায় ভারতবর্ষের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি।

জলধর জন্মশতবার্ষিক—

ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ বৎসর কাল তাহার দানের দ্বারা যে আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন আমরা আজ তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসবের সময় দেশবাসীকে সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদান করিতে অনুরোধ জানাই। অজাতশত্রু নিরহঙ্কার জলধর সেন মহাশয় ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল ভারতবর্ষ-সম্পাদনা কালে দেশে যে সাহিত্যিকের দল তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আজ সমবেত ভাবে জন্ম শতবার্ষিক পালনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক মানুষ হিসাবেও তাঁহার তুল্য মানুষ দেশে দুর্লভ। জীবিত কালে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার অভাব হয় নাই। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার গুণগান করিয়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রশংসাবাণী রচনা করিয়াছিলেন, সে সকলের পুনরাবৃত্তিই আজ তরুণ দেশবাসীদিগকে নূতন প্রেরণা দান করিবে। আমরাও জলধরদাদার জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানাবার সুযোগ গ্রহণ করিব।

অনাবৃষ্টি ও খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি—

বাংলাদেশের আবহাওয়া পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার প্রধানতম কারণ, দেশে গাছের অভাব। যে দেশ ঘন-জঙ্গলে প্রায় পূর্ণ ছিল, সে দেশে আজ গাছ নাই। বহু বৎসর ধরিয়া কর্তৃপক্ষ বৃক্ষরোপন উৎসব করিয়াও কোন ফল লাভ করেন নাই। দেশবাসীর এ বিষয়ে উৎসাহ ও আন্তরিকতার অভাব আজ বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৃক্ষের অভাবে এ দেশে যথাসময়ে বৃষ্টির অভাব হইয়াছে ও তাহার ফলে পূর্বকালের মত আর শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। সে জন্য স্বাধীনতা লাভের পর ১৩ বৎসরে দেশবাসীর খাদ্যাভাব পূরণ না হইয়া দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এ অভাব কবে বা কি ভাবে দূর হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না—শাসকগণের এ বিষয় কোনরূপ চিন্তা আছে বলিয়া ও মনে হয় না। গ্রীষ্মকালে এ দেশে আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি প্রচুর ফল উৎপন্ন হইত ও তাহা খাইয়া সাধারণ দেশবাসী ২মাস কাটাইয়া দিত—সে সকল ফল এখন দুর্লভ। প্রধান খাদ্য চাউলের কথা না বলাই ভাল—কারণ এখনও দারুণ গ্রীষ্মে বাঙ্গালীকে রুটি খাইয়া বাঁচিতে হইতেছে—বাজারে চাউলের মণ ৩০টাকা। তরিতরকারী গত ৩মাস কাল এতই দুর্মূল্য যে সাধারণ গৃহস্থকে প্রায় বিনা তরকারীতেই জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। চিনি, তৈল, দুধ, মসলা প্রভৃতির অভাব ত এতটুকুও কমানো সম্ভব হয় নাই। ঐ সকল জিনিষের দাম প্রতি বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

স্বতন্ত্র খাদ্য-উৎপাদন দপ্তর সৃষ্টি হইলেও দেশবাসী খাদ্যের প্রাচুর্য্যের কথা চিন্তাও করিতে পারে না। প্রতিদিন তাহাদের অভাবের মধ্যদিয়া অতি কষ্টে জীবনধারণের উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। দেশবাসী ক্রমে উৎসাহহীন ও নির্জীব হইয়া পড়ায় তাহাদের পক্ষ হইতে এ বিষয় কিছু করা সম্ভব হয় না। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে চিন্তা করেন না—সরকারী চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া শুধু নিষ্ফল হইয়া চলিয়াছে। এই ভাবে দেশ-শাসন চলিলে দেশের ভবিষ্যত যে চিরদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, সে কথা আজ বলার প্রয়োজন নাই। আমরা বহু বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও লাভবান হই নাই। তথাপি বার বার এই খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সকলকে অবহিত করার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারি না।

যুদ্ধের আশঙ্কা—

ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর রাজনীতির অবস্থা দিন দিন সঙ্কটপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্যারিসে উচ্চ শক্তি সম্মিলন যে ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহাতে সারা দুনিয়ার লোক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা ও রাসিয়া আজ জগতের দুইটি শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী জাতি—তাহাদের নেতৃদ্বয় যেভাবে ও যে ভাষায় বাক্য বিনিময় করিয়াছেন, তাহা সমগ্র জগতের লোককে বিস্মিত করিয়াছে। এ দিকে রুসিয়ার শক্তি ও সমর্থন লাভ করিয়া চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ তাহাতে উপযুক্তভাবে বাধা প্রদান না করায় চীনা সৈন্য প্রতিদিনই অগ্রসর হইয়া ভারতীয় এলাকা দখল করিতেছে। ভারতের উত্তরসীমান্তস্থিত নেপাল, ভুটান ও সিকিম আজ চীনের ঔদ্ধত্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্থান চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও ভারতের মতই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা জানে চীন ক্রমশঃ শক্তিমান হইয়া ভারত ও পাকিস্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিব্বতের মত এক সুবৃহৎ জনপূর্ণ দেশ আজ চীনের অধীন—অধিকাংশ তিব্বতবাসী আক্রমণকারী চীন কর্তৃক পরাভূত হইয়া চীনা সৈন্য বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে এবং তিব্বতের রাস্তা, রেলপথ, গৃহাদি নির্মাণের নামে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। অন্য পক্ষে ভারতরাষ্ট্র বিরাট হিমালয় পর্বত পার হইয়া যাইয়া চীনের আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে না। যে কোন সময়ে চীনা সৈন্যরা ভারতের সমতল প্রদেশে উপস্থিত হইয়া ভারত দখল করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। পার্বত্য অঞ্চলের বহু জমী (যাহা পূর্বে ভারতের ছিল এবং যেখানে মানুষ বাস না করায় ভারত সে সকল স্থান রক্ষার ব্যবস্থায় অবহিত ছিল না) চীন সৈন্যরা দখল করিয়াছে ও তথায় গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। চীনারা সীমান্তে বহু রেলপথ ও গাড়ীর রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে ও পাহাড়ের তলা দিয়া পথ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পর ভারতের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সারা ভারত হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উত্তর সীমান্তে সমবেত না করিলে চীনাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমরা কি শুধু বসিয়া এই রহস্য দেখিব—না কর্তব্যে মনোনিবেশ করিব ?

খেলা ধুলা



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উইম্বল্‌ডনের ইতিকথা

উইম্বলডনে, 'অল ইংলণ্ড লন্ টেনিস অ্যাণ্ড ক্রোকে ক্লাব-এর বাৎসরিক প্রতিযোগিতার আর দেরী নাই। আগামী ২০শে জুন এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। সারা বিশ্বের বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ এই বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য শীঘ্রই লণ্ডনে এসে সমবেত হবেন।

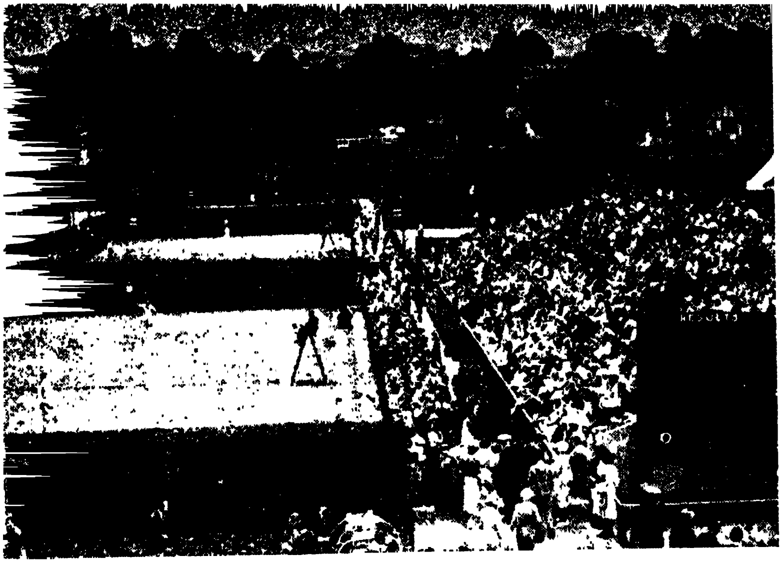
উইম্বলডনে এই টেনিস প্রতিযোগিতার একটি স্বতন্ত্র রকমের আকর্ষণ আছে—টেনিস খেলোয়াড়দের মত দর্শকদের মধ্যেও এই প্রতিযোগিতার প্রতি একটা ভিন্নরকমের আকর্ষণ লক্ষ করা যায় এবং দর্শকদের নিকট এই প্রতিযোগিতার সম্মানও সবচেয়ে বেশী। প্রতি বৎসর অসংখ্য দর্শক এই খেলা দেখবার জন্য ভীড় করে থাকেন। খেলোয়াড়দের ন্যায় দর্শকগণের মধ্যেও এক অদ্ভুত ধরণের উত্তেজনা লক্ষ করা যায়।

১৮৭০ সালের প্রথম দিকে মেজর ওয়াণ্টার উইংফিল্ড নামে একজন ভদ্রলোক একটি খেলার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তিনি এই খেলাটির নাম দেন 'স্ফেইরিস্টাইক' (sphairistike) এবং এই খেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ সালে ওয়েল্‌সের একটি 'গ্রাস্ কোর্টে'। এই ধরণের একটি খেলা অবশ্য ১৮৬৮ সালে বার্মিংহামের অন্তর্গত এজ্‌বাস্টনেও একবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাই হ'ক, মেজর উইংফিল্ডের এই খেলাটি খুব অল্প দিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং তাঁরই পরিকল্পিত নেট্ ও বল ব্রিটেনে এবং বিদেশে বিক্রীত হতে লাগলো।

১৮৭৫ সালে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব খেলার এক নিয়মকানুন প্রকাশ করেন এবং অল ইংলণ্ড ক্রোকে ক্লাব খেলাটিকে গ্রহণ করেন। প্রথম লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষদের) খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালে। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২২ জন। এর অব্যবহিত পরে এম-সি-সি, এই খেলাটির সকল দায়িত্ব অল ইংলণ্ড ক্রোকে ক্লাবের হাতে তুলে দেন।

শুধু ব্রিটেনেই নয়, বিশ্বের বহু দেশেই খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ইংরাজরাও তাঁদের সাথে সাথে এই খেলাটিকে অন্যান্য দেশে নিয়ে যান। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিবাসীরা টেনিস খেলার প্রবর্তন করেন ১৮৭০ সালে। এই বৎসরেই অষ্ট্রেলিয়ার মেল্‌বোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব 'অ্যাশফল্ট কোর্টে' এই খেলার ব্যবস্থা করেন। ১৮৯০ সালের মধ্যে খেলাটি কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জামাইকা প্রভৃতি বহু দেশে প্রসার লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রে খেলাটি প্রবর্তিত হয় বারমুডার থেকে।

খেলাটি বাইরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই খেলার কেন্দ্রস্থল উইম্বিলডন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। বিজয়ীর সম্মান লাভের জন্য অদম্য আগ্রহে বিশ্বের চারিদিক থেকে খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। বিশ্বের সকল দেশের শৌখিন বা এ্যামেচার খেলোয়াড়গণ আজ উইম্বলডন



উইম্বলডন খেলাকালীন কয়েকটি বাহিরের কোর্টের সাধারণ দৃশ্য

বিজয়ের সম্মানকে লন্ টেনিস খেলার শ্রেষ্ঠসম্মান বলে মনে করেন।

১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত লন্ টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অল ইংলণ্ড ক্লাব বর্ত্তমানে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করছেন। খেলার ইভেন্টের সংখ্যা এখন; পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবল্স, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবল্স, মিক্সড্ ডবল্স, অল্ ইংলণ্ড প্লেট—পুরুষদের এবং মহিলাদের। শেষোক্ত বিষয় দু'টি কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত প্রতিযোগীদের জন্য। জুনিয়র ইভেন্টসের প্রবর্ত্তনও করা হয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসের প্রথম খেলা হয় ১৮৮৪ সালে।

গত শতাব্দীতে লন্ টেনিস খেলার সূত্রপাত হলেও লন্ টেনিসের স্বর্ণ-যুগ বলতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বোঝায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে 'সেণ্টার কোর্ট' ক্রমশ দর্শক পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তৈরী হলো নূতন নূতন কোর্ট। সেই সঙ্গে খেলোয়াড়দের আকর্ষণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আধুনিক উইম্বল্ডনের নূতন 'সেণ্টার কোর্টে' এখন ১৫,০০০ দর্শকের স্থান সংকুলান হতে পারে। তা'ছাড়া উইম্বল্ডনের ১ নম্বর কোর্টের আসন সংখ্যা হ'ল ৬,০০০ এই সঙ্গে আরও ১৪টি 'গ্রাস্ কোর্ট' এবং ৯টি 'হার্ড্ কোর্ট' আছে। উইম্বলডন প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে। কেবলমাত্র শৌখিন বা এ্যামেচার খেলোয়াড়দের মধ্যেই এই খেলা এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল। এই বৎসরের প্রতিযোগিতার পরই এর শেষ হবে। আগামী বৎসর থেকে পেশাদার খেলোয়াড়গণও এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন। ফলে এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণও বহুগুণে বেড়ে যাবে।

এই হল উইম্বলডনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লন্ টেনিস খেলার মানের উন্নতির জন্য উইম্বলডন্ যে বিশেষ সহায়তা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এর বাইরের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে কালের গতির সাথে সাথে কিন্তু উইম্বলডনের সম্মানের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নি। এখনও বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের লক্ষ্য হল এই উইম্বল্ডন চ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ গ্রহণ করা এবং বিজয়ীর সম্মান লাভ করা।

বাহির বিশ্বে ***

* মিস্ ট্র্যুম্যান্ পুনরায় উইম্বল্ডনের বাঞ্ছিত খেলোয়াড়

আগামী ২০শে, জুন থেকে উইম্বল্ডন প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মিস্ খ্রিষ্টিন ট্রুম্যানকে নিঃসন্দেহে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ মহিলা লন্ টেনিস খেলোয়াড় বলা চলে। গত উইম্বলডনে ব্রিটেন এঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এঁর পরাজয়ের ফলে সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের পর মিস্ ট্রুম্যানই হচ্ছেন প্রথম ইংরাজ মহিলা যিনি উইম্বলডনে ১নং 'সিডিং' লাভ করেন। উইম্বলডনে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে না পারলেও তিনি ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং সুইস্ প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হন। তিনি যে এবার উইম্বলডন

জয়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

খ্রিষ্টিনের যখন আট বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতা মাতা শুনে অবাক হলেন যে সে তার নৃত্য শিক্ষা ছেড়ে দেবে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় খ্রিষ্টিন গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন, "আমি ঠিক করেছি এর বদলে আমি লন্ টেনিস খেলোয়াড় হবো।"

লন্ টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের 'ট্রেনিং' ম্যানেজার ও অল্ ইংলণ্ড ক্লাবের শিক্ষক ড্যান্ ম্যাসকেল খ্রিষ্টিনের নৈপুন্য লক্ষ করেন। ম্যাসকেল খ্রিষ্টিনকে লণ্ডনের কুইন্স ক্লাবের এল্-টি-এ, 'কোচিং' ক্লাসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইখানে ম্যাসকেল তাঁকে জানান যে তাঁর বিশ্বাস খ্রিষ্টিন একদিন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবেন, তবে এর জন্য দীর্ঘ এবং কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

১৯৫৮ সালে ওয়াইটম্যান কাপ প্রতিযোগিতায় খ্রিষ্টিন আমেরিকার মিস্ এ্যাল্থিয়া গিব্সনকে পরাজিত করেন। তাঁর শিক্ষক ম্যাসকেল বলেন ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই খ্রিষ্টিন উইম্বলডন মুকুট লাভ করবেন।

মিস্ ট্রুম্যানের যখন ১৬ বছর বয়স তখন সমালোচকগণ বলেন যে তাঁর শরীরের অত্যধিক দীর্ঘতা এবং ওজনের জন্য তিনি উচ্চ শ্রেণীর টেনিস খেলোয়াড়ের দ্রুততা অর্জ্জন করতে পারবেন না। খ্রিষ্টিনের উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট। এই সমালোচনার পর তিনি ব্রিটিশ অলিম্পিক দলের প্রধান শিক্ষক জিওফ্ ডাইসনের নিকট পেশী উন্নয়ন করতে শুরু করে দিলেন। আর সেই সঙ্গে চল্‌ল খাওয়া দাওয়ার কড়াকড়ি।

এরপর খ্রিষ্টিন নিয়মিতভাবে বিখ্যাত আমেরিক্যান 'কোচ', মিস্ "টিচ" টেনান্ট-র কাছ থেকে শিক্ষা নিতে লাগলেন। এ্যালিস মার্ব্বেল্, পলিন্ বেজ্, মরিন্ কনোলী প্রমুখ বিখ্যাত মহিলা খেলোয়ড়গণ এই মিস্ টেনান্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। টেনান্ট তাঁর ছাত্রী সম্বন্ধে বলেছেন, মরিন কনোলীর পর খ্রিষ্টিনই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। তিনি আরও বলেন, "একদিন খ্রিষ্টিন হয়তো প্রমান করবে, সে কনোলীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ।"



খ্রিষ্টিন্ ট্রুম্যান্

* দাবা খেলায় নুতন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান

সম্প্রতি মস্কোতে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা এফ-আই-ডি-ই (Federation Internationale Des Eschecs) এর পরিচালনাধিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় গত বারের বিজয়ী রাশিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় বট্‌ভিন্নিক্ পরাজিত হয়েছেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর বট্‌ভিন্নিক্ তরুণ খেলোয়াড় মিহাইল্ টল্ এর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। দুজনের এই খেলা ২১ রাউণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

* হোয়াইট সিটির জন্য নুতন এ্যাথলেটিক ট্র্যাক

কমনওয়েল্থের এ্যাথলেটগন সকলেই লণ্ডনের হোয়া-

ইট সিটি ষ্টেডিয়ামের সঙ্গে পরিচিত। পুরানো ট্র্যাকের বদলে এখানে নূতন 'সিণ্ডার ট্র্যাক'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ত্তমান ট্র্যাকে মেট্রিক এবং ইংলিস দূরত্বের জন্য আলাদা চিহ্নের প্রয়োজন হবে না। ব্রায়ান হিউসন, গর্ডন পিরি, মেরী বিগন্যাল প্রমুখ এ্যাথলেটগণ এই নূতন ট্র্যাক্ পরিক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছেন।



কৃষ্ণান ও ললিতা

ভারতের জাতীয় এবং এশিয়া চ্যাম্পিয়ন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় শ্রীরমানাথন কৃষ্ণান গত ২রা মে, মাদ্রাজে শ্রী টি, এস, সিতাপতির কন্যা কুমারী ললিতার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। শৃঙ্গেরীর জগৎ-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য নব-দম্পতির উদ্দেশ্যে তাঁর আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ প্রেরণ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, শ্রীরাজা-গোপালাচারী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ এই উপলক্ষে হয়। শ্রীমতী এম, এস, সুভালক্ষী এবং সঙ্গীত কলানিধি মাদুরাই মণি আয়ার কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভারত এবং ভারতের বাহির থেকে অসংখ্য অভিনন্দন পত্র নব-দম্পতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়।

আমরা তাঁদের সুখময় জীবন কামনা করি।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ডেভিস কাপ ঃ

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ফিলিপাইন ৫-০ গেমে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোনে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই খেলাটি ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টির দরুণ নির্দ্দিষ্ট দিনে খেলাটি আরম্ভ হয়নি। পর পর চার-দিন খেলাটি স্থগিত থাকে। শেষে পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম দিনের খেলায় ফিলিপাইন ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। প্রথম দিনের দু'টি সিঙ্গলস খেলায় ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ-কুমার পরাজিত হ'ন। ফিলিপাইনের খেলোয়াড় এম্পন অপ্রত্যাশিতভাবে ৬-৩, ৮-৬, ৬-১ গেমে কৃষ্ণানকে পরা-জিত করেন। ৪০ বছর বয়সেও এম্পন যথেষ্ট ক্রীড়া কৌশল এবং কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। অপর দিকে রেমুণ্ডো দেরো ৬-০, ৬-১, ৬-১ গেমে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরেশকুমারকে পরাজিত করেন। খেলার সময় কৃষ্ণানের প্রতি ম্যানিলার দর্শক সাধারণের বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি কৃষ্ণানকে উত্তেজিত করে ; ফলে তিনি তাঁর স্বাভা-বিক খেলা খেলতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় ফিলিপাইনের দাঙ্গো এবং জোসী অত্যাশিতভাবে ৬-২, ৬-২,৬-২ গেমে ভারতীয় জুটী নরেশকুমার এবং কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

পুনরায় বৃষ্টির দরুণ ৪ঠা জুন তারিখে বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫ই জুন বৃষ্টির দরুণ দু'বার খেলা স্থগিত থাকে। এই খেলা দুটির ফলাফলের উপর কোন গুরুত্ব না থাকায় ভারতবর্ষ শেষ পর্য্যন্ত খেলার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে এই দুটি খেলাতেও ফিলিপাইনের কাছে হার মেনে নেয়। কারণ ভারতীয় দলের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে ভারতবর্ষে ফিরে আসা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল ঃ

আগামী রোম 'অলিম্পিক গেমস' প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যদি হকি খেতাব লাভ করতে পারে তাহলে ভারতবর্ষের পক্ষে উপর্য্যুপরি ৭বার হকি খেতাব জয় করা হবে। ভারতবর্ষ প্রথম অলিম্পিক হকি খেতাব পায় ১৯২৮ সালে। তারপর ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৫২, এবং ১৯৫৬ সালে হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ ক'রে ভারতবর্ষ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তা অতিক্রম করা কোন দেশের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। গত ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের খেলার ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ মাত্র এক গোলের ব্যবধানে পাকি-স্তানকে ফাইনালে হারিয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। তাছাড়া জার্ম্মানীর বিপক্ষে ভারতবর্ষ মাত্র ১-০ গোলে জয়ী হয়ে-ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে আজ হকি খেলায় পাল্লা দিতে পারে পাকিস্তান এবং পশ্চিম জার্ম্মানী। ১৯৫৯ সালের ইউরোপ সফরে ভারতীয় হকি দল বার্লিন একাদশ দলের কাছে হেরে এসেছিলো। অনেক হকি বিশারদের মতে, ভারতীয় হকি খেলার মান আগের থেকে অনেক নিম্নগামী হয়েছে এবং অপর দিকে হকি খেলায় পশ্চিম জার্মানী প্রভূত উন্নতি করেছে। এই সফরের ফলা-ফল থেকে ভারতীয় হকি খেলার পরিচালক মণ্ডলী রোম অলিম্পিকের কথা চিন্তা ক'রে খুব যে বেশী সতর্ক হয়েছেন মনে হয় না।, রোম অলিম্পিক গেমসের জন্য ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন পর্ব্ব চূড়ান্তভাবে শেষ হয়েছে। কোন কোন খেলোয়াড়ের নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য ক'রে পত্রপত্রিকায় বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। হায়দ্রা-বাদে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা শিবির স্থাপন করা হয়েছিল সেখানে সময়মত অনেক খেলোয়াড়ই উপস্থিত হতে পারেন নি ; নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অন্যতম দুজন সদস্য ধ্যানচাঁদ এবং কে ডি সিংয়ের (বাবু) অনুপস্থিতি বিশেষ ক'রে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে—খেলোয়াড় নির্ব্বাচন নিয়ে কোথ্যও একটা মতভেদ হয়েছে। যে হাবুল মুখার্জি বিগত প্রত্যেকটি ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের অভীজ্ঞ কোচ হিসাবে কাজ করেছেন, তাঁরও

চেহারা দেখা গেল না। নির্ব্বাচিত ২১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে রেলওয়ের ৬ জন, সার্ভিসেস দলের ৫ জন, পাঞ্জাবের ৩ জন, বাংলার ২ জন, মহারাষ্ট্রের ২ জন, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাইয়ে একজন করে খেলোয়াড় আছেন।

যে ২১ জন খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব অলিম্পিক খেলোয়াড় আছেন এই ৬ জন—ক্লডিয়াস, লক্ষ্মন, দেশমুখ, কেশব দত্ত, উধম সিং এবং ভোলা। ক্লডিয়াস দলের অধিনায়ক হয়েছেন। ক্লডিয়াস এই নিয়ে উপর্য্যুপরি চারবার ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে নির্ব্বাচিত হলেন।

অলিম্পিক হকি ঃ

১৯৬০ সালের রোমের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দেশ যোগদান করবে। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বৃটেন এবং জার্ম্মানী—এই চারটি দেশকে চারটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাকি দেশ অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জাপান, কেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, স্পেন এবং সুইজারল্যাণ্ডকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে এই চারটি বিভাগের যোগদানকারী দেশগুলি লীগ প্রথায় খেলবে। প্রত্যেক গ্রুপের বিজয়ী দেশগুলিকে নিয়ে টুর্ণামেণ্টের সেমি-ফাইনাল খেলা হবে। সেমি-ফাইনাল থেকেই নক্ আউট প্রথায় খেলা হবে।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

১৯৬০ সালের রোমের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্য্যায়ের খেলায় ১৬টি দেশ খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। সমান চারটি ভাগে এই ১৬টি দেশ লীগ প্রথায় খেলবে। প্রত্যেক ভাগ থেকে বিজয়ী দলকে নিয়ে শেষে নক্আউট প্রথায় খেলা হবে।

ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে ৪র্থ গ্রুপে ; এই বিভাগে খেলবে ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী এবং পেরু। ভারতবর্ষ ২৬শে আগষ্ট খেলবে হাঙ্গেরীর সঙ্গে, ২৯শে আগষ্ট ফ্রান্সের সঙ্গে এবং ১লা সেপ্টেম্বর পেরুর সঙ্গে

উইম্বলডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৬০ সালের উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা আগামী ২০শে জুন থেকে আরম্ভ হবে। ৩৭টি দেশের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়রা এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ বছরেই সর্ব্বাধিক সংখ্যক খেলোয়াড় নাম দিয়েছেন। এতকাল উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র সখের খেলোয়াড়দের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আগামী বছর থেকে পেশাদার খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের আর কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। সুতরাং আগামী বছরে উইম্বলডন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগির গামা ঃ

ভূতপূর্ব্ব বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগির গামা ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। শেষ জীবনে তিনি শোচনীয় আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলেন।

১৯১০ সালে গামা ইংলণ্ডে যান। লণ্ডনে প্রথমে তিনি লড়েছিলেন রোলারের সঙ্গে। ২০ মিনিটের লড়ায়ে তিনি রোলারকে পরাস্ত করেন। এই লড়াইয়ের ফলাফল থেকে গামা সম্বন্ধে সেই সময়ের বিশ্ববিজয়ী এবং নামকরা কুস্তিগিরদের মনে একটা দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়। সুনাম হারাবার ভয়ে কেউ গামার সঙ্গে লড়তে সাহস পাননি। জেবিস্কো নামে একজন পুলিশ কুস্তিগিরের সঙ্গে গামার লড়াই হয়। ৩ঘণ্টা ৪৫মিনিটের লড়াইয়ে গামা জয়ী হন। ১৯২৮ সালে পাতিয়ালায় দ্বিতীয়বার গামা জেবিস্কোর লড়াই হয়। ১২ সেকেণ্ডে গামা জেবিস্কোকে পরাজিত করেন। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এসে গামা ১২ বার লড়াই ক'রে তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখে।। কুস্তি খেলার ইতিহাসে গামার লড়াই মহাভারতের ভীমের শৌর্য্যের মতই পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগাখাঁ কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত আগাখাঁ কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশদল ২-০ গোলে

বার্মাসেল স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করেছে। পাঞ্জাব পুলিশ ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৯ ও ১৯৫৫ সালে আগাখাঁ কাপ জয়ী হয়েছিল।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬০ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উপস্থিত লীগ তালিকায় অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। ১০টা খেলায় তাদের ১৮ পয়েণ্টে হয়েছে। দুটো খেলা ড্র করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে ঠিক তার পরের খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র করা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উপস্থিত ২য় স্থানে আছে—১০টা খেলায় ১৭ পয়েণ্ট। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ১টা খেলায় হার হয়েছে এবং ১টা ড্র গেছে; ১৯টা গোল দিয়ে মাত্র ১টা গোল খেয়েছে।

মোহনবাগান আছে ৩য় স্থানে—১১টা খেলায় ১৮ পয়েণ্ট। তাদের ২ টা খেলা ড্র; হার ১ টা—ইষ্টার্ণরেল দলের কাছে।

মহমেডান স্পোর্টিং বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ইষ্টবেঙ্গল বনাম খিদিরপুরের খেলা ড্র যাওয়াতে মোহনবাগান যতখানি পিছিয়ে পড়েছিল তার দূরত্ব কিছুটা কমে গেছে। এখন মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান—এই তিনটি ক্লাবের মধ্যেই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই সীমাবদ্ধ। তারিখ ১০।৬।৬০

শেষ কোথায়

শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়

নকল ন্যাকামী ভরা, এ মর জগৎ,
লুপ্ত হোক্ মোর আঁখি হতে। দৃষ্টি পথ
ধায় যেন সচ্ছনীল অলক্ষ্যের পানে
আজি হতে; সুপ্ত মন জাগুক্ চেতনে!
আমার জগৎ যেন পায় নবরূপ
অদৃশ্য সঙ্গীতে! সুরভি ছড়াক্ ধূপ
সমাধি বেদীতে; নাহি যার চিহ্ন কোনখানে।
অশনি পড়ুক আসি আমার ভবনে।
বাঁচিবার প্রয়োজন যার থাকে থাক্
মোর নাহি; আমার পৃথিবী যাক্
কালের গহ্বরে এইক্ষণে,
ধ্বংস হোক রুদ্রের নয়ন বানে।
মোর চিহ্ন নাহি থাকে যেন কারও পায়ে
ধূলায় জড়ায়ে। নিয়ে যাক্ আমারে ফিরায়ে
মর্ত্তসীমা হতে গগনের গায়ে।
ছায়া পথ যেথা আছে ঘন ছায়ে!
যেথা নাই হিংসা দ্বেষ জৈব ভালবাসা,
নাই যেথা লুব্ধ দৃষ্টি কোন নীচ আশা
শুধু চিন্তা আছে অচিন্ত্য রূপেতে।
সেথা মোর ঠাঁই হোক্ কালের প্রভাতে।



সাহিত্য সংবাদ

ভক্তি প্রসঙ্গ ঃ স্বামী বেদান্তানন্দ

দেবর্ষি নারদের ভক্তি সূত্র বিখ্যাত গ্রন্থ। মাত্র চৌরাশিটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ভক্তিসর্গের সকল রহস্য, উহার অধিকারী বিষয় সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণীর সহায়তায়। তাই স্বামীজীর 'ভক্তি প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি সত্যই ভক্তিময় হয়ে উঠেছে। ভক্তি মার্গের পথিকরা এ গ্রন্থ পাঠে হ্লাদিত হবেন বলেই আশা করি।

[প্রকাশক—স্বামী বেদান্তানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন টি, বি স্যানা-টোরিয়াম, রাঁচি। মূল্য—১'২৫]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি অল্প মূল্যে কেনা ঃ আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত

কার্টুনে সজ্জিত চমৎকার হাসির কবিতার বই। সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুঃখে দারিদ্রের জ্বালা, তারি মধ্যে কবি হাসি ফোটানর সাধনা করেছেন। সে সাধনায় যে তিনি অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছেন পাঠক-পাঠিক মাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন।

[প্রকাশক—শ্রীবীথি হালদার। ১৫-বি চুণাপুকুর লেন কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা]

এক পকেট হাসি ঃ প্রবোধ চন্দ্র বসু

অজস্র হাসির উপাদানে ভরাট করে দিয়েছেন লেখক তাঁর 'এক পকেট হাসি'কে। প্রত্যেকটি কথিকায় পাঠক পাঠিকা প্রাণ খোলা হাসিতে নিজের দুঃখ যাতনা, সমস্যার কথা ভুলে যাবেন, ফিরে পাবেন বেঁচে থাকার আস্বাদন।

[প্রকাশক—নদার্ণ বুক ক্লাব, ৬৭ বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫। মূল্য ২৲ টাকা]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

স্বপন বুড়োর গল্পমালা সিরিজ ঃ স্বপন বুড়ো প্রণীত

ছোট ছেলে মেয়েদের উপযোগী আলচ্য গ্রন্থখানি খুব চিত্তাকর্ষক ও উপহার যোগ্য। পাতায় পাতায় আছে সুন্দর ছবি আর গল্পাংশের ফাঁকে ফাঁকে মন-ভুলানো ছড়া। সহজ সরল ভাষায় রূপকথার বর্ণনা ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে কাহিনী। রচনার শক্তিমত্তা লক্ষ্য করা গেল। গল্পটী নিছক গল্প হলেও এর পশ্চাতে আছে একটি আদর্শ, এজন্যে বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা উন্নত ধরণের। গল্পটী বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ছেলে মেয়েরা পড়ে প্রচুর আনন্দ পাবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

[প্রকাশক—আর্ট ইউনিয়ন ৫৫।৭ গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ দাম-১'২৫]

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নতুন রেকর্ড

কলম্বিয়ায় প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয়

GE 21983—শিল্পী মঞ্জুলা গুহের কণ্ঠে দুখানা মনোরম গান—"ওহে নীরব এসো নীরবে" ও "আমায় রাখতে যদি"।

GE 21984—জনপ্রিয় শিল্পী লতামুংগেশকর গেয়েছেন দুখানা অনবদ্য আধুনিক গান—"তোমার বকুলবনে" ও "আমার গোপন ব্যথার মাঝে।"

GE 21991—শিল্পী মানিক ভট্টাচার্যের সুমিষ্ট কণ্ঠে দুখানা ভাবমধুর গান—"প্রাণ কাঁদেরে কাঁদে শচীমাতার প্রাণ" ও "দয়াল তোমার দয়া আছে।"

GE 30438—"পার্শনাল এ্যাসিসট্যাণ্ট" বাণীচিত্রের একখানা হাস্যমধুর গান গেয়েছেন—ইলা, আলপনা প্রভৃতি। গানখানা হল—'না না না শ্রীচরণকমলেষু নয়' ও অপর গানখানা—'এই দেশ ভালো'—গেয়েছেন হেমন্তকুমার।

GE 30441—'কুহক' বাণীচিত্রের আরও দুখানা গান গেয়েছেন হেমন্তকুমার। গান দুখানা—"নওল কিশোরী" ও "বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই"।

GE 30443—'কুহক' বাণীচিত্রের দুখানা গান গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—তাঁর দরদী কণ্ঠে। গান দুখানা—"সারাটি দিন ধরে" ও "আরও কাছে এসো"।

GE 30443—'কুহক' বাণীচিত্রের আর দুখানা গানও গেয়েছেন হেমন্তকুমার। গান দুখানা "পেয়েছি পরশমানিক" ও "হায় হাঁপায় যে এই হাঁপর।"

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত







শ্রাবণ—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সাধনভূমি ভারতবর্ষ ও সাধনবাধক ভবব্যাধি

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

এই ধরাধামে মানবজন্ম শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে, সমাজপরিকল্পনায়, কৃষিশিল্পে, বাণিজ্যে প্রাণীজগতে মানব শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও মানব পশুবৎ জীবনধারণ করিয়া থাকে। এজন্য মানব জীবনের প্রকৃত বিশেষত্ব তাহার ঈশ্বর চিন্তার সমর্থতায় এবং জন্মজন্মার্জিত সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডনের ক্ষমতায়।

মানবেতর প্রাণীর দেহ—পূর্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের ভোগজন্য ভোগদেহ—প্রকৃতির তাড়না তাহাদের সমস্ত কর্ম্মের উৎস—বর্ত্তমানের চিন্তাই তাহাদের মুখ্য ও প্রবল—অতীত ভবিষ্যৎ তাহাদের পক্ষে গৌণ ও সামান্য। কিন্তু মানব দেহ প্রারব্ধ—ভোগসহ সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডনোপযোগী সাধন দেহ—ইহাই মানবদেহের বৈশিষ্ট্য। চিন্তাশীল মানবমনে অতীত ভবিষ্যতের চিন্তাই মুখ্য ও প্রবল—বর্ত্তমান চিন্তা অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্‌॥

কৃত কর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন শত কোটী কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। মানব শুভাশুভ যে কর্ম্ম অহংবুদ্ধির আশ্রয়ে করিবে, মানব তাহার ফল ভোগে বাধ্য। শুভ কর্ম্মের ফল সুখ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ। সর্বভূতের হিতার্থে ও ভগবানের প্রতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক আমরা যে কর্ম করি তাহা শুভফলদাতা এবং তাহার বিপরীত কর্ম্ম অশুভফল প্রসব করে ইহা সামান্যভাবে বলা যায়।

মানবকৃত কর্ম্মফল প্রধানত দুই প্রকার—(১) প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ আরম্ভ হইয়াছে (২) সঞ্চিত অর্থাৎ যাহার ফলভোগ ভবিষ্যতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে প্রারব্ধ ভোগভিন্ন খণ্ডিত হয় না, কিন্তু সাধনপন্থী হইলে সঞ্চিত কর্ম্মফল খণ্ডন করা যায়।

আমাদের ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বা সাধনভূমি এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য আটটী বর্ষ স্বর্গীগণের পুণ্যশেষে উপভোগের স্থান—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী।

বহু পুণ্যফলে মানব এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভে সমর্থ হয়। এই ভারতবর্ষে কত যোগী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বিভিন্ন আশ্রমে, তীর্থক্ষেত্রে, পর্বতকন্দরে ধর্ম্মসাধনায় তাহাদের মানবজীবনের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নহে। ভারতের আকাশে-বাতাসে, জলেস্থলে, বৃক্ষলতায়, পত্রপুষ্পফলে সাধক মহাপুরুষগণের তপোবীর্য্য বর্ত্তমান। প্রাকৃত জনগণ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, ইহা সাধনপন্থীগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য দেশে আইনষ্টাইনের মতো বিজ্ঞানী, রথচাইল্ডের মতো ধনী, হিটলারের মতো দাম্ভিক পুরুষের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু যুগে যুগে যোগী সাধক মহাপুরুষের জন্ম দিতে পারে না। তাহা একমাত্র ভারতের মৃত্তিকায় সম্ভব। এজন্য পাশ্চাত্য ভোগায়তন সুধীগণের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পরম বিস্ময়।

শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াও যে কারণে সাধারণ মানব সাধনপন্থী হইতে ইচ্ছা করে না এবং সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডনের প্রয়াস করে না তাহার কারণ "ভবব্যাধি"। এই ব্যাধির কথা জড়-বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই এবং থাকা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের তন্ত্রে পুরাণে বহুস্থানে এই ব্যাধির উল্লেখ আছে। ভবব্যাধি কোন রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—ব্যাধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঋষির বাক্য—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। আমাদের শরীর ব্যাধিমন্দির। এক্ষণে ব্যাধিমন্দির পদের প্রকৃত অর্থ কি? মন্দিরের অর্থ দেবগৃহ। ব্যাধি কাহারও আরাধ্য বা কাম্য নহে। সুতরাং ব্যাধির মন্দির (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস) ব্যাধিমন্দির এই অর্থ হইতে পারে না। আমাদের শরীর প্রকৃত দেবায়তন; শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে দুগ্ধে সর্পিবৎ অবস্থান করিতেছেন—সাধনহীন ব্যাধিগ্রস্ত আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং ব্যাধিমন্দিরের অর্থ "ব্যাধিগ্রস্তমন্দির" (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়) এই ব্যাধি প্রকৃত পক্ষে ভবব্যাধি।

ভবব্যাধি বিষয়ে বলিতে আমাদের আলোচনা আবশ্যক—(ক) ভবব্যাধি বলিতে আমরা কি বুঝি? (খ) ভবব্যাধির কারণ কি? (গ) লক্ষণ কি? (ঘ) প্রতিষেধ কি? (ঙ) চিকিৎসা কি? (চ) চিকিৎসক কে?

(ক) ভবব্যাধি বলিতে আমরা কি বুঝি?

ভব জন্য ব্যাধি = ভবব্যাধি (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়)। 'ভব' অর্থ হওয়া (To Be) বা জন্মগ্রহণ করা। 'ভূ' ধাতুর উত্তর অল্ (ভাববাচ্যে) ভব। সুতরাং জাত ব্যক্তির এই ব্যাধি স্বাভাবিক এবং বয়োবৃদ্ধি ও পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে এই রোগের বৃদ্ধিও স্বাভাবিক। এই রোগের প্রধানতম লক্ষণ ভ্রান্তি বা মায়ামোহ—বুঝিয়াও না-বোঝা বা জানিয়াও না-জানা। ইহার কারণ—যাহার ইচ্ছায় এই জগৎ সংসার তাঁহার ইচ্ছাতেই এই ব্যাধি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতি-কারিণঃ। এই ব্যাধি আছে বলিয়াই এই জগৎ সংসার—নতুবা কে কার? —কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?

এক্ষণে ব্যাধি বা রোগ বলতে আমরা কি বুঝি?—আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির একটা স্বচ্ছন্দ বা সহজ স্বাভাবিক গতি বা ভাব আছে। যদি কোন কারণে সেই গতি বা ভাব বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন আমরা আমাদের শরীরে একটা অস্বচ্ছন্দতা বা দুঃখ অনুভব করি। এই অবস্থা যে কারণে হয় সেই কারণকে আমরা ব্যাধি বা রোগ বলি। মাথার ভার বা মাথা ব্যথা না হলে আমাদের যে একটা মাথা আছে এ কথা আমরা ভুলে থাকি। পেটে ব্যথা না হলে পেটের অস্তিত্ব আমাদের মনে থাকে না। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। তদ্রূপ সুখে থাকিলে আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয় যে মন—সেই মনের কথাও আমাদের মনে থাকে না। দুঃখে, অপমানে, ষড়রিপুর তাড়নায়, অভাবের জ্বালায় ত্রিতাপদগ্ধ জীব আমরা—আমাদের মনের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন আমাদের

মনে হয় আমাদের বুদ্ধি সামান্য, শক্তি সীমাবচ্ছিন্ন। তথাপি আমরা অহংমদমত্ত। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে স্থায়ীসুখপ্রাপ্তি অসম্ভব জানিয়াও স্থায়ীসুখপ্রাপ্তির আশায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে চলি। যে শরীরের তোষণ প্রসাধনের চিন্তায় আমরা সর্বদা উদ্বিগ্ন—সেই শরীর আমার চিরসাথী নয়—ইহা বুঝিয়াও বুঝি না—যে পুত্রকন্যা ধন-সম্পত্তির জন্য আমি আমার প্রতিমুহূর্ত চিন্তাক্লিষ্ট—তাহাও যে আমার চিরকাল থাকিবে না, ইহা জানিয়াও গাঢ় তমোময় মমত্বগর্ত্তে পড়িয়া আছি তাহা হইতে উদ্ধারের চিন্তা মাত্র করি না—যে কারণে আমাদের মনে এই মোহঘোর সেই কারণ ভবব্যাধি।

(খ) ভবব্যাধির কারণ

ভবব্যাধির কারণ কর্ম্মফল ভোগজন্য মরলোকে জন্মগ্রহণ। ইহার বুদ্ধির কারণ দ্বিবিধ—(১) সহজাত (২) অর্জ্জিত।

মানবশিশু আত্মকেন্দ্রিক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানব শিশুর মতো স্বার্থপর ও আত্মসুখীপ্রাণী প্রাণীজগতে দ্বিতীয়টী আর নাই। মানবশিশু নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তায় অসমর্থ। বয়োবৃদ্ধি এবং পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে উহার পরিধি বিস্তৃত হয়। শারীরিক প্রয়োজনে আহারবিহারাদির সুখস্বচ্ছন্দতার সঙ্গে মানসিক প্রয়োজনে যশ, খ্যাতি, প্রভুত্ব, প্রণয়, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি চিন্তনীয় হয়। প্রাকৃত মানব আজন্ম সুখান্বেষী—দুঃখভোগ কাহার লক্ষ্য নহে। তথাপি আমরা যে সাময়িক দুঃখবরণ করি তাহা ভবিষ্যৎ সুখপ্রাপ্তির আশায়। মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় বহির্মুখী, এজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানবের সুখান্বেষণ স্বাভাবিক।

সুতরাং ভবব্যাধির মূলগত কারণ—বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগেচ্ছা এবং তজ্জনিত মোহ। এই মোহ সংসারস্থিতিকারিণী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মা মহামায়ার ইচ্ছায়। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবণিতা কেহই এই মোহ হইতে বিনা সাধনায় মুক্তি পাইতে পারে না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্রহ্মজ্ঞ মেধসমুনি হৃতসর্বস্ব রাজা সুরথকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

অন্যে পরে কা কথা—জ্ঞানীগণের অন্তঃকরণও লীলাময়ী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা মহামায়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। প্রাকৃত মানব আমরা মোহিত হইব, ইহাতে বিচিত্রতা কি? মায়াধীশ ভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন তিনিও পার্থিবজীবনে মোহাবিষ্ট হন—অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম, তথাপি রামে ললুভ মৃগায়। মায়াধীন আমরা মায়ামুগ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করি—সাধনপন্থী না হইলে আমরণ মায়ায় মোহিত হইয়া নরজীবন শেষ করিব ইহা স্বাভাবিক। এজন্য ঋষি মেধস মহারাজা সুরথকে বলিয়াছেন—

মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপেহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সেব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥

মা মহামায়া মোহেরও কারণ ও মোহমুক্তিরও কারণ। তিনি আরাধিতা হইলে ইহলোকে ভোগ, পরলোকে সুখ ও মোক্ষ বিধান করেন।

(গ) ভব ব্যাধির লক্ষণ

জ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি বা বুঝি, আমাদের বুদ্ধি বিবেক আমাদের মনে যে কর্ত্তব্যবোধের উন্মেষ করে কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রায় সকলেই তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই বা করি। এই যে আমরা বুঝিয়াও বুঝি না—ইচ্ছা না করিয়াও বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টা—ইহা ভব ব্যাধির লক্ষণ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর রাজা সুরথ, শত্রুগণ ও দুষ্ট অমাত্যবর্গ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া মহামুনি মেধসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াও তাহার হৃতত্যক্ত রাজ্যের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। সেই সময় সেই স্থানে সমাধি নামক এক ধনী বৈশ্য তাহার ধনলোভী স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক হৃত-সর্বস্ব ও তাড়িত হইয়াও তাহাদের কুশল চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন। আমরাও আমাদের দুর্বিনীত অধর্ম্মাচারী স্ত্রী-পুত্রাদির দ্বারা অবমানিত লাঞ্ছিত হইয়াও তাহাদের প্রতি স্নেহহীন হইতে পারি না। এই যে অনাত্মীয়, অনভিলষিত, অনায়ত্ত বিষয়ে আত্মীয়ভাব ও অফলপ্রদা চিন্তা এবং তজ্জন্য দুঃখভোগ—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্মের "কিমাশ্চর্য্যম্" প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

প্রতিদিন অসংখ্য জীব তাহাদের জীবলীলা শেষ করিতেছে—আমাদের বহু প্রিয়-পরিজন আত্মীয়স্বজন পরলোকে গমন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তথাপি আমরা যাহারা বাঁচিয়া আছি তাহারা চিরদিন বাঁচিব মনে করিতেছি—বিষয়ানন্দে প্রমত্ত থাকিয়া—মৃত্যু কি? মৃত্যুর পর আমাদের গতি কি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহজীবনের দুর্দ্দম আশার শেষ কিনা—ইহার চিন্তা আমাদের মনে আসে না—এই যে ধ্রুব মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি ভাব—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

আজ যাহারা কিশোরকিশোরী, যুবকযুবতী মানব জীবনের বিশেষত্ব এবং উদ্দেশ্য ভুলিয়া পার্থিব সুখলাভ বা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে ধাবিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছেন—তথাপি সেই ক্লেশকে না জানিয়া তাহার কারণ না জানিয়া তাহার নিবৃত্তির পথ জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন না—ইহাই ভবব্যাধির লক্ষণ।

আজ যাহারা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবন যাত্রাপথের শেষ সীমায় উপনীত, তাহারাও তাহাদের ত্রিতাপদগ্ধ জীবনের ক্লেশের শান্তির জন্য পার্থিব বিষয়ে আত্মনিবিষ্ট হইয়া ক্লিষ্ট ও বিভ্রান্ত; তথাপি তাহারা চিন্তা করিতেছেন না তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন। এখন কোথায় যাইবেন—এ সকলের নিয়ন্তা কে? কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ কাহার ইচ্ছায় বিঘূর্ণিত? ইহাই ভব ব্যাধির লক্ষণ।

আমরা যে শক্তির সাহায্যে আহার করি, শ্রবণ করি, দর্শন করি, গমনাগমন করি, স্পর্শ করি, জীবনধারণ করি, কথা বলি, চিন্তাকরি, সাহিত্য শিল্পাদি রচনা করি, সেই শক্তির উৎস কোথায়? শক্তিমান পুরুষ রুগ্ন বা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইলে বা মরিয়া গেলে সেই শক্তি কোথায় যায়? তাহার চিন্তা না করিয়া ঐ শক্তিকে আমাদের নিজস্ব মনে করিয়া শক্তির মত্ততায় আমরা উন্মত্ত হইয়া আত্ম-পীড়ন বা পরপীড়নে স্বেচ্ছা করি—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

আমরা শ্রেষ্ঠ মানব-জীবন লাভ করিয়া, মানব-জীবন ও পশু-জীবনের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়াও—আহার-বিহারাদিতে আমাদের মূল্যবান জীবন ক্ষয় করিতেছি—দিনান্তেও একবার যিনি সৎচিৎ আনন্দময়, সর্বলোকাশ্রয়, বিশ্বাত্মা, সত্যস্বরূপ, রসং বৈ সঃ, তাহার চিন্তা করিবার সময় পাইতেছি না—অথচ বৃথাকার্যে, বৃথা বাগাড়ম্বরে, আত্মপ্রতারণায় ও পর-প্রতারণায় কালক্ষেপণ করিতেছি—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

আমরা সকলেই জানি ও প্রতিদিন উপলব্ধি করি ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণিক ও দুঃখগর্ভ—তথাপি আমরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ। মদ্যপ মদ্যপানের অপকারিতা জানিয়াও মদ্যপরিত্যাগে অক্ষম। লম্পট, লাম্পট্য আয়ুনাশক ও রোগের মূলীভূত কারণ জানিয়াও লাম্পট্যে রত। ঔদরিক অতি ভোজনের দুঃখ বুঝিয়াও অমিতাচারী—এই যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখপ্রাপ্তির জন্য বৃহত্তর ক্লেশ ভোগ—ধর্ম্ম কি জানিয়াও ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি—অধর্ম্ম কি জানিয়াও অধর্ম্মে রতি—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

আমাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, বক্তৃতায় ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশে উন্মুখ, তাহারাও কার্য্যক্ষেত্রে পার্থিব সুখ আশায় অজ্ঞানীবৎ আচরণ করেন—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

আমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, ভণ্ড, যাহারা আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনাকেই জীবনের সার ধর্ম্ম মনে করিয়া জীবন ক্ষয় করিতেছেন—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্—জানিয়াও যাহা নশ্বর যাহা অল্প তাহার জন্য লালায়িত, পরমপদ প্রাপ্তির পথ জানিয়াও পথভ্রষ্ট হইতেছেন—ইহাই ভবরোগের লক্ষণ।

(ঘ) ভবব্যাধিরপ্রতিষেধ কি?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—জাত ব্যক্তির এই রোগ স্বাভাবিক। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডন ইহজীবনে কর্ম্মফলে বদ্ধ না হইয়া জনম মরণ প্রবাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমপতি লাভই ভবরোগের প্রতিষেধ। আমরা অহেতু বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে যে কর্ম্ম করিয়াছি বা ইহজীবনে যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা শুভকর্ম্ম হৌক বা অশুভ কর্ম্ম হউক, তাহার ফলভোগ আমাদের অনিবার্য। সুতরাং সুখ দুঃখভোগ জন্য আমাদের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

সুখ ও বন্ধন—দুঃখ ও বন্ধন। সুখ ভোগের দ্বারা শুভ-কর্ম্মার্জিত পুণ্যের ক্ষয় এবং দুঃখ ভোগের দ্বারা অশুভ-কর্ম্মার্জিত পাপের ক্ষয় হয়। এইরূপে প্রারব্ধভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জিত বহু কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধিত হয়, তথাপি বহু সঞ্চিত থাকে। তাহার পর বর্ত্তমান জন্মেও বহু কর্ম্মফল ভোগ্য হইয়া উঠে। সুতরাং বর্ত্তমান জীবনে আমাদের এইভাবে কর্ম্ম করণীয়, যাহাতে তাহার বন্ধন না হয় এবং সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডন হয়।

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন –

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গ সমাচর॥

অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ যে কর্ম্ম করা যায় তাহা ভর্জিত বীজের ন্যায়—তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয় না, সুতরাং ফল-প্রসূ হয় না। এজন্য ভগবানের আদেশ—মুক্তসঙ্গ সমাচর। আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা এজন্য 'আমরা কর্ত্তা' এবোধ ত্যাগে অক্ষম, সুতরাং আমাদের কর্ম্মফল ভোগও অবশ্য-ম্ভাবী। যাঁহাদের কর্ম্মফলে কোন আসক্তি নাই—যাহারা নিত্যতৃপ্ত এবং নিরাশ্রয়, তাহাদের কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যোগ-কর্ম্মসু কৌশলম্। যোগীগণ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন। অভ্যাস-যোগ দ্বারা ইহা আয়ত্ত করিতে হয়। একজন্মে এই কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত না হইলেও তাহা বৃথায় যাইবে না। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসে পরজন্মে তাহার অভ্যাস দ্রুত হইবে। ভগবানে শরণাগতি ভিন্ন কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধির লোপ সম্ভব নয়। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত হইলে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্ম-নিবেদন করিলে সঞ্চিত কর্ম্মফলের খণ্ডন হইবে—নূতন কর্ম্মফলের বন্ধন হইবে না, সুতরাং ভবব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ও দূরীভূত হইবে।

(ঙ) ভবব্যাধির চিকিৎসা কি?

আমাদের শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসায় যেরূপ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা এবং আহার বিহারাদির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক, তদ্রূপ ভবব্যাধির চিকিৎসায় দশেন্দ্রিয়ের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় মনের নিয়ন্ত্রণ জন্য আহার বিহারাদির নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির সাধন প্রয়োজন। রোগ বিনাশের শক্তি আমাদের সহজাত। সুচিকিৎসক সেই শক্তির উদ্দীপনা করেন—তাহার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থায়।

আমাদের শাস্ত্রবাক্য—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যাহারা বলহীন, সাধনভজন হীন, তাহাদের মেধা ও বহুবিধ শাস্ত্রজ্ঞান অফলপ্রসূ। তাহাদের পক্ষে ভবব্যাধির উপশম করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নহে। অন্ধের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য যেমন অদৃশ্য, সাধন-হীন কপটাচারীগণের নিকট স্বয়ংপ্রকাশক আত্মাও তদ্রূপ অপ্রকাশিত।

শারীরিক হিসাবে যেরূপ উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ শরীরে জীবনীশক্তি সবল ও সক্রিয় থাকিতে চিকিৎসায় রোগ নিরাময় সহজ হয়, তদ্রূপ ভবরোগের চিকিৎসা যৌবনারম্ভে করিলে মঙ্গলদায়ক হয়। অনুর্বর স্থানে, প্রস্তরে বা মরুভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বীজ যেমন ফলপ্রসূ হয় না—তদ্বারা অমিতাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির চিকিৎসাও নিস্ফল হয়। এজন্য আমাদের কর্ত্তব্য—ক্ষেত্র প্রস্তুতি। আমাদের মন "প্রমাথী বলবদ্দৃঢ়ং" এবং বায়োরিব সুদুষ্করং—বায়ুকে নিগ্রহ যেরূপ অসম্ভব প্রমাথী মনকে তদ্রূপ। ইহার প্রতিকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—অভ্যাসযোগ। "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।"

অনেক সময় দেখা যায়, কোন রোগ শরীরে বদ্ধমূল হইলে রোগ সম্বন্ধে রোগীর কোন চেতনা বা বোধ থাকে না এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা, এরূপ অবস্থায় রোগ প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য হয়। এরূপ আমরা অনেকে যে ভবব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত এবং মোহগ্রস্ত ইহা বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না—এজন্য আমাদের নিত্যকর্ত্তব্য ব্রহ্মোপাসনা ও আত্মানুসন্ধান, আত্মউপলব্ধির চেষ্টা। এই অনুশীলন আপাতদৃষ্টিতে বৃথা গেলেও বৃথা যায় না—ইহার ফল সুদূরপ্রসারী। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনেব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

(চ) ভবব্যাধির চিকিৎসক কে ?

শ্রীগুরুগীতায় আছে—যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্গুরুকং নিত্যমহম্ ভজামি। সুতরাং ভবব্যাধির চিকিৎসক—সদ্গুরু। এই গুরুবাদ সাধনভূমি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য ধর্ম্মে গুরুকরণের অবকাশ নাই। কারণ তাহাদের ধর্ম্ম কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি—পণ্ডিত, মূর্খ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জড়বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগী, ভোগী সকল নরনারীর জন্য তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সহজ-সরলভাবে এক এবং তাহাদের ভগবান এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। কিন্তু সাধনভূমি ভারতবর্ষের ভগবৎবোধ সাধক যোগীগণের সাধনলব্ধ বস্তু, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও বহুরূপে বহুভাবে লীলারত। তিনি নিরাকার হইয়াও সাধকের সাধনার সৌকর্য্যার্থে সাকার। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়—এক আমি বহু হই। "উপাসনার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা"—সাধকের উপাসনার জন্য ব্রহ্ম নানা রূপ কল্পনা করেন। ব্রহ্মের এই বহুত্ব তাহার একত্বের প্রতিবন্ধক নহে। তিনি একই সময়ে এক এবং বহু, একই সময়ে সাকার এবং নিরাকার, ইহা ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক। যে ধর্ম্ম মনে করে ব্রহ্ম আকার গ্রহণে অক্ষম, বহু হইতে অসমর্থ—সে ধর্ম্মে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান নহেন।

ভবব্যাধির চিকিৎসায় নিত্যকর্ত্তব্য—ব্রহ্মোপাসনা। এই বহুরূপে লীলায়িত পরমব্রহ্মের উপাসনা—সদ্গুরু ভিন্ন সম্ভব নহে। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ও তাহাদের ধর্ম্মের আদর্শে এই সাধনভূমি ভারতবর্ষে অনেকে গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। এজন্য তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া মুক্তিপ্রয়াসী। আমাদের পুরাণে বর্ণিত অবতারগণ সকলেই গুরু স্বীকারে সাধনা করিয়াছেন—লোক সংগ্রহের নিমিত্ত। পরমজ্ঞানী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব গুরুস্বীকার ও মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতজীব আমরা ভবব্যাধিগ্রস্ত ত্রিতাপদগ্ধ নিত্যক্লিষ্ট। আমাদের গুরুকরণ ভিন্ন সাধনপন্থী হইয়া ভবব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের আশা দুরাশা।

শ্রীশ্রীগুরুগীতায় মহাদেব বলিয়াছেন—

> গুরুগীতাভিধং দেবি! শুদ্ধং তত্ত্বং ময়োদিতং।
> ভবব্যাধি বিনাশার্থং স্বয়মেব্ সদাজপেৎ॥

গুরুগীতায় যে তত্ত্বোপদেশ বিবৃত আছে তাহা ভবব্যাধি বিনাশ জন্য স্বয়ং জপ করিবে। অনেকের ধারণা মন্ত্র গ্রহণ মাত্র শিষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়। ইহা ভ্রম। ভবব্যাধি হইতে মুক্তি—সাধনালব্ধ বিষয়।

আমাদের শাস্ত্রে সদ্গুরুর লক্ষণ—

> শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃশুদ্ধবেশবান্।
> শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠিতং শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিমান্॥
> আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্র-বিশারদং।
> নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

আমাদের শাস্ত্রমতে গুরুকরণের পর গুরুকে মানুষ মনে করা, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করা, সাধনার জন্য প্রতিমাকে শিলা মনে করা পাপ।

> গুরৌ মানুষবুদ্ধিংতু মন্ত্রেচাক্ষরবুদ্ধিকং।
> প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

সদ্গুরু কৃপা লাভ করিয়া মন্ত্রগ্রহণে সাধনপন্থী হওয়ার ফল অব্যর্থ। শিশু যেমন তাহার অঙ্গপুষ্টি বুঝিতে অক্ষম—অতি ক্ষুদ্রায়তন শিশু—দুর্বল অসহায় ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট শিশু কখন কিভাবে পূর্ণায়তন সবল মদমত্ত যুবকে পরিণত হইতেছে বুঝিতে পারেনা, তদ্রূপ সদ্গুরুর উপদেশে পরমশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জপে অভ্যস্ত হইলে আমরাও জানিতে পারিব না—কখন এই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দে প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে—অমৃতের পুত্র আমরা অমৃতের আস্বাদনে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংসাররূপ বিষবৃক্ষের সকল ফলই বিষময় মাত্র—দু'টী ফল অমৃতময়—একটী সৎগ্রন্থপাঠ, অপরটী সাধুসঙ্গ। এই দুইটী ভবরোগ উপশমের সহায়ক। দেহীর পক্ষে দেহের সংরক্ষণ কর্ত্তব্য—ভোগার্থে নয়—সাধনার্থে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। এই শরীর ভগবানের মন্দির, ইহা বিশ্বাস করিয়া এই শরীরে যাহা কিছু করিতেছি সমস্তই ভগবানের প্রীতির জন্য—যৎকরোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্—এই ভাবে অভ্যস্ত হইলে আমাদের দুর্নিবার মন বশে আসিবে, সদ্গুরুর উপদেশে ও কৃপায় তাহার প্রদত্ত বীজ অঙ্কুর উদ্গমে সমর্থ হইবে এবং শীঘ্রই পরিপতি লাভ করিয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে—এই মর-জীবন ভবব্যাধি হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে। মহাপুরুষগণের এই বাক্য রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের মতো অভ্রান্ত।

সাফল্যের সিঁড়ি

শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত ও চিত্রিত



গাঁয়ের কুমোররা মাটি দিয়ে বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাছে-শেখা হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো তৈরী করে—তার বাইরে আর বাড়াতে চায় না! হাটে-বাজারে এইসব হাঁড়ি, কলসী বিক্রী করে যা দু'পয়সা ঘরে আসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। অভাবের সংসার, কিন্তু তাতেই তারা খুশী। কিন্তু কোনো কোনো উদ্যমশীল কুম্ভকার গতানুগতিক পথে চল্‌তে একান্ত নারাজ।

দু'একজন সেই মাটি দিয়েই হয়ত মাটির ঘোড়া, আর আহ্লাদী পুতুল তৈরী করে—গাঁয়ের হাটে নিয়ে যায়—ছেলে-পেলেরা আনন্দ করে তা কেনে—কুম্ভকারের আরো উৎসাহ বেড়ে যায়। নানা রঙ-বেরঙের পুতুল তৈরীর দিকে সে নজর দেয়। চারদিকে শুধু যে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে তাই নয়—উপার্জ্জনের অঙ্কটাও তার উল্লেখযোগ্য হয়। পটুয়া বলে একটা খ্যাতিও রটে। তার মগজে নিত্য-নতুন জিনিস তৈরীর একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে।

আমাদের নিধিরাম সেই জাতের ছেলে। নিত্য-নতুন বুদ্ধি তার মগজে গজিয়ে ওঠে। চলার-পথে কোনো বিপদেই সে ভয় খায়না!

সামান্য এক গরীব ঘরে নিধিরামের জন্ম। নিধিরামের বয়েস যখন সাত বছর তখন হঠাৎ একদিন রাত্রে কলেরা রোগে তার মা-বাপ দু'জনেই মারা গেল।

নিধিরাম আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল।

কিন্তু তাই বলে নিধিরামের অদৃষ্ট খারাপ—এই কথা যদি তোমরা বলো—তা হলে কিন্তু সে কথা মেনে নিতে পারবো না।

নিধিরামদের পাশেই এক অবস্থাপন্ন গেরস্তের বাড়ী।



নিধিরাম

নিধিরামের মা সেই বাড়ীতে শাক-সব্জী, লাউ-কুমড়ো বিক্রী করত। মায়ের সঙ্গে গিয়ে-গিয়ে সেই বাড়ীর

ছেলেদের সঙ্গে শ্রীমান্ নিধির ভারী ভাব হয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে খেলা-ধুলা—একসঙ্গে ওঠা-বসা। তাই নিধিরামকে ও বাড়ীর সবাই খুব ভালোবাসত।

বাপ-মাকে হারিয়ে নিধিরাম যখন অথৈ পাথারে পড়ল—তখন পাশের বাড়ীর গৃহিণী তাকে কাছে টেনে নিলেন। বল্লেন, আমার ছেলে-মেয়েরা যদি দু'মুঠো ভাত পায়—তাহলে নিধিরামও উপোসী থাক্‌বে না। নিধিরামের মা কত অকালের জিনিস আমার সংসারে এনে দিত। নিজের ছেলেকে না খাইয়ে ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাছের প্রথম ফল আমাদের দাওয়ায় ঢেলে দিয়ে যেতো, সে কথা আমি ভুলবো কি করে?

এইভাবে নিধিরাম বড়লোকের বাড়ী আশ্রয় লাভ করল। গাঁয়ের লোকেরা বল্লে—এ নিধিরামের শাপে বর হল। নিজের বাড়ীতে ত' দুখিনী মা আধ-পেটা খাইয়ে রাখত। বড়লোকের সংসারে ঠাঁই পেয়েছে—এবার ভালো-মন্দ খেয়ে বাঁচবে।

নিধিরামের কপালে সত্যি তাই হল।

আশ্রয়দাত্রী গৃহিণী শুধু যে ওর খাওয়া-পরার দুর্ভাবনা



বড়গিন্নি

ঘুচিয়ে দিলেন, তাই নয়—বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে একই পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিলেন তিনি। এরজন্যে বাড়ীর গিন্নিকেও কম বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হয়নি!

বাড়ীর লোকেই তাকে কথা শুনিয়েছে, গরীবের ছেলেকে গরীবের মতোই মানুষ করো। এককাঁড়ি পয়সা নষ্ট করে ওকে আবার পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া, বই শ্লেট খাতা-পেন্সিল কিনে দেওয়া…একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না বড়বৌ?

কিন্তু বাড়ীর গিন্নি স্বামীর কথাতেও বিশেষ কান দেননি। বলেছেন, দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন নিজের পেটের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাদা ব্যবস্থা করবো না। পাশাপাশি বসে খাবে—আর ও-যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌বে—আমি সব চাইতে ছোট মাছ পেলাম—আমার সংসারে আমি তা' কিছুতেই হতে দেবো না।

সত্য, কথা রেখেছেন বাড়ীর বড় গিন্নি। খাওয়া-পরা, বই-পত্তরে তিনি কোনোদিন নিজের ছেলে-মেয়ে আর নিধিরামের কোনো তফাৎ রাখেননি।

বাড়ীর দাসী-চাকরেরা আড়ালে রসিকতা করে বলেছে, বড়গিন্নির পুষ্যি-পুত্তুর! ওকে যদি তোমরা কেউ কিছু বলো, তা হলে এবাড়ীর অন্ন উঠ্‌ল!

এইভাবে নিধিরাম এ বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল।

বাড়ীর বড় মেয়ে বিন্দুবাসিনী মায়ের গুণটা পেয়েছিল। সে নিধিরামকে ঠিক ছোট ভাইয়ের মতোই দেখতো, এতে বিন্দুর অন্যান্য ভাইরা কিন্তু নিধিরামকে আদৌ দেখতে পারত না। আরো একটা বিষয় বড় বিসদৃশ হয়ে উঠল! বাড়ীর ছেলেদের চাইতে নিধিরাম পাঠশালার পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতো। বাড়ীর কর্ত্তা থেকে সুরু করে সবাই নিধিরামকে এজন্যে বিষ-নজরে দেখত!

শুধু বড়গিন্নি আর বিন্দুবাসিনীর জন্যে ওকে কেউ কিছু বল্‌তে সাহস করত না। একদিন বাড়ীর এক ঝি ইচ্ছে করেই খাওয়ার সময় ওকে দুধ দেয়নি!

সেজন্য বিন্দুবাসিনী একেবারে অনর্থ করেছিল!

এইভাবে নিধিরামের জীবন-ডিঙি তর্‌তর্‌ করেই এগিয়ে গিয়েছিল।

কয়েক বছর বাদে বাড়ীর বড় মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এ মধুর সন্দেশে গোটা বাড়ীতে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সব চাইতে খুশী হল

নিধিরাম। বিন্দুদির বিয়ে হবে—সে একাই একশ হয়ে খাটা-খাটুনি সুরু করে দিলে।



বিন্দুদি

কথায় বলে—যে গরু দুধ দেয়, তার চাঁটও সহ্য হয়। নিধিরামের ছুটোছুটি আর খাটা-খাটনি দেখে—বাড়ীর ঝি-চাকরেরা গতর এলিয়ে দিল! কত খাটবে—খাটুক না—বাপ-মা-খাওয়া ছেলেটা।

রশোন-চৌকী বায়না করা, পুকুরের মাছের ব্যবস্থা করা, স্যাঁকরা বাড়ী ছুটোছুটি···সব কাজেই নিধিরাম।

তারপর একদিন আলো জ্বললো, বাদ্যি বাজ্‌ল, সানাই পোঁ ধরল, রাশি রাশি মাছ জালে ধরা পড়ল, ভিয়েন চড়ল, বহু লোক পাতা পেতে উদর পূর্ত্তি করে চলে গেল, আর বিন্দুবাসিনীও চেলি পরে, চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে স্বামীর হাত ধরে শহরে চলে গেল।

কয়েকদিন বাদেই দ্বিরাগমনে এলো মেয়েজামাই। বাড়ীতে আবার হুল্লোড় সুরু হয়ে গেল। সব কাজেই আগে নিধিরামের ডাক পড়ে। বিন্দুদি এসে নিধিরামের দুই হাত উপহারে ভর্ত্তি করে দিয়েছে। সবাইকার চোখ টাটায়···কিন্তু কেউ কিচ্ছু বল্‌তে সাহস করেনা!

জামাই মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার···কল্‌কাতায় হালকেতায় তৈরী বিরাট বাড়ী। নিজেরই ফার্ম্ম আছে, বহুলোক খাটে! বাড়ীর বড় জামাই। কৃতী পুরুষ। আদর আপ্যায়নের সীমা নেই। এই জামায়ের আবার মাছ ধরার সখ।

কাজেই আবার ডাক পড়ল নিধিরামের। ছিপ নিয়ে এসো, হুইলের ব্যবস্থা করো, ভালো সুতো কেনো, কোন্ পুকুরে বেশী মাছ আছে···ঠিক করো। মাছ ধরবার চারের ব্যবস্থা করো—

নিধিরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই। নতুন জামাই বাড়ীতে এসেছে,—কর্ত্তা থেকে সুরু করে সবাইকার বাসনা নতুন জামাইয়ের সঙ্গে একটু কথা-বার্ত্তা বলে, একটু ঘনিষ্ঠ হয়—, খানিকটা আপন করে নেয়—এই নতুন মানুষটিকে।

কিন্তু নিধিরামের জ্বালায় কি এতটুকু সুস্থির হয়ে বস্‌বার যো আছে?

জামাইকে নিয়ে সে যেন একেবারে চর্কিপাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় কেঁচো, কোথায় পিঁপড়ের ডিম খুঁজে খুঁজে মরছে দুইজনে। আর এ ব্যাপারে অসীম উৎসাহ জামায়ের। আবার শুধু নিজেদের পুকুরে মাছ ধরলেই হবেনা। নিধিরামের পরামর্শে জামাই ছুটেছে—দুই মাইল দূরে কোথায় ঝিল আছে—সেইখানে ছিপ ফেল্‌তে।

বাড়ীর নতুন জামাই, তাকে কেউ নাগালের মধ্যে পায়



জামাইবাবু

না! ঠাকুমা-দিদিমাদের এতদিনের সখ—নতুন জামাইকে

পিঠে-পায়েস করে খাওয়াবে; শ্বশুরদের সখ নিজেদের সাবেক কালের ঐশ্বর্য্য দেখাবে; শ্যালকদের সখ জামাইকে নিয়ে নৌকো ভ্রমণে, বনভোজনে যাবে;—আর শ্যালিকাদের সখ রসিকতা করবে আর গান শোনাবে নতুন জামাইকে! কিন্তু সব ভেস্তে দিলে ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়া নিধিরাম। দিন নেই, রাত নেই—এত কি ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি বাপু?

বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল বাড়ী শুদ্ধু সবাই।

শুধু বিন্দুবাসিনী সব কিছু দেখে মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসতে লাগল। ওর আস্কারা পেয়েই ত' নিধিরামের এত বাড় বেড়েছে। নইলে নিধিরামের এত আস্পর্দ্ধা হয় কি করে?

মেয়েজামাই জোড়ে এলে জোড়ে ফিরে যেতে হয়। যাত্রার সময় জামাই শাশুড়ীর কাছে একটি অনুরোধ জানালো। বল্লে, মা, আমার একটা আর্জ্জি আছে আপনার কাছে। বড়গিন্নি ভাব্‌লেন, জামাই বুঝি গঙ্গাস্নান করতে আর কালিঘাট দেখতে তাঁকে কল্‌কাতা যেতে বলবে।

ওমা, তা নয়।

জামাই বল্লে, নিধিরামকে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। ভারী কাজের লোক। আর তা ছাড়া আপনার মেয়েও ওকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখে। ওকে আমায় দিয়ে দিন। আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবার আর মানুষ করবার সব দায়িত্ব নিচ্ছি!

প্রস্তাব শুনে বড়গিন্নি একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলেন। এই প্রথম তাঁর মনে হল, নিধিরামকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেন, উনি কি তাকে ছেলের মতো বাড়ীতে ঠাঁই দেননি? নিশ্চয়ই ছোঁড়াটা গোপনে জামাইকে ধরেছে কল্‌কাতায় যাবার জন্যে। নেমকহারাম কোথাকার!

কিন্তু জামায়ের অনুরোধ। ঠেল্‌বেন কি করে? সুতরাং মাথা নেড়ে সম্মতি দিতে হল।

বিন্দুবাসিনীর ভাইয়েরা ত' একেবারে রেগে লাল! জামাইবাবু আমাদের একবার কল্‌কাতায় যেতে অনুরোধ করলে না, আর নিধিরামকে চিরদিনের জন্যে নিজের বাড়ীতে নিয়ে তুলছে! সত্যি, ভাগ্যি করে এসেছে বটে নিধিরাম।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, নিধিরামের কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করবার কোনো উপায় নেই। ঘোম্‌টার আড়ালে বিন্দুদির মুখটা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে!

কীল খেয়ে কীল হজম করা ছাড়া আর উপায় কি?

এরপর থেকে নিধিরামের জীবন-ডিঙ্গি তর্‌ তর্‌ করে এগিয়ে চল্লো।

কল্‌কাতায় গিয়ে নিধিরাম সিঁড়ির পর সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসল। বিন্দুবাসিনীর ভাইয়েরা তখন কলেজের সদর দরজাই পেরুতে পারেনি। যে সাফল্য ওদের পাওনা ছিল—তাই যেন নিধিরাম গ্রাস করে বসেছে।

বাড়ীর বড়গিন্নিও আজ সেই অনুযোগই করে থাকেন।

—দুধ দিয়ে আমি কাল সাপ পুষেছিলাম—এই হয়েছে এখন তার মুখের বুলি!

কাজেই ধীরে ধীরে দেশের বাড়ীর সঙ্গে নিধিরামের সম্পর্ক একেবারে উঠে গেছে বল্লেই চলে।

নিধিরাম লক্ষ্য করে দেখেছে—জামাইবাবুর কাছে বড়লোক এক জাঁদরেল দেশ-নেতা আনাগোনা করে থাকেন।

নিধিরাম তাঁর কাছে যাতায়াত সুরু করে দিলে।

সোমেশ্বরবাবু আগেই ছেলেটিকে এ বাড়ীতে দেখেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের প্রয়োজনীয় চিঠি চাপাটি ড্র্যাফট্‌ করতে ছেলেটি একেবারে অদ্বিতীয়। দু-একখানি চিঠি নিয়ে নিধিরাম একাধিকবার ওঁর বাড়ীতে গিয়েছেও।

সোমেশ্বরবাবু বুঝ্‌লেন, ছেলেটির মধ্যে অনেক গুণ আছে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে আগামী নির্ব্বাচনে ওর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ পাওয়া যাবে।

অপরদিক থেকে নিধিরাম সোমেশ্বরবাবুর দুটি দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করেছে। একটি হচ্ছে, ভদ্রলোক বেশ ভোজনবিলাসী। ভালো খাবার, মাছ ফল পেলে তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর ২য় কথা হচ্ছে, সোমেশ্বরবাবু ভয়ানক কালী-ভক্ত। কোনো একটা নতুন কাজে হাত দেবার আগে তিনি কালীঘাটে ছোটেন, আর জবার মালা গলায় নিয়ে মা-মা বলে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকেন।

নিধিরাম বুঝলে—এই দুটি ব্যাপারকে মূলধন করে তাকে অতি সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

বিন্দুর কাছে গিয়ে একদিন নিধিরাম বল্লে, বিন্দুদি, আমায় গোটাকয়েক টাকা দেবে?

বিন্দু বল্লে, কেন রে? হাত-খরচের টাকা ত' তোর জামাইবাবুর কাছ থেকেই পাস! আবার টাকার কি দরকার পড়ল?

নিধিরাম উত্তর দিলে, এ একটা বাড়তি খরচ দিদি। বি-এটা পাশ করলাম। চুপচাপ বসে থাকতে ত' পারি না। তাই নানা যায়গায় হাঁটাহাঁটি করছি—একটা ভালো চাকরীর জন্যে। চাকরীর ব্যাপারে একটু এদিক-ওদিক ত' করতেই হয়। বুঝতেই ত' পারছ। জামাইবাবুর কাছে মুখ ফুটে আমি বাড়তি আর কিছু চাইতে পারি না। আমার ভারী লজ্জা করে।

এরপর বিন্দু আর কোনো আপত্তি করেনি।

বিন্দুদির কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে এই ঘটনার দিন কয়েক বাদেই নিধিরাম শেয়ালদা বাজার থেকে একটা প্রকাণ্ড রুই কিনে রিক্সাতে চাপিয়ে সরাসরি সোমেশ্বর-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল।

সোমেশ্বরবাবু তখন ভুঁড়িতে তেল মালিশ করছিলেন। ওই বিরাটকায় রোহিত মৎস্য দেখে ভোজন-বিলাসী সোমেশ্বরবাবুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন, একি হে নিধিরাম, এতবড় মাছ কোত্থেকে জোগাড় করলে?

বিনয়ের অবতার হয়ে নিধিরাম উত্তর দিলে, আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে জোগাড় করতে হয় নি। আমাদের দেশের বাড়ীতে যে পুকুর আছে—তাতেই ধরা পড়েছে। আমাদের প্রথা আছে, প্রথম পাওয়া জিনিসটি দেব-ভোগে উৎসর্গ করতে হয়—তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

পূজোয় স্বয়ং মহাদেব তুষ্ট হন—আর এ ত' সামান্য মর্ত্তের মানুষ।

সোমেশ্বরবাবু হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা। বড় ভাল ছেলে তুমি। আজ কিন্তু আমার সঙ্গে বসেই তোমায় খেতে হবে।

নিধিরাম ঘাড় চুল্‌কে, মুখ নীচু করে—নিজের সম্মতি জানায়।

এই ভাবে নিধিরাম কোনো দিন নিয়ে আসে বড় বড় আম, কোনোদিন মজঃফরপুরের লিচু। বলে, এ আমাদের বাগানের ফল। মা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নিধিরামের এই জাতীয় কথা শুনে তার মৃতা মার শব-দেহটা নড়ে-চড়ে উঠতে চায় কিনা—জানা যায়নি। তবে ভোগের যথাযোগ্য ব্যবস্থায় দেবতা যে তুষ্ট হয়েছেন—সে কথা দু' একদিন পরেই জানা যায়।

সোমেশ্বরবাবু তাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেছেন।

নিধিরামের এখন অনেক কাজ।

সোমেশ্বরবাবু সভা-সমিতিতে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে বক্তৃতা প্রদান করবেন—নিধি-রামকে সেই বক্তৃতা লিখে দিতে হবে। জুতো-শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি—সব কিছু তাকে জেনে রাখ্‌তে হবে। তা ছাড়া সাম্‌নেই নির্ব্বাচনী পর্ব্ব।

ঢাকের গুড়্ গুড়্ শব্দ অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছে।

সোমেশ্বরবাবু যেদিন নির্ব্বাচনের আবেদন-পত্র দাখিল করতে যাচ্ছেন—নিধিরাম কোত্থেকে ছুটে এসে তাঁর গলায় একটা জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে, আর কপালে লেপ্‌টে দিলে সিঁদুর।

বল্লে, আমি এইমাত্র কালীঘাট মায়ের বাড়ী থেকে আসছি, আপনার জয় সুনিশ্চিত।

সোমেশ্বরবাবু ভারী খুশী।

নিধিরামের পিঠ চাপড়ে বল্লেন, ইলেক্‌শনে যদি জিততে পারি তা হলে উপযুক্ত পুরস্কার তুমি পাবে।

ভাগ্যলক্ষ্মী তখন মৃদু-মৃদু হাস্য করেছিলেন কিনা কে জানে!

তারপর এসে পড়ল বহু আকাঙ্খিত নির্ব্বাচন-পর্ব্ব! সোমেশ্বরবাবু একে নাম-করা জন-নেতা, তার ওপর অর্থের জোর তাঁর অসামান্য।

সুতরাং যা ঘটবার তাই ঘট্‌ল।

প্রচুর সিগারেট পুড়ল, চায়ের কাপ নিঃশেষিত হল, পেট্রোল জলের মতো গড়িয়ে গেল, রাশি রাশি ট্যাক্সি আর গাড়ী কলকাতার শহর চষে বেড়াতে লাগলো, তার ওপর

পোষ্টারে পোষ্টারে সারা শহরের দেয়ালগুলি ঢেকে গেল। খাবারের দোকানের বিল পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠল।

আরো কিছুদিন বাদে নির্ব্বাচনী ফলাফল কাগজে ঘোষিত হল।

দেখা গেল, জননেতা সোমেশ্বরবাবুর বিপক্ষ ব্যক্তি কয়েক হাজার ভোটে তাঁকে পরাজিত করেছে।

সেই খবর পেয়ে সোমেশ্বরবাবু সহসা শয্যা নিলেন। সবাইকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ তিনি একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

গল্পের পরিশিষ্টের এখনো খানিকটা বাকি আছে। কেন না, আমাদের গল্পের নায়ক সোমেশ্বরবাবু নন। আসল নায়ক হচ্ছে—নিধিরাম।

কিছুদিন বাদেই জানা গেল, নিধিরাম বেহালা অঞ্চলে বাড়ী তুলেছে। কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তার অতি শীঘ্রই শুভ-বিবাহ কার্য্য সমাধা হবে। তাঁর সব কিছু সম্পত্তি নাকি তিনি মেয়ে-জামায়ের নামে লিখে দেবেন।

কুলোকে আরো রটিয়ে বেড়াতে লাগলো যে সোমেশ্বর-বাবুর নির্ব্বাচনী ব্যাপারে যে অর্থ জলের মতো খরচ হয়েছে, তার অর্দ্ধেকের ওপর নিঃশব্দে নিধিরামের পকেটে প্রবেশ করেছে।

আগামী নির্ব্বাচনীতে নিধিরাম নিজেই যে দাঁড়াবে—এ কথা নাকি ধ্রুব সত্য।

নিধিরাম সাফল্যের সিঁড়ি খুঁজে পেয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

আমাদের ধারণা যে শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন নিমাই বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; সকালে উঠিয়া তাহার মা ও পত্নী তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কান্নাকাটি করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাইবার সময় নিমাই তাঁহার মাকে বলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না—চৈতন্যভাগবত পড়িয়া ইহা জানা যায়। নিমাইয়ের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার বিবরণ চৈতন্যভাগবতে যাহা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

একদিন নিমাই বসিয়া একমনে "গোপী" "গোপী" জপ করিতে-ছিলেন। নিকটে একজন ছাত্র ছিল। সে বলিল "গোপী গোপী" করিতেছ কেন? কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ কর। শাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম করিতে বলিয়াছে, গোপী নাম জপ করিতে বলে নাই। গোপী নাম জপ করিলে পুণ্য নাই। কৃষ্ণনাম করিলে পুণ্য আছে। ইহা শুনিয়া নিমাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

> প্রভু বোলে, "দস্যু কৃষ্ণ কোন জনে ভজে॥
> কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে।
> স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥
> সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
> কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥"

> এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
> পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
> আথে ব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
> পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে "ধর ধর"॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫ অধ্যায়।

এমন সময় নিমাইয়ের সঙ্গীগণ আসিয়া নিমাইকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এদিকে ছাত্র প্রাণভয়ে দৌড়িয়া অন্য ছাত্রগণ যেখানে থাকে সেখানে উপস্থিত হইল। সে হাঁপাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে—ইহা দেখিয়া অন্য ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে? তুমি এমন করিতেছ কেন?" ছাত্র কহিল, "ওঃ আজ বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। সবাই বলে নিমাই পণ্ডিত বড় সাধু। এজন্য আজ তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম বসিয়া 'গোপী গোপী' জপ করিতেছে। অপরাধের মধ্যে আমি বলিলাম—গোপী নাম করিয়া কি হইবে? কৃষ্ণ নাম কর। ইহা শুনিয়া নিমাই লাঠি হাতে আমাকে তাড়া করিল। কৃষ্ণকে কত গালাগালি দিল। তখন ছাত্রগণ নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ভারিত সাধু! অন্যায় ভাবে রাগ করে এবং ব্রাহ্মণকে মারিতে যায়।" কেহ বলিল, "তাঁহাকে বৈষ্ণবই বলা যায় না—যখন কৃষ্ণ নাম করেন না।" কেহ বলিল, "বড় অদ্ভুত কথা!

বৈষ্ণব গোপী নাম জপ করবে।" আর একজন বলিল, "তিনি মারিতে জানেন, আমরা মারিতে জানি না? এবার মারিতে আসিলে আমরা সবাই মিলিয়া মারিব। কাল তাঁর সঙ্গে পড়েছি, আজ তিনি কি করিয়া গোসাঞি হইলেন?" নিমাই ইহাদের পরামর্শের কথা জানিতে পারিলেন।

একদিন নিমাই সঙ্গীদের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় হাসিয়া বলিলেন, কফ নিবারণ করিতে পিপুলের ঔষধ করিলাম, কিন্তু কফ বাড়িয়া গেল। কেহ বুঝিল না। কেবল নিতাই বুঝিলেন—যে প্রভু সংসার ছাড়িবেন। নিতাইয়ের অত্যন্ত দুঃখ হইল। নিমাই নিভৃতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "কোথায় লোক উদ্ধার করিব, তানয়, লোক সংহার করিতে যাইতেছি। যাহারা আমাকে মারিবে বলিতেছে আমাকে মারিলে তাহারা ধ্বংস হইবে। তাহা হইতে দিব না। আমি সন্ন্যাসী হইয়া তাহাদের বাটিতে ভিক্ষা চাহিব, সন্ন্যাসীকে কেহ মারে না। সকলে প্রণাম করে, তাহারাও আমার পায়ে ধরিবে। এইভাবে তাহারা উদ্ধার হইবে।" নিতাই বলিলেন, "প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে। তোমাকে কে বাধা দিতে পারে?" তাহার পর নিমাই তাহার সংকল্পের কথা মুকুন্দ ও গদাধরকে বলিলেন। তাঁহারা খুব দুঃখ করিতে লাগিলেন দেখিয়া নিমাই বলিলেন, "তোমরা ভাবিতেছ আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহা নহে। আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকিব।" লোক মুখে শচীদেবী এই কথা শুনিলেন। শুনিয়া মূর্ছিত হইলেন। পরে নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। তুমি লোককে ধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছ। বৃদ্ধ মাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি ধর্ম?" শচী আহার ছাড়িলেন। তাঁর প্রাণ রক্ষা দায় হইল। নিমাই মাকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন "মা তুমি কাঁদিও না। পূর্বে বহুবার আমি তোমার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছি। তুমি কৌশল্যা ছিলে, আমি রাম ছিলাম। তুমি দেবহুতি ছিলে, আমি কপিল ছিলাম। তুমি দেবকী ছিলে, আমি কৃষ্ণ ছিলাম। আমি কি তোমাকে ছাড়িতে পারি?" দিনকতক কীর্তনানন্দে কাটিল। তারপর নিমাই নিতাইকে বলিলেন, "দেখ আমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন বাড়ী ছাড়িব এবং কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইব। একথা তুমি কেবল পাঁচজনকে বলিবে—আমার মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ!" নিতাই সেইমত পাঁচজনকে বলিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের দিন আসিল, সারাদিন সংকীর্তনে কাটিল। সন্ধ্যার সময় নিমাই গঙ্গার ধারে গিয়া বসিলেন। গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। তারপর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তগণ চারিদিকে বসিল। নগরের অসংখ্য লোক মাল্য চন্দন লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। সর্বাঙ্গে চন্দন এবং বহু মালা পরিয়া প্রভু বসিয়া রহিলেন। যে দেখা করিতে আসিল প্রভু সকলের গলায় মালা পরাইলেন। সকলকে বলিলেন, "তোমরা সর্বদা কৃষ্ণ নাম করিবে, কৃষ্ণ চিন্তা করিবে।" শ্রীধর একটি লাউ নিয়া আসিল। অন্য একটি ভক্ত কিছু দুধ আনিল। প্রভু বলিলেন, "বড় ভাল হইল। মা, শীঘ্র দুগ্ধ-লাউ পাক কর।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে (৯ টার পর) প্রভু সকলকে বিদায় দিলেন এবং আহার করিলেন। তাহার পর শয়নগৃহে গেলেন। প্রভু নিদ্রিত হইলেন। হরিদাস ও গদাধর নিকটে শয়ন করিলেন। শচী জানেন যে আজ নিমাই গৃহ ছাড়িবে। শচীর নিদ্রা নাই। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে প্রভু উঠিলেন এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গদাধর ও হরিদাস উঠিলেন। গদাধর বলিলেন, "আমি সঙ্গে যাইব।" কিন্তু প্রভুর মত হইল না। তিনি বলিলেন,—"আমি একলাই যাইব।" ঘরের দ্বারে শচী বসিয়া ছিলেন। নিমাই মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা তুমি আমাকে পালন করিতে কতই না কষ্ট করিয়াছ। আমি কোটীকল্পেও তাহা শোধ করিতে পারিব না। জন্ম জন্ম ঋণী থাকিব। কিন্তু, দেখ মা, জগতে সকলেই ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবদের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার কে অন্যথা করিতে পারে? আমি চলিলাম। তোমার সব ভার আমার উপর রহিল।" শচীর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। চক্ষু দিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইল। প্রভু মাতার পদধূলি লইয়া ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন।

ইহা চৈতন্যভাগবতের বিবরণ। চৈতন্যমঙ্গলে আছে যে, যে রাত্রে নিমাই গৃহ ছাড়িয়া যান সে রাত্রে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। নিমাই তাঁহাকে বা মাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যান।

চৈতন্যমঙ্গলের বিবরণ চৈতন্যভাগবতের বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। সুতরাং এই দুই বিবরণের মধ্যে একটি বিবরণকে গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষা চৈতন্য-ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥

আদি লীলা ১৩ পরিচ্ছেদ

যে সকল কথা চৈতন্যভাগবতে নাই সেই সকল কথা বলিবার জন্য চৈতন্যচরিতামৃত লেখা। চৈতন্যচরিতামৃতে কোনও উল্লেখ নাই—নিমাই যখন গৃহ ছাড়িয়া যান তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায় ছিলেন। অনুমান করা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যভাগবতের বিবরণই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্তের কড়চাও একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতেও এবিষয়ে কিছু উল্লেখ নাই।

যদি চৈতন্যচরিতামৃত বা মুরারিগুপ্তের কড়চায় চৈতন্যভাগবতের বিবরণের বিরোধী কোনও কথা থাকিত, তাহা হইলে চৈতন্য-ভাগবতের বিবরণ গ্রহণ করা যায় কিনা এ বিষয় সন্দেহ উঠিতে পারিত। কিন্তু এই দুই গ্রন্থে সেরূপ বিরোধী কথা না থাকাতে চৈতন্যভাগবতের কথা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্য-মঙ্গল চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। এজন্য চৈতন্য-মঙ্গলের বিবরণ গ্রহণ না করিয়া চৈতন্যভাগবতের বিবরণ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণবতা

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

কবির স্বরূপ ও লক্ষণ সাহিত্য-আলোচনায় একটি চিরন্তন বিচার-বস্তু। তাঁহার সংজ্ঞার এই জন্য অন্ত নাই। নিষ্কর্ষ হিসাবে বলা যাইতে পারে—কবি সর্বানুভূ। শাতসকা আলোকরশ্মি যেমন কেন্দ্রীভূত হয়—মানব-চেতনার সকল প্রকাশ তেমনি উন্মুখ হয় কবিপ্রতিভায়। ইন্দ্রিয়পুঞ্জের চরম প্রখরতা কবি-মানস। দেশ ও কালের সীমায় পরিচ্ছন্ন হইয়া বিশ্বজনের অন্তরে নিখিলের এই প্রতিচ্ছবি হয় বিচিত্র রঙে রঙীণ। বিশিষ্ট জাতির ও ঐতিহ্যের ভাব সূত্রে অনুস্যূত হইয়া উহা নানা বস্ত্রায় সজ্জিত হয়। মহাকবি মাত্রেই এইজন্য একাধারে বিশ্বকবি ও জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথে এই দুই স্বরূপের সংযোগ অপূর্ব সৃষ্টির আকর হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তার ধারা প্রসারিত হইয়া অখিল-মানব-মনের নির্বিশেষে উপভোগ্য সম্পদে দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ভাবে ও ভক্তিরসে অনুরঞ্জিত তাঁহার কবিতাগুলি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বৈষ্ণবতা বিশ্বাত্মার নিবিড়তম উপলব্ধি, উহার নিরন্তর বোধ এদেশের। নিত্য উচ্চারিত মন্ত্র ইহাই—'আকাশ পরিব্যাপ্ত পদার্থ চক্ষু যেমন, সূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ তেমনি সর্বদা লক্ষ্য করেন'। 'বাসুদেব ময় জগৎ'—ইহা বৈষ্ণবের কথা ও গীতার উক্তি—তিনিই 'গতির্ভর্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'। রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন—আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্চে এই—যে পরমাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধের উপলব্ধিই ধর্মবোধ—যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। বৈষ্ণবতার মূলতত্ত্বগুলি তাঁহার লেখায় নানা স্থলে অতি সহজে ব্যক্ত হইয়াছে। 'কেবল বিজ্ঞানেই তাঁকে জানিবে। রসো বৈ সঃ। তাই মিলনের এত সাজসজ্জা। ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত? জগতে কি এইটেই ফাঁকি?' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—'জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে যে, 'আমি তোমার'। এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চলেছে। মানুষ তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে বলতে চায় 'তুমি আমার।' কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান।' বৈষ্ণব সাহিত্যে এই নিবিড় আত্মীয়তা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে রূপায়িত হইয়াছে। বৈষ্ণবতার এই তত্ত্ব—এই বাণী বিচিত্র আলাপে অনুরণিত হইয়াছে রবীন্দ্র রচনায়। শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন—পিতা, প্রভু, বন্ধু সকল সম্বন্ধসূত্রের মূলে তিনি—একটা কোন সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—শেষ কথা নয়। অন্তরতর কথা—আমার আপন ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। আরও বলিয়াছেন—প্রেমে সব মিটমাট। দ্বৈত ও অদ্বৈত, এক ও বহু, শক্তি, স্থিতি, গতি, লাভ। তিনি personal কি impersonal—এক স্পর্শ করে না। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে', 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্'—অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা। মুক্তি ও বন্ধন—কেউ কাউকে রেয়াত করে না। অধীনতা, স্বাধীনতার সমান গৌরব প্রেমে। তিনি কেবল মুক্ত হলে নিষ্ক্রিয় হতেন। প্রকাশ পান বন্ধনের রূপে। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত বা পিতৃত্বে, সখিত্বে, পতিত্বে বদ্ধ। সীমা অসীমের প্রকাশ। অব্যক্তের চেয়ে ব্যক্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈষ্ণবতার সাহস—বহু, জীবনের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—মনে প্রাণে কাঁদিয়ে প্রেমের ঋণ শোধ করাবেন। শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ে উদ্ধৃত আছে—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং তদুপাসনমেব।' আরও আছে—রসো বৈ সঃ—মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অমৃতধারা। তাঁকে পেতে সকলকে পেতে হবে। গীতাঞ্জলির ছত্রে ইহারই যেন প্রতিধ্বনি—

> বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
> আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।
> আমিও কি আপন হাতে করবো ছোটো
>
> বিশ্বনাথে
>
> জানাব আর জানব তোমার ক্ষুদ্র পরিচয়?

এই ভাবে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে অনুরণন রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেক স্থলে লক্ষ্য হয়—প্রবন্ধে যাহা বিবৃত—ছন্দে তাহার ঝঙ্কার। আত্মপরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—

যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম ব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।

তরুণ রবির একটি দীপ্তিচ্ছটা—ভানু সিংহের পদাবলি—বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের নিপুণ অনুকরণ পাঠে প্রধান সাহিত্যিকগণও ভ্রমে পড়িয়া-

ছিলেন—বিস্মৃত প্রাচীন রচনার ইহা নব আবিষ্কার ভাবিয়াছিলেন। রাধা-মাধবের যমুনা কুলে নিভৃত ললিত লীলার প্রতি রবীন্দ্র প্রতিভার এই আকর্ষণ অহেতুক বা আকস্মিক ভাবে ঘটে নাই, প্রেমের ঠাকুরই তাঁহার উপাস্য—আত্ম নিবেদনই তাঁহার ভজন রীতি—ইহাই নিয়তির নির্দ্দেশ মনে হয়। প্রতিভার পরিপুষ্ট বিকাশ হইল—নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে—ভক্তি রসে বিচ্ছুরিত—বৈষ্ণব ভাব সম্পদের এই রত্ন-মঞ্জুষায়' ভক্ত হৃদয়ের অনুভূতি ও আকুতি ভারতীয়—ভক্তি-সাহিত্যের মূলতত্ত্বগুলি রূপে রসে, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় ও অভিনব রূপকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—গীত ও ছন্দের এই কয়খানি অপূর্ব মিলিত অবদানে। সতর্ক অনুশীলনে ইহা ধরা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের পরম্পরাগত প্রতীক ও উপাসনা-প্রণালীতে কবীন্দ্রের মর্মের যোগ না থাকিলেও উহার মুখ্য ভাব ও তত্ত্ব যে স্বতঃই তাঁহার অন্তরে পরিস্ফূর্ত্ত হইত—ইহা সহজেই প্রমাণিত হয় এবং বুঝা যায় যে ভক্তি-প্রেমের ধর্মে ছিল তাঁহার নাড়ীর টান—প্রকৃতিগত স্বাজাত্য। রবীন্দ্র গীতিকাব্যে লিখিত—মানবের জীবন ও নিয়তি এবং ভগবৎ সম্পর্ক যেভাবে কল্পিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়। অজানা অনন্ত পথের যাত্রী মানুষ। এই নিঃসঙ্গ একাকী পথিকের চির সহচর ও অনন্য সহায় শ্রীভগবান। জন্মে জন্মে তিনিই পান্থসখা।

পান্থ তুমি, পান্থ জনের সখাহে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া। লি ৯৫

জীবন-রথের তিনি চির-সারথি।

জীবন রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার। লি ৯৮

নিখিলের গতি—গ্রহতারার আবর্ত্তন তাঁহার ইঙ্গিতে নিষ্পন্ন হইতেছে।

হে চির সারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।

এই রথ যাত্রার আহ্বান গীতাঞ্জলিতে ধ্বনিত।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি ঐ যে বাহির পথে।
আয়রে ছুটে, টানতে হবে রশি
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ঐ যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি। ১১৮

শ্রীগৌরাঙ্গের পুরীধামে রথাগ্রে নর্ত্তন-বিলাস স্বভাবতঃই ইহাতে মনে পড়ে। শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখায়—

রথারূঢ়স্যারাদধি পদবি নীলাচল পতে
রদভ্র প্রেমোর্মি স্ফুরিত নটনোল্লাসবিবশঃ।

যিনি সারথি তিনিই অন্য দৃষ্টিতে রাখাল—সকল জীবের পালক ও চালক। গীতিমাল্যে আছে—

ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।

কবি আরও লিখিলেন—

এই তো তোমার আলোক ধেনু সূর্য তারা দলে দলে ;
কোথায় বসে বাজাও বেণু চরাও মহা গগন তলে।
সকাল বেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে
মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে।

এই নিখিল ভরা সঙ্গীত গোরাযের গ্রহসুরলহরী—sphere music-এর অনুরূপ। বৃন্দাবনের গোপনন্দনের বংশীধ্বনিতে বিশ্বমঙ্গল ও এই বিশ্বসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দম নন্দয়ন্
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঁঙ্কারার্থ মুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশী নিনাদঃ শিশোঃ।

বাঁশরীর মোহিনী মায়ায়—মুরলীধরের নৃত্যকলায় কি ইন্দ্রজাল—তাহার বিচিত্র কল্পনা গীতিমাল্যের একটি (১০ম) কবিতায়—

কে গো তুমি বিদেশী, সাপ খেলানো বাঁশি তোমার
বাজাল সুর কী দেশী।
নৃত্য তোমার দুলে দুলে কুন্তল পাশ পড়ছে খুলে
কাঁপছে ধরা চরণে
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্র ধনুর বরণে
গোপন গুহার মাঝখানে যে তোমার বাঁশি
উঠছে বেজে, ধৈর্য্য নারি রাখিতে।
কত কালের আঁধার ছেড়ে বাহির হয়ে এল ধেয়ে
হৃদয় গুহার নাগিনী
নত মাথায় লুটিয়ে আছে, ডাকে তারে
পায়ের কাছে, বাজিয়ে তোমার রাগিনী।
বিশ্বনাথের রস জেনেছে
রবে না আর ঢাকা সে।

পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়নাগের ফণারউপর নৃত্যের বর্ণনা মনে আসে।

সুখ দুঃখের পারাবার এ সংসারে তিনি
কাণ্ডারী। জীবন এই সাগরে পাড়ি—তিনি
ভবতরীর মাঝি। অন্তিমে তিনিই ভরসা।
ওরে মাঝি, ওরে আমার জীবনতরীর মাঝি। গী ১৪০

বলাকায় কবি লিখিলেন—

এই দেহটি ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো
এই দুদিনের নদী হব পার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ
অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই মুক্তি। (৩৪)

যে তরঙ্গমালায় জীব ভাসিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে—নিত্য দোলায় দুলিতেছে—সে সকল তাঁহা হইতেই। কবিগুরু লিখিয়াছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রেতি যুক্তঃ—কাহার শক্তিতে প্রাণ প্রথম বাক্যও লাভ করেছে। নর্তমান প্রাণের সঙ্গে হাত ধরা-ধরি করে, বিশ্ব আন্দোলিত। বিজ্ঞানে জানা, ভক্তিতে উপলব্ধি। অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম-এষ স্নেব আনন্দযতি।

চিরজীবন বাহু দোলায় তব এমনি করে কেবলি
দাও নাড়া। গী ১৩৫

ঋতুর নৃত্য, জীবন মরণের আন্দোলন, আলো-আঁধার, আশা-অবসান, ভয়-উল্লাসের আবর্ত্ত—বিশ্ব-দোলায় তাঁহার দোল-উৎসবের বৈচিত্র্য। দখিন হাওয়ার পুলক, ফাগুয়ার উন্মাদনা অগণিত ছন্দোঝঙ্কার রবীন্দ্র কবিতায় জাগাইয়াছে।

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।
ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।

এই অসীম লীলার তিনি মূল—তিনি রস স্বরূপ—প্রাণের প্রভু—প্রেমের ঠাকুর। তাঁহার এই লীলার যন্ত্র ও অন্তরঙ্গ মানুষ—কারণ সে বিভুবনের অধিকারী—বিশ্বভুবনের মুকুর—বিরাটের সহচর। কেমন করে তড়িৎ আলোয় দেখতে পেলেন মনে, তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে আমার এই জীবনে।

সে সৃষ্টি যে কালের পটে লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
মনে ভাবি কান্না-হাসি আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে আমারই ঢেউ খেলা।
আপন লইয়া অন্তরে মানুষ বিভোর—এই সঙ্কীর্ণ-
তার বন্ধন কাটে ভূমার অনুভবে।

অসীম বিরাটের উপলব্ধিতে সমর্থ তাহার ধীশক্তি। অহমিকার মোহ দূর হইলে ইহা বোধ হয়—

সেই আমি তো বাহন মাত্র, যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র
যা রেখে যায় তোমার সে ধন রয় তো তোমার সনে।
জীবন আমার দুঃখে সুখে দোলে ত্রিভুবনের বুকে
আমার দিবানিশির মালা জড়ায় শ্রীচরণে।
মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ—আমার মাঝে হে আনন্দ
তোমার প্রকাশ দেখে মোহ ঘুচল এ নয়নে।

এই বোধে বাধা দেয় অহংজ্ঞান। অহমিকা ও কামনা ত্যাগে জীবের নিজ স্বরূপবোধ পরিস্ফুট হয়। তাঁহার সুখদুঃখের বিধানে নতি-স্বীকার—তাহাতেই আত্ম-নিবেদন ও সার্থকতা বোধ—মানবতার সার ও পরম সম্পদ বলিয়া জ্ঞান হয়—এই জন্য বৈষ্ণবতার অর্থ বিনম্রতা ও কৃপয়া তব পাদপংকজ স্থিতধূলি সদৃশংবিধিস্তয়া। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতা—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

এই দৈন্য ও নিরভিমানতার ভাবও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ভঙ্গীতে চরম উৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে।

অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব। (গী-৩৮)
গর্ব আমার নাই রইল প্রভু
চোখের জল তো কাড়বে না কেউ কভু
নাই বসালে তোমার কোলের কাছে
পায়ের তলে সবারি ঠাঁই আছে
ধূলায় পরে পাতব আসন খানি (লি-৬৪)
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গ ভূমি
সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি (লি-৯৯)

বৈষ্ণবতার গৌরব নিঃস্বতার গৌরব, বৈষ্ণবতার সান্ত্বনা নিরহংকারের প্রশান্ত আত্মপ্রসাদ—এই ভাবে অনুপ্রাণিত ঠাকুর-কবির কবিতাগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবানুদ্যুতিতে বৈষ্ণব চেতনার অপূর্ব্ব সঞ্জীবন ও রসায়ন।

মনের আসন, আরাম শয়ন নয়ত তোমার তরে
সব ছেড়ে আজ খুশি হয়ে চলো পথের পরে
আজকে যাত্রা করব মোরা অমানিতের ঘরে
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা সেই ধূলাতে লুটাই মাথা
ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই, আনন্দরস ভরে।
বৈষ্ণবতারও ইহাই মম বাণী।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরোপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

গৌরব ভক্তের নিঃস্বতায়, পার্থিব সম্পদের দৈন্যে। ভোগবিলাস, সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিহার বৈষ্ণবতার অঙ্গ। কবি বলেন—(লি-৭৩)

সজল না সে চোখের জলে পৌঁছল না চরণতলে তিলে তিলে পলে পলে ম'ল যে জন পালঙ্কে। অন্যত্র লিখিয়াছেন—যে ধনমান পায়নি-সেই বলতে পারে সত্যকে পেয়েছি।

না রাখ-তার ঘরের আড়াল, না রাখ তার ধন
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন। (লি-৬৬)

শ্রীভাগবতের শ্লোকে আছে—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং সানিষ্কিঞ্চন জনপ্রিয়াঃ।
তিনি চির নিষ্কিঞ্চন-নিষ্কিঞ্চন জনই তাঁর প্রিয়।

সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে
যেথায় থাকে সবার অধম দিনের হতে দিন
সেই খানে যে চরণ তোমার রাজে। (লি-১০৭)

অন্যত্র কবির লেখা—

বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কল্লোলন।

তপস্যার কঠিন আবরণ বাহিরে, অন্তরে দুঃখ সম্বেদন সর্বজীবের ক্লেশের ও অন্তর দেবতার সাথে বিচ্ছেদের করুণ মধুর অনুভূতি—অধ্যাত্ম-সাধনার এই দুই উপাদান বৈষ্ণবতার শুক্তি ও মুক্তা। একটি উপায়, অন্যটি উপেয়। অন্যত্র বলিয়াছি বৈষ্ণবতার মুকুটমণি ভগবৎ-প্রেম। ভক্তিতত্ত্বের সূক্ষ্ম সুকুমার সুষমা এই দেবগৃহের শিখর ও গোপুরম। কিন্তু তাহার মূলস্তম্ভ তাহার রত্নবেদী হইতেছে অকিঞ্চনতা। রবীন্দ্র কাব্যের অপূর্ব শিল্পে যে মানসমন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহাতে এ দুয়েরি শোভা বৈভব ও বৈচিত্র্যে অনুপম। এই দেউলের গর্ভগৃহ একান্তে নিরালায়। যেখানে স্রষ্টা ও জীবের নিভৃত সমাগম। ইহার প্রাঙ্গণ বাহ্যজগৎ ও লোক সমাজ। মধুর রসের বিবিধ আলাপ নির্জনে বিশ্ব প্রেমের স্ফূর্তি ও প্রকাশ বাহিরের বিশাল চত্বর। অন্তঃপুর ও বহিরঙ্গন এই দুইয়ের মাঝে আনা গোনাই কাব্য বস্তু, নানারসের লীলা রঙ্গ বিলাস। তাঁহার প্রকাশ বিশ্বচরাচর, তাঁহার পূজার উপকরণ নিখিলে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু তিনি অন্তর দেবতা।

এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্প বিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর
এই তো ভালো। (লি-৪৯)

অথচ—

হে বিশ্বভুবন রাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মাহিমা-মাঝে। নৈবেদ্য ৪১

কামনার বস্তু ভোগের সামগ্রী—সুখসম্পদ নয়—তাহার দান। এ সকল হইলেও তিনিই কামনার ধন।

অজস্র তোমার দান—সে নিত্য দানের ভার
আজি আর পারি না সহিতে
পারি না সহিতে এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া আসা।

তাঁহার প্রকাশ সর্বত্র। তিনি মধুর ও ভয়াল, রুদ্র ও সুকুমার, সুন্দর ও বিকট।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক সে রসাতলে। গী ৮৯

সকল দশা বিপর্যায়ের ভিতর দিয়া সেই নিঠুর প্রেমিক জীবকে আপনার দিকে টানিতেছেন—ডাকিতেছেন। তাঁহার এই আহ্বান শরতের শোভায়, শিশিরের স্নিগ্ধতায়, বসন্তের চাঞ্চল্যে, গ্রীষ্মের রুক্ষতায়, বরষার আকুল আবেগে, প্রভাতের প্রাণ হিল্লোলে, সায়াহ্নের অবসাদে, নিশীথের মৌন গাম্ভার্য্যে। নিত্য-সহায় এই সর্ব নিয়ন্তাকে বিস্মৃতি ও নানা প্রসঙ্গে চকিতের মত তাঁহার স্পর্শে পুলক—পাওয়া না পাওয়ার এই অশেষ বৈচিত্র্যের আলাপই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সঙ্গীত।

বাজিয়ে ছিলে বীণা তোমার দিই বা না দিই মন
আজ প্রভাতে তারি ধ্বনি শুনি সকল ক্ষণ। লি ৮৫
দিনের শেষে মলিন আলোয় কোন নিরালা নীড়ের টানে
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে উদাস ধ্বনি উধাও আসে
তান তুলেছে কোন দুপুরে মনের মাঝে অনেক দূরে
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে
সে যে আসে. আসে, আসে
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রঙে
সে যে আসে, আসে। গী ৩২
মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার কোরে আসে।
আজি আমি যে যসে আছি তোমারি আশ্বাসে।
আমার নয়ন ভুলানো এলে
শিউলি তলার পাশে পাশে—ঝরা-ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে। লী ২৩
শরতের মোহনরূপে শুধু নয়, তাহার ভয়াল
প্রভঞ্জনেও তাহার প্রকাশ—
ঝড় এনেছ এলোচুলে মোহনরূপে কে রয় ভুলে?
জানি নাকি মরণ নাচে গো ঐ চরণ মূলে?
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু সাগর কূলে। মোহনরূপে কে রয় ভুলে?

তাঁহার স্পর্শের পুলক জীবের সত্তায় চিরন্তন—তথাপি আপন-ভোলা মানুষ চকিতে তাঁহাকে পায়, নিমিষে হারায়। বিরহ ও মিলনের, পাওয়া ও হারানোর এই রঙ্গনাট্য মানব-চেতনার বৈচিত্র্য।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

সকল প্রাণ বিবর্তের মধ্য দিয়া জীবের পথিনির্দেশ করিয়াছে তাঁহার এই আমন্ত্রণ। তাঁহার আহ্বানই বিশ্বসঙ্গীত—জীবনের আনন্দ বাঁশরী। ইহাই কবির চিত্তে যুগে যুগে জন্মে-জন্মান্তরে সুর লইয়া জাগাইয়াছে।

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান। লী ৩১

এই গানের প্রেরণা এ জন্মে শুধু নয়, ইহা তাঁহার প্রকৃতিতে আদিহীন অন্তহীন,।

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবন ধারা বেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী অধ্যাত্ম জীবনের একটি প্রধান উদ্দীপন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাঁশীর মোহিনী-মায়া নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ সাহিত্যের ইতিহাসে সুর ও ছন্দের অতুলনীয় মিলনেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কবিতা নানারসে অভিষিক্ত হইলেও বিশ্বপতির গীতি-সহচররূপেই তাঁহার অভিমান-গৌরব। এই গান বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রেরণায় স্ফুরে এবং সার্থক হয় উহার বোধেই। মানুষের সকল কৃতিত্ব তাঁহারি কৃতিত্ব। তিনি যন্ত্রী, মানুষ যন্ত্র ও নিমিত্ত মাত্র। বিচিত্রের লীলা-সঙ্গী রূপেই কবি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

তোমার কাছে খাটে না মোর কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি যদি সরল বাঁশি গড়ি
আপন সুরে দিবে তারি সকল ছিদ্র ভরি।

তাঁহার ইচ্ছায় স্বেচ্ছা মিলান, তাঁহার কার্য্যের উপায় রূপে আপনাকে একান্ত ভাবে অনুভব করা—ইহাই ভক্তির সাধনা। এই ভাবেই জীব দৈব অভিপ্রায়ের বাহক ও সাধক হয়। এই অহং বোধ পরিহারের ও আত্মনিবেদনের সুর কত বিচিত্র আলাপে রবীন্দ্র রচনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবিকরোজ্জ্বল মানস-সরোবরের লহরীমালার মত, নায়াগ্রা প্রপাতের শীকরোচ্ছ্বাসের বর্ণচ্ছটার মত—ইহার প্রকাশ প্রতিটি কবিতায় অভিনব ও পৃথক। আমি ও তুমির মাঝে এই যে নিকট-তম পরিচয় লীলা ইহাতে নব নব কল্পনা ও রসসঞ্চার কবিগুরুর কৃতিত্ব। মানুষ ভগবানের সন্ধানী প্রায় সকল ধর্ম্মে—কিন্তু ভগবান মানুষের অন্বেষক, তাহার প্রেমের ভিখারী—ইহা বৈষ্ণবতার কথা। দেবতা ও মানবের এই যে পরস্পর প্রেমাধীনতা—ইহার রহস্য বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

মানুষের অণুতা, নগণ্যতা—তবু কল্পনা বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের সঙ্গে প্রেম। ইহা কি অধ্যাত্ম প্রভাবেরই চরম উন্মত্ততা? বৈষ্ণবের অভিমান কালী পৃথিবীর বাইরে—আমিই সেই কালী। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে। তয়োরেকং পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি। কী অনন্ত একলা তিনি, এক জায়গায় একাধিপত্য ত্যাগ করেছেন। ধুলি জল চাইনে বললে মারতে আসে। তিনি চুপ করে সরে বসেন। তিনি বরসজ্জায় আসবেন, প্রেম প্রত্যেকে আমি—অধিকারের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ—কিন্তু অন্য ইচ্ছার সঙ্গে না মিললে সার্থক বোধ করে না। ইচ্ছার এই চরম অধীনতা। তিনি ইচ্ছাকে চান—সে জন্য দ্বারস্থ—এই প্রেমের নীতি। (শা ৩৬)

ইচ্ছার সাথে ইচ্ছার মিলনে, দৌত্য করে প্রার্থনা। বৈষ্ণব বলেন, তাঁর বাঁশির সুর আমাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা।

মিলনের বাঁশি বিশ্বে তোমার রণে— শা ১১৫
বেদনা দূতী গাহিছে-ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান। গী ২৭
আমার পরশ পাবে বলে আমায় তুমি নিলেকোলে
কেউ তো জানে না তা। মা ১২
হে অন্তরের ধন, এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন
তোমার বাঁশী নানা সুরে আমায় খুজে বেড়ায় দূরে
পাগল হল, বসন্তের এই দখিন সমীরণ।

আধুনিক ইংরাজ কবি Francis Thomoson এর Hound of Heaven এইভাবের অত্যন্ত করুণ চিত্র। বৈষ্ণব কবিতার ইহা একটি পুরাতন ধুয়া। তাঁহার উদ্দেশে শুধু ভক্তের অভিসার নহে, ভক্তের উদ্দেশে তাঁহার অভিসার।

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নিরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। গী ১৮
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার গী ২০
এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে
কোন ঘাটে যে ঠেকবে আসি কে জানে তার গতি
পথ হারা কোন পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি
কোন অচেনা আঙ্গিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে
অগৌরবের বাড়িয়ে গরব করাব আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে। বলাকা ৫
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম যে হত মিছে গী ১২১
আমার তুমি করবে দাতা আপনি ভিক্ষু হবে
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে
তুমি রইবে না ঐ রথে, নামবে ধুলাপথে
যুগ যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।
সফল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ারমাঝে হে।

এই সকল গানের কলিতে ও অনুরূপ অগণিত ছত্রে যে

হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের পূর্বরাগের সাথে তুলনীয়। আবার শুধু অভিসার বা পূর্বরাগ নয়, প্রেম বৈচিত্রের সকল ভাব ও ভাবাভাস রবীন্দ্র রচনায় নিপুণ ও অভিনব প্রকাশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একই ভাবের পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনে যে পর্য্যাপ্তি ও বিরসতা আসে, ইহাতে তাহা নাই। কারণ প্রতি উচ্ছাস প্রতিভার নবনবোন্মেষে স্বতন্ত্র। একটা দিব্য প্রাচুর্য্যই রবীন্দ্র অবদানের বৈশিষ্ট্য। মূল ধাতু ও উপধাতু (Isotopi) এর সমাবেশে যেমন সৃষ্টির অসীম বিভূতি প্রকাশ হয়—ইহাও সেইরূপ।

চিত্ত অন্তঃপুরে জীবে ও পরমাত্মার সম্পর্কে যে অগণন অনুভূতির বৈচিত্র্য চলিয়াছে—তাহা পদাবলী সাহিত্যে কতকগুলি সুনির্ণীত শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রস-তত্ত্বের শ্রেণী বিভাগ অতিক্রম করিয়াও যেন সংযোজনা ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। নিরমল হেম সমতুল—প্রেম কতনালঙ্কারতায় বিধি শিল্পকার করিল প্রচার তাহা গণা নাহি যায়—এই কারিকতা কবিগুরুর সৃজনী প্রতিভায় নবভাবে সার্থক হইরাছে। পরম্পরাগত রসভাবগুলিতে তিনি নূতন ও মৌলিক, উদার ও অসঙ্কীর্ণ ব্যঞ্জনা সংযুক্ত করিয়াছেন। ফলে সর্বসাধারণ ও সর্বজনসংবেদ্য অনুভূতিসকল প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে। উৎকণ্ঠা, অভিমান, আশা, সান্ত্বনা, ব্যগ্রতা, উল্লাস, দৈন্য, স্মৃতি, আত্ম নিবেদন, বিরহ, মিলন, অভয়, সৌভাগ্য-গরিমা, অন্তিমের ভরসা প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের অনুভাবসঞ্চারি ভাবের নব রূপায়ণে দাঁড়াইয়াছে।

আত্মপরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—বিশ্বদৃশ্যে নিবিড় আনন্দ বোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না। শান্তিনিকতেনে বলা হইয়াছে—অনন্তশূন্যে উৎসবের নিরন্তর আহ্বান। দেবতা অপেক্ষা করতে জানেন। বিদ্রোহী মানুষ লুটিয়ে পড়বে। ক্ষণ কালের নমস্কারে অসাড়তা দূর। (১৩৭) নিখিলের ঐশ্বর্য্যের মাঝে তাঁহার আবির্ভাব রবীন্দ্র কবিতার অপূর্ব বাক্‌শিল্পে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-পরিহারে মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রীতিঘন অন্তরঙ্গ রূপে তাঁহার প্রকাশ সমান বা আরও অধিক নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতন (৩৭) তিনি লিখিয়াছেন—প্রেম আনন্দের মূর্ত্তি। নিয়ম সত্যের মূর্ত্তি। না তাকালেও অরসিক বলে গালি দেয় না। রাজবেশ ধরে এলে জন্মজন্ম দাসানুদাস থাকতে হবে। আনন্দ মূর্ত্তি জোর করে দেখাবেন না—পণ করছেন।

কৃষ্ণদাসের এই কথা—

পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রধানত সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কৈবলার রীতি।
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাহাও উদ্দিপন
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে হয় সঙ্কোচন
কেবলা শুদ্ধ প্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য্য না জানে
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে

জীব ও জগদীশের প্রেমমধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথায় রবীন্দ্র কাব্যে ভরপুর।

হে অন্তরের ধন
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন
আমার ঘরে তোমায় আমি একা রেখে দিলাম স্বামী
কোথায় যে বাহিরে আমি ঘুরি সকল ক্ষণ।

শান্তিনিকেতনে কবি লিখিয়াছেন—ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছা জ্ঞানে কর্মে প্রকাশ করে, তখন অপরূপ পদার্থ দাঁড়ায়। ভক্তের জীবনের বৈচিত্র্যে আর বিরুদ্ধতা নাই—আমার মধ্যে তোমার, তোমার মধ্যে আমার স্থান। তুমি আমার প্রেমিক-আমি তোমার প্রেমিকা।

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাইরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রকাশের ভাষা এবং নানা ভাবের ছায়া প্রেমভক্তি সাধনার উপর পড়িয়াছে—দেশকালনিরপেক্ষ ভাবে। বিশ্বের ধর্ম-সাহিত্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রবীন্দ্র কাব্যে ইহা বহুস্থলে লক্ষণীয়। কিন্তু পার্থক্য আছে। শান্তিনিকেতম ১৩শ ভাষণে তিনি লিখিয়াছেন—কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা ভুলে—রস সম্ভোগ, প্রেমের রস—রস বিকৃতি। আমাদের প্রেমের সাধনা—সতী-স্বীর সাধনা—তাতে হ্রী, ধী, শ্রী থাকবে পৃথিবীর যেমন বাতাসের আবরণ। নইলে জ্বলনের পাশে হিম মৃত্যু হ'ত।

নৈবেদ্যে (৪৫) আছে।

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল কেন ভক্তি মদ ধারা
নাহি চাই নাথ।

কবির দৃষ্টি শুধু মধুর সুন্দরে আবদ্ধ নয়, রুদ্র ভয়ালও তাঁহার বিশ্ব-রূপ দর্শনের মধ্যে।

লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক সে রসাতল।
আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমায় এমন করে করেছে নিঠুর
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার
ওরে ভেঙ্গেছে তোর দ্বার
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ আসছে জীবন মাঝে
ওযে আসছে বীরের সাজে

এই যে মধুর-মনোরম রূপের সাথে রুদ্র ভয়াল, কঠোর, বীভৎস-প্রকাশকে প্রত্যক্ষ ও তাহাকে স্বাগত—ইহাতে কবির দৃষ্টির বাস্তব ও ব্যাপক, সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়। এই ব্যথার দেবতাকে দুঃখে দৈন্যে বরণ করাই বৈষ্ণবতার সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

ভক্ত জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদ সম্পদে পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে নিটোল হয়ে অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্চে প্রেমের রূপ। (১৬ খণ্ড—৩৭০ পৃঃ) বলরাম দাসের সাথে সুর মিলাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

আমি তোমার ধর্মপত্নী ভোগের দাসী নহি
আমার কাছে লাজ কি স্বামী নিষ্কপটে কহি
আমায় প্রভু দেখায়োনা সুখের প্রলোভন
তোমার সাথে দুঃখ বহি সেই তো পরম ধন।
পতিব্রতা সতী আমি তাই তো তোমার ঘরে
হে ভিখারি সব দারিদ্র্য আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই পাইনা সুখের দান,
আমি তোমার প্রেমের পত্নী এই তো আমার মান।

এই ভাব সূত্রেই কবি গাহিলেন—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।

এই বেদনা-বরণ ও বেদনা-বহন বৈষ্ণব আদর্শ—ভারতের ভক্তমালায় তাহার সজীব চিত্ররাজি। এই বৈষ্ণবতা ভক্তি ও মুক্তি দুইই তুচ্ছ করে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।

তাঁহার দৃষ্টিতে মুক্তির অর্থ বিশ্বাত্মতা। গী ১১৯

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে পারব কবে।
নিখিল আশা আকাঙ্ক্ষাময় দুঃখে সুখে
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গ পাত ধরব বুকে। গী ৮৮
এসেছি তোমারে, হে নাথ পরাতে রাখী
যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাতে
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি। গী ৪৩

বৈষ্ণবতার আদর্শ চ্যুতিতে তাঁহার আক্ষেপ—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার,
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান। গী ১০৮

ভাগবত বলিয়াছেন—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং প্রজতে মোচ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

কবিগুরুর কণ্ঠে উদাত্ত ঝংকার উঠিয়াছে এই বিশ্বাত্মতার আলাপে এবং মানব জীবনের পরম সার্থকতার অঙ্কনে। বলাকায় তাঁহার লেখা—

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে ফাঁকির ফাঁকা মানুষ
কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে
আমার প্রেমে আমার স্নেহে আমার ব্যাকুল বুকে
আমার লজ্জা আমার সজ্জা আমার দুঃখে সুখে।
আমার গানে স্বর্গ আজি ওঠে বাজি
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়
আকাশ ভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।

কোন পাশ্চাত্য মণীষী বলিয়াছেন—স্বর্গ যদি পরলোকে ও কালান্তরে না থাকে—তাহা এখনই এবং এখানেই আছে—অথবা তাহা কোথায়ও ও কোনদিনই নাই। আধুনিক মানবীয়তাবাদ Humanism এরও এই কথা। বৈষ্ণবতা অন্তঃকরণের উগ্র ও আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তির নিয়মন ও উপশমের দ্বারা—সুকুমার ও পরার্থপ্রবৃত্তির পরিপোষের দ্বারা—অর্থাৎ মানবিকতার অনুশীলন দ্বারা মর্ত্যে অমরত্ব প্রতিষ্ঠার ব্রতী। তাই বাঙ্গলার বৈষ্ণবতার প্রেমভক্তির অঙ্কনে বিস্ফারিত চক্ষে—

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে ত্রিদশ পুরাকাশ পুষ্যায়তে

ভারতীয় চিন্তা ও তাহার পরিণতি India thought and its Development নিবন্ধে আধুনিক লেখক Allert Schweitzer এর মন্তব্য এ বিষয় লক্ষ্যণীয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতবাদ রবীন্দ্র চিন্তা ধারায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। জগৎ ও জীবনের বাস্তবতা স্বীকার উভয়ের ভাব-পুঞ্জের বৈশিষ্ঠ্য—ভারতীয় মণীষীর অন্য যে তত্ত্বটি পূর্বাপর প্রবল হইয়াছে—তাহা বিশ্ব ও জীবনতার নেতি জ্ঞান (negation)—অলীকবোধ তুচ্ছতাভাব! ইহার বিপরীতে অপর ভাব দৃশ্যমান। নিখিলের প্রতি মর্য্যাদা বুদ্ধি—বাহ্য জগৎকে অঙ্গীকার ঐহিক জীবনের মূল্যে শ্রদ্ধা।

কবিগুরুর লেখনী এই ভাবে বৈচিত্র্যে মনোহর করিয়াছে গীত ঝঙ্কারের কল্পনার রামধনু রঙ্গে, নবরস মাধুর্য্যে।

মানব জীবনের ইহাই পরম মর্য্যাদা বৈষ্ণবের চক্ষে—কারণ ইহা ভগবদুপলব্ধির সুযোগ ও তাঁহার সেবার উপায়। শ্রীভাগবত বলেন বিধাতা নিজ নিবাসের জন্য পরপর নানা উদ্ভিদ্ ও জীব নির্মাণ করিয়া সন্তোষ না পাইয়া অবশেষে মানুষ সৃষ্টিতে তৃপ্ত হইলেন—কারণ তাহার মনীষা ব্রহ্মাববোধে সমর্থ। গীতাঞ্জলিতে আছে—

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নিরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
তোমার আকাশ. উদার আলোক ধারা
দ্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তারা
তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।

শুকদেবের মুখে এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণো কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়ো নঃ
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনে হস্তু ভবত্তনু নাম।

শেষ চরণে ভক্ত দর্শনে যে নয়নের সার্থকতা নৈবেদ্যে যেন তাহারই অনুরণন।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ
ওরে দীন তুই জোড় কর করি কর তাহা দরশন
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি বহিয়া যেতেছে অমৃত লহরী
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহরে শুভাশীষ বরিষণ।

নাম গানে ভক্ত হৃদয় হয় বিগলিত—দেবতা অতীন্দ্রিয়—কিন্তু তাঁহার নাম কীর্ত্তন সহজ ও প্রত্যক্ষফল। গীতিমাল্যে কবি গাইয়াছেন—

বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ব'লে
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবন পথে সংগোপনে রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণ ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।

প্রণতিতে উপাসনা সাঙ্গ ও সম্পূর্ণ। সকল স্তব স্তুতির এই একই তাৎপর্য্য—ভক্তিশাস্ত্রের ইহাই চরম অবদান—রবীন্দ্র রচনায় ইহার প্রকাশ মর্মস্পর্শী।

এই ক্লান্তধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমার করি গো নমস্কার
এই কর্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
হংস যেমন মানস যাত্রী তেমনি সারাদিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহা মরণ পারে।

প্রেম ভক্তির প্রতীক ও প্রকাশরীতি রবীন্দ্র কাব্যে যে বৈচিত্র্যে বিকশিত হইয়াছে—তাহার বিবৃতি বিস্তৃত নিবন্ধেই সম্ভব—ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নহে। পরম্পরাগত ভাব ও ভাষার সহিত উহার সাদৃশ্য নানাস্থলেও নানাবিধ, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অতীতের ঊর্ণনাভ তন্তুতে প্রাচীন সংস্কৃতির সন্তান জড়িত হওয়া স্বাভাবিক। আত্ম পরিচয়ে তিনি নিজ অধ্যাত্ম স্বরূপের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা হইতে ভারতে যুগ যুগ পরিপুষ্ট বৈষ্ণবতার পার্থক্য সুস্পষ্ট। যে সকল মিল আছে প্রতিচ্ছবি ও অনুরণনের সেই কুসুম দাম—কি প্রযত্নে গ্রথিত কবি নির্মিত—বহুর মধ্যে একটি কল্পনা বিলাস অথবা অন্তরের স্বতঃউৎসারিত ভাব ধারা? এ বিষয়ে কবিগুরুর নিজ অভিমত সূত্রপাতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি "চিরন্তন ভারতের আধুনিক আত্মপ্রকাশ" কিনা—তাহা সহৃদয় মনস্তাত্ত্বিকেয় বিচার্য্য। কিন্তু নিদান যাহাই হউক—বৈষ্ণব ভাবমূলক রবীন্দ্রকাব্যের আধুনিক মনের উপর প্রভাব কিরূপ বা কি পরিমাণ হইতে পারে তাহা মানবিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল মাত্রের আলোচ্য। বাহ্য প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদে, নব নব শক্তির আবিষ্কারে, আপন-হারা মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে একান্ত অশক্তি ও অসহায়তা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে। বৈষ্ণবতা মনঃশিক্ষার আকর। রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণবতা সে পক্ষে আধুনিক জগতের পরম সহায় হইতে পারে। সম্প্রদায়ের পরিভাষা ও মতবাদ হইতে বিমুক্ত—ভক্তি প্রেমের প্রচারে ইহার সম্ভাব্যতা বিপুল। গতানুগতিক চিত্তবৃত্তি ও চিন্তা চর্চাকে বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া নিখিলের রজতশুভ্র পটে—Cosmic silver screen এ বৈষ্ণবতার উৎক্ষেপ—রবীন্দ্র কাব্যের অবদান। সে হিসাবে কবিগুরু অভিনব সার্বজনীন বৈষ্ণবতার প্রবর্ত্তক হইতে পারেন। সঙ্গীতে ও ছন্দের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও অনুস্যূতিতে বিশ্বের সাহিত্যে ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনুপম, অদ্বিতীয়। যে সকল মূল বৈষ্ণব ভাবগ্রন্থি তাঁহার কবিতায় দেখা যায় তাহাতে কীর্ত্তনের পালা হিসাবে রস শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত তাঁহার রচনা সজ্জিত ও বিন্যস্ত—তাহা হইলে ভক্তি রসাস্বাদের যে অভাবনীয় একটি প্রণালী রচিত হয়—ইহা নিশ্চিত। রবীন্দ্রবাণীর যাঁহারা নিধিরক্ষক ইহার প্রসার ও প্রচারে উন্মুক্ত—এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অবধান ফলপ্রদ হইতে পারে।

গল্প

ছাড়াছাড়ি

শ্রীচারুলতা রায়চৌধুরী

বিস্তৃত একটি হল ঘরে চায়ের সরঞ্জাম সাজান। নানারূপে লোভনীয় আহার্য্য সামগ্রী ক্ষুদ্রাকার টেবিলগুলির শোভা-বৃদ্ধি কোরে আছে। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই সেইগুলির চারিপাশ দখল কোরে বসেছেন। তাঁদের মৃদু গুঞ্জন ঘর-টিকে মুখরিত কোরে রেখেছে। সহধর্ম্মিণীসহ গৃহস্বামী তখনও দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান; অতিথিদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। কামরায় নতুন কেহ প্রবেশ কোরলেই অভ্যাগতদের দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল প্রবেশ-দ্বার অভিমুখে। সকলেই যেন কাহার প্রতীক্ষা কোরছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একটি মহিলার আবির্ভাবে কক্ষ মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। পরণে তাঁর সোনালি পাড়যুক্ত হাল্কা সবুজ রংএর শাড়ী। পাড়ের সঙ্গে রং মেলান যে ব্লাউস ছিল পাতলা শাড়ী তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। আস্তিন কাঁধের উপর চড়ায় বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব বোঝবার উপায় ছিল না। ঝাঁকড়া চুলের রাশ বাড়ার পথে বাধা পেয়ে ঘাড় পর্য্যন্ত এসে আটক পড়েছে। তন্বী শ্যামা, ছেলে বেলায় কালো মেয়ে বোলে অখ্যাতি ছিল। সেইজন্যই কিনা জানিনা নাম রাখা হয়েছিল কৃষ্ণা। রূপ বিয়োগের কোঠায় পড়লেও অঙ্গভঙ্গীতে রসের প্রভাব ছিল প্রচুর। চোখে কটাক্ষ, হাসিতে মনের মানুষকে কাছে ডাকার ঈষৎ সঙ্কেত। এর ওপর অতি সন্তর্পণে অভ্যাস-করা গঠনের দোলার আকর্ষণ তো ছিলই! এত গেল বাহির আকৃতির কথা। উপরি সম্পদেরও ফাঁক রাখতে দেয়নি সে কোথাও। নামের পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমায় যোগ তো ছিলই, অধিকন্তু পিয়ান বাজানয় পারদর্শী, বিদেশী প্রথায় নাচে দক্ষ, আধুনিক চালে সুর ভাঁজতে অভ্যস্ত। এহেন গুণসম্পন্না কন্যায় যশ যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি? পুরুষ মাত্রেই তার পূজারী বোললে অত্যুক্তি হবে না। মেয়েরা বিচার কোরে সখিত্ব করে—তাই তাদের কথা আলাদা। কৃষ্ণাকে তারা সোহাগ দেখাত, কিন্তু ভালবাসত না।

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকতেই একটি মেয়ে তার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে ঠ্যালা দিয়ে বোললে, "ওই যে রে এসেছে। ইস্ চলার কি ভঙ্গী! এত দেরী হ'ল কেন কে জানে।"

উত্তর এল, 'আহা তোমার যেমন কথা। তাড়াতাড়ি এসে পড়লে অমন যে সাজের ঘটা তা দেখবে কে শুনি? তাছাড়া ওকি তোমার আমার মত নাকি? প্রস্তুত হ'তে সময় লাগে না?"

আর এক প্রান্ত থেকে শোনা গেল, "একা বোলে মনে হচ্ছে যেন। সাথিটী গেলেন কোথায়?

পাশ থেকে সুরেখা উত্তর কোরলে, যাবে আবার কোথায়? অবসর যেটুকু পেয়েছে অন্য কোনও সুন্দরীর মন ভোলানর কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে। দেখছ না, চোখের দৃষ্টি দিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। লজ্জা তো নেই, ভয়ও নেই। বেচারা মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি!

বন্ধু শীলা টিপ্পনী কেটে বোললে, "ওরে বাসরে, তোর যে দেখি বড় দরদ। যে লোক নিজের স্ত্রীকে বশে রাখতে পারে না সে আবার পুরুষ নাকি?"

সুরেখা বোললে, তা যা বোলেছিস্? কিন্তু করেই বা কি? স্ত্রীকে তো আর চাবি বন্ধ কোরে রাখতে পারে না।

শীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর কোরলে—হুঁ, তোর যেমন কথা। বন্ধের মধ্যে থাকবার মেয়েই ও বটে।

অশুভা প্রশ্ন কোরলে—লোকটি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন? আগে তো দেখিনি কখন।

শীলা—ওঃ তা জান না বুঝি? শুনতে পাই একেবারে খাস বিলাতে বাস। পাশ দিয়ে গেলে টাটকা বিদেশী

রসের গন্ধ পাওয়া যায়। মুখে অনর্গল বিজাতীয় বুলির খৈ ফুটছে। দেশী ভাষা বোলতে গেলেই জিভ্ যায় জড়িয়ে। চটক দিয়েই তো মজিয়েছে মেয়েটাকে। তুমি কি ওকে সাধারণ মানুষ মনে কোরছ ?

অনুভা—না, তা কোরছি না। তবে ভয় পাই কৃষ্ণার জন্য। পিছল মাটিতে পা দিয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত পড়ে না মরে।

লীলা—তোমার যে ভাই 'পাড়া পড়শির ঘুম নেই' এর অবস্থা হল।

অনুভা—তা তুমি বোলতে পার। কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। পাঁকে তলিয়ে যেতে দেখলে সহানুভূতি আসে বৈকি।

অণিমার বেশ একটুখানি রূপের গরব ছিল। সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণাকে তার কাছে হার মানতে হবে এই ছিল তার বিশ্বাস। তাই রূপের বাজারে নিজেকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে কোরত। অন্তরে ঈর্ষা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে, এইটি পাঁচজনের কাছে প্রমাণ করবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার প্রচুর। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকতেই সে তার সযত্নে আঁকা ভ্রূ ফুলিয়ে ঈষৎ নাচিয়ে চোখ ইসারায় তাকে ডাক দিল। কৃষ্ণা কাছে এলে তার আঁচল চেপে বোললে—ঐখানে একটা খালি জায়গা আছে, বস না।

কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে আসছি বোলে চলে গিয়ে নিকটস্থ অন্য একটি খালি টেবিল দখল কোরে বসল।

অণিমার পক্ষে এই তাচ্ছিল্য সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। পরিচিত কাহার সহিত সাক্ষাৎ করবার ছলে সে উঠে প্রবেশ-দ্বারের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে গিয়ে বসল। গোপন উদ্দেশ্য কিছু ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। দ্বারের কাছে থাকলে চলার-পথে রসিকজন তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরতে পারবে না।

মধুর সন্ধান পেলে মক্ষিকার-দল যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসে তেমনিভাবেই নানা ছাঁচের মানুষ অল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণার টেবিলটির চারিপাশ ঘিরে ফেললে। তাঁদের রসকেলির রঙ্গ দূরের মানুষকেও চঞ্চল কোরে তুলছিল। বাঁকা মুরারী ঢংএ অদূরে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া [illegible] পাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে তাঁর কৌতুকের হাসি। কৃষ্ণা তাঁকে পাশের চৌকিটি দেখিয়ে বোললে—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না। এই লোকটিকে নিয়েই পরিচিত মহলে নানারূপ কাণাকাণি চলেছিল।

বছর দশ পূর্ব্বের কথা—অনিল চ্যাটার্জ্জি তখন হালে বিদেশ থেকে ফিরে সরকারী বড় চাকরিতে বহাল হয়েছে। বিয়ের বাজারে তার দাম তখন অনেক। বিবাহযোগ্যা কন্যার মায়েরা তাকে নিয়ে টানাটানি সুরু কোরে দিলেন। বাড়ীতে আহারের পাট তাঁর প্রায় উঠেই গিয়েছিল। কৃষ্ণার মা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন—এহেন পাত্রকে হাত-ছাড়া করা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। বলা মাত্রই মোহিনী তার মায়াজাল বিস্তার সুরু কোরে দিলে। অনিল মোহ-মুগ্ধ হয়ে সেই জালে জড়িয়ে পড়লেন। শুভলগ্নে শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল।

কৃষ্ণা যখন দুটি সন্তানের মা, তখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল ঐ সুরজিৎ। তাদের মিত্রতা সুরু হ'ল কোন এক জলসার ভীড়ে। হাসিতে গল্পে সভা জমিয়ে রাখতে সুরজিৎ ছিল ওস্তাদ। কৃষ্ণা যে রকমটি চায়, এ যেন ঠিক সেই ছাঁচে গড়া মানুষ। এর তুলনায় নিজের স্বামীকে তার অত্যন্ত নগণ্য বোলে মনে হল। তার বাড়ীতে সুর-জিতের হল অবাধ গতি। যখন খুসী সে আসে এবং তারপর দুজনে একসাথে বেরিয়ে যায়। যেখানে সুরজিৎ সেইখানে কৃষ্ণা। ঘরে তার আর মন বসেনা। ছেলে-মেয়ে দুটি রইল আয়ার জিম্মায়।

অনিল যে সমাজে মানুষ সেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোন বাধা ছিল না। স্ত্রীর স্বাধীন চলাফেরাকে তাই এ পর্য্যন্ত অন্যায় বোলে মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু কিছুদিন থেকে কৃষ্ণার ব্যবহার সামাজিক সৌষ্ঠবের বেশ একটু বাইরে চলে গিয়েছিল এবং অনিলের মত আধুনিক-পন্থী মানুষের পক্ষে অতটা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। নানা যুক্তি দিয়ে স্ত্রীকে সে বোঝাবার চেষ্টা কোরলে। কিন্তু যে মানুষ প্রকৃতিস্থ নয় সে কি বুঝতে চায়? তাছাড়া বোঝাবার সময়ও তখন পার হয়ে গিয়েছে। অনিল যখন বোললে, "লোকে তোমাকে নিয়ে নানা কথা বোলছে—সেটা শুনতে আমার ভাল লাগছে না। তুমি ইচ্ছা কোরলে অনায়াসে এটা থামাবার

ব্যবস্থা কোরতে পার”—কৃষ্ণা তখন জোর দিয়েই উত্তর কোরলে—“লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার শুনতে ভাল না লাগে ওদিকে কাণ না দিলেই পার।” তারপর একদিন সোজাসুজি বোলে বসল “আমি সুরজিতকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।” অনিল এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে হতবম্বের মত তাকিয়ে রইল। ধাক্কাটা যখন সামলে নিতে পারল, প্রশ্ন কোরলে “কথাটা কি ভেবে বলছ কৃষ্ণা? আমাকে না হয় ছেড়ে যাবে—কিন্তু অঞ্জনা আর অমলেন্দু, তাদেরও কি ছেড়ে যেতে পারবে?” কৃষ্ণা খানিক চুপ কোরে থেকে উত্তর কোরলে,—“তারাও আমার সঙ্গে যাবে।” অনিল ঠোঁটের কোণে করুণ হাসি ফুটিয়ে বোললে “তা কি হয়?” এরপর কৃষ্ণা যখন বোললে, “তাহ’লে তারা তাদের বাবার কাছে থাকবে। এরকম তো কত থাকে” অনিল তখন বুঝলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু বোলতে যাওয়া তার বিড়ম্বনা বোলে মনে হ’ল। বলবার মত মনের অবস্থাও ছিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু “আচ্ছা তাই হবে” বোলে সেখান থেকে চলে গেল।

ছাড়াছাড়ির পর কৃষ্ণা সুরজিৎকে সঙ্গে নিয়ে এক হোটেলে গিয়ে উঠল। অঞ্জনা ও অমলেন্দুকে স্কুলের বোর্ডিংএ রেখে অনিল কিছুদিনের মত বিদেশে পাড়ি দিল। অমলেন্দু নিতান্ত শিশু, বোঝবার বয়স তখন তার হয়নি, অঞ্জনার বয়স তখন আট। তাদের ক্ষুদ্র জীবনে অভাবনীয় একটা কিছু যে ঘটে গেল তার স্বল্প একটু আভাস সে পেলে। দিনের বেলা সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে সেও একজন, পড়াশোনায় ও খেলা-ধূলার সময় কেটে যায়। রাত্রির অন্ধকারে সে হয়ে যায় নিতান্ত একা। বালিশে মুখ গুঁজে সে কাঁদে। তার মনে হয় কি যেন তার হারিয়ে গেছে। মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে বসে নিজের নূতন আবে-ষ্টনীকে বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর “মাঃ” বোলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ে! অমলেন্দুকে কেউ কিছু বোললে সে সহ্য কোরতে পারে না। সমস্ত স্নেহ দিয়ে ছোটভাইটিকে সে আগলে রাখতে চায়।

এদিকে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন কোরে এসে নূতন যোগ-সূত্রকে আইনসঙ্গত কোরে নেবার জন্য কৃষ্ণা যতই তাগাদা দেয় সুরজিৎ ততই একটা না একটা অজুহাতে দিন পিছুতে থাকে। একদিন সকালে কৃষ্ণা গেছে সপিং এ (Shopping)। ফিরে এসে দেখে সুরজিৎ মহাআড়ম্বরে সুটকেস (Suitcase) গোচাচ্ছে। কৃষ্ণা অবাক হয়ে প্রশ্ন কোরলে, “একি ব্যাপার? কোথায় চললে?”

সুরজিৎ বোললে “বিলাত থেকে একটা জরুরী তার এসেছে, আমাকে দুই একদিনের মধ্যেই রওনা হতে হবে। প্লেনে (Plane) একটা সিট্ (seat) বুক্ (book) করবার প্রাণপণ চেষ্টা কোরছি। সিট্ পেয়েছি খবর এলেই চলে যাব।”

কৃষ্ণা বোললে “বাঃ, তা কি কোরে হয়? আমিও সঙ্গে যেতে চাই যে। আগে বন্ধনটা পাকা কোরে নাও তারপর যাবার কথা বোল। তার আগে কোনমতেই যেতে পার না”

সুরজিৎ অসহিষ্ণু স্বরে বোলে উঠ্ল, “পাগলামি কোর না কৃষ্ণা। আমাকে যেতেই হবে। বোলছি না কাজ আছে। যা তা কোরলেই হল নাকি।”

কৃষ্ণা বরাবর সুরজিতের কাছ থেকে খোসামদ পেয়ে এসেছে। এরকম রুক্ষ স্বর সে শোনেনি কোন দিন। তাই সে ব্যথা পেলে। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে অভিমানের সুরে বোললে “ও! তাই বুঝি? কাজের কথাটা কিন্তু তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল, আমাকে ঘর থেকে ডেকে এনে তারপর নয়। এখন আমি যাই কোথায় শুনি?”

সুরজিৎ কাষ্ঠহাসি হেসে বোললে, “আরে চট কেন? তোমার ব্যবস্থা না কোরেই কি আমি যাচ্ছি? তুমি যেমন আছ উপস্থিত তেমনি থাকবে। পরের কথা পরে হবে। কেমন এইবার খুশী তো? বিদায় বেলা অমন মুখ গম্ভীর কোরে থাকতে নেই। একটু হাস দেখি।”

কৃষ্ণা হাসলে না বা কোন কথা বোললে না। মনের মধ্যে একটা অশান্তি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে কৃষ্ণা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে

হাতে দিয়ে বোললে, "সাব সুবে কা বখৎ আপকে লিয়ে এই চিঠি দেকে চলা গিয়া।"

কৃষ্ণা চমকে উঠল, তাকে না বোলেই চলে গেল, মানে? চিঠি খুলে দেখলে লেখা আছে "ভেবে দেখলাম, ঘর ভাঙ্গা কোন কাজের কথা নয়। তোমাকে নিজের ঘরে ফিরে যাবার অবসর দিয়ে আমি আমার আপন নীড়ে ফিরে চললাম। আমার সাথী আমায় ডাক দিয়েছেন। যাবার বেলায় একমাসের জন্য তোমার হোটেলের সমস্ত খরচ দিয়ে গেলাম্। আশা করি তার মধ্যে তুমি নিজের ব্যবস্থা কোরে নিতে পারবে। তোমার সঙ্গে মিলনের ক্ষণগুলি আমার মর্ম্মস্থলে সযত্নে তুলে রাখলাম, আর দিয়ে গেলাম আন্তরিক শুভ-কামনা।

কৃষ্ণা চিঠি হাতে স্তম্ভিতের মত বসে রইল। তার মনে হল তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। মানুষ এত কপট হতে পারে! এই লোকটির জন্য সে তার ছেলে, মেয়ে, স্বামী সব ছেড়ে চলে এসেছিল। ছিঃ, নিজের প্রতি তার ঘৃণা এল, অনেকক্ষণ নিঃশব্দের মত থাকার পর অস্ফুট স্বরে তার মুখ থেকে বার হ'ল, "আমি কুমারী নই, কাহার স্ত্রী নই, তবে আমি কি?" তারপর হত-চেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল-স্মরণে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(১)

আজকে আমার জাগছে মনে সুদূর অতীতকালের কথা!
ছেচল্লিশ বর্ষ আগে পেতাম প্রচুর প্রসন্নতা!
চির-শোভন ছিল ভুবন, আপন ছিল সবাই ভবে!
সদাই জীবন সুখে মগন, স্বপন দেখা চলতো তবে!
হারিয়ে গেছে সেদিন আমার, হারিয়ে গেছে সে সব কিছু!
বর্ত্তমানের বিষণ্ণতায় ধাই অতীতের পিছু পিছু।
রই সে-স্মৃতির রোমন্থনে আজ কিছুকাল আনন্দে।
বন্ধু, তোরা মনকে আমার সেই অতীতে আসন দে!

(২)

ছেচল্লিশ বর্ষ আগে দেখেছিলাম রায়-কবিকে!
মনের পটে এঁকে নিলাম সেদিন শোভন মূর্ত্তিটিকে।
আদুড় দেহ, গোলগাল মুখ, গোঁফ-দাড়ি নেই, স্বল্পকেশী,
ফর্সা শরীর, পৈতে গলায়, ঈষৎ বেঁটে, সুস্থ পেশী।
"সুর-ধামের" ফুলবাগানে বিদ্যাসাগর-চটী পায়ে
বসে থাকতে দেখেছিলাম একটা কি এক গাছের ছায়ে।
ক্ষণকালের সেই যে দেখা, অনন্ত সেই মুহূর্ত্ত
ভুলতে কভু পারবো না তো, তুলছে মনে আবর্ত্ত!

(৩)

বলিষ্ঠ এই পুরুষ-কবির ভাষা আমায় মাতিয়ে তোলে।
ছন্দ এবং মিলের বাহার আকুল করে মধুর বোলে।
ভাব প্রকাশের ভঙ্গী গতি মুগ্ধ করে সংযমনে।
গাম্ভীর্য্যের সাথে সাথে জাগায় আবার সরল মনে।
প্রাণখোলা এই চারণ-কবির মনটা ছিল শিশুর মতো।
শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, স্পষ্ট কথা শোনায় কত।
প্রসাদ-গুণে সব বোঝা যায়, বুকটা ছিল প্রশস্ত;
ভণ্ডামিকে দুর্নীতিকে চাবকে করে দুরস্ত।

(৪)

স্বাধীনতার জন্যে তাহার বুক-ভরা কী আকুলতা।
সবকে "আবার মানুষ হ'তে" ছড়িয়ে গেছে প্রাণের ব্যথা।
জানিয়ে গেছে, শুনিয়ে গেছে ভারতবর্ষ কিসে বড়।
জাগিয়ে গেছে হিন্দুকে সে, মাতিয়ে গেছে হ'তে দড়।
বামুন ছিল বিলাত-ফেরত, বামনাইয়ের সে যায়নি তাঁবে;
হিন্দু ছিল মনে প্রাণে, হিন্দু ছিল ভাষায় ভাবে।
কাব্য নাটক হাসির গানের শব্দযোজন জ্বলন্ত।
'নোবেল্ প্রাইজ' পায়নি তবু রইবে চির-জীবন্ত!

(৫)

ওগো "আমার দেশের" কবি, ডাক্‌ছে "আমার জন্মভূমি"।
আবার তুমি ফিরে এসো, মানুষ আজো রইলো ঘুমি'।
সবকে "আবার মানুষ হ'তে" শোনাও এসো বোধন-গীতি।
দূর করে যাও বর্ত্তমানের যুবক নারীর মৃত্যুভীতি।
অর্থলোভীর, জাতিদ্রোহীর মুখোস খুলে দেখাও এসে।
আবার এসো রুদ্ররূপে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশে।
আজ বাঙালী লক্ষ্মীছাড়া, বোঝেনা তার কি স্বত্ব।
সস্তা আমোদ লুঠছে সবাই, রয় সিনেমায় প্রমত্ত।

(৬)

জাগাও জাতির মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা।
জাতিপ্রীতি, মৈত্রী আনো। আনো পূর্ব্বস্বচ্ছলতা।
রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারে দেশ ডুবালো পাপের পাঁকে।
সৃষ্টি করে' দারুণ অভাব লুঠছে সবাই লাখে লাখে।
ভাত-কাপড়ের বাড়িয়ে অভাব মন্ত্রীরা ক'ন লম্বা কথা।
বজ্রনাদী ভাষার জোরে থামাও তাঁদের প্রগল্‌ভতা!
এসো এসো, চারণ-কবি, আবার এসো এ-বঙ্গে।
দেশ-সমাজের শত্রু বধে জাতকে জাগাও ভ্রূভঙ্গে।

প্রবন্ধ সাহিত্য

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী

আজকাল প্রবন্ধ সাহিত্যের সমাদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভাল প্রবন্ধের লেখকের অভাব হয়তো নাই, কিন্তু প্রকাশের অসুবিধা থাকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ সাহিত্যিককে কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাহিত্যসেবা করিতে হয়। প্রবন্ধের বই লইয়া গেলে অধিকাংশ প্রকাশক ফিরাইয়া দেন—বলেন, কয়খানি কাটিবে যে এর জন্য এত খরচ করিব, ক্ষমা করিবেন। যদিও বা কোন প্রকাশক ছাপাইতে সম্মত হয়েন, বৎসরের শেষে অর্থের জন্য যাইলে হয়তো বলিয়া বসেন, কয়েক শ' ছাপাইয়া ছিলাম, মাত্র নিরানব্বই খানি বিক্রয় হইয়াছে। খরচপত্র বাদ দিলে কিছুই দেওয়ার থাকেনা, এই নয় টাকা নয় নয়া-পয়সা লইয়া যাউন।

প্রবন্ধের আদর কত কম তাহা সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় দেখিলাম: প্রথমআরম্ভ হইয়াছে কথা-সাহিত্য শাখার অধিবেশন; তারপর কাব্যশাখা; তারপর প্রবন্ধশাখার স্থান মিলিয়াছে। কথা সাহিত্যের চাহিদাই আজকাল সবচেয়ে বেশী। সেইজন্য তাহার সমাদর সর্বাগ্রে। কবিতায় রস আছে, কিন্তু আজকাল তাহার জন্য গল্প-উপন্যাসের মত কাহারও আগ্রহ থাকে না। নিজে কবিভাবাপন্ন না হইলে কবিতার মাধুর্য কে উপলব্ধি করিবে? কবিতা-রস-মাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ'। বছর বছর প্রবন্ধের দুর্গতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলেই দেখিয়া থাকেন। আমি কয়েকটী রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রবন্ধের দুর্গতি দেখিয়া সেইসব অনুষ্ঠানে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। যতক্ষণ নাচগান চলিল ততক্ষণ সভা পরিপূর্ণ। যেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্র-দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল, প্রায় সবাই একে একে উঠিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—

শূন্য সভাতল
বক্তারা বিহ্বল,
সভাপতি চঞ্চল
উদ্যোক্তা ছলছল।

এক বৎসর প্রথমে প্রবন্ধ, পরে রবীন্দ্রনৃত্যগীতের ব্যবস্থা করায় শ্রোতাদের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দিল। "আগে গান, পরে বক্তৃতা,"—"কে এমন বিশ্রী ব্যবস্থা করিল,"—এইরূপ চীৎকারে সভা পণ্ড হওয়ার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করিয়া আজকাল যে সকল অনুষ্ঠান হয় তাহার বেশীরভাগ স্থলে তরুণদের খুশী করার জন্য নাচগানের ষোলআনা না হোক্ পনের আনা প্রাধান্য থাকে—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবিগুরুর লেখনী চলিলে নিশ্চিতই মনের আক্ষেপে কিছু লিখিয়া বসিতেন (ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন—আমি কবি নই)—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
জিজ্ঞাসিবে শিশু কোন   কে বা (সে) রবীন্দ্রঠাকুর?
উত্তরিবে গুরু সে শিশুরে—
জান নাক নাম এই   নৃত্যগীত সুপটুর।

পল্লীঅঞ্চলে বা অন্যত্র তাঁহাদের রবীন্দ্র রচনাবলীর সহিত সম্পর্ক থাকিবে না। শুধু দেখা শোনার অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাদের নিকট একশত বর্ষের পরে শিশু এই রকম উত্তরই পাইবে। সে যখন আবার জিজ্ঞাসা করিবে—"নৃত্যগীত সুপটুর" মানে কী স্যার? তখন নিশ্চিত উত্তর শুনিবে—নৃত্য মানে নাচ, গীত মানে গান, পটু মানে যে ভাল জানে; অর্থাৎ সবটার মানে দাঁড়াইবে—রবীন্দ্রনাথ ভাল নাচিয়ে গাইয়ে ছিলেন।

প্রবন্ধ "কথাটার অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'; ভাব ও ভাষার বেশ বাঁধাবাধির মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ভাষা ও ভাবের অসংযমও যথেচ্ছ প্রয়োগ থাকিলে ভাল প্রবন্ধ হয় না। তাই বোধহয় প্রবন্ধের দিকে আধুনিক পাঠকের রুচি কম এবং সেই কারণে আধুনিক লেখকের আগ্রহও কম।

অলংকারশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"কমপি বিষয়মবলম্ব্য রচিতং পরস্পরসম্বদ্ধং বাক্য—কদম্বকং প্রবন্ধোনাম।" "স এব প্রবন্ধো গদ্যময়ঃ পদ্যময়শ্চ"—অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া পরস্পর সুন্দর সম্বন্ধ আছে এমন বাক্য সমূহকে প্রবন্ধ বলে। সংস্কৃতে পদ্যে লেখা প্রবন্ধ আছে; বাংলায়, অন্ততঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবিতায় প্রবন্ধ পাওয়া যায়না। ভাগবতীয় ষট্সন্দর্ভের কারিকায় প্রবন্ধ বা সন্দর্ভের বেশ ভাল লক্ষণ পাওয়া যায়, যথা—

"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।"
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

অর্থাৎ প্রবন্ধ কোন একটি গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেও তাহাতে বাজে কথা থাকিবেনা, কেবল সার ও উৎকৃষ্ট কথা থাকিবে, নানারূপ অর্থ

প্রকাশ করিবে এবং ঐ প্রবন্ধে যাহা লেখা হইবে তাহা যেন জানিবার মত বিষয় হয়—যাহার জন্য পাঠক পাঠিকার আগ্রহ আপনা হইতেই আসিবে।

দুঃখের বিষয়, আজকাল প্রবন্ধ এই কথাটির ব্যবহার পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য সূচীতে অথবা তাহা অবলম্বনে যে সমস্ত প্রবন্ধের বই ছাপা হইতেছে তাহার বেশীর ভাগ হইতে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ কথাটি নির্ব্বাসিত, উহার পরিবর্ত্তে রচনা কথাটি ব্যবহার করা হইতেছে। বাংলা "ব্যাকরণ ও রচনা" এইরূপ নাম বহু পুস্তকে দেখা যায় এবং পুস্তকের মধ্যেও রচনা কথা ব্যবহৃত হয়। কথা-সাহিত্যিক গল্প বা উপন্যাস রচনা করেন, মেয়েরা বেণী বা শয্যা রচনা করেন, শিল্পী শিল্প রচনা করেন, মালাকার মাল্যরচনা করেন, রচনার অর্থ এত ব্যাপক। প্রবন্ধ এক প্রকার রচনা মাত্র, রচনা-মাত্রই প্রবন্ধ নয়।

মিশনারী এবং তাঁহাদের সহকর্মী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অনুবাদের মধ্য দিয়া বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালী মনকে প্রবন্ধের দিকে প্রথম আকৃষ্ট করে। ঐ পত্রিকা ছাড়াও সমাচার-দর্পণ, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-কৌমুদী, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবন্ধ সাহিত্য রূপ পাইয়াছে। রামমোহন রায়ের পর তত্ত্ব-বোধিনী গোষ্ঠীর নিকট প্রবন্ধ সাহিত্য বিশেষ ঋণী। এই তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সেকালের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখকগণ। এই গোষ্ঠীর প্রেরণাই পরবর্ত্তীযুগে বঙ্গদর্শন ও ভারতীতে পরিণতি লাভ করে। প্রবন্ধ সাহিত্যে জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে ভাবসাম্য আনেন তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে আরোপ করেন লালিত্য, শ্রুতিমাধুর্য্য ও সাবলীলতা। এ বিষয়ে ঈশ্বর-চন্দ্রের অতুলনীয় অবদান স্বীকার করিতেই হইবে।

সে সময়ের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একাল, বিবিধ প্রবন্ধ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ এবং রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের বিবিধার্থসংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ সাহিত্যে নূতন ভঙ্গী আনেন প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুলাল ও কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা। প্রবন্ধ সাহিত্যে ইতরতাবর্জ্জিত নির্মল শালীনতা আনেন পরবর্ত্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র। কর্মে, জ্ঞানে, চিন্তায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিলেন। উহাতে লিখিত হইল তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ। রমেশচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি আসিয়া যোগ দিলেন। এইভাবে বাংলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল।

প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুই প্রকারের—প্রথম, রচনাধর্মী বা রসধর্মী প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয়, জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক প্রবন্ধ।

প্রথম প্রকার প্রবন্ধ মনঃপ্রধান, খেয়াল খুসীর উন্মাদনায় ইহাতে সাহিত্যগত কলাশিল্পের পরাকাষ্ঠা ফুটিতে দেখা যায়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ও বীরবলের হালখাতা এই জাতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর এই জাতীয় হইলেও ইহা সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য। গল্প, কাব্য, সমাজদর্শন, রাষ্ট্রদর্শন, সমালোচনা, আত্মচিন্তা-সব কিছুই ইহাতে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রবন্ধ এবং মোহিতলালের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ইহার মধ্যে ধরা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার প্রবন্ধ বিষয়প্রধান। ইহাতে সাহিত্যিকের প্রতিভা অপেক্ষা বিষয়বস্তু এবং মনস্বিতাই প্রধান উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' এই জাতীয় প্রবন্ধ হইলেও ইহাতে প্রতিভা ও মনস্বিতার অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে।

এখন প্রবন্ধ সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সাহিত্যের গতি-নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া শেষ করিব। "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ছিল একান্তভাবে ধর্মসচেতন বা দেব-সচেতন"—দেবতার লীলা ছিল আখ্যান বস্তু, তাহা নীতিপূর্ণ কবিতায় রচিত হইত, আগেকার যুগের বাংলা সাহিত্যকে জীবন-সচেতন বা ক্ষুধা-সচেতন বলা যায়। এখন বেশীর ভাগ সাহিত্যের লক্ষ্য কেবল দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের সর্ব্বপ্রকার ক্ষুধা—উদরের ক্ষুধা হইতে যৌনক্ষুধা পর্য্যন্ত। এই ক্ষুধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সাহিত্যের আদর্শের গতি অনেক নিচে নামিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যিক বন্ধুগণকে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে বিনীত আবেদন জানাই। আমি সাহিত্যিক নহি, শিক্ষক। পঁয়ত্রিশবৎসর শিক্ষকতা এবং এখনও নানাভাবে শিক্ষার সেবা করিবার চেষ্টা করার ফলে বুঝিয়াছি যে, শিক্ষার মান এবং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠনের মান ধর্মমূলক নীতিশিক্ষার ভিত্তির অভাবে দ্রুত নামিয়া যাইতেছে। জাতীয় সাহিত্যের সহায়তায় শিক্ষার সেই অবনমনের গতিরোধ করিতে হইবে। নচেৎ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বিদেশী ইংরাজকে তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের বহুমুখী উন্নতির আশা মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষামন্দিরে ও অন্যত্র পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতায় পরিণত হইয়াছে। Independence এর ফলে দেশের মধ্যে Indiscipline প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; সাহিত্যের কশাঘাতে সেই উচ্ছৃংখলতার গতিরোধ করিতে হইবে। শুধু ছাত্রসমাজ নয়, সমাজের সকল স্তরই ইহার জন্য দায়ী। তের বৎসর মাত্র স্বাধীনতা-লাভের পর মনে হইতেছে—জাতি দেশকে ভালবাসিতে পর্য্যন্ত ভুলিতেছে, দেশবাসী প্রকৃত দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধ হারাইতেছে; তাই জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ঘোর দুর্নীতি, জাতীয়তা ও সংগঠনের বিরোধী কার্য-কলাপ দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্র ও সরকারের দোষগুণের বিচার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এর সমালোচনা করিতে যাইয়া দেশবাসী দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথে পা দিতেছেন। আপনারা ক্ষমা করিবেন, সাহিত্যকে সস্তা ও জনপ্রিয় করার জন্য কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক বিদূষক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; বিদূষকের কাজ যেমন রাজার চিত্তবিনোদন, সাহিত্যিকের কাজ তেমনি সমাজের চিত্তবিনোদন। কিন্তু ইতর জাতীয়

হানিকর সুখের প্রলোভন প্রকৃত আনন্দ নয়, তাহা সর্বনাশের নামান্তর মাত্র। জাতিকে সেই পথে না লইয়া যাইয়া তাহাকে প্রকৃত আনন্দের পথে আনিতে হইবে। যে দেশে যে জাতির সাহিত্য এইভাবে যতই নির্মল আনন্দ দান করিতে পারিয়াছে, সেই জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে ততই উন্নত আদর্শে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

আজ কয়েকজন বলিষ্ঠনীতির সাহিত্যিক যদি সাহিত্যের চাবুক হস্তে লইয়া আগাইয়া আসেন, সাহিত্যের গতি এবং সেই সংগে সমাজের বিভিন্ন স্তরে চেতনা ফিরাইয়া আনেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, জাতি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। এই তেজস্বী সাহিত্যিকদিগকে কে রক্ষা করিবে? দেশবাসীও রাষ্ট্র। ইঁহাদের লেখা কেবল যে সংবাদপত্র সম্পাদকেরা প্রকাশ করিবেন তাহা নহে—ইঁহাদের গল্প, কবিতা, বিশেষ করিয়া প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে। দেশের লেখকগণকে উৎসাহিত করায় জন্য সরকার যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার বেশীরভাগ এইসব তেজস্বী সাহিত্যিকগণের জন্য ব্যয় করিতে হইবে—তাঁহাদের লেখা প্রকাশে সহায়তা করিয়া, তাঁহাদের পুস্তক ক্রয় ও বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাঁহাদের প্রবন্ধাদিকে পাঠ্যপুস্তকে প্রকৃষ্ট স্থান দিতে হইবে।

আজ দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে আপনারা আবার বংগ-ভারতীর বেদী রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। মায়ের ভক্তদের অভ্যর্থনার জন্য মংগল-তোরণ রচনা করিয়াছেন, মংগলঘট বসাইয়াছেন। কিন্তু দামোদরের সর্বনাশী বন্যার গতিকে প্রতিহত করিয়া যেভাবে তাহাকে কল্যাণী মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইয়াছে, ঠিক তেমনিভাবে জাতীয় সাহিত্যের উদ্দাম উচ্ছৃংখল গতিকে যদি সাহিত্যরথীগণ জাতির কল্যাণে ফিরাইয়া না আনেন, তাহা হইলে আপনাদের বংগভারতীর এই পূজার আয়োজন সার্থক হইবে কিনা সন্দেহ। আমরা যাহারা সাহিত্যিক নহি গভীর নৈরাশ্যের সহিত মনে করিব—

বৃথা এই সহকার শাখা
বৃথা এই মংগল কলস।*

*বৈষ্ণবচকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে উদ্বোধন বক্তৃতা।

বলাকা

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

সান্ধ্য সূর্য্য অস্তাচলে রক্তিম আভায়—
দিগন্তের কানে কানে শেষ কথা কয়ে যেন যায়।
একমুঠো স্বর্ণ ঝরা রোদ, আমলকি শাখে আর
বেতসের বনে,
হেসে হেসে খেলে যায় শেষ লুকোচুরী।
এরই মাঝে আকাশের ঘন নীলিমায়,
শত শত শ্বেত শুভ্র কমলের প্রায়,
ফুটে উঠো হে বলাকা তুমি—।
ভেসে যাও হাল্‌কা ডানায় তটিনীর নীলজলে
ভেসে যাওয়া কমলিনী প্রায়।
হে বলাকা!
কবে কোন শুভদিনে,
আকাশের সুনির্ম্মল পথে
যাত্রা তব হয়েছিলো শুরু?
কিছু আমি নাহি জানি তার?
শুধু নিত্য হেরি তোমা সায়াহ্নবেলায়
ফিরে যেতে দলে দলে কুলায় তোমার।
আমিও বলাকা!
প্রসারিত বিশ্বে মম জল্পনার ইন্দ্রধনু ডানা:
ধরার ধূলির পথে যাত্রা মোর করিয়াছি শুরু।
কোনখানে শেষ হ'বে এ যাত্রা আমার?
কোথায় থামিবে মোর চলার প্রস্তুতি?
সীমিত জীবন রাজ্য আলো অন্ধকারে।
আসিবে নামিয়া জানি বিদায়ের বেলা।
আমার সোনালী-স্বপ্ন মুছে দিয়ে দূরে—বহুদূরে
গৃহ অভিমুখী মন নিয়ে চলে যাবো হে বলাকা
তোমারই মতন,
মিলাইতে সুর মম অসীমের সুরে।



এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

আটাশ

সরকারী দপ্তরে এবং সরকারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় দুর্নীতি নিয়ে গতকয়েকবছর ধরে খুবই আলোচনা চলেছে। লোকসভা, রাজ্যসভা, নানাপ্রাদেশিক বিধানসভা—সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা, দুর্নীতির ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে সরকার যথোপযুক্ত অবহিত হচ্ছেন না। অনেকেই বল্‌ছেন যে নীতিজ্ঞানের অভাব যদি এভাবে বাড়্‌তে থাকে, তাহলে দেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোকে বেশীদিন সুস্থ রাখা যাবে না। এই কাঠামো যদি একদিন ভেঙ্গে পড়ে তাহ'লে ডিমক্রেসীর অবসান এবং ডিক্‌টেটরশিপ্-এর অভ্যুদয় হওয়াও অসম্ভব নয়।

এর উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, বলা হয়যে বিরোধীদল অন্যায়ভাবে অতিরঞ্জন কর্‌ছেন। কোন কোন মহলে অল্পসল্প দুর্নীতি হয়ত রয়েছে, কিন্তু সরকার ও ঘুমিয়ে নেই, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেছেন এবং করছেন।

এর প্রমাণ স্বরূপ সরকারী ইস্তিহারে প্রায়ই ফিরিস্তি দেওয়া হয়, স্পেশাল পুলিশদপ্তর অথবা দুর্নীতিদমন বিভাগ কতগুলো কেস্ তদন্ত করেছে এবং তদন্তের ফলে কতগুলো অফিসারের বিরুদ্ধে শাসনমূলক ব্যবস্থা (disciplinary action) অবলম্বন করা হয়েছে। ফিরিস্তি দেখে আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হবে, যা করণীয় সরকার যথাসম্ভব কর্‌ছেন, এর বেশী আশা করা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে।

কিন্তু ফিরিস্তিগুলো একটু তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যালোচনা কর্‌লে দেখা যাবে যে অধিকাংশ কেসেরই নায়ক হচ্ছেন চুনোপুঁটি মাছ। বড় বড় রুইকাৎলার দল স্পেশাল পুলিশ-দুর্নীতিদমন বিভাগের জালে কিছুতেই পড়্‌ছেন না। অথচ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও দুর্নীতি কম নয়।

যে একবছর আমি দুর্নীতিদমন বিভাগে সচিবত্ব করে-ছিলাম আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম এই শ্রেণীর লোকদের দুর্নীতি এবং ব্যভিচারকে expose কর্‌তে। এই প্রচেষ্টায় আমি অনেক বাধা পেয়েছি, আমাকে indirect ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে—আমার ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে আমি যেন এঁদের ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামাই। কিন্তু বাধা আমাকে আরও বেশী সক্রিয় করে তুলেছে, indirect ভয়প্রদর্শনে আমি পশ্চাদ্‌পদ হইনি'।

বলা বাহুল্য, আমার অনেক রিপোর্টই কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি'। তাঁরা হয়ত মনে করেছেন, আমি যেন একটু বাড়াবাড়ি কর্‌ছি।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, একটু বাড়াবাড়িই বোধ হয় আমি করেছিলাম। যাঁরা সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরা এসবক্ষেত্রে বল্‌বেন, কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সমাজের সব দুর্নীতি তোমাকেই দূর কর্‌তে হবে? can't you let sleeping dogs lie কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা ঠেঁটামি ছিল (আমার গৃহিণী বলেন, এখনও রয়েছে) যে I could never leave such things to themselves. এর ফলে চাকুরী জীবনে আমাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হয়েছে।

মনে পড়্‌ছে, খবর পেলাম এক দপ্তরের অধিকর্ত্তা টেণ্ডার বিলির সময় নানাপ্রকার অসাধুতা অবলম্বন কর্‌ছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেল যে ওঁর বিরুদ্ধে এর আগেও এই জাতীয় অভিযোগ এসেছিল এবং আমার দপ্তরের পূর্ব্বতন সচিবেরা তদন্ত করে তাঁকে benefit of doubt দিয়েছিলেন। বুদ্ধিমানের মত আমারও উচিত ছিল এই পথ অনুসরণ করা। কিন্তু আমি বলে বস্‌লাম যে ভাল-ভাবে তদন্ত কর্‌তে চাই এবং এজন্য অধিকর্ত্তাকে অন্য কোন দপ্তরে সাময়িকভাবে বদলী কর্‌তে হবে, নইলে অধস্তন কর্ম্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে মোটেই সাহস পাচ্ছে

না।...অধিকর্তা মহোদয়ের সে কি আস্ফালন! ডাঃ দাসকে দেখে নেব, আমার মত একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ করছেন, ধৃষ্টতা ত কম নয়!

এই ভয় প্রদর্শনে আমি অবশ্য কাতর হলামনা, এবং আমার দৃঢ়তা দেখে কর্তৃপক্ষ আমার নির্দ্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌তে বাধ্য হলেন। পরে ব্যাপক তদন্ত করে আমি যখন অধিকর্তা মহোদয়ের সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনী সরকারের সাম্‌নে উপস্থাপিত করেছিলাম তখন পর্ষদের একজন মন্ত্রী আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যে—অবশেষে তত বিরাট্ একটা দুর্নীতির আড্ডা আমি ভেঙ্গে দিতে পেরেছিলাম।

কিন্তু অনেক সময়েই আমি কোন অভিনন্দন পাইনি। তার বদলে অনুভব করেছি একটা চাপা বিরক্তি—যে আমি শুধু শুধু অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছি। অথচ, মুখোমুখি আমাকে প্রতিরোধ কর্‌বার মত সাহস কর্তৃপক্ষের ছিলনা, কারণ তাঁরা জান্‌তেন যে facts সম্বন্ধে খানিকটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি কোন তদন্ত সুরু করিনা।

উনত্রিশ

দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে সরকারের স্বজনবাৎসল্য বা nepotism। আজ আমাদের দেশে শাসনব্যবস্থায় যে ফাটল ধরেছে তার পেছনে আছে এই nepotism এর বিরাট অনুস্থিতি।

Nepotism অল্পবিস্তর সব দেশেই আছে, স্বাধীনতা-পূর্ব্ব ভারতবর্ষেও এর অভাব ছিলনা। কিন্তু ইদানীং এই ব্যভিচারটা যেন অস্বাভাবিকরূপে বেড়েই চলেছে। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে যাঁরা চাকুরী বা সরকারী অনুগ্রহ পায়না তাঁরাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই চার্জ্জ আনেন, ভাবেন যে যাঁরা চাকুরী বা অনুগ্রহ পেয়েছেন—তাঁরা সবাই কোন মন্ত্রী বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর আত্মীয় বা অনুগৃহীত।

সরকার পক্ষের এই defence একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবু আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে গত-কয়েকবছরের মধ্যে দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে এবং সংস্থায় nepotism অসম্ভবরকম বেড়েছে। মাঝে মাঝে এর উপর অল্প আব্রু দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই এই স্বজনপোষণ চল্‌তে থাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নগ্নভাবে।

পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসী এবং পার্টি গভর্ণমেণ্টএ খানিকটা nepotism অনিবার্য্য, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে যেখানে নীতিজ্ঞান শিথিল হয়ে এসেছে সেখানে nepotism দুর্নীতি আরও বাড়ায়। একটা বিশেষ চাকুরী বা অনুগ্রহ দিলেই স্বজন পোষণের সমাপ্তি হয় না, যাঁকে চাকুরী বা অনুগ্রহ দেওয়া হয় তিনি স্বভাবতঃই মনে করেন যে তিনি বিভাগীয় আইনকানুনের উর্দ্ধে, তিনি যদি কোন অন্যায়ও করেন তাঁকে কোন শাস্তি পেতে হবেনা। দুর্নীতিদমন বিভাগে কাজ করার সময় এবং তার আগে এই পরিস্থিতির অসংখ্য নিদর্শন আমার নজরে এসেছিল।

দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ কর্‌ছি। ঘটনা দুটোই আমার এই অধ্যায়ের বাইরে। আমি তখনও দুর্নীতি-দমন বিভাগে আসিনি, বাংলা সরকারেরই অন্য দুই দপ্তরের সচিব আমি। তবু উল্লেখ কর্‌ছি, কারণ nepotism এর এমন সূক্ষ্ম প্রকাশ সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

প্রথম দপ্তরে একটা নতুন স্পেশালিষ্টএর পদ সৃষ্টি করা হ'ল। সিদ্ধান্ত হ'ল যে পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের কাছে যাবার দরকার নেই, টেক্‌নিক্যাল পদ, এক টেক্‌-নিক্যাল কমিটিই প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ কর্‌বে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বেছে নেবে।

টেক্‌নিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান্ হলেন একজন প্রবীণ আই-সি-এস অফিসার, আমি হ'লাম তার অন্যতম সদস্য। এবাদে কমিটিতে নেওয়া হ'ল দু'জন বিশেষজ্ঞকে। প্রাথমিক বাছাই করার পর আমরা ইণ্টারভিউএ ডাক্‌লাম পাঁচজন প্রার্থীকে। একজন বিশেষজ্ঞ মুখই খুল্‌লেন না বল্‌লে চলে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞটি প্রশ্নের পর প্রশ্নে প্রার্থীদের নাজেহাল ক'রে তুল্‌লেন। আমরা, অর্থাৎ অ-বিশেষজ্ঞদ্বয়, খুসীই হ'লাম ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই searching প্রশ্ন করার কায়দা দেখে।

অবশেষে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির কর্‌লাম যে প্রার্থী "ক" হচ্ছেন যোগ্যতম, নিয়োগপত্র তাঁকেই দেওয়া উচিত।

বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগপত্র দস্তখত কর্‌তে

যাচ্ছি,এমন সময় রেজিষ্টার্ড পোষ্টএ পেলাম একখানা চিঠি—প্রার্থী "গ" লিখেছেন। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি এইরূপ—

"আমি আপনার দপ্তরের—পদের একজন প্রার্থী ছিলাম এবং কয়েকদিন আগে আপনার সামনে উপস্থিতও হয়েছিলাম। অবশেষে কে মনোনীত হয়েছেন জানিনা, কিন্তু একটা বিষয় আপনার নজরে না এনে পারলাম না। বিশেষজ্ঞ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন, আমার জবাব কতখানি সন্তোষজনক হয়েছিল বল্‌তে পারিনা, কিন্তু আমি প্রশ্ন কর্‌ছি, উনি কমিটিতে এলেন কোন আইন অনুসারে? আপনি কি জানেন না যে প্রার্থী "ক" ওঁর আপন ভাগ্নে? আপনি যে দপ্তরের সচিব সেখানেও কি এই জাতীয় স্বজনপোষণ চলে?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুণাক্ষরেও আমাদের কাউকে জান্‌তে দেন্‌নি' যে প্রার্থী "ক" তাঁর অতি নিকট-আত্মীয়। অথচ "ক"কেই আমরা নিয়োগ করতে চলেছি।

তথ্‌খুনি টেলিফোন করলাম ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জিজ্ঞাসা করলাম প্রার্থী "ক" সত্যি তাঁর ভাগ্নে কিনা। খবরটা কোথা থেকে পেয়েছি সেটা অবশ্য গোপন করে গেলাম।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা' মুহূর্ত্তের জন্য। বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন, তাতে কি হয়েছে? আমার ভাগ্নে বলে বুঝি সে চাকুরীর যোগ্য হতে পারেনা?

—নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু আমাদের কমিটির নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ হবে যে। বিধানসভায় এ সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ওঠে, কি জবাব দেব আমরা?

—কেন, বল্‌বেন বিশেষজ্ঞ কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী "ক" কে মনোনয়ন করেছেন!

—কিন্তু কমিটিতে যে ছিলেন মনোনীত ব্যক্তির মামা এবং তিনিই ছিলেন প্রধান বিশেষজ্ঞ!

—আপনি নিজেই ত দেখেছেন—প্রার্থীদের মধ্যে "ক"ই ছিল সবচেয়ে সপ্রতিভ, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল সবচেয়ে নির্ভুল। আপনি নিশ্চয়ই Suggest করছেন না—যে আমি তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলাম!

—আমি কিছুই Suggest করছি না, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি শুধু বল্‌ছি এই যে—একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এর প্রতিকার করতে হবে আমাকে।

—কি প্রতিকার করতে চান্?...বেশ একটু রাগের সুরেই তিনি বল্‌লেন।

—নতুন ইণ্টারভিউ কমিটি বসাতে হবে। প্রার্থীদের আবার ইণ্টারভিউ করব আমরা এবং এবার আমি আগে থেকেই সাবধান হব, কমিটিতে কোন প্রার্থীর আত্মীয় যেন সদস্য না থাকেন।

—এতে কিন্তু আমাকে রীতিমত অপমান করা হবে, ডাঃ দাস।

—আমি নিরুপায়। আমি যে দপ্তরের সচিব সেখানে খানিকটা শালীনতা, খানিকটা নীতিপরায়ণতা বজায় রাখতে চাই। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তাহ'লে অনায়াসে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারেন।

নতুন কমিটি বসল। এবার আমি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাকলাম একজন অবাঙালী বিশেষজ্ঞকে, ভাব্‌লাম, সাবধানের মার নেই।

যা' ভেবেছিলাম তাই হ'ল। প্রার্থী "ক" এবার in order of merit স্থান পেলেন তৃতীয়, আর প্রথম স্থান পেলেন প্রার্থী "গ", যিনি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রার্থী "ক"এর আত্মীয়তার কথা আমার নজরে এনেছিলেন।...যথাসময়ে প্রার্থী "গ" কাজে যোগ দিলেন।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি'। কর্ত্তৃপক্ষের তিনি দক্ষিণহস্ত, আমার বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই তিনি বলেছিলেন, যার ফলে কিছুদিন পরেই আমি দেখতে পেলাম যে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাকে ডিঙিয়ে আমারই প্রাপ্য একটা পুরস্কার দেওয়া হ'ল আমার চেয়ে অনেক জুনিয়ার একজন অফিসারকে।

কিন্তু শিক্ষা আমার হ'ল না। দু'বছর পরে আবার ঘটল অনুরূপ এক ঘটনা। এবার প্রার্থী ছিলেন মাত্র একজন—সুদীর্ঘ অবসর-ভোগী প্রাক্তন অফিসার। আমারই দপ্তরে বহাল হতে চান্ উপদেষ্টা হিসেবে, মন্ত্রীমহলে তাঁর প্রচুর খাতির, আমি যদি তাঁর নামটা উপযুক্ত স্থানে পেশ

ক'রে দিই তা'হলে চাকুরীটা অনায়াসেই তিনি পেয়ে যান।

—কিন্তু আমার যে কোন উপদেষ্টারই দরকার নেই, মিঃ কর।···আমি বল্লাম।

—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এত স্কীম্ তৈরী হয়েছে, এগুলো চালু করবেন কি ক'রে?

—দপ্তরে কর্ম্মচারীর অভাব নেই, মিঃ কর। অভাব হচ্ছে conscentiously কাজ করবার ইচ্ছার। তাছাড়া আপনার বয়স হয়েছে, এখন কি আপনার পক্ষে এত পরিশ্রম করা সম্ভব?

—আমি ত আর মাঠেঘাটে যাব না, আমি সেক্রেটারিয়েটের এক কোণে বসে advice দেব।···আমি একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, আপনি এটা শুধু যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন্।

একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মিঃ করের দরখাস্তখানা আমি গ্রহণ কর্‌লাম, কিন্তু তাঁকে বল্লাম যে আমার মতামত আমি নির্ভীকভাবে পেশ করব।

"যথাস্থান" থেকে টেলিফোন এল: দরখাস্ত আমার কাছে পাঠাবার কি মানে হয়—যদি আপনি মনে করেন যে এর জন্য আপনার দপ্তরে কোন স্থান নেই?

তিরস্কারটা যুক্তিসঙ্গত। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লাম, মিঃ কর দরখাস্তটা আপনার কাছে address করেছিলেন, তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছি।

—কোন প্রয়োজন ছিল না।···বললেন "যথাস্থান।"

কিন্তু অবশেষে যা' ঘটল তা' দেখে-শুনে আমিও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সরকারী কাজে আমাকে দিন পাঁচেকের জন্য কল্‌কাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। যেদিন ফিরে এলাম—আমার ডেপুটি সেক্রেটারী মুখ কাঁচুমাচু করে আমাকে বল্লেন, মিঃ করকে আমাদের দপ্তরের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে, স্যার। উনি কাল কাজে join করেছেন।

—সে কি? কার হুকুমে?···প্রশ্ন করলাম আমি।

—"যথাস্থান"এর। অর্ডারটা আমি প্রথমে দস্তখত কর্‌তে চাইনি', কিন্তু জলে বসে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না স্যার, তাই দস্তখত করেছি। আমার অপরাধ

বেচারী ডেপুটি সেক্রেটারীর কি অপরাধ? তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি সোজা ছুটলাম "যথাস্থান"এর কাছে। চোখা-চোখা কয়েকটা কথা তাঁকে বলে খানিকটা শান্ত হয়ে ফির্‌লাম আমার কামরায়।

সেদিন কাজে মন দিতে পারিনি।' মিঃ কর চাকুরী পেলেন কি না পেলেন সেটা বড় কথা নয়। আমাকে ডিঙিয়ে তিনি খোদ কর্তৃপক্ষের সাহায্যে চাকুরীটা পেয়েছেন সেটাও বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই যে সরকারের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা অম্লানচিত্তে এমন nepotismএর প্রশ্রয় দিচ্ছেন! অথচ তাঁরাই আশা করেন এবং বক্তৃতা দিয়ে থাকেন যে তাঁদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ যেন নীরবে, দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের কর্ত্তব্য করে যায়! একজন বিখ্যাত পলিটিক্যাল নেতার ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছা করে: Oh, the impudence of it!

ত্রিশ

স্বজনপোষণ ছাড়াও আরও অনেক সূক্ষ্ম (subtle) উপায় আছে, যার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি সরকারের বর্ত্তমান নীতি যে —সবাইকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার তাঁদের পুন-র্নিয়োগ করতে পারেন ষাট বছর অবধি।

"উপযুক্ত ক্ষেত্র" এবং "রাষ্ট্রের প্রয়োজন" এই দুটো গালভরা কথা আপাতঃদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনেকক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার করা হয় "yes-men"দের আনুকূল্যে। ফল হয় এই যে normal চাকুরী জীবনেও অনেক অফিসার "yes-men" হতে চেষ্টা করেন, এই আশায় যে পঞ্চান্নোর্দ্ধে তাঁদের ভাগ্যেও হয়ত একটা চাকুরী বা সরকারী অনুগ্রহ জুটবে। এই জাতীয় অফিসারের পক্ষে নির্ভীক ভাবে কাজ করা যে কত কঠিন তা' সহজেই অনুমেয়।

আজ যে কোন দপ্তরের (প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়) statistics নেওয়া হোক্ না কেন, দেখা যাবে যে উঁচু পদ-গুলোয় বেশ কয়েকটির মধ্যেই "রাষ্ট্রের প্রয়োজনে" পঞ্চান্নোত্তীর্ণ অফিসারেরা বসে আছেন। অথচ দ্বিতীয়

বেতন কমিশন যখন সুপারিশ করল যে রিটায়ারমেণ্টএর বয়স পঞ্চান্ন থেকে আটান্ন বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সরকার তা' কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। কারণ? রিটায়ারমেণ্টএর বয়স বাড়ালে জুনিয়ার অফিসারদের প্রমোশন পেতে দেরী হবে, সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে নতুন নতুন অফিসার নিয়োগ করার পথেও বাধা হবে। অথচ, অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই: পঞ্চান্নোত্তীর্ণ "yes-men"দের জন্য অনুরূপ (equivalent) নতুন পদের সৃষ্টি করা হচ্ছে, দপ্তরের সচিব বা অধিকর্ত্তার সঙ্গে থাকছেন এক বা ততোধিক উপদেষ্টা (যথার্থ প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক), এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের জন্য আলাদা ষ্টেনোগ্রাফার, পিয়নের পদ। জনসাধারণের পয়সার এমন অপব্যবহার প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে আমি কখনও দেখিনি।'

তবু আমি কোন আপত্তি তুল্‌তাম না, যদি পঞ্চান্নোর্দ্ধে পুনর্নিয়োগের নীতি ছোটবড় সকলের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-ভাবে প্রয়োগ করা হ'ত। আই-সি-এস্ বা আই-এ-এস্ সচিব অথবা কোন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্ত্তা - উপ-অধিকর্ত্তা অবলীলাক্রমে পুনর্নিয়োগের অর্ডার পাচ্ছেন, কিন্তু বেচারী কেরাণী বা ছোট অফিসারের ক্ষেত্রেই "রাষ্ট্রের প্রয়োজন"টা কমে আসে! স্বাধীন ভারতে এই বৈষম্য, এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমি অনেকবার প্রতিবাদ জানিয়েছি, অধিকাংশ সময়েই ফল পাইনি।'

মনে পড়ে, আমারই দপ্তরের একজন জুনিয়ার অফি-সারের রিটায়ারমেণ্টএর বয়স এগিয়ে এসেছে, অফিসারটি এসে আমাকে জানালেন যে তাঁর একমাত্র ছেলে তখনও কলেজে, আর দুটো বছর যদি তাঁকে চাকুরী করতে দেওয়া হয় তাহ'লে ছেলেটি তার শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে। সরকার ত এই প্রকার অনুগ্রহ অনেক বড় বড় অফিসারের ক্ষেত্রেই করছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও অনুগ্রহ করাটা কি একেবারেই অসম্ভব?

সোজা চলে গেলাম আমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টএ, যেখানে এই সব বিষয়ের প্রাথমিক বিবেচনা করা হয়। আমার বন্ধু, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টএর সচিব বললেন, ডাঃ দাস, আপনি ত জানেন পুনর্নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য নয়। এই অফিসারটি যদি আজ রিটায়ার করে যান্ তাহ'লে এর জায়গায় অনুরূপ অফিসার পেতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হবেনা।

বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই আমি বললাম, আর অধিকর্তা শ্রীযুত বিমলকান্তি ধ্রুবকে যখন আপনারা উপদেষ্টা হিসেবে আরও দু'বছরের জন্য বহাল করলেন তখন বুঝি রাষ্ট্রের প্রয়োজনটা খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল?

হাসলেন আমার বন্ধু। বল্‌লেন, আমি নগণ্য অফিসার, রাষ্ট্রের প্রয়োজন কোন্ ক্ষেত্রে বেশী এবং কোন্ ক্ষেত্রে কম তা চুলচেরা বিচার করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। এটার বিচার করবেন মন্ত্রীপর্ষদ।

আপনি অন্ততঃ আপনার ডিপার্টমেণ্ট্-এর সম্মতিটা দিন্ না হয়। মন্ত্রীপর্ষদের সঙ্গে কথা বল্‌ব পরে।

—আগে ওখান থেকে clearance আনুন, আমাদের দিক থেকে তখন কোন বাধা পাবেন না।

বলা বাহুল্য, শাসনযন্ত্রের জটিল কাঠামোর এককোণে অবস্থিত এই নগণ্য অফিসারটির পুনর্নিয়োগের জন্য কেহই গা কর্‌লেননা। আমি যখন এই কেস্‌টার human aspect টা দেখ্‌বার জন্য কর্তৃপক্ষকে আবার অনুরোধ জানালাম, তখন তাঁদেরই একজন মন্তব্য করলেন যে এতবেশী বয়সে ভদ্রলোকের বাপ হওয়া উচিত হয়নি, অবিমৃষ্যকারিতার ফল এখন তাঁকে ভোগ করতেই হবে!

এই অফিসারটির ব্যাপারে যদিও আমি কৃতকার্য্য হই নি, তবু দু'একটি ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট আমার সঙ্গে তর্ক করতে করতে মাঝে মাঝে হয়রাণ হয়ে যেতেন, আমাকে "খুসী" (contented) রাখবার জন্য কোন কোন কেস্-এ concede কর্‌তেন।

চাকুরী থেকে ইস্তফা দেবার পর আমার বন্ধু ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টএর সচিবের কামরায় গিয়েছিলাম। তিনি বল্‌লেন, আসুন, ডাঃ দাস। আপনার কথাই আলোচনা হচ্ছিল।

বল্‌লাম—আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ কর্‌ছি। তা, নিন্দা কর্‌ছিলেন, না প্রশংসা?

—নিন্দা না প্রশংসা সেটা আপনিই বিচার কর্‌বেন। বলছিলাম, ডাঃ দাস যে ভাবে আমাদের browbeat কর্‌তেন এবং জোর করে আমাদের সম্মতি আদায় করে নিতেন তা খুব কম সচিবই করে থাকেন। ওর সঙ্গে আমরা সবসময় একমত হতে পারিনি, কিন্তু ওঁকে আমরা সত্যি miss কর্‌ব।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লাম, ফিনান্স ডিপার্ট-মেণ্টকে আমি মাঝে মাঝে browbeat করেছি—এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আমি কল্পনা কর্‌তে পারিনা।…সরকারী কর্ম্মশালা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এসময় আপনাদের উপদেশ দেওয়া হয়ত ধৃষ্টতা। তবু অনুরোধ কর্‌ব, নিয়মকানুন-গুলো নিরপেক্ষভাবে apply কর্‌বেন এবং অধস্তন কর্ম্মচারী এবং কেরাণীদের দুরবস্থার কথা একটু মনে রাখ্‌বেন। হাজার হোক্, তারাও মানুষ।

(ক্রমশঃ)

শিশুর সাথী—মা

শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাথী কে ? সাথী এমন একজন, যার সাথে ছিল না পূর্ব্ব-পরিচয়, হঠাৎ হোল একদিন দেখা। তারপর, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে, চিনে নিল দুজন দুজনকে, হোল উভয়ের ভাব-বিনিময়, মনের মিল। ক্রমে উভয়েই হয়ে উঠল উভয়ের অপরিহার্য্য সঙ্গী—আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, সঙ্কটে। ঠিক এমনি করেই মাও হন শিশুর সাথী।

স্রষ্টার নির্দ্দিষ্ট বিধানে শিশু আসে মায়ের কোলে। উলুধ্বনি, শঙ্খরোলের মাঙ্গলিকীতে মুখর হয়ে ওঠে গৃহস্থের গৃহ ও অঙ্গন। ধরার বুকে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সেই মূক ক্ষুদে মানুষটী পরিবারস্থ সবার অন্তরকে দোল দেয় এক অনবদ্য আনন্দ হিল্লোলে, ভরিয়ে তোলে এক অপরিমেয় তৃপ্তিতে। আর, শত আনন্দ কোলাহল থেকে নিজেকে পৃথক রেখে, ঐ যে বিবর্ণা, শীর্ণা নারীটি পরম আগ্রহে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে সমস্ত দেহ মন দিয়ে অনুভব করেন তাঁর আত্মজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত অসুস্থতা, অস্বস্তি উপেক্ষা করে অনুক্ষণ সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখেন তাঁর প্রাণ-শক্তির কেন্দ্রস্থল ঐ ছোট্ট মানুষটীর প্রতি—তিনিই 'মা'। একদা যে ছিল এক অংগ, এক প্রাণ, বিধাতার ইঙ্গিতে পৃথক হয়ে এলেও, নারীর চরম সার্থকতা ঐ নাড়ী-ছেঁড়া ধনটি যেন এক অংগ হয়েই মিশে থাকে মায়ের বুকের সাথে। তারপর, ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ঐ সজীব মানুষ-পুতুলটি মায়েরই কোলের মধ্যে। যে এল দুর্ব্বল, মা-ই তার শক্তি ; যে এল অক্ষম, মা-ই তার একমাত্র সম্বল ; কিন্তু এল যে ভাষাহীন মূক হয়ে, সে কেমন করে, কাকে জানাবে তার শতসহস্র প্রয়োজন ?—কে বুঝবে তার ভাষাহীন অভিব্যক্তি ? তাই, শিশুর সেই নীরব ভাষা বোঝবার শক্তিও বোধ হয় স্রষ্টা জাগান মায়েরই অন্তরে। সে শক্তি কেমন করে, কখন, কোন পথে এসে যে মায়ের মনের মণিকোঠায় পুঞ্জীভূত হয়, তার হদিস আজও কেউ পেল না। তবু আসে সেই শক্তি, আর সে শক্তির উৎস একমাত্র মায়েরই অন্তরে। একেই বলে বুঝি 'নাড়ীর টান !

ভাষাহীন শিশুর বাহ্যিক অভিব্যক্তি না থাকলেও অন্তরে অনুভূতির অভাব থাকে না। এই অনুভূতির মাধ্যমেই শিশু চিনতে শেখে তার জীবনের প্রথম সীমা মা-কে। মাতৃঅঙ্কের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে শুয়ে ক্ষুধিত শিশু যখন গ্রহণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র উপাদান মাতৃস্তন, শুষ্ক কণ্ঠ-নালীতে অনুভব করে অঝোর ধারায় সুধার ক্ষরণ, মুহূর্তে শিশু মেলে ধরে তার ছোট ছোট চোখ দুটির আয়ত দৃষ্টি তাঁরই মুখের দিকে,—যাঁর বুক থেকে ঝরে পড়ছে সেই অমৃতধারা ! অবাক বিস্ময়ে শিশু তাকিয়ে থাকে সেই মুখখানির দিকে। বুঝি, বুঝতে চায়—চিনতে চায় কে এ ? কে এমন করে না চাইতেই প্রতিক্ষণে মিটিয়ে চলেছে তার সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার দাবী ?—না জানতেই ভরিয়ে দিচ্ছে তার সমস্ত অভাব-অভি-যোগের দৈন্য ? তার প্রশ্নের উত্তর বুঝি সে পায় তার ক্ষীণ দীপোজ্জ্বল কচি মনে—শুনতে পায় বোধহয়—'ওরে শিশু ! ওরে কচি ! ওরে অবুঝ ! এই যে তোর মা !' হঠাৎ শিশুর অনুভূতির হয় সবাক্ অভিব্যক্তি, বেরিয়ে আসে একটি আখর—"মা" ! এ যেন একদা দস্যু নিরক্ষর রত্নাকরের মুখে প্রথম ভাষা—"মা নিষাদ"—। এমনি করেই শিশু ভাবতে শেখে মাকে, চিনতে শেখে তার সকল প্রয়োজনের সাথীকে। আত্মজের কণ্ঠে প্রথম ভাষা, মধুমাখা 'মা' বুলি শুনে মাও হয়ে যান আত্মহারা ; পরম আগ্রহে বুকের সাথে চেপে ধরেন তাঁর ঐ 'নাড়ী-ছেঁড়া ধনটিকে', ঐ অক্ষম, দুর্ব্বল, আপন সত্তাকে। কি যে আকুলতা, কি যে নিষ্ঠা, কি যে আত্মত্যাগ মায়ের অহর্নিশি চলতে থাকে ঐ শিশু মানুষটিকে ঘিরে, জগতে তার তুলনা মেলে না ! সমস্ত দিনে সংসারের কর্ত্তব্যে পরিশ্রান্তা মা গভীর রাত্রে শয্যাগ্রহণ করেন একটু বিশ্রামের আশায়। কিন্তু, বিশ্রাম কি তিনি পান ? সারাদিনের ক্লান্তি অপনয়নের জন্য একটু নিদ্রা,—তাও কি হয় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ? শয্যাতলে তাঁর বুকের কাছেই রচিত হয়—তাঁর বুকের মাণিকের ছোট্ট শয়নটি। কতবারই কেঁদে ওঠে শিশু নানা কারণে, নিদ্রিতা মায়ের সজাগ অন্তর সাড়া দেয় বারবার। অবোধ হলেও শিশু মন বুঝতে পারে—কে করে এমনভাবে তার নিঃস্বার্থ পরিচর্য্যা, কে দেয় তাকে এমন নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, একটু একটু করে বেড়ে ওঠে মায়েরই ভাষায় সেই—আমার সোনা ! চাঁদের কণা ! শশীকলার মত মায়েরই কোল জুড়ে। নীরব একনিষ্ঠ সাধিকার মত আত্মজের মঙ্গল সাধনায় মায়ের সমস্ত দেহমন সারাক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁরই কোলে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া ঐ শক্তিসামর্থ্যহীন শিশুটির ভাষাহীন অভিব্যক্তির প্রতীক্ষায়। এমনি করেই গড়ে ওঠে মা ও শিশুর মধ্যে মাতৃস্নেহের অতুলনীয় সেতু বন্ধন—যে পথে মাই হন শিশুর জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাথী।

মা-ই যে শিশুর শ্রেষ্ঠ সাথী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ শিশু তার শিশুজীবনে যতরকম সাথীর সংস্রবে আসে মায়ের তুল্য কেউ নয়। শিশু নিজে তা অনুভব করে, প্রমাণ করে দেয় তার আচরণে। শিশু যখন হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, আপন মনে তার খেলার সামগ্রী নিয়ে খেলতে শেখে—তখনও কিন্তু ঐ সব মন ভোলানো কোন

কিছুই বেশীক্ষণ পারে না শিশুকে তার পরম সাথী মায়ের কথা ভুলিয়ে রাখতে। নিবিষ্ট মনে খেলতে খেলতে হঠাৎ শিশুর মনে পড়ে তার শ্রেষ্ঠ সাথী মায়ের মুখখানি ; মুহূর্তে সে মাকে পাওয়ার জন্য হয়ে ওঠে ব্যাকুল, ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার মাকে ভুলিয়ে রাখার সমস্ত সম্ভার, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার মায়ের সঙ্গ পাওয়ার জন্য। তারপর যখনই পায় সে মাকে—থেমে যায় তার কান্না, ভুলে যায় সব ব্যথা, মায়ের বুকের ভেতর মুখখানা সে ঘষতে চায় বারেবারে, —বুঝি জানাতে চায়—"মা গো ! ওরা আমায় তোমার কথা ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি মা ! মায়ের সঙ্গহারা শিশুর সেই মনোভাবকে রূপ দিয়েই কবি বলেছেন—

নীড়ের পাখী যেমন মাগো আকাশ পানে ধায়,
আকাশ পেয়ে খানিক পরে নীড়কে আবার চায় ;—
তেমনি মাগো !—

শিশুকাল থেকেই মানুষের জীবন গড়ে ওঠার মূলাধারই হচ্ছে শিক্ষা ও সঙ্গ। মনোবিদ্‌দের মতে, শিক্ষার চাইতে সঙ্গ-সাথীই মানুষের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশী প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে শিশুদের ওপর। শিশুকে তার ভাবীকালে মানবত্বের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হলে প্রথম থেকেই শিশুর মাকে নিতে হবে সেই দুরূহ ব্রত, আর সে ব্রত পালন করতে হলে সন্তান স্নেহে অন্ধ মাকে মনোবিজ্ঞানী পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকাতে হবে তাঁর আত্মজের দিকে। নবজাত শিশু যেন একতাল কাদা। কুম্ভকার যেমন নরম মসৃণ কাদার তালটাকে দিতে পারে তার ইচ্ছামত গড়ন, শিশুর সাথী মা-ও পারেন তাঁর স্নেহের পুত্তলীকে গড়ে তুলতে মনের মতন করে। শৈশবে যখন শিশুর মন থাকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ফুলের মত কোমল—তখন সেই স্বচ্ছ কোমল মনে যে দাগ পড়বে গভীরভাবে, বড় হওয়ার সাথে সাথে সে রেখা গভীর-তর থেকে গভীরতম হয়ে উত্তরকালে শিশুর জীবনকে করবে প্রভাবান্বিত। সেই রেখাই করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্দ্দেশ। শিশুর মনের কচিপাতায় এই রেখা প্রথম টেনে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব মায়ের। কেমন করে যে মায়েরা তাঁদের এই বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন—মনীষী মনোবিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন তার পন্থা ও পদ্ধতি। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই তার প্রতিটি ভাবভঙ্গী, কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার এবং বেড়ে ওঠার সংগে সংগে সেগুলির পরিবর্তন যে মায়েরা কিভাবে লক্ষ্য করবেন, শিশুর কোন আচরণ থেকে তার চারিত্রিক কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং মায়েরাই বা কিভাবে সেই সমস্ত লক্ষণগুলি শিশুকে গড়ে তোলার কাজে লাগাতে পারেন, এ সম্বন্ধে বক্তব্য এবং জ্ঞাতব্য এতই প্রচুর যে বিশদভাবে আলোচনা করার সাধ থাকলেও সাধ্য আমাদের পরিমিত।

শৈশবে শিশুর যখন ভাষা বোঝবার শক্তি থাকে না, তখনও কিন্তু সে খুশী ও বিরক্তির পার্থক্য বুঝতে পারে। অর্থাৎ অপরের মনোভাব নিজের অন্তর দিয়ে শিশু অনুভব করে। মায়ের হাসির সাড়া শিশু হাসি দিয়েই দেয়, মায়ের ধমক বা চোখ রাঙ্গানির প্রতিক্রিয়ার অভি-ব্যক্তি শিশু দেয় ঠোঁট ফুলিয়ে। শিশুর মনের এই অনুভূতি সম্বন্ধে মায়েদের সচেতন থাকতে হবে। মনঃ-সমীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুর ভাবভঙ্গী, আচরণ সব কিছুই নির্দ্দেশ দেয় তার জীবনধারার। আমাদের দেশে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে অন্ন-প্রাশনের সময় শিশুর সামনে টাকা, মাটী ও কলম রাখা হয়। এর ভেতর সে যেটা বেছে নেয়, মায়েরা মনে করেন শিশুর এই নির্ব্বাচনই তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্দ্দেশ করে। যেমন কলম ধরলে ধারণা হয় যে শিশু হবে বিদ্যার জাহাজ। মাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হলেও, ক্ষুদ্র মানুষটির সেই নির্ব্বাচনই তার অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনার অভিব্যক্তি। এইরকম, শিশুদের আচরণের মাধ্যমে তাদের মনোভাবের অভিব্যক্তি শিশুর সাথী মায়েরা যদি পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন, তবেই তারা শিশুদের গড়ে তোলার ব্যাপারে হবেন কৃতকার্য্য। শিশুরা জানে না তাদের মনোভাব কিভাবে অবদমিত করতে হয়—যেমন পারে কিশোরকিশোরী বা যুবকযুবতীরা ; ফলে শিশুর আচরণই হয় তার মনোভাবের দর্পণ। শিশুর সেই স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাবকে যদি শৈশবেই করা হয় অবদমিত—তাহলে তাতে হয় তার প্রভূত ক্ষতি—যে ক্ষতি ভাবীকালে হয়ত অপূরণীয়ই থেকে যায়।

মায়েদের অনুযোগ করতে শোনা যায়—'আমার ছেলেটি মোটেই খেতে চায়না, অথচ অমুকের একই বয়সী ছেলেটী কেমন সুন্দর খায় ! আবার কেউ হয়ত বলেন—আমার ছেলেটার পাঁচবছর বয়স হোল, এখনও এত নোংরা যে দিনরাত ধুলোকাদা নিয়েই আছে।' আবার কোনও মা হয়ত অভিযোগ করেন,—'আমার ছেলেটির মাত্র দুবছর বয়েস অথচ কি দুরন্তই যে হয়েছে, তাকে নিয়ে আর যেন পেরে উঠিনে। মেরে ধরেও তার ভাঙ্গাচোরার স্বভাব কিছুতেই বদলানো গেলনা।' মায়েদের এইরকম কত অনুযোগ ও অভিযোগই না শোনা যায়। কিন্তু, তাঁদের একথা জানা প্রয়োজন, সমবয়সী দুটি শিশুর খোরাক কমবেশী নির্ভর করে তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর। পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, যে শিশুটি অপেক্ষাকৃত কম খায়, হয় তার স্বাস্থ্য স্বাভাবিকের চাইতে ভাল—তাই তার অধিক খোরাকের প্রয়োজন নেই—অথবা সে দৈহিক অসুস্থ। পাঁচ বছরের শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবই ধুলো কাদা নিয়ে খেলা করা। দুই বছরের সব শিশুরই স্বভাব ভাঙ্গাচোরা ; এটা তার অস্বাভাবিক দুরন্তপনা নয়। অবশ্য মনোবিদ্‌রা একথা অস্বীকার করেন না যে—শিশুর স্বাভাবিক আচরণ প্রায় সবক্ষেত্রেই মা বাপের কাছে বিরক্তিজনক হয়। কিন্তু যদি তারা অবহিত হন যে, শিশু তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন আচরণ করবেই এবং তা স্বতপ্রমাণিত তাহলে শিশুর চঞ্চলতা বা বিরক্তিকর আচরণে রুষ্ট হয়ে তাঁরা শাসন বা তাড়নার দ্বারা সেই সব দুরন্তপনা ও অবাধ্যতাকে অবদমিত করে আত্মজের চারিত্রিক ক্ষতি করতে প্রয়াসী হবেন না। শিশুদের বিভিন্ন বয়সের আচরণ কেমন তা অতি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ ১ থেকে ৯ বছর পর্য্যন্ত মানবজীবনের এই অধ্যায়টুকুকেই শৈশবকাল বলে অভিহিত করেন। এই সময় শিশুদের

স্বাভাবিক আচরণের যদি হয় ব্যতিক্রম, তখনই করতে হবে তার অনুসন্ধান। শিশুকালের প্রথম অবস্থায় শিশু নড়াচড়া লক্ষ্য করতে খুব ভালবাসে,—যেমন জীবজন্তুর, যানবাহনের চলাচল ইত্যাদি এবং এর থেকেই প্রমাণিত হয় তার নতুন জিনিষ জানবার আকাঙ্খা। ক্রমে তার আসে অধিকার-বোধ; নানাধরণের জিনিষ আয়ত্ত করার জন্য আগ্রহশীল হয় এই খুদে মানুষটি; কোনরকম বাধা পেলেই চীৎকার করে, কেঁদে জানায় তার প্রতিবাদ। সুতরাং শিশুর এই কান্নাকে কাঁদুনে বলে ভুল বিচার করা হবে। বয়স যতই বাড়তে থাকে স্বাধীন চেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তার আচরণে এবং এই কারণেই কারণে-অকারণে শিশুকে 'না' বলতে শোনা যায়। কখনও কখনও শিশুকে দেখতে পাওয়া যায় তার সমবয়সীদের সংগে ঝগড়া ও মারামারি করতে। এই রকম দুরন্ত শিশুকে মায়েরা বলে থাকেন 'মারকুটে।' কিন্তু শিশুর এই মারামারি করার স্বভাব স্বাভাবিক এবং তা অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মনোভাবের সূচনা-মাত্র। নিজের জামাকাপড় নিজেরা পরবার জন্য আব্দার করা, নিজেদের খাবার নিজহাতে খাওয়ার জন্য জিদ্—এতে শিশুদের স্বভাবলক্ষণ আত্মনির্ভরতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। ৪।৫ বছরে শিশুরা হয়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসু। এই সময় তারা প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তাদের এই প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে সহজভাবে তাদের অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক জোগানো উচিত। নইলে, তাদের জানবার আগ্রহ অবদমিত হয়ে উত্তর জীবনে শিশুদের ভেতর হীনমন্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ৬,৭ বছরের শিশুদের নেতৃত্বভাবাপন্ন হতে দেখা যায়। যার ফলে সমবয়সীদের সাথে তারা প্রায়ই হয়ে ওঠে বিবাদমান। ৮,৯ বছরের শিশুর স্বাধীন মনোভাব ব্যাহত হলে অনেক সময় পিতামাতার অবাধ্য হতে দেখা যায়। 'অবাধ্য' বলে এই শিশুদের কেবল শাসনই না করে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার, তাদের অবাধ্যতার হেতু কি? কেন তারা মাঝেমাঝে বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

সব মায়েরাই যদি মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুর প্রকৃত সাথী হতে পারেন—তাহলেই তাঁরা দেখতে পাবেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

নবদ্বীপে রাসোৎসব

স্বামী বিজয়ানন্দ

'নবদ্বীপ'—এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা দেখা যায়। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত দ্বীপাকার এই স্থান-টিতে প্রাচীনকালে দেশ-দেশান্তর হইতে বাণিজ্য-তরণী আসিয়া ভিড় করিত। ক্রমে এখানে দোকান-পসার, হাট-বাজারও বসিল। দ্বীপসদৃশ স্থানটিতে নূতন বসতি হইল বলিয়া লোক ইহাকে নূতন দ্বীপ বা নবদ্বীপ বলিয়া থাকে।

বহু প্রাচীনকালে ভাগীরথীর চরে অবস্থিত এই স্থানটিতে জনৈক সন্ন্যাসী বিরাট নয়টি প্রদীপ জ্বালাইয়া বিশেষরূপে কোন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ভাগীরথী ও জলঙ্গীতে গমনাগমনকারী নৌকারোহী সকলেই উক্তস্থানে আসিয়া উক্ত সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করিত এবং ঐস্থানটিকে ন-দীয়া (নয়টি প্রদীপ) নামে অভিহিত করিত। তাহা হইতেই অনেকে অনুমান করেন নদীয়া ও নবদ্বীপের উৎপত্তি।

চৈতন্য-ভাগবতে নবদ্বীপকে একটি মাত্র দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু হরিগুর চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমা বিবরণে নয়টি দ্বীপ লইয়া গঠিত দেশকে নবদ্বীপ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। (১) অন্তর্দ্বীপ, এই স্থানটিই প্রকৃত নবদ্বীপ। (২) সীমন্ত দ্বীপ বা সিমুলিয়া (বামুন-পুকুর, মিঞাপাড়া, বল্লালদিঘী) (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার ও স্বরূপগঞ্জ) (৪) মধ্যদ্বীপ (খাজিদা, পানশিলা ও ভালুকা (৫) কোলদ্বীপ (কোবলা, সমুদ্রগড় প্রভৃতি) (৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, বিদ্যানগর)

(৭) মোদদ্রুম দ্বীপ (মামগাছি, মহৎপুর, ব্রহ্মাণীতলা) (৮) জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর, পারুলিয়া, সুলণ্টু) (৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রডাঙ্গা, সংবরপুর, পূর্ব্বস্থলী)।

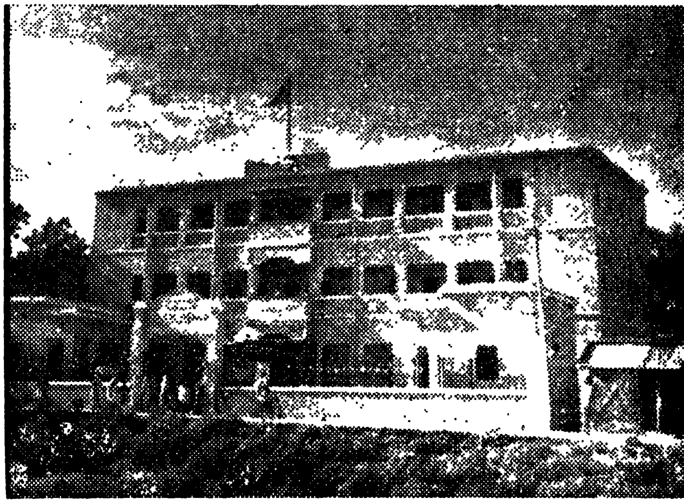
শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদধূলিতে পূত এই বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপে কতদিন ধরিয়া রাসলীলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। বহু অনুসন্ধানের পর যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে কাহারও মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই নবদ্বীপে রাসলীলার প্রবর্ত্তন হয়। কেহ কেহ বলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে ইহার সূত্রপাত। কেহ বা বলেন, আগমবাগীশের সময় হইতে রাসোৎসবের প্রবর্ত্তন। যাই হউক, স্বাধীন বঙ্গনৃপতিগণের রাজধানী নবদ্বীপে যে রাসলীলার সমারোহ দেখা যায় নাই—তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবমতে রাসলীলা যখনই আরম্ভ হউক না কেন—শাক্তমতে রাসপূর্ণিমার মহাসমারোহ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। রাসোৎসবের



শ্রীশ্রীকাত্যায়নী

প্রাচীনতা নির্ণয় করা বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য নয়; ইহার সার্থকতা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করাই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে



নবদ্বীপে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রিনিবাসের একাংশ
(প্রেমচাঁদরায় সুভদ্রাময়ী যাত্রিনিবাস)

বিশ্বাসবান ছিলেন না, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শক্তিপূজক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাবল্যদৃষ্টে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধিতা করিয়াছেন—তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ স্বয়ং নবদ্বীপে উপস্থিত থাকিয়া নিজে আদ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার নামে সংকল্প করাইয়া পূজা করাইয়াছেন, এমন ইতিহাসও পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপের যাবতীয় বার-ইয়ারী শক্তিপূজার সংকল্প মহারাজার নামেই হইত এবং এখনও কতকগুলি প্রাচীন পূজার সংকল্প তাঁহারই নামে হয়—এমন শুনিয়াছি।

বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রাস হইতে নবদ্বীপ তথা তাঁহাদের রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য শক্তিপূজার বিপুল সমারোহ এবং প্রভূত অর্থব্যয় নদীয়ার রাজবংশের অনেকে করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্র কৃষ্ণনগর, নদীয়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করিয়া যান। তৎপূর্ব্বে এদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ছিল না। বাসন্তী পূজার সম

বাসন্তী মূর্তির অনুকরণে হট-হটিকা পূজা নামে অপর একটি পূজার প্রচলনও মহারাজ গিরিশচন্দ্র নবদ্বীপে করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পূজা উপলক্ষে তদানীন্তন বঙ্গের বহু জমিদার, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পূজা, যাত্রা, মহোৎসব, অন্নসত্র ইত্যাদি মহাধুমধামে সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত পূজা আজিও নবদ্বীপধামে অনুষ্ঠিত হয়।

হেমন্তের মেঘনির্মুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ধবলিত রাত্রে শব সাধনায় যোগারূঢ়া পুণ্যরজনীই তো ভক্ত গোপিগণের রাসলীলার মহামাহেন্দ্র-ক্ষণ; ভক্তের সাথে শ্রীভগবানের সম্মিলনের মহাপুণ্য তিথিই তো রাসপূর্ণিমা। সর্বত্র ভগবদ্দর্শন তথা আত্ম-দর্শনের ইঙ্গিতই তো রাসলীলার চরম সার্থকতা। কিন্তু কবে, কোথায়, কিভাবে রাসপূর্ণিমায় শিববক্ষোপরি শবাসনা করালবদনা মহাকালীর পূজা প্রচলিত হয়—তাহা জানিবার আকাঙ্খা জাগে সমাগত ভক্ত হৃদয়ে। কোথাও সদুত্তর পায়—কোথাও বা তাহাদের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ভৌতিক জগতের প্রাচুর্য্যের চাপে রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যুবরণ করে।



শ্রীশ্রীনবদুর্গা—অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী—তেঘরিপাড়া



শ্রীশ্রীভদ্রকালী—চারিচারাপাড়া

মহাকালীর অর্চনায় নবদ্বীপবাসীর এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা, এত উন্মাদনা কেন—রাসলীলা দর্শন মানসে বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীধাম নবদ্বীপে সমাগত ভক্ত নরনারীর অন্তরে এই প্রশ্নই জাগে। অসংখ্য যাত্রীর ভিড় ঠেলিয়া ত্রস্তপদে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া ব্যাদরাপাড়ায় পৌঁছিয়া শিব ও শবারূঢ়া বিশালকায়া মহাকালীর মূর্তিদর্শন করিয়া ভক্তগণ ভীতি-বিহ্বলচিত্তে চিন্তা করে—শ্রীকৃষ্ণের সাথে মহামিলনের

নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমায় এই শক্তিপূজার সমারোহ দেখিয়া আমিও স্তম্ভিত হইয়াছি। মাতৃসাধক বাঙালী মাতৃ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে যুগে যুগে। আদ্যাশক্তিকে মাতৃরূপে সাধনায় এই সার্থকতা বিশ্বের আর কোন জাতিই অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। অমানিশার সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে মহাশ্মশানের বুকে রণতাণ্ডবোন্মত্তা নর-মালাবিভূষণা মহাকালীর সাধনায় যেমন বাঙালী সাধকের

সিদ্ধি—পূর্ণিমার রৌপ্যকরোজ্জল রজনীতে প্রাচুর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মীর সাধনায়—বাঙালীর জীবনে তেমনই আনে ঐশ্বর্য্য—আনে প্রাচুর্য্য—আনে বিত্ত, সম্পত্তি, বৈভব।

সেই মাতৃপূজার অবিচ্ছিন্ন ধারা নবদ্বীপে বহন করিয়া আনিয়াছে—শক্তিসাধনা। প্রাতঃস্মরণীয় আগমবাগীশ ছিলেন শক্তিসাধক। মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে নদীয়া যখন ভাসমান, বাংলার মাতৃসাধনার উজ্জ্বল দীপশিখাকে চির-অনির্ব্বাণ-



শ্রীশ্রীমুক্তকেশী—দণ্ডপাণিতলা

কৃতিমানসে তিনিই নাকি রাসপূর্ণিমায় মাতৃপূজার ব্যবস্থা করেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপে শিব ও শক্তিসাধনার পীঠস্থান ছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের স্বর্গারোহণের পরই বাংলা দেশে তান্ত্রিক সাধনার প্রাবল্য দেখা যায়। আদিশূরের সময় হইতেই নবদ্বীপ বাংলার রাজধানী ছিল, নবদ্বীপ হইতেই তন্ত্রসাধনার রূপ সমগ্র বাংলা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। তখনও কিন্তু অধুনা প্রচলিত আদ্যাশক্তির এবম্প্রকার মূর্ত্তি পরিকল্পিত তাহাতেই সিদ্ধমন্ত্রে মাতৃপূজা সমাপন করিতেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন একসময়ে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নবদ্বীপের একপ্রান্তে ঘটস্থাপন করিয়া দক্ষিণাকালিকার পূজার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি কিছুদিন পরে তদীয় ভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণকুমারকে উক্ত ঘটে মাতৃপূজার আদেশ দান করিয়া তাঁহাকে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদানান্তে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। তদবধি উক্ত ঘটেই দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে এবং উক্ত দেবী গ্রাম্যদেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন।



শ্রীশ্রীরণকালী—তুড়োপাড়া

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় উক্ত ঘট নবদ্বীপের মধ্যস্থানে একটি বটবৃক্ষমূলে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহদাহকালে উক্ত বটবৃক্ষ দগ্ধীভূত হয়। তখন হইতে এই গ্রাম্যদেবী বিদগ্ধ মাতা বা পোড়ামা নামে অভিহিতা হইয়া আসিতেছেন। পোড়ামা নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীরই আরাধ্য দেবী। নিঃসন্তান, কন্যাদায়গ্রস্ত জনকজননী, বিপদাপন্ন নরনারী সকলেই মানসিক করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

নবদ্বীপে অতিপ্রাচীনকাল হইতেই বুড়াশিব, যুগনাথ

দণ্ডপাণি শিব এই পঞ্চশিবের পূজার প্রচলন ছিল। যুগনাথ-শিব ও দণ্ডপাণি শিব বৌদ্ধযুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। নবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শৈব ও শাক্তমতের মহাসমন্বয়ে সুগঠিত সমাজ ও পাণ্ডিত্য-গৌরব-মহিমা-মণ্ডিত ভারতের তীর্থভূমি তথা মাতৃসাধনার মহাপীঠস্থান নবদ্বীপে শক্তি পূজার বেদীমূলে প্রজ্বালিত হোমানল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় একদল সাধক প্রাণপণ শক্তিতে মাতৃপূজায় ব্রতী হইলেন। প্রধানতঃ



শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন—দণ্ডপাণিতলা

তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া নদীয়ারাজগণ নবদ্বীপে শক্তিবাদ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাই বৈষ্ণব পর্ব্বাহে যখন কৃষ্ণ প্রেমবিভোর, ভক্তি রসাপ্লুত-ভক্ত-কণ্ঠে সুললিত রাগে কীর্তনের সুরমাধুর্য্য কৃষ্ণবিরহকাতর বৈষ্ণবের প্রাণে কৃষ্ণ দর্শনের আকুল আগ্রহের সঞ্চার করিত, ঠিক তন্মুহূর্তেই হয়তো নবদ্বীপে অপর একস্থানে তন্ত্রসাধকগণ মাতৃবেদীমূলে জয়ঢকানিনাদের ব্রহ্মতালে তাথৈ তাথৈ নৃত্যরত; আত্মসম্বিৎহারা ধ্যানমগ্ন সাধক হয়তো তখন সমাধি অন্তে রুদ্র বাদ্যের তালে তালে নৃত্যসহকারে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীর রাজসিক আড়ম্বর, সর্ব্বোপরি বাদ্যের উগ্রতাণ্ডবতা বৈষ্ণবের কীর্তনের করুণ সুরকে অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিত—তখন হইতে এখনও নবদ্বীপে বিভিন্ন প্রকার মাতৃমূর্ত্তি দেখা দেয়। আদ্যাশক্তি কোথাও মহাকালী, কোথাও শ্যামা, কোথাও ভুবনেশ্বরী, আবার কোথাও বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী বা ভদ্রকালীরূপে পূজিতা।

আজিও রাসপূর্ণিমায় শক্তিপূজার মহাসমারোহ নবদ্বীপের পল্লীতে পল্লীতে দৃষ্ট হয়। পল্লীর সকলে মিলিয়া এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে বন্ধুগণ মিলিয়া এই পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া এখানে ইহাকে বার-ইয়ারী পূজা বলে। রাসের শক্তিপূজার কোনটিই-এখানে ব্যক্তিগত নহে—প্রত্যেকটিই বার-ইয়ারী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়, এমন কি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমস্ত পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশ্যেই সুরাপানাদি চলিত। বিসর্জ্জনের দিন প্রকাশ্য রাজপথেই প্রতিমা লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে গমনকালে যুবকগণ সর্ব্বসমক্ষেই সুরাপান করিতেন এবং সুরাপাত্র হাতে লইয়া মত্ত অবস্থায় বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। সে দৃশ্য এবং অবস্থা আধুনিক কালে এমনই নাকি বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। গত বৎসরের রাসোৎসবে প্রকাশ্যভাবে সুরাপান দৃষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু গভীর রাত্রে দুই একটি স্থানে প্রতিমাদর্শনমানসে গমন করিয়া পূজানুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে পানোন্মত্ত অবস্থায় লক্ষ্য করিয়াছি। উন্মত্ততা এমনই চরমে পৌছিয়াছিল যাহাতে দূর হইতে মহিলাদর্শনার্থীদের ভীত হইয়া পলায়ন করিতেও দেখিয়াছি।

আজিকার নবদ্বীপে পল্লীতে পল্লীতে শক্তিপূজা আয়োজন দেখিলাম। যুবক ও প্রৌঢ়গণের বিশালকায়া মুক্তকেশীর পূজা দেখিয়া বালকগণ ক্ষুদ্রাকারে মূর্তিকরাইয়া বালকেশ্বরী নামে পূজা করেন। সর্ব্বপ্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে ব্যদরা-পাড়ার শব ও শিব, তেবরীপাড়ার শ্যামা, যুগনাথতলার গৌরাঙ্গিনী, রামসীতাপাড়ার বামাকালী, চারি-চারাপাড়ার ভদ্রকালী এবং আমড়াতলার মহিষমর্দ্দিনী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি দেড়শত বা দুইশত বৎসর যাবৎ—কোন কোনটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বা

মহিষমর্দ্দিনী শ্রীদুর্গার মহিষাসুরনিধনের মূর্তি। গৌরাঙ্গিনী—যুগলসিংহারূঢ়া দেবী দুর্গা—বামে সরস্বতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মীসহ অসুর নিধনোদ্যতা। প্রত্যেকটি মূর্ত্তিই উচ্চতায় অষ্টাদশ হইতে বিংশ হস্ত পরিমিত। প্রত্যেকটিরই চালচিত্র প্রাচীন মতে সু-অঙ্কিত। মূর্তি-নির্মাণে বাংলাদেশে সে সর্ব্বনাশী আধুনিকতা দেখা-দিয়াছে তাহা নবদ্বীপে একটিমাত্র মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোনটিতে বড় একটা লক্ষিত হয় নাই। চালচিত্র প্রভাব-মণ্ডিত অত্যাধুনিকতার দুর্ব্বিসহ মোহ আজ সর্ব্বত্র যে ভাবে পূজানুষ্ঠানকারীদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং যেভাবে দেবদেবীর মূর্ত্তির রূপায়ন - হইতেছে—তাহাতে বাংলার ধর্ম্মপ্রাণ, সমাজহিতৈষী, তথা কলানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি অচিরে বাংলার সেই আধুনিকতার মোহ অপনোদনে ব্রতী না হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেবদেবীর মূর্তি লইয়া এক-শ্রেণীর মানুষ ধর্ম্মের নামে নিজেদের মনের নীচ প্রবৃত্তিগুলির ইন্ধন যোগাইতে প্রবৃত্ত হইবে। বাংলার মূর্তিশিল্পের প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতা চিরতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

এই বৎসর রাসোৎসবে নবদ্বীপে "যুগলমিলন"-নামীয় রাধাকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রধান রাজপথে স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে কেহ বিচক্ষণ বা প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন কিনা জানিনা-কিন্তু মূর্ত্তির পার্শ্বেই একটি সাইন বোর্ডে "বন্ধু-মহল" কথাটি লেখা ছিল। রাসোৎসবে এই বন্ধু-মহলটিকে অনুরূপ পূজা করিতে ইতিপূর্ব্বে কেহ কোনদিন দেখেন নাই। নাইলনের সাড়ীপরিহিতা শ্রীরাধাশ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলে বেষ্টিতাবস্থায় দণ্ডায়মানা। শ্রীমতীর বসন-ভূষণে নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ লজ্জার লেশমাত্র রক্ষিত হয় নাই। মূর্ত্তিটি এমনই ঘৃণ্য অভিরুচি-সম্পন্ন যাহাতে পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে যে কোন ব্যক্তিই এই মূর্ত্তি দর্শনে লজ্জিত হইয়া পূজামণ্ডপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন্ শক্তিবলে—রাস-পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে দেবতার এই বিকৃতরুচিসম্পন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ্য রাজপথে স্থাপন করিয়া পূজার নামে নিজেদের অন্তরের পাশবিক বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিয়া নবদ্বীপের নৈতিক আবহাওয়া কলুষিত করিয়া বাংলার ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর পক্ষ হইতে আমি নবদ্বীপের যুগলমিলন মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাতাগণের নিকট জবাবদিহি চাহিতেছি এবং এই বলিয়া পূজানুষ্ঠানকারিগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে যদি কোথাও পুনরায় দেবদেবীর মূর্ত্তি লইয়া এইভাবে নিজেদের পাশবিকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রয়াস দেখা যায়—তাহা হইলে বাংলার সমাজপতি ও ধার্মিক জনসাধারণের নিকট—তাঁহারা ধর্ম্ম-দ্রোহী ও সমাজদ্রোহীরূপে গণ্য হইবেন।

এই বৎসরের মূর্ত্তি রূপায়নে বড় আখড়ায় পূজিত



শ্রীশ্রীদেবী গোষ্ঠ – ব্যানার্জিপাড়া

একটি মূর্ত্তি "হরিহরমিলন" চরম সার্থকতালাভ করিয়াছে। একদিকে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ ঐরাবতে সমারূঢ়, অন্যদিকে পার্ব্বতীসহ মহাদেবের বৃষে অধিষ্ঠান। অপূর্ব্ব মিলন-উভয়ের। মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক রহস্য উদঘাটন করিলে দেখা যায় লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পার্ব্বতী—শক্তির, নারায়ণ প্রাচুর্য্যের ও শিব ত্যাগের মূর্ত্তিবিগ্রহ। তাঁহাদের

শিক্ষাভিমানী, ভারত-সংস্কৃতি-বিস্মৃত অর্বাচীন জনসমাজকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নয় কি? ভারত দেবতার লীলাভূমি। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণপ্রস্রবণ। ত্যাগ সংযম সত্যব্রহ্মচর্য্যই ভারতের মর্ম্মবাণী। তাই ভারতের শিক্ষা—সমন্বয়ের শিক্ষা—ভারতের সাধনা-সমন্বয়ের সাধনা, নবযুগের ঋষি আচার্য্য প্রণবানন্দের 'এযুগ মহামিলনের যুগ—এযুগ মহাসমন্বয় মহামুক্তির যুগ—এই বাণীকে রূপান্বিত করিয়াছে—এই মূর্ত্তিটি। এখানে শক্তির সহিত ভক্তির, প্রাচুর্য্যের সহিত ত্যাগের, ঐশ্বর্য্যের সহিত বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে। ভক্তিহীন শক্তিতো নিছক গুণ্ডামী মাত্র; আবার দুর্ব্বলের ভক্তি—সে তো ভগবদপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ।



শ্রীহরিহর মিলন—বড়-আখড়া

কলানৈপুণ্যে আরও দুই একটি মূর্ত্তির সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে—এই বৎসর নবদ্বীপে। ব্যানার্জ্জিপাড়ার দেবী গোষ্ঠ, তেঘরিপাড়ার নবদুর্গা, চারিচারি বাজারের ভদ্রকালী, রামসীতাপাড়ার মহিষমর্দ্দিনী তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দেবী-গোষ্ঠ মূর্ত্তিতে দেখি দেবী দুর্গা বালক শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া ক্ষীর' ননী খাওয়াইতেছেন এবং সম্মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ আদি দেবতা ও বলরাম সহ শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি গোপনায়কগণ গোষ্ঠে ধারিণী দেবী রুদ্রমূর্ত্তিতে মহিষাসুরনিধনরতা। অপূর্ব্ব দেবীর মুখভঙ্গিমা, অপরূপ মাধুর্য্য ত্রিনয়নের। মুখাবয়বের নয়নমনোহর রূপলাবণ্য যে কোন ভক্তের প্রাণেই মাতৃভক্তি তথা শক্তির উন্মেষ জাগায়। এই মূর্ত্তির ধ্যানে সাধকের সিদ্ধি অবধারিত।

ভদ্রকালীর বিশাল মূর্ত্তি। পাদমূলে শ্রীরামলক্ষ্মণ ও তৎপাদমূলে করযোড়ে পবননন্দন উপবিষ্ট। রামায়ণে কথিত মহীরাবণপূজিতা ভদ্রকালীর বলিরূপে শ্রীরামলক্ষ্মণ আনীত হইলে হনুমানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাহারা রক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাই এখানেও ভদ্রকালীর মূর্ত্তিতে মহীরাবণ, শ্রীরামলক্ষ্মণ, হনুমানকেও দৃষ্ট হয়।

এই বিরাট ও বিশালাকৃতি মূর্ত্তিগুলির প্রায় সবগুলিই এখনও ডাকের বা শোলার সাজ দ্বারাই সুসজ্জিত করা হয়। এই সাজগুলিও সকলের প্রশংসা অর্জ্জনের দাবী রাখে।

এই সব চিরাচরিত মূর্ত্তিগুলি ছাড়াও কাত্যায়নী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন, অন্নপূর্ণা, গণেশজননী, হরপার্ব্বতী ও অনেকগুলি যোদ্ধৃবেশী শ্রীকৃষ্ণের বা পার্থসারথির বেশে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। তুড়োপাড়ার রণতাণ্ডবোন্মত্তা রণকালী, নন্দীপাড়ার নৃত্যকালী মূর্ত্তিও শিল্পের দিক হইতে প্রশংসার দাবী করে। অতীতে কোন এক বৎসর ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিও নির্মিত হইয়া পূজিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু এই মূর্ত্তি নির্ম্মাতা ও পূজার উদ্যোক্তাদের অনর্থ ঘটায়—ছিন্নমস্তার পূজা বন্ধ হইয়াছে।

শাক্ত সম্প্রদায়ের এই ব্যাপক ও মহাআড়ম্বর তথা রাজসিক সমারোহে পূজাবিধি দেখিয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৈষ্ণবগণও কোন কোন স্থানে গঙ্গামূর্ত্তি বা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বিরাট বিরাট মূর্ত্তি করাইয়া পূজা করিতেছেন। কিন্তু তাহা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প।

পরদিন আড়ং বা বিসর্জ্জনের পালা। মধ্যাহ্ন হইতেই বিসর্জনের আয়োজনে সমগ্র সহরে সাজ সাজ রব পড়িয়

বৈদ্যুতিক তারগুলিও অপসারণ করিতে হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা রণতাণ্ডবে মাতিয়া ওঠে। বিভিন্ন পল্লীর উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটে। সব প্রতিমাগুলিই দণ্ডপাণিতলার প্রধান রাস্তা দিয়া পোড়ামাতলায় নীত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও এই পোড়ামাতলায় দাঁড়াইয়া সমস্ত প্রতিমাগুলি দর্শন করিয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করিতেন।

রাসোৎসবের মূর্তিকল্পনা এবং সমারোহে শক্তিপূজার আড়ম্বর দেখিয়া একটি তথ্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে—দেশ, জাতি ও সমাজকে বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া, তাহার কর্ণকুহরে শক্তিমন্ত্র ধ্বনিত করিয়া, জাতিকে সবল সতেজ ও ক্ষাত্রশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল—রাসোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ নবদ্বীপবাসীগণ সে তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই এই সমস্ত পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। স্বাধীন রাষ্ট্রে বাংলার ক্ষাত্রশক্তিকে যদি পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়—জাতির ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় যদি পুনরায় বিদ্যুদ্বীর্য্যের সঞ্চার করিতে হয়—তবে এই পূজানুষ্ঠানগুলিকে পুনরায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে শক্তিসংগ্রহ করিয়া শক্তিসাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে প্রতিমা লইয়া মারামারি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং সময় সুযোগমত ব্যক্তিগত আক্রমণে বিগত বৎসরের ঝগড়ার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রচেষ্টা চলিবে। পরস্পরের এই ঘৃণ্য জিঘাংশা মনোবৃত্তি যতদিন না দূরীভূত হইবে—ততদিন মাতৃপূজায় শক্তিলাভের আশা—নিরর্থক; সকল প্রচেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি, অরণ্যে রোদনে পরিণত হইবে।

ভারত ও চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র দত্ত

ভারতবাসীমাত্রই অদ্য যে সমস্যা সম্বন্ধে বেশী সজাগ হয়েছেন তা হ'ল চীন-ভারত-সীমান্ত সমস্যা। সমস্যার স্বরূপ যাই হোক না কেন ভারতবাসীর মনে এটা একটা আঘাত স্বরূপ। কারণ, এই সেদিনের কথা—চীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে কি বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাল কলকাতাবাসী তথা ভারতবাসী। সে কি উদ্দীপনা আর উৎসাহ। চীনের মুক্তি সংগ্রামে ভারতবাসীর যে সমর্থন ছিল তা যেন সার্থক রূপ পেল চীন-ভারত-মৈত্রীর মধ্যে। বিশ্বের শান্তি সাধনে নেহেরু চৌয়ের "পঞ্চশীল" নীতি আজও মনে পড়ে। সেটা কি শুধু পরিহাস? সাম্প্রতিক সীমান্ত ঘটনাবলীতে চীনের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে তা কি সত্যই ভয়াবহ নয়। ভারতবাসী মাত্রেই আজ তাই আহতমনা। তারা সজাগ হয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়—পরিকল্পনা তৈরীর বিষয়েও ভারতসরকার সীমান্তের ঘটনাবলীর পরে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত রূপায়ণ ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করছেন। প্রতিরক্ষার প্রতি নজর দিচ্ছেন। সীমান্তের গোলযোগ রাজনৈতিক যুদ্ধে পর্য্যবসিত হোক বা না হোক—চীনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে ভারতকে আর একটী দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। সে হ'ল তার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি চীনের আক্রোশাত্মক মনোভাব।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা যখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে বৈরী মনোভাবের প্রকাশে, তখন সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ করে ভারতের মত দেশে—যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে অর্থনীতি যথেষ্ট নির্ভরশীল এবং প্রগতি পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য এই নির্ভরশীলতা আরও প্রবল—সেখানে আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

বৈরী মনোভাবাপন্ন কোনও দেশ যখন অন্য একটী দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে এগিয়ে আসে, তখন তাকে বলে বাণিজ্য সংঘাত বা Trade war। এই বাণিজ্য-যুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেও চলতে পারে, আবার যখন নানাকারণে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করা সমীচীন হয়না তখন বিকল্পহিসেবেও এই বাণিজ্য সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে অবাণিজ্যিক নীতিতে বাণিজ্য সংঘাতে কাজ চালান

হয়। উদ্দেশ্যমূলক এই নীতি। সব দেশই এমনকরে বাণিজ্য সংঘাতে এগোতে পারেনা। এরজন্য কয়েকটী অনুকূল পরিবেশ থাকাচাই। চীন ভারত বাণিজ্য সংঘাত বুঝতে হ'লে এই অনুকূল পরিবেশ গুলো কি তা বুঝতে হবে।

চীন ভারতের শুধু প্রতিবেশীই নয়। প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ু, কৃষিদ্রব্য, শিল্পদ্রব্য, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে রপ্তানী যোগ্য শিল্পদ্রব্য—তুলাজাত দ্রব্য, কৃষিদ্রব্য—চা তৈলবীজ প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হতে পারে।

চীনের ভারত-বিরোধী বাণিজ্য নীতি ব্যাখ্যা করার আগে আর একটী বিষয় স্পষ্টকরে বোঝান দরকার। বৈদেশিক বাণিজ্যে ডাম্পিং বলে একটা কথা আছে। এর ব্যবহারিক অর্থ হ'ল এই—যে কোনও দেশ প্রতিযোগী দেশের ব্যবসায় নষ্ট করার জন্য কম মূল্যে মাল সরবরাহ করে এবং এভাবে বাজার দখলকরে। তারপর একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে সাময়িক যে ক্ষতিটা হল তা পূরণ করে নেয়।

চীনের এই ডাম্পিং নীতি বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যও তৈলবীজ-এর ক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালেই চালু হয়েছিল। গত বৎসর চীন হঠাৎ এনীতি ত্যাগ করে, কারণ ঐ নীতি গ্রহণ করায় চীনে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তা হয়েছিল—স্বাভাবিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য নয়—ডাম্পিং নীতির জন্য। শিল্পের পরে তাই একটা চাপ পড়ে অযথা, উন্নতি ব্যাহত হয়।

বর্ত্তমান ভারতের বিরুদ্ধে আবার এ নীতি চালু করার প্রধানতঃ চারটী কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ গত ১৯৫৭ সালের ডাম্পিং নীতির প্রভাব এড়িয়ে শিল্পগুলো আরও সবলহয়ে উঠেছে এবং চীনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এরজন্য বাজারের প্রসার চাই।

দ্বিতীয়তঃ—চীনে এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন—চীনের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা চাই। ব্যবসায় যুদ্ধে সফল হয়ে প্রতিযোগী দেশগুলোকে কাবু করতে পারলে চীন অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে।

তৃতীয়তঃ—চীন আশঙ্কা করে যে আগামী বৎসরে পণ্যোৎপাদন আশানুরূপ বেড়ে গেলে সেগুলা বিক্রীত না হলে দেশের কৃষিও শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হ'বে

চতুর্থতঃ—ভারতের প্রতি চীনের যে আক্রোশ সীমান্তের ঘটনায় প্রকাশ পাচ্ছে তাতে অন্যান্য দেশের সমর্থন নাই। তাই যদি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষতি করা যায় তবে একদিকে যেমন আক্রোশ প্রকাশ করা সম্ভব, অন্যদিকে নিজেদের বাণিজ্যের প্রসার করে দেশের উন্নতি করা সম্ভব।

চারটী উল্লেখযোগ্য পথে এই বাণিজ্য যুদ্ধ চালাবে চীন।

(১) ভারতের বাণিজ্য জাহাজের যোগানে কারসাজী করে—

(২) ভারতের বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য খর্ব করে—

(৩) তৈলবীজ রপ্তানী ব্যাহত করে।

(৪) চা রপ্তানী বাণিজ্য নষ্ট করে।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—এসব পথে চীন কতটা সফলহতে পারে এবং ভারতের কতদূর ক্ষতি হতে পারে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী জাহাজ গুলোর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নিজস্ব পর্য্যাপ্ত জাহাজ না থাকায় জাহাজ ভাড়া বাবদ ভারত প্রতি বছর অনেক টাকা ব্যয় করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই আপাত-অদৃশ্য আমদানী সামগ্রীটী ভারতের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা টেনে নেয়। চীনও প্রচুর জাহাজ ভাড়া করে। গত বছর চীন ডাম্পিং নীতি ত্যাগ করায় লণ্ডনের বাজারে জাহাজ ভাড়া কমে গেল। এতে ভারতের সুবিধা হয়েছিল খুব। লণ্ডনের বালটিক এক্সচেঞ্জ জাহাজ ভাড়ার বৃহত্তম কেন্দ্র। চীনা বাণিজ্য প্রতিনিধিরা সম্প্রতি এখানে অধিকমাত্রায় জাহাজ ভাড়া করতে সুরু করেছে। এর ফলে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে দুই ভাবে। জাহাজের যোগান কমে যাওয়ায় এবং চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে ভাড়া বেড়ে গেছে। চীন এই জাহাজ ভাড়ার ব্যাপারে এত তৎপর হয়েছে যে শুধু লণ্ডনের বাজারেই নয়, নরওয়ের জাহাজমালিকদের কাছেও সরাসরি আবেদন সুরু করে দিয়েছে। এর ফলে বাল্টিক এক্সচেঞ্জে ভাড়ার সূচক-সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় পথ হ'ল বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য। ভারত বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে প্রতি বছর। ভারতীয় বস্ত্রের আমদানীকারী দেশগুলোর মধ্যে মধ্য-এশিয়া ও দঃ পূঃ এশিয়ার দেশগুলো অন্যতম, চীন ঐদেশ গুলোতে ভীষণ প্রতিযোগিতা সুরু করেছে। চীনের বস্ত্রশিল্পে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভারতের চেয়েও চীন কম মূল্যে বস্ত্র সরবরাহ করতে পারবে। ভারতের উৎপাদন-মূল্য একটু বেশী। প্রতিযোগিতা করতে হলে এ বিষয়ে ভারতকে আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হ'বে। কিন্তু তাহা সময়-সাপেক্ষ। তাই চীন এদিকে ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে।

তৃতীয় পথ হ'ল ভারতের চা রপ্তানী ক্ষেত্র। ভারতের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ⅓ অংশ আসে চা রপ্তানী হতে। চা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। কালো চা ও সবুজ চা। ভারতে প্রধানতঃ কালো চা ই বেশী উৎপন্ন হয়। গুণে ও স্বাদে সবুজ চা উৎকৃষ্টতর। চীন সবুজ-চা ও কালো-চা প্রায় সমানই উৎপন্ন করে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে—বিশেষ করে রাশিয়ায় এই সবুজ চা বেশ প্রিয়। এ ভাবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই আছে। সম্প্রতি প্রায় ৩০০০০ বাক্স চা লণ্ডনে চীন থেকে পাঠান হয়। এর দাম ভারতের চায়ের দামের অর্দ্ধেকের ও কম। ক্রেতা মাত্রই কম মূল্যে ভাল জিনিষ চায়। চীনের এই ডাম্পিং নীতি চালু থাকলে ভারত ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে

চতুর্থ পথ হ'ল তৈলবীজ রপ্তানীর ক্ষেত্রে। ভারত শুধু তৈলবীজ উৎপাদনেই নয়—রপ্তানীতেও উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে পৃথিবীতে। চীন ও ভারতের মধ্যে জল বায়ুর সাদৃশ্যের কথা আগেই বলা হ'ল মৃত্তিকার সাদৃশ্য ও রয়েছে। চীন ও তৈলবীজ উৎপাদনে অগ্রণী, উন্নত


দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
RP.164-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

প্রচেষ্টায় এই তৈলবীজ উৎপাদন আরও বাড়িয়ে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে পারে। শিল্পপ্রধান মহাদেশীয় দেশগুলোতে তৈলবীজের চাহিদা খুব। সেখানে চীন একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই ভারতের তৈলবীজ রপ্তানীরও ক্ষতি হ'তে পারে। এভাবে বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে যেতে পারে। চীন ভারত বাণিজ্য সংঘাতের এই হ'ল সম্ভাব্য পরিণতি। ভারত সরকার এখন শান্তি-নীতির প্রধান পরিপোষক। তার মনোভাব ও আপোষধর্মী।

অন্য দিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সুরু হয়েছে সংগ্রাম। এক একটী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে দেশের অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের দরুণ পরিকল্পনা ব্যয় অনেক ছাঁটকাট করতে হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের পরিকল্পনা বৈদেশিক মুদ্রার উপর কতটা নির্ভরশীল। তৃতীয় পরিকল্পনা তৈরীর কার্য্য এর মধ্যে সুরু হয়েছে। এর জন্যও আরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হবে। তাই ভারতকে আরও বেশী সজাগ হ'তে হবে। যাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি অব্যাহত থাকে তার জন্য যথাযথ উপায় গ্রহণ করতে হ'বে। এই উপায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

(১) জাহাজ তৈরী বৃদ্ধি করা, যাতে মধ্য-প্রাচ্য ও নিকটও সুদুর প্রাচ্যের বর্ত্তমান দুইটী শিপিং কর্পোরেশন ছাড়াও আর একটী কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(২) বস্ত্র-শিল্পের সুসংগঠন।

(৩) মূলধনী সামগ্রী রপ্তানিকারী দেশগুলোর সঙ্গে অধিকতর বাণিজ্য বন্ধন।

(৪) রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমান।

(৫) রপ্তানীতে সরকারী সাহায্য দেওয়া—

(৬) শিল্পের বিভিন্নমুখী প্রসার এবং

(৭) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার।

এই ভাবে এগুলে ভারত তার অর্থনৈতিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করতে পারবে।

সে পাখীকে দেখেছি তো!

শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

সে পাখীকে দেখেছি তো—শ্রাবণের বিশ্রব্ধ সন্ধ্যায়
চাঁদের লণ্ঠন ঢাকা মেঘকরা পূবালী আকাশে,
নিভে আশা গোধূলির ক্ষুব্ধ ম্লান বিদায়ী আভাসে—
গোলাপের স্বপ্নভাঙা ব্যথাক্লিষ্ট রজনীগন্ধায়।
সে পাখীকে দেখেছি তো—ছায়া নীল
কুহেলী তন্দ্রায়,
নিরালায় ঝরে পড়া ব্যর্থলগ্ন চাঁপার সুবাসে,
সেতারের শেষ মীড়ে বকুলের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে,
তমসার তীরে তীরে—মজে-আসা অলকানন্দায়।

তাকে তো দেখিনি আমি বসন্তের দোদুল হিন্দোলে,
দেখিনি তো পূর্ণিমায় সোনাঝরা রাতের বিলাসে,
মল্লিকার গুচ্ছে গুচ্ছে ভ্রমরের মত্ত গুঞ্জরণে।
দেখিনি আনন্দঘন সমুদ্রের তরঙ্গ হিল্লোলে।
প্রস্ফুটিত পদ্মে পদ্মে লুব্ধ মুগ্ধ মধু অভিলাষে,
শষ্পশ্যাম বনতলে সবুজের স্বপ্ন আহরণে।

যৌবন-রাগিণী

দুর্গাদাস সরকার

সবাই বিস্ময় মানে। সংশয় আমারো মনে মনে,
কেন সে-নদীটি শেষে সাগরে না গিয়ে চুপচাপ:
মাটিতে হারালো, আর নিল সেই জড়ের উত্তাপ;
কী কথা লুকানো ছিল ছায়া-ঢাকা মনের গহনে।

একদা সে ছিল শান্ত। ক্ষতি-ক্ষোভ ছিল না কিছুই।
গুণে ও গরিষ্ঠ ছিল সততায় শ্রেয় ততোধিক।
ছাবিবশেও মগ্ন তবু পথ ভোলে যেমন নাবিক—
তেমনি কীভাবে যেন অকস্মাৎ দিল কা'কে যূঁই।

হয়তো পারিনি আমি ঠিক সেই ছেলেটির মতো
কামনা মিশিয়ে দিতে। আমার চল্লিশে আমি জানি
ছিল আশা, ভালবাসা। আমাকে নিয়েই কানাকানি
যা কিছু হয়েছে—তার মিথ্যা কিছু ছিল না অন্তত।
আমাকে সে প্রেম তার একদিন দিয়েছিল নাকি!
সত্য, থাকা মরণেও যৌবনের সম্রাজ্ঞী একাকা!!

অনুবাদ সাহিত্য



একটি পৌরাণিক কাহিনী

[লেখক : স্টিফান জাইগ্]

অনুবাদক—উপমন্যু

চপলমতি জেরুজালেমের অধিবাসীরা আবার শাস্ত্র উপেক্ষা করেছে, আবার তারা দিয়েছে পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয়। জড়-দেবতার পূজায় মেতে উঠেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। শুধু তাই নয়। তারা ঈশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র ক'রতেও দ্বিধা করেনি। সলোমনের তৈরী সেই মন্দিরে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এক ঠাকুর, বলির নামে সুরু করেছে হত্যা। মূক পশুর রক্তে ভেসে যাচ্ছে প্রশস্ত চত্বর।

তাঁরই মন্দিরে তাঁর এই অপমান ঈশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। পুঞ্জীভূত ক্রোধে কেঁপে উঠলেন তিনি। প্রসারিত হ'ল তাঁর বিশাল বাহু, আকাশ বিদীর্ণ ক'রে বজ্রনিনাদে বেজে উঠলো তাঁর কণ্ঠ। নির্বোধ মানুষগুলোর পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এইবার তাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে মৃত্যুর অভিশাপ, ধ্বংস হবে ওই সহর। বজ্রনিনাদে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘোষিত হল ঈশ্বরের এই সঙ্কল্প।

ভূমিকম্পে পৃথিবী ন'ড়ে উঠল, অনন্ত প্লাবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সুরু হল প্রবল বর্ষণ। উত্তাল জলধি বিপুল গর্জনে ফুলে ফেঁপে উঠল, থর থর ক'রে কেঁপে উঠল উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। আকাশের পাখী অজ্ঞান হ'য়ে আছড়ে পড়ল মাটির বুকে। দেবতারা পর্য্যন্ত ভয়ে শিউরে উঠল।

জেরুজালেমের আকাশেও বাজল সেই বজ্রনির্ঘোষ। ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনল সেই মূঢ় অধিবাসীরা, কিন্তু কেউই তারা বুঝল না তার অন্তর্নিহিত অর্থ। তারা জানলনা যে তাদের ধ্বংসের জন্য এই আয়োজন। তারপর পায়ের তলায় মাটি উঠল কেঁপে, মাথার ওপর মধ্যাহ্নের সূর্য্য ঢাকা পড়ল কালো মেঘে, সহর আচ্ছন্ন ক'রে নেমে এল মধ্যরাত্রির অন্ধকার। প্রবল ঝড়ে চোখের সামনে ছিন্নমূল লতার মত লুটিয়ে পড়ল উন্নতশীর্ষ দেবদারুশ্রেণী। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের দল প্রাণ ভয়ে আশ্রয় নিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। ঝড়ের প্রচণ্ড নর্তনে, বৃষ্টির প্রবল বর্ষণে সেখানেও তাড়া ক'রে এল মৃত্যু। শেষ মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর্ত মানুষের দল করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করল ঈশ্বরের করুণা। ঈশ্বর কিন্তু নিরুত্তর। প্রকৃতির উদ্দামতায় সঞ্চারিত হল নূতন বেগ, অন্ধকার হল গাঢ়তর।

সেই প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে শুধু পৃথিবী নড়ে উঠলো না, নড়ে উঠলো মাটির তলায় কবরের শীতল শান্তিতে শয়ান মৃতের দল। ঘুমিয়ে ছিল তারা শেষ বিচারের অপেক্ষায়। বজ্রধ্বনিতে জেগে উঠে ভাবল—এসেছে বুঝি সেই বহু-প্রতীক্ষিত পরম মুহূর্ত, আকাশ জুড়ে বেজে উঠেছে দামামা তারই ঘোষণায়। সেই অসংখ্য সদ্যজাগ্রত আত্মা প্রলয় উপেক্ষা ক'রে অসীম শূন্য পার হ'য়ে এসে দাঁড়াল স্বর্গের সীমানায়। প্রকৃত ব্যাপার শুনে তারা যেমন হতাশ হ'ল, তেমনি আশঙ্কিত হ'ল তাদেরই বংশধরদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে। সকলে তখন সমস্বরে জানাল প্রার্থনা—"হে ঈশ্বর! রক্ষা কর এই অবোধ সন্তানদের, রক্ষা কর সহর জেরুজালেম।" আবার বজ্রনিনাদে ভেসে এল ঈশ্বরের উত্তর—"এদের পাপ আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। ভালবাসা এদের কাছে ব্যর্থ হয়েছে, ধ্বংসই এদের একমাত্র প্রাপ্য।"

পূর্বপুরুষের দল ব্যর্থ হ'য়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন। তখন নিবেদন জানালেন মুসা-প্রমুখ মহাপুরুষরা। কিন্তু কোনো ফল হ'লনা। ঈশ্বর তাঁর সঙ্কল্পে রইলেন অটল,

অনড়। আকাশের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুতের ঝলক। প্রলয় গর্জনে ডুবে গেল সব প্রার্থনা। সকলেই বুঝল ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, ধ্বংস আসন্ন।

ঈশ্বরের অগ্নিস্রাবী ক্রোধের সামনে আর কারুরই সাহস নেই মুখ তুলে দাঁড়াবার। সাধু, সন্ত, মহাপুরুষ সকলেই ম্রিয়মান, কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করছেন, মর্ত-বাসী উত্তরপুরুষদের মর্মন্তুদ পরিণতি। এমন সময় সাহসে নির্ভর ক'রে এগিয়ে এল এক নারীর আত্মা। ইহুদীদের মাতৃপ্রধানা র‍্যাচেলের প্রাণ সন্তানদের আসন্ন দুর্ভাগ্য ভেবে কেঁদে উঠল। সব বাধা অমান্য ক'রে নির্ভয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন ঈশ্বরের পদপ্রান্তে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জানালেন তাঁর নিবেদন—

"হে সর্বশক্তিমান! আমার ক্ষুদ্র বক্ষে সাহস নেই তোমার সামনে আসবার, কম্পিত ওষ্ঠে ভাষা নেই তোমার সম্বোধনের। তবু আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে—এই ভীরুতা যেমন তোমারই দান, তেমনি তুমিই আমার কণ্ঠে এনে দেবে প্রার্থনার ভাষা। আমার সন্তানরা আজ বিপন্ন, আমি মা, আমি কি পারি স্থির হ'য়ে বসে থাকতে! আমি মূর্খ নারী, আমি জানিনা তোমার ক্রোধ উপশমের উপায়। আমি শুধু জানি যে তুমি সর্বনিয়ন্তা, তুমি চেয়েছ ব'লেই আমি এসেছি তোমার সম্মুখে; তুমি ভাবগ্রাহী, তাই আমার ভাষা যতই দুর্বল হোক, তুমি বুঝবে আমার অন্তরের আর্তিটুকু।"

এইটুকু ব'লে ক্লান্ত র‍্যাচেল নোয়ালেন তাঁর মাথা! ব্যর্থ হ'লনা তাঁর আন্তরিক আবেদন। ঈশ্বর প্রশমিত করলেন তাঁর ক্রোধ, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন এই শোকার্তা মায়ের বক্তব্য শুনবেন ব'লে।

ঈশ্বর দাঁড়িয়েছেন স্তব্ধ হ'য়ে, সঙ্গে সঙ্গে সৌরজগতে নেমে এল অসীম শূন্যতা, বিশ্বচরাচরে থেমে গেল প্রাণের স্পন্দন। আর বাতাসের বেগ নেই, নেই বজ্রের গর্জন। মাটীর বুকে প্রাণীরা নিশ্চল, উড়ন্ত পাখীর পাখা গেছে গুটিয়ে। সব স্থির, রুদ্ধশ্বাস। কালের গতি হয়েছে রুদ্ধ, দেবশিশুর দল দাঁড়িয়ে আছে পাষাণবৎ স্থাণু হয়ে। সূর্য্য, চন্দ্র তারকারাশি চক্রপথে হঠাৎ দাঁড়িয়েছে থেমে, নদীর স্রোতে নেমেছে নিদ্রার নিশ্চলতা।

ঘটছে তাদের কেন্দ্র ক'রে। মাটীর মানুষ তারা, কেমন ক'রে তারা কল্পনা করবে স্বর্গের এই অপূর্ব পরিবেশ। তারা শুধু অবাক হ'য়ে দেখল—হঠাৎ ঝড় গিয়েছে থেমে, কম্পন হয়েছে স্তব্ধ। আশায় উদ্বেল হয়ে সকলে তাকাল আকাশের পানে। কিন্তু হায়, সেখানে মসীকৃষ্ণ মেঘ ঘন হ'য়ে জমে আছে, যেন দিগন্ত জুড়ে বিছানো রয়েছে একটা শবাধারের আবরণ। অন্ধকার ধীরে ধীরে মেলছে তার মৃত্যু-শীতল ছায়া, নেমে আসছে প্রাক্-প্রলয় স্তব্ধতা, অন্তরীক্ষে শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর পদধ্বনি।

ঈশ্বরের এই ভাবান্তর কিন্তু র‍্যাচেলের দেহে জাগাল শক্তি, মনে এনে দিল সাহস। নূতন উদ্দীপনায় তিনি সুরু করলেন তাঁর প্রার্থনা:

"হে ঈশ্বর, তুমি জান যে 'হারান' নামে জনপদের বাসিন্দা লাবানের কন্যা আমি, পিতার মেষ পালনের ভার ছিল আমার ওপর। একদিন সকালে জনকয়েক তরুণী আমরা আমাদের তৃষ্ণার্ত মেষপালকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম এক ঝর্ণার ধারে। ঝর্ণার মুখ চাপা দিয়ে পড়েছিল একটা পাথর। আমরা সকলে চেষ্টা করেও পারলাম না সরাতে সেই পাথর। হতাশ হয়ে ব'সে পড়েছি, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল সুগঠিত দেহ, সুপুরুষ এক পথিক। অবহেলে সে সরিয়ে দিল সেই বিরাট পাথর। তার অসীম শক্তির পরিচয়ে আমরা বিস্মিত হ'লাম। সে তার পরিচয় দিল। তার নাম জেকব, সে আমাদেরই আত্মীয়—আমার পিসী রেবেকার ছেলে। পরিচয় পেয়ে আমি তাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এলাম। এই ক্ষণিক পরিচয়েই আমরা পরস্পরকে ভালবাসলাম। এই নূতন অনুভূতির আবেগে সে রাত্রি আমার চোখে ঘুম এলনা। জেকবের সঙ্গে মিলনের কামনায় শয্যা হল কণ্টক। এই সব কথা আজ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই—কারণ আমি জানি যে মানুষের অন্তরে এই কামনার আগুন তোমারই দান। তোমারই অজ্ঞেয় লীলায় তরুণী উন্মুখ হয় তরুণের বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য, নর আর নারীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় প্রেমের অমৃতলোক। তোমারই করুণায় আমরা পরস্পরকে ভালবাসলাম, দিলাম বিবাহের প্রতিশ্রুতি।"

"হে প্রভু, আমার বাবার স্বভাব তুমি জানতে। কঠিন

আমাকে বিবাহ করার বাসনা। বাবা নিতে চাইলেন প্রথমে তাকে পরখ ক'রে। বাবার বিচারে যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হবে সে পশুর মতো পরিশ্রমী, ধরণীর মতো ধৈর্য্যশীল হওয়া চাই। জেকবকে তাই জানিয়ে দেওয়া হ'ল সাত বৎসর তাকে বাবার অধীনে কাজ করতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই পাওয়া যাবে আমাকে। আড়াল থেকে শুনে আমি আশঙ্কায় কেঁপে উঠলাম। মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কঠিন এই আদেশ শুনে জেকবের মুখ গেল শুকিয়ে। পরিপূর্ণ বিকশিত আমাদের যৌবন, বুকে আমাদের জ্বলছে কামনার আগুন; এই অবস্থায় কেমন ক'রে আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের বিরহ সহ্য করবো। হে প্রভু, অনন্ত কালের বুকে তোমার লীলা, তাই তোমার কাছে সাত বৎসর সাত মুহূর্তের সমান। তোমার একটি পলকে সাত বৎসর সময়ের পাথায় ভর দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তুমি ভুলোনা যে সামান্য মানুষ আমরা, জন্ম আর মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত গণ্ডীতে বাঁধা আমাদের জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামান্য পরমায়ু থেকে খ'সে পড়ছে এক একটি মুক্তার মতো মহামূল্য সঞ্চয়। অনন্ত কালপ্রবাহে একই স্রোতে দু'বার অবগাহন সম্ভব নয়। তাই সেই আদেশ শুনে সাত বৎসর আমাদের সাত জন্মের মত দীর্ঘ মনে হয়েছিল। অকল্পনীয় এই শাস্তি; সাত বৎসর আমরা কাছে কাছে থাকবো, কিন্তু পাবো না পরস্পরকে পাশে। আমাদের রক্তিম ওষ্ঠে উদগ্র চুম্বনের বাসনা প্রতিদিন গোলাপের মতো বৃথাই ফুটবে আর শুকিয়ে ঝ'রে পড়বে। অসহ্য হ'লেও আমরা দুজনেই বাবার এই আদেশ মাথা পেতে নিলাম। এই দীর্ঘ বিরহ যাপনে আমরা স্বীকৃত হ'লাম, কারণ আমরা পরস্পরকে সত্যিই ভালবাসতাম।"

"তুমিই তোমার সৃষ্ট জীবের সত্তা আচ্ছন্ন করেছো কামনার প্রচণ্ড আবেগে, অন্তরে তাদের দিয়েছো ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কেন্দ্র ক'রে নিরন্তর উদ্বেগ। দিন যায় রাত্রি আসে, বয়স যায় বেড়ে, শোনা যায় মৃত্যুর পদধ্বনি। এই অবস্থায় যৌবনের উচ্ছল পাত্র থেকে জীবনের রস আকণ্ঠ পান করবার ইচ্ছাকে দমন কি করা যায়? জানি, তোমার দান এই আগুনে প্রতি মুহূর্তে আমাদের পুড়ে ক্ষয় হ'তে হবে। তা জেনেও, আমরা দু'জন আশায় বুক বাঁধলাম, সুরু করলাম রাত্রির তপস্যা। তোমারই দয়ায় শেষ হ'ল সেই আঁধার রাত, সাত বৎসর শেষ হয়ে দেখা দিল নূতন উষার আলো। মনে হ'লো হঠাৎ পড়েছিলাম ঘুমিয়ে, জেগে দেখি স্বপ্নের সোনার তরীতে পার হ'য়ে এসেছি সাত বছরের কাল-সমুদ্র।"

"সেই নূতন উষার আলো আমার হাসিতে মিশিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালাম, আসন্ন উৎসবের আয়োজন প্রার্থনা করলাম। বাবার মুখে কিন্তু আনন্দের সামান্যতম রেখাও পড়ল না। বর্ষার আকাশের মত থমথমে সেই মুখ থেকে বজ্রের মত বার হ'ল দুটি কথা "লিয়াকে ডাক। আমার ভগ্নী লিয়া।"

"হে সর্বনিয়ন্তা, তুমি জান—লিয়া আমার চেয়ে বয়সে দু'বছর বড় হ'লে, কুরূপের জন্য তখনও তার বিয়ে হয়নি। জীবনের এই ব্যর্থতায় বেচারি ভেঙ্গে পড়েছিল। তার এই ব্যর্থতার জন্যই তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। তার স্বভাবটি ছিল সুন্দর, তাই তার প্রতি আমার স্নেহের সীমা ছিল না। তবু কেন জানি না, বাবার আদেশ শুনেই আমার মনে হলো—জেকবকে আর আমাকে ঠকাবার জন্য কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। তাই লিয়াকে ডেকে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম বাবার সঙ্গে তার কথোপকথন। বাবার কণ্ঠ শোনা গেল:

লিয়া, তুমি জান সে জেকব র‍্যাচেলকে বিয়ে করবার আশায় আমার অধীনে সাত বৎসর কাজ করেছে। তার কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তবুও তার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করবোনা। তোমার আগে তোমার ছোট বোনের বিয়ে হবে, এমন অসামাজিক ব্যবস্থায় আমি সম্মত হ'তে পারিনা। প্রত্যেক নর আর নারী—জনক আর জননী হ'য়ে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখবে—এই হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশ। মানুষ না থাকলে কে করবে সেই সৃষ্টিকর্তার বন্দনা? মাটি শস্যশ্যামলা হবে, নারী সন্তানবতী হবে—এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার ক্ষেত্রেই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? তাই আমি স্থির করেছি তোমার সঙ্গেই জেকবের বিবাহ হবে। তুমি প্রস্তুত হও। অবগুণ্ঠিত বধূ তোমাকে জেকব সন্দেহ মাত্র না করে র‍্যাচেল ভেবে বিয়ে করবে। কথার শেষে দেখলাম বাবার মুখে খুসীর হাসি আর লিয়া লজ্জায় নতমুখী।

"কিন্তু এই পরামর্শ শুনতে শুনতে বাবা আর বোনের প্রতি ক্রোধে আক্রোশে আমি দিশেহারা হলাম। হে প্রভু, কন্যার কর্তব্য, ভগ্নীর দায়িত্ব থেকে চ্যুত হওয়ার সেই অপরাধ ক্ষমা কর; একবার বিচার কর আমাদের ছুটি তৃষিত অন্তরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা, জেকবের কঠোর পরিশ্রম—আর তারই প্রতিদান এই প্রতারণা, আমার প্রাণাধিককে ছিনিয়ে নেবার এই ষড়যন্ত্র। আমি আমার বাবার বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধ-পরিকর হ'লাম, ঠিক আজ যেমন জেরুজালেমে তোমার সন্তানেরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তেমনি। হে সর্বনিয়ন্তা, মানুষের এই মনোবৃত্তি তোমারই দান। স্নেহের, সুবিচারের অভাব বোধ হ'লেই আমাদের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। তখুনি আমি গোপনে জেকবকে জানালাম এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী। বাবার অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য আমরা প্রস্তুত হ'লাম। মতলব আমিই দিলাম। স্থির হ'ল নববধূ বাসর ঘরে প্রবেশের পূর্বে বর-বেশী জেকবের কপোলে তিন বার চুম্বন করবে। যদি না করে তাহলে সে বুঝবে যে অবগুণ্ঠিতা সেই বধূ আমি নই।"

"সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বাবার আদেশে লিয়া বধূবেশে সজ্জিতা হ'ল। যত্ন করে চোখে কাজল আর মুখে রাগরঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া হল; যাতে বাসর ঘরে পরিপূর্ণ মিলনের পূর্বে জেকব তাকে চিনতে না পারে। বিকাল থেকে আমাকে ছুতো ক'রে কাজ দেওয়া হল দূরের খামারে। সেই নির্জন পরিবেশে ঘনায়মান অন্ধকারে আমি পাশবদ্ধা হরিণীর মত ছটফট করতে লাগলাম। হে অন্তর্যামী, তুমি জান যে লিয়ার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দ্বেষ ছিলনা। আমার প্রিয়তম দীর্ঘ সাত বৎসর দাসত্ব করেছে আমাকে পাশে পাবার আশায়। কেন তাকে তার সেই আকাঙ্খিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে! বিবাহের লগ্ন ঘোষণা করে বাজনা বেজে উঠল। কামনার অগ্নি আবার শতমুখে জ্বলে উঠল আমার রক্তের কণায় কণায়। অচৈতন্য আমি ধুলায় লুটিয়ে পড়লাম।

"জ্ঞান হ'লে দেখলাম বন্দিনী আমি, পরিত্যক্তা আমি। হতাশার ক্লান্তিতে দেহ অবশ, চোখের সামনে যেমন, মনেও তেমনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এমন সময় খামারের দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল হাতে একটি দীপ নিয়ে বধূবেশে লিয়া। কনের আসন ছেড়ে সে চুপিসাড়ে পালিয়ে এসেছে। ক্রোধে ঘৃণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। লিয়া আরো কাছে এসে আমার মাথায় দিল তার হাতের স্পর্শ। কেন জানিনা আমি চোখ ফেরালাম, প্রদীপের মৃদু আলোয় দেখলাম লিয়ার মুখখানি। মৃতের মত পাংশু সেই মুখ দেখে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে উথলে উঠল এক পৈশাচিক আনন্দের ঢেউ। তা'হলে সেই বিশেষ মুহূর্তে শুধু আমার নয়—লিয়ার মনেও জ্বলছে আগুন—অশান্তির আগুন। আমার এই বিরুদ্ধ মনোভাব কিন্তু তার চোখে ধরা পড়লনা। এক মায়ের কোলে আমরা মানুষ হয়েছি, আশৈশব দুজনে ভাগ করে নিয়েছি সুখ আর দুঃখ। কাছে এসে স্নেহময়ী দিদির মত সে আমায় বুকে টেনে নিলে, কানের কাছে মুখ এনে কম্পিত স্বরে জানালে তার মনের ব্যথা:

"বাবার এই চাতুরীর ফল কি হবে ভাই র‍্যাচেল? আমার এ সব মোটেই ভাল লাগছে না। জেকব তোমাকে ভালোবাসে, তবু কেন তাকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র; তোমার বদলে কেমন ক'রে আমি তাকে বরণ করবো? ভয়ে আমার বুক কাঁপছে, কারণ আমি জানি যে এই প্রতারণা তার চোখ এড়াবে না। তারপর সে যদি আমায় বাসর ঘর থেকে বার ক'রে দেয়! সে অপমানের লজ্জা আমি ঢাকবো কেমন ক'রে! আমায় দেখে সকলে কৌতুক করবে। আমার কাহিনী কুৎসিত লিয়ার বিবাহ-প্রচেষ্টার মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী-বংশপরম্পরায় সকলের হাসির খোরাক জোগাবে। ভাই র‍্যাচেল, তুমিই বল এখন আমি কি করবো? আমি কি এই বিবাহে সম্মতি দেব—না দেব না—বাবার বিরুদ্ধাচরণ করবো? আর যদি বিয়ে হয়ই—কেমন ক'রে বাসর-শয্যার পূর্বে জেকবের চোখকে ফাঁকি দেব? তুমি আমায় এই সঙ্কটে সাহায্য কর র‍্যাচেল, ঈশ্বর সাক্ষী করে আজ আমি তোমার কাছে সহযোগিতা চাইছি!

র‍্যাচেলের সমস্যার, তার সঙ্কট-কাহিনী শুনে আমি

বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি। বরঞ্চ খুসীই হচ্ছিলাম। এমন সময় তার মুখে উচ্চারিত হ'ল তোমার মধুর নাম। আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার অন্তরে উথলে উঠল স্নেহের প্রস্রবণ, নিভে গেল ক্রোধের ঈর্ষার আগুন। তোমার করুণার স্পর্শ অনুভব করলাম হৃদয়ে, অন্তরের অন্ধকার এক মুহূর্তে মুছে গেল দিব্য আলোর ঝলকানিতে। হে প্রেমময়, এ তোমারই লীলা। হঠাৎ কোন সোনার কাঠির পরশে আমাদের মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, অপরের ব্যথায় মনে হয় নিজেরই ব্যথা, বুক ভ'রে যায় স্নেহে, সহানুভূতিতে, অপরের দুঃখে আমরা ফেলি চোখের জল। আর সেই পরম লগ্নে নেমে আসে তোমার আশার্বাদ, দূর হ'য়ে যায় মানুষে মানুষে ভেদ, ঘুচে যায় সব শত্রুতা। সেদিন তোমার নামের যাদুস্পর্শে জেগে উঠলাম নূতন আমি। তুচ্ছ মনে হ'ল আমার নিজের দুঃখ। লিয়াকে সুখী করবার জন্য আমি উন্মুখ হ'লাম। আজ যেমন আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি আমার এই অশ্রুসিক্ত আবেদন, সেদিনও ঠিক তেমনি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল অশ্রুমুখী লিয়া, আমার সহোদরা লিয়া। সেদিন তার কাতর অনুনয় আমি অমান্য করতে পারিনি। জেকবকে ফাঁকি দেয়ার মন্ত্র তাকে শিখিয়ে দিলাম, বলে দিলাম, বাসর-শয্যায় যাবার আগে বরের কপালে যেন তিনটি চুম্বন দিতে তার ভুল না হয়। তোমার প্রেমের সম্মোহনে, হে লীলাময়, আমি হারালাম আমার প্রেমাস্পদ —এই অভাগিনীর জন্য শুধু রইল ঈর্ষাকে জয় করার সান্ত্বনা।

আমার কাছ থেকে জেকবকে জয়ের মন্ত্র জেনে লিয়া আনন্দে আত্মহারা হ'ল। তার কৃতজ্ঞতার প্রকাশে, আদরের উচ্ছ্বাসে আমি ক্ষণিকের জন্য ভেসে গেলাম। শুধু মনে হ'ল কি অপূর্ব তোমার সৃষ্টি। যেখানেই তোমার বিভূতির সামান্যতম বিকাশ, সেখানেই মানুষের কি বিরাট পরিবর্তন। দুজনেই কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানিনা। এক সময় লিয়া সামলে উঠে দাঁড়াল। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার সে স'রে এল আমার কাছে, আবার শোনা গেল তার কম্পিত কণ্ঠ।

"তুমি যা বললে র‍্যাচেল—আমি ঠিক তাই করবো। কিন্তু তাতেও যদি সে সন্তুষ্ট না হয়? যদি সে আদর আহ্বানের উত্তর না দিলে সে কি মনে করবে? হয়তো বিরক্ত হবে। কিন্তু কথা আমি বলবো কেমন করে? কথা বললেই ধরা প'ড়ে যাব যে আমি র‍্যাচেল নই, আমি লিয়া। তোমার কণ্ঠস্বর আমি পাব কোথা! ভাই র‍্যাচেল, তুমি আমায় আর একটু সাহায্য কর, এই সমস্যার সমাধান ক'রে দাও—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

হে প্রভু, লিয়ার কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল তোমার নাম, তার মুখ দিয়ে তুমিই বোধ হয় কথা বললে। তাই যদি না হবে, তা হ'লে কেমন করে আমি ভেসে গেলাম স্নেহের প্লাবনে, কেমন ক'রে আমার ভেতর এল চরম ত্যাগের প্রবৃত্তি। নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আমি উত্তর দিলাম:

"তুমি শান্ত হও বোন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ সঙ্কটে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হবেনা। আমি বাসরঘরে এখনই গিয়ে শয্যার-শিয়রে পালঙ্কের তলায় লুকিয়ে থাকবো। শয্যায় তোমার সঙ্গে পূর্ণমিলনের পূর্বে জেকব প্রশ্ন করলে আমি মৃদুস্বরে তার উত্তর দেব। প্রথমে মিলনের উত্তেজনায় সে এই ফাঁকিটুকু ধরতে পারবে না। সানন্দে সে তোমাকে টেনে নেবে তার বক্ষে—তারপর সহজেই সার্থক হবে তোমাদের পরিপূর্ণ মিলন। তুমি আমার বোন, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি এই ত্যাগ স্বীকার করবো। আমার এই ত্যাগের সাক্ষী থাকবেন সেই সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর—যাতে ভবিষ্যতে আমার উত্তর-পুরুষরা প্রয়োজনের সময় তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়।

এই সেই রাত্রি—আমার জীবনের দীর্ঘতম প্রতীক্ষার, আমার যৌবনের চরমতম পরীক্ষার রাত্রি। পালঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে ব'সে শুনলাম বিবাহের বাজনায় ধ্বনিত হল মিলনের রাগিণী, নাচের ছন্দে, গানের সুরে বাতাস উঠল ভ'রে। এগিয়ে এল কলরোল, দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল বর আর বধু। উঁকি মেরে দেখলাম জেকব থমকে দাঁড়িয়েছে আমার নির্দেশিত সঙ্কেতের আশায়। লিয়া নিখুঁত ভাবে পালন করল আমার উপদেশ। এল মিলনের লগ্ন। প্রিয়ার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে আবেশে বিভোর জেকব শুধাল—র‍্যাচেল, কথা

বিপুল বেদনায় বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আমি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম "বল প্রিয়।" নিশ্চিন্ত জেকব নিমেষে লিয়াকে আচ্ছন্ন করল সাত বৎসরের রুদ্ধ কামনার অশান্ত উচ্ছাসে! হে প্রভু, সেই কাল রাত্রিতে আমার কঠিন পরীক্ষার তুমিই একমাত্র সাক্ষী। আমার চোখের সামনে আমার সর্বস্ব চ'লে গেল অন্যের অধিকারে। হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিতে পারতাম জেকবকে, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম তার বুকে। কিছুই পারলাম না। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা নিজের অন্তরের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করলাম, নীরবে ফেললাম চোখের জল। সাত ঘণ্টা মনে হল যেন সাত যুগ। এই অভিজ্ঞতার তুলনায় জেকবের সাত বৎসর প্রতীক্ষা মনে হল অতি তুচ্ছ। তোমারই করুণায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম এই পরীক্ষায়। সাত ঘণ্টা শুধু কেঁদেছি আর তোমারই চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি—"হে অনন্ত ধৈর্যের আধার, আমায় ধৈর্য দাও! হে সর্বশক্তিময়, আমায় শক্তি দাও।"

"ভোরের আলো ফুটতেই ক্লান্ত পদে ছেড়ে এলাম সেই ঘর। নবদম্পতি তখনো সুখনিদ্রায় মগ্ন। নিজের ঘরে ফিরে এসেও অশান্তি যায়না! জানি এখনই ধরা পড়বে সব চাতুরী—আর তখন সুরু হবে জেকবের তাণ্ডব। হলও তাই। একটু পরেই প্রচণ্ড গর্জনে মুক্ত অসি হাতে ছুটে এল জেকব আমার বাবার সন্ধানে। প্রাণভয়ে ভীত বৃদ্ধ বাবা আমাব, সেই ক্ষিপ্ত বীরের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে জানালেন প্রার্থনা "হে ঈশ্বর, বাঁচাও।" তোমারই প্রেরণায় আবার আমার প্রাণ উঠল কেঁদে, ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম জেকব আর বাবার মাঝখানে। জেকবের তখন জ্ঞান ছিলনা, সামনে বাধা পেয়ে সজোরে আঘাত করল আমার দেহে। আমি ছিটকে পড়লাম। সেই আঘাত আমার মনে হল প্রিয়তমের আদর। বক্ষ জুড়ে আমার উথলে উঠল আনন্দের প্লাবন। আমি জানতাম সেই আঘাতের প্রচণ্ডতায় ছিল আমার প্রতি তার প্রেমের গভীরতার প্রকাশ। মুহূর্তে হাতে তার ঝলসে উঠল শাণিত অস্ত্র। চক্ষু বুজে নিজেকে নির্ভয়ে সঁপে দিলাম সেই মৃত্যুরূপী মুক্তির আশায়। সেদিন সেই আঘাতে মৃত্যু হ'লে আমি ঠাঁই পেতাম তোমার পায়ের তলায়।

অবস্থা দেখে প্রেমিক জেকব জেগে উঠল। তার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল। এগিয়ে এসে সে আমাকে তুলে নিল তার বক্ষে, চুম্বন দিয়ে মুছিয়ে দিল আমার আঘাতের যন্ত্রণা। সেদিন আমারই মুখ চেয়ে জেকব শান্ত হল। এক সপ্তাহ পরে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। আমি হলাম তার দ্বিতীয়া পত্নী। কালক্রমে পূর্ণ হল আমার মা হবার কামনা। যত্নে পালন করলাম সন্তান সন্ততি, দিলাম তাদের তোমার নামের অভয়মন্ত্র। হে সর্বশক্তিমান, হে পতিতপাবন, আজ আমার পরম প্রয়োজনে তোমার চরণে এসেছি এই প্রার্থনা নিয়ে "জেকবের মত তুমি তোমার ক্রোধের ঘনঘটা অপসারণ কর, সংবরণ কর তোমার মারণাস্ত্র।" সামান্য এক নারী আমি, আমি যদি লিয়ার প্রতি করুণা দেখাতে পেরে থাকি—সর্বশক্তিমান তুমি, তুমি কেন দয়া করবে না ওই মৃত্যুভীত আমার সন্তানদের। হে প্রভু, আমার সন্তানদের দয়া কর, বাঁচাও জেরুজালেম সহর।

শ্রান্ত নিঃশেষিতশক্তি র‍্যাচেল এই বলে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন অচৈতন্য হ'য়ে। স্বর্গের বাতাসে জেগে রইল তাঁর আর্তির রেশ।

তবুও ঈশ্বরের অন্তরে সাড়া নেই। তিনি তখনো নিরুত্তর। ঈশ্বর স্তব্ধ হলেই থেমে যায় পৃথিবীর প্রাণস্পন্দন। কালের গতি যায় থেমে, পৃথিবীর বুকে নেমে আসে মৃত্যুর অন্ধকার, শোনা যায় প্রলয়ের পদধ্বনি। একমাত্র ঈশ্বরই চৈতন্যময়। তিনি স্তব্ধ হ'লে জীবনের চিহ্ন লুপ্ত হয়, সব গতি রুদ্ধ হয়। ঈশ্বরের স্তব্ধতা অসহ্য, ঈশ্বরের স্তব্ধতাই সৃষ্টির শেষ।

বুকের ওপর স্তব্ধতার এই অসহ্য বোঝার ভারে আবার চৈতন্য ফিরে পেলেন র‍্যাচেল। চারদিকে থমকে গেছে সব। হাওয়া বইছে না, থেমে আসছে প্রাণের স্পন্দন। নিভন্ত প্রদীপের শিখার মত সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে তিনি শেষবার গর্জে উঠলেন। আর প্রার্থনা নয়, প্রার্থনা দিয়ে স্পর্শ করা যাবেনা এই প্রস্তরীভূত স্তব্ধ ঈশ্বরের অন্তর। পুঞ্জীভূত ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ল এই অসহায়া মায়ের কণ্ঠ হ'তে।

হে সর্বব্যাপী ঈশ্বর, তুমি কি বধির? হে সর্বশক্তির আধার, তুমি কি শুনবে না আমার এই প্রার্থনা, আমার

তা'হলে কি আমি এই বুঝবো যে তোমার আর আমার অবস্থায় কোনো ভেদ নেই। আমার প্রিয় জেকব .অন্যের হবে শুনে আমি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরেছিলাম। আমার সন্তানেরা অন্য দেবতার পূজা করছে দেখে তুমিও সেই ঈর্ষায় অভিভূত হয়েছ। তাই যদি না হবে, তাহলে তুমি এখনও নিস্তব্ধ কেন? আমি এক সামান্যা নারী হয়েও তোমারই করুণায় জয় করে ছিলাম সেই ঈর্ষার প্রভাব। আমার সাধ্যমত লিয়ার প্রতি পালন করেছি আমার কর্তব্য; জেকব তার সাধ্যমত আমার প্রতি বর্ষণ করেছে তার করুণা। তুমি বিশ্বের ঈশ্বর, তুমি সবশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা, অনন্ত বিভূতির আধার তুমি, তুমি কেন আজ এই সন্ধিক্ষণে করুণা প্রদর্শনে বিমুখ হবে! আমি স্বীকার করছি যে আমার সন্তানেরা মূর্খের মত কাজ করছে, তারা অন্যায় করেছে। কিন্তু তারা যদি তোমার কাছে, তাদের বিশ্বপিতার কাছে ক্ষমা না পায় তো কোথায় তাদের আশ্রয়? তুমি অনন্ত-শক্তির আধার, তাই তো তোমার ক্ষমাও হবে সর্বব্যাপী। তা যদি না হয় তা'হলে এরপর তোমারই ভক্তরা বলবে— একদিন এই পৃথিবীর এক সামান্যা নারী র‍্যাচেল যে ক্রোধ জয় করতে পেরেছিল, সেই ক্রোধেরই বশীভূত হয়ে ধ্বংসে মেতেছিলেন সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর। তোমার এই অপবাদ আমার সহ্য হবে না। তুমি যদি অনন্ত করুণার আধার না হও, তোমার ক্ষমা যদি সর্বব্যাপী না হয়, তা'হলে তুমি আমার চোখের জলের আল্পনায় আঁকা, সকল দুঃখের প্রদীপ দিয়ে দেখা সেই করুণাঘন ঈশ্বর নও। ধ্বংসরূপী ঈশ্বরকে আমি চিনি না, আমি স্বীকার করি না তোমার এই রুদ্রমূর্তি। তোমার ভক্তেরা ভয়ে মাথা নোয়ায় নোয়াক, আমি মা, সন্তানের মঙ্গল বুকে নিয়ে আমি এই মুহূর্তে রুদ্ররূপী ঈশ্বরকে অস্বীকার করছি। তোমার সদাপ্রসন্ন বদনে শোভা পায় না এই ক্রোধের কালিমা, তোমার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে এই হিংসার জ্বালা বেসুর। তোমার আজকের রূপই যদি সত্য হয়, তা'হলে আমি তোমার পূজা ত্যাগ ক'রে সানন্দে দাঁড়াবো গিয়ে আমার সন্তানদের পাশে, মাথা পেতে নেব তোমার উদ্যত বজ্র। রুদ্ররূপী ঈশ্বরে আমার প্রয়োজন নেই, ঈর্ষায় অভিভূত ঈশ্বরকে আমি ঘৃণা করি। আর তুমি যদি আমার ঈশ্বর, আমার ভক্তির মাধুরী দিয়ে গড়া ঈশ্বর হও, তা'লে এই মুহূর্তে অপসারিত কর তোমার এই তিমিরস্তব্ধ আবরণ, প্রকাশিত হও তোমার করুণাঘন, প্রসন্নবদন, জ্যোতির্ময়রূপে, ক্ষমা কর আমার সন্তানদের, রক্ষা কর জেরুজালেম নগরী।"

বুক নিঙড়ে নিঃসারিত এই বেদনার প্রকাশের পর অচৈতন্য র‍্যাচেল লুটিয়ে পড়লেন ঈশ্বরের পদতলে।

সমাগত দেবতা, অসংখ্য আত্মা, রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষ-মান—এই বুঝি দুর্বিনীতা নারীর অপরাধে সকলের মাথার ওপর নেমে এল উদ্যত বজ্রাগ্নি। ঈশ্বরকে অস্বীকারের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। লক্ষ্যাতীত সর্বনিয়ন্তার হাত থেকে এইবার নেমে আসবে সেই দণ্ডাদেশ—সকলকে গ্রাস করবে মৃত্যুর কালোছায়া। কিন্তু কোথায় সেই সর্বনাশের সঙ্কেত?

সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল র‍্যাচেল মাথা তুলেছেন, চেয়ে আছেন ঈশ্বরের আসনের পানে। ধীরে ধীরে তাঁর মুখমণ্ডল বেষ্টন ক'রে ফুটে উঠছে এক স্বর্গীয় জ্যোতি— রাতের আঁধার ছিন্ন ক'রে ফুটে ওঠা নবারুণের মত। ঘাসের বুকে সদ্যপড়া শিশিরের মত টলটল করছে তাঁর চোখের কোণে দু ফোঁটা অশ্রুবিন্দু—ঠিক যেন নিটোল নির্মল দুটি মুক্তা। কোথা থেকে এল এই আলোর বন্যা? এই প্রশ্নের উত্তর জানেন দেবতারা। ঈশ্বর শুনেছেন র‍্যাচেলের আকুতি, এই নারীর অন্তরে প্রকাশিত হচ্ছেন তাঁর করুণাঘন প্রসন্ন মূর্তিতে। এই নারীই ভালবাসে ঈশ্বরকে, তাই যাঁকে ভালবাসে তাঁর দোষ দেখে স্থির থাকতে পারেনি। নির্ভয়ে প্রকাশ করেছে তার মনের কথা। অকৃত্রিম, অনির্বাণ এই প্রেমের প্রতিদানে ঈশ্বর অসীম স্নেহে নিঃশেষে ঢেলে দিলেন তাঁর করুণার আলো। দিগন্ত উদ্ভাসিত হল সেই জ্যোতির প্লাবনে, আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে নেমে এল আনন্দের প্রস্রবণ। দেবদূতের দল আবার নির্ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল, অসংখ্য আত্মার আননে ফুটলো হাসি—সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠল ঈশ্বর-বন্দনা।

মাটির পৃথিবীতে মৃত্যুভীত মানুষের দল তখনো জানেনা স্বর্গের এই অবটনের কথা। কম্পিত বক্ষে তারা দাঁড়িয়ে-ছিল আসন্ন শেষের প্রতীক্ষায়। এমন সময় সেই পাষাণ-কঠিন স্তব্ধতা ভেদ করে শোনা গেল প্রাণের মর্মর, মাথার ওপর ঘনায়মান কালো মেঘের রাশি ছিন্ন ক'রে ভেঙে পড়ল আলোর ঢেউ। ধীরে ধীরে দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে ফুটে উঠলো একটি সাত-রঙা রামধনু—আলোর বুকে মায়ের মুখের হাসি।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

(৬)

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী

সমরকন্দ ও আন্দেজান পুনরুদ্ধারের জন্য বারবার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়ে আবার খোজেন্দে ফিরে আসি। খোজেন্দ অতি ক্ষুদ্র স্থান। এর ওপর দুইশ সৈন্য ভরণপোষণের দায়িত্ব দেওয়া কঠিন। যে লোক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের অভিলাষী, সে কি এমন একটা বিশেষত্বহীন জায়গায় সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল বাস করতে পারে?

এইখানে থাকার সময় খোজা মকারাম আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনিও আমার মত রাজ্যথেকে নির্ব্বাসিত একজন ভবঘুরে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। আমার পক্ষে কি এখানে চিরকাল থাকা ঠিক হবে, না অন্য জায়গায় চলে যাব? কি আমার করা উচিত এবং কোনটাই বা করা উচিত নয়? আমার অবস্থা দেখে তিনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমার জন্য খোদার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তিনি প্রস্থান করলেন। আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

সেইদিনই বিকেলের নমাজের পর উপত্যকার প্রান্তে একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। পরিচয় নিয়ে জানা গেল—সে আলি দোস্ত তাগাইয়ের ভৃত্য। তার প্রভুর কাছ থেকে সে এক বার্ত্তা নিয়ে এসেছে। তার মর্ম্ম হলো এই যে—সে নিঃসন্দেহে ভীষণ অপরাধ করেছে। কিন্তু তার এই বিশ্বাস আছে যে আমি তাকে ক্ষমা করবো। যদি আমি সসৈন্যে তার কাছে চলে আসি তাহলে মারঘিনান প্রদেশ আমার হাতে সমর্পণ করে চিরকাল সে আমার অনুগত হয়ে এমন কাজ করে যাবে—যাতে তার অতীত ভুলভ্রান্তির কথা আমার মন থেকে মুছে যাবে এবং সেও তার দুষ্কার্য্যের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে। এই সংবাদ পাবার পরই আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম মারঘিনানের দিকে। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে। মারঘিনানের দূরত্ব প্রায় একশ মাইল। সেই রাত এবং পরদিন দুপুরের নামাজের সময় পর্য্যন্ত কোনও খানেই বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করিনি—একটানা চলে এসেছি। দুপুরের নমাজের সময় একটি গ্রামে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিই। সেখানে ঘোড়াগুলোর কিছুটা শ্রান্তি দূর হলে তাদের খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার পর আবার রওনা হই গভীর রাত্রে। ঘোড়ার পিঠে পথ চলতে থাকি পরদিন ভোর পর্য্যন্ত। তারপর ভোর থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। পরদিন ভোর হতে না হতেই মারঘিনানের চার মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছই। এইখানে আমার পর উইস বেগ এবং আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে আমার কাছে নিবেদন করলেন যে আলিদোস্ত তেঘাইয়ের মত লোক যে নানা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। তার একটি মাত্র কথায় বিশ্বাস করে, দূতের মারফত কোনও রকম কথাবার্ত্তা না চালিয়ে, কোনও চুক্তি সম্পাদন না করে তার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে উচিত হবে? সত্যিই তাঁদের পক্ষে এই ধারণা করা মোটেই অনুচিত নয়। সুতরাং কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করলাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কথা ঠিক হলো যে আমাদের আশঙ্কা অমূলক না হলেও আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করতে অনেক দেরী করে ফেলেছি। তিনদিন তিন রাত্রি কোনও রকম বিশ্রাম না করে ছুটে এসেছি একশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। আমার লোকদের আর ঘোড়াগুলোর দেহে এমন শক্তি নাই যাতে এত দূরের পথে আবার ফিরে যাই। যদিও বা ফেরার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এমন জায়গা চোখে পড়েনা যেখানে নিরাপদে থাকা যেতে পারে। সুতরাং যখন এতদূর চলে আসা হয়েছে তখন আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়াই ভাল। আল্লার যা ইচ্ছা তাই হোক। সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হলাম।

প্রভাতের নমাজের সময় আমরা মারঘিনানের দুর্গ ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হই। ফটক বন্ধ ছিল। আলিদোস্ত তাঘাই ফটকের উপর দাঁড়িয়ে কতকগুলি সর্ত্ত ঠিক করার অভিপ্রায় জানালো। তার সর্ত্তগুলি মেনে নেওয়ার এবং তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়ার পর সে দুর্গ-ফটক খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো এবং আমাকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করে দুর্গের মধ্যে একটি প্রাসাদে সসম্মানে নিয়ে গেল। আমার সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ অনুচরদের সংখ্যা তখন ছিল দুইশ চল্লিশ জন।

দেখলাম—উজ্জন হাসান এই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে এবং অত্যাচারে তাদের জর্জ্জরিত করেছে। সমস্ত দেশবাসী আমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। মারঘিনানে আসার দুই তিন দিন পরেই আমি কাশিম বেগকে একশ সৈন্য সঙ্গে দিয়ে আন্দেজানের দক্ষিণ দিকে পাঠালাম। তাকে নির্দ্দেশ দিলাম যে ঐ স্থানের পার্ব্বত্য এবং সমতল ভূমির জনসাধারণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে—যেন তারা বিনা দ্বিধায় আমার বশ্যতা স্বীকার করে। অনুরোধ যদি তারা উপেক্ষা করে, তাহলে—বলপ্রয়োগ করতেও যেন

দ্বিধা না করা হয়। আমি আরও একদল সৈন্য আখ্‌সির দিকে পাঠালাম এই নির্দেশ দিয়ে—যেন তারা খোজেন্দ নদী অতিক্রম করে আখসির দিকে যায় এবং দুর্গগুলি অধিকারের জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করে। আর পাহাড়ীদের মনোরঞ্জন করে যেন আমাদের দলে আনবার ব্যবস্থা করে।

কয়েকদিন পর উজ্জন হাসান ও তাম্বল আমার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য অগ্রসর হয়। কাশিম বেগ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীকে দুই দিকের কার্য্যভার দিয়ে পাঠিয়েছি। অল্প কয়েক জনই আমার কাছে ছিল। তাদেরই কোনও রকমে অস্ত্রসজ্জিত করে আমরা এগিয়ে গেলাম—যাতে তারা নগরের উপকণ্ঠে না পৌছাতে পারে। শত্রুরা কিছুই করতে পারলো না, দুই দুইবার তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারা দুর্গের ধারে কাছেও আসতে সক্ষম হলো না।

কাশিম বেগ আন্দেজানের দক্ষিণে পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার জনসাধারণকে সম্পূর্ণ বশে আনে। শত্রুপক্ষের সৈন্যরাও একে একে দলত্যাগ করে আমার সঙ্গে যোগ দেয়।

হাসান দেগেচি আখসির একজন মাতব্বর লোক। সে তার নিজের দলবল এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের সংগ্রহ করে শুধু মাত্র লাঠির সাহায্যে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে। তারা ভীত হয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেয়। সেই সময় হাসান দেগেচি আর তার সঙ্গীরা আমার কর্ম্মচারীদের আমন্ত্রণ করে সুরক্ষিত আখসি সহর প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

এই সংবাদ শুনে উজ্জন হাসান ভীত হয়ে তার বাছাই করা লোকজন এবং তার বিশ্বাসী অনুচরদের আখ্‌সি দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠায়। খুব ভোরে নদীর তীরে এসে পৌছায় তারা। যখন এই সংবাদ আমার সৈন্যদের আর মোগলদের জানানো হয়, তখন একদল সৈন্যকে ঘোড়ার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম খুলে নিয়ে নদীতে নামবার আদেশ দেওয়া হয়। অপর পক্ষ যারা দুর্গ রক্ষা করতে এসেছিল তারা কি করবে ঠিক করতে না পেরে নৌকাগুলো টেনে খানিকটা উজানে না নিয়ে যেখানটায় তারা এসে পৌচেছিল সেখানেই নৌকায় চড়ে বসে। ভাটার টানে তাদের নৌকা দুর্গ ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে যায়। তারা ঠিক দুর্গের কাছে পৌছতে পারেনা। আমার সৈন্য আর মোগলরা ঘোড়া থেকে সাজ সরঞ্জাম খুলে প্রস্তুত হয়েই ছিল—তারা নানা দিক থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রুপক্ষের লোক যারা নৌকায় ছিল তারা ভীত হয়ে এ আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না। কার্য্যোখাজ বক্‌সি মোগল বেগের এক ছেলেকে তার কাছে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। সেই ছেলেটি বক্‌সি কি বলতে চায় শুনবার জন্য নির্ভয়ে তার কাছে যায়। বক্‌সি ছেলেটির হাত ধরে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে। এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লো। আমাদের লোকেরা যারা জলে নেমেছিল তারা শত্রুপক্ষের যারা নৌকায় ছিল তাদের ডাঙ্গায় টেনে নামিয়ে—তাদের প্রায় সবাইকেই জবাই করলো। উজ্জন হাসানের বিশ্বস্ত ভৃত্য যারা নৌকায় ছিল তাদের মধ্যে মাত্র একজন রক্ষা পেল—কারণ সে কবুল করেছিল যে সে একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর একজনও বেঁচে গিয়েছিল—তার নাম সৈয়দ আলি। সে এখনও আমার কাছেই উঁচুপদে বহাল আছে। সত্তর-আশি জনের মধ্যে পাঁচ ছয় জনের বেশী এ যাত্রায় রক্ষা পায়নি।

আন্দেজান আমারই রাজ্য—এই ঘোষণার পর বিদ্রোহীরা শান্ত হতে বাধ্য হলো। মহান্ আল্লার দয়ায় ১৪৯৯ সালের জেল্‌কাদ্ মাসে আমার পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করি—যা থেকে প্রায় দুই বৎসর আমি বঞ্চিত ছিলাম।

উজ্জন হাসান আন্দাজানে প্রবেশ করতে ব্যর্থকাম হয়ে আখ্‌সির দিকে ফিরে গেল। সংবাদ পেলাম সে আখ্‌সি দুর্গে প্রবেশ করেছে। সেই ছিল বিদ্রোহের নেতা। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে চার-পাঁচ দিন পরই আখ্‌সির দিকে অভিযান চালাই। আমরা সেখানে পৌছানো মাত্র আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে সে দুর্গ সমর্পণের প্রস্তাব করে এবং তার নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে দুর্গের অধিকার ছেড়ে দেয়।

উজ্জন হাসানকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে তার জীবনের অথবা সম্পত্তির কোনও ক্ষতি করবো না। সুতরাং তাকে আখ্‌সি পরিত্যাগ করে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সে হিসারের দিকে চলে যায়। তার দলের বেশীর ভাগ সৈন্য ও অনুচর তার দল পরিত্যাগ করে। এরাই আগেকার গোলযোগ ও বিদ্রোহের সময় আমার অনুগামীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার ও তাদের ধন সম্পত্তি লুঠ-তরাজ করেছিল। আমার আমিরদের মধ্যে কয়েকজন আমার কাছে সমবেতভাবে প্রার্থনা জানায় যে এই দলটিই যত নষ্টামির মূল এবং নানা ঝঞ্ঝাট সৃষ্টির কারণ। এরাই আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করেছে। এরাই আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়েছে। এরা তাদের প্রধানদের প্রতি এমন কি আনুগত্য দেখিয়েছে যে তাদের বিশ্বাস করতে হবে? কি অধর্ম্ম হবে যদি এখন এই বিশ্বাসঘাতকদের বন্দী করে তাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করার আদেশ দেওয়া হয়? বিশেষতঃ তারা যখন আমাদেরই ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদেরই পোষাক পরিচ্ছদ পরে জাঁক দেখাচ্ছে, আর আমাদেরই ভেড়া আমাদেরই চোখের সামনে জবাই করে দিব্যি আহারের ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে—এমন ধৈর্য্য কার আছে যারা এই সব দেখেও সহ্য করে যাবে? যদি তুমি করুণা করে এই সব দুর্বৃত্তদের জিনিষপত্র কেড়ে নেওয়ার আদেশ না দাও অথবা সাধারণ-ভাবে লুঠতরাজের অনুমতি দিতে যদি তোমার কোনও দ্বিধা থাকে—তাহলে অন্ততঃ যারা তোমার বিপদে আপদে সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গী হয়ে আছে তাদের মুখ চেয়ে এই অনুমতিটুকু দাও যে তারা যেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি যা এরা লুঠ করেছে এবং যা এখনও তারাই ভোগ করছে সেই-

সর্ত্তটুকু পালন করেই রেহাই পায় তা'হলেও তাদের ভাগ্যের জোর বলে মানতে হবে।

তাদের প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত আমি মেনে নিলাম। আদেশ দেওয়া হলো যে আমার অনুচরেরা—যারা আমার বিপদে বরাবর আমার সহায় ছিল এবং যুদ্ধাভিযানে আমাকে সাহায্য করেছিল—তারা তাদের নিজেদের লুণ্ঠিত জিনিষপত্র সনাক্ত করতে পারলে সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারবে। এই আদেশ মোটের উপর ন্যায় সঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল এবং অনেক ভেবে চিন্তে এই আদেশ জারী করা হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গির মির্জ্জার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যখন আমার এত নিকটে আছে তখন অস্ত্রশস্ত্রধারী অতগুলো লোককে উত্যক্ত করা ঠিক হলো না। যুদ্ধে বা রাজকার্য্যে এমন অনেকগুলো বিষয় আছে—যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ন্যায় সঙ্গত ও সঠিক মনে হলেও, সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে অসংখ্য রকমের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সেগুলো যাচাই করে নেওয়া উচিত। আমার ঐ আদেশ জারি করার ব্যাপারটা দুরদৃষ্টির অভাবেরই পরিচয় দিয়েছিল। তার ফলে কি প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিদ্রোহই না ঘটে গেল! এই অবিবেচনা প্রসূত আদেশের ফলস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে আমাকে দ্বিতীয়বার আন্দেজানের রাজ সিংহাসন হারাতে হয়।

মোগলেরা আতঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহ করলো। আমার মায়ের কাছে দেড় হাজার কি দু হাজার মোগল ছিল, আর প্রায় অতগুলো মোগলও হিসার থেকে এসেছিল মনে হয়। এই মোগলের দল বরাবরই নানা-রকমের অনিষ্ট সৃষ্টির জন্য দায়ী। এ পর্য্যন্ত পাঁচ পাঁচবার তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমার সঙ্গে তাদের মেজাজের কোনও সমতা না থাকায় আমার বিরুদ্ধবাদী তারা হতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপতি খানদের সঙ্গে বরাবর শত্রুতা সাধন করার জন্য তারা সত্যই অপরাধী।

এই বিদ্রোহের সংবাদ আমার কাছে নিয়ে আসেন সুলতান চিনাক্। এই সংবাদ আমাকে জানিয়ে সে আমার খুবই উপকার করে। এই কাজে যদিও সে আমাকে সহায়তা করেছিল কিন্তু শেষটায় সে আমার বিরুদ্ধে এমন সয়তানি করেছিল যাতে ঐ একটি সৎকাজ কেন—ঐ রকম শত কাজের মাহাত্ম্যও মুছে যেত। ভবিষ্যতে অপকর্ম্ম করার প্রবৃত্তির কারণও এই যে—সেও ছিল জাতে মোগল।

বিদ্রোহের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমিরদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা মত প্রকাশ করলো যে এটা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। এ রকম ক্ষুদ্র ব্যাপারে স্বয়ং রাজার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজনই নাই। কাশিম বেগ ও আরও কয়েকজন দলপতিকে কিছু সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেই যথেষ্ট হবে। সিদ্ধান্ত সেই রকমই হলো। তারা মনে করেছিল যে এটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু মর্ম্মান্তিক-ভাবে তাদের এই ভুল ভেঙ্গে গেল।

পরদিন ভোরে দুইপক্ষের সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়ালো। যুদ্ধ আরম্ভ পেয়ে তরবারির দুই তিনটি আঘাত করে—কিন্তু তাকে প্রাণে মারেনি। আমার কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য বীরের মত আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা পরাস্ত হয়। কাশিম বেগ আর তিন চারজন বেগ ও কর্ম্মচারীসহ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। অন্য সব আমির ও কর্ম্মচারীরা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে। এই যুদ্ধে দুইজন অশ্বারোহী সেনা বীরোচিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চালিয়েছিল। আমার পক্ষে সামাদ এবং শত্রুপক্ষের হিসারের একজন মোগল—নাম সা' সওয়ার। তারা সামনা-সামনি যুদ্ধ করে। সা সওয়ার তার তরবারি দিয়ে এমন জোরে সামাদের মাথায় আঘাত করে যে শিরস্ত্রাণ ভেদ করে সেই তরবারি তার মাথার খুলির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করে। এই রকম গুরুতর আঘাত পেয়েও সামাদ তার তরবারি দিয়ে সা' সাওয়ারের মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত হানে যে তার মাথার খুলির অনেকটা অংশ ছিন্ন হয়ে যায়। সা' সাওয়ারের মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল না। তার ক্ষত স্থান তাড়াতাড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। সে প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু সামাদের ক্ষতস্থানের পরিচর্য্যা করার কেউ না থাকায় সে তিন চার দিনের মধ্যেই মারা যায়।

এই পরাজয় আসে অত্যন্ত অসময়ে—যে সময়ে আমি ছোটোখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপর্য্যয়ের পর সবেমাত্র আমার রাজ্য পুনরধিকার করেছি। তাম্বল্ কৃতকার্য্য হওয়ার পর আইসের উঁচু টিলার মুখোমুখি সমতল ক্ষেত্রে আন্দেজানের চার মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছায় এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করে। যাহোক, তার অগ্রগতি বন্ধ হয় এবং সে পিছিয়ে যায়। তার অগ্রগতির সময়ই আমার যে দুইজন আমির তার হাতে ধরা পড়ে তাদের হত্যা করে। মাসখানেক নগর প্রান্তে অপেক্ষা ক'রে কিছুই না করতে পেরে উসের দিকে ফিরে যায়।

১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

এই সময়টায় আমার কয়েকজন কর্ম্মচারীকে খুব তাড়াতাড়ি পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করতে আমার রাজ্যের নানা-স্থানে পাঠাই। সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য মই, কোদাল, কুড়োল এই-রকম নানা আসবাব সংগ্রহ করার জন্যও আদেশ দিই। তারপর ডানে, বাঁয়ে, মধ্যে এবং সম্মুখ ভাগে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ব্যূহ সজ্জিত করে উসের দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য অগ্রসর হই।

মাদু দুর্গ খুবই সুরক্ষিত। উত্তরে যেদিকে নদী সেই দিকের দুর্গের অংশ এমন উঁচু যে নদী থেকে তীর নিক্ষেপ করলে কোনও রকমে দুর্গের দেওয়াল পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। দুর্গের মধ্যে জল সরবরাহের জন্য একটা নালা কাটা হয়েছে নদী থেকে দুর্গ পর্য্যন্ত। দুর্গের তলা থেকে নদী পর্য্যন্ত এই নালা-পথের দুই পাশ প্রাচীরে ঘেরা। নদী কাছে থাকায় দুর্গ রক্ষীরা নদীর তলা থেকে কামানের গোলার মত বড় বড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে দুর্গে জমা করেছিল। মাদু দুর্গ থেকে যে রকম অবিরাম বড় বড় পাথর ছোঁড়া হয়েছিল আমার অন্য কোনও অভিযানের সময়

আবদল কদুস দুর্গ প্রাচীরের নীচে পৌঁছতেই উপর থেকে ছোঁড়া এক পাথরের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে নীচে মাথা ওপরে পা করে সেই উঁচু থেকে গড়াতে গড়াতে কোনও জায়গায় না থেমে নদীতে এসে পড়লেন। ভাগ্য গুণে তিনি বিশেষ কোনও আঘাত পাননি। কোনও রকমে জল থেকে উঠে তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

দুই দিকে প্রাচীরে ঘেরা সুঁড়ি পথে পাথরের নুড়ির আঘাতে ইয়ার আলি গুরুতর আহত হয়। পরে তার মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। শিলাখণ্ডে আহত হয়েছিল আমাদের অনেক সেনাই। প্রাতর্ভোজনের আগেই অভিযান চালিয়ে আমরা জলের উৎসে ধারা অধিকার করতে সক্ষম হই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অভিযান চলে। কিন্তু শত্রুপক্ষের জল সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের আক্রমণে বানচাল হয়ে যাওয়ায় দুর্গরক্ষীগণ দুর্গরক্ষা করা অসম্ভব মনে করে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং অবশেষে আমাদের হাতে দুর্গ সমর্পণ করে।

তাম্বলের ছোট ভাই খলিল ছিল ও পক্ষের সৈন্যদের নায়ক। তাকে এবং তার সহচর সত্তর আশি কিংবা প্রায় একশ কর্ম্মঠ যুবক সৈন্যকে বন্দী করা হ'লো এবং তাদের কড়া নজরে রাখবার জন্য আন্দেজানে পাঠানো হলো। আমার আমির, কর্ম্মচারী ও সৈন্যরা—যারা শত্রুর হাতে পড়েছিল, আমাদের এই বিজয় তাদের পক্ষে সৌভাগ্য স্বরূপ হয়েছিল।

ত্রিশ কি চল্লিশ দিন আমরা প্রায় চুপ করেই ছিলাম। সরাসরি কোনও যুদ্ধ বা আক্রমণ হয়নি। মাঝে মাঝে আমাদেরও শত্রুপক্ষের লুণ্ঠতরাজকারীদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলেছিল। এই সময় আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম রাত্রে সতর্ক পাহারার ব্যাপারে। সৈন্য শিবিরের চারপাশে গড়খাই কাটারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে ট্রেঞ্চ কাটার সম্ভাবনা ছিলনা সেখানে গাছের ডালপালা সাজিয়ে রাখা হ'লো। আমার সৈন্যদের যথারীতি অস্ত্রসজ্জিত করে ট্রেঞ্চের ধারে ধারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কুচকাওয়াজ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তিন চার রাত্রির পর এক এক রাত্রিতে শিবিরে বিপদ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তো এবং সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

এই বছর বাইসনগর মির্জ্জাকে আমন্ত্রণ জানালেন খসরু সা এই ছল করে যে—তাঁরা দুইজন একযোগে বাল্‌খ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যাবেন। খসরু সা তাঁকে নিয়ে আসে কুন্দেজে। সেখান থেকে তাঁরা বাল্‌খ জয় করার জন্য সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। উবজে পৌঁছিয়ে সেই হীন অবিশ্বাসী সয়তান রাজ্যের অধিকার হস্তগত করার জন্য এক নিষ্ঠুর চক্রান্ত করলো। হায়, কি করে রাজলক্ষ্মী এই অপদার্থ ঘৃণ্য জীবের উপর সদয় হলেন—যার না আছে বংশ-মর্য্যাদা, না আছে জন্মের গৌরব, না আছে প্রতিভা, খ্যাতি, জ্ঞানবুদ্ধি, না আছে সাহস, বিচারবুদ্ধি বা ভালমন্দ জ্ঞান? এই সর্পের চেয়েও খল খসরুসা বাইসনগর মির্জ্জা আর তাঁর আমিরদের বন্দী করে ধনুকের সংস্কৃতিসম্পন্ন মিষ্ট স্বভাবের উচ্চবংশের সর্ব্বগুণান্বিত রাজাকে এইভাবে খুন করা হ'লো মহরমের দশদিনের দিন। তাঁর কয়েকজন আমির এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলো না।

শীতকালীন শিবিরে সৈন্যদের রাখার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। যে সব গ্রামে শিবির স্থাপন করা হ'লো তার চারপাশেই সুন্দর শিকারের জায়গা। ইলামিশ নদীর ধারে জঙ্গলে অসংখ্য পাহাড়ি ছাগল, হরিণ আর বুনো শুয়োর। ছোট ছোট জঙ্গল আর ঝোপঝাড় চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে। সেখানে আছে বনমুরগী আর খরগোস। এখানকার মত দ্রুতগতি খেকশেয়াল আমি আর কোথাও দেখিনি। যতদিন আমি শীতকালীন শিবিরে ছিলাম, দুই তিন দিন পর পরই আমি শিকারে বের হতাম। বড় বড় জঙ্গল তাড়িয়ে পাহাড়ি ছাগল আর হরিণ শিকার করতাম। ছোট ছোট ঝোপঝাড় থেকে বুনো মুরগী শিকার করতাম—বন্দুক কিংবা তীর ধনুক দিয়ে। এখানকার বনমুরগী খুব মোটাসোটা। যতদিন আমরা এখানে ছিলাম প্রচুর পরিমাণে বনমুরগীর মাংস খেয়েছি। শীতের শিবিরে চল্লিশ পঞ্চাশ দিন ছিলাম আমরা। আমায় কয়েকজন অনুচরকে এই সময়ে ছুটি দিতে হলো এবং আমিও আন্দেজানে ফিরে যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম।

রাত্তির বেলা শীতটা খুব বেশী পড়তো। এমন হ'লো যে আমার অনুচরদের মধ্যে অনেকের হাত পায়ে তুষারক্ষত দেখা গেল। কয়েক জনের কান শুক্‌নো আপেলের মত কুকড়িয়ে শুকিয়ে যাওয়ার মত হ'লো।

তাম্বল আমার অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তার বড়ভাইকে সাহায্য করার জন্য দ্রুতগতিতে সসৈন্যে বেরিয়ে এলো। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়টায় নৌকেন্দের দিকটা ধূলোয় আঁধার হয়ে আসছে এই অবস্থা দেখে বোঝা গেল যে তাম্বলের সৈন্য এগিয়ে আস্‌ছে। তার বড়ভাইয়ের অকারণে পশ্চাদপসরণের এবং আমার অগ্রগতির সংবাদে হতবুদ্ধি ও বিব্রত হয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আমি বল্লাম এ সেই দয়াময় খোদার কাজ—যিনি এখানে নিয়ে এসেছেন শুধু ওদের ঘোড়াগুলোর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ার জন্য। আমরা এগিয়ে যাব। আল্লার দয়ায় শত্রুপক্ষের যারা আমাদের হাতে পড়বে তারা আর নিষ্কৃতি পাবে না।

লাঘারি এবং আরও কয়েকজন কিন্তু নিবেদন করলো—হুজুর, দিনের আলো নিভে আসছে, রাত হতে আর বেশী দেরী নাই। যদি আমরা এখনই আক্রমণ না করি সেইটেই ভাল হবে। কারণ রাত্রে ওদের সরে পড়বার কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। তারপর আমরা যেখানে ওদের দেখা পাব সেখানেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।

এই উপদেশ অনুসারেই কাজ হলো—তখনই তাদের আর আক্রমণ করা হলো না। যখন সৌভাগ্যবশতঃ শত্রু হাতের মুঠিয়

সয়ে পড়বার সুযোগ করে দিলাম আমরা।

কথায় আছে :—

'যখন হাতের কাছে সুযোগ আসে
তক্‌খুনি তা ধরবে।
সে সুযোগ যদি হেলায় হারাও
সারা জীবন ভুগবে।'
অসময়ে যে অলস কাজ সুরু করে
সে কাজ নিষ্ফল হয় তার।
কর্ম্মী যে জন, ঝাঁপ দিয়ে সুযোগ সে ধরে
পূর্ণ তার জীবন সম্ভার।

কয়েকটি সর্ত্তে সন্ধি চুক্তি করা হ'লো। আগসির দিকের দেশগুলি জাহাঙ্গির মির্জ্জার দখলে থাকবে, আর আন্দেজানের দিকের দেশগুলি থাকবে আমার অধিকারে। আমাদের এলাকাগুলির বিধি ব্যবস্থা শেষ করে আমি আর জাহাঙ্গির মির্জ্জা সম্মিলিত হয়ে একযোগে সমরকন্দ আক্রমণ করবো।

সুলতান আমেদের কন্যা আইসা সুলতান বেগমের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা আমার বাবা ও কাকার জীবিতাবস্থাতেই পাকাপাকি ঠিক হয়েছিল। খোজেন্দে পৌঁছিয়েই শ্রাবণ মাসে তাকে বিয়ে করি। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে তার প্রতি আমার ভালবাসা খুব গভীর হলেও লজ্জায় তার কাছে সব সময়ে যেতে পারিনি—দশ পনরো কিংবা বিশ দিনের মধ্যে এক একবার যেতাম। পরে অবশ্য আমার ভালবাসায় মন্দা পড়ে এলো, আর আমার লজ্জাও বেড়ে গেলো। ফলে মা রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আমাকে তিরস্কার করে তার কাছে জোর করে পাঠাতে লাগলেন। আমিও তখন অপরাধীর মত স্ত্রীর কাছে ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পর এক একবার যেতাম।

এই অবসর সময়ে ক্যাম্প বাজারের একটি ছেলের সাথে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে যায়। তার প্রতি আমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি। তার নাম বাবুরি। আমার নামের সঙ্গে তার নামের অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল।

'গভীর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি
মুগ্ধ হলাম, পাগল হলাম,
মনের কথা জানেন অন্তর্যামী।'

এর আগে আমি কারও প্রতি এমন উগ্র ভালবাসা বা আকর্ষণ অনুভব করিনি। বলতে কি ভালবাসা কিংবা উগ্র কামনার অভিজ্ঞতা আমার এর আগে কোনও দিনই হয়নি এবং কারও কাছ থেকে শুনিও নি। এই অবস্থায় পড়ে ফারসীতে কয়েকটি কবিতা লিখি তার মধ্যে একটি এই—

'কোন প্রেমিক বল আমার মত মুগ্ধ,
প্রেমানলে এমন ভাবে দগ্ধ।
আমার মত অসম্মানের পশরা কেবা বয়!
কে দেখেছে এমন পাষাণ হিয়া
কেন এমন ঘৃণা? কেন নাইকো মায়া?
করো দয়া, নইলে আমার প্রাণ যে রাখা দায়।'

কখনও কখনও এমন হয়েছে যে বাবুরি আমার কাছে এসেছে, কিন্তু আমি লজ্জায় সোজা-সুজি তার মুখের দিকে চাইতে পারিনি। তাহলে কেমন করে তাকে আমার কামনা আর প্রেমের কথা মুখ ফুটে বলে মনের গুরুভার হাল্‌কা করতে পারি? এমনি বিপর্য্যয়কর মনের মত্ত অবস্থা আমার তখন যে—সে যখন আমার কাছে আসতো তখন তাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি—আর যখন সে চলে যেত তখনও কোন অভিযোগের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। আমার এই প্রেমবিহ্বল অবস্থায় একদিন কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে আমি এক সরু গলিপথের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখোমুখি বাবুরির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই অতর্কিত সাক্ষাৎ আমার মনের ওপর এমন ঘা দিল যে, আমার অস্তিত্বকে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল। আমি চোখ তুলে তার মুখের দিকে চাইবো অথবা একটা কথা তাকে বলবো এমন অবস্থা আমার ছিল না। মনে পড়লো মহম্মদ সেখের কবিতাটি—

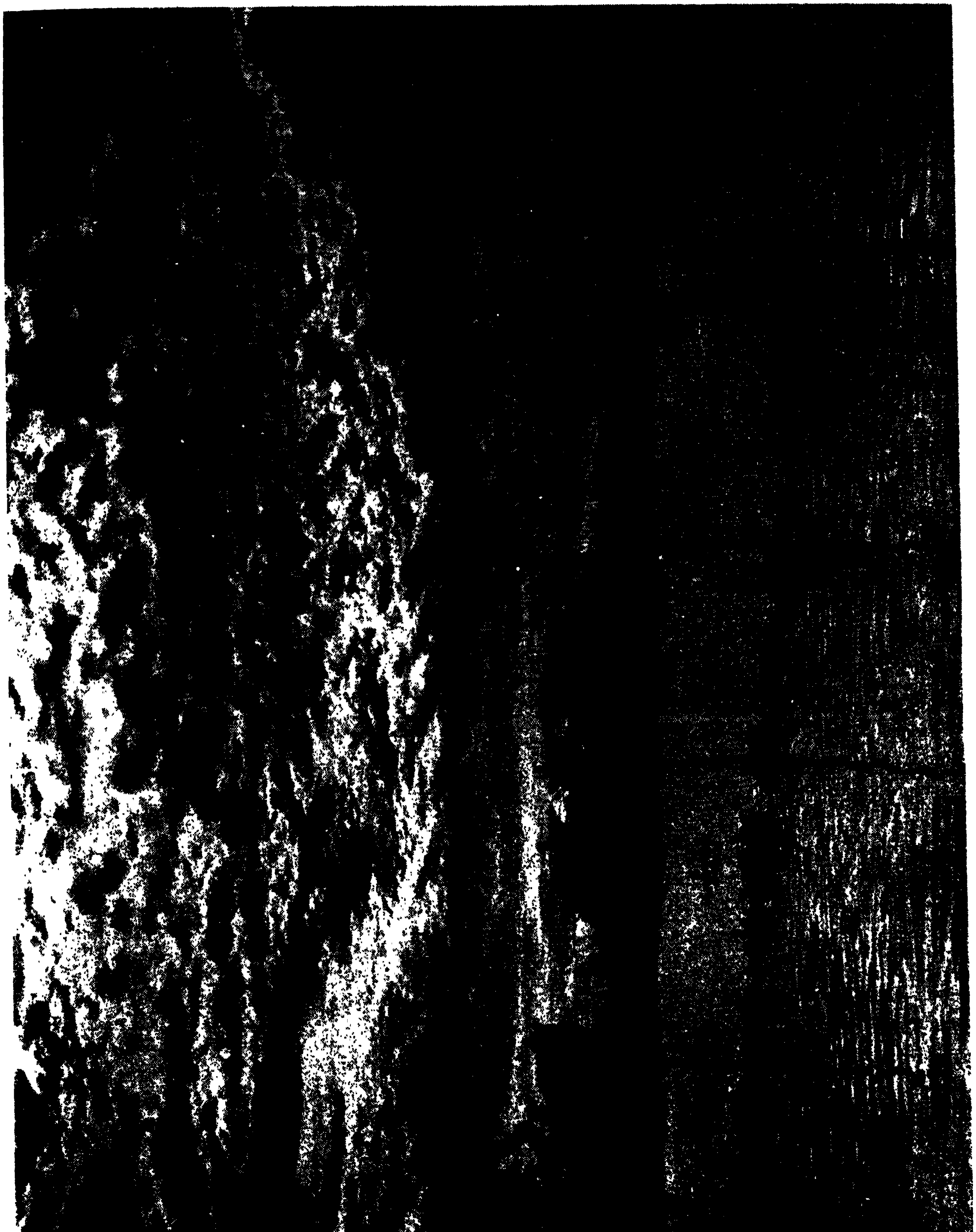
'যখন আমি তোমায় দেখি, প্রিয়,
লাজে তখন পড়ি কাতর হয়ে।
সঙ্গীরা যে মুচকি হাসি হাসে, আমার দিকে চেয়ে,
ঘুরে দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।'

এই কবিতা আমার মানসিক অবস্থার সাথে সুন্দর খাপ খেয়ে যায়। আমার কামনার উগ্রতায় এবং যৌবনের পাগলামিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম খালি মাথায়, খালি গায়ে, রাস্তায়, অলিতে গলিতে, ফুল আর ফল বাগানে। বন্ধু-বান্ধব বা অপরিচিতের দিকে কোনও নজরই দিতাম না। আমার নিজের সম্মান বা অন্যের সম্মানের দিকেও আমার কোনও লক্ষ্য ছিল না। তুর্কিতে এই কবিতাটি লিখি।—

কামনায় জরজর
হিয়া কাঁপে থরথর
পাগল হলাম নাকি? জানিনে।
বুঝেছি কি কখনই
প্রেমিকের দশা এই,
যে মজেছে সুন্দর আননে।

কখনও কখনও পাগলের মত ঘুরে বেড়াতাম পাহাড়ে, সমতল ভূমিতে, কখনও বা রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে, কোনও বাড়ী বা উদ্যানের সন্ধানে যেখানে আমার প্রিয়কে দেখতে পাব। আমার এমন অস্থির অবস্থা হলো যে বসতেও পারি না, উঠতেও পারি না, দাঁড়াতেও পারি না, হাঁটতেও পারি না।

(তুর্কিতে) 'চলে যাওয়ার শক্তি নাই
থাকতেও না পারি।
কি দশায় ফেলেছ প্রিয়
লাজে আমি মরি।





গল্প

ত্রিযামা

মায়া বসু

মস্তবড় দামী গাড়িটা দরজার কাছে থামতেই শৈলেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

"আসুন ডাক্তারবাবু। এসো সুকুমার। ব্যাগটা আমার হাতে দাও।"

"কেমন আছেন উনি?"—সুকুমার গাড়ির দরজা খুলে দিল ডাঃ ঘোষকে।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে শৈলেন উত্তর দিল, "মোটেই ভাল নয়। একই রকম।"

"রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

"না, সমস্ত রাত ছটফট করেছেন। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। কার নাম ধরে ডাকছেন, কাকে খুঁজছেন। জ্বরটাও আছে।"

সুকুমারের মুখ গম্ভীর হল। একবার তাকাল প্রবীণ চিকিৎসা-বিশারদ খ্যাতিমান ডাঃ অমরেশ ঘোষের ভাবলেশহীন মুখের দিকে। তারপর নিঃশব্দে দুজনে শৈলেনের সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় রোগীর ঘরে এসে ঢুকলো।

ডিম ব্লু ল্যাম্প জ্বলছে ঘরের মধ্যে। পুরু গদি-পাতা খাটের উপর রোগিণী প্রায় অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে চাদর চাপা দেওয়া। সামনে দুখানা চেয়ার পাতা, বোধহয় ডাক্তারবাবুদের জন্যেই রাখা হয়েছে। পাশেই টেবিলের উপর ওষুধের শিশি, গ্লাস, প্রেসক্রপশন, কাগজ কলম—এটাওটা। তারি একধারে ধূপদানিতে গোটাকতক ধূপকাঠি চন্দনের গন্ধ বিলিয়ে প্রতি মূহূর্তে নিঃশেষ হয়ে আসছে। ঠিক যেন ওই রোগিণীরই জীবনের মতন।

মাথার কাছে বসে থাকা বউটি ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের বড় জোরালো আলোটা জ্বেলে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল সমস্ত ঘরখানা।

ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে খাটের কাছে গিয়ে মায়ের কপালে হাত রাখল শৈলেন। "মা—দেখ কে এসেছেন।"

দেওয়ালের দিকে আধখানা মুখ ফেরানো। চাদরের তলায় দেহের অস্তিত্ব আছে কিনা বোঝা কঠিন। ডাঃ ঘোষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন রোগিণীর দিকে। সুকুমারের কাছ থেকে রোগের বিষয় সবই শুনেছেন। রুগী যে বাঁচবে না এ বিষয়ে সুকুমারের সঙ্গে তিনিও একমত। সুকুমার তাঁরই ছাত্র ছিল এককালে। কয়েক বছর আগে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে মেডিকেল কলেজ থেকে। শৈলেন ওরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই এতদিন সেই তার মাকে দেখছে।

অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে যাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল শৈলেন। তারই আগ্রহে, সুকুমার কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার অমরেশ ঘোষকে কল দিয়েছিল।

একেবারেই শেষ অবস্থা। করবার কিছুই নেই তাঁর। তবু একথা বলা যায়না। বললেও ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না। এখানে তিনিও যে সামান্য মানুষ মাত্র, একথা কেউ মানবে না। ডাক্তার বলে কি এরা তাঁকে ডাকে? না। তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি নামঅর্থ, এদেরই লোকে ডাকে। এই সব নির্মোকের অন্তরালে যে মানুষটি আছে, তাকে নয়। মৃত্যু যেখানে অবধারিত, সেখানে লোকে তাঁকে চায় সান্ত্বনার জন্যে—নিজেদের ভোলানোর জন্যে—মিথ্যে আশ্বাসের জন্যে। না হলে ডাঃ সুকুমারের কথাই তো যথেষ্ট। বয়স অভিজ্ঞতা আর ভিজিট তাঁর অনেক বেশী। তবু এক জায়গায় এসে সব মতই এক হয়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুকে চিনতে সেখানে কারুরই ভুল হয় না। যেখানে

শূন্য হাতে একলা ফিরে যাবার সমস্ত চিহ্নকে সে নিঃশেষে মুছে দিয়ে আসে। একটিমাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করে মৃত্যু রচনা করে তার বৃত্ত।

তাকে কেন্দ্রচ্যুত করার ক্ষমতা ডাঃ ঘোষের নেই। সুকুমারের নেই, কারুরই নেই।

পরম স্নেহে নিঃসাড় রোগিণীর মুখখানা দুহাত দিয়ে আস্তে আস্তে শৈলেন ফিরিয়ে দিল ওদের দিকে।

এক পলক মাত্র সেই রোগজীর্ণ ক্লান্ত দুঃস্থ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা ডাঃ ঘোষের হৃৎপিণ্ডটা অস্বাভাবিক দ্রুত-গতিতে চলতে আরম্ভ করল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে যেন তাঁর সমস্ত পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল। মনে হল যেন তিনি বেঁচে নেই। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শুব্ধ হয়ে গেছেন। অচল অবশ পা দুটোর উপর ভর করে তিনি যেন আর কোনমতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না।

অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কলকাতার নামকরা চিকিৎসক ডাঃ অমরেশ ঘোষের বিচিত্র কর্মজীবনে, অনেক অভাবনীয় দুর্ঘটনাই তাঁর কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তবুও এতবড় বিস্ময় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল, রাধারাণীর শেষ সময়ে তাঁকে এখানে এভাবে আসতে হবে—একথা কি কখনও কল্পনাও করেছিলেন?

একেই কি বলে ভাগ্য? না গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত? যারা নাকি আড়ালে থেকে মানুষকে তাদের অদৃশ্য আঙ্গুলে বাঁধা সুতোয় নাচায় পুতুল নাচের মতো!

বোধহয় সেই অদৃশ্য ধাক্কাতেই প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে চেয়ারটার উপরে বসে পড়লেন ডাঃ ঘোষ। এতদিন পরে আজ আর এই চাঞ্চল্যের কোনই মানে হয় না। অনেক—অনেক নিষ্ঠুর মৃত্যুকে নির্বিকারভাবে পদদলিত করে যশের সুউচ্চ শিখরে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাধারাণী তাঁর জীবনে বহুদিন আগেই মৃত। নতুন করে আরেকবার না হয় তার মৃত্যুর সাক্ষী হবেন তিনি। একদিন—বহুদিন আগে ওর জীবনের সমস্ত আশা সুখ স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন তিনি। এক পরম যন্ত্রণাদায়ক তিলে তিলে মৃত্যুর হাতে ওকে সমর্পণ করে নিজের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করতে চলে গিয়েছিলেন বহুদূরে। আজ শেষ সময়ে তাই কি রাধারাণী তার প্রতিশোধ নিল?

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এক এক করে রোগিণীর সমস্ত পরীক্ষা শেষ করলেন তিনি। তারপর কম্পিত শীতল হাতে তার হাতখানা তুলে নিলেন নাড়ী দেখবার জন্যে। অবশ্য এত পরীক্ষা না করলেও চলত। অভিজ্ঞ দৃষ্টি এক পলকেই বুঝে নিয়েছিল, আর বেশীক্ষণ নয়। বড় জোর একটা দিন—অথবা আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

সুকুমারের সঙ্গে শৈলেনের অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠের আলাপ কানে গেল।

"বুঝতে পারিনা সুকুমার, কাকে উনি এমন করে খোঁজেন। কাকে দেখতে চান। এমনিতেই তো দিন-রাত প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন। এতটুকু জ্ঞান ফিরে এলেই দরজার দিকে তাকান। বিছানা হাতড়ান, কাকে যেন ডাকেন। কথাও তো জড়িয়ে গেছে। বোঝাই যায় না কিছু। এত দুর্বল হয়ে গেছেন—"

"ওঁর এমন কোন আত্মীয়স্বজন আছেন কি—যাঁকে উনি খুব ভালবাসতেন? মনে হয় তাঁকেই দেখতে চান।"

"তুমি তো সবই জানো ভাই। মায়ের সব কথাই তোমায় বলেছি। মা বড় দুঃখ পেয়েছেন সমস্ত জীবন। এতবড় দুর্ভাগ্য যেন কোন মেয়ের কপালে কখনও না হয়।"

"তোমার মত ছেলের মা যিনি হতে পেরেছেন, তাঁর ভাগ্যটা অন্তত একদিক দিয়ে খারাপ নয়, একথা আমি বলব শৈলেন।"

ওদের দুজনের কথা ফিসফিসানি সবই কানে আসছে। ডাঃ ঘোষ একদৃষ্টে চেয়ে আছেন শৈলেনের মায়ের দিকে। আর বেশীক্ষণ এ মিথ্যে পরিচয়টা বয়ে বেড়াতে হবে না অনন্ত দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে আসা ওই হতভাগিনীকে।

শৈলেনের মা নয়। ইন্দ্রনাথ রায়ের বিবাহিতা স্ত্রীও নয়। ও রাধারাণী। শুধুই রাধারাণী।

সরল বিশ্বাসে যে একদিন তাঁর মুখে তুলে ধরেছিল তার হৃদয়-নিংড়ানো অমৃত। আর তার বিনিময়ে রাধা-রাণীর সমস্ত জীবনটাই তিনি বিষজর্জর করে তুলেছেন। এ সেই রাধারাণী।

সব গেছে। রূপ—যৌবন। কুঁচবরন কন্যার মেঘবরন

কেশ বলে যাকে একদিন আদরে আদরে ব্যস্ত করে তুলতেন, আজ তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। ভাঙা গালে, রোগজীর্ণ মুখে কঙ্কালসার শরীরে মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। শুধু ওর ঠোঁটের উপরের সেই তিলটা এখনো ঠিক আছে। ওটাও মুছে যাবে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পর।

কিন্তু কী করে ভুলবেন তিনি সেই ফেলে-আসা প্রথম যৌবনের কত সুখ কত মধুর স্মৃতিচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন একদিন ওরই গোলাপ পাপড়ির মত আরক্ত ওষ্ঠাধরের ঐ কালো তিলটার উপরে?

সব যাবে, শুধু মুছে যাবেনা সেই রক্তাক্ত স্মৃতিটা। মরণান্তিক দুঃখের কাঁটাটা নতুন করে বিঁধিয়ে দিয়ে গেল রাধারাণী তার শেষ সময়ে।

ও মরে বাঁচবে। আর তিনি? প্রতিদিন নতুন করে তিলে তিলে অনুতাপের আগুনে ছটফট করবেন! সেই অদৃশ্য কাঁটাটার অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর জীবন থেকে মুছে যাবে সবটুকু শান্তি।

বেশ তো ভুলেছিলেন একরকম! অন্তত চোখের আড়ালে ছিল বলে এতবড় দুঃখ যাকে দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটা সচেতন হননি। আজ বন্যার মত সমস্ত রুদ্ধ স্মৃতি বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে এসেছে। আজ মনে হচ্ছে এভাবে ওর সমস্ত জীবন ব্যর্থ করার জন্যে ওর অকাল মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী।

একটু নড়ে চড়ে উঠলো রাধারাণী। শৈলেন তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "মা, জল খাবে?"

শুনতে পেল কি পেলনা। বুঝতে পারল কি পারলনা। প্রাণপণ শক্তিতে দরজার দিকে তাকাল রাধারাণী। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শীর্ণ শিরাবহুল হাতখানা দিয়ে এদিক ওদিক কি খুঁজলো বিছানার পরে। বৃথাই। তারপর আচ্ছন্নের মত আবার চোখ বুজলো।

"কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না কাকে উনি দেখতে চান?" শৈলেনের গলা ধরে এলো। "ওঁর মা মারা গেছেন। ভাই বোন আপনার বলতে কেউ নেই। এ যন্ত্রণা চোখে দেখতে আমার আর ইচ্ছা হয়না। যদি জানতে পারতাম কাকে উনি দেখতে চান, যেমন করেই

আবার রাধারাণী ছটফট করে উঠলো। ঠোঁটটা ঈষৎ ফাঁক করে অস্পষ্ট স্বরে কার নাম ধরে কি যেন বলল। মাথা নীচু করে ওর মুখের কাছে এগিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন ডাঃ ঘোষ। কিন্তু কিছুই বোঝা গেলনা।

এবার ডাঃ ঘোষ কথা বললেন, "আপনার বাবা কি এখনও এসে পৌছেননি? টেলিগ্রাম করেছিলেন?"

সুকুমার আর শৈলেনের চোখে চোখে নিঃশব্দে কী কথা হয়ে গেল। বেদনায় ম্লান হয়ে এলো শৈলেনের মুখ।

"তিনি বাইরে থাকেন, তাছাড়া শরীরও অসুস্থ তিনি আসতে পারবেন না।"

টেবিলের উপর থেকে কাগজ টেনে নিয়ে খস্ খস করে কয়েকটা ওষুধের নাম লিখলেন ডাঃ ঘোষ।

"ওষুধগুলি আনিয়ে নিন এখুনি। অক্সিজেন দেওয়াও দরকার। ওঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।"

দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল শৈলেন।

প্রেসক্রপশনটার ওষুধগুলোর নাম পড়ে মনে মনে একটু বিস্মিত হল সুকুমার। জ্ঞান ফিরে আসবার উত্তেজক ওষুধ ইনজেকশন। কিন্তু যেখানে রোগীর নাড়ীই ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেখানে ও সব ওষুধের সার্থকতা কোথায়—সেটা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

"অক্সিজেন কি এখন থেকেই দেওয়া হবে স্যার?"

"হ্যাঁ। আর ওই ইনজেক্শনটাও এখনি দেওয়া দরকার।"

কিন্তু তাতে কি কোন কাজ হবে? প্রশ্নটা করতে গিয়েও করলনা সুকুমার। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কথাটা ডাক্তারের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বাণী। কিন্তু যার শ্বাসই থেমে আসছে তার সম্বন্ধে ডাক্তার ঘোষের মত এতবড় বিজ্ঞ চিকিৎসক কিসের আশা করছেন, তা সে ঠিক বুঝতে পারলনা।

ডাঃ ঘোষ সবই বুঝতে পারছিলেন। সুকুমারের বিস্ময়। তাঁর মত লোকের এতক্ষণ ধরে আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রিণীর কাছে বসে থাকা। প্রত্যেক ঘণ্টার আয় যাঁর অবিশ্বাস্য রকমের। কলের উপর কলে যাঁর সময় একেবারে ছকে বাঁধা। একমুহূর্ত যাঁর এদিক-ওদিক

শত রুগী ফেলে তিনি বসে আছেন যেখানে, সেখানে এতটুকুও লাভের প্রত্যাশাও নেই। নেহাত শৈলেনের আন্তরিক ব্যাকুলতায়, বাঁচবে না জেনেও সুকুমার তাঁকে কল দিয়ে এনেছে এখানে।

তাও অর্ধেক ভিজিটে।

আর সে রুগী প্রাণোচ্ছল যুবক-যুবতী নয়, কিশোর-কিশোরী নয়, এমন কি শিশুও নয়। যার মৃত্যুতে কারু এতটুকু ক্ষতিও হবে না, এমনি এক ভাগ্যহত নারী, মরে যে শান্তি পাবে বঞ্চিত জীবনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে।

অনেক রাত অবধি বসে রইলেন ডাঃ ঘোষ। সব ব্যবস্থা করে নীচে নেমে এলেন।

কিন্তু নামবার সময় এত কষ্ট হচ্ছে কেন? ওঠবার সময় তো মোটেই টের পান নি? পায়ে বাত হল নাকি? কত বয়স হল তাঁর? রাধারাণী তাঁর চেয়ে তো অনেক ছোট ছিল? মনে মনে বুঝি ওর বয়সটা হিসাব করলেন। এমন কি বয়স হয়েছে ওর? ওই বয়সেও মেয়েরা সহজেই মা হয়। অটুট থাকে রূপ-যৌবন। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য। বড় অল্প বয়সেই রাধারাণীকে চলে যেতে হচ্ছে। অত্যুগ্র মৃত্যু-ইচ্ছাই বোধ হয় এর কারণ—

কিন্তু এজন্যে দায়ী কে?

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল কেন? ব্লাড প্রেশারটা কদিন দেখা হয়নি। নিশ্চয় বেড়েছে। সময়ই হয়না নিজের কথা ভাববার। অন্যের চিন্তায় পরিপূর্ণ তাঁর মন সদাসর্বদা।

শুধু কি নিজের? আর একজনের কথা কি কখনও ভেবেছেন তিনি? আজ যেমন করে তিনি ভাবছেন তাঁর শৈশব-যৌবন সহচরী রাধারাণীর কথা? যদি ওর চোখের জলে ভেজা করুণ চিঠিগুলো পড়েও একটু ভাবতেন ওর জন্যে সেদিন, তবে বোধ হয় রাধারাণীকে এমন ভাবে মরতে হতনা।

একাই ফিরে যেতে হবে তাঁকে। সুকুমার আজ সমস্ত রাত মুমূর্ষু রুগীর কাছে থাকবে। শৈলেন বলে রেখেছে ওকে।

গাড়িতে ওঠবার আগেই শৈলেন তাঁর হাতের ভিতর টাকা। দর্শনী—রাধারাণীকে শেষ দেখা দেখবার ভিজিট! এত বড় পরিহাস বুঝি জীবনে আর কেউ তাঁর সঙ্গে করেনি। ঝিম ঝিম করে উঠল সমস্ত শরীর নোটগুলোর স্পর্শে। টাকা নয়, যেন জ্বলন্ত একটা ধাতু তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। মুঠো খুলে যে সেগুলোকে ফেলে দেবেন, সেটুকু শক্তি সামর্থ্য পর্যন্ত তাঁর আর অবশিষ্ট নেই।

এত বড় প্রচণ্ড আঘাত তিনি বুঝি আর কখনও পাননি। আত্মসংবরণ করতে না পেরে গাড়ির দরজাটা ধরে কোনমতে টাল সামলালেন ডাক্তার ঘোষ।

শৈলেন চলে গেছে উপরে। সুকুমার ডাঃ ঘোষের ভাবান্তর লক্ষ্য করে কাছে সরে এলো।

"আপনার কি শরীর ভাল নয় স্যার?"

"কদিন থেকেই ব্লাড প্রেশারটা বেড়েছে। খুব অসুস্থ বোধ করছি। শোন সুকুমার, আমি আজ আর কোথাও যাবনা। রাতও অনেক হয়েছে। তুমিতো সমস্ত রাত এখানে থাকবে। মনে হয় শেষ সময়ে ওঁর জ্ঞান ফিরে আসতেও পারে। যদি তাই হয়, যত রাতই হোকনা কেন, আমায় একটা টেলিফোন কোরো। আমি একবার আসতে চাই সে সময়।"

"আচ্ছা স্যার। নিশ্চয় ফোন করবো।" বিস্মিত-ভাবে সুকুমার একবার তাকাল ডাঃ ঘোষের দিকে। এত মৃত্যুকে যিনি সদাসর্বদা দেখছেন, নাড়াচাড়া করছেন—তিনি আবার একটা মৃত্যুকে দেখতে চান কেন—বোধ হয় এই কথাই মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল।

এই বোধ হয় প্রথম ফিরে গেল দর্শনপ্রার্থীরা। অত্যন্ত অসুস্থ বলে সমস্ত কল রিফিউজ করে দিলেন ডাঃ ঘোষ। নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা বোধ-হয় এই প্রথম ওলট-পালট হয়ে গেল।

শোবার ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। সুকুমারের টেলিফোনের প্রত্যাশায় আজ তাঁকে বোধহয় সমস্ত রাত সজাগ হয়েই থাকতে হবে। তাঁকে যেতে হবেই রাধারাণীর কাছে। এক ভয়ঙ্কর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর তাঁকে খুঁজে পেতে হবেই।

নিশ্চয় তাকেই—যাকে সে শেষ মুহূর্ত্তে ক্ষমা করতে পেরেছে।

কিন্তু কে সে?

তিনি? না ইন্দ্রনাথ রায়?

একজন যাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করে তার নির্মল কুমারী-মনকে প্রলুব্ধ করেছে দিনের পর দিন। তার সরল বিশ্বাসের সুযোগে লুণ্ঠন করেছে তার হৃদয় মন। তারপর আর পিছন ফিরে তাকায় নি। ভবিষ্যতের নিশ্চিত উজ্জ্বল পথে এগিয়ে চলে গেছে—ওকে অন্ধকার পথের একধারে ফেলে রেখে। সাড়া দেয়নি ওর ব্যাকুল মিনতিতে।

আর একজন ধর্মান্ধ প্রৌঢ় বিপত্নীক—দেবতা অগ্নিসাক্ষী করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়েও দেয়নি। মিথ্যে ধর্মের মোহে, অন্ধ অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে সে স্ত্রীকে ফেলে রেখে পরমার্থের সন্ধানে গৃহত্যাগ করল। একদিনের জন্য ফিরেও তাকাল না ভাগ্যহত আর একটা নিরাপরাধ রক্তমাংসের মানুষের দিকে!

মাঝখানে মস্ত জল-টলটলে একটা পুকুর, আর একটা আমজাম-কাঁঠালের বাগান। এ পাশে মণ্টুদের বাড়ি, ও পাশে রাধারাণীদের। পুকুরে স্নান করতে সাঁতার কাটতে আর আম জাম কুড়োতে কুড়োতে কখন এক সঙ্গে তারা বাল্য কৈশোরটা পার করে দিয়েছিল জানতেও পারেনি। যৌবন এলো অনেক বাধা নিষেধ সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে। কিন্তু ততদিন মন দেওয়া-নেওয়া শেষ হয়ে গেছে।

গ্রামের পড়াশেষ করে মণ্টু চলে গেল সহরে। গ্রাম অবশ্য সহর থেকে এমন কিছু দূরে নয়। তবু মন বসত না কলেজের পড়ায়। ছুটিতে তো আসতোই, বিনা ছুটিতেও পালিয়ে আসতো রাণীর কাছে। দেখা হত পুকুর ধারে, আম বাগানে। সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকত ওকে দেখবার জন্যে, একটুখানি কাছে পাবার জন্যে। শৈশব কৈশোরের সহচরী দুরন্ত-যৌবনের রক্তে রক্তে জোয়ার জাগাতো। সব ন্যায়-অন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যেত ভালবাসার বাঁধভাঙ্গা-বন্যা—

প্রথম প্রথম ভয় পেত। আপত্তি করত রাণী। বাবা নেই। বিধবা মা। জ্যাঠামশাই-এর বাড়ি তারা থাকে। তাঁরা ভালও বাসেন যথেষ্ট। কিন্তু রাণীরা বামুন। পাড়া গাঁয়ে এ বিয়ের চলন এখনো হয়নি। তাছাড়া মণ্টুর বাবাও এই বিয়েতে রাজী হবেন না। অনেক আশা ভরসা তাঁর মণ্টর উপর। গ্রামের স্কুলের সেরা ছেলের বাবা তিনি।

তাছাড়া এভাবে লুকিয়ে দেখা করাও অন্যায়।

"অন্যায় কিসের রাণী?" মণ্টু বোঝাতো রাণীকে। "মালা বদল করে কি আমি তোমায় বিয়ে করি নি? এখন লুকিয়ে করেছি, সময় হলে সবার সামনে তোমায় বিয়ে করবো। ডাক্তারীটা পাশ করতে দাও, নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। মাত্র কয়েকটা বছর অপেক্ষা করো।"

তবু রাণীর ভয় যেতনা। আমার যে বিয়ের সম্বন্ধ আসছে— "এলেই বা। ভয় কিসের? সত্যি সত্যি যদি বিয়ে ঠিক হয়ে যায় তুমি আমায় চিঠি লিখে জানিও। বিয়ের আগে তোমায় নিয়ে যেখানে হোক পালিয়ে যাবো।"

ভবিষ্যতের কথা চাপা পড়ে যেত সেই উচ্ছল মুহূর্ত্তে। অসীম সুখে আর সরল বিশ্বাসে মণ্টুর বুকে মুখ লুকোতো সেই সরল বোকা মেয়েটা। মণ্টুদার প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হবেনা। ওর সঙ্গে রাণীর বিয়ে হবেই।

বড় সুখে, বড় নিশ্চিন্ত মনেই দিন কাটছিল রাণীর।

কিন্তু ভুল ভাঙলো অনেক দেরীতে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর।

চিঠির পর চিঠি দিয়েও মণ্টুর কাছ থেকে কোন উত্তর পেল না রাণী।

রূপকথার মায়াবিনীর মত কলকাতা সহর তখন বুঝি ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে মণ্টুকে।

যদিও সুন্দরী—তবুও পাড়াগাঁয়ের গেরস্ত বাড়ির মেয়ে। না জানে গানবাজনা, না জানে খুব একটা লেখাপড়া। মাথার উপর বাপ নেই। তেমন একটা পয়সারও জোর নেই। তাই বিয়ে হতে বেশ একটু দেরীই হচ্ছিল রাণীর। কিন্তু হঠাৎ একেবারে প্রায় বিনা পণেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

কলকাতা থেকে ইন্দ্রনাথ রায় এসেছিলেন আম বাগান ইজারা নিতে। পরম ধার্মিক। দেববিজে অসাধারণ ভক্তি। সহস্রবার গুরুমন্ত্র জপ না করে জল

পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। কয়েক বছর বিপত্নীক হয়ে অবধি ধর্মকর্মে আরো বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। সাধু সঙ্গ পেলে রাতদিন পড়ে থাকেন তাঁর পদতলে, পরমার্থের আশায়।

রাণীর জ্যাঠামশাই এর সঙ্গে আলাপ হতে বড় যত্ন করে তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন তাঁকে। এমন পুণ্যবান ধর্মাত্মা লোকের পায়ের ধুলা পড়লে তাঁর বাড়ি পবিত্র হয়ে যাবে। অনুরোধ করলেন অন্তত একটা দিন থেকে যেতে।

কারো হাতে খান না তিনি। কুমারী কন্যা ভগবতীর প্রতীক। তাই একমাত্র রাণীকেই তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম করে দিতে হল। সদাসর্বদা কাছে কাছে থাকতে হল, যেন কোন অসুবিধা না হয় মান্য অতিথির।

সে দিন আর সে রাত ঐ বাড়িতেই থাকতে হল ইন্দ্রনাথ রায়কে। আর সমস্ত রাত ধরে তিনি প্রাণ-পণে গুরুমন্ত্রের মত জপ করতে লাগলেন তুলসীদাসের শ্লোক।

দীপ সিখা সম জুবতি জন মন
জানি হোসি পতঙ্গ
ভজহিঁ রাম ত্যজি কাম মদ
করহি সত সঙ্গ।

সুন্দরী যুবতী নারী প্রদীপশিখার মত; ওরে মন পতঙ্গের মত তাতে উড়ে পড়তে চেওনা। রামকে ভজন কর। কাম মদ ত্যাগ কর। সদা সৎসঙ্গ কর—

কিন্তু হায়রে। রাত্রির অন্ধকার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যখনি মূর্তিমতা উষার মত রাণীকে দেখলেন, কোথায় তলিয়ে গেল গুরুমন্ত্র আর তুলসীদাসের দোঁহা। একমাত্র রাধারাণী ছাড়া আর বুঝি কোথাও কিছু রইলনা—।

ফিরে যাবার সময় কথাটা পাড়লেন। অবশ্য ইতি-মধ্যে সব খবরই জানা হয়ে গিয়েছিল রাণী সম্বন্ধে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এতবড় ভাগ্য রাণীর হবে কে ভেবেছিল? নাম রাণী, কপালও করে এসেছে রাণীর মতন।

বয়স একটু হয়েছে বটে, কিন্তু চেহারা দেখে কি বোঝা যায়? তাছাড়া অবস্থা খুব ভাল। কলকাতায় বাড়ি ঘর আছে। দু-তিনটে ছেলে মেয়ে আছে বটে, তা রাণীর বয়সটাই বা কম কিসে?

বয়সকালে বিয়ে হলে ওই তিন ছেলের মা হত না নাকি এত দিনে?

ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। তবে ইন্দ্রনাথের তরফ থেকে একটু লুকিয়ে চুরিয়ে। চক্ষুলজ্জা তো আছে একটা। ছেলে মেয়েরাও কেউ একটা খুব ছোট নয়। কাজ কি আগে থেকে হাঁক ডাক করে?

সব চেয়ে আদরের বারো তেরো বছরের কোলের ছেলে গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের মতই চেহারা। নয়নের মণি মাতৃহীন সন্তান। বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি ঢুকে দেখলেন ছেলে প্রবল জ্বরে অচৈতন্য।

একে তো লুকিয়ে বিয়ে করেছেন, তার উপর ছেলের এই আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথ-বাবু। ডাক্তার, কালীবাড়ি, গুরুমন্ত্র, সাধুসন্ন্যাসী সমস্ত ব্যর্থ করে গৌরাঙ্গ মারা গেল তিনদিনের মাথায়।

ডাক্তার বললেন—মেনিনজাইটিস্।

আত্মীয়-স্বজন বললেন, কি অলুক্ষণে বৌ বাবা, তেরাত্তির পেরুল না ছেলেটাকে খেলে?

গৌরাঙ্গের দিদিমা, ইন্দ্রনাথের মৃতাস্ত্রীর মা, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাকী ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে নিজের বাড়ি রওনা হলেন। মেয়েটা মারা যাবার পর থেকে তিনিই ওদের বুকে করে মানুষ করেছেন। আজ এতদিন বাদে মতিচ্ছন্ন জামাই ওই ডাইনীর সুন্দর মুখ দেখে ভুলে গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে ঘরে। এ দুটো ছেলে মেয়েও বাঁচবে না এখানে থাকলে।

বিয়ে বাড়ি নয়—চারিদিকের ছি ছি আর ধিক্কারের ভিতর সদ্যমৃত প্রাণাধিক সন্তানের শ্মশানের উপর মূর্চ্ছা-হতের মত বুদ্ধিভ্রংশের মত বসে রইলেন ইন্দ্রনাথ রায়।

আর রাধারাণী? তার কথা জানেন একমাত্র অন্তর্য্যামী।

বৌভাত হলনা। ফুলশয্যা হলনা। রাণীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ রায় তাঁর জীবনের মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে তীর্থে পাগলের মত।

মহা-অপরাধ করেছেন তিনি দেবতার কাছে, গুরুর কাছে। একটা রক্ত মাংসের লোভ আর সুন্দর মুখ

তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। কেন একথা তিনি বুঝতে পারেননি? প্রত্যেক মহাপুরুষদের জীবনের সাধনপথে এমন মূর্তিমতী বিঘ্ন তাদের মায়াজালে পথ ভোলাতে আসে, একথা জেনেশুনেও কেন তিনি সাবধান হননি?

সংসারে আর ফিরে আসেননি ইন্দ্রনাথ। রাণীর মা, জ্যাঠামশাই জেঠিমা কারু কথাতেই নয়। কী হত বলা যায়না, রাণী নিজে থেকে চিঠি লিখত যদি কান্নাকাটি করে—কিন্তু সেও আশ্চর্য মেয়ে। একলাইন চিঠিও কখনো তাঁকে লেখেনি ফিরে আসবার জন্যে।

বিলেত থেকে এম, আর, সি, পি পাশ করে কয়েকটা রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এসে রাণীর সমস্ত খবরই পেয়েছিল মণ্টু। মর্মান্তিক অনুশোচনায় দেশে ছুটে এসেছিল রাণীর সঙ্গে দেখা করতে।

রাণী দেখা করেনি। দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছিল। মণ্টুর সহস্র অনুনয়েও সে দরজা খোলেনি।

ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। ছটফট করে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন ডাঃ ঘোষ। ছোট্ট একটা অন্ধকারের বৃত্ত বড় হতে হতে যেন তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করল। একটি মাত্র সূক্ষ্ম অনুভূতি ওলটাতে লাগল ফেলে-আসা অতীতের একটা কীটদষ্ট পৃষ্ঠা!

একখানা চিঠি লিখেছিল মণ্টু রাধারাণীর কাছে। ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার অবিমৃষ্যকারিতায় রাণীর জীবন নষ্ট হয়েছে। একথা প্রাণ গেলেও ভুলতে পারবেনা মণ্টু। রাণী কি তাকে ক্ষমা করবে না? মণ্টু ভেবেছিল—বিয়ে হয়ে গেলে স্বামী সন্তান নিয়ে রাণী একদিন সুখী হতে পারবে। কিন্তু এমন হবে, কি করে মণ্টু জানবে?

ইন্দ্রনাথও আশ্রম থেকে চিঠি লিখেছিলেন রাধারাণীকে। তাঁর জন্যে, তাঁর ভুলে রাধারাণীর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের সাধ্য কি—ঈশ্বরের বিধান খণ্ডন করেন? যা নিয়তি, ভবিতব্য, তা ঘটবেই। মানুষ উপলক্ষ মাত্র।

রাণী যেন তাঁর পায়ে নিজের সুখদুঃখ, ভালমন্দ সঁপে দিতে পারে, যিনি একমাত্র পাপীতাপীকে অমৃত দিতে পারেন, শান্তি দিতে পারেন।

উত্তরও রাণী দেয়নি। মণ্টু শুনেছিল সব কথা, রাণীর মায়ের কাছ থেকে।

শুধু একজন মাত্র রাণীকে ভুলতে পারেনি। ইন্দ্রনাথের বড় ছেলে শৈলেন। বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল দিদিমা মারা যাবার পর। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়িতে মায়ের মতই যত্নে সম্মানে এনে রেখেছিল রাধারাণীকে।

কানের কাছে বিদ্রূপের মতই ঘড়িটা বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং।

ইন্দ্রনাথ আর মণ্টু।

দুজনে মিলেই নষ্ট করেছে রাণীর জীবনটা!

আজ যদি শেষ মুহূর্ত্তে রাধারাণীর এতটুকু জ্ঞানও ফিরে আসে, ডাঃ ঘোষ শুধু এইটুকুই জানতে চাইবেন তার কাছে, কাকে সে দেখতে চায়? কাকে সে খুঁজছে এমন করে?

এ প্রশ্নের মীমাংসা না হলে আর কী নিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সারাজীবন?

যশ অর্থ প্রতিপত্তি স্ত্রী ছেলে মেয়ে, মানুষের জীবনের সব সুখ সৌভাগ্য আর পরিপূর্ণতা তিনি পেয়েছেন।

তবু কেন আজ সব ব্যর্থ আর মিথ্যে মনে হচ্ছে?

ডাঃ ঘোষের চোখের জলে পিলো-কভারটা ভিজে উঠলো। কেউ কোনদিন জানতে পারবেনা ডাঃ ঘোষের বিনিদ্র রাত্রি কী দুর্বিসহ যন্ত্রণায় কাটবে আজ থেকে!

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ভাল করে মাথায়, চোখে মুখে জল দিলেন ডাঃ ঘোষ। হাই ব্লাডপ্রেশারের রুগী তিনি। উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করা দরকার।

অন্ধকারেই ঘরের ভিতর, বারান্দায় পায়চারি করতে করতে একসময় জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ছাড়া বুঝি সমস্ত কলকাতা সহরটা ঘুমে অচেতন।

স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও আজ কেউ এখানে নেই। দার্জিলিং বেড়াতে গেছে তারা কিছুদিনের জন্যে। স্কুলের ছুটি এখন।

শুধু তাঁরই এতটুকু সময় নেই বিশ্রাম নেবার।

কিন্তু মাথার যন্ত্রণাটা হঠাৎ এত বেড়ে গেল কেন?

নাকি ? বাড়িতে চাপরাশী বেয়ারা, অন্য সব লোকজনও আছে।

নাড়ীটা একবার দেখলেন। ওষুধ খাওয়াও দরকার। কলিংবেলটা টিপতে গিয়েও টিপলেন না। একটু বিশ্রামের বড় দরকার। শুয়ে পড়লেন বিছানার উপর।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, অসহ্য ক্লান্তিতে অসুস্থ শরীর অসাড় হয়ে এলো। ঘরের পাতলা অন্ধকারটা যেন আরো নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারের পর্দা হয়ে দুলতে লাগল তাঁর চোখের সামনে।

তিনিও কি জ্ঞান হারাচ্ছেন নাকি রাধারাণীর মত ?

নিঃশব্দে রাধারাণী এসে ঘরে ঢুকলো। অপরূপ দেহে রূপের তরঙ্গ তুলে। প্রথম যৌবনের আত্মসমর্পণের মাতাল-করা হাসি আর কটাক্ষে মনোমোহিনী !

"তুমি এতরাত্রে কেমন করে এলে ?" আরক্ত বিহ্বল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল মণ্টু।

"আর ফিরে যেওনা। অনেক দুঃখ তোমাকে আমি দিয়েছি, তুমি দিওনা রাণী।"

রাধারাণী কোন কথা বললনা।

"কাছে এসো। তোমার হাতখানা আমার কপালে রাখো রাণী। বড় যন্ত্রণা। বড় কষ্ট।"

নিরুত্তর রাধারাণী আরো একটু কাছে সরে এলো। "আর তোমাকে যেতে দেবনা—কিছুতেই না—" আস্তে আস্তে মণ্টুর জড়িত কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এলো।

ত্রিযামা রাত্রির শেষ প্রহরে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কেউ ধরল না। আবার বাজলো ; অনেকক্ষণ একটানা ভাবে।

মণ্টুর ঘুম ভাঙলনা।

বাংলা সাহিত্যে রাজশক্তির অনুগ্রহ

অমল হালদার

শুধু বাংলা দেশেই নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশেই সাহিত্য প্রথমে রাজশক্তির অনুকূল্যে ও অনুগ্রহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়। তারপর তা সারা দেশের ও জাতির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে তার আবেদন থাকে একটি নির্দিষ্ট সমাজের কাছে। পরে রাজশক্তির চেষ্টায় ও অনুগ্রহে তা সমগ্র দেশে প্রচার লাভ করে। তাছাড়া রাজারা কবিদের সভা-কবির পদে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্বও নিয়ে থাকেন। আর তার ফলেই কবি সাহিত্যিকরা চিন্তা করবার সুযোগ ও অবকাশ পান। সাহিত্য যে যুগে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল সে যুগে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। সুতরাং তারা কবিদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেও তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারত না, এ ক্ষেত্রে রাজাদের প্রসাদ লাভ করা ছাড়া কবিদের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করার সঙ্গে রাজসভার প্রভাব কিছু-কিছু তাদের রচনার মধ্যে এসে পড়েছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার, প্রচার, সংরক্ষণে রাজসভার দান কবি-প্রতিভার বিকাশ হয়, রাজসভার সংস্পর্শে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নব-রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন কবি কালিদাস। তিনি বিশেষভাবেই গুপ্ত রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। তার কয়েকটি কাব্যে গুপ্ত রাজবংশাবলীর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। রঘুবংশকে এক হিসাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক কুল-পঞ্জী-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'কুমার সম্ভব' কাব্যে কুমারের জন্ম ও তাড়কাসুর নিধনের মধ্যে বোধ করি কুমার গুপ্তকে কল্পনা করা হয়েছে ও সেই অনুযায়ী কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবলমাত্র ঐ দুখানি কাব্যতে নয়, কালিদাসের সমস্ত কবি-ধর্মতেই গুপ্ত যুগ ও সাম্রাজ্যের কিছু না কিছু প্রভাব আছেই।

রাজতন্ত্রের যুগে ইংরাজী সাহিত্যের যে সব কবি-সাহিত্যিক রাজসভা কর্তৃক—প্রভাবিত ও অনুগৃহীত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলেন জিওফ্রে চসার। চসার শুধু সভাকবি রূপেই পরিচিত নন; তার প্রধান এবং অন্যতম পরিচয় কবিত্ব। ঐ সম্পর্কে Nevill Cog-hill বলেছেন, His father John an his fore-father,

more tennously with the court. John was Deputy Butler to the King at Southampton in 1348. চসারের বাল্যশিক্ষা সুরু হয় St Paul's Almonryতে। সেখান থেকে তাঁকে পাঠান হয় Countess of Olsterএর বালক সহচর কোরে।

From there he went on to be a page in the household of the—Countess of Ister, Ulater Duchess of Clearence, wife of Lionel the third son of Edward III' The first mention of Geoffrey Choucer's existence is in her household accounts for 1357.

এই শ্রেণীর অভিজাত পরিবেশের মধ্যে চসারের বাল্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি রাজকীয় আদব—কায়দাগুলি অতি সহজেই রপ্ত কোরে ফেলেন। He would there have acquired the finest education in good manners, a matter of great importance not only in his career as a courtier, but also in his career as a poet. No English poet has so mannerly an approach to his reader.

চসার ল্যাঙ্কাস্টারের 'John of Gount' এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন।

As a page he would wait on the greatest in the land. One of these was the Duke of Lancuster, John of Gaunt;—throughout his life he was Choucer's most faithful Patron and Protector.

কালক্রমে চসার সভাকবির মর্যাদায় ভূষিত হন।

He was promoted as a courtier. In 1367 he was attending on the King himself and was referred to as Dilectus. Valettus noster···our dearly beloved valet.

(Chaucer's life: Canterbury Tales Nevill coghil.)

চসার সভাকবি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সার্থক রচনা The Knight's Tale-এ।

ইংরাজী সাহিত্যের যুগান্তকারী কবি ও নাট্যকার সেক্‌সপীয়ারও রাজ অনুগ্রহ লাভ করেন বলে কথিত আছে। ঐ সম্পর্কে কোন এক সমালোচক বলেছেন—

One patron Shakespeare had among the nobility, the Earl of Southampton, to whom many of his Sonnets are addressed. Queen Elizabeth showed him same works of her favour as early as 1594, and after the accession of James I he was called upon the latest effort of his genius, was produced to celebrate the marriage of Princess Elizabeth with Elector Frederick in 1613.

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরাজী সাহিত্যের মত আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও বিভিন্ন রাজসভা ও রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক কম পৃষ্ঠপোষিত হয়নি। বাংলা সাহিত্য-বিকাশের পথে বিভিন্ন রাজশক্তি যে কতভাবে কত সাহায্য করেছেন, কত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন—সে প্রমাণ মিলবে সাহিত্যের ইতিহাসে।

সভাকবির রচনা দিয়েই একরকম বাংলা সাহিত্যের সুরু, আর এই সভাকবি হোলেন লক্ষ্মণ সেনদেবের সবিশেষ প্রিয়পাত্র জয়দেব গোস্বামী। তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্য সেন রাজদরবারে প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল। জয়দেবকে রাজসভার কবি বলে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"জয়দেব লক্ষ্মণসেনদেবের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজসভাতেও কবির গতিবিধি ছিল। সেকশুভোদয়ে জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গীত কলাভিজ্ঞতার একটি মনোরম কাহিনী আছে।"

সুতরাং জয়দেবকে সভাকবি আখ্যা দিতে আমাদের আর কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। তাছাড়া জয়দেবের কাব্য পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এক বিদগ্ধ সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কাব্য রচনা করেন। সেন রাজারা ছিলেন ধনী-বিলাসী নাগরিক, সম্ভবত আদিরসের দিকে ঝোক অত্যন্ত বেশী, আর রাজসভা হতেই জয়দেব আদিরসের প্রেরণা পেয়েছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে আদিরসের যে বাড়াবাড়ি দেখা গেছে, তা—সে যুগেরই উৎকট যৌনলালসায় পরিচয় বহন করে। সেই রাজসভার অন্যান্য কবিরা যেমন, উমাপতি ধর, শরণ আচার্য্য, গোধন, ধোয়ী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেন। ধোয়ী তাঁর পবনদূতে এবং বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে সেন যুগের ক্রমবর্ধমান উৎকট যৌন-লালসার সোৎসাহ চিত্র এঁকেছেন—জয়দেবের কাব্যে আদিরসের বাহুল্য এবং সংস্কৃত ভাষার কাব্য রচনার প্রেরণা এ-হতেই।

বাংলা রামায়ণ রচয়িতা ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস ওঝা যে সভাকবি ছিলেন তা' তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। গৌড়ের রাজসভার বিস্তৃত ঐশ্বর্য বর্ণনা তার বিলাস-ব্যসন বিভিন্ন পরিষদের নাম ও তাঁদের প্রতিষ্ঠার কথা—সবই স্থান পেয়েছে কবির আত্মবিবরণীতে। কবি গ্রন্থারম্ভে এ সবের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে রামায়ণ রচনার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু তিনি কোন রাজার অনুগ্রহ ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাস দেননি। যাই হোক্ বিশেষজ্ঞ সমাজ তাঁকে রাজা গণেশ বলে ধরে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসের রাজানুগ্রহের বৃত্তান্ত এবার তার নিজের কথাতেই শোনা যাক।

তিনি লিখেছেন,—

সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহসম রাজা আমি করিলাম গোচর।

সপ্তঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধায়া আইল দুত হাথে সুবর্ণ লাটি॥
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভার॥
নয় বৃহদ্দগেল্যাস রাজার দুয়ার।
সোনা-রূপার ঘর দেখি মন চমৎকার।
রাজার ডাইনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।
বামেতে কেদার খাঁ ডাইনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র বস্যা রাজা পরিহাস মন॥
গন্ধর্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তেঁহ গৌরব অপার॥
তিনি পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজ পাশে॥
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে॥

এইভাবে চলছে বিস্তৃত বর্ণনা। বর্ণনা দীর্ঘ কিন্তু পাঠকের ক্লান্তি নেহাতই তুচ্ছ। আত্মবিবরণীর শেষে কবি গ্রন্থরচনার কারণ নির্দ্দেশ করলেন।

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইয়া রাজার দুয়ার।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আসি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য-ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥

কবি মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের আগে ও পরে কবি নিজের কথা অল্পবিস্তর বলেছেন। বাংলার নবাব রুকনু-দ-দীন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কবির আসল নাম মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।" এই গৌড়েশ্বর—নিশ্চয়ই ১৪৫৯-১৪৭৪ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন—কাব্যের মধ্যে মুসলমানী শাসনের কোন পরিচয় না থাকলেও নবাবের চেষ্টাতেই মালাধরের কাব্য পাঠক সমাজে সমধিক প্রচার লাভ করে।

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি মিথিলায় রাজকবি বলেই অধিক প্রসিদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা বলেন যে তিনি মিথিলার দশজন রাজার রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং সকলেরই অনুগ্রহ লাভ করেন। এই দশজনের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন কীর্তি সিংহ, দেব সিংহ ও তাঁর পুত্র শিব সিংহ। বিদ্যাপতির কাব্যে মিথিলার রাজবংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তিনি প্রথমে হরগৌরী বিষয়ক পদ রচনা করেন। কারণ মিথিলার রাজারা ছিলেন শৈবমতাবলম্বী, আর তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি হরগৌরী বিষয়ক পদ রচনা করে রাজাদের নামে উৎসর্গ করেন। রাজা শিব সিংহ ও রাণী লছিমা দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত প্রচুর পদ পাওয়া গেছে। তাঁর প্রথম দিকের পদগুলি অধিকমাত্রায় আদিরসসিক্ত—এতে রাজসভার প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। রাণী লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির কোন একটা যোগসূত্র ছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। রাধাকৃষ্ণের রূপকে—বিদ্যাপতির প্রথমদিকের লিখিত ও লছিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত পদগুলি এই প্রমাণ দেয়। মিথিলার রাজসভার ঐশ্বর্য বিলাসব্যসন সবই ফুটেছে তাঁর কাব্যে—রাজসভাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্যের ভাষা, অলংকার ও চিত্রকল্পে দানা বেঁধে উঠেছিল।

ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—

"বাংলার পুরাতন সাহিত্যে ভারত পাঁচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজ দরবারের আওতায় হয়েছিল।"

ডাঃ সুকুমার সেনের মতের উপর নির্ভর করে আমরা বাংলা মহাভারত রচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তৈরী করতে পারি। সর্বপ্রথম যিনি বাংলার মহাভারত লেখেন তাঁর নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তিনি সুলতান হোসেন শাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাস্তিখানের পুত্র পরাগল খানের সভাকবি ছিলেন। পরাগল খান কাছাড়—ত্রিপুরার অভিযানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান; তাই সুলতান হোসেন শাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে চারটি গ্রামের প্রধান সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন।

সভায় বসে পরাগল প্রতিদিনই ভারত পুরাণ কাহিনী শুনতেন; সংস্কৃত মহাভারত শুনে তা হতে রস গ্রহণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অথচ মহাভারত কহিনীর চমৎকারিত্ব তিনি ভুলতে পারেন না। ক্রমাগত ভারত কাহিনী শুনতে শুনতে প্রৌঢ় লস্করের কৌতুহল গেল বেড়ে। সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে তিনি অনুরোধ করলেন দেশী ভাষায় মহাভারত রচনা করিতে।

এই সব কথা কহ সংক্ষেপে করিয়া।
দিনকে শুনিতে পারি পাঁচালি রচিয়া॥
এই আদেশ পেয়ে পুলকিত হয়ে কবি লিখছেন —
তাহার আদেশমালা মস্তকে ধরিল;
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালি রচিল॥

ভনিতায় কবি একাধিক স্থানে পরাগল খানের ভারত-কাহিনীপ্রিয়তার ও দানে মুক্তহস্ততায় প্রশংসা করেছেন। যেমন,:—

লস্কর পরাগল পুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী।
কতুহলে করাইল ভারথ পঞ্চালী॥

পরাগল খানের পুত্র নসরৎ খানও সুলতান হোসেন শাহার সেনাপতি ছিলেন। তিনি অনেক অভিযানে পিতাকে সাহায্য করেন। তাঁর আসল নাম ছিল নসরৎখান। পিতা পরাগল খানের জীবিত কালেই তিনি ছুটি-নাম ধারণ করেন। পিতার সভাকবি


লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!
LIFEBUOY SOAP
আ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম!
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে!
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন!
L.17-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

শ্বমেধ পর্ব কাহিনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলে তিনি 'নিজের সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধ পর্বকথা বিস্তৃত ক'রে লিখতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, এই পর্বটি ছুটি খানকে বেশ ... করত। তিনি এটি শ্রদ্ধা সহকারেই পাঠ ও আবৃত্তি করতেন। বীর-রসাত্মক কাহিনী যে মুসলমান সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ-কী।

পাঠান শাসনের ঔদাসীন্য ও স্বেচ্ছাচারিতায় বাংলা দেশের শান্তি নষ্ট হয়। পাঠান শাসকরা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করতে সুরু করল। সেই অতিরিক্ত আয় জনসাধারণের কল্যাণে লাগল না, মোগল শাসকগোষ্ঠীর ভোগে লাগল। বহু লোকের মত চণ্ডীকাব্যের অদ্বিতীয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে ও খাজনার দায়ে পড়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করে চক্রবর্তী কবি আবড়াতে যান। সে যুগে আবড়া ছিল ব্রাহ্মণপ্রধানস্থান। স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন ব্রাহ্মণ; তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিতে খুশী হয়ে রাজা বাঁকড়া রায় অনতিবিলম্বে কবিকে ছেলেদের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তাই কৃতজ্ঞ কবি বলেছেন,

> সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
>
> সুত পাঠে কৈল নিয়োজিত।
>
> তার সুত রঘুনাথ দ্বিজকুলে অবদাত।
>
> গুরু করি পূঁজিত বিহিত।

বাস্তুহারা কবির দিন কোন রকমে কাটতে লাগল। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হলেন, কবির ও সুখের দিন এল। চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন; পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু সে কথা আবার কবিকে স্মরণ করিয়ে দিল। মুকুন্দরাম স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজার গোচরে নিয়ে গেলেন। রঘুনাথ রায় অবিলম্বে কবিকে চণ্ডীকাব্য রচনা করতে আদেশ দিলেন।

অবশেষে কাব্য সমাপ্ত হলে রাজা প্রাচীন প্রথামত কবিকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করলেন।

সপ্তদশ শতকে আরাকানে একদল সভাকবির উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা সকলেই রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আরাকানের রাজারা মুসলমান হলেও হিন্দু কাব্য ও পুরাণের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়ে ছিলেন। রাজ অনুগ্রহে একাধিক কবি কাব্য রচনা করেন। দৌলৎ কাজী খাঁ, সৈয়দ আলাওল, সৈয়দ সুলতান ও মহম্মদ খান—এঁরা সকলেই রোসাঙ্গ রাজসভার কবি এবং রাজশক্তির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়ে তাঁদেরই নির্দেশে কাব্য রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবমংগল কাব্যে শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহের অনুগ্রহে ও অনুরোধে শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কর্ণগড়ের রাজারা ছিলেন বীর যোদ্ধা, বিলাসী নাগরিক হওয়াকে তারা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। তাই রামেশ্বরের কাব্যে উগ্র বিলাসিতা, যৌন-ব্যভিচার ও আদিরসের বাড়াবাড়ি দেখি না—যা দেখেছি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। ভারতচন্দ্র রায় যে কি ভাবে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুনজরে পড়লেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন, ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে ফরাসডাঙ্গায় কিছুদিন কাটাইয়া কবি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুনজরে পড়িলেন। এখন কবির অন্নবস্ত্রের চিন্তা আর রহিল না। মূলাজোড়ে জায়গা জমি দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সভাকবিকে স্থিত করিলেন।"

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে। তাই তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে বিলাসী রাজসভার চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজসভার উগ্র বিলাসিতার মধ্যে না থাকলে ভারতচন্দ্র কখনো ঐ রকম আদিরসসিক্ত কাব্য রচনা করতে পারতেন না; বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায় যে, এক বিশেষ শ্রেণীর সমাজকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কবি ঐরূপ প্রয়াস করেছেন।

ভারতচন্দ্রের পর রাজশক্তির অবসান ও বণিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান। বিদেশী বণিকের দল ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগে সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালী আবার স্বাধীনতা হারাল; তাই বাংলার সামন্ত রাজাদের আধিপত্যও আর রইল না। সুতরাং সাহিত্যে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান এইখানেই।

গান

শ্রীচুনীলাল বসু

কোন অপরাধে অপরাধী আমি
বলো ওগো দয়াময়।
কারে বা হাসায়ে কারে বা কাঁদায়ে
এহাল হোলো জ্ঞানময়॥

না জানি ভজন না জানি পূজন
কেমনে পূজিব ও রাঙা চরণ
কে দিবে মোরে পথেরই সন্ধান
ওগো কৃপাময়॥



আজ্‌কের দিনে কিভাবে চল্‌বে

উপানন্দ

জীবনের প্রভাতই কাজ কর্‌বার উপযুক্ত সময়। তোমাদের প্রতিদিনের যাত্রাপথে ধ্বনিত হচ্ছে প্রভাতীসুর, তোমাদের হৃদয়-তোরণে বাজছে আশাবরী রাগিনী। এসময়ে এক মুহূর্ত্ত অপব্যয়িত হওয়া উচিত নয়। অপরাহ্নে সময়ের মূল্য কিছুই নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও পটুতা বৃদ্ধি পায় না, অপব্যয়িত হ'য়ে থাকে। আজকাল অল্পায়ুতার দিন। বিশ বছরের ভেতর বিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জ্জন শেষ করে, ত্রিশের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌তে হবে। প্রবেশ কর্‌বার সময় আসে নানা বাধাবিপত্তি, পদে পদে দিতে হয় পরীক্ষা। যাতে প্রবেশ কর্‌বার শক্তি হয়, তার জন্যে ছেলেবেলা থেকে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। চল্লিশের স্তরে আসে প্রৌঢ়তা, ক্রমে শক্তি ক্ষয় হোতে থাকে, তখন আর বেশী কিছু করা যায় না।

অধিকাংশ লোকই সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে বিপর্য্যয়গ্রস্ত হয়, তার কারণ আত্মশক্তিতে অজ্ঞতা আর নিরুৎসাহ। ক্রমে পথভ্রষ্ট হয়ে জীবনভরা অশান্তি নিয়ে মরুপথে শুকিয়ে ঝরে যায়। যাঁরা নিজ নিজ জীবনের পরমলক্ষ্য স্থির রেখে উত্থান ও পতন, আশাও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে পেরেছেন, তাঁরাই কালে সময়সাগরতীরে নিজেদের পদাঙ্ক রেখে গেছেন, তাঁরাই জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের ভাণ্ডারে কিছু না কিছু সম্পদ সম্ভার দান করে গেছেন।

এই নিখিল বিশ্ব বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে লক্ষ্যহারা গ্রহের মত ভ্রাম্যমান হোলে কোনদিন উন্নতি করা যায় না। তোমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিশিষ্টগুণ বা শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, কর্ম্মশক্তি, অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ ভিন্ন যে উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠ্‌বে না। বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট মৃত্যু সময়ে নিজের জামাতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'সাধু হবে, ধার্ম্মিক ও নীতিবান হবে, নতুবা মরণের দ্বারদেশে এসে কোন মানুষের প্রাণেই শেষ সান্ত্বনা মিলতে পারেনা—' তোমরা ছেলেবেলা থেকে স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপদেশ অনুসারে চল্‌বে।

তোমাদের জীবনের যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, তাহোলে সংসারের ঘূর্ণীচক্রে ঘুরপাক খেতে হবে, কোন দিনই মনুষ্যত্বের বিকাশ হবেনা, অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে বহুকষ্ট পেতে হবে। চারিদিকে যেমন নানা পরিবর্ত্তন ঘটছে, তোমাদের মনেরও তেমনি পরিবর্ত্তন হচ্ছে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে যেমন নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করে, তোমরাও তেমনই আদর্শকে লক্ষ্যকরে জীবন-পথে অগ্রসর হবে। পথভ্রষ্ট হোলে জীবন সাগরে বিপন্ন হয়ে উঠ্‌বে। সৎশিক্ষা দ্বারা দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষার অভাব হোলে ধ্বংস অনিবার্য্য। তোমাদের ভাব-প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তোমাদের মধ্যে অনেককে স্বার্থের ধূলি-জালে নিক্ষেপ করে স্বার্থান্বেষী দল-কৌলিন্য-বিশিষ্ট রাজনৈতিক জুয়াড়ীরা সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিতে পারে—আর তারা বিপথে পরিচালিত হয়ে আত্মোন্নতিবিহীন হয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করে নিতে পারে।

মনুষ্যত্বলাভের পথ সহজ নয়। এপথে আস্‌তে গেলে নীরব ও একাগ্র সাধনার প্রয়োজন। তাছাড়া মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও শারীরিক শক্তি অর্জ্জন ভিন্ন সব সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। রাশি রাশি বই পড়লেই জ্ঞানলাভ হয়না। অপরের ভাব ও চিন্তা-প্রসূত কথা মাথার মধ্যে নিয়ে যেখানে সেখানে আবৃত্তি কর্‌তে পারলে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে বইপড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। অধীত বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব

করে নেবার ক্ষমতা না হোলে বইপড়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। এজন্তে অধ্যয়নের সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করবে, তাহোলে বই পড়ে বহু জ্ঞানলাভ করবে।

বইয়ের ভেতর তোমরা যা কিছু পাও, সেগুলি যেন রান্নাকরা আহার্য্য বস্তুর মত, নিয়ে খেতে পারলেই হয়। গ্রন্থকার যা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন বা অধ্যয়ন করে যা অর্জ্জন করেছেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ের ভেতর। তোমরা হয়তো ভাবছ ঐগুলি মুখস্থ করে রাখলেই যথেষ্ট। তাতে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। গ্রন্থকার যা দেখেছেন, তা নিজের চোখে দেখতে হবে। তিনি যা অনুভব করেছেন তা নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে, যে বিষয় অবলম্বন করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই বিষয়কে নিজের চিন্তাধারায় নূতন ছাঁচে ঢেলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত করতে হবে। এইভাবে দিনের পর দিন অভ্যাস করলে নিজেদের চিন্তাবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে আর তার দ্বারা যে জ্ঞানের আহরণ হবে, তার সঙ্গে পূর্ব্বাধিকৃত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করলে বইপড়ার যথার্থ ফল লাভ করতে পারবে।

ছেলেবেলা থেকে লোকমত উপেক্ষা করতে অভ্যাস করোনা, তাহোলে বড় হোলে কিছু করতে পারবেনা, অপ্রাসঙ্গিক আলাপ ও অসহনীয় চাকিকথা বর্জন করবে। শান্ত, ধীর, অহঙ্কারশূন্য, সদাপ্রসন্ন হবে, অন্যথা কোন দিন শান্তি সুখ পাবে না। পরচর্চ্চায় শত্রুবৃদ্ধি হয়, মনেরও শান্তি থাকে না। সর্ব্বদা পবিত্র মনে থাকবে। ভগবান আছেন, এটা বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। বড় বড় বাক্যবাগীশরা লোককে প্রতারণা করে। তাদের দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হোতে পারেনা। বাকসংযত হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে। শিক্ষাকে জটিল করার উদ্দেশ্য—যাতে তোমাদের মধ্যে খুব ভালো ছেলে ছাড়া উচ্চশিক্ষা না পায়। শিক্ষালাভের পথ এরূপ অবস্থা হয়ে উঠেছে যে, দরিদ্রের ছেলে মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া করা অসম্ভব। আমাদের দেশ বড় দীন। একথা কয়জনই বা ভাবে? তোমাদের গুণ থাকতে পারে-কিন্তু অপরের আরও বেশী আছে, এটা ভেবে নম্রতা অবলম্বন করবে। নম্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন করে বিদ্যাভ্যাস করবে, এখনকার দিনে বিশেষ পরিশ্রম না করলে জটিল শিক্ষার ব্যূহভেদ করে জয়লাভ করতে পারবে না।

অনেক নির্বোধ উপদেশ অবহেলা করে ধ্বংসের অগাধ সলিলে মিশে যায়, একথাটা ভুলো না। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন ও দ্রুত বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন জটিল হয়ে উঠ্‌ছে। একজন্তে উচ্চতর পুঁথিগত শিক্ষালাভ করে কেরাণী, উকিল প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি করলে হবেনা, ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হ'বে। আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের বৃহত্তর অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করে শেষে অন্য কোন কাজ করবার সামর্থ্য হারিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। একজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করাও তোমাদের দরকার। বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হোতে গেলে শুধু কালি-কলমের ওপর নির্ভরশীল হোলে চল্‌বে না, যন্ত্রপাতিকেও অবলম্বন করতে হবে।

তোমাদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-অর্জ্জনের কোন না কোন বৃত্তিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট হোতে হবে। আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে পূর্ব্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা গেছে, তাই অ-বাঙালীরা এসে যন্ত্রযুগোপযোগী শিল্পবাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র অধিকার করে বসে আছে। একজন্তে বাঙালী আজ শিল্প-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে কেরাণী বা পদস্থ কর্ম্মচারী হয়ে রয়েছে, তার ওপরে উঠ্‌তে পারেনি। বাঙ্‌লার অর্থনৈতিক সঙ্কট, বাঙালীর অন্নসমস্যা ও বেকার অবস্থা লক্ষ্য করে আজ তোমাদের এগিয়ে আস্‌তে হবে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে—তোমরা বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়্‌লে বাহিরের লোক এসে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

আজ আর ভাব বিলাসের দিন নেই শাস্ত্র-মর্য্যাদা জ্ঞান নিয়ে অলস জীবনযাপন করলে চল্‌বে না। সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালী জাতি বহু কেরাণী সৃষ্টি করেছে, এখন তাকে যন্ত্রশিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তোমাদের মত তরুণ প্রাণকে গড়ে তুল্‌তে হবে। তোমাদের সহযোগিতা একজন্যেই আবশ্যক। বার্টাণ্ড রাসেল বলেছেন—'মানবসমাজকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখে একমাত্র যে বস্তুটী, তা হচ্ছে সহযোগিতা আর এই সহযোগিতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ—'

একজন্তে আমার অনুরোধ অন্তর থেকে সকল প্রকার বিদ্বেষভাব দূর করে ফেল, জ্ঞানীরা বা পর্য্যবেক্ষকরা যা বলেন তাই শুনে সেইমত কাজ করতে শেখো।

সুন্দরবনের বাঘ

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জম্বুদ্বীপ ছেড়ে চল্‌লো নৌকো খুব জোরে। বাঁ-দিকে অনেক দূরে সাগর তীর্থকে ফেলে রেখে হুঁ হুঁ কোরে ছুটে চল্‌লো মুড়িগংগার মোহানার দিকে। সমুদ্রে তখন জোয়ার এসে গ্যাছে।

বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রে বেশ বড় বড় ঢেউ উঠছে। নৌকো দু'দিকেই বেশ কাত হ'চ্ছে। সোজা হোয়ে বসা যাচ্ছে না। এরিই মধ্যে আমরা গল্প কোরে চলেছি। দাঁড়িমাঝিরা, আমি, মধু ও নসেন সবাই

শঙ্কর ও হরেনের কুমীর ঘায়েল করা ব্যাপারটার খুব তারিফ্ করলাম।

শঙ্কর বেশ দুঃখ্ কোরেই বল্লে, "তাতো হোলো—কিন্তু বাঘ শিকার তো করা গ্যালো না—"

হরেন বল্লে, "আগে ঘা না দিয়ে তীরে নেমে একটু ঘুরলেই হয়ত বাঘ দেখা যেতো।"

বুড়োমাঝি বোলে উঠলো, "হুঁ-হুঁ-হুঁ—ওসব জঙ্গল-দ্বীপের ধারণা নেই আপনার—সুন্দরবনের অনেক দ্বীপে এখনো মানুষের পা পড়েনি। তবে কাঠের জন্য যে সব দুর্দ্ধর্ষ কাঠুরে লুকিয়ে সুন্দরবনের ঐ সব দ্বীপে ঢোকে, তাদের অনেককেই আর ফিরতে হয় না—"

আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?"

বুড়ো মাঝি বল্লে, "কেউ বাঘের পেটে যায়, কেউ বা কুমীরের পেটে যায়—আবার কেউ বা সাপের কামড়ে মারা যায়।"

খুব অবাক হোয়ে নমেন বলে, 'তবে সুন্দরবনে মানুষ বাস কচ্ছে কি কোরে ?"

বুড়োমাঝি বলে, "তা করবে না কেন। বসতি এগোচ্ছে একটু একটু করে। এখন ত অনেক জায়গা বাসকরার মতন হ'য়েছে—তবে গভীর জঙ্গলে বড় একটা কেউ যেতে পারে না।"

নমেন বলে, "কেন ?"

মাঝি বলে, "মোহনার মুখে সব জায়গাতেই সমুদ্রের খাড়ি, বড় বড় নদী আর অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে—এই সবইতো সুন্দরবন। বসতি হোলে হিংস্র জন্তু প্রাণের ভয়ে আরো গভীর বনে চলে যায়। কাজেই এসব দ্বীপের অধিকাংশই সাপে আর বাঘে ভর্তি। জলেতে আছে হাঙ্গর কুমীর। মিষ্টি জলের অভাব—তারপর এইসব জলপথে নৌকো নিয়ে আসা খুব বিপদ—ঝড়ে যে কত নৌকো ডুবে গ্যাছে তার ঠিকানা নেই! গরমের দিনে এদিকে নৌকো নিয়ে এগোনই যায় না—এই সব কারণেই ওসব জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব হয় না।

শঙ্কর বলে, "তাহ'লে সুন্দরবনে শিকার করাতো ভয়ানক ব্যাপার—"

বুড়োমাঝি বলে, "ভয়ানক বলে ভয়ানক—পদেপদে বিপদ—দেখলেন তো জম্বুদ্বীপে।" এই বোলে নিস্তুমাঝি "গুড়ুক গুড়ুক" করে তামাক টানতে লাগলো।

আমরা সবাই যেন 'হুতুম্-থুম-থুমের' মতন বোসে রইলুম। সুন্দরবনের একটা ভীষণ রূপ যেন আমাদের মনের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা কোরতে লাগলো।

অন্ধকার হোয়ে গ্যাছে। নৌকো মুড়িগংগার মোহানা থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। সমুদ্রের ঢেউ অনেকটা কমে এসেছে। পশ্চিম দিকে সাগর দ্বীপে আর পূবদিকে ২৪পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল। তবে এই দু'তীরের কোন তীরকেই পরিষ্কার দেখা যায় না। সমুদ্রের জলে ফস্ফরাস থাকে—তাই অন্ধকারের মধ্যেও বেশ অনেকটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। শুধু নৌকোর গায়ে আছড়ে-পড়া ঢেউ ভাঙ্গার সেই একঘেয়ে শব্দ। বুড়ো মাঝি নীরবতা ভংগ কোরে মাঝিকে জিজ্ঞাস কোরলো, "সুধীর! কাঁকড়ামারির চর বোধ হয় এসে গ্যালো না ?"

সুধীর মাঝিও বেশ পাকা। বহুবার এসব পথে সে নৌকো চালিয়েছে। কাজেই মোহানার মুখে নদী নালা, চর, ও দ্বীপের খবর সে রাখে। কোন দ্বীপে বসতি হয়েছে, কোনদ্বীপ নির্জন, জন্তু জানোয়ারে ভর্তি, সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে নতুন বসতি হ'চ্ছে—এসব খবর সে বেশ ভালো ভাবেই ব'লতে পারে। সে ধীরে ধীরে বলে, "হাঁ"।

প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা কালো দ্বীপ দেখা গ্যালো। বুড়োমাঝি দ্বীপটি দেখিয়ে বল্লে, "বাবুরা এইবার বন্দুকগুলোয় টোটা ভ'রে ঠিক হোয়ে থাকুন, বাঘ যদি মারতে চান তো এই সুযোগ।"

সুধীর মাঝি বোলে ওঠে, "ভাঁটা নেমেছে—আর তো এগোনো যাবে না—লঙ্গর কোথায় ফেলবো ?"

বুড়োমাঝি বল্লে, "কাঁকড়ামারির উত্তর ধার ঘেঁষে লঙ্গর ফ্যালো। তবে জলটা ভাল কোরে মেপে লঙ্গরটা দেখে ফেলিস্—দরকার হোলেই যেন সহজে তোলা যায়।"

দ্বীপ থেকে প্রায় ৫০ হাত দূরে নৌকো লঙ্গর করা হোলো। সুন্দরী, গড়াই, গেমো প্রভৃতি জঙ্গল যেমন

আর সব দ্বীপ ভরা—এই দ্বীপটিতেও ঐ সব গাছেরই জঙ্গল। আমি, নমেন আর মধু নৌকোর ভেতর থেকে জানলা দিয়ে দ্বীপের তীর বরাবর দেখছি। শঙ্কর ও হরেন নৌকোর দু'মুখে বন্দুক তাক্ কোরে গুঁড়িমেরে তীরের দিকে চেয়ে বোসে রইলো। শঙ্কর ও হরেনের চোখদুটো যেন সুন্দরবনের বাঘ মারবার জন্যে জ্বলতে লাগলো।

বুড়োমাঝি হারিকেনের আলোটাকে নৌকোর খোলের মধ্যে কমিয়ে রাখতে বললো। কারণ আলো দেখলে বাঘ আসে না।

অনেকক্ষণ কেটে গ্যালো, কিন্তু বাঘের কোন চিহ্নই নেই। কিছুক্ষণ পরে বুড়োমাঝি ফিস ফিস্ কোরে বল্লে, "শঙ্করবাবু, বন্দুক ঠিক কোরে ধরুন—ঐ ঝোপটার পাশদিয়ে কতকগুলো হরিণ জল খেতে নামছে—"

শঙ্কর আস্তে বল্লে, "মারবো?"

বুড়োমাঝি বল্লে, "না—না—বন্দুকের আওয়াজ পেলে বাঘ আর এদিকে আসবে না। হরিণ শিকারের জন্যে বাঘও হরিণের পেছন পেছন কোন ঝোপে নিশ্চয়ই 'ওৎ' পেতে বোসে আছে—বা দিলেই সব পণ্ড হোয়ে যাবে।"

হঠাৎ দেখি হরিণগুলো তীর বরাবর পালাতে সুরু করলো। শঙ্কর বন্দুকটা বাগিয়ে ধোরে বোলে ওঠে, "বাঘ বোধ হয় তাড়া কোরেছে—"

বুড়োমাঝি নীচু গলায় বল্লে, "বাঘে ঠিক যে তাড়া কোরেছে তা নয়—আমাদের নৌকোটাকে দেখে শিকারীর ভয়েও ওরা বোধ হয় পালিয়ে গ্যালো—"

মাঝির কথা শেষ হোতে না হোতে বিকট শব্দে সারা জঙ্গলটা যেন কেঁপে উঠলো। বাঘের ডাক চিড়িয়াখানায় শুনেছি বটে, কিন্তু বনের বাঘের এরকম ডাক কখনো শুনিনি। কি ভয়ঙ্কর এর ডাক। শঙ্কর ও হরেনের তাক্ করা বন্দুকের গোড়াটা আচম্কা ডেকের ওপর ঠুকে গ্যালো।

বুড়োমাঝি বল্লে, "বাঘটা তাহোলে ঠিকই এসেছিল। লাফ দেবার আগেই হরিণগুলো পালিয়ে গ্যালো। তাই বোধহয় "রায়সাহেব" (বাঘ) গোসা কোরেছেন।"

শঙ্কর ব্যস্ত হোয়ে বোলে ওঠে, "ঝোপের পাশে দু'টো যেনো কি জ্বল জ্বল ক'রছে—বাঘের চোখ নাতো?"

"কই!— কই!—" বুড়োমাঝি শঙ্করের পাশে এসে বসে।

শঙ্কর বলে "ঐ যে—যেখেনে হরিণগুলো ছিল ঠিক তার পাশের ঝোপটায়—"

বুড়ো নিঙমাঝি কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, "হাঁ, বাঘই তো বটে—"

শঙ্কর বলে, "গুলি করবো?"

বুড়ো মাঝি বলে, "না, যদি ফস্কে যায় তাহলে এক-লাফে হয়তো নৌকায় এসে পড়তে পারে—"

এইকথা বোলে বুড়োমাঝি নিঃশব্দে লঙ্গরটাকে তুলে নৌকোটাকে আরও ৫০।৬০ হাত দূরে সরিয়ে নিতে বল্লো। ঠিক ঐভাবে নৌকোটাকে সরিয়ে নেওয়া হোলো। বাঘের চোখ দুটো তখনও একই ভাবে জ্বলছিলো।

হরেন শঙ্কর দু'জনে এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়লো—কিন্তু কারুর গুলি বাঘের গায়ে লাগলো না। বাঘ কিন্তু পালায়নি—একই ভাবে ছিল। শঙ্কর আর একটা টোটা ভরতে যাবে তখন বুড়ো মাঝি শঙ্করের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিজেই টোটা ভরলো। তারপর বাঘের চোখ লক্ষ্য কোরে গুলি ছুঁড়লো। সংগে সংগে বাঘের চিৎকার শোনা গ্যালো। ঝোপের পাশ থেকে বাঘটা লাফ দিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গ্যালো।

বুড়োমাঝি বললে, "বোধ হয় পায়ে টায়ে লেগেছে—তাই গোঙড়াতে গোঙড়াতে চোলে গ্যালো।"

বুড়ো মাঝির পাকা হাত দেখে শঙ্কর হরেন খুব প্রশংসা করতে লাগলো! কিন্তু মাঝি সে সব কথায় কান না দিয়ে আপন মনেই বোলে ওঠে, "মরলে তো ভাল হোতো, কিন্তু এতো আর এক বিপদ হোলো দেখছি—"

আমরা সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বিপদ মাঝি?"

মাঝি কোন উত্তর না দিয়ে নৌকোর চারদিকটা ভাল কোরে দেখে নৌকোটাকে আরও উত্তর পশ্চিম দিকে সরিয়ে নিয়ে লঙ্গর ক'রতে বললে।

লঙ্গর করার পর সকলকে রাত্রে জেগে থাকতে বল্লো। হাওয়াটা যদি উত্তরে না হোতো, তা হোলে উজান ঠেলেও সে নৌকো ছেড়ে দিতো। কারণ কাঁকড়ামারির চরের কাছে রাত কাটানো ভাল নয়। আমরা বেশ ভয় খেয়ে গেলাম। মাঝিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ো মাঝি তখন তামাক খেতে খেতে বললো, "সেবার মাইথন থেকে আরও দক্ষিণে সুন্দরবনের একটা দ্বীপে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম। দ্বীপটির মাঝে একটি খাল ছিলো। খালের মাঝামাঝি আমাদের নৌকোটাকে লঙ্গর করা হয়েছিল। পাছে রাত্রে বাঘ আসে এই জন্যে একজন মাঝি গলুইয়ের কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিল। আমরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হোলে উঠে দেখি, পাহারারত মাঝিটি নেই—তার জায়গায় কতকটা রক্ত শুকিয়ে রোয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাদের রক্ত যেন হিম হোয়ে গ্যালো—"

আমি বল্লাম, "কি সর্বনাশ, নৌকোয় বাঘ?" আমরা সকলে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম!

শঙ্কর জিজ্ঞেস করে—"বাঘটা কি কোরে এলো?"

বুড়ো মাঝি বল্ল, "সুন্দর বনের বাঘ খুব চালাক—অদ্ভুত এদের বুদ্ধি আর সাহস। তন্দ্রার ঘোরে মাঝিটি যেন ঢুলে পড়েছিল, ঠিক সেই সময়ে বাঘ আস্তে আস্তে সাঁতরে এসে নৌকোর গা বেয়ে চুপি চুপি উঠে মাঝিটির ঘাড়টি কামড়ে ধোরে নিঃশব্দে নিয়ে যায়। আমরা কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না।"

আমরা সকলে 'থ' হোয়ে গেলাম। বুড়ো মাঝি তখন বল্লে, "এই ভয়েইতো নৌকোটাকে সরিয়ে নিয়ে এলাম—কি জানি এ বনের বাঘকে তো বিশ্বাস নেই।"

সে রাতে আমাদের কারুর ঘুম হয়নি। শঙ্কর আর হরেন সারারাত নৌকোর দুপাশে বন্দুক তাক কোরে বোসেছিলো। রাতটা প্রায় সকলেরই বেশ আতঙ্কে কেটেছিল।

ভোরের একটু আগেই জোয়ার এসে গ্যালো। পাল-ভরা দখিনে বাতাসে নৌকো খুব জোরে কাকদ্বীপের দিকে ছুটে চললো। কাঁকড়া-মারির চর দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনন্ত জলের মধ্যে মিলিয়ে গ্যালো।

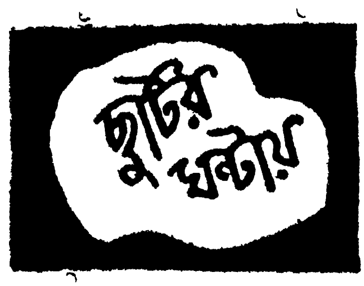


সূর্য্যি মামা

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সোনার দেশের ছোট্ট ছেলে শোনো মোর নাম,
পরশে মোর ধরার বুকে জাগে উজল প্রাণ।
সূর্য্যি ঠাকুর নামটি আমার থাকি আকাশ পারে,
নিদ ভাঙানীর গানটি গেয়ে বেড়াই চারিধারে।
ভোরের আগেই কমল বনে জাগাই কমলকলি,
মিঠি হাতের পরশে মোর জাগে ভোমর অলি;
টুনটুনি আর বুলবুলিরা গেয়ে উঠে গান,
ছল ছল ছল নদীর জলে জাগে মধুর তান।
জাগো ওগো ছোট্ট খোকা চক্ষু দুটি খোলো,
ভোরের পাখী যায় হেঁকে যায় "গা তোল, গা তোল।"

—



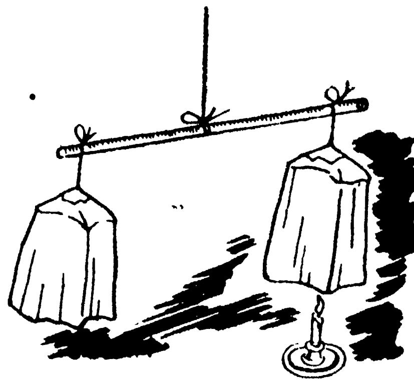
চিত্রগুপ্ত বিরচিত

ইতিমধ্যে তোমাদের অনেকেই হয়তো আগের সংখ্যায় যে সব মজার খেলার কথা-বলেছি, সেগুলি নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করেছো। আজ তোমাদের আরো দুটি নতুন ধরণের মজার খেলার কথা বলি। এ দুটি খেলাও তোমরা পরখ করে দেখতে পারো—রীতিমত মজা পাবে।

গরম বাতাস আর ঠাণ্ডা বাতাস ঃ

প্রথমেই বলি, গরম বাতাস আর ঠাণ্ডা বাতাস ওজন করে দেখবার খেলার কথা। ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে গরম বাতাস যে হাল্‌কা হয় ওজনে—বিজ্ঞানের এ রহস্য, হয়তো তোমাদের অনেকেরই জানা নেই। এরহস্যের প্রত্যক্ষ প্রমা

পেতে হলে—পাশের ছবিতে আঁকা দাঁড়ি-পাল্লার মতো

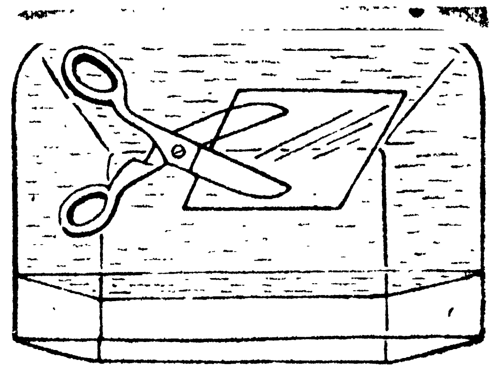


একটি দাঁড়ি-পাল্লা তৈরী করো। কি করে করবে, বলি। একটা লম্বা কাঠি নাও—তার দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে দুটি কাগজের ঠোঙা ঝুলিয়ে দাও। কাঠির মাঝামাঝি আরো একটি দড়ি বাঁধো। এবারে দড়ি-বাঁধা ঐ কাঠিটি হলো দাঁড়ি-পাল্লার মতন। কাগজের ঠোঙা দুটির মুখের ফুটো থাকবে নীচের দিকে—উপর দিক থাকবে ঢাকা—রন্ধ্রহীন। এবারে একটি বাতি জ্বালো—জ্বেলে দাঁড়ি-পাল্লাটি এমন ভাবে বাতির উপরে ধরো, যেন একটি ঠোঙার খোলা-মুখ থাকে ঠিক জ্বলন্ত বাতির উপরে। তবে হুঁশিয়ার—ঠোঙাটি এমন ভাবে বাতির উপরে ধরতে হবে যে জ্বলন্ত আগুনের এতটুকু ছোঁয়া না লাগে ঠোঙার গায়ে। দাঁড়ি-পাল্লাটিকে এভাবে ধরবার ফলে, বাতির আগুনের তাপে এ ঠোঙাটির ভিতরকার বাতাস গরম হয়ে উঠবে—তখন দেখবে, পাল্লার প্রান্তে গরম-বাতাসভরা ঠোঙাটি উপরে উঠবে এবং অন্য দিকের ঠাণ্ডা-বাতাসভরা ঠোঙাটি ভারী বলে নীচের দিকে নেমে যাবে। কারণ, তোমরা সকলেই দেখেছো—দাঁড়ি পাল্লায় কোনো জিনিষ ওজন করলে—ভারী দিকটা হেলে থাকে নীচে, আর হাল্কা দিক উঠে যায় উপরে…কাজেই গরম বাতাস আর হাল্কা বাতাসের ওজনের তফাৎ সহজেই বোঝা যায়!

কাঁচি দিয়ে কাঁচ কাটার কায়দা ঃ

এবারে যে মজার খেলাটির কথা বলবো, সেটি যদি নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারো তো, এ খেলাটি দেখিয়ে লোকজনকে রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে।

তোমরা প্রায় সকলেই দেখেছো যে কাঁচ কাটবার সময় বিশেষ এক ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়…সেটি না হলে সুষ্ঠুভাবে কাঁচের অংশ কাটা চলে না। কিন্তু কাঁচ কাটবার আরো একটি বিচিত্র উপায় আছে—আজ তোমাদের সেই উপায়টির কথাই জানিয়ে রাখি।



এ পদ্ধতিতে কাঁচ কাটতে হলে—বড় একটি পাত্রে জল ভরে নাও, আর নাও—এক টুকরো পাতলা কাঁচ এবং একটি ভালো কাঁচি। এবারে ঐ কাঁচটিকে হাতে ধরে পাত্রের জলে ডুবিয়ে রাখো—তবে হুঁশিয়ার… কাঁচের টুকরো এবং হাত আগাগোড়া যেন পাত্রের জলে ডোবানো থাকে—এতটুকু বাইরে বেরিয়ে না থাকে। এবারে অন্যহাতে কাঁচটিকে বাগিয়ে ধরে, কাঁচি-সমেত সে-হাতটিকেও পাত্রের জলের মধ্যে আগাগোড়া ডুবিয়ে দাও। পাত্রের জলে কাঁচ আর কাঁচি সমেত দুটি হাত কব্জী পর্য্যন্ত ডুবিয়ে রেখে এবারে ঐ জলের মধ্যেই কাঁচি চালিয়ে নিজের খুশীমত ছাঁচে কাঁচের টুকরোটিকে কাটবার চেষ্টা করো। দেখবে—জলের ভিতরে-রাখা কাঁচের টুকরোটিকে দিব্যি ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করে কাঁচি চালিয়ে মোটা কাপড় বা কার্ডবোর্ডের টুকরোর মতো অনায়াসে কেটে ফেলা যাবে। এ কাজ কেন সম্ভব হয়, জানো? জলের মধ্যে কাঁচ আর কাঁচি ডুবিয়ে রাখার জন্য কাটবার সময় এ দুটিতে কোনো 'স্পন্দন' বা vibration জাগে না বলেই কাঁচ ফাটে না।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি ঃ

ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়

অসমান চতুষ্কোণের হেঁয়ালি ঃ

৮	১১	২	১৩
১০	৫	১৬	৩
১৫	৪	৯	৬
১	১৪	৭	১২

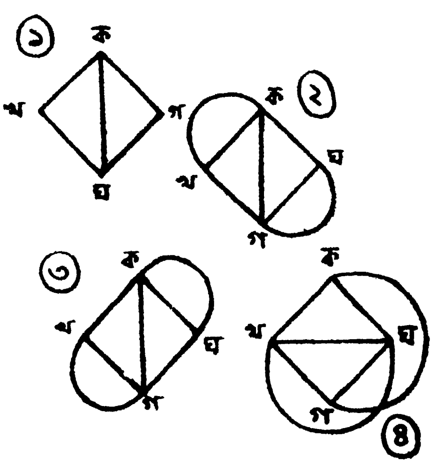
উপরে এলোমেলোভাবে সাজানো প্রতি খোপে ১ থেকে ১৬ অবধি যে নম্বর দেওয়া চতুষ্কোণটি রয়েছে, তার লম্বা-লম্বি কিম্বা আড়াআড়ি অথবা কোনাকুনি এক লাইনে পর-পর চারটি খোপের সংখ্যা একত্রে যোগ দিলে মোট অঙ্ক দাঁড়াবে ৩৪ ! ধরো, তোমাকে বলা হলো—২ আর ১৫ এই দুটি নম্বর ব্যবহার করতে পারবে না, তবে এ দুটি নম্বরের বদলে উপরের চতুষ্কোণের মধ্য থেকে অন্য যে-কোনো দুটি সংখ্যা বেছে নিয়ে তুমি যোগ দিতে পারবে—চারটি সংখ্যার যোগফল কিন্তু হওয়া চাই ৩৪…এর কম বা বেশী হলে চলবে না ! এবারে এমনভাবে এই চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি খোপে ২ আর ১৫ সংখ্যা দুটিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নম্বর-গুলি সাজাও—যাতে লম্বালম্বি, আড়াআড়ি কিম্বা কোনা-কুনি ভাবে এক-লাইনে পর-পর চারটি খোপের সংখ্যা যোগ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে—৩৪ ! তোমার সাফল্য নির্ভর করছে—২ আর ১৫ সংখ্যা দুটির বদলে, অন্য যে দুটি সংখ্যাকে পুনর্বার ব্যবহার করার জন্য তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে বেছে নিতে পারবে ! এবার দেখ দেখি, আজব অঙ্ক-সাজানো এই চতুষ্কোণের হেঁয়ালির সমাধান করতে পারো কি না !…

নদী পার হওয়া ঃ

নদীর ঘাটে একখানি ডিঙি-নৌকা…এপার থেকে ওপারে যাবে বলে তিনজন সাধু আর তিনটি রাক্ষস এলো ঘাটে ! ছ'জনই ওপারে যাবে, কিন্তু নৌকায় মাঝি নেই… তাছাড়া নৌকায় আবার একসঙ্গে দু'জনের বেশী পার হবার উপায় নেই—এমন ছোট্ট নৌকা। কিন্তু রাক্ষস মানুষ খায়, তাই সাধুদের হলো ভাবনা—দু'জন কি তিনজন রাক্ষসের কাছে একজন সাধুকে রেখে, দুজন সাধু ওপারে যাবে—তাতে বিপদ…রাক্ষসরা দলে ভারী হলে—সাধুকে খেয়ে ফেলবে ! অথচ ছ'জনকেই নদী পার হতে হবে ! এদিকে সাধুদের মধ্যে একজন, আর রাক্ষসদের মধ্যেও একজন শুধু নৌকা চালাতে পারে। বলতে পারো, কি উপায়ে নিরাপদে সকলে নৌকায় চড়ে নদীপার হতে পারে ?…

আষাঢ় মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর—

পথের ধাঁধার উত্তর—



গোলকের ভিতরকার চারটি দ্বীপকে রেখা টেনে চতু-ষ্কোণ তৈরী করো—উপরের ঐ ১ নং ছবির মতো ধরণে। এই চতুষ্কোণে চারটি বিন্দু—'ক', 'খ', 'গ' আর 'ঘ' হলো চারটি দ্বীপ এবং এই দ্বীপের বিন্দুগুলি ঘিরে রেখা টেনে বিভিন্ন সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াতের পথের নিশানা রচনা করো। তবে যে সব নিয়ম-ব্যবস্থা আছে—তার একটুক ব্যতিক্রম করা চলবে না।

এখন, যদি তুমি 'ক' এর সঙ্গে 'খ', এবং 'গ' এর সঙ্গে 'ঘ' এর যোগাযোগ করবার জন্ম বাইরে দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পথ রচনা করো, তাহলে যাতায়াত চলবে ২ নং ছবির ধরণে। যদি তুমি 'ক' আর 'ঘ', কিম্বা 'খ' আর 'ঘ' এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করতে চাও তাহলে ৩নং ছবিতে যেমন হদিশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে পথ চলতে হবে! আবার, যদি তুমি 'ক' আর 'গ' কিম্বা 'খ' আর 'ঘ' এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে পথ চলতে চাও, তাহলে তোমায় যাতায়াত করতে হবে—৪নং ছবির হদিশ অনুসারে। যাই হোক, উপরের এই হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'খ' আর 'ঘ'—এই দুটি বিন্দু হলো—এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াতের 'আদি' এবং 'শেষ' প্রান্ত। সুতরাং যে কোনো পথেই তুমি যাতায়াত করো, তোমাকে হয় 'খ' কিম্বা 'ঘ'—এ দুটি বিন্দুর কোনো একটিতেই 'যাত্রা-সুরু' এবং 'যাত্রা-শেষ' করতেই হবে। কাজেকাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শান্তিবাবু এবং কান্তিবাবু—এ দুই বন্ধুর একজনের বাড়ী হয় 'খ' দ্বীপে, নয় 'ঘ' দ্বীপে। অর্থাৎ যদি আমরা ধরে নিই যে কান্তিবাবুর বাড়ী 'ঘ' দ্বীপে, তাহলে তাঁর বন্ধু শান্তিবাবুর বাড়ী হবে 'খ' দ্বীপে! এইভাবে হিসাব করে দেখলে—২নং ছবির ধরণে, মোট ৪৪ বার, ৩নং ছবির ধরণে, মোট ৪৪ বার এবং ৪ নং ছবির ধরণে, মোট ৪৪ বার—অর্থাৎ সবশুদ্ধ, মোট ১৩২ বার প্রত্যেকটি সাঁকো মাত্র একবার করে পার হয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করা যাবে। ২নং ছবির হদিশ অনুসারে, বাইরের অর্দ্ধবৃত্তাকার পথ-রেখাকে যদি 'ঙ' হিসাবে ধরা যায়, তাহলে 'খ ঙ ক খ,' 'খ ঙ ক গ,' খ ক ঙ খ' কিম্বা 'খ ক গ' প্রভৃতি ধরণের ৬ রকম উপায়ে যাতায়াত করা চলবে। এমনিভাবে, যদি 'খ ঙ ক ঘ,' 'খ ক ঘ,' 'খ গ ঙ ঘ,' 'খ গ ক' কিম্বা 'খ গ ঘ' হিসাবে পথ-চলা যায়, তাহলে ৪ রকম উপায়ে যাতায়াত সম্ভব। এই হিসাব অনুসারে, ৩ নং ছবির হদিশমতো পথ-চললে, 'খ ঙ গ ক,' 'খ ঙ গ খ,' 'খ গ ক' কিম্বা 'খ গ ঙ খ' প্রভৃতি ৬ রকম উপায়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করা সম্ভব হবে। এছাড়া 'খ ঙ গ ঘ,' 'খ ক ঙ ঘ,' 'খ ক গ,' 'খ ক ঘ' কিম্বা 'খ গ ঘ'—আরো ৬ রকম উপায়েও পথে যাতায়াত চলবে। ৪ নং ছবির হদিশমতো পথ চলার ধরণটিও—ঠিক উপরোক্ত উপায়গুলিরই অনুরূপ। এবার তোমরা নিজেরা বসে-বসে এ সব বিভিন্ন পথের সন্ধান রেখায় ফুটিয়ে তোলো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে।

যারা পথ এঁকে পাঠিয়েছে তাদের নাম :—

তৃপ্তিরাণী মাইতি (মেদিনীপুর) চার রকম পথ দেখিয়েছে :—

মাধবী বাগচী (সীতারামপুর) ছ'রকম পথ দেখিয়েছে :—

একরকম পথ দেখিয়েছে :—

১। বাপি সেনগুপ্ত (ধানবাদ)
২। উমা, দিগীন্দ্র ও দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ধানবাদ)
৩। প্রদীপগুহ রায় (রাজস্থান)
৪। দেবেশবর্ম্মন রায় (হাজারীবাগ)

বুদ্ধির ধাঁধার উত্তর :—মশাই।

যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের নাম :

১। রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সুতপা মুখোপাধ্যায় (কামারহাটী)
২। অরিন্দম ও সুপ্রিয়া দাস (কৃষ্ণনগর)
৩। দেবেশকুমার বর্ম্মনরায় (হাজারীবাগ)
৪। বলরাম, কিরীটি, সুব্রত, বদন ও তীর্থনাথ (রামসাগর ছাত্রাবাস)
৫। পদ্মাবতী ধর ও শ্যামসুন্দর ধর (কলিকাতা)
৬। বাপি সেনগুপ্ত (ধানবাদ)
৭। উমা, দিগীন্দ্র ও দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ধানবাদ)
৮। দেবাশীষ মৈত্র (কলিকাতা)
৯। প্রভাসকুমার কাষ্ঠ (শান্তিপুর)
১০। দীপু, শিবু, টুলু, মানস ও মানব মিত্র (কলিকাতা)
১১। মাধবী বাগচী (সীতারামপুর)
১২। তৃপ্তিরাণী মাইতি) মেদিনীপুর)

এ্যান্‌তন্‌ প্যাভলোভিচ চেখভ

অশোক সেন

এ বছরের জানুয়ারী মাসে চেখভের জন্মের শতবার্ষিকী পূর্ণ হয়েছে। চেখভের জন্ম হয় ১৮৬০ সালের ১৭ই জানুয়ারী এবং ১৯০৪ সালের ১লা জুলাই রাত্রে তিনি মারা যান ৪৪ বছর বয়সে। নাটক ও ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তাঁর স্থান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে। এ প্রবন্ধে নাট্যকার চেখভ সম্বন্ধেই কিছুটা আলোচনা করা যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে, টলষ্টয় ও চেখভের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও যশ ছড়িয়ে পড়বার আগে, যে সব রাশ্রিয়ান নাট্যকারেরা নাটক রচনা করতেন তাঁদের লেখবার বিষয়বস্তু ছিল নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা—যেমন, দাসপ্রথা, সরকারী কর্ম্মচারী মহলের অসাধুতা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পাপাচার, সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের আলস্য ও বিলাসপূর্ণ জীবনধারা ইত্যাদি। এ বিষয়ে লেখা গোগলের Revizor বা The Inspector General (১৮৩৬) অল্পদিনের মধ্যেই নাম করে ফেলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে।

১৮৫০ থেকে ১৮৭০ এর মধ্যে Ostrovski ও Pisemski র লেখাগুলি প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হতে থাকে রাশিয়াতে। কিন্তু বাহির বিশ্বে এদের লেখা নাটক বিশেষ সমাদর পায় না।

টলষ্টয় তাঁর বিখ্যাত নাটক The Power of Darkness রচনা করেন ১৮৮৬ সালে—কিন্তু নাটকটি প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও ১৮৯৪ সালের আগে অর্থাৎ Alexander III বেঁচে থাকা অবধি এ নাটককে মঞ্চস্থ করবার জন্য ওদেশে সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় নি।

এ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৮তে Theatre libreএ—দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক Lola—রাশিয়ান peasant life নিয়ে লেখা এই বাস্তবধর্ম্মী নাটকটির উচ্চ প্রশংসা করেন Lola। ক্রমশঃ চারিদিকে নাটকটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে—নাট্য সমালোচকেরা আজ একবাক্যে স্বীকার করেন যে মঞ্চে Naturalistic Dramaর যুগ প্রবর্ত্তনের জন্য যে তিনটি নাটক প্রধানতঃ দায়ী সেগুলি হল—Tolstoyএর The power of Darkness, Ibsen এর Ghosts এবং Strudbergএর miss gulic.

টলষ্টয় ছাড়া টুর্গেনেভেরও কয়েকটি নাটক বেশ খ্যাতি লাভ করে (A month in the Country ; The step mother)। এঁরা সবাই সত্যিকার শক্তিশালী নাট্যকার ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাশিয়ার Master Dramatist বলতে একবাক্যে প্রথমেই নাম করা হয় চেখভের। তার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর নাটকগুলিতে আগাগোড়া নাট্যরস যেভাবে জমে উঠেছে এমনটা বোধহয় ও দেশের আর কোনো নাট্যকারের মধ্যেই দেখা যায় না।

বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেত্রী ও প্রডিউসার Erade Gallienne চেখভ সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন—অনেক সময়েই একটা অদ্ভুত কথা শোনা যায় যে চেখভের নাটকগুলো এত typically Russian যে অন্য দেশের লোকের কাছে এসব নাটকের কোনো আবেদন থাকতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনে এ ধরণের উক্তির আর প্রতিবাদ করবারও দরকার হয় না। যেহেতু চেখভের নাটকের পাত্রপাত্রীর নামগুলো আমাদের কানে শুনতে অদ্ভুত লাগে বা তারা দাঁড়িগোঁফ রাখে। Samorar এবং ikon ব্যবহার করে, সুতরাং তাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন মানবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, এতো আর কোনো যুক্তি নয়।

সাধারণ লোককে চেখভ যেমনভাবে বুঝতেন, যেমনভাবে তাদের মর্মে প্রবেশ করতে পারতেন—আধুনিক সাহিত্যে এবিষয়ে আর কেউ তাঁর সমকক্ষ আছেন বলে মনে হয় না। তাদের দোষত্রুটি দেখে তাঁর মুখে যেন হাসির রেখা ফুটে উঠতো—তাদের আনন্দে নিজেও অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং চোখের কোনটা হয়তো ভিজে যেতো। অন্তরের অগাধ স্নেহ, কোমলতা, করুণা, প্রীতি ও সহানুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দরদী চেখভ মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সত্যই আবিষ্কার করলেন যে, মানুষ শুধুমাত্র ভাল বা শুধুমাত্র মন্দ, শুধু সুখী অথবা শুধু অসুখী, কিম্বা সম্পূর্ণ শক্তিমান বা সম্পূর্ণ দুর্ব্বল—এর কোনটাই আসল পরিচয় নয়। এই সবগুণগুলিই একই সঙ্গে তার ভেতর দেখা যায়—এই সব নিয়েই সে পূর্ণ মানুষ—

চেখভের নাটকগুলো পড়লেই বোঝা যায় মানব জীবনের সত্যাসত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল কত স্পষ্ট কত প্রগাঢ়। একদিকে তার বিষাদে ভরা, আবার সেই সঙ্গেই মিশ্রিত হয়ে থাকে একটা comical element—এই দুইয়ে মিলিয়েই বোধ হয় চেখভ তার দর্শক ও পাঠকদের সামনে a complete sense of life এর চেহারা ধরতেন।

চেখভের নাটকগুলো বুঝতে হলে সেই সময়কার রাশিয়ার ইতিহাস একটু জানা থাকা দরকার। তাঁর জন্মের একবছর বাদে (১৮৬১) দাসত্ব প্রথা আইনের দ্বারা অবলুপ্ত হলেও, চাষীদের উপর পীড়ননীতি আরও বহুদিন অবধি চলতে থাকে। রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন Tzar এবং তাঁরই নিযুক্ত মন্ত্রীবর্গ।

দাসত্বপ্রথা অবলোপের পরও বহুদিন অবধি জমিদারেরা প্রজাদের

উপর দমননীতি এবং অত্যাচার চালিয়ে গেলেন। তফাৎটা শুধু হল এই যে, এখন আর আগের মত তারা ভূমিদাস রইল না, অর্থাৎ তাদের নিয়ে কেনাবেচার ব্যাপারটা মাত্র বন্ধ হয়ে গেল। জমিদারেরা এত বেশী ভাড়া এবং জরিমানা ইত্যাদি প্রজাদের থেকে আদায় করতেন যে দুঃস্থ প্রজাদের পক্ষে এসব পাওনা মিটিয়ে আর তাদের কৃষির ব্যাপারের কোনো উন্নতি সাধন করা সম্ভব হোত না। এই সব কারণেই তদানীন্তন চাষবাস এবং কৃষিকর্ম্মের দিকটা এত পেছিয়ে পড়েছিল যে প্রায়ই ফসল উৎপাদনে অজন্মা দেখা দিত এবং দেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হোত। চাষীদের অবস্থা ক্রমশঃ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল এবং অনেকেই সব হারিয়ে শেষে বড় সহরের দিকে রওনা হোত কোনরকমে জীবিকা অর্জ্জনের আশায়। চেখভ নিজে ভূমিদাসের পৌত্র, তাঁর বাবাও ছিলেন সাধারণ দোকানদার। ছেলেবেলা থেকেই অভাব, অত্যাচারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কৃষি-শ্রমিক ও কারখানা, মিল প্রভৃতির শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমাগত যে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল তারই প্রথম বিস্ফোরণ হয় চেখভের মৃত্যুর একবছর বাদে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে—নানাকারণে অবশ্য এই শ্রমিক বিদ্রোহ কৃতকার্য্যতা লাভ করেনি।

'During these grey years most of the "Intellectuals", with no outlet for their energies, were content to forget their ennui in Vodka and Card-playing; only the more idealistic gasped for air in the stifting atmosphere, crying out in despair against life as they saw it and looking forward with a pathetic hope to happiness for humanity in "two or three hundred years" It is the inevitable tragedy of their existence, and the pitiful humour of their surroundings that are portrayed with such insight & sympathy by Anton Tchekoff who is, perhaps, of modern writers, the dearest to the Russian people.'—Marian Fell.

Taganrog এর হাইস্কুল থেকে সম্মানের সঙ্গে পাশ করে চেখভ ডাক্তারী পড়বার জন্ত ভর্ত্তি হলেন মস্কো ইউনিভার্সিটিতে। একই সঙ্গে পড়াশোনা ও লেখার সাধনা চলতে লাগল—কারণ এই বয়স থেকেই তাঁকে পরিবারের সাহায্যের জন্ত অর্থ উপার্জ্জন করতে হোত। ডাক্তারী পাশ করবার পরও চেখভ একই সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসা এবং সাহিত্য-সাধনা চালিয়ে যান। তাঁর ভাই মাইকেল বলেন যে স্কুলে পড়বার সময় Anton তাঁর প্রথম নাটক fatherless রচনা করেন; পরে এ নাটকটি তিনি ছিঁড়ে ফেলেন। ১৯২৩ সালে চেখভের একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং এটির নাম দেওয়া হয় fatherless—যদিও নামের সঙ্গে কাহিনীর কোনই সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এর নায়ক ২৭ বছর বয়সের স্কুল মাষ্টার Platonor। সে মনে করে তার ভেতরটা প্রেম একেবারে শুকিয়ে গেছে। Turgenev এর Kudin এর মত plotonovও দেখাতে চায় সে মনে প্রাণে দার্শনিক—প্রেম এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়—কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে না। সব সময় মদে চুর হয়ে থাকে এবং নিত্য নূতন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়। একটি বিবাহিতা মহিলা—যাকে সে বিপথগামী করেছিল—শেষ পর্য্যন্ত তাকে গুলি করে হত্যা করে। কাহিনীর ভেতর বিশেষ কিছুই নেই—কিন্তু প্রধান চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এইজন্ত যে, পরের আরও অনেক নাটকেই এই ধরণের চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়—এরা হচ্ছে সেই জাতীয় লোক যারা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না—যাদের জীবনটাই হচ্ছে বাহুল্য মাত্র। প্লেটোনভ আমাদের Hjalmar Ekdalএর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য চেখভের নাটকটি 'wild Duck' নাটকের আগেই লেখা হয়।

এরপর চেখভ কয়েকটি একাঙ্ক নাটক লেখেন—তার মধ্যে 'The Bear' নাটকটি আজও নানাদেশে ষ্টেজ হয়।

১৮৮৭ সালে চেখভ তাঁর চার অঙ্কের ইভানভ নাটক প্রকাশ করেন। প্রধান চরিত্রটির সঙ্গে প্লেটোনভ্ চরিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ইভানভ গ্রামবাসী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক—তিনি বিয়ে করেন একজন ইহুদি মেয়েকে। Gentle কে বিয়ে করার দরুণ এবং baptized হওয়াতে মেয়েটির বাপ-মা তাকে ত্যাগ করে—ইভানভের আত্মীয়রাও তাকে গ্রহণ করতে চায় না—ফলে ইভানভকে একেবারে সমাজ বহির্ভূত হয়ে থাকতে হয় এবং ক্রমশঃ যেন চারিদিক থেকে তার সর্বনাশ হবার উপক্রম হয়। তার স্ত্রী হয়ে পড়ে ক্ষয়রোগাক্রান্ত এবং ইভানভ Sasha নামে একটি যুবতী মেয়ের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। মেয়েটিকে বিয়ে করবে ঠিক করে শেষকালে বিবেকের দংশনে ঠিক বিয়ের আগে গুলি করে ইভানভ আত্মহত্যা করে।

বন্ধু Suvorinকে লেখা চেখভের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ইভানভকে তিনি দুশ্চরিত্র হিসাবে দেখাতে চাননি। ইভানভ উচ্চ-বংশজাত এবং উচ্চ শিক্ষিত—যদিও সে নিজে মনে করে—সে এক সময় অনেক কিছু বড় কাজ করেছে, আসলে কিন্তু জীবনে সে এমন কিছুই করতে পারেনি। চেখভ একটি চিঠিতে লিখেছেন—"Never, or hardly ever, do we find in Russia a gentleman or a University man who does not boast of his past. The present is always worse than the past. Why? Because Russian irritability has this peculiar quality, that it is quickly followed by exhaustion." এরপর চেখভ তৎকালীন রাশিয়ান যুবকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্কুল ছাড়তে না ছাড়তেই তারা বিরাট সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বসতো—স্কুল তৈরী করবে, চাষীদের শিক্ষিত করবার আয়োজন করবে, সামাজিক দুর্নীতি দূর করবে এবং আরও কত কি। এত সব বোঝার চাপে ৩৫ বছর হতে না হতেই তারা ক্লান্ত এবং জরাজীর্ণ হয়ে পড়তো। এরপর আবার চেখভের চিঠি থেকে তুলে দিই—"At this stage people without vision or scruple blame their circumstances

call themselves Superfluous, see themselves as Hamlets & leave it at that. People such as Ivanor do not solve problems, they only sink under the weight of them."

১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চেখভ্ The wood Demon নাটকটি রচনা করেন—তখনকার দিনে প্রচলিত একঘেয়ে Theatrical devices বাদ দিয়েই তিনি ঐ নাটকটি লেখেন। বনভূমির প্রতি চেখভের যে একটা সহজাত প্রীতির ভাব ছিল, এ নাটকেই তা প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত রূপে প্রায় আট বছর বাদে এই নাটকটিই আবার Uncle Vanya নামে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি লোকের করুণ জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটকটি রচিত। নাটকের মূল বক্তব্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে একটিমাত্র প্রতীক ঘটনার ভেতর দিয়ে—Vanya প্রফেসার Serebriakovএর প্রতি দু'দুবার গুলিবর্ষণ করল, অথচ একবারও সাফল্যলাভ করতেপারল না। এই ব্যর্থতাই—নাটকটির পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দাম্ভিক প্রফেসর পূর্ব্ব স্ত্রীর মা, ভাই ও মেয়েকে চিরকাল এমন একটা ভাব দেখিয়ে এসেছেন—যেন কালে তিনি এক বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন নিজেকে। Vanyaর যখন এ বিশ্বাস ভাঙল তখন আর নিজেকে শোধরাবার সুযোগ বা বয়স তার নেই। তার জীবনের ব্যর্থতা তার নিজের কথার ভেতর দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—

Oh how I have been deceived! For years I have worshipped that miserable Gout-ridden Professor. Sonice and I have squeezed this estate dry for his sake. We have bartered our butter and curder and peas like misers, and have never kept a morsel for ourselves, so that we could scrape enough pennies together to send him. I was proud of him and his learning; I have received all his words and writings as inspired, and now? Now he has retired, and what is the total of his life? A blank! He is absolutely unknown, and his fame has burst like a soap bubble. I have been deceived, I see that now, basely deceived'.

প্রফেসরও অন্তরে উপলব্ধি করেছেন নিজ জীবনের ব্যর্থতা। তাঁর পূর্ব্ব স্ত্রীর মার চরিত্র এত ব্যর্থ যে শেষ পর্য্যন্ত নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই তিনি সত্য বলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। প্রফেসরের দ্বিতীয়া স্ত্রী Helenaর জীবনও ব্যর্থতায় ভরা, অন্য দুটি প্রধান চরিত্র Dr. Astroff এবং প্রফেসরের মেয়ে Souia ও জীবনে সুখী নয়। এই সমস্ত অসাফল্য এবং ব্যর্থতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে—গুলি ফসকিয়ে যাবার ব্যাপারটা।

The wild Duck এর মত চেখভের The sea Gull ও হচ্ছে Shattered illusions এর প্রতীক। Theatre-theatrical বলতে যা বোঝায় চেখভের নাটকগুলোতে তা একেবারেই নেই। অথচ টেকনিক এবং ক্র্যাফ্টম্যানসিপের একটা পরিণত রূপ পাওয়া যায় এসব নাটকে। চেখভের প্রত্যেক নাটকের ভেতরেই একটা সহজ সরলভাব রয়েছে আগাগোড়া—এজন্যই এ নাটকগুলিকে অভিনয়ে জমিয়ে তোলা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। যে সহজ সত্যকে চেখভ রূপ দিয়েছেন তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে—অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও ভেতর থেকে সেই সত্যের রূপকে উপলব্ধি করতে হবে। ফাঁকী দিয়ে বা প্যাঁচ, পয়জারের সাহায্যে চেখভের নাটককে জমিয়ে তোলা যায় না। সার্থক মঞ্চ-রূপায়নের জন্য দরকার হয় Stanislavskyর মত প্রডিউসারের। এই নাটকে তখনকার রাশিয়ান নাটকের অসারতা এবং একঘেয়েমীর কথা চেখভ কন্‌ষ্টান্‌টিনের মুখ দিয়ে এইভাবে বলিয়াছেন—"The theatre of the day is all repeatition and routine…and presents nothing but people eating, drinking, ffiting, strolling and wearing fine clothes" এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। টলষ্টয় ছোট গল্পের লেখক হিসাবে চেখভকে খুব উচ্চ স্থান দিতেন—কিন্তু চেখভের নাটক মোটেই appreciate করতে পারেননি। একবার নাকি চেখভকে বলেছিলেন, "you know that I dont like Shakespeare, .but your plays, my dear Anton Pavlovitch are even worse than his."

চেখভ এর পরের নাটক The Three Sisters লেখার প্ল্যান করেন ১৮৯৯তে এবং পরের বছর নাটকটি সম্পূর্ণ করেন। এই নাটকটি এবং এর পরের নাটক The Cherry Orchard এ রাশিয়ার তদানীন্তন দৈনিক জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যহীন প্রবাহ যেন আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনটি বোনের মস্কো যাবার ব্যাকুল আগ্রহ এবং ব্যর্থ হতাশার ছবি সত্যিই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

চেরী অর্চ্চার্ড নাটকে সাধারণ অর্থে প্লট বলতে যা বুঝি তার স্থান নীচে। আসল প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্র চিত্রণের দিকটায়। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নৈরাশ্যময় পরিণতির চিরন্তন ইতিহাসই এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ দৃশ্যে যে গাছ কাটবার শব্দ আসছে তা যেন এক যুগের অবসানে নতুন যুগের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভাই বোনের জীবনের অসাফল্যের চিত্রের ভেতর দিয়ে নাট্যকার মানব জীবনের গভীর হতাশার চিরন্তন কাহিনীকেই Symbolise করেছেন। Madame Ranevskyর Cherry Orchard এর মত, বাস্তবজীবনে আমাদেরও অনেক উচ্চাশা ও গৌরবের সামগ্রী ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নষ্ট হয়ে যায়। গল্প বা কাহিনী বিষাদময় হলেও এ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে নানা ধরণের চরিত্র। আর সব চরিত্রের ভেতরই এমন এক একটা অদ্ভুত দিক আছে—যার ফলে নাটকটি

একদিকে বিদায়ের ব্যথা যেমন চারিদিকে বিষাদের ছায়া ফেলে, তেমনি আবার এরই ভেতর Trofimov এর Goloshes হারিয়ে যাওয়াটা একটা হাল্কা রসের সৃষ্টি করে। সমস্ত নাটকেই এই গম্ভীর এবং হাল্কা ভাবটা পাশাপাশি ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

চেখভ সম্বন্ধে সব থেকে বড় ভুল ধারণা করা হয়, যখন বলা হয় যে তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। তাঁর সময়ের লোকেদের জীবনের ব্যর্থতা, আলস্য বিলাস, হতাশার ছবি তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বলে, তিনি নিজেও নৈরাশ্যবাদী এ ধরণের বিশ্লেষণ তো সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। Eva de Gallienne এর উত্তরে বলেছেন—"Take Verehinin in the Three Sisters. A man, unhappy in his personal life, tortured by the indifference and inadequecy of people about him and yet his lifes creed, reiterated through all personal experiences, his lifes cry is always. "And yet, in reality, what a dfference there is now & what has been in the past. And when a little more time is past—another two or three hundred years—people will look upon our present manner of life with horror and derision, and everything of today will seem awkward and heavy, and very strange and uncomfortable. Oh, what a wonderful life !......Can you only imagine ?...Here there are only twice of your sort in the town now, but in generations to come there will be more & more & more ; and the time will come when everything will be changed and be as you would have it, they will live iu your way, and later on you two will be out of date—people will be born who will be better than you."

And later in Tchekov's last play, many say his greatest 'The cherry Orchard' the student Trofimov has, to use his own words, 'through so much already. As soon as winter comes, I am hungry, careworn, poor as beggar, and what ups and downs of fortune have I not known. Yet, in his transcendent idealism, he has a robust & unbroken faith in what life can & will be : 'To eliminate the petty and transitory which hinders us from being free and happy—that is the aim & meaning of our life Forword ! we go forword irresistible towards the bright star that shines yonder in the distance. forward ! Do not lag behind friends !...Here is happiness. Here it comes, It is coming nearer, nearer ; already. Can hear its footsteps, And if we never see it—if we may never know it—what does it matter ? others with see it after us"

চেখভ ছিলেন আদর্শবাদী। আর ,আদর্শবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায় নৈরাশ্যবাদে। ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সব দিক দিয়ে সুখী হতে পারবে, এ ধারণা তাঁর ছিল দৃঢ়। বরং যদি বলা যায় যে জীবন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিরাট আশাবাদী, তাহলেই তাঁর মনের আসল পরিচয় দেওয়া হবে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি বলেই The cherry orchard নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে Trofimov এর মুখ দিয়ে যেন Russian Revolution এর আবির্ভাবের ইঙ্গিত দেবার জন্য বলিয়েছেন—All Russia is our garden. The earth is great & beautiful—there are many beautiful places in it. Think only, Anya, Your grandfather, great grandfather, and all your ancestors were slave owners of living souls and from every cherry in the orchard, from every leaf, from every trunk their are human creaturs looking at you. Cannot you hear their Voices ? oh, it is awful ! Your orchard is a fearful thing. —when in the evening or at night one walks about the orchard, the old bark on the trees glimmers dimly in the dusk— the old cherry trees seem to be dreaming of centuries gone by & tortured by fearful visions. Yes ! we are at least two hundred years behind, we have really gained nothing yet, we have no definite attitude towards the past, we do nothing but theorise or complain of depression or drink Vodka. It is clear that to begin to live in the present we must first expiate our past or we must break with it ; we can expiate it only by suffering, by extraordinary unceasing labour. Understand that, Anya !"

চেখভের নাটকগুলোকে অভিনয়ে জমানো বড় শক্ত। কারণ জীবনের সহজ সরল সত্যের দিকটাকে তিনি এত স্বতস্ফূর্ত্তভাবে প্রকাশ করেছেন যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী সে সব সত্যকে যদি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি না করেন তবে মঞ্চাভিনয়ে তা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত অভিনয়টাই অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হবে। লণ্ডনের স্যাভিল থিয়েটারে চেখভের The Sea Gull অভিনয় দেখতে গিয়ে এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছিল। সমস্ত অভিনয়ের ভেতরে যেন কোন প্রাণ ছিল না।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!

মিনু তার পুতুলের জন্য সর্ব্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা আর ঝক ঝকে রঙীন।

জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়াবার দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

*সানলাইটে জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে*

S/P. 2-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রস্তুত

সাময়িকী

বাঙ্গালীর বিপদ—

স্বাধীনতা লাভের পর ১৩ বৎসর অতীত হইল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালীর দান কি ছিল, তাহা বোধ হয়, আজও কেহ ভুলিয়া যায় নাই। বাঙ্গালাদেশেই স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল এবং প্রধানত বাঙ্গালীর দানেই তাহা পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ফলভোগ বাঙ্গালী কতটুকু করিতে পাইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আজ বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা দেশের বৃহত্তর অংশ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পরিণত হওয়ায় এক কোটিরও অধিক লোককে উদ্বাস্ত হইতে হইয়াছে—১৩ বৎসরে স্বাধীন দেশের শাসকগণ উদ্বাস্ত সমস্তার সমাধান করিতে পারে নাই—আজও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্ত পরিবার এমন গৃহে বাস করিতেছে, সেখানে কোন দিনই মানুষ বাস করিত না। উদ্বাস্তদের লইয়া ভারত-সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছিনিমিনি খেলিতেছে—বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত—কোথাও উদ্বাস্তদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান সংগৃহীত হয় নাই। বেকার-সমস্যা অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে অধিক—বাংলার বাহিরে কোথাও বাঙ্গালী তাহার অন্ন-সংস্থানে সমর্থ হয় না—এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য দিন দিন এমনভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে পশ্চিম-বাংলার মধ্যেও বাঙ্গালী কোন-ঠেসা হইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ—সেখানে বাঙ্গালী কোন সুখ-সুবিধালাভ করে না। কেন্দ্রীয় সরকার যতই গুণানুসারে চাকরী দানের কথা বলুন না কেন, কাজের বেলায় দেখা যায়—সেখানে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতির প্রাধান্য ও প্রাবল্য থাকায় সেখানে বাঙ্গালীকে পিছাইয়া আসিতে হয়। সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী স্থান পায় না—কেন পায় না, সে কথা না বলাই ভাল। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য এত বাড়িয়া গিয়াছে—চাকরীর ক্ষেত্রে সেখানেও বাঙ্গালী আর স্থান পায় না। পশ্চিমবঙ্গে গত কয় বৎসরে বহু নূতন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে মালিকানা বা পরিচালনা অবাঙ্গালীর হাতে থাকায় শ্রমিকের কাজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ অবাঙ্গালীরাই দখল করিয়াছে—বাঙ্গালী "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া অরণ্যে রোদন করিতেছে। কলিকাতা ও সহরতলী এককালে বাঙ্গালীর বাসস্থান ছিল—কিন্তু আজ বজবজ হইতে কাঁচরাপাড়া এবং সাঁকরাইল হইতে ত্রিবেণী—গঙ্গার উভয় তীরের স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিলে মনে হয়—বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বাস করিতেছি—সেখানে অধিকাংশ অধিবাসী অবাঙ্গালী। সরকারী-কারখানাগুলিতে বাঙ্গালী অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা নীতিবিরুদ্ধ—কাজেই সেখানে "গুণের" অজুহাতে অবাঙ্গালী বেশীসংখ্যায় কাজ পায়। অধিকাংশ কারখানার মালিক বা পরিচালক অবাঙ্গালী, সেখানে অবাঙ্গালী-কর্মী যে বেশী হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যে কয়টি বাঙ্গালী মালিকের কারখানা আছে—সেখানেও, বাঙ্গালী আজ এত দেশাত্মবোধহীন যে, অবাঙ্গালীকেই অধিক সংখ্যায় ভর্তি করা হয়। কামার, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, ফেরিওয়ালা, পানের দোকানওয়ালা, মুদী, ময়রা প্রভৃতির কাজ ত বাঙ্গালী ছাড়িয়া দেওয়ায় গত ৫০ বৎসর ধরিয়া অবাঙ্গালীরা সব দখল করিয়া লইয়া বসিয়া আছে। শিল্পাঞ্চলের ত কথাই নাই, পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও মুদীর দোকান, খাবারের দোকান, পানের দোকান প্রভৃতি অবাঙ্গালীরা দখল করিয়া বসিয়া আছে। বাঙ্গালী এক সময়ে কলিকাতার সওদাগরী অফিসসমূহের কাজ এক-চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল—এখন মাদ্রাজী, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় সে সকল স্থান হইতেও তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে। সহর ও সহরতলী অঞ্চলে যে সকল জমী ও বাড়ী বিক্রয় হইতেছে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে অবাঙ্গালীরা ক্রয় করায় সহরতলী ও সহরের অধিকাংশ জমী ও বাড়ী আজ অবাঙ্গালীর করতলগত। অবশ্য ৫০ বৎসর পরে তাহারা সকলেই বাঙ্গালী হইয়া যাইবে—কিন্তু যতদিন

তাহা না হয়, ততদিন বাঙ্গালীর দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। এখন আমরা সেই অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। বাঙ্গালী শ্রম-কাতর, বাঙ্গালী ব্যবসা-বিমুখ, বাঙ্গালী কুনো—অর্থাৎ বাড়ী হইতে অধিক দূরে যাইতে অসম্মত—এই সব অপবাদ সত্য বটে, কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে আজ ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সমগ্র আসানসোল মহকুমা লইয়া বিরাট দুর্গাপুর-শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে যদি বাঙ্গালী যুবকের দল—হাজারে হাজারে যাইয়া প্রতিযোগিতায় অবাঙ্গালীদের হঠাইয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চল ক্রমে বিহারের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে—বাঙ্গালীর সেখানে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার যে অংশ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, সেখানে যদি বাঙ্গালীরা দলে দলে যাইয়া বাসস্থাপন না করে, তবে সেখানে অবাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক হইবে। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্বেও আজ বাঙ্গালীকে সে সকল স্থানে সকল অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করিতে হইবে এবং নূতন নূতন বাঙ্গালী পরিবারকে সেখানে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিতে হইবে। সেরাইকলা ও খরসোয়ান জেলা দুইটি বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। রাজনীতিক সীমায় এখন তাহারা বিহারের মধ্যে—উড়িষ্যা সে দুইটিকে তাহাদের একাংশ বলিয়া দাবী করিতেছে, এ অবস্থায় বাঙ্গালীরা যদি ঐ ২টি জেলায় যাইয়া বসবাস আরম্ভ করে, তবে হয়ত ভবিষ্যতে তাহা বাংলারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে—বর্ত্তমানেও সেখানে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা কম নহে। সাওতাল পরগণা বাঙ্গালী সৃষ্টি করিয়াছিল, বন কাটিয়া সহর বানাইয়াছিল; মিহিজাম, জামতাড়া, কর্মাতাড়, মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলা, দেওঘর প্রভৃতি সহরে আজও বাঙ্গালার গৃহের সংখ্যাই অধিক—বাঙ্গালী তরুণের দল কি সে সকল স্থান ক্রমে ছাড়িয়া দিবে—না তথায় যাইয়া বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা যাহাতে আরও বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিবে? তাহাতে নানা অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও বাঙ্গালীকে সে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সকল কথা বর্ত্তমানের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র সকল বেকার বাঙ্গালীকে চিন্তা করিয়া দেখিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। এক সময়ে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া বাঙ্গালী সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—এখন অসুবিধা ও দুর্ভোগের মধ্যে তাহাদের সে কাজ করিতে হইবে—নচেৎ বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতা ও সহরতলীর খাদ্যসমস্যা ও বাসস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য একদল বাঙ্গালীর এই সকল স্থানের বাস ত্যাগ করিয়া—যে সকল স্থানে মানুষের বাস কম, অথচ ভাল বাসস্থান ও কৃষি-বাণিজ্যের সুযোগ আছে, সে সকল স্থানে চলিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই প্রস্তাব কঠোর ও অপ্রিয় সত্য-সে জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে বহু লোকের মনঃপূত হইবে না। তথাপি আমরা এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে অনুরোধ করি।

দণ্ডকারণ্য সমস্যা

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, ভারতের বহু রাষ্ট্রেই জন-সমস্যা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে চিন্তিত ও বিব্রত করিতেছে। বাংলা দেশে চাকুরী-সমস্যা, বাসগৃহ-সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙ্গালীকে—শুধু উদ্বাস্তুদের নহে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকেও দণ্ডকারণ্যের নূতন বাসস্থানে যাইতে বলা হইয়াছিল। সত্যকথা, সেখানে পূর্বে মানুষ বাস করিত না, জলা ও জঙ্গলে সে অঞ্চল পূর্ণ ছিল—কাজেই নূতন যাহারা যাইবে, তাহাদের বহু অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রধান কথা—ঐ সকল অসুবিধা ও কষ্ট সত্বেও বাঙ্গালী আজ যদি দণ্ডকারণ্যে না যায়, তবে পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজী যাইয়া সে অঞ্চল দখল করিবে ও পরে বাঙ্গালীর পক্ষে আর তথায় যাইয়া বাসস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। যে সময়ে বাঙ্গালীকে আন্দামানে যাইতে বলা হইয়াছিল, সে সময় যদি অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী তথায় যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিত তাহা হইলে সে স্থান অন্য রাষ্ট্রের লোকে পূর্ণ হইয়া যাইত না। এখন আর বাঙ্গালীর পক্ষে আন্দামানে যাইয়া বাস করা তত সহজ নাই। সে জন্য বাঙ্গালীকে—বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তুদিগকে দণ্ডকারণ্যের নূতন প্রদেশে পাঠাইবার জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ দেশনেতাদিগের চেষ্টার অভাব নাই। কতকগুলি বিষয় লইয়া দণ্ডকারণ্যে

বাঙ্গালী বসবাসের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপের ফলে সে সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এক দিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে চেষ্টিত হইয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই দেশনেতারা যদি প্রচারের দ্বারা অবস্থা অনুকূল করেন, তাহা হইলে বহু সহস্র বাঙ্গালী পরিবার—সরকারী ব্যয়ে দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। মানুষের বড় সমস্যা—আহার ও বাসস্থান—সে সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুবিধার কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। ভিলাই ও রৌরকেল্লায় যে বিরাট শিল্পনগরী ও কারখানা নির্মিত হইতেছে, তাহা বহু লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দিবে ও বহু লোক দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া ঐ সকল স্থানে কর্মসংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। এ বিষয়ে সারা দেশে ব্যাপক প্রচার কার্য্য পরিচালনার প্রয়োজন হইয়াছে।

আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন--

সকল রাজ্যেই মানুষ স্থানীয় অধিবাসীদিগকে অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী দেখিতে চায়। আসাম-রাষ্ট্র পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, সে সকল পাহাড় ও জঙ্গলে যাহারা বাস করিত, বহু দিন তাহারা সভ্যতার কাছে আসে নাই। উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নাগাজাতির মধ্যে শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের প্রচার হওয়ায় নাগা-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং নাগা অধিবাসীদিগকে বহু প্রকার অধিকার প্রদান করিয়া সে বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছে। তথাপি নাগারা আরও অধিক সুখ সুবিধার দাবীতে তাহাদের অঞ্চলে গণ্ডগোল করিতেছে। অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চলে—খাসীয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের আদিম অধিবাসীরা এক সময়ে অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল—তখন বাঙ্গালীরা সে সব স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। আজ নূতন শিক্ষালাভ করিয়া আসামের একদল 'অধিবাসী সেখানে আর বাঙ্গালীকে অধিক সুখভোগ করিতে দিতে চাহে না। ইহাই মানুষের জন্মগত প্রকৃতি। ইহারই ফলে আজ আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলনের সূত্রপাত। নীতির দিক দিয়া ইহা ভাল কি মন্দ—তাহা বিচারের বিষয় নহে—প্রয়োজনের তাগিদে আদিবাসীরা তাহাদের অধিকার রক্ষায় চেষ্টিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কবে হইবে বা কিভাবে হইবে—তাহা কেহ বলিতে পারে না। আসামের বাঙ্গালীরা প্রথম হইতে এ বিষয়ে সতর্কতার সহিত কাজ করিলে, বাঙ্গাল-খেদা আন্দোলন আজ এমন তীব্র আকার ধারণ করিত না। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী অধিবাসী—আজও নিশ্চিন্তে আসামে বাস করিয়া অন্ন-সংস্থান ও পরিবার-প্রতিপালন করিতেছে; কে, কোন সময়ে আসামে গিয়াছেন, তাহা এখন হিসাবের বাহিরে। কাজেই পুলিশ বা সৈনিকের সাহায্যে এই বিরোধ দমনের চেষ্টা না করিয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা আসামে বাঙ্গালী-বাসের সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। পূর্বপাকিস্তান হইতে যেমন পশ্চিমবঙ্গে বহু হিন্দু আসিয়াছে—তেমনই কয়েক লক্ষ হিন্দু আসামেও গিয়াছে। তাহারা আবার যাহাতে বাস্তুহারা না হয়, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় বিরোধের মীমাংসা করা প্রয়োজন। লোকসভার সদস্যগণ সে দিক দিয়া চেষ্টা করিলে শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান হইবে। আসামে বাঙ্গালীদের উপর যে অন্যায় ও অমানুষিক নির্য্যাতন চলিতেছে, তাহা অবশ্যই নিন্দার্হ। ইহা বন্ধ করার শক্তি যদি সরকারের না থাকে, তাহা আরও শোচনীয় ব্যাপার। আমরা সরকারকে এ বিষয়ে উপযুক্ত কর্ত্তব্য-পালন করিতে বলি।

আয় ব্যয়ের হিসাব চাই--

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক এক পত্র প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস-দলের সকল এম-এল-এ, এম-এল-সি, এম-পি, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতিকে নিজ নিজ বর্তমান আয় ব্যয়ের ও গচ্ছিত অর্থের হিসাব কংগ্রেস-সভাপতির নিকট দাখিল করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঐ হিসাব না দিলে তাঁহাকে দল হইতে অপসারিত করা হইবে। এত দিনে যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে চেতনা হইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয়। অবশ্য কি উপায়ে ঐ টাকা উপার্জন করা হইয়াছে, তাহাও জানাইতে হইবে। কংগ্রেসী নেতারা দুর্নীতি-পরায়ণ কি না তাহা জানাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। দেখা যাউক—মন্ত্রীদের আয়-ব্যয় পরীক্ষায়

পর কংগ্রেস কর্তারা কি মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান হইবে, সন্দেহ নাই।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান কবি, স্বর্গত সুধী হীরেন্দ্র নাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গত ২৬শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা রাসেল ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যুগেই তিনি তাঁহার স্বকীয়তা দ্বারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সলিসিটার ছিলেন, পরে ১৯৫৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ১৯৩১ সালে তাঁহার সম্পাদনায় পরিচয় মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। তন্বী, ক্রন্দসী, অর্কেষ্ট্রা, উত্তর-ফাল্গুনী, সংবর্ত, দশমী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া তিনি যশ অর্জন করেন। স্বর্গত, কুলায়, কালপুরুষ প্রভৃতি প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থও তাঁহাকে খ্যাতি দান করে। মৃত্যুকালে তিনি ইংরাজীতে আত্মজীবনী রচনা করিতেছিলেন।

কলিকাতাবাসী ছাত্রদের স্বাস্থ্য—

প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ত্তমানে লোকসভার সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায়কে নেত্রী করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিটীর তদন্তে প্রকাশ—কলিকাতাবাসী শতকরা ৩৩ জন ছাত্র অজীর্ণ রোগে ভোগে। একে ত ভাল খাদ্য পায় না—তাহার উপর দুপুরে ৫।৬ ঘণ্টা কাল কোন খাদ্য না পাওয়ায় তাহাদের অজীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। মধ্যাহ্নে স্কুলে বাধ্যতামূলক খাদ্য দানের ব্যবস্থা সফল হয় নাই—মাত্র কয়েকটি স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কাহারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। শ্রীমতী রেণুকা রায় এ বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা করিয়া দিলে দেশের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। এ বিষয়ে একটি কথা মনে পড়ে। কলিকাতা সহরে ভেজাল খাদ্য বিক্রেতার শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই। পুলিস বা কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য-বিভাগ কেহই এ বিষয়ে কাজ করেন না। কর্পোরেশনের কর্মীরা ভেজাল খাদ্য ধরিয়া দিলে পুলিস—যে কারণেই হউক—অপরাধীকে ছাড়িয়া দেয়। কাজেই লোক ভেজাল খাদ্য খাইয়া অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়। সম্প্রতি পচা চাউল ধরিয়া দিতে যাইয়া একজন লোক অপমানিত হইয়াছে। কর্পোরেশন-কর্মীরা ধরিয়া দিলেও পুলিস অপরাধীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে নাই। কে ইহার ব্যবস্থা করিবে। আইনে নাকি গলদ আছে—সেই ফাঁকে অপরাধী পলাইয়া যায়। ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধান প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষকে আমরা ভেজাল খাদ্য বিক্রয়-বন্ধের চেষ্টায় অধিক অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারি বসু—

গত ২৫শে মে কলিকাতা মহাজাতি সদনে বিপ্লবী-নায়ক রাসবিহারী বসুর ৭৫তম জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। গদর দলের নেতা ডাঃ ভাই ভগবান সিং উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা শ্রীআনন্দমোহন সহায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, পাঞ্জাবের শ্রীকেদারনাথ সাইগল প্রভৃতি রাসবিহারীবাবুর জীবন ও কার্য্যধারা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অসুস্থতাবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া একটি লেখা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সভায় পঠিত হয়। রাসবিহারীবাবু দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়াছিলেন—কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কবি নজরুল ইসলাম—

গত ২৫ শে মে কলিকাতায় বা বাংলা দেশের নানাস্থানে খ্যাতনামা বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম এর ৬১ তম জন্মদিন পালন করা হইয়াছে। কবি বর্তমানে কলিকাতা মন্মথ দত্ত রোডে বাস করেন—তিনি বহু বৎসর যাবৎ সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি হারাইয়াছেন—শুধু একস্থানে বসিয়া থাকেন—খাওয়া পরার প্রয়োজনও অনুভব করেন না। অন্যে তাঁহাকে খাওয়াইয়া ও কাপড় পরাইয়া দেন। বহু চেষ্টা ও চিকিৎসা সত্বেও কবিকে রোগমুক্ত করা যায় নাই। সরকারী অর্থসাহায্যে তিনি দিন যাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রীও পক্ষাঘাতে পঙ্গু। পুত্র ও পুত্র-বধুরা তাঁহাদের দেখাশুনা করেন। আমরা এই দিনে কবিকে শ্রদ্ধা জানাই ও তাঁহার রোগমুক্তি কামনা করি।

কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—

২৪ পরগণা বসিরহাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি স্বর্গত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিক উৎসব গত ৩০ শে মে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতি ও শ্রীছবি বিশ্বাস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি ভুজঙ্গধরের সাধনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ কবিকে অমরত্ব দান করিয়াছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থগুলির পুনঃ প্রকাশ সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীমতী সাকিনা খাতুন—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমন্ত্রী ও বিধান সভার সদস্য আবদুস সুকুরের মৃত্যুতে ২৪ পরগণা ক্যানিং কেন্দ্রে যে আসন শূন্য হইয়াছিল, তাহাতে সুকুর সাহেবের কন্যা তরুণী শ্রীমতী সাকিনা খাতুন গত ৩১ শে মে নির্ব্বাচিতা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন এবং কমুনিষ্ট-প্রার্থী অপেক্ষা ৩৪ হাজার বেশী ভোট পাইয়াছেন।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ১১ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র নির্বাচন লইয়া গণ্ডগোলের ফলে সরকারকে ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয় ও গত ৩রা জুন সরকারী নিযুক্ত সভাপতির সভাপতিত্বে কলিকাতার নূতন মেয়র ও ডেপুট মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। বিরোধী ইউ-সি-সি সদস্যগণ সভায় যোগদান করেন নাই। প্রাক্তন ডেপুটী মেয়র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু মেয়র এবং ডাক্তার ইব্রাহীম ইসমাইল ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪১ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়রকে অভিনন্দিত করি।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্মী ও পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের বর্তমান সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় রায় ও শ্রীমতী অনিলা দেবী পুনরায় গত ২৫ শে মে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেস ও পি-এস-পি প্রার্থীদ্বয়কে পরাজিত করিয়াছেন।

ভূস্বর্গ

শম্ভু চৌধুরী

রাজতরঙ্গিণী কহ্লনেরে করিল মুখর—
গল্পের স্বরগপুরী সেই শৈলাবাসে
ভারতের প্রজাতন্ত্র আজি সমুজ্জল।
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিরুপায় বিচ্ছিন্ন ভারত
সে কলঙ্ককালিমায় লাঞ্ছিত গৌরব—
হিন্দুমুসলমান আজি প্রেমমন্ত্রে জাগি'
ফিরায়ে এনেছে সেই লুপ্ত মহিমায়।
রাজনীতি স্বৈরিণীর জারজসন্তান—
দুইজাতিতত্ত্ব—হায়! মিথ্যা অপবাদ!

ভ্রান্ত পথযাত্রী যত উন্মত্ত সেনানী—
বসুধা করিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শিবিরে,
রক্তিম উল্লাসে হের ছাড়িছে হুঙ্কার—
তাদেরে আহ্বানি প্রেমে পঞ্চশীল
ধর্ম্মচক্র পানে—
ভারত-কাশ্মীর তীর্থে চীনারের ছায়ে
আপেল দাড়িম্বকুঞ্জ-তলে
স্বরগের তুষার ধবল মহিমায়—
হিংস্রমূঢ় দানবের সমাধি প্রাঙ্গণে।

বৈদেশিকী

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এশিয়া আর আফ্রিকার রাজনৈতিক বিপ্লব গত কয়েক মাস থেকে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীকে ম্লান করে দিয়েছে। একে একে সেগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, দুনিয়ার রাষ্ট্রধীরেরা এখনই কি আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বিংশ শতকের তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর কিছুদিন এমন কথা শোনা গিয়েছিল যে, আর কোন বিশ্বযুদ্ধ হবে না, স্থায়ী শান্তির দিন সমাগত। ভ্যার্সাই চুক্তির অন্য অনেক দোষ থাকলেও তাতে করে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমারেখা এমন ভাবে টানা হয়েছিল যে, শতকরা মাত্র ৩ জন নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের বাইরের এলাকায় পড়ে গিয়েছিল: যারা ইউরোপের প্রায় ৫০ কোটি অধিবাসীর শতকরা মাত্র ৩ জন—দেড় কোটি লোক; এদের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ লোকই ছিল জর্মন। এই দেড় কোটি লোকের ধূমায়িত অসন্তোষ এবং তাদের মধ্যে অর্ধকোটির তীব্র বিক্ষোভকে মূলধনরূপে গ্রহণ করে হিটলার ইউরোপে "নববিধান" প্রবর্তনের আশা করেন। ভাষাগত জাতীয়তার ভিত্তিতে তখন ইউরোপকে পুনর্বিন্যস্ত করলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিলম্বিত করা যেত। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আগ্রহাতিশয্যে ১৯৩৯ সালে যে যুদ্ধ সুরু হল, তার পরিসমাপ্তিতে ১৯৪৫ সালে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় পুনর্বণ্টন ভয়াবহতর হয়ে উঠল। এখন প্রায় দু-কোটি জর্মনের বাসভূমি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির কবলে, তা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম দুই জর্মনির বিচ্ছেদ তো আছেই। ফিনল্যাণ্ড, রোমানিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি—এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমারেখা সংশোধন করতে হবে, এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া আর লিথুয়ানিয়া রাষ্ট্র তিনটিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, দুই জর্মনিকে পুনর্মিলিত করে পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া আর লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে মিলিত জর্মনির সীমা-সংশোধন করতে হবে; এ তো মাত্র পূর্ব-ইউরোপের কথা; দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে আরো কয়েকটি গুরুতর অদলবদল দরকার। এই সব পরিবর্তন সাপেক্ষে ইউরোপে এখন অন্তত তিনকোটি লোক নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের বাইরে অপমান ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হ'চ্ছে। আমরা ভারতীয়রা যে শান্তির জন্যে লালায়িত, এই সব লোক তার মহিমা বোঝে না। আর একটা যুদ্ধ না বাধ্‌লে এদের অবস্থা পরিবর্তনের কোন আশা নেই; তাই ভালো বা মন্দ যাই হোক না, আর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার নামে এরা ততটা আতঙ্কিত নয়। সেই জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা শোনা গেছে, আগের বারের মতো দুদিন সবুর সয়নি। ১৯৪৪ সালেই ব্রিটেন ও আমেরিকার মিলিত বাহিনীর দ্বারা জর্মনদের সহযোগিতায় রুশ বিতাড়নের কথা আলোচিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ১৯৪৮ সালে আমেরিকার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুস্তিকা আকারে প্রচারিত হয়, তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ ঘটাবার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। সবাই জানেন, চার্চিলের এই ইচ্ছা কত প্রবল ছিল। আইকের তৎকালীন প্রবল অনিচ্ছায় এবং মার্কিন সৈন্যদের রণক্লান্তির জন্যে ১৯৪৫ সালে ব্রিটেন-ফ্রান্স-মার্কিন-জর্মনির মিলিত আক্রমণ রুশিয়াকে সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু তখন থেকেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা আলোচিত এবং অন্তত বার ছয়েক পৃথিবী বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে—বার্লিন অবরোধ, কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দোচীনের যুদ্ধ, সুয়েজ খালের যুদ্ধ, ১৯৫৭ সালে তুর্ক-সিরিয়া সীমান্তবিরোধ, ১৯৫৮ সালে লেবাননে মার্কিন সেনাবতরণ। বর্তমানে শীর্ষ সম্মেলন আর নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থ হবার পর তৃতীয় মহাযুদ্ধের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিচার্য।

১৯৫০ সালেও মার্কিন বেতারে নিয়মিতভাবে বলা হত—পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পশ্চিম জর্মনি পর্যন্ত এলাকায় আমরা রুশকে চূর্ণ করব। পাকিস্থান-ইরাণ-তুরস্ক-গ্রীস-ইতালি-পশ্চিম জর্মনি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে কমিউনিস্ট শক্তিগুলিকে পরিবেষ্টন করা হয়। এই বলয়ে দুটি ফাঁক গড়ে ওঠে; নিরপেক্ষ অষ্ট্রিয়া আর ইউগোশ্লাভিয়া। অষ্ট্রীয়া মনে-প্রাণে জর্মন, তার নিরপেক্ষতায় কিছু যায় আসে না; ইউগোশ্লোভিয়াকে দলে আনার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। তিতো মার্কিনের তত পক্ষপাতী নন, পুরো জর্মন-বিদ্বেষী—কিন্তু ব্রিটেন এবং বিশেষভাবে চার্চিলের ভক্ত; তিনি যে মিত্রপক্ষে যোগ দিতে পারেন না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ১৯৫০ সালে চীনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। ব্রিটিশ সেনাপতির মতে, তৃতীয় মহাযুদ্ধে এশীয় রণাঙ্গনে বড় দরের যুদ্ধ হবার কথা ছিল না; হংকং থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত প্রসারিত এলাকায় ছোটখাট যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনামাত্র ছিল, আসল যুদ্ধ হবার কথা পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পশ্চিম জর্মনি পর্যন্ত এলাকায়, অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া আর পূর্ব ইউরোপ।

কিন্তু গত দশ বছরে এই অবস্থা একেবারে বদলে গেছে।

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হবার সময় চীনে চিআং-সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল; পাকিস্থান প্রথম থেকেই ইঙ্গমাকিন পক্ষে ঝুঁকে ছিল; ভারত মুখ্যত ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে লাল চীনের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষার সঙ্কল্প করে। সেই জন্যে তিব্বত চীনের হাতে নির্বিবাদে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনই ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যা বলেছিলেন তা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, ব্যাপারটাতে ভারত খুশি হয় নি। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে আমরা মিত্রপক্ষে যোগ দেব। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ সুরু হলে নেহরুও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, উত্তর কোরিয়াই আক্রমণকারী। ভারত অচিরে নিরপেক্ষতা-নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সে নির্লিপ্ততা-নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও ভারত যে সম্ভাব্য মহাযুদ্ধে কোন্ পক্ষে যোগ দেবে, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় নি। ভারতের ভঙ্গুর আর অকেজো বন্ধুত্বের ভরসায় না থেকে চীন-ভারত সীমান্তে কিছু অগ্রবর্তী ঘাঁটি গড়ার উদ্দেশ্যে চীন তিব্বতে পথ-ঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা এবং সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে মনোযোগী হয়। তারপর লাদাখের কিছু অংশও তারা দখল করে। এর ফলে চীন ভারতের ক্ষণস্থায়ী বন্ধুত্ব হারিয়েছে বটে কিন্তু চীনের অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটি হিমালয়ের কোলে ভারতের সীমারেখার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে—যেখান থেকে দিল্লি মাত্র কয়েক শো মাইল দূরে। চীনের নিকটতম বিমানঘাঁটি থেকে ভারতের রাজধানীতে বোমাবর্ষণ করা এখন অতি অল্প সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ভারতের তেমন কোন সীমান্ত ঘাঁটি নেই যেখান থেকে চীনের বড় বড় শহরে বোমা ফেলা যায়। কাজেই শুনতে পরস্পরবিরোধী কথা বলে মনে হলেও এখন দিল্লী থেকে পিকিং যত দূর—পিকিং থেকে দিল্লি তত দূর নয়!

১৯৫৪ সালের লাল চীনের সহায়তাপুষ্ট হো-চি-মিনের বাহিনী উত্তর ভিএত্নাম রাষ্ট্র গঠন করে। লাও দেশে ভিএৎমিন বাহিনী ঢুকে পড়ে দুটি জেলাও দখল করে। ভারত সরকার চৈনিক সম্প্রসারণবার্তা গোপন করে চীনাতোষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরলোকগত ডালেসের উক্তি থেকে বোঝা যেতে থাকে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চীনে সুরু হওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৫০ সালে স্তালিন যখন কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়ে দেন, তখন কমিউনিস্ট মহল্লায় এ-কথা বারবার শোনা গিয়েছিল যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবে না, আর যদি তা বাধে, তবে ইউরোপে নয়, এশিয়ায় বাধবে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ সমান-সমান ভাবে শেষ হল বটে, কিন্তু তাতে দেখা গেল যে, মার্কিণ সমরসজ্জা অনেক উন্নত ধরণের হলেও, খুব কম সৈন্য নিয়ে প্রায় দশগুণ বেশি সৈন্যের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা মার্কিণবাহিনীর থাকলেও, এশিয়ার চীনা ও মঙ্গোল বাহিনী সংখ্যায় বিপুল এবং স্থলযুদ্ধে তারা মার্কিণের সঙ্গে সমানে সমানে লড়্তে সমর্থ। মার্কিণের রক্তচক্ষুতে এশিয়াবাসী আর ভীত হবে না-বুঝে সেনাপতি ম্যাকআর্থার দারুণ রাগে Slav-Mongol hordes! আমি জানি এই স্লাভ-মঙ্গোল বাহিনীগুলিকে কি করে শিক্ষা দিতে হয়। তিনি চীনে প্রবেশের প্রয়োজন হলে সে-অধিকার দাবি করেন এবং পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমতিও পাবার চেষ্টা করেন। ব্রিটেনে তাঁকে "প্রলয়োন্মত্ত ষাঁড়" বলে বর্ণনা করা হয় এবং ট্রুম্যান তাঁকে অপসারিত করেন। ম্যাকআর্থারের বাহিনী এক সময়ে মাঞ্চুরিয়া থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ছিল। তাঁর অপসারণের পর তাঁর প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া গ্রহণ না করলে জয়লাভের আশা নেই বুঝে কোরিয়ার যুদ্ধ থামিয়ে ফেলার চেষ্টা করে আইক বিশেষ জনপ্রিয় হন। চীনের ভয়াল সামরিক শক্তির সম্বন্ধে আগে কোন ধারণাই মিত্রপক্ষের ছিল না। চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতির পর ব্রিটিশ সেনাপতি মণ্টগোমেরি খুব সম্প্রতি চীন পরিদর্শনকালে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হংকং অধিকারের জন্যে চীন কোন চেষ্টা করলে বড় রকমের যুদ্ধ বেধে যাবে। অর্থাৎ আগের ঘোষণার বিপরীত উক্তি করে এখন বলা হচ্ছে যে, চীনকে নিয়ে বড় যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। চীন মাঝে মাঝে ফরমোসা মুক্ত করার কথা বললেও হংকং মুক্ত করার কথা মণ্টগোমেরিকে শাসিয়ে বলে নি।

তা সত্ত্বেও এটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতোই তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে এশিয়ায় বড় রকমের যুদ্ধ অনিবার্য। সে-যুদ্ধ শুধু হংকং থেকে সিঙ্গাপুর এলাকায় নয়, কোরিয়া এবং ভারত-চীন সীমান্তেও বাধবে। ভারতে শান্তির জন্যে কাপুরুষোচিত আকুলিবিকুলি থাকলেও নেহরু-সরকার বা তাঁর উত্তরাধিকারী-সরকারকে যুদ্ধ করতেই হবে। ভারত যে ইঙ্গমার্কিন পক্ষে যোগ দেবে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কাজটা অর্থাৎ মৈত্রী সাধনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই সুবিধাজনক। সারা এশিয়ায় এবং আফ্রিকাতেও আজ বিশ্বব্যাপী বোঝাপড়ার জন্য তোড়জোড় কেমনভাবে চলছে, এই প্রসঙ্গে তা দেখা যাক।

প্রথমত, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লব; সিংম্যান রি অপসারিত হওয়ায় জাপ-মার্কিন কূটনীতির জয় হয়েছে এবং মাত্র নির্বোধ কমিউনিস্টরা এতে আনন্দিত হয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধে জাপানিদের সাহায্য নেবার কথা উঠলে রি প্রাণপণে বাধা দেন। তাঁর বাধাদানের ফলে কোরিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী জাপানের সাহায্য নেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি। অভিজ্ঞ জাপ সামরিক বাহিনীর সাহায্য ব্যতীত মাঞ্চুরিয়া পুনরধিকার করা অসম্ভব। রি-র পতনে কোরিয়ায় জাপ বাহিনীর ভবিষ্যৎ অবতরণ আর একটি বাধা থেকে মুক্ত হল। জাপানের বিরুদ্ধে কোরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে রি যত আন্দোলনের নেতৃত্বই করে থাকুন না কেন, এখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতালোভী শাসক ছাড়া আর কিছু নন, তাঁর পতনে কোরিয়ার বিপ্লবী জনসাধারণের কল্যাণ হবে। মুখে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানালেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁর পতনে নিষ্কণ্টক হয়েছেন এবং সেই জন্যে আদৌ দুঃখিত হন নি। সিংম্যানের চেয়ে জাপানিদের বন্ধুত্ব এখন মার্কিণের অনেক বেশি কাম্য। তাই রি-র পতনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া পরস্পরের

প্রথমে খুব আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। সিংম্যানের পতনে কোরীয়রা মার্কিণবিরোধী হয়ে উঠেছে এ-কথা বলার উপায় রইল না—সাম্প্রতিক দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণে আইকের বিপুল জনপ্রিয়তা থেকে। সিংম্যানের পতনের সঙ্গে মার্কিণবিদ্বেষের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোরীয়দের মধ্যে সুগভীর স্বজাতিপ্রেমের উদ্বোধনের যে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা আশাব্যঞ্জক ; এর পর আর বিদেশিনীপতি কোন কোরীয় রাষ্ট্রনায়কের পদ লাভ করতে পারবে না, সিংম্যানের পতনের পর এই ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী কোন নির্বাচনেই আর শ্বেতাঙ্গিনীর স্বামী রি উক্ত পদ পাবেন না। দক্ষিণ কোরিয়া ভূতপূর্ব প্রভু জাপানকে ভয় করে, চীন ও রাশিয়া তার প্রবলতম দুই শত্রু ; এমন অবস্থায় মার্কিণের বন্ধুত্ব কোরিয়ার পক্ষে এখনই ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং রি অপসৃত হলেও মার্কিণের সেখানে অপদস্থ হবার ভয় নেই।

দ্বিতীয়ত, তুরস্কের বিপ্লব ; এই বিপ্লবও কুশাসকের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনের নিদর্শন। দক্ষিণ কোরিয়ার মতোই এখানেও অত্যাচারীকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছে। একটা প্রভেদ এই দেখা যায় যে, কোরিয়ায় ছাত্র ও অধ্যাপকদের দ্বারা আন্দোলন পরিচালিত আর তুরস্কে ঐ সঙ্গে সেনাবাহিনীও যোগ দেয়। সেনাপতি গুর্‌সেল মেন্দেরেসকে ক্ষমতাচ্যুত করলেও কামাল পাশার অনুগামী ইসমেত্‌ ইনোনুকেও সরাসরি ক্ষমতা দখল করতে দেন নি। তিনি ব্রহ্মের সেনাপতি নে-উইনের মতো নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নিয়মতান্ত্রিক আস্থাভাজন সরকার গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন। ব্রহ্মে উ নু সাময়িক সামরিক শাসনের পর আবার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। তুরস্কেও কোন সুশাসক তেমন সুযোগ পেতে পারেন।

পতনের পর রি আর মেন্দেরেস, দুজনের বিরুদ্ধে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়, দুটি অতি-বীভৎস অত্যাচারী শাসকের পতন হওয়ায় দুই দেশের অশেষ কল্যাণের পথ খুলে গেছে। এর মধ্যে কমিউনিস্টদের কোন প্রভাব নেই ; সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে নতুন সরকার গঠিত হলে মার্কিণদের স্বার্থহানির কোন ভয় নেই বলে তুরস্কেও মার্কিণরা মেন্দেরেস এবং জালালকে কোন সাহায্য করে নি। বরং এই সব দেশে জনগণের বিশ্বাসভাজন সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে যুদ্ধের সময় এদের আত্মরক্ষা করা শক্ত হবে বুঝে মিত্রপক্ষীয় সব দেশই দক্ষিণ কোরিয়া এবং তুরস্কের ঘরোয়া ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকেছে। পাকিস্থানের মুসলিম লিগ সরকারের পতন হওয়ায় যেমন জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় নি, বরং একটা নির্ভরযোগ্য সরকার দেশবাসীর ভাগ্যে জুটেছে, এই দুই দেশের ব্যাপারও কতকটা তাই। পাকিস্থানের বর্তমান সরকার এখন চান, যেন সেই সব নেতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন যাঁরা ভারত আর পাকিস্থানের পুনর্মিলন সাধনে উদ্যোগী হতেও পারেন। তার উদ্দেশ্য, যেন পাক সামরিক শক্তির কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে পাক সামরিকবাহিনী

তৃতীয়ত, জাপানের আন্দোলন ; জাপানের আন্দোলনে আইকের জাপান-পরিদর্শন পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেল, এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাপানের ঘটনাবলীর মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে, যা দক্ষিণ কোরিয়া আর তুরস্কে দেখা যায়নি। এখানেও ছাত্র আর অধ্যাপকেরা আন্দোলনের নেতা, শ্রমিকরাও তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, মিল এই পর্যন্তই। অন্য সব ব্যাপারে জাপানের গণবিক্ষোভ বিচিত্র পথে অভিনব সাফল্য অর্জন করেছে, যা সারা এশিয়ার গ্রহণযোগ্য আদর্শ। এক, জাপানের প্রধান মন্ত্রী কিশি মোটেই কুশাসক নন, রি বা মেন্দেরেসের মতো ; তবুও তাঁর পদত্যাগের দাবি করা হয়েছে এবং তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন। দুই, কিশি যাবার আগে জাপ-মার্কিন চুক্তি পাকা করে গেছেন, যার ফলে জাপানের মর্যাদা ও অধিকার বহু গুণে বেড়ে যাবে এবং যে বিক্ষুব্ধ জনতা এর প্রতিবাদী, তাদের স্বাধিকারের দাবি পরোক্ষভাবে পূরণের ব্যবস্থাই হবে। তিন, দুর্দান্ত মার্কিন সেনাপতি ম্যাকআর্থার জাপানি ছাত্রদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হয়েও কোন প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে পারেন নি—পাছে জাপানের জনসাধারণের বিরাগভাজন হতে হয়, সেই ভয়ে ; এ যে জাপানি ছাত্রদের কত বড় সাফল্য, তা বলে শেষ করা যায় না ; যে ম্যাকআর্থার ১৯৪৫ সালে জাপানকে পর্যুদস্ত ও অপমানিত করেছেন প্রতি পদে, সেই তাঁর অসহায় নতিস্বীকার আর আইকের জাপান-যাত্রা বাতিল হওয়ায় মার্কিণের এখনকার চোখে জাপানের গুরুত্ব কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সহজে বোঝা যায়। এই ছাত্র-উদ্দীপনায় চীন ও কমিউনিসমের কোন প্রভাব নেই, জাপানের অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদ ও তেজস্বিতাই এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মূলে সক্রিয়। যে আমেরিকা জাপানে পারমাণবিক বোমাবর্ষণ করেছে যার প্রতিক্রিয়ায় আজও লোক মরছে, সেই আমেরিকা আজ রুশ-চীনের ভয়ে জাপানের প্রণয়প্রার্থী ! এমন অবস্থায় জাপানের তরুণসমাজ আমেরিকার কান মলে নেবে, এটা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। চার, এত অপমান সত্ত্বেও মার্কিণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা জাপানের উপর মোটেই রাগ করেন নি। আইক, ম্যাকআর্থার, হ্যাগার্টি, স্টাসেন, হার্টার—সকলের ধারণা জনসাধারণের মার্কিনবিদ্বেষ এতে প্রমাণিত হয় না ! গরজ বড় বালাই ! জাপানের শিল্পবিস্তার জনৈক মার্কিন সিনেট-সদস্যকে যেমন উদ্বিগ্ন করেছে আর তার সমাধানকল্পে তিনি মার্কিনদেশে জাপানি পণ্য-দ্রব্য বর্জন করার কথা বলেছেন, তেমনি জাপানের বিরাট শিল্পসামর্থ্য সমরাস্ত্র উৎপাদনের কাজে অন্ততঃ আংশিকভাবে নিয়োগের আশায় আজ জাপানকে সামরিক চুক্তিতে না জড়িয়ে মার্কিণের উপায় নেই। ঐ চুক্তি বজায় রাখতে হলে জাপানকে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও সামরিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবেই। মার্কিনরা তাতে সম্মত ; অচিরে তার প্রমাণও পাওয়া যাবে। জাপানি ছাত্ররা ওকিনাওআ প্রভৃতি দ্বীপ ও ঘাঁটিগুলি ফেরৎ চেয়েছে। কিশির পরবর্তী মন্ত্রীরা যাতে চুক্তি বাতিল না করেন, তার জন্যে এখন উত্তরোত্তর আমেরিকা জাপানকে তার হারানো অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেবে। পাঁচ, কিশির পদত্যাগের সংবাদে বা আইকের জাপান না দেখায়

মার্কিন সামরিক মৈত্রীচুক্তি বরবাদ করতে চায়, কিশি যাওয়ায় বা আইক জাপানে না আসায় তাদের বিশেষ কিছু লাভ নেই। বরং কিশি যাওয়ায় আমেরিকা জাপানকে খুশি করতে ব্যগ্র হবে, আর পরবর্তী মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জাপান পরিভ্রমণে যাবার আগে নিশ্চয় জাপদের সন্তোষ-বিধান করে যাবেন।

পরলোকগত মহামনীষী বিনয়কুমার সরকারের প্রায় দৈববাণীর মতো উচ্চারিত কয়েকটি মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া হল তাঁর বিস্ময়কর দূর-দর্শিতা ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান দেখবার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক বর্তমান পরিস্থিতি ও ভাবী পরিণতির ধারণাটাও করে নিতে পারবেন; ১৯৪৫ সালে বিনয়কুমার বলেছিলেন ঃ—

"জাপান হারবামাত্র বিশ কোটি রুশের সাম্রাজ্য ঢুকে পড়বে এশিয়ার মঙ্গোলিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, উত্তর চীনে আর কোরিয়ায়। এশিয়ায়ও বিশ-কোটিওয়ালি রুশিয়ার অতিবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। জাপান যেই হেরে যাবে অমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জাপানের সঙ্গে সমঝোতা আর বন্ধুত্ব কায়েম করবে। এশিয়ায় বিশ কোটি রুশের অতিবৃদ্ধি হতে বাঁচোয়ার জন্যে অবশ্যম্ভাবী ইংরেজ-জাপানি মিলনসন্ধি। বর্তমানে ইংরেজদের ভয় প্রধানত বা একমাত্র রুশ জাত, রুশ নরনারী, রুশিয়ার সাম্রাজ্য, রুশিয়ার অতিবৃদ্ধি। অতি জরুরি ইংরেজ-জাপানি বন্ধুত্ব। জাপান যদি বেশ কিছু বড় আর শক্তিশালী থাকে—অথচ অতি-কিছু না হয় তাহলেই মার্কিন ভায়ারা ইংরেজের সঙ্গে নরম সুরে কথা কইতে অভ্যস্ত হবে। এ্যংলো জাপানি সমঝোতা ও বন্ধুত্ব, এটাও ভেতরে ভেতরে গজে উঠবে, অর্থাৎ খোলাখুলি নয়।"

যাঁরা রুশ-চীন বিভেদের সুখস্বপ্নে মশ্‌গুল, তাঁদের বোঝা উচিত যে, রুশ-চীন মৈত্রী আপাতত ইঙ্গমার্কিন মৈত্রীর চেয়েও সুদৃঢ় এবং ১৯১১ সালে এশিয়ায় জাপানের যে-ভূমিকা ছিল, ১৯৬০ সালে চীনের সেই ভূমিকা অর্থাৎ এশিয়া থেকে ইঙ্গমার্কিন শক্তির উচ্ছেদ চীনের সাধ্য বিষয়। এমন অবস্থায় জাপানকে তোয়াজ করা ইঙ্গমার্কিনের কাছে নিতান্ত দরকারি কাজ।

আফ্রিকায় গানা, গিনি, দাওমে, তোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুনস্, মালি, সোমালিল্যাণ্ড, সোমালিয়া, মালাগাসি, কঙ্গো,রুআন্দা-উরুন্দি, টাঙ্গানিকা, নাইজেরিয়া রাষ্ট্রগুলি সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করেছে ও করবে; অল্প কয়েক বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে লিবিয়া, তুনিসিয়া, মরক্কো ও সুদান। আলজিরিয়ায় প্রবল স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে। এত দ্রুত আফ্রিকার স্বাধীনতা লাভ অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বলে মনে হবে। গানা কয়েক বছর আগে ডোমিনিয়ন মর্যাদা পায়; এবার ১লা জুলাই সে প্রজাতন্ত্র হচ্ছে। ব্রিটিশ ও ইতালীয় সোমালি এলাকা অখণ্ড সোমালিয়া রাষ্ট্র গঠন করছে। ইংরেজ, ফরাসি আর বেলজীয় সাম্রাজ্যবাদীরা হঠাৎ ভালোমানুষ হয়ে গেছে মনে করার কোন কারণ নেই; গণ-আন্দোলনের তীব্রতার জন্যও রাতারাতি এই সব দেশকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হয়নি। ছ বছরে সতেরোটি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দিলেও এই সাম্রাজ্যবাদীরা কেনিয়া এবং আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দেয়নি, যদিও সারা আফ্রিকায় স্বাধীনতার জন্যে সবচেয়ে রক্তপাত হয়েছে ঐ দুই দেশে। আফ্রিকা মার্কিনদের মতে, "The richest price on the earth." এশিয়ায় শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদীদের নির্বুদ্ধিতার ফলে কতকগুলি দেশ স্বাধীনতা পেলেও সেখানে ভূতপূর্ব মালিকদের সুনজরে দেখা হয় না। আফ্রিকায় একই ভুলের দ্বারা এই মহার্ঘতম প্রাপ্তিটি কমিউনিস্টদের কবলগত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে নানা দিক থেকে মূল্যহীন অনেকগুলি দেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতামাত্র দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে এ-সব দেশে রুশ প্রচার কার্য সহজে চলতে পারবে না। কমিউনিস্ট দেশগুলি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই সব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কেনিয়ায় ইংরেজ আর আলজিরিয়ায় ফরাসি ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ ঐ দুই দেশের সামরিক গুরুত্ব আর ইউরোপীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং স্থানীয় বাসিন্দা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের নিরাপত্তার জন্যে। যে সব অঞ্চলের জলবায়ু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অনুপযুক্ত, যেখানে বেশি ইউরোপীয় মূলধন নিয়োজিত নয় এবং যে সব এলাকার সামরিক গুরুত্ব যৎসামান্য, সে-সব ভূমিখণ্ডকে মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে ইউরোপীয়দের আপত্তি নেই। পর্তুগাল অবশ্যই এটুকু সুবুদ্ধির পরিচয়ও দিতে চাইছে না।

আফ্রিকার এই রাজনৈতিক প্রগতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রচার-কার্য প্রবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে; কমিউনিস্ট সম্প্রসারণের সামনে এর ফলে গুরুতর বাধা উপস্থিত হবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আফ্রিকায় বিস্তার-লাভের সম্ভাবনাও কমে যাবে। ভবিষ্যতের রণাঙ্গন পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, চীনের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত এবং বড় জোর উত্তর আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাতে আফ্রিকার সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক উন্নতি আরো দ্রুত, আরো নির্বিঘ্ন হবে।

২৮।৬।৬০



লা মি লী পু

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জয়ন্ত চাকরি নিয়েছে। সি-কে ইনডাষ্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে সে। এতদিন পরে ওর সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠেছে বিপুল উৎসাহে। ওর কল্পনা রূপ নিয়েছে প্রাণময় বাস্তবতায়। জয়ন্ত যেন ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন।

কাজ! যে কাজ সে চেয়েছিল, সেই কাজই পেয়েছে আজ। সকাল সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত নিজেকে ডুবিয়ে রাখে কাজে। শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই। সারাটা দিন কারখানার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জয়ন্ত মেহনতি মানুষগুলোকে উজ্জীবিত করে রাখে কর্ম-প্রেরণায়। এ পাশের কুলি ব্যারাক থেকে আরম্ভ করে ও পাশের ট্রেণিং শেড পর্যন্ত সকলেই উৎসুক-আগ্রহে চেয়ে থাকে ওর আগমন প্রতীক্ষায়। ট্রেণিং সেন্টারের ছেলেদের ও নিজের হাতে কাজ শেখায়। তাদের উৎসাহিত করে। অসহায় নিঃস্ব ছেলেগুলো দেখতে দেখতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত মমতার স্পর্শে। মনিব তো নয়, যেন গরীবের মা-বাপ!

ব্রততী বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এতদিন অনেক অর্থ ব্যয় করেও সে যা পারেনি, জয়ন্ত ছ মাসে তাই করেছে ওদের ভিতর মমত্ব-বোধ জাগিয়ে। কাজের নেশায় ওরা মশগুল হয়ে উঠেছে। ওদের ছন্নছাড়া জীবনে এসেছে বাঁচবার প্রেরণা।

মিস্টার চ্যাটার্জী! মাস্টারি করছেন বুঝি?···জয়ন্তকে খুঁজতে খুঁজতে ব্রততী এসে দাঁড়ায় ট্রেণিং শেডের দরজায়।

আসুন, মিস্ রায়।

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা নামিয়ে রেখে জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণিং শেডের ছেলেগুলোও সসম্মানে দাঁড়িয়ে ওঠে ব্রততীকে দেখে।

ব্রততী বিব্রত হয়ে পড়ে: না না, ব'সো তোমরা। কাজ করো।······আপনি দাঁড়িয়ে উঠলেন কেন মিস্টার চ্যাটার্জী?

নইলে, ওরা ডিসিপ্লিন শিখবে না কোনদিন। ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ। সেইটার অভাবেই ওরা ছন্নছাড়া হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। মা-বাপ তো ছিলনা। দয়া আর হতচ্ছেদ্দায় মানুষ হয়েছে।

জানি।

জয়ন্ত হাসে। ওদের কাজে বসিয়ে হাসিমুখে শেড থেকে বেরিয়ে আসে।

হাসির তাৎপর্যটুকু বুঝতে ব্রততীর বিলম্ব হয় না। তবুও বলে: হাসলেন যে!

এম্‌নি।

এম্‌নি কোনো কাজ কোনদিন জয়ন্ত চ্যাটার্জী করেন কি?

জয়ন্ত কেন, সকলেই করে। যে ডিসিপ্লিন আপনার জীবনে আছে, জয়ন্তর জীবনে সে ডিসিপ্লিন হয়তো ছিল না কোনদিন। তবুও একটুখানি সুযোগ পেতে না-পেতেই, সে একটা লেক্‌চার দিয়ে বসলো আপনাকে ডিসিপ্লিন সম্পর্কে।

তাই।···দূরের জিনিস দেখে, অমনি মনে হয় অনেক সময় অনেক কথা। কিন্তু সব সময় তা সত্যি হয় না।

মুহূর্তে ব্রততীর কণ্ঠস্বরটা কেমন একটু থমথমে হয়ে আসে। জয়ন্ত বুঝে উঠতে পারে না কোথায় ওর নরম তন্ত্রীতে স্পর্শ লেগেছে।

জয়ন্ত প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে নেবার আগেই ব্রততী নিজেকে সামলে নেয়। হাসিমুখে বলে: ছেলে বেলায় মা মরেছে। সংসারে আপন বলতে ছিলেন শুধু বাবা। অপরিসীম স্নে

আর দুর্বলতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। গায়ে কখনো আঁচ লাগতে দেননি। বাইরের পৃথিবীকে চিনবার সুযোগ পাইনি কোনদিন। প্রখর অভিজাত্যবোধ ছিল বাবার। তাই আমার জীবনের যা কিছু ডিসিপ্লিন, সে শুধু গড়ে উঠেছিল আভিজাত্যের গণ্ডীর ভিতর। বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে শিখিনি।

দুজনে অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

জয়ন্ত এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল ব্রততীর কথাগুলো। ভালো-মন্দ কিছুই বলেনি।

রেক্সিন-আঁটা চেয়ারখানা ব্রততীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে: যা শিখেছেন, তার বেশী দরকার হবে না কোনদিন।

সান্ত্বনা দিচ্ছেন, মিস্টার চ্যাটার্জী?

না। কিছু প্রয়োজন আছে কি তার?

আপনার দিক থেকে হয়তো নেই। কিন্তু—

আপনার দিক থেকে আছে, এই তো!

হাঁ। আমার শূন্যতা যে কোথায়, তা আমি বুঝি। সেটা বুঝি বলেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, আপনার ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে পড়ি।…ছেলেগুলো নিশ্চিন্ত হয়েছে। ওদের উৎসাহ যেন দশগুণ বেড়ে গেছে আপনাকে পেয়ে।

মৃদু হাসির সঙ্গে জয়ন্ত বলে: ওদের নিশ্চিন্ততাই দেখেছেন। ভয় তো দেখেন নি।

না দেখলেও, বুঝি মিস্টার চ্যাটার্জী। সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। আপনি আসবার আগে কারখানা কি নিয়মে চলতো, আর এখন কি নিয়মে চলে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার হয় না।…অভিজ্ঞতা তো আমার ছিল না কোনদিন, শুধু আকাঙ্খাই ছিল। কিন্তু সে আকাঙ্খাকে রূপ দেবার ক্ষমতা ছিল না। আজও নেই। আপনাকে না পেলে—

কারখানা বোধহয় এতদিনে ডকে উঠতো।…কেমন?

সত্যি তাই। ডকে না উঠলেও, অল্প দিনের ভিতর এ উন্নতি হতো না।

জয়ন্ত হো হো শব্দে হেসে ওঠে।

জয়ন্তকে এমন করে হাসতে সে দেখেনি কোনদিন। স্বল্পভাষী বলিষ্ঠ-প্রকৃতির মানুষ। নিরলস উৎসাহে মত্ত থাকে রাত্রিদিন শুধু কাজ নিয়ে। মুখে হাসি থাকলেও, মনের দরজা খোলে না সে হাসিতে। কথা বলতে গিয়ে অনেক দিন ব্রততী কথা গিলে নিয়েছে আড়ষ্টতায়; পাছে অসতর্ক মুহূর্তে কোনো ভুল করে বসে। জয়ন্ত একবার কোন সিদ্ধান্ত করে বসলে, তাকে যে সহজে আর ফেরানো যাবে না, সেটুকু বুঝতে তার বাকী ছিল না।

অসমাপ্ত কথার জের টেনে জয়ন্ত বলে: আপনার আকাঙ্খা রূপ পেতো কিনা, জানি না। তবে আপনি যে রূপ পেয়েছেন আপনার আকাঙ্খার ভিতর দিয়ে, তাতে কোন সন্দেহ নাই মিস্ রায়। স্যার সি-কের বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনি। এত ঝঞ্ঝাট সইবার প্রয়োজন তো আপনার ছিল না! তবুও এ অদ্ভুত খেয়াল আপনার কেন হলো, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি।

উত্তর থাকলে তো পাবেন! উত্তর ওর নেই কিছু। অবশ্য আমিও ভাবিনি কোনদিন। ভাবলে হয়তো নিজেও পেতাম না কোনো উত্তর খুঁজে।…একটা কিছু নিয়ে তো বাঁচতে হবে, তাই।

কিন্তু সি-কে ইন্ডাস্ট্রিজ তো একটা-কিছু নয় মিস্ রায়, অনেক-কিছু: একাধারে কারখানা, ট্রেনিং সেন্টার, অরফ্যানেজ, ডেস্টিচ্যুট হোম, অনাথ আশ্রম—আরো কত কি! ছোটখাটো একটা দুনিয়া। অবশ্য কাজ সকলকেই করতে হয়। বসে খাবার কোনো ব্যবস্থা নাই।

থাকলে, জয়ন্ত চ্যাটার্জী সমর্থন করতেন কি? আই হ্যাভ নোন হিম বেস্ট উইদিন দিস্ শর্ট পিরিয়ড। চিনতে তো বাকী নেই আমার।

কথাটা বলে ফেলে ব্রততী কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ে। নতমস্তকে টেবিলের ওপর কাগজ-চাপাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

জয়ন্তর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। দ্বিতীয় কথা না বলে, পাশের শেল্‌ফ থেকে রিপোর্টের খাতাখানা নামিয়ে ব্রততীর সামনে খুলে ধরে: মিস্ রায়, গত তিন সপ্তাহে কারখানার যে উন্নতি হয়েছে, তা আশাতীত। এই ভাবে কাজ চললে,

করতে পারবো। অন্তত আরো দুটো নতুন ডিপার্টমেণ্ট খোলা যাবে। যদি মনে করেন, এখুনি—

বলেছি তো, সে ভার আপনার। আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করবেন।...আড়ষ্টতা কাটিয়ে ব্রততী মুখ তুলে চায়।

জয়ন্ত প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বলে: এ সপ্তাহে কয়েকটি নতুন মেয়ে এসে ভর্তি হয়েছে কারখানায়। বেশ ভালো কাজ জানে। আগে একটা প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করেছে। আমি রাজি হয়েছি তাদের বেশী মাইনে দিয়ে নিতে।

কাজ-জানা লোক হলে ভালো মাইনে তো চাইবেই।

আমাদেরও অনেক সুবিধে। ভালো কাজ পাবো। তা ছাড়া, অন্য মেয়েদের কাজ শিখিয়ে নিতে পারবে।

তাই।

ব্রততী উঠে দাঁড়ালো।

তখন চারটে বাজে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ব্রততী আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো অফিস ঘরের সামনে: মিস্টার চ্যাটার্জী।

বলুন।

যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতাম।

জয়ন্ত এগিয়ে এলো দরজার কাছে। স্বাভাবিক হাসিমুখে বললে: জানেন তো, সহজে কিছু মনে করা-না-করার বালাই আমার নাই। বলবার কিছু থাকলে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

আমি বলছিলাম কি—

ব্রততী ইতস্তত করে।

জয়ন্ত একটু থেমে বলে: বলুন। সংকোচ করবার নাই কিছু।

সারাদিনের এই অক্লান্ত খাটুনি। তার ওপর নিজে রান্না-বান্না করে না খেলে কি হয় না?

রান্না তো করি না আমি। বেয়ারা কুকারটা সাজিয়ে দেয়। আমি সময়মত নামিয়ে নিই।

খাবারটা যদি দুবেলা আমার ওখান থেকে পাঠাই!

তা হয় না, মিস্ রায়! মাপ করবেন।...কারখানায় আরো অনেকে কাজ করে।

জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না।

ব্রততী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে আর কোন কথা যোগায় না। ওর সবটুকু অস্তিত্ব যেন জমাট বেঁধে আসে। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে: আচ্ছা। গুডনাইট, মিস্টার চ্যাটার্জী।

পামার-বাজারের ওপাশে বিস্তীর্ণ ময়দানটা জুড়ে হয়েছে সি-কে ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানা। মস্ত বড় এলাকা জুড়ে নতুন কারখানার সীমানা প্রসারিত হয়েছে। একপাশে কুলি ব্যারাক। মাঝখানে ছুরি-কাঁচি, এনামেল-প্লেটিং, টিনের গাড়ী-মটর-উট-হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি রকমারি খেলনা তৈরির কারখানা। অন্যদিকে প্লাষ্টিক ও রাবারের নানা জিনিস তৈরী হয়। বড় বড় শেডগুলো ছাড়িয়ে বেকার ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং সেণ্টার। দক্ষিণ সীমান্তে জয়ন্ত ও আরও দু'চারজন কর্মচারীর কোয়ার্টার। পাশের আটচালা ঘরখানা শ্রমিক-কর্মীদের নাইট স্কুল।

সন্ধ্যার পর ট্রেনিং সেণ্টারের ছেলেমেয়ে আর কারখানার শ্রমিকদের নিয়মিত স্কুল বসে ওই আটচালায়। বিকেল চারটের ছুটি পেয়ে, কোলাহল করতে করতে ফিরে যায় যে-যার আস্তানায়। সারাদিনের শ্রান্তি কাটিয়ে আবার ছ'টা বাজতে না-বাজতে ওরা ফিরে আসে, বই খাতা নিয়ে এসে হাজির হয় কারখানার ফটকে।

ওদের আগ্রহ দেখে জয়ন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ব্রততী বিস্মিত হয় জয়ন্তর অফুরন্ত এনার্জি দেখে। মানুষ তো নয়, যেন জীবন্ত একটা ডাইনামো! অনেকদিন ব্রততী ভেবেছে জয়ন্তকে বলবে সে-কথা। কিন্তু পারে না। অজানা সংকোচ এসে বাধা দেয়। ওর স্বতস্ফূর্ত প্রশ্ন কিন্তু আসে।

বাধা পড়ে না জয়ন্তর মনের সবল গতিতে। ব্রততীর ইচ্ছাটা স্পষ্ট করে জেনে নেবার উদ্দেশ্যে বলে: আপনি নিজে যদি দেখা-শোনার ভার নিতেন, তাহলে মেয়েদের জন্যে নাইট স্কুলের একটা পৃথক সেক্শান খুলতাম। নতুন যে কয়েকটি মেয়ে এসেছে তারা অনেকেই চায় স্কুলে ভর্তি হতে।

ওরা তো কেউ কেউ পড়ে আপনার স্কুলে।

বধান করি, একথা অবশ্য অস্বীকার করি না। যতদিন থাকবো এখানে ততদিন নিশ্চয়ই করবো সে কাজ। যাক, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে,এই স্কুলে পড়তে ওদের অসুবিধা হয়। সে অসুবিধা থাকবেই।

কেন ?

রাত ন'টার পর ওদের বাসায় ফিরতে হবে। তাছাড়া বিকেল চারটেয় কারখানার ছুটি। স্কুল বসে সাড়ে ছটায়। মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয় অত অল্প সময়ের ভিতর ফিরে আসা। অতসী, কান্তমণি, ফুলটুসি—নতুন যে সব মেয়ে এসেছে, তারা থাকে অনেক দূরে। অনেকে হয়তো ছ'টার আগে বাড়ী ফিরতেই পারে না। সারাদিনের খাটুনির পর—

সে সমস্যা তো থাকবেই মিষ্টার চ্যাটার্জী। কারখানা ছাড়াও সংসারের কাজ আছে মেয়েদের।

তাই বলছিলাম—

বলুন। বলবারই বা কি আছে। যা আপনি ভালো বুঝবেন, তাই করবেন। স্যার সি-কে রায়ের স্মৃতি এই ইন্‌ডাস্ট্রী। সে স্মৃতি রক্ষার ভার আপনার হাতেই তুলে দিয়েছি মিষ্টার চ্যাটার্জী। আমি জানি, তার মর্যাদা আপনি রাখবেন।

ব্রততীর কণ্ঠস্বরে যেন অস্বাভাবিক একটা আকুতি ফুটে ওঠে।

জয়ন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার মুখপানে।

ক্রমশঃ

ঘণ্টায় ২০০০ মাইল গতিবেগ সমন্বিত জেট্‌-বিমান

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসছে। সম্প্রতি জানা গেছে যে, বর্ত্তমানে বিমান পরিকল্পকগণ এক নূতন রকমের ‘জেট্’ ইঞ্জিনের পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই ইঞ্জিনের দ্বারা বিমানে ঘণ্টায় ২,০০০ মাইল পথ পরিক্রমণ সম্ভব হবে। এইরূপ অসম্ভব দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এর প্রচলন আমরা দেখতে পাব। এই



কারখানায় র‍্যাম্‌জেট্ ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে

বিমানের দৌলতে দূর আর দূর থাকবে না, মাত্র দু’ ঘণ্টায় দিল্লী থেকে টোকিও বা নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে যাওয়া সম্ভব হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে একমাত্র ‘র‍্যাম্‌জেট্’ ইঞ্জিনের সাহায্যেই এইরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান তৈরী সম্ভব। এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ১,২০০ মাইল এবং তদূর্দ্ধ গতিবেগেও ভালভাবেই কাজ করবে। আর র‍্যাম্‌জেট্ ইঞ্জিনে কোনরূপ জটিলতা নেই। খুব সরল উপায়েই ইহা পরিচালিত হয়। র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিনগুলির নলের ন্যায় আকৃতি এবং আভ্যন্তরীণ সহজ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য এদের “উড়ন্ত ষ্টোভ পাইপ্” বলা হয়। বর্ত্তমানে বহুল-প্রচলিত ‘টার্বোজেট’ ইঞ্জিন অপেক্ষা র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিনে অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং দ্রুতগতিতে পরিচালনে মিতব্যয়িতা ও নির্ভরশীলতাও অনেক বেশী বাড়বে।

র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিন, টার্বোজেট ইঞ্জিনের ন্যায় জটিল প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত নয়। ইঞ্জিন বলতে এখানে উভয়দিক খোলা একটি ধাতুনির্ম্মিত টিউব ছাড়া আর কিছুই নয়। বায়ুমণ্ডলে চলার জন্য এই ইঞ্জিন বায়ু আহরণ করে, প্রচণ্ডগতিতে চলার ফলে আহরিত বায়ু এর ভিতর এসে অবরোধ সৃষ্টি করে। এই বায়ু কোন যন্ত্রের দ্বারা ‘কম্প্রেস্‌ড্’ হয় না—ইঞ্জিনের সম্মুখ গতির ফলে বায়ুর যে চাপ সৃষ্টি হয় তার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। আবার ইঞ্জিনের মধ্যে যাবার সময় ভিতরকার নালীর গঠনের জন্য বায়ু আরও কম্প্রেসড্ হয়। এর পরবর্ত্তী প্রক্রিয়া টার্বোজেট ইঞ্জিনের ন্যায়, যেমন, কম্প্রেস্‌ড্ বায়ু ‘ফিউয়েল’-র সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং ‘কম্বাশ্চন্ চেম্বারে’ ইহা প্রজ্বলিত হয়, ফলে ইঞ্জিনের পশ্চাৎভাগ দিয়ে উত্তপ্ত গ্যাস্ প্রবল বেগে বার হয়ে আসে।

কিন্তু র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিনের প্রধান অসুবিধা হলো, এই ইঞ্জিন দণ্ডায়মান থাকাকালীন সময় কায করবে না বা বিমানের সাধারণ গতিবেগে চালিত অবস্থায়ও এই ইঞ্জিন কার্য্যকরী হবেনা। যতক্ষণ না ইঞ্জিন প্রবল গতিতে সম্মুখদিকে পরিচালিত হবে, যার ফলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরিত বায়ুকে কম্প্রেসড্ করা সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ইঞ্জিন কার্য্যকরী হবেনা।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষা কার্য্য চলেছে। Marquardt Aircraft কম্পানীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন যে, প্রথম পর্য্যায় টার্বোজেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা যেতে পারে—তারপর উপরে উঠে বিমান যখন দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে তখন টার্বোজেট বন্ধ করে দিয়ে র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিন চালু করলেই চলবে। এই কম্পানীর

মতে ১৯৭০ সালের মধ্যে সম্ভাবিত র্যাম্‌জেট-টার্বোজেট বিমানগুলির আকার প্রায় এখনকার Boeing 707 অথবা Douglas DC-8. বিমানের মত হবে। আর যাত্রী বহনের ক্ষমতা থাকবে ১৪০জন। ১০ থেকে ১২ মাইল উচ্চে শব্দের তিনগুণ বেশী বেগে (এই উচ্চতায় শব্দের বেগ ঘণ্টায় ৬৬০ মাইল) ধাবিত হবে এরূপ বিমানের পরিকল্পনা হচ্ছে। এই বিমানগুলি পরিচালনে খরচাও আজকাল-কার মন্থরগতি 'জেট্' গুলির চাইতে কম হবে। এই বিমানে কোথাও অবতরণ না করে ৬,০০০ মাইল পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে।

আগুনে পোড়া রোগীর চিকিৎসায় লবণ জল

আগুনে পোড়া প্রভৃতি আঘাত বা বিষম দুর্ঘটনায় মানুষের দেহমনের অবস্থা এমন হয় যে আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে রোগীকে প্রায়ই এই 'শক্' বা আঘাত থেকে বাঁচানো যায় না। কিন্তু আঘাত প্রাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই ধরণের রোগীর চিকিৎসা যে কি ভাবে হবে তা' চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের নিকট কিছুকাল আগেও বেশ সমস্যার বিষয় ছিল।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ হেল্‌থের ডাঃ স্যান্‌ফোর্ড রেজেন্‌থ্যালের নির্দ্দেশে এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। তাঁরা মানুষ এবং জন্তু উভয়েরই উপর গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পেয়েছেন। দেখা গেছে যে, দুর্ঘটনার ফলে 'শক্' লাগা রোগীকে কিছুটা লবণ জল খাইয়ে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের আর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না।

অন্যান্য দুর্ঘটনার ব্যাপারে মতদ্বৈধ থাকলেও, আগুনে-পোড়া রোগীর দেহে লবণ জল প্রয়োগ সম্পর্কে কোন মত-দ্বৈধ থাকতে পারে না। গবেষণায় এর ফল সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বড় রকমের দুর্ঘটনায় এ পর্য্যন্ত রোগীর দেহে সাধারণতঃ রক্ত বা প্ল্যাজমা প্রয়োগ করা হত। সাত বছর ধরে গবেষণার পর জানা গেছে যে, আগুনে-পোড়ার ব্যাপারে লবণ জল ঠিক সম পরিমাণ প্ল্যাজমা বা রক্তের মতই কার্য্যকরী হয়ে থাকে। পৃথিবীর যে সকল স্থানে প্ল্যাজমা পাওয়া যায় না সে সকল স্থানে, যেমন লিমা এবং পেরুতে, লবণ জল প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। যে সকল রোগীর শরীরের দশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্য্যন্ত পুড়ে গেছে—কেবল তাদের নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই ধরণের ৭৯টি রোগীর দেহে লবণ জল প্রয়োগের ফলে দেখা যায় যে ২৪ঘণ্টার মধ্যে একটীরও মৃত্যু হয়নি। আগুনে পোড়া শিশুর দেহে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ 'শক্ পিরিয়ডে' লবণ জল এবং প্ল্যাজমা এই দুইটি দ্রব্য প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—এর ফলে শতকরা একানব্বইটি শিশুই রক্ষা পেয়েছে। বড় রকমের বোমা বর্ষণের ফলে আগুনে-পোড়া রোগীদের বাঁচানোর জন্য লবণ জল প্রয়োগ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রায় দশ ছটাক বা এক কোয়ার্ট জলের মধ্যে চায়ের চামচের এক চামচ লবণ এবং আধ-চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয়। রোগীর দেহের যা ওজন সেই ওজন অনুপাতে, তাঁর প্রতি ২০ পাউণ্ডের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ওষুধ এক কোয়ার্ট বা দশ ছটাক পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়। আর পরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার অর্দ্ধেক পরিমাণে দেওয়া হয়।



সুইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডায় যৌথ-কৃষি-সমবায়

অণিমা রায়

ভারত সরকার কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দেশে খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধি করবার জন্য ভারতের গ্রামে গ্রামে যৌথ কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করবার কাজ আরম্ভ করেছেন। আমাদের মত অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে কৃষি-সমবায়ের কাজ বহু আগে থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা হয়ত এ বিষয়ে কিছু শিক্ষা ক'রতে পারি। তাই সেই সব দেশের কৃষি সমবায় আন্দোলনের আদর্শ, গঠন এবং সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা উচিত।

কয়েক বছর আগে জেনেভাস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান (International Labour Office, Geneva) ২৩টি দেশে কৃষি-সমবায়-নীতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের প্রণীত "যৌথ কৃষি-সমবায় প্রাথমিক জরীপ" পুস্তিকাটি থেকে সুইডেন, ক্যানাডা ও ফ্রান্সে যৌথ-কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য এই প্রবন্ধে দেওয়া হল।

সুইডেন

সুইডেন সরকার সমাজ কল্যাণের জন্য একটি স্বাধীন কৃষি সমাজ থাকা প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু সুইডেনের অধিকাংশ আবাদগুলির আয়তন এত ছোট যে, সেগুলিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলে না এবং সেগুলি থেকে এত সামান্য আয় হয় যে কৃষক জমি ছেড়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য অন্য কাজ ক'রতে বাধ্য হয়।

কৃষি ও কৃষকের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দূরীভূত করবার জন্য ১৯৪৩ সালে সুইডেন সরকার একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করেন এবং কৃষি-উন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত পন্থা নিরূপণ করার ভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত করেন। সমিতি বহু গবেষণা করার পর সুপারিশ করে যে কৃষি উন্নয়নের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন ক'রে কতকগুলি যৌথ কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা দরকার এবং কৃষি সমবায় সমিতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হওয়া দরকার :—(১) সন্নিকটবর্তী কৃষকেরা যৌথ-কৃষি সমবায় সমিতি গঠন ক'রে নিজ নিজ আবাদ সমবায় সমিতিকে বিক্রী ক'রবেন এবং তার মূল্য স্বরূপ নিজেদের জমির আয়তন অনুসারে সমিতির মূলধনের শেয়ারের অংশ পাবেন।

(২) ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক বা কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষি সমবায় সমিতি গঠন ক'রে জমি কিনতে বা খাজনা ক'রে ভাড়া নিতে পারেন। এই জমি তাদের সমবায়িক প্রথায় চাষ করতে হবে।

উপরোক্ত কৃষি সমবায় সমিতিগুলি সরকারী কৃষিপর্ষদে নিবন্ধভুক্ত (রেজিষ্টারী) ক'রতে হবে। সমস্ত সদস্যদের সমবায় সমিতির আবাদগুলিতে খাটবার অধিকার থাকবে ত বটেই, অধিকন্তু এই সব আবাদে তাদের খাটতে বাধ্য করা হবে। সমষ্টিগত চুক্তির সর্ত অনুসারে এই সব কৃষি শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হবে। মজুরী দেবার পর টাকার সুদ এবং নির্দ্ধারিত সংচিতি (Reserve Fund) আলাদা করে রেখে যে টাকা উদ্‌বৃত্ত হবে তা সদস্যদের মধ্যে অধিবৃত্তি (Bonus) হিসাবে বণ্টন করা হবে।

সমিতির সুপারিশে বিশেষভাবে বলা হয় যে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকেরা সরকারের কাছে অনুদান ও ঋণবাবদ যে রকম অর্থ সাহায্য পান, সমবায় সমিতিগুলি যেন সে সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন।

সুইডেন সরকার সমিতির সুপারিশগুলি গ্রহণ করেন এবং সুইডেনের আইন সভা সুপারিশগুলি অনুমোদন ক'রে সেগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য যথোচিত আইন প্রণয়ন করে।

এইভাবে সুইডেনে কতকগুলি যৌথ কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে উঠে। এই সমিতিগুলি টুকরা টুকরা জমি একত্রিত করার পর উন্নতবীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি ব্যবহার, যন্ত্র সাহায্যের এবং সেচের জলের ব্যবস্থা করাতে গত দশ বছরে শস্যের ফলন অত্যন্ত বেড়েছে—কয়েকটি স্থানে শতকরা আশী থেকে নব্বই ভাগ বেড়েছে।

ছোট ছোট আবাদের জন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের ফলে প্রতিষ্ঠিত এই সব যৌথ কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে স্থানে স্থানে কৃষকের দল স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে যৌথ কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপন করেছেন। জামতাল্যাণ্ডে কতকগুলি কৃষক নিজেদের পারিবারিক খাদ্য সরবরাহের মত জমি খাসে রেখে বাকি জমি ত্রিশ বছরের জন্য একটি যৌথ কৃষি সমবায় সমিতিকে বন্দোবস্ত দিয়েছেন। যৌথ কৃষি সমবায় সমিতিটি কৃষকেরা নিজেরা গঠন করেছেন এবং সমিতিভুক্ত জমির পরিমাণ হয়েছে ১৩০ হেক্টেয়ার। প্রতি সদস্য-কৃষক আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার বীজ প্রভৃতি কেনবার জন্য সমিতির তহবিলে হেক্টেয়ার প্রতি ১০০ ক্রোনার (সুইডেনের মুদ্রা) জমা দিয়েছেন এবং যৌথভাবে সমিতির ১৩০ হেক্টেয়ার জমি চাষ করছেন। তাঁদের ছোট ছোট খাস জমিগুলি সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাতে কৃষি যন্ত্রপাতির সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে। এখন ছোট ছোট খাস জমিগুলির ফসলে সদস্যদের সংসার স্বচ্ছল হয়েছে এবং যৌথ কৃষি সমিতির আয় থেকে তাদের যথেষ্ট অর্থাগম হচ্ছে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে ১৯৪৩ সালে সুইডেনে সুব্যবস্থিত ও আয়ের কৃষিকার্যের যে সব অন্তরায় ছিল পশ্চিম বাঙলায় আজও সেই-রকম অন্তরায় আছে—টুক্‌রা টুক্‌রা জমি ও কৃষকের দারিদ্র্য। সুইডেনে যৌথ কৃষিকার্য দ্বারা কৃষি ও কৃষকের যে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে, পশ্চিম বাঙলায় তা হবে না কেন?

ক্যানাডা

ক্যানাডায় নিম্নলিখিতভাবে কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে—(১) নিজ নিজ জমির চাষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখে কৃষকেরা নিজেদের সমস্ত যন্ত্রপাতি একত্রিত ক'রে একযোগে জমিগুলিতে খাটাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

(২) কতকগুলি সমবায় সমিতি আছে যারা (১) নং নীতি অনুসরণ করে। শুধু কতকটা জমি যৌথ চাষ করে।

(৩) কতকগুলি সমবায় সমিতি (১) নং নীতি অনুসরণ করে, কিন্তু সমস্ত জমি যৌথভাবে চাষ করে। কৃষকেরা শুধু পশু-প্রজননের কাজ নিজ নিজ ইচ্ছামত করে।

(৪) কৃষকদের জমি, লোকবল, মূলধন ও যন্ত্রপাতি সমস্ত একত্রিত ক'রে সমবায় সমিতি সমবায়িক প্রথায় সেগুলি কাজে লাগায়।

১নং, ২নং, ৩নং প্রথায় কৃষকদের নিজ নিজ জমির উপর মালিকানা স্বত্ব বজায় থাকে। ৪নং প্রথায় সমস্ত জমি মূলধন, পশু ও যন্ত্রপাতির মালিকানা স্বত্ব সমবায় সমিতিতে অর্শায়।

১নং, ২নং এবং ৩নং সমবায় সমিতিগুলি আমাদের দেশের সারভিস্ কো-অপারেটিভের অর্থাৎ সমবায়িক সেবাসমিতির অনুরূপ। ৪নং সমবায় সমিতিগুলি ভারত সরকার প্রস্তাবিত যৌথ কৃষি সমবায় সমিতির অনুরূপ। ক্যানাডায় এই সমিতিগুলি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ ক'রছে। সুতরাং ভারতে অনুরূপ সমিতিগুলি সাফল্যের সঙ্গে কাজ ক'রতে না পারার কোন কারণ নেই।

ক্যানাডার একটি কৃষি সমবায় সমিতির সাফল্যের বিষয় এবার বলা হবে। কয়েকজন কৃষক নিজেদের জমি, যন্ত্রপাতি, পশু প্রভৃতি একত্রিত ক'রে "স্টারগিস সমবায় আবাদ" নামে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করেন। প্রতি কৃষক প্রদত্ত জমি ইত্যাদি মূল সমিতির খাতায় তাঁর নিকট প্রাপ্ত ঋণ হিসাবে জমা হয় এবং এগুলি সমিতির মূলধন দাঁড়ায়। কৃষকেরা ও তাঁদের পরিবারস্থ মহিলারা সকলেই সমিতির সদস্য হ'ন এবং একযোগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় ১৭০০ একর জমি চাষ করেন। প্রতি বছরে এত লাভ হতে থাকে যে ১৯৪৬ সালে সমিতি স্টারগিস গ্রামটি কিনতে সমর্থ হয়। আবাদ সংলগ্ন এই গ্রামে সমিতি সদস্যদের বাসগৃহ তৈরি ক'রে দেয়। সদস্যেরা সমিতিকে ভাড়া দিয়ে আবাদের কাজ আরও ভালভাবে পরিচালনা ক'রতে থাকেন। অধিকন্তু, স্টার-গিস গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং গির্জা, বিদ্যালয়, সিনেমা প্রভৃতি তৈরি ক'রে সমিতি সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে সমর্থ হন।

সদস্যেরা সমিতিকে প্রদত্ত জমি প্রভৃতি মূল্যের উপর ন্যায্য হারে সুদ পান এবং নিজেদের শ্রম অনুসারে মজুরী অর্জন ক'রে থাকেন। আবার বছরের শেষে সমিতির মুনাফার অংশও পেয়ে থাকেন।

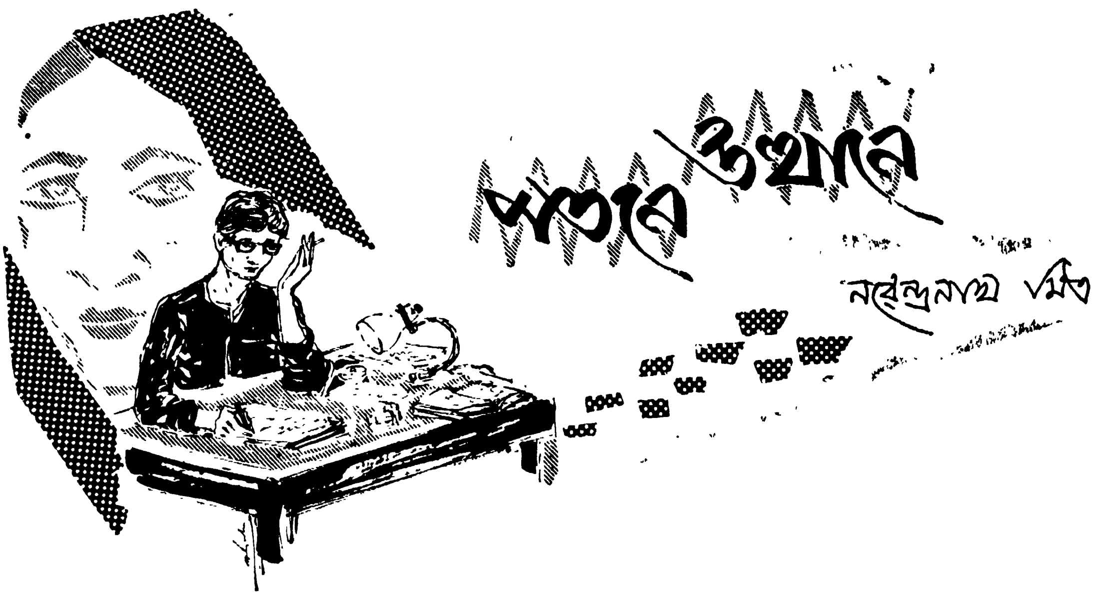
ফ্রান্স

১৯৪৪ সালের পরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান জরীপ ক'রে দেখেন যে সে সময় আল্পস্ পর্বতের গাত্রে মাত্র কুড়িটি যৌথ কৃষি-সমবায় সমিতি ছিল। সমিতিগুলি নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত ছিল—সদস্যরা নিজ নিজ জমির মালিকানা স্বত্ব বজায় রেখে জমিগুলি সমিতিকে বন্দোবস্ত (Lease) দেন এবং একযোগে সেগুলি চাষ করেন। সচরাচর প্রতি কৃষক সমিতির সদস্যের সংখ্যা ছিল শুধু মাত্র ৭জন এবং আবাদের সংখ্যা ছিল ৫টি। সদস্যেরা একযোগে সমিতির কাজ পরিচালনা করতেন। সদস্যদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমিতির সভাপতি হতেন, অপর একজন সদস্য সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ হতেন এবং একজন সদস্য হতেন কৃষি-কৌশল অধিকর্তা (Technical Director)। বাকী চার জন সদস্য হিসাব-পরীক্ষকদের কাজ করতেন ও প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর সমিতির আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করতেন।

প্রতি সদস্য নিজ যন্ত্রপাতি পশু প্রভৃতি তাঁর মূলধনের অংশস্বরূপ সমিতিকে দিতেন এবং সমিতি সদস্যদের সমানভাবে শেয়ার দান ক'রত। অবশ্য যে সদস্যের দানের মূল্য কম হ'ত তাঁকে নগদ টাকা দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করতে হ'ত। সমিতির সদস্যরা উৎপন্ন ফসল বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে নিজেদের দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক মজুরী সমান অংশে নিতেন এবং সে মজুরীর হার সমিতির সাধারণ সভায় স্থির করা হ'ত। যে সব সদস্যদের পরিবার বড়, তাঁরা নিজেদের অভাব মেটাবার জন্য সর্বাগ্রে সমিতির ফসল কিনতে পারতেন। বছরের শেষে প্রত্যেক সদস্য তাঁর জমির অনুপাতে অধিবৃত্তি পেতেন। কোন সদস্য সমিতির অনুমতি না নিয়ে কার্যে অনুপস্থিত হ'লে তাঁকে সমিতির ক্ষতিপূরণ করতে হত।

এই সব সমিতি এরূপ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিল যে ১৯৪৯ সালে এই রকমের ৪,৫০০ কৃষি সমবায় সমিতি ফ্রান্সে গড়ে উঠে এবং সমবায়িক প্রথায় কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে ও আবাদগুলিতে ব্যবহার ক'রে কৃষকদের প্রভূত কল্যাণসাধন করে। ফ্রান্সে ফসল উৎপাদনও বিশেষভাবে বেড়ে যায়।

সুইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডা ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশ। সে সব দেশে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যদি শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে, তাহ'লে ভারতেই বা হবে না কেন। সততার অভাব ও আলস্য দূর হলে ভারতে সমবায়িক কৃষিকার্য সফল করতে পারে।



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২

লাইব্রেরী ঘরটি দোতলায়। সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে উঠতে লাগলেন অনুরাধা। মাঝখানে বিশ্বরূপ। সবচেয়ে পিছনে উৎপল।

নীচে হলঘরখানায় বসেছিল উৎপল—ঘরখানা ঠিক তারই ওপরে। আকার ও অবিকল সেই ঘরের মতই। কিন্তু নীচের ঘরখানা যেমন শূন্য, এ ঘর তা নয়। এ ঘরে সারি সারি চারটি আলমারিতে বইঠাসা। কোন আলমারির তালা যে শিগগির খোলা হয়েছে তা মনে হয়না। কাঁচের আলমারিগুলির মধ্যে যে রাশ রাশ বই নাম আর লেখকের পরিচয় বহন করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের শান্তিও শিগগির কেউ ভেঙেছে বলে উৎপলের মনে হলনা। কিন্তু সাজানো গোছানোর পদ্ধতি নিখুঁৎ।

এক আলমারিতে বাংলা গল্প উপন্যাস আর কাব্য—আর এক আলমারিতে শুধু রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলীর বাঁধানো সংস্করণ, তৃতীয়টী ইংরেজীতে লেখা ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্বের বই—চতুর্থটি বইয়ের আলমারি নয়, ছোটখাট মিউজিয়াম। সতীশঙ্কর যে সব জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন পুতুলে প্রতিকৃতিতে তারই সব স্মৃতি ধরেছেন। আর তাঁর স্মৃতি তাঁর রুচি ধরে রেখেছে এই নিদর্শনগুলি। তাজমহল, নানা আকারের ছোট বড় শাঁখ, রঙীণ ঝিনুক, শামুক, কালো পাথরের শ্বেতপাথরের নানা রকমের দেবীমূর্ত্তি সুন্দর করে সাজানো।

কাঁচের ভিতর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে উৎপল বলল, 'ওঁর এসব বিষয়েও সখ ছিল?'

অনুরাধা বললেন, 'তা ছিল। কোন বস্তুতেই ওঁর উৎসাহ কি কৌতুহলের অভাব ছিল না। কোন কিছু নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করতে ওঁকে দেখিনি। খেতে বসে কোনদিন নিজের অভাব বোধ করেননি। শাক-চচ্চড়ি নিরামিষ-আমিষ সমানে খেয়েছেন। তেমনি কোন বিষয়ে অপ্রবৃত্তি বলে কিছু ছিলনা। বরং বেশিরকমের প্রবৃত্তি'—বলতে বলতে অনুরাধা থেমে গেলেন।

কথাটা খট করে উৎপলের কানে লাগল! অনুরাধার দিকে চেয়ে বলল, 'বেশিরকমের প্রবৃত্তি মানে?'

জবাব দিতে একটু কি দেরি হল অনুরাধার? একটু কি ভাবতে হল?

তিনি বললেন 'মানে? মানে এমন মানুষ কি আপনি দেখেননি যাঁদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ, আর দারুণ কাজ করবার শক্তি? যাঁরা কিছুতেই শান্ত হতে পারেননা,

স্থির থাকতে পারেন না? যাঁরা ছেলেমানুষের মত দুরন্ত আর চঞ্চল? তিনি ঠিক সেইরকম ছিলেন। আমি তাঁকে মাঝে মাঝে বলতাম—বিশু বড় হলে ঠিক তোমার মত হবে কিনা বলা যায়না, কিন্তু তুমি বড় হয়েও অনেক ব্যাপারে অবিকল বিশুর মত আছ।'

হঠাৎ অনুরাধার খেয়াল হল বিশু নেই এঘরে। তিনি বলে উঠলেন, 'ওমা, ছেলেটা আবার কোথায় গেল। দেখুন কাণ্ড। এই আছে এখানে—এই আর পাবেননা। এঘর থেকে ওঘরে হুটোপুটি ছুটোছুটি লেগেই আছে। গোটা বাড়িটাই যেন ওর খেলার মাঠ।'

উৎপল একটু হাসল, 'ছেলেমানুষ, চঞ্চল তো হবেই। বরং শান্তশিষ্ট হলেই ভাববার কথা ছিল।'

অনুরাধা একথার কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের পূবপ্রান্তে যে পাথরের ষ্ট্যাচুটি রয়েছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উৎপলের দিকে চেয়ে ফিরে বললেন, 'এই যে এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম; মিঃ রায়ের জন্মদিনে ওঁর শিল্পী বন্ধু সমীরণ সেন ওঁকে এটা উপহার দিয়েছিলেন। উনি সেবার পঁয়তাল্লিশ উৎরে ছেঁচল্লিশে পড়লেন।'

উৎপল লক্ষ্য করে দেখল—শান্তশিষ্ট এক ভদ্রলোকের আবক্ষ মর্মরমূর্তি। মিসেস রায় তাঁর স্বামীর যে চঞ্চল দুরন্তপনার বর্ণনা দিলেন এই মূর্তিতে তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। বরং দেখে মনে হয় ধীর স্থির ধ্যানগম্ভীর একটি প্রৌঢ়ের প্রতিকৃতি। দৃষ্টি, দুটি ঠোঁটকে মিলিয়ে রাখবার ভঙ্গিতে একটু যেন বিষাদের ছাপ।

উৎপল ভাবল—চঞ্চল অস্থির বহির্মুখী মানুষের জীবনেও নিশ্চয়ই বিষণ্ণ গম্ভীর অনেক মুহূর্ত আসতে পারে। জীবনের দ্রুত ধাবমান অসংখ্য মুহূর্তের মধ্যে সেই মুহূর্তটিই হয়তো শিল্পীর চোখে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। পলায়নপর সেই মুহূর্তটিকে শিল্পী পাথরে স্থায়ীভাবে খোদাই করে রেখেছেন। হয়তো তিনি ভেবেছেন—বিষাদ আর গাম্ভীর্যই জীবনকে মহিমার স্পর্শ দেয়।

মূর্তি দেখে যা মনে হয় সতীশঙ্কর তেমন সুপুরুষ ছিলেন না। চেপটা ধরণের মুখ, পুরু ঠোঁট, বড় বড় কান, ওঁচা কপালকে প্রচলিত সৌন্দর্যের মানদণ্ডে ঠিক মনোরম বলা চলে না। তবু মূর্তিটির এক আলাদা রূপও আছে। একেই কি শিল্পের রূপ বলা হয়? শিল্পীর সাধনা আর নৈপুণ্যের রূপ?

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করলেন, "মূর্তিটি কেমন লাগছে আপনার?'

উৎপল বলল, 'চমৎকার। খুব ভালো হয়েছে।' অনুরাধা একটু হাসলেন, উনি কিন্তু নিজের এই প্রতিমূর্তি দেখে প্রথমে খুব খুসি হননি। বন্ধুকে বলেছিলেন—একি কাঁদো-কাঁদো একখানা মুখ তৈরি করে দিয়েছ আমার? আমি কি ওই রকম? মনে হয় তোমার নিজের মনোভাবকে আমার মুখে লেপে দিয়েছ। একথা শুনে সমীরণবাবুর মুখখানা যেন কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটু বাদে তিনি ফের হেসে বলেছিলেন, শঙ্করদা, আপনি কি সব সময় দেখতে পান?'

উৎপল জিজ্ঞাসা করল—'সতীশঙ্করবাবু এর কী জবাব দিয়েছিলেন?'

অনুরাধা বললেন, 'কী আর জবাব দেবেন? চুপ করে গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম নিজের এই ষ্ট্যাচুটির তিনি কোন আদর করেন নি। ঘরের এক কোনে লুকিয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন। তারপর কিছু দিন বাদে কোন কোন সময় লক্ষ্য করেছি—লুকিয়ে লুকিয়ে এই মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াতেন। চুপ করে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেনই। যেন রক্ত মাংসে গড়া আর একটি পাথরের মূর্তি। কতদিন যে আমার হাতে ধরা পড়ে গেছেন তার ঠিক নেই। কতবার আমি ঠিক ধরতে গিয়েও ধরতে পারিনি। পিছন থেকে সরে এসেছি। উনি সব সময় সব ব্যাপারে ধরা পড়তে চাইতেন না, ধরা দেওয়া পছন্দ করতেন না। কেই বা করে?'

অনুরাধার গলার স্বরে কোথায় যেন একটু উদাস বিষাদের সুর এসে লাগল।

ঠিক সোজাসুজি নয়, আড়চোখে উৎপল তাঁর দিকে তাকাল। মনে হল শুধু তাঁর গলার স্বরে নয়—তাঁর মুখে-চোখেও সেই বিষাদের ছায়া পড়েছে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই অনুরাধা একটু যেন উচ্ছল তরল সুরে বললেন, 'আসুন, ওঁর আর একটা ছবি দেখবেন আসুন। যে অয়েল-পেইন্টিংটার কথা বলেছিলাম—এই যে।'

অনুরাধা দক্ষিণ মুখী হয়ে দেয়ালের দিকে তাকালেন। উৎপলও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। এবার আর ভাস্কর্য নয়, চিত্রকরের তুলিতে আঁকা রঙীণ প্রতিকৃতি। এবার আর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ নয়, প্রসন্ন পরিতৃপ্ত, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, সম্ভোগে সুখী পুরুষের একখানি মুখ।

অনুরাধা বললেন, 'এ ছবি আমি করিয়েছি। আর্টিষ্টকে আমার এ্যালবাম থেকে একখানা পুরোণ ফটোগ্রাফ বেছে দিয়েছিলাম। সেখানা এনলার্জ করিয়ে নিয়ে এই অয়েল পেইন্টিংটা করে দিয়েছেন। অবশ্য খরচও পড়েছে যথেষ্ট। তা পড়ুক। কেমন হয়েছে বলুন?'

উৎপল এবারও বলল, 'চমৎকার। ভারি সুন্দর হয়েছে।'

অনুরাধা খুসি হয়ে বললেন, 'সবাই এই মূর্তিটির প্রশংসা করে। ফটোটা ওঁর নিজেরও খুব পছন্দ ছিল। অবশ্য আরো অনেক ভালো ভালো ফটো আমার এলবামে আছে। আপনাকে পরে দেখাব। যদি আপনার কাজে লাগে আপনি ব্যবহার করবেন। কিছু কিছু ব্লক করেও ছাপা যেতে পারে।'

উৎপল বলল, 'তা তো যায়ই।'

অনুরাধা একটা আলমারির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওঁর মধ্যে যতদূর পেরেছি খবরের কাগজের কাটিং, ওঁর নিজের ডায়েরি, নোটবুক, দরকারী চিঠি-পত্র—সব গুছিয়ে রেখেছি। যখন যা দরকার হবে আপনি হাতের কাছে পাবেন। যা এখানে নেই—কোথায় গেলে পাবেন আমি আপনাকে সন্ধান দিতে—মানে মেটিরিয়ালসের কোন অভাব হবে না। শুধু চাই—সব সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর কিছু একটি নির্মাণ করব। তা তো শুধু উপাদান থাকলেই হয় না। তার জন্যে আলাদা শক্তি চাই। 'চলুন বেরোন যাক।'

উৎপল তাঁর পিছনে পিছনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘর তো নয় যেন এক যাদুঘর। সতীশঙ্কর মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের এই মৃত আসবাবপত্রের মধ্যে এতক্ষণ কাটাতে ঘুরে বেড়াতে নিশ্চয়ই অস্বস্তি লাগত উৎপলের—যদি না এই মৃত মরুভূমির পাশ দিয়ে আর একটি উচ্ছল উদ্বেল জীবনধারা বয়ে যেত। যদিও অনুরাধা তার স্বামীর কথাই অনুক্ষণ বলছিলেন, একটি বলিষ্ঠ কিন্তু মৃত পুরুষ তাঁকে সব সময় অধিকার করে রাখছিল, আশ্চর্য তবু উৎপলের খুব বেশি হিংসা হয়নি। স্বামীর স্মৃতির অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে একটি সুন্দরী নারীর রমণীয় মুখ সে বারবার দেখেছে। যদিও তাঁর সব কথাই স্মৃতিকথা, তবু তাঁর ভাষার সরলতা, বলবার ভঙ্গি, আর স্বরের মাধুর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য অনুরাধার সহজ সপ্রতিভতা। ভাবতে অবাক লাগে উৎপলের সঙ্গে তাঁর আজই পরিচয় হয়েছে। এর আগে তিনি উৎপলের নাম মাত্র শুনেছেন। বিজনবাবু গোপনে উৎপলের কথা ওঁকে বলেছেন। তাকে দিয়ে কাজ হতে পারে হয়তো এমন একটু সুপারিশও করেছেন। কিন্তু অনুরাধার চাল-চলন আলাপ-ব্যবহার দেখলে মনে হয়—উৎপল যেন তাঁর কতকালের চেনা। কোন সংকোচ নেই, কুণ্ঠা নেই, বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। অনুরাধা অবশ্য পর্দানশীন মহিলা নন। উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার চেয়েও বড় কথা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন, তার কাজ কর্মে সাহায্য করেছেন। মিঃ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর অসমাপ্ত কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এ সব কথা উৎপল বিজনবাবুর মুখে শুনেছে। পুরুষের সঙ্গে মিশবার—তার সঙ্গে কাজ করবার—তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার অভ্যাস আছে অনুরাধার। তাই কি এই অসংকোচ; তবু প্রথম দর্শনে প্রথম আলাপে আর একটু লজ্জা মিশানো থাকলে যেন শোভন হত, রহস্যময়তা বাড়ত। কিন্তু অনুরাধার বোধ হয় তা ইচ্ছা নয়। কি তিনি ও সম্বন্ধে সচেতনই নন। উৎপলের হঠাৎ মনে হল এই রূপবতী মহিলাটি তাঁর মনে এক তীব্র সৌন্দর্য-বোধের উদ্রেক করলেও এক স্বতন্ত্র পুরুষ হিসাবে উৎপল হয়তো তাঁর মনকে কিছুমাত্র নাড়া দিতে পারেনি। তার কোন লেখাই তিনি পড়েছেন কিনা সন্দেহ—পড়লেও হয়তো ভালো লাগেনি—কি মনে করে রাখেননি, বিশেষ বৃত্তিজীবী হিসাবেই তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং কাজে নিযুক্ত করেছেন। বাড়ির গৃহিণীরা যেমন নতুন ধোপার সামনে কোন সংকোচ বোধ করেন না, দর্জিকে অনায়াসে নতুন জামা তৈরির ভার দেন—এও তেমনি।

উৎপল তাঁর কাছে তাঁর স্বামীর জীবনী তৈরীর কারিকর ছাড়া কিছু নয়।

আসুন।

অনুরাধা এবার তাকে একটি ছোট ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। মাঝখানে লম্বা টেবিল, আর তার দুদিকে পাশাপাশি সাজানো চেয়ার দেখে উৎপল বুঝতে পারল এটি খাবার ঘর। যে মেয়েটি তখন চা এনে দিয়েছিল—সেই বড় একখানা প্লেটে করে লুচি মোহনভোগ আর দুটি সন্দেশ নিয়ে এল। কাঁচের গ্লাসে জল নিজেই অনুরাধা ঢেলে দিলেন। তারপর বসলেন উৎপলের মুখোমুখি। উৎপল বলল—এ কী।'

অনুরাধা হেসে বললেন 'খুবই সামান্য কিছু। খান।' উৎপল বলল—কিন্তু ভর-সন্ধ্যা বেলায় এযে সারা রাত্রির আয়োজন।

অনুরাধা হঠাৎ কোন্ জবাব দিতে পারলেন না! একটু সময় নিলেন। আর সেই সময়টুকু ভরে উৎপল অস্বস্তি বোধ করল। সে কি অশোভন কিছু বলে ফেলেছে। ভয়ে চোখ তুলে অনুরাধার দিকে তাকাতে পারল না। পাছে তাঁর ভ্রূকুটি দেখতে হয়।

কিন্তু একটু বাদে অনুরাধা যা বললেন তাতে উৎপলের মন থেকে আতঙ্ক দূর হল। উদ্বেগের লেশ রইল না।

তিনি বললেন—খান খান। বেশি করে না খেলে বেশি বেশি লিখবেন কী করে।'

এবার উৎপল হেসে অনুরাধার দিকে তাকাল, 'বেশি করে খাওয়ার সঙ্গে কি বেশি করে লিখতে পারার সম্পর্ক আছে নাকি?' আমি তো শুনেছি যাঁরা কম খান, কম পরেন, কম করে বাঁচেন—তাঁরাই বেশি লিখতে পারেন।'

অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন। তার কথার বাঞ্ছিত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলেন। হয়তো ভালো করে ধরতে পারলেন না। কি এই মুহূর্তে ও ধরণের কোন দুরূহ আলোচনায় যোগ দিতে তাঁর ইচ্ছা হলনা।

তিনি জবাব দিলেন, 'যাই হোক—এই কয়েকখানা লুচির বেলায় আপনি কিন্তু সেই ফরমুলা এ্যাপলাই করবেন না। আপনাদের শিল্প সাহিত্যকে যদি বা ফর-মূলায় বাঁধা যায়, জীবনকে যায়না। সেইখানে জীবনের জয়, আবার পরাজয়ও।'

উৎপল বিস্মিত হল। হঠাৎ এ ধরণের একটি তথ্যগত বাক্য সে অনুরাধার মুখ থেকে আশা করেনি। শুনে খুসিও হল। কিন্তু চট করে কোন জবাব তার মুখে জোগাল না। লুচি তরকারিতে মুখ ভরতি বলেই নয়, মনেই এলনা। আর সেই মুহূর্তে পরিবেশনকারিণী এসে বলল, 'দিদিমণি, আপনার ফোন এসেছে। শিল্পমন্দির থেকে আপনাকে ফোনে ডাকছে।'

অনুরাধা উঠে দাঁড়ালেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি খেয়ে নিন। আমি আসছি।' একটু হেসে বললেন 'কিছু ফেলে রাখবেন না যেন। পদ্মা তুই এখানে থাক। ওর কী লাগে না লাগে দেখবি।'

পদ্মা বলল, 'আচ্ছা দিদিমণি।'

অনুরাধা বেরিয়ে এলেন।

উৎপল খেতে খেতে নিজের মনেই ওঁর শেষ কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগল। জীবন সাধারণ সূত্রে বাঁধা পড়েনা—সেখানেই জয়, সেখানেই তার পরাজয়। হঠাৎ একথাটা কেন বলতে গেলেন অনুরাধা। ইচ্ছা করে বলেছেন, না মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। সতীশঙ্করের জীবনী লেখার কাজে এই মন্তব্যের কি আলাদা কোন তাৎপর্য আছে? তাঁর জীবনও কি জয়ের মালা আর পরাজয়ের জ্বালায় ভরা? ভালো মন্দ সাদায় কালোয় বিচিত্রবর্ণ?

কিন্তু উৎপল যতদূর বুঝেছে—অনুরাধা চান না তাঁর স্বামীর জীবন সেভাবে লেখা হোক। অনুরাধা নিশ্চয়ই চুণকামের পক্ষপাতী। চার দেয়াল একেবারে সাদা ধবধবে রাখাই বোধহয় পছন্দ করবেন। যেন কালির ছিটেফোঁটাও যেন কোথাও না থাকে। এমনকি ফাউণ্টেনপেনের কালির রঙ যদি সাদা হত তাহলেই যেন অনুরাধা আরো নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু তা হয়না। সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে লিখতে হয়। তবেই সে লেখা দেখা যায়, পড়া যায়। অন্তত এখানে সর্বশুক্ল মানে সর্বশূন্য। অনুরাধা যা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চান, উৎপল কি তা পারবে? একটি মানুষকে শুধু তার গুণের সমষ্টির মধ্যে প্রকাশ করা এবং সেই সঙ্গে তাঁকে জীবন্ত করে তোলা কি সম্ভব? সতীশঙ্করের মর্মরমূর্তি যে শিল্পী গড়েছেন

তিনি তাঁর জীবনের বিষাদগম্ভীর মুহূর্ত্তকে ধরেছেন; যিনি তৈলচিত্র করেছেন তিনি তাঁর জীবনের একটি প্রসন্ন মধুর মুহূর্ত্তকে প্রকাশ করেছেন। দুইই সত্য। কিন্তু আরো সত্য আছে। সেই সত্য হয়তো প্রচুর মিথ্যা দিয়ে ভরা। সতীশঙ্করের পঞ্চান্ন বছরের আয়ু আরো অনেক বিচিত্র মুহূর্ত্তে বিম্বিত। এককোঁটা বিষাদ কি এক ছিটে হাসিতে সেই দীর্ঘ কর্মময় জীবনকে ধরা যাবেনা। কিন্তু অনুরাধা বোধহয় তার কাছে তাঁর স্বামীর তৈলচিত্রখানির মত একটি শব্দচিত্র প্রত্যাশা করেন। প্রত্যাশা নয়, অর্থের বিনিময়ে দাবি করতে পারেন অনুরাধা। বেশ তাই হবে। তিনি যা চান, যেমন করে চান, ঠিক তেমনি করেই একখানা জীবনী লিখে দেবে উৎপল। সে তো আর এখানে সৃষ্টি করতে আসেনি। নিজের ভাষায় অন্যের ইচ্ছার অনুবাদ করতে এসেছে। সে অনুবাদ যত অবিকল হয় ততই ভালো, যত সামগ্রিক হয় মূল লেখিকার পরিতৃপ্তি। এখানে ফারমায়েসী লেখা লিখতে এসেছে উৎপল সেন। সে ইচ্ছা করলে ছদ্মনামের আড়ালে—এমন কি বিনা নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারবে। তার কাজটুকু পেলেই খুসি হবেন মিসেস রায়। উৎপলের নাম এমন কিছু যশো-গৌরব বহন করেনা যার জন্যে তাঁর আগ্রহ থাকবে। হয়তো তিনি আরো অর্থ ব্যয় করে আর একজন খ্যাতিমান লেখকের নামটি কিনে নেবেন। উৎপল একটু হাসল। আপনাকে আর দুখানা লুচি দিই?'

উৎপল চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। পদ্মা লুচির থালা হাতে আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজের থালার অবস্থা দেখে উৎপল এবার ভারি লজ্জিত হয়ে পড়ল। একটুকরো খাবারও তার পাতে নেই। অন্যমনস্ক হয়ে খেতে খেতে সে প্লেট একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে। যাকে বলে 'পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' মন যতক্ষণ শিল্পতত্ত্বে মগ্ন ছিল অবিশ্বস্ত হাত আর মুখ ততক্ষণে সব খাবার শেষ করে ফেলেছে।

উৎপল ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'না না না। আর খেতে পারবনা। আর দেবেননা।'

তরুণী পরিবেশিকা হেসে বলল, 'লজ্জা করছেন কেন, নিননা আর দুখানা।'

জোর করে আরো দুখানা লুচি উৎপলের পাতে ফেলে দিল পদ্মা।

রোগা, গায়ের রং পুরা কালো। লম্বাটে মুখ। নাক-চোখের গড়ন তীক্ষ্ণ। ব্যবহারে কোন আড়ষ্টতা নেই।

উৎপল বলল, 'এ কি করলেন।'

পদ্মা মুখ টিপে হেসে বলল, 'আপনি বসুন। মিষ্টি নিয়ে আসি।'

কিন্তু ও ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপল উঠে পড়ল। সুযোগ ছাড়ল না। মেয়েটি তাকে অতই পেটুক ভেবেছে নাকি?'

পদ্মা ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ কি, আপনি উঠে এলেন যে।'

উৎপল রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল 'আপনি বড় বেশি দিয়ে ফেলেছেন।'

পদ্মা কোন প্রতিবাদ না করে বলল, 'আপনি কি এবার নীচে যাবেন? উনি বোধহয় আর আসতে পারলেন না। ব্যস্ত আছেন।'

উৎপল বলল, 'চলুন।'

কিন্তু মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই বেরোলনা। একটু ইতস্তত: করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সতীশঙ্করদার জীবনী লিখবেন?'

সতীশঙ্করদা! মেয়েটির কৌতূহলে উৎপল তত বিস্মিত হয়নি, কিন্তু সতীশঙ্করকে দাদা সম্বোধন করায় অবাক হল। উৎপল ভেবেছিল—মেয়েটি পরিচারিকা ধরণেরই কেউ হবে। অনুরাধার বেল শুনলে যে ছুটে আসে, সে নারী-বেয়ারা ছাড়া আর কি। কিন্তু বিশ বাইশ বছরের একটি তরুণীকে চট করে তুমি বলতে পারেনি উৎপল। তবে প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করেছে মেয়েটি নিজেই প্রতিবাদ করে বসবে, 'আমাকে আবার আপনি বলছেন কেন?'

বয়সের দিক থেকে নয়, মেয়েটির সামাজিক অবস্থার দিক থেকে এই বিনয়টুকু তার কাছে আশা করছিল উৎপল। একটু চুপ করে থেকে সে এবার বলল, এঁরা কি আপনার কোন আত্মীয়? সতীশঙ্করবাবু কি—'

পদ্মা বলল ঠিক আত্মীয় নয়। তবে আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। আশ্রয় দিয়েছেন, পড়াশুনোর সুবিধে

করে দিয়েছেন। এমন উপকার তিনি তো অনেকেরই করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন— ।'

উৎপল বলল, 'শুনেছি।' কিছু মনে করবেন না— আপনি কোন পর্যন্ত—'

পদ্মা বলল, 'পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? বি, এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। কিন্তু রেজাল্ট ভালো হোলোনা।'

পদ্মা মুখ নামিয়ে নিল।'

উৎপল একটু সান্ত্বনা আর সহানুভূতির সুরে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে। ভালোই হোলো, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে আপনিও অনেক তথ্য আমাকে দিতে পারবেন।' পদ্মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'না না না! আমি তাঁর জীবনের কীইবা জানি। আপনি যদি জানতে চান অনেকের কাছে অনেক কথা শুনতে পারবেন। আমি বিশেষ কিছু জানিনে।'

উৎপল একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

এবার পদ্মা পুরোবর্তিনী হয়ে তাকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল।

পদ্মা বলল, 'কিছু মনে করলেন না তো।'

উৎপল বলল, 'কেন?'

আপনার সঙ্গে আলাপ করলাম।

উৎপল বলল, 'ভালোইতো।'

পদ্মা বলল, 'আপনার লেখা পড়েছি। আমার খুব ভালো লাগে।'

উৎপল একটু হেসে বলল, 'তাহলে তো এক ধরণের আলাপ আমাদের আগেই হয়ে গেছে। সেই আলাপই আসল আলাপ।'

পদ্মা এ কথার কোন জবাব দিলনা।

উৎপল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল—এই বিরাট বাড়ির প্রতিটি আসবাবপত্র, তৈলচিত্র, মর্মরমূর্তি, বইপত্র, পত্রিকা—একজনের জীবন কাহিনীর নানা উপাদান নানা স্মৃতি ধরে রেখেছে। কিন্তু আরো দুজন জীবন্ত সাক্ষীর সন্ধান পেল উৎপল। অনুরাধা আর এই পদ্মা। গ্রহীতা আর অনুগ্রহীতা। শব্দ দুটি উচ্চারণ—করতে পেরে উৎপল নিজের মনেই হাসল। কিন্তু মিসেস রায় পদ্মার সঙ্গে কেন পরিচয় করিয়ে দিলেন না? কেন একটি সাধারণ পরিচারিকা বলে ভাবতে দিলেন? একি তাঁর ইচ্ছাকৃত? না খেয়াল করেননি?

ভাবতে ভাবতে উৎপল অনুরাধার সেই অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাঁর সামনে দুখানা চেয়ার দখল করে আরো দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। অনুরাধা তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উৎপল ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। যেন সে অনাহূত হয়ে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুরাধার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি আর গিয়ে উঠতে পারলাম না। এঁরা এলেন। বসুন না আপনি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন।'

উৎপল এক প্রান্তের চেয়ারটায় গিয়ে বসল। অনুরাধা বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি উৎপলকুমার সেন। লেখক। নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন।'

দুজন ভদ্রলোক যে ভাবে হাসলেন তাতে সে যে ওঁদের কাছে একেবারেই অশ্রুতনামা—সে সম্বন্ধে উৎপলের কোন সন্দেহই রইল না।

অনুরাধা এবার ওঁদের পরিচয়ও দিলেন। একজন নিরঞ্জন দাশগুপ্ত এডভোকেট। আর একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক। তার নাম নবগোপাল হালদার। ন্যাশনাল ট্যানারির একজন ডিরেক্টর। দুজনেই প্রৌঢ়। পঞ্চাশ থেকে যাটের মধ্যে বয়স। এরা কী জন্যে এসেছেন সে অনুরাধা খুলে বলবে না। উৎপলের আসবার উদ্দেশ্যও ওঁদের কাছে বলা বাহুল্য মনে করলেন।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর সবাই চুপচাপ। নীরবতা আর নিশ্চলতা উৎপলই প্রথম ভাংল। একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলল, 'আমি তাহলে আজ চলি।'

অনুরাধাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কারের ভঙ্গিতে দুখানা হাত যুক্ত করলেন—খানিকটা উত্থিতও করলেন। হেসে বললেন 'আচ্ছা আপনাকে আর আটকে রাখবনা। এমনিতেই বোধ হয় অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি।

উৎপল বলল, 'না না'।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবার সারা বাড়িতে বেশ আলো জ্বলে উঠেছে।

প্রশস্ত উঠান পেরিয়ে যে গেট সেখানেও আলো জ্বলছে। চাকর দারোয়ানের নড়াচড়া লক্ষ্য করল উৎপল। প্রথমে বাড়িটিকে যত বেশি নির্জন বলে মনে হয়েছিল এখন আর তা লাগছেনা। প্রমীলা-রাজ্য বলেও মনে করবার আর কারণ নেই।

উঠান পেরিয়ে গেটের কাছে এল উৎপল। কালো বড় একখানা গাড়ি একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বোধ হয় চর্মব্যবসায়ীর গাড়িই হবে। আসবার সময় এ বাড়ির খালি গ্যারেজ লক্ষ্য করেছে উৎপল। একেবারে খালি নয়। ভাঙাচোরা ফার্নিচারে ভরতি। এ গাড়ি যে মিসেস রায়ের সম্পত্তি নয়, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয়না।

হিন্দুস্থানী দারোয়ান ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করছিল। উৎপলকে বেরোতে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল। সে যখন এ বাড়িতে ঢোকে তখন এত সম্মান দেখায়নি। হয়তো তার সঙ্গে মিসেস রায়কে আলাপ আলোচনা করতে দেখে দারোয়ানের একটু শ্রদ্ধা বেড়েছে।

গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়ল উৎপল। পিছনে সতীশঙ্করের বাড়িটা রহস্যপুরীর মত পড়ে রইল। বাস ধরবার জন্যে এবার সে বাঁদিকে মোড় নিল। সরু রাস্তার দুদিকে দোকান পাট। মুসলমানের বসতিই বেশি। উৎপল এ পাড়ায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই বেগবাগান অঞ্চলে তিনচার বছরের মধ্যে সে আসেনি। কি আরও বেশি। আসবার কোন উপলক্ষই ঘটেনি। কলকাতায় এমন অনেক রাস্তা আছে যে রাস্তায় সে দু একবার মাত্র হেঁটেছে। একবারও হাঁটেনি এমন রাস্তার সংখ্যাই বোধ হয় বেশি। আশ্চর্য, এত জায়গা থাকতে এ পাড়ায় এসে কেন বাড়ি করলেন সতীশঙ্কর। বাড়িটি কি তাঁর তৈরি করা—না কিনেছেন? হয়তো কিনেই থাকবেন। কারণ বাড়িটির জাফরি-কাটা জানলাগুলি লক্ষ্য করেছে উৎপল। আর নাম মোহন-মঞ্জিল। এবার মনে পড়ছে। নিশ্চয়ই কোন ধনী মুসলমানের বাড়ি ছিল। কি এখনও আছে। হয়তো সতীশঙ্কর বাড়িটা কেনেননি! সস্তায় ভাড়া নিয়েছিলেন। তাই প্রাক্তন মালিকের নাম আর রূপ তিনিও মুছে ফেলে দিয়ে যাননি, মিসেস রায়ও মুছতে পারেননি।

যাই হোক, বাড়িটায় কিন্তু জায়গা আছে প্রচুর। ঘরও অনেকগুলি। সংখ্যা কত—ছখানা না আটখানা—না কি আরও বেশি উৎপল অবশ্য গুণতে চেষ্টা করেনি। মিসেস রায়ের কিন্তু গৃহ-বিলাস আছে। অনেকগুলি ঘর খালিই ফেলে রেখেছেন। ভাড়া দেননি, কি আর কোন কাজে লাগাননি। এবার কি কাজে লাগবে? একটি ঘর তার লেখার জন্যে ছেড়ে দেবেন? কোন ঘর? উৎপল নিজের মনেই হাসল। সে বড় বেশি আশা করছে। লেখেই যদি—সে তার নিজের ঘরে বসেই লিখবে। মানিকতলার গলির মধ্যে একতলার সেই একখানা ঘর। একটি তক্তপোষেই যার সবটুকু জুড়ে গেছে। সেই বিছানায় পদ্মাসন হয়ে বসে মাথার বালিশকে টেবিল বানিয়ে—কি আর একটু উঁচু করবার জন্যে একটি স্যুটকেস পেতে—না লিখতে পারলে তার লেখা বেরোয়না। কি লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে গড়িয়ে নিতে না পারলে তার আরাম হয় না। পাশের ঘরে সংসারের হিসাব নিকাশ নিয়ে উঁচু পর্দায় দাদা-বউদির দাম্পত্য সঙ্গীত বাজতে থাকে। মিণ্টু আর নিণ্টুর কান্না চেঁচামেচি অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করে। ওপরে নীচে আশে পাশে আরো তিন ঘর ভাড়াটে পরিবারের কলহ-কোলাহল মুহূর্ত্তের জন্যও শান্ত হয়না। এই অতি-পরিচিত অভ্যস্ত পরিবেশ ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে এক কলমও লিখতে পারে না।

বাসে উঠে বসবার জায়গাটুকু জুটিয়ে নিয়ে আজকের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাবতে ভাবতে চলল উৎপল, গেলেই দাদা বকবেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। বকবেন—'আজও সারাদিন ঘুরে ঘুরেই কাটালি।' বউদি বলবেন—কোন দায়িত্ব তো ঘাড়ে পড়েনি। ওর আর চিন্তা কী।

আজকের এই নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন একটা ঠিকে কাজের চুক্তির কথা উৎপল কি ওঁদের বলবে? না এখনি বলে কাজ নেই। মন্ত্রগুপ্তি রাখা ভালো। না আঁচালে বিশ্বাস কি। মিসেস রায়ের মর্জি যে কাল পর্যন্ত একই রকম থাকবে—তারই কি কিছু স্থিরতা আছে? উৎপলের নিজের মন ও কি কম অস্থির? মনের মধ্যে যে আসন পাতা তা বড়ই নড়বড়ে। তাই সেখানে না বসেন লক্ষ্মী, না সরস্বতী। বড় ভয়—পাছে হুড়মুড় করে জল চৌকি শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়েন।

কাল যে উৎপল দ্বিতীয়বার ওমুখো হবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। ছেলেবেলায় জীবনী পড়তে গেলে তার গায়ে জ্বর আসত, এখন লিখবার কথা ভেবে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়েছে। তাছাড়া যাঁর সম্বন্ধে লিখবে তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই তার জানা নেই।

বিজনকাকা অবশ্য বলেছিলেন, 'তুমি না জানতে পারো, কিন্তু তাঁকে জানেন সহরে এমন লোকের অভাব নেই। প্রাক্তন বিপ্লবী সমাজকর্মী জননেতা হিসাবে তিনি অনেকের কাছেই পরিচিত ছিলেন। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীতেও তাঁর বেশ দান আছে।'

হয়তো আছে। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত অপরিচিত নারী পুরুষকে কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে পরিচিত করে তুলতেই তার বেশি উৎসাহ। যারা ভিড়ের মানুষ, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে—ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সহযাত্রী, যাদের মুখ দেখা মাত্রই মানুষ ভুলে যায়, আবার দ্বিতীয় দেখবার পর চেনা চেনা মনে হয়, যারা কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যায়না—ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্লাটফর্মের ভিড়ে সহজেই হারিয়ে যায়।

কিন্তু সতীশঙ্করের জীবনচরিত তো তেমন করে লিখলে চলবেনা। (ক্রমশ)

॥ নিশীথ রাতে ॥



জমাদার ঃ—হেই ও !···চোরি !···কেয়া হ্যায় ইসমে ?···

চোর ঃ—হেঁ হেঁ···এ সবে সরিয়েছি···এখনো খুলে দেখিনি, দাদা···তার আগেই তুমি পাকড়াও করলে !···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

মেয়েদের কথা

নারী ও চাকুরী

শ্রীঅঞ্জলি চক্রবর্ত্তী বি.এ, বি.টি

প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়লে দেখ্‌তে পাই তখন সমাজ জীবনে নারী একটি বিশিষ্ট সম্মানের স্থান অধিকার করেছিল। জ্ঞানের পথে তাঁদের কোন বাধা তেমন ছিল না। কিন্তু মুসলমান আগমনের পর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে ভারতীয় নারীর জীবন ক্ষুদ্র পরিবেশে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই আধুনিক ভারতের নারী বর্ত্তমানের অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছে অনেক পরে। পাশ্চাত্য দেশের নারী যখন বাহির-কর্মে অভ্যস্ত, তখন আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা কিংবা তাঁদের অগ্রজ যারা ছিলেন তাঁরা বহির্জগৎ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মসুখে কেন্দ্রীভূত সংসারের ঘানি টেনে চলেছেন। এজন্য তাঁদের কোন দুঃখ ছিল কিনা জানি না—অন্ততঃ দু'একজনের মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে সেটুকু নিয়েই তারা তৃপ্ত। নারী জীবনেও যে ব্যাপ্তি থাকতে পারে এ কথা তারা হয়ত ভুলে গেছেন—কিংবা এ কথা ভাবার মন বা সাহস তাঁদের ছিল না! তবে ব্যতিক্রম যে ছিল না—তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মের বাইরে—তাই তাঁদের নিয়ে কোন কিছুর বিচার চলে না।

যুগের অভিযান প্রাচীনের চিরাচরিত ধারাকে রেহাই দেয়নি। পরিবর্ত্তনের কালস্রোতে ভারতের নারীও শিক্ষার আলোক পেয়েছে। সুযোগ পেয়েছে ঘরের বাইরে এসে বহির্বিশ্বকে দেখার। প্রগতিশীল নারী আজ পুরুষের সমানাধিকার শুধু জ্ঞানেই নয়—কর্মেও চায়। অগ্রগতির এই আশীর্ব্বাদ নারী-জীবনকে অলোকপ্রাপ্ত করেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রদীপের তলার অন্ধকারের মত অভিশাপও কিছু এনেছে বৈকি।

চাকরী-জগৎ আজ নারী পুরুষের সংখ্যাধিক্যে বিপর্যস্ত। বিশেষ করে ভারত বিভাগের পর এ সংখ্যা বিপুল আকারে দেখা দিয়েছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে অর্থের চাহিদাই হয়ত মূলতঃ দায়ী—তবে নিছক সখের চাকুরীজীবীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই সখের চাকুরীয়াদের মধ্যে দু'দল আছে—অবিবাহিতা—বিবাহিতা। প্রথমোক্তার দল একান্ত নিরলস দিন কাটাবার চাইতে কর্মে নিজের চরিতার্থতা খোঁজেন। কিন্তু যারা স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী—তাদের এ সৌখিনতা কেন? অনেকে হয়ত বল্‌বেন—"সংসারী হয়েছি বলে কি বিদ্যা-বুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিতে হবে?" আবার হয়ত অনেকের যুক্তি হবে—"আমার সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বলেই আমার চাকুরী করা।"

প্রথমোক্তাদের কথাই আগে বিচার করে দেখা যাক্‌। চাকুরী করলেই যে বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপকতা ঘটবে, আর না করলেই যে সব নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে—এ কথা যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য সেটা যারা চাকুরী করেন তাঁরা যদি ভেবে দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন। বিপরীতধর্মী দু'টো কাজ সুষ্ঠুভাবে করা খুবই কষ্টকর। সংসারের মূল দায়িত্ব গৃহে—আর চাকুরীর বিস্তৃতি বাইরে। যিনি সংসারী, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যই কি তাঁর প্রথম ও প্রধান নয়?

কর্মী মায়েদের সন্তানরা মায়ের স্নেহ হারায় না সত্য, কিন্তু মাকে একান্তভাবে পাবার অবকাশ তাদের কোথায়? ভাগ্যে মায়ের স্নেহযত্ন কতটুকু জোটে? তাদের স্নান-খাওয়া পরের হাতে, তাদের আদর-আবদার পরের কাছে। কাজে যাবার আগে মা শিশুকে সামান্য আদর করে নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন। কাজ হতে ফেরার পরও তাঁরা তাই করেন। অনেকে সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে সেটুকুও পারেন না। এ গতানুগতিক ধারায় শিশুহৃদয় যদি মায়ের প্রতি বিরূপ হয় তবে কি খুব অন্যায় হবে?

প্রথম প্রথম অনেক মাকেই পরিমিত সময়ের বেশী বাইরে থাকতে হয় কাজের অজুহাতে—কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় ঐ অজুহাতকে তারা সিনেমা পিকনিক্ নানা খেয়াল-খুশীতে ব্যবহার করে চলেছেন। হয়ত মা-বিরহ অবসরকে পূর্ণ করে দেবার জন্য প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী জিনিষপত্র এই শিশুরা পায়—কিন্তু এতে শিশুমনের গঠন অসম্পূর্ণ থেকে যায়—কারণ মায়ের জন্য শিশুর যে হৃদয়ানুভূতি—আর কিছুর দ্বারাই সেটা পূর্ণ হবার নয়।

কেবল শিশুমনের গঠনেই অভাব ঘটে তা নয়। এই শিশুদের জীবনে নানাপ্রকার বিপদও ঘটে। অনেক কর্মী-মায়ের সন্তানরা একান্তভাবে ঝি কিংবা চাকরের পরিচর্য্যার উপর বড় হয়—এতে ওদের জীবনে নানাপ্রকার বিপদ এমন কি জীবনহানির সম্ভাবনাও যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। এ রকম দুর্ঘটনার কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়।

ছেলেমেয়েই কেবল নয়—সংসারী কর্মীর কাছ হতে সংসার নানাভাবে বঞ্চিত হয়। সকালে কর্মে যাবার ব্যস্ততা এবং বিকালে কর্মের ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে সংসারের সুষ্ঠু তদারক সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বভাবতই সংসারে দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা ও সেই সঙ্গে অশান্তি। পরিবারের পাঁচজন অসন্তুষ্ট হন—নিজের জীবনেও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে। তবে কেন এই অর্থের মোহ? টাকা এমনই জিনিষ যা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিপ্সাকেও বাড়িয়ে তোলে। পুরুষের এ লিপ্সা হয়ত শোভা পায়—(কারণ সংসারের আর্থিক দায়িত্ব ছাড়া অনেক দায়িত্বই প্রত্যক্ষভাবে তাদের থাকে না) কিন্তু নারীর সাজে না। নারীর সার্থকতা অর্থে নয়—সার্থক নারীসুলভ গৃহিণীপনায়।

প্রাচীনকালে যে যুগে ভারতে নারীরা জ্ঞানের আলোকে আলোকপ্রাপ্তা ছিলেন—তখন নারী-জীবনে চাকুরীর কথা বড় একটা জানা যায় না। সেই যুগে আমাদের গৃহ-জীবন ও সমাজ-জীবনে প্রগতির অভাবও ছিল না। তাই মনে হয়—পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছেড়ে বাংলার মায়েরা গৃহে মনোনিবেশ করলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চাইতে লাভবান হবে। সংসার আবার শান্তির আশ্রয় হয়ে উঠবে। কর্মী মায়ের সংসারে আর যাই থাকুক, অনাবিল শান্তির মাধুর্য্য থাকে না। আর বাহির কর্মে নারী জীবনের যে সম্মান বহুলাংশেই তার অপলাপ ঘটে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রতিভাশালিনীদের কথা আলাদা। যারা সাধারণ—যাদের সাধারণ স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন নেই তাদের উদ্দেশ্য করেই আমার এ লেখা।

—

হাতের কাজ

গালার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গালা—লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সাদা, কালো—নানা রঙের সাধারণ গালা…সেই গালায় রকমারি নক্সার শিল্প-কাজ করে ঘরের সজ্জা-শ্রী বাড়ানো যায়। গালার বিচিত্র কারু-শিল্পের রীতিমত নাম আর দাম আছে সৌখিন-সমাজে।

বাড়ীতে অনায়াসেই সংসারের কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে অবসর-সময়ে গালার নানারকম কারু-শিল্প রচনা করা যায়। এ কাজের জন্য প্রয়োজন—কয়েকটি বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম। গোড়াতেই সে সব সরঞ্জামের একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। বলা বাহুল্য, এ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়—বাজারে এগুলি সহজেই পাওয়া যায়।

গালার কারু-শিল্প-সামগ্রী রচনার জন্য প্রয়োজন :—

১) ১৫ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি মাপের একখানি পাত্‌লা কাঁচ
২) এক পাত্র ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার জল

৩) নানা রঙের কয়েকটি গালার কাঠি (Sealing-Wax)
৪) একটি স্পিরিট-ল্যাম্প (Spirit-Lamp)
৫) দু'চারটি ইস্পাতের তৈরী বোনবার কাঠি (Steel Knitting Needle)—সরু, মোটা এবং মাঝারি সাইজের
৬) 'মৌল্ডার' (Moulder) অর্থাৎ 'ছাঁচ-রচনার' যন্ত্র
৭) 'স্প্যাচুলা' (Spatula) অর্থাৎ 'প্রলেপ-রচনার' যন্ত্র
৮) গালা রাখবার পাত্র
৯) এক টুকরো নরম কাপড়



উপরের ছবিতে এ সব সরঞ্জামের নক্সা দেখলেই আরো সুস্পষ্টভাবে এগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে।

উপরে লেখা সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করবার পর, গালার কারু-শিল্প কাজে হাত দিতে হলে, মজবুত একটি টেবিলের উপর কাঁচখানিকে বেশ সমানভাবে পেতে রাখতে হবে…কাঁচ রাখবার কারণ, স্পিরিট-ল্যাম্পের আগুনে-গলানো গালা যেন টেবিলে না পড়ে…পড়লে টেবিলে দাগ ধরবে…পালিশ চটে গিয়ে টেবিলটি শ্রীভ্রষ্ট হবে। তাছাড়া কাঁচের উপরে আগুনে গলানো গালার ফোঁটা পড়লে, তা নষ্ট হবে না…সে সব গালার টুকরো হাওয়ায় শুকিয়ে গেলেও পরে ঐ কাঁচের উপর থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে আবার আগুনের আঁচে গলিয়ে নিয়ে কাজে লাগানো চলবে। কাজের সময় আগুনে গালার বিভিন্ন রঙের কাঠিগুলিকে গলানোর জন্ম স্পিরিট-ল্যাম্পে যে মেথিলেটেড-স্পিরিট (Methylated Spirit) ব্যবহার করা হবে, সেটি যেন সরেস-ধরণের হয়—না হলে পরিষ্কার জলজলে আগুন মিলবে না এবং গালা-কাঠির রঙের আভাও তেমন বিচিত্র-উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে না। এছাড়াও নজর রাখতে হবে স্পিরিট-ল্যাম্পের পলিতাটি (Wick) যেন সমানভাবে ছাঁটা থাকে…খুব মোটা বা সরু না হয়। কারণ, ল্যাম্পের পলিতাটি পরিষ্কার থাকলে—আগুনের আঁচও ভালো হবে…ভুষো-কালির কালো শিষ ওঠবার আশঙ্কা থাকবে না এবং গালার রঙগুলিও আগাগোড়া সুস্পষ্ট-উজ্জ্বল আভায় ফুটে উঠবে! বাজার থেকে পয়সা খরচ করে স্পিরিট-ল্যাম্প না কিনে, বাড়ীতে বসেই মুখে মাথবার স্নো ক্রীমের খালি পাত্র কিম্বা ফাউনটেন-পেনের কালির খালি শিশি দিয়েও চমৎকার স্পিরিট-ল্যাম্প বানানো যেতে পারে। উপরের ছবিতে তার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের স্পিরিট-ল্যাম্প বানাতে হলে খালি স্নো, ক্রীম অথবা কালির শিশির ঢাকনীর মধ্যভাগে একটী ছিদ্র রচনা করে তারই ভিতর দিয়ে ল্যাম্পের পলিতাটিকে পরিয়ে দিতে হবে। পাত্রের ভিতরে ভরে দিতে হবে—পরিষ্কার মেথিলেটেড স্পিরিট। তাহলেই দিব্যি চমৎকার এবং কাজের উপযোগী স্পিরিট-ল্যাম্প তৈরী হবে।

বাজারে নানা জাতের, নানা রঙের গালার কাঠি (Sealing Wax Sticks) পাওয়া যায়; যে গালা নেবেন, সে গালা বেশ স্বচ্ছ (Transparent) হয় যেন। গালার কারু-শিল্পে সূক্ষ্ম-চিত্র-বিচিত্র-কাজের জন্ম

বাজারে সেরা জাতের যেসব গালা পাওয়া যায়—পারতপক্ষে সেই সব গালা ব্যবহার করবেন। কেনবার সময় লম্বা এবং বড় সাইজের গালার কাঠি (Sealing Wax Sticks) নেবেন, নেহাৎ ছোট সাইজের গালা নেবেন না।

সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, কাজ সুরু করবার সময়, গোড়াতেই স্পিরিট-ল্যাম্পটি জ্বেলে নেবেন। ল্যাম্প জ্বালবার সময় নজর রাখবেন—আগুনের জ্বলন্ত শিখা যেন সরু ছুঁচালো এবং ঊর্দ্ধমুখী না হয়…বিভিন্ন জাতের গালা আগুনে গলাতে বিভিন্ন সময় লাগে…কোনো গালা চট করে গলে, কোনো গালা গলে একটু দেরীতে। গলানোর সময়, গালার একপ্রান্ত ধরে অন্য প্রান্তভাগটিকে ল্যাম্পের আগুনের শিখায় ধরুন…আগুনের আঁচে গলানোর সময় গালার কাঠিটিকে সর্ব্বদা জ্বলন্ত শিখার উপরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ধরবেন—তাহলে গালা অপচয় হবে না এবং সমানভাবে গলবে। একভাবে আগুনের শিখার উপরে ধরে থাকলে গালা অসমানভাবে গলে দীর্ঘ ও কাজের অসুবিধা-জনক হবে এবং গালা অপচয়ও ঘটবে সবিশেষ। কাজেই এদিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আগুনের তাত পেয়ে গালা যেমনি একটু গলেছে দেখবেন, তখনই সে গালাটিকে শিখার কাছ থেকে সরিয়ে একখানা শক্ত কাগজের উপরে ধরবেন…কাগজের বুকে টস্‌টস্ করে কয়েক ফোঁটা গালা ঝরে পড়বে…প্রথম-প্রথম এমন একটু-আধটুকু অপচয় ঘটা স্বাভাবিক…তারপর হাত রপ্ত হলে, এ অপচয়টুকু বাঁচাতে পারবেন অনায়াসে।

শিল্প-কাজের সময় গালা-কাটির মুখের দিক ঠিক পেন্সিল-ধরার মতো কায়দায় ধরে রাখা চাই…পেন্সিলে যেমন লেখা বা আঁকা যায়, গালার গলিত-দিকটাও ঠিক তেমনি পেন্সিলের মতো…যদি কিছু লিখতে চান বা নক্সা রচনা করতে চান—তাহলে এই গলিতগালা-কাঠিটিকে পেন্সিল-ধরবার মতো ভঙ্গীতে ধরে কোনো পাত্রের গায়ে সুষ্ঠুভাবে অক্ষর লেখা অথবা চিত্র-রচনার কাজ করবেন। গালার কারু-শিল্পে এইটিই হলো আসল কাজ…এবং এ কাজে পার-দর্শিতালাভ করতে নিয়মিত অভ্যাস এবং চর্চ্চা প্রয়োজন। এই সব গলিত-গালার ফোঁটা থেকে কোনো জিনিষের উপর লেখা, কিম্বা বিচিত্র নক্সা-রচনা করা চলে কি পদ্ধতিতে,সে কথা বারান্তরে আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

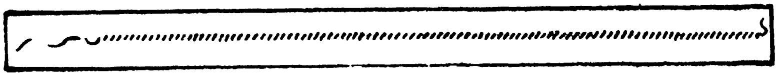
দেশী সেলাই

সুলতা মুখোপাধ্যায়

গতবারে 'লবকী,' 'পেসুজ,' 'তুরপাই' প্রভৃতি কয়েক ধরণের দেশী সেলাইয়ের কথা বলেছি, এবারেও ঐ ধরণের আরো কয়েকটি সূচী-শিল্প-পদ্ধতির কথা বলবো।

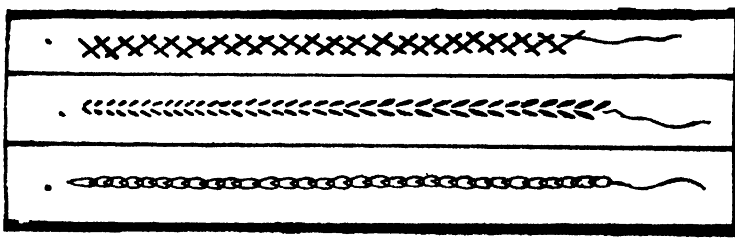
গোড়াতেই বলি, 'বখেয়া' সেলাইয়ের কথা। এ 'সেলাইয়ের পদ্ধতি হলো—প্রথমে ছুঁচ-সুতো দিয়ে কাপড়ের উপর একটি 'পেসুজ' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে—যে-জায়গা থেকে কাপড়ে ছুঁচ চালিয়ে নীচে থেকে ফোঁড় তুললেন, ঠিক সেই জায়গা দিয়ে ছুঁচ-সুতো চালিয়ে আগের মতো আর একটি 'পেসুজ' তুলুন; তাহলেই 'বখেয়ার' একটি 'প্যাচ' সেলাই হলো। তারপর, আবার দ্বিতীয় 'পেসুজের' মাঝখানে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুললেই 'বখেয়ার' দ্বিতীয় 'প্যাচ পড়বে…এমনিভাবে সমান ব্যবধান রেখে 'পেসুজ' আর 'প্যাচ'-রচনা করে সেলাইয়ের সুতোর ফোঁড় দিয়ে আগা-গোড়া সেলাই চালালেই পরিপাটি-ধরণের 'বখেয়া' সূচী-শিল্পের কাজ হবে। 'বখেয়া' সেলাইয়ে, 'পেসুজ' যত ঘন আর 'প্যাচ' যত ছোট হবে, সেলাইও তত মিহি হবে…আর সে সেলাই দেখতেও ভালো হবে। কাপড়ের 'সদর' অর্থাৎ 'বাইরের দিকে' 'বখেয়া' সেলাই করতে হয়। 'সদর' দিকে পর-পর মাছের ডিমের মতো ধরণে 'বখেয়ার' ছোট-ছোট 'প্যাচ'গুলি সরল-রেখায় পড়ে, কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ কাপড়ের যে দিকটাকে 'মফঃস্বল' বা 'অন্দর' বলে, সেদিকে 'পেসুজের' ব্যবধান-অনুসারে বড়-বড় 'প্যাচ' পড়ে; সেজন্য অন্য সব রকম সেলাইয়ের চেয়ে 'বখেয়া' সেলাই অনেক বেশী মজবুত আর টেকসই হয়। এ কারণে, 'বখেয়া' সেলাইয়ের কাজে সব সময়েই একটু মোটা আর মজবুত সুতো ব্যবহার করবেন। সরু সুতোয় 'বখেয়ার' প্যাচ তেমন ভালো দেখায় না।

গৃহস্থ-ঘরে 'বখেয়া' সেলাইয়ের খুব বেশী প্রয়োজন হয়—সেমিজ, পেটিকোট, পাঞ্জাবী, ঘাঘরা, কুর্ত্তা,চাপকান, চোগা প্রভৃতি নানা ধরণের জামা-কাপড়ের প্রান্তভাগ যাতে সহজে ছিঁড়ে না যায়, সেজন্য 'সঞ্জাব' অর্থাৎ ডবল-ভাঁজের 'পটি'



•• কাপড়ের উপর বিভিন্ন ধরণের দেশী সেলাইয়ের নমুনা ••

দিতে হয়···এই 'সজ্জাবের' কাজে 'বখেয়া' সেলাই প্রয়োজন, তাছাড়া, সাধারণভাবে 'পাট' দেবার কাজে এবং জামার পকেট, সামলা, কলার প্রভৃতি এ সব কাজও 'বখেয়া' সেলাই দেওয়ার রীতি আছে। এসব কাজের সময় হাতে 'বখেয়া' সেলাই তুলতে কষ্ট হয় বলে, অনেকে সেলাইয়ের কলের সাহায্যে এ-ধরণের কাজ করেন। কলে-সেলাই-করা 'বখেয়া' কাজ সরু, মোটা এবং সমান-ছাঁদের হয় বলে সেগুলি বেশ সুন্দর দেখায়, এবং সে কাজে পরিশ্রম সময়ও লাগে অল্প। এই কারণেই, অনেকে 'তুরপাই' সেলাইয়ের সেলাইয়ের কাজ করতে হয়। এ ধরণের সেলাইকে ইংরাজীতে বলে—'হেরিংবোন্' সেলাই (Herringbone stitch)। 'হেরিং'-মাছের কাঁটার মতো তিন-কোণা ছাঁদে রচিত হয় বলে এর নাম—'হেরিংবোন-সেলাই'! কাপড়ের 'জোড়ের' উপরের দিক থেকে আরম্ভ করে এ সেলাই নামাতে হবে নীচের দিকে। তবে দু'পাট-করা কাপড়ের দু'প্রান্ত মিলিয়ে পাটে-পাটে সেলাই করতে হলে 'তুরপাই', 'বখেয়ার' মতো কাপড়ের নীচের প্রান্ত থেকে উপরের দিকে 'ফোঁড়' তুলতে হবে।

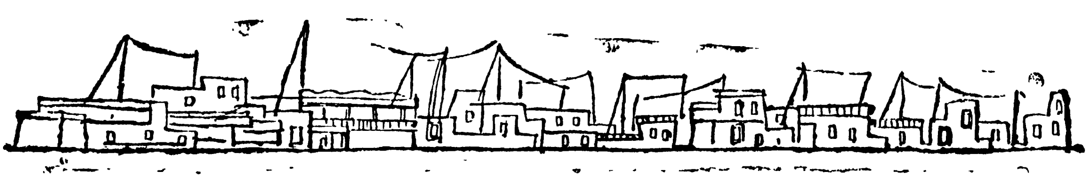


কাজও আজ কাল সেলাই-কলের সাহায্যে 'বখেয়া' সূচী-শিল্প-পদ্ধতিতে অনায়াসেই সেরে নেন। সেলাই-কলে গুলি-সুতোর' সাহায্যেও 'বখেয়া' সেলাইয়ের কাজ করা যায়—তবে, খুব 'মাজা' সুতো কলে চলবে না· এজন্য প্রয়োজন—'না-মাজা সুতো'! 'বখেয়া' সেলাইয়ের কাজ সহজসাধ্য···প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-ঘরেই এ ধরণের সূচী-কার্য্যের রীতিমত রেওয়াজ দেখা যায়।

'বখেয়া' সেলাই ছাড়া আরো একটি বিশেষ ধরণের দেশী সেলাইয়ের পদ্ধতি হলো—'জিঞ্জিরা'! ফ্লানেল, কাশ্মীরা প্রভৃতি মোটা পশমী কাপড় মুড়ে সেলাই করলে 'দরজ' অর্থাৎ কাপড়ের 'মাড়াই বা 'পাট' (ভাঁজ) খুব পুরু আর মোটা হয়। তাই 'দরজ' চিরে 'জিঞ্জিরা'

'জিঞ্জিরা' সেলাইয়ের কয়েক ধরণের 'ফোঁড়'-তোলার পদ্ধতির ছবি দেওয়া হলো। এ ছবিগুলি দেখে কাপড়ের বুকে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে বিভিন্ন ধরণে 'জিঞ্জিরা'-সেলাইয়ের কাজ করবার পদ্ধতি বুঝতে পারবেন সহজেই। 'জিঞ্জিরা' সেলাইয়ের জন্য প্রথম এবং তৃতীয় চিত্রে যেমন ধরণের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে, সেগুলি তেমনিভাবে রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। দ্বিতীয় চিত্রের অনুরূপ 'জিঞ্জিরা' সেলাইয়ের জন্য প্রথমে তিনটি সমান রেখায় এবং সমান-ব্যবধান রেখে 'পেসুজ' সেলাই করে, তারপরে 'সম-কৌণিক' 'জিঞ্জিরা-সেলাই' করতে হয়।

বারান্তরে, সূচী-শিল্পের আরো কয়েকটি বিষয় আলো-করার ইচ্ছা রইলো।





দারিদ্র্যযোগ

উপাধ্যায়

উল্কা ও বজ্রপাত যোগে কিম্বা ধূমকেতুর উদয় কালে জাতকের কোষ্ঠিতে উত্তম গ্রহের সমাবেশ ও রাজযোগ থাকা সত্ত্বেও জাতক অতিশয় নিঃস্ব হবে। বৃহস্পতির পরম নীচ স্থান মকর রাশির পাঁচ ডিগ্রী। এখানে বৃহস্পতি থাক্‌লে জাতক রাজযোগ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতা ভোগ করবে। শুক্র কন্যা রাশির সাতাশ ডিগ্রীতে থাক্‌লে মানুষ যত বড় উচ্চ পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, তার পদচ্যুতি ঘট্‌বে আর সে অনেক দুঃখ কষ্টভোগ কর্‌বে। কেন্দ্রে কোন গ্রহ না থাক্‌লে আর শুভগ্রহরা অস্তগত বা নীচস্থ হোলে অথবা চারিটী গ্রহ শত্রু গৃহে থাক্‌লে রাজযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

পরাশর বলেছেন—যদি লগ্নে বা চন্দ্রের প্রতি অন্ততঃ একটি গ্রহের ও দৃষ্টি না থাকে তা হোলে রাজযোগ ভঙ্গ হয়। একই গ্রহ দশম ও একাদশের অধিপতি হোলে অথবা নবমাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি এবং দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি গ্রহ যথাযথক্রমে পরস্পর সম্বন্ধাবদ্ধ হোলে রাজযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ধনাধিপতি অস্তমিত হয়ে নীচ রাশিতে থাক্‌লে আর ধনস্থানে ও নিধনস্থানে পাপগ্রহ থাক্‌লে জাতক ঋণগ্রস্ত হ'য়ে অর্থ কষ্ট পায়। চন্দ্রের সঙ্গে শনি, মঙ্গল ও শুক্র থাক্‌লে প্রধান দারিদ্র্যযোগ। এই যোগে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়। লগ্ন থেকে দশম স্থানে, রবি থেকে একাদশ স্থানে, আর চন্দ্র থেকে নিধন স্থানে কোন গ্রহ না থাক্‌লে জাতক দরিদ্র হয়। লগ্নে পাপগ্রহ নবম বা দশমাধিপতির সঙ্গে একত্র থেকে মারকাধিপতি দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে নিধন সূচিত হয়। যদি চারিটা কেন্দ্রে আর ধন স্থানে পাপগ্রহ থাকে, তা হোলে জাতক অত্যন্ত দরিদ্র হয় এবং নিজের বংশের লোকের ভয়ের বস্তু হয়। যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ ষষ্ঠ,অষ্টম কিম্বা দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাপগ্রহের দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয় আর অন্য শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তা হোলে জাতক দরিদ্র হবে।

যদি পঞ্চম স্থানের অধিপতি ষষ্ঠ স্থানে আর ভাগ্যাধিপতি দশম স্থানে থাকে এবং এদের ওপর মারকাধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকে তা হোলে জাতক ধনহীন হবে। যে কোন ভাবের অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে থাকে আর যে যে ভাবের অধিপতির গৃহে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি থাকে, তারা যদি শনি বা অন্য পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহোলে জাতক দুঃখী, চঞ্চল ও নির্ধন হয়। যে গ্রহের নবাংশে চন্দ্র থাকে, সেই নবাংশাধিপতি যদি মারক স্থানস্থিত বা মারকাধিপতির সঙ্গে যুক্ত হয় তবে জাতক অর্থহীন হবে। লগ্নাধিপতি যে নবাংশে থাক্‌বে সেই নবাংশাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশস্থানগত হয়ে মারকাধিপতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে জাতক দরিদ্র হয়। রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তি ও দরিদ্র হয়—যদি পাপগ্রহযুক্ত লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশস্থানগত হয়ে মারকাধিপতির দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়। সপ্তমে কিম্বা অষ্টমে রবি শনি মঙ্গল ও রাহু থাক্‌লে জাত ব্যক্তি ইন্দ্র তুল্য হোলেও নীচান্ন ভক্ষণ করে। ত্রিকোণাধিপতি গ্রহই প্রধান ধন দাতা, ত্রিকোণপতির সঙ্গে সম্বন্ধাবদ্ধ কেন্দ্রপতি ধনপতি ও লাভাধিপতি গ্রহ ও ধনদাতা, ঐ সকল গ্রহ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে থাক্‌লে তাদের ধনদাতৃত্ব শক্তি হ্রাস হয়। শুভগ্রহগণ পাপ স্থানে থাক্‌লে আর পাপগ্রহরা শুভ স্থানে থাক্‌লে কোনগতিকে অন্ন সংস্থান হোলেও বস্ত্রের অভাবের জন্য লালায়িত হোতে হবে।

চন্দ্রের দ্বিতীয়ে বা দ্বাদশে রবি ভিন্ন গ্রহ না থাক্‌লে, চন্দ্র ও কেন্দ্র রবি ভিন্ন অন্য গ্রহের দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট না হোলে কেমদ্রুমযোগ হয়, কেমদ্রুমযোগে জাত ব্যক্তির ধন নাশ হয়। ধনাধিপতির মিত্র হোলেও ধন ভাবে ধননাশক গ্রহ থাক্‌লে বা দৃষ্টি দিলে ধনভাবের বিশেষ শুভ হয় না। ব্যয়াধিপতি ধন স্থানে, দ্বাদশাধিপতি একাদশ স্থানে, ধনাধিপতি নীচস্থ ও দুঃস্থানগত হোলে রাজদণ্ডহেতু ধন ক্ষয় হয়।

সিংহ লগ্ন, শনি উচ্চস্থ, নবাংশে নীচস্থ অথবা পাপ দৃষ্ট, এরূপ স্থলে রাজযোগ ভঙ্গহেতু মানুষ দারিদ্র্য কষ্টভোগ করে। তুলার দশ ডিগ্রির মধ্যে রবি থাক্‌লে জাতক উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ কর্‌লেও নিঃস্ব হবে। দ্বাদশাধিপতি ও লগ্নাধিপতি ক্ষেত্র বিনিময় কর্‌লে আর সপ্তমাধিপতির সঙ্গে সহাবস্থান কর্‌লে বা দৃষ্ট হোলে দারিদ্র্যযোগ হয়। লগ্নে চন্দ্র ও কেতুর অবস্থান হোলে জাতক দরিদ্র হয়। লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে থেকে দ্বিতীয়াধিপতি বা সপ্তমাধিপতির সঙ্গে একত্র থাক্‌লে বা দৃষ্ট হোলে

জাতক দারিদ্র্য লাঞ্ছিত হয়। পঞ্চমাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ব দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে সহাবস্থান করলে এবং শুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সংযোগ-বর্জ্জিত হোলে জাতক দরিদ্র হয়।

দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হ'য়ে যদি পঞ্চমাধিপতি ষষ্ঠ বা দশম স্থানে থাকে তা হোলে দারিদ্র্যযোগ হয়। নৈসর্গিক পাপগ্রহ নবম বা দশমাধিপতি না হয়ে মারকাধিপতির সঙ্গে অথবা দৃষ্ট হয়ে লগ্নে থাক্‌লে জাতক নির্ধন হয়। দ্বিতীয়াধিপতি এবং সপ্তমাধিপতিকে মারকাধিপতি বলা হয়, অনেকে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতিকে ও এই মারক সংজ্ঞা দিয়েছেন। বৃহস্পতির ধন স্থানে কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি না থাক্‌লে জাতক ধন সঞ্চয় কর্‌তে পারে না। ধন স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি নির্ধনতার বাঞ্জক।

তুলা, কুম্ভ ও মকর রাশি ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে লগ্ন হোলে আর সেখানে শনি থাক্‌লে জাতকের অমঙ্গল ও দারিদ্র্য দেখা যায়। যে কোন গ্রহ দ্বিতীয় বা একাদশ স্থানে পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হোলে এবং দ্বিতীয়াধিপতি, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং একাদশাধিপতি অথবা পাপগ্রহ পীড়িত হোলে অর্থোপার্জ্জনে কষ্ট ভোগ কর্‌বে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌বে। তার দারিদ্র্য কষ্ট কোন দিন দূর হবে না। ধন স্থানে শনি ভাগ্যহানিকারক। সুতরাং বহু টাকা রোজগার করা সত্ত্বেও শেষে নিঃস্ব হয়ে মানুষ কষ্টভোগ কর্‌তে পারে। ধনস্থানে ক্রূরগ্রহ অবস্থান কর্‌লে আর ধনাধিপতিও পাপযুক্ত হোলে জাতক ধনহীন হয়। ধন স্থানে বুধ চন্দ্রের দ্বারা দৃষ্ট হোলে ধন ক্ষয় হয়। ধনপতি ও আয়পতি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত, ক্রূর গ্রহাংশগত, পাপযুক্ত আর হীনবল হয়ে যদি চৌরাদি ভাবাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয় তা হোলে চৌর, অগ্নি এবং রাজার দ্বারা ধন হানি হয়।

ধনপতি যে ভাবপতির সঙ্গে যুক্ত বা দৃষ্ট, সেই ভাবপতি যদি নীচস্থ, শত্রুযুক্ত, ষষ্ঠাষ্টমাদি কুস্থানস্থিত বা অস্তগতাদি দোষে বিনষ্ট হয় তবে সেই ভাবপতি দ্বারা জাতকের অর্জ্জিত সমস্ত ধন নষ্ট হয়ে যাবে—আর জাতক দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ক্ষীণ চন্দ্র ধন স্থানে থাক্‌লে পৈতৃক ধন নষ্ট হয়ে যায়।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, অশ্বিনী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক অবস্থা মোটের উপর ভালোই যাবে। নূতন পদমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা,অর্থ লাভ-সম্মান ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভফল এবং শত্রুপীড়া, দুঃসংবাদ-স্বজনবিরোধ, চৌর্য্যভয় ইত্যাদি অশুভফলের সম্ভাবনা। পিত্তবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, শিরঃপীড়া সূচিত হয়। আর্থিক অবস্থা মাসের শেষার্দ্ধে বিশেষ আশাপ্রদ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে কিছু লাভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে। অনাদায়ী টাকা পাবার আশা আছে। চাকুরিজীবিরা উপরওয়ালার সন্তোষভাজন হবেন। ব্যবসায়ীও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী উত্তম। বিদ্যার্থীরা আশানুরূপ ফল পাবে না। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের বিশেষ আধিপত্য।

বৃষ রাশি

মৃগশিরানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, রোহিণীজাতগণের পক্ষে অধম এবং কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অসুস্থতা মধ্যে মধ্যে ঘটবে। উদরঘটিত পীড়ার আশঙ্কা করা যায়। মর্য্যাদাহানিকর কোন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে লাঞ্ছনাভোগ। হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। চোখের পীড়াদি সূচিত হয়। পারিবারিক অশান্তি প্রায়ই ঘটবে। ভৃত্যাদির অশিষ্টতা। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে, মধ্যে কোন ব্যাপারে আশাভঙ্গ সম্ভাবনা, পারিবারিক কলহ। ব্যয়বৃদ্ধি হোলেও অভাব অনটন প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্পেকুলেশন মাসের প্রথমার্দ্ধে চলতে পারে। রেসে আংশিক ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটামুটি খারাপ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। পদোন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। পদোন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। পারিবারিক ক্ষেত্রে মহিলাগণের চরম অশান্তিভোগ, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ, অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তির সম্ভাবনা।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে অধম এবং আর্দ্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। এমাসটী মিশ্রফলদাতা। কলহ, উদ্বিগ্নতা, বাধা বিপত্তি, স্বজনবিয়োগ ও স্বাস্থ্যের অবনতি প্রভৃতি অশুভ ফল। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সন্তান লাভ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, কর্ম্মসংস্থান প্রভৃতি শুভফল। রক্তের চাপবৃদ্ধি ও হৃদরোগের আশঙ্কা আছে। পারিবারিক শান্তিও শৃঙ্খলা আশা করা যায়। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীর অনবধানহেতু কোন মূল্যবান দ্রব্যের হানি, সম্মানবৃদ্ধি ও ভ্রমণ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি মন্দ নয়, মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা আছে। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে লাভজনক পরিস্থিতি ও কর্ম্মের বিস্তৃতি। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, রেসে অর্থহানি। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্লেষাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম, পুনর্ব্বসুগণের পক্ষে অধম। সাধারণ সাফল্য, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্বজন-বিরোধ, শত্রুজয় প্রভৃতি সূচিত হয়। মধ্যে আশাভঙ্গ। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক অশান্তি। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের পরামর্শ গ্রহণ বর্জ্জনীয়, বিপত্তির কারণ আছে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা যোগ আছে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণাদির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায়না, কিছু কিছু গোলযোগের আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। রেসে ও স্পেকুলেশনে লাভ। মহিলাগণের পক্ষে পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা আছে। সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীরা আশানুরূপ সাফল্য লাভে বঞ্চিত হবে, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-জীবির পক্ষে মাসটী উত্তম।

সিংহ রাশি

মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরফল্গুনীগণের পক্ষে অধম। কার্য্যসিদ্ধি, শত্রুজয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উত্তম বন্ধুলাভ প্রভৃতি যোগ আছে। ব্যয়বৃদ্ধি, মামলা মোকর্দ্দমা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য খুব ভালো বলা যায়না, মধ্যে মধ্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি, কণ্ঠনালী প্রদাহ, বায়ুপ্রকোপ, হাঁপানি সূচিত হয়। পারিবারিক কলহ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়, কর্ম্মস্থানে গোলযোগ বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম সময়। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের পক্ষে অসাধারণ সাফল্য। বিদ্যার্থীগণের আশানুরূপ ফল লাভ। রেসে অর্থলাভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী ও চিত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে অধম। সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সম্মান লাভ, বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাধারণের কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব লাভ, বিলাস ব্যসনাদির বস্তু ক্রয়। শত্রুবৃদ্ধি, উদ্বেগ ও চিত্তচাঞ্চল্য। নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা ও অনুশীলন। উদরপীড়া, মাথাধরা এবং চক্ষুপীড়া। পারিবারিক ক্ষেত্রে মতানৈক্য হেতু কিঞ্চিৎ অশান্তি, সন্তানাদির শুভফল। আয়বৃদ্ধি ঘটলেও কিছু কিছু সংস্কারের জন্য ব্যয়, বৈষয়িক ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অনুকূল, সামান্য বিশৃঙ্খলতা ঘটলেও মাসের শেষে দূর হবে। সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা, অনাদায়ী অর্থ প্রাপ্তি। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ। রেসে অর্থ ক্ষতি। সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাগণের সতর্কতা আবশ্যক, পারিবারিক ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ, প্রণয়ে বিপত্তি আশঙ্কা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম।

তুলা রাশি

স্বাতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রা ও বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মোটামুটি। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান বৃদ্ধি, সৌভাগ্য লাভ, জ্ঞান বৃদ্ধি প্রভৃতি সূচিত হয়। ভ্রমণ, স্বজন বিরোধ, পথে দুর্ঘটনা, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক অবস্থা ভালো বলা যায় না, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট মধ্যে মধ্যে ঘটবে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। ব্যয় বৃদ্ধি জন্য চিত্তের উদ্বেগ, বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে কিছু কিছু গণ্ডগোল, মামলা মোকর্দ্দমা ও হয়রাণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। চাকুরীজীবীর পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হোতে হবে। রেসে ও স্পেকুলেশনে কিছু অর্থলাভ, বিদ্যার্থীগণের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যম সময়। মাসের প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করবে।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখাও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, অনুরাধা-নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। এ মাসটী মিশ্রফলদাতা। শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, চৌর্য্য ভয়, পকেটমারের আশঙ্কা, স্বজনবিরোধ, মাসের শেষার্দ্ধে সৌভাগ্য-বৃদ্ধি ও সুখ-সম্পদভোগ। পারিবারিক কলহের আশঙ্কা নেই। স্ত্রীর পীড়াদি। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। চাকুরি-জীবীর পক্ষে উত্তম বলা যায় না, নানারকম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। রেসে অর্থ-লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাগণের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিপত্তির কারণ আছে।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। সৌভাগ্যবৃদ্ধি, কর্ম্মোন্নতি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, আয়বৃদ্ধি, পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রভৃতি সূচিত হয়। অর্থাগমের বহু প্রকার সুযোগ দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ হেতু শুভ পরিস্থিতি ও লাভ। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়, কোন রূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য। রেসে অর্থক্ষতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের লাভ ও প্রতিষ্ঠা।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়াগণের পক্ষে মধ্যম এবং শ্রবণা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। কলহ বিবাদ, দুর্জ্জনের সংসর্গ, মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। কর্ম্মে সাফল্য, জনপ্রিয়তা, লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। স্বজন বিয়োগ। উদরের গোলযোগ। মধ্যে মধ্যে পীড়াদি। অর্থা-

গমের সুযোগ। আয়। আংশিক ব্যয় বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়, নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। চাকুরিজীবীরা আশানুরূপ ফললাভ করবে না, উপরওয়ালার বিরাগ-ভাজন হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি বলা যায়। রেসে অর্থলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের সম্মান, সুযোগ ও প্রতিষ্ঠালাভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, শতভিষা-গণের পক্ষে অধম। উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, কর্ম্মে সাফল্য, উত্তম অবস্থা, জনপ্রিয়তা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও শুভসংবাদ প্রাপ্তির যোগ। মধ্যে মধ্যে ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ ও উদ্বেগ ঘটবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা। শত্রুবৃদ্ধি, পারিবারিক শান্তি। অর্থোন্নতির যোগ আছে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। অনাদায়ী অর্থলাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়, পদোন্নতির সম্ভাবনা। উপরওয়ালার অনুগ্রহলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে উত্তম সময়। কর্ম্মের বিস্তৃতি ও প্রতিষ্ঠা। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের বিশেষ সাফল্য—অলঙ্কারলাভ ও সুখ সম্পত্তি।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের উত্তম সময়। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রা-শ্রিতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সময়। স্বাস্থ্যোন্নতির যোগ আছে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তম কর্ম্মের যোগাযোগ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, স্বজন বিরোধ, বন্ধু বিচ্ছেদ বা বিয়োগ। মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি, আশাতীত উন্নতির সূচনা। ভ্রমণ। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীর পক্ষে মধ্যম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী-গণের পক্ষে মাসটী ভাল বলা যায়, কর্ম্মের বিস্তৃতিলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। রেসে অর্থক্ষতি, স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাগণের সতর্কতা আবশ্যক। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো বলা যায়।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক বিষয়ের ফল সম্পূর্ণ ভালো নয়, মাঝে মাঝে কষ্ট। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। পাকাশয়ের দোষ। আর্থিক উন্নতি। ভ্রমণ। সৌভাগ্যোদয়। পারিবারিক অশান্তি। সন্তানের বিবাহযোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন

শিরঃপীড়া, বেদনাসংযুক্ত পীড়াভোগ। ধনাগম। ভ্রাতৃকলহ। বন্ধুলাভ। ব্যয়বৃদ্ধি। কর্ম্মোন্নতি। দাম্পত্য সুখ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুনলগ্ন

দেহপীড়া। ধনভাব মধ্যবিধ। কর্ম্মলাভ। পদোন্নতি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ব্যবসায়ে উন্নতি। গৃহাদি সংস্কার। ব্যয়বাহুল্য। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

কর্কট লগ্ন

কিঞ্চিৎ দেহপীড়া। কণ্ঠনালী প্রদাহ। অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ। পত্নীর বিশেষ পীড়া। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মসংস্থান। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ ফললাভ।

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। অর্থাগমে বাধা। ব্যয়বাহুল্য। আশা-ভঙ্গ। শত্রুবৃদ্ধি ও মিত্রলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধা।

কন্যালগ্ন

শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা। ধনভাবের ফল সম্পূর্ণ শুভ নয়। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। সন্তানভাব শুভ। ব্যবসায়ীর উন্নতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। আংশিক ব্যয়বৃদ্ধি।

তুলালগ্ন

শারীরিক অবস্থা মন্দ নয়। মানসিক উদ্বেগ। মামলা মোকর্দ্দমার জন্য দুশ্চিন্তা। ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য। শত্রুবৃদ্ধি। সন্তানের দেহপীড়া। শুভ কার্য্যে ব্যয়াধিক্য। অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহ সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধাবিঘ্ন।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। ব্যয়বৃদ্ধি। গৃহ নির্ম্মাণ বা সংস্কার। পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাও পাকাশয়ের দোষ। ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্মলাভ। অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহ সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনুলগ্ন

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। ভ্রাতার সহিত মত ভেদ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সৌভাগ্যোদয়। সঞ্চয়ে ব্যাঘাত। উদ্বেগ। নানারকমে কর্ম্মের যোগাযোগ। সন্তান স্থান সম্বন্ধে শুভ ফল। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

মকরলগ্ন

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। অর্থাগমের যোগ। ব্যয়াধিক্য হেতু চাঞ্চল্য। ভ্রাতৃবিরোধ। পত্নীর পীড়া। আয়বৃদ্ধি। সন্তান লাভ। সন্তানের বিবাহ সম্ভাবনা। ভ্রমণ। সদ্বন্ধু লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ। শত্রুবৃদ্ধি যোগ। চাকুরিতে উন্নতি। গুরুজন বিয়োগ। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

মীনলগ্ন

দেহভাব মধ্যম। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। ব্যয়াধিক্য। সন্তান লাভ। সাময়িক ঋণযোগ। দাম্পত্য সুখ। কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। আত্মীয়ের পীড়া। সন্তানের দেহপীড়া। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রোম্ অলিম্পিকে কমন্‌ওয়েল্‌থ সাঁতারুদের জয়লাভের সম্ভাবনা

বিল্ এড্‌ওয়ার্ডস

এবারে কমন্‌ওয়েল্‌থ থেকে যে সকল সাঁতারু অলিম্পিকে যোগদান করবেন তাঁরা অনুশীলনের পালা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। কমনওয়েল্‌থের দেশগুলির মধ্যে অষ্ট্রেলীয়ার সাঁতারুগণই সব চাইতে উন্নত ফল প্রদর্শন করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালের মেল্‌বোর্ণ অলিম্পিকেও অষ্ট্রেলীয় সাঁতারুগণই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এঁদের পর ব্রিটেনের কয়েকজন সাঁতারুও ভাল ফল এবার প্রদর্শন করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

গত মেলবোর্ণ অলিম্পিকে অষ্ট্রেলীয়রা আটটি স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। তাঁরা আশা করছেন আগামী অলিম্পিকে আরও বেশী স্বর্ণ-পদক লাভ করবেন। এজন্য অষ্ট্রেলীয়গণ গত চার বৎসর ধরে কঠোর অনুশীলন করে এসেছেন এবং এর ফলও 'রেকর্ড বুকে'ই রয়েছে—কয়েকটি বিষয়ে ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম।

যে সকল নূতন সাঁতারু এবার অষ্ট্রেলিয়া দলের শক্তি বৃদ্ধি করছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন জন্ কনরাড্‌স ও ইল্‌সা কনরাড্‌স—এঁরা দু'জন ভ্রাতা-ভগিনী, এবং এঁরা দু'জনেই স্বর্ণপদক লাভের আশা রাখেন।

জনের বয়স ১৭ বৎসর আর ইল্‌সার ১৫ বৎসর। দু'বছর আগেই এঁরা বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। জন ৪০০ মিটার এবং ১৫০০ মিটার ফ্রী স্টাইল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি ৪ × ২০০ মিটার রিলে প্রতিযোগিতাতেও অষ্ট্রেলিয়াকে সাহায্য করবেন।

ইল্‌সা মহিলাদের রিলেতে স্বর্ণ-পদক লাভের আশা রাখেন। তিনি ৪০০ মিটার ফ্রী-স্টাইলে অংশ গ্রহণ করবেন। আশা করা যায় লোরেইন ক্র্যাপের জয়ের গৌরব তিনি ম্লান করতে পারবেন। ইল্‌সা কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার সেরা মহিলা সাঁতারু নন। অষ্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাঁতারু হলেন ডন্ ফ্রেজার। ইনি মেলবোর্ণে অলিম্পিকে ১০০ মিটারে জয়লাভ করেন এবং চারটি স্বর্ণপদক অধিকার করার অনন্যসাধারণ গৌরব অর্জন করেন।

ফ্রেজার রোমে স্প্রিণ্ট বিজয়িনীর সম্মান রক্ষা করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তা'ছাড়া ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের আশাও তিনি রাখেন। রিলে রেসেও তিনি অষ্ট্রেলিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন।

কোচ, হ্যারি গ্যালানার মতে ফ্রেজারের এই অসম্ভব ক্ষমতার মূলে আছে তাঁর মন্থর হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসের অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ফ্রেজারের হৃৎস্পন্দন হল মিনিটে ৪২ থেকে ৪৪বার মাত্র। একজন নারীর হৃৎস্পন্দনের স্বাভাবিক হার হল ৬৫ থেকে ৭০ বার। আর তাঁর ফুসফুসের কার্য্যক্ষমতা একজন সাধারণ নারীর ফুসফুসের ক্ষমতা অপেক্ষা শতকরা দশভাগ বেশী।

অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল বিজয়ী জন্ হেনরিক্স এবং ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার বিজয়ী মারে রোজ এখন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। কিন্তু তাঁরা যথাসময়ে অষ্ট্রেলিয়া দলে যোগদান করবেন। এবার তাঁদের স্বদেশীয় জন্ ডেভিড্ ও জন্ কন্‌রাডসের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হবে।

অষ্ট্রেলিয়ার সন্তরণ দলের ৩২জনের মধ্যে ১২জন পুরুষ ও ১৩জন মহিলা আছেন। এঁরা ছাড়া থাকবেন ডেভিড্ থেইল, অলিম্পিক ব্যাক-ষ্ট্রোক চ্যাম্পিয়ন; বিশ্ব রেকর্ডধারী নেভিল হেইল (বাটারফ্লাই) ও জন মঙ্গটন (ব্যাক্-ষ্ট্রোক)।

১৯৫৬ সালের অলিম্পিকের পর থেকে ব্রিটেনও এইদিকে যথেষ্ট উন্নত ফল প্রদর্শন করেছে। ১৯৫৬ সালের ব্যাক্‌ষ্ট্রোকে স্বর্ণপদক লাভ করেন জুডি গ্রীণহাম। কিন্তু তিনি এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। ব্রিটেন এখন যাঁদের উপর উন্নত ফল প্রদর্শনের আশা রাখছে, তাঁরা হলেন তিনবার ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন, ইয়ান্ ব্ল্যাক্; বিশ্ব ব্রেস্টষ্ট্রোক রেকর্ডধারী, এনিটা লন্‌সব্রো; মার্গারেট এড্‌ওয়ার্ডস, নাটালি স্টুয়ার্ডস এবং ডাইভার ব্রায়ান্ ফেল্‌পস।

নাটালি স্টুয়ার্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮মাস আগে ইংলণ্ডে আসার আগে পর্য্যন্ত রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশনে বাস করতেন। ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল নাটালি ব্রিটেনের পক্ষ হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কি না। জানা গেছে যে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।

ব্রায়ান হোপ্‌সের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর—এবং তিনিই এখন ইউরোপের হাইবোর্ড চ্যাম্পিয়ন। এই বিষয়ে আমেরিকার যে আধিপত্য রয়েছে তিনি এবার তা ভেঙ্গে দেবার সঙ্কল্প করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য অনেকগুলি কমন্‌ওয়েল্‌থ দেশ রোম অলিম্পিকে সন্তরণে যোগদান করবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া অপরাপর দেশগুলির আকর্ষণীয় ফল লাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও কানাডার আইরিন ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ডাইভিং-এ পদকলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে সন্তরণে একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার উপরই কমন্‌ওয়েল্‌থের সম্মান অনেকটা নির্ভর করছে।



১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে পুরুষ এবং মহিল বিভাগে এ্যাথ্‌লেটিক্‌সের বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল গুলির এবং তাদের রচয়িতাদের নাম নিয়ে দেওয়া হল।

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স

পুরুষ

১০০ মিটার

১৯৩২—টোলান (আমেরিকা)
১৯৩৬—ওয়েন (আমেরিকা)
১৯৪৮—হ্যারিসন ডিলার্ড (আমেরিকা)

সময়:—১০"৩

২০০ মিটার

১৯৫৬—মরো (আমেরিকা)—২০"৬

৪০০ মিটার

১৯৫২—রোডেন্ (জামাইকা)—৪৫"৯

৮০০ মিটার

১৯৫৬—কোর্টনি (আমেরিকা)—১'৪৭"৭

১,৫০০ মিটার—১৯৫৬ ডিলানি (আয়ারল্যাণ্ড)—৩'৪১"২

৫,০০০ মিটার

১৯৫৬—কুট্স (রাশিয়া)—১৩'৩৯"৬

১০,০০০ মিটার

১৯৫৬—কুট্স (রাশিয়া)—২৮'৪৫"৬

ম্যারাথন

১৯৫২—এমিল জাটোপেক (চেকোশ্লভাকিয়া)—২ঘঃ – ২৩'০৩"২

৪ × ৪০০ মিটার রিলে

১৯৫২—জামাইকা—৩'০৩"৯

১১০ মিটার হার্ডলস

১৯৫৬—কাল্হুন (আমেরিকা)—১৩"৫

৪০০ মিটার হার্ডলস

১৯৫৬—ডেভিস (আমেরিকা)—৫০"১

হাই জাম্প

১৯৫৬—ডুমাস (আমেরিকা)—২,১২ মিটার

লং জাম্প

১৯৩৬—ওয়েন (আমেরিকা)—৮,০৬ মিটার

ডিস্কাস্

১৯৫৬—য়্যাল্ ওয়েটার (আমেরিকা)—৫৬,৩৬ মিটার

সট্-পাট্

১৯৫৬—পি, এ'ব্রায়েন (আমেরিকা)—১৮,৫৭ মিটার

জ্যাভেলিন

১৯৫৬—ড্যানিয়েলসন (নরওয়ে)—৮৫,৭১ মিটার

হ্যামার থো

১৯৫৬—কনোলি (আমেরিকা)—৬৩,১৯ মিটার

মহিলা

১০০ মিটার

১৯৩৬—টিফেন্স (আমেরিকা)

১৯৫২—জ্যাক্সন্ (অষ্ট্রেলিয়া)

১৯৫৬—কাথ্‌বার্ট (অষ্ট্রেলিয়া)

সময়—১১"৫

২০০ মিটার

১৯৫৬—কাথ্‌বার্ট (অষ্ট্রেলিয়া)—২৩"৪

৮০ মিটার হার্ডলস

১৯৫৬—স্ট্রীক্‌ল্যাণ্ড (অষ্ট্রেলিয়া)—১০"৭

৪ × ১০০ মিটার রিলে

১৯৫৬—অষ্ট্রেলিয়া—৪৪'৫

হাই জাম্প

১৯৫৬—ম্যাক্‌ডানিয়েল (আমেরিকা)—১,৭৬ মিটার (বিশ্ব রেকর্ড)

লং জাম্প

১৯৫৬—ক্রেজেসিন্স্কি (পোল্যাণ্ড)—৬,৩৫ মিটার

সট্-পাট্

১৯৫৬—তিখ্‌কিয়েভিচ্ (রাশিয়া)—১৬,৫৯ মিটার

জ্যাভেলিন

১৯৫৬—জাউন্‌সেমে (রাশিয়া)—৫৩,৪০ মিটার

ডিস্কাস্

১৯৫৬—ফিকোটোভা (চেকশ্লোভাকিয়া) ৫৩,০৯ মিটার

বাহির বিশ্বে ✱✱✱

• ওয়েটারের পুনরায় সাফল্যের সম্ভাবনা

নিউ ইয়র্কের ওয়েষ্ট ব্যাবিলনের বিখ্যাত এ্যাথ্‌লেট্ অলিম্পিক বিজয়ী য়্যাল্ ওয়েটার রোমে আসন্ন অলিম্পিক গেম্‌সে স্বীয় সুনাম বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। গত মেল্‌বোর্ন অলিম্পিকে ওয়েটার ডিস্কাস ছোঁড়ায় ১৮৪ ফিট্ ১০½ ইঞ্চি (৫৬·৩৬ মিটার) দূরত্বে



অলিম্পিক রেকর্ডধারী য়্যাল্ ওয়েটার

ডিস্কাস নিক্ষেপ করে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে য়্যাল্ তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত এই রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ১৯০ ফিট্ ৭½ (৫৮·১০ মিটার) পর্য্যন্ত ডিস্কাস ছুঁড়েছেন। তাঁর শিক্ষক জো ম্যাক্ক্লাস্কির বিশ্বাস যে আগামী রাম অলিম্পিকে য়্যাল্ এর চেয়েও ভাল ফল প্রদর্শন করবেন।

ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র য়্যাল্ ওয়েটারের উচ্চতা ৬ ফিট্ ৪ ইঞ্চি এবং দেহের ওজন ২৪০ পাউণ্ড। তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর তাঁর এই দীর্ঘ দেহে অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। আর তা'ছাড়া তাঁর দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের নমনীয়তাও তাঁর ডিস্কাস্ ছোঁড়ায় সাফল্যের অন্যতম কারণ বলা চলে।

✱ কৃষ্ণানের পরাজয়

১৯৬০ সালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতা ভারতীয়দের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ থেকে উইম্বলডন জয়ের আশা সঞ্চারিত হয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, এশিয়া চ্যাম্পিয়ন, রমানাথন কৃষ্ণান চিলির খ্যাতনামা খেলোয়াড় লুই আয়লার বিরুদ্ধে অনবদ্য ক্রিড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং অয়লাকে পরাজিত করে ব্রিটেনের ক্রিড়া সমালোচকগণের নিকট থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। আয়লার বিরুদ্ধে জয়ের ফলে কৃষ্ণান ভারতীয় হিসাবে প্রথম উইম্বলডন সেমি-ফাইনাল খেলবার গৌরব লাভ করলেন। কৃষ্ণানকে ঐতিহাসিক উইম্বলডন ফাইনালে দেখবার আশা সকল ভারতীয়ের মনেই হয়েছিল। কিন্তু উইম্বলডনের সেমি-ফাইনাল খেলার গুরুত্ব ও গাম্ভির্য্য তরুণ কৃষ্ণানের স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল ফলে আয়ালার বিরুদ্ধে তিনি যে ক্রিড়া নৈপুন্য প্রদর্শন করেছিলেন ফ্রেজারের বিরুদ্ধে তা প্রদর্শন করতে পারলেন না। ভারতের উইম্বলডন জয়ের আশা এইখানেই নির্ম্মূল হল।

অষ্ট্রেলিয়ার নেইল ফ্রেজার এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রাখে কেষ্ট মারে কে! বেচারা বুখহল্জ, তাঁর পায়ের পেশী সংকোচন না হলে ফ্রেজারকে হয়তো কোয়ার্টার-ফাইনালেই বিদায় নিতে হত। চতুর্থ সেটে পয়েণ্ট যখন উভয়েরই সমান (১৫-১৫) তখন বুখ্হল্জকে পায়ের পেশী সংকোচনের জন্য অবসর গ্রহণে বাধ্য হতে হয়। বুখ্হল্জ তখন ২-১ সেটে অগ্রগামী ছিলেন। বুখ্হল্জের নিকট অব্যাহতি পেয়ে ফ্রেজার সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণানকে পরাজিত করে তাঁর স্বদেশীয় রড্ লেভারের সঙ্গে মিলিত হন ফ্রেজার এবং লেভার দুজনেই বাম্ হাতে খেলেন। উইম্বলডনের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম দু'জন নেটা খেলোয়াড় ফাইনালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করলেন। লেভারকে পরাজিত করে নেইল্ ফ্রেজার ১৯৬০ সালের এবং ৭৪ তম উইম্বল্ডন বিজয়ার সম্মান লাভ করলেন।

মহিলাদের ফাইনালে ব্রেজিলের মিস্ বুয়েনো তাঁর গতবারের উইম্বলডন বিজয়িণী আখ্যা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মিস্ রেনল্ডসকে পরাজিত করেন।

* ইউরোপে ভারতীয় এ্যাথ্‌লেট্‌গণ

রোমে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের পূর্ব্বে ভারতীয় এ্যাথ্‌লেট্‌গণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন। এর ফলে তাঁরা ইউরোপের আবহাওয়ার সহিত পরিচিত হবার এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের। প্রস্তুত করবার সুযোগ পাবেন কম্যাণ্ডার পেরেরার তত্বাবধানে ভারতীয় এ্যাথ্‌লেট্‌গণ জার্ম্মাণীর মিউনিক্ শহরে এক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয়দের যোগদানের ফলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণও বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পায়। ২০,০০০ দর্শক এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। ৪০০ মিটার দৌড়ে জার্ম্মাণীর কার্ল-কাউফ্‌মান ইউরোপীয় রেকর্ড ম্লান করেন। তিনি এই দুরত্ব ৪৫,৯ সেঃ অতিক্রম করেন। এই রেসে ভারতের খ্যাতনামা এ্যাথ্‌লেট্‌ মিল্‌খা সিং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁর সময় লাগে ৪৬ সেকেণ্ড।

কোলোনে ৮০০ মিটার দৌড়ে ভারতের দল্‌জিৎ সিং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১ মিনিট ৫১'৩ সেঃ সময় তিনি এই দুরত্ব অতিক্রম করেন। হপ্-ষ্টেপ-এ্যাণ্ড-জাম্পে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীতা লক্ষ করা যায়। মহিন্দর সিং এই বিশয়ে উচ্চ স্থান লাভ করেন।

এরপর লণ্ডনের হোয়াইট্‌ সিটিতে ভারতের কৃতি দৌড়বীর মিল্‌খা সিং তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন। ব্রিটিশ এ্যামেচার এ্যাথ্‌লেটিক য়্যাসোসিয়েশন কতৃক পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় মিল্‌খা সিং ৪৪০ গজ দৌড়ে যুক্তরাজ্যের জাতীয় এবং সকল সময়ের বহিরাগতদের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তিনি ৪৬,৫ এই দুরত্ব অতিক্রম করেন। রেসের পর তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে ট্র্যাকের মাটি ভারি না থাকলে তিনি আরও দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হতেন। জানা গেছে আসন্ন অলিম্পিকে মিল্‌খা সিং শুধু ৪০০ মিটার দৌড়েই অংশ গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন।



৪০০ মিটার রেসে অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগিত্রয়
(বাম দিক থেকে) আব্দোউ সায়ে, কাউফ্‌মান ও মিল্‌খা সিং

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড—দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ডঃ ২৯২ (সুব্বা রাও ৫৬) ও ২০৩।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ ১৮৬ (ওয়েট ৫৮) ও ২০৯
(ওয়েট ৫৬ নট আউট, ম্যাকলীন ৬৮)

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১০০ রাণে সফররত দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে পরাজিত করে। খেলার পঞ্চম দিনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা দল তাদের ২য় ইনিংসের খেলা পুনরায় আরম্ভ করে তখন তাদের হাতে ৭টা উইকেট জমা এবং জয়লাভের জন্যে ১৯০ রাণ দরকার। কিন্তু এই ৭টা উইকেটে দক্ষিণ

আফ্রিকা দলের ৮৯ রাণ ওঠে। ফলে তারা শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করে।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৩৬২ (৮ উইকেটে ডিক্লে: স্মিথ ৯৯, সুব্বা রাও ৯০ ডেক্সটার ৫৬, ওয়াকার ৫২। গ্রীফিন ৮৭ রাণে ৪ উইকেট)।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১৫২ (ষ্টেথাম ৬৩ রাণে ৬ উইকেট) ও ১৩৭ (ষ্টেথাম ৩৪ রাণে ৫ উইকেট)।

লর্ডসে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৭৩ রাণে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করে।

এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যেও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বোলার গ্রিফিন বোলিংয়ে দুর্লভ সম্মান হ্যাট-ট্রিক লাভ করেছেন ২য় দিনের খেলায় শেষের দিকে তাঁর বলে স্মিথ, ওয়াকার এবং ট্রুম্যান আউট হন। শেষের দুজন বেল্ড আউট। সরকারী টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে তিনিই প্রথম এই দুর্লভ সম্মান লাভ করলেন।

এ পর্য্যন্ত সরকারী টেষ্ট খেলার ইতিহাসে ১৫ বার 'হ্যাট-ট্রিক' হয়েছে। ইংলণ্ডের পক্ষে ৭ বার, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৬ বার, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ১ বার। অষ্ট্রেলিয়ার টি. জে. ম্যাথুজ ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একই খেলায় ২ বার 'হ্যাট-ট্রিক' করে যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২৮৭ (ব্যারিংটন ৮০, কাউড্রে ৬৭, গডার্ড ৮০ রাণে ৫ উইকেট) ও ৪৯ (২ উইকেটে)

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৮৮ (ট্রুম্যান ২৭ রাণে ৫ উইকেট) ও ২৪৭ (ও'লীন ৯৮। ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৪ উই)

নটিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করে। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড ৩-০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। সুতরাং বাকি দুটি টেষ্ট খেলার আকর্ষণ বিশেষ নেই।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৬০ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা —অপেশাদার জীবনের শেষ অধ্যায়। আগামী বছর থেকে পেশাদার খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের আর কোন বাধা থাকবে না। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে দু'জন ন্যাটা খেলোয়াড় খেলেছিলেন। প্রতিযোগিতার গত ৮৩ বছরের ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম। ফাইনালে দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন ন্যাটা খেলোয়াড় খেলেছেন এমন ঘটনা অনেক আছে। এ পর্য্যন্ত এই তিনজন ন্যাটা খেলোয়াড় ফাইনালে জয়ী হয়েছেন—অষ্ট্রেলিয়ার নর্ম্যান ব্রুক্স ১৯০৭ ও ১৯১৭ সালে, ১৯৫৪ সালে ইজিপ্টের জরোশ্লাভ ড্রোবনি এবং ১৯৬০ সালে অষ্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রাসার। ১৯৬০ সালের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন খেলোয়াড় উঠেছিলেন। গত ৬ বছরের মধ্যে এই নিয়ে ৫ বার ফাইনালে কেবল অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই খেললেন। এই থেকে প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের প্রাধান্য সূচিত হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে গতবারের বিজয়িনী মারিয়া বুয়েনো জয়লাভ করেন। এছাড়া মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালেও তিনি জয়লাভ ক'রে, দ্বিমুকুট সম্মান লাভ করেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রাসার জয়ী হ'ন। ১৯৫৮ সালে তিনি রানার্স-আপ হয়েছিলেন। গতবছর ফ্রাসার ১৮,০০০ পাউণ্ডের রফাতে পেশাদার খেলোয়াড় জীবন গ্রহণের আমন্ত্রণ পান কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পুরুষদের ডাবলসে আমেরিকা এবং মিক্সিকো এবং মহিলাদের ডাবলসে আমেরিকা এবং ব্রেজিল জয়লাভ করে।

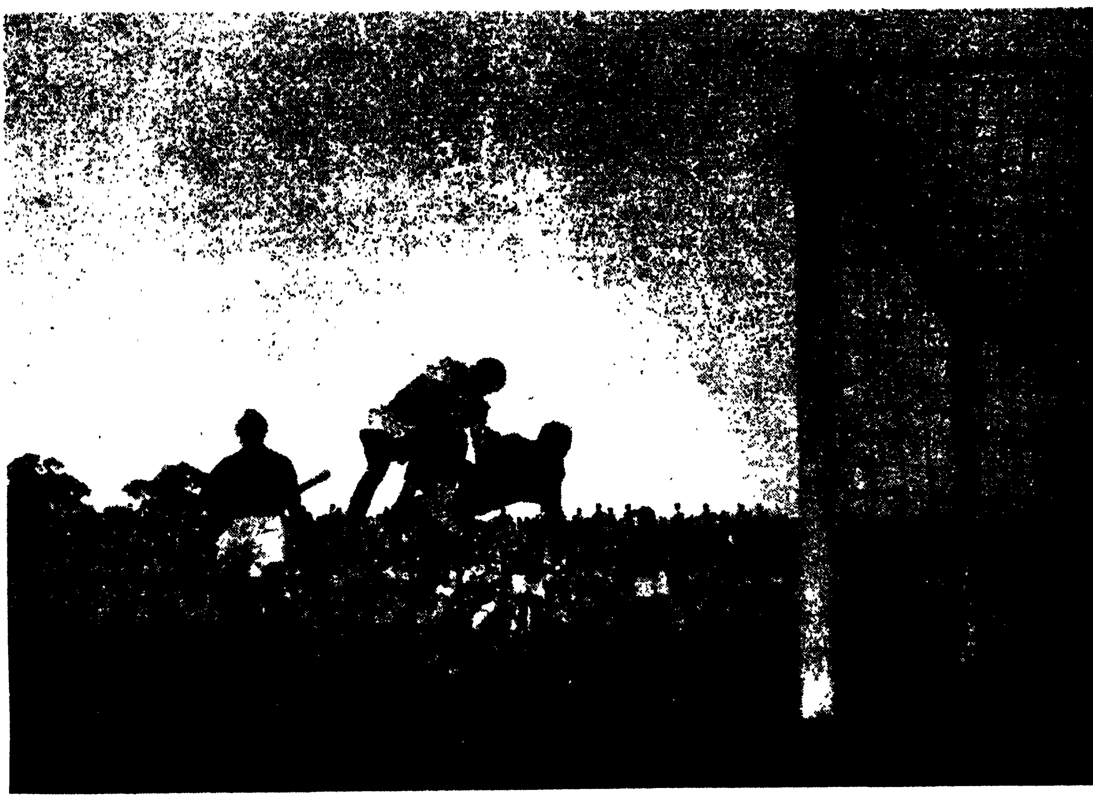
পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রামনাথ কৃষ্ণান সেমি-ফাইনালে এ বছরের সিঙ্গলস বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রাসারের কাছে পরাজিত হ'ন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এরপর আন্তর্জাতিক সুইডিস লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান ৬-৩, ১-৬, ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ সেটে ফ্রাসারকে পরাজিত ক'রে

ফাইনালে ওঠেন। আলোচ্য বছরের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় বাছাই খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় কৃষ্ণান সপ্তমস্থান পেয়েছিলেন।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

নিউইয়র্কের পোলো গ্রাউণ্ডে হেভীওয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা ফ্লোয়েড প্যাটারসন ৫ম রাউণ্ডে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ইঙ্গেমার জোহানসনকে ভূতলশায়ী ক'রে পুনরায় হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্ব-খেতাব লাভ করেছেন। হেভীওয়েট বিভাগের ইতিহাসে তিনি ভিন্ন অন্য কোন মুষ্টযোদ্ধা বিশ্বখেতাব একবার হারিয়ে তা উদ্ধার করতে পারেননি। সেই দিক থেকে প্যাটারসন ইতিহাস এক নতুন অধ্যায় যোজনা করলেন।

বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। ২৩টা খেলায় ৩৯ পয়েন্ট—জয় ১৭টা, ড্র ৫টা, হার ১টা। মোহনবাগান ৪৭টা গোল দিয়ে ৯টা গোল খেয়েছে। এই দলের ৬ জন নামকরা খেলোয়াড অলিম্পিক অনুশীলন শিবিরে যোগদান করায় দলটির পূর্ব্ব শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। দলের অমিয় ব্যানার্জি অসুস্থতার দরুণ অনুশীলন শিবির থেকে অতি সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। তাঁকে বি এন আর দলের বিপক্ষে খেলতে দেখা যায়। জোড়াতালি দেওয়া মোহনবাগান ক্লাবের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। লীগ তালিকায় প্রধান তিনটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের থেকে অলিম্পিক অনুশীলন শিবিরে খেলোয়াড় গেছে মোহনবাগানের ৬ জন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ৫ জন এবং মহমেডান স্পোর্টিংযের ১ জন। ২৯শে



মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগানদলেরগোল সম্মুখের দৃশ্য।
মোহনবাগানের গোলরক্ষক সনৎ শেঠ একটি অব্যর্থ গোল বাঁচান।　　ফটো ঃ সুভাষ সোম

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ঃ

বর্ত্তমানে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ তালিকায় গত

জুন তারিখে স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব খেলা ড্র ক'রে একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে। এই সময়

তারা লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রেছিল। ২৯শে জুন থেকে ১৪ জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ৬ টি খেলায় যোগদান ক'রে মোট ৭ পয়েণ্ট নষ্ট করেছে অর্থাৎ তারা ৫ পয়েণ্ট পেয়েছে। খেলার ফলাফল—জয় ১ হার ২, খেলা ড্র ৩।

১৬টা খেলায় একসময়ে (২৫শে জুন) ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানের থেকে ৩ পয়েণ্টে এগিয়ে ছিল; এই ব্যবধান ক্রমশঃ কমতে কমতে মোহনবাগানই এখন সমান ২৩ টা খেলায় ইস্টবেঙ্গলের থেকে ৪ পয়েণ্টে এগিয়ে গেছে। বর্ত্তমানে মোহনবাগানের ২৩ টা খেলায় ৩৯ পয়েণ্ট, ইস্টবেঙ্গলের ২৩ টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট; আর মোহনবাগানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং দলের ২১ টা খেলায় ৩৪ পয়েণ্ট।

আলোচ্য মরসুমে এ পর্য্যন্ত তিনজন, খেলোয়াড় 'হ্যাট-টিক' করেছেন—১ম পি রায় চৌধুরী (এরিয়ান্স) ইণ্টার ন্যাশানালের বিপক্ষে, ২য় দীনু দাস (ই আই আর) হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে এবং ৩য় নারায়ণ (ইস্টবেঙ্গল) বালী প্রতিভার বিপক্ষে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়বান্ধবী" (১৬শ সং)—৪৲

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস" (১ম ভাগ)—১৲

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "ভীষ্ম" (৯ম সং)—২.৭৫

দৃষ্টিহীন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বটকালীর জঙ্গলে"—২৲

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (৩০শ সং)—২.৫০, সাজাহান (৩৪শ সং)—২.৫০

শ্রীননীগোপাল আইচ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "জাগে শর্বরী"—১.৫০

উষা দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ফুলশয্যার রাতে"—৩৲

বিজ্ঞপ্তি

আগামী আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষ পূজা বা শারদীয়া সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে শীর্ষস্থানীয় লেখক-লেখিকাগণের রচনা ও নয়নাভিরাম চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া আশ্বিনের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে। প্রতি কপির মূল্য ২৲। ভারতবর্ষের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে উক্ত সংখ্যার বিজ্ঞাপনের জন্য এখন হইতেই সত্বর হইবার অনুরোধ জানাই। ইতি

বিনীত—কর্মাধ্যক্ষ,
ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা | যশোদা দুলাল | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



ভাদ্র—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কার্য-কারণানন্যত্ববাদ

ডকটর রমা চৌধুরী

পূর্ব দুই সংখ্যায় শঙ্করের কার্যকারণবাদ বা সৎকার্যবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে (শ্রাবণ, কার্ত্তিক ১৩৬৪)।

সৎকার্যবাদের মূল কথা হল যে, সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির পূর্বেও কার্য কারণে সত্তাবান থাকে। শঙ্কর বলছেন—

"প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। প্রতিষেধমাত্রং হীদম্, নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি। ন হ্যয়ং প্রতিষেধঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি কথম্? যথৈব হীদানীমপীদং কার্যং কারণাত্মনা সৎ, এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। নহীদানীমপীদং কার্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি। কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্যস্য প্রাগুৎপত্তেরবিশিষ্টম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ২।১ ৭, শঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের কারণে অস্তিত্ব কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন বর্তমানে কার্য কারণরূপেই সৎ, তেমনি উৎপত্তির পূর্বেও তাই ছিল। বস্তুতঃ, অতীতে বা বর্তমানে, উৎপত্তির পূর্বে বা পরে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় কার্যকারণাত্মক, কারণরূপেই অস্তিত্ববান, কারণের ব্যতিরিক্ত বা কারণ থেকে স্বতন্ত্র কোনো দ্বিতীয় তত্ত্ব নয়।

এরূপে সৎকার্যবাদ স্বীকার করলে, কার্য-কারণের অনন্যত্ববাদও স্বীকার করে' নিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪-২০, এই সাতটী সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বিশদভাবে তাঁর সুবিখ্যাত কার্য-কারণানন্যত্ববাদ স্থাপিত করেছেন।

কার্য-কারণের এই অনন্যত্ববাদের তিনটী অর্থ :—প্রথমতঃ, সৃষ্টির পূর্বে, অতীতে, কারণ ও কার্য অনন্য বা অভিন্ন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে, স্থিতিকালেও, বর্তমানেও কারণ ও কার্য অনন্য আছে। তৃতীয়তঃ, লয়ের পরে, ভবিষ্যতেও কারণ ও কার্য অনন্য থাকবে। সৃষ্টির পূর্বে যে কার্য্য কারণে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে, সে কথা পূর্বে সৎ-কার্য-স্থাপন-প্রসঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে। সেই সময়ে কেবল মাত্র কারণই অভিব্যক্ত ও প্রত্যক্ষগোচর থাকে, অথচ শ্রুতি ও যুক্তি বলে স্বীকার করে নিতে হয় যে অনভিব্যক্ত ও প্রত্যক্ষের অগোচর কার্যও কারণেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষতঃ যা কারণ, বস্তুতঃ তা কেবল কারণই নয়, কার্যও ; অর্থাৎ, কারণ ও কার্য এক ও অভিন্ন। সেজন্য, সৃষ্টির পূর্বে যে কারণ ও কার্য অনন্য, তা' আর পৃথক্ ভাবে প্রমাণিত করার প্রয়োজন নেই,—সৎকার্যবাদ-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাও সিদ্ধ হয়েছে। একই কারণে, লয়ের পরেও কারণ ও কার্যের অনন্যত্বের পৃথক্ প্রমাণ আবশ্যক নয়' যেহেতু, তখনও কেবলমাত্র কারণই দৃষ্ট হয়, কার্যটী যদি কারণে থাকে ত অভিন্ন হয়েই কেবল থাকতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে, প্রশ্ন হচ্ছেঃ সৃষ্টির পরেও, স্থিতিকালেও, বর্তমানেও যখন কার্যটী কার্যরূপেই, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গুণ, শক্তি, ক্রিয়া, ও আকারাদি বিশিষ্টরূপেই এবং আপাত-দৃষ্টিতে কারন থেকে পৃথক্ রূপেই দৃষ্ট হচ্ছে, তখনও কি কার্যটী কারণ থেকে অনন্য বা অভিন্ন ? শঙ্করের মতে যে কারণ ও কার্য সর্বকালে সর্বাবস্থায় অভিন্ন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য, সৃষ্টির পরেও যে, কারণ ও কার্য অনন্য, তা'ই এখন পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণিত করা হচ্ছে।

ব্রহ্মসূত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, ব্রহ্ম যে জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এই বেদান্তসম্মত মতবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাতটী প্রধান আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথম আপত্তি এই যে, চেতনস্বরূপ ব্রহ্ম অচেতন-স্বভাব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে, ব্রহ্ম জগতের কারণ হতে পারে না (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৪—১২)। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম জীব-জগতের কারণ হ'লে, ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য জগতের মধ্যে কোনোরূপ বিভাগ থাকতে পারে না, যেহেতু উভয়েই ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মস্বরূপ বলে অভিন্ন হয়ে পড়বে (ব্রহ্ম-সূত্র ২।১।১৩-২০)। শঙ্কর প্রথমতঃ এই উভয় আপত্তিই ব্যবহারিক দিক থেকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, কারণ ও কার্য যে সর্বাংশে এক ও অভিন্নস্বরূপ হবে, এরূপ কোনো নিয়ম নেই। যেমন, চেতন পুরুষ থেকে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি হয়। উপরন্তু, কারণ ও কার্য যদি সম্পূর্ণ সমভাবাপন্ন হত, তা'হলে কারণ থেকে কার্যোৎপত্তির প্রকৃত অর্থই থাকত না—যেহেতু বিদ্যমান কারণ থেকে একটী নূতন, বিভিন্ন কার্য লাভের জন্যই ত লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

"অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতি-বিকার ভাব এব প্রলীয়েত।" (ব্রহ্ম সূত্র, ২।১।৬, শঙ্কর ভাষ্য)।

অর্থাৎ, কারণ ও কার্য যদি সম্পূর্ণরূপে অভিন্নস্বরূপ হ'ত, তাহলে কারণ কার্য ব্যবস্থাই বিলুপ্ত হয়ে' যেত।

পুনরায় ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, তারও অন্যথা হতে পারে না।

"অত্রোচ্যতে। প্রসিদ্ধো হ্যয়ং ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগো লোকে। যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোজ্য ওদন ইতি।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৩, শঙ্কর ভাষ্য)।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এরূপ সমাধান ব্যবহারিক সমাধানই মাত্র। সেজন্য, পরিশেষে, শঙ্কর পারমার্থিক দিক্ থেকে, কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ যে 'অনন্য-সম্বন্ধ' বা অভেদ-সম্বন্ধ, তা' প্রমাণিত করেছেন ব্রহ্মসূত্রের পূর্বোক্ত সাতটী সূত্রের ভাষ্যে (২।১।১৪—২০)। শঙ্কর বলেছেন —

"অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং 'স্যাল্লোকবৎ' ইতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি ; যস্মাৎ তয়োঃ কার্য-কারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্যাবগম্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪, শঙ্কর ভাষ্য)।

অর্থাৎ, ব্যবহারিক ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ স্বীকার করে'ই পূর্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করা হল। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, এই বিভাগ পারমার্থিক বিভাগ নয়। পারমার্থিক দিক থেকে কারণ বা পরব্রহ্ম এবং কার্য্য বা বিশ্বপ্রপঞ্চ। অনন্য' বা অভিন্ন। 'অনন্য' শব্দের অর্থ হল "ব্যতিরেকেণা-ভাবঃ"। অর্থাৎ, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অস্তিত্ব

সর্বদাই অসম্ভব। শ্রুতি ও যুক্তি উভয় দিক্ থেকেই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

শ্রুতি প্রমাণ হল ছান্দোগ্যোপনিষদের সেই সুবিখ্যাত মন্ত্র :—

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"

(ছান্দোগ্য, ৬৷১৷৩)

ছান্দোগ্যোপনিষদে আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদে (৬৷১) বলা আছে যে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে' গম্ভীরচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করলে পিতা তাঁকে বল্লেন—'শ্বেতকেতু, তুমি ত গম্ভীরচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছ। কিন্তু তুমি সেই উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলে, যা' দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয় অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়?'

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" (ছান্দোগ্য ৬৷১৷৩)।

শ্বেতকেতু সেই উপদেশের বিষয় জানতে ইচ্ছুক হলে' আরুণি তিনটী উদাহরণের দ্বারা এই নিগূঢ় বিষয় ব্যাখ্যা করেন—

যেমন, একটী মৃৎপিণ্ড জানলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, যেমন একটী সুবর্ণপিণ্ড জানলেই সমস্ত সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়, যেমন একটি লৌহপিণ্ড জানলেই সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়।

"বিকার বা কার্য কেবল শব্দমূলক ও নামমূলক। কিন্তু একমাত্র মৃত্তিকা, সুবর্ণ বা লৌহই সত্য।" (৬৷১৷৩—৬)।

এই প্রসঙ্গেই, আরুণি শ্বেতকেতুর নিকট সুপ্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" বা জীব-ব্রহ্মের একাত্মতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেন (ছান্দোগ্য ৬৷৮—৬৷১৬)।

এরূপে, কারণকে জানলেই কার্যকেও জানা যায় কেন? এর উত্তরে, উপরের মন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলছেন—

"কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্যমন্যদ্ বিজ্ঞাতং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ। কারণেনানন্যত্বাৎ কার্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যন্ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদন্যৎ কারণাৎ কার্যং স্যাৎ, ন ত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্যম্। কথং, তর্হীদং লোকে 'ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ," ইতি? শৃণু, বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকেব সত্যং বস্তু অস্তি।" (ছান্দোগ্য ৬৷১৷৩, শঙ্কর ভাষ্য)।

অর্থাৎ, কারণ মৃৎপিণ্ডকে জানলেই অন্যান্য কার্য জ্ঞাত হবে কেন? তার হেতু এই যে, কার্য কারণ থেকে অনন্য বা অভিন্ন। এক বস্তু জানলে অপর এক ভিন্ন বস্তু জানা যায় না, সত্য। কিন্তু, কার্য ত কারণ থেকে ভিন্ন নয়। অবশ্য লোকব্যবহারে 'এই কারণ, এই তার কার্য্য, এরূপ বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কারণই একমাত্র সত্য, কার্য কারণাতিরিক্ত বস্তু নয়, নাম বা শব্দই মাত্র।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যেও শঙ্কর বলেছেন—

"এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন ঘটশরাবোদঞ্চনদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং—বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারঃ—ঘটঃ শরাবঃ উদঞ্চনঞ্চেতি, ন তু, বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয় মাত্রং হ্যেতদনৃতং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি।" (ব্রহ্মসূত্র ২৷১৷১৪, শঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ, এস্থলে বলা হয়েছে যে, একমাত্র মৃৎপিণ্ডই পরমার্থ বা সত্য বস্তু; সেজন্য ঘট, শরাব, বা পাত্র, উদঞ্চন বা জালা প্রমুখ মৃৎপিণ্ড থেকে তথাকথিত উৎপন্ন বিভিন্ন কার্য প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, সেই কারণেই মৃত্তিকাকে জানলেই তাদেরও জানা যায়। বস্তুতঃ, তাদের নামই কেবল বিভিন্ন—প্রথমটার নাম 'ঘট', দ্বিতীয়টীর নাম 'শরাব', তৃতীয়টীর নাম 'উদঞ্চন' ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, স্বতন্ত্র কার্য কিছুই নেই—এরূপ তথাকথিত বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র কার্য নামতঃ বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র হলেও, বস্তুতঃ মিথ্যাই মাত্র, কারণ মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২৷১৷১৪—২০) শঙ্কর কেবলমাত্র শ্রুতির ভিত্তিতে নয়, যুক্তির ভিত্তিতেও কার্য-কারণের অনন্যত্ব স্থাপনা করেছেন। সেই সকল যুক্তি হল সংক্ষেপে এই :—

বস্তুগত্যা বা বস্তুর অস্তিত্বের দিক থেকে, প্রথমতঃ, উপাদান কারণ বিদ্যমান থাকলেই কার্যও বিদ্যমান থাকে, না থাকলে থাকে না।

"যৎ কারণং ভাব এব কারণস্য কার্যমুপলভ্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৫, শঙ্কর ভাষ্য)।

যেমন মৃত্তিকা থাকলেই ঘট, তন্তু থাকলেই পট বিদ্যমান থাকে, অন্যথায় নয়। যদি দুটি বস্তু সত্যই 'অন্য' বা 'ভিন্ন' হয়, তা হলে একটী বিদ্যমান থাকলে অন্যটি বিদ্যমান থাকে না। যেমন, অশ্ব উপস্থিত থাকলেও, গাভী উপস্থিত থাকে না; অন্য পক্ষে অশ্ব উপস্থিত না থাকলেও, গাভী উপস্থিত থাকে। অশ্ব ও গাভীর মধ্যে অবশ্য কোনোরূপ সম্বন্ধই নেই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দুটী বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে ক্ষেত্রেও সেই দুটী বস্তু ভিন্ন বলে, একটি থাকলে অপরটী থাকে না। যেমন, কুম্ভকার (নিমিত্ত কারণ) ও ঘটের মধ্যে নিমিত্ত নৈমিত্তিক সম্বন্ধ থাকলেও, এমন কি কেবলমাত্র কুম্ভকার থাকলেই ঘট থাকে না। আপত্তি হতে পারে যে, দুটি বস্তু ভিন্ন হলেও, একটি থাকলে অপরটীও থাকে, যেমন অগ্নি ও ধূম। এর উত্তর এই যে—এই সম্বন্ধ নিয়ত সম্বন্ধ নয়। যেহেতু, অগ্নির অভাবেও ধূম থাকে, দৃষ্টান্তঃ ধূমপূর্ণ উত্তপ্ত দুগ্ধভাণ্ড, পুনরায়, ধূমের অভাবেও অগ্নি থাকে, দৃষ্টান্তঃ অগ্নিবর্ণ, জলন্ত লৌহশলাকা। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।১।১৫)

দ্বিতীয়তঃ বস্তুর অস্তিত্বের দিক থেকে, যেমন উপাদান কারণ থাকলে কার্যও থাকে, অন্যথায় নয়—তেমনি মনের ধারণার দিক থেকে, উপাদান কারণের উপলব্ধিতেই কেবল কার্যেরও উপলব্ধি হয়, অন্যথায় নয়। শঙ্করের মতে, প্রথম হেতুর অপেক্ষা এই দ্বিতীয় হেতুটীই কার্য-কারণের অনন্যত্বের প্রধানতর হেতু; যেহেতু, দুটী বস্তু ভিন্ন হলেও, একটী থাকলে অন্যটীও কোনো কোনো অবস্থায় থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত হয়ত পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু দুটী বস্তু ভিন্ন হলেও, একটীর উপলব্ধিতেই অন্যটীরও উপলব্ধি হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত কোনো সময়েই ও কোনো অবস্থাতেই পাওয়া যায় না। যেমন, অগ্নি ও ধূমের দৃষ্টান্ত। অগ্নি ও ধূম দুটী ভিন্ন বস্তু হলেও, কোনো কোনো সময়ে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অগ্নি থাকলেও ধূমও থাকে। কিন্তু কোনো সময়েই ও কোনো ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র অগ্নির উপলব্ধি হলেই, সঙ্গে সঙ্গেই ধূমেরও উপলব্ধি হয় না। সেজন্য শঙ্কর বলছেন—

"তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্যকারণয়োরনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৫, শঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ, আমাদের মতে, কারণ থাকলেই কার্যের উপলব্ধি হয়, না থাকলে নয়, সেজন্যই কারণ ও কার্য অভিন্ন।

তৃতীয়তঃ, এক বস্তু যদি অপর বস্তুতে পূর্ব থেকেই নিহিত হয়ে না থাকে ত, কোনোদিনও সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না, যেমন, বালুকা থেকে কোনোদিনও তৈলের উদ্ভব হতে পারে না, কেবল মাত্র সর্ষপ থেকেই পারে। সেজন্য, স্বীকার করতে হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে কার্য কারণেই নিহিত হয়ে থাকে, এবং সেরূপে কারণের সঙ্গে অনন্য তাই যদি হয়। তা হলে, সৃষ্টির পরেও কার্য কারণের সঙ্গে অনন্যই থাকবে—যেহেতু যার যা সত্তা, স্বরূপ বা স্বভাব তার ত ব্যত্যয় ঘটতে পারে না কোনোদিনও। সেজন্য, কারণ ও কার্যের যদি এই স্বরূপ হয় যে, পূর্বে তারা অনন্য বা অভিন্ন ছিল, তা'হলে পরে তারা আর ভিন্ন বা পৃথক্ হয়ে যেতে পারে না, কিন্তু অনন্যই থাকে, আপাতদৃষ্টিতে যা'ই বোধ হোক্ না কেন। সেজন্য শঙ্কর বলছেন—

"যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বাদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্যমিত্যবগম্যতে। যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং, অতোহপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্যস্য" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৬, শঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ, যা যে বস্তুতে বিদ্যমান নয়, তা' সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। সেজন্য উৎপত্তির পূর্বে কারণ ও কার্য-অনন্য। পুনরায়, সেজন্যই সৃষ্টির পরেও তারা তাই, যেহেতু, ত্রিকালে কারণ বা কার্যের সত্তার কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারেনা—সত্তা একই। সেই হেতুও, কারণ ও কার্য-অনন্য।

চতুর্থতঃ, কারণ ও সৃষ্ট কার্যের মধ্যে অবশ্য আকারগত ভেদ আছে। কিন্তু আকারগত-ভেদ সত্তাগত-ভেদ একেবারেই নয়। একই সত্তা বা বস্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন-রূপ পরিগ্রহ করতে পারে; কিন্তু সেজন্য তার সত্তা, স্বরূপ,

স্বভাবের কোনোরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হবে কেন? বরং বা নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও আমরা অনায়াসে সেই একই বস্তুকে চিনে নিতে পারি। শঙ্কর বলছেন—

"ন চ বিশেষ-দর্শন-মাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। নহি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিত-হস্ত-পাদঃ—প্রসারিত-হস্ত-পাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথা, প্রতিদিনমনেক-সংস্থানানাপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ, আকারগত বিশেষ বা ভেদ হলেই যে বস্তুও ভিন্ন হয়ে—তা নয়। যেমন দেবদত্ত এক সময়ে সঙ্কুচিত-হস্তপাদ এবং অন্যসময়ে প্রসারিত-হস্তপাদ হতে পারে। কিন্তু তার হস্তপাদ সঙ্কুচিত হয়েই থাকুক, বা প্রসারিত হয়েই থাকুক—তাতে তার স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। কারণ, সব সময়েই সে যে সেই একই দেবদত্ত—এই বোধ সকলেরই থাকে। একই ভাবে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিরাও প্রতিদিনই বিভিন্নরূপে, বিভিন্নাকারে দৃষ্ট হন। কিন্তু সেজন্য কি তারা নিত্যনূতন হ'ন? উপরন্তু, 'ইনিই আমার পিতা', 'ইনিই আমার মাতা,' 'ইনিই আমার ভ্রাতা' এরূপ' বোধ আজীবনই থাকে। সেজন্য, এইভাবে, কেবল মাত্র আকার, রূপ বা অবয়বের হ্রাস, বৃদ্ধি পরিবর্তন দেখেই যদি বস্তুকেই ভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে গর্ভস্থ শিশু ও ভূমিষ্ঠ শিশু যে ভিন্ন, অথবা একই ব্যক্তি বাল্যে, যৌবনে ও বার্ধক্যে ভিন্ন—তাও স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে, লোকব্যবহার অসম্ভব ও জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

একই ভাবে, সংবেষ্টিত (গুটান) পট (বস্ত্র) ও প্রসারিত পট, আকারে ভিন্ন হলেও, প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিন্ন (ব্রহ্মসূত্রে ২।১।১৯)।

সমভাবে, প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ, কেবলমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহকারী পঞ্চপ্রাণ এবং সাধারণ অবস্থায় স্ব স্ব আকুঞ্চন-প্রসারণাদিরূপ কার্যে রত পঞ্চপ্রাণ, ক্রিয়াদির দিক্ থেকে ভিন্ন হলেও, প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিন্ন (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২০)।

শঙ্কর এস্থলে নটেরও উদাহরণ দিয়েছেন (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।১।১৮)। একজন নট বা অভিনেতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে সজ্জিত হন। কিন্তু এই রূপগত ভেদের জন্য তিনি স্বয়ং কোনদিনও ভিন্ন হয়ে যান না—সেই একই ব্যক্তি থাকেন।

এরূপে, রূপ, আকার; ক্রিয়া প্রভৃতির ভেদের জন্য বস্তুর ভেদ হয় না।

পঞ্চমতঃ, কারণ ও সৃষ্ট কার্য যদি অনন্য না হত, তা হলে অশ্ব ও মহিষের মতই তাদেরও ভিন্ন বলেই বোধ হত। তা' যখন হয় না, তখন কারণ ও কার্যের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব অবশ্যস্বীকার্য। যদি বলা হয়—কারণ ও কার্য সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই সম্বন্ধের জন্যই, ভিন্ন হলেও তাদের অভিন্ন বলে বোধ হয়—তার উত্তর এই যে, দুটী ভিন্ন বস্তুকে সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা আবদ্ধ করা যায়না, যেহেতু সেক্ষেত্রে অনাবস্থা দোষের উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।১।১৮)

এরূপে, শ্রুতি ও যুক্তি বলে প্রমাণিত করা যায় যে কারণ ও সৃষ্ট কার্য "অনন্য।" অর্থাৎ, কারণ ও কার্য সর্বকালেই, সর্বাবস্থাতেই "অনন্য", অথবা এক ও অভিন্ন।

শঙ্করের মতে, এই ভাবে অনায়াসে প্রমাণিত করা যায় যে, তথাকথিত কারণ ব্রহ্ম এবং তথাকথিত কার্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কোনো দ্বিতীয় সত্য, সত্তা বা তত্ত্ব নয়।



গল্প

অনির্ব্বাণ

শ্রী বার্ণিক

(ক)

সেদিন সকাল থেকেই বিজয়ের মনটা বাড়ীর জন্যে যেন কেমন করছিলো।

হঠাৎ পিয়ন এসে বল্ল, বাবু! চিঠি আছে।

জানলা দিয়ে আড়চোখে নিচের দিকে চেয়ে বল্ল বিজয়—দাঁড়াও আসছি! মনটার মধ্যে তার খুশীর দোলা লাগলো। তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় এসে, পিয়নের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে সেখানেই খাম ছিঁড়ে পড়তে থাকলো সে।

বিজয়ের স্ত্রী আর তার একমাত্র মেয়ে রূপা তাকে চিঠি লিখেছেন। স্ত্রীর চিঠিটা পড়া শেষ করেই মেয়ের চিঠিটা পড়তে থাকলো সে। তার মেয়ে তাকে লিখেছে,

বাবামণি—

আসীবার সময়ে আমার জন্নে চক চক ফরক লাইনটানা খাতা আর শোন-পাপড়ী আনিবে। মার জন্নেও কিছু আনিও। আমি ভাল আছী। তুমি কেমন আছ।

রূপা

কাঁচা অপটু হাতের লেখা আর সোজা-বাঁকা অক্ষরের ছোট্ট চিঠির মধ্যে বিজয় এক অনির্বচনীয় আনন্দ খুঁজে পেল। মাঝে দুটো একটা অক্ষরের আকারের বিরাটত্ব বিজয়ের মনে যে কেবল কৌতুহলই সঞ্চার করল, তাই নয়—অভূতপূর্ব্ব পুলকের অনুভূতিও জাগিয়ে তুল্লো। বার বারই পড়ল চিঠিটা। তবু তৃপ্তি হল না; আবার পড়ল। বড় ভাল লাগতে থাকল বিজয়ের। বানান ভুল আর অক্ষরের শিশুসুলভ আকৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে সে তার কচি মেয়ের ছবিটাই খুঁজে পেল। মনে মনে হাসলো সে। ভাবল, হয়তো সেও এক কালে তার মেয়ের মত হাতের লেখায় আর বানান ভুলে ভরে তুলতো তার চিঠির পাতা, হয়তো সেই চিঠি পড়ে তার বাবা আনন্দ পেতেন, তার মত মনে মনে হাসতেন।

এই রূপার প্রথম লেখা চিঠি। তার পাঁচ বছরের মেয়ের নিজের হাতে লেখা প্রথম ফিরিস্তি। ভাষা কেউ বলে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু হাতের লেখা তার নিজেরই।

অফিসে বেরোবার মুখে, চিঠিটা পকেটে নিয়েই বেরোল বিজয়। নাহ'লে, রূপার ফিরিস্তি অনুসারে জিনিষ আনতে যদি ভুল হয়ে যায়! আজ শনিবার—সপ্তাশেষ। তাই সময় এবং দিন হিসেব করেই বিজয়ের স্ত্রী বিজয়কে চিঠি দিয়েছে। আজ যে বিজয়ের বাড়ী ফিরবার দিন।

যাই হ'ক, অফিসে গিয়েও মেয়েটার চিঠিটা বার করে আর একবার পড়ল বিজয়। খুশী-ভরা মনে পড়তে পড়তে আপন মনেই হাসল সে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সহকর্ম্মী শৈলেন বিশেষ অর্থপূর্ণভাবে মিচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,-কি বিজয়—কার চিঠি এতো মন দিয়ে পড়া হচ্ছে? বলি, তেনার বুঝি!

সরল মেয়েটার মতোই সহজ হাসি দিয়ে বল্লো বিজয়—নারে! রূপা লিখেছে—মানে, আমার মেয়ে লিখেছে। দেখ্‌বি কি লিখেছে? বলে আগ্রহসহকারে চিঠিটা শৈলেনের হাতে দিল সে।

চিঠিটা পড়ে হেসে বলে উঠলো শৈলেন—কত বয়েস রে তোর মেয়ের?

—এই পাঁচ বছর হল!

—বেশ, বেশ! তা—জিনিষপত্রগুলো কিনছিস তো?

—দেখি! জবাব দিল বিজয়।

—দেখি কী রে, তুই তো হপ্তা শেষেই বাড়ী যাস। আজও তো যাবি। দেখবি, না নিয়ে গেলে মেয়েটা কি করে!

মনে মনে ভাবল বিজয়, তা আর তোকে বলে দিতে হবে না। সে আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু মুখে বল্লো—কেন? তুই কি বিয়ে না করেই এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিস?

—হয়তো তাই-ই! বলে হেসে উঠলো শৈলেন।

এবারে বিজয়ও প্রাণভরা হাসি দিয়ে বল্লো, যা-ই বলিস—এর আনন্দই আলাদা।

ঈষৎ পরিহাসের সুরে এবারে বলে উঠলো শৈলেন, তা ভাই যা-ই বলো না—ও বিবাহ আর সন্তানাদির ব্যাপারে 'পরস্মৈপদীই' ভাল, আত্মনেপদীতে অনেক জ্বালা!

এবারে বিজয় আর শৈলেন এক সঙ্গেই হেসে উঠলো।

শনিবারে কাজ করার আগ্রহ প্রত্যেকেরই সাধারণতঃ একটু কম থাকে। বিশেষতঃ, যারা কলকাতার বাইরে থেকে যাতায়াত করে, তাদের তো কথাই নেই। বিজয় অবশ্য কলকাতায়ই থাকতো। কেবল শনিবার বাড়ী গিয়ে আবার সোমবার ফিরে এসে কাজে যোগদান করত। তাই, তার মনটাও আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বর্দ্ধমান যদিও খুব বেশী দূরে নয়, তবুও বিজয়ের মনে হতে থাকলো যেন সেটা কতো দূরে।

কাজ করতে কতোবার যে ঘড়ি দেখলো বিজয়, তার হিসেব নেই। কাঁটা যেন আর চলে না। মেয়েটার চিঠিটাই আজ তাকে বেশী চঞ্চল করে তুলেছে। কেবলই ভাবছে কতোক্ষণে জিনিষপত্রগুলো রূপার হাতে তুলে দিয়ে তার হাসি-মুখ দেখতে পাবে। কাজ-কর্ম্মগুলো সব কোনমতে সেরে, দুটো বাজতে না বাজতেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

রাস্তায় যেতে যেতে রূপার মুখখানাই কেবল তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো। ডাগর ডাগর চোখ দুটো আর তার সুন্দর কচি মুখখানা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে থাকলো তার মনের পর্দ্দায়। অন্যের কাছে রূপাকে দেখতে যেমনই লাগুক না কেন, বিজয়ের কাছে তার সব কিছুই সুন্দর! সব কিছুই আদরণীয়। বাপমায়ের চোখে সন্তানের অরূপটাও রূপ হয়ে ধরা দেয়! সেখানে কোন যাচাই নেই, কোন প্রশ্ন—কোন সংশয় নেই। সেখানে বাবা—বাবা; সন্তান—সন্তান! দু'দিনের না দেখা যেন অনেক দিনের অদেখা বলে বিজয়ের কাছে মনে হচ্ছিলো। যা নাগালে তার প্রতি মানুষের যতো আকর্ষণ থাকে, যা তার নাগালের বাইরে তার প্রতি যেন তার আরো বেশী আকর্ষণ।

বেলা তখন দুটো বেজে গিয়েছে। ফুটি-ফাটা রোদে সমস্ত রাস্তাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। পথচারীর সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। কচিৎ-কদাচিৎ এক-আধজন লোককে, হয় অফিসের কাজে—নয় ঘরের তাড়নায় অধোবদনে রোদে-পোড়া রাস্তা দিয়ে সবেগে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। বিজয়ের অবশ্য অফিসের কাজ অথবা গৃহের তাড়া—এর কোনটাই ছিলনা। তবুও জোরেই হাঁটছিলো সে। অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে বড়বাজারেই গেল। হাওড়া যাবার পথে বলে, সেখান থেকেই জিনিষপত্র কেনা তার পক্ষে সুবিধেজনক এবং তাই করত সে। প্রয়োজন-মত কিঞ্চিৎ দ্রব্যসম্ভার সেখান থেকেই কিনে বাড়ী নিয়ে যেত।

বাজারে ঢুকে প্রথমেই পকেট থেকে মেয়ের চিঠিটা সে বার করল। তারপরে ফিরিস্তির সঙ্গে মিলিয়ে সব কেনা-কাটা করল। জিনিষ তো মাত্র তিনটে—কিন্তু তাতেই তার কতো আগ্রহ, কতো উদ্যম। দেখে বেছে বেছে একটা ভাল ফ্রক বার করে দোকানীকে বল্লো বিজয়—সামান্ আচ্ছা হোগা তো? মেরা একঠো লেড়কিকা লিয়েই এ মোল্‌তা ম্যায়!

গোঁফে তা দিতে দিতে জবাব দিলো দোকানী—লিয়ে যান। সে দেখতে হোবে না। বহুত মজবুতি অউর ফ্যান্সি মাল আছে।

যাহক, সেইটেই কিনলো বিজয়। দাম একটু বেশী হলেও, রূপার পছন্দ হলেই হল। স্নেহ যেখানে বড়—সেখানে ক্ষমতার গণ্ডি-বিচার থাকেনা। সেখানে সাধ্যা-তীতও সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিজয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ফ্রক, খাতা কেনার পর শোন-পাপড়ি কেনার পালা। হ্যারিসন রোডের ওপারেই বড় মিষ্টির দোকান। সেখান থেকেই সে শোন পাপড়ি কিনলো। বাড়ীর আর সবাইর

কথা মনে করে দু'সের রসগোল্লাও না কিনে পারলোনা। এবারে মেয়েকে বেশী খুশী করবে বলে একটা বড় সুন্দর ডল পুতুল কিনে, মেয়ের জিনিষগুলো সব এক সঙ্গে প্যাকেট করল। একহাতে রসগোল্লার হাঁড়ি, আর এক হাতে প্যাকেটটা নিয়ে হাওড়ার দিকে পা বাড়াল বিজয়।

সামান্যই তো দূরত্ব, হেঁটেই পাড়ি দিলো সে।

বিজয়ের সমস্ত সপ্তাহটাই বুঝি এই একটা দিনের পথ চেয়ে বসে থাকে। ছ'দিনের কর্ম্মক্লান্তির শ্রান্তি—এই শনিবারেই লোপ পাইবার জন্যে দিন গণনা করে। শনিবারেই হয় বিজয়ের পুনরুজ্জীবন। আজ সে তার জন্মভূমিতে ফিরে চলেছে, ফিরে চলেছে তার আপন জনের কাছে। যেখানে সে নিজেতে সম্পূর্ণ, সেখানে!

টিকিট কেটে ট্রেণে চড়েছে বিজয়। কিন্তু সময় যেন তার আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। প্রতিটি মুহূর্তই যেন আর ফুরোবেনা বলে তার মনে হচ্ছে। অধীর হয়ে মনে মনে বলে উঠছে সে, দূর ছাই! ছাড়েনা কেন ট্রেণ! বিজয় সাধারণ মনুষ, সাধারণ চাকুরে! তার আশা ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র—সংগতিও সামান্য! তবুও সেই ক্ষুদ্রত্বকে অবলম্বন করেই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে বিজয়! সকল নিরাশার মধ্যেও আশার পথ চেয়েই সে বসে আছে। মাকড়শার জালের মতোই হয়তো একদিন তার আশার জাল দুঃখের আঘাতে ছিন্ন হয়ে উধাও হয়ে যাবে; হয়তো মনের কোণ থেকে সে আশার জাল পাকিয়ে টেনে বার করে আনবে দারিদ্র্যের বাস্তবতা! তবু—সেও তো মানুষ, —তারও তো সাধ আছে। মনের পর্দ্দায় কতো যে রঙ্গিণ স্বপ্ন দেখেছে সে তার হিসেব নেই। আজও ভাখে সে—ভবিষ্যতেও দেখবে। একশ পাঁচটাকা মাইনে দিয়ে পাঁচটা মানুষের উদর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভরণ-পোষণই সাধ্যাতীত ভাবে মেটাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও —বিজয় ভাবে, দুটো দিন যাক। মাইনে বাড়ুক—তখন নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশী স্বচ্ছলতা আসবে। তার আশা, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে, গান শেখাবে। রূপাকে সে গোবরের মধ্যে পদ্মফুল করে তুলবে। সে হবে তার আদরের, সকলের গর্ব্বের!

সেদিনও ট্রেণে বসে তেমনি ভাবছিল বিজয়। ভাবছিল, আর ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে পড়ছিল। ট্রেণের কামরা তখন যাত্রীতে ভরা—কিন্তু বিজয়ের সেদিকে খেয়াল ছিলোনা। আপন চিন্তাতেই সে তখন আত্মহারা। ভাবতে ভাবতে হেসেছিল সে—কেঁদেও ছিল। কেউ তা খেয়াল করেছিল, কেউ করেনি। যারা বিজয়ের সেই স্বতস্ফূর্ত্ত ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিল—তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় পাগল!

সে যাই হক, ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিজয়, তা সে টের পায়নি। যখন ঘুম ভেঙ্গেছে তখন দেখেছে, যে পাশে-বসা ভদ্রলোকের ঘাড়ে ঘুমে ঢুলে পড়েছে সে—আর ভদ্রলোক ঠেলা দিয়ে তাকে বলছেন—আরে! ও মশাই! সোজা হয়ে বসুন—একেবারে গায়ের পরে যে!

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে—জবাব দিয়েছিল বিজয়— একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

—ঘুমোন না! কে বাধা দিচ্ছে। তা বলে একেবারে গায়ে শুয়ে পড়ে—বলেছিলেন ভদ্রলোক।

বিজয় আর কোন কথা বলেনি। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভাবনার রাজ্যও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর কথা, সংসারের কথা, ধবলী গরুটার কথা, চাকর রামদাসের কথা—সর্ব্বোপরি রূপার কথা আবার ভাবতে আরম্ভ করেছিল সে। এ এক বিচিত্র ভাবনা! সংসারী মানুষ হলে, এসব না ভেবেও পারা যায় না। কখন কি ভাবে যে এ সব ভাবনা চোরের মত গোপনে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যে—তা বলা শক্ত। তবু, এর অস্তিত্ব যতদিন আছে—প্রতিক্রিয়াও আছে।

বর্দ্ধমানে ট্রেন পৌঁছুতে তখন আর মিনিট পাঁচেক বাকি। ইঞ্জিনের গতি কমে আসতে থাকলেও, বিজয়ের বুকের স্পন্দনের গতি কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। বারবারই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলো সে, আর কত দূর!

গাড়ী তখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ঢুকেছে। রেলগাড়ীর হুইশেলের অনুরণনে ষ্টেশনটা যেন কেঁপে উঠছে। বিজয়ের কানে এলো, সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর, চাই…চা গরম্।

পান-সিগারেট। ভালো মিহিদানা-সিতাভোগ চাই! ইত্যাদি নানা মানুষের নানা সুরের খণ্ড বিখণ্ড অনুনয় আহ্বান। গাড়ী যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা দুলে উঠলো।—এসে গেছি তাহলে! ভাবতে ভাবতে একরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাকেট আর রসগোল্লার হাঁড়িটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে পড়ল বিজয়। এতক্ষণ তার সে মন বর্দ্ধমানে পৌছুবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সত্যি-কারের নাগালের মধ্যে পৌছে কিন্তু সে মন নেতিয়ে পড়ল; পা দুটো যেন আর চলতে চাইছিল না বিজয়ের। আশা-আনন্দের এক তরফা মিছিল তার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিকে রোধ করে দাঁড়িয়েছিল—ধীরে ধীরে ষ্টেশনের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়াল সে। জন্মভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে চারদিকে তাকাল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একবার আপন মনেই হেসে উঠলো বিজয়। মনে পড়ে গেল তার মেয়ের কথা। এখনই তো একটু পরে—প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে সে।

তখন সূর্য্যদেব এপার-কে আঁধার করে—ওপারের পথে এগিয়ে গিয়েছেন—আলোয় ভরে তুলতে। সন্ধ্যে তখন। প্রায় সাতটা বাজে। পাতলা অন্ধকারে ঢাকা সমস্ত বর্দ্ধমান সহর। বিজয়ের চোখে কিন্তু আলো জ্বলছিল—আশার আলো, তার প্রিয়গণকে দেখার আনন্দের আলো।

এবারে রিক্সা চড়ার পালা। আস্তে এগিয়ে গেল সে রিক্সা-স্ট্যাণ্ডের দিকে। পরিচিত রিক্সা-চালক নবেন্দুকে দেখেই বল্ল বিজয়, চল্ রে!

নবেন্দু বল্ল হেসে—ভাল আছেন বাবু?

আরাম করে গদিতে বসে, জবাব দিল বিজয়—এই আছি একরকম। তোর খবর কি?

নবেন্দু বল্ল—খবর ভাল নয় বাবু। সংসারে বড্ড টানাটানি। যা আনি, তাতে পোষায় না।···আমাদের আর ভাল থাকাথাকি কি, আজ আছি তো কাল নেই। ভাল থাকবেন আপনারা—ভদ্দর বাবুরা।

এবারে একটা বিড়ি ধরিয়ে, তাতে আরাম করে একটা টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করল বিজয়—তা হ্যাঁরে, আমার বাড়ীর খবর জানিস? মেয়েটার খবর কিছু রাখিস-টাখিস?

—কার খবর বাবু? রূপা মা'র!

—হ্যাঁরে! তার!

—না বাবু, ওদিকে এ হপ্তায় আর যাওয়া পড়েনি। সেই গত শনিবার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, আর আজ যাচ্ছি।

বিজয় বল্লো এবারে—নে—এখোন চল তাড়াতাড়ি।

—হ্যাঁ, যাই বাবু। বলে জোরে রিক্সা চালাতে থাকলো নবেন্দু।

(খ)

বিজয়ের স্ত্রী বিজয়কে যেদিন চিঠি লিখেছে, সেদিন বিকেলেই হঠাৎ আছাড় খেয়ে বুকে-মাথায় দারুণ আঘাত পেল রূপা। বিভ্রাটটা ঘটিয়েছিল একটা কলার খোসা। জোরে দৌড়ে আসতে গিয়ে, কলার খোসায় পা পড়ে আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল রূপা—মাথা কেটে, হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়ল তার।

ডাক্তার এসে বল্ল, বুকেই খুব বেশী চোট লেগেছে। হার্টটাও বড্ড দুর্ব্বল।

বিজয়ের স্ত্রী বন্দনা উদ্বেগের সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—ভয়ের কিছু নেই তো?

—না, তেমন কিছু নেই। তবে, জ্ঞানটা যে কেন ফিরে আসচে না তা বুঝচি না। যাক্—ঔষধ তো দিয়ে-ছি।

বন্দনা এম্নিতেই খুব ঘাবড়ে যায় নি, তার ওপরে ডাক্তারবাবুও তেমন কিছু না বলায় সেদিন আর সে বিজয়কে খবর পাঠানোর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করল না। ভাবলো, কালই তো আসছেন! শুধু শুধু খবর জানিয়ে ব্যস্ত করা ঠিক হবে কি!

রাত্রের দিকে আর একবার ডাক্তারবাবু এলেন। তখনও রূপার জ্ঞান ফেরেনি। এবারে আরো ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বল্লেন, ঠিক বুঝতে পারছিনা কেসটা। শেষে ব্রেণে হেমারেজ হল না তো? মনে তো হচ্ছে বুকেই লেগেছে!

বন্দনার ছোট দেওর অনন্তই ডাক্তারবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলো। সে শুনে জিজ্ঞাসা করল—কি বুঝছেন, আর কাউকে কনসাল্ট করবেন?

—না, তেমন কিছু বুঝছিনা। তবু কেন যেন একটু কিন্তু-কিন্তু লাগছে! দেখা যাক—রাতটা তো যাক!

বন্দনাও সব কিছু শুনলো। ভাবলো, ডাক্তারদের সব কিছুই বেশী বেশী। এই বল্ল, ভয় নেই—এই আবার অন্যরকম বলছে।

যাই হ'ক, সে রাত্রে কেউ না ঘাবড়ালেও—পরের দিনও যখন রূপার জ্ঞান ফিরে এলো না, তখন সকলেই ঘাবড়ে গেল। ভোরবেলা ডাক্তারবাবুকে ডাকাল বন্দনা। ডাক্তারবাবু এসে নাড়ি দেখে—উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লেন—কনডিশন সিরিয়স! এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

এবারে বন্দনা ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি দেওর অনন্তকে পাঠিয়ে দিল পোষ্টাফিসে, বিজয়কে আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে যে খবর পাওয়া মাত্র যেন বাড়ী চলে আসে সে। সকাল তখন ছ'টা। সাইকেলে চড়ে পোষ্টাফিসে ছুটলো অনন্ত। আরজেণ্ট টেলিগ্রামও করল সে।

দুঃখের বিষয় টেলিগ্রাম গিয়ে যখন বিজয়ের মেসে পৌঁছুলো, তখন সে বাড়ীর পথে—ট্রেণে।

এদিকে রূপার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকলো। ডাক্তারবাবু বারবারই বলতে থাকলেন, এখুনি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন—নইলে রোগী সার-ভাইভ্ করবে কিনা সন্দেহ। প্রাচীনেরাও বলতে থাকলেন, সময়টা খারাপ! একে অমাবস্যা তায় শনিবার। মনে হয়, হাসপাতালে নেওয়াই দরকার। লক্ষণগুলো ভাল ঠেকছে না।

এবারে অসম্ভবভাবে ঘাবড়ে গেল বন্দনা। একবার বৃদ্ধা শাশুড়ী ও আর একবার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলো সে, কি হ'বে মেয়ের, বাঁচবে তো রূপা? একমাত্র সন্তান তার, তায় স্বামী অনুপস্থিত; অসহায় অবস্থার চূড়ান্ত উপলব্ধি তাকে বিব্রত করে তুল্লো। বিবাহিতা মেয়েদের কাছে স্বামীই তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। গাছের শিকড়ের মত যে সে তাকেই অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেখানেই তার বাঁচবার খোরাক, সেখানেই তার বৃদ্ধি। তাই বন্দনার পাশে আর সবাই থাকা সত্ত্বেও তার মনে হতে থাকলো, কে যেন নেই তার পাশে। সবাই থেকেও কেউ নেই।

রূপাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে গাড়ী আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বলে উঠলো—জ্ঞান ফিরেছে! জ্ঞান ফিরেছে রূপার।

হ্যাঁ, সত্যিই রূপার জ্ঞান তখন ফিরেছে। ডাক্তারবাবু সেখানেই ছিলেন। সাবধানে রূপাকে ষ্টেথস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, মনে হয় ডেন্‌জারটা কেটে গেল। ন্যাচারাল রেসিসটেন্সের জোরেই অনেক সময় অসুখ সারে। আমার মনে হয় এটাও সেরকম কিছু।

বেলা তখন দুটো। ভাল করে চোখ মেলে তাকাল রূপা। বেশ কষ্টসাধ্যভাবে তাকিয়ে তার মাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল সে, বাবা কই?

বাবা-অন্ত প্রাণ মেয়ের। তাই তার বাবাকেই সে প্রথম স্মরণ করল। সে জানে যে আজ শনিবার, তার বাবার আসার দিন। তাই তার এই জিজ্ঞাসা।

সকলেই তখন উৎসুক হয়ে রূপার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। রূপা দেখেছে তাদের। কিন্তু কিছু বলেনি। কেবল আবার জিজ্ঞাসা করেছে, কই, আমার বাবা কই?

বন্দনা তখন মেয়ের পাশেই বসে। আকুল উচ্ছ্বাসে জবাব দিল সে, এই আর কিছুক্ষণ পরেই আসবেন। লক্ষ্মী মা আমার, চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করো।

রূপা বল্ল—কে? মা! বলেই আবার কাতর স্বরে বলে উঠলো সে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে মাগো! বাবা কই, বাবা এলে সব সেরে যেতো!

ডাক্তারবাবু তখনও ছিলেন সেখানে। এবারে আর একবার ভাল করে রূপাকে পরীক্ষা করে, যাবার জন্যে উঠে পড়ে বল্লেন—এখন অবস্থা ভালর দিকে। এক রকম আউট অফ ডেনজারই। এ যাত্রা বেঁচে গেল মেয়েটা। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি! বলে চলে গেলেন তিনি।

মুখে হাসি ফুটে উঠলো বন্দনার। গভীর আঁধারের মধ্যে যেমন সামান্যতম আলোও স্পষ্ট দর্শনীয় হয়ে ওঠে, তেমনি ওই দুঃখের পরিবেশে বন্দনার প্রাণস্পর্শী হাসিও সকলেরই দৃষ্টিগোচর হল। বুকে আবার বল ফিরে এলো বন্দনার। দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তায় ভরপুর সমস্ত বাড়ীটা এবারে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আশ্বস্ত হল।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ হল চলে গিয়েছেন। বন্দনা একমনে বসে তখন মেয়ের মাথায় জল পট্টি দিচ্ছে, আর

পাথার বাতাস করছে। অনন্ত রূপার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্কুলের ফুটবল ম্যাচের কথা চিন্তা করছে।

তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। রূপা একটু ঘুমিয়েছিল। সহসা জেগে উঠে, বেশ একটু উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করল সে—কি হল, বাবা কি আসবেন না?

বন্দনাও একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। গত কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি—তাই মেয়ের মাথায় পাথার বাতাস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ সাড়া পেয়ে, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে বললো—কি! কী হয়েছে মা?

চোখের জল ফেলে বলল রূপা, বাবাকে যে বড্ডো দেখতে ইচ্ছে করছে!

—এই তো, এলেন বলে! জবাব দিলো বন্দনা।

এবারে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল রূপা, মা! আমাকে একটু ধরো। আমি দাঁড়াব।

শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলো বন্দনা, করিস কি মা! শুয়ে থাক। নাড়াচাড়া করতে ডাক্তারবাবু একেবারে নিষেধ করেছেন।

কি হল কে জানে। আকস্মিকভাবে রূপা তার মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো—বাবা কই? বলেই বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

বন্দনা মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি রে! কি হল? অমন করে শুয়ে পড়লি কেন?

রূপা কিন্তু কোন সাড়া দিল না।

বন্দনা এবারে রূপার গায়ে ভাল করে হাত বুলিয়ে, মাতৃসুলভ সমবেদনায় আস্তে বলে উঠলো—আবার অজ্ঞান হয়ে গেলি! বলেই ব্যস্ত হয়ে বাইরে এসে চেঁচাতে থাকলো, মা! মাগো! রূপা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

ততক্ষণে আরো অনেকে এসে হাজির হয়েছে সেখানে।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বাড়ীর খুব কাছেই তাঁর ডাক্তারখানা। ফলে আসতে দেরী হয়নি তাঁর। উদ্বেগজনিত অন্যমনস্কতার সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, প্রথমেই রূপার হাতের নাড়ি টিপে ধরলেন ডাক্তারবাবু। উদ্বেগের চিহ্ন আরও বেড়ে গেল তাঁর মুখে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে বুকে ষ্টেথো লাগালেন। এবারে ব্যর্থতার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার সমস্ত হাবভাবে। অবনত-মুখে সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেলেন—সব শেষ হয়ে গিয়েছে। পারলাম না বাঁচাতে! বলতে বলতে সজল-চোখে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বন্দনা বিশ্বাস করতে পারলো না সে কথা। ওরে রূপারে! বলে একবার বুকফাটান চিৎকার করে—বলতে থাকলো সে—না! না!—না ডাক্তারবাবু! এ অসম্ভব, আপনি ভুল বলছেন। ভাল করে আবার দেখুন। রূপা বেঁচে আছে, আমি বলছি রূপা বেঁচে!

ডাক্তারবাবু ততক্ষণ বোধহয় তাঁর ডাক্তারখানায় ফিরে গেছেন।

বন্দনা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনা যে তার এক-মাত্র সন্তান তখন মৃত। রূপাকে কোলের মধ্যে তুলে নিয়ে, বার বার তার বুকে কান দিয়ে বলতে থাকলো সে—ওইতো! ওইতো ধুক ধুক করছে। বল্লেই হল! ডাক্তার-বাবুরা সব কী!

ওদিকে তখন ক্রন্দনের রোল উঠেছে।

* * * *

বিজয় এসে যখন বাড়ী পৌছুলো তখন রূপাকে বাইরে বার করে আনা হয়েছে। বন্দনা তখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। পাড়ার কে একজন ভদ্রমহিলা তার চোখে মুখে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

কান্নার শব্দ অনেক দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিলো। বিজয়ও রিক্সায় আসতে আসতে সে কান্না শুনতে পেয়ে-ছিলো। পেয়ে, জিজ্ঞাসা করেছিল সে নবেন্দুকে, হ্যাঁরে! কাদের বাড়ী কান্নাকাটি পড়েছে রে? কেউ ম'ল নাকি?

ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিল নবেন্দু—কে জানে বাবু। কতোই তো মরছে।

তারপরে বাড়ীর কাছে এসে চমকে উঠেছিল বিজয়। এতো আমারই বাড়ী থেকে, বলতে বলতে রিক্সা থেকে নেমে কেবল প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল সে। রসগোল্লার হাঁড়িটা রিক্সার পাদানিতেই তখনও পড়েছিল।

অনন্ত তার দাদার পথচেয়েই দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদ-ছিলো। বিজয়কে আসতে দেখে এবারে একেবারে হাউ-

হাউ করে কেঁদে বলে উঠলো সে, দাদাগো—একী সর্ব্বনাশ হল!

—কেন, কি হয়েছে? তখনও লাস দেখে নি বিজয়। তাই জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে যেই চাদর-ঢাকা ছোট্ট বস্তুটা তার নজরে পড়েছে, অমনি অবর্ণনীয়ভাবে কেঁপে উঠে আবার জিজ্ঞাসা করেছে সে, কে? কে মরেছে রে? অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল অনন্ত—দাদা! রূপা, রূপা আর বেঁচে নেই।

—রূপা! কী বলিস্! বলে হাতের প্যাকেটটা মাটিতে ধপ্ করে ফেলে দিয়ে, পাগলের মত ছুটে গিয়ে চাদরের ঢাকাটা সরিয়ে দিল বিজয়। এবারে রূপার মৃতদেহ দেখে কেমন করে যেন শিউরে উঠলো সে। উঃ! বলে একবার বুক চাপড়ে—চাপা আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলো, এ আমি কি দেখছি! এ সত্যি, না স্বপ্ন! মা, মা আমার—সাড়া দে। চুপ করে থাকিস নি। এই ত্যাখ চেয়ে, আমি—আমি এসেছি! বুকের কোন্ অন্তরাল থেকে যেন একটা কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে বিজয়ের কণ্ঠস্বরে এসে আবার হারিয়ে যেতে থাকলো। মৃত্যু যে এতো নিষ্ঠুর হতে পারে—তা এর আগে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি বিজয়। তার সমস্ত চেতনা লোপ পেতে চাইলো। জীবন্মৃতের মত নির্জীব নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে বসে থেকে—শোকের আগুনে নিজেকেও আহুতি দিতে থাকল সে।

বিজয়ের মুখখানা তখন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। দুঃখের আঘাত বড় নিদারুণ। অতি বড় প্রলয়ের চেয়েও প্রলয়ংকর। এ অভাবনীয় অবস্থায় পড়ে হতবাক হয়ে পড়ল সে। তার প্রতি শিরা-উপশিরা তখন জলে উঠেছে; সন্তান-হারা পিতার হাহাকারে ভরে উঠেছে তার সমস্ত অন্তর। কাঁদতে চেষ্টা করেও কাঁদতে পারলোনা সে। সব শুকিয়ে গেছে—শোকের আগুনে পুড়ে সব খাঁ খাঁ করছে। চোখে জল আসবে কোত্থেকে! সবই যে তখন জ্বলছে—আর জ্বলছে।

অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাকুলতায় মেয়েটাকে কেবল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো বিজয়। ধ্যানমগ্ন সাধুর মত, সমস্ত পিতৃসত্তাকে একত্রীভূত করে প্রায় একঘণ্টা মেয়েকে বুকের মধ্যে ধরে রাখলো। তারপরে নিজেই একসময়ে বল্লো, চলো, যাত্রা করি। অনেক তো দেরী হয়ে গিয়েছে।

প্যাকেটটা বগলদাবা করে, সমস্ত রাস্তাটা মেয়েকে বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরে শ্মশান পর্য্যন্ত হেঁটে গেল বিজয়। নিজের হাতে চিতা সাজিয়ে, মেয়েকে তাতে চড়িয়ে—বগল থেকে প্যাকেটটা বার করে সেটা রূপার বুকের ওপরে রেখে—ভাল করে শেষবারের মত একবার মেয়েকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলে। অপলক দৃষ্টিতে, রূপার ঝরা-ফুলের মত শুকিয়ে-যাওয়া মুখখানার দিকে, চেয়ে রইলো বিজয়। অনেকক্ষণ বাদে তার দু'চোখের জল টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ল। এবারে উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলো সে—শেষে এই তোর মনে ছিলো মা!

রাত তখন অনেক। জল ঢেলে চিতার আগুন তখন সবে নেভান হয়েছে। সবাই কাঁদছে। কাঁদছে না কেবল বিজয়।

মেয়ের চিতার আগুন নিভে গিয়ে তখন তার বুকে জ্বলে উঠেছে।



মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী

সুধাংশু বশিষ্ঠ

উনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত বঙ্গনারী বঙ্গ-সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন স্বর্গতা কবিরাণী গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁদের একজন। সুষ্ঠু প্রকাশ-ভঙ্গী ও রচনার মৌলিকতায় গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁদের অন্যতম না হ'লেও—প্রতিভাশালিনী। যে সাবলীলতা, যে অনাড়ম্বর নিরাভরণতা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা একজন বৈদগ্ধ্যহীন কবির পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার লেখক অমর গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর অভ্যুদয় এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।...এই চারিজনের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনীর স্থান আরও বিশিষ্ট; স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারের কন্যা, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রচলিত ধারার সহিত উভয়েই কিছু কিছু পরিচিত ছিলেন। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী নারীমনের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার আবেগের কেন্দ্র মূলতঃ তাঁহার স্বামী। তাঁহার পরিবেশ মূলতঃ গৃহসংসার-পরিবেশ।"

অসামান্যা প্রতিভাশালিনী গিরীন্দ্রমোহিনী জীবনের ফুটন্ত কৈশোরে যখন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'লেন তখন সাহিত্যরসিক সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেদিনের মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার কর্ণধারেরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকে। ভারতী, সাহিত্য, বালক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল স্বামীপ্রেমে-সিক্ত সুরের বিচিত্র কাব্য।

পুণ্যভূমি কলকাতার এককোণে ভবানীপুরের মাতুলালয়ে ১২৬২ বাংলার ৩রা ভাদ্র গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। পিতা ৺হারাণচন্দ্র মিত্রের আদি বাসভবন ছিল পূজ্যপাদ নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত চব্বিশ-পরগণার পাণিহাটি গ্রামে।

শৈশবের বসন্তমধুর দিনগুলো বিদ্যাশিক্ষা আর নানা বিষয় চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন মজিলপুরে। শিক্ষার প্রতি অসীম অনুরাগ, পরদুঃখকাতরতা ও শান্তিপ্রিয়তা—এই তিনটি সৎগুণের ঐশ্বর্য্যশালিনী গিরীন্দ্রমোহিনী চিত্তের তৎপরতা বশে বাড়ীর বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ চর্চায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

শৈশবে শিক্ষকের নিকট গিরীন্দ্রমোহিনী ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করেন।

শৈশবে তাঁর কাব্যানুরাগ পরিস্ফুট হয়েছিল—এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাঁকে ঐ সময় নাম জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে বলতেন—

আমার নামটি বাবু চাঁদা
পাখি মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা।

(চরিতমালা)

পিতা ৺হারাণচন্দ্র মাঝে মাঝে স্বরচিত ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদ করে শোনাতেন। স্বভাব কবি গিরীন্দ্রমোহিনী বিদেশী কবিতার ভাবানুসরণে এক কবিতা লেখেন—যা 'তপোবন' নামে 'ভারত-কুসুমে' প্রকাশিত হয়। এছাড়া বহু ইংরাজী কবিতার অনুবাদ শুনে এবং 'কোকিল দূত' 'মহানাটক' 'কবিকঙ্কণ' প্রভৃতি পাঠ করে তাঁর কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হয়ে ওঠে।

দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয় তদানীন্তন কালের জমিদার অক্রুর দত্তর বংশধর নরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে।

বিবাহ বন্ধন তাঁর কাব্যানুরাগে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি এই সময় প্রতিভাকে বিভিন্ন দিকে বিকাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বসুমতী লিখেছিলেন, "যে যুগে হিন্দুনারী অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুর-আবদ্ধা থাকিয়া সমাজের সহিত—বিদ্যাচর্চার সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইবার সুযোগ পাইতেন না—সেই যুগের আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে শিক্ষিতা বর্দ্ধিতা মহিয়সী নারী তিনি, সামাজিক বাধা তাঁহার উচ্চ শিক্ষার —বিদ্যানুশীলনের—সৎ-সাহিত্য আলোচনার প্রতিভাবিকাশ-সাধনায় পথরোধ করিতে পারে নাই।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার'। তবে ইতিপূর্ব্বে স্বামীকে পদ্যে-পদ্যে লেখা কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' নামে একত্রিত করিয়া তিনি প্রকাশ করেন। প্রয়োজন-বোধে এইরূপ একটি পত্রের কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

পরমপূজ্য-প্রণয়পবিত্র প্রাণবল্লভ

স্বধর্ম্ম পরিপালকেষু—

শ্রীযুক্ত......

প্রাণেশ্বর!

অদ্য তিন দিবস হইল আপনার বদন শশধর অদর্শনে এ অবলার

হৃদয়গগন ঘোর চিন্তাতিমিরাবৃত আছে। মঙ্গল সমাচার দানে চিন্তা-তিমির দূরীকৃত করিবেন।

*　　*　　*　　*

গত ত্রিরজনী　　ওহে গুণমণি,
না পেয়ে সংবাদ।
হায় মোর মন　　ভাবে সর্ব্বক্ষণ
ঘটিল এ কি প্রমাদ॥
হয়ে কুলনারী　　সরমেতে মরি
জিজ্ঞাসিতে নারি কারে,
প্রাণপতি!　　তবে কিসে সতী
সমাচার পেতে পারি।
যাহা হউক ভাই　　এই ভিক্ষা চাই
ঈশ্বর সদনে আমি।
থাক যেইখানে　　রেখ মোরে মনে,
কুশলে থাকহ তুমি॥

কলিকাতা　　অনুগতা
বহুবাজার　　শ্রীমতী···

১৫ই কার্ত্তিক ১২৭৭

গিরীন্দ্রমোহিনীর যখন প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। ১২৯০ সালে স্বামী নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১২৯৪ সালে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুকণা' প্রকাশিত হয়। স্বামীর প্রতি ভালবাসার বশে তাঁর মৃত্যুর পরে অশরীরী আত্মার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে এক বাসনা এই কাব্যের কবিতাগুলোর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কবি নিজেই ভূমিকায় বলেছেন, 'সংসার সুখের অভিলাষীর এ শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে?'

এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা,
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা,
এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন॥

প্রায় কবিতাগুলো স্বামীবিরহজনিত, এছাড়া কতকগুলি কবিতায় গ্রাম্য পরিবেশের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

মাটিতে নিকানো ঘর,　　দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খড়ো চালখানা ছাঁটা,　　লতিয়া করোলালতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান॥

জীবন প্রভাতে দেখা পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ—ছায়া-ঘেরা গ্রাম কবির স্মৃতির পটে আঁকা রয়েছে। বিরহ সাগরে ভেসে জীবন প্রভাতের দিনগুলোর কথা স্মরণ করেছেন। কবির অধিকাংশ কবিতায় এরূপ শান্ত স্নিগ্ধ সুরের পরিচয় পাওয়া যায়, মনে হয় কবি নিতান্তই 'প্রকৃতি-পালিতা।

কবির কবিদৃষ্টি কতো সহজ! নিছক বাস্তবের রূঢ়তা মানুষের মনে একই প্রশ্নের ঝড় তুলে আসছে—আর জীবনের একই সার্ব্বজনীন পরিণতি জেনেও মানুষের প্রেম-অর্থ-যশের জন্য ব্যাকুলতা কবিহৃদয় অনুভব করেছেন—

জীবনের পরপার নাই,
মানবের পরিণাম ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন,
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।
নিশ্বাস ফুরালে আমি ছাই,
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই॥

আবার— ছাই যদি শেষেতে সকল
কেন তবে তুই অশ্রুজল?
ছাই যদি মানব জীবন,
তবে করি ছাই আভরণ!
যতটুকু দেহে আছে প্রাণ,
রসে রসে গাই ছাই গান!

গিরীন্দ্রমোহিনী সেই ধরণের কবি, যিনি কবিতা লিখতেন শুধু কবিতাকে ভালবাসতেন বলেই—আর গভীর সুরে ঘরোয়া কথা বলতে চেয়েছেন বলেই। কবি হৃদয়ে দুঃখ নিয়েই চিরদিন কাটিয়েছেন, অতএব তাঁর কবিতাগুলোর অধিকাংশই নিছক দুঃখের কবিতা হয়ে পড়েছে। অনেকের মনে হবে—তিনি পৃথিবীকে মৃত্যুর সমান দেখে গেছেন। কিন্তু, অসহায়ের মত দেখেননি; মৃত্যুজয়ের দুঃসাহসিক বাণী প্রচার করে গেছেন—

সাধের তরীখানি বটে ডুবে গেছে জলে,
বাকী আর যাহা আছে, তাও যদি যায় চলে,
তথাপি তোমার দান অমূল্য বিশ্বাস মণি,
তাহারি পরশ বলে হব নিত্য ধনী।

*　　*　　*

এই বিশ্বাস আছে মনে, নাই তাই মৃত্যুভয়
জীবন মরণ সখা! জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়!

গিরীন্দ্রমোহিনী স্বভাবকবি! কবিমনের উচ্ছাসবশতঃ তিনি কবিতা লিখেছেন, কবিতাগুলোর অধিকাংশই অহেতুক অনুপ্রাসের ঘনঘটা-বর্জ্জিত।

আজ অত্যন্ত দুখের বিষয় আমরা অনেকেই তাঁকে ভুলে গেছি—ভুলে গেছি তাঁর সৃষ্টিকে। শ্রদ্ধেয় বসুমতী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর অসংখ্য কবিতা গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করে যথেষ্ট উপকার করেছেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এইখানেই শেষ করছি।

বাঙলা ভাষায় সংস্কৃতের অবদান

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের এই বাঙলা ভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টিতে সংস্কৃতের অবদান কতখানি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সকলেই জানেন বা ব্যাকরণে পড়েছেন বাঙলা ভাষায় সাধুশব্দ বলতে যা বোঝায় তার অধিকাংশই সংস্কৃত হতে আহরণ করা। যে সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে বাঙলাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের আধুনিক নাম হচ্ছে 'তদ্ভব' শব্দ। আমরা যখন বাঙলায় 'চন্দ্র' লিখি, তখন সেটি হয় তদ্ভব শব্দ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সংস্কৃত শব্দকেই বাঙলা শব্দ বলে চালিয়ে নিয়েছি! কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের কর্তৃপদকেও আমরা শব্দ রূপেই গ্রহণ করেছি। আমরা যখন নর, মুনি, সাধু, জল, পতি, স্ত্রী লিখি, তখন আমরা সংস্কৃত শব্দকেই বাঙলা শব্দরূপে স্বীকার করে থাকি। কিন্তু যখন সখা, দাতা, ভ্রাতা, ভগবান, আত্মা, বণিক্, জ্ঞানী ইত্যাদি লিখি, তখন সংস্কৃত শব্দের কর্তৃপদকেই আমরা বাঙলা শব্দ বলে মনে করে থাকি। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের অন্য কোন কারকসূচক পদকে আমরা বাঙলায় তৎসম শব্দ বলে মেনে নিতে সম্মত নই। বাঙলা ভাষায় 'ভগবান্', 'দাতা' প্রভৃতি এক একটি শব্দ। কিন্তু 'ভগবন্তম্' 'দাতারম্' এক একটি শব্দ নয়। যদি ভাষায় কোথাও ভগবন্তম্, দাতারম্ দেখতে পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ওগুলি নিছক সংস্কৃত বুলি, বিশেষ কারণে বাঙলা ভাষায় সাঁদ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মজা এই যখন ভগবান্ দাতা, সখা, আত্মা প্রভৃতি সংস্কৃতের কর্তৃপদী শব্দের গায়ে অন্য শব্দ বসিয়ে যৌগিক শব্দ গঠনের আবশ্যকতা হয়, তখন মূল সংস্কৃত শব্দকে আবার ডাক পড়ে। এইজন্য যেমন আমরা একদিকে লিখি, ভগবান্, দাতা, সখা, আত্মা ইত্যাদি, আবার আর একদিকে লিখতে হয়, ভগবৎপ্রেম, দাতৃগণ, আত্মদর্শন, সখিসুলভ ইত্যাদি।

আরো একটা কথা বলবার আছে। নিত্য-ব্যবহার্য অনেক সংস্কৃত শব্দের, এক, দুই বা ততোধিক প্রতিশব্দও থাকে। আমরা সংস্কৃত হতে শব্দের সঙ্গে প্রতিশব্দও আহরণ করেছি—মুখের সঙ্গে নিয়েছি, আনন, বদন, আস্য ইত্যাদি; চন্দ্রের সঙ্গে নিয়েছি, শশী, শশধর, নিশাকর, চন্দ্রমা, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি। যেমন, একই প্রকার তরকারী যত উপাদেয়ই হোক—বার বার খেতে ভাল লাগে না, সেই কারণেই বাঙলাভাষায় প্রাচীন সাহিত্যাচার্যগণ, কেবল মুখ বদলাবার জন্য সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে তাদের প্রতিশব্দ সকলও স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আবার বাঙলা ভাষার ক্রিয়াগুলিও যে সংস্কৃত ক্রিয়ার তদ্ভব বিকাশ, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। এখানে 'শয়ন করা', 'ভোজন করা', 'গমন করা', প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ার কথা বলছি না—এরা ত স্রেফ্ সংস্কৃতের নকল। যাদের আমরা বাংলা ক্রিয়া বলি, তারাও যে সংস্কৃত ক্রিয়ার তদ্ভব পরিণতি, তা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেই বেশ বোঝা যায়। হতে পারে সংস্কৃত ক্রিয়া নানা ঘুরপাক খেয়ে এবং নানা 'টেষ্ট টিউবের' মধ্য দিয়ে এসে বাঙলা ক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু বাঙলা ক্রিয়াও যে সংস্কৃত-ভিত্তিক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যদি তা না হত, উভয় ভাষায় ক্রিয়ার আদ্যক্ষর প্রায় একই হতো না। শৃণোতি—শোনে, খাদতি—খায়, তিষ্ঠতি—থাকে, আস্তে—আছে, পঠতি—পড়ে, শেতে—শোয়—এইসব হতে সহজেই প্রমাণিত হয় বাঙলা ক্রিয়া সংস্কৃত ক্রিয়ারই অপভ্রংশ। ক্রিয়া বিশেষণের বেলায়ও ঐ কথা, যেমন—যদা—যখন, তদা—তখন, যত্র—যেথায়, কুত্র—কোথায়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, একই ধাতু বা শব্দের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়, তবে উচ্চারণের কতকটা সামঞ্জস্য থাকে। যেমন—ভয় ও ভীতি, পরিচয় ও পরিচিতি (এগুলি হল ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয়) আবার—মধুরত্ব, মধুরতা, মাধুর্য, মধুরিমা, মাধুরী (এগুলি হল শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়)। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতের এই বিশেষত্বটুকু ধরে ফেলেছেন এবং প্রচলিত প্রাচীন শব্দগুলোকে নূতন আকারে পরিবর্তিত করে সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করছেন। তাই আজ, 'পরিচয়ের' বদলে দেখতে পাই 'পরিচিতি', সংস্কারের স্থানে 'সংস্কৃতি', 'রূপান্তরিত'র স্থানে 'রূপায়িত ইত্যাদি'। আবার কোন কোন স্থলে একশব্দের পরিবর্তে আর একশব্দ, হয় সংস্কৃত অভিধান হতে আহৃত, না হয় সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত হচ্ছে। যেমন—'প্রতিষ্ঠানের' বদলে 'সংস্থা', 'শিক্ষয়িত্রীর' বদলে 'শিক্ষিকা', 'স্বীকার্য' এর বদলে 'অনস্বীকার্য' ইত্যাদি। উপসর্গের সাহায্য নিয়েও প্রাচীন শব্দের নবীন রূপ দান করা হচ্ছে। যেমন—প্রদানের বদলে 'অবদান', 'পরীক্ষার' বদলে 'নিরীক্ষা,' ইত্যাদি। বৃদ্ধা বাঙলা ভাষার মধ্যে এই ভাবে নূতন রক্ত সাঁধ করিয়ে দিয়ে ভাষাকে আরো তেজীয়ান, আরো

কর্মপটু, আরো গুরুভার-বহনক্ষম করে তোলা হচ্ছে। এ সবই সম্ভব হচ্ছে সংস্কৃতের মহিমায়।

কিন্তু এসব কথা বলবার জন্য আমি কলম ধরিনি। সংস্কৃতের আরো যে কত বড় বড় অবদান আছে সেই সব প্রসঙ্গের উল্লেখ করি।

পৃথিবীর বর্তমান যুগকে এখন আমরা বিজ্ঞানের যুগ বলে থাকি। এই বিজ্ঞানরূপ বৃত্তের পরিধি প্রকাণ্ড—ঠিক যেন বৃহস্পতির কক্ষপথ। এই পরিধির মধ্যে আছে, রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, চৌর্যবিদ্যা, মানুষ মারা বিদ্যা, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির বিদ্যা, সভ্যতা ধ্বংসের বিদ্যা আবার গণিত-ভূগোল-স্বাস্থ্য-রন্ধন-সংগীত প্রভৃতি বিদ্যা আরো কত ধরণের বিদ্যা, তার ক'টারই বা খবর রাখি, আর ক'টাই বা জানি। এই বিদ্যারাশি বা তার শতাংশ আমরা ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে অর্জন করে।থাকি। কারণ ইংরাজি এমন একটা ভাষা যা বিশ্বের ব্যক্ত, অব্যক্ত, এমন কি পরব্রহ্মের স্বরূপ পর্যন্ত প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। আমাদের শ্রুতি যেমন নিত্য-নূতন, ইংরাজী ভাষাও তেমনি নিত্য নূতন।

এ হেন বিজ্ঞানের যুগে, একদিকে যেমন নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নির্মিত হচ্ছে, নূতন নূতন বিদ্যা, শিল্প, বাদ-বিসম্বাদ আত্মপ্রকাশ করেছে, অপর দিকে তেমন সে গুলোকে বোঝাবার জন্য নিত্য নবনব ইংরাজী শব্দ বা 'ফ্রেস্' গঠিত হচ্ছে। আর সেই সকল ইংরাজী শব্দ বা ফ্রেস্ ভূমিষ্ট হয়েই বিশ্বদূতমণ্ডলীর কৃপায় জগতের যাবতীয় সংবাদপত্রের অফিসে, তারে-বেতারে এসে পহুঁচিচ্ছে এবং আমাদের বাঙলা ভাষার দৈনিকপত্র-সমূহের অফিসেও এসে ডাক মারছে। আর এই সকল গালভরা ও দাঁত-ভাঙ্গা ইংরাজী শব্দ বা শব্দসমষ্টি হস্তগত হবা মাত্রই সম্পাদকগণ বা সাংবাদিকগণ সংস্কৃতের দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে নূতন নূতন সংস্কৃতভিত্তিক বাঙলা শব্দ গঠন করে নিজ নিজ সংবাদপত্রে চালিয়ে দিচ্ছেন। আজ যে অভিনব, অশ্রুতপূর্ব শব্দটা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে কাল সেটা ছাত্রদের প্রবন্ধে, বক্তাদের ভাষণে সভাসমিতির সেক্রেটারীদের বাৎসরিক রিপোর্টে উল্লিখিত হচ্ছে। তাই ভাবি, আজ সংস্কৃত ভাষা না থাকলে এই সমস্ত দুর্বোধ, দুরুচ্চার্য ও দুরুহ ইংরাজী শব্দ বা ফ্রেজ্, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হত কিনা।

এর পর আর এক প্রসঙ্গের উত্থাপন করি। আজকাল সাহিত্যিক বা সাধারণ লেখকদের মাথায় একটা ঝোঁক চেপেছে—নিজ নিজ রচনার মধ্যে সংস্কৃত উক্তি সাঁধ করিয়ে দিয়ে রচনার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করা। এটা অতি শুভ লক্ষণ বলতে হবে। এই উক্তিগুলি সচরাচর প্রাচীন কবি-দের কাব্যনাটকের অন্তর্গত শ্লোকের একট চরণ বা অর্ধাংশ হয়ে থাকে। আবার অজ্ঞাতনামা কবিদের শ্লোকাংশ (যাদের বলে উদ্ভট শ্লোক) বা বেদ—উপনিষদের মন্ত্রাংশ ও উক্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব উক্তিগুলির মধ্যে বীর, হাস্য, শান্ত, করুণ, আন্ত—সবই বর্তমান। যার যেমন দরকার সে সেই ভাবে নিজের রচনার জন্য বেছে নেয়। বস্তুতঃ এগুলিকে এক একটি হীরক-খণ্ড বলা যেতে পারে। এরা প্রবন্ধের যে অনুচ্ছেদে আসন পেতে বসে, সেখানটা ভাবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বাঙলা সাহিত্যে সংস্কৃত উক্তির প্রয়োগ যে আগে ছিলনা তা নয়, কিন্তু বর্তমানে এদের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়, এই সব উক্তির ছড়াছড়ি। সম্পাদক ও সাংবাদিক মহলে এদের আদর আরো বেশি। ষ্টাফ্ রিপো-টারগণ নিজ নিজ রিপোর্টে একটু খানি সংস্কৃত বুক্‌নী সাঁধ করিয়ে দিয়ে গর্ব অনুভব করেন। বক্তারা তাঁদের লিখিত বক্তৃতায় একগণ্ডা সংস্কৃত বুলি সাঁধ করিয়ে দিয়ে বক্তৃতাকে আরো জোরালো করবার চেষ্টা করেন। দুএকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"সভায় গিয়ে দেখলুম কা কস্য পরিবেদনা—সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।"

"আমায় তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—পুলিশের লাঠী খেয়ে সভায় থাকতেও পারছি না, আবার নিজের কর্তব্য চিন্তাকরে সভা ছেড়ে উঠে যেতেও পারছি না।"

বর্তমানে সংস্কৃতের উপর সাহিত্যিকদের, লেখকদের, গ্রন্থকারদের, ছাত্রদের, বক্তাদের এই যে একটা অহৈতুকী অনুরক্তি, এটা শুভ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ—হয়ত সংস্কৃত একদিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

এইবার আমার শেষ বক্তব্য পাঠক-পাঠিকাদের শুনিয়ে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটাই। বস্তুতঃ এই শেষ কথাটির জন্যই আমি আমার প্রবন্ধের সূচনা করেছি।

উপরে যে-সব সংস্কৃত উক্তির কথা বললাম, তারা হচ্ছে-অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুগযুগান্ত ধরে মুখে মুখে প্রচারিত—অমরশ্লোকাবলীর এক একটা অংশ। এরা যে শুধু বাঙলাভাষাতেই ব্যবহৃত হয় তা নয়, অন্যান্য আঞ্চ-লিক ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়ে-থাকে এবং ছাত্রদের পাঠ্য বিশেষ করে সংস্কৃত টোলের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকেও সন্নিবেশিত থাকে। এরা সংস্কৃতের ছাপ এঁটেই বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়, এবং পাঠকদের গোড়াতেই জানিয়ে দেয় এরা সংস্কৃত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এমন কতকগুলো ক্ষুদ্রতর ও সংক্ষিপ্ততর উক্তি বাংলাভাষায় ছড়িয়ে আছে যারা সংস্কৃতের নাগরিকতা বজায় রেখেও বাঙলার ছাপ এঁটে কেবল বাঙলাভাষারই পুষ্টি সাধন করে থাকে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালী পাঠকের কাছে—ছদ্মবেশে থাকে—আবার-কখনো কখনো ধরা দিয়েও থাকে। এরা বাঙলা ব্যাকরণের গোলক ধাঁধা। বৈয়াকরণ এদের নিয়ে যে কি করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

এখানে সংক্ষিপ্ত কথাটার ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমি যদি বলি 'রামের,' সেটা নিশ্চয়ই হবে বাঙলা কথা, আমি যদি বলি 'রামকা,' সেটা নিশ্চয়ই হবে হিন্দী বুলি সুতরাং হিন্দী ভাষা। তেমনি 'রামস্য' বললে সেটা অবশ্যই সংস্কৃত উক্তি, ভাষা, প্রয়োগ, যাকিছু হতে বাধ্য। এই বার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দি।

আমাদের ভাষায় নিত্য ব্যবহার্য 'অর্থাৎ' কথাটা কি। এটা দেশী—

বিদেশী শব্দ নয়, এমন কি সংস্কৃতের নিকট হতে ধার-করা কোন তৎসম শব্দও নয়। এটা পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত একটা পদ।

"রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ রামচন্দ্র।" এই বাক্যটার মানে রামের জ্যেষ্ঠপুত্র, যা বলার আসল অর্থ হইতেছে রামচন্দ্র।

"দৈবাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা"—মানে, দৈবের আনুকূল্য হেতু তার সঙ্গে আমার দেখা।

"অগত্যা আমাকেই সেখানে যেতে হল"—মানে, অন্যগতির অভাব হেতু আমাকেই সেখানে যেতে হল।

"আমি আদৌ একথা জানতুম না"—আমি আদিতেই বা গোড়াতেই একথা জানতুম না।

আবার আর একদিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের সংস্কৃত ভাষার এমন কতিপয় ছোট ছোট অব্যয় আছে যাদের আকার ক্ষুদ্র হলেও অর্থ গভীর—যেমন, ন, চেৎ, তু, বা, কুত্র, তথা, চ, অধিকম্, ইত্যাদি। এরা প্রায়ই দুটি দুটিকরে, একসঙ্গে বসে, এক সঙ্গে কথা কয়, একসঙ্গে অর্থপ্রকাশ করে। এরা যেন মাণিক জোড়, অথচ সমাসের দ্বারা আবদ্ধ নয়। কখনো কখনো তিনটিকেও গায়ে গায়ে বসে থাকতে দেখা যায়। যেমন—নচেৎ, তথাপি, কুত্রাপি, অথচ, পরন্তু, নতুবা (ন+তু+বা), ইত্যাদি। এরা বাঙলা ভাষায় অজস্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু এদের এক একটিকে বাঙলা শব্দ কখনই বলা যেতে পারেনা। এরা এক একটি বাঙলা শব্দ মোটেই নয়, এক একটি সংস্কৃত ফ্রেজ্, এবং খাঁটি সংস্কৃত বুলি।

"খাও, নচেৎ আমি বড়ই দুঃখিত হব।" এখানে 'নচেৎ' মানে, 'না যদি,' 'যদি না খাও।'

তিনি দরিদ্র অথচ মনের সুখে দিন কাটিয়ে দেন।" এখানে 'অথচ' মানে 'এবং তার পরের কথা হল।'

"তিনি সংকীর্ণচেতা নন্। পরন্তু এক মহান সদাশয় ব্যক্তি।" এখানে 'পরন্তু' মানে হচ্ছে, "কিন্তু তার পরের কথা যদি-বলতে হয় তবে বলি।"

"বরঞ্চ তুমি যাও, আমি থাকি।" এখানে 'বরঞ্চর' মানে হচ্ছে, "আমার যাওয়ায় চেয়ে তোমায় যাওয়াই ভাল।

উপরের বাক্যগুলি সব বাঙলা বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে একটু করে সংস্কৃতও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অবশ্য বক্তার অজ্ঞাতে। কিন্তু যদি Very Good, আমিই সেখানে যাবো। তখন বাঙলায় কথা কইতে গিয়ে একটু ইংরাজী বুলিও আওড়ান গেলো সজ্ঞাতে. এমন হবার কারণ হচ্ছে, আগেকার পণ্ডিতগণ—বাড়ীতে ঝী চাকর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতেন বটে, কিন্তু বাইরে, সভাসমিতিতে, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রশিষ্য প্রভৃতিদের সঙ্গে কথাবার্তায় সংস্কৃতই বেশী ব্যবহার করতেন। বাঙলায় কথা কহিতে কহিতে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে সংস্কৃত বুলি সাঁদ করিয়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পরে আমাদের বাঙলাভাষা নিজের গরজে ঐ—সব উক্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

'দ্বারা' কথাটাকে বাঙলা বিভক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কথাটা বিভক্তি নয়, একটা সংস্কৃত উক্তি। দ্বার্ শব্দের মানে প্রবেশ-পথ, উপায়, করণ, ইত্যাদি। সুতরান্ 'কুঠার দ্বারা' একটা নিছক সংস্কৃত উক্তি—মানে, কুঠায়রূপ: করণের সাহায্যে। বর্তমানে 'কুঠারের' দ্বারা' লিখে এটার গায়ে বাঙলার ছাপ দেওয়া হয়। কিন্তু 'তদ্দারা' ও 'এতদ্দারা' একেবারে সংস্কৃত ভাষণ। এইদুটি কথা সংস্কৃতের নাগরিকতা বজায় রেখে বাঙলার সেবা করে চলেছে। এতদ্দারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, মানে, এইরূপ করণের সাহায্যে আপনাকে জানান যাইতেছে যে।

বৈষ্ণব বা ভিখারী যখন বাড়ীতে এসে 'হরে কৃষ্ণ' বলে চেঁচায়, তখন অনেকেই বুঝতে পারেনা। অশিক্ষিত লোকটি খাঁটি সংস্কৃত বুলি আওড়ে বসল। বাড়ীর গৃহিণীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সে হরিরূপী কৃষ্ণকে ডাক দিল। বস্তুতঃ সাধু বাঙলার সম্বোধন মাত্রই সংস্কৃত উক্তি। হে সখে, হে পিতঃ, হে ভগবান, হে মহাত্মন্—এসব সংস্কৃত বুলি বৈ আর কিছু নয়। এদের বাঙলা বলে মনে করলে, একই কথার তিনটে করে বানান হয়ে পড়ে—পিতৃ, পিতা, পিতঃ; বা, ভগবৎ, ভগবান্, ভগবন্।

এরা সব হল ছদ্মবেশী সংস্কৃত নাগরিক। এইবার, শিক্ষিত পাঠকের কাছে প্রকট আর অশিক্ষিত পাঠকের কাছে অপ্রকট—এমন কতিপয় সংস্কৃত বুলি উল্লেখ করে প্রবন্ধ সমাপন করি।

তব (তোমায়) ও মম (আমার) এই দু'টি সংস্কৃত বুলি বাঙলা পদে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়। সাধারণ পাঠক জানে না যে এরা সংস্কৃত। বন্দেমাতরম্, স্বাগতম্, নমস্তে—এরা যে নিছক সংস্কৃত, অনেকে বুঝতেই পারে না।

সর্বশেষে রইল চিঠির ভাষা। আগে চিঠিপত্রে সংস্কৃতের ছড়াছড়ি থাকত। এখন অনেকটা কমেছে, কিন্তু একেবারে লোপ-পায়নি। শিরোনামা লিখতে হলে এখনো সংস্কৃতের সাহায্য নিতে হয়। শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্, শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্, বাসুদেবায় নমঃ, রামকৃষ্ণায় নমঃ, রামকৃষ্ণো জয়তু, জয় জয় রামকৃষ্ণ, সরস্বত্যৈ নমঃ—এরা হল একেবারে—নির্ভুল শুদ্ধ সংস্কৃত ফ্রেজ। কিন্তু সাধারণ পাঠক তা বুঝতে পারেনা। তার পর চিঠি আরম্ভ করতে হত সবিনয় নিবেদনম্, কল্যাণীয়াসু, পূজনীয়েষু বলে; শেষ করতে হত, অলংবিস্তারেণ বলে, নাম সই করতে হত দেবশর্মণঃ, দেব্যাঃ দাস্যাঃ বলে। এরা সংস্কৃতের নাগরিক হলেও বাঙলাতেই এদের স্থায়ী বসবাস—বাঙলা ছেড়ে ভারতের আর কোথাও বাসা বাঁধে কিনা জানি না।

নকুলদানা

সোনারপুর থেকে ট্রেনে আসতে হয় রোজ। রেল লাইন ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয় স্টেশনে। আজও আসছিলাম। একটা জায়গায় জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশীক্ষণ দাঁড়াবার উপায় নেই। অফিসের বেলা হয়ে যাবে।

ভীড়ের একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম একটি অল্প-বয়েসী বৌ



ট্রেনে কাটা পড়েছে। এমন তো হামেশাই দেখছি আজকাল। আঁতকে উঠতাম প্রথম প্রথম। এখন প্রায় অভ্যেস হয়ে গেছে দেখে দেখে। বুকের কাছটা থেঁতলে প্রায় দুখানা হয়ে গেছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা। এই তো সেই বৌটি!

সুরজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কপাল আমার ঘেমে উঠল। শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল।

তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো, একটুকরো নকুলদানা চাকার তলায় পড়ে থেঁতলে গেলে বাদামের কস বেরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, এ যেন ঠিক তেমনি থেঁতলে গেছে।

এ উপমাটি মনে আনবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

ধীরে ধীরে ওখান থেকে ষ্টেশনে চলে এলাম। মনটা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বছর চারেক আগের এমনি একটি দিনে বিকেলে মনটা ঘুরে ফিরে মরছিল। ভাবনা আর আমার বক্ষে ছিল না।

চোখের সামনে দেখছিলাম শিয়ালদা ষ্টেশনের ভীড় ঠেলে আমার কামরার দিকে এগিয়ে এল এই বৌটি। একটি ছেলের হাত ধরে আর একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে।

অপিস ছুটির পর ট্রেণে ভীষণ ভীড়।

কোন কামরা খালি না পেয়ে এই কামরাটায় উঠে পড়ল। আমি একটু হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলাম। বৌটি উঠতেই তাকালাম।

মুখখানি ফ্যাকাশে, ম্লান। চোখ দুটি বড় বড়, কিন্তু যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন। গভীর বেদনায় ডুবে আছে। রঙটি মাজা-মাজা। সব মিলিয়ে বৌটিকে বেশ সুশ্রী মনে হয়।

ছেলে দুটি খুব কালো। বড়টির বয়েস দেখলে এগারো-বারো মনে হয়। ছোটটি চার বছর বলে আন্দাজ করা যায়। বড় ছেলেটির চোখ দুটি চঞ্চল। কিন্তু চতুর।

ছোটটির মুখখানি মায়ের মত। চোখদুটি বড় বড়। চাউনি ম্লান।

বৌটি দাঁড়াতে পারছিল না বলে মনে হোল। হয়তো সমস্তদিন রাস্তার রাস্তায় ঘুরেছে, কি হয়তো কোন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল।

দেখে মনে হয় অত্যন্ত ক্লান্ত।

নিজে অনেকটা সরে বসে বৌটিকে বলি—বসুন।

বৌটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। নামমাত্র হাসি। হাসিতে যে এত কারুণ্য থাকতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। জায়গাটা ছাড়বার সময় দেখলাম রোগা দুর্বল হাতখানা ফ্যাকাশে! রক্তশূন্য। মরতে বসেছে! ভাবলাম মনে মনে। এমন ফ্যাকাশে পাণ্ডুর মেয়ে এত চোখে পড়ে যে ওটা দেখা প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাল টুকটুকে ডালিমবালা বেদানাবালার সংখ্যা আমাদের পোড়া দেশে কটাই বা! চুলোয় যাক!

মনটাকে নির্লিপ্ত করে বসে রইলাম।

ট্রেণ ছাড়বার আর বেশী দেরী নেই। দু চারটি ফেরিওলা উঠছে। অমন তো উঠেই থাকে। খেয়াল করা দরকার মনে করিনি।

হঠাৎ আমার পাশে বড় ছেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে শুনলাম।—এখনই নকুলদানা! এই তো মুড়ি খেয়ে এলি। চুপ কর।

তাকিয়ে দেখি একটি ফেরিওলার থলেতে নকুলদানা। লম্বা সরু করে কাগজে মোড়া। ছোটটি প্রায় নাকের ভেতর দিয়ে স্বর বার করে—নকুলদানা খাব।

বড়টি এবার ধমকে ওঠে। চুপ মার। বাড়ি গিয়ে দোব।

আমার দিকে একবার তাকায়। তারপর ছোটটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—মায়ের কাছে পয়সা নেই বলছি। তুই একদম বোকা।

বড়টি বেশ জ্ঞানে বুদ্ধিতে ভারী, মনে মনে হাসি পায়।

নকুলদানাওয়ালা ওদের চোখে লোভের দৃষ্টি দেখে পর পর ঘুরে ফিরে ওদের দিকেই আসছে। হাতের তালুতে একমুঠো নকুলদানা বার করে দেখাচ্ছে। আর চেঁচাচ্ছে। কুড়-মুড়-ড়-ড়-ড়! নকুলদানা! ছোটটির চোখদুটো নকুলদানার শোকে আচ্ছন্ন। মায়ের মুখের দিকে বড় করুণ চোখে তাকায়। মায়ের কঠিন ঠোঁট দুটো দেখে কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

মায়ের চোখে ভর্ৎসনার ভাবটা অনেক আগেই টের পেয়েছে বড়টি। ও ছোটটিকে আবার ধমকায়—ফের! ছোটছেলেটার ঘোলাটে চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। দুজনের কাছে ধমক খেয়ে ও মায়ের আঁচলের কোণটা নিয়ে কামড়াতে থাকে।

স্থির বসে দেখছিলাম। তাকালাম ওদের মায়ের দিকে। মুখখানায় একটা বাহ্যিক কাঠিন্য। মিষ্টি মুখখানি অনেক দিনরাতের কঠোরতায় যেন শুষ্ক হয়ে আছে। মেঘের মত থমথমে। সাদা রক্তহীন বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকায় আমার দিকে।

আমি চোখ নামিয়ে দেখি। কি জানি কেন মনে হয়, সমস্ত অপরাধ যেন আমার। আমার পকেটে অনেকগুলো টাকা আছে, ওর আঁচলে হয়তো একটা পয়সাও নেই, এটা যেন আমার অপরাধ। ভাবটা স্থায়ী না হতেই তাকিয়ে দেখি, নকুলদানাওয়ালাটা আবার ওদের সামনে এসেছে। এবারে ছোটছেলেটি আর কিছু বলল না।

বড়টি বার বার তাকাল নকুলদানাওয়ালার হাতের চেটোয় গোটা গোটা নকুলদানাটির দিকে। তার শুকনো ঠোঁটটা একবার জিভ দিয়ে চেটে নিলে।

আবার ঠোঁট শুকিয়ে এলো। আবার চাটল।

তারপর মায়ের কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে বললে—দেখছ মা, নকুলদানাগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়।

মায়ের চোখদুটো ভরা বিরক্তি।

আর কিছু না বলে চুপ করে যায় বড়টি।

আমি ফেরিওয়ালাটাকে ডাকি। এই—প্যাকেট কত করে?

—চার চার পয়সা বাবু!

—চার প্যাকেট দাও।

বিস্ফারিত চোখে ছেলে দুটো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ওদের দিকে একবার তাকিয়ে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে লোকটার হাতে দিয়ে চারটে মোড়ক নিয়ে নিই।

ওর মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। হয়তো এরই ভেতর টেরিয়ে একবার আমার দিকে দেখে নিয়েছে। মুখখানি তার কঠিন।

বড় ছেলেটি ঠোঁটটা আর একবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে আমার দিকে ঘেঁসে বসে।

—আপনি বুঝি খাবেন?

আমি হাসি। বলি—না।

ছোটটির বোলাটে বড় বড় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার দিকে উঠে আসতে চায়। দেখতে পাই ওর মা জোর করে ছেলেটার হাত চেপে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে।

ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে।

বড়টি মায়ের দিকে একবার তাকায়। বোধহয় দেখে নেয় মা দেখছে কিনা। তারপর আমার আরও কাছ ঘেঁসে বসে বলে—ওগুলো তবে কি করবেন?

হেসে বলি—একজনকে দোব।

—কাকে?

—সে আছে, তুমি চিনবে না।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—সোনারপুর। তোমরা কোথায় যাবে?

—আমরাও ওখানেই যাব। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম আমরা। বাবা কতদিন বাড়ি যায় না! তা দেখা হোল না।

—তোমার বাবা কি করেন?

—চাকরি করে। মেসে থাকে। আমাদের কাছে একদম যায়না।

—চুপ করে থাকি।

ছেলেটা একটু ভেবে আবার নিজে নিজেই বলে—জানেন, মা চিঠি লিখলে বাবা উত্তর দেয় না। পোষ্টা-পিসে গিয়ে গিয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।

অন্য কথা পাড়ি। তুমি পড়ো না?

—না। আমাদের তো টাকা নেই!

বলে ছেলেটা আর একবার আমার হাতের মোড়ক চারটের দিকে তাকায়।

ছোটটি যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘুম—ঘুম তার এসেছে। মায়ের কোলের দিকে হেলে পড়ছে।

বড়টি বলে—এই এতগুলো একজনকে দেবেন?

—হ্যাঁ।

বলে চুপ করে থাকি। কথা বলতে আর ইচ্ছে হয় না। জানি কথা বললে উত্তর কি শুনতে হবে। ভাল লাগে না শুনতে। জানি হয়তো এদের বাপ সামান্য রোজগার করে। তা থেকে মেসের খরচ চালিয়ে নেশা-ভাঙ করে কিছুই হয়তো দিতে পারেনা। এদেরও দিন কাটে না। চেয়ে চিন্তে যা পায়, তাতে দুবেলা শুধু ভাতই হয়তো জোটে না। সে কথা এই ছোটছেলেটির কাছ থেকে আর একবার জেনে কি লাভ? ভাল লাগে না। অসহ্য লাগে। এরচেয়ে বোধহয় সংসারটা দুদিনে উড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেলেও ভাল ছিল।

সোনারপুর স্টেশন আসতে আর বাকী নেই। ছোট-

ছেলেটা ঘুমে ঢলে পড়েছে মায়ের কোলে। বড়টি শেষবারের মত ক্ষীণ আশা নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে—এই সব নকুলদানা আপনি একজনকে দেবেন?

—হ্যাঁ।

আমার মুখে হ্যাঁ শুনে চোখ ছুটো ওর নিরাশ হয়ে যায়। আমি ওর দিকে ভাল করে তাকাতেই একটু যেন হাসবার চেষ্টা করে।

স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। আমি আমার থলেটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। নেমে কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি।

কই ওরা তো নামছে না।

একটু উঁকি মেরে দেখি বড় ছেলেটিকে ওর মা কি কারণে ধমকাচ্ছে। কি সব বলছে। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। বোধহয় সব কথা ওর ঠিক মনের মত হচ্ছে না। তাই ভাল করে বোঝবার চেষ্টাও করছে না।

একটু পরে ওরা নামে। বৌটির কোলে ছোটটি। ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়টি পাশে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড় ছেলেটা যেন একটু হকচকিয়ে যায়।

আমি হেসে হাতখানা ধরি।—তোমার জন্মই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মুহূর্তে বৌটি ছেলেটার দিকে তীব্র ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকায়।

ছেলেটা মায়ের চোখ ছুটো দেখে আমার মুখের দিকে তাকায়। কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এই নাও। এই সব নকুলদানা তোমার আর তোমার ভাইয়ের।

ছেলেটা মুহূর্তে একবার মায়ের দিকে তাকায়। তাকিয়েই বলে—না, না, নকুলদানা আমরা ভালবাসি না। আমাদের একদম ভাল লাগে না।

আমি জোর করে দিতে চাই।—তা হোক, তুমি নাও, ধরো।

ছেলেটার মুখখানি তখন করুণ অথচ ভয়ার্ত।

ওর মা এসে ওর হাত ধরে টানে।—চলে এসো।

ছেলেটা চলে যায় মায়ের পাছে পাছে।

মোড়ক চারটে হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। ততক্ষণে গাড়ি চলতে স্বরু করেছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে মোড়ক চারটে লাইনের ওপর চাকার তলায় ফেলে দিলে। নকুলদানাগুলো ছড়িয়ে পড়ে। থেঁতলে যায়। বাদামের শাঁস লাইনের ওপর থেঁতলে রয়েছে গুটিকতক নকুলদানা। আজও থেঁতলান হাড়-মাংস দেখে সেদিনের সেই থেতলে যাওয়া একটি করে নকুলদানার কথা মনে হয় বা র বার।

ট্রেণের তলায় পড়ে মরেছে বৌটি, এই তো বৌটি।

ছেলেছুটো কি খবর পেয়েছে? কে জানে?

কিন্তু কেন এমন হোল?

শুধু কি তাই? কেনই বা আজ ওদের কথা লিখলাম, কেউ কি জানে?

সনেট

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কত দিবসের চেনা তোমায় আমায়!—
গৃহের সম্মুখে পুষ্প-কাননের প্রায়
তবু দেখি নাই তোমা কভু চোখ তুলে;—
তুমি যে আমার—তাও গিয়েছিনু ভুলে
সহস্র ঝঞ্ঝাটে! আজি ঝিঁঝি-ডাকা সাঁঝে
খুলি' চুল এলে যবে স্তব্ধ গৃহ মাঝে,
মনে হ'ল প্রাণহীন কাব্যের পাতায়
এতদিন যে—নারীরে খুঁজিয়াছি হায়,
দেখেছি যাহার ক্ষণ-অঞ্চল-আভাস;
যে তুলেছে আলোকিয়া মনের আকাশ
রঙাণ মুহূর্তে মোর; কল্পনা যাহারে
সাজায়েছে সঙ্গীতের শতনরী হারে—
সেই তুমি—এই তুমি—মোর তুমি প্রিয়া!—
এত রূপ রেখেছিলে কোথা লুকাইয়া?

সাংবাদিকতা-বৃত্তি ও ভারতের নারী

শ্রীরেবা চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশের নারী জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেও সাংবাদিকতা-শিল্পে তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

আধুনিক ভারতের নারী আজ আর শুধু অন্ত-পুরিকাই নন, আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনে তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন আঙিনার বাইরে জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাব্রতীর কঠিন দায়িত্ব থেকে সুরু করে আইনজীবী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রের কর্ণধার প্রভৃতি বিভিন্নরূপে আপন কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাকে সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ করেছেন। আরও আনন্দের কথা এই যে, শুধু এই খানেই তাঁরা থেমে থাকেননি, তুষারশৃঙ্গ অভিযানে, সাগরজয় প্রভৃতির মত দুঃসাহসিক কাজেও তাঁরা আপনাদের যোগ্যতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু, ভারতের মহিলারা অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বিশেষতঃ, শিক্ষাক্ষেত্রে ভীড় জমালেও সাংবাদিকতা-বৃত্তিতে তাঁদের আত্মনিয়োগ এখনও পর্য্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ।

সাংবাদিকতা-শিল্পে এদেশের নারীর সংখ্যাল্পতার একটি কারণ হল, আমাদের দেশের সংবাদপত্র গোষ্ঠীর কর্ত্তৃপক্ষ মহলের সংবাদপত্রে মহিলা-সাংবাদিক নিয়োগ সম্পর্কে নানাপ্রকার আশঙ্কা ও গোঁড়ামি। সংবাদপত্র-জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, সাংবাদিক জীবনের কৃচ্ছ্রসাধন ও বন্ধুর পথ মেয়েদের জন্যে নয়।

অবশ্য, মাসিকপত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে একথা খাটেনা; সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি পত্রিকাও রয়েছে—যেখানে মহিলা-সাংবাদিকদের হাতে-কলমে সাংবাদিকতা চর্চ্চার কিছুটা সুযোগ আছে। কিন্তু, দৈনিক পত্র-পত্রিকার বিস্তৃত জগতে নারী-সাংবাদিক-নিয়োগের প্রশ্নে এদেশের সংবাদপত্র মহল এখনও নীরব এবং দ্বিধাগ্রস্ত।

অথচ, যোগ্যতার বিচারে দেখা যায় যে, সাংবাদিক হিসাবে নারী কোনও অংশেই পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে কম নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইউরোপের অনেকদেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে অনেক সংবাদপত্রের পক্ষে মহিলাদের নিয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ওদেশের নারী-সাংবাদিকরা একথা নিশ্চিত-রূপেই প্রমাণ করেছেন যে, মেয়েরা পুরুষের মতই সাংবাদিকতার যে কোনও বিভাগে, এমন কি, জেনারাল রিপোর্টিং-এর কাজেও দক্ষ হতে পারেন।

বর্ত্তমান যুগে ভারতের নারীসমাজেও দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছে। সমাজের ও রাষ্ট্রের আথিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে নারীকেও আজ খুঁজতে হচ্ছে জীবিকা অর্জনের নতুন নতুন পথ। সাংবাদিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য, জনকল্যাণ ও দেশের সেবা। এই মহান্ বৃত্তি নারীর পক্ষে শুধু যে একান্ত উপযোগী—তাই নয়, এই বৃত্তির মাধ্যমে ভারতের মহিলারা দেশ ও জাতি-গঠনের মহৎ ভূমিকায় নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করবার উপায় খুঁজে পাবেন।

আগেই বলেছি, দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান কাজ—দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণী রচনাতেও মহিলাদের পারদর্শিতার উদাহরণের অভাব নেই। সুতরাং, এদেশের সংবাদপত্রমহল যদি মহিলা-সাংবাদিকদের সংবাদপত্রে নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়টি উদারতা ও সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করেন এবং অহেতুক গোঁড়ামি বর্জন করেন—তা'হলে দৈনিক সংবাদপত্রের জেনারাল রিপোর্টাররূপে মহিলা সাংবাদিকদের দেখতে পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের ব্যাপার হবে না। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও যেটুকু প্রতিকূল পরিবেশ এখনও রয়েছে—মেয়েরা আপন দৃঢ়তা ও যোগ্যতাবলে সেই বাধাটুকু নিশ্চয়ই জয় করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এছাড়া, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ

বিভাগ রয়েছে যেগুলি পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশী যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন। এই বিভাগগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি মেয়েদের একটা সহজাত প্রবণতা রয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দেশের ও বহিরাগত বিশিষ্ট বিদেশী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহের বিবরণী, বিশেষ প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কাহিনী রচনা।

বর্ত্তমান যুগের বেশীর ভাগ উল্লেখযোগ্য মাসিক, পাক্ষিক এবং দৈনিক পত্রপত্রিকায় 'নারী জগৎ' একটি অপরিহার্য্য অংশ। স্ত্রীশিক্ষা ও প্রগতির যুগে পাঠিকাদের মধ্যে কাগজের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে মেয়েদের জন্যে একটি বা কয়েকটি পাতা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট রাখতেই হবে। এতে যে সব রচনা প্রকাশিত হয়—তা' সবই প্রায় নারী ও শিশু-সম্পর্কিত নানা ধরণের সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিতাত্মক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। মহিলা সাংবাদিকরা এই বিভাগে স্বভাবতঃই তাঁদের পুরুষ-সহকর্মীদের চেয়ে বেশী উৎকর্ষতা দেখাতে পারেন।

এই বিভাগে নারী ও শিশুসম্পর্কিত সমস্যামূলক প্রবন্ধাদি ছাড়াও ফ্যাসন, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা, সাজপোষাকে রুচি ও আধুনিকতা, নতুন নতুন রান্না, দেশ বিদেশের রান্নাঘরের খবরাখবর, সূচীশিল্প ও অন্যান্য চারু ও কারুশিল্প, গৃহস্থালীর পারিপাট্য ও পরিচালনা, খাদ্য-সমস্যা, খাবারের 'খাদ্য মূল্য' সম্পর্কিত গবেষণা ও আলোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্যসম্বলিত আকর্ষণীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার সুযোগ মহিলা সাংবাদিকদের রয়েছে। অবশ্য, একথা বলছিনা যে, পুরুষ সাংবাদিকেরা এ সকল বিষয়ে লিখতে অসমর্থ বা অপুট, তবে মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করার কাজ মহিলা-সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব।

দৈনিক বা মাসিক পত্রপত্রিকায় মহিলা সাংবাদিকদের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে লেখবার সুযোগ আছে। এটি হচ্ছে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিশু-কল্যাণ, শিশুপালন। শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত নতুন আবিস্কৃত মতবাদ ও সূত্র এবং সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ কি ভাবে করা যেতে পারে, শিশু ও কিশোরের মানসিক গঠনের ত্রুটি ও সংশোধনের উপায়, শিশু ও কিশোর অপরাধীদের অপরাধ-প্রবণতার কারণ ও প্রতিকারের উপায়, শিশুশিক্ষার বিভিন্ন দিক, শিশু ও কিশোরদের পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচনে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্বিক সূত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে মহিলা-সাংবাদিকরা মনোজ্ঞ সংবাদকাহিনী ও বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন। এই বিষয়বস্তুগুলি মহিলা সাংবাদিকের সহজাত প্রবণতায় আরও ব্যঞ্জনাময় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে।

নারী সাংবাদিকের কর্মক্ষেত্র শুধু সংবাদপত্রপত্রিকার গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা যেমন পত্রপত্রিকার কর্মীরূপে অথবা ফ্রী-ল্যান্স-জার্নালিষ্টরূপে সাংবাদিকতায় ব্রতী হতে পারেন, তেমনি বেতার জগতের বিভিন্ন বিভাগে যেমন, শিশুমহল, বিদ্যার্থীমহল, মহিলামহল ইত্যাদির পরিচালনা-ক্ষেত্রে এবং সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচার বিভাগ, বিজ্ঞাপন বিভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সাফল্য-লাভের সুযোগ পেতে পারেন।

সুতরাং সাংবাদিকতা-শিল্পের বিভিন্ন দিকেই মহিলারা আত্মনিয়োগ করে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন। এখন পর্য্যন্ত সংবাদপত্র জগতের দৈনিকগুলিতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত। কিন্তু দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় যখন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্য স্বীকার করেন নি তখন আশা করা যায় যে, শীঘ্রই এই সব পত্রিকা মহিলা-সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের জগতে প্রবেশের সুযোগ দেবেন।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে প্রয়োজন হবে সহরে ও জেলায় জেলায় নতুন নতুন কাগজের। অদূর ভবিষ্যতের সেই বিশাল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের মত নারী সাংবাদিকেরও প্রয়োজন হবে পত্রপত্রিকার বিভিন্ন কাজে।

অতএব, একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, জীবিকা অর্জনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ভারতের মেয়েদের রয়েছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প নিয়ে সাংবাদিকতায় ব্রতী হলে তাঁরাও অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতই সাফল্য লাভ করতে পারবেন এবং এই মহান্ বৃত্তিকে করে তুলবেন জীবনের অবলম্বন।

বাঙালীর খাদ্য-সমস্যা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

আজকাল খাদ্যের কথা তুলতেই ভয় করে ; কারণ কোন্ খাদ্য ভাল, কোন্ খাদ্য মন্দ—তার মোটামুট খবর কারো কাছেই তেমন অজানা নয়। আসল কথা, জন-সাধারণের হাতে পয়সা কোথায় যে তারা ভাল খাদ্য কিনে খাবে ?

খুবই খাঁটি কথা। চাউলের মণই যেখানে পঁচিশ তিরিশ টাকা, সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্তের তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নিছক চাল-ডালের সংস্থান করতেই হিমসিম খেতে হয়—তারপর কাপড় চোপড়, বাড়ি-ভাড়া, ইস্কুল কলেজের বই বেতন ত আছেই। কাজেই খাদ্যের ভাল মন্দ বিচার ক'রে যোগাড় ক'রবার অবসর কোথায় ? অবশ্য অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'লেও এমন পরিবারেরও অভাব নেই যাঁদের কাছে, খাদ্যবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন এবং মূল্য আছে—অবশ্য তাঁরা যদি কথাগুলো তলিয়ে দেখে প্রাত্যহিক জীবনে উহা প্রতিপালনের চেষ্টা করেন। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, খাদ্য বিষয়ে রুচি এবং সংস্কার আমাদের দেশে এত বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, অর্থাভাব না থাকলেও বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত আহার্য্য গ্রহণে আমাদের অনেকেরই ঘোরতর আপত্তি ও বিতৃষ্ণা লক্ষিত হয়। বিদেশী সরকারের আমলে দেশের লোকদের নিরামিষাশী ক'রে তোলবার গৌণ প্রচেষ্টা কম হয়নি। পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদিতে "গরম দেশ, এখানে প্রাণীজ আমিষ সহ্য হয়না" বলে প্রচার করতেও দেখা গেছে। অথচ একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, সাহস, উৎসাহ, উদ্যম, বীর্য্যবত্তা—এক কথায় মানবোচিত গুণরাজি বিকাশের প্রধান উপায় হল উপযুক্ত আমিষ খাদ্য গ্রহণ। জাপান এই সত্যের জীবন্ত উদাহরণ। জাপান যখনই বুঝতে পারল যে ইউরোপীয়দের শৌর্য্য-বীর্য্য বুদ্ধিমত্ত'র মূলে তাদের খাদ্য পদ্ধতি—তখনই সে রাতারাতি নিজেদের প্রাচীন নিরামিষ প্রধান খাদ্যের আমূল পরিবর্তন ক'রে ফেলল—ফলে নব্য-জাপান আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শীঘ্রই ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরমতম আঘাত খেয়েও দেখ্‌তে দেখতে তারা সামলিয়ে নিল—এমন কি ভারতকে বিপুল অর্থ সাহায্য পর্য্যন্ত দিতে সমর্থ হল। একটু অবান্তর হ'লেও উল্লেখযোগ্য যে, জাপান কেবলমাত্র ইউরোপীয় খাদ্য-পদ্ধতিই অবলম্বন করেনি, পরন্তু বিশ্বের জ্ঞান রাজ্যের চাবিকাঠি স্বরূপ ইংরেজী জার্মান ও ফরাসী ভাষাও তারা সাগ্রহে আপনার করে নিয়েছে।

অনেকে বলতে পারেন—"মাছ মাংস ডিম না খেয়েও ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই শৌর্য্যবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। একথার জবাবে বলতে চাই, শুধু মাছ মাংস ডিমই আমিষ খাদ্য নয়, পরন্তু ছানাও অতি উৎকৃষ্ট আমিষ পদার্থ। সুতরাং মাছ মাংসাদি না খেয়েও যাঁরা পর্য্যাপ্ত দুধ বা প্রচুর ছানা খেয়ে থাকেন তাঁদের উচ্চ স্তরের আমিষ খাদ্যই খাওয়া হল। বিজ্ঞানীরা আমিষ খাদ্যের মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ করেছেন। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা প্রথম পর্য্যায়ের আমিষ ; আর দ্বিতীয় বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর আমিষ পাওয়া যায় ডাল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ্য আমিষের মধ্যে ডালই প্রধান। ডালের শতকরা কুড়ি পঁচিশ ভাগ আমিষ। চাল আটাতেও শতকরা আট দশ ভাগ আমিষ থাকে। তবে কলছাঁটা চাল ও সাদা ময়দাতে খুবই ক'মে যায়। শাকসব্জী ও ফল-মূলের মধ্যে আমিষ পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণেই থাকে। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ্য আমিষে শরীরের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা বজায় রাখা যায় না।

খাদ্যের আর একটি উপাদান ভাইটামিনের নাম আজকাল ছেলে বুড়ো সকলেরই সুপরিচিত। পাঠশালার ছেলে মেয়েদের আজকাল ভাইটামিনের 'শতনাম', মাত্রা ও গুণাগুণ মুখস্থ করতে প্রাণান্ত হ'চ্ছে। আমি বলি, ভাইটামিনের অত খবরে কাজ নেই ; কারণ কেবলমাত্র ভাইটামিন রাশি রাশি খেলেও কোন ফল হবে না, যদি খাদ্যের অন্যান্য উপাদান—আমিষ, কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার-শর্করা) এবং তৈল জাতীয় পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়া না হয়। ভাইটামিন ও লবণ পদার্থ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য হলেও এগুলো সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে। তৈল-পদার্থের মধ্যেও প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দুটি প্রকার ভেদ আছে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে হলে কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ্য তৈলে চলে না—প্রাণীজ তৈল, ঘি, মাখম, মাছের তেল, মেটে, ডিম প্রভৃতির স্নেহ পদার্থ খাওয়া দরকার ; যেহেতু উল্লিখিত প্রাণীজ তৈলে ভাইটামিন এ ও ডি থাকে। ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি ছাড়া চোখের জ্যোতি ভাল রাখা ভাইটামিন এ'র প্রধান কাজ ; পক্ষান্তরে ভাইটামিন শরীরের অস্থি সংগঠনে সক্রিয়। এই কারণে প্রসূতি ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকদের এবং ছেলেমেয়েদের বাড়তির বয়সে ভাইটামিন ডি-সংযুক্ত খাদ্যের খুব বেশী দরকার।

কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যাঁরা করেন তাঁদের স্নেহ পদার্থের চাহিদা বেশী, কারণ সমান পরিমাণ আটা বা চালের চাইতে এতে বেশী শক্তি সরবরাহ করে। পরিশ্রমী লোকের পক্ষে নারকেল ও চীনাবাদাম খাওয়া

খুবই উপকারী। ছোলার ছাতুও খুব ভাল খাদ্য। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, যে সব কর্ম্মী টিফিনে মুড়ি মুড়কি চিবোয় তাদের চাইতে ছাতু যারা খায়, তারা অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারে। আমাদের মেস-বোর্ডিং-এ বা গৃহস্থ বাড়ীতে ডালের যে জলীয় ঝোল আমরা সাধারণতঃ খেয়ে থাকি, তাতে আমিষ পদার্থ যৎসামান্যই থাকে। তাই ডালের বড়ি-বড়া বা ধোকা খেলে সহজ-পাচ্য অনেকটা উদ্ভিদ্‌জাত আমিষ উদরস্থ হতে পারে। ডালের বড়ি খেতেও মুখরোচক, খাদ্য বিষয়ে একটি মোদ্দা কথা এই, মুখরোচক খাদ্যই সহজে পরিপাক হয়। এই কারণেই বোধ করি মশলা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। অধুনা পাশ্চাত্য খাদ্যবিদেরাও স্বীকার করেছেন যে, রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণের চেয়ে মশলা সাহায্যে করা ভাল; যেহেতু তাহাতে কতকগুলি দরকারী ভাইটামিন অনেকদিন অবধি অটুট থাকে।

মাছের মধ্যে ছোট চুনো মাছ—পুঁটি, টাকি, বাটা, বেলে, গুলে, খলসে, খয়রা, টেংরা, চেলা, ন্যাদশ, পারশে, খরসলা, ক্যাসা, কাজলি (বাঁশপাতা), পিয়েলি, মৌরলা প্রভৃতি মাছ কাটা-রুইকাতলার খণ্ডের চেয়ে বেশী উপকারী; কারণ ছোট মাছের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই উদরস্থ হয় ব'লে আমিষ পদার্থ বাদে বিবিধ ভাইটামিন, হরমোন ও তৈল পদার্থ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গোটামাছের কাঁটা প্রায়শঃ চিবিয়ে খাওয়ার দরুণ উপকারী ফসফেট ও চুণ জাতীয় লবণ-পদার্থ শরীরস্থ হয়। বোধকরি এইকারণে ছোটমাছগুলো চুনো মাছ আখ্যা পেয়েছে।

ডিম কদাচ কাঁচা খাওয়া ঠিক নয়। কাঁচা ডিমে ব্যাধিবীজ থাকতে পারে। হাঁসের ও মুরগীর ডিমের আমিষ পদার্থের বেশী পার্থক্য দেখা যায়না—মুরগীর ডিমে জলীয় ভাগ বেশী থাকাতে উহার তৈল পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। বাড়তি বয়সে ও যৌবনে ডিম খাওয়া ভাল, বৃদ্ধ বয়সে উহার ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া দরকার। ডিমের মধ্যে কোলেস্টেরল নামে যে তৈল পদার্থ থাকে উহা সম্পূর্ণ পরিপাক না হলে শিরা উপশিরার মধ্যে জমে গিয়ে রক্তের চাপ সৃষ্টি করে বলে জানা গেছে। যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম তেমন করেন না তাঁদের পক্ষে অধিক বয়সে মাখন প্রভৃতি প্রাণীজ স্নেহপদার্থও কম খাওয়া দরকার—কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ঘনীভূত তেল ত বিষবৎ পরিত্যাজ্য। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর যে সকল দেশে প্রাণীজ স্নেহপদার্থের ব্যবহার অত্যধিক, সেই সব দেশে রক্তের চাপে মৃত্যুর হারও সর্ব্বাধিক। এই দিক থেকে সরিষা, তিল, সোরগোঁজা, তিসি প্রভৃতির তৈল যথেষ্ট নিরাপদে গ্রহণীয়!

আমিষ ও অন্যান্য খাদ্য পুরুষানুক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে খেলে শুধু মানসিক শক্তিই নয়, পরন্তু দেহের অবয়ব সুঠাম হয়, উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে—সেকালের ঢাকার সনাঅঞ্চলেরও ইদানীং বালিগঞ্জের স্বচ্ছল পরিবারে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্ম্মানরা বলে—Der Mensch ist, was or isst—(যা খাই, আমরা তাই)—অর্থাৎ খাদ্যের উপরে মানুষের প্রকৃতি নির্ভর করে। আমাদের শাস্ত্রেও গুণানুসারে সত্বঃ, রজঃ তমঃ ত্রিবিধ খাদ্যের উল্লেখ আছে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির যেখানে গম জন্মায় সেখানে রুটির এবং যেখানে ধান জন্মায় সেখানে ভাত—প্রধান শক্তিপ্রদ খাদ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। চাল ও আটা কার্ব্বোহাইড্রেট শ্রেণীর শ্বেতসার নামক পদার্থ। গোল আলু, রাঙা আলু, শঠি, মানকচু, কাঁচকলা প্রভৃতিও শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যবস্তু। বিভিন্ন জারক রসের ক্রিয়ায় শরীরের মধ্যে শ্বেতসার গ্লুকোজে পরিণত হয়—তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শরীরের তাপ ও শক্তির যোগান দেয়। চিনি মধু গুড় প্রভৃতিও কার্ব্বোহাইড্রেট। পূর্ব্বেই বলেছি, তৈল পদার্থও শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে এবং সমপরিমাণ শ্বেতসার বা শর্করা অপেক্ষা তৈল পদার্থ অনেক বেশী শক্তি সরবরাহে সক্ষম। তবে আমাদের শরীর যন্ত্র এরূপভাবে তৈরী যে, শুধু তেল, ঘি খেয়ে আমরা হজম ক'রতে পারিনা তাই কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্য (শ্বেতসার ও শরকরা) গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। উপরে যে সব শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যের উল্লেখ করা হল, তার মধ্যে যে কোন একটি বেশী খেলে অপরটি সেই অনুপাতে কম খাওয়া চলে। তাই দেখছি, বিলাতে লোকেরা অল্প কয়েক টুকরো রুটির সঙ্গে বেশ খানিকটা গোল আলু ভাজা বা সেদ্ধ এবং সেই সঙ্গে মাছ মাংস খেয়ে দিব্বি দিন কাটায়। আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও ঐ ধারণা জন্মায়নি; নতুবা আমাদের আলু-প্রধান অঞ্চলের লোকেরা কেন—পশ্চিম বাংলার সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই লোকে যদি এই প্রদেশজাত অপর্য্যাপ্ত আলুর এইরূপে সদ্ব্যবহার করত—তবে অন্যস্থান থেকে গম আমদানী যথেষ্ট হ্রাস পেত—দেশের টাকা দেশেই থাকত। পশ্চিম-বাংলায় আলু চাষ প্রসারের সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। ফলনের দিক থেকেও বিঘা প্রতি ১০০ মণ আলু ফলানো যায়—অথচ বাংলাদেশে গড়-পড়তা বিঘা প্রতি ধানের ফলন আট দশ মণের বেশী নয়। ধানের তুলনায় আলুর ফসলে প্রায় অর্দ্ধেক সময় লাগে এবং আলুর ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা ও অনেক কম। সুতরাং আজ যেখানে পঁচিশ তিরিশ টাকা মণ চাল কিনে খাচ্ছে—সেখানে আট দশ টাকা মণ দরে আলু কিনে প্রচুর ব্যবহার করলে কতটা সাশ্রয় হতে পারে তা বুঝিয়ে বলার দরকার করেনা।

স্বল্পমেয়াদী ফসল হিসাবে অনেকে কাঁচকলা চাষের কথা বলে থাকেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি উহা তেমন সুবিধাজনক নয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে সতেজ ১২টি মাঝারি ধরণের কাঁচকলার তেউড় উঁচু উর্ব্বর রৌদ্রবহুল জায়গাতে রুয়েছি—প্রায় দুবছর হ'তে চলল (মার্চ্চ ১৯৫৫) এর মধ্যে আমি ২২ কাঁদি কলা মাত্র পেয়েছি। অপর্য্যাপ্ত জমি না থাকলে কলার চাষ সম্ভব নয়, কারণ কলাগাছ মাটির সার ও রস এত বেশী শোষণ করে এবং ছায়া ফেলে যে কলা ঝাড়ের তলায় বা আশে-পাশে অপর কিছুই জন্মায় না।

স্বল্প মেয়াদী চাষ হিসাবে গোল-আলু রাঙ্গা-আলু চাষের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। খাদ্য হিসাবে আলু একটি অতি উপাদেয় বস্তু। চীনেবাদামের

চাষ বৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। চীনেবাদাম অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য—এর মধ্যে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৫.৮, স্নেহপদার্থ ৩৮.৩ এবং কার্ব্বোহাইড্রেট ২৪.৪। চীনে বাদামের চাষ শক্ত নয়। দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মালে এর দাম সস্তা হ'ত এবং উহার ব্যাপক ব্যবহারে জাতীয় স্বাস্থ্যের সুরাহা হ'ত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, মটর ছোলা প্রভৃতির ডালে আমিষ পদার্থ শতকরা ২৫, কার্বোহাইড্রেট প্রায় ৬০ ভাগ থাকে, তবে চীনেবাদামে যেমন প্রচুর তৈল থাকে ডালের মধ্যে উহা নেই বললেই চলে (শতকরা ১ ভাগ মাত্র)। বোধ করি এই কারণেই তেল লবণ মেখে ছোলা মটর ভাজা খেতে অত ভাল লাগে।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বাঙলার অনেক কৃষকপল্লীতে গৃহজাত গমের রুটি, যব বা ছোলার ছাতু, ঘরের দুধ ও ঘরেপাতা দই-এর সঙ্গে আম কাঁঠাল মেখে খেয়ে একবেলা ভাত না খেয়েও লোকেরা বেশ আরামে কাটিয়ে থাকে। কোনও কোনও অঞ্চলে চাষীরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে রাঙাআলু বা মুখী কচু সেদ্ধ গৃহজাত আখ বা খেজুর গুড়ের সঙ্গে খেয়ে নেয়। অনেকে বা মাষকলাই ডালের পুরু রুটি ও গুড় খেয়ে মাঠের কাজ করে। ফলতঃ এগুলি খাদ্যবিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য।

সহরে এঁচড়ের কল্যাণে পাকা কাঁঠালের ত গন্ধ পাবারই আর উপায় নাই। অথচ পাকা কাঁঠাল অতি পুষ্টিকর মুখরোচক খাদ্য। কাঁঠালের বীচিও ভাইটামিন বি-সংযুক্ত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য—গোল আলুর প্রায় তুল্যমূল্য। কাজেই কাঁঠাল চাষ সম্প্রসারণ জাতীয় সরকারের অবশ্যকরণীয় বলে মনে করে। সাধারণতঃ উঁচু, অপেক্ষাকৃত অনুর্বরজমিতে কাঁঠাল গাছ ভাল জন্মে।

মাদ্রাজীরা তেঁতুল বেশী খায়, তাই তাদের অনেক বড়-সড়কের পাশে তেঁতুল গাছের শ্রেণী দেখলাম। বাংলাদেশের সড়কের দুধারে কাঁঠাল গাছ বসালে—ছায়া এবং ফল উভয়ই পাওয়া যেত; কাঁঠালের শক্ত হরিদ্রাভ মূল্যবান কাঠও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করত।

খাদ্য বিষয়ে বাঙালী বড় অপচয়প্রবণ জাতি। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে ভোজের নামে খাদ্যের অপচয় করতে না পারলে কি গরীব কি ধনী কোনও গৃহস্থই মনে তৃপ্তি পায়না। পিতৃপিতামহের আমলের অঢেল স্বচ্ছলতা থেকে আমরা যে আজ নিদারুণ ভাবে বঞ্চিত, সেকথা এসময় আমরা একেবারেই ভুলে যাই।

বাংলাদেশের একটা অতি বড় খাদ্য-সম্ভাবনাকে আমরা অঙ্কুরেই বিনাশ করি—সে হচ্ছে ডাবের অনিয়ন্ত্রিত অপর্যাপ্ত ব্যবহার। ডাবের জল খেয়ে লক্ষ লক্ষ ডাব শেষ না করলে মূল্যবান খাদ্য পাওয়া যেত। অন্যভাবে না হোক তেল করে ব্যবহার করলেও বাইরে থেকে নারকেল তেলের আমদানীতে যে অজস্র টাকা চলে যায় তার পুরাপুরি না হলেও বেশ খানিকটা রোধ করা যেত। টাটকা নারকেল তেল খাদ্যহিসাবে ও উত্তম। লবণ বলতে সাধারণ লোক আমরা একটি মাত্র বস্তুই জানি—যা প্রত্যহ পাতে বা রান্নায় ব্যবহার করি। বিজ্ঞানীরা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছেন মানব দেহে অনেক প্রকার লবণ আছে। সাধারণ পরিচিত লবণ বাদে পটাসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, ক্যালসিয়ম, মাঙ্গানিজ, লোহা, তামা, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর লবণ আমাদের শরীরে বিদ্যমান। এগুলি আমরা কিনে খাবনা—এগুলির অধিকাংশই আসে শাকশবজি, ফলমূল, মাছ দুধ থেকে। মাছ দুধ যখন অনেকেরই নাগালের বাইরে—তখন শরীর রক্ষার অপরিহার্য্য এই লবণ পদার্থ পাওয়ার জন্য দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় শাকশব্জির দরকার সবচেয়ে বেশী। যারা শুধু ডাল ভাত বা ঘি রুটি মাংস খায়, তাদের এইসব অত্যাবশ্যক লবণ পদার্থের ঘাটতি জন্মে; ফলে নানা প্রকার ব্যাধি তাদের পেয়ে বসে। শাকশবজি ফলমূলে শুধু লবণ পদার্থই নয়, পরন্তু অনেক রকমের ভাইটামিনও থাকে—কাজেই খাদ্যের মধ্যে এগুলি না পেলে রক্তের চাপ, অকালে দাঁত পড়া, চোখে ছানি পড়া, অ্যাপেনডিসাইটিস ও পাকাশয়ের নানারূপ পীড়া জন্মাতে পারে। এই সব রোগ এমনকি ক্যানসার বা কর্কট রোগও সভ্যতার অভিশাপ বলে অনেক পাশ্চাত্য মনীষী মনে করেন। মাটির কোল থেকে আমরা যতই সরে যাচ্ছি—টাটকা শাকশবজি, টাটকা ফলমূল ও টাটকা দুধ মাছ থেকে যতই আমরা নিজেদের বঞ্চিত কচ্ছি—'খোদার উপর খোদগিরি করে নানা কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ও কৃত্রিম ঠাণ্ডার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য বেশীদিন রেখে খাবার চেষ্টা করছি—ততই আমরা সভ্যতার অভিশাপরূপী—রক্তের চাপ, কর্কট রোগ প্রভৃতির কবলে পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছি। গত পঁচিশ বৎসর ধরে পাথুরেকয়লা সম্ভূত সালফা ও সালফোন জাতীয় সিনথেটিক ঔষধ এবং পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন্ ও ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতি এ্যান্টিবাইওটিক ঔষধের আবিষ্কারে নিউমোনিয়া, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি জীবাণুঘটিত অনেক ব্যাধিই মানুষের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু তৎসত্বেও মোটের উপর মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়েনি, বার্দ্ধক্যের আগমনও বিলম্বিত হয়নি। তাই অনেক পাশ্চাত্য মনীষীরই এখন অভিমত এই যে, খাদ্যের আরও সুষ্ঠু নির্ব্বাচনে এবং প্রকৃতির সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যতিরেকে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ফললাভের কোনও আশা নেই।

ফল বলতে কেবল আঙুর আপেল কমলালেবু ডালিম বেদানাই নয়, পরন্তু কলা, পেয়ারা, টম্যাটো, বৈঁচি, জাম, জামরুল, গোলাপজাম, লিচু, আঁশফল, আম, আনারস, কাঁঠাল, কুল, কয়েৎবেল, কামরাঙা, করঞ্জা, আমলকী, সফেদা, আমড়া, তরমুজ, ফুটি, শশা, প্রভৃতি যে সময়ে ও যেখানে যা সস্তা ও টাটকা মেলে তা খেলেই চলবে। ছেলেমেয়েদের কুল, কয়েৎবেল, কাঁচাআম ও পেয়ারা খাবার খুব ঝোঁক—তাদের বাড়তির বয়সে ভাইটামিন ও লবণ পদার্থের অত্যধিক চাহিদার জন্যই এসব ফল খাওয়া দরকার। পেট খারাপ করবে ভেবে খেতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। বাতাবিলেবু, পাতিলেবু, কমলালেবু প্রভৃতিও—ভাইটামিন সির প্রকৃষ্ট আধার।

শাক বলতেও তেমনি কেবল পালং শাকই নয়—পরন্তু নটে, মেথি, চেঁকি, বেথে, হিঞ্চে, মটর, ছোলা, খেসারি, পাট, পুনর্নবা, তেলাকুঁচে, কচু, কলমি, কুমড়ো, লাউ, মুলো, পেঁয়াজপাতা ও কপি, লেটুস

প্রভৃতি শাকের কথাও ভুললে চলবে না। ফলতঃ যে কোনও শাক কচি ও টাটকা হলে উহা ভাইটামিন সি, ফলিক এ্যাসিড, ভাইটামিন ই, ভাইটামিন বি, ও ভাইটামিন এ'র আধার—তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শাকের বিবিধ লবণ পদার্থও আছেই।

সবজি সম্বন্ধেও অনেকেরই ধারণা পরিষ্কার নয়। আলু বেগুন পটল ফুলকফি বাঁধাকপি ভিন্ন অপরগুলি অনেকের কাছেই অপাংক্তেয়। কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন—"লাউ বা মিষ্টি কুমড়োতে কি কিছু আছে মশায়?" এর উত্তরে বলতে চাই—স্বভাবজাত যে সব স্কন্দ ও সবজি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ব্যবহার করে আসছেন তার কোনটাই ফেলনা নয়। ডুমুর, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙে, চিচিঙ্গে, কাঁচকলা, শিম, বরবটি, ওল, মানকচু, মেটে আলু, ঢেঁড়স, পেঁপে, সোলাকচু, থোড়, মোচা, সজনে ডাঁটা, চালকুমড়ো, লাউ, মিটকুমড়ো, গাজর, মুলো, ওলকপি, বীট, কাঁচা তরমুজ, ফুটি, শশা প্রভৃতিও তরকারি হিসাবে উত্তম।

ঋতু বিশেষে যখন যা টাটকা ও সস্তা পাওয়া যায় তাই গ্রহণীয়। ভিন্ন ভিন্ন সবজিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাইটামিন ও লবণ পদার্থ পাওয়া যায়। সস্তা ফলের মধ্যে টম্যাটোর উপকারিতার অনুপাতে উহার প্রচলন এখন সব জায়গায় তেমন হয়ে ওঠেনি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এর প্রচলন বাড়িয়ে তোলা নিতান্ত দরকার। জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। গাজর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। গাজর খেলে যথেষ্ট ভাইটামিন এ পাওয়া যায়। এ ভাইটামিনের এরূপ প্রকৃষ্ট আধার নাই বললেই চলে। গাজরের দাম ও বেশী নয়, আর যাঁদের গৃহসংলগ্ন কিছু জমি আছে, তাঁরা শীতকালে গাজর ফলাতেও পারেন। এর মধ্যে শতকরা প্রায় দশ ভাগ কার্বো-হাইড্রেট থাকে। ভাতে সেদ্ধ বা তরকারী ব্যঞ্জনে গাজর-ব্যবহার করা চলে। দুধ গুড় দিয়ে জ্বাল দিয়ে আলুর পায়েসের মত গাজরের মুখরোচক খাদ্যই ছেলেরা খেতে পারে। শহরে যেখানে ব্যাপকভাবে চোখ খারাপ হচ্ছে—সেখানে গাজরের প্রচলন বাড়ানো সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একথা ভুললে চলবে না যে, যতদিন আমরা চাষীকে চাষা বলে ঘৃণার চক্ষে দেখব, জাত্যাভিমান বা আলস্য বশে বাস্তুভিটা সংলগ্ন জমি নিজ হাতে আবাদ না করব, ততদিন আমাদের খাদ্য সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সভ্যতার অভিশাপস্বরূপ রোগগুলির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। স্বভাবজাত টাটকা শাকসবজির অভাবে এগুলি দেখা দেয়। খাদ্যবিদ্গণের পরীক্ষায় যতদূর জানা যায়—এ রোগগুলির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ ভাইটামিন বি; ভাই-ই এবং তৈলপদার্থ সঞ্জাত বিশেষ তিনটি অম্ল পদার্থের (unsaturated fatty acids—liacliacc acid and arachicloric acid) অভাব।

এই অম্লগুলি সচরাচর উদ্ভিজ্জ তৈল খেলে পাওয়া যায়। ঘি মাখন প্রভৃতিতেও কিছুটা থাকে। ভাইটামিন বি-এর প্রধান উৎস—শুষ্ক খামি (yeast), প্রাণীর যকৃৎ (মেটে), ডাল, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, আটা, ঝোলা গুড়, কাঁচা ভুট্টা। ভাইটামিন ই সাধারণতঃ পাওয়া যায়—ধান ও গমের অঙ্কুর তৈলে, তুলা বীজ তৈলে, লেটুস প্রভৃতি টাটকা শাকে।

তাড়ির মধ্যে বিবিধ বি-ভাইটামিন থাকে, সুতরাং মাতলামির সীমা অতিক্রম না করে আদিবাসী বা অপর গরীব লোকেরা যারা পুরুষানুক্রমে উহা খেয়ে আসছে এবং তাড়ির মরসুমে যাদের স্বাস্থ্য সত্যই শুধরিয়ে উঠতে দেখা যায় তাদের এই অভ্যাস জোর করে ছাড়াতে যাওয়া ভাল নয়। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মাতরি দ্বীপের আদিম লোকেরা নারকেল রসের তাড়ি খেত; খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের সভ্য করে তোলবার সদুদ্দেশ্যে ঐ পানীয় বন্ধ করায় তাদের বহুলোক বেরি বেরি রোগে প্রাণ হারায় জানা গেছে।

একথা মনে রাখা ভাল যে সাদা চিনির চাইতে ঝোলাগুড় নানা-কারণে বেশী উপকারী। বিবিধ অত্যাবশ্যক ভাইটামিন বাদে লবণ পদার্থও ঝোলাগুড় থেকে পাওয়া যায়। ঘোল ও দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকার দরুণ উহা অন্ত্রের সুস্থতা বিধান করে। নিয়মিত দই ঘোল ব্যবহারে দীর্ঘজীবন লাভ হয় বলে শোনা যায়।

ছেলে মেয়েদের খাবার ঃ—বাড়তির বয়সে প্রধান উপাদানগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন ও লবণ পদার্থের বেশী দরকার। সুতরাং এই সময়ে সুসমঞ্জস খাদ্যের (balanced diet এর) প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

খাদ্য এক ঘেয়ে না হয় সে দিকে প্রখর নজর রাখাও দরকার। জায় (items)—অঙ্কুরিত মুগ বা ছোলা, চিড়া, মুড়ি, বাদামভাজা, ছোলার ছাতু, আটার রুটি, পাঁউরুটি, গোল আলু সিদ্ধ, ডিম সিদ্ধ, ছানা, অনুপান—দুধ, দই, ঝোলাগুড়, লঙ্কা লবণ তেল, পেঁয়াজ ও আদার কুচি, মাখন। ফল মূল—আম, জাম, আনারস, শশা, কলা, পেয়ারা, টমাটো, শাঁক আলু, কমলালেবু, পেঁপে। এখন এগুলি পরিবেশন করতে হবে সহজপ্রাপ্য ও সুলভ দেখে এবং ছেলে-মেয়েদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী। অবশ্য প্রথম থেকে তাদের খেয়ালের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না—ধীরে ধীরে তাদের রুচির পরিবর্ত্তন করতে হবে।

পরিবেশনের মোটামুটি নমুনা—

(১) মুড়ি বাদাম লঙ্কা লবণ তেল ও পেঁয়াজ কুচি এবং টম্যাটো।

(২) পাউরুটি ডিম সিদ্ধ এবং কলা (আম)

(৩) আটার রুটি দুধ গুড় এবং পেয়ারা (টম্যাটো)

(৪) গুড় আলু সিদ্ধ এবং টম্যাটো

(৫) ছোলার ছাতু দই এবং কলা (আম)

(৬) ছানা পাঁউরুটি এবং আনারস (পেঁপে বা পেয়ারা)

(৭) অঙ্কুরিত ছোলা, আদার কুচি এবং শাঁক আলু (কলা) ইত্যাদি।

উপরে প্রদত্ত নমুনার প্রয়োজন বিবেচনা মত স্থান কাল পাত্র ভেদে অদল-বদল অবশ্যই করা যাবে। এ গুলি শেষ কথা নয়, উদাহরণ ছলে দেখানো হয়েছে মাত্র। সম্প্রতি খাদ্যবিদ্গণ বলতে শুরু করেছেন কমলা-লেবুর রস ভাইটামিন সি'র প্রকৃষ্ট আধার নয়—যেহেতু উহাতে সিট্রাল নামে যে পদার্থ থাকে তাতে ভাইটামিন সি নষ্ট করে দেয়। তারপর

কমলা লেবু আমাদের নিম্ন বাংলার ফলও নয়, দামও বেশী—সুতরাং উহার পরিবর্তে টমাটো, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতির বহুল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

শিশু ও ছেলে-মেয়েদের—বিশেষ করে অবস্থাপন্ন পরিবারের—খাদ্য পরিবেশনে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে অতি-ভোজন না ঘটে। অল্প বয়সে পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়ার দরুণ যদি তারা তাড়া তাড়ি বেড়ে উঠে শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ করে তবে তারা দীর্ঘজীবী হয়না। ফলে দেখা গেছে, উপো সুখো পেয়ে সুস্থ শরীরে ধীর গতিতে বেড়ে যারা অপেক্ষাকৃত দেরীতে পূর্ণতা লাভ করে তারাই সাধারণতঃ দীর্ঘ জীবন পায়। (It had been found that over-feeding during the period of growth and development shortens this period, so that adult size is reached earlier and shortens life—Food and Health, H. M. Sinclair, B. M- J. Dec. 14. 1957 pp. 1424.)

শহরে শিক্ষিত পরিবারে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় খাদ্য বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত অবহেলাও চলেছে শোচনীয়ভাবে। আগে একান্নবর্ত্তী পরিবারে শাক সুক্তো চড়চড়ি ঝোল ঘণ্ট অম্বল রান্নার যে সুযোগ ছিল, এখন একক গৃহিণীর পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী পুত্রের ডাল ভাত যোগাতেই গৃহিণীর গলদ ঘর্ম্ম হ'তে হয়, ঘণ্ট তরকারি শাক শুক্তো যেগুলি ভাইটামিন ও লবণ পদার্থের প্রধান উৎস তা প্রস্তুত করবার সময় কই তাঁর? ছোট মাছের অশেষ গুণের উল্লেখ আগেই করেছি। এরূপ পরিবারে ছোট মাছ এনে ধুয়ে কুটে রান্না করার সময় না পাওয়ায় ইলিশ বা কাটা পোনার খণ্ড এনে তাড়াতাড়ি জ্বাল দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। মাংস রান্না ও সময়-সাপেক্ষ বলে সচরাচর উহা হয়ে ওঠে না। কাজেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে খাদ্য বিষয়ে নিদারুণ উদাসীন হওয়াতে আমরা অকাল মৃত্যুই ডেকে আনছি। যদি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই-ই হলাম তবে সাহেবদের মত হোটেলে খাওয়া অভ্যাস করলাম কই? আর এখন পর্য্যন্ত কলকাতার মধবিত্তের পক্ষে সস্তায় তৃপ্তির সঙ্গেই আহার্য্য সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থাই ত হলনা। একটা প্রগতিশীল জীবন্ত জাতির পক্ষে এর চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ভাবাই যায় না:—'পবিত্র হিন্দু হোটেলের' অভাব নেই, কিন্তু আসলে যে সেগুলি অপবিত্রতার প্রতিমূর্তি!

আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত নয় বলেই এরূপ ঘটেছে। মুখে সবাই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বলি, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে আপন ভাই-এর সর্বনাশ করেও নিজে লাভবান্ হতে কসুর করিনা।

আমার মনে হয় জাতীয় সরকার উদ্যোগী হলে এই জাতীয় কলঙ্কের অপনোদন করতে পারেন। স্বামীপুত্রহারা পূর্ববঙ্গ-আগতা বর্ষীয়সী সুগৃহিণী অনেকেই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ নানা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। চরিত্রবান্, দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উন্মুখ, উৎসাহী কর্মীদলের সহযোগিতায় এঁদের নিয়ে যদি সত্যিকারের মায়ের দরদ দিয়ে প্রস্তুত ডাল ভাত মাছ চড়চড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা হ'ত, তা হ'লে কলকাতা শহরে মধ্যবিত্তের খাবার ভাবনা কোথায়'। ঘরে ঘরে উনুন জ্বালানতে দেশের লোকের গায়ের রক্তে সংগৃহীত পাথুরে কয়লার বিরাট অপচয়ও হ্রাস পেত, তাছাড়া ভাল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সস্তায় পেয়ে লোকেরা স্বাস্থ্যলাভ করতে পারত। পুরুষেরা প্রাত্যহিক হাট-বাজার করা ও মেয়েরা রান্নার ঝামেলা থেকে রেহাই পেলে জাতির কর্মশক্তির আরও সদ্ব্যয় হবার সুযোগ বৃদ্ধিপেত।—অন্ততঃ তাঁরা সময় পেয়ে নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় সাহায্য করলে বর্তমানে যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রতি বৎসর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে জাতীয় জীবন বিষম করে তুলছে তারও অনেকটা লাঘব হত। আজকাল মেয়েদের (কেবল দুস্থ নয় পরন্তু স্বচ্ছল পরিবারের ও) চাকুরীর প্রতি অসম্ভব ঝোঁক পড়েছে; ফলে ছেলে মেয়ে লালন পালনের ভার পড়ছে গিয়ে অশিক্ষিত এবং অনেকস্থলে রোগগ্রস্ত ঝি-চাকরের উপর। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ যে বিত্তের বলে বলীয়ান ছিল—স্বামী স্ত্রী সাড়ে আটটা নটার ঝি চাকরের রান্না ডাল ভাত নাকে মুখে গুঁজে ট্রামে বাসে ঝুলে অফিস পানে ছুটলে সেই বিত্ত অর্থাৎ মানসিক কৌলিন্য—আর বেশী বজায় থাকবেনা। শারীরিক ও নৈতিক অধঃপতন হবে অপরিপূরণীয়। বিশেষ করে জাতির ভবিষ্যৎ যারা—তাদের একথা হয়ত অনেকের জানা নাই যে, সাধারণতঃ যে সব জায়গায় ঝি-চাকর কলকাতার গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করে সেই সব জায়গায় কুষ্ঠ রোগ বেশী। কুষ্ঠ জীবাণু শরীরস্থ হ'লে সদ্য সদ্য রোগ প্রকাশ পায়না—পনের কুড়ি বৎসর বাদেও রোগ প্রকাশ পেতে পারে—অথচ এরূপ লোকের শরীর থেকে রোগ জীবাণু বেরিয়ে অন্যকে আক্রমণ করতে পারে। আবার সব থেকে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে জন্ম থেকে ১৪ বৎসর বয়সের ছোটমেয়েদের মধ্যেই এই রোগের সংক্রমণ সব চেয়ে বেশী। কাজেই উল্লিখিত পরিবারে আগামী কয়েক বৎসরে কুষ্ঠ রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে কিনা, কে বলতে পারে? এখন হতে ট্রপিক্যাল স্কুলের কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগে বহু ভদ্র পরিবারের ছেলে মেয়ে ঢেরই প্রত্যহ চিকিৎসার্থে যেতে দেখি। জাতির কর্মধারগণ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন নিশ্চয়ই।

পরিশেষে একটু অবান্তর হলেও বলতে চাই, মেয়েরা যতদূর পারে লেখাপড়া শিখুক, যত ইচ্ছা জ্ঞান লাভ করুক, তবে পুরুষের নিছক অর্থকরী শিক্ষার চাইতে তাদের শিক্ষা ধারার একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকাই সমীচীন। সুগৃহিণী ও সুমাতা হওয়াই মেয়েদের শেষ এবং স্থির লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং জাতির স্থায়ী কল্যাণের দিক থেকে তাহাই বোধ করি সর্বতোভাবে কাম্য। মানব সমাজে আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ও রামনের মায়ের দান যে কত বেশী, তা সর্ব যুগে সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। ইয়োরোপে স্ত্রী শিক্ষায় সম্যক্ অগ্রসর হলেও সেখানে সস্তায় স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ঘর করার প্রতিই মেয়েদের বেশী আগ্রহ দেখা যায়। জার্মানিও সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি সচ্ছল সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের খবর জানি; এদের গৃহিণীরা যথেষ্ট লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও কেহই চাকুরীজীবী নন—মেয়েদেরও এঁরা এমন শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে তাঁরা পরে সুগৃহিণী হ'তে পারেন। সমাজে সংযম ও ত্যাগের যথেষ্ট দরকার আছে। বাড়ীর ভিত্‌টা শক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক,

অথচ সে লোক চক্ষুর অন্তরালেই অবস্থান করছে। ভিতকে লোক-চক্ষে তুলে ধরতে গেলে বাড়ির অস্তিত্বই লোপ পায়। সমাজ ও ঐ সুদৃশ্য গৃহের মত—এর যত শক্তি যত সৌন্দর্য্য সকলের আধার আমাদের জননী জাতি। তাঁদের ত্যাগ ও মহত্ত্বেই সমাজ এগিয়ে চলেছে। ফুলফল শোভিত বৃক্ষের মূলের সঙ্গেই তাঁদের তুলনা করা যায়। তাঁদের অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত অহরহ সমাজ জীবনে শরীর ও মনের খোরাক যোগাচ্ছে বলেই ত উহা এত সুমনোহর, এত সমৃদ্ধ। তাই বলি, অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী আমাদের মাতৃজাতির হস্তে অন্ন প্রস্তুতি ও পরিবেশনের ভার ন্যস্ত থাকলে আমাদের ভাবনা কিসের?

খাদ্য প্রসঙ্গে শেষ কথা এইযে উহা যত পুষ্টিকরই হোকনা কেন, সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম না করলে ছেলেবুড়ো কারো পক্ষেই সম্যক্ পরিপাক ক'রে যথার্থ পুষ্টিলাভ করা সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে একথা ও অবশ্য চিন্তনীয় যে, আমরা খাওয়ার জন্যই বাঁচিনা—বাঁচার জন্যই খাই।—আর সেই বাঁচা মানে জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল থেকে কেবলমাত্র, শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনই নয়, পরন্তু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দেশের তথা জগতের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করাই প্রকৃত বাঁচা—আর তাতে করেই দেশের অসংখ্য লোকের গায়ের রক্ত জল ক'রে উৎপন্ন খাদ্যের সত্যিকারের সদ্ব্যবহার।

সামারসেট মমের সাহিত্যবৃত্ত

অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শো উনষাট সালের গোড়ার দিকে সমারসেট মমের একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে (Points of view—Heinemann, 215.); তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ঘোষণা করেছেন—এই হোল তাঁর শেষ বই, এখানেই তাঁর সাহিত্যবৃত্ত সম্পূর্ণ হোল। এর আগে তাঁর এমনিতর প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে আরও দু'টি—A writer's Note book আর The Summing up। এমনিভাবে ঘোষণা করবার ক্ষমতা মম ছাড়া আর কার রয়েছে? বার্ণাড শ'য়ের মত লোককে চমকে দেবার জন্যে তাঁর কোনো মন্তব্য কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি। বার্ণাড শ আর সামারসেট মম দু'জনে সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির; দু'জনেই সাহিত্যিকবৃত্তির গোড়াতে ঘা মেরেছেন, একজনের তাতে মুখ খুলে গেছে, অন্য জনের মুখ বন্ধ হয়েছে; মনোভঙ্গী, বাকভঙ্গী ও সাহিত্যিক-কলায় তাঁরা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। বার্ণাড শ চেয়েছেন চলতি জগতের মাথায় চেপে নিত্য নতুন কথার চমক লাগিয়ে লোককে চমকে দিয়ে একাধারে ভাবাতে ও হাসাতে। সামারসেট মম সেখানে চলতি জগত থেকে নিজেকে জনান্তিকে নিয়ে গেছেন, সহানুভূতিহীন জগতের সততার উপর আস্থা হারিয়ে, নিজের ব্যক্তিত্বের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন, সৎ ও আত্মস্থভাবে জীবনযাপন করে একটা নিঃশব্দ সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতিতে লিখে গেছেন, তাঁর কাছে লেখা সখ নয়, "Job"।

(সম্প্রতি প্রাচ্য পরিভ্রমণে বেরিয়ে মম বোম্বাইয়ে অবতরণ করলে তাঁকে এই ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করায় তিনি অস্বীকৃত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।)

একনিষ্ঠ ব্রতীর মত তিনি এই Job করে গেছেন। বিস্তৃত জগতের উপর তাঁর চোখ খোলা আছে, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি সব কিছু দেখেছেন। এই অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতে মানুষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে শিখিয়েছেন। তিনি উদাসী প্রকৃতির; কিন্তু তা বলে রক্তমাংসের মানুষকে উপেক্ষা করেননি তিনি, মানুষ ও জগতের নানা নিহিত সৌন্দর্য্য সম্পর্কে অনবহিত থাকেননি। তাঁর লেখার মালমশলা সমস্ত বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত; তবে ঘটনা, কল্পনা ও শ্রুতি মিলেমিশে তাঁর অনবদ্য রচনাকে সম্ভব করেছে। তিনি তাঁর জাগতিক ঘটনার প্রত্যক্ষগোচর অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল এবং সুপরিমিত ভাষায় ও ভঙ্গীতে বলে গেছেন। তিনি এই বৈজ্ঞানিক যুগের প্রকৃত শিল্পী, একটা নির্মোহ দৃষ্টিতে

মানব সমাজ ও মানব চরিত্রের জটিল বন্ধনকে উন্মোচিত করে এক অতলান্ত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন; তাঁর লেখা সাহিত্য হয়ে উঠেছে এবং তার শিল্প বিজ্ঞান অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর গল্পের প্লটের বুনুনি তাঁর রূপদক্ষতার এবং শিল্পের মাঝে বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রবেশ করার নিদর্শন; গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি অনুচ্ছ্বাসিত আত্মস্থতায় গল্পের জাল বুনেন। তাঁর রচনার অননুকরণীয় প্রসাদগুণের কথা বলা হয়েছে। মম অন্যান্য আধুনিক লেখকদের মতো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ মানস বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বাইরের ঘটনার পাশাপাশি মনের গহন খবর দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর লেখায় মানবজীবনের নানা চিরন্তন সমস্যার এবং আধুনিক জীবন সমস্যার (যেমন তাঁর Constant wife-এ) আলোচনা ও তার একটা সুস্পষ্ট সমাধান নির্দ্দেশের প্রয়াস আছে।

১৮৯৮ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস Liza of Lambeth প্রকাশিত হয়। তারপর এই ১৯৫৯-এ তাঁর শেষ গ্রন্থ Points of view প্রকাশিত হোল। মাঝে এই একষট্টি বছর তিনি অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন প্রচুর ছোটগল্প—(তিনখণ্ডে তাঁর সমস্ত ছোটগল্পগুলি সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে)—উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী। উপন্যাসও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্যপ্রতিষ্ঠা। তিনখণ্ডে তাঁর নির্বাচিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে; এই তিনখণ্ডে তাঁর অভিজ্ঞতা বিস্তারের ক্রম অনুসারে সজ্জিত হয়েছে উপন্যাসগুলি। প্রথমখণ্ডে লণ্ডনের পটভূমিকা, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচ্যখণ্ডের পটভূমিকা, তৃতীয়খণ্ডে বিশ্ব-জাগতিক পটভূমিকা। তাঁর ছোটগল্পগুলির বেশির ভাগ বেশ বড়, তবু তাদের নিটোল লাবণ্য অক্ষুণ্ণ। লেখক জীবনের খণ্ডিত রূপকে চিত্রিত করতে গিয়ে জীবনের ধর্মকে ভুলেননি। জীবনের গতি বড়ই একঘেয়ে ও শিথিল, কিন্তু তার মাঝেই দেখা দেয় চমকময় অভাবিত ঘটনা-সেই ঘটনার আলোকে জীবন তার রহস্য নিয়ে তার মর্মরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এখানে তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করবার অবকাশ নেই, তাই উদাহরণ স্বরূপ Sanatorium, The Round Dozen, The Human Element, The Creative Impulse The Alien Corn, The Colonel's Lady, Rains ইত্যাদি গল্পের নাম করা যেতে পারে। তাঁর প্রথম উপন্যাস Liza of Lambeth তখনকার প্রথা অনুযায়ী cockney novels এর গোত্রসম্ভূত। Cakes and Ale কে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে; শরৎচন্দ্রের "দত্তায়" তার একটা নিটোল লাবণ্য ও মধুর সৌরভ আছে। Of Human Bondage কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে গণ্য করা হয়।

মম বুঝি জেন অষ্টেনের উত্তরসূরী, কেন না তাঁর লেখার একটি বিশেষ লক্ষণ হোল—বিভিন্ন লোকের মধ্যে আলাপ ও কথাবার্তার মাঝ দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। এর সাথে ডিকেন্সের বিচিত্র চরিত্রের বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে অবতারণা ঘটেছে, যেমন—The Round Dozen বা Sanatorium গল্পে)। সামারসেট মম চান না মনোবিশ্লেষণের গহন বেড়াজালে নিজেকে আকীর্ণ করতে, কেন না তিনি জানেন "But who can fathom the subtleties of the human heart?" বহির্ঘটনার পাশাপাশি মনলোকের সংবাদ ও উদ্ঘাটিত হতে চলেছে। ঘটনার মাঝ থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না, তাঁর মননশীল মন তাই নানা চিন্তায় ও কথায় ব্যক্ত হয়ে চলেছে এবং তাঁর দৃষ্টি সাধারণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে প্রসারিত হয়েছে মহাজীবনের দিকে। সাধারণ জীবন যা এখানে ওখানে এর ওর তার সাথে মেলামেশার মাধ্যমে নানান কর্মধারায় অভিব্যক্ত হচ্ছে তার বিচিত্রতা উদ্ঘাটন করেও তিনি মহাজীবনের অতলান্ত রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এগিয়ে গেছেন ও শেষ পর্য্যন্ত এমন এক সীমায় এসে পৌচেছেন, যা হোল "রেজর্স এজ।" তিনি সাধারণ মানুষের জগতে দেখেছেন কত বোকামি, কত ফাঁকি, কত ভুল এবং তার উদ্দেশে তাঁর শাণিত কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। এজন্যে তিনি এই জীবনের মাঝেও এমন এক জীবনের সন্ধান করেছেন—যার অবিচল দুর্গে বাস করে এসবকে উপেক্ষা করা যায় ও পাওয়া যায় এক মহান আদর্শকে। সমারসেট মম কিন্তু সাধারণ জীবনকে অবহেলা করতে পারেন নি। সারা জগৎ জুড়ে জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি জীবনে মহান বিকাশকে বরণ করে নিয়েছেন,—এখানেই মমের শ্রেষ্ঠত্ব; মমের মত জীবনের এই বিচিত্র প্রকাশ ও মহান বিকাশের রূপকার বিশ্বসাহিত্যে আর কে আছেন জানিনা॥

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

একত্রিশ

সরকারের নানা প্রতিষ্ঠানে যে দুর্নীতি রয়েছে তা' প্রত্যেক ভুক্তভোগীই জানেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ই তা' স্বীকার কর্‌তে চান্‌না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—নিম্নস্তরের পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি, রেল দপ্তরে বুকিং বিভাগে (প্যাসেঞ্জার এবং পার্শেল উভয়তঃ) দুর্নীতি, আদালতের পেয়াদা-পেস্কারদের মধ্যে দুর্নীতি।—কিন্তু দুনীতির উল্লেখেই সরকার কেমন যেন allergic হয়ে ওঠেন!

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই allergyর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি তখন সবেমাত্র দুর্নীতি-দমন বিভাগের ভারগ্রহণ করেছি। আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন নয়া-দিল্লীর Indian Institute of Public Administrationএর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী—বল্‌তে যে তাঁদের Instituteএর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় যদি আমি একটি প্রবন্ধ লিখি তাহ'লে তাঁরা খুব অনুগৃহীত হবেন।

আমি প্রথমে এই অনুরোধ এড়িয়ে যেতে চাইলাম। বল্‌লাম, আমার সময় নেই।

—না, ডাঃ দাস, ওসব ওজর আমরা শুন্‌ব না। আপনি ত নানা পত্রিকায় লেখা দেন, আমাদের Institute কি অপরাধ কর্‌ল? আপনার এতদিনের সরকারী জীবনের অভিজ্ঞতার যে কোন aspect নিয়ে লিখতে পারেন, কোন বাঁধাধরা নিয়মে আপনাকে চল্‌তে হবে না।

—জানেন ত, আমি আবার একটু স্পষ্টভাষী। কি লিখে বস্‌ব, আপনাদের হয়ত মনঃপূত হবে না।

—সে ভয় কর্‌বেন না, ডাঃ দাস। আমাদের Institute ত সরকারের দপ্তর নয়, আমরা হচ্ছি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের পত্রিকায় যাঁরা লেখেন তাঁরা তাঁদের নির্ভীক মতামতই ব্যক্ত করে থাকেন। পত্রিকার মুখবন্ধে তাই আমরা লিখে দিই যে প্রবন্ধগুলোয় যে সব কথা বলা হয়েছে—তার সঙ্গে সরকার বা Institute একমত এমনঃ যেন কেউ মনে না করেন।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।…আমি জবাব দিলাম।

নয়াদিল্লী ফিরে গিয়ে ভদ্রলোক আবার চিঠি লিখলেন। "আমার অনুরোধ আশা করি আপনার মনে আছে। আপনার পছন্দমত যে কোন বিষয়ে লিখতে পারেন, প্রবন্ধটি administration সংশ্লিষ্ট হলেই হ'ল। আমাদের বিশেষ সংখ্যা প্রেসে যাচ্ছে ৩১শে মার্চ্চ তারিখে, তার আগে যেন লেখাটি পাই।"

ততদিনে দুর্নীতি দমন বিভাগে আমার মাস চারেকের মত অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভাবলাম আমার এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখি তাহলে দেশের হয়ত উপকার হতে পারে। "Integrity in Public Administration" এই নাম দিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ পাঠালাম ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদকের কাছে—deadline (৩১শে মার্চ্চ)এর বেশ কয়েকদিন আগেই।

দু'সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, চার সপ্তাহ কেটে গেল, ওদিক থেকে কোন উচ্চবাচ্য নেই। পর পর দুটো reminder পাঠালাম।

অবশেষে জবাব এল, আমার প্রবন্ধ ওঁরা যথাসময়ে পেয়েছেন, কিন্তু কতকগুলো "technical" অসুবিধার জন্য প্রবন্ধটি সম্পাদক-পরিষদের "বিবেচনাধীন", তাঁদের স্থির-সিদ্ধান্ত আমাকে শীঘ্রই জানানো হবে।

ভীষণ রেগে গেলাম আমি। "technical" অসুবিধা? সম্পাদক-পরিষদের "বিবেচনাধীন?"

সম্পাদক-পরিষদের কর্তা তখন কেন্দ্রীয় দপ্তরের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী, আমারই সতীর্থ আই-সি-এস্ অফিসার।

সরাসরি তাঁর কাছে লিখলাম আমি। বল্লাম—লেখাটি আমি পাঠিয়েছিলাম তাঁদেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে। কি "technical" অসুবিধা হচ্ছে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আমার Home কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি': সরকারের কোন কোন মহলে যে দুর্নীতি রয়েছে এবং চেষ্টা কর্‌লে তা কমানো যায়, এটা তাঁরা মানতে রাজী নন্। এ সম্বন্ধে তর্ক কর্‌তে চাই না, তবে এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটাও যদি Instituteএর কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়ে থাকে তা'হ'লে তাঁরা যেন দয়া করে লেখাটি ফেরৎ পাঠান। ডা: দাসের লেখা Instituteএর পত্রিকার চেয়ে উচ্চাঙ্গের অনেক পত্রিকার সম্পাদকই সানন্দে গ্রহণ কর্‌বেন।

এর উত্তরে জবাব এল, জয়েণ্ট সেক্রেটারী শিগ গীরই অন্য কাজে কল্‌কাতায় যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে মুখোমুখি এ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

জয়েণ্ট-সেক্রেটারী কল্‌কাতায় এলেন খবর পেলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। কারণ অবশ্য আমি বুঝলাম; আমার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করবার মত সাহস তাঁর নেই।...এ সাহসের অভাব আমি আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।

সপ্তাহ দুই পরে আমি আবার লিখলাম জয়েণ্ট-সেক্রেটারীকে।

এবার জবাব এল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে সময়ের অভাবে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় দেখা কর্‌তে পারেননি। যাই হোক্, লেখাটি তাঁরা প্রকাশ কর্‌তে পারবেন না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেটি ফেরৎ পাঠাচ্ছেন।

আমি জবাব দিলাম, তাঁর দুঃখে আমিও দুঃখিত। তবে আমি খুসী বোধ কর্‌ছি এইজন্য যে তিন-চার মাস দেরী হ'লেও অবশেষে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন!

মাস কয়েক পরে এই লেখাটি প্রকাশিত হ'ল কল্‌কাতার বিখ্যাত কমার্শিয়াল পত্রিকা "Capital" এর বার্ষিক বিশেষ সংখ্যায়। আমার বন্ধুবান্ধব এবং সতীর্থ যাঁরাই এই লেখাটি পড়লেন (লেখাটির ইতিহাস অনেককেই আমি বলেছিলাম) তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন, কেন Institute of Public Administration এই অত্যন্ত objective এবং mild লেখাটি প্রকাশ করতে রাজী হননি'। লেখাটিতে দুর্নীতির জন্য দায়িত্ব আমি কেবল সরকারের উপর চাপাইনি', চাপিয়েছিলাম দেশের লোকের উপরেও, দায়ী করেছিলাম কতকগুলো rigid আইন-কানুনকেও।

এই Institute of Public Administration সম্বন্ধে ১৯৬০ সালের এপ্রিলমাসের Times of India কাগজে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাই নিয়ে সম্পাদকের কাছে অনেক চিঠিপত্রও আসে। আমার অভিজ্ঞতার চুম্বক সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলাম—আমার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল Times of Indiaর ২৮শে এপ্রিল সংখ্যায়। বলা বাহুল্য, আমার চিঠির কোন প্রতিবাদ Instituteএর পক্ষ থেকে আসেনি'। আসবেই বা কি করে? আমি ত বানিয়ে কোন কথা বলিনি'—প্রত্যেকটি statementএর লিখিত প্রমাণ আমার কাছে এখনও রয়েছে!

বত্রিশ

দুর্নীতি কি ক'রে দূর করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই দেশে হচ্ছে এবং মতবিরোধও কম দেখা যাচ্ছে না। শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ বল্‌ছেন, ট্রাই-বুন্যাল বসানো দরকার, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত নেহরুর তাতে ঘোরতর আপত্তি, তাঁর মতে ad hoc কমিটির মাধ্যমেই অনুসন্ধান চল্‌তে পারে, পরে যদি কোন গণমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে specific charges পাওয়া যায়—তখন না হয় ট্রাইবুন্যালের কথা ভাবা যাবে।

আমার মতে ট্রাইবুন্যাল-বনাম-কমিটি এই তর্ক নিতান্তই নিরর্থক। প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যে অনুসন্ধানের ভার দিতে হবে এমন একজন বা একাধিক লোককে—যাঁরা নির্ভয়ে, কর্তৃপক্ষ কি মনে করবেন সে ভাবনা দূরে রেখে, কাজ করতে পারবেন। সরকারের executive এবং legislative এই উভয় branch থেকে এঁরা হবেন সম্পূর্ণ পৃথক্, কোন পার্টির আওতায়ও এঁরা আস্‌বেন না। আর, প্রাথমিক তদন্তের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করার যদি প্রয়োজন থাকে তা'হলে আমাদের দেশে ও ডেনমার্কএর বিখ্যাত Ombudsmand বা Grievance Man এর পদের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এই Ombudsmand বা Grievance Man এর

একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। আজকের দিনে যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নানাদিকে বেড়েই চলেছে, বুরোক্রেসীর নিষ্ক্রিয়তা এবং red-tapism দুর্নীতির সহায়ক। তাই ডেন্‌মার্কেও সৃষ্টি করা হয়েছে এই ombudsmand বা Grievance Man এর পদ; এঁর কাজ হচ্ছে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শোনা এবং প্রত্যেকটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে তা' দূর করতে চেষ্টা করা। অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তিনি এবং প্রত্যেকটি দপ্তরের অধিকর্ত্তা তাঁর নির্দ্দেশ সশ্রদ্ধভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য। এই সংস্থায় ডেন্‌মার্কের শাসনযন্ত্রে red-tapism এবং দুর্নীতি খুবই কমে এসেছে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে যে—যে ট্রাইবুন্যাল বা কমিটিকে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হবে তাকে অনেকটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ তাঁরা যে নির্দ্দেশ দেবেন কর্ত্তৃপক্ষকে তা' গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ তা' গ্রহণ করতে না পারেন, তা'হলে কারণটা লিখে জানাতে হবে এবং বছরে অন্ততঃ একবার এই সব কেস্‌এর (যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ ট্রাইবুন্যাল বা কমিটির নির্দ্দেশ গ্রহণ করতে পারেননি) একটা তালিকা উপস্থাপিত করতে হবে লোকসভায় বা সংশ্লিষ্ট বিধানসভায়, যাতে সদস্যগণ বিচার করতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষের এই অস্বীকৃতি কতদূর যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

তৃতীয় প্রয়োজন হচ্ছে সরকারের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে সরলতা, সাবলীলতা নিয়ে আসা। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় এমন অনেক আইনকানুন বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে যা কাজের সহায়তা ত করেই না, বরং বাধার সৃষ্টি করে এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিতে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের প্রলুব্ধ করে। এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে এই সব কর্ম্মপদ্ধতি streamline করা আজ নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে যে জনসাধারণকে হতে হবে সচেতন, সক্রিয় এবং ভয়শূন্য। সরকার ট্রাইবুন্যালই বসান, আর red tapeই দূর করুন, দুর্নীতি কিছুতেই যাবে না—যদি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ বদ্ধপরিকর না হন্ যে তাঁরা কিছুতেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবেন না। আমি জানি, এই উপদেশ মানতে হলে আমাদের এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে অনেক প্রার্থী ও ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সমবেত চেষ্টায় দুর্নীতি যদি উচ্ছেদ করা যায় তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আরও বড় ক্ষমতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন।

গত দেড় বছরের মধ্যে আমার এই suggestionগুলো Statesman এবং অন্যান্য দু'একটি সংবাদপত্রের মারফতে আমি কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে পেশ করেছি। আমি এও জানি যে তাঁদের কেউ কেউ আমার Diagnosis এবং care সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে further action ধামাচাপা পড়ে যায়, সংশ্লিষ্ট স্বার্থ (vested interests) এসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আই-সি-এস্ থেকে বিদায় নেবার পর একবার রাইটার্স বিল্ডিংস্ এ গিয়েছিলাম বাংলা মন্ত্রীপর্ষদের দু'-একজনের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের একজনের সঙ্গে যে বাক্যবিনিময় হ'ল তারই একটু আভাস দিচ্ছি।

—Statesmanএ আপনার লেখা পড়লাম, ডাঃ দাস—আপনি যা' বলেছেন তা' খুবই সমীচীন।

—সমীচীন যদি মনে করেন তাহ'লে তা কাজে লাগাননি কেন? আমি আরও বিশদ্ একটা note আপনাদের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারি, যদি আশ্বাস দেন্ যে সেটা ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া হবে না—অথবা আপনাদের সরকারী archives এর প্রকোষ্ঠে docketed এবং filed হয়ে থাকবে না।

—মন্ত্রীপর্ষদে আমার মতামত ত সহ্য হয় না, ডাঃ দাস। আমি কি করে আপনাকে গ্যারাণ্টি দিই যে শেষ পর্য্যন্ত আপনার note এর উপর action নেওয়া হবে?

অনেক মন্ত্রীর কাছ থেকেই এই অসহায়তার অজুহাত আমি শুনতে পেয়েছি। প্রশ্ন করি, নিজেদের যদি এতই অসহায় মনে করেন তাহ'লে তাঁরা আসন আঁকড়ে বসে রয়েছেন কেন? কেন তাঁরা জোরগলায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন না?

বাংলাদেশের সাধারণ নরনারীর সংস্পর্শে আসবার, তাঁদের অভাব অভিযোগ জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আই-সি-এস্ এর বর্ম্ম আমাকে কোনদিনই

তাঁদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখ্‌তে পারেনি।' তাঁদের চিন্তাধারার খানিকটা খবর রাখি। তাঁদের হয়ে আমি সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, সরকার যেন এই দুর্নীতি বিষয়ে আর একটু বেশী অবহিত হন্‌।

সবচেয়ে মজায় কথা হচ্ছে এই যে—যাঁরা সরকারের yes-men তাঁরা ও কর্তৃপক্ষের এই ঔদাসীন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাঁদেরও অনেকে চান, সরকার যেন সমাজবিরোধী লোকের নির্লজ্জ লাভ-লোভ এবং দুর্নীতির দুষ্ট-বৃত্ত-রচিতজঘন্য কুকীর্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

কিন্তু মহাদেব এখনও ধ্যানমগ্ন।

তেত্রিশ

দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব, আই-সি-এস্‌ ও পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ ডাঃ দাস ও যে অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারেন নি' তারই একটা গল্প বল্‌ছি।

সেদিন ছিল বর্ষাচ্ছন্ন মুখর রাত। কল্‌কাতার নানা রাস্তায় জল জমে গেছে, দক্ষিণ কলকাতায় ট্রাম চলাচল বন্ধ, বাস্‌গুলোও কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে। আমি বাড়ীতে বসে অফিসের ফাইল ঘাঁট্‌ছি।

হঠাৎ শুনি নীচে একটা প্রকাণ্ড সোরগোল। একটি মেয়েমানুষের কান্না এবং আমার পুরানো বেয়ারার ধমক।

—সাহেব এখন কাজ কর্‌ছেন। তোমার কি দরকার না বল্‌লে তোমাকে ওপরে যেতে দেওয়া হবেনা।

—তোমার পায়ে পড়ি তোমার সাহেবকে খবর দাও। আমার কথা আমি সাক্ষাতে তাঁর কাছে বল্‌ব।

চেঁচামেচি শুনে আমি বেয়ারাকে ডাক্‌লাম। প্রশ্ন কর্‌লাম, মেয়েটি কে ?

—আশে পাশেরই ব্যস্তির কোন মেয়ে হবে, হুজুর। বল্‌ছি এখন দেখা হবেনা, তবু শুন্‌ছেনা।

—ওকে বস্‌তে ব'লো। আমি আস্‌ছি।

রাগে গজ্‌গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে বেয়ারা চলে গেল।

আঠারো উনিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির, নাম লীলা, কাছেই উদ্বাস্ত কলোনিতে থাকে। তার এক দূরসম্পর্কীয় পিসেমশায়ের বাড়ীতে। ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি উঠেছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে পড়া চালাতে পারেনি, ম্যাট্রিক পরীক্ষাও দেওয়া হয়নি'।

পিসেমশায় বার্দ্ধক্যে প্রায় অকর্ম্মণ্য বল্‌লেই চলে। খোলার ঘরের দাওয়ায় সামান্য পান বিড়ির দোকান করেন। বাড়ীতে কোন বয়স্ক ছেলে নেই, পিসীমার একটি ছেলে জগদ্দলের দিকে কোন্‌ এক কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহান্তেও একবার বাড়ীতে আসেনা, উপার্জ্জনের প্রায় সবটাই খরচ করে নিজের আমোদ প্রমোদে এবং নেশায়। ফলে সংসার চালাবার ভার এসে পড়েছে লীলার ওপর।

অনেকের হাতে পায়ে ধরে সে এক নারীকল্যাণ আশ্রমে একটা চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন চাকুরী করেই সে বুঝ্‌তে পেরেছে যে, বাইরের ভদ্র আবরণের পেছনে অত্যন্ত কুৎসিৎ ব্যাপার চলেছে। তবু সে চাকুরী ছেড়ে দিতে সাহস করেনি, কারণ তাহ'লে অচল হবে। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে।

কিন্তু কয়েকদিন থেকেই সে লক্ষ্য কর্‌ছে যে সেক্রেটারী যতীনবাবু যেন একটু লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছেন। আশ্রমের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ কাদম্বিনী দেবীকে সে একথা বলেছিল। তিনি ধমক দিয়ে বলেছেন যে, যে মেয়ে সৎপথে থাকতে চায় তাকে কেউ বিপদে ফেল্‌তে পারেনা।

তারপর আজ সন্ধ্যার একটু পরে যতীনবাবু লীলাকে ডেকেছিলেন আশ্রমের অফিস ঘরে। তাকে প্রকারান্তরে বলেছেন যে সে যদি তার চাকুরী বজায় রাখ্‌তে চায় তাহলে তাকে যতীনবাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে হাজিরা দিতে হবে এবং এও বলেছেন যে তিনি আশা করেন লীলা আজ রাত দশটার পর তার ওখানে যাবে।

—আপনি আমাকে বাঁচান্‌, বাবু।...অশ্রুকলঙ্কিতমুখে লীলা বল্‌ল।...আমাদের কলোনিতে সবাই আপনার কথা বলে। আপনি যদি যতীন্‌বাবুকে একটু ধমক দিয়ে দেন্‌, তাহ'লে তিনি আমার পেছনে আর লাগবেন না।

—কিন্তু যতীনবাবুর স্ত্রী ছেলেপুলে নেই ?...আমি প্রশ্ন কর্‌লাম্‌। লীলা ঘাড় নেড়ে বল্‌ল যে—এসম্বন্ধে সে খবরই রাখেনা।

তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম লীলার দিকে। কাহিনীটার

মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, তবে আমার পঁচিশ বছরের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনেক সময় এজাতীয় অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু লীলার চোখ দেখে বুঝ্‌লাম সে এতটুকু বানিয়ে বলেনি'।

—তুমি এতই ভয় পেয়েছ যে এই দুর্য্যোগের মধ্যে ছুটে এসেছ? আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যতীনবাবু তোমার কোন ক্ষতি করতে পার্‌বেনা।

লীলা কতটা ভরসা পেল জানিনা। শুধু বল্‌ল, আজ আমি বাড়ী যাবনা, এখানেই থাক্‌ব।

আমি প্রমাদ গণলাম। আমার গৃহিণী যতই উদার হোক্‌না কেন, লীলার এই বাড়াবাড়ি কিছুতেই সহ্য কর্‌বেন না। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি বাড়ীতে নেই, আমার সংসারের ঝামেলা থেকে জিরোবার জন্য গেছেন বাপের বাড়ীতে। কিন্তু ফিরে এসে আমার বেয়ারার কাছে যখন শুন্‌বেন, তখন?

বল্‌লাম, এখানে তোমার থাকা চল্‌বেনা লীলা। আমার লোক তোমাকে বাড়ীতে পৌছে দেবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় লীলা উঠ্‌ল।

বেয়ারা ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ঠিকমত পৌছে দিয়ে এসেছ ত?

জলে কাদায় ভিজে বেয়ারার মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল না। বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই জবাব দিল, আমি আবার কোথায় পৌছে দেব? হন্ হন্ করে সে নিজেই কলোনির একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল এবং আমাকে বল্‌ল, তুমি যেতে পারো। আমি মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম।

বল্‌লাম্ ঠিক আছে।

পরের দিন অফিসে যাবার পথে লীলার বর্ণিত সেই নারীকল্যাণ আশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে চাইলাম যতীন্‌বাবুকে। অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—কাকে চাই?

—যতীন্‌বাবুকে। যতীন্ দত্ত।

—আমিই যতীন্ দত্ত।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। কোথায় বস্‌তে পারি?

ব'লে আমার পরিচয় দিলাম।

দেখ্‌লাম্ যতীন্‌বাবুর মুখখানা কেমন যেন শাদা হয়ে গেল।

ভেতরে এসে কোন প্রকার ভণিতা না করে তাকে জানালাম লীলার অভিযোগ। জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বল্‌লাম, আপনি যদি লীলার পেছনে এভাবে লাগেন তাহ'লে চাকুরী যাবে আপনার, লীলার নয়। তাছাড়া একজন মহিলাকে বে-ইজ্জত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন এই অপরাধে আপনাকে জেলের অতিথিও হ'তে হবে।

বোকার মত যতীন্‌বাবু তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বল্‌লেন, লীলা আপনাকে এসব বলেছে?

গরমসুরে জবাব দিলাম, হাঁ, লীলা বলেছে এবং তার কথা অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

—কিন্তু লীলা যে আমার স্ত্রী, স্যার!

আমার মেজাজ তখনও গরম। বল্‌লাম—ওসব ধাপ্পায় ডাঃ দাস ভোলেন্ না। আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লীলাকে বিরক্ত কর্‌বেন না।

যতীন্‌বাবু হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে ডাক্‌লেন, দিদি, ওদিদি! একবার এদিকে আসুন ত!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কৃশাঙ্গী শাদা থান কাপড় পরা একজন বৃদ্ধা মহিলা। পলকের মধ্যে তাঁকে চিন্‌লাম, তাঁকে বহুদিন থেকে জানি, তাঁর সাধুতা, নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম।

—তারপর, নবগোপাল, এখানে কি মনে করে?

—আপনি কি আশ্রমেই থাকেন না কি?

—হ্যাঁ, আমিই ত এখানকার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্।... যতীনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ত? ও হচ্ছে আমার ডান হাত। আমার সেক্রেটারী। ওকে না পেলে আমার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হ'ত।

ব'লে সপ্রশংসভাবে যতীন্‌বাবুর দিকে তাকালেন তিনি। যতীন্‌বাবু রীতিমত লজ্জিত বোধ কর্‌লেন।

—দিদি, লীলা গতকাল ডাঃ দাসের কাছে গিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে নানা নালিশ করে এসেছে।...ডাঃ দাস

কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌ছেন না যে লীলা আমার স্ত্রী। আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন না!

কাদম্বিনী দেবীকে আমি বল্‌লাম আগের দিন রাতের কাহিনী।

কাদম্বিনী দেবী হেসে বল্‌লেন, এই ত? এটা হচ্ছে লীলার নতুন পাগ্‌লামি। আমি বল্‌ছি, লীলা যতীনের বিবাহিতা স্ত্রী। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়েছি। স্তম্ভিত ভাবে শুন্‌লাম লীলার ইতিবৃত্ত। এই আশ্রমেরই মেয়ে সে, এখানে এসেছিল তিনচার বছর আগে। আশ্রমের অন্যান্য মেয়েদের মত তারও একটা অপ্রীতিকর পূর্ব্ব-ইতিহাস ছিল। তবে সে খুবই চেষ্টা কর্‌ছিল লেখাপড়া শিখে আত্মনির্ভর হ'তে।...তারপর হঠাৎ সে যতীনের প্রেমে পড়ে, যতীনেরও তাকে ভাল লাগে। কাদম্বিনী দেবীকে যতীন্ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, তাঁরই উপদেশে বা আদেশে লীলাকে বিয়ে করে, সে আজ মাস পনেরো হবে।

বিয়ের কিছুদিন পরেই লীলার এই নতুন ব্যাধি দেখা দেয়। আর কিছুই নয়—মাঝে মাঝে তার ধারণা জন্মায় যে যতীন্ তার স্বামী নয়, যতীন্ তাকে অন্যায়ভাবে বেইজ্জত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। একবার সে এই আশ্রমের অফিসে এসে সকলের সাম্‌নে একটা বিশ্রী সীন্ করেছিল। যতীন্ ত লজ্জায় লাল। কিন্তু হাজার হোক্ তাঁর স্ত্রী, কি কর্‌তে পারেন? যতীনের ধৈর্য্যের (ধৈর্য্যের কেন, স্নেহের) প্রশংসা না করে পারা যায় না। কোন উত্তাপেই সে উত্তপ্ত হয়না, বিশেষ করে যেখানে লীলা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। লীলাকে সে সত্যি ভালবাসে, বিয়ের পর লীলার এই অদ্ভুত ব্যবহারে যতীনের ভালবাসা যেন আরও গভীর, আরও অন্তঃসলিলা হয়ে উঠেছে।

—তুমি যদি চাও আমি লীলার কাছে এখ্‌খুনি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। খুব সম্ভব এতক্ষণে সে তার সাময়িক পাগ্‌লামি কাটিয়ে উঠেছে।

বল্‌লাম, না, কোন প্রয়োজন নেই।

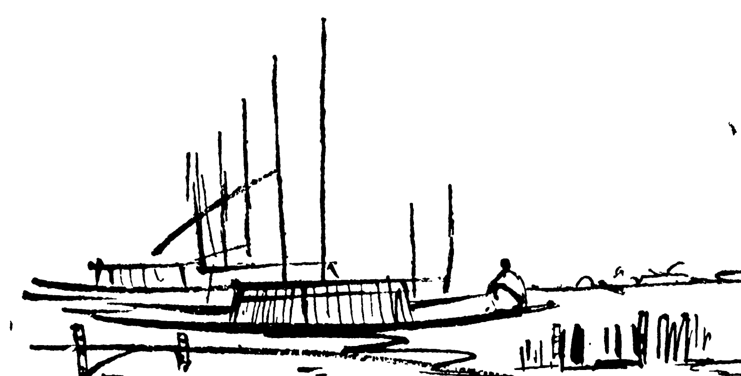
তারপর যতীন্‌বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, আপনি কিছু মনে কর্‌বেননা, বুঝতেই ত পার্‌ছেন, এরকম নালিশ কোন মেয়ে যদি আমার কাছে করে তাহ'লে সে সম্বন্ধে আমাকে অনুসন্ধান করতেই হয়। তবে আপনার কথাটা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়াটা আমার উচিত হয় নি। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

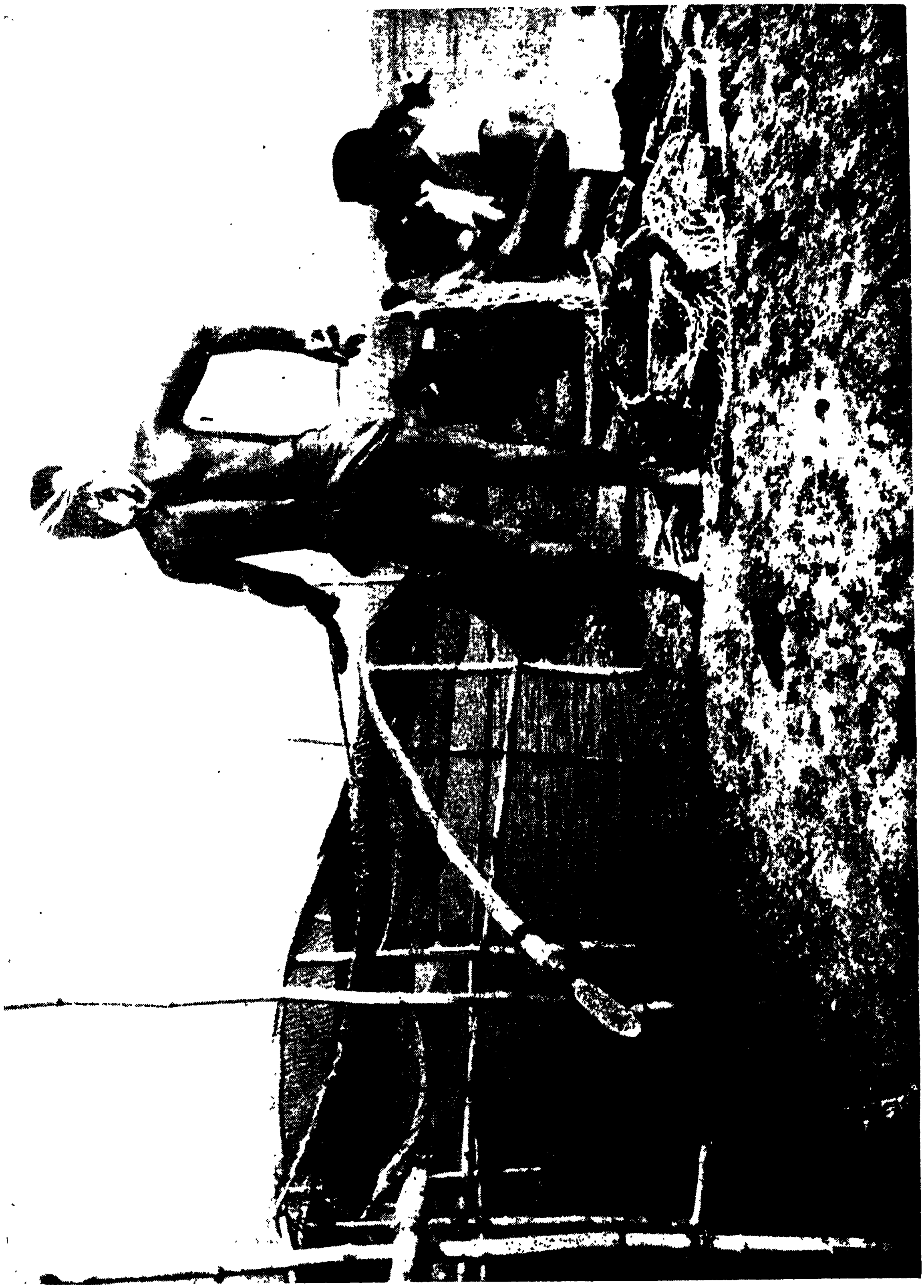
আরও বিব্রতবোধ করলেন যতীন্‌বাবু। বল্‌লেন, না, না, আমি কিছু মনে করিনি, ডাঃ দাস।

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে আস্‌বার পথে গাড়ীতে বসে কেবলই মনে হচ্ছিল, জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের শেষ বোধ হয় কখনও হয় না। আমার দম্ভ এক মুহূর্ত্তে চূরমার করে দিয়েছে এই লীলা-যতীন্ সম্পর্কীয় ঘটনা -

লীলার এই schigophreniaর একটা সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) আমার পেশা নয়। সব রহস্যের আচরণই যে আমাকে উন্মোচন কর্‌তে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)







রবীন্দ্র কাব্যে রসতত্ত্ব

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

কাব্যতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্ব রসভাবে মণ্ডিত হলেই কাব্য হয়ে উঠে প্রকৃত কবিত্বের নিদর্শন। সত্যের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি ব্যতীত সৃষ্টির প্রকৃত মাধুর্য্য বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। কবি তাই একাধারে কবি এবং মনীষী—দার্শনিকতত্ত্ব ভাবনায় বিশ্বরহস্যের উদ্‌গাতা। কবি এবং দার্শনিকের মধ্যে বৈষম্য যেখানে—কবিত্ব সেখানে জীবন-লীলার রস ও ভাবের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ভারতীয় চিন্তায় এজন্যই বলা হয়েছে—'কবি মনীষী।' জগতের আলো দুঃখ-সুখের সংঘাত অতিক্রম করে কবিমানস রসের উৎস-সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। এই যাত্রা মহাযাত্রাসীমা—ছুটে চলেছে অসীমের আকর্ষণে। সীমাহীন আকাশে কেবল মুক্তির রূপ নয়—হৃদয়ের আকাশেও মুক্তির রূপ প্রভাসিত হয়ে পড়ে। কবির দৃষ্টি তাই অনাদি সৃষ্টি রহস্যের সমুদ্রতীরে অসীম-কালের আকাশের দিকে চেয়ে অভিভূত হয়—একদিকে অস্থিরতা নিয়ে জাগে নব নব জিজ্ঞাসা, আবার হৃদয়ের ধ্যান-মন্দিরে জাগে অখণ্ড শান্তি। এই দুই বিপরীত পরিবেশে কবির দার্শনিক উপলব্ধি নিত্য নতুন রূপ ও পরিণতিলাভ করেছে। একদিকে ভাগবত-প্রেম তাঁর কাব্যে অসীম বিরহ সৃষ্টি করেছে, আবার উপনিষদের ঋষিগণের মত শান্ত সমাহিত আনন্দ-রসের শান্ত পরিবেশে কখনো তিনি অপার প্রশান্তিতে ধ্যানমুগ্ধ। একদিকে রুদ্রের অস্থিরতা এবং অন্যদিকে শান্ত রসের মাধুর্য্য তাই সর্ব্বদা কবি চিত্তকে আকর্ষণ করছে দেখতে পাই। এই বিষয়ে রবীন্দ্র-মানস সর্ব্বদা সচেতন, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানী মন তাই তমসা থেকে জ্যোতিতে—অসৎ থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিত্য জাগরিত। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কেই জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—

'সত্যকে মূল দৃষ্টিতে দেখিলাম, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখিলাম।'

এই দর্শন কবির জীবন দর্শন। আত্মার জ্যোতিরূপ এবং বিশ্বের আনন্দরূপ কবিমানসে প্রভাবিত হয়েছিল বলেই কবি বলেন—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!"

কোন্ সুদূরের পিয়াসী কবির প্রাণ—সংসারের মাঝে থেকেও সংসারের সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে প্রাণ জীবনের রস উপলব্ধিকেই খুঁজে—জগতের সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছে? এই প্রাণ কি বিশ্বপ্রাণ? এই প্রাণই হোল দেহের উর্দ্ধে মনপ্রাণ। তিনি তাই বলেন—

"হে সবিতা তোমার কল্যাণরূপ
কর অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।"

উপনিষদে আছে 'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ।' আনন্দের 'রসো বৈ স' মূর্ত্তি বিশ্বের স্থূলতাকে অতিক্রম করে পরম সুখের রসস্পর্শ নিয়ে আসছে। অন্তরতম আনন্দময় সত্তায় কবি তাই দুঃখের ঊর্দ্ধে নিজেকে তুলে ধরেছেন, তিমিরের উর্দ্ধে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের আত্মপরিচয়ে এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। সত্যের আনন্দরূপ তাঁর দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে বলেই কবি খণ্ডের মধ্যে সমগ্রকে এবং সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে দেখতে পেয়েছেন। তাই কবি বলেন—

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অনু হতে অনীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥"

ভূমাকে ধ্যান চোখে কবি দেখেছেন অতীতের অতীত আলোকে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব কবির দৃষ্টিকে দিব্য-জ্ঞানে আলোকিত করেছে। দেহের যবনিকা ভেদ করে তাই অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা প্রজ্বলিত কবি দেখেন। দিব্য পরাজ্ঞান এখানে কেবল আত্মিক উপলব্ধি নয়—ইহা সৌন্দর্য্য দর্শনের রসরূপকে অভিব্যক্ত করেছে। উপনিষদে আছে—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

রবীন্দ্র মানসে দিব্য আলোকের অভিব্যক্তি অনুভূতির বোধিতে অনু-ভূতি সীমাকে অস্বীকার করে না। জীবনের সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি থেকে মহানিষ্ক্রমণের অধীরতা নেই—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—সেই ভুবনেই কবি অনন্তকালের সম্বন্ধ নিয়ে জেগে আছেন! ১৩১১ সালে কবিকে নিজের সম্বন্ধে বলতে শুনি—

"তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার

বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এই লীলা তো আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিহিত এই প্রেমের লীলা।"

'উৎসর্গ' কাব্যে সুস্পষ্টভাবে আত্মানুভূতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের সুর স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত দেখা যায়—

"ধূপ আপনারে বিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

ভারতবর্ষের সত্যের অনুধ্যানের একটি দার্শনিক রূপ এখানে ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন ভারতের ঋষিসাধনার সিদ্ধির প্রতীক। তাই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে অসীমের উপলব্ধির আলোক কেবল নয়—ভাব ও রসের এবং জ্ঞান ও সিদ্ধির বহু বিচিত্রতা বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভারতবর্ষের এই বিচিত্র সাধনার ভাব ও রস এবং জ্ঞান ও সিদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে। তাই কেবল উপনিষদ এবং বেদান্ত নয়—বৈষ্ণব রসচেতনা, বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ববাদ, সহজিয়া এবং বাউল সম্প্রদায়ের রাগ-অনুরাগ এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্করের সাধনা—সেই সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরতত্ত্ব নতুন রূপমূর্তি লাভ করেছে। বহু মত ও পথের বৈপরিত্যের মধ্যে মহামিলনের আনাগোনা তাই রবীন্দ্র কাব্য ও দর্শন। এই দার্শনিক দৃষ্টি অবিচ্ছিন্নভাবে এই পরম সত্যকেই প্রচার করেছে যে, কবি সংসারে ভাগবত সত্তা ও লীলাকেই সত্য জেনেছেন। তিনি জেনেছেন—

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

নতুন উষার সূর্য্যের পানে দৃষ্টি নিয়ে একদা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হোল—সেই নতুন উষার সূর্য্যের আলোকেই দেখতে পাই রবীন্দ্রজীবন মহাকাব্যের নানা সর্গ। রবীন্দ্র কবিমানসের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে অধ্যাত্ম-আকুতি এবং আবেগ-অনুভূতি জীবন, বিশ্ব এবং জীবন দেবতার লীলাপালা চলেছে। কবির কামনার সার্থকতা কোথায়? অসীমকে পেতে গিয়ে সীমার বন্ধনে যে কান্না—তারই পরিচয় পাই নিন্দুক কামনার ব্যর্থ বেদনায়—

"যে অমৃত লুকানো তোমার
সে কোথায়?
অন্ধকারে সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে কেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।"

এই চিন্তা-চেতনা-প্রবাহের উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, ভারত-চিন্তা থেকে এর উৎপত্তি, বিকাশ, গতি ও পরিণতি। ভারতীয় সাধনা এবং পশ্চিমের ভাব-চিন্তার সমন্বয়ের পথে রবীন্দ্র-মানস চিরতৎপর, ফলে রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাকে ভিত্তি করে ভারতের বৃহৎ ও মহৎ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়—

"মানুষের দুটি জগৎ আছে—একটি অহং, আর একটি আত্মা। মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার।' জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। এই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার হয় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্ম্মের যোগে লোভ ও স্বার্থপরতা।"

কবি এখানে বৃহতের আহ্বানের কথা দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরেছেন। মাটির বিকাশ নিজের জন্য নয়—বৃহতের প্রতিষ্ঠার জন্যই চাই মুক্তি. জীবনের পরম সার্থকতা এই বৃহতের যোগেই। সত্যের পথে তাই জীবন চৈতন্যে বিকাশ লাভ চায়, ভূমায় প্রকাশিত হতে চায়। অনন্ত পরিপূর্ণতার সন্ধানেই কবি-আত্মা বিশ্ব-আত্মায় মধ্যে মিলন খুঁজে—শক্তি ও রসের সমন্বয়ে জীবনে হ্লাদিনীর উদ্বোধন।

আধ্যাত্মিক সাধনার পথ কবির নিজের হৃদয়ের আদেশে পথচলার ইতিহাস। সংসার ও পরমার্থ পরস্পর তাই পরস্পরের সহায়ক। তাই কবির দৃষ্টি সামগ্রিক সত্যের পানে কবি দেখেন—

"সমুখে যেমন পিছেও তেমন মিছে করি সোরগোল,
চিরকাল একি লীলা গো অনন্ত কলরোল।"

ভিতর থেকে সুর উঠছে—কবি সেই সুরে সত্যের উপলব্ধি করে চলেছেন। ভোগ ও বন্ধনকে স্বীকার করে পথ চলা। এই সমন্বয় দেখতে পাই "নৈবেদ্য" "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" তথা গীতিমালিকা কাব্যত্রয়ে। সর্ব্বত্র শুনতে পাই অন্তরাত্মার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুর—

'আমার বোঝা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তাকে জানত,
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।'

অন্তরতম উপলব্ধির আলোকে রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অন্তরালে রূপ ও রস যেন ঝর্ণাধারায় উন্মুক্ত প্রবাহিত—অপূর্ব্ব পুলক রসে কবি দেখেন—

"হঠাৎ খেলার শেষে কী দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।"

রবীন্দ্র কাব্যের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক দিক—এই আধ্যাত্মিক-উপলব্ধি-সঞ্জাত সঙ্গীত ও কবিতাবলী এবং এই সঙ্গে আছে ধর্ম্ম ও দার্শনিক প্রবন্ধাবলী। আধ্যাত্মিক সাধনার শান্ত সমাহিত রসে কবি আত্ম-সমাহিত। অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তুচিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গম তীর্থে কবিকে দেখতে পাই যেন ভারতের সনাতন আত্মার বিকশিত রূপ।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

১৫০০ সালের ঘটনাবলী

উজবেক্‌রা সমরকন্দ দখল কর্‌বার পরই আমরা কেস্‌ থেকে হিসারের দিকে রওনা হই।

ভালমন্দ মিশিয়ে আমার লোক ছিল—দু'ইন' চল্লিশ জন। আমার অনুচর আমির ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে এই সিদ্ধান্ত করা হ'লো যে—সেবানি খাঁ যখন এই সেদিন সমরকন্দ দখল করেছে তখন এত অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই সমরকন্দের অধিবাসীরা তার প্রতি এবং সে নিজেও সমরকন্দবাসীদের প্রতি পরস্পর অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। যদি কিছু করতে হয় এই তার উপযুক্ত সময়। যদি আমরা এই সময় কোনও রকমে সহসা দুর্গের ভিতর যেতে পারি—তাহ'লে দুর্গ অধিবাসীরা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে। তাও যদি না হয় তাহলে তারা অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে—নিশ্চয়ই উজবেক্‌দের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে না। মোট কথা কোনও রকমে একবার ঐ নগরে প্রবেশ করতে পারলে আল্লার যা ইচ্ছা তাই হবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েই আমরা ঘোড়ার সওয়ার হলাম এবং রাতের অনেকটা সময়ই দ্রুত এগিয়ে এলাম। মাঝ রাত্রে পৌঁছাই—ইউরেট খাঁয়ে। শত্রু সৈন্য সজাগ হয়ে আছে জেনে আমরা এগোতে ভরসা পেলাম না, পিছিয়ে এলাম ইউরেট খাঁ থেকে। ভোরে কোহিক নদী পার হয়ে ইয়ারাইলাক্‌ পুনঃ দখল করলাম।

একদিন আমার কয়েকজন কর্ম্মচারী ও আমিরদের সঙ্গে আস্‌ফেনডেক্‌ দুর্গে কথাবার্ত্তা বলছিলাম। কথা চলছিল নানা বিষয়ে। আমি বলে ফেলি—আচ্ছা একটা শুভদিনের কথা আন্দাজ করা যাক। কবে আল্লা আমাদের এমন সুদিন দেবেন—যেদিন আমরা সমরকন্দ দখল করতে পারবো।

কেউ কেউ বল্‌লো—বসন্ত কালে। তখন চলছিল—হেমন্ত কাল। কেউ বল্‌লো—এক মাস, কেউ বল্‌লো চল্লিশ দিনের মধ্যে, আবার কেউ বল্‌লো কুড়ি দিনের মধ্যে। নেভিয়ান গোকুলতাস্‌ বল্‌লো—কুড়িদিনের মধ্যেই নিয়ে নেবো সমরকন্দ। সর্ব্বশক্তিমান আল্লা তার কথাই শুনেছিলেন—কারণ আমরা এক পক্ষের মধ্যেই সমরকন্দ অধিকার করেছিলাম।

এই সময় আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। দেখ্‌লাম—মহামতি খাজা আবদাল্লা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলাম। তিনি ভেতরে এসে বসলেন। তাঁর জন্য একখানা টেবিল পাতা আছে। কিন্তু টেবিলের আস্তরণ খুব পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয়নি। সেইজন্য এই নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক লোকটি যেন একটু বিরক্ত হয়েছেন। মোল্লা বাবা এই ব্যাপার বুঝতে পেরে আমাকে একটা ইসারা করলেন। আমিও ইঙ্গিতে জানালাম যে এটা আমার দোষ নয়—যে টেবিল সাজিয়েছে তার দোষ। আমাদের মধ্যে ইসারায় যে কথা হলো খাজা সাহেব তা বুঝলেন এবং আমার কৈফিয়তে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি উঠলে আমি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলাম। বাড়ীর হলঘরে মনে হলো তিনি তাঁর বাঁ বা ডান হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন উঁচুতে তুললেন যে আমার একটা পা উঠে এলো মাটি থেকে। সেই সময় তিনি তুর্কি ভাষায় আমাকে বল্লেন—'তোমার ধর্ম্মগুরু তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন। এই স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন পরই সমরকন্দ দখল করি।

সমরকন্দ আকস্মিকভাবে দখল করবার জন্য যাত্রা ক'রেও সেখানকার দুর্গ রক্ষীদের সতর্ক দেখে ফিরে আসতে বাধ্য হই। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লার উপর বিশ্বাস রেখে আবার সেইভাবেই দুপুরের নামাজের পর বেরিয়ে পড়লাম সমরকন্দের দিকে। আবদাল মকারম আমার সঙ্গেই ছিল। মাঝ রাত্তিরে মোখাক সেতুর কাছে পৌঁছলাম। সেইখান থেকে কয়েকজন বাছাই করা লোক পাঠালাম দুর্গের দিকে। তাদের উপদেশ দিলাম—মই সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে। তারা যেন প্রেমিক গুহার উল্টোদিকের দুর্গ প্রাচীর মইয়ের সাহায্যে টপকিয়ে দুর্গের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্গ মধ্যে ঢুকেই তারা একটু ও দেরী না করে ফিরোজ গেটে যারা পাহারায় আছে তাদের আক্রমণ ক'রে সেটা দখল করে নেয় এবং আমাকে যেন লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়।

আমার উপদেশ মত তারা এগিয়ে গেল। নিঃশব্দে তারা প্রেমিক গুহার বিপরীত দিকের দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করলো। তারপর ফিরোজ গেটের দিকে ধাওয়া করলো। সেখানে তারা ফাজিল তেরখান নামে তুর্কিস্থানের এক বণিককে দেখতে পায়। সে তুর্কিস্থানে সেবানিখানের অধীনে কাজ করেছিল এবং তার পদবৃদ্ধি ও হয়েছিল। আমার অনুচররা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তরবারির আঘাতে তাকে এবং সৈনিকদের ভূমিশায়ী করে কুড়োল দিয়ে ফটকের তালা ভেঙ্গে দরজা খুলে দিল।

সেই সময়েই আমি ফটকের কাছে পৌঁছে গেছি। দরজা খোলা পেয়েই ভিতরে ঢুকে পড়লাম। নগরবাসীরা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। দোকানদাররা কিন্তু দোকান থেকে উঁকি মেরে দেখছিল কি ব্যাপার ঘটেছে। তারা বাইরে এসে আল্লার উদ্দেশে প্রার্থনা সুরু করে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আর সব অধিবাসীরা জানতে পারলো এই ঘটনার কথা। তারা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো। তাদের এবং আমার অনুচরগণের মধ্যে সাদর সম্ভাষণ বিনিময় চলতে লাগলো। তারা প্রত্যেক রাস্তায় আর গলিতে উজবেক্‌দের দেখতে পেলেই লাঠি

আর পাথর নিয়ে ধাওয়া করে তাদের পাগলা কুকুরের মত হত্যা করতে লাগলো। এই ভাবে চার পাঁচ শ' উজবেককে তারা বধ করলো। নগরের শাসক ব্যাপার সুবিধে না দেখে সেবানি খানের কাছে পালিয়ে গেল।

ফটকে প্রবেশ করেই আমি কালবিলম্ব না করে কলেজ ভবনের দিকে চলে যাই। সেখানে পৌঁছিয়েই ঐ ভবনের খিলান-করা হলঘরে আমি বসবার জায়গা করে নিই। ভোর পর্য্যন্ত যুদ্ধ কোলাহল শোনা গেল চারদিকে। কয়েকজন নাগরিক ও দোকানদার কি ঘটেছে জানতে পেরে দলে দলে তাদের হাতের কাছে যে সব খাদ্য-দ্রব্য পেলো তাই নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য চলে এলো এবং আমার জয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

সকালে খবর পেলাম যে উজবেকরা লোহ ফটক দখল করে আছে-আর সেখানেই তাদের দলের লোকজনদের জড়ো করেছে। আমি এই খবর পেয়েই পনরো কুড়ি জন লোক নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেই দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু নগরের মারমুখো জনতা যারা উজবেকদের রাস্তায় গলিতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তারাই আমার সেখানে পৌঁছানোর আগেই লৌহ ফটক থেকে তাদের তাড়িয়েছে।

কি ঘটছে জানতে পেরে সেবানি খাঁ তাড়াতাড়ি একশ কি দেড়শ' অশ্বারোহী সেনা নিয়ে 'লৌহ ফটকের সামনে চলে আসে। তার পক্ষে এ একটা মস্ত সুযোগ—কারণ আমার জনবল মুষ্টিমেয়। কিন্তু সেবানি খাঁ বুঝতে পারলো এখানকার অবস্থা—জনসাধারণের মনের গতি। ব্যাপার সুবিধার না দেখে সে আর অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

আমি সহর ছেড়ে উদ্যান প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। সম্ভ্রান্ত ও নগরের নানা বিভাগের কর্ম্মচারীরা আমার কাছে এসে তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানালো। প্রায় দেড়শ' বছর আমাদের বংশের লোকরা সমরকন্দের রাজা ছিলেন। এক বিদেশী দস্যু—কেউ জানে না কোথা থেকে সে এসেছিল—এই রাজ্য অধিকার করে নেয়, আর আমাদের বংশের হস্তচ্যুত হয়। পরম শক্তিমান আল্লা আমাদের হৃতরাজ্য আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই রাজ্যজয়ের সন তারিখকে স্মরণে রাখার জন্য কয়েকজন কবি আমোদ করে কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটির কথা মনে আছে যে—পনরশো অক্ষরে সেই কবিতা লেখা হয়েছিল।

মন বল দেখি স্মরণ করে
সে কোন সনে
জিতল রণে
বাবর বাহাদুর ?'

আন্দেজান থেকে আমার আসবার পরই মা, ঠাকুমা এবং পরিবারের আর সকলে রওনা হন্। পথে অনেক অসুবিধা এবং দুঃখ কষ্ট ভোগ করে অতি কষ্টে তাঁরা উরাত্তিপয়ে পৌঁছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের সমরকন্দে আনবার ব্যবস্থা করি। এই সময়ে আমার প্রথমা স্ত্রী আইসা সুলতান বেগমের গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মে। তার নাম দেওয়া হয় জেবরউন্নিসা অর্থাৎ রমণীরত্ন। এইটিই আমার প্রথম সন্তান। আমার বয়স তখন উনিশ। ত্রিশ চল্লিশদিন বয়সেই তাকে আল্লা কাছে টেনে নেন।

সমরকন্দ অধিকার করার পরই একের পর এক বার্তাবহ কিংবা দূত পাঠাই দূরের ও নিকটের সকল সুলতান, খাঁ, আমির ও সর্দ্দারদের কাছে। অনুরোধ জানাই তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি যেন আমি পাই। আমার পত্রবাহকরা চিঠি নিয়ে অনবরত যাতায়াত করতে লাগলো। নিকটবর্ত্তী কয়েকজন সুলতান, আমির সব জেনেশুনেও আমার প্রস্তাব অনৌদ্ধত্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। আর কয়েকজন যারা পূর্ব্বে আমার পরিবারের প্রতি কোনও অন্যায় বা অবজ্ঞা বা অপমান করার দোষে দোষী, তারা ভয়ে কোনও সাড়াই দিল না। অল্প কয়েকজন আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেও সময়মত তারা এমন কিছু সাহায্য করেনি যাতে আমার কোনও উপকার হয়। তাদের কথা পরে বলছি।

সাওয়াল মাসে সেবানি খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সসৈন্যে বেরিয়ে পড়ি নগর থেকে। 'নব-উদ্যানে' সৈন্যদের প্রধান ঘাঁটি করে সেখানে আরও সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পাঁচ ছয় দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর সেখান থেকে যাত্রা করে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাই—সির-ই-পুল পর্য্যন্ত। আরও কিছুদূর এগিয়ে শিবির স্থাপন করি। আমাদের শিবির সুরক্ষিত করার জন্য ট্রেঞ্চ কাটা ও বেড়া দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করা হয়। বিপরীত দিক থেকে সেবানি খাঁ এগিয়ে আসতে থাকে এবং কিছুদূরে শিবির স্থাপন করে। তার শিবির থেকে আমার শিবিরের দূরত্ব ছিল চার মাইল।

এইভাবেই আমরা চার-পাঁচদিন ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার পক্ষের ছোটখাটো সৈন্যদল শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজ্ঘর্ষের সৃষ্টি করছিল। একদিন ওদের একটা বড় দল এগিয়ে আসে, সেদিন সজ্ঘর্ষটা বেশ জোরালো হয়, কিন্তু কোনও পক্ষই সুবিধে করতে পারে না। আমার সৈন্যদের মধ্যে পতাকাবাহী একজন সৈন্য অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। সে পালিয়ে গিয়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ বলতে লাগলো—পতাকাবাহী সৈন্যটি হচ্ছে সিদিকারি। তা হওয়া সম্ভব, কারণ সিদিকারি বক্তৃতার বেলায় খুব সাহসী, তরবারি হাতে নিলেই সে কাপুরুষ হয়ে ওঠে।

একরাত্রে সেবানি খাঁ আমাদের চমকিয়ে দেয় শিবির আক্রমণের চেষ্টা ক'রে। কিন্তু আমাদের ট্রেঞ্চ দিয়ে ঘেরা শিবির এমন সুরক্ষিত ছিল যে তারা কিছুই করতে পারলো না। ট্রেঞ্চের ধারে এসে যুদ্ধ হুঙ্কার করে কয়েকটি তীর ছুঁড়ে তারা সরে পড়লো।

আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এইবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলাম। কামবের আলি আমাকে সাহায্য করলেন। বাকিটের খান প্রায় দুইহাজার সৈন্য নিয়ে 'কেলে' পৌঁছিয়েছেন—পরদিনই

তাঁর আমার কাছে আসার কথা। মীর সাহেবের পুত্রকে হাজার দেড়হাজার সৈন্য নিয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার মাতুল খাঁ সাহেব পাঠিয়েছেন। তারা আমার শিবির থেকে মাইল ষোলো দূরে দাবুলে এসে গিয়েছে—পরদিন সকালে তাদের এখানে পৌঁছনোর কথা। এই রকম যখন পরিস্থিতি, তখন আমি হঠকারিতার বলে যুদ্ধে নেমে পড়লাম।

'অশান্ত মনের বেগে
আগু পিছু নাহি ভেবে,
ত্বরিতে যে অসি ধরে হাতে।
হঠকারি সেই জন
অবশেষে ভাঙ্গা মন,
সে হাত দংশিবে নিজ দাঁতে।

আমার তাড়াহুড়া করে যুদ্ধে নামার আগ্রহের হেতু ছিল এই যে, সেইদিন দুই বিরোধী সেনার মাঝে আকাশে অষ্টনক্ষত্রের উদয় হবে। যদি এই দিনটির সদ্ব্যবহার না করি এবং ঐ দিনটি চলে যায় তাহলে এ সুযোগ পেতে আরও তেরো চোদ্দদিন কেটে যাবে—আর এই সময়টা শত্রুপক্ষের সুবিধাজনক হবে। এইরকম মনোভাব নিয়ে ঘটনার বিচার করা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। সেইজন্য আমার তাড়াতাড়ি যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত করার দৃঢ় যুক্তি ছিলনা।

সকাল বেলায় সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত করা হলো। অশ্বদের জিন বল্গা চাপিয়ে তৈরী করে নেওয়া হলো। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম শত্রুর সম্মুখীন হতে—ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে সৈন্যব্যূহ সাজিয়ে নিয়ে। শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমরা এগিয়ে গেলাম। তারাও আমাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। বিরোধীয় দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হলে শত্রুপক্ষের ডান সারির সৈন্য আমার বাঁদিকের সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের পিছন দিকটা ঘিরে ফেলে। আমি তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াই। আমার এই রকম স্থান পরিবর্তন করার ফলে আমার সম্মুখের বাছাই-করা অভিজ্ঞ সৈন্য দল ডান দিকে পড়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কেউই আমার সঙ্গে আসতে পারে না। যাহোক, এ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যের প্রবল চাপে শত্রু সৈন্যের সম্মুখ ভাগ বিপর্যস্ত হয়ে পিছিয়ে যায়। এমন কি সেবানি খাঁয়ের কয়েকজন অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ তার কাছে গিয়ে বলে যে এখনই পিছিয়ে না গেলে সমস্তই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে তাতে সম্মত না হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের সারির সেনারা আমার বাঁ সারির সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে পশ্চাৎ দিকে আমাকে আক্রমণ করে। আমার স্থান পরিবর্তনের ফলে আমার সম্মুখভাগের সেনারা ডান দিকে পড়ায় আমাদের সম্মুখ ভাব অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। শত্রুপক্ষ সুযোগ বুঝে পেছনে ও সম্মুখে আক্রমণ চালিয়ে অজস্র শর বর্ষণ আরম্ভ করলো। যে সব মোগল সৈন্য আমার সাহায্যের জন্য এসেছিল তারা যুদ্ধে কোনও উদ্যম না দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আমারই লোকদের লুণ্ঠন করতে সুরু করলো। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই যে তারা এমন করেছে তা নয়—এই রকমের সয়তানিই মোগলদের চিরাচরিত নীতি। যদি কোনও যুদ্ধে জয়ী হয়—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে। আর যদি তারা পরাজিত হয় তা হলেও মিত্রপক্ষের লোকদের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে যা পারে নিয়ে পালিয়ে যায়।

মাত্র বার কি পনরো জন সৈন্য আমার পাশে ছিল। কোহিক নদী আমাদের অতি নিকটে। আমার সৈন্যদলের দক্ষিণ সারির এক প্রান্ত প্রায় নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ছুটে গেলাম। তীরে পৌঁছিয়েই ঘোড়া আর সৈন্যদের সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নদী পার হতে দেখা গেল যে অর্দ্ধেকটায় জল খুব গভীর নয়, কিন্তু মাঝামাঝি আসতেই আর থৈ না পাওয়া ও অনবরত শর নিক্ষেপের মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সওয়ার নিয়ে ঘোড়াদের সাঁতরিয়ে পারে নিয়ে আসা হলো। তীরে পৌঁছিয়ে ঘোড়ার ভারী সাজ সরঞ্জাম কেটে বের করে ফেলে দেওয়া হলো। উত্তর তীরে পৌঁছিয়েই আমরা শত্রু সৈন্য থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। এই সময় বজ্জাত মোগলরা সওয়ারদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তাদের জিনিষপত্র লুঠ করলো। ইব্রাহিম তেরখান এবং আরও কয়েকজন সুদক্ষ সৈনিককে এইভাবে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাদের জিনিষপত্র কেড়ে নিয়ে মোগলরা তাদের হত্যা করে।

'জাতে মোগল, মোগল জাত?
দেবদূত এরা? কখন নয়।
মোগল জাত—বদ্জাত।
সোনার আখরে যদি লেখা থাকে
মোগল নাম।
গৌরব সেটা? কখনও নয়।
মোগল নাম—দুর্ণাম।'
'সাবধান! মোগলের ক্ষেত থেকে
তুলেও তুলোনা, শস্যবীজ এক কণা।
সে বীজ এমন,
যেখানে করিবে রোপণ
বিষবৃক্ষে হবে৲পরিণত। একথা ভুলোনা'

কোহিক নদীর উত্তর পার দিয়ে আমরা কিছুদূর এগিয়ে আবার নদীপার হয়ে এপারে চলে আসি। বিকেল ও সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়ে 'সেখজাদের' ফটকে পৌঁছাই, তারপর নগরে প্রবেশ করি।

বড় দরের অনেক সুদক্ষ সৈন্য এবং নানা শ্রেণীর বহুলোক এই যুদ্ধে নিহত হয়।

এই বিপদে যারা আমাকে সৎপরামর্শ দিতে পারে—তেমন তেমন সেনাপতি এবং আমার বিশিষ্ট অনুগতদের আহ্বান করলাম। আলোচনায় স্থির হলো যে এই দুর্গ যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করতে হবে এবং এটা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে হবে। আমি ও কাসিম বেগ

আমার বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে রিজার্ভ দল গঠন করি। আমার জন্য নগরের মাঝখানে শিবির স্থাপন করে সেখানে প্রধান আস্তানা করা হলো। সেনাদলের অনেককে বিভিন্ন ফটকে পাহারা দেওয়া, দুর্গ প্রাচীর রক্ষা প্রভৃতি ভাগে ভাগে নানা কাজে নিযুক্ত করা হলো।

দুই তিন দিন বাদে সেবানি খাঁ অগ্রসর হয়ে নগর থেকে কিছু দূরে আস্তানা গাড়লো। এই সময় সমরকন্দ নগরের ও অন্যান্য জেলার কতকগুলো অপদার্থ গুণ্ডা শ্রেণীর লোক একত্রিত হয়ে—আল্লা মহান—এই আওয়াজ তুলে কলেজ ভবনের ফটকে এসে হাজির হ'লো। সেখান থেকে হৈ হুল্লোড় করে যুদ্ধ যাত্রা করলো। সেবানি খাঁ সেই সময় রণসাজে সজ্জিত হয়ে আক্রমণের জন্য বেরোচ্ছিল। ওদের রণ-হুঙ্কার শুনে আর এগোতে সাহস করলো না। এই ভাবেই কয়েক দিন কেটে গেল। অজ্ঞ জনতা কোনও দিনই নিক্ষিপ্ত শর বা তরবারির আঘাত যে কি ব্যাপার তা জানতো না। তারা কোনও দিন সম্মুখ যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয় নি, যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা যে কি ভয়াবহ—তারও কোনও অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। সেবানি খাঁর নিশ্চেষ্টতা দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল। তারা দুঃসাহস ভরে তাদের জায়গা ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেল। অভিজ্ঞ বয়স্ক লোকেরা তাদের এগিয়ে আক্রমণ করার কাজটা নির্বুদ্ধিতা হবে বলে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তারা সে উপদেশে কর্ণপাত না করে তাদের গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিল।

একদিন সেবানি খাঁ লৌহ-ফটকের কাছাকাছি এসে আক্রমণ চালায়। গুণ্ডা জনতা এর মধ্যে বেশ সাহসী হয়ে উঠেছিল। তারা খুব বীরত্ব দেখিয়ে তাদের রীতি অনুসারে নগর থেকে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। আমি তাদের পেছন পেছন একদল অশ্বারোহী সেনা পাঠাই এই ভেবে যে—যদি ওদের পিছিয়ে আসতে হয় তাহ'লে ফেরার পথে অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ঘিরে নিয়ে আসতে পারবে। উজবেক্‌দের সাফল্যে ঘোড়া থেকে নেমে হাতাহাতি লড়াই করে আমার পক্ষের জনতাকে লোহা ফটক পর্য্যন্ত খেদিয়ে আনলে তারা ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা যুদ্ধ করছিল তারা সরে পড়াতে জায়গাটা পরিস্কার হতেই শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে এগিয়ে এল। কাচবেগ্ এই দেখে তরবারি নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উজবেক্‌দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নগরবাসীরা তার অদ্ভুত বিক্রম দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। আক্রমণকারীরা তখন শর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করার কথা ভুলে পিছন ফিরে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। আমি ফটকের ওপর দাঁড়িয়ে শরনিক্ষেপ করে চলেছি। আমার সঙ্গীরাও অনবরত তীর ছুঁড়ছে। ওপর থেকে তীর বর্ষণের প্রাবল্যে শত্রুপক্ষ আর মসজিদ পর্য্যন্ত এগোতে পারলো না, তারা পিছিয়ে গেল।

অপরাধের সময় প্রতি রাত্রে দুর্গ প্রাচীরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পর্য্যবেক্ষণের কাজ করতো—কাশিম বেগ এবং কখনও অন্যান্য বেগ বা সৈন্যাধ্যক্ষরা ফিরোজ গেট থেকে 'সেখজাদে' গেট পর্য্যন্ত ঘোড়ার চড়ে যাওয়া যেত। অন্য জায়গায় যেতে হলে অবশ্য পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। দুর্গের চারদিকে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হতো সন্ধ্যায়, আর শেষ করতাম ভোরে।

সেবানি খাঁ একদিন লোহা ফটক আর সৈখজাদে ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় আক্রমণ চালালো। আমি আমার রিজার্ভ সৈন্য নিয়ে আক্রান্ত স্থানের দিকে এগিয়ে গেলাম—সবুজ ফটক এবং সুঁচওয়ালা ফটকের দিকে নজর না রেখে। সেই দিন 'সেখজাদ' ফটকের ওপর থেকে আমি অভ্রান্ত ভাবে একটা সাদা ঘোড়াকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করি। দেহে তার ছোঁয়া মাত্র ঘোড়াটি প্রাণশূন্য দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্য প্রবলভাবে উষ্ট্রগ্রীবার দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ প্রাকারের কাছে কিছু জমি দখল করতে সক্ষম হয়। আমি যেখানে ছিলাম সেই দিককার শত্রুসৈন্য বিতাড়নের কাজে তখন আমি ব্যস্ত। বিপদ যে অন্যদিক থেকে আসতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সেইদিক থেকে তখন শত্রুরা দেওয়াল টপকানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে পঁচিশ ছাব্বিশ খানা মই দিয়ে। মইগুলি এমন চওড়া যে এক সারিতে দুই তিনজন চড়ে উঠে আসতে পারে। সেবানি খাঁ সাত আটশ' বাছাই করা সেনা ও মই নগর প্রাচীরের ওধারে 'কামার ও 'সুঁচ-ওয়ালা' ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল, আর সে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অন্য জায়গায় আক্রমণ করার ভান করছিল। এই জন্য বিপদ যে কোন দিক দিয়ে আসছে তার সঠিক ধরণা করতে পারিনি। শত্রু-পক্ষের যে সৈন্যদল লুকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা যখন দেখ্‌লো যে প্রাচীরের অপর পাশে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নাই—তখন তারা গুপ্ত জায়গা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে দুই ফটকের মাঝামাঝি দুর্গ দেওয়াল টপকানোর জন্য মই লাগিয়ে ফেল্‌লো। সুঁচওয়ালা ফটক পাহারার ভার ছিল কারা-বিলাসের ওপর এবং 'সবুজ' ফটক পাহারার্ ভার ছিল সিরাম তাঘাই ও তার ভাইদের ওপর। যুদ্ধ অন্যদিকে হচ্ছে দেখে তারা বুঝতে পারেনি যে বিপদ এই দিক থেকে আসতে পারে। তারা তখন নিজ নিজ কাজে হয় বাড়িতে অথবা বাজারে ঘুরছে। আমিররা যে কয়েকজন চারিদিকে দৃষ্টি রেখেছিল—তাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকজন লোক ছিল। যাহোক, কুচ্ বেগ এবং আর একজন বীর অশ্বারোহী শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা সেদিন অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিল। শত্রুপক্ষের কয়েকজন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এসেছিল আর কয়েকজন দেওয়াল টপকানোর উদ্যোগ করছিল। সেই সময় আমার চারজন অনুচর বীরের মত খোলা তরবারি নিয়ে তাদের আক্রমণ করে প্রাচীরের ওপরে তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের পিছু হঠতে বাধ্য করে। সবচেয়ে বীরের কাজ করেছিব—কুচ্‌বেগ। তার এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত চিরকাল স্মরণযোগ্য। এই অপরাধের সময় দুইবার সে অত্যন্ত সাহসিক কাজ করে। কারা বিলাস সুঁচওয়ালা ফটকে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শত্রু আক্রমণ ভালভাবে প্রতিহত করে। খাজা গোকুধতাস ও কুল নাজের কয়েকজন অনুচর নিয়ে শত্রু আক্রমণ প্রতি-রাধ করে 'ধোবি' ফটকের কাছে। তারা শত্রুসৈন্যের পিছন দিক থেকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। এইভাবে শত্রু আক্রমণ নিষ্ফল হয়।



এক ঝলকে
সবার
চোখে...

স্তব্দ
পলক
তোমার
রূপে

এক ঝলকে, চোখের পলক স্তব্দ হলো, মুগ্ধ হয়ে, স্নিগ্ধ রূপে তোমার। তোমার রূপে হারিয়ে আছে, সবার চোখের দৃষ্টি...রূপ যে তোমার মায়া মধুর মিষ্টি। এমন দিনটি সবার জীবনে কখন আসে? এ প্রশ্নের জবাব জানেন লাস্যময়ী চিত্র তারকা শকিলা। 'চেহারার লাবণ্যতাতেইতো নারীর রূপের বিকাশ। তাইতো আমি সুবাস ভরা লাক্স ব্যবহার করি। এর কুসুম কোমল ফেনার পরশ আমার ত্বককে সজীব আর লাবণ্যময়ী রাখে'—শকিলা দেবীর অবিজ্ঞতা। আপনার রূপও এমনটিই হবে-নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করুন

শকিলা—কে অমরনাথের "বরাত" ছবিতে

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার বিশুদ্ধ,
শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

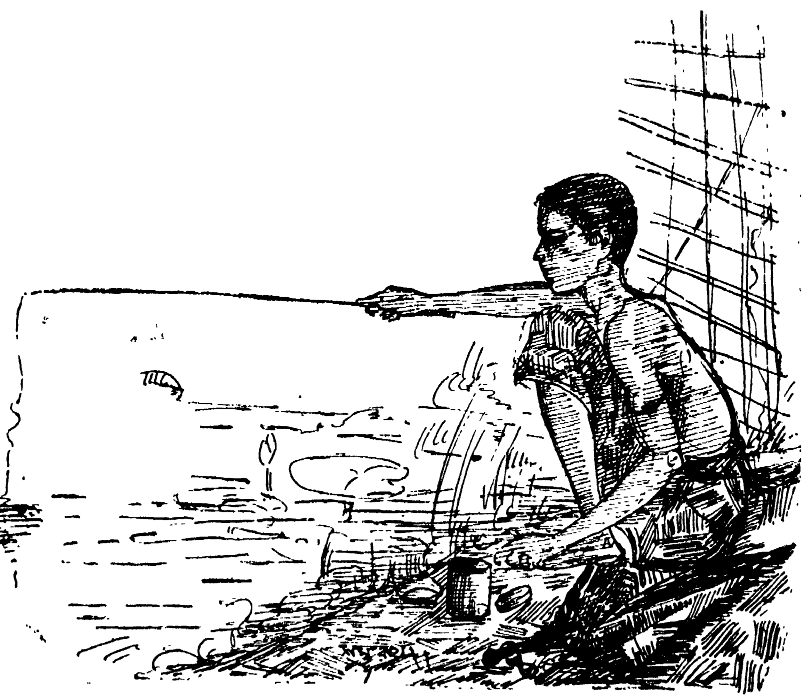
LTS.67-X52 BG

আর একবার কাশিকবেগ ছোট একদল সৈন্য নিয়ে 'সুঁচওয়ালা' ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে উজবেকদের পরাস্ত করে। তাদের কয়েকজনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাদের শিরচ্ছেদ করে। তারপর তাদের মাথা নিয়ে ফিরে আসে।

শস্য পাকার সময় হয়েছে—কিন্তু নতুন ফসল ঘরে তোলার উপায় নাই। অপরাধ চলছিল অনেকদিন ধরে। দুর্গ-নগরবাসীরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়লো। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে গরীব আর নীচুজাতের লোকেরা কুকুর আর গাধার মাংস খেতে বাধ্য হলো। ঘোড়ার খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাদের গাছের পাতা খাওয়ানো হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তুঁত গাছের পাতা তাদের খাদ্যের পক্ষে ভাল। কেউ কেউ গাছের বাকলা জলে ভিজিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে আরম্ভ করলো। তিন চার মাস সেপনি খাঁ দুর্গের কাছে আসেনি। দুর্গ থেকে কিছু দূরে চার দিক ঘিরে রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করছিল।

এক গভীর রাতে যখন সকলেই বিশ্রাম করতে গিয়েছে, সেপনি খাঁ রণ-দামামা বাজিয়ে রণ-হুঙ্কার তুলে 'ফিরোজ' গেটের দিকে এগিয়ে এলো। কলেজ ভবনে ছিলাম তখন আমি। খুবই আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম সেদিন। এরপর প্রায় রাত্রেই তারা দামামা বাজিয়ে ঐ রকম হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো। আমার অধীন সামন্ত রাজ এবং সর্দারদের কাছে দূত পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম, কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোনও সাড়া পাওয়া গেলনা। যখন আমি ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিলাম তখন চেয়েও অনেক সময় কারও কাছ থেকে সময় মত কোনও সাহায্য পাইনি। অথবা তা না পেলেও তখন আমার কোনও অস্বস্তি বা ক্ষতি হয়নি। সুতরাং যখন আমি বিপদের চরম সীমায় এসে পৌঁচেছি তখন যে কারও সাহায্য পাবনা সেটা তো জানা কথা। সুতরাং অবরুদ্ধ অবস্থায় যখন চরম দুর্দ্দশায় পড়েছি তখন আমার এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কেউ আশার আলো জ্বালাবে এমন মনে করাও ভুল। প্রাচীন মহাজনরা বলেছেন—দুর্গ রক্ষা করতে হলে চাই মাথা, দুই হাত আর দুই পা। মাথা হচ্ছে—সেনাপতি, দুই হাত হচ্ছে দুই দল মিত্র বাহিনী, যারা দুইদিক দিয়ে এগিয়ে আসবে, আর দুই পা হচ্ছে জল আর পর্য্যাপ্ত রসদের ব্যবস্থা দুর্গের মধ্যে।

তাম্বলকে আন্দেজান থেকে অগ্রসর হতে দেখে আমেদ বেগ আর তার কয়েকজন অনুচর সুলতান মামুদ খাঁকে তার গতিরোধ করার জন্য অনুরোধ করে। দুইদলের অবশ্য লেক্‌লেকন্ সীমায় দেখা হলো—কিন্তু কোনও দলই আক্রমণ সুরু করলো না। সুলতান মামুদ খাঁ মোটেই যোদ্ধা ছিলেন না। যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। যখন তাম্বলের সামনে তিনি দাঁড়ালেন—তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হ'লো তিনি কথায় ও কাজে কাপুরুষ। আমেদ বেগ ছিল রূঢ়ভাষী কিন্তু তার মনিবের কাজে বাহাদুর এবং সরিয়া আদাম। সে রূঢ়ভাবে খাঁকে বলছিল—তাম্বল এমন কি জাঁদরেল লোক যাকে দেখে আপনি ভয়ে আতঙ্কে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়লেন? যদি আপনার তাকে চোখে দেখ্‌তে ভয় করে-তাহ'লে চোখ দুটো বেঁধে ফেলুন। তারপর আসুন তার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ি। ক্রমশঃ



তিতিক্ষা..............

শিল্পী—শম্ভু রায়

গল্প

শূন্য

সঙ্কর্ষণ রায়

বা-ব্বা!

খোকনের আধো আধো ডাক রূপকের মনের তারে অদ্ভুত একটা সুরের তরঙ্গ তোলে। যেন এর আগে কোন শিশু বাবা বলে ডাকে নি।

অথচ বাবার চেয়েও খোকন তার দিদিমাকেই বেশি চেনে। রূপক হাত বাড়ালেও দিদিমার কাছ থেকে সে আসতে চায় না তার কাছে। রূপকের বুঝি অভিমান হয়। সে বলে, তোর সঙ্গে আড়ি—কক্ষণো আর তোর কাছে আসব না।

খানিকক্ষণ বাদেই আবার খোকন রূপকের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, বা-ব্বা বায়ো—দিদা মন্ন—দিদা মাব্বো।

রূপক হেসে বলে, হ্যাঁরে খোকন, তুই আমার কাছে গিয়ে থাকবি?

খোকনের দিদিমা বলেন, তাই থাক্। আমি মন্দ তোর বাবা ভাল—তোর বাবার কাছেই থাক্ গিয়ে।

তারপর রূপককে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেন, জানলে বাবা, ছেলে তোমার কথায় কথায় আমাকে শাসন করে। বলে, মাব্বো—নাতি দিয়ে মাব্বো। বাবা দাবো—বাবা বায়ো।

খোকন তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে তার দিদি-মার কথা শোনে—হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বলে, দিদা মিত্তি—দিদা মাতের দোল।

খোকনকে নিয়ে বীথিকাদের বাড়ির সামনের বাগানটি-তে বেড়াতে বেড়াতে এক এক সময় কী রকম অন্যমনস্ক হয়ে যায় রূপক। দুলতে থাকা তরুলতার ফুলের ঝাঁকে তখন সন্ধ্যার রোদটুকু খোকনের মুখের হাসির মত ফুটে উঠেছে—জিনিয়ার স্তবকে দিগন্তের প্রতিচ্ছবি।

অনেক দিন আগে এম্নি সব সন্ধ্যা তার মনে যে সব রঙের আলপনা বোলাত—তারা সব খোকনের মুখের হাসিতে এসে মিশেছে আজ। গোপন স্বপ্নের জাগরণের স্বাক্ষর যে রঙে চিহ্নিত মুখে—সে রঙ চন্দ্রমল্লিকা ও দো-পাটির সম্ভারে কোথাও সে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

বীথিকার মা বলেন, হ্যাঁ বাবা, বীথি তো আজকাল চিঠিপত্র লেখা বন্ধই ক'রে দিয়েছে। খোকনের জন্যও কী ওর মন উতলা হয় না!

রূপক বলে, হয়তো রিসার্চ নিয়ে খুব ব্যস্ত—সময় পাচ্ছে না।

কিন্তু খবরের কাগজে দেখলুম—কাপ্রি না কোথায় এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী হচ্ছে ওখানে।

তার সঙ্গে রিসার্চের কী সম্পর্ক আমি ভেবে পাই নে। তুমি ওকে লিখে দাও না বাবা, সম্মিলনী-টম্মিলনী ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে ফিরে আসুক না চটপট।

রূপক কিছু বলল না। সেদিন রাত্রে বীথিকাকে চিঠি লিখবে ব'লে সে কাগজপত্র নিয়ে বসল। কিন্তু লিখতে পারল না।

বীথিকার বিদেশ যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে, করুণ ছল ছল চোখ মেলে সে বলেছিল, যেতে চাই নে তবু জোর করে পাঠাতে চাও? ফ্রান্সের সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর পেরাঁর সাগ্রহ আহ্বানে সাড়া দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তার—তাঁর দেওয়া স্কলারশিপ সে প্রত্যাখ্যান করতেই চেয়েছিল। রূপকের আগ্রহে একরকম অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে যেতে রাজি হ'য়েছিল। বিদায় মুহূর্তে তার সেই নীরব চেয়ে-থাকা সন্ধ্যাতারায় কতদিন সে দেখেছে! কিন্তু সে সজল দৃষ্টির স্মৃতি মুছে গেছে ধীরে ধীরে। আজ বুঝি চেষ্টা ক'রেও মনে করতে পারে না।

বাইরে জ্যোৎস্না বিচিত্র মায়াজাল রচনা করেছে—তার মনের শূন্যতা যেন ঐ জ্যোৎস্নার পাখায় ভর ক'রে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

রূপক বীথিকার মায়ের কাছে গিয়ে বলে, খোকনকে আমার কাছে নিয়ে রাখব।

বীথিকার মা আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, পারবে তুমি সামলাতে? নাওয়ানো-খাওয়ানো এ সব কী পুরুষ মানুষের কাজ বাবা! তা' ছাড়া যে দস্যি ছেলে তোমার!

রূপক একটু হেসে বললে, পারবো বৈকি। একান্তই না পারি আপনার কাছে দিয়ে যাব আবার। রোজ দুপুর-বেলায় অবশ্য আপনার কাছেই রেখে যাব। ওকে নিয়ে তো আর য়ুনিভার্সিটিতে যেতে পারব না।

বীথিকার মা রাজি হ'লেন।

জামা-জুতো প'রে বাবার কোলে চেপে ব'সে খোকন বললে, দিদা—দাই।

খোকনের মুখে চুমু খেয়ে দিদিমা বললেন, যাই বলতে নেই দাদুভাই—বলো আসি।

মিষ্টি হেসে খোকন বললে, আতি।

দু'দিনেই টের পেল রূপক বীথিকার মা ঠিকই বলে-ছিলেন—দুরন্ত খোকনকে সামলানো তার কর্ম নয়। এক মুহূর্ত্তও স্থির হ'য়ে থাকবে না ছেলেটা। ঘর থেকে ঘরে দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়—তার পেছন পেছনে ছুটোছুটি করতে করতে প্রাণান্ত হয় রূপক।

এক এক সময় রূপক বলে, এ রকম দুষ্টুমি করলে কিন্তু তোকে তোর দিদার কাছে দিয়ে আসব।

সঙ্গে সঙ্গে রূপকের গলা জড়িয়ে ধরে খোকন বলে, দিদা মন্ন—দিদা দাবো না। বাবা বায়ো।

রূপক হেসে ফেলে বললে, বল্ তা' হ'লে যে আর দুষ্টুমি করবি নে।

দুষ্টু হাসি হেসে খোকন বললে, বাবা দুত্তু।

চোখ পাকিয়ে রূপক বলে, তবে রে!

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে খোকন।

সদর দরজা খোলা পেলেই খোকন বাইরে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থেকে নীচের দিকে চেয়ে বলে, বাবা, দাই—আমি দাই।

ছুটে এসে রূপক খোকনকে তুলে নিয়ে বলে, প'ড়ে যাবি যে রে। তোকে নিয়ে আর পারি নে বাবা।

ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রূপক ক্লাসের নোট তৈরী করে। রুদ্ধ দুয়ারের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে খোকন। তারপর রূপকের লেখবার টেবিলের সাম্নে এসে মুখ তুলে বলে, নেকা-পরা কোব্বো।

রূপক বলে, করবে বৈকি বাবা। তোমার জন্য সোনায় বাঁধানো কলম এনে দেব।

খোকন বলে, ক-অ-ম। ওতা ক-অ-ম।

হাত বাড়িয়ে খোকন রূপকের হাতের কলমটি ধরতে যায়।

পরক্ষণে খোকনের দৃষ্টি জানলার ওপরে কার্ণিসে বসা চড়াই পাখিটির দিকে পড়ে। কলমের কথা ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা পাপি। ঐ পাপি।

বিরক্তি প্রকাশ ক'রে রূপক বলে, নোট লেখা আর হ'বে না দেখছি। এমন জ্বালাতন করিস তুই বাবা!

খোকন ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, পাপি নেই—পাপি উয়ে—গেও।

যাকগে উড়ে। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস তো।

রূপকের কোলে উঠে ব'সে তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে রূপকের হাতের কলমটি আঁকড়ে ধরে খোকন বললে, নিকো না বাবা।

ডক্টর নিয়োগী রূপকের কামরায় এসে বললেন, মনে হচ্ছে তোমার সংখ্যাতত্ত্ব শূন্যে মিলিয়ে গেছে। যদিও তোমার থিয়োরী অব নাম্বার্সের কিছুই বুঝি নে—তবুও তোমার ওপর ভরসা ছিল খুব। ভেবেছিলাম সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের সমীকরণ ক'রে খুব একটা জোরালো

রূপক হেসে বললে, দুরাশা। দেখছেন না আমার কাগজ-পত্র ফাইল সব কিছুর ওপর ধুলো জমেছে। মনে হচ্ছে আমি ফুরিয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হ'বে না! কিন্তু এককালে প্রচুর কাজ করেছিলাম অবশ্য। সে সব কারুর হাতে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম। সম্প্রতি মনে হচ্ছে সসম্মানে পশ্চাদপসরণ করা যাক।

ডক্টর নিয়োগী অবাক হ'য়ে বললেন, সে কী হে?

রূপক বললে, এই একটু আগেই আপনি বলেছিলেন

আমার সংখ্যাতত্ত্ব শূন্যে মিলিয়ে যেতে চলেছে। সত্যিই তাই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

ক্লাসের নোট তৈরী ক'রে স্নান ও খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে অনেক দেরি হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন। তাড়াতাড়ি খোকনকে জামা-জুতো পরাতে চেষ্টা করে রূপক। কিন্তু খোকন জুতো কিছুতেই পরবে না।

রূপক বিরক্ত হ'য়ে বলে, জ্বালাতন হ'য়েছে তোকে নিয়ে। এদিকে য়ুনিভার্সিটির বেলা হ'য়ে গেল। কী যে করি! থাক তা' হলে তোর জুতো পরা। খালি পায়েই চল্। দেখিস দিদা কি রকম তোকে বকুনি দেয়।

খোকন খালি পায়ে নাচতে নাচতে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে যায়। রূপক ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সময় আর নেই। খোকনকে তার দিদিমার কাছে পৌঁছে দিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাড়াতাড়ি সে পোষাক পরতে থাকে।

খোকন ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে যে সদর দরজাটি খোলা আছে। এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিপাত ক'রে সে বাইরে বেরিয়ে এল। বাবার নজর এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে—খুব ফুর্তি তার। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকায় সে। কোন অতলে তলিয়ে গেছে বিরাট লম্বা সিঁড়িটি। নীচের দিকে অন্ধকার। তাতে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে যেন অনেক রহস্য—যাদের অদৃশ্য ইঙ্গিত খোকনকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে।

পোর্টফোলিও ব্যাগটা গোছাতে গোছাতে রূপক দেখল খোকন সেখানে নেই। খোলা সদর দরজার দিকে তার নজর পড়ল। দুষ্টুটা নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ বাইরের থেকে শিশুকণ্ঠের আর্ত চিৎকার রূপকের চারপাশের নৈঃশব্দকে চিরে ফেলে ধারালো ছুরির মত। রূপক ছুটে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির ওপর কেউ নেই। নীচে অন্ধকার। সে অন্ধকার হঠাৎ যেন উঠে এসে তাকে ঘিরে ফেলে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে যায়।

সিঁড়ির নীচে খোকনের নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহটা প'ড়ে ছিল!

ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বললেন, সেরিব্রেল হেমারেজ।

বীথিকার মা বাগানে বেতের চেয়ারে ব'সে ছিলেন খোকনের জন্য সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিলেন কিছু দিন আগে—অসমাপ্ত সোয়েটারটা তাঁর কোলের ওপর প'ড়ে ছিল। সোয়েটারটিতে হাত রেখে সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে হ'ল রঙিণ জামা-জুতো পরে সামনের গ্র্যাভেল ওয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে খোকন যেন বলছে, দিদা দাই—আমি দাই।

ক্লাসের নোট তৈরী করছে রূপক। তার কাজে বাধা দিতে আসবে না কেউ। সদর দরজা খোলাই আছে। বন্ধ করবার দরকার হয় না আর।

লিখে যাচ্ছিল রূপক। হঠাৎ পাশের জানালার ওপর-কার কার্ণিসে ব'সে-থাকা চড়াই পাখিটির দিকে তার নজর পড়ল। তার কানে এল খোকন যেন বলছে, পাপি। আমি পাপি নেব বাবা।

হঠাৎ ছোট্ট একটা কোমল হাত যেন তার কলমটা আঁকড়ে ধরে।

আপন মনেই সে বলে, লিখতে দিবি নে খোকন!

ডক্টর নিয়োগী ঠাট্টা ক'রে সেদিন বলেছিলেন, তোমার রিসার্চ তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছ—মনে হচ্ছে অন্ততঃ পক্ষে শূন্যের সংজ্ঞায় পৌঁছে গেছ।

রূপকের মনে হ'ল ডক্টর নিয়োগী যদি এখন তার সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি হয়তো শূন্যকেই প্রত্যক্ষ করবেন—সংজ্ঞার দরকার হ'বে না।

ডক্টর পেরাঁর একটা চিঠি পেল রূপক। তিনি লিখেছেন যে বীথিকা তার রিসার্চ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তিনি আর তাকে স্কলারশিপের এক্সটেন্‌শন দিতে পারবেন না। তিনি মনে করেন যে অবিলম্বে বীথিকার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রূপক। সে ডক্টর পেরাঁকে লিখে দিল যে বীথিকার মন সাময়িকভাবে বিক্ষিপ্ত হলেও সে আবার তার কাজে মন দিতে পারবে এ বিশ্বাস তার আছে। ডক্টর পেরাঁর যদি আপত্তি না হয় তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করবার ইচ্ছে তারও। তাঁর অনুমোদন পাওয়ামাত্র সে রওনা হবে।

বীথিকাকে সে লিখল, সংখ্যার সংজ্ঞা খুঁজছিলাম। সুস্পষ্ট সংজ্ঞা অঙ্কের ফর্মূলায় বাঁধতে পারি নি এখনো। কিন্তু খোকন হঠাৎ আমাকে শূন্যের মাঝখানে বসিয়ে রেখে সংখ্যাতত্ত্বের পথের পাঠোদ্ধারের মন্ত্র দিয়ে গেছে। শূন্য থেকেই শুরু করতে পারব আমরা।

সারস্বত

শ্রীশঙ্কর গুপ্ত

চাণক্য শিশুকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত লালন করা ও তাহার পর দশ বর্ষ তাড়না করার স্বপক্ষে রায় দিয়ে গেছেন। আর বলেছেন ষোল বছর বয়স হলেই পুত্রের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করতে।

অধুনা একটি সংবাদে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের মানবিক অধিকার কমিশনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংস্থায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেত্রাঘাতের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। যে সব দেশ কোন মতামত দানে বিরত ছিল তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারত প্রস্তাবটির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানে বিরত ছিল।

আধুনিক শিক্ষাজগতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই স্তরে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত। প্রাথমিক স্তরেরও পূর্বে নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেন স্তরে ছোট শিশুদের জন্য মন্তেসরী প্রবর্তিত এক বিশেষ পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। এই অতি-শিশুদের প্রহার করতে কোন সম্প্রদায় মত দেয় নি। কিন্তু প্রাথমিক স্তর সাধারণত ছয় থেকে এগার বৎসরের ছাত্র অধ্যুষিত। চাণক্যের ফরমূলা অনুসারে অবশ্য পাঁচ বছর পেরোলেই তাড়নার স্তর আসবে, কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের ঐ সংস্থা সে বিষয় কোন উল্লেখ করেছেন কি না খবরে তা প্রকাশ নয়। বারট্রাণ্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কথায় ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীল মনোভাবের পরিচয় অতি স্পষ্ট, মানুষকে মানুষের হাতে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হবে বলে বিধাতা তাকে যথেষ্ট ঘাতসহ করে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি।

প্রাণীজগতে যে সব আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে মানুষ তারই অন্তর্ভুক্ত বলে তারও কতকগুলো সহজ আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে। তার মধ্যে ভয় অন্যতম এবং মনোবিজ্ঞানীরা নাকি বলেন যে সমস্ত ভয়ই মৃত্যুভয় থেকে জাত। অর্থাৎ মৃত্যুভয় মানুষের চরম ভয়; আর সব ভয়গুলো তারই কোনটা আট আনা, কোনটা তিন আনা, কোনটা আধ আনা। আবার স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁদের বক্তব্য একটা আঙুল কেটে ফেললে মানুষ মরে না, কিন্তু নখের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পিন ফোটালে মানুষ যন্ত্রণায় মারা যেতে পারে অর্থাৎ দারুণ যন্ত্রণা মৃত্যুর কারণ ঘটায় বা ঘটাতে সক্ষম। প্রথম প্রহার, দৈহিক যন্ত্রণা, ভয় এবং মৃত্যু এগুলোকে আমরা একসূত্রে গ্রথিত করতে বা ধাপে ধাপে রাখতে পারি।

প্রহারে মনে ভয় জাগে। ভয় থেকে বাধ্যতা আসে। বাধ্যকে নির্দেশ দিয়ে কাজ চালান যায়। শিক্ষক মশায়ের চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাতের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখলে ছাত্র শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। তখন ছাত্রকে গঠন করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর। হয়ত এই ধারণার ভিত্তিতেই এত কাল লাঠৌষধির প্রচলন ছিল। কিন্তু অধুনা আমাদের দেশে সে প্রথা কার্যত উঠে যাওয়ার ছাত্রসমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে স্বাধিকার-প্রমত্ততা না বলে ভয়ের অভাব এর কারণ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। তাড়নায় ভয়ে ছাত্রদের মন পঙ্গু এবং অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—শিক্ষাবিজ্ঞানীদের এই মত। আবার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটার উপযোগী মানসিক পূর্ণতালাভ করার আগে ভয়ের ব্যবস্থা লোপ করায় উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব। এমন ক্ষেত্রে কর্তব্য নির্ণয় কঠিন।

প্রীতি দিয়ে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তা অন্য-নিরপেক্ষ নয়। আবেদন মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে কিন্তু তাও অপরপক্ষের স্বীকৃতি-সাপেক্ষ। কিন্তু শাসন পরিচালনের ক্ষেত্রে যা পরাপেক্ষ তাতে অনেক বাধা—সে কাজে অনেক বিলম্ব হতে পারে, অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই আইন, অনুশাসন বা আবেদন সব নয়—পুলিশের প্রয়োজন। থানা, আদালত, জেলখানার ভয় সাধারণ মানুষকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া মানবিকতার দিক থেকে গর্হিত—এটা ভেজালদাতা যে না বোঝে তা নয়, হয়ত ভালই বোঝে। কিন্তু লোভ, অর্থগৃধ্নুতা তার কাছে মানবিকতার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ভেজালদাতাকে গ্রেপ্তার করা, দোষ প্রমাণ হলে কঠোর শাস্তিবিধান করা বা প্রকাশ্য স্থানে লাঞ্ছনা ঘটান ভেজালদাতার ভয়ের কারণ হয়। মানবিকতার দোহাই দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় না, লাঠৌষধি সে ফলদান করে। যা মাত্র দু'দশজন অসাধারণ ব্যক্তির আয়ত্ত, তা যদি পাইকারীভাবে সাধারণের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়—তাহলে সাধারণ মানুষ সে মহত্ত্বের দাম দিতে জানে না। তাই শাসনের ভয়ে দুষ্কৃতকারীরা যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত না হয়—তা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বা চাণক্য যার কথাই ধরা যাক—ছাত্র-সম্প্রদায় অর্থাৎ কিশোরজগতকে ভয়শূন্য করা ঠিক নয়। বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে প্রত্যেক পরীক্ষা গ্রহণের সময় যে তাণ্ডব চলছে তার ছোঁয়াচ অন্যান্য প্রদেশেও লেগেছে। খবর কাগজে আমরা তা মাঝে মাঝে দেখছি। ছাত্র সমাজের এই বিশৃঙ্খলাপ্রবণতার একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের সঙ্গে বিষ্ণুশর্মার পুনর্মূষিকোভব আখ্যানের নীতির মিল আছে। ইঁদুরকে বিড়াল কুকুর ইত্যাদি করে বাঘে পরিণত করার পর বাঘ হয়ে সে মুণিকেই খেতে চাইলে—তিনি আবার তাকে ইঁদুরে

পরিণত করে দেন। রাজনীতি অদ্ভুত দ্রব্য। সব দেশের নেতারা আন্দোলন করেন। নেতাদের তখন হাতিয়ার—সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয় ছাত্রবৃন্দ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন, ভাবপ্রবণ, আদর্শপ্রিয়, প্রাণচঞ্চল বীরপূজক তরুণদের প্রাণের ভয় কম থাকে, কেন না প্রাণ যাওয়া যে বিশেষভাবে কোন ভয়ের কথা—প্রাণ সম্পর্কে মমতা জাগ্রত হওয়ার অভাবে সেটা তারা বুঝতে পারে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক রথী মহারথীকে ঘরোয়া গল্পের সময় বলতে শোনা যায়—কি ভাবে তাঁরা বুদ্ধিমান, চতুর, বিচক্ষণ ভালছাত্রদের বিদ্যালয় যাতায়াতের পথে ওৎ পেতে সংগ্রহ করতেন—কি ভাবে ধীরে তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতেন—কি ভাবে একদিন একটা পুঁটলি, একদিন কিছু কাগজ, একদিন হয়ত একটা আস্ত পিস্তল দিতেন এখানে ওখানে পৌছবার জন্য। শেষে তাকে উদ্বুদ্ধ করতেন দীক্ষা নেবার জন্য। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সে যে একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক হতে পারবে এ প্রমাণ দেবার জন্য যখন সে আগ্রহে আকুল, তখন হয়ত তাকে কোন ভগ্ন মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কালীর সামনে বুক চিরে বা আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে লিখে দিতে হয়েছে অঙ্গীকার। এমনি রক্ত আখরে অঙ্গীকার লেখা বহু ছেলে এ দেশে শহীদ হয়েছে। প্রাণ দিয়েছে তারা দেশের জন্য ত বটেই, কতকটা তারুণ্যের জন্য, হঠকারিতার জন্য এবং তদানীন্তন নেতাদের জন্যও বটে। রাজনৈতিক নেতারা আর যাই হোক মুণি নন, কাজেই পুনর্মূষিকোভব বললেও তাঁদের শাপ ফলবে না।

বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ানর অসুবিধা হল নামতে পারা যায় না। পাগলকে খ্যাপাবার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না, খ্যাপামি সারাবার জন্যই প্রয়োজন চিকিৎসকের। ছাত্রসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারার মত নেতৃত্ব কোথায়? দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক নেতা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে বলবেন, জানি—আন্তরিক ভাবেই বলবেন, ছাত্ররা পরীক্ষা পণ্ড করে, বিদ্যালয়ের আসবাব ভাঙ্গে, শিক্ষককে প্রহার করে, পরিদর্শককে ছোরা দেখায়—এ আমরা চাই না, চাই না, কখন চাই নি; না এগুলো তাঁর চান নি। সে কথা একশ বার ঠিক। অন্য বহুতর রাজনৈতিক আবর্তে তাদের নামিয়েছেন কিন্তু নিজেদের শক্তি-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার যাচাই কখন করেন নি। ফল হল অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা। প্রমাণ চোখের সামনে প্রতি বছর দেখা যাচ্ছে; দিন দিন বাড়ছে। এখন আর বাঘের পিঠ থেকে নামতে পারা যাচ্ছে না।

আমাদের দেশের অভিভাবকদের নিশ্চিন্ততা এবং বিশ্বাস—এ দুটি গুণ—তাদের ছেলেদের সম্পর্কে যে তলে তলে কতখানি আয়ত্ত হয়ে গেছে তা ভাবা যায় না। ছেলেকে স্কুলে দেওয়া হয়েছে; ব্যস আর ভাবনা নেই, কর্তব্য শেষ। মাঝে মাঝে টিপে দেখারও দরকার মনে করেন না। আর প্রত্যেক ছেলেই যে বাড়ীতে অত্যন্ত ভালমানুষ এ তথ্যটি তাঁদের কাছে একেবারে অজ্ঞাত। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে অষ্টম শ্রেণীর পরে—এমন একটি ছেলে হঠাৎ সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাওয়ায় তাকে বলতে হল, কালী পুজা কি বিশ্বকর্মা পুজোয় চাঁদা চাও তার মানে বুঝি, কখন ত বই দেখি না তোমাদের হাতে, আবার সরস্বতী পুজো করা কেন। আজকালকার ধারা অনুসারে আমার তৎক্ষণাৎ লাঞ্ছিত হবার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা এত সত্য এবং আমার শান্ত অথচ দৃঢ় প্রত্যাখ্যানটা এত অপ্রত্যাশিত যে ছেলেটি একটু ঘাবড়ে গিয়েই দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল। দু একদিন পরে তার অভিভাবকের সঙ্গে দেখা—ঘটনাটির কথা বললাম। আশ্চর্য, তিনি বললেন ছেলে স্কুল ফাইনাল দেবে। পাড়ায় সবাই জানে যে সারা সকাল দুপুর সন্ধ্যা যে কটি ছেলে হলদে বাড়ীটার সামনে জটলা করে চাঁদা-চাওয়া ছেলেটি তাদের পাণ্ডা। কেবল তার অভিভাবকের বিশ্বাস যে সে স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে। কারণ সাতআট বছর আগে সে বোধহয় কোন স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকবে। আর তখন সে হয়ত তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। কাজেই অঙ্ক কষে অভিভাবক নিশ্চিন্ত—যে ছেলে স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে।

ঘরে বাইরে কোথাও যদি ছেলেরা শৃঙ্খলা না শেখে—তবে কেমন করে ছাত্রসমাজ সুশৃঙ্খল হতে পারে তা দুর্বোধ্য। শৃঙ্খলা ভাঙ্গলে সাজা দেওয়া পরের কথা, আগে শৃঙ্খলা শেখান দরকার। কে শেখাবে এবং কোথায় শিখবে? শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।' যদি শৃঙ্খলা সেখানে শেখাতে পারি তবেই শৃঙ্খলাভাঙলে সাজা দিতে পারব। নইলে ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই—হতে চাইলেই কি আর হতে পারা যায়! অভিভাবক ভাবছেন ছেলে স্কুলে ডিসিপ্লিন শিখছে নিশ্চয়ই, শিক্ষক ভাবছেন ছাত্র বাড়ীতে কি আর শৃঙ্খলা শিখছে না—ছেলে ততক্ষণ আপনার অষ্টম শ্রেণীতে পড়া বিসর্জন দিয়ে রাস্তায় হলদে বাড়ীর সামনে জটলা করছে, আর ফাঁক পেলেই লোকের কাছে সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইছে।



অনুবাদ সাহিত্য



নব-মঞ্জরী

[এডিথ্ ম্যাক্হোয়ার্টার]

অনুবাদ—হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এলেই তরুণীর দু'টি চোখ ব্যাকুলভাবে খুঁজে বেড়ায়—বাঙ্গালার পল্লীর বুকে নীরবে দণ্ডায়মান খেজুর গাছের সারি ও কদলীপত্রের সবুজের সমারোহ। পল্লীর কূপের ধারে গৃহ-বধূদের কলরব, ধূলি-ধূসর পথের উপর দিয়ে মন্থরগতিতে ধাবমান গোরুর গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ আজো তার কানে বাজে। ভোরের বাতাসে ভেসে-আসা মাঠের উষ্ণ ঘ্রাণ, নব-মঞ্জরীর মিষ্টি গন্ধ-মাখা শীতল সমীর স্পর্শের জন্য উতলা হয়ে ওঠে মনখানি।

নগরীর কর্মব্যস্ত এই নদীতীর তার অন্তরে জাগায় সীমাহীন বেদনা। তিনমাস হলো তার বাবা মারা গেছে। পল্লীর শান্তিময় পরিবেশ ছেড়ে সে এখানে এসেছে তার কাকার এই চায়ের দোকানে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে চেয়ে আছে—প্রশস্ত নদীর উজ্জ্বল, উচ্ছল জলরাশির দিকে। অদূরে ঠাসাঠাসি করে অপেক্ষা করছে মালবাহী জাহাজ, জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোট্ট তরীগুলি দুলছে, ডিঙি নৌকা নদীতে পাড়ি দিয়েছে, জাহাজ ও তীরের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে তরণী, দিনের কাজ হয়েছে সুরু।

তরুণী একবার ডিঙি নৌকাগুলির দিকে একদৃষ্টে চাইলো। তরুণ মাঝি কি বেরিয়েছে? কী মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর, মুখখানি হাসিমাখা। তার কাকার দোকানে সে রোজ চা খেতে আসে। পেট্রলের আলোর নীচেকার ছায়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। ধীরে ধীরে চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে সে চায় তরুণীর সলজ্জ, সহাস্য দু'টি চোখের পানে। কাল সন্ধ্যাবেলা তার কাকা দোকানে ছিলনা, বাইরে গিয়েছিল কী একটা কাজে। এই সুযোগে সে তার সঙ্গে আলাপ করেছে, আলোচনা করেছে দু'জনে সুদূর পল্লী-জীবনের কথা। দু'জনের মনই ফেলে-আসা পল্লীর স্মৃতিভারাক্রান্ত, মৌন ব্যথায় কাতর।

তরুণ বলেছে: এ সময়ে আমাদের গাঁয়ে শিমুল ফুল ফোটে।

: আমাদের গাঁয়েও লাল মুকুল ভরে ওঠে সারা বনে।

: ঝরা পাপড়িতে পথ রাঙা হয়।

: পাট ভিজানো শেষ হয়ে গেছে এখন?

: পথের ধারে যে পুকুরগুলিতে পাট ভিজিয়ে রাখা হয়, সেগুলো তো এখন—এই গরমে শুকিয়ে গেছে।

: শিগগিরই আমের ডালে বসে কোকিল ডাকবে।

: নেবুর মুকুল ফোটার সময় হয়েছে।

: নেবুর মুকুল?—আমাদের ঘরের দরজায় একটি নেবু গাছ আছে।

সেই স্মৃতি এখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল দু'জনকে। তরুণীর মনে হয়েছিল—সে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরের দরজায়, উষ্ণ বাতাসে মাখা নেবুর মুকুলের সৌরভে বিভোর তার মন-প্রাণ।

কাকার কর্কশ কণ্ঠস্বরে তার তন্দ্রা ভাঙলো। তার এই ঔদাসীন্যের জন্য—কাকা তাকে তিরস্কার করলো। বলল, একজন বিশিষ্ট লোক এসেছেন। তাড়াতাড়ি খুব ভালো করে এক কাপ চা তৈরী করে নিয়ে আয়।

বাইরে চলে গিয়েছিল সে। দোকানে এসে দেখলো—জনৈক নাবিক দাঁড়িয়ে আছে। সে পকেটে হাত দিয়ে

টাকা বাজাচ্ছে। শাদা দাঁত বার করে হাসছে, আর উঁচু সুরে কী বলছে।

তরুণ মাঝির সঙ্গে আর কোন কথা বলবার সুযোগ হয়নি তাই।…

পরদিন সন্ধ্যায় আবার এলো সেই নাবিক। সমুদ্র ও দেশ বিদেশের গল্প করে দোকান সর-গরম করে তুললো। এক মুঠো টাকা দোকানীর হাতে দিয়ে বলল, আমার বন্ধুদের আজ বিনা পয়সায় চা খাইয়ে দাও। আজ সকলেই আমার বন্ধু—এখানে যারা আছে সকলকে চা দাও।

এক কোণায় চুপ করে বসেছিল তরুণ। বিনা পয়সার চা খেতে সে রাজী হলোনা, নিজের চায়ের দাম নিজেই দিল। তারপর তরুণীর দিকে এগিয়ে যেতে চাইলো। নাবিক কনুই দিয়ে ঠেলে রাখলো তাকে। শুধু একবার দেখলো তার দিকে।

অন্ধকারে নীরবে বসে রইলো তরুণ। হাতের তালুর উপর চিবুক রেখে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তরুণীর দিকে। তরুণী একবার চোখ তুললো, তার ভীরু দৃষ্টি মিললো দৃষ্টির সঙ্গে, নীরব ভাষায় হলো দুজনের বাক্য-বিনিময়। তরুণীর দৃষ্টি অনুসরণ করে নাবিক অনুভব করলো তরুণের অস্তিত্ব।…

পরদিন সন্ধ্যায় নাবিক এলো, একটি পুঁটলি নিয়ে এলো বগল-দাবা করে। এসেই দোকানীকে বলল, তোমার ভাইঝি কোথায় গেল? তাকে একবার ডাক। মোড়কটির রঙ সবুজ, গায়ে সোনালি সুতোর ডোরা কাটা।

শাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল তরুণী, হাতের একটি আঙুল দিয়ে শাড়ির উজ্জ্বল ভাঁজগুলির উপর টোকা মারতে লাগলো। নাবিককে ঘিরে ধরলো সবাই। এই বহুমূল্য শাড়িটির প্রশংসা করলো, সুদূর প্রাচ্যের যে দেশটি থেকে শাড়িটি কেনা হয়েছে সেখানকার বর্ণনা শোনার আগ্রহ জানালো। শুধু সেই তরুণ রইলো দূরে—তরুণীর উপর তার দৃষ্টি।

নাবিক বলল, না, এটি তোমার। রঙের এমন বাহার আর কোথাও দেখেছ? কখনও দেখবেও না। নাও।

ইতস্ততঃ করল মেয়েটি, নাবিকের মুখের দিকে একবার চাইল, লোভনীয় শাড়িটির দিকে চাইল আবার। তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করলো তরুণ। হঠাৎ সে বলে উঠলো, রঙ? রোদে রাঙা ধান গাছের রঙের পরশ রয়েছে যার মনে, সোনালি সূর্যাস্তে আকাশ-ছোঁয়া ধূলির ভিতর দিয়ে নীড়ের পানে ধাওয়া টিয়াপাখির সবুজ ডানার স্মৃতি আজো যে ভুলতে পারেনি, তার কাছে এই নিষ্প্রাণ সবুজ শাড়ি তো অতি তুচ্ছ।

তরুণের চোখের সঙ্গে তরুণীর চোখের মিলন হলো। নাবিকের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল তরুণী। আশ্বস্ত হলো তরুণ।……

পরদিন নাবিক জাহাজ থেকে নিয়ে এলো একটি সুন্দর ব্যাগ। বলল, এটি আমেরিকায় তৈরী। তরুণী চা ঢেলে দিল চায়ের কাপে, সবাই এসে বসলো নাবিককে ঘিরে, পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি ও জাঁকজমক সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

তরুণ মাঝি রইলো দলছাড়া হয়ে। এসব বাজে গল্প শোনার আগ্রহ নেই তার—নীরবে বসে রইলো সে। দেখলো মেয়েটি চকচকে ব্যাগটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নাবিক তাকে দেখাচ্ছে—ব্যাগের সঙ্গে আয়নাটি কেমন করে লাগানো হয়েছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তরুণীর দুটি চোখ; লজ্জিত, ভীরু স্মিত হাসির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেলো মনের উল্লাস। তরুণের অন্তর কেঁপে উঠলো আশঙ্কায়। তরুণীর হাসির সুযোগ নিয়ে নাবিক তরুণীর হাতে তুলে দিল উপহারটি। বলল, দেখ—এই খোপটা। এখানে টাকা রয়েছে। শিকলটি টেনে দিল সে। তারপর বলল, প্রচুর যায়গা—অনেকগুলো নোট সাজিয়ে রাখা যাবে—দশ টাকা, একশো টাকার নোট! নাবিকের স্ত্রীর ব্যাগ এমনি বড় না হলে চলে না।

হো হো করে হেসে উঠলো নাবিক। বন্ধুরাও যোগ দিল তার হাসিতে। লজ্জারুণ হয়ে উঠলো তরুণী! চলে এলো সেখান থেকে দূরে। চা তৈরী করতে লাগলো সে। তরুণ মাঝি অনুভব করলো—তরুণীর মনখানি প্রলোভনমুক্ত হতে পারেনি তখনও। মনে হলো—মুহূর্তের জন্য সে ভুলে গেছে তাকে, বিস্মৃত হয়েছে পল্লীগৃহে ফিরে যাবার আকুলতা। সে তাই ভাবতে লাগলো—কেমন করে, কী বলে, কোন ছবি তার সামনে তুলে ধরে

তাকে বাস্তবতার রাজ্যে টেনে আনা যায়? কিন্তু, কিছুই মনে এলোনা তার। বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। লক্ষ্য করলো, দুর্বল হয়ে আসছে তরুণীর মন, নাবিক তাকে বার বার অনুনয় করছে, টাকার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে তার কাকার মুখখানি। ব্যথা পেলো তরুণ, রুষ্ট হলো তরুণীর উপর। চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর পড়ে রইলো। বোধহয় এসে সে নদীতীরে দাঁড়ালো। আলোয় ঝলমল জাহাজগুলির দিকে চেয়ে রইলো দাঁড়িয়ে, তার আশা, আবেগ ও চিন্তা দমন করবার চেষ্টা করলো।

আগে—যখন তরুণী এখানে আসেনি, তখন—তরুণ মাঝি নদীতীরে এসে দাঁড়ালেই তৃপ্তি বোধ করতো এই ভেবে—ছ'টি বছর তো প্রায় শেষ হয়ে এলো—এরই মধ্যে সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছে, দু'এক বিঘা জমি কেনার মতো সামর্থ্য হয়েছে তার। নদীতীর থেকে জাহাজ, আবার জাহাজ থেকে নদীতীর পর্যন্ত নৌকা বাইতে বাইতে সে ভাবে সেই শুভ দিনটির কথা—যেদিন সে এই উজান স্রোতে ডিঙি বাওয়া শেষ করে ছোট তরী রেখে যাত্রা করবে তার নিজের দেশের দিকে। তার সুখের অন্ত থাকবে না সেদিন, শহুরে নদীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবেনা, সমুদ্রগামী জাহাজখানি দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া অবধি সেদিকে চেয়ে থাকবার প্রয়োজন হবেনা আর। ছোট্ট তার তরীখানি নির্জন পল্লীপ্রকৃতির যত কাছে আসবে, ততই তৃপ্ত প্রফুল্ল হবে তার অন্তর। নিজেরই জমির উপর সে গুণ গুণ করে গান গেয়ে বেড়াবে, একটি লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদ কিনবে, খড়ের ছাউনি দিয়ে বাঁধবে ঘর, তার পাশে থাকবে সর্ষে ক্ষেত, কুটীরের সামনে অফুরন্ত রোদে আনন্দে খেলা করবে শিশুর দল। ভিতর থেকে ভেসে আসবে চুড়ির মৃদু আওয়াজ ও মধুর নারীকণ্ঠ।…

অনাগত ভবিষ্যতের এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল সে। এমন সময় নদীতীরে এলো এই মেয়েটি; নাম-না-জানা যে নারী তার স্বপ্ন-রচা নীড়ে নীরবে আনাগোনা করতো সে এলো মূর্তিমতী হয়ে, কল্পনা নিল বাস্তব রূপ।

কিন্তু আজ যে তার সেই আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অর্থলোলুপ পিতৃব্য নাবিকের টাকা খাচ্ছে। তার কাছে সে বিবাহের প্রস্তাব দেবে কেমন করে—সে যে সামান্য একজন মাঝি, আনা-পয়সার হিসাব করে, আর নাবিক তো দশটাকা একশো টাকা ছাড়া কথাই বলেনা। সে কি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে? নাবিকের আবির্ভাব না হলে তরুণীর পিতৃব্য হয়তো তার প্রস্তাব বিবেচনা করতো, কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা কোথায়?

তবে—নাবিক যদি চলে যায়! সব জাহাজই কি দু'দিন আগে-পরে নাবিকদের জড় করে নিয়ে ফিরে যায়না আবার? কিন্তু কবে চলে যাবে নাবিক? কত দিনই বা থাকবে এখানে? সমুদ্রযাত্রার আগে কতদূর এগিয়ে যাবে তরুণীর ব্যাপারে? এমনি করে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখের পানে চেয়ে থাকবার দরকার কী? কোন আশা আছে কী? তরুণীর কথা ভুলে গিয়ে কালই এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো হবে। কিন্তু—যে পল্লীতে সে থাকবেনা, সেখানে কি কোন আনন্দ পাওয়া যেতে পারে?

চিন্তায় জর্জর হলো তরুণের মনখানি, তবু সে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অনুভব করলো—এই তরুণীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার সকল সুখ; তাকে পেতে হলে আর দেরী করলে চলবেনা। নাবিকের অর্থ, উপহার ও প্রলোভনে তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠবার আগেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা করা সহজ, তাকে কার্যে পরিণত করা তেমন সহজ নয়।……

গভীর নৈশ অন্ধকারে একাকী অন্যমনস্কভাবে চলতে লাগলো তরুণ। সে টেরই পেল না কখন নদীতীর ছেড়েছে—এসে পড়েছে রাজপথে, মনোরম উদ্যানের সুবিন্যস্ত ছায়ার ভিতর দিয়ে আলোকিত বাতায়নগুলি তাকে ইশারায় ডাকছে। নেবুর মুকুলের উগ্র সুবাসে সে বুঝলো—অনেক দূর এসে গেছে।…………

পরদিন সন্ধ্যায় নাবিক এলো যথারীতি। সঙ্গে নিয়ে এলো এক জোড়া কঙ্কন। সোনার কঙ্কন, গায়ে পাথর বসানো, পাথরের জৌলুসে চোখ ঝলসে যায়। তরুণীর দিকে কঙ্কন জোড়া বাড়িয়ে ধরে সে—সেই কল্পিত দেশটির কথা, যেখান থেকে সে কিনেছে এই অমূল্য জিনিষটি—তরুণীকে কাছে ডাকলো সে। বলল, একবার এসো দেখি তোমার হাতে ঠিক হয় কিনা। স্মিতমুখে হাত বাড়িয়ে তরুণীর হাত ধরতে চাইলো নাবিক, কিন্তু তরুণী সরে এলো পেছন দিকে।

তরুণীর কাকা কর্তৃত্বের সুরে বললো, এসো—এসো বলছি—হাত দাও।

তরুণ মাঝি অপাঙ্গে চাইলো একবার। তরুণীর এই অনিচ্ছা নাবিকের কাছে তার দাম বাড়িয়েছে। কিন্তু তরুণী নিশ্চল। হাতখানি শাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে সে। ঘাড় নিচু করে চায়ের পেয়ালার দিকে চেয়ে আছে একমনে।

তিরস্কার করলো তরুণীর কাকা। বলল, ওকি—এসো। ওসব গেঁয়ো লজ্জা ভুলে শহরের কায়দা-কানুন মতো চলতে হবে। এসো, একবার দেখি—বহুমূল্য এই অলঙ্কারটিতে তোমায় কেমন মানায়।

তরুণীর দিকে চেয়ে ধূর্ত হাসি হেসে নাবিক বলল, বহুমূল্য অলঙ্কার পরবার মতো জোরালো মণিবন্ধ না হলে কি নাবিকের স্ত্রী হওয়া যায়?—সে তার লোমশ হাতখানি বাড়িয়ে তরুণীর আঙুল চেপে ধরলো, কিন্তু কঙ্কনটি হাতে পরিয়ে দেবার আগেই অদূরে কোলাহল শোনা গেল। কে বলে উঠল, চা—চা! তাড়াতাড়ি। আট কাপ চা। মাঝিদের বসিয়ে রাখলে চলবেনা। তাড়াতাড়ি।

আটজন সঙ্গী নিয়ে তরুণীর কাছে এগিয়ে গেল তরুণ মাঝি। তরুণী তৎক্ষণাৎ তার হাতখানি নাবিকের সিক্ত মুষ্টি-মুক্ত করে চায়ের পেয়ালা নিয়ে চা তৈরী করতে লাগলো।—সবাই উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল নীরবে, দেখতে লাগলো—নাবিক, তরুণ মাঝিও তরুণীর ব্যাপারটা কেমন করে নিষ্পত্তি হয়।

তরুণী একমনে চায়ের পেয়ালায় চিনি নাড়তে লাগলো। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। নাবিক তার মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখবার চেষ্টা করলো। সে তেমনি ভাবে কঙ্কন দুটি বাজাতে লাগলো। তার ধারণা পরিণয় ব্যাপারে এই কঙ্কন ও কঙ্কন-ক্রয়ের সামর্থ্য অপরিহার্য। সুসময়ের প্রতীক্ষায় রইলো সে। উচ্ছল আলোয় ঝলমল করতে লাগলো কঙ্কন, টিং টিং আওয়াজ শোনা গেল। নাবিক তরুণীর দিকে উৎসুক দৃষ্টি হেনে হাসলো। ভাবলো—এই আওয়াজ ও ঝলক ব্যর্থ হবেনা।

নাবিকের অদূরে দাঁড়িয়ে তরুণ মাঝি ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক খুলে বার করলো ছোট্ট একখানি মালা। সবুজ মালাখানি, মাঝে মাঝে মোমের মতো শাদা ফুল, পাঁপড়িগুলি লালচে। নব-মঞ্জরীর গন্ধে আমোদিত হলো ঘরটা।

তরুণী থামলো। হাত বাড়ালো মালাখানির দিকে। ফুলগুলি আঙ্গুলে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্থিরভাবে। একটু পরে সে ঘাড় তুললো, আলোর দিকে তাকালো, নাবিকের মাংসল দেহটির দিকে চোখ তুলে চাইলো—যেন তার ঝন্‌ঝনে পকেট ও সেই কাঁকনের মধ্যে এতটুকুও বাস্তবতা নেই—ফাঁকি—সবটুকুই ফাঁকি।

চায়ের পেয়ালার ধোঁয়ার উপর মুখ রেখে, আঁধারের ভিতর থেকে, আলোয় উজ্জ্বল সমুদ্রগামী জাহাজের উপর থেকে যারা তার দিকে চেয়ে আছে তাদের সকলের দিকে চোখ তুলে চাইলো সে। সে দেখতে পেলো না কাউকে, চোখে পড়লো না কিছুই। সুধু দেখলো—বাঙ্গালার পল্লীর একটি কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মুকুলিত নেবু গাছ, অদূরে রবিকরোজ্জ্বল অবারিত মাঠ, উপরে আকাশে সবুজ ডানা মেলে উড়ে চলেছে টিয়াপাখির দল, নীচে ধূলিমাখা পথের উপর দিয়ে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে একটি লোক। দিনের শেষে লাঙ্গল কাঁধে করে বলদগুলিকে চালিয়ে নিতে নিতে সে তৃপ্তিভরে গেয়ে চলেছে গান। ঘরের দরজায় এসে প্রিয়-সম্ভাষণে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটের কোণে, সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর তরুণ মাঝির মতো—অবিকল।......

সেই রাত্রিতেই জল আনবার অছিলায় বাইরে এলো তরুণী। তরুণ মাঝি অপেক্ষা করছিল সেখানে। অদূরে চায়ের দোকানের কোলাহলের মধ্যে তাদের কানে বাজলো নাবিক ও তরুণীর কাকার কণ্ঠস্বর। বিবাহের লেন-দেন সম্বন্ধে আলোচনা তাদের মধ্যে।......

দাঁড়ের আঘাতে নদীর জলে উঠলো একটানা সংগীত।

সেই সুরের মধ্যে ডুবে গেল সব কোলাহল। নদীর উজ্জ্বল কালো-জলের উপর তরুণ মাঝির প্রতিচ্ছবি দেখলো তরুণী। তরুণ একবার চোখ তুলে চাইলো তরুণীর পানে। তার মাথার চুলের সঙ্গে বাঁধা মালাখানি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়লো।

উজান-স্রোতে ভেসে চললো তরুণী। নেবুর মুকুলের প্রাণমাতানো গন্ধ—তারই সাথে সাথে ছুটলে আরোহীদের পথ দেখিয়ে।

রাম ও রাবণ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে যে প্রদেশ উত্তর-প্রদেশ বলে খ্যাত, তার পূর্ব নাম ছিল সংযুক্ত প্রদেশ। এখনও সেটা অনেকেরই মনে থাকবার কথা। হয়ত ২৫।৩০ বছর পরে একথা অনেকের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে। এই সংযুক্ত প্রদেশে তখনকার দিনে রামলীলা এক অতি-বিখ্যাত পর্ব বা আনন্দোৎসব ছিল।

আমাদের বাংলাদেশে যেমন হরিনাম ও কৃষ্ণনাম আকাশে-বাতাসে, বৃক্ষ-লতায়, তৃণে-গুল্মে, পথে-ঘাটে, ধুলায়-কাদায় মিশে ছিল এবং এখনও আছে, তখনকার দিনে ঐ সব দেশে রামনামের ঐ ভাবের প্রভাব ছিল। আমরা এখানে নিত্য-স্মরণীয় হরিনাম ও কৃষ্ণনামের সঙ্গে রামনাম কিঞ্চিৎ মিশিয়ে দিয়ে রামের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করেছি। তাঁরা সেখানে মন্দিরে, অভিনয়ে, রামমূর্ত্তি দর্শনে ও রামনাম শ্রবণে তেমনি আগ্রহান্বিত। হরিনাম বা কৃষ্ণনাম সেখানে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রামভক্ত হনুমানের প্রভাবও সেখানে অত্যন্ত প্রবল। আজিও ঐ সব দেশে হনুমানদাস, হনুমানপ্রসাদ ইত্যাদি নাম শুনতে পাওয়া যায়। ঐ সব দেশে এখন পর্য্যন্ত হনুমানকে হনুমানজী বলে উল্লেখ করা হয়। সুপ্রভাত বা গুড্‌মর্ণিং এর পরিবর্ত্তে এখনও সেখানে কারো কারো মুখে "রাম-রাম" শুনতে পাওয়া যায়।

রামলীলা যাঁরা করতেন—তাঁদের আয়োজন সামান্য ছিলনা। প্রত্যেকটি চরিত্রের উপযুক্ত লোক খুঁজে বা'র করা সহজ কথা নয়। হনুমানের মুখ-ভাবে বীরত্ব ও রাম-ভক্তি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠা চাই, রাবণের চাই অন্যায় আচরণে ভয়হীন ও অকুণ্ঠ স্বাধীনতা। বহু সন্ধানের ফলে হনুমান ও রাবণ পাওয়া যেত। কিন্তু রাম খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে কঠিন ছিল। সেই কিশোর নবদূর্বাদল-শ্যাম মূর্ত্তি, সেই প্রয়োজনে বজ্রের মত কঠোর অথচ স্বভাবতঃ কুসুমের চেয়েও কোমল মুখ কি সহজে পাওয়া যায়? এই ধরণের সকল অভিনেতার সমন্বয় যাঁরা করতে পারতেন কেবল তাঁদেরই রামলীলার অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত। কিন্তু একটি নিখুঁত রামলীলার দল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সক্রিয় রাখতে গেলে পাত্রগুলিকে সর্বদা একভাবাপন্ন রাখতে হয়। তাদের মুখভাব, কণ্ঠস্বর, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। সেজন্য অভিনয়ের কর্ম-কর্ত্তা বা দলের সত্ত্বাধিকারীকে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হোত, কোথায় কার পরিবর্ত্তন এসেছে বা আসছে। তাই আজকের নবদূর্বাদলশ্যাম রাম পাঁচ-সাত বৎসর পরে একেবারে হয়ত অ-রাম হয়ে গেলেন, অর্থাৎ, সেই অভিনেতা আর রাম সাজার উপযুক্ত রইলেন না। তখন অধিকারীকে আবার নূতন রামের সন্ধান করতে হত।

বাংলাদেশে আমরা ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমটি দেখতাম মতিলাল রায়ের যাত্রার অভিমন্যুবধের পালায়। কিশোর অভিমন্যু ও বালিকা উত্তরা। কি সুন্দর, কোমল, নয়নাভিরাম মূর্ত্তি! সে মূর্তি দেখলে চক্ষু সার্থক হত। সে কি মধুর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর! সে কণ্ঠস্বর শুনলে কান জুড়িয়ে যেত। ৭।৮ বছর পরে তারা আর সেরকম রইল না। আকৃতিতে কাঠিন্য দেখা দিল। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য এল। আবার নবীন অভিমন্যু ও নবীনা উত্তরার সন্ধানের প্রয়োজন হত।

রামলীলার রাম পাওয়া আরও দুর্লভ ছিল। কত কাল গেছে সেই নবদূর্বাদল শ্যাম, অতি মনোহর মূর্ত্তি যা সারা ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কল্পনায় ভরা আছে, মানসপটে আঁকা আছে—তার সঙ্গে সবাই মিলিয়ে নেবে। কত চেষ্টা, কত সন্ধানানুসন্ধান, কত সাধনায় তা মেলে। যখন কল্পনা ও বাস্তবের মূর্ত্তি এক হয়ে যায়, অধিকারীর

আনন্দের অন্ত থাকেনা; যারা দেখবে তাদের তো কথাই নাই।

একবার এক রামলীলার অধিকারীর রাম অপূর্ব হয়েছিল। যত লোক সে মূর্তি দেখেছে, সেই কণ্ঠস্বর শুনেছে সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছে সত্যই বুঝি ত্রেতা-যুগের সেই পতিতপাবন কিশোর রাম আজও পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যেতে তেমনি উদ্যত হয়ে আছেন। লক্ষ্মণের মত ভাইকে বনবাসের সাথী পেয়ে আজও বুঝি সেই দুটি কমললোচনে সুগভীর স্নেহের আলো ফুটে রয়েছে। সে মূর্তিদর্শনে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল।

তারপর সেই অপূর্ব রাম অচল হয়ে গেলেন। আবার নূতন রাম এলেন। তাঁর শিক্ষা চলল। তিনি 'মানুষ' হলেন। সবাইকে অল্পবিস্তর মুগ্ধ করলেন। ক্রমশঃ সেই নূতন রাম আবার সকলের চিত্ত জয় করে নিলেন। আবার তাঁকেও একদিন অবসর নিতে হল।

বহুকাল পরে এই দলের অকস্মাৎ একদিন রাবণের অভাব ঘটল। যে দুর্দ্ধর্ষ রাবণের আকৃতি দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে কেঁদে উঠত, যার কঠিন গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনলে শিশুরা মায়ের কোল খুঁজত, তার চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে একদিন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এলো। কর্কশ ক্রোধ দেখাতে গিয়ে সে কণ্ঠস্বর যেন মমতায় ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এই রাবণের কঠিনতা ও দুর্দ্ধর্ষতার উপর রাম-সীতার মাধুর্য্য ও কোমলতা অনেকখানি নির্ভর করে। যে পরিমাণে রাবণের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পাবে, সেই পরিমাণে রামসীতার প্রতি দর্শকের মমত্ব জাগবে।

রাবণের মুখাকৃতিতে কঠিন ভ্রূকুটি ও নির্ভয় অন্যায় আচরণের ছাপ মিলিয়ে আসতেই অধিকারী চিন্তিত হয়ে রাবণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কত কল-কারখানা, নোংরা বস্তি, জুয়ার আড্ডা, মদের দোকান সে খুঁজে বেড়াতে লাগল; কিন্তু মনোমত রাবণ আর পায় না। কঠিন মুখাকৃতি মেলে তো, দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল দেখে। অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য বল, অথচ মুখে পাপও নির্দয়তার সুস্পষ্ট ছাপ আর মেলে না! শেষে এক তাড়িখানায় এসে ঠিক মনের মত "রাবণ" দেখতে পেলে অধিকারী। ২।৪ দিন আড়াল থেকে নিয়ম করে তাকে দেখে নিলে। পছন্দ হল।

প্রথম একদিন তার কাছে প্রস্তাব করলে—'তুমি রামলীলায় অভিনয় করতে রাজী আছ?'

সে 'হো' 'হো' করে হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

অধিকারী আবার বললে—'তোমাকে রাবণ সাজতে হবে।'

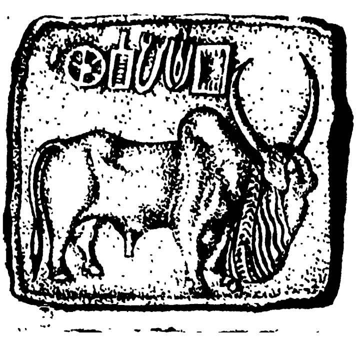
সে উত্তর দিল...'বেশ সাজব।'

"কিন্তু তুমি হাসলে কেন?" অধিকারী জিজ্ঞাসা করলে।

লোকটা আর একবার হেসে জবাব দিলে—বছর ৮।১০ আগে আমিই তো আপনার দলে রাম সাজতাম। আপনি কত আদর করে আমাকে রেখেছিলেন।

অধিকারী অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল। সেদিনকার সেই নয়নাভিরাম রামের সুন্দর মুখ আজকের এই কদাকার নৃশংস মুখমণ্ডলের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলেনা!

তার হাতে টাকা দিয়ে তাকে বায়না করে রাখলে। কিন্তু মনের মধ্যে এই কথাটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত খচ্-খচ্ করতে লাগল—সেদিনকার সেই অমন সুন্দর মনোহর রাম আজকের এই ভয়ঙ্কর রাবণ হবে! এমনও হয়?



মঙ্গলগ্রহে তথ্যানুসন্ধানী যান

ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে অভিযানকারীগণের পক্ষে ট্রাক, হেলিকপ্টার এবং রকেট টার্‌বাইন দ্বারা পরিচালিত এরোপ্লেন সেখানে অনুসন্ধান কার্য্যের সাহায্যের জন্য তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ফ্রান্সিস কার্টাইনো নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকান রকেট সোসাইটির অধিবেশনে এই পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ সম্বন্ধে তথ্যাদি পেশ করেন।

মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ সম্পর্কে বিবেচনার পর মিঃ কাটাইনোর বিশ্বাস যে সেখানকার পরিবেশের পক্ষে রকেট টার্‌বাইন পরিচালনাই সুপ্রশস্ত হবে। তার কারণ ঐ গ্রহের আবহাওয়ায় ৯৬ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস রয়েছে, আর অক্সিজেনের ভাগ প্রায় শূন্য। কিন্তু টারবাইন ইঞ্জিন পরিচালনের জন্য অন্যান্য ইঞ্জিনের ন্যায় বাতাসের প্রয়োজন হয়না। টার্‌বাইন এক রকম যন্ত্র বিশেষ, এর সাহায্যে মোটর বা ইঞ্জিনের কার্য্যকরী শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।



শিল্পীর পরিকল্পিত মহাকাশ যান। লক্ষ্য লক্ষ্য মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহ থেকে মানুষকে ঘুরিয়ে আনবে এই যান।

মঙ্গলগ্রহ অভিযানে যে যানগুলি নিয়ে যাওয়া হবে, সেগুলি কিভাবে তৈরী হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেছেন;

প্রথমতঃ ট্রাকসমূহের কাঠামো হবে নলাকৃতি এবং টায়ারের মধ্যে বায়ুর চাপ থাকবে খুব অল্প। এইসকল ট্রাক মোটর টার্‌বাইন দ্বারা চালিত হবে এবং ঘণ্টায় গড়ে এর গতি হবে ১৬ মাইল। এগুলিকে মুড়ে ফেলা যাবে।

হেলিকপ্টারের মাথার উপরের পাখা বা রোটার, টার্‌বাইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এই রোটার ব্লেড্‌ও ইগার কাঠামো বায়ুর দ্বারা ফোলান যায় এরূপ উপকরণ দিয়ে তৈরী হবে। তবে এর ল্যাণ্ডিংগিয়ার, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট এবং ফুয়েল ট্যাঙ্ক ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হবে।

এরোপ্লেনগুলি হবে দু' ইঞ্জিন বিশিষ্ট 'মনোপ্লেন', এদের 'প্রপেলার'ও টার্‌বাইন দ্বারা চালিত হবে। মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় যে সকল বস্তু রয়েছে তাদের ঘনত্বর বা ডেন্‌সিটির পরিমাণ অতি অল্প বলে 'প্রপেলার'গুলি হবে খুব বড় রকমের।

পৃথিবী থেকে ৫৫,০০০ ফিট উর্দ্ধের আবহাওয়ার মতই

আবহাওয়া রয়েছে মঙ্গলগ্রহে। যে বিমানগুলি পাঠান হবে তার গতি হবে ঘণ্টায় ২০০ মাইল এবং উড়বার সময় 'রান্ওয়ের' দৈর্ঘ্য হবে ১০০০ ফিট্। হিলিকপ্টারগুলির গতি হবে ঘণ্টায় ১৩০ মাইল। বিমান এবং হেলিকপ্টারের ওজন হবে আড়াই হাজার পাউণ্ড। দু'জন বিমান চালক ছাড়া ১০০ পাউণ্ড ওজনের মালবহনের ক্ষমতা এদের থাকবে।

মিঃ কার্টাইনো এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, মঙ্গলগ্রহে অবতরণই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেখানে কোন বস্তু নামাতে গেলে প্রতি পাউণ্ডের জন্য ৮০০ থেকে ১০০০ পাউণ্ড ওজনের সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য প্রথম যিনি এই গ্রহে অবতরণ করবেন তাঁর সঙ্গে বেশী কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়তো হবে না, পদব্রজেই তথ্যানুসন্ধান করতে হবে। এরপর পরবর্তী অভিযানে যানবাহন নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

চক্ষু চিকিৎসায় অভিনব যন্ত্র—

যে সকল চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে শল্যচিকিৎসায় বিপদের সম্ভাবনা আছে এরূপ চোখের চিকিৎসার জন্য একপ্রকার অভিনব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রটির নাম "লাইট্ কো-রেগুলেটার"।

যে সকল ছেলেমেয়ে চোখের রেটিনার উপর টিউমার হওয়ার ফলে কষ্ট পেয়ে থাকে তাদের ঐ টিউমারের উপর ঐ যন্ত্র থেকে তীব্র আলোক নিক্ষেপ করে ঐ টিউমারটি নষ্ট করে দেওয়া হয়। রেটিনার উপর এর ফলে যে গর্ত সৃষ্টি হয় তা'ও এই প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা সম্ভবপর হয়েছে এবং যে সকল কোমল ঝিল্লী বা 'মেম্ব্রেন্' দৃষ্টিশক্তির পথে বাধা প্রদান করে তাদেরও এইভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়।

অতি-বেগুনী রশ্মির মধ্যে যে সকল ক্ষতিকারক বস্তু রয়েছে তা ফিল্টারের সাহায্যে নিক্ষেপ করার জন্য চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না। ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উইলিয়াম এইচ-হভ্নার ইহার উদ্ভাবক।

দুগ্ধ সংরক্ষণের নূতন উপায়—

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গব্যশালা-বিভাগীয় জনৈক বিজ্ঞানী কয়েকমাস পর্য্যন্ত দুধ টাটকা রাখার একটি অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। এই পন্থায় প্রথমতঃ কাঁচা দুধকে যান্ত্রিক উপায়ে বীজাণুমুক্ত করে মাখনের সঙ্গে ভাল করে মেশানো হয়। দুধের উপকরণের শতকরা ৩৬ভাগ যাতে বজায় থাকে সেইভাবে জাল দিয়ে দুধ ঘন করা হয় এবং টিনের কৌটায় ভর্ত্তি করে পুনরায় গরম করা হয়, তারপর হিমায়িত করা হয়। এই দুধ অন্ততঃ তিনমাস থেকে সাড়ে তিনমাস পর্য্যন্ত টাটকা থাকে, দুধের গন্ধটুকুও নষ্ট হয় না।

হীরার মূল্য নির্দ্ধারক যন্ত্র—

জহুরী তো জহর চেনেই—কিন্তু সাধারণ লোকেও যাতে হীরা, চুনি, পান্নার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারেন এবং তাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন অ্যাল্বার্ট স্যামুয়েল নামে জনৈক আমেরিকান তার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির সাহায্যে হীরা, চুনি, পান্না ইত্যাদির ছবি বৃহদাকারে পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়। পদার্থটির উপর রেখায় চার হাজার সমচতুর্ভুজ বা স্কোয়ার অঙ্কিত থাকে। এই সব মণিমাণিক্যে কোন ত্রুটি থাকলে তা ঐ চিত্রে ধরা পড়ে। কারণ যে সকল মণিতে ত্রুটি আছে তাদের ক্ষেত্রে ঐ সকল সমচতুর্ভুজের মধ্যে কোন কোনটিতে তেমন আলোকপাত হয় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই বিষয়টি বিচার করেই সেই মণিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেড় ক্যারেট ওজনের একটি মণিকে প্রকৃত আকৃতির ৩৯১০ গুণ করে দেখান হয়।

তুষারপাতের মধ্যেও গাছপালাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা—

তুষারপাতের জন্য গাছপালাকে, বিশেষ করে লেবু-জাতীয় গাছকে বাঁচানো খুব কঠিন হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঐ সময় গাছপালার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারলে এরা বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা এ জন্য এম্-এইচ্ ৩০ নামে একপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। এই ওষুধ প্রয়োগের ফলে এই ধরণের গাছের বৃদ্ধি কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং এই প্রক্রিয়ার তাদের সাময়িকভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভব। এই ভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ফলে তুষারপাতের পরে এদের আর মৃত্যু ঘটে না।

সঙ্গীত



বঙ্গজননী স্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

বঙ্গজননি মঙ্গলখনি সর্বধরণিবন্দ্যে
হরিতকান্তি-জনিতশান্তি-তনয়হৃদয়নন্দ্যে।
জগন্মোহিনীং মাতরং ত্বাং বন্দে।
ষড়ৃতুবিলাসিনীং সুহাসিনীং বন্দে॥

আতপবিরসে নিদাঘদিবসে সান্ধ্যসমীরণসুসেবিনীম্।
নবঘনমালে বর্ষণকালে নদীকল্লোলোল্লাসিনীম্।

শেফালিশোভিত-শারদপ্রভাত-নৃত্যৎকাশকুলশোভিনীম্।
পরম-সুকান্ত-সুশান্তহেমন্ত-লসদ্ধান্যমধুহিল্লোলিনীম্॥
বঙ্গজননীং সুভাষিণীং বন্দে॥

সংহতশোণিত-হিমবাতশীত-বিদলনারুণ করপীযূষিণীম্।
অশোকচম্পক-কেসরকুরুবক-শোভিতবাসন্ত হিল্লোলিনীম্॥

সুর ও স্বরলিপি ঃ গীতবিশারদ শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য

I পা র্সা র্সা র্সা I নি নি ধা পা I পাম্ম ধাপা পা পা I পাম্ম গাম্ম গা গা I
ব — ঙ্গ জ ন — নি — ম — ঙ্গ ল খ— — নি —
I সা রে রে রে I রেগা মা পা I গা পামা গা গা I গা গা গা গা I
স র্ব ব ধ র — ণী — ব — ন্দ্যে — — — — —
I সা সা নি্ ধ্া I নি রে রে রে I নি রে গা মা I গারে গা রে সা I
হ — রি ত কা — ন্তি — জ — নি ত শা- — ন্তি —
I সা পা পা পা I পা নি ধা ধা I পা ম্ম গা গা I ম্ম পা ধা ধা I
ত ন য় — হৃ দ য় — ন — ন্দ্যে — — — — —

I ধা নি র্সা র্রে I র্রে র্রে র্রে র্রে I র্সা র্গা র্রে র্রে I র্সা নি ধা নি I
জ গ ন্ মো — হি নি — মা — ত — স্বাং — ব —

I র্সা র্রে র্রে র্রে I র্রে র্রে র্রে র্রে I নি রে র্গা র্মা I র্গারে র্গা র্রে র্সা I
ন্দে — — — — — — — ষ ড়ৃ তু বি লা সি নীং —

I র্সা র্সা র্গা র্রে I সা নি ধা নি I র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা র্সা I
সু হা — সি নীং — ব — ন্দে — — — — — — —

I সা সা সা ম I মা মা মা মা I মা ধা ধা ধা I ধা ধা ধা ধা I
আ ত প বি র — সে — নি দা ঘ ছি ব — সে —

I মা ধা নি র্সা I ঋ´ ঋ´ র্সা র্সা I র্সা মা ধা নি I সা সা সা সা I
সা — ন্ব্য স মী — র ণ সু সে — বি ণী — — ম্

I পা নি র্সা র্রে I র্সা নি পা মা I রে মা ণি পা I মা রে সা সা I
ন ব ঘ ন মা — লে — ব র্ ষ ণ কা — লে —

I নি্ র্সা নি্ প্া I নি সা রে রে I - মা মা রে I পা পা পা পা I
ন ষ্টী ক ল্ লো — লো — — ল্লা — সি নী — — ম্

I পা ছা ছা ছা I নি নি নি নি I নি র্সা র্সা র্সা I ঋ´ ঋ´ র্সা র্সা I
শে ফা — লি শো — ভি ত শা র দ প্র ভা — ত —

I র্সা ঋ´ র্মা র্গা I ঋ´ ঋ´ র্সা র্সা I সা মি ছা নি I র্সা র্সা র্সা র্সা I
নৃ — ত্যৎ কা — শ কু ল শো — — ভি ণী — — ম্

I র্সা র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা I র্সা নি ছা মা I জ্ঞা মা ণি ছা I ণি র্সা র্সা র্সা I
প র ম সু কা — ন্ত — সু শা — ন্ত হে ম — ন্ত

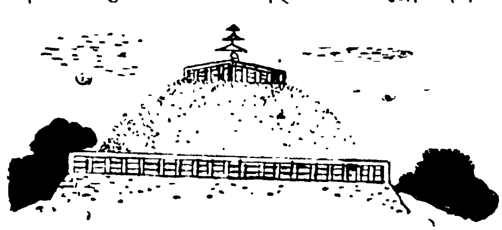
I র্সা র্সা র্সা ণি I ণি ণি ছা মা I জ্ঞা মা ণিছা নি I র্সা র্সা র্সা র্সা I
ল স দ্ ধা — ন্য ম ধু হি — ল্লো লি নী — — ম্

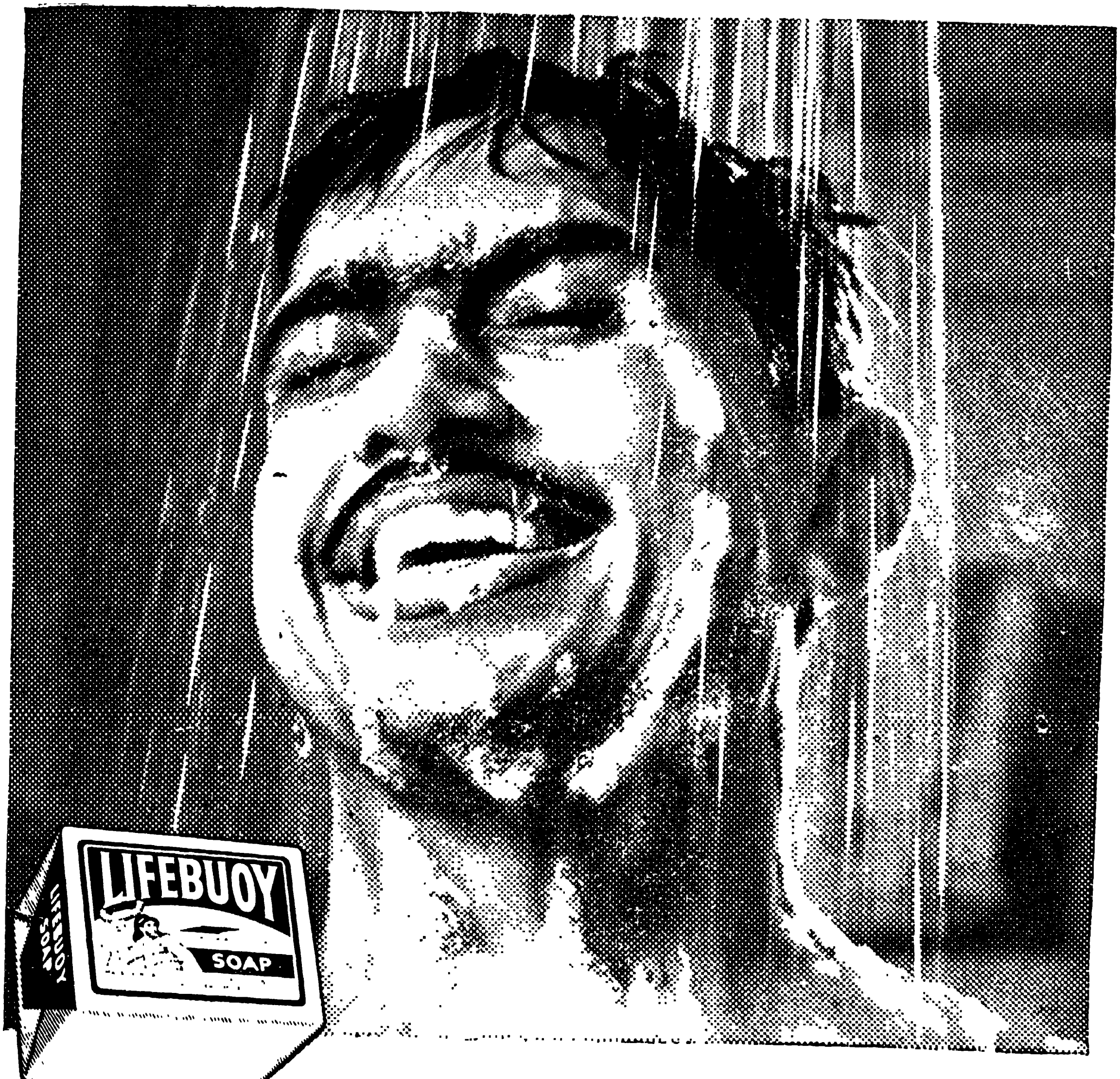
I র্সা র্সা র্সা র্সা I ছা ছা ছা ছা I পা পা পা হ্ম I হ্ম হ্ম গা গা I
শো — ষি ত শো — ণি ত হি — ম বা — ৩ শী ত

I গা হ্ম পা ছা I পা হ্ম গা গা I হ্ম গা গা হ্ম I সা সা সা সা I
বি দ ল না রু ণ ক য় পী যূ — ষি ণী — — ম্

I সা গা গা গা I গা হ্ম হ্ম গা I হ্ম ধা ণি র্সা I ধাণি নির্সা র্সা র্সা I
অ শো — ক চ — ম্প ক কে — স র কু- রু- ব ক

I র্সা র্গা র্গা র্গা I র্ম্ম র্গা র্সা র্সা I র্সা নি ধা নি I র্সা র্সা র্সা র্সা I
শো ভি ত বা স — ন্ত — হি — ল্লো লি না — — ম্




LIFEBUOY
LIFEBUOY SOAP
SOAP

ধম্মপদ ও ধম্মলিপি

অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

পালি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের প্রথমভাগ সূত্রপিটকের অন্তর্গত "ধম্মপদ" বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষার সার-সংকলন। ধর্মপথের পথিক যিনি, তাঁর পক্ষে এটি একখানি অমূল্য গ্রন্থ। শুধু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বলে অভিহিত কোরলে এর প্রতি অবিচার করা হবে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ধম্মপদ মানবধর্মগ্রন্থ—মনুষ্যত্বলাভের চিরন্তন পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষের মর্ম কোষ থেকে চয়ন করা ভাবকুসুমগুলি যেন একটি মাল্যরূপ নিয়ে বিশ্বমানবের কাছে অর্পিত হয়েছে। যেসব সুভাষিত মুক্তাবলী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে মনুস্মৃতিতে, জৈন ধর্মগ্রন্থে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশকথায় মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভগবদগীতায়—সেইগুলি তথাগতের দৈবী-স্পর্শে আকর্ষিত হয়ে এক সংহত রূপ ধারণ কোরেছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর এখানে কান পাতলে শোনা যায় সহজেই।

'ধম্মপদ' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কোরতে গিয়ে নানা জনে নানামত প্রকাশ কোরেছেন। সাধারণতঃ যে অর্থ সর্বজনগ্রাহ্য, তাই আমরা এস্থলে গ্রহণ কোরেছি। 'ধম্ম' শব্দের অর্থ ধর্ম; আর "পদ" শব্দের অর্থ পথ। কিন্তু 'ধর্ম' কথাটির প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হবার প্রয়োজন আছে। ধর্ম বলতে এখানে বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্ম বোঝায় না। ধর্ম বললে বুঝতে হবে "নীতি"। এই নীতি কোনও এক বিশেষ দেশও কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তই এই নীতির প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনের, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এই নীতি-ধর্মের উদ্দেশ্য। রোগ-শোক জরা-মৃত্যুক্লিষ্ট মানুষ চায় দুঃখ থেকে মুক্তির পর চিরস্থায়ী আনন্দ। এ হল তার শ্রেয়ের কথা। আবার, মানুষ চায় পারিবারিক শান্তি, চায় সামাজিক শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও সুখ। এ হল তার প্রেয়ের সমস্যা। শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিলে চলবে না। তবেই হবে সুসমঞ্জস জীবন পরিকল্পনা। ধম্মপদের নীতি-ধর্ম এই শান্ত সরল সহজ ছন্দে জীবনের সমস্ত গরমিলের মিলন সাধতে শিক্ষা দেয়।

ধম্মপদ ধর্মগ্রন্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে রহস্য বা তত্ত্ববিচারের কোনও স্থান নেই। উপনিষদ্ বা গীতার অধ্যাত্মতত্ত্ব বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধান ধম্মপদের বিষয়বস্তু নয়। কে, জে, সণ্ডার্স ঠিকই বলেছেন, "তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যা আত্মপ্রত্যয় এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।" অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "তত্ত্ববিদ্যা নিরপেক্ষভাবে শুধু আচরণসাধ্য জীবননীতির আদর্শে সর্বমানবকে সার্থকতার পথে প্রবর্তিত করাই এর লক্ষ্য।" তাই সর্বমানবীয় হৃদয়ের কাছে ধম্মপদের আবেদন স্বাভাবিক।

ধম্মপদের "বুদ্ধবগ্‌গের" ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হয়েছে: জেনে রাখ, পৃথিবীতে দুঃখ সবচেয়ে বড় সত্য; দুঃখের কারণ আবিষ্কার কর, নিশ্চিত জেনো, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়; ভাল কোরে জেনে রাখ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন কোরলে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, ব্রাহ্মণ বগ্‌গের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে: আত্ম-সঙ্কোচকারী পাঁচটি কারণ (পঞ্চস্কন্ধ) অতিক্রম কর, বাহ্যিক সৌন্দর্যে (রূপ) আকৃষ্ট হয়ো না, ইন্দ্রিয়-ভোগে (বেদন) আসক্ত হয়ো না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে (সঞ্জ) যে আত্মার অধীনতা জন্মে তা' থেকে নিজেকে মুক্ত কর। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে স্ব-শক্তির সীমা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা (সংস্কার) উপস্থিত হয় তা থেকে নিজেকে মুক্ত কর। নিজেকে ইন্দ্রিয়াধীন জীব মনে করা মিথ্যা জ্ঞান (বিজ্ঞান)। অতএব, তা থেকে নিজেকে মুক্ত কর। মার্গ-বর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে: পথের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অথঙ্গিকো মজ্জো) শ্রেষ্ঠ। সত্যের মধ্যে চারটি আর্য্যসত্য (চতুরো সচনম) শ্রেষ্ঠ। ধর্মের মধ্যে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বস্তুতঃ ত্যাগের আদর্শই ধম্মপদের সারমর্ম। সকল রকম কামনা-বাসনা, পার্থিব ভোগ-লালসা, ইন্দ্রিয়াসক্তি হতে মুক্ত হতে না পারলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করা যায় না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি এই নশ্বর বস্তু-জগতের সুখ-দুঃখের উর্ধে নিজের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি নির্বাণ বা চিরস্থায়ী শান্তিলাভ কোরতে চান তিনি সর্বদা সর্ব বিষয়ে অনাসক্তি অবলম্বন কোরে থাকেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার এবং বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার একমাত্র উপায় অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। ষড় রিপু যাকে ধম্মপদে বলা হয়েছে "মার"—তার অত্যাচার সব চাইতে বেশী সহ্য কোরতে হয় আসক্ত লালসাপরায়ণ ব্যক্তিকে।

অত্যধিক লালসা বা ভোগাকাঙ্ক্ষা যে শুধু ব্যক্তিমনের শান্তি বিঘ্নিত করে তা' নয়, ব্যক্তিকে পরিবার ও সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ কোরে তোলে। একের ভোগাকাঙ্ক্ষা অপরকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকেও বঞ্চিত করে। ভোগাকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতার জন্মদাতা। স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজের সুখও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করা। তাই পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। ধম্মপদের নীতি-ধর্ম বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, এ নীতি প্রীতির নিয়ম।

॥ ২ ॥

"ধম্মপদের বলিষ্ঠ নীতিপরায়ণতার একমাত্র তুলনাস্থল হ'চ্ছে ভার

বর্ষের সর্বত্রব্যাপ্ত প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনসমূহ—অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের এই মন্তব্য ধম্মপদপাঠকালে প্রণিধান যোগ্য।

তথাগত বুদ্ধ মানুষের প্রতি মৈত্রী ও করুণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর্ত পীড়িত মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। তাই তিনি তাঁর কঠোর তপস্যালব্ধ বোধির আলোকে মানুষকে দেখিয়েছিলেন দুঃখ মুক্তির পথ। সেই আলোকের ইশারা বহন করে ধম্মপদ।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক ছিলেন আদর্শ নরপতি। প্রজা তাঁর কাছে সন্তান-তুল্য (সবে মনুসা মে পজা)। প্রজার ঐহিক ও পারত্রিক সুখই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্যবস্তু। কলিঙ্গের সংগ্রাম আর মানুষের হাহাকার অশোকের চেতনাকে অনুতাপানলে বিদগ্ধ কোরে যে সদ্ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত কোরেছিল, তা দিয়ে তিনি শুধু স্বীয় কল্যাণ সাধন কোরেই ক্ষান্ত হ'ন নি, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের পর্ব্বতগাত্রে, গিরি-গুহায়, স্তম্ভ-গাত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সরল সহজ প্রাকৃত ভাষায় সত্য,ধর্ম, কল্যাণের পথের সন্ধান। এই সব সৎপথের দিক্‌দর্শনকারী অশোকের অনুশাসন সমূহই হ'ল ধম্মলিপি।

অশোক ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে ধর্মোপদেশ দেন নি। তিনি ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন গার্হস্থ্যাশ্রমী পরিবারের ও সমাজের মানুষকে। তিনি মানুষের লক্ষ্যস্থল নির্বাণকে মনে করেন নি। তাঁর মতে পরলোকে স্বর্গসুখ এবং ইহলোকে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিই লক্ষ্যস্থল। অশোকের ধর্মের স্বরূপ কি? তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে—এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ধর্মের স্বরূপ হ'ল কল্যাণ (সাধবে অথবা বহু-কয়ানে) এবং অকল্যাণ বা পাপ য'তে মুক্তি। কল্যাণ হয় কয়েকটি গুণের অনুশীলনে। যেমন, দয়া, দান, সত্যবাদিতা (সচে), পবিত্রতা (সোচয়ে), বিনয় (মোদবে)। এই সব শীল বা চারিত্রিক আচরণকে কেমন কোরে কার্য্যে রূপদান কোরতে হবে তাও অশোক বলেছেন তাঁর বিভিন্ন ধম্মলিপিতে। 'দয়ার' অর্থ প্রাণীদের প্রতি অহিংসা আচরণ (অনারম্ভো প্রাণানাম্ অবিহিসা ভূতানাং) ধম্মপদের "দণ্ডবর্গে" বারবার বলা হয়েছে—"অহিংসা পরমধর্ম।" "দান" অর্থ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি উদার ব্যবহার (সমন—ভাভনেসু সম্পটিপতি), আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি সৎব্যবহার (মিত-সংথুত সহায়—নাতিকেসু যস্তাপটিপতি) দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সৎ-আচরণ (দাস-ভতকমহি—সম্পটিপতি), প্রজার প্রতি বাৎসল্য ও রাজার প্রতি পিতৃভাব ইত্যাদি। ধম্মপদের "পকিন্নক বগ্‌গের" চতুর্থ শ্লোকে এই সৎ-আচরণের শিক্ষা দেয়। মাদবে বা 'বিনয়' প্রকাশিত হয়ে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি (মাতরি পিতরি সুসুসা), শিক্ষক ও আচার্য্যদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বয়োবৃদ্ধও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধায় (থৈর সুসুসা বধু সুসুসা)। ধম্মপদের "নগবগ্‌গের" ত্রয়োদশ শ্লোকে—মাতাপিতার প্রতি ভক্তির কথা আছে।

অশোক "সাধবে" বা "বহু কয়ান" বলতে বোধহয় বুঝিয়েছেন সেই সব কাজের কথা, সেবার কথা যা 'বহুজন হিতায়' উৎসর্গীকৃত হয়। তাই তিনি নিজে যেসব জনকল্যাণকর কাজ কোরেছেন তার উল্লেখ কোরেছেন সপ্তম গিরিলিপিতে। সেখানে বলা হয়েছে: "রাস্তায় আমি বটবৃক্ষ রোপণ কোরেছি যাতে পশুও মানুষকে ছায়া দান করে। 'আমি' আম্রকুঞ্জ গড়ে তুলেছি। পথে পথে কূপ খনন কোরে দিয়েছি।" শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় শিলালিপিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, অশোক মনুষ্য ও পশুচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা কোরেছিলেন ভারতে এবং ভারতের বাইরে। এই সব জনহিতকর কাজের উল্লেখ দ্বারা অশোক প্রজাসাধারণকে অনুপ্রাণিত কোরতে চেয়েছিলেন।

অশোকের ধর্মের মধ্যে "অপাসিনব" বলে একটি কথা আছে। "অপাসিনব" শব্দের অর্থ 'আসিনব' বা 'পাপে'র থেকে অব্যাহতি। 'আসিনব' বা পাপের সৃষ্টি হয় কোন সব অপগুণের দ্বারা? এ প্রশ্নের উত্তর আছে তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে। বলা হয়েছে—হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ, দ্বেষ—এগুলিই হ'ল পাপের আকর। (ইমানি আসিনব গামিনি নাম অথ—চন্ডিয়ে নিঠুলিয়ে ক্রোধে মানে ইস্যা)। অতএব, পাপমুক্ত হতে হবে যাতে এই নীচ প্রবৃত্তিগুলি অচিরেই মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে ধম্মপদের "ক্রোধ বগ্‌গের তৃতীয় শ্লোকটি স্বভাবতঃই স্মরণ হয়:

"অককোধেন জিনে কোধম্ অসাধুম্ সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ম্ দানেন, সচ্চে নালীক বাদিনম্॥"

—ক্রোধকে অক্রোধ, অসাধুতাকে সাধুতা, কৃপণতাকে দান এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দিয়ে জয় কোরবে।

অশোকের ধর্মনিহিত 'শীল' বা চারিত্রিক আচরণের আলোচনা কোরতে গেলে ধম্মপদের "বগ্‌গের অষ্টাদশ শ্লোকে উল্লিখিত" পঞ্চশীলের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। "পঞ্চশীল" হল গৃহস্থের অবশ্য আচরণীয় পাঁচটি কর্তব্য—কোন প্রাণীকে হিংসা না করা, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করা, মিথ্যা কথা না বলা, পরস্ত্রীসংসর্গ না করা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করা। "শীল"ই ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ। অশোকের চতুর্থ গিরিলিপিতে বলা হয়েছে; "ধম্মচরণে পিন ভবতি অসীলস"—চরিত্রবান্ না হলে ধর্মানুশীলন করা যায় না। ধম্মপদের "ধম্মথ বগ্‌গ"ও বলা হয়েছে যে কৃচ্ছ সাধনা, বিদ্যা, বুদ্ধি বা গৈরিকধারণ—এ সবের দ্বারা ধর্মপথ লাভ করা যায় না। চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা মন নির্মল হলে তবেই ধর্মপথে চলা যায়। "ব্রাহ্মণ বগ্‌গে"ও বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ কোরলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। আচরণের দ্বারা চারিত্রিক বল অর্জন কোরলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। সুতরাং "শীল"কে ধম্মপদে কত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। অশোকের ধম্মলিপির ধর্মোপদেশের সার মর্মও "শীল-চর্য্যা"।

॥ ৩ ॥

ধর্মের নীতি পালন কোরতে গিয়ে মানুষ কোনও দিন তার স্বাধীনতা হারায় নি। নীতি অনুসারে চলতে গিয়ে হয়ত সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে নি, আবার যে শৃঙ্খলা সে লাভ কোরেছে তা' কখনই শৃঙ্খল হয়ে দেখা দেয় নি। ধর্মনীতি পালন কোরতে গিয়ে তার মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি কোরেছে।

ধম্মপদ ধর্মের পথে চলতে গিয়ে জন্মগত স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" কোনও এক অদৃষ্ট ঈশ্বরের শরণাগতি গ্রহণ কোরতে বলে নি। আত্মপ্রত্যয়ের কথাই বলা হয়েছে। "শরণাগতি"র চেয়ে আচরণীয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। তাই ভিক্খু বগ্‌গে বলা হয়েছে "অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্ত মত্ত না"—নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের বিচার কর। "অত্তা হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি"—নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের গতি। সৎকর্ম কোরলে উন্নতি হবেই, অসৎ কর্ম কোরলে অবনতি অবশ্যই হবে। এ নিয়মের অন্যথা করা কোনও অলৌকিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনির্মাতা। "অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া। অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং "(আত্মবর্গ)—নিজেই নিজের আশ্রয়—অন্য আশ্রয় আর কে থাকতে পারে? নিজেকে সুসংযত কোরলে দুর্লভ আশ্রয় পাওয়া যায়।

এই আত্মনির্ভরশীলতাই মানুষকে "অপ্রমাদ" বা কর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। এই অপ্রমাদের জন্য চাই সদাজাগ্রত উদ্যম ও পুরুষকার। ধম্মপদের "অপ্পমাদ বগ্‌গে" বলা হয়েছে: "অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং। অপ্পমত্তা মিয়ন্তি যে পমত্ত যথা মতা॥"—অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, যারা প্রমত্ত তারা মৃতবৎ।

অশোকের ধম্মলিপি থেকে জানা যায় যে তিনিও মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মে উৎসাহিত কোরেছেন। ষষ্ঠ গিরিলিপিতে তিনি উত্থান নীতির প্রশংসা কোরেছেন এবং আলস্যের নিন্দা কোরেছেন।

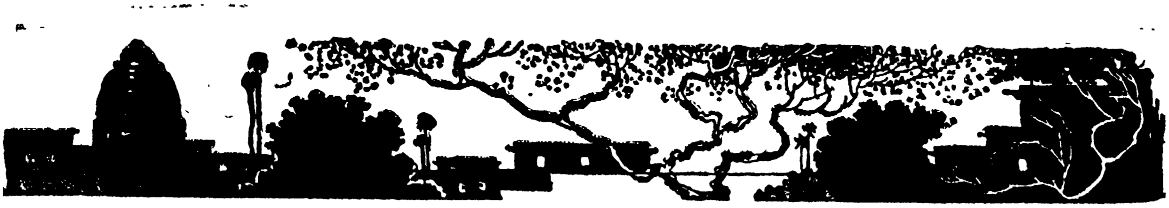
"কতয়ব মতে হি মে সর্বলোকহিতং; তস চ পুন এস মুলো, উস্টানং চ অথ সংতীর না চ"—সর্বলোকহিতই আমি কর্তব্য মনে করি এবং তারও মূলে হচ্ছে উত্থান এবং দ্রুতকর্ম সম্পাদন। আবার, প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে বলা হয়েছে "খুদকা চ মহাৎপা চ ইমং পকমেয়ু"—ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই পরাক্রম সহকারে কাজ করুক। এইভাবে, অশোক তাঁর লেখমালায় উৎসাহ ও পরাক্রমের উপযোগিতা বর্ণনা কোরেছেন। কারণ, তিনি জানেন, কর্মসাধন বড় দুষ্কর। তাতে প্রয়োজন অমিত মানসিক বল ও পরাক্রম। তাই পঞ্চম গিরিলিপিতে অশোক বলেছেন: "কলানং দুকরং। সুকরং হি পাপং। ধম্মপদের আত্মবর্গে বলা হল: "সুকরানি অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ। যং বে হিতং চ সাধুং চ তং বে পরম দুকরং॥"—অসাধু কর্ম এবং নিজের অহিত সুকর—যা হিত এবং সাধু পরম দুষ্কর। পরাক্রম ও উদ্যম চাই-ই চাই, কেননা সে পথ যে শাণিত ক্ষুরধার—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" এই প্রসঙ্গে ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার একটি মন্তব্য লক্ষ্যণীয়—"With Buddha appamada is the single term by which the whole of his teaching might be summed up"—অর্থাৎ বুদ্ধের মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যে তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে। (Asoke and his inscriptions, P. 250)

ধম্মপদ ও অশোকের ধম্মলিপিতে যেমন ভাবের মিল রয়েছে তেমন স্থানে স্থানে কথারও মিল আছে। ধম্মপদের "তৃষ্ণা বর্গে" বলা হ'চ্ছে—

"সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি সব্বরসং ধম্মরসো জিনাতি। সব্বরতিং ধম্মরতী জিনাতি; তন্হক্খয়ো সব্বদুক্খং জিনাতি"—ধর্মদান সবদানকে জয় করে, ধর্মরস সব রসকে জয় করে, ধর্মরতি সব রতিকে জয় করে, আর তৃষ্ণাক্ষয় সব দুঃখকে জয় করে।

অশোকের নবম গিরিলিপিতেও আছে—"নতু এতারিসম্ অস্তি দানং ব, অনুগহো ব য়ারিসং ধম্মদানং ব, ধম্মানুগহো ব"—ধর্মদানের মতদান নেই। ধর্মে যে উপকার হয় তেমন আর কিছুতে হয় না—আবার, ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কোরে বলছেন: "য়োস লধে এতকেন ভোতি সর্বত্র বিজয়ো সবত্র পুন বিজয় প্রীতি-রসো সো লধ ভোতি প্রীতি ভ্রম-বিজয়ম্পি"—ধর্মের দ্বারা সর্বত্র যে বিজয়লাভ হয় তা' প্রীতিরসময়। ধর্মবিজয়ে সেই প্রীতি লব্ধ হয়। ধম্মপদের "তন্হাবগ্‌গের" প্রতিধ্বনি কোরে ধর্মরসও ধর্মরতির কথা এখানে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির জয়যাত্রা একদিন দিকে দিগন্তরে বের হ'য়েছিল। সেদিনকার সে যাত্রা 'ধর্মযাত্রা,' সেদিনকার সে জয় "ধর্ম বিজয়।" সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অন্তরলোকে চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল ভারতবর্ষের আসন। বিশ্বের মানবজাতি মুগ্ধ হ'য়ে শ্রবণ কোরেছিল "ধম্মপদ" আর "ধম্মলিপির" সত্যধর্মের কথা। 'শীল' আচরণের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল সমুদ্রমেখলা পৃথ্বীর সকল মানুষ। ধম্মপদ বৌদ্ধধর্মের গীতা। অশোকের ধম্মলিপি প্রজাসাধারণের জীবনবেদ। ধম্মপদ শ্রুতি, ধম্মলিপি স্মৃতি। ধম্মপদ একটি জীবন-পরিকল্পনা দিয়েছে। ধম্মলিপি সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদানে সহায়তা কোরেছে। একের তপস্যা, অপরের ফললাভ। একের অনুভূতি, অপরের প্রচার। সব মিলে-মিশে একই উদ্দেশ্যসাধিত হ'য়েছে সে হল ভারতের চিত্ত দিয়ে পৃথিবীর চিত্ত জয়—সত্যিকারের ধর্মবিজয়।





দুর্দ্দিনে তোমাদের কর্ত্তব্য

উপানন্দ

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিসমাপ্তির পর বাঙ্গালী জাতির আর বাংলা ভাষার অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, আর এটা দেশের পক্ষে ঐতিহাসিক কলঙ্ক হোলেও তা প্রত্যাহার করা হয়নি, বরং যূথবদ্ধ ষড়যন্ত্রের অপরাজেয় তেজস্বিতায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত। আজ তোমরা লক্ষ্য করছ ভারতে বর্ব্বর যুগের আবির্ভাব।

এই প্রতীকারহীন দুর্দ্দশাও বিড়ম্বনা এই, রক্তাক্ত বেদনা, ভারতীয় সভ্যতার মহাসম্ভাবনাকে নিষ্ক্রিয় করে দিল। আজ ইংরাজ নেই, পূর্ব্বে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন ইংরাজের দোহাই দেওয়া হয়েছে, আর আজ? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, অন্য জাতির প্রতি বাঙ্গালীর কোন বিদ্বেষ নেই।

আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন বাঙালী আজকের রাজনৈতিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নব আলোকে জেগে উঠবে। তোমাদের ওপরই নির্ভরশীল হয়েছে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ, জাতিগঠন ও উন্নয়নে তোমরা আত্মনিয়োগ করো।

বিশ্বাস করি এমন এক অপরাজেয় দৈবীশক্তি আছে, যার কাছে একদিন আকাশ-চুম্বী দম্ভের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মানুষকে নত হোতেই হবে। একক মানুষ হিসাবে ও প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য আছে। শক্তিশালী প্রমত্ত যূথবদ্ধতার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে নির্ভীকভাবে দাঁড়াতে হবে একক মানুষকে, তার মধ্যেই আছে সেই পর্ব্বতবিচূর্ণকারী মহাশক্তি।

তোমরা প্রত্যেকে সেই মহাশক্তির, ধারক ও বাহক। পুঁথির পাতা থেকে সুরু করে প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতায় জন্মলাভ করুক তোমাদের মধ্যে অপূর্ব্ব বীরত্ব। শপথগ্রহণ করো—নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে জাতীয় জীবনকে উন্নত করবার জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তোমাদের শৌর্য্য বীর্য্য, প্রতিভা, চরিত্র ও জ্ঞান বুদ্ধি সমস্তই বঙ্গ-জননীর সেবায় উৎসর্গ করা আশু প্রয়োজন। অতীত বাংলার গৌরবোজ্জ্বল চিত্র, ভগ্ন বাংলার বর্ত্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তোমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

যে আদর্শের ওপর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, সে সভ্যতার আদর্শ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তোমরা বোধ হয় জানো, যথার্থ রাষ্ট্রচেতনা ভিন্ন বর্ত্তমানে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। মানসিক, চারিত্রিক ও আত্মিক শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা দেশকে উন্নততর করবার ভার তোমাদের ওপর। আজকের দিনে রাজনীতি সমাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যথার্থ শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে দেশের সমুদয় কর্ত্তব্যভার তোমাদের নিতে হবে আর তোমাদের অনুগামীদিগকে ও শিক্ষিত করে তুলবে, দেশ এই আকাঙ্ক্ষা করে। এজন্যে তোমাদের প্রস্তুতি কোথায়?

বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের সাক্ষ্য ইতিহাস দিয়ে আসছে। এই বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষ একদা রঘুর সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। সিংহল, শ্যাম, কাম্বোজ, মালয় প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বাংলার পালবংশ ভারতের নানাদেশ জয় করেছিল, মধ্যযুগকে স্তম্ভিত করেছিল বাংলার বারো ভুঁইয়ারা। ইংরাজের প্রথম আমলে বাঙালী পল্টন ও ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব দান করেছে, শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়েছে, সংগ্রামের পুরোভাগে এসে জাতীয় রথের সারথী হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দবাহিনী পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছে। ইংরাজ কূট চক্রান্ত করে বাঙ্গালীকে শক্তিহীন করবার চেষ্টা করেছে, বাঙালী মরেনি, এখনও মরবে না—তার নিদারুণ অস্তিত্বের সঙ্কট একদিন দূর হবে এরূপ বিশ্বাস আমাদের আছে। এসঙ্কটের ত্রাণ অস্ত্র তোমরা।

তোমরা বোধহয় জানো—রাজনৈতিক ভাগ্য অন্বেষণকারীরা কিভাবেই না মজলিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে শীকার ধরবার জন্যে। একটি কলেজের ছেলের দুটি রিভলবারের আওয়াজের জন্যে অপেক্ষা করছিল প্রথম বিশ্ব-

যুদ্ধ। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানো উনিশ শো চোদ্দ সালের আটাশে জুনের কথা—যে সময়ে অস্ট্রিয়ার রাজ-প্রতিনিধি আর্কডিউক ফ্রান্সিস চলেছেন গাড়ীতে চড়ে। এম্নিভাবেই জমে থাকে এক একটি স্থানে এক একটি জাতির মধ্যে বারুদের স্তূপ শুধু অগ্নি সংযোগের অপেক্ষায়। তারপর সুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সুরু হয় প্রলয়কাণ্ড। আজ জাতীয় প্রগতি পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে, এসেছে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিপর্য্যস্ত, এ সময়ে দেশের যৌবনশক্তি বা প্রাণশক্তি তোমরা নীরব হয়ে থাক্‌তে পারো না। মানসিক, নৈতিক, আত্মিক আর শারীরিক সর্ব্বপ্রকার শক্তি চর্চ্চা সুরু করে দাও—শুধু নিছক আড্ডা দিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে জটলা করে, রেস্তোঁরা ও কফি-হাউসে গরম গরম বক্তৃতা করে কোনদিন জাতীয় শক্তির পুনরুজ্জীবন কর্‌তে পার্‌বে না। এজন্যে সাধনা ও অনুশীলন প্রয়োজন। জেনে রেখো মনুষ্যত্ব-লাভের পন্থা অতি দুরূহ। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় তোমরা ক্রমেই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হয়ে পড়ছ—এটা ভুল্‌লে চল্‌বে না।

শক্তি অর্জ্জিত হয় জ্ঞানের পথে। এই জ্ঞানের পথকে অবলম্বন করে চল্‌তে হবে। চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে ও আত্মশক্তির স্ফুরণে আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তা ও স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকৃত। তোমরা ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপরতা দেখাও—তোমাদের সংহতি শক্তি সুদৃঢ় হোক্। গীতার বাণী হোক্ তোমাদের অবলম্বন, এই গীতাই দানবীয় হিংস্রতা ও অন্তর্বিরোধ ক্ষেত্রে তোমাদের রক্ষা করবে—তোমাদের বিজয়রথের অগ্রগতিকে আসন্ন করে তুল্‌বে। তোমরা বিবেকানন্দ, বিপিন পাল সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করো, তাহোলে আশা করা যায় বাঙ্গালীর হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার হবে। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো বাঙালীজাতিকে সকল রকমে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করে তুল্‌বে বিশ্বের মাঝে, আর যাতে অন্য কোন জাতির চক্রান্ত তোমাদের দৃষ্টিতে চূর্ণ হয়ে যায় তার জন্যে প্রস্তুত হবে।

দুই পণ্ডিত

শ্রীজয়দেব রায়

ইংরেজ শাসকরা কেবল আমাদের গায়ের জোরেই শাসন করেন নি, তাঁদের অনেকে আমাদের সঙ্গে প্রেম ও মৈত্রীর বাঁধনে বদ্ধ হয়েছিলেন। শাসকদের অধিকাংশই ছিল বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো দুরন্ত ছেলে। স্বদেশে কোন দিকে কিছু করতে না পেরে সাগর পারের উপনিবেশে ভারতীয়দের ওপর প্রভুত্ব করতে এসেছিল। আবার বহু সুধী পণ্ডিতও এসেছিলেন, এদেশে তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, জ্ঞান ধর্মের মৈত্রীসেতু বেঁধেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন-ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি।

উইলিয়াম জোন্স সাহেব ১৭৮৩ সালে কলকাতায় আসেন সুপ্রীমকোর্টের জজরূপে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; ফরাসী, লাতিন, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি বহু ভাষা তিনি জানতেন। এদেশে এসে তিনি আবার সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁর মৌলবীর অভাব হ'ল না—কিন্তু কোন পণ্ডিতই তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন—ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত ভাষা শেখালে জাতিধর্ম নষ্ট হবে।

শেষে একজনের পরামর্শে তিনি সালকিয়ার বৈদ্য কবিরাজ রামলোচন বিদ্যাভূষণের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। রামলোচন সাহেবকে বললেন—দেশে এত বড় বড় পণ্ডিত থাকতে সাহেব আমার কাছে এসেছ কেন?

জোন্স বললেন—আমি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমাজপতি। তিনি নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার প্রত্যেক পণ্ডিতকে অনুরোধ করলেন, কেউই আমাকে পড়াতে রাজী হলেন না।

রামলোচন একটু চিন্তা ক'রে বললেন—বোধহয় বেশী টাকার লোভ দেখালে অনেক গরীব পণ্ডিত রাজী হত।

জোন্স বিরক্ত হয়ে বললেন—মশাই, আমি ৫০০ টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুনলাম আমাকে দেবভাষা শেখালে মহাপাপ হবে।

রামলোচন বিস্মিত হয়ে বললেন—বলেন কি? ভাষা শেখালে মহাপাপ হয়। চমৎকার ব্যাপার। আপনি বৈদ্য পণ্ডিতদের কাছে গিয়েছিলেন?

জোন্স বললেন—হ্যাঁ, তা-ও গিয়েছিলাম। উত্তর কলিকাতার এক বৈদ্য-পণ্ডিত রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে শাসাতে লাগ্‌ল—তুমি যদি ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শেখাও তাহলে তোমাকে একঘরে করব, তোমার কবিরাজী পসার পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দেবো।

রামলোচন উত্তেজিত হয়ে বললেন—জজ সাহেব, শুনুন। আপনি জজসাহেব ব'লে নয়, ভালো মাইনে

দেবেন বলেও নয়, আপনার মতো পণ্ডিতলোককে সংস্কৃত ভাষা শেখালে সংস্কৃত ভাষারই গৌরব বৃদ্ধি হবে, দেশের কাজ হবে, জাতির মঙ্গল হবে—তাই আমি শেখাবো। আমি সমাজের ধার ধারি না, যে সমাজ জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান দেওয়া পাপ মনে করে সে সমাজকে আমি পরোয়া করি না। জ্ঞানার্থী যে জাতিরই হোক, যে ধর্মেরই হোক তাকে জ্ঞান দান না করা শিক্ষিত লোকের পক্ষে পাপ মনে করি। আমি আপনাকে ভাষা শেখাবো।

স্যার উইলিয়াম জোন্স এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী চলে গেলেন।

সব চে' বড়

শ্রীসুধীরকুমার রায়

"মস্কোর ঘণ্টা" সব চে' বড়
　　ওজন দুশো টন,
ঘণ্টা দেখে ধ্বনি শুনে
　　সবাই অবাক হন।

"গোল গম্বুজ" বড় খিলান
　　বড় "ডুবং মঠ"
"লণ্ডন" সহর সব চে' বড়
　　সেথায় বড় শঠ।

সবচে' বড় সিনেমা হল
　　নিউইয়র্কের "রবিস"
ছ'হাজার লোক বসতে পারে
　　সাহেব থেকে বকিস।

"জুম্মা" হলো বড় মসজিদ
　　পোপের প্রাসাদ বড়,
নামটি হলো "ভ্যাটিকান্"
　　বেজায় রকম দড়।

গির্জার বড় "সেণ্ট্ পিটার"
　　এঞ্জেলসের "বাইবেল"
বইয়ের ওজন চব্বিশ মণ
　　পড়ার নামেই হার্টফেল্।

জলের ট্যাঙ্কের সেরা হলো
　　কলিকাতার "টালা,"
দশটা পুকুর মধ্যে যেন
　　রাবণ রাজার জালা।

"ওকল্যাণ্ড্ ব্রীজ" বড় সেতু
　　"ব্রড্‌ওয়ে" রাজপথ,
দুটিই কিন্তু আমেরিকায়
　　বলিহারি হিম্মত!

"এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং" হলো
　　সব চে' বড় বাড়ী,
সবচে' বড় ফর্দখানা
　　এই খানেতেই সারি।

অদ্ভুত চোর

শ্রীশিশিরকুমার মজুমদার

উজ্জয়নী নগরের কাছাকাছি কোন এক গ্রামে এক নামকরা চোর বাস করত। চোরটির চুরি করার একটা বিশেষত্ব ছিল। সে বছরে মাত্র একদিন চুরি করতো।

চোরের তো চুরি করবার দিন এল এক অমাবস্যা তিথিতে। চোর চুরি করবার জন্য বের হল। গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার জলতৃষ্ণা পেল। সে দূরে একটা নদী দেখতে পেল। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু। তাই চোর তাড়াতাড়ি জলতৃষ্ণা মিটাবার জন্য নদীর দিকে অগ্রসর হোল। চোরটিতো নদীতে নেমে আঁজলা ভরে জল খেতে গেল, ইতিমধ্যে বাঁদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে এক শেঠজী। গাঁয়ের এক মস্ত ধনী। শেঠজীও তাকে দেখেছে, আর দেখা মাত্র ঘাটের দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে। হঠাৎ চোর বলে উঠল, "মাৎ আইয়ে শেঠজী।" এর ভয়ই করছিল শেঠজী। শেঠজী ভয়ে কাঠ হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এক্ষুণি হয়তো কিছু কেড়ে নেবে। হঠাৎ ঘাড়ে একটা চাপড় পড়ল, চমকে উঠল শেঠজী। কিন্তু একটা কথায় একটু আশার আলোও

দেখলো। "ডরো মাৎ। আইয়ে পাণি পীজিয়ে।" ভয়ে ভয়ে তার ছড়িটাকে বগলে চেপে কোনরকমে জল পান করতে লাগলো। বুদ্ধিমান চোর একটা জিনিস লক্ষ্য করল্ল।. চোর বল্ল, "শেঠজী, আপনার ঐ ছড়িটা আমাকে দিনতো, দেখবো। বাঃ কি সুন্দর—এরকম ছড়ি পেলে কিনে নিতাম।" শেঠজী মাথা নেড়ে ঘোরতর আপত্তি করলো। চোরের দেহ দৃঢ় হ'ল। সে হঠাৎ ছড়িটা কেড়ে নিল। এবং ছড়ির মাঝখানটা পট্ করে ভেঙ্গে ফেল্ল, সাথে সাথে চোরের হাতে চারটি মূল্যবান রত্ন ছড়ির ভিতর থেকে এসে পড়ল।" কি শেঠজী, এত ভয় মনে নেই আমি বলেছিলাম, 'ডরো মাৎ'। আপ্নিতো জানিয়ে দিলেন ছড়ির ভিতর করে রত্ন নিয়ে যাচ্ছেন। এবার যদি আমি এগুলো নিয়ে যাই—চোর বল্ল। এবার শেঠজীর মুখ ভয়ে সাদা ব্লটিং পেপারের মত হয়ে গেল। "ভয় নেই। আমি যাকে আশ্বাস দেই তার জিনিষ কেড়ে নেই না। যাক্, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" চোর বল্ল। ভয়ে ভয়ে শেঠ্ বল্ল, "উজ্জয়িনীতে।"

"বেশ, আমার একটা উপকার করে দেবেন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমজিৎকে বল্বেন যে আমি তাঁর নগরে চুরি করতে যাব।" "আচ্ছা।" বলেই ওখান থেকে শেঠ্জী তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীর পথের দিকে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার মধ্যে শেঠ্জী মহারাজার সাথে দেখা করে বল্ল, মহারাজ, পথে একটা চোর বল্ল যে আপনার নগরে আজ রাতে চুরি করতে আসবে।" বলেই শেঠ্জী নিজ কাজে চলে গেল।

রাজা মনে ভাব্ছেন, "আশ্চর্য্য তো এই চোর! যে চুরি করতে আসবে, আগে থেকেই জানায়, এ কিরকম। আচ্ছা একবার পরীক্ষা করতে হবে।'

সেদিন গভীর রাত হওয়ার আগেই ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হোল, "মহারাজা বিক্রমজিতের আদেশে সমস্ত নগর-প্রহরীদের আজ রাতের জন্য নিজ নিজ ঘরে যেতে বলা হচ্ছে। নগরবাসীরা যেন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন; যদি কারো ক্ষয় ক্ষতি হয়, তাঁর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মহারাজ বিক্রমজিতের। তাক্ ডুম্ ডুম্—ডুম্।"

*　　*　　*　　*

নিকষ কালো অন্ধকার রাত। গভীর। মহারাজার প্রাসাদের উপর দিয়ে একটা প্যাচা ‘চ্যা, চ্যা, কর্কশ শব্দ করে গভীর রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন করে দিল। মহারাজা বার হলেন ছদ্মবেশে। সাজলেন একটি পাকা চোর।

চোরের মত নগরের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করলেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা যায়গায় হঠাৎ দাঁড়ালেন। "ঐ দূরে কি একটা নড়তে দেখা গেল না?" মনে মনে বল্লেন—চোররূপী প্রজা। "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটা লোক খালটায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটু এগোই।" রাজা গিয়ে শুধালেন লোকটার কাছে—"এত রাতে কে তুমি ভাই?" "আগে তোমার পরিচয় দাও" লোকটি বল্ল। "আমি এ নগরের চোর।" চোর বেশী রাজা বল্লেন। তখন লোকটি বল্ল, আমি এ নগরে চুরি করবো বলে এসেছি। কিন্তু তুমিই তো বাদ সাধ্লে। "তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। আমিও তোমাকে সাহায্য করবো। তোমাকে সাহায্য করবো। তোমাকে এ নগরের বড় বড় ধনীর ঘরে নিয়ে যাব।" চোর ছদ্মবেশী রাজা আশ্বাস দিলেন। প্রথমে তারা এক সাউ বণিকের বাড়ীতে গেল। ফটকের কাছে চোররূপী রাজা দাঁড়িয়ে রইলেন, আর চোরটি ভিতরে ঢুক্লো। চোর ভিতরে ঢুকে দেখে সাউ আর তার বৌ আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে আর নাক ডাক্ছে। এখন মজা হোল কি, সাউ বৌ এর ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস আছে। যেই মাত্র চোর ঘরে ঢুকেছে—সাউ বৌ বলে উঠ্ল, "ভাই এসেছ। এস। এস।" সঙ্গে সঙ্গে চোর বেরিয়ে এল। রাজা বল্লেন, "কি ভাই, বেরিয়ে এলে যে?" চোর বল্ল, "না ভাই, চুরি করব না।" কেন? চোর রূপী রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। চোর বল্ল, সাউ বউ আমাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। 'ভাই' হয়ে কি বোনের বাড়ী চুরি করতে পারি? রাজা বুঝলেন, চোর শাস্ত্রবিশ্বাসী। এবার রাজা এক লবণ ব্যবসায়ী শেঠের বাড়ী নিয়ে গেলেন। অন্ধকারে চোর হাতড়াতে হাতড়াতে কতকগুলো নুন ভর্ত্তি বস্তা দেখ্লো, নুন গুলো সব চাকা চাকা। চোর ভাবলো মিষ্টির চাকা বুঝি। সাথে সাথে এক টুক্রো মুখে পুরে দিল। এঃ নুন। নুন খাই যার, গুণ গাই তার। "মা নিমক হারামি নেহী করেংগে।" মনে মনে বল্ল চোর এবং শেঠের ঘর থেকে

বেরিয়ে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হে ভাইয়া, চুরি করলেনা?" চোর লবণ খাওয়ার কথা বল্ল। রাজা মনে বল্লেন, "অদ্ভুত।" এবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন জ্বল জ্বল করছে শুকতারাটি। তাড়াতাড়ি বল্লেন, "চলো ভাই রাজপ্রাসাদে।" চোর রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে ভাব্‌লো এত "অদ্ভুত।" একটাও প্রহরী নেই। চোরকে ছদ্ম বেশী রাজা নিয়ে গেলেন নিজের ধনভাণ্ডারে। দুটো মোহর ভর্ত্তি কলসী দেখিয়ে বল্লেন—'নাও ভাই, তাড়াতাড়ি এই দুটো, রাত্রি আর বেশী নেই—' চোর আপত্তি করল। রাজা অস্ফুট স্বরে বলে ফেল্‌লেন "অদ্ভুত।" চোর বল্ল, 'তুমি একটা নাও ভাই আমি একটা নেই, তুমিতো আমার পথ-প্রদর্শক। চোরের উদারতা, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-বিশ্বাস দেখে এবার আবার বলে ফেললেন, "অদ্ভুত।" চোর বল্ল "অদ্ভুত কি ভাই।" চোররূপী রাজা তাড়াতাড়ি বল্লেন, "এককলসীর দুটোরং।" হঠাৎ অদূরে একটা টিয়া পাখী ডেকে উঠ্‌ল। রাজা বিক্রমজিৎ ভাব্‌লেন, ভোর হয়েছে তাই বোধ হয় ডাক্‌ছে। একী। চোর যে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। চোর বল্ল, "মহারাজ, শুভ প্রভাতে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।" রাজা বিস্মিত হলেন চোরের ভদ্র ব্যবহারে। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বুঝলে কি করে আমি রাজা।" আপনায় ঐ পাখীটা বলে দিল, আমি পাখীর ভাষা সামান্য আয়ত্তে এনেছি—চোর উত্তর দিল। চোরের বিনয় দেখে রাজা আরো মুগ্ধ হোলেন। প্রভাতকালীন দরবারে রাজা তাঁর সভাসদ্‌ মণ্ডলীর একজন করে নিলেন এই অদ্ভুত চোরকে।



ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত বিরচিত

অন্যান্য বারের মতো এবারেও আরো কটি মজার খেলার কথা বলছি। এগুলি নিছক খেলা নয়… বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র রহস্যেরও পরিচয় পাবে তোমরা এই সব মজার খেলার চর্চ্চা-অনুশীলনের ফলে।

গরম জলের চেয়ে ঠাণ্ডা জল ভারী ঃ

গোড়াতেই বলি, গরম জল আর ঠাণ্ডা জল ওজনের মজার খেলাটির কথা। এ খেলার জন্য প্রয়োজন কয়েকটি ঘরোয়া জিনিষ—দুধ, মধু কিম্বা জ্যামের দু'টি বড় মুখওয়ালা বোতল, এক শিশি লাল কিম্বা নীল রঙের কালি, এক-খানা মোম-ঘষা কাগজ (waxed paper) কিম্বা পাতলা কার্ড, একপাত্র গরম জল, আর একপাত্র ঠাণ্ডা জল। ঐ সব সামগ্রী সংগ্রহ করার পর একটি বোতলে খানিকটা লাল কিম্বা নীল কালি ঢালো। তারপর গরম জল ঢেলে বোতলটি কাণায় কাণায় পূর্ণ করো। এবারে, আর একটি বোতল নাও…এ বোতলে ঠাণ্ডা জল ভরো। তারপর দ্বিতীয় বোতলটির মাথায় ঐ মোম-ঘষা কাগজের টুকরো কিম্বা পাতলা কার্ডখানি বেশ মজবুত করে চেপে ধরো—যাতে বোতলের মুখটি ঢাক্‌নী-আঁটার মতো বেমালুম এঁটে বন্ধ হয়ে থাকে। এবারে, এই বোতলটিকে হুঁশিয়ারভাবে উল্টে ধরো…বোতলের জল যেন একটুও না বাইরে পড়েযায়। তার পর এই উল্টোনো-বোতলটিকে সেঁটে ধরো ঐ রঙীণ (কালি-ভরা) গরম-জলের বোতলটির মাথায়। এখন, এই দুটি বোতলকে মাথায় মাথায় ভালোভাবে সেঁটে ধরে, ঠাণ্ডা-জলভরা বোতলের মুখে যে মোম-ঘষা কাগজ বা পাতলা কার্ডখানি রেখেছো, সেটিকে খুব ধীরে ধীরে সরিয়ে

নাও। দেখবে, নীচেতে-রাখা গরম-জলের বোতল থেকে রঙীণ গরম-জল ঢুকবে উল্টো-করে-ধরা ঠাণ্ডা-জলের

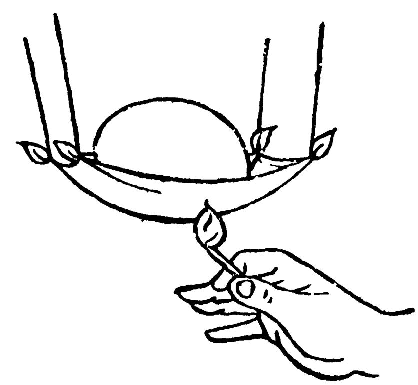


বোতলের মধ্যে। মনে রেখো, এ খেলা দেখানোর সময় ঠাণ্ডা-জলের বোতলটিকে কিন্তু বরাবরই উল্টোভাবে ধরে থাকতে হবে রঙীণ গরম-জলভরা বোতলটির মাথায়—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ধরণে!

উপুড়-করে-ধরা ঠাণ্ডা-জলের বোতলের মধ্যে নীচে-রাখা রঙীণ গরম-জল কেন উঠলো—জানো?···ঠাণ্ডা-জলের চেয়ে গরম-জল হালকা—তাই!

সূতো আগুনে পোড়ে না ঃ

এবারে যে খেলার কথা বলবো—সেটিও ভারী মজার। এ খেলাটির জন্য সরঞ্জাম প্রয়োজন—এক-টুকরো মিহি মস্‌লিন-ধরণের পাতলা কাপড় বা রুমাল, এক বাণ্ডিল সুতো, একটা খালি-ডিমের খোলা, একপাত্র গরম জল আর খানিকটা গুঁড়ো নুন। এ সব জিনিষ জোগাড় করে নিয়ে, প্রথমেই গরম-জলের পাত্রে বেশ খানিকটা নুন ফেলে ভালো করে গুলে মিশিয়ে নাও··· জল যেন খুব বেশী লোনা হয়—সেদিকে বিশেষ নজর রাখা চাই। এবারে ঐ নুন-গোলা গরম-জলে খানিকটা সুতো এবং মিহি কাপড়ের টুকরোটিকে বেশ খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখো। তারপর, ঐ কাপড়ের টুকরো আর বাতাসে বেশ খট্‌খটে করে শুকিয়ে নাও। কাপড় আর সুতো আগাগোড়া ভালোভাবে শুকিয়ে যাবার পর, সেগুলিকে আবার ঐ লোনা-জলে বেশ চুবিয়ে নাও এবং রোদে-বাতাসে মেলে দিয়ে ঝর্‌ঝরে শুক্‌নো করে নাও। এমনি ভাবে ঐ কাপড়ের টুকরো আর সুতোটুকুকে বার কয়েক বেশ ভালো করে লোনা-জলে চুবিয়ে আর রোদে-বাতাসে শুকিয়ে নেবার পর, শুক্‌নো-ঝরঝরে কাপড়ের চার কোণে মজবুত ভাবে ঐ সুতোর চারটি 'ফালি' বেঁধে ঝোলার মতো ধরণে ধরে, পুরো-জিনিষটিকে আরো বার কয়েক ঐ লোনা-জলে চুবিয়ে এবং রোদে-বাতাসে মেলে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর, ঐ শুকনো-ঝরঝরে সুতোবাঁধা কাপড়ের টুকরোটিকে দোলনা, মশারি বা ঝোলার মতো ধরণে মজবুত করে কোনো সুবিধা-মত উঁচু জায়গায় পাকাভাবে টাঙিয়ে রেখে তার ভিতরে খালি-ডিমের খোলাটিকে বসিয়ে দিতে হবে।



এবারে ঐ ঝোলার মতো ভঙ্গীতে সুতো-বেঁধে-টাঙানো ডিমের-খোলা-রাখা কাপড়ের নীচে একটি জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি কিম্বা মোমবাতি ধরো—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে—তেমনি ভঙ্গীতে। দেখবে, জ্বলন্ত আগুনের ছোঁয়ায় ঐ কাপড় আর সুতো যাবে পুড়ে নিমেষের মধ্যে—কিন্তু পুড়লেও, লোনা-জলে ভেজানো ঐ কাপড় আর সুতো এতটুকু ছিঁড়বে না এবং ঝোলার ভিতরকার হাল্‌কা ডিমের খোলাটিও মাটিতে পড়বে না সহজে।

কেন এমন হয়—জানো?··· বারবার নুন-জলে ডুবো-

আর সুতো আগুনে পুড়ে ছাই হলেও, সে ছাই এমন মজবুত হয়ে ওঠে যে ঝোলার মধ্যকার ডিমের খোলাটিও সুতো-বাঁধা কাপড়ে বেমালুম অটুট ঝুলতে থাকে…সুতো বা কাপড় পুড়ে ছাই হলেও খশে ঝরে পড়ে না !

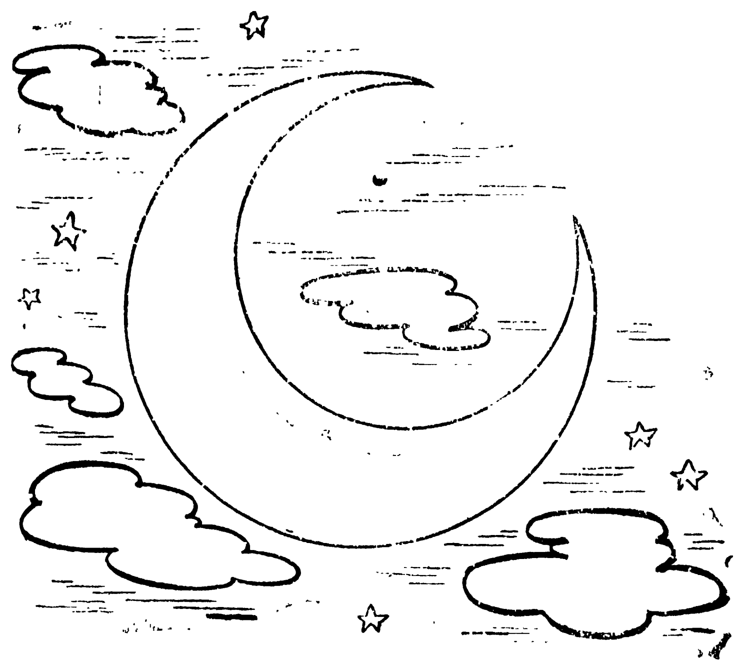
—

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

দ্বিজপতি মুখোপাধ্যায়

চাঁদের গায়ে ছুরি চালানো ঃ

পাশের ছবিতে দেখছো—আকাশের বুকে একফালি চাদ। ধরো, তোমাদের হাতে যদি প্রকাণ্ড একটা ছুরি দিয়ে আকাশের ঐ ফালি-চাঁদকে কেটে টুকরো-টুকরো করতে বলা হয়, তাহলে চাঁদের গায়ে পাচবার লম্বালম্বিভাবে ছুরি চালিয়ে ঐ একফালি চাঁদকে কেটে ক' টুকরো করতে পারো ? মনে রেখো—মাত্র পাঁচবার ছুরি চালাতে পাবে—তার বেশী নয় !



ছু'খানি ট্রেণের হেঁয়ালি ঃ

রেল-পথ…পাশাপাশি ছুটি লাইন…ছু'লাইনেই পশ্চিম দিক থেকে পুর্বদিকে কলিকাতা-অভিমুখে ছু'খানি ট্রেণ চলেছে। প্রথম ট্রেণখানি লোকাল প্যাসেঞ্জার—প্রত্যেক ষ্টেশনে থামতে থামতে চলেছে। দ্বিতীয় ট্রেণখানি হলো এক্সপ্রেস। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ছেড়েছে ২-১২ মিনিটে…শেষ ষ্টেশন অর্থাৎ কালিকাতায় এ ট্রেণ পৌছুচ্ছে ৩-২৪ মিনিটে ; এক্সপ্রেস ট্রেণখানি ছাড়ছে ২-২৬ মিনিটে—এ ট্রেণ শেষ ষ্টেশন অর্থাৎ কলিকাতায় পৌছুচ্ছে ৩-১৭ মিনিটে। বলো দেখি, কখন এক্সপ্রেস ট্রেণখানি ঐ লোকাল প্যাসেঞ্জারকে পার হয়ে এগিয়ে যাবে ?

*

শ্রাবণ মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর ঃ

১। চতুষ্কোণের হেঁয়ালীর উত্তর ঃ—

১	১০	৯	১৪
১৩	১০	৫	৬
৮	৩	১৬	৭
১২	১১	৪	৭

যদি তুমি ২ আর ১৫ সংখ্যার বদলে, ৭ আর ১০ সংখ্যা ছুটিকে ছুবার বসিয়ে ছক সাজাও, তাহলে ছকের সাজানো-সংখ্যাগুলি হবে—ঐ পাশের চতুষ্কোণটির ধরণের এমনিভাবে যে-কোনো ষোলোটি সংখ্যাকে সাজিয়ে চতুষ্কোণ বানাতে পারো—তবে, সে সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটিকে এমন ধরণে সাজাতে হবে যে আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি সারিতে পাশাপাশি সংখ্যার পার্থক্য যেন বরাবর সমান থাকে। এই ধরণে সাজানো নীচের চতুষ্কোণটি দেখলেই বুঝতে পারবে—লম্বালম্বিভাবে পর-পর সাজানো ২ নম্বর এবং আড়াআড়িভাবে পর-পর সাজানো সংখ্যাগুলির মধ্যে ৩ নম্বরের পার্থক্য বজায় রয়েছে—

১	৪	৭	১০
৩	৬	৯	১২
৫	৮	১১	১৪
৭	১০	১৩	১৬

যারা নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে তাদের নাম ঃ—

১। দেবকী কুমার নন্দী (হুগলী)
২। নীতা, পালোয়ান, কৃষ্ণা ও চিন্ময় গুপ্ত (দিল্লি)
৩। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৪। সুব্রত কুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৫। শুভময় মজুমদার (জামতাড়া)
৬। মোহনদাস চক্রবর্ত্তী (জামসেদপুর)
৭। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৮। অনীতা, অনুরাধা, অরূপ ও অঞ্জন সেন (আগড়পাড়া)
৯। প্রশান্ত ঘোষ ও নির্ম্মল মুখোপাধ্যায় (খড়দহ)

২। নদী পার হওয়া ধাঁধার উত্তর ঃ—

ধরো, তিনজন সাধুর নাম দেওয়া হলো **ক, খ** আর **গ** এবং তিনজন রাক্ষসের নাম দেওয়া হলো—**চ, ছ** আর **জ**। এদের মধ্যে শুধু **ক** আর **চ** নৌকা বাইতে জানে। প্রথম দফায় **চ** আর **ছ** নৌকায় চড়ে নদীর ওপারে গেল। **ছ**কে সেখানে রেখে **চ** আবার নৌকা নিয়ে এপারে ফিরে এলো। এপারে এসে **জ**কে নিয়ে **চ** আবার নৌকা বেয়ে গেল ওপারে ; সেখানে **জ**কে নামিয়ে রেখে **চ** নৌকা নিয়ে ফিরে এলো এপারে। এবারে **ক** আর **খ** নৌকায় চড়ে নদী পার হয়ে গেল ওপারে। **খ** রইলো ওপারে···এবং নৌকা নিয়ে **ক** আর **ছ** ফিরলো এপারে। এর পরের বার **ক** আর **চ** গেল ওপারে। সেখানে থেকে নৌকায় চড়ে **ক** আর **জ** ফিরলো এপারে। তারপর **ক** আর **গ** গেল ওপারে। তারা দুজনেই রয়ে গেল ওপারে—নৌকা নিয়ে **চ** ফিরে এলো এপারে। এবার **চ** আর **জ** গেল ওপারে। **জ**কে ওপারে রেখে, **চ** নৌকা নিয়ে ফিরলো এপারে। অতঃপর **চ** আর **ছ** গেল ওপারে। এমনি ভাবেই তিনজন সাধু আর তিনজন রাক্ষসদের প্রত্যেকেই শেষ পর্য্যন্ত সব কিছু সর্ত্ত বজায় রেখে দিব্যি বুদ্ধি খাটিয়ে অনায়াসে নৌকায় চড়ে নদীর এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করতে পারলো।

যারা নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে তাদের নাম ঃ—

১। অমিয় কুমার মল্লিক (হুগলি)
২। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৩। বরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, চন্দনা ও বাপি বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৪। বাপি ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর)
৫। মালতী পুরকায়স্থ (বিলাসপুর)



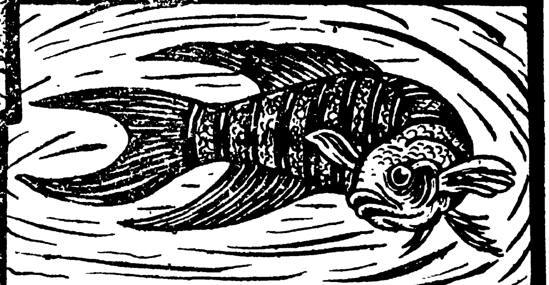
আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



পাণ্ডা : রেকুন বংশের জীব… ভাল্লুকদেরই গোত্র; তিব্বত, চীন, জাপান আর ভারতবর্ষের নেপাল অঞ্চলের পাহাড়ী জঙ্গলে বাস। ভাল্লুকদের মতো এরাও মাংসাশী… ফলমূল, পোকামাকড়ও খায় গাছে চড়তে, লাফালাফিতেও পটু। এদের দেহ লাল, হলদে আর কালো বড়-বড় রঙীন লোমে ঢাকা আকারেও ভাল্লুকের মতো দীর্ঘ হয়। বেশ বুদ্ধিমান জীব… সহজেই পোষ মানে। ভাল্লুকের মতো স্বভাব



লামা : উটের জাতের জীব… আকারে ছোট… পাকস্থলীতে জল-সঞ্চয়ের থলি আছে, তবে উটের মতো কুঁজ নেই এদের পিঠে। কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী… সহজেই পোষ মানে। নিরীহ স্বভাব… দক্ষিণ আমেরিকায় বাস। এদের গায়ের লোমে পশমী-কাপড় তৈরী হয়, পিঠে সওয়ার হয় লোক।

স্বর্গের মাছ : চীনে আর ইন্দো-চীনে মিঠা-জলে এ মাছের বাস… নাম 'প্যারাডাইস মাছ'—কারণ, এদের গায়ের রঙ সোনালী, তার উপর লাল-রঙের ডোরা। কাদা-জলে কিন্তু এ মাছের রঙ বদলে বাদামী হয়ে যায়। এরা জলের বুকে নিজেদের মুখের লালায় ফুৎকারের বুদ্বুদ ফুটিয়ে তার মধ্যে বাসা বানিয়ে থাকে।





মার্খোর : বিচিত্র এক ধরণের বুনো ছাগল… পারস্য, তিব্বত আর হিমালয়ের পাহাড়ী-অঞ্চলের বাসিন্দা। বোনেদী-বংশের জীব… আদিম পৃথিবীর বুকে এদের পিতৃপুরুষরা অবাধে বিচরণ করে বেড়াতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের গায়ের রঙ ধূসর, শিঙের গড়ন ইস্ক্রুপের মতো পাকানো আকারে প্রায় ছ' ফুট লম্বা হয়। কাশ্মীরে এক জাতের পাহাড়ী মার্খোরের লম্বা দাড়ী আর ঝাঁক্ড়া লোম দেখা যায়।



সত্যের উদ্ধারে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে বউদির অভ্যর্থনা—সারাদিন কোথায় ছিলে উৎপল? সেই যে খেয়ে বেরিয়েছ আর এই ফিরলে।

উৎপল বলল, কাজেই গিয়েছিলাম বউদি।

নীলিমা বল্‌ল 'তোমার কাজ! ঘুরে বেড়ানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া এসবও তো তোমার-কাজের মধ্যে।'

একদিন উৎপল কথায় কথায় নীলিমাকে বলেছিল, 'বউদি, তোমাদের কাজের ধারা আর আমাদের কাজের ধারা একেবারে আলাদা। তোমরা যখন হাত মুখ চালিয়ে কাজ কর, তখনই শুধু কাজ কর। আর আমরা যখন কলম চালাই তখনও কাজ করি, যখন কলম বন্ধ করি তখনও আমাদের কাজ বন্ধ হয়না। বসেই থাকি—আর ঘুরেই বেড়াই—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডাই দিই—আর শান্তভাবে চুপচাপ কাটাই, আমাদের কাজ চলতেই থাকে।'

নীলিমা হেসে বলেছিল, 'ওই মুখখানা আছে বলেই আছ। আরো কতকগুলি কাজের নাম বাদ দিলে কেন। নাওয়া খাওয়া থুথু ফেলা নাক ঝাড়া—এসবও তো তোমাদের শিল্পকর্ম। তোমাদের আজকালকার সাহিত্যে এসব কাজেরই তো খুব সমাদর!'

উৎপল বউদির সঙ্গে তর্ক না করে তাঁর অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। সমসাময়িক কয়েকজন লেখকের লেখায় এই সব প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যবহার সেও লক্ষ্য করে হেসেছে।

নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে উৎপল বলল, 'বউদি, দাদা ফেরেনি?'

নীলিমা বল্‌ল, 'অফিসের পর আজ নাটকের মহড়া আছে না তাঁদের? এখনই কি ফিরবেন। বেশ আছ তোমরা। একজনের থিয়েটার আর একজনের সাহিত্য। দুজনে দুই নেশা নিয়ে মশগুল হয়ে আছ। আমারই শুধু কিছু নেই। আমিই শুধু দাসী বাঁদীর মত সংসারে খাটতে এসেছি। খেটে খেটেই যাব।'

উৎপল স্তব্ধ হয়ে বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগাটে চেহারা। বয়স আর কত হবে। বড়জোর বত্রিশ তেত্রিশ। কিন্তু এরই মধ্যে গাল-টাল ভেঙে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অনেক দিন ধরে ফিমেল ডিজিজে ভুগছে বউদি। দাদা কখনো কখনো চিকিৎসায় খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসে, ওষুধ পথ্য আসে। তারপর দুচারদিন যেতে না

যেতেই সেই উদ্দীপনায় ভাঁটার টান লাগে। রোগ তার অধিকার ছাড়েনা। হয়তো ভুগেভুগেই বউদির মেজাজ এমন খিটখিটে হয়ে গেছে। উৎপলের মনে সহানুভূতির স্পর্শ লাগে।

'বউদি, চল কাল আমরা কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।' নীলিমা অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় আবার যাব!'

উৎপল জবাব দিল, 'আর কোন জায়গা না জুটলে সিনেমা তো আছেই।'

নীলিমা বলল, 'না ভাই অত সুখে কাজ নেই। মাসের শেষ। ওদুটো টাকা থাকলে সংসারের কাজে লাগবে।'

উৎপল বলল, 'ভয় নেই। তোমার সংসারের ফাণ্ডে হাত দেবনা। আমার হাতখরচ থেকেই টাকাটা দেব।'

নীলিমা তাতেও প্রসন্ন হোলোনা, বলল, 'যেখান থেকেই দাও—সে টাকা সংসারে দিলেই একটু সাশ্রয় হবে। মাসের শেষ কটা দিন যে কীভাবে কাটাই তা আমিই জানি।'

সস্তা টেবিল ঘড়িটার মত বউদির মেজাজ একেবারেই বিগড়ে গেছে। দাদা না ফেরা পর্যন্ত তা আর ভালো হবার আশা নেই।

দুই ভাইঝি মিণ্টু নিণ্টু টেবিলের দুদিকে দুখানি চেয়ার পেতে নিয়ে পড়ছে আর ঘুমের আবেশে ঢুলছে। উৎপল সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল—তারপর নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

নীলিমা একবার পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি চা-টা এখন কিছু খাবে?'

উৎপল বলল, 'না বউদি আমি খেয়ে এসেছি।'

নীলিমা যদি জিজ্ঞাসা করত, 'কোত্থেকে খেয়ে এলে?'

উৎপল তাহলে সবই খুলে বলত। আজকের সান্ধ্য অভিযান সবিস্তারে বর্ণনা করবার তার বেশ ইচ্ছা করছিল। কিন্তু বউদির মনে উৎসাহের অভাব দেখে সে চুপ করে গেল।

'আমার কোন চিঠিপত্র আছে নাকি?'

নিত্যকার এই প্রশ্নটি তার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল।

নীলিমা নিজের ঘরের ভিতর থেকেই জবাব দিল, 'থাকলে তো বলতামই।'

উৎপল ঘরে এসে আলো জ্বালল। অগোছানো ছোট টেবিলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখল—ভুল ভ্রান্তিতে কোন একখানা অভাবিত, অপ্রত্যাশিত চিঠি যদি সত্যি কোথাও লুকিয়ে থাকে। না, নেই। কে লিখবে চিঠি? কদাচিৎ কোন অখ্যাত কাগজের তরুণ সম্পাদক একটি গল্প ভিক্ষা করে চিঠি দিয়ে থাকেন। বিনা দক্ষিণায় কি সামান্য দক্ষিণায় একটি লেখা যদি উৎপল তাঁকে পাঠায় তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। বড় জোর মফঃস্বল সহর থেকে দুএকজন প্রফেসার বন্ধু উৎপলের খোঁজখবর আর লেখার অগ্রগতির কথা জিজ্ঞাসা ক'রে পোষ্টকার্ড ছাড়ে। কোন অভাবনীয় কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তবু উৎপল মাঝে মাঝে উন্মুখ উৎসুক হয়ে থাকে যদি কিছু ঘটে, যদি কিছু ঘটে।

টেবিলের ওপর একটি সাদা পাতায় একটি গল্পের অনুচ্ছেদ। আজ সকালে শুরু করেছিল। একটি প্যারার বেশি এগোয়নি। একটি বাক্যকে অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে উঠে পড়েছিল। সেই ভাবেই পড়ে আছে। এ গল্প হয়তো আর শেষ হবে না। বাক্যটি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে সে শেষ করতে পারে। কিন্তু গল্পের পরিণাম সম্বন্ধে অত নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করবার জো নেই। এ গল্পের তো সবে শুরু। কত গল্প অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েও যাত্রা শেষ করতে পারেনি। পা ভেঙে মুখ থুবড়ে পথের মধ্যে পড়ে আছে। মরে গেছে—মুছে গেছে। একটি অসম্পূর্ণ গল্প যেন একটি অসম্পূর্ণ জীবনের প্রতীক। কত আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গ ব্যর্থতা বিফলতার কাহিনীতে ভরা কত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সমষ্টি একটি সম্পূর্ণ জীবন। সতীশঙ্কর রায়ের জীবনও কি তাই নয়? তাঁর সব সাধ কি পূর্ণ হয়েছে, সব ইচ্ছা কি মিটেছে? সংসারে কারোরই কি তা মেটে? শতায়ু হলেও কি শত সাধ নিয়ে বেঁচে থাকা যায়, সাধ নয়—কাজ করতে করতে বেঁচে থাকা চাই। 'কুর্বন্নেবহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। যে মানুষ শত বছর বেঁচে থাকতে চায় সে কাজ করতে করতে বেঁচে থাকতে চাইবে। সতীশঙ্কর পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে মারা গেছেন। কর্মী পুরুষ অনেক কাজ করেছেন। উৎপল যদি অতদিন

বাঁচে কি তাঁর চেয়েও আর এক দশক বেশি পরমায়ু পায়, সে কোন্ কাজ করতে করতে বাঁচবে? লিখতে লিখতে? লেখাকে কাজ ভাবতে বড় কষ্ট লাগে। কর্ম বললেও তার কাঠখোট্টা স্বভাব যায় না। না লেখা তার কাছে কাজ না—খেলা। লেখা লেখা লেখা। এই দুটি শব্দের মধ্যে যে ধ্বনির সাদৃশ্য আছে তা কি শুধু শব্দগত? অর্থগতও নয়? আর কোন খেলা জানে না—উৎপল শুধু লেখা নিয়ে খেলতে জানে। নিজের লেখার বেলায় সে পূর্ণ স্বাধীন! স্বাধীন না বলে যথেচ্ছাচারী বলাই ভালো। যখন খুশি সে লিখতে বসে, যখন অনিচ্ছায় পেয়ে বসে উঠে দাঁড়ায়—ছুটে পালায়। কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। বিষয় সম্বন্ধেও তাই। যা মনে আসে তাকেই কলমের মুখে নামিয়ে দেয়। খুঁজে-পেতে ভেবে-চিন্তে পরিশ্রম করতে সে রাজী নয়। তাহলে লেখার আনন্দ থাকে না, তাহলে তা কাজের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা শুনে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'খবরদার খবরদার' এমন কাজ ও কোরো না। লেখকের পক্ষে লেখা নিয়ে খেলা মানে আগুন নিয়ে খেলা। সাপ নিয়ে খেলা। খেলতে না জানলে আগুন তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। একদিনে পোড়াবে না সারাজীবন তুষানল হয়ে পুড়িয়ে মারবে। সাপ তোমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে বিষ দাঁত বসিয়ে দেবে। একদিনে মরবে না—দিনে দিনে মরবে। লেখাকে যারা খেলার বস্তু বলে ভাবে, তারা নিজেরাই কালের হাতের পুতুল। অদৃশ্য-ভবিষ্যৎ কালের নয়, নিজেদেরই জীবনকালের যৌবনকালের। ছোট মেয়ে কতটুকু সময়ের জন্যে তার পুতুলকে আদর করে? আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় কলতলায়, সিঁড়ির পাশে—কি রাস্তার ধারে। তুমি যদি সারাজীবন অ্যামেচার হয়ে থাকতে চাও থাকতে পারো। কিন্তু সত্যিই যদি লিখতে চাও তোমাকে শক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

এ সব কথা উৎপল নিজেও কি ভাবে না? এ সব উপদেশ বাণী সে কি আরো পড়েনি শোনেনি? তবু কাজ তার মেজাজের মধ্যে নেই। কেউ কেউ পৃথিবীতে কাজ করতে আসে, কেউ কেউ খেলা করতে। কেউ কেউ খেলাকেই কাজ বলে মনে করে। তারা প্রফেসনাল প্লেয়ার। কেউ কেউ কাজ নিয়ে কর্ত্তব্য নিয়ে আজীবন খেলে যায়, তারা উৎপলের মত অ্যামেচারিষ্ট লেখক।

চেয়ারে চেপে কলম খুলে বসল উৎপল। সকালের গল্প শুরু করা উল্টে একটি নতুন সাদাপাতায় শিরোনামা লিখল সতীশঙ্কর রায়। কিছুদিনের জন্যে উৎপল সেনের আর কোন কাজ নেই। এই মৃত খ্যাতিমান পুরুষটির পিছনে পিছনে প্রেতলোকের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে হবে। যারা কাজের মানুষ তারা কাজ করে, আর যারা কথার মানুষ তারা কলম নিয়ে তাঁদের পিছনে পিছনে ছোটে। কিন্তু এই ছুটো-ছুটি কোন জীবন্ত মানুষের পিছনে নয়—যার জীবন অস্ত হয়েছে তাঁর জীবনীর জন্যই কিছুদিন প্রাণপাত করতে হবে উৎপলকে। কিন্তু কলমের মুখে তুলে ধরতে পারলে মৃত আর জীবিতের মধ্যে কি কোন তফাৎ থাকে? অথচ লেখক তার সমসাময়িক জীবিত চরিত্রগুলিকে মৃতের সামিল করে তোলে—আর ক্ষমতাবান লেখক কশ্চিৎ বহুকাল পূর্বে মৃত বিস্মৃত মানুষকে প্রাণবন্ত করে। বর্ত্তমান আর অতীত—জাবিত আর মৃত—দুইই তার হাতে উপাদান। তাই একজন কল্পিত কি অল্প-পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে উৎপল যদি গল্প লিখতে পারে একজন মৃত আর অপরিচিত কিন্তু বহুজনের পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে লিখতে তার কোন সংকোচ হওয়া উচিত নয়। একটিমাত্র অসুবিধা এখানে তার স্বাধীনতা সংকুচিত। পা টিপে টিপে সতীশঙ্করের বাস্তব জীবনের অনুসরণ করে তাকে চলতে হবে। এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু তাই কি? না তাও নয়। উৎপল নিজের মনেই হাসল। তার কল্পনাকে—লেখনীকে সতীশঙ্করের সহধর্মিণীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী করতে হবে। সে পথ যে সব সময় ধর্মপথ হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু অর্থের জন্যে পথ থেকে মাঝে মাঝে কেইবা না নেমে দাঁড়ায়? কে না সিধে পথ ছেড়ে চোরা গলি দিয়ে হাঁটে, যারা হাঁটে না তারা লাখে দু'একজন। আর জীবনী মানেই তো এই। প্রশস্তি। দেশে বিদেশের রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনীই হোক, আর আত্ম-জীবনীই হোক—বেশির ভাগই হোয়াইটওয়াস করা দেয়াল। তাই সতীশঙ্করের সাধ্বী স্ত্রীর অনুরোধে যদি তাকে এক আধটু অসাধু হতে হয় সংসারে এমন কিছু অষ্টম আশ্চর্য ঘটবে না।

এই কারচুপি কি কল্পিত গল্প-উপন্যাসেও চলেনা? ’তি আর ঔচিত্যবোধের দোহাই দিয়ে অমসৃণ রুক্ষ-স্থূল যুক্তিহীন সামঞ্জস্যহীন বাস্তবকে র‍্যাঁদা দিয়ে ঘষে ঘষে র তাকে সাহিত্যে আনতে হয়, তবে বস্তু রসবস্তু হয়ে ঠ। কাল্পনিক সাহিত্যের বেলায় যা চলে কাল্পনিক ইতি-সের বেলায় তা চলবে না কেন? কাল্পনিক ইতিহাস বই ? মিসেস রায়ের সাধের ইতিহাস। বৈজ্ঞানিকদের তিহাসিকদের সাধনার ওপর ধনীদের ক্ষমতাশীল রাজ-তিক দলের দলীয় নেতাদের সাধের প্রলেপ পড়ে। এই ই নিয়ম। তার ভিতর দিয়ে সত্য যেটুকু উঁকি-ঝুঁকি র তাই দেখে তাকে চিনতে হয়।

কিন্তু মিসেস রায়ের বলবার ভঙ্গি বড় মধুর, ব্যবহার মনোরম। তিনি জোর করেন নি। বলেছেন লোকে ন শ্বেত পাথর দিয়ে স্মৃতি-মন্দির গড়ে তেমনি তিনি মীর জন্য সুন্দর ভাষার পবিত্র ভাবের একটি দুগ্ধ-ধবল সৌধ গড়ে তুলতে চান। তার স্থপতি হবে উৎপল ল। শব্দের শ্বেত-পাথরে সে মন্দিরের চূড়া তৈরী করবে। ৎ তার খেয়াল হল কী করেছে সে। কলমের আঁচড় টতে কাটতে একটি নারী মুখের রেখা-চিত্র সে এঁকে লেছে। এই মুখের সঙ্গে মিল আছে অনুরাধা রায়ের। চ মাথার ওপরে নাম লেখা তাঁর স্বামীর। ছবির সঙ্গে ম পরিচয়ের অসঙ্গতি দূর করবার জন্যে উৎপল সতীশঙ্কর য়ের আগে একটি মিসেস বসিয়ে দিয়ে নিজের মনে সতে লাগল। কত সহজে সমাধান হয়ে গেল জটিল স্যার। তাতেও তৃপ্তি নেই। উৎপল আস্তে আস্তে ম বুলিয়ে বুলিয়ে শঙ্কর শব্দটিকে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য এবং ষ পর্যন্ত একটি কালির গোলক করে তুলল। সতী। হ্যাঁ ই ভাল্লা। ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। সতী দে তী দে সতী দে সতী দে। সতীশঙ্করের জীবনে নিশ্চয়ই ান বিশেষ ভূমিকা আছে তাঁর স্ত্রীর। স্বামীর তুলনায় সে অনেক তরুণী রূপবতী বুদ্ধিমতী নারী তাঁর খ্যাতিমান াক্রান্ত স্বামীকে কি ভয় করতেন—শ্রদ্ধা করতেন—না লোবাসতেন? মৃতের প্রতি যে শ্রদ্ধা আর মমতা নুরাধা রায়ের এখন দেখা যাচ্ছে জীবিত স্বামীর ওপরও ও সেই শ্রদ্ধা-প্রীতির ধারা অনুক্ষণ এমন স্রোতস্বতী ছিল? ৎপল সে কথা ধীরে ধীরে জানতে পারবে। যদিও লিখতে পারবে কিনা জানে না। কেমন ছিল ওঁদের দাম্পত্য-জীবন। একজনের উপর আর একজনের প্রভাব বিস্তারের ধরণটা কেমন ছিল? খানিকক্ষণের আলাপেই উৎপল বুঝতে পেরেছে অনুরাধা আর যাই হন—সরলা কোমলা অবগুণ্ঠিতা অন্তঃপুরচারিণী নন। তিনিও ব্যক্তিত্বময়ী। স্বামীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘাত সম্মেলনের ইতিবৃত্ত কি জানতে পারবেনা উৎপল? সব সময় কি অনুরাধা স্বামীর মনের সঙ্গে মত মিলিয়ে তাঁর অনুগমন করেছেন—না কখনো কখনো বাধা দিয়েছেন, প্রতিরোধ করেছেন? সব সময় কি হেরেছেন—সন্ধি করেছেন, না বিজয়িনীও হয়েছেন কোন কোন দিন? সতীশঙ্করের লাইব্রেরী ঘরে নানা চিঠি-পত্র আর সাময়িক-পত্রে ছড়ানো তাঁর কর্ম-জীবনের হাজার রকমের তথ্যের সঙ্গে তাঁদের অন্ত-র্জীবনের গোপন ইতিহাসেরও কি উপাদান পাবে না উৎপল? কল্পনা করে সে ভারি উৎসাহ আর উল্লাস বোধ করল। তার ভূমিকা এখন যেন আর কল্পনা-নির্ভর উপন্যাস-লেখকের নয়। ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষক আর গবেষকের। সতীশঙ্করের জীবন তো নয়, যেন এক দূরকালের প্রাগৈতিহাসিক পুরী। এতদিন মাটির তলায় প্রোথিত ছিল। খুঁড়ে খুঁড়ে তার সন্ধান মিলেছে। কি নেনের কাজ এখনো চলেছে। আর সেই মৃত মূক স্তব্ধ পুরীর অলিতে-গলিতে একক উৎপল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃহৎ পুরীর ভাঙা দেয়ালে, ধ্বসে-পড়া স্তম্ভগুলিতে, আসবাব-পত্রের টুকরোয় প্রস্তর ফলকে দীর্ঘ যুগের জীবনধারা মৌন হয়ে রয়েছে। কিন্তু উৎপল ভাষা জানে না, দুরূহ দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধার জানে না। কিন্তু উৎপলকে জানতেই হবে। যত পরিশ্রমই হোক, যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক তাকে এই পুরীর মর্মোদ্ঘাটনের সঙ্কেত খুঁজে বার করতে হবে। নইলে এই গোলক ধাঁধা থেকে সে বেরোতেই পারবে না। বেরোবার পথ সে ভুলে গেছে। নির্গমনের দ্বার তাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

কল্পনাটা উৎপলের নিজেরই খুব ভালো লাগল। এই-বার জীবনী লেখার কাজটাকে তত বিরক্তিকর বলে আর মনে হচ্ছে না। তার মধ্যে রহস্য আর রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছে উৎপল। যে কোন কাজের মধ্যেই কি তাই মেলে? যে কোন কর্মের যে কোন বস্তুর যে কোন ব্যক্তির

গভীরে প্রবেশ করতে পারলে তার আনন্দের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়? কুরূপা অশিক্ষিতা নির্গুণা নারীর মধ্যেও যেমন তার অনুরাগী হৃদয় রসের স্বাদ পায়।

অতীত জীবনের সঙ্গে বিস্মৃত পরিত্যক্ত প্রোথিত পুরীর তুলনা সুসঙ্গত বলে মনে হল উৎপলের। শুধু সতীশঙ্করের জীবন কেন যে কোন মানুষের অতীত জীবনই তো তাই। বিস্মৃত মৌন ভগ্নস্তূপে ভরা পরিত্যক্ত এক পুরী।

প্রত্যেকের স্মৃতিলোক সেই ছেড়ে-আসা পুরী জাতিস্মর না হলে যার সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়না। কিন্তু স্মৃতি কি অবিকল সেই বস্তু সেই ভাব সেই অনুভব সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার তীব্রতা ফিরিয়ে আনতে পারে? আসবার পথে সে ভাংতে ভাংতে গড়তে গড়তে নতুন নতুন রূপ নিতে নিতে আসে। যে পুষ্পক-রথে চড়ে অতীত দীর্ঘপথ দীর্ঘকাল অতিক্রম করে বর্তমানের দ্বারে এসে পৌছায় সে রথের একখানা পাখা স্মৃতি দিয়ে গড়া আর একখানা পাখা কল্পনায় মোড়া।

উৎপল ইচ্ছা করলেই নিজের অতীতের বাল্যের কৈশোরের এমন কি প্রথম যৌবনের সুখ দুঃখকে ঠিক সমান তীব্রতায় অনুভব করতে পারেনা। উৎপল জাতিস্মর মানে অতীতস্মর হতে পারে—কিন্তু যে উৎপলকে সে ফেলে এসেছে সেই উৎপল হওয়ার সাধ্য আর তার নেই।

'বাঃরে, তুইও কি মিণ্টু নিণ্টুর মত হলি নাকি? বসে বসেই ঘুমোচ্ছিস?'

উৎপলের দাদা নির্মল এসে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। বয়সে সাত আট বছরের বড়। স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘাঙ্গ! সুপুরুষ বলে গর্ব আছে মনে। দলে যতবার যত রকমের নাটক অভিনীত হয় তার প্রধান ভূমিকাটি নির্মল শুধু পদাধিকার বলেই দখল করেনা অভিনয় দক্ষতা আর নটোচিত রূপের দাবি ও তার আছে। লুঙ্গি পরে খোলা গায়ে তোয়ালে কাঁধে নির্মল বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল—যাওয়ার পথে ছোট ভাইয়ের খোঁজ নিতে এল।

উৎপল মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে প্রতিবাদ করল, 'বাঃ ঘুমোব কেন?'

নির্মল বলল, 'তবে কি ধ্যান? সাহিত্য-সাধনা হচ্ছিল?'

তার গলা পরিহাসে তরল। দুখানি হাতে ধ্যানী মুনীর মুদ্রা।

'দেখি সারাদিনে কিরকম প্রোগ্রেস হয়েছে। ক'স্লিপ লিখেছিস দেখি।'

উৎপল তাড়াতাড়ি মিসেস রায়ের মুখ আঁকা কাগজখানি লুকিয়ে ফেলে বলল, 'একপাতাও লিখতে পারিনি দাদা।'

নির্মল চোখ কপালে তুলবার ভঙ্গি করে বলল। বলিস কি—সারাদিনের মধ্যে একপাতাও হয়নি। আজকাল অনেক লেখকই তো শুনি একদিনে আধখানা উপন্যাস লিখে ফেলে। এই জেট-প্লেনের যুগে তুই একেবারে গরুর গাড়িতে উঠে বসে আছিস। উঁহু তোমার দ্বারা তো তাহলে এ লাইনে সুবিধে হবেনা। তুমি আমাদের থিয়েটারের ক্লাবে চলে এসো। আমি গড়ে পিটে ঠিক করে নেব।

নীলিমা প্রম্পটারের মত পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর স্বামীর কাছে নালিশের ভঙ্গিতে বলল 'সারাদিন বাড়ি ছিল নাকি যে লিখবে? কোথায় কোথায় টো টো করে ঘুরেছে। তোমার আসবার একটু আগে বাড়ি ফিরল। যেমন দাদা তেমনি ভাই। বাড়ি বলে তো কোন ভাবনা-চিন্তা নেই তোমাদের।'

'যাও ভাত বাড়ো গিয়ে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে' স্ত্রীকে এক কথায় সরিয়ে দিয়ে নির্মল অন্তরঙ্গ সুরে উৎপলকে জিজ্ঞাসা করল, 'আড্ডা দিতে কোথায় গিয়েছিলি বলতো? কফি-হাউসে নাকি একেবারে দাক্ষিণাত্যে?

দক্ষিণ কলিকাতাকে নির্মল আদর করে মাঝে মাঝে দাক্ষিণাত্য বলে—কখনো বা বলে দক্ষিণ মেরু।

খোঁচা খেয়ে টলে উঠল উৎপল। তার মন্ত্রগুপ্তির সংকল্প আর রইল না।

উৎপল বলল। আড্ডা দিতে যাইনি দাদা। কাজেই বেরিয়ে ছিলাম। বিজনবাবুর চিঠি নিয়ে বেগবাগান গিয়েছিলাম সতীশঙ্কর রায়ের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে এসেছি। সতীশঙ্করের একখানি বায়োগ্রাফি লিখে দিতে হবে।'

একটু চুপ করে থেকে নির্মল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'বায়োগ্রাফি! তাও আবার সতীশঙ্কর রায়ের!

বেছে বেছে এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষকে ঠিক করেছিস বটে।'

উৎপল বিস্মিত এমন কি একটু আহত হয়ে বলল, 'তার মানে?'

নির্মল বলল, 'তার মানে সমাজ নাট্যে তাঁর রোল একটি পাকা ভিলেইনের। আমাদের ক্লাবের ভূপেন দাস কয়েকবছর ওই পাড়াতেই ছিল। একদিন যাস আমাদের ক্লাবে। অনেক খবর সে তোকে দিতে পারবে। অ্যামেচার দু'একজন অভিনেত্রীও তাঁকে বিশেষভাবে চিনত। তাদের জবানবন্দীও তোর কাজে লাগবে।'

নীলিমা এসে তাড়া দিল। 'ভাত বাড়তে বলে তুমি যে দিব্যি গাল-গল্প জুড়ে দিয়েছ। এখনো দেখি তোমার গা ধোয়াই হয়নি। কত রাত হল বলো তো। মানুষেরই তো শরীর নাকি। তোমাদের কি গণ্ডাখানেক ঝি-চাকর আছে?

তোয়ালেখানা কাঁধেই ছিল। নির্মল একটু নতজানু হ'য়ে দুখানি হাত জোড় করে বলল—

'দেবি, নতুন চাকরে আর কিবা প্রয়োজন
চির পুরাতন ভৃত্য আদেশ প্রত্যাশী।'

নীলিমার কোন মন্তব্যের অপেক্ষা না করে এক ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

নীলিমা বলল, 'আমার তো মরণ নেই। রাত-দিন এই ঢঙ দেখতে দেখতেই আমি গেলাম।'

বাথরুম থেকে জল-প্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

খেতে বসে কেউ আর সতীশঙ্কর রায়ের প্রসঙ্গ তুলল না। নীলিমার মুখের ভাব মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

দাদাকে মানভঞ্জনের সুযোগ দেবার জন্যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে উৎপল উঠে এল। ফের এসে ঢুকল নিজের ছোট্ট ঘরে।

না, দাদাদের ক্লাবে প্রথম দিকে যাওয়ার ইচ্ছা নেই উৎপলের। হয় তো কোন দিনই যাবে না। এই উল্টো-পাল্টা জনশ্রুতি তার কাজে ব্যাঘাতই করবে! তা ছাড়া এ সব জানবার শুনবার হয় তো প্রয়োজনই হবে না উৎপলের। মিসেস রায় এসব চান না। তিনি তাঁর স্বামীকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখতে চান, দেখাতে চান। তাঁর মানসভূমিতে সতীশঙ্কর রায় নতুন করে জন্মগ্রহণ করবেন। দিব্যকান্তি রাম অবতার।

বৌদি এক ফাঁকে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। আলো নিভিয়ে উৎপল এবার শুয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ

আমরা দুজন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

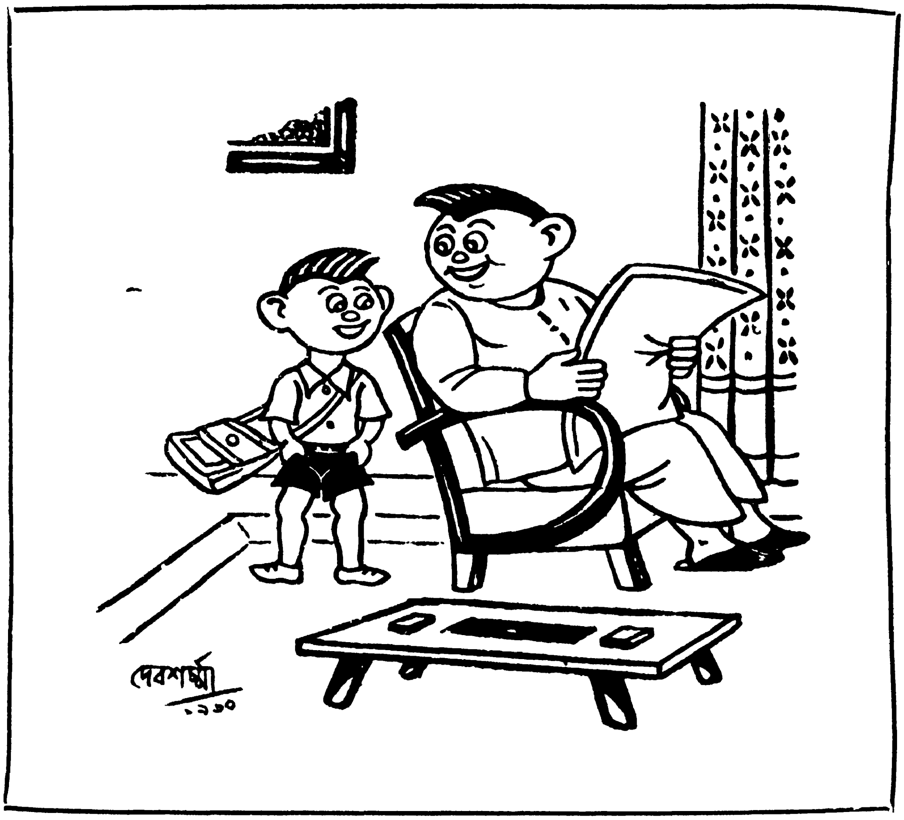
যৌবনের দেবতার অকৃপণ দানে তুমি পেয়ে পূর্ণরূপ,
মনোহরণের তরে মসৃণ সৌন্দর্য্যরেখা দেহেতে ফুটালে।
কবিতার আলিপনা রচিতেছ জ্বালাইয়া হৃদিগন্ধধূপ
দুর্ব্বার ভাবের স্রোতে যে তরী দুলিছে, তাতে আমারে
উঠালে।
তোমার স্খলিতকণ্ঠে কি কথা শোনাতে চাও ক্ষণ অবসরে!
যেথায় মিলেছি এসে মধুময় অবকাশে মোরা পরস্পরে।

যৌবন-উন্মুখ কুঁড়ি ফুটেছে নিভৃতে বুঝি নিশীথ-প্রচ্ছায়ে,
সৌরভ তাহারি যেন মদির বাতাসে বহে। মর্ম্ম-সুখোচ্ছ্বাসে
চীৎকার ধ্বনিতে মন ভরে ওঠে মধুরিমা আবেশে বিলায়ে,
অধরে মধুর হাসি, পেলব পরশ লাগি চাঁদ নেমে আসে।
এ রাতে যেওনা ফিরে আরক্তিম সমারোহে আমরা দুজন,
বনবীথিকায় বসে কোথা যেন বিহগেরা করিছে কূজন।

স্বপ্নে-মনে-পড়া সেই মালবিকা তুমি! অনাবৃত অঙ্গ তব
অতি অপরূপ। সুনীল নয়ন হোতে বিলোল কটাক্ষহানি
প্রীতিরসধারা বহি এসেছ সহসা। তোমারে যে বক্ষে ল'ব
অভিনব রূপান্তরে ভাবিনিক আমি, একা-থাকা-ঘরে আনি
অস্পষ্ট অস্ফুটবাণী কানে কানে অনুরাগে
শুনাতে তোমাকে,
তন্বীতনুলতা যেন অতনুপরশে মোর অবলগ্ন থাকে।

এ বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে বক্ষের আঁচলে ঢাকা বসন্তকুসুম
দলিত মথিত হয়ে সম্ভোগ-বিধ্বস্ত দেহে ব্যথা দিতে পারে;
জ্বলে তব সারাক্ষণ কম্পিত কামনা শিখা, তিল বিন্দু ঘুম
নাহিক নয়নে বুঝি! আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি প্রেমের সম্ভারে
অজ্ঞাত পুলকে জাগে। টুটে যাক্ অভিসারে নৈশনীরবতা,
মিলনের ক্লান্তি হীন আলাপনে রাখিবে কি অর্থহীন কথা?

॥ আধুনিক শিক্ষার ধারা ॥



পিতা—রোজ তো একগাদা বই ব্যাগে ঝুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছিস…পড়া-
শোনা কি রকম হচ্ছে…আয় তো একবার দেখি !…

পুত্র—বারে…ইস্কুলে বুঝি পড়া হয় !…সেখানে রোজ কত খেলা,
কত সব 'মিটিং'…আরো কত কি !…

পিতা—বটে ! টিচাররা তবে কি করেন ক্লাশে ?…

পুত্র—টিচাররা বলেন—বই-টই ও সব বাড়ীতে পড়ে নিও…আমরা
শুধু পরীক্ষা নেবো !

—*—

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এত দ্রুত পট পরিবর্তন করছে যে, দীর্ঘকালের মধ্যে ইতিহাসে তেমন দেখা যায়নি। রুশ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেষ্টনে অনেক ছোট দেশও হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করছে,যা সাধারণত বড় দেশের ভাগ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। উত্তর আমেরিকা মহাদেশে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত কুবা বা কিউবা এমন একটি দেশ।

কুবা রাজ্যের আয়তন মাত্র ৪৪২০৬ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা মাত্র ৬৫ লক্ষ। এমন একটি রাজ্য আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ একটি রাজ্যকে শাসিয়ে কথা বলতে পারে, এটা অখণ্ড ভারতের সুদৃঢ় নিরাপত্তায় বিশ্বাসীরা কল্পনা করতে পারেন না। বিরাট আকারের রাজ্য না হলে আজকের বিশ্বে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; আগের আন্তর্জাতিক ঔদাসীন্যের যুগে ব্যাপারটা কতকটা তা থাকলেও এখনকার অবস্থা এমনই যে, কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহজে বিপন্ন হতে পারে না। কোন বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেই, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ দেশের শরণাপন্ন হলে সাহায্য পাবে, এটা প্রায় নিশ্চিত। তা ছাড়া জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের আশা তো আছেই।

সাম্প্রতিক কালে কিউবা আর কঙ্গো দেশের ব্যাপারে এই আশাব্যঞ্জক অবস্থার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন আর বিশ্বে ছোট রাজ্যের নিতান্ত অসতর্ক না হলে সহসা স্বাধীনতা হারাবার ভয় নেই। লেবাননে মার্কিন সেনা অবতরণ করলেও যে কারণে সেখানে আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি, ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইস্রেল একযোগে মিশর আক্রমণ করেও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়, ঠিক সেই কারণে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের পর থেকে কমিউনিস্ট শক্তিরাও আর এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি এবং সেই কারণেই যে কোন ক্ষুদ্র কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প স্বাধীনতাপ্রিয় চতুর জাতি স্বাধীনতালাভ করতে আর তা রক্ষা করতে পারে। কারণটা হল, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক রেষারেষির সদ্ব্যবহার বা বিশ্বশক্তির সুপ্রয়োগ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। প্রাচীন কালে যানবাহন এবং সংযোগরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি; বিশ্বের একপ্রান্তে কি ঘটছে অন্যপ্রান্ত তার কোন খবর সহজে পেত না বা রাখত না। কিন্তু এখন গভীরতম জঙ্গলের মধ্যেও সহজে কোন জাতিকে হত্যা করা চলে না, সমস্ত পৃথিবী ছুটে আসে তার প্রতিবিধানের জন্যে। এর ফলে উনিশ শতকে বেলজীয়রা লক্ষ লক্ষ কঙ্গোবাসীর হাত-পা কেটে নৃশংসভাবে হত্যার সুযোগ পেলেও এখন তা করা অকল্পনীয় হয়ে উঠেছে। রুশের বাধাদানের ভয়ে মার্কিণরা ১৭ আর ৩৮ উত্তর অক্ষরেখা অতিক্রম করে কোরিয়া আর ভিএতনাম অখণ্ড করে তুলতে পারছে না বা ক্ষুদ্র আলবানিয়া রাজ্য অধিকার করতে পারে না। আবার, চীনারা ভারতে অবাধে অগ্রসর হতে পারে না এই আশঙ্কায় যে, ভারত তাহলে সোজাসুজি ইঙ্গমার্কিণ শক্তিগোষ্ঠীতে যোগ দেবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডি-ভ্যালেরার আইরিশ রাজ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শুধু যে নিরপেক্ষ থেকেছে তাই নয়, হিটলার আর মুসোলিনির মৃত্যুতে ও পরাজয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, চার্চিল রাগে তর্জন করলেও কাজে কিছু করতে পারেন নি, পর্তুগাল মুসোলিনির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশ করেছে, কারো ভয়ে পশ্চাৎপদ হয় নি। এখন নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতের অবস্থাও যা, সিংহল, আফগানিস্থান, আয়ার, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অবস্থাও তাই; আকার-আয়তন বা জনসংখ্যার তারতম্যে স্বাধীনতার দিক থেকে কিছু আসে যায় না। বরং ভারতের তুলনায় কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সম্মান আর আত্মনির্ভরশীলতা ঢের বেশি। কোন শক্তিজোটে যোগ না দিলেই যদি আন্তর্জাতিক সম্মান খুব বেশি হবার কথা হয়, তাহলে সেদিক থেকেও বিশালকায় ভারতের মতোই ক্ষুদ্রকায় কাম্বোডিয়া, সিংহল, আয়ার, ইউগোস্লাভিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ নিরপেক্ষ এবং অপক্ষপাতী রাজ্য। ঐ সব দেশের জনসাধারণ ভারতবাসীদের তুলনায় পরাধীন বা বৈদেশিক প্রভাবের অধীন তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি স্বাধীন। তার কারণ, তারা বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ বা বহুভাষী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দিন ক্রমশ, চলে যাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা আর আমেরিকায় পরাধীন বা প্রায়-পরাধীন এলাকাগুলি সেই জন্যে ক্রমশ মুক্তির দিকে বেশি পরিমাণে অগ্রসর হচ্ছে। এই অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং রুশ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পথ প্রশস্ত করছে। কঙ্গো থেকে যে বেলজীয় সৈন্যরা অপসারিত হল এবং কিউবায় মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স্ক নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর তাড়নায় মার্কিন কর্তৃত্ব আজ অপদস্থ, তার কারণ ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ না হয়ে রুশ-মার্কিণ বন্ধুত্ব কায়েম হলে সারা জগতের

পরাধীন জাতিগুলির পক্ষে মহা দুর্দিন ঘনিয়ে আসত। শক্তিশালী রাজ্য-সাম্রাজ্যগুলির পারিস্পরিক ঈর্ষা, শত্রুতা ও প্রতিযোগিতাই ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত ভরসাস্থল, একথা বহু মনীষী বারবার বলেছেন। নেতাজি এ কথা যেভাবে উপলব্ধি করে বিশ্বশক্তির সুপ্রয়োগ করতে পেরেছিলেন, আজ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় নেতাই তা পারেন নি। নানা সাহেব, আজিম উল্লা, মহেন্দ্র প্রতাপ, রাসবিহারী বসু, মোহন সিং প্রভৃতি অনেক নেতাই যুগে যুগে ভারতকে স্বাধীন করার আগ্রহে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু নেতাজির মতো সাফল্যের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তিগুলির সুনিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশকে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে আর কেউ উপস্থিত করতে পারেন নি। বর্তমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও বিশ্বব্যাপারে তাঁরা সুনিপুণ প্রয়োগশিল্পী হতে পারেন নি যেটা লুমুম্বা আর কাস্ত্রো কিম্বা কয়েক বছর আগে নাসের আর হো চি মিন পেরেছেন।

আফ্রিকার তরুণ জাতি আর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সম্বন্ধে ইউরামেরিকার আগ্রহের অন্ত নেই; ভারত সম্পর্কে আজ আর ইউরোপ-আমেরিকার মনে বিশেষ কোন আগ্রহ বা উৎকণ্ঠা নেই; এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর প্রতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দোষে পাশ্চাত্যে অনেকেই বীতশ্রদ্ধ; কিন্তু আফ্রিকার অনুন্নত অথচ উৎসাহী কালো মানুষদের সম্বন্ধে রুশ-মার্কিন দু পক্ষই আশাবাদী। কঙ্গোর নেতার আহ্বানে জাতিপুঞ্জ এবং রুশ মহল্লা একযোগে সাড়া দেওয়ায় জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে রুশরা বাধা দেয় নি। ভারত চীনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আবিশ্ব কৌতুক আর উপহাসের পাত্র হয়েছে, প্রকৃত সহানুভূতি বা সাহায্যের কার্যকরী প্রতিশ্রুতি কেউই জানায় নি। ভারতের তুলনায় আফ্রিকার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং আগামী শতকে আফ্রিকা যদি ভারতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়, তাহলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। ভারত থেকে এখন শতকরা যত জন ছাত্র ইউরোপে আমেরিকায় পড়তে যায়, তার শতকরা প্রায় দুগুণ ছাত্র আফ্রিকা থেকে পাশ্চাত্ত্য জগতে বিভিন্ন বিদ্যা শিখতে যায়। অবশ্য আফ্রিকা থেকে পাশ্চাত্ত্য-জগৎ নিকটতর এবং ছাত্রদের সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের চেয়ে আফ্রিকার উপরেই পাশ্চাত্যজগৎ বেশি কৃপাশীল—বিশেষত ব্রিটেন বাদে অবশিষ্ট দেশগুলি। কারণ যাই হোক, কার্যত পাশ্চাত্য সভ্যতা আফ্রিকায় দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এখন আর আফ্রিকাকে অন্ধকার মহাদেশ বলা ঠিক হবে না। আফ্রিকার উত্তর অংশ আরব-আফ্রিকা এবং সেমিটিক-হামিটিক সভ্যতাগুলির প্রাচীন ও বর্তমান লীলাভূমি। মিশরীয়, কার্থেজীয় আর আরব সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক, রোমক আর আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা এই অঞ্চলে বারবার মিশেছে। এই অঞ্চলের বহু অংশ বিশেষত নগরগুলি ভারতের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে উন্নততর। আরব-আফ্রিকার দক্ষিণস্থ কালো আফ্রিকাও আজ আর বৈজ্ঞানিক জীবনচেতনাপরিশূন্য বর্বরদের দেশ নয়; সেখানকার ১৪ কোটি কালো মানুষরা সকলে যেমন কালো জংলি নয়, তাদের মধ্যে তেমনি সুশিক্ষিত এবং সুশ্রী নরনারীর অভাবও নেই। আন্তর্জাতিক অবস্থার অনুকূলতার সুযোগে এরা এখন একের পর এক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা লাভ করছে।

এই সব স্বাধীন আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলি এখনও ভাষা তথা জাতির ভিত্তিতে সুসীম ভাবে এবং পরিচ্ছিন্নরূপে গড়ে ওঠে নি। সুচতুর ফরাসি নেতা শার্ল দেগল এদের স্বাধীনতা দিয়ে বিশ্বে অনেকগুলি নতুন ক্ষুদ্র শক্তির অভ্যুদয় ঘটাচ্ছেন বটে, কিন্তু পরে দীর্ঘকাল ধরে এদের নিজেদের মধ্যে সীমানাসংক্রান্ত বিরোধ লেগে থাকবে।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতালাভে ভারতীয়রা অনেকেই সাম্রাজ্য-বাদের অবসানে হর্ষ প্রকাশ করছেন বটে, সে-হর্ষ অসঙ্গতও নয়, কিন্তু একটা ব্যাপারে ভারতীয়দের সচেতন থাকলে ভালো হয়। আফ্রিকার নবজাগ্রত অধিবাসীরা শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদীদের অপছন্দ করে বটে, কিন্তু ভারতীয়দেরও তারা সুচক্ষে দেখে না। আফ্রিকা এশীয় মহাসম্মেলনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে এখন আর এ-সত্য গোপন নেই যে, আফ্রিকার নব-উদ্বুদ্ধ জাতিগুলি ভারতীয়দের ঈর্ষা আর বিদ্বেষের চোখেই দেখে, তার কারণও সুস্পষ্ট। ভারতীয়রা আফ্রিকায় শাসন আর শোষণের ব্যাপারে শ্বেত-সাম্রাজ্যের সহযোগীর কাজই করে গেছে। আফ্রিকায় যে-সব ভারতীয় এখনও নিরাপদে বাস করে, তারা শ্বেতকায়দের স্নেহচ্ছায়াতেই বসবাস করে। আফ্রিকা থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকরা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দেরও পাততাড়ি গুটোতে হবে। কয়েক বছর আগে স্মাট্স্-মালান-ফেরভুর্টের দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকার কালো মানুষেরা অসংখ্য ভারতীয় নরনারীর ধন-প্রাণ-মান লুণ্ঠন করে, সে-কথা হয় তো এখনও অনেকের মনে আছে। তার জন্যে কেবল শ্বেতকায়দের প্ররোচনাদানকে দায়ী করলে নিতান্ত অর্বাচীনের কাজ হবে। সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ফেরভুর্ট প্রভৃতির বর্ণবিদ্বেষী সরকার না থাকলে একজন ভারতীয়ও বেঁচে থাকত না, কালো আফ্রিকার সমব্যথী সমনির্যাতিত ভ্রাতৃবৃন্দের হাতেই তাদের নিঃশেষ হতে হত। গান্ধি ও গান্ধিপুত্রদের শত প্রয়াস সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার এই অবস্থা। অন্যত্র অবস্থা শোচনীয়তর। সম্প্রতি বেলজীয় কঙ্গো থেকে সমস্ত ভারতীয় নরনারীকে মহা বিপন্ন অবস্থায় পলায়ন করতে হয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্বাস্তু ভারতীয় নারী ও শিশুদের ছবি নিশ্চয় অনেকেই দেখেছেন। তাদের হাতে যে দু একটি জিনিস ছিল, তা ছাড়া তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। আরব আফ্রিকার ছ কোটি অধিবাসীর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, তারা ভারতীয়দের মানুষ বলেই মনে করে না, কালো আফ্রিকার লোকদের মনোভাব সম্বন্ধে প্রতুলচন্দ্র সরকারের মতো বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর, যিনি নিতান্ত অরাজ-নৈতিক লোক, তিনি কি বলেন, শোনা যাক:—

"তারা আফ্রিকার ভূখণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ এবং এশিয়াবাসীদের সকলকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত স্বরাজ আনতে চায়। মুখে এরা ভারতকে যতই ভালো বলুক, বিশ্বাস করুক, ওরা একথা ভালো ভাবেই বুঝে নিয়েছে যে, আফ্রিকার বড় বড় ব্যবসায়, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ভারতীয়রাই

র্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গদের একবার উচ্ছেদ করতে পারলে তাদের পরবর্তী লক্ষ্যই হবে এশিয়াবাসিগণ। ওদের বর্তমান শ্লোগান হচ্ছে Africa for the Africans—আফ্রিকা শুধু মাত্র আফ্রিকাবাসীদের জন্যই। ওরা আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দিগকে ঠিক মতো বিশ্বাস করতে পারছে না, সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখছে।"

আলজেরিয়ার স্বাধীনতালাভের জন্যে অনেক ভারতীয় বামপন্থী দল আন্দোলন করে বটে, কিন্তু আলজেরিয়ার স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ, সেখানকার বারো লক্ষ ফরাসির অস্তিত্বের অবসান। বিশ্বে কোন একটি জাতির স্বাধীনতা লাভ ব্যাপারটিকে সব সময় সকলের উপভোগ্য অবিমিশ্র অমৃত-ফল মনে করা যায় না। আজ যদি আসাম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে তাহলে সেখানে যেমন কোন বাঙালির পক্ষে বাস করা সম্ভবপর হবে না, তেমনি বিশ্বের সব রাষ্ট্র স্বাধীন হবার পর বহু লোককে অবশ্যই উদ্বাস্তু হতে হবে। পাকিস্থানের স্বাধীনতা লাভের অর্থ যে পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুশূন্য হওয়া, একথা উনিশ শতকে ফরাসি পর্যটক বলে গিয়েছিলেন; ১৯৪৭ সালের অগষ্ট মাসের আগে ভারতের হিন্দু নেতারা নাকি তা বুঝতে পারেন নি। তেমনি একথাও জেনে রাখা ভালো যে, দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দান্ত ফেরুভুর্ট সরকার তবু "ঘেটো" বা "এ্যাপার্টহাইড" নীতির আশ্রয়ে কিছুসংখ্যক ভারতীয়কে থাকতে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু বুর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে জুলুদের রাজত্বে একজনও ভারতীয় বাস করতে পারবে না।

অবশ্য যেমন পাকিস্থান হয়েছে তেমনি এ সবও হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তবু কিসে কি হতে পারে, এঁচে রাখলে আখেরে কাজ দেবে।

অনেকগুলি রাজ্যকে হঠাৎ স্বাধীনতা দেবার ফলে এখন আফ্রিকায় মোট কটি রাজ্য স্বাধীন, তা জানার কৌতূহল পাঠকদের থাকতে পারে। সেজন্যে তাদের সম্পূর্ণ তালিকা, আয়তন আর লোকসংখ্যাসমেত দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, আফ্রিকার বিপুল অংশ জঙ্গলে ঢাকা আর মরুভূমি বলে তার লোকসংখ্যা ভারতের প্রায় অর্ধেক; কিন্তু তার জন্যেই নবগঠিত রাজ্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটি প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আর বিপুল শিল্প-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। যেখানে যেখানে লোকবসতি আছে, সে-সব জায়গায় সভ্যতার আধুনিক উপকরণও কম-বেশি পাওয়া যায়। সুতরাং আফ্রিকার পুরোনো ছবি ভুলে যাওয়াই ভালো।

আরব-আফ্রিকায় আলজেরিয়া ছাড়া আর সব এলাকাই স্বাধীন; এখানে জামাল নাসের, আবদুল করিম আর হবিব বুরগিবার মতো শক্তিশালী নেতাদের আবির্ভাবও হয়েছে; এশিয়ার আরব ভূখণ্ডে আছেন কাসেমের মতো জবরদস্ত নেতা; কিন্তু তবু আরব ঐক্য এখনও সুদূর-পরাহত; পারস্য উপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত আফ্রিকা-এশীয় আরবভূমি একত্র হলে তার আয়তন হবে ৩৬ লক্ষ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু সেদিন এখনও দূরবর্তী। কালো আফ্রিকায় প্রায় কোন রাষ্ট্রেই লোকসংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কঙ্গোর মতো বিরাট আকারের রাজ্য সেখানে আছে। নিগ্রো অর্থাৎ সুদানি এবং বান্টু ভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে গোষ্ঠীগত মিল থাকলে কি হবে, যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থার ত্রুটি এবং ভৌগোলিক বাধাবিপত্তির জন্যে জনগোষ্ঠী ছোট ছোট ভাষাভাষী সম্প্রদায়গুলিতে বিভক্ত। নিচে যে তালিকা দেওয়া হল, তার প্রায় কোন রাজ্যই এক-ভাষী বা ভাষাভিত্তিক নয়, আরব দেশগুলি বাদে। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এরা একভাষী রাষ্ট্র গঠনে উৎসাহী হবেই। নাইজেরিয়া রাজ্যে ইবো, ইওরুবা আর কানো নামে তিনটি একভাষী জাতির সম্মিলন ঘটানো হয়েছে, যা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অবস্থার কয়েকটি পরিবর্তন হলেই তিনটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে।

(১) মিশর—তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গমাইল—দুকোটি চল্লিশ লক্ষ লোক (২) লিবিয়া—ছ'লক্ষ আশি হাজার বর্গমাইল—এগারো লক্ষ লোক (৩) তুনিসিয়া—আটচল্লিশ হাজার বর্গমাইল—আটত্রিশ লক্ষ লোক (৪) মরক্কো—এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার বঃ মঃ—এক কোটি দু' লক্ষ লোক—এই চারটি আরব দেশ এবং ইউরোপীয় ও বর্বর জাতির লোক বাদে মোটামুটি একভাষী। (৫) লাইবেরিয়া—তেতাল্লিশ হাজার বর্গমাইল—সাড়ে সাতাশ লাখ অধিবাসী (৬) সুদান—নয় লক্ষ সাড়ে সাতষট্টি হাজার বঃ মঃ—এক কোটি বাসিন্দা (৭) ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া - চার লাখ বর্গমাইল—দুকোটি লোক (৮) সোমালিয়া—দু লাখ বাষট্টি হাজার বর্গমাইল—বিশ লক্ষ অধিবাসী (৯) গানা—৯১৮৪৩ বর্গমাইল—৪৮ লক্ষ লোক (১০) গিনি—সাতানব্বই হাজার বর্গমাইল—পঁচিশ লক্ষ লোক—(১১) মালি ফেডারেশন—পাঁচ লক্ষ একত্রিশ হাজার বর্গমাইল—৬ মিলিঅন বাসিন্দা (১২) তোগোল্যাণ্ড—২১৮৯৩ বর্গমাইল—এগারো লাখ লোক (১৩) কামেরোন—এক লাখ ছেষট্টি হাজার বর্গমাইল—বত্রিশ লাখ অধিবাসী (১৪) মাগাগাসি বা মাদাগাস্কার—দুলক্ষ একচল্লিশ হাজার বর্গমাইল—৫ মিলিঅন লোক (১৫) কঙ্গো—নয় লক্ষ চার হাজার সাতশো সাতান্ন বঃ মঃ—এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ লোক (১৬) নাইজেরিয়া ফেডারেশন—তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার বঃ মঃ—৩৪ মিলিঅন বাসিন্দা; এ ছাড়া, (১৭) আইভরি কোস্ট (১৮) ভোল্তা (১৯) দাওমে এবং (২০) নাইজার—এই চারটি রাষ্ট্র একত্র হয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করবে, আয়তন হবে সাত লাখ সত্তর হাজার বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা এক কোটি। (২১) চাদ (২২) মধ্য আফ্রিকা (২৩) ফরাসি কঙ্গো এবং (২৪) গাবন রাষ্ট্র চারটি ও এই বছর স্বাধীনতা লাভ করছে। এরা ফেডারেশন গঠন না করতেও পারে। এদের আয়তন যথাক্রমে চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার, দু'লাখ আটত্রিশ হাজার, এক লাখ বত্রিশ হাজার এবং এক লক্ষ তিন হাজার বঃ মঃ; লোকসংখ্যা যথাক্রমে ছাব্বিশ, এগারো, আট ও চার লাখ। সোমালিয়া রাজ্যটি ব্রিটিশ ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সম্মিলন। ও দুটকে ধরে ১৯৬০ সালেই সতেরোটি আফ্রিকান রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করছে! ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই। রুআন্দা, উরুন্দি, কাতাঙ্গা, টাঙ্গানিকা রাজ্যগুলিও যে কোন সময় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। কাতাঙ্গা এখন বেলজীয় কঙ্গোর অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে স্বাধীনতা লাভের যে

আন্দোলন চলেছে, তাকে বিদেশি-প্ররোচিত বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়। স্থানীয় লোকদের সমর্থন না থাকলে বিদেশি-প্ররোচিত আন্দোলন ধোপে টেকে না। আশা করা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপে কঙ্গোয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তখন কাতাঙ্গার স্বাধীনতার দাবি কতটা অকৃত্রিম, তা বোঝা যাবে।

বর্তমান জগতে আফ্রিকার পর কিউবা তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মার্কিন কর্তৃত্ববিমুক্তির জন্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মার্কিনের হস্তক্ষেপে কাস্ত্রোর পতন হতে পারত'; কিন্তু তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুশ সমর্থন আয়ত্ত করে জগৎকে চমকে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। তাঁকে নির্বিবাদে থাকতে দিলে তিনি রুশের দিকে ঝুঁকে পড়তেন না, এটা বুঝে মার্কিন সরকার এখন তাঁকে মেনে নেয় কিম্বা ছলে-বলে-কৌশলে তাঁর পতন ঘটায়, সেটা দেখার বিষয়। হাঙ্গেরিতে ইম্‌রে নজে এবং তিব্বতে দলাই লামারা এমন ক্ষিপ্র হলে রুশ ও চীন সে-দুই দেশে জাতি-হত্যার সুযোগ পেত না। হাঙ্গেরি আর তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন জগদ্বাসীর কাম্য, কিউবার অবস্থা মার্কিনি হস্তক্ষেপে গুআতেমালা বা হাঙ্গেরির মতো না হয়, সেটাও সকলের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কিউবাকে কার্যকরী কোন সাহায্য দেওয়া রুশের পক্ষে অসম্ভব। লাতিন আমেরিকা ঐক্যবদ্ধ স্পেনীয় রাষ্ট্র গড়তে না পারলে মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান অসম্ভব। তার জন্যে আমেরিকার আঠারোটি স্পেনীয়ভাষী রাজ্যকে এখনও দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হবে। ২৯।৭.৬০

নীল ভূমি

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অক্ষম বিধাতা। সৃষ্টির জালে হাত-পা জড়িয়ে পঙ্গু মাড়কসার মত চেয়ে আছে মানুষের মুখপানে। আজও পারেনি ওদের হাত থেকে ভাগ্যের মানদণ্ড ছিনিয়ে নিতে। অন্ধ নুলো ভিকিরীগুলো পথে পথে গড়িয়ে বেড়ায়। রোশনাই জ্বালা সারি সারি দালানের আনাচে-কানাচে—এঁদো গলির মোড়ে, পথের বাঁকে ডাস্টবিন-গুলো ঘিরে আজও ওদের ভিড়। এঁটো পাতা, ভাঙ্গা মাটির গেলাস, কপ্‌টে-সড়া-কটোরা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছাই-এর গাদায়। ছড়ানো একমুঠো ভাত, উচ্ছিষ্ট রুটির দুটো টুকরো, না-হয় কতক-গুলো মাছের কাঁটা আর মাংসের হাড় টেনে টেনে জড়ো করে। কোটরের ভিতর থেকে চোখের তারাগুলো জ্বল জ্বল করে রকমারি বাসি-খাবারের গন্ধে। ভোজ! ভোজ ছিল কাল ও-পাশের লাল বাড়ীটায়।

রিক্ত মানুষের করুণ কান্না দ্রুতগামী রথের চাকায় মিলিয়ে যায়। ওদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস চাপা পড়ে পেট্রলের গন্ধে। তবুও কাঁদে ওরা। পথে পথে ককিয়ে কেঁদে মরে অন্ধ শকুনির ছানার মত।

একটা পয়সা দেবে বাবা? মেয়েটা দুদিন ধরে খায়নি কিছু। ভোক ছাঁদিতে ঢলে পড়েছে।

অতসী থমকে দাঁড়ায়। পা দুটো চলে না। তবুও এগিয়ে যায় ওদের কাছে।

অন্ধ! বুড়ো লোকটা অন্ধ!···মেয়েটার হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়ায়। উপোসে উপোসে মেয়েটা ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

এক ঝলক স্মৃতি উথলে ওঠে অতসীর বুকের পাঁজরা ছাপিয়ে: ওর বাবা!—এমনি অন্ধ ছিল ওর বাবা। অন্ধ বাপের হাত ধরে পাড়ায় পাড়ায় ভিক মেগে বেড়াতো অতসী। কতদিন খায় নি ওরা। সারাদিন পথে পথে ঘুরে যেদিন যা জুটতো, আগে বাবাকে দিয়ে পরে সে খেতো। তাও কি সোজা ছিল! চোখ না থাকলেও উপেনের দৃষ্টি ছিল। অদ্ভুত সে-দৃষ্টি! সে-দৃষ্টিকে অতসী ফাঁকি দিতে পারেনি কোন দিন।

খাবারের গরাস্ যখন অতসী ধরে দিত উপেনের সামনে, উপেন হাতখানা বাড়িয়ে কাছে ডাকতো অতসীকে: কই দেখি মা! খেয়েছিস্ তুই?

হাঁ, বাবা।

বিশ্বাস হতো না উপেনের কোলের কাছে টেনে নিয়ে, ওর চোখেমুখে হাত বুলিয়ে, শুকনো ঠোঁট দুটো আঙুল দিয়ে অনুভব করে বলতো: না রে, না। খাস্‌নি তুই। খেয়ে নে মা, তুই আগে খেয়ে নে।

কতটুকুনই বা বয়েস ছিল তখন অতসীর!···আজ সে-টুকুও ধুয়ে মুছে গিয়েছে। আজ আর কেউ নাই ওর পৃথিবীতে তেমনি করে কাছে টেনে নিতে।

আঁচল থেকে পয়সা খুলতে খুলতে অতসী কখন যে জড় পদার্থের মত নিথর হয়ে গিয়েছিল, তা নিজেও বুঝতে পারে নি।

খবরদার!

অতসী চমকে উঠে। হঠাৎ মালের বোঝা মাথায় নিয়ে ঝাঁকা-মুটেটা হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ওর গায়ের ওপর এসে পড়েছে!

খবরদার, মায়ি।

অতসী। গা বাঁচিয়ে পিছুহটে দাঁড়ায়।

মুটেটা হনহন করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, ভারি বোঝার ঝোঁক সামলে। ঝাঁকার ভারে কাঁধদুটো নুয়ে

পড়েছে। চাল-ডাল-সব্জি-মাছ—রকমারি জিনিসে ঝাঁকাটা বোঝাই।…ধনীর বাজার!

মুটেটা যেন তুর্কি ঘোড়া! ঘনঘন পা ফেলে গা দুলিয়ে ছুটে চলে। দাঁড়াবার অবসর নাই। ভার বয়ে বয়ে কাঁধদুটো চওড়া হয়েছে। কিন্তু পেটটা কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়েছে শিরদাঁড়ার কাছাকাছি। ঘাড়ের চিম্‌ড়ে পেশিগুলো দড়ির মত ফুলে উঠেছে। কপালের কোল বয়ে মাথার ঘাম টস্‌টস্‌ করে ঝরে পড়ছে বুকে! পরণের তেলচিটে কাপড়খানা ভিজে উঠেছে ঘামে।

অতসী আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় অন্ধ ভিকিরীটার মুখোমুখি। আঁচল থেকে দু-আনা পয়সা খুলে মেয়েটার হাতে দিয়ে বলে: চিড়ে মুঁড়ি, না-হয় ছাতু কিনে খেয়ো।…তোমার বাবাকেও দিও।…কেমন?

বাবা নয় দাদু। বাবা মরেছে ওলাউঠোয়। তারপর মরেছে মা।

মেয়েটার কণ্ঠস্বর থমথমে হয়ে আসে। চোখদুটো ছলছল করে। কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি ভেসে ওঠে ওর উপোসী কচি মুখখানায়।…কতই বা হবে বয়েস! নয় না-হয় দশ। বড় জোর এগারো।

ও! তোমার দাদু?

হ্যাঁ: মেয়েটি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে দু'-আনিটা আঁচলে বাঁধে।

অতসী আর দাঁড়ায় না। অস্বস্তিতে মনটা তোলপাড় করে। বিস্মৃত-প্রায় অতীত এসে ভিড় করেছে মনের দরজায়। অতসী আর দাঁড়াতে পারে না। মনে হয়, বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়বে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল আপন পথে।

গাঁয়ে থেকে যারা এসেছিল, তারা কেউ কেউ মরেছে রাস্তায় পড়ে। কেউ কেউ আবার ফিরে গিয়েছে গাঁয়ে। কেউবা অদৃষ্টের দুর্বিপাকে ছিটকে পড়েছে সুন্দরবনের বাদায়, না-হয় আবাদের হিজলে। রাজধানীর জলুস-রোশনাই দেখে হতভাগার দল দেওয়ালি পোকার মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসেছিল শহরের রাজপথে। ভাত—ভাত করে হালাক হয়েছে পথে পথে কেঁদে। তারপর দিশেহারা হয়ে, কেউ মুখ গুঁজড়ে পড়েছে ডাস্টবিনে, কেউ বা যম-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে গাড়ীর চাকায় হুমড়ি খেয়ে। বেঁচেছে। ভাত-ভাত করে কেঁদে মরার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে। একমুঠো ভাতের জন্যে মানুষের পেটে কি জ্বালা, কে বুঝবে সে কথা! ওই হা-ঘরের দল, হাত-পা আছে, নাক, মুখ-চোখ সুখ-দুঃখ হাসিকান্না—সবই আছে ওদের, তবুও নাই বাঁচবার অধিকার। মানুষ হয়ে জন্মেও ওরা আগাছার মত পথের কাঁটা হয়ে আছে মানুষের পৃথিবীতে। ওদের আত্মা কেঁদে মরে সর্বভুক্ উল্কামুখা প্রেতের মত। জঠরের আগুন কণ্ঠনালী ছাপিয়ে ওঠে: দেবে মা, একটুকু ফেন?…একখানা বাসি রুটি!…ক'দিন ধরে খাইনি কিছু। খিদের জ্বালায় কলজেটা জ্বলে-পুড়ে গেল।

চোখের কোটরে শুকনো তারা দুটো মিট মিট করে। শরীরের লবণাক্ত অংশ নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছে। চর্বি নাই, মাংস নাই, আছে শুধু চামড়ার ওপর ভেসে-ওঠা রুঠো শিরাগুলো। কপালের পাশে ফুলে উঠেছে আঁকা-বাঁকা শিরা উপশিরার গোছা। চোয়ালের হাড় দুটো মেঠো-পথের কালভার্টের মত উঁচু হয়ে উঠেছে। তেল পুড়ে শেষ হয়েছে। এখন শুধু সলতে পুড়ছে। তাই প্রদীপ আজো নেবেনি। আলো নাই, তবুও আগুনটুকু মিটমিট করে চোখের তারায়। হাতে-পায়ে যে গতিবেগ, সে গতিবেগ জীবনের নয়, মৃত্যুর। মৃত্যুর তাড়া খেয়ে খেপা-কুকুরের মত পথে পথে ছুটে বেড়ায় ওরা। কাঠের পা-গুলোয় যেন চলন্ত কল লাগানো আছে। চলে, কিন্তু লাফিয়ে পড়তে জানে না। নইলে, দোকানে দোকানে ওই সব থালা-ভরা খাবার! প্রাসাদে প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন! ওরা পারে না হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে? পারে না কেড়ে নিয়ে মুঠো-মুঠো করে পেটে গুঁজে দিতে? না—না, পারে না ওরা। ভোজের সভায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, পৈশাচিক তাণ্ডবে পারে না ওরা দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করতে! মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরেছে দিনের পর দিন গোটা-গোটা উপোস দিয়ে। মরণ যত এগিয়ে আসে, মৃত্যু ভয়ের বিভীষিকায় তত ওরা কুঁকড়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে অতসী পথ ভুলে যায়। মগজে ঝড় ওঠে। ওর বিস্মৃতপ্রায় অতীত, অন্ধকার ভবিষ্যৎ আর আবছা-বর্তমান যেন এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যায়।

ও ভুলতে পারেনি ওর অন্ধ বাপের সেই রোগ শয্যার দিনগুলো। ওর নিঃসম্বল অসহায় আর্তনাদ শোনে নি নির্দয় কালা ভগবান। সারাটা দিন ঘুরেও পারেনি উপেনের সাবু-বার্লির পয়সা জোগাড় করতে।…সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এঁদো বস্তির কানা গলিটায় কালো বাতাস থমথম করছিল। সারাদিনের জমাট বাঁধা ভাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বস্তির ঘরে ঘরে। ছুঁচো আর ধাড়ি ইঁদুরগুলো পেয়েছে রাতের স্বাধীনতা। গলির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে ওদের উৎসব—দাম্পত্য-কলহ, প্রেম, অভিমান।

আজ কি খাবে বাবা ?

কিছু না।…উপেন পাশ ফিরে শুয়েছিল।

কপালে হাতখানা রেখে অতসী অনুভব করেছিল তার জ্বরের উত্তাপ। বাঁ-হাতের পিঠে চোখের জল মুছে বলেছিল : সারাদিন খাওনি কিছু। তাই মাথার যন্ত্রণা কমছে না।

তুই ! তুই কিছু খেয়েছিস মা ?

হাঁ, বাবা।…একটুখানি সাবু পেলে—

উপেন হেসেছিল। ওই রোগ যন্ত্রণার ভিতরেও শুকনো হাসিতে কুঁচকে উঠেছিল তার শীর্ণ থুতনিটা।…চোখ নাই, তবুও চোখের যন্ত্রণা গেল না মা।

খানিকক্ষণ অতসী বক্ষ ধ'রে বসেছিল ওর শিয়রের কাছে। চোখে জল ছিল না। মুখে কথা ছিল না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল উপেনের মুখপানে।

আচম্বিতে কখন বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল অতসীর মসী-লিপ্ত অন্ধকার আকাশে।…ছাতাওয়ালা গলির মোড়ের সেই ছাতাওয়ালাটা কতদিন দেখিয়েছে ওকে সিকি-দু'আনি-আধুলি। লোভ দেখিয়েছে পাইনাফুলি শাড়ির।…পয়সা! পয়সা দেবে লোকটা।

অতসী আর অপেক্ষা করেনি। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। ইঁদুরগুলো ওর পায়ের শব্দে ছড়-বড় করে এদিক-ওদিকে ছুটে গিয়েছিল। একটুও ভয় করেনি ওর। মাথায় যেন খুন চেপেছিল। আত্মহত্যার নেশা।…পয়সা! পয়সা যেমন করে হোক আনবে সে।

ছাতাওয়ালা মিন্‌সেটা চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে তহবিল মিলাচ্ছিল। এক কাঁড়ি টাকা, সিকি-দু'আনি আধুলি। পাশে হাত-বাক্সটা খোলা।

গলিতে তখন লোক চলাচল ছিল না। ছাতাওয়ালা মিন্‌সে একলা ঘরে বসে টাকা-পয়সা গুণছিল। ঘরের দরজা বন্ধ। পাশের জানালাটা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল থাক-থাক ক'রে সাজানো সিকি-দু'আনি-আধুলিগুলো।

ভাববার অবকাশ ছিল না অতসীর।…বাজারের দোকান হয়তো এখনো খোলা আছে। সাবু-বার্লি-মিছরী, না-হয় বাতাসা, খৈ—যা হোক কিছু মিলবেই।

ওর অন্ধ বাপ বিছানায় পড়ে জ্বরে কোঁকাচ্ছে। দু'দিন ধরে পারেনি তাকে কোন পথ্যি দিতে। উপোসে উপোসে চোখের যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। কপালের রগগুলো ফুলে উঠেছে। টনটন করছে জ্বরের ধমকে।

এদিক-ওদিক জ্ঞান ছিল না অতসীর। পাগলের মত গিয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিলে।

কে ?

আ-মি।

তুমি !…জানালা দিয়ে এক নজর দেখে, মিন্‌সে ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল : সেঙাৎ! তুমি ?

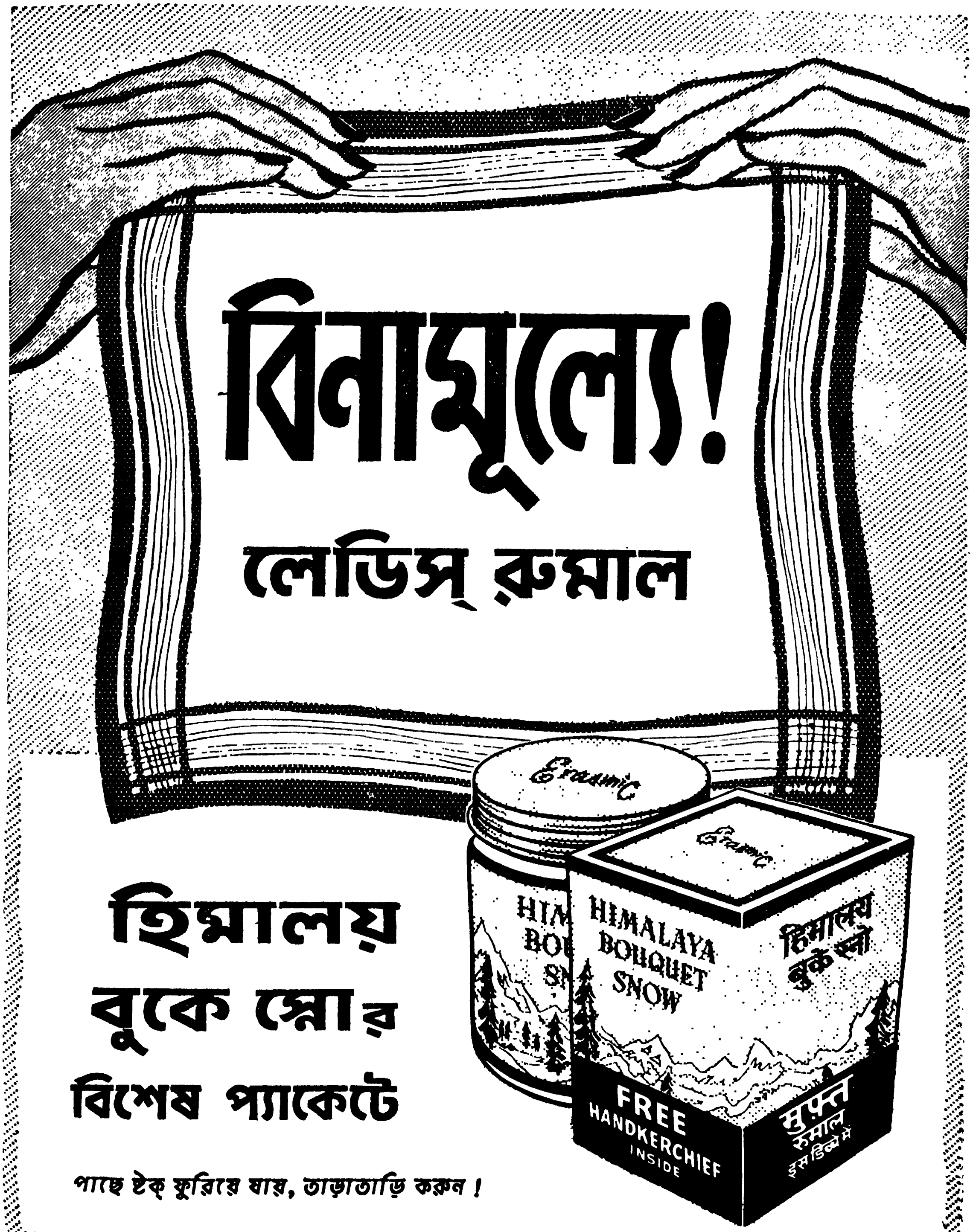
কী-সে বীভৎস উল্লাস লোকটার চোকে মুখে! আনন্দ যেন উপচে উঠেছিল। মিন্‌সে যেন ফেটে পড়ছিল আহ্লাদে আটখানা হয়ে।

অতসী ঘরে ঢুকতেই দরজাটায় সশব্দে খিল লাগিয়ে দিয়ে, আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিল : সেঙাৎ! তুমি ? তু—মি!…হা-হা, হা-হা।

কদাকার কুচ্ছিত লোকটা যেন শিকারী নেকড়ের মত জড়িয়ে ধরেছিল অতসীকে।…তারপর ?

তারপর কি ঘটেছিল, তা অতসী জানে না। আজ সে ভাবতেও পারে না। ভাবতে গেলে মাথাটা গুলিয়ে যায়। কোনো স্মৃতি নাই। আছে শুধু জ্বালা। বিষ-দাঁতের তীব্র জ্বালা লেগে আছে ওর ঠোঁটে-মুখে। মনে হয়, সেই কুঁদো লোকটার গায়ের ঘাম যেন আজো চটচট করে ওর সারা গায়ে। বিন্‌ঝিন্ ক'রে ওর সর্বশরীর।

পথে পথে ঘুরে অতসী যখন বস্তিতে ফিরলো, তখন পুঁটি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছে। পদ্ম বক্ বক্ করে নিবারণের পাশে বসে। নিবারণ সাড়া দিচ্ছে না।


বিনামূল্যে!
লেডিস্ রুমাল
হিমালয়
বুকে স্নো'র
বিশেষ প্যাকেটে
পাছে ষ্টক্ ফুরিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি করুন !
HIMALAYA BOUQUET SNOW
हिमालय बुके स्नो
FREE HANDKERCHIEF INSIDE
मुफ़्त रूमाल इस डिब्बे में

নতুন কারখানাটা বাসা থেকে অনেক দূর। দুবেলা পায়ে হেঁটে অতখানি পথ যাতায়াত করতে অতসী আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বাড়ী ফিরবার সময় পা দুটো যেন ওর চলে না। সারাদিনের ক্লান্তি জমে পা-দুটোয়। দেহটা অবশ হয়ে আসে। তাই মন থাকলেও, সে আর পারে না কারখানার স্কুলে যেতে। কুনো-বেড়ালের মত হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকে ঘরে। কোনদিন ঘুমে ভেঙে পড়ে। কোনদিন বা মগজটা তেতে ওঠে নানা দুশ্চিন্তায়। কার জন্যেই বা ভাবনা ওর! তবুও যেন ভাবনার অন্ত থাকে না।···দীনু! দীনু হয়তো বেঁচে নাই আর। নইলে, এতদিনের ভিতর একটি বারও কি উঁকি মারতো না। এত নির্মায়িক তো ছিল না সে।

প্ল্যাষ্টিক কারখানার কাজ সে ছেড়েছে অনেকদিন। কিন্তু কাতিক আজো ছাড়েনি আসা-যাওয়া। সময়ে-অসময়ে যখন-তখন এসে হানা দেয় অতসীর দরজায়। ভালো আছো অতসী?

হ্যাঁ।···হুড়মুড় করে অতসী বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে, পাছে কাতিক ঢুকে পড়ে ওর ঘরে।

দরজার মুখে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে অতসী বলে: আমাদের ভালোমন্দ সবই সমান কার্তিকবাবু। আপনি কেন মিছেমিছি কষ্ট করে আসেন এতদূর?

কার্তিক হাসে। বেকুবের মত হেসে বলে: তোমার খবর নিতে।

না-না অমন করে যখন-তখন আসবেন না আপনি। আমরা গরীব মানুষ। নানা জনে নানা কথা বলে। যদি দরকার হয় কোন দিন, আমিই যাবো।

ইচ্ছা থাকলেও কার্তিক আর দাঁড়াতে পারে না। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে অতসী আবার বিছানায় গিয়ে পড়ে।

পুঁটি কিছু না বললেও, পদ্ম ছাড়ে না। সমানে রাত নটা পর্য্যন্ত টীকা-টিপ্পনি কাটে। মুখে কিছু আটকায় না তার।

অতসী শুনেও শোনে না। মুখ বুঁজে পড়ে থাকে ঘরের কোণে।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে অতসী উঠে গেল বস্তি ছেড়ে। কেরাণী-বাগানে মাসিক দশ টাকায় একখানা ঘর ভাড়া নিলে ক্ষান্তমণির মাট-কোঠায়।

রবিবার সকালে একখানা রিক্সা ডেকে, অতসী যখন তার কাঁথা-কলসী বেঁধে নিয়ে উঠলো গাড়ীতে, মনটা তার হাহাকার করে ভেঙে পড়ছিল কান্নায়। রিক্সা থেকে নেমে, পুঁটির হাত-দু'খানা ধরে বললে: পুঁটিদিদি তোদের ঋণ শুধতে পারবো না কোনদিন। সময় পেলে যাস। বেশী দূর তো নয়।

যাবো।···পুঁটির চোখদুটোও ভিজে উঠেছিল।

একটু থেমে, অতসী অনুনয় করে বললে: যদি কেউ কোনদিন এসে আমার খোঁজ করে, ঠিকানাটা বলে দিস। শুধু বলে নয়, তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাস্। নইলে, হয়তো সে যাবে না। আবার পালাবে।

তা জানি।

জানিস্ তো। দুনিয়ায় আর কেউ নাই আমার।··· লম্বা ফর্সা চেহারা। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে হয় তো তামাটে হয়েছে। চুল দাড়িতে হয়তো ময়লা জমে জটা বেঁধেছে। তবুও চিনতে পারবি পুঁটিদিদি। ভদ্দরলোকের ছেলে, চোখমুখ দেখেই চিনতে পারবি তাকে।···খোকাকে তো দেখিস্নি। দেখলে চিনতে তোর ভুল হতো না। অবিকল তেমনি চোখ···নাক-মুখ।

কি ভেবে, অতসী এগিয়ে গেল পদ্মর ঘরের সামনে। একবার থমকে দাঁড়িয়ে, ডাকলে পদ্মদিদি!

কি?···পদ্ম বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মুখে কিছু না বলে, তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অতসীর মুখপানে।

অতসী চোখের জল মুছে বললে: যদি কিছু দোষ করে থাকি, মাপ করিস্। আর···নিবারণবাবুকে দেখিস্। তুইও যেন নন্দার মতন ছেড়ে পালাস্ না। ভালমানুষের ছেলে, অনেক উপকার করেছে। ঠিক বড় ভাই-এর মতন দেখেছে আমার বিপদের সময়। আমার কপাল মন্দ তাই—

তাই পিরিত জমেনি। এই তো!

অতসী আর কোন জবাব দিল না। মাথাটা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

নিবারণ তখন বাসায় ছিল না।

পুঁটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল গলির মুখে। রিক্সার ঘণ্টাটা ঠুং ঠুং করে মিলিয়ে গেল বড় রাস্তার মোড়ে।

ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা

আত্মবিশ্লেষণ

মহামায়া দেবী

আজ আমি একটা অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কিছু আলোচনা করতে বসেছি যেটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটে আমাদের সকলেরই জীবনে। মাতৃত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ এ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই বোধহয় একমত। অতি-আধুনিকাও একটী শিশু সন্তানকে বুকে চেপে মাতৃত্বের আস্বাদ না পেলে জীবনটাকে নীরস মনে করেন—যদিও অনেক সময় হয়তো ফ্যাসনের খাতিরে মুখে তা স্বীকার করেন না।

তরুণী মা তার শিশু যে মুহূর্ত্ত থেকে গর্ভে আসে কত কি কল্পনার প্রাসাদ রচনা করে চলেন, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ভুলে যান—তাকে পেতে কি অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। অসীম মমতায় শিশুকে বুকে চেপে তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেন তাঁর নাড়ী ছেঁড়া ধনকে। শিশুর নিরাপত্তা, তার সুখ স্বাচ্ছন্দ-বিধানই তাঁর সমস্ত কাজের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। শিশুক সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য মা যে কোন ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না—এ কথা নতুন করে বলাটাই আমার পক্ষে হাস্যকর। কারণ মায়ের মত নিঃস্বার্থ স্নেহ আর কে দিতে পারে?

কিন্তু আমার আলোচনার কেন্দ্র হল শিশুটী, যাকে ঘিরে মায়ের অনেক আশা, অনেক সাধ। মেয়ে হলে মা প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে সযত্নে শিক্ষা দিতে থাকেন—যাতে পরের ঘরে গিয়ে সে সুখী হতে পারে। আধুনিক যুগের সবরকম শিক্ষা দীক্ষায় তাকে শিক্ষিত করে, তার নাচ-গান পড়াশুনা বাবদ একটী ছেলে মানুষ করে তোলার মত খরচ করেও পণপ্রথার হাত থেকে রেহাই পান বোধহয় খুব কমসংখ্যক মা-বাপ। বিয়ে দেবার সময় অসঙ্গত বুঝেও তাঁরা যথাসাধ্য বা সাধ্যাতিরিক্ত পণ দেন যাতে মেয়েটী বিবাহিত জীবনে সুখী হয়। মেয়ে-জামাইয়ের কাছে বিনিময়ে প্রত্যাশা কিছু থাকেনা, থাকে শুধু একান্ত শুভেচ্ছা যেন তারা নিজেদের আনন্দনীড় গড়ে তুলতে পারে।

এখানে একটা কথা সতত আমাদের মনে আসে, মা-বাপ না হয় মেয়ে-জামাইয়ের কাছে কোন কর্ত্তব্য আশা করেন না—কেবল তারা সুখী হলেই তাঁরা সুখী, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নানা সামাজিক প্রথা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আইনতঃ আমরা মেয়েরা ছেলেদের মতই সমান ভাবে পিতৃধনের দাবীদার—হয়েছি এক্ষেত্রে কেমন করে সহজে মেনে নিতে পারবো যে বিবাহিতা কন্যা বলেই আমরা পর হয়ে গেলাম? (যেটা এতকাল স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা হয়েছে)। যত কর্ত্তব্য কেবল স্বামী ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, বাপের বাড়ীর প্রতি কোন দায়িত্ব আমাদের নেই—কিন্তু এখনও আছে কেবল রোগে ভোগে, প্রসবের সময় তাঁদের কাছে সব রকম সুবিধা আদায় করা। হয়তো কয়েকটী ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে—কিন্তু বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মেয়েদের যে এই অবস্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাইদের সঙ্গে সমানভাবে মা বাপের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আমরা করতে পাবো না। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর সকলে—অথচ কোন লজ্জায় মোটা টাকা শিক্ষা ও বিবাহ বাবদ খরচ করিয়েও হাত বাড়াবো—বাপের যা সামান্য হয়তো সম্পত্তি আছে তার দিকে ভাইদের সঙ্গে চুলচেরা ভাগের দাবী নিয়ে! এখানে স্মরণ রাখা ভাল এখানে মস্তধনী লাখপতির কন্যাদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছেনা, অসংখ্য মধ্যবিত্ত সংসারের কথা যেখানে পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহ বাবদ খরচ করে একটা মাথা-গোঁজার বাড়ী বা সামান্য কয়েক হাজার টাকা হয়তো বা অবশিষ্ট থাকে, ধনী পিতা কন্যাকে পুত্রর সঙ্গে সমান করে লাখ টাকা বা বাড়ী গাড়ী দিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু এসে যায় না—কিন্তু মধ্যবিত্তর ঐ একটী মাত্র ভদ্রাসন নিয়ে মেয়ে-ছেলের মধ্যে ভাগের কথাই এখানে প্রধান আলোচ্য। মেয়েদের এ নিয়ে গভীর চিন্তা করা দরকার, সবচেয়ে বেশী দরকার, তাদের স্বামীদের। স্ত্রীর মা-বাপকেও সমান কর্ত্তব্য করার দায়িত্ব যদি নিতে পারেন তিনি, তবেই শ্বশুরের সম্পত্তি বা অর্থ গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ তাঁর হওয়া উচিত নয়, নয়তো ওদিকে নজর না দেওয়াতেই তিনি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবেন। কারণ স্ত্রী মানেই যে তিনি এ কথা জানে কে? মেয়েদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার, স্বামীকে কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করবার বুদ্ধি তাঁর থাকা দরকার, নয়তো মেয়েদের উচিত পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাইয়ের সঙ্গে কোনরকম দাবী না করে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেওয়া।

এবার আসে সেই মায়ের কথা—যিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করে আত্মপ্রসাদে, গর্ব্বে ফুলে ওঠেন, পরিবারের কাছেও তাঁর মর্য্যাদা বেড়ে যায়—কেননা এ হলো ছেলে, এ পরের বাড়ীতে কিছু নিয়ে যাবেনা উপরন্তু ঘরে আনবে অনেক কিছু, সেই সঙ্গে একটী বৌ—যার উপর সংসার অনেক কিছু দাবী করে, অনেক কিছু আশা করে। সেই শিশু-পুত্রকে অবলম্বন করে মায়ের কল্পনা প্রায় আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। ছেলে মোটা টাকা রোজগার করবে, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁদের বুড়ো বয়সে দেবে ছুটী। ছেলের বিয়ে দিয়ে ফুট ফুটে সুন্দরী বৌ আনার সুখ-স্বপ্ন দেখেন না—এমন মা বিরল কিন্তু এখানেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আমাদের।

যে গভীর মমতায়, অসীম স্নেহ দিয়ে আমরা ছেলেকে গড়ে তুলি

কেবল তার সুখটারই প্রাধান্ত দিই, কি করে ছেলে আমার ভবিষ্যতে সুখী হবে, নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাত্রা করবে আমাদের অবর্ত্তমানেও তারজন্য সাধ্যমতচেষ্টার ত্রুটী করিনা। সেজন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা থাকে যাতে সে একটী সুযোগ্য সঙ্গিনী পায়—তাই আমরা খুঁজি সুন্দরী বিত্তশালিনী বধূ।

ছেলের বিয়ে দেবার সময় কি প্রবল উৎসাহ মায়ের—যেন বৌ বাড়ীতে এলেই হাতে চাঁদ পান। কিন্তু সেই একান্ত কল্যাণী মূর্ত্তি মা কেমন করে যেন ধীরে ধীরে ছেলের বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই বদলাতে থাকেন। একটা বিরাট অসন্তোষের বোঝায় যেন তিনি ক্লান্ত, কোন কিছুতেই তাঁকে তুষ্ট করা বধূর পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। সেই মা কুটুম্বর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে বৌকে বাপ মায়ের কুশিক্ষা দেওয়ার নজীর দেখান। ছেলের কাছে, ছেলের বাবার কাছে ও প্রতিবাসীদের কাছে বধূনিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় ছেলে ভারসাম্য রাখতে পারেনা। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আর তরুণী বধূর প্রতি আকর্ষণ, এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে সে বেচারার অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীণ। মাতৃভক্তি প্রবল হলে বধূর কপালে অসীম দুর্গতি ও নির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী আবার বধূ প্রীতি মাতৃভক্তিকে ছাপিয়ে গেলে ছেলে অনায়াসে বধূর পক্ষ নিয়ে মা বাপকে অপমান করতে কুণ্ঠিত হয়না। যে মা ছেলেকে এত কষ্টে এত মমতায় তাকে এত বড় করে তুললেন সেই মা হতেই তার দাম্পত্য জীবনের আনন্দ লোপ হবার উপক্রম হয়, সংসারে ঘনিয়ে আসে অশান্তির কালোছায়া।

এই ব্যাপার প্রায় প্রতি মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে, বিত্তবানের ঘরে কিছু কম—কারণ তাঁরা ছেলের উপার্জ্জনের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হন না। সেজন্য ছেলের নব-বিবাহিতা বধূর প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি দেখে ভীত হন না। প্রতি মুহূর্ত্তে ছেলে পর হয়ে যাবে বা বধূর বশীভূত হয়ে তাঁদের ফাঁকি দেবে এ মর্ম্মান্তিক চিন্তার জ্বালা তাঁহার থাকে না। বধূ ঘরে তাঁদের অনেকটা সৌখীন অলঙ্কারের মত, তাঁদের উচ্চ ঘরের মর্য্যাদা যাতে বধূ পূর্ণভাবে পালন করে সে দিকে রাখেন প্রখর দৃষ্টি। কিন্তু মধ্য-বিত্ত ঘরে যাঁরা বাড়ীর কর্ত্তার মৃত্যু বা পেন্সনের সাথে সাথে সম্পূর্ণরূপে পুত্রের উপার্জ্জনের উপর ভরসা করে থাকেন তাঁদের 'ছেলেকে বধূ হাত করে নিল' এ আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়া খুব মুস্কিল, খুব উদার না হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শাশুড়ী বৌয়ে যে সংঘাত বাধে তার পরিণামে কত সংসারে যে অশান্তির আগুন জ্বলে তার সংখ্যা নেই। বধূর মোহ থেকে পুত্রকে সরাবার অপরিসীম কৌশল রচনা করা হয় এমন দৃষ্টান্ত ও বিরল নয়। কিন্তু মায়েরা যদি সেই কৌশল বধূকে বশীভূত করবার রচনায় লাগাতেন, তাহলে আজ মধ্যবিত্ত ঘরের অন্য ইতিহাস রচনা হতো।

নিজের ছেলেকে পরের মেয়ের একান্ত অনুগত হতে দেখলে মায়ের মন স্বভাবতঃ ক্ষুব্ধ হয়েই ওঠে—কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এই দুর্ব্বলতা কাটিয়ে ওঠা। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চাইতে ছেলের বিয়ে দেওয়া এক হিসাবে অনেক বেশী শক্ত। মনকে অত্যন্ত উদার ও পরিষ্কার রাখা চাই, ভিন্ন পরিবারে, ভিন্ন আবহাওয়ায় ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি-পালিতা একটি মেয়েকে, বধূ করে এনে তার ভুলত্রুটী অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে আমাদের সহ্য করতে হবে, মিষ্টকথায় তাকে দিতে হবে পথ নির্দ্দেশ, তার মা বাপের দোষত্রুটীর উল্লেখ করে বা তাঁদের দেওয়া তত্ব-তাবাসের তুচ্ছতা নিয়ে বধূকে কথা শোনাবার প্রবল ইচ্ছা দমন করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেক মাকে অনুশীলন করতে হবে যাতে এই বদভ্যাসটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি, একটু সংযম ও চেষ্টায় তা নিশ্চয় করা সম্ভব কারণ যে মুহূর্তে আমি বধূর মা-বাপের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক কথা বলব সেই মুহূর্তে তার কাছে আমার আসন এত নীচে নেমে যাবে যা সারা জীবনেও আর পুনরুদ্ধার করা যাবেনা—এটা ভুললে আমাদের কিছুতেই চলবে না যে, স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছেলের কাছে আমরা পাই বা আশা করি ঠিক সেই জিনিষটী মেয়ের মনেও তার মা বাপের জন্য আছে। বরং আমার মনে হয় মেয়েদের মনে ছেলের চেয়েও বেশী টান থাকে বাপ মায়ের প্রতি, কারণ তাঁদের ছেড়ে অল্প বয়সেই তাকে পরের ঘর করতে চলে আসতে হয় এবং সারাজীবন মেয়েরা বাপ মায়ের কাছ থেকে কেবল নিতেই থাকে। কিন্তু প্রতিদানে কোন কর্ত্তব্য করতে পায়না। সেজন্য তাদের মনের এই অতি দুর্ব্বল স্থানে যদি না ভেবে চিন্তে আঘাত করা হয় তাহোলে তারা হয়ে ওঠে দুর্বিনীত ও উদ্ধত। আমাকে মুখের উপর যদি শুনিয়ে দেয় পাঁচকথা, তাহোলে আমার সম্মান তো কিছু রইল না—উপরন্তু বধূ মুখের ওপর জবাব করছে দেখে মাথা গরম করে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে ফেলা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। আর এরূপ ঘটনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। ৯।১০ বছরের বালিকা বধূ আর আমরা পাইনা, যারা সাতচড়েও 'রা' না করে নতশিরে কেবল হুকুম তামিল করবে, আজকালকার আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেদেরও তাদের বাপ মায়ের মর্য্যাদা বোধের দিকে অতিমাত্রায় সচেতন। ছেলের বাপ-মায়ের চাইতে মেয়ের মা বাপের মর্য্যাদা কোন অংশে কম এ তারা আর কোনমতেই মানতে প্রস্তুত নয়। কাজেই তাদের বাপ মা তুলে, কথা শুনিয়ে গায়ের ঝাল মেটানর অপার সুখ এক-কালে যা শাশুড়ীর দল ভোগ করে গেছেন আমাদের কপালে তা নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা হলেও বর্ত্তমান যুগের নানা পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে এটাও মেনে নিতে আমরা বাধ্য, নচেৎ প্রলয় বেধে গেলে কাকে দোষ দেওয়া যাবে ?

তাই বলি ছেলের বিয়ে দেবার মুহূর্ত্ত থেকে মা নিজেকে শক্ত করবেন। ছেলে বৌ সুখী হলেই আমরা সুখী, মনের মধ্যে এ চিন্তাটারই প্রাধান্য দিতে হবে। ফলে বধূ বা কুটুমের দোষ অনুসন্ধান করবার স্পৃহা আপনা থেকেই কমে যাবে—দেখা যাবে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর সকলের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়ে বধূও বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদ দুঃখও অনেক ভুলেছে, শ্বশুরবাড়ীর সকলকে সে আপন ভাবতে পারছে, তাদের সুখসুবিধার জন্য তারও চিন্তা আপনা থেকেই

আসবে। স্বামীর প্রেমে ঐশ্বর্য্যশালিনী মেয়েটীর হাসি আনন্দ সংসারে স্বর্গের সৃষ্টি করবে, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করবার মত মন তৈরী করবার অবকাশ পাবে না সে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সে হয়ে উঠবে অপরূপা !

কিন্তু ছেলে বৌ নিয়ে এই রকম একটী সুখের সংসার গড়ে তোলবার অনেক আশা নিয়ে মা যখন ছেলের বিয়ে দেন—অথচ সে আশা তাঁর ভেঙ্গে পড়ে বধূর জ্বালাময়ী বাক্যে বা অশিষ্ট আচরণে, আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বদলে যখন উৎক্ষিপ্ত হয় বধূর ঘৃণা তখন আমাদের কি প্রয়োজন নেই আত্মচিন্তার ? আমরা মায়েরা কি কিছু ভুল করিনা ? কথায় বলে 'স্নেহ নিম্নগামী' অর্থাৎ স্নেহ ঝরণার মত ঝরে পড়ে স্নেহের পাত্রের উপর, আগে আমি স্নেহ করবো আমার কনিষ্ঠ পাত্রকে তবে বিনিময়ে পাবো শ্রদ্ধা। মায়ের স্নেহই সন্তানের মনে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। কিন্তু যেমন করে নিজের সন্তানের দোষক্রটি উপেক্ষা করি, তেমন করে কি পারি বধূর সামান্য দোষকেও উপেক্ষা করতে ?

আমরা কি লোভীর মত কুটুমের পয়সার দিকে চোখ ফেলে বসে থাকিনা ? মনোমত তত্ত্ব-তাবাস না হলে বধূর সামনেই গজরে উঠতে কি দ্বিধা করি ? আর একটা সবচেয়ে বড় অন্যায় করি, সেটা হচ্ছে নবদম্পতির ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফেলি অনেক সময় ; কিন্তু একটু চিন্তা করে ভাবতে হবে নিজের ঠিক ঐ বয়সের কথা, আমার স্বামী আমায় নিয়ে জগত-সংসার ভুলে ছিল কি না, কিছুকাল পরে এ তন্ময়তা কিছুটা কাটবেই ততক্ষণ একটু ধৈর্য্য ধরলে অসীম সুখের সন্ধান পাবেন মায়েরা। বয়সের ধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

আমাদের সবচেয়ে মজার মনস্তত্ত্ব হলো এই যে আমার মেয়েটিকে নিয়ে যখন জামাই আমাদের সামনেই হাসি গল্প করে বা তাকে নিয়ে সিনেমা যায়, তখন আমরা খুশীতে আনন্দে গদগদ হয়ে উঠি, কিন্তু ঠিক এর বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি হয় যখন ছেলে-বৌ এই কাজগুলি করে।

জামাই মেয়েকে খুব গহনা শাড়ী দিলে আমাদের আত্ম-প্রসাদের সীমা থাকে না, আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীকে ডেকে ডেকে দেখাতে গর্ব্ব অনুভব করি, কিন্তু ছেলে বৌকে দিলে আমাদের মুখ মন ভারী হয়ে ওঠে—এ বড় মুস্কিল। এই মুস্কিলের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের হতে হবে সমদর্শী। আর এটা মনে রাখতে হবে দাবী তো করেও কম নয়, মায়ের ছেলের উপর দাবী ও স্ত্রীর স্বামীর উপর দাবী শাশ্বত ও চিরন্তন—কোনটা কম, কোনটা বেশী তার বিচার করতে বোধহয় স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও হিমসিম খাবেন। তবে পুত্রের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এসে মা যদি একটু পেছিয়ে তাঁর দাবীটা খাটাতে থাকেন তাহলে বোধহয় এ সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু তিল তিল করে গড়ে ওঠা ছেলেকে পরের মেয়ের হাতে সঁপে দিয়ে সরে দাঁড়াবার মত উদার মনোবৃত্তি ও সহনশীলতা কি আমাদের আছে ? যাঁরা পারেন, যে শাশুড়ী বধূর মধুর সম্পর্ক সংসারের সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলে। তাঁদের অনুকরণ করাটাই আমাদের সব মায়েদের একমাত্র লক্ষ্য হোক। কেন আমরা একটু চেষ্টা করে নিজেদের সংসারের শান্তি বজায় রাখতে পারবো না ?

বধূকে ও প্রতি মুহূর্ত্তে মনে রাখতে হবে আজ সে বধূ কিন্তু সেও একদিন মা হবে, কত দুঃখে কষ্টে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে হবে, তার আবার আচরণ থেকেই শিশু শিক্ষা নেবে ক্রমশঃ। বধূ যদি গুরুজনদের শ্রদ্ধা না করতে পারে, ভবিষ্যতে তাকেও একদিন ঠিক ঐ অবস্থার সম্মুখীন হতেই হবে, তারও ছেলে বৌয়ের কাছে কিছু প্রাপ্য আশা করা চলবেনা। কাজেই বিপরীত অবস্থার মধ্যে পড়ে কোন সময় অসহ্য বোধ হলেও সংসার ও স্বামী সন্তানের মুখ চেয়ে সংযত আচরণ করতে হবে, মেয়েরাই তো সংসারে শান্তি ও লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সৃষ্টি ও ধ্বংস দুইই মেয়েদের হাতে।

গালার কারু-শিল্প

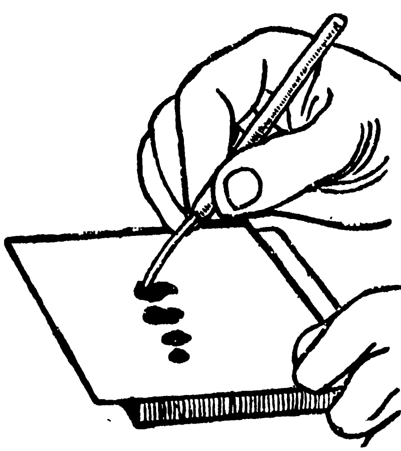
রুচিরা দেবী

২

গালার কারু-শিল্পে যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন লাগে—গতবারে তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি। সে সব সরঞ্জামের সাহায্যে, রঙীণ গালা-কাঠি (Sealing Wax Sticks) দিয়ে নানা ধরণের জিনিষপত্রের উপরে কি ভাবে বিচিত্র আলঙ্কারিক অক্ষর-লেখা (decorative letter-writing), ফুল-লতাপাতার ছবি-আঁকা আর সুন্দর-সুন্দর নক্সা রচনা করা চলে—এবারে তার কিছু হদিশ জানাচ্ছি।

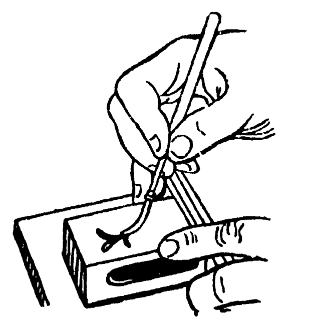
গালার কারু-শিল্পে হাত পাকানোর সময়, গোড়ার দিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোনো দামী বা সৌখিন সামগ্রীর উপরে নক্সা-রচনার চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ, প্রথম দিকে তেমন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না-থাকার দরুণ তাঁদের কাজে নানা রকম ভুল-ক্রটি ঘটবার সম্ভাবনা বেশী এবং সে সব ক্রটি-বিচ্যুতির ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই বহু দামী আর সৌখিন জিনিষপত্রের বিশেষ লোকসান ঘটে। তাই, গালার কাজ করবার সময়, গোড়ার দিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে মজবুত কার্ডবোর্ড, পাতলা কাঠ কিম্বা 'ম্যাসোনাইট-বোর্ডের' (Masonite Board) টুকরোর উপরে গলিত গালা-কাঠির রঙ-বেরঙের ফোঁটা ফেলে

হাত-পাকানো উচিত। এভাবে কাজ করলে দামী সৌখিন জিনিষপত্র লোকসানের ভয় থাকে না এবং শিল্প-চর্চ্চাতেও পারদর্শিতা জন্মায় খুব অল্পদিনের মধ্যে! খামের উপর শীলমোহর আঁটবার সময় যেভাবে গলিত-গালার ফোঁটা ফেলেন, সেইভাবে ফোঁটা ফেলবেন। তবে হুঁশিয়ার, ফোঁটাগুলি যেন খুব ঘেঁষাঘেষি না পড়ে। খুব ঘেঁষা-ঘেষি অনেকগুলি গলিত-গালার ফোঁটা পড়লে নক্সার সূক্ষ্ম কাজ চালানোর পক্ষে রীতিমত অসুবিধা ঘটে এবং শিল্প-কাজও শ্রীহীন আর ধ্যাবড়া ধরণের হয়। কাজেই ফোঁটাগুলি যেন সুষ্ঠুভাবে পড়ে সেদিকে নজর রাখা দরকার। যাই হোক, কার্ডবোর্ডে কিম্বা কাঠের যে পাত্রে নক্সার কাজ করবেন—তার উপর রঙীণ গালা-কাঠির গলিত-ফোঁটা পড়বামাত্র সে ফোঁটা গরম থাকতে থাকতেই পেন্সিল, তুলি বা কলম দিয়ে ছবি-আঁকা বা লেখার ভঙ্গীতে সরু, মোটা কিম্বা মাঝারি ধরণের ইস্পাতের তৈরী বোনবার কাঠি (Steel Knitting Needle) 'স্প্যাটুলা' (Spatula) অথবা 'মডেলার' (Modeller) যন্ত্র চালিয়ে সেই গালার গরম ফোঁটা থেকে ফুল-পাতা, অক্ষর প্রভৃতির বিচিত্র আলঙ্কারিক নক্সা (Decorative Models) রচনা করতে হবে।



কিভাবে গলিত-গালার ফোঁটাকে বোনবার কাঠি, মডেলার কিম্বা 'স্প্যাচুলা' অর্থাৎ 'প্রলেপন' যন্ত্র চালিয়ে বিচিত্র নক্সায় রূপান্তরিত করা যাবে—উপরের ছবি দুটিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হলো। এ কাজে রপ্ত হতে হলে রীতিমত অভ্যাস প্রয়োজন। প্রথম প্রথম আশানুরূপ ফল না পেলেও শিক্ষার্থীদের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই···দু'চারদিন ধৈর্য্য ধরে এ-কৌশলটি অভ্যাস করলেই অচিরে তাঁরা নানা বিচিত্র নক্সাদার শিল্প-রচনার কাজে পারদর্শী হয়ে উঠবেন। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখি—এগুলি জানা থাকলে শিক্ষার্থীদের কাজের অনেক সুবিধা হবে। গালার শিল্প-কাজের সময় যখন কার্ডবোর্ড বা কোনো পাত্রের উপরে এক-একটি ফোঁটা ফেলবেন এবং সে ফোঁটা গরম থাকতে-থাকতে বোনবার কাঠি, 'মডেলার' বা 'স্প্যাচুলা' যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনা-নুরূপ নক্সার ছাঁদে গলিত-গালাকে রূপদান করবেন, তখন সাবধানে এ কাজ করবেন এবং বিশেষ নজর রেখে নক্সা ফুটিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন, নক্সা যত মিহি আর সূক্ষ্ম ছাঁদের হবে, শিল্প-কাজের শ্রী-সৌষ্ঠবও তত বাড়বে। গলিত-গালার ফোঁটা ফেলার সময় নজর রাখবেন—প্রত্যেকটি ফোঁটা যেন নিখুঁতভাবে পড়ে—খুব বেশী বড় বা ছোট ধরণের কিম্বা ধ্যাবড়া-ছাঁদের না হয়!

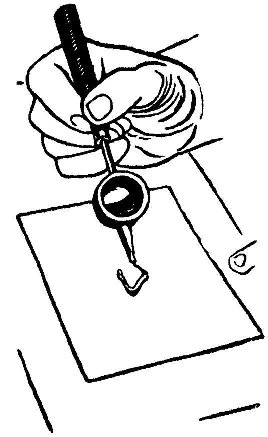
সূক্ষ্ম-ছাঁদের নক্সা-রচনার কাজে প্রয়োজনানুসারে সরু, মোটা কিম্বা মাঝারি সাইজের বোনবার কাঠি ব্যবহার করবেন। তবে বড়-ধরণের কাজে অর্থাৎ ফুলের পাপড়ি, গাছের ডাল-পাতা, ঘাস, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি নক্সা রচনার জন্য 'স্প্যাচুলা' (Spatula) বা 'প্রলেপ দেবার যন্ত্রটি' ব্যবহার করাই উচিত। আগুনের আঁচে গলানো গালাটুকু,



'স্প্যাচুলা' চালিয়ে কার্ডবোর্ড বা কোনো জিনিষের উপরে রঙের তুলি-বোলানোর ভঙ্গীতে পাতলাভাবে প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন। রাজমিস্ত্রীরা যেভাবে 'কর্ণিক' যন্ত্র চালিয়ে দেয়ালের গায়ে সমান এবং মোলায়েমভাবে বালি-সিমেণ্টের প্রলেপ দেয়, তেমনিভাবে 'স্প্যাচুলা' যন্ত্র দিয়ে গলানো-গালা প্রলেপনের কাজ করারও রীতি

আছে। তবে, মনে রাখবেন—গলিত-গালা বড় শীঘ্র জুড়িয়ে ঠাণ্ডা-জমাট হয়ে যায়…তখন ঐ বোনবার কাঠি বা 'স্প্যাচুলা' চালিয়ে সুষ্ঠুভাবে নক্সার কাজ করা চলে না। সুতরাং গালা গরম এবং গলিত থাকতে থাকতেই নক্সা রচনা করবেন। অনেকের অভ্যাস—আগুনের আঁচে অনেকক্ষণ ধরে রেখে গালা গলান। এভাবে বেশীক্ষণ আগুনের তাপে ধরে রাখার দরুণ শুধু যে অনেকখানি গালার অপচয় হয় তাই নয়, গরম আঁচে গালা-কাঠিরও মুখের দিকে পেন্সিল বা তুলির সরু ডগার মতো আকার যায় বিগড়ে এবং পরে ঐ ভোঁতা মুখওয়ালা গালা-কাটি দিয়ে সূক্ষ্ম নক্সা-রচনার সময় কাজের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই আগুনের আঁচে গালাকে বেশীক্ষণ ধরে গলানো উচিত নয়।

বোনবার কাঠি, 'মডেলার' আর 'স্প্যাটুলা' ছাড়াও, গালার নক্সা-রচনার কাজে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কোনো কারুকার্য্যের বিরাট বাইরের 'সীমারেখা' বা 'Outline' আঁকার জন্য গলিত-গালা রাখবার পাত্র অর্থাৎ 'Wax Container যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। এই যন্ত্রটির ছবি গতমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সরঞ্জামটিকে বিচিত্র এক ধরণের ক্ষুদে হাঁড়ি বা Saucepan বলা চলে… ছোট্ট এই পাত্রটির সামনের দিকে বসানো থাকে গলিত-গালা ঢালবার একটি ফাঁপা নল এবং পিছনের দিকে থাকে হাতে ধরবার জন্য লম্বা একটা হাতল। এই পাত্রের মধ্যকার হাঁড়িতে গালার দু'চারটি মাত্র টুকরো আগুনে গলিয়ে নেবার পর, সামনের ঐ ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে সেটিকে প্রয়োজনানুরূপ নক্সার ছাঁদে কার্ডবোর্ডে কিম্বা কোনো জিনিষের উপরে সুষ্ঠুভাবে ঢেলে রেখা টেনে বড় বড় ধরণের 'সীমারেখা' বা 'Outline' রচনা করা যায়। পাশের ছবিটি দেখলেই ব্যাপারটি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। তবে, এ কাজ করবার সময় বিশেষ হুঁশিয়ার থাকতে হবে—ঢালবার সময় গলিত-গালা যেন প্রয়োজনমত স্রোতে (Flow) সমানভাবে পড়ে—খুব বেশী, কিম্বা নিতান্ত অল্প ধরণে না পড়ে। তাছাড়া এ পাত্রে রেখে আগুনের আঁচে গলানোর সময় গালা যেন টগ্‌বগ করে খুব বেশীক্ষণ না ফোটে, কিম্বা পাত্রে যেন অনেক টুকরো গালা একেবারে গলানো না হয়। এ দুটি বিষয়ে নজর না রাখলে ঢালবার সময় পাত্রের ফাঁপা-নলের ভিতর দিয়ে গলিত-গালা সমানভাবে পড়বার পক্ষে সবিশেষ অন্তরায় ঘটবে।



গলিত-গালা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিল্প-কাজ করবার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে নানা ধরণের নক্সাদার গালার কারুকার্য্য করা চলবে। আগামী সংখ্যায় বিশদভাবে সেই সব বিভিন্ন কারুকার্য্যের কিছু হদিশ জানাবার বাসনা রইলো।

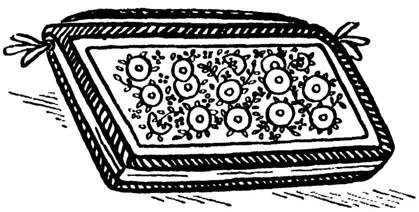
—

উলের তৈরী মেয়েদের হাত-ব্যাগ

শ্রেয়সী গুপ্তা

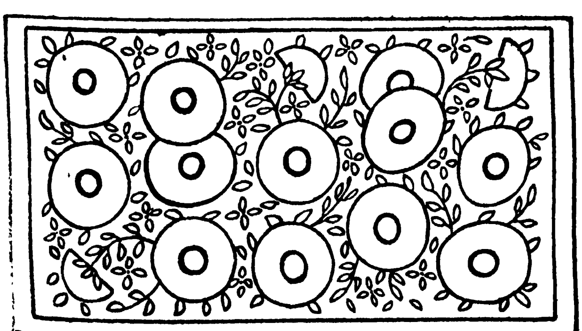
এখনকার দিনে মেয়েদের নিত্য হাটে-বাজারে এবং নানা কাজে বাহিরে বেরুতে হয়…সে সময় পয়সা-কড়ি আর টুকিটাকি জিনিষ রাখবার জন্য মেয়েরা 'ভ্যানিটি কেস্' বা ছোট হাত-ব্যাগ ব্যবহার করেন। বাজারে মোটা কাপড়ের, চামড়ার, প্লাষ্টিকের তৈরী নানা-সাইজের হাত-ব্যাগ পাওয়া যায়—দাম বেশী নয়…তাছাড়া যাঁদের টাকার জোর আছে, তাঁরা দামী-দামী ভ্যানিটি-কেস্ বা হাত-ব্যাগ ব্যবহার করেন। মেয়েদের পক্ষে এই ভ্যানিটি-কেস্ বা হাত-ব্যাগ এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ।

কম খরচে অথচ বেশ সুদৃশ্য হাত-ব্যাগ ঘরে অনায়াসে তৈরী করে নিতে পারেন। সেই ধরণের হাত-ব্যাগ তৈরীর কথা বলি। এ সব হাত-ব্যাগ ময়লা হলে কেচে নিতে পারবেন।



প্রথম ছবিতে যে হাত-ব্যাগের নমুনা দেখছেন, সে ব্যাগ তৈরী করতে হলে চাই ১৪॥ ইঞ্চি লম্বা আর ৬ ইঞ্চি চওড়া 'লিনেন' (Linen) কাপড়। এ কাপড় কিনে ব্যাগের ভিতরকার 'লাইনিং' (Lining) বা 'অস্তরের' জন্য ঐ একই মাপের পাতলা যে-কোনো কাপড় বা কাপড়ের চওড়া পাড় নেবেন। তা ছাড়া ব্যাগের কাপড়ের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে অন্য আর এক টুকরো কাপড় নেবেন—এ কাপড়ের মাপ হবে ১০ ইঞ্চি লম্বা আর ৮ ইঞ্চি চওড়া।

ছবিতে হাত-ব্যাগের উপরে ফুল-পাতার নক্সার যে কাজ দেখতে পাচ্ছেন, সেটি করা হয়েছে মোটা 'ট্যাপেষ্ট্রি-উলের' (Tapestry wool) সাহায্যে। এ ধরণের হাত-ব্যাগ তৈরী করতে হলে—গাঢ় সবুজ রঙের উল নেবেন—দুই হালি ; ফিকে-সবুজ রঙের উল নেবেন—দুই হালি ; হলদে রঙের উল—এক হালি ; নীলাভ-গোলাপী রঙের উল—এক হালি ; আর বেগুনী-গোলাপী রঙের উল—এক হালি। এই সঙ্গে চাই নীল আর হলদে রঙের দুই হালি এমব্রয়ডারির রেশমী সুতো—ব্যাগের 'ধারি' দেবার জন্য। এ ছাড়া গোটা কয়েক কাঠের বা হাড়ের তৈরী 'বিড্' (Bead) 'কাঠি' চাই ব্যাগের চারিধারের কিনারা রচনার জন্য। এই 'বিড্গুলি' পেলে হাত-ব্যাগটিকে আরো মজবুত, সুন্দর আর সুব্যবহার্য্য করে তোলা যাবে।

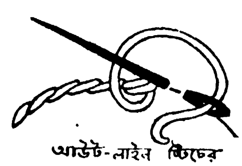


উপরের ছবিতে হাত-ব্যাগের বাইরের দিকে রঙীণ উল দিয়ে ফুল-লতা-পাতার যে বিচিত্র নক্সার কাজ তৈরী করতে হবে, তার নমুনা দেওয়া হলো। এই নমুনাটি কিম্বা নিজের পছন্দমতো অন্য কোনো ধরণের নক্সা গোড়াতে একখানি কাগজের উপর পরিপাটি ছাঁদে এঁকে নিয়ে, পরে সেটিকে হাত-ব্যাগের কাপড়ের বুকে সুষ্ঠুভাবে 'ছকে' অর্থাৎ 'ট্রেস্' (Tracing) করে নিতে হবে। 'ট্রেসিং'এর কাপড়টি ভাঁজ করে নিয়ে, এক দিকে নক্সাটিকে ছকে নেবেন। তারপর উপরের নক্সার ঐ ফুলগুলিকে রঙীণ 'ট্যাপেষ্ট্রি' পশমের সাহায্যে পাশের ছবিটিতে সেলাই বা 'ষ্টিচের' যে-



পদ্ধতি দেখানো হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে তৈরী করবেন। এ ধরণের সেলাইয়ের পদ্ধতিকে ইংরাজীতে বলে—'লেজি-ডেজি ষ্টিচ' (Lazy daisy stitch)। সেলাইয়ের সময় নজর রাখবেন—ফুলের ফাঁকে-ফাঁকে কাপড়ের অংশ যেন এতটুকু না দেখা যায় ব্যাগের বাইরের দিক থেকে।

ফুলগুলি তৈরী করতে হবে—গোলাপী রঙের যে দুই রঙের পশম রয়েছে—তাই দিয়ে। তবে পাশাপাশি দু'টি ফুল যেন একই রঙের না হয়। পাশাপাশি একই রঙের দুটি ফুল থাকলে নক্সার বাহার খুলবে না—তাই এদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। ফুলের মাঝখানে রেণুগুলি হবে হলদে রঙের পশমে—বিলাতী 'ফ্রেঞ্চ-নট' সেলাইয়ের পদ্ধতিতে। ফুলের পাশে পাতাগুলি সেলাই হবে উপরোক্ত 'লেজি-ডেজি ষ্টিচে'—কোনোটা গাঢ় সবুজ, কোনোটা ফিকে সবুজ রঙের পশমে। পাতার



ডাঁটি সেলাই হবে পাশের ছবিতে দেখানো 'আউট-

লাইন ষ্টিচ' (Outline stitch) পদ্ধতিতে। এ ছাড়া ব্যাগের কিনারাও মুড়বেন ঐ 'আউট-লাইন ষ্টিচ' সেলাই পদ্ধতিতে নীল রঙের পশমে এবং হলদে রঙের সুতো দিয়ে এই নীল 'ধারির' উপর 'হেমিং' (Hemming) সেলাই দেবেন।

এমব্রয়ডারির কাজ শেষ হলে, কাপড়টিকে উল্টো করে পেতে তার উপর ঈষৎ-ভিজে আর একখানি কাপড় চাপা দিয়ে সাবধানে ইস্ত্রী করে নিতে হবে। ঐ ভিজে কাপড়ের উপর ইস্ত্রী চালানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে—চাপ যেন বেশী না পড়ে···কাপড়ের উপর ইস্ত্রীর বেশী চাপ পড়লে, পশমটি চেপে-দেবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা! এ কাজের পর, 'লাইনিং' বা 'অস্তর' বসানোর জন্য কাপড়ের যে টুকরোটি রয়েছে, সেটিকেও পারিপাটিভাবে এমব্রয়ডারি করা কাপড়টির উপর মাপে মাপে পেতে ইস্ত্রী করে নেবেন।

হাত ব্যাগের জন্য ৮ ইঞ্চি লম্বা দুটি হাড়ের কাঁটা বা কাঠের কাঠি অর্থাৎ 'বিড্' (Bead) এর কথা আগে বলেছি; সেগুলিকে ব্যাগের দুই প্রান্তে 'লাইনিং' বা 'অস্তরের' ভিতর দিয়ে চালিয়ে ব্যাগের কিনারা মুড়ে নিন উপরোক্ত 'আউট-লাইন ষ্টিচের' সেলাই করে। পশমের কাজ শেষ করে ঐ নীল ধারি-দেওয়া অংশের উপরে হলদে সুতোর 'হেম্' (Hem) সেলাই দিতে হবে ··একেবারে ঘেঁষাঘেষি ধরণে হলদে সুতোর সেলাই দেবেন—একটু ফাঁক-ফাঁক ভাবে সেলাইয়ের কাজ করবেন। নজর রাখবেন—এ সেলাই যেন বরাবর সোজা-সুজিভাবে এবং উঁচু দিকে থাকে! এবারে কাপড়ের আরো যে একটি ১০ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি টুকরো রয়েছে—সেটিকে পরিপাটি ভাবে 'পকেট' বা 'খোপের' মতো ধরণের দু'পাটে ভাঁজ করে হাত ব্যাগটির ভিতরে সেলাই করে দিতে হবে। সাধারণতঃ ব্যাগে যেমন দুটি বা তিনটি 'খোপ' করা থাকে—সেই ভাবে জুড়বেন। জোড়া দেবার সময়, এই দু'ভাগ কাপড়ের মাঝখানে যদি একটি মজবুত-গোছের 'পেষ্ট-বোর্ডের' (Paste board) টুকরো লাগিয়ে নেন, তাহলে ব্যাগটি আরো বেশী কার্য্যকরী ও টেঁকসই হবে। তবে, ময়লা হলে, এ ব্যাগটিকে কাচবার সময় ঐ 'পেষ্ট-বোর্ডের' টুকরোটিকে বার করে নিয়ে তারপর পশমী-কাপড়-কাচার পদ্ধতিতে ধোলাই করতে হবে। ব্যাগের ভিতরের দিকে 'খোপ' তৈরী হয়ে যাবার পর, নক্সাদার বাইরের অংশ দুটিকে পরস্পরের মুখোমুখি-ভাবে সাজিয়ে দুই প্রান্তে দুটি 'সেফটি-হুক্' (Safety hook) বা 'টিপ-কল' লাগিয়ে নেবেন।

তারপর, হাত ব্যাগের হাতল তৈরী করবার জন্য, মানান-সই আট-দশটি রঙের 'তিন-ফেরতা' (3-ply) পশমের সমান আকারের লম্বা লম্বা টুকরো নিয়ে, সেগুলিকে পরিপাটি ভাবে দড়ির মতো ছাঁচে পাকিয়ে নিন। এবারে ঐ রঙীণ পশমের দড়ির মুখে হাড়ের বা কাঠের কাঠি (Beads) দুটি লাগিয়ে দিয়ে, কাঠির মুখ দুটি দুধারে সেলাই করে এঁটে দিন।

তা হলেই দেখবেন—সুন্দর একটি নক্সাদার পশমের হাত-ব্যাগ তৈরী হয়েছে।

প্রেম তবে প্রবঞ্চনা ?

'বৈভব'

প্রেম তবে প্রবঞ্চনা ?
—প্রেম নহে আরাধনা ?

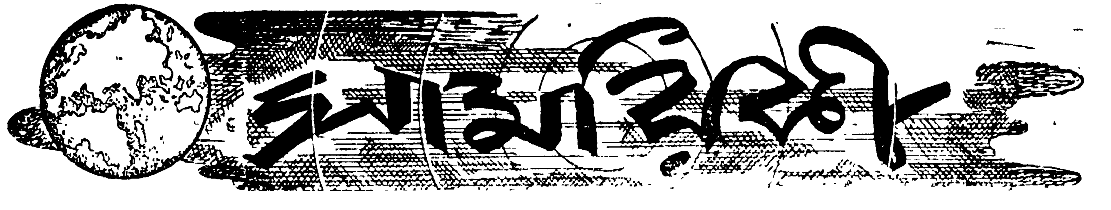
*   *   *

নিতি নিতি কলগীতি
মিলনের মধু
'তুমি আমি, আমি তুমি'
—দুটি কথা প্রাণে চুমি।

তারপর ভুলে যাওয়া—
বিরহের গান গাওয়া।

*   *   *

প্রেম নহে প্রবঞ্চনা।
প্রেম—জীবনের উন্মাদনা।
মরণের আরাধনা!
প্রেম—একাকীর উপাসনা।



আসামে বঙ্গাল-খেদা—

আমরা গত মাসের ভারতবর্ষে আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তখনও সকল সংবাদ ঠিক ভাবে আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাহার পর আসাম হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে,তাহাতে শুধু বাঙ্গালী জাতি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয় নাই—সমগ্র ভারতবর্ষের লোক প্রাদেশিকতার তাণ্ডব লীলায় বিস্মিত হইয়াছে। প্রথমে ভাষা-সমস্যা লইয়া আসামে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ হয়। আসামে অসমীয়া ভাষা-ভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক নহে। একাংশে নাগা জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ। সম্প্রতি নাগাদের আন্দোলনের ফলে আসামের একাংশ লইয়া নাগা-রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে—কাজেই নাগারা নিজেদের রাজ্যে নিজেদের ভাষা লইয়া থাকিবে—আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব। বাকী অংশে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা কম নহে। নানা কারণে বহু বৎসর ধরিয়া (শতাধিক বৎসর ত বটেই, তদপেক্ষা অধিক হইবে) বাংলাদেশ হইতে বাঙ্গালী যাইয়া আসামে বাস করিতেছে। যে কারণেই হউক, বাঙ্গালীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক অগ্রসর বলিয়া আসামের অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য অধিক। একদল অসমীয়া বাঙ্গালীদিগকে ও অসমীয়া-ভাষা-ভাষী বলিয়া ঘোষণা করার পক্ষপাতী।

১৯৬১ সালে আদম সুমারী বা লোকগণনা আসিতেছে—যদি আসামবাসী সকল লোককে বা অধিকাংশ লোককে অসমীয়া ভাষা-ভাষী বলিয়া গণ্য করা না যায়, তবে পরবর্তী নির্বাচনে বঙ্গ-ভাষাভাষীদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকরী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ও অ-অসমীয়াদের জন্য উপযুক্ত স্থান প্রদান করিতে হইবে। এই সব ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য গত জুলাই মাসের প্রথম হইতে আসামে বাঙ্গালী-বিতাড়ন আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গ-ভাষা-ভাষী সকল আসামবাসী যাহাতে আসাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় সেজন্য আসামের মন্ত্রিসভা ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সমর্থনে হঠাৎ একদিন রাজ্যের সর্বত্র বাঙ্গালীদিগকে প্রহার আরম্ভ হয়—শুধু প্রহার নহে—প্রহারের মাত্রা এত অধিক হয় যে বহু লোক তাহার ফলে নিহত হয়। আসামের সকল সহরে বাঙ্গালীর গৃহে আগুন ধরাইয়া বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালী গৃহস্থগণ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়—কিন্তু তাহাতে ও ফল হয় না। প্রকাশ্যভাবে বাঙ্গালী মহিলাদের উপর অমানুষিক ও বর্বরোচিত নির্য্যাতন হয়—পথে ঘাটে মাতা পিতার সম্মুখে শিশু হত্যা করা হয় এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই দোকান পাট, ধন-সম্পত্তি সকলই লুণ্ঠিত হয়। এই ঘটনার প্রথম ২ দিন আসাম গভর্ণমেণ্ট তথা আসামের পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। আসামের রাজ্যপাল প্রাক্তন সামরিক-নেতা শ্রীশ্রীনাগেশ তৃতীয় দিনে পথে ঘাটে সৈন্য মোতায়েন করিয়া বাঙ্গালীকে রক্ষা করার ব্যবস্থায় অগ্রসর হন। কিন্তু আসামের মন্ত্রিসভা প্রথম হইতে প্রকাশ্যভাবে দুষ্কৃতকারীদের সমর্থন করায় অবস্থা আয়ত্তে আনিতে বহু বিলম্ব—প্রায় ১১ দিন চলিয়া যায়। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীচালিহা বাঙ্গালী বিদ্বেষীছিলেন না—সেজন্য তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া ঘরে আটক থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং অর্থসচিব শ্রীফকরুদ্দীনের হাতে দেশ-পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তিনি প্রথম হইতেই বাঙ্গালী বিদ্বেষী ছিলেন এবং বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার দমন ব্যবস্থায় আদৌ মনোযোগী হন নাই। দিল্লীতে খবর পৌছিলে কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সঙ্গে লইয়া আসাম পরিদর্শনে গমন করেন এবং আসাম সরকার তথা মন্ত্রিসভা কৌশলে শ্রীনেহরুকে বুঝাইয়া দেন যে আসামের ঘটনা তত উল্লেখ-যোগ্য নহে। এমন কি—ঐ সময়ে দিল্লীতে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হয়, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় যোগদান করিয়া আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের সকল ঘটনা উপস্থিত করা সত্বেও সেখানে আসাম সরকার তথা আসাম কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের কার্য্যের নিন্দা করিয়া কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এমন কি অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে অগ্রসর হন নাই। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রবল থাকায় এবং ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালীর আধিপত্য ইদানীং ঐ সকল রাজ্যের নেতাদের চক্ষু-শূল হওয়ায়—কেহই বাঙ্গালীর এই বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন নাই। এমন কি, ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় শ্রীনেহরুর উক্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলিয়া মনে হইয়াছে। আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতন কিরূপ মর্মন্তুদ ও শোকাবহ হইয়াছে, তাহা, পাঠকগণ প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন—আমরা সে সকল ঘটনার পুনরুক্তি করিতে বিরত থাকিলাম। শুধু ঐ সকল সংবাদ পাঠ করিয়া বার বার মনে হইয়াছে যে আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতন—পাকিস্তানে হিন্দু নির্য্যাতনকেও হার মানাইয়াছে—নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি ব্যাপার পাকিস্তানেও হয়ত এমন কঠোরভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। শত শত নহে, হাজার হাজার বাঙ্গালী পরিবার আসামের বাস ত্যাগ করিয়া নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালায় চলিয়া আসিতেছে—পূর্ববঙ্গ হইতে ২ কোটি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসায় পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের বাসস্থান দান করা অসম্ভব হইয়াছে। তাহার উপর আসাম হইতে যদি ২০।৩০ হাজার বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে চায়, তবে তাহাদের লইয়া বাংলা সরকার কি করিবেন? কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গৃহহীন ও আশ্রয়হীন বাঙ্গালী পরিবারগুলির আসামে পুনর্বসতির জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অসমীয়াদের মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে তাহা কিরূপে সম্ভব, তাহা বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারিতেছে না।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ শুধু আসাম সরকার তথা আসাম কংগ্রেস-নেতাদের বাঙ্গালী নিধন ব্যবস্থার নিন্দা করেন নাই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিষ্ক্রিয়তারও নিন্দা করিয়াছেন। ফলে কংগ্রেস কর্মী সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে—আগামী ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে কোন উৎসব পালন করা হইবে না এবং অনেক স্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদে জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করা হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র অধিবাসীরা সেদিন নীরবে প্রার্থনা করিয়া বাঙ্গালার প্রতি এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবে। অনেক স্থানে ঐদিন মৌন-মিছিল বাহির করিয়া সকলকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের সংবাদ আসার পর জলপাইগুড়ী ও কুচবিহারে বাঙ্গালীরা কিছু বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল বটে, কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপের ত্বরান্বিত কার্য্যের ফলে তাহা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ঐ সময়ে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটের পঞ্চম দিবসে (১২ই জুলাই ধর্মঘট আরম্ভ হয়) অর্থাৎ ১৬ই জুলাই শনিবার আসাম দিবস পালিত হয় বটে, কিন্তু সেদিন অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা শুনা গেলেও কার্য্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোন অনাচার ঘটে নাই—সেদিন ডাক্তার রায়ের সরকার এমন নিবারক-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব হইতে দুষ্ট লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন যে কোথাও কেহ অনাচার করিতে সাহসী হয় নাই।

বাঙ্গালীর আজ সত্যই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। যাঁহারা নেতার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের উপর নানাকারণে দেশবাসীর যথোচিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। দেশে বহু রাজনীতিক দল গঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন কংগ্রেসের শক্তি কমিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ঐ সকল দলের নেতাদের উপর—পি-এস-পি, জনসংঘ, কম্যুনিষ্ট দল প্রভৃতি—কাহারও বিশ্বাস নাই। ফলে আজ দেশবাসীকে সঠিক কর্তব্যপথ প্রদর্শনের লোকের অভাব। এই দুর্দিনে পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগকে উত্তেজিত হইয়া সহসা কিছু করিতে সকলেই নিষেধ করিবেন। বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ধীরভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। আজ যদি আমরা কোন কারণে—আসামে


রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল'
বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
লাবণ্যময়ী হয়···! সুবাস ভরা রেক্সোনার
রশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
জ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী।
RP.165-X52 BG

বাঙ্গালীর প্রতি অনাচারের প্রতিবাদে বাংলা হইতে আসামী বা যে কোন অবাঙ্গালীকে তাড়াইতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে যে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার বাস করিয়া জীবিকার্জন ও শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছে, তাহাদের কি হইবে তাহা সর্বাগ্রে চিন্তা করা প্রয়োজন। বরং কংগ্রেস হইতে শান্তিসেনার দল গঠন করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করিয়া সে সকল স্থানের বাঙ্গালী অধিবাসীদের কাছে পাঠাইতে হইবে ও বুঝাইতে হইবে—আজ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাসঙ্কুল—কাজেই যত অধিক সংখ্যার বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বাস করিবে, ততই তাহা পরোক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালীদিগকে সাহায্য করা হইবে। সেজন্যই আজ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার দণ্ডকারণ্যে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্ত বাঙ্গালীকে পাঠাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন ও সেজন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না।

আসামের অনাচার আমাদের নূতন শিক্ষাদান করিয়াছে। কেন্দ্রের নিকট ধর্ণা দিয়াও এই উপক্রুত আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইল না। আসামের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোন নিরপেক্ষ সুপ্রীমকোর্ট-বিচারক দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থায় সম্মত হইল না। এ বিষয়ে শ্রীনেহরু যে কৈফিয়ৎই দান করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের এই দুইটি দাবী উপেক্ষিত হইলে তাহারা নিজেদের সত্যই অসহায় বলিয়া মনে করিবেন। কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে এতগুলি রাজ্য গঠিত হইয়া পরস্পর সহযোগিতা দ্বারা ও কেন্দ্রের সমর্থন লাভ করিয়া রাজ্যপরিচালনা করিতেছে। আসামে বাঙ্গালীদের উপর এই অত্যাচারের প্রতীকারে কেন্দ্রীয় সরকার যদি উদ্যোগী না হয়, তবে রাজ্যসরকার কাহার উপর ভরসা করিয়া কাজ করিবে। আমরা জানি, বর্ত্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে দেশরক্ষা ও শাসন করা সম্ভব নহে। সেজন্যই এখন পর্য্যন্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মত তেজস্বী ব্যক্তিও কোন কঠোর পথ অবলম্বনের কথা ব্যক্ত করেন নাই। কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী, সুচেতা কৃপালানী, আভা মাইতি প্রভৃতির নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল আসাম যাইতেছে, তাহাদের উপর বাঙ্গালী তাহার এই বিপদে অনেকটা নির্ভর করিবে এবং আশা আছে, তাঁহারা আসামের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবেন।

আজ আমাদের আসামবাসী আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই বিশেষ বিপন্ন—কাজেই বাঙ্গালীর পক্ষে আজ বিচলিত ও উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু এই অবস্থাতেও আর যাহাতে আসামবাসী বাঙ্গালীরা আসাম ত্যাগ না করে ও যাহারা আসাম হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা ও পুনর্বসতি লাভ করিয়া আসামে ফিরিয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। শুধু অর্থ সাহায্য দান করিয়া নহে, মানুষের মধ্যে মনের বল ফিরাইয়া আনিয়া এ কার্য্য সম্পাদন করা প্রয়োজন।

আসামের একাংশ স্বাধীনতা লাভের সময় পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। ত্রিপুরা ও মণিপুর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন—নাগারা পৃথক রাজ্যগঠন করিয়া লইল, তাহাও কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন থাকিবে। এ অবস্থায় ছোট আসাম রাজ্য হইতে সকল বাঙ্গালী যদি চলিয়া আসে, তবে আসামীদের কি অবস্থা হইবে—কি করিয়া আসামের অর্থনীতি-ব্যবস্থা চলিবে—অসমীয়ারা ও কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন না? একদল রাজনীতিকের প্রদত্ত উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া যাহাদের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারা কি পশুই থাকিয়া যাইবে, না পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সভ্য জগতে বাস করিবে? আসামের নেতারা আজ অসমীয়াদিগকে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করুন—বাঙ্গালীদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়া আসামের পার্ব্বত্য আদিবাসীরা আজ জাগরণ লাভ করিয়াছে—তাহারা কি এইভাবে উপকারী বাঙ্গালী-বন্ধুদের প্রত্যুপকার করিবেন—না মানুষের মত ব্যবহার দ্বারা বন্ধু বাঙ্গালী-অধিবাসীদের নিজস্ব করিয়া লইয়া দেশের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবেন। এই ঘটনার ফলে আসামের গঠনমূলক কার্য্যসমূহও অবশ্যই বিলম্বিত হইবে এবং তাহার ফল সকল দেশবাসীকে ভোগ করিতে হইবে। আমরা দেশের অধিবাসীকে আজ অবিচলিত থাকিয়া কর্ত্তব্য পালনে আহ্বান জানাই।

আসামে নূতন নাগারাজ্য—

গত ১লা আগষ্ট দিল্লীতে পার্লামেন্টের প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এক বিবৃতি পাঠ করিয়া জানান যে নাগা-নেতাদের প্রস্তাব অনুসারে আসামে 'নাগাল্যাণ্ড' নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করা হইল। তথায় নূতন বিধানসভা ও মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে। আপাতত আসামের রাজ্যপাল নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল হইবেন। যেমন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক নাগা অঞ্চল শাসিত হইতেছিল, তেমনই ঐ বিভাগই আপাততঃ নাগাল্যাণ্ড শাসন করিবেন, নাগা রাজ্যের মধ্যেই টুয়েন-সাং জেলার শাসনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতে বর্তমানে ১৫টি রাজ্য ছিল—নাগাল্যাণ্ড ষোড়শ রাজ্য হইল। ঐ অঞ্চল ভারতের উত্তর-পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত—সে জন্য ঐ অঞ্চল শাসনের ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে দিল্লীতে কয়দিন ধরিয়া নাগা-প্রতিনিধিদের সহিত শ্রীনেহেরুর আলোচনার ফলে এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস—এই নবরাজ্য গঠনের ফলে ভারতের ঐ অঞ্চল সুরক্ষিত হইবে। নূতন রাজ্যের উত্তরে শিবসাগর জেলা, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে মিকির ও উত্তর কাছাড় ও দক্ষিণে মণিপুর রাজ্য অবস্থিত। ডিমাপুর, কোহিমা প্রভৃতি সহর নাগাপাহাড় জেলার মধ্যে অবস্থিত।

কর্ণাটক-কেশরী দেশপাণ্ডে—

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা কর্ণাটক-কেশরী গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে গত ৩০ শে জুলাই বেলগাঁও সহরে ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ছিলেন এবং বহু বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে গত ৫৫ বৎসর তিনি সক্রিয় রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

উড়িষ্যার চাল—

পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত জুলাই মাসের শেষে উড়িষ্যা যাইয়া সেখান হইতে অধিক চাল আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তথায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ও সরবরাহ-মন্ত্রী নীলমণি রাউত রায়ের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে চালের মণ—২১।২২ টাকা। তবে কালাহান্দি ও কোরাপুট জেলায় ১৮।১৯ টাকা মণ দরে বাংলার জন্য ১৫ হাজার টন চাল কিনিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। মালগাড়ী পাওয়া গেলেই ঐ চাল পশ্চিমবঙ্গে আনা হইবে। এ বৎসর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চালের মণ ১৯৫৯ সালের এই সময়ের দাম অপেক্ষা মণকরা ২ টাকা কম। তবে বাঙ্গালীর পক্ষে উড়িষ্যার চাল খাওয়া কষ্টকর ব্যাপার।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাসগৃহের একাংশে বর্তমানে 'রবীন্দ্র ভারতী' প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। ঐ গৃহের অন্যান্য অংশ ক্রয় করিয়া আগামী বৎসর তথায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এখন রবীন্দ্র ভারতীতে গান, নাটক ও সঙ্গীত আলোচনার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার নামে তাঁহার গৃহে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাই—সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইবে। বদান্য দেশবাসী এ বিষয়ে উপযুক্ত অর্থসাহায্য দান করিলে সত্বর ইহা সম্পাদন সম্ভব হইবে।

টালীগঞ্জ এলাকার উন্নতি—

টালীগঞ্জ এলাকার ১২ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান উন্নত করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের সকল অসুবিধা দূর করার জন্য একটি নূতন স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১২ বর্গ মাইলের মধ্যে ৭ বর্গ মাইল কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে ও ৫ বর্গ মাইল তাহার বাহিরে অবস্থিত। হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের পর টালীগঞ্জ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠিত হইলে ঐ অঞ্চলে নূতন নূতন পল্লীর অধিবাসীরা অবশ্যই উপকৃত হইবে। কসবা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া, নাকতলা, টালীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যে পরিমাণে লোকের বসতি বাড়িয়াছে, সে পরিমাণে পথ, ড্রেণ, জল, আলো, বাজার, যানবাহন

প্রভৃতির ব্যবস্থা হয় নাই। নূতন সংস্থার কার্য্য যত সত্বর আরম্ভ হইবে, ততই দেশবাসীর পক্ষে আনন্দের কথা।

বাঙ্গালীর দণ্ডকারণ্য যাত্রা—

গত ২৭শে জুলাই কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভায় স্থির হইয়াছে, আগামী অক্টোবর মাস হইতে প্রতিমাসে ১২ শত করিয়া বাঙ্গালী উদ্বাস্তকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাওয়া হইবে। বিভিন্ন শিবিরের লোকই প্রথম যাইবে। প্রথমে পারলিকোট ও উমেরকোটের গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ ও চাষের জমীর কাজ আরম্ভ হইবে। পূজার পূর্বেই আরও ৫ শত উদ্বাস্তকে পারালকোটে—স্থায়ী বাসস্থান দান করা হইবে। এ পর্য্যন্ত ১৮ শত বাঙ্গালী-উদ্বাস্ত পরিবার দণ্ডকারণ্যে গিয়াছে—২ শত পরিবার পুনর্বাসন লাভ করিয়াছে—৪ শত পরিবারকে পুনর্বাসন স্থানে পাঠান হইয়াছে। বাকী ১২ শত পরিবার অক্টোবর মাসে উমেরকোটে পুনর্বাসন লাভ করিবে। তথায় ছুতার, রাজমিস্ত্রী ও শিক্ষকের অভাব অধিক। ঐ শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যায় লইয়া যাওয়া হইবে। গৃহ-নির্মাণ, জলাশয় খনন প্রভৃতি কাজ তাহাদের দেওয়া হইবে। ৪০ জন উদ্বাস্ত মোটর চালক ও তাহাদের সহকারীকে তথায় লইয়া যাইয়া পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ঐ সকল লোক যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে, এখন হইতে সে জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষা-ব্যবস্থা আরম্ভ করিতে হইবে।

মাংস বনাম হাড়

মলয় রায়চৌধুরী

সুরেদের কেষ্টবাবু হঠাৎ হাজির সেদিন সকালে। খরোষ্ঠি লিপি উদ্ধারেচ্ছু প্রিন্সেপের মতো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেললাম ওঁর দিকে। বললেন—"কি আর বলবো দাদা, বউ একেবারে বোম্‌পেলাট্‌"। শেষে ভাল করে বোঝালেন ব্যাপারটা। স্ত্রীর ওজন হয়েছে একশো পঁচাত্তর পাউণ্ড এবং কেষ্টবাবু নিজে সেই ছিয়ানব্বই পাউণ্ডেই নট-নড়ন-

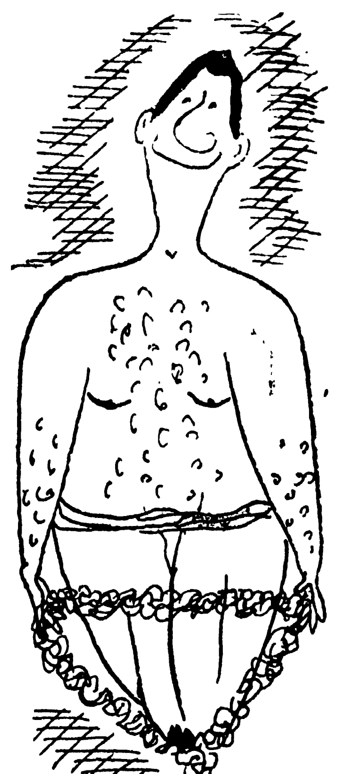


একেবারে বোম্‌পেলাট্‌

চড়ন রয়েছেন। এখন উপায়? পাশাপাশি হাঁটা দায় হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে শতকরা পঁচাত্তরজনের অবস্থা কেষ্টবাবুদের মতোই। অফিস করতে বের হন কেউ টিং-টিং করতে করতে—আর কেউবা গদাই-লস্করীতে থপ-থপিয়ে। ঠিক চেহারায় সাম্য রেখেছেন আর কজন। আর সাম্য না হলেই গোলবাধার উপক্রম—তখনই আরম্ভ হবে জীবনের কোনটিকি যাত্রা, একবার এ ঢেউয়ে কাৎ, আর একবার ও ঢেউয়ে কাৎ।

যাঁরা মোটা, অর্থাৎ কেষ্টবাবুর ভাষায় বোম্‌পেলাট্‌—তাঁদের কথাই ভাবুন। কি অবস্থাখানা। বাসের ভেতর একটু এদিক ওদিক হেলার উপায় নেই, হেললেই চতুর্দিক হতে উঃ—আঃ—গেলুম—শুনতে হবে, বাস থেকে নামার সময়ও তাই—ঢেউএর মতো দুপাশের ভীড় যাবে সরে, কিন্তু তারপরই সামলাতে না পেরে ভীড়টি যদি একবার এদিক আর একবার ওদিক হয় তাহলেই হয়েছে। কিম্বা সেই কনেটির মনের কথাই একবার ভাবুন। শুভদৃষ্টির সময় যদি সামনে একখানি বপুকে এবং মূর্তিমান মাংসকে পিটপিটিয়ে 'মালাখানি' বাড়াতে দেখে—তখন? তারও ইচ্ছে সেই মেয়েটির মতো হবে, যে টাক-মাথা-বর দেখে শুভদৃষ্টির সময় কোন্নগর থেকে পেনিটির দিকে



শুভদৃষ্টির সময় যদি…

দৌড়ে ছিল। ব্যবসার মতো মোটা হওয়ার ওপরে আমাদের মাড়োয়ারী ভাইদের একচেটিয়া অধিকার—ওঁদের যেন মাংস-চর্বিরও মনোপলি। একবার এক শেঠজীকে দেখেছিলাম 'অংরেজীখেল' দেখতে গিয়েছিলেন, বোধহয় চ্যারিটিফাণ্ডের টিকিটখানা কেটেছিলেন বলেই

তাঁর আগমন সম্ভব হয়েছিল। হলটিতে সেদিন ভীড় হয়েছিল প্রচণ্ড, নিজের মাংসল অস্তিত্ব স্মরণ করে মুখ শুকিয়ে গেল শেঠজীর। বললেন—"হায় রাম, একদম হাউল ফুস"। মানে হাউস ফুলটা আর বের হলনা মুখ দিয়ে।

অবশ্য এককালে এমন ছিল যখন গায়ে-গত্তি-লাগা



একদম হাউলফুস…

না হলে মেয়েদের সুন্দরী বলা চলত না, প্যারাগণ অব বিউটি, শুধু তাঁদেরই বলা হত যাঁদের মাংস-চর্বির পরিমাণ হাড়ের চেয়ে বেশী। আর পুরুষদের তো কথাই নেই, একটু বালাইষাট-বলতে-পাওয়া চেহারা না হলে তাঁদের ব্যক্তিত্বই খুলত না তেমন।

কিন্তু দিনকাল গেছে বদলে, সকলেই এখন একটু 'স্লিম্' হতে চায়। মেয়েদের ঝোঁক গেছে 'এইট্ শেপ্' চেহারার দিকে, সকলেরই আদর্শ ব্রিজিট্ বার্ডোট্ কিম্বা মারলীন্ মনরোর তথাকথিত 'বিউটি'। অনেক মহিলার মতে স্লিম্ না হলে নাকি নাইলন খাপ খায় না আর হৃদয়-খোলা-ওয়েস্ট কাট্ ইত্যাদি নানারকম নতুন ডিজাইনও গ্রহণ করা যায়না।

স্লিম মানে রোগা নয়, স্লিম মানে তন্বী। বিয়ের বাজারে তাই তন্বী না হলে পার করা ভার। পূর্বসূরীদের ছিল স্বাস্থ্যবতী, এখন তাঁদের উত্তরসূরীদের হয়েছে তন্বী। তন্বী হবার জন্যে বাজারে ক্যালোরি চার্ট, ডায়েট্ কন্ট্রোল ইত্যাদি বহু কিছু পাওয়া যায়। পুরুষেরাও অনেকে চেহারা ঠিক করার জন্য ক্লোরোফিল্-ভিটামিন্ থেকে সমতুল ভোজন অবধি সব পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। সাত সকালে উঠেই চলেছে নানা প্যাটার্নের ডিগবাজী আর কসরৎ।

স্লিম হলেই কেবল হল না—মাপে মাপে জামা কাপড়ও প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। এক ভদ্রলোক বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, স্ত্রীর জন্যে তাঁর একটা কোট্ কেনার ইচ্ছে হল। কিন্তু এখন সাইজ বলেন কি করে। তাই স্ত্রীর উচ্চতা জানালেন। দোকানদার আরও সমস্ত মাপ জিজ্ঞাসা করলে বললেন: "শী ইজ স্লিম্ ইন দি হিপ্, বাট্ ক্যারীজ লারজার পোরশান্ অব হার কার্গো অন হার আপার ডেক্!"

তাহলেই অবস্থা বুঝুন! তন্বী হবার ইচ্ছে হলেই হল না, তাকে আবার সামলাতেও হবে। আমেরিকায় আজকাল তন্বী হবার দিকে সকলেরই ঝোঁক। সুযোগ বুঝে ব্যবসাদাররাও বাজারে নানারকম আকর্ষক মাল ছেড়েছেন।



আজকাল আবার তন্বী না হলে…

আমাদের দেশে আবার তিরিশোত্তরে ভুঁড়ি হয়ে যাওয়া আর এক গুণ। এদিকে হয়ত উনত্রিশ ইঞ্চি বুক

কিন্তু ভুঁড়িটি ঠিক চল্লিশে পৌঁচেছে, আর তাই নিয়ে রাত্তির দিন হাঁস-ফাঁস। অনেকে বলেন যে ভুঁড়ি হচ্ছে কিনা সে খবর প্রথম থেকেই রাখা উচিত এবং বনস্পতি, ঘী ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করা উচিত। ভুঁড়ি গজিয়েছে কিনা তা দেখবার জন্যে সটান শুয়ে পড়ুন চিৎ হয়ে, আর দেখুন বুড়ো আঙুল দেখা যায় কিনা দু'পায়ের। পেটের এভারেষ্টে দৃষ্টি আটকালেই বুঝবেন যে হ্যাঁ আপনিও এবার গণ্যমান্য হচ্ছেন। মেয়েদের ভুঁড়িটি তত বাড়েনা, কারণ তাঁদের আগাপাশতলা চর্বি বাড়তে থাকে জাহাজের শ্যাওলার মতো। কিন্তু ভারতে রোগাই বোধ হয় বেশী। সেজ মাইমাদের মতো দুমণ পঁয়ত্রিশ সের আর কজনেরই বা হয়? তাই ঝোঁকটা বেশী মোটা হওয়ার দিকেই।

মোটা হওয়ার জন্যে ডাক্তারমশাই হয়তো বলবেন যে, আপনার ছোট ছেলেটি যা খায় সেই সবই খান আপনি। অবশ্য তার মানে এ নয় যে আপনার ছোট ছেলের মতো আপনিও ঝুমঝুমি, পুতুল, ইট্‌পাট্‌কেল, জুতো, জামা সব চেবাতে আরম্ভ করবেন! দিনে খাওয়া থেকে সবশুদ্ধ তিন হাজার ক্যালরী গ্রহণ না করলে চেহারাটি ফিরবে না। বাঙালী তার দৈনিক খাওয়া থেকে ঠিক মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায়। ভাত, রুটি, আলুর তরকারী থেকে পায় কর্বোহাইড্রেট্‌, আর মাছ থেকে এবং শাক থেকে বাকী জিনিসগুলো পায়। আরেকটা জিনিস যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বৎসরান্তে একবার চেঞ্জে যাওয়া। এর অনেক গুণ। এ গুণে রাঁচীর লোক কলকাতা গিয়ে এবং কলকাতার লোক কাশী গিয়ে মোটা হয়ে ফেরেন। আরেক জিনিস যা প্রয়োজন তাহল মন। ডানলোপিলোয় বসে মনকে অসুস্থতার বাঁশবাদাড়ে পাঠালে চেহারা সামলানো কোনো কালেই সম্ভব নয়।

কেষ্টবাবু এককালে বলতেন যে, "মশাই টাকা না হলে চেহারা ঠিক রাখা কারুর কম্মো নয়।" উনি নজির দেখাতেন—সিনেমার অমুক-কুমার, তমুক-কুমারের কিম্বা শেঠ বিঠলভাই ঢনঢনগোপালদের। পাঁজির আকারের সিনেমা পত্রিকাগুলো জোগাড় করে প্রমাণ করতে চাইতেন যে মোটা হওয়ার অনুপাত টাকার অঙ্ক অনুযায়ী। কিন্তু ওঁর স্ত্রীও যখন একটু গায়ে-গতরে বাড়লেন তখন ভুলটা একটু ভাঙল। সম্পূর্ণ ভুল ভাঙেনি কারণ ওঁর সন্দেহ হয় যে এ নিশ্চয়ই ওঁর স্ত্রীর নামে একশো পঁয়ত্রিশ টাকার ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট থাকার গুণ!

আমার এক বয়সকালের বন্ধু দুঃখ করত যে—সে মোটা বলেই নাকি প্রেমে পড়লনা। আমরা সান্ত্বনা



আমার এক বন্ধু একবার প্রেমে পড়েছিল…

দিতাম যে প্রেমে পড়া অত সোজা নয়, তার জন্যে চাই হরেক রকম ডুয়েট্‌গানের কলি মুখস্থ, চাই ঘোড়ায় চড়তে জানা, সোর্ড ফাইটিং আর একখানা পেল্লাদ টাইপ্‌ সব-থেকে-বেঁচে-যাওয়া গুণ। কিন্তু শেষে বন্ধুটিও পড়ল প্রেমে এবং তারপর বিবাহাদি করে যখন রোগা হয়েছে তখন আবার একদিন দেখা। বলল প্রেমে পড়েই রোগা হয়েছে। এখন বুঝুন ঠ্যালা, এ যেন মাছের কাঁটা গেলা! মোটা হওয়াও বিপদ, আবার রোগা হওয়াও বিপদ। তাই প্রয়োজন একখানি গোলগাল না-মোটা না-রোগা চেহারার।

কিন্তু মোটা বা রোগা হলেই হলনা। সহন শক্তি থাকা চাই। চেহারার ভয়ে তিনতলার ঘর ভাড়া নেন না

অনেকে—কারণ কষ্ট সইবে কে? এই কষ্ট দূর করার জন্যে আমেরিকার ওয়াল্টার রীড্ আরমি ইন্সটিটিউট্-এর ডাঃ রবার্ট গালামবস এবং ডাঃ গ্যাব্রীয়েল্ নাহাস্ এক রকম ওষুধ বের করেছেন। এর পর আপনার নিউ সেক্রেটারিয়েট্ বিল্ডিংএর ওপরতলায় একটা ঘর পেলেও ক্ষতি নেই। এক ঢোঁক শুই শুষুধ খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন!

রোগা যাঁরা তাঁরা একটা জিনিস পান, সে হল বেশী বছর বাঁচতে—একে আপনি লাভই বলুন আর ক্ষতিই বলুন। মাংসল পাকা-চুলে-দাদু খুব কম দেখবেন। বেশীর ভাগ দাদুই যাঁরা নাতজামাই-নাতবউএর যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকেন—তাঁরা মোটা নন—অবশ্য খুব রোগাও নন।

যাই হোক, মোটা বনাম রোগা বা মাংস বনাম হাড়ের ঝগড়া আমাদের দেশে বহুকাল চলেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের উচিত জমি বণ্টনের সঙ্গে এগুলো বণ্টনের দিকে একটু লক্ষ্য দেওয়া। যদিও জমির মতোই এগুলোকেও এদিক থেকে ওদিক করা যায় না, তবু ইনটেন্সিভ আর এক্সটেন্সিভ্ কালটিভেশনের ফলে ফসল যেমন বাড়ান যায়, তেমনি করেই একটু চেহারা ঠিক রাখার প্রতি নজর রাখলেই মাংস এবং হাড়ের রাশিয়ান-আমেরিকান ঝগড়াটা শেষ করা যায়!

এবং তাহলেই হয়ত একদিন দেখব কেষ্টবাবু এসে বলছেন—"দাদা, আমিও বোম্‌পেলাট্ না হয়ে পারলুম না!"

আত্ম-প্রতারণা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

সংসারে প্রতারকের অভাব নাই। বাহিরের লোকের দ্বারা কখন প্রতারিত না হয়ে থাকলেও একজন লোক আপনাকে প্রায়ই ঠকায় এবং তার কাছে আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি বার বার হার মেনে আসছেন। সে লোকটি কে জানেন?...আপনি নিজে। মনোবিদ্যার অগ্রগতির ফলে মন সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং মানসিক কার্য্যাবলী ভালভাবে বোঝবার এবং ব্যাখ্যা করবার সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েই দেখেছি যে, আমরা নিজেদের কতভাবে কি রকম করে ঠকাই।

আজ রবিবার। হঠাৎ আপনার মনে পড়ে গেল যে শনিবার আপনার কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি ত! ভেবে দেখলেন, কাল নানা কাজে আপনি সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্যে ওখানে যাবার কথা আপনার মনে হয়নি। সুতরাং না যাওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ ছিল। মন আপনার শান্ত হল—কথা না রাখার অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। ব্যাপারটার ওইখানেই কি সত্যি শেষ? বাস্তবিকই কি কাজের ভিড় আপনার যাওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ? কি কাজে যাবার কথা ছিল, কামাখ্যাবাবু লোকটিকে কি রকম বলে আপনি মনে করেন, তাঁর প্রতি আপনার মনের ভাব কিরকম, তিনি ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলেন, কি রকম ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আপনার আগে যোগাযোগ হয়েছিল, এ-সব যদি যথাযথভাবে মনে করবার চেষ্টা করেন, তা হলে হয়ত একটু ইঙ্গিত পাবেন যে, তাঁর কাছে যাবার প্রতিশ্রুতিটা ভুলে যাওয়ার অন্য কারণ সম্ভবত ছিল। হয়ত লোকটিকে আপনি পছন্দ করেন না, হয়ত বা যে কাজের জন্যে যাবার কথা—সে কাজটি আপনার প্রীতিকর নয়। এই রকম অনেক 'হয়ত'র সন্ধান পাবেন। এই সব 'হয়ত'র জন্যে তাঁর কাছে না যাওয়ার একটা ইচ্ছা আপনার আগে থেকেই ছিল। এই যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছার দ্বন্দ্বের ফলেই ভুলটা হয়েছে। এক্ষেত্রে না যাওয়ার ইচ্ছেটা জয়ী হয়েছে। আপনি স্বীকার করতে চাইবেন না নিশ্চয়; বলবেন কই, না-যাওয়ার ইচ্ছে ত আমার একবারও হয়নি—বরং যাওয়া হয়নি বলে এখন আপশোষ হচ্ছে।

ঠিক কথা। আমিও মেনে নেবো যে না-যাওয়ার ইচ্ছে আপনার মনে একবারও হয়নি এবং আপনার সাম্প্রতিক অনুতাপ কৃত্রিম নয়, বাস্তব। কিন্তু এখানে মন বলতে আপনি যা বুঝছেন—এবং সাধারণতঃ আমরা সকলেই যা বুঝি—সেটা মনের অতি সামান্য অংশমাত্র। আধুনিক মনোবিদ্যার এইটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যে বরফস্তূপ (iceberg) বলতে যেমন—যে অংশটা জলের ওপরে ভাসে শুধু সেই অংশটা বোঝায় না, জলের নীচে যে অংশটা থাকে সেটাও বোঝায়—তেমনি যে-টুকুর বিষয়ে আমরা সচেতন শুধু সেইটুকুই আমাদের মন নয়

যে অংশ সচেতন অর্থাৎ সজ্ঞান (conscious) স্তরের নীচে থাকে সেটাও মনের অংশ। আবার ঠিক বরফ-স্তূপের মত মনের বেশীর ভাগটাই (প্রায় ১০ ভাগের ৯ ভ গ) সজ্ঞান স্তরের নীচে থাকে। এই নীচের অংশকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যে সব চিন্তা, ইচ্ছা, ঘটনার স্মৃতি প্রভৃতির কথা ঠিক এই মুহূর্তে সজ্ঞানে নেই, অথচ একটু চেষ্টা করলেই সজ্ঞানে আনা যায়—অর্থাৎ যাদের বিষয় সচেতন হতে পারি সেগুলো মনের অসজ্ঞান (reconscious) স্তরে আছে বলে কল্পনা করি। আপনার না যাওয়ার ইচ্ছে যদি অসজ্ঞান স্তরে থাকে, তা হলে আপনি সহজেই স্বীকার করে নিতে পারবেন যে, কাজের ভীড় আপনার প্রতিশ্রুতি না রাখবার যথার্থ কারণ ছিল না। অনেক চিন্তা, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি কিন্তু মনের আরও নিম্ন-স্তরে থাকে, যেগুলোকে তাদের আদিমরূপে সজ্ঞানে আনা যায় না। মনোবিদরা বলেন—সেগুলো মনের নির্জ্ঞান (unconscious) স্তরে থাকে। সেখান থেকে তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করে। নিজ-রূপে সজ্ঞান স্তরে আসে না বলে তারা যে আমার মনের অংশ তা আমরা সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মানসিক রোগসমূহের নিদানগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে নির্জ্ঞানস্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আর অবকাশ থাকে না।

আমরা সজ্ঞান মনকেই মন বলে ভাবি। আত্মপ্রতারণা কথাটা তাই ব্যবহার করা যায়। আমাদের সজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রদ; ব্যাপার হচ্ছে এই, আপনি অন্যের আত্মপ্রতারণা যত সহজে বুঝতে পারেন নিজের প্রতারণা কিন্তু তত সহজে ধরতে পারেন না।

শিশু থেকে আমরা বড় হয়েছি, আদিম-কাল থেকে আমরা সভ্যতার যুগে এসেছি। শিশু-মনের এবং আদিম-যুগের মানুষের সব প্রবৃত্তিই আমাদের মনে আছে।

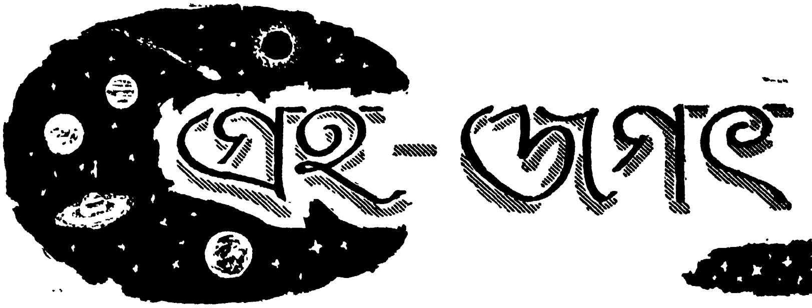
সেগুলিকে অবদমন করে আমরা সভ্য মানুষ হয়েছি। সে প্রবৃত্তি-গুলি চলে গেছে নির্জ্ঞান স্তরে। সেখানে কিন্তু তারা জড় অবস্থায় থাকে না। অনবরতই চেষ্টা করে সজ্ঞানে আসবার এবং আসে। বিকৃতরূপ ধরে আসে বলে আমরা তাদের চিনতে পারি না, ঠকে যাই।

তিনকড়ি বড় নিন্দনীয় কাজ করে, তাই আপনি তাকে পছন্দ করেন না। ব্যাপারটা কি সত্যি তাই, না তিনকড়িকে পছন্দ করেন না বলেই তার নিন্দনীয় কাজগুলির খবরই শুধু আপনি রাখেন; তার ভাল কাজ-গুলি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনকড়ির চলন বাঁকা তাই তাকে দেখতে পারেন না? ভাল করে ভেবে দেখুন নিজেকে ঠকাচ্ছেন কিনা। ফণীবাবুকে কটাক্ষ করে সেদিন ক্লাবে রমেশ যে ঠাট্টাটা করে-ছিল, সেটা নন্দ অত উপভোগ করেছিল কেন বলুন ত? শুধু কৌতুক হিসেবে দেখলে ঠাট্টাটা ত এমন কিছু উঁচুদরের নয় যে অত হাসি পাবে, আর ত কেউ অত হাসেনি। অনেকে হয়ত ভুলেই গেছে……নন্দ কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে মনে করে, আর হাসে; এটাকে নন্দ আপনার রসিকতা উপভোগ করবার ক্ষমতার পরিচয় বলেই মনে করে। এখানেও নন্দ হয়ত আত্ম প্রবঞ্চনাই করছে। ফণিবাবুর বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক ভাব নন্দর মনে কোথাও লুকান ছিল। ফণিবাবু কিন্তু নন্দর গুরুস্থানীয় লোক, তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সে কিছু করতে পারে না—কিন্তু রমেশ তাঁকে আক্রমণ করতে পারে ও কথার ছলে করেও ছিল সেদিন। তাই রমেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নন্দ তার আক্রমণের ইচ্ছা কতকাংশে চরিতার্থ করেছিল। তার বাসনা চরিতার্থ হতে পারল বলেই তার অত আনন্দ।

বৌমা বল্লেন, খোকা খেলনাটা ভেঙ্গে ফেলছিল বলে তাঁর রাগ হয়ে-ছিল—সেই জন্যে তিনি খোকাকে অত প্রহার করেছিলেন। এটা কিন্তু তিনি নিজেকে প্রতারণা করেছেন। সামান্য একটা খেলনা ভেঙ্গে ফেলা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয় যে অত শাসন তাকে করতে হবে। অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি শাশুড়ীর কাছে কিছু পূর্বে তিরস্কৃত হয়ে-ছিলেন, রাগের উৎপত্তিটা সেইখানে। শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। এমন সময় খোকা খেলনাটা ভেঙ্গে ফেলে, রাগ প্রকাশের একটা সুযোগ হয়ে গেল।

কোন একটি লোককে সকালে সম্মোহিত (Hypnotise) করে যদি বলে দেওয়া যায় যে, সে বিকালে ৪টার সময় কাশীবাবুর হাতে একখানা বাজে কাগজ দিয়ে বলবে যে, হরিবাবু তাঁকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন। তা'হলে সে ঠিক বেলা ৪টার সময়ে এসে নির্দেশ মত কাজ করবে। তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন কেন সে এই রকম করলে—সে অনেক রকম কারণ দেখাবে, কিন্তু আসল কারণটা সে জানে না। আমাদের ব্যবহারও অনেক সময় ঐ রকমই হয়। কোন একটা কাজ করি কেন কারণ জানি না। কাজের আসল কারণ কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যায়। শুচিবাইগ্রস্ত গৃহিণী নিজেকে বোঝান যে শাশুড়ীর আমলের শুচিতা বজায় রাখবার জন্যেই অথবা নোংরা জিনিষ ব্যবহার করে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি যাতে না হয়, সেই জন্যে একটা বাসন তিনবার করে মাজতে হয়। একটা জায়গা পাঁচবার মুছে ফেলা দরকার হয়। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না যে মনের ময়লা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা থেকেই বাইরের ময়লা দূর করবার তাঁদের এত প্রবল আবেগ আসে। এই ভাবেই তিনি নিজেকে ঠকিয়ে যাচ্ছেন। লেডি ম্যাকবেথের হাত সমস্ত সমুদ্রের জলেও পরিষ্কার হল না, আরব দেশের সমস্ত সুগন্ধেও স্নিগ্ধ হল না।

নিজেদের মন সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। মনের কিয়দংশের সঙ্গে শুধু আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। সুতরাং এই প্রতারণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার—এই প্রতারকটিকে এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় মন সম্বন্ধে জ্ঞান-বৃদ্ধি করা, অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজেদের মনের গতি ও কার্য্যাবলী উপলব্ধি করবার অভ্যাস করা। জ্ঞানীরা সেই পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা বলেছেন—'আত্মানং বিদ্ধি'—know thyself.' আধুনিক মনো-বিদরা বলে দিচ্ছেন, এই 'self' শুধু সজ্ঞান নয়—self-এর কল্পনায় নির্জ্ঞানেরও স্থান দিতে হবে।



বিবাহে যোটক বিচার

উপাধ্যায়

দম্পতীর জীবনের মিল হবে কিনা তা নিয়ে যোটক বিচারের যে বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, তা অনেক সময়ে সম্যক্‌ভাবে অনুসৃত হয়না, তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারলে, জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কতকগুলি মামুলি বচনের ওপর নির্ভরশীল হোলে অনেক সময়ে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, শেষে হয়তো ভালো ভালো পাত্রপাত্রী হাতছাড়া হয়ে যায় বিচারের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে। এজন্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা, এবং কোথায় গলদ আছে, তা দেখিয়ে আলোচনার অবকাশ আনাই আমার বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য।

প্রাচ্য দেশের জ্যোতিষীরা পাত্র-পাত্রীর একজনের রাশি-নক্ষত্রের সঙ্গে অপরের রাশি-নক্ষত্রের মিল দেখে থাকেন আর পাশ্চাত্য-দেশের জ্যোতিষীরা দেখে থাকেন একজনের জন্মমাসের সঙ্গে অপরের জন্মমাসের মিল আছে কিনা। আর্য্যজ্যোতিষীরা যোটক-বিচারে জন্মকুণ্ডলীতে যেখানে চন্দ্র আছেন সেখানকার রাশি ও নক্ষত্র নিয়ে আটটি স্তরে যোটক বিচার করেন। একে বলা হয় অষ্টকূট। এক একটি কূটের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যথা (১) বর্ণ (২) বশ্য (৩) তারা (৪) যোনি (৫) গ্রহ মৈত্রী (৬) গণ (৭) রাশি (৮) নাড়ী। এর মধ্যে বর্ণ, বশ্য, গ্রহমৈত্রী ও রাশিকূট চন্দ্রের রাশি ধরে বিচার করা হয়—আর তারা, যোনি, গণ ও নাড়ীকূট চন্দ্রের নক্ষত্র ধরে বিচার করা হয়।

পাত্র ও পাত্রীর পরস্পরের বর্ণের মিত্রতা বা একতা থাকলে একগুণ, বশ্যকূটে দুইগুণ, তারাকূটে সাতগুণ আর ত্রিনাড়ীকূটে আটগুণ। এই অষ্টপ্রকার কূটফল ছত্রিশগুণ। মুহূর্ত্তচিন্তামণি মতে গুণাধিক্য হোলে বিবাহ দেওয়া যায়। ষড়ষ্টকাদি দোষের প্রতিপ্রসব আছে, নবপঞ্চকাদি দোষেরও প্রতিপ্রসব আছে। সেগুলি জানা না থাকলে বাহ্যতঃ বিচারের দ্বারা বিবাহ খণ্ডন করা অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক। সে সম্বন্ধে রাশিকূট বিচারে অবতারণা করা যাচ্ছে।

বর্ণকূট

বর্ণ চারটি—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পাত্র-পাত্রীর জন্মরাশি ধরে এগুলি ঠিক করে নিতে হয়। বর্ণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে—কিন্তু যা যুক্তিসঙ্গত, তা এখানে দেওয়া গেল। বিচার 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' এরূপভাবে করা অযৌক্তিক, তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা অনুসৃত হয়ে যখন সত্যে উপনীত হওয়া যায় তখনই প্রকৃত বিচার হয়। অপ্রাসঙ্গিক তর্কউত্তাপের সৃষ্টি করে, মানুষের মনে আনে বিভ্রান্তি, ফলে বড় বড় শুভ সুযোগ অকারণে সরে যায়। বিবাহ বিলম্বিত হয়।

রাশির কারকতায় দেখা যায় যে—মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিতত্ত্ব-সংজ্ঞক। এই হিসাবে অগ্নিরাশিগুলি বা যেগুলি তেজ বা বীর্য্যের সূচক, সেই রাশিগুলি ক্ষত্রিয়। এজন্য মেষ সিংহ ও ধনু ক্ষত্রিয়বর্ণ। বৃষ কন্যা ও মকর পৃথ্বীতত্ত্ব সংজ্ঞক। পৃথ্বীরাশিগুলি দাসত্ব ও গতানুগতিকতার কারক, এজন্য এরা শূদ্রবর্ণ। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুতত্ত্বসংজ্ঞক। এই হিসাবে এরা বায়ুরাশি। বায়ুরাশিগুলি বিনিময় ও সঙ্ঘবদ্ধতাসূচক। এজন্য বৈশ্যবর্ণ বলে অভিহিত হয়েছে।

কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশিসংজ্ঞক, এজন্য এরা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সূচক। বিপ্রবর্ণ রূপে কথিত। বর্ণবিচারের সাধারণ নিয়ম এই যে, পাত্রের বর্ণ যদি পাত্রীর বর্ণের চেয়ে উঁচু বা তার সমান হয়, তাহোলে উত্তম মিল হবে কিন্তু পাত্রী বর্ণশ্রেষ্ঠা হোলে মিল হবে না। বলা বাহুল্য যে, শূদ্র সবচেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণ, বৈশ্য তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর বিপ্র সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হোলে স্বামীর নিধনাশঙ্কা অথবা অন্যবিধ অশুভ হয়ে থাকে। পরন্তু সেই কন্যা অতি মহৎকুল সম্ভবা হোলেও পতিপরায়ণা হয়না। বলা হয়েছে—'বর্ণ জ্যেষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্। বিবাহং যদি কুর্ব্বীত তস্যা ভর্ত্তা বিনশ্যতি।' বর্ণের মাত্র একগুণ ফল। গুণাধিক্য হোলে এটা উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত, অথচ এরূপ বচন Contradictory হচ্ছে। যোটক বিচারের বাহ্যদৃষ্টিতে এইসব গলদগুলি ধরা পড়ে।

বশ্যকূট

রাশির সাধারণ রূপ যা দেওয়া হয়েছে তা ধরে বশ্যাবশ্যের বিচার হাস্যকর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে রাশির নামগুলি দেওয়া হয়েছে এদের প্রকৃতির সঙ্গে জীবের প্রকৃতির এক একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। যেমন মেষরাশির নাম দেওয়া হয়েছে ভেড়ার প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে। ভেড়া অল্পেই উত্তেজিত হয়। বৃষ নাম দেওয়া হয়েছে ষাঁড়ের 'গোঁ' বা একগুঁয়েমি লক্ষ্য করে। সিংহের গম্ভীর তেজস্বিতা লক্ষ্য করে সিংহরাশির নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পশু হিসাবে সিংহের কাছে মেষ বা বৃষের জোর কম। অতএব মেষ-বৃষ সিংহের বশ্য হবে। এ রকম জল্পনা-কল্পনা কতদূর অসঙ্গত তা সহজেই অনুমেয়।

জ্যোতিবাচস্পতি বর্ণ ও বশ্যকূটের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— "বর্ণ ও বশ্যের বিচারের যে সূত্র দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারা কঠিন নয়, সেকালে লোক কী রকম স্ত্রী চাইতেন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা কী ছিল। স্ত্রীর প্রকৃতি ও শক্তি স্বামীর চেয়ে নিকৃষ্ট হওয়াই অর্থাৎ স্ত্রীকে সবরকমে পায়ের তলে রাখাই তখনকার দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ছিল। এটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, সে তর্ক থাক্, কিন্তু এযুগে এরকম আদর্শ চল্‌বে কি ?'

বশ্যের ব্যাপারে একটি নিয়ম শাস্ত্রে আছে যে, সিংহ ছাড়া আর সব চতুষ্পদ, দ্বিপদ রাশিমাত্রেরই বশ্য—আর জলচরগুলি দ্বিপদরাশির ভক্ষ্য। মিথুন, তুলা, কুম্ভ, কন্যা ও ধনুরাশির পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বিপদ, আর মকরের আদ্যার্দ্ধভাগ, মেষ, বৃষ, সিংহ ও ধনুর শেষার্দ্ধভাগ চতুষ্পদ হয়ে থাকে। কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকররাশির শেষার্দ্ধভাগ কীট নামে প্রসিদ্ধ। বৃশ্চিক রাশি কীট মধ্যে গণ্য না হয়ে সরীসৃপ নামে কথিত হয়েছে। সিংহরাশি কন্যা পতির পূর্ণবশীভূত হয় না, তার কাছে পতিকেই প্রায় পরাস্ত হোতে হয়। এজন্যে জ্যোতিষেরা সিংহ রাশির কন্যা গ্রহণ করতে আপত্তি করেন।

তারাকূট

পাত্রের জন্ম নক্ষত্র থেকে কন্যার নক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনায় যদি ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, অষ্টম বা নবম এর অন্যতম হয় তবে বিবাহে বরের তারা শুদ্ধ হবে। ৯এর অধিক হোলে ৯ বাদ দিয়ে উক্ত নিয়মে তারা শুদ্ধি নিরূপিত করতে হয়। এইরূপে কন্যার জন্মনক্ষত্র থেকে বরের নক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনায় কন্যায় তারাশুদ্ধি নিরূপিত হয়। পাত্রের জন্মনক্ষত্রটী যদি পাত্রীর জন্ম, সম্পদ, ক্ষেম, সাধক, মিত্র বা অতিমিত্র হয় তাহোলে উত্তম মিল নতুবা অমিল বলে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিবাচস্পতি বলেছেন—'এখানেও একটু মজা আছে—পাত্রের নক্ষত্র যদি পাত্রীর জন্ম. সম্পদ বা অতিমিত্র তারা না হয়, তাহোলে যেখানে পাত্রের থেকে গণনায় পাত্রীর নক্ষত্র শুভ হবে, পাত্রী থেকে গণনা করলে সেখানে অশুভ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এ গণনার যে কী সার্থকতা আছে, তা বোঝা দুষ্কর।'

যোনিকূট

যোনি বিচার পাত্র-পাত্রীর জন্মনক্ষত্র থেকে করতে হয়। শতভিষা ও অশ্বিনীর ঘোটক-যোনি। স্বাতী ও হস্তার মহিষ-যোনি। কৃত্তিকা ও পুষ্যার মেষযোনি। পূর্ব্বাষাঢ়া ও শ্রবণার বানর যোনি। অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়ার নকুলযোনি। রোহিণী ও মৃগশিরার সর্পযোনি। জ্যেষ্ঠা ও অনুরাধার হরিণ যোনি। আর্দ্রা ও মূলার কুকুর যোনি, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদের গো যোনি। চিত্রা ও বিশাখার ব্যাঘ্রযোনি। অশ্লেষা ও পুনর্ব্বসুর বিড়ালযোনি এবং মঘা ও পূর্বফল্গুনীর ইন্দুরযোনি। অশ্বমহিষ, হস্তীসিংহ, সর্পনকুল, ইন্দুর-বিড়াল ইত্যাদি পরস্পরের ঘোর শত্রুতা, এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত অমিল মনে করতে হবে। একযোনি বা একশ্রেণীর যোনি হোলেই উত্তম মিল হয়। যেমন একশ্রেণীর যোনি—বাঘ-সিংহ, হস্তী-অশ্ব ইত্যাদি।

গ্রহমৈত্রীকূট

গ্রহমৈত্রীর মিল ঠিক করতে হয় জন্মরাশির অধিপতি গ্রহ থেকে পাত্রের জন্মরাশির অধিপতি গ্রহ যদি পাত্রীর জন্মরাশির অধিপতি, (যেমন পাত্রের রাশি মেষ, পাত্রীর রাশি বৃশ্চিক, এই দুইটী রাশির অধিপতি একই গ্রহ—মঙ্গল অথবা পাত্রের রাশি বৃষ, পাত্রী রাশি তুলা উভয়েরই রাশির অধিপতি একই গ্রহ শুক্র) গ্রহের অতিমিত্র বা মিত্র হয় তাহোলেই মিল হবে, নইলে অমিল।

গণমৈত্রীকূট

পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের এক গণ হোলে তবে দম্পতীর দাম্পত্য সুখ উত্তম হয়। দেবগণ ও নরগণে মধ্যম সুখ, দেবগণ ও রাক্ষসগণে বৈরতা (কোনমতে অল্প সুখ) অর্থাৎ কলহাদি আর নরগণ ও রাক্ষসগণে উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়ে থাকে। জ্যোতিস্তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, বরের নরগণ ও কন্যার রাক্ষসগণ হোলে বরের মৃত্যু অথবা নির্ধনতা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে গর্গমুনি বলেন পাত্রের রাক্ষস ও পাত্রীর নরগণ হোলেও সদ্ভকূট মেলক হোলে আর পরস্পরের রাশ্যাধিপতির মিত্রতা, যোনি মিত্রতা, রাশিবশ্যতা হয় তবে সে বিবাহে কোন দোষ না হয়ে শুভ হয়ে থাকে। প্রমাণ যথা— 'রক্ষোগণো যদাপুংসাং কুমারী নৃগণো ভবেৎ। সদ্ভকূটং খগপ্রীতি যোনি শুদ্ধিঃ শুভস্তদা।'

গণের আসল তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জগতে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর মনোভাববিশিষ্ট লোক আছে—যাঁদের মনোভাব বিশ্লেষণ মূলক বা Analytical তাঁদের রাক্ষসগণ বলা হয়। তাঁদের আচার ব্যবহার ও খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে তামসিক গুণ প্রকাশ পায়। যাঁদের মনোভাব সংশ্লেষণ মূলক বা Synthotical তাঁদের দেবগণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁদেরও মধ্যে আছে সাত্ত্বিক ভাব। যাঁদের মনোভাব সংরক্ষণমূলক বা Conservative, তাঁদের নরগণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের [illegible]

সংগঠনশক্তির ভাব, রাক্ষসগণের প্রকৃতির মধ্যে আছে সংস্কার করবার ইচ্ছা, সমালোচনা করবার শক্তি আর নরগণের প্রকৃতির মধ্যে আছে সংরক্ষণ শক্তি, গতানুগতিকতা। প্রকৃতির বৈপরীত্য হোলে পাছে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আসে এজন্তে গণমিলনের বিচার হয়।

রাশিকূট

যোটক বিচারের মধ্যে এই রাশিকূট বিচারকেই সবচেয়ে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাচ্য জ্যোতিষীরা আগে রাশিকূট বিচার করে তার পর অন্য কিছু বিচারে এগিয়ে থাকেন। রাশিকূটের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাত্রের রাশি থেকে পাত্রীর রাশি গণনায় যতসংখ্যক রাশি হয়, তা ভাল না মন্দ সেইটে বিচার করা। এর মূলগত ধারণা এই যে, পাত্রের রাশিকে লগ্ন মনে করলে, তা হোলো পাত্রীর রাশি তা থেকে কোন ভাবে রয়েছে এইটে দেখা। এই রাশি মিলের স্তর চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) রাজযোটক (২) দ্বিদ্বাদশ (৩) ষড়ষ্টক (৪) নবপঞ্চক।

রাজযোটক—বর ও কন্যার যদি এক রাশি হয় অথবা পরস্পর সমসপ্তক (যেমন বৃষবৃশ্চিক) হয় বা পরস্পর চতুর্থ দশম (যেমন তুলা কর্কটে) অথবা পরস্পর তৃতীয় একাদশ হয় তা হোলে রাজযোটক মেলক হয়ে থাকে, এই রাজযোটক মেলক শ্রেষ্ঠ। বর ও কন্যার রাজযোটক মেলক হয়ে যদি তার সঙ্গে গ্রহমৈত্র, বর্ণ, গণ, যোনি ও তারা শুদ্ধ হয় তবে দাম্পত্য সুখের পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়ে থাকে আর দম্পতীর ভাগ্যবৃদ্ধি, নীরোগ ও সুখৈশ্বর্য্যভোগ ইত্যাদি শুভফল হয়। জ্যোতি বাচস্পতি বলেছেন—'একরাশি হয়ে যদি নক্ষত্রও এক হয়, তা হোলে তা অত্যন্ত অশুভ—সেক্ষেত্রে যোটেই মিল হবেনা, কিন্তু একরাশি হয়ে ভিন্ন নক্ষত্র হোলে খুব ভালো মিল হবে—' এ ধারণা তাঁর কোথা থেকে হোলো সে সম্বন্ধে তাঁর বিবাহে জ্যোতিষ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু শাস্ত্রকাররা বলছেন—একনক্ষত্র ও এক-রাশি যোগে বিশেষ ফল আছে—একর্ক্ষ চ যদা কন্যা রাশ্যেকা চ যদা-ভবেৎ। ধনপুত্রবতী নারী ভর্ত্তা চ চিরজীবকঃ। এ বিবাহে কন্যা ধন-বতী ও পুত্রবতী এবং তার স্বামী দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে। পাত্র ও পাত্রীর একনক্ষত্র হয়ে ভিন্ন রাশি হোলে সে বিবাহে দম্পতীর সুখ হয়না, কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্র হ'য়ে একরাশি হোলে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ হয়। বিবাহে বিষম সপ্তমযোগ পরিত্যজ্য। পাত্র ও পাত্রীর রাশি বিষম হয়ে পরস্পর সপ্তমস্থানে থাকলে সে বিবাহে মৃত্যুর আশঙ্কা। কিন্তু জ্যোতিবাচস্পতি বলেছেন বিষম সপ্তকেও বিবাহ দেওয়া যায়।

দ্বিদ্বাদশ মিলন—বর ও কন্যার রাশি দুটি যদি এমন হয় যে, এক-জনের দ্বিতীয়ে আছে অপরের রাশি তাহোলে সেই যোগকে দ্বিদ্বাদশ বলা হয়। দ্বিদ্বাদশ দুই প্রকার (১) মিত্র দ্বিদ্বাদশ (২) অরি দ্বিদ্বাদশ। পাত্রের রাশি থেকে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হোলে ধননাশিনী এবং দ্বাদশে হোলে ধনবতী ও পতিপ্রিয়া হয়। জ্যোতির্প্রকাশে আছে—'দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা' কিন্তু বশিষ্ঠ বলেছেন—'দ্বির্দ্বাদশে…ভবনেশ মৈত্রে শুভায় পাণিগ্রহণং দ্বিধেয়ম্' পাত্র ও পাত্রীর রাশির অধিপতিদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকলে পাণিগ্রহণ শুভ ও বিধিসঙ্গত এই কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হোলেও বিবাহ দেওয়া যায়। জগমোহনে বশিষ্ঠ ও কশ্যপের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে—'দ্বির্দ্বাদশং শুভং প্রোক্তং মীনাদৌ যুগ্ম-রাশি যুব মেষাদৌ যুগ্মরাশৌ তু নির্ধনত্বং ন সংশয়। এই সব বচনের অন্তর্নিহিত যুক্তিগ্রহণ করা দরকার, বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত জ্যোতিষীদের ছকে ফেলে-দেওয়া বচনের অন্ধ অনুসরণ করে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ না রেখে। শাস্ত্রকারদের ভেতরকার যুক্তি হচ্ছে এই যে পাত্রের যদি বিযোড় রাশি হয় আর কন্যার হয় যোড় রাশি আর রাশিদের মধ্যে মিত্রতা থাকে অথবা দুইটী রাশির অধিপতি একই গ্রহ হয়, তাহোলে সেখানে একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের আশা করা যায়। বিযোড় রাশিগুলি প্রত্যক্ষ (Positive) পুরুষ ভাবের সূচক, আর যোড় রাশিগুলি পরোক্ষ (Negative) বা স্ত্রীভাবের সূচক। এক্ষেত্রে বরের বিযোড় আর কন্যার যোড় রাশি হওয়া দরকার আর সামঞ্জস্য বা সঙ্গতির মিত্রতা আবশ্যক। কিন্তু দুইটি রাশির অধিপতি একই গ্রহ হোলে সুসঙ্গতি থাকে। এক্ষেত্রে বিবাহ চলে।

মেষ-মীন, মিথুন-বৃষ, সিংহ-কর্কট, তুলা-কন্যা, ধনু-বৃশ্চিক ও কুম্ভ-মকর যদি যথাক্রমে বর ও কন্যার রাশি হয় তাহোলেই উত্তম মিলন হবে, নতুবা নয়। অরি দ্বিদ্বাদশে বিবাহ পরিত্যজ্য।

ষড়ষ্টক মিলন—দ্বিদ্বাদশের মত এই মিলনের নিয়ম একই প্রকার অর্থাৎ যদি অধিপতি দুটির মিত্রতা থাকে কিম্বা যদি একই গ্রহ দুটি রাশিরই অধিপতি হয় আর বরের রাশি বিযোড় ও কন্যার রাশি যোড় হয় তাহোলে বর ও কন্যার পরস্পরের ষষ্ঠ ও অষ্টমে রাশি হোলেও তা শুভপ্রদ। মুহূর্ত্ত গ্রন্থগুলিতে এই মিলের সম্বন্ধে যে সব বচন পাওয়া যায় তা'তে ভেতরকার ধারণাটুকু স্পষ্ট হয় না। যদি কন্যার রাশি থেকে বরের রাশি অষ্টম হয় আর বরের রাশি থেকে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হয়, সে স্থলে উভয়ের রাশ্যধিপের মিত্রতা থাকলেও সেই বিবাহ পরিত্যজ্য। মিত্র ষড়ষ্টক মেলকে বিবাহ বিশেষ বিপদজনক নয়। অরি ষড়ষ্টককে বিবাহ পরিত্যজ্য। পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের রাশ্যধিপতি এক হোলে কন্যা থেকে বরের রাশি অষ্টম হোলেও বিবাহ দেওয়া যায়, বশিষ্ট ভৃগু ও কশ্যপ একথা বলেছেন কেননা উভয়ের Positive ও Negative এর তারতম্য দোষ নষ্ট করছে। পাত্র ও পাত্রীর রাশির অধিপতি একই গ্রহ হোলে সে গ্রহের নিজস্ব ঘর দুটিতে সে নিজে আগুন লাগাতে পারে না, যে কোন বুদ্ধিমান স্বীকার করবে। 'ষড়ষ্টকাদৌ প্রতি প্রসব মাহ' পংক্তিতে বলা হয়েছে—'সৌহৃদ্যেহ্যভয়োর্দ্বয়োরপি' তয়োরেকাধিপত্যেঽপি চ। তারা ষষ্ঠ সুমিত্র-মিত্র-জনন ক্ষেমাথ সম্পদ্ যদি।' ষট্‌কাষ্টে নবপঞ্চমে ব্যয়-ধনে যোগেঽপি পুংযোষিতোঃ। প্রীত্যায়ুঃ সুখবৃদ্ধি-পুষ্টিজনক কার্য্যো বিবাহস্তদা।"

পাত্র ও পাত্রীর রাশির অধিপতিগ্রহদ্বয়ের মিত্রতা বা উভয়ের রাশ্যাধি-পতি গ্রহ এক হোলে পাত্রের নক্ষত্র থেকে কন্যার নক্ষত্র গণনায় তারা শুদ্ধি' আর কন্যার রাশি পাত্রের বশ্য হোলে, কন্যার বাল-বৈধব্য, অন-পত্যতা অল্পায়ু প্রভৃতি যোগ না থাকলে ষড়ষ্টক, নব পঞ্চক ও দ্বিদ্বাদশ-

যোগে বিবাহ হোতে পারে আর তা'তে দম্পতীর প্রীতি আয়ু, সুখবৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ হয়।

নব-পঞ্চক মিলন

পাত্রের রাশি থেকে কন্যার রাশি নবম অথবা পঞ্চম হোলে এই মিল হয়। তার মধ্যে পাত্রের রাশি থেকে কন্যার রাশি যদি নবম হয়, তা-হোলে মিল উত্তম, কিন্তু যদি পঞ্চম হয় তাহোলে অশুভ। পুংসো গৃহাৎ সুতগৃহে সুতহা চ কন্যা। ধর্ম্মেস্থিতা সুতবতী পতিবল্লভা চ। পুংসো গৃহাদ্ ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা। রিপ্‌ফেস্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ। এই মিল নির্দ্দেশের কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। চতুর্থ দশমকে রাজ-যোটক বলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু পঞ্চম নবমকে যে কেন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা বোঝা গেল না। পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা তাঁদের গ্রন্থে ভাব বিচারের ক্ষেত্রে পঞ্চম নবমকে ত্রিকোণ বলে উল্লেখ করে অতি শুভ বলেছেন, অন্যভাব সম্বন্ধে মতভেদ থাক্‌লেও এ সম্বন্ধে সকলেই একমত অথচ যোটক বিচারের বেলায় নবম-পঞ্চমের বিরুদ্ধে অর্থ হবার কারণ কি সে বিষয়ে আলোচনা ও তত্ত্বানু-সন্ধান আবশ্যক। আমি এ বিষয়ে জ্যোতির্বিবিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পাত্রের রাশি থেকে কন্যার রাশি জন্ম হোলে কি যুক্তিতে অশুভ হবে এই প্রশ্ন উপস্থিত করছি।

নাড়ী কুট মিলন

এ বিচার জন্ম নক্ষত্র থেকে করা হয়। সমস্ত নক্ষত্রগুলিকে আদি, মধ্য ও পৃষ্ঠ এই তিন শ্রেণীর নাড়ীতে ভাগ করা হয়েছে। পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের জন্ম-নক্ষত্র আদ্য নাড়ীতে থাক্‌লে বরের নিধনাশঙ্কা, মধ্যে থাক্‌লে উভয়ের নিধনাশঙ্কা—আর পৃষ্ঠ নাড়ী হোলে কন্যার মৃত্যু হয়। নাড়ীবেধে বিবাহ বর্জ্জনীয়। শ্রীপতি বলেন, বর ও কন্যার রাশ্যাধি-পের মধ্যে মিত্রতা বা উভয়ের রাশ্যাধিপতি এক আর বরের তারাশুদ্ধি ও কন্যার বশ্য রাশি হয় তাহোলে বিবাহ দেওয়া যায়, অশুভ হয় না। নাড়ীবেধ নক্ষত্রগুলি যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে তা ইংরেজীতে বলে Mechanical arrangement. এর পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না এ সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন।

অষ্টকুটের বিচারই শাস্ত্রমতে বিবাহ প্রসঙ্গে চূড়ান্ত বিচার। এর উপর আর একটি বিচার করা হয়, ভৌমবর্ত্তিদোষ আছে কিনা, কন্যার বৈধব্য আর পাত্রের স্ত্রীবিয়োগ। উপরে যে মিল বিচার করা হয়েছে, তা একমাত্র চন্দ্রের অবস্থান থেকে। রাশিচক্রের অন্যগ্রহ বা কোন ভাবের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। কোষ্ঠী বিচারে যাঁরা এত সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করেছেন, মিল বিচারের বেলায় এই স্থূল নিয়ম দিয়ে কেমন করে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন—যেক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর জীবন-মরণ ভাগ্য আর ধর্ম্ম একই সূত্রে গ্রথিত। যাঁরা এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন, তাঁরা অনেকেই বলেছেন, অষ্টকুটের এই জটিল বিচার একে-বারেই নিরর্থক।

এ প্রসঙ্গে জ্যোতি বাচস্পতি বলেছেন—"শুধু দুজনের রাশি নক্ষত্র দিয়েই যদি মিল বিচার করা চল্‌তো, তা হোলে রাশি চক্রের কোনই সার্থকতা থাক্‌তো না। বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই হিসাবে দুজনের উত্তম মিল হোলেও তাদের দাম্পত্য জীবন সুখহীন এবং এই হিসাবে মোটে মিল না হোলেও দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়েছে।"

পাশ্চাত্য মতে পাত্রের রবি যে রাশিতে আছে, পাত্রীর রবি যদি সেই রাশিতে অথবা তার পঞ্চম, নবম কিম্বা সপ্তম রাশিতে থাকে তাহোলে মিল, নতুবা অমিল। মিলের আসল তত্ত্ব সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কোথাও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেন নি। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মিলের আসল তত্ত্ব নিয়ে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, ভরণী মধ্যম, অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে অধম ফল। বিশেষভাবে পীড়া না হোলেও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘট্‌বে। পিত্তবায়ুপ্রকোপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পথ্য ও দৈনন্দিন কৃত্যাদি সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। মানসিক অশান্তি, পারিবারিক কষ্ট, বন্ধু-বিচ্ছেদ, স্বজনবিরোধ প্রভৃতি আছেই, তাছাড়া আছে অপমান, মামলা-মোকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়া। মাসের প্রথম দিক্‌টায় সহনশীলতা থাক্‌লেও শেষের দিকে নানা ভাবে কষ্টভোগ আছে। এর মধ্যে আছে শত্রুদের গুপ্ত চক্রান্ত। আর্থিক অবস্থা উর্দ্ধগামী হোলেও ব্যয়প্রবণতার চাপে সঞ্চয়ের অভাব হেতু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বে। প্রতারণা, মামলা মোকর্দ্দমা, শাসকগণের হুম্‌কি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। শেষপর্য্যন্ত অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী বা কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ হোতে পার্‌বে না, ক্ষতির দিক্‌টাই অনেকখানি। ভাড়া অনাদায়, ফসলের দুরবস্থা, জমিসংক্রান্ত, দ্বন্দ্ব-কলহ, আর্থিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। চাকুরিজীবীর অবস্থা মোটেই ভালো নয়। গভর্ণমেণ্ট চাকুরিজীবীর ভাগ্যে লাঞ্ছনাভোগ নানাভাবেই হবে, এমনকি পদচ্যুত হওয়াও অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিজের কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশ, আদেশ পালন ও ধৈর্য্য-ধারণই একমাত্র মহৌষধ। চাকুরিজীবী মেয়েদের পক্ষে কোন প্রকার রোমান্সে জড়িয়ে না পড়াই ভালো। মহিলাদের ভাগ্যে এমাসে দুর্ভোগ। পারিবারিক, সামাজিক, প্রণয় ও অবৈধভাবে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী আশা-প্রদ নয়। রেসে প্রাপ্তিযোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বাধা।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকার পক্ষেই খুব ভালো, রোহিণীর পক্ষে নিকৃষ্ট, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। কারো ভালোফল বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, ব্যয়বৃদ্ধি, অপবাদ, অপ্রত্যাশিত মামলা মোকর্দ্দমা, কর্ম্ম-বিপত্তি, ক্লান্তি-

কর ভ্রমণ। প্রথমার্দ্ধে কিছু কিছু সাফল্য, লাভ ও সম্মান আশা করা যায়। পিত্তপ্রকোপ হেতু গাত্রে চর্ম্মরোগ, রক্তদুষ্টি, ছেলেমেয়েদের পক্ষে মারী-ভয়। পারিবারিক শান্তি ঘট্‌বে না। টাকা-কড়ি লেনদেন করা বা কোন স্পেকুলেশনে আত্মনিয়োগ করা অনুচিত। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর কোন পরিকল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কর্ম্মে হস্তক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, কেননা ঝড়, বন্যা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এদের ক্ষতি কর্‌বে। দলিল-দস্তাবেজ ভালো করে দেখে শুনে তবে টাকার লগ্নী করা বাঞ্ছনীয়। চাকুরিজীবী বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট চাকুরি-জীবীর পক্ষে বহুপ্রকার অসুবিধা, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভোগ অনিবার্য্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী অপ্রসন্ন নয়, গড়্‌পড়্‌তা আয় ঠিকই থাক্‌বে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী খারাপ নয়। রেসে মোটা টাকা হার্‌তে হ'বে। গৃহিণী স্থানীয়ারা রান্না-ঘরে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হোতে পারেন। বেফাঁস কথা বলা, পরচর্চ্চা করা, মনশ্চাঞ্চল্য, কথা-বার্ত্তায় অসংযত ভাব মহিলাদের মধ্যে বর্জ্জনীয়। কোন প্রকার রোমাণ্টিক আবহাওয়ার মধ্যে আসা চল্‌বে না। পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে। এবিষয়ে মহিলাদের সতর্কতা আবশ্যক।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রাশ্রিতগণের সময় একইভাবে যাবে, মৃগশিরারই কিছুটা ভালো বলা যায়। মাসটী মিশ্র-ফলদাতা। উল্লেখ-যোগ্য ভালো কারো ভাগ্যে নেই। কোন রকমে শরীরটা যাবে, চোখের অসুখ, পিত্তপ্রকোপ ঘটবে, ভ্রমণে ক্লান্তি ও ক্ষতিকর পরিস্থিতি। পারিবারিক আবেষ্টনী ভালো হবে। পারিবারিক কেন্দ্রের বাহিরে কিছু ঝগড়া বিবাদ গণ্ডগোল লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক-ক্ষেত্রে হুঁসিয়ার। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। কৃষিজীবীর পক্ষে যৎপরোনাস্তি ক্ষতি। ভূম্যধি-কারী ও বাড়ীওয়ালার সময়টা ভালো যাবে না, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট। চাকুরির ক্ষেত্রে পরের জন্যে নিজের লাঞ্ছনা ভোগ, উপরওয়ালার বিরাগ-ভাজন, অপবাদ, কৈফিয়ৎ প্রদর্শন প্রভৃতি সম্ভব।

ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম। রেসে অর্থক্ষতি। মহিলাদের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। অবৈধপ্রণয়ে সাফল্য, দাম্পত্যকলহ, সামাজিক-ক্ষেত্রে সম্মান, গার্হস্থালী বিষয়ে ঔদাসীন্য, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা, ভ্রমণ, বিলাসব্যসনে আসক্তির বৃদ্ধি। সময়ে সময়ে হিসাবের ভুলহেতু বিড়ম্বনা ভোগ। চাকুরিজীবী মেয়েদের নৈরাশ্যজনক আবহাওয়া।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু আর অশ্লেষার সময় একই রকম, পুষ্যার ভাগ্যে কিছু সুবিধা-সুযোগ মিলবে। মাসটী মিশ্রফলদাতা। লাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভোগ উপভোগজনিত প্রীতি, উপঢৌকনপ্রাপ্তি, শত্রুজয় এসব ভালো ফল যেমন আছে, তেম্নি আছে সময়ে সময়ে অপদস্থ হওয়া, পকেটমারের ভয়, চোরের উপদ্রব, কর্ম্মে বাধা, অপবাদ প্রাপ্তি। নানাপ্রকার রোগ ঘট্‌তে পারে। রক্তের চাপ, হৃদ্‌যন্ত্র, চক্ষু, শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র আক্রান্ত হবে, তা ছাড়া আছে উদরশূল। ঘরে কোন রকম কলহ বিবাদ না হোলেও বাইরে হবে, এজন্যে অশান্তি ও কষ্টভোগ। আর্থিক ক্ষেত্রে আশাপ্রদ পরিস্থিতি। টাকা আস্‌তেই থাক্‌বে। সঞ্চয় হবে না। হোমরা-চোমরাদের কাছ থেকে লাভ, পরিশ্রমে সাফল্য, মুরুব্বির অনুগ্রহলাভ এসব হবে। কিন্তু নগদ টাকার সময়ে সময়ে বেশ টান ধর্‌বে। অচেনা ব্যক্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে। স্পেকুলে-শনে আর রেসে কিছু টাকা আস্‌বে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে অশুভ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। ব্যব-সায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। মহিলাদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। দাম্পত্য প্রণয়ে বিপত্তি, রোমাণ্টিক পরিবেশে নিন্দালাভ, সংসারের কাজে সাফল্য, ধর্ম্মচর্চ্চায় উন্নতিলাভ। যে সব মেয়ে বেকার রয়েছে, তাদের কর্ম্মলাভ। পর পুরুষের বান্ধবতায় কার্য্যসিদ্ধিও আমোদপ্রমোদে কালযাপন।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীরই বেশ ভালো সময়, পূর্ব্বফল্গুনীর মধ্যম আর মঘার ভাগ্যে নিকৃষ্টফল। বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুগ্রহলাভ, কর্ম্মে সাফল্য, বিলাসব্যসনদ্রব্যলাভ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি। উদ্বেগ, স্বজনবন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য, ক্ষতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে শেষে অনুশোচনা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো যাবে। পথ্য সম্বন্ধে সতর্ক হোলে কোন পীড়ার ভয় থাক্‌বে না। সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক। পারিবারিক সুখশান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। বাইরের লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ সংঘর্ষ হোলেও বিশেষ অনিষ্ট হবে না। আর্থিক ব্যাপারে শুভ, লাভজনক পরিস্থিতি। হঠাৎ ভাগ্যো-ন্নতির সম্ভাবনা। স্পেকুলেশন ও রেসে অর্থলাভ। কৃষিজীবী, বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন যোগ আছে। সুযোগ এলেই অবহেলা করা চল্‌বে না, উন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। এমাসে মহিলাদের ব্যস্ততা দেখা যায়। জিনিষপত্র ক্রয়, গৃহস্থালী কাজে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়, চিত্রার মধ্যম ও হস্তার নিকৃষ্ট সময়। প্রথমার্দ্ধে সৌভাগ্য, আমোদপ্রমোদ, সাফল্যলাভ, বিদ্যা-শিক্ষায় সাফল্য ও গৌরববৃদ্ধি, শেষার্দ্ধে স্বজনবিরোধ, অপরিমিত ব্যয়-হেতু দুশ্চিন্তা, আঘাতপ্রাপ্তি, দুর্ঘটনার ভয়, শত্রুদের ষড়যন্ত্র, অবমাননা, অসৎসঙ্গ ইত্যাদি সূচিত হয়। অন্য কোন প্রকার অসুখ না হোলেও আঘাত প্রাপ্তি বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এমাসে কোথাও ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। পারিবারিক অশান্তি। কোন স্বজন বা নিকট-আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তিযোগ আছে। অর্থের দিকে একরূপ ভাবেই যাবে

বরং ব্যয়াধিক্য ঘটবে। শেষার্দ্ধে অর্থাগমের পথগুলি মুক্ত হবে, তবু থাকবে পয়সার টান। লাভ ও ক্ষতি স্পেকুলেশনে দেখা যায়। রেসেও নাই। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। শত্রুদের দ্বারা নিগ্রহভোগ। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম সুযোগ, পরিবর্ত্তন ও অনুকূল পরিস্থিতি—সাফল্যের মুহূর্ত্তে কিছুটা বাধা প্রথম এলেও তা অতিক্রান্ত হবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে ভালো-মন্দ দুইই ঘটবে। মহিলাদের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে শুভ। যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ আনন্দও তৃপ্তিলাভ, ঘরে বাহিরে ভালোবাসালাভ, বহু পুরুষের সহিত পরিচয় ও বান্ধবতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাদর। যে সব মেয়ে বৃত্তিজীবী, চাকুরিজীবী বা অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত, উন্নতিলাভ করবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারিত ও নিগ্রহ ভোগ করবে। অধ্যাত্মসাধিকার সাফল্য।

তুলা রাশি

চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিত গণের পক্ষে অনেকটা ভালো, স্বাতী ও বিশাখার পক্ষে মধ্যম। অন্তরের বাসনার পূর্ণতা, লাভ, সদ্বন্ধুলাভ, সৎসঙ্গ, বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদিলাভ, সাধারণ সাফল্য, সৌভাগ্যোদয়, নূতন পদমর্য্যাদা সম্মানবৃদ্ধি, শত্রুজয়, পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভৃতি শুভ ঘটনার সংযোগ। কোন কারণে বন্ধুবিচ্ছেদ, অভাবনীয় অশুভ পরিস্থিতি ও তার জন্য পরিবর্ত্তন, ক্ষতি ও কিছু কিছু আশাভঙ্গ যোগ আছে। দুর্ঘটনার ভয় আছে। স্বাস্থ্যের অবনতি নেই। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের সম্ভাবনা। সামাজিকতার ক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধি, আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর শুভ হবে। নানাদিক দিয়ে লাভ। উত্তরাধিকার সূত্রে, গবেষণায়, মামলা মোকর্দ্দমায় জয়, গ্রন্থ-প্রকাশে অথবা বিদ্যামূলক কার্য্যাদিতে, ভ্রমণে নানাপ্রকার লাভ। টাকার লগ্নী ও স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থাগম। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটামুটি সন্তোষজনক। পদোন্নতি, মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও সম্মান লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে বিশেষ শুভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ সাফল্য ও সম্মান বৃদ্ধি। রোমাণ্টিক ও অবৈধ প্রণয়ের পরিবেশ বিশেষ অনুকূল। একাধিক পুরুষের বন্ধুতা ও সাহায্যে নানা প্রকার লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উত্তম, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে পূর্ব্বার্দ্ধে শত্রুবৃদ্ধি, কলহ বিবাদ, মনস্তাপ, ক্ষতি, নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি, অকারণ ভ্রমণ যোগ আছে। শেষার্দ্ধে শত্রুহানি, শুভকর্ম্ম সংযোগ, নূতন পদমর্য্যাদা, সৌভাগ্যলাভ, উচ্চপদস্থগণের অনুগ্রহলাভ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। উদর ঘটিত পীড়া, চক্ষুরোগ, পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অশান্তি থাকলেও শেষার্দ্ধে সুখস্বচ্ছন্দতা। পরিবারবর্গের মধ্যে সন্তান জন্ম, আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি সূচিত হয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শেষার্দ্ধ উত্তম, প্রথমদিকে নানাপ্রকার অশুভ ঘটনার সমাবেশ, কলহ বিবাদ ও মানসিক উদ্বেগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। রেসে লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাজনক নয়। মহিলাদের পক্ষে এমাসে সর্ব্ববিষয়ে সংযত হয়ে চলা দরকার। বাহিরের কাজে বেশী আত্মনিয়োগের যোগ। অধ্যবসায়, তদ্বির ও অন্যপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা আশাতীত ভাবে কার্য্য সিদ্ধি। প্রণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো, পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। কারো পক্ষে মাসটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মে বাধা, ক্লান্তিকর উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ, শত্রুবৃদ্ধি, মামলা-মোকর্দ্দমা, উদ্বেগের বৈচিত্র্য প্রভৃতি এ মাসের অধিকাংশ সময়ে বর্ত্তমান, শেষের দিকে কিছু কিছু কর্ম্ম সাফল্য, সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ। অতিরিক্ত উত্তাপজনিত শারীরিক কষ্ট, রক্তের-চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে। কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তি থাকলেও মারাত্মক কিছু হবে না, শান্তি ও ঐক্য সংরক্ষিত হবে। বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ-আদি হোলেও তা গুরুতর হবে না, ক্ষণস্থায়ী হবে। আর্থিক অনটন। টাকা এলেও সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হয়ে যাবে, সঞ্চয়ের আশা কম। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহাদি সম্ভাবনা। প্রতারণা বা চুরির জন্য ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি যোগ আছে। চাকুরীর পক্ষে নানা-প্রকার অসুবিধা ও লাঞ্ছনাভোগ, এমন কি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে কর্ম্মক্ষতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মহিলাদের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, আশাভঙ্গ, প্রণয়হানি, উদ্বেগ ও কলহ বিবাদজনিত অশুভ পরিস্থিতি।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া পক্ষে মাসটী উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শ্রবণার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। প্রলোভন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উদ্বেগের বৈচিত্র্য, অপবাদ, অসৎ-সঙ্গ, কুপরামর্শে বিভ্রান্তি, শত্রু উৎপীড়ন, মামলা মোকর্দ্দমা, ব্যয়াধিক্য, ক্ষতি, কর্ম্মে বাধা প্রভৃতি সম্ভাবনা। মাসের শেষ দিকে খ্যাতি, বন্ধুর সাহায্যলাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য ক্রয় প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি। বায়ু বৃদ্ধি, রক্তের চাপবৃদ্ধি। সন্তানদের পীড়া ও এজন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, আত্মীয় স্বজন ও সন্তানাদির সঙ্গে কলহ, বয়োজ্যেষ্ঠদের শত্রুতা পারিবারিকক্ষেত্রের ভিতরে বাহিরে। আর্থিক অবস্থার অবনতি, নূতন কর্ম্মোদ্যম বর্জ্জনীয়, স্পেকুলেশন ও রেসে বিশেষ ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। চাকুরি-জীবীর পক্ষে প্রচুর বিড়ম্বনা ভোগ, ওপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার জন্য নানা অসুবিধা, ভৃত্যাদির ব্যবহার ও অপ্রীতিকর। মহিলাদের পক্ষে

এ মাসটী উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। গার্হস্থ্যালী কাজে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। বাহিরের যে কোন ব্যাপারে না থাকাই ভালো। উদর পীড়া ও হজমের দোষ ঘটবে।

কুম্ভ রাশি

শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রের পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে উত্তম। শত্রুহানি, সুখ, লাভ, জনপ্রিয়তা, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, উত্তম স্বাস্থ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, স্বজনবন্ধুর আগমন, যশ প্রতিষ্ঠা ও পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি যোগ আছে। স্বজনগণের কাছ থেকে দুঃখ প্রাপ্তি, অসৎসংসর্গের দরুণ কুফল, অপমান, কর্ম্মেবাধা প্রভৃতিও মাসের শেষার্দ্ধে সূচিত হয়। স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ আছে। উদর ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, জ্বর ও প্রস্রাবের গণ্ডগোল ঘটতে পারে। পরিবারবর্গের সঙ্গে মতভেদ হেতু কলহাদি সম্ভব। আর্থিকক্ষেত্র বিশেষ শুভ। নানাপ্রকারে অর্থাগম, আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, নানাভাবে উপার্জ্জনজনিত আয় বৃদ্ধি। জমি, শেয়ার, ডিভিডেণ্ট প্রভৃতি মাধ্যমেও আয় বৃদ্ধি। রেসে হঠাৎ বহু টাকা প্রাপ্তি, লটারীতে, খেলায়ও অর্থলাভ। শেয়ার-মার্কেটে স্পেকুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী উত্তম নয়, মামলা মোকর্দ্দমার যোগ আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম, প্রতিযোগীতায় জয়। নূতন পদমর্য্যাদা, কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে উপরওয়ালার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম। মহিলাদের পক্ষে জনপ্রিয়তালাভ। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ। অবৈধ প্রণয়ে, কোর্টশিপে ও রোমাণ্টিক পরিবেশে নানাপ্রকার আনন্দ অনুভূতি বিলাসব্যসন দ্রব্য ও অর্থলাভ। অবিবাহিতাগণের পক্ষে ভাবী বিবাহের আশার আলোক সম্পাত হবে।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত অপেক্ষা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাতগণের অপেক্ষাকৃত শুভ সময়। মাসটী মিশ্রফলদাতা। শত্রুগণের উৎপীড়নে অসুবিধা ভোগ ও তজ্জনিক মানসিক উদ্বেগ, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি, উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মগ্রহণ, কলহ, পদমর্য্যাদার হানি, অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন ও ক্ষতি, শেষের দিকে সর্ব্বপ্রকারে শুভ, চিত্তের সমতা, সাফল্য, সুখ, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জ্জন। নিজের ও সন্তানাদির অসুখ। দুর্ঘটনার ভয়, কলহ, বিবাদ, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য, পরিবারের বহির্ভূত স্বজন কুটুম্বাদির সহিত মনান্তর প্রভৃতি যোগ আছে। অর্থ ক্ষতি হবেই। শেষের দিকটা কিছু ভালো। রেস ও স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, কোন রকমে মাসটী যেতে দেওয়াই ভালো। চাকুরিজীবী ও বেকার ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসের শেষ দিকটা অনুকূল। নূতন কর্ম্মলাভ, পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ সময়, মধ্যে মধ্যে বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। মহিলাদের পক্ষে মাসটী অশুভ। কোন প্রকারে সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়। পরপুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো, কোনপ্রকার রোমাণ্টিক পরিস্থিতি বিপত্তি ঘটাতে পারে।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে মধ্যম। পাকাশয়ের দোষ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। সৌভাগ্যহানি। পারিবারিক অশান্তি। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

বৃষলগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি। ভ্রাতৃ-কলহ, ব্যয়-বৃদ্ধি, কর্ম্মক্ষতি, দাম্পত্যসুখের অভাব, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

মিথুনলগ্ন

দেহ পীড়া, উদ্বেগ, অশান্তি, ব্যয়-বৃদ্ধি, কর্মলাভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ, মহিলাদের পক্ষে শুভ।

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক সুখ, অর্থাগম, শত্রুজয়, ব্যয়-বাহুল্য বিদ্যার্থীর পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া, মহিলাদের প্রীতিকর ঘটনা।

কন্যালগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অশান্তি, বৈষয়িক গোলযোগ, সন্তানের উন্নতি, পত্নীর শারীরিক কষ্ট, ব্যয়াধিক্য, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে মধ্যম।

তুলালগ্ন

মানসিক উদ্বেগ, আশা ভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, অর্থাগম, সন্তানের পীড়া, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, শিরঃপীড়া, গৃহনির্মাণ বা সংস্কার, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি, ভাগ্যোন্নতি, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

ধনুলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। অর্থক্ষয়, কর্ম্মের বিস্তৃতি, বিষয়বিত্তভোগ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধা, মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়।

মকরলগ্ন

অর্থাগমের যোগ, শারীরিক অবনতি, সন্তানের পীড়া, পারিবারিক অশান্তি, ভ্রমণ, সম্বন্ধলাভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মহিলাদের পক্ষে নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, ধনভাবের ফল উত্তম, পদোন্নতি, গৃহসংস্কার, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

মীনলগ্ন

দেহভাব উত্তম নয়, স্নায়বিক-দুর্বলতা, রক্তের চাপ-বৃদ্ধি, কর্ম্মস্থলে অশান্তি ও উদ্বেগ, আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলহ, ব্যবসায়ে উন্নতি, সন্তানের পীড়া, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, মহিলাদের পক্ষে অধম।

খেলা ধূলা



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আসন্ন রোম অলিম্পিকে ভারতের আশা

বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছে। কিন্তু একমাত্র হকি খেলা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়েই এ'পর্য্যন্ত সামান্যতম কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হয়নি। চিরদিনই ভারত তার বিশ্বজয়ী হকি খেলোয়াড়গণের মুখের পানে তাকিয়ে এসেছে এবং এতদিন ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই হকি খেলোয়াড়গণ তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এসেছেন। তাঁদের প্রতি জাতির এই আস্থার অবমাননা কোনদিনই হতে দেননি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগতে তাঁরা ভারতবর্ষকে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৬ বার ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকিতে বিজয়ী হয়েছে। ১৯০৮ এবং ১৯২০ সালে বিজয়ী হয় গ্রেট ব্রিটেন তারপর ১৯২৮ থেকে ক্রমান্বয় বিজয়ী হয় ভারত। নিপুণতায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের ধারে কাছে পৌছানও অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের পক্ষে এতদিন সম্ভব হয়নি। কিন্তু ক্রমশঃ ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষ করে জার্ম্মানী, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড এই খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছে। তারপর দেশবিভাগের ফলে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পাকিস্থান হকি দল ভারতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে পরিণত হয়েছে। হকি খেলায় ভারতের একছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাতে এরা বদ্ধপরিকর। আসন্ন রোম অলিম্পিকে ভারতকে সত্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হবে। ভারতের শ্রেষ্ঠত্বে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে তার অবসান ঘটাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে ভারতবর্ষ এখনও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল। এবারকার অলিম্পিকে হকির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তা বিস্ময়কর। দলগত শক্তি এবং খ্যাতি অনুযায়ী ভারতের পরই পাকিস্থানের আসন। সেই অনুযায়ী ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানকে দু'টি ভিন্ন গ্রুপে রাখাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু এই দুটি শ্রেষ্ঠ হকি দলকে একই গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারত এবং পাকিস্থানকে ফাইনালের পূর্ব্বেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হবে। সম্প্রতি নাইরোবীতে সফররত পাকিস্থান অলিম্পিক হকিদলের পরাজয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর থেকে উপলব্ধি করা যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশ হকি খেলায় কতখানি উন্নতি করেছে। কিন্তু ভারতীয় হকিদলের উপর চিরদিনই আমাদের আস্থা আছে। ভারতীয় হকি খেলোয়াড়গণ রোমে তাঁদের সাথে করে নিয়ে গেছেন সমগ্র জাতির শুভেচ্ছা এবং ভারতীয় হকির সম্মান ও ঐতিহ্য, যা তাঁদের অনুপ্রাণীত করবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় হকিদল বাংলার কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় ল্যাস্‌লি ক্লডিয়াসের নেতৃত্বে পুনরায় বিজয় গৌরবে ভারতের মাটিতে ফিরে আসবে।

হকির পর ভারতের অলিম্পিক পদক লাভের আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছে খ্যাতনামা দৌড়বীর মিল্‌খা সিং-এর উপর। এশিয়ান প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের পরই ১৯৫৮ সালে কার্ডিফে কমনওয়েল্‌থ গেমে ৪৪০গজ দৌড়ে তিনি কমনওয়েল্‌থ রেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯১৮ সালে মিলখা সিং ২০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বের ক্রমতালিকায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এরপর তাঁর পুনঃ পুনঃ সাফল্য ভারতবাসীর মনে ভারতের সর্ব্বপ্রথম এ্যাথলেটিকসে অলিম্পিক পদক লাভের আশা জাগরিত করেছে। আসন্ন রোম অলিম্পিকে যোগদানের পূর্ব্বে কিছু সংখ্যক এ্যাথলেটকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দান করে আই-ও-এ'র কর্ত্তৃপক্ষগণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপে এই সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে মিলখা সিং যে উন্নত ফল প্রদর্শন করছেন তা সকলের মনে নূতন আশার সঞ্চার করেছে। জার্ম্মানীর মিউনিকে প্রথম প্রতিযোগিতাটিতে যোগদান করে ৪০০ মিটার দৌড়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পশ্চিম জার্ম্মানীর খ্যাতনামা দৌড়বীর কার্ল কাউফমান ৪৫.৯সেঃ এই দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম হন। মিলখার সময় লাগে ৪৬ সেকেণ্ড। এরপর তিনি লণ্ডনে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ৪৪০গজ দৌড়ে যুক্তরাজ্যের বহিঃরাগতদের মধ্যে সর্ব্বকালের রেকর্ড স্থাপন করেন। সম্প্রতি ফ্রান্সে, প্যারিসের নিকট ফন্‌টেনেব্লেউতে মিল্‌খা সিং আরও উন্নত ফল প্রদর্শন করেছেন। ৪৫.৮ সেকেণ্ডে তিনি এই দূরত্ব অতিক্রম করেন। অলিম্পিকের ঠিক পূর্ব্বে তাঁর এই সাফল্য খুবই আশাপ্রদ। অলিম্পিকের জাঁকজমক এবং গুরুত্বে বিচলিত না হয়ে 'হিটে' তিনি যদি তাঁর যথার্থ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন তা হলে এ্যাথলেটিক্‌সে ভারতের সর্ব্বপ্রথম অলিম্পিক পদক লাভের আশা বাস্তব রূপ ধারণ করবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

ভারতের অন্যান্য এ্যাথলেটগণের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপে বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সাফল্যলাভ করেছেন কিন্তু অলিম্পিকে সাফল্য লাভের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। গত জুলাই মাসে বার্মিংহামের নিকটে এক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ভারতের ম্যারাথন দৌড়বীর লালচাঁদ ১৫ মাইল দৌড়ে বি, ব্রাউনিংকে ১৫০ গজ পশ্চাতে রেখে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রোগ্রামে তাঁর নাম না থাকায় তাঁকে জয়ী বলে ঘোষণা করা সম্ভব হয় না। ভারতের দলজিৎ সিং অর্দ্ধ-মাইল দৌড়ে ১মিঃ ৫৫,৮ সেঃ অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আবার জার্ম্মানীর কোলোনে ৮০০ মিটার দৌড়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দলজিৎ সিং ১ মিঃ ৫১,৩ সেঃ এই পথ অতিক্রম করেন। গ্লাসগো রেঞ্জার্সে'র এক প্রতিযোগিতায় লং জাম্পে ভারতের বীর সিং ২২ ফুট ৯ ইঞ্চি লাফিয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। এই প্রতিযোগিতাতেই মাখন সিং ২২০ গজ দৌড়ে (২১. ১. সেঃ) তৃতীয় হন।

গত মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এবার সেই স্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে হাঙ্গেরী প্রভৃতি শক্তিশালী দল রয়েছে।

এবারকার অলিম্পিকে ভারতের পক্ষে মহিলা প্রতিনিধি দল পাঠান সম্ভব হবে না। যাই হ'ক অন্যান্যবারের তুলনায় এবারকার ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ যে উৎকৃষ্টতর ফল প্রদর্শন করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাহির বিশ্বে ***

* ব্রিটেনের আশা

আসন্ন রোম্‌ অলিম্পিকে মেরী বিগ্‌নালের মাধ্যমে ব্রিটেন একটি স্বর্ণ-পদক লাভের আশা রাখে। কুমারী বিগ্‌নাল ১৯৫৯ সালের ব্রিটেনের 'বৎসরের সেরা মহিলা খেলোয়াড়' নির্ব্বাচিতা হয়েছেন। তিনি বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দৈর্ঘ্য লম্ফন ও স্প্রিণ্টে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি উচ্চ লম্ফনেও বিশেষ পারদর্শিনী।

বামে ৮০ মিটার হার্ডলস, দৈর্ঘ লম্ফন এবং সম্ভবত পেণ্টাথলন্ এই তিন বিষয়েতাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে আশা করা গেছিল, কিন্তু জানা গেছে কুমারী বিগ্‌নাল অলিম্পিকে শুধু মাত্র দৈর্ঘ লম্ফনেই অংশ গ্রহণ করবেন। সেজন্য তিনি কেবলমাত্র এই বিষয়েই একান্তভাবে অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। মট্‌সপার পার্কে এ্যামেচার এ্যাথলেটিক য়্যাসোসিয়েশনের নিযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাধিনে তাঁর অনুশীলনকার্য্য সমাপ্ত হয়েছে।

মিড্‌লেসেক্সের ষ্টানমোরে ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স ষ্টেসনে, এ-এ-এ পরিচালিত অভ্যন্তরীণ (indoor) এ্যাথ্‌লেটিক প্রতিযোগিতায় মেরী বিগ্‌নাল লং জাম্পে সহজেই বিজয়িনী হন। গত গ্রীষ্মের পর এই প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিনি লং জাম্পে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ মহিলাগণের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভঙ্গ করেন (১৯ ফিট্‌ ৮½ ইঞ্চি)। তিনি প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড অপেক্ষা ১ ফুট বেশী লাফাতে সক্ষম হন।



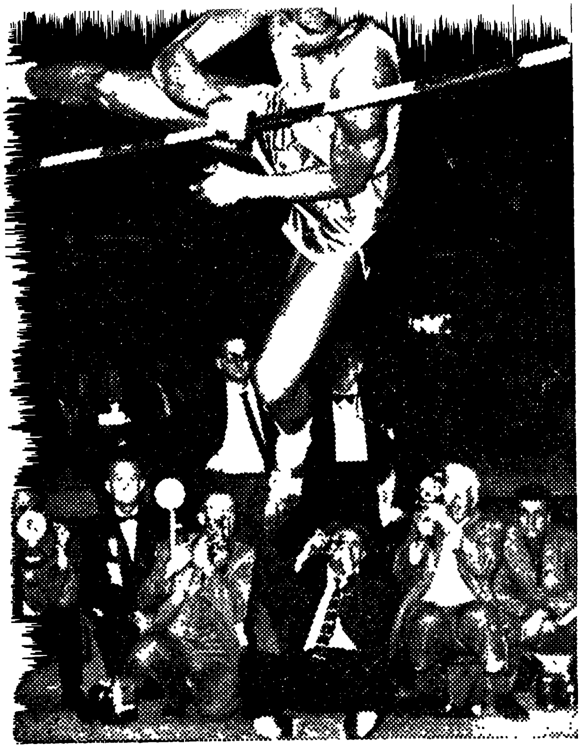
মট্‌সপার পার্কে মেরী বিগ্‌নাল স্প্রিণ্টার ও হার্ডলার ক্যারল কুইণ্টনের পিঠে ভর দিয়ে অনুশীলন করছেন

* 'ইয়াচে' করে আটলাণ্টিক পাড়ি

প্রথম একক 'transatlantic yacht' রেসে লণ্ডনের ৫৮ বৎসর বয়স্ক মানচিত্র প্রস্তুত কারক ফ্রান্সিস চিচেষ্টার বিজয়ী হয়েছেন। ইংলণ্ডের প্লিমাউথ থেকে নৌকা ভাসিয়ে ৪০ দিন পরে তিনি নিউ ইয়র্ক বন্দরে উপনীত হন। তিনি এক মাস্তুল বিশিষ্ট ৩৯ ফিট্ জিপ্‌সি মথ্‌ III ইয়াচে করে যাত্রা করেন। ১৯৫৬ সালে ২৫ ফিট 'Salmo'তে স্কটল্যাণ্ড থেকে কুইবেক, ক্যানাডা গমনের যে রেকর্ড ই, জি, হামিল্টন স্থাপন করেছিলেন সে রেকর্ডও চিচেষ্টার ভঙ্গ করেছেন। আটলাণ্টিক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন। 'ইহা সব সময়ই ভয়ঙ্কর। কেমন করে যে নৌকা বাঁচতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না'। একাকী যাত্রার সবচেয়ে খারাপ দিক তিনি বলেন ঢেউয়ের প্রচণ্ড শব্দ। চিচেষ্টার তাঁর এই অভিনব ভ্রমণকালে একবার প্রচণ্ড গতিবেগ সমন্বিত ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। এই ঝড় ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ঝড়ে তাঁর নৌকার খোঁটা বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তাঁর 'ব্যারোমিটার'ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

* উচ্চ লম্ফনে বিশ্ব রেকর্ড—

আমেরিকার বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জন্ থমাস উচ্চ লম্ফনে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্ত্তমান মরশুমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রায় অখ্যাতই ছিলেন। তাঁর এই সাফল্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। আমেরিকার পূর্ব্ব উপকুলে ইন্‌ডোর প্রতিযোগিতায় তিন্ সপ্তাহের মধ্যে তিনি তিনটি রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এরপর থমাস তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে। এখানে



জন্ থমাস

তিনি ৭ফিট অতিক্রম করে উচ্চ লম্ফনে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। জন্ থমাসের বয়স ১৭ বৎসর এবং তাঁর উচ্চতা ৬ফিট ৪¼ ইঞ্চি।

* ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ান রেফার জনসন

ডেকাথলনে বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টিকারী এ্যাথ্লেট রেফার জনসন যে রোমে উন্নতর ফল প্রদর্শন করবেন তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৫৮ সালে এবং পরবর্ত্তিকালে ডেকাথলনে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর নাম বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৫৮ সালে মস্কোয় তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, রাশিয়ার ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ান, ভ্যাসিলী কুজ্‌নেৎসোভের সহিত রেকর্ড ভঙ্গকারী প্রতিযোগিত য় জনসন ২৮৮ পয়েন্টে কুজ্‌নেৎসোভকে পরাজিত করেন। এই ১৯৫৮ সালেই তিনি আমেরিকার 'বৎসরের শ্রেষ্ঠ ক্রিড়াবিদ' নির্ব্বাচিত হন। এরপর জনসন ডেকাথলনে ৮৬৮৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে কুজ্‌নেৎসোভের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে তিনি ঐ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। ১০০ মিটার—১০.৬ সেঃ, দৈর্ঘ লম্ফন—২৪ফিট ৯½ইঃ; সট্‌পাট ৫২ফুট; উচ্চ লম্ফন ৫ ফিট ১০ইঃ; ১০০ মিটার হার্ডলস ১৪.৫ সেঃ; ডিসকাস ১৭০ ফিট ৬½ ইঃ; বর্শা ছোঁড়া—২৩৩ ফিট ৩ইঃ; ১৫০০ মিটার দৌড় ৫মিঃ ৩ সেঃ।

রেফার লুইস্ জনসন লস্ এ্যাঞ্জেলসে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যায়াম শিক্ষকতায় গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবস্থায় তাঁর নম্র এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর কলেজের ১১ হাজার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁকে ছাত্র সংস্থার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করে। জনসনের বয়স ২৪ বৎসর।

—

ডেকাথলনে বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টিকারী রেফার জনসন



খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬০ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান লীগ বিজয় করেছে। এ নিয়ে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ৯বার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। উপর্যুপরি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫৪-৫৬ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে। এ ছাড়া লীগ পেয়েছে ১৯৩৯ ও ১৯৫১ সালে। মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর কোন দল এত অধিকার প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়নি। খ্যাতনামা ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব লীগ পেয়েছে ৮বার।

আলোচ্য বছরে মোহনবাগান দলের লীগ বিজয় নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ২রা জুলাইয়ের পর মোহনবাগান দলের ৬জন নামকরা খেলোয়াড় হায়দ্রাবাদ শিক্ষা শিবিরে যোগদান করে। ফলে মোহনবাগানদলকে বাকি খেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করতে হয়। অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড় শৈলেন মান্নাকে দলের এই সঙ্কট অবস্থায় খেলতে হয়। মান্না এখনও যে তাঁর পূর্ব্ব দক্ষতা হারাননি তা আলোচ্য বছরের লীগের একাধিক খেলায় প্রমাণ করেছেন। তাঁর মনোবল এখনও অটুট রয়েছে। মোহনবাগান ক্লাবের লীগ জয়লাভে এটাও প্রমাণিত হয়েছে, স্থানীয় খেলোয়াড়রা কত নির্ভরশীল এবং দলের মনোবল কতখানি অনমনীয়। আলোচ্য বছরের লীগ খেলায় মোহনবাগান মাত্র একটি খেলায় হার স্বীকার করে—লীগের প্রথমার্দ্ধে ইষ্টার্ণ রেল দলের কাছে ০-১ গোলে। ৫টি খেলা ড্র করে—লীগের প্রথমার্দ্ধে রাজস্থান (১-১), খিদিরপুর (০-০), ও ইষ্টবেঙ্গলের (০-০) সঙ্গে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং মহামেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে। মোহনবাগান দলের বড় কৃতিত্ব, তারা লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপর্যুপরি ১১টি খেলায় এবং ভাঙা দল নিয়ে উপর্যুপরি ৯টি খেলায় জয়লাভ করেছে।

২রা জুলাই মোহনবাগান লীগের ফিরতি খেলায় ২-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করায়—মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের অবস্থা সমান দাঁড়ায়—এই তিনটা দলের প্রত্যেকেরই তখন ৭টি ক'রে পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের ১৯টা ক'রে খেলা—পয়েন্ট ৩১। মহমেডান স্পোর্টিং ১টা কম খেলে ২৯ পয়েন্ট করেছে। এই খেলার পর থেকেই মোহনবাগান তার দলের ৬ জন নিয়মিত নামকরা খেলোয়াড়ের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। ইষ্টবেঙ্গল দলের ৫জন



১৯৬০ সালের প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগচ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ফটো : ডি, রতন

নিয়মিত খেলোয়াড় ছিল না। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি দলের মধ্যে তখন দারুণ স্নায়ুযুদ্ধ আরম্ভ হয় লীগের খেলায় জয়-পরাজয় নিয়ে। এই তিনটি দলের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। মোহনবাগান ৬জন নিয়মিত খেলোয়াড় হারিয়ে লীগের বাকি খেলাগুলিতে একটানা জয়লাভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। অন্যদিকে মোহনবাগানের থেকে

ইষ্টবেঙ্গল ৮ পয়েন্ট পিছনে থেকে ৩য় স্থান পেয়েছে এবং মহমেডান স্পোর্টিং এক পয়েন্টের পিছনে লীগে রাণার্স-আপ হয়েছে। একসময়ে ১৭টি খেলায় যখন ইষ্টবেঙ্গলের ৩০ পয়েন্ট ছিল তখন মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং তিন পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল। ইষ্টবেঙ্গল বাকি এগারটি খেলায় ১১ পয়েন্ট লাভ করে। অপরদিকে লীগের শেষের ১১টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাব প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভ করে ২২ পয়েন্ট পেয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দল পাঁচজন নিয়মিত খেলোয়াড় হারিয়ে দলটি খুবই দুর্ব্বল হয় এবং সেই সঙ্গে মনোবল হারিয়ে ফেলে। দলের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তাদের শেষের ১১টি খেলার মধ্যে ১০টিতে জয়লাভ করে এবং একটি খেলা এরিয়ান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র করে।

মোহনবাগান দলের পূর্ব্ব সাফল্যের খতিয়ান

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৩৯	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮



মোহনবাগান ক্লাবের লীগ জয়লাভে সমর্থকদের জয়ধ্বনি ফটো : ডি, রতন

লীগ তালিকায় প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৮	২২	৫	১	৬১	১০	৪৯
মহঃ স্পোর্টিং	২৭	২২	৪	২	৫৫	১৪	৪৮
		১৭	৭	৪	৪১	১৩	৪১

১৯৬০ সালের ফলাফল

বালীপ্রতিভা	৩—২, ৩—০
বি এন আর	২—০, ৫—১
রাজস্থান	১—১, ২—০
উয়াড়ী	২—০, ৩—০

পুলিশ	৩—১,	৩—০
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে	০—১,	১—১
হাওড়া ইউনিয়ন	৬—০,	৩—০
খিদিরপুর	০—০,	৪—১
এরিয়ান্স	১—১,	২—০
জর্জ টেলিগ্রাফ	২—০,	২—১
ইণ্টার ন্যাশন্যাল	২—০,	২—০
মহমেডান স্পোর্টিং	১—০,	০—০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	৩—০,	২—০
ইষ্টবেঙ্গল	০—০,	২—০

গোলদাতা

এ ব্যানার্জি ১৪, সালাউদ্দীন ১৪, এস ঘোষ ১০, ডি দাশ ৫, এস গোস্বামী ৬, এস নন্দা ৫, এস সমাজপতি ৩, এ চক্রবর্তী ১।

আলোচ্য মরসুমে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় এই ৬জন খেলোয়াড় 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন—ডি দাস (ইষ্টার্ণরেলওয়ে), নারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল), পি রায় চৌধুরী ও বি গুহ (এরিয়ান্স), আপ্পালাররাজু ও ভারালু (বি এন আর)।

ইংলণ্ড—দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

৪র্থ টেষ্ট

ইংলণ্ড ঃ ২৬০ (বেরিংটন ৭৬ ; এড্‌কক্‌ ৬৬ রানে ৪ উইঃ) ও **১৫৩** (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ এড্‌কক্‌ ৫৯ রানে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২২৯ (ম্যাকলীন ১০৯, এ্যালেন ৫৮ রানে ৪ উইঃ) ও ৪৬ (কোন উইকেট না পড়ে)।

ম্যাঞ্চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৪র্থ টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বৃষ্টির দরুণ নির্দ্ধারিত দিনে এবং তার পরের দিন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। ফলে টেষ্ট খেলার ১ম ও ২য় দিন মাঠে মারা যায়। ৩য়দিন খেলা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। ৩য় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু আগে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ২৬০ রানে শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা কোন উইকেট না হারিয়ে ১৭ রান করে। মাত্র ৩০০০ দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিল।

৪র্থ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ১ম ইনিংস ২২৯ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ড মাত্র ৩১ রানে এগিয়ে থাকে। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাদলের রয় ম্যাক্‌লীন উভয় দলের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী (১০৯) করেন। ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ২ উইকেট হারায় যথাক্রমে দলের ২১ ও ৪১ রানে। ২ উইকেটে ইংলণ্ডের ৫০ রান ওঠে।

খেলার শেষ দিনে অর্থাৎ ৫ম দিনের সকাল দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় তাড়াতাড়ি উইকেট নিয়ে খেলাটা নিজেদের জয়লাভের অনুকূলে এনে ফেলে। ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে ১০১ রান উঠেছে। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে ব্যারিংটন এবং এ্যালেন নির্ভীকভাবে মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন ৯০ মিনিট—এই সময়ে দু'জনের চেষ্টায় দলের ৩৩ রান উঠল। ব্যারিংটন ২ ঘণ্টা ২০মিনিট খেলে নিজস্ব ৩৫ রান ক'রে ওয়েটের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। এই নিয়ে ওয়েট টেষ্ট ক্রিকেটে ৯৮টা ক্যাচ ধরলেন। এ্যালেন ৯০ মিনিট খেলে ১৪ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। রানের থেকে উইকেটের পতনরোধ করাই এই সময়টায় বেশী প্রয়োজন ছিল; ব্যারিংটন ও এ্যালেন জুটী তা সাফল্যের সঙ্গেই করেছিলেন। ব্যারিংটন আউট হলে টুম্যান খেলতে নেমে পিটিয়ে ১৪ রান করেন। দলের ১৫৩ রানে ইংলণ্ড ২য়ইনিংসেরখেলারসমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার সময় আছে ১০৭ মিনিট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে জয়লাভের জন্যে ১৮৫ রান দরকার যা করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকা জয়লাভের চেষ্টার ধার দিয়েই গেল না। নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল তাদের ৪৬ রান উঠেছে কোন উইকেট না পড়ে। ১ম উইকেটের জুটিতে এই অপরাজেয় ৪৬ রানই আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে তাদের সর্ব্বাধিক জুটির রান। দুদিনের খেলা ভণ্ডুল হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৩৩০০০ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল এবং দর্শনী বাবদ উঠেছিল ৪,২০০ পাউণ্ড।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

রোমের আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে। দলের অধিনায়ক পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন বাংলার প্রদীপ ব্যানার্জি। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, অলিম্পিক ভারতীয় হকি দলে বাংলারই খেলোয়াড় এস ডব্লু ক্লডিয়াস অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। অলিম্পিক ফুটবল এবং হকি দলে বাংলার খেলোয়াড়দ্বয় অধিনায়ক পদলাভ করায় আমরা গৌরব অনুভব করছি। অলিম্পিক ভারতীয় ফুটবল দলে বাংলার ৮জন, বোম্বাইয়ের ৫জন, অন্ধ্রপ্রদেশের ৩জন, সার্ভিসদলের ২জন এবং মাদ্রাজের ১জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছে। বাংলা থেকে স্থান পেয়েছেন প্রদীপ ব্যানার্জী (ইষ্টার্ণ রেলওয়ে); জার্ণেল সিং, কেম্পিয়া ও চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান); অরুণ ঘোষ, রামবাহাদুর, কানন ও বলরাম (ইষ্টবেঙ্গল)। গত ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ অলিম্পিকে যে ভারতীয় দল যোগদান করেছিল তার ৬জন খেলোয়াড় এই দলে আছেন।

সাহিত্য সংবাদ

দীপাঞ্জলি

মহাযোগী অনির্বাণ

শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, তারপর সুধাঞ্জলি, এইবার দীপাঞ্জলি।

হৃদয় কি থালী মেঁ মৈঁনে হৈ প্রেম কা দীপ জলায়া।

হৃদয়ের থালি 'পরে আমি জ্বালি প্রেমের প্রদীপ আজ

সেই দীপের অঞ্জলি চির কিশোরের পায়। তাঁরই আলোর প্রসাদ আবার তাঁকে সঁপে দেওয়া। দেওয়ার যে-আনন্দ, সেও তো তাঁর দান। অথবা সে তো তিনিই :

ভকতন মেঁ ভগবান বসে রী, ভকতন মেঁ ভগবান্।

হৈ এক ভকত ভগবান্!

ভক্তের মাঝে ভগবান—এক ভক্ত ও ভগবান্।

এ কার অঞ্জলি—ইন্দিরার না মীরার? বোঝবার উপায় নাই। মীরার শব্দাবলীর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারাই দেখবেন, দুয়ের মাঝে কোনও তফাৎ নাই—ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে উভয়ত্র একই সুরের মূর্ছনা। মনে হবে, নাম-রূপের যে ভেদ তা সেই একেরই চিদ্‌বিলাস, যুগ হতে যুগে একেরই সমৃদ্ধতর সম্ভূতি।

ভক্তমালের রচয়িতা নাভাজী মীরার পরিচয় দিয়েছেন একটি কথায় :

সদরিস গোপিন প্রেম প্রগট কলিজুগহিঁ দিখায়ো।

এই কলিযুগে গোপীর প্রেমকে মীরা আবার তেমনি ক'রে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সেই প্রেমকে আমরা আবার দেখলাম।

বৈষ্ণব বলেন, প্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। মোক্ষকেও সে ছাপিয়ে গেছে। নিগ্রর্ন্থ আত্মারাম যে-মুনি, তিনিও অহৈতুক প্রেমের টানে তাঁর দিকে ভেসে চলেন। আর সহজে তাঁকে যে ভালোবাসে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই সে চায় না, শুধু তাঁকেই চায় :

কুছ বোলূঁ না কুছ মাঁগূঁ না
মৈঁ চরণ ন সংগ লগ জাঁউ!
মৈঁ দুখ সুখ এক মনাউঁ—
মৈঁ তন ধন সব বেচ দুঁরী
বস্ প্রভুকী মৈঁ হো জাঁউ।

বলিব না কোনো কথা, চাহিব না কিছু শুধু
চরণে জড়ায়ে রবো তাঁর
দুখ সুখ হবে একাকার
তনু মন ধন সব বিকায়ে দিব লো, হব
একান্ত নাথের আমার।

*   *   *

প্রেমি ন মাঁগে মুকতী শকতী মাগে আন ন মান।
ভোগ ন মাঁগে, মোক্ষ ন মাঁগে, মাঁগে, না নির্বাণ॥

এই আবেগ আত্ম সমর্পণের বিবশ আকূতি কোথা থেকে ওঠে, কেউ বলতে পারে না :

প্রীত ন বস কী বাত সখী রী
হোনী থী সো হোঈ,
রংগ লিয়ো প্রভুনে রংগ অপনে
অব ক্যা করেগা কোঈ।

প্রেম সে তো নয় কারো বশ সখী,
হলো আজ যা হবার :
রাঙালো আমারে রঙে সে তাহার,
কারে ভয় বল আর?

কি দেখে যে ভুললাম, তা বোঝাই কি ক'রে! আমি তার ভুলিনি, ভুলেছি মাধুরীতে :

নারায়ণ মেঁ দেখিয়ো নহী
মা মৈঁ জগতর খৈয়া
অধর মুরলিয়া লে আয়ো মৈঁ
দেখ্যো হৃদয়র খৈয়া!
মধুর বৈন, মধুর নৈন, মধুর রৈন আয়া।
মধুর অংগ, মধুর ঢংগ, মধুর লয় শুনায়া
মোহ লিয়ো মন মেরা রী
মন মোহ লিয়ো গিরিধারী।

নারায়ণ আমি দেখি নি তো তারে,
জগতের কাণ্ডারী।
অধরে মুরলী নিয়ে এলো সে যে
দেখিনু হৃদি বিহারী।
মধুর ভাষণ মধুর নয়ন
সন্ধ্যা এলো মধুর
মধুর মাধুরী মধুর চাতুরী
বাজালো মধুর সুর
মোহিল আমার মন সে, মজালো
মন সখী গিরিধারী আমারা

আর অমনি

ছুট গয়ো সব বন্ধন পল মেঁ
মোহ মায়া সব হারী !
সব বন্ধন খসিল পলকে,
মোহ মায়া সব মানিল হার।

মুক্তি আমি তো খুঁজিনি, সে আপনি এসেছে। আমার মুক্তি যে ছুটি ললিত বাহুর বন্ধনে।

এই যে প্রেম—অকারণ, অবারণ। মুগ্ধা কিশোরীর মন, আপনাকে আপনি বিভোর। কিছুরই ভাবনা তো তার ছিল না। কিন্তু এ কি !

শুন শুন রি সজনিয়া ! বাঁসরী :—
পনঘট পর কোঈ বজাওত হৈ।
শোন্ শোন্ সখী শোন্ না উছাস লো !
সে কে নদীকূলে বাঁশি সুরে ডাকে।

মুহূর্তের মাঝে কি যে থেকে কী যে হয়ে গেল :

আজ সখী মন ব্যাকুল মেরা
মন মোহন কঁহি আওত হৈ,
কোই ন রোকন হার সখী অব
শ্যামল মুঝে বুলাও ত হৈ।
আজ সখী মন ব্যাকুল আমার
এলো বুঝি মনোমোহন ফিরে !
যে রুধিবে আজ আমাকে—যখন
ডাক দিলো বঁধু যমুনাতীর !

শুরু হ'ল নিরন্ত অভিসার—বনের পথে, না মনের পথে? আশা-শার আনন্দ-বেদনার ফুলে আর কাঁটায় ছাওয়া পথে, তার যেন আর নাই। তখন

সখী রি মৈঁ তো প্রেম দিবানী
শ্যাম পে বাবরি হোঈ !
আমি সখী প্রেমে আপন হারা
শ্যাম তরে পাগলিনী !

একবার পথে যে পা বাড়িয়েছে, তার ফেরবার উপায় নাই। হায়,

প্রভু তুম সংগ প্রীত লগাকে ভই
য়হ কৈসী দশা হমারী ?
না তোড় সকুঁ, না ছোড় সকুঁ
মুখ মোড় সকুঁ ন মুরারী !
ভালোবেসে আজ তোমাকে দেখ না
কী দশা আমার শ্যামরায় !
না পারি ছিঁড়িতে ছাড়াতে বাঁধন
না পারি ফিরাতে মুখ হায় !

কথনও মনে হয়,

শ্যাম পায়ো রী সখী
মৈঁ শ্যাম পায়ো রী !
পেয়েছি শ্যামলে আজ সখী, আমি
পেয়েছি পেয়েছি দিশা তার !

পর মুহূর্তেই দেখি, কই, কোথাও ত কেউ নাই :

খোজত খোজত ভঈ বাবরী,
মিলিয়ো না গিরধারী।
খুঁজে খুঁজে আমি পাগলিনী—দিশা
মিলিল না তবু বঁধুয়ার।

উপনিষদের ঋষিও বলেছিলেন, 'তস্য এষ আদেশঃ, বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ন্যমিমীষদ্ আ,—এই তার নিশানা, বিদ্যুতের মত এই ঝলক দিল, এই আবার মিলিয়ে গেল।

অভিমানে তখন বুক ভ'রে ওঠে। বলি :

জা রি সখী, শ্যামল সে কহ দে—
অব বো মন ভরমায়ে না।
নৈ নোঁ সে জো দূর রহে তো
মন মেঁ ভী বো আয়ে না।
যা সখী, শ্যামলে বল গিয়ে—যেন
আমার মন মজায় না সে।
নয়ন থেকে সে রবে দূরে যদি
হৃদয়ে ও যেন সে না আসে।

কিন্তু হায়, তাকে ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ, আমার যে

রোম রোম মেঁ বস গয়ো মোহন
নৈন বসে বন বনোয়ারি !
রোমে রোমে করে বিরাজ মোহন
নয়নেও রাজে বনোয়ারি।

তাই আবার বলি

না না রি সখী, কুচ্ছ না কহ না
হোতা হৈ প্রেম মেঁ সব সহনা
বিরহাতো প্রেম কা ইক গহনা
জিস হাল মেঁ রাখে মৈঁ রহনা···
না না সখী, কিছু বলিস না তুই তারে,
প্রেমকে সহিতে হয় নিতি বেদনারে.
বিরহ প্রেমের ভূষণ—কি জানিস নারে ?
রহিব যেমনি রাখিবে বঁধু তোমারে।

হায়রে এই তো ভালোবাসা—

জো সুখ কী হৈ নৈয়া
তো পতবার দুখ কী,
জো সুখ কী হৈ বীণা
তো ঝংকার দুখ কী।

তরণী সুখের হয় লো যদি,
ক্ষেপণী দুখের হয় ধরায়।
বীণা হয় যদি সুখের সখী,
ঝংকার লীন হয় ব্যথায়।

তারপর? এই হিয়াদগদগি পরাণ পোড়ানির একদিন শেষ হয়, যখন আত্মচৈতন্যের দীপ উদ্ভাস্বর হ'য়ে ওঠে বিশ্বচৈতন্যের সৌর মহিমায়। তখন—

ক্যা বাহর ক্যা অন্দর।
জিধর নৈনে দেখা তুম্ হেঁ নাথ পায়া।
কী বাহির, কী বা অন্তর?
যেথা মেলি আঁখি, তোমারেই দেখি সুন্দর!

তখন তুমি বিশ্বময়, আমি যে তোমারই তনুজা। আমি তখন

তরঙ্গ হো জাঁউ যমুনা কী
লিপটী রহুঁ কিনারে
চন্দা বন আও তুম মোহন
দর্শন বনু মৈ প্যারে।
তরঙ্গ আমি হব যমুনার
কুলেরে জড়ায়ে রবো।
চাঁদ হ'য়ে যবে উদিবে মোহন,
আমিও মুকুর হব।

অথবা

বোলো তো ছোটা সা তারা হো জাঁউ গিরিধারী
সাঁঝ কে বেলে ঝিলমিল করকে দেঁখু রাই তিহারী।
যদি বলো—আমি হে মুরলীধারী
আধ ফোটা তারা হব
সন্ধ্যার কুলে ঝিকিমিকি-আঁখি
পথ চেয়ে রব তব।

অথবা

পঞ্ছী হো জারে মন মেরা…
ফুল জো হো জারে…
নীর জো হো জারে যমুনা কা…
ধূলী হো জারে…

নিত নিত পরশন করে পিয়াকে জব প্রভুজী আবে।
পাখী যদি হতে চাস্ ওরে মন,
চাস যদি ফুল হ'তে,
যমুনার জল হ'তে চাস যদি
ধূলি কণা পথে পথে
নিতুই প্রিয়ের পরশন তরে
যবে সে আসিবে ফিরে।

বঁধু, আর কি আমায় ছেড়ে যেতে পারবে তুমি:

জাওগে তুম হরি—জানে ন দুঁগী
পবন বনুঁগী, মেহা বনুঁগী,
হোকর ছায়া. সংগে রহুঁগী
তুম জা ন সকোগে মুরারী—
হমেঁ ছেড়কে মুরলীধারী।
তুমি যাবে কোথা হরি? দিব না যেতে,
পবনের রূপে বাদলের রূপে
ছায়া রূপে পিছু লব চুপে চুপে
তুমি পারিবে না যেতে আর
ছেড়ে কুটির দাসী মীরার।

আর তো তোমার উপর আমার কোনও অভিমান নাই। আমি জানি না

মুঝসী অবলা লাখোঁ প্রভুজী,
তুম স নাথ ন গেঈ।
আমার মতন অবলা কতই আছে,
তোমার মতন বঁধুয়া কোথায় পাব?

এবার

জব সাগর বুঁদ সমাঈ
বিন্দু সিন্ধু হোঈ।
সিন্ধু নামিলে বিন্দুর বুকে
বিন্দু যে হয় সিন্ধু।

তার ও পর? জ্ঞান আর প্রেম, আকাশ আর সমুদ্র এক হ'য়ে (কিছু কি আর বাকি রইল?

না, রইল বই কি। দীপ নিবিয়ে সব চুকিয়ে দিতে তো চা আমি। তাই তার আত্মা যাওয়ার পথে এবার বাসা বাঁধলাম:

দীপক! জলনা সারী রাত,
রে দীপক! জলনা সারী রাত
আজ সুনা হয়—ধুঁস পথ পর
আয়েঙ্গে মেরে নাথ

রে দীপক ! জ্বলনা সারী রাত
প্রদীপ ! জ্বল্ তুই সারা রাত,
ও প্রদীপ ! জ্বল্ তুই সারা রাত
শুনেছি আজ যে এই পথ বেয়ে
আসিবে সে প্রাণনাথ।
ও প্রদীপ ! জ্বল্ তুই সারা রাত।

[দীপাঞ্জলি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত মীরাভজন ও ইংরাজি অনুবাদ (হরিকৃষ্ণ মন্দির—পুনা—৫) ৩৷০]

কত তার আলো

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

কেন তার দীপের প্রভায়
দেখি তোমার নির্মল আলো—
কেন এই কালর শোভায়
পূর্ণিমার শুভ্রতা ঢালো।
কেন তার নিখিল আপন
আমার এ নয়নের কালো কাজলে—
এনে দেয় প্রেমের জাগরণ
ছলনাহীন মনের দর্পণ-জলে।

কেন তার বেদনার উপহার
নিতে নাহি জানো তব মহিমায়-
আমি রাখি তাই খোলা এ দুয়ার
নিশীথ স্বপনের নগ্ন সীমায়।
আমার এ নিভানো মনের লেখা
জ্বলিছে তোমার প্রদীপ শিখায়
কালের অক্ষরে কত যেন দেখা
তোমারি নামের লুপ্ত লিখায়।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

[রা]জ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তৃতীয় নয়ন"—৪'৫০
[প্র]ভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "আশীর্বাদ"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "তবলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি"—২৲

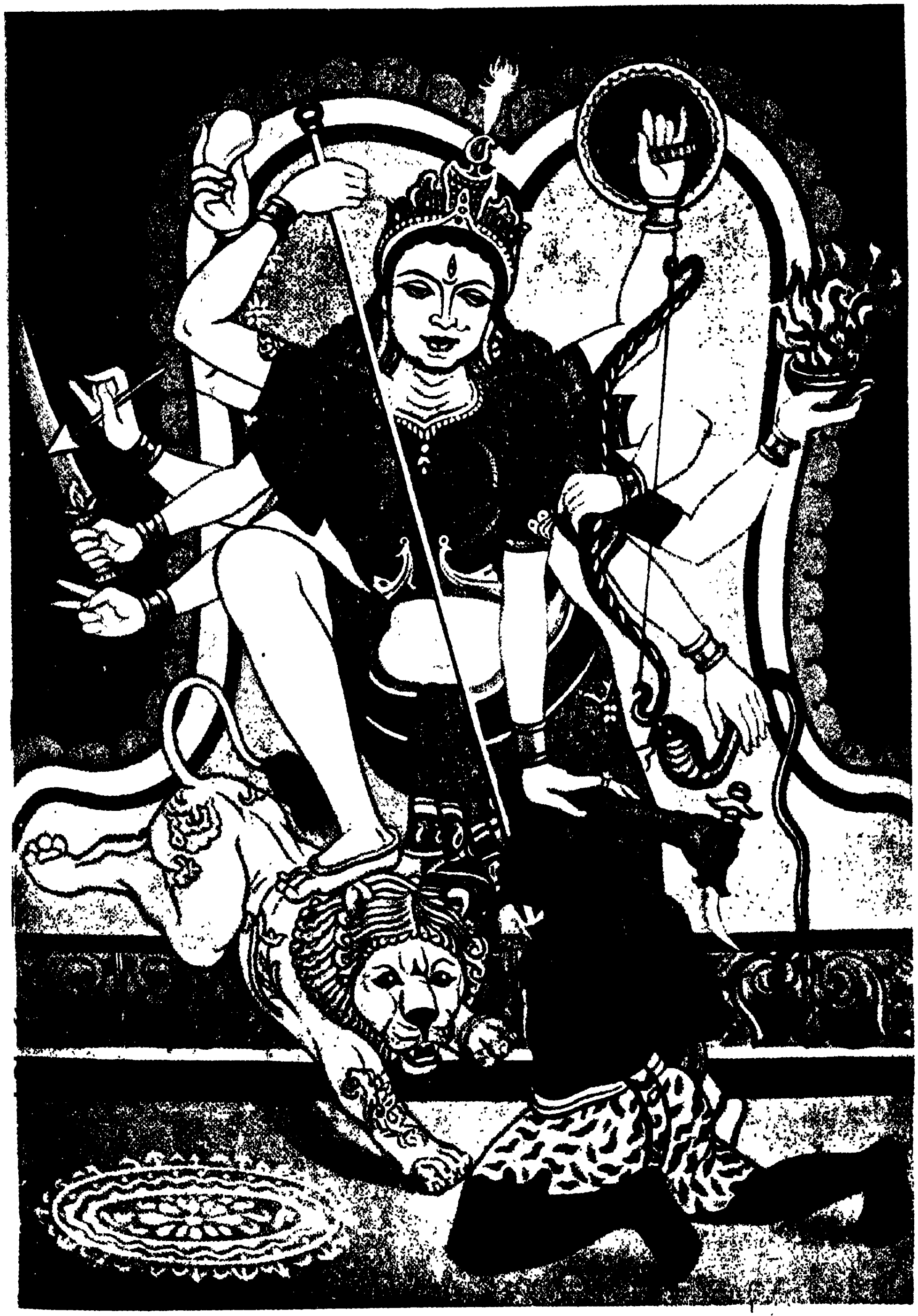
বিজ্ঞপ্তি

পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পূজা বা শারদীয়া সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে শীর্ষস্থানীয় লেখক-লেখিকাগণের রচনা ও নয়নাভিরাম চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া আশ্বিনের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে। প্রতি কপির মূল্য ২৲। ভারতবর্ষের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে উক্ত সংখ্যার বিজ্ঞাপনের জন্য এখন হইতেই সত্বর হইবার অনুরোধ জানাই। অচুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনদাতাগণকে শারদীয়া সংখ্যার বিজ্ঞাপনের বিশেষ মূল্যহার পত্র লিখিলে জানান হইবে। ঐ সংখ্যার জন্য সকল বিজ্ঞাপনের কপি ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—
কর্মাধ্যক্ষ,
ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী : শ্রীঅসিত বসু

সংহার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্







আশ্বিন—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা। তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ। সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায় নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধানমুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্। দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥ মেধাসি দেবি! বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা। শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা॥ দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

সাহিত্যে হাস্যরস - প্রাক্‌ বঙ্কিমযুগ

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

হাসি ও কান্না মানুষের দুইটি সহজাত বৃত্তি। সাহিত্য-সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই এই দুইটি বৃত্তি বাহ্য ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে মানবের মানস লীলার বৈচিত্র্য-সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রথম হাসি জীবনের উল্লাস ও মেজাজের প্রসন্নতা-প্রসূত; প্রথম কান্না শারীরিক বেদনা বা প্রহারের যন্ত্রণা হইতে উদ্ভূত। একেবারে আদিম স্তরের মানুষ অকারণেই হাসিয়া তাহার জীবনানন্দকে প্রকাশ করে ও ক্রন্দনমূলক চীৎকারের দ্বারা তাহার দৈহিক ক্লেশ-বোধকে মুক্তি দেয়। গোড়ার দিকে এগুলি বিশেষ মানস-সম্পর্কহীন শারীরিক প্রক্রিয়ামাত্র। এই স্থূল জৈব ব্যাপারে কোন সূক্ষ্মতর মানস-প্রেরণা দুর্নিরীক্ষ্য।

মানব সভ্যতা আর একটু অগ্রসর হইলে হাসির মধ্যে কিছুটা উপহাস—পরিহাসের তির্যক তাৎপর্য ও কান্নার মধ্যে মনোবেদনার কিছুটা স্পর্শ মেশে। হাসি আনন্দেরই দ্যোতক। কিন্তু এই আনন্দে পরের উপর শ্রেষ্ঠতাবোধ, অপরের দুর্দশার কৌতুককর উপভোগ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ জীবনানন্দের সঙ্গে কৌতুকরসের সংমিশ্রণ ঘটে। মানুষের সামাজিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা তাহার হাসির উপাদান যোগায়। হাসি আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া অপরকেন্দ্রিক হইয়া উঠে। দিনান্তে শিকারের শেষে যখন আদিম মানবগোষ্ঠী গুহার আঁধারে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করে, তখন কাহারও কাহারও অপটুত্ব বা দুর্ভাগ্যের কাহিনী বা লাঞ্ছনার স্মৃতি গুহাবাসী মানবের হাস্যকে উতরোল করিয়া তোলে। এখনও মানুষের মনে মাত্রা বা ঔচিত্যবোধের একটা সার্বভৌম মানদণ্ড গড়িয়া উঠে নাই। সে অপরের পা পিছলাইয়া আছাড় খাওয়া, লক্ষ্যভেদে অসামর্থ্য, বন মধ্যে পথ হারাইয়া শিকার-অন্বেষণে ব্যর্থতা, একত্র-আহারের সময় নিজ ন্যায্য ভাগে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনাকেই হাসির উপাদানরূপে ব্যবহার করে। ইহার কিছুকাল পরেই চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের উৎকেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া হাস্য-রসের উত্তেজনাকর আমোদ যোগায়। তখন বাহিরের দুর্ভাগ্যের পরিবর্তে অন্তরের বিকৃতিই হাসির মূলে রস-সিঞ্চন করে, কোন কোন লোক এমন অদ্ভুত পোষাক পরে, এমন উদ্ভট অঙ্গ-ভঙ্গী করে, কথায়-বার্তায় ও আচার-আচরণে এমন অসঙ্গতির পরিচয় দেয় যে তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্য দিয়াই অনিবার্যভাবে হাস্যরসের উদ্রেক করে। এই চরিত্রগত অসঙ্গতির সূক্ষ্মতর উপলব্ধিই হাস্যরসকে সহজ জীবন হইতে সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নের হেতু হয়। এইখানে প্রকৃতির অধিকার শেষ হইয়া মানবের শিল্পরস সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

আদি-যুগের সাহিত্যে যে স্থূল হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জীবনানুকৃতিমূলক—লেখকেরা যেন জীবনের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কৌতুকরস-সিক্ত পাতা ছিঁড়িয়া তাঁহাদের গ্রন্থে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং এই নীতি অনুসারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য প্রায় সকল দেশের সাহিত্যেই আদিগ্রন্থগুলি মহাকাব্য জাতীয়; এগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গুণসম্পন্ন। মহাকাব্যের পূর্ববর্তী খসড়া খণ্ডকাব্যগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে—ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের পূর্বগামী প্রেরণার পরিচয় আজ বিস্মৃতি-বিলীন। এই মহাকাব্যগুলি খুব উন্নত ও পরিণত শিল্পকলার নিদর্শন—ইহারা পুরাকালের জীবন বিবৃতি—কেবল এইটুকু ছাড়া ইহাদের মধ্যে আদিম স্তরোচিত শিল্পগত অপরিণতির কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে হাসির ছবি পাওয়া যায়, তাহাতে আধুনিক-যুগের সূক্ষ্ম অন্তর্মুখিতা না থাকিলেও যথেষ্ট শিল্প সুষমা ও কারুকুশলতা আছে। বাল্মীকিতে রাক্ষস বানর প্রভৃতির যে উপহাস্য চিত্র আছে, তাহা স্থূল-উপাদান-গঠিত হইলেও উহাদের মধ্যে প্রতি-নিধিত্বমূলক উপযোগিতা ও গ্রন্থের সমগ্র ভাবাবহের সঙ্গে

কলাসম্মত সঙ্গতি আছে। কুম্ভকর্ণের অপরিমিত ঔদরিকতা তাহার চরিত্রগত বীভৎসতারই একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। বানরদের সময় সময় উদ্ভট ও অসঙ্গত আচরণ তাহাদের ভক্তির আত্মবিলোপী-আতিশয্যের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যে বিধৃত। মহাভারতে এই হাস্যকরতা শুধু গৌণ চরিত্রে সীমাবদ্ধ নাই, ইহা ভীম, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি মুখ্য নায়কদের মধ্যেও সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান ও তারতম্যবোধের সহিত প্রসারিত হইয়াছে। ভীমের হাস্যকরতা তাহার আকর্ষণীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরং বাড়াইয়াছে; তাহার চরিত্রের হঠকারিতা ও ক্ষাত্রশৌর্যের পরিণামচিন্তাহীন আতিশয্যই অনেক ক্ষেত্রে হাস্যজনক পরিস্থিতির হেতু হইয়াছে। শুধু ভীম কেন, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, কর্ণ এমন কি অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত এই লঘু রংএর ছোপ হইতে মুক্ত থাকেন নাই—হাসির আবির খেলায় সকলেরই অঙ্গ কম বেশী রঞ্জিত হইয়াছে। হাসি যে কেবল কয়েকটি খেয়ালী, উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের একচেটিয়া অধিকার নহে, ইহা যে মহৎ চরিত্রেরও উপাদান, সার্বভৌম মানবপ্রকৃতির সম্ভাব্য অঙ্গ—এই সত্য মহাভারতকারের মানব-প্রকৃতির সর্ববিধ বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। হোমারেও Thessites Pandorus প্রভৃতি ইতর ব্যক্তি শুধু নয়, Achilles, Agamemnon, Paris, Troilus প্রভৃতি উভয়পক্ষীয় বীর ও উদার প্রকৃতি যোদ্ধাগণও মাঝে মধ্যে উপহাস্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং এই সুদূর অতীতের মহাকাব্যসমূহেও যে হাস্যরসের দর্শন মিলে তাহাতে প্রকৃতির একমেটে রংএর উপর সূক্ষ্ম শিল্পকার্যের সুদক্ষ তূলিকা প্রয়োগের স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। খনি হইতে উদ্ধৃত অপরিচ্ছন্নতা রত্নের ন্যায় মানব প্রকৃতির সহজাত স্বতোৎসারিত হাসিটি শিল্প মার্জনায়, বৈপরীত্যনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে ও সামগ্রিক পরিবেশের সহিত নিপুণ মিশ্রণরীতিতে এক অপরূপ দ্যুতি-ভাস্বরতা অর্জন করিয়াছে।

২

মহাকাব্যোত্তর যুগে সমাজ বিন্যাসের দৃঢ়তর ও জটিলতর রূপের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সাহিত্যিক হাস্যরসের কতকগুলি নূতন পর্যায় ও প্রকাশ ভঙ্গী দেখা দিল। হিমালয়ের বিশাল বক্ষপটে নানাজাতীয় ভূস্তর, উদ্ভিদ জীবন ও দৃশ্য বৈচিত্র্যের ন্যায় মহাকাব্যের উদার আশ্রয়ে হাস্যরস অন্যান্য রসের সহিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সহজ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। হাসিটা মানব মনের আর পাঁচটা বৃত্তির ন্যায় একই যৌথ পরিবারভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই সমষ্টিগত মিলনের পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিশেষ সচেতনতা উদ্ভূত হইল। তখন পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য হাসির প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবর্তিত হইতে সুরু করিল। হাস্যকর পরিস্থিতির সংযোজনা ও উপহাস্য চরিত্র সৃষ্টির দিকে লেখক সচেতনভাবে মনোনিবেশ করিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই প্রবণতার প্রথম আবির্ভাব ঘটিল দেবপ্রশস্তিমূলক আখ্যান, কাব্য বা নীতি কবিতার মধ্যে মানবিক রস সঞ্চারের জন্য। প্রথম বাংলা রচনা চর্যাপদে ধর্মতত্ত্বের একনিষ্ঠ চর্চার মধ্যে হাসির কথার কোন স্থান ছিল না। তথাপি চর্যাকারেরা নিজেদের আবেশমত্ততা ও সাংসারিক ঔদাসীন্য বুঝাইবার জন্য প্রবাদবাক্যের তির্যক-দ্যোতনায়, সাধারণ অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যমূলক চমকপ্রদ উক্তির সাহায্যে ওষ্ঠে হাসি না ফুটাইলেও মনে হাসির পূর্ববর্তী অবস্থারূপ একটা বিস্ময় উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন। পরোক্ষভাষণ বা উদ্ভট উপমা প্রয়োগ যে সাহিত্যিক হাস্যরসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা এইখানে প্রথম উদাহৃত হইল। প্রাকৃত জনসাধারণের কাছে ইহার সূক্ষ্মতর তাৎপর্য অনধিগম্য; শুধু মার্জিতরুচি রসিকই ইহার উপভোগে সক্ষম। এইরূপে হাসি উহার প্রাকৃত স্থূলতা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক পরিশীলিত রূপ গ্রহণের দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হইল। উপহাস্য পরিস্থিতির উচ্চকণ্ঠ হৈ-হুল্লোড় ছড়াইয়া উহা মৃদুব্যঞ্জনাময় মানস-আবেদনের রূপ ধারণ করিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ ও বড়াইবুড়ীর রূপ-বিকৃতি বর্ণনায় ও রাধাকৃষ্ণের তুমুল, উত্তর-প্রত্যুত্তরপূর্ণ, নিপুণ ঘাতপ্রতিঘাতে উপভোগ্য কলহে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় ধারারই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এখানে একদিকে যেমন হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস আছে, তেমনি বর্ণনাও বাক্‌প্রয়োগের সুস্মিত ভঙ্গিমায় ও কুশল রীতিতে উচ্চতর সাহিত্যিক উৎকর্ষেরও পরিচয় মিলে। দৈহিক অসঙ্গতি নিখুঁত রসোচ্ছল বাণীচিত্রে লেখক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে

চাহিয়াছেন। তেমনি, রাধাকৃষ্ণের কলহে পল্লীসুলভ ইতর কোন্দল কেবল প্রকাশের তীক্ষ্ণ অনবদ্যতায়, নিছক আঘাত-প্রতিঘাত-নৈপুণ্যে উচ্চতর আর্টে উন্নীত হইয়াছে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগেরও যে একটা আর্ট আছে, বাছিয়া-গুছিয়া গালির শব্দ ব্যবহার করিলে তাহারও যে একটা আকর্ষণ আছে তাহাই এখানে প্রমাণিত। এই আদি মধ্যযুগের ভক্তিও কামরস মিশ্রিত কাব্যে fun ও wit, স্থূল-কৌতুক ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি এক সংশ্লেষমূলক মিলনে সংযুক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে হাস্যরসের মান নিম্নগামী। হাস্যকর পরিস্থিতির সংযোজনাই এখানে হাস্যরসের প্রধান উৎস। নারীগণের পতিনিন্দা, চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যিক শঠতা ও মনসার রোষে তাহার শারীরিক পীড়ন ও লাঞ্ছনা—এ সবই স্থূল হাস্যরসের উপাদান। বাচনভঙ্গীতে এমন কোন উপভোগ্য মনোহারিতা নাই। যাহাতে বিষয়ের তুচ্ছতার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। মূল আখ্যানের সঙ্গেও ইহাদের সংযোগ অত্যন্ত শিথিল। মঙ্গলকাব্যে হাস্যরসের স্থূলতার একমাত্র ব্যতিক্রম মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরামের হাস্যরসের মধ্যে একটা নূতন উপাদান মিশিয়াছে—উহা চিত্তপ্রসন্নতামূলক স্নিগ্ধতা, সমাজ-সমালোচনায় উদার, জ্বালাহীন রঙ্গপ্রিয়তা। এইখানে একদিকে হাসির পরিবিবিস্তার ও গভীরতা-সম্পাদন, অন্যদিকে humour-এর অমৃত-নিস্যন্দী সুস্বাদুতা। মুকুন্দরামের হাসি সমগ্র সমাজের উপর প্রসারিত—সমাজমনের ও সামাজিকবৃন্দের মানস অসঙ্গতির সরস উদ্‌ঘাটন, বেদনার রূপান্তরিত, কল্পনা-রঞ্জিত, পাত্রান্তর-ন্যস্ত প্রতিচ্ছবি এবং অমর, অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টির মূল প্রেরণা। তিনি নিজের দুঃখকে লঘু করিয়াছেন, দেশব্যাপী অরাজকতা ও উৎপীড়নকে পশুসমাজের করুণ, অথচ অপপ্রয়োগে উপভোগ্য আর্তিতে বিস্ময়-মধুর রূপ দিয়াছেন। মুরারিশীল ও ভাঁড়ুদত্তের শঠতার রন্ধ্রপথে তাহাদের অন্তর-রহস্য অনাবৃত করিয়াছেন, লহনা-খুল্লনার সপত্নীবিরোধ বিড়ম্বিত গৃহস্থালীতে বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের ঈষৎ-বিক্ষুব্ধ, কৌতুককর বিমূঢ়তার আদলটি দেখিয়াছেন। মুকুন্দরামে আসিয়া হাসি কারুণ্যরসসিক্ত, জীবনবোধে প্রজ্ঞাময়, সংসারের সমস্ত বৈষম্য-অসঙ্গতির ঊর্ধ্বে এক উদার, সমন্বয়কারী ভাবনিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

৩

মুকুন্দরাম পর্যন্ত আমরা হাসির যে বিভিন্ন পর্যায়গুলির সঙ্গে পরিচিত হইলাম তাহাদের মধ্যে চিন্তালেশহীন, তরল জীবনোল্লাস, কৌতুককর অবস্থা বিপর্যয়, সমাজমানের উল্লঙ্ঘনজাত হাস্যাস্পদ আচরণ ও চারিত্রিক উৎকেন্দ্রিকতা, তির্যক ভাষণের চারুতা (wit) ও জীবনরসের স্নিগ্ধতা (humour)—এই কয়েকটি স্তরকে পৃথক করা যায়। মুকুন্দরামের গভীর জীবনবোধপ্রসূত হাস্যরসিকতা প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত অননুকরণীয়ই ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবতন্ময়তার মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে মৃদু, সস্নেহ তিরস্কারও অম্লমধুর শ্লেষের সাক্ষাৎ পাই। শাক্তপদাবলীতে মাতা-পুত্রের মান-অভিমানের ভিতর দিয়া কপট অনুযোগ ও ছদ্ম-তিরস্কারের সুরটি কখনও কখনও শোনা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে হাস্যরস তাহা ভক্তিরসকে ঘনীভূত করিবার একটা গৌণ উপায় মাত্র, ইহার কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা নাই। এলোকেশী, বিবসনা—শ্যামা মায়ের বীভৎস রূপ বর্ণনায়ও যদি কিছু হাস্যকর উপাদান থাকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভক্তিরসের অধীন। এই ধর্মসাধনার পরিবেশে যে ক্ষীণ হাস্যরসের বিকাশ হইয়াছে তাহা ইহার বৈচিত্র্য ও সর্বব্যাপিত্বের নিদর্শনরূপেই আমাদের মনে একটু অভিনবত্বের স্পর্শ আনে। হাসি যে কেবল হাস্যকর পরিস্থিতির ফল নহে, ইহা যে করুণ, ভক্তিসাধনাত্মক প্রভৃতি বিপরীত-ধর্মী পরিবেশেও নিজ শক্তির পরিচয় দিতে পারে তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন হাস্যরসধারার শেষ কবি বলা যায়। ইনি মুকুন্দরাম অপেক্ষা রাজসভা-কবি বিদ্যাপতির অধিকতর অনুবর্তী। মধ্যযুগ হইতেই রাজসভা ও জমিদারের বৈঠক একপ্রকার রুচিবিকারগ্রস্ত, অথচ কারু-কার্যময় হাস্যরসের অনুশীলনের প্রেরণা দিয়াছিল। এই পরিবেশে যে হাসির উদ্ভব তাহা আদিরসের আবিলতাকে বিদগ্ধ ভাষণের আভাষ-ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলার মধ্যে নিহিত। অশ্লীল মনোভাবের উপর সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর আবরণ দেওয়ার শিল্পকৌশলই ইহার মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার। ভাবিতে গেলে দেহসম্ভোগ, ইন্দ্রিয় লালসার রসাল বর্ণনার মধ্যে কিছুটা কাব্য-সৌন্দর্য থাকিতে পারে,

কিন্তু হাসির উপাদান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এখানে হাস্যরস উদ্রিক্ত হয় লেখকের প্রকাশ চাতুরীর রহস্য সঙ্কেতে, নিষিদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ভদ্র আবরণের পিছনকার চটুল ইঙ্গিতটুকুর উপলব্ধিতে। এ যেন দুর্বোধ্য হেঁয়ালির সমাধানে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়, কতকটা তাহারই অনুরূপ। কামকলার মধ্যে যেমন আবেশ-মত্ততা আছে, তেমনি একটা উত্তেজনাময় হর্ষেরও শিহরণ অনুভূত হয়। ইহাতে হাসির আবেদন যুগপৎ শিরা-স্নায়ু ও মননের প্রতি প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। গোপনতার বেড়া ভাঙ্গায় যে চাতুর্যময় আনন্দ—ভারতচন্দ্রের কবিতায় আমরা প্রায় সেইরূপ আনন্দই আস্বাদন করি।

আর একদিক দিয়া মুকুন্দরামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পার্থক্য অনুভূত হয়। ভারতচন্দ্রের হাসি রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছে। অবশ্য বিদ্যা ও সুন্দরের কামকেলিকলা লইয়া যে হাসি তাহা রঙ্গপ্রধান। কিন্তু পরিবেশ-চিত্রণে আঘাতের দিকে প্রবণতা যেন তীব্রতর হইতেছে। হীরার আচরণ-বর্ণনায় নিছক কৌতুকরস যেন শ্লেষাত্মক মনোভাবের স্পর্শে উগ্র ও ঝাঁজালো হইয়া উঠিয়াছে। হীরার প্রতি কবির সহানুভূতি ও জুগুপ্সা যেন দুই-এরই সংমিশ্রণ আছে। কোটাল প্রভৃতি রাজানুচরবৃন্দের, এমন কি খোদ রাজা-রাণীর আচরণে হাঁক-ডাক, লম্ফ-ঝম্প, আড়ম্বর-আস্ফালনের মধ্যে এই কৌতুক ও শ্লেষ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অবশ্য ভারতচন্দ্র ইহাদের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে অতিক্রম করেন নাই—উগ্র সংস্কারক মনোবৃত্তি সে যুগের কোন লেখকেরই ছিল না। তিনি রাজসভার কবি হইয়া ধীরে ধীর রাজসভার উপহাস্য দিক্‌টা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। আগামী যুগের ব্যঙ্গ প্রাধান্য, আধুনিক সমাজ চেতনার সংশয়—তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সুদূর পূর্বাভাস তাঁহার হাস্য-বিস্ফারিত ওষ্ঠাধরের এক কোণে বঙ্কিম রেখায় অর্ধস্ফুট।

৪

ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সমাজে প্রথম সমাজের অনুসরণে সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ হইল। হাসি পূর্বের সরল একমুখীনতা হারাইয়া ব্যঙ্গে ধারালো, বিদ্রূপে অশালীন ও শ্লেষে বক্র-বঙ্কিম হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রধনু বর্ণালী সংশ্লেষের ন্যায় নানাপ্রকার রং-এর বৈচিত্র্যও স্ফুরিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণে সমাজে এমন সব হাস্যকর আতিশয্য দেখা দিল, যাহা কেবল হাসির উদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আঘাত করিবার প্রবণতা জাগাইল। এই সমাজ দেহ-মনে উদ্ভূত অসঙ্গতিগুলি শুধু হাসিয়া উড়াইবার ব্যাপার নহে। ইহারা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় সমস্ত সমাজের রক্তধারাকে বিষাক্ত করিবে এই আশঙ্কা বিশুদ্ধ হাস্যোচ্ছ্বাসকে এক নিগূঢ়তর অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত করিল। "নীচ যদি উচ্চ-ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" বা "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"—ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত-নির্দিষ্ট এই নীতি সংযম উল্লঙ্ঘন করার উত্তেজনা ক্রমশঃ উগ্রতর হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত আমাদেব পৌষ-পার্বণের পিঠা ও তপ্‌সে-মাছ খাওয়াইয়াছেন; কিন্তু কয়েকটি ব্যতি-ক্রম বাদ দিলে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুক প্রায়ই তাপমাত্রা চড়াইয়া ব্যঙ্গ তীব্রতার উঁচু পারদরেখায় পৌছাইয়াছে। বাঙ্গালীবাবুদের ইংরাজী-খানা খাইবার ধুম, স্ত্রী-স্বাধীনতার উগ্র আতিশয্য, নাস্তিকতার ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও অশালীনতা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই, তাঁহার রসিকচিত্তের উপভোগকে বার বার ব্যাহত করিয়া তাঁহাকে কঠিন আঘাত হানিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই সর্বব্যাপী ব্যঙ্গপ্রিয়তাই হাসির আধুনিক বিবর্তনের প্রধান লক্ষণ। সমস্ত আধুনিক হাস্যরসিকের মনোভাবে এই বিস্ফোরক শক্তির কম-বেশী উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। হাসির মিষ্টজলের নদী আধুনিকতার সমুদ্র-মোহনায় পৌছিয়া ব্যঙ্গ লবণাক্ত, অম্লক্ষারের ঝাঁঝযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে রাজ-শেখর বসু পর্যন্ত সকলের হাস্য রচনায় এই সমাজ-সংস্কারক মনোভাব, এই সংশোধনী প্রেরণা কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকটভাবে বিদ্যমান।

এই ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের বিষয়ভেদে, মাত্রাভেদে ও লেখকের মেজাজভেদে অনেকগুলি স্তর আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে (১৮০০—১৮২১) এই হাস্যরস ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বাদবিতণ্ডার সঙ্গে প্রধানভাবে জড়িত ছিল। কবির লড়াই-এর অশালীন ঐতিহ্য, স্থূল ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিছক গালাগালির ইতর আতিশয্য প্রথম-যুগের মননশীল

বিচার-বিতর্কেও উদাহৃত হইয়াছে। রামমোহন রায় এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির নানা কারণের মধ্যে হাস্যরসিকতাকে গণনা করা যায় না। যাঁহারা ধর্মবিতণ্ডার শুষ্ক শাস্ত্রবচন কণ্টকিত পথ ত্যাগ করিয়া "বাবু" সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসনের কুসুমাস্তৃ, সুরা-সঙ্গীত-চাটুবাক্যবীজিত পথখানি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা যে হাস্যদেবীর অধিক অনুগ্রহভাজন হইবেন তাহা স্বাভাবিক। এই জাতীয় রচনায় রঙ্গের মধু ও ব্যঙ্গের হুল স্বভাববৈরিতা ত্যাগ করিয়া এক সাময়িক মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হইয়াছিল। হুতোম প্যাঁচার নকশায় যে সমস্ত ব্যসনধর্মী প্রমোদের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে যেন লেখক একহাতে আলিঙ্গন ও অপর হাতে কষাঘাত করিয়াছেন। এই সমস্ত নিষিদ্ধ আমোদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভূত ও রোজা একই দেহে বিরাজ করেন—সুতরাং ইহারা সাধু-সমাজ ও বেল্লিক-সমাজ উভয়েরই আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠে। কাজেই হাস্য-রসের প্রধান ধারা এই জাতীয় নকশার মধ্যেই আবিল, উদ্দাম স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার সহিত পরাধীনতার জ্বালা স্বাজাত্যবোধেরও গভীর জীবন-দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিলেই ও প্রতিভার কটাহে এই মিশ্র পানীয়কে জ্বাল দিলেই কমলাকান্তের দিব্য সোমরস তৈয়ারীর ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়।

কল্লোলে মর্ম্মরে কে রোধিবে মিলন উচ্ছ্বাস !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সুদূর দিগন্ত হোতে তুমি যেন নেমে-আসা চাঁদ
বৈরাগী মরুর বুকে।
আনারকলির মত মুখখানি তব, বারে বারে সকৌতুকে
দূর করে দেয় মোর ক্লান্তি অবসাদ।
বেদুইন-সন্ধ্যাটিরে ঘিরে আছে যাত্রী যাযাবর,
তার মাঝে হেরিলাম ইরাণের সদ্য-ফোঁটা গোলাপী-তনুর
পীনস্ফীত তুঙ্গবক্ষে কুসুম স্তবক দুটি—চিত্তে নিরন্তর
দেয় দোলা। অতনু-ধনুর
শরাঘাতে হবে কি কাতর প্রণয়-সঙ্গম ক্ষণে
বাহুর বন্ধনে।

পিছনে ফেরে না নদী,
উৎস তার শৈলশৃঙ্গে কাঁদে।
তোমার হৃদয় নদী ছুটে যায় প্রেমে নিরবধি
যৌবনের স্রোতে। তব তীব্র দৃষ্টিপাতে
স্বপনের তারকারা ফুটে ওঠে মরম আকাশে ;
বিলাসী বাতাস বাসনার তীরে তীরে বয়,
কল্পনার পদচিহ্ন,পড়ে আছে কতকাল
তারি আশে-পাশে !
নাহি পরিচয়।

প্রাণের তরঙ্গ মোর তটে দেয় হানা,
বন বীথিকায় ক্লান্ত ডানাগুলি বিশ্রামের খুঁজি অবকাশ
পাষাণ রাত্রির আলেয়ারে দেখে,
ফেলে রেখে তার গানখানা ;
কল্লোলে মর্ম্মরে কে রোধিবে মিলন উচ্ছ্বাস !
কামনার নীড়ে নীড়ে রতিরজনীর
চলেছে কূজন।
তুমি কি হয়েছ হেথা এ রাতে অধীর ?
নিরালায় আমরা দু'জন।





মৃগতৃষ্ণা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

একেবারে আচমকা। অফিস-ফেরত ট্রাম। বাদুড়ঝোলা অবস্থা।

ট্রাম পুরো থামবার আগেই দুর্মতি হল ভদ্রলোকের। লাফিয়ে নামতে গিয়ে একেবারে মোটরের সামনে। ডবল ব্রেক টিপেও বিপদ এড়ানো গেল না। একটা চাকা প্রায় হাঁটুর ওপর।

ঠিক কতখানি লেগেছে বোঝা গেল না। কেউ বুঝতেও দিল না। পথচলতি লোকেরা মারমুখো হ'য়ে উঠল। অযথা চীৎকার। অশ্রাব্য গালাগাল। ধরাধরি করে লোকটাকে গাড়ীর মধ্যে পুরে দিল। ড্রাইভারকে ধমক দিল, সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাও। একটু দেরী কর না।

কয়েকজনের ইচ্ছা ছিল ড্রাইভারের ওপর একটু হাতের সুখ করে নেবে। এলোপাথাড়ি মার। এমন সুযোগ বেশী জোটে না—কিন্তু বাদ সাধল আহত প্রৌঢ়।

ক্লান্ত স্বরে বলল, দোষ আমার। এঁর কোন দোষ নেই। ট্রামের হাতলটা হঠাৎ ফসকে গিয়ে আমিই পড়েগেছি মোটরের সামনে।

আহত লোকটাকে গালমন্দ করতে করতে জনতা সরে গেল।

এত বড় একটা ব্যাপার, এত হৈচৈ, কিন্তু রাণী অশ্রুময়ীর কোন খেয়াল নেই। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। আজ শ্যাম্পেনের মাত্রা বেশ বেশী। সামনের সব কিছু ধোঁয়াটে। গাড়ী থামল। সকলে ধরাধরি করে একটা লোককে তাঁর পাশে শুইয়ে দিল, এটুকু বোঝা গেল। কিন্তু কেন, লোকটাই বা কে, এভাবে রাণী অশ্রুময়ীর পাশে শোবার সাহস সে কোথা থেকে সংগ্রহ করল, কিছুতেই তিনি বুঝতে পারলেন না।

গাড়ী জনতা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতে রাণী অশ্রুময়ী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জড়ানো গলায় বললেন, তারক, তারক।

ড্রাইভার পিছন দিকে না ফিরেই বলল, বলুন রাণীমা। আর তারকের পিছন ফেরার সাহস নেই। একবার জবর একটা দুর্ঘটনা কোন রকমে এড়িয়েছে। আর একবার কিছু হ'লে, পথের মানুষ আর তাকে আস্ত রাখবে না। মেরে থেঁৎলে দেবে।

এ কে আমার পাশে? রাণীর স্খলিত কণ্ঠ শোনা গেল।

দুর্ঘটনার কথাটা তারক শোনাল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে। কারণ এই মুহূর্তে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। অর্ধেকের বেশী কথা কানেই যাবে না। যেটুকু যাবে অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক তার অনেকখানিই গ্রহণ করতে পারবে না।

আমরা কোথায় যাচ্ছি? রাণী যথাসম্ভব এককোণে সরে বসলেন। পাশের লোকটার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

অন্যদিন মোটর সোজা গঙ্গার ধারে চলে যায়। রাণী অশ্রুময়ী নামেন না। গাড়ীর মধ্যে বসেই হাওয়া খান। ঠাণ্ডা হাওয়ার পলকে নেশাটা এক সময়ে ফিকে হ'য়ে আসে। তখন তারককে গাড়ী ঘোরাতে বলেন।

আজ গাড়ী উল্টো দিকে চলেছে।

হাসপাতালে যেতে হবে। বাবুটিকে ভর্তি করে দিতে হবে।

আড়চোখে রাণী চেয়ে চেয়ে দেখলেন। কাঁচা পাকা চুল পিছন দিকে ওল্টানো। কোটরগত চোখ, উঁচু চোয়াল, সজারুর কাঁটাকে হারমানানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালে, গালে শিরার জট।

পরণের আধময়লা পাঞ্জাবিটা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কাদা লেগেছে এপাশে ওপাশে। হাঁটুর কাছে ধুতিটা লাল। টকটকে লাল। প্রৌঢ়র শীর্ণ দেহের রক্ত এত শ্যাম্পেন-লাল হ'তে পারে রাণী অশ্রুময়ীর ধারণাও ছিল না।

দুটি চোখ নিমীলিত। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখের পেশী কুঁচকে উঠছে।

রাণী অশ্রুময়ী ভয় পেলেন। গাড়ীর মধ্যে, তাঁর এত কাছে, লোকটার যদি কিছু হয়, তা হলে সারা জীবন তিনি আর এ গাড়ী চড়তে পারবেন না। অথচ অন্য কোন গাড়ী চড়বেন, অবস্থা আর তেমন নেই। এ গাড়ী বিক্রী করা যায় না, বিক্রী করার কথা রাণী ভাবতেও পারেন না।

কোমর থেকে রুমাল বের করে রাণী মুখটা মুছলেন। মুখ নয়, এমন ভাব করলেন যেন গোটা অতীতটাকেই মুছে ফেললেন। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। গলিত অতীতের শবটা বারবার সামনে এসে দাঁড়ালে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে যাবে। তাঁর বর্তমানকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

তাঁর বর্তমান। সুরার ফেনিল তরঙ্গ মন্থন করে যে বর্তমান তাঁর জন্য বিস্মৃতির অমৃত বয়ে এনেছে।

আবার অশ্রুময়ী এ পাশে ফিরলেন। লোকটা তেমনি চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছে। একটা হাত প্রসারিত করে দিয়েছে রাণীর দিকে। মোটর একটু জোরে মোড় ফিরলেই ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে।

কতদূর হাসপাতাল কে জানে? কোথায় চলেছে তারক?

রাণী অশ্রুময়ী পিছনের সীটে হেলান দিলেন। কোন কাজ নেই। পরিপূর্ণ অবসর। সারাটা দিন ইঁটের পাঁজরপ্রকট বিরাট জনশূন্য অট্টালিকার মধ্যে ছটফট করেন। প্রতি প্রকোষ্ঠ হাজার স্মৃতিবিজড়িত। অলিন্দে, বাগানে, অন্দর মহলে দীর্ঘশ্বাসের শিহরণ। চত্বরে-চত্বরে অসংখ্য হারিয়ে যাওয়া মানুষের ভীড়।

আর একমাস। তারপরেই রাণী অশ্রুময়ীকে চলে

যেতে হবে। কোথায় তিনি আজও জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন জেঠমল বুলাকীপ্রসাদ এ বাড়ীর দখল নেবে। বিরাট এক কারখানা হবে এখানে। দড়ি তৈরীর কারখানা। জেঠমল বুলাকীপ্রসাদ অনেক অপেক্ষা করেছে। পরিচয় দিয়েছে বহু ধৈর্যের। আর বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুদে আসলে অনেক টাকার ব্যাপার। রাণীকে ঋণমুক্ত হ'তেই হবে।

ভুল করেছেন রাণী অশ্রুময়ী। হোটেলের নিভৃত প্রকোষ্ঠে, ভারি পর্দার অন্তরালে আরও কিছুক্ষণ কাটাতে পারতেন। অল্প অল্প করে চুমুক দিতে পারতেন রক্তিম মদিরায়। চোখের সামনে উচ্ছল সব স্বপ্ন, ছায়া-ছায়া ঘটনার অংশ, বিচিত্র অনুভূতি। সেই রংমহল থেকে সরে এসে রাণী ভুলই করেছেন। মুমূর্ষু মানুষের তিক্ত সান্নিধ্যে তাঁর নিজের নিশ্বাসও ভারী হ'য়ে উঠছে।

এ জীবনও বেশীদিন নয়। অলঙ্কার প্রায় শেষ, মেহগনি-আসবাবও সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

তারপর, তারপর কি করবেন রাণী অশ্রুময়ী? কোন মন্ত্রে বিস্মৃতিকে আবাহন করবেন? অতীতের শরশয্যা থেকে মুক্তি পাবেন কিসের স্পর্শে?

তারক ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। সতর্ক গতিতে। স্পীডোমিটারের কাঁটা কুড়ির ঘরে কাঁপছে। শঙ্কাতুর হৃদয়ে। কবে, কতক্ষণ পরে হাসপাতালের দরজায় পৌছবে, কে জানে!

আবার রাণী অশ্রুময়ী এপাশে চোখ ফেরালেন। অনেকক্ষণ আর চোখ সরাতে পারলেন না।

প্রৌঢ়টি চোখ খুলেছে। উদাস দৃষ্টি। ঘোলাটে দুটি চোখ। এদিক ওদিক নয়, সোজা মোটরের হুডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

রাণীর মনে হল একসময়ে—হয়ত প্রৌঢ় তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাবে। তাঁকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করবে। যদি শরীরে শক্তি থাকে, তাহলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে সরিয়ে নেবে নিজেকে। অভিজাত পরিবারের মহিলার সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত কঙ্কালসার দেহের যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়।

একদৃষ্টে দেখতে দেখতে রাণী অশ্রুময়ী চমকে উঠলেন। বসলেন সোজা হ'য়ে। একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

ঠিক ভ্রূর কাছে লম্বা একটা দাগ। ভ্রূ থেকে কপালের মাঝখান পর্যন্ত।

এ দাগ রাণী অশ্রুময়ীর খুব চেনা। তাঁর নিজের দেওয়া দাগ এত শীঘ্র এত সহজে তিনি ভুলতে পারেন না। ভোলা সম্ভব নয়।

রাণী অশ্রুময়ী মনে মনে হিসাব করতে লাগলেন। ক বয়স হবে এই দাগটার? কত বছর?

বছর পঁচিশের কম নয়। তখন রাজাবাহাদুর শু বেঁচে নন, দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করছেন। কাছাকাছি মধ্যে একমাত্র নীলগঞ্জের রাজারই হাতি ছিল। একটা আধটা নয়, সাত সাতটা।

তখন অশ্রুময়ী তম্বী। তাঁর রাজত্ব অন্দরমহলে। দাস দাসী পরিবৃতা হয়ে। স্বামীর দেখা মিলত রাত দশটার পর। তাও সব দিন নয়। যেদিন রাজাবাহাদুরের নিজে অন্দরমহলে রাত কাটাবার মর্জি হ'ত।

সেদিনের কথাটা অস্পষ্ট মনে আছে রাণী অশ্রুময়ীর মহাল থেকে রাজাবাহাদুর ফিরলেন। সঙ্গে প্রজাদের দেওয়া উপঢৌকন। চিতাবাঘের ছাল, মৃগনাভি, মধু ফলপাকুড়ের রাশ। গাড়ী থেকে নামানো হ'ল।

চিক ঢাকা জানলার ফাঁক দিয়ে অশ্রুময়ী দেখছিলেন সব জিনিস নামানোর পরে একটি তরুণ নামল। কৃশকায় শ্যামাভ। নেমেই এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল প্রাসাদোপম অট্টালিকা, রাজাবাহাদুরের ঐশ্বর্যসম্ভার।

উৎসাহের আতিশয্যে অশ্রুময়ী চিকটা একটু তুলে ধরেছিলেন, লোকটা মুখ তুলতেই চোখাচোখি হ'ল।

অশ্রুময়ীর সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। ময়াল সাপের মাদকতা-ভরা দৃষ্টি। চোখ ফেরানো যায় না দৃষ্টি থেকে। নিজেকে সরিয়ে নেওয়া যায় না।

রাত্রে রাজাবাহাদুরের কাছে সব শুনেছিলেন। গুণী-লোক। চমৎকার হাত বেহালার। ছড় টানার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মূর্ছনায় শুধু বেহালার তারই নয়, শ্রোতার সারা দেহ মন বেজে ওঠে। অব্যক্ত বেদনার মায়া অলৌকিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে মানুষকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। সুর আর তানের মোহময় জগতে।

অশ্রুময়ী বলেছিলেন, আমি শিখব বেহালা, তুমি বন্দোবস্ত করে দাও।

রাজাবাহাদুর রাজী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, বেশ, কাল থেকেই শুরু কর।

পরের দিন থেকেই অবশ্য সম্ভব হয়নি। নতুন বেহালা এসেছিল অশ্রুময়ীর জন্য। রাজাবাহাদুর নিজে পছন্দ করে অর্ডার দিয়েছিলেন। লোকটার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল জমিদার বাড়ীতে। ভবঘুরে কপর্দকহীন মানুষটা আশ্রয় পেয়েছিল।

প্রথম প্রথম রাজাবাহাদুর সামনে থাকতেন। আলবোলায় তামাক খেতে খেতে বাজনা শুনতেন। অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঝে মাঝে বলতেন, রাণীকে ভাল করে শিখিয়ে দাও ওস্তাদ। যেন তোমার হাতের মিষ্টি গুণ পায়। অমনি ছড় টানার কান্না। মনে হয় যেন সারা পৃথিবী গুমরে গুমরে কাঁদছে।

লোকটার কি নাম অশ্রুময়ী জানতেন না। তিনিও ডাকতেন ওস্তাদ বলে। ওস্তাদ বেহালার তারগুলো ঠিক করতে করতে উত্তর দিয়েছিল, সাধনা করতে হবে রাজাবাহাদুর। আমার মতন সর্বহারা হ'য়ে পথে পথে বেড়াতে হবে। সব না হারালে এ জিনিস হাতে আসে না। নিজের কান্না উজাড় করে না দিলে, সুরের ছোঁয়ায় মানুষকে কাঁদানো যায় না।

লোকটির কথায় রাজাবাহাদুর সশব্দে হেসে উঠেছিলেন, বাঃ, কথাটা চমৎকার বলেছ ওস্তাদ। ভারী সুন্দর বলেছ।

অশ্রুময়ী কিন্তু হাসেন নি। তাঁর হাসি পায় নি। এক দৃষ্টে শুধু লোকটার দিকে চেয়েছিলেন।

প্রথম কয়েকদিন রাজাবাহাদুর এসে বসতেন, তারপর আর সময় পেতেন না। মহালে বেরোতে হত তাঁকে, রাতের অন্ধকারে আতরী-বাঈয়ের বাড়ী যেতে হত। মাঝে মাঝে টাকা ধার করতে শহরে মাড়োয়ারীর গদিতেও আসতেন।

তখন শুধু ওস্তাদ আর অশ্রুময়ী। গোড়ার দিকে একজন পরিচারিকা থাকত, কিছুদিন পর তাকে আর প্রয়োজন হয়নি। ওস্তাদের হাতে বেহালা থাকলে, আর তার চোখ কোনদিকে যেত না। কারুর দিকে নয়।

অশ্রুময়ী কিন্তু সুবিধা করতে পারেন নি। খুব উদ্যম নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, কিছুদিন পর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। মসৃণ কাঠের বুকে তারের গোছা, ছড়ের ছোঁয়ায় সুর-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।

নিজে ভাল বাজাতে শেখেন নি বটে, তবে সুরকে ভাল বেসেছিলেন। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওস্তাদের বাজনা শুনতেন। তন্ময় হয়ে।

ওস্তাদ মাঝে মাঝে বলেছে, নিন, আপনি অভ্যাস করুন এবার।

না, না, অশ্রুময়ী ঘাড় নেড়েছেন, আমার দ্বারা হবে না। আপনি বাজান। ইমন কল্যাণ কিংবা মোহিনী।

ওস্তাদ হুকুম তামিল করেছে।

দু একদিন অশ্রুময়ী অন্য কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন।

ওস্তাদ, আপনার আপনজন কেউ নেই?

ওস্তাদ আস্তে আস্তে মাথা তুলে একবার রাণীর দিকে চেয়েছে, তারপর মাথা নীচু করে বেহালাটা তুলে ধরেছে। অর্থাৎ আপনজন বলতে ওই বেহালা।

এমন মানুষকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও মুশকিল।

রাজাবাহাদুরের কাছে ওস্তাদের কথা রাণী কিছু কিছু শুনেছেন।

কাঁধে একটা ঝোলা, এক হাতে ভাঙা বেহালা, ধূলিধূসরিত দেহ, অপরিচ্ছন্ন পোষাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইচ্ছা হ'লে কোন গাছের ছায়ায় বসে ছড় টানত। করুণ মূর্ছনায় বাতাসও ভারী হ'য়ে উঠত। পাখীরা কাকলী ভুলত। গ্রামের লোকেরা ঘিরে দাঁড়াত তাকে। চিত্রার্পিতের মত বাজনা শুনত।

রাজাবাহাদুর বাজনা শুনছিলেন গভীর রাত্রে। বিছানায় ছটফট করছিলেন। ঘুম আসে নি। বার দুয়েক পানপাত্র নিঃশেষ করেছিলেন। বারান্দায় এসে বসেছিলেন। তবুও না।

হঠাৎ কানে গেল বেহালার সুর। যোগিয়া রাগ। মনে হ'ল খুব কাছে কেউ বাজাচ্ছে।

সিঁড়ির ধাপে প্রতাপ মণ্ডল শুয়েছিল। রাজাবাহাদুরের খাস দেহরক্ষী। সব সময় কাছে কাছে থাকে।

রাজাবাহাদুর সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন, প্রতাপ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ ধড়মড় করে উঠে পড়েছিল। শোয়ানো বর্শাটা শক্ত হাতে তুলে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছিল, হুজুর।

কাছে পিঠে কে বেহালা বাজাচ্ছে?

কানের পাশে হাত রেখে প্রতাপ কিছুক্ষণ ধরে শোনার চেষ্টা করে বলেছিল, ওই পাগলটা হুজুর, বণ্ডীর মন্দিরে বসে বাজাচ্ছে।

রাজাবাহাদুর আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। প্রতাপের পাশ কাটিয়ে পথে নেমেছিলেন।

বাধ্য হয়ে প্রতাপকেও রাজাবাহাদুরের পিছন পিছন নামতে হয়েছিল।

বণ্ডীর মন্দিরের ভাঙা পাঁচিলে ঠেস দিয়ে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছিল। প্রত্যেকবার ছড় টানার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছিল। রাত্রির আকাশে-বাতাসে সুরের লহরী। অমিয় তরঙ্গ।

বাজনা না থামা পর্যন্ত রাজাবাহাদুর চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ছড় থামতে কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।

পরিচয় পেয়েও লোকটির কোন ভাবান্তর হয় নি। বরং তার সুরের সাধনার ব্যাঘাত হ'তে যেন একটু বিরক্তই হয়েছিল।

তারপর রাজাবাহাদুর লোকটির হাত ধরে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। হয়ত প্রথমে ভেবেছিলেন, নিজেই শিখবেন ছড় টানার মায়াময় রহস্য, কিন্তু অন্য বহু খেয়ালের মতন এ ইচ্ছাও স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। তারপর অশ্রুময়ীর কথা মনে পড়েছে। অপর্যাপ্ত অবসর। অনায়াসেই রাণী এ যন্ত্রটি আয়ত্ত করতে পারেন। এমন গুণী লোক বিরল।

অলিন্দের একপাশে অব্যবহার্য এক ঘরে ওস্তাদের জায়গা হয়েছিল। ভিতর মহলে যাতে অশ্রুময়ী প্রয়োজনে ডেকে পাঠাতে পারেন।

সে রাতের কথা অশ্রুময়ীর বেশ মনে আছে। অবিস্মরণীয় রাত।

হঠাৎ অশ্রুময়ীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ইনিয়ে-বিনিয়ে কে যেন কাঁদছে। কোন মানুষের কান্না নয়। রাজবাড়ীর আত্মাই বুঝি কাঁদছে। আর্তস্বরে।

দিন পনেররাজাবাহাদুর বাড়ী নেই। রাণীকে বলেছেন—মহালে গিয়েছেন দুর্বিনীত প্রজাদের শাসন করতে। ফিরতে দেরী হবে। কিন্তু আসল কথা অশ্রুময়ী জানেন। চরের মুখে খবর পেয়েছেন। রাজাবাহাদুর আতরী-বাঈয়ের পদপ্রান্তে পড়ে আছেন। বাঁধা পড়েছেন তার নূপুরের নিক্বণে।

অশ্রুময়ী বিছানা থেকে নামলেন। নেমেই বুঝলেন কান্না নয়, মাঝরাতে ওস্তাদ বেহালা নিয়ে বসেছে।

পা টিপে টিপে অশ্রুময়ী বাইরে এসেছিলেন।

ঝড় শুরু হয়েছে। প্রকৃতির তাণ্ডব নর্তন। দুরন্ত বাতাসে পর্দাগুলো দুলছে।

অশ্রুময়ী এগিয়ে গেলেন।

ওস্তাদের ঘর অন্ধকার। বিদ্যুতের আলোয় অশ্রুময়ী দেখতে পেয়েছিলেন, জানলার কাছে ওস্তাদের ঘন কালো মূর্তি। থুঁতনীতে বেহালা চেপে আস্তে আস্তে ছড় টানছে। ঝড়ের উন্মাদনা ছাপিয়ে আরও উত্তাল সুরের আবর্ত।

হঠাৎ রাণী অশ্রুময়ীর ঘোর কেটে গেল। গাড়ী হাসপাতালের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। পাশের লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ জানবে না, কত বড় এক গুণী লোক কি অবস্থায় পড়েছে। আহত হয়েছে কার গাড়ীর তলায়। কপালের ওপর নিষ্ঠুরতার নির্মম স্বাক্ষর এঁকেও বুঝি তাঁর পরিতৃপ্তি আসে নি; তাই আর এক প্রত্যঙ্গের ওপর চরম আর এক আঘাত দিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

রাণী অশ্রুময়ী জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন, যাতে ওস্তাদকে গাড়ী থেকে নামবার সময় তার দৃষ্টি না এদিকে পড়ে। তাঁকে না চিনতে পারে।

আধ ঘণ্টার ওপর লাগল সব বন্দোবস্ত করতে। রাণী অশ্রুময়ীকে একটা কাগজও সই করতে হল কাঁপা কাঁপা হাতে।

সব চুকে যেতে তারক এসে আবার স্টিয়ারীংয়ে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে রাণীর দিকে চেয়ে রইল—আদেশের অপেক্ষায়।

রাণী অশ্রুময়ী খুব মৃদু কণ্ঠে বললেন, বাড়ী।

হ্যাঁ, সোজা বাড়ীই যাবেন। গঙ্গার ধারে আজ নয়।

লোকটা পাশে নেই, তবু রাণী সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে বসলেন। ওদিকে চোখ ফেরাবার সাহসও তাঁর নেই।

রাত্রে খাটে শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন। আশ্চর্য, এতদিন পরে, এ ভাবে দেখা হয়ে গেল ওস্তাদের সঙ্গে? চিনতে সে পারেনি, বিধাতার আশীর্বাদ।

বিছানায় শুয়ে সে-রাতের কথাটা ভাবার চেষ্টা করলেন।

রাণী অশ্রুময়ী খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ওস্তাদের ধ্যান ভেঙে ছিল। একবার শুধু ফিরে চেয়েছিল অশ্রুময়ীর দিকে। কোন কথা বলে নি।

বেহালার ছড় টানতে টানতে বিছানার ওপর এসে বসেছিল। বাজনা শুনতে শুনতে অশ্রুময়ীরও জ্ঞান ছিল না। মীড়, গমক, মূর্ছনায় প্রাণের তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে। কাঠ আর তারের গোছা থেকে এমন হৃদয়-মথিত-করা সুর কি করে ওস্তাদ বের করে। কোন যাদুর স্পর্শে!

রাণী অশ্রুময়ী ওস্তাদের পাশে গিয়ে বসেছিলেন। পরিবেশ ভুলে।

খুব আস্তে আস্তে ছড় টানছিল ওস্তাদ। মাটির অভ্যন্তর থেকে একটা চাপা কান্নার রেশ। রাণী অশ্রুময়ীর মনে হয়েছিল তাঁরই অন্তর্বেদনা বুঝি রূপ নিয়েছে ওস্তাদের বেহালার সুরে। আভিজাত্যের আবরণ ঘিরে হৃদয়ের যে ব্যথাকে রাণী অশ্রুময়ী চাপা দিতে চেয়েছিলেন, সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই ব্যথাকে এ ভাবে টেনে হিঁচড়ে তারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কেন প্রকাশ করছে ওস্তাদ।

সুরের খেলা যখন জলদে, তখনই সর্বনাশ হয়েছিল।

রাণী অশ্রুময়ী সরে এসে একটা হাত রেখেছিলেন ওস্তাদের বাহুমূলে। কেন তা তিনি নিজেই জানেন না। সে করুণ মূর্ছনা সহ্য করতে পারেন নি, তাই থামতে বল-ছিলেন ওস্তাদকে কিংবা নিজেকে ভুলেছিলেন। জড়িয়ে পড়েছিলেন সুরের জালে।

ওস্তাদ একটা হাত দিয়ে বেষ্টন করে অশ্রুময়ীকে টেনে এনেছিল কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছড় ছিটকে পড়েছিল। আচমকা ককিয়ে উঠে বেহালা থেমে গিয়েছিল।

সুর থামার সঙ্গে সঙ্গে রাণী অশ্রুময়ীর চেতনা ফিরে এসেছিল। এ কি হ'ল? নীলগঞ্জের রাণীর অঙ্গে কুলশীল-হীন এক যাযাবরের স্পর্শ কি করে তিনি সহ্য করবেন। এ কি স্পর্ধা পথের ভিখারীর!

দু'হাতে সবেগে ওস্তাদকে ঠেলে দিয়ে রাণী অশ্রুময়ী ছুটে নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। দেয়ালে টাঙান চাবুকটা পেড়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে আবার গিয়েছিলেন ওস্তাদের ঘরে।

বেহালা সামনে নিয়ে ওস্তাদ তখনও চুপচাপ বসেছিল। খুব কাছে গিয়ে রাণী অশ্রুময়ী সজোরে চাবুক চালিয়ে-ছিলেন। ঝড়ের মাতনকে ডুবিয়ে চাবুকের শব্দ—একটা আর্তনাদ।

পিছন ফিরে রাণী অশ্রুময়ী আর দেখেন নি। নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। এক ফোঁটা ঘুম আসেনি চোখে। বুকে বালিশ চেপে চুপচাপ শুয়েছিলেন।

পরের দিন খুব ভোরে উঠেছিলেন। ঝড় থেমেছে। চারদিকে তার ধ্বংস লীলা। গাছের ডাল, পাতা ইতস্তত ছড়ানো।

পা টিপে টিপে রাণী অশ্রুময়ী ওস্তাদের ঘরে উঁকি দিয়ে-ছিলেন। ঘর খালি। বেহালার ওপরে দু-এক ফোঁটা রক্ত। জমাট বেঁধে রয়েছে।

ওস্তাদ আর ফিরে আসেনি। রাজাবাহাদুর দু-একবার খোঁজ করেছেন, তারপর নিজেই বলেছেন, ওসব লোক কি এক জায়গায় থাকতে পারে কখনও! পথ ওদের টানে।

তারপর একটা একটা করে ইঁট খসে পড়ার মতন, একটু একটু করে সব গিয়েছিল। মৌজার পর মৌজা লাটে উঠেছিল, মহালের পর মহাল হাতবদল করেছিল। শেষকালে বসতবাটীর পাট্টাও গিয়েছিল অন্যের কবলে। সব সর্বনাশ রাজাবাহাদুরকে দেখতে হয়নি। তার আগেই তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিলেন।

রাণী অশ্রুময়ীকে উঠে আসতে হয়েছিল কলকাতার বাড়ীতে। কিন্তু সে বাড়ীও বাঁচাতে পারেন নি। ঋণের বোঝা বাড়ীর চেয়েও ভারী হয়ে উঠেছিল।

সকালে যখন অশ্রুময়ী উঠলেন, তখন শরীর অনেকটা ঝরঝরে। নেশার ঘোর কেটে গেছে।

বসে বসে আগের দিনের ঘটনাটা ভাবতে লাগলেন। একি করেছেন তিনি? এতদিন পরে ওস্তাদকে পেয়েও একটা কথা বলেন নি। অবহেলা করেছেন অমন এক গুণী লোককে বিশেষ করে ওই অবস্থায়।

বাইরে বেরিয়ে রাণী অশ্রুময়ী ডাকলেন, তারক, তারক। গ্যারেজের ওপরেই তারক থাকে। অসময়ে রাণীর আহ্বান শুনে ছুটে এসে দাঁড়াল।

ডাকলেন রাণীমা?

হ্যাঁ, একবার গাড়ীটা বের করতে হবে।

বিস্মিত তারক এক দৃষ্টে রাণী অশ্রুময়ীর দিকে চেয়ে রইল।

আমি একবার হাসপাতালে যাব।

কথা শেষ করে অশ্রুময়ী আর দাঁড়ালেন না। ভিতরে চলে গেলেন।

তারকই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ওয়ার্ড নম্বর ষোল, বেড নম্বর বাইশ। তিনতলায়।

কি ভাবে কথা শুরু করবেন রাণী অশ্রুময়ী সেটা মনে মনে ভাবছিলেন। ক্ষমা চাইবেন আগের দিনের ব্যবহারের জন্য? বলবেন, চোখের জ্যোতি কমে গেছে, এখন কাছের মানুষকেও আর চিনতে-পারেন না। একেবারে কোণের বিছানা। ওস্তাদ জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে আঘাতটা বোধ হয় গুরুতর নয়।

রাণী অশ্রুময়ী তারককে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বললেন। তাঁর পিছন পিছন ভিতরে যাবার দরকার নেই। কে জানি যদি ওস্তাদ পুরোনো কথার জের টানে।

পায়ের শব্দ হ'তেই ওস্তাদ মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে রাণী অশ্রুময়ী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রাতের আলো-অন্ধকার নয়, নেশার ঘোরও নেই। সব কিছু পরিষ্কার।

এই লোকটাকে দেখে এত ভয় পেয়েছিলেন রাণী অশ্রুময়ী? এত ভাবনা এই মানুষটাকে ঘিরে? ওস্তাদের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। কাটা দাগটাও সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

লোকটা কিছু বলবার আগেই রাণী অশ্রুময়ী হন হন করে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। আর একবারও পিছন না ফিরে।

তারকও নেমে এল।

রাণী অশ্রুময়ী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, নয়তো বিশ্রী একটা অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'ত। পুরোনো দিনের কাদা আর পাঁক সারা গায়ে ছিটকে পড়ত।

গাড়ীতে উঠেই কিন্তু রাণী অশ্রুময়ীর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

আর একবার অনায়াসেই দেখা হ'তে পারত ওস্তাদের সঙ্গে। আর একটিবার।

সে রাতের কোন কথা রাণী অশ্রুময়ী তুলতেন না। কেবল অনুনয় করতেন। এই সময়ে বেহালা শেখাতে পারেন না ওস্তাদ। আজ তো রাণী অশ্রুময়ী সব হারিয়েছেন। তাঁর অর্থ, সম্পদ, আভিজাত্য। রূপ, যৌবন, লাবণ্য।

সব না হারালে যদি বেহালা শেখার অধিকারিণী না হয়, তা হ'লে রাণী অশ্রুময়ীর মত যোগ্যতা আর কার আছে! তিল তিল করে সর্বস্ব কে হারিয়েছে এমন ভাবে!

জীবন সন্ধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সূর্য্য নামে অস্তাচলে, আস্‌ছে নেমে অন্ধকার!
সেই আঁধারে মিলিয়ে যাবো। দুঃখে সুখে নির্ব্বিকার
দিব্যি আছি চিতায় শুয়ে। উর্দ্ধে বিরাট ঐ আকাশ!
আমায় আমি দেখছি খাসা: পরিত্যক্ত জীর্ণবাস
পড়ে আছি। আগুন জ্বলে; শেষকালেতে কিছু নাই!
বাতাসেতে উড়ছে কেবল কয়েক মুঠো কাঠের ছাই!
শ্রাদ্ধ-বাসর বেশ জমেছে! ভাষণগুলি চমৎকার!
কাব্যে নাকি গেঁথেছিনু বঙ্গবাণীর কণ্ঠহার!
আরও অনেক প্রশস্তিবাদ—যথা ছিলাম দেশ-প্রেমিক
প্রশংসায় কে নয়কো খুসি? তবু জেনো বলছি ঠিক:
মৃত্যুপারের খ্যাতির প্রতি নেইকো বিশেষ আকর্ষণ!
তবুও যদি নেহাৎ মোরে স্মরণ করো বন্ধুজন,
মনে রেখো: দূরের কাছের আস্‌তো যারা নিঃসহায়
আমার সকল শক্তি দিয়ে নিয়েছিনু তাদের দায়;
দুর্ব্বলেরে ত্যাগ করিনি। অন্য কোন পরিচয়
নাইবা দিলে! জয় তোমাদের! নরনারায়ণের জয়।

শক্তিপীঠ ভারতবর্ষ ও শ্রীশ্রীশারদীয়া শক্তিমহাপূজা

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

পরমাশক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতি দক্ষসুতা সতী তাহার পিতৃদেব প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলে স্বামী নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিলে সতীপতি দেবাদিদেব মহাদেব সতীদেহস্কন্ধে সমগ্র জগৎ পর্যটন করেন। সেই সময় সতীদেহ খণ্ডীকৃত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে একান্নটি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এই স্থানগুলি সিদ্ধশক্তিপীঠ—শক্তিপূজার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। প্রকৃত-পক্ষে এই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরমাশক্তির লীলা নিকেতন—তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে এই সিদ্ধশক্তিপীঠ সাধনভূমি ভারতবর্ষ—শক্তিসাধনার উৎকৃষ্ট স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ভারতবর্ষ সাধনভূমি এবং অন্যান্য বর্ষভোগভূমি এই ভারতে সাধনায় মানব অচিরে মহাফল লাভে সমর্থ হয়। এই কারণে ভারতবর্ষে অসংখ্য যোগীসাধক মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর চক্ষে ভারতবর্ষ পরম রহস্যময় এবং পরমবিস্ময়।

আদ্যাপরমাশক্তি জাগতিক সমস্ত শক্তির উৎস। সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণের মহতী শক্তি তাঁহারই শক্তি—রজঃগুণ-প্রধান আসুরিক শক্তিও তাঁহারই শক্তি। উভয় শক্তির সংগ্রাম তাঁহার লীলা। "কেন" উপনিষদে বর্ণিত আছে অসুর বিজয়ে দেবগণ অহংকৃত হইলে স্বয়ং আদ্যাশক্তি, উমা হৈমবতী দেবীরূপে দেবগণের অহংকার চূর্ণ করেন।

এই আদ্যাপরমাশক্তি ভারতবর্ষের যোগীসাধকগণের দৃষ্টিতে চৈতন্য-ময়ী; এজন্য তিনি আমাদের আরাধ্যা-দেবীরূপে পরমা পূজনীয়া।

আদ্যাপরমাশক্তির স্বরূপ

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী আদ্যাপরমাশক্তিরস্বরূপ উপলব্ধি প্রাকৃত মানবগণের সাধ্যাতীত। সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সাধক-যোগী মহাপুরুষগণ তাঁহাকে দেখিয়াছেন। আমরাও সাধনপন্থী হইলে তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হইব।

অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষীর মুখে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন—

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ (দেবীসূক্ত)

জীবগণ যে শক্তির সাহায্যে আহার করে, দর্শন করে, বাঁচিয়া থাকে কথা শোনে সেই শক্তি আমারই শক্তি।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সম্বভূব॥ (দেবীসূক্ত)

আমি বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে উহাদের অন্তরে-বাহিরে বিচরণ করিতেছি। যদিও স্বরূপভাবে আমি আকাশে অতীত, পৃথিবীর অতীত, অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপিণী তথাপি স্বীয় মহিমায় এ সমগ্র জগৎরূপ ধারণ করিয়াছি।

এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁহার বাহ্যমূর্তি হইলেও তিনি কূটস্থ চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিরাজমানা আছেন। জাগতিক সমস্ত শক্তি আদ্যাশক্তি মহামায়া শক্তি। এই শক্তি জড়-বিজ্ঞানীদের চক্ষে অন্ধ—যোগীগণের চক্ষে সৎচিৎ আনন্দস্বরূপা।

বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের আদ্যাশক্তি মহামায়া এক মনে করিলে আমরা ভুল করিব। বেদান্তের মায়ার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, শু ব্যবহারিক সত্তা আছে; কিন্তু তন্ত্রের আদ্যাশক্তি মহামায়া নিত্যা স্ব ব্রহ্মস্বরূপিণী। সুতরাং বেদান্তের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের আদ্যাশক্তি মহামা এক—শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে আছে—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি। তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ হও। আদ্যাশক্তি মহামায়া কূট চৈতন্যরূপে-নিরাকারা নির্বিকারা—কিন্তু জগৎরূপে সাকারা—জাগতি সর্বভূতে চৈতন্যময়ীশক্তিরূপে বিরাজমানা। এই আদ্যাশক্তির একপা অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্যে নিত্য লীলাময়ী এবং তাহার তিনপা নিত্যাশুদ্ধা মুক্তা স্বয়ং প্রকাশমানা।

দেবী ভাগবতে আছে—

সেয়ংশক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী—।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥

সচ্চিদানন্দরূপিণী অরূপা মহামায়া ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিবার জ রূপ ধারণ করেন।

শক্তিপূজায় অবশ্যপাঠ্য বেদমূলা শ্রীশ্রীচণ্ডী। বেদমাতা স্ব শ্রীশ্রীচণ্ডীরূপে প্রকাশমানা। তিনি পরমাত্মময়ী। শ্রীশ্রীগীতা যেমন সক উপনিষদের সার—শ্রীশ্রীচণ্ডী সেইরূপ সকল তন্ত্রশাস্ত্রের সারভূতা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে মহামুনি মেধস মহারা সুরথকে বলিয়াছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্বমিদং ততং।

সেই দেবী নিত্যা অর্থাৎ জন্মনাশরহিতা এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁহা মূর্তি—তিনি চিন্ময়ীরূপে এই সমস্ত জগতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন—

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

আদ্যাশক্তি মহামায়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যরূপা মহাবিদ্যা,—তিনি সর্বমোহিনী মহামায়া,—তিনি সর্বজ্ঞত্বশক্তিরূপা মহামেধা, তিনি সর্বদেব-শক্তিরূপা,—সর্বমহাসুরশক্তিরূপা—তিনি সর্বভূতের মূলকারণরূপা প্রকৃতি—তিনি সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিভাবিনী—তিনি প্রলয়রাত্রিরূপা—মহারাত্রি এবং দুষ্পরিহরা মোহরাত্রি।

দেবতাগণ তাহাদের স্তবে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে বলিয়াছেন—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

তুমি সুকৃতিগণের গৃহে শ্রীরূপা পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী রূপা এবং নির্মলবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ে সাধনবুদ্ধিরূপা।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

তুমি সর্বব্যাপিনী—এই নিখিল জগৎ তোমার অংশভূত—তুমি অব্যাকৃতা। (নির্বিকারা) তুমি আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

তুমি বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্বপালিনী—তুমি বিশ্বাত্মিকা, তুমি বিশ্বধাত্রী।

দেবতাগণ আদ্যাশক্তি মহামায়াকে বলিয়াছেন—তুমি সর্বভূতে বিষ্ণু-মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতা, ভ্রান্তি, ব্যাপ্তি, চিতি (কূটস্থ চৈতন্যরূপা)

মহামুনি মেধস মহারাজা সুরথকে বলিয়াছেন—

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈববিশ্বং প্রসূয়তে।
সাযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

তিনি এই বিশ্বকে মায়া বিমুগ্ধ করিতেছেন—তিনি বিশ্বকে প্রসব করেন, তিনি সাধনায় তুষ্ট হইলে নিষ্কামভক্তকে আত্মজ্ঞান এবং সকাম ভক্তকে ঐশ্বর্য প্রদান করেন।

আদ্যাশক্তি মহামায়া প্রাকৃত জনগণকে সংসারবন্ধন নিমিত্ত অবিদ্যা-রূপে—অপরমা, অপরদিকে সাধক যোগীগণের নিকট বিদ্যারূপে পরমা-পরমমোক্ষদাত্রী। তিনি লক্ষ্মীরূপে পরমসম্পদ দান করেন আবার অলক্ষ্মীরূপ সমস্ত বিনাশ সাধন করেন। তিনিই সব, আর সবই তিনি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে গতিং শুভাং॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া স্তব দ্বারা স্তুত এবং গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দ্বারা সম্যকভাবে পূজিতা হইলে বিত্তপুত্রাদি, ধর্মে মতি, এবং শুভাগতি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা সেই জগৎ প্রকৃতিরূপা আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা।

পূর্বে বহু আড়ম্বরে ধুমধামে অনেক গৃহস্থ বাটীতে শ্রীশ্রীশারদীয়া মহা-পূজা হইত, আজ তাহাদের অধিকাংশ হতশ্রী দীন হীন—তাহাদের সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ ভগ্নদশায় চর্মচটিকার লীলাক্ষেত্র অথবা পূজার্চনা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। ইহার কারণ কামাচার—যথাশাস্ত্র পূজার প্রতি অশ্রদ্ধা। এই সকল শাস্ত্র কাহারো কপোলকল্পিত বিষয় নহে। ইহা ব্রহ্মজ্ঞ সাধকমহাপুরুষগণের সাধনালব্ধ বস্তু। এই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনে পূজার ফল—অলক্ষ্মী এবং বিনাশ।

শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারত।
ন চ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাগতিম্॥

যিনি শাস্ত্রবিধি উলঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ কর্ম করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন না—সুখ বা পরাগতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদাগৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশোপজায়তে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া ভবকালে (মঙ্গল বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যথাশাস্ত্র কার্যকরণ সময়ে) মানবগণের গৃহে ঐশ্বর্যরূপা লক্ষ্মী এবং অভাবে (কামাচারে) তিনি অলক্ষ্মীরূপে বিনাশ সাধন করেন।

সুতরাং শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা ভক্তিযুক্তমনে যথাশাস্ত্রকরণীয়া। অন্যথায় সকল অভীষ্টের বিনাশ।

দেবার্চনায় কর্তব্য কি ?

দেবার্চনার সর্বপ্রথম কর্তব্য পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি—আমাদের শাস্ত্রে আছে—

আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেবশুদ্ধিস্তুপঞ্চমী
যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চনা কুতঃ॥

যে সকল ব্যক্তি দেবার্চনা ইচ্ছা করিয়া (১) আত্মশুদ্ধি (২) স্থানশুদ্ধি (৩) মন্ত্রশুদ্ধি (৪) দ্রব্যশুদ্ধি (৫) দেবশুদ্ধি না করিয়া আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ করিয়া বা লৌকিক প্রতিষ্ঠা লাভ জন্য দেবার্চনায় ব্রতী হন তাহাদের দেবার্চনা ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

(১) দেবার্চনায় আত্মশুদ্ধি (আমার 'আমি'কে শুদ্ধি)। আমার 'আমির' সাক্ষাৎ পাই আমরা আমাদের অন্তঃকরণে—আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারিপ্রকার কার্যকারিতার মধ্যে। আত্মশুদ্ধি প্রধানতঃ আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি। পঞ্চমহাভূতের সমষ্টিগত ভাব হইতে আমাদের অন্তঃকরণের উদ্ভব। আমাদের পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন। মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়বর্গ কার্যে অক্ষম; কিন্তু মন ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যতীত কার্য করিতে সক্ষম। তবে তাহার বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। এজন্য মন সর্বদাই চঞ্চল ও প্রমাথী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনকে নিশ্চল করে। চিত্তের কার্য অনুসন্ধান এবং অহংকারের কার্য অভিমান।

অহংকারের ধর্ম ইচ্ছা। শুদ্ধ ইচ্ছার কোন কার্যকারিতা নাই।

ইচ্ছা ফলপ্রসূ করিবার জন্ম অহংকার সক্রিয় হইলে চিত্ত তাহার করণের উপায় অনুসন্ধান করে—বুদ্ধি তাহাতে নিশ্চয়ভাব গ্রহণ করিলে মন ইন্দ্রিয়বর্গ আশ্রয়ে কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়।

আমার ইচ্ছা বহু, কিন্তু তাহার পরিপূরণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এখানেই আমরা বুঝি আমি সর্বশক্তিমান নহি—আমার একজন নিয়ন্তা আছেন। এই নিয়ন্তাকে জানিলে এবং তাহাতে যুক্ত হইতে অভ্যাস করিলে অভিমানের নাশ হয়—আত্মশুদ্ধি লাভ করে।

(২) দেবার্চনায় স্থানশুদ্ধি—অহংভাব বা অভিমান যেস্থানে দেবার্চ্চনায় যুক্ত না থাকে—চিত্ত যে স্থানে বিক্ষিপ্ত না হয়—বুদ্ধি দেবার্চনা বিষয়ে নিশ্চিত থাকে—মন অন্য কোন বিষয়ে নিযুক্ত না হইতে পারে এরূপ স্থান দেবার্চনায় উপযুক্ত। পূজার স্থান সুসংস্কৃত ও শান্ত সমাহিত ভাববিশিষ্ট হওয়া কাম্য। পূজাস্থলে মাইকের উচ্চরবে কুৎসিত কুরুচি-পূর্ণ গীতবাদ্য,—পরনিন্দা পরচর্চা,—বৃথা বাগাড়ম্বর—স্থান শুদ্ধির বাধক।

(৩) দেবার্চনায় মন্ত্রশুদ্ধি—পূজার্থী স্বয়ং অশক্ত হইলে উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ, ভক্তিমান মন্ত্রার্থজ্ঞ পুরোহিতকে দেবার্চনায় প্রতিনিধি নিয়োগ করা উচিত। অনুপযুক্ত পুরোহিত দ্বারা অশাস্ত্রীয় ক্রিয়ার ফল—দেবতার রোষ-অলক্ষ্মীপ্রাপ্তি ও বিনাশ।

(৪) দেবার্চনায় দ্রব্যশুদ্ধি—দেবার্চনার দ্রব্যাদি যথাশাস্ত্র ও যথোপযুক্ত হওয়া বিধেয়। এ বিষয়ে বিত্তশাঠ্য ও শ্রমশাঠ্য করা অনুচিত। দেবার্চনায় উৎসবাদি অঙ্গ, সুতরাং উৎসবাদির ব্যয় দেবার্চনার ব্যয় অপেক্ষা অধিক হওয়া অন্যায়। আজকাল সার্বজনীন পূজাক্ষেত্রে দেখা যায় পূজার ব্যয় অপেক্ষা উৎসবাদির ব্যয় অধিক। তাহারা উৎসব উপলক্ষ করিয়াই পূজায় ব্রতী হইয়া থাকেন। এরূপ দেবপূজা নিষ্ফলা। বন্ধ্যানারীর সন্তান প্রসবের প্রয়াসের মতো হাস্যকর প্রচেষ্টা।

(৫) দেবার্চনায় দেবশুদ্ধি—দেবতার মূর্তি দেবতার ধ্যানানুযায়ী হওয়া উচিত। দেবতার ধ্যান সাধকগণের সাধনালব্ধ। সাধকস্য হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা—বিভিন্ন সাধকের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সাধকের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। সাধক সেই রূপকে স্বীয় চিত্তপটে রাখিয়া সেই দেবতার ধ্যান স্থির করিয়া গিয়াছেন—ইহা কাহারো কপোলকল্পিত নহে। যে ধ্যানে যে দেবতার পূজা হইবে সেই ধ্যানানুযায়ী মূর্তি গঠন না করিয়া দেবমূর্তিকে আর্টের অধীন করিয়া ইচ্ছামত গঠন—কামাচার-অশ্রদ্ধার দ্যোতক।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—

অর্চকস্য তপোযোগাৎ আর্চনাৎ সাতিশয়নাৎ
অভিরূপস্য বিম্বানাং দেবতা-সান্নিধ্যমিচ্ছতি।

পূজকের যদি তপস্যা থাথে, পূজোপকরণ—যদি সাতিশয় ভাবে সংগৃহীত হয় এবং দেবমূর্তি যদি ধ্যানানুযায়ী গঠিত হয় তাহা হইলেই দেবতা সেখানে আবির্ভূত হন। উৎসবের আতিশয্য ও আর্টের আতিশয্যে দেবতার আবির্ভাব-কল্পনা বাতুলতা।

রামানুজ বলেন—দেবতার পূজার পাঁচ অঙ্গ—(১) আভগমন অর্থাৎ পূজাস্থানের সংস্কৃতি বিধান (২) উপাদান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র পূজোপযোগী—সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ (৩) ইজ্যা—যথাশাস্ত্র ভক্তিযুক্ত-চিত্তে পূজা (৪) সাধ্যায় (স্তবাদি পাঠ) ও মন্ত্রজপ—(৫) যোগ অর্থাৎ সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত-ভাবে ভগবদনুসন্ধান। আমাদের শাস্ত্রমতে যোগ-এর অর্থ—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে পার্থিব বিষয়ে ধাবিত হয়। ইহা নিরুদ্ধ হইলে ভগবৎসত্ত্বা উপলব্ধি হয়। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। যম নিয়মাদি অভ্যাসে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া সমাধিভাবে ভগবৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—

অস্তি, ভাতি, প্রিয়ং, রূপং, নামচেত্যর্থপঞ্চকং।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং বিশ্বরূপং ততোদ্বয়ং ॥

অস্তি (সত্তা—সর্বত্র বিদ্যমানতা) ভাতি (দীপ্তি—স্বয়ং প্রকাশ-মানতা) প্রিয় (আনন্দরূপ) এই প্রথম তিনটি—ব্রহ্মের স্বরূপ এবং পরের দুইটি রূপ ও নাম বিশ্বের স্বরূপ। নাম ও রূপের উৎপত্তিকেই সৃষ্টি আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে নাম ও রূপের অতীত সত্তায় যাইতে হইবে। সমাধি অবস্থা নাম ও রূপের অতীত অবস্থা। ইহা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব—নিজের উপলব্ধির বিষয়।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শত জন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

(জ্ঞানসংকলনীতন্ত্র)

কোন ভাগ্যবান যদি এক নিমিষ বা নিমিষার্ধ মাত্র সমাধি লাভ করিতে পারেন তাহার শত জন্মের অর্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

॥ মূর্তিপূজার রহস্য ॥

ভারতীয় ধর্ম্মে মূর্তিপূজা—পুতুল পূজা নহে। দেবতামূর্ত্তি পুতুল নহে—ইহা যোগী সাধকগণের সাধন লব্ধ বস্তু। কাহারো কল্পিত রূপ নহে ইহা সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক। দেবতার স্নান মন্ত্রে আমরা বলি—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্বতো স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম ॥

যিনি অসংখ্যশীর্ষ-বিশিষ্ট অসংখ্যচক্ষু পদ বিশিষ্ট তিনি সকল ভূমি স্পর্শ করিয়া আমার দশাঙ্গুল স্থানে (হৃদয়ে—বক্ষ হইতে গলদেশ দশাঙ্গুল বা মস্তিষ্কে—ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দশাঙ্গুল) অবস্থান করুন। কোন ভক্তই সসীমের পূজা করে না—সসীমকে আশ্রয় করিয়া অসীমের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করাই ভক্তের আনন্দ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য মধ্যে যেরূপ অসীম ভাব-এর মহাপ্রকাশ সম্ভব শাস্ত্রে বর্ণিত সাধক যোগীগণের তপোলব্ধ দেবতামূর্তির মধ্যেও সেইরূপ অসীম সত্তার মহা বিকাশ সম্ভব। অজ্ঞানীর চক্ষে যাহা কয়েকটি অক্ষর মাত্র—জ্ঞানী সেই অক্ষর সমষ্টির ভাব মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। সেইরূপ ভ

পূজার্থী দেবতামূর্ত্তি পূজনে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। এই ভাবের অসীমতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতির চেয়ে বড়।

প্রত্যেক ধর্ম্মের দুইটি দিক্ আছে, একটি অনুষ্ঠানের দিক্—অপরটি দার্শনিক দিক—একটি ভক্তিমিশ্রিত কর্ম্মের দিক অপরটি জ্ঞানের দিক। যাঁহারা শুধু ধর্ম্মের বাহ্যরূপ বা অনুষ্ঠানের দিক অনন্যমনাঃ হইয়া দেখেন তাঁহারা ধর্ম্মান্ধ। এই ধর্ম্মান্ধগণ পৃথিবীতে মহাবিপ্লব করিয়াছেন আজিও করিতেছেন। যাঁহারা সকল ধর্ম্মের দার্শনিক দিক জানিতে পারেন তাঁহারা স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারেন—সকল ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে বিশেষ প্রভেদ নাই শুধু পথের বা উপায়ের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রচারিত বা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায় (১) প্রাচ্য, (২) প্রতীচ্য। প্রাচ্যধর্ম্মের মূলকেন্দ্র—শক্তিপীঠ সাধনভূমি ভারতবর্ষ। এই ধর্ম্ম শাশ্বত ও সনাতন—ইহার লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। এই ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সুখ ও বন্ধন দুঃখ ও বন্ধন—এই উভয় বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্তি। এই মুক্তি সাধনলভ্য—জন্মজন্মান্তরের সাধনা-সাপেক্ষ। এই ধর্ম্মের ভগবান "একমেবদ্বিতীয়ং"—এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার—সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ—তথাপি সাধকের হিতার্থে বহুরূপে লীলায়িত। সাধকের এই সত্য দর্শনেব্য মূর্ত্তি পূজার উদ্ভব।

প্রতীচ্য ধর্ম্মের মূল কেন্দ্র ভোগভূমি। তাহাদের ধর্ম্মের লক্ষ্য অনন্তস্বর্গ বা অনন্ত সুখ ভোগ। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় ও নিরাকার—সাকার গ্রহণে অসমর্থ। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের জন্য সহজ সরলভাবে এক। এজন্য এই ধর্ম্মে গুরুকরণের অবকাশ নাই এবং মূর্ত্তি পূজা নিষিদ্ধ।

প্রাচ্য হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান—অধিকারীভেদে—জ্ঞানী অজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী অবিষয়ী ভেদে বিভিন্ন। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে—ইহা গুরুমুখী। ভারতীয় ধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজার রহস্যভেদ অনধিকারী ভোগায়তন ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভব নহে। মূর্ত্তি-পূজায় পূজার্থীকে অগ্রে ধ্যানানুযায়ী মূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া তদাত্মায় আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া মানসপূজা করতঃ মূর্ত্তিপূজা করিতে হয়। ভোগভূমিতে যে পুতুলপূজা প্রচলিত ছিল এই পূজার সহিত তাহার স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—প্রত্যেক জাতির একটা না একটা অবলম্বন বা মেরুদণ্ড আছে। যেমন কোন জাতির রাজনীতি, কোন জাতির বাণিজ্য, কোন জাতির কৃষি, কোন জাতির শিল্প, কোন জাতির ধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম্মই হিন্দুজাতির একমাত্র অবলম্বন বা মেরুদণ্ড। হিন্দুজাতি যে দিন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইবে সেই দিন হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। ভারতের নরনারী অমৃতের পুত্র সুতরাং অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা আদিপূজা কিনা?

শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে—"রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানু-গ্রহায়চ অকালে বোধিতা দেবী।" এইজন্য অনেকে বলেন ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণের বধার্থে সর্বপ্রথম অকালে (অর্থাৎ দেবতাগণের বিশ্রাম সময় দক্ষিণায়ন সময়ে) শরৎকালে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক বলা সঙ্গত হয় না।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্বে মহারাজা সুরথ মহামুনি মেধসের উপদেশে স্বীয় হৃতরাজ্য উদ্ধারকল্পে এই শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

মহারাজা সুরথের জন্মের বহু পূর্বেও এই শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল। দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যখন দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবতাগণের অধিকার হরণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বিনষ্ট করেন—তখন দেবী স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চঃ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি সমন্বিত॥
সর্ববাধা বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্য সুতান্বিতঃ।
মনুষ্য মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

শরৎকালে প্রতিবর্ষে—যে মহাপূজা করা হয় তাহাতে ভক্তিযুক্ত মনে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে আমার প্রসাদে মানবগণ—সর্ববাধা বিনির্মুক্ত এবং ধনধান্যসুতান্বিত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে দেবী বাক্যে বসন্তকালের পূজার কোন উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

কালে সর্বেষু বিশ্বেষু মহাপূজা চ পূজিতে।
ভবিতা প্রতিবর্ষে চ শারদীয়া মহেশ্বরি॥

এস্থলে শ্রীভগবান প্রতিবর্ষে শারদীয়া পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বসন্তকালের পূজার কথার উল্লেখ নাই।

সুতরাং শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজাই আদিপূজা। ইহা দক্ষিণায়নএর সময় এজন্য বোধন কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা আদ্যাশক্তি জগন্মূর্ত্তি প্রকৃতিদেবীর পূজা। শক্তিপীঠ সাধনভূমি ভারতবর্ষের ষড়ঋতুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে শরৎকালই যে চিন্ময়ী প্রকৃতি দেবীর পূজা আরাধনার প্রকৃষ্ট সময় ইহা উপলব্ধি করা যায়।

বসন্তকাল প্রকৃতিদেবীর শিশুকাল—প্রতিবর্ষে বসন্তে প্রকৃতি শান্তস্নিগ্ধ নিদ্রাচ্ছন্ন সদ্যোজাত শিশুর মতো নব কলেবরা—তখন বৃক্ষ-লতার নব কিশলয়ে, অশোক পুষ্পস্তবকে, গন্ধরাজ যুঁই-বেলা-রক্তকরবী চূতমুকুল প্রভৃতি গন্ধে আমোদিত মলয়বাতাসে মাখান থাকে শিশুর মুখের সুমিষ্ট হাসির মতো সুস্নিগ্ধ হাসি। বসন্তে প্রকৃতি নবজাত—সদাসুষুপ্ত।

গ্রীষ্মে প্রকৃতি রৌদ্রাতিরৌদ্রা—সদাচঞ্চলা দুর্দ্দমনীয়া বালিকা—কালবৈশাখীর রুদ্রচ্ছন্দে ক্ষণহাসি ক্ষণক্রন্দনে ক্ষণ গর্জ্জনে ক্ষণিক নৃত্যপরা।

বর্ষায় প্রকৃতি প্রথম ঋতুমতী রজঃস্বলা তরুণী—প্রিয়তমের মিলন-সমুৎসুধা—তাহার দয়িতের বিয়োগব্যথায় বিধুরা—অশ্রুসিক্তা-ক্রন্দনা

মুখরা। সূর্য্যদেব আষাঢ় মাসে আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথমপাদে যে দিবসত্রয় কুড়িদণ্ড অবস্থান করেন—সেই সময় পৃথিবী প্রতিবর্ষে রজঃস্বলা হয়েন—ইহা শাস্ত্রবাক্য। এই সময়কে অম্বুবাচী বলে।

শরতে প্রকৃতি পূর্ণ-যুবতী—পরম কমনীয়া পরম মনোহরা—পীনোন্নত পয়োধরা, "সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী" লাস্যলীলায় মহামহিমান্বিতা—মস্তকে সুনীল আকাশে শুভ্র মেঘের কিরীটী, হৃদয়ে প্রেম প্রীতি স্নেহভালবাসার প্লাবন চক্ষে অমৃত দৃষ্টি মুখে মধুর্মী হাসি। সমুন্নতবক্ষে পীযূষধারা—পদতলে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—মলয়জশীতলা ধরিত্রী।

হেমন্তে প্রকৃতি প্রৌঢ়া, ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা আত্মসমাহিতা।

শীতে প্রকৃতি রিক্তা গলিতযৌবনাবৃদ্ধা, সর্বত্যাগিনী, আত্মবিস্মৃতা যোগিনী।

সাধনভূমি ভারতবর্ষের ষড়ঋতুর অবস্থা চিন্তা করিলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি—শরৎকালই আদ্যাশক্তি জগন্মূর্ত্তি চিন্ময়ী প্রকৃতিদেবীর পূজাআরাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

শরৎকলে আশ্বিনমাসে শুক্লাষষ্ঠীতে দেবীর বোধন, তৎপর শুক্লা সপ্তমী হইতে শুক্লানবমী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। পরে দশমীক বিসর্জ্জন। পরবর্ত্তী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা এবং তৎপরের অমাবস্যায় দীপান্বিতা শ্রীশ্রীকালীপূজা। ভক্তিসমাহিত চিত্তে যথাশাস্ত্র পূজায় অভীষ্ট ফল লাভ হয়। আমরা দেবীকে নমস্কারে বলি—

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবী—নমোঽস্তুতে॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

আদ্যাশক্তি পূজনে মূর্ত্তি (১) শ্রীশ্রীদুর্গা।

পরমা আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গারূপে অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, পূর্ণেন্দুসদৃশাননা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযৌবনসম্পন্না, পীনোন্নতপয়োধরা। দশহস্তেদশপ্রহরণধারিণী—বামপদতলে পশুরাজসিংহ দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ-তলে নির্ভিন্ন হৃদয়, নির্যদস্ত্রবিভূষিত, রক্তারক্তিকৃতাঙ্গ, রক্তচক্ষু পাশবেষ্টিত পরিপূর্ণ ক্রোধের মূর্ত্তি মহিষাসুর। মহিষাসুর বধের পর তিনি পরিপূর্ণ কামের মূর্ত্তি শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় কে নিহত করেন।

ষড় রিপুর মধ্যে কাম ও ক্রোধ প্রধান। শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্ন—বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত কাম ও ক্রোধ মহাশন এবং মহাপাপজনক। ইহারা পরমশত্রু। মানবশরীরে কাম ও ক্রোধরূপ অসুরদ্বয় প্রতিনিয়ত মহা অশান্তিসৃষ্টি করিতেছে—ইহাও অবিদ্যারূপিণী দেবী মহামায়ার সৃষ্টি। দেবীর শরণ গ্রহণ করিলে তিনি এই মহাসুরদ্বয়কে দমিত করেন। এই রিপুর দমনে অন্য চারিটি রিপু মদ মোহ লোভ ও মাৎসর্য্য সহজভাবে দমিত হয়।

(২) শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

ইহার পরবর্ত্তী পূর্ণিমায় আদ্যাশক্তি মহামায়ার সম্পদরূপিণী শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ হস্তে পাশ ও অক্ষমালা ও বরদা; বামহস্তে পদ্ম ও অঙ্কুশ। বামহস্তের পদ্মটি স্বর্ণময় কিন্তু ব্যগ্রকরা। দেবী স্বর্ণময় পদ্মের লোভ দেখাইতেছেন—যাহারা লুব্ধ হয় তাহারা পাশবদ্ধ হয় এবং অঙ্কুশের নিত্য আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়—ধনলুব্ধগণের এসংসারে শান্তি নাই। আর যাঁহারা পার্থিব ধনে লুব্ধ হন না—অক্ষমালা গ্রহণে সাধনপন্থী হন তাঁহারা পরমসম্পদ-লাভের বরগ্রহণে সমর্থ হন।

(৩) শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা

ইহার পরবর্ত্তী অমাবস্যায়—অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিশীথরাত্রে মহামঘপ্রভা শ্যামা শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা দেবীর পূজা। এই মূর্ত্তি আদ্যাশক্তি মহা-মায়ার নিত্যলীলাময়ী জগৎপ্রকৃতির পরিপূর্ণতম মূর্ত্তি—সৃষ্টিস্থিতিলয় একাধারে। এই দেবী নিত্যসৃষ্টির আনন্দে মুক্তকেশী, দিগম্বরী, স্মেরাননা মহাকাল—সুরতপ্রযুক্তা, বিপরীতারতাতুরা—নিত্য স্থিতির নিমিত্ত হসন্মুখী, সুখপ্রসন্নবদনা পীনোন্নতপয়োধরা, অভয়া ও বরদা—নিত্য-লয়সাধন জন্য করালবদনা ঘোরা, ঘোরদ্রংষ্ট্রা, সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গধরা, কণ্ঠবসত্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিবচর্চ্চিতা, সৃকদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননা শ্মশানালয়বাসিনী। আদ্যা শক্তি সৃজনকালে সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতিরূপা প্রলয়ে সংহাররূপা। এই তিনরূপের সমন্বয় শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকামূর্ত্তি এই মূর্ত্তি শক্তিসাধকগণের পরমতপোলব্ধমূর্ত্তি—শক্তিসাধনপন্থীগণের-দৃষ্টিতে এই মূর্ত্তি পরম মনোহরা। এই মূর্ত্তি দীপান্বিতা—অজ্ঞানান্ধকার নাশিনী—জ্ঞানালোকপ্রদাত্রী। রামপ্রসাদ, পরমহংসদেব, স্বামী নিগমানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধযোগী মহাপুরুষগণ শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সাধননিষ্ঠ হইলে এ জন্মে না পারিলেও জন্মান্তরে তাঁহার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইব। হিন্দুধর্ম্মানুশীলনে কোন ব্যর্থতা নাই শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—দেবগণ বলিতেছেন—

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা, রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি॥

তুমি তুষ্টা হইলে অশেষ উপদ্রব নাশ কর, রুষ্টা হইলে সকল অভীষ্ট নষ্ট কর—তোমার ভক্তগণের কোন বিপদ হয়না—তোমার আশ্রিতগণ সকলের অশ্রয়নীয় হয়।

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

প্রাণ চায়

দেবেশ দাশ

রেখা—ম্যালকম্ ম্যাসন্

অনেক, অনেক বছর বাদে। তা অন্ততঃপক্ষে চল্লিশ বছর ত হল। রাধহরিবাবু পারসিয়ান গাল্‌ফে সেই কৈশোর থেকে সারা জীবনটা কাটিয়েছেন। এখন ধীরে ধীরে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসার বাসনা হয়েছে। বাংলার সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধই এতদিন ছিল না—শুধু বাংলা কবিতা পড়া ছাড়া।

আসানসোল পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গুনগুন করে গান সুরু করেছেন। কত দীর্ঘকাল বাংলা গান শোনেন নি। এখন নিজেকেই শোনাতে লাগলেন—"এই দেশেতেই জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি।"

কিন্তু ব্যাপার দেখে আর মরবার ভরসা তেমন পেলেন না। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে দেখলেন যে শুধু নিজের ফার্ষ্ট ক্লাস নয়, সব কামরা থেকেই যারা পিল পিল করে নামছে তারা প্রায় সবাই এই দেশেতে অর্থাৎ বাংলায় বোধ হয় অন্ততঃ মরবে না। তবু সব দেশের লোক তার দেশে যে আসছে তা দেখেও তিনি খুসী হলেন। অল ইণ্ডিয়া ও অল ওয়ার্ল্ড সমন্বয়ের ছবি বাংলার মাটিতে পা দিয়েই দেখে রাধহরিবাবু খুসী হলেন। মনে মনে বিশ্বকবিকে স্মরণ করলেন—"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" তারপর কন্‌স্‌টিটিউশনখানাকে ধন্যবাদ দিলেন। সারা ভারতটাই আমার। আমার বেঁচে থাকার ঠাঁই। সবার উপরে আমি ভারতীয়।

পারসিয়ান গাল্‌ফে অয়েল কোম্পানীর বড় ফোরম্যান অর্থাৎ কারখানার কর্তা। রাধহরি চ্যাটার্জির মনে খুসীর সীমা নেই।

ষ্টেশনে ওর সম্পর্কে এক নাতীর আসার কথা ছিল। এই তাড়াহুড়ো আর চিড়ে-চ্যাপ্টা ভীড়ের মধ্যেও বাঙ্গালী খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। অনেকদিন যদিও দেখেন নি। তবুও চট করেই নজরে পড়ে গেল।

তারপর নাতীকে আদর করে নাম জিজ্ঞেস করলেন। রঞ্জন? বাঃ বাঃ, বেশ নাম, দাদু। একালের উপযুক্ত নাম। রবিঠাকুর সমস্ত পৃথিবীতে বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করেছেন। আমরা পার্শিয়ান গাল্‌ফে বসে তা অনুভব করেছি। তোমরা গোটা দুনিয়াকে রঞ্জন করে দাও।

মনের খুসীতে রাধহরিবাবু নাতীর সঙ্গে ট্যাক্সি চেপে বসতে যাচ্ছিলেন। ওঃ, সেই বছর চল্লিশ আগে শেষ এ দেশ ছেড়েছিলেন। ভাগ্যের সন্ধানে। তার মধ্যে কত বদলে গেছে দেশ। সোনার বাংলায় কত না জানি ব্যবসার সোণা ফলছে। পাঁচসালা প্ল্যানগুলোর কথা তিনি বিদেশে বসেই কাগজে পড়েছিলেন। ট্রেণে এত ভীড় দেখে সেই সোণার সংকেতই তিনি পেয়ে এসেছেন। না হলে কি আর দেশ-বিদেশের এত হরেক রকমের লোক কলকাতা ধাওয়া করে আসছে। এমন কি রবিঠাকুরের একখানা কবিতাই মনে মনে আউড়ে ফেললেন—

"দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।

কিন্তু এ ভদ্রলোক দেখি ভিক্ষে চায়? হঠাৎ রাধহরিবাবু মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলেন।

ফিস ফিস করে রঞ্জনকে বললেন—দেখত, দাদু, ভুল করছি না কি? ভদ্রলোকের ছেলে ত মনে হচ্ছে। কথা-বার্ত্তা বেশ মাজা ঘষা। কিন্তু ভিক্ষে চাইচে কেন? আবার হাত জোড় করে।

রঞ্জন খুব মজা পেয়ে গেল। বলল—বাঃ রে, ভিক্ষে চাইছে, তা হাত জোড় করবে না? তবে ভদ্রলোক কি না তাই, সুন্দর করে সবিনয়ে চাইছে।

রাধহরিবাবুর চোখের চশমার ফ্রেম সোণার। চশমার কাঁচ দুটোও বোধ হয় আজ সোণালী। তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে ওই হাতজোড়ের মধ্যেও বেশ ইণ্ডিয়ান আর্ট ফুটে বেরোচ্ছে! কেমন নরম সরমভাবে হাত দুটি এক সঙ্গে জোড়া।

মনে পড়ল আগেকার কথা। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় ছেলেরা পথে পথে গান গাইত; চাঁদা চাইত। দেশের জন্য ভিক্ষা।

সেই চাওয়ার মধ্যে ছিল না লজ্জা; ভিক্ষার মধ্যে ভিক্ষুকতা। তারো আগে ছিল বৈষ্ণবের মাধুকরী। এক রকম বলতে গেলে ধর্ম্মের সঙ্গেই ভিক্ষাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্ষার মধ্যেও ছিল সম্ভ্রম, ছিল সৌন্দর্য্য।

সে সব নাতীকে বললেন। তবু একটু কিন্তু কিন্তু ভাব রয়ে গেল। ভদ্রলোক যেন ভিক্ষাটাকে উপায়ের পথ করে নিয়েছেন। তাহলে…



ভিক্ষা-শিল্প

নাঃ, এখন ওসব ইকনমিক্স ভাববেন না। শুধু ভিক্ষার ধরণটার প্রশংসা করলেন।

নাতী মাথা নেড়ে সায় দিল—হবে না দাদু। এটি আমাদের দেশ। আর্টিষ্টের দেশ। ভিক্ষে—ও হচ্ছে ভিক্ষা-শিল্প। জন্ম হইতেই আমরা…

হঠাৎ দাদুর মনে পড়ল সে কথাটা যেন পড়েছেন আগে। হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—জন্ম হইতেই আমরা মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত।

তাই বলি। যা হোক। যে দেশে লোকে আর্টের ময়ান মাখিয়ে ভিক্ষে চায় সে দেশ নিশ্চয়ই আর্টে খুব এগিয়ে গেছে। জীবনের সব কিছুতেই চাই সুন্দরের স্পর্শ। দু'জনে ভিড় ঠেলে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অনেক কিছুই নতুন। আবার নতুন কিছুই নয়। রাধহরিবাবু দু'চোখ ভরে সতৃষ্ণ-নয়নে কলকাতা দেখতে লাগলেন। যা দেখেন তা-ই যেন মায়ায় ভরে ওঠে।

ষ্ট্র্যাণ্ড ছাড়িয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীট পাড়ার কাছ দিয়ে ট্যাক্সী যেতে যেতে আটকিয়ে গেল। পথে ভীড়; দলের পর দল লোক; ভদ্রলোক সব চলেছেন পায়দলে। বিকেল বেলায় যাকে ইংরাজীতে বলে কনষ্টিটিউশন্যাল—অর্থাৎ দেহ-চর্চ্চা। একটু বেড়িয়ে নিলে গা গতর চাঙ্গা থাকে। অফিস ফেরতা লোকদের স্বাস্থ্যের দিকে এহেন নজর দেখে উনি খুব খুসী।

রঞ্জনকে বললেন—সত্যি, দেশটার উন্নতি অবশ্যই হচ্ছে। আমাদের ছোটবেলায় কি কুড়েমির দিন ছিল। চাকুরে বাবু ছিল কুড়ের বাদশা। অফিসে ঠায় বেঞ্চি দখল আর বাড়ীতে ঠেসে বিছানায় মৌরসি পাট্টা। আট-পৌরে ঘরে তাই চেয়ার থাকত না; শুধু তক্তপোষ। যখন খুসী গড়িয়ে নেওয়ার ঢালাও নেমন্তন্ন।

—বাঃ, আপনারা তাহলে এক্সার-সাইজ করতেন না?

—করতাম দাদু, করতাম। সেটি শুধু সরস্বতীর আখড়ায়।

রঞ্জন উসখুস করে বলল,—সেটা দাদু, এ যুগেও চলছে। তবে স্কুলের গেটের সামনে, রাস্তার পাশে আরো বেশী। কিন্তু এই যে দল চলেছে এরা হাঁটছে না, হাঁকছে পূজা বোনাসের জন্য। প্রত্যেকবার পূজোর মুখেই বিকেলে অন্য লোকের কাছে অফিস পাড়ার রাস্তা বন্ধ।

আশ্চর্য্য হলেন রাধহরিবাবু। সে কিরে? আনন্দ-ময়ীর আগমনে?

—হাঁ, দাদু; আনন্দময়ীর ভোল পালটে গেছে। তখন গরীবও কিছু খেতে পেত। এখন মধ্যবিত্তও সংসার চালাতে পারে না। যখন এদেশ থেকে গিয়েছিলেন তখন



সরস্বতীর আখড়ায়

ত আর চালের দাম চল্লিশ ছিল না, ছিল চার। কিন্তু মাইনে ত দশগুণ বাড়েনি, খরচও দশগুণ কমেনি। কাজেই ওরা আগে থেকে বোনাস দাবী করে রাখছে। আগে ছিল "নূন আনতে পান্ত ফুরোয়।" এখন পান্ত ত পাওয়া যায় না ; নূন গলে গেছে।



চশমাটা মুছতে মুছতে দাদু বললেন—কিন্তু দাদু, নিশ্চয়ই দরবার করে বুঝিয়ে বললেই অফিসের কর্ত্তারা কিছু ব্যবস্থা করে দেয়। রাস্তায় হট্টগোল না করে অফিসে···

বাধা দিল রঞ্জন—"আবেদন আর নিবেদন খাস।"—এই ত বলবেন। কিন্তু ওসবের দিন চলে গেছে এদেশ থেকে। দিন-কাল বড় কঠিন। কর্ত্তাদের দিল আরো কঠিন।

—কেন, ডেপুটেশনে কোন ফল হয় না ?

—ওঃ দাদু, আপনি সেই পারসিয়ান গাল্‌ফের স্বপ্নই দেখছেন। পোড়া বাংলাদেশে অফিসে অফিসে—নো ভেকান্সি ! আর যদি ভেকান্সি থাকেই তাতেই বা কি। এখন সব অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশন। কুচো চিংড়ীর বেলাতেও।

অবাক হয়ে উনি বললেন—তাহলে ত চাকুরেবাবুদের ঘর সংসার চালানও মুস্কিল। চাকর-বাকর রাখা তাহলে মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব নয়।

হেসে ফেলল রঞ্জন,—দাদু, মনিব এ যুগে চাকর রাখে না ; চাকরই রাখে মনিব। আপনি সে যুগে ছিলেন সে জমানা বদলে গেছে।

রাখহরিবাবু ডেমোক্র্যাটিক। উনি বললেন—অবশ্য আগে একটু বাড়াবাড়িও ছিল। চাকররা শুধু সম্মান দিত না, সেবা দিত। আর সাহেবদের



হুজুরে হাজির

বাড়ীতে ত দেখেছি সাহেবের গলায় সাড়া ফুটবার আগেই সেলাম। হুজুরে হাজির দিতে তর সইত না।

হঠাৎ দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসখানার কথা ওর মনে পড়ে গেল। উনি আওড়ালেন—সর্বদাই দাসী শ্রীচরণে।

রঞ্জন হাসল,—আজ অবশ্য শ্রীও নেই, চরণও নেই। এখনি দেখতে পাবেন বাদুড়ঝোলা ট্রামে ট্রামে। চরণ দিয়ে চরে বেড়াবার জায়গাও নেই রাস্তায়।

—কেন, ফুটপাথ?

—ফুটপাথ কেন; মাঠেও নয়। গড়ের মাঠেও গড়াবার জায়গা আর নেই।

চোখের সামনে উনি দেখলেন হকার্স কর্ণার থেকে আরম্ভ করে নতুন গজানো বাড়ীঘর অফিস। তার মাঝে যেটুকু আছে এখনো ফাঁক তাতেও ফাঁকি দিয়ে হাওয়া খাওয়ার পথ নেই। গোধন, যে সনাতন ভারতের কত বড় ধন তার প্রচার সমস্তটা মাঠ জুড়ে। কাগজে পড়েছিলেন যে কলকাতা সহর সাফ হয়ে যাবে এবার। খাটাল থাকবে না, ঘুটে জ্বলবে না। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যদের উত্তর পুরুষ আমরা। ঐতিহ্য কি কলকাতা থেকে মুছে ফেলতে পারি? গোবর গঙ্গাজল দিয়ে?

তাহলে বোধহয় সবল মনুষ্যত্বের সাধনা সুরু হয়েছে। উৎসুক ভাবে উনি এই সব গরুর দুধে পুষ্ট সুস্থ সবল বুক উঁচু করে চলে বেড়ান বাঙ্গালী দেখতে চারিদিকে নজর দিলেন। বাঙ্গালী যে বিজনেস মক্স করতে পারেনি তা জানতেন। কাজেই চৌরঙ্গীর দিকে আর তাকালেন না। মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মাঠেই এককালে মোহনবাগানকে গোরাদের হারিয়ে শিল্ড জিততে দেখেছিলেন ছেলেবেলায়। তার উত্তেজনা মন থেকে এখনো মুছে যায়নি। সারি সারি ক্লাবের তাঁবুগুলো দেখতে দেখতে বুকটা ফুলে উঠতে লাগল।

এই একটা জিনিষ যাতে বোধহয় এখনো খুসী হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করা যাবে। উনি জিজ্ঞেস করলেন—দাদু, আজকাল কলকাতার ক্লাবগুলোর সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় কে? সেই অভিলাষ, ভাদুড়ী ব্রাদার্স ওদের মত বেরোচ্ছে?

রঞ্জন গোটা দুই তিন নাম এক নিঃশ্বাসে করে গেল। উনিও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনে গেলেন।

ওকে একেবারে চুপ করে থাকতে চেখে রঞ্জন ব্যাপারটা বুঝে নিল। বলল—এখন আমাদের ক্লাবগুলো সব হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া টিম কিনা—তাই।

সন্ধ্যার পরে রাখহরিবাবু একটু বেরোলেন। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের জন্য টুকিটাকি ঘর সাজাবার জিনিষ 'কিউরিয়ো' এসব এনেছেন। সেগুলো একটা এট্যাচি কেসে ভরে নিয়ে বাড়ীর বাইরে এলেন। সামনেই একটি ভদ্রগোছের তরুণ দাঁড়িয়ে। সে সবিনয়ে যা নিবেদন করল তাকে ভদ্রভাবে সাহায্য প্রার্থনা বলা চলে। রাখহরিবাবু সদ্য নাতীর কাছে ধারকরা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাঙ্গালী সাজে বেরিয়েছেন। মনটা স্বদেশী ভাবে ভরপুর।

উৎসাহ করে বললেন—বেশ বেশ, সাহায্য নিশ্চয়ই করব। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে সাহায্য করবে না ত কে করবে? এই নিন আমার এট্যাচি কেসটা; ট্যাক্সি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিন। আপনাকে খুসী করে দিব।

ভ্রুকুটিতে ভদ্রলোকের মুখ ভরে উঠল। তিনি বেশ কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন এটাচি কেসটাকে এগোতে দেখে। যেন নোংরা অস্পৃশ্য কিছুর ছোঁয়া লেগে যাবে।

ইতিমধ্যে বেশ শক্ত পা দুটো ফেলে মাথা উঁচু করে একজন পশ্চিমা এগিয়ে এল। সোজা এটাচি কেস্‌টাতে হাত লাগিয়ে বলল—চলিয়ে হুজুর।

রাতে ফিরে এসে রাখহরিবাবুর চোখে ঘুম এল না। চারদিকে দেখতে লাগলেন নিজের কল্পনার দেশকে, সাধের স্বপ্নকে। এই মেনে থাকতে হবে বাকীটা জীবন—সব সাধ সব সাধনা মিশিয়ে তৈরী এই দেশ। ঘুম আসতে চায় না, তবুও তিনি নিজের দেশের প্রথম রাতটি জেগে কাটাতে চান না। সুখসুপ্তিই ত সুখের লক্ষণ। রাত গভীর হয়ে গেল। ক্রমে তার ঘুমও গভীর হল। পাশের আলনায় টাঙানো ধুতি আর পাঞ্জাবী এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু তারাও যেন ওর স্বপ্নকে এমন ঠাট্টা করতে লাগল। যে বাঙ্গালীর উনি স্বপ্ন দেখতেন তাদের গায়ে যেন ওগুলো ঠিক মত মাপে বসছে না।

ওগুলো যেন তার নিজের গায়েও ঠিক বসছে না। ওর বলিষ্ঠ হাতের মুঠি পাঞ্জাবির আস্তিনটাতে জড়িয়ে গেছে।

তন্দ্রার ঘোরে উনি ভাবতে লাগলেন—না, না, আমারই দোষ। কেন আমার মুঠি জড়াতে দেব আস্তিনে ?

জড়ানো কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে গেল আরেকটা ছবি। ঝুরি নেমে এসেছে ঝুড়ি ঝুড়ি বটগাছ থেকে।

খুশী হয়ে উনি বাংলার আরেকটা ছবি দেখতে চাইলেন। ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যাকুল রাখহরিবাবু গুনগুন করে যেন গেয়ে উঠলেন—আমার বাটের বটের ছায়ায়। সেই ত বাংলা দেশ, শ্যামল সরস দেশ যার দিকে উনি তাকিয়ে থাকতেন মরুভূমির দেশ থেকে।

কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবটা যেন বড় আঁধারে ঘেরা। বটের ঝুরিগুলো বড় জটিল হয়ে উঠল। তার ভেতর দিয়ে কিছুই ছাই দেখা যায় না।

কিন্তু দেখতেই হবে। দেখবার জন্যেই যে উনি এসেছেন এত বছর পরে। "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।" ওসব না দেখতে পেলে চলবে কেন ?

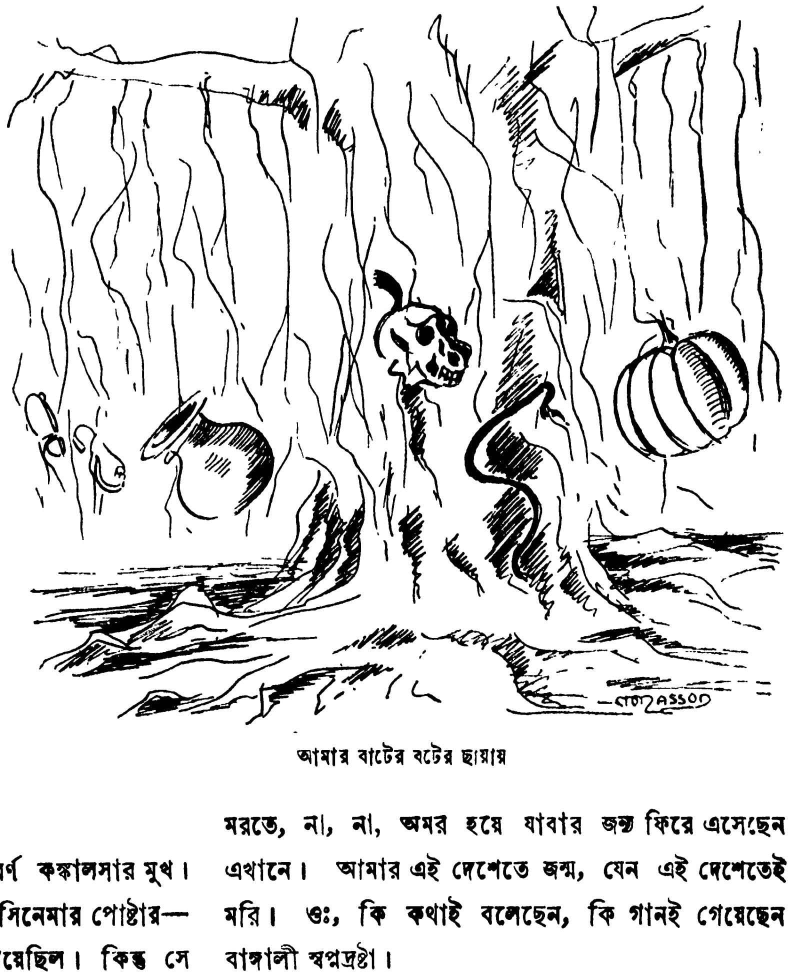
'স্নিগ্ধ সমীর' 'স্নিগ্ধ সমীর' কথা-গুলো কেমন যেন ওর তন্দ্রাকে গভীর করে তুলল। অন্ধকারও হয়ে উঠল গাঢ়তর।

বটের ঝুরির সঙ্গে ঝুলছে কুমড়ো আর কলসী, ছেঁড়া চটি আর, আরো যেন কি কি।

হ্যাঁ আর ঝুলছে একটি শীর্ণ বিবর্ণ কঙ্কালসার মুখ। দেওয়ালে দেওয়ালে রাস্তায় দেখেছেন সিনেমার পোষ্টার—ক্ষুধিত পাষাণ। গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল। কিন্তু সে ছবিটাকে এই স্বপ্ন ঢেকে দিল।

পাশ ফিরে আরো ভাল করে ঘুমে ডুবে যেতে চাইলেন রাখহরিবাবু। ওসব স্বপ্ন সত্য নয়। সত্য নয়। এগুলো ওকে ভুল দেখাচ্ছে, ভাঁওতা দিচ্ছে। উনি ঠকবার জন্য এত বছর পরে বাংলা দেশে আসেন নি। এমনি উনি মেহের আলীর মত সব ধরে ফেলবেন—ঝুট হ্যায়, ইয়ে সব ঝুট হ্যায়।

একটু আরাম লাগল। সব ঝুট যদি তিনি ধরে ফেলতেই পারেন তাহলে যা কিছু সাচ্চা তাও খুঁজে বের করতে পারবেন। সাগর-ছেঁচা ধন তার বাংলা। কবিরা অমৃতময় বাণী শুনিয়েছেন। রাখহরিবাবুরা দল বেঁধে কৈশোর স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে সুর করে গেয়ে বেড়িয়েছেন সে গান। সুর দিয়ে স্বীকার করেছেন, প্রাণ দিয়ে করেছেন প্রার্থনা। সেই সাচ্চার সন্ধানেই ত শেষ বয়সে



আমার বাটের বটের ছায়ায়

মরতে, না, না, অমর হয়ে যাবার জন্য ফিরে এসেছেন এখানে। আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি। ওঃ, কি কথাই বলেছেন, কি গানই গেয়েছেন বাঙ্গালী স্বপ্নদ্রষ্টা।

রাখহরিবাবুর স্বপ্নও মোহময় হয়ে উঠল। মেহের আলী পাগলা হতে পারে, কিন্তু বিশ্বকবির সৃষ্টি। রাখহরিবাবুর স্বপ্নে কিন্তু অন্য একজন মেহের আলীর ছবিও ফুটে উঠল। উনি আশ্চর্য্য হয়ে দুজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন।

একজন বলল—আমিই মেহের আলী। ক্ষুধিত পাষাণ আমার।

অন্যজন হেঁকে উঠল—না, আমিই মেহের আলী। বিশ্বভুক পরাণ আমার।

—আমি রসিক।

—আমিও কম রসিক নই। রূপোলী রসে আমি দুনিয়া মজিয়েছি।

—তা তুমি করে থাকতে পার। কিন্তু আমি রস দিয়ে শিল্প-সৃষ্টি করি।

—সৃষ্টি সোজা ; তা থেকে রস নিংড়ে কাজে লাগান শক্ত। আমি তোমাকে আমার হুকুম বরদার করে নিব। তুমি খাট, তাই খাটো।

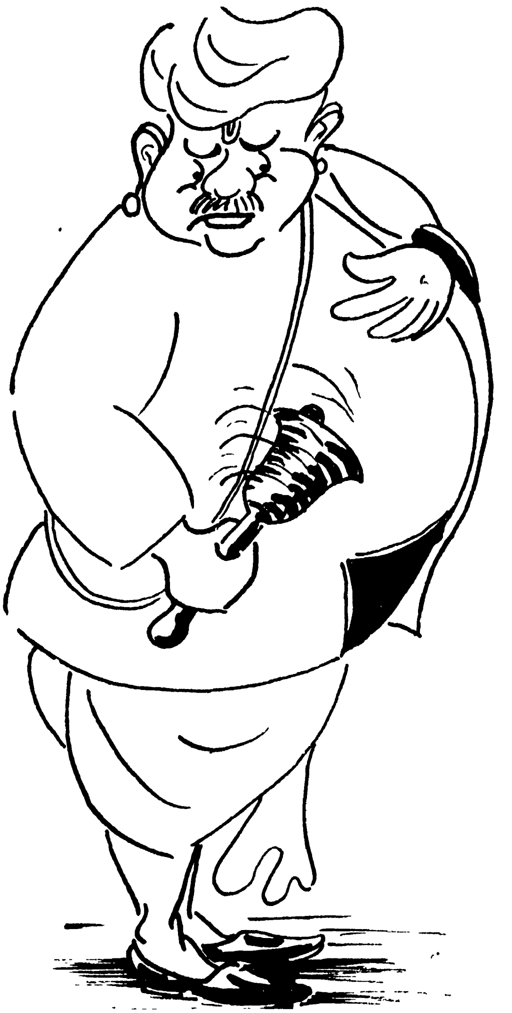
—না। আমি স্বাধীন, আমি স্রষ্টা। আমি সুন্দর। আমি স্বপ্ন দেখি।

হেঁকে উঠল নতুন মেহের আলী—তবে তুমি দুনিয়ায় ঠাঁই পাবে না। সুন্দরের সীমানা আমিই টেনে দিয়েছি। আমার খেয়ালে সে কায়া নেয়। রূপোর প্রয়োজনে নেয় রূপ। শুধু স্বপ্নের জন্য সংসার নয়।

শিল্পী রসিক মেহের আলী ম্লান মুখে মিলিয়ে যেতে লাগল। নতুন রসের কারবারী। আরো উগ্র হয়ে উঠল। আরো সর্বগ্রাসী। ঘণ্টা নেড়ে সে হাঁকতে লাগল—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।

দক্ষিণের জানলা থেকে বড় এলোমেলো হাওয়া বইতে লাগল। রাখহরিবাবুর বড় সাধের ধার করা ধুতি আর পাঞ্জাবী অসহায়ের মত পাথালি-পাথালি করতে লাগল। ঘুমের মধ্যেই তিনি যেন ওই পোষাক থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তার বদলে লম্বা ঝোলা আরবী জোব্বাও পরলেন না। এককালে ভাবতেন যে আরবী পোষাক একটু অদল বদল করে বাঙ্গালী পোষাকের মত করে পরবেন। আজ কিন্তু সে সাহস হল না। মিটে গেছে সে সাধ। তার চেয়ে বিশ্ব-মানব হয়ে বেঁচে থাকা সোজা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তিনি আবার সেই বছর চল্লিশ ধরে পরতে অভ্যস্ত স্যুট পরে নিলেন। ঘুমের মধ্যে দেখলেন যে তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। চশমার মধ্যে দিয়ে চোখ উদ্‌ভ্রান্ত। মন বলতে চাইছে আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু মুখ বলতে চাইছে না, না। যাকে আমি ভালবাসি সে তুমি আজকের তুমি নও।



তফাৎ যাও, তফাৎ যাও

কিন্তু সেই মুহূর্তেও কবিতা তাকে ছাড়ল না। রাখহরিবাবুর মনে পড়ল—প্রাণ চায়···। কিন্তু বাকী কথাগুলি আর মনে এল না। চক্ষু কি চায় ?

ঘুম ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে।

মধ্য-যুগের হিন্দী-সাহিত্যে শাক্ত প্রভাব

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিন্দী কবিগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হয়; সাধারণভাবে তাঁহার লিখিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' কাব্য চতুর্দশ শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হয়; যদিও এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই, কেহ কেহ 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে রক্তলোলুপা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা বা কালী বলিয়া বর্ণিত দেখি। একটি পদে দেখি দেবী চণ্ডিকা ইন্দ্রকে বলিতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই-সব যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি ক্ষুধিত আছি, আমাকে শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া দাও।

কহৈ চংডি সুরপতি সুনহি, রুধির অঘার্বহু মোহি।
রামাইন ভারথ ছুধি, রহী নিহারৈ তোহি॥

উত্তরে আবার দেখি, 'হে চণ্ডি, যদি কনৌজ এবং দিল্লী রাজ্যে লড়াই লাগিয়া যায়, তবে যোগিনীদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইবে, শিবের গলায় মুণ্ডমালা সুশোভিত হইবে, আর তোমার রক্ত-পাত্রও পূর্ণরূপে ভরিয়া যাইবে।

চংডী বরণ পুজ্জাই ত্রিপ, মংডি মুংড উরমাল।
জো কনবজ ঢিল্লিয় বয়র, ভরহিঁ পত্র রজবাল॥

অপর একটি পদে দেবীর স্তুতিতে বলা হইয়াছে—'যখন দেবতাদের অসুরগণের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তুমি দেবতাগণকে দিয়াছিলে অমৃত—আর অসুরগণকে করিয়াছিলে মোহিত; মহিমর্দিনী কালী তিন লোকে সমস্ত রণে জয়কারিণী, জালন্ধরকে ভস্মকারিণী, রামের মতনই দশস্কন্ধ রাবণের বধকারী; যখন যখনই দেবতাগণের উপরে বিপৎপাত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি উঁহাদিগকে অভয় দিয়াছ; হে বীরাধিবীর, দানবদহনী, আমাকে তোমার চরণের শরণে রাখ।'

মহন গহন জব সুরণি, জুদ্ধ অসুরাং সুর জব্বহ।
অমরণি অপ্পিয় অমিয়, মোহি অসুরণি তুমি তব্বহ॥
কালী সুর-মহিথাস, তিপুর জিত্তিয় হর জংগহ।
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংধর ভংযহ॥
জহঁকহঁ সুরংক দেবন পরিয় অভয় তুম দেবতব।
বীরধিবীর দানবদহন, চরন সরন হম রক্খি অব॥

মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের মধ্যে একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাসের সমগ্র সাহিত্য-রচনার একটি শাক্ত পটভূমিকা লক্ষ্য করিতে পারি। 'রাম-চরিতমানস'ই তুলসীদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভক্তরূপে তুলসীদাস সর্বজনবিদিত। কিন্তু তুলসীদাস-রচিত এই 'রাম-চরিত-মানসে'র বক্তা হইলেন স্বয়ং শঙ্কর এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উমা। ইঁহারা যে শুধু বক্তা ও শ্রোতাই ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চরিত-মানসে'র মধ্যেই এই জিনিসটি বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শঙ্কর-ভবানীই হইলেন শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় ভক্ত—মর্ত্যে তাঁহারাই রামভক্তির প্রচারক। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—এমন সুন্দর রাম-চরিত ইহা শিবই রচনা করিয়াছিলেন,—এবং রচনা করিয়া আবার কৃপা করিয়া উমাকে শুনাইয়াছিলেন।

সম্ভু কীন্হ যহ চরিত সোহাবা।
বহুরি কৃপা করি উমহিঁ সুনাবা॥ (বালকাণ্ড)

রাম-চরিত রচনা করিয়া মহেশ নিজের 'মানসে' ইহা রাখিয়া দিয়াছিলেন; সুসময় পাইয়া 'শিবাকে' বলিয়াছিলেন।

রচি মহেস নিজ মানস রাখা।
পাই সুসমউ সিবা সন ভাখা॥ (ঐ)

ভবানীরও রাম-চরিত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার অন্ত ছিল না, নানা-ভাবে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই উত্তর দিয়াছেন।—

কীন্হ প্রশ্ন জেহি ভাঁতি ভবানী।
তেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী॥ ইত্যাদি (ঐ)

অন্য দিকে আবার দেখিতে পাই, শিব-পার্বতীর পরম-ভক্ত হইলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। আসলে মনে হয়, তুলসীদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন করিয়া রাম-ভক্তি প্রচার করিয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তিনি একটি প্রবল শৈব-শাক্ত মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সেই শিব-পার্বতীর ভক্ত-সমাজে রামভক্তিকে সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসীদাস উমা-মহেশ্বরকেই রামভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উমা-মহেশ্বরকেই কেবল রামভক্ত করিয়া তুলিলে শৈব শাক্তগণের মনে একটা ক্ষোভ দেখা দিতে পারে, এইজন্য তিনি সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ্বরের ভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তুলসীদাসের ধর্ম-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। কাশীধাম তুলসীদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শিব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অপর প্রসিদ্ধ দেবীক্ষেত্র বিন্ধ্যাচলও কাশী হইতে

বেশী দূরবর্তী নয়, আশি মাইলের মত হইবে। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-মানসের বিভিন্ন স্তরে পার্বতী-মহেশ্বরের প্রভাব থাকিবারই কথা। সেই প্রভাবের পরিচয় তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানসে' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ।
বরনাউঁ রামচরিত চিতচাউ॥ (বালকাণ্ড)

'শিবাকে ও শিবকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাহিত চিত্তে আমি রামচরিত বর্ণনা করিতেছি।'

সপনেহু সাঁচেহু মোহি পর জৌ হর গৌরি পসাউ।
তৌ ফুর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভনিতি প্রভাউ॥ (ঐ)

'স্বপ্নেও যদি আমার উপরে হর গৌরী সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাষার কবিতার বিষয় আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা সত্য হউক।'

অন্যত্রও দেখি, তুলসী রাম-মহিমা গান করিয়াছেন 'সুমিরি উমা-বৃষকেতু'। তখনকার দিনে সাধু-সন্তগণের মধ্যে গিরি-নন্দিনীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাবিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা যায় তুলসীর এই উক্তি হইতে— 'রামনাম হইল সাধু ও বিবুধকুলের হিতের জন্য গিরি-নন্দিনীর ন্যায়'— 'সাধু বিবুধ কুল হিত গিরি নংদিনি'। অন্যত্র তুলসী বলিয়াছেন, 'কলি দেখিয়া জগহিতের জন্য হরগিরিজা শবর মন্ত্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' ১ এই শবরমন্ত্র হইল অর্থহীন ছন্দোহীন তুক্‌তাক্ মন্ত্র। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য করিয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-গিরিজাকে অবলম্বন করিয়া অনেক শবরমন্ত্রের প্রচলন ছিল।

'রাম-চরিত-মানসে' দেখা যায়, হর প্রথমাবধিই রামভক্ত হইলেও দেবীর মনে রাম বিষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি উপাখ্যানে দেখি, একদিন সীতাবিরহকাতর রামচন্দ্রকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর 'জয় সচ্চিদানন্দ জগপাবন' বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিতেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন সতী।—

সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখী।
উর উপজা সন্দেহ বিসেখী॥

শিবকে তখন নানাভাবে রামচরিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল। মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভক্তিকে যত সহজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, শাক্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সতীকে অবলম্বন করিয়া তুলসীদাস দক্ষযজ্ঞ ও সতী-দেহত্যাগের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পরে তিনি খানিকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহেশ্বরের পরিণয়-কাহিনী। এই কাহিনী মোটামুটিভাবে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনা অবলম্বনে রচিত। তুলসীদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুগামী যে, দেখিলেই বোঝা যায়, কালিদাসের কাব্যের সহিত তুলসীদাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তুলসীদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং শিবের সহিত তাঁহার পরিণয় লইয়া 'পার্বতী-মঙ্গল' নামে একখানি পৃথক্ কাব্যই রচনা করিয়াছিলেন। 'পার্বতী-মঙ্গলে' 'রাম-চরিত-মানস' হইতে কিছু বিস্তৃত বর্ণনা দেখি, বিষয়বস্তুরও সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় স্বাভাবিক-ভাবেই তুলসীদাস তাঁহার নিজের সমাজকে অনেকখানি আনিয়া ফেলিয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খানিকটা লৌকিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' আছে, 'একদা স্বেচ্ছাগতি নারদ পিতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন,—বিশুদ্ধ প্রেমপ্রযুক্ত এই কন্যা মহাদেবের অর্ধাঙ্গভাগিনী এক বধূ (সপত্নীশূন্যা ভার্যা) হইবে।' তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানসে' দেখিতে পাই, দেবর্ষি নারদ একদিন বেড়াইতে আসিলে হিমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাকিয়া দেবর্ষিকে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অনেক ভালর কথা বলিয়া নারদ উমার হস্তরেখা বিচার করিয়া কিছু মন্দের কথাও বলিলেন,—

অগুন অমান মাতু পিতু হীনা।
উদাসীন সব সংসয় ছীনা॥
জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলিহি পরী হস্ত অসি রেখ॥

'গুণহীন মানহীন মাতা-পিতাহীন, উদাসীন, সব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এমন—জটিল যোগী অকাম-মন, নগ্ন এবং অমঙ্গলবেশধারী—এইরূপ স্বামী ইহার মিলিবে, হাতের রেখা সেইভাবেই পড়িয়াছে।' এই 'অবগুন' খণ্ডাইবার জন্য নারদ তপস্যার কথা বলিলেন; মা মেনকাকে বুঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায় গেলেন। 'পার্বতী-মঙ্গলে'র বর্ণনাও অনুরূপ। সেখানে নারদ বলিলেন, 'মোরেঁহু মন অস আব মিলিহি বর বাউর'—'আমার মনে এই হইতেছে যে ইহার "পাগল" বর জুটিবে' এই কথা শুনিয়া মাতা-পিতাকে বুঝাইয়া উমা নিজেই তপস্যায় গেলেন।

হর-পার্বতীর বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া 'অন্নেয়ে' নারদকে একচোট গাল—সকল বাঙালী কবিই মেনকা এবং প্রতিবেশিনীগণের মারফতে পাড়িয়াছেন, এ ব্যাপারে তুলসীদাসও কসুর করেন নাই। বর দেখিয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে করিয়া 'শ্যাম সরোজে'র চক্ষু দুইটি জলে ভাসাইয়া করিয়া কন্যার কপালের দুঃখের কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদিলেন—এবং শেষ পর্যন্ত বলিলেন—

তুম্হ সহিত গিরি তে গিরউঁ পাবক জরউঁ জলনিধি মহঁ পরউঁ।
ঘর জাউ অপজসু হোউ জগ জীবত বিবাহ ন হৌঁ করউঁ॥

'তোমার সহিত গিরি হইতে পড়িব, আগুনে জ্বলিব, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; ঘর যাউক, অপযশ হউক, জীবন থাকিতে তোমার বিবাহ দিব না।'

ইহার পরই নারদকে গাল পাড়িবার পালা—

[illegible] কিনহ বসত উজারা॥

---

(১) কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা

অস উপদেসু উমহি জিন্‌হ দীন্‌হা। বৌরে বরহি লাগি তপু কীন্‌হা॥
সাঁচেহু উন্‌হকে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ কি জান প্রসব কী পীরা॥

'নারদের আমি করিয়াছি কি অনিষ্ট—যিনি আমার ভরাবাড়ি উজাড় করিলেন! যিনি উমাকে দিলেন এই উপদেশ—পাগলা বরের জন্য করিল তপস্যা। সত্য সত্যই উঁহার মায়াও নাই—মোহও নাই; উদাসীন—না আছে ধন, না ঘর-বাড়ী, না স্ত্রী। পরের ঘর করে নষ্ট, না আছে লজ্জা—না ভয়; বাঁঝা কি জানে প্রসবের বেদনা?'

'পার্বতী-মঙ্গলে' দেখি, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব 'বরাতী' (বরযাত্রী) দেখিয়া গ্রামের বাচ্চাগুলি ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল এবং ঘরে গিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—

প্রেত বৈতাল বরাতী ভূত ভয়ানক।
বরদ চঢ়া বর বাউর সবই সুবানক॥

'প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত—এই হইল বরযাত্রী; আর বলদের উপরে চড়িয়া 'বাউরা' বর—সবই সুন্দর!'

বিবাহ উপলক্ষে মেয়েদের দ্বারা কিছু গালাগালির ব্যবস্থা তুলসীদাস না করিয়া পারেন নাই। হিমালয়ের বাড়িতে পাক-শাস্ত্র অনুসারে বহুবিধ রান্না হইবার পরে বরযাত্রিগণকে খাইতে ডাকা হইল; বরযাত্রী দেবতারা খুব আস্বাদ করিয়া খাইতেছেন, আর এদিকে 'নারিবৃন্দ সুর জেঁবত জানী। লগী দেন গারী মৃদুবানী॥' এবং 'গারী মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি ব্যঙ্গ বচন সুনাবহীঁ। 'পার্বতী-মঙ্গলে' দেখি বরযাত্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সুর করিয়া গালি দিয়াছেনই, জুয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গালি দিয়াছেন,—জুআ খেলাবত গারি দেহিঁ গিরিনারিহিঁ। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর শিবকে গালি দিয়া লাভ কি? তাহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই!—'অপনী ওর নিহারি প্রমোদ পুরারিহি।'

বিবাহের পরে মায়ের নিকট হইতে পার্বতীর বিদায় গ্রহণ করিবার দৃশ্য তুলসীদাসও বেশ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার মাকে জড়াইয়া ধরিতেছিল—বার বার পড়িতেছিল মায়ের চরণে। স্নেহ-প্রেমের সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার নয়। সব নারীরা আসিয়া দেখা করিলেন উমার সঙ্গে—উমা আবার গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরণা। পরম প্রেম কছু জাই ন বরনা॥
সব নারিন্‌হ মিলি ভেঁটি ভবানী। জাই জননি উর পুনি লপটানী॥

তাহার পরে চলিতেই হয়—আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া চলে উমা, সবাই দেয় আশীর্বাদ; চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকাইতে থাকে উমা;—সখীরা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে।

জননী বহুরি মিলি চলী উচিত অসীস সব কাহু দঈ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতুতন তব সখী লেই সিব পহঁ গঈ॥

আমরা পূর্বে মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আসিয়াছি যে সীতা দেবী-আরাধনা করিয়াই রামচন্দ্রের ন্যায় বর পাইয়াছিলেন, তুলসীদাসেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই মিথিলায় গিয়া প্রভাতে উঠিয়া গুরুর আদেশে ফুল তুলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে নানাপ্রকার গাছ ও বিবিধ বর্ণের লতাবিতান শোভা পাইতেছিল। গাছে গাছে যেমন নূতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল, তোতা, চকোরের কাকলী ও ময়ূরের নৃত্যে উদ্যান মুখরিত। বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ সরোবর, মণিদ্বারা নির্মিত বিচিত্র সোপান। নির্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর জল-পাখীদের খেলা। দুই ভাইয়ের মন মুগ্ধ, মালীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা কিছু ফুল তুলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আসিলেন সীতা, গৌরী পুজিবার জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।—

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী। গাবহীঁ গীত মনোহর বানী॥
সর সমীপ গিরিজাগৃহ সোহা। বরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥
মজ্জন করি সর সখিন্‌হ সমেতা। গঈ মুদিতমন গৌরি নিকেতা।
পূজা কীন্‌হি অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সুভগ বর মাঁগা॥

'সঙ্গে ছিল সুন্দরী চতুরা সখীগণ, তাহারা মনোহর পদের গান গাহিতেছে। সরোবরের সমীপেই ছিল গৌরী-গৃহ; তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। সখীগণসহ সরোবরে স্নান করিয়া সীতা মুদিতমনে গৌরী-ভবনে গেলেন; অধিক অনুরাগের সহিত করিলেন পূজা, নিজের অনুরূপ সুন্দর বর প্রার্থনা করিলেন।' এই গৌরী পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া উঠিয়া সীতা উদ্যানে দেখিতে পাইলেন রাম-লক্ষ্মণ—তাঁহার দেহ হইল রোমাঞ্চিত—চোখ অশ্রুসিক্ত।

ব্রজ-অঞ্চলে যে-সব লৌকিক দেবীর গীত পাওয়া যায় তাহাতেও সীতার গৌরী দেবীর কাছে বর-প্রার্থনার প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি, মেয়েরা 'করবা-চৌথি'র ব্রত করিতেছেন। 'করবা-চৌথি' হইল কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্থী, এই তিথিতে মেয়েরা গৌরী-ব্রত করেন। এখানে দেখি, মেয়েরা দধির অর্ঘ্য দিয়া গৌরী-ব্রত করিতেছেন, আর বর প্রার্থনা করিতেছেন অযোধ্যার ন্যায় রাজ্য, রাজা দশরথের ন্যায় শ্বশুর, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় স্বামী, লক্ষ্মণের ন্যায় ছোট দেবর, ভরতের ন্যায় বড় দেবর—আর ছোট বোনটির মত একটি ননদ!

মৈঁ তৌ বরতু রহী উ করবা-চোথি, দহীন কে অরঘ দীএ॥
মৈঁ নেঁ মাঁগো ঐ অজুধ্যা কৌ রাজু; সুসর রাজা জসরথ-সে।
মৈঁ নেঁ মাঁগী কৌসল্যা-সী সাসু, সুসর রাজা জসরথ-সে॥
মৈঁ নেঁ বর মাঁগে ঐঁ সিরি রাঁম, দিবর ছোটে লছিমঁন-সে।
মেরে চরত ভরত দেবর জেঠ, ননঁদ ছোটী ভগিনী সী॥ ২

তুলসীদাস যে তাঁহার সমাজ-জীবন হইতে একটি শাক্ত ঐতিহ্যও লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 'বিনয়-পত্রিকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দেখিতে পাই। প্রথমটি হইল—

২। ব্রজ কা লোক-সাহিত্য, ডক্টর সত্যেন্দ্র সম্পাদিত।

দুসহ-দোষ-দুখ-দলনি কুরু দেবি ! দায়া ।
বিশ্বমূলাসি, জন-সানুকুলাসি, শর-শূল-ধারিণী, মহামূল মায়া ॥
তড়িতগর্ভাংগ সর্বাংগ সুন্দর লসত, দিব্য পট, ভব্য ভূষণ বিরাজৈ ।
বালমৃগমংজু-খংজন-বিলোচনি, চংদ্রবদনি, লখি কোটি রতিমার লাজৈ ॥
ইত্যাদি ।

স্তবের শেষে কিন্তু প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'দেহি মা ! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেম নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাপিয়া ॥' ঘনশ্যাম রাম, তুলসী পাপিয়া, প্রেমলাভের জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ভাগবত-পুরাণে দেখি, ব্রজের গোপ-বালিকাগণ কৃষ্ণলাভের পূর্বে কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন। শক্তির উপাসনা করিয়াই যে পুরুষোত্তমে প্রেমলাভ করিতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। দুর্গার কোলে কৃষ্ণের যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পরিকল্পনা এইখান হইতেই আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মা শক্তিরূপিণী—শক্তির বুক হইতেই ত পুরুষোত্তমের উদ্ভাস।

'বিনয়-পত্রিকা'র দ্বিতীয় দেবীস্তুতিটি হইল এইরূপ—

জয় জয় জগজননি, দেবি, সুর-নর-মুনি-অসুরসেবি,
ভক্তি-মুক্তি-দায়িনি, ভয়হরণি, কালিকা ।
মংগল-মুদ-সিদ্ধিসদনি, পর্বশর্বরীশ-বদনি,
তাপ-তিমির-তরুণতরণি-কিরণমালিকা ॥ ইত্যাদি ।

এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই—

তুলসী তব তীর তীর সুমিরত রঘুবংশ বীর,
বিচরত মতি দেহি মোহ-মহিষ-কালিকা ॥

তুলসীদাস-রচিত 'কবিতাবলী'র মধ্যেও আমরা চারিটি দেবী-বিষয়ক কবিতা দেখিতে পাই। একটি কবিতায় দেখি, মা ভবানী অন্নপূর্ণার নিকটে করুণ আর্তিপ্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই—লালসায় লালসায় ফিরিতে হয় দ্বারে দ্বারে দীনদুঃখীর মত—মলিন বদন—মন মেটে না—কেবল খেদ ! শক্তি-সামর্থ্য-উৎসাহ শুধু শ্রাদ্ধে-বিবাহে—মন সতত চঞ্চল—বুঝিতে পারা যায় শুধু ঢোল-তূরীর শব্দ ! পিয়াস আছে—বারি নাই, ক্ষুধা আছে—খাইবার 'চানা' নাই—এখন শরণ শুধু ভবানী অন্নপূর্ণা।[৩]

৩। লালচী ললাত, বিললাত দ্বার দ্বার দীন, বদন মলিন, মন
মিটৈ ন বিসূরনা ।
তাকত সরাধ কৈ বিবাহ কৈ উছাহ কছু, ডোলৈ লোল বুঝত
সবদ ঢোল তুরনা ॥
প্যাসে হু ন পাবৈ বারি, ভূখে ন চনক চারি, চাহত অহারন
পহার দারি কুরনা ।
সোক কো অগার দুখ-ভার-ভরো তৌলোঁ জন জৌলোঁ দেবী
দ্রবৈ ন ভবানী অন্নপূর্ণা ॥
—উত্তরকাণ্ড, ১৪৮ সং ।

উত্তরকাণ্ডের ১৬৮ সংখ্যক কবিতাটির লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী—'মেরে মায় বাপ গুরু সংকর ভবানিঐ'। ১৭৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হইয়াছে—

রচত বিরংচি, হরি পালত, হরত হর,
তেরেহী প্রসাদ জগ অগজগপালিকে ।
তোহি মেঁ বিকাস বিশ্ব, তোহি মেঁ বিলাস সব,
তোহি মেঁ সমাত মাতু ভূমিধরবালিকে ॥
দীজৈ অবলংব জগদংব ন বিলংব কীজৈ;
করুণা-তরংগিনী কৃপা-তরংগ মালিকে ।
রোষ মহামারী পরিতোষ, মহতারী ! দুনী ;
দেখিয়ে দুখারী মুনি-মানস-মরালিকে ॥

'সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা, হরি পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন—সবই তোমারই প্রসাদ, ওগো চরাচরপালিকে ! তোমার মধ্যেই বিশ্বের বিকাশ, সকলের বিলাস তোমারই মধ্যে—আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে, হে মা পার্বতী ! অবলম্বন দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব করিও না,—হে করুণা-তরঙ্গিণী—কৃপা-তরঙ্গ-মালিকে, রোষ-মহামারী ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রতি পরিতুষ্ট হও,—দেখ দুঃখার্ত—হে মুনি-মানস-মরালী !'

অপর একটি কবিতায় তুলসী বলিতেছেন,—'মহামারী মহেশানি মহিমা কী খনি, মোদ মংগলকী রাসি, দাস কাসী-বাসী তেরে হৈঁ ॥' 'হে সংহাররূপিণী মহেশানি, মহিমার খনি, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসী) তোমারই দাস।' (১৭৪ সংখ্যক)।

নির্গুণপন্থী হিন্দী কবিগণের দোঁহা ও গীতে শাক্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছু থাকিবার কথা নহে। কবীরের দোহাবলী, পদাবলী ও রমৈনীগুলিতে কবীরের ধর্মমতের সকল উদারতা সত্ত্বেও শাক্তধর্ম-সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা দেখা যায়। বোধ হয় শাক্ত সাধন-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান কবীরের ভাল লাগিত না বলিয়া তিনি বহুস্থানে স্পষ্টভাবে সাধকের পক্ষে শাক্তসঙ্গ নিষেধ করিয়াছেন। দুর্গা প্রভৃতি শক্তিদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন অতি সাধারণ দেবী বলিয়া মনে করিতেন। তাই কবীরকে একাধিক স্থানে বলিতে দেখি, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোটি দুর্গা পদসেবা করেন—'দুর্গা কোটি জাকৈ মর্দন করৈ'। কবীর অন্যত্র বলিয়াছেন—'কোটি সকতি সিব সহজ প্রগাসো একৈ এক সমানা'[৪]। সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রহ্মে কোটি শক্তি এবং শিবের প্রকাশ—আমার একের মধ্যেই সব সমাহিত।

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবীরের উপরেও শাক্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নহে। কবীরের নামে একটি বাণী প্রচলিত আছে,—'নির্গুণ হৈ পিতা হমারা সগুণ মহতারী'[৫]—নির্গুণ হইলেন আমার পিতা,

৪। কবীর গ্রন্থাবলী, শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত (নাগরী-প্রচারিণী-সভা), পরিশিষ্ট, ১৬২।

৫। এই উক্তিটি কবীরের নামে বহু স্থানে উদ্ধৃত দেখি ; কিন্তু কোন কবীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা এই পদটি খুঁজিয়া পাই নাই।





ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আলোকের পথে

ফটো : মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

সগুণ হইলেন আমার মা। এই কথাটিই কিন্তু আসলে শক্তিবাদের মূল কথা। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব শক্তিকে অচলের 'চল' বা অটলের 'টল' বলিয়াছেন। অচল অটলই হইল নিগুর্ণ, 'চল' বা 'টল'ই হইল সগুণ অবস্থা। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলা হইয়াছে, 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তঞ্চামূর্ত ঞ্চ'; এই অমূর্তই নিগুর্ণ অবস্থা—মূর্তই সগুণ। সগুণরূপেই ত মায়ের মূর্তি। সগুণ রূপ হইতেই ত আমরা জাত—সগুণেই প্রতিপালিত—বিধৃত, তাই সগুণই মাতা। কবীরের এই বাণীটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ।

কবীর তাঁহার দোঁহা ও পদাবলীতে বহু স্থলে এক মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগৎপ্রপঞ্চে মোহ ও আসক্তি-উৎপাদক একটা ভ্রান্তিমাত্র। সাধারণভাবে কবীর এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাপিনী আদিশক্তিরূপত্ব স্বীকার করেন নাই। মায়ার বিশ্বব্যাপিত্ব যেখানে বর্ণিত সেখানেও তাহার বিশ্বব্যাপিনী শক্তিরূপত্বের আভাষ স্পষ্ট নহে। যেমন—

মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহী লোগ।
মায়া জল থলি মায়া আকাসি, মায়া ব্যাপি রহী চহুঁ পাসি।
মায়া মাতা মায়া পিতা, অতি মায়া অস্তরী সুতা।
মায়া মারি করৈ ব্যৌহার। কহৈ কবীর মেরে রাঁম অধার।৬

অথবা—

মায়া মহাঠগিনী হম্ জানি।
তিরগুন পাশ লিয়ে কর ডোলে বোলত মাধুরী বানী॥ ইত্যাদি।

কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার সাধারণ মোহময়ী ভ্রান্তিরূপিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবর্ণিত প্রকৃতি রূপ বা শক্তিশাস্ত্রবর্ণিত শক্তিরূপের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর রচিত বহুসংখ্যক হেঁয়ালী বা সন্ধাভাষা রচিত গূঢ়ার্থক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদগুলি 'উল্টাবাসী' নামে প্রসিদ্ধ। এই পদগুলির সাধারণতঃ বক্তব্য হইল এই যে দুনিয়ায় সর্বত্রই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সর্বত্রই দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। জীব তাঁহার 'সহজ' স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া পদে পদে কুহকিনী মায়ার অধীন হইতেছে এবং বন্ধনক্লেশ ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ—হয় মায়ার হস্তে পুত্তলিকা-প্রায়। এই মায়াকে কবীর বহু স্থানেই একটি মোহিনী চঞ্চলা নারীর রূপ দিয়াছেন—যে অসাবধান উদাসীন পুরুষকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বন্ধনগ্রস্ত করিতেছে। একটি পদে কবীর বলিয়াছেন—

কৈসে নগরি করৌ কুটবারী, চংচল পুরিষ বিচষন নারী।

জীবকে এই 'চঞ্চল পুরুষ' এবং মায়াকে 'বিচক্ষণ নারী' বলিবার মধ্যে পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈনী'তে বলিয়াছেন—

কহন সুনন কৌ জিহি জগ কীন্হা, জগ ভুলাঁন সো কিনহুঁ ন চীন্হাঁ।
সত রজ তম থৈঁ কীন্হীঁ মায়া, আপণ মাঁঝৈ আপ ছিপায়া॥৭

'কহিবার শুনিবার জগৎ (অর্থাৎ ব্যবহারিক জগৎ) যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে কেহ চিনিল না। সত্ত্ব রজ তম দ্বারা করিলেন মায়া—আপনার মাঝে আপনাকে লুকাইলেন।' এখানে তাহা হইলে দেখিতেছি পরব্রহ্ম রাম নিজেই সত্ত্ব রজ তম দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ভুলাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন—তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জীব মায়াকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারে না। আবার দেখি,—

সুক বিরখ যহু জগত উপায়া, সমঝি ন পরৈ বিষম তেরী মায়া॥
সাখা তীনি পত্র যুগ চারী, ফল দোই পাপ পুঁনি অধিকারী॥
... ...
কহন সুনন কৌ কীন্হ জগ, আপৈ আপ ভুলাঁন॥
জিনি নটবৈ নটসারী সাজী, জো খেলৈ সো দীসৈ বাজী॥

"শুক্ল বৃক্ষ রূপ এই জগৎ উৎপন্ন করিলে—বুঝিতে পারে না কেহ বিষম তোমার মায়া। (এই মায়া-বৃক্ষের) তিনটি শাখা—চারি যুগ পত্র; পাপ-পুণ্যের অধিকার হইল ফল।...কহিবার শুনিবার (ব্যবহারিক) এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন—আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান; জিনি নাটক করিতেছেন তিনিই সাজিলেন নাট্যশালা; যিনি খেলিতেছেন তিনিই বাজি দেখিতেছেন।" ত্রিগুণাত্মিকা এই মায়া—তাহাই হইল তিন শাখা—চারি যুগ ব্যাপ্ত হইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার জগৎ-প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ। এখানেও দেখিতেছি মায়া যে মূলতঃ ব্রহ্মের আত্ম-শক্তি এইরূপই একটা আভাস। আবার দেখি—

এক বিনাঁনীঁ রচ্যা বিনাঁন, সব অয়াঁন জো আপৈ জাঁন।
সত রজ তম থৈঁ কীন্হী মায়া, চারিখাঁনি বিস্তার উপায়া॥

'এক "বুনুনী" এক "বোনা" রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সব জানে তাহারা অজ্ঞান। সত্ত্ব রজ তম হইতে মায়া রচিয়াছেন, চারি যুগে বিস্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই যেন এক চতুর 'বুনুনী'র বোনা জাল; সত্ত্ব রজ তম দ্বারা মায়া সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মায়াই চারি যুগে এই 'বুনানি'কেও বিস্তার করিয়া দিতেছে। কবীরের এই-জাতীয় পদগুলি আলোচনা করিলেই মনে হয়, পুরাণের যুগে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া ও তন্ত্রের শিব-শক্তির ভিতরে যে একটা জনপ্রিয় সমন্বয় দেখা দিয়াছিল সেই সমন্বয়জাত শক্তিতত্ত্ব একটা সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপে কবীরের নিকটেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; তাই মাঝে মাঝে 'মায়া'র বর্ণনায় তাঁহার কবি-মানসের পট-ভূমিতে দেখা দিয়াছে মায়ার একটা আদিশক্তি-রূপিণীত্ব। একটি পদে কবীর স্পষ্টই বলিয়াছেন—

দুতিয়া দুহ কবি জানৈ অংগ।
মায়া ব্রহ্ম রমৈ সব সংগ॥৮

৬। পদাবলী, ৮৪; শ্যামসুন্দর দাস সম্পাদিত (নাগরী-প্রচারিণী সভা)। ২ ঐ, ৮০

৭। ঐ।
৮। কবীর গ্রন্থাবলী (নাগরী-প্রচারিণী-সভা), পৃঃ ৩০৩।

কবীর এবং মধ্যযুগীয় সগুণপন্থী নির্গুণপন্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের উপরেই তন্ত্রোক্ত নাদ-বিন্দু-তত্ত্বের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। যোগ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কবিতা-গানেই দেখিতে পাই। সকল ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া চিত্তে সমাহিত হইলে এবং শ্বাস-প্রবাহের সহিত চিত্ত-প্রবাহও নিরুদ্ধ হইলে ভিতরে স্ফুরণ হয় এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন করিয়াই পৌঁছাইতে হয় ধ্রুব বিন্দুতে। গুরু নানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণের পদেও আমরা বহুভাবে এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তন্ত্রমতে এই নাদই শক্তি, বিন্দুই শিব। এই নাদ-তত্ত্বই কবীর প্রভৃতির শব্দ-তত্ত্ব।

পূর্বেই বলিয়াছি, শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। কিন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি প্রকৃত মাতৃসাধকগণের মত ও সাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকৃত সাধকগণের ক্ষেত্রে শাক্ত কোনও সম্প্রদায় নহে, শাক্ত একটা ভাবমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিরাকার নির্গুণের ঘর বড় উঁচু ঘর, সেখানে মন বেশীক্ষণ রাখা যায় না; তাই তাঁহার সন্তানভাব। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, এই সন্তানভাব কবীরের মধ্যেও এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে। যেমন কবীরের সন্তানভাবের ভারী সুন্দর একটি পদ,—

হরি জননী মৈ বালিক তেরা,
কাহে ন ঔগুণ বকসহু মেরা॥

সুত অপরাধ করৈ দিন কেতে, জননীকে চিত রহৈঁ ন ততে॥
কর গহি কেস করৈ জৌ ঘাতা, তউ ন হেত উতারৈ মাতা॥
কহৈ কবীর এক বুদ্ধি বিচারি, বালক দুখী দুখী মহতারী॥৯

"হরি জননী, আমি তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান দিনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সেদিকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) কেশ হাতে আকর্ষণ করিয়া কত আঘাত করে, তথাপি মাতা স্নেহ ত্যাগ করে না। কহে কবীর এক বুদ্ধি বিচারিয়া, বালক দুঃখী হইলেই মাতাও দুঃখী।"

কবীরের মধ্যে 'মায়া'-সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাই দাদূর ভিতরে মায়া-সম্বন্ধে অনুরূপ অনেক আলোচনা দেখি। বরঞ্চ মায়াই যে শক্তি এই কথাটা দাদূর দুই-একটি পদে কবীর হইতে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে দাদূর একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—

মায়া আগৈঁ জীব সব ঠাঢ় রহে কর জোড়ি।
জিন সিরজে জল বুদংসৌঁ তাসৌঁ বইঠে তোড়ি॥
সুর নর মুনিয়র বসি কিয়ে ব্রহ্মা বিশ্ন মহেস।
সকল লোককে সির খড়ী সাধুকে পগ দেস॥
মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার।
ঠকুরাণী সব জগত কী তীনউঁ লোক মঁঝার॥
মায়া দাসী সংত কী সাকত কী সিরতাজ।
সাকত সেতী ভাঁডনী সংতো সেতী লাজ॥
সকল ভুবন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলাবণহার।
দাদূ সো সুঝৈ নহী জিস কা বার ন পার॥
মায়া মৈলী গুণ মঈ ধরি ধরি উজ্জ্বল নাবঁ।
দাদূ মোহৈ সবহি কো সুর নর সবহীঁ ঠাবঁ॥১০

'মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যিনি সৃজিলেন (সমস্ত বিশ্ব) জলবিন্দু হইতে তাঁহার সঙ্গে বসিল (সব সম্বন্ধ) ছিন্ন করিয়া। সে বশ করিয়াছে সুর নর মুনিগণকে, বশ করিয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকে; সকল লোকের শিরে আছে দাঁড়াইয়া—শুধু সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী—তাঁহার দরবারে দাসী; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণী। মায়া দাসী সন্তের—শাক্তের মাথার মুকুট; শাক্তের কাছেই তাহার ভাঁড়িভুঁড়ি, সন্তের কাছে লজ্জা। সকল ভুবন ভাঙ্গে গড়ে—চালায় কত চাতুরী; দাদূ, তাহা বোঝাই যায় না—যাহার নাই সীমা-পরিসীমা। মায়া মলিন—সে গুণময়ী—কিন্তু উজ্জ্বল নাম ধরিয়া ধরিয়া—হে দাদূ, মোহিত করে সকলকেই—সুর নর সকল স্থানে।'

এই পদটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে, দাদূর ধারণা ছিল, শাক্তগণ আসল সৃষ্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই—মায়াকেই শক্তিরূপে সারসত্য জানিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পরবর্তী কালের সন্ত কবি দরিয়া সাহেবের অনেক পদের মধ্যেও আমরা মায়ার সমজাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।১১ দাদূর কবিতায় আরও একটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দেখি—

অজ্ঞা অপরংপার কী বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফুলৈ ফলৈ পিরথি অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদূ জয়জয়কার॥

'অম্বরে বসিয়া আছেন ভর্তা, আর অসীম অপারকে না জানিয়াও সবুজ পট্টাম্বর পরিধান করিয়া ধরিত্রী করিতেছে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। বসুধা সব ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিতেছে,—পৃথিবী অনন্ত অপার; গগন গরজিয়া জলস্থল ভরিতেছে—হে দাদূ, জয়জয়কার।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদূর মনে একটি ঐতিহ্যের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করি। এখানে অসীম অনন্ত অজ্ঞাত ভর্তার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্ত্রের একটি জনপ্রিয় মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পরবর্তী কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একটি ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে ত্রিগুণাত্মিকা

৯। পদাবলী, ১১১ সং, (নাগরী-প্রচারিণী)।

১০। দাদূ, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত।

১১। 'জ্ঞান-মূল' ও 'জ্ঞান-রত্ন' দ্রষ্টব্য; ডাঃ ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী লিখিত 'সংত-কবি দরিয়া' দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্ত্রমতেও শক্তি হইলেন শিবের সমস্ত কামনা-পূরণের জন্য কামেশ্বরী। এইসকল চিন্তাধারাই মিলিয়া মিশিয়া চমৎকার কবিত্বময় রূপগ্রহণ করিয়াছে এই সব পদে।

নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদূর অনেক পদ রহিয়াছে। কম্পনাত্মক নাদই সৃষ্ট্যাত্মক আদিস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্ত্রের শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। নাদ বা শব্দের এই সৃষ্ট্যাত্মক আদিস্পন্দন রূপ দাদূর অনেক কবিতায় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। দাদূর শব্দ-সম্বন্ধে একটি পদে আছে—

জ্ঞান লহরী জহঁ তৈঁ উঠৈ বাণী কা পরকাস।
অনভব জহঁ তৈঁ উপজৈ সবদ কিয়া নিবাস॥
জহঁ তন মন কা মূল হৈ উপজৈ ওঁকার।
তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার॥১২

'যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণীর প্রকাশ; যেখান হইতে অনুভব উৎপন্ন হয়—সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তনু মনের মূল—সেখান হইতে জাগে ওঁকার; সেইখানেই দাদূ নিধি পাইবে—নিরন্তর নিরাধার।

জ্ঞানে চিদ্‌বৃত্তির সক্রিয়তা—সেখানে বাণী (শব্দের মধ্যমা-বৈখরী রূপ)। যেখানে জ্ঞান নাই—শুধু অনুভূতি—সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদি নাদ বা শব্দই হইল ওঁকার। দাদূ অন্যত্র বলিয়াছেন—

সবদৈঁ বন্ধা সব রহৈ সবদৈঁ হী সব জাই।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ সবদৈঁ সবৈ সমাই॥১৩

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ন্যায় মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যেরও একটি প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে বৈষ্ণব-কবিতা। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার ন্যায় হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতাও কৃষ্ণলীলা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙলা-দেশে এই কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে যেরূপ রাধার প্রাধান্য, হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রূপ নয়। তবে বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় যেরূপ, ঠিক সেরূপ না হইলেও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই রাধাবাদ যে ভারতীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে আমি এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি, আমার শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ গ্রন্থে এ-বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঐ গ্রন্থেই আমি হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও প্রেমশক্তিরূপিণী রাধাকে কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোসাঁই হিত-হরিবংশজী সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভী মতবাদ প্রচার করেন; হিন্দীতে এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া বহু বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে। গোসাঁই হিতহরিবংশজী যুগল-লীলার সাধক ছিলেন; কিন্তু এই যুগল-লীলার প্রধান আশ্রয় ছিল শ্রীরাধা; কৃষ্ণের পরিচয় এই রাধার বল্লভরূপেই, এইজন্যই এই মতটির নাম রাধাবল্লভী মত। হিতহরিবংশজী বলিয়াছেন—

শ্রীহিতজূ কী রতি কোউ লাখনি মেঁ এক জানে।
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে॥

রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণ-ধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে তত্ত্বের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙলা-দেশের 'কিশোরীভাজনে'র। এই কিশোরীভাজন-তত্ত্বও রাধাবল্লভী-তত্ত্ব মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একটি বিশেষ শক্তিবাদেরই বিশেষ পরিণতি 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমি এ-বিষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছি। বিষয়গুলি গ্রন্থান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না।

হিন্দী রীতিকালের প্রসিদ্ধ কবিভূষণের রচিত হিন্দী আলঙ্কারিক গ্রন্থ 'শিবরাজভূষণে'র মঙ্গলাচরণ ভবানী-স্তুতি দ্বারাই কবি করিয়াছেন।

জৈ জয়ংতি জৈ আদি সকতি জৈ কালি কপর্দিনি।
জৈ মধুকৈটভ-ছলনি দেবি জৈ মহিষ-বিমর্দিনি॥ ইত্যাদি।

রীতিকালের আরও অনেক কবি এইরূপে তাঁহাদের কাব্যে শক্তির স্তুতি বা উল্লেখ করিয়াছেন।

১২। দাদূ, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত।
১৩। ঐ প্রশ্নোত্তরী।





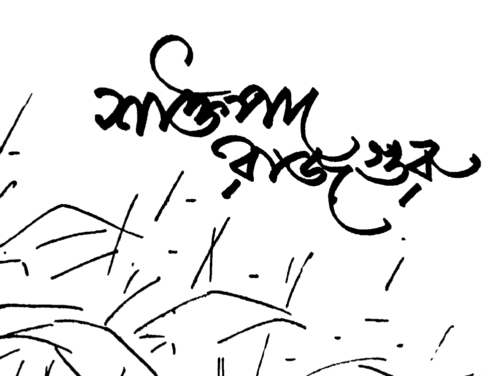
দেহমন



ফাটা বাঁশের আগলা কে যেন করোগেট টিনের উপর দিয়ে সজোরে টেনে নিয়ে চলেছে এমনি কর্কশ শব্দটা পাড়া ভরিয়ে তোলে। শব্দটা কোত্থেকে বের হচ্ছে তা ওরা জানে, জেনেই সতর্ক হয়ে ওঠে। কেউ বা নুইয়ে পড়া ঝুপড়ির পাশ দিয়ে সরে যায়, কেউ গিয়ে ছাউনির খড়বিহীন ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

কোন মেয়ে একটু সাহসে ভর করে চেয়ে দেখে বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে। বৌটা বোধহয় নোতুন এসেছে এ পাড়ায়, কৌতুহলী ডাগর দুটো চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

শক্তিপদ রাজগুরু



আটহাতি রঙীণ শাড়ীতে সদ্যজাগর পুরুষ্টু যৌবনকে ধরা যায়নি, চারিদিকে শাড়ীর ব্যর্থ আবেষ্টনী ভেদ করে তার উদগ্র প্রকাশ।

ভিড় জমে গেছে তাঁতিপাড়ায়, জায়গাটা তাঁতিপাড়া শেষ হয়ে ডোমপাড়ার এলাকা সুরু হয়েছে—ঠিক সেই বরাবর ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে।

কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে—শালা, মাগনা দিইছি নাকি টাকা?

ক্ষীণকণ্ঠে একটা জবাব দেবার চেষ্টা প্রকাশ পায়, টাকা দোব বই কি সাহাজী।

—দোব বই কি? আভি লে আও।

পাতিবৌ এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে, নোতুন সবে মাস-খানেক এসেছে এ গাঁয়ে; রতন মানুষটাকে ভালোই লেগেছে। পাড়ার মধ্যে এমন যোয়ান হাসিখুশী মরদ দেখেনি। এরই মধ্যে এসে টের পেয়েছে পাতিবৌ সৌরভী, আশমানী আরও এপাড়ার অনেকেরই নজর ছিল ওর উপর। সৌরভী সেদিনই বলেছিল—তুকে হিংসে হয় পাতিবৌ, তুই তো আমার সতীন লো।

পাতির বুক ধড়াস করে ওঠে—কেনে?

কে জানে বেবশ মরদের মন আর হাওয়ার পথ, ঠিক-ঠিকানা নেই। হাসে সৌরভী—এমনিই মন চায় বল্লাম। ডরাচ্ছিস কেনে তু।

আশমানী হাসে—কে জানে ভাই, উর লাগরটিকে যদি ডবাস করে রসগোল্লার মত উবু উবু গিলে ফেলাই!

...রতনের সঙ্গে ঘর বেঁধে পাতিবৌ খুশী হয়েছে, সেই খুশীর লহর ওর সারা দেহমনে, গানের সুরে—চলায় বলায়। আজ হঠাৎ সেই দুর্বার মরদটিকে কেমন যেন অসহায় দেখে নিজের মনেই একটা দুঃসহ বেদনা অনুভব করে।

ভিড়ের একপাশে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পাতিবৌ।

কুৎসিত কদর্য লোকটা—তার চেয়ে কর্কশ তার গলা। চোখদুটোর উপর দুটো মাংসের জড় কোঁচকানো পুটুলি নেমে এসেছে, নীচের পাতার দিক থেকেও ঠেলে উঠেছে এক ড্যালা মাংস। দুইদিকের মাঝখানে কুত কুত করছে একজোড়া কয়রা রংএর কবুতরের চোখের মত চোখ; মাংসের আস্তরণ ভেদ করে যেন তীব্র একটা জ্বালা ফুটে বের হয় ওর থেকে। গালের চামড়ার রং তামাটে কর্কশ, হাতগুলো ফাটা ফাটা—চামড়ায় অসংখ্য খাঁজ; ঘৃণিত কুৎসিত একটা জীব পচা পাঁকমাখা শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করছে।

—এখুনিই আন টাকা।

রতন বে-কায়দায় পড়ে গেছে। বিয়ে করবার সময় কিছু টাকা গৌরসাহের কাছে কর্জ নিয়েছিল একমাসের কড়ারে। কিন্তু দিয়ে উঠতে পারেনি।

এতদিন লুকিয়ে বেড়িয়েছে, আজ দুপুরের রোদে খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় গা গড়ান দিতে এসেই বিপদে পড়েছে। কাচুমাচু করে—দোব সাহাজী।

সাহাজী গর্জে ওঠে—দোব! টাকা না দিতে পারিস গরুটাই নিয়ে যাবো আজ। পঞ্চাশ টাকা আর টাকৃতি দুআনা সুদ পঞ্চাশ দুগুণে একশো আনা, ছয়টাকা চার আনা, দুমাসে সাড়ে বারো টাকা; এ্যাই মদনা ধর গরুর দড়ি, টাকা দিবি গরু পাবি। পাশেই ঘাস খাচ্ছিল গরুটা, সঙ্গের তাজা বাছুরটা এদিক-ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ মাকে বাঁধতে দেখে সেও এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, গরুটা নিশ্চিন্ত মনে গা চাটছে বাচ্চাটার; সে জানে না—তাকে নিয়েই এত কাণ্ড বেধেছে। গলার দড়িতে টান পড়তে একবার ডাগর কালো চোখ দুটো তুলে কৌতূহলী চোখে চাইল।

পাতিবৌ এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল ব্যাপারটা; হঠাৎ দেখে তারই বাপের বাড়ী থেকে আনা সখের গরুটা ওই কুৎসিত সাহাজী ধরে টানাটানি করছে; সে আর চুপ করে থাকতে পারে না।

এসে বাধা দেয়—আমার গরু!

গৌর সাহা গর্জে ওঠে ফ্যাঁস করে—এ্যাও!

কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল পাতিবৌ, লোকটার গা থেকে একটা বিশ্রী তেলের গন্ধ ভক ভক করে নাকে আসে। চালমুগরার তেল মালিশ করে বোধহয়। মদনা মুনিষও গরুটাকে টেনে নিয়ে যায়।

রতন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, পাতি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার বাপের বাড়ী থেকে আনা নিজের হাতে মানুষ-করা বড়-করা গাইটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল ওরা বিনা বাধায়।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামে ডোম পাড়ায়, দিনের আলোয় ওরা বাঁশ বেতের চুপড়ি ঝুড়ি মোড়া তালপাতার পাখা তৈরী করে, রাতের অন্ধকারে ওরা অন্য মানুষ। গ্রামের বাইরে লাল কর্কশ পাথুরে ডাঙ্গা, মাঝে মাঝে হেঁকে যায় শালবনের হাওয়া, শিয়ালের ডাক জেগে ওঠে একটা—অনেকগুলো; সম্মিলিত প্রতিবাদের সুরে, আবার থেমে যায়। বাতাসে বাতাসে শুকনো শালপাতার মর্মরধ্বনি; দু-একটা তারা দপ্ দপ্ করে কালো আকাশের কোলে।

ডোমপাড়ায় ওরা অনেকেই বের হয়, পুরুষরা বাঁশ ছোলা কাটারী হাতে, লাঠি নিয়ে রাতের অন্ধকারে বের হয় পথে, দূর-দূরান্তরের নিশুতি বনগ্রামের দিকে; পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে মেয়েরা কেউ কেউ বের হয় গ্রামের দিকে। রাতের অন্ধকারে তারার আলোয় ওদের সুরু হয় অভিসার।

...পাতিবৌ আসার পর থেকেই বদলে গেছে রতন। কেমন যেন দুবলা হয়ে গেছে ওর মন, ওই নরম দেহের নিবিড় ছোঁয়া পেয়ে। কানিকুড়ো, আমতেলে নটাই হাসে—মাগ পেয়ে মাদী হয়ে গেলি রতনা।

রতন হাসে। পাতিবৌ ওকে বদলে দিয়েছে।

আজ সেই কথাটা মনে হয় বেশী করে। নইলে ওই কুঠে সাহাজী বাড়ীচড়াও হয়ে এসে গরুর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে রতনা ডোমের উঠোন থেকে; আর তারই বা দোষ কি! রতনা একরাত বের হলেই পঞ্চাশ টাকা আনতে পারতো, কত টাকা এনেছিল—ওই সৌরভী, আশমানি—আনারসী ওরা জানে।

পাতিবৌ প্রথমেই বলেছিল—আমার ওতে দরকার নাই। একবেলা আধপেটা খাবো—তবু ও-পয়সা বেন্ধঅক্ত গোঅক্ত।

পাতিকে পেয়ে ভুলেছিল রতন। আজ পাতিবৌএর কান্নায় কেমন যেন বদলে উঠেছিল রতন, ক্ষণিকের জন্য মনে হয় কুঠে সাহার হাত মুচড়ে গরুর দড়িটা কেড়ে নেবে, কিন্তু পারেনি।

পাতিবৌ বলে—পঁইছে; পাঁইজোর, হাসুলী, নারকেল-ফুল বেচে টাকা দোব।

হাসে রতন—রূপো ক'ভরির আর কি দাম হবে বল?

—তবে? পাতিবৌ-এর কণ্ঠে হতাশার সুর। তারার আলোয় রতনের মুখের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে—একটা আদিম কাঠিন্য ফুটে উঠেছে দুর্মদ যোয়ান ওই মানুষটির মুখ-চোখে। শিউরে ওঠে পাতিবৌ। বলে ওঠে—বাবার কাছে কিছু টাকা আনবো।

—না। রতন প্রতিবাদ করে—গায়ে গতরে খেটে টাকা শোধ দোব।

গৌর সাহা কবে ওই কুৎসিত রোগের কবলে প্রথম পড়ে জানে না, বোধ হয় তার পিতৃধন হিসাবেই পেয়েছে এটিকে। প্রথম দিকে চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিল, বাবা রতনেশ্বরের চরণামৃত, মগরা ধোয়া জল, কবে মানসিক করেছিল গোপনে গোপনে।

চালু মুদীখানার দোকান, হাত পা ঢেকে জিনিস-পত্র বেচবার চেষ্টা করে; বসন্ত সাহার ভাই-ঝিও আসে প্রায় নির্জন দুপুরে, চিনু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়, ওর দিকে চেয়ে; আমতা আমতা করে গৌর—কাউর ঘা!

—ওষুধ-পত্র করো কেনে?

গৌর ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে। নির্জন দুপুরে বাড়ীর দিককার দরজা বন্ধ; বিধবা পিসী ছাড়া তিনকুলে কেউ নেই। বসন্তও জানে—মা-বাপ-মরা চিনুকেই ওর ঘাড়ে চাপাবে। জমি-জিরাত ব্যবসা সবই ক্রমশঃ হাতাবে সে। এখন থেকেই গৌরকে পরামর্শ দেয়—যখন তখন দরকার হয় ডাকবি আমাকে, কারবারে একা লোক সামলাবি কোন দিক।

গৌরও চতুর সাবধানী, জানে ওর মতলব। তাই এড়িয়ে থাকে। ওষুধ-পত্র করেও কিছু হয় না, ক্রমশঃ ওই কুৎসিত ব্যাধি মনের পাপের মতই সারা দেহ-মন ছেয়ে ফেলে। বৃষ্টি নেমেছে। আবার বৃষ্টি। শাল বন—ডাঙ্গা ঝাপসা হয়ে থাকে বৃষ্টির ধারায়, ঘসা কাঁচ রংএর মেঘস্তর নেমে এসে যেন মাটি ছুঁয়েছে। বনগড়ালী জল বয়ে চলেছে রাস্তা ছাপিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে। আনমনে বসে আছে গৌর!

মাঠের সব সবুজ ছাপিয়ে চক চক করছে বৃষ্টির জল। হঠাৎ ভিজে জ্যাব্‌জেবে হয়ে চিনুকে উঠে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভিজে পাতলা শাড়ীখানা গায়ে চেপে বসেছে, নিটোল পূর্ণতা ফেটে পড়ে:শাড়ীর বাঁধন অগ্রাহ্য করে।

—উস্, ভিজে গেলাম।

গৌরের বুভুক্ষু দুই চোখের দৃষ্টি দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল চিনু। কদর্য বিশ্রী হয়ে উঠেছে মুখ-চোখ, ঠোঁটের রং। কুকড়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। পা দু'টো হাঁটু পর্যন্ত ফাট ধরেছে। হাঁ করে দেখছে ওকে—গিলে খাচ্ছে কুতকুতে দু-চোখ দিয়ে।

—চিনু!

এগিয়ে আসছে গৌর। নির্জন বৃষ্টিবেরা চারিদিক। জনমানব নেই। আদিম প্রকৃতির শুদ্ধরূপ যেন কুশ্রী বীভৎসতায় ফেটে পড়ছে। হঠাৎ চমকে ওঠে চিনু; কর্কশ ফাটা আধক্ষয়া হাতগুলো এসে তার গায়ে চেপে বসছে, একটা বিষাক্ত সাপ যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চায় তাকে। শিউরে ওঠে চিনু! এক ধাক্কায় গৌরকে ছিটকে ফেলে রুখে দাঁড়াল মেয়েটা—নর্দমার পোকা, এত সখ তোর! ছিঃ ছিঃ!

চিনু বৃষ্টির মধ্যে নেমে গিয়ে ভিজতে ভিজতেই চলে যায়; সারা গায়ে হিমজল-কণা পড়ছে ঝরঝরিয়ে। তবু গায়ের জ্বালা যেন থামে না। সারা গা রি রি করছে অসহ্য ঘৃণায়।

গৌর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কে যেন সজোরে একটা চড় মেরেছে তার গালেই।

সেই জ্বালাটা আজও ভোলেনি গৌর। চিনু যেন পথে-ঘাটে দেখেছে মেয়েদের চোখে অসহ্য ঘৃণা। নরকের কীটের মত ঘৃণার চোখে দেখে তারা। দীর্ঘ কতগুলো বছর এই নীরব ঘৃণা সয়ে এসেছে আজ মনে করতে পারে না। সমাজের অবজ্ঞা আর অবহেলা সয়ে পরিত্যক্ত একটি বিষাক্ত সরীসৃপের মত রয়েছে সে। তাই জমেছে অন্তরে শুধু গরল—নিজেই তাতে জ্বলে পুড়ে মরে অহরহ।

একটা দিকে সে আনন্দ আর আশ্বাস খুঁজে নিয়েছে। ক্রমশঃ তার জীবনের সব আশা-আনন্দ এক জায়গাতেই সীমিত করে নিজের চারিপাশে উর্ণনাভের মত জালবুনে রেখেছে।

দোকানদারি শেষ পর্যন্ত তুলেই দেয় সে। চিনুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়; যাবার সময় ফিরেও চায়নি গৌরের দিকে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখে গৌর, শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই ফুলহাতা কামিজ পরে থাকে, চিনু কেমন সুন্দর পুরুষ্টু হয়ে ওঠে।

এর পর আর বসন্ত দোকান মুখো হয়নি, গ্রামে সেইই কথাটা তোলে—ওই বিষাক্ত রোগী দোকান করবে গাঁয়ে?

কথাটা অনেকেই শোনে, চিন্তার কথা। ক্রমশঃ অনুভব করে গৌর —অদৃশ্য পথ দিয়ে খদ্দেররা উধাও হয়ে যায়। যদিও বা আসে ডোমপাড়া বাউরীপাড়া থেকে কিছু, তাও বাকীর খদ্দের। আর ডোমপাড়ার আশমানী—সৌরভী? ওরা পথ থেকেই হাসে,...গৌরের বুকে ঝড় ওঠে। নিষ্ফল ঝড়—চিনুর সেই ঘৃণাভরা চাহনি ভোলেনি সে। কেমন যেন সারা মনে জ্বালা ধরায়।

পিসী গজগজ করে—দোকানদারি তুলে দে গৌর।

মেয়েগুলোর হাবভাব তার ভাল লাগে না, গৌরকে পাগলই করে দেবে এইবার। গৌরকে দেখে কেমন যেন ভয় করে তার নিজেরই। নিষ্ফল ব্যর্থতার জ্বালায় অসহায় অর্ধপঙ্গু মরদটা এইবার ক্ষেপে না ওঠে, জীবনের সব কিছু থেকে বঞ্চিত না হয়।

গৌর জবাব দেয়—অনেক টাকা বিলেত বাকী, দোকান তুলে দিলে আর আদায় হবে? বাড়ী বাড়ী তাগাদা করবি। নালিশ পুলিশ শেষ তক।

পিসী জজের মত রায় দেয়। কি ভাবছে গৌর সাহা।

হঠাৎ একদিন তাগাদা দিতে গিয়ে আবিষ্কার করে—যারা তাকে ঘৃণা করে পালিয়ে যায়, তাকে দেখলে অবজ্ঞা করে, তাদের সকলকেও সে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করতে পারে; মনের চাপাপড়া ব্যর্থতার জ্বালা প্রকাশ-পথ পায়। লোকের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় হাঁক পাড়ে।

—তখন ধার নিতে সম্মানে বাধেনি? ফেল টাকা, আভি ফেল।

সেই সঙ্গে সুদি কারবারও সুরু করেছে। মাসে টাকতি দু আনা সুদ। জমছে! গৌর সাহা জীবনের মোক্ষ খুঁজে পেয়েছে সুদি কারবারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের অনেক গণ্যমান্য লোক আসে, হ্যারিকেনের ম্লান আলো জ্বালা খড়ো ঘরের ভিতর চাটাইএ বসে, ঘরময় চালমুগরো তেলের বিশ্রী গন্ধ; গৌরের কালো ফাটা কর্কশ চামড়া ঢাকা ব্যাঙের মত কুৎসিত মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। মুখুয্যে মশায় বলে—

—বাবা শত খানেক টাকা যদি দিতে পারিস?

—জমি বন্ধক দিতে হবে আজ্ঞে। সাফ্ কথা।

গায়ের চামড়ার মতই মনটা কঠিন কর্কশ হয়ে উঠেছে। কোন মায়া-দয়ার স্পর্শ সেখানে নেই। নবনী চাটুয্যেকে পরিষ্কার হাঁকিয়ে দেয়—সুদ দুমাসের আগে ফেলতে হবে চাটুয্যে মশায়, তারপর অন্য কথা। টাকা পয়সার বেলায় বাপের খাতিরও করি না।

ওই তার আনন্দ। মাটকোঠার উপরের ঘরে দেওয়ালের সঙ্গে বসানো ছোট চোরা সিন্ধুকটা খুলে দেখে রাতের বেলায়। লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা ছোট ছোট কয়েকটা পুঁটুলি, সিকি, দুয়ানি, রূপার টাকার তোড়া। আর কিছু নোট। এক কোণে থলিতে রাখা সোনার গহনা কিছু, রূপোর হাসুলি, পায়জোর, বাঁক-মল—বিভিন্ন পরিবার থেকে বন্ধক রাখা মালপত্র, ওর কতকগুলো আর ছাড়ানো হবে না। বিবির দামে ডুলি বিকিয়ে যাবে, আসলের উপর চেপেছে সুদ, আসলকে ছাড়িয়ে গেছে। ম্লান আলোয় ওর সামনে বসে থাকে কুশ্রী বীভৎস লোকটা। ওই তার মোক্ষ—আনন্দ সব কিছু। ওর জন্তই কুঠে গৌর আজও গ্রামে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। লোকের পালে-পার্বণে অনেক খাতক নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য গৌর যায় না। বলে মানসিক আছে। খাওয়া বারণ। তবুও নেমন্তন্ন না পেলে চটে ওঠে—সুদ আসলের তাগাদায় গেরস্থকে রাস্তার উপর হাটতলাতেই হাড়ির হাল করতে ছাড়ে না।

—কি করছিস রে গৌর? কে যেন ডাকছে তোকে। নীচে থেকে পিসী হাঁক পাড়ছে; খাতকই বোধ হয়। গৌর সঙ্গোপনে আবার সিন্ধুক বন্ধ করে চাবি তিনটা টানাটানি করে দেখে বেশ হৃষ্টমনেই নেমে আসে। দাওয়াতে এসেই বোমার মত ফেটে পড়ে গৌর,

—আবার টাকা চাইতে এসেছো? নিকালো—নিকাল যাও ঘরসে।

বসন্ত এসেছিল টাকার জন্য, চিনুর কাকা বসন্ত। কেন জানে না গৌর অসহ্য উত্তেজনায় ক্ষেপে ওঠে ওকে দেখলে। মনে ঝড় ওঠে। সেই নিদারুণ ব্যর্থতা আর অপমানের জ্বালায় অন্ধকার দেখে দুই চোখে।

...কিছু দিবি না বাবা?

—এক আধেলাও না।

বসন্ত চুপ করে বের হয়ে গেল। খুঁটি ধরে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গৌর। কুৎসিত মুখখানায় একটা শ্বাপদলালসা জেগে উঠে বীভৎসতর করে তুলেছে তাকে।

হঠাৎ পাতিবৌকে গোয়ালবাড়ীতে আসতে দেখে অবাক হয় গৌর। বাড়ীর পিছনেই রাস্তার ধারে পাঁচীল-ঘেরা গোয়ালবাড়ী। হালের বলদ একজোড়া, কয়েকটা গাই-গরু ও ছাগল আছে। ওপাশে খড়ের গাদা। গৌরের ঘর-গেরস্থালীর দিকে নজর আছে! সাজানো সব কিছু।

শিউলি-গাছের নীচে একগোঁজে বাঁধা গরুটা জাবনা খাচ্ছে। বাছুরটা লাফঝাঁপ করছে আশ-পাশে। হঠাৎ দেখে নধর পুরুষ্ট মেয়েটি গোবরের ঝুড়ি বগলে এনে দাঁড়িয়েছে গরুটার পাশে, সযত্নে হাত বোলাচ্ছে ওর গায়ে পিঠে, গরুটাও মুখতুলে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সকালের সোনাগলা রোদের আভায় বৌটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল গৌর। কেমন যেন একটা চাপা সুর জাগে মনে।

গলায় সেই সহজাত কাঠিন্য আর আসে না। একটু মোলায়েম সুরই বের হয়। এ সুর ঠিক তারও যেন অচেনা। অনেকদিন আগেই এই কণ্ঠস্বর তার বিকৃত হয়ে গেছে। আজ সেই সুর ফিরে এসেছে তার কণ্ঠে অজানতেই।

—কি করছিস এখানে?

পাতিবৌ মুখ তুলে চাইল লোকটার দিকে। সারারাত সে একরকম ঘুমুতে পারেনি গরুটাকে ছেড়ে। কেমন যেন নাড়ীর টান মিশে আছে ওর সঙ্গে—মাটির টান। জবাব দেয়—দেখতে এলাম খেয়েছে কিনা? ছানি আরও কুটি কুটি কাটতে হবেক গো? ইয়ে কাড়ায় খাবার ছানি, গাই গরুতে কি খেতে পারে। আর কচি ঘাস দিও চাট্টি—নইলে গা টেনে যাবেক। কাঁচা নাড় কিনা! 'পালান নামবেক নাই, দুধও আসবেক কম।'

কথাটা বলেই যেন লজ্জায় পড়ে পাতিবৌ। নিজের সারা দেহে কেমন যেন অসহ্য লজ্জার শিহর খেলে যায়, অকারণেই ছোট শাড়ীখানা দিয়ে তার অফুরান যৌবনের প্রকাশ গোপনের প্রয়াস পায়।

গৌর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সহজ সলজ্জ একটি মেয়ে। চিনু! চিনুর চেয়েও নিটোল স্বাস্থ্য—তার চেয়ে অনেক কম দেমাক। নিজের অসহায়

দারিদ্র্যের বোঝায় নুইয়ে পড়েছে। গৌর কোথায় যেন জোর পায় মনে মনে।

বলে ওঠে—কাজ করবার, গরু দেখাশোনার জন্য একটা কামিনও পাচ্ছি না। তা থাক না কেন তুই। গরু-বাছুর দেখবি, ঘাস করবি। খাওয়া রাতের চালসিধে আর মাস্‌কে চার টাকা মাইনে।

পাতিবৌ কি ভাবছে। চার টাকা হ'লে প্রায় বছর খানেকের মধ্যেই আবার গরুটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আসছে বিয়োনের সময় বিয়োন তার ঘরেই। তাছাড়া এই ক'মাস নিজের হাতে খেতে দিতে পারবে গরুটাকে। উপরন্তু কিছু রোজগার।

কি ভেবে মাথা নাড়ে—আচ্ছা, উকে বলে দেখি।

গৌর রতনের কথা শুনে কেমন যেন হতাশ হয় মনে মনে। তবু বলে ওঠে শুকনো ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায়—বলগে বুঝিয়ে। দুবেলা খোরাকী, আর চার টাকা—একটা মরদের মাইনে।

রতনের রোজকারের মতই প্রায়। পাতিবৌ ও কথাটা মেনে নিয়েছে।

গৌর চুপ করে বসে আছে গোয়াল বাড়ীর শিউলি গাছের নীচে। পাতিবৌ চলে গেছে। আবার শূন্যতা নেমেছে বাড়ীখানায়। বাতাসে গোবর আর গরুর গায়ের একটা মেটে তীব্র গন্ধ। বাছুরটা দাপাদাপি করছে।

কেমন যেন একটা খাঁ খাঁ শূন্যতা জেগে ওঠে ওর সারা মনে। পাতিবৌ-এর দেহটা চোখের উপর ভাসছে; কি একটা দুর্বার আহ্বান। মাস মাস একমুঠো টাকাই কবুলতি করে বসল; কেমন যেন সূর্যের উজ্জ্বল আলোটা গায়ে তির্যকগতিতে এসে পড়ে—চড়চড়ে জ্বালা ধরায় সর্বাঙ্গে।

সামান্য কাজ। পাতিবৌ গোয়ালের সামনের খড়গাদা থেকে মাথায় করে খড়ের বোঝাটা এনে গোয়ালে নামিয়ে গাছ কোমর করে ধারালো বঁটিতে খড় কাটতে থাকে দুলে দুলে। ওপাশে মাটির কলসীতে জল এনে রেখেছে। সকালের দিকে জলছানি দিতে হয় গরুকে, ধাত ঠাণ্ডা থাকে। খোলছানি দেবে বৈকালে। শুকনো কিছু খোল আর নুন মিশিয়ে ছোট ডালিটা ধরে দিয়েছে গরুটার সামনে। বাছুরটাও এক একবার মুখ লাগিয়ে খোলের দু একটা দানা চিবোবার চেষ্টা করে ওর দিকে বড় বড় চাহনি মেলে। যেন বিরাট একটা কাজ করছে সে তারই সাক্ষী রাখছে পাতিবৌ। পাতিবৌ হাসে খড়-কাটা থামিয়ে। ঘাড় নাড়ে—খা!

খড়ের গুঁড়ো আর গোয়ালের ভাপসা গরমে ঘেমে উঠেছে, পিট পিট করছে গা-পিঠ সর্বাঙ্গ। গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলে একটু হালকা হয়ে খড় কাটতে থাকে। প্রায়ান্ধকার ঘরটা—জানলার একফালি ছিদ্র দিয়ে খানিকটা আলোর আভামাত্র এসে পড়েছে।

হঠাৎ পিছন ফিরেই অবাক হয়ে যায়; আবছা অন্ধকারে দুটো টিকটিকির চোখের মত স্বচ্ছ নীল তারা তার দিকে অমনি শ্বাপদ-লালসাভরা চাহনিতে চেয়ে রয়েছে। একটি মুহূর্ত্ত! পাতিবৌ কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে নেয়। মুখে-চোখে ফুটে সলজ্জ আভা; এগিয়ে আসছে গৌর।

অজানা আতঙ্কে কাঁপছে পাতিবৌ। গৌর ফতুয়ার পকেট থেকে টাকাগুলো ওর হাতে তুলে দেয়—মাসা-বধি কাজ করছিস মাইনে নিবি না?

পুরোপুরি পাঁচ টাকাই দিলাম গো।

পাতিবৌ কথা বলে না, হাত পেতে টাকাগুলো নিয়ে খুঁটে বেঁধে আবার কাজে মন দেয়। গৌর দাঁড়াল না—পা পা করে বাইরে চলে গেল।

···কেমন যেন স্থবির চেতনাবিহীন মনে একটা ক্ষীণ সাড়া সুরের রেশ জাগে। তাগাদায় বের হয়ে অনর্থক লোককে কড়া কথা শোনাতে পারে না, কেমন যেন মমতা বোধ হয়। ছাঁপোষা-মানুষ। দেবেই বা কোথকে—আহা!

কি ভেবে গাঁয়ের বাইরে হাটতলায় এসে দাঁড়াল। বড় দীঘির চারিদিকে বট অশ্বত্থ কুঁচলে-গাছের সবুজ সমারোহ। হাট তখনও জমেনি। পাখীর কলরবে ভরে রয়েছে চারি-দিক, দীঘির জলের ওপর দিয়ে চাহনি মেলে চেয়ে থাকে—কাছিমের পিঠের মত ক্রমনিম্ন মাঠ গিয়ে শাল বনের সবুজে শেষ হয়েছে। আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে সবুজ শালবন—নীল স্বপ্নমাখা। জ্বালা করা চোখ দুটো সবুজের স্নিগ্ধতায় কেমন আরাম পায়।

কি ভেবে হাট থেকে কিনে ফেলে একটা রঙীণ শাড়ী,

নগদ পাঁচ টাকা খরচ করে বসে। টাকা! অনেক টাকাই খাটছে তার, তার থেকে না হয় পাঁচটা গেল। মনে মনে একটা আনন্দের সুর জাগে।

ছুপুরের ডোমপাড়া ঝিমিয়ে থাকে। মরদরা গেছে যে যার কাজে, মুনিষ মাহিন্দারি করে, মাঠে-ঘাটে থাকে সারাটা দিন। ফেরে সেই তিনপহর বেলায়। বটতলায় তালাই পেতে ধান সেদ্ধ ভাপিয়ে মিলে শুকোতে দিয়ে কাক তাড়াতে বসে দল বেঁধে, কেউ বা শুকনো খেজুর পাতার তাল নিয়ে তালাই বুনতে থাকে, মেয়েরাই দা দিয়ে বেতের ছিল্‌কী তুলে কুলো ধামা বোনে।

সেই সঙ্গে চলে আলোচনা। রাতের বিচিত্র রহস্যান্ধকার জীবনের কত চাপা হাসি, আর ব্যর্থ বিকৃত কামনার টুকরো গল্প।

আশমানীর ঘরের চালে টাঙ্গানো অনেক ক'টা হুঁকোই, একটার নলে আবার কড়ি বাঁধা।

হাসে আশমানী—উটো বামুনদের জন্যে, আসে তো অনেক জাতই।

—বেনারসী বলে ওঠে—হ্যাঁ, বাবা ত্রিযুগীনাথের থান কিনা। ছত্রিশ জাতের মেলা।

কবে গাঁয়ের কোন ছেলে আড়ালে কাকে ডেকেছিল, কে বুড়ো দত্তমশায়ের চাকরাণ-জমি ভোগ করে কেন—তারই হিসেব কিতেব ওঠে; চাপা হাসি আর কুৎসিত রসিকতা চলে মেয়ে-মহলে।

—কি লা তুর্ কিছু জুটলো? আশমানী জিজ্ঞাসা করে পাতিবৌকে।

—ধ্যাৎ! পাতির মুখ গাল ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়।

—এই তো বয়েস লো, যা পারিস দেখে-শুনে লে তারপর সেই ভাতারের ঝাঁটা আর লাথি। ঘেন্না ধরো যাবেক দেখবি—বলে ওঠে আশমানী।

পাতি কথা বলে না, মুখ নীচু করে চুপড়ি বুনতে থাকে। কয়েকখানা চুপড়ি আসছে-হাটে বেচতে নিয়ে যাবে।

…ওদের কথাগুলো মনে কেমন চাঞ্চল্য আনে। রতন সারাদিন মাহিন্দারি করে এসে সন্ধ্যাবেলাতেই মশার কামড়ের ভয়ে পায়ে কেরোসিন তেল মেখে শুয়ে পড়ে। জল-বাদলে চাষের কাজ—গরু মোষের সঙ্গে ঘুরে আলাতন হয়ে যায় মানুষটা। গা থেকে জমির পাঁকমাটি আরও কেরোসিন তেলের গন্ধ মিশে কেমন বদ-চিমসে একটা গন্ধ ওঠে।

—ঘুমুলি? পাতির সারা মনে বাদল-রাতের অব্যক্ত বেদনা।

রতন মড়ার মত পাশ ফিরে শোয়, কোন সাড়া শব্দ নেই ঘুমুচ্ছে। চুপ করে পড়ে থাকে পাতি। আনারসী সৌরভার কথাগুলো মনে পড়ে। কেমন যেন একটা চাপা আনন্দের স্বাদ তারা পেয়েছে। শাড়ীও পরে রকমারি। কোত্থেকে আসে কে জানে!

একনজর মনে পড়ে কয়েকদিন আগেকার সেই ক্ষুধার্ত অসহায় দৃষ্টি! নির্জন গোয়ালের ভিতর তার অর্ধনগ্ন দেহটার দিকে চেয়ে আছে একজোড়া চোখ।

…বাইরে বৃষ্টি নামে, বার বার বৃষ্টি। রতনের অসাড় দেহটার পাশে পড়ে আছে পাতিবৌ—ঘুম আসে না।

বাদল রাতে মন কেমন যেন করে। মনে পড়ে ওই গৌর সাহার কথা। প্রথম দিন যেটা দেখেছিল সেটা ওর প্রকৃত স্বরূপ নয়। মনের ভিতর একটা ভিন্ন সত্তা আছে যেটাকে চিনেছে তারপর। পঙ্গু ব্যর্থজীবন লোকটার জন্য মায়া হয়।

সেদিন শাড়ীখানা দেখে চুপ করে থাকে পাতিবৌ।

—তোর জন্যে হাট থেকে আনলাম।

—এসব আবার কেনে?

শাড়ীখানা নিতে নিতে বলে; ওর বিবর্ণ কোঁচকানো মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে। গরুর দুধটা রোজকার মত খানিকটা ওকে দেয়।

—নিয়ে যা।

নধর চিকন গরুটা, পাতিবৌ-এর নিজের ঘরেও এতখানি দুধ দিত না। এখানে গৌর খোল-ভূষির ব্যবস্থা করেছে, বাকীটুকু করে পাতিবৌ। নির্জন গোয়ালবাড়ী বর্ষার শেষ—আকাশে সাদা মেঘের টুকরো ছিটিয়ে রয়েছে পেঁজা তুলোর মত। বাতাসে সদ্যফোটা শিউলির ক্ষীণ সৌরভ

পাতি বলে চলেছে—আমার বাপের বাড়ীর কাছে মহেশপুরের কালী জাগ্রত কালীথান। একবার সেখানে ওষুধ খেয়ে দেখো না তুমি?

—তুই বলছিস? গৌর ওর দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে।

—নিয়ে যাবি একবার ? চলনা।

পাতিবৌ-এর ছুচোখে কি সমবেদনার নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়া। গৌর চুপ করে কি ভাবছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইবার চেষ্টা করে—আবার নিজের কাছেই দুঃসহ লজ্জা লাগে, চুপচাপ উঠে গেল।

আজ আর তাগাদায় যাবার মন নেই।

পিসীও দেখে ওর মনের এই পরিবর্তন। গৌর বলে ওঠে—কাল একবার মহেশপুর কালীথানে যাবো।

পিসী দেখেছে ওর মনের ব্যাকুল আগ্রহ, আবার সারবে সুস্থ হয়ে উঠবে সে। মুক্তি পাবে ঘৃণ্য এই ব্যাধির কবল থেকে।

—যা, মা যদি দয়া করেন এইবার।

রতনও কেমন দেখছে পাতিবৌএর মধ্যে একটা পরিবর্তন। আগেকার সেই উত্তাপ, অসীম আগ্রহ নেই তার মনে। সেই হাসিও থেমে গেছে। সান্ত্বনা দেয় বৌকে—পুজোর পরই শালার কাছ থেকে গরু ছাড়ান করে আনবো।

কথা কয়না পাতিবৌ, বলে ওঠে—কাল বাবার বাড়ী একবার যাবো।

—টাকা চাইতে ?

—না, এমনিই।

কথা বলে না রতন। পাতিবৌ বলে চলেছে—সাঁঝ বেলাতেই ফিরবো কিন্তু।

—কেনে ? এক দিনেই ?

হাসে পাতিবৌ—আত কাটাতে মন চায় না।

কেমন যেন নিজেরই কানে বিশ্রী ঠেকে ওই হাসি। ...ন্ত কোন পাতিবৌ হাসছে। হাসবার বিকৃত চেষ্টা ...রছে। মিথ্যে কথা বলা আশমানী সৌরভীর মত তারও ...ভ্যাস হয়ে গেছে।

...গৌরের মনে আনন্দের আভা। বনের ভিতর দিয়ে ...কটা চলেছে, দুপাশে বর্ষার বৃষ্টি ধোয়া শালবন, ...খা-ডাকা বনভূমি। পাতিবৌ একটু এড়িয়ে এসে সঙ্গ ...য়েছে। চলেছে দুজনে, পাতিবৌএর মা কালীর কাছে ...বার প্রণাম করে—সেরে উঠুক লোকটা। গৌরের ... ক্ষণিক পাওয়ার আনন্দ এমনি করে প্রকৃতির উদার ... সায়েরের অসীম রূপের সন্ধান কোন দিনই পায়নি।

বনের প্রান্তে বালু পাথর ভরা নদীর তিরতিরে কালো জলের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল গৌর, ওপারে গ্রামসীমার ঊর্ধ্বে দেখা যায় মন্দির চূড়া।

—পেন্নাম করো গো মুনিব, মা কালীর থান—হুউ যে।

গৌর প্রণাম করে কৃতজ্ঞতাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে।

...রতন প্রথম প্রথম ঠিক ভাবতে পারেনি ব্যাপারটা। ক্রমশঃ যেন টের পায় কিছুটা। সৌরভীই বলে ওঠে—উঠতি বয়সের পাখী পুষলে খাঁচায় রাখতে হয়—তা জানিস না মরদ ?

হাসে আশমানী—ধারালো ছুরির ফলার মত সেই হাসি। আজ বুঝতে পারে তার শাড়ী পাওয়ার ইতিহাস, বাপের বাড়ী যাবার ছল-ছুতনো। এতদিন চেষ্টা করেও গরুটা ছাড়াতে পারেনি রতন, নিজে কতখানি অসহায় সেই সত্যটাই তার মনে অসহ্য জ্বালা আনে। আশমানী হাসি থামিয়ে বলে—ইয়ে ঢুলী সমেত বেসজ্জন ভাই। গাই বাছুর, গরুর মালিক সমেত লিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকার ফ্যারে। বাঁ শিয়ালি করে পাড়ায় আইছিল বটে।

রতন এক দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেয় তাকে। থামে না ওরা—হেসে এ ওর গায়ে লুটোপুটি।

—ঘরের মাগকে দাবড়াতে পারিস না—পর মেয়েকে দাবড়ানো ? মেনিমুখো মিনসে কোথাকার।

চুপ করে সরে গেল রতন। অসহায় রাগে ফুলছে। পাতিবৌ তাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। নইলে—

...আকাশে-বাতাসে কেমন হলুদগোলা আমেজ। কোথায় পাখী ডাকছে ছায়াঘন গাছ-গাছালির আড়ালে। গৌর সেদিনের স্মৃতি আজও ভুলতে পারে নি। পাতিবৌ-এর হাসির সুর ওর দেহের ভাঁজগুলো কেমন তৃষ্ণা জাগায় মনে। নিদারুণ সেই তৃষ্ণা।

...জনহীন গোয়ালে খড় গাদা থেকে খড় নামাচ্ছে পাতিবৌ। বলিষ্ঠ মেয়েটা, শাড়ীখানা হাঁটুর কাছে এসে থেমে গেছে। হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের পাতা অবধি একটা মসৃণ পূর্ণতা। সারাদেহে বর্ষার নদীর জোয়ার। এগিয়ে আসছে চুপি চুপি গৌর।

...হঠাৎ চমকে ওঠে পাতিবৌ। গৌর সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। ফাটা ফাটা কর্কশ হাত দুটো—ওর কুৎসিত কদর্য মুখখানা—ওকে ঘিরে সেই তেলের বিশ্রী

একটা দুর্গন্ধময় পরিবেশ—চমকে ওঠে পাতিবৌ। খড় বোঝাটা ফেলে দিয়ে সজোরে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে ওকে শক্ত.কাঁকুরে মাটির উপর।

—ছিঃ ছিঃ! সারা শরীরে পাতিবৌএর নিদারুণ ঘৃণা। জলছে সারা মন। এই নরকের পোকাটাকে সারাবার জন্য মা কালীর থানে নিয়ে গিয়েছে; দয়ামায়া করেছে।

—মা-বুন ঘরে নাই তুর? সর্বাঙ্গে থিক থিক করছে পোকা, তবু খিদে মেটেনি? মর।

কাপড়টা সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পাতিবৌ। হঠাৎ খড় গাদার আড়াল থেকে রতনকে বের হয়ে আসতে দেখে ধরে ফেলল ওকে পাতিবৌ। রাগে জলছে দুর্মদ লোকটা।

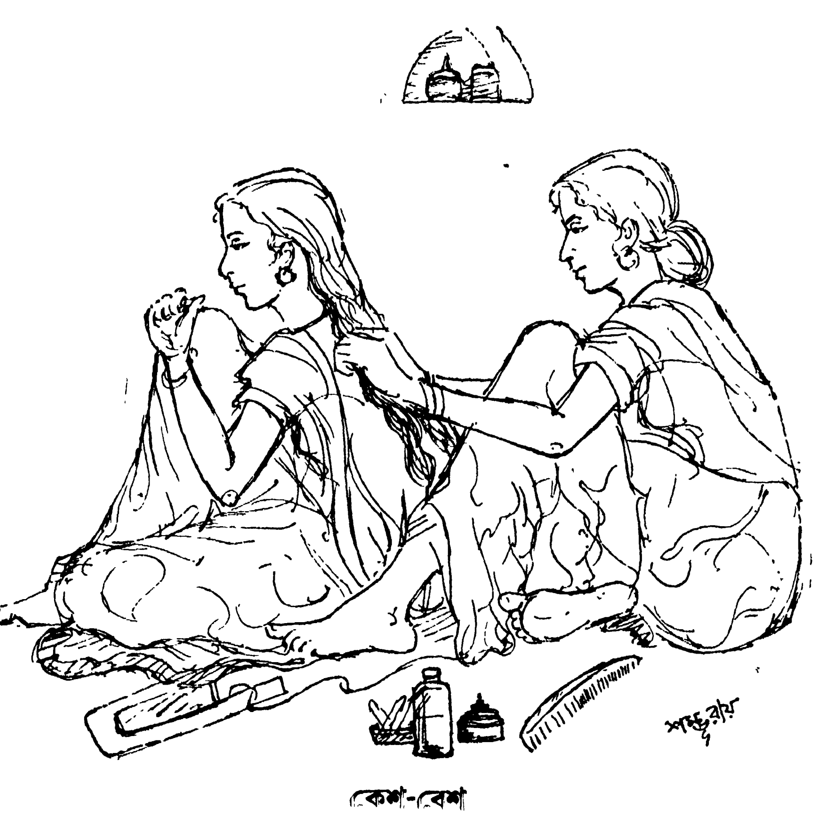
—দিই শেষ করে।

বাধা দেয় পাতিবৌ—না, পড়ে থাক কুকুরটা, চল। হাত ধরে টেনে ওকে বের করে নিয়ে চলে গেল।

জনহীন গোয়াল বাড়ীর উঠান থেকে কোন রকমে উঠে বসেছে গৌর। সর্বাঙ্গে জ্বালা করছে। ঘা-গুলো ছড়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে বেদনায়।

দয়া আর মায়াই তার প্রাপ্য, তার বেশী কিছু নয়। চিনুকে মনে পড়ে—পাতিবৌও আজ তাকে সেই কথাটাই নিষ্ঠুর ভাবে জানিয়ে দিয়ে গেল।

মানুষ যেন সে নয়—মানুষের খাতা থেকে বাতিল একটি জীব। দুপুরের রোদে বুক জলছে, কোথায় কোন শান্তির আশ্বাস নেই। গরুটা নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে বাছুরের গাকে চাটছে পরম স্নেহভরে।



কেশ-বেশ



বোম্বাই শহর থেকে মাত্র চৌত্রিশ মাইল দূরে সেণ্ট্রাল রেলওয়ের কল্যাণ স্টেশন। সে স্টেশন ছাড়িয়ে আরেকটি স্টেশন পরেই পুণা যাবার পথে পড়বে বোম্বায়ের নতুন শিল্পকেন্দ্র—অম্বরনাথ।

অম্বরনাথ স্টেশনে নেমে হাঁটাপথে প্রায় মাইল খানেক দক্ষিণে এগুলে, চোখে পড়বে পশ্চিমঘাট গিরিমালার শ্যামল বৃক্ষবহুল ছোট একটি উপত্যকা-উপলাকীর্ণ এক পাহাড়ী নদীর শীর্ণধারা স্বপ্নসঞ্চারী সেই সবুজ উপত্যকাটিকে নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনেও সবুজের ছোঁয়ায় সজীব রাখে। মালভূমির পিঙ্গল পথ ধরে আরও একটু এগিয়ে গেলেই যাত্রীর নজরে পড়বে—অন্ধকারের মতো ঘন কালোরঙের পাথরের এক বিশাল স্তূপ—উপত্যকা প্রান্তের সুদীর্ঘ বনভূমির শীর্ষদেশ ছাড়িয়ে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিস্মৃত-অধ্যায়ের কঙ্কালের মতো হয়ে মূক হয়ে গেছে। স্তূপের ভাঙা শিখরের উপর বসানো রয়েছে লাল কাপড়ের এক ছোট্ট নিশান—চারপাশের উঁচু মালভূমি থেকে বয়ে-আসা হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে যেন হাজার বছর আগেকার উৎসব মুখর এক সামন্ত রাজ্যের কীর্তি কাহিনী আধুনিক যুগের যাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিরালা প্রান্তরের মৌন কালোপাথরের এই স্তূপই হলো অম্বরনাথের সু-প্রাচীন দেউল। পাহাড়ী নদীর পাথরে বাঁধানো ছোট্ট সাঁকোটি পেরিয়ে দেউলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে যাত্রীকে প্রথমেই যা বিস্ময়ে অভিভূত করে—সে হোল মন্দিরের ভিত্তি গাত্রের অভিনব কারুকার্য। মন্দিরের ভিত্তি থেকে শিখরদেশ পর্যন্ত আগাগোড়া খোদিত রয়েছে অসংখ্য মূর্তি—ইলোরার ছাঁদে খোদাই করা তাম্বুল-করঙ্ক বাহিনী মূর্তি ফলক থেকে আরম্ভ করে মন্দিরের দক্ষিণ ভিত্তিগাত্রের 'নটেশ মূর্তি, প্রত্যেকটিই দক্ষিণী শিল্পে বৈচিত্র্যের অপরূপ কমনীয়তারই পরিচয় দেয়। অম্বরনাথ দেউলের গঠন-ভঙ্গি ছয়কোণা,



অম্বরনাথের মহেশ্বর দেউল—মন্দির-গাত্রের বিচিত্র মূর্ত্তি-কারু
(লেখক গৃহীত আলোক-চিত্র)

তারার ছাঁদে আগাগোড়া কালো পাথরে গড়ে তোলা হয়েছে—যে শিল্প-শৈলী দক্ষিণ কানাড়ার অতীত হয়শালা রাজ্যের বেলুড় ও হলেবীড় মন্দির দুটিকে করেছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

অম্বরনাথ দেউলের ভিত্তি ফলকের লিপি থেকে জানা যায় যে দেউলটি স্থাপিত হয়েছে ১০৬০ খ্রীস্টাব্দে। উত্তর কঙ্কনের এক সামন্ত রাজ, মহামণ্ডলেশ্বর মাম্‌বাণী 'মহাকাল'কে তাঁর নতি জানিয়ে গেছেন—অনুপম ভাস্কর্যমণ্ডিত এই দেউলের মাধ্যমে। এই সামন্তরাজ যে কোন দেশের—তার স-ঠিক পরিচয় ইতিহাসের পাতায় আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। দেউলের ভিত্তি-লিপি থেকে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে ইনি ছিলেন খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের শীলহরা-বংশের চালুক্যরাজ্যের একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা।...

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। বিশাল দক্ষিণাপথের অধীশ্বর ছিলেন তখন চালুক্য বংশের নরপতিগণ। দক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড সুশৃঙ্খলে শাসন করবার উদ্দেশ্যে সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্নপ্রদেশে পুরাতন মৌর্যশাসন পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি ক্ষত্রপরাজ বা শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহামণ্ডলেশ্বর মাম্‌বানী চালুক্যরাজের অধীনে এই ধরণেরই একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। সম্ভবতঃ উত্তর মালাবারের অনেক অঞ্চল তাঁর শাসন অন্তর্গত ছিল। শিলহরা-বংশের উত্তর পুরুষেরা শৈব ছিলেন কিনা তার প্রমাণ আজ অস্পষ্ট হলেও এ বংশের অন্যতম শাসনকর্তা মহামণ্ডলেশ্বর মাম্‌বাণী যে একজন পরম শৈব ছিলেন তার প্রমাণ সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষিত রয়েছে অম্বরনাথের মহেশ্বর দেউলের লিপিফলকে।

ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলেও এ তথ্য সহজেই অনুমান করা যায় যে অধুনা মহীশূর রাজ্যের বিশ্ববিখ্যাত হলে বীড় ও বেলুড় মন্দির দুটির শৈলী স্থাপত্যকলার রীতি মহামণ্ডলেশ্বরকে তাঁর অম্বরনাথ দেউল রচনার কাজে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অতীতের সু-প্রসিদ্ধ হয়শালা নরপতিদের প্রতিষ্ঠিত চেন্ন কেশবের মন্দির হলেবীড় পত্তনকে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য গৌরবে মহিমান্বিত করেছে। অ-পূর্ব সে মন্দিরের কারুকার্য—অনবদ্য তার গঠন সৌন্দর্য...মন্দিরের বিগ্রহ চেন্ন-কেশব বা সুন্দর কেশবেরই উপযুক্ত সে মন্দিরের অভিনব বিচিত্র কলা-সম্ভার। মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে, খিলানের মাথায়, অতি সূক্ষ্ম ভাস্কর্য কলা—এ সবই যেন সেই মন্দিরের বিগ্রহ চেন্ন কেশবেরই সম্মিত রূপ-গরিমারই স্ফূর্ত বিকাশ। মন্দিরের এই অপরূপ রূপ দর্শনে মহামণ্ডলেশ্বর সম্ভবতঃ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আরাধ্য-দেবতা মহাকাল মহেশ্বরকে 'কালের' রেখায় বিভঙ্গ করে তুলতে হলে, তাঁর ভক্তির প্রতীক অম্বরনাথ দেউলটিকেও হলেবীড়ের স্থাপত্য শৈলীর ছন্দে রূপায়িত করে তুলতে হবে—সম্ভবত এই ছিল তাঁর অতন্দ্র প্রেরণা। হয়তো হয়শালারাজকেও মহামণ্ডলেশ্বর তাঁর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যে এমন একদল অধীতকর্মা শিল্পীকে তাঁর রাজ্যে পাঠাতে যারা তাঁর পরম-আরাধ্য মহাকালের স্বপ্ন দেউলকে বাস্তবের রূপ গাম্ভার্যে অভিনবত্ব দান করতে পারবে। বৈষ্ণব হয়শালা রাজ সেদিন বোধ হয় শৈব মাম্‌বাণীর সনিবন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। তাই আজ চেন্ন কেশবের' মন্দির শৈলীর সার্থক সাক্ষ্য বহন করছে বোম্বাই শহরের অনতিদূরের এই অম্বরনাথ দেউল। কালের দুর্বার



অম্বরনাথের মহেশ্বর দেউল—প্রাচীর-গাত্রের শৈলী-কারু
(লেখক গৃহীত আলোক-চিত্র

স্রোত আজ 'মহাকাল'কেও অবজ্ঞা অবহেলা করেছে। জনগণের স্মৃতির আড়ালে মহেশ্বর দেউলের অপরূপ শিখর চূড়া আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এ সত্বেও দেউলের গঠন ভঙ্গিমার যে অপরূপ গৌরবময় ছন্দ তার তেমন বিশেষ পতন ঘটেনি।

দেউলের উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকের তিনটি থাম-সম্বলিত প্রবেশ পথ থেকে ছন্দে ছন্দে সোপানের শৈলীরেখায় দেউলের ভঙ্গিমা অধুনা নিশ্চিহ্ন দেউল শিখরের দিকে উঠে গেছে।...পশ্চিমের যে প্রবেশ-পথ—সে পথের দেউড়ী পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে পৌঁছানো যায় বিগ্রহের গর্ভগৃহে। গর্ভগৃহটির গঠন দক্ষিণী স্থাপত্যরীতিতে মন্দিরের সমতল ভিৎ থেকে বেশ একটু নিচে নেমে গেছে। পরপর পাথরের আটটি সিঁড়ির ধাপ নেমে বিগ্রহের পূজামণ্ডপে পৌঁছানো যায়। শীতের অপরাহ্ণে মন্দিরের অলিন্দ পথে সূর্য্যের আভা এসে পড়ে বিগ্রহকে কিছু সময়ের জন্যে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। দেউলের ভিতরের অংশটি দ্বিতল। সম্ভবত উপরের তলা অতীতে দেউলের তদানীন্তন পূজারীদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হোত। দোতলায় পৌঁছবার সোপান শ্রেণীর আজ আর চিহ্নমাত্র নেই। দেউলের ভেতরে ঢুকলেই প্রথমে নজরে পড়ে অপূর্ব কারুকার্য্যখচিত পাথরের চারটি থাম—যার ওপোর মন্দিরের প্রথম তলের ছাদ দাঁড়িয়ে আছে। একতলার উপরের অংশের বিভিন্ন জায়গা জীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্যে সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অধুনা লোহার বরগার ব্যবস্থা করছেন ছাদটিকে যাতে বজায় রাখা যায়। কিন্তু এই লোহার বরগাগুলি এমন শৃঙ্খলাহীন ভাবে বসানো, যার আড়ালে থামের একদিকের সূক্ষ্ম কাজগুলি সব ঢাকা পড়ে গেছে।

দেউলের মধ্যেকার প্রায়ান্ধকার আলোয় অন্দরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি যা চোখে পড়লো তার উৎকর্ষতার সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে এ্যালিফান্টার গুহা-মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে।

এই সর্বাঙ্গসুন্দর দেউলটি তৈরী করতে যে পাথর ব্যবহার করা হ'য়েছিল তা নরম জাতের হওয়ার জন্যে পাথরের সূক্ষ্ম কাজগুলির অনেকাংশই ক্ষয়ে গেছে। তা সত্বেও মহামণ্ডলেশ্বর মাম্‌বাণীর রচিত এই দেউল ন'শো বছর পরেও তার শিল্পসমৃদ্ধিতে দর্শকের মনে বিস্ময়ের যে বিপুলতা আনে তার উচ্ছ্বাস কালের এই সুদীর্ঘ ব্যাপ্তিকেও মুছে দিয়ে মাম্‌বাণীর শিল্পীমনকে আমাদের নিকটতম করে তোলে।

জীবন ভরিয়া করিবে কি পরিহাস

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

দূরের তারকা, তোমার পানেতে চেয়ে
ভেসে চলি কত দূর,
বিস্মৃতি হ'তে কত স্মৃতি আসে ছেয়ে
কানে বাজে নব সুর।

তুমি আছ থির, নহ চঞ্চল,
আমি অশান্ত চির-চঞ্চল;
বাসনা-লোলুপ লুব্ধ পরাণে দিশা-হারা ছুটে যাই,
তুমি শুধু দেখ মুগ্ধ নয়ানে, মরীচিকা—কিছু নাই।

তুমি আছ হায়, দূর নভোলোকে
পৃথিবীর বুকে আমি,
শতেক যোজন আঁধার-আলোকে
ব্যবধান দিবাযামী।

নীলিমার বুকে শুভ্র যূথিকা,
চির-আলোকের ক্ষুদ্র কণিকা,
অম্লান-দ্যুতি ভাতিবে গো তুমি শাশ্বত যুগ ধরি'
মানবের বুকে শুধুই ফিরিবে কোলাহল সঞ্চরি'।

জীবন ভরিয়া এমনি করিয়া করিবে কি পরিহাস,
জীবন তরণী এমনি বহিয়া পাব শুধু উপহাস?
শুভ্র তোমার অমলিন আলো
জ্বালায়ে তুলুক যত মোর কালো,

নীরব আশিস্ দিও তুমি মোরে মৃদু হাসিটুকু হেসে,
জীবন-সন্ধ্যায়, জীবনের ভোরে, জীবনের পথে এসে।



জলা পাহাড়ের নরভুক

শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

ঘটনাটি ঘটেছিল জলা পাহাড়ের কাছেই। বেশীদিনের কথা নয়। যোগেনদা টাউনে এসেছিলেন জমি-জমা সংক্রান্ত জরুরী কাজে। উকিল-বাড়ীতে বেশ দেরী হয়ে গেল। আসার সময় কাছারী থেকে কাহাকেও সঙ্গে আনতে পারেননি, কারণ দুইজন বরকন্দাজই মুহুরীর সঙ্গে খাজনা আদায়ের জন্য মহলে চলে গিয়েছিল। আজ সকালে আসার কথা ছিল কিন্তু ফেরেনি। মোটা টাকার কিস্তী—তার উপর দিনকাল যা পড়েছে তাতে সাবধান না হলে নিজেকেই গুণাগার দিতে হয়।

উকিল-বাড়ী থেকে ফেরার সময় কোন সঙ্গী না পাওয়ায় একলাই ফিরতে হল। ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ভয়ের কারণ কি একটি? প্রথম গরুর গাড়ীর চাকার দ্বারা তৈরী রাস্তা। চাকা ও নরম মাটির সংঘর্ষণে জায়-গায় জায়গায় গভীর গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ গর্ত্তের ভিতর আচমকায় পা পড়লে পুনরায় গোটা পা নিয়ে হাঁটার সম্ভাবনা থাকে কম। দ্বিতীয় বিষাক্ত সরীসৃপের অবাধ আনাগোনা। ওরা ছোবলের সংস্পর্শে কাহাকেও আনতে পারলে আত্মাকে শূন্যে হাঁটিয়ে ছাড়ে।

এর উপর হঠাৎ চিতা বাঘ বা দাঁতাল বুনো শুয়োরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে, জানোয়ার মানুষকে কি ভাবে আপ্যায়ন করবে, অনুমান করা শক্ত নয়। জানোয়ার ছাড়ান দিলেও রাস্তার ধারেই নীলকর সাহেবদের পোড়ো বাড়ীকে পাশ কাটাবার উপায় নেই। অতীতের কাহিনী আজও লোমহর্ষক ঘটনাকে জীবন্ত করে রেখেছে। দিনেরবেলাতেও ওদিকে যেতে গা ছম্-ছম্ করে।

যোগেনদা, দুর্গানাম স্মরণ করে রাস্তায় নেমে পড়ে-ছিলেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলেন। রাস্তার দুই ধারে ধান ক্ষেত, বাঁশঝাড়, বাবলা গাছ এবং পচা ডোবা। বাবলা গাছের ঝোপগুলি নির্ব্বিবাদে বাড়তে পেয়ে ঘন জঙ্গলের মত হয়ে গিয়েছে। বেলা তখন পড়ন্ত। যোগেনদার আশা ছিল কোন না কোন চাষীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। ওরা সন্ধ্যার দিকে দল বেঁধে হাঁটে। ক্ষেতজমির কাছে এলে যে যার মাচানে চলে যায়, ফসল পাহারা দেবার জন্যে। এদিকে বুনো শুয়োরের উৎপাত বড্ড বেশী। অনেক সময় ওদের বাচ্চা ধরার লোভে চিতাবাঘও জমির ভিতর ঢুকে যায়।

ইতিমধ্যে চারধার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। দৃষ্টি

প্রায় অচল, কেবল দূরে কাছারীসংলগ্ন শিবমন্দিরের সাদা দেওয়াল ঝাপসাভাবে দেখা যায়।

এইটুকু রাস্তা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, কিন্তু পথ আর শেষ হতে চায় না। চোখের কাজ বন্ধ হওয়ায় কান খাড়া করে রেখেছিলেন। যে রাস্তায় চলছিলেন সেখানে কখন, কোনদিক থেকে এবং কি ঘটবে জানার উপায় নেই। হঠাৎ মন্দিরের দিক থেকে যে ডাক শুনলেন তাতে রক্ত হিম হয়ে যাবার যোগাড়। যেখানে আশ্রয়ের আশা, সেইখানেই বিপদ প্রস্তুত থাকায়, যোগেনদা ভাবলেন রাত্রিটা নীল-কুঠিতেই কাটিয়ে দি ; কিন্তু নীল-কুঠির নাম মনে আসতেই, ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠল, নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললেন, "রাম, রাম, দুর্গা দুর্গা" স্ব-কর্ণে রামনাম শোনায়, দেবতাকে জোর গলায় স্মরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। শব্দের সঙ্গে আরো একটি সাবধানতার কথা ভাবতে লাগলেন। সচল সাদা কাপড়ের কথা। ঐ বস্তুটি দেখতে পেলে, শুয়োর ও চিতাবাঘ এমন কি জঙ্গলের বড়কর্তাও (বড় বাঘ) সহজে মানুষের কাছে ঘেঁসতে চায় না। বুদ্ধি ঘটে আসায় দলিলপত্র বগলদাবায় করে জামা খুলে ফেললেন। তারপর রজকের প্রথায়, থেকে থেকে মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন। শুকনো ডাঙ্গায় কাপড় কাচায় মনে বল পেলেন।

সামনে বিপদ, পাশে বিপদ, পিছনে কিছু আছে কিনা কে জানে। কোন দিক থেকেই যখন পরিত্রাণ নেই, তখন কপাল ঠুকে সামনে এগুনোই ভাল।

ইতিমধ্যে কাছারীর দিকে চিতাবাঘের ডাক থেমে গিয়েছে। যোগেনদার চলা থামেনি, শেষ পর্য্যন্ত কাছারীর উঠানে পৌছালেন। অবাক কাণ্ড রোয়াকে লণ্ঠন নেই, ঘরের দরজা পর্য্যন্ত খোলা। তার মানে, এই আসছি ভেবে ঠাকুর বেরিয়েছিল—তারপর ওপাড়ার মসগুলি আড্ডায় জমে যাওয়ায় ঘরের দিকে আর ফিরতে পারেনি। কাল যখন-খুসী এসে একটা অজুহাত দেবে আর কি। দলিল-পত্রের উপর কাহার নজর পড়েনি তো? মোকদ্দমার সময় এমনটি ঘটা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। ভিতরে ঢুকতেই পায়ের তলায় আঠার মত চ্যাটচেটে কোন তরল পদার্থের সহিত তাঁহার প্রাচীন ও প্রিয় চটি আটকে যেতে লাগল, প্রায় ছেঁড়ার অবস্থা। প্রথমেই মনে হোলো মাত্রাধিক্যের উদ্গীরণ। পানদোষ বেসামাল হলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালাতে দেখেন থোকা থোকা জমাট রক্ত এবং কাছেই তাঁহার রাত্রির আহার ঢাকা রয়েছে। ঢাকা হঠাৎ কিছুর সহিত ধাক্কা লাগায় বেশ খানিকটা ভাতের উপর উঠে গিয়েছে। দড়ির খাটও স্থানভ্রষ্ট, ঘরের ভিতর সব কিছুতেই কেমন একটা তোলপাড়ের ভাব। হঠাৎ চিতাবাঘের ডাক কাছারীর একটু কাছেই শোনা গেল, তাড়াতাড়ি দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন।

পক্কা টাটির দরজা মোটা কাঠের সাহায্যে বন্ধ হওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হবার অবসর পেলেন। বগল-দাবায় যে গোপনীয় দলিল চাপা পড়েছিল তার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এতক্ষণে মনে পড়ল সেটি ট্রাঙ্কে তুলে রাখা এখুনি দরকার। খাট সরে আসায় ট্রাঙ্ক আরো ভিতর দিকে ঢুকে গিয়েছে। কাগজ ভর্ত্তি ভারী বাক্স টেনে বার করাও এক হাঙ্গামা। দলিলকেও বাইরে রাখা যায় না। গত্যন্তরে ট্রাঙ্কের উপর টানা হেঁচড়া চলল। জমিদারীর কারবারে বলপ্রয়োগ অনেক সুবিধা এগিয়ে দেয়, যোগেনদার চেষ্টাও বিফল হয়নি। কোন প্রকারে বাক্সকে খাটের তলা থেকে বার করে দলিলটি গুছিয়ে রেখে, ডালা ডবল তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। আজকের রাতটা কাটাতে পারলে হয়, কাল যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে।

হাঁফ ছাড়ার সময় পেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন রাত নয়টা বেজে গিয়েছে। অম্লরোগী মানুষ, রাত্রির আহার সম্বন্ধে আর দেরী করা ভাল হবে না। কাজের মধ্যে এখন ঐটুকুই বাকী। পিঁড়ে পেতে খেতে বসলেন। ঢাকনার বাকিটা খুলতে দেখেন একটি পায়ের দাগ, বড়সড় জানোয়ারের পা, কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের থাবা। ভাতের অনেকটা অংশ পিষে দিয়েছে। মাটির মেজেতেও ভাতশুদ্ধ আধখানা থাবার ছাপ পড়েছে। বাঘ যেন টিপ-সই দিয়ে নিজের সনাক্তির ছাপ রেখে গিয়েছে। এতটা দেখার পর, যোগেনদা লণ্ঠন নিয়ে উঠলেন, দরজার কাছে আসতে দেখতে পেলেন কোমর পর্য্যন্ত উঁচু টাটির বেড়ায় ছেঁড়া ফিতেতে পানের বটুয়া ঝুলছে—তার সঙ্গে

সঙ্গে খানিকটা কাপড়। সন্দেহ রইল না ঠাকুরকে বাঘে নিয়েছে।

অকস্মাৎ আতঙ্ক যেন তাঁহাকে চেপে ধরল। বাঘ যদি আবার ফিরে আসে তো হালকা টাটির দেয়াল ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ? ঘরে একটিও অস্ত্র নেই। একনলা ঠাসা বন্দুক, টাঙ্গী...এমন কি রামদাটি পর্য্যন্ত বরকন্দাজরা নিয়ে গিয়েছে, বাবুদের টাকা সামলাবার জন্য।

অবস্থার ফেরে অবসাদ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। ক্রমান্বয় তন্দ্রার ঘোরে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও চোখ খুলে রাখা সম্ভব হোলো না। ক্লান্তি, উত্তেজনা সব কিছু জড়িয়ে তাঁহাকে কাবু করে ফেলেছিল।

কাছারীর নাগালেই ক্ষেত জমি। হঠাৎ তিনকড়ি বাগ্দীর মাচানে কেরোসিনের টিন বেজে উঠল। টিন পেটানর সঙ্গে চিৎকার শুনে যতগুলি কাছাকাছি মাচান ছিল সব কয়টি থেকে টিনের আওয়াজ সুরু হোল। বিকট শব্দ। সকলেই বুঝেছিল কেবল শুয়োর তাড়ানর জন্য ঐ রকম একযোগে চিৎকারের প্রয়োজন হয়নি। আত্মস্তোকের প্রয়োজন থাকায় যোগেনদা ভাবতে লাগলেন, তাহলে বাঘ ঐ দিকেই গিয়েছে। নিশ্চয় একলা যায়নি, বামুন ঠাকুরকেও নিয়ে গিয়েছে। যোগেনদার ভিতর থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। নিশ্চিন্ত হলেন, আহার ফেলে বাঘ এদিকে আসছে না।

একজনের মৃত্যুতে অপরের সান্ত্বনাকে নিন্দনীয় ভাবা স্বাভাবিক, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" প্রবাদ বাক্যটি উড়িয়ে দেয়া চলে না।

এদিকে টিন পেটান থেমে গেলে কি হয়। সব কয়টা মাচানে মশাল জ্বলে উঠেছে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে মশালের আগুন স্থানটিকে যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত করে ফেলেছে। একটার পর একটা চিতা জ্বলায় মনে হচ্ছে মড়কের মড়া পুড়ছে। কোনদিকে কোন শব্দ নেই। কেবল মানুষের হাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের নৃত্য চলেছে।

জঙ্গল ঘেঁসা গ্রামে, মানুষের অভিজ্ঞতা যতই নির্ভরশীল হোক, নিশ্চিন্ত হবার প্রতিশ্রুতি সব সময় থাকে না। বাঘেরও আচরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কোন বাঘ ভীতু, কোন বাঘ বেজায় সাহসী, কোনটা চালাক, কোনটা সাবধানতা সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। মানুষের মতই ওদের চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

খুব সম্ভব অতি নিকটে টিনের শব্দ ও মানুষের চিৎকার শুনে বাঘ বামুন-ঠাকুরকে ফেলে পালিয়েছিল। এরপর বেশ খানিকটা সময় কেটে যেতে মশালের আলোও ঝিমিয়ে যেতে লাগল।

যোগেনদা সঙ্কেত জড়িত শব্দের দিকে এতক্ষণ কানখাড়া রেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জেগে থাকা সম্ভব হোল না, বসা অবস্থাতেই হাঁটুর উপর কপাল রেখে ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। বেশীক্ষণ আরাম কপালে ছিল না। আতঙ্ক গা ঘেঁসে থাকায় সামান্য শব্দতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল; শুনলেন টাটির পাশে ষ্টীলের ট্রাঙ্ককে কিছুতে যেন আঁচড়াচ্ছে। ঘুমের ঘোর তখন কেটে গিয়েছে, বাক্সের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেটা নড়ছে। যত বড়ই ইঁদুর হোক, অত ভারী ট্রাঙ্ককে তো নড়াবার ক্ষমতা ইঁদুরের থাকতে পারে না। ঘরে আলো জ্বলছে, সুতরাং ভৌতিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। ঘটনাটি উঠে দেখতে হোল। কাছে এসে দেখেন একটি প্রকাণ্ড থাবা, টাটির দেয়াল ফুটো করে বাক্সকে ঠেলার চেষ্টা করছে। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চেষ্টা চললেই গোটা দেহ ভিতরে এসে পড়তে পারে। প্রথমটা বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি তাঁহার সহায় হোলো। যোগেনদা ট্রাঙ্কের একটা দিক তুলে ধরলেন, বাধা সরে যাওয়ায় বাঘের পা অনেকটা ভিতরে এসে গেল।

থাবা বাক্সের তলায় আসতেই প্রাণপণ শক্তিতে তার উপর বাক্স আছাড় মারলেন। বাক্সের কিনারা সশব্দে এসে পড়ল বাঘের নখের উপর। নখের উপর পড়তেই যোগেনদা সমস্ত দেহভার তার উপর চাপিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের মত হুঙ্কার দিয়ে হেঁচকা টানে বাঘ থাবা বার করে নিল। যোগেনদা বাক্সের উপর বসে পড়েছিলেন—হ্যাঁচকায় মেঝের উপর পড়ে গেলেন।

পরের দিন তিনকড়ি এবং অন্য চাষীরা নায়েববাবুকে খবর দিতে এসে দেখে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ—তাছাড়া রোয়াকে থোকা থোকা শুকনো রক্ত এবং দরজার পাশেই খানিকটা গর্ত্ত। সন্দেহজনক দৃশ্য, চাষীদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। অনেক ডাকা ডাকিতেও যখন দরজা খুলল

না—তখন জোর দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হোলো। লোকগুলি ভিতরে প্রবেশ করে দেখে, নায়েববাবু অজ্ঞান অবস্থায় বাক্সের পাশেই পড়ে আছেন। চোখে মুখে জল দিতে কিছুক্ষণ বাদে তাহার জ্ঞান ফিরে এল।

জ্ঞান ফিরে আসতে শুনলেন, বামুনঠাকুর মারা গিয়েছে। বাঘে মেরেছিল এবং তিনকড়ির মাচানের তলায় ফেলে গিয়েছে।

এতবড় বাঘ নাকি ওরা কখন দেখেনি। ঘটনাটির খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। স্থানীয় দারোগা-বাবুকে খবর দেবার পরই মেজবাবুকে বিশদ বিবরণসহ—লম্বা জরুরী টেলিগ্রামে জানান হোলো—এখুনি শিকারীর ব্যবস্থা না হলে চাষীরা ক্ষেতে যেতে পারছে না।

মেজবাবু জমিদার পরিবারের মেজ ছেলে। বয়স যৌবনকে পাশ কাটালেও স্বাস্থ্য তাঁহাকে যুবক করে রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই কুস্তী, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া, শিকার ইত্যাদি খেলাধুলার প্রতি বিশেষ আসক্তি থাকায় 'বাবু' খেতাবটি কাজে লাগানর অবকাশ পাননি। টেলিগ্রামে মানুষ মারার খবর পেয়েই জলা-পাহাড়ের কাছারীতে এসে উপস্থিত হলেন। লটবহর সঙ্গে কিছুই ছিল না। শিকারের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তাই নিয়ে এসেছিলেন। পুরো একদিন রেলপথে ভ্রমণের পর প্রায় আট মাইল গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে যে মানুষ ক্লান্তিবোধ করে না সে আবার কেমনতর জমিদার? এই ধরণের আলোচনা যখন প্রজাদের মধ্যে চলছিল, তখন মেজবাবু শিকারের আয়োজনে নেমে পড়েছেন।

রওনা হবার আগে তার যোগেই খবর দিয়েছিলেন যেন লাস পোড়ান না হয়। বামুন ঠাকুরকে বাঘে মারা Kill হিসাবে ব্যবহার করলে সামান্য চেষ্টাতেই বাঘকে পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এসে খবর পেলেন দাহ-ক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। বাঘ মারার একটা বড় সুযোগ নষ্ট হওয়ায় খুবই খারাপ লাগল।

ঘটনার প্রধান সাক্ষী তিনকড়ি। তখন কিছু করার না থাকায় তিনকড়ির কাছ থেকে খবর নিতে লাগলেন, এর আগে বাঘ এদিকে মানুষকে ঘর থেকে বার করে নিয়েছিল কিনা, রাস্তায় বা মাঠে কোন লোক আক্রান্ত হয়েছিল কিনা, আক্রমণ করার সময় সামনে থেকে আসে—না পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে। হঠাৎ কাছে হঠাৎ মাচান থেকে চিৎকার করে ওঠায় বাঘ কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করেছিল কিনা, ইত্যাদি। উত্তর যা শুনলেন, তাতে লাভজনক কিছু পাওয়া গেল না। বাঘ কি প্রকৃতির তা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর দাঁড় করাতে হোলো। মোটমাট যে সিদ্ধান্তে পৌছালেন তাতে জন্তুটিকে ঘরোয়ানা চালের নরভুক বলা চলে। বার্দ্ধক্য বা বিকলাঙ্গের অজুহাতে যারা মানুষ মারে তাদের সাহস আসে ক্ষুধার তাড়নায় এবং দৈহিক শক্তি অকেজো হবার দরুণ। দুই একবার সাহস কাজে লাগলে মানুষ মারা সহজ হয়ে যায়।

বর্ত্তমান আসামী, স্ব-হস্তে যোগাড় করা আহার ছেড়ে এই অঞ্চল থেকেই চলে গিয়েছে—তার মানে দূর গ্রামে আহারের সন্ধানে ঘুরছে। শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে এবং তার সঙ্গে বেজায় চালাক না হলে এই রূপটি সম্ভব নয়।

বাঘের চরিত্র বা শিকার ধরার পদ্ধতি যাই হোক, এখন যেখানে মরা মানুষটিকে ফেলেছিল সেই জায়গাটি পরীক্ষা করা দরকার। তিনকড়িকে বললেন, "চল দেখিয়ে দে কোথায় বামুন ঠাকুরকে ফেলেছিল।" তিনি জানতেন—দুই দিনের পুরোনো পদচিহ্নে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না, তবু যদি কিছু আশাপ্রদ জুটে যায়। যথাস্থানে এসে দেখলেন, জায়গাটি কর্দ্দমাক্ত। বহুলোকের সমাগমে মাটি একেবারে ময়দা সানা হয়ে গিয়েছে।

শিকারের গোড়াতেই যত রকমের কু-লক্ষণ এগিয়ে আসায় উৎসাহ ঝিমিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল, তবে মেজ-বাবু দমে যাবার পাত্র নয়। তিনি ভাবলেন ঘর থেকে টেনে বার করার সাহস যে বাঘের থাকে এবং মানুষ ধরার পর যদি হাতে পাওয়া আহার পরিত্যাগ করে পালাতে হয় তাহলে নয় কাছাকাছি কোন গ্রামে সে মানুষ মারবে, অথবা আবার এদিকে ফিরে আসবে।

কারণ ঘর থেকে মানুষ বের করার সাহস একটি ঘটনায় সংগ্রহ হয়নি। ওটা বেশ কিছুদিনের পুরানো অভ্যাস। তবে সব বাঘেরই আহার সন্ধানে টহল দেবার রীতি আলাদা। কোন বাঘ একদিন অন্তর একই রাস্তায় ফিরে আসে, কোনটি দুইদিন, এইভাবে সপ্তাহকাল বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তনের দিন স্থির থাকে।

মেজবাবু ভাবলেন, জীম করবেটের (Jim corbet শিকারী) মত নিজেই বাঘের আহার হয়ে কোন মওড়ায় অপেক্ষা করলে কি হয়। কিন্তু যেখানে বাঘেরই পাত্তা নেই সেখানে মওড়ার কথা অবান্তর। আপন মনেই একটা ফন্দী বার করেন, তার জবাবে অপ্রিয় সত্য সামনে এলে ভিন্ন মতলবের দিকে ঘুরতে হয়। অনেক রকম ঘোর-প্যাঁচের তোলপাড়ে নাজেহাল হয়ে ভাবলেন, নায়েব মশায়ের প্রতি বাঘ আকৃষ্ট হয়েছিল। ঐ ঘরে শুলে কেমন হয়? ওঘরে শুতে হলে, নায়েব মহাশয়কে তাঁবুতে যেতে হয়। কাপড়ের ঘরে উনি শোবেন বলে মনে হয় না, তবু বলে দেখা যাক। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতেই যোগেনদা বললেন, সেকি একটা কথা হোলো, আপনি শোবেন খোড়ো ঘরে—আর আরাম করব আমি আপনার তাঁবুতে? আপনি হলেন মুনিব আর আমি—। আপত্তির কারণ বুঝতে মেজবাবুর সময় লাগল না।

আরাম ভোগের জন্য মেজবাবু এখানে আসেন নি। আসলে আজ থেকেই টোপ ফেলে কোন জায়গায় বসবেন ঠিক করে এসেছিলেন।

তাঁবু ঘিরে সে ভাবে চুলি জ্বালান ও লোকজনকে দেহরক্ষী হিসাবে রাখা হয়েছে তাতে আবেষ্টনীতে শিকারের আবহাওয়া অপেক্ষা বাইজী নাচের প্রত্যাশা বেশী। এই ব্যবস্থার পিছনে সে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার আন্তরিক চেষ্টা ছিল সে বিষয় সন্দেহ করা চলে না, ঐ কারণেই মেজবাবু বললেন ব্যবস্থা খুব ভাল হয়েছে তবে অত সুখ আমার ধাতে সইবে না। দেরী হয়ে গেলে সব কিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে, তাই আজ থেকেই আমি নিজে একটু খানা-তল্লাসী করে আসি। পূর্ণিমার রাতে আলো ধরার জন্যে লোকেরও দরকার হবে না। বন্দুকে লাগান ১৮ সেলের (Shell) টরচ্ (Torch) তো আছেই, তাছাড়া আলাদা একটি ছোট টরচ্ পকেটে রইল আপনার কিছু ভাবনা নেই। মানুষ খেকো বাঘের সঙ্গে রাত্রিবেলা একলা পরিচয় করতে যাবার প্রস্তাবে সকলেই আপত্তি তুললেন কিন্তু মেজবাবু একবার কোন সিদ্ধান্তে এলে তার পরিবর্তন অসম্ভব।

যোগেনদাকে তোয়াজ করার প্রয়োজন থাকায় আহারের পর বিশ্রামের পালা শেষ করে বৈকাল থেকেই বন্দুকের কলকব্জা দেখে নিতে লাগলেন।

কোন পকেটে কোন টোটা রাখবেন, তাড়াতাড়ি কি ভাবে বার করবেন, অভ্যাস করে দেখা দরকার ছিল। তাঁহার শিকার তো উঁচু মাচান বা হাতীর উপর থেকে হাওদায় চড়ে গুলি চালান নয়—যে একজন পিছন থেকে যাবতীয় প্রয়োজনের সরবরাহ করবে। মৃত্যুর সহিত খেলার উৎসাহ দেখে অনেকেই ভাবল—নিশ্চয় কোন ঘরোয়া ঝগড়া হয়েছে, বাবু আত্মহত্যার জন্য এখানে এসেছেন।

বৈকাল পার হয়ে সন্ধ্যা এসে গিয়েছে। এরই ভিতর চাঁদের আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা সুরু করে দিয়েছে, মেজবাবুও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যে সব চাষীকে বাবুর দেহরক্ষী হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই উবে গিয়েছে—তাঁবুতে বাবু শুচ্ছেন না শুনে। যে কয়জনকে চোখে দেখা যাচ্ছিল তারাও চার-ধারে চুলি জ্বালিয়ে তাঁবুর মধ্যে গা ঢাকা দিল। ভীড় কমে যাওয়ায় যোগেনদা উস্‌খুস্ করছেন দেখে মেজবাবু বললেন, আপনি ঘরে ঢুকে হুড়কো দিন। না চাইতেই একান্ত প্রয়োজনীয়কে পেয়ে যাওয়ায় যোগেনদা বললেন—হুজুর যখন বলছেন তখন আপনার আদেশ অমান্য করি কেমন করে। কথাটা শেষ করেই বাধ্যতার প্রমাণ দিতে সময়-ক্ষেপ করলেন না।

যোগেনদা যে সত্যই ভিতরে গিয়ে হুড়কো লাগাবেন এতটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁহার ব্যবহারে আদর্শ প্রভুভক্তির নমুনা দেখে মেজবাবু মনে মনে হাসলেন। বন্দুকের ঘোড়া (trigger) পরীক্ষা করে, দুই নলে দুই রকম টোটা ভরে নিলেন। তারপর আমাদের চেনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গম্যস্থল বলে নির্দ্দিষ্ট কিছু ছিল না, চলাটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। যদি প্রার্থিত জীবটির সহিত দেখা হয়ে যায়। বাঘ পরিষ্কার ও জানা রাস্তা পেলে কখনও অন্য পথে চলতে চায় না। খুব সম্ভবতঃ কাঁটার ভয়েই এই রূপটি হয়ে থাকে কারণ বাঘের পায়ের তলায় sponge rubberএর মত প্যাডিং (padding) থ.কে নিঃশব্দে হাঁটার জন্য। চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই এগুচ্ছিলেন, চতুর্দ্দিক বলতে পিছনটাও বাদ দেন নি, মাঝে মাঝে ওদিকটাও ঘুরে দেখে নিচ্ছিলেন—কারণ হিসাব করা

আক্রমণে বাঘ কখন সামনে থেকে আসে না। পোয়া-খানেক হাঁটার পর মনে হোলো একটু দূরে বাঘ তাহারই দিকেই এগিয়ে আসছে এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলের দু'পাশে তাকাচ্ছে। ফিনফোটা জ্যোৎস্নার আলোয় দৃষ্টিভ্রমের প্রশ্ন ছিল না। মেজবাবু বন্দুক ঠিক করে দাঁড়িয়ে গেলেন বাঘ তখন টরচের পাল্লার বাইরে,একশ গজের উপরে হবে।

আশ্চর্য্যের কথা! মানুষ থেকো বাঘ, রাস্তার মাঝ-খানে লোভনীয় আহারকে দেখেও সোজা তাহারই দিকে এগিয়ে আসছে। ষাট গজের কাছাকাছি আসতে বাঘ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মেজবাবুও আলো জ্বালার আগে আন্দাজে যতটা সম্ভব মাথার উপর নিশানা ঠিক করে টরচের সুইচ টিপবেন ঠিক করেছিলেন। সুইচের কাছে আঙুল এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় বাঘ লাফ মেরে কাছারী বাড়ীর দিকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। তখন উত্তেজনা এমন ভাবেই তাঁহাকে পেয়ে বসেছিল যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাবতে লাগলেন বাঘের অস্বাভাবিক আচরণের কথা। হয়ত অন্যমনস্ক হয়েছিল কিন্তু যে বাঘ নরভুক সে নিরালায় অত সুবিধার মধ্যে মানুষকে দেখে অন্যমনস্ক হয় কেমন করে? এ ছাড়া হয়ত আরও অনেক প্রশ্ন তাঁহাকে ভাবিয়ে তুলত কিন্তু কাছারীর দিক থেকে হৈ-চৈএর আওয়াজ উঠল। সব চিন্তা ফেলে, মেজবাবু ছুটে গোলমালের জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। যা ভেবেছিলেন তাই ঘটেছে, যোগাড় করা মানুষদের মধ্যে একজন কমে গিয়েছে। এইটুকু সময়ের ভিতর চিলে ছোঁ-মারার মত ভীড় থেকে মানুষকে নিয়ে যাবে এতটা ভাবতে পারেন নি। অনুমান করে-ছিলেন বাঘকে দেখে—সকলে চীৎকার করে উঠেছিল।

ঘটনাটি এইরূপ, লোকটা প্রাকৃতিক ডাকে ঝোপের দিকে গিয়েছিল। কাজের শেষে রাস্তার দিকে পিছন ফিরতেই বাঘ লোকটির উপর লাফিয়ে পড়ে, এবং মানুষটি পড়ে যেতেই তাকে হিঁচড়ে ঝোপের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। এত বড় বাঘ যে ওদিকে এগুতে কেহ সাহস পায় নি। লোকটাকে নিয়ে যাবার সময় তার গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বের হয়নি।

শান্তভাবে মেজবাবু সব শুনলেন। তার পরেই তাঁহার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। বললেন শীগ্‌গির জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে তাঁহার পিছনে আসতে। বলাটা অনুরোধের সুরে ছিল, ফলে বেশীর ভাগ লোকই পিছনে আসার পরিবর্ত্তে পিছিয়ে পড়ল। যে কয়জন সাহসী ছিল তারা মেজবাবুর বাতি লাগান বন্দুককে বিশ্বাস করে ফেলেছিল, নির্দ্দেশকে এড়িয়ে যাওয়া দরকার বোধ করল না।

বন্দুক সংলগ্ন আঠারো সেলের (shell) টরচ্‌কে (torch) জ্বালিয়ে রাখার উপায় নেই কারণ বালবের (bulb) আয়ু মাত্র সাত সেকেণ্ড, তারপরেই ফিউজ হয়ে যায়।

আলোটি কেবল গুলি চালানর সময় জ্বালা হয়। পকেটের ছোট টরচ্‌ খুব কার্য্যকরী না হলেও, বাঘের চোখ খোঁজার জন্য ঐটুকুই প্রধান অবলম্বন। খানিকটা ঝোপের দিকে যেতেই যে গর্জ্জন শোনা গেল তাতে সব কয়টি সাহসী পুরুষ যে যেদিকে পারল চোখ-কান বুজিয়ে ছুট দিল। বাঘ এত কাছে, যে ছোট টরচ্‌ ব্যবহার করা চলে না—কিছু দেখা গেলেও দুই হাত জোড়া থাকায় বন্দুক চালানর বিশেষ অসুবিধা হবে কারণ কিছু ঘটলে নিশানা করার সময় পাওয়া যাবে না। গত্যন্তরে রেডি ট্রিগারযুক্ত বন্দুকে লাগান টরচ্‌ই জ্বালতে হোলো। যেদিক থেকে গর্জ্জন শুনেছিলেন সেদিকে বাঘের চোখ দেখা গেল না। এদিক ওদিক ঘোরাতে যেটুকু সময় লাগল তাতেই আলোর আয়ু শেষ হয়ে গেল। ঘন ঝোপের তলা তখন ঘোর অন্ধকারে চাপা পড়েছে। বাঘ কয়েক হাতের মধ্যেই তাঁহাকে দেখছে। অথচ মেজবাবু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এইরূপ অবস্থায় বাঘকে তাড়াতে হলে শূন্যে গুলি চালান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বিকট আওয়াজের সহিত গুলি বেরিয়ে যেতেই পুনরায় গর্জ্জন শুনলেন, তার পরেই কয়েকটি শুকনো কাঠি ভাঙ্গার আওয়াজ পেলেন। শুভ সঙ্কেত, বাঘ শিকার ছেড়ে পালিয়েছে, তবে কত দূর গিয়েছে বলা শক্ত।

এক হাতে বন্দুক ধরে পুনরায় ছোট টরচের সাহায্যে জ্বলন্ত চোখ খুঁজতে লাগলেন কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন, নরখাদক যেদিকেই যাক সে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাবেই। আলো কাছাকাছি সব জায়গাতেই ঘুরে এল, কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

এখন কি করা যায়? মানুষটা হয়ত বেঁচে থাকতে পারে। তাকে বাঘের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হলে এখুনি চেষ্টা না করলে কাল আর তাকে পাওয়া যাবে না। শিকারীর আত্মমর্য্যাদা যেন ভিতর থেকে আদেশ দিল নিজের মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে মানুষটাকে বাঁচাও। তোমাকে বিপদের বাইরে রাখার জন্যই লোকটা এখানে এসেছিল। তুমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে, যদি নোংরা কাপুরুষের মত ফিরে যাও। পরিহাস জড়িতঅন্তরের আদেশ তাঁহাকে উত্তেজিত করে তুলল। সামনে কয়েক পা এগিয়ে আসতে ঘন কাঁটা গাছের ডাল তাঁহার হাতের উপর এসে পড়ল। বিষাক্ত কাঁটার ঘনিষ্ঠতায়, ভীমরুলের হুল ফোটানর প্রতিক্রিয়া ছিল। হঠাৎ হাত নাড়াতেই ট্রিগারের উপর আঙ্গুলেও কাঁটা বিঁধে গেল। তারপর মুহূর্ত্তেই অতি নিকটে কয়েক হাতের মধ্যে বিকট গর্জ্জন শুনলেন। বন্দুকের দুইটি নলই খালি।

পকেট থেকে টোটা বার করার সাহসও নেই। সামান্য নড়াচড়াতেই বাঘের দৃষ্টি বেশী করে আকৃষ্ট হবে। নিশ্চল অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। এরই ভিতর বাঘের গোঙ্গানীর আওয়াজ শোনা গেল, এই জাতীয় শব্দের সহিত মেজবাবুর বহুবার পরিচয় হয়েছে। নিশ্চিন্ত হলেন বাঘের শ্বাসক্রিয়া শুরু হয়েছে আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ওর ভয়াল ভবলীলা শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যাশায় ভুল হয়নি, কিছুক্ষণ পরেই আবেষ্টনী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এইটুকু সময়ের ভিতর যে কালঘাম তাঁহাকে ভিজিয়ে দিয়েছিল বুঝতে পারেন নি। উত্তেজনা স্তিমিত হওয়ায় মনে হোলো বরফ দিয়ে তাঁহাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আরো খানিকটা সময় কেটে যেতে কাছারীর দিকে ফিরলেন।

উঠানে একটি লোকও নেই। তাঁবুর ভিতর থেকেও কোন মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। নায়েব মহাশয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধই আছে। পুরুষের আগমনে অন্তঃপুরিকাদের যে ভাবে গলা খাকরাণী দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে মেজবাবু সাঙ্কেতিক শব্দটি ব্যবহার করতেই একজন দুইজন করে তাঁবুর ভিতর থেকে পর্দ্দানশীন পুরুষদের মাথা বার হতে লাগল। ভীত, চকিত নানারূপ মুখাকৃতি দেখে, জঙ্গলের বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করার ইচ্ছা এসেছিল কিন্তু একটি মুহূর্ত্ত নষ্ট করার সময় ছিল না—রাশভারী গলায় জানালেন, এখুনি আট দশটা মশাল চাই। নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে, বাঁশ কিম্বা ডালে বাঁধ—আর আমার ঘি, তেল যা এসেছে তাই দিয়ে ভেজাও। মেজবাবুর গলা শুনে যোগেনদা একটু দরজা খুলেছিলেন, ঘি তেল দিয়ে মশাল জ্বালার আদেশ শুনে ধীরে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাঘের হুঙ্কার ছিল ভাল। মেজবাবুর হুকুম তার চেয়েও ভীতিপ্রদ। বাঘের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় কিন্তু মেজবাবুর হুকুম না মানলে সব কিছুই ঘটতে পারে। দেখতে দেখতে মশাল তৈরী হয়ে গেল। লোকেরা এবার সত্যই মেজবাবুর পিছু নিল। অতগুলি মশালের আলোয় বাঘকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না, দেখা গেল, মহা-শক্তিশালী ভয়ঙ্করের প্রতীক অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। বাঘে-ধরা মানুষটি সজ্ঞানে পড়েছিল। লোকটা কথা বলার চেষ্টায় কতকগুলি জড়ান শব্দ বার হোলো মাত্র—যা বলল তা অর্থহীন। ভয়ে লোকটা পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। গলায় বা মুখে কোথাও কামড়ের দাগ নেই। বাঘ ধরেছিল কাঁধের কাছে।

পিঠে যে থাবা পড়েছিল সেইটি সাংঘাতিক। কাছারীতে নিয়ে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট কড়াভাবে ক্ষত-স্থানে লাগিয়ে দেওয়ায় যে যন্ত্রণা উঠল তা দেখার চেয়ে লোকটার মৃত্যু হলে ভাল হত। রেলগাড়ীতে পাঠালেও এ তল্লাটে ৫০ মাইলের ভিতর বাঘে খাওয়া মানুষের শুশ্রূষার উপযুক্ত হাসপাতাল নেই। মেজবাবু বিশদ বিবরণ সহ চিঠির মত লম্বা টেলিগ্রাম বাড়ীতে পাঠালেন ওষুধসহ ডাক্তারকে পাঠানর জন্য। উপযুক্ত সময় ডাক্তার এসে পড়েছিলেন, তা না হলে লোকটাও বাঁচত না এবং নাখেরাজ চার বিঘা আবাদি জমিও বংশপরম্পরায় ভোগ দখলের অধিকার পেত না।

সামান্য কাঁটাও সে ঘটনাচক্রের সহায়তায় বাঘ শিকার করতে পারে, মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারে এ কথা কেহ বিশ্বাস করবেন না বলেই গল্পটি মেজবাবুর অনুমতি নিয়ে লিখতে হোলো।

কঃ পন্থাঃ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাণে গল্প আছে দেবতা ও অসুরগণ লক্ষ্মীর সন্ধানে সমুদ্র মন্থন করেছিল। সমুদ্র মন্থন করতে করতে লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল ঠিক, অমৃত ভাণ্ডও জুটে ছিল; কিন্তু গরলও উঠেছিল সেই সঙ্গে। ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষও লক্ষ্মীর সন্ধানে শক্তির সাধনা করেছিল। সেই সাধনার বলে পৃথিবীর বুকে তার নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায় যে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে জীবনে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস করেছে। প্রথম যুগে নিজের দৈহিক শক্তিকে সে সম্বল করেছিল। দ্বিতীয় যুগে পশুশক্তিকে আয়ত্ত ক'রে সে এক নূতন সমাজ বিন্যাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে সমৃদ্ধির প্রাচুর্য্য না থাক, অশান্তি সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর তৃতীয় যুগের সূত্রপাত হল যখন সে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে আয়ত্ত করতে পারল। সেই তৃতীয় যুগকে শিল্প বিপ্লব বলে নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে অপরিসীম শক্তি তার জীবনে ব্যাপক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা সম্ভব করল, তাই যেন সঙ্গে এনে দিল দুই ভাণ্ড গরল। একদিকে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক বিরোধ ও অপরদিকে শাসিত ও শাসকের দেশের বিরোধ। এই দুই গরলের বিষাক্ত সংস্পর্শ তার বাস্তব সংগতির ঐশ্বর্য্যকে বিড়ম্বিত করল, তার জীবনকে অশান্তিতে ভরে দিল।

মানুষের জীবনের ইতিহাসের এই তৃতীয় যুগ এখনও শেষ হয়নি। তা দ্রুতগতিতে যেন এক চূড়ান্ত সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ এক নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

মানুষের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস এই শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সে সংঘর্ষ পূর্ব্বে ক্ষুদ্র আকারে ছিল, এখন তা ব্যাপকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত নানা শক্তিকে সে আবিষ্কার করেছে এবং তাদের আয়ত্ত ক'রে আরও শক্তিমান হয়েছে। বাস্তবিক বলতে কি গত পঞ্চাশ বছরের মানুষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, বিরাট আকারে এই শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। সে সংঘর্ষ ক্রমশই আরও মারাত্মক এবং আরও ধ্বংসাত্মক রূপ নিচ্ছে।

নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর যে জাতিগুলি শক্তি ও সমৃদ্ধিতে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে, তাদের মস্তব্য যেন একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুক্ষণ জেগে রয়েছে। তার প্রেরণা একদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা গেল ইউরোপের শক্তিশালী জাতিগুলি পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতিগুলিকে গ্রাস করতে উন্মুখ। ইতিপূর্ব্বেই এসিয়ার সমগ্র দক্ষিণ ভাগ প্রায় তাদের আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে কি কাড়াকাড়ি না পড়ে গেল। সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলির রেশারেশি চূড়ান্ত আকারে আত্মপ্রকাশ করল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে। জার্মানির সাম্রাজ্যলিপ্সা ইংরেজের বিরাট সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করতে বসেছিল। তাই এই প্রলয়ঙ্করর সংঘর্ষ।

এই সংঘর্ষের ফলে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য ও তার মিত্র সাম্রাজ্য অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি টিকে রইল। কিন্তু সেই সংঘর্ষের ফলেই একটি নূতন রাষ্ট্রশক্তি জন্মগ্রহণ করল যা ভবিষ্যতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অংশ গ্রহণ করবে। রুশ সম্রাটের স্বৈরতন্ত্রকে বিলোপ করে যে নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হল তা শ্রমিক-মালিক বিরোধে শ্রমিকের পক্ষ গ্রহণ করল।

শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্বের মীমাংসা একটা এইভাবে হতে পারে যে মালিকশ্রেণী একেবারে থাকবে না কেবল শ্রমিক নিয়ে সমাজ হবে। যাঁরা এই রাষ্ট্রের ভাগ্য-বিধাতা হলেন তাঁরা যাঁকে গুরু বলে মেনে নিলেন, তিনি বিধান দিয়েছিলেন মালিক শ্রেণী থাকবে না। তাঁর সেই নূতন বিধান যেন নূতন যুগের নূতন পরিবেশে এক নূতন ধর্ম্মের বিধান। সেকালের ধর্ম্মগুলির সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়, কেবল লক্ষ্য বস্তুর পার্থক্য তাদের কিছু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে।

সেকালের মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। জগতের খানিকটা সে বুঝত, বেশীর ভাগটাই বুঝত না। যে মহাশক্তি তাকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করেছে তার স্বরূপ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হত না। মানুষ জানতে শেখে পরিচিতের সহিত অপরিচিতের সংযোগ স্থাপন করে। তাই তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে, তার বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিতে এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সেই শক্তিকে যেমন কল্পনা করেছিল তা তার জানা জগতের সংগে মিল রেখেছিল। তাই সেই শক্তিকে সে একটি সর্ব্বশক্তিমান পুরুষোত্তমরূপে কল্পনা করেছিল, তাঁর বাসের জন্য ঊর্দ্ধলোকে স্বর্গরাজ্যেরও কল্পনা করেছিল। জীবনকে মানুষ বড় ভালবাসে। তাই পরলোকের অস্তিত্বও কল্পনা করেছিল। পরলোকে সুখে থাকবার প্রয়োজনে সে পুণ্য সঞ্চয়েরও প্রয়োজনীয়তা বোধ করত। এইরূপ কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাসই মানুষের ধর্ম্মের ভিত্তি। সে ইহলোক ও পরলোক মুখাপেক্ষী হয়ে তার শাস্ত্রকারের নির্দ্দেশ অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে পালন করত।

যে নব বিধানকে এই নূতন রাষ্ট্রগ্রহণ করল তাও এই ধরণের। তারও ভিত্তি কতকগুলি সুদৃঢ় বিশ্বাস। তবে বর্ত্তমান যুগে যে পরিবেশে

তাদের জন্য, 'সেই পরিবেশ তার রূপটাকে একটু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে মানুষের জ্ঞানের সীমা এখন অনেক প্রসার লাভ করেছে। তার দৃষ্টিশক্তি এখন মহাশূন্যের গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। আমেরিকায় মাউণ্ট, পালোমারের অবেক্ষণাগারে যে দূরবীক্ষণটি স্থাপিত হয়েছে তার ব্যাস দুশো ইঞ্চি। তার বক্ষে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসরের দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রের সন্ধান দেয়। সেখানে মানুষ কোথাও স্বর্গরাজ্যের সন্ধান পায় না। সে দেখে, যে নিগূঢ় শক্তি বিশ্বকে পরিচালিত করে তার কার্য্যক্রমকে কতকগুলি নিয়মে বাঁধা যায়, এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ করে তার অপরিসীম শক্তির কিছু অংশ সে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং স্বর্গে আর তার বিশ্বাস নাই। ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট করুণার আধার প্রেমময় ভগবানে তার আস্থা সে হারিয়েছে। পরলোকের স্বপ্ন তার ধূলিসাৎ হয়েছে। তাই সে ইহলোক মুখাপেক্ষী হয়ে বর্ত্তমান জীবনেই সুখের সন্ধান করে। যন্ত্রের সাধনায় যে পণ্যদ্রব্যগুলি সে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে তাকে ব্যবহার ক'রে এক স্থূল ভোগাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এই নব-বিধানের নূতন শাস্ত্রকার বিধান দিলেন যে ইহলোকই সব, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। বাস্তব সম্পত্তি আহরণ ক'রে তার স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল সম্ভোগের উপকরণই সে জোগান দিতে পারে। কিন্তু তার অন্তরায় হল মালিক-শ্রেণী, কারণ তারা ভাগ্যবস্তুর প্রতি অতি লোভপরায়ণ এবং পারলে সবটাই কোলে টানে। কাজেই শ্রেণীবিহীন সমাজ স্থাপন কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাস আনে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ। কাজেই এই নূতন রাষ্ট্র যখন এই নব-বিধানকে তাদের রাষ্ট্রের ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করল, তখন ভিন্ন মতবাদীরা তাদের চক্ষে বিধর্ম্মী হল। এর ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর সংঘর্ষটা একটা নূতন রূপ নিল। পূর্ব্বে যেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিযোগিতার যুদ্ধ এখন সেটা হয়ে দাঁড়াল এই নূতন বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম্মে যারা বিশ্বাসী এবং যারা এ ধর্ম্মগ্রহণ করে নি তাদের রেষারেষি।

যারা এই ধর্ম্মকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, সেই জাতিরা বলে মালিক ও শ্রমিকের বিরোধে মালিকের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর সমাধান অন্য পথে আইন দ্বারা সম্ভব হয়। যেটা প্রয়োজন তা হল মালিকের হাতে অত্যধিক ধন সঞ্চয় যাতে না হয় তাই দেখা। তার দরুন এই নব-বিধান যে নির্দ্দেশ দেয় তাতে ত ঠিক মালিকের উচ্ছেদ হয় না। বহু মালিকের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রই এক মাত্র মালিক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সকল মানুষই হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক। ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অত্যধিক হস্তক্ষেপ হয়।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এইভাবে এক আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিভাগ এসে পড়ল। পৃথিবীর শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল এই বস্তুতান্ত্রিক নববিধানে একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ। অপর দল তার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ,ব্যাপারটিকে আরও মারাত্মক সম্ভাবনায় পূর্ণ ক'রে তুলল। সে কথাটা বুঝতে হলে বিংশ শতাব্দীর গত কয়েক দশকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে মানুষের সংহার শক্তি কতখানি আয়ত্ত হয়েছে, তা বোঝা দরকার।

প্রেম যেমন মহাশক্তির আধার, বিদ্বেষও তেমন মহাশক্তির প্রেরণা। প্রেমাস্পদের জন্য মানুষ কিনা করতে পারি? আবার বিদ্বেষের বশীভূত হলে মানুষের সাধ্যাতীত কিছু নাই। তবে উভয়ের একটা বড় পার্থক্য আছে। প্রেম সৃষ্টির অনুকূল, বিদ্বেষ সংহারের অনুকূল। মানুষ ভালবেসে প্রিয়জনের জন্য ঘর বাঁধে; সেই ঘরকে কত মনোরম ক'রে সাজায়। বিদ্বেষ শত্রুর ঘরকে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে উৎসাহিত করে। মানুষের ইতিহাসের তৃতীয় যুগে যে দুই গরলের ভাণ্ড মানুষের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করেছে, তার বিষাক্ত আবহাওয়া নিদারুণ বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করেছে। তাই যার প্রতি তার বিদ্বেষ, তার ধ্বংসের জন্য নূতন মারণ অস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য কি গভীর সাধনা সে করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষই মানব সমাজে বড় প্রেরণা এবং সেই প্রেরণাই তাকে উৎসাহিত করেছে তার বৈজ্ঞানিক ও তার প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী শিল্পীকে উগ্র হতে উগ্রতর মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে। ধ্বংস করবার উন্মাদ স্পৃহাই তার একমাত্র প্রেরণা। কারণ বিদ্বেষই ধ্বংসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যে জার্ম্মাণ জাতির মুখে পরাজয়ের কল লেপিত হল, সেই জার্ম্মাণ জাতি বিজ্ঞানে ভারি প্রগতিশীল। তার পরাজয়ের গ্লানি, তার প্রতিহিংসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে উৎসাহিত করল মারণকার্য্যে পটুত্ব অর্জ্জন করবার সাধনায়। হিটলারের নেতৃত্ব তাই যখন তার প্রতিহিংসাবৃত্তি ইন্ধন পেল, তখন জগতকে বিস্মিত করে অতি অল্পকালের মধ্যে সেই জাতি এমন নিপুণ সেনাবাহিনী গড়ে তুলল যা বিদ্যুৎ যুদ্ধে পারদর্শী। এই নূতন যন্ত্রের উপর অবিচলিত আস্থা তাদের উন্মাদনা দিল নূতন করে রণমদে মাততে। সুরু হল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই ধ্বংসময় মহাযুদ্ধের মধ্যেই চলল তাদের নূতন সংহার শক্তির আবিষ্কারের সাধনা। সেই সংহার শক্তির সন্ধানও তারা পেল এবং যখন তা প্রায় আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল তখন তাদের পরাজয় ঘটল।

বিজেতা জাতির উত্তরাধিকারের দাবীতে আমেরিকা তখন এই নূতন লব্ধ জ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে পরমাণুকে ভাঙতে শিখল। ইউরেনিয়াম ধাতুর এক শ্রেণীর অণুকে বৈদ্যুতিক আঘাত হেনে ভাঙতে পারা যায়। তার ফলে যে তেজ এবং তাপ নির্গত হয় তা মানুষের ধারণাতীত। প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তাকে ব্যবহার করতে মানুষ অনেক দিন শিখেছে। কিন্তু এমন বিরাট ধ্বংসাত্মক শক্তি তার নাগালে এই প্রথম এল। একই প্রণালীতে হাইড্রোজেনের অণুর সহিত বৈদ্যুতিক উপাদান যোগ ক'রে হিলিয়ম অণুকে পরিণত করতে শিখে অনুরূপ নীতির ভিত্তিতে আরও অধিক তেজ উৎপাদক সংহার অস্ত্র সে

উদ্ভাবন করল। সূর্য্যের চুল্লীতে যে প্রক্রিয়া তাকে অমিত তেজঃপুঞ্জের ক্ষয়হীন ভাণ্ডারের অধিকারী করে, সেই প্রক্রিয়া সে আয়ত্ত করল।

এমন প্রলয়ঙ্কর শক্তি যে জাতির আয়ত্ত তার সহিত যে জাতির মিল নাই, সে জাতিও এ বিষয় তাকে একমাত্র অধিকারী হয়ে থাকতে দিতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পৃথিবীতে দুটি মহাশক্তিধর জাতি প্রতিষ্ঠিত হল। এক দিকে মার্কিন জাতি ও অপর দিকে রুশ জাতি। রুশিয়া নববিধানের ধর্ম্মগ্রহণ করেছে। আমেরিকা তার ঘোর বিরোধী। এই পরিস্থিতিতে রুশিয়ার নিরাপত্তা নির্ভর করে অনুরূপভাবে এই প্রলয়ঙ্কর শক্তিকে আয়ত্ত করার উপর। কয়েক বছরের সাধনার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। এখন অনুরূপ অস্ত্রে রুশিয়াও সজ্জিত।

অবস্থাটা দেখে মনে পড়ে যায় ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'নক আউট টুর্ণামেন্ট'এর কথা। অবশ্য একটি হল খেলা এবং অপরটি জীবন মরণ সমস্যা। তবু মিল আছে। ফুটবলি প্রতিযোগিতায় একে অপরকে হারিয়ে প্রতিযোগিতা হতে বাহির ক'রে দেয় এবং শেষ ধাপে অবশিষ্ট থাকে মাত্র দুটি দল। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যে দল জিতবে সেই হবে চ্যাম্পিয়ান। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে দলাদলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক শক্তিগুলির যে সমাবেশ হয়েছে, তা অনেকটা এই ধরণের। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে অনেকগুলি মহাশক্তি চাপা পড়ে গেছে, বাকিগুলি হীনবীর্য্য হয়েছে। আরও শক্তি সঞ্চয় ক'রে নির্গত হয়েছে দুটি মহাশক্তি। একটি রুশ মহারাষ্ট্র, অপরটি উত্তর আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা উভয়ের অপরিসীম। যন্ত্রের স্রষ্টা এবং যন্ত্রের পরিচালক হিসাবে এই দুটি জাতির হস্তে যে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা কল্পনাতীত। অপরপক্ষে পরমাণু হতে উদ্ভূত শক্তি ব্যবহার ক'রে প্রলয়ঙ্কর বোমা নির্ম্মাণের ক্ষমতা উভয়েরই হস্তগত এবং সেই বোমার সঞ্চয় তাদের উভয়ের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত। অপর পক্ষে এই দুই মহাজাতির অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হবার সম্ভাবনা রাখে।

তাই বলছিলাম রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে শক্তির প্রতিযোগিতায় কত বিভিন্ন জাতি যে যোগ দিয়েছিল আর তারা একে একে পরাভূত হয়ে রঙ্গমঞ্চ হতে যেন অপসারিত হয়েছে। এখন বাকি রয়েছে দুই মহাশক্তি। তাদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ঘটতে যেন বাকি রয়ে গিয়েছে। ফুটবল খেলায় এইরূপ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষ উৎসুক হবে। একদল জিতবে অপর দল হারবে। যে দল জিতবে তারা হবে খুসী। যে দল হারবে তারা চূড়ান্ত বিজয়ের গৌরব হতে বঞ্চিত হবে। আর যারা নিরপেক্ষ ক্রীড়ানুরাগী তারা খেলা দেখে খুসী হবে। কিন্তু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা ঘটবার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই মানুষের আতঙ্ক লাগে। এটি ত খেলার প্রতিযোগিতা নয়। এ যে চূড়ান্ত সংহারের প্রতিযোগিতা। এ যে প্রলয়ের খেলা। জয় পরাজয়ের কথা এখানে অবান্তর। দুই শক্তিরই এমন ধ্বংস বিধানের ক্ষমতা আছে যে একে অপরকে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে সংহার করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই সংঘর্ষ যে প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত করবে, তা উভয় শক্তিকে ত সংহার করবেই, উপরন্তু কোনো নিরপেক্ষ জাতিও সেই সর্ব্বাত্মক বিনাশ হতে রক্ষা পাবে না। সেই বিশ্বগ্রাসী প্রলয় পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই সংহার করবে।

এই সর্ব্বাত্মক প্রলয় হতে মানুষের পরিত্রাণের উপায় আছে কি? থাকলে তা কোন পথে আছে? যে পথে মানুষ বর্ত্তমানে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত সে পথে নাই। উভয় শক্তিই উন্নত হতে উন্নততর ধ্বংসাত্মক বোমা উৎপাদনে লিপ্ত এবং মাঝে মাঝে তার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। তুলনায় হীনবল অথচ বিজ্ঞানে অগ্রবর্ত্তী অন্য যে জাতি আছে, তারাও অনুরূপ বোমা নির্ম্মাণে দক্ষতা লাভ করেছে। তারাও মাঝে মাঝে বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ফলে বিস্ফোরণে উদ্ভূত রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলটিকে ক্রমশ দূষিত ক'রে তুলছে। এই দোষণের মাত্রা যখন নিরাপত্তার সীমা লঙ্ঘন করবে, তখন পৃথিবীর বক্ষে মানুষের প্রাণ ধারণের ক্ষমতা আর থাকবে না। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না হক পরোক্ষ বিষক্রিয়ার ফলেও পরিণতি একই হয়ে দাঁড়াবে।

এই আসন্ন সর্ব্বাত্মক সংহারের গ্রাস হতে অব্যাহতি লাভের একটি মাত্র পথ আছে। যে ঘৃণা যে বিদ্বেষ বোধ এই সংহারের উন্মাদনায় বিভিন্ন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাকে নির্ব্বাসন দেওয়া। সেটি কি সম্ভব হয় না? সহাবস্থিতির নীতি এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। হিংসাকে মনে পোষণ ক'রে রেখে সহাবস্থিতি নীতি বিশেষ ফল দেবে না। এটি একটি কৃত্রিম পরিস্থিতি। আমি আমার বিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ক'রে যেমন আছি, আমার বিপক্ষও তেমন আছে। আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুধু এড়িয়ে চলি এই কারণে, যে জানি আমরা উভয়কেই উভয়ে যুগপৎ সংহার করবার ক্ষমতা রাখি। বিদ্বেষভাবের মাত্রা বেড়ে গেলে এটুকু বিবেচনা বুদ্ধিও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন প্রলয়ের পথ রোধ করা যাবে না।

সুতরাং বিদ্বেষ বোধ নির্ব্বাসনই একমাত্র নিষ্কৃতির পথ। বিবাদের যা মূল, এই দুই বিভিন্নমুখী আদর্শের যা ভিত্তি, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে উভয় ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ এই যে দুটি বিপরীতমুখী আদর্শ, তাদের লক্ষ্যবস্তুর কোনো বিভিন্নতা নাই। উভয়েরই জন্ম একই পরিবেশ হতে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষ নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে ঐশ্বর্য্য উৎপাদনের ক্ষমতা লাভ করল। তার ফলে যে নূতন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত ক'রে মানুষ যে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করল তা হতেই তার উৎপত্তি। এই নূতন পরিবেশে দেখা গেল বৈজ্ঞানিক গবেষণাও যন্ত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা মানুষের হাতে এমন শক্তি এনে দেয় যা তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থূল ক্ষুধাগুলির পূরণ করবার ক্ষমতা রাখে। ভাল খাদ্য, ভাল পরিচ্ছদ, পঞ্চইন্দ্রিয়কে নানা সুখকর উপকরণ জোগান এখন তার পক্ষে সম্ভব। সেই উপকরণ কয়েকটি ভাগ্যবান ব্যক্তির

জন্য সংরক্ষিত রাখবার প্রয়োজন নাই। বরং নূতন যন্ত্র যুগের প্রতিষ্ঠার অনুরোধই তাকে সকল মানুষের নিকট সুলভ ক'রে দেওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে উভয় আদর্শই একমত। যন্ত্র ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক। তার যা শক্তি তা অপরিমিত সংখ্যায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। তা বর্ত্তমানে এমন রূপ নিচ্ছে যাতে ক্রমশই স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। ফলে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা একদিকে তার যেমন হ্রাস পাচ্ছে, অপরপক্ষে উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা এসে পড়ে। একদিকে কারখানার কর্ম্ম হতে শ্রমিক বিচ্যুত হচ্ছে। অপর দিকে এই অগণিত পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমান যুগে শিল্পে অগ্রবর্ত্তী জাতিরা এর সমাধান খোঁজে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ক'রে। কারণ, পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারলে এই দুই সমস্যারই যুগপৎ সমাধান সম্ভব। এক পক্ষে মাল বাজারে সহজে কাটে, অপর পক্ষে প্রাথমিক উৎপাদনের কাজে যে শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে সে এই পণ্য দ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থায় পরোক্ষ-ভাবে কাজ পাবার সুযোগ পায়। পণ্যদ্রব্যের কাটতি বাড়ান যায় সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নীত ক'রে। অর্থাৎ যে ব্যবহার্য্য পণ্য পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিশালী কয়েক শত বা কয়েক সহস্র মানুষ ব্যবহার করত, তাকে যদি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে শেখে, তা হলে তার চাহিদা লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। ফলে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বাজারে কাটতি হয়। হেনরী ফোর্ড আমেরিকায় এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি অল্প মূল্যের মটরগাড়ী নির্ম্মাণ ক'রে তাকে অল্প বিত্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।

এই ভাবে একটা সমাধান হয় বটে, কিন্তু তার একটা প্রতিফল দেখা যায় যা মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে। সাধারণ মানুষের জীবন হতে দারিদ্র্য জাত দুঃখকে নির্ব্বাসিত করতে হলে খানিক পরি-মাণ জীবনের মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে বৈ কি। স্বস্তির জীবন ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন সকলের ভাগ্যে জোটাতে পারা একটি বড় কৃতিত্ব। কিন্তু এর শেষ কোথায়? এক স্থানে তার ছেদ না টানলে সুখের সন্ধান যে তাকে মরীচিকার অনুসরণে নিযুক্ত ক'রে তার জীবনকে বিড়ম্বিত করবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের ব্যাপার এখনই ঘটতে চলেছে। এই রাষ্ট্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই কারণে শিল্পে ব্যক্তিবিশেষের মালিক হিসাবে নিযুক্ত থাকায় এ রাষ্ট্রে কোনো বাধা নাই। তবু মালিক-শ্রমিক বিরোধ এখানে তত প্রখর হয়ে দেখা দেয় নি। তার কারণ এখানে শিল্প এত সমৃদ্ধ যে এই যন্ত্রচালিত শিল্পকে সজীব রাখার প্রয়োজনেই এখানে শ্রমিক সমেত সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে। এখানে সাধারণ মানুষের পক্ষেও মটর গাড়ি রাখা সম্ভব। পাকা বাড়ীতে বাস করা সম্ভব। বাস্তব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তা তার নাগালের মধ্যে।

তাই বর্ত্তমান কালে সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্য তার মটরগাড়ি থাকবে, তার রেডিও থাকবে, তার টেলিভিসন থাকবে। এই আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার অঙ্কটিও বেশী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এতগুলি ভোগের বস্তু সঞ্চয়ের জন্য তার অত্যধিক শ্রম ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয়। ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা উপার্জ্জন করতে তার সকল শক্তি, সকল সামর্থ্য ব্যয়িত হয়। ফলে তার জীবনে অবসর জোটে না। যে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়, তাতে যোগ দেবার তার সামর্থ্য থাকে না। যে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থায় অক্রিয়ভাবে বসে থাকা চলে, তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই সিনেমা ও টেলিভিসনের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্তিমিত প্রাণশক্তিকে সতেজ করতে উত্তেজক পানীয় বস্তু বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশে স্বস্তি জীবন হতে নির্ব্বাসিত হয়। এক বিরামহীন চাঞ্চল্যের মধ্যে জীবন কাটে। কলুর ঘানি টানা বলদের মত এক বিরক্তিকর অবস্থিতিতে জীবন পর্য্যবসিত হয়। ঔষধ সেবন ক'রে নিদ্রার আরাধনা করতে হয়। মানসিক বিকারের রোগ সুযোগ পায়, উন্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কৃত্রিম উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার ফলে পাকস্থলীর ক্ষত রোগ দেখা দেয়। অত্যধিক বাস্তব সম্ভোগের চেষ্টা জীবনকে শান্তিহীন, স্বস্তিহীন, আরামহীন বিভীষিকায় পরিণত করে।

এইখানেই মানুষ ভুল ক'রে বসেছে। লক্ষ্মীর অন্বেষণ করতে গিয়ে সে যেন অলক্ষ্মীর গলায় বরমাল্য দিয়েছে। মানুষের জীবনকে যে সকল সম্পদ সার্থক করে, অর্থ তার বহু উপাদানের একটি। কিন্তু আমাদের বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক তাকেই সর্ব্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন। মানুষ জীবনকে আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রণে পরিণত করতে পারে। কিন্তু মানুষ লুব্ধ হয়েছে এক সংকুচিত জীবনের আদর্শের প্রতি যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থূল ভোগ বিলাসের খোরাক যোগানই যথেষ্ট মনে করে। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষ যে ভোগ্যসামগ্রীর উৎপাদন করে তা এমনি পাওয়া যায় না। পণ্যদ্রব্য হিসাবে তাকে বাজারে কিনতে হয়। সেই কারণে অর্থের প্রয়োজন। এই পণ্যদ্রব্যের যারা উৎপাদনে লিপ্ত তাদের স্বার্থে অনেক সময় দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। এই উৎপাদনে যারা কর্ত্তৃত্ব করে তাদের হাতে অত্যধিক অর্থ অধিগত হয়। এই পণ্যদ্রব্য যারা বাজারে বিক্রয় করে তাদেরও অত্যধিক সঞ্চয় সম্ভব। এই আর্থিক সঞ্চয় তাদের ক্ষমতা দেয় স্থূল ভোগলিপ্সার তৃপ্তি সাধনের উপকরণ জোগাবার। এইজন্যই এই ক্ষমতা হতে যারা বঞ্চিত হয় তাদের সহিত এদের সংঘর্ষ। সুতরাং সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় স্থূল ভোগ সুখের উপকরণে অবাধ অধিকার হতে বঞ্চনা। আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিদ্বয়ের মধ্যে যে রেষারেষি তার ভিত্তি একই স্থূল ভোগের আদর্শ। এইটিই পরম ক্ষোভের বিষয়। মানুষের অধিকারে যে অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার আছে তার কতটুকুই বা এই অর্থ বিনিময়ে পাওয়া যায় এবং তাই নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ ধ্বংস যজ্ঞে আহুতি হবার উপক্রম হয়েছে। মানুষ যেন লক্ষ্মীর অন্বেষণে গিয়ে উর্ব্বশীকে আবিষ্কার করেই নিজেকে ধন্য মনে করছে।

মানুষের জন্য যে আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে তার স্বরূপটি

আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। অর্থ সম্বন্ধে অযৌক্তিক অতিসচেতনতা তাকে মানব জীবনের অন্য মহত্তর সম্পদ সম্বন্ধে উদাসীন করেছে। মানুষ বস্তুটি বড় জটিল। তার হৃদয় আছে, তার মন আছে। তার হৃদয়ে ভালবাসার বৃত্তি আছে, তার হৃদয়ে যেখানে মহত্ত্বের বিকাশ দেখা যায় সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি আছে। তার মনে ইচ্ছা শক্তি আছে। সেই ইচ্ছাশক্তির স্বভাবতই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করতে উৎসুক। তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তারণিক এক অতিশয় কাম্য বস্তু। তার মনে জ্ঞানশক্তি আছে। সেই জ্ঞান শক্তি কেবল ব্যবহারিক কাজে লাগে এমন জ্ঞান সঞ্চয়েই তৃপ্তি পায় না। তার সে জ্ঞান পিপাসার অন্ত নাই, জ্ঞান আহরণের জন্যই তার মন জ্ঞান আহরণে আগ্রহশীল হয়। তার কর্ম্মশক্তি সৃষ্টির আনন্দের আস্বাদনপ্রয়াসী। কেবল স্থূল উপাদানে যে সৃষ্টি সম্ভব হয় তা তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। বড় অট্টালিকা, বিরাট সেতু বা আকাশযান নির্ম্মাণ ক'রে সে কর্ম্মশক্তি তৃপ্তি পায় না। অবাস্তব উপাদান নিয়ে সূক্ষ্মতর ভিত্তিতে আরও বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভব। সেখানেই যেন তার সৃষ্টি শক্তি অবাধ ক্ষেত্র পেয়ে অনন্ত তৃপ্তির আস্বাদন পায়। সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, কালিদাসের শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তার নিদর্শন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, কাণ্টের 'ক্রিটিক' তার উদাহরণ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা ও আইনষ্টানের আপেক্ষিকতাবাদও তার নিদর্শন।

এই যে ভালবেসে আনন্দ, এই যে শক্তির আধারকে, কল্যাণের উৎসকে শ্রদ্ধা নিবেদনে আনন্দ, এই যে জ্ঞান সঞ্চয়ে আনন্দ, সাহিত্য রচনায় আনন্দ—এত যে আনন্দের ছড়াছড়ি তাদের অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। তাদের পাবার অধিকার লাভ করতে হলে সংযম চাই, সাধনা চাই, উদার দৃষ্টিভঙ্গি চাই। তারা এমন স্থূল বস্তু নয় যে পরিমাপ ক'রে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়। তাদের বাস্তব পরিমাপ নাই। অথচ তারাই মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস। পঞ্চেন্দ্রিয় যে স্থূল ভোগ সুখে স্বভাবতই অধিকারী, তাদের যে স্থূল খাদ্য সুখ দেবার অধিকার রাখে, তাই পরিমাপ করা যায়, তাই ভাগ করা যায়। তা সীমাবদ্ধ এবং পরিমিত। তাই একজন পেতে গেলে আর একজন বঞ্চিত হয়। এই সূক্ষ্ম পর্য্যায়ের আনন্দ অনন্ত। তার ভোগে ক্ষয় নাই। একজন ভোগ করলে আর একজনের বঞ্চনা নাই। এই বিরাট আনন্দের জগতের প্রতি ঔদাসীন্যই আমাদের এমন উন্মত্ত করেছে। তাকে অবহেলা ক'রে আমরা লালায়িত হয়েছি সেই স্থূল ভোগলিপ্সার প্রতি যা মানুষের জীবনকে হীন করে, সংকুচিত করে। যে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হতে পারত তাকে যেন সামান্য সুখ দিয়ে বঞ্চিত করছি। যে পদ্ম পঙ্কের আস্তরণ ভেদ ক'রে উর্দ্ধলোকে সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত অনন্ত আলোকের জগতের স্পর্শ পেয়ে শত শত দল মেলে ফুটতে অধিকারী, তাকে যেন পঙ্কের মধ্যেই নিমজ্জিত রাখতে প্রয়াস করছি। এইটাই সব থেকে মর্ম্মভেদী ক্ষোভের কারণ।

যাকে জীবনের সর্ব্বস্ব মনে ক'রে সমগ্র মানব জাতি অকল্যাণ ডেকে এনেছে, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার মূল্য কতখানি হওয়া উচিত সে কথা যদি হৃদয়ঙ্গম করি, তা'হলে জাতিতে জাতিতে এই যে রেষা-রেষি তা যেন অপনোদন করা যায়। যার জন্য সমগ্র মানব জাতির জীবন বিপন্ন করতে চলেছি তার মূল্য যখন যৎসামান্য পরিগণিত হবে তখন এই সর্ব্বাত্মক ধ্বংসের আয়োজনের আর প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকবে না। নকল লক্ষ্মীর অনুসরণই আনে ধ্বংস, সংঘর্ষ ও অশান্তি। আসল লক্ষ্মীর স্বরূপ স্বতন্ত্র। তাঁর অনন্ত ধনভাণ্ডারের ক্ষয় নাই, তার ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের অবকাশ নাই। আসল লক্ষ্মীর সন্ধান আনে শান্তি, স্বস্তি, মৈত্রী ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের আমন্ত্রণ।

জিজ্ঞাসা

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডান হাতে আর বাম হাতে মিলে
বেধে গেল বাক্ যুদ্ধ
ডাইনী সে জোরে মটকিয়ে দিল
বামার কব্জি সুদ্ধ।
শিরে করাঘাত হানে বাম হাত
সমুখে আইন পুস্তক
বলে, "তুমি তারে শাস্তি না দিলে
কী করতে আছো, মস্তক?"

মস্তক থাকে তটস্থ হয়ে—
ডান হাতে দিলে শাস্তি
সেও যদি বলে, "আছো কী করতে?
এর চেয়ে ভালো নাস্তি।"
আমরা সভয়ে দেখছি দাঁড়িয়ে
জননীর দুরবস্থা
এমনিতে ছিল অঙ্গহীনা সে
হবে কি ছিন্নমস্তা?

স্ট্যাচু

শ্রী মন্মথ রায়

[নিশীথ রাতের কলিকাতা। একটি নির্জন পার্ক। পার্কের এক কোণে শ্বেত পাথরের বেদীর উপরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি। এই মর্মর মূর্তিটি স্বর্গগত বিখ্যাত এক দেশ-নেতার। স্তম্ভগাত্রে একটি মর্মর ফলক। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ :

"সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয় ও কর্মযোগী পরদুঃখকাতর ও দানবীর স্বনামধন্য দেশনেতা সেবাব্রত চৌধুরীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ। জন্ম ১৩০৬ সন ২৫শে আষাঢ়—মৃত্যু ১৩৬০ সন ১২ই.আশ্বিন।"

আশ্রয়হীন একটি বেকার যুবক এই স্মৃতি ফলকে লিপিবদ্ধ কথাগুলি উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতেছিল।]

যুবক। (পাঠ শেষ হইলে) পরদুঃখকাতর! দানবীর! হায় হায় কি দুর্ভাগ্য আমি! কলকাতা সহরে আমি চাকরীর খোঁজে এসে পড়েছি কখন? হায় হায় এই মহাপুরুষটির স্বর্গগমনের পর। কয়েক বছর আগে যখন এই মহাপুরুষ বেঁচে ছিলেন, হায় হায় তখন যদি আসতে পারতাম কলকাতায়, এই মহাপুরুষের পায়ে গিয়ে পড়লে একটা কিছু সুরাহা আমার হতোই হতো। হায় হায় কবি ঠিকই বলেছেন! "অভাগা যগুপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।"

[ঐ অঞ্চলে পাহারারত একটী কনেস্টেবলের প্রবেশ]

কনস্টেবল। এখানে এতো রাতে তুমি কি করছো?

যুবক। আমাকে তুমি বলছেন কেন আপনি?

কনস্টেবল্। চোর জোচ্চোরদের তুমি বলবো না তো কি বলবো?

যুবক। আমি চোর জোচ্চোর? কোন অধিকারে আপনি আমাকে চোর জোচ্চোর বলছেন?

কনস্টেবল। রাত একটার সময় ভদ্রলোক এই নির্জন পার্কে হাওয়া খেতে আসেন না। আর তা ছাড়া, তোমার চেহারা আর পোষাক যা দেখছি, তাতে তোমাকে কোন সাধু পুরুষ বলে মনে করতে পারছি না।

যুবক। সাধু পুরুষের পরিচয় কি চেহারা আর পোষাকে লেখা থাকে?

কনস্টেবল। তুমি তো বেশ গোলমেলে লোক দেখছি। চলো, থানায় চলো।

যুবক। বাঁচালেন আমাকে আপনি। কী উপকার যে করলেন তা আর কী বলবো? চলুন।

কনস্টেবল। সে কি হে? তোমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবো, সেটা হোলো গিয়ে তোমার উপকার?

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, উপকার। পরম উপকার। একটা চাকরী-বাকরীর খোঁজে গ্রাম থেকে সহরে এসেছিলাম মাসখানেক আগে। যে ক'টা টাকা সঙ্গে ছিলো পাইস্ হোটেলে খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছে। মাথা গোঁজ-বার কোনো আশ্রয় নেই বলেই রাতটা কাটাই রেল-স্টেশনের প্লাটফর্মে, নইলে পার্কে। কিন্তু সেখানেও পুলিশের তাড়া খেতে হয়—যেমন এখন যাচ্ছি। আজ মনে হচ্ছিল এখন আমার একমাত্র আশ্রয় দয়াময় সরকারের জেল। যেখানে যেতে পারলে একেবারে রাজ-আতিথ্য—খাওয়া-পরা আর মাথা গোঁজবার সব সমস্যার অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান।

কনস্টেবল। তুমি কি বলছো হে?

যুবক। আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি।

কনস্টেবল। তবে তো আমি তোমার এই উপকার করবো না। আরো কিছু ভোগো।

যুবক। ও মশাই শুনুন। আমার চেহারাটা দেখছেন? কাপড়চোপড় ছেঁড়া বটে। কিন্তু হাতের কব্‌জী আর গায়ের জোর বাপ-মায়ের কৃপায় আপনার চেয়েও বেশী। আপনি আমাকে হাজতবাসের সুযোগ না দিতে চাইলে সে সুযোগ আমি জোর করে আদায় করবো আপনাকে পিটিয়ে।

কনস্টেবল। ওরে বাবা, সে কি?

যুবক। হ্যাঁ, মশাই। না খেতে পেয়ে পেয়ে আমি এখন মরীয়া হয়ে উঠেছি।

কনস্টেবল-এর হাত চাপিয়া ধরিল

কনস্টেবল। আর! শোনো, শোনো। মারামারি কেন হে? না খেয়ে আছো—বোসো, বোসো। কিছু খাবার আমিই তোমাকে দিচ্ছি।

যুবক। সেকি! আপনি মশাই আমাকে খেতে দেবেন?

কনস্টেবল। হ্যাঁ, দেবো, দেবো। আমার পরিবারের দিব্যি আছে যে?

যুবক। পরিবারের দিব্যি! কি দিব্যি?

কনস্টেবল। সেটা অত্যন্ত গুপ্ত কথা। এসো বসি। (যুবকটিকে বসাইয়া পকেট হইতে একটি কাগজের মোড়কে করা কিছু পুরী ও মিষ্টি বাহির করিয়া যুবকের সামনে রাখিল) তুমি খেতে থাকো। আমি বলছি।

যুবক। (খাইতে খাইতে) আপনি আমাকে অবাক করেছেন মশাই। কি ভাগ্য আমার! ঐ মহাপুরুষের মুখ দেখেছি বলেই বোধ হয়। হ্যাঁ নিশ্চয়, তাই আপনার মতো মহাপুরুষ কনস্টেবলের হাতে পড়েছি। না না, ভুল হলো আপনি তো আপনার পরিবারের নির্দেশে আমাকে খাওয়াচ্ছেন—আমার ধন্যবাদটা বোধহয় তাঁরই বেশী পাওনা। এই খাওয়ানো ছাড়া আরো কিছু নির্দেশ আছে নাকি তার? বলুন না আপনার পরিবারের কী আদেশ আছে আপনার উপর?

কনস্টেবল। তুমি বেশ বলো দেখছি। আমি বললাম নির্দেশ, তুমি বলছো আদেশ? তা আদেশই বটে। (হাস্য) তোমাকে গোপনে বলছি আমার অফিসারের আদেশ—সেও আমি সব সময়ে মানি না, কিন্তু আমার গিন্নীর আদেশ—সে আমি মানবোই। কারণ, দেখেছি—তাতে দিন দিন আমার ভালো হচ্ছে।

যুবক। বুঝছি, সাক্ষাৎ দেবী তিনি। তা সেই দেবীর আদেশ-টাদেশগুলো বলুন না আমাকে।

কনস্টেবল। তিনি বলেন, আমি লোকটি খুব সুবিধার নই। মিছে কথাতো বলিই—তা ছাড়াও নীতি-বিরুদ্ধ কাজকর্মও কিছু কিছু করি। তাতে আমি বলি—দু-একটা মিছে কথা কি দু একটা অকাজ কুকাজ শুধু আমি কেন—কে না করছে আজ? আর আজই বা কেন? চিরদিন চিরকালই মানুষমাত্রেই এ সব করেছে।

যুবক। না না সে কথা বলবেন না, আপনি সকলের কথা ধরবেন না। এই ধরুন এই মহাপুরুষটি—যার বেদীতলে আমরা বসে আছি। ঐ পড়ে দেখুন, লেখা আছে—সত্যাশ্রয়ী—জিতেন্দ্রিয়-বিশেষণগুলো একবার দেখুন। যার মুখখানি দেখেছিলাম বলে আজ আপনার মতো দয়াবান লোকের হাতে আমি এই খাবার পেয়ে বেঁচে গেলাম। সবাই অসাধু নন। তবে আপনি-আমি হয়তো মাঝে মাঝে—

কনস্টেবল। হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমরা তো আর মহাপুরুষ নই। অতিসাধারণ মনুষ্য আমরা। আজকাল যা দিন পড়েছে—আমাদের একটু ভুলভ্রান্তি হওয়া—হ্যাঁ, তা হয় বৈ কী। তাই আমার পরিবার বলেন, বলেনও বলবো না—একেবারে, আদেশই দিয়েছেন—ডিউটি সেরে যখন বাড়ী আসবো, তার, আগে—কোনো ভিখিরিকে যেন আমি কিছু খেতে দিই। তিনি বলেন, এতে দিনের ছোটোখাটো পাপ-টাপগুলো—অবশ্য আমি এগুলোকে পাপ-টাপ না বলে, 'হরির কৃপায় দশ জনে খায় আমরাই কেন খাব না, বলতে চাই—তা সে যাই হোক্—তিনি বলেন, ও সব ধুয়ে মুছে যায়। আর ঐ ভিখিরী যদি খেতে পেয়ে আশীর্বাদ করে তাহলে দেখেছি পরদিন উপরি-রোজগারটা আমার বেড়ে যায়—। (হাস্য)

যুবক। ভালো ভালো, এ বিশ্বাসটা থাকা ভালো তাতে একটা হতভাগা লোক সেও খেয়ে বাঁচছে, অন্তত একটা রাত খেয়ে বাঁচছে—আর আপনিও দুটো পয়সার মু

দেখছেন। আমার তো মশাই কেন যেন মনে হচ্ছে এই যে মহাপুরুষ—যাঁর বেদীতে আমরা বসে এই সব ধর্মকথা আলোচনা করছি—এই মহাপুরুষের ঐ পাথরের মুখটি—এ মশাই আমি রোজ দেখবো। যেমন আজ দেখেছি। তাতে আর কিছু না হোক, আমার যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছে—অন্তত: রোজ রাতে আমার ভরাপেট খাবার জুটবে। যেমন আজ জুটলো।

কনস্টেবল। না না, তোমাকে আমার আরও কিছু বলবার আছে। তার আগে অবশ্য তোমাকে আমি ওই কল থেকে জল খেয়ে নিতে বলছি।

যুবক। যা বলেছেন। পেট ভরে গেছে। এখন ঐ কল থেকে দু'আঁচলা জল খেলেই দেখবেন আমি বেশ ভালো লোক। কাউকে ঠকানো মনোবৃত্তি আমার একেবারেই নেই। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমার পাশে দু'দণ্ড বসে আপনি আপনার পরিবার—পরিবারই বা কেন বলি, বরং বলবো সেই দেবীর আরো দু'চারটি মহান্ আদেশ যা তিনি দিয়েছেন আমাকে বলতে পারেন।

[যুবকটি জল খাইতে গেলো। কনস্টেবলটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। ইতিমধ্যে যুবকটি প্রত্যাগমন করিল]

যুবক। আঃ। কী তৃপ্তি যে হোলো আজ। খাবার-গুলো বেশ ভালো ছিলো।

কনস্টেবল। তা আর হবে না? খাবারগুলি যে "মধুর ভারত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের।"

যুবক। যদি কিছু মনে না করেন—বড়ো কৌতূহল হচ্ছে—জানতে—ক' টাকার খাবার আপনি আমাকে খাওয়ালেন। মানে, এতো ভালো খাবার আমি এর আগে খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না কিনা। আর তাই দামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনস্টেবল। দাম কি আর আমিই জানি বাপু? ও সব—

যুবক। ও—

কনস্টেবল। হ্যাঁ।

যুবক। ও তা বেশতো বেশতো। আমি ধরে নিচ্ছি—অমূল্য। অথবা যে দামে আপনি কিনেছেন আমাকেও সেই কেনা দামেই দিয়েছেন।

কনস্টেবল। (হাসিয়া) তুমি বেশ বলো হে। কিন্তু এবার তোমাকে যা দিচ্ছি এটা একেবারে ঘরের। গিন্নীর নিজের হাতের তৈরী। নাও। (পকেট হইতে একটি পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি পান দিয়া) খাও।

যুবক। পান! বা-বা-বা। আপনি বুঝি খুব পান খান?

কনস্টেবল। না না, পান-দোষটোষ আমার নেই।

যুবক। কিন্তু আমি তো প্রায়ই দেখি—বেশীর ভাগ কনস্টেবলই পানের দোকানের সামনে ডিউটি দেয়।

কনস্টেবল। তা দিক। কিন্তু এই দ্যাখো আমার দাঁত সাদা।

যুবক। তবে স্যার আপনার পকেটে পানের ডিবো কেন?

কনস্টেবল। ওটা গিন্নীর আদেশ। তিনিই একডিবে পান সঙ্গে দেন—মানে আমাদের কাছেও তো অনেকে পান খেতে চান যে। গিন্নী বলেন, শুধু সেলাম করতে নেই। বুঝেছো?

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেলাম আর সেলামী।

কনস্টেবল। বাঃ। কী সুন্দর তুমি বলো। তোমাকে একদিন আমার বাড়ী নিয়ে যাবো হে। ও হো-হো, তা তো হবে না। তাঁর আবার দ্বিতীয় নির্দেশটাও রয়েছে কিনা?

যুবক। ও, তবে দ্বিতীয় নির্দেশও আছে? বলুন না, সে আদেশটা কী? আমার তো এখান থেকেই তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনস্টেবল। (চটিয়া গিয়া) প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে? সে যে কী চিজ্, তা জানো না তো—তাই। দ্বিতীয় নির্দেশটা শুনলেই তা বুঝবে।

[সঙ্গে সঙ্গে রুল দিয়া যুবকটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।]

যুবক। একী! একী, আপনি আমাকে ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনস্টেবল। কী করবো? তাঁর আদেশ! বলেছেন, প্রথমে খাওয়াবে—তারপর ঠ্যাঙাবে।

যুবক। আরে শুনুন—শুনুন—ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনস্টেবল। বলেছেন, খুব ঠেঙিয়ে দেবে যাতে আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছু না চায়—তোমার পিছু না নেয়—তোমার বাড়ী ধাওয়া না করে। বলো, এ সব করবে না, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিচ্ছি। নইলে—

আবার মারিতে উদ্যত হইল

যুবক। না না, না মশাই, আমি কথা দিচ্ছি আমি আর আপনার মুখই দেখবো না। মুখ দেখবো শুধু একটি লোকের—হ্যাঁ ঐ মহাপুরুষের। আপনি এখন স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন, আমি এখন এই মহাপুরুষের পায়ের তলায় পড়ে ঘুমুবো।

কনস্টেবল। রাত বারোটার পর পার্কে থাকাও বে-আইনি।

যুবক। তবে মশাই আমাকে হাজতে নিয়ে চলুন, আমি তো তাই চাইছি।

কনস্টেবল। না না—ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যাবো না। এখন ওই পানওয়ালীর দোকানটার উপর নজর রাখতে হবে—

যুবক। আরে মশাই, আপনি তো পান খান না—

কনস্টেবল। (হাসিয়া) ঐ পানওয়ালীর পান দু' একটা খাই।

যুবক। (ঈংগীতপূর্ণ চোখে) ও।

কনস্টেবল। হ্যাঁ।

যুবক। বেশ তো, বেশ তো। তা খান না। শুভস্য শীঘ্রং।

কনস্টেবল। তোমাকে একটা কথা না বলে যেতে মন সরছে না।

যুবক। কী বলুন তো ?

কনস্টেবল। এখানে তোমার না থাকাই উচিত। না না, আইনের কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে এই, এই মূর্তিটার আশে-পাশে অনেকে অনেক কিছু দেখেছে বেশী রাতে। আমার মনে হয় চোরাকারবারীরা আসে। আর তারাই রটিয়েছে এই ভূতের ভয়।

যুবক। এঁ্যা ?

কনস্টেবল। হ্যাঁ। একজন ভয় পেয়ে মারাও গেছে শুনেছি।

যুবক। তাই নাকি ? তবে তো আর এখান থেকে আমি কিছুতেই নড়ছি না।

কনস্টেবল। তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

যুবক। খেতে না পেলে ঐ একটা ভয়ই থাকে না। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থা করে দিন—দেখবেন প্রাণের ভয় আমারই হবে সবচেয়ে বেশী।

কনস্টেবল। না তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারিনে। আমার ডিউটি আছে।

"লোকে বলে প্রেম করেছি, প্রেম কারে কয় জানিনে,
মনের মানুষ মন নিয়েছে, লোকের কথা মানিনে।"

[গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান করিল। যুবকটিও ঐ গানের কলিটি গুণগুণ করিতে করিতে একটি ইঁট সংগ্রহ করিয়া মাথায় দিয়া বেদীর উপরে শয়ন করিল এবং অনতিকালের মধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। কিছুপরে ঐ স্থানে একটি উন্মাদিনী নারী চুপি চুপি চোরের মতো প্রবেশ করিয়া হাতের যষ্টিটি দিয়া মূর্তিটিকে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিল। এই শব্দে যুবকটির ঘুম ভাঙিতেই সে ধড়মড় করিয়া সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল।]

যুবক! একি। একি! কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে এ সব ?

নারী। Shut up. Get out.

যুবক! সেকি!

নারী। I say, get out. বেরিয়ে যাও!

যুবক। বেরিয়ে যাবো মানে ? তুমি ঐ মহাপুরুষকে—

নারী। ম-হা-পু-রু-ষ! হাঃ হাঃ হাঃ! তোমরা জানো মহাপুরুষ। কিন্তু আমি জানি উনি কে এবং কি।

যুবক। দেশশুদ্ধ লোক ওঁকে মহাপুরুষ বলে জানে—আর তুমি একটা পাগলি—

নারী। Shut up. I am his wife. বাংলা করে বলছি, আমি ওঁর স্ত্রী। আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ওঁকে।

যুবক। আপনি ওঁর স্ত্রী ? স্ত্রী হয়ে আপনি আপনার স্বামীকে ঠেঙাচ্ছেন ?

নারী। হ্যাঁ ঠ্যাঙাচ্ছি। ঐ স্ট্যাচু আমি ভাঙ্গবো। ঐ বেদী আমি চুরমার করবো।

[লাঠি দিয়া পুনরায় আঘাত করিতে উদ্যত হইলে যুবকটি উঠিয়া পিঠ দিয়া মূর্তিটিকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল।]

নারী। (ইহাতে নিরস্ত হইয়া) ও। তবে তোমাকে সব খুলে বলতে হবে দেখছি। তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে এই লোকটা সত্যাশ্রয়ী নয়, জিতেন্দ্রিয় নয়। ঐ ভণ্ড লোকটির মুখোসটা খুলে দিতে হবে। বেশ তবে বোসো।

[বেদীতটে উভয়েই বসিল]

নারী। ঐ স্মৃতি-ফলকে যা যা লেখা আছে ওর একটি কথাও মিথ্যা নয় বলেই ছিলো আমার ধারণা। আর সে জন্ম আমার গর্বের ছিলো না সীমা। গৌরবের ছিলো না শেষ। আমার মনে হতো জগতে আমার চেয়ে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। বাল্যকাল থেকেই শংকরের মতো স্বামী পেতে গৌরীর মতো তপস্যা করেছিলাম আমি। আমার মনে হতো ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। (হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল) আমার সেই স্বামী মারা গেলেন কবে জানো? ঐ লেখা আছে, ১২ই আশ্বিন ১৩৬০। আবার মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে সব আলো গেলো নিভে।

যুবক। ওঁকে হারিয়ে বহু লোকই অনাথ হয়েছিলেন মা। ঐ স্মৃতিফলকের লেখা থেকেই তা বুঝছি।

নারী। আমারও তাই মনে হতো। আমিও তাই ভাবতাম! ওঁকে ছেড়ে বাঁচা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠলো বাবা। ওঁর মৃত্যুর পর আমার মৃত্যুর জন্ম আমি তপস্যা করেছি বাবা।

যুবক। আমি সেটা বিশ্বাস করছি মা।

নারী। শেষে সেই মৃত্যু আমার এল। মরতে বসে এতো আনন্দ কারো হয় না—যেমন আমার হয়েছিলো বাবা। কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেন চলেছি এক মহা-অভিসারে আমার স্বামীর মহাজীবনের স্বর্গে। হিন্দু নারী, আমরা বিশ্বাস করি, শেষ নিঃশ্বাসে যে কামনা করে মানুষ—জীবনের পরপারে তা হয় পূর্ণ। আমিও তাই আমার শেষ নিঃশ্বাসে এই প্রার্থনাই করেছিলাম আমার যেন স্থান হয় আমারই স্বামীর শ্রীপাদপদ্মে।

যুবক। বুঝতে পেরেছি। মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েও আপনি বেঁচে উঠেছেন। আর সেই শোকে হয়েছেন পাগল।

নারী। হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কিছুই বোঝোনি, কিছুই বোঝোনি তুমি।

যুবক। হ্যাঁ, আপনার সব কথাই যে আমি বুঝবো, এ স্পর্ধা আমি রাখি না। যাঁরা প্রকৃতিস্থ, তাঁদেরই অনেক কথা আমরা বুঝি না। কিন্তু তবু বলুন, আমি শুনবো। বলুন মা, বলুন।

নারী। স্পষ্ট বুঝলাম আমার মৃত্যু হলো। একি তুমি মুখ ফিরালে যে? তুমি হাসছো বুঝি? (রাগে ও ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি হাসছো? তুমি হাসছো?

যুবক। শুনুন মা শুনুন। হাসা তো দূরের কথা—আপনাকে দেখে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে—আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কত বড়ো লোকের স্ত্রী আপনি, আর আপনার কিনা আজ এই দশা।

নারী। আমার দুঃখে আকাশ বাতাসও আজ কাঁদে। সব শুনলে তুমিও এখনি কাঁদবে।

যুবক। আপনি মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। এই আপনার দুঃখ, না?

নারী। (চটিয়া গিয়া) you are all fools. (কাঁদিয়া) কাউকে আমি আমার কথা বোঝাতে পারি না—মরতে আমি চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার মৃত্যু হলো। যে মৃত্যু আমি কামনা করেছিলাম সে মৃত্যু আমার হলো। কিন্তু মৃত্যুকালে যে কামনা করেছিলাম তা আমার পূরণ হলো না।

যুবক। কেন? কেন মা?

নারী। এই স্মৃতি ফলকটির জন্ম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্মৃতিফলকটির জন্ম।

যুবক। সে কী মা? কেন বলুন তো?

নারী। আমার অন্তিমবাসনা হলো পূর্ণ। স্বামীর সঙ্গে আমার হলো সাক্ষাৎ। কিন্তু সে সাক্ষাৎ কোথায় হলো জানো?

যুবক। বলুন?

নারী। স্বর্গে নয়, স্বর্গে নয়।

যুবক। তবে?

নারী। নরকে।

যুবক। ন-র-কে!

নারী। হঁ্যা, নরকে।

যুবক। নরকে কেন মা? নরকে কেন?

নারী। ঐ স্মৃতিফলকে লেখা রয়েছে সত্যাশ্রয়ী সে।—জিতেন্দ্রিয় সে। আমিও তাঁকে তাই জানতাম। দেশের লোকেও তাই জানতো। কিন্তু সে যে একটা মিথ্যা মুখোস পরে দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গেছে—তা জানতেন শুধু ঈশ্বর। আর জানতো অবশ্য সে নিজে। জীবনের পরপারে আমার সঙ্গে যেই দেখা, তখন আর সে তাকাতে পারে না আমার দিকে।

যুবক। ওঃ।

নারী। হঁ্যা। তাঁর মুক্তি হয়নি। তাঁর মুক্তি হয় নি। সংগতি হয়নি তাঁর। কেন জানো?

যুবক। আপনিই বলুন।

নারী। তাঁর জীবনের মিথ্যেটাই অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্মৃতিস্তম্ভরূপে—এতে তাঁর পাপ আরো বেড়ে যাচ্ছে—আরো বেড়ে যাচ্ছে।

যুবক। ও।

নারী। হঁ্যা। যতলোক এই স্মৃতিস্তম্ভে এই লেখাটি পড়ছে তারা সবাই তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে—

যুবক। আমিও করেছি মা।

নারী। তুমিও করেছো? তবে তুমিও তার পাপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছো। এক একটি লোক তাঁর এই স্মৃতিফলকে লেখা প্রশস্তি পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কষাঘাত সে ভোগ করছে নরকে। হঁ্যা, এই হয়েছে তাঁর শাস্তি—এই হয়েছে তাঁর শাস্তি! সে যে কী অবর্ণনীয় কষ্ট, জীবিত তোমরা, বুঝবে না, বুঝবে না। আমি তা স্বচক্ষে দেখে, সহ্য করতে না পেরে, রোজ রাতে চলে আসি এখানে—ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙতে। কিন্তু আমার কি সাধ্য! সুদীর্ঘ জীবনে সে মিথ্যার যে সুদৃঢ় সৌধ রচনা করে গেছে আমি তা ধূলিসাৎ করবো।

যুবক। তাইতো! তাইতো মা।

নারী। এই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মুক্তি নেই বলে আমারও মুক্তি নেই।

যুবক। তাইতো।

নারী। একটা উপকার তুমি আমায় করবে বাবা?

যুবক। বলুন মা।

নারী। একটা ডিনামাইট দিয়ে এটা উড়িয়ে দিতে পারো বাবা?

যুবক। ডিনামাইট আমি কোথায় পাবো মা?

নারী। তাও তো বটে। আচ্ছা বলতে পারো বাবা, আমাদের দেশে এটম্‌বোম্ কবে পড়বে?

যুবক। না মা, এ্যাটমবম্ আর পড়বে না। যাদের হাতে এ্যাটমবম্ তারা এটা বুঝে গেছে—এ্যাটমবমের লড়াই সুরু হলে পৃথিবীটাই হবে ধ্বংস, বাঁচবে না কেউ।

নারী। তবে—তবে—এই মিথ্যার জয়-ধ্বজাটাই কি সত্য হয়ে থাকবে।

যুবক। যতদিন মিথ্যা আর মেকী থাকবে আমাদের সভ্যতার ভিত্তি ততদিন ঐ স্ট্যাচু অক্ষয় হয়েই থাকবে—কারো সাধ্য নেই ওটা ভাঙে।

নারী। তবে?

যুবক। এই সভ্যতার প্রথম ঘোষণাই ছিল মনের কথা গোপন রাখতেই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি। তাতেই সুরু হয়েছে সমাজ জীবনে মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা আর ছলনা।

নারী। তুমি মিথ্যা বলোনি, স্ত্রীর মন রাখতেও স্বামী করেছেন মিথ্যাচার।

যুবক। সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যাচার। পেটে ক্ষুধা নিয়েও মুখে রেখেছি লজ্জা। কপালে করাঘাত করে বলেছি এ দুঃখ এ দারিদ্র্য আমাদের অদৃষ্টের দোষ। হঁ্যা, জীবনটাই ছিলো এমনি একটা মিথ্যার ভিত্তি।

নারী। ভেঙ্গে ফেলো সেই মিথ্যার ভিত্তি। ভেঙে ফেলো ঐ স্ট্যাচু। সুরু হোক সত্যের জয়যাত্রা।

যুবক। সুরু হয়ে গেছে মা। আমরা স্বীকার করি না—মনের ভাব গোপন করতেই ভাষার সৃষ্টি। আজ আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে শিখেছি আমাদের মনের সংকল্প।

নারী। কি সে সঙ্কল্প বাবা?

যুবক। আমরা আবার বাঁচবো। বাঁচবার জন্য আমরা আবার লড়াই করবো।

নারী। হঁ্যা বাবা, এটা খুব সাহসের কথা।

যুবক। পেটের ক্ষুধাই জুগিয়েছে এই সাহস। আর


SUNLIGHT
SOAP
Rs 10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP

এই সাহসেই নিহিত রয়েছে সত্যের জয়—মিথ্যার ক্ষয়।

নারী। একদিন তবে ঐ স্ট্যাচু ধ্বংস হবে তো বাবা?

যুবক। নিশ্চয়।

নারী। যাক্—আশার কথাই শুনে যাচ্ছি তোমার মুখে।—মিথ্যে আর মেকী ধ্বংস হোক। নিপীড়িত বেদনার্ত মানব আত্মার মুক্তি হোক। মুক্তি হোক।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান]

যুবক। হোক না কেন পাগল, কিন্তু কথার দাম আছে। এর পর আর কি ঘুম আসবে? দেখি?

[ইঁটটিকে আবার বালিশ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই অদূরে গীতরত কনষ্টেবলটির আবির্ভাব হইল। যুবকটি উঠিয়া বসিল।

কন্‌স্টেবল। "লোকে বলে প্রেম করেছি,
প্রেম কারে কয় জানিনে,
মনের মানুষ মন নিয়েছে,
লোকের কথা মানিনে"।

কি গো, ঘুমোও নি যে?

যুবক। ঘুমোবার কি আর জো আছে? আপনি মশাই যাবার পরই এসেছিলো একটা পাগলী। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। বলে, সে নাকি এই মহাপুরুষের স্ত্রী।

কন্‌স্টেবল। সে কি হে? এ মহাপুরুষের স্ত্রী তো বছর দুই হলো মারা গেছেন।

যুবক। আপনি কি বলছেন মশাই? মারা গেছেন? এই পাগলীটাও তাই বলছিলো বটে—

কন্‌স্টেবল। ঠিকই বলেছে। হরসুন্দরী পার্কে এঁর স্ত্রীরও স্ট্যাচু রয়েছে। দেখনি বুঝি?

যুবক। আপনি বলছেন কী মশাই?

কন্‌স্টেবল। চলো, দেখবে চলো।

যুবক। তবে কি—তবে কি—

[থামিয়া গিয়া অন্যদিকে তাকাইল]

কনস্টেবল। মনে হচ্ছে হঠাৎ ভয় পেলে যেন?

যুবক। পাগলীটা বলছিলো, এঁরই স্ত্রী সে। পরপার থেকে চলে এসেছে।

কনস্টেবল। (হো হো করিয়া হাসিয়া) আরে কথায় বলে—'কিনা বলে পাগলে, আর কি না খায় ছাগলে।' এসো—হাঃ হাঃ হাঃ।

[তাহাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

যবনিকা

নবজাতক

দুর্গাদাস সরকার

ফুলের কলি ফুটতে পারে আপন প্রতিবেশে
অভিনিবেশে বলেছো অবশেষে।

তাই, এই যে উৎসব,
চারিদিকেই ভীড়ের ভারে কঠিন কলরব।
তোমার মুখ মলিন, মন দূর সাগর-পারে,
অজানা ছায়া ঘিরেছে যেন রোদের চারিধারে।
বদল তুমি করেছো ভাষা, ভূষণে সজ্জিত,
চরণ ফেলো কত না লজ্জিত।
এখনো তবু পাওনি তুমি আমার বাংলাকে।
সহসা তুমি উদাস হও। তোমাকে যেন ডাকে
গভীর গূঢ় ঘন পাইন বন।
তোমার মন
ভূমধ্য সাগরে,
তোমার শিশুকালের শোনা শব্দ তা'তে ঝরে।
মহামিলন স্বপ্নে আমি ছিলাম সকাতর,
জানো তো তুমি তোমাকে এনে তাই বেঁধেছি ঘর।
নিজেকে কতো রেখেছি চুপচাপ,
আমি তোমার ভাবান্তরে করিনি পরিতাপ।
নীরব আছি শ্বসিত নিঃস্বনে
তোমার কথা মানিনি মনে মনে।

জঠরে যদি উঠলো ব্যথা, সফল করো
সফল করো ধ্যান,
পাইন বনে মিলুক গিয়ে
হিমালয়ের গান।

আধুনিক ভারতের দৃষ্টিতে মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্র

.নরেন্দ্র দেব

মানুষের আদর্শ যুগে যুগে বদলে চলেছে। একদিন যে যে গুণকে মানুষ সর্বোত্তম বলে মনে করতো, কালক্রমে সে গুণ তার কাছে তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়। দেবতার নামে পশুবলি আজ আর পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয় না। সতীদাহ সভ্যমানব সমাজে আজ গৌরবহীন। এ যুগের রামচন্দ্রেরা সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে মানুষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার বলেই গণ্য করেন। ব্রাহ্মণের জন্মগত কৌলীন্যের মর্যাদা ও সমাজের শীর্ষস্থানটি আজ ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। অন্ধবিশ্বাসের দিন এ যুগে আর নেই। যা যুক্তিতর্ক ও বিচারসহ নয়, একালের বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ তা মেনে নিতে চায়না। একাধিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃতির দ্বারা সমর্থিত হ'লেও কোনও কথাকেই লোকে আজকাল অভ্রান্ত বেদবাক্য বা 'অকাট্য সত্য' বলে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়।

এই দ্বিধা সংশয় ও বিতর্ক-প্রধান বর্তমান যুগে সেকালের অনেক কিছু আদর্শেরই মূল্যমান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মহাভারতে দেখা যায় একাধিক মহামানবের অলৌকিক মহিমা সগৌরবে পরিকীর্তিত। তারমধ্যে শান্তনু নন্দন দেবব্রত ভীষ্মের মহান চরিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণেই রঞ্জিত হয়েছে। পুরুষ পরম্পরায় নিরবধিকাল ভারতবাসীরা তা স্বীকার করেও এসেছেন। কিন্তু, কালের মহিমা এমনি যে, বর্তমান যুগের রুচি, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে মহাভারতের ভীষ্ম-চরিত্রের যুক্তিযুক্ত এবং প্রভাববিমুক্ত বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে ভীষ্মদেবের অনেক কিছু আচার আচরণই এযুগে সমর্থন করতে পারা যায় না।

'দেবতার বেলা লীলা খেলা' এ ভক্তি মিশ্রিত ফাঁকির যুক্তিতে আধুনিক মন সায় দিতে চায়না। ভীষ্মদেবের জন্ম বৃত্তান্তই তো অদ্ভুত! এই বিংশশতাব্দির বিজ্ঞান-অধ্যুষিত জগতে এ ধরণের রূপ-কথা কে আজ বিশ্বাস করবে? 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর' একথা বলে এ যুগের বুদ্ধি-অভিমানীদের কিন্তু নিরস্ত করা যাবে না। তারা কেমন ক'রে একথা মেনে নেবে যে 'নিখিল পূজিতা এক দেবীর সঙ্গে মর্ত মানবের সংসর্গে শান্তনু নন্দন দেবব্রতের জন্ম'! সে দেবীটি আবার কে? না, হর-শিরাশ্রিতা পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তাই দেবব্রতের আর এক নাম 'গাঙ্গেয়'।

জহ্নুমুনি ছিলেন রাজর্ষি। তাঁর জানুবিনির্গত আত্মজা জাহ্নবীকে যদি দেবী বলে স্বীকার না করি, তবে পতিতপাবনী সুরধুনী গঙ্গা দেবীর অনেক উপাখ্যানই অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে হয়। মহাভারতে দেখা যায়, দেবরাজ ইন্দ্রের সুরসভায় দেবী সুরধুনীর অবধি গতিবিধি ছিল। কোনো পুণ্যশ্লোক নরপতিরও এ সৌভাগ্য মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য, এর জন্য তাঁদের বহু অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করতে হয়েছিল।

এমনিই এক সুকৃতিবান রাজা একদা ইন্দ্রলোকের সুরসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহারাজ 'মহাভিষ' নামে খ্যাত। ইন্দ্রসভায় সেদিন অন্যান্য দেবতা ও কয়েকজন ঋষিও হাজির ছিলেন। অকস্মাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাতের জরুরী প্রয়োজনে সেখানে সরিদ্বরা গঙ্গাদেবীও এসে পড়েন। অসামান্যা রূপসী ও স্থির-যৌবনা তিনি। দেবসভায় প্রবেশ করবামাত্র অশান্ত বায়ুর তাড়নায় তাঁর পরিধেয় বস্ত্র সহসা স্খলিত হয়ে পড়ে। গঙ্গাদেবীর এই অসহায় অবস্থা দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ লজ্জায় মাথা নিচু করে নতমুখে রইলেন। কিন্তু নৃপতি মহাভিষ ছিলেন মর্ত্যের মানুষ। তিনি সেই অলোক লাবণ্যময়া তন্বী ভাগীরথী দেবীর নগ্ন সৌন্দর্যের প্রতি এমন মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন যে, মানুষ-টির সেই অকুণ্ঠ অপলক দৃষ্টি গঙ্গাদেবীকেও বিস্মিত ও বিচলিত ক'রে তুলেছিল। তিনি যেন কিছুতেই সে দৃষ্টির মোহিনী আকর্ষণ এড়াতে পারছিলেন না। কটিবস্ত্র সংবরণ করে নিয়ে ফেরবার পথে নৃপতি মহাভিষের সেই মুগ্ধ আঁখির বাসনা-রঙীণ চাহনি বারবার ভাগীরথীর বিহ্বল চিত্তকে চঞ্চল করে তুলছিল।

গঙ্গাদেবীর অন্তর্ধানের পর দেবতা ও ঋষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে মহাভিষকে তাঁর এই নির্লজ্জ আচরণের জন্য দেবসভার অযোগ্য বিবেচনায় ইন্দ্রলোক থেকে বিতাড়িত করে দিলেন। মহাভিষ তখন মর্ত্যলোকে ফিরে এসে মহারাজ প্রতীপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

এদিকে সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী তাঁর ফেরার পথে দেখেন বসুদেবগণ পথের মাঝে মূর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হয়ে পড়ে আছেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন, অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ বশিষ্ঠ ঋষি তাঁদের অভিশাপ দিয়ে গেছেন যে তাঁদের আবার মনুষ্যযোনিতে গিয়ে জন্ম নিতে হবে। বসুদেবগণের এই দুর্ভাগ্যের প্রতি গঙ্গাদেবী সহানুভূতি প্রকাশ করতেই তাঁরা দেবীকে ধরে বসলো, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমরা কোনোও সামান্যা মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে পারবো না। আপনি কৃপাপরবশ হয়ে মানবীরূপ ধারণ করে মহারাজ প্রতীপের পুত্র শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করুন। আমরা তাঁর ঔরসে আপনার গর্ভে একে একে জন্মলাভ করে ধন্য হবো। গঙ্গাদেবী তাঁদের এ অনুরোধ রক্ষা করবেন বলাতে, বসুদেবগণ সাহস পেয়ে তাঁকে আরও এক অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, জননী জাহ্নবী! আমরা একে একে আপনার গর্ভ থেকে

ভূমিষ্ঠ হবামাত্র আপনি আমাদের নদীর জলে ভাসিয়ে দেবেন। মর্ত্যলোকের যন্ত্রণা যেন একদিনের জন্যও আমাদের সহ্য করতে না হয়।

গঙ্গাদেবী তাঁদের এ নিষ্ঠুর অনুরোধেও সম্মত হলেন, কিন্তু শেষ পুত্রটিকে তিনি জলে দেবেন না বললেন। একজন বিশ্বজয়ী মহৎ নৃপতির সঙ্গে আমার স্বেচ্ছা-সঙ্গম কি নিষ্ফল হয়ে যাবে? সে আমি হতে দেব না। মহারাজ শান্তনুর প্রতি তাতে ঘোরতর অবিচার করা হবে।

অগত্যা বসুদেবগণ গঙ্গাদেবীর এ ইচ্ছা মেনে নিলেন। কিন্তু বলে দিলেন, আপনার গর্ভের সেই শেষ সন্তানটি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মহাবীর হয়ে উঠবেন বটে, কিন্তু তাঁকে নিঃসন্তান অবস্থায় মরতে হবে। বংশ থাকবে না তাঁর।

এরপর মহাভারতে দেখতে পাই মহামান্য মহারাজ প্রতীপ পৃথিবীর অধিপতি হবার পর রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী তীরে গিয়ে যোগাসনে তপস্যা শুরু করেছেন। তপস্যানিরত মহারাজ প্রতীপের অপূর্ব তেজব্যঞ্জক রূপে মুগ্ধ ও মোহাভিভূত হয়ে গঙ্গাদেবী একদা রূপসী তরুণীর মূর্তি ধারণ করে এসে একেবারে ধ্যানসমাহিত প্রতীপরাজের দক্ষিণ উরুদেশে অন্তরঙ্গ প্রণয়িনীর মতো উদ্বেল চিত্তে বসে পড়লেন।

নারী সংস্পর্শে মহারাজ প্রতীপের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। তিনি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি? এভাবে আমার কাছে এসেছেন কেন?

গঙ্গাদেবী নির্লজ্জার ন্যায় রাজার কাছে নিজের মনের গোপন-অভিলাষ ব্যক্ত করলেন।

মহারাজ শান্তভাবে বললেন: ক্ষমা করবেন। আমি এখন তপস্যানিরত। যোগসাধনে দীক্ষিত। এ অবস্থায় পরদার সম্ভোগ করলে আমি ধর্মে পতিত হবো। আমি যোগভ্রষ্ট হবো।

গঙ্গাদেবী শুনলেন না সে কথা। বললেন, আমি আপনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী। আমাকে প্রত্যাখান করবেন না। আমি কোনো নিন্দনীয়া অগম্যা স্ত্রীলোক নই। আমি একজন দিব্যাঙ্গনা। আমাকে গ্রহণ করলে আপনাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে না।

তখন মহারাজ নিরুপায় হ'য়ে বললেন, দেবী! আমি বড় দুঃখিত। আপনি চিত্ত-চাঞ্চল্যবশতঃ একটা মস্ত ভুল করে বসেছেন। ভোগ্যা কামিনীর স্থান বরাবর পুরুষের বাম উরুতে। দক্ষিণ উরু আমাদের পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূ স্থানীয় স্নেহের পাত্র পাত্রীগণের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং আপনি যখন আমার দক্ষিণ উরুতে এসে উপবেশন করেছেন, তখন আমি আপনাকে আমার পুত্রবধূরূপেই গ্রহণ করছি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি. আমার পুত্রের সঙ্গে নিশ্চিত আপনার বিবাহ দেব।

অগত্যা গঙ্গাদেবী ক্ষুণ্ণচিত্তে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

দেব-মানব-পূজিতা সুরধুনী গঙ্গাদেবীর এমনি এক দ্বিচারিণী চরিত্র আমরা মহাভারতের আদিপর্বে দেখতে পাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর প্রতি এখানে সুবিচার করেছেন বলা চলে না। যাইহোক, অতঃপর সেই পূর্বোক্ত স্বর্গচ্যুত মহারাজ "মহাভিষ" মর্ত্যে নেমে এসে প্রতীপ মহিষীর গর্ভে শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। বয়োপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত হ'য়ে পড়েন। একদা অরণ্যপ্রান্তে নির্জন ভাগীরথী তীরে তিনি যখন মৃগয়ার শ্রান্তি দূর করবার জন্য বিশ্রাম করছিলেন, প্রিয়দর্শন যুবক শান্তনুর সঙ্গে রূপসী গঙ্গাদেবীর অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল। শান্তনু সেই অপরূপ সৌন্দর্যময়ী নারীর আশ্চর্য রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তরুণীর পাণি প্রার্থনা করলেন। গঙ্গাদেবীও সেই পরমসুন্দর রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিচয় নিয়ে জানলেন তিনিই প্রতীপ পুত্র 'শান্তনু'। হঠাৎ, বসুদেবগণের উদ্ধারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শান্তনুকে তিনি পতিত্বে বরণ করে নিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে, তাঁর যে কোনও কাজ—তা সে যতই অন্যায় হোক না কেন, শান্তনু কখনো তাতে বাধা দেবেন না। রূপমুগ্ধ মহারাজ শান্তনু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এবং ওই রূপসী মেয়েটি যে কে, তার কোনও পরিচয় না-নিয়েই সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। রূপসী মেয়ে এই সুযোগে সর্ত করিয়ে নিলেন যে, যদি শান্তনু তাঁর এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তবে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাবেন।

কলকল্লোলিনী সরিদ্বরা গঙ্গার মনোরম সঙ্গ সুখে শান্তনুর মহানন্দে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। গঙ্গাগর্ভে তাঁর পর পর সাতটি চন্দ্র সূর্যের ন্যায় পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র পত্নী একে একে তাদের জলে বিসর্জ্জন দিচ্ছেন দেখে শান্তনু মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেও স্ত্রীর এ অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারেননি। কারণ, তিনি ছিলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু, অষ্টম পুত্রের বেলা তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পত্নীকে এই নিষ্ঠুর কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করলেন। ফলে, তাঁর অষ্টম শিশুটি রক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু চিরযৌবনা রূপসী গঙ্গাদেবী তৎক্ষণাৎ শান্তনুকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

শান্তনুর এই শেষ পুত্রটিই মহাভারতখ্যাত মহান দেবব্রত। পিতার সন্তোষের জন্য সুকুমার যৌবনে ভীষণ দুই প্রতিজ্ঞা করায় পরবর্তী জীবনে তিনি 'ভীষ্ম' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে গঙ্গাদেবী যে পুত্রকে সর্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত সমরদক্ষ ও নির্ভীক করে গড়ে তুলে পিতৃ সন্নিধানে পাঠিয়েছিলেন সেই ধীমান ও বুদ্ধিমান পুত্র ধীবরপল্লীর এক দাসরাজের কাছে যে দুটি কঠিন প্রতিজ্ঞায় নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? সেকি তাঁর দেশের কল্যাণের জন্য? জাতির মঙ্গলের জন্য? বংশের মানমর্য্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য? অথবা, বিশ্বজনের হিতের জন্য? এই যে তিনি তাঁর অশেষ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবনটাকে এমনভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দিলেন, এ কিসের জন্য? কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল,—একটি রূপ-যৌবনোচ্ছ্বলা জেলের মেয়েকে দেখে তাঁর প্রৌঢ় পিতার নারী-সম্ভোগ কামনা উদগ্র হয়ে ওঠায়, তিনি 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে' নিজের আত্মোন্নতিকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। ভীষ্মের ন্যায় একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ যুবকের বোধ

উচিত ছিল, তিনি এরূপ অঙ্গীকারের দ্বারা নিজের রাজ পরিবারের ও পিতৃকুলের কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন? যে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ত্যাগ স্বীকারের জন্য মহাভারত উচ্চকণ্ঠে তাঁর জয়গান করেছেন, একালের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোনও লোকই বলবেন ভীষ্মের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। এতবড় সুদূর-প্রসারী এক অন্যায় সামাজিক অপরাধ, আর কিছু হতে পারেনা। তিনি এক নীচ কুলোদ্ভবা জেলের মেয়েকে কামান্ধ পিতার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য ভরতবংশের কুলবধূ ক'রে আনায়, অভিজাত পরিবারের বিপুল মান মর্য্যাদাকে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছিলেন। এটাকে অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত ঝোঁকের বশে বা গোঁয়ার ছেলের নিজের জিদের ফলে ঘটে যাওয়া একটা ঘোর অকল্যাণকর পারিবারিক দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। যার পরিণাম পরবর্তীকালে অতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ভীষ্ম যদি তাঁর তরুণ জীবনের অরুণ উষায় তরল বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে পিতৃপ্রীতি বশে এমন প্রচণ্ড ভুল না করতেন, তাহলে হয়ত ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই সংঘটিত হ'তনা, এবং বিরাট কুরুবংশও এমন শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হ'য়ে যেত না। ভীষ্মের এই অবিমৃশ্যকারিতার সমর্থনে যদি কেউ বলেন ভীষ্মের শিক্ষাই ছিল 'পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ' তাহলে একথাও উঠতে পারে যে পিতৃবিয়োগের পর কোনও মাতৃভক্ত পুত্রের জননী যদি পত্যন্তর গ্রহণে অভিলাষিণী হয়ে কোনও নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে দ্বিতীয় পতিরূপে মনোনীত করেন তাহ'লে সে মাতৃভক্ত পুত্র কি ভীষ্মের দৃষ্টান্ত অনুসরণে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' শ্লোকের দোহাই দিয়ে মায়ের সেই ইতর-বিবাহ মঞ্জুর করবেন এবং সেই লোকটিকেও অকুণ্ঠ চিত্তে 'পিতা' বলে সম্বোধনও করবেন? ব্যাপারটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন কাজ নয় কি?

দেবভাষায় রচিত শ্লোকের বর্মেচর্মে আবৃত হয়ে কোনও অন্যায় আচরণে উদ্যত পিতার দুর্নীতিমূলক অপরাধের সহযোগিতা করে এযুগের কোনও আদর্শ পিতৃভক্ত পুত্র কি বর্তমান আইনের আওতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন? আজকাল ভেজাল খাদ্য, নকল ঔষধ ও চোরাকারবার করতে গিয়ে, নোটজাল করতে গিয়ে, অপহৃতা নারী বা কন্যাকে এনে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে ধৃত হলে পিতা পুত্র উভয়েরই ধর্মাধিকরণে শাস্তি হ'য়ে যাচ্ছে। সুতরাং, দেশের সঙ্গে জড়িত নিজের জীবনের সর্ব সার্থকতা বিসর্জন দিয়ে কামাতুর পিতার উপভোগের জন্য ধীবরকন্যা সত্যবতীকে সমাদরে রাজপরিবারে এনে স্থান দেওয়ায় ভীষ্মের অন্ধ পিতৃভক্তির আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর দূরদৃষ্টি, সুবিবেচনা ও নীতিবোধের অভাবও কি সূচিত হয়নি? এই বিশ্রী ব্যাপারে কেবল মহারাজ শান্তনুর চরিত্রই হীন হয়ে পড়েনি, ভীষ্মদেব নিজেও তাঁর এই নির্বোধ আচরণের দ্বারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর বারনারী সম্ভোগ লালসা তৃপ্ত করার জন্য তাঁকে গণিকালয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়ায় খ্যাত লক্ষহীরাকে পর্যন্ত লজ্জা দিয়েছেন।

ভীষ্মের সমগ্র জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করলে দেখা যায় যৌবনের তরল আবেগে মূঢ় পিতৃভক্তি দেখাতে গিয়ে পরিণামে তাঁকে সারাজীবন দু'টি উদরান্নের জন্য নিবীর্য হয়ে দুর্যোধনের নানা দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। বৃদ্ধ পিতার পদস্খলনকে বাধা না দেওয়ার ফলে তিনি নিজের কাছে, নিজের বংশের কাছে এবং আপন উত্তরাধিকারী-দের কাছে যে মহা-অপরাধ করেছিলেন আজীবন তাঁকে সে জন্য কঠিন শাস্তিভোগ করতে হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে সে পরিচয় ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ম্বর সভায় এই চিরকৌমার্যব্রতধারী ভীষ্মকে উপস্থিত হ'তে দেখে বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে হয়, তিনি কি হিসাবে কন্যা লুণ্ঠন করে আনতে ছুটলেন? বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্য্যের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তবে বিচিত্র-বীর্যকে না পাঠিয়ে তিনি স্বয়ং ছুটে গেলেন কোন যুক্তিতে? অনুজ বিচিত্রবীর্য তখনও পূর্ণযৌবনে উপনীত হননি। সেদিনও তিনি কিশোর কুমার। তাঁকে স্বয়ম্বর সভায় পাঠালে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে পাছে অনুজ ভাইটি আহত হয়, এই আশংকায় স্নেহপরায়ণ অগ্রজ নিজেই স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, এই যদি তাঁর কৈফিয়ৎ হয়, তাহলেও আর একটি সংশয়াত্মক প্রশ্ন ওঠে যে সেই তরুণ বালকের জন্য তাঁর মত একজন পরিণতবুদ্ধি মানুষের একেবারে তিন তিনটি প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে আনার কি এমন জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল? এর কোনই সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়না।

বিচিত্রবীর্যের সৌভাগ্যবশতঃ শাল্বরাজের প্রতি আসক্ত কুমারী অম্বা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় কেবলমাত্র অম্বিকা ও অম্বালিকা দুটি কন্যাই হস্তিনার রাজঅন্তঃপুরে রয়ে গেল। দীর্ঘ সাত বৎসর এই দুই পত্নীর সহবাসে দিবারাত্র অন্তঃপুরেই অবস্থান করার ফলে শেষ পর্যন্ত দুরন্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে অপরিণত যৌবন বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যু ঘটলো। তিনি দুই পত্নীর কারুর গর্ভেই সন্তান উৎপাদন ক'রে যেতে পারেননি। বিচিত্রবীর্যের এই শোচনীয় পরিণামের জন্য যদি কেউ ভীষ্মকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেন, তবে ভীষ্মের পক্ষে তা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। কারণ, তিনি ছিলেন নাবালক ভাইয়ের একমাত্র অভিভাবক। নিন্দুক প্রবীণেরা নিশ্চয়ই তাঁকে এই বলে দোষী করবেন যে অপ্রাপ্ত-যৌবন ভাইকে উঠ্‌তি বয়সে একসঙ্গে দুই নারী সম্ভোগের সুযোগ দিয়ে ভীষ্মদেব সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। অভিভাবকের অযোগ্যতা এবং আর একবার তাঁর অদূরদর্শিতাই প্রকাশ পেয়েছে এক্ষেত্রে।

ভীষ্মের বিমাতা রাণী সত্যবতী আরও একটি সাংঘাতিক অভিযোগ আনতে পারতেন তাঁর এই সপত্নী পুত্রের বিরুদ্ধে যে, ভীষ্ম নিজে সিংহাসনে না বসলেও প্রকৃতপক্ষে নাবালক ভাইয়ের প্রতিভূ স্বরূপ সমগ্র রাজ্য পরিচালনার যা কিছু দায়িত্ব তা সমস্তই তিনি একা নিষ্পন্ন করতেন। অমিত রাজশক্তির এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার দীর্ঘকাল ভোগ করার সুযোগ পেলে মানুষের মনে ক্ষমতার একটা তীব্র মাদকতা এসে যায়। সত্যবতী যদি মনে মনে এ সংশয় পোষণ করতেন যে তাঁর কচি ছেলে

বিচিত্রবীর্যকে অপরিণত বয়সে একেবারে দুই নারী সংসর্গে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার দুরভিসন্ধি করেছিলেন তাঁর সপত্নী পুত্র ভীষ্ম, রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসনদণ্ড নিষ্কণ্টকে নিজের হাতেই বরাবর কায়েম রাখবার জন্য! রাণী সত্যবতীর এ অভিযোগের ভীষ্মদেব কি সঙ্গত উত্তর দিতেন তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর। তবে, বিংশ শতাব্দীর মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা হয়ত বলবেন, না, ভীষ্ম ক্ষত্রিয় কুলজাত, ভীষ্ম রাজপুত্র, তিনি সমরকুশলী প্রখ্যাত বীর। প্রায়ই দেখেন তাঁর পরিচিত একাধিক ক্ষত্রিয় রাজকুমার স্বয়ম্বর সভায় হানা দিয়ে বীর্যশুল্কে কন্যা হরণ করে নিয়ে এসেছেন। তিনি যদিও রাজা হবেন না এবং চিরকুমার থাকবেন বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন, তাহলেও, মানুষ তো তিনি, তায় আবার শক্তিমান যুবা পুরুষ! তাঁর নির্জ্ঞান মনের অবচেতন স্তরে, রাজ্যান্তরের স্বয়ম্বর সভা থেকে বাহুবলে কন্যা হরণ করে আনবার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সংগুপ্ত ছিল। সেই সাধ পূর্ণ করবার অদম্য বাসনা বীরবর ভীষ্মের অবচেতন মনকে তাড়না করে কাশীরাজ দুহিতাদের স্বয়ম্বর সভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, বৈমাত্র-ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য কন্যা সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন এই বলেই তিনি মনকে বুঝিয়েছিলেন। একেবারে তিন কন্যা নিয়ে আসার ফলাফল তিনি অত ভেবে দেখবার সময় পাননি। মনোবিজ্ঞানের বিচারে এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা চলে না।

তারপর, শাম্বরাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অম্বা শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের গুরু পরশুরামের মধ্যস্থতায় ভীষ্মকেই পতিত্বে বরণ করবার দাবী নিয়ে ভীষ্মের কাছে ফিরে এলেন। তাঁর যুক্তি হল, স্বয়ম্বর সভা থেকে যিনি কন্যা হরণ করে আনেন তিনিই সে কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য। পরশুরামও এটা স্বয়ম্বরের চিরাচরিত বিধি বলে স্বীকার করে নিয়ে ভীষ্মকে আদেশ করলেন অম্বাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে। কিন্তু, ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা তুলে গুরু-আজ্ঞা পালনে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। ফলে গুরুশিষ্যে বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ।

ভীষ্মের এ আচরণকে কোনও যুক্তি দিয়েই উচিত হ'য়েছিল বলে সমর্থন করা চলেনা। শুধু যে চিরাচরিত স্বয়ম্বর বিধিই তিনি লঙ্ঘন করলেন তাই নয়, গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তিনি ভারতীয় নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ করলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যিনি ক্ষত বিক্ষত হ'য়েও নপুংসক শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি বীরের নীতিবিরুদ্ধ কাজ হবে বলে, কিন্তু গুরুর বেলা এ সুবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান তাঁর উদয় হয়নি কেন তা' বোঝা যায়না।

বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যুর পর বিমাতা সত্যবতী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও ভীষ্মদেব বংশ রক্ষার জন্য নিঃসন্তান ভ্রাতৃবধূদের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করতে সম্মত হননি, কারণ তিনি চিরকৌমার্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ দেখা যায় সত্যবতীর কানীনপুত্র আশৈশব ব্রহ্মচারী ঋষি বেদব্যাস এসে মাতৃ আজ্ঞায় বিধবা রাজবধূদের ক্ষেত্রে উপগত হ'য়ে কুরুবংশ রক্ষা ক'রে গেলেন!. কুমারী ধীবর-কন্যার অবৈধ গর্ভজাত পরাশর পুত্র ব্যাসদেবের দ্বারা কুরুবংশ যে কিভাবে রক্ষা হ'তে পারে এবং ভীষ্মদেব যে কোন যুক্তিতে এই অনাচারে সম্মতি দিলেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। হয়ত বা ঘাড়ে এসে পড়া ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের বিপদ এড়াবার জন্য তিনি বিমাতার এই দ্বিতীয় অবান্তর প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন।

যাই হোক, পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাই ভীষ্মদেব রয়েছেন কৌরবপতির আজ্ঞাবাহী অন্নদাস ও রাজভক্ত অনুগত প্রজা হয়ে। তিনি কুরু বংশের জ্যেষ্ঠ ও কুরুশ্রেষ্ঠ হ'য়েও পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনের বারম্বার বিবিধ অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি সেই অন্যায়কারীদেরই পক্ষ অবলম্বন করলেন। কোনো সৎবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাঁর এ কাজ সমর্থন করতে কুণ্ঠিত না হয়ে পারবেন না। তাঁরা বিস্মিত হয়ে ভাববেন তিনি সব জেনে শুনেও দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনী প্রভৃতির পাপ সংসর্গে কেমন করে রয়ে গেলেন? অন্ন-ঋণের দায়ে কি এত বড় অসম্মান বহন করা যায়?

ঋতুমতী একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর থেকে টেনে এনে দুর্মতি দুঃশাসন যখন সভামধ্যে তাকে বিবস্ত্রা করতে প্রবৃত্ত হ'ল দ্রৌপদীর কাতর মিনতি সত্ত্বেও ভীষ্মদেব লাঞ্ছিতা কুলবধূর মর্যাদা রক্ষার কোনও চেষ্টাই করলেন না। স্থবীর ভীষ্ম যে বয়সের ভারে নিবীর্য হ'য়ে পড়েছিলেন তাও তো মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এই বৃদ্ধই সেনাপতি হ'য়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বীর বিক্রমে সংগ্রাম করে প্রতিদিন দশ হাজার পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করেছেন। কুরু সভায় দ্রৌপদীর অসম্মানে বাধা না দেওয়ায় ভীষ্ম চরিত্র হয়ে উঠেছে অত্যন্ত হীন ও অবনত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের নানা আচরণ ও ব্যবহার বিচার করে দেখলে পূর্বাপর বহু অসঙ্গতিই চোখে পড়ে। ইতিপূর্বে ভীষ্মকে দেখি দৌরাত্ম্যকারী দুর্যোধনের দলের সর্দার হ'য়ে ছুটেছিলেন তিনি বিরাট রাজার গো-গৃহে গরু চুরি করতে? মহাভারতের মহান চরিত্র ভীষ্মের এমন অনেক অন্যায় কাজ কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। তবে, বিংশ শতাব্দীর মনোবিকলন বিদ্যার সাহায্য নিলে কতকটা হদিস মেলে।

পাণ্ডুরাজের শোকাবহ মৃত্যুর পর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়ে যখন সমস্ত রাজকার্যের ভার ভীষ্মের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং দৃষ্টিহীনের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে পুত্র দুর্যোধনের হাতে রাজ্য পালনের সমস্ত ভার অর্পণ করলেন, তখন পিতৃব্য ভীষ্ম একেবারে বেকার হয়ে পড়ায়, তাঁর মনের গোপন কোনে নিশ্চয় একটা দুর্জয় অভিমান জমে উঠেছিল। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এতকাল তিনিই ছিলেন সমগ্র কুরু সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা, হস্তিনাপুরীর দণ্ডমুণ্ডের প্রধান কর্ণধার। সেই উচ্চাসনের অমিত সম্মান থেকে অকস্মাৎ স্খলিত হয়ে পড়ায় দুর্যোধনাদির প্রতি তাঁর অন্তরে একটা চাপা আক্রোশের সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হয়ত তারই প্রভাবে তিনি সমস্ত ব্যাপারেই হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে এই উদাস বৈরাগ্যভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে—যা, তোরা যা খুশী করগে যা, আমি আর তোদের ভাল মন্দ কোনও কিছুই দেখব না। সুকুমার স্নেহ-প্রেমের স্পর্শহীন, বিফল জীবনের ব্যর্থতা ও শূন্যতা এবং সংসারের নির্মম ক্রুরতা হয়ত এ সময় এই অকৃতদার বৃদ্ধের

অন্তরকে দুঃসহ পীড়া দিচ্ছিল। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে কেন?

দুর্দান্ত দুর্যোধনের দোর্দণ্ড শাসনের মাঝে পিতামহ ভীষ্ম কোনো পাত্তাই পেতেন না। প্রতিবাদ শুনছে কে? নিষেধ মানছে কে? দুর্যোধন ছিল সেকালের এক অতি-আধুনিক ছেলে। কাউকেই কেয়ার করে না। বাপ মাকেই সে ধমকে কথা কয়। ভীষ্ম তাই বেগতিক দেখে বোবা বনে গেছলেন। কথাই আছে বোবার শত্রু নেই! নিজের মান নিজের কাছে! সদুপদেশ কিছু দিতে গেলে হয়ত ক্ষমতাদর্পী, উদ্ধত অবিনয়ী ও অহংকারী দুর্যোধনের কাছে তাঁকে অপমানিত হতে হবে। এই ভয়ে ভীষ্মদেব হস্তিনার কোনও ব্যাপারেই আর হস্তক্ষেপ করতেন না। এত দোষ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভীষ্ম চরিত্র মহাভারতে এমন মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে কেন, একথা বুঝতে হলে সে যুগের রীতি-নীতি, আদর্শ, পদ্ধতি, তদানীন্তন, রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজবিধি প্রভৃতি যুগাচারকে সামনে রেখে বিচার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সে যুগে কুমারী কন্যা হরণ করে আনা একটা পৌরুষের পরিচয়। বিবাহ করা না করা বীরের ইচ্ছাধীন। ঋষি থেকে রাজর্ষি পর্যন্ত কারুরই পরদার গমনে বাধা ছিল না। ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রথা অভিজাত সমাজেও প্রচলিত ছিল। এক স্ত্রী নিয়ে পাঁচ ভায়ের সংসার করা কুরুকুলের মত রাজবংশেও নিন্দনীয় ছিল না। জুয়া খেলায় ধনসম্পত্তির মতো স্ত্রীকেও পণ রাখা চলতো। সে কালেও সংসারে মানব চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি, হীনতা দীনতার লজ্জাকর পরিচয় বড় কম পাওয়া যায় না। দেবতা ও ঋষিদের মধ্যেও ব্যভিচার সহজ ছিল অনেক। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ভীষ্ম চরিত্র স্থাপন ক'রে বিচার করলে দেখা যাবে এ মানুষটি সেকালে দোষে গুণে যথার্থ ই অসাধারণ ছিলেন।

ভীষ্মের পরস্পর-বিরোধী আচরণের স্বপক্ষে একটা সবচেয়ে বড় যুক্তি দেওয়া যায় যে সে বেচারা কি করবে? তাঁর জন্মের বহু আগে থেকেই তো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবিধি ভাগ্য দেবতারা নির্দেশ করেই রেখেছিলেন! তবে হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর সম্বন্ধে যে, নিজের উদীয়মান জীবনটাকে সম্পূর্ণ মাটি ক'রে বৃদ্ধ বাপকে খুশী করায় যে অমূল্য পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন সেটা হ'ল ইচ্ছামৃত্যু!' কিন্তু একান্ত প্রয়োজনের সময়েও দেখা যায় তিনি এ বর তাঁর কাজে লাগান নি। অপমান সহ্য করছেন, অসম্মান বহন করেছেন, অনাচার অত্যাচার চোখের সামনে দেখেছেন। জ্ঞাতিবিবাদ ও আত্মকলহের ফলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি মহাপ্রস্থান করবার ইচ্ছা করেন নি। বরং অন্যায়কারীদের পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন। একেই বলে—প্রাণের মায়া কি মানুষ সহজে ছাড়তে পারে? ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা যেটুকু চোখে পড়ে, সেযুগের মানুষের তুলনায় তা আকিঞ্চিৎকর। তবু মনে হয় 'শরশয্যাই' তাঁর যোগ্য শাস্তি।

(মহাভারত, আদিপর্ব, ৯৫-১০৫ অধ্যায়)

চিকিৎসক

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"পিতৃকৃতা জনিরস্তু শরীরিণঃ
সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি।
জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা
ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ।" শঙ্করবিজয়ম্।

সন্দেহ হয়? বৈদ্যেরে ডাকো
সন্দেহ নাই—ডাকিলেই পাবে তারে
রাত্রি দুপুরে, রোদে জলে ঝড়ে—
আসিবেই, সেকি না এসে থাকিতে পারে?
না এলে, করিবে লোকে দুর্নাম
নামীর চেয়েও বড় হয় নাম
তার চেয়ে তার কিবা আছে সঞ্চয়?
দিন যাহা আনে, দিন গেলে শেষ,
সরেশ পরিতে থায় সে নিরেশ
পুঁজি শুধু তার তোমাদেরি প্রত্যয়।
মানিতেই হয় রোগীদের দাবী
তাহাদেরি হাতে অন্নের চাবী
তারো হাতে আছে তাহাদেরি সব প্রাণ,
যে প্রাণ পাইয়া চিনে পিতামাতা
সে প্রাণ ধারণে নানা ছুতো-নাতা
আধি ব্যাধির ব্যথায় পাইতে ত্রাণ।
পিতা-মাতা দেয় দেহের জন্ম
তাহে প্রাণ করে বাস,
ব্যাধি বেদনায় বৈদ্য সে দেয়—
আরোগ্য আশ্বাস!
সুস্থ স্বস্থ সবল শরীরে
মিলে স্বর্গের সুখ—
ভিষক না হলে সেই স্বর্গেই
মিলে নরকের দুখ।

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

চৌত্রিশ

মাত্র একবছর আমি দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম এবং এই দপ্তরের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিল আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি দেখ্‌লাম যে আগ্রহ এবং দৃঢ়তা থাকলে এই বিভাগে জনসাধারণের উপকার কর্‌বার বিশাল সুযোগ রয়েছে তখখুনি আমার অসন্তোষ কেটে গিয়েছিল।

দপ্তরটা নতুন নয়। স্বাধীনতালাভের একবছর আগে থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সচিবের পদ ভার সবসময়ই অধিকার করে এসেছেন আমারই মত একজন আই-সি-এস্ অফিসার। কিন্তু ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের আগে পর্য্যন্ত এই দপ্তরের অস্তিত্বের খবর ও অনেকে জান্‌ত না। অথচ এর ঠিক একবছরের মধ্যে এই দপ্তরের কর্ম্মতৎপরতা দেখে শুধু বাংলা দেশে কেন, বাংলার বাইরে ও অনেকে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই পরিবর্ত্তনের জন্য আমি নিজে অনেকখানি দায়ী। চাকুরীজীবনের প্রথমদিন থেকেই আমার বিশ্বাস যে আমরা অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা দেশের সেবা করতে পারি মাত্র এক উপায়ে, সে হচ্ছে নির্ভয়ে এবং ব্যবহারিক (material) পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে কাজ করে যাওয়ায়। এই নীতি সম্পূর্ণভাবে আমি অনুসরণ করেছিলাম দুর্নীতিদমন বিভাগের বছরটিতে।

সরকারী যে কোন বিভাগে বাঁধা-ধরা অনেক আইন-কানুনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাজ কর্‌তে হয়। দুর্নীতি দমন বিভাগের কাজে এই আইন কানুনের বাধা একটু বেশীই ছিল। তবু যে আমি খানিকটা সাফল্য লাভ কর্‌তে পেরেছিলাম তার প্রধান কারণ, আমি কখনও ভীরু মন নিয়ে আমার অনুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হইনি। অনেক কেস্ আমাকে তদন্ত কর্‌তে হয়েছে যেখানে অভিযুক্ত ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারের সুদক্ষ কর্ম্মচারী বা প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু আমি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইনি'।

বলা বাহুল্য, আমাকে নানা অসুবিধায় পড়্‌তে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বার্থ (vested interests) পদে পদে আমার অনুসন্ধানকে ব্যর্থ কর্‌বার চেষ্টা করেছে, কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমার high-handedness এবং বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে অনেক নালিশও করা হয়েছে। দু'এক সময় কর্ত্তৃপক্ষের মধ্য থেকেই আমার শুভানুধ্যায়ীরা বলেছেন আমি যেন একটু সাবধানে অগ্রসর হই, সিংহাসনের পেছনে যাঁরা রয়েছেন অন্ততঃ তাঁদের পা যেন না মাড়াই। কিন্তু ডাঃ দাসের একগুঁয়েমি দেখে তাঁরাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বাইরের লোকে যা'ই মনে করুক না কেন, দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। অসাধুতার অকাট্য প্রমাণ পেলে ও প্রত্যক্ষভাবে তিনি কিছুই কর্‌তে পারেন না। বড় জোর লিখ্‌তে পারেন তাঁর রিপোর্ট এবং যথাস্থানে পাঠাতে পারেন তাঁর মতামত ও সুপারিশ (recommendation)। Action নিতে পারেন একমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীপর্ষদ। এরা যদি action না নেন্ অথবা রিপোর্ট ধামাচাপা দেন, দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব অসহায় নিষ্ফল রোষে ফুল্‌তে পারেন মাত্র। ...তবু বাংলাদেশের জনসাধারণের মতে আমি এক বছরে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছিলাম তার ঢেউ অনেকদিন পর্য্যন্ত অনুভূত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বল্‌তে চাই। এই দপ্তরে যেটুকু সাফল্য আমি অর্জ্জন কর্‌তে পেরেছিলাম তা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না—যদি আমি আমার বিভাগীয় অফিসারদের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা না পেতাম। তাঁরা যে নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধ এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। পরে আমি জান্‌তে পেরেছিলাম যে

এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁদের কয়েকজনকেও অনেক অসুবিধায় পড়্‌তে হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের বছরটায় একটা নতুন অভ্যাস আমি অর্জ্জন করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ডায়েরী লেখা। এর আগে বা পরে আমি কখনও নিয়মিতভাবে ডায়েরী লিখিনি, কিন্তু এই বছরটার অভিজ্ঞতা আমি ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে, যে সব চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সন্মুখীন আমি হয়েছি কিছুদিন পরে হয়ত তা ভুলে যাব, তাই তার স্মৃতি আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেছি ডায়েরীর পাতায়। এই ডায়েরীটি অত্যন্ত মূল্যবান্, কারণ এর মধ্যে এমন সব তথ্য আছে যা' সরকারের কাছে পাঠানো আমার রিপোর্টেও নেই। পাছে হারিয়ে ফেলি বা চুরি যায় এই ভয়ে ডায়েরীটি শীল্‌মোহর ক'রে সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার ব্যাঙ্ক্‌এর হেফাজতে। "এক অধ্যায়" এর উপসংহার যদি কখনও লিখি, এই ডায়েরীটি খুবই কাজে লাগ্‌বে।

এমন অহমিকা আমার নেই যে আমি যা দেখেছি বা জেনেছি তাই একমাত্র সত্য। যাঁরা অভিযুক্ত, স্বপক্ষে তাঁদেরও অনেক কিছু বল্‌বার আছে বই কি! তবে এটুকু আমি জোরগলায় বল্‌তে পারি যে প্রত্যেকটি বড় কেস্ আমি নিজে নাড়াচাড়া করেছি এবং খুবই চেষ্টা করেছি objective এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌তে। আগেই বলেছি, অনেকক্ষেত্রে আমি clearance certificateও দিয়েছি। যাঁরা আমাকে ছিদ্রান্বেষী বা inquisitorial এই প্রকার আখ্যা দিয়েছেন তাঁদের অবগতির জন্য আমার এই statement পুনরুচ্চারণ কর্‌লাম।

অবশ্য এটা আমি অস্বীকার করি না যে এই দপ্তরের কাজে আমি অননুভূতপূর্ব্ব তৎপরতা এবং উৎসাহ দেখিয়েছিলাম। সেটা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই অপরাধী।

এই প্রসঙ্গে ছোট একটা ঘটনার উল্লেখ কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারছি না। একটা বড় কেস্ তদন্ত কর্‌বার সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কতকগুলো ব্যভিচারের খবর আমার নজরে এসেছিল এবং সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আলাদা একটা নোট্‌ও পাঠিয়েছিলাম। রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ কোন ব্যাপারই গোপন থাকে না, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীটি কেমন ক'রে জান্‌তে পেরেছিলেন আমার এই নোটএর কথা। তিনি তুমুল হৈ-চৈএর সৃষ্টি করেছিলেন এবং দাবী জানিয়েছিলেন যে আমার এই নোট প্রত্যাহার করতে আমাকে বাধ্য করা হোক্। আমি অবশ্য একটা Show-downএর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যতদিন পর্য্যন্ত আমি দপ্তরের সচিব ছিলাম ততদিন এ সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করা হয়নি। বম্বে চলে আসবার পর শুন্‌লাম— কর্ত্তৃপক্ষ আরও অনুসন্ধান ক'রে জেনেছেন যে আমার নোটএ যে সব ঘটনার উল্লেখ ছিল তার কোন conclusive প্রমাণ তাঁরা পান্‌নি, অর্থাৎ আমার নোটটা ভিত্তিহীন!

ব্যাপারটার উপসংহার এখানেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীটি বম্বের ঠিকানায় আমাকে হঠাৎ একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিটা এইরূপ :

প্রিয় ডাঃ দাস,

আপনি একজন কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লেখক বলে গর্ব্ব অনুভব করেন, কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার কল্পনাশক্তি অত্যন্ত নীচুস্তরের। যে কল্পনার জাল বুনে আপনি এবং আপনার দপ্তরের কয়েকজন অফিসার আমার সম্বন্ধে নোট্ পাঠিয়েছিলেন সত্যের প্রখর আঘাতে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। আপনার একটু লজ্জাবোধ হচ্ছে কি?

আমি জবাব দিলাম :

"প্রীতিভাজনেষু,

আমি একজন কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লেখক এজাতীয় গর্ব্ব কখনও প্রকাশ করেছি বলে মনে হচ্ছে না। তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে, যে নোটএর কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তাতে কল্পনার চেয়ে রূঢ় প্রমাণসিদ্ধ কথাই ছিল বেশী। লিখেছেন, সত্যের প্রখর আঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রশ্ন করছি, কি জাতীয় সত্য? কর্ত্তৃপক্ষ একবারও আমাকে ডেকেছিলেন কি? নোটএর স্বপক্ষে আমারও কিছু বল্‌বার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি? আমি হয়ত নির্লজ্জ, কিন্তু আপনাদের যদি সাহস থাকে তাহলে আমার নোট এবং পরবর্ত্তী চুণকাম-করা "সত্য" উভয়ই প্রকাশ করে দিন্ না!

এই চিঠির কোন জবাব পাইনি, আশাও করিনি। আমার ডায়েরীর সঙ্গে এই চিঠিগুলো এবং আরও কয়েকটি মূল্যবান্ কাগজপত্র আমার ব্যাঙ্ক্এর হেফাজতে রেখে দিয়েছি।

পঁয়ত্রিশ

জীবনের এই অধ্যায়ের উপসংহারে আর একটা বিষয়ের অবতারণা না ক'রে পার্‌ছি না। পলিটিক্যাল পার্টি পোষণ কর্‌তে গিয়ে যে সব দুর্নীতির সূত্রপাত হয় সে সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বল্‌ব।

সবাই জানেন যে অনেক কোম্পানী, শিল্পপতি ও কণ্ট্র্যাক্টার বিশেষ বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টির ফাণ্ডে এক-কালীন বা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। যাতে এরকম চাঁদা দেওয়াটা কোর্টে বেআইনি বলে সাব্যস্ত করা না হয় সেজন্য Indian companies Actকে সংশোধন (amend) করাও হয়েছে। এই সংশোধন প্রস্তাব যখন লোকসভায় উত্থাপিত হয় তখন অনেকে প্রতিবাদ করে-ছিলেন, বলেছিলেন যে জাতীয়-জীবনে এই ব্যবস্থার repercussions কল্যাণকর হবে না, কিন্তু দেশের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন্ নি। পরে কল্‌কাতা হাইকোর্টে এর একটা কেস্এ একজন বিচারপতি এসম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্যও করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন যে,যে আচরণ morally indefensible তাকে আইনের সাহায্যে আইনসম্মত করা উচিত হয়নি।'

দুর্নীতিদমন বিভাগে কাজ করার সময় অনেক কোম্পানী, শিল্পপতি ও কণ্ট্র্যাক্টরের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা কর্‌বার সুযোগ আমার হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই আমি লক্ষ্য করেছি যে তদন্ত করে এঁদের বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট দাখিল করা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত action নেওয়া হয়নি।' পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, এঁদের অনেকেই হয় কোন রিলিফ ফাণ্ডে নতুবা কোন পার্টি ফাণ্ডে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে থাকেন। এই চাঁদা দেওয়ার জন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়নি' এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা হয়ত সম্ভবপর নয়, কিন্তু বাংলা দেশের জনসাধারণ যদি এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছয় তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি ?

মনে পড়ে, অত্যন্ত বে-আইনী কতকগুলো কাজ করার অপরাধে আমারই নির্দেশে কয়েকজন বিত্তশালী ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমার অধস্তন কর্ম্মচারীরা প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলেন, বলেছিলেন, ডাঃ দাস, এঁদের গ্রেপ্তার করা উচিত হবে কি ?...আমি বলে-ছিলাম, আইন যখন বলে যে এ জাতীয় অপরাধ কর্‌লে এঁদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, আপনারা নির্ভয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য করে যাবেন।

গ্রেপ্তারটা করা হয়েছিল এক সন্ধ্যায়, যখন আদালত বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার ফলে অভিযুক্তদের অন্ততঃ সেই রাতটা কাটাতে হবে পুলিশের অতিথিশালায়। Non-bailable offence, কাজেই আমার নির্দ্দেশে পুলিশ ও জামিন দিতে প্রস্তুত নয়।...সেই রাতে চারদিক থেকে আমার বাড়ীতে সে কি টেলিফোন !... "একি করেছেন, ডাঃ দাস ? আপনার কর্ম্মচারীরা এঁদের মত গণ্যমান্য লোককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে ?" "নৃসিংহ-বাবু এই সেদিন আপনাদেরই বন্যাতাড়ন ফাণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি জানেন না বুঝি ?" "মিঃ কাপুরের কোম্পানী প্রতি বছর পার্টি ফাণ্ডে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, তার পুরস্কার কি এই ?"

বলা বাহুল্য, আমার নির্দ্দেশ আমি প্রত্যাহার করিনি এবং একটা রাত তাঁদের কাটাতে হয়েছিল পুলিশের হেফাজতে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পরের দিন আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন এবং চার্জ্জ-সিট দাখিল করার পরেও নানা সরকারী আধা-সরকারী সভাসমিতিতে তাঁরা আনাগোনা করেছিলেন, সম্মানিত অতিথির পোষাকে। এই সব দেখে সাক্ষীরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং discretion is the better part of valour এই নীতি অনুসরণ করে তারা প্রকাশ্য আদালতে সত্য কথা বল্‌তে সাহস করেনি।

আমার ধৃষ্টতা এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার এঁরা ক্ষমা কর্‌তে পারেননি। নানাভাবে আমাকে অপদস্থ এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে এঁরা চেষ্টা করেছিলেন এবং আজও কর্‌ছেন। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আন্‌বার প্রয়াসও এঁরা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এগোননি, কারণ তাঁরা জান্‌তেন (এবং এখনও জানেন) যে তাঁদের

expose করবার মত মালমশলা ব্যাঙ্কের হেফাজতে আমি রেখে দিয়েছি।

দুঃখ হয় শুধু এই ভেবে যে পার্টির স্বার্থ নিয়ে দেশের অধিনায়কেরা এতই আবিষ্ট (obsessed) হয়ে রয়েছেন যে এই পলিসির ethics এবং এর ব্যাপক পরিণামের (long-term consequences) কথা একেবারেই ভাবছেন না।

ছত্রিশ

আই-সি-এস্ থেকে আমি বেরিয়ে আসি ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে, কিন্তু দুর্নীতিদমন দপ্তর থেকে বিদায় নেই ঐ বছরের ৩০শে নভেম্বর। পুরো ডিসেম্বর মাসটা আমি ছুটিতে ছিলাম।

আই-সি-এস থেকে অবসর গ্রহণ করবার সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম ঐ বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে, কিন্তু আমার formal দরখাস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম ২৯শে জুলাই তারিখে। সরকারের অনুমোদন আমার কাছে পৌছায় এর ঠিক একমাস পরে—২৮শে আগষ্ট তারিখে। বোধহয় তার পরের দিনই খবরটা বাংলাদেশের নানা কাগজে ছড়িয়ে পড়ে।

সে কি হৈচৈ! খবরের কাগজে কি জল্পনাকল্পনা! সরকারী জীবনের সবচেয়ে বড় আসনগুলো পাবার প্রাক্কালে ডাঃ দাস কেন পদত্যাগ করছেন? দুর্নীতিসংক্রান্ত একটা বিশেষ কেস্ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধই কি এর কারণ? শুধু বন্ধুবান্ধবেরা নয়, পরিচিত-অপরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে, ঐ এক প্রশ্ন: আপনি কেন চলে যাচ্ছেন, ডাঃ দাস?

সরকারী আইন-কানুনের কঠিন নিগড়ে আমি তখন আবদ্ধ, কাজেই এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিনি। আজ খুলে বলছি।

প্রথমেই বলছি যে দুর্নীতিসংক্রান্ত কোন বিশেষ কেস্ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য আমি পদত্যাগ করিনি। আর এ গুজবও সত্যি নয় যে কর্তৃপক্ষ আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। ...পদত্যাগ আমি করেছি আমার স্বাধীন ইচ্ছায়।

পক্ষান্তরে এটাও সত্যি যে দুর্নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে এবং আরও অনেক ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার গভীর মতবিরোধ চলছিল। আমি ক্রমশই দেখছিলাম, আমার চিন্তাধারা, আমার কর্ম্মপদ্ধতি কর্তৃপক্ষের পছন্দ হচ্ছে না। হয়ত দোষটা আমারই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজে খাপ খাইয়ে নিতে না পাওয়াটা চরিত্রের একটা defect বই কি!

সে যাই হোক্, ধীরে ধীরে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল যাতে কর্তৃপক্ষের এবং আমার মধ্যে একটা সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী লিখবার সময় এখনও আসেনি। তবে আপাততঃ এটুকু বলতে পারি যে ১৯৫৮ সালের মে বা জুলাই মাসে না হ'লেও—তার বছরখানেক বছর দুয়েকের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই পদত্যাগ করতাম।

এখানে একটা অদ্ভুত coincidenceএর কথা না ব'লে পারছিনা। ঠিক ঐ সময়টায় "মাসিক বসুমতী"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল আমার লেখা উপন্যাস "অভিযাত্রী"। ১৯৪২-৫১ সালের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসের নায়ক প্রদীপ, কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের একজন সত্যাগ্রহী, স্বাধীন ভারতে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তার নজরে আসে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নানা দুর্নীতি এবং গলদ, সে দেখতে পায় যে যাঁরা এককালে ছিলেন একনিষ্ঠ দেশসেবক—ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছেন স্বার্থান্বেষী, কুটিল এবং অসত্যাশ্রয়ী। আর দেখতে পায় যে আই-সি-এস্ এর বর্ম্মপরিহিত বড় কর্ম্মচারীরাও নিঃসঙ্কোচে করছেন তাঁদের স্তুতি। অবশেষে প্রদীপের সঙ্গে তার উপরওয়ালার লাগে সংঘর্ষ এবং সরকারী চাকুরীশালা থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়।

প্রদীপের কাহিনী পড়ে অনেকেই তখন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ডাঃ দাস, আপনিই কি আপনার উপন্যাসের নায়ক প্রদীপ? এই উপন্যাসের আবরণে আপনার পদত্যাগের কাহিনীই কি আপনি বলতে চেয়েছেন?

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, না।

কথাটা strictly সত্যি। "অভিযাত্রী" উপন্যাসটি আমি লিখেছিলাম ১৯১৬ সালের জুন-জুলাই-আগষ্ট মাসে। তারপর বহুদিন ওটা ফেলে রেখেছিলাম। ১৯৫৭

সালের শেষভাগে কি একটা কাজ উপলক্ষে "মাসিক বসুমতী"র সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক আমার কাছে আসেন। কথায় কথায় আমার লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির বিষয় উল্লেখ করি। ঘটকমশায় তাঁর পত্রিকায় আমার এই উপন্যাসটি সমর্পণ করতে অনুরোধ করেন এবং আমি রাজী হই। যতদূর মনে পড়ে বাংলা ১৩৬৪ সালের শেষাশেষি অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৫৮ সালের প্রথম ভাগে "অভিযাত্রী" ধারাবাহিকভাবে "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশিত হ'তে সুরু করে। কাজেই এই উপন্যাসের আভরণে আমার পদত্যাগের কাহিনী আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম—একথা সত্যি নয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যা নিহিত ছিল তার ছায়া নিশ্চয়ই এই কথার ওপরে পড়েছিল। কোন Psychic sixth sense আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কি না, সেটা Psycho-analyst এবং Psychiatristরা বিচার করে দেখ্‌বেন। আমি নিজেও অবাক্ হয়ে যাই যখন ভাবি পদত্যাগ কর্‌বার সিদ্ধান্ত নেবার পুরো দু'বছর আগে কি ক'রে প্রদীপের ছবি আমি এঁকেছিলাম!

"অভিযাত্রী" রচনার সঠিক তারিখ থেকে নিশ্চিতভাবে একটা জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে: পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিতে-না পারার অবস্থা সুরু হয়েছিল দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার নেবার অনেক আগে থেকেই। সে সব কাহিনী বল্‌ব আরও কিছুদিন বাদে, পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে।

আমার এই অধ্যায়ের সমাপ্তি হল ১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে। আমার পরবর্ত্তী সচিবের কাছে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে যখন বিদায় গ্রহণ কর্‌লাম তখন মুখে হাসি টেনে নিয়ে এলেও মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে আবেগময় মুহূর্ত্ত এসেছিল এর দিন তিনেক পরে, যখন মহারাষ্ট্র-নিবাসের হলঘরে দুর্নীতিদমন বিভাগের ছোট বড় সমস্ত অফিসার মিলিত হয়ে তাঁদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ আমাকে উপহার দিলেন একখানা রূপোর salver তাঁদের প্রত্যেকের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। এই উপহারটি আমাকে সর্ব্বদা মনে করিয়ে দেয় সেই একটি বছরের কথা—যে বছরটিকে একহিসেবে আমি বল্‌তে পারি আমার সরকারী চাকুরী জীবনের চরম উৎকর্ষ (climax)।

এই অধ্যায়ের অনলস প্রতিধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই প্রত্যূষের স্বল্পাভ অস্বচ্ছতায়, রৌদ্রময় মধ্যাহ্নের নিঃসঙ্গ প্রহরে, রাত্রির উৎসবমুখর কোলাহলের মধ্যে। প্রতিধ্বনির রূপ আমার কাহিনীর মাধ্যমে কতখানি ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছি তা বিচার কর্‌বার ভার বাংলাদেশের বন্ধুদের হাতে তুলে দিলাম। শুধু আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের—যাঁদের আনুকূল্যে বা যাঁদের উপলক্ষ করে নিতান্ত ক্ষুদ্র, অথচ আমার কাছে প্রগাঢ়, এই ভূমিকায় আমি অংশগ্রহণ কর্‌তে পেরেছিলাম।

সমাপ্ত

এ শুধু স্বপ্ন

শান্তশীল দাশ

একটি পৃথিবী, একটি মানুষ জাতি:
প্রীতির বাঁধনে বাঁধা সবাকার মন;
শান্ত স্নিগ্ধ আলোর বিমল ভাতি,
সবাকার মুখে বিরাজিত সারাক্ষণ।

নাই কোনখানে মালিন্য এতটুক,
যেদিকে তাকাও প্রসন্ন চারিধার;
মুখে হাসি, আর আশ্বাসে-ভরা বুক,
নেইকো কোথাও বেদনা ব্যর্থতার!

স্বল্প অভাব, আয়োজন-প্রয়োজন
অতি ছোট ছোট, তবু সংকোচ নাই;
তৃপ্ত হৃদয় পেয়ে অমূল্য ধন,
অসীমাশ্রয়ী চিত্ত সবার, তাই।

এ শুধু স্বপ্ন—তবু বেশ ভালো লাগে;
মনের গভীরে আজো এ স্বপ্ন জাগে।

বাংলার কথা, বাঙালীর কথা

শচীন সেনগুপ্ত

বাংলার কথা অনেক দিন বলিনি, ভাবিওনি। চীন, সোবিয়েৎ, এসিয়া, আফ্রিকা, স্বাধীন ভারত, স্বাধীন জগৎ ধ্যান করেই দিন কাটিয়েছি। অকস্মাৎ আসাম অপ্রত্যাশিত আঘাত হেনে তুরীয়লোক থেকে ধাক্কা মেরে বাংলার মাটিতে ফেলে দিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লাটকর্জ্জন একবার আঘাত হেনেছিল। তখন কিশোর ছিলাম, বয়েস বারো বছর। সেই আঘাতই চেতনা জাগালো। বাংলা কি তাই জানলাম, বাংলার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি তাই বুঝলাম, লক্ষ-লক্ষ বাঙালীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠলাম—

আমরা ঘুচাবো, মা, তোর দৈন্য
মানুষ আমরা নহি ত মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

শুধু গাইলামই না, জীবন পণ রেখে মায়ের লাঞ্ছনা যারা সেদিন করেছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বন্ধুর পথে পা বাড়ালাম আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি। সে লাঞ্ছনার প্রথম প্রতিশোধ নিয়েছিলাম প্রতি-আঘাত করে নয়, যে-হাতে বিদেশী শাসক আমাদের দেশকে বিভক্ত করেছিল, সেই হাত দিয়েই আবার তা সংযুক্ত করাতে বাধ্য করে। সে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা।

নতি স্বীকার করতে হোলো বলে শাসকরা হোলো ক্রুদ্ধ। বিহার আর উড়িষ্যাকে তারা বাংলার অঙ্গ থেকে কেটে পৃথক করে দিল, কোলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লীতে। বিহার-উড়িষ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম না। পূর্ব্ব বাংলা থেকে আসামকে আবার বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া হোলো। তাতেও আমরা ক্ষুব্ধ হলাম না। পূব আর পশ্চিম বাংলা পুনরায় মিলিত হোলো বলেই আমরা আনন্দিত হলাম।

কিন্তু হারালাম না কি কিছুই? হারালাম বৈ কি! লক্ষ-লক্ষ বাঙালীকে হারালাম,—তাদের 'নিজবাস ভূমে পরবাসী' করে দিলাম। কথাটা তখন বুঝিনি, পরেও অনেকদিন বুঝিনি, আঘাত খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে বুঝেছি। গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমল থেকে যে-সব বাঙালী বিহারে-আসামে বস-বাস করছিল, চৈতন্য-সংস্কৃতিকে আসামে উড়িষ্যায় বহন করে নিয়ে গিয়েছিল যে সব বাঙালী, আলীবর্দ্দীর আমলে রাজনীতিক প্রয়োজনে যে বাঙালীরা বিহারে-উড়িষ্যায় বস-বাস করেছিল, ইংরেজ আমলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যারা বিহার-উড়িষ্যা-আসামে বস-বাস করেছিল, তাদের বংশধর বাঙালীরা বিহারে-উড়িষ্যায়-আসামে পরবাসী হয়ে গেল। সংখ্যার হিসেব নেই। শশাঙ্কের আমল থেকে অর্থাৎ সাড়ে ছয়শত খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সাড়ে বারো শত বৎসরে রাজকার্য্যে অথবা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বাংলা-মায়ের কোল ছেড়ে বিহারে,উড়িষ্যায় কত বাঙালী বস-বাস করেছিল, তার সংখ্যা জানবার কোন উপায় নেই। কিন্তু গিয়েছিল যে, তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। গৌড়রাজ শশাঙ্ক পাটলীপুত্রে একাকী প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন নি, সঙ্গে বহু বাঙালী অবশ্যই ছিল। উড়িষ্যায়-আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বংশানুক্রমে বাঙালী বৈষ্ণবদের ওই সব অঞ্চলে বসবাস করতে হয়েছিল, আলিবর্দ্দীর আমলে আর ইংরেজ আমলেও বহু বাঙালীকে যেতে হয়েছিল। সাড়ে বারো শত বছর কাল যারা গিয়েছেন, তাঁরা ফিরে আসেন নি। অনেকে বেমালুম মিশে গিয়েছেন তাদেরই সঙ্গে, যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁরা বস-বাস করেছেন। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানরা বেশি মিশেছেন। অনেকে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বজায় করেও রেখেছেন। রাজ কাজে অথবা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাহক হয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা, স্বভাবতই, তাঁদের প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের বংশধররা তা পাননি। তবুও যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত যোগ্যতার জন্যই তা পেয়েছেন, বাঙালী হিসেবে তা পাননি। কিন্তু সকলে বাঙালীর ভাষা বর্জ্জন করেন নি, যদিচ অনেকে ভাঙা বাংলায় কথা বলেছেন, ধুতি চাদরের বদলে পা-জামা, পাঞ্জাবী অথবা কোট-পেণ্টুলান পরেছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ওই বাঙালীদের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল। বঙ্গ বিভাগকে রহিত করতে ইংরেজকে বাধ্য করাতে সক্ষম হওয়ায় দ্বন্দ্বে আমরা যেমন জয়লাভ করলাম, তেমন এই বাঙালীদের হারিয়ে ক্ষতি-গ্রস্তও হলাম, যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হলাম রাজধানী স্থানান্তরিত হবার ফলে। কিন্তু ও-সব কিছুই আমাদের চিন্তার মধ্যেই এলো না, যেহেতু আমরা তখন থেকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করাই বড় কাজ বলে মনে করলাম। তখন থেকে আমরা সারা ভারত নিয়েই কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করলাম।

[২]

কিন্তু তারও আগেকার কথা আছে। রামমোহনের আবির্ভাবের কথা (পলাশী যুদ্ধের পনেরো বছর পরে), বাংলার উনবিংশ শতকের রেনেসাঁর রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের উদয়কালের (১৭৭২-১৮৬০) কথা। এবং ওরই মাঝে সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭) কথা। রামমোহনের

আবির্ভাব বাংলার উনবিংশ শতকের রেনেসাঁর প্রথম অরুণ-রাগ বলা যায়, ভারতের পূর্ব্বতম প্রান্তের সেই বর্ণবিভূতি সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কেননা রামমোহন প্রাচীন ভারতকে নবীনের নয়নে প্রতিফলিত করে তুল্লেন তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন মানসে। তখনকার ভারত তাঁকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালো। কোন্ ভারত? মহারাষ্ট্রীয় ভারত, মাদ্রাজ-কেন্দ্রিক দক্ষিণ ভারত। কিন্তু উত্তর ভারত নয়। বিদেশী পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি এবং সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যে-যে অঞ্চলে, রামমোহন বিচ্ছুরিত আলো সেই-সেই অঞ্চলে নব-প্রভাতের জাগরণ সূচনা করল। "বাংলা আজ যা বলে, সমগ্র ভারত কাল তার প্রতিধ্বনি তোলে"—ও-কথা কোন বাঙালী কখনো মুখ দিয়ে বার করেননি। ও-কথা বলেছিলেন স্থিতধী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।

বাংলা রেনেসাঁর ভরা-জোয়ারের মাঝেই সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭) উত্তর ও মধ্য ভারতে আগুন জ্বেলে তোলে। বাংলা তাতে যোগ দেয়না। তা যে কেবল বাঙালী সিপাহী ছিল না বলেই তা নয়, বাঙালী তখন মনে-মনে ইংরেজের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করেনি। সে তখন ইংরেজী সাহিত্যের ও সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে যেমন মুগ্ধ হচ্ছে, তেমন সংশয়াপন্নও হচ্ছে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে নতুন করে বুঝতেও চাইছে। দ্বন্দ্বে তখন তার মন মেতে উঠল না। প্রত্যক্ষ কারণও তেমন কিছু পীড়াদায়ক হয়ে উঠল না তার কাছে, যেমন তা হয়েছিল নানা সাহেবের কাছে, তান্তিয়া টোপীর কাছে, রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের কাছে, বাহাদুর শা'র কাছে, অযোধ্যার অধিপতিদের কাছে।

বাঙালী শুধু যে সিপাহী যুদ্ধে যোগই দেয়নি, তা নয়; তখন, এবং তারপরেও, জাতি হিসেবে নয়, ব্যষ্টি হিসেবে, ইংরেজের প্রতিষ্ঠার সহায়তাই করেছে,—যেমন কোম্পানী আমলে, তেমন ভিক্টোরিয়া আমলেও। তাই করে কোলকাতা থেকে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত বহু বাঙালী সরকারী-কর্ম্মচারী হিসেবে, উকিল-ব্যারিষ্টার হিসেবে, ডাক্তার হিসেবে, অধ্যাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

সিপাহী যুদ্ধের ব্যর্থতার পর ইংরেজ-শাসকরা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে উত্তর-ভারতে যে বর্ব্বর উপদ্রব করে, যে নৃশংস অত্যাচার করে, তার ফলে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবার কোন কারণ থাকে না। তা ছাড়া, সিপাহী যুদ্ধের ব্যর্থতাই প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় মুসলিম রাজশক্তিকে সর্ব্বহারা করে, পলাশীর যুদ্ধের ব্যর্থতা নয়। তাই সম্প্রদায় হিসেবে উত্তর ভারতের মুসলমানরাও ইংরেজের প্রতিষ্ঠায় ক্ষুণ্ণ হয়, ক্ষুব্ধ হয়। 'উত্তর ভারতে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে যে দ্বিতীয় অচেনা জাতিকে তারা উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখল, সে-জাতি হচ্ছে বাঙালী। ইংরেজ দণ্ড-পুরস্কারের মালিক। তারা তাই ক্রমশ, পরাজয়ের জ্বালা প্রশমিত হতে হতে, আরাধনার পাত্র হয়ে উঠল; আর বাঙালী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকায় অবাঞ্ছনীয় ভাগ্যান্বেষী বিবেচিত হতে লাগল। বলা-বাহুল্য ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালীকে খুব প্রীতির চোখে দেখল না।

কর্ম্ম ব্যপদেশে যে বাঙালীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্ব প্রথমে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে পারেননি। তখন এয়ার লাইন ত কল্পনাতেই আসেনি, রেল-লাইনও সর্ব্বত্র ছিল না। তাঁদের বংশধরদের মাঝে কতজন সংস্কৃতিতে, আচারে, ব্যবহারে, বাঙালী রইলেন,—আর কতজন ভারতের লোকারণ্যে মিলিয়ে গেলেন, তার হিসেব কেউ রাখল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা জয় করবার পরে নিজেদের প্রয়োজনের তাড়ায় এবং বিজিতদের খুশি রাখবার আশায় যে বাঙালীদের তক্‌মা দিয়ে প্রসিদ্ধ করে তুলেন, তাঁদের মাঝে ছিলেন রায়রাঁয়াণ রাজবল্লভ (ঢাকার নন), মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান রামচরণ, দেওয়ান কান্তবাবু, দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, দেওয়ান গোবিন্দ মিত্র—আরো কত। ব্যবসায়ের সুবিধে করে দিলেন কতই না পেয়ারের পাত্র বাঙালীর।

রেনেসাঁর সময় ওঁদের বংশধররা যেমন হলেন রাজা মহারাজা, তেমনই হলেন শেঠ-মুৎসুদ্দি। কোলকাতায় সব বড় ব্যবসায়ের দালাল হোলো বাঙালী। আর কোলকাতা এক সঙ্গে ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী আর প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর হওয়ায় বাঙালী দালালরা আমদানী-রপ্তানি কারবারে বিদেশী বণিকদের পরেই সমগ্র ভারতীয়-ব্যবসায়ে বড় স্থান দখল করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে ব্যবসা পত্তন করেছিলেন। তাইত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :—

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্যশালিনী,
আবার তোমায় হেরিব জননী সুখে দশদিকপালিনী।
ওগো, ভুবন-মন মোহিনী।

কিন্তু কাল হোলো লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্ত্তিত পার্মামেণ্ট সেটলমেণ্ট, জমিদারীর চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, শ্রমবিহীন-আয়ভোগের স্থায়ী ব্যবস্থা। বাঙালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে জমিদার হতে লাগল, বাগানবাড়ী কিনতে লাগল, রিয়াল প্রপার্টি বাড়াবার দিকে ঝুঁকে পড়ল। জলে-বাতাসে যেমন ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা যায় না—ব্যবসায়-বৃত্তিতেও তা যায় না। কোলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালীর হাত থেকে অবাঙালীর হাতে সরে যেতে লাগল।

জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা অবিমিশ্র ক্ষতিরই কারণ হয়ে উঠল না কিন্তু। রেনেসাঁর সময়, এবং তারপরেও, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জমিদাররা অগ্রসর হলেন। হিন্দু কলেজ (১৮১৭) তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১) হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও মঞ্চ (১৮৫৭), বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার (১৮৫৫) জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর থিয়েটার (১৮৬৬) সবই প্রতিষ্ঠা পায় জমিদারদের উদ্যোগে। আর ওদের শক্তি বৃদ্ধি করেন বাংলার বিদগ্ধরা। সেই সময় থেকে বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্য এবং নাট্য সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় আত্ম-নিয়োগ করে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, এবং ইণ্ডিয়ান

ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বাই শহরে হলেও সভাপতি হন বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই কিন্তু কংগ্রেসকে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা দেন।

[৩]

কংগ্রেস তখন আবেদন-নিবেদন মারফৎ কিছু-কিছু সংস্কারই শুধু চাইতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে সর্ব্বপ্রথম চরমপন্থীদের দাবী উপস্থিত কর' নিয়ে নবীনে-প্রবীণে দ্বন্দ্ব হয়। কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায়। ওর পর থেকেই কংগ্রেস জনমতকে প্রতিফলিত করবার প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। মহারাষ্ট্র ছাড়া বাংলার স্বদেশী আন্দোলন বড় কেউ সমর্থন করেন না। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের মালিকরা লাভবান হন। বাংলা ও মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের এক অংশ চরমপন্থী হয়ে ওঠেন এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় বালগঙ্গাধর তিলকের, লালা লাজপৎ রায়ের, এবং বিপিনচন্দ্র পালের উপর। অবশ্য বাংলার চরমপন্থী রাজনীতির উৎস হয়ে ওঠেন শ্রীঅরবিন্দ, যিনি বরোদায় থাকতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দুপ্রকাশ কাগজে "পুরাতনের পরিবর্ত্তে নতুন প্রদীপ জ্বাল" শীর্ষক প্রবন্ধমালা লিখে কংগ্রেসের ভিক্ষা-নীতির প্রতিবাদ শুরু করেন। প্রবীণরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রাণাড়ে এবং প্রবীণ কংগ্রেস-নায়করা ইন্দুপ্রকাশের উপর চাপ দিয়ে সে প্রবন্ধমালার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, যিনি বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথমে (১৮৬১) বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তাতে যোগ দেন। তাঁরা তাঁদের জীবন-স্মৃতিতে তার উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ধমনীতে বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি তাঁর মাতামহের রক্ত থেকে এসেছিল কিনা তা বলবার কোম উপায় নেই। তবে মানুষের দেবজন্ম সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালে তিনি যা বলেছেন, তা থেকে অনুমান করা যায় বিপ্লবের প্রতি অনুরাগ তাঁর আত্মোপলব্ধিরই ফল।

রাজনারায়ণের পরিকল্পনা বাংলাদেশে রূপ প্রদান করলেন শ্রীঅরবিন্দ যখন তিনি ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন, বন্দেমাতরম্ ইংরেজী দৈনিকের যখন তিনি সম্পাদনা শুরু করলেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তার আগে শুরু হয় বোম্বাই প্রদেশে। বাল গঙ্গাধর তিলক জনগণকে জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে গণপতি-উৎসব এবং শিবাজী-উৎসব প্রবর্ত্তিত করেন। শিবাজী উৎসবে শিবাজীর উক্তি হিসেবে বলানো হয়—"আমি আমার দেশকে পরবশতা থেকে মুক্ত করেছিলাম, ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম, স্বরাজ স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু হায়, আজ দেখছি সবই ধ্বংস হয়েছে। বিদেশীরা আজ সর্ব্বত্রই বর্ব্বর অত্যাচার করছে, দেশলক্ষ্মীকে দেশের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা দাবার ঘুঁটি হয়ে দাবাখেলার ছকের শোভা বৃদ্ধি করছেন।" লক্ষ লক্ষ লোক শিবাজী উৎসবে সমবেত হোতো, এবং প্রেরণা পেত। বাংলাদেশেও শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার নেতৃত্ব করেন। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসবের দিন-দশেকের মাঝেই চাপেকরভ্রাতৃদ্বয় র‍্যাণ্ড আর আয়ার্ষ্ট নামক দুইজন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীকে গুলী করে হত্যা করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। মানুষ খেতে পায়না, অথচ কর সংগ্রহের জন্য তাদের উপর তখনো অত্যাচার চলে। জনগণ খেতে না পেয়ে দোকানপাট লুঠ করতে শুরু করে। তিলক জনগণকে বোঝান—"লুট-পাট করে ক'দিন পেট চালাবে, ভাই সব? কালেক্টরদের বল, গভর্ণমেণ্টকে বল, তোমরা কাজ করতে প্রস্তুত। কাজের বিনিময়ে তোমরা খাদ্য দাবী কর। বাধ্য কর গভর্ণমেণ্টকে কাজ দিতে, খাদ্য দিতে। তারা তা দিতে বাধ্য।" কোথাও কোথাও জনতা তাই করে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই প্লেগ। দুই মহামারী জনগণকে মোরিয়া করে দেয়। তারা বাঁচবার জন্য কোথাও কোথাও সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা চালায়। আর তখন এই র‍্যাণ্ড আর আয়ার্ষ্ট তাদের উপর নানা অত্যাচার করে। চাপেকরভ্রাতৃদ্বয় তাই তাদের হত্যা করে। চাপেকর ভাইদের ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই হয়, তিলককেও রাজদ্রোহমূলক ভাষণ দেবার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল থাকবার সময়েই গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে কিছু কিছু বৈপ্লবিক সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়। বাংলায় ফিরে এসে অরবিন্দ বিপ্লবী শক্তি সংগঠন করবার জন্য বহুমুখীন আন্দোলন শুরু করেন। তার কতগুলি থাকে প্রকাশ্য, এবং কতগুলি গুপ্ত। প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজী দৈনিক বন্দেমাতরম এবং বাংলা সান্ধ্য দৈনিক সন্ধ্যা, আর অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। আর গুপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানিকতলা মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে বোমা তৈরির ব্যবস্থা চলে, এবং বাংলা সাপ্তাহিক যুগান্তরের সহায়তায় নানা কৌশলে সন্ত্রাসবাদের ও বিপ্লববাদের প্রচার চলে। বাংলাদেশের সমগ্র শহরে শহরে, এবং বড় বড় গ্রামে অনুশীলন সমিতির আদর্শে আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, মিলিটারী কুচ-কাওয়াজ প্রভৃতির অনুশীলন চলতে থাকে।

বাংলায় বৈপ্লবিক প্রয়াস একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অবলম্বনে অগ্রসর হয়, এবং বাংলার যে-সব নেতা কংগ্রেসে নরমপন্থী বলে বিবেচিত ছিলেন, বাংলার বিপ্লবী আদর্শকে তাঁরাও আশীর্ব্বাদ করতেন। তার কারণ এই যে, কংগ্রেস তা কেবলমাত্র বাঙালীর প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের মতো নায়ককেও কংগ্রেসে ভারতীয় ঐক্য বজায় করে রাখবার জন্য বাঙালীর রাজনৈতিক আদর্শকে সীমায়িত রাখতে হোতো। অথচ বাংলায় সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে ম্যাটসিনির কার্ব্বোনারি সম্প্রদায়কে আদর্শ করে নেবার আবেদন উপস্থিত করেন প্রকাশ্য সভায়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার জন্য মুরারীপুকুর বাগানে তৈরী বোমা দিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে

পাঠানো হয়। কিংসফোর্ড সাহেবের উপর রাগের কারণ এই যে, তিনি যখন কোলকাতায় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁর আদালতে "যুগান্তর" সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে সিদিশান অভিযোগের বিচার (১৯০৭) হয়। ভূপেন্দ্রনাথ কেবল যুগান্তরের সম্পাদক হিসেবেই খুব বাংলার প্রিয়পাত্র হন না, স্বামী বিবেকানন্দের ভাই বলেও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর বিচারের দিনে লালবাজারের পুলিশ কোর্টে অসম্ভব ছাত্র সমাগম হয়। পুলিশ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য মারপিট করে। সুশীল সেন নামক এক তরুণ একজন ইংরেজ সার্জ্জেণ্টকে প্রহার করে। সুশীলকে গ্রেফতার করা হয়, এবং ওই কিংসফোর্ড সাহেব তার বিচার করে বেত্রাঘাতের দণ্ড দেন। সুশীলের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দিলে জনচিত্ত অত বিক্ষুব্ধ হোতনা। কিন্তু বেত্রদণ্ডকে তারা বর্ব্বরোচিত এবং প্রতিহিংসামূলকই মনে করে।

কিংসফোর্ডকে তারপরেই মজঃফরপুরে বদলী করে দেওয়া হয়। কিংসফোর্ড সাহেব যে গাড়ীতে মজঃফরপুরে আদালতে যাতায়াত করতেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘটনার দিনে, সেই গাড়ী জজ কেনেডির পত্নী এবং আর একটি মহিলা ব্যবহার করেছিলেন; কিংসফোর্ড সে গাড়ীতে ছিলেন না। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল প্রক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে মিসেস কেনেডি আর তার সঙ্গিনী নিহত হলেন। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরেই ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল মজঃফরপুর থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন; কিন্তু ততদিনে সারাদেশ ও পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছে। ট্রেনে বাঙালী পুলিশ অফিসার নন্দলাল বসু প্রফুল্লকে সন্দেহ করে তার ওপর নজর রাখেন। প্রফুল্ল বুঝতে পারেন—ধরা তাঁকে পড়তেই হবে। ট্রেন মোকামাঘাটে পৌঁছিলে তিনি নিজের রিভলবার বার করে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

তারপরেই মুরারীপুকুর বোমার আড্ডা পুলিশ আবিষ্কার করে এবং সেইখানেই নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমনস্কর, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, বিভূতি সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট চৌত্রিশজন ধরা পড়েন। শ্রীঅরবিন্দও রেহাই পান না। দুই বছর ওই মামলা চলবার পর হাইকোর্টে চূড়ান্ত বিচার হয়। সরকার পক্ষে থাকেন কৌসুলী নর্টন সাহেব, আর আসামীদের পক্ষে চিত্তরঞ্জন। শ্রীঅরবিন্দ ও অপর চতুর্দ্দশজন নিরপরাধ বলে মুক্তি পান, আর বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র প্রমুখ পনেরো জন আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। নরেন্দ্র গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু জেলের মধ্যেই তিনি নিহত হন। সেই অপরাধে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু জেলের মাঝে রিভলবার ওরা পেলেন কি করে, সে রহস্য বিচারের সময়ও উদ্ঘাটিত হোল না।

এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন কিন্তু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোলনা, সারা বাংলায় ও বাংলার বাইরে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার অনুশীলন সমিতি পূর্ব্ববঙ্গে নব রূপ গ্রহণ করল পুলিন দাসের নেতৃত্বে, দেরাদুনে ও দিল্লীতে রাসবিহারী বসু, পাঞ্জাবে সর্দার অজিত সিং, লালা লাজপৎ রায়, ভাই পরমানন্দ, কাশীতে ও উত্তরপ্রদেশে যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, শচীন সান্যাল, নেতৃত্ব নিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারে বড়লাট হার্ডিংকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হোলো, কিন্তু হার্ডিং অক্ষতই রইলেন।

[৪]

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। তখন জানা যায় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ মাত্র দশহাজার সৈন্য রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিপ্লবীরা মনে করেন দেশকে মুক্ত করবার এইটেই সুবর্ণ সুযোগ। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে পারলে, ভারতীয় সৈনিকদের বিপ্লবে যোগদান করাতে পারলে ওই সময়েই দেশকে স্বাধীন করা যায়। ভারতে যে বৈপ্লবিক প্রয়াস চলছিল, তা ছাড়াও বার্লিনে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন্দ্র দত্ত, প্রমুখ ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্স কমিটির মাধ্যমে জার্ম্মেনীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন—যাতে করে কিছু আধুনিক সমর-সরঞ্জাম তাঁরা ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। জার্ম্মেনী তাতে সম্মত হয়, এবং তার সহায়তার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা সাংহাই, ব্যাঙ্কক, বাতাভিয়া প্রভৃতি স্থানে কাজ করতে থাকেন। তাঁদের নায়ক ছিলেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরে যিনি এম, এন, রায় নামে খ্যাত হন। আমাদের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারও বাতাভিয়ায় থেকে তখন কাজ করেছিলেন, এবং কারারুদ্ধও হয়েছিলেন সেখানে! আমেরিকা-প্রবাসী শিখরা গদ্দর দল নাম দিয়ে যে বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তোলেন, স্থির হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁরাও ভারতে এসে পৌঁছুবেন সর্দ্দার গুরুদত্ত সিংহের নেতৃত্বে। আর বিদেশে যে-যেখানে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন, তাঁদের নেতৃত্ব নিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, ওবাইদুল্লা সিন্ধি এবং এম-বরকতুল্লা! স্থির হলো ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম আঘাত হানা হবে।

কিন্তু জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক প্রেরিত যে জাহাজ বালেশ্বরের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেবে, সে জাহাজ এসে পৌঁছুলো না। বুড়ী বালামের মোহানায় বাঘা-যতীন দিনের পর দিন জাহাজের প্রত্যাশায় রইলেন। তার পূর্ব্বে কোলকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ডাকাতি করে যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় সদলে সরে পড়েছিলেন। পুলিশ তাদের সন্ধান করছিল। তারা জানতে পারলে তাঁরা বুড়ীবালামের তীরে অবস্থান করছেন। একদিন অতর্কিতে পুলিশ দলটিকে ঘিরে ফেলল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হোলো। যতীন মুখোপাধ্যায় এবং চিত্তপ্রিয় সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এই ঘটনা যুদ্ধকালীন বিপ্লবের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোতেই সরকার বিপ্লব প্রয়াস সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য রাউলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। ওই কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার বিপ্লব দমনের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক আইন তৈরি করতে মন দিলেন সারাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। তবুও রাউলাট বিল আইনে পরিণত হোলো। তাতে বিনা বিচারে অন্তরীণ করবার এবং নির্ব্বাসিত করবার

অধিকার সরকারকে দেওয়া হোলো। ক্ষমতা পেয়েই পুলিশ এবং মিলিটারী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করল। প্রতিবাদমুখর নিরস্ত্র নর-নারীকে জালিয়ানওলাবাগে ডায়ার-ওডায়ার নৃশংসভাবে হত্যা করল। হাঁটুতে প্রকাশ্য রাজপথে হাঁটিয়ে, নাকে খত দিইয়ে অমৃতসরে মধ্যযুগীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতিকে ধিক্কার দিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত স্যার উপাধি বর্জ্জন করলেন, মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন, ১৯১৯। বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বুঝতে পেরে ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের নরমপন্থীদেরকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইণ্ডিয়ান রিফর্মস্ য্যাক্ট দ্বারা শাসন-সংস্কারের খসড়া আইন সিদ্ধ করল। মহাত্মা গান্ধী নন-কো-অপারেশন ঘোষণা করলেন। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন, সরকারী শিক্ষা বর্জ্জন, আইন-আদালত বর্জ্জন হোলো নিরস্ত্র জনগণের অস্ত্র।

নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেশন বাঙালী সারা-মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারল না। কিন্তু সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিরোধের কথা ভেবে, এবং অসীম শস্ত্র-শক্তির বিবেচনা করে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ওতে যোগ দেওয়া শ্রেয় মনে করলেন। সারা ভারতবর্ষ এবং কংগ্রেস নন-ভায়োলেন্স নীতি গ্রহণ করলেও কিন্তু বিপ্লববাদ লুপ্ত হলো না, বরং বিপ্লবীরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠলেন। পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশ, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, ১৯২৭ থেকে রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রোহন লালের আত্মত্যাগে লাল হয়ে উঠল। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেব, রাজগুরু এবং চন্দ্রশেখর আজাদের বীরোচিত কীর্ত্তি দেশকে অনুপ্রাণিত করে তুল্ল। কংগ্রেস নন-ভায়োলেণ্ট নীতি অবলম্বন করেও শেষ দুই শহীদের কীর্ত্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিল, যদিচ সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স গোপীনাথ সাহার আত্মদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিল বলে মহাত্মাজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং প্রস্তাবটির ভাষা বদল করতে বাধ্য করিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে যতীন দাস অনশনে আত্ম-ত্যাগ করলেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেস পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল। আর ওই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেই ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবের প্রাণ নেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অমুজাচরণ সেন, ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকের প্রাণ নিতে ব্যর্থ হয়ে অতুলচন্দ্র সেন আত্মবলি দিলেন। চট্টগ্রামের বীরদল ওই বছরেরই এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করলেন, ২২শে এপ্রিল তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে, ৬ই মে তারিখে কলারপোলে এবং ২৮শে জুন তারিখে চন্দননগরে ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করলেন; পুনরায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গৈরাতে, এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গেভালাতে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষোক্ত স্থানে নায়ক সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা) ধৃত হন। প্রীতিলতা ওয়াদেদার, বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন করে মৃত্যু বরণ করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। রাসবিহারী বোস পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে অনেকদিন আগেই জাপানে চলে যান, এবং সেখানে থেকেই তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য ইণ্ডিয়া ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগ গড়ে তোলেন, এবং সুভাষচন্দ্র জার্ম্মেনী থেকে জাপানে যাবার পর তাঁরই ওপর নেতৃত্ব অর্পণ করেন। গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। তার পরের কাহিনী সকলেরই জানা আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত-অভিযানও মণিপুরের মাটিতে পদক্ষেপ করবার পর ব্যর্থ হয়। কিন্তু সে পরাজয়ও জাতিকে জয়ের গৌরব দেয়। কেননা আজাদ হিন্দ ফৌজই ইংরেজকে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় সৈনিকদের সহায়তায় ভারতকে পরাধীন রাখবার প্রয়াস সার্থক হবে না। মহাত্মা ইংরেজকে ভারতবর্ষ কুইট করবার দাবী কংগ্রেসের মারফৎ যখন উপস্থিত করেছিলেন, ইংরেজ শাসকরা তখন কংগ্রেসকে বে-আইনি ঘোষণা করেছিলেন এবং নায়কদের কারারুদ্ধ করেছিলেন। জনগণ বিপ্লব ঘটালো। জেলের বাইরে যে-সব রাজনীতিক কর্ম্মী ছিলেন তাদের সহযোগে এবং পৃথক ভাবেও। সে বিপ্লব ভায়োলেণ্টও ছিল, নন-ভায়োলেণ্ট ছিল। তখনকার বড়লাট ওয়াভেল সাহেব বিলেতের পার্লামেণ্টে লিখেছিলেন—"সাব-কণ্টিনেণ্টের মতো একটি বিরাট দেশের জনতা যদি যায়গায় যায়গায় রেল-লাইন ভেঙে দেয়, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়, থানা জ্বালিয়ে দেয়, স্বাধীনতা ঘোষণা করে, আর পুলিশের আর মিলিটারীর উপর যদি আস্থা রাখা না যায়, তাহলে সে-দেশকে কেমন করে কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা যায়?"

তা রাখা যে যায় না, যুদ্ধে লোকবল আর অর্থবল হারিয়ে ইংরেজ হাড়ে-হাড়ে তা বুঝতে পারল। আর তারই ফলে ভারতবর্ষ সে 'কুইট' করতে সম্মত হোলো। বিভিন্ন রকমের আলাপ-আলোচনার পর ভারত স্বাধীনতা পেল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। অনেকে বলেন ওই স্বাধীনতা 'দান' হিসেবে এসেছে। আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি সত্যিকারের কামনার ফলে, সাধনার ফলে, বহুজনের আত্মবলির ও স্বার্থ-ত্যাগের ফলেই স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত হয়েছে।

[৫]

স্বাধীনতা পাবার পর আমরা বাঙালীরা দেখলাম ওর জন্য আমাদের কী চড়া মূল্যই না দিতে হ'য়েছে। আমরা দেখলাম—

(১) আমাদের দেশের তিন ভাগ কাটা গেছে। সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ আমাদের দেশকে আর সোনার বাংলা বলবার অধিকার আর আমাদের নেই; বলতে হবে পশ্চিম বঙ্গ।

(২) এই সঙ্কীর্ণ দেশে এসে উপস্থিত হলো বাস্তুহারা চল্লিশ লক্ষ ভাই-বোন। আমরা হাঁ হাঁ করে বল্লাম—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

(৩) ওঁরা আসবার আগে কার্য্য-ব্যপদেশে পুব-বাংলা থেকে যাঁরা এসে কোলকাতায় এবং শহরতলীতে বস-বাস করতেন অথচ ছুটি ছাটায়, পাল-পার্ব্বণে, যাঁরা জন্ম-পল্লীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতেন, তাঁরাও দেখলেন তাঁরাও উদ্বাস্তু হয়েছেন—তাঁদেরও বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, হস্তান্তরিত হয়েছে।



॥ দুই মুখ ॥



ফটো : অজয়কুমার দে

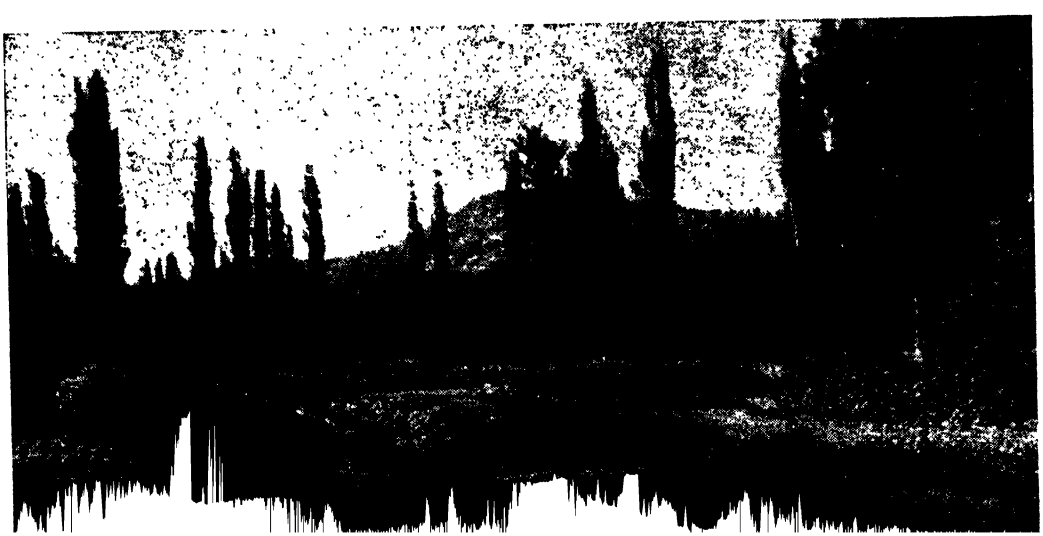


॥ ভূস্বর্গ কাশ্মীর ॥

আচ্ছাবল উদ্যান

ফটো : দেবেন ব্রহ্ম

॥ ভেরীনাগ ॥



রতবর্ষ প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্

(৪) অল্প যায়গায় অতিরিক্ত লোক এসে পড়ায় প্রয়োজনীয় জিনিস দুর্ম্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠ্‌ছে।

(৫) স্কুল-কলেজের শিক্ষা, পুঁথি-পত্রের দাম, দিনে-দিনে ব্যয়-বহুল হচ্ছে, আপিস স্থানান্তরিত হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬) ঠেলা-ঠেলি না করে দু'পা যাবার উপায় নেই, কাড়া-কাড়ি না করে প্রয়োজনীয় কোন কিছু সংগ্রহ করবার সম্ভাবনা নেই।

(৭) উদ্বাস্তরা এখানে ঠাঁই পাচ্ছে না, ওখান থেকে তাড়া খাচ্ছে, তাদের জীবন-মরণের সঙ্গে জড়িত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা নিয়ে জুয়া খেলা চলছে।

(৮) তার উপরে এলো আসামের আঘাত, এবং চল্লিশ হাজার সর্ব্বহারা। এই শেষের ঘটনা অপর সকল সমস্যাকে চাপা দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

কে দায়ী? বাংলার ও বাঙালীর এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? আসামের ঘটনা নিয়ে বাঙালীর আর একবার বিচার চলছে।

নানা জনের এ বিষয়ে নানা মত। মতগুলি এই :—

(ক) আসামের ঘটনার জন্য আসামের বাঙালীরাই দায়ী।

(খ) বাঙালী মাত্রই আত্মাভিমানে স্ফীত, নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যধিক গর্ব্বিত।

(গ) কার্য্যে অক্ষম, ক্রন্দনে পটু, পরের সম্পদে ঈর্ষ্যান্বিত। আরো অসংখ্য অভিযোগ আছে। এই তিনটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করে দেখা যাক।

(ক) আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই দেখিয়েছি বাঙালী আসামে কোন্ সুদূর অতীত থেকে গিয়েছে, এবং বস-বাস করেছে। তখন এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। ইংরেজের আমলে শুধু রাজ-কর্ম্মচারীরাই যায়নি, ব্যবসায়ীরা গেছে, উকিল গেছে, ডাক্তার গেছে, অধ্যাপক গেছে, শিক্ষক গেছে, চাষীও গেছে বহু। সবাইকে গবর্ণমেণ্ট নেয়নি, সবাই নিজের খুশি মতো যায়নি, আসামের নানা প্রতিষ্ঠান আহ্বান করেও নিয়ে গেছে অনেককে কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দিয়ে। আসামের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তখন থেকে এখন অবনত হয়নি, উন্নতই হয়েছে। কাজেই বাঙালীরা গিয়ে আসামের ক্ষতি করেনি, উন্নতর সহায়তাই করেছে। তখন যে-সব কাজের জন্য পর্য্যাপ্ত অসমিয়ার অভাব ছিল, এখন সেই সব কাজের জন্য অপর্য্যাপ্ত অসমিয়া তৈরি হয়েছে, এ-কথা হয়ত সত্য। তারা সবাই কাজ পাচ্ছে না বলে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, তাদের-কে চলে আসতে হবে অসমিয়ারা যোগ্য হয়েছে বলে? তাহলে ভারতের সকল রাজ্যই ত প্রত্যেক আগন্তুক জাতির লোকদেরকে ও-কথা বলতে পারে। যদি তাই বলে, তা হলে ভারত ইউনিয়নের অবস্থা কি দাঁড়ায়?

অথচ এ-কথাও সত্য যে, অসমিয়ারা কাজ না পেলে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হতে পারে। কিন্তু কাজের ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব কি আসাম-প্রবাসী বাঙালীর? নিশ্চিতই নয়। সে দায়িত্ব রাজ্যসরকারের এবং ভারত সরকারের। রাজ্য সরকার বাঙালী মাইনরিটি নিয়ে গঠিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই—চিরদিনই অসমিয়ারাই গভর্ণমেণ্ট গড়বেন, ভারত সরকারও কখনো কোন একটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবেনা। কাজেই আসামে যদি সত্যিই বেকারের সংখ্যা বেড়ে থাকে, তা'লে তার জন্য প্রথমত অসমিয়াদের কাছে জবাবদিহি হবেন প্রথমত আসাম সরকার, এবং দ্বিতীয়ত ভারত সরকার।

রাজ্য সরকার যদি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার প্ল্যানিং এমন ভাবে করতে না পারেন যাতে করে রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধান হয়, তাহলে সেই ত্রুটি কি আসামের বাঙালীরা পূর্ণ করে দেবেন ভারত ইউনিয়নে তাদের যে মৌলিক অধিকার আছে তাই ত্যাগ করে? যদি তাই করতে হয়, তা হলে ইউনিয়নের সার্থকতা কি?

যে বাংলা কল্পনা করে তারা নিজেরা বলত—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

সে বাংলার ছবি আর ত তাদের মনে রঙ ধরায় না। আর ত সারা ভারত তাদের বাণী শোনাবার জন্য উৎকর্ণ থাকে না? কী নিয়ে সে আর অভিমান করবে? সংস্কৃতির গৌরবই বা সে করবে কেমন করে? সংস্কৃতির মানদণ্ড ত দিল্লীর দুই ব্যক্তি হাতে ধরে বসে আছেন। তার একজন কেমব্রিজ, আর একজন অক্সফোর্ড। তাঁরা জয়দেব, চণ্ডী-দাসকে স্বীকার করেন না, মাইকেল বঙ্কিমকে তুচ্ছ করেন, রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে উৎসব করেন বিদেশীদের দৃষ্টিতে বড় হবার প্রত্যাশায়। সারা ভারতের সংস্কৃতিই ত তাঁরাই মুঠোর মাঝে নিয়ে বসে আছেন। বাঙালীর জন্য কিছুই ত রাখেন নি, যা নিয়ে তারা গরব করতে পারে। আর বাঙালীর অকর্ম্মণ্যতা? পরাধীন আমলে কিছু কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছিল বলেই ত আসামে আজ তাদেরকে মার খেতে হয়, কোলকাতাতেও হতে পারে। আর তারা কাঁদে? হুজুরের মুখে হাসি দেখলেই হাসতে হয় বলে তারা কাঁদে।

আমাদের স্বাধীনতার প্রকালে বিলেতের শ্রমিক সরকার একটি মিশন পাঠিয়ে ছিলেন। তার নায়ক ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স। তিনি আমাদের স্বাধীনতার একটা নক্সা করে দিয়েছিলেন। তাতে দেশবিভাগের কথা ছিল না। আমাদের নায়করা তা অগ্রাহ্য করলেন। আমাদের স্বাধীনতার পর তিনি অভিনন্দন জানিয়ে যে তার পাঠিয়ে-ছিলেন, তাতে বলেছিলেন—"তোমরা স্বাধীনতা পেলে বলে তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ভালো করে পড়ে আমি এটা দেখেছি যে, কেন্দ্রীয় অতি-কর্তৃ'র সে বরদাস্ত করতে চায়নি কোন কালেই। তোমাদের যদি কোন বিপদ আসে, সেই দিক দিয়েই

আসবে। আশা করি সেই দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখবে।" মুঘলরা ও-কথা জানত। কিন্তু ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ার লেখকরা আর ইণ্ডো-মুসলিম কালচারের নায়করা তা জানেন যদিও মানেননা না। তাঁরা শুধু মানেন—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!

ভাষা নিয়ে এত গোলমাল হোতনা যদি সাত তাড়া-তাড়ি রাষ্ট্রভাষা ঠিক করে ফেলা না হোতো। ওর জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষিদের মন থেকে দাবী ওঠবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। হিন্দী সংখ্যাগুরু ভারতীয়ের ভাষা নয়। বহুভাষাভাষি দেশে ওই ভাষাটি বেশি লোক বলে, এই মাত্র। কিছুদিন অপেক্ষা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হোতনা। Pharat that was India আজও ভারত হয়নি, ইণ্ডিয়াই রয়েছে বলে ইণ্ডিয়ান প্রাইম মিনিষ্টার সারাবিশ্বের শ্রদ্ধার অধিকারী। শোচনীয় ভাষার প্রশ্ন নিয়েও ত এই ঘটনা ঘটবার কোন কারণ নেই। বাঙালীরা ত বলেনি আসামে অসমীয়া নয়, বাংলা ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা। তারা বড় জোর বলে থাকতে পারে মাইরিটিকে তার মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সংবিধানে, সে অধিকার থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। তা যাতে না হয়, তা দেখবার দায়িত্ব যেমন রাজ্য সরকারের, তেমন কেন্দ্রীয় সরকারেরও।

সুতরাং বাঙালীর দোষে অসমীয়রা বাঙালীর উপরে এমন মার-মুখো হয়েছে, এ-কথা বলবার আর তা মেনে নেবার কোন কারণ নেই, ভাষার জন্য হয়েছে তাও মনে করবার কোন কারণ নেই। নিঃসন্দেহে ঘটনাটা কিছুটা অর্থনীতিক কারণে এবং অনেকটা রাজনীতিক কারণেই ঘটেছে। রাজনীতিক বিষয়ে রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একই স্বার্থ, এবং অর্থনীতিক কারণের জন্য উভয় সরকারের সমানই দায়িত্ব এবং তাও রাজনীতির-সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রপতির শাসনে এখন কোন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু প্রথম দিকে তা করলে ধন-প্রাণ কিছু রক্ষা পেত, আর লাঞ্ছনা অবমাননা সম্বল করে চল্লিশ হাজার নরনারী শিশুকে দয়ার উপর নির্ভর করে পথে দাঁড়াতে হোতো না। কিন্তু এ-কথা বোঝা যায়, যে কারণে কেরেলায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হয়েছিল, সেই কারণেই আসামে তা করা হয়নি। নতুবা ধন-জনের ক্ষতির কথা ভাবলে আসামে, ঘটনার প্রথম দুই-তিন দিনের মাঝেই, রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করবার সংগত কারণ ছিল।

[৬]

আজ বলা হচ্ছে কোন কিছু না ভেবে বিতাড়িতদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু সকলে ফিরে যাবে না, গেলেও তাদেরকে ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে, দীন-হীন হয়ে থাকতে হবে। ভাষার সেই প্রশ্ন থেকেই যাবে, সেই অর্থনীতিক সঙ্কট, সেই রাজনীতিক ফন্দি-ফিকির। হিন্দু-মুসলমানে এক-একবার দাঙ্গা হয়েছে, আর আসল সমস্যা চাপা দিয়ে বলা হয়েছে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটতে-ঘটতে কতবার দাঙ্গা হোলো; অবশেষে দেশ-বিভাগও হয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্ত্তন তাতেও কি হয়েছে? হৃদয়ের বর্ত্তন ঘটাতে হলে অর্থনীতিক স্বস্তির, সু-শিক্ষার, এবং সত্যিকারের সংস্কৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। তা করবার দায়িত্ব কার? সরকার ত সবই করছেন বিলেত-আমেরিকার নকল করে। (খ) বাঙালীর আত্মাভিমান বড় প্রবল, এ-কথাও সত্য নয়। সত্য যা, তা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন—"বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি!" বাঙালী গর্ব্ব করত তার দেশ নিয়ে। মুঘলরা বলত গুল্‌-বাগ, আজ সেই গুলবাগ প্রাইম মিনিষ্টারদের নাইট সেয়ার।

ভাষা নিয়ে বাঙালীর স্পর্শকাতরতা মোটেই নেই। সে তার ভাষায় শতকরা প্রায় পঁচিশটি বিদেশী শব্দ আদর করেই স্থান দিয়েছে এবং ভালো শব্দ পেলেই তা নিয়ে নিচ্ছে। পার্শি-ইংরাজী রাষ্ট্রভাষা থাকবার কালেই যে ভাষা তার গড়ে উঠেছে, তার জন্য সে লজ্জিত নয়। কিন্তু কেউ যদি বলে এই কয়েক বছর তোমাকে হিন্দী শিখে নিতেই হবে যেহেতু হিন্দীভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা তাহলে, সব ভাষাভাষিরাই ঘাড় ফুলিয়ে বলবে—"কেন হে বাপু, তোমার ভাষা এমন কি পয়গম্বরের ভাষা হয়ে উঠেছে হে!" কেবল বাংলা-ভাষাভাষিই এ-কথা বলবার অধিকার রাখে না, উর্দ্দু, গুজরাতী, মারাঠী, মালয়ালাম, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী সব ভাষাভাষিই এ-কথা বলবার অধিকার রাখে। কিন্তু ও-সব কথা থাক্। আসাম-বাংলার কথাই বলা যাক্।

বলতে লজ্জা হ'লেও বলতে হবে বাঙালী যেমন পুর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু-দের দুঃখ ঘোচাতে পারেনি, তেমন আসাম থেকে বিতাড়িত বাঙালীদের দুঃখও বোচাতে পারবে না। বাংলায় থেকেই যে তারা দুখ-সায়রে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তাদের আজ ধরে নিতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবলম্বিত নীতি আর সেই সরকারের সমর্থকদের বাঙালীর প্রতি অপ্রীতি নানা যায়গায় বাঙালীকে অতিষ্ঠ করবে, এমন কি এই শহর কোলকাতা-তেও তা করতে পারে।

বাংলা বলতে আজ কোলকাতাই বোঝায়। এই কোলকাতা ধন-তান্ত্রিকতার প্রকাশ। ধনতান্ত্রিকতার সকল কুফলই এখানে নির্ধনকে নিরাবলম্ব করেছে। নির্ধন এখানে টিকে থাকতে পারবে না। এর প্রতি-কার করতে হলে, আমার মনে হয়, এই খাতে চিন্তাকে প্রবাহিত করতে হয়:—

(ক) কোন প্রকার কো-য়্যালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করা যায় কিনা।

(খ) সকল রাজনীতিক দল সর্ব্বসম্মত একটি সংগঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন কিনা।

(গ) কৃষি কো-অপরেটিভকে, গ্রাম পঞ্চায়েৎকে, কার্য্যকরী করা যায় কিনা।

(ঘ) রাষ্ট্রিয় প্রয়াসে বৃহৎ ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা।

(ঙ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে পারেন কিনা।

(চ) নিরাশ মনে আশার আলো জ্বেলে তোলা যায় কিনা, অবসন্ন মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করা যায় কিনা।

যদি না যায়, বঙালী জাতির বেঁচে থাকা, কোলকাতাতেও প্রতি-ষ্ঠিত থাকা দায় হয়ে উঠবে। আসামের ঘটনা তারই ইঙ্গিত।



বনফুল

মধ্যে আরও অনেক পার্থক্য আছে। হরিসেবক ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক, বেশ গোঁড়াই বলা চলে। এ যুগেও ত্রিসন্ধ্যা করেন, জাতিভেদ মানে না দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আঙুলে অষ্টধাতুর আংটি আছে। বিলাস বিপরীত প্রকৃতির। একটু বিলাসী গোছের। মাথার চুলটি সুবিন্যস্ত, পোষাকপরিচ্ছদ ছিমছাম। চেহারাটিও সুন্দর। বেহালা বাজাবার শখ আছে। হরিসেবক সকাল সন্ধ্যা পূজা করে, বিলাস বেহালা বাজায়। সাহিত্য, সিনেমা এসব শখও আছে। ভগবান বা দেবদেবী নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না কখনও।

এত অমিল সত্ত্বেও কিন্তু দুজনের ভাব খুব।

১

হরিসেবক আর বিলাসকুমার বাল্যকাল থেকেই নিবিড় বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ। ছেলেবেলায় পাঠশালায় এক সঙ্গে পড়েছিল, স্কুলেও এক সঙ্গে ছিল কিছুদিন। তারপর দু'জনে দু'জায়গায় কলেজে পড়ে। হরিসেবক কাশীতে আর বিলাসকুমার হাজারিবাগে। কর্ম্মক্ষেত্রও বিভিন্ন স্থানে। হরিসেবক একটি কলেজের অধ্যাপক, বিলাস একটি আপিসের কেরাণী। বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দুজনের

একবার পূজোর সময় হরিসেবক বিলাসকে লিখলেন —"এবার পূজোটা মান্দার পাহাড়ে কাটাব ঠিক করেছি। তুমি তো দুমকায় আছ, দুমকা মান্দার থেকে বেশী দূর নয়।

যদি দু'চার দিনের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে যাও বড় আনন্দের হবে। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না…"

বিলাস সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

এসে দেখল হরিসেবক কেবল বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে মান্দারে আসে নি। তার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। হরিসেবকের মেয়ে দীপু (দীপালি) কিছুদিন থেকে মূর্চ্ছা-রোগে ভুগছে। ডাক্তারি কবিরাজী কোন রকম চিকিৎসাতেই কোন রকম ফল হয় নি। হরিসেবক শেষে দৈব করছিল। অনেক জায়গা থেকে মাদুলি আনিয়ে পরিয়েছিল, অনেক জায়গার পাদোদক আনিয়ে খাইয়েছিল তবু কিছু হচ্ছিল না। এমন সময় সে একদিন স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্নে কে একজন দিব্য-কান্তি পুরুষ এসে যেন হরিসেবককে বলছে তুমি আগামী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রিতে মন্দার পাহাড়ে যেও। সেখানে মধুসূদন আছেন। তিনি সেদিন একটি সভ্য লোককে তাঁর অভীষ্ট বর দেবেন। হরিসেবক সেইজন্যই এখানে এসেছে। ঠিক করেছে পূর্ণিমা রাত্রে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে যাবে। বিলাসকে দেখে হরিসেবক উল্লিসিত হ'য়ে উঠল। সব কথা তাকে খুলে বলল।

"তুই যাবি আমার সঙ্গে ?"

বিলাস বিস্মিত হল।

"আমি ! আমি গিয়ে কি করব। ওসব দেব-দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই ভাই। তা ছাড়া ওসব ব্যাপার একা একা করাই ভালো। কি জানি মধুসূদন হয়তো আমার মতো লোকের সামনে আবির্ভূতই হবেন না।"

"কিন্তু একা একা রাত্রে ওই পাহাড়ে উঠতে ভয় করে। শুনেছি ওখানে বাঘ-টাঘ বেরোয়। আচ্ছা, তুমি না যাও পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি খুব উঁচুদরের সাধকও একজন। রোজ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে' পুজো করেন। তাঁকে বললে তিনি আপত্তি করবেন না।"

"তুমি সঙ্গে লোক জোটাতে চাইছ কেন। এসব জিনিস একা একা করাই ভালো—"

"কিন্তু ওই যে একটা শর্ত্ত আছে—সভ্য লোককেই মধুসূদন অভীষ্ট জিনিসটি দেবেন। মধুসূদনের বিচারে আমি যদি ঠিক সভ্য না হই তাহলে তো আর পাব না। তাই আরও দু'একজন শিক্ষিত লোককে নিয়ে যেতে চাই। আমাকে না দিলে তাঁকে দিতে পারেন হয় তো—"

"তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ কোন ভরসায়। আমি ম্লেচ্ছ লোক, অশাস্ত্রীয় ভোজন করি, মাঝে মাঝে মদ-টদও খেয়েছি। আমি সঙ্গে থাকলে তো মধুসূদন তোমার ত্রিসীমানায় আসবেন না"

"বেশ আমি পণ্ডিতজীকেই নিয়ে যাব—"

২

লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রি। চারিদিকে স্বপ্নের পাথার। হরিসেবক আর পণ্ডিতজী অনেকক্ষণ আগে মান্দার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে চলে' গেছেন। বিলাস বাড়ির বাইরে একা চুপ করে বসেছিল। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। হঠাৎ বিলাসের মনে হল—আমিও পাহাড়টায় ঘুরে আসি একটু। এই জ্যোৎস্না রাত্রি পাহাড় থেকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছে। দেখে আসি।

নিজের বেহালাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সত্যিই স্বপ্নের পাথার চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরে বিলাসও স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল সে যেন কোন অজানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে মন্দারকে সে দিনের আলোয় দেখেছে এ যেন সে মান্দার নয়। এ যেন একটা নূতন আবির্ভাব। সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ অত্যন্ত পরিচিত। যে স্বপ্ন মনের গহনতম প্রদেশে সুপ্ত ছিল তা যেন সহসা রূপ নিয়েছে আজ রাত্রে।

…বিলাস পাহাড়ে উঠছিল। এর আগে সে উঁচু পাহাড়ে ওঠে নি কখনও। পাহাড়ে ওঠবার রাস্তাও তার জানা ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে হোঁচট খেতে খেতে তবু সে উঠছিল। পাহাড়ের উপর থেকে এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি কেমন দেখায় এই আগ্রহ তাকে পেয়ে বসেছিল যেন। আরও ওপরে চল, আরও, আরও…। অনেক দূর ওপরে উঠে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার মনে হতে লাগল শব্দহীন একটা মন্ত্রই যেন অপার্থিব সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এ-ও যেন সে সহসা আবিষ্কার করল এই মন্ত্রের সাধনাই তো সে করছে সারাজীবন ধরে অজ্ঞাতসারে, আজ সত্যটা পরিস্ফুট হয়ে

উঠল তার কাছে। অনাবিল এই সৌন্দর্য্যের দিকে নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। বারবার তার মনে হ'তে লাগল, ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম।

...কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো পড়েছিল, মসৃণ, সমতল এবং প্রকাণ্ড। অনেকটা চৌকির মতো। তার উপর বসে বেহালা বাজাতে লাগল বিলাস। সুরে আর সৌন্দর্য্যে সত্যই স্বর্গলোক মূর্ত্ত হয়ে উঠল।

...কতক্ষণ কেটেছিল তা খেয়াল ছিল না বিলাসের। হঠাৎ তার মনে হল তার বেহালার সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে কে যেন। বিলাস বেহালা থামিয়ে বাঁশী শুনতে লাগল। অপূর্ব্ব সুর, দরবারী কানাড়ার এমন অপূর্ব্ব আলাপ আর কখনও শোনেনি সে। বিলাস উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল, কাছেই একটু নীচে আর একটি চাতালের উপর বসে' একটি কিশোর বাঁশী বাজাচ্ছে। আস্তে আস্তে নেমে গেল বিলাস। কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। বিলাসের মনে হল কোন সাঁওতালের ছেলে বুঝি। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, তার উপর একটি ময়ূরের পালক গোঁজা।

"খুব চমৎকার বাঁশী বাজাও তো তুমি—"বাঃ"

"আপনার বেহালাও চমৎকার। আপনার বেহালা শুনেই আমি বাঁশী নিয়ে বেরুলাম—"

"তুমি এখানেই থাক ?"

"হ্যাঁ। আপনি এখানে কেন এসেছেন—"

"এমনিই বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে যা পেলাম তা পাব আশা করি নি"

"কি এমন পেলেন—"

"পেলাম না ? এই জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ দেখলাম, তোমার বাঁশী শুনলাম—"

"এখানে অনেকে মধুসূদনের কাছে বর প্রার্থনা করতে আসেন। আপনার তেমন কোন প্রার্থনা নেই ?"

"প্রার্থনা না করেই যা পেলাম তাই তো আমার আশাতীত। আর কি চাইব"

"মুচকি হেসে ছেলেটি বললে—"আচ্ছা তাহলে যাই এখন—"

তরতর করে' ছেলেটি নেমে যেতে লাগল। বিলাসের মনে হল তার অন্তরতম প্রিয়জন যেন চলে যাচ্ছে।

"শোন শোন তোমার পরিচয়ই তো নেওয়া হল না। কি নাম তোমার"

ছেলেটি কিছু বলল না, ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে।

৩

হরিসেবক ও পণ্ডিতজীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। হরিসেবক সমস্ত রাত ভাগবত পাঠ করেছিলেন, পণ্ডিতজী উপনিষদ। তাঁরা কোন প্রত্যাদেশ পান নি, কোনও ওষুধও পান নি। হতাশ হয়েই ফিরেছিলেন তাঁরা। বিলাসের ছুটিও ফুরিয়ে গেল সে আবার ফিরে গেল ডুমকায়। মাস কয়েক পরে সে হরিসেবকের চিঠি পেল একটি।

ভাই বিলাস,

আশা করি ভাল আছ। গত লক্ষ্মী পূর্ণিমায় আমি পণ্ডিতজীকে নিয়ে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে গিয়েছিলাম, তা তো তুমি জানই। তখন কোন প্রত্যাদেশ বা ওষুধ পাই নি যদিও, কিন্তু তারপর থেকে দীপু ভাল আছে, আর একদিনও মূর্চ্ছা হয় নি। মাঝে মাঝে খবর দিও। ভালবাসা জেন। ইতি

তোমারই
হরিসেবক

চিঠিটা পেয়ে বিলাস একটু বিস্মিত হল। দিন কতক আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত মন্দার পাহাড়ে সে যেন বসে' আছে কার প্রত্যাশায়। হঠাৎ একটা পাথরের পিছন থেকে সেই শ্যামবর্ণ কিশোরটি এসে দাঁড়াল। মুচকি মুচকি হাসছে, হাতে বাঁশি। বিলাসের দিকে চেয়ে যেন বললে—"সেদিন আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলা হয় নি। আমার নাম মধুসূদন"

হরিসেবকের চিঠিটার দিকে চেয়ে বিলাসের মনে হ'ল তবে কি—? এর বেশী আর সে ভাবতে পারলে না। সেই শ্যামবর্ণ কিশোর ছেলেটির ছবি তার মানসপটে ফুটে উঠল কেবল। মাথার চুল চূড়া করে' বাঁধা, তাতে গোঁজা রয়েছে একটি ময়ূরের পালক। হাতে বেণু, মুখে হাসি।

আসামের ইতিকথা

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

এখন ভারতের উত্তর-পূর্বস্থিত যে অঞ্চলকে আসাম বলা হয় পুরাকালে তাহার অধিকাংশ কামরূপ নামে পরিচিত ছিল এবং ইহার রাজধানী ছিল গৌহাটিতে। ইহার অন্য নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর—এককালে এই রাজ্য খুব সমৃদ্ধ ছিল এবং বাংলাদেশের করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ বঙ্গদেশ ও কামরূপের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির দিক দিয়া কোন প্রভেদ ছিল না। রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় কামরূপও আর্যাবর্তের এই পূর্ব-অঞ্চলের অন্যতম প্রদেশ-রাজ্য ছিল। আর্যভাষা যখন এই অঞ্চলে বিস্তৃত হয় তখন বাংলাদেশ ও কামরূপের ভাষা ছিল একই ?—প্রথমে মাগধী-প্রাকৃত, পরে মাগধী-অপভ্রংশ। কামরূপের ভাষা কখন স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়া বর্তমান অসমীয়ায় পরিণত হইল তাহা বলা কঠিন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই বৈশিষ্ট্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অসমীয়া ভাষায় রচিত সর্ব-প্রাচীন যে সাহিত্যের নিদর্শন এযাবত পাওয়া গিয়াছে, তাহা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। গ্রন্থকার হেম সরস্বতী রাজা দুর্লভনারায়ণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্লভনারায়ণ তখন গৌহাটি ত্যাগ করিয়া কুচবিহারের ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কামতা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বাংলাদেশের করতোয়া নদী হইতে আসামের বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই দুর্লভনারায়ণের কিছুপূর্বে অর্ধবর্বর আহোম জাতি ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্ত আক্রমণ করে। এই আহোম জাতি থাইজাতির এক শাখা। মোঙ্গল জাতীয় থাইগণ পূর্বে চীনদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বাস করিত। ক্রমে তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের সীমান্তে উপস্থিত হয়। ইহাদেরই আর এক শাখা প্রথমে টংকিন ও পরে ইন্দো-চীনের পূর্ব প্রান্তেস্থিত হিন্দুরাজ্য চম্পা অধিকার করে। তদবধি এই বিজয়ী জাতির নাম অনুসারে চম্পা-রাজ্য আনাম এই নামে অভিহিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাইজাতির আর এক শাখা দলে দলে বিভক্ত হইয়া ভারতের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ব্রহ্মদেশের পূর্বাংশ ও মেনাম নদীর উপত্যকা অধিকার করে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এই শেষোক্ত রাজ্যের নাম ছিল শ্যাম। বর্তমানে ইহা থাইল্যাণ্ড বা থাই প্রদেশ নামে অভিহিত। ব্রহ্মদেশের থাই-গণ এখনও শান নামে পরিচিত এবং তাহাদের বর্তমান অবস্থা হইতেই হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে থাইজাতির কি অবস্থা ছিল তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই শান জাতিরই এক শাখা ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং তাহাদের নাম অনুসারেই ইহার নাম হয় 'আ-শাম (আ-সাম) বস্তুতঃ শান ও শাম একই শব্দের রূপান্তর মাত্র। আসাম হইতেই আহোম নামের উৎপত্তি।

আহোম ভাষা পূর্বোক্ত থাইজাতির শাখাগণের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন লাটিন ভাষার সহিত বর্তমান ইটালীয় ভাষার যে সম্বন্ধ, আহোম ভাষার সহিত শান ও শ্যামদেশীয় ভাষার ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ। চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় আহোম ভাষাও ছিল এক-অক্ষরাত্মক (mono-syllebic)। বর্তমানে এই ভাষার আর কোন নিদর্শন নাই—কারণ আহোম জাতি ভারতবর্ষের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে—তাহাই এখন অসমীয়া ভাষা নামে পরিচিত। আহোম জাতির ধর্মবিশ্বাসও ছিল আদিম অসভ্য জাতির ধর্মের অনুরূপ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্বর থাইবংশীয় যে আহোম জাতি এইরূপে ক্রমে ক্রমে

হিন্দুর ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া সভ্য জাতিতে পরিণত হয় তাহারা সর্বপ্রথমে বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অর্ধ শতাব্দী পরে আসামের পূর্ব-অঞ্চলে বসবাস করে। আহোম নায়ক সু-কা-ফা সদলবলে মৌলঙ্ হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে আসামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পৎকাই পর্বত অতিক্রম করেন। তারপর নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চরইদেও নামক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটে। ঐ রাজ্যের রাজধানী গৌহাটি হইতে কোচবিহারের নিকটবর্তী কামতায় স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন রাজবংশের আমলেই এই পরিবর্তন হয় অথবা নূতন কোন রাজবংশ এই প্রাচীন রাজ্য অধিকার করিয়া নূতন এক রাজধানী স্থাপন করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এখন হইতে কামরূপ রাজ্যের রাজধানী ছিল কামতা। এই রাজ্য পশ্চিম করতোয়া নদী হইতে পূর্বে বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এখন যে প্রদেশকে আসাম বলা হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাহা অনেকগুলি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পূর্বপ্রান্তে নব-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র আহোম রাজ্য আর পশ্চিম প্রান্তের এক অংশ কামতা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যস্থলে যে খণ্ডরাজ্যগুলি ছিল তাহার মধ্যে চুটিয়া ও কাছাড় রাজ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। চুটিয়া রাজ্য ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরে—উত্তরে সুবর্ণশ্রী ও দক্ষিণে দিশং নদীর পূর্বভাগে অবস্থিত ছিল; ইহার রাজধানী ছিল সদিয়া। চুটিয়াগণ পার্বত্য ও আদিমকালে অসভ্যজাতি ছিল। কিন্তু সুদুর অতীতকালেই তাহারা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহোমগণ আসামে রাজ্য স্থাপন করিবার পর চুটিয়াগণ তাহাদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। ফলে প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া চুটিয়াগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আহোমগণের সহিত যুদ্ধ করে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহোমগণ তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য স্থাপন করে।

চুটিয়া রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল কাছাড় রাজ্য। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে পশ্চিমে নওসং পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে ননশ্রী নদীর উপত্যকা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আহোম জাতি আসাম আক্রমণ করিলে কাছাড়িগণের সহিতও তাহাদের বিবাদ হয়। প্রথম আহোম-রাজ সু-কা-ফার পুত্র সু-তেউ-ফার রাজত্বকালে কাছাড় রাজ দিখু নদীর পূর্ববর্তী ভূভাগ আহোমদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন।

চুটিয়া ও কাছাড় রাজ্যে পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইহাদের শাসনকর্তারা ভূঁঞা নামে অভিহিত হইতেন—এবং সমষ্টিভাবে ইহা-দিগকে বারো-ভূঞা বলা হইত। ইঁহারা নামে কামতা রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন—কিন্তু প্রায়ই বিশেষতঃ কামতা রাজ দুর্বল হইলে—স্বাধীন অধিপতির ন্যায় আচরণ করিতেন! তখন সংকোশ নদীর পূর্বে কামতা রাজ্যের কোন অধিকার থাকিত না—অর্থাৎ ইহা বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ থাকিত!

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আহোম ও কামতা রাজ্যের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। অবশেষে কামতা রাজ স্বীয় কন্যা রজনীকে আহোম রাজ সু-খাং-ফার সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন। ইহার ফলে আহোম রাজ্য পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবার কামতা ও আহোম রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। এবারেও কামতা রাজ আহোম রাজের সহিত স্বীয় কন্যা ভাজনীর বিবাহ দিয়া সন্ধি করিলেন। কিন্তু একদিকে আহোম ও অপরদিকে বাংলার মুসলমান রাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে কামতা রাজ্য ক্রমেই হতবল হইয়া পড়িল। অবশেষে গৌড়ের রাজা হুসেন শাহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কামতা রাজ্য জয় করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই কামতা রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে কুচবিহার রাজ্যের উদ্ভব হয়।

আহোম রাজ সু-হুং-মুং ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ সু-হেন্-ফা নাগা জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য দখল করেন, কিন্তু কাছাড়ীদের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন। সু-হুং-মুং বহু বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর কাছাড় রাজ্য অধিকার করেন। চুটিয়াদের সহিতও দশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে, ইহার ফলে চুটিয়া রাজ্য ধ্বংস এবং আহোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চুটিয়া রাজ্যের ধ্বংসের ফলে হিন্দু-ধর্ম ও সভ্যতা আহোমদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। আহোম-রাজ

স্থ-হুং-মুং হিন্দু-ধর্ম ও সভ্যতার অনুরাগী ছিলেন। তিনি তিন শত আহোম পরিবারকে চুটিয়া রাজধানী সদিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সদিয়া হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও নানা জাতীয় শিল্পী আনাইয়া নিজ রাজধানীতে বসবাস করাইলেন। চুটিয়ার রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকগণকে পাকরি স্থরি নামক স্থানে বসবাস করাইলেন ও চুটিয়া রাজ্যের নানাস্থানে আহোম উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। রাজা নিজে স্বর্গনারায়ণ এই নূতন নাম ধারণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে (১৪৯৭—১৫৩৯) বাংলার মুসলমান রাজা আসাম আক্রমণ করেন কিন্তু স্বর্গনারায়ণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আসামের স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

এইরূপে স্বর্গনারায়ণের রাজ্যকালে—ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র আসাম প্রদেশে আহোমগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অসভ্য অর্দ্ধবর্ব্বর আহোম জাতি হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে মিশিয়া গিয়া বর্তমান আসামের পত্তন করে।

শ্যামসুন্দর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

যুগের যুগের যত ভক্তের
চন্দন চুয়া তোমার দেহে,
বহু রূপ তব, বহুবল্লভ—
তোমাকে চেনাই কঠিন যে হে।
কতই শাস্ত্র, শতক স্তোত্র, উপাখ্যানই—
আবরি রেখেছে তোমাকে তাহা তো সবাই জানি।
কেমনে দেখিব? কোথায় রয়েছ—
অবাক হইয়া থাকি যে চেয়ে।

২

সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতিরা—
প্রণাম দিতেছে তোমার পায়ে,
সবাই তোমারে লভিতে যে চায়—
সবাই তোমাকে দেখিতে চাহে।
নামের আড়ালে বেশ তো লুকায়ে রয়েছ নামী?
ফুল তুলসীর আড়ালেতে ঠিক শালগ্রামই,
যাহা বল তুমি শুনিতে পাইনে—
এত জোরে সবে মহিমা গাহে—
তোমার নাগাল পেলাম না হে।

৩

তুমি যে শ্রীমৎ ভাগবত পুঁথি—
হইয়া রয়েছ আমার চোখে।
পড়িতে পারিনে চন্দন লেপা—
ফুলের স্তবক সকল শ্লোকে।
মলাটের ছবি পুঁথির ডুরি ও পুষ্প ভারে—
তুমি ডুবে আছ—সাধ্য কাহার চিনিতে পারে?
দোষ কি তাদের অপরূপে তাই—
অরূপ বলে যে অনেক লোকে?

৪

বড়ই কষ্টে বড় মনোদুখে—
চতুর শৃগাল নয়ন জলে—
না পেয়ে দ্রাক্ষা অমন মধুর—
দ্রাক্ষা ফলকে অম্ল বলে।
ভুবন ভুলানো জানিতে দাও না
কোথায় থাকো,
ওই শ্যাম তনু ষড়ৈশ্বর্য্যে ঘেরিয়া রাখ,
রাগী যারা ফেরে রাগের পথেতে—
আমিও মিশিব তাদের দলে।



বত্রিশ পুতুলের নতুন কাহিনী

পরিমল গোস্বামী

কবি কালিদাসের দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকার এটি সর্বপ্রথম রচিত পরিত্যক্ত কাহিনী। সম্প্রতি এটি আমার হস্তগত হয়েছে। মহাকবি কি কারণে এটি পরিত্যাগ ক'রে বহুশ্রুত ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্যের কাহিনীটি রচনা করলেন তা আমি জানতে পারিনি। আমার মতে এই কাহিনীটিরও যথেষ্ট মূল্য আছে, আর এই কারণেই আমি এটির পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। কাহিনীটি এ যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী বলেই মনে হয়।

কতকালের কথা সে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো জায়গা। সেখানে বাঘের উপদ্রব নিবারণের অভিপ্রায়ে এক ক্ষেতে একটি মাচা বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই মাচায় যে ওঠে সেই বিজ্ঞ বনিকের বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একথা শুনে বিখ্যাত বণিক সোমদেব অনুমান করলেন ঐ জায়গায় মাটির নিচে কোনো রহস্য আছে। তদনুযায়ী তিনি মাচার নিচের মাটি খোঁড়ালেন এবং তার ফলে পাওয়া গেল বত্রিশটি পুত্তলিকা খচিত মূল্যবান এক সোনার আসন, সোজা ভাষায়, গদি।

সোমদেব পুলকিত চিত্তে গদিটি আনিয়ে চালের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে খুব ঘটা ক'রে তাতে বসতে যাবেন এমন সময় বত্রিশ পুত্তলিকার প্রথম পুত্তলিকা শ্রীমতী মিশ্রকেশী বাধা দিয়ে ব'লে উঠল চালের ব্যবসা করতে হলে যাঁর এই গদি সেই দেবদত্তের মতো কুশলী হতে হবে। চালের ব্যবসায় দেবদত্তের মতো প্রতিভা অদ্যাবধি কেউ জন্মায় নি। শোন তাঁর কথা। কত গুদাম ছিল তাঁর। দেশের নানা জায়গায় ছড়ানো ছিল সে সব। তাঁর চাল-কল ছিল এক হাজার, আর পাথর ভাঙার কল ছিল একশ। দেশের ছোট ছোট পাহাড় তাঁর কারখানায় কত যে চূর্ণ হয়েছে তার সংখ্যা নেই। দেশের সমস্ত ধান তিনি কিনতেন। সেই ধান চাল হবার পর তাতে তিনি মোন প্রতি দশ সের ক'রে পাথর চূর্ণ মেশাতেন। অর্থাৎ ত্রিশ সের চালে দশ সের পাথর মিশলে তবে এক মোন হত। মানে তিন ভাগের সঙ্গে এক ভাগ পাথর। তা হলে বুঝে দেখুন কি বিরাট ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এঁর কৃপায় দেশের সকল চাল এঁর গুদামজাত হয়ে চালের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হত!

ব্যবসা করতে পারবে তুমি? তা যদি না পার তা হলে এ গদির আশা ছাড়।

সোমদেব মনমরা হয়ে পিছিয়ে গেলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন আমি ভাগ্য গণনা আর কবচের ব্যবসা করব। ব'লে গদিতে বসতে যাবেন এমন সময় চতুর্থ পুত্তলিকা শ্রীমতী ইন্দ্রসেনা তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, ঐ ব্যবসাতে পুণ্যাত্মা দেবদত্তের সমান না হলে গদিতে বসা যাবে না। শোন তাঁর এই ব্যবসার কথা। দেবদত্তের পরিকল্পনা খুবই কৌশলপূর্ণ। এত বড় দেশের প্রত্যেকটি লোক তাঁর কাছে ঋণী হয়ে পড়েছিল এমনই তাঁর গণনার নির্ভুলতা। তিনি সবার ভাগ্য একখানা পোষ্টকার্ড পেলেই বলে দিতেন। বলতে গেলে তিনিই ছিলেন সবার ভাগ্যগঠনকারী। মানে তিনি যা নির্দেশ দিতেন ভাগ্য সেই পথে চলতে বাধ্য হত। কারণ এক আশ্চর্য দৈব ক্ষমতায় তিনি প্রত্যেকটি লোককে একই ভাগ্যের অধীন করতে পারতেন। শুধু সময়ের ক্রম-পর্যায়ে যেটুকু তফাত। তিনি প্রত্যেকের মাসানুক্রমিক বর্ষ ভাগ্য একেবারে ছেপে রেখেছিলেন। যে যখন সেটা পাঁচ-সিকে দিয়ে কিনবে তখন থেকেই তার প্রথম মাস আরম্ভ হল। যথা প্রথম মাস ভালয়-মন্দে কাটবে। দ্বিতীয় মাসে অন্ততঃ একবার মাথা ধরবে। তৃতীয় মাসে বাড়ি তৈরির কল্পনা আসবে মাথায় এবং তখুনি মিলিয়ে যাবে। চতুর্থ মাসে বিস্তর আকাশ-কুসুম দেখা যাবে। কিন্তু পঞ্চম মাসে এক কেউটে সাপের পাল্লায় প'ড়ে নাস্তানাবুদ হতে হবে—ইত্যাদি।

এই ভাগ্য গণনায় মাত্র পাঁচসিকে খরচ, কিন্তু উক্ত কেউটে সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি রক্ষাকবচ (মাত্র পাঁচ টাকা) তিনি ঐ সঙ্গে একেবারে পাঠিয়েই দিতেন সম্মতির অপেক্ষা না রেখে, এবং গ্রাহকের মঙ্গলার্থেই বলতেন, উক্ত সাপ অতি ধূর্ত, তার প্রভাব থেকে যেমন ক'রে হোক, মুক্ত হওয়া চাই। লোকে ঐ কবচের জন্য পাঁচ টাকা দিয়ে দেবদত্তের প্রতি আরো কৃতজ্ঞ হত। এই বাবদ মাসে তিনি আয় করতেন দেড় লক্ষ টাকা। এ রকম গণৎকার না হতে পারলে এ গদিতে বসার উপযুক্ত হওয়া যায় না।

এ কথা শুনে সোমদেব ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, এবং বললেন আমি ওষুধের কারবার করব। ব'লে গদিতে বসতে যাবেন এমন সময় পঞ্চম পুত্তলিকা শ্রীমতী সুদতী বাধা দিয়ে বলল, ওষুধের কারবারে দেবদত্ত যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সে রকম কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবে গদিতে বসতে পারবে। তবে শোন সেই কথা। কে না জানে দেবদত্তের বিরাট ওষুধের কারবার ছিল। সব ওষুধই ছিল তাঁর নিজের কারখানার তৈরি। কিন্তু ব্যাপারটা বলতে যত সহজ আসলে তত সহজ নয়। একটুখানি গীতার কথা তুলতে হবে সব বুঝিয়ে বলতে গেলে। গীতায় বলেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২-২২

—অর্থাৎ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে নববস্ত্র পরিধানের মতো, সময় উপস্থিত হলেই আত্মা জীর্ণ দেহটাকে ছেড়ে নতুন দেহকে আশ্রয় করে। এটা হল গীতার কথা। দেবদত্ত তাঁর ব্যবসায়ে এই কথাটাই একটু উল্টে নিয়েছিলেন।



তিনি পুরনো দেহকে আশ্রয় ক'রে ব্যবসা চালাতেন। অর্থাৎ যত দামী বিদেশী ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় তা ব্যবহারান্তে তার শিশিগুলো তিনি তাঁর লোক দিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করতেন, এবং তার মধ্যে তাঁর তৈরি গুঁড়ো বা তরল ওষুধ ভ'রে বাজারে ছাড়তেন। তা এমন ওষুধ যে তাতে কারো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মনে হতে পারে এটি একটি প্রতারণা। কিন্তু আদৌ তা নয়। বরং এটি দেহ-বিজ্ঞানের একটি বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা। আর সেই সঙ্গে দেশের অর্থ দেশে রাখার কৌশল। অসুখ করলে দেহ থেকেই তা সারাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ নানা কৃত্রিম উপায়ে দেহকে পর-নির্ভর করে তুলছে। পর-নির্ভর মানে ওষুধ-নির্ভর। ওষুধ বর্জন করলে মৃত্যু সংখ্যা হঠাৎ খুব বেড়ে যেতে পারে, তবু ওষুধের অপমান থেকে দেহকে বাঁচানো দরকার। এইটি শিক্ষা দেবার জন্যই দেবদত্ত তাঁর ওষুধ-অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। অপর উদ্দেশ্যটি নিশ্চয় এতক্ষণ বোঝা গেছে। বিদেশী শিশিতে দেশী ওষুধ। রুগীর দেহ এবং মনোবল অক্ষুণ্ণ রইল, টাকাও বাঁচল অনেকটা। এক ইঞ্চি পরিমাণ খালি একটি শিশি কয়েক বছর আগে দেবদত্ত পঁচিশ টাকা পর্যন্ত দিয়ে কিনেছিলেন, এবং তাতে শাদা গুঁড়ো বা জল ভর্তি ক'রে একশ পঁচিশ টাকায় বিক্রি করেছেন। তখন কতগুলো ওষুধ দুষ্প্রাপ্য ছিল, এবং ঐ রকম দামই ছিল। তাই বলছিলাম ওষুধের ব্যবসা করতে হলে দেবদত্তের মতন এমন কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। গরীব রুগী একটি খালি শিশি বেচেছে পঁচিশ টাকায় এটি কম কথা নয়। ওষুধের ব্যবসায়ে দেবদত্তর মতন কৃতী না হলে গদিতে বসা চলবে না।

সোমদেব এ কথা শুনে পুনরায় পিছিয়ে এলেন এবং একটু চিন্তা ক'রে বললেন, আমি হোমিওপ্যাথি কলেজ খুলব এবং ডাকযোগে শিক্ষা ও ডিপ্লোমা বিলির ব্যবস্থা করব। এই কথা ব'লে তিনি গদিতে বসতে যেতে ষষ্ঠ পুত্তলিকা শ্রীমতী অনঙ্গনয়না বাধা দিয়ে বলল, ডাকযোগে হোমিও-প্যাথি শিক্ষার কলেজ খুলতে হলে দেবদত্তের মতন কৌশলী হতে হবে নইলে এ গদিতে বসা যাবে না। সেই কৌশলের কথা বলছি, শোন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় কলেজের বিজ্ঞাপন দিতেন। উদ্দেশ্য



এই যে, দেশে অগণিত বেকার লোক আছে তারা এই ফাঁদে ধরা দেবে। আসলে হোমিওপ্যাথি নিরাপদ ওষুধ, যে কেউ চিকিৎসক হতে পারে, বাধা নেই। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে উপাধি একটা থাকলে লোককে ঠকানোর সুবিধা হবে। অতএব একটা "এম-ডি গোল্ড মেডাল প্রাপ্ত" উপাধি শস্তায় কিনতে ক্ষতি কি ? টাকা পাঠালেই ডিপ্লোমা এমন কথা কাগজে কলমে লিখতে লজ্জা হয়, তাই তিন মাসের উপযোগী একটি পাঠক্রম তৈরি করতে হয়েছে, এবং নামেই তা পাঠক্রম, কারণ একটা মাত্র শীটে ছাপা, পড়তে এক মিনিট লাগে। এর জন্য সর্বোচ্চ দেড়শ টাকা, এবং যে পারবে না তাকে ক্রমাগত লোভ দেখাতে দেখাতে দশ টাকা পর্যন্ত নামা। দশটা টাকা পেলেও মোট ন'টাকা লাভ।

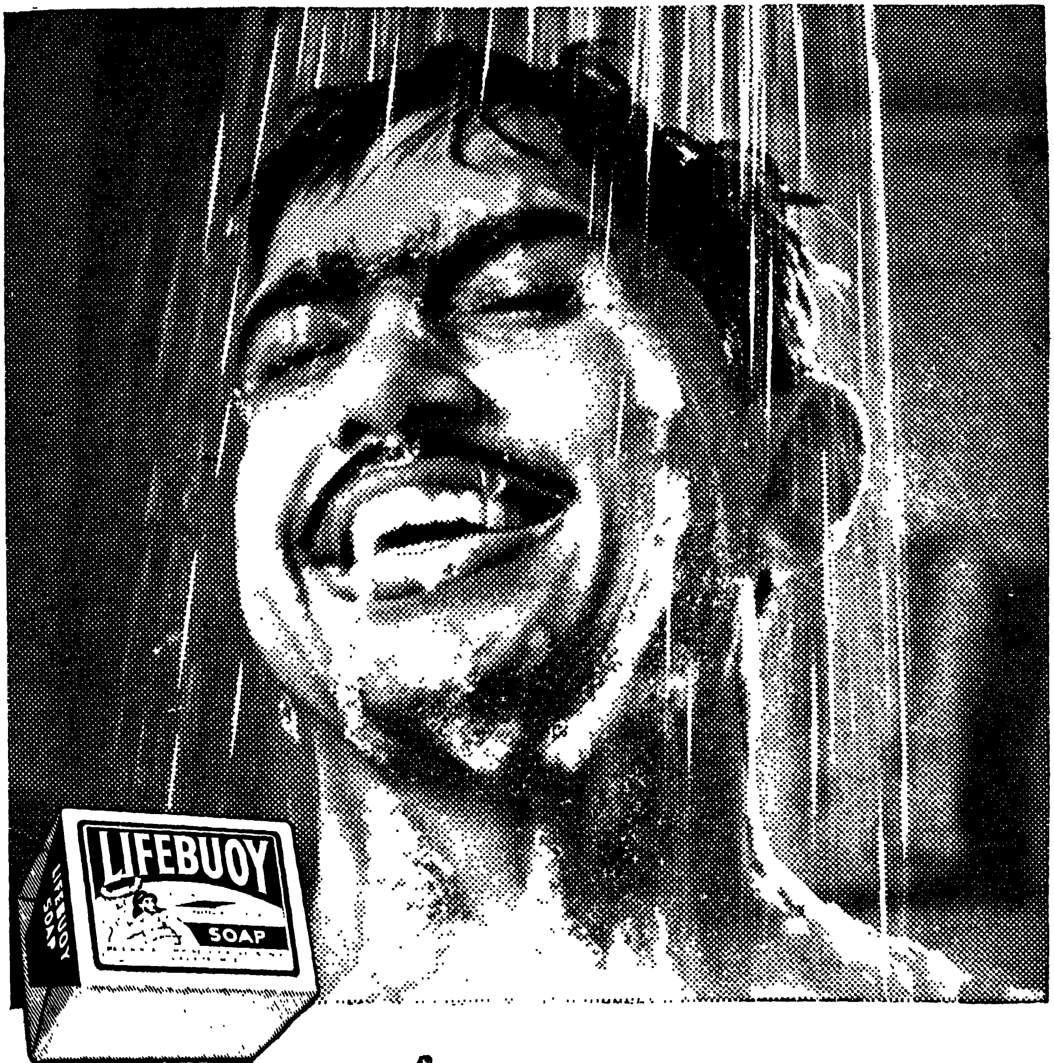
ডাকযোগে "শিক্ষা"—অথচ তাঁর চিঠিতে লেখা থাকত একটি মাত্র সীট খালি ছিল, তার জন্য ৬২৫টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু আপনার দরখাস্ত "ওলডেস্ট" অর্থাৎ "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন" তাই আপনাকেই সীটটি দেওয়া ঠিক করেছি। অতএব টাকা পাঠান। এ চিঠি অবশ্য প্রেসে ছাপানো চিঠি, কারণ সবাইকে ঐ একই চিঠি পাঠাতে হত। প্রত্যেকেই ভাবত আহা কি ভাগ্য! এই মনস্তত্ত্বের উপর ভরসা ক'রে দেবদত্ত দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতেন। অতএব এ ব্যবসাতে তাঁর মতো কৌশলী না হতে পারলে এ গদিতে বসা চলবে না।

সোমদেব পিছিয়ে এসে কর্তব্য ভাবতে লাগলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, দুত্তোর, এ গদিতে আমার কাজ নেই, অকারণ সময় নষ্ট করা হচ্ছে। ব'লে চলে যাবার উপক্রম করতে কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা প্রভৃতি বাকী ছাব্বিশটি পুত্তলিকা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। বলল, দেবদত্তের গুণ প্রচারের জন্য তাঁর বংশধরেরা আমাদের টাকা দিয়ে এই গদি রক্ষার ভার দিয়েছে, আমাদের গুণ প্রচার কাজ শেষ না হলে আমরা টাকা পাব না। ওগো, আমাদের কি হবে ?

কিন্তু সোমদেবের কানে গেল না তাদের আবেদন। তিনি ছটি পুত্তলিকার মুখে দেবদত্তের অপূর্ব কৃতিত্ব ও কৌশলের কথা শুনেই বুঝতে পারলেন বাকী ছাব্বিশটি পুত্তলিকাও ঐ একই রকম গুণের কথা বলবে এবং কোনো ব্যবসাতেই তাঁর সাধ্য হবে না যে তিনি দেবদত্তের পায়ের ধুলোর যোগ্য হন। অতএব তিনি গদির আশা ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ন মনে স্থান ত্যাগ করলেন এবং যেমন ছিলেন তেমনি রয়ে গেলেন।

পরে জানতে পারা গেছে একটি সৎকাজ তিনি করেছিলেন। তিনি ঐ বত্রিশটি পুতুলসহ গদিটি দেবদত্তের বংশধরদের খোঁজ ক'রে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।




LIFEBUOY
LIFEBUOY SOAP
SOAP

গ্যেটে ও একেরমানের কথোপকথনের কিয়দংশ

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

(মহাকবি গ্যেটের জন্ম ১৭৪৯, মৃত্যু ১৮৩২—একেরমান তাঁর অনুরাগী শিষ্য ও সচিব)

অনেক পাঠকই লেখার কৈফিয়ৎ তলব করে থাকেন। তাই সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। গত বৈশাখের শনিবারের চিঠিতে মাননীয় বিমল সিংহ মহাশয় 'অকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে নিতান্ত জাগতিক ব্যাপারে, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধকে কবিগুরু জরাজীর্ণ ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে উপমিত করেছেন। ঐ গাড়ী যতদিন বৃটিশ শাসনের সুদৃঢ় রজ্জুতে আস্তাবলে বাঁধা থাকবে ততদিন তার বিভিন্ন জীর্ণ অংশ পরস্পর সংলগ্ন থাকার দরুন গাড়ী বলেই মনে হবে কিন্তু রজ্জু-বন্ধন ছিন্ন হলে এবং ঐ গাড়ী সোল্লাসে রাস্তায় বের করলেই ওর বিভিন্ন অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আর গাড়ীর অস্তিত্ব থাকবে না। কবির এই বাণী যে বর্ণে বর্ণে সত্য আজ চোখের জলে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি।

একেরমানের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে জার্মান মহাকবি গ্যেটেও সেইরূপ অনেক অকাট্য খাঁটি কথা অতি সহজ ভাবে প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তারই কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

বুধবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪

গ্যেটে বললেন,—"আমি একটা মস্ত সুযোগ পেয়েছি যে, আমার জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর কয়েকটি বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। এই ধর, যেমন সপ্তবার্ষিক সংগ্রাম, ইংলণ্ড অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমেরিকার স্বাধীনতালাভ, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের অভ্যুদয়, তার দেশ বিজয় ও সর্বশেষে সেই মহা পরাক্রান্ত বীরের শোচনীয় পতন। এই সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি পরবর্তী যুগে যারা জন্মাবে এবং এখন যারা শিশু তারা বই প'ড়ে ঐ সব বিরাট ঘটনার কতটুকু বুঝতে পারবে আর কতটা শিক্ষালাভ করবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"সামনে আমাদের কিরূপ সময় আসছে, তা বলা শক্ত; তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, শান্তি শীঘ্র আসবে না। সন্তুষ্ট হয়ে থাকা জগতের নিয়ম নয়। শক্তিমানেরা কখনও এ আশ্বাস দেবে না যে তাদের হাতের ক্ষমতার অপব্যবহার তারা করবে না; আর জনসাধারণও ধীরে ধীরে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে আশায়—নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না। মানুষকে যদি আমরা perfect দেখতে চাই তবে তার জন্য পরিবেশও perfect করতে হবে। তাই দেখতে পাচ্ছি, আজ হোক, কাল হোক এখানে বা সেখানে সংঘর্ষ বেধে উঠছে। মানব সমাজের এক অংশ দুর্ভোগ ভুগছে—আর অপর অংশ মজা লুটছে। আত্মাভিমান এবং পরশ্রীকাতরতা—এই দুটি দৈত্য মানুষকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দলীয় সংঘর্ষের কোন অবসান আছে বলে আমার মনে হয় না।"

রবিবার, ২রা মে, ১৮২৪

গ্যেটে একেরমানকে বললেন—"তুমি অমুক পরিবারের সঙ্গে মেশ না কেন? ওখানে ত অনেক সাংস্কৃতিক মজলিস বসে, দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা লোকও তাতে যোগ দেন। ওখানে তোমার অনেক শেখবার আছে।" একেরমান বললেন—"আমি সর্বদা আপনার পদতলে বসে যে আলো, যে আদর্শ লাভ করছি তাতে অপর কোনও খানে গিয়ে কিছু শেখবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি আমার নেই। তার পরে সমাজে মিশতেও আমি তেমন জানি না। নিজের ভাললাগা, মন্দলাগা বিষয়ে আমি বড় সচেতন। আমার নিজের আদর্শ ও স্বভাবের সংগে খাপ খায় এরূপ লোকের সংসর্গই আমার ভাল লাগে এবং তার সাহচর্য ও বন্ধুত্বই আমি কামনা করি।"

একথা শুনে গ্যেটে বললেন—"তোমার এই মনোভাবের আমি কিন্তু প্রশংসা করতে পারিনে। আমরা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের যদি পরিবর্তন করতে না পারি তবে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? সকল মানুষের চিন্তাধারা বা মনোবৃত্তি হুবহু তোমার নিজের সংগে খাপ খেয়ে যাবে এরূপ আশা করা নিতান্তই ছেলেমি। আমি কিন্তু কখনো এরূপ করিনি। প্রত্যেক মানুষকেই আমি তার নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে ভালবাসি এবং সর্বদাই চেষ্টা করি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে আমার কতটা শিক্ষণীয় আছে। আমি তার কাছে—সহানুভূতি প্রত্যাশা করি না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে কোনও মানুষের সাহচর্যই আমার কাছে অপ্রীতিকর বোধ হয় না—সে লোক যত ভিন্ন প্রকৃতিরই হোক না কেন। এইভাবেই বহুমুখীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভে আমাদের চরিত্র বলবত্তর ও প্রশস্ততর হয়ে গঠিত হবার সুযোগ পায়। তুমিও এই ভাবে চেষ্টা করবে—এতে সুফল পাবে। এই বিরাট বিশ্বে যেখানেই হোক তোমার স্থান করে নিতে পারবে।"

ঐদিন বিকালে একেরমান গ্যেটের সঙ্গে বেড়াতে বের হলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁসে উঁচু নীচু পথ। বসন্ত সমাগমে গাছপালা নতুন

পাতা ও ফুলে শোভিত। মাঠগুলি সবুজ গালিচায় মোড়া। অস্তগামী সূর্য ধীরে ধীরে দূর পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়ছে। উভয়ে নীরবে পশ্চিম-দিকে মুখ করে পথে হাঁটছেন। সূর্যাস্ত দেখে কবি কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন—পরে প্রাচীন এক কবির একছত্র উচ্চারণ করলেন —"অস্তগামী সূর্য, তবু সেই সূর্য বটে।" কবি পুনরায় সোৎসাহে বলে উঠলেন—"পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়; তবে এই চিন্তা আমায় বিচলিত করে না। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ অবিনশ্বর—অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আত্মা অনবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয়। আত্মা ঐ সূর্যের মতই। চর্মচক্ষে আমরা সূর্যাস্ত দেখতে পাই; প্রকৃতপক্ষে সূর্যের ত উদয়াস্ত নাই—সে যে নিরবধিকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোক দান করে চলেছে।"

মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮২৮

একেরমান বললেন—"সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড় বড় লেখকদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে। অনেকের বাতিক আছে অনুসন্ধান করবার—কোন বড় লেখক কোন্ উৎস থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন—কার কার কাছে তিনি কি পরিমাণে ঋণী!"

শুনে গ্যেটে বললেন—"এটা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। একটা সুস্থ সবল লোক তার শক্তি কোথা থেকে পেয়েছে—তার জন্য কি সে যে গরু, ভেড়া ও শুয়োর খেয়েছে—তাদের কাছে খোঁজ নিতে যাবে যে কে কতটুকু শক্তির যোগান দিয়েছে?—আমরা শক্তি নিয়েই জন্মাই, কিন্তু আমাদের ক্রমবিকাশ নির্ভর করে পার্থিব শত শত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর—আমরা তা থেকে কতটা আপনার করে নিতে পারি সেই শক্তির উপর। আমি নিজে গ্রীক ও ফরাসী সংস্কৃতির নিকট এবং শেকসপিয়র, ষ্টারণ ও গোল্ডস্মিথের নিকট অসম্ভব ঋণী। তাই বলে কোন্ উৎস থেকে আমার সংস্কৃতি এবং মানসিক বিকাশ কতটা হয়েছে তা প্রমাণ করা অসাধ্য। মোদ্দা কথা হচ্ছে, মানুষের এমন আত্মা থাকা চাই যে সে সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে এবং যেখানেই সত্যের অবস্থিতি থাকুক না কেন সে তা আহরণ ও আয়ত্ত করতে পারে।"

গেটে আরও বললেন—"পৃথিবী এত পুরাতন এবং হাজার হাজার বছর ধরে এখানে এত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন ও চিন্তা করে গেছেন যে, নতুন কিছু বলবার মত তাঁরা বড় একটা রেখে যান নি। এই ধর না, বর্ণ সম্বন্ধে আমার মতবাদ (colour theory). এটাও সম্পূর্ণ নতুন নয়। প্ল্যাটো, লিওনার্ডো দ ভিনসি এবং আরও অনেক মনীষী এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু আমিও যে এ সত্যের সন্ধান পেয়েছি তা আমি জানিয়ে গেলাম। আমি যে এর জন্য সাধনা করেছি এবং এর সন্ধান পেয়েছি—সেইটিই আমার কৃতিত্ব বলে মনে করি।"

"মানুষের উচিত, সত্যকে সতত নতুন করে পেতে যত্নবান হওয়া। কারণ অসত্য আগাছার মত সর্বদা সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে উদ্যত। এটা যে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি বা দুবলতা প্রসূত শুধু তাই নয়—পরন্তু গোটা সমাজ এর জন্য দায়ী। খবরের কাগজে (ভাগ্যে রেডিও বেরোয়নি তখন), বিশ্বকোষে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে—সর্ব্বত্রই অসত্যের জয় জয়কার। অসত্য জাঁকিয়ে খোসমেজাজে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান, যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ লোক (majority) এর স্বপক্ষে রয়েছে।"

দর্শনী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

লালকেল্লার তিরপলিয়া দেউড়ির দোতালার একটি অন্ধকার কারাকক্ষে অন্ধ ফারুকশিয়র বাহুর উপাধানে মাথা রেখে শায়িত। অন্ধকার কারাগারে অন্ধীকৃত ভূতপূর্ব্ব বাদশা। পাশের কক্ষে প্রহরারত শান্ত্রীর পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়; কথনো শুনতে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গতায় বিরক্ত শান্ত্রীর আপন মনে ফার্সী বয়েত আওড়ানোর শব্দ; দুই কক্ষের মাঝেকার প্রাচীরে মানুষ-প্রমাণ উঁচুতে ছোট্ট যে ঘুলঘুলিটা আছে তাই দিয়ে কখনো কখনো একটা আলোর অঞ্জলি এসে পৌঁছয় ঘরের মধ্যে, কিন্তু তা কি দেখতে পায় অন্ধের চোখ! নিয়মিত সময়ে দিনে রাতে একবার শান্ত্রীর পাহারায় খুলে যায় লোহার দরজার কুলুপ, একজন কেউ ছুঁড়ে দেয় খানকতক পোড়া রুটি, রেখে দেয় এক ভাঁড় জল। বাস্‌, বহিঃ-পৃথিবীর সঙ্গে ঐ তার একমাত্র যোগাযোগ। ঘরে কোন আসবাব নাই, না একটা চারপাই—না একখানা কুর্শি। সব-ছিল থেকে কিছু-নাই'র অতল গহ্বরে যে পতিত—এই কয় দিনেই সে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে মানুষের প্রয়োজন কত সামান্য। আর আয়োজন! ঐ লালকেল্লা, শাজাহানাবাদ, হিন্দুস্থান। তাতেও প্রয়োজন মেটে না, তখন লাঠালাঠি কাটাকাটি, পরিণাম কবর নয় কারা! এর চেয়ে কবর ভালো। লাফিয়ে ওঠে অন্ধ সিংহ, সদর্পে পদক্ষেপ করে, কিন্তু কয়েক ধাপ না যেতেই বাধা দেয় দেয়ালগুলো। এ কয়দিনেই ঘরের সীমা সরহদ্দ সে বুঝে নিয়েছে। বুঝে নিয়েছে—তবু বিশ্বাস হ'তে চায় না। বন্দী পাখী খাঁচার শলাকাগুলোকে বিশ্বাস করে না বলেই বেঁচে থাকে। পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, শুয়ে পড়বার আগে আকণ্ঠ জলপান করে নেয়, জল যে সরাবের চেয়ে সরবতের চেয়ে বেশি মিষ্টি হতে পারে—এই প্রথম সে বুঝতে পারলো।



শ্বাস যায় তবু আশা যায় না। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে আব্দুল্লা খাঁ আফগানকে—মানে কিনা ঐ শান্ত্রীকে হাত করবার চেষ্টা করেছে সে, লোভ দেখিয়েছে একখানা চিঠি রাজা জয়সিংহের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে সাত হাজারী মনসবদার করে দেবে তাকে। আব্দুল্লা খাঁ আফগান সব কথা জানিয়ে দেয় হুসেন আলি খাঁকে। আরো কঠোর হয় কারাগারের অবরোধ। অবশ্য তার আরো কারণ আছে। শাজাহানাবাদের লোকের সহানুভূতি ফারুকশিয়রের দিকে, বাজারে বাজারে গুজব রটে যায় যে বড় বড় সব ওমরাহ তহব্বর খাঁ, রুহুল্লা খাঁ প্রভৃতি রাজা জয়সিংহের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রকাণ্ড সৈন্যদল নিয়ে এগোচ্ছে। আর সর্ব্বোপরি ফারুকশিয়র একেবারে অন্ধ

হয়নি, এখনো দেখতে পায়। সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ আর সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ স্থির করে—আর নয়, এবারে কারার বন্দীকে কবরে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। সিদি জাসিন খাঁকে পুরস্কারের লোভ দেখায় তারা, লোকটা এমন বেয়াকুব অস্বীকার ক'রে বসে। বন্দী হলেও এক সময়ে তো বাদশা ছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ভাবে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বন্দী জানতে পায় না এসব পরামর্শ, জানবার কথাও নয়। এক মাসের মধ্যে জনপ্রাণীর মুখ দেখতে পায় নি, তখনি শুধরে নিয়ে ভাবে কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি। কি হ'ল ফকরুন্নিসা বেগমের, কি হ'ল যোধপুরী বেগমের—আর কি হ'ল জুলেখার। সে জানে বেগম দুইজন স্বাধীন নয়, কিন্তু জুলেখা তো বেগম নয়, বেগম নয় বলেই স্বাধীন—সে-ও কি ভুলে গেল নাকি! অবশ্য একেবারে ভোলেনি, নূতন বাদশা রফি-উফ-সারজাৎ। কেমন আছে খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে লোক পাঠিয়েছিল, বুঝতে পারেনি সেটা বাদশাহী বিদ্রূপ, না বাদশাহী ধিক্কার। উত্তর চাইলে পাঠিয়ে দিয়েছিল একটা ফার্সী বয়েত—

"মালীর পরে ওগো কোকিল
রেখো না বেশি আশা
ওই বাগানে ক'দিন আগে
আমারো ছিল বাসা।"

বয়েতটা পাঠিয়ে দিয়ে এত দুঃখের মধ্যেও মনে মনে হেসেছিল। ক'দিনের বাদশার উদ্দেশ্যে ক-দিন আগেকার বাদশার পরামর্শ।

ঐ বয়েতটা পাঠিয়ে দিয়ে সে আবিষ্কার করলো যে তেমন তেমন ক'রে চেপে ধরলে দেখা যায় যে, দুঃখের মুঠোর মধ্যে দু-একটা সুখের মুক্তো পাওয়া যায়। আর একটু চেপে ধরলে তার অন্য হাতের মুঠো খুলে গিয়ে কি জুলেখা বেরিয়ে পড়বে না! যে গিয়েছে সে কি একেবারেই গিয়েছে। সেদিন সে-ই তো লড়েছিল সবচেয়ে বেশি, সবাই যখন ক্ষান্ত হ'ল, ক্লান্ত হয়ে হার মানলো, তখনো লড়ছিল সে। তবু দেহে এত শক্তি? নয় কেন? বিদ্যুল্লতার মজ্জাতেই থাকে বজ্রের আগুন। মুরিদ খাঁ এক ধাক্কায় ওকে ফেলে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মাথা ফেটে বের হ'ল রক্ত। ঐ তার শেষ চিহ্ন, সূর্য্য অস্ত যাওয়া আকাশে রঙীণ মেঘ।

এতক্ষণ আমরা চলেছি কাহিনীর পায়ের উপরে ভর দিয়ে, এবারে ভর দিতে হবে ইতিহাসের পায়ের উপরে, তবে চালটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

আলমগীরের মৃত্যুর পরে সে কথাটা লোকে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে বাদশাহী অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদিরশাহের হাতে বাদশাহের পরাজয়ে সেই কথাটা দুনিয়াময় প্রচারিত হ'য়ে গেল; অন্তঃসারশূন্য বাদশাহী ভেঙে পড়লো। যা কোন মতে নড়বড়ে অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে রইলো তা হচ্ছে জীর্ণ কাঠামোখানা। অথচ এই দুই ঘটনার মধ্যে ব্যবধান মাত্র বত্রিশটি বছরের।

আলমগীরের পরে একের পরে এক বাদশাহের দল তখৎ-এ-তাউসে বসতে সুরু করলো, জীর্ণ কাঠামোখানা মেরামত করা দূরে থাক, তাকে খাড়া রাখবার সাধ্যও ছিল না এদের। হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় এরাই ঠাট বজায় রেখে রাজত্ব করতে পারতো—কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে দুঃসময়ের যোগ্য একজন বাদশাও বসলো না সিংহাসনে। অথচ বাদশাহীর প্রতি লোভ কারো কম নয়, নূতন বাদশাহের সিংহাসন আরোহণ মানেই একটা ক'রে গৃহযুদ্ধের রক্তনদী উত্তরণ। বাহাদুরশাহ, জাহান্দরশাহ, ফারুকশিয়র। এই ফারুকশিয়রের কথা আমরা বলছি। রাজার চেয়ে মন্ত্রীর প্রতাপ যখন বেশি হয়—বুঝতে হবে রাজ্যের দুঃসময়। এই সময়ে হুসেন আলি খাঁ আর আব্দুল্লা খাঁ নামে দুই ভাই, ইতিহাসে এরা "সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল" নামে পরিচিত, King-maker এর পদবী গ্রহণ করেছিল। নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি মতো যখন যাকে খুশী এরা বাদশাহী দিয়েছে—আবার সরিয়েছে। ফারুকশিয়রকে এরাই বসিয়েছিল সিংহাসনে, আবার সরালো এরাই। কেন? একদিকে অকর্ম্মণ্য দুর্বল বাদশা, অপরদিকে স্বার্থান্ধ প্রবল রাজপুরুষ—আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ফারুকশিয়রের অপসারণ স্থির হ'য়ে গেলে লালকেল্লার যে রাজকারাগারে বাদশার বংশধরদের এই চরম প্রয়োজনের জন্য জীইয়ে রাখা হ'তো সেখান থেকে রফি-উদ্-সারজাৎ নামে একজনকে টেনে বের ক'রে এনে দেওয়ানী আমে তখত্-এ-তাউসের উপরে বসিয়ে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হ'ল। এখন আর ফারুকশিয়রকে বন্দী করতে কোন বাধা রইলো না। তখন সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের আদেশে নিজামউদ্দিন আলি খাঁ,

রাজা রতনচাঁদ, রাজা ভকতমাল প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল আফগান সৈন্য রঙমহলে ঢুকে পড়লো ফারুকশিয়রকে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে। তারপরে, না, এবারে ঐতিহাসিকের নিজ কণ্ঠস্বরে শোনা যাক, নিরাবরণ সত্য নিরাভরণ পালোয়ানের দেহের মতো কঠিন, সাহিত্যিকের কলমের স্পর্শে রসহানির আশঙ্কা।

"এই সব লোক, সংখ্যায় পুরা চার শ, সবেগে ঢুকে পড়লো বাদশার অন্তঃপুরে। অন্তঃপুরের মেয়েদের অনেকে অস্ত্র গ্রহণ করে বাধা দিতে অগ্রসর হ'ল, কতক আহত হ'ল, কতক নিহত। মেয়েদের কান্নাকাটি ও বিলাপের প্রতি কেউ কর্ণপাত করলো না। যে ছোট ঘরটায় ফারুকশিয়র লুকিয়েছিল তার দরজা ভেঙে ফেললে হতভাগ্য বাদশা ঢাল-তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলো—আর আঘাত করতে সুরু করলে দুর্বৃত্তদের। এ হেন কোণঠাসা অবস্থায় আক্রমণে কোন ফলোদয় হ'ল না। তার মা, স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য মেয়েরা তাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করলো। বিলাপ-পরায়ণ মেয়েদের প্রতি কেউ কোন সম্ভ্রম দেখালো না, তাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন আক্রমণকারিগণ তাকে ঘিরে ফেললো; ধরলো তার হাত আর গর্দ্দান, খসে পড়লো তার পাগড়ী, এই ভাবে তাকে টেনে বের করে নিয়ে এলো অন্তঃপুর থেকে।...সবল সুপুরুষ এই মানুষটিকে, বাবরের বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সুগঠিত দেহ এই যুবককে ঘন ঘন আঘাত ও ভর্ৎসনা করতে করতে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসা হ'ল দেওয়ানী-খাসে হুসেন আলি খাঁর সম্মুখে। হুসেন আলি খাঁ কনকদানির বাক্সটি থেকে সুর্ম্মা পরাবার সূঁচটি বের ক'রে একজনের হাতে দিয়ে বল্‌ল, এবারে বন্দীকে শুইয়ে ফেলে দিয়ে চোখ দুটো অন্ধ করে দাও। তারপরে অন্তঃপুরে আর ভাণ্ডারে কিম্বা অন্তঃপুরিকাদের দেহে যা পাওয়া গেল, নগদ, কাপড়-চোপড়, সোনা-দানা, তৈজসপত্র সমস্ত লুণ্ঠিত হ'ল, এমন কি দাসী বাঁদী আর নাচওয়ালীগুলোকেও যে যেমন পারলো আত্মসাৎ করলো। চোখে সূঁচ চালিয়ে দেওয়ার পরে ফারুকশিয়রকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তিরপলিয়া দেউড়ীর কারাকক্ষে।" *

॥ ২ ॥

কারাগারের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। তবু শব্দের আভাসটুকু ধরা পড়লো অন্ধের প্রখরতর শ্রবণেন্দ্রিয়ে। দৃকপাত করলো না সে, করবারও আছেই বা কি! নিয়মিত পোড়া রুটি আর জলের ভাঁড় রাখবার লোকটা বই তো নয়। ক্ষুধার ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যটুকুর অভাব পূরণ ক'রে নেয় সে অমৃতরসে, তাই তখন পান করছিল হতভাগ্য বন্দী। জুলেখাকে প্রথমে তার নজরে পড়েনি, মিশে ছিল সে আর দশজন সুন্দরী বাঁদীর দলে। তারপরে মানসিক কোন গ্রহোদয়ের নিয়মে দিগন্তের ধারে দেখা দিল ছোট্ট সুকুমার-গজমোতির মতো মুখখানি। দিগ্‌বলয় অনুসরণ ক'রে কিছু দিন সে প্রদক্ষিণ করলো বাদশাকে, তারপরে দেখা দিল ঢেউয়ের মাতামাতি। প্রথমে ফারুকশিয়র ভেবেছিল ও আর কিছু নয়, পরিচিত চাঁদের অভ্যস্ত লীলা। না, না, তা নয়। জুলেখা সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, তনুভঙ্গে কুর্নিশ করলে ঢেউগুলো কূল ছাপিয়ে যায় কেন, ঢেউকে এতখানি উদ্বেল করতে আর তো পারে না কেউ। জুলেখাই তার হৃদয়ের নূতন গ্রহ। সে বুঝলো, কিন্তু তার আগেই বুঝে নিয়েছিল রঙমহলের আর সকলে। এখন ফকরুন্নিসা বেগম আর রাঠোর বেগমের পরেই তার মর্য্যাদা। বাদশা স্থির করেছিল তাকে সাদি ক'রে বেগমের পদ দান করবে। এমন সময়ে এলো বিপর্য্যয়। তা নাই হ'ল। বাঁদী বলেই সে স্বাধীন, স্বাধীন বলেই সে আসতে পারে। কিন্তু আজো কেন এলো না। এমন কত কি চিন্তা দিয়ে বন্দী বুনে চলে আলোকলতার জাল।

কারাগারে সে প্রবেশ করলো, নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল দরজাটা। ঘর অন্ধকার, কিছুই চোখে পড়ে না, কোথায় বন্দী—কোথায় জিনিস-পত্র। অন্ধকারে পায়ে লেগে গড়িয়ে পড়লো জলের ভাঁড়, ঢেলে পড়ে গেল জলটা।

জলটা ফেলে দিলে, আজ আবার একি নূতন উপদ্রব।

এই তো বাদশার কণ্ঠস্বর—ঐ তো ওখানে বাদশা। হায় হায় একেবারে মেঝের উপরে, নাই একখানা গাল্‌চে, নাই একখানা কুর্শি, এমন কি একখানা চারপাই পর্য্যন্ত নাই। খালি মেঝের দেয়াল ঠেস দিয়ে খালি গায়ে বসে আছে বাদশা।

* The Later mughals, Part I,—Irvine. ইসলামী আইন অনুসারে অন্ধ রাজত্ব করবার অধিকার হারায়।

আগন্তুক সম্মুখে গিয়ে অভ্যাস মতো কুর্নিশ করে, তখনি বুঝতে পারে ঐ চোখে যে দৃষ্টি নাই।

পায়ের শব্দ কাছিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে বন্দী বলে ওঠে, আজ আবার কি হুকুম। খুন করবে নাকি?

কেউ উত্তর দেয় না। আগন্তুক হয় তো ভাবে—কি প্রসঙ্গ দিয়ে কথা সুরু করবে।

যে অবস্থায় আছি কোতল হতে ভয় পাই না, কারার চেয়ে কবর ভালো। কিন্তু তার আগে একবার শেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে না নূতন বাদশা। একবার জুলেখাকে দেখলে সহস্রবার মরতে রাজি আছি। যাও, যাও, বাদশাকে বহুৎ বহুৎ কুর্ণিশ জানিয়ে আরজি পেশ করগে।

তার চোখে জল গড়ায়, আগন্তুকের চোখেও জলের ধারা। দুই ধারায় রাখীবন্ধন হয়ে যায়। চোখের জলের জলের বিচিত্র প্রকৃতি।

কি, এটুকু দয়া করবার হুকুমও নেই বুঝি। তবে নিয়ে এসো কি আছে, তলোয়ার—না কিরিচ—না গুপ্তি—না পিস্তল! জুলেখা আছে মনের মধ্যে—তোমার হিন্দুস্থানের বাদশার সাধ্য নেই কেড়ে নেয় সেই মন।

আগন্তুক আর মৌন রক্ষা করতে পারে না, ডুকরে কেঁদে উঠে বলে—বাদশা! বাদশা! এই যে বাঁদী হাজির।

মত্তমাতঙ্গের বলে ফারুকশিয়র লাফিয়ে উঠে বলে, জুলেখা, জুলেখা, দিল পিয়ারী জুলেখা, জড়িয়ে ধরে তাকে সবলে, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত ক'রে দেয় চুম্বনে। তারপরে নিজে বসে তাকে বসিয়ে নেয় কোলের উপরে।

তার গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—পিয়ারী, তোমার চোখে জল কেন?

বাদশা—

আমি তো আর বাদশা নই।

তুমি চিরকালই বাদশা, তুমি যেখানে বসবে সেখানেই তখৎ-এ-তাউস।

চোখের জলের উত্তর তো পেলাম না।

বাঁদীর চোখ তো জল পড়বার জন্যেই। তোমার চোখে জল দেখছি কেন বাদশা।

চোখের জলের কাছেও কি বাঁদী বাদশা ভেদ আছে?

এতদিন তো আমার চোখে জল পড়েনি বাদশা।

তবে আজ পড়ছে কেন?

সুখে।

আমার বন্দীদশায় তোমার সুখ?

হঠাৎ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না জুলেখা। সে জানে বাদশার বন্দীদশায় তার সুখ নয়—অথচ বন্দী না হলে কি প্রেমের এমন নিঃসপত্ন স্বীকৃতি পেতো বাদশার মুখে। প্রেম বড় নিষ্ঠুর।

জুলেখা বলে, আবার তুমি বসবে তখৎ-এ-তাউসে।

তাহ'লে পশ্চিমে উঠ্‌বে সূর্য্য।

দু হাজার বছর সূর্য্য পূবদিকে উঠেছে, না হয় এবার উঠবে পশ্চিম দিকে।

না পিয়ারী সে আশা করো না। তার চেয়ে বলো এ কদিনের খবর।

তখন দাড়িম থেকে দানা খসিয়ে নেবার মতো একে একে খসিয়ে নেয় তার মুখ থেকে এই এক মাসের সংবাদ, দাড়িমের দানার মতোই চোখের জলে শুভ্র রক্তের আভাসে রঙীণ দুঃসহ সব সংবাদ।

তুমি এতদিন আসনি কেন পিয়ারী।

প্রথম কদিন তো মাথায় চোট লেগে বেহুঁশ ছিলাম। তারপরে হুঁশ হ'লে দেখলাম যে দিলদার খাঁর হারেমে বন্দী।

শয়তান! বেইজ্জত করেছিল তোমাকে?

না, সে সুযোগ পায়নি। তার মেয়ে আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

কোথায় গেলে পালিয়ে?

তালকাটোরায় গিয়ে ক'দিন লুকিয়ে রইলাম।

তারপরে?

ধীরে ধীরে ফিরলাম সহরে, কাগজী মহল্লায় চাচীর কাছে। সেখানে সব খবর পেলাম।

কি কি খবর?

ফকরুন্নিসা বেগম সাহেবা বাপের ঘরে গিয়েছে, আর যোধপুরী বেগম সাহেবা চলে গিয়েছে দেশে।

তুমিই বা চলে গেলে না কেন?

কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার বাপের ঘর?

থাকলে আসতে না নিশ্চয়।

যাদের ওসব নেই তারা কি সবাই এসেছে নাকি?

গোসা করলে পিয়ারী ! তুমি ছাড়া আমার কেই বা আছে ?

এই বলে কাছে টেনে নেয় তাকে।

তারপরে শুধায় চাচীর ঘরে আসবার পরেও তো অনেক দিন হ'ল—এতদিন আসনি কেন ?

বাদশা, পাহারাওলা কি ঢুকতে দেয়।

কি বলে ?

বলে ধরে নিয়ে যাবে উজীর সাহেবের কাছে।

তারপরে ?

আজ দশ দিন ধরে কাঁদাকাটি করছি, বলছি, সাহেব একবার চোখের দেখা বই তো নয়, কে-ই বা জানছে ? শেষে বলে টাকা-কড়ি দাও। বলি যে, থাকলে কি না দিতাম সাহেব। তখন বলে—এখনি ভাগো। উজীর সাহেব খবর পেলে আমার গর্দ্দান যাবে।

তারপরে সে বলে যায়, এই ভাবে দশদিন কাঁদাকাটি হাঁটহাঁটি করবার পরে আজকে হুকুম পেয়েছি।

কিসের বদলে ?

কিসের বদলে শুনে জুলেখার মুখ শুকিয়ে যায়, গা কাঁপতে থাকে ; তবু থামে না—বলে যায়।

এতক্ষণ সে যা বলছিল সত্য, এবারে যা বলতে সুরু করলো সর্ব্বৈব মিথ্যা।

বাদশা নওরোজের দিকে আমাকে একটা জড়োয়া হার দিয়েছিলে, সেটা এত দুঃখের মধ্যেও হাত ছাড়া করিনি। সেটা দিয়েছি আফগান সর্দ্দারকে। সে খুব খুশী হয়ে দরজা খুলে দিতে রাজি হ'ল। বলল, হাঁ, হাঁ, এই তো বাদশার যোগ্য দর্শনী বটে! বলল, এটি আমার বিবিকে খুব মানাবে। তখনি সেটা জেবের মধ্যে পুরে দরজার কুলুপ খুলে দিল।

বন্দী বলে, লোকটাকে আমি দোহাজারী মনসবদার ক'রে দেব—একবার তখৎ-এ-তাউসে বসি না।

তারপরে বলে, পিয়ারী, তোমার বোধ হয় বিশ্বাস হ'ল না যে আমি আবার বাদশাহী পাবো! পাবো, পাবো, নিশ্চয়ই জেনো পাবো। কেমন করে পাবো সেই গোপন কথাটাই আজ বলবো তোমাকে, বলবো বলেই প্রত্যেক দিন আশা করছিলাম তোমার আগমনের।

তার কথায় বিশ্বাস হ'ল কিনা জানি না, খুব সম্ভব তার কথা কানেই ঢুকলো না জুলেখার। তখন মনে পড়ছে—আফগান পাহারাওলার সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল, আর মনে পড়ছে যে দর্শনীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি সে লাভ করেছে। কি হঠকারিতাই না সে ক'রে ফেলেছে—এতখানি না করলে কি এমন ক্ষতি হ'তো! না হয় নাই হ'তো দেখা বাদশার সঙ্গে।

অনেক তত্ত্ব-তালাসের পরে জুলেখা জানতে পারে যে ফারুকশিয়র বন্দী আছে তিরপলিয়া দেউড়ির কারাকক্ষে। বুঝতে পারে কড়া পাহারা। তবু একদিন গিয়ে উপস্থিত হয়, দূর থেকে দেখবামাত্র ভাগিয়ে দেয় পাহারাওলা। আবার যায় আবার তাড়া খায়, দুটো মিনতি করবার সুযোগটুকুও পায় না। এই ভাবে ৫।৬ দিন তাড়া খাওয়ার পরে একদিন কথা বলবার সুযোগ পায়, পাহারাওলা শুধায় কি চাই ?

একবারটি দেখা করতে চাই বাদশার সঙ্গে।

ভাগো হিঁয়াসে—গর্জ্জন ক'রে ওঠে পাহারাদার।

আবার পরদিন যায় জুলেখা। এবারে পাহারাদারের হাতে একটি হীরার আংটি দিয়ে বলে, খাঁ সাহেব একবার দেখা করতে দাও।

আংটিটা দিতে তার দুঃখ হয়, বাদশার এই উপহারটিকে এত কষ্টের মধ্যেও রক্ষা করেছিল, তখন ভাবে সেই শেষ উপহার যদি সাক্ষাৎকারের সুযোগ জুটিয়ে দেয়, তবে তার চেয়ে সদ্ব্যবহার আর কি হতে পারে!

খাঁ সাহেব সেটি জেবের মধ্যে পুরে বলে, আভি ভাগো।

মধুর হাসি হেসে জুলেখা বলে, সে কি খাঁ সাহেব, তোমাকে যে ভেট দিলাম।

খাঁ সাহেব হাসিতে কালো গুম্ফশ্মশ্রু আলোকিত করে তুলে বলে, আমিও তো কথা বলেছি তোমার সঙ্গে।

তবে এবার দরজাটা খুলে দাও।

ঐটুকুতে ফাটকের দরজা খোলে না।

আর যে কিছু নাই।

যোগাড় করো গো।

জুলেখা ফিরে আসে, কি যোগাড় করবে, কোথায় যোগাড় করবে, কে করবে তাকে সাহায্য। শেষ সম্বল তার অকারণে তলিয়ে গেল অতলে। তবু না গিয়ে উপায় নাই। আবার যায়।

এবারে খাঁ সাহেবের চোখে বীভৎস লোলুপতা ঝলক দিয়ে ওঠে। ভয় পায় জুলেখা। পুরুষের ঐ দৃষ্টি খুব চেনে সে। জীবনে যে পথ সে অবলম্বন করেছে তার মোড়ে মোড়ে ঐ দৃষ্টির জলসা। তবু না বুঝবার ভান করে বলে—দরজাটা খুলে দাও খাঁ সাহেব।

ভেট আনো।

বলেছি তো মূল্যবান্ আর কিছু নেই আমার।

এবারে মৃদু হেসে বলে, আরে তুমি তো আছ।

না বুঝবার ভান ক'রে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে জুলেখা।

কি পিয়ারী বুঝলে না। তবে শোন, বলে আওড়ায় এক ফার্সী বয়েত—

> "দরিয়ায় মুক্তা থাকে,
> খনিতে হীরক,
> সুন্দরার সর্ব্ব অঙ্গে
> রত্নের চমক।"

ব্যাখ্যা করে বলে তোমার হীরা জহরতের অভাব কি বিবি, মনে করলেই হারুণ-অল-রসিদের ভাণ্ডার খুলে দিতে পারো।

রাগ ক'রে চলে যায় জুলেখা।

খাঁ সাহেব হেসে বলে, ফিন আনে হোগা। তারপরে হাতে তাল দিতে দিতে গুনগুন স্বরে গান ধরে।

> "যা যা রে ভোমরা দূর দূর যা।"

দু'দিন আসে না জুলেখা, ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবে। খাঁ সাহেবের দাবী মেটালে দেখা হয়, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা করাও যে দরকার। তার জন্যে নয়, বাদশার জন্যে, যদি কিছু উপকার করা সম্ভব হয়। বাজারে তো অনেক রকম গুজব রটছে, আম্বেরের রাজা জয়সিং আসছেন, আসছে শ্বশুর অজিত সিং, সঙ্গে স্বয়ং নিজাম-উল-মুলক। নিশ্চয় এখন চিঠি চালাচালি আবশ্যক। কে আর করবে সে কাজ জুলেখা ছাড়া। সে স্থির করে আবার যাবে—কিন্তু না, না, ও দাবী মেটাবার পণে নয়, মনসবদারীর লোভ দেখিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আদায় করবে হুকুমটা।

সন্ধ্যাবেলায় রুহুল্লা খাঁর ভাই এসে হাজির। জুলেখা বিবি অনেক খুঁজে তোমার দেখা পেয়েছি।

জুলেখা শুধায়, হঠাৎ আমাকে কিসের প্রয়োজন?

নুরুদ্দিন খাঁ তাকে নিভৃতে নিয়ে যা জানালো তার মর্ম্ম হচ্ছে যে তহবর খাঁ, রুহুল্লা খাঁ রাজা জয়সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, সকলে মিলে সৈন্য সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। ওদিকে দক্ষিণ থেকে নিজাম-উল-মুল্ক রওনা হয়েছে। সে আর একটু কাছে এলেই সকলে মিলে লড়াই করে ফারুকশিয়রকে উদ্ধার ক'রে আবার সিংহাসনে বসাবে।

জুলেখা বলে, লড়াই তো মরদের কাজ, আমি কি করবো?

বিবি, জেনানার মতো কাজও আছে, তোমাকে তাই করতে হবে। একটা গুজব রটেছে যে ফারুকশিয়র সম্পূর্ণ অন্ধ হয় নি, এখনো একটু দেখতে পায়। কথাটা সত্য হলে ঐ গুজবের হাতিয়ারেই আমরা লড়াই ফতে ক'রে দেব। এখন তোমাকে তিরপলিয়া দেউড়িতে গিয়ে বাদশার কাছ থেকে জানতে হবে কথাটা সত্য কিনা।

আমি যে নিতান্ত ছোট!

আরে বিবি, তুমি ছোট বলেই তো এসেছি তোমার কাছে। যে খাঁচায় ঈগল পাখা ঢুকতে পারে না তাতে চড়াই পাখী অনায়াসে ঢুকে যায়।

না হয় ঢুকলাম, কিন্তু বাদশা আমাকে এমন গোপন কথাটা জানাবে কেন।

নুরুল্লা খাঁ বলে উঠল, এবারে হাসালে বিবি, তোমাকে জানাবে কেন? তাহলে শাজাহানাবাদের কোন লোকটা না জানে যে বাদশার দিল তোমার ওড়নার খুঁটে বাঁধা। শোন বিবি, পিরীতের চেয়ে গোপনঃকিছু তো নেই—তা যখন বাদশা তোমাকে জানাতে পেরেছে—একথাটাও জানাবে।

কথাগুলো শুনে জুলেখা এত দুঃখের মধ্যেও একটু গৌরব বোধ করলো, সেই সঙ্গে একটুখানি আনন্দও। বল্ল, আচ্ছা চেষ্টা ক'রে দেখি।

আর দেখাদেখি নয়, কালই যাবে।

জুলেখার একবার ইচ্ছা হ'ল যে পাহারাদারের ঘুষের টাকাটা চেয়ে নেয়—কিন্তু চাইতে পারলো না। তামাম

শাজাহানাবাদে জানিত বাদশার প্রণয়িনীর পক্ষে সামান্য একটা লোকের কাছে হাত পাতা চলে না।

কি বিবি যাবে তো? আরে ফারুকশিয়র বাদশা হলে তুমিই তো হবে বেগম।

আচ্ছা যাও, যাবো কাল।

লোকটা চলে গেলে সারাদিনের চিন্তা-সঙ্কটের উপরে যবনিকা টেনে দিয়ে সিদ্ধান্ত করলো প্রহরীর প্রার্থিত দর্শনীর বিনিময়েই প্রবেশাধিকার অর্জ্জন করবে সে ফারুকশিয়রের কারাগারে। এখন প্রয়োজন ফারুকশিয়রের, যখন মন রাজি হয়নি তখন প্রয়োজন ছিল নিজের। পরাভিমুখী প্রেম সর্ব্বত্যাগী।

জুলেখাকে দেখে পাহারাওলা বলে উঠল—কি বিবি মিছামিছি ঘোরাঘুরি করছ কেন, দর্শনী মিটিয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ো, বলতে বলতে তার দুই চোখে নির্লজ্জ কামনা উঁকি দিতে থাকে।

জুলেখা বলে, সেই মনে করেই তো এলাম।

বাহবা বাহবা! ভয় কিসের কাক-পক্ষীটিতে জানতে পাবে না।

আগে দেখা করে বের হয়ে আসি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, মাল নিয়ে তবে তো দাম দেবে।

এসো—বলে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কারাগারে দরজা খুলে দেয়; মৃদু স্বরে বলে—যতক্ষণ খুশী থাকো কেউ তাগিদ দেবে না।

এই সব কথা মনে পড়ছিল জুলেখার, মনে পড়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল, বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনীর কোলের উপর ব'সেও তার শান্তি ছিল না, দাম চুকোবার পর্বটা মনে পড়ছিল। কিন্তু আসল কথাটা এখনো পাড়তে পারেনি, কি ক'রে পাড়বে বুঝতে পারছিল না, এমন সময়ে ফারুকশিয়র নিজেই পথ ক'রে দিল। বলল—জুলেখা, দিল, তোমাকে সেই সবচেয়ে গোপন কথাটা বলবো, যে কথার অপপ্রয়োগ হলে আমার মৃত্যু, সুপ্রয়োগ হলে আমার সিংহাসন লাভ।

জুলেখা বলল, এমন কথা বিশ্বাস ক'রে নাই বললে, আমাকে বাদশা, অপপ্রয়োগ তো হ'তে পারে।

পারে নাকি পিয়ারী! তাই যদি হবে—তবে প্রাণ হাতে ক'রে এখানে আসতে গেলে কেন? পাহারাওলা না হয় ভালো, ছেড়ে দিয়েছে—সৈয়দরা জানতে পারলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।

পাহারাওলা ভালো! মাথা ঘুরতে থাকে জুলেখার! অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলে—কি কথা বাদশা!

আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হইনি, এখনো একটু দেখতে পাই এই চোখটাতে। কি বিশ্বাস হ'ল না? এই দেখো চুমো খাচ্ছি তোমার ডান গালের তিলটির উপরে। কি এবারে বিশ্বাস হল তো? অন্ধের চোখ কি তিল দেখতে পায়।

ওটা তুমি আন্দাজে করলে।

আন্দাজে। বেশ, এবারে বাম গালের টোলের মাঝখানটিতে?

ওটাও আন্দাজ।

এটাও আন্দাজ! আচ্ছা এবার তোমার কণ্ঠের ত্রিবলীর মাঝখানকার চিহ্নটিতে?

ওটাও আন্দাজ, জানা জায়গা।

জুলেখা, তোমার দেহের কোন্ জায়গা আমার অজানা, তাহলে কিছুতেই তোমার বিশ্বাস হবে না।

তবে পরীক্ষা করি, কটা আঙ্গুল বলো, বলে মুঠ বন্ধ ক'রে থাকে।

আঙ্গুল দেখাও। এবারে নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে। ওকি, ওকি, চোখে জল কেন?

জুলেখা বলে, বাদশা, আমি পাষণ্ড, আমি পামর, আমি শয়তানী।

বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ফারুকশিয়র শুধায়, কি হ'য়েছে পিয়ারী!

জুলেখা ভাবে দর্শনীর রহস্য প্রকাশ করে। তখনি মনে হয়, তাতে এখনি হাঙ্গামা বেধে উঠে আসল উদ্দেশ্য মাটি হ'য়ে যাবে। যেমন করেই হোক ফারুকশিয়রকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

জুলেখা বলে, বাদশা আমি এবারে যাই।

যাবে?

চমকে ওঠে ফারুকশিয়র, যেন ও-কথাটা এই প্রথম শুনলো। তারপরে বলে, হাঁা যেতে তো হবেই। তার আগে এক কাজ করো, তোমার কথা মনে পড়ে এমন কিছু আমাকে দিয়ে যাও।

জুলেখা বলে, বাদশা আমি তোমার, কিন্তু আমার তো এমন কিছু নাই যা তোমাকে দিতে পারি।

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে নিয়ে তার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে বাদশা বলে—চুলের এই কাঁটাটি দিয়ে যাও।

চুলের কাঁটা খুলে দিতে দিতে বলে, একি দেওয়ার যোগ্য জিনিস ! কি করবে এ নিয়ে বাদশা ?

অনেক সময়ে, ফার্সী বয়েত মনে আসে, ঐ কাঁটার আঁচড় দিয়ে দেয়ালে লিখে রাখবো। তখন বাদশার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুর্নিশ ক'রে জুলেখা বলে, বাদশা, এবারে আসি।

আর একটু দাঁড়াও।

দুই হাতের মধ্যে তার মুখখানি নিয়ে অন্ধপ্রায় চোখের ক্ষীণ রশ্মিটুকু তার মুখের উপরে নিক্ষেপ ক'রে বলে, এই যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি পিয়ারী, দিনান্তের শেষ আলো যেমন দেখতে পায় সুন্দর পৃথিবীকে। ওরা যখন চোখে কাঁটা বিঁধিয়ে দিল, ভাবলাম বাদশাহী গেল, হয়তো প্রাণও যাবে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি ক'রে গেল তোমার মুখখানি দেখবার শক্তি। তারপরে ক'দিন পরে যখন চোখের দু'একটা রশ্মি ফিরে পেলাম, মনে হ'ল, না, আল্লা তো নিষ্ঠুর নন, আবার দেখতে পাবো তোমাকে আর আজ এখন বুঝছি আল্লা রীতিমতো সদয়, তোমাকেও ফিরে পাবো আর সেই সঙ্গে হয় তো বাদশাহিটাও।

জুলেখা চুপ ক'রে থাকে। এত সুখের যে মূল্য দিতে হবে তা স্মরণ করে তার অন্তরাত্মা কাঁপতে থাকে। সে ভাবে আল্লা রীতিমতো সদয় বইকি।

জুলেখা বেরিয়ে যায়, বন্ধ হ'য়ে যায় কারাগারের দরজা।

ফারুকশিয়রের মনে আনন্দ ধরে না, ঘরের মধ্যে পদক্ষেপ ক'রে বেড়ায়, যেন কারাগার নয় হিন্দুস্থানের অবাধ সাম্রাজ্য। সমস্ত শরীর তার হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে, ইচ্ছা করলে এখনি ঐ ছাদের বাঁধন, ভেদ ক'রে উড়ে যেতে পারে। আর ঐ কাঁটাটি কখনো রাখছে জেবে, কখনো বুকে, কখনো হাতের মুঠোর মধ্যে। অবশেষে দেয়ালের কাছে এসে কাঁটার আঁচড়ে লিখে দিল এক ফার্সী বয়েত—

চুলের কাঁটায় ফুলের কাঁটায়
প্রভেদ গেল ঘুচি,
উঠলো ফুটে—প্রেমের গুলাব
হৃদয়-রক্ত-রুচি।"

বয়েতটা লিখে একটু শান্ত হ'লে মনে পড়লো এত সুখ যার কল্যাণে সম্ভব হ'ল, সেই পাহারাওলাকে দুটো মিষ্টি কথা বলা উচিত। চেষ্টা করলে ঐ ঘুলঘুলিটা দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখা যেতে পারে।

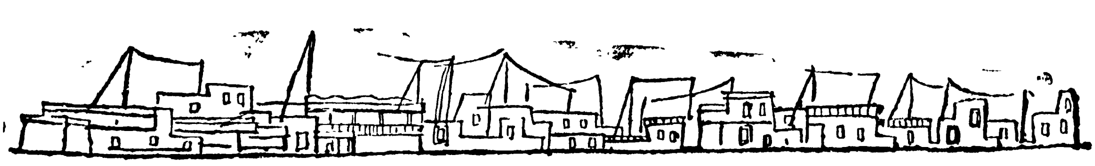
ঘুলঘুলিটার কাছে গিয়ে পায়ের আঙুলগুলোর উপরে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠে তাকালো ঘরটার দিকে—অন্ধপ্রায় চোখ প্রথমটা কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু দু'এক লহমার মধ্যেই চোখের আলোয় ঘরের অন্ধকারে আপস হ'য়ে যায় আর চোখে পড়ে।

প্রথম নজরে অন্ধ বিশ্বাস করতে পারে না তার নষ্টপ্রায় দৃষ্টিকে। দ্বিতীয় নজরে পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তৃতীয় নজরে গর্জ্জন ক'রে উঠে, বেঈমান, শয়তানী।

তারপর দরজায় মারে ধাক্কা। লোহার দরজা বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখায় না। তখন চীৎকারে গর্জ্জনে অভিশাপে ধিক্কারে সেই কারাকক্ষ প্রতিধ্বনিত করে চার দেয়ালে আঘাত ক'রে ক'রে ফিরতে থাকে।

তারপরে হঠাৎ কি মনে পড়ায় থমকে দাঁড়ায়। চট ক'রে জেব থেকে চুলের কাঁটাটি বের ক'রে নিয়ে নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়ে আর সবলে কাঁটাটি চালিয়ে দেয় চোখের মধ্যে। এই তো আমার একসঙ্গে লাভ হ'য়ে গেল বাদশাহি আর বেগম ! তারপরে বলে, আল্লার মুঠো থেকে চোখের এই দৃষ্টিটুকু ছিনিয়ে নিয়েছিল কে ? শয়তান, শয়তান।

বলে আর হাসে, সে হাসি উন্মাদের।



জন্মাষ্টমী

শ্রীদিলীপ কুমার

শ্রীবৈজ্ঞানিক প্রিয়বরেষু,—

আমাদের হরিকৃষ্ণমন্দিরে পর পর দুটি মহোৎসব হ'য়ে গেল: ঠাকুর কৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৩ই তারিখে ও গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব ১৫ই তারিখে। প্রতিবৎসরই এ-দুটি উৎসব হয় আমাদের মন্দিরে, কিন্তু এবার পর পর দুদিন উৎসবে এত ভিড় হয়েছিল যে মাদৃশ বয়স্কের ক্লান্তি আসার কথা। কিন্তু যুক্তিবাদী বললে হবে কী যে—বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে ভাগবতীকৃপা লজ্জায় পর্দানসীনা হয়েছে, আমার দেহে মনে শুধু আনন্দ নয় ভরসাও জেগে উঠেছে প্রায় চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী উচ্ছ্বাসে। মহোচ্ছ্বাস মহানন্দের অপরাধ কী বলুন? পর পর দুটি জন্মদিনে কী উৎসাহই না দেখলাম ধর্মার্থী ও ধর্মার্থিনাদের মধ্যে! জন্মাষ্টমীর দিন দুবেলায় সবশুদ্ধ হাজার দুই ভক্ত ও ভক্তিমতী এসেছিলেন, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়,উৎকল ও বঙ্গ হ'তে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রায় মহামানবের সাগরতীরে বললেই হয়। দীপাবলি, ভজন, নামকীর্তন, ভাষণ, আরতি, ইন্দিরার ভাবনৃত্য, পরিশেষে ধনীদরিদ্র অভিজাত অস্পৃশ্য প্রভুভৃত্য সবাইয়ের একত্রে পংক্তিভোজন—কিছু কি বাকি রইল? আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ভাবতে যে আমাদের মন্দিরে সবাইকেই শুচি বলে বরণ করা হয়—এমনকি আমাদের আদুরে কুকুর সাথীও মন্দিরে ঢুকে প্রসাদ পায়—যদিও এতে "শুচিবেয়েরা" শিউরে উঠবেন। তাছাড়া পার্সী শিখ সাহেব সবাই ভজন করেন—ঠাকুরের নামকীর্তনে যোগ দেন এ শ্রীক্ষেত্রে। কাজেই এসব দেখে-শুনে যদি আজ উজ্জিয়ে উঠে আপনার দরদী পত্রের উত্তরে একটি দীর্ঘ-পত্র লিখতে কোমর বেঁধে বসি, তবে আপনি আশা করি নিজগুণে মার্জনা করবেন এ দুরন্ত অধ্যবসায়কে।

এ আশা করি কারণ মহদাশয়ের কাছেই মানুষ আশা করে। (কালিদাস এমন কথাও বলেছেন: যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা—অর্থাৎ

নিরুপমের কাছে চেয়ে না পেলেও খেদ নাই:
নরাধমের প্রসাদ যেন ভুলেও নাহি চাই।)

তা ছাড়া আপনি শুধু মহদাশয় তো নন, তদুপরি (কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?) বৈজ্ঞানিক হ'য়েও মানেন যে অধ্যাত্ম ব'লে একটি অনস্বীকার্য আনন্দরাজ্য আছে বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক যার পাসপোর্ট পায় না। মানেন যে, এ রাজ্যে ঢুকতে হ'লে চাই শ্রদ্ধা ভক্তি—যার স্থান মস্তিষ্কে নয়—হৃদয়ে। উপনিষদ বলেছে: "হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি।" কিন্তু শুধু শ্রদ্ধাই নয়, সত্যেরও প্রতিষ্ঠা হৃদয়েই—"হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি।" পাশ্চাত্য জ্ঞানপন্থীরা এ কথায় সম্ভবতঃ ঘোর আপত্তি করবেন—বলবেন: এ কেমন কথা—জ্ঞানের মণিপীঠ তো মস্তিষ্কে। কিন্তু ভারতের সনাতন আর্ষ বোধি বলে: অধ্যাত্ম উপলব্ধির গভীর অতলে যে পৌঁছায় সে মস্তিষ্ক নয়—সে এই হৃদয়ই বটে। তাই ভগবানকে আমরা "মনোযামী" উপাধি দিই নি, ডাকি "অন্তর্যামী" ব'লে। কারণ মস্তিষ্কের যে পেশা—বিচার বিশ্লেষণ—সে পেশায় নেশা হ'তে পারে বড় জোর, কিন্তু মেশা যায় না পরাৎপরের চেতনায়। এই জন্যেই অত বড় জ্ঞানমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞ মহাযোগী রমণ মহর্ষিও আমাকে বলেছিলেন ১৯৪৪ সালে: "ভক্তি জ্ঞান-মাতা"। এবং এ ভক্তির অধিষ্ঠান হৃদয় ব'লেই ভক্তিকে বাদ দিয়ে যে মানস

(cerebral) জ্ঞান তাতে না ছিন্ন হয় হৃদয় গ্রন্থি, না দীর্ণ হয় সংশয়। ফল হয়—আপনারই ভাষায়ঃ জ্ঞানের পথের পথিকের দুর্দশা যে—তার ভাগ্যে জোটে শুধু সংশয়, নৈরাশ্য, এবং নিরানন্দ।"

আপনি সহৃদয় মানুষ—তাই তো আপনার প্রতি হৃদয়ের একটি সহজ টান আমি সত্যই অনুভব করি (নৈলে আপনাকে এত শত লিখতে যাবই বা কেন বলুন ?)—আর সেই টানের আলোতেই দেখতে পাই যে, আপনি সংশয়ী হ'লেও (গীতার ভাষায়) "অশ্রদ্দধান" নন। আপনি নিজে মুখেই তো মেনে নিয়েছেন গীতার কথা : "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" এটুকু আপনি মানেন ব'লেই আপনার সঙ্গে অধ্যাত্ম আলোচনা চলে। মানে, ধরুন যদি আপনি বলতেন যে আপনার মানসবুদ্ধি যে সত্যের নাগাল পায় না সে সত্য নামঞ্জুর—তা হ'লে রাজনৈতিক ভাষায় আমাকে বলতেই হ'ত যে, আপনার সঙ্গে ধর্মালোচনার মূল ভিত্তিই গ'ড়ে ওঠে নি—there is no basis for discussion.

অথ, মিল থেকেই সুরু করি। আপনি গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকের যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ এই পদটি উদ্ধৃত করেছেন আপনার পত্রে। এই শ্লোকটিরই তৃতীয় পাদে ঠাকুর বলেছেন আর একটি কথা : "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ।" অর্থাৎ মনেরও উপরে বুদ্ধি। উপনিষদে বলে : শরীর হ'ল রথ, ইন্দ্রিয়—ঘোড়া, মন—লাগাম, বুদ্ধি—সারথি, আত্মা—রথী। এখানে বুদ্ধিকে সারথি বলা হয়েছে—সেই মনের লাগাম দিয়ে মানুষকে চালায় ব'লে। পাশ্চাত্য দর্শন বুদ্ধি ও মনকে সমার্থক জ্ঞান করে, কিন্তু আমরা মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব'লে বুদ্ধির বাহন পদেই বাহাল ক'রে এসেছি। কেবল সঙ্গে সঙ্গে ব'লে এসেছি যে এই মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ হ'লে তবেই আমাদের অন্তর্যামী যে-পরম যন্ত্রী আমাদের যন্ত্রবৎ চালাচ্ছেন তাঁর বিধান মেনে কৃতকৃতার্থ হয়—যাত্রার পথে কাঁটা না হ'য়ে হয় পাথেয়।

আপনার নম্র পত্রে একথা আপনিও স্বীকার করেছেন, লিখেছেন যে, মন বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে "তবেই হয়ত স্বজ্ঞা (intuition) আসবে।" ঠিক কথা, কেবল এখানে আপনার "হয়ত"-র জায়গায় আমি বসাতে চাই "সহজে" পদটি। আপনার কাছে এ-সত্যটি অজানা নেই যে অধ্যাত্মপথের পরিব্রাজকরা সবারই শেষ আদর্শ "সহজিয়া" হওয়া—অর্থাৎ চেতনার এমন এক শিখরচারী হওয়া যেখানে প্রজ্ঞা হ'য়ে উঠেছে আমাদের স্বভাব-উপাধি। কিন্তু এই উপাধি পেতে হ'লে চাই আগে সাধনাবলে সাংসারিক দিক দিয়ে নিরুপাধি হওয়া—অর্থাৎ জীবন ও চেতনা সম্বন্ধে চলতি ধ'রে-নেওয়া ধারণাগুলিকে (preconception) বরখাস্ত ক'রে মনকে চিন্তাশূন্য করা ; গীতার ভাষায় : "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।" পাতঞ্জলেও এ-হেন ধ্যানধারণার ফলে কী হয় তার আভাষ দেওয়া হয়েছে ; বলা হয়েছে—"বিবেকখ্যাতির" ফলে হয় "ধর্মমেঘ সমাধি।" ধর্মমেঘ শব্দটি বড়ই সুপ্রযুক্ত। এ কেমন ? না, ধরুন সর্ববিধ ব্যক্তিগত বাসনা নিরস্ত হ'লে চিত্তের চারপাশে যেমন একটি সহজ প্রসন্নতার আবহ গ'ড়ে ওঠে তেমনি সর্বদা যেন একটি ধর্মঘন জ্ঞানঘন মেঘমেদুর উপত্যকায় যোগী অবস্থান করেন সহজ অবস্থাতেই ভাবস্থ থেকে। অর্থাৎ এ-সমাধি জগৎকে দূরে ঠেকিয়ে নিজের ভাবরাজ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকা নয়—এর ফলে হয় এই যে, জগতে আছি, সবই করছি অথচ আমাকে ঘিরে আছে প্রশান্তি প্রসন্নতার এক আশ্চর্য আবহ—শুচি পবিত্রতার একটি স্নিগ্ধ তৃপ্তিমণ্ডল। আমি এ-টীকা করছি এ-বিষয় পুরো একমাস ধ'রে কিছু অপরোক্ষ অনুভব এক সময়ে আমার হয়েছিল ব'লে। বলব সেকথা ? বলিই না, আপনি যখন আমাকে কপট বা মিথ্যুক মনে করেন না—আশা করি একটু প্রীতির চোখেই দেখেন (আমি আপনাকে যতটা ভালোবেসেছি ততটা ভালো না বাসলেও) এখন খোলাখুলি সৎকথা বলতে বাধা কি ? শুনুন তবে।

তখন আমি মাদ্রাজে। ১৯৫৪ সালে। আমেরিকা থেকে ফিরেছি। রিক্ত। কোথায় থাকি ? কী করি ? পণ্ডিচেরি থেকে চলে এসেছি, সেখানে ফিরতে সাধ নেই—গুরুদেব নেই—বড়ই দারুণ অবস্থা। তাছাড়া দারিদ্র্য। বাড়িভাড়া ক'রে থাকার অবস্থা নয়। আমার বইয়ের আয় তখন মাসিক ২৫০।৩০০্র বেশী হবে না। তাতে এ-দারুণ কংগ্রেসী রামরাজ্যে বাড়িভাড়া ক'রে থাকা যায় না—বুঝতেই তো পারেন। এমন সময়ে ইন্দিরার প্রিয় ভগ্নী কান্তা ও তার স্বামী নরোত্তমলাল নন্দা আমাদের সাদরে আশ্রয় দেয়। কিন্তু তাদের ছোট্ট বাড়ি। একটি ঘরে আমরা থাকতাম—ইন্দিরার সঙ্গে ছিল তার দুই ছেলে।

ওরা নিতে না চাইলেও একরকম জোর ক'রেই আমরা মাসে ২০০৲ দিতাম ওদের। একটি ছোট্ট কয়লা রাখার ছফুট × তিনফুট ঘরে আমি দিনের পর দিন বই লিখতাম কিছু উপায় করতে। ভাবুন কী অবস্থা! শান্তির পরিবেশ নয়—মানতেই হবে আপনাকে। কারুর কাছে কিছু চাইবারও জো নেই—আমাদের পণ যে আকাশবৃত্তি। নিজে যেচে কেউ কিছু দিলে বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু না দিলে "চুপটি ক'রে থাকো ব'সে মুখটি ক'রে ভার"—আর কি।

আচ্ছা। এমন সময়ে সার সি পি রামস্বামী চিঠি লিখলেন: জানি আপনার অবস্থা—অনেক স'য়েছেন আর কেন? আসুন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের ডিরেক্টর হ'য়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি সাদর দরদী আমন্ত্রণ—অনবদ্য যাকে বলে।

লোভ যে একেবারে হয় নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। এইতো সব সমস্যার আশু সমাধান করায়ত্ত। এরই নাম কি বিধাতার কৃপা? না। এরই নাম লোভ: মোটা মাইনের সস্তা আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সাধনার আকাশবৃত্তির উঞ্ছবৃত্তির দুঃখবরণ করতে ভয় পাওয়া। ইন্দিরাও বলল: কক্ষণো না। ভগবান্ আছেন মুখে বললেই চলবে না, তিনি ভক্তের দুর্গতি করেন না এ বিশ্বাস যার আছে সে ভগবৎসাধনা ছেড়ে ওমরাও হবে কিসের লোভে?

সার সি পিকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখে দিলাম: "ভগবান্কেই চাওয়া যাক—বড় চাকরির সহজ সুলভ আরামকে নয়।" (খুব সংক্ষেপে বলছি একাহিনী—কারণ সে-দুর্দশার কথা সব মুখে বলার সময় নেই—বাড়ীতে বহু অতিথি—তাছাড়া মন্দিরের হাজার কাজ।)

আপনি মনস্বী তথা দরদী, সহৃদয়। বলুন তো, এ-অবস্থা কি ধর্মমেঘ-সমাধির অনুকূল—যার ফলে হয় "ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ?" এ-অবস্থায় নাম গান ভজন ধ্যান ধারণা প্রথম দিকে ফাঁকা ফাঁকা লাগত বৈকি। মনে এল গ্লানি। তবে এতদিন করলাম কি? ষোলো কড়াই কানা? হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থসমস্যার সাময়িক কিছু সমাধান হ'ল একটি উপন্যাস ছেপে। কিন্তু সেটা তুচ্ছ। হঠাৎ সেই ছোট্ট বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় একা ছাদে ব'সে ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে মনে নেমে এল এক অপূর্ব চিত্তপ্রসাদ। সত্যিই সব ক্লেশ যেন গ'লে গিয়ে রূপ নিল পরমা শান্তির। দিনের পর দিন ধ্যানে বসতে না বসতে শান্তি নামে দেহে মনে, আর সারাদিন তার রেশ থাকে! একেবারে অপ্রত্যাশিত—বাংলার বাইরে বিদেশে বিভুঁয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব গুরু-শুভার্থী কেউ কোথাও নেই—শুধু আমি আর ইন্দিরা রোজ ভজন করি দিনে রাতে। কিন্তু যেই সন্ধ্যায় ধ্যানে বসি নামে কী একটা প্রবাহ মূর্ধা থেকে—সমস্ত শরীর তো জুড়িয়ে যায়ই, মনের তাপও গ'লে জল হ'য়ে যায়। কান্তা ও নরোত্তমলালকে রোজ বলি: "দেখ ভাই, আর কোনো দুঃখ নেই একথা বললে কিছুই বলা হ'ল না—বলব: এ-অবস্থা যদি আমার স্থায়ী হয় তবে আর চাই কী? মন পূর্ণতার এক অপরূপ অনুভবে নীল নিটোল হ'য়ে উঠেছে। চরম দুর্লগ্নে এ কী বিধাতার করুণা?" কৃষ্ণকে আমি চর্মচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তাঁর করুণা যে আমাকে "ধর্মমেঘের" মতনই ঘিরে থাকত দিনের পর দিন—এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য! কৃষ্ণকে দর্শন করলেও সে সময়ে এ-অবস্থা আমার হ'ত কিনা কে জানে? সবচেয়ে বড় কথা: অসহায় অবস্থায় এল সহায়, ভরসা, শক্তি। উত্তীর্ণ হলাম সংকট একমাসের বলদা শান্তিতে। তাই মনে হয়—কিছু মনে করবেন না—আপনি ঠিক ধরতে পারেন নি মনে হয় যখন লিখেছেন: "ভক্ত যখন কৃষ্ণের দর্শন পান, বা গোপাল-রূপী ভগবানের সঙ্গে খেলা করেন—বুদ্ধিবাদীরা, জ্ঞানপন্থীরা এসবের হয়ত ব্যাখ্যা করবেন ভক্তমনের প্রক্ষিপ্ত সৃষ্টি ব'লে।" কারণ বুদ্ধিবাদী বলতে যদি উপনিষদের শুভবুদ্ধি-বাদী বোঝেন (স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিন) তাহ'লে বলব যে সে-বুদ্ধির এমন "ছায়ায় কায়াভ্রম" হ'তেই পারে না কেন না সে বুদ্ধি ইতি-মধ্যেই কিছুটা অন্ততঃ আভাষ পেয়েছে বেদের সেই "অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ"—এর যিনি অনিত্যদের মধ্যে নিত্য, চেতনদের মধ্যে চেতয়িতা হ'য়ে বহুর ভোগবিধান করেন "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আপনার সংশয়ের উত্তরে বলব যে, এ-ইতিহাসও নির্ভেজাল বৈষ্ণবের কাছে অবান্তর যে তার অন্তরে পেতে চায় সেই ভক্তবৎসলকে

যিনি তার "যোগক্ষেম বহন করেন" (যোগক্ষেমং বহাম্যহম্)—তাকে শরণব্রতে দীক্ষা দিয়ে বলেন : "আমাতে-তন্ময় হ'লে সর্ব দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবেই পাবে (মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি)—শুধু জীবনে নয়, আমাকে স্মরণ ক'রে দেহত্যাগ করলেও আমার কাছেই আশ্রয় পাবে (অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ)।" শুধু কৃষ্ণকে কেন বলি—প্রতি ধর্মের সাধকই তার ত্রাতাকে চায় দুঃখ-তারক হিসেবেই বরণ করে। খৃষ্টের বাণী স্মরণীয় : "Come unto me, all ye that labour and areh eavy-laden and I will give you rest—হে ভারক্লিষ্ট জীবনশ্রান্ত মানুষ! এসো আমার কাছে, আমি তোমাকে দেব পরম বিশ্রাম।" কিম্বা বুদ্ধের :

"জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা
অথো সরীরং পি জরং উপেতি।
সতং ন ধম্মো ন জরং উপেতি
সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়ন্তি॥

রাজরথও হয় দীর্ণ—দেহও জরায় জীর্ণ হয় ভূতলে।
শুধু সুজনের ধর্ম অমর—সাধকের কাছে সাধুরা বলে।"

আপনি আরো লিখেছেন : "শাস্ত্রে কৃষ্ণের যেরূপ বর্ণনা আছে ভক্ত শুধু সেই রূপেই কৃষ্ণকে দেখতে পান..." ইত্যাদি। অর্থাৎ—কবিগুরুর ভাষায়—ভক্ত ঠাকুরকে তার নিজের "মনের মাধুরী" মিশিয়েই "রচনা" করেছেন—এই না? কিন্তু একথা শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়—তথ্যের দিক দিয়েও প্রামাণ্য নয়, কেন না শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম বা নীল, ইন্দিরা বার বারই দেখেছে কৃষ্ণকে গৌরকান্তি, কেবল নীল জ্যোতির্মণ্ডলাসীন ব'লে তাঁকে নীলাভ দেখায়। একথা আরো একজনের কাছে শুনেছি যিনি কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। তাছাড়া আমাদের ওই বহুরূপী খামখেয়ালী ঠাকুরটি খুশখেয়ালে তাঁর নানা রূপই প্রকট করেন নানা সময়ে—কখনো চক্রধর, কখনো পার্থসারথি, কখনো বালগোপাল—আরো কত অগুন্তি রূপ! এমনও জানি যে ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করতে করতে হঠাৎ সাধক দেখল আর এক দেবতাকে। কিম্বা গুরুমূর্তি ধ্যান করছে—দেখা পেল ইষ্টের। এক সাধিকার একবার কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল। সে চেয়ে চেয়ে দেখল কিন্তু মুগ্ধ হল না তেমন। কৃষ্ণ তখন রাগ না ক'রে উল্টো প্রসন্ন হ'য়ে তার গুরুরূপে মূর্ত হ'য়ে হেসে বললেন "এবার?" আমার বলবার কথা এই যে সে কৃষ্ণের ধ্যান আদৌ করে নি—করেছিল গুরুমূর্তির ধ্যান "ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ।" কাজেই এক্ষেত্রে অন্ততঃ আপনার ঐ অটোসাজেস্‌সনের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

তাছাড়া এমনও হয়—কেউ বা কালীর ধ্যান করতে করতে কৃষ্ণের দেখা পায়, কি শিবের ধ্যান করতে করতে কালীর। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য—ধ্যান-দৃষ্ট মূর্তির কেবল যে আন্তর সত্তাই (subjective entity) আছে এমন নয়—তার বহিঃসত্তাও (objective existence) আছেই আছে। কিন্তু একথার কি ধরনের প্রমাণ আপনি চান? যুগ যুগ ধ'রে হাজারো ভক্ত সাধক পূজারী প্রেমিক ইষ্টকে দর্শন স্পর্শন ক'রে ধন্য হয়েছে—তাদের চরিত্র শুদ্ধ হয়েছে, সর্বভূতে দয়া এসেছে, রিপুর অত্যাচার থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে, বার বার বিপদে আপদে সংকটতারণের আশ্রয় পেয়েছে—এসবই কি নিছক কল্পনা হ'তে পারে—গাণিতিক probabilityর বিচারেও? শুধু তাই নয়, আজও যারাই চায় তারাই পায়—অঘটন আজো ঘটে—যদি অবশ্য তারা একান্তী হয় ও সাধনার সর্ত পালন করতে প্রস্তুত থাকে। এ-যুক্তিতে অপসিদ্ধান্ত (fallacy) কোথায়? তাছাড়া ঠাকুর গীতাতেই কি বলেন নি যে, যে ভক্ত যে-রূপে তাঁর দর্শন চায় তিনি সেই রূপেই তাকে দর্শন দেন? এমন কি অবয়বহীন শালগ্রামেও ব্রহ্মচৈতন্যের আবির্ভাব হয় যার স্পর্শে সাধকের চেতনায় পরমানন্দ ক্রমে তার গোটা জীবনটাই বদ্‌লে যায়। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন তাঁর এক দীর্ঘ পত্রে। তাতে প্রথমে লিখেছিলেন (২-১২-৪৬) কী করবে "I have always regarded the incarnation as a fact and accepted the historicity of Krishna as I have accepted the historicity of Christ" * (সে সব উদ্ধৃত করতে গেলে এ-চিঠি হ'য়ে দাঁড়াবে মহাভারত)। কিন্তু

* পুরোটি চিঠি দ্রষ্টব্য : Letters of Sri Aurobindo vol. I—p. 353.

রপরেই আমাকে লিখলেন (অনুবাদ ক'রে দিই ক্ষেপে): "কৃষ্ণ সত্যি ছিলেন কি না এ-গবেষণার ঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের কোনো সম্বন্ধই নেই। কারণ, ধকের জীবনের লক্ষ্য হ'ল ভাগবত কৃষ্ণের সঙ্গে যোগ ও ার চেতনার দিকে তার নিজের চেতনার প্রগতি—অন্তরে ার সঙ্গে মিলন ও প্রাক্ মিলন পর্বে ইষ্টের জন্যে তৃষ্ণা, ক্তির বিকাশ ও তীর্থপথে চলতে চলতে আলোর পাথেয় াহরণ। এই সব যে পেয়েছে, তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছে, নেছে তাঁর স্বর, জেনেছে তাঁকে বন্ধু, প্রেমিক, দিশারি, রু, প্রভু ব'লে *—সর্বোপরি, যার সমগ্র চেতনারূপই পান্তর য়েছে তাঁর স্পর্শে, কিম্বা যে তাঁর আবির্ভাবকে নিজের ধ্যে অনুভব করেছে—তার কাছে এসবই (অর্থাৎ তিহাসিক বিতণ্ডাই) বাহ্য।"

একথা আপনিও খানিকটা মানেন মনে হয়, তাই ক ধরেছেন: "ভক্তির পথ সহজ সরল বটে কিন্তু তাতে শ্বাস চাই গভীর···ভগবৎ কৃপা ভিন্ন, সাধনা ভিন্ন ঐরূপ শ্বাস হয়ত আসতে পারে না।" ঠিক কথা, কিন্তু এর রেই যখন আবার লিখলেন: "আমাদের চেষ্টা হয় জ্ঞানের ারা সংশয় ছিন্ন করবার, তখন টুকতে ইচ্ছা হয়: বটে, কন্তু কী ধরণের জ্ঞান? উপনিষদে আছে দুরকম জ্ঞানের বিদ্যার কথা: পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা হ'ল াপনাদের সায়েন্স বা বস্তুবিচার। তবে বস্তুটির সম্বন্ধে নেক কিছু জানা যায় যা জেনে লাভ সমূহ—(যদিও ক্ষতিও হয় প্রয়োগ না জানলে, চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—যে থা আপনিও একাধিক বৈজ্ঞানিক মিলে স্বীকার করে-ছেন)। কিন্তু জানা যায় না সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মাকে —মানুষের হৃদয়ে যাঁর অধিষ্ঠান, যাঁকে জানলে তবেই সে মৃত হয় নৈলে নয় ("এষ দেব বিশ্বকর্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ···য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি")—যাঁকে জানলে আর কিছু জানার থাকে না ("নাতঃ পরং বেদি-তব্যং হি কিঞ্চিৎ")। এহেন দুর্লক্ষ্য মহান পুরুষকে জানতে হ'লে চাই অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতি—অর্থাৎ পরা বিদ্যার প্রসাদ। অন্য ভাষায়: যে-বুদ্ধি যে-জ্ঞান দিয়ে বস্তুবিশ্বের বিশ্লেষণ ও তদন্ত ক'রে মানুষ দুনিয়ার চেহারা বদলে দিয়েছে সে-জ্ঞানে সে-বিদ্যায় তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান তথা স্বাস্থ্যরক্ষা হ'তে পারে বটে—কিন্তু অন্তরের দৈন্য, প্রবৃত্তির বর্বরতা, দুঃখ শোক তাপ ক্লৈব্য অনুশোচনা, অশান্তি—এসবের কোনো প্রতিষেধকই মিলতে পারে না। তার জন্যে চাই ভগবৎশরণ, ভক্তি, শরণাগতি। এই ভক্তিসাধনার পথে প্রজ্ঞা তথা শক্তিও উপচিত হয়, যার বলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও বাইরের নানা বাধাকে জয় করতে শেখে। তাই শ্রীঅরবিন্দ ভক্তিকে এত বড় বলেছেন। আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে (২।২।১৯৩২): "যোগের সম্বন্ধে আমার নানা লেখায় আমি ভক্তিকেই সবচেয়ে বড় বলেছি। কারণ ভক্তি যতই গভীর হয় উপলব্ধির শক্তিও ততই সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, স্বভাবের রূপান্তরও সহজ হ'য়ে আসে।" "তাঁর সিন্থেসিস অফ যোগ"-এ তৃতীয় ভাগে প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন তিনি (এ-ভাষার অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন ব'লে মূল ইংরাজি উদ্ধৃতিটুকু দিয়েই ইতি করি)।

"Love is the power and passion of the divine self-delight and without love we may get the rapt peace of its infinity, the absorbed silence of the ananda, but not its absolute depth of richness and fulness." অপিচ: "Love fulfilled does not exclude knowledge, but itself brings knowledge; and the completes the knowledge, the richer the possibility of love."

এই জ্ঞানই কাম্য—এই দুর্লভ অধ্যাত্ম জ্ঞান, পরা-বিদ্যা—আর তার সঙ্গে ভক্তি প্রেমের আদৌ বিরোধ নেই —বরং এ ওকে পূর্ণতা দেয়, গানের কথা ও সুর যেমন পরস্পরকে পূর্ণতা দেয়।

এই খানেই আমার চিঠির সমাপ্তি টানব ভেবে-ছিলাম কিন্তু তারপরে মনে হ'ল যে, যখন আনন্দের ঝোঁকে এতখানিই লিখে গেলাম তখন আপনার আর একটি মন্তব্যের সম্বন্ধেও কিছু লিখলামই বা—আপ্তবাক্য যখন ভরসা দিয়েছে—"অধিকন্তু ন দোষায়।"

* গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
(গীতায় কৃষ্ণের এ নানা বিভাবই ধ্যেয়—এবং প্রতি বিভাবই উপ-লব্ধিগম্য, ফাঁকা কথা নয়)।

আপনি লিখেছেন : জ্ঞানপন্থীর ভাগ্যে জোটে মনঃকষ্ট, সংশয়, নিরাশা ; কেন না "জীবজগতের অগুন্তি দুঃখদৈন্য, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তির সে কোনো কারণ খুঁজে পায় না।" এ-সম্পর্কে আগেই বলেছি যে মানস জ্ঞান (অপরা বিদ্যা) ও আত্মবোধের আলো (পরা বিদ্যা) এক বস্তু নয়। তাই আপনার এ-উক্তিটি মানস জ্ঞানপথের গড়পড়তা পথিকের বেলায় ঘটলেও অধ্যাত্মপথের মহাপরিব্রাজকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁরা সবাই মানুষের দুঃখের নিদান তথা চিকিৎসা উভয়েরই দিশা পেয়েছেন, বলেছেন : যত নষ্টের গোড়া হ'ল আমাদের অহংকারের ভেদবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সুখের বিপর্যয় লোভ। মহাভারতে ভীষ্ম বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা : যে, সবচেয়ে দারুণ রিপু হ'ল লোভ—কেন না সে মানুষের সব গুণকেই গ্রাস করে কুমীরের মতন। যুগে যুগে দেশে দেশে সব মহাজনই এ-কথায় সায় দিয়ে এসেছেন, বলেছেন এ-ধোকার টাটি জগতকে রাতারাতি মজার কুঠিতে রূপান্তরিত করা যেত যদি সব মানুষকে নির্লোভ করা সম্ভব হ'ত। তাই মানুষ তার দুঃখদৈন্যের কারণ খুঁজে পায় নি এমন কথা বলা চলেনা। বলা চলে শুধু এইটুকু যে (গীতার ভাষায়) যে-সুখ "অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপম" সেই রাজস সুখের লোভ থেকে মুক্ত করে তাকে সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী করবার উপায় সে আবিষ্কার করতে পারেনি। অবশ্য ধর্মের পথে তাকে চালালে সাত্ত্বিকতার মুক্তি মেলে এ-উত্তর প'ড়েই রয়েছে, কিন্তু এ-উত্তরে কোনো সত্যিকার লাভ হয় না, কেন না ধর্ম-পথে চলতে গেলে—অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হ'তে গেলে—কোনো সস্তা সুখ বা তৃপ্তির ঘুষ কি বখশিশ মেলে না। ধর্মের পথে প্রথম দিকে বহুদিন ধ'রে সাধকের ভাগ্যে জোটে শুধুই শুষ্কতা ও নানা বাধার চাপ। পক্ষান্তরে অধর্মের আপাতঃ-সুস্বাদু কাম ক্রোধ লোভের পথে টাটকা টাটকা সুখ নেশা উত্তেজনা জাতীয় রকমারি নগদ বিদায় মেলে, যদিও তার পরিণাম—সর্বস্বান্তি। কিন্তু মোহ যাকে পেয়ে বসে সে আখেরের কথা ভাবে না তো, ভাবে কেবল আশু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা—জুয়াড়ির মতন। আর জুয়াড়ি হ'ল স্বভাবে চোরা—ধর্মের কাহিনীতে কান দেবে কেন? অর্থাৎ সে মূঢ়কে বলা বৃথা যে, পরমার্থ-সিদ্ধি বিনা স্বার্থসিদ্ধি অসম্ভব—পরার্থনিষ্ঠার হাতেই চিরন্তন আনন্দলোকের ছাড়পত্র।

এক সময়ে আমি সত্যিই আথাল পাথাল ভাবতাম মানুষের এই দুঃখ দৈন্য—বিশেষ করে মূঢ়তার সমস্যা নিয়ে : "ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ"—ধর্মই ধারণ করে জেনেও কেন তার মতিচ্ছন্ন হয়—অধর্মের পথে পা বাড়িয়ে সে কেন রসাতলমুখো হ'তে চায়? ভাবতাম—কোন্ পথে মানুষের হিতসাধন করা যায় সবচেয়ে সহজে? আমার "তীর্থংকর"-এ দেখতে পাবেন প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে রোলাঁ, রাসেল ও গান্ধীজিকে এই একই প্রশ্ন করি। তাঁদের মধ্যে রোলাঁর উত্তরই আমার প্রথমদিকে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যে, শিল্পী মানুষকে যে আনন্দ পরিবেষণ করে সেইই হ'ল মানুষ তথা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা। কিন্তু তারপর শিল্পীদের মতিগতি দেখে বুঝতে পারি যে তাঁরা যে-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাতে মানুষ টুকরো টুকরো আনন্দের স্বাদ পেয়ে খানিকক্ষণ জাগতিক আধিব্যাধির চাপ ভুলে থাকলেও প্রকৃতির হাজারো দুঃখ দৈন্য হীনতার চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তখন ছুটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে গীতার নির্দেশে : "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ"—অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম প্রশ্ন ও সেবা করলে তবেই তাঁদের উপদেশে জ্ঞানের ক্ষুধা মিটতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মুখে প্রজ্ঞা পারমিতার আলো দেখে মনে হয়—গীতার অঙ্গীকার সত্য, তাঁর উত্তরও আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয়—যদিও গীতায়ও সেই উত্তরই পেয়েছিলাম—যে, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে বলেই জীব মোহের দ-য়ে মজে। পরে তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী"তে শ্রীঅরবিন্দ এ-বাণীটিকে তাঁর বলিষ্ঠ কাব্যছন্দে আরো চমৎকার ক'রে ফুটিয়েছিলেন :

Pain is the signature of the Ignorance
Attesting the secret God denied by life :
Until life finds Him pain can never cease

অর্থাৎ

অজ্ঞানই ব্যথার রক্তস্বাক্ষর—সে-ব্যথা বলে : রাজে
সুগুপ্ত সে-বিভু—যাঁরে নাস্তিক জীবন অস্বীকারে।
তাঁহার মিলন বিনা বেদনার নাই অবসান।

নাস্তিক বুদ্ধিবাদী ওরফে মানসজ্ঞানপন্থীরা বলবেন হয়ত : "কেমন ক'রে একে আপ্তবাক্য ব'লে মেনে নেয়— যখন দেখি নানা মুনির নানা মত ?" এ-সংশয়ের উত্তরে শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব (যে কথা ডীন ইঞ্জ বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর Liva Mystica শীর্ষক কাব্য সংকলনের ভূমিকায়) যে, মানস বুদ্ধি বা জ্ঞানের অরাজক রাজ্যে হাজারো উল্টোপাল্টা বাণীর ঝড়ঝাপটা আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করলেও একটি অত্যাশ্চর্য সত্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চোখে না পড়েই পারে না : যে, যাঁরা কোনমতে একবার "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" মন্ত্রের ডাকে সাধনবলে মনের আলো-আঁধারী এলাকা পার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মতভেদ নেই—তাঁরা সবাই একবাক্যে নিজের নিজের উপলব্ধির জবানিতে সাক্ষী দিয়েছেন যে, যোগ-সাধনায় ছায়াহীন আলোর নাগাল পাওয়া যায়, আর সে-আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে সবাইকে ভালো-বাসতে না পারলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। তাঁরা এই সঙ্গে আরো একটি তত্ত্বের দিশা দিয়েছেন : যে, সবাইকে ভালোবাসব বললেই ভালোবাসা যায় না—এ পারেন কেবল সেই মহাপুরুষেরা যাঁরা ভগবানকে ভালবেসে তাঁর কাছ থেকে দৃষ্টিবর পেয়ে দেখতে পেরেছেন যে, সর্বভূতে তিনিই জন্ম নিয়েছেন শুধু প্রেমের আদানপ্রদানে আনন্দ-লীলা করবে। তাই খাঁটি ধার্মিক সাধু-সন্তরা চিরদিনই গেয়ে এসেছেন যে, জীবের মধ্যে শিবকে দর্শন ক'রে "সর্বভূতহিতে রতাঃ" হ'তে না পারলে সর্বেশের আরাধনা সম্পন্ন হয় না। তাই তো ভাগবত ঘোষণা করেছেন।

(৮।৭।৪৪) :

তপ্যন্তে লোকতাপেন প্রায়শঃ সাধবো জনাঃ।
পরমারাধন' তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥

অর্থাৎ

অপরের তাপনিবৃত্তি তরে দুঃখ সহেন সাধুগণ :
সকলের হৃদে রাজেন যে-বিভু এই তো তাঁহার আরাধন।

ডীন ইঞ্জ মিথ্যা বলেন নি : এ শুধু আমাদের বেদ গীতা ভাগবতের রায় নয়—সর্বদেশে সর্বকালে জ্ঞানী ধ্যানী সাধকেরা সবাই এই উপলব্ধিকেই অঙ্গীকার করেছেন। আপনি যোগিকবি এ-ই ওরফে জর্জ রাসেলের অপরূপ মিসটিক কবিতা পড়েছেন কি ? তাঁর একটি কবিতার চরণ আমার মনকে প্রায়ই জাগিয়ে তোলে :

When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of the world
For its tenderness

অর্থাৎ

অন্তরাত্মা যখন জাগে—সে হয় না তো আর স্বপ্নসুখী :
করুণা কোমল আকিঞ্চনেই হয় সে নিখিলবিশ্বমুখী।

এ থেকে আমি দেখাতে চাইছি যে, মানস জ্ঞান-বুদ্ধির আলো-আঁধারী চৌহদ্দি পেরুতে না পেরুতে মানুষ সবদেশেই পেয়ে এসেছে আত্মবোধের সেই অদ্বিতীয় দিব্য দৃষ্টি যার আলোয় সে দেখতে পেয়েছে একটি মহাসত্য : যে, লৌকিক বুদ্ধি ও ঋদ্ধির প্রভূত প্রগতি হ'লেও তার বরে বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ হওয়া যায় না। সে-জন্যে চাই অন্তরাত্মার আলোকলোকে জেগে ওঠা। এ-জাগৃতি-সাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন তাঁরা কেউই মানস বুদ্ধির নির্দেশে চলেন নি, চলেছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসার, ভক্তি-সাধনার, প্রেম তৃষ্ণার তাগিদে। এই শ্রেণীর দ্রষ্টা সাধুরাই চিরদিন জীবনের আঁধার গোলোক ধাঁধায় আলোর পথ কেটে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে তূর্যস্বরে ঘোষণা করে-ছেন : "অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্" (শঙ্করাচার্য)। বাকি সবাই সংশয়াত্মা হ'য়ে অনৈশ্চিত্যের খাঁচায়ই থাকতে থাকতে আকাশকে ভুলে ভেবে বসেছেন যে, শুধু খাঁচাই সত্য—আকাশ কবিকল্পনা।

কিন্তু জীবন্মুক্তেরা প্রেমের বাণী ঘোষণা করলে হবে কি, নাস্তিক্যের আসুরিক মোহে প'ড়ে ও স্বাবলম্বী হওয়ার মিথ্যা গর্বে এযুগে অনেক বস্তুতান্ত্রিক জননায়ক সাহেবি ঢঙে বলা সুরু করেছেন যে সাধু-সন্তের নির্দেশ পেয়ে বিশ্ব-মানবের দুঃখনিবৃত্তি হতেই পারে না, কেননা অধ্যাত্ম ধ্যান ধারণা সমাধিবাদে দু'চারজন অতীন্দ্রিয়বাদী শান্তি পেলেও সাড়ে পনের আনা অশান্ত সংসারীর আধিভৌতিক দুঃখ তাপ উপশান্ত হয় নি ও হ'তেই পারে না—কাজেই সাধু-দেরকে ভ্রান্ত দিশারি বলে অর্ধচন্দ্র দেওয়াই পন্থা।

এ-দৃষ্টিভঙ্গি কেন আত্মঘাতী—বলি সংক্ষেপে।

সৃষ্টির অরুণোদয় থেকে দেখা যায় যে, মানুষের বুদ্ধির একটু একটু ক'রেই বিকাশ হয়েছে—ধীরে ধীরেই তার চোখের ঠুলি খ'সেছে—অল্প অল্প ক'রেই সে এগিয়েছে চেতনার ক্রম-বিকাশের পথে এবং এই বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে যে স্বার্থকে ভালোবাসলেই সিদ্ধি আনন্দ হয় না—যে-অনুপাতে মানুষ পরার্থনিষ্ঠ হয় সেই অনুপাতেই পরমার্থের আলোয় যথার্থ উদার পরমানন্দের দিশা পায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রজ্ঞাচক্ষু আরো একটি বাস্তব সত্যের দেখা পায়: যে বার বার ঠেকেও মানুষ শেখে না মোহ তাকে পেয়ে বসে ব'লেই। তাই বার বার ভোগে উটের ম'ত কাঁটাঘাস খেয়ে—তবু ঐ কাঁটাঘাসই খায়—কাঁটাঘাসের সুস্বাদের লোভে। অধর্মের ঢালুপথে পা পাড়িয়ে বার-বারই ঠিকরে খট্টায় পড়ে, তবু ঢালুপথে চলার আরাম তার মন টানে—চড়াই ওঠা কষ্ট—কাজেই সে বলে উঠে—কাজ নেই নেমেই আনন্দ করি—সাম্‌লে চললেই চলবে—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ি ধরা আর কি। এ-লোভের মোহ তাকে পেয়ে বসে কেন না অধর্মের কারবারে রাতা-রাতি প্রচুর মুনফা আসে ব'লে সে ভাবে না যে আবার হ'তে হবে দেউলে। মহাভারতে এই কথাই বলেছেন মুনি: "অধর্মে নৈধাত তাবৎ—" কিনা অধর্মের পথে প্রথম দিকে হয় শ্রীবৃদ্ধি, কিন্তু শেষে সর্বনাশ "সমূলস্ত বিনশ্যতি": the wages of sin is death—বলেছে বাইবেলেও।

এই যে মোহ মদ লোভ, এই যে সস্তায় কিস্তি মেরে রাতারাতি রইস হবার কামনা—একে সর্বনাশা ব'লে চেনেন কাঁরা? না, যাঁরা খাঁটি সাধুসজ্জন, মুনিঋষি, জ্ঞানী ধ্যানী। কিন্তু তাঁরা ধর্মের পথনির্দেশ দেওয়ার পরেও যদি গড়পড়তা মানুষ লোভকেই প্রশ্রয় দিয়ে উন্মার্গগামী হয় তবে তাঁরা কী করবেন শুনি? সাধুরা সাধু বলেই গায়ের জোর খাটান না—শুধু যে শক্তি তাঁদের নেই তাই নয়, গায়ের জোরে সবাইকে সাধু করতে চাইলে তাঁরা আর সাধুই থাকতেন না, হ'য়ে দাঁড়াতেন এক এক সেকেন্দর, সীজর, চেঙ্গিস খাঁ, লেনিন, হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন, মাও সে টুং। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life-Divine-এ ঠিকই লিখেছেন: "Spirituality cannot be called upon to deal with life by a non-spiritual method or attempt to cure its ills by the panaceas, the political, social or other mechanical means which have always failed and will continue to fail to solve anything".

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, অধর্মের বড়ি দিয়ে মানুষের আধিব্যাধি সারানোর চেষ্টা বৃথা, একমাত্র ধর্মের পথেই অধর্মের অন্যায়ের অত্যাচারের নিবারণ হতে পারে। কিন্তু হলে হবে কি, এ-যুগে নাস্তিক্যের কুটিল মোহ নানা কুযুক্তি দিয়ে এই অসত্যকে সত্য বলে প্রচার ক'রে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে যে সুবিধাবাদ, চালাকি, ডিপ্লমাসি, দল, পার্টি, সত্যগোপন ও ভোটের জোরেই রাতারাতি রামরাজ্য এলো বলে। ফল হয়েছে এই যে প্রতি দলই অট্টরবে হাঁকছেন: "আমার দলের এই যে মহান্ 'ইস্‌ম্' এরি নাম ধন্বন্তরি—সর্বরোগশোকতাপ-হরা—কাজেই যে-পাষণ্ড এ মহা পাঁচন সেবন করতে না চাইবে তাকে জোর ক'রে গেলাব, তাতে সে মরে মরুক।" কিন্তু মুস্কিল এই যে এ-গা-জোয়ারি ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে প্রতিপক্ষের পাল্টা বিরুদ্ধ ঘোষণা—যার ফল হয় কুরুক্ষেত্র—চিরদিন এইই হয়ে এসেছে, কেবল এবারকার কুরুক্ষেত্র হবে অসভ্য তীরধনুক নিয়ে নয়, সভ্যতম আণবিক বোমা নিয়ে। এ দলাদলি হানাহানির পথে বড় জোর কোনো একটি দলের বা জাতির নাস্তিক-ঐহিক (secular) ভোগের উপকরণ জড়ো করা যেতে পারে, কিন্তু সে-ভোগ দেখতে দেখতে দুর্ভোগেই পর্যবসিত হয়: কেননা অধর্মের অপল্‌কা ভিৎ-এ কোনো স্থায়ী ভোগসৌধ গড়া অসম্ভব; ধর্মকে বাদ দিয়ে রকমারি জাঁকালো ইস্‌ম্-এর পথে মানুষ গড়তে পারে বড় জোর পার্টি পুলিশ—বড়জোর একের পর এক পঞ্চবার্ষিকীর ডামাডোল, কেবল পারে না রামরাজ্য আনতে। মানুষকে লেকচার দিয়ে পরার্থব্রতী করা যায় না: অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকদের পায়ে-চলা পথে মানুষের মুক্তির স্বর্ণসরণি গ'ড়ে ওঠে না—সে-পথ গ'ড়ে উঠতে পারে শুধু বহু ধর্মযাত্রীর পদযাত্রার যোগফলে। এ-পথ আজো যে তেমন স্পষ্ট হ'য়ে গ'ড়ে ওঠেনি তার কারণ এ-নয় যে ধর্মের পথ খতিয়ে বিপথ, তার কারণ শুধু এই যে, যথেষ্ট উৎসাহী যাত্রী আজো একান্ত নিষ্ঠায় ধর্মের তীর্থপথকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ রাজপথ ব'লে বরণ করেনি—চেয়েছে স্বার্থের চোরাগলিতে গলাগলি ক'রে চোরাবাজারের কারবারী হ'তে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ

বলতেন যে জগতের আজ এত দুঃখ দৈন্য এজন্যে নয় যে সাধুরা মানুষকে ভুল পথে চালাতে চেয়েছেন সে-পথকে "ধর্ম" নাম দিয়ে, মানুষের দুঃখের মূলতঃ দুটি হেতু চোখে পড়েঃ এক, মহত্তম সাধুও সর্বশক্তিমান্ নন এবং দুই, অগণ্য অসাধুর সংখ্যার অনুপাতে যথার্থ সাধুরা সংখ্যায় নগণ্য।

জন্মাষ্টমীর দিনে এই কথাই আমি বলছিলাম কাল: যে আমরা প্রত্যেকে ধর্মপথে চ'লে ধার্মিক হ'লে তবেই মানুষের চিরন্তন দুঃখ নিবৃত্তি হ'তে পারে—আর কোনো পথে হানাহানি রূপান্তরিত হ'তে পারে না সৌভ্রাত্রে—হাজার হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই বুলি বা পঞ্চশীলের মনুসংহিতা রচনা করলেও না। যাঁরা এ-সব বিধান দেবেন সর্বাগ্রে তাঁদের হ'তে হবে নিঃস্বার্থ, মহান্, সাধু—নৈলে কেউ তাঁদের কথা শুনবে না—কারণ সাধুতাই হ'ল এই ভগবদ্দত্ত চাপরাশ—বলতেন না কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব? এই হ'ল জন্মাষ্টমীরও পরমাবাণী—চিরন্তনী ঘোষণা:—ভয়ার্ত মানুষকে বরাভয়ের পথনির্দেশ দিতেই ঠাকুর যুগে যুগে জন্মান—বলেছিলেন দেবকী শিশু কৃষ্ণকে তাঁর জন্মদিনে:

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥ (ভাগবত ১০।৩।২৭)

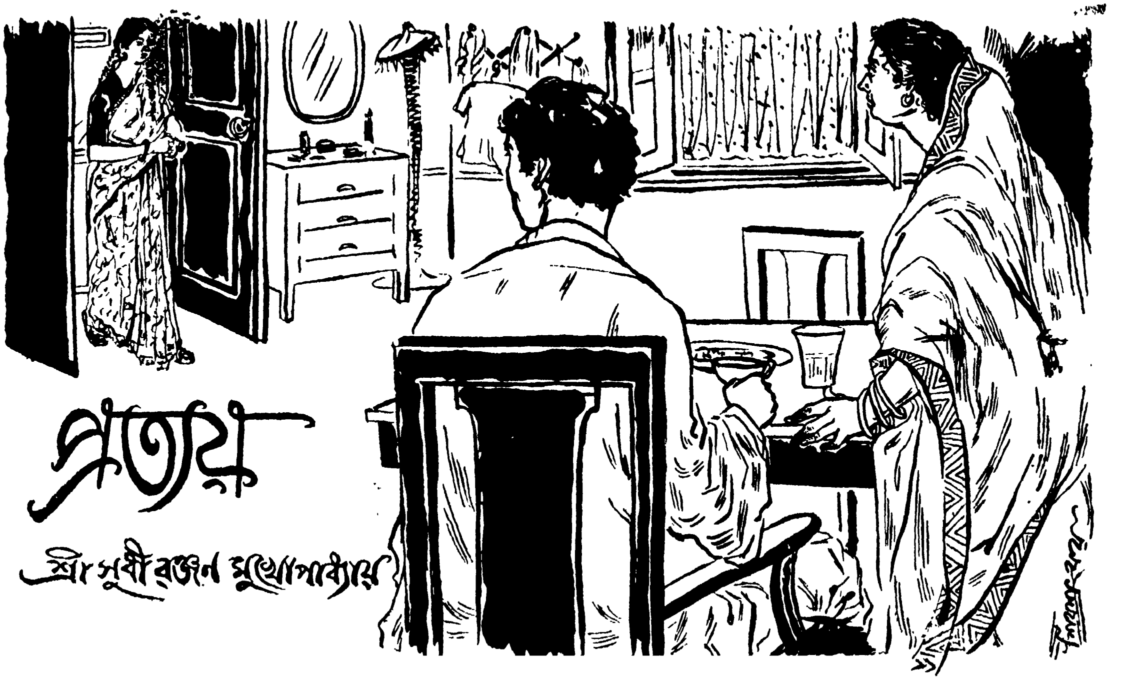
পশুধর্ম বরি' লভি মৃত্যুর দর্শন যবে—ধাই
দিকে দিকে ঘোর ভয়ে—পাই না তো অভয়ের দিশা:
বহুভাগ্যে যবে কেহ পায় তব শ্রীচরণে ঠাঁই
সেই শুধু নিরাপদ রাজে—কাটে তারি মোহনিশা
অন্তরে তোমার জন্মবরি'। মৃত্যু শোক দুঃখ ভয়
পারে না ব্যথিতে তারে যে পেয়েছে তোমার আশ্রয়।

সাধু মহাত্মারা যে-পথের পথিক হ'য়ে অভীঃ হ'য়ে পরমের বরাভয় ঘোষণা করেছেন সে পথ ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। কংগ্রেসের পথে নয়, ঐহিক নাস্তিক নানা "ইস্‌ম্" কণ্টকিত সেকুলার মন্ত্রের পথে নয়, পঞ্চবার্ষিক শতবার্ষিক বা ধুম-ধড়াক্কার পথেও নয়—শুধু ধর্মের পথে, সত্যের পথে, ভক্তির পথে, প্রেমের পথে। পথ তো আমরা জানি, কেবল—মনের অগোচর পাপ নেই—সে-পথে চলতে চাই না ব'লেই হাহাকার করি দুঃখযন্ত্রণায়—যদি অন্তরের শুভ-বুদ্ধির দিশায় চলতে চাইতাম, যদি প্রত্যেকে ঠাকুরের নির্দেশ মেনে হৃদয়ে বরণ করতাম সেই সর্বদুঃখতারকের জন্মাষ্টমী—তাহ'লে এ-পৃথিবী হ'ত আজ স্বর্গ। সেই একটি মাত্র পথ অমৃত লোকের রামরাজ্যের—সে পথ পার্টির নয়। বুদ্ধিবাদের নয়, ডিপ্লোমাসির নয়, রাজনৈতিক সুবিধাবাদীর নয়, এমনকি বৈজ্ঞানিক ভোগবাদেরও নয়—সে পথ হ'ল সাধনার, দীনতার, ভেদবুদ্ধির নিরসনে পরার্থব্রত বরণের সনাতন রাজপথ। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—মুক্তির এই একটি বৈ দুটি পথ নেই।

আমাদের দেশকে বিবেকানন্দ সাধু-অধ্যুষিত "পুণ্য-ভূমি" আখ্যা দিয়েছিলেন। এ-যুগে আমরা এ-ধরণের উচ্ছ্বাসে হাসি, বলি বিবেকানন্দ সাধুদের বড় করেছিলেন এক সেকেলে মনোবৃত্তির মোহে। এ-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কাদের মধ্যে আপনি ভালো ক'রেই জানেন—তাদের নাম রাজনৈতিক—politician; আজকের যুগে সবদেশেই রাজনৈতিকের দারুণ প্রতিপত্তি। ভোট পেয়ে রাজ্যশাসকদের অন্যতম হবার জন্যে এঁরা এমন কর্ম নেই যা করতে পিছপাও হন। এ-জাতীয় সংস্কারকেরা সমাজ-সংস্কার করবেন এ-আশা আজও (হায়রে!) অনেকেই করেন। তাঁদের যুক্তি এই যে যেহেতু ধার্মিকরা দুর্বল, রাজনৈতিকরাই সবল, সেহেতু রাজনৈতিকের মুখর শক্তিধর দরবারেই অশক্ত মানুষের প্রগতি মুক্তির পত্তন হ'তে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গভীর দৃষ্টি-প্রোজ্জ্বল Ideal of Human Unity-র Inadequacy of the State Idea-শীর্ষক অধ্যায়ে এঁদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন উদ্ধৃত করলে এ-শ্রেণীর মনোবৃত্তির শোচনীয় অবস্থার খানিকটা আভাষ মিলবে ব'লে কিছু উদ্ধৃত করলামই বা। তিনি লিখছেন:

"He (the modern politician) does not represent the soul of a people or its aspirations. What he does usually represent is al the average pettiness, selfishness, egoism self-deception that is about him and these

(h)e represents well enough as well as a great (d)eal of mental incompetence and moral (c)onventionality, timidity and pretence. Great (i)ssues often come to him for decision but he (d)oes not deal with them greatly; high words and noble ideas are on his lips, but they rapidly become the clap-trap of a party. The disease and falsehood of modern political life is patent in every country of the world and only the hypnotised acquiescence of all, even of the intellectual classes, in the great organised sham, cloaks and prolongs the malady, the acquiescence that men yield to everything that is habitual and makes the present atmosphere of their lives." তাই মহামতি দ্রষ্টা সখেদে লিখছেন: "Yet it is by such minds that the good of all has to be decided, to such hands that it has to be entrusted, to such an agency calling itself the State that the individual is being more and more called upon to give up the government of his activities." এর ফল কী হয়েছে তার ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন আছে—আসামে পার্টি-পোলিটিশিয়ানদের কীর্তি যা ঘটেছে তার পরেও?



প্রত্যয়

শ্রী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ধোঁয়াটে কুয়াশায় আবছা ইউক্যালিপটাসের মতো যেন দীর্ঘ সম্পূর্ণ একটা দেহ! মাথায় আলোর দীপ্তি নিয়ে স্থির হয়ে আছে। আর হাওয়ায় ভর করে গুঞ্জন করছে পোকার ঝাঁক। এক-একটা পোকা যেন এক-একটা ফুলের ছোট ছোট কলি। একটানা অনুনয় ভিজে-ভিজে পাতলা কাচ ভেদ করে বোধহয় লজ্জার শিহর ছড়িয়ে দিচ্ছে দপ্‌দপ্‌ শিখার গায়ে। তাই কাঁপা-কাঁপা আলো ঈষৎ নিষ্প্রভ।

ঠিক সেই রূপোলি ল্যাম্পপোস্টের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েন অনিমেষবাবু। খুশির চাপা উত্তেজনায় মাথা তুলে ওপরে দেখেন একবার। রাশি-রাশি পোকা ঝরে পড়ে তাঁর চুলে, কানের কাছে, দুধ-দুধ সাদা কাশ্মীরি-শালের এপাশে-ওপাশে। পড়ুক। বিরক্তির একটা রেখাও ফুটে ওঠে না তাঁর কপালে। আগুনের ঝাঁজে পুড়ে মরার এই মাথা-কোটা অনুনয়-গুঞ্জন তাঁকে এক অদ্ভুত উল্লাসের স্বাদ দেয়। আর তখন হাসি-হাসি মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ল্যাম্পপোস্ট স্পর্শ করেন অনিমেষ-বাবু। হিম-হিম কনকনে ঠাণ্ডা। হাত সরিয়ে নেন তিনি। কিন্তু সরে যান না। আলো পোকা আর কনকনে প্রতিধ্বনি—সব জড়িয়ে হঠাৎ মাঝশীতের সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে তিনি যেন নিজকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। আর একটা তাপ—অহঙ্কারের মৃদু একটা গতি তাঁর মনকে অল্প-অল্প দোলা দেয়।

এবার ডানদিকে ফিরতে হবে। সরু একটা রাস্তা। কিন্তু চলে গেছে অনেক দূর। এপাশে-ওপাশে কাঁচা ড্রেণ। অনেক দূরে-দূরে ছোটবড় পাকাবাড়ি। খুব কাছেই রেল লাইন। একটু এগিয়েই লেক। কলকাতার শহরতলী হলেও পাড়াগাঁয়ের ঘ্রাণ লেগে আছে রাস্তার পাশাপাশি ফুলো-ফুলো ঘাসে, গরু-ছাগলের অবাধ চলাফেরায় আর মাথার ওপর মিটিমিটি তারায় ছাওয়া আয়োজন আকাশের শিমুল-তুলো রঙে। এত বড় আকাশ শেষবার কবে দেখেছেন অনিমেষবাবু—মনে নেই।

এই রাস্তার বাঁদিকের শেষ বাড়িটা পূর্ণিমার। পাশেই একটা পুকুর আছে। সামনে গরু-মোষের খাটাল। পেছনে ঘন বাঁশ ঝাড়। সন্ধ্যে হতে না হতেই শরীরের সব রক্ত শুষে নেয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সেখান থেকে ছুটে আসে মশার ঝাঁক। সূচের মতো সরু অস্ত্র তাদের। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর! হাজার মারলে লক্ষ ছুটে আসে। লক্ষ

মারলে কোটি। নিদারুণ প্রতাপ এই সৈন্যবাহিনীর। আর সংখ্যার শেষ নেই।

এতদিন কোন যোগাযোগ করেনি বলে বোধ হয় কৈফিয়ৎ হিসেবে এমনি রসিকতার আমেজ ছিটিয়ে-ছিটিয়ে কৌশলে চিঠিটা শেষ করেছিল পূর্ণিমা। লিখেছিল, আমাকে তোমার মনে আছে কি? আমার নাম পূর্ণিমা। ডাক নাম খুকি। প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে আমার সঙ্গে তোমার প্রায়ই দেখা হত। যাক্ ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারবে যে আমি তোমার বাড়ির খুব কাছাকাছি থাকি। একদিন এসো। এখান-ওখান থেকে তোমার খবর মাঝে মাঝে পাই। তুমি আমার খবর রাখো কিনা জানি না। একটিই মেয়ে আমার। ওর বাবা মারা গেছে বছর দু-এক আগে। এখন ছোট একটা ফ্ল্যাটে কোন রকমে মাথা গুঁজে মা আর মেয়ের দিন কেটে যায়।

তারপর চিঠিতে আবছা ছক কেটে তার বাড়িটা কোথায় বুঝিয়ে দিয়েছে পূর্ণিমা। সেখানে যেতে হলে পথের অসুবিধার কথাও লিখেছে এবং অবশেষে মশার কামড়ের ভয় দেখিয়ে আবার লিখেছে, তবু তুমি কাছেই আছ— একদিন আসবে না?

খুব আস্তে আস্তে হাঁটেন অনিমেষবাবু। পথ একটু দেরিতেই শেষ হোক। পূর্ণিমার লেখা কয়েকটা লাইনে মনের একটা তন্ত্রী হঠাৎ যেন বেজে উঠেছে। বাজুক। মন্দ লাগছে না তাঁর। পূর্ণিমাকে কোন উত্তর দেন নি তিনি। চিঠি পেয়েই একেবারে তার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দেবেন, এক ডাকেই এসেছি পূর্ণিমা।

সাবধানে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নেন অনিমেষবাবু। না, আশে-পাশে কোন মানুষ নেই। তাঁর মনের কথা কেউ টের পাবে না। মাটি কাঁপিয়ে মন্থর-গতি একটা মালগাড়ি বেরিয়ে যায় ঝমঝম করে। এঞ্জিনের আলো কাঁপে অনেকদূর অবধি। শূন্যে কেটে কেটে যায় ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ডানদিকের মাঠে ধোপাদের রঙ-বেরঙের কাপড় হাওয়ায় দোলে। আর একদিকে সারি-সারি ইঁট। আরও একটা বাড়ি উঠবে বোধহয় শীগ্‌গির। কিন্তু অন্ধকারে ভিতের কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পান না অনিমেষবাবু।

পূর্ণিমা তাঁকে ডেকেছে। হয়তো আজও তিনি সংসারের পাকে-পাকে জড়িয়ে পড়েননি আর হারানো অতীতের বেদনা আর কল্পনা পূর্ণিমাকেই তাঁর কাছে সব-কিছুর চেয়ে প্রধান করে তোলে—নারীত্বের এমনি এক অহঙ্কারের কম্পনের তাগিদেই সে তাকে ডেকেছে। কেন যাবেন না অনিমেষবাবু!

যদিও সব মিথ্যা। তবুও মিথ্যার একটা রঙ আছে। আর তার রেশ লাগে অনিমেষবাবুর শিরায়-শিরায়। কবে হারিয়ে গেছে পূর্ণিমা! চিঠি না পেলে হয়তো প্রথম যৌবনের একটি কিশোরীর কথা ভেবে এক মুহূর্তও অপচয় করতেন না অনিমেষবাবু। একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলতেন না।

হ্যাঁ, সংসারের কোন বন্ধন-শৃঙ্খল তাঁর দেহেমনে কোন অনুরণন জাগায় নি। কিন্তু তার কারণ পূর্ণিমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান নয়। হয়তো কোন বিশেষ কারণই নেই অনিমেষবাবুর একক জীবনযাপনের। টাকা করার উগ্র নেশা, ব্যবসার এক-একটি কঠিন পাক আর বিশৃঙ্খল স্বাধীন দিনের মিঠে-কড়া স্বাদ তাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বারবার—প্রথম বয়সের কোন মেয়ের স্মৃতি কিম্বা বিচ্ছেদ-বেদনা নয়। তবে বৈধব্যের ম্লান করুণ মুহূর্তে অনিমেষবাবুর কথা ভেবে পূর্ণিমা যদি নিজেকেই দায়ী করে—আর প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করে মনে মনে। করুক।

কিন্তু সেই মিথ্যাকে আজ অনিমেষবাবু সত্য করে তুলবেন। আঁকা-বাঁকা কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে থমথমে একটা আভা ফুটিয়ে তুলবেন পূর্ণিমার টানা-টানা চোখে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাবেন। উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন জোনাকি-মিটিমিটি বাঁশঝাড়ের দিকে। ব্যর্থতার তুষার-স্পর্শ অনুভব করবেন রোমকূপে রোমকূপে। জীবনে শ্রী নেই। শান্তি নেই। ভানের দাহে পূর্ণিমার সামনেই হঠাৎ এক সময় জ্বলে উঠবে তাঁর শরীর। বেদনার রেখায় ছোট হয়ে আসবে কপাল। শূন্যতার বিকট গ্লানি লজ্জা দেবে পূর্ণিমার ঘরের ঠাণ্ডা দেয়ালকেও। অহঙ্কার কাঁপে অনিমেষবাবুর চোখের তারায়। জ্বলুক পূর্ণিমা। তাঁর জন্যে আর একজন যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কথাটা নেশার মতো পেয়ে বসে তাঁকে। এই ভাবনার ছিন্ন-ভিন্ন

াল কী তীব্র উল্লাসের স্বাদ বহন করে আনে তাঁর মনে! াদক্ষেপের গতি দ্রুত হয় অনিমেষবাবুর। অন্ধকারে লতে চলতে কঠিন ইঁটে বার বার পা ঠেকে যায়। কিন্তু াঘাত অনুভব করার বয়সটা হঠাৎ যেন পার হয়ে গেছে াঁর।

দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের মৌন সমর্থন, থমথমে অন্ধকার ার আকাশ-জোড়া ভিজে করুণ নির্জনতা সেই মিথ্যাকেই ঠাৎ সত্য করে তোলে। পূর্ণিমা! প্রথম বয়সে অন্তরঙ্গ একটি মেয়ের নাম! জীবনের একটি কালজয়ী স্বাক্ষর! ঘুমপাড়ানি অন্ধকারে দুঃসহ আলোর নিঃশব্দ জাগরণ। পূর্ণিমা! হাওয়ার রিমঝিম কম্পনের সঙ্গে যেন মিশে যায় ার একটি দীর্ঘশ্বাস। পূর্ণিমা! আর যত সত্য ছিল এতদিন অনিমেষবাবুর জীবনকে ঘিরে—তাঁর কর্ম-বাসনা আকাঙ্ক্ষা মোহ ঐশ্বর্য বৈভব—এক মুহূর্তে—একটি নিশ্বাসের শব্দে দপ্ করে নিভে যায়। শুধু একটি ত্য। একটি প্রেম। কৈশোর ফুরিয়ে যাওয়া একটি মেয়ের চঞ্চল দেহ ক্ষিপ্র বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে।

বিশ বছর বয়সের সেই লালচে আগুন আবার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরে অনিমেষবাবুর শরীরকে, পূর্ণিমা!

এ ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে যাবার সরু বারান্দায় একটা উদ্দামগতি ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে, চুপ। মা জেগে আছেন। এখন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না।

আমি পাস করেছি।

বাহাদুর!

আজ সন্ধ্যেবেলা জোরে জোরে সেই গানটা গাইবে?

গাইব, হঠাৎ হাসির ঝিলিক ছুঁড়ে মারে পূর্ণিমা, তুমি পাস করেছ তো আমার কি! আমি যাকে-তাকে গান শোনাতে পারব না।

বিষ খাব তাহলে।

খাও।

বিষ নয় সুধা—

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে পূর্ণিমা, অমন বোকা-বোকা কথা বল না। পাস করেছ বলে ভারী ইয়ে—কথা শেষ করে না সে। সেই বিশ বছরের শরীরে আশ্চর্য ঘ্রাণের শিহর তুলে সরে যায়। থামে না। তাকায় না পিছন ফিরে। তবুও খুশির মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে যায়। কী গাঢ় রঙ!

আর এক বছর পরে বিশ হবে একুশ। তারপর বাইশ। আর খুব ভাল একটা চাকরি। বাড়ি। বড় একটা বাগান। কোন বাধা থাকবে না। ভয় থাকবে না। শাসন থাকবে না। ঘরে-ঘরে অবাধ গতি পূর্ণিমার। নরম-নরম হাতেনতুন-নতুন চুড়ি। সিন্দুরের টানা লাল একটা রেখা। সারা-দিন দেখবে শুধু একজন। তবুও দেখার তৃষ্ণা মিটবে না। এমন কেউ তো আর কোথাও নেই। কা ঘন কালো চুল। দুষ্টুমি ভরা চোখ। ভরা দেহ! কবে বাইশ হবে আজকের ভীতু বিশ!

অত দেরি করে ফিরেছিলে যে কাল? কৈফিয়তের দাবী নিয়ে পূর্ণিমার চোখ দুটো জ্বলে।

থিয়েটারে গিয়েছিলাম।

বলে যাওনি যে?

প্রথমে কোন উত্তর নেই। তারপর ভিজে গলার স্বর, তুমি কলেজ থেকে ফিরেছিলে কি না—

সে-খবরও রাখ না। থাক—ঝাঁজের একটা হলকা সরে যায়। দরজা বন্ধ করবার শব্দ অনেক বেশি আজ। একদিকে অনুতাপ। আর একদিকে কঠিন অভিমান। যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে। তিনদিন। পাঁচদিন। সাতদিন। ওদিকের কোন খবর আসে না। আর এদিকে ক্ষুধা নেই। তৃষ্ণা নেই। ঘুম নেই। কোন কাজে মন নেই। তখন বিশ বছর বয়সের দিশাহারা মানুষটি অনেক ভেবে, অনেক যত্ন করে একটা চিঠি লেখে সতেরো বছরের পূর্ণিমাকে। উত্তরও আসে, আমার পরীক্ষা। কারুর কাঁদুনি শোনবার সময় নেই। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।

তারপর দুজন ছিটকে পড়ে দুদিকে। ভাড়াটে বাড়িতে চিরদিন কে আর থাকে। যাবার সময় দুটো ভিজে-ভিজে চোখ কাঁপে। একজন বার বার পিছন ফিরে দেখে। মন্থর হাওয়া। ফ্যাকাশে দিন। কেউ তাকায় না কারুর মুখের দিকে।

মাসিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেও।

তুমি আসবে না?

আসব।

শনিবার বিকেলে আমি গানের ইস্কুলে যাই।

জানি।

কত কম দেখা হবে—কি হবে?

মা আসছেন—

কী অপূর্ব সেই মুখ! কান্নার আগে-আগে কী সুন্দর চিবুক! ভোলা যায় না। বিশ বছরের তরুণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। কারুর ভয়ে সরে যায় না। যা হয় হোক। যাবার সময় হয়ে গেছে। এখন কাকে ভয়। গায়ের জোরে পূর্ণিমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আর একটু হলেই হয়তো সেদিন—

তারপর শেষ দিন।

গলার স্বর চেনাই যায় না। দম্ভের ঝাঁজ সেই তরুণ শরীর যেন কেটে-কেটে দেয়, আমি কি করব?

তুমি কিছু বললে না কেন?

বলবার কি আছে?

কবে দেখতে এসেছিল?

কাল।…তুমি যাও—

পূর্ণিমা!

একবার ফিরে দেখে শুধু, আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না—তুমিও পারবে না—

কেন?

মা মরে যাবেন তাহলে—

আর আমি?

নিষ্ঠুর একটা দৃষ্টি। দয়া মায়া প্রেম—কিছু নেই। বিশ বছরের তরুণের উস্কোখুস্কো চুল ওড়ে। উষ্ণ নিশ্বাস পড়ে। যন্ত্রণায় শরীর কাঁপে। সব হারিয়ে যায়—নিভে যায়। অন্ধকারের জগৎ প্রবল বেদনার হাহাকার জড়িয়ে যায় একজনের চৈতন্য লুপ্ত করে। কিন্তু তখন কাছাকাছি আর কেউ নেই। শুধু শীত, আলোর পোকা আর মৃত্যুর কনকনে স্পর্শ।

সেই পূর্ণিমাকে আজ আবার দেখেন অনিমেষবাবু। স্থূল দেহ। কানের কাছে চুলে অল্প-অল্প পাক। অনেক বছর সংসার করার ক্লান্তি চোখে-মুখে। কিন্তু হাসে অনিমেষবাবুকে দেখে। যত্ন করে বসবার ঘরে বসায়। জোরে পাখা চালিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

আমি জানতাম তুমি আসবে।

অনিমেষবাবু জোর করে শুকনো হাসি হাসেন। হাঁপান। যেন প্রবল অনিচ্ছায় জিজ্ঞেস করেন,কেমন আছ?

এই আর কি, একটু থেমে পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করে, তুমি? তারপর নিজেই বলে ওঠে, বেশ ভালই তো দেখতে পাচ্ছি—

এই আর কি, নিস্তেজ স্বর বার হয় অনিমেষবাবুর গলা থেকে। তিনি এদিক-ওদিক তাকান। ম্লান সংসারের এক-একটি চিহ্ন। পুরনো চেয়ার-টেবিল। আলোর স্ট্যাণ্ড। বই এর আলমারি। পাখার ব্লেডেও ঘন ঝুল। এমন করে হঠাৎ না এলেই হত। কয়েকদিন পর পূর্ণিমার চিঠির উত্তরে দু-লাইন গুছিয়ে লিখে দিলেই তো দায় ফুরিয়ে যেত তাঁর। অস্বস্তির আলোড়নে স্থির হয়ে বসে থাকেন তিনি।

না, একটি কথাও তাঁর বলবার নেই পূর্ণিমাকে। অনেক বছর আগের যে বিদ্যুৎ-শরীর এখানে আসবার সময় পথের অন্ধকারে ঝলসে উঠেছিল তাঁর চোখের সামনে, আর পৌরুষের যে অহঙ্কার একটা নতুন সুরের স্বাদ দিয়েছিল—আর মনে ভিড় করে এসেছিল অনেক এলোমেলো কথা—এখন কিছু নেই। কোন নাম—কোন অহঙ্কার কোন হঠাৎ-পাওয়া সত্য—কিছু না। সব মিথ্যা।

কি খাবে বল? হাসে পূর্ণিমা, এতদিন পর দেখা! সহজে ছাড়ছি না আজ তোমায়—

থেমে থেমে অনিমেষবাবু বলেন, আজ থাক। আর একদিন আসব—আজ বড় দেরি হয়ে গেছে।

কিছু দেরি হয় নি, যেন উত্তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে কথা বলে পূর্ণিমা, না খাইয়ে ছাড়ব নাকি তোমায় ভেবেছ? আমি ট্যাক্সি ডাকিয়ে দেব ঠিক সময়—কাছেই তো বাড়ি! এত ব্যস্ত কেন যাবার জন্যে?

আমি এ সময় কিছু খাই না পূর্ণিমা!

আমার হাতে খেতে বুঝি আপত্তি? পূর্ণিমা টেনে টেনে বলে, বাব্বা, এখনও এ—ত রাগ!

রাগ? অনিমেষবাবু অবাক হয়ে যান, রাগ করব কেন?

কিশোরীর মতো হেসে ওঠবার চেষ্টা করে পূর্ণিমা, আমি কিছু বুঝি না ভাব? নিষ্প্রভ ছায়ায় আরও ম্লান দেখায় তার মুখ, ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে? পূর্ণিমা ফিসফিস করে ওঠে, বিশ্বাস কর, সব ছিল কিন্তু কী যেন ছিল না! শান্তি ছিল কিন্তু উন্মাদনা ছিল না! বিয়ের প্রথম দিন থেকে একটা দাহ আমাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এত দূর ঠেলে নিয়ে এসেছে—ক্ষমা করবে না?

ভয়ে শিউরে ওঠেন অনিমেষবাবু। দেয়ালে যেন কার ছায়া পড়ে। কে বুঝি শোনে এক প্রৌঢ়ার এই হাস্যকর গোঙানি! কাঠ-কাঠ দেহ অনিমেষবাবুর। ভীত মুখ। ভারাক্রান্ত অস্বস্তির খোঁচায়। একদিকে হেলে তিনি প্রহর গোনেন। কথা বলেন না। হাসেন না। এই মুহূর্তে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চান।

কথা বলবে না?

পূর্ণিমা, দুর্ঘটনায় আহত একটা মানুষ যেন বাঁচবার জন্যে মিনতি করে ওঠে, আমি আজ অনেক কাজ ফেলে এসেছি—আমাকে এখুনি যেতেই হবে—

না, প্রৌঢ়ার দৃঢ়স্বরে চমকে ওঠেন অনিমেষবাবু।

বিরক্তির খাঁজ পড়ে তাঁর চোখের নিচে, আমার অনেক কাজ—

জানি, হয় তো পূর্ণিমা অনিমেষবাবুর একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিত। কড়া শাসনের তপ্ত এক দাপট বেরিয়ে আসত তার জিব ঠেলে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর জুড়িয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা দেহটাকে জ্বালিয়ে দিত। বিশ বছর বয়সের সেই চঞ্চল যুবককে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলত। কিন্তু বাইরে স্লিপারের থস থস শব্দ শুনে নিজেকেই শাসন করে পূর্ণিমা সংযত করে। বয়সোচিত হাসি হাসি মুখে শান্ত স্বরে বলে, আমার মেয়ে।

আর চমকে ওঠেন অনিমেষবাবু। সোজা হয়ে বসেন। উত্তেজনার জোয়ারে দিশা হারান। তাঁর চোখ দুটো কথা বলে। দেহের ফাঁকে-ফাঁকে জড়ো-করা সব ক্লান্তি অস্বস্তি আর অবসাদ একটি চঞ্চলা কুমারীর আবির্ভাবে মুছে যায়। তিনি দেখেন পূর্ণিমার মেয়েকে। বিমূঢ় বিভ্রান্ত। অনেকক্ষণ চোখ ফেরান না—ফেরাতে পারেন না। একেই তো এতক্ষণ ধরে মনের অলি-গলি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন অনিমেষবাবু। সদ্য ফোটা স্থির একটা ফুল। দম্ভের ঝাঁজ দানা বাঁধে তাঁর মনে। একটি একটি করে রাস্তায় সাজানো সব কথাগুলো আবার মনে পড়ে যায়—পৌরুষের অহঙ্কার-জ্বলা আঘাত করবার সব কটা তীর পূর্ণিমার কথার উত্তরে কৌশলে ছুঁড়ে মারতে চান।

কিন্তু আর কোন কথা নেই পূর্ণিমার মুখে। শুধু ঈর্ষার একটা বিস্ময় আছে। আর পরাজয়ের গ্লানির এক একটা কঠিন আঁচড়। নির্লজ্জ প্রৌঢ়ের এ মুগ্ধ দৃষ্টি অসহ্য। এ ভাবান্তর অশোভন। অপমানের শাণিত ভাষা মনে-মনে সাজায় পূর্ণিমা। এ বাড়িতে আর কোন আপ্যায়ন নেই এই প্রৌঢ়ের জন্যে। মেয়েকে সতর্ক করে দেওয়া মায়ের প্রধান কাজ বই কি।

বৈদ্যুতিক শক্তির চাপে একটা যন্ত্র যেন ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তোলে, মনীষা, তোমার অনিমেষ কাকা—প্রণাম কর।

ও আপনি! খুশির হিল্লোলে সেই সদ্য-ফোটা ফুল ভেঙে পড়ে অনিমেষবাবুর পায়ের ওপর।

থাক থাক, ব্যস্ত অনিমেষবাবু ত্রস্ত দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মনীষাকে তুলে ধরতে যান।

মনীষা, দরদের আর কোন লেশ নেই কর্তব্য-কঠোর মায়ের স্বরে, এত দেরি করে ফিরলে কেন? যাও শীগ্‌গির। কাল ভোরেই তো রজত আসবে। অত টাস্ক এক রাত্তিরে করবে কেমন করে!

আহত মনীষা চলে যায় মায়ের দিকে একটা বিরক্তির দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে—আর পূর্ণিমার গলার স্বর শুনে আর একবার চমকে ওঠেন অনিমেষবাবু। তাকে দেখেন। কিন্তু ইচ্ছে করে না দেখতে।

তোমার ঠিকানা রজতের কাছ থেকেই পেয়েছি, মনীষার সঙ্গে কথা বলার মতো ভারী স্বরেই অনিমেষবাবুকে বলে পূর্ণিমা, তোমাদের আপিসের রজত ঘোষ—তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স—ক্রূর হাসি হেসে সে জিজ্ঞেস করে, চিনতে পার?

একটু ভেবে মাথা নেড়ে অনিমেষবাবু বলেন, না।

তখনও বিদ্রূপের হাসি হাসে পূর্ণিমা, তারই সঙ্গে আমি মনীষার বিয়ের ঠিক করেছি—মাঘের প্রথমেই বিয়ে,

কথা বলতে-বলতেই ঝুঁকে পড়ে বাইরে তাকায় সে, অনেক রাত হল না?

অনিমেষবাবু উঠে দাঁড়ান, আমি আজ তাহলে—

পূর্ণিমাও উঠে দাঁড়ায়। কথা বলে না। অন্ধকার সিঁড়িতে সাবধানে আন্দাজে-আন্দাজে পা ফেলেন অনিমেষবাবু। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালবার কথাও খেয়াল থাকে না পূর্ণিমার। তবু অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির কাছে। থমকে-থমকে একটা প্রৌঢ় এগিয়ে যায়—মিশে যায় ঘন অন্ধকারে। পূর্ণিমা তবু দেখে। মনীষা তখন জোরে-জোরে পড়া মুখস্থ করে।

চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান অনিমেষবাবু। দূর থেকে পূর্ণিমার বাড়ীটাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তবু এখন আর কোন মিথ্যা নেই কোথাও। সবই আছে। সবই থাকবে। নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপলব্ধির মহিমায় তিনি নিজের কাছে হঠাৎ যেন অনেক সহজ হয়ে ওঠেন।

অন্ধকারের ওপারে চিরদিনই অক্ষয় হয়ে থাকবে—পূর্ণিমা আর অনিমেষবাবুর সেই মোহময় আলোর জগৎ। কালের নিষ্ঠুর শাসন শুধু যুগে-যুগে সে-জগৎ থেকে পুরাতনকে দেবে নির্বাসন, আর নতুনকে করবে অভ্যর্থনা। আর সে-জগতে অসময়ে অনধিকার প্রবেশ করতে গেলে হতাশায় দেহ হিম হয়ে যাবে একজনের, আর একজনের শরীর জ্বলবে ঈর্ষায়।

আর ওদিকে ফিরে তাকাবার কোন দরকার নেই। ল্যাম্পপোস্টের পোকাগুলো ঘন ঘন বিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্যেই যেন তাঁর চুলে চোখে পড়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি সে-পথ পার হয়ে যান অনিমেষবাবু।

বিস্ময় ধর্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দীর্ঘ আয়ুর পথটি এলাম হেঁটে
দ্বিধা সংশয়ে জীবন তো গেল কেটে।
সমাধান কিছু পাইনিক খুঁজে বিজ্ঞানে দর্শনে
সংশয় তারা ঘনায় নূতন প্রশ্ন জাগায় মনে।
পরম সত্য কি যে তা হলো না জানা,
প্রখর রবির আলোক-ধাঁধায় হয়ে রইলাম কানা।
গভীর নিশীথে মহাকাশে যত চাই
মহা বিস্ময়ে কিছুতে পাই না থাই।
মহাশূন্যের লাখ কোটি কোটি তারা
সবাই সূর্য, ভাবিতে একথা হয়ে যাই দিশেহারা
বেদবেদান্ত পাঠের আমার হয় নাক প্রয়োজন
বারি-বিম্বিত চন্দ্রের মত মনে হয় এ জীবন।
কোন কুহকীর হেরি এ ইন্দ্রজাল!
সকলি স্বপ্ন, মায়াময় দেশ-কাল।

মহা বিস্ময়ে ডুবে যায় মোর ইহলোক পরলোক,
আত্মা জন্ম-জন্মান্তর-সংসার, তাপ-শোক,
স্বর্গ নরক সত্য-মিথ্যা পাপ-পুণ্যের ভেদ,
ষড়্‌দর্শন তন্ত্র-মন্ত্র বেদ।
মৃত্যুরে বুঝি ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ মাঝে লয়।
গাঢ় সুপ্তিতে স্বপ্ন লুপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।
বিস্ময়ঘন বিশ্বে বৃথাই সত্যের সন্ধান,
লবণ-পুতুল কেমনে জানিবে সিন্ধুর পরিমাণ?
তারার জ্যোতির অক্ষরে লেখা অসীম গ্রন্থখানি
যত পড়ি তত ডুবি রহস্যে ঘটে যে বুদ্ধিগ্লানি।
ঊর্দ্ধে চাহিলে হেরি যে বিশ্বরূপ
করি থর থর কাঁপে অন্তর মিলায় বস্তুস্তূপ।
মহা-বিস্ময় সিন্ধুতে হয় চেতনার অবসান
এ জীবন যেন স্বপ্ন-বিম্ব ক্ষণিক স্পন্দমান।

সকলি মিথ্যা জীবন ভুবন দেহ-গেহ কাল-দেশ?
সত্য কি শুধু এই বিস্ময়াবেশ?

মহালয়া

শ্রীজয়গোপাল সাহিত্যশাস্ত্রী

মহালয়া! পিতৃপক্ষের শেষ-দিন! পিতৃগণ তৃপ্ত হইবেন—আশীর্বাদ করিবেন—আর সেই আশীর্বাদের শীতল ছায়ায়—গড়িয়া উঠিবে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের কুলের সংসার—ইহাই কি 'মহালয়ার' অন্যতম উদ্দেশ্য?

ইহার উত্তরে একবাক্যে বলা চলে উহা উদ্দেশ্যই নহে। সনাতন জীবনধারায় যে পৌর্বাপর্য আছে—তাহারই স্মরণ, মননে ইহার সার্থকতা, ইহার উদ্দেশ্য নিহিত। সনাতনী আমরা—ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যেই স্তিমিত জীবনপ্রবাহ লইয়া আমাদের চিন্তা-তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই—সে প্রবাহ যে অনন্ত, কালস্রোতের মতই আত্মবিস্মৃত—এ দৃষ্টি আনমনীষায় ধরা পড়িয়াছে, তাই একটা যোগসূত্র রচনা করার প্রয়াস প্রতিফলিত এই সব উৎসবে।

মহালয়া—উৎসব! কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে বলা আবশ্যক। প্রায়ই কথার বাগ্‌জালে, অবান্তরতার আতিশয্যে মূল বস্তুটিকে লুকাইয়া রাখা হয়। তাই মহা আলয়া অর্থাৎ পরবর্তী দেবীপক্ষে দেবীর আগমন-জনিত আনন্দের সূচনা—এইরূপ অনেক কথাই বলা হয়। অনেক সময় সম্পাদকীয় স্তম্ভেও অনেক বস্তু দেখা যায়—যাহার সঙ্গে মহালয়ার কোন সম্বন্ধই নাই। সনাতন জীবনধারার এরূপ একটি স্মারক ব্যাপারের সহিত আমাদের পরিচয় থাকা একান্ত কাম্য। বিশেষ করিয়া যাঁহারা এখনও পিতৃপুরুষদের কথা অতিপবিত্রভাবে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া থাকেন।

সনাতন জীবনধারা একান্তভাবেই আত্মিক আদৌ শিশ্নোদরপরায়ণ নহে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাহা করা যায়—তাই ব্রহ্মার্পণ, ব্রহ্ম-হবিঃ। এই মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—আর্য চিন্তা, সনাতন মনীষা। জন্মজন্মান্তরের বিশিষ্ট জীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া একটা যোগসূত্রের স্থাপন—উহাকে আপন বলিয়া স্বীকরণ, ইহাই মহালয়ায় প্রতিফলিত হয়।

মহালয়া কথাটি হইল—'মহালয়'। কিন্তু 'অমাবস্যা' কথাটির পূর্বে বসিয়া মহালয়া অমাবস্যা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। 'মহালয়া' কথাটি ঐ 'অমাবস্যা' পদটির সঙ্গের সম্বন্ধসূত্র ধরিয়া আসিয়াছে। কাজেই অনেকটা অঙ্গাঙ্গিভাবেই যুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'মহ' আর 'আলয়' এই দুই কথা লইয়া 'মহালয়' শব্দটি গঠিত। 'মহ' শব্দটির অর্থ হইল উৎসব, আর 'আলয়' কথাটি বুঝায় গৃহ বা স্থান। সুতরাং 'মহালয়' কথাটির সামগ্রিক অর্থ হয় উৎসব স্থান—

ভবিষ্যপুরাণে দেখা যায়—

যেয়ং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশীভুবি,
তমস্যাং দদ্যান্ন বেদেতনং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥

এইদিন পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তৃপ্ত হন—তাঁহাদের মর্ত্যে আগমন ঘটে, শ্রাদ্ধীয় দিব্যাগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

অমাবস্যা পিতৃগণের একটি দিন—অবশ্য গৌণ হইলেও। ঐ দিন কার্য-কারণ ভাবে উৎসবটি হয়, কাজেই মহালয়া অমাবস্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক—কিন্তু তাঁহারা ঐ দিন পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। পার্বণশ্রাদ্ধের সংকল্প বাক্যটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—মহালয় নিমিত্তক অমাবস্যায়াম্ মহালয় নিমিত্তক অমাবস্যাকৃত্য অর্থাৎ অমাবস্যায় এই উৎসব কার্য—মহালয় কথাটির তৎপর্য এখানেই।

যে তত্ত্বের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত—তাহা সনাতন ধর্মের গোড়ার কথা—জীবাত্মা জন্মান্তর ও পরমাত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা। এই দিনের উপরেই সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধর্মে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরজন্ম সম্বন্ধে তাহারা নির্বাক। সনাতন ধর্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াই কর্মের প্রাধান্য দিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্মানুসারেই জন্ম। আর এই ধর্ম ও জন্মের গতি চাহিয়া জীবাত্মার উর্ধতন বা অধোগমন। জীবাত্মাকে আমুক্তি এই কর্মের সিঁড়ি ভাঙিয়া চলিতে হয়—অভীষ্টের পথে।

এই চলার পথেই তাহাকে আসিতে হয় এক একটা জন্মে। ঐ জন্মে সে যে যোনিই পরিগ্রহ করুক—পূর্বজন্মের, সন্তান-সন্ততির মত অন্ন পানীয়াদি সে সেই জন্মে তারই অনুরূপ ভাবে পাইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে বলিলে বেশ বুঝা যায়—যদি কোন জীবাত্মা—কর্মবশে মনুষ্যজন্ম হইতে গোজন্ম লাভ করিয়াছে—তাহার পূর্বজন্মের সন্তানগণ শ্রাদ্ধ দিনে তাহাকে যে অন্নপানাদি দান করিবেন—তাহা ঐ দিনে ভাল ঘাস, জল ইত্যাদি রূপে আসিবে—অর্থাৎ ঐ দিন গোরূপী জীবাত্মা তাহার ভাল খাদ্য—ঘাস, জল ইত্যাদি পাইবে। ইহা তাহার উদ্দেশ্য—দেওয়া শ্রাদ্ধীয় বস্তুর দিব্যাগ্রভাগ।

শ্রদ্ধা সহকারে যাহা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। এখানে যুক্তিতর্কের অবকাশ কম। আত্মার অবিনশ্বরত্ব, কর্মের ধাপে ধাপে জীবাত্মার—পরমাত্মার দিকে গমন—এ সবই বিচার করিয়া এই শ্রাদ্ধকার্য। এখানে আছে সশ্রদ্ধ স্মরণ, মনন, তর্পণ।

মহালয়ায় পিতৃগণ মর্ত্যে আসিয়া শ্রাদ্ধীয় দিব্যাগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন—সম্বৎসর তাহারা তৃপ্ত থাকেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে আছে—

যো বৈ শ্রাদ্ধং নর-কুর্যাদেশস্মিন্নপি বাসরে।
তস্য সম্বৎসরং যাবত্তৃপ্তাঃস্তুঃ পিতরো ধ্রুবম্ ॥

সন্তান দত্ত সশ্রদ্ধ অন্নপানাদি একটি সম্বৎসর পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করে। কতখানি চিত্তশুদ্ধি, কতখানি আত্মাদর লইয়া এই কাজ করিতে হয়! আমারই পিতৃগণ আমার দত্ত অন্নপানীয়ের প্রতীক্ষায় আছেন, আর আমি তাহা হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করিব! এ ধারণা যে কতখানি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময় জন্মে। এই বিশ্বাসের মূলে ঐ একাত্মবোধ যাহা কর্মবশে জন্মান্তরেও আমরা বিস্মৃত হই না। সেই কারণেই আমরা শ্রাদ্ধাদি না করার জন্য প্রত্যবায়ী হইয়া থাকি।

মৎস্য পুরাণে আছে—

সূর্য্যে কন্যাস্থিতে শ্রাদ্ধং যো ন কুর্যাদ্ গৃহাশ্রমী।
কুতস্তস্য নং পুত্রাঃ পিতৃনিঃশ্বাস পীড়নাৎ ॥

শ্রাদ্ধের তিথিতে উপস্থিত হইয়া যদি পিতৃগণের অভুক্ত, অস্নাত অবস্থায় ফিরিতে হয়—তবে পুত্রের উন্নতি কোথায়?

প্রতিধর্মেই এরূপ বিশ্বাসের স্থান আছে। বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা বৃথা। অবশ্য—কেহ কেহ এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন—আমাদের মতে তাহা নিরর্থক। কারণ—আত্মার অবিনশ্বরত্বের উপর নির্ভর করিয়া—এই সব বিশ্বাস ও কার্যাদি। আত্মা দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু নহে—কাজেই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমায় সীমিত নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে—মহালয়ার পিতৃগণ নরলোকে আসেন। শাস্ত্রে আছে ঐ দিনটির এমনই মাহাত্ম্য যে সে দিন যমলোক প্রেতলোকের দ্বার পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়। তাই অধোগামী আত্মারও মর্ত্যে আগমন ঘটে। ঐ সময় পিতৃগণ মর্ত্যলোকে আসিয়া কিছুকাল মর্ত্যেই থাকিয়া যান।

মহালয়ার পরই দেবীপক্ষ। এই পক্ষকালও পিতৃগণ থাকেন মর্ত্যে ও পরে দীপান্বিতায় চলিয়া যান স্বস্ব স্থানে। ব্রহ্মপুরাণে আছে—

"অশ্বযুগ্ কৃষ্ণপক্ষেতু শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ দিনে।"—অশ্বিনীনক্ষত্রে যুক্ত কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ শ্রাদ্ধের বিধান এইজন্যই আছে—হেতু হইল যমলোক পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগণ বেশ কিছু কাল ধরিয়া মর্ত্যেই থাকিয়া যান, তখন তাঁহাদের অন্নপানাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে হয়।

দীপান্বিতার উল্কাদান মন্ত্রে আছে—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতে মে মহালয়ে।
উজ্জ্বল জ্যোতিষাবস্থ প্রপশ্যন্তু ব্রজন্তুতে ॥

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়—মহালয়ায় আসিয়া পিতৃগণ দীপান্বিতা পর্যন্তই থাকিয়া যান।

এমন নিবিড় শ্রদ্ধা—স্বর্গমর্ত্যের এমন যোগসূত্র বোধহয় অন্য কোন দেশের চিন্তায় নাই। যাঁহারা আত্মার বিবর্তনে একাত্মবোধ ভাবিতে পারেন—তাঁহাদের পক্ষেই এ চিন্তা সম্ভব—যাঁহারা প্রতিটি অনু-পরমাণুতে বিশ্বস্রষ্টার রূপ দেখিতে পান তাঁহাদের দৃষ্টিতেই এ সত্য প্রতিভাত হয়—অন্য দৃষ্টি সেখানে পৌঁছিতে পারে না।

এ দৃষ্টি এ চিন্তা হইল ভারতীয় ভাবধারার অন্যতম কথা। ভারতীয় জীবনে বেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। এই সময় নানা ভাবে ইহা ফুটিয়া উঠে—

সত্যেন্দ্রনাথও গাহিলেন—

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি—
আকাশে প্রদীপ জ্বালি—

বোধহয় কবির ক্রান্তি দর্শনে এসত্য ধরা পড়িয়াছে।

পিতৃগণের তৃপ্তি কে না চায়? সব দেশেই, সব কালেই ইহা চাহিয়াছে। তবে আত্মবৎ সেবা বোধহয় ভারতীয় মনীষার স্বকীয় ধর্ম। এমন আত্মাকে বহুরূপে দেখা, জীবাত্মা পরমাত্মার এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ বোধহয়—অন্য কোথাও দেখা যায় না। পিতৃপূজা অন্য ধর্মেও আছে চিত্র বা আলেখ্যের মাধ্যমে—পিতৃগণকে স্মরণ করা—অন্য-দেশেও দেখা যায়। ইংরাজ কবির উক্তি—

O, had those lips the words!—কথাটা তাহা বেশ বুঝাইয়া দেয়। আমরা অমৃতের সন্তান—কাজেই অমৃতই হইতে চাই। আমাদের প্রতি কাজেই এই অমৃত বর্ষণ, অমৃত পোষণ। শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া তাই অমৃতময় পরিবেশ প্রার্থনা করি—

মধুবাতা ঋতায়তে—
মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ······ইত্যাদি।

মহালয়ার এই অমৃত যেন বিশ্বকে অমৃতের পথ দেখায়—বিশ্বকে মধুময় করে—ইহাই আকুতি।



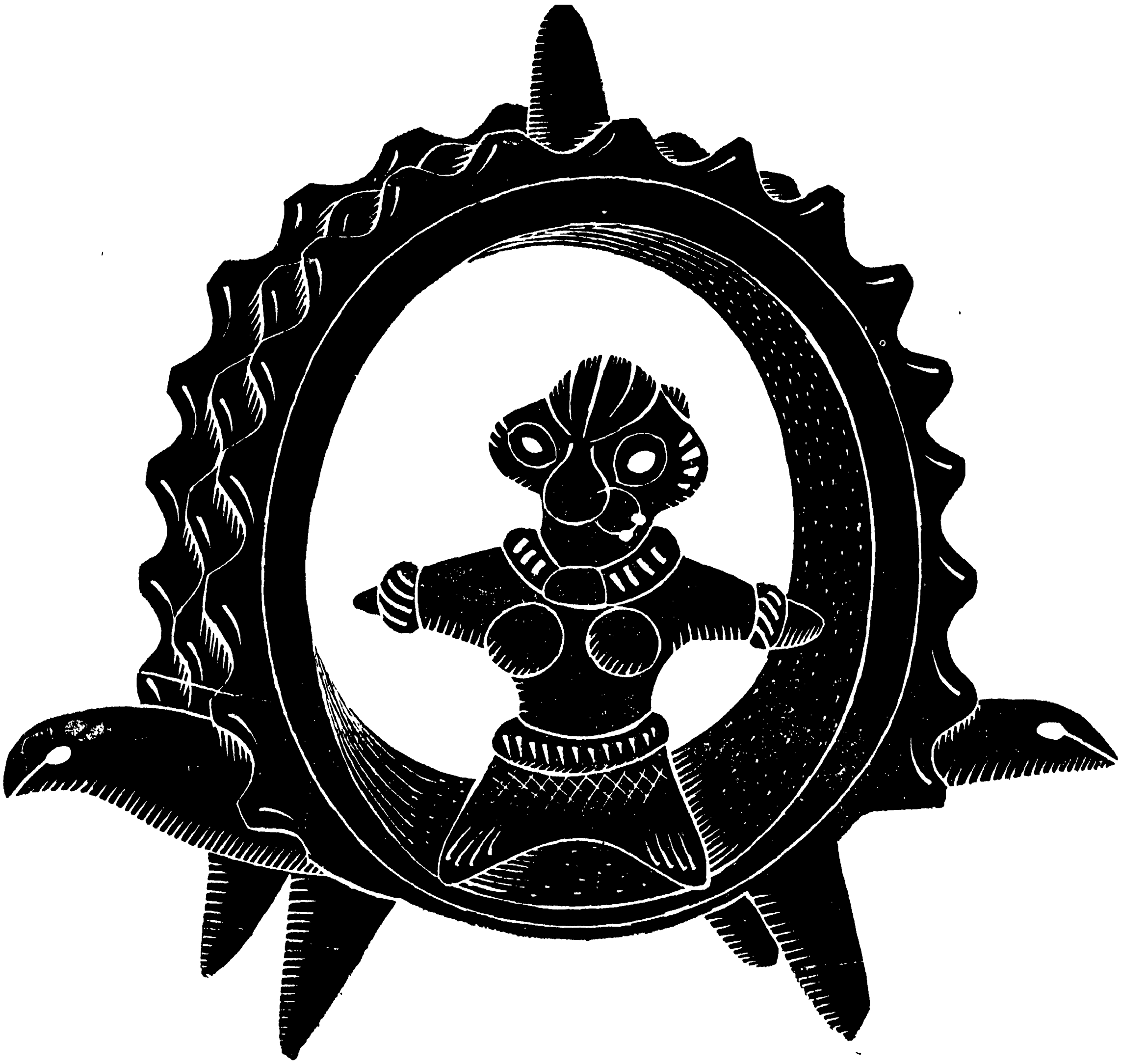
বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৬০ সাল আফ্রিকার ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বছরের মধ্যে আরো কয়েকটি আফ্রিকীয় রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করবে। কাতাঙ্গা যে কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাতাঙ্গার স্বাধীনতা লাভে আপত্তি করার কিছু নেই। কঙ্গো এক-জাতিক একভাষী রাজ্য তো নয়ই, বেলজীয় শাসনের বন্ধন ছাড়া সেখানে আর কোনরকম ঐক্য বা ঐতিহ্যের বন্ধন কোনকালে ছিল না। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি ভারতের সঙ্গে কঙ্গোর স্বাধর্ম্য কল্পনা করে অখণ্ড কঙ্গোর জন্যে যে হাস্যকর আর্তনাদ সুরু করে দিয়েছে, তা বিদেশি শিক্ষিতমণ্ডলীর চোখে পড়লে উপহাস ও অবজ্ঞার কারণ হত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচক্ষণ প্রতিনিধিরা সৌভাগ্যবশত কঙ্গোর স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নবান্ হয়েও তার অখণ্ডতার জন্যে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত নন। সেইজন্যে তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত কাতাঙ্গাকে কঙ্গোর পাত্রিস লুমুম্বার হাতে তুলে দেবেন না, এ-কথা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করা যায়। কঙ্গো আরো অনেক খণ্ডে বিভক্ত হবে, হওয়া উচিত; তার জন্যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ভারত-বিভাগের অনুরূপ ব্যাপার হল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আফ্রিকার বিশাল বেওয়ারিশ সাম্রাজ্যভূমিতে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে যখন যেখানে যতটুকু পেরেছে, সে তখন সেখানে ততটুকু গ্রাস করেছে, তার সেই সাম্রাজ্য গঠনের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা জাতীয় পরিকল্পনা ছিল না, তাই নবগঠিত আফ্রিকার রাজ্যগুলির সীমারেখা কোন নীতি অনুসারে সুসম্বদ্ধ নয়। রাজ্যগুলির মধ্যে কোনরকম ঐক্য বা সমজাতীয়তার ভিত্তি নেই। আফ্রিকার পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এখন প্রধান লক্ষ্য; ঐ লক্ষ্যসিদ্ধির পর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে ভাষা তথা জাতীয়তার ঐক্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে; তার ফলে আফ্রিকার বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্র নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে। ঐ পুনর্গঠনের পরই আফ্রিকার প্রকৃত মুক্তি ও জাতীয় ঐক্যবিধান হতে পারে। এখন সেখানে যা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক চেতনার সম্প্রসারণ মাত্র। আফ্রিকায় যে জাতিগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও ব্রিটিশ, কোথাও ফরাসি, কোথাও পোর্তুগীজ শাসনে পড়ে আছে এবং সেই ভাবে ইতস্তত ছিন্নভিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করছে, সেই জাতিগুলিকে আলাদা আলাদা করে এক একটি সংহত রাষ্ট্রে একত্র করার জন্যে এক বিরাট আন্দোলন অনিবার্য এবং সেই আন্দোলন ক্রমশ শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে যাবেই। কোআমেন্‌ক্রুমা, পাত্রিস লুমুম্বা ধরণের নিকৃষ্ট প্রকৃতির সাম্রাজ্যবাদী নেতারা ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে পারবে না। তার জন্যে জোমো কেনিআত্তা, সোম্বে, ডক্টর বান্দা প্রভৃতির মতো স্বাধীনতাপ্রিয় নেতার প্রয়োজন হবে। সমগ্র কঙ্গোবাসীর ইচ্ছা থাক বা না থাক, আমার কর্তৃত্বে সমস্ত কঙ্গো এলাকা থাকতে বাধ্য—লুমুম্বার এই মনোভাব সমর্থনের অযোগ্য। গানা, গিনি প্রভৃতি রাজ্যের কোন কোন নেতা লুমুম্বাকে সাহায্য করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বেঁধে-দেওয়া সীমারেখাগুলিকে বজায় রাখতে চাইছেন আর ভারতের খবরের কাগজগুলো সেটাকেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শ বলে প্রচার করছে প্রকৃত ব্যাপার কিছুই না বুঝে।

ইংরেজের চোখে ভারতকে বিচার করা যেমন মারাত্মক ভুল, আফ্রিকাকে জানতে হলে তেমনি কোন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া চলে না। আফ্রিকায় অনেক ভারতীয় বাস করলে কি হবে, সাধারণত ভারতীয়রা বিশেষত বাঙালিরা আফ্রিকার জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর রাখে না। আফ্রিকার নবজাগরণ-রহস্য বুঝতে হলে আফ্রিকার ভাষা, সংস্কৃতি ও পূর্ব ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করা দরকার। এ ব্যাপারে ফরাসি ও জর্মণ মনীষীদের সাহায্য অপরিহার্য।

আফ্রিকার উত্তর অংশের আরবদের কথা বাদ দিলে অবশিষ্ট সমস্ত মহাদেশে প্রধানত নিগ্রোদের বাস; হাবশী, সোমালি ও দু একটি ছোট জাতির কথা বাদ দিয়ে এই হিসেব দেওয়া যাচ্ছে। নিগ্রো ভাষাগুলির মোট সংখ্যা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, ৪৪৬টি। কিন্তু তাঁদের মতে, ভারতের ভাষাসংখ্যা ৫৭৯টি! ভারতের ভাষাভিত্তিক পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন ৫৭৯টি ভাষা স্বীকার্য নয়, নেপাল, সিংহল আর আফগানিস্থান ধরে মাত্র গোটা বিশেক ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র ভৌগোলিক ভারতের ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলিকে গঠন করা চলে, তেমনি ভাষা ধরলে আর তার অন্তর্গত উপভাষাগুলিকে ধরা নিষ্প্রয়োজন বলে আফ্রিকায় নিগ্রো-ভাষী এলাকায় ৪৪৬টি ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করা নিরর্থক। ভারতে এমন ভাষা ছিল বা আছে—যাতে হাজার খানেক মাত্র লোকে কথা বলে এবং তারা একটিমাত্র গ্রামে বাস করে। এই সব ভাষা বা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। দু হাজার বর্গমাইল এলাকা এবং এক মিলিঅনের কাছাকাছি লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এক একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা চলে—স্তালিনের এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল; ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সোভিএট ও চীনা এলাকায় রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের



কাজ আজও দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং এখনও বহুকাল চলবে। আফ্রিকায় সেই ভিত্তিতে কাজ হতে হলে যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন। এই শতাব্দীর মধ্যে সে-কাজ সমাপ্ত হবে, এমন আশা করা যায়। ইতিমধ্যে কঙ্গো, সুদান প্রভৃতি নাম- গুলিকে মাত্র ভৌগোলিক মর্যাদাই দেওয়া চলে।

নিগ্রো ভাষাগুলির অবস্থান হল পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এবং নাইল উপত্যকায়। এর দুটি শাখা :—বান্তু আর সুদানীয়। প্রথম শাখার ভাষাসংখ্যা উপভাষা নিয়ে ১৮২ এবং দ্বিতীয় শাখার ২৬৪। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বান্তুভাষার সংখ্যা ১৬।১৭টির বেশি নয়; সুদানীয় ভাষার সংখ্যাও তাই; এক মিলিঅনের কম লোকে কথা বলে না, এমন নিগ্রো ভাষার সংখ্যা প্রবন্ধলেখকের অনুসন্ধান অনুসারে চৌত্রিশটির বেশি নয়; পরে এ অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। আফ্রিকা মহাদেশে মাদাগাস্কার দ্বীপের মালাগাসিদের কথা বাদ দিলে, সেমীয়, হামীয়, বুশম্যান আর হটেন্‌টট্ ভাষাগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে মহাদেশের বৃহত্তর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভাগে এই নিগ্রোগোষ্ঠীর দুই শাখার ভাষাভাষীরা বাস করে। এদের মধ্যে আজ বিপুল বিক্রম সঞ্চারিত; অভিনব এক প্রেরণায় এরা আজ আশাচঞ্চল। এদের জাতীয় বিকাশের পথে বাধা না দেবার সিদ্ধান্ত করে ডাগ হামারশিল্ড সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে আফ্রিকায় বর্তমানে (১৯৬০ সালের মধ্যে) ২৪টি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছে; আরো গোটা বিশেক রাজ্য স্বাধীনতা পেলে সমগ্র আফ্রিকা মুক্তিলাভ করবে। যদি ভাষার ভিত্তিতে সম-ভাবাপন্ন সন্নিহিত ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে আফ্রিকার রাজ্যগুলির সীমারেখা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়, তাহলে আফ্রিকার মোট রাষ্ট্রসংখ্যা চল্লিশের বেশি হবে না। আফ্রিকা এই পথে আজ ধাবিত হলেও তাকে বাধা দিয়ে নিজ নিজ রাজ্যের বাণিজ্যিক ও ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় কোআমেন্‌ক্রুমা, সেকু তুরে প্রভৃতি নেতা সচেষ্ট। কঙ্গোর অখণ্ডতা বজায় রাখার অর্থ, ফরাসি ভাষা কঙ্গোর সর্বত্র অব্যাহত রাখা; তাতে কঙ্গোর আফ্রিকীয় ভাষাগুলির মুক্তিবিধান কোনদিন সম্ভবপর হবে না। ফরাসি শিক্ষায় দীক্ষিত পাত্রিস লুমুম্বা সেই চেষ্টাই করছেন এবং গিনির ফরাসিনবীশ সেকু তুরে তাঁকে সৈন্য পাঠিয়ে সোৎসাহে সাহায্য করছেন যাতে বেলজীয় কঙ্গোতে ফরাসি ভাষা তথা লুমুম্বার সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যস্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। কাতাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতলব হাসিল হবার কথা নয়, কারণ, কাতাঙ্গার খনিজ সম্পদ কঙ্গোর মধ্যে কাতাঙ্গাকে রেখেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভোগ করতে পারে, যেহেতু কঙ্গোর খনিজ সম্পদ কাজে লাগাবার ক্ষমতা পাশ্চাত্যের বিনা সহায়তায় কঙ্গোবাসীর এখন মোটেই নেই। শিল্পোন্নয়ন সাপেক্ষে এখনও আফ্রিকাবাসীকে বহুদিন পাশ্চাত্যের উপর নির্ভর করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির সীমারেখার অদল-বদল হলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা করে দেওয়া হল মনে করে আর্তনাদ করার কিছু নেই। কায়েমি স্বার্থগুলিই জাতীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে বাধা দিয়ে থাকে।

সাইপ্রাসের স্বাধীনতা লাভে সকলেই আনন্দিত হলেও একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সাইপ্রাস কার্যত ব্রিটেনের সামরিক তত্ত্বাবধানে থেকে যাচ্ছে। তা ছাড়া, গ্রীকদের পরম বাঞ্ছিত "এনোসিস" বা গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের মিলনকে প্রাণপণে বাধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কুখ্যাত সিরিল র‍্যাডক্লিফ সাইপ্রাসকেও গ্রীকস্থান ও তুর্কিস্থানে ভাগ করার প্রস্তাব করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ সতর্ক থাকায় সাইপ্রাস অখণ্ড রয়ে গেল। আমরা আশা করব যে, একদিন গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের পুনর্মিলন সম্ভবপর হবে, সম্ভবত রুশভীতি থেকে গ্রীস ও তুরস্ক মুক্ত হবার পরে। গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে একদিন সংঘর্ষ অনিবার্য বুঝেই ইউগোশ্লাভিয়া দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গেই মৈত্রীচুক্তি বাতিল করে দিয়েছে। খাস ইউরোপেই সাম্রাজ্যবাদ যে কত প্রবল, তা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, মাল্টা, সাইপ্রাস, কর্সিকা প্রভৃতি এলাকাগুলি দেখলে বোঝা যায়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ এখনও ইউরোপে বেশ-কিছু বর্তমান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি ও ফ্যাসিবাদীদের ধ্বংস করার পর ইঙ্গ-মার্কিনদের উদ্যোগে ইতালিতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়., তার দুর্বলতা সম্প্রতি আবার চোখে পড়েছে। ইতালিতে মুসোলিনির পতনের পর বাদলিইঅর হাতে ক্ষমতা যায়; ১৯৪৩—৬০, গত ১৭ বছরে ইতালিতে ২২বার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছে; সিঞোরে ফান্‌ফানির বর্তমান মন্ত্রিসভা কতদিন স্থায়ী হবে, বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সে শার্ল দে গলের আবির্ভাবের আগে যেমন ক্রমাগত পরিবর্তন চলেছিল, ইতালিতে এখন সেই অবস্থা। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অকেজো বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

লাওসে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সেখানে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিকাশ হবে বলে আশা করা যায়। লাওস বা লাওদের দেশে মার্কিন প্রভাব ক্রমবর্ধমান ছিল; তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশের মতো সেখানেও এই আকস্মিক অভ্যুত্থান প্রমাণ করে যে, যে পূর্ণ স্বাধীনতা জাতিমাত্রের কাম্য, তা এই সব দেশে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য ঐ অভ্যুত্থানের পরও লাওদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে, এখনও সে-কথা বলার সময় আসেনি।

ভারতের প্রতিবেশী এই সব দেশে ভারতের প্রভাব ক্রমশ কমে আসছে এবং ভারত ও এই সব দেশ পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে যাচ্ছে, এটা ভারতের পক্ষে শুভ লক্ষণ বা মর্যাদার কথা নয়। ব্রহ্ম ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে অনাক্রমণচুক্তি সম্পাদন করেছে, এবং ঐ চুক্তি সম্পাদনের আগে ভারতকে কিছুই জানানো হয়নি। তার মানে এই যে, ভারতের সঙ্গে চীনের কোন যুদ্ধ বাধলে ব্রহ্ম ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে পারবে না; কার্যত, ভারত-ব্রহ্ম মৈত্রী চুক্তি ফেঁসে গেছে—আর সেই সঙ্গে ইন্দোচীন উপদ্বীপে ভারতের মানহানিও ঘটেছে। কয়েক

বছর আগে লাওদের রাজা কাতরভাবে ভারতের সাহায্য চেয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের নিশ্চয়তালাভের আশায়। ভারতের ঔদাসীন্যে লাওদের সরকারকে হতাশ হতে হয়। এর পরে ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, লাওস আর কাম্বোজ-দেশে যে-সব রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, তাদের সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ভারত কিছুই জানতে পারেনি। "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল" অবস্থা কোন দেশের পক্ষেই সম্মানের কথা নয়। প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে মান খোয়াবার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করার কোন কথাই উঠতে পারে না। অযাচিতভাবে যে সম্মান ভারত কোরিয়া আর ভিএৎনামে পেয়েছিল, এখন নিজের দোষে সে তা হারিয়ে ফেলেছে। এশিয়ায় নেতৃত্বশক্তি এখন আর ভারতের হাতে নেই।

১৭।৮।৬০।

ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো*

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র—এই হ'ল ইতিহাসের অগ্রগতির ধারা। সামন্ততন্ত্রে মুষ্টিমেয় ভূস্বামীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয় অগণিত সাধারণ মানুষ; এই ভূমিদাসদের দেহ বা মন দুই-ই পুষ্টির অভাবে ক্রমে শুকিয়ে যায়। সাধারণের জীবিকার দিক থেকে ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের তুলনায় মন্দের ভাল, তবে এ ব্যবস্থাতেও স্বল্প-সংখ্যক পুঁজিপাতর স্বার্থে অসংখ্য শ্রমজীবী বা পণ্যভোগী জনসাধারণ শোষিত হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের মানবিক বিকাশলাভের অধিকার এক্ষেত্রে প্রায়ই সঙ্কুচিত হয়। এই হিসাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সমাজতন্ত্র বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণবিধান ও রাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগদান সমাজতন্ত্রের কাজ। সমাজতন্ত্রে মানুষে মানুষে ভেদ নেই, জীবনে সাফল্যলাভের প্রশ্নে সকলেরই সেখানে সমান দাবী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন, সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নাগরিকমাত্রেই তা ভোগ করবার অধিকারী।

সুদীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার পর ভারত যখন বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'ল, আধুনিক পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় কর্তৃপক্ষ সঙ্গতকারণেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ভারতের রাষ্ট্র-কাঠামো গড়ে তোলার সংকল্প নিলেন। ইংরেজ আমলে অসম-ধনবণ্টনের দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক অখ্যাতি লাভ করেছিল। একদিকে মুষ্টিমেয় জমিদার—রাজা-মহারাজা, অন্যদিকে অসংখ্য কৃষাণ—মজুর—সাধারণ মানুষ। দেশে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের নিয়ে দেশের সত্যকার পরিচয়, ভারতের সেই অগণিত জনসাধারণ দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা ও অস্বাস্থ্যের গ্লানিতে শোচনীয় জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। ভারতের শতকরা বিরাশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, বিদেশী শাসনের যুগে এই গ্রামীণ ভারতবাসী নিষ্করুণভাবে ভাবে অবহেলিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বভার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উপেক্ষিত জনগণকে সব দিক থেকে উন্নত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন :—'Swaraj for me means the freedom for the meanest of our countrymen... The Swaraj of my dream is the poor man's Swaraj', —'আমার কাছে স্বরাজ শব্দের অর্থ হ'ল আমার দেশের হীনতম ব্যক্তির স্বাধীনতা।...আমার স্বপ্নের স্বরাজ হচ্ছে দরিদ্র জনগণের স্বরাজ।' শুধু বিদেশী রাজশক্তির শোষণ নয়, দেশী-বিদেশী যে কোন শোষণকেই গান্ধীজী ধিক্কার জানালেন। আঠারো দফা গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে তিনি 'সর্বোদয় পরিকল্পনা' রচনা করলেন। 'সর্বোদয়' মানে সকলের উদয়, অর্থাৎ এ হচ্ছে এমন এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা যাতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে কোন মানুষ দেহ মনের সুস্থ বিকাশলাভের জন্মগত অধিকার অবাধে ভোগ করতে পারে।

গান্ধীজীর এই 'সর্বোদয়' দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো পরিকল্পিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের বড় কথা হ'ল রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত সম্পদের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই সমাজতন্ত্র কিন্তু ভারতের জন্য পরিকল্পিত হয়নি। পণ্য উৎপাদনের সমস্ত উপায়গুলি ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত হচ্ছে না এবং গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হ'লেও অনেকগুলি শিল্পে বে-সরকারী মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী-বে-সরকারী মিলিত উদ্যমে ভারতে শিল্প-প্রসারের এক মিশ্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে,বে-সরকারী শিল্প মালিকানার কিছুটা স্বীকৃতি থাকলেও ভারতের সরকারী নীতি হ'ল শিল্প পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় বেসরকারী শিল্পপতিদের প্রভাব ক্রমেই কমিয়ে আনা। নানা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে দেশের শিল্পাগার গুলিকে জনস্বার্থে সংরক্ষিত করতে পারবেন বলে আশা রাখেন। শিল্প-পতিদের মুনাফা বা পারিশ্রমিকের সর্বোচ্চ হারও এই সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং 'কোম্পানী আইন' সংশোধন করে ও উচ্চতর আয়ের উপর উচ্চতর হারে আয়কর বসিয়ে ধনীদের নগদ টাকার প্রাচুর্য কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মুনাফাকর, বিত্তকর, ব্যয়কর, দানকর বা মৃত্যুকরের মত নূতন নূতন কর স্থাপন দেশ-বাসীর মধ্যে সম্পদের অসমতা হ্রাসের সাফল্যজনক উপায় সন্দেহ নেই। জমিদারী প্রথার বিলোপ অনুরূপ একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের মত চাষীদের জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত না করে সমাজতান্ত্রিক ভারতে ভূমির প্রতি মমতাশীল চাষীর হৃদয়ানুভূতিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং উচ্ছেদ করা হয়েছে মধ্যস্বত্ব-ভোগী জমিদারদের। State Trading বা গুরুত্বপূর্ণ পণ্যাদির বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি অংশগ্রহণের নীতি এখন ক্রমেই কার্যকরী হচ্ছে, পুঁজিপতিদের অতি-মুনাফারোধে এবং পণ্য-বণ্টনে সমতা সৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। হাতের নগদ টাকা লগ্নী করে ফেলবার জন্য অর্থবান ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে ভারতে উদারতর সরকারী ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নানারকম সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ধনীদের নগদ টাকার স্বাচ্ছল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে তাঁরা পণ্যবাজারে অবাঞ্ছিত চাহিদার সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং ফলে মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা আপনিই কমে যাবে।

অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, শুধুমাত্র পুঁজিপতি বা বিত্ত-শালীদের নিয়ন্ত্রণ করলেই ভারতে ইপ্সিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে না, তার জন্য একই সঙ্গে দরকার গরীবদের অবস্থার উন্নতি। প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি, ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ও সমহারে সেগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বেকার সমস্যার সমাধানের উপর এই উন্নতি নির্ভর করে। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর চাষের জমি ভালোভাবে পুনর্বণ্টিত হ'লে এবং সেবা-সমবায় ও যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সমবায় নীতি প্রসারিত হ'লে চাষের তথা চাষীর উন্নতি অবশ্যই হবে, তবে ভারতের কৃষিব্যবস্থা এত পুরানো এবং ভারগ্রস্ত যে, এদেশের তীব্র বেকার সমস্যার সমাধান করতে হ'লে এই সঙ্গে শিল্পের ব্যাপক প্রসার অপরিহার্য। আশার কথা, দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিগত ন' বছরে ভারতে ইস্পাত, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা প্রভৃতি শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, মৌলিক শিল্পের উন্নতির ফলে কারখানা গড়ে তোলবার প্রাথমিক অসুবিধা বহুলাংশে ক'মে যাওয়ায় এবার ভোগ্যপণ্য শিল্প সহজেই প্রসারিত হবে। অনুন্নত দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করলে প্রথম দিকে অনেক সময় ও অর্থব্যয় অনিবার্য এবং সাধারণ দেশবাসীকে বহু দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। গত কয়েক বছরে ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতারা ভারতের জনগণকে এই স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণে অনুপ্রাণিত করেছেন। জাতীয় আয় বাড়িয়ে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ধনী-দরিদ্রের আয়ের অসমতা হ্রাস, এবং অর্থনৈতিক সমবণ্টনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা,—এইগুলিই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হয়েছে।

ভারতের জন্য যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো পরিকল্পিত হয়েছে তাতে সমস্ত নাগরিকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগদানের ব্যবস্থা আছে। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা। তাছাড়া এখন ভারতবাসীর মানসিক ও মানবিক উন্নতির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য উদারভাবে রচিত হয়েছে ভারতের সংবিধান। অস্পৃশ্যতা ও বেগার প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, সমস্ত নাগরিককে অবাধে চলাফেরার, মতপ্রকাশের এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ধর্মগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারী চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের এখন সমান অধিকার। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং দেশবাসীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নৈতিক বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি স্বাধীন ভারতের মূলনীতি। ভারতের যুগান্তকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নের পরিকল্পনা নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজসেবামূলক খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা পাশ্চাত্যজগতে প্রচলিত সংজ্ঞার সমাজতন্ত্র নয়। ভারতের মহান ঐতিহ্য ও জীবন-দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে শ্রেণীহীন শোষণ-হীন সমাজ গড়বার প্রতিশ্রুতি এতে দেওয়া হয়েছে। এ হ'ল সমাজ-তন্ত্রের এক নূতন রূপ, ভারতীয় প্রতিভা থেকে এর উদ্ভব, এর মর্মলোকে মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের স্বপ্ন সঞ্চারিত। ভারতকে সত্যকার 'welfare state' বা 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' রূপে গড়ে তোলাতেই এর সার্থকতা। এর ওপর অপরিবর্তনীয় কোন রাজনৈতিক সংজ্ঞা আরোপ করবার দরকার নেই।



উত্তম পঠন পদ্ধতি

উপানন্দ

এখন পড়ার কথা। তার মধ্যে অকারণে সময় নষ্ট করবে না। পড়াশুনায় মনোযোগ দেবে। পড়বার সময় সর্ব্বপ্রকার আরাম বর্জ্জনীয়। চেয়ারে বসে পড়াই ভালো। পিঠ সোজা ক'রে চেয়ারে বসে পড়বে, মাথাটি যেন বেশী ঝুঁকে না পড়ে। বসবে যেদিকে আলো পড়বে এসে তোমাদের পেছনের দিক থেকে। বসবে সোজা হয়ে। বায়ু সঞ্চালিত স্থানই উত্তম। যেখানে মানুষ চলাফেরা করছে সবেগে, সেখানে বসবে না। নিদ্রা, ক্ষুধা, আশাভঙ্গ, নানাপ্রকার অশান্তি, মানসিক কষ্ট বা গল্প করবার প্রবৃত্তি ও গল্পশোনা পড়ার পক্ষে ক্ষতিজনক। পড়তে বসবার আগে তোমাদের আমোদ-প্রমোদ, গল্প গুজব, আবেগ-উচ্ছ্বাস, হাসি-তামাসা, খেলা-ধুলো সব শেষ করে নিতে হবে, যখন পড়বে তখন নিস্তব্ধতা আবশ্যক। পড়তে পড়তে মন কোন রকমেই যে সময় বইয়ের পাতায় স্থির হয়ে থাকতে অনিচ্ছুক, সে সময়ে লিখতে বসবে। অধ্যয়নের সময় পঠিত বিষয় বস্তুগুলি যাতে গভীরভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করে, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবে।

যা পড়েছ, সেগুলি লিখবে আর নিজেরা মিলিয়ে দেখে নেবে বইয়ের সঙ্গে ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা। বানান ভুল হোলো কিনা দেখে নেবে। পাব্‌লিক লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগারে যাবে। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে কি ভাবে পাঠকেরা বই নিয়ে এক মনে পড়ছে। পড়তে বসে নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী, চীৎকার ও মুদ্রাদোষ যেন না প্রকাশ পায়। পেন্সিল নিয়ে পড়তে বসবে। উল্লেখযোগ্য কথা পেলেই দাগ দেবে। ঐগুলি উপকারে লাগবে। তোমাদের ভাব অনুভাব আনার পক্ষে এরাই হবে সহায়ক। বইয়ের পাতার অলিখিত প্রান্তে (অর্থাৎ মার্জিন দেওয়া অংশে) এই সব সম্পর্কে টীকা-টিপ্পনি লিখে রাখবে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। পড়া শেষ হোলে টীকা-টিপ্পনিগুলি দেখবে, মনে আলোচনা করবে, যাতে বোধগম্য হয় তার জন্যেও চেষ্টা করবে।

এমনিভাবে পড়ার অভ্যাস করলে, ক্রমে ক্রমে তোমাদের অন্তরে একটা লাইব্রেরী বা পাঠাগার গড়ে উঠবে। এই পাঠাগারে থাকবে অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বিষয়বস্তু, শব্দভাণ্ডার ও ভাবসমষ্টি। এগুলি সময় ও সুযোগ মত স্থান-বিশেষে প্রয়োগ আর আলোচনা-প্রসঙ্গে অভি-ব্যক্তির মাধ্যমে প্রশংসা ও সাফল্য গৌরবলাভ করবে। মনই মানুষের অধিনায়ক। উত্তমভাবে মনন ব্যতীত মনস্বিতা প্রকাশ পায় না। তোমাদের কর্ত্তব্য অধ্যয়ন। সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন ভিন্ন মানসিক শক্তির স্ফুরণ হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যাদের পড়াশুনা বেশী নেই, তারাই নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করে ও লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়।

অধিকাংশ লোক প্রয়োজনমত পড়ে না, কম পড়ে। পাশের নম্বর কোন মতে রাখার উদ্দেশে পড়া খুব খারাপ। উত্তমভাবে না পড়লে জ্ঞানার্জ্জন হবে না। পড়ার অভ্যাস রাখাটাই বড় কথা নয়, পড়ায় উন্নতি করাটাই দরকার। পড়ার উন্নতি করা যায় নানাভাবে। বহুরকমের বই আছে নানাশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে। প্রাথমিক শিক্ষার সময় ছেলেবেলায় সকলেই এক ধরণের বই পড়ে, তারপর জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। যার যে বিষয়ে ঝোঁক, সে সে-বিষয়ের বই পড়তে থাকে।

বই নিয়ে পড়তে বসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বোধ না থাকলে বইয়ের পাতা খুলে বসে থাকার কোন মানে হয় না। তোমাদের মধ্যে অনেকেই সন্ধ্যা বেলায় পড়তে বসে ঢুলতে থাকো আর সকাল বেলায় দেরী করে ঘুম থেকে ওঠো—এই বদ্ অভ্যাস থাকলে লেখাপড়ায় কোন দিন উন্নতি

হবে না। যে বৃত্তি অবলম্বন করবে ভাবী জীবনে, তারই উপযোগী বই বেছে নিয়ে পড়তে হবে। বিষয়বস্তু হিসেবে পড়ার ধরণের পার্থক্য আছে। উপন্যাস পড়ার ধরণের মত পরীক্ষার পড়ার ধরণ হোতে পারে না। আনন্দ উপভোগের জন্যে, সাংস্কৃতিক জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে, গবেষণার জন্যে আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে মানুষ বই পড়ে, তা ছাড়া টেক্‌নিক্যাল বা বৃত্তি শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের বইও পড়তে হয়, বিভিন্নপ্রকারের পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পড়ার আবশ্যকতা আছে, পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনা সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যেও পড়ার দিকে আছে মানুষের আগ্রহ। লক্ষ্যহীন পড়া পাথরের ওপর শস্য ছড়ানোর মত কোন কাজে আসে না।

কোন বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ লক্ষ্য রেখে বই পড়া দরকার যাতে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন হয়। মনের মধ্যে অধীত বিষয়গুলি সম্যকভাবে সংরক্ষিত রাখবে—চেষ্টা করবে একই বিষয়বস্তুর ওপর খুব বেশী পড়ে নিতে। প্রত্যেকটি কথা ধরে পড়ো না, পড়বে ক্ষুদ্র শব্দসমষ্টি আর বাক্যগুলি একটানাভাবে। কল্পনা শক্তি বাড়াবার জন্যেই পাঠের প্রয়োজন, শুধু কথা পুঁজি করবার দিকে লক্ষ্য রাখলে হবে না। যা পড়ে এসেছ মনে রাখবার চেষ্টা করবে কিন্তু তা দেখবার জন্যে, পিছনের দিকে পাতা উল্‌টে যাবে না। শব্দ সংগ্রহ করবে আর সেগুলি স্থানবিশেষে প্রয়োগ করবে, অধ্যয়নের ভেতর তারা যেন স্থান পায়। আজকাল ক্লাস ছেলে-দের রিডিং পড়ানোর দিকে নজর নেওয়া হয় না।

নতুন শব্দ পাওয়ামাত্রেই সেটিকে খাতায় টুকে রাখবে আর চেষ্টা করবে এর অর্থ খুঁজে বের করবার। যে সব কথা তোমরা জানো, যে সব প্রসঙ্গ, যে সব সূত্রের সঙ্গে তোমাদের পরিচয়, তাদের সঙ্গে এ শব্দের কোথায় সাদৃশ্য আছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে। তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আবশ্যক, শব্দ তত্ত্বের ওপর অধিকার অর্জ্জন করতে হোলে। তোমাদের ভেতর গড়ে উঠুক শব্দ কোষ। অভিধান দেখবে, একই শব্দ কত রকমভাবে নানাস্থানে ব্যবহৃত হোতে পারে, তা জানবার চেষ্টা করবে। যে কোন শব্দের বিপরীত বোধার্থক শব্দ জেনে রাখবে। অভিধান না খুলে কতটা শব্দ মন থেকে টেনে এনে কাজে লাগাতে পারো। সেদিকে সচেষ্ট হবে।

শব্দটি বলবে, শব্দকে নিয়ে বাক্য রচনা করবে, দেখবে ঠিক বাক্য রচিত হোলো কিনা, যেখান থেকে শব্দটী প্রথম পেয়েছিলে সেখানে দৃষ্টি দেবে, পংক্তিটি পড়বে। যদি দ্রুতভাবে পড়া শেষ করবার ইচ্ছে হয়, তাহোলে অজানা শব্দগুলো একত্র করে একটা খাতায় টুকে রাখবে আর অবসর মত সেগুলো দেখবে, আলোচনা করবে আর মুখস্থ করে রাখবে। যদি ভালোভাবে পড়তে চাও তাহোলো শব্দগুলির ওপর যাতে অধিকার জন্মায় ও প্রয়োগ করবার ক্ষমতা বাড়ে, সে সম্বন্ধে বিশেষ নজর নেবে।

শব্দ অধ্যয়নে যে সময়টা অতিবাহিত হবে, তা ব্যর্থ হবে না—পরিশ্রমের দাম সময় মতই পাওয়া যায়। অল্প সময়ের ভেতর ভাষার অধিকার হোলে সাময়িকভাবে ধীরে ধীরে পড়া আর জ্ঞানার্জ্জন করার চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়া বহুলাংশে ভালো, তাতে সময়ের ক্ষতিপূরণ হবে। মনঃসংযোগ করতে শেখো। পড়বার জন্যে **নির্দ্দিষ্ট সময় ও জায়গা ঠিক করে** নিতে পারলে সব চেয়ে ভালো হয়। চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করো না। নিস্তব্ধতা, প্রশান্তি, সুপ্রণালী বদ্ধ অধ্যয়ন, মনঃসংযোগ, অভ্যাস, উদ্যম ও উৎসাহ বিদ্যার্জ্জনের সময় বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, পথ হাঁটবে তোমরা। হাঁটবার শক্তি অর্জ্জন করো। বিদ্যার সীমা নেই, শেষ নেই—স্নাতকোত্তর হয়েও অনেক কিছু শিখবার থাকে।

একঘেয়েমি সময়ে সময়ে মন ভারাক্রান্ত করে তোলে, পড়বার সময় বেশ প্রফুল্ল হয়ে মন বসাবে, সচেষ্ট হবে একঘেয়েমি দূর করবার জন্যে যথাসাধ্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করতে। অসুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত পড়াশুনায় কখন অনিচ্ছা প্রকাশ করবে না। পড়ার ব্যাপারটা ঠিক যেন গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মত। মাইলের ওপর মাইল ধরে চলেছে গাড়ী একঘেয়ে দৃশ্যের ভেতর দিয়ে, কোন আকর্ষণই নেই, হঠাৎ এমন জায়গা এলো যেখানকার দৃশ্য থেকে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া গেল—মন থেকে বেরিয়ে এলো—"এমনটি তো আগে কখন দেখিনি—" পড়াটাও ঠিক এই রকম, একঘেয়ে ভাবে পড়তে পড়তে এমন একটা অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো যা হয়ে উঠলো খুব চিত্তাকর্ষক আর দূর হয়ে গেল একঘেয়েমি।

পড়তে বসে মেজাজটা ঠিক মত তৈরী না হোলেও পড়া ছাড়বে না, শেষে আপনা আপনি মন বসে যাবে, মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। আগে যে সব পড়েছ তারা একত্র হয়ে তোমাদের সামনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেবে, নতুন আলোকসম্পাত করবে অধ্যয়নের ভ্রাম্যমাণ পরিস্থিতির মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তোমাদের জীবন উন্নত হয়ে উঠবে। সর্ব্বদাই প্রত্যেক বিষয়বস্তুর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। বইগুলির ভেতর স্থান-বিশেষ, পংক্তি আর শব্দ সমষ্টি চিহ্নিত করবে—নিজস্ব ধারণা বা ভাবধারা সম্বন্ধে লিখবে, সব কিছুই বোকার মত মেনে নিয়ে তোতাপাখীর মত আওড়াবে না—সর্ব্বদাই প্রশ্ন করবে, ভাববে আর আলোচনা করবে। দশখানা নোটবই একত্র করে প্রশ্ন আর তার উত্তর দেখে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করলে কোন মতে পাসই করা যায়, জ্ঞান-বুদ্ধি হয় না। উদ্যম-শক্তি আরোপ করে ক্রমাগত তোমাদের বিষয়টিকে আঁকড়ে ধরবে নব নব জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা নিয়ে, তাহোলেই চিত্তের একাগ্রতার সংযোগে সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে, পড়ায় থাকা চাই দ্রুতি বা গতিবেগ। দ্রুত পড়তে পারলে পড়া খুব ভালো হয়, সুন্দর আবৃত্তি সম্ভব হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব ছেলে এক মিনিটে দেড়শো থেকে আড়াইশো শব্দ পড়তে পারতো, তারা এমনই উন্নতি করেছে যে একটানা পড়েছে মিনিটে তিনশো, চারশো এমন কি পাঁচশো শব্দ—কথা অস্পষ্ট হয়নি বা দম নিতে হয়নি।

তাড়াতাড়ি পড়ার কায়দা আছে, এ কায়দাটি আয়ত্ত করতে হলে তোমাদের চোখ দুটি যেন দ্রুতভাবে লেখার ওপর দিয়ে চল্‌তে থাকে। পড়বার সময় আমাদের চোখ দুটি একটি পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে গতি-মন্থর হয়ে চলে, নিয়মিত ভাবে থেমে থেমে, সঙ্কটাবস্থা নিয়ে। এর মধ্যে দৃষ্টির ছাপটা গিয়ে লাগে মস্তিষ্কে আর ব্যাখ্যা করা বা বুঝবার অবকাশ আনে।

দৃষ্টিপ্রখরতা বৃদ্ধি আবশ্যক। একবার যাতে কথাগুলি আবর্ত্তিত

হয়ে মনের ভেতর প্রবেশ করে স্থায়ী হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমরা যদি সুসংবদ্ধ সম্বন্ধবিশিষ্ট কথার সমষ্টি দিয়ে ভাবসম্প্রসারণ করতে পারি সেইটেই বিশেষ উপযোগী হবে, একটা কথা নিয়ে টানা-হেঁচ্ড়া করে কোন সুবিধা হবে না।

উত্তমভাবে অধ্যয়নের অর্থ হচ্ছে ভালো করে চোখ দিয়ে দেখে সমগ্রতাটী আয়ত্তাধীনে আনা। ঠিকমত দৃষ্টি ফেলে বিশিষ্ট ছন্দের মধ্য দিয়ে ক্ষণবিরতির ফাঁকে ফাঁকে উত্তমভাবে কথা উচ্চারণ করে কি ভাবে দ্রুত পড়ে যায় উত্তম পড়ুয়ারা, তা লক্ষ্য করবে। অনুকরণ করবে তাদের। প্রত্যেক দিন অন্ততঃ কুড়ি মিনিট ধরে তাড়াতাড়ি পড়বার অভ্যাস করবে, এর ফল এত ভালো হবে যে শেষে তা লক্ষ্য করে খুশীতে মন ভরে উঠবে।

দ্রুত পঠনে প্রকৃতপক্ষে ধারণা, অনুভূতি ও ধীশক্তি বৃদ্ধি পায়, এর ফলে যা পড়া যায় তা মন থেকে সরে যায় না। দ্রুত পঠন অভ্যাস করে যখন সাফল্যলাভ হবে তখন তোমরা খুব আনন্দ পাবে, ফলে আরও পড়বার ইচ্ছা হবে, পড়ার মেজাজটা আপনাআপনি এসে যাবে। এর দ্বারা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, পরীক্ষায় বিশেষভাবে সিদ্ধিলাভ করে শেষে জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারবে।

পূজোর মেলা

প্রভাকর মাঝি

পূজোর মেলায় আয় কে যাবি
পূজোর মেলায় আয়,
বারোয়ারী পূজোর মেলা
বসলো যে আটচালায়।
ভয় কি, যদি আকাশটা মুখ
গোম্‌ড়া করে থাকে,
ভ্যাপোর ভ্যাপোর বেলুন-বাঁশী
কিনেই দেবো তাকে।
রসের ভিয়েন চড়িয়ে, ত্থাখো,
ময়রারা কি বিকে,
ভন্‌ভনিয়ে উড়ছে মাছি
যাবে না ঐ দিকে।
তার চেয়ে চল্ গরম পাঁপর
কিনবো জনে জনে,
খেতে খেতে টো টো করে
ঘুরবো অকারণে।
শেষ কালেতে নাগর-দোলায়
চড়বো খানিকক্ষণ,
তখন কিন্তু টুটুর জন্যে
ভরবে ব্যথায় মন।
নাগর দোলায় চড়তে যে ওর
বড়ই ছিল সাধ,
হতচ্ছাড়া আমাশাটা
সাধলো তাতে বাদ।
সাঁঝ-আরতি দেখার পরে
ফিরবো যতো সাথী
টুটুর জন্যে কিনে আনবো
শুঁড়-ওলা এক হাতী।

ভিক্টর হুগো

রচিত

"লে মিজারেবল্"

সৌম্য গুপ্ত

(সার-মর্ম্ম)

[এখন থেকে এ আসরে ছোটদের জন্য আমরা দেশ-বিদেশের বিখ্যাত কাব্য-নাটক-উপন্যাসের সার-মর্ম্ম সঙ্কলন প্রকাশ করবো। এ মাসে সঙ্কলিত হলো, উনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী কথাশিল্পী ভিক্টর হুগো রচিত "লে মিজারেবল্দ্" উপন্যাসের সার-মর্ম্ম]

আঠারো শতাব্দীর শেষাশেষি অক্টোবর মাসের বিকাল-বেলা। ফ্রান্সের ছোট একটি সহরের পথে শ্রান্ত-গতিতে হেঁটে চলেছে দোহারা-গড়নের বেঁটে-খাটো চেহারার মধ্য-বয়সী এক পথিক! মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ…পরণে জীর্ণ-ধূলিধূসর শত-তালিযুক্ত কোট, পেণ্ট্‌লেন, শার্ট… পায়ে মোজা নেই—শুধু একজোড়া ছেঁড়া জুতো। হাতে মোটা লাঠি, আর পিঠে দরকারী জিনিষপত্রে বোঝাই কাপড়ের তৈরী একটা পুঁটলী।

পথিকের নাম জ্যঁা ভাল্জাঁ…দীর্ঘ উনিশ বছর জেলখানায় কয়েদী থাকার পরে আজ সে ছাড়া পেয়ে সহরে ফিরছে। জ্যঁা ভাল্জাঁ গরীব ক্ষেত-মজুরের ছেলে…বাপ মারা যাবার পর, বোনের সংসারে থেকে পেটের দায়ে সামান্য ক্ষেত-মজুরের কাজ করতো। হঠাৎ দেশে এলো দুর্দ্দিন…দিন চলে না! শেষে বোনের সংসারে অনাহার-অনটনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ-কষ্ট দেখে কাতর হয়ে সে একদিন সহরের এক রুটিওয়ালার দোকান থেকে এক টুকরো রুটি চুরি করে বসলো। দোকানদারের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় জ্যঁা ভাল্জাঁ ধরা পড়লো দুঁদে পুলিশ-দারোগা জ্যাভার্ট আর শাস্ত্রীদের হাতে!

বিচারের সময় আইন-আদালত দেখলো শুধু চুরির অপরাধ…কেউ একবার ভেবেও দেখলো না যে কতখানি অভাবে-দুঃখে জ্যঁা ভাল্জাঁ দায়ে পড়ে চুরি করেছে! সামান্য একখানা রুটি-চুরির অপরাধে জ্যঁা ভাল্জাঁর সাজা হলো—পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড! সরকারী-বিধানে জ্যঁা ভাল্জাঁর নাম গেল মুছে—সে হলো জেলখানার চব্বিশ হাজার ছ'শো এক নম্বরের কয়েদী! এমন কি, যাদের জন্য সে চুরি করেছিল, কালক্রমে তারাও তাকে ভুলে গেল।

ক'বছর জেলখানায় বাস করার পর জ্যঁা ভাল্জাঁর মন অধীর হলো বাইরের দুনিয়ার জন্য! সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলো বার-বার অনেকবার…কিন্তু প্রতিবারেই ধরা পড়লো—তার ফলে, চুরির সাজার উপর কারাবাসের মেয়াদের হার বেড়ে চললো—জেলখানা থেকে পালানোর অপরাধে। এমনিভাবে মেয়াদের হার বেড়ে জ্যঁা ভাল্জাঁকে জেলে থাকতে হলো উনিশ বছর। সেই সুদীর্ঘ কারাবাসের পর জ্যঁা ভাল্জাঁ আজ সদ্য মুক্তি পেয়ে সহরে ফিরছে। সারাদিন আহার জোটেনি তার…কোথায় যাবে, কি খাবে—তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই!

পথের পাশেই খাবার-সাজানো সরাইখানা দেখে সে গেল এগিয়ে…কিন্তু, জেল-ফেরৎ কয়েদী বলে চিনতে পেরে সরাইওয়ালা তাকে দিলে তাড়িয়ে!

কাজেই, আবার সেই পথ! রাত ঘনিয়ে আসছে…শীতে কোথায় পাবে আশ্রয়—এই ভাবতে-ভাবতে পথে সেখানেও ঠাঁই মিললো না! সে সরাইওয়ালাও জ্যঁা ভাল্জাঁকে দাগী-চোর জেনে পাড়ার যত দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিলে। ছেলের দলের অনর্গল ঢিল আর টিট্‌কারী বর্ষণের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে জ্যঁা ভাল্জাঁ শেষে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালো এক গৃহস্থ-ভদ্রলোকের দরজায়—আশ্রয়ের আশায়! ভদ্রলোক ছাপোষা-মানুষ…ভাল্জাঁর চেহারা আর পোষাক-আশাক দেখে তাঁর সন্দেহ হলো—লোকটা ডাকাত! তিনি সটান বন্দুক উঁচিয়ে জ্যঁা ভাল্জাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ীর দরজা বন্ধ করলেন।

ওদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতে চলেছে! কোথাও আশ্রয় না পেয়ে জ্যঁা ভাল্জাঁ শেষে শ্রান্ত হয়ে সহরের প্রান্তে গীর্জ্জা-ঘরের পাশে ছোট্ট একটি বাড়ীর পাথরের রোয়াকে এসে শুয়ে পড়লো। এমন সময় এক বুড়ী এসে তাকে মমতাভরে জানালে,—সামনের ঐ গীর্জ্জায় গেলেই সে-রাতের মতো আশ্রয় আর আহার জুটবে—কারণ, ওখানকার বিশপ ভারী ভালো…তাঁর মনে আছে দয়া-মমতা!

বুড়ীর কথা শুনে জ্যঁা ভাল্জাঁ এলো গীর্জ্জায়। বিশপ তখন ঘরে বসে তাঁর বোনের সঙ্গে গল্প করছিলেন—সহরের পথে সেদিন যে দাগী জেল-কয়েদীর আবির্ভাব ঘটেছে, তারই আলোচনা হচ্ছিল। জ্যঁা ভাল্জাঁ ঘরে ঢুকেই বিশপকে জানালো নিজের আসল পরিচয়। তার দুর্ভোগের কথা শুনে দাগী-কয়েদী জ্যঁা ভাল্জাঁকে বিশপ সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন—রূপোর বাতিদান, বাসন আর হরেক রকমের উপাদেয় খাবার সাজানো খানা-টেবিলে। ভূরি-ভোজনের পর, বিশপ নিজে রূপোর বাতিদান হাতে করে জ্যঁা ভাল্জাঁকে পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন গীর্জ্জার সুসজ্জিত প্রার্থনা-ঘরে—এ-ঘরের এক কোণে অতিথির শোবার ব্যবস্থা বিশপের এই সরল ব্যবহার আর আন্তরিক দরদে জ্যঁা ভাল্জাঁ অবাক হয়ে গেল…সবাই যাকে দাগী-কয়েদী বলে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকেই এত সমাদর! যাই হোক শ্রান্ত-অতিথির আরামের ব্যবস্থা করে, রূপোর বাতিদান ঘরে রেখেই বিশপ সে-রাতের মতো তাঁর নিজের শয়ন-কক্ষে চলে গেলেন।

জ্যঁা ভাল্জাঁর কিন্তু নরম বিছানায় শুয়ে ঘুম হলো না…

মনে জাগলো দুর্ব্বার লোভ! নিশুতি-রাতে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, সেই সময় বিছানা ছেড়ে উঠে জ্যাঁ ভালজাঁ চুপি-চুপি ঘরের দামী রূপোর বাতিদান, খানা-কামরায় রাখা রূপোর দামী বাসনকোশন—সব চুরি করে পুঁটলীর মধ্যে পুরে গীর্জ্জার পাঁচিল টপকে পথে বেরুলো।

পরের দিন সকালে বিশপের লোকজন মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে—রূপোর বাসনকোশন আর বাতিদান চুরি গিয়েছে এবং রাতের অতিথি ফেরার! বিশপ কিন্তু বিন্দু-মাত্র বিচলিত হলেন না। এমন সময় সহরের পুলিশ-দারোগা জ্যাভার্ট আর তার শান্ত্রীরা বিশপের কাছে বামাল-সমেত পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে এনে হাজির করলো দাগী-চোর জ্যাঁ ভালজাঁকে। জ্যাভার্ট জানালো—এ হলো দাগী-চোর…এই সব জিনিষ দেখে ওকে পাকড়েছি! তবে এ বলছে—বিশপ এগুলি ওকে দিয়েছেন!…জ্যাঁ ভালজাঁর দুর্দ্দশা দেখে বিশপ বললেন—হ্যাঁ, রূপোর এ সব জিনিষ তিনি ওকে উপহার দিয়েছেন…চুরি নয়—এ সব ওরই জিনিষ! বিশপের কথায় জ্যাঁ ভালজাঁকে মুক্তি দিলেও, দারোগা জ্যাভার্টের সন্দেহ কিন্তু কাটলো না। পুলিশ-শান্ত্রীরা বিদায় হতেই, জ্যাঁ ভালজাঁ কৃতজ্ঞতাভরে বিশপের কাছে মাথা নত করে জানালো যে, তাঁরই দয়ায় আজ সে কয়েদ থেকে রেহাই পেলো! বিশপ তাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করে রূপোর দামী বাসনগুলি তার হাতে তুলে দিলেন…উপদেশ দিলেন—এ সব বেচে যে টাকা পাবে, সে টাকায় ভালোভাবে কাজকর্ম্ম করে সাধু জীবন গড়ে তোলো!

বিশপের কাছে বিদায় নিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ রূপোর দামী জিনিষপত্র বেচে অনেক টাকা পেলো—সেই টাকা নিয়ে সে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়…মনে দারুণ অনুতাপ…খালি ভাবে, কি করে জীবনকে নতুন-ছাঁদে গড়ে তুলবে! এমনি চিন্তায় সে যখন বিভোর, তখন পিঠে-ভেক্কীর-বাক্স-ঝোলানো হাতে বেহালা নিয়ে ছোট্ট একটি বাজীকর-ছেলে সেখানে এসে পয়সা-লোফালুফি করে খেলা দেখাতে লাগলো। খেলার ফাঁকে হঠাৎ তার হাত ফশ্‌কে পয়সাটি গড়িয়ে এসে পড়লো জ্যাঁ ভালজাঁর পায়ের কাছে! অন্য-মনস্কভাবে না-দেখে জ্যাঁ ভালজাঁ পয়সাটিকে তার পায়ের তলায় মাড়িয়ে ধরলো। হারানো-পয়সার খোঁজে বাজীকর ছেলেটি এলো জ্যাঁ ভালজাঁর কাছে। বিরক্ত হয়ে হাতের লাঠি তুলে মারবার ভয় দেখিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ তাকে দিলে তাড়িয়ে! তাড়া খেয়ে ছেলেটি মনের দুঃখে চোখের জল ফেলে সেখান থেকে চলে গেল। সে চলে যাবার পর, জ্যাঁ ভালজাঁর হঠাৎ নজরে পড়লো—সে পয়সাটি তার পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে। মনে জাগলো দারুণ গ্লানি…কিন্তু সেই বেচারী বাজীকর-ছেলেটিকে খুঁজে পেলো না কোথাও! ভালজাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিশপের চেহারা…মনে পড়লো তাঁর উপদেশ—ভালো হয়ো…সাধু জীবন গড়ে তোলো!…ভালজাঁ ব্যাকুল হয়ে ছুটলো…পথে দেখা হলো আরেকজন পাদ্রীর সঙ্গে—কিন্তু সেই ছোট্ট বাজীকর-ছেলেটি?…তার কোনো সন্ধান মিললো না! পাগলের মতো পকেট থেকে মুঠো-মুঠো টাকা বার করে পথের সেই পাদ্রীর হাতে তুলে দিয়ে ভালজাঁ অনুরোধ জানালো,—এ টাকা দুঃখী-গরীবদের দেবেন!…এই বলে উন্মাদের মতো সে আবার চললো পথে!

কাজকর্ম্ম করে সৎভাবে জীবন কাটাবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ সহরে-সহরে ঘুরে বেড়ায়…কিন্তু জেল-খানার দাগী-কয়েদীর হল্‌দে-টিকিটের দরুণ কোথাও তার চাকরি জোটে না। ক্রমে বিশপের রূপোর বাসন-বিক্রীর টাকা—তাও সব খরচ হয়ে গেল।

এমনিভাবে জ্যাঁ ভালজাঁ যখন ফ্রান্সের এম্-স্যুর্-এম্ সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন হঠাৎ একদিন শুনলো প্রচণ্ড কলরব—আগুন! আগুন! বাড়ীতে আগুন লেগেছে! …জ্যাঁ ভালজাঁ ছুটলো জ্বলন্ত বাড়ীর দিকে…কানে এলো এক মহিলার করুণ-আর্ত্তনাদ—ওগো কে আছো…বাঁচাও …আমার বাচ্ছা দুটো রয়েছে ঐ জ্বলন্ত বাড়ীতে…

চীৎকার শুনে, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে জ্যাঁ ভালজাঁ ছুটে গেল পথের পাশে সেই জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে…বহুকষ্টে লেলিহান-অগ্নিস্তূপের মধ্য থেকে বুকে পুরে আনলো দুটি অসহায় শিশুকে! সহরের লোক তার এই সাহস দেখে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো। শিশুদের মা-বাপ অর্থাৎ সেই মহিলার স্বামী সহরের জুতো-চুনার কারখানার মালিক—তাঁরা স্বামীস্ত্রী সাদরে জ্যাঁ ভালজাঁকে ডেকে তাঁদের কারখানায় চাকরিতে বাহাল করলেন।

সেই থেকে সুরু হলো জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়! আসল নাম গোপন করে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ নতুন নাম নিলে—ফাদার মাদ্‌লিন্! কর্ম্মপটুতার ফলে, কিছু-দিনের মধ্যেই তার পদোন্নতি আর আর্থিক-উন্নতি ঘটলো প্রচুর···শুধু কারখানায় নয়, সারা সহরে সে ক্রমশঃ হয়ে উঠলো এক বিশিষ্ট নাগরিক—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সে হলো সহরের 'মেয়র'! প্রচুর অর্থের সদ্ব্যবহার সে করে নানাভাবে—দীন-দরিদ্রকে অকাতরে সাহায্য-দান, স্কুল-হাসপাতাল গড়ে তোলা···সব রকমের জনহিতকর কাজেই সে অগ্রণী! সারা সহরের লোক তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে!

হঠাৎ ভাল্‌জাঁর এই শান্তি-সুখের জীবনে ভেসে এলো অশান্তির কালো মেঘ! দুর্দ্ধর্ষ-দারোগা জ্যাভার্ট বদলী হয়ে এলো এ সহরে পুলিশের কর্ত্তা হয়ে। ফাদার মাদ্‌লিনের চেহারা দেখে তার মনে সন্দেহ জাগলো—এ সেই ফেরারী দাগী-কয়েদী জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ···নাম-ভাঁড়িয়ে এখানে এসে থাশা জমিয়ে বসেছে! জ্যাভার্ট সারাক্ষণ ছায়ার মতো গোয়েন্দাগিরি সুরু করলো—ফাদার মাদ্‌লিনের আসল পরিচয় জানবার জন্য। ওদিকে দারোগা জ্যাভার্টকে দেখে ফাদার মাদ্‌লিন্-বেশী জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর মনেও রীতিমত দুশ্চিন্তা ···সে কৌশলে আত্ম-পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করে!

এমন সময় একদিন সহরের পথে মাল-বোঝাই একটা ঘোড়ার গাড়ীর চাকা ভেঙে গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে বুড়ো গাড়োয়ান ফোঁশল্‌ভা মারা যাবার উপক্রম। ফাদার মাদ্‌লিন্ সে পথে চলেছিলেন···তিনি এসে গায়ের জোরে কাঁধ দিয়ে ভাঙা-গাড়ীটাকে ঠেলে তার তলা থেকে বহু কষ্টে টেনে তুলে বুড়ো-গাড়োয়ান ফোঁশল্‌ভার প্রাণ বাঁচান। ফোঁশল্‌ভা কিন্তু ছিল মাদ্‌লিনের পরম শত্রু! কারণ, মাদ্‌লিন-বেশী জ্যাঁ ভালজাঁ ঝুটো-চুনী-তৈরীর কারখানায় যোগ দিয়ে একচেটিয়া কারবার চালানোর ফলে, ফোঁশলভার ব্যবসাতে প্রচুর লোকসান হচ্ছিল। তাই নিরুপায় হয়ে ফোঁশল্‌ভা শেষে ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে কোনমতে দিনগুজরান করছে—এমন সময় এই ঘটনা! সেদিন এই ঘটনার সময়, দারোগা জ্যাভার্টও হাজির ছিল সেখানে। সে লক্ষ্য করলে—প্রৌঢ় ফাদার মাদ্‌লিনের এই বিপুল দৈহিক শক্তি। এ দেখে তার দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে অসীম শক্তিশালী এই লোকটিই সেই ফেরারী-কয়েদী! কিন্তু প্রমাণাভাবে তাকে তখন গ্রেপ্তার করা গেল না।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে, চুনীর কারখানার এক রুগ্না গরীব-মজুরনী ফ্যান্‌টিন্‌কে কাজে গাফিলতীর দরুণ বরখাস্ত করার ফলে, সে মেয়েটি রাগে-আক্রোশে তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলো। শান্তিভঙ্গের অপরাধে সে মজুরনীটিকে গ্রেপ্তার করতে আসে দারোগা জ্যাভার্ট, কিন্তু ফাদার মাদ্‌লিনের মধ্যস্থতায় ফ্যান্‌টিন্ সেযাত্রা মুক্তি পায়। বাধা পেয়ে দারোগা জ্যাভার্টের আক্রোশ বাড়লো ফাদার মাদ্‌লিনের উপর। জ্যাভার্ট গোপনে চিঠি লিখে পুলিশের বড়কর্ত্তাকে জানালো তার সন্দেহের কথা!

ওদিকে ফাদার মাদ্‌লিন জানতে পারলেন যে দুঃখিনী ফ্যান্‌টিন্ রোগে মুমূর্ষু শয্যাশায়িনী। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে মাদ্‌লিন্-বেশী জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ফ্যান্‌টিনের শিশু-কন্যা কসেট্‌কে তিনি পালন করবেন। সংসারে কেউ নেই বলে, অসহায় ফ্যান্‌টিন্ কারখানায় কাজের সময় তার শিশু-কন্যাকে রেখেছিল থেনার্ডিয়ার নামে এক ধড়িবাজ অর্থ-পিশাচ পরিবারের কাছে। কসেট্‌কে দেখা-শুনোর অছিলায় থেনার্ডিয়ার আর তার স্ত্রী মোটা টাকা আদায় করতো প্রতি মাসে। তাই ফাদার মাদ্‌লিনের হাতে শিশু কসেটের ভার সঁপে দিয়ে দুঃখিনী ফ্যান্‌টিন্ শেষ নিশ্বাস ফেললো।

দারোগা জ্যাভার্ট ইতিমধ্যে পুলিশের বড়কর্ত্তার চিঠি পেলেন যে মাদ্‌লিন্‌কে ফেরারী-কয়েদী মনে করা ভুল, কারণ—সম্প্রতি তাঁরা জ্যাঁ ভাল্‌জাঁকে গ্রেপ্তার করে কুলি-খাটানোর জাহাজে নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এ খবর জেনে দারোগা জ্যাভার্ট সটান এলো ফাদার মাদ্‌লিন্‌কে পরখ করে দেখতে। তাঁকে সন্দেহের কথা প্রকাশ করে সে জানালো—দাগী-কয়েদীর গ্রেপ্তার এবং দ্বীপান্তরে-পাঠাবার সংবাদ। মাদ্‌লিন-বেশী জ্যাঁ ভালজাঁ এ কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না···তাঁর মনে দারুণ দাহ···মিছামিছি একজন নিরপরাধীকে এই কঠিন শাস্তি পেতে হবে!···সকলের অলক্ষ্যে তিনি পাড়ি দিলেন আরাস্ সহরের আদালতে—যেখানে সেই জ্যাঁ-ভালজাঁ-সন্দেহে গ্রেপ্তার-করা আসামীর বিচার চলছিল!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কেবল আজি হাসি

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

হা-হা-হি-হি বিকট হাসি
হাসছে গদাধর,
পাড়ার যত ছেলে ছিল
শুনে হাসির স্বর—
জুটল সবাই তারি কাছে
শুয়ে সে যেথা ঘরের মাঝে
এলায়ে কলেবর।
হাসো কেন ?—শুধায় সবে
তাকে নরম সুরে,
বিকট হাসির দস্তিপনা
মাথায় কেন ঘুরে !
কী হ'ল যে হাস্‌ছো এমন
গদাধরের খুশী কী মন
হাসির থালি জুড়ে !



কেবল আজি হাসি

উত্তরে সে বলে হেসে—
শুন্‌বে কেন হাসি !
আরস্থলা আজ ভেজে দিলেন
খেতে দিলেন মাসি।
থাম্‌বে এত সর্দ্দি শুনে—
খেলাম ন'টা গুণে গুণে
থাম্‌ল তাতে কাশী !
তাই তো হেথা শুয়ে শুয়ে
কেবল আজি হাসি !

সোনার হরিণ

শ্রীআশাবরী দেবী, বি-এ

রাজকুমারী মঞ্জু মুখখানি রাঙা কোরে বসে আছে—ভারী অভিমান হয়েছে তার।

রাজরাণীর একটিমাত্র মেয়ে মঞ্জু। সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্যন্ত কতো যে পাঠ নিতে হয় বেচারী মঞ্জুকে—তার আর ঠিক্ ঠিকানা নেই। বসা, চলা, হাসা,-কথা-কওয়া সবই ওকে মাপের মধ্যে আনতে হবে। তাছাড়া, রাজ কাজের ছোটো ছোটো ধাপগুলি এখন হতেই ক্রমশঃ পার হ'তে শিখচে ও। এতো বড়ো রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাণী যে মঞ্জুই হবে।

মঞ্জু ভারী সুন্দর দেখতে। সকলে বলে মঞ্জু চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। মঞ্জুর ঘন কালো চুলগুলি গভীর জলের ঢেউর মতো পাক খেয়ে খেয়ে পিঠের ওপর আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—আর ওর গোলাপী ঠোঁট দুটি যেন সর্বদাই অভিমানে রাঙা হয়ে ফুলে রয়েছে।

রোজ ভোরবেলা হ'তে একশো রকম সাজ-সজ্জা আর নানারকম আদব-কায়দার বোঝায় ছোট্ট মঞ্জু হাঁফিয়ে ওঠে একেবারে। প্রত্যেকদিন এই কলরব মঞ্জুর ভালো লাগে না আর। বেশী তার হাসা হবে না—হুকুম কোরবার সময় ভিন্ন জোরে সে কইবে না কথা—ওর হাঁটার ছন্দ হবে রাজহাঁসের গতিছন্দের তালে—আরও কত কিযে। এরপরও আছে বিপুল পড়াশোনা—নীরস রাজনীতির চর্চা।—আট বছরের মঞ্জুকে কি একবারটি ভুলতে দেবেনা যে সে রাজার মেয়ে—সেই হবে এই বিরাট রাজ্যের রাণী—?

আজ সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত মঞ্জুর পরীক্ষা ছিলো মহারাজা মহারাণীর কাছে। কিছুই পারেনি মঞ্জু—কিছু শেখেনি সে—মহারাজা মহারাণী তাইতে বকেছেন ওকে। অমনি দুলালী মেয়ে পালিয়ে নিজের ঘরে—সোনার কপাটে খিল দিয়ে—গালে হাত দিয়ে বসে আছে—ওর নীল চোখ দুটির ভ্রমরকালো কুঞ্চিত পল্লব বেয়ে অভিমান গলে পড়ছে।

শাস্তির পর প্রশ্রয় দেয়া নীতি নয়—তাই মহারাজা-মহারাণী ডাকেননি তাঁদের নয়নের মাণিককে—ভবিষ্যতে যে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হবে তার শিক্ষা তো সাধারণ আদর্শে ফেললে চলবে না।

মঞ্জুর মহলের ওর শোবার ঘরের কোণের দিকটায় একটি ছোট্ট নকল সরোবর—তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে পদ্মফুল ফুটেচে—লাল, সাদা, হলদে, গোলাপী···সমস্ত বাতাসটা সেই সুগন্ধে ভার হয়ে উঠেছে। বিকেল হ'তেই সখীরা এসে ওইখানটাতে সেতার আর বীণা, বাঁশী আর মৃদঙ্গ নিয়ে কলরবের স্রোত বইয়ে দেবে। এ পাশে হাতীর দাঁতের কালো সাদা আলমারীর ওপর হ'তে নীচ পর্যন্ত ঠাসা জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য আর সাহিত্যের সংখ্যাহীন বই—ও-গুলোয় পৃথিবীর সব সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের বর্ণনা রয়েচে। বড়ো হওয়ার আগেই সব শেষ কোরে ফেলতে হবে মঞ্জুকে। আর ওধারে মঞ্জুর খেলামহলের পেছনেই হাতীর দাঁতের

চিকে ঢাকা ঘোরানো বারেণ্ডা মহারাণীর মহলের দিকে চলে গেছে। কাকাতুয়া, টিয়া, চন্দনা, হীরামন সব সারে সারে সোনার দাঁড়ে খেলছে—সার বসানো সোনা, রূপা, স্ফটিকের পাত্রে দুলছে চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ আর রজনীগন্ধার দল।

ঘরের মেঝেয় মিশর দেশের গালিচা পাতা আছে। বইয়ের আলমারীর পাশে মণির জড়োয়াতোলা মেজ, তারই এদিকে ছোট্ট দরজাটা দিয়ে মঞ্জুর খেলাঘর। পুতুলের দর্শনী যেন একটা—খোকাপুতুল, বৌপুতুল, গিন্নিপুতুল, সেপাই-শান্ত্রী, বাজনদার, রাজপুত্র, কোটালপুত্র সকলেই আছে। আর আছে হাতীশালে জরীদার সাজে হাতী—ঘোড়াশালে ঘোড়া, আরও কতো কি! আড়ি কুড়ি বরং-বরের খেলনা পাতির মেলা—মঞ্জুর খেলাঘর কি অপরূপ সাজানো যে—পেছনের ঘোরানো বারেণ্ডার ফুলের মেলার মাঝে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চন্দনার মুখে মঞ্জুর নাম শুনেই খেলাঘরে ছুটে নেচে চলে আসে মঞ্জুর জীবন্ত খেলাগুলি হরিণ খরগোশ আর কাঠবেড়ালীগুলি। খেলাঘরের পুতুলগুলি সবই যে কি সুন্দর সাজ আর দেখতে! তবু শুধু হীরের গয়নাপরা মঞ্জুর আদরের মোমের বড়ো পুতুলটি মঞ্জুর খাটের ওপর বসে আছে; মঞ্জুর কাছেই ও শোয়।

দক্ষিণের মস্ত দেওয়াল জোড়া জানালার কাছে—মণিমুক্তোর ঝালর দেয়া মস্ত সোনার পালঙ্ক—তারি ওপর মঞ্জুরাণী গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

—জানালা দিয়ে—বাইরে···নীচে রাজবাড়ীর বিরাট বাগানের খানিকটা মঞ্জুর জানালার নীচে পর্যন্ত বাড়ানো রয়েছে। বাগানের প্রাচীর শেষ হয়েছে নদীর ধারেতে গিয়ে। নদীতীরের রহস্য ঢাকা ঘন বন বীথিকা দেখা যায় না। দূরে দিগন্তে নদীর ক্রমশঃ মিলিয়ে-যাওয়া রেখার শেষ টান পাটে বসা সূর্যের ছটা লেগে চিক্ চিক্ কোরছে।

এক সময় মঞ্জুর চোখ পড়লো নীচে বাগানের প্রাচীরের গায়ে ঝুমকো-লতার ঝোপের ফাঁকে ইট খসে পড়ে ফেটে একটা ফাটল ধরেছে।—সেই ফাঁকের মধ্য হ'তে একটি ছোট্ট মুখের ওপর দুটি নীল চোখ অবাক হয়ে ওর মুখের পানে অপলক চেয়ে আছে।

এক নিমিষে ভারী ভালো লাগলো মঞ্জুর। চোখের জল মুছে ফেললো ও। তারপর জানালা দিয়ে ঝুঁকে ডাকলো হাতছানি দিয়ে। উজ্জ্বল হাসি আর বিস্ময় উপচে-পড়া মুখে এবার একটি ছোট্ট মেয়ে ফাটল দিয়ে বাগানের ভেতর গলে এলো। মেয়েটি মঞ্জুরই বয়সী হবে—পিঠের সাথে একটি চ্যাঙড়ী—হাতের ছিপ দিয়ে একটা জালের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

এদিকে দরজায় সখীরা এসে ঘা দিচ্ছে:—মঞ্জুরাণী, মঞ্জুদেবী, রাজকুমারি! দোর খুলুন—।

মঞ্জু ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললো:—তোমার নাম কি? ও বললো: মনুয়া,—আর তোমার?

মঞ্জু বললো: মঞ্জু। কালকে আবার এসো কিন্তু। মহারাজা মহারাণীর কাছে খবর গেলো যে সেদিন হ'তে পাঠে ভারী মনোযোগ হয়েচে রাজকুমারী—মঞ্জু এবার নিয়মিত পড়াশোনা শুরু কোরেচে আবার নাকি একলা পড়লে—পড়া ভালো হয়, তাই রোজ দোরে খিল দিয়ে পড়াশোনা করে।

ওপর জানালায় মঞ্জু আর নীচে বাগানে ঝুমকো ঝোপের পাশে লতা আর ফুলের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনুয়া—ওদের বন্ধুত্ব আকাশের তারা ফুলের মতো দুর্লভ সুন্দর।

মনুয়া বললো: রাজকুমারি ভাই। তুমি কি পরীর দেশে থাকতে আগে? তোমার মতো এতো সুন্দর—এতো ভালো মেয়ে কোথাও নেই।—তোমার মাথার মুকুটটা কি দিয়ে বানানো ভাই?—আর মালার গোল আলোর মতো ফুলটা—?

মঞ্জু বললো: ভাই মনুয়া! তুমি আমাকে মঞ্জু বোলো, আমার নাম মঞ্জু কিনা।—তোমার পিঠের ডালাটা কি সুন্দর দেখতে—আর ঐ কাপড়টা ফুটো-ফুটো করা?

মনুয়া বিপুল বিস্ময়ে দুই চোখ মেলে মঞ্জুর ঐশ্বর্যের বেষ্টনে উজ্জ্বলতর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে একান্ত শ্রদ্ধাভরে। শুভ্র নিটোল মুখখানির দুপাশ ছেয়ে ভ্রমর কালো কুঞ্চিত কেশের আকুল ঢেউ······কাণে মাথায়, গলায়—হাতে হীরে মোতী ঝলমল কোরছে। মঞ্জুর রত্ন নূপুরের রুনু-ঝুনু ও যেন শুনতে পায় মনুয়া। এই তো তার চিরকালের মনে মনে গড়া স্বপন-পুরীর রাজকন্যা। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস কোরতে পারে না মনুয়া···কল্পনা করে সেও যেন মঞ্জুর হাত ধরে পাশাপাশি ঐ স্ফটিকের ওপর ঝকঝকানো পাথরের আল্পনা-পদ্ম-লতা-পাতা-কাটা বিচিত্র হাতীর দাঁতে আর চুনি-পান্নাতে মোড়া জানালাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জু অবাক হয়ে ভাবে—সত্যি মনুয়া কি সুন্দর মিষ্টি দেখতে। এমন সে দেখেনি কখনো—চোখের ওপর সোনালী রুক্ষ চুল এসে পোড়ছে কেবলি—খোঁপায়—খোঁপায়—হীরে মুক্তো কিছুরই ফুলের সঙ্গে যে বাঁধা নেই সেগুলি। আর রাঙারাঙা ঠোঁট দুটির মধ্যে শুভ্র সুন্দর, সরল হাসিটি···কৌতূহলে বড়ো-বড়ো কালো চোখের মণি দুটি অকারণেই নেচে ওঠে। মনুয়ার গায়েতে কি চমৎকার জালের তৈরী জামা ছিঁড়ে গেছে এখেনে-ওখেনে···হাতে বালো—পায়ে ধুলো। মঞ্জু মনে মনে ভাবে জেলের মেয়ে মনুয়ার হাত ধোরে বাগানের ঐ ফাটল পেরিয়ে···নদীর তীর বেয়ে ও যেখানে খুশী গেলো—যতোক্ষণ খুশী বেড়িয়ে এলো—গল্প করলো! আহা! ওর চিরকালের শোনা আর বইয়ে পড়া কল্পনার দুঃসাহসী মেয়ের রূপ।···একান্ত মুগ্ধ হ'য়ে আগ্রহভরে ভাবে মঞ্জু।

কতো কথাই যে হয় দুইজনে। অর্থহীন হাসিভরা সব কথা। মঞ্জু বলে: ভাই মনুয়া! তোমাকে আমার বড্ড ভালো লাগে। তুমি কি সুন্দর গল্প বলো—কতো কি জানো—জানো-না ভাই? তুমি কি আমার কাছে থাকবে? খেলাঘরে শুধু তুমি আর আমি খেলা কোরবো? বকুল, পারুল—হেনাদের আসতে বারণ কোরে দেবো—।

মনুয়া হেসে ওপরের দিকে চায়, তারপর ব্যগ্র হয়ে বলে ওঠে: ভাই মঞ্জু। তোমাকে না দেখে থাকা যায় না এমনসুন্দর তুমি ভাই—মনে হয় যেন তুমি দেবতাদের মেয়ে।···এই বাগানটা পেরিয়ে গেলেই কতো

এ সব জায়গা আছে—অনেক ফুল ফোটে সেখানে…তোমায় সেখানে বসিয়ে মালা গেঁথে পরিয়ে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে ভাই! যদি ভাই, একবারটি আমার সঙ্গে আসো—সব দেখিয়ে আনবো।—মাছ ধরতে শিখিয়ে দেবো…ডালা বানাতে—নৌকা বাইতে—সব! আসবে ভাই মঞ্জু?

—আবার একটু ভেবে মনুয়া বলে: আচ্ছা ভাই মঞ্জু। কোনদিক্ দিয়ে আসবো তোমার কাছে? তোমার সুন্দর ঘরে আমি এই ধুলো পায়ে যেতে পারবো তো ভাই? তোমার মা আমায় দেখে কিছু বলবেন না তো ভাই?

মঞ্জু এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারে না—ওর মুখখানি ম্লান হয়ে আসে।

শেষকালে দুই বন্ধু পরস্পরকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। অনেক ভীরু পরামর্শের পর ওরা ব্যবধান সরিয়ে দেবে স্থির করলো। পরদিন মনুয়া নিয়ে এলো আপন হাতে বোনা এক জালের দড়ির সিঁড়ি—নিপুণ হাতে ছুঁড়ে ফেললো মঞ্জুর জানালায়।

মনুয়া বললো: মঞ্জু ভাই! নেমে এসো নীচে!

মঞ্জু বললো: মনুয়া ভাই? তুমি ওপরে উঠে এসো না?

……মঞ্জুর মন দুলে ওঠে মনুয়ার ডাকে—মনুয়ার হাত ধোরে সবুজ নদীতীর বেয়ে যাওয়া—কতো বন—কতো পাহাড়! মনুয়া কতো ফুল—কতো ফল নিয়ে আসবে:—আকাশে পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ উঠলে, ও আর মনুয়া নৌকো কোরে নদীর ওপর দিয়ে পাড়ি জমিয়ে জলপরীদের দেশে চলে যাবে। অসীম, অবাধ নীল আকাশ ছেয়ে কতো মেঘ ছড়িয়ে থাকবে…কল্পনার সম্পূর্ণ ছবিটি।

……মনুয়ার পাদুটি থরথর কোরে কাঁপছে: একবারটি ও যাবে মঞ্জুর ঘরেতে গিয়ে দাঁড়াবে, তার সব দৈন্য অপূর্ণতা ভুলে রাজকুমারীর মহলে…সেই স্বপন-পুরীর রাজ্যে? দেওয়ালে, মেঝেতে শুধু হীরে মুক্তোর ফুল……কতো পুতুল…কতো খেলনা। আর রাজকুমারী মঞ্জুর সাজ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্তখানিই যে ঝলমল করে…কতো রকম আলো-ঠিকরোনো রং তার—সোনালী, রূপোলী, নীল—সবুজ…। হীরের গয়নাপরা মঞ্জুর বুকে-থাকা ঐ গোলাপী গাল, সোনালী-চুল মস্ত হাসিমুখ,চেয়ে-থাকা পুতুলটিকে মনুয়াও যে মঞ্জুর মতোই ভালোবাসে। …বড্ড বড্ড আদর কোরতে ইচ্ছে করে তাকে একবার বুকে নিয়ে। মঞ্জুর একশো সখীর নাচ গান—আলো উচ্ছসিত ঘর থেকে ভেসে আসে… কতোদিন শুনেছে মনুয়া অন্ধকারে প্রাচীরের ফাটলের চোখ রেখে উন্মুখ বেদনাতুর হৃদয়ের সবটুকু আগ্রহ দিয়ে…কি আশ্চর্য সুর আর ঝঙ্কার! প্রত্যেকদিনকার স্বপ্নে-দেখা ঐ পরীর দেশে এখুনি মনুয়া সবটুকু নীল আকাশ, সবুজ বনের আলো-হাওয়া আর উধাও নদীর স্রোত ফেলে চলে আসতে পারে।

মঞ্জু বললো: মনুয়া ভাই! আসবো নীচে?

মনুয়া বললো: মঞ্জু ভাই! উঠবো ওপরে?

দুটি বন্ধু—হীরের মালা আর বনের ফুল শঙ্কামাখা হাসিমুখে ওপরে আর নীচে সিঁড়ির দুটি প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে মহারাজা-মহারাণী এসে ঢুকলেন ঘরে—মঞ্জু মুক্তির প্রত্যাশায় আনন্দের ব্যগ্রতায় খিল দিতে ভুলে গেছিলো।

ওদিকে ভীরু পা ফেলে হারিয়ে-যাওয়া মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত জেলেজেলেনীর প্রাচীরের ফাটল দিয়ে ঢুকছে রাজ-বাগানের ভিতর।

আপনহারা হ'য়ে মঞ্জু আর মনুয়া দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হঠাৎ মঞ্জু বলে ওঠে: মনুয়া ভাই—আমি আসছি। অমনি মনুয়াও বলে উঠলো:—আমিও আসছি মঞ্জুভাই।

সিঁড়ির ধাপে যেই পা ফেলতে যাবে মঞ্জু মহারাণী ওকে ব্যাকুল আবেগে জড়িয়ে ধরলেন দুহাতে। স্নেহগম্ভীর স্বরে মহারাজা বোললেন: এ কী মঞ্জু মা! তুমি যে রাজকুমারী—শিক্ষা তোমার ভুল হোলো কী?… কোথা হ'তে এলো এই নীচ জাতের মেয়েটা? ক্ষুব্ধ স্বরে মহারাণী বলে ওঠেন মঞ্জুর চোখের জলের ধারা আঁচলে মুছে নিতে নিতে।

জেলে হিঁচড়ে নিয়ে এলো মেয়েকে…জেলেনী কপাল চাপড়ে বলে ওঠে: পথের কাঙাল হ'য়ে রাজার ঘরে কেন ঢুকেছিলি রে হতভাগী? মনুয়া চীৎকার কোরে কাঁদতে কাঁদতে সিড়িটা চেপে ধরতেই—পুরানো দড়ির সিঁড়িটা আচম্‌কা ছিঁড়ে পড়ে গেলো।

পরদিন সকালেই রাজমিস্ত্রী এসে প্রাচীরের ফাটল মেরামতী শুরু কোরলো। ততোক্ষণে তার দুই পাশে মঞ্জু আর মনুয়ার চোখের জলের জমাট বিন্দুগুলি শুকিয়ে গেছে।

শরৎ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আবার মাঠের সবুজ গালিচা পরে
উজল রোদের সোনালি মধু যে ঝরে।
আবার আকাশে তুলোট মেঘের ছক।
নদী চরে সারি দেয় এক ঠেঙে বক।

দু-চার মাইল রেল লাইনের ধারে
কাশরা এ ওর গায়ে পড়ে বারে বারে।
ঘুমপাড়ানির রিম ঝিম্ ঝিম্ গান
গেয়ে গেয়ে রাতে ঝিল্লীরা হয়রাণ।

অশথের শিরে শালিখ শিশুর ডাক।
মিছিল করিছে কবুতর সাত ঝাঁক।

হলুদ বরণ প্রজাপতি উড়ে আসে।
গঙ্গা ফড়িং ডিগবাজি খেয়ে থামে।

অপরাজিতার নীলবড়ি রঙ থামে
শরতের চিঠি এসেছে সবার নামে।

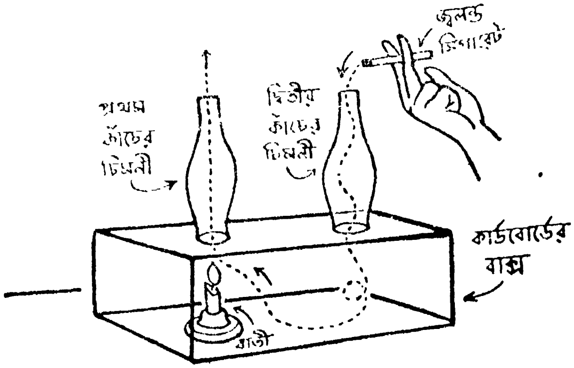


চিত্রগুপ্ত বিরচিত

ধোঁয়া নামে নীচে :

ধোঁয়া উপরে ওঠে—এই হলো নিয়ম। কিন্তু এবারে যে মজার খেলার কথা বলবো—তাতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে—অর্থাৎ ধোঁয়া উপরে না উঠে, নীচে নামে! কি করে এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটে—তাই বলছি।

একটা কার্ডবোর্ডের তৈরী ছোট বাক্স নাও…সেটাকে মেঝেয় কিম্বা টেবিলের উপরে উপুড় করে রাখো—অর্থাৎ বাক্সের যে মুখ খোলা, সেদিকটা থাকবে নীচের দিকে এবং বন্ধ-দিক থাকবে উপর দিকে। বাক্সের উপর দিকে অর্থাৎ বন্ধ দিকটিতে দুটি ছোট গর্ত করতে হবে। এবারে বাক্সের ভিতরে বাঁ দিকে রাখো একটি জ্বলন্ত বাতি, আর বাক্সের উপরদিকে যে দুটি গর্ত বানিয়েছো, সেই গর্ত দুটির মুখে বসাও দুটি কাচের চিমনি—নীচের ছবিতে



যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে। তবে সাবধান, জ্বলন্ত বাতির আগুন যেন বাক্সে না লাগে! দেখবে জ্বলন্ত বাতির ধোঁয়া, বাতির উপরে বাঁদিককার চিমনী দিয়ে উপরে উঠছে। এবারে ডানদিককার চিমনীর মুখে এক টুকরো জ্বলন্ত সিগারেট বা ধূপকাঠি ধরো…দেখবে—সিগারেট বা ধূপের ধোঁয়া ডানদিকের চিমনী দিয়ে নীচে নামবে।

কেন এমন হয়, জানো? জ্বলন্ত সিগারেট বা ধূপকাঠি ধরবার আগে বাতির ধোঁয়া বাঁদিককার চিমনীর মুখ দিয়ে উপরে উঠছিল—ধোঁয়া উপরে ওঠবার বাতাস পাচ্ছে ডানদিককার চিমনির মুখ দিয়ে। এখন ডানদিককার চিমনীর উপরে জ্বলন্ত সিগারেট বা ধূপকাঠি ধরবামাত্র শোষণের (Suction) অতিরিক্ত আকর্ষণে সিগারেটের ধোঁয়া সবলে নীচে নামে।

বোতল-কামান :

এবারে যে খেলাটির কথা বলবো—সেটিও ভারী মজার। এ-খেলাটি দেখাতে হলে সরঞ্জাম চাই—একটি ছিপিখোলা খালি বোতল, খানিকটা সুরাসার বা ভিনিগার (Vinegar), খানিকটা খাবার গুঁড়ো-সোডা (Bi-carbonate of Soda) কিম্বা 'বেকিং পাউডার' (Baking Powder), এক টুকরো পাতলা কাগজ আর দুটো গোল পেন্সিল।

সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, বোতলের মধ্যে এমন ভাবে খানিকটা সুরাসার বা 'ভিনিগার' ভরো যে বোতলটি কাং করে মেঝে বা টেবিলের উপর শুইয়ে দিলে ভিতর-কার আরকটুকু যেন বাইরে এতটুকু না পড়ে যায়। এবারে বেশ খানিকটা 'বেকিং-পাউডার' কিম্বা গুঁড়ো-সোডা ঐ পাতলা কাগজের ঠোঙায় মুড়ে এবং সে ঠোঙার দুদিকের মুখ ভাল করে পাকিয়ে বন্ধ করে এঁটে দিয়ে 'ভিনিগার' ভরা বোতলটির মধ্যে সেঁধিয়ে দাও। কাগজের এই মোড়কটিকে বোতলের মধ্যে রেখেই তাড়াতাড়ি বোতলের মুখে ছিপি এঁটে, বোতলটিকে কাং করে শুইয়ে দাও ঐ দুটি পেন্সিলের উপরে। দেখবে, একটু পরেই কামান বন্দুকের মতোই বিকট আওয়াজ করে বিদ্যুৎ-বেগে বোতলের মুখে আঁটা ঐ ছিপিটি ছুটে বেরিয়ে



পরে দূরে সরে যাবে সেই দ্রুতগতির দাপটে বোতলটিও খুদে-কামানের মতোই পেন্সিলের উপরে গড়িয়ে পিছু হটবে।

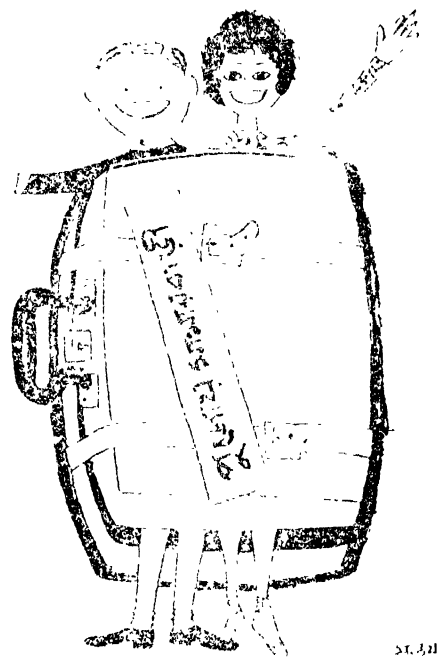
এ ব্যাপার কেন ঘটে, জানো?…বোতলের মধ্যে ভিনিগার আর গুঁড়ো-সোডার সংমিশ্রণে জন্মায় একরাশ কার্বন-ডায়োক্সাইড গ্যাস (Carbon Dioxide Gas) বাষ্প…সেই গ্যাসের চাপে কামানের গোলার মতোই সশব্দে এবং ক্ষিপ্রগতিতে বোতলের মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় ঐ এঁটে-বন্ধ-করা ছিপি। তাই এ মজার খেলাটির নাম—'বোতল-কামান'!

মুখোশ

মলয় রায়চৌধুরী

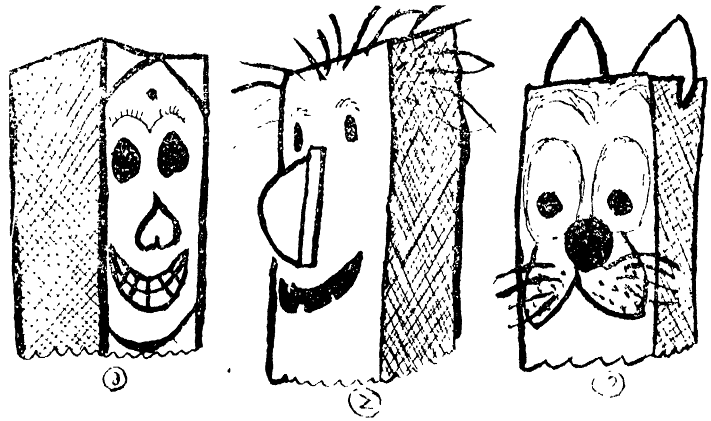
আজ তোমাদের মুখোশ তৈরী করতে শেখাই। দেখো কত সহজে তুমি নিজেই একটা মুখোশ তৈরী করে নিতে পারো, বাজার থেকে আর তাহলে কিনতে হবে না।

তোমাদের বাড়ীতে পিজবোর্ডের বাক্স আসে নিশ্চয়ই—ওই যে, বাজার থেকে কাপড়, জামা, জুতো এই সব কিনলে একটা বাক্স দেয়, সেই ধরণেরই একটা বাক্স যোগাড় কর। এই বাক্সটা থেকেই হবে তোমার মুখোশ। এখন দেখ বাক্সটা তোমার মুখের সঙ্গে খাপ খায় কিনা; যদি হয় তাহলে কাঁচি দিয়ে বাক্সটার নীচের দিকটা—যে দিকটা কাটলে বাক্সটা গলাতে আটকাবে না সেই দিকটা এবং মুখোশের পেছন দিকটা কেটে ফেল। মুখোশের ছবিগুলো

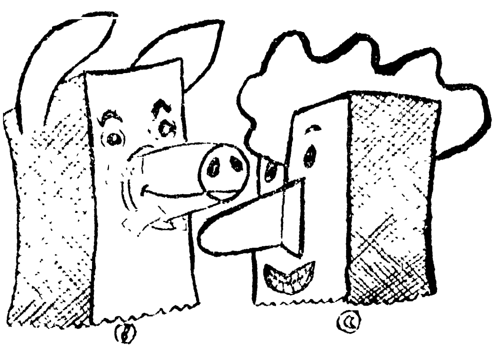


দেখলেই বুঝতে পারবে। এখন বাক্সটার রইল কেবল চারটে দিক—মাথার ওপর, মুখের দিকটা—যা সামনে থাকবে আর দুদিকের কানের দিকের দুটো পাশ। এবার বাক্সটায় চোখের জায়গা দুটোয় আর নাকের কাছটা ছেঁদা করে নাও। ব্যস হয়ে গেল মুখোশ।

কিন্তু তুমি যদি ঠিক কেনা মুখোশের মতোই তৈরী করতে চাও তাহলে ছবিগুলো দেখ, কি রকম মুখোশ চাও। সামনে দিকটা এঁকে নিতে পারো, ১ আর ৩এ যেমন আছে। ৩ আর ২এ যে গোঁফ আর চুল রয়েছে সেগুলো নারকোল ছোবড়া থেকে আঁশ বের করে আঠা



দিয়ে এঁটে দিলেই হল। ২ আর ৫ এর মতো নাক তৈরী করতে ইচ্ছে হলে ঠিক ওই রকম করে একটা পিজবোর্ড কেটে নাও, তারপর সোজাসুজি এঁটে দাও দু-পাশে কাগজ সেঁটে। ৪ এর মতো নাক তৈরী করতে হলে ওই ধরণের গোল কৌটো বা আইসক্রীম-এর কাপকে উল্টে কাগজে আঠা লাগিয়ে সেঁটে দাও আর নাকের ফুটো করে নাও। ছবিতে যেমন আছে তেমন করে একটা কালো সুতো পরিয়ে দিতে পারো, সেটা লাগাম হবে। ৩ এবং ৪এর মতো কান বা ৫ এর মতো মাথাটা যদি উঁচু করতে চাও



তাহলে ছবির মতো করে পিজবোর্ড কেটে নাও, তারপর বাক্সটার কানের দিকটা ব্লেড দিয়ে একটু কেটে পিজ-বোর্ডের কান দুটো ঢুকিয়ে দাও। ইচ্ছে হলে নাকটা যেমন করে কাগজ দিয়ে এঁটেছো, কানটাও তেমনি করে এঁটে নিতে পারো। মুখ, ভুরু ইত্যাদি এঁকে নিলেই হবে।

তাহলে বুঝতে পারছো যে মুখোস তৈরী করা যায় বাড়ীতে বসেই, কোনও অসুবিধে নেই অথচ কিনতেও হবে না। আর তা ছাড়া নিজে সব জিনিস করলে বেশ আনন্দও হয়। ছবিতে যেমন আছে তেমনি যে কোনও একটা মুখোশ তুমি এখন নিজেই তৈরী করতে পারবে, ইচ্ছে হলে নিজের মতো করে মুখ চোখ কান তৈরী করতে পারো, তাতে আরও মজা!

এবার দুদিকে সুতো বেঁধে পরে নাও, মুখের মাপে-মাপে হলে যদি খুলে না পড়ে যায় তাহলে সুতোরও দরকার নেই।

চোখ গেল

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

গহন গভীর অগাধ বনতল,
শাখা পত্রে জটীল জটাদল।
মাটীর তলে শিকড় শতমূল
লক্ষ প্রাণের বন্ধনে ব্যাকুল।

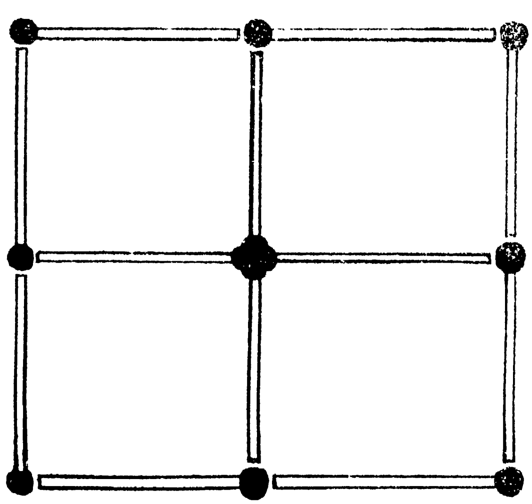
রাত্রি নিথর গন্ধ মদির বায়,
পুষ্প লতায় রোমাঞ্চ জাগায়,
হঠাৎ ও কার কাতর কাকলি?
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল

মিষ্টি মধুর সুরের মিতালি,
কান্না করুণ ব্যথায় ছল ছল।
ব্যাকুল পাখী বৃক্ষ শাখান্তরে,
ক্ষুব্ধ স্বরে অন্বেষিছে কারে ?
চক্ষে কি তার অশ্রু অবিরল ?
অন্ধকারে সিক্ত করে মাটী।
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল,
রাতের পাখীর চক্ষে ঝরে জল।
কদম্ব বন রোমাঞ্চে নিঝুম।
পাপিয়া তোমার নেই কি চোখে ঘুম।
রাত্রি বেলা একি চোখের ব্যথা,
স্তব্ধ বনের চঞ্চল নীরবতা ?

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

দিবাকর গুপ্ত

দেশলাইয়ের কাঠির ধাঁধা ঃ



উপরের ছবিতে বারোটি দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে যে ছকটি রচনা করা হয়েছে, তাতে চারটি চতুষ্কোণ ফাঁকা ঘর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছো। ধরো, তোমাকে যদি বলা যায়, দেশলাইয়ের বাক্স থেকে আর কোনো বাড়তি কাঠি ব্যবহার না করে, শুধু ঐ বারোটি কাঠিকে নতুন ধরণে সাজিয়ে পাঁচটি চতুষ্কোণওয়ালা একটি ছক রচনা করতে—তাহলে তুমি কিভাবে মাত্র ঐ বারোটি দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে নতুন ছকটিকে বানাবে ? বারোটি দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে নতুন এই চতুষ্কোণ-ছকের পাঁচটি ঘরের প্রত্যেকটি যেন আগাগোড়া ফাঁকা থাকে—এ নিয়মটি কিন্তু বিশেষভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া আরো মনে রাখতে হবে যে—পাঁচটি ফাঁকা-চতুষ্কোণ রচনার সময় মাত্র বারোটি দেশলাইয়ের কাঠিই ব্যবহার করতে হবে এবং এ বারোটি কাঠিই যেন বরাবর অটুট-অক্ষত থাকে···কোনো কাঠিই ভেঙে টুকরো করা কিম্বা একটিও নতুন কাঠি যোগ দেওয়া চলবে না! তবে, এই নতুন ছকের পাঁচটি চতুষ্কোণের প্রত্যেকটিই যে সমান আকারের হবে—এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই···কোনো ঘর ছোট কিম্বা কোনো ঘর বড়—এ ধরণের হলেও চলবে। মোট কথা, সংখ্যায় পাঁচটি ফাঁকা-চতুষ্কোণ থাকা চাই এই নতুন ছকে—এই হলো আসল ধাঁধা! এবারে দেখো তো চেষ্টা করে তোমরা—এই বিচিত্র ধাঁধার মীমাংসা করতে পারো কিনা!

সিঁড়ির হেঁয়া

অনেক-তলা বাড়ী। নীচের তলা থেকে দোতলায় উঠতে ২৬টি সিঁড়ি; দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে ২০টি সিঁড়ি; তিনতলা থেকে চারতলায় উঠতে ১৮টি সিঁড়ি; চারতলা থেকে পাঁচতলায় উঠতে ১৮টি সিঁড়ি; পাঁচতলা থেকে ছ'তলায় উঠতে ১৬টি সিঁড়ি—তার উপরেও আছে আরো তলা। নীচের তলা থেকে সব-উপরের তলায় উঠতে সর্ব্বসমেত ১১০টি সিঁড়ি।

এক ভদ্রলোক ৫৬টি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলেন, উঠেই আবার ১৮টি সিঁড়ি নামলেন···নেমেই তিনি এলেন পাঁচতলায়! বলো দিকিন, তিনি কোন তলা থেকে সিঁড়ি ওঠা সুরু করেছিলেন ?···

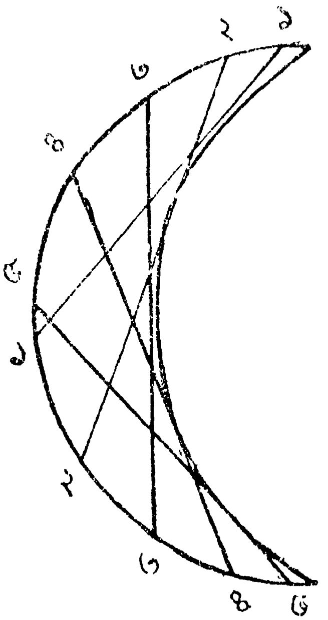
কিশোর-জগতের সভ্যদের রচিত ধাঁধা

রচনা :—বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন

১। সমান মাপের ছটি বল আছে। তা'র মধ্যে

একটি অন্যগুলির চেয়ে ওজনে সামান্য একটু বেশী ভারী। শুধু একটি দাঁড়িপাল্লা তোমাকে দেওয়া হ'লো। আর কিছু নেই। মাত্র তু'বার ওজন ক'রে ব'লে দিতে হবে, কোন বলটি বেশী ভারী। চেষ্টা ক'রে দেখো তো পার কি না।

ভাদ্রমাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর



১। উপরের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে—কি-ভাবে পাঁচটি রেখা টেনে চাঁদের ফালি কেটে টুকরো করতে হবে। এভাবে রেখা টেনে কাটতে পারলে চাঁদের ফালিকে অনায়াসেই একুশটি টুকরোতে ভাগ করা যাবে।

২। এক্সপ্রেস ট্রেণখানি সারা পথটুকুতে ২১ মিনিট এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানি যাত্রা সুরু করবার সময় ১৪ মিনিট আগে রওনা হচ্ছে। কাজেই হাওড়ার দিকে এগিয়ে চলার পথে এক্সপ্রেস ট্রেণখানি ⅔ অংশ যাবার পর প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানিকে ধরে ফেলবে এবং এ দুটি ট্রেণের একসঙ্গে দেখাদেখি যখন ঘটবে তখন ঘড়িতে সময় দেখাবে তিনটে!

"চাঁদের গায়ে ছুরি চালানো" ধাঁধার নির্ভুল উত্তর যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম :—

১। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। কুনু মিত্র (কলিকাতা)
৩। পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৪। দুলাল চন্দ (বর্দ্ধমান)
৫। রঞ্জনা, রঞ্জিত, বিশাখা ও সুদর্শন চক্রবর্তী (নিউ দিল্লী
৬। ছায়া, সন্ধ্যা, মুক্তি ও পাখী সেন (মধুপুর)
৭। মদন গঙ্গোপাধ্যায় (রায়পুর)

"দু'খানি ট্রেণের হেঁয়ালির" নির্ভুল উত্তর যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম :—

১। মুক্তিপ্রিয়া চক্রবর্তী (কামারপুকুর)
২। দেবকীকুমার নন্দী (জামগ্রাম)
৩। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৪। কাণু, শিপ্রা ও চিত্ত (জয়নগর)
৫। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৬। দুলাল চন্দ (বর্দ্ধমান)
৭। কুনু মিত্র (কলিকাতা)
৮। পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৯। ছায়া, সন্ধ্যা, মুক্তি ও পাখী সেন (মধুপুর)
১০। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা ঘোষ (কৃষ্ণনগর)

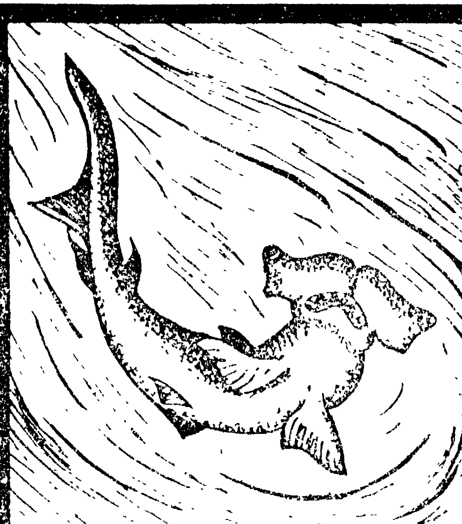


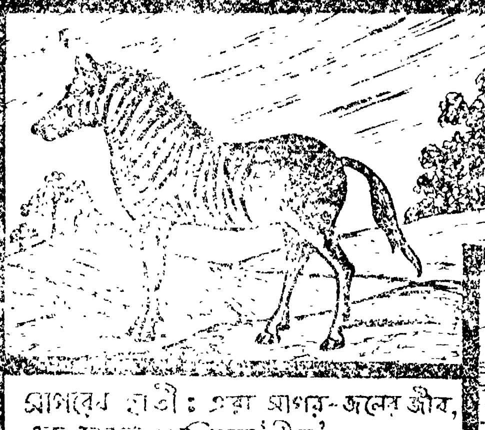
আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

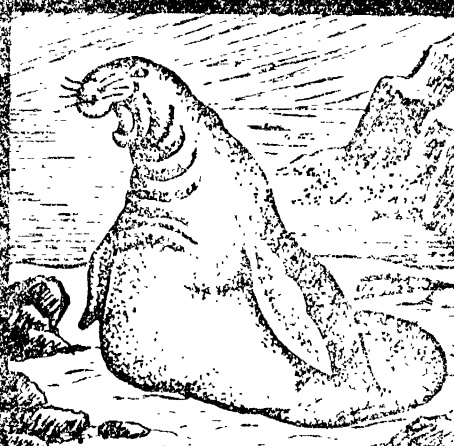
দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

হাতুড়ী-মুখো হাঙর: এরা একজাতের হিংস্র মাংসাশী হাঙর - এদের মাথার অংশের গড়ন হাতুড়ীর মতো ধরণের বলেই আকৃতি এমন ভয়াবহ-বীভৎস দেখায়। সাগর জলের বাসিন্দা ... সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সাগরের লোনা জলে এদের বাস। এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর বহু দূর থেকে শীকারের আন্দাজ করতে পারে এবং দ্রুতগতিতে সাঁতার দিয়ে পড়ে! এই ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জীবদের দেখা মেলে ভারত-মহাসাগরে আর ভূমধ্যসাগরে। এরা প্রবাল-দ্বীপগুলির কাছে থাকতে ভালবাসে। নানা জাতের হাঙরদের মধ্যে এরাই হলো সব চেয়ে ... হিংস্র ... ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মতো ... খাবারের সন্ধানে দল বেঁধে ঘোরে





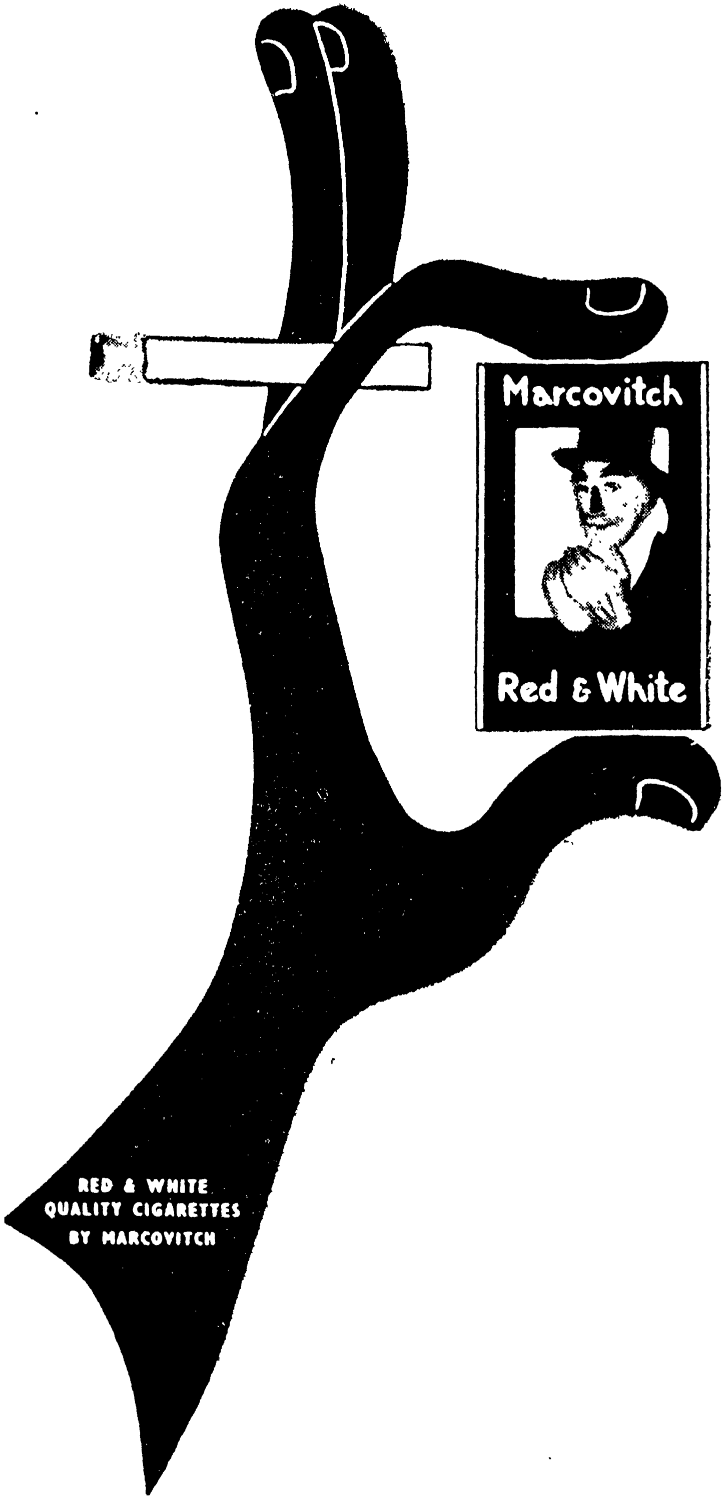
কুয়াগগা: এরা ঘোড়া আর জেব্রার গোত্রের জীব...দক্ষিণ-আফ্রিকার বন-জঙ্গলের বাসিন্দা। এদের সামনের দিক জেব্রার মতো আর পিছনের অংশ বুনো-ঘোড়ার মতো.. আজকাল এ সব জীব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে।



সাগরের হাতী: এরা সাগর-জলের জীব, এক জাতের অতিকায় 'সীল' বংশের মাংসাশী জলচর প্রাণী। এরা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ ... শীত-প্রধান মেরু-প্রদেশের সমুদ্র জলে বাস করে। এরা স্তন্যপায়ী জীব... আকারে প্রায় দশ-বারো হাত লম্বা হয়। এদের কান থাকে না, উপরের ঠোঁট হাতীর শুঁড়ের মত ঝোলানো, তাই এদের 'হাতী-সীল' নাম দেওয়া হয়েছে



গণ্ডার-পোকা: এরা হলো এক জাতের হিংস্র পোকা .. দেহটি মোটা খোলের আবরণে ঢাকা, মুখের দিকে রয়েছে শক্ত দাঁড়ার মতো ছুঁচালো দুটি শিঙ - গণ্ডারের শিঙ ও চামড়ার মতোই কঠিন


Marcovitch
Red & White
RED & WHITE
QUALITY CIGARETTES
BY MARCOVITCH



যোগী দেউল

শ্রী পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে—বড় মাঠটা পার হবার আগেই মেঘ উঠে এল হেঁড়ে কোণ থেকে।

দামোদরের ওপারে বিস্তীর্ণ মাঠ, শনিবার বাড়ী যাচ্ছিলাম। হাওড়ায় লোহার কারখানায় কাজ—রবিবারটাই যা ছুটি। দু'মাইল মাঠটা আলপথে পার হলে তবে গ্রাম—মাঠের মাঝামাঝি আসতেই ঝড় উঠে এল, ফাঁকা মাঠ আশ্রয় নেই কোথাও।

একেবারেই অসহায়, সঙ্গে ছাতাও নেই। হঠাৎ মনে পড়ল, রাস্তা ছেড়ে আধপো গেলেই মজা দামোদরের পাড়ে বটের নীচে ভাঙ্গা মন্দির আছে। কালো মেঘ ধূসর হ'য়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—ধুলোর ঝড় উঠেছে—রাস্তা ছেড়ে ওই ক্ষীণ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলাম—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেদ মেসিনে কাজ করি, একটু ছুটেই হাঁপিয়ে পড়লাম। পেছন ফিরে দেখলাম কে আর একজন একটা বোঝা নিয়ে ছুটেছে পিছন পিছন, ঐ শিবমন্দিরের আশ্রয়ের জন্তেই বোধ হয়। ধুলায় ধূসর বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ও অনেকটা এসে পড়েছে—একজন বাজরাওয়ালী।

বাজরাওয়ালী কথাটা এ দেশের কথা। বিধবা, আধবা অথবা নিরাশ্রয়া নীচু শ্রেণীর মেয়েরা অনেকে আনাজপত্র কিনে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে,—বা অন্য হাটে বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করে। এরা বাজরাওয়ালী নামে পরিচিত। এক হাট থেকে কপি কিনে অন্য হাটে নিয়ে যায়—বা এক বাজরা কপি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে দু'তিন টাকা মুনাফা পায়। এটা একমণ বোঝা বহনের পারিশ্রমিকও বলা যায়। যুবতী, বালিকা থেকে বৃদ্ধা এমন অনেক মেয়েই এই ব্যবসা করে—এই স্বাধীন ও বন্ধনহীন জীবন ও অর্থের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে স্খলন পতন না হয় এমন নয়। অন্যদিকে স্বাধীন সুন্দর পবিত্র জীবনযাপনও বিচিত্র নয়।

ছুটে যখন বিগ্রহহীন ভাঙ্গা দেউলের কাছাকাছি এসেছি তখন প্রবল ঝড়ের সঙ্গে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মত গায়ে বিঁধছে। বটের ছায়ায় ভাঙ্গা মন্দিরের বারান্দায় ঘনান্ধকার, হাতড়ে হাতড়ে উঠে দক্ষিণের বারান্দায় আশ্রয় নিলাম—এখানে পশ্চিমা বৃষ্টির ছাট্ কম। মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না—ফাটা ফাটা দেয়ালের মাঝে কত কি আছে—পিছনের দেয়াল অশ্বত্থের শেকড়ের চাপে ফেটে ফাঁক হয়ে আছে—বারান্দায় যদিও এতটুকু আলো আছে ভিতরে নিবিড় অন্ধকার।

ঝড় চল্‌ছে, বিদ্যুৎ হানছে—কিন্তু এই মাঠের মাঝে অতবড় বোঝাটা নিয়ে ও মেয়েটা কোথায় গেল! এতবড় মাঠ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ দেখি ও এসে গেছে—বোঝাটা নিয়ে আস্‌তে হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়।

বাজরাওয়ালী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—কে গো একটু আগে আগে এলে—বোঝাটা নামিয়ে দাও না—

বোঝাটা ধরে নামিয়ে দিলাম—সে হাতড়ে হাতড়ে উঠে এল, আমারই কাছে পশ্চিমের দেয়ালের কাছে। কাপড় নিংড়ে গা মুছে বললে,—তুমি লগেন নাকি গো?

আমার নাম নগেনই—বললুম—হ্যাঁ।

—তুমি আগে আগে আস্‌ছিলে, আমি দূর থেকেই চিনেছি—একেবারেই ভুলে গেলে লগেন—

আমার সঙ্গে কোন বাজরাওয়ালীর অন্ততঃ পরিচয় নেই জীবনে। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চল্‌ছে—বিদ্যুৎ হান্‌ছে তাই নিজেদের অস্তিত্ব বুঝতে পারছি! বিগ্রহহীন ভাঙ্গা দেউলে আমি আর ওই মেয়েটি—জানি না ও কে! বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া নয় বৃদ্ধা—

সে বললে—আজকাল রাতে ভাল দেখতে পাই না—রাতকানাই হ'য়েছি বোধ হয়, কি করে যাবো! আমি নীরব। হঠাৎ যেন আকাশ চিড়িক মেরে দু'ফাঁক হ'য়ে গেল—সে তীব্র আলোয় মনে হল ও স্বাস্থ্যবতী এবং সম্ভবতঃ আধাবয়সী হবে।

—শনিবারে বাড়ী যাচ্ছ—হ্যাঁ লগেন? হাট থেকেই বোঝাটা ভারী হ'য়েছে। তোমার মা বৌ সব ভাল আছে?

—হ্যাঁ—

—মাইনে কত পাও?

—টাকা আশি—

—বেশ, খেয়ে খরচে টাকা পঞ্চাশ বাড়ীতে আসে —না?

আমি নীরব—কথা বেশী বললেই হয়ত ভুলটা ভেঙ্গে যাবে।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ অমনি ছেড়ে গেলে লগেন—বলেও যেতে পারতে ত?

চুপ করে রইলাম—এই নগেন আর ওর জীবনের সাথে হয়ত কোন গোপনীয় যোগসূত্র আছে, জীবনের জটিল পথে সে সূত্র ছিন্ন হ'য়েছিল হয়ত কোন দিন। আজ অপরিচয় ও অন্ধকারের সুযোগে হয়ত তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রলোভন হল, চুপ করে রইলাম ওর জটিল জীবনের এই ফাটল-ধরা কাহিনীর সন্ধানে—

বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির ধারা—ভাঙ্গা দেউলের অন্ধকারে মুখোমুখা আমি আর ওই শ্রমজীবী মেয়েটি—চারি পাশ ঘিরে রয়েছে মানুষের জীবনকাহিনীর মত তিমিরাচ্ছন্ন আকাশ বাতাস।

বাজরাওয়ালী, দেয়ালের কাছে এসে বসে বললে,—তুমি ত পালিয়ে বিয়ে ক'রলে। ভাবলে, আমি জানতে পারলে হয়ত' বাধা দেব কিংবা রাগ করবো কিন্তু তাতে আমি ত খুব খুশী। তুমি বাজরাওয়ালীকে নিয়ে থাকবে ঘর সংসার করবে না এত আমি চাইনি লগেন। আর বিয়ে করলেই কি সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে হবে? চেনা জানা ত থাকতে পারে—

আমি চুপ করেই ছিলাম—বিড়ি খাওয়ার তেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু ধরাতে সাহস নেই, ম্যাচের কাঠির আলোয় যদি ওর ভুল ভেঙ্গে যায়, যদি চিনে ফেলে এ নগেন সে নগেন নয়।

—বৌ কেমন হল?

—ভালই—

—তোমার বৌকে দেখে এসেছি সেদিন,—আনাজ বিক্রি করে এলাম তোমাদের গাঁয়ে। তা বৌটি ভাল পেয়েছ বেশ আট-সাট গড়ন। মা'কে তোমাকে সেবা যত্ন করে ত?

—তা করে।

—তোমার শরীর ত খুব খারাপ হ'য়েছে মনে হয়, গলার স্বরও কেমন ভেঙ্গে গেছে। শুনেছিলাম কি যেন অসুখ হয়েছিল তোমার—

—টাইফয়েড—মিথ্যে কথা বল্লুম লোভে পড়ে।

—এখন ভাল ত? গায়ে বল পেয়েছ ত? ওই টাইফয়েডে ত মানুষকে ফোঁপরা করে দেয়—

—হ্যাঁ—ভাল।

ও ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে বললে, বিড়ি খাবে না? কাপড় ভিজে গেছে, হাওয়ায় শীতও ধরেছে।

সে কাছে এসে অন্ধকারে হাতড়ে আমার হাতটা ধরে বিড়ি দিল, দেশলাই জ্বালতেই মুখটা আড়াল করলাম। দেশলাই হাওয়ায় নিভে গেল—বললে, তুমি ধরাও নগেন—

আমি দেশলাই নিয়ে পিছন ফিরে দু-হাতের ফাঁকে ধরালুম—দু'জনেই বিড়ি ধরিয়ে নিলাম। সে বললে,—আচ্ছা অমন হঠাৎ পালিয়ে গেলে কেন? তুমি বিয়ে করবে শুনলে কি অখুশী হতাম—তোমার বৌএর জন্যে আমি যে হার গড়িয়েছিলাম তা জানো? সে হার কত কষ্টে তৈরী! হাটে হাটে এই দেড়মণ বোঝা টেনে টেনে যা পাই, তার পেটে খাই কতটুকু! খাওয়ার সময়ই বা কোথায়? সেই টাকা রেখে রেখে—চার বছরে একশ টাকা করেছিলাম। সেই টাকা দিয়ে হার গড়িয়েছিলাম, কিন্তু দেওয়া আর হ'ল না। আমাকে ত ডাকলে না একবার—যদি ডাকতে হার পরিয়ে দিয়ে বৌএর হাতে তোমাকে দিয়ে আসতাম।

ও যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললে মনে হয়। বললে, তুমি যেন রোগা হ'য়ে গেছ খুব। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় বুঝি—ওর নগেন হয়ত আমার চেয়ে স্বাস্থ্যবান ছিল।

—রেঁধে খাওয়া ত! হুঁ পুরুষ মানুষে কি রেঁধে খেয়ে কাজ করতে পারে?

ও বিড়ি টেনে যাচ্ছিল—শেষ টান দিতেই বিড়িটা চড়্‌চড় করে উঠল। সে ফেলে দিয়ে বললে, আজ ত আঁধার, এই আঁধারে এই ভাঙ্গামন্দিরে আমরা দু'জন জুটেছি—কিন্তু একদিন জোছনা রাত্রে দুজনে এখানে কাটিয়েছিলাম মনে আছে?

ওর জীবনের জ্যোৎস্না রাত্রির কথা জানি না, তবুও লোভ হল জানতে তাই বললুম—হ্যাঁ—

—বকপোতায় সিনেমা দেখে এসে এখানে রাত কাটালুম দু'জন,—দেব-দেউল তার সাক্ষী রইল। তোমার জামা ছিল না, ফ্লানেলের জামা আর পশমী গলাবন্ধ কিনে দিয়েছিলাম, তাই পরে গিয়েছিলে বকপোতা, কি সুন্দর মানিয়েছিল তোমাকে। ফিরবার পথে সেই পুন্নিমে রাত্রে এখানে এসে রাত কাটালুম,—ভোর রাত্রে শীতে দু'জনই ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপি! আঁচলের মাঝে তোমাকে রেখে তবে কাঁপুনি বন্ধ করি—

ও যেন একটু হাসল মনে হয়। জানবার লোভটা দুর্জ্জয় হ'য়েছিল কিন্তু ভয়ও ছিল কম নয়, ও যদি কোন মতে জান্‌তে পারে আমি ওর নগেন নয়? দেড় মণ বোঝাটা যে এনেছে তার দৈহিক শক্তিকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। এই নির্জ্জন দেব-দেউলে আত্মরক্ষা করাই হয়ত সম্ভব নয়।

বাইরে ঝড় চল্‌ছে—বৃষ্টির ছাট্‌ এসে বারান্দার অনেকখানিই ভিজিয়ে দিয়েছে, ও উঠে কাছে এসে বসল, বললে, বৃষ্টির ছাট্‌ আস্‌ছে, তোমার কাছেই একটু বসি, ভয় পেলে না ত? ভয় পেয়েছিলাম, এত নিকটে বস্‌লে হয়ত কণ্ঠস্বরে ভুল ভাঙ্গতে পারে। ধরা পড়ে যাব—

—না—

—ও, এখন বিয়ে করে তা হলে সাহসী হয়েছ! কি ভীতুই তুমি ছিলে, রাত্রে আমার ওখানে গেলে ত বাড়ী পর্য্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দিতে হত, নিয়ে আস্‌তে হত।

একটু থেমে সে বললে, আচ্ছা নগেন, রাতে ভা

দেখতে পাইনি, রাতকানাই হ'য়েছি বুঝি, তোমরা ত শহর-বাজারে থাকো, এর কোন ওষুধ-পত্তর আছে জানো ?

—ডাক্তার দেখাতে হয়—

—কোথায় আর ডাক্তার ? শহরের ডাক্তার দেখানর লোক কি আমরা ? অত খরচ পাই কোথা, কোথায় গিয়ে থাকি—কেই বা আর আছে আমার—

আনমনে হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—একেবারে কানা হলে কি করে খাবো ? এত যেমন তেমন করে দু' তিন টাকা হাটে হাটে হয়।

আমি নীরব—নগেন হলে হয়ত অন্য কথা বলত। শহরে নিয়ে ব্যবস্থা করতে পারতো কিন্তু আমি কি বলব ? ও আবার বিড়ি বের করলে, আমাকে দিয়ে বললে,—ধরাও নগেন, শীত পাচ্ছে—ঝড় কি আর থামবে না। যাবো কি করে বোঝা নিয়ে ? এই মেঠো পথ—আল ত নেই—রাস্তাও নেই। যদুগড় ত কাছের পথ নয়, এখনও তিন পো রাস্তা।

আড়াল করে বিড়ি ধরানো হল—দু'জনে বসে টান্তে লাগলাম। ও হঠাৎ আমার হাতটা ধরলে, অন্ধকারে হাতটা স্পর্শে একটু অনুভব করে নিয়ে বললে—খুবই কাবু হয়েছ দেখছি, দিনকয়েক ছুটি নিয়ে দেশে এসে ডিম মাছ দুধ আর একটু একটু দেশী খেলে শরীর ভাল হ'য়ে যাবে—এখন ত রোজগার করছ—

—হবে, ছুটি যে নেই—

—চাকুরীর থেকে জীবনটা ত বড়।

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি সমানে চলেছে,—অন্ধকারে অশ্বত্থ গাছের মাথাটা ঝাপটাচ্ছে পাগলের মত,—যেন ভর হয়েছে ওর, গাঁজা খেয়ে মাথা নাড়ছে গাজনের সন্ন্যাসী ঠাকুরের মত। আকাশ চিরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—

হঠাৎ ও বললে—তোমার বৌএর হারটা ঘরেই রয়ে গেল, তা আর দেওয়া হল না। তুমি এমন করে চলে গেলে ? বোঝা টেনে টেনে দু'পয়সা যা রোজগার করেছি, তা ত সবই তোমাকে দিয়েছি নগেন। তোমার আসা-যাওয়ার সুবিধে হয় না—তাই টর্চ্চ কিনে দিলাম। দু'হাট তখন মার খেয়েছি—লাভ ত ডকে লোকসানই হ'য়েছে—যা হোক্ হঠাৎ সেই কাঁটালী কলার বাজারটায় লাভ হ'ল তাই দিতে পারলুম। সে বোঝা নিয়ে আমতায় গিয়েছিলাম আট ক্রোশ হেঁটে, যা হোক্ লাভ হ'ল—টর্চ্চ কিনে নিয়ে আস্‌লাম কিন্তু খাওয়া হল না,—চা বেগুনী খেয়ে আবার আট ক্রোশ হেঁটে এলাম ফিরে। তবুও সে কি আনন্দ সেদিন! অত কষ্ট করেও তোমার হাসিমুখ দেখে সব ভুলেছিলাম।···এত করেও কিন্তু তোমার মন পেলাম না, তুমি ছেড়ে গেলে একটা কথা বলে গেলে না—যাচ্ছি বলে যেতে ত পারতে!

কোন এক নগেন এই মেয়েটির গুরুতর শ্রমলব্ধ অর্থ ওর দুর্ব্বলতার সুযোগে হরণ করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বেদনাহত বুভুক্ষিত নারীকে—বঞ্চনার এই কাপুরুষতার জন্যে যেন নিজেকেই হঠাৎ অপরাধী মনে হ'তে লাগল। সেই কৃতঘ্ন নগেনের বেইমানীর বোঝা অকস্মাৎ যেন এই দেব দেউলের ঘনান্ধকারে আমার মাথায় চেপে বসল। মনে হল অপরাধ স্বীকার করে ওকে সান্ত্বনা দেই, কিন্তু সাহস হ'ল না।—প্রলোভনের খেসারৎ দিতে হল এই বেইমানীকে স্বীকার করে।

সে আবার সুরু ক'রলো—যাক্, তাতে কিছু মনে করি না, তুমি ত আমাকে ভালবাসনি—জামা-কাপড়ের জন্যে আসবে কিন্তু আমি কেন তোমাকে ভালবাসলাম তা ত জানো না। দূর গ্রামের ছেলে তুমি, বয়সেও হয়ত ছোট ছিলে—কিন্তু আমি মজেছিলাম—দুঃখ পাব ব'লেই। বিয়ের সময় যদি একটু বলতে মুখের কথা, হারটা দিয়ে ছুটি নিতাম। কাকে দেব হারটা ? নিজেই বা পরি কি করে ? বাজরাওয়ালীর গলায় সোনার হার দেখলে লোকে কি বলবে বল—

বাইরে ঝড় চলছে গুম্‌রে গুম্‌রে, ওর মনেও হয়ত ব্যর্থ-তার একটা ঝড় চল্‌ছে অমনি করে। আর আকাশ চিরে যেমন আলোর ফিনকি দিচ্ছে তেমনি করে ওর মনের আগুনের ফিনকি দিচ্ছে ওর কাহিনী। একদিন চলে যাবে জেনেও ও সবই দিয়েছিল নগেনকে।

সে বিড়িটার নিভন্ত শেষটা ফেলে দিয়ে বললে,—প্রথম সেদিন দেখা তোমার সঙ্গে। তোমাদের গাঁয়ের ঘনাদাসের দোকানের সাম্‌নে। কপির দাম নিয়ে দর-দস্তুর, তুমি কিনতে পারলেনা বলে মুখ বেজার করে রইলে, আমার মনে দুঃখ হল। ভাবলুম লাভ নাই হল দিয়ে যাই—তাই দিয়ে এলুম কপিটা তোমাকে—তার পর তোমার

জন্যেই তোমার মাকে মা বলে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালাম। তোমার ত তখন গরুর দুধ বেচে সংসার চলে—চাষ করতেও পার না, চাকুরীও নেই তোমার—শীতের দিনে গায়ে দেওয়ারও কিছু নেই। তোমার মাকে আনাজ দিয়ে আসতাম, পয়সা নেই নি কোনদিন।...তুমি যেদিন আমার বাড়ী গেলে সেদিন ভাবলুম আমার জয় হ'ল, গভীর রাত্রে তোমাকে এগিয়ে দিলাম এই মাঠের মাঝ বরাবর তবুও তুমি যেতে পার না তাই ত টর্চ কিনতে আমতা গেলাম বোঝা নিয়ে—

...আমি ভাবলুম টাকা রোজগার করে কি হবে? গতর যতদিন আছে ততদিন ভয়ই বা কি, তাই আমার বলতে আমি কিছু রাখিনি, সবই তোমাকে দিতাম। তোমার বাই হল সিনেমার, কত পয়সাই তুমি খরচ করেছ—তাতে দুঃখ ছিল না। তোমার হাসি দেখলে আমার বুক ভরে যেত। তোমাদের ঘরের খড় উড়ে গেল এমনি কালবৈশাখীতে আমি গাঁ থেকে খড়ের বোঝা দিয়ে এসেছি তোমাদের বাড়ীতে—সে সব ভুলে আমাকে না বলেই বিদায় দিলে—

—তারপর তোমাদের গাঁয়ে কতদিন গেছি, তোমার মার কাছে শুনেছি তুমি চাকুরী করতে গেছ শহরে, দেখা হয়নি কোন দিন—হঠাৎ আজ দেখা এখানে। এই ভগ্ন দেউলেই আমরা কাটিয়েদিলাম এক রাত্রি। এই অশ্বত্থ গাছের ফাঁকে জোছনা এসেছিল বারান্দায়—এই বুড়ো অশ্বত্থ আর দেউল সাক্ষী রয়ে গেছে তার।

আমি শুনছিলাম, রিক্ত এই শ্রমজীবী মেয়েটির দুঃসহ শ্রমলব্ধ টাকা নিয়ে নগেন ছিনিমিনি খেলেছে, তারপর হঠাৎ একদিন ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে মনের স্লেট পরিষ্কার করে নিয়েছে নিজের প্রয়োজনে আর ওর স্লেটে পাথরের অক্ষয় দাগ রয়ে গেছে অলক্ষ্যে।

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি কমে এসেছে, আকাশের রং ফিরছে ধীরে ধীরে। সম্ভবতঃ শুক্ল পক্ষ পূবের দিকে হয়ত চাঁদ উঠবে মেঘের ফাঁকে। বারান্দায় অস্বচ্ছ আলোয় এখন ওর অবয়বটা আমি দেখতে পাচ্ছি। ও হয়ত আমাকে দেখছে—

হঠাৎ ও বললে, আচ্ছা—নগেন, আমি ত অনেক কথা বললাম, তুমি ত কিছু বললে না। তুমি কেন না বলে চলে গেলে—

আমি আস্তে আস্তে মিথ্যা কথাটা বললাম,—হঠাৎ চাকুরীর খবর এল রাতে। ভোরে বেরিয়ে চলে গেলাম।

—যেয়েই কাজে লেগে গেলে!

—হ্যাঁ—

—কিন্তু তারপরে ত বাড়ী এসেছ, একদিনও ত দেখা করনি। আগেকার মত ত যেতে পারতে। না হয় দিনে যেতে পারতে—বিয়ের সময় তুমি, তোমার মা একটিবারও আমার কথা ভাবলে না। আমি ত গিয়েছিলাম, চাইনি ত কিছু কোনদিন—ঐ হারটার দিকে যখন তাকাই,'তখন মনটা হু হু করে ওঠে, কত সাধ ছিল, কত কষ্টে ওটা তৈরী করেছিলাম। তোমার বৌ এর গলায় পরিয়ে দেব,—তোমার ছেলে হলে দুধের বাটি ঝিনুক দেব—

আমি নীরব।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বিয়ে ত বছর দুই করেছ, ছেলেপুলে হবে না?

—না।

—বৌ ত ডাগর, ছেলেপুলে হবে না কেন? বিয়েতে ত ব'ললেই না, ছেলেটা দেখতেও ডাকবে না?

আমি বললাম, ডাক্‌বো।

একটা ব্যর্থতার নিশ্বাস মুক্ত করে বলল, হ, আর ডাকবে! ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঝিনুক বাটি দিতুম—দুধ খেত সে—

—তুমি কেমন আছ?

—আমাদের থাকা! আছি—আছে একজন, তোমারই মত নেমকহারাম। আসে যায়, আমি ত ঘরের বৌ নয়, দাবীও কিছু নেই। আর ভাল থেকেই বা কি হবে নগেন? জাত কুলও আমাদের নেই যে ভয় হবে। তবে তুমি বড় দাগা দিয়ে গেছ মনে। তোমাকে নিয়ে যেন মেতে উঠেছিলাম হঠাৎ যখন চলে গেলে, চারিদিক যেন খাঁ খা করছে। মনের অবস্থা মনেই লয় হয়ে গেল—এখন সবই করি। কাজও করি ব্যবসাও করি কিন্তু মনের ফাঁকা ফাঁকাই রয়ে গেছে—ভাবি, তাই হোক্ এ জনমে ত সুখের জন্যে জন্মায়নি'—যাক্ ও বলে আর কি হবে!

নিষ্ফল এই হতাশার বাণী যেন মানব মনের চিরন্তন নিরাশার দীর্ঘশ্বাসরূপে পৃথিবীর বাতাসে মিশে গেল। ভাঙ্গা দেউলের নির্জ্জন নীরব এই স্বল্পান্ধকার ওর ভাঙ্গা মনের প্রতিচ্ছবি—বিগ্রহহীন ভাঙ্গা দেউলের শূন্যতার বেদনার্ত্ত।

কি বলা যায়—এই বেদনার্ত্ত অন্তরে কিসের প্রলেপ দিতে পারি আমি—আর এক নগেন। পূবের আকাশ ফরসা হ'য়ে এসেছে,—চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে। ঘোলাটে একটা আলো এসে পড়েছে মন্দিরের গায়ে, ভিজা অশ্বত্থের পাতাগুলো চিক্‌মিক্ করছে মাঝে মাঝে। তার নীচে এখনও অন্ধকার।

ও দেয়াল হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন ভাবছে আপন মনে। হঠাৎ সে আমার অত্যন্ত গাঁ ঘেঁসে বসে বলল, আচ্ছা লগেন, এই যে আমি তোমার এত কাছে বসে আছি। এত কথা তোমাকে বললাম, তোমার মনে কিছু বল্‌ছে না—এই ভাঙ্গা দেউল সাক্ষী আছে আজও, তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি ছাড়বে না কোনদিন, বিয়ে করলেও না—

আমি কি ব'লব? চুপ করে রইলাম। ও সস্নেহে আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বসে রইল। আমি তার হাতটাকে ধরে রইলাম—ভাবছিলুম ওকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলব, কিন্তু কেমন করে কি বলি?

হঠাৎ হাতখানা ফেলে দিয়ে ও বলল, না লগেন। আমি ছোট জাতের মেয়ে কিন্তু ছোটলোক নয়। তুমি বিয়ে করে সংসারী হয়েছ, সুখী হয়েছ, সুখে থাক, তোমাকে আমি টানতে চাইনে। আমাদের গতি নেই তাই এই পথে চলেছি। তবে তোমার ছেলে হলে খবর দিও যাবো—

—তুমি চলে যাওয়ার পরে পাঁচ বছর তোমাদের গাঁয়ে ত আর যাইনি, হঠাৎ একদিন খেয়াল হল তোমার বৌ দেখতেই—কপির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার মা অবশ্য চিনলেন, পান দোক্তাও দিলেন। আমি দূর থেকে তোমার বৌকে দেখে এলাম। আমি খুব খুশী লগেন, তোমার বৌটা ভালই হয়েছে। তোমাদের মুখ দেখলে আমিও খুসী হব—

ঝড় থেমে গেছে—ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো মেঘের ফাঁকে ক্ষীণ চাঁদের আলো স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে,—ভাঙ্গা দেউলের অবয়ব, অশ্বত্থ গাছের সীমারেখা আকাশের গায়ে যেন চেনা যায়। আলোর ভয়ে ভীত হ'য়ে উঠ্‌লাম। বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় দেহ মন চম্‌কে উঠছে। ওর গায়ে যেন আলোর ছোঁয়াচ লাগবে এখুনি—বারান্দার ভিতর দিকে অন্ধকার ঘেঁসে বসে আছি। আলোয় যেতে ভয় করছে—

ও আস্তে আস্তে বললে, তোমার মনে নেই? কি করে যাই, চোখে ত ভাল দেখি না রাতে। তুমি ত একদিন জানালা দিয়ে প্যাকাটির খোঁচা দিয়ে দিলে চোখে—সেই চোখটায়ই যেন ভাল দেখতে পাইনি। কেমন ঝাপসা লাগে।

একটু হেসে ও বললে, তুমি চলে গেলে না বলেই কিন্তু তোমার দেওয়া খোঁচাটা চিরস্থায়ী হ'য়ে রইল—মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল, এ অপরাধ মাথা পেতে নেওয়া চলে না। সত্য গোপন করে লাভ কি? কিন্তু এখন, এতক্ষণ মিথ্যার জাল বুনে এখন···

—আচ্ছা লগেন, তোমাকে আদ্দীর পাঞ্জাবি দেইনি বলে রাগ করলে কিন্তু দিলে কি ভাল হত? তোমার চাকুরী নেই, অন্ন জোটে না। লোকে যে তোমাকে চোর বলত তা তুমি বুঝলে না? আজ কতদিন হল! ছ' বছর বোধ হয়—এখন চাকুরী করছ একটা আদ্দীর পাঞ্জাবি করে নিও—

ও কিছুক্ষণ পরে বলল, চল, ফরসা হ'য়েছে, চলে যেতে পারবো চল—বারো মাসের চেনা পথ, খুব চলে যাবো—

সে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার নীচে দাঁড়াল, আমি আনাজের বাজরাটি তুলে দিলাম তার মাথায়। সে বললে,—তুমি যেতে পারবে ত লগেন, না ভয় করবে—

—পারবো—

ও যেন হাসতে চেষ্টা করে বলল, হ্যাঁ, নতুন বৌ-এর টানে টানে চলে যাবে জলজঙ্গল ভেঙ্গে। এখন কি আর ভয়ডর আছে?

ও যাবে দক্ষিণে, আমি যাব পশ্চিমে।

ওর পিছন পিছন চুপে চুপে, অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, মজা দামোদরের ক্ষীণ জুলিটা পার হতে। ও



চলে গেলে আমি যাবো, অন্ধকারের গোপনীয়তাকে জোছনার আলোকে আর আনব কি করে?

ও হঠাৎ বোঝাটা নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—একটা কথা রাখবে নগেন? রাখবে?

—রাখবো—

কোন কথাই ত রাখনি, এইটা রেখো। ছেলে হ'লে একবার ডেকো শুধু চোখের দেখা দেখে আসবো, তোমার মা'কে ত মা বলেছি একদিন—

ওর কণ্ঠস্বর যেন ভিজে এসেছে মনে হয়—

···শোনো, শোনো, ও আমার হাতটা অন্ধকারে খুঁজে নিয়ে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল, বাজারের উপর দিয়েই ত যাবে, বৌ-এর জন্য দু'টাকার মিষ্টি নিয়ে যেও। এ কথাটা রেখো, হারটা নিলে না, একটু মিষ্টি নিয়ে যেও—

ওর কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে যেন থেমে গেল—জানি না হয়ত' অন্ধকারে চোখের জলও ঝরে পড়েছে—ও দ্রুত চল্‌তে আরম্ভ করল, মজা দামোদরের ছোট জুলিটা পার হ'য়ে ও যেন ছুটছে, আমি ওর বেইমান নগেনের সমস্ত অপরাধ নীরবে মাথা পেতে নিয়েছিলাম কিন্তু এই দানকে আমি কেমন করে গ্রহণ করি। হেঁকে বললাম,—শোনো, শোনো, তুমি ভুল করেছ—আমি—থেমে যেতে হল আর কিছু বলতে পারিনি।

ও অশ্বত্থের ছায়াঘন অন্ধকার পেরিয়ে মাঠে নেমে ছুটছে। বললে, না না, আমি ভুল করিনি নগেন, আমার কথা বলো না, মিষ্টি নিয়ে যেও—

ও ছুটল মাঠের পথে—

পুনরায় বললাম, শোনো শোনো, একটু দাঁড়িয়ে যাও—

ও আরও ত্বরিৎ গতিতে ছুটলো তার বোঝা নিয়ে—মাঠের পিছল পথে।

আমি ভাঙ্গা দেউলের এই বুড়ো অশ্বত্থের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম চুরির আসামীর মত কাঠগড়ায়।

দিনের আলোয় এ টাকা আমি কেমন করে ফিরিয়ে দেব ওকে? আর এক নগেনও ওকে প্রবঞ্চনা করেছে আজ, এই বিগ্রহহীন ভাঙ্গা দেউলে—লোভে পড়েই।

এ পথ চলার পথ

সতীন্দ্রনাথ লাহা

জানালার ধারে এসে দাঁড়াল মেয়ে,
চেয়ে দেখে বারংবার যে পথ দেখা।
হারান দিনের সুর ওঠে কি গেয়ে?···
শোনে তাই আনমনে বিজনে একা॥
দেখা চেনা সব কিছু আজও কি টানে?
···অনেক অনেক দিন হয়ে গেল পার।
কারা যেন কোথা যায়—তা'ও ও জানে।
মুছে না তো স্মৃতি আজ হয়ে একাকার॥
বাঁশী হাতে সেই ছেলে এখনো কি যায়—
কুচ্‌কুচে কালো রং মাথা ভরা চুল।
এই পথে সুর সে কি এখনো বিলায়?
কাছে ডেকে কত দিন দিয়েছিল ফুল॥
নিল ছেলে হাত পেতে কাছেতে আসি,
ঘ্রাণ নিল প্রাণ ভরে দু'হাতে চেপে।
দুটি চোখে মাখা তার লুকান হাসি।
চোখে চোখে দেখা হোত অনেক খেপে॥
কখনো বলেনি মেয়ে—কাছেতে এসো,
অনেক মনের কথা রয়েছে বলার।
ভালবাসি আমি তোরে, তুমিও বেসো—
বলেনি তো কোন দিন পথিক চলার॥
ভাবে বালা: ফুল ছুঁলে মনে সে আসে,
বাঁশী সুর ভেসে এলে বেঁধে যে মনে।
তাকাবে কি সেই চোখে, যে চোখ হাসে।
কারে ডেকে গান গাই—সে কি তা শোনে?
এ পথ চলার পথে চলেছে সবাই,
পথ চেয়ে জানালায় দাঁড়ানো বৃথাই।
কা'র লাগি কে কোথায় রচেছিল গান।
দেওয়া নেওয়া সব কিছু হয় না সমান॥
তবুও দাঁড়াতে হবে কাজে অকাজে—
হারানো সুরের রেশ যখনি বাজে॥

ঐতিহাসিক রহস্য সন্ধানে এ্যাটম্

বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে নূতন নূতন সত্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে নূতন তথ্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। কার্ব্বন—১৪ নামে মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় (radioactive) পরমাণুর সাহায্যে ৩০,০০০ বৎসরের পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহেরও সঠিক সন, তারিখ নির্দ্ধারণ সম্ভব হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণের বহুদিনের স্বীকৃত ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ১৯৪১ সালে কার্ব্বন—১৪ আবিষ্কার করেন। এর সাত বৎসর পরে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ উইলার্ড এফ্ লিবীর মাথায় এক মতলব আসে, তিনি জানতেন যে সৃষ্টির আদিকাল হতে মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ (cosmic rays) মহাশূন্য থেকে এসে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে। এই মহাজাগতিক রশ্মির কয়েকভাগের সহিত পৃথিবীর পাঁচ মাইল উর্দ্ধে নাইট্রোজেন এ্যাটমের সংঘাতের ফলেই তেজস্ক্রিয় এ্যাটম কার্ব্বন—১৪ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কার্ব্বন—১৪ ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসছে। জীবন্ত পশু পক্ষী, মানুষ এবং উদ্ভিদ কার্ব্বন—১৪কে কার্ব্বনডাই-অক্সাইডরূপে গ্রহণ করছে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বন—১৪ গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর এদের দেহে সঞ্চিত কার্ব্বন—১৪ সুনির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মোটামুটিভাবে ধরলে, কোন বস্তুতে সঞ্চিত কার্ব্বন—১৪-এর অর্দ্ধেকভাগ নষ্ট হয় ৬০০০ বৎসরে। এখন কোন্ বস্তুর মধ্যে কি পরিমাণ কার্ব্বন—১৪ আছে এবং কি হারে তা নষ্ট হয়েছে তা স্থির করতে পারলেই সেই বস্তুটির সঠিক বয়স নির্দ্ধারণ সম্ভব। তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি যন্ত্রও নির্ম্মিত হল।

প্রথমে তিনি একখণ্ড কাঠের উপর পরীক্ষাকার্য্য চালালেন। মিশরের রাজা তৃতীয় সিসোট্রিসের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া উপলক্ষে যে নৌকাটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার থেকেই এই কাষ্ঠখণ্ডটি সংগৃহীত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কাঠের উপর সঞ্চিত কার্ব্বন—১৪-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে তিনি উহার যে প্রাচীনত্ব নিরূপণ করেন তার দ্বারা ঐতিহাসিকগণের মত সমর্থিত হয়। রাজা সিসোট্রিসের মৃত্যু হয় তিন হাজার সাতশো বৎসর পূর্ব্বে। এরপর মিশর থেকে প্রেরিত গম ও বার্লি পরীক্ষায় ৫,২০০ বৎসরের পুরাতন নির্দ্ধারিত হল। শিকাগোর মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রাপ্ত একখণ্ড কাঠ পরীক্ষা করে দেখা গেল তা ৮,২০০ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু কেহ ইহা ধারণাও করতে পারেন নি।

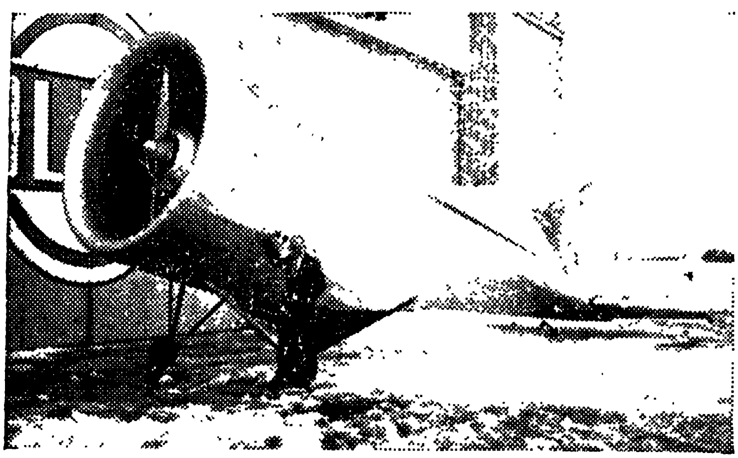
ক্রমে এইরূপ পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেল যে পূর্ব্বে যে সকল সন, তারিখ সম্বন্ধে সকলের কোনরূপ সন্দেহ ছিল না অনেক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভুল। যেমন, আমেরিকার কোন কোন অংশ থেকে রেড্ইণ্ডিয়ান জাতির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংগৃহীত হচ্ছে। এই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এরা ১৯০০ বৎসরের পুরাতন। ১৯৫০ সালে প্রাপ্ত কতকগুলি নিদর্শন কার্ব্বন—১৪ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে বর্ত্তমানে আমরা যে রেড্ইণ্ডিয়ান জাতিকে জানি এগুলি তাদের নয়, এদেরই অন্য কোন সম্প্রদায়ের এবং এরা খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাস করতো, ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে নয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নূতন আলোকসম্পাত হল।

চীনের মাঞ্চুরিয়ার পুলাতিয়েন গ্রামে একটি বিরাট জলশূন্য হ্রদ আছে। কবে যে এই হ্রদের জল শুকিয়ে গেছিল তা কেউ জানে না। এই শুষ্ক হ্রদের মাটির তলা থেকে এক জাপানী উদ্ভিদবিজ্ঞানী জলজ পদ্মবীজের সন্ধান পান। এই সকল বীজ কার্ব্বন—১৪-এর সাহায্যে পরীক্ষা

করে দেখা গেল এরা একহাজার বৎসরের পুরাতন এবং প্রমাণিত হল যে ঐ হ্রদও একহাজার বছর আগেই শুকিয়ে যায়। এই পদ্মবীজ পরে আমেরিকায় পাঠান হয় এবং এর থেকে গাছ উৎপাদনের চেষ্টা হতে থাকে। ওয়াশিংটন সহরের ন্যাশনাল পার্কের কেজিলওয়ার বাগানে এই সকল বীজ রোপণ করা হয়। ১৯৫১ সালে এই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন গোলাপী রঙের ষোড়শ দল পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণের ধারণা ছিল যে ২০০ বছরের বেশী পুরাতন বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কার্ব্বন—১৪ তাঁদের ধারণা পাল্টে দিল। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর কার্ব্বন—১৪-এর এই পরীক্ষা যন্ত্রই সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

ডানাবিহীন বিমান—

বিজ্ঞানের এই আধুনিক যুগে এমন লোক খুব কমই



এরোডিন

আছেন যিনি বিমান দেখেন নি। উঠতে বসতে লোকে এখন বিমানে করে পাড়ি দিচ্ছে, চিঠি-পত্তর যাচ্ছে বিমানে করে। বিমান এখন আর আশ্চর্য্যের বস্তুই নয়। কিন্তু ডানাহীন এরোপ্লেনের কথা বললে একটু অদ্ভুত শোনায় না কি? অদ্ভুত হলেও ইহা সত্য। কালিফোর্নিয়ায় 'এরোডিন্' নামে এক ডানাহীন বিমানের ব্যাপকভাবে 'উইণ্ড টানেল টেষ্ট' চলেছে। এই অদ্ভুত দর্শন বিমানটি মাটি থেকে সরাসরি উপরে উঠতে বা নামতে পারবে এবং সম্মুখ গতি থেকে পিছিয়ে আসতে সক্ষম হবে। বায়ুপ্রবাহকে ইহার দু'টি বিরুদ্ধ আবর্তনকারী 'প্রপেলারে'র থেকে বিমানের কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালন করে এবং বহির্গামী বায়ুকে বিমানের তলায় অবস্থিত নিয়ন্ত্রণযোগ্য নির্গমনপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে এইরূপ করা সম্ভব হয়েছে। কলিন্স এরোনটিক্স রিসার্চ ল্যাবরেটরীজ, আমেরিকান নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর জন্য এই বিমানের উন্নতি সাধন করছেন। 'টানেল টেষ্টে' উত্তীর্ণ হলে ১৯৬০ সালেই 'এরোডিন'কে উড়তে দেখা যাবে।

ভ্রমণোপযোগী রেফ্রিজেরেটর—

যাঁরা সপ্তাহ শেষে বাইরে যান তাঁদের সুবিধার জন্য পশ্চিম জার্ম্মানীর GAWA GmbH কোম্পানী সঙ্গে করে নিয়ে যাবার মত প্লাষ্টিক রেফ্রিজেরেটর বাক্স নির্ম্মাণ করেছেন। যে কোন ছোট মোটর গাড়ীর লাগেজ বাক্সে ইহা রাখা যায় আর ওজনও মাত্র ৩০ পাউণ্ড। প্রোপেন গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিসিটি উভয়ের যে কোনটির দ্বারা এই রেফ্রিজেরেটর চালান যায়। আর কেবল সুইচ টিপে গ্যাস থেকে ইলেক্‌ট্রিক বা ইলেক্‌ট্রিক থেকে গ্যাসে পরি-বর্ত্তন করা যায়।

ইহা ব্যতীত ষ্টুটগাটের বাউক্‌-নেখট কোম্পানী এক অভিনব রেফ্রিজেরেটর ব্যাগ তৈরী করেছেন। এই ব্যাগের নাম দেওয়া হয়েছে 'ESKI'. ভ্রমণের সময় এবং কাজের সময়ও এই ব্যাগ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে। 'কুলিং কট্রিজ'গুলিকে ব্যাগে রাখার আগে ঘণ্টাখানেক রেফ্রিজেরেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। খাদ্য এবং পানীয়কে সারাদিন ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা এই ব্যাগের আছে।

পকেট সাইজ টেলিফোন—

সময় সময় কাছাকাছি জায়গার সহিত সাময়িক টেলি-ফোন সংযোগের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মেটাবার

জন্য এক রকম ছোট্ট সুন্দর টেলিফোন সেট্ নির্ম্মিত হয়েছে। এই সেটে, দু'টি কথা বলার যন্ত্র এবং কয়েকশত গজ তার আছে আর এর ওজনও খুব কম, মাত্র এক পাউণ্ড। একটি সাধারণ এ্যাটাচি কেসে এটিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারা যায়। যন্ত্রটির হ্যাণ্ডেলের মধ্যে তিনটি ড্রাই ব্যাটারী লাগান আছে। এই ব্যাটারীগুলিই প্রয়োজনীয় ইলেক্‌ট্রিসিটি যোগায়। ৯ মাইল্ দূরত্বে পর্য্যন্ত এই টেলিফোনে কথা বলা যেতে পারে। বাড়ীর মধ্যে ব্যবহারের জন্যও আর এক রকম টেলিফোন নির্ম্মিত হয়েছে। এই টেলিফোনের ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহ হয় একটি সাধারণ টর্চ্চ ব্যাটারী থেকে। বার্লিনের সিয়েমেন্স্ কোম্পানী এর নির্ম্মাতা।

॥ নাকের বদলে নরুণ ॥



গৃহিনী :—ওগো···দ্যাখো, দ্যাখো···কাল রাত্তিরে চোর এসে যে-কাণ্ড করে গিয়েছে—আজকের কাগজে তার এক কলম রিপোর্ট ছেপেছে···পড়ো!···

শিল্পী : পৃথ্বী দেববর্ম্মা

দুরূহ হত্যাকাণ্ডে পারিবেশিক প্রমাণ

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌-এস্‌-সি, ডি-ফিল্‌, আই-পি-এস্‌.

এই পরিবৈশিক প্রমাণকে ইংরাজীতে বলা হয় 'সারকামসটেনসিয়াল এভিডেন্স'। এমন অনেক ঘটনা আছে যার একক অবস্থানের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু উহাদের একত্র সমাবেশ ব্যক্তি বা দলবিশেষের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মানুষ মিথ্যা কথা বললেও বলতে পারে, কিন্তু পরিবেশ কখনও মিথ্যা বলে না। ঘটনাস্থলে বা অন্য কোনও স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি মূক নির্জীব বস্তু এবং তৎসহ অপরাধের পূর্ব্বের বা পরের কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে এই পরিবৈশিক প্রমাণ গড়ে তোলা হয়ে থাকে। এই বিশেষ প্রমাণের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে মানুষকে ফাঁসী পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রাচীনকালে হিন্দু ভারতের মনীষিগণ এই পরিবৈশিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে নির্ভুলরূপে বহু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। কোনও একটি বিষয়ের সত্য নিরূপণের জন্যে তাঁরা তিনটি উপায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন—(১) প্রত্যক্ষম, (২) আগম, (৩) অনুমান। যা তাঁরা নিজের চক্ষে দেখতেন বা নিজের কর্ণে শুনতেন তাদের তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেছেন। বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হতে শুনা কাহিনীকে তাঁরা বলতেন আগম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যকে তাঁরা বলতেন আগম। এই বার অনুমান সম্বন্ধে বলবো। একটি বস্তুর চারিটি গুণের মধ্যে যদি তিনটি গুণ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তার চতুর্থ গুণটি যদি অপ্রত্যক্ষ থাকে, তা হলে ঐ বস্তুর প্রত্যক্ষ তিনটি গুণের গুণাগুণ বিচার করে উহার চতুর্থ গুণটি কি হতে পারে তা তাঁরা নির্ভুলরূপে বলে দিতে পারতেন। আজিকার দিনেও সুষ্ঠু তদন্তকার্যের জন্য আমরা এই অনুমানের সাহায্য নিয়ে থাকি। আমাদের এই নির্ভুল অনুমানই হয়ে থাকে পরিবৈশিক প্রমাণের মূল ভিত্তি। অনেকেরই মনে হতে পারে যে অনুমানের উপর নির্ভর করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি দেখাবো যে এইরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। তবে সম্ভাব্য ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এই বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। এই ভুল বা ভ্রান্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়েরাও সচেতন ছিলেন। এই সকল সম্ভাব্য ভুল বা ভ্রান্তিকে তাঁরা বলতেন বিকল্প। এই বিকল্প দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—অন্তর্বিকল্প বা হ্যালুসিনেসন এবং বহির্বিকল্প বা ইলিউসন। এই যুগের রক্ষীরাও এইরূপ সম্ভাব্য ভুলের বিরুদ্ধে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে এসেছেন। এই পরিবৈশিক প্রমাণের সঙ্গে একটি তারের জালের (wire net) সঙ্গে তুলনা করা চলে। ধরুন এই জাল কোনও জীবের উপর নিক্ষেপ করা হলো। এই জালের ফোকরগুলি যদি বড়ো বড়ো হয় তা হ'লে ঐ জীবটি ঐ ফোকর গলে বার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু উহার মধ্যে দিয়ে যদি সে গলে বেরিয়ে আসতে না পারে তা হলে সে ঐ জালের কোনও এক দুর্ব্বল স্থানে আঘাত হেনে তা ছিঁড়ে বার হয়ে আসতে পারে। কিন্তু যদি সে ঐ তারের জালের ফোকর গলে বা তার কোনও অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে না আসতে পারে তা হ'লে বুঝতে হবে যে সে ঐ তারের বেড়াজালে আটকে গেছে। এই পরিবৈশিক প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথমে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য বা ডাঁটা সংগ্রহ করে থাকি। তারপর এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা কয়েকটি মনগড়া থিওরী বা পরিসংজ্ঞা সৃষ্টি করি। বলা বাহুল্য যে, এই সকল থিওরী আমরা 'আমাদের না দেখা' ফাঁকগুলি পূরণ করে নিয়ে অনুমান দ্বারা তৈরী করে নিই। এর পর আমরা দেখি যে আমাদের মনগড়া থিওরীগুলির মধ্যে কোনটি সংগৃহীত তথ্যসমূহের মধ্যে পুরাপুরি খাপ (fit in) খাচ্ছে। এইভাবে বিচার করে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তে এসে উপনীত

হয়। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যদি আমরা দেখি যে এই সম্পর্কে একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হ'লে উহাকে কোনও প্রকার প্রমাণরূপে অভিহিত করা যাবে না। নিম্নের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির দ্বারা বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

'কোনও একটি ঘেরাঘোরা টেনিস কোর্টের মধ্যে কয়েকজন য়ুরোপীয় ব্যক্তি টেনিস খেলছিল। এমন সময় তারা 'মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে' চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখলে যে এক ব্যক্তি বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূমির উপর পড়ে রয়েছে, এবং ঐ ক্লাবেরই এক বেয়ারা 'জন' ঐ নিহত ব্যক্তির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঐ ছুরিকার হ্যাণ্ডেলটি ডান হাতে মুঠো করে ধরে বার করে নিচ্ছে। এছাড়া ঐ রক্তমাখা ছুরিকাটির হ্যাণ্ডেলটি পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে উহাতে ইংরাজী J অক্ষরটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। যেহেতু জন্ নামের আদ্যক্ষর ইংরাজী 'জে', সেই হেতু তাঁরা ধরে নিলেন যে 'জন্'ই ঐ ছুরির মালিক এবং সে-ই ছুরিটা নিহত ব্যক্তির বুকে বসিয়ে তা পরে তুলে নিচ্ছিল।'

এইখানে দেখাবো যে উপরোক্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ এমনও হতে পারে যে জিম নামে অপর এক ব্যক্তিই ছিল ঐ ছুরির প্রকৃত অধিকারী। এই ইংরাজি J আদ্য অক্ষরটি ঐ টেনিস ক্লাবের বেয়ারা জন্ এবং ঐ নিহত ব্যক্তির প্রকৃত আততায়ী জিম—এই উভয় ব্যক্তির নামেরই আদ্যক্ষর। এমনও হতে পারে যে ঐ জিম নামের লোকটা ঐ নিহত ব্যক্তিকে ছুরিকাবিদ্ধ করে ঐ ছুরি সে তার বুক হতে না উঠিয়েই ত্বরিতগতিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। ঐ টেনিস ক্লাবের বেয়ারা দূর হতে তা দেখে ঐ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দয়াপরবশ হয়ে ছুটে এসে তার পাশে বসে পড়ে তার বক্ষ হতে ঐ ছুরিকা উঠিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক সময়েই টেনিস ক্লাবের খেলোয়াড়রা খেলা ছেড়ে মেইন গেট ঘুরে ঘটনাস্থলে এসে তাদের বেয়ারা জনকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। এই বিশেষ মামলাটিতে দেখা যাচ্ছে যে সংগৃহীত পরিবৈশিক প্রমাণ দ্বারা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে না। এখানে যেহেতু আমরা একই সঙ্গে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি, সেইহেতু এই জন বা জিম—এদের কাউকেই আমরা এই খুনের ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করতে পার'ছি না। কিন্তু এমন পরিবৈশিক প্রমাণও আছে যার দ্বারা আমরা মাত্র একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি। বহু চেষ্টা করেও সেইক্ষেত্রে একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষণে অজানা বিষয় জানবার জন্য আমরা কিরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকি সেই সম্বন্ধে কিছুটা বলার প্রয়োজন হবে। বস্তুতপক্ষে দুরূহ মামলার অজ্ঞাত অপরাধীদের খুঁজে বার করবার জন্য আমরা একজন গবেষক ছাত্রের ন্যায়ই অগ্রসর হয়ে থাকি। গবেষক ছাত্রদের ন্যায়ই আমরা ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মনগড়া পরিসংজ্ঞা বা থিওরী তৈরী করে নিই। এরপর একটি পথ ধরে যদি অগ্রসর হয়ে দেখি যে সম্মুখের পথ বন্ধ তা হলে সেখান থেকে ফিরে এসে অন্য পথে আমরা তদন্ত করে থাকি। ধরুন কোনও এক গলিতে প্রত্যুষে আমরা একটা মুণ্ডহীন দেহ আবিষ্কার করলাম। কে কাকে কেন খুন করলো তার বিন্দুবিসর্গও কারুর কাছ হতে আমরা জানতে পারলাম না। এমন অবস্থায় আমাদের এই খুন সম্বন্ধে কয়েকটি মনগড়া থিওরী তৈরী করে নেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও থাকে না। এই ক্ষেত্রে আমরা তদন্ত পরিচালনার জন্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি থিওরী বা পরিসংজ্ঞা তৈরী করে নিতে পারি, যথা—

(১) লোকটি হয়তো নিকটবর্তী কোন এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের রাঁধুনী বামুন বা ভৃত্য ছিল। হয়তো সে ঐ বাড়ীর কোনও অনূঢ়া বা বিধবা কন্যার সহিত প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। বাড়ীর নির্দ্দয় পুরুষরা এই প্রণয়ঘটিত ব্যাপার অবগত হয়ে তাকে খুন করে গোপনে রাত্রে তার লাসটি এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

(২) হয়ত নিহত ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য : তাকে বিশ্বাসঘাতকরূপে বুঝে দলের অপর লোকরা তাকে ভুলিয়ে এখানে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছে।

(৩) হয়ত নিহত ব্যক্তি কোনও ধনীর দুলাল। তার অন্য ভ্রাতারা পৈতৃক সম্পত্তি হতে তাকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাকে নিহত করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে।

(৪) হয়ত ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক পুলিশ কর্ম্মচারীর ইনফরমার বা গোয়েন্দা। দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করার জন্য অন্যান্য চোরেরা তাকে এখানে এনে নিহত করে থাকবে।

(৫) হয়ত ঐ লোকটি একজন চোর বা ডাকাত। চোরাই মালের হিসাব্ বণ্টন নিয়ে কলহ করলে তারই দলের লোকেরা তাকে খুন করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এইরূপ কয়েকটি মনগড়া থিওরী তৈরী করে নিয়ে আমরা দেখি যে কোনটি পরিদৃষ্ট অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খেতে পারে। হাত ও পায়ের চেটো ও দেহের কাঠিন্য হতে যদি আমরা বুঝি যে নিহত ব্যক্তি কোনও বড় ঘরের সন্তান হতে পারে না, সে একান্তরূপে একজন নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাহলে আমাদের সৃষ্ট দুই একটি থিওরী আমরা প্রারম্ভে পরিত্যাগ করে অন্যান্য থিওরীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পর পর তদন্ত করে যেতে পারি।

উপরোক্ত রূপ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার দ্বারা কিরূপ নির্ভুল রূপে অপরাধীদের খুঁজে বার করে দুরূহ মামলা-সমূহের কিনারা করা সম্ভব তা নিম্নের দৃষ্টান্ত হতে বুঝতে পারা যাবে।

সকলেই দেখেছেন যে টালি নালার উপরকার খিদির-পুর ব্রীজ হতে একটি ট্রাম রাস্তা খিদিরপুর ডকের উপর-কার ব্রীজ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। একদিন প্রভাতে এই রাস্তার মাঝ বরাবর স্থানে ফুটপাতের নীচে একটি ডাস্ট-বিনের মধ্যে একটি নারী দেহের নিম্নাংশ পাওয়া গেল। ঠিক কটিদেশ বরাবর এই নারীদেহটি নিখুঁতভাবে কর্ত্তিত হয়েছে। আমরা এই মৃতদেহের নিম্নাংশের মসৃণতা ও হাত পায়ের চেটো হতে বুঝতে পারলাম যে, সে কোনও এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী ছিল। এর পর দেহের গড়ন ও পরিধি হতে বুঝলাম যে সে ছিল একজন আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়স্কা নারী। এই সময় আমরা তার যৌনকেশ ক্ষৌরকৃত অবস্থায় দেখি। এদেশে একমাত্র স্বল্পবয়স্কা নারী এবং বেশ্যাগণ এইভাবে যৌনকেশ ক্ষৌরকৃত করে থাকে। ভদ্রপরিবারের প্রৌঢ়া নারীগণ চরিত্রহীনা না হলে কখনও এইরূপ কোনও ব্যবস্থা ব্যবলম্বন করে নি। এ ছাড়া এই পল্লীতে কোথাও কোনও বেশ্যাপল্লী থাকবার কথাও নয়। এইভাবে কেবলমাত্র সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ নারী ছিল একজন চরিত্রহীনা মধ্যবিত্ত পরিবারের ৪৫ বৎসর বয়স্কা নারী।

এরপর এই প্রকার পরিদর্শন লব্ধ তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুমানেরও সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমরা জানি যে নিজেদের আবাসে খুন সমাধা হলেই মৃতদেহ বা লাস অন্যত্র পাচারের প্রয়োজন হয়। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে অপরাধী ও নিহতা নারী একত্রে এক স্থানে বাস করতো, তা না হলে এইভাবে দেহ কর্ত্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময় তার পাওয়ার কথা নয়। আমরা এও অনু-মান দ্বারা বুঝলাম যে এইরূপ নৃশংস খুন করার পর ঐ খুনীর পক্ষে ঐ কক্ষে আর একটুক্ষণও অবস্থান করা সম্ভব নয়, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে ঘরে তালা বন্ধ করে অন্যত্র (ঐ দিনই প্রত্যূষে) চলে গিয়ে থাকবে। এক্ষণে এই মৃত-দেহ কেহ টালির নালার ওপার থেকে রাত্রে নিয়ে এলে সে উহা ঐ টালি নালার জলেই নিক্ষেপ করতো। অন্য দিকে ডকের ওপার থেকে ঐ লাস কেহ নিয়ে এসে সে এতদুর না এসে উহা ঐ ডকের জলেই নিক্ষেপ করে চলে যেতো। এইজন্য আমরা বুঝে নিলাম যে ঐ ডাস্টবিনের অবস্থানের স্থানটির বামে বা ডাইনের কোনও বস্তির বাড়ীতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি সমাধা হয়েছে। এরপর ঐ চতুঃ-পার্শ্বের বাড়ীগুলিতে খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারলাম যে একটি যুবক ভাড়াটিয়া ঐ দিন প্রত্যূষে তাদের ঘরে দরজায় তালা দিয়ে একাকী কোথায় চলে গিয়েছে। সে ঐ ঘরে তার মাতার সঙ্গে বসবাস করতো। যাবার আগে সে সকলকে বলে যে রাত্রে তার মার হঠাৎ কলেরা হওয়ায় সে কাউকে না বলে তার মাকে হাসপাতালে দিয়ে এসেছে। জনৈকা সহ-ভাড়াটিয়া অতি প্রত্যূষে তাকে একটি বস্তাসহ বার হয়ে যেতে দেখে তাকে ঐ বস্তাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে-ছিল। উত্তরে ঐ যুবকটি তাকে বলেছিল—ও কিছু নয় মাসী। ওটা পচা ময়দার বস্তা। মামার বাড়ী ওটাকে রেখে হাঁসপাতালে মাকে দেখতে যাবো। এর পর আমরা ঐ ঘরটির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সেখানে চাপ চাপ মনুষ্য রক্ত ও মনুষ্য দেহের মাংস খণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখতে

পাই। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ঐ নারীর আপন পুত্র আপন মাতার স্বভাব-চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তাকে ঐ ভাবে খুন করেছিল।

এইভাবে তদন্ত করার জন্য অপরাধী কেন এই এই কাজ করেছিল যেমন বিচার করতে হয়, তেমনি সে এই কাজ এই এই ভাবে করতে পারতো, কিন্তু সে তা কেন করেনি, তাও বিচার করতে হয়। তবে সব কিছু নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার উপর। এমন বহু নির্জীব বস্তু আছে যারা কইতে পারে। এই সম্বন্ধে আমি একটি হত্যা মামলার উল্লেখ করে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সমাপ্ত করবো।

ভবানীপুর থানায় একদিন একটি যুবক এসে একটি জোড়া খুনের খবর দিলে। এজাহারে সে জানায় যে, সে এই দিন সকালে তার সম্পর্কিত দিদিমার বাড়ীতে গিয়ে দেখে যে রোয়াকের উপর তার বৃদ্ধা দিদিমা ছুরিকাহত হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর পর সেখান হতে ঘরে ঢুকে দেখে যে তার মামীমাকেও কে বা কারা খুন করে রেখে গিয়েছে। আমি থানা হতে টেলিফোনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি যে ঐ সংবাদদাতা যুবকটিই স্থানীয় পুলিশকে তদন্তের ব্যপদেশে সাহায্য করছে। ঐ মৃত যুবতীটির ঘরে বাক্সপেটরা ভাঙা ও তার ভিতরের দ্রব্যাদি বিপর্যস্ত দেখা যায়। আমি বেশ বুঝতে পারি যে, চুরির উদ্দেশ্যে খুন করা হয়েছে। ঐ খুনী এদের দু'জনারই পরিচিত, সেইজন্যে এদের দুজনাকেই খুন করার প্রয়োজন ছিল। ঐ ঘর থেকে বার হয়ে অন্য পথের অভাবে বৃদ্ধার সম্মুখ দিয়ে তাদের যেতে হয়। এইজন্য ঐ নির্দ্দোষ বৃদ্ধাকেও তাদের হত্যা করতে হয়েছে। আমি অনুমান দ্বারা এও বুঝতে পারি যে, আততায়ী এদের নিকট আত্মীয় না হলে ঐ বৃদ্ধার সম্মুখ দিয়ে ঐ যুবতীর কক্ষে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এরপর আমি লক্ষ্য করি যে, ঐ সংবাদদাতা যুবকের চুড়িদার পাঞ্জাবির কয়েকটি স্থানে পোড়া দাগসহ কয়েকটি করে ছিদ্র রয়েছে। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঐ যুবক উত্তর করে যে বিড়ি খেতে গিয়ে আজই তার জামার অগ্নির স্ফুলিঙ্গ লাগায় আজই তার জামার ঐ সব ছিদ্র সংযুক্ত হয়েছে। আমি এরপর ঐ যুবকটির লপেটা জুতা ও বাবরীকাটা চুল ও টেরীটি পরিলক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে, সে বিড়ি খাবার ছেলে নয়, সে যদি খায় তো হাভানা সিগারেট খাবে। তা ছাড়া ঐ দিনই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার পাঞ্জাবী ঐ ভাবে বিদগ্ধ না হলে সে এতোক্ষণ উহা পরিবর্ত্তন করে অন্য জামা পরতো। এর পর আমি তার পকেটে হাত দেওয়ামাত্র একটি হাভানা সিগারেটের কৌটা বেরিয়ে পড়ে। আমি বেশ বুঝতে পারি যে তার পাঞ্জাবিতে রক্তের ছিটার ফোঁটা লাগায় সে পোড়া বিড়ির মুখ তাদের উপর সংলগ্ন করে সেগুলি বিদূরিত করবার চেষ্টা করেছে। এরপর বাহিরের একটি পান-বিড়ির দোকানে তদন্ত করে আমি জানতে পারি যে, ঐ দিন সকালে এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সে একটি মাত্র বিড়ি তার কাছ হতে চেয়ে নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করি এবং তার ও তার দুই জন বন্ধুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী একটি পোদ্দারের দোকান তল্লাস করে ঐ বাড়ীতে অপহৃত বহু অলঙ্কারাদি উদ্ধার করতেও সক্ষম হই।

এই সকল দুরূহ তদন্ত কার্যে সফলতা অর্জ্জন করতে গেলে রক্ষীদের হওয়া দরকার চরিত্রবান ও নিষ্পাপ এক চিন্তাশীল সুসভ্য মানুষ। তবেই তাদের মধ্যে চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ আসা সম্ভব। সবার উপর তাদের থাকা প্রয়োজন নাগরিকদের উপর একটি অকৃত্রিম দরদ ও সেবা পরায়ণতার ভার। তা না হলে প্রতিটি তদন্তের পরিশেষে তাদের স্মারকলিপিতে 'নো ক্লু কেস টু' এই মন্তব্যটুকুই শুধু বছরের পর বছর লিখে আপন কর্ত্তব্য শেষ করতে হবে।





পৃথিবীর শেষ দিনে

শ্রীঅখিল নিয়োগী লিখিত ও চিত্রিত

পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে মজুমদারদের বৌ হিমানী অঙ্গনাকে ডেকে বল্লে, শুনেছ দিদি, পৃথিবীর শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে।



মজুমদার বৌ

অঙ্গনা অবেলায় স্নান করেছে। তাই চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে উত্তর দিলে, পৃথিবীর নয়, আমাদেরই শেষদিন এগিয়ে এসেছে। বাজারে পাঠাও, কোনো জিনিষটি ছোঁবার জো নেই! ছেলে-মেয়েদের পাতে কি ধরে দেবো শুনি? ওদিকে ত' মুখপোড়া মাষ্টাররা গাদা গাদা বই পাঠ্য করে বসে আছে! খোকার চাইতে খোকার বই ভারী! মগজে যদি কিছু না জম্‌বে—ওরা পড়া তৈরী করবে কি দিয়ে? কর্ত্তা বলেন, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াও! ঝাঁটা মারি অমন সংসারের মুখে।

অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বলে ফেলে অঙ্গনা হাঁপাতে লাগলো।

হিমানী বল্লে, কিন্তু আমার কথাও এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখো না। এবার আর দিশী জ্যোতিষী নয়,—একেবারে খাস লাল চামড়ার গণৎকার। ইটালীর কোন্ পাহাড়ের ওপর বসে, খড়ি পেতে, বিদেশী পাঁজি দেখে গুণে বলেছে এই সাম্‌নের বেস্পতিবার পৃথিবীর শেষ দিন। মনের সাধ-আহ্লাদ যদি কিছু থেকে থাকে ত' কর্ত্তাকে বলে পূর্ণ করে নাও!

অঙ্গনা তেমনি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে উত্তর দিলে,

ধু-আহ্লাদ পূর্ণ হবে একেবারে নিমতলা ঘাটে গিয়ে।



অঙ্গনা

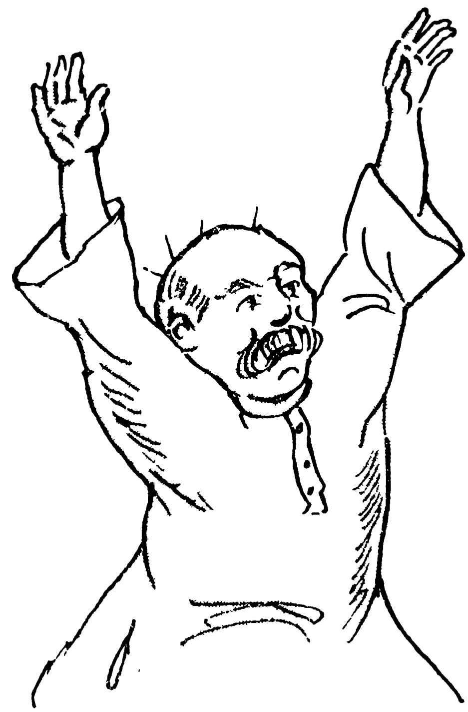
সেই যে কনে বৌ হয়ে এসে হেঁসেলে ঢুকেছিলাম একদিনের জন্যে ছুটি পেয়েছি ?

হিমানী গলা খাটো করে বল্লে, আমার ভারী ইচ্ছে—একটা বিছে-হার গড়াই। কাল রাত্তিরে কথায়-কথায় কর্ত্তাকে বলেছি। এক কথায় রাজী হয়ে গেছে! বল্লে, পৃথিবীর কিছুই যখন থাকবে না,—তখন তোমার মনের ক্ষোভ রাখবো না। শুনছ দিদি, ওই বিছে-হার পরে নাইট শো'তে সিনেমা দেখে আস্‌বো। তারপর পৃথিবী রসাতলে যায়—যাক্!

বৈদ্যনাথ প্রধান লটারীর টিকিট কিনে বসে আছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এবার তাঁর নামে মোটা টাকা উঠবে। কিন্তু ওই ইটালীর 'কোন পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বসে বিদেশী গণৎকার যে ফতোয়া জারি করেছেন, তার ফলে টাকাটা হাতে আস্‌বার আগেই যে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে!

এখন উপায় কি ?

অনেক ভেবে-চিন্তে মনে মনে স্থির করেছেন,—কালিঘাটে গিয়ে মা-কালীর কাছে মানত করে আস্‌বেন,—এই ভাঙা-চোরা পৃথিবীটাকে আরো কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখ্‌তে। লটারীর টাকাটা যদি কোনো মতে হাতে আসে—তবে যাক্ না পৃথিবী গোল্লায়! তার আগেই



বৈদ্যনাথ প্রধান

বৈদ্যনাথ প্রধান একদিনের আবু-হোসেন হয়ে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করে নিতে পারবেন।

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে—আর কলেজ ষ্ট্রীটের কফি হাউসের একান্তে বসে লোহিত আর লাবণী ফিস্-ফিস্ করে কি আলোচনা করছে।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে অনেকগুলি ধোঁয়া ছেড়ে লোহিত তিক্তকণ্ঠে বল্লে, পৃথিবী শেষ হবার আর সময় পেলে না? কত করে কাকাবাবুর মত আদায় করেছি, সে আমিই জানি। কাকিমা কিন্তু এখনো চটে রয়েছেন। বল্‌ছেন, বামুনের বাড়ীতে কায়েতের মেয়ে এসে সব ছুঁয়ে একাকার করে দেবে—এ আমি কিছুতেই সইব না। তার চাইতে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও।

লাবণী অগোছাল চুলগুলি কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলে, তা তুমি কি উত্তর দিলে শুনি ?

লোহিত বল্লে, আমি? আমি বল্লাম, লাবণী একেবারে পটে আঁকা লক্ষ্মী-প্রতিমা। দেখবে সে এসে কেমন তোমার পূজোর চন্দন ঘসে দেবে, নৈবিদ্যি সাজিয়ে দেবে। তোমার ঠাকুরের জন্য মালা গেঁথে দেবে—

কফির কাপে চুমুক দিয়ে লাবণী বল্লে, অল রট্।

লোহিত তাকে আশ্বস্ত করে উত্তর দিলে, আরে তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বিয়েটা ত' আগে হয়ে যাক্! তারপর চন্দন ঘসার বদলে ফাউল রোষ্ট করলেই হবে। জানো তো' কাকাবাবুর হাতে অনেক টাকা। কাকাবাবুর কোনো ছেলেপেলে নেই। আর আমিই তার একমাত্র ভাইপো—

লাবণী অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর দিলে, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। তুমি এমন কাওয়ার্ড জানলে আমি অতনুকে কথা দিতাম। সে আমার চিঠির উত্তর পেলো না বলেই রাগ করে কঙ্গোতে চাক্‌রী নিয়ে চলে গেল! তোমার চিঠি পড়ে ভেবেছিলাম, তোমার সাহস আছে! এখন দেখছি, তুমি মেয়েদের চাইতেও ভীতু!



লোহিত ও লাবণী

লোহিত লাফিয়ে উঠে বল্লে, আহা, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে চাইছ না লাবণী; আমি ত সব ম্যানেজ করে ফেলেছিলাম। এমন সময় ওই ইটালীর গণৎকারের অগ্ন্যুৎপাত! কাকিমা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন। পৃথিবীর শেষদিনের খবর পড়েই একেবারে খাপ্পা! বল্‌ছেন, বামুনের ছেলের সঙ্গে কায়েতের মেয়ের বিয়ে। এই সব অনাচার হচ্ছে বলেই ত' ভগবান পৃথিবীর শেষদিন ঘনিয়ে আনছেন…

লাবণী ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দিলে, থাকো তুমি তোমার কাকিমার আচার-বিচার আর গোবর খাওয়া নিয়ে! আমি কঙ্গোই যাবো—

লোহিত মরিয়া হয়ে লাবণীর হাত চেপে ধরে করুণ আবেদন জানালে, ডোণ্ট্ বি সিলি লাবণী, তুমি কঙ্গো গেলে যে কলকাতার শহর একেবারে কানা! তার চাইতে এসো, আমরা পৃথিবীর শেষ দিনের জন্য অভিনব প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। শুধু তুমি আর আমি…একটা ছোট্ট নৌকো ভাড়া করে সারাদিন গঙ্গার ওপর কাটিয়ে দেবো। 'নোয়ার আর্কের' মতো হবে আমাদের দু'জনের নৌকো। যদি গঙ্গার জল বাড়ে—আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঁচুতে উঠবো—

লাবণী ভয় পেয়ে প্রতিবাদ করলে, কিন্তু যদি জল বাড়ার সঙ্গে ক্ষিদে পায়?

লোহিত এক তুড়িতে সমস্ত ভয় দূর করে দিয়ে উত্তর দিলে, কোনো চিন্তা নেই প্রিয়ে, 'চাওয়া' থেকে প্রচুর খাবার কিনে নৌকো ভর্ত্তি করে রাখবো। পাশে থাকবে সঞ্চয়িতা। আমি একমনে আবৃত্তি করবো—

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী—
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী!"

পচা কাসুন্দী গাঁয়ের পুণ্যালোভাতুর পদি পিশির চিন্তার অবধি নেই। পৃথিবীর শেষ দিন যে ঘনিয়ে এসেছে—সে খবর এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেও পৌঁছেচে।

তাই পদি পিশির মুখে আর অন্ন উঠ্‌ছে না। ভেবে ভেবে পিশি একেবারে কাহিল হয়ে গেছে! কুলোকে বলে, পিশির লুকোনো সিন্দুকে নাকি অনেক টাকা। পিশির অনেক দিনের কামনা—সারা ভারতবর্ষে যত তী

রাছে সব যায়গায় মাথা কুট্‌বে, আর সকল তীর্থ-সলিলে মাথা ডোবাবে। খুব ছেলেবেলায় পিশি নাকি একটা



পদি পিশি

পিঁড়ি ছুড়ে মা ষষ্ঠীর বাহন বেড়ালকে মেরে ফেলেছিল! সেই পাপের এখনো প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি! আজ যাই—কাল যাই করে তীর্থযাত্রাও হয়নি। অথচ শিয়রে শমন এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর শেষ দিন এসে পড়েছে।

গাঁয়ের পুরুতঠাকুরকে পিশি ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি বিধান দিয়েছেন—এই গ্রামে যত বেড়াল আছে তাদের সবাইকে খাঁটি দুধ খাওয়াতে হবে। এই খবর শুনে সারা গাঁয়ের ছেলেরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজে লেগে গেছে। যত বেড়াল পেয়েছে—মেনি বেড়াল, হুলো বেড়াল, বন-বেড়াল—সব গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে এনে পিশির উঠোনে জড় করেছে।

আর একদল ছুটেছে গয়লা পাড়ায়। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে খাঁটি দুধ সংগ্রহ করতে হবে। সেই দুধ বাটিতে বাটিতে ঢেলে বেড়ালদের সাম্‌নে ধরতে হবে। মার্জ্জার দল যদি খুশী মনে দুগ্ধ পান করে—তবেই বোঝা যাবে যে, মা ষষ্ঠী পিশিকে ক্ষমা করেছেন।

এই নতুন কাজ পেয়ে পাড়ার ভাইপোদের আর উৎসাহের অন্ত নেই। পিশি দাওয়ায় বসে মালা জপ্‌ছে, আর ছেলেদের কাণ্ডকারখানা দেখছে!

শেঠজী দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠেছেন। এ রকম বিশ্রী স্বপ্ন তিনি জীবনে দেখেন নি! একটা সাপ যেন তাকে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে! তিনি না পারছেন ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে, আর না পারছেন সাপের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে! প্রাণ যায় তাঁর এমনি অবস্থা।

ছায়া-ছবির মতো বিগত দিনের অনেকগুলি ঘটনা তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো! কবে কোন্ অন্ধকার ঘরে বসে ঘিয়ের সঙ্গে সাপের চর্ব্বি মিশিয়েছেন, কোন সেই ভুলে-যাওয়া যুগে লাখো লাখো মণ চাল মজুত



শেঠজী

করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছেন, কোন সময় আটা ময়দার সঙ্গে মিহি পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে লোককে ঠকিয়েছেন—সব কিছু যেন তিনি সিনেমার ছবির মতো দেখতে পেলেন।

প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুল না। বহুকাল তিনি বাঙলা দেশে আছেন, কিন্তু এমন বিপদে কখনো পড়েন নি! বাঙালীর

তাই তিনি বাংলা বলতে পারেন। এই ত সেদিন এক বাঙালী বাউল তার ফটকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে গেল—"মনে কর শেষের দিন কি ভয়ঙ্কর!"

সেই সর্ব্বনাশা দিন কি সত্যি আস্‌ছে?

এইবার শেষ চেষ্টায় তিনি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন—পানি—পানি—

পাশের ঘরেই ছিল ওর খাস গোমস্তা। ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, কেয়া হুয়া শেঠজী?

শেঠজী কোনো রকমে দম নিয়ে উত্তর দিলেন, ধরমশালা বানা দেও—!" হরদোয়ারমে একঠো, দিল্লীমে একঠো, ইলাহাবাদমে একঠো, কাশীমে একঠো, আউর কলকাত্তামে একঠো…

—

খবরটা যখন ছাত্রমহলে চালু হয়ে গেল, তখন পুলকের প্রস্রবণ বইতে লাগলো!

পৃথিবীর শেষ দিন!

এর চাইতে সুখবর আর কিছু কি হতে পারে? সাম্‌নেই পরীক্ষা—মুখ-ব্যাদান করে বসে আছে!

যদি পৃথিবীর শেষ দিনই এসে থাকে তবে ত' সব ভাবনা-চিন্তার ইতি! রাত জেগে নিরস পাঠ্যপুস্তকগুলি মুখস্থ করতে হবে না; দিল-খোস হয়ে সিনেমা হাউসের সাম্‌নে লাইন দেয়া চল্‌বে; খেলার মাঠে ভীড় জমাতে কারো বুক এতটুকু কাঁপবে না…এমন কি পরীক্ষার হলে গিয়ে কষ্ট করে চেয়ার-টেবিল অবধি ভাঙ্‌তে হবে না!

সুসংবাদ…মধি লিখিত সু-সমাচার!

ছাত্রদল উল্লসিত হয়ে এক বিরাট বিপুল সম্মেলন আহ্বান করে ফেল্ল। ছাত্র-ছাত্রীরা সেই সভায় অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতে লাগলো।

—ভাই সব, চলো মিছিল করে গড়ের মাঠ। আজ আমাদের আনন্দের অবধি নেই! আর আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে না। পৃথিবীর শেষ দিন সমাগত! আমরা সবাই রবিঠাকুরের চ্যালা! রবিঠাকুর জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষায় হাজিরা দেন নি—আমরাও দেবো না।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল দেবো না—দেবো না। খানিক বাদেই বিরাট এক শোভাযাত্রা বের হল-- ছেলে-মেয়েরা ঝাণ্ডা হাতে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চল্লো—

"যাবোই—মোরা যাবো—
লক্ষ্মীরে হারাই যদি—
অলক্ষ্মীরে পাবো॥"

নিস্তারিণী দেবীর অনিদ্রারোগ হয়েছে। আগে বিছানায় গা এলিয়ে দেবামাত্রই দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ত! কিন্তু ইদানিং ঘুম আর কিছুতেই আসে না!

এপাশ-ওপাশ করেন—রাত্রি ক্রমে গভীর হয়—বারোটা বাজে—একটা বাজে—দুটো বাজে—

কিন্তু নিস্তারিণী দেবীর চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই!

কি কুক্ষণে কর্ত্তা এসে খবরের কাগজ পড়ে শোনালো! সেই থেকেই ত নিস্তারিণী ঠাক্‌রুণের অনিদ্রা রোগ! পৃথিবীর শেষ দিন এগিয়ে এসেছে! তাই শুনেই ত চোখে তার ঘুম নেই!

কর্ত্তা নানারকম ঠাণ্ডা তেল এনে দিয়েছেন, ঠাণ্ডা সরবৎ খাওয়াচ্ছে রোজ…কিন্তু নিস্তারিণী দেবীর চোখে এতটুকু ঘুমের আমেজ নেই।

পাড়া-প্রতিবেশিনীরা দলে দলে দেখতে আস্‌ছেন—তাঁকে। তিনি কারো সঙ্গে কোনো কথাও বল্‌ছেন না—শুধু এপাশ আর ওপাশ! মাছের চোখের মতো ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দুই নয়ন।

সেদিন সুযোগ বুঝে পাশের বাড়ীর মিত্তির-গিন্নি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ দিদি, পৃথিবী যদি রসাতলে যায় ত' আমরা সবাই ত এক সঙ্গে মরবো। তার জন্যে তোমার এত ভাব্‌না কিসের?

নিস্তারিণী দেবী চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিস্‌ ফিস্‌ করে উত্তর দিলেন, ধরো, যদি মিন্‌সে মারা যায়—আর আমি অভাগী কোনো রকমে বেঁচে থাকি—তবে মাছ বিনে ভাতের গেরাস মুখে তুল্‌বো কেমন করে? তুমিই বলে দাও না…!

•

পাড়ার মদন খুড়োকে সেদিন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে বেড়াতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল!

ইদানিং মদন খুড়ো বড় একটা বাড়ীর বার হতেন না।

একটা সওদাগরি অফিসে মদন খুড়ো 'ক্যাশিয়ারের কাজ' করতেন। তারপর কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন। অফিসের লোকেরা বলাবলি করে, মদন খুড়ো আরো কিছুদিন চাকরী করতে পারতেন—কিন্তু ক্যাশের টাকার গোলমাল হওয়াতেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। যে টাকা তার জমা ছিল তাই থেকে ক্ষতিপূরণ করে কোনো রকমে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন।

তারপর থেকে চেনা-পরিচিত মহলে এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে মদন খুড়ো ধার না নিয়েছেন। ধার নিয়েছেন বটে, কিন্তু সে টাকা কাউকে শোধ দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি!

ইদানিং তিনি বাড়ী থেকে আর বেরুতেনই না। কেউ খোঁজ নিতে গেলে—জানা যেত—মদন খুড়ো বাড়ী নেই!

সেই মদন খুড়োকে সাজ-পোষাক করে বেরুতে দেখে সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। অনেকে ভাবলে খুড়ো বোধ করি লটারীতে টাকা পেয়েছেন। এইবার ঋণ শোধ করবেন।

প্রথমে পাড়ার মুদি এগিয়ে গেল।

—খুড়ো মশাই, টাকাটা কি এইবার পাওয়া যাবে? মদন খুড়ো মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, আরে ভায়া, পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে,—এখন ভগবানের নাম করো। তুচ্ছ টাকা-পয়সা নিয়ে মাতামাতি কেন? পরলোকে গিয়ে চিত্রগুপ্তকে মুখ দেখাতে পারবে?

পৃথিবীর শেষদিন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বটুকলালের ছুটোছুটি খুব বেড়ে গেছে। বটুকলাল সব সময়ই কর্ম্মব্যস্ত লোক। নানা প্রদেশেই তার ব্যবসা চালু আছে। বিভিন্ন প্রদেশে বটুকলাল বিভিন্ন নামে পরিচিত।

আসামে সে প্রদীপ ফুকন, বাঙলাদেশে সে বটুকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উড়িষ্যায় নাম নিয়েছে নিতাই পণ্ডা, বিহারে তাকে সকলে জানে ধরম সিং বলে, মাদ্রাজে তার নামকরণ হয়েছে—ত্রিনেত্র স্বামীনাথম্, গুজরাটে সে বিশ্বনাথ বেনিগল্, কেরেলে সে আর সি পানাপ্পা। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মতো—এক এক প্রদেশে তার এক এক নাম।

বটুকলালের ব্যবসাটা কি জান্‌তে চাইছেন? ওর নিকটতম বন্ধুরা ওকে বিবাহবিশারদ বটুকলাল বলেই জানে। তবে ব্যবসা ওর ভালো ভাবেই চালু আছে।

পৃথিবীর শেষদিনের সংবাদ পেয়ে বটুকলাল বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। পৃথিবী রসাতলে যাক্,—কিন্তু ওর বিয়ের সংখ্যা বাড়ুক—

সবাই একটি বিশেষ তারিখের একটি বিশেষ লগ্নের জন্যে রুদ্ধ কণ্ঠে অপেক্ষা করে আছে—

স্থবিরা পৃথিবী কার মন রাখ্‌বে?





কল্যাণী
অধ্যাপকের ভালো লেগেছে
কল্যাণীতে এসে অধ্যাপকটি প্রথমেই গেলেন স্কুল দেখতে। শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন যে এই নতুন শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হবে। ছাত্ররা যা চায় সবকিছুই কল্যাণীতে রয়েছে—মুক্ত বাতাস, পার্ক ও খেলাধুলার মাঠ, রাস্তাঘাট আর সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির কাছে থেকেও নগর-জীবনের সুখ-সুবিধার এই ব্যবস্থা দেখে অধ্যাপকটি মুগ্ধ।
জীবন যাত্রায়
আনন্দ আনবে
কল্যাণী
যোগাযোগ করুন:
কল্যাণী সেল্‌স অফিস, ১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯, ডেভলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, রাজভবন, কলিকাতা বা পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসার, কল্যাণী, জেলা—নদীয়া।

মেয়েদের কথা

সম্মুখে শান্তি পারাবার—

মনীষা মুখোপাধ্যায়

আনন্দ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে জগত। জগত আনন্দময়েরই অভিব্যক্তি। কিন্তু আপনি কেন জগতে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না? চিত্তে পাচ্ছেন না শান্তি? আপনার হয়ত সবই আছে, ধন, মান, সামাজিক মর্যাদা, আত্মীয়-স্বজন ভালবাসার পাত্র, তবু কোন-না-কোন কারণে আপনার মনে আনন্দ নেই—শান্তি নেই। কেন? আপনি নিজের বা স্বামীর চেষ্টায় দুঃখ-দারিদ্র্য জয় করে সামাজিক সম্মান-লাভ করেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু তবু আপনার মনে শান্তি নেই কেন? আর যদি শান্তিই না পেয়ে থাকেন তবে জীবনে যা পেয়েছেন সে-সকলের মূল্য কি?

উষার শান্ত মুহূর্তে নিত্য নূতন আলোতে বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করে আসেন সূর্যদেব। পশু পাখী গাছপালা তৃণ-লতা, ফুলের কুঁড়ি তার সাড়া পেয়ে আনন্দে শিহরিত হয়ে জেগে উঠে। পাখী গান গেয়ে তার অভ্যর্থনা জানায়, মুকুল প্রস্ফুটিত হয় ফুলে তারি আনন্দ-অভিনন্দনে। কিন্তু সে আনন্দের স্পর্শে আপনি শিহরিত হচ্ছেন না কেন?

আপনি বলেছেন আপনার সমস্যা রয়েছে, উদ্বেগ রয়েছে, আশংকা রয়েছে, দুশ্চিন্তা রয়েছে, ভয় রয়েছে, দুঃখ রয়েছে, দারিদ্র্য রয়েছে, রোগ রয়েছে, শোক রয়েছে, পারিবারিক কলহ রয়েছে। কি করে শান্তি পাবেন? তাই না? কিন্তু সমস্যা তো শুধু আপনার একারই নেই। আপনার সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা মানুষের আছে, আপনার উদ্বেগের চেয়েও বেশী উদ্বেগের মধ্যেও অনেক মানুষ আছেন, কিন্তু আপনার মত বিব্রত তাঁরা হচ্ছেন না। আশংকা-দুশ্চিন্তা-ভয় বলুন এজগতে কার নেই। কিন্তু আপনি এমন কাতর হয়ে পড়েছেন কেন? দুঃখ-দারিদ্র্যের কষ্ট সত্যি অনেক সময় অসহনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনার দুঃখ-দারিদ্র্যের চেয়েও অধিক কষ্টে মানুষ রয়েছে আপনি চোখ খুললেই দেখতে পাবেন। তারা আপনার মত মুষড়ে পড়েনি। রোগ-শোক-মৃত্যু এ তো জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এর যন্ত্রণা তো আমাদের নীরবে সহ্য করতেই হবে। এর থেকে তো রেহাই নেই, কারোরই নেই। কিন্তু এ-সকল কষ্টে অভিভূত হয়ে আমরা, আনন্দ-লোক থেকে নিত্য প্রবাহিত আনন্দ ধারার অমৃত রস থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছি কেন?

বিশ্বের অণুতে অণুতে রয়েছে আনন্দ-শিহরণ। বিস্তীর্ণ-বিশ্বের অসীম উদারতায় রয়েছে পরম শান্তি। সে আনন্দের, সে শান্তির আমরা পূর্ণ-অধিকারী। শত দুঃখ, শত দৈন্য, সহস্র ভয়-ভাবনার মধ্যেও সে আনন্দ—সে শান্তি আমরা পেতে পারি। তার জন্যে চাই মানসিক প্রস্তুতি—শান্তির জন্য সংগ্রাম, আনন্দের জন্য সাধনা। সে সংগ্রামে জয় আপনার সুনিশ্চিত, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ আপনার অনিবার্য।

সংসারে শান্তি আপনি কেন, অনেক কম মেয়ের ভাগ্যেই মিলে। তার কারণ অজস্র। কিন্তু অজস্র কারণের দিকে কেউ নজর দিচ্ছে, সকলেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছেন আপনার দিকে। পরিবারে বউ হয়ে যবে আপনি প্রবেশ করেছেন, বিয়ের আনন্দের কোলাহল থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যেন এ সংসারের বুকে আঘাত মেরে তাকে খান খান করে দিচ্ছেন। আপনার শ্বশুর মশায় বৃদ্ধ মানুষ, তিনি আপনার শাশুড়ীর কথা শুনে-টুনে গম্ভীর হয়ে বলছেন—সব কিছুর মূলে হচ্ছো—তোমরা। মেয়ের জাত। 'দারয়তি ভ্রাতৃন্' এজন্যে তোমাদের নাম হয়েছে 'দারা'—পুংলিঙ্গ, বহুবচন। আপনার শাশুড়ী ভাল করে বুঝেন নি কথাটা, তিনি রেগে-

মেগে বলে উঠলেন, 'আমার জন্যে সংসারে আগুন লেগেছে?' আপনার শ্বশুর অপ্রস্তুত হয়ে কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন, "আরে রাম, আমি কি তোমার কথা বলছি? বউরা কি ভাবে ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সংসার ভেঙ্গে দেয় তা শাস্ত্রেই বলেছে, সে কথা বলছি।" আপনার শাশুড়ীর রাগ তাতে কমে না, তিনি রেগে-মেগে বলেন, "বলি আমরা আর বৌ হয়ে আসিনি? তাঁর বক্তব্য আপনিই সকল অনর্থের মূল।"

আমি জানি একা কেউ অনর্থের মূল নন। অনর্থের মূলে রয়েছে অনেকে। আমার ছোট বোন ইভার দুঃখের কাহিনীটা একবার বলি। ইভার বিয়ে হয়েছে বেশীদিন হয়নি। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সুন্দরী বলে ইভার খুব আদর হয়েছিল। তার শ্বশুর, শাশুড়ী, জা, ননদ, সকলেই তাকে স্নেহ করত। বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বৌ-এর কিছু কিছু সমালোচনা হতে লাগল। ইভা ভঙ্গ-বামুনের মেয়ে বিয়ে হয়েছে কুলীনের সঙ্গে। ইভার শাশুড়ী সে কথা দুদিন তাকে শুনিয়ে ফেলেছেন। ইভা কোন কথা বলতে পারে নি, মনে তার রাগ জমাট হয়েছিল। ইভার ননদের এক বান্ধবী ইভার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছিল, তাকে সে একদিন বলে ফেলল, "আমরা ভঙ্গের ঘরের মেয়ে হলেও এমন একজনের উচ্ছিষ্ট থালায় পর পর সাতজন বসে খাইনি। কথাটা ইভার ননদের কানে গেল, সেখান থেকে শাশুড়ীর কানেও। ইভার সংসারে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী কে? একা ইভা? মোটেই নয়। তার জন্যে দায়ী —ইভার ননদের বন্ধু, ইভার ননদ, ইভার শাশুড়ী, ইভার ভাসুর,ইভার শ্বশুর,আর ইভা নিজেও। ইভার ননদও তাঁর বন্ধু চুকলিকাটার জন্য দায়ী, শাশুড়ী এক থালায় এতগুলি লোককে খাওনোর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বিরুদ্ধে কথা বলায় রেগে যাওয়ার জন্য অপরাধী, বাড়ীর কর্তারা এই স্বাস্থ্য নীতি বিগর্হিত আহার-পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য দায়ী। ইভার দোষই সবচেয়ে কম। কিন্তু সে কথা কে বলবে? শাশুড়ী বলেছেন, "ছোট বৌমা, তুমি আমার সোণার সংসারে আগুন জ্বালিও না।" ইভার মনে খুব লেগেছে। ধীরে ধীরে সে এক থালায় পর পর সাতজন খাওয়ার ব্যবস্থাটা মেনে নিল। এখন সকলে তার প্রশংসা করে, আমি কিন্তু করি না, কারণ ইভার পক্ষে যেমন ননদের বন্ধুকে কথাটা বলা ঠিক হয়নি, তেমনি ঠিক হয় নি অস্বাস্থ্যকর আহার-পদ্ধতি মেনে নেওয়া। তার উচিত ছিল, এর মূলে কি রয়েছে তা আবিষ্কার করা। একটু লক্ষ্য করলেই সে দেখতে পেত, তার শাশুড়ী, এক নম্বর কৃপণ! ঝি রেখে বাসন তিনি মাজাচ্ছেন না। বাসন-মাজার কাজটাকে কমিয়ে রাখার জন্য শাশুড়ী এই এক থালায় সাতজনের ব্যবস্থা চালু করেছেন। ইভা যদি নিজে বাসন-মাজার কাজটা করে ফেলে, শাশুড়ীকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারে, তবে আমি ঠিক বলতে পারি, কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি না করেই ইভা তার স্বামীর সংসারের লোকদের একটি অতি জঘন্য অভ্যাস দূর করতে পারত।

কুলবধূরা স্বামীর সংসারে এসে অনেক সময়ে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে, নিজের বাপের সংসারকে ভুলতে পারে না বলে। স্বামীর সংসারে থাকে তারা ঠিক অতিথির মত। স্বামীর সংসারের সংগে একাত্ম হতে পারে না। বাপের সংসারের ভালমন্দ তারা যত চিন্তা করে, তার শতাংশও চিন্তা করে না স্বামীর সংসার সম্পর্কে। তার উপর বাপের ঘরের কথা শ্বশুরের ঘরে, আর শ্বশুরের ঘরের কথা বাপের ঘরে বয়ে নিয়ে দুই সংসারে কলহ বাধায়। এক সংসারের সমালোচনা আর সংসারে সাধারণতঃ হয়ে থাকে, সে সব সমালোচনার কথা যদি ঘরের বৌ তার বাপের বাড়ীতে নিয়ে বলে, তাতে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে তাতে আশ্চর্য কি?

আমি ছোট বয়সে কিছুকাল মামার বাড়ীতে থেকে পড়তুম। সেখানে শুনতুম আমার দিদিমা দিবারাত্র আমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে গালি বর্ষণ করছেন। আমি সে সব শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখতুম, ছুটিতে যখন বাড়ী আসতুম, ঠাকুরমার কাছে দিদিমার সব-কথা বলতুম। ঠাকুরমা তাতে ভয়ঙ্কর চটে যেতেন; আমাকে সাবধান করে দিতেন কখনও যেন এই বাড়ীর কথা ও-বাড়ীতে আমি না নিয়ে যাই। কুলবধূদের পক্ষে এ নিয়ম পালন অত্যন্ত দরকারী। তাদের মনে রাখা উচিত বিয়ের পর তাদের গোত্রান্তর হয়েছে। মনেপ্রাণেও সে গোত্রান্তরটা পরিস্ফুট হওয়া দরকার।

অনেক মা-বাপ আবার মেয়ের সংসারের ব্যাপার নিয়ে খুব মাথা ঘামায়। মেয়ে-জামাইএর কিসে দুপয়সা জমবে, জীবনবীমা দু একটা বাড়বে, দুএক কাঠা করে জমি কেনা হবে মেয়ের নামে, সে সব বিষয়ে তাদের কড়া-নজর থাকে। উত্তমার গল্পটাই বলছি। উত্তমার স্বামীর সংসার খুব শান্তির ছিল। সংসারে শুধু দুই দেবর আর বিধবা শাশুড়ী। দেবর দুজন তার স্বামীর খুব অনুগত—কলেজে পড়াশোনা করছে। উত্তমার স্বামীর লেখাপড়ার ইচ্ছা ছিল খুব, কিন্তু অর্থাভাবে তা করতে পারেনি। যা হোক্ তবু চাকুরীটা খুব ভাল পেয়েছে। তাই নিজের পড়াশোনার অপূর্ণ বাসনাটা ভাইদের মধ্যে পূর্ণ দেখতে চায়। উত্তমার মা ও বাবা এ সম্বন্ধে খুব ভেবেছেন ও দেখেছেন উত্তমার স্বামী তার ভাইদের জন্যে কমসে-কম মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে। বছরে ছয়শত টাকা। দু বছরে একহাজার দুশ টাকা। সোজা কথা নয়। এ টাকায় যেউত্তমার জন্যে তাঁরা রামরাজাতলায় চার কাঠা জমি কিনে দিতে পারেন। দ্বিতীয় বছরের জামাইষষ্ঠীতেই শাশুড়ী জামাই-মেয়েকে একথাটি ভাল করে সমঝাতে চেষ্টা করেন। উত্তমা শ্বশুরবাড়ী এসে সে-সব উপদেশ কার্যকরী করার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে। কিন্তু তার স্বামী মোটেই তাকে আমল দেয় না। উত্তমা ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। সে প্রতি রাত্রে স্বামীর কর্ণে একই মন্ত্র জপ করতে থাকে। কিছু ফল হয় না। তাতে তার মেজাজ যায় বিগড়ে। নানা রকমভাবে ছোট ছোট বিষয়ে শাশুড়ী, দেবর ও স্বামীর সঙ্গে তার ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আর সে ঠোকাঠুকির ফলে সে সংসারটা ভেঙ্গে-চুরে যায়। কিন্তু আমি জানি পৃথগন্ন হওয়ার পাঁচবছর পরেও উত্তমার নামে চারকাঠা জমি কেনা হয়নি। কিন্তু সংসারটা তো তার ভাঙলো। এক্ষেত্রে উত্তমা ছেলেমানুষ। সে বুঝেই কত, আর তাকে দোষ দোবই বা কি? কিন্তু তার মা-বাপকে দু-এক কথা না বললে চলে না। তাঁদেরই উচিত হয়নি মেয়ের সংসারে নাক গলানো। তাঁদের ভাবা উচিত ছিল নিজের সংসারে তাঁরা কি চান। নিজের সংসারে তাঁরা চান ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেন সম্প্রীতি বজায় থাকে, শান্তি থাকে। মেয়ের সংসারেও সেই সম্প্রীতি ও শান্তিটাই তাঁদের সর্বান্তঃকরণে কামনা করা উচিত ছিল। মেয়ের সংসারে শান্তিভঙ্গ হয় এমন কিছু করা, বলা কিংবা ভাবাও তাঁদের পক্ষে উচিত হয়নি।

সংসারে শান্তি নানাপ্রকারে বিঘ্নিত হয়। রোগ, শোক, মৃত্যু, দৈবদুর্বিপাক প্রায় প্রত্যেক সংসারকেই বিপর্যস্ত করে। তারপর পরিবারের আমরা যদি একটু বিবেচনা না করে চলি তবেও সংসারে শান্তি অসম্ভব। পরিবারস্থ বধূগণই শুধু সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে একথাও আমি বলতে পারি না। তবে সে শান্তি তাঁদের চিন্তা ধারা, ভাষণের রীতি ও কার্যের পদ্ধতির উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁদের চিন্তার মধ্যে একথাটা দৃঢ়মূল হওয়া দরকার যে—পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। কারণ পারিবারিক অশান্তি তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী পীড়া দেবে। তাঁদের অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সময়ে, আর রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সংকল্প করতে হবে, "আমি কায়মনোবাক্যে আমার পরিবারে শান্তি বজায় রাখব; কোনরূপ অশান্তির কারণ আমি যেন না হই।" কিন্তু এরূপ সংকল্প শুধু তাঁকে একা করলেই চলবে না। তাঁর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর-ননদ সকলকেই এরকম একটা সংকল্প করতে হবে, সংসারে শান্তি চাই বলে, কারণ শান্তি সকলের পক্ষেই একান্ত কামনীয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হাতের কাজ

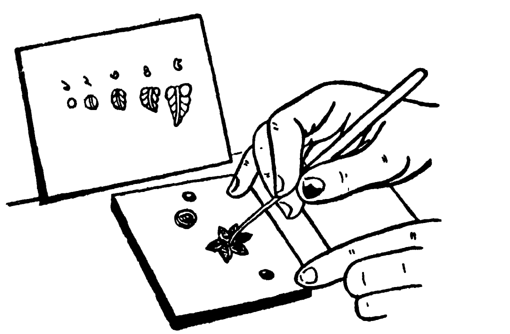
গালার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতবারে গালার কারু-শিল্প রচনার জন্য কি কি সরঞ্জাম চাই এবং এ শিল্প-কাজের জন্য গালার কাঠি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়—তার মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারে রঙীন গালার কাঠি এবং ঐসব সরঞ্জামের সাহায্যে বিভিন্ন সামগ্রার উপর কিভাবে নানা ধরণের কাজ করা যায়—সেই কথা বলছি।

ফুলদানী, ট্রে, ছবির ফ্রেম, সিগারেট ও দেশলাই রাখার বাক্স, গহনার বাক্স, কলম-পেন্সিল-তুলিদান, বিবিধ আসবাবপত্র, কাঁচের বা কাঠের পাত্র প্রভৃতি নানা ধরণের জিনিষের উপর গালার নক্সা-কারুকার্য্য করা চলে। এ সব নক্সাও নানা ছাঁদের হয়। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে, প্রথমে পাতা-লতা-ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি সোজা-ধরণের নক্সা-রচনা থেকে কাজ সুরু করাই ভালো···কারণ এ' সব ধরণের নক্সার কাজ সহজসাধ্য এবং এ কাজে হাত রপ্ত হলে অল্পদিনের মধ্যে অনায়াসেই আরো নানা রকমের কঠিন ও সূক্ষ্ম-ছাঁদের বিচিত্র কারু-শিল্প রচনার কাজ করতে পারবেন।

গোড়াতেই বলি, রঙীন গালা-কাঠি দিয়ে পাতার নক্সা রচনার কথা। কাঁচের বা কার্ডবোর্ডের সামগ্রীটির উপর নক্সার ছাঁদ অনুসারে জলন্ত বাতির আঁচে গলানো গালার ফোঁটা ফেলুন এবং এই ফোঁটার গালা গরম থাকতে থাকতে পাতা বা ফুলের পাপড়ির আকারে কিম্বা গাছের ডালপালার বা লতার ছাঁদে অর্থাৎ গালার কাঠি দিয়ে যে ধরণের চিত্র রচনা করতে চান, সেই ছাঁদে ঐ গলিত-গালার উপরে 'মডেলার' (Modeller) লোহার কাঠি (Steel Knitwing Needle), বা 'স্প্যাচুলা' (Spatula) চালিয়ে পাতা, পাপড়ি, ডালপালা বা লতার নক্সা ফুটিয়ে তুলতে হবে।



পাশের ছবি দেখলেই এই ধরণের নক্সা ফুটিয়ে তোলবার পদ্ধতিটি বুঝতে পারবেন। ছবিতে গলিত-গালার ফোঁটা থেকে ফুলের পাপড়রি নক্সা ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে পর-পর চারটি (১, ২, ৩, ৪,) পর্য্যায়ে। গরম গালার ফোঁটা থেকে পাতার নক্সা রচনার পদ্ধতিটিও দেখানো হয়েছে গত মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত ১নং চিত্রে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ফুল পাতার নক্সা-রচনার আরো একটি ছবি এখানে প্রকাশিত হলো।

প্রথমোক্ত ছবিতে পিছনে সাজিয়ে রাখা কার্ডে দেখানো হয়েছে—গলিত গালার গরম ফোঁটা থেকে পর-পর পাঁচটি



পর্য্যায়ে 'লোহার কাঠি', 'মডেলার' বা 'স্প্যাচুলা'র সাহায্যে কি ভাবে পাতার নক্সা ফুটিয়ে তুলতে হয়। এমনিভাবে পাতা, পাপড়ি বা লতার নক্সা রচনা করতে করতে হাত বেশ রপ্ত হলে, ক্রমে বাড়ী-ঘর, পথ-বাগান, পাহাড়, নৌকা, এমন কি নানা ধরণের মানুষ আর পশু-পাখীরও বিচিত্র সব নক্সা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে নজর দেবেন। তবে সে সব নক্সার কাজও উপরিউক্ত পদ্ধতিতে করতে হবে। তার নমুনা দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে।

আগেই বলেছি, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড়-বড় নক্সা রচনা করতে হলে—'স্প্যাচুলা'র প্রয়োজন। কাজেই তালপাতা, কলাপাতা, পদ্মপাতা, মনসা বা চেনার প্রভৃতি সুদীর্ঘ পাতার চিত্র-রচনা করতে হলে, 'লোহার কাঠি' বা 'মডেলারের' বদলে 'স্প্যাচুলা' দিয়ে কাজ করাই ভালো। তবে 'স্প্যাচুলা' দিয়ে বড় জায়গায় কাজ করবার সময়, গলিত-গালার উপর বেশ সাবধানে 'স্প্যাচুলা' ব্যবহার করা প্রয়োজন। সাবধানে এবং সুষ্ঠুভাবে 'স্প্যাচুলা' যন্ত্রটিকে চালনা করতে পারলে একরত্তি গলিত-গালার ফোঁটাকে বেশ দীর্ঘায়ত-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। 'স্প্যাচুলা' ছাড়া শুধু 'লোহার কাঠি' বা 'মডেলার' দিয়ে দীর্ঘ পাতা বা বড়-বড় জায়গায় গালার

কারু-শিল্প রচনা করতে গেলে কাজের সময় নানা অসুবিধা ঘটে, এবং শেষ পর্য্যন্ত শিল্পকাজটিও তেমন পরিপাটি নিখুঁত ছাঁদের হয় না। সাধারণতঃ, যেভাবে পেন্সিল, কলম বা তুলি চালিয়ে আমরা চিত্র-রচনার কাজ করি, গালার কারু-শিল্পে নক্সা ফুটিয়ে তোলবার জন্য ঠিক তেমনিভাবে 'স্প্যাচুলা', 'লোহার কাঠি' বা 'মডেলার' চালাতে হবে। এসব সরঞ্জাম চালিয়ে কাজ করার পদ্ধতি ইতিপূর্ব্বেই গত ভাদ্রমাসের সংখ্যায় প্রকাশিত ১নং ও ২নং ছবিতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুদীর্ঘ ঘাস বা তৃণ-শিখা, বাঁশ গাছ ও পাতা, গাছের মোটা গুঁড়ি বা ডালপালা প্রভৃতির নক্সা-রচনার সময় 'স্প্যাচুলা' যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগে। তাছাড়া কোনো সামগ্রীর বুকে চওড়া 'বর্ডার' বা 'পাড়' রচনার সময় 'স্প্যাচুলা' ব্যবহার করাই ভালো।

'স্প্যাচুলা' ছাড়াও 'স্যস্-প্যানের' (Sauce Pan) মতো ছাঁদের, সামনে সরু নল-বসানো গলিত-গালা রাখার যে বিচিত্র পাত্রটির কথা ইতিপূর্ব্বে জানিয়ে রেখেছি সেটির সাহায্যেও নানা ধরণের শিল্প কাজ করা চলে। এ সরঞ্জামটির বিশদ বিবরণ গত ভাদ্রমাসের সংখ্যায় জানিয়ে রেখেছি, তাই এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আপাততঃ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গালার কারু-শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি আরো কয়েকটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখি।

নক্সা-রচনার সময়, গলিত-গালার ফোঁটা শুকিয়ে গেলে, জ্বলন্ত-বাতির আঁচে 'স্প্যাচুলা'-যন্ত্রটিকে বেশ ভালো-ভাবে তাতিয়ে গরম করে নিয়ে, সেই জুড়িয়ে-যাওয়া গালার ফোঁটার উপর এটি আবার চেপে ধরলেই, গালা নরম ও কাজের উপযোগী হয়ে উঠবে। তখন সেই নরম গালার বুকে 'লোহার কাঠি', 'মডেলার' বা 'স্প্যাচুলা'—অর্থাৎ নক্সা-ফোটানোর জন্য যে সরঞ্জামটির প্রয়োজন, সেটিকে পেন্সিল বা তুলি-চালানোর ভঙ্গীতে ব্যবহার করে ধৈর্য্য ধরে পরিপাটিভাবে কাজ সারতে হবে।

গলিত-গালার ফোঁটার উপর পাতা বা ফুলের পাপড়ির নক্সা ফুটিয়ে তুলতে হলে 'লোহার তৈরী বোনবার কাঠি' কিম্বা 'মডেলার' বা ছাঁচ-তোলার 'মোলডার' সরঞ্জামের প্রয়োজন। গালার ফোঁটা গরম ও নরম থাকতে-থাকতেই তার উপর প্রয়োজনমত-ছাঁদে 'লোহার কাঠি' বা 'মোল-ডারের' মৃদু চাপ দিয়ে তুলি অথবা পেন্সিলের আঁচড়-টানার ভঙ্গীতে কারুশিল্পের ডিজাইন-অনুযায়ী নক্সা ফুটিয়ে তুলতে হবে। কাজের সময় গালার ফোঁটা ঠাণ্ডা হয়ে শুকিয়ে গেলে, 'লোহার কাঠি' বা 'মোলডারটিকে বাতির আগুনে ভালোভাবে তাতিয়ে গরম করে নিয়ে জুড়ানো-গালার ফোঁটার উপর কিছুক্ষণ চেপে ধরলেই, সে গালা আবার নরম হয়ে যাবে। তখন তার বুকে 'লোহার কাঠি' বা 'মোলডার' চালিয়ে অনায়াসেই আবার নক্সা-রচনার কাজ করা চলবে।

এক রঙের গালার উপরে অন্য রঙের গালা-কাঠির প্রলেপ লাগাতে হলে অর্থাৎ, যেমন ধরুন—সাদা রঙের ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে হলদে রঙের রেণু রচনা করা—এ ধরণের কাজের জন্য যে পদ্ধতির রেওয়াজ আছে—সেটি খুবই সহজসাধ্য। প্রথমে সাদা রঙের গালায় ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ির নক্সা রচনা করে নিয়ে, সেগুলির উপরে 'লোহার কাঠি' বা 'মোলডারের' ডগায় এক চিল্‌তে হলদে রঙের গালা-কাঠির টুক্‌রো লাগিয়ে জ্বলন্ত বাতির আঁচে গালিয়ে নরম করে নিয়ে, সে টুকরোটিকে ঐ পাপড়িগুলির ঠিক মাঝখানে বসিয়ে 'মোলডারের' মৃদু চাপ দিয়ে ফুলের রেণুর ছাঁদে রচনা করতে হবে। শুকিয়ে যাবার পর, রঙীন গালার এই টুকরোটি রীতিমত পাকাপাকিভাবে ফুলের পাপড়ির বুকে আঁকড়ে থাকবে—সহজে ঝরে যাবে না। ছোট জিনিষের উপর সূক্ষ্ম নক্সার কাজ করতে হলে এ পদ্ধতিটি বিশেষ সুবিধাজনক। তবে জায়গা জুড়ে এ ধরণের কাজ করতে হলে, গলিত-গালার ফোঁটা ফেলে 'স্প্যাচুলা', বা 'মোলডারের' সাহায্যে নক্সা-রচনা করাই ভালো।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে, গোড়ার দিকে খুব ছোট কোনো জিনিষপত্রের উপর সূক্ষ্ম-ধরণের নক্সার কাজ করার চেয়ে বড়-বড় সামগ্রীর উপর সাধাসিধে মোটা-ছাঁদের নক্সা-রচনা করাই ভালো। কারণ, গোড়ার দিকে এ সব কাজে নানা রকম অসুবিধা ও ভুল-চুক ঘটতে পারে এবং তার ফলে অপচয় আর অসাফল্যের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং প্রথম-প্রথম মোটা-ছাঁদের সাধাসিধা নক্সার কাজ করে নিয়মিত অভ্যাস-অনুশীলনের ফলে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা

সঞ্চয়ের পর ছোট-খাট সৌখিন জিনিষপত্রের উপর সূক্ষ্ম-ছাঁদের শিল্পকারু রচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি দরকারী কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোড়ার দিকে, নানা রকম সৌখিন জিনিষপত্রের উপরে শিক্ষার্থীরা গালা-কাঠি দিয়ে যে সব বিচিত্র নক্সার কাজ করবেন, সেগুলি রচনার আগে যদি তাঁরা জিনিষটির বুকে পরিকল্পিত-নক্সার একটি অবিকল-খসড়া এঁকে নিয়ে তারপর রঙীন গালার গলিত-ফোঁটা ফেলে চিত্র-রচনা করেন, তাহলে তাঁদের কাজ হবে সহজসাধ্য এবং শিল্প-সামগ্রীটিও হয়ে উঠবে আগাগোড়া নিখুঁত, পরিপাটি ও অপরূপ শ্রীমণ্ডিত। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই এ বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

এই হলো গালার কারুশিল্পের মোটামুটি নিয়ম। এ নিয়ম-অনুসারে অল্প কিছুদিন নিষ্ঠাভরে চর্চ্চা-অনুশীলন করলে শিক্ষার্থীরা অচিরেই পারদর্শিতা লাভ করবেন এবং অনায়াসেই নানা ধরণের বিচিত্র সৌখিন সামগ্রীর উপর বিভিন্ন-ছাঁদের সূক্ষ্ম-সুন্দর গালার নক্সা-কারুশিল্পের কাজ করে নিজেরা যেমন তৃপ্তি পাবেন, সংসারের আর পাঁচ-জনকেও তেমনি প্রচুর আনন্দ দিতে পারবেন।

পশম দিয়ে ছবি বোনা

রোচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ-বেরঙের পশম দিয়ে কার্পেটের উপর নানা-ধরণের বিচিত্র-সুন্দর চিত্র-রচনার রেওয়াজ আমাদের দেশে বহু-দিন থেকেই চলে আসছে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-ঘরেই সব বয়সের পুরনারীরা—অর্থাৎ বৃদ্ধা ঠাকুমা-দিদিমা থেকে সুরু করে বাড়ীর ছোট্ট নাত্‌নিটি অবধি সকলেরই এ সব সূচী-কাজে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কার্পেটের উপর রঙীন পশম দিয়ে এঁরা যে সব নক্সা-রচনা করেন—সেগুলি নিতান্তই মামুলী-ছাঁদের…অর্থাৎ সেই সাবেকী-সনাতন প্রথানুসারে ফুল-লতা-পাতা, পাখী, বাঘ, কুকুর, বেড়াল বা দেব-দেবীর ছবি—বাজারে কার্পেটের 'প্যাটার্নের' (Pattern) যে সব গতানুগতিক নক্সা-ছাপা সুলভ বই পাওয়া যায়—তারই হুবহু অনুকরণ মাত্র! অথচ, একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা অনায়াসে এই সব গতানুগতিক ধারায় সূচী-শিল্পের কাজ না করে, কার্পেট ছাড়াও মোটা 'লিনেন' (Linen), 'ম্যাটি' (Matte), বনাত (Felt)' চট প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের ওপর পশমের সাহায্যে সম্পূর্ণ অভিনব-ছাঁদের আরো কত রকমের যে সুন্দর-সুন্দর নক্সা-কারুকার্য্য করতে পারেন, তা বলে শেষ করা যায় না। আজ তাই পশম দিয়ে এমনি ধরণের নূতন পদ্ধতিতে, মোটা 'লিনেন' চট কিম্বা বনাতের উপরে সূচী-চিত্র রচনার বিষয় কিছু বলছি।



উপরে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের নক্সাটি দেওয়া হলো—সেটি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিলিপি-অনুসরণে রচিত। এ নক্সাটি উপরিউক্ত তিন-ধরণের কাপড়ের উপর নানা রঙের পশমের সুতোর সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে। তবে, স্থানাভাবে নক্সাটি ছোট-আকারে মুদ্রিত হলো—সূচীকার্য্যের জন্য ২৭ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বড় করে কাপড়ের উপরে এঁকে নিতে হবে। সূচীকার্য্য শেষ হবার পর, এ ছবিটিকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে কিম্বা 'পাটা' বা 'স্ক্রোলের' (Scroll) ধরণে ঝুলিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলে দেয়ালের শোভা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এ নক্সাটিকে 'কুশন', পর্দ্দা, টেবিল-ক্লথ, ট্রে-ঢাকা, এমন কি বিছানা-ঢাকা দেবার কাপড় শ্রীমণ্ডিত করবার কাজেও ব্যবহার করা চলবে।

যাই হোক, আপাততঃ কাপড়ের বুকে এ নক্সাটি সেলাই করতে হবে কিভাবে, সেই কথা বলি।

নক্সাটিকে রচনার জন্য নেবেন বড় সাইজের বনাত কিম্বা 'লিনেন' কাপড়ের টুক্‌রো। কাপড়ের রঙ হবে খুব হালকা অথবা খুব গাঢ় ধরণের। কাপড়ের জমি হালকা রঙের অর্থাৎ শাদা, হলদে, গোলাপী, আশমানী ধরণের হলে গাছ-পাতা, জলের ঢেউ, বাঁশের মাচা, ডাঙার ঘাস-পাথর, দূরের পাহাড় এবং ছোট্ট কুটিরটি সেলাই করতে হবে মানানসই গাঢ়-ধরণের রঙীন পশমের সুতো দিয়ে। কাপড়ের জমির রঙ গাঢ় অর্থাৎ কালো, ঘন নীল বা সবুজ বেগুনী প্রভৃতি হলে—গাছপালা, পাহাড়, জল, কুটির, মাচা সবই করতে হবে মানানসই হালকা-রঙের পশমী সুতোয়।

এ ধরণের নক্সা-পট 'ব্যাক্ ষ্টিচ' (Back Stitch) পদ্ধতিতে সেলাই হবে। তবে বাঁশ-জাতীয় গাছের পাতাগুলি সেলাইয়ের জন্য—'ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্রয়ডারী' বা দেশী ধরণের সূচী-কার্য্য করতে হবে। গাছের ডাল সেলাই করার জন্য গাঢ়-সবুজ রঙের পশম নেবেন। পাতাগুলি সেলাই করবার সময় কতকগুলি গাঢ়-সবুজ এবং কতকগুলি ফিকে-সবুজ রঙের পশমে সেলাই করলে সূচী-শিল্প বেশ সুন্দর দেখাবে। নক্সাতে সমুদ্রের কূলে কুটিরের সামনে যে বাঁশের মাচাটি দেখা যাচ্ছে, সেটি সেলাই করবেন—'রাষ্ট-ব্রাউন' (Rust-Brown) অর্থাৎ মরচে-ধরা বাদামী রঙের পশমে। সাগর-কূলে উঁচু টিলার উপর যে কুটিরটি রয়েছে সেটি সেলাই করতে হবে—'সাটিন ষ্টিচ' (Satin Stitch) পদ্ধতিতে। ডাঙার কিনারে যে বিন্দু-চিহ্নগুলি রয়েছে সেগুলি সেলাই করতে হবে—'ফ্রেঞ্চ নট' (French Knot) পদ্ধতিতে। ডাঙার জমি—অর্থাৎ যে দিকটি সাগরের জলের কিনারায় রয়েছে—সে অংশটি 'রাষ্ট-ব্রাউন' রঙের পশমে সেলাই করতে হবে। কুটির-টিকেও রাষ্ট ব্রাউন রঙের পশমে সেলাই করতে পারেন—তবে পশমের এই রঙ পছন্দ করার ব্যাপারটি আগাগোড়া নির্ভর করে—আপনি হালকা বা গাঢ় যে রঙের কাপড় ব্যবহার করবেন—তার উপর। কাজেই এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোনো নির্দ্দেশ দেওয়া সমীচীন হবে না।

নক্সাটি যদি ২৭ × ২০″ মাপে তৈরী করেন—তাহলে গাছের জন্য গাঢ় সবুজ পশম নেবেন দুই আউন্স। সমুদ্রের জন্য নীল রঙের পশম নেবেন—এক আউন্স। এ ছাড়া সাদা পশম এক আউন্স এবং 'রাষ্ট-ব্রাউন' পশম নেবেন দুই আউন্স।

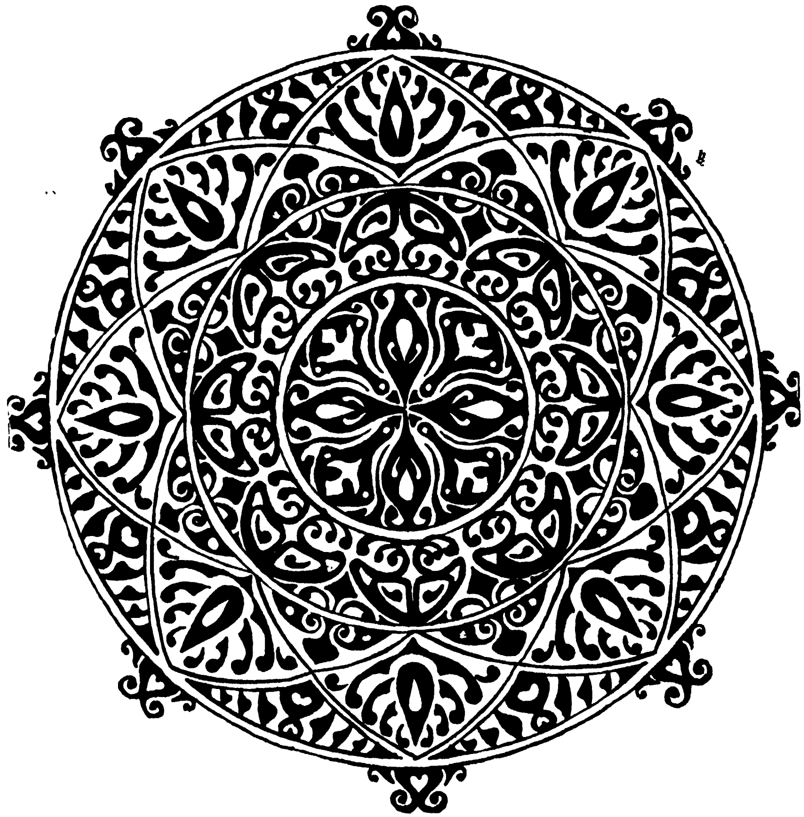
নক্সাটি সেলাই করবার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। সেলাইয়ের সময় নক্সার চারি-পাশে অন্ততপক্ষে যেন আড়াই ইঞ্চি কিম্বা তিন ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা যেন ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়। এ ফাঁকা জায়গাটুকু না রাখলে, সেলাইয়ের পর নক্সা-চিত্রটি বাঁধাবার সময় রীতিমত অসুবিধা ঘটবে।

সেলাইয়ের জন্য সরেস পশম ব্যবহার করবেন—তার ফলে সূচীকার্য্য টেঁকসই এবং পাকা-রঙের হবে। শস্তা দামের পশম আদৌ ব্যবহার করবেন না।




বছরের
সেরা
উপহার
USHA
সারাজীবন
কাজে
লাগবে

আল্পনা—



-শিল্পী ঃ অনুরাধা ঘোষ

রান্নাঘর

মাংসের কোপ্তা ও কাবাব

কোপ্তা ঃ—

উপকরণ—১ সের মাংস, পরিমাণমত ধনে, লঙ্কা, হলুদ-বাটা, গরমমশলা, জিরামরিচ, লবণ ও আধপোয়া আন্দাজ মটর ডাল এবং ৩।৪টি হাঁসের ডিম।

প্রথমে একঘণ্টা পূর্ব্বে মটর ডাল ভিজিয়ে রাখবেন। ডাল বেশ নরম হয়ে গেলে, খুব মিহি করে বেটে নেবেন। এখন একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ (দেড়পোয়া। দু'পোয়া আন্দাজ) জল দিয়ে মাংস সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ করবার সময় মাংসের সঙ্গে হলুদবাটা, লঙ্কাবাটা, ধনেবাটা, জিরা-মরিচ মাখিয়ে দেবেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি যে পূর্ব্বেই হাড় বাদ দিয়ে মাংসখণ্ডগুলি যেন ভাল করে থুড়ে নেওয়া হয়। এবার মাংস সিদ্ধ হয়ে জল ক্রমশঃ শুকিয়ে মাংসের গায়ে লেগে গেলে উনান থেকে নামিয়ে নিন ও গরমমশলা, পরিমাণমত লবণ ও ডাল বাটা ভাল করে মাংসের সঙ্গে মাখিয়ে নিন। রুচি অনুযায়ী ডাল বাটার সঙ্গে ভাল কিস্‌মিস্‌ মিশিয়ে নিতে পারেন। এবার ইচ্ছা-মত ছোট-বড় মাংসের বড়া প্রস্তুত করুন। ইতিমধ্যে একটি পাত্রে ডিমগুলি ভেঙে লবণ দিয়ে ফেটিয়ে (গুলে) রাখবেন। এবার মাংসের বড়াগুলি ডিমে ডুবিয়ে ভাল করে

য়েয়ে ভেজে নিন। এখন গরম গরম পরিবেশন করে দেখুন তো কিরকম মুখরোচক কোপ্তা প্রস্তুত হয়েছে।

কাবাব ঃ—

উপকরণ—মাংস ১ সের, ঘি ১ পোয়া, দই আধ পোয়া, পরিমাণমত দারুচিনি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ, আদা ও ২।৩টি হাঁসের ডিম এবং পরিমাণমত কিছু ময়দা।

প্রথমে পেঁয়াজ ও আদা রস করে নিয়ে মাংসে মিশিয়ে দিন। পূর্ব্বেই মাংসে দই মাখিয়ে রাখবেন। এবার একটা পাত্রে ঘি দিয়ে উনানে বসিয়ে দিন। ঘি গরম হলে তাতে মাংস দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে মাংসের জল শুকিয়ে আসবে তখন আধসের আন্দাজ জল দিয়ে মাংস সিদ্ধ করুন। এই সময় পরিমাণমত লবণ দিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে দারুচিনি, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, মরিচ গুঁড়িয়ে একটি পাত্রে ডিম গুলে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। এবার মাংস সিদ্ধ হলে (আপনার প্রয়োজনমত জল রাখবেন) ঐ মাংস সিদ্ধ জলে পরিমাণমত ময়দা মিশিয়ে জলটিকে ঘন করে নিন। মাংসগুলিকে কিন্তু আলাদা তুলে রাখবেন। এবার ডিম ইত্যাদি যেগুলি আলাদা পাত্রে গুলে রেখেছেন—সেগুলি ময়দা মিশ্রিত জলে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এখন ঐ ঘন জলে একটি একটি করে মাংসখণ্ড ডুবিয়ে ঐগুলি ঘিয়ে লালচে করে ভেজেনিন। তাহলেই কাবাব প্রস্তুত হল। একে মাদ্রাজী কাবাব বলে। এটিও খুব মুখরোচক।

—সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়

অপরাজেয়

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বাঙালী, তোমার মস্ত যে অপরাধ—
যে দেশে থাকবে সকলকে ক'রে ছোট,
বিদ্যা এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে
মাথা চাড়া দিয়ে বড়ো হ'য়ে তুমি ওঠো!
দেশোয়ালীদের শিক্ষার বিস্তারে
পয়সা খরচ করবে নিজেরা মিলে।
বাঙালীটোলাটা জমিয়ে তুল্‌বে ক্রমে।
বুদ্ধ লোকেরা ভাব্‌বে তাড়িয়ে দিলে
—প্রতিযোগিতায় পারছে না যারা মোটে—
তারাই সহজে হর্ত্তা-কর্ত্তা হবে!
প্রদেশে প্রদেশে এই খেলা চ'লে চ'লে
বাড়িয়ে দিচ্ছে তোমারি তো গৌরবে।
তুমি হিংসার পাত্র যে সকলের,
মনে মনে করে সবাই তোমারে ভয়।
একলা পারে না, দলবল নিয়ে আসে
সৈন্য পুলিশ সহায় যখন হয়।
দশজনে মিলে কুমারী নির্য্যাতন,
বাঙালী গুণ্ডা ভাবিতেও পারে না যে!
অবোধ শিশুরে অনাথ করিতে যাওয়া—
বাংলা দেশের পিশাচেরও বুকে বাজে!
তাই বাংলায় যত স্মরণীয় এলো,
আর কোনো দেশে কখনো আসিলনাকো।
আসামে আসামী ফরিয়াদী হয়ে ওঠে,
বিতাড়িত তুমি, অপরাজিতই থাকো।

তারা ঢের ছোট, তুমি হ'লে ঢের বড়ো,
প্রতিবাদ তব দুর্দ্দমনীয় তাই!
'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' কাকে বলে,
আজ দুর্দ্দিনে তাহারি প্রমাণ চাই।
সব চেয়ে মার দিয়ে গেছে ইংরেজ,
সেও চ'লে গেছে লাঞ্ছিত নত শিরে;
মরেনি বাঙালী, সারা ভারতের মাঝে
সব সেরা জাত্‌—এই পরিচয়টিরে
যদি উজ্জ্বল সহসা করিতে পারে
সিনেমা-পাগল ভ্রান্ত যুবক দল,
মারের বেদনা নেশারে তাড়ায় যদি,
দেখা দেবে ফের, শেষ তার সম্বল।
ফাঁকা কথা দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে চাপা দিয়ে
যে জাত্‌কে আজ ভোলানো যায়না মোটে,
পৃথিবী টল্‌বে, বিলাস-তন্দ্রা ভেঙে
সত্যিই আজ তারা যদি জেগে ওঠে।
ওরা দেখেছিলো সেই সব বাঙালীরে—
জবর দখলে যাদের আস্ফালন,
তাড়া খেয়ে এসে ছুশো বিঘে বাস্তর
স্বত্ব এবং অর্থের কীর্ত্তন।
ওরা দেখেছিলো—তীর্থে তীর্থে ঘোরা
ন্যাড়ানেড়ি, যারা বোকার মতন ঠকে।
দেখেনি মনীষা—খাপ খোলা তলোয়ার,
বাংলা দেশে যা চিরদিন ঝক্‌ঝকে।



আসাম সমস্যার আলোচনা—

গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে এবং ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩ দিন দিল্লীতে লোকসভায় অধিবেশনে আসাম সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় সে দিন যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বিধান সভায় তাঁহার প্রস্তাবটি সকল দলের সকল সদস্য এক যোগে গ্রহণ করায় কেন্দ্রের নিকট সে প্রস্তাবের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। সে দিন বিধানসভায় স্বতন্ত্র দলের সদস্য কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র শ্রীসুধীর চন্দ্র রায় চৌধুরী যে অকুণ্ঠ ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা ডাক্তার বিধানচন্দ্রের মত লোকেরই প্রাপ্য। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে তিনি পূর্বে সকল দলীয় নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সে বিষয়ে সকলের সম্মতি গ্রহণ করায় পশ্চিমবঙ্গের সকল বিরোধী দলের নেতা বিস্মিত হইয়াছেন এবং ডাক্তার রায়ের এই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পক্ষে আরও আনন্দের কথা দিল্লীর লোকসভাতেও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সংশোধন প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। আলোচনার প্রথম দিনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ লোকসভায় যে তেজোদীপ্ত ভাষণ দান করেন, তাহা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হন। তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব করার যোগ্য ব্যক্তি, তাহা তাঁহার সে দিনের বক্তৃতায় প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার পরই স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের পক্ষে অতুল্যবাবুর সংশোধনী প্রস্তাব মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় দিল না। দিল্লীর লোকসভার প্রস্তাব বা কলিকাতার বিধান সভায় প্রস্তাব হয়ত সর্বজনগ্রাহ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমর্থন লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতুল্যবাবুর প্রস্তাবে আসামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে উপযুক্ত সময়ে এক বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের সুপারিশও সেই তদন্ত কমিশন করিবেন। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ঘোষণা করেন, দাঙ্গাদুর্গতদের আশু পুনর্বাসনে সাহায্যের জন্য একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শীঘ্রই আসাম যাইবেন এবং পুনর্বাসনের ব্যাপারে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য সব সময়েই পাওয়া যাইবে। প্রধানমন্ত্রীও ঘোষণা করেন—দোষীদের সাজা দেওয়ার জন্য সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার-বিভাগীয় দ্রুত তদন্ত চাহেন। কিন্তু হাঙ্গামার মূল কারণ সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের প্রশ্নটি ইহার সহিত জড়িত নহে—বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত আসাম সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে—বাংলার দাবী উপেক্ষিত হইলে জনগণের বিক্ষোভ ঝটিকার আকারে দেখা দিবার পূর্বাভাষ সূচিত হয়। এই দিন সভায় বিতর্ককালে আসামের নিপীড়িত বঙ্গভাষীদের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য বিচার-বিভাগীয় তদন্তের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক সদস্যের তত্ত্বাবধানে আসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা অবলম্বনে সর্বসম্মত দাবী ঘোষণা করা হয়। সে দিন বিধানসভায় আসাম সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও শ্রীজ্যোতি বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীঅমর বসু, শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী, শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

আসাম সম্পর্কে বাংলার দাবী—

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় প্রস্তাবে বাংলা নিম্নলিখিত দাবীগুলি জ্ঞাপন করিয়াছে—(১) বাস্তহারাদের জন্ম গৃহ নির্মাণ (২) ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ—কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে অর্থ বণ্টন (৩) আইন ও শৃঙ্খলার পুনপ্রতিষ্ঠা (৪) দোষীদের শাস্তিদান—হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্ম বিচার বিভাগীর তদন্ত (৫) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈঠকে ভাষা সমস্যার আলোচনা এবং মীমাংসা-সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত মুলতুবী রাখা (৬) স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের একজধ সদস্যকে আসাম প্রেরণ।

পশ্চিকবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি দাবী—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের ১২ জন সদস্য সম্বলিত এক প্রতিনিধি-দল দিল্লী যাইয়া লোকসভার সদস্যদিগকে এক স্মারকলিপি হিতরণ করিয়াছেন। তাহাতে আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড় (উত্তর কাছাড় সমেত) ও ত্রিপুরা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করার দাবী জানানো হইয়াছে। ঐ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইলে আসাম সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। এ দাবী নূতন নহে। এক দিকে যেমন পশ্চিম বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনই আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালী-অধিবাসীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অন্ধ্র রাজ্যে দুর্ভিক্ষ—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডীর বাসভবনে অন্ধ্র রাজ্যের ভীষণ দুর্ভিক্ষের অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছিল। অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএম-সঞ্জীবায়া ও কেন্দ্রীয় খাদ্য-উপমন্ত্রী শ্রীএম ভি কৃষ্ণাপ্পা প্রভৃতি বহু অন্ধ্র নেতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বলেন—মাদ্রাজ হইতে সঞ্চিত ৫০ হাজার টন ব্রহ্মদেশীয় চাল শীঘ্রই ট্রেণে করিয়া তেলেঙ্গানা ও রায়লাসীমা অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে এবং তথায় ১৪ টাকা মণ দরে প্রচুর গম দেওয়া হইবে। ছোট ছোট সেচের কাজের জন্ম প্রচুর অর্থ তথায় ঋণ দান করা হইবে। তেলেঙ্গানার ৯টি জেলায় দারুণ অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—১৮৮৫ সালের পর কখনও এত বড় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। রায়লাসীমার ৪টি জেলায় সকল পুষ্করিণী শুষ্ক ও জলশূন্ম হইয়াছে—তথায় লোককে বিনামূল্যে খাদ্য দিয়া তাহাদের দ্বারা ঐ সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করানো একান্ত প্রয়োজন। বিহার, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে বন্যা এবং অন্ধ্রে অনাবৃষ্টি—নানা দিক দিয়া ভারত আজ বিপন্ন।

ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন—

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গত ৫ই সেপ্টেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিয়াও সুনামের সহিত কাজ করিতেছেন। তাঁহাকে কবে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ দান করা হইবে—সে দিনের জন্ম সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে।

শ্রীনেহরুর উড়িষ্যা ভ্রমণ—

উড়িষ্যা রাজ্যের ভীষণতম বন্যার পর গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উড়িষ্যায় যাইয়া উড়োজাহাজে ৯০ মিনিট ধরিয়া কটক ও বালেশ্বর জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকালে উড়োজাহাজে দিল্লী হইতে ভুবনেশ্বর পৌছিবার ১০ মিনিট পরেই তিনি আবার বাহির হইয়া পড়েন—তাঁহার সঙ্গে উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুখতংকর, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। তথায় তিনি বলেন—বন্যা বন্ধ করা যাইবে না—তবে বন্যার জল যাহাতে সত্বর সমুদ্রে চলিয়া যায় সে জন্ম উপযুক্ত ড্রেণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী—

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী অধিবাসীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে—ইহাতে চিন্তাশীল বাঙ্গালীমাত্রই শঙ্কিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থায় ৯ লক্ষ কর্মীর মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র শতকরা ৪১ জন। ১৯৫৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৮৬৮৩ জন নূতন চাকরী পায়—তন্মধ্যে বাঙ্গালী ৭১৫১ এবং এবং অবাঙ্গালী ১১৫৩২। সরকারী কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থা এরূপ যে—সেখানে কোন বাঙ্গালী চাকরীপ্রার্থী সাহায্য ও সহানুভূতি পায় না। বাংলা দেশের অধিকাংশ ব্যবসা অবাঙ্গালীদের অধীন—তাহার ফলে নিত্য

বহু বাঙ্গালী কর্মচ্যুত হইতেছে। এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বাংলা দেশে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবারও কোন লোক নাই—ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। দিল্লীর ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ ভি, আর, ভি, রাও ভারত সরকারের অর্থ-নীতি বিভাগে উচ্চপদ লাভ করায় দিল্লীর ঐ পদ খালি হইয়াছে। শ্রীসিদ্ধান্তের স্থানে কে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

কলিকাতায় জল সরবরাহ—

কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে জল সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ তহবিলের পরিচালকমণ্ডলী ৩২৪১০০ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ অর্থে কলিকাতায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে। উত্তম পানীয় জল সহর ও সহর-তলীর সর্বপ্রধান সমস্যা। গ্রীষ্মে জলাভাব, বর্ষায় জল কলুষিত হয়—সে জন্য লোক দুঃখ ভোগ করে। ইহার স্থায়ী প্রতীকার সম্ভব হইবে কি ?

উড়িষ্যা বন্যায় ক্ষতি—

উড়িষ্যায় ভীষণ বন্যায় ৯টি জেলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মোট ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার লোক বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে ও ৫৩০০ বর্গ মাইল জমী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কটক, বালেশ্বর, পুরী, কিওনঝর, ঢেঁকানল, ফুলবাণী, ময়ূরভঞ্জ ও সুন্দরগড় জেলার বনাই মহকুমায় ক্ষতি অধিক হইয়াছে। সম্বলপুর জেলাও ক্ষতিগ্রস্ত—কিন্তু তাহার ক্ষতির পরিমাণ স্থির হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ঘুরিয়া উপযুক্ত সাহায্য ও প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কংসারী হালদারের দণ্ড—

লোকসভার সদস্য শ্রীকংসারী হালদার ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ অঞ্চলে হত্যা, লুঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গত ২৯শে আগষ্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সার এম-বিশ্বেশ্বরিয়া—

খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি ডাক্তার সার এম-বিশ্বেশ্বরিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর ১০০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন! তিনি এখনও সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম আছেন। ঐ দিন স্মরণীয় করার জন্য ভারত সরকারের পোষ্ট ও টেলি-গ্রাফ বিভাগ ১৫ নয়া পয়সা দামের বিশেষ ডাক টিকিটে তাঁহার ছবি প্রকাশ করিবেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। মহারাষ্ট্র দেশে ডাঃ ডি-কে-কার্ভেও শতায়ু হইয়াছেন—তিনি খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও কংগ্রেস—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় কংগ্রেস দল ৬ বার ভোটে পরাজিত হইয়াছে। এ অবস্থা থাকিলে কংগ্রেস দলের মেয়রের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। দলকে শক্তিশালী করার কি কোন উপায় নাই ?

শ্রীঅরুণ রায়—

শ্রীঅরুণ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের ডেপুটী কন্ট্রোলার ছিলেন। তিনি গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ পদের অপর ২ প্রার্থী ডাক্তার গোলাপ রায়চৌধুরী ও শ্রীবসন্তকুমার মুখো-পাধ্যায় পূর্বেই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ২টি কাউন্সিলের—আর্টস ও সায়েন্স—সেক্রেটারীর কাজ করিতেছেন। শ্রীঅরুণ রায়কে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর লোকসভায় উপমন্ত্রী শ্রীশাহ নওয়াজ বলেন—গতবৎসরে ভারতের রেলে ৯০ লক্ষ যাত্রী বিনাটিকিটে ভ্রমণ করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে ও তাহার ফলে রেলের ৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। কত লোক ধরা পড়ে নাই, তাহার হিসাব নাই। রেল কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা দ্বারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করেন না কেন জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন—

পশ্চিমবঙ্গে দুইটি নূতন বড় বড় বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন সম্মত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন—তাহাতে দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ব্যাণ্ডেলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে যে কেন্দ্র স্থাপন করিবেন তাহাতে আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থানও হইবে।

কলিকাতায় ৫০ তলা বাড়ী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে যে এক বাণিজ্য সংস্থা চৌরঙ্গী রোডে একটি ৫০ তলা অর্থাৎ অর্থাৎ ৫৫০ ফিট উচ্চ বাড়ী নির্মাণ করিবেন। অতি অল্প পরিমাণ জমীর উপর ঐ সুউচ্চ গৃহে বহু অফিসের স্থান সংকুলান হইবে। ঐ বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। ঐ বাড়ীর ভিত কিরূপ দৃঢ় করা প্রয়োজন, তাহা সকলের বিবেচ্য।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—

বর্দ্ধমানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রীসুকুমার সেন আই-সি-এস তাহার নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছিলেন। তিনি গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় ও সে জন্য আপাতত ৬মাস ছুটী লওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহ আই-সি-এস বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীগুহ এক সময়ে বর্দ্ধমানে জেলা-জজের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সারা জীবন নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

উদ্বাস্তু উন্নয়নে সরকারী দান—

২৪পরগণা জেলার দমদম এলাকার তিনটি মিউনিসিপালিটি (উত্তর দমদম, দমদম ও দক্ষিণ দমদম) এবং হুগলী জেলার হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটীর উদ্বাস্তু-প্রধান অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ২ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। উদ্বাস্তু-ত্রাণ বিভাগ হইতে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। উদ্বাস্তু-প্রধান অঞ্চলগুলির গত ১০ বৎসরেও কোন উন্নতি করা হয় নাই।

গঙ্গা সাগরতীর্থ—

খ্যাতনামা সাধক শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত দেবযান নামক মাসিক পত্রের গত আষাঢ় সংখ্যায় মহা-মহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এক আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি গঙ্গা-সাগরতীর্থকে উন্নত করার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গঙ্গা-সাগর যাইবার পথ নির্মাণ করিতে ও যাহাতে ১২ মাস তীর্থ যাত্রীরা তথায় যাইতে পারেন, তাহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। সীতারামদাসকেও তথায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় তীর্থ একমাত্র গঙ্গা-সাগর। তাহা সমুদ্রতটে হইলেও বর্তমানে ১২ মাস তথায় লোক বাস করে। সুন্দরবন বা ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অধিক লোক-বসতি নাই—ফলে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির ব্যবস্থাও কম। গঙ্গাসাগর উন্নত হইলে সমগ্র সুন্দরবন এলাকা উন্নত হইবে। কাজেই পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়ের এই প্রস্তাব সকলের সর্বতো-ভাবে সমর্থন করিয়া সে বিষয়ে কাজ করা কর্তব্য।

নরঘাটে হলদী নদীর উপর সেতু—

মেদিনীপুর জেলার নরঘাট নামক স্থানে হলদী নদীর উপর একটি সেতু নির্মিত হইতে কলিকাতা হইতে তমলুক, কাঁথি ও দীঘার যোগাযোগ স্বল্প ব্যয় ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইবে বলিয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মেছেদা হইতে পাকা রাস্তা হইলে সেই পথে তমলুক হইয়া নরঘাট দিয়া কাঁথি ও দীঘা যাওয়া সহজসাধ্য হইবে। নরঘাটে খেয়ার নিকট কাঁচা রাস্তাও পাকা করা হইতেছে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের জন-নায়ক সেচ-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, খাদ্য-উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি, সরবরাহ-উপমন্ত্রী শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীসুবোধ মাইতি, শ্রীপ্রবীর জানা প্রভৃতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে মোটর যোগে দীঘা যাওয়ার ব্যবস্থা

হইলে দীঘার সমুদ্রতীর ও সমৃদ্ধতর হইবে। ফলে অবশ্যই ঐ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিও বর্দ্ধিত হইবে।

শিক্ষকের পর্বত অভিযান—

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুল-শিক্ষক শ্রীসুকুমার রায় হিমালয়ের নন্দ-ঘুটি পর্বত-শৃঙ্গ অভিযানে দলের নেতৃত্ব করিবেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সে জন্য তাঁহাকে সবেতন এক মাসের ছুটী দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের শাসন—

পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় আই-সি-এস অবসর গ্রহণ করায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার আই-সি-এস অস্থায়ীভাবে তাঁহার স্থানে চিফ-সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন—গত ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীআর-গুপ্ত আই-সি-এস স্থায়ীভাবে চিফ-সেক্রেটারীর কাজে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীতালুকদার ঐ দিন হইতে শুধু রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে কাজ করিতেছেন—তিনি কিছুকাল উভয় কাজই দেখা শুনা করিতেন। শ্রীআর-গুপ্ত শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন—তাঁহার স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী আই-এ-এস শিল্প-বাণিজ্যের সেক্রেটারী হইয়াছেন। হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীজে-সি-তালুকদার আই-সি-এস শ্রীনিয়োগীর স্থানে স্থানীয়-স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগে আসিয়াছেন। শ্রীসুনীলকুমার ব্যানার্জী আই-এ-এস শ্রম বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি শ্রীজে-এন-তালুকদারের স্থানে রাজ্য সরকারের পরিবহন কমিশনার ও পরিবহন বিভাগের সেক্রেটারী হইয়াছেন। শ্রীএস-এম-ভট্টাচার্য্য আই-এ-এস শ্রম দপ্তরে লেবার-কমিশনর ছিলেন—তিনি শ্রীসুনীলকুমার ব্যানার্জীর স্থানে শ্রম-দপ্তরের জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছেন। ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীডি-এন-ব্যানার্জি আই-এ-এস শ্রীভট্টাচার্য্যের স্থানে লেবার কমিশনারের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর একই দিনে এতগুলি বড় পদে নূতন কর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অসমীয়ারা চটিবে—সেজন্য ভয়—

গত ১লা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লোকসভায় তিন দিন ব্যাপী আসাম-হাঙ্গামা আলোচনার উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধান-মন্ত্রী জহরলাল নেহরু বলিয়া ফেলিয়াছেন—এক সময়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও আলোচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে আসামের জনসাধারণ মনে ভীষণ ব্যথা পাইবে ও চটিয়া যাইবে বলিয়া তাহা করা হয় নাই। আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনে শ্রীনেহরুর মনে একটু ব্যথা লাগে নাই—তাহা হইলে তিনি প্রকাশ্যভাবে অসমীয়াদের অন্যায় সমর্থনে এই কথা বলিতে পারিতেন না।

পরলোকে হিরণ্ময়ী দেবী—

অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী শরৎবাবুর হাওড়া সামতা-বেড়স্থ বাস-ভবনে সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শরৎবাবুর সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন।



সূর্যগ্রহণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

কালে কালে কত দেখব ! ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাসে একদল লোক ডাইরেক্‌ট য়্যাকশন শুরু করে দেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা যায় তাদেরি জেদ জয়ী হয়েছে। দেশ ভেঙে দু'খানা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে আরেক দল লোক ডাইরেক্‌ট য়্যাকশনে নামল। দু'মাস যেতে না যেতে দেখা গেল তাদেরি জেদ জয়ী হয়েছে। একটি রাজ্যের আইনসভায় সংখ্যাগুরু দলের শাসন রদ হয়েছে। আইনসভা থাকলে আবার সেখানে তারা সংখ্যাগুরু হতে পারত, তাই আইনসভাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচকদের রায়টাকে সরাসরি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা হলে ডাইরেক্‌ট য়্যাকশনকে ইংরেজীতে থ্রী চীয়ার্স দিতে হয়—থ্রী চীয়ার্স ফর ডাইরেক্‌ট য়্যাকশন ! হিপ হিপ হুরে।

ই এম ফস্টার তাঁর দেশের ডেমোক্রেসীকে থ্রী চীয়ার্স দিতে পারেননি। টু চীয়ার্স দিয়েছেন। আমি আমার দেশের ডেমোক্রেসীকে ওয়ান চীয়ারও দিতে পারছিনে। কারণ থ্রী চীয়ার্সের তিনটিই তো ডাইরেক্‌ট য়্যাকশনকে দিতে হচ্ছে।

দেশে যখন গণতন্ত্র ছিল না তখন নিরস্ত্র দেশবাসীকে গান্ধীজী একটি অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অস্ত্রটি অহিংস। তার নাম সত্যাগ্রহ। বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে মিটমাট ও মিলনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সত্যাগ্রহী সর্বদাই আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। নিমন্ত্রণ জানালে সে প্রত্যাখ্যান করে না। হৃদয় জয় করার জন্যেই তার অভিযান। অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে পারলেই সে জিতল, নয়তো নয়।

কোথায় ডাইরেক্‌ট য়্যাকশনের নিন্দাবাদ শুনব। না শুনতে হলো তার জিন্দাবাদ। গণতন্ত্র যে দেশে চলবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামও সেই দেশে চলবে, ভালো টাকা যে বাজারে চলবে খারাপ টাকাও সেই বাজারে চলবে, গ্রেশামের আইনে এমন কথা বলে না। দুটোকেই চলতে দিলে খারাপ টাকা ভালো টাকাকে তাড়িয়ে দেবেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গণতন্ত্রকে দেশছাড়া করবেই। আপাতত রাজ্যছাড়া করেছে। আগামী নির্বাচনের পর দরকার হলে আবার রাজ্যছাড়া করবে।

অবশ্য কমিউনিস্টরাও সুবোধ নয়। তারা কি জানত না যে ক্যাথলিকদের পিছনে বিশ্ব ক্যাথলিক সঙ্ঘ রয়েছে? ক্যাথলিকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে এই তো সেদিন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি পেরন গেলেন হেরে। ক্যাথলিকদের উপর গুলি চলেছে বার বার তিন বার। তখন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে কমিউনিস্ট সরকারের আর রক্ষা নেই। দু'দিন আগে হোক পরে হোক—এই রক্তপাতের জন্য দায়ী করা হবে তাদের। যেমন করেই হোক বিদায় দেওয়া হবে তাদের।

সংবিধান মতে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার কথা গভর্নরের। কিন্তু একদল মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলে আর এক দল মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে তাঁকে। তিনি যদি জানতেন যে কেরলের আইনসভার আস্থাভাজন আর একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা সম্ভব, তা হলে তিনি হয়তো এতদিনে কমিউনিস্টদের বিদায় দিয়ে তাদের প্রতিপক্ষদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে থাকতেন।

গভর্নর তা পারলেন না। অগত্যা রাষ্ট্রপতিকেই হস্তক্ষেপ করতে হলো। সংবিধান মতে রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করতে পারেন কখন? প্রথমত, যখন দেশ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যখন দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় কিংবা যখন দেশ বা দেশের একাংশ অন্তর্বিক্ষোভে জর্জরিত হয়। এরূপ স্থলে তিনি সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ঘোষণাপত্র জারী করতে পারেন। তার পর ৩৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারকে প্রয়োজন মতো হুকুম দিতে পারেন ও নিজেদের কর্মচারী

দিয়ে রাজ্য সরকারের কাজ করিয়ে নিতে পারেন। এখানে লক্ষণীয়, রাজ্য সরকারের কতক ক্ষমতা যাবে, কিন্তু রাজ্য সরকার যাবে না। মন্ত্রীরা থাকবেন। আইনসভাও থাকবে।. দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করতে পারেন—যখন এমন এক পরিস্থিতির উদয় হয়েছে বলে জানতে পান যে পরিস্থিতিতে সংবিধানের বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র জারী করতে পারেন। তখন তিনিই রাজ্যসরকারের যাবতীয় ক্ষমতার মালিক। মন্ত্রীরা থাকবেন কি না তিনিই স্থির করবেন। আইনসভা থাকবে কি না সেটাও তাঁর বিবেচনা-সাপেক্ষ। নির্বাচনের ইঙ্গিত যদিও কোথাও নেই, তবু আইনসভা না থাকলে নির্বাচনের প্রয়োজন আপনি এসে পড়ে।

এমারজেন্সীর এই দুই প্রকার ব্যবস্থা পাশাপাশি ধরে বিচার করলে বোঝা যায় কেরলের আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের জন্যে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয়, বরং ৩৫২ অনুচ্ছেদই প্রযোজ্য। আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের লেশমাত্র সঙ্কেত ৩৫৬ অনুচ্ছেদে নেই। আগেও যতবার এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কাজ করা হয়েছে আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের প্রশ্ন ওঠেনি। মন্ত্রীদের উপর থেকে আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা চলে না গেলেও—আস্থা চলে যাওয়ার গণতন্ত্রসম্মত প্রমাণ না পেলে তাদের বিদায় করে দেওয়া সংবিধান রচয়িতাদের অভিপ্রেত নয়, সংবিধানের স্পিরিট নয়। আইনসভার উপর থেকে অধিকাংশ নির্বাচকের আস্থা উঠে না গেলেও—আস্থা উঠে যাওয়ার গণতন্ত্রসম্মত প্রমাণ না পেলে তাকে বাতিল করে দেওয়াও সংবিধান রচয়িতাদের অভিপ্রেত নয়, সংবিধানের স্পিরিট নয়। তবে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা যদি কিছুতেই সম্ভব না হয় রাজকার্যে শৈথিল্য আসবেই, শাসনযন্ত্র বিকল হবেই, কাউকেই দায়ী করতে পারা যাবে না, একদল মন্ত্রী আরেক দল মন্ত্রীকে দোষ দিয়ে নিজেরা খালাস হতে চাইবে। আইনসভা যদি স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সহায়ক না হয় তা হলে তাকে বাতিল করাই উচিত। তখন নির্বাচকদের কাজ হবে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে সাহায্য করা।

কেরলের পরিস্থিতি কিন্তু সেরূপ নয়। স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী আড়াই বছর ধরে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, আরো আড়াই বছর নিতে তৈরি। আইনসভাও অস্থিরমতি নয়, স্থিরমতি। তা হলে নির্বাচকদের সাহায্যের প্রয়োজন কী ও কেন? মেয়াদ পূর্ণ হোক আগে। বাইরে একদল লোক অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে বলে যদি রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে থাকে তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে এমারজেন্সী ঘোষণা করতে পারতেন। তা হলে মন্ত্রীরাও টিকে যেত, আইনসভাও টিকে যেত, অথচ ইউনিয়ন সরকারের শাসনে অরাজকতা রোধ হতো। দেখে শুনে মনে হয় যে মন্ত্রীরা টিকে থাকুক এটা উদ্দেশ্য নয়, মন্ত্রীরা যাক এইটেই উদ্দেশ্য। আইনসভা টিকে থাকুক এটাও উদ্দেশ্য নয়, আইনসভা যাক এইটেই উদ্দেশ্য। সম্ভবত তারা টিকে থাকলে বিমোচন-সমর-সমিতির রাগ পড়ত না, ডাইরেক্ট য়্যাকশন বন্ধ হতো না, কেরল সরকারের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভারত সরকারকেই গুলি চালাতে হতো। কেন তাঁরা পরের স্বার্থে গুলি চালিয়ে নিজেরা অপ্রিয় হবেন? তার চেয়ে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করলে হয়।

রাজনীতির দিক থেকে হয়, কিন্তু নিয়মের দিক থেকে হয় না। যে খেলার যে নিয়ম। ডাইরেক্ট য়্যাকশন করল বিমোচন সমর সমিতি, অর্ধেক পরমায়ু গেল নম্বুদিরিপাদ মন্ত্রীমণ্ডলীর ও কেরল আইনসভার। নির্বাচকদের বিনা দোষে তাদের রায় ওলটাল। হিংসার কাছে আপীল করলে যদি রায় ওলটায় তবে এখন থেকে লোকে আইন-কানুনের ধার ধারবে না। গুটিকতক মানুষকে পুলিশের উপর লেলিয়ে দেবে, পুলিস যেইগুলি চালাবে অমনি দিল্লীতে গিয়ে দরবার করবে, মন্ত্রীদের তাড়াও। অমনি মন্ত্রীরা বরখাস্ত হবে, আইনসভা বাতিল হবে। এটা রাজনীতি হতে পারে, সংবিধাননির্দিষ্ট মূলনীতি বা খেলার নিয়ম নয়। হস্তক্ষেপ হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু ৩৫৬ অনুসারে নয়, ৩৫২ অনুসারে।

হ্যারলড ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন, ইংলণ্ডের ভদ্রলোকরা খেলার নিয়ম পালটাতে পারেন। তা শুনে রক্ষণশীলদের কী রাগ! ল্যাস্কি বেঁচে থাকলে এখন হয়তো বলতেন, ভারতের ভদ্রলোকরা খেলার নিয়ম বদলাতে পারেন। তা শুনে কংগ্রেস নেতাদেরও রাগ হবে। কিন্তু কথাটা উঠবেই। ইংলণ্ডে দেখা যায় সরকারপক্ষ

যখন একটার পর একটা উপনির্বাচনে হেরে যান তখন ধরে নেন যে সাধারণ নির্বাচনের দিন আগত ঐ। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ফেলেন। তাঁরাই কেয়ারটেকার হয়ে নির্বাচন ঘটান। এই হলো গণতন্ত্রের ঐতিহ্য। কোথা থেকে কমিউনিস্টরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলে যদি এই ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করা হয় তবে গণতন্ত্রই তার মহত্ব হারাল। কমিউনিজমের কী! তার ভিন্ন ঐতিহ্য।

যেখানে গণতন্ত্রের জীবনমরণের প্রশ্ন সেখানে কিসে আপাতত সুবিধা সেটা বড় কথা নয়। কারণ গণতন্ত্র দুর্বল হলে ডিকটেটরশিপ তার ঘাড় মটকাবে। আমরা যদি নিজেদের ভুলে ডিকটেটরশিপের দিকে একপা এগিয়ে গিয়ে থাকি তো সে ভুল শোধরাতে হবে, সে পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে। নয়তো ভারতে ডিকটেটরশিপের যত দেরি আছে ভেবেছিলুম তত দেরি নেই। এ রকম সঙ্কট আরো গোটা কয়েক ঘনালেই এবার যা যা করা হয়েছে তাতে কুলোবে না, বিশেষ বিশেষ পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। পাছে তারা নাম ভাঁড়িয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় সেই ভয়ে নির্বাচনব্যবস্থা রদবদল করতে হবে। সম্প্রতি ফরাসী দেশে দ্য গল যা করলেন। তাঁর অবর্তমানে রণপতিরাই এর সুযোগ নেবেন।

কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। একদল বিশ্বাস করেন যে পার্লামেণ্টারি ক্রিকেটখেলায় তাঁদের স্থান আছে, তাঁরা আপাতত বল করতে পারেন, যথাকালে ব্যাট ধরতে পারেন। আরেক-দল বলেন, ক্ষেপেছ? ওটা হলো বুর্জোয়াদের নিজস্ব খেলা। তোমাদের হাতে ব্যাট পড়বে দেখলে ওরা নিয়মকানুন বদলে দেবে।

পঞ্চাশ বছর কাল সাধনা করেও প্রথমোক্ত দল ব্যাট হাতে পেলো না। কোনো মতে নাম ভাঁড়িয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাট টিকিটে পার্লামেণ্টে গিয়ে বল করার অধিকার পেলো। তখন লেনিন দেখিয়ে দিলেন কেমন করে সরা-সরি ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে হয়। লেনিনের ধারাই এ যাবৎ চলে আসছিল। সে ধারায় পরিবর্তন আনলেন বিশ্ব কমিউনিজমের ইতিহাসে কেরলের নাম্বুদিরিপাদ। সেটা অবশ্য ভারতের সংবিধানের কল্যাণে। এতে বিশ্ব গণতন্ত্রেরও মর্যাদা বাড়ল। সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে এত ক্ষণস্থায়ী হবে কে তা অনুমান করেছিল! আমাদের আনন্দের কারণ ছিল এই যে আমরা শ্রেণীসংগ্রামের রক্ত রাঙা মার্গ থেকে কমিউনিস্টদের নিবৃত্ত করে গণতন্ত্রের খেলায় তাদের জন্যেও ঠাঁই করে দিয়েছি।

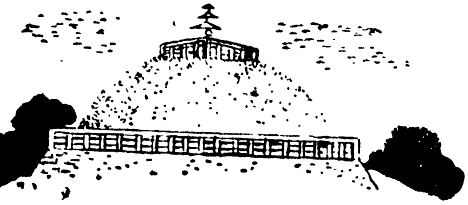
এই সঙ্কটে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে কমিউনিস্টদের গণতন্ত্রের খেলা খেলতে দেব কি দেব না। খেলতে দেব না, এই যদি হয় চিন্তার ফল তবে খেলার নিয়ম পালটাতে হবে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ধুয়ো ধরেছেন যে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বাস্তবিক, ৩৫৬ অনুচ্ছেদ ঠিক খাটে না। আর ৩৫২ অনুচ্ছেদ খাটলেও রাজনীতির দিক থেকে অসমীচীন হতে পারে। কিন্তু সংবিধান যদি সংশোধিত হয় তবে সেটা আর গণতান্ত্রিক বলে গণ্য হবে না। আমাদের তখন গৌরব করবার কিছু থাকবে না। আমরা প্রায় আয়ুব খাঁর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছব। ডিকটেটরশিপের আধ রাস্তায়। খেলতে দেব, যেমন এতদিন দিয়ে এসেছি, এই যদি হয় সিদ্ধান্ত তবে যতদিন না ওদের দিক থেকে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অনু-রোধ আসছে ততদিন ৩৫৬ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা চলবে না। চলতে পারে ৩৫২ অনুচ্ছেদ, সেটা ওরা চা'ক বা না চা'ক। না চাইলে পদত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যে সরকার ডাইরেক্ট য়্যাকশন দমন করতে নিযুক্ত তাকে দমন করলে ডাইরেক্ট য়্যাক্শনকেই জিতিয়ে দেওয়া হয়। তারপর হয়তো ডাইরেক্ট য়্যাক্শন বন্ধ হবে, কিন্তু সেটা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে বলে। অন্যায় উপায়ে অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে এর মতো রাষ্ট্রদ্রোহকর আর কী আছে? স্বয়ং রাষ্ট্রপতি হবেন এর সহায়ক এ কি কখনো কাম্য হতে পারে?

আমাদের গণতান্ত্রিক বিবর্তন ব্যাপত হলো। আমরা ভিতরে ভিতরে নাড়া পেলুম, দুর্বল হয়ে গেলুম। একবার যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে আবার চাইবে, কেরল ক্রমে শাসনের অযোগ্য হয়ে উঠবে। যারা জিতল তারা ভিন্ন আর কেউ তাদের শাসন করতে পারবে না। অপর পক্ষে তারাই যদি শাসক হয় তবে অন্যায়ের ষোল কলা পূর্ণ হবে। তখন কমিউনিস্টরা যদি ডাইরেক্ট য়্যাকশন করে তা হলে কেউ তাদের নিন্দাবাদ করবে না, অথচ রাষ্ট্রপতি যদি ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ না করেন সবাই তাঁর

দোষ ধরবে। তবে কি ৩৫৬ই কেরলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? তাই বা কেমন করে হবে? বাধ্য হয়ে কেরলকে মাদ্রাজের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। কিন্তু মাদ্রাজ যদি রাজী না হয়? এ সমস্যা সমাধানের অতীত, যদি না কেরলীয়দের নিজেদের সুমতি হয়। মীমাংসার সূত্র তাদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদেরও কিছু বলা যেতে পারে। তাঁরা যদি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্রই ভারতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ তা হলে গণতন্ত্রের সঙ্গে যা বেখাপ তাকে ত্যাগ করতে হবে। ডাইরেক্ট য়্যাকশন নিশ্চয়ই বেখাপ। ফাসিস্টরা করলেও বেখাপ, কমিউনিস্টরা করলেও বেখাপ। কমিউনিস্টরা যদি গায়ের জোরে ডাইরেক্ট য়্যাকশন চাশিয়ে যান ফাসিস্টরাও তাই করবে। ভারতের মাটিতে গণতন্ত্র শুকিয়ে গেলে তার স্থান নেবে কমিউনিস্ট ও ফাসিস্ট দুই মহীরুহ। ভারতের মাটি যে রকম তাতে ফাসিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের লড়াই বাধলে ফাসিস্ট জিতবে, গণতন্ত্র থাকলে তো তাদের নিবৃত্ত করবে? জার্মানির সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য আছে। জার্মানিতে যখন কইজারতন্ত্রের অবসান হয় তখন সকলে ধরে নিয়েছিল যে এইবার থেকে গণতন্ত্রই সে দেশের নিয়তি। কিন্তু বাইরের আকাশে সোভিয়েট ধূমকেতু ক্রমবর্ধমান তেজ ও ঘরের কোণে ঘরভেদী বিভীষণের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা দেখে জার্মানদের বুকের রক্ত মাথায় ওঠে। গণতন্ত্র যাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল তাঁরা ঠিক ব্যালান্স রাখতে পারলেন না। তাঁদের কমিউনিস্টভীতি যত প্রবল ছিল গণতন্ত্রপ্রীতি তত প্রগাঢ় ছিল না। নাৎসীরা জানত যে গণতন্ত্র দুর্বল হলে দেশের সেন্টিমেন্ট তাদেরি জিতিয়ে দেবে, কমিউনিস্টদের নয়। আর কমিউনিস্টরা মার্ক্স্ মুনির শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত বলে জেনে এসেছে, দেশের লোকের নাড়ী টিপতে শেখেনি। তাই হিটলার যা চায় তাই করে বসল। গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিল। লাভ হলো নাৎসীদের। ভারতেরও মাথার উপর তিব্বত জুড়ে বসে আছে কমিউনিস্ট চীন, ঘরে যদি কমিউনিস্টরা উপদ্রব বাধায় ভারতীয়দেরও বুকের রক্ত মাথায় উঠবে। গণতন্ত্র তো যাবেই, কমিউনিজমও টিকতে পারবে না। ফাসিজম নিষ্কণ্টক হবে। এ দেশেও কমিউনিস্টভীতি যে পরিমাণ সত্য গণতন্ত্রপ্রীতি সে পরিমাণ সত্য নয়।

দ্বিতীয়ত, কেরল মন্ত্রিমণ্ডলীর ধারণা ছিল না এক একটি গুলীর কত দাম। ক'টাই বা গুলী খরচ হয়েছে কেরলে, তবু যে ক'টা হয়েছে সে ক'টাই সংখ্যালঘু ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে অত্যধিক। বাইশ বছর আগে কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নেয় গান্ধীজী নিষেধ করে দিয়েছিলেন গুলী চালাতে। তবু মুসলমানদের উপর বাধ্য হয়ে গুলী চালাতে হয়। সে সব গুলী লাগল জিন্না সাহেবের কাজে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে না গেলে তিনিই বিমোচন সমর শুরু করতেন বছর কয়েকের মধ্যে, তখন আরো গুলী চালাতে হতো, তাতে বিমোচন সমর আরো জোর পেতো, শেষে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বরখাস্ত করে শান্তিরক্ষা করতেন। আইন-সভায় কংগ্রেসের অনেক বেশী ভোটের সংখ্যাধিক্য, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ইংরেজের মন বুঝে জিন্না সাহেবের মেজাজ বুঝে মুসলমানদের নাড়ী বুঝে মানে মানে আগেভাগে সরে গেছে ও সাড়ে ছ'বছর বনবাসে কাটিয়েছে। ফিরে এসেও কি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারল? বিমোচন সমরের সম্মুখীন হয়ে রাজত্বের একাংশ ছেড়ে দিয়ে সংখ্যাধিক্য ভোগ করার অধিকার ও গুলী চালনার অথরিটি পেলো। আগামী নির্বাচনের পরে কমিউনিস্টরা সংখ্যাগুরু হলেও গুলী চালাতে গিয়ে বিপদে পড়বে। ভোটের জোরে সরকার চালানো এক কথা, গুলী চালানো অন্য কথা।



রূপান্তরিতা

মায়া বসু

১

বাঘিনী শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে—

আচম্‌কা এই উপমাটাই মনে এসেছিল ওকে দেখে।

চিত্র-বিচিত্র হলুদ আর খয়েরীতে মিশেল ডোরাকাটা ছাপা শাড়িতে কালো রংএর ব্লাউজে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল নীতিশের।

মনে হয়েছিল ঘন অরণ্যের আদিম অন্ধকার থেকে রক্ত তৃষ্ণায় উন্মত্ত ক্ষুধাতুরা প্রাণীটি বেরিয়ে এসেছে লোকালয়ে।

সহরের অতি আধুনিক সভ্যতার মুখোস পরে, হাস্য-লাস্য কটাক্ষ কৌতুকময়ী রূপসী মায়াবিনীরূপে।

কিন্তু যতই ওকে ভাল করে নজর করছে, ততই হতাশ হচ্ছে নীতিশ। বাঘিনী হলে ভালই লাগত। উপযুক্ত শিকার হ'ত প্রকৃত শিকারীর। অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে খেলিয়ে মুঠোর মধ্যে আনত। অনেকদিন বাদে মনের মত কাজ পেত নীতিশ। একটা উত্তেজনার খোরাক।

কিন্তু বাঘিনী দূরে থাক, এ যে একটা হরিণী মাত্র! প্রথমেই ভুল করে বসেছে নীতিশের পকেটে হাত দিতে গিয়ে। এ পথে একেবারে নতুন মেয়েটা। অন্য কোন পুরুষ হলে বুঝতে পারত না। কয়েকটা বছর আটকা ছিল বটে কিন্তু তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে এতটুকুও মরচে ধরেনি। তার ক্ষুরধার বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতায় এক পলকেই বুঝতে পেরেছে মেয়েটাকে।

জুয়ার আড্ডায় বালা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ ওকে দেখে হাতটা একটু কেঁপে উঠেছিল। কোথায় যেন দেখেছে ওকে! মনের মধ্যে খুঁজেছিল তন্ন তন্ন করে। কিন্তু না। মাঝে মাঝে এ রকম মনে হওয়াটার কারণটাকেই ভাল করে ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। অস্বস্তির কাঁটাটার খচ-খচানি ছাপিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল উদগ্র কৌতূহল।

প্রথমটা ভেবেছিল ওর সুদর্শন চেহারাটাই বুঝি মেয়েটার আকর্ষণ। বোধহয় সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা পথে-ঘাটে শিকার খুঁজে বেড়ায় সন্ধ্যাবেলার চৌরঙ্গীতে।

কিন্তু ভুল ভাঙলো। তার দিকে নয়—মেয়েটা খেলা দেখছে, অনেকক্ষণ ধরে। মুঠো-মুঠো টাকা উড়ছে পড়ছে, হার হচ্ছে জিত হচ্ছে—করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে দর্শকের দল, সেই সঙ্গে ঝলসে উঠছে মেয়েটার লোলুপ চাহনি—

—ওর নজর টাকার দিকে।

ইলেকট্রিক আর নিয়নের কড়া সাদা আলোয় ঝলমল কার্নিভাল। টিন দিয়ে ঘেরা মস্ত কম্পাউণ্ডটার মধ্যে গাছ-গুলোর শাখা-প্রশাখায় লাল নীল সবুজ হলুদ বাল্বগুলো জ্বলছে নিভছে। সামনেই নাগর দোলা। সব বয়সের ছেলে-মেয়েরা অধীর উল্লাসে পাক খাচ্ছে বন বন করে। সার সার গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া একজিবিশনের স্টল। চায়ের স্টলে সুসজ্জিত নর-নারীর ভিড়। খানিকটা দূরেই কোল্ড ড্রিঙ্ক। শাড়ি স্যুট সালোয়ার গাউন ধুতি পাঞ্জাবির বৈচিত্র্য। সিগারেটের ধোঁয়া। প্রসাধনের গন্ধ। এসেন্সের উগ্র সৌরভে ভারাক্রান্ত বাতাস। আনন্দের স্বর্গ।

কিন্তু স্বর্গ কি শয়তান ছাড়া?

মনে মনে হেসে অতি অবহেলায় বাজী জেতার টাকা-গুলো তুলে নিয়ে মেয়েটার ঠিক চোখের সামনেই পেট মোটা ব্যাগটার মধ্যে ঠেসে ভরে, জুয়ার রিং থেকে বেরিয়ে এসে নীতিশ একেবারে ওর পাশেই দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মেয়েটার হাত তার পকেট ছুঁয়েছে অতি সন্তর্পণে।

হঠাৎ যেন ভিড়ের ধাক্কায় টলে পড়েছে এইভাবে নীতিশ মেয়েটার গায়ের উপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল।

মেয়েটা ত্রস্ত সচকিত হয়ে হাত সরিয়ে নিল। কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। দুই চোখে দেখা দিল ভয়ের সঙ্কেত। ওরই মধ্যে একটু সরে গিয়ে গায়ের আঁচল ঠিক করতে লাগল।

আশ্চর্য হয়ে গেল নীতিশ।

কী বোকা! কী বোকা! এত বড় সুযোগ করে দেওয়া সত্ত্বেও পারল না? অথচ অতি সহজেই ব্যাগটা তুলে নেওয়া যেত। এই খরগোশের চেয়েও ভীরু মেয়েটাকে বাঘিনী মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল নীতিশ?

ভাল করেই তাকাল এবার ওর দিকে। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন মাত্র নেই। ভ্রু আঁকা নয়। নিজস্ব রেখায় বঙ্কিম। পর্যাপ্ত চুলের রাশে বেণী বাঁধা আটপৌরে খোঁপা। ঠোঁটে রঙের প্রলেপ না পড়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে রক্তিম। পরনে নাইলনের স্বচ্ছ শাড়ী নয়। যৌবন উচ্ছল দেহ-বসন শাসনে এতটুকু এলোমেলো হ'তে পারেনি। পিচ্ছিল হয়ে আঁচল খসে পড়েনি বুকের প্রান্ত থেকে। হাতে ক'গাছা লাল কাঁচের চুড়ি। কানেও কাঁচের লাল ফুল।

অবশ্য মেয়েটা খুবই সুন্দর দেখতে বিনা আভরণেই, তবুও একেবারে আনাড়ী। সাজতে পর্যন্ত শেখেনি। এ সব কাজে নেমে সাজগোজ দিয়ে বিভ্রম ঘটাতে হয়। হাব-ভাবে প্রলুব্ধ করতে হয় মুগ্ধ পুরুষকে। তা নয়, গায়ে একটুখানি ছোঁয়া লেগেছে কি না লেগেছে, মুখখানা ব্যাজার করেছে স্থাখ—

"অত্যন্ত দুঃখিত—ভিড়ের ধাক্কায়—কিছু মনে করবেন না।"

বিনীতভাবে নীতিশ মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলল। একটু অন্তরঙ্গ হবার আশায়।

ভ্রু-কুঞ্চিত করে মেয়েটা অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে কঠোর ভাবে তাকাল নীতিশের দিকে। কথার উত্তর না দিয়েই মুখ ফিরিয়ে সহসা চলতে সুরু করল সামনের দিকে।

এই সুস্পষ্ট অবহেলায় নীতিশের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠল। এতবড় স্পর্ধা এই মেয়েটার? তারি পকেট মারতে এসে তাকেই চোখ রাঙানো? একটা কথার জবাব পর্যন্ত না দিয়ে এ ভাবে চলে যাওয়া—মুখের উপর?

তবু যদি নীতিশ না জানত কোন ধরনের মেয়ে ও!

হঠাৎ যেন জেদ চেপে গেল নীতিশের। কোথায় যাবে তুমি? কত দূর? নীতিশ মজুমদারকে তুমি চেন না। তোমার মত অনেক মেয়েকেই—

ভিড়ের মধ্যে মিশে ওকে অনুসরণ করতে করতে নিজের মনেই হাসল ও। একবার যখন আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছ, আবার সুযোগ মত অন্য কারু পকেটে হাত দেবেই তুমি আজ। একবার ভুল করেছি, এবার হাতে-নাতে ধরব। তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে শাস্তি দেবার জন্যে কেউ পুলিশ ডাকবে না, তবু সেই অপমান দু-চোখ ভরে দেখব। তুমিও দেখবে আমাকে।

মেয়েটা একটা চায়না সেটের দোকানে দাঁড়াল। সেখান থেকে শাড়ীর স্টলে। একজোড়া আধুনিক তরুণ-তরুণী শাড়ী কিনে হাসিতে কলরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে তাদের দুজনের দিকে তাকাল। আবার চোখ ফেরাল ঝলমলে শাড়ীগুলোর উপর। তারপর এগিয়ে চলল অন্য স্টলে।

এলোমেলো নর-নারীর ভিড়ের মধ্যে আড়াল থেকে ওর দিকে নজর রেখে চলতে লাগল নীতিশও।

খানিকটা দূরে সিনেমা দেখান হচ্ছে। থিয়েটার পার্টিও এসেছে দলবল নিয়ে। এক জায়গায় সুরু হয়েছে নাচ গান। টেলিভিশন। জুয়াখেলা। সার্কাস। ভানুমতীর খেল। এ আনন্দ মেলায় কোনটাই বাদ নেই। পৃথিবীর সব কিছু লোভনীয় সামগ্রীর মেলা বসেছে এখানে। এ যেন একটা রং-এর নেশা। আলোর নেশা চোখে আর মনের তৃপ্তি।

সে তৃপ্তিতে মেতে উঠেছে কার্নিভালের প্রত্যেকটি নর-নারী।

কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় এক নেশায় মাতাল হয়েছে নীতিশ।

দড়ি দিয়ে বাঁধা ক্যাম্প বসেছে। কালো কাপড়ের মাথায় বড় বড় লাল হরফে লেখা ওয়ান ম্যান সার্কাস, নীচে একটা কম বয়েসী দু-হাত কাটা ছেলের ছবি। তীর ধনুক নিয়ে পা দিয়ে লক্ষ্যভেদ করছে। এক পাশে টিকিট বিক্রী

করছে একটা লোক। ক্যাম্পের দরজার পাশেই মাইকের সামনে আর একটা লোক চিৎকার করে খেলার বিবরণ দিয়ে লোক জড়ো করছে।

আরো অনেকের সঙ্গে মেয়েটা এসে দাঁড়াল। অনেকেই টিকিট কিনে ঢুকে পড়ল। ও একটু ইতস্তত করল, টিকিট কিনবে কিনা। দুহাত কাটা ছেলেটার ছবিটা দেখল ভাল করে। মাইকের কথাগুলো শুনল মন দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে বিষণ্ন মুখে।

পাশে খানিকটা দূরেই আরেকটা ক্যাম্প! মস্ত বড় একটা বটগাছের তলায়। আলো নেই। বোধহয় ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়নি। ভানুমতীর খেলা অন্ধকারেই জমে বেশী। শুধু কার্নিভালের বিদ্যুতের আলোর প্রতিফলনে দেখা গেল ভিড় এখানে প্রচুর। কুড়ি মিনিটের সো। কালো কাপড়ের উপর ভূতুড়ে ছবি দিয়ে রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। মাইকের সামনে বসে একটা লোক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। "আসুন, দেখে যান। যাদুর খেলা। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বিখ্যাত যাদুসম্রাট রায়বাবুর যাদুদণ্ডে একটি সুন্দরী তরুণী আপনাদের চোখের সামনে কি করে কঙ্কালে পরিণত হয়ে যাচ্ছে—এমন সুযোগ হারাবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি—

কালো রংএর কাপড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা হল। দুপাশে ওয়ানম্যান সার্কাসের মত দুটো ছবি। একধারে একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতীর। অপরদিকে দাঁত বার করা বীভৎস দর্শন একটা কঙ্কালের।

এ হেন যাদুর আকর্ষণে দলে দলে ছেলেমেয়েরা ঢুকছে। মেয়েটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর করল চারদিক। নীতিশকে দেখতে পেল না। তারপর একখানা টিকিট কাটল।

অন্ধকারে এগিয়ে এলো নীতিশও। একখানা টিকিট কেটে সেও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হলের ভিতরেও প্রায়ান্ধকার। সরু প্যাসেজ পেরিয়ে তবে সার সার চেয়ার পাতা।

মেয়েটার সামনেই বছর দশেকের ফ্রক-পরা একটা ছোট মেয়ে। অন্ধকারেও তার গলার হারটার ঝকঝকানি এড়াল না নীতিশের শিকারী চোখ।

ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যেই ছোট মেয়েটা সহসা চিৎকার করে উঠল। "বাবা আমার হার?"

বিদ্যুৎবেগে নীতিশ এগিয়ে এসে মেয়েটার হাতে ধাক্কা দিতেই ওর বরফ শীতল অবশ হাত থেকে হারটা পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে একহাতে মেয়েটাকে শক্ত করে চেপে রেখে নীতিশ চিৎকার করে উঠল। "আলো—প্লীজ আলোটা জ্বালান তাড়াতাড়ি।"

হৈ-চৈ গোলমাল। কী হল? কার হার? কে নিল? নানান গুঞ্জনে ভরে গেল হল। আলো জ্বলে উঠল। না কিছুই হয়নি। ছোট মেয়েটার পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে সোনার হারটা।

হেঁট হয়ে হারটা কুড়িয়ে নীতিশ মেয়েটার হাতে দিতে দিতে বলল, "এই নাও খুকী তোমার হার, কিন্তু গলায় দিও না, এর মুখটা খোলা।"

মেয়েটির বাবা হার ফিরে পাওয়ার আনন্দে ওকে ধন্যবাদ দিতে যেতেই নীতিশ বাধা দিল।

"চেয়ে দেখুন, হারটার জোড়ের মুখ আলগা হয়ে গেছে, খুলে পড়ে গেছে তাই। সাবধানে আপনার কাছে রেখে দিন। গলায় দিলে আবার খুলে পড়ে যেতে পারে।"

সবার সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দিয়ে মেয়েটার হাত ধরেই পাশাপাশি চেয়ারে বসে পড়ল নীতিশ। আলো নিভে গেল—আরম্ভ হল ম্যাজিক।

কিন্তু এ কী হল? যা ভেবেছিল তা না করে—এ কী করে বসল নীতিশ?

"দেখুন দেখুন ভাল করে তাকিয়ে দেখুন এই সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা মেয়েটির দিকে। অদৃশ্য যাদুকরের মায়াদণ্ডের প্রভাবে ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন হচ্ছে। দেখুন কী ছিল, আর কি হচ্ছে মেয়েটি।"

অন্ধকারেই মেয়েটার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে থাকা ওর হাতের মুঠির স্পর্শে নীতিশ বুঝতে পারল ও কাঁদছে!

"দেখুন নিষ্ঠুর যাদুকরের নির্মম খেলা। নিরপরাধিনী মেয়েটিকে কঙ্কালে পরিণত করছে। দেখুন ওর কণ্ঠার হাড়, বুকের পাঁজর, স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। দেখুন দুচোখের দৃষ্টি। দেখুন ওর সমস্ত শরীর—"

মেয়েটার অস্ফুট ফোঁপানীতে বিরক্ত হল নীতিশ। হাতে চাপছিল জোরে। "চুপ করে থাকো। পরে তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"দেখুন এবার কঙ্কালটাকে! রক্ত নেই মাংস নেই—জীবন নেই, কিছু নেই। আপনারা এই বীভৎস দৃশ্য দেখে শিউরে উঠছেন না? ভাবছেন তার বুঝি হৃদয় নেই? মন নেই? এমন সুন্দর একটা প্রাণকে সে বুঝি একেবারেই নষ্ট করে দিল? না না সে পাষাণ নয়। এই কখানা হাড়কেই এই কঙ্কালটাকেই সে আবার রক্তমাংসের মানবীতে রূপান্তরিত করবে। মন দিয়ে শুনুন। দেখুন। প্রথম অধ্যায় শেষ হল। এবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের খেলা। আর এটাই ভয়ানক কঠিন খেলা। মানুষকে তিলে তিলে মেরে ফেলা সহজ, কিন্তু তাকে বাঁচানো বড় কঠিন—"

চমৎকার! মনে মনে তারিফ করল নীতিশ। যাদু-করের চেয়েও যে লোকটা কথার যাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে সবাইকে। কবিত্ব করে কথা বলতে জানে বটে! মানুষকে তিলে তিলে ক্ষয় করা অতি সহজ, কিন্তু সে অপমৃত্যুর হাত থেকে মানুষের পর্যায়ে রূপান্তরিত করা সত্যিই ভয়ানক কঠিন।

সেকথা এতগুলো দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল করে কি নীতিশই জানেন?

খেলা শেষ হতে আলো জ্বলে উঠল।

"আমার সঙ্গে এসো। পালাবার চেষ্টা কোরো না ভিড়ের মধ্যে। দুবারই আমি ধরে ফেলেছি হাতে নাতে—মনে থাকে যেন।"

কার্নিভালের বাইরে বেরিয়ে এলো দুজনে। লজ্জায় অপমানে মুহ্যমান মেয়েটা ভীত কম্পিত দেহে অনুসরণ করতে লাগল ওকে। পালাবার পথ নেই। চিৎকার করার উপায় নেই। থানা। পুলিশ। জেল। দুচোখের সামনে ধকধক করে জ্বলে উঠল অপরাধের, পদস্খলনের শাসনের রক্তচক্ষু।

"তোমার নাম কি?" মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল নীতিশের, একেবারে ছেলেমানুষের মুখ! প্রথমবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন হয়, ঠিক সেইরকম।

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে মেয়েটা ভাঙ্গা গলায় বললে, "আমার নাম—আমার নাম লতা। কিন্তু আমি তো চুরি করিনি। আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? থানায়? জেলে? বিশ্বাস করুন—জীবনে কখনো আমি চুরি করিনি। কোনদিনও না।"

নীতিশ মনে মনে বললে, "নরকে।" মুখে বললে, "চুরি আগে করেছো কিনা জানি না। আজ করতে গিয়েছিলে, আমার জন্যেই পারনি। না হলে করতে। তবে থানায় দেব না। সে ইচ্ছে থাকলে ওখানেই দিতাম। তোমাকে তোমার বাড়িতেই পৌঁছে দেব।"

সকৃতজ্ঞ জলভরা দুই চোখ পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরল লতা ওর দিকে। "আপনি আমায় মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছেন।" কথা আটকে গেল। গালের উপর জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল ঝর্ ঝর্ করে।

দূরে রেসকোর্সের মাঠটাকে দেখা যাচ্ছে। যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা যেন মুঠোমুঠো স্বপ্ন ছড়িয়ে দিচ্ছে রাত্রির নির্জন নিঃশব্দতার মধ্যে।

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"আনোয়ার শা রোডে।"

একটা চলন্ত ট্যাকসি থামিয়ে ওকে নিয়ে উঠে বসল নীতিশ। মেয়েটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে ওকে। নিঃস্বার্থপর উপকারী ভেবেছে। ভালই হয়েছে ভবিষ্যতের পক্ষে। এ মুখোস খুলতে উপস্থিত রাজী নয় সে। সময় হয়নি। একে-বারে দরজা ঘেঁষে সরে বসল নীতিশ। ওর স্পর্শ বাঁচিয়ে।

আলো-ছায়া ভরা পথ দিয়ে ট্যাক্সি চলতে লাগল, নীতিশের নির্দেশে। দূরে দেখা যাচ্ছে গঙ্গা। কেল্লার উঁচু করা মাটির পাহাড়।

পার হল চৌরঙ্গী। আশু মুখার্জী রোড। এক সময় শেষ হ'ল টালীগঞ্জের ট্রাম লাইন। আঁকা-বাঁকা পথে আনোয়ার শা রোডে এসে গাড়ি থামল। আর যাবার পথ নেই।

অবশ শরীরে জোর এসেছে। সাহস এসেছে। নীতিশের ভদ্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়েছে লতা।

গাড়ির দরজা খুলে দিল নীতিশ। নিজে নামল না। "একলা যেতে পারবে?"

সকাতর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে লতা তাকাল ওর দিকে।

"আপনার দেখা না পেলে হয়ত মাথা উঁচু করে আজ বাড়ি ফিরতে পারতাম না। কোনদিন পারতাম কিনা, তাই বা কে জানে? কষ্ট করে যখন এত দূরে এলেন, একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান আমার ঘরে। আর নিজের চোখে দেখে যান কী অবস্থায় পড়ে আজ এই কাজ করতে গিয়েছিলাম।"

উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মনে মনে হেসে গাড়ি থেকে নেমে এলো নীতিশ।

প্রায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে, এবড়ো-খেবড়ো খোয়া ওঠা সরু পায়ে চলা পথ। ঘাস জঙ্গল ছোট বড় গাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। এখানে ওখানে এক আধটা বাড়ি, কোনটাই ভাল করে শেষ হয়নি। বিদ্যুতের আলো এখনো আসেনি। মিটমিটে জোনাকিগুলো যেন আরো অন্ধকার বাড়াচ্ছে। পথ চলতি একটা নেড়ি কুকুর ওদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যার পর এখানকার লোকেরা যে এ পথে চলাফেরা করে না, সেটা সহজেই বোঝা যায় রাস্তার অবস্থা ও নির্জনতা দেখে।

আধভাঙ্গা একটা পোড়ো বাড়ি ভূতুড়ে বাড়ির মত অস্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে কোন মতে, এই অন্ধকারের মধ্যে। লতার পিছনে পিছনে নীতিশ এসে দাঁড়াল জোড়াতালি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা বাইরের দরজাটার কাছে।

নিস্তব্ধ রাত্রি বিদীর্ণ করে বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এলো কুৎসিত কলহ। নারী কণ্ঠের সুউচ্চ চিৎকার। একজনের একঘেয়ে গোঙানি আর কান্নার সুর। আর একজনের ধিক্কার, অভিশাপ আর গালাগাল!

"মর মর মরে যা বুড়ি। তুই মলে হাড়ে বাতাস লাগে মেয়েটার। আমিও বাঁচি। ভাত জোটে না ওষুধ চাই। লজ্জা করে না এই বয়সে ওষুধ খেয়ে এমন ভাবে বেঁচে থাকতে?"

চমকে উঠল নীতিশ। একটা বিভীষিকার রাজ্যে যেন ও চলে এসেছে! অস্বস্তিতে সমস্ত গা গুলিয়ে উঠল। এমন জানলে কে আসত? একটা সুন্দরী অল্প বয়সের মেয়েকে দয়া করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

দরজায় ধাক্কা দিল লতা। "পিসিমা দরজা খোল। ঠাকুমা—একটু চুপ করো তোমরা।"

দরজা খুলে গেল। মিটমিটে কাঁচফাটা লণ্ঠনটার মরা আলোয় জল-জ্যান্ত অভাবের নগ্ন চেহারাটা অস্পষ্ট রইল না নীতিশের চোখে।

সামনেই ঘেরা বারান্দায় পাতা মাদুরের উপর শুয়ে থাকা কঙ্কালসার বুড়িটা হাঁপাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রাণপণে নিঃশ্বাস টানছে। হাড়সর্বস্ব বুকটা ওঠানামা করছে। শুধু দুটো জলন্ত চোখ প্রেতিনীর চোখের মত জলছে। প্রায় তারি আর এক সংস্করণ বিধবা মধ্যবয়সী, খাটো ছেঁড়া একখানা ধুতী কোনমতে পরা, দরজাটা খুলে দিয়েই নীতিশকে দেখে অন্তরালে আত্মগোপন করল।

বাড়ির ভিতর আগাছার জঙ্গল। উঠোনটার মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস। কে জানে সাপ আছে কিনা! মনে মনে শিউরে উঠল নীতিশ। লতার বাইরের অতি সুন্দর চেহারাটার সঙ্গে কোন মিল নেই—কল্পনাও করেনি ভিতরের এই শোচনীয় অবস্থা। এই প্রেত পুরী থেকে পালাতে পারলে ও যেন বাঁচে এখন—

কিন্তু পালাবার উপায় নেই। লতা সম্মোহিত করেছে যেন ওকে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে লতা এ পাশের একখানা ঘরে ঢুকল নীতিশকে নিয়ে। তক্তপোষের উপর ছেঁড়া শাড়ি পাতা। বসালো ওকে। "একটু বসুন। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে এভাবে এখানে এনে। আমার যে উপকার করেছেন আজ, জীবনেও তার প্রতিদান দিতে পারব না। সবচেয়ে দুঃখ এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারব না আজ।"

লতার সকৃতজ্ঞ চাহনি, আন্তরিক কথাবার্তায় অস্বস্তি বোধ হল নীতিশের। "থাক থাক। চা খাব না। তোমার বাবা, ভাই, কেউ নেই?"

"না। কোন পুরুষ মানুষই নেই। ঠাকুরমা পিসিমাই আমার মানুষ করেছিলেন। আজ আমার অদৃষ্টে ওঁরাই অমানুষ হয়ে গেছেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে প্রায় নিভে-আসা লণ্ঠনটার পলতেটা বাড়িয়ে দিতে গেল লতা।

আর সেই মুহূর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল

নীতিশ। বিদ্যুতের প্রখর আলোয়, নিয়মের কড়া সাদা টিউব লাইটে যা চোখে পড়েনি, এই ম্লান ছায়াচ্ছন্ন আলোয় ভাল করেই নজরে পড়ল অবনতমুখী লতার রাশিকৃত কালো কুঞ্চিত চুলের মাঝখানে রক্তের মত লাল টকটকে সিঁদুর রেখা—! বিবাহিতার চিহ্ন !

···নির্মেঘ বায়ুকোণে রক্তমেঘের ইসারা ; ঝড়ের সঙ্কেত।

দূরে গাছপালার শিরশিরাণির শব্দ নিয়ে ভেসে এলো এক ঝলক বাতাস। জানলার ওপাশে কারা যেন মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তির মত ! কারা যেন ফিস ফিস করে ষড়যন্ত্র করছে নীতিশের বিরুদ্ধে।

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া, গা-ছমছমানি অন্ধকার নির্জনতা সমস্ত পরিবেশ মিলিয়ে নীতিশের সন্দেহ কুটিল অপরাধী মন সচেতন হয়ে উঠল আসন্ন বিপদ সম্ভাবনায়।

এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে গেছে !

ফাঁদ ! রমণীরূপের মোহিনী মায়ার ফাঁদে ধরা পড়েছে সে। এতদিন পর, এত বড় ভুল করার পরিণামের ফল পেতে হবে তাকে। অভিনয়—চরম অভিনয় করে নিশাচরী মেয়েটা ওকে ভুলিয়ে এনেছে এখানে, এই অচেনা সহরতলীতে। ওর মাণিব্যাগের নোটের তাড়া, মেয়েটার লোলুপ চাহনি,—সব মিলিয়ে দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেছে।

"আপনার স্বামী আছে, আপনি বিবাহিতা, তবু কেন আমাকে ডেকে এনেছেন ঘরে ? এই রাত্রে ?"

"আমার স্বামী ?" চমকে ফিরে তাকাল লতা নীতিশের দিকে।

হ্যাঁ আপনার স্বামী। মাথার সিঁদুরটা কি মিথ্যে বলতে চান ? ওরা কারা জানলা থেকে সরে গেল ? ছি ছি আপনি শুধু চোর—পকেট মারই নন, আপনি—মতলব আমি বুঝতে পেরেছি—"

ধিক্কারভরা কথাগুলো শেষ না করেই তক্তপোষ থেকে নীতিশ ছিট্‌কে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল লতাও। সমস্তদিনের অনাহারে ক্লান্ত নির্যাতিত দেহ মন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। মাথার ভিতর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নীতিশের গলার কাঠিন্যে, মুখের সুতীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তিতে কোন কথাই অগোচর রইল না ওর কাছে।

"দাঁড়ান।" উত্তেজনায় কাঁপছে কণ্ঠস্বর। কাঁপছে সমস্ত শরীর, তক্তপোষটাকে শক্তি দিয়ে আশ্রয় করে লতা বললে, "একটুখানি দাঁড়ান। আমি চোর ! আমি পকেট মার, কিন্তু সব জেনে-শুনেও আপনি আমায় ঘেন্না করেন নি। পুলিশে দেননি।" তাই বলছি, "এত দয়া আপনার, আর একটু দয়া করে শুনে যান কে দায়ী আমাদের এই অবস্থার জন্যে। কে আমাদের তিনটে অসহায় দুর্বল নিরপরাধ মেয়েমানুষকে তিলে তিলে ক্ষয় করে এনেছে ? কেন আমায় নামতে হয়েছে বিপথে চুরি করতে পকেট মারতে। এই মাত্র ম্যাজিক দেখে এলেন না ? এখানে সেই খেলার প্রথম অধ্যায়টাই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। দিনে দিনে তিনটে মেয়েমানুষকে কঙ্কাল তৈরী করে চলেছে আমার স্বামীর হাত !"

দম নিতে থামলো লতা। ভুলে গেল নীতিশ অপরিচিত আগন্তুক মাত্র। সমস্ত জীবনের তিক্ত বিষাক্ত যন্ত্রণাটাকে সে যেন নিবেদন করছে তার বঞ্চিত ভাগ্যের পায়ে !

"এমন অবস্থা ছিল না। এই পোড়ো বাড়িতেও ছিলাম না তখন। সচ্ছল সংসার। সম্ভ্রান্ত বংশের বড় আদরের একমাত্র মেয়ে আমি। মা বাবা ছিলেন না। ঠাকুমা পিসিমা বুকে করে মানুষ করেছিলেন। বিয়েও দিলেন ; আনন্দ মিত্র লেনের বাড়িতে থাকতেই। রূপে গুণে কার্তিকের মত স্বামী পেয়ে মেয়েটা আনন্দে জ্ঞানহারা হয়ে স্বামীকে নিয়ে বাসর-ঘরে ঢুকলো। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতে চেয়ে দেখে সমস্ত গয়না গা থেকে খুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে তার স্বামী।"

আনন্দ মিত্র লেন ! বিয়ের রাত ! স্বামী—গায়ের গয়না খুলে—বিরাট একটা কালো পাথরের চাঁই নেমে আসছে নীতিশের মাথার উপর ! পালাতে গেল—পারল না। সরে দাঁড়াতে গেল দরজার দিকে। এখনি যে জীবন্ত সমাধি দেবে ওটা।

কিন্তু নড়বারও শক্তি হারিয়ে গেছে। কালো পাথরটা ক্রমশঃ বড় হয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াল। মুক্তি নেই। মুক্তি নেই নীতিশের !

"শুধু গয়না নয়। বিধবা ঠাকুমা পিসিমার তিলে তিলে জমানো যথাসর্বস্ব টাকাকড়ি। নগদ যা ছিল হাতের

কাছে। সব নিয়ে উধাও হয়েছে, শুধু রেখে গেছে সিঁদুরটুকু।"

অতি অদ্ভুত ভাবে, তীক্ষ্ণ রেখাঙ্কিত হয়ে উঠেছে লতার মুখ। সাপিনীর চোখের মতন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে তার দুই চোখের নীলাভ দ্যুতি।

"আপনার মত হৃদয়বান ভদ্রলোক এ সব কথা বিশ্বাস করবেন না জানি, তবু শুনতে বাধা কি? আপনি যে কথা কল্পনাও করতে পারেন না, আমার স্বামী সেই কাজই করে গেছে।"

খোলা দরজা দিয়ে দমকা হাওয়া আসছে। তেল না থাকা লণ্ঠনটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে এক চক্ষু ড্রাগনের মত। সেই দানবীয় কালো পাথরটা ভারী পর্বতের মত চেপে বসেছে নীতিশের মাথায়। লতার প্রত্যেকটি কথা কবর খোঁড়ার মত কেটে কেটে বসছে তার বুকের উপর।

"হ্যাঁ খোঁজ পাওয়া গেল কয়েক বছর পরে। এলাহাবাদে আর একটা বিয়ে করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সমীরণ ঘোষাল। এবারে পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছে বিয়ের আসরেই। জেল হয়ে গেছে কয়েক বছরের জন্যে।"

সমীরণ ঘোষাল! আর একটা মিথ্যে নাম! এলাহাবাদ বিয়ের আসর! জেল—

তলিয়ে যাচ্ছে নীতিশ। মৃত অতীতের অতল সমাধি গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে ক্রমশঃ!

উন্মাদিনীর মত বলে চলল লতা, "তারি জন্য আমাদের তিনটে মেয়েমানুষের আজ এই অবস্থা। ঠাকুমা পিসিমা মরতে বসেছে। কলকাতা আর কিছুদিনের মধ্যেই হবে ঐ যাদুকরের হাতের আরেকটা কঙ্কাল! কোথা থেকে সে আমাদের কোথায় নামিয়েছে? হয়ত আজই আপনার পকেট মারতাম, ঐ মেয়েটার গলার সোনার হার চুরি করতাম যদি—যদি আপনার মত দেবতার সঙ্গে দেখা না হত! যদি না আপনি আমাকে এতবড় সর্বনাশের আর মহাপাপের হাত থেকে আমাকে রক্ষা না করতেন—"

"দেবতা! দেবতা!"

অন্ধকার কবর থেকে উঠে এসে সেই অবয়বহীন ভয়ঙ্কর দানবটা নীতিশের কানের কাছে দাঁতে দাঁত ঘষে বিকট শব্দে হেসে উঠল।

বিভ্রান্ত দিশেহারার মত, উন্মাদের মত দুই কানে হাত চেপে খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে ঘাস, জঙ্গল ভরা উঠোনে, তারপর জনহীন ভূতুড়ে মাঠটার মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল নীতিশ।

সেই দানবটা তাকে তাড়া করেছে!

এই তো সংসার

শ্রীসুধীর গুপ্ত

এ ব্রহ্মাণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে আমরা দুজনে
মিলন-বিরহ-লীলা করি আস্বাদন।

বিটপী-বীণার তব রস-আলাপন
বাজে, কভু কল-শব্দ সমীর-স্বননে।

হে সুন্দরী, মেঘ-বাস পরি ক্ষণে ক্ষণে
কেড়ে লও অনায়াসে তুমি মোর মন;

আমার জীবনে মিশি' তোমার জীবন
রহস্য বুনিয়া চলে ভুবনে ভুবনে।

ক্ষুধা হ'য়ে ওঠে সুধা,—অন্ধকার আলো
বৈপরীত্য—ব্যবধান মুহূর্ত্তে আবার

অভিনব ভাব-রসে হয় যে রসালো;
সর্ব্ব-সমন্বয়-জাত আনন্দ-পাথার

একাকার ক'রে দেয় সব মন্দ-ভালো;—
মহারাস-রসাত্মক এই তো সংসার।



ভবিষ্যদ্বাণীর পর্য্যালোচনা

উপাধ্যায় .

গ্রহপুঞ্জের গতিপর্য্যবেক্ষণ করে বিশ্বধ্বংসের সম্বন্ধে বহুরকম কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত শুনে আসছি আমরা। কেউ বলছেন কলিযুগের শেষ হয়ে আসছে, সত্যযুগের আবিভাব আসন্ন প্রায়। কেউ বলছেন সত্যযুগ সুরু হয়েছে। কেউ বলছেন এখনও আমরা কলি-যুগের প্রভাতের মধ্যেই রয়েছি, এযুগ শেষ হোতে ৪২৬,৯৩৯ বৎসর বাকী আছে। আমরা এখন অষ্টবিংশতি মহাযুগের শেষ যুগের মধ্যে রয়েছি। সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত ১,৯৫৫, ৮৮৫,০৬১ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেকে আবার জেন্দ আবেস্তা, বাইবেল ও নানা দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ আর প্রাচীন পুঁথিগুলি থেকে যে সব তথ্য উদ্ধার করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় খৃষ্টের আবিভাবের পর দুহাজার বছরে খণ্ড প্রলয়ের মাধ্যমে একটি যুগের শেষ হ'বে, আর দেখা দেবে নতুন যুগ। উড়িষ্যার প্রাচীন গ্রন্থে এবং অন্যান্য ভারতীয় পুঁথি থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে অনেকে দেখিয়েছেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পর কলিযুগের শেষ হবে, এই যুক্তি যে খণ্ডন করবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'বে বলে ঘোষণা করেছেন কোন মধ্যপ্রদেশের জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান। কোন কোন পণ্ডিত পঞ্জিকায় প্রোক্ত বর্ষগুলির ওপর কটাক্ষ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন যুগের হিসাব ঠিক হয়নি। তাঁরা প্রশ্ন করেছেন কিভাবে এরূপ বর্ষ নির্ণয় করা হয়েছে। তাঁদের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ১,৭৫০ বর্ষে হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষ ভাগে ঘটে। রামরাবণের যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব্ব সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগে। বাইবেল বর্ণিত মহাপ্রলয়ের সময় যখন নোয়া নৌকার উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কর্কট রাশিতে সাতটি গ্রহের সমাবেশ হয়েছিল। প্রাচীন জ্যোতিবীরা রাহু ও কেতুকে গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করেন নি। জনৈক পণ্ডিত ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ধ্বংসের প্রসঙ্গে বলেছেন ইহুদীদের কোন প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া গেছে, মকর রাশিতে সাতটি গ্রহের সমাবেশ কালে একটি মহাদেশই সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আটটি গ্রহের সমাবেশ হবে। সুতরাং এঁদের মতে একটি মহাদেশ সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাবে, যেমন করে গেছে স্বর্ণলঙ্কা। অবশ্য একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে মধ্য ভাগ থেকে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ঘোর দুর্দ্দিন। ভারতবর্ষ তমসাচ্ছন্ন সঙ্কট-দুর্যোগে আর্ত্তনাদ করবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত গ্রহ সমাবেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বহুলোকের জীবন ধ্বংস হবে। মধ্য এশিয়ার একাদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিজ খাঁ আবির্ভূত হয়ে যে সময়ে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত নরহত্যা ও লুণ্ঠন সুরু করেছিলেন, সে সময়েও অনেকটা অনুরূপ গ্রহ সমাবেশ হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক দৈবজ্ঞ, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষবেত্তা, ভবিষ্যদ্রষ্টা, অধ্যাত্ম সাধক ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর ধ্বংসের আসন্নতার বাণী প্রচার করে আমাদের অন্তরে এনে দেন ভীতি ও অবসন্নতা। তাঁদের বাণী পৃথিবীর নানাদেশের নানা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বহুবিঘোষিত হ'য়ে থাকে সময়ে সময়ে, আর আমরা যারা বিশ্বের অধিবাসী আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জনৈক গণিত জ্যোতিষবেত্তা বলেছিলেন যে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব এবং পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ হেতু ধরণীর ধ্বংস হবে ঐ বৎসর। অনেকে বোকার মত হয়েছিলেন এই সংবাদে আর বহু-লোকের মস্তিষ্ক বিকারও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে ধূমকেতু শুধু ঐ বৎসরে নয়, তারপরেও আর দেখা গেল না।

কার্ল'টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর প্রোফেসার করিগ্যান 'পপুলার এষ্ট্রোনমি'তে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংসের কথা। তাঁর উক্তিতে জানা যায় যে সূর্য্য থেকে একটি নূতন গ্রহ ধাক্কা খেয়ে পড়বে আর তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, জলে স্থলে কোন জীবজন্তু থাকবে না। তাঁর গাণিতিক তথ্য সূর্য্য থেকে গ্রহের বিচ্ছিন্নতার নির্দ্দিষ্ট সময় প্রকাশ করেছে, কিন্তু ধ্বংসের তারিখ রেখেছে অনুক্ত করে। অষ্ট্রিয়ার ডক্টর ফাল্‌বি বলেছিলেন বেলা তিনটা তিন মিনিটের সময় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর পৃথিবীর মৃত্যু অনিবার্য্য, ঈশ্বরের করুণায় আজও পৃথিবী বেঁচে আছে।

লর্ড কেল্‌ভিন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পৃথিবীর ধ্বংসের বাণী আমাদের কাছে শুনিয়েছেন। তিনি দিন মাস বছর নির্দ্দিষ্ট করে

দেননি। তাঁর মতে প্রায় চারি শত বৎসরের ভেতর প্রাণী জগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—পৃথিবীতে অক্সিজেনের অভাবে। কেন না মনুষ্য সমাজ আর শ্রমশিল্প কেন্দ্রিক কারখানাগুলির কাজের চাপে এই বাষ্প নিঃশেষিত হবে। রয়েল এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাটির মিষ্টার গোর পৃথিবীর দ্রুত ধ্বংসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে বিশ্ববাসীর ভীতি সঞ্চার করেছেন। রশ্মি নিঃশেষিত তারকাদের একটির সঙ্গে সূর্য্য প্রায় সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। এই সব মৃত তারারা মহাশূন্যে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। একঘন্টার মধ্যে উভয় গ্রহের সংঘর্ষে যে বাষ্পীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে তার ভীষণ উত্তাপে শুধু পৃথিবী নয়, সমগ্র সৌরমণ্ডলে গ্রহরা ধ্বংস হয়ে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর কথিত এই বাণী কার্য্যে পরিণত হয়নি।

গণিতজ্যোতিষবেত্তা অধ্যাপক এলবাপোর্টার বলেছিলেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে সূর্য্যের ওপর ছয়টি গ্রহের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে সমগ্র সৌরমণ্ডলের ভার সাম্য নষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সৌরজগৎ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চেতাবাণীর বিবৃতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে বেলা ১২টা ৪৪ মিনিটের সময় কলিযুগের অবসান হবে, শ্বেত অশ্বোপরি কল্কির আর্বিভাব হবে আর মানুষের পরমায়ু হবে চারিশত বৎসর, দুর্ব্বলেরা হবে সবল আর কোন গৃহে থাক্‌বে না বিধবা। রোগ, শোক পাপ তাপ সবই অবলুপ্ত হয়ে যাবে সত্য যুগের আর্বিভাবে।

হিন্দু পত্রিকায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছিল যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলিযুগ শেষ হবার পর পৃথিবীর অক্ষগতির পরিবর্ত্তন প্রবণতার দরুণ পৃথিবীতে দ্বিতীয় চন্দ্ররূপে এসে দাঁড়াবে শুক্র, কতকগুলি শৈলমালা লুপ্ত হয়ে যাবে, চব্বিশ থেকে ত্রিশ ঘণ্টায় পরিণত হবে দৈনন্দিনমান আর গ্রহমণ্ডলের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। সে বাণীও ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ইটালীর অতীন্দ্রিয়বাদী বিয়াঙ্কার মতে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপ্রলয় হবার কথা ছিল এবং তিনি ও তাঁর ভক্ত বৃন্দ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে রক্ষা পাবার কথা ছিল না। এই সংবাদ পৃথিবীর সকলদেশের সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হয়। শেষ বিচারের দিনের সম্ভাবনা আগত প্রায় ভেবে ইটালীর হাজার হাজার নারী পুরুষ গির্জ্জায় গিয়ে পাপ স্বীকার করতে সুরু করলো। ফিলিপাইনের বালক-বালিকারা বিদ্যালয়ে গেল না। পোপ এ বিষয়ে হাঁ না কিছুই বললেন না। প্রোফেট বিয়াঙ্কা একশত শিষ্য নিয়ে মণ্ট ব্লাঙ্কের ওপর ৭১৫০ ফুট উঁচুতে মুক্তির ঘাঁটি করলেন।

গণনার ওপর বিয়াঙ্কার এরূপ অভ্রান্তি-জনিত আত্মবিশ্বাস হয়েছিল যে, ধ্বংসের সময় (১২·৪৫ মিঃ জি এম টি) নিকটবর্ত্তী হোতে দেখে তিনি আর তাঁর শিষ্যেরা কুটীরের মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ঐ দৈবী ভাবাপন্ন পুরুষের জনৈক শিষ্য জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লো ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে জলপ্লাবনের পরিবর্ত্তে জনতার বিদ্রূপাত্মক কোলাহলের স্রোত তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। মৃত্যু আসন্ন ভেবে বহু আতঙ্কগ্রস্ত নারী পুরুষ লণ্ডনের মদের দোকানে গিয়ে প্রচুর মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে ছিল। আমাদের এখানে নেতাজীর আবির্ভাব নিয়ে বহু জ্যোতিষী এবং কয়েকটি পঞ্জিকার গণকরা কয়েক বছর ধরে বেশ বাজার গরম করে ছিলেন। কেউ কেউ ক্রিষ্টালের ভেতর দিয়ে তাঁকে আসতে দেখেছেন। সে গণনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক গণিত জ্যোতিষের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন কর্‌লে দেখা যায় অন্ততঃ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের আগে সূর্য্যের অবসান ও পৃথিবীর মৃত্যু ঘট্‌বে না। সে সময়ে থাক্‌বে শুধু তাপ বিকীরণের অসীম সমুদ্র, থাক্‌বে না ঘন তরল অথবা বাষ্পীয় অবস্থা এমন কি এ্যাটমও যাবে ভেঙে। পদার্থবিদ্ ডাঃ ওয়াটার ফিল্ড বলেছেন কালাতীত অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ত অবস্থায় অনেকটা সৃষ্টির প্রারম্ভের মত থাক্‌বে সৌরজগতের সমাপ্তি। বাষ্পের সমমাত্র অব্যবস্থিত বস্তু পিণ্ড ছিল প্রথম অনন্তস্তরে, ধ্বংসের পরবর্ত্তী অনন্তস্তরে থাক্‌বে তাপ বিকীরিত অব্যবস্থিত বস্তুপিণ্ড।

সৃষ্টির মূলে যে দৈবী ইচ্ছা প্রকট হয়েছিল তার ভেতর আমরা ভগবানের লীলা তত্ত্বকেই উদ্ভাসিত হোতে দেখি। সুতরাং হাজার হাজার হাইড্রোজেন বোমা পড়্‌লেও সহজে পৃথিবীর ধ্বংস হ'বে না অথবা মনুষ্য জাতির বিলোপ সাধন হ'বে না। মহাশক্তি এমনই নিরাপত্তার অর্গল বন্ধ করে তাঁর সন্তানদের রক্ষা কর্‌ছেন যে, যতই পৃথিবীর ধ্বংসের গান ধ্বনিত হোক্‌না কেন বৈজ্ঞানিক, দৈবজ্ঞ ও দৈবীশক্তি সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠে, একথা সত্য ভগবানের মহান্ সৃষ্টিকে লুপ্ত করা যাবে না আর মহামায়ার সন্তানেরা নিশ্চিহ্ন হবে না। চণ্ডীতে বলা হয়েছে—'মহামায়া প্রসাদেন সংস্থার স্থিতিকারিণঃ।'

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকাজাতব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, ভরণীর পক্ষে মধ্যম এবং অশ্বিনীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। শেষের দিকে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। প্রতিযোগী ও শত্রুর নিকট লাঞ্ছনা ভোগ, দুর্ঘটনার ভয়, স্বজন-বিচ্ছেদ, স্বাস্থ্যের অবনতি, নানাপ্রকার উদ্বিগ্নতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও নানা আশঙ্কা। শেষার্দ্ধে সময়টি বহুলাংশে ভালো হবে। সাফল্য, সৌভাগ্য, মর্য্যাদাবৃদ্ধি, আনন্দ ও সুখ, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, বিলাসব্যসন, শত্রু জয় প্রভৃতি সম্ভব। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক অসুস্থতা মধ্যে মধ্যে ভোগ করতে হবে, বায়ু অথবা পিত্ত প্রকোপের সম্ভাবনা আছে, শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি দূর হবে। পারিবারিক অশান্তি যোগ আছে। আত্মীয় কুটুম্বাদির সঙ্গে মতভেদ হেতু কলহ বিবাদ হবে। আর্থিকক্ষেত্র মোটের উপর মন্দ নয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থ প্রাপ্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল। চাকুরিজীবীদের পক্ষে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনাভোগ। এমন কি মর্য্যাদাহানি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি

জীবিগণের পক্ষে মোটের উপর মন্দ নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধে শুভ নয়, শেষার্দ্ধে ভালো বলা যায়। প্রথমার্দ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে বিচ্ছিন্নতা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ কিন্তু পারিবারিকক্ষেত্রে থাকবে নানাপ্রকার অশান্তি।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রোহিণী ও মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। বন্ধু স্বজন ও কুটুম্বাদির সঙ্গে কলহ বিবাদ উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটবে। ব্যর্থপ্রচেষ্টা, ক্লান্তিজনক ভ্রমণ, ক্ষতি, দুর্ঘটনা, অসৎসংসর্গ এবং তজ্জনিত নানাবিপত্তির আশঙ্কা আছে। শ্লেষ্মাধিক্য, ব্রঙ্কাইটিস, পিত্ত ও বায়ুপ্রকোপ। রোগ নিবারক ঔষধ, উপযুক্ত পথ্য ও বিশ্রাম প্রয়োজনীয়। বালক-বালিকার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাবে। অপরিমিত ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। প্রতারণা, জামিন হওয়ার জন্য বিপত্তি ইত্যাদি আশঙ্কা করা যায়। রেসে ও স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূমধ্যকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। মামলা-মোকদ্দমায় প্রতিবাদীরূপে দাঁড়াতে হবে, অনেক সময়ে নিজেদের সত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্যেও মামলা করতে হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ বলা যায় না। নৈরাশ্য ও উপরওয়ালার পীড়ন প্রভৃতি সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি খারাপ নয়। মাসের মাঝখানে উত্তরোত্তর উন্নতি আশা করা যায়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মাসটি আদৌ শুভ নয়, নানাপ্রকার জটিল পরিস্থিতির যোগ আছে। এজন্যে চিত্তের ধৈর্য্য আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর হোলে গুরুতর বিপত্তির কারণ ঘটবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক কেননা আশা ভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয় প্রভৃতি যোগ আছে, তাছাড়া রন্ধনশালায় দুর্ঘটনার ভয়, কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, বা পড়ে যাওয়ার দরুণ দৈহিক কষ্ট ভোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

মিথুন রাশি

রাশিগত তিনটি নক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের ফল একই রকম হবে। মাসটি ভালো মন্দ মিশ্র ; বরং মন্দের ভাগই কিছু বেশী, যেমন কলহ, বিবাদ, প্রণয়ভঙ্গ, বন্ধুবিচ্ছেদ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, উৎসাহের অভাব, উদ্বেগ ও আশাভঙ্গ, স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে অসাফল্য প্রভৃতি। সান্ত্বনালাভ, বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব, সুখ, লাভ, বিলাসব্যসন, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন বা গবেষণা, বনভোজন, ভ্রমণ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও শত্রুজয় প্রভৃতি শুভ ফল শেষের দিকে ঘটতে পারে। উল্লেখযোগ্য পীড়া না হোলেও সাধারণভাবে দুর্ব্বলতা থাকবে। পিত্ত-প্রকোপ ও চক্ষু পীড়ায় যারা কষ্টভোগ করছে তাদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক সুখ শান্তির অভাব ও স্বজনবিরোধ। আর্থিক ক্ষেত্রটি শুভ। নানাদিক থেকে আয় বৃদ্ধি ও ধনাগম। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূমধ্যিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি অশুভ। চা বাগানের মালিক ও খনি প্রতিষ্ঠানের আশাতীত পুঁজি হবে। চাকুরিজীবির সময় ভালো যাবে। পদমর্য্যাদালাভ, কর্ম্মোন্নতি, উপরওয়ালার প্রীতিলাভ ও কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ সংবাদ প্রভৃতি আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষাজাত ব্যক্তিগুলির ফলই মোটামুটি একই প্রকার। মাসটি ভালো মন্দ মিশ্রিত। উদ্বেগ, অশান্তি, ভয়, ব্যর্থ-প্রচেষ্টা, পারিবারিক কলহ, স্বজনবিরোধ, অযথা অপবাদ, ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ ফলগুলির আশঙ্কা করা যায়, শেষার্দ্ধে সুখ, শ্রীবৃদ্ধি, শত্রুদমন, পুণ্যাদি কার্য্য, সম্বন্ধ লাভ প্রভৃতি আশা আছে। শারীরিক অবনতি ঘটবে না। পিত্তপ্রকোপ বা চক্ষু পীড়া। ঘরে বাইরে কলহ বিবাদ লেগেই থাকবে। আর্থিক অবস্থাও উদ্বেগজনক। প্রথমার্দ্ধে অর্থ অনটন, শেষার্দ্ধে অর্থ সঙ্কুলান। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে লাভ ও ক্ষতি দুইই ঘটবে। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি বিরক্তিপ্রদ, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে অতিবাহিত হবে, কোন প্রকার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে গেলেও বাধা। চাকুরির ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রাত্যহিক দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হোতে হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য। সামাজিক ও পারিবারিকক্ষেত্রে বহু অসুবিধা ভোগ। যে সব নারী ক্লাব, মজলিস ও পার্টিতে যেতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে বহু সুবিধা সুযোগের আশা আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা উত্তরফল্গুনীজাতগণের সময় শুভ। মঘার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মোটামুটিভাবে মাসটি ভালো যাবে। অর্থাগম, ধনসম্পত্তি, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যোগ আছে, তা ছাড়া ধনৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির সঙ্গলাভ, নূতন নূতন বিষয় অধ্যয়নে আসক্তি, শত্রু দমন প্রভৃতি সম্ভব। কলহ বিবাদ, ক্লান্তি-কর ভ্রমণ ও নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি যোগ দেখা যায়। আর্থিকক্ষেত্রে খুব উন্নতিযোগ নেই, মধ্যে মধ্যে অর্থের হ্রাস ঘটবে। মাসের শেষার্দ্ধটি সন্তোষজনক। রেস খেলায় লাভ। স্পেকুলেশনে আংশিক ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটবে না। তবে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মিশ্র ফল। বেকার মেয়েরা চাকুরি পেতে পারে। প্রণয়বৃদ্ধি ও পুরুষের উত্তম সৌহার্দ্দ্যলাভ। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ-জনক। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম। হস্তা ও চিত্রাজাতগণকে কিছু

কিছু কষ্টভোগ করতে হবে। এ মাসে নবোত্তমে কোন প্রকার নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। রুটিন মাফিক কাজ চালিয়ে যাওয়া বিধেয়। ভালো মন্দ না দেখে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াও অযৌক্তিক। সর্ব্ব বিষয়ে বাধা, উদ্বিগ্নতা, মানসিক কষ্ট, কলহ বিবাদ, মন কষাকষি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শত্রুদের অপকৌশলজনিত লাঞ্ছনাভোগ, অপরের অসৎ পরামর্শ গ্রহণজনিত কার্য্যে কষ্টভোগ, দুঃসংবাদপ্রাপ্তি প্রভৃতি সূচিত হয়, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে বিশেষতঃ শেষার্দ্ধে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃদরোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অতিরিক্ত কর্ম্ম বর্জ্জনীয়, বিশ্রাম কর্ত্তব্য। ঘরে বাইরে মনোমালিন্য, কলহ ও মতভেদজনিত অশান্তি। বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ সতর্কের সঙ্গে মেলামেশা বাঞ্ছনীয়, সামান্য কথা থেকে শেষ পর্য্যন্ত মনান্তর ঘটতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার আশা নেই। কোন প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হোতে পারে। স্পেকুলেশনে প্রচণ্ড ক্ষতি। অপরিচিত বা সন্দেহজনক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কোনপ্রকার সংস্রব রাখা বিধেয় নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠবে। সম্যক্‌ভাবে আদায় বা উৎপাদন হবে না। গভর্ণমেণ্ট, প্রকৃতি ও শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে সচেষ্ট হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে সব ব্যাপারেই সময় নেবে, কোন প্রকার উন্নতি আশা করা যায় না। সহকর্ম্মীরা অপদস্থ করবার দিকে ঝুঁকবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা প্রথমে কিছু অসুবিধা ভোগ করলেও শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মোটেই ভালো নয়। আশ্রম, মঠ, মন্দির ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্রে সতর্কতা আবশ্যক। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহ প্রকাশ অনুচিত। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চিত্তস্থির করে চলা দরকার। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। রেসে না যাওয়াই ভালো, কেননা বারম্বার হার হবে।

তুলা রাশি

তুলারাশিজাত ব্যক্তি মাত্রেরই একই প্রকার ফল। প্রথমার্দ্ধে উত্তম, শেষার্দ্ধে নিকৃষ্ট ফলভোগ। কিছু সাফল্য, লাভ, উত্তম বন্ধু ও সঙ্গসুখ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রু জয় প্রথমার্দ্ধে আশা করা যায়। শেষার্দ্ধে অসাফল্যজনিত দুশ্চিন্তা, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, কলহ, বিবাদ, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ প্রভৃতি যোগ আছে। বিদ্যাক্ষেত্রে শুভ ফল। শরীরে আঘাত প্রাপ্তি ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা। জীবনীশক্তির হ্রাস, ভ্রমণজনিত অবসাদ। কোন প্রকার আঘাত পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না করলে ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে জীবন বিপন্ন করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কলহ বিবাদ চলবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুভূত হবে কিন্তু পরিবর্ত্তনের চেষ্টা শুভজনক হবে না। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে লাভ হবে না। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মোটামুটি সন্তোষজনক। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধে শুভ, শেষার্দ্ধে নৈরাশ্যজনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টি একভাবে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। যে সব মেয়ে যৌগিক ব্যায়াম, আসন প্রভৃতির দিকে আগ্রহশীল, তারা সাফল্যলাভ করবে, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হবে। বহু নারীর অবৈধ প্রণয়জনিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আধিক্য হেতু অসুস্থতার কারণ ঘটবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের ফল একই প্রকার। মাসটি সকলের পক্ষে উত্তম। আশাআকাঙ্ক্ষার পূর্ণফলপ্রাপ্তি যোগ। সাফল্য, অর্থাগম, শত্রুজয় ও সৌভাগ্য লাভ সূচিত হয়। কলহ, ক্ষতি, পীড়া, উদ্বিগ্নতা মধ্যে মধ্যে দেখা দেবে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক প্রীতি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক উন্নতিযোগ। সর্ব্বপ্রকার নব-প্রচেষ্টা সার্থক হবে। স্পেকুলেশনে কিছু লাভ। রেসে অর্থাগম, ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে উত্তম। মামলা মোকদ্দমা বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে অতীব উত্তম। পুলিশ বা সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীর পক্ষে পুরস্কার, পদকপ্রাপ্তি ও পদোন্নতি যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উৎকৃষ্ট মাস। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ। অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ, মুক্তপ্রেম ও অবাধ মেলামেশায় আশাতীত সাফল্য, উপঢৌকন লাভ ও আমোদ-প্রমোদের নানা উপকরণপ্রাপ্তি। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষেও বিশেষ শুভ সময়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম অবস্থা।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বাষাঢ়ার মধ্যম এবং মঘার নিকৃষ্ট সময়। গ্রহদের আনুকূল্যে অভাব হেতু বিশৃঙ্খল অবস্থা। শেষার্দ্ধটি কিছু ভালো বলা যেতে পারে। শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকবেই, উল্লেখযোগ্য পীড়া হবে না। উদরের গোলমাল ঘটবে। ঘরে বাইরে বিবাদ, কথা কাটাকাটি, মতভেদ ও মনান্তর। ব্যয়াধিক্য যোগ। নগদ টাকার চাহিদা। আর্থিক কোন প্রচেষ্টাই সাফল্য লাভ করবে না। দৈনন্দিন টাকা লেন দেনের ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক, প্রতারণা বা চুরির আশঙ্কা। স্পেকুলেশন ও রেস খেলা একেবারেই বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ শুভ ফলের আশা করা যায় না এ মাসে রুটিন মাফিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু করা চলবে না। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শেষ সপ্তাহটি ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়ে গুরুতর বিপত্তি, এমন কি জীবন বিপন্ন হোতে পারে। পারিবারিক কর্ম্মে অবহেলাজনিত দুর্ভোগ। সামাজিক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা ও অপমান হেতু মানসিক অস্বচ্ছতা। মাতার সহিত মনোমালিন্য। চাকুরিজীবী নারীর ভাগ্যে প্রতারণাজনিত গুরুতর কষ্ট ভোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো নয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠাজাতগণ বহু দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'বে। কোন গ্রহই অনুকূল নয়। সুতরাং কোন কিছু ভালো আশা করা যায় না। অসৎসংসর্গ, প্রতারণা, চৌর্য্য ভয়, অর্থক্ষতি পকেটমারের দৃষ্টিহেতু অর্থহানি, কর্ম্মে অসাফল্য, মামলায় পরাজয় ও অপমান। মধ্যে কিছু খ্যাতি ও লাভ যোগ আছে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, সন্তানের পীড়া, গুরুজনদের সঙ্গে কলহবিবাদ, ঘরে বাইরে শত্রুর চক্রান্ত দেখা যায়। কোন স্বজনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। আয় হ্রাস হবে, ঋণযোগ, ব্যয়বৃদ্ধি, প্রতারণা ও চুরির জন্য বিশেষ ক্ষতি। স্পেকুলেশন ও রেস বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটা মিশ্রফল-দাতা। গৃহ নির্ম্মাণ, গৃহ সংস্কার ও ভূম্যাদি ক্রয়ের পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রটি সুবিধাজনক নয়। উপরওয়ালার কোপে পড়বার ভয় আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না, অবৈধ প্রণয়ে নিগ্রহ ভোগ, পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়া। জলে ভ্রমণ বর্জ্জনীয়, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা অনুচিত। অপবাদের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মোটেই ভালো নয়।

কুম্ভ রাশি

সকলের পক্ষেই এক প্রকার ফল। মোটের উপর মাসটি ভালোই যাবে, একটু বাধা ও কষ্ট ভোগ হোতে পারে। সুখ, নানা প্রকার লাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান, সৌভাগ্য, জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রভৃতি ফল দেখা যায়। স্বজনবর্গ কষ্ট দিতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা নানাপ্রকার চক্রান্ত করবে। প্রথমার্দ্ধে বহু কার্য্যে বাধা বিঘ্ন আসবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো যাবে কিন্তু উদরের ও মূত্রাশয়ের গোলযোগ আছে। শেষার্দ্ধে রক্তের চাপ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য হবে না। আর্থিক ক্ষেত্র অতীব শুভ। নানাপ্রকারে অর্থাগম হবে। ভুল ত্রুটির জন্য কিছু ক্ষতি হবে। বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণাজনিত মানসিক আঘাত। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। ভূম্যাদিলাভ, গৃহ ও স্থাবর সম্পত্তির সুযোগ আছে কিন্তু ঝড়, বন্যা, বিপরীত আবহাওয়া ও গভর্ণমেন্টের জন্য ক্ষতি। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নানাস্থানে গমনাগমন। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ হোলেও উল্লেখ-যোগ্য লাভ বা উন্নতি আশা করা যায় না। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বাস পরিবর্ত্তন বা পরিবেশের পরিবর্ত্তন অনুচিত। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। সাহিত্য সেবায় খ্যাতি অর্জ্জন কিন্তু অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে প্রীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে সময়টা উত্তম বলা যায় না।

মীন রাশি

সকলের পক্ষেই এক প্রকার ফল। কোন গ্রহই অনুকূল নয়। মাসের শেষার্দ্ধে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করা যায়। বিলাস ব্যসন বৃদ্ধি। মাসের প্রথমার্দ্ধে সুখ, লাভ, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির যোগ আছে। অপবাদ, দুঃসংবাদ, কর্ম্মে বাধা-বিপত্তি, জ্ঞাতি শত্রুতা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্ভব। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া। হজমের গোলমাল, বুকে ব্যথা, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি আশঙ্কা আছে। নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা। স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে কলহ। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই যাবে। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক সঙ্গতি দেখা যায়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য সময় বলা যায় না। নানা প্রকার অশান্তি ভোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। বেকার ব্যক্তিদের কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি ভালোই যাবে। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। স্ত্রীলোক গণের পক্ষে মাসটা এক ভাবেই যাবে। এমাসে পড়াশুনা বা গান বাজনায় সাফল্য লাভ। বিলাস ব্যসন সামগ্রী ক্রয়ে ঠকবার সম্ভাবনা। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন হবে না, অবৈধ প্রণয়ে কিঞ্চিৎ লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। পাকাশয়ের দোষ, রক্তের চাপবৃদ্ধি, দুর্ঘটনার আশঙ্কা। সন্তানাদির পীড়া। সৌভাগ্যবৃদ্ধি। পারিবারিক কলহ বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম। মহিলাদের পক্ষে উত্তম ফল।

বৃষলগ্ন

শিরঃপীড়া, বেদনাসংযুক্ত পীড়া ভোগ, পিত্তপ্রকোপ। ধনাগম। মাতৃপীড়া। গুরুজন বিয়োগ। বন্ধুলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আংশিক ক্ষতি। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম।

মিথুনলগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি। ধনলাভ। স্ত্রীর পীড়া। সৌভাগ্যলাভ। কর্ম্মোন্নতি। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ। বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ সময়। মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

কর্কট লগ্ন

শ্লেষ্মাপ্রকোপ। শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। অত্যধিক ব্যয়। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়।

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা আদৌ ভালো যাবে না। ধনাগম যোগ আছে। সৌভাগ্য লাভ। ব্যয়বৃদ্ধি। পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়। মহিলাদের পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো। ধনভাব উত্তম। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি। মনস্তাপ। ব্যয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। মহিলাদের পক্ষে পারিবারিক কষ্ট, প্রণয়ভঙ্গ।

তুলালগ্ন

উদর ঘটিত পীড়া। মানসিক উদ্বেগ। ধনাগম। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ। বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন। সন্তানের দেহ পীড়া। ভাগ্যস্থানে বাধা বিঘ্ন। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থীর পক্ষে অধম সময়।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, উল্লেখযোগ্য পীড়ার আশঙ্কা। ভাগ্যোন্নতি। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য। স্ত্রীর পীড়া পাকাশয়ের দোষ। মনস্তাপ। কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

ধনুলগ্ন

শারীরিক দুর্ব্বলতা। আর্থিকোন্নতি। ব্যয়বৃদ্ধি। কর্ম্মে অসুবিধা ভোগ। আশাভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম।

মকরলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। সম্বন্ধুলাভ। পত্নীর পাকযন্ত্রের পীড়া। বায়ুপ্রকোপ। সৌভাগ্য লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অশান্তি ভোগ। ধনভাবের ফল মধ্যম। পত্নীর আন্তরিকতা অনুভব কিন্তু পীড়াদি কষ্ট। সন্তান পীড়া। আশাভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়।

মীনলগ্ন

পীড়াদি কষ্ট, বায়ু প্রকোপ, হৃদ্রোগ। নূতন ঋণযোগ। আয়ভাব শুভ। ভাগ্যোদয়ে বাধা। ব্যয়বৃদ্ধি। সম্পত্তি সুখ। স্বজন বিয়োগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাভঙ্গ। মহিলাদের পক্ষে উত্তম সময়।

মিনতি

হাসিরাশি দেবী

আজকে আবার দেখা হ'লো যদি এমন দিনে—
তাহ'লে—শোনো,—
ঐ দুই চোখে এনোনা আমায় কিছু না চিনে
প্রশ্ন কোনো।
কি নিয়ে এলেম! কি আনিনি—আর এসব নিয়ে—
কথান্তর,·········
ভুলতে না পারি, রেখে দেই এস' বাতিল দিয়ে,—
পরস্পর।
তারচেয়ে দেখ সকালের রোদ উপ্‌ছে পড়ে—
সে যেন সোনা—
ছোঁওয়া লেগে তার হিমেল রাতের নেওর ঝরে,—
মুক্তা বোনা।
হলুদ' রংয়ের ভাঙ্গাচোরা মাটি—সবুজ হয়;—
এ কোনক্ষণ?
ক্ষতির হিসেব মুলতুবি' রেখে—শান্তিময়
হয়—এ মন।

পোষা-পাখী নয়—বুনো পায়রাটা এসে বসেছিলো
হঠাৎ যেন,
যেখানে আমার এ ঘরে অপার আকাশ মেশে;
কি জানি—কেন!
তুমি দেখেছ কি দেখ'নি' তা নিয়ে ভাবিনি কিছু
তবুও জানি
দু'জনেরই মন ছুঁয়ে ও'র ডানা—চ'লেছে পিছু,—
দুসারা মানি।
খোলা জানালায় রংখেলে যায় পলাশী-ফাগ,—
দেখেছ আজ।
শোনো—'যা রয়েছে ঢাকা-দেওয়া—সেটা তফাতই থাক্—
খুলে—কি কাজ!
এমন আলোর দিনটা যেন না ব্যর্থ হয়,—
একথা শোনো—
রাখো অনুরোধ, মন ভরে যেন আজ না রয়
প্রশ্ন কোনো!

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ ডাউন্ ট্রেন্ ॥

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ থিয়েটারের প্রথম অবদান "ডাউন ট্রেন্"-এর অভিনয় চলছে। নাটকটি লিখেছেন শ্রীসলিল বসু এবং অভিনয় করেছেন—রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, জয়শ্রী সেন, প্রভৃতি, আর শিল্প নির্দ্দেশনা ও আলোক সম্পাত করেছেন তাপস সেন।

নাটকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মাত্র একটি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে সমগ্র গল্পটি বলা হয়েছে। দৃশ্যটি হচ্ছে একটি ছোট্ট ষ্টেশন-এর—সেখান থেকে গ্রাম্য যাত্রীরা বেশির ভাগ যাওয়া আসা করে পরের জংসন্ ষ্টেসনেই কাজে আর অকাজে। সেই ছোট্ট ষ্টেসন্ "পারুই"-এর ষ্টেসন্ মাষ্টার সত্যকিঙ্করের জীবনের এক দুর্য্যোগময় মুহূর্ত্তের দৃশ্যই তুলে ধরা হয়েছে দর্শক সমক্ষে। মাত্র একটি দৃশ্য, আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা ও তার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়েই নাটকের বিষয় বস্তু রচিত। এতে নতুনত্ব যথেষ্ট আছে তাতে সন্দেহ নেই, আর বিশেষ করে স্বনামধন্য শিল্পী তাপস সেন-এর আলোক সম্পাতের শিল্প চাতুর্য্য দর্শক মনকে অভিভূত করে ফেলে। গ্রাম্য ষ্টেসনের দৃশ্যটিকে মঞ্চের ওপর বাস্তব রূপে দেখানর কৃতিত্ব শ্রীসেনেরই—তাঁর জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

উত্তমকুমার প্রযোজিত তারাশংকরের অবিস্মরণীয় 'সপ্তপদী'র নায়ক কৃষ্ণস্বামী ও নায়িকা রিণাব্রাউন রূপে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।



অভিনয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা চলে সকলকার অভিনয়ই চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। বিশেষ করে প্রধান চরিত্র ষ্টেসন মাষ্টার সত্যকিঙ্করের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সত্যকিঙ্করের স্ত্রীর ছোট্ট ভূমিকায় গীতা দের অভিনয়ও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

নাটকটী বিয়োগন্তি,—বিয়োগন্ত বললেই শুধু হবে না নাটকটির ট্রাজেডি গিরিশ ট্রাজেডিকেই অনুকরণ করেছে না বলে অনুসরণ করেছে এই বলব এবং সে জন্যই এটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও এমন ফাঁক নেই যে দর্শক মন একটু হাঁফ ছাড়বে। নাটক দেখতে এসে দর্শক মন বিষাদ কালিমায় লিপ্ত হয়ে ঘরে ফেরবার সময় যেন স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে সম্পূর্ণ ট্রাজেডি এ যুগের দর্শকদের মনোমত হবে কিনা। আগের যুগে মানুষের মন এখনকার মানুষের মতন ছিল না। তখন জীবনে ট্রাজেডির সংখ্যাও ছিল অল্প। তাই মানুষ ট্রাজেডির বিষাদ রস উপভোগ কেরতে আসত পয়সা খরচ করে। কিন্তু যুগ এখন পাল্টে গেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর এই স্বাধীন ভারতের এই বাংলা নামক প্রদেশের এখন ঘরে ঘরেই ট্রাজেডি নানা রকমের, নানা প্রকারের! তার ওপর অভিনয় দেখতে এসে যদি দুর্দ্দশাগ্রস্থ নায়কের সর্ব্বহারা জীবনের বিষাদময় পরিণতির গভীর ট্রাজেডি মনের ওপর চেপে বসে, আর সেই ভার বহন করে নানা সমস্যা ভারাক্রান্ত গৃহকোণে ফিরতে হয় তাহলে অনেক দর্শকই হয়ত নাটক দেখার সোয়াস্তি উপ-ভোগ করতে পারবেন না বা নাটক দেখতেও চাইবেন না।

এখানে কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন "কিং লীয়ার" কি পুরোপুরি দেখান হয় না? না তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? একথা ঠিক। নাটকের ট্রাজিক্ রসই যে শ্রেষ্ঠ রস তাতে সন্দেহ নেই। আর আজকালকার কালের হল্লোর মার্কা আমোদ-ভরপুর সিনেমার যুগে ট্রাজিক্ ধর্ম্মী নাটকের প্রয়োজনও আছে হাল্কামনা দর্শকদের মনে গভীরতা এনে দেবার জন্য। কিন্তু, এই ট্রাজেডিকে, বিশেষ করে বিশুদ্ধ ট্রাজেডিকে ফোটাতে হলে তার অনুরূপ বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনই শুধু নয় দেশ, কাল, পাত্র ভেদও আছে। তা ছাড়া মাত্র একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়েই নাটক দেখানর মধ্যে যত অভিনবত্বই থাক দর্শকমন কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে থেকে আর একই দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন হাঁফিয়ে ওঠে—তখন চায় পরিবর্ত্তন; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন যদি না পায়, ডাইভার্‌সান্ যদি না থাকে তা হলে একঘেয়েমীর ছোঁয়াচ লেগে যায়, আর তাতেই আসে রস সৃষ্টিতে বাধা—যে বাধা কাটিয়ে রস আর দানা বেঁধে উঠতে পারে না। যাই হোক, এ বিচারের ভার দর্শকদের ওপর। আমরা অভিনন্দন জানাই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আর শিল্প-নির্দ্দেশককে তাঁদের সাফল্যের জন্য।



প্রেমচাঁদ আঢ্য প্রযোজিত "হাসপাতাল" চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে সুচিত্রা সেন।

দেশে বিদেশে ঃ

"ক্ষুধিত পাষাণ" বাংলা চিত্রটিকে সরকারীভাবে ভারতের একমাত্র যোগদানকারী চিত্ররূপে নির্ব্বাচিত করে ভেনিসের আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবে পাঠান হয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ডের Cork-এর পঞ্চম আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবের জন্যেও "ক্ষুধিত পাষাণ"কে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে।

* * *

১৯৫৮ সালের বার্লিন চিত্রোৎসবের দুইটি পুরস্কার বিজয়ী ভি, শান্তারামের "বার হাত দো আঁখে" চিত্রটি শীঘ্রই পশ্চিম জার্ম্মানির সর্ব্বত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে (Commercial basis) প্রদর্শিত হবে। আগষ্ট মাসের শেষের দিকেই খুব সম্ভব চিত্রটি পশ্চিম বার্লিনে মুক্তি লাভ করেছে।

* * *

এই বৎসরের বার্লিন চিত্রোৎসবে সরকারীভাবে পাঠান অসমীয়া চিত্র "পুবেরুণ"-কে UFA International অব্যবসায়িক ভিত্তিতে পশ্চিম জার্ম্মানীতে প্রদর্শনের জন্য নিয়েছেন। চিত্রটি স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে প্রদর্শিত হবে।

* * *

ভেনিসের একুশতম আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে। এই উৎসবে ব্রিটিশ অভিনতা John Mills-কে ব্রিটিশ চিত্র "Tunes"-এ অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার Volpi Cup দেওয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিণ অভিনেত্রী Shirley MacLaine মার্কিণ চিত্র "The Apartment"-এ অভিনয় করে। ফরাসী চিত্র "Le Passage duRhin"-কে শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে 'Golden Lion of St. Mark" পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

* * *



মুক্তিকামী 'শহরের ইতিকথা' চিত্রে মালা সিন্‌হা ও উত্তমকুমার।

খবরাখবর ঃ

বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় শীঘ্রই ভারত সরকারের তরফে একটি বিশেষ ধরণের ডকুমেণ্টারী বা প্রামাণ্য চিত্র নির্ম্মাণে উদযোগী হবেন বলে জানা গেছে। এই বিশেষ চিত্রটি তৈরী হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে, আর মুক্তি পাবে আগামী বছরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়। চিত্রটির দৈর্ঘ্য হবে ৫০০০ ফিট্ এবং রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গানের গ্রামোফোন্ ও টেপ্ রেকর্ডগুলিও ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হবে। এইটির পর শ্রীরায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প—'পোষ্ট মাষ্টার', 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি'-কে নিয়ে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করবেন।

* * *

বিখ্যাত অভিনেতা অশোককুমার ইতিহাসখ্যাত বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় অবলম্বনে একটি হিন্দী চিত্র নির্ম্মাণের মনস্থ করেছেন। অশোককুমারের সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র অরূপকুমারকে সিরাজদ্দৌলার ভূমিকার জন্য এই চিত্রে মনোনীত করবার সম্ভাবনা আছে।

বিখ্যাত বাংলা চিত্র "তাসের ঘর"-এর হিন্দী চিত্ররূপ দেওয়া হবে বোম্বেতে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার এবং নায়িকায় ভূমিকায় নামবেন বোম্বাইএর বিশিষ্টা অভিনেত্রী নিম্মি। উত্তরকুমারের এইটাই হবে প্রথম হিন্দী চিত্রে অভিনয়। মঙ্গল চক্রবর্ত্তী চিত্রটি পরিচালনা করবেন।

প্রযোজক-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তাঁর নিজের লেখা গল্প "কোমল গান্ধার"-কে চিত্ররূপ দেবার কাজে এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন। প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন—সুপ্রিয়া চৌধুরী, অবনিশ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে প্রভৃতি। ছবিটিতে অন্যান্য সঙ্গীতের সহিত কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতও থাকবে এবং সেগুলি গাইবেন দেবব্রত বিশ্বাস। এছাড়া কয়েকটী ক্লাসিকাল্ নৃত্যও চিত্রটীর সৌষ্ঠব বাড়িয়ে দেবে।

* * *

উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনীত "শুন বরনারী" চিত্রটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

'যাত্রীক' পরিচালিত "স্মৃতিটুকু থাক" ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন এই চিত্রটিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অসিতবরণ অভিনীত জয়শ্রী পিক্‌চার্সের "অজানা কাহিনী" পূজার আগেই মুক্তি পাবে।

* * *

ব্রটেনে প্রথম ভারতীয় যিনি একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর পক্ষে একটি সাফল্যজনক ইংরাজী চিত্র নির্মাণ করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন বাংলার ছেলে শ্রীউমেশ মল্লিক। শ্রীমল্লিক বহুদিন ওদেশে রয়েছেন এবং চিত্র নির্মাণ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর প্রযোজিত এই "The Man Who Couldn't Walk" চিত্রটির গল্পও তাঁর নিজেরই লেখা।

এখানে শ্রীউমেশ মল্লিককে (উপবিষ্ট) বি, বি, সি,-র "বিচিত্রা" অনুষ্ঠানে প্রযোজক শ্রীএস, এল, সিন্‌হার সঙ্গে আলাপরত দেখা যাচ্ছে।



শিল্পীর কথা

'বৃন্দাবন পথযাত্রী চলার পথে থেমে যাও'...

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বরিশাল জেলার উজিরপুর ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঐ গ্রামের অধিবাসী মুখুজ্জেরা ছিলেন ও অঞ্চলের জমিদার। শুধু জমিদার হিসাবেই নয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতেও ওঁরা ছিলেন গৌরবান্বিত। ওঁদেরই পূর্বপুরুষ 'কাশীখণ্ড' রচয়িতা বলরাম বাচস্পতি এবং তাঁর অনুজ জগন্নাথ সার্বভৌম শুধু বাঙলার নয়, সারা ভারতের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। ঐ বংশেরই গৌরব যদুনাথ ও সদানন্দ মুখুজ্যে ছিলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। সংস্কৃত চর্চায়, সংগীত সাধনায়, বারমাসে তের পূজা-পার্বণপালনে ও জনহিতকর নানা কার্যে লিপ্ত থেকে এঁরা ছিলেন বাঙলার একটি আদর্শ জমিদার বংশ।

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর পূর্বের কথা বলছি। উক্ত জমিদার বাড়ীর বিরাট নাটমন্দিরে হচ্ছে যাত্রাগান। লোকে লোকারণ্য। প্রায় সারারাত্রি ধরেই চলল গান। পরের দিন সকালে জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল থেকে ছ'সাত বছরের একটি বালকের অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হল যাত্রাশেষে নাট্মন্দিরে বিশ্রামরত যাত্রাদলের অধিকারী। বালকটি গাচ্ছিল পূর্বরাত্রে অভিনীত নাটকের একটি গান। যে শুনেছে সেই গান এবং শ্রুতিধরের মত তার কথাও সুর অবিকল মনে রেখেছে। অধিকারী বিনা দ্বিধা ও সংকোচে ভেসে আসা গানের সুর শুনতে শুনতে প্রবেশ করল অন্দরমহলে। কিন্তু প্রথম বাধা পেল ছেলেটির বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছ থেকে। সবিনয়ে সে বলল, আপনাদের বাড়ীর ঐ ছেলেটি এমন সুন্দর গান গায় আর এত চমৎকার গলা! ওকে যদি আমার যাত্রাদলে ভর্তি করে দ্যান্ তাহলে—

কথাটা শেষ করতে পারলে না অধিকারী। ইতিমধ্যে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত মাত্র দু একটি মিষ্টি (?) কথা শুনেই সভয়ে সে এল পালিয়ে অন্দরমহল থেকে। ঠাকুরমা তার স্পর্ধার কথা শুনেই অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বুঝলেন না কেন আকৃষ্ট হয়েছে সে। সেদিনকার সেই বালকটি আর কেউই নয়, ইনি হচ্ছেন বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব, সুরব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পূজারী সংগীতরত্নাকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর পিতা গজেন্দ্রনাথ মুখুজ্জেমশাই ছিলেন একজন নামকরা সংগীতশিল্পী। বাড়ীতে নিয়মিত হত

সংগীতচর্চা। সংগীতের প্রতি সিদ্ধেশ্বরবাবুর ছিল সহজাত অনুরাগ, তদুপরি তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমিষ্ট। সুতরাং অতি শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

একবার যে সুর তাঁর কানে যেত তা যেন শ্রুতিধরের মতই তিনি আয়ত্ত করে নিতেন। শৈশবেই পিতার কাছে তিনি কবি রজনী সেন রচিত ভক্তিমূলক গান রামপ্রসাদী, কীর্তন প্রভৃতি গান শিখতেন।

ন'বছর বয়সে তিনি কোলকাতায় আসেন এবং কিছুদিন এখানে একটি স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই প্রাণের একান্ত তাগিদে বালক সিদ্ধেশ্বর স্বামী যোগানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রাঁচিতে অবস্থিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, শৈশব থেকেই তাঁর মন ছিল কেমন যেন উদাসী। ছ'সাত বছর বয়সে গ্রামের শ্মশানের ধারে একটি বিরাট বটবৃক্ষের তলে অনেক সময় তিনি গিয়ে বসে থাকতেন। কি যেন ভাবতেন একমনে, বড্ড ভাল লাগত তাঁর এই নির্জনতা, এই নিঃসংগ সময়টুকু। দশ থেকে তের এই তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে থেকে তের বৎসর বয়সে তিনি ফিরে এলেন কোলকাতায়। এখানে এসে চিংড়ীঘাটা অঞ্চলে অবস্থিত ভূতনাথ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন।

তখন বাঙলার অগ্নিযুগ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউয়ে আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত। বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাসে ব্রিটিশ শাসকগণ তখন সন্ত্রস্ত-ভীত-ত্রস্ত। বিপ্লবীদের নীরব কার্যকলাপ তখন দ্বিগুণ উদ্যমে চলছে অতি সংগোপনে। চোদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্র সিদ্ধেশ্বর তখন গোপনে লিপ্ত হন বিপ্লবীদলের সংগে। কালিঘাটে স্বামী সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'গদাধর আশ্রমে'ও যাতায়াত করেন।

১৯২৮ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সে অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। এই সভায় স্বদেশী সংগীত পরিবেশন করেন তরুণ সিদ্ধেশ্বর। এখান থেকেই কাজী নজরুল ইসলামের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন তিনি। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে কাজী সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শিল্পী বলেন যে, সংগীত জগতে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবার মূলে তাঁর কাজীদার উৎসাহ-প্রেরণা এবং সংগীত শিক্ষা, যা কিছু তাঁর কাছে পেয়েছেন তা অপরিশোধ্য।

এদিকে তৎকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তানরাজ বিপিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে তিনি শিক্ষা করতে থাকেন উচ্চাংগ সংগীত। তারপর বিভিন্ন সময়ে মুর্শিদাবাদের মঞ্জু সাহেব, রামপুরের খাদেম হোসেন, সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছে তিনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেন। এঁদের মধ্যে ৺নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও ৺সতীশচন্দ্র দত্ত এই দুই প্রবীণ ওস্তাদের কথা বারবার তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পী বলেন, এঁরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে এবং বহুদিন পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে এমন আন্তরিক ভাবে সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন যা সত্যিই দুর্লভ।

১৯৩১ সালে সিদ্ধেশ্বরবাবু কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রথম গান পরিবেশন করেন।

উক্ত বছরেই 'ক্যালকাটা স্টুডেণ্টস্ কনফারেন্সে' অনুষ্ঠিত সংগীত প্রতিযোগিতায় কীর্তনে প্রথম এবং ঠুংরী গানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি।

১৯৩২ সালে তরুণ শিল্পী সিদ্ধেশ্বর 'টুইন কোম্পানী'তে তাঁর গান প্রথম রেকর্ড করেন। গান দুখানা কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও পরিচালিত। ঐ বৎসরেই কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বেংগল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেণ্টস্ কনফারেন্সে' খেয়াল ও আধুনিক গানে শিল্পী প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৩৫ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশনে' যোগদান করে তিনি খেয়াল, টপ্পা, ভজন, কীর্তন ও বাঙলাগানে প্রথম স্থান অধিকার করে লাভ করেন স্বর্ণপদক ও শ্রোতৃমণ্ডলের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত সংগীত' প্রতিযোগিতায় শিল্পী যোগদান করেন এবং খেয়াল, টপ্পা, ও ভজনে প্রথম স্থান এবং ধ্রুপদ ও ঠুংরীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম গজল, শ্যামা সংগীত' আধুনিক গান প্রভৃতি শুধু রচনাই করতেন না, তিনি হিজ মাস্টার্স

ভয়েস ও টুইন কোম্পানি'তে গানের ট্রেনিংও দিতেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরবাবু কাজী সাহেবের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেছেন এবং সুযোগ পেয়েছেন কাজীদার কাছ থেকে নানাধরণের গান শেখবার।

১৯'৬ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনে' যোগদান করে শিল্পী খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদ গানে প্রথম এবং ঠুংরীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রায় নয় শত প্রতিযোগী যোগদান করেন এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার।

'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'দেশের মাটি', 'রিক্তা', 'কয়েদী' প্রভৃতি বহু কথাচিত্রে সিদ্ধেশ্বরবাবু প্লে ব্যাক করেছেন এবং 'ভক্ত কবীর' চিত্রের সংগীত পরিচালক সুরসাগর হিমাংশু দত্ত মশাইয়ের এ্যাসিষ্টাণ্টের কার্য করেন।

১৯৩৭ সাল থেকে 'ফিল্ম কর্পোরেশন কোম্পানি'তে তিনি বেশ কিছুদিন সরকারী সংগীত পরিচালকের কার্য করেন কৃতিত্বের সংগে।

'সৈনিকা কা স্বপ্ন' (১৯৪৭), 'ছঃখীর ইমান', 'সর্বহারা', 'যা হয় না' (১৯৪৮) এবং 'লীলাকঙ্ক' (১৯৫৮) প্রভৃতি বাণীচিত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সংগীত পরিচালনা করেছেন।

বহু সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি বিচারক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। 'শশাঙ্ক', 'নারীপ্রগতি', 'মাতৃপুজা', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটিকা যেগুলি রেকর্ড করা হয়েছে 'হিজ মাষ্টার ভয়েস' ও 'টুইন কোম্পানি'তে, সেগুলিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু।

১৯৫১ সালে ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ সিদ্ধেশ্বরবাবুকে 'সংগীত রত্নাকর' উপাধি প্রদান করে যথার্থই একজন গুণীর সমাদর করেছেন।

১৯৪৮ সালে এলাহাবাদের 'প্রয়াগ সংগীত সমিতি' কর্তৃক গৃহীত সংগীত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার এবং 'সংগীত প্রভাকর' উপাধিলাভ করেন।

ঐ বৎসর হতেই তিনি প্রয়াগ সংগীত সমিতির পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বাঙলাদেশ থেকে আজ পর্যন্ত আর কোন সংগীত-শিল্পী এরূপ একটি বিরাট সংস্থার পরীক্ষক নিযুক্ত হন নি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই, মিউজ ও 'বি মিউজের পরীক্ষক পদেও তিনি নিযুক্ত আছেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোলকাতায় ইটালী অঞ্চলে নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু টপ্পা গান গেয়ে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ গোলা



শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

আলি খাঁ সাহেব ঐ টপ্পা গান শুনে সিদ্ধেশ্বরবাবু আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং ব এ্যায়সা টপ্পা হিন্দুস্থানমে হাম কোভি নেই শুনা।' ব বিক পক্ষে, প্রাচীন বাঙলা ও টপ্পা গানে সিদ্ধেশ্বর ন্যায় শিল্পী আজ একান্ত বিরল।

তাঁর ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে জগন্ময় মিত্র, পান্না ঘোষ, চিত্ত রায়, সুপ্রভা সরকার, প্রতিমা বন্দ্যোপা গায়ত্রী বসু, অরুণ দত্ত, বাণী ঘোষাল, কেশব বন্দ্যোপা সুকুমার মিত্র প্রভৃতি বহু শিল্পী আজ বাঙলার স জগতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সর্বজনপ্রিয় মারবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বরবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছাত্র।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বর্তমানে সংগীত শিক্ষাদান

নিয়োজিত। এবং নিজেও উচ্চাংগ সংগীত সাধনা করছেন এলবহাবাদ নিবাসী অতি প্রবীণ সংগীত-সাধক ভাটুজীর নিকট। এবং কীর্তনের তালিম নিচ্ছেন হরিদাস ব্রজবাসী ও হরিদাস কর মহাশয়ের নিকট থেকে। কেন না, শিক্ষার নেই কোন সীমা পরিসীমা।

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন সে হচ্ছে পণ্ডিত বংশ, সংগীতসাধকের বংশ। এঁরা দশভাই। ভাইদের মধ্যে রত্নেশ্বরবাবু ও সত্যেশ্বরবাবু ও সংগীত জগতে বিশেষ পরিচিত। সংগীত শিক্ষা প্রসারকল্পে কোলকাতায় এবং পশ্চিম বাঙলার কয়েকটি স্থানে সিদ্ধেশ্বরবাবু সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরও কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা করছেন।

কোলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে বহুবার তিনি সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেছেন। 'বৃন্দাবন পথযাত্রী চলার পথে যাও', 'রাজার দুলালী জুলেখা আজিও কাঁদে', 'লাইলীরে খুঁজি বন বনান্তে মজনু ফিরছে হায়' প্রভৃতি তাঁর অসংখ্য গান রেকর্ড হয়েছে হিজ মাষ্টার ভয়েস, মেগাফোন, টুইন প্রভৃতি কোম্পানিতে।

বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরবাবু পঞ্চাশের কোঠায় পা দিতে চলেছেন। এত গুণের অধিকারী হয়েও এতটুকুও অহঙ্কার নেই তাঁর। শিশুর মত। সারল্য ও মাধুর্যে তিনি ভরপুর। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। তদুপরি, তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমরা কামনা করি তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন।

শান্ত হোলো প্রগলভা মেয়ে

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তুমি কি অরণ্য হয়ে গেলে?
তোমার ও মুখে কেন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ম্লানিমা?
শ্রাবণ কান্নায় হায় প্রশ্ন তুলে ধরি:
তোমার একক রাজ্যে বলো বলো কি পেলে কি পেলে?
তোমার দুচোখ জুড়ে সাগরের সুনীল বিস্ময়:
চেয়ে আছো দিগন্তের দিকে—
এতটুকু ভাষা নেই তাতে—
রাতের আকাশতলে নক্ষত্রের মতন তন্ময়।

মনে পড়ে এইতো সেদিন,—
বৈশাখের বহ্নিস্পর্শ দিয়েছিলে প্রাণে—
উদ্ধত বক্ষেতে ছিল কামনার সুনীল ইশারা,
রক্তস্মরা কৃষ্ণচূড়া ফুটেছিল তাইতো আহ্বানে।
অনেক ঝড়ের পরে প্রকৃতি কি কথা আর বলে?
তাই বুঝি তুমি শান্ত অজন্তার গুহার মতন—
তবুও অবাধ্য ব্যথা এই বুকে জাগে—
শিউলির সাদা ফুল টুপ্ টুপ্ ঝরে পড়ে ঘাসের আঁচলে।



খেলা ধুলা



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশ অলিম্পিক

রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক গেম্‌সের পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই কদিন ধরে বিশ্বের সকল দেশের কৃতী খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে নূতন নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড। যাঁরা বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পেয়েছেন তাঁদের দীর্ঘদিনের অনুশীলন ও চেষ্টা হয়েছে সার্থক। যাঁরা পদক লাভে বিফল হয়েছেন তাঁরা ফিরেছেন অলিম্পিকে যোগদানের অভিজ্ঞতা ও মধুর স্মৃতি নিয়ে।

সপ্তদশ অলিম্পিক ভারত কোন দিন ভুলবেনা। ভারতের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের এখানে হয়েছে অবসান, ভারত হারিয়েছে তার ৩২ বৎসরের সম্মান ও ঐতিহ্য। বিশ্ব বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের পরাজয় সমগ্র ভারতবাসীর মনে দিয়েছে তীব্র কশাঘাত। গত এশিয়ান গেম্‌সেই ভারতের হকি খেলার মানের অবনতির সূচনা দেখা যায়। এখানে ভারত পাকিস্থানের পরে স্থান লাভ করে গোলের গড়পড়তার হিসাবে। কিন্তু তারা খেলায় পরাজিত হয় নি। এই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় হকিদল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হল। অলিম্পিকের প্রথম দিকে ভারতীয় দল যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল তাতে সকলেরই বিশ্বাস হয়েছিল তাদের বিজয়ী আখ্যা বজায় থাকবে। কিন্তু যতই প্রতিযোগিতা এগুতে লাগল ততই ভারতীয় দলের খেলারও অবনতি ঘটল। ভারতীয় দলের ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতাই সবচাইতে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে এবং দলের মধ্যে সংহতির অভাবও দেখা যায়। অপর পক্ষে পাকিস্থান দলের খেলা সুসংবদ্ধ হয় এবং তাদের জয়ও সেই অনুযায়ী যুক্তিসংগত হয়েছে। টোকিওতে যাতে



৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টিকারী কার্ল কাউফ্‌মান (জার্মানী) ও ভারতের মিলখা সিং।



বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথ্লেট রেফার জনসন (আমেরিকা) ডেকাথলনে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

ভারতের সম্মান পুনরুদ্ধার হয় এখন থেকে সে বিষয়ে সর্ব্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন এসেছে।

সমগ্র প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ও রাশিয়ার প্রতিযোগীগণই প্রাধান্য বজায় রাখেন এবং এইরূপই অনুমান করা গেছিল। কিন্তু এবারকার অলিম্পিকে ইতালী এবং সম্মিলিত জার্মানীর প্রতিযোগীগণ এদের সঙ্গে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তা বিস্ময়কর। বিশেষ করে স্বল্প খ্যাত ইতালীয় প্রতিনিধিগণের বেসরকারী দলগত তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার ও ১৩টি স্বর্ণপদক লাভ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। অলিম্পিকের পূর্ব্বেও কেহ ভাবেন নি যে জার্মানী ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগীদের উপর ইতালী স্থান পাবে। সাইকেল চালনায় তাঁদের সর্ব্বৈব প্রাধান্য দেখা যায়। সান্তে গাইয়র্ডন এবারকার অলিম্পিকে সর্ব্বপ্রথম দু'টি স্বর্ণ পদক লাভের গৌরব অর্জন করেন। এরপর ২০০ মিটার দৌড়ে ইতালীর লিভিও বেরুট্টির সাফল্যও অপ্রত্যাশিত। অলিম্পিকের প্রথম দিকে আমেরিকার এ্যাথ্লেটগণের ব্যর্থতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। হ্যামার থ্রো-তে আমেরিকার কোন প্রতিযোগীই প্রথম ছ'জনের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেন না। তাঁদের খ্যাতিমান প্রতিযোগী হল্ কন্নোলীর ব্যর্থতাও বিস্ময়কর। রাশিয়ার রুডেন্কভ এই বিভাগে অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ২২০ ফিট ১⅝ ইঞ্চি দূরত্বে হাতুড়ী ছোঁড়েন। এরপর আমেরিকার খ্যাতনামা উচ্চ-লম্ফনকারী জন্ থমাসের ব্যার্থতা সকলকে স্তম্ভিত করে। তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি রৌপ্য পদক পর্য্যন্ত অর্জন করতে সক্ষম হননি। তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই বিভাগেও রাশিয়া স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে নেয়। আর, স্যাভ্লীকাদ্জে ৭ ফিট ১ ইঞ্চি লাফিয়ে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড করেন। স্বল্প পাল্লার দৌড়েও আমেরিকা এবার তাদের আধিপত্য হারিয়েছে। ১০০ মিটার দৌড়ে জার্ম্মাণীর আর্মিন হ্যারী এবং ২০০ মিটার দৌড়ে ইতালীর বেরুট্টি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এঁরা দুজনেই অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। আমেরিকা কিন্তু এই ব্যর্থতা পুরন করে সট্পাটে। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ তিনটি পদকই তাদের করায়ত্ব হয়। বিল্ নেডার, প্যারী ও'ব্রায়েন ও ডালাস লং যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এই বিভাগে আমেরিকার সর্ব্বৈব সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমেরিকার এ্যাথ্লেটগণের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের নিগ্রো মহিলা এ্যাথ্লেট্ উইল্মা রুডলফ্। ১০০ মিটার দৌড়ে ইনি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ৪×১০০ মিটার রিলেতেও তিনি স্বর্ণপদক পান। এবারকার অলিম্পিকে তিনিই একমাত্র প্রতিযোগী যিনি এ্যাথলেটিক্সে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। রেফার জনসন (আমেরিকা) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথলেট্ আখ্যা বজায় রাখেন।

ডেকাথলনে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ফরমোসার ইয়াং চুয়াং কাওয়াং আর রাশিয়ার খ্যাতনামা এ্যাথলেট কুজনেৎসোভ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এবারকার অলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড় খুবই প্রতিযোগিতামূলক হয়। ভারতবাসীর নিকট এই দৌড়ের গুরুত্ব অনেকখানি ছিল কারণ ভারতের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর মিল্‌খা সিং এই বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন। মিলখা সিং পদক লাভে ব্যর্থ হয়েছেন সত্য কিন্তু তিনি যেরূপ তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাতে প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্ব্ব বোধ করেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তি অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তিনি পদক লাভে বঞ্চিত হন। প্রথম স্থান নিয়ে জার্ম্মানীর কার্ল কাউফম্যান্ ও আমেরিকার ওটীশ ডেভিসের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং দুজনে একই সময় এই দূরত্ব অতিক্রম করেন। কিন্তু 'ফটো ফিনিসে' ডেভিসকে বিজয়ী সাব্যস্ত করা হয়। কাউফমান্ দ্বিতীয় স্থান পান। এঁরা দুজনেই ৪৪.৯ সেঃ ৪০০ মিটার অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। তৃতীয় স্থান পান দক্ষিণ আফ্রিকার এম, স্পেন্স। এর আগে একাধিকবার স্পেন্স মিলখা সিং-এর কাছে পরাজিত হয়েছেন। অলিম্পিকেও অতি অল্পের জন্য তিনি মিলখাকে ছাড়িয়ে গেছেন। স্পেন্সের সময় লাগে ৪৫.৫ সেঃ আর মিলখার লাগে ৪৫.৬ সেকেণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়া দল সন্তরণে গতবারের ন্যায় তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে না পারলেও সমগ্র অলিম্পিকের মধ্যে সব চাইতে উত্তেজনা মূলক শ্রেষ্ঠ রেসে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করেছে। ১,৫০০ মিটার দৌড়ে অষ্ট্রেলিয়ার হার্ব্ব ইলিয়ট ৩ মিনিট ৩৬.৬ সেকেণ্ডে নুতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ফ্রান্সের মাইকেল জাজি আর তৃতীয় হন ইস্তভান্ রোজসাভোল্‌গী (হাঙ্গেরী)।

রাশিয়া এবারর বেসরকারী দলগত তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। অলিম্পিকের গোড়ার দিকে যে গ্রীষ্মাধিক্য দেখা দিয়েছিল তাতে সবদেশের প্রতিযোগীগণই অল্প বিস্তর বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাশিয়ার প্রতিনিধিগণকে সেরূপ বিচলিত মনে হয়নি এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের অপ্রত্যাশিত খারাপ ফল অল্পই হয়েছে। জিম্‌নাষ্টিকে রাশিয়ার আধিপত্য এবার অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। জাপান এই বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। রাশিয়া ও জাপান উভয় দেশই জিম্‌নাষ্টিকে ৪টি করে স্বর্ণপদক লাভ করে। লং হর্স বিভাগে রাশিয়ার বোরিস্ স্যাক্লিন ও জাপানের টাকাশি ওনো দুজনেই সমান পয়েণ্ট পান এবং দু'জনকেই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। আর সেজন্য এই বিভাগে কোন রৌপ্য পদক দেওয়া হয় না। পমেল্‌ড হর্স বিভাগেও এর পুনরাবৃত্তি হয় বোরিস স্যাক্লিন আর ফিন্‌ল্যাণ্ডের ইউজেন্ একম্যান্ সমান সমান হওয়ায় উভয়েই স্বর্ণপদক পান। এ্যাথ্‌লেটিক্‌সে রাশিয়ার প্রেস ভগ্নীদ্বয়ের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তামারা প্রেস সটপাটে স্বর্ণপদক লাভ করেন আর ইরিণা প্রেস ৮০ মিটার হার্ডলে স্বর্ণপদক পান। মহিলাদের ডিস্‌কাস ছোঁড়ায় রাশিয়ার পানোমারেভা অলিম্পিক রেকর্ড করেন। তিনি ৮০ ফিট ৯½ ইঞ্চি দুরত্বে ডিস্‌কাস্ ছোঁড়েন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইরিণা প্রেস। ভারোত্তলনে রাশিয়ার সম্পূর্ণ আধিপত্য দেখা যায়। তাঁরা এই বিষয়ে মোট ৫টি স্বর্ণপদক ও ১টি রৌপ্যপদক পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয়স্থান অধিকারী আমেরিকা পায়—১টি স্বর্ণপদক, ৪ট রৌপ্য পদক এবং ১টি ব্রোঞ্জপদক। রাশিয়ার ভাশভ্ হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড করেন। তিনি মোট ৫৩৭.৫ কিলোগ্রাম ওজন তোলেন। ৮০০ মিটার রেসে লুড্‌মিলা-লিসেউকো সেভাকোভা বিশ্ব রেকর্ড করেন। ১৯২৮ সালের পর এইবার থেকে আবার এই বিষয়টির পুনরুষ্ঠান হল।

সমগ্র অলিম্পিকের সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যায় ম্যারাথন দৌড়ে। এই বৈশিষ্ট্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ দৌড়ে ইথিওপিয়ার বাকিলা আবেবে প্রথম স্থান লাভ করে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। তিনি ২ঘঃ ২০ মিঃ সময়ে এই দুরত্ব অতিক্রম করেন (অলিম্পিক রেকর্ড)।

সন্তরণে এবার আমেরিকা গতবারের চেয়ে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। সেই সঙ্গে এবার অষ্ট্রেলিয়ার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমেরিকা সন্তরণে সাফল্য লাভ করলেও ডাইভিং-এ তাদের যে একাধিপত্য ছিল তা এবার ভেঙ্গে গেছে। জার্ম্মানীর ১৭ বৎসর বয়স্কা তরুণী



(উপরে) এ্যানিটা লন্‌সব্রো (ইংলণ্ড) ২০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।



মিল্‌খা সিং (ভারতবর্ষ)

সপ্তদশ অলিম্পিয়ার্ড

(নীচে) ২০০ মিটার ব্রেষ্ট স্টোকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী খ্যাতনামা উল্‌ট্রড্‌ উর্‌শেল্‌মান (জার্মানি)



(নীচে) তিনটি স্বর্ণপদকের অধিকারিণী উইলমা রুডলফ্‌ (আমেরিকা)



বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত দৌড়বীর আর্মিন হ্যারী (জার্মানী) ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।





(উপরে) হেয়্‌দি-স্মীড্‌ (জার্মানী) মহিলাদের ফেন্‌সিং-এ স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।



(উপরে) হার্ডলসে স্বর্ণপদক অধিকারী লী কাল্‌হুন্‌ (আমেরিকা)



রাশিয়ার বিখ্যাত প্রেস্‌ ভগ্নীদ্বয়। তামারা (বামে) সট্‌পাটে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন এবং ইরিণা ৮০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক পান।

ইনগ্রীড ক্রামার মহিলাদের হাইবোর্ড ডাইভিং-এ (৯১·২৮ পয়েণ্ট) এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহিলাদের ২০০ মিটার ব্রেস্ট্‌স্ট্রোক্‌ সাঁতারের ফলও কিছুটা অপ্রত্যাশিত। জার্মানীর উর্‌সেল্‌মানই স্বর্ণপদক লাভ করবেন আশা করা গেছিল। কিন্তু ফাইনালে ব্রিটেনের কুমারী এ্যানিটা লন্‌সব্রো ২ মিঃ ৪৯·৫ সেঃ বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। উলট্রুড্‌ উর্‌শেল্‌মান ২ মিঃ ৫২ সেঃ সময় নেন। অষ্ট্রেলিয়ার সেরা মহিলা সাঁতারু ডন্‌ ফ্রেজার এবার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন (৬১·২ সেঃ)। দ্বিতীয় হন আমেরিকার কৃতী সাঁতারু খৃষ্টিন ভন্‌ সালৎসা। আর তৃতীয় হন ব্রিটেনের নাটালি ষ্টুয়ার্ড। ভন্‌ সালৎসা এবার দুটি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে তিনি অলিম্পিক রেকর্ড করেন। ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে আমেরিকার মহিলারা বিশ্ব রেকর্ড করেন—৪ মিঃ ৪১·১ সেঃ। ২০০ মিটার বাটার ফ্লাইতেও মাইক ট্রয় বিশ্ব রেকর্ড করেন।

ফুটবল খেলায় স্বর্ণ পদক লাভ করেছে যুগোশ্লোভিয়া। ফাইনালে ডেন্‌মার্ক ৩-১ গোলে পরাজিত হয়।

পক্ষকাল ব্যাপি উৎসাহ উত্তেজনার পর রোম আজ শান্ত হয়েছে। সপ্তদশ অলিম্পিককে ঘিরে নানান জল্পনা-কল্পনা, আশা আকাঙ্খার হয়েছে অবসান। আবার চার বৎসর পরে অলিম্পিকের ডাক আসবে। এবার আসর বসবে এশিয়ায়, টোকিওতে। এই চার বছরের মধ্যে ভারতকে প্রস্তুত হতে হবে—ফিরিয়ে আনতে হবে তার লুপ্ত গৌরব।



খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড ঃ ১৫৫ (পুলার ৫৯। এডকক্‌ ৬৫ রানে ৬ উইকেট) ও ৪৭৯ (৯ উইকেটে)

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৪১৯ (গডার্ড ৯৯, ওয়েট ৭৭, ও'লীন ৫৫, টেফিল্ড ৪৬ নট আউট। ডেক্সটর ৭৯ রানে ৩ উইকেট) ও ৯৭ (৪ উইকেটে)

ওভালে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ৫ম বা শেষ টেস্ট খেলা ড্র গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এক সময়ে জয়লাভের যে আশা দেখা দিয়েছিল তা বৃষ্টিপাতের দরুণ ভরাডুবি হয়।

আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ইংলণ্ড এক নাকাড়ে ১ম, ২য় ও ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে 'রাবার' পায়। ৪র্থ ও ৫ম টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

১৮ই আগষ্ট প্রথম দিনের খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান করে। এইদিন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নীল এড্‌কক্‌ ৬০ রানে ইংলণ্ডের ৫টা উইকেট পান।

১৯শে আগস্ট খেলার ২য় দিনে ইংলণ্ডের বাকি ২টো উইকেট ৫০ মিনিটের খেলায় পড়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে ২৪ রান ওঠে। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৪$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। ২য় দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংসে ৩টে উইকেট পড়ে ১৬৭ রান ওঠে।

৩য় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংস ৪১৯ রানে শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৬৪ রানে অগ্রগামী হয়। এইদিন ইংলণ্ড সমাপ্তির আধঘণ্টা আগে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু কোন রান উঠেনি মাত্র এক ওভার খেলা হয়েছিল। তারপর আলো অভাবে এবং বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার ৪র্থ দিনের খেলায় ইংলণ্ড যেন হারানো শক্তি ফিরে পায়। ৪টে উইকেট পড়ে ইংলণ্ডের ৩৮০ রান উঠে। প্রথম উইকেটের জুটিতে পুলার (১৭৫) এবং কলিন কাউড্রে (১৫৫) দলের ২৯০ রান তুলে দেন। খেলার শেষ দিনে ইংলণ্ড ৯ উইকেটে

৪৭৯ রান ক'রে ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন হাতে খেলার সময় ছিল আর ১৮০ মিনিট। দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়লাভ করতে হ'লে ২১৬ রান তুলতে হবে। ৪ উইকেট পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ৯৭ রান ওঠে। ফলে খেলাটি ড্র যায়।

রোম অলিম্পিক ঃ

রোমে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ ক'রে উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। আধুনিককালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ১৮৯৬ সালে আরম্ভ হয়। রাশিয়া অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে। গত দু'বারের মত আমেরিকা এবারও দ্বিতীয়_স্থান পেয়েছে। অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়ার যোগদানের পূর্ব্বে আমেরিকা প্রতিবারই প্রথম স্থান পেয়ে এসেছিল। আলোচ্য বছরের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়া আমেরিকা অপেক্ষা ২৩৬ পয়েন্ট বেশী পেয়ে প্রথম হয়েছে। রাশিয়ার পয়েন্ট ৬৯১½ এবং আমেরিকার ৪৫৫½।

পয়েন্টের তালিকা

রাশিয়া ৬৯১½, আমেরিকা ৪৫৫½, জার্মানী ২৮২½, ইতালী ২৩১½, হাঙ্গেরী ১৫৩½, জাপান ১৪৮, পোল্যাণ্ড ১৪৭½, অষ্ট্রেলিয়া ১৪১, বৃটেন ১৩৬, চেকোশ্লাভাকিয়া ৭৯½, রুমানিয়া ৭৯, তুরস্ক ৭২, সুইডেন ৫৫, ফিনল্যাণ্ড ৫২, ফ্রান্স ৫১, ডেনমার্ক ৪৫, সুইজারল্যাণ্ড ৪০, বুলগেরিয়া ৩৯, হল্যাণ্ড ৩৯, নিউজিল্যাণ্ড ৩০, বেলজিয়াম ২৭, যুগোশ্লাভিয়া ২৫½, ইরাণ ২৩½, দক্ষিণ আফ্রিকা ২১½, ক্যানাডা ১৬, ইউনাইটেড আরব ১৫½, নরওয়ে ১৪½, অষ্ট্রিয়া ১২, পাকিস্তান ১২, ব্রেজিল ১১½, আর্জেন্টিনা ১১, মেক্সিকো ১০, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১০, ভারত ৯, গ্রীস ৭, ইথিওপিয়া ৭, ভেনেজুলা ৬, কোরিয়া ৫½, ঘানা ৫, ফরমোজা ৫, মরক্কো ৫, সিঙ্গাপুর ৫, ইরাক ৪, স্পেন ৪, আয়ারল্যাণ্ড ৪, কিউবা ৩, পোর্টরিকো ৩, রোডেশিয়া ৩, আইসল্যাণ্ড ২, কেনিয়া ১, বাহামাস ১ পয়েন্ট।

নিম্নে শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি দলের পদকের তালিকা দেওয়া হল

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৪৩	২৯	৩১
আমেরিকা	৩৪	২১	১৬
ইতালী	১৩	১০	১৩
জার্মানী	১২	১৯	১১
অষ্ট্রেলিয়া	৮	৮	৬

অলিম্পিক হকি :

রোমে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। পাকিস্তানের পক্ষে ইনসাইড লেফট্‌ খেলোয়াড় নাসার প্রথমার্দ্ধের খেলার ১১ মিনিটে গোলটি দেন। এই পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষ ১৯২৮ সালে থেকে অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় যে অপরাজেয় সম্মান অধিকার ক'রে এসেছিল তার অবসান হ'ল। পূর্ব্বাপর ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের খেলোয়াড়রা হকি ষ্টিক চালনায় যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ১৯৬০ সালের ভারতীয় হকি দলটি তার কিছুই দিতে পারেনি। তা ছাড়া 'Positional' খেলার যথেষ্ট অভাব ছিল। রাজনৈতিক মোড়লির প্রাধান্য ভারতীয় হকি দলের এই পরাজয়ের অন্যতম কারণও।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ভারতবর্ষ—১ : অষ্ট্রেলিয়া—০ (অতিরিক্ত সময়ে)
স্পেন—১ : নিউজিল্যাণ্ড—০
পাকিস্তান—২ : জার্ম্মানী—১
ইংলণ্ড—২ : কেনিয়া—১ (অতিরিক্ত সময়ে)

সেমি ফাইনাল

ভারতবর্ষ—১ : ইংলণ্ড—০
পাকিস্তান—১ : স্পেন—০

ফাইনাল

পাকিস্তান ১ : ভারতবর্ষ—০

বাস্কেটবল ঃ

১ম আমেরিকা; ২য় রাশিয়া, ৩য় ব্রেজিল, ৪র্থ ইটালী, ৫ম চেকোশ্লোভাকিয়া, ৬ষ্ঠ যুগোশ্লাভিয়া, ৭ম পোল্যাণ্ড, ৮ম উরুগুয়ে।

সুটিংটুর্নামেণ্ট ঃ

এই প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে রাশিয়া ২টি স্বর্ণ পদক, ২টি রৌপ্য পদক এবং ২টি ব্রোঞ্জ

পদক লাভ করে। বাকি ৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছে এই চারটি দেশ—অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, আমেরিকা এবং রুমানিয়া।

ওয়াটার পোলো ঃ

১ম ইটালী (৫ পয়েণ্ট), ২য় রাশিয়া (৩য় পয়েণ্ট), ৩য় হাঙ্গেরী (২য় পয়েণ্টে)।

জিমন্যাষ্টিক ঃ

পুরুষদের দলগত বিভাগ : ১ম জাপান (৫৭৫.২০ পয়েণ্ট), ২য় রাশিয়া (৫৭২.৭০ পয়েণ্ট), ৩য় ইটালী (৫৫৯.২৫ পয়েণ্ট)।

পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগ : ১ম বি সাখলিন (রাশিয়া) —১১৫.৯৫ পয়েণ্ট ; ২য় টি উনো (জাপান)—১১৫.৯০ পয়েণ্ট, ৩য় ওয়াই টিটোভ (রাশিয়া)—১১৫.৬০ পয়েণ্ট।

মহিলাদের দলগত বিভাগ : ১ম রাশিয়া (৩৮২.৩২০ পয়েণ্ট), ২য় চেকোশ্লোভাকিয়া (৩৭৩.৩২৩ পয়েণ্ট), ৩য় রুমানিয়া (৩৭২.০৩৩)।

মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগ : ১ম লরিশা লাটিনিনা (রাশিয়া), ২য় সোফিয়া মুরাটোভা (রাশিয়া), ৩য় পোলিনা অষ্টাখোভা (রাশিয়া)।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ৪র্থ গ্রুপে ভারতবর্ষ তার প্রথম খেলায় ১—২ গোলে হাঙ্গেরীর কাছে পরাজিত হয়। রোম থেকে ১০০ মাইল পথ মোটরে পাড়ি দিয়ে ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়রা হাঙ্গেরীর সঙ্গে Aquila পাহাড়তলীতে মিলিত হয়। ভারতীয় দল খুব বেশী গোলের ব্যবধানে হাঙ্গেরীর কাছে গো-হার হারবে এই রকমই ধারণা ছিল। হাঙ্গেরী খুব শক্তিশালী—এই দেশই অলিম্পিক খেতাব পাবে এমন দৃঢ় ধারণ বিশেষজ্ঞ মহল থেকে প্রচার করা হয়েছিল। খেলার ৩১ মিনিটে হাঙ্গেরী প্রথম গোল দেয়। এর চার মিনিট পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জি গোলটি শোধ করার অপূর্ব সুযোগ পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বলটি বারে লাগে, গোলরক্ষক সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৬ষ্ঠ মিনিটে ভারতীয় গোলরক্ষকের সঙ্গে দলের দুই রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়ের ভুল বুঝাবুঝির ফলে ভারতীয় দল ২য় গোলটি খায়। ১৫ মিনিটে ভারতীয় দলের চুণী গোস্বামী বিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বলটি বলরামকে সেণ্টার করেন। বলরাম সুন্দর ভাবে গোল দেন।

ভারতবর্ষ বনাম ফ্রান্সের খেলা ড্র যায়। উভয় পক্ষেই একটি ক'রে গোল হয়। ভারতবর্ষ প্রথম গোল দেয়। বিশ্রাম সময়ে কোন পক্ষেই গোল হয়নি। খেলার ৭২ মিনিটে ভারতীয় দলের অধিনায়ক প্রথম গোল দেন। ৮৩ মিনিটে ফ্রান্স গোলটি শোধ দেয়। খেলার ধারা দেখে অনেকেই বলেছেন, ফ্রান্স সৌভাগ্যক্রমেই খেলাটি ড্র করেছিল। লীগের ৩য় বা শেষ খেলায় ভারতবর্ষ ১—৩ গোলে পেরুর কাছে হেরে যায়। বিশ্রাম সময়ে পেরু ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। পেরুর কাছে ভারতবর্ষ এঁটে উঠতে পারেনি। ভারতবর্ষ গোল করার কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে। পেরুর কাছে ভারত-বর্ষের খেলা খুবই খারাপ হয়। ফ্রান্স ২—১ গোলে এবং হাঙ্গেরী ৬—২ গোলে পেরুকে হারায়। এই সঙ্গে ফ্রান্স এবং হাঙ্গেরীর বিপক্ষে ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল ধরলে পেরুর কাছে ভারতবর্ষের এই শোচনীয় ব্যর্থতা আকস্মিক দুর্ঘটনার সমানই মনে হয়।

ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়া বনাম ইতালীর খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। শেষ পর্য্যন্ত টস ক'রে যুগোশ্লাভিয়া জয়লাভ ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ডেনমার্ক ২—০ গোলে হাঙ্গেরীকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়।

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যুগো-শ্লাভিয়া ৩—১ গোলে ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে। খেলার ২য় মিনিটে যুগোশ্লাভিয়া প্রথম গোল দেয়। পুনরায় গোল দেয় ১৩ মিনিটে। এর-পর ৩৮ মিনিটে যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে গ্যালিক যে ৩য় গোলটি দেয় তা ইটালীয়ান রেফারী বাতিল করেন। এই নিয়ে রেফারীর সঙ্গে গ্যালিকের দারুণ বচসা হয়। রেফারি গ্যালিককে মাঠ থেকে বের ক'রে দেন। দশজন খেলোয়াড় নিয়েই যুগোশ্লাভিয়া খেলার ৭০ মিনিটে ৩য় গোল দেয়। খেলা ভাঙ্গার ৩০ সেকেণ্ড আগে ডেনমার্ক একটি গোল শোধ দেয়। রেফারিং খুব ভাল হয়নি।

হাঙ্গেরী ২-০ গোলে ইটালিকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

সেমি-ফাইনাল

যুগোশ্লাভিয়া ১ : ইটালী ১

ডেনমার্ক ২ হাঙ্গেরী ০ :

ফাইনাল

যুগোশ্লাভিয়া ৩ : ডেনমার্ক—১

সাহিত্য সংবাদ

কেউ ফেরে নাই ঃ শক্তিপদ রাজগুরু।

মাটীর নীচে অজস্রসম্পদ সঞ্চিত রেখেছেন বসুন্ধরা। মাটীর উপরে কাজ করে চলেছে কত কল, কত কারখানা,—অহর্নিশি চলছে রেলগাড়ী, নিত্য জ্বলছে চুল্লী প্রত্যেকটি রান্নাঘরে, প্রস্তুত হচ্চে আমাদের খাদ্য যা নইলে আমরা বাঁচি না। আমাদের জীবনের এক প্রধান অবলম্বন, সকল সম্পদ সৃষ্টির উপাদান ঘনীভূত সূর্যতাপ—কয়লা। মাটীর নীচে স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে কয়লা। মানুষ সে কয়লা তুলে আনে বসুধার গর্ভস্থ অন্ধকারের বুক থেকে। সে-সকল মানুষের জীবনের কতখানিই বা আমরা জানি?

শক্তিমান্ উপন্যাসিক শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু। কয়লাখানি জীবনের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ঐ কয়লাখনি জীবনের নিখুঁত আলেখ্য। খনি-মধ্যে যারা হাতে প্রাণ নিয়ে নেমে যায় তাদের জীবনের অনেকখানিই আমাদের অজানা। পাতাল পুরীর মালকাটাদের জীবন কত বিচিত্র। তাদের জীবন নিয়ে কি রকম নির্বিচারে খেলা করে খনির ঊর্দ্ধতন কর্মচারীকুল আর মালিকেরা। চিনতোড় কলিয়ারির মালকাটাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে এক নুতন মালকাটা। নাম তার বসন্ত। মালকাটাদের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলে তার প্রতিবাদ জানায় বসন্ত। নুতন ম্যানেজার মিঃ মিত্রও সমর্থন করে মালকাটা বসন্তের কথা। স্বার্থান্ধ ম্যানেজার ও এজেণ্ট ব্রেজার আর ফষ্টার তাঁদের কথার মূল্য দেয় না কিছুই।

কিন্তু মালকাটা বসন্ত কিছুতেই নিরাশ হয় না। মালকাটা সমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠে সে অল্পদিনের মধ্যেই। মালকাটাদের স্ত্রী ও রাখনীদের মধ্যেও বসন্তের প্রতি উৎসক্য জাগে। চিঠি লিখাতে আসে ইংরেজীতে ভূতপূর্ব ম্যানেজার লিষ্টারের এদেশীয় পত্নী সৌরভী। লিষ্টার এদেশ ছেড়ে চলে গেল। সৌরভী ব্যবসা ধরল তরকারীওয়ালীর। খনির ওভারম্যান শরণসিং তার মানুষ। বসন্তের ঘরে সৌরভীর আনাগোনা শরণসিং-এর মনে জাগায় বন্য হিংস্রতা। সে হিংস্রতা প্রকট হয় কয়লাখনির অভ্যন্তরেও। বসন্তের বিরুদ্ধে আক্রোশ জাগে শুধু শরণসিং-এরই নয়। খনি ম্যানেজার ফষ্টার ও তার দালালরাও ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে হিংসায় মেতে উঠে। সেই হিংসাতেই কাহিনী জটিল হয়ে উঠে। তারপর নেমে আসে খনিতে ভয়ানক দুর্যোগ—ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এক শিফটের প্রায় তিন শত মালকাটা মারা যায়। বসন্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই সুরু করে মালকাটাদের ক্ষতি পূরণের জন্যে। ক্রমে প্রকাশ পায় খনির মালিক মিঃ চাটার্জির পুত্র দেবেশই খনির মালকাটা বসন্ত। বসন্তকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন মিঃ চাটার্জি। কিন্তু কিছু ফল হয় না। শ্রমিকদের স্বার্থ কিছুতেই জলাঞ্জলি দিতে পারে না বসন্ত। শেষে দুর্ঘটনায় নিহত মালকাটাদের গোপনে সরিয়ে ফেলার সময়ে গাড়ী আটক করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় বসন্ত। তারপর?

মিঃ চাটার্জির জীবনে তাতে আসে গুরুতর অনুশোচনা। বড়ই মর্মান্তিক কাহিনীর উপসংহার।

অজস্র প্রেম-বিরহের কাহিনীতে এই বৃহৎ উপন্যাস ভরপুর। ফষ্টারের সঙ্গে ব্রেজারের স্ত্রীর 'লভবটি', ভক্তির সঙ্গে কেষ্টর বৌ গৌরীর প্রেম, নমিতার সঙ্গে দেবেশের হৃদয়-ভাঙ্গা গড়ার অনেক কাহিনী মিশে এই উপন্যাসকে রম্য ও চিত্তাকর্ষী করে তুলেছে। পাতালপুরীর রহস্যলোকের মর্মস্পর্শী কাহিনী লেখকের দরদী লেখনী মুখে অনবদ্য রূপলাভ করেছে। প্রচ্ছদপটটীও সুন্দর হয়েছে।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৭'৫০ নয়া পয়সা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দিব্য জীবনের সন্ধানে ঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

ঋষি অরবিন্দের সাধনার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কয়জন জানেন তাঁর মর্ম্মকথা? কয়জন জানেন তাঁর সাধনার প্রণালী, পন্থা, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধির মহিমা? কয়জন জানেন দিব্য জীবনের অর্থ কি? কি করে প্রত্যেক মানুষই সে জীবনের অধিকারী হতে পারেন? কয়জন জানেন পূর্ণযোগ কাকে বলে, কি করে সে যোগ করতে হয়? আর কয়জনই বা জানেন অতিমানবের অবতরণ কি করে হচ্ছে?

অতি অল্পসংখ্যক লোকই এ সকলের সন্ধান রাখেন। শ্রীঅরবিন্দের দুরূহ ইংরাজী ভাষার ঘন আবরণ ভেদ করে তাঁর প্রকাশিত মহাসত্যের উপলব্ধি করতে পারা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। এই মহাসত্যকে সাধারণের গোচরীভূত করার উদ্দেশ্য নিয়েই লেখক "দিব্য জীবনের সন্ধানে" রচনা করেছেন, আর সাধারণের বোধগম্য অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীঅরবিন্দের মত ও পথ। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে সাধারণ বাঙ্গালীর যেমন সুবিধা হয়েছে তেমনি, এরূপ গ্রন্থকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও প্রকাশিত করে সর্ব্বভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারাকে প্রচারিত হবার সুবিধা করে দেওয়া উচিত। আর তবেই ভারতের সাধারণ মানুষ জানবে ঋষি অরবিন্দ আমাদের কি দিয়ে গেছেন। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হবে এ আশাই করি।

[প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দাম ২৲ টাকা]।

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুদূর বাঁশরী : দেবেশ দাশ

উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থটিতে কবির উনত্রিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সম্প্রতিকালে রচিত হইলেও, আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা ও অর্থহীনতা মুক্ত। স্বচ্ছ সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে কবিতাগুলি রচিত। মেঘনায় উদ্বাস্তুদের উপর রচিত কবিতাগুলি বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। দেবেশবাবু ইতিমধ্যে ছোট গল্প, উপন্যাস ও রম্য রচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার নানাগ্রন্থ ইতিমধ্যে ভারতীয় ও বিদেশী নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে তাজমহল, হলদীঘাটের সন্ধ্যা, সাজাহানের স্বপ্ন, পদ্মিনী, আলাউদ্দিন, পৃথিবীর প্রেম, বৈশাখ, হে মহাজীবন প্রভৃতি কবিতাগুলিও উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে কবির সৌন্দর্যবোধ, বেদনাবোধ, অন্যদিকে অনুভূতির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিকই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে সুদূর হইতে ভাসিয়া আসা বাঁশরীর সুর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুদূর প্রবাসে বসিয়াও কবি বাংলাদেশের অন্তরের বাণী উপলব্ধি করিয়া তাহাকে গভীর সুরে অথচ মিষ্ট ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোংলিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা]

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন রেকর্ড

'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্' ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস'

N 82873—জনপ্রিয় শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা ভাবমধুর গান—'পথ চেয়ে রাধিকা রয়েছে জাগি' ও 'কেন জানি না বাজে মোহন মুরলী'।

N 82874—'তোমার স্বপ্ন নিয়ে রাত্রি এলো' ও 'এ শুধু তোমার আমারে লেয়ে' দুখানা আধুনিক গান গেয়েছেন শিল্পী বাসবী নন্দী।

N 82875—'ঐ ধমকী ধমকী চলে' ও 'আমি কি খুঁজিলাম'—গান দুখানা গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী সনৎ সিংহ।

N 82876—শিল্পী ইলা বসু গেয়েছেন দুখানা মনোরম গান—'ঐ আকাশে পূর্ণ চাঁদ' ও 'নতুন নতুন রং'।

N 82877—জনপ্রিয় শিল্পী শ্যামল মিত্র পরিবেশন করেছেন দুখানা আধুনিক গান। গান দুখানা—'এ প্রেম যেন তোমার' ও 'ও কালো হরিণ চোখে'।

N 82878—'ভাল কইর‍্যা বাজাও গো' ও 'ললিতে ও ললিতে' এই দুখানা পল্লী সংগীত গেয়েছেন সর্বজনপ্রিয় শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

N 82879—শিল্পী গীতা সেন—'আনন্দে রুমঝুম বাজে' ও 'বধু এমন বাদল দিনে'—এ দুখানা আধুনিক গান গেয়েছেন।

N 82880—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান। গান দুখানা—'রঙিনার রাঙা দেহে ভাব লেগেছে' ও 'ময়ূরকণ্ঠি রাতের নীলে'।

N 82881—শ্যামল মিত্র ও ইলা বসু যুগ্মকণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান গেয়েছেন। গান দুখানা—'একটি নতুন গান শুনবে বলে' ও 'যদি ঝড় ভাঙে ঘর'।

N 82882—শিল্পী মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'ডাকে কোয়েলা বারে বারে' ও 'তখনি তোরে বলেছিনু মন'।

N 82883—জনপ্রিয় শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন দুইটি গান—'কি যেন বলবে আমায় গো' ও 'কাজলতা মেয়ে শোনো।'

N 82884—জনপ্রিয় শিল্পী বাণী ঘোষাল গেয়েছেন—'ছায়া ছায়া ঝাউবন দুলছে' ও 'টুপুর টুপুর বকুল ঝরে।'

N 82885—'এবার আমি সাধ করেছি' ও 'একবার বিরাজ মা হৃদ্ কমলাসনে'—দুখানা শ্যামা সংগীত গেয়েছেন শিল্পী—সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

N 82886—জনপ্রিয় শিল্পী পূরবী মুখোপাধ্যায় দুখানা রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছেন—গান দুখানা—'ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না।' 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার তরী।'

কলম্বিয়া

'GE 24993—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা গান—'রূপসাগরে ডুব দিয়ে' ও সাগর থেকে ফেরা।'

'GE 24994—শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—'এ সুর ঝরা' ও 'তোমার দ্বীপের আলোতে নয়।'

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী : শ্রীশিবশংকর কুণ্ডু | ঘরছাড়া | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্







কার্ত্তিক—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

স্বাধীনতার সমস্যা

কালীচরণ ঘোষ

তাসের ঘর যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই ভাবে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন মহাদেশে পরাধীনতার সৌধ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপীয় শ্বেতকায় জাতিসকল প্রায়ই আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকার সময় মনের আনন্দে সাগর-পারের দুর্ব্বল দেশগুলির উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে এবং সুযোগসুবিধামত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের এ কার্যের প্রধান সহায় হইয়াছে, কূটনীতি, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করার সুফল দেখা দিয়াছে। ইহা মোটামুটি গত সাড়ে চার শতাব্দীর কাহিনী। তাহার পর ইহার প্রতাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইতে সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে! এই প্রসঙ্গে বলা যায় আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গজাতি প্রথম পদার্পণ করে ১৫৬৫ সালে, আর আফ্রিকায় যায় তাহারও আগে।

প্রভাব প্রতিপত্তি যশঃ ছাড়া আর্থিক লাভ এই সকল জাতিকে প্রলুব্ধ করে এবং যত ভাবে সম্ভব অক্ষমের বক্ষ হতে লক্ষ মুখ দিয়া রক্ত শোষণ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়াছে। তাহারা সময় সময় বর্ব্বরতার চরম উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

কোথাও কোথাও সামান্য গোলোযোগ হইলেও মনের আনন্দে বেশ চলিতেছিল, মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে স্বার্থের জোর-লড়াই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরাধীন জাতিসমূহের তাগতে কোনও সুবিধা হয় নাই। তাহারা যে

তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকল সৌভাগ্যের একটা শেষ আছে। কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যেও স্বাধীনতার চেতনা ধীরে ধীরে অন্ধকার ফুঁড়িয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। তাহা দমন করিবার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা সভ্যতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ১৯৩৭ সাল একটি বিরাট সন্ধিক্ষণ—তখন বিদেশী শ্বেতজাতির কবল হইতে ভারত মুক্তিলাভ করে। সুভাষচন্দ্র দিব্যচক্ষে ইহা দেখিতে পাইয়াছিল এবং রুদ্রকণ্ঠে তাহা জগতে ঘোষণা করিয়াছিল। হরিপুরা কংগ্রেস (১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮)-এর সভাপতিরূপে বলিয়াছিল—ভারতবর্ষ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। কারণ ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদই অপর সকলের মূল ভিত্তি। যদি তাহাকে চূর্ণ করা যায় তাহা হইলে সেই ঘটনা সমস্ত পরাধীন দেশের আদর্শ-স্বরূপ হইবে; তাহারা বুঝিতে পারিবে শ্বেতজাতি দুর্দ্ধর্ষ হইলেও অজেয় নয়। কৃষ্ণকায় পরপদানত জাতির নিকটও তাহাকে নতি স্বীকার করিতে হইতে পারে। স্বাধীন ভারত অর্থে সকল মানবের পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি। নেতাজীর ভাষায় "Ours is a struggle not only against British Imperialism—but against world imperialism as well, of which the former is the key-stone. We wre, therefore, fighting not for the cause of India alone but of humanity as well. India freed means humanity saved."

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে যে কয়টি পরাধীন দেশ শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে তাহারা সংখ্যায় নগণ্য। ইহাদের মধ্যে ইজিপ্ট (মিশর) প্রথম ফুয়াদকে অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হয় ১৯২২ সালে। ওয়াফাদ দলপতি, জগলুল পাশার নাম এই কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা ("Dark Continent") জগতে আলোকের ক্ষীণরশ্মি দেখাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারত ইহাতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত ১৯৪৬ সালে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করে। এশিয়াখণ্ডে ইহা সকল পরাধীন জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

অর্দ্ধশতাব্দীকালের অধিক আন্দোলন ও পরম ত্যাগ-স্বীকার দ্বারা অজস্র রক্তপাতের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইল—১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। খণ্ডিত ভারতের অংশ লইয়া স্বাধীন পাকিস্তান একই সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ইংরাজের কবল হইতে মালয় মুক্তি লাভ করিয়াছে ১৯৪৮ (১লা ফেব্রুয়ারী) সালে। জাপানের দখল (১৯৪১-৪৫) হইতে মুক্ত হইয়া মালয় ইংরাজের তাঁবে থাকিলেও নিজ সম্বিৎ যখন ফিরিয়া পাইল, তখন স্বাধীনতার হাওয়া চারিদিকে বহিতেছে, ভারত স্বাধীন হইয়াছে, সুতরাং ইংরাজের পক্ষে মালয় ছাড়িয়া দেওয়া যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয়।

মালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জ এই সময়ে ওলন্দাজ অধিকারে ছিল। ১৯৫০ সালে ডাঃ সোয়েকর্ণর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া (জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো, সেলিবিস, মাদোয়েরা, রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ, বাঁকা, বিল্লিটন, মলকাস্ ও টিমর দ্বীপপুঞ্জ ও টিমর) বন্ধনপাশ মুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

আফ্রিকার অপরাপর পর-পদানত রাজ্যের শৃঙ্খলমুক্তির বাসনা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুদান ১৯৫২ সালে নূতন সংবিধান লইয়া আংশিক স্বাতন্ত্র্যলাভ করিলেও তাহার শান্তি ছিল না; তখনও মিশর ইহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ১৯৫৪ সালে নূতন পার্লামেণ্ট গঠিত হইলেও ১৯৫৬ সালে সুদান পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিল।

অপরাপর ক্ষুদ্র রাজ্যও এই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দুর্ব্বার গতি শ্বেতকায় জাতিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যাহাতে আর কেহ "স্বাধীনতার স্বর্গসুখ লাভ" করিতে না পারে তাহার বিরাট তোড়জোড় চলিতে সুরু হইয়াছে। কিন্তু একবার যে প্রবাহ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নামিয়াছে তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পোর্ত্তুগাল আফ্রিকায় প্রথম আসিয়া জুটিয়াছিল, এখন আঙ্গোলা ও মোজাম্বিক আঁকড়াইয়া আছে।

আফ্রিকাত্যাগী বিদেশীদের মধ্যে তাহারাই শেষ যাত্রী হইবে এরূপ আশা করা ভুল হইবে না।

টিউনিসিয়া (ফরাসী), মরক্কো (ফরাসী) ১৯৫৬ সালে, ঘানা বা গোল্ডকোষ্ট (ব্রিটিশ) ১৯৫৭ সালে এবং গিনি (ফরাসী) ১৯৫৮ সালে বিদেশীর বন্ধন-পাশ মুক্ত হয়।

১৯৫৯ সাল যুদ্ধ অশান্তি, আলাপ আলোচনায় কাটিয়া গিয়াছে, আর ১৯৬০ পড়িতেই স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছে! মাদাগাস্কার নতুন নাম মালাগাসি (ফরাসী), সোমালিল্যাণ্ড (ব্রিটিশ ও ইতালীয়), নব কলেবর সোমালিয়া ১৯৬০ (জুন-জুলাই), কঙ্গো (বেলজিয়ম), সেনেগিল, চাদ, কঙ্গো অপার-ভল্টা ও নাইজার, ডাহোমি, আইভরি কোষ্ট (ফরাসী) সকলে (জুলাই-আগষ্ট) মুক্তি লাভ করিয়াছে। সেনেগল হইয়াছে মালি ফেডারেশন, মাদাগাস্কার দ্বীপ নবনাম মালাগাসি ঐ দলে পড়িয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মিশ্রিত শ্বেতজাতি বলিয়া একটা বড় অংশ দখল করিয়া বসিয়া আছে, আর সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ডামারাল্যাণ্ড ও নামকুয়াল্যাণ্ড দখল করিয়া আছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিরোধী পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া দখল করিবার পর স্বপক্ষীয় দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতজাতির তত্ত্বাবধানে উহাদের রাখা হয়। আজ এক লোলুপ রাজ্য অপরের সম্পত্তির উপর দখলকার হইয়া বসিয়া আছে। এই অঞ্চলের লোকরা সতৃষ্ণ নয়নে জগতের দিকে তাকাইয়া আছে। যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছে, তখন এই দুইস্থানের অধিবাসীরা যে অশান্তি ভোগ করিতেছে, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্যের অ-শ্বেতকায় জাতিদের সহিত মিলিত হইয়া একদিন অনর্থ ঘটাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। শ্বেতজাতি নিজেদের সুযোগ ছাড়িবার একমাত্র দাওয়াই বুঝিতে পারে, তাহা সশস্ত্র বিদ্রোহ। যেখানেই তাহা রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে সেখান হইতে ঘোর অনিচ্ছায় অপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সাইপ্রাস সর্ব্বশেষ স্বাধীন রাজ্য (আগষ্ট ১৯৬০) তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

আফ্রিকায় যে কয়টি পরপদানত দেশ আছে, তাহাও শীঘ্র মুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের দেহে দুষ্ট-ক্ষতের মত—গোয়া, দমন, দিউ—রহিয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় আঙ্গোলা মোজাম্বিক পর্ত্তুগালের অধীনে রহিয়াছে। পাকিস্থান আর ভারতের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ভারতীয় মুসলমান স্বতন্ত্র রাজ্য চাহিয়াছে। অপরাপর মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রের মত তাহারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আর নূতন চিন্তার কারণ নাই।

প্রবল যখন সুযোগসুবিধা পাইবে তখন নিতান্ত অহিংসভাবে বসিয়া থাকিবে না। এখন দুর্ব্বল জাতিরা দলের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। জগতে আমেরিকা আর রুশ দুই প্রতিপক্ষ বিরাট শক্তিশালী দলে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং দুর্ব্বল পক্ষ ইহাদের এক দলের সাহায্য-সমর্থন প্রার্থনা করে। অপর পক্ষ একটু ত্রস্ত হইয়া পড়ে। এই ভাবে কয়েকটি দেশ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্য বিশেষতঃ আফ্রিকায় মিশর যখন (সুয়েজ খালের ব্যাপার লইয়া) বিব্রত, তখন রুশ প্রতিপক্ষকে হুমকি দিয়া নিরস্ত করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এই সুযোগে বাঁচিয়া আছে। সম্প্রতি কিউবা আমেরিকার বহু মূল্যবান সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াও রক্ষা পাইয়া গেল। আর প্রবলের অত্যাচার নগ্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—চীনের আক্রমণ তিব্বতের উপর। একটি নিরপরাধ শান্ত দেশ শক্তিমত্ত পরধনলোলুপ নবজাগ্রত জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, নেপাল, সিকিম, ভূটান এই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিব্বত জাতি-সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইলেও, রুশ তাহার সাহায্যে আসিবার কথা নহে, আর সামান্য তিব্বত লইয়া আমেরিকা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করিল না। তিব্বত সেরূপ সশস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করে নাই, সুতরাং একটা বড় যুদ্ধ হইল না।

দেশ স্বাধীন হইতেছে, পরের সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতেছে। বিদেশীর অধিকার একটা জাতির সকল রকম স্বার্থের পরিপন্থী সে বিষয়ে দ্বিমত নাই এবং কালে কালে সকল জাতিই আত্মনিয়ন্ত্রণের বাসনা লইয়া বিজেতা দখলীকারদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। ইহা মানুষের চিরন্তন অধিকার। যাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতার চিন্তাসৃষ্টি, জনমত

গঠন, বিদেশীদের অন্যায় কার্য্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, নিজেরা নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, চরম আত্মবলি দ্বারা স্বাধীনতার আগমন সম্ভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় ইহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিদেশী শাসক সকল সময়েই নিজের দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুগপৎ শাসন ও শোষণ কার্য্য পরিচালিত করে। স্বদেশের লোক আমদানী করিয়া দায়িত্ব ও সম্মানজনক সমস্ত পদ অধিকার করিয়া রাখা তাহার এক লক্ষ্য। যাহাতে বিজিত জাতি শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে না পারে, শাসক-গোষ্ঠীর সহিত সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে না পারে, সে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় না। শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় পরাধীন মানবের মধ্যে দৃঢ়মূল করিবার জন্য সকল উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাদের অতীতের যাহা কিছু মহান ও গরীয়ান তাহার প্রতি উপেক্ষা অশ্রদ্ধা ঢালিয়া দিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। স্বাধীনতা-হীনতার সকল পাপ সামান্য কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারতের পাঠকের কাছে বিস্তৃত তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই।

অন্যদিকে ইহা একেবারেই অবিমিশ্র অভিশাপ বলিয়া মনে করা যায় না। বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জাতির মধ্যেও একটা একাত্মবোধ জমিয়া উঠে। ভারতবর্ষ এই এক প্রধান কারণের জন্য একতার মর্য্যাদা বুঝিয়াছে এবং একমুখী প্রচেষ্টায় শত্রু দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী শাসকগণের ভাষা সমাজের উচ্চতর স্তরের লোকদের মধ্যে যোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইংরাজী ভাষা সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল লোককে সারা ভারতে ভাব আদান প্রদানের সুবিধা করিয়া দেওয়ায় প্রধান আন্দোলন—স্বাধীনতা, সমাজসংস্কার, শিক্ষা, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রভৃতি যে কোনও কারণেই হোক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার সুযোগ দিয়াছে। শাসকদিগের মধ্যে যাহা কিছু তাহাদের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতি সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। পরস্পরে যোগাযোগ থাকার ফলে বৃহত্তর জগতের সহিত ভাব ও শিক্ষা বিনিময় দ্বারা পরাধীন জাতির মধ্যেও একটা আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ হইয়া থাকে। নিজেদের প্রয়োজনে হইলেও শাসক গোষ্ঠী বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কারলব্ধ নূতন যন্ত্রপাতি আনিয়া বসাইতে বাধ্য হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় কঙ্গো, ফিলিপাইন, গোল্ড কোষ্ট এমন কি ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশেও নূতন নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাইতে বহু বৎসর ক্ষয় হইয়া যাইত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিদেশী শাসন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে এক বিধি-ব্যবস্থায় না আনা পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকিত। নূতনের সন্ধান করিবার মত মনোভাব, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আবহাওয়া গড়িয়া ওঠা অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রতিবেশী রাজ্যকে দমন করিবার জন্য অন্যজাতির সাহায্য কামনা করিতে হইত। অনেক সময় দুই বিবদমান দেশই এই কারণে একই সময়ে বিদেশীর করতলগত হইয়া গিয়াছে, বানরে বিড়ালের রুটি ভাগ করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

পরাধীনতা মহাপাপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হয় বেশী তাহা আবিষ্কার করা বাতুলতা মাত্র। যে সকল দেশ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বাধীন হইয়াছে যথাসম্ভব তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। স্বাধীন দেশ বলিয়া পরিচয়ের গৌরব লাভ করা ছাড়াও সাধারণ নাগরিকের সুখশান্তি বৃদ্ধি করার পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জাতীয় আয়, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের বহুল প্রসার-সম্ভাবনা হইয়াছে। জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হইলেও (কারণ অজস্র স্বাধীনদেশ সকলেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভে প্রয়াসী হইলে একটা নূতন গোলো-যোগের সম্ভাবনা) একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই নিজ নামে পরিচয় প্রত্যেক স্বাধীন জাতির একটা বিরাট গৌরব। আজ যখন এক জাতি কোন সভায় আসন লাভ করে, তাহার জাতীয় পতাকা তাহার আসন সূচিত করিয়া থাকে। আজ ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদের পতাকা—আর ইজিপ্ট বা মিসর, সুদান, ঘানা, টোগোল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, সিংহলের পরিচয় দেয় না। পৃথিবীর দরবারে আজ কোনও শ্বেতাঙ্গ, (ভাড়া করা না হইলে) কৃষ্ণাঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে না। অথবা প্রতিনিধিত্ব করার নামে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করিবার সুযোগ পায় না।

এই সকল সুখসুবিধা স্বাধীনতার আবির্ভাবে ভোগ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ব্যষ্টি হিসাবে আজ প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের করতলগত। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের সঙ্গে, নূতন নূতন সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

যে সকল দেশ স্বাধীন হইয়াছে, বিদেশীর আওতায় থাকিয়া প্রায় সকলেই শক্তিহীন; পরের শক্তি তাহাদের অপর আক্রমণকারী জাতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে—যখন এই সকল প্রবল জাতি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কেহ পরাজিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকারভুক্ত দেশসকল বিজেতারাষ্ট্র দখল করিয়াছে। গত দুই বিশ্বযুদ্ধে এই প্রকার রদবদল বহু হইয়াছে। বিশেষতঃ জার্ম্মানী ও জাপানের আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে অধিকারসকল অপরে লুটিয়া পুটিয়া খাইয়াছে।

ইংরাজের অধিকার সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া ছিল, তাহার রাজ্যে কখনও সূর্য্যাস্ত ঘটিত না। সুতরাং যতদিন ইংরাজ পরাক্রমশালী ছিল, ততদিন তাহার অধিকৃত রাজ্যসমূহ যথেষ্ট নিরাপত্তা ভোগ করিয়াছে। এই নীতি স্থূলতঃ সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এ যুগে যেমন শ্বেতাঙ্গ প্রভাব বিস্তারের সহিত একের পর এক দেশ তাহাদের কুক্ষীগত হইয়াছিল, আজ আবার কালের প্রভাবে পরাধীন দেশের মধ্যে আত্মচেতনা লাভ করায় সেই লৌহ-নিগড় একের পর এক খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে, যদি সৎভাবে অর্থাৎ সম্প্রীতির সহিত ইহা হইয়া থাকে, যেমন ফিলিপাইন, তাহা হইলে পূর্ব্বের সংশ্রবে, বন্ধুভাবে পূর্ব্বতন শাসকবর্গের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অনেক সময় আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে এই সাহায্য যাচ্ঞা করিতে সঙ্কোচ হইতে পারে। সুতরাং আজ স্বাধীন দেশসকল কেবল প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট হইতে নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত অচিরকালের মধ্যেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। স্বাধীনতা লাভের ইহা এক বড় সমস্যা।

যতদিন ইংরাজ ভারতের মালিক ছিল ততদিন তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষ, অপরের আক্রমণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইংরাজ চিরকালই রুশ ভল্লুকের ভয় দেখাইয়া ভারতের রাজনৈতিক শিশুকে শান্ত রাখিয়া দিত। পাকিস্তান ইংরাজের সৃষ্ট হইলেও আজ তাহা ভারতের এক প্রধান অশান্তির কারণ। তাহার উপর আছে চীনাদের উৎপাত। তাহারা ১২ হইতে ১৫ হাজার বা তাহারও অধিক বর্গমাইল ব্যাপিয়া স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া আছে। মাঝে মাঝে সৈন্য পাঠাইয়া গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের এত সুযোগ ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ব্বল বা পক্ষপাতদুষ্ট হইলে ভারতবর্ষের মত প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গমাইল বৃহদায়তন রাজ্য উপযুক্ত শাসনে রাখা সম্ভব নহে। মুসলমান সাম্রাজ্য অপরাপর দুর্ব্বলতার সহিত কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হওয়ায় নানারূপ আঘাত সহ্য করিতে পারে নাই। আজ অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, গুজরাট স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে। নাগারা আত্মনিয়ন্ত্রিত রাজ্য লাভ করিতে চলিয়াছে। ত্রিপুরা, মণিপুর ও আসাম পার্ব্বত্য অঞ্চল নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সম্মুখীন। নাগ বিদর্ভ, পাঞ্জাবী সুবা নূতন রাজ্য চায়; হিমাচল প্রদেশ নিজের সীমিত শক্তিতে কেন্দ্রের শাসন মানিয়া লইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

বর্ব্বর মারাত্মক আচরণ সুফল প্রসব করে, এক কেরল ব্যতীত, সর্ব্বত্রই প্রমাণিত হইয়াছে। নানা প্রকার উৎপাত করিয়া অন্ধ্র মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বলপ্রয়োগে, সামান্য অংশ ছাড়িতে হইলেও, বিহার বাঙ্গলার কতক অংশ দখল করিয়া আছে। সর্ব্বাধিক কারণে সরাইকেল্লা, খরসোয়ান উড়িষ্যার অংশ হইলেও বিহার তাহা জবরদস্তি দখল করিয়া রহিয়াছে। কাশ্মীর এখন আন্তর্জাতিক সমস্যার পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, সুতরাং এখানে মাত্র তাহার উল্লেখ করা গেল। ইহার উপর রাষ্ট্রভাষা বিরোধ। মাত্র এক ভোটের সংখ্যাধিক্যে বিজয়ী হিন্দীর দল যদি ভারতের সব অংশে চাপ দিতে থাকে, তাহা হইলে অগ্ন্যুৎপাত অবশ্যম্ভাবী।

আসাম দেখাইয়াছে সামান্য ভাষার নামে কত বড় অমানুষিক বর্ব্বর আচরণ করিয়া বিনা সাজায় শান্তিতে আনন্দে বিচরণ করিতে এবং "আমাদের দাবী" মানাইয়া লইতে পারা যায়। কেন্দ্রীয় শাসন আজ একেবারে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাই চারিদিকে অশান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।

মুসলমানরা ভারত বিভক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। যেমনভাবে পাকিস্তানে হিন্দুদের জল্লাদের খাঁড়ার নীচে বসাইয়া রাখিয়াছে, অন্ততঃ সেইভাবে ভারতে মুসলমানকে বাস করিতে দিলে সমীচীন ব্যবস্থা হইত। আজ তাহারা নির্ব্বিচারে কাশ্মীর ষড়যন্ত্র করে, পাকিস্তানী পতাকা উড়ায়, মুশ্লিমলীগ গঠন করে—শীঘ্র যে আবার স্বতন্ত্র মুস্লিম এবং পাকিস্তানের সহিত যোগ রক্ষার জন্য খোলা পথ (করিডর) দাবী করা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চশীলের জননী ভারত তাহা মানিয়া লইবে—তাহারও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

ব্রহ্মের শান্তি নাই, তাহাকে চীনা কমিউনিষ্ট বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। আরও একটু দূরে ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, লাওস্ সবই-জ্বলিয়া মরিতেছে।

আফ্রিকার যে সকল রাজ্য স্বাধীন হইল তাহাদের অনেকেই আয়তনে একটি বড় জমিদারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গাম্বিয়া মাত্র ৪,০০০ বর্গ মাইল; ডাহোমি ৪৩০০০, ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড ১৩,০৪১ বর্গ মাইল। অপর সকলেই আয়তনে এত ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু লোকসংখ্যা স্বল্প মাত্র, কাহারও অধিবাসী সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র। অনেকেরই খনিজ সম্পদ আছে, কিন্তু কেবল তাহারই সাহায্যে একটা স্বাধীন দেশের খরচ সঙ্কুলান এবং উন্নতিমূলক কার্য্যবিধি পালিত হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এখন এই সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজ্যের কোনও একটি বা একাধিক রাজ্যকে গ্রাস করিবার জন্য যদি কোনও প্রবল জাতি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইহাদের কাহারও আত্মরক্ষার সামর্থ্য নাই। কেবল আক্রমণকারীর প্রতিপক্ষ কোনও প্রবল জাতির আর্থিক ও যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণরোধ করিবার জন্য যে সামান্ত ব্যয় করিতে হইবে, তাহারও সংস্থান অনেকেরই নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে আসিয়া রক্ষা করিবে, তাহা দুর্ব্বল রাষ্ট্রের পক্ষে দুরাশা হইতে পারে; "উহা শক্তের ভক্ত, দুর্ব্বলের যম"; দক্ষিণ আফ্রিকা বারে বারে তাহার নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়াছে, কোনও ফল হয় নাই। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার তাঁবেদারী (mandated territory) তাহারা ছাড়ে নাই, সেখানেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশে কোনও ফল হয় নাই। পর্ত্তুগীজরা আঙ্গোলা, মোজাম্বিক ছাড়ে নাই, ছাড়িবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। উপরন্তু নূতন পর্ত্তুগীজবাসী আনিয়া শ্বেত অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা উপনিবেশিক নীতির এক চরম অধ্যায়।

আভ্যন্তরীণ গোলমালের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই আছে। কঙ্গো বেলজিয়মের কবল হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কাটাঙ্গা স্বাধীন থাকিতে চাহে, আমাদের মধ্যে যদি মধ্যভারত মধ্যপ্রদেশে যুক্ত না হইয়া "স্বাধীন" থাকিতে চাহিত, তাহা হইলে ঐ এক ফল দাঁড়াইত। ইহাতেও শেষ হয় নাই, কঙ্গোর মধ্যেই বালুবা জাতির নেতা জোসেফ্ গালুলা ১০ই আগষ্ট কঙ্গোরই এক অংশকে "মাইনিং ষ্টেট" নাম দিয়া নিজেকে প্রেসিডেণ্ট আখ্যায় ভূষিত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

ভারতবর্ষের একাত্মবোধ ইংরাজের আওতায় অনেক দিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেও পরস্পরের বিরোধভাব কাটে নাই। সেই হিসাবে কল্পনা করা যায়, আফ্রিকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে নানা প্রকার বিদ্বেষ দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। দূর-প্রাচ্যে ত আছেই; মধ্যপ্রাচ্যের কয়টি স্বাধীন দেশের মধ্যে কত বিভেদ, সর্ব্বদা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও আহ্বান আস্ফালন লাগিয়াই আছে। কেবল তিন প্রধান রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া তাহারা মনে মনে আক্রোশ পোষণ করিলেও প্রকাশ্য যুদ্ধ চাহে না এবং সেই কারণেই সেখানে বড় রকমের গোলোযোগ সহজে হইতে পারে না।

আফ্রিকায় টানা-হেঁচড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের নামে নয়, ঐক্য, সঙ্ঘ, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার নামে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে প্রলুব্ধ করিবার আকাঙ্খা নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি কয়টি আসিয়া না পড়িলেও কঙ্গোর ব্যাপারে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ভিন্ন আকারে অন্যত্র প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বড় যুদ্ধ হয় না, কারণ রুশ ও আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র জানে যে এবার কয়েকঘণ্টার মধ্যে উভয় দেশ ধ্বংস

করিবার মত অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আছে। মিঃ উনসটন চার্চ্চিল একসময় বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ করার বন্ধ একমাত্র উপায় যুদ্ধাভিলাষী জাতিসকলের শক্তি সঞ্চয় করা। যখন একজন জানিবে অপরের হাতে মারাত্মকতর অস্ত্র আছে, তখনই যুদ্ধ-সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালের কথা। আজ তাহা বহুলাংশে সত্য হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধান দেশ সম্বন্ধে সে কথা প্রয়োগ করিবার সময় এখনও আসিয়া দেখা দেয় নাই। এখন ভয়ের যুগ চলিতেছে এবং ভয়ই অধিকাংশ সময় লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া থাকে। এ ভয় কাল্পনিক হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ফল একই। বিহারে ও আসামে বাঙ্গালীর অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বিহারী আসামী সর্ব্বদাই মারমুখী হইয়া আছে এবং সময়-অসময় অঘটন ঘটাইতেছে। সারা ভারতের মুখে পঞ্চশীলের স্রষ্টা শান্তির দূত, মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্রের মুখে চুণকালি লেপিতেছে।

নূতন কথা নহে, কারণ বলিবার মত নূতন কথা আর কিছু নাই, কেবল পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলা এবং বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে হয়ত কোনও সুফল হইতে পারে। এই নব-স্বাধীনতালব্ধ দেশগুলি লইয়া এখন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাহাতে হঠাৎ কোথাও বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ না হয়। শক্তিমানকে আক্রমণ করিতে শক্তিমানেও ভয় পায়। সুতরাং এই সকল রাজ্যের ব্যষ্টিগত শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে সমষ্টির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইলে কোনও উপায় নাই। বড় রকমের কিছু হইবার পূর্ব্বে এক মনোভাবাপন্ন, একই সমস্যায় বিব্রত, একই স্বার্থে প্রণোদিত জাতিসকলের একটা মিলনক্ষেত্র প্রয়োজন। এই সংস্থার প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত করা যায়। আফ্রিকার আকাশে আমেরিকার মত যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। নায়াসাল্যাণ্ড, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, উত্তর রোডেশিয়া—এমন কি মোজাম্বিক লইয়া একটি সঙ্ঘ-গঠন করিয়া পরীক্ষা করা চলে। কারণ ইহাদের মিলন প্রয়োজনাতিরিক্ত ভূমির আয়তন, লোকসংখ্যা ও অর্থনৈতিক মালমশলা পাইতে পারে, একটা অতি-শিথিল আন্তর্জাতিক মিলনের সূত্র পাইতে পারে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার স্বরূপ আজ অতি বিকটরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্বার্থপ্রণোদিত কয়েকটি রাজ্য আজ আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইতেছে। ইহারা প্রথমেই অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য দেয়, তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজ রাষ্ট্রের লোকের (গুণাগুণ যোগ্যতাধিকার না করিয়াই) কর্ম্ম-সংস্থান, ভাষার প্রাধান্য, জাতির গৌরব এবং ধর্ম্মের নিশান লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। রাজ্য-স্বাতন্ত্র্য দিয়া দেখা গিয়াছে এখন কেন্দ্রের একক-কর্তৃত্ব (Unitary form of Government) গ্রহণ করাইতে না পারিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে, (আব্রাহাম লিন্‌কন পাওয়া যাইবে না) যোগ্য লোক ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে পারে।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে মিলনের চেষ্টা নাই একথা বলা যায় না। একবার রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা (League of Nations) গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের (United Nations Organisation) দিন চলিতেছে। ইহা প্রবলের কাছে নতি স্বীকার করিয়া আছে। নিতান্ত খেয়ালখুশীমত পঞ্চ-প্রধান, বিশেষতঃ নিরাপত্তা সমিতি (Security Council) তে রুশ বাধা (veto) প্রদানে—সমস্ত গুরু আলোচনা রোধ করিয়া দিতেছে। কোরিয়া লইয়া বিতণ্ডায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ নাজেহাল হইয়াছে; আর বর্ণবৈষম্য ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে।

তাহা হইলেও বলিতে হইবে এই মিলন-চেষ্টায় প্রচুর মঙ্গল-সম্ভাবনা আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষতঃ দুর্ব্বল রাষ্ট্র ইহার নির্দ্দেশ মানিয়া লইতেছে। আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নামে সৈন্য উপস্থিত না থাকিলে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর লইয়া মাথা ফাটাফাটি করিত। আবার যখন চীন তিব্বত দখল করিল (?) তখন সারা জগতের শক্তিশালী রাষ্ট্র তাহা দূর হইতে দেখিয়া চীনকে দুদশটা কড়া কথা শুনাইল, আর ভারতের পঞ্চশীল পালনের 'বাহবা' দিয়া ক্ষান্ত নিরস্ত হইয়া রহিল, কারণ ইহার পিছনে রুশ আছে তাহা ইহারা জানে।

কমনওয়েল্‌থ, জাতীয় সংস্থার আজ বিশেষ প্রয়োজন

হইয়া পড়িয়াছে। ভাবের আদান প্রদান, অভাব অভিযোগ, ত্রুটি বিচ্যুতি শাসন ব্যাপারে ঘটিয়া থাকে। কখনও আন্তর্জাতিক কূটনীতি ব্যাপার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যদি দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার একটা উৎকট মানসিক ব্যাধির পরিচয় না দিত, কমনওয়েলথ মাধ্যমে অনেক সৎ কাজ, বিশেষতঃ অশান্তির প্রসার রোধ করা সম্ভব হইত। হতাশ হইবার কারণ নাই। আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে হয়ত পূর্ণ নাগরিক অধিকার না দিলেও, এই সকল দেশের লোকের অবাধ চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিময় চলিতে পারিবে। পরস্পরের আক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া, একযোগে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হইবে। একটা পৃথিবী-জোড়া বিরাট শক্তি ও জনমতের বিরুদ্ধে হঠাৎ একটা অযৌক্তিক আক্রমণ একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানে একদেশের বিজ্ঞানী অপর দেশে গিয়া নিজ বিদ্যার কারিগরী জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। রাজ্য শাসন একটি অতি কঠোর ফলিত কলাবিদ্যা, ইহা আয়ত্ত করিতে কেবল বিদ্যাবুদ্ধি হইলে চলে না, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতার প্রয়োগশক্তি প্রভৃতি নানা গুণের অধিকারী হইতে হয়। আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিশেষজ্ঞের বড় অভাব হইতে পারে; যদি তাহারা অপর রাজ্য হইতে লোক আনিয়া নিজেদের সরকারী পদমর্য্যাদা, রাষ্ট্র-পরিচালনার কোনও কোনও বিষয়ে দেশীয় প্রতিনিধিগণের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে অপর রাজ্যে যাহা ভাল, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক দ্বারা নিজরাজ্যে সুসম্পন্ন হইতে পারে। সকলের খবর সকলে জানিতে পারিবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। সন্দেহ, অবিশ্বাস সকল আন্তর্জাতিক কলহের মূল। ইংরাজের সহিত, কমনওয়েলথের অপরাপর রাজ্যের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে।

ছোট ছোট সঙ্ঘ যখন বিস্তৃতি লাভ করিবে তখন বৃহৎ গোষ্ঠী হিসাবে ক্রমেই পরস্পরের দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণের পক্ষপাতী হইবে। তাহা ছাড়া ব্যয় সংক্ষেপ, শিল্প-বাণিজ্য-পণ্যের নিয়মিত বাজার আপদ বিপদে সাহায্য সহযোগিতা বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমানে কয়েকটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি বলবৎ আছে। ইহার সব কয়েকটির মূলে চুক্তির বাহিরে অপর-শক্তির প্রতি ভয়ই ইঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। একথা স্মরণ রাখা দরকার এই সকল চুক্তি মাত্র কাগজের দামে চলে, যতদিন সম্প্রীতি আছে স্বার্থের দায় আছে। ততদিন এই চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে এক মুহূর্ত্তে চুক্তি নস্যাৎ হইয়া যায়।

প্রবলকে ভয় স্বাধীনজাতির প্রধান শত্রু। পরের শক্তি অনেক সময়ই কল্পনার উপর নির্ভর করে—তাহাতে অর্থও বিজ্ঞানে-ধনী দেশ শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করে, আর দরিদ্র, ডজনে ডজনে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হতাশ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া থাকে।

স্বাধীনতায় জাতি বা রাজ্যগত সুখ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার সমস্যাও অত্যন্ত গুরুতর, বিশেষতঃ অপরের আক্রমণ-সম্ভাবনা একটা চিরন্তন বিভীষিকা। বর্ত্তমানে কোনও শক্তিগোষ্ঠীর সহিত যোগ না দিলেও এ সকল দেশ সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়; তথাপি নিরপেক্ষ থাকিলে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। দুই প্রবলের কলহে কখনও কখনও দরিদ্র প্রতিবেশীকে সাক্ষী করিয়া আত্মদোষক্ষালন ও দলে ভারি করিবার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। সকল পরাক্রান্ত দেশ জানে সামরিক শক্তি হিসাবে ভারত একটা নগণ্য দেশ; কয়েক সেকেণ্ডে তাহার ধ্বংস সাধন করা সম্ভব। ইহা এতই দুর্ব্বল যে পাকিস্তান তাহার কাশ্মীরের অংশ দখল করিয়া আছে, সে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়া আছে। চীন তাহার মাথায় চাঁটি লাগাইতেছে, আর সে পিছু হটিতে হটিতে বলে—'মারবি, মার দেখি'—আর পঞ্চশীলের দোহাই পাড়িয়া উদ্ধার পায়। তাহার অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের এক মুষ্টিমেয় দল সমস্ত সভ্যজনোচিত আইন কানুন অমান্য করিয়া অন্ততঃ দশ দিনের জন্য গুণ্ডা-সাহী রাজত্ব চালাইয়াছে, তাহার শক্তি ছিল না যে তাহা রোধ করে। এ হেন ভারতবর্ষকে দলগত স্বার্থের জন্য, প্রচারকার্য্যে শক্তিদানের জন্য কোনও দেশ মুরুব্বিয়ানা করিতে আহ্বান জানায়। এই দৃষ্টান্ত প্রায় সকল শক্তিমান স্বাধীন দেশের পালনীয় হইতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পর আন্তর্জাতিক সমস্যা গাঢ়তর হইয়াছে। এই সকল রাজ্য শক্তিমান জাতির ক্রীড়নক হইয়া থাকিবে, হয়ত এরূপ আশা তাহারা পোষণ করে।

পৃথিবীর মঞ্চে ইহা সতরঞ্চ খেলার স্বরূপ। রাজা মন্ত্রী হয় হস্তী নৌকা পদাতিক সবই আছে, "মানুষে ঠেলিয়া না দিলে ইহারা চলৎশক্তিহীন, তাহাও আবার যে সোজা, কোণাকুণি, একপদ, আড়াইপদ যাইতে পারে, তাহার সেই বাঁধা পথেই চলিতে হয়।

ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এক একটী স্বতন্ত্র বারুদের স্তূপ। যেমন পূর্ব্বে ইউরোপের বলকান রাজ্যসকল কেবল যে নিজেদের মত যুদ্ধ করিত তাহা নহে, অপরের আক্রোশ মিটাইবার জন্য ইহাদের নানা অছিলায় রণে উদ্বুদ্ধ করা হইত, এই সব ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য নূতন করিয়া অশান্তির কারণ হইতে পারে। "বড়"র ঠাণ্ডা বা গরম যুদ্ধের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, ইহারই এক কণা কোন স্তূপে গিয়া বিভ্রাট ঘটাইয়া সারা বিশ্বে অগ্নি ছড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

অপরের অধীনে থাকিয়া সদাসর্ব্বদা বিপ্লবের সম্ভাবনা বহু পরিমাণ দূর হইয়াছে। এখন যাঁহারা শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান ধনের ধারক, সেই সকল দেশ ইহাদের সহানুভূতি লইয়া পরিচালিত করিলে জগতে শান্তি আসিবে। পরস্পরের প্রতি ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইলে আজ যে রণসজ্জা চলিতেছে, সকল স্বাধীন রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ আয় প্রতিরক্ষার নামে ব্যয় হইতেছে। তাহার প্রয়োজন হ্রাস পাইলে বহু অপব্যয় হইতে সারা পৃথিবীর দেশগুলি সমস্ত জগতে রক্ষা পাইবে। ইহাদের প্রতি-বৎসরের ব্যয়ের অর্দ্ধেক যদি অনুন্নত দেশের জন্য নিয়োজিত হয়, দ্বন্দ্বের, অন্ততঃ প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দূর হয়। তাহা হইলে পৃথিবীর চিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে। এই সকল রাজ্য এক স্বার্থে চালিত হইলে জগতে মানবের কল্যাণের সম্ভাবনা বেশী। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা অনাগত অনুরূপ কোনও "সঙ্ঘ"র মাধ্যমে হয়ত একদিন চিন্তাশীল ভগবৎ-বিশ্বাসী কর্ম্মবীরের সাহায্যে কবির কল্পনা দার্শনিকের আশা "এক মানবগোষ্ঠী, এক ধর্ম্ম ও এক ভগবান" বাণী সার্থক হইবে। সে অবস্থা একদিন আসিবে, সেই আশায় আজ "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"র মধ্যেও মানুষ কিছুটা স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছে।

বিফল প্রয়াস

গোপাল ভৌমিক

এখন তুমি চোখের জলে ভিজে
নিজের কাছে ছোট হবেই নিজে।
যাকে ভেবে ফেলছ চোখের জল
কখন বিরূপতার হলাহল
পান করে সে হয়েছে সব-ভোলা—
পরসমণি আছে শিকেয় তোলা।

দুয়ার খোলা ছিল যখন ভুলে
পরশমণি নাও নি কেন তুলে?

নিজের জ্বালা নিয়ে তখন তুমি
দেখনি তার মনের বনভূমি
পুড়ে পুড়ে হয় যে রোজই খাক—
কাছে থেকে দাও নি তখন ডাক।

দেহ মনের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে
আজকে যখন সে গিয়েছে দূরে
তখন তোমার চোখে ঝরে জল;
ওদিকে তার হৃদয়—শত দল

শুকিয়ে কখন হয়ে গেছে কালো,
মিছেই শুধু চোখের জল ঢালো!

গল্প

নরনারী

কৃষ্ণকলি

হাসপাতালের বড় ফটকটা দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল চারুবালা। গভীর উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। মাথার উপর প্রখর রোদের তাণ্ডব, আশে-পাশে মানুষের ভীড়, ঘাড়ের শিরাটা কঠিন হয়ে উঠেছে—যাক, মদনের ঘরে আর ফিরবে না চারুবালা। এই শেষ, জন্মের মত মদনের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাপড়ার এইখানেই ইতি।

ক্ষণকাল আগের ডাক্তারের কথাগুলো কানের মধ্যে শত শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। মদন ওর ভালবাসার মূল্য রাখলো না? কিন্তু কেন রাখলো না? চারুবালা ওর সঙ্গে কি শত্রুতাই করেছে, যার জন্য মদনের এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা?

অন্যায় পাপ কখনও গোপন থাকে? থাকে না। আজ ডাক্তার সবটুকু বলেছেন। বলেছেন—তোমার স্বামীর দোষেই তোমার এমন মরা-হাজা ছেলে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

ডাক্তারের কথা কিছু বোঝে নি চারু, বোঝার মত কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তার সুস্থ সবল ছেলে হচ্ছে না বলে মদনের কি দোষ থাকতে পারে—এ কথাটা ওর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল।

কিন্তু চারুবালার ফ্যালফ্যালে মুখের দিকে তাকিয়ে বাকি কথাটা ডাক্তার না বলেও থাকতে পারেন নি। বলেছিলেন—তোমার স্বামীর দোষ, মানে চরিত্রের দোষ আছে। সত্যি করে ছেলে চাইলে—শুধু তোমার নয়—তোমার স্বামীরও ভালমত চিকিৎসার দরকার।

একটা কথা, একটা শব্দ মাত্র—'স্বামীর চরিত্র-দোষ আছে'—মাথার মধ্যে দিয়ে শরীরের প্রতিটি স্তরে স্তরে ভূমিকম্পের মত দুলে উঠেছে চারুর। সুস্থ সুন্দর রমণীয় পৃথিবী মুহূর্তে রুক্ষ কঠিন বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। মদনের চরিত্র-দোষ আছে? তাহলে কি কোন খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায়। তাকে লুকিয়ে গোপনে এই সব করে। চারুকে ভালবাসা, প্রেম-দেখানটা নেহাতই ছলনা?

ভিতরের উন্মত্ত কান্নাটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করলো চারু। তিন তিনটে ছেলে-মেয়ে হল, একটা বাঁচলো না, কিন্তু কত সাধ, মনের কত আকুতি—কাণা হোক, খোঁড়া হোক—যা কিছু একটা হোক, চারুর যেন কোল-জোড়া হয়ে থাকে, মা বলে ডাকে।

কিন্তু কেউ থাকে নি, কেউ মা বলে ডাকেনি। এই সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাস একদিনের জন্য কেউ গ্রহণ করে নি। চারুবালার দুঃখ বেদনা সীমাহীন ছিল, শুধু কি তাই? নিজের পাবার চাইতেও আর যার কথাটা মনে পড়তো, সে মদন—মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তারও তো সাধ আছে, বাসনা আছে, অপদার্থ চারু তাকে কি দিতে পারলো?

আর এই কথাটা ভেবে নিজের ব্যথার চাইতেও লজ্জাটা যেন শতগুণ বেশী হয়ে উঠেছে। পরের ছেলে-মেয়ে নিয়ে যখনই মদন খেলা করতো, আদর করতো—দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে চারু, মনের মধ্যে মুচড়ে উঠেছে। গভীর লজ্জায় ঘৃণায় নিজের উপরই অশ্রদ্ধা জেগেছে। আর নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা জেগেছে। অপর দিকে মদনের উপর গভীর মমতায়, প্রেমে, ভালবাসায় সারা মন ভরে উঠেছে। মদনের মনে পিতৃত্বের আকুতি যতখানিই থাক, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেনি কোনদিন। মানুষটা চারুর অক্ষমতার জন্য একদিনও এতটুকু অভিযোগ তোলে নি।

আবার নিরুদ্ধ অভিমানে বুকের ভিতরটা উদ্বেল হয়ে উঠলো। ডাক্তারের গুরুগম্ভীর কথাগুলো সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যে মানুষ তার দেহের সঙ্গে, অস্থির

সঙ্গে মজ্জায় মজ্জায় মিশে গিয়েছে, যার উপর বিশ্বাস আর ভালবাসার বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসেনি কোনদিন—সেই মানুষ দিনের পর দিন তার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে ?

মধ্যাহ্নের সূর্য মাথার উপর আগুন ঢালছে। ঘনঘন পা চালাল চারু বাসার দিকে। সম্বন্ধের শেষ করার আগে, আর একবার মদনের ঘরে যাওয়া দরকার।

কিন্তু সারা অন্তর যেন ফেটে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। জীবন ভোর যত বেদনা যত গ্লানি—মদনকে পাওয়ার মাঝে যা ভুলে গিয়েছিল চারু—সেগুলো আবার নতুন করে মনে পড়ছে। যে মা-বাপকে জ্ঞানে কোনদিন দেখলো না চারু, তাদের কথা মনে পড়ে দুটো চোখ জল-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

মা বাপ নিতান্ত শিশু বয়সে মরেছে—জীবনে স্নেহ কি বস্তু কখনও জানে নি চারু। জ্ঞান হয়ে অবধি যাদের কাছে মানুষ হতে দেখেছে নিজেকে—তারা ওর কাকা-কাকী, তাও আপন নয়। কোথাকার কোন সম্বন্ধের সূত্র ধরে সেখানেও এসেছিল নিজেই জানে না। জীবনের মূল্য দিয়ে দেখেছে চারু, সেখানে স্নেহ ছিল না, প্রীতি ছিল না, মিষ্ট কোন সম্বন্ধ ছিল না, ছিল শুধু স্বার্থের সম্পর্ক এবং সে স্বার্থে আঘাত লাগলে—কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে এতটুকু দেরী হয় নি। কাকী ঠুকে ঠুকে মেরেছে, খেতে দেয়নি। অসহ্য যাতনায় কাঁদবার উপায় ছিল না চারুর—চোখের জল দেখলে কাকী বলতো—কেঁদে কেঁদে সংসারে অমঙ্গল ডেকে আনছে—তিনকুল-খাওয়া হতচ্ছাড়ি।

ভয়ে প্রাণভরে কাঁদতেও পারে নি চারুবালা।

আর সেই উদয়-অস্ত অমানুষিক খাটুনী আর নির্যাতনের মধ্যেই একদিন চারুবালা আবিষ্কার করেছিল। হঠাৎ তার উপর স্নেহের আধিক্য দেখাচ্ছে কাকা-কাকী। ভুল শুনেছে—কি স্বপ্ন দেখছে—প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে নি, কিন্তু অজানা কিছুই থাকে না, চারু শিগ্‌গীরই জানতে পেরেছিল—কাকার বাড়ী আর জায়গাজমি বন্ধক রাখতে হয়েছিল বড় মেয়ের বিয়ের সময়—যে মহাজনের কাছে জিনিষগুলো ছিল, সে টাকার বদলে তাকে চায়।

কাকা গদগদ ভাষায় কথা বলে, কাকী এটা ওটা খাওয়ায় এবং ঐ ভাবে ভালবাসার আতিশয্য দেখাতে দেখাতে একদিন সেই মহাজনের সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে গেল।

সব কথা ভাল করে মনে নেই চারুর ? আজ অনেক-দিন পর সেই অতি-পুরোন স্মৃতির আবরণ ওঠাতে চাইলো। মহাজন লোকটাকে যেদিন প্রথম দেখলো চারু—শুধু মনে হয়েছিল—মানুষ এমন কুৎসিত হয় ? ভালবাসা নয়, প্রেম নয়, শুধু সারা মন জুড়ে দুর্নিবার একটা ভয় সঞ্চিত করে তুলেছিল।

মহাজন লোকটা অনেক কাপড় গয়না দিয়েছিল, কিন্তু কাপড় গয়নায় কি মন ভরে ? তার মুখের টেনে-আনা মিষ্টি কথায় কোথাও আন্তরিকতা ছিল না। মানুষটার আকৃতিপ্রকৃতি ব্যবহার একমাত্র পশু ছাড়া আর কারো সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ভয়ে দিশাহারা চারুবালা গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো, ভগবানের কাছে মুক্তির পথ খুঁজতো। কারণ কাকার কাছে ভাবনা থাকলেও ভয় ছিল না, কিন্তু বিয়ের পর মহাজনের কাছে ভাবনা আর ভয় অহোরাত্র ওকে পাগল করে তোলার উপক্রম করেছিল।

কিন্তু সৌভাগ্য বলতে হবে, বেশীদিন এ দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি চারুবালাকে। মুক্তির পথ একদিন আপনি এসেছিল। একদিন বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কাকার সঙ্গে জোর ঝগড়া বেঁধেছিল মহাজনের—পরের দিন কোথা গিয়েছিল। দেখা গেল তার মরা দেহটা গ্রামের নদীর জলে ভাসছে।

চারুবালাকে ফিরে আসতে হয়েছিল কাকার কাছে। কিন্তু যাবার সময় যে চারুবালা গিয়েছিল, ফিরে এসেছিল যে—সে অন্য জন। এরপর প্রায় উঠতে লাথি আর বসতে ঝাঁটা খেয়েও কাকীর মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়নি চারুবালা। এক একটা দিন কাটা জীবনে বিড়ম্বনা হয়ে দেখা দিয়েছিল ? সকাল হলে মনে হ'ত, হয়তো রাত আর আসবে না, রাত এলে দিনের সূর্যোদয় আবার দেখা প্রত্যাশাটা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকতো।

এমনি করেই দিন কেটেছে। একান্ত একঘেয়ে দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে চারু উন্মনা হয়েছে। মনে হয়েছে জীবনে

কি আর বৈচিত্র্য আসবে না? এ দিনের কি শেষ হবে না? কালচক্র কি চিরদিন এমনই যাবে?

কিন্তু না, পরিবর্তন হয়েছিল, এসেছিল ওর জীবনে বসন্তের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের দিন।

চারুবালাদের গ্রামে, কাপাসডাঙ্গার বাণেশ্বর শিবের জন্মতিথিতে খুব জোর মেলা বসে। প্রতি বছর এ মেলায় নানান দেশ থেকে হরেক রকম জিনিষ নিয়ে লোক এসে জড় হয়। বাণেশ্বর শিবের অত বড় খালি মাঠ লোকে-জনে আলোয়-বাজনায় অন্য রকম হয়ে যায়। তিনদিনের জন্য মেলা সেবারও বসেছিল, বোধ করি অন্যান্য বারের তুলনায় কিছু বেশী জম-জমাটও হয়ে থাকবে। কত যে গয়না কাপড় খেলনা বাজী তেলে-ভাজা মিষ্টি খাবারের দোকান বসেছিল তার ইয়ত্তা নেই। তিনদিনের মেলায় লোকজনের ভীড় লেগেছিল তিন সপ্তাহ আগে থেকে।

সেবার সমস্ত পাড়ার মানুষ-জন ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল মেলায়। চারুবালাও না যেয়ে থাকে নি। একদিনের জন্তে কোথাও একটু যাবার দরকার হলে কতখানি যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হত—সে এক চারুবালাই জানে। হাতের কাজ শেষ করে কুল কিনারা পায় না—কাকী তারই মধ্যে আরও একটা কাজের ভার চাপায়। চারু তাই করেছে। ঘরের কোন ছাড়া বাইরের জগতের একটু সামান্য জিনিষ দেখার আশায় মনের উৎসাহে চারু জীবন দিয়ে কাজ সেরেছে। তারপর—হাতের কাজকর্ম সমস্ত কিছু শেষ করে দুরু দুরু বুকে—মেলায় যাবার জন্তে তৈরী হয়েছে, চারু একলাই যায় না, কাকার ছেলে-মেয়েরাও যায়—কাকীও বাড়ী থাকে না।

সারা বছরে মাত্র একটা দিনের ঐটুকুই বিলাস ছিল চারুবালার অতি ছোট্ট জীবনে।

অন্য বছরের মত সেবারও গিয়েছিল চারুবালা মেলায়। প্রত্যেক বছর কাকা নিজের ছেলে মেয়েদের কিছু কিছু পয়সা দেয় হাতে—পছন্দ মত এটা সেটা কেনার জন্তে। সবার কি খেয়াল হয়েছিল কাকার—ওকেও ডেকে দুটো পয়সা দিয়েছিল।

পয়সা হাতে পেয়ে চারুবালার আনন্দের সীমা ছিল না। স্বাধীনভাবে কেনাকাটা করতে পারার আনন্দে সারা মন ভরে উঠেছিল, মনে হয়েছিল দুপয়সায় সারা মেলার জিনিষ কিনে ফেলে। কিন্তু কোন কিছু করতে হয়নি। চারুবালাকে থাকতে হয়েছিল, একটা ছোট্ট চালার কাছে। তেলেভাজা হচ্ছে। একটা মস্ত উনুনে বিরাট এক কড়া তেলে গরম গরম আলুর চপ বেগুনী ফুলুরী ভাজছে যে লোকটা তারই সামনে।

চারুবালার নজর ছিল, উনুনের কড়ার উপর, ফুলুরী ভাজার কায়দাটা ওর ভারী ভাল লেগেছিল, কিন্তু ফুলুরী ছেড়ে চারুবালার চোখ একসময় ফুলুরী ভাজা লোকটার দিকে উঠতেই—ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা কড়ার মধ্যে ঝাঁঝরি করে জিনিষপত্র ভাজছে, আর ওর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে।

সারা শরীর অদ্ভুত এক আবেগে রোমাঞ্চে কেঁপে উঠেছিল চারুর। প্রথমবার দেখে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয়ই ভাল নয়—নতুবা ওর দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকবে কেন? সুতরাং ওখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত, কিন্তু চলে যেতে যেয়েও চলে যেতে পারেনি চারু-বালা। লোকটার চোখের দিকে চেয়ে, মাটির সঙ্গে পা দুটো ওর আটকে গিয়েছিল। লোকটার চোখে সম্মোহন ছিল, সুতরাং পিছন ফিরে চলে আসার বদলে, চারুবালা আরও দুপা এগিয়ে গিয়েছিল, গায়ে কাপড় টেনে তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ধরেছিল।

ফুলুরী ভাজা লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—নেবে নাকি?

চারুবালার মুখে কথা সরে না—একপয়সায় কখানা বেগুনী?

—দু'খানা। লোকটা পরিচিতের মত একগাল হেসে-ছিল, নেবে?

—দাও এক পয়সার।

কোনমতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ান চারুর হাতে লোকটা শালপাতায় মোড়া বেগুনীর ঠোঙাটা গুঁজে দিতেই চারু আঁচল খুলে একটা পয়সা দিতে গিয়েছিল, মানুষ এত ভাল হয়? মানুষ এমন মিষ্টি সুরে কথা বলে? হাসে? একবারের দেখাতেই এমন আপনজন হয়ে ওঠে।

চারুবালার লজ্জারক্ত মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল লোকটা। বলেছিল—খাওনা, গরম আছে। খেয়ে ফেল, মিথ্যে ঠাণ্ডা করে লাভ কি!

তবু চারুবালার মুখে হাত ওঠে না ! মানুষ জন আসছে যাচ্ছে, জিনিষপত্র কেনাকাটা হচ্ছে, চারুবালা চেয়ে দেখলো কাকার ছেলে-মেয়েরা অনেক দূর চলে গেছে ওকে ছেড়ে। চারু তাকিয়ে দেখলো কিন্তু ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গ নিল না। একবারও মনে ভয় হল না, ভয় আসেনি, চরম লাঞ্ছনার।

লোকটা চারুকে সামনের উঁচু ঢিবিটা দেখিয়ে বলেছিল, বসো। বসে বসে খাও, মেলার চারদিক সব দেখাশোনা হয়ে গিয়েছে ?

মুখ নিচু করে রোমাঞ্চিত চারু ঘাড় নেড়েছিল—একদিনে কি সব দেখাশোনা হয় ?

—তাহলে আবার কাল আসবে ?

—কি করে আসি, কাকীটা ভালমানুষ নয়, কোথাও যেতেটেতে দেয় না, শুধু খাটায়। আজ এখানে এসেছি কি কম কাণ্ড করে।

আজ এক নজরের দেখা, অপরিচিত পথের মানুষ তেলেভাজাওলা। কোথায় ও থাকে, কোথায় ও যাবে—কিছু জানে না চারু—কিন্তু সেই সামান্যক্ষণের দেখাতেই চারুবালার মনে হয়েছিল—ঐ মানুষটা ওর একান্ত আপনজন আত্মজন—ও ছাড়া আর কেউ নেই চারুর, ছিলনা কোনদিন। চারুবালার মনে হয়েছিল, হৃদয়ের সকল বদ্ধ দুয়ারগুলো খুলে ধরে। সে আর এমন করে বাঁচতে পারছে না, তাকে কেউ আড়াল করে ধরুক, আপন করে গ্রহণ করুক—চারুবালা তাকে ধরে একান্ত নির্ভয়ে পরগাছার মত বেড়ে উঠবে। জীবন যেমনভাবেই কাটুক, জীবনের ভার একজন নিলেই নিশ্চিন্ত, তার চাইতে বেশী চাইবার আর কিছু নেই তার।

লোকটা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেছিল,মা বাপ নেই বুঝি ?

—থাকলে এমন করে কষ্ট দেয় পরে ?

—তা বেশ। আমারও কেউ নেই। লোকটা মহা স্ফূর্তিতে হেসেছিল, কাকা বিয়ে দেয়নি কেন ?

—তাও দিয়েছিল। একটা সুদখোর বুড়ো, মহাজনী কারবারে কার সঙ্গে যেন ঝগড়া-বিবাদ করেছিল—তারা খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—

সত্যি নাকি ? লোকটার চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি, তোমার ত তাহলে বড় কষ্ট।

বুকের মধ্যে যে ক্ষত ছিল, লোকটা একেবারে সেই জায়গায় হাত দিয়েছে, সান্ত্বনা সহানুভূতির প্রলেপে, ক্ষতের রক্ত চোখের দুকূল ছাপিয়ে নেমেছিল। লোকটা আস্তে বলেছিল—ছিঃ কাঁদতে নেই। এই দেখনা, আমারও ত কেউ নেই, নেই তো কি বয়ে গেল।

কেউ না থাকাটা যেন বড় মজার ব্যাপার, চারু হেসে ফেলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার দেশ কোথায় ?

কলকাতা কোথায় জান ?

—জানি না আবার ! কলকাতাতেই তো থাকি ! লোকটা তেলে-ভাজা ভাজতে ভাজতেই কথা বলছে, এক বড় লোকের গাড়ী বারান্দার তলায় এই সব ভাজা-ভুজি করি, আবার ইচ্ছে হলে এসব মেলার খবরাখবর পেলে সেখানেও যাই। অঢেল রোজগার। কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ? কুড়িয়ে নিতে জানলেই হল।

অজানা মানুষটির আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে চারুবালা কি করবে দিশে পায় না। মিনতি করে বলেছিল, কলকাতায় আমার একটা চাকরী হয় না ? বাসন মাজা, বাটনা বাটা, আমি সব কাজ পারি। টাকা-কড়ি যদি না দেয় নাই দিক, শুধু দুটি খেতে আর পরতে দেবে—তা হলেই আমি সেখানে যাই। এখানে আর ভাল লাগছে না থাকতে, মাঝে মাঝে মনে হয় পালিয়ে যাই কোথাও ! এত কষ্ট কি সহ্য হয় ?

—তা তো বটেই ! লোকটা ঘাড় নাড়লো। তা কলকাতায় চেষ্টা-চরিত্র করলে হতে পারে বাসন-মাজার কাজ। সব বাবু লোকেরা থাকে তো কলকাতায় বেশী—ঝি-চাকর তাদের সব সময়ই দরকার। তুমি যাবে কলকাতায় ?

লোকটা প্রত্যাশা ভরে চাইলো। সেদিকে তাকিয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি শির-শিরিয়ে উঠেছিল চারুর। চারুর তখন বয়স হয়েছিল, বুঝতে শিখেছিল লোকটার চোখে প্রেমের সুধা মিশান আছে। চারু চোখ নীচু করেছিল, জবাব দিতে গলার স্বর কেঁপে গিয়েছিল, বলেছিল—যেতে তো চাই, কিন্তু যাব কার সঙ্গে ?

—কেন, আমার সঙ্গে যাওয়া যায় না ? আমি যদি নিয়ে যাই।

—তুমি নিয়ে যাবে ? সঙ্গে করে ? আবেগে

উত্তেজনায় থরো থরো কেঁপেছিল চারু। বিশ্বাস হয় না, সত্যি তুমি নিয়ে যাবে ?

—সত্যি সত্যি সত্যি! লোকটা হাসতে হাসতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—তোমার নাম কি ?

—চারুবালা দাসী।

—বাঃ, চমৎকার নাম। সুন্দর নাম। আমার নাম মদন।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না চারুর চোখে। চারুর মনে হয়েছিল। এ মদন সাধারণ মদন নয়। তাদের কাপাসডাঙ্গার মদনমোহন ঠাকুরই যেন তার দুঃখে সদয় হয়ে ভালবাসার সুধাপাত্র নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সন্ধ্যার আঁধার অনেকক্ষণ হলো নেমে এসেছে। গ্যাসের আলোয় সমস্ত মেলাটা অন্ধকার আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন; নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও উঠে দাঁড়িয়েছিল চারুবালা। আপন জনের কাছে বিদায় নেবার মত করে বলেছিল, এবার তবে যাই ?

—এস! কলকাতায় যদি কাজ নিতে চাও আমার সঙ্গে দেখা করো, আমি এখানেই থাকবো দুদিন।

ঘাড় নেড়ে চারুবালা পথে নেমেছিল, অন্ধকার পথে চলতে সঙ্গীহীন চারুর মনে হয়নি—ওর কপালে আজ অশেষ নির্যাতন আছে। কাকার ছেলে-মেয়েরা বহুক্ষণ সঙ্গ ছাড়া। চারু সাহসে ভর করে একলাই অগ্রসর হলো।

ঘাড়ের শিরাটা কঠিন হয়ে উঠেছিল, মেরুদণ্ডটা সোজা। পৃথিবীতে ভয় বলে যে একটা বস্তু আছে সে কথা চারুর মনে হয়নি একবারও, কারণ যে চারুবালা মেলা দেখতে এসেছিল এবং যে চারুবালা ফিরে যাচ্ছে—ওরা দু-জন বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিল। সারা মন এক অপার অনির্বচনীয় আনন্দে রোমান্সে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। অনাস্বাদিত এক পাওয়ার আস্বাদে দুর্নিবার হয়েছিল চারুবালা সেদিন।

বাড়ী ঢোকার মুখেই হোঁচট খেল চারু। কানে গেল কাকী চারুবালার নামে কাকার কানে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম কটুক্তি প্রয়োগ করছে। কাকীর ছেলে-মেয়েরা রসান দিচ্ছে। ওরা মদনের সঙ্গে চারুর ঘনিষ্ঠতাটুকু নিজের চোখেই দেখে গেছে।

এমন করে একখানা কথা সাতখানা করে লাগানো নতুন ঘটনা নয়—অন্য দিন হলে চারুবালা হিম-শীতল হয়ে যেত, সেদিন তা হয়নি। বরং সুদৃঢ় পায়ে সাহসে ভর করে বাড়ীতে ঢুকেছিল—যা হবার হয়ে থাক।

কাকা চারুকে দেখে রণহুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে এসেছিল, দু-হাত দিয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরে ঝাঁকিয়েছিল—কোথায় ছিলি এত রাত অবধি ? পর-পুরুষের সঙ্গে পিরীত! লাথি মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদি।

শুধু মুখের কথায় কাকী সন্তুষ্ট নয়, ইন্ধন জুগিয়েছিল পুরোদমে, মরণদশা তোমার, ও বিষের ঝাড় কি শুধু মুখের কথায় হবে ভেবেছ ? জাত-জন্ম যদি বাঁচাতে চাও তবে মুখের কাজ হাতে কর, ছেলে-পুলে সমাজ নিয়ে আমাদের বাস করতে হয়।

—নিশ্চয়ই! কাকার হাতের মুঠোভরা চুল উঠে এসেছিল। তবু রেহাই দেয় নি, দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে শাসিয়েছিল—বল আর কোনদিন কোথাও যেতে চাইবি ? খাবি-দাবি ঘরের কাজ নিয়ে থাকবি—দুধ-কলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছি এত কাল, এখন ফণা ধরে জাত মারতে চাও।

মনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন উঠলে, শাসন করে সেখানে বাঁধ দেওয়া যায় না, দিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একপক্ষ যত কঠিন হয়—অপর পক্ষের জন্য মন তত কাঁদে, তত ছুটে চলে, ঠিক এমনই হল চারুবালার। কাকার প্রহার, কাকীর নির্যাতন সেই কিছু নতুন ছিল না—প্রায়ই অমন ঘটনা ঘটেছে। অন্য সময় হলে নিজের জীবন বাঁচানর কথাই সব চাইতে আগে মনে পড়ে। মনে হয় কি করে ওদের প্রসন্ন করবে চারু, কি ভাবে সহজ সরল হয়ে ওদের সঙ্গে মিশবে, ওদের দয়ার প্রসাদে নিজের জীবন ধন্য করবে—ওরা ওর সকল দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে আবার আগের মত গ্রহণ করে ধন্য করবে চারুকে—এই কথাটাই মনে হয়।

কিন্তু সেদিন তা হয়নি, চারুবালা সেই প্রথম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিন বুঝেছিল পিছনে নিঃস্বার্থ প্রেম থাকলে সকল কাজে সকলের মাঝে মানুষ এমনই দুর্বার হয়ে ওঠে। ঘরকে তুচ্ছ করে যারা পথকে সম্বল করেছে তাদের পিছনে ছিল নিঃশঙ্ক প্রেমের হাতছানি।

গভীর রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে চারুবালা ছেঁড়া দুখানা কাপড় গামছায় বেঁধে পথে নেমেছিল। যাকে চেনে না, জানে না—মাত্র ক্ষণিকের পরিচয়—সেই পথের মানুষের অনিবার আকর্ষণে চিরদিনের জন্য ঘর ছেড়েছিল দুঃসাহসিনী চারুবালা, একবারও মনে হয়নি, যার উপর এতখানি বিশ্বাস রাখলে সে তার যথাযোগ্য পুরস্কার দেবে কিনা।

দিনের বেলার রঙ্গীণ মেলা—রাত্রির কোলে ঘুমে অচেতন। চারুবালা ভীরু পায়ে দুরু দুরু বুকে খুঁজে বেড়িয়েছিল তেলে-ভাজা মদনকে। অন্ধকারে মানুষের ভীড়ের গাদা থেকে মানুষ চিনে বার করা এক ভীষণ দায়। তবু বহু কষ্টে কৃতকার্য হয়েছিল চারু। উনুনের অল্প অল্প আঁচ তখনও অবশিষ্ট, তারই আভায় খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল মদনের। উনুনের পাশে হাতা-খুন্তি আর কড়ার মাঝখানে ছেঁড়া চটের উপর গভীর প্রশান্তিতে ঘুমুচ্ছে মানুষটা। ডাকেনি চারু, পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, সারাদিন অনেক খাটে লোকটা, একটু ঘুমাক।

কিন্তু না, জেগে উঠেছিল মদন, ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ঘুম-ঘুম চোখ আর অন্ধকারে মানুষ চিনতে পারেনি, শুধু হাতখানা চেপে ধরেছিল, মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল—কে, কথা বল না কেন?

ফিসফিসিয়ে চারুবালা উত্তর দিয়েছিল—আমি, চারুবালা দাসী, তোমার কাছে এসেছি, আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে?

পরম আশ্বাসে আত্ম-সমর্পিতাকে বুকের সঙ্গে বেঁধেছিল মদন—যাব, নিশ্চয়ই যাব।

পরের দিন, রাতের আঁধার তখনও কাটে নি। চিরদিনের মত কাপাসডাঙ্গাকে পিছনে ফেলে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে ছিল দুঃসাহসিনী প্রেমিকা চারুবালা।

মদন ওকে এনে তুলেছিল কলকাতার উল্টোডিঙ্গির এক বস্তির আস্তানায়। বহু লোকের একত্র বাস। কলহ চেঁচামেচি, নোংরা আর অশ্লীল কটূক্তির মাঝেই মদনের এতটুকু একটু খুপরী ঘর। অনেক ইঙ্গিত ইসারা আর রহস্যময় চাহনীর রাস্তা মাড়িয়ে মদন ওকে ঐ ঘরেই এনে তুলেছিল। বলেছিল—এই নাও তোমার ঘর।

—আমার ঘর? ভয় আর আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল চিরবাঞ্ছিত চারুবালার দুটো চোখ। মনে হয়েছিল পৃথিবীতে এর চাইতে বড় পাওয়া বুঝি আর কিছুতে নেই।

চারুর ভয় আর বিশ্বাস দেখে মদন হেসেছিল। বলেছিল—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা? সত্যি গো, এতদিন এ ঘর আমার ছিল, আজ থেকে তোমার। আমি খাব-দাব, আর কাজ-কর্ম করবো।

বিস্ময়ে পুলকে মাখামাখি চারু ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। হাত পাঁচেকের একখানা কুটুরী—মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, টিনের চালা, জানলাবিহীন একটা ছোট কামরা। আসবাবের মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুর, তেলচিটে বালিস, কয়েকটা কৌটো, একটা ধোঁয়ায় মলিন হাঁড়ি গড়াগড়ি খাচ্ছে।—এই তার ঘর—এই তার সাম্রাজ্যের অধিক মহাসম্পদ। যা আজ অবধি হাত তুলে কেউ দেয়নি—তাই দিয়েছে এই মানুষটা, সামান্য এক শহরের কথায়—প্রেম এত সুন্দর হয়।

কিন্তু মধ্যে একটা বড় সংকোচ কোথা ছিল। মনে হয়েছিল যেখানে ভালবাসা, এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে হৃদয় বাঁধার কাছে পবিত্রতা কোথায়? সাক্ষী কোথায়?—সে তো রাতের আঁধারে পালিয়ে এসেছে। প্রেমের মাঝে গোপনতা থাকবে কেন, অন্ধকার থাকবে কেন?

চারুবালা বলেছিল—ঘর কি করে আমার হবে, তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয় নি?

—তাতে কি হল? মদন হাসতে হাসতে নির্ভয়ে বলেছিল—নাই বা হল বিয়ে, ভালবাসাই আসল।

—তা হয় না, লোকে যে বলবে?

চারুর দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়া দেখে মদন দ্বিতীয় কথা বলে নি। দোকান থেকে সিঁদুর কিনে এনে চারুর মাথায় লাগিয়ে দিয়েছিল। এ কাজে সাক্ষীও ছিলো—পাড়ার রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বিগ্রহ আর পুরোহিত।

আর সেই সিন্দুর পরার দিন থেকে আজ অবধি অব্যাহত জীবন কাটাচ্ছে মদন ঘোড়ুই আর চারুবালা দাসী। দুজনের মধ্যে কোনদিন এতটুকু অবিশ্বাসের বিন্দুবাষ্প ওঠেনি, দুজনের মধ্যে কোনদিন ছাড়াছাড়ি হয় নি—একজন একজনকে না দেখলে পৃথিবী দেখে অন্ধকার।

এই এদের জীবন, এই এদের স্বর্গ। কিন্তু সেই স্বর্গ আর বিশ্বাসের পর্বতে ফাটল ধরলো আজ। ছেলে হয়ে কেন বাঁচে না। কেন সুস্থ সবল ছেলের জন্ম দিতে অপারগ হচ্ছে চারু, সেইটা জানতেই দিনের পর দিন হাসপাতালে ছুটোছুটি করেছে—দেখিয়েছে এবং সমস্ত কিছু দেখে শুনে ডাক্তার যে মন্তব্য করলেন তাও শুনলো। চারুর দোষ নয়, মদনের চরিত্র দোষেই রোগ আছে—আর তারই ফলে ওর পেটের ছেলেদের রুগ্ন জীর্ণ ও অকাল-মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে বার বার।

আঁচল দিয়ে চোখের জলটুকু মুছে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলো চারুবালা। এখানে ঢোকার এই শেষ, যা কিছু সামান্য জিনিষ আছে গুছিয়ে নিতে হবে—মদনের সঙ্গে সম্বন্ধের এইখানেই ইতি। মদনের সঙ্গে আর কোন দরকার নেই। এতদিন আর কিছু না থাক—চারু জানতো মদনের অপার ভালবাসা আছে, কিছু না পাওয়ার মধ্যে সেই টুকুই ছিল সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। কিন্তু না, বিচারে ভুল হয়েছে! ভালবাসাটা ভ্রান্ত। এতদিন চোরা-বালির উপর দাঁড়িয়েছিল চারু, এবার আবার নতুন করে পথে নামতে হবে তাকে।

বামুন বাড়ীর পুরোন চাকরটা চলে যাওয়া অবধি ওরা ধরেছে চারুকে, চাকরের রাতদিনের কাজ ওকে নিতে বার বার বলছে। বামুনদের একান্নবর্তী সংসার, কলকাতায় আসা অবধি চারু ঐখানেই কাটিয়ে এল। বাসন মাজা, বাটনা বাটা, জল তোলা—অনেক কাজ। খেতেও দিতো ওরা দুবেলা, থাকতেও বলে এসেছে এতদিন। শুধু চারুবালাই পারে নি মদনকে ছেড়ে থাকতে। সুখে দুঃখে দুটি প্রাণ এক হয়ে মিশে ছিল এক জায়গায়। বাবুদের বাড়ী থেকে গামছায় ঢেকে ভাত এনেছে চারু, রকে বসে তেলেভাজার উদ্বৃত্ত অবশিষ্টাংশ এনেছে মদন। দুজনে দুজনের জিনিষ এক সঙ্গে করে ভাগাভাগী খেয়েছে, একজন একজনকে না দিয়ে কিছু মুখে দিতে পারেনি কোনদিন।

চারু ঘরে ঢুকে দেখলো, মদন নেই। দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ে ওর কড়া খুন্তি হাতা বারকোষ উনুন নিয়ে পথে। ফেরে সেই সন্ধের পর। সেদিনও গেছে। ওর খাওয়া থালা বাসনগুলো পড়ে রয়েছে, চারু সে সব গুলো মেজে ঘষে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখে ঘরে শিকল দিয়ে বেরিয়ে এল। বামুন বাড়ী যেতে হবে। থাকার ব্যবস্থাটা আজ থেকেই পাকা করা উচিত।

দুখানা কাপড় গামছা গুছিয়ে নিল চারু। পাশের ঘরে থাকে মনায়ের মা। সামনে চেয়ে দাঁড়াল। বললো মনায়ের মা, তোর দেওর এলে বলিস—আমি বামুন-বাড়ীতে রাতদিনের কাজে লেগে গেছি। ঘরে ফেরা আমার হবে না।

কথা শুনে মনায়ের মা অবাক বিস্ময়ে ফিরে চাইলো—বলিস কিরে চারু। দেওরকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

—মরণ। তোর দেওরকে কি আঁচলে বেঁধে রেখেছি যে ছেড়ে থাকতে কষ্ট লাগবে?

মনায়ের মায়ের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে পথে নামলো চারু। দীর্ঘ দিনের স্নেহের বন্ধন ঘর খানার ইটের পাঁজরে পাঁজরে জড়িয়ে গিয়েছিল। আর শুধু কি ঘর—ঘরের মানুষটি নয়? মদনকে ছেড়ে আসার নামে তত্ক্ষণে চোখের দুকুল ছাপিয়ে জল নামলো। তাকে ছেড়ে কাকে ভালবাসে মদন? বহুরূপীর জাত ওরা, নয়তো যে চারুকে পারে তো বুকের খাঁচায় রাখতে চায়, সেই মানুষ—সেই কিনা, অন্য মেয়ে মানুষের কাছে যেয়ে চরিত্র খুইয়ে বসে আছে। বেশ, মদন যেন তাই যায়—কিন্তু পাপ কি চাপা থাকে? যে করে হোক ধরা পড়েই একদিন—শুধু মাঝখান থেকে চারুরই যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেল। কেউ এল না তার কোলে, কেউ মা বলে ডাকলো না। জীবনের কত বড় আকাংখা পুরণ হল না। এমন করে কেন মদন তার ক্ষতি করলো? ভালবাসা ছাড়া সে তো মদনের কোন অনিষ্ট করে নি।

বামুন-বাড়ী এসে চারুবালা সোজা গৃহিণীর কাছে যেয়ে দাঁড়াল। বামুন গিন্নি বিকেলে এ সময়ে ঠাকুর-ঘরে শীতল দেবার ব্যবস্থায় থাকেন। চারুবালা ডাকলো—মা।

গৃহিণী পিছন ফিরে ডাকলেন—চারুবালা? কি বলছিস?

—আমি আজ থেকেই এখানে রাতদিনের জন্য থাকবো মা!

—বেশ তো, থাক। গৃহিণী ঘাড় নাড়লেন।—আমার

তো থাকতেই বলছি। তুই তো বাপু ঘর ছেড়ে একবেলা থাকতে পারিস না।

চারুর কালো মুখ বেগুনী হয়ে উঠলো। এ অপবাদ সে আর রাখবে না জীবনে।

বামুন-বাড়ীর একান্নবর্তী পরিবার। মস্ত সংসার। কাজেকর্মে সময় কাটে কোথা দিয়ে—বোঝার উপায় নেই। চারুবালা অনলস হাতে কাজ করে, মদনকে ভুলতে হবে। পাপী, পরাসক্ত, যার চরিত্র নেই—তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না চারু।

কিন্তু মনের সে সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকছে কোথা। যাকে ভুলতে চায় সে যে বড় কাছে এসে দাঁড়ায়।—সারা মন জুড়ে তার ছবি সকল কাজে বাধা সৃষ্টি করে—চারুবালা দুর্বল হয়ে পড়ছে। সংসারের অফুরন্ত কাজের মধ্যে একটা মানুষের মুখ সব সময়ই দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে। দুটি বলিষ্ঠ বাহু অহরহ আকর্ষণ করছে তাকে। রাতে ঘুম নামে না দাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুয়ে, সারা রাত বিনিদ্র কাটে চারুবালার।

যাবে নাকি চারুবালা ফিরে? না হয় একদিন চুপি চুপি যেয়ে দেখে আসবে। কি করছে মানুষটা। রাগ করেছে হয়তো! অভিমান? আবার হয়তো কিছুই নয়। কোথায় কোন মনের মানুষ বসে আছে।—সেখানেই দিন রাত কাটাচ্ছে, চারুবালা না থাকায় সুবিধেই হয়েছে।

মানসিক দুশ্চিন্তায় এক সপ্তাহ কাটলো। এরই মধ্যে একদিন—এ বাড়ীর ছোট বউএর ছেলে নিয়ে ছাদে উঠেছে চারু, শরীর ভাল না থাকায় অবিরাম কেঁদে চলেছে ছেলেটা। তাকে ভুলাতেই ছাদে ওঠার প্রয়োজন। কৃত্রিম বাঘ ভাল্লুক পশু পাখী দেখাতে দেখাতে চারুবালা ছাদের পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়াল। চওড়া রাস্তাটা সামনে দিয়ে সমান যেয়ে বাঁক নিয়েছে অদূরে—সেই বাঁকের মাথার এক বাড়ীর রকে অতি-পরিচিত একটা চেনা মূর্তি বসে রয়েছে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে এ বাড়ীর পানে।

ধ্বক্ করে উঠলো চারুবালার বুকের মধ্যে। একটা নিরুদ্ধ উত্তেজনায় পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি থর থরিয়ে কেঁপে উঠলো। ভুল নয়। ভুল দেখেনি চারু—মদনই বসে আছে নিঃসন্দেহে। নিষ্পলকে চেয়ে আছে এদিকে।

এক অপূর্ব আনন্দে উচ্ছাসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো চারুবালা। কতদিন—যেন কত যুগ ধরে ঐ চির-চেনা ছায়া মূর্তিটা দেখেনি চারু। সারা মন—যাবে কি যাবে না এই দ্বন্দ্বে তোলপাড় করে উঠলো। না যাওয়াই উচিত। মদন বিশ্বাসহন্তা। বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে ছাদের পাঁচিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অদূরে রাস্তার আলোয় যে নিস্পন্দ মূর্তিটা এতদূর হতে নজরে আসছে—যার হাতধরে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনার অসহ্য ব্যথা বেদনার সমুদ্র পার হয়ে নিবিড় ভালবাসার কূলে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন—তাকে কি ছেড়ে থাকতে পারবে চারু চিরদিনের জন্যে? না, পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

ছাদ থেকে নেমে এল চারু। সামনের বারান্দায় গৃহিণী বসে আছেন নাতি-নাতনী নিয়ে, গল্প করছেন, চারু এসে সামনে দাঁড়াল।—মা, একবার বাড়ী যেতে চাই।

তার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? গৃহিণী রসিকতা করলেন।

চারুবালা সলজ্জে জিভ কেটে প্রণাম করলো।—তা নয় মা, ঘর সংসারের কেমন কি হচ্ছে একবার দেখে আসা দরকার। কাল সকালেই আবার আসবো।

গৃহিণী সম্মতি জানাতেই দ্রুত পায়ে চারু নেমে এলো জনাকীর্ণ রাজপথে। ঘোমটা দীর্ঘ করে প্রায় উড়ে চলে এলো চারু মদনের সামনে। যেন কিছুই হয়নি। এমন করে প্রশ্ন করলো—তুমি এখানে।

—তুই-ই বা কেন এখানে।

—আমি তো আছিই।

এক গাল হাসলো মদন—আমিও তো রোজই আসছি—মনে করি তোর সঙ্গে দেখা করবো। রাগ করে কেন এলে এটুকু তো জানতে ইচ্ছে—কিন্তু তুই যেন ডুমুরের ফুল চারু, একদিনও দেখতে পাই না।

—দেখতে পাবে কি করে। আমি থাকি বাড়ীর মধ্যে। এতদূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়?

—কাপাসডাঙ্গায় আরও দূরে থাকত চারু, দেখা হয় নি?

মুখখানা ঘুরিয়ে নিল চারু—কথা বলার সময় মদনের সামনে পোড়া চোখের জল কিছুতেই দেখাবে না।

চারুর নীরবতায় প্রাণ ভরে হাসলো মদন—বুঝলি চারু, মনের টানই হচ্ছে সব চাইতে বড় টান। সেই টানের জোর থাকলে সাধ্যি কি, তুই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকিস।

তাই তো, মনের অদৃশ্য আকর্ষণই সব চাইতে বড় আকর্ষণ। সামান্য ক্ষণের দেখা এই মানুষটার কাছে জীবনে সেই পরম সত্যের পাঠ একদিন নিয়েছে চারু। জেনেছে মনের আকর্ষণ কি বিচিত্র—মুহূর্তের দেখায় ঘরের বার হয়ে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে সেই যে ভেসে পড়েছিল—সে তো মনেরই আকর্ষণে।

চারুবালার নীরবতায় মদন সস্নেহে ওর হাত ধরলো, চারু বোস, সেদিন কেন না বলে চলে এসেছিলি?

—সে অনেক কথা।

চারু বসলো না মদনের পাশে। জায়গাটা লোকে জনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মদন বুঝলো চারুর মনের কথা। বললো—তবে ঘরে চল যাই।

চারু মিথ্যে বললো, কি করে যাব ঘরে, কাজকর্ম সব ফেলে এসেছি!

—তা হোক, তোর ঘরে তুই একবার চল দেখি, মদন মিনতি করলো—তোর জন্যে রোজ ভাত রাঁধি, আর মনে করি বুঝি তুই আসবি। তা এক হপ্তা হয়ে গেল একদিনও এলি না।

চোখের দুকুল ছাপিয়ে আবার জল নামলো চারুর। বললো—তবে, ঘরেই চল, এখানে বসে কথা বলা যায় না।

ওরা দুজন ফিরে এলো পুরোন বাসার কোটরে। মদন দেশলাই জ্বেলে সন্ধ্যে দেখাল। চারুবালা ঘরের সব দিকে দৃষ্টি ফিরাল। যেটুকু দেখলো—তার সবটুকুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। চারুর এমনই পছন্দ! তাই বরাবরের অ-গোছালো মদন এমন কর্মনিপুণ হয়ে উঠেছে।

আলো জেলে চারুর পাশে ফিরে এল মদন। হাত ধরলো, বললো—ঘোমটা খোল, দুদিন বাবুদের বাড়ী থেকে তুই যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছিস চারু!

—হবোই তো! চারু মৃদু গলায় ঝংকার দিল, তুমিও নতুন হয়েছ।

—কেমন করে হলুম?

—যেমন করে সবাই হয়!

চারুর শুষ্ক কথার মধ্যে কোনরকম রাগ অভিমান বা বিরক্তির লক্ষণ দেখতে পেল না মদন। চারুর কথার ধারা নতুন কায়দা ও দূরের মানুষের মত, মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে মদনের দেরী হল না, ও বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। বললো, এর মানে? তুই কি সব বলছিস রে চারু?

—যা সত্যি তাই বলছি। তুমি নতুন হচ্ছো আমি তো পুরোনই আছি, আমায় তোমার তাই ভাল লাগেনা।

মনের মধ্যে চারুর আরও অনেক কথা ছিল কিন্তু তার সবটুকুই শেষ করতে পারলো না। মদনের বেদনা-কাতর অভিব্যক্তি ওকে বিচলিত করে তুলেছে।

মদন মনের সমস্ত বিস্ময় চাপা দিয়ে জানতে চাইলো, কি হয়েছে তোর, সব কথা খুলে বল তো শুনি! কে তোকে কি বুঝিয়েছে? সেদিন কাজ থেকে ফিরে এলে মনায়ের মা আমায় ঘরের চাবি দিয়ে বললো, হাসপাতাল থেকে ফিরে একদম বসিস নি তুই—সোজা নাকি এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছিস। কথাটা শুনে অবধি ভাবছি নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে তোর। কি হয়েছে রে চারু?

মদনের আগ্রহভরা প্রশ্নে চারু মাথা নাড়লো, কি আবার হবে, কিছু না—

—তবে ও কথা বললি কেন? তোকে ভাল লাগে না, এতদিনে তুই এই বুঝেছিস? তোকে যদি না ভাল লাগবে, তবে কার জন্যে কাজ কর্ম সব ফেলে রেখে ও বাড়ীর দিকে চেয়ে বসে থাকলুম বল?

তাই তো! তবে কি ভুল করেছে চারু? কিন্তু তাই বা কি করে হয়। ডাক্তারদের কথা তো মিথ্যে হয় না? মিথ্যে কথা বলে তাঁদের লাভই বা কি! তবু যাই হোক, মদনের কাতরতা দেখে ভুলবে না চারু, সত্য মিথ্যা, আজ সবটুকুই যাচিয়ে নেবে।

চারু বললো—তোমার কথা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছেন—

—কি বলেছেন ডাক্তারবাবু? চারুর মুখের কথা কেড়ে নিল মদন।

—বলেছেন, তোমার স্বামীর চরিত্র দোষ আছে,

তাইতেই অসুখ, আর তারই জন্যে নাকি আমার অমন সব মরা-হাজা ছেলে হচ্ছে।

—এই কথা বলেছেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু?

মদন সোজা হয়ে বসলো, ভ্রূ দুটো বিস্ময়ের আবেগে কুঁচকে উঠেছে, চারু সেদিকে তাকিয়ে সুদৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়লো—বলেছেন বই কি, তাঁরা না বললে আমি জানবো কি করে। এ ছাড়া আরও বলেছেন। বলেছেন—বাজারের মেয়েমানুষদের কাছে গেলে ঐ সব রোগ হয় পুরুষদের।

—মিথ্যে কথা! ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লো মদন। এ একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। বিশ্বাস কর চারু—তোকে ছাড়া কোন মেয়েমানুষকে চিনিনে আমি। এই তোর গায়ে হাত দিয়ে—

চারুর গায়ে হাত দিয়ে একটা গভীর শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে যেয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল মদন। নিবিড় অন্ধকারে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের মত এক রাতের একটি না-বলা কথা থেকে গিয়েছে জীবনের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির কোন এক ছিন্ন পাতার কোনায়। তবে কি সেই—? সেই মায়াবিনী কুহকিনী? কোন এক দুর্বল মুহূর্তে মদনের মনের পাতায় মোহজাল বিস্তার করেছিল সে, তারই কি ক্ষণিক খেয়ালের খেসারৎ যোগাতে হচ্ছে আজ অবধি তাকে? হবেও বা! ডাক্তাররা তো মিথ্যে বলেন না—তাই হবে—সেই সামান্য ক্ষণের মায়ামুগ্ধ মন চিরদিনের জন্য কালোর রেখা টেনে রেখেছে তারই জীবন-নাট্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যে। স্বীকার করবে এ কথা মদন—নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। ক্ষমা চাইবে চারুর কাছে—এতদিন ধরে সে কথা গোপন করার জন্য। আর সব শুনেও চারু যদি ক্ষমা না করে, বাবুদের বাড়ী চলে যেতে চায়—যাক, বাধা দেবে না মদন, শুধু চারুর আসার আশা-পথ চেয়ে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনের দিন কটা।

জন্ম দিয়ে মা বাপ মরেছিল, স্নেহ প্রীতি কি বস্তু জানে নি জীবনে, ঘরে দেখার কেউ কোথাও ছিল না। পরের দরজায় দুটো খেয়ে আজ পরগাছার মত মানুষ হয়ে উঠেছে মদন। সেই ভাবেই অনেকখানি জীবন-যাপনের মূল্য দিয়ে মদন একটা জিনিষ শিখেছিল ভাল—তেলেভাজার বিদ্যে। আর সেই বিদ্যের জোরে মেলায় মেলায় এখানে ওখানে ঘুরে তেলে ভাজা বিক্রি করেছে। ব্যবসাটা ভাল, এতেই দুটো পয়সার মুখ দেখেছে, স্বাধীন ভাবে থেকেছে।

আর এমনই এক মেলায় দেখা গোলাপীর সঙ্গে, ঝুমুর দলের দেহসর্বস্ব মেয়ে—ছলনাময়ী, মিথ্যে কুহকে মদনের নেশাসক্ত মনে কামনার আগুন জ্বলিয়েছিল সেদিন।

কয়েকজন ইয়ার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তাড়ি খেয়েছিল মদন, খাওয়াটা কিছু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে গোলাপীকে স্বর্গের অপ্সরা বলে ভ্রম হয়েছিল, সেই সুযোগটুকু নিয়েছিল দেহ-ব্যবসায়িনী কুলটা গোলাপী—ধরা দিয়েছিল সেই রাতে তার কাছে।

তা'হলে একদিনের ক্ষণিক মোহের জন্য সারা জীবনের পথ কি তবে সেই বন্ধ করে দিয়ে গেছে? সেই ভ্রষ্টা মেয়েটা, সামান্য ক্ষণের জন্য এমন করে তার সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে গেলো!

তাও যদি যায়, যাক—কিন্তু এ কথা চারুকে বোঝায় কি করে যে তাকে দেহ দিয়েছে, রোগ নিয়েছে—তাকে প্রেম দেয় নি।

চারুর হাত ধরলো মদন—মনে পড়েছে রে, করেছিলুম বটে সে একটা অন্যায়, সে অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন এক মেলায়—একটা ঝুমুরের মেয়ে এসেছিল। বিশ্বাস কর চারু, তাকে আমি ভালবাসিনি, কেমন যেন একটা—

লজ্জায় ধিক্কারে অনুশোচনায় দু'চোখ ভরে জল নামলো মদনের। পরম স্নেহে অনুতপ্ত মদনের দুটো হাত টেনে নিল চারু নিজের কোলের উপর। ও-ত প্রাণ ভরে কাঁদলো। এ কান্না বেদনার নয়—লজ্জার। যাকে ভালবাসি তাকে বিশ্বাস করতে পারিনি? বিশ্বাসের ভিত আল্‌গা হলে ভালবাসা কি সুদৃঢ় হয়?

অপর জনও কাঁদলো প্রাণ ভরে। এ কান্না লজ্জার নয়, স্বীকারোক্তির। সব কিছুকে স্বীকার করে প্রকাশ করে নিশ্চিন্ত হওয়ার কান্না। জীবনের মস্ত বড় কলংক-কর কাহিনী এতদিন পর বলতেঃপেরে হল্‌কা হলো মদন—সুস্থ হলো। যাকে এত ভালবেসেছে মদন, তাকে কি করে এতদিন এ কথা না বলে থাকতে পেরেছিল? যাকে ভালবাসা যায়—তার কাছে কি গোপনতা চলে?

সমস্ত গোপনতা স্বীকারের আনন্দে প্রাণভরে কাঁদলো মদন। আর সমস্ত ত্রুটিকে ক্ষমা করে প্রিয়জনকে কাছে টানার আনন্দে কাঁদলো চারু।

শতাক্ষী শাকম্ভরী দুর্গা

ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

মূর্তি-রহস্যের ১৫নং শ্লোকের শেষার্ধ এইরূপ—শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা। অর্থাৎ যিনিই শাকংভরী, তিনিই শতাক্ষী এবং তিনিই দুর্গা। এভাবে বলতে গেলে ললিতারহস্য নামকগ্রন্থে ভাস্কর রায় দেবীর এক হাজার নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বহু হাজার নাম উদ্ধৃত করে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তাদের স্থিতি-স্থাপকতা বিচার করে সে সে নামের অবশ্য প্রামাণিকতা স্থাপন করেছেন, সেই সমস্ত নামের একক দেবী তো বিশ্বজননী দুর্গাই। তা হ'লে, শতাক্ষী, শাকম্ভরী ও দুর্গমাসুর-হন্ত্রী দুর্গার নাম এক সঙ্গে সংগ্রথিত করে ঋষি মার্কণ্ডের সুরথকে বললেন কেন?

অন্যান্য প্রমাণ সহযোগে এই মৌলিক পংক্তির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তার পূর্বে শ্রীশ্রী চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের ৪৯—৫০নং শ্লোক উদ্ধৃত করি—দেবী সুপ্রসন্না হয়ে দেবতাদের বলছেন—

শাকংভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥

এই "তত্রৈব" শব্দের "তস্মিন্নের জন্মনি" ব্যতীত অন্য কোনও সার্থক অর্থ হয় না।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী টীকাকারেরা কি বলেন? দেবী-ভাগবতের ৭.২৮.৮৩ টীকায় শৈব নীলকণ্ঠ বলেছেন—"অত্র শতাক্ষী—শাকম্ভরী দুর্গা দেবতানাং জলদান-অন্নদান দৈত্যবধকর্মভেদেন নামভেদ মাত্রমেব কেবলং, ন ত্ববতারভেদ ইতি বোধ্যম্।" অর্থাৎ, এ স্থলে শতাক্ষী, শাকংভরী ও দুর্গা—দেবতাদের জলদান, অন্নদান ও তাঁদের জন্য দৈত্যবধ—এই হেতু ত্রিবিধ কর্মভেদে ভগবতীর তিনটী ভিন্ন নাম হয়েছে বটে, অবতারভেদ হয়নি, এটীই বুঝতে হ'বে।

এঁদের আবির্ভাবের স্থান সম্বন্ধে গুপ্তবতী—টীকাকার বলেন যে এঁদের উৎপত্তিস্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে সহ্যাদ্রি পর্বতের ঈষৎপূর্বে। এঁদের আবির্ভাব-কালসম্বন্ধেও নাগোবেদীভট্ট একই কাল নির্দেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, "বৈবস্বত-মন্বন্তর এব চত্বাংরিশত্তমে যুগে শতাক্ষী-শাকম্ভর্যাবতার।" এই শতাক্ষী শাকম্ভরীই যে দুর্গা, তা অতি সুন্দরভাবে দেবীভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের ২৮তম অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রুরু নামক অসুরের পুত্র দুর্গম ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হয়ে দেবতাদের পর্যুস্ত করল। বেদসমূহ লুপ্ত হলো; শতবর্ষ-ব্যাপী অনাবৃষ্টি হল। দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় দেবী সন্তুষ্টা হয়ে "শতাক্ষী" রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনন্ত নেত্র থেকে নয়দিন নিরন্তর বৃষ্টি পড়তে লাগলো। দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঠিক একই কথাই তো বলেছেন—"শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।"

শাকম্ভরী সম্বন্ধেও দেবীভাগবত (১) যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তার সঙ্গে মূর্তি-রহস্য প্রোক্ত শাকম্ভরীর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। শাকম্ভরীর ব্যাখ্যায় তত্ত্বপ্রবেশিকা বলছেন, শাকেন বিভর্তি পুষ্ণাতীতি শাকংভরী"—শাকদিয়ে যিনি পোষণ করেন। শান্তনবী টীকাতেও টীকাকার বলছেন—"লোকরক্ষণার্থং স্বশরীরোদ্ভবানি শাকানি বিভর্তীতি শাকম্ভরী।" দেবী-ভাগবতে স্পষ্ট বলা ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাকান্ (৩) স্বকরস্থিতান্। স্বাদূনি ফলমূলনি ভক্ষণার্থং দদৌ শিবা। শতাক্ষী, একই যুগাবতারের এ ভাবে বিভিন্ন নাম, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইলো না।

বঙ্গীয় চণ্ডীটীকাকায় মহামহোপাধ্যায় গোপাল চক্রবর্তী তাঁর তত্ত্বপ্রকাশিকায় "দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি"—এই পংক্তিটীকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন কেন, তা বোঝা ভার। যাই হোক্, শতাক্ষী শাকংভরী দুর্গা যে মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা থেকে ভিন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ আবির্ভাব স্থান, লীলাস্থল, কার্য সবই তো পৃথক্। মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাবকাল স্বায়ংভুব বা প্রথম মন্বন্তর, লীলাস্থল হিমালয় এবং অবতারত্বের কারণ মহিষাসুরবধ; কিন্তু অন্য দুর্গার আবির্ভাবকাল বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তর, লীলাস্থল বিন্ধ্যাচল এবং অবতারত্বের কারণ দুর্গম বা দুর্গ অসুরের বধ।

দেবীভাগবতে(৪) দেবী নিজের দুর্গানামের ব্যাখ্যান করেছেন—

---

(১) এখানে শতের অর্থ অনন্ত। দেবী-ভাগবত (৭.২৮.৪৪) বলছেন—

"অস্মচ্ছান্ত্যর্থমতুলং লোচনানাং সহস্রকম্।
ত্বয়া যতো ধৃতং দেবি শতাক্ষী ত্বং ততো ভব॥

(২) ৭.২৮.৪৫-৪৭

(৩) অমরকোষের টীকাকায় ভরত শাক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যাই কিছু ভোজন করতে পারা যায় তাই শাক। এই শাক দশ রকমের—

মূল পত্র-করীরাগ্র ফলকাণ্ডাধিরূঢ়কম্।
ত্বক্ পুষ্পং কবকঞ্চৈব শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

(৪) ৭.২৮.৭৯

দুর্গমাসুরহন্ত্রী ত্বাদ্ দুর্গেতি মম নাম যঃ।
গৃহ্ণাতি চ শতাক্ষীতি নায়াং ভিত্ত্বা ব্রজত্যদো।"

অর্থাৎ। দুর্গাসুর বধ হেতু আমার পরিগৃহীত দুর্গা ও শতাক্ষী নাম যে গ্রহণ করবে, সে মায়া অতিক্রম করে পরা গতি প্রাপ্ত হবে।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে (৫) বলা আছে—

"অত্র প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
যে মাং দুর্গাং শরণাগতা, ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ।"

দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে যে-দেবী ও দুর্গমাসুরের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভাগবতী শতাক্ষীর শরীর থেকে কালী, তারা, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তিগণ আবির্ভূতা হয়ে দৈত্যসেনা নিধন করতে লাগ্‌লেন। একাদশ দিবসে দুর্গাসুর নিহত হল। দুর্গাসুরের নিধনে দেবতাগণ যে স্তুতি করেছিলেন, তা'তে তাঁরা জননীকে উপনিষদ্‌-বেদ্যা, পঞ্চ-কোশান্তরস্থিতা মায়েশ্বরী, মুনিরা যাকে দিনরাত ধ্যান করেন—সেই প্রণবরূপা ভুবনেশ্বরী বলে ঘোষণা করেছেন। তার পরে অপূর্ব সরল দৈন্য জ্ঞাপন করে বলেছেন—

যঃ কুর্যাৎ পামরান্ দৃষ্টা রোদনং সকলেশ্বরঃ।
সদয়াং পরমেশানীং শতাক্ষীং মাতরং বিনা॥

অর্থাৎ, পামর দেবগণকে দেখে পরমকরুণাময়ী মাতা শতাক্ষী দুর্গা ব্যতীত সব কিছুর প্রভু হয়ে আর কে রোদন করবে?(৬)

ভ্রাতৃবিরোধের দাবানলে জ্বলেপুড়ে ভারতবাসীরা আজ পামর হয়ে গেছেন। মাতৃকৃপা ব্যতীত তাদের উদ্ধারের আর উপায় কি?

(৫) ৭২.৭১

(৬) দেবীভাগবত, ৭,২৮,৬৯-৭৩

হিটলারকে লিখিত গান্ধীজির চিঠি

(জার্মান থেকে অনূদিত)

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

[গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ডক্টর গটফ্রিড ফিশার নামক আমার জনৈক অধ্যাপক বন্ধু—১৯৫৮ সালে জার্মান থেকে প্রকাশিত Lesem-buch fuer Deutsche বইখানি আমায় উপহার দেন। ঐ পুস্তকে বহু মূল্যবান প্রবন্ধের মধ্যে ১৯৪১ সালে হিটলারকে লিখিত গান্ধীজির চিঠিখানি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধীজির জীবনাদর্শ এই প্রতি ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই এর অনুবাদ প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'ল।]

প্রিয় বন্ধু!

আমি আপনাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করছি—এটা নিছক মামুলী ভদ্রতা রক্ষা বলে মনে করবেন না। জগতে সবাই আমার বন্ধু, আমার শত্রু কেহই নাই। বিগত তেত্রিশ বৎসর যাবৎ আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হ'ল সমগ্র মানবজাতির বন্ধুত্ব লাভ করা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব প্রতিষ্ঠিত করা।

আমি আশা করি আপনি সময় ক'রে চিঠিখানি প'ড়ে দেখবেন এবং বুঝতে চেষ্টা করবেন আমার মতে আস্থাবান্ মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশ ব্যক্তি আপনার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করছে।

আপনার অসীম সাহসিকতা এবং মাতৃভূমির প্রতি আপনার সুগভীর অনুরাগ সম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ কোন সন্দেহ নাই এবং আপনার প্রতিপক্ষেরা আপনাকে যে দানব আখ্যা দিচ্ছে তাহাও আমরা বিশ্বাস করি না। পরন্তু আপনার নিজের লেখা এবং আপনার বন্ধু ও অনুরাগিবৃন্দের বিবিধ ভাষণ থেকে ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, আপনার অনেক কার্যকলাপই প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং

মানবতার মর্যাদাহানিকর। বিশেষ করে যে সকল ব্যক্তি আমার মত বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে এইরূপই প্রতিভাত হচ্ছে। সম্প্রতি চেকোশ্লোভেকিয়া, পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের প্রতি আপনি যেরূপ আচরণ করেছেন, তা থেকেই আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

আমি বেশ জানি, এইরূপ শক্তিপ্রদর্শন আপনার নিজের কাছে খুবই গৌরবের বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু আমরা শৈশব থেকেই এরূপ কাজকে মনুষ্যত্বের চরম পরিপন্থী বলে বিবেচনা করতে শিখেছি। এই কারণেই আমরা আপনার বিজয় কামনা করতে পারছি না। বৃটিশের আধিপত্য-লিপ্সা এবং ন্যাশান্যাল সোসালিজম উভয়কেই আমরা সমান বিতৃষ্ণার চোখে দেখে থাকি। যদি উভয়ের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য বোধ করি তবে তা শুধু নীতির দিক থেকে। ইংরেজের মনে আঘাত দিতে আমরা চাই না—আমরা শুধু চাই তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে—কিন্তু তা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের জয়ের দ্বারা নয়। বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে নয়। এটা এমন একটা সংগ্রাম, যার জয় অবশ্যম্ভাবী। এটা নির্ভর করে এই নীতির উপর। যে কোনও বিজয়ীই তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, যদি বিজিত স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বিজয়ীর সংগে সহযোগিতা না করে। বাহু-শক্তির সম্মুখীন হবার জন্য আমরা এমন এক আত্মিক-শক্তি আবিষ্কার করেছি, যে শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে প্রচণ্ডতম যুদ্ধাস্ত্রকেও নিঃসন্দেহে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর। আমি এর নাম দিয়েছি নিরস্ত্র সংগ্রাম। এতে পরাজয়ের গ্লানি নেই। এর প্রয়োগের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন নেই এবং যে ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞানের বিপুল সাহায্য আপনি নিয়েছেন, এতে সেই ধ্বংসের দেবতার প্রসাদলাভেরও প্রয়োজন হয় না।

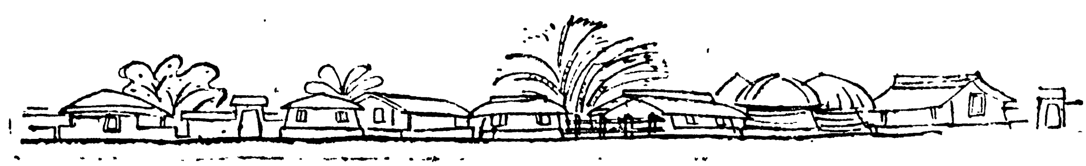
আমি বুঝতে পারি না আপনি কেন তলিয়ে দেখছেন না যে, এই ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞান কারো একচেটিয়া নয়। গ্রেটবৃটেন যদি এই বিজ্ঞানের অধিকারী না-ও হয়, তবে অপর কোনো শক্তি ইহা আয়ত্ত করবে এবং আপনার অস্ত্রই তারা আপনার উপর প্রয়োগ করবে। আপনি আপনার জাতির জন্য এমন কিছু রেখে যেতে পারছেন না যাতে ক'রে আপনার জাতি গর্ব অনুভব করতে পারবে। যত সুচিন্তিতভাবেই প্রযুক্ত হোক না কেন, নির্মম নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শন কোনও জাতির পক্ষেই গৌরবের বিষয় হতে পারে না।

এই কারণেই মনুষ্যত্বের তরফ থেকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আপনি যুদ্ধে বিরত হউন! যদি গ্রেটবৃটেনের বিরুদ্ধে আপনার মনোমালিন্যের কারণগুলি কোনও আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট পেশ করেন, তবে আপনি আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আপনার বিধ্বংসী ক্ষমতা যে প্রবলতর যুদ্ধের দ্বারা—তা প্রমাণ করতে পারেন, কিন্তু আপনার কার্যকলাপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা যুদ্ধের সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায় না। পরন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের দ্বারা কোন্ পক্ষ সত্যাশ্রয়ী তা প্রমাণিত হতে পারে—যদিও মানব-বিচারশক্তির একটা সীমারেখা আছে।

আজকের দিনে যখন সমগ্র ইয়োরোপীয় জাতির হৃদয় শান্তির জন্য ব্যাকুল, তখন আমরা আমাদের অহিংস সংগ্রামও স্থগিত রেখেছি। এ সময় আপনাকে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক আবেদন জানানো খুব বেশী বলে মনে করি না। আপনার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হলেও এটা লক্ষ লক্ষ ইয়োরোপবাসীর কাছে আজ পরম কাম্য। অগণিত ইয়োরোপীয়ের মূক মর্মবেদনা, শান্তির জন্য মৌন আকুল আবেদন আজ আমার কানে আসছে। কারণ আমার কান কোটি কোটি নর-নারীর মৌন আবেদন শুনতে অভ্যস্ত!

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

এম. কে. গান্ধী



আমার কলিকাতা দর্শন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আসিয়াছিলাম ঘর-ছাওয়ানো (করোগেট) টীন কিনিতে। সেই আমার প্রথম কলিকাতা দর্শন।

সন তেরশত দশ সালের তিরিশে চৈত্র আগুন লাগিয়া আমাদের ঘর-দুয়ার পুড়িয়া গেল। বিবাদবশত একজন আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। দুই বৎসর বয়সে পিতৃদেবকে এবং সাত বৎসর বয়সে মাতাঠাকুরাণীকে হারাইয়াছিলাম। একাধারে জনক-জননীরূপে যে মাসীমাতা আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছিলেন, এই বিপদে তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তখনকার দিনে ডাকাতের এমন সর্বনাশা উপদ্রব ছিল না। তবে ছিঁচকে চোরের ভয় ছিল। আমাদের দুটি ভাইকে লইয়া মাসীমাতা খুব ভয়ে ভয়েই দিন কাটাইতেন। কারণ তাঁহার হাতে কিছু নগদ টাকা ছিল। তিনি বিপদে-আপদে লোককে ধার দিতেন, বেশী টাকা হইলে গহনা বন্ধক রাখিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত কিছু গহনা-পত্রও ছিল। রোজ রাত্রে শুইবার সময় তিনি কুলদেবতা শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীরাধারাণীকে স্মরণ করিতেন এবং একটি ছড়া আবৃত্তি করিতেন। ঠাকুর প্রণাম করিয়া এই ছড়া আমাদিগকেও আবৃত্তি করিতে হইত। "চোর-চাপাটি বাঁশের পাতা, আসবে চোর কাটবো মাথা। হুটুর মুটুর লোটা কান, শিং নড়বড় বোকা দাড়ি, পাহারা দেন আমাদের বাড়ী। আম শীমের অম্বল, কাঠ শীমের ঝোল, চোর-ডাকাত পড়লো সহর বর্দ্ধমানের কোল। কাছিমের খোলা দুয়ারে। চোর পালালো সহরে॥ কাছিম, কাছিম, কাছিম।" কিন্তু এত করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। মাটীর কোঠাঘরের উপরে রাশীকৃত নূতন হাঁড়ি মালসার মধ্যে নগদ টাকা, গহনা-পত্র, আবশ্যকীয় দলিল আদি—এমন কি আমাদের দুই ভাইএর কোষ্ঠী দুইখানাও তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সে সমস্তই পুড়িয়া গেল। রূপার টাকা তাল পাকাইয়া গেল। গহনাগুলি সোনায় রূপায় মিশিয়া গেল, কতক ছাই হইয়া গেল। আমার মাতুল বংশের সঞ্চয় হাতের লেখা প্রায় দুইশতখানি পুঁথি আগুনের মুখে চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল। দুইটী গোলায় ধান ছিল, যেটীতে আধা-আধি ছিল সেটী ছিল শরের তৈরী 'হামার', তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। যেটী পরিপূর্ণ ছিল সেটী বাঁশের তৈরী "বাসার", তাহার অর্দ্ধেক পুড়িল, অর্দ্ধেক বাঁচিল। এই পোড়া ধানের চালের ভাতে এমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ উঠিত, খাইতে কষ্ট হইত। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আমরা এই ভাত খাইয়াছিলাম। কারণ "নবান্ন" না গেলে নূতন চালের ভাত খাইতে নাই।

বৎসরটা ছিল অজন্মার বৎসর, খড়ের কাহন ছিল আঠার টাকা, কুড়ি টাকা। দুমকা হইতে খড় আনাইতে হইয়াছিল। চুরির ভয়ে অনেকগুলি খড় মাসীমাতা একখানি ঘরের কোঠায় বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘরে অর্জ্জুন কাঠের কড়ি ছিল, কিন্তু কোন কাঠের পাটা (তক্তা) বা বাঁশ বা শর বিছানো ছিল না। সাধারণত এইরূপ কোন আচ্ছাদনের উপর মাটী লেপিয়া আমাদের "কোঠা" তৈরী হয়। ঘর ছাওনের খড় চাই, চারিটি বলদ ও কুড়ি বাইশটি গাই গরুর খাবার চাই। সুতরাং অনেক খড় কিনিতে হইয়াছিল। অবশ্য একালের তুলনায় আঠার টাকা কাহন কিছুই না। কারণ গত বৎসর একশত টাকা কাহন খড় বিকাইয়াছে। এ বৎসরও আমাদের গ্রামাঞ্চলে খড়ের দর প্রতি কাহন চৌষট্টি টাকা। কিন্তু আমি বলিতেছি ষাট বৎসরের পূর্ব্বের কথা। মাসীমাতা কিছু টাকা ঘরের মেঝেতে মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং কোন রকমে ঘর দুয়ার মেরামত হইল। সে বৎসর বড় কষ্টেই কাটিয়াছিল।

মাসীমাতা পরলোকগমন করিলেন। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁহার অন্তিম সময়ে আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তিনি আমাকে এক শিষ্য বাড়ী পাঠাইয়া

দিয়াছিলেন। তাঁহার কোথায় কি আছে, সব কথাই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিপক্ষে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হইল। নয়টী গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং গ্রামের শূদ্রগণের স্ত্রী-পুরুষ ও তথাকথিত ইতর হাড়ি মুচি ডোম বাগদীগণের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে খাওয়ানো হইয়াছিল। মনে আছে হাড়ি মুচি বাগদী ডোমদের জন্য বারসলি (ছয় মণ) চাউল রান্না করিতে হয়। গ্রামে কয়েকঘর মুসলমান ছিল, ইহাদের লুচি খাওয়াইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ একদিন লুচি ও দ্বিতীয় দিন অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ভাল ঘিএর দর ছিল পঁচিশ হইতে ত্রিশ টাকা মণ। যে কোন বাড়ীতে লুচি ভাজিলে সারা গ্রামে সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িত। রসগোল্লার সের ছিল চারি আনা। খাঁটী সরিসার তেল ছিল টাকায় চারি সের। মাছ কিনিতে হয় নাই, নিজেদের পুকুরেই পাওয়া গিয়াছিল। তরকারী-পত্রও খুব শস্তা ছিল। ভাল কীর্ত্তন দলের—যেমন গণেশ দাস, অবধুত বন্দ্যোপাধ্যায়—দক্ষিণা ছিল একশত টাকা। এই জন্য একদল ছোট-খাট কীর্ত্তনীয়া—পায়র গ্রামের অক্ষয় দাসকে আনা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেল। এইবার ঘরের দিকে নজর পড়িল।

পোড়া ঘর ভাল মেরামত হয় নাই। ঘর বলিতে একখানিই ব্যবহার-যোগ্য। মাতামহদের বৃহৎ গোষ্ঠী, নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ায় বাড়ীর আয়তন ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। পরে আমার পিতাঠাকুর অপরের নিকট সংলগ্ন বাস্তুর অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় তিনি বাড়ী-ঘর গুছাইবার অবসর পান নাই। বড় ঘরটা ছিল খাপছাড়া জায়গায়। উঠান প্রায় ছিল না। বৃহদাকার ঘর, নীচে যেমন পিঁড়ে এবং মেঝে, উপরেও তেমনই পিঁড়ে এবং মেটে কোঠা। ঘরটার দেওয়ালের প্রস্থ নীচে আড়াই হাত, উপরে দেড় হাত। এই ঘরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এবং দক্ষিণ দুয়ারী ঘর করিলে দুই ভাইএর থাকার সুবিধা হয় এবং অনেকটা উঠানও পাওয়া যায়। আমাদের দুই ভাইএরই বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং পাঁচজনের পরামর্শে এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যে লাগিয়া গেলাম। দক্ষিণ-দুয়ারী যে দুইখানি ঘর আগুন লাগিয়া ভগ্ন দশায় ছিল, সেই দুইটীকে জুড়িয়া ত্রিশ-বত্রিশ হাত লম্বা একখানা ঘর আরম্ভ করা গেল। মাঠ হইতে মাটী আনা, সেই মাটী ভিজাইয়া ছাঁটিয়া মাড়িয়া দলা পাকাইয়া তাহা হইতে দেওয়াল তোলা, চালের কাঠামোর জন্য কাঠ ও তালের কড়ি, কড়ি কাঠের জন্য মজবুত কাঠ জোগাড় করা, তাহার পর চাল তৈয়ার, ছুতার মিস্ত্রী ও অন্যান্য মজুরের সাহায্যে এই সমস্ত কাজ যখন শেষ হইল, তখন স্থির হইল যে আর খড় নয়, টীন কিনিয়া ঘর ছাওয়াইতে হইবে। কলিকাতায় টীন শস্তা। অতএব কলিকাতায় যাওয়া দরকার। এই সময় একটা কথা উঠিল কলিকাতা যাইবে কে? আমি—না জ্যেষ্ঠ সহোদর? কেহ কেহ দয়া করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করায় সাব্যস্ত হইয়া গেল যে টীন কিনিতে কলিকাতা আমিই যাইব।

আমার তখন আর বয়স কত, সুতরাং একজন মুরুব্বি চাই। কলিকাতা হেন স্থান, তায় টাকা-কড়ির ব্যাপার, সুতরাং রসিকলাল চৌধুরী তখন গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেখা-শোনা করিতেন। বিনিময়ে মাসীমাতা তাহার প্রয়োজন মত ধান ও টাকা কর্জ্জ দিতেন এবং তাহার কোন সুদ লইতেন না। আমাদের সময়েও এই সম্বন্ধ বজায় ছিল। তিনি কলিকাতা যাত্রায় আমার সঙ্গী হইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কলিকাতার বিষয় তিনিও ওয়াকিবহাল নহেন। অতএব তিনি আর একজন মুরুব্বি পাকড়াও করিলেন, তাহার মধ্যম ভাইএর শ্যালক পুরন্দরপুরনিবাসী পুলিনবিহারী সাহাকে। পুলিনবিহারীর একটী চাল ডাল লবণ মসলার দোকান ছিল। তিনি মাল কিনিতে কলিকাতা বড়বাজারে যাতায়াত করিতেন। বীরভূমের যোগীন্দ্র রায় এক বস্ত্রে কলিকাতায় আসিয়া একটী মসলার গদির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি বীরভূমের লোককে বিশেষ সাহায্য করিতেন। পুলিনবিহারীকে যোগীন্দ্র রায়ই বড়বাজারে পরিচিত করিয়া দেন। পুলিনবিহারী হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে চাউলও বিক্রী করিতে আসিতেন। সুতরাং কলিকাতা তাহার জানা জায়গা। আমরা কুড়মিঠা হইতে পুরন্দরপুর, তথা হইতে আমদপুরে আসিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরিলাম। পুলিনবিহারী আমাদিগকে কলিকাতায় বড়বাজারে তাহার মহাজনের গদীতে আনিয়া তুলিলেন।

প্রথম দিন তিনজনেই খাইতে গেলাম একটী বিশুদ্ধ

হিন্দু হোটেলে। দেখিলাম দুইটী বৃহদাকার মাটীর গামলা। একটী গামলার উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি মাটীতে মাজিয়া ডুবাইয়া অপরটীতে ধুইয়া লইল। ঠাকুর সেই বাসনেই আমাদের ভাত বাড়িয়া দিলেন। উক্ত ঝি নাম্নী মহিলাটিই আমাকে পানীয় জল দিয়া গেলেন। আবার তিনিই আমার ও আমার শুঁড়ি-জাতীয় সহযাত্রী দুইজনের উচ্ছিষ্ট বাসন তুলিয়া লইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানে একটি মুক্তিলতা বুলাইয়া দিলেন। মনটা ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল। এ কোথায় ভাত খাইলাম, কাহার হাতের পানীয় জল? পুলিনবিহারীকে মনের কথা জানাইলাম। পরদিন সে মহাজনের গদীতেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। খাইতে গিয়া দেখিলাম আসন পাতা এবং জলের গেলাস সাজানো আছে। মহাজন-বাড়ীর ঝিটী গত রাত্রে পুলিনবিহারীদের থালা-বাসন পরিষ্কার করিয়াছিল, তাই খাইয়া উঠিয়া তাহার দেওয়া জলে মুখ না ধুইয়া কলের জলে হাত-মুখ ধুইতে গেলাম। চতুরিণীর ব্যাপারটি বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে সমস্ত কাজ ফেলিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল—ঠাকুরমশায় জলটা কার দেওয়া খেয়ে এলেন!

টীন কেনা এবং হাওড়ায় বুক করিবার ব্যবস্থা হইল, টিন আমদপুর ষ্টেশনে গিয়া পৌছিবে, ডাকযোগে রসিদ পাইলে আমরা ছাড়াইয়া লইব। এইবার সব দেখিবার পালা। কালীঘাটে গিয়া পূজা দিয়া আসিলাম। থিয়েটার দেখা হইল না। রসিকলাল বলিল—কেল্লাটা একবার দেখিলেই হয়। পুলিনবিহারী বলিল—সে আর বেশী কথা কি? তোমাদিগকে কেল্লা দেখাইয়া আমি রামকৃষ্ণপুর যাইব। আমরা কেল্লা দেখিতে বাহির হইলাম সকাল তখন আটটা। পুলিনবিহারীর বগলে খাতা-পত্র। কেল্লার মধ্যে অগ্রসর হইলাম, দুই পাশে গোরা মুচিরা জুতা তৈরী করিতেছে। অকস্মাৎ এক সিপাহী আসিয়া আমাদিগকে পাকড়াও করিল। তিনজনকেই ধরিয়া লইয়া চলিল। পথে পথে অনেক দূর লইয়া গিয়া আমাদিগকে এক গাছ-তলায় বসাইয়া দিয়া সে সামনের একটা ব্যারাকে গিয়া ঢুকিল। কিছুক্ষণ পরে সিপাহীর সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল এক লম্বা-চওড়া জোয়ান ইয়া-গালপাট্টা, গোঁফেরই বা বাহার কত? খালি গা, পৈতেটা বেশ মোটা এবং সাদা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। বোধহয় পূজা করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিলেন এবং হিন্দীতে শুনাইলেন যে আমরা কেল্লার নক্সা লইতে আসিয়াছি। তিনি পুলিনের খাতা কয়খানা কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পুনরায় যখন তাহার দর্শন পাইলাম, তখন বেলা একটা। এদিকে গাছতলায় আমার উপরে সমানে তিরস্কার বর্ষিত হইতেছিল। যেন আমিই কেল্লা দেখিবার জন্ম জেদ করিয়াই এই বিভ্রাট বাধাইয়াছি। যাহা হউক অনেক কাকুতি-মিনতির পর বারটী টাকা জরিমানা দিয়া আমরা অব্যাহতি পাইলাম। টীনের বাণ্ডিল খরিদ হইয়াছিল উনিশ টাকা দরে। নানান্ খরচের গোলযোগ মিটাইবার জন্ম তাহার দর লেখা হইল একুশ টাকা। হিসাবটা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দেখাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ঐ দিন অন্ন জুটে নাই।

পরদিন সঙ্গী দুইজন রামকৃষ্ণপুরে গেলেন। আমি অন্নাহার ত্যাগ করিয়া মিষ্টান্ন খাইয়া কাটাইতেছি। উদ্দেশ্য বাড়ী গিয়া অভ্যক্ষ ভক্ষণের একটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। বাড়ী ফিরিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছিলাম। হায়রে অদৃষ্ট, তখন কি জানিতাম ইহা অপেক্ষাও বিড়ম্বনা কপালে লেখা আছে। তখন কি জানিতাম—জীবনে নরক দর্শনও করিতে হইবে। আমার জীবনে এই একটা মজা দেখিলাম, যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, যে বস্তুকে ঘৃণা করিয়াছি, শ্রীভগবান সেই ঘৃণ্য ব্যক্তির সাহচর্য্যই আমাকে দান করিয়াছেন, সে ঘৃণ্য বস্তু আমার সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছেন। ঘটনা চক্র ঘৃণ্য ঘটনাবর্ত্তে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সঙ্গী দুইজন রামকৃষ্ণপুর গিয়াছে। দুপুরে বাহিরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি "যুগান্তর" বিক্রী হইতেছে, একপৃষ্ঠা ছাপা, সন্ধ্যাও একখানা লইলাম। আমি "বঙ্গবাসী"র নিয়মিত পাঠক ছিলাম। খবর আমার অজানা ছিলনা। বাড়ী আসিয়া কাগজ দুইখানা অতি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি যখন হেতমপুর রাজবাটীতে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কাজে ঘুরিতেছিলাম, সেই সময় খানাতল্লাসীর আনাগোনায় কাগজ দুইখানি এবং বন্দেমাতরম লেখা পিতলের কতকগুলি ব্যাজ আমার জ্যেষ্ঠ নষ্ট করিয়া ফেলেন। একজন বাজিকরের মেয়ের দ্বারা "বন্দেমাতরম" মন্ত্রটি আমি নিজের হাতে উল্কীতে লেখাইয়া লইয়াছিলাম। সে লেখা এখনো আছে। গ্রামে ফিরিয়া যুগান্তর ও সন্ধ্যা কয়েকদিন ধরিয়া আগাগোড়া শুনাইয়া একটী স্বদেশী দল গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। চেষ্টা সফল হয় নাই। যুগান্তরে একটি কবিতা ছিল, আরম্ভটা এইরূপ—

রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া রুদ্ধ ধমনী বহিয়া;
জীবন আমার স্পন্দিছে আজ মরণ চুম্ব যাচিয়া॥

যুগান্তরের একটা লেখায় সুপারি ঠন্ঠন্ ইলিশের উল্লেখ ছিল। সন্ধ্যাতে একটা লেখা ছিল—'ভাগাভাগির ঘর-কন্না'। মধ্যপন্থীগণের আপোষ মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মবান্ধবের স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় লেখা একটি জোরাল প্রবন্ধ। কাগজ দুইখানির জন্ম আজ অনুশোচনা হয়। যুগান্তর ও সন্ধ্যা পাইয়া মনে হইয়াছিল, কলিকাতা দর্শন সার্থক হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অলঙ্কার বিন্যাস

প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

অলঙ্কার কথার সঙ্গে সুগম পরিচয় অঙ্গের ভূষণরূপে। সাহিত্যে অলঙ্কার স্বর্ণাদি নির্মিত পদ্মরাগাদি মণিখচিত নয়, ভাষার অলঙ্কার ভাষার দ্বারাই বিলসিত—আর তাহাতে বার বার একটি কথা ব্যবহার করিয়া বা কোনো কিছুর সঙ্গে উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া কখনো সন্দেহ, কখনও অধিকগুণ বলিয়া, কখনও পরিণাম ফল বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখাইয়া আরও কতভাবে যে পণ্ডিতগণ ভাষাবাণীকে সুমণ্ডিত অলংকৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রণবনাদ ব্রহ্ম হইতে নিখিল ধ্বন্যাত্মক জগতের আবির্ভাব। ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ, তাই "অলঙ্কার কৌস্তুভ" কাব্যপুরুষের শরীরাদি বর্ণনা করিয়া বলেন—

> শরীরং শব্দার্থৌ ধ্বনিরসব আত্মাকিলরসো
> গুণামাধুর্য্যাদ্যা উপমিতিমুখোহলঙ্কৃতি গণঃ।
> সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো
> যদাস্মিন্ দোষঃ স্যাচ্ছ বণকটুতাদিঃ স ন পরঃ॥

শব্দ ও অর্থচমৎকারিত্ব লইয়া কাব্যপুরুষের সুগর্বিত শরীর। এই শরীরে প্রাণ ধ্বনি। রস আত্মা। কাব্যনিষ্ঠ গুণ। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার। সুসংস্থিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতেছে গৌড়ী প্রভৃতি ভাষার রীতি। সুলক্ষণ কাব্যপুরুষের শ্রবণকটুতাদি ক্ষুদ্র দোষ দোষের মধ্যে না ধরিলেও চলে।

সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় উহাতেও যথাস্থানে শব্দ ও অর্থচমৎকারিত্ব রহিয়াছে এবং কাব্যপুরুষের অলঙ্কারাদির মত প্রতিটি কথার অলঙ্কার আছে। এই অলঙ্কার চয়ন বেদ ও উপনিষৎ কাননে নিত্য নবায়মান আনন্দবোধের সহায়ক। মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট ও পুরাণসংহিতায় সুপ্রচুর অলঙ্কার বিন্যাসে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় মনীষার চমৎকৃতিপূর্ণ সাংখ্য যোগাদি দর্শনের আচার্য্যগণ—এমন কি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য, কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থরচনায় বিষয়-বিশেষ বর্ণন কৌশলে অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন নির্বাধরূপে। সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য ও পুরাণে সর্ব্বত্র অলঙ্কার প্রয়োগপ্রাচুর্য্য। অল্পকথায় যিনি সংস্কৃতে কিছু বলেন বা লিপিবদ্ধ করেন উহা শারীরবিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান। ইতিহাস-কথা বা উপকথা যাহাই হউক না কেন অলঙ্কার ভিন্ন কিছুই হইবার নয়।

যাঁহার একপাদ বিভূতি, বিশ্বভুবন ত্রিপাদ—যাঁহার অমৃতময় সেই পরমপুরুষ বিরাট ভগবান বিষ্ণুর মহিমা বেদ, উপনিষদ্, পঞ্চরাত্র, ভাগবত যেখানেই বর্ণিত হইয়াছে অলঙ্কার যে সেখানে প্রধানস্থান গ্রহণ করিয়াছে উহা আর বলিতে হইবে না। অব্যক্ত, অনন্ত বিরাট বিভু ব্যক্ত সান্ত প্রিয়প্রভু। তাঁহাকে প্রীতির বিষয় করা যে অলঙ্কারের সার্থকতা, তাহা বেশ উপলব্ধি হয় বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনায়।

মহাকবি কেহ উপমাদি অলঙ্কারের গৌরবে, কেহ বা শব্দার্থের চমৎকৃতিতে, আর কেহ বা পদলালিত্যে স্মৃতির কোঠায় চিরদিনের জন্য স্থান করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত নায়কনিষ্ঠ কাব্যের চমৎকৃতি ও ব্রহ্মানন্দ সহোদর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য অপ্রাকৃত রসঘন পরব্রহ্ম। কাজেই এই সাহিত্য স্বকীয় রসচমৎকৃতিতে যে আপামর সর্ব্বজনের হৃদয়গ্রাহী হইয়া বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিষ্ণুবৈষ্ণবাশ্রিত পারমার্থিক-রসপরিপুষ্ট অগণিত কাব্যনাটকাদি অলঙ্কৃত সাহিত্য বিলাসও ধ্বনিমুখর অলঙ্কার সুমণ্ডিত হইয়া পরম প্রেমপ্রোজ্জ্বল স্বরূপ সন্ধান দিয়াছে ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলা যায়। জগন্নাথকৃত রসগঙ্গাধরের কথাই বলি—

> স্মৃতাপিতরুণাতপং করুণয়া হরন্তী নৃণা
> মভঙ্গুর তনুত্বিষাং বলায়িতা শতৈর্বিদ্যুতাং।
> কলিন্দ গিরিনন্দিনীতটসুরদ্রুমাবলম্বিনী
> মদীয়মতি চুম্বিনী, ভবতু কাহপি কাদম্বিনী॥

যাঁহার স্মরণেও প্রখর সংসার-তাপ দূর করে—অভঙ্গুর শত শত অচলা চপলা সেবিত কালিন্দীতটে কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত—অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক সেই মেঘ আমার মতিকে চুম্বন করুক। কাদম্বিনী এখানে শ্রীকৃষ্ণ। কাপি কোন এক, বলার উদ্দেশ্যে মেঘের ধর্ম শ্যামবর্ণ, রসবর্ষণ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণে থাকিলেও তাহা হইতে অধিক ফলদায়ক অতএব প্রসিদ্ধ। কাদম্বিনী হইতে ব্যতিরেক। প্রথম তিনটি পাদে তিনটি বিশেষণেই ব্যতিরেক অলঙ্কারের পোষাক। মেঘ দৃষ্ট হইয়া বর্ষণ দ্বারা প্রখর সূর্য্যতাপ দূর করে, ব্যক্তিবিশেষের অন্য তাপ দূর করে না। এই মেঘ সর্ব্বকালে সকলের তাপ দূর করে তাহাও শুধু স্মরণমাত্র। লৌকিক মেঘ চঞ্চল, চপলা-সেবিত অপ্রাকৃত মেঘ কৃষ্ণ স্থির দামিনীরূপা গোপীনিসেবিত অতএব সর্ব্বাংশে ভিন্ন। প্রাকৃত মেঘ আকাশে থাকে, এই মেঘ যমুনার তটে কল্পবৃক্ষের তলায় অতএব ব্যতিরেক। ব্যতিরেক রূপক, অতিশয়োক্তির মিলনে বিচিত্র অলঙ্কার বৈভব এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ এই শ্লোক।

প্রাকৃত কবির কথা যাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—কাব্যরচনার প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে যশঃলাভের অভিসন্ধি, অর্থলাভের প্রত্যাশা প্রভৃতি। অপ্রাকৃত কাব্য রসাস্বাদন বিচারপরায়ণ ভাগবতের কথা অন্যরূপ। তিনি বলেন—

> যশঃ প্রভৃত্যেব ফলং নাস্তু, কেবলমিষ্যতে
> নির্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণ লাবণ্য কেলিষু।
> চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দলয়স্তু যঃ
> স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ ॥

পারমার্থিক কাব্যনির্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণের গুণ লাবণ্যকেলি প্রভৃতিতে চিত্তের প্রগাঢ় আনন্দমগ্নতাই রচনাকারী ও স্বাদক উভয়ের পরমলাভ।

কাব্যের লক্ষণ কবির লক্ষণ ইত্যাদি বহু মতবাদসাপেক্ষ বিষয়গুলি লইয়া হঠাৎ কোনো কথার অবতারণা না করাই ভাল। এ সম্বন্ধে সকলেরই একটা মানস সংস্কার মোটামুটি আছে। তবে পারিভাষিক কবি অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি এবং কাব্য আস্বাদনের উপযোগী প্রাক্তন সংস্কার যাহার আছে এমন ব্যক্তিকে বলা যায়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত কবির বাক্য নির্মিতিকেই কাব্য বলা হইয়াছে। "নির্মিত" কথার তাৎপর্য্য অসাধারণ চমৎকারিণী রচনা। ইহাদ্বারা রসাপর্ষক দোষরহিত যথাসম্ভব "গুণালঙ্কারং রসাত্মকং শব্দার্থ যুগলং কাব্যং" এই কথার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশে মম্মটাচর্য্যের কথা স্মরণীয়। তিনি বলেন, তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি ইতি। অলঙ্কারযুক্ত হইলে কাব্যেতো হয়ই—কোনো ক্ষেত্রে অলঙ্কার না থাকিয়াও উত্তম কাব্য হয় তাহার প্রমাণ আছে।

ভাষা প্রকাশের রীতি চিরকালই অপরের চিত্তমনোহারিণী প্রসাদগুম্ফিত মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাবগম্ভীর শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সংস্কারের অপেক্ষা রাখে। কাব্যের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিধানে তাই নানাপ্রকার পদ প্রয়োগের চাতুর্য্য অনুসৃত হয়। এই পদপদার্থ উপন্যাস প্রক্রিয়া বৈচিত্র্য হইতেই শব্দালঙ্কার ও অগণিত অর্থালঙ্কারের উদ্ভব হইয়াছে। মণ্ডন ব্যাপারে অলঙ্কার বাণী কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত বা অনাদরণীয় তো হয়ই নাই, বরং রসিক মনোহারী বলিয়া প্রায়শঃ সমাদর লাভ করিয়াছে। অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্যে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় বলিয়া কাব্যরস বিচারপরায়ণগণও আলঙ্কারিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কাব্যসমালোচনা, রসবিচার, ধ্বনিতত্ত্ব-সন্ধান অলঙ্কার শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কবিকর্ণপূরতো সোজাসুজি তাঁহার গ্রন্থকে "অলঙ্কার কৌস্তুভ" নাম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

আরও শুনা যায়—

> বদনে নবনীটিকানুরাগো নয়নে কজ্জলমুজ্জ্বলং দুকূলং।
> ইদমাভরণং বিলাসিনীনামিতরভূষণমঙ্গ দূষণায়॥

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে অন্য অলঙ্কার ভারস্বরূপ হয়। বরং বৃক্ষবল্কলও অভিনবশোভা মাধুর্য্য অভিব্যক্ত করে। সেইরূপ ভাবপ্রচুর কাব্য অলঙ্কার মণ্ডিত হয় না। হইলেও লালিত্য ধারণ করে। যেখানে প্রীতি নিরুপাধি সেখানে অলঙ্কার অপ্রয়োজন—মিলনের বিঘ্ন। সেইরূপ ভাবসম্পদ গৌরবান্বিত প্রেমপ্রেরণা সমুচ্ছাসিত ভক্তিরসকাব্যে অন্য অলঙ্কার স্থানে স্থানে বিঘ্নও উৎপাদন করে। স্বভাবোক্তিই সেখানে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। নিরুপমবস্তুকে যতই বর্ণনার প্রচেষ্টা চলে ততই রূপক আর উপমার ঘটা বাড়িয়া যায়। কখনও বা সন্দেহ, কখনও বা উৎপ্রেক্ষা দ্বারা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়। পরিণামে আক্ষেপই অবলম্বিত হয়। দানকেলি চিন্তামণির একটি শ্লোক দেখুন—

> ফুল্লচম্পকাবলিরিয়ং কিং নো ন সা জঙ্গমা,
> কিং বিদ্যুল্লতিকাততি ন'হি ঘনে সাপে ক্ষণদ্যোতিনী।
> কিং জ্যোতির্লহরী সরিন্নহি ন সা মূর্ত্তিং বহে তৎ ধ্রুবং
> জ্ঞাতং জ্ঞাতমসৌ সখাকুলবৃতা রাধা স্ফুটং প্রাকৃতি ॥

এখানে সন্দেহ করা হইয়াছে আবার নিজেই তাহার উত্তর দিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। শ্রীরাধার অভিনব রূপের নব নব মাধুর্য্যভঙ্গি ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে কবির কথায়। অনুরাগ ধ্বনিত হইতেছে নতুবা প্রতিক্ষণে নব হইয়া হৃদয়ের বিস্ময়স্ফারতা হইবে কেন? এই রসাস্বাদন চমৎকৃতিই রসের সার বলিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শ্লেষ, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন কিন্তু রসেরই প্রাধান্য বলেন এবং রসধ্বনিই যে কাব্যের আত্মা স্পষ্ট ভাষায় তাহা ঘোষণা করেন। রস অঙ্গ নয়—ইঁহার মতে রসই কাব্য—অঙ্গী। রসধ্বনিই আত্মা। অতএব সকল অলঙ্কার রসবোধের সহাকরূপে বিচারিত হইবে। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। অগ্নিপুরাণের কথাটি এখানে স্মরণীয় বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্। কাব্যে বাক্যের বৈচিত্র্য প্রধান হইলেও রসই উহার জীবন। রসধ্বনিশূন্য কাব্য কাব্যই নয়।

ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে।

> প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাং।
> যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

নিপুণপ্রতিভাভাজন মহাকবির বাক্যে এমন সব ধ্বনিগর্ভ অর্থ থাকে যাহা ললনার অঙ্গের লাবণ্য ও অঙ্গ সন্নিবেশ দ্বারা ব্যক্ত অথচ শরীর হইতে অতিরিক্ত এক বিশেষ গুণের মত।

কবিকর্ণপূর অলঙ্কার কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে এই ব্যঙ্গ লাবণ্যামৃতের সন্ধান দিয়াছেন—

> স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
> অতিশয়িত পদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনিমুরারাতে ॥

যে ধ্বনি উত্তম কাব্যের পদ ও পদার্থ হইতে ভিন্ন, যাহা দ্বারা আলঙ্কারিকের ব্যঞ্জনাবৃত্তি বিস্তার লাভ করে বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও ব্রহ্মানন্দ হইতে

উৎকৃষ্ট ব্রজসুন্দরীগণের আনন্দাশ্রুবর্ষণকারী মুরারীর সেই মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক। ধ্বনি অর্থ উত্তমকাব্যের ব্যঙ্গভূত এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব। কর্ণপূরের ভাষায়—

ধ্বনিরুত্তমকাব্য তত্ত্বং ব্যঙ্গভূতং যৎকিমপি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী বিচিত্র অলঙ্কার প্রাচুর্য্যে নাটক, কাব্য, বিলাপ ও স্তবমালা গ্রন্থণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যে কোনও একখানা কাব্যের সমালোচনাও সুদীর্ঘ কাল চলিতে পারে। অপ্রাকৃত রসধ্বনিতৎপর ভাগবতগণ কৈতবরহিত হৃদয়ে রসঘনানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে সকল ভাব অলঙ্কারে পরিভূষিত দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের পদনখমণি জ্যোতিতে উদ্ভাসিত অন্তর-রসিত ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও প্রাণেশ্বরীর অলঙ্কার সঞ্চয়নেই নগ্নচিত্ত। প্রাকৃত নায়কনায়িকাশ্রয়ে প্রবৃত্তি তাঁহাদের সমীপে আকর্ষণহীন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাগবত-রসিকগণের অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের রূপবর্ণনায় যেরূপ চাতুর্য্যসহকারে কাব্যালঙ্কার সমাহৃতি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন উহা সহৃদয় কাব্যসমালোচকের প্রণিধানযোগ্য। প্রধান প্রধান সর্ব্বঅলঙ্কারে তিনি আরাধ্য ভগবানকে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণীর প্রশংসা করিয়া বলেন,

অন্তঃ প্রেমঘৃতস্মিতোত্তম মধুনর্ম্মৈক্ষকরৈঃ সংযুতা
শব্দার্থোভয়শক্তিসূচিত রসাদীন্দুল্লসৎ সৌরভা
আভীরী মদনার্ক তাপশমনী বিশ্বৈক সন্তর্পণী
সা জীয়াদমৃতাব্ধিদর্পদমনী বাণী রসালা হরেঃ।

শ্রীহরির বাণীই রসালা। ঘৃত মধু শর্করা কর্পূরাদি মিলনে রসালা হয়। বাণী রসালায় আন্তর প্রেমঘৃত। মধুরস্মিত উত্তম মধু। নর্মমিশ্রিত দৃষ্টি শর্করা। শব্দশক্তি দ্বারা যে অর্থসূচিত রস উহা কর্পূর। আভীরীগণের কামসূর্য্য তাপনাশিনী এই কর্পূর সুগন্ধযুক্ত বাণী রসালা জয়যুক্ত হউক। এখানে রসালা ও বাণীর অভেদ বলাতে রূপক আর বাণী হইতে রসালার বৈলক্ষণ্য হেতু ব্যতিরেক অলঙ্কার অন্বেষণীয়। আরাধ্যের রূপবর্ণনা-সেবায় নানা অলঙ্কার মণ্ডিত কাব্যোপচার প্রদানপূর্ব্বক তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন,

অপার মাধুর্য্য সুধার্ণবানি
নানাঙ্গ ভূষাচয় ভূষণানি।
জগদ্দৃগাসেচনকানি শৌরে
বর্ণ্যানি নাঙ্গানি সহস্রবক্তৈঃ॥

এই শ্লোকেও স্বভাবোক্তি রূপক এবং আক্ষেপালঙ্কার দ্রষ্টব্য। অপার মাধুর্য্যামৃত সাগর, অঙ্গভূষণেরও ভূষণ, জগতের দৃষ্টির অভিষেকামৃত শূরনন্দন কৃষ্ণের অঙ্গসমূহ সহস্রবদনেও বর্ণনা করা যায় না।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

১৫০১ সনের ঘটনাবলী

অবরোধ কয়েকদিন ধরে চলছে। রসদ এবং অন্যান্য দরকারি জিনিষও বাইরে থেকে আর আসছেনা। কোনও জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়ারও আর বিন্দুমাত্র আশা নাই। এই অবস্থায় আমার সেনারা আর নগরবাসীরা মনোবল হারিয়ে ফেলে দুই একজন করে ক্রমশ আমার দল ছেড়ে চলে গেল। সেবানি খাঁ নগরবাসীদের দুর্দ্দশার কথা জানতে পেরেছিল। সে সুযোগ বুঝে 'প্রেমিক গুহার কাছে এগিয়ে এসে শিবির স্থাপন করলো। এই বিপদের সময় দশ পনেরোজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে উজ্জন নগরের মধ্যে ঢুকে পড়লো—জাহাঙ্গির মির্জ্জার বিদ্রোহের সময় যার ফলে আমাকে পূর্ব্বে সমরকন্দ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, এই উজ্জন হাসানই ছিল সে বিদ্রোহের প্রধান চক্রান্তকারী। তারপরও সে বরাবর বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

খাদ্যাভাব এবং নানা দুর্দ্দশায় কাবু হয়ে পড়েছে আমার সৈন্য আর নগরবাসীরা। যে সব লোক আমার সঙ্গে বরাবর ছিল এবং যারা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল তারাও দুর্গ প্রাচীর টপকিয়ে পালাতে সুরু করলো। কোনও দিক থেকে কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা নাই দেখে আমিও হতাশ হয়ে পড়লাম। এমন কোনও দিকই চোখে পড়লো না—যে দিক থেকে আশার ক্ষীণ আলোও দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের রসদ এবং দরকারি জিনিষ প্রথম থেকেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। এখন তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল, আর নগরে রসদ আনারও উপায় নাই। এই অবস্থায় সেবানি খাঁ কতকগুলো সর্ত করে পাঠালো। যদি কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা থাকতো অথবা যদি সামান্য কিছুও খাদ্যসামগ্রী মজুদ থাকতো তাহ'লে কখনও আমি তার কথায় কর্ণপাত করতাম না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমি দুর্গ সমর্পণে স্বীকৃত হই এবং গভীর রাতে আমার মা খানুমের সঙ্গে দুর্গ ছেড়ে চলে আসি। আর দুইজন মহিলাও আমাদের সাথে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু আমার বড় বোনকে ওয়া আটকায় এবং

সে সেখানি খাঁয়ের হাতে পড়ে। রাতের অন্ধকারে আমরা অনেকবার পথ হারিয়ে ফেলি এবং অনেক কষ্ট ভোগ করে ভোর নাগাদ দিদার অতিক্রম করি। সকাল বেলায় নমাজের সময় 'কার বোঘ' পাহাড়ে পৌঁছে যাই। পথে আমি কাম্বার আলি আর কাশিম বেগের সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ের পাল্লা দিই। আমার ঘোড়াই অবশ্য আগে আগে ছুটছিল। কতদূরে এগিয়ে এসেছি দেখার জন্য যেমন পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়েছি, অমনি ঘোড়ার জিন যেটা আল্‌গা বাঁধা ছিল সেটা ঘুরে গেল, আর আমিও মাথা নীচু করে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি আবার মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ায় চেপে বসলাম, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি যেন জ্ঞান-হারা হয়ে ছিলাম। এই জগতের সমস্ত কিছুই যেন ধোঁয়াটে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তিই যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

সান্ধ্য নমাজের পর আমরা একটা গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে একটা ঘোড়া জবাই করে তার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেই মাংস খাই। সেখানে ঘোড়াদের বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করি। তারপর আবার রওনা হয়ে পরদিন ভোরে 'দিজাক্' নামে এক গ্রামে পৌঁছে যাই। এখানে আমরা পেলাম সুন্দর চর্ব্বি-ওয়ালা মাংস, ভাল সেঁকা গমের রুটি। মিষ্টি ফুটি আর প্রচুর রসালো আঙ্গুর। সুতরাং দুর্ভিক্ষের চরম সীমা থেকে পৌঁছে গেলাম প্রাচুর্য্যে, দুর্বিপাক আর বিপদের সীমানা থেকে পৌঁছে গেলাম শান্তি আর আরামের রাজ্যে।

'দুঃখ কষ্ট অনাহার ফেলে দূরে
এলাম চলে এক শান্তির দেশে।
লাভ করলাম নতুন জীবন,
পৌঁছে গেলাম সুন্দর পরিবেশে।
মন থেকে মৃত্যুভয় মুছে গেলো
ক্ষুধার নির্ম্মম জ্বালা দূর হ'লো,
(জীবনে) সুষমা পেলাম ফিরি অবশেষে।'

আমার সমগ্র জীবনে এমন আনন্দ আর কোনও দিন পাইনি। এমন শান্তি ও প্রাচুর্য্যের উপলব্ধিও আর কোনও সময়েই আমার হয়নি। চার পাঁচবার দুঃখকষ্টের পর আরাম এবং অভাব থেকে প্রাচুর্য্যে উত্তীর্ণ হয়ে অসীম আনন্দ ভোগ করেছি। কিন্তু এই প্রথমবার আমি শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যে নিরাপত্তাবোধ এবং ক্ষুধার পীড়া থেকে পরিত্রাণ লাভ করে যে প্রাচুর্য্যের স্বাদ পাই তার তুলনা হয় না। দুই তিনদিন 'দিজাকে' বিশ্রাম এবং আনন্দ ভোগ করে 'দেখাটের' দিকে অগ্রসর হই।

'দেখাট' এক উঁচু পর্ব্বতের নীচে অবস্থিত। এখানকার অধি-বাসীরা জাতিতে 'আর্য' হলেও তাদের বহু ভেড়া ও ঘোড়া আছে তুর্কিদের মতই। 'দেখাটে' চল্লিশ হাজারের মত ভেড়া আছে। আমরা চাষীদের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। আমি এখানকার একজন গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে ছিলাম। বাড়ীর মালিকের বয়স সত্তর আশি বছর। তাঁর মা তখনও বেঁচে ছিল—তার বয়স তখন ১১১ বছর। এই বৃদ্ধা মহিলার একজন আত্মীয় যখন তাইমুরের সৈন্য হিন্দুস্থান আক্রমণ করে তখন সেও তাদের সঙ্গে ছিল। এই ঘটনার কথা সেই বৃদ্ধার তখনও স্মৃতিতে ছিল এবং সে প্রায়ই সেই সব কথা আমাদের বলতো। যতদিন আমি 'দেখাটে' ছিলাম নিকটের পাহাড়ে পাহাড়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতাম। পাহাড়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস করে দেখা গেল যে আমাদের পায়ের পাতা এমন শক্ত হয়ে উঠেছে যে পাথরকে আর পাথর মনে করতাম না। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মধ্যে একদিন পাহাড়ি পথে চল্‌তে চল্‌তে দেখলাম যে একটি লোক পাহাড়ি সরু পথে একটা গরু নিয়ে যাচ্ছে। তার কাছে আমি পথের নিশানা জানতে চাহিলাম। সে বললো—আমার গরুর দিকে নজর রাখো। যতক্ষণ না এই রাস্তার মাথায় পৌঁছায় ততক্ষণ এই গরুর দিক ছাড়া অন্য দিকে দৃষ্টি দিও না, তা হলেই তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। খাজা আসেদুল্লা লোকটির রসিকতা উপভোগ করে টিপ্‌পনি কেটে বল্‌লো—আমাদের মত জ্ঞানী লোকের কি অবস্থা হবে যদি এই গরুটি পথ ভুল করে।

শীতকালে আমার অনেক সেনা এখানে দলবেঁধে লুঠ-তরাজের সুযোগ নাই দেখে আন্দেজানে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইলো। কাশিম বেগ আমাকে উপদেশ দিল যে যখন এরা ফিরে যেতে চাইছে তখন এদের সঙ্গে জাহাঙ্গির মির্জ্জাকে আমার কোনও একটা পোষাকের জিনিষ পাঠালে ভাল হয়। আমি একটা উদ্বিড়ালের চামড়ার টুপি পাঠালাম। কাসিম বেগ তারপর আবার বল্‌লো—তামবলকেও কোনও একটা উপহার পাঠালে কি বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে? যদিও তার এই উপদেশে আমি মনে মনে সায় দিইনি তবুও তার উপর্য্যুপরি অনুরোধে আমি তামবলকে সমরকন্দে তৈরী একটা বড় তরবারি পাঠালাম। ঠিক এই তরবারিই পরে কেমন করে আমারই মাথায় এসে পড়েছিল সে কথা পরের বছরের ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করবো।

কয়েক দিন পরে আমার ঠাকুমা—যিনি সমরকন্দ ছেড়ে আমার সঙ্গে আসতে পারেন নি—তিনি এই সময় পরিবার পরিজন এবং ভারী আসবাব পত্র এবং কয়েক জন ক্ষুধায় পীড়িত ক্ষীণকায় অনুচর নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছলেন।

শীত ঋতুতে খোজেন্দের নদীর জল জমাট বরফ হয়ে যায়। সেই সময় সেবানি খাঁ সেইনদী অতিক্রম করে খোজেন্দে পৌঁছায় এবং এই দেশ বিধ্বস্ত করে। আমি এই সংবাদ পেয়ে আমার সৈন্যসংখ্যা নগণ্য হলেও আক্রমণের জন্য খোজেন্দের দিকে অগ্রসর হই। দারুণ শীত। ঠাণ্ডা হাওয়ার তাণ্ডব অবিরাম চলেছে। শীতের তীব্রতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দুই তিন দিনের মধ্যে অসহ্য শীতের দরুণ আমার কয়েক জন অনুচর প্রাণ হারালো। এই সময় দেহের পবিত্রতার জন্য ধর্ম্মের অনুশাসনে আমার অবগাহন করার প্রয়োজন হলো। একটা ছোট

নদীতে স্নানের জন্য নেমে গেলাম। নদীর তীরের কাছাকাছি জল বরফ হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে শুধু জল চোখে পড়ছে, কারণ সেখানে স্রোত বইছে। সেই জলে আমি নেমে গেলাম এবং ষোল বার ডুব দিলাম। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল আমার সর্ব্বদেহে সূঁচ ফুটাতে লাগলো। পরদিন সকালে খোজেন্দের নদীর জমাট বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে পার হয়ে এলাম। সেবানি খাঁ তার আগেই সে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে!

লুণ্ঠনকারী উজবেকরা সরে পড়েছে এই বিবরণ পেয়ে আমি এই সংবাদ লোক মারফৎ খান্‌কে জানিয়ে দিই। মোল্লা হাইদারের ছেলে মোমিন সমরকন্দে পরিচয় হয়েছিল এই সূত্রে নেডিয়ান গোকুল তাসকে এবং আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে। আমি যখন বেস্‌কেট থেকে চলে আসি—তখন এই দল এখানেই থেকে যায়। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপর ভোজের আয়োজন করা হয়। পরদিন সকালে সংবাদ পাই যে মত্ত অবস্থায় নেডিয়ান্ গোকুল তাস খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আমি হক্ নাজিরের সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করতে পাঠাই—যেখান থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। বেস্‌কেতে কবর দিয়ে তারা আমার কাছে ফিরে আসে। উৎসবের জায়গা থেকে কিছু দূরে তারা নেডিয়ানের মৃতদেহ দেখতে পায় একটা খাড়াইয়ের তলে। অনেকেই সন্দেহ করে যে মোমিন নেডিয়ানের ওপর তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই তাকে এই ভাবে হত্যা করেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি তা অবশ্য কেউ জানে না। তার মৃত্যুতে আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়ি। জীবনে খুব অল্প লোকের অভাবেই আমি এমন বিহ্বল হয়েছি। প্রায় দশদিন আমি অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করি। কয়েকদিন পরেই আমি দেখাটে ফিরে আসি।

দেখাট জায়গাটা সমতল ভূমি। সেখান থেকে চলে এলাম মাসিখার পার্ব্বত্য প্রদেশে—যেখানে ঝরণার জল পাওয়া যায়। ঝরণার ধারে আমার একটি কবিতা প্রস্তরে খোদাই করে রাখার ব্যবস্থা করি।

'মহান্ জেমসিদ, এক ঝরণার ধারে
রেখেছেন বাণী তাঁর পাথরে খোদাই করে।'
"এই ঝরণার ধারে, আমাদের মত
লয়েছে বিশ্রাম, লোক অগণিত।
তারপর নিমিষে মুছে গেছে
সেই স্মৃতি পৃথিবীর বুক থেকে।
যদি বা করিতে পারি এ জগৎ জয়।
ব্যক্তিত্ব ও বাহুবলে
তবুও সে গৌরব পারিব না করিতে বহন
নিজ সাথে।
জীবনের পর পারে যখনই যাব চলে।"

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কবিতা বা অন্য কোনও অনুলিপি পাথরে খোদাই করে রাখার রেওয়াজ আছে।

এই সময়ে কবি মোল্লা হাজারি আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি এই কবিতাটি তখন রচনা করি।

'শিল্পী তোমার ছবি আঁকুক
যতই নিপুণ হাতে,
(সেই) ছবির চেয়ে তুমি যে মহীয়ান্।
লোকে তোমায় আত্মা বলুক
যতই গরব করে,
(সেই) আত্মা থেকে তুমি যে গরীয়ান।"

কবিতা লেখার চল্‌তি রীতি অনুযায়ী আমি একটি কবিতা লিখি: ছন্দ নির্ভুল হলো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কবিতার রীতি ও গাঁথুনির নিয়ম সম্বন্ধে আমার কোনও পড়াশোনা ছিল না। খাঁ অবশ্য কবিতার রীতিনীতিতে ওয়াকিবহাল বলে অহঙ্কার করতেন। তিনি কবিতা লিখতেও পারতেন, যদিও তাঁর কবিতার ছন্দভঙ্গী ও বিষয়বস্তু খুবই কাঁচা রকমের ছিল। আমার কবিতাটি তাঁকে দেখিয়ে এর ছন্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা বলি। কিন্তু তিনি আমার সন্দেহ দূর করার মত কোনও জোরালো সদুত্তর দিতে পারেন নি। বাস্তবিক পক্ষে কবিতার রীতিনীতি বিচার করবার মত তাঁর কোনও গভীর জ্ঞান ছিলনা। আমার চারপদী কবিতাটা হচ্ছে এই!—

(তুর্কিতে)

'যে জন বিপাকে পড়ে, স্মরণ কি করে তারে কেউ?
নির্ব্বাসিত জনের মনে বনে কি সুখের ঢেউ?
আনন্দ গিয়েছে চলে মন থেকে, আমি পরবাসী।
নাই শান্তি নাই সুখ, যত আমি হইনা সাহসী।'

আমি অবশ্য পরে জান্‌তে পেরেছিলাম যে কাব্য রচনায় কবির স্বাধীনতা আছে তাতে তুর্কি ভাষায় 'তে' এবং 'ডাল্' ও 'গায়েন্', ক্বাফ্' ও 'কাফ্' ছন্দ মেলাতে প্রায়ই একটার বদলে আর একটা ব্যবহার করা চলে।

পরদিন সকালে আমার সেনারা একটি শিকারের দল গঠন করে কাছাকাছি শিকার করতে আরম্ভ করে, তারপর এগিয়ে গিয়ে 'বুরাকে' গিয়ে থামে। আমার প্রথম লেখা গীতি-কবিতাটি এইখানে শেষ করি।

কবিতাটি এই!—

'নিজ আত্মা ছাড়া
পাই নাই, কোনও কালে
হিতৈষী বিশ্বাসী বন্ধু
এই ভূমণ্ডলে।

অন্তরের বাণী ছাড়া,
আর কোনও বাণী
পাই নাই, শুনি নাই,
যে বাণী দেখাবে পথ,

ঘুচাবে মনের গ্লানি।
নিজের হৃদয় ছাড়া
আর কোনও বন্ধু নাই মোর
এই ধরাতলে।'

আমার কবিতাটি বার পংক্তির। এরপর আমি যতগুলি গীতি কবিতা রচনা করেছি—সবগুলি এই রকম বার পংক্তির।

এখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে খোজেন্দের নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছাই। নদীর অপর পারে পৌঁছিয়ে একদিন একটি উৎসব উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা করি। তাতে আমার সমস্ত কর্ম্মচারী আর তরুণ সেনারা আনন্দে যোগ দেয়। সেইদিনই আমার কোমরবন্ধের সোনার আঁকড়াটি চুরি যায়।...

১৫০২ সালের ঘটনাবলী

এই বছর তাসখেন্দে থাকার সময় আমি অসহনীয় দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ি। আমার কোনও দেশ নাই, কোনও কালে আমার বলতে পারবো এমন কোনও আশাও নাই। অভাবের তাড়নায় আমার ভৃত্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারাও দারিদ্র্যের জন্য আমাকে অনুসরণ করতে পারেনি। যখন আমার মাতুলের কাছে 'ডিভানে' আসি, তখন মাত্র দুই একজন ভৃত্য আমার কাজের জন্য ছিল। তবে এক বিষয়ে আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে আমার এই অবস্থা কোনও অপরিচিত লোকের নজরে পড়েনি—শুধু আমার নিজের আত্মীয়দের কাছেই ধরা পড়েছিল। মাতুল খানকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি খালি পায়ে, খালি মাথায় সা' বেগমকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম—ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে যেমন স্বাধীনতা লোকে নিজের বাড়ীতে ভোগ করে থাকে।

শেষ পর্য্যন্ত আমার এই অনিশ্চিত জীবন যাত্রায় আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ি। গৃহহীন, ভবঘুরে অবস্থার যন্ত্রণা যেন আর সহ্য করতে পারছিনা। বেঁচে থাকাটাও যেন দুঃসহ বলে মনে হচ্ছে। ভাবলাম, এই বিড়ম্বিত জীবনযাপন করার চেয়ে দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও নিভৃত জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করি যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, আমার পরিচয়ও জানতে পারবে না। জনসমাজে আমার এই দুঃখ দুর্দ্দশা এবং হীনতা দেখিয়ে বেড়ানোর চেয়ে যতদূর আমার পা চলে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। মনে করলাম চীনে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে নতুন করে ভাগ্যের সন্ধান করি। শৈশব কাল থেকেই চীনে যাবার স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি—কেননা আমি ছিলাম রাজা এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রজাসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য উপেক্ষা করে দূরে যাওয়া চলে না। এখন রাজার মুকুট মাথা থেকে খসে পড়েছে, আমার মাও তাঁর মা ও ছোট ভাইয়ের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। সুতরাং এখন আর আমার দূরে সরে যাওয়ার বাধা কোথায়? আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়েছে! আবুল মকারমের মারফৎ আমি এই কথাটা প্রচার করতে চেয়েছিলাম যে সেবানি খাঁর মত দুর্দ্ধর্ষ লোক যখন একবার শত্রুতা আরম্ভ করেছে তখন তুর্কি হোক—কি মোগলই হোক সকলেরই ভয়ের কারণ আছে। সুতরাং যাযাবর তাতারদের সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করার আগেই তার কার্য্য কলাপের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে। কারণ কথায় আছে—

'থাকিতে সময় নেভাও আগুন,
বিলম্ব ঘটিলে, হবে নিদারুণ,
জগৎ জ্বলিবে দাউ দাউ করে
যদি না সময়ে নেভাতে পার।
শত্রুধনুতে শর সংযোজন
করিতে দিওনা, হবে অঘটন।
চকিতে তুলিয়া তীর ধনু করে
আগেই যদি না আঘাত কর।

এ ছাড়া প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর খাঁ তাঁর ভাইকে অর্থাৎ আমার ছোটকাকাকে দেখেননি এবং আমিও তাঁকে কোনওদিন দেখিনি। সুতরাং আমি ভাবছি যে এইবার ছোটমামার কাছে চলে যাই এবং মধ্যস্থ হয়ে যাতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হয় তার ব্যবস্থা করি।

এই কথাগুলো প্রচার করার আমার উদ্দেশ্য হলো যে এই দল করে আমি আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে সরে যাব। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করি যে এখান থেকে সরে পড়ে মোগলি-স্থানে চলে যাব এবং নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবো। আমার মতলবের কথা ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ করিনি, কারণ এটা প্রকাশ করবার মত কথা নয়। আমার ইচ্ছাটা মাকে জানালে তিনি এতে কিছুতেই মত দেবেন না। তা ছাড়া, যে সব সঙ্গীরা এখনও আমার অনুগত রয়েছে ও আমার ভবঘুরে জীবনে দুঃখকষ্টের অংশভাগী হয়েছে, তারা এখনও মনে মনে ভিন্ন রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আছে। সুতরাং আমার মনের কথা তাদের কাছেও প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। আবুল মকারাম অবশ্য সা' বেগম ও আমার মামার কাছে আমার শেখানো কথাটা জানিয়ে দিল এবং তাঁদের অনুমতিও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁদের পরে মাথায় এলো যে আমাকে যথারীতি আদর আপ্যায়ন করা হয়নি, বলেই বোধ হয় আমি দূরে সরে যেতে যাচ্ছি। তাঁদের এই সন্দেহের জন্যই তাঁরা আমাকে দূরে চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে বিলম্ব করলেন। এই সময় আমার ছোটমামার কাছ থেকে একজন লোক এসে জানালো যে তিনি নিজেই এখানে আসছেন। আমার দূরে, চলে যাওয়ার অভিসন্ধিটা এইভাবে একরকম ভেস্তে গেল। ছোটমামার কাছ থেকে আর একজন লোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসেই জানালো যে তিনি প্রায় এসে পড়েছেন। সা' বেগম এবং আমরা আর সকলে ছোটমামার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা 'ইয়েমা' পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ছোট খাঁ কখন ঠিক পৌঁছিয়েছেন জানতে না পেরে আমি ঘোড়ায় চড়ে অনির্দিষ্টভাবে দেখা

দেখবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখোমুখি একেবারে ছোট-মামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি অস্বস্তি ভোগ করছিলেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল যে এক নির্দ্দিষ্ট জায়গায় অবতরণ করে নিজ আসনে বসে আমাকে খুব জমকের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনা জানাবেন। কিন্তু আমি হঠাৎ তাঁর সম্মুখে এসে পড়ায় তাঁর সে সুযোগ মিললোনা। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলাম তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। তিনি উত্তেজিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁর দুই পুত্র সুলতানদের ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটুগেড়ে বসতে এবং আমাকে আলিঙ্গন করতে আদেশ করলেন। দুই সুলতানকে আলিঙ্গন করে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমরা সা' বেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিছু পরেই ছোট খাঁর সঙ্গে সা'বেগমের সাক্ষাৎ হ'লো। খাঁ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। তারপর তাঁরা পুরণো গল্প নিয়ে মাঝ রাত্তির পর্য্যন্ত মেতে রইলেন।

পরদিন ছোট মামা মোগলদের রীতি অনুযায়ী মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত পরার উপযোগী পোষাক ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত একটি ঘোড়া আমাকে উপহার দিলেন। পোষাকের মধ্যে ছিল সোনার সুতোয় নক্সা করা একটা মোগলটুপি। চায়না সাটিনের একটা লম্বা আলখাল্লা—তাতে সূঁচে তোলা নানা ফুলের নক্সা, একটা পুরনো রীতিতে তৈরী বুক পিঠ ঢাকার চীনা বর্ম্ম, একটা শান্ দেওয়ার পাথর, একটা টাকা রাখার থলি, সেই থলির এক পাশে ঝুলছে কয়েকটা জিনিষ যেমন মেয়েরা গলায় পরে এমন অল্পদামের মণি—সুগন্ধি মাটি রাখবার ছোট্ট কৌটা। থলির অন্য পাশেও এমনি তিন চার রকমের জিনিষ ঝোলানো আছে।

এখান থেকে আমরা তাসকেন্দের দিকে ফিরে চললাম। আমার বড় মামা তাসকেন্দ থেকে বেরিয়ে যোল মাইল পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। একটা সামিয়ানা খাটিয়ে তারই নীচে তিনি বসেছিলেন। ছোট খাঁ সোজাসুজি তাঁর সম্মুখে এসে বড় খাঁর বাঁদিকে ঘুরে গেলেন এবং চক্রাকারে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তাঁকে সেলাম জানিয়ে নয়বার নতজানু হলেন। তারপর এগিয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ছোট ভাই আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দুই ভাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আলিঙ্গনের পর ছোটভাই আবার নয় বার নতজানু হলেন। রীতি অনুযায়ী বড় খাঁকে উপঢৌকন দেওয়ার সময়ও তিনি বারংবার নতজানু হচ্ছিলেন। উপহার দেওয়ার পর তিনি নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ছোট খাঁর লোকজনও মোগল পোষাকে সজ্জিত ছিল। মাথায় তাদের মোগল টুপি। চায়না সাটিনের আলখাল্লা গায়ে—তাতে ফুলের নক্সা, কাঁধে ঝুলছে তুনীর। ঘোড়ার জিন সবুজ রঙের মোটা চামড়ার এবং ঘোড়াগুলিও মোগল প্রথায় সজ্জিত।

ছোট খাঁ অল্পসংখ্যক লোক সঙ্গে এনেছিলেন। তারা সংখ্যায় এক হাজারের বেশী কিন্তু দু' হাজারের কম। তিনি বলিষ্ঠ এবং সাহসী পুরুষ, তরবারি চালনায় নিপুণ এবং তাঁর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তরবারির উপরেই তাঁর আস্থা ছিল বেশী। তিনি বলতেন দণ্ড, বর্শা কুঠারের ওপর একবারই মাত্র নির্ভর করা যায়। প্রথম আঘাত ব্যর্থ হলে আর কোনও উপায় থাকে না। তাঁর বিশ্বাসী তীক্ষ্ণ তরবারি কখনও তিনি দূরে রাখতেন না, হয় সেটা থাকতো তাঁর কোমরে বাঁধা—না হয় তাঁর হাতে। তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ভিন্ন দেশে এবং গৃহ থেকে দূরেই অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি ব্যবহারে ছিলেন একটু রুক্ষ এবং কথাবার্ত্তায় কর্কশ। যখন আমি ছোট মামার সঙ্গে ফিরে আসি তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিত মোগল সাজে সজ্জিত। আবদল মকারাম আমাকে চিনতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—এই সুলতানটি কে? যতক্ষণ আমি কোনও কথা বলিনি সে আমাকে চিনতেই পারেনি।

তাসকেন্দে ফিরেই দুই খাঁ সুলতান আমেদ তাম্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। ছোট খাঁ আর আমি আগেই চলে যাই। পার্ব্বতী পথ অতিক্রম করবার পর সৈন্যসংখ্যা গণনা করে দেখা গেল—অশ্বারোহী সেনা প্রায় ত্রিশহাজারের মত হবে। কাছাকাছি দেশ থেকে খবর এসে পৌঁছালো যে তাম্বলও তার সৈন্য নিয়ে আখসির দিকে অগ্রসর হয়েছে। ছোট খাঁ পরামর্শ করে স্থির করলেন যে আমাকে একদল সৈন্য দিয়ে পাঠাবেন—যাতে আমি খোজেন্দের নদী পার হয়ে উসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তামবলের সৈন্য ব্যূহর পেছন দিকে আক্রমণ করতে পারি। কারনান্ থেকে আমি খাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে খোজেন্দের নদী ভেলায় পার হয়ে যাই এবং দ্রুত উসের দিকে এগোতে থাকি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উস্ দুর্গের কাছে পৌঁছে যাই। দুর্গরক্ষীরা তখন অসতর্ক অবস্থায় ছিল, আমাদের আগমনের সংবাদও তারা পায়নি। আর কোনও উপায় না দেখে তারা দুর্গ আমাদের হাতে সমর্পণ করে। সেখানকার অধিবাসীরা আমার খুবই অনুরক্ত ছিল এবং আমি কবে ফিরে আসব এই অপেক্ষা করছিল। কিছুটা তামবলের ভয়ে এবং কিছুটা আমি অনেক দূরে ছিলাম বলে তাদের নিঃস্বার্থঃ হয়েই থাকতে হয়েছিল। আমার উসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দেজানের পুব ও দক্ষিণ থেকে এই পার্ব্বত্য ও উপত্যকাবাসীরা দলে দলে আমার কাছে এসে উপস্থিত হতে লাগলো। উজকেন্দবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানকার সুদৃঢ় দুর্গটি আমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলো। সীমান্তবর্ত্তী উজকেন্দই এককালে দারগানার রাজধানী ছিল। তারা একজন লোক পাঠিয়ে তাদের আনুগত্য জানালো। কয়েকদিন পর মারখিনানের অধিবাসীরা সেখানকার গর্ভনরকে আক্রমণ করে তাকে তাড়িয়ে আমার দলে যোগ দিল। খোজেন্দ নদীর তীরস্থ আন্দেজানের অংশবর্ত্তী সমস্ত দেশের অধিবাসীরা কেবল আন্দেজান ছাড়া আর সব সুরক্ষিত স্থানের অধিকার আমার হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলো। এই

সময় যদিও অতগুলি সুরক্ষিত দুর্গ আমার অধিকারে চলে এল এবং সমস্ত দেশ জুড়ে তাম্বলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহজনিত গোলমাল সুরু হয়ে গেল—কিন্তু তাম্বল এতে একটুও বিচলিত না হয়ে তার সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে আখসি ও করনানের মাঝামাঝি জায়গায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করে খাঁদের সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে শিবির স্থাপন করে। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হলো বটে, কিন্তু তাতে কোনও পক্ষেরই জয় পরাজয়ের মীমাংসা হলো না।

আন্দেজানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গ সহ অধিকাংশ জাতি ও উপজাতীয় লোক আমার বশ্যতা স্বীকার করলো। আন্দেজানের অধিবাসীরাও আমার পক্ষে চলে আসার জন্য খুবই উৎসুক ছিল কিন্তু তারা কোনও সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। আমি মনে করলাম এক রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে আন্দেজানের সীমানায় গিয়ে পৌছাই। সেখান থেকে একজন বিশ্বস্ত লোককে আন্দেজানের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্য পাঠিয়ে দেব। যদি তারা আমার অভিপ্রায় মত কাজ করতে রাজি হয় তাহলে তাদের সাহায্যে আমাকে যে কোনও উপায়ে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এই মতলব ঠিক করে একদিন সন্ধ্যায় উস্ থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং মাঝরাত্রের কাছাকাছি আন্দেজানের দুই মাইলের মধ্যে এসে পড়লাম। সেখান থেকে কাম্বার আলি বেগ্ ও আরও কয়েকজন বেগকে এগিয়ে যেতে বলি। তাদের উপদেশ দিই, তারা যেন গোপনে কয়েক জনকে খাজা এবং আর মাতব্বর লোকদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আমি এবং আমার অনুচররা সেই জায়গাতেই অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করতে থাকি।

রাত্রি তখন প্রায় তিন প্রহর। আমাদের মধ্যে কতক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে, কেউ কেউ গভীর ঘুমে মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ রণবাদ্য বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রণহুঙ্কারে স্থানটা সরগরম হয়ে উঠলো। আমার লোকেরা ঘুমের ঘোরে অভিভূত হয়েছিল। তারা বুঝতে পারলো না শত্রুপক্ষের কতজন লোক তাদের আক্রমণ করতে এসেছে। তারা ভয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো। দলবদ্ধ হয়ে পালাবার কথাও তাদের মনে হলো না। নিজের নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। আমার এমন সময় হলো না যে তাদের আবার একসাথে জুটিয়ে নিতে পারি। উপায়ান্তর না দেখে আমি শত্রুর দিকে তিনজন অনুচর নিয়ে অগ্রসর হলাম। আমরা চারজন ছাড়া আর সকলেই পালিয়ে গিয়েছে। আমরা একটু অগ্রসর হতেই শত্রুপক্ষ রণহুঙ্কার তুলে একঝাঁক শর নিক্ষেপ করে আমাদের আক্রমণ করলো। সাদা মুখ ঘোড়ায় চড়া একজন সেনা আমার কাছে এসে গেল। আমি একটি তীর ছুঁড়লাম। সেটা ঘোড়াকে বিঁধলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শত্রুপক্ষ একটু থমকে গেল। আমার তিনজন সহচর আমাকে বললো—এই রাতের অন্ধকারে শত্রু পক্ষের যে কতজন লোক আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে বোঝা কঠিন। আমাদের দলের সমস্ত সেনাই পালিয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে সংখ্যায় নগণ্য—মাত্র চারজন লোক আছি। এই অল্প লোক নিয়ে আমরা শত্রুপক্ষের এমন কি ক্ষতির আশা করতে পারি? বরং আমাদের পলায়নপর সেনাদের পিছু নিয়ে তাদের একত্রিত করে এখানে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাই ভাল।

দ্রুত অশ্বচালনা করে আমরা পলায়নপর সেনাদের ধরে ফেললাম। তাদের কয়েকজনকে চাবুক দিয়েও দস্তুরমত পেটা হলো। কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার আমরা চারজন ফিরলাম। আমাদের অনুসরণকারীদের ওপর একঝাঁক শরও নিক্ষেপ করলাম। শত্রুরা একটুখানি থামলো। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেলো যে আমরা মাত্র চারজন তীর চালাচ্ছি, তখন তারা আমার সব সেনা পালাচ্ছে তাদের অনুসরণ করে তাদের ওপর অস্ত্র হানবার জন্য সেইদিকে ধাওয়া করলো। যখন দেখা গেল যে আমার সেনারা কিছুতেই যুদ্ধ করবে না তখন তাদের রক্ষা করার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তিন চারবার তীর চালিয়ে তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। শত্রুসৈন্যরা এইভাবে আমাদের অনুসরণ করে পাঁচ মাইল চলে আসে। আমি বললাম শত্রু সেনা বেশী দেখা যাচ্ছে না এসো, আমরা একজোট হয়ে ওদের আক্রমণ করি। কিন্তু যখন আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলাম ফিরে চেয়ে দেখি আমার সৈনারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ছত্রভঙ্গ সৈন্যরা একে একে নানাদিক থেকে এসে হাজির হলো বটে কিন্তু আমার সুদক্ষ সৈন্যদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিল যে তাদের ভয়ের ভাব তখনও দূর হয়নি। তারা সোজাসুজি উসে চলে গেল।

ক্রমশঃ

গল্প

নিতান্তই সাধারণ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

মীনাক্ষী, মিনতি, মীনা—হয়ত অন্য কিছু কাণ্ড হইতে পারে। আমি কিন্তু শুনিয়াছি মীন্‌পুরা নামের অপভ্রংশ মাত্র।

প্রায় প্রত্যহই দেখি, বুকঠাসা ট্রামে অফিস-যাত্রীদের মধ্যে যৌবনের মীন-কেতন উড়াইয়া চলিয়াছে, শুধু মীন নয়, আরো কয়েকজন সহপাঠিনীও আছে, বাব্‌লি, পান্না, চিঙ্‌ড়ি—হীরে, জহরৎ, মণি।

পরীক্ষার সময় ছাড়া জীবনে তাহাদের প্রজাপতির রঙ্‌—ছটফটে স্বভাব। অফিস-যাত্রীদের মাঝে নিত্যই কলেজে যাওয়া। পড়াশুনার আলাপ-আলোচনার বাহিরে জীবনের আরেক পৃথক সত্তা আছে। কোন তরুণ কাহাকে দেখিয়া মজিয়াছে, কাহার জন্য কে কি খাইয়া মরিতে প্রস্তুত—ইত্যাদি আলোচনা ট্রামে কলেজ-যাওয়ার পথে মুখর হইয়া ওঠে।

শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেছে। জীবনের নিত্য-প্রয়োজনের তাগিদে—সংসারের গণ্ড-অপগণ্ড প্রতিপালনে, যৌবনের রঙ্‌ এখন বিবর্ণ যাহাদের, তাহাদের এখন এ-সব কথায় মন দেওয়ার তেমন আগ্রহ কোথায়?

তবুও টুকরা টুকরা কথাগুলি মনে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক হানে!

এই মীন্‌, তোর অতনুর খবর কীরে? বাব্‌লি শুনাইতেছিল—

'আর বলিস্‌ নে ভাই, বেচারির জন্যে কী করি বল্‌ তো? মীনা সমস্যা-জড়িত কণ্ঠে বলিল।

'এতদূর যখন, তখন বল্‌ না তোর বাবাকে, বিয়ের প্রস্তাব করুক্‌!' বাব্‌লিরই কণ্ঠস্বর।

পান্না ওপাশের সীট হইতে টিপ্পনি কাটিল, 'ওদের বাড়িতে শুঁট্‌কি মাছের ঝাল খেয়েই তুই মজেছিস্‌?'

চিঙ্‌ড়ি ছটফট করিতেছিল, 'ও বাবা, ব্যাপার কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে? ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত! কিন্তু আমাদের বাদ দিলি কেন ভাই?

মীনা বলিল, 'নারে, অতটা হাল্কা নয়। ব্যাপারটি সিরিয়স? আমাকে না পেলে অতনু নাকি সায়নায়েড্‌ খেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

তারপর আরো কত ফিসফিসানি চলিতে লাগিল। বালিগঞ্জের ডিপো হইতে ট্রাম আগাইয়া চলিয়াছে। ভিড়ে ভারাক্রান্ত ট্রাম-প্রকোষ্ঠ, অগণন যাত্রীদের ওঠা-নামার ব্যস্ততায়, কলরবে, হাঁক ডাকে কলেজে-পড়া মেয়ে কয়টির কলকণ্ঠ ডুবিয়া গেল।

লেডিস সীটের পিছনে বসিয়া শুনিতেছিলাম—টুকরা কথার কলধ্বনি। অনুমানে বুঝিলাম, কোন এক অতনু থতনু মীনের প্রেম সম্বন্ধে হাবুডুবু খাইতেছে। মীনের মনে তাহারই প্রতিক্রিয়া।

লেডিস সীটের পিছনের একক জায়গাটিতে নিত্য বসিবার সুযোগ নাই! মীন, পান্না, বাব্‌লি, চিঙড়ির সমস্যাকে তাই প্রতিদিন ছুঁইতে পারি না।

সেদিন অফিস যাইবার কালে মীন-সম্প্রদায়ের কাছাকাছি ছিলাম, শুনিলাম আরেক কথা। ভয়ঙ্কর কথা।

চলন্ত ট্রাম হইতে একখানি দণ্ডায়মান ট্যাক্সিকে দেখাইয়া মীন বলিতেছিল, 'ওই যে দেখছিস্‌! ঠিক এসে জুটেছে।'

'কে? তোর সেই দৈত্য?' পান্না মুখ বাড়াইয়া দেখিল।

'হ্যারে, যা বলেছিস—ঠিক যেন জায়েন্ট?' বাব্‌লি মন্তব্য করিল।

চিঙড়ি কহিল, 'আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়ার ব্যবস্থা করনা, তোর অতনুকে ব'লে।'

মীন আস্ফালন করিল, 'অতনুর দরকার কী? আমার পায়ে কী স্যাণ্ডেল নেই?

ট্রাম চলিতেছিল। দেখিলাম, ওদিকে একখানি ট্যাক্সি ট্রামের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট একজন তরুণ বসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। গুণ্ডা-প্রকৃতির নয়, নিতান্ত স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ যুবক—দৈত্যের পশুত্ব উহার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

'ঠিক দেখবি কলেজের কাছে গিয়ে ট্যাক্সি থামিয়েছে! —মীনের কণ্ঠে উদ্বেগের চিহ্ন।

'কদিন ফলো করছে বল্ তো?' বাবলি শুধাইল।

'আমাদের পাড়ার জলসাতে সেদিন দেখেছিলাম। যেচে এসে আলাপ করলে, তারপর থেকেই দেখি প্রায় রোজই।

মীনের কথায় পান্না প্রশ্ন করিল, 'তুই আমল দিলি?

'আমল দেবো কেন? অতনুকে উপলক্ষ করেই আমার সঙ্গে কথা কইলে।'

চিঙড়ি ফড়ফড় করিয়া উঠিল, 'অতনু ওকে চেনে নাকি?'

মীন তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, 'আরে ছোঃ, ওই দৈত্যের সঙ্গে অতনু মিশতে যাবে কেন?

বাবলি আশঙ্কা প্রকাশ করিল, 'লোকটা পুলিশের স্পাই নয় তো?'

'দূর স্পাই হতে যাবে কেন? আর আমরা কী রাজনীতি করি যে আমাদের পিছু ধাওয়া করবে।'

তবুও বাবলি কহিল, 'নারে, তুই জানিস নে, পুলিশের আজকাল এর জন্যে একটা স্বতন্ত্র দপ্তরই হয়েছে যারা প্রেমিক-প্রেমিকার পিছনে লাগে।'

'যা যা। আমি তার জন্যে থোড়াই কেয়ার করি। অতনুকে আমি ভালোবাসি। এর জন্যে নিজের বাপ-মাকে ভয় করিনে, তার আবার পুলিশের ভয়!

ট্রাম আসিয়া কলেজের কাছ বরাবর দাঁড়াইয়া গেল। মীন্ এবং তাহার অপরাপর সহপাঠিনীর দল উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি দেখিলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য, বেবি ট্যাক্সিখানিও থামিয়াছে। আর তাহা হইতে বীরদর্পে অবতরণ করিল সেই দৈত্যটি—দূর হইতেও যাহার হাতের মাংস পেশীগুলিকে স্ফীত বলিয়া লক্ষ্য করা যায়।

এস্‌প্লানেড হইতে বালিগঞ্জের লাষ্ট কারে বাড়ী ফি'রতেছিলাম ফাঁকা গাড়িতে—চলন্ত ট্রামের একেবারে সামনের সীটে বসিয়া বসন্তের হাওয়ায় মনে আমেজ লাগিতেছিল।

ভবানীপুরে পূর্ণ থিয়েটারের কাছ হইতে একটি নব-বিবাহিত দম্পতি উঠিল। কালহাস্যের কল-কাকলি তুলিয়া আমার পাশের সীটটিতে আসিয়া উপবেশন করিল।

তাহাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, একী, এ যে দেখিতেছি মীন্‌কে! ঘোর লাল রঙের বেনারসীতে সু-উজ্জ্বল গৌর-তনু, অঙ্গ জুড়িয়া নব-নির্মিত স্বর্ণালঙ্কারের ঝিলিক্—কানে দু'টি হীরার টব জল্-জল্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে তাহার সিঁথিমূলের রক্তবর্ণ সিঁন্দুর রেখা।

মীনের তাহা হইলে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু একী! তাহার পাশে উপবিষ্ট যে সুসজ্জিত তরুণটিকে দেখিতেছি—সে কী মীনের স্বামী? আমার চোখে কী স্বপ্নের ঘোর লাগিয়াছে?

ভালো করিয়া চক্ষুদ্বয় মার্জনা করিয়া দেখিলাম, না, ভুল করি নাই। এ যে দেখিতেছি সেই দৈত্যটিকে। কলেজের পড়ুয়া মেয়েদের পিছনে ট্যাক্সি হাঁকাইয়া ছুটিয়া লো সেই জায়েণ্টই—হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, হাতের মাংসপেশীগুলি স্ফীত—বেশ সতেজ তরুণ।

অকস্মাৎ দৈত্য প্রশ্ন করিল মীন্‌কে, 'আচ্ছা, তোমার সেই ডন্‌জোয়ান অতনুর খবর কী বলতো? বিয়েতে তো এলোও না!'

'তার কথা আর বলো না। কাওয়ার্ড! চিঙড়ির জন্যে এখন সে আত্মহারা। তাকে না পেলে সে নাকি আত্মহত্যা করবে।'

'বটে! তারপর?'

'তারপর বাবলি, তারপর পান্না।'

'তারপর?'

'তারপর কোন এক সুলক্ষণা গৃহস্থ কন্যা।'

'তারপর?'

'ছেলে-পিলে, ঘর-সংসার, অফিস-বাড়ী, চোখ-বাঁধা বলদ আর কি!'

নৈশ-নিস্তব্ধ রাত্রির চলন্ত ট্রামে কৌতুকের প্রস্রবণ বহিল—খিল্ খিল্ করিয়া মীন্ হাসিতেছে।

বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেক চেষ্টা করেও আফ্রিকাতে ফেডারেশন খাড়া করা যাবেনা, গত কয়েক মাসে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মালি ফেডারেশন সেনেগাল আর সুদান, এই দুটি রাজ্যকে একত্র করে গড়া হয়েছিল; ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষে এই মিলিত রাষ্ট্রের আয়তন আর লোকসংখ্যার হিসেব দেওয়া হয়; সম্প্রতি সেনেগাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে ৮০৬০০ বর্গমাইল এলাকা আর মাত্র তেইশ লক্ষ লোকের উপর নির্ভর করে। সুদান আগের "মালি" নামটিই বজায় রাখ্‌ল, তবে "ফেডারেশন" অংশটুকু বাদ গেল; এর আয়তন দাঁড়াল ৪৫০৫০০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা হল মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ। বলা একেবারে বাহুল্য নয় যে, এই বিভাগের ফলে সেনেগাল আর ফরাসি সুদান বা মালি, কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিম্বা কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের আক্রমণ করেও বসে নি। বেছে বেছে বৃহৎকায় "এক জাতীয়" রাষ্ট্র ভারতকেই যে কেন একবার ক্ষুদ্রতর পাকিস্থান, আর একবার বৃহত্তর চীন আক্রমণ করে বসে—আর খাব্‌লা খাব্‌লা মাংস তুলে নেয়, তা বলা ভারি শক্ত! শুধু যে মালি ফেডারেশনের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে তাই নয়, আইভরি কোস্ট, ভোল্‌তা, দাওসেই এবং নাইজার রাষ্ট্র চারটিও আলাদা ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ কর্‌ল, ফেডারেশন গঠন কর্‌ল না। ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে এদের আয়তন আর লোকসংখ্যার মিলিত পরিমাণটা দেখানো হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে এদের আয়তন আর লোকসংখ্যা হল :—

(১) হস্তিদন্ত উপকূল রাষ্ট্র—এক লক্ষ তেইশ হাজার বঃ মঃ—পঁচিশ লক্ষ লোক; (২) উচ্চ ভোল্‌তা—এক লক্ষ ছয় হাজার বঃ মঃ তেত্রিশ লক্ষ অধিবাসী; (৩) দাওসেই বা দাওসে বা ডাগোমি—ছেচল্লিশ হাজার বঃ মাঃ—সতের লক্ষ বাসিন্দা; (৪) নাইজার—চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বর্গ মাইল—পঁচিশ লাখের মতো জনসমষ্টি।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের প্রবল আগ্রহে এই সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণ ফরাসি সরকারের স্নেহাঞ্চলকে তুচ্ছজ্ঞান তো করেই—কোন বিশালকায় সাম্রাজ্যের অঙ্গলীন হয়ে তাকে ফেডারেশন বলে গণ্য করবার মতো মূঢ়তাও এদের নেই। এই জন্যেই কঙ্গো রাষ্ট্র ফেডারেশন বা কনফেডারেশন না হয়ে ভাঙনের মুখে এগিয়ে চলেছে এবং একদা-দেশপ্রেমিক তৎপর রাজনীতিজ্ঞ লুমুম্বা এখন কঙ্গো-সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আফ্রিকায় অনুপ্রবেশের লোভে ব্যাকুল ক্রুশফ লুমুম্বার পোষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তাতে ক্রুশফকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের ভাঁড় হতে হয়েছে—আর লুমুম্বার জনপ্রিয়তা অস্তোন্মুখ; কাতাঙ্গা, কাসাই আর হীরক প্রজাতন্ত্র এই তিনটি স্বাধীন রাজ্য অচিরে কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সোভিএট হুমকির দ্বারা তার অন্যথাচরণ ঘটবে না; প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মনশাসিত রুআন্দা এবং উরুন্দি নামে দুটি এলাকা বেলজীয়-কঙ্গোর অন্তর্ভুক্ত হয়; আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে অভিভাবকত্বের অবসান হয়ে অর্থাৎ ম্যাণ্ডেটের অপসারণের পর এ দুটি রাজ্যও একত্র বা পৃথক্‌ ভাবে স্বাধীনতা লাভের অধিকারী; সুতরাং বর্তমান ৯ লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট কঙ্গোর পরিবর্তে অদূর ভবিষ্যতে ছটি রাষ্ট্র দেখা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে গৃহযুদ্ধ যে কত বীভৎস হয়ে উঠবে, কঙ্গোর কাসাভুবু—মোবুতু—লুমুম্বা—দোম্বের পারস্পরিক বিবাদ তার প্রশস্ত নিদর্শন। শান্তিপূর্ণ ভাবে ফরাসি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানো বা "কম্যুনোতে ফ্রাসেঁজ"এর বিলুপ্তি সাধনের মতো তথাকথিত অখণ্ড কঙ্গো রাষ্ট্রকেও জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিলে এই অনাবশ্যক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি দেখা যাবে। নির্দোষ ডাগ হামারশিল্ডকে অনাবশ্যক কটূক্তি করলে ক্রুশফের আত্মতৃপ্তিলাভ হলেও সমস্যার মীমাংসা অসম্ভব।

রাষ্ট্রগঠনের নানা ভিত্তি থাকতে পারে; আবহমান কাল থেকে বহুজাতিক বহুভাষিক রাষ্ট্র সর্বত্র গড়ে উঠেছে; কোথাও ধর্ম, কোথাও ধর্মসম্প্রদায় বা বিশেষ মতবাদ, কোথাও ভাষা, কোথাও লিপি, নানা ধরণের বিচিত্র প্রেরণায় বিভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি হল একজাতীয়তা অর্থাৎ "এক জাতি এক প্রাণ একতা!" কিন্তু তথাকথিত একজাতীয়তার বনিয়াদ সব চেয়ে দৃঢ় কোথায়? ভাষাগত জাতীয়তাবাদই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতীয়তাবোধ; একভাষী জনগোষ্ঠী ধর্মীয় বা ভৌগোলিক কারণে আবার একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারা অন্যভাষীর সঙ্গে মিলে স্বচ্ছন্দ মনে এক জাতিরূপে পরিগণিত হতে পারবে না, যদিও এক রাষ্ট্র হয়ত গড়্‌তে পারবে, কারণ জাতি আর রাষ্ট্র সমার্থক নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভুল করে প্রায়ই জাতি আর রাষ্ট্র এক অর্থে ব্যবহার করা হয়; আমরা যাকে ইউ,এন,ও, বলি, তা আসলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, জাতিসঙ্ঘ নয়; আবার, তা শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রদের সঙ্ঘ, পৃথিবীর সব রাজ্য সাম্রাজ্যের সঙ্ঘ নয়। তবে, একথাও মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীন জাতিমাত্রেরই নিজস্ব রাষ্ট্র থাকবে, এটা স্বাধীন বিশ্বে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; কাজেই কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী স্বাধীন অথচ তার নিজের রাষ্ট্র নেই, এ হতে পারে না; সুতরাং যাদের নিজস্ব রাষ্ট্র নেই, আজকের জগতে তাদের স্বাধীন জাতীয় সত্তা স্বীকৃত নয়; হয় তারা পরাধীন, নয় তারা কোন বৃহৎ জাতির অঙ্গীভূত। এই সত্য ভারতীয়দের মাথায় ভালো করে ঢুকতে আরো কিছুদিন লাগবে। কিন্তু বিদেশে এ-সত্য এত প্রবলভাবে উপলব্ধ যে, কেবল আফ্রিকায় নয়,

[ইন্দো]নেশিয়াতেও কিছুতেই যারা স্বভাবত বিভিন্ন, তাদের জোর করে [এক] জাতি এবং এক রাষ্ট্রের বাসিন্দারূপে থাকতে রাজি করা যাচ্ছে না। [ইং]রেজরা রোডেশিয়া-নিয়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশন গঠন করেও ডক্টর বান্দা [প্র]ভাবিত নিয়াসাভূমিকে সহজে পরিপাক করতে পারছে না, অখণ্ড [ভা]রতের সমর্থকদের চোখের সামনে ব্রহ্ম, পাকিস্থান, সিংহল, আফগানি-[স্থা]ন, নেপাল, মাল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ক্রমশ ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি থেকে [বি]চ্ছিন্ন হয়েছে, কেউ কোন কার্যকরী বাধা দিতে পারে নি, ফরাসি [ই]ন্দোচীন চারটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এককেন্দ্রিকতার কথা ভুলে, ঐ একই কারণে। পৃথিবীতে যতগুলি ভাষা আছে, অন্তত ততগুলি জাতি [আ]ছে; ঐ জাতিগুলির মধ্যে যেগুলি নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র চায়, সেগুলিকে তা মঞ্জুর করতে হবে, তা না হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত [হ]বে না, সব মানুষের সমান অধিকারের বুলির কোন অর্থ হবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে আফ্রিকা মহাদেশে এখন ২৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে; এরা সকলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য। স্বাধীন বিশ্বসভায় স্বাধীন জাতি বলে গণ্য হওয়ার জন্যে আফ্রিকায় বাকি জাতিগুলি যেমন দ্রুত তৈরি হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিএট ইউনিয়নের মধ্যে তাদের মন পাবার জন্যে রেষারেষিও তীব্রতর হচ্ছে। কঙ্গোকে নিয়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে প্রচণ্ড বিতর্কের রহস্যই এই যে, রুশ-চীন আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারের জন্যে ব্যাকুল আর ইঙ্গমার্কিন তা প্রতিরোধের জন্যে বদ্ধ-পরিকর।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক অধিবেশনের অভিনবত্ব এই যে, পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ এবার একত্র হয়েছেন; ক্রুশ্চফ হার্টার ম্যাকমিলান-নেহরু-নাসের-তিতো প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নিউইয়র্কে একত্র সমাবেশ সারা জগৎকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে। এই অধিবেশনে ক্রুশ্চফ মার্কিনদের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন এবং সারা জগতের চোখে কতকটা হাস্যাস্পদও হয়েছেন তাঁর অসার চপল ভাষণের জন্যে। এই পদ্ধতিতে রুশরা জগদ্বাসীর চিত্ত জয় করতে পারবে না। রুশজাতির প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি প্রমাণিত হচ্ছে খেলাধুলায়, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক অগ্রগতিতে এবং সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতিতে; অভিজ্ঞ মার্কিন অর্থনীতিবিদরাও মানেন যে, রুশের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে এবং এক পুরুষের মধ্যে রুশ-মার্কিন জীবনধারাসাম্য একেবারে অসম্ভব নয়। এমন অবস্থায় যে গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ রুশদের রক্ষা করে চলা উচিত ছিল, ক্রুশ্চফ তা বজায় রাখতে পারেন নি; বর্তমান অধিবেশনে তাঁর আচরণ সোভিএট শক্তিসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে একটু লঘু করে ফেলেছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৫৬ সালে সুএজ খালের ব্যাপারে মার্কিনের আচরণে বিশেষ বিব্রত ও অপদস্থ হয়; এণ্টনি ইডেন তাঁর সম্প্রতি লিখিত স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে তাঁর তিক্ত শ্লেষ ও ক্ষোভ ব্যক্ত করে যা লিখেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে মনোমালিন্য ও মতভেদের অভাব নেই; রুশ-চীন শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিরোধে অতঃপর ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেরা অগ্রণী না হয়ে আমেরিকাকে এগিয়ে যেতে দেবে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে গত চার বছর আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে মার্কিনকে সামনে রেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স রুশ-চীনবিরোধিতায় অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য ইঙ্গমার্কিনদের মধ্যে আত্মকলহের প্রবল সম্ভাবনা ১৯৮০ সালের আগে গড়ে উঠবে না, যেমন রুশ-চীন মতবিরোধে রুশ-চীন সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ১৯৮০ সালের আগে নেই। ইঙ্গমার্কিন ও রুশ-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ঐ ব্যাপারে শেষ মীমাংসা হবে; অর্থাৎ তৃতীয় মহাযুদ্ধ বা তার সম্ভাবনা চুকে যাবার আগে ইঙ্গমার্কিন বা রুশ-চীনের নিজেদের মধ্যে কোন সংঘাতের আশা নেই; কৌতুকের বিষয় এই যে, দু পক্ষই এ বিষয়ে প্রবলভাবে অভিসন্ধিপূর্ণ চিন্তার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্তমান অধিবেশনে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করে শান্তি স্থাপনের একটা চূড়ান্ত বা আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে বা চলবে বলে যারা মনে করেন, তাঁরা মরীচিকার মায়ায় মুগ্ধ; পঞ্চশক্তির নেতৃরূপে নেহরুপ্রস্তাবের প্রত্যাহার দেখে বোঝা যায় যে, তথাকথিত নিরপেক্ষতার কোন গুরুত্ব শক্তিমান্ বিশ্বের চোখে নেই; রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরাট অধিবেশনে ৯৭টি শক্তির ৯৯টি ভোটে (সোভিএট ইউনিঅনের ৩ টি ভোট) বিশ্বে শান্তি স্থাপন বা নিরস্ত্রীকরণের ভরসা নেই; বিভিন্ন শক্তি সেখানে আগামী বিশ্বসংগ্রামে কে কোন পক্ষে যাবে এবং কোন সর্তে রক্ষা করবে, তারই হিসেব নিকেশ করতে ব্যস্ত। মুখে স্বীকার না করলেও ভারতের নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ এবং মিশরের নাসেরও সেই প্রয়াসে নিযুক্ত।

কঙ্গোর ব্যাপার নিয়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধার কোন আশঙ্কা নেই; এ-ব্যাপারে দুই পক্ষের তীব্র মতভেদে খালি এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, অভ্যন্তরে বারুদ সর্বদা শুকনো অবস্থায় তৈরি আছে। কঙ্গোর চেয়ে লাওসের অবস্থা বেশি গুরুত্বপূর্ণ; এখানে যে গৃহযুদ্ধ চলছে তার ফিকিরে যদি কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে তো বটেই, সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পক্ষে তা একটা বিপদের কারণ হবে। আগামী মহাযুদ্ধে ক্রমশ হংকং থেকে সিঙ্গাপুর এলাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নেহরু আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বড় বড় সমস্যা নিয়ে সর্বদা চিন্তান্বিত থেকেও পাকিস্থান ভারতের যে প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এবং চীন প্রায় বারো হাজার বর্গমাইল দখল করে বসে আছে, তা উদ্ধার করবার কোন ব্যবস্থা করেন নি; রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি কাশ্মীর, লাদাখ এবং গোয়া মুক্ত করার কোন প্রস্তাব বা আলোচনা তোলেন নি; তুলে কোন লাভও হবে না; কারণ, বিশ্বের চোখে ভারতই কাশ্মীরে আক্রমণকারী, পাকিস্থানের প্রতি প্রায় সকলেরই সহানুভূতি; ভারত ইঙ্গমার্কিন গোষ্ঠীতে সোজাসুজি যোগ না দিলে লাদাখের পুনরুদ্ধারে ইঙ্গমার্কিন ভারতকে কোন সাহায্য করবে না; গোয়া ইঙ্গমার্কিনমিত্র পর্তুগালের হাতে, তার বিরুদ্ধে যাবার আগ্রহ ব্রিটেন আর আমেরিকায়

নেই। সুতরাং ভারতের পররাষ্ট্রনীতি উত্তম, ভারত যা হারিয়েছে তা চিরকালের মতো হারিয়েছে।

অনেকে ভাবেন, দুই মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির অনেকাংশ স্বাধীনতা পেয়েছে, বাদ বাকিরাও মাত্র মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাভীত দেশগুলির উদারতা ও প্রগতিশীলতার দরুণ ক্রমশ স্বাধীনতা পাচ্ছে যেমন আফ্রিকায়। অতএব, তৃতীয় মহাযুদ্ধ ব্যতীতই সমস্ত পৃথিবী স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ নতুন মুখোশ পরেছে: মার্কিন মুলুকে তার অভিনব রূপ ফিদেল কাস্ত্রোর সাম্প্রতিক চার ঘণ্টা ব্যাপী এক বক্তৃতায় সুসমালোচিত হয়েছে; বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদ নব রূপ পরিগ্রহ করায় বিশ্ববাসীর মুক্তির দিন এখনও সুদূরে। আগামী সংখ্যায় এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাবে।

সাধু সঙ্গে এক সন্ধ্যা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এল-এল-এম্

ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমিতে কত শত সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়া—দেশকে ও জাতিকে ধন্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত সাধকের পুণ্য প্রভাবে বহু পাপী তাপী শান্তি লাভ করিয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দুইজন কৌপীন-সম্বল সন্ন্যাসী বাঙ্গালার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন তাহা আজ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধক রামপ্রসাদ এক দিন বাঙ্গলার আকাশ বাতাসকে তাঁহার সাধন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া বহু অন্ধ পথিককে আলোর সন্ধান দিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। আজও রামপ্রসাদের গান—বাঙ্গালার নরনারীর অতি পরিচিত ও অতিপ্রিয়, রামকৃষ্ণদেব নিজে ভগবৎ সঙ্গীত রচনা করেন নাই, কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গীত গুলি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। পরমহংস-দেবের শ্রীমুখে যিনি রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন যে সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রীভগবানের পূজা কত মধুরভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। সত্যই ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ সাধকের হৃদয়নিঃসৃত এই সঙ্গীত—কিন্তু সমস্ত সাধকের এই সঙ্গীত রচনার শক্তি থাকে না, যে সমস্ত সাধক স্বরচিত এই সঙ্গীতে মায়ের আরাধনা করিতে সক্ষম তাঁহারা সত্যই ভাগ্যবান।

বাঙ্গালা দেশের এক নিভৃত পল্লীতে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ এক সাধকের জন্ম হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বরচিত সাধন সঙ্গীতগুলি যখন গান করেন তখন মনে হয় যেন মা প্রসন্ন হইয়া—তাঁহার গানের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার নাই। রাম-কৃষ্ণ দেবের ন্যায় সরল সহজ ভাষায় তিনি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি যে মীমাংসা করিয়া দেন তাহা তাঁহার ভক্তদের নিকট অতি সরল বলিয়া মনে হয়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমলা গ্রাম হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান জেলার পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে কালনা সহরে তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমাতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণনগর কোর্টের একজন প্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে এই সাধকের সম্বন্ধে বহু তথ্য জ্ঞাপন করেন। তিনি আমাকে বলেন যে উক্ত সাধক কৃষ্ণনগরে প্রায়ই এক মোক্তারের বাসায় আসেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে—তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে উক্ত সাধুর নিকট লইয়া যান।

এই সাধক ভবা-পাগলা বলিয়া পরিচিত। একখণ্ড লালবস্ত্র পরিধান করিয়া সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন। প্রণাম করিয়া যখন দাঁড়াইলাম বলিলেন—"এস বাবা, আমার ভাগ্য দেখ, এখানে বসে আছি, কিন্তু তোমার মত জজও এখানে আমার কাছে আসছে। তুমি আমার সামনে বস", —তাঁর সামনে বসিলাম। তখন তিনি তাঁর স্বরচিত এই গানটী গাহিলেন :—

"বদন ভরিয়া তাঁরে ডাক।
কর সংসার এটাওযে তাঁর—
হইওনা সন্ন্যাসী এই খানেই থাক॥
রাখিও সবার মন, ভাবিও একজন,
দিওনা বিসর্জ্জন (শুধু) মনকে বাঁধিয়া রাখ।
(হউক) সার্থক জীবন তোমার—
সে বিনে বন্ধু নাই আর
(তাই) গোপনে হৃদয়েতে তাঁর ছবি আঁক॥
মানব জীবন তোমার, কতদিন রবে আর,
এসেছ যাবে আবার (তাই) মানুষের মত তুমি থাক।
আসা যাওয়া
এ, যে নদীর খেওয়া।

নিশ্চয়ই যাইতে হয়ে ঠিক জেনে রাখ ॥
অমূল্য সময় গেলে ভাগ্যে কি আর তাই মিলে
দিও না ভাই পায়ে ঠেলে, সময় থাকিতে তাঁরে ডাক।
পেয়েছ মধুর বদন—
কর তাঁর নাম উচ্চারণ,
(সদা) ভকত পদধুলি, তব অঙ্গে মাখ ॥
সুখ দুঃখের অন্তরালে, যেওনা মন তুমি চলে,
প্রেমের মধুর কথায়, সব কথা ঢাক ॥
ভবা পাগলার কথা
কখনও হবে না বৃথা,
সে যে হৃদয়ে গাঁথা অযথা কেন মন হাক ॥

গানটী গাহিবার পর তিনি বলিলেন—"দেখ বাবা আমিও সংসারী, তবে সং না সেজে সার করেছি তাঁর রাঙ্গা চরণ দুখানি। এখানে থেকেও তাঁকে পাওয়া—যায়।" তার পর গাহিলেন :—

"সহজে কি দেখা মিলে, নিজে না দেখা দিলে, (মা)
একা শুধু তোমার নয় মা, জগৎ মাতা তাঁকে বলে।
(কত) মুনি ঋষি মায়ের তরে—
বনে গেছে গৃহ ছেড়ে।
দেখতে পেতাম এই সংসারে, ডাক্‌তাম্ যদি সবাইমিলে।
বিশ্ব ব্যাপী তাঁহার সন্তান,
মায়ের কি কেউ করল সন্ধান।
পাষাণী নয় জাজ্জ্বল্যমান, দেখনা একটু নয়ন মেলে ॥
সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করে,—
তবু মা রয় অন্ধকারে।
নিজেকে নিজে চিন্তে নারে—ঘুম পাড়ে মা কোলে ২।
ভবা পাগলা কয়ে গেল
(মাকে) ডাকার মত কে ডাকিল।
মা যে কোথায় লুকিয়ে রইল,—একটু খানি ভূমণ্ডলে„"

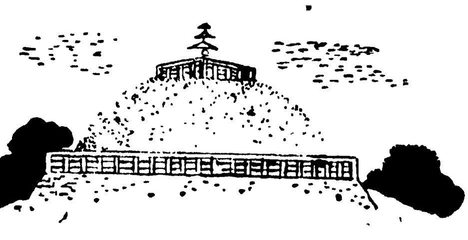
এরূপে মাঝে মাঝে গান ও মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। একবার তিনি বলিলেন—যখন সাধন করিতাম তখন ইটের উপর মাথা দিয়া মাটীতে শুইয়া থাকিতাম। ইহা দেখিয়া কয়েকজন বলে—পাগল তুমি ইটের উপর মাথা দিয়া শোও—ইহাতে কি সুখ পাও। তখন আমি এই গানটী গাই—"

(মন ভাব দেখি) আমার মত সুখী ভবে কে।
অনাহারে যোগান আহার, অন্নপূর্ণা মা আমাকে
সবাই শোয়রে চাঁদিনা ঢাকা, কত কোমল মধুর বাসে,
আমি শুই মা শ্যামল ঘাসে, চাঁদিনা ঢাকা নীল আকাশে।
(আছে)—সবার কত ঝাড় লণ্ঠন,
আমার কাজ হয় নক্ষত্রগণ,
(তাদের) হাওয়া দেয় কত দাসদাসী গণ—
আমায় আপনি পবন দিতে থাকে ॥
বেড়ায় যখন তারা সবে (কত) পাহারায় পিছে আগে,
ভবার সঙ্গের পাহারাদার জ্ঞান, বিবেক আর প্রেম বৈরাগ্যে—
(তাদের) শত্রু যখন কাছে আসে
(তারা) অস্ত্রাঘাতে তাদের নাশে
ভবার কুবাসনা তারি নাশে—
ঐ যে দেখ মোর শ্যামা মাকে ॥

এইরূপ বহু স্বরচিত গান তিনি ও তাঁহার একটী ভক্তের কন্যা হারমোনিয়াম বাজাইয়া শুনাইলেন। সমস্ত গানগুলিই মধুর ও ভগবৎ-প্রেমের অপূর্ব্ব প্রকাশ। এ গানগুলি এত সহজ ও সরল যে অশিক্ষিত লোকের মনেও স্থায়ী মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া যায়। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতের ন্যায় এই সঙ্গীতগুলিও বাঙ্গালা ভাষায় অমরত্ব লাভ করিবে বলিয়া আমার ধারণা।

ভাষায় ও ভাবে সত্যই এই সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব। দুইটি খণ্ডে কেবলমাত্র ৮০০ সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে ১৫০০০ পনের হাজার গানের মালা তিনি গাঁথিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি তাঁহার চোখের সামনে ভাসছে, এগুলি যেন তাঁর মন্ত্র এবং এই মন্ত্রগুলি—বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নিকট যেমন মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার নিকটেও সেইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশের বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে এইটুকুই সৌভাগ্য যে এখনও এইদেশে এই সাধকের ন্যায় বহু ব্যক্তি আছেন। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই সাধক-কবির প্রসন্ন বদন ও সৌম্য উজ্জ্বল দৃষ্টির সান্নিধ্যে আসিলে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহা সে-দিন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।



পৌরাণিক নগর ও নাগরিক জীবন

ডকটর রমা চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণাবলী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুতঃ, সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান অংশ বেদোপনিষদের প্রতিচ্ছবিই হল রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ "ইতিহাস", বিষ্ণু-বায়ু প্রমুখ, "পুরাণ" এবং মনু-যাজ্ঞবল্ক-প্রমুখ, "স্মৃতি।" বেদোপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বকে সহজ, সরল, সাধারণ ঘটনা, উপাখ্যান, উদাহরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট সুবোধ্য করাই হল এগুলির প্রধান কার্য। সেইজন্যই বলা হয়েছে—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"

ইতিহাস ও পুরাণ বেদকেই সম্যক্ ভাবে প্রপঞ্চিত করে।

পুরাণসমূহ বহু সরস, মধুর আখ্যায়িকায় পূর্ণ। এই সব থেকে, সেই সময়ের সামাজিক, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটী সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। পুরাণে নগর ও গ্রাম সম্বন্ধেও নানারূপ আলোচনা আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও অবহেলার বস্তু নয়।

"নগর" শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—নগা ইব প্রাসাদময় সন্তি যত্র তৎ নগরম্, অর্থাৎ, যেস্থানে পর্বতের ন্যায় উচ্চ প্রাসাদ প্রভৃতি আছে, সেই স্থানই হল "নগর।" "নগর", "পুর", "পত্তন", "স্থানীয়" প্রভৃতি অনেকের মতে, সমার্থক; অনেকে এগুলির মধ্যেও প্রভেদ করেন। যথা, "যত্র অষ্টশত-গ্রামীয়-ব্যবহার-স্থান-মধ্যবর্তী তৎ নগরম্", "যত্র রাজা তৎ পরিচারকাশ্চ তিষ্ঠন্তি, তৎ পত্তনম্", "প্রাকারাদিনা দুর্গং; যোজনবিস্তীর্ণং নগরং স্থানীয়ম্", "বহুগ্রামীয়ব্যবহারস্থানং পুরং, তত্র প্রধানভূতং নগরম্।" অর্থাৎ, আটশ গ্রামের কেন্দ্রস্থল "নগর"; যে স্থানে রাজা ও পরিচারকেরা থাকেন সেই স্থানটী হল "পত্তন"; যে যোজনব্যাপী নগর পরিখা প্রভৃতির জন্য দুর্গম, তা'ই হল "স্থানীয়"; বহু গ্রামের কেন্দ্রস্থল "পুর", এবং পুরের মধ্যে প্রধান "নগর।"

এই ভাবে পুরাণে, নগর নির্মাণের যোগ্য সময়, নগরের প্রকৃত লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ, জ্ঞানগর্ভ বিবরণ আছে। যেমন, নগরের নির্মাণ সময়ের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে :—

স্থিররাশি-গতে ভানৌ চন্দ্রে চ স্থিরভোদয়ে।
শুদ্ধে কালে দিনে চৈব নগরং কারয়েৎ নৃপঃ।"

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র স্থিররাশি গত হলে, সেই শুদ্ধ দিন ও কালে রাজা নগর প্রতিষ্ঠা করবেন।

নগরের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর স্বামী ভৃগুবচন উদ্ধৃত করে বলছেন :—

নৃপবাসঃ পুরী প্রোক্তা বিশাং পুরমপীষ্যতে।
একতো যত্র গ্রামো নগরঞ্চৈকতঃ স্থিতম্॥
মিশ্রং তু খর্বটং নাম নদী-গিরি-সমাশ্রয়ম্।
বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি হি।
স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চ।
পণ্যক্রিয়াদি নিপুণৈশ্চাতুর্বর্ণ্য-জনৈর্যুতম্
অনেক জাতি-সম্বন্ধং নৈকাশিল্পসমাকুলম্।
সর্বদৈবতসম্বদ্ধং নগরস্ত্বভিধীয়তে॥

অর্থাৎ, যেস্থানে রাজা বাস করেন, তা' হল "পুরী", এবং যেস্থানে সাধারণ জনেরা থাকেন, তা' হল "পুর"। যেস্থানে বিপ্র ও বিপ্রভৃত্যেরা ও শূদ্রেরা বাস করেন, তা' হল "গ্রাম," যেস্থানে ব্যবসাবাণিজ্য-নিপুণ চতুর্বর্ণ বাস করেন, যেস্থানে বহু জাতিও বসবাস করেন, যেস্থানে বহুশিল্প আছে এবং যেস্থানে সর্ব-দেবতার আরাধনা হয়—তা' হল "নগর।" একদিকে গ্রাম, একদিকে নগর থাকলে, মধ্যবর্তী, নদী-পর্বত-বহুল, মিশ্র স্থান হল "খর্বট।"

বিখ্যাত বায়ুপুরাণেও এই প্রসঙ্গে বলা আছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে, ভূমিতল অসমান ছিল বলে কোনো নগর বা গ্রাম ছিল না। পরে শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য বসতবাটী এবং গ্রাম-নগরের উদ্ভব হয়। এস্থলেও, পত্তন, নগর, ঘোষ, খেট, (নগরের উপকণ্ঠ) খর্বট, গ্রাম, দুর্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

দুর্গ চার প্রকারের,—তিন প্রকারের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পর্বত, খাল প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত দুর্গ, এবং এক প্রকারের কৃত্রিম বা প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত দুর্গ। এই কৃত্রিম দুর্গে কেবলমাত্র একটী প্রবেশ দ্বার থাকত, এর নাম "স্বস্তিক"; এবং এতে একটী করে "কুমারী পুর"ও থাকত। "নদী-দুর্গের" উল্লেখও বিষ্ণু এবং অন্যান্য পুরাণে আছে।

এই নদী-দুর্গ ব্যতীত নগর প্রমুখ অন্যান্য বসতি-স্থান পর্বত ও জলাধারের সন্নিকটেই স্থাপিত হত। বিষ্ণুপুরাণের ভৌগোলিক-বিবরণী যুক্ত বহু অধ্যায়ে পর্বত-শিখরে ও পর্বত-পাদদেশে স্থিত নগরের উল্লে[খ] পাওয়া যায়। এই সব নগরের অধিকাংশই দৈত্য, দানব, রাক্ষস, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর প্রভৃতিদের নগর। এই সব নগরে আকাশচুম্বী প্রাসাদ, বিস্তৃত রাজপথ ও চতুষ্পথ বা চৌমাথা, তোরণ, প্রাচীর, পরিখা, উদ্যান প্রভৃতি ছিল।

বায়ুপুরাণে বায়ুপুরস্থ একটীমাত্র ধর্মশালার উল্লেখ আছে। বায়ুপু[রে] ১৮০০০ ব্রাহ্মণ ও ৩৬০০০ শূদ্র বসবাস করতেন। বায়ুপুরাণে, বসত-বাটীরূপে "শালা", "প্রাসাদ" "ভবন" ও "গুহা" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। "শালা" শব্দটীর সঙ্গে "শাল-বৃক্ষের," এবং "প্রাসাদ" শব্দটির সঙ্গে "প্রসাদ বা প্রসন্ন-তার" সম্পর্ক থাকতে পারে ব্যুৎপত্তিগত দিক্ থেকে

বাস, "শালা" হল বৃক্ষশাখা-নির্মিত কুটীর এবং "প্রাসাদ" হল আনন্দদায়ক অট্টালিকা।

বায়ুপুরাণে বিশাখ পর্বতের অভ্যন্তরে স্থিত "গুহা-নগরেরও" উল্লেখ আছে। শেষ জীবনে, জপ তপ ধ্যানের জন্য গুহাবাস প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হত। বায়ুপুরাণে হস্তিশালা, রথশালা, গোশালা (গোষ্ঠ) প্রভৃতির বিষয়ও বলা আছে। সূতিকাগৃহ, শ্মশানায়তন ও শূন্যগৃহে যে পিশাচেরা ভ্রমণ করত, এও বলা আছে। বসত-বাটির অংশরূপে সোপান, শিলাতল, তোরণ, বলভী (ছাত), কূটনির্ব্যূহ (দ্বার), গবাক্ষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে গৃহ-প্রবেশানুষ্ঠানের সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায়। ধর্মাচার দ্বারা সংস্কার না করে নবনির্মিত বাটিতে বসবাস করা উচিত নয়, যেহেতু সেরূপ গৃহে পিশাচেরা নির্ভয়ে বিচরণ করে।

পৌরাণিক-নগরে সাধারণতঃ চতুর্বর্ণের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল। মৎস্য পুরাণে এই স্থান-নির্ণয়ের জন্য একটি বিধি দেওয়া আছে:—একটি গর্ত করে, তার মধ্যে একটা মাটির প্রদীপ রাখতে হবে, এতে চারদিকে চারটী সলতে থাকবে। যে দিকের সলতেটী সব চেয়ে বেশী জ্বলবে, সেই দিক্ হবে ব্রাহ্মণের উপযোগী ইত্যাদি।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে যে, নগর লম্বা, গোল, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হতে পারে। রাজার দশ হাতে একটী "রাজহস্ত," তারপর ক্রমান্বয়ে দশগুণ বেড়ে বেড়ে হল, "রাজদণ্ড", "রাজছত্র", "রাজকাণ্ড", "রাজপুরুষ"। দশগুণ "রাজপুরুষ" পরিমিত স্থানে "রাজধানী" স্থাপিত হবে। দশটী "রাজধানী" নিয়ে হল একটী "রাজক্ষেত্র"। পুরপত্তন আরম্ভ হবে এই "রাজক্ষেত্র" নিয়ে। যে দেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, সে দেশ লক্ষ্মী, জয়, সখ্য, একতা, সমৃদ্ধি, মঙ্গল, বল, সাম্রাজ্য, ভোগ-সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করে।

দেবীপুরাণের মতে, নগর সর্বমঙ্গলকারক ও আক্রমণরোধকারী হবে। নগরে তোরণদ্বার, কুমারীপুর, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা ও চারটী চৌমাথা থাকবে। নগরে এই সাতটী দোষ থাকবে না। যথা, নগর "ছিন্নকর্ণ" বা দ্বিমুখ হবেনা, অর্থাৎ, একটীর অধিক প্রবেশতোরণ থাকবে না; "বিনাস বা ছিন্নঘ্রাণ" হবে না, অর্থাৎ, নগরের সামনেই অত্যুচ্চ প্রাসাদ থাকবে না, উচ্চ প্রাসাদ থাকবে; "কৃশামধ্য" হবে না, অর্থাৎ, নগরের মধ্যস্থল সামনে এবং পেছনের দিক্ থেকে সরু হবে না; "দুঃস্থিত" বা ঢালু হবে না; "নৈঋত বা ধনদুর্বল হবেনা; "গর্তান্ধ" বা গর্ত-স্থল হবে না; "বিভোদিত" বিচ্ছিন্ন হবেনা, একটানা হবে।

এইভাবে, বিভিন্ন পুরাণে নগর সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানসম্মত ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা ও বিবরণী আছে' য' থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যাও অল্প উন্নত ছিল না। সমস্ত পুরাণে এইসব লক্ষণযুক্ত বহু সমৃদ্ধ নগর-নগরীর উল্লেখ আছে। যেমন, বায়ু-পুরাণ (৯৯-১৬৫), বিষ্ণুপুরাণ (৪-২১-২৮) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ (৪-৪), মৎস্য-পুরাণ (৫০-৭৮, ১০৩.১৪), ও ভাগবত-পুরাণ (৯-২১-২০), হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে। এস্থলে বলা হয়েছে যে, বৃহৎক্ষত্রের পুত্র ধার্মিক সুহোত্র, তৎপুত্র হস্তী, তিনিই হস্তিনাপুরের নির্মাতা (বায়ু ৯-১৬৫)। গঙ্গার জলে হস্তিনাপুর ভেসে গেলে, কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় (বিষ্ণু ৪-২১-২৮)। অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই মাত্র কেবল বলা আছে, হস্তিনাপুরের আর কোনো বর্ণনা নেই।

পুরাণে নাগরিক জীবনের একটী সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ বায়ু পুরাণ থেকে দু'একটি বিষয় উল্লেখ করছি। পৌরাণিক যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হত। ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সমাজের মস্তক ছিলেন এবং তাঁরাই সকলের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ ও পথপ্রদর্শক ছিলেন বলে, সমাজের শুভাশুভ তাঁদের আচরণের উপরই নির্ভর করত, তাঁদের কর্মে কোনো দোষ হলে, সমগ্র সমাজই দুর্দশাগ্রস্ত হত। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রভূত প্রভাব ছিল। তাঁরাই ছিলেন রাজার পুরোহিত।

বিষ্ণুপুরাণের মতে (৫৭-৭০), প্রত্যেক রাজচক্রবর্তীরই চতুর্দশ "রত্ন" অবশ্যপ্রয়োজন—সাতটী প্রাণবান রত্ন:—ভার্যা, পুরোহিত, সেনানী (সেনাধ্যক্ষ), রথকৃৎ (সারথি), মন্ত্রী, অশ্ব, কলভ (তরুণ হস্তী); সাতটী প্রাণহীন রত্ন:—চক্র, রথ, মণি, ধনু, রত্ন, কেতু (পতাকা) ও নিধি। রাজা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলে, পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এ দৃষ্টান্তও আছে (৮৮-১৩৬)।

ব্রহ্মার বক্ষ থেকে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয়গণের তিনটী প্রধান কার্য ছিল—বল, দণ্ড ও যুদ্ধ (৮-২৬৯), অথবা রাজ্য ও সমাজরক্ষা।

ব্রহ্মার উদরজাত বৈশ্যদের তিনটী প্রধান কার্য:—পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি (৮-১৬৪)।

ব্রহ্মার পাদদ্বয়জাত শূদ্রের দুটী প্রধান কার্য—শিল্পাজীব (শিল্প নির্মাণ) ও ভৃতি (কায়িক পরিশ্রম, ভৃত্যত্ব)।

সমাজে নারীদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। মাতা ও সহধর্মিণীরূপে তাঁরা প্রচুর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। নারীরা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানেরও পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। যোগ ও তপস্যায় রতা নারীদের বহু দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়। যেমন "বৃহস্পতিভগ্নী প্রভাসপত্নীকে" যোগ-সিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে (২৭-৮)। বিবস্বতপত্নী সংজ্ঞা বনে তপস্যা করেন।

পৌরাণিক সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা, নিয়োগ-প্রথা, মাতার নামে সন্তানদের নাম ও বংশপরিচয়-প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

পুরাণে, নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্যগীতাদি ললিতকলারও বহু উল্লেখ আছে।

এরূপে, পুরাণে নাগরিক জীবনের একটী সুসমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। এই জীবনের মূল সূত্র ছিল "ধর্ম" বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম, আচার-ব্যবহার, বিধি-বিধান। আধ্যাত্মিক দিক থেকে ব্রাহ্মণ ও লৌকিক দিক্ থেকে রাজা এই ধর্ম রক্ষা করতেন। তা' সত্ত্বেও, লোকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব ছিল না। সেজন্য সমাজের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা জনসাধারণের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধি। এরূপে, নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, স্বর্ণ বৈদিক-যুগের মহিমা কালপ্রকোপে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়লেও, পৌরাণিকযুগেও তার রেশ যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেজন্য, এ যুগেও বহু জ্ঞানী-গুণী, ভক্ত-সাধক,—আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দিক্ থেকে শ্রেষ্ঠ নরনারীর সাক্ষাৎ লাভ আমরা করি।

গল্প

বিভ্রাট

কমল মৈত্র

প্রথমে কারো খেয়াল হয়নি। হবার কথাও নয়। কুশণ্ডিকা শেষ হতেই বেলা দেড়টা। খাওয়া-দাওয়া মিটতে বেলা তিনটে। সন্ধ্যের আগেই বর-কনে রওনা হবে। মেয়েগুলো একটু গড়িয়ে নেবে বৈকী। কনেরও একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। ঠাকুমা সকলকে গড়িয়ে নিতে বললেন। এক্ষুণি তো সাজসাজ রব উঠ্‌বে। তারপর বর-কনে রওনা হলেই—ব্যস্‌ বিয়ে বাড়ীর জৌলুস সব নিভে যাবে। আত্মীয়-কুটুমদের প্যাকিং সুরু হবে একে একে।

ঠাকুমাই ধড় মড় করে উঠে বসলেন আধঘণ্টা যেতে না যেতেই। অনেক কাজ রয়েছে চারিদিকে। কনে সাজাতে হবে। কনের বাক্স ভাল করে গুছিয়ে দিতে হবে। নতুন জামাইয়ের জলখাবার-চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চারদিকে কাজ থৈ থৈ করছে। সকলকে যেমন ধমকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন তেমনি আবার ধমকে তুলে দিলেন। কতটুকু সময় আছে হাতে?

কনে সাজাতে বসলেন একদল। ঠাকুমা ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে। জামাইয়ের দাদা বিকেলেই গাড়ী নিয়ে এসে পড়বেন বর কনেকে নিতে। কনের মা কনের বাক্স নিয়ে বসলেন।

বরের বাড়ীর নাপিত উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ঠাকুমা বলে উঠলেন, ওরে ও কমু, জামাইয়ের স্যুটকেসটা দে। তৈরী হয়ে নিক। আর হ্যাঁ সাবান তোয়ালে সব কলঘরে দিয়েছিস—না তাও বলতে হবে? যেটা না বলব—

—আজ্ঞে দাদাবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিন—বেলা তো আর নেই। নাপিত ঠাকুমার কথা শেষ হবার আগেই বলল—দাদাবাবু? মানে নাত-জামাই? বাইরে ঘরে নেই? দেখ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে?

—আজ্ঞে না মা। বাইরের ঘরে না দেখে ভাবলাম বোধহয় ভিতরে এসেছেন।

ততক্ষণ উঠোনের ধারে ভীড় জমে গেছে। জামাই—নতুন জামাই কোথায় গেল? খাওয়া দাওয়ার পর ছেলে-মেয়ের দল পাকড়াও করে নিয়ে গেল বাহিরের ঘরে। কনিকা পান নিতে গিয়ে দেখে এসেছিল—নতুন জামাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। এর মধ্যে কোথায় গেল? ছেলেরা বলল, জামাইবাবু কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমাদের ঘুমিয়ে নিতে বললেন। উনিও তো ঘুমুচ্ছিলেন।

ঠাকুমা নাপিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাদের দাদাবাবু—

কি উত্তর দেবে নাপিত? তাড়াতাড়ি খেয়ে সে দুপুরের শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সত্যি কথা আর বলা যায় না। আমতা আমতা করে বলল, অগ-ঙ্গার দেশের মানুষ আমরা—তাই খেয়ে দেয়ে একটু গঙ্গার ধারে বসেছিলুম।

বাড়ীর অন্য কেউ কিছু বলতে পারল না। এক বাড়ী ভর্ত্তি লোক। জামাই কখন বেরিয়েছে—কোথায় গেছে—কোন হদিশ পাওয়া গেল না কারো কাছ থেকে।

—কোথাও বাইরে গেছে কিছু ধূমপান ইত্যাদির তাগিদে—এসে পড়বে—ভীড়ের মধ্যে কে যেন মন্তব্য করল। এলেই রক্ষে। বরের দাদা একটু পরেই এসে পড়বেন, তার আগে এলেই মুখরক্ষে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলল—জামাইয়ের দেখা নেই। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে কর্ত্তাব্যক্তিদের মুখে। বিয়ে বাড়ীর রূপ বদলে গেল। জ্যাঠামশাই সবাইকে ডেকে জেরা করছেন—এমন কোন কথা জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কিনা—যাতে তার রাগ বা অভিমান হতে

পারে। এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা, যাতে জামাই অপমানিত বোধ করতে পারে।

ইতিমধ্যে জামায়ের দাদা এসে পড়লেন। তিনি সকালে কুশণ্ডিকায় বর কনেকে বসতে দেখে কলকাতা গিয়েছিলেন অপিসের জরুরী কাজে। তিনি ভাইয়ের খবর শুনে প্রথমে কোন গুরুত্বই দিলেন না। তার ভাই হারিয়ে যাবার ছেলে নয়। আর তাছাড়া ভাই এখানে নতুন নয়। এখানকার কলেজ থেকে বছর সাতেক আগে পাশ করেছে। কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে আড্ডা মারছে।

রওনা হবার সময় অনেকক্ষণ উতরে গেছে। আর চুপ করে বসে থাকা যায়না। খোঁজখবর চলতে থাকে। বন্ধুবান্ধবের বাড়ীর খবর নেওয়া হ'ল। সম্ভাব্য জায়গায় ঘুরে দেখা হল—কিন্তু জামাইকে পাওয়া গেল না। জামাইয়ের দাদা এবার রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠ্লেন। তবে তার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ীতে কিছু এমন ঘটেছে যাতে রাগ করে চলে গেছে। কনে অপছন্দ হয়েছে? বিলেত-ফেরৎ ভাইকে তিনি জোর করে বিয়ে দিলেন। কনে নিজে দেখে পছন্দ করার পর তো বিয়ে ঠিক হয়েছে।

বর-কনে নিয়ে পৌছানর সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়ীতে সকলে ভাবতে বসেছে। মা তো নিশ্চয় ঘর আর বার করছেন। খবর একটা দেওয়া সরকার। কি খবর দেবেন? বর কনেকে বরণ করে তোলবার জন্য যখন সবাই ছুটে আসবে শাঁখ হাতে —তখন তিনি একা গাড়ী থেকে নেমে কি বলবেন, তার ভাই যদি ইতিমধ্যে বাড়ী পৌছে যায়? তাহলে মাকে সামলানো সত্যি দুরূহ হয়ে উঠবে। কিন্তু এখান থেকে ওঠেন বা কেমন করে? অথচ বাড়ী যাওয়া একান্ত দরকার। শুধু কনেকে নিয়ে যাবেন? তা কি করে হয়? সব গুলিয়ে যেতে থাকে বরের দাদার।

—আচ্ছা আমি এবার উঠি—হঠাৎ বলে ওঠেন বরের দাদা।

—সে কা? চমকে বলেন, কনের বাবা।

—হ্যাঁ, দেখি কলকাতা গেল কিনা। আর তাছাড়া বাড়ীতেও সবাই ভাববেন শুধু। বরের দাদা আস্তে আস্তে কথাগুলো বলেন।

—সে তো নিশ্চয়। কনের বাবা সায় দেন বরের দাদার কথায়।

—খবর পেলেই বৌমাকে নিয়ে যাব। অভয় দিতে ভোলেন না কনের বাবাকে—।

বরের দাদা চলে যাওয়াতে কুটুম্ব বাড়ীর সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মেয়ের কি হবে—বর বা বরের দাদা যদি কোনদিন না আসে?

নানারকম আলোচনাই চলছিল মেয়েমহলে। বরের দাদা চলে যাওয়ার পর আলোচনা আর চাপা থাকল না।

—সকলে বলে ভাল করে খোঁজ খবর নিয়েছিলে—ছেলে তো শুনি বিলেত-ফেরৎ—

—হ্যাঁগা ঠাকুরঝি—বিলেতে তো কোন লটবট করে আসেনি?

কনের মা বিব্রত বোধ করেন।

ঠাকুমা উদ্ধার করতে আসেন।—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ! মেয়ের বিয়ে কেউ খোঁজ খবর না নিয়ে দেয় নাকি?

—কি জানি বাছা—এতটা বয়স হলো এমন তো কখনও দেখি নি—তাই বলছিলাম। সত্যি কুটুম-সাক্ষাতের মুখ বন্ধ করবেন কি করে ঠাকুমা?

বাড়ীর ছোটছেলে ভণ্টু চিলেকোটার ছাদে বসে আছে। বসে বসে ভাবছে। কি ভাবছে? ভাবছে বাড়ীর এই জটিল পরিস্থিতির জন্য দায়ী সে। আজ বিকেলের দিকে যখন বাজার থেকে ফিরছিল—গঙ্গার ধারে নতুন জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা। জামাইবাবু তার কাছ থেকে যখন সাইকেলটা চাইলেন—তখন জেনে নেওয়া উচিত ছিল—কোথায় যাচ্ছেন। সদ্য পৈতেয় পাওয়া র‍্যালে সাইকেল প্রাণধরে কারুকে সে দেয় না। কিন্তু নতুন জামাইবাবুকে 'না' করতে পারেনি। তবে কায়দা করে যদি জেনে নিতে পারত জামাইবাবুর গন্তব্য স্থানটী—তাহলে জামাই খুঁজে আনার কৃতিত্ব তারই হত।

কিন্তু জামাইবাবু যদি সত্যি আর ফিরে না আসেন? ভাবতেই পারে না ভণ্টু সে কথা। নতুন সাইকেলটা তার এতই প্রিয়—তাকে এইভাবে হারানোর কথা কল্পনাই করতে পারে না। দিদির যেমন আর বর হবে না—তেমনি তার জীবনেও আর সাইকেল হবে না। জামাইবাবুকে সাইকেল

দেওয়ার কথা কারুকে বলেনি। বলতে পারেনি সাহস করে, বললেই তো জেরা সুরু হবে—কেন দিল সে সাইকেল—কোথায় গেছে। সে যে কতবড় নির্বোধ—তা প্রমাণ হয়ে যাবে এক মুহূর্তে। একটা কথা মনে আসতেই সে সোজা হয়ে বসল। জামাইবাবু ভালভাবে সাইকেল চালাতে জানেন তো? কোন এক্সিডেণ্ট করেননি কোথাও? সকলে তো সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছে। হাসপাতালে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। সকলের অলক্ষে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। গঙ্গার ধারে যেখানে সে জামাইবাবুকে সাইকেল দিয়েছিল সেইখানেই আবার দেখা। ভণ্টুকে দেখেই জামাইবাবু নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। ভণ্টু প্রথমেই দেখে নিল—সাইকেলটী অক্ষত আছে। তবে জামাইবাবুর এমন চেহারা হল কেন? চুল অবিন্যস্ত—গাল মুখ ফোলা-ফোলা—চোখের কোনে কালি।

শ্বশুর বাড়ীর পরিস্থিতির কথা জেনে নিলেন ভণ্টুর কাছ থেকে। তারপর নিজের কাহিনী বললেন তাকে। ভণ্টু যদি একটু ম্যানেজ করে, তাহলে বড় ভাল হয়। নিশ্চয় করবে ভণ্টু। তার সাইকেল সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়েছে। দিদির বর ফিরে এসেছে। আর কি? ভণ্টু জামাইবাবুর কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে চড়ে বসল। আগে ভাগে খবর তো একটা দিতে হবে।

বীরদর্পে প্রবেশ করেই ভণ্টু ঘোষণা করল—জামাই-বাবু আসছেন।

কোথায়? কোথায়? সকলের সমস্বরে একপ্রশ্ন। নিঃঝুম বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল।…কোথায় গিয়েছিল? মেয়ে মহলের প্রশ্ন। বাড়ীর কর্তা হুকুম জারী করলেন—কোন প্রশ্ন যেন জামাইকে না করা হয়। এস বাবা এস, জামাইকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন শ্বশুর মশাই। তারপর হাঁকডাক সুরু করলেন—'ওরে বাবাজীকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে। যাও বাবা—আগে স্নানটা সেরে এস।

এক্ষুণি বর কোনেকে নিয়ে রওনা হওয়া দরকার। বরের বাড়ীতে নিশ্চয় এতক্ষণ মহা হৈ চৈ হচ্ছে। ঠাকুমা ব্যস্ত হ'ল। কনের মা কনে সাজাতে বসেন আবার। মুছে যাওয়া কাজল আবার সুষ্ঠু করে দিয়ে দেন।

বরকর্তা গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বর কনেকে খাইয়ে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসেন, বরকর্ত্তা। বর কনের জিনিষপত্তর ওঠে গাড়ীতে। ভণ্টু কোথা থেকে দৌড়ে এসে ভীড় ঠেলে গাড়ীর কাছে এগিয়ে যায়। জামাইবাবুর হাতে বারো আনা পয়সা গুঁজে দেয়। জামাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভণ্টুর দিকে।

—রেখে দিন কাছে। দরকার লাগতে পারে। এ গাড়ীটা চন্দননগরের ভিতর দিয়ে যাবে। বলেই ভীড়ের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ভণ্টু। গাড়ী চলতে সুরু করল। মেয়েরা আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। বিয়ে-বাড়ীর সেই চিরন্তন দৃশ্য।

রাত্রে ভণ্টুকে ঠাকুমা অনেক খোসামদ করলেন আসল ব্যাপারটা জানবার জন্য। ভণ্টু ঠা'কুমার কাছে সব কথাই বলে—জামাইকে সাইকেল দেবার কথা।

—কিন্তু তা অত দেরী হ'ল কেন? বলল তোকে কিছু? ঠাকুমার প্রশ্নে ভণ্টু রীতিমত চটে ওঠে।

—বলবে না মানে। সবই বলেছে।

—কোথায় গিয়েছিল রে?

—চন্দননগরে ওঁর কে মাষ্টার মশায় থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় দেরী হয়ে যায়। সন্ধ্যের মধ্যে ফিরছিলেন—ব্যস 'উইদাউট লাইট্'—উঃ বাবা ফ্রেঞ্চ আইন। সঙ্গে সঙ্গে ফাটকে ভর্ত্তি—নেট্ ছ'আনা ফাইন্।

—তা ফাইন্ দিয়ে চলে এলেই তো হত।

—কোথা থেকে দেবে? তোমাদের দেওয়া ধুতি, পাঞ্জাবী, বোতাম, রুমাল, সঙ্গে খুচরা পয়সা তো দিয়ে দাওনি। বাবুর নিজের ম্যানিব্যাগ নিজের জামার পকেটে —আর সে জামা তো তার সুটকেসে।

—তারপর? ঠাকুমার উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন। জামাইবাবু বললেন—'সারা রাত' ভাই হাজতেই থাকতে হত। ভাগ্যিস ন'টার সময় যে পুলিশ বাবুটী বদলিতে এলেন তিনিও আমার মত নববিবাহিত। আমার অবস্থা বুঝে নিজের পকেট থেকে ফাইন্ দিয়ে মুক্তি দিলেন।

সেই রাত্রেই ঠাকুমা উঠলেন। ভণ্টুদের পড়ার ঘরে এসে ওদের খাতার পাতা ছিঁড়ে নাতনীকে চিঠি লিখতে বসলেন। ঠাকুরমার জামাই ফিরে আসার পর কি রকম যেন সন্দেহ হয়েছিল। নাতনীকে একান্তে ডেকে সাবধান হতে বলে দিয়েছিলেন। সত্যি ঘটনা না জানলে হতভাগী মেয়ে ফুলশয্যার রাতটা না নষ্ট করে দেয়।



ঝাঁপতাল

কে বলেছে গিরির মেয়ে
আমরা কি তোর পর
শ্যাম-ধরণীর শ্যামলা মেয়ে
গঙ্গাজলী ঘর ॥
আষাঢ় কালো এলোচুলে
এক ফালি চাঁদ দেয় কে তুলে
ত্রিনয়নে কাজল দেখেই
ভুললো মহেশ্বর ॥

কোথায় দীঘি পদ্ম আঁকা
পরবি বসে রাঙা শাঁখা
ভাঙা বেড়া বাঁধবি কোথা
ফড়িং ধরার দিগন্তর ॥
ভরা ঘাটে ঘট ভরা আর
প্রাণ ভরা মা-ডাক
ঘরে ঘরে কোথায় পাবি
আগমনীর শাঁখ
খুঁজলে দেশান্তর ॥

কথা ঃ স্বামী সত্যানন্দ   সুর ঃ শ্রীবেচু মুখার্জ্জি   স্বরলিপি ঃ শ্রীগায়ত্রী মুখার্জ্জি

+			৩				০			১			
ম	গর	|	স	স	ন্	|	স়	ম	|	গ	গ	গ	|
কে	ব		লে	-	ছে		গি	রির		মে	-	য়ে	
প	প	|	ধ	ধ	ধ	|	পক্ষ	ধপ	|	ম	ম	গ	
আম	রা		কি	-	তোর		প					র	
গ	ম	|	প	ন	ন	|	র্স	র্গর্র	|	ন	র্স	র্স	
শ্যাম	ধ		র	-	নীর		শ্যাম	লা		মে	-	যে	
র্সন	র্রর্স	|	ন	ধপ	প	|	পক্ষ	ধপ	|	রু	র	স	|II
গ	ঙ্গা		জ	-	লী		ঘ	-		-	-	য়	

+ ৩ ০ ১
প প | ক্ষ গ ম | প র্সন | প ধ প |
আ ষাঢ় কা - লো এ লো চু - লে

প ন | র্স র্র র্র | র্স র্গর্র | ম র্স র্স |
এক ফা লি - চাঁদ দেয় কে তু - লে

র্স র্র | র্র র্র র্র | র্ম র্গর্র | র্স ন ধপ |
ত্রি ন য় - নে কা জল দে - খেই

পক্ষ ধপ | র র র | স স | স স স | II
ভুল লো ম - হে শ্ব - - - র

গ ক্ষ | প প প | ক্ষ গ | র র স |
কো থায় দী - ঘি প দ্ম আঁ - কা

স র | স ম ন্ | স ম | গ গ গ |
পর বি ব - সে রা জা শাঁ - খা

গ প | ধন র্র র্সনধপ | প ধ | ম ম গ |
ভা ঙা বে - ড়া বাঁধ বি কো - থা

পক্ষ ধপ | র র র | সগ রগ | স স স | II
ফ ড়িং ধ - রার দি গন্ ত - র

+ ৩ ০ ১
পক্ষ ধপ | গ গ ম | প ন | র্স র্স র্স |
ভ রা ঘা - টে ঘট ভ রা - আর

ন ন | ধন র্রর্স র্স | ধন র্সন | ধ প প |
প্রাণ ভ রা - মা ডা - - - ক

প ন | র্স র্র র্র | র্স র্গর্র | ন র্স র্স |
ঘ রে ঘ - রে কো থায় পা - বি

প প | পক্ষ ধপ প | ম ম | গ গ গ |
আ গ ম - নীর শাঁ - - - খ

পক্ষ ধপ | র র র | স স | স স স | II
খুঁজ লে দে - শান্ ত - - - র

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগযুগান্তর ধরে ভারতের শাশ্বত চিদাকাশে, তার সাধনার তিহে, এমন একটি ঘটনা ঘটে চলেছে যে—তার তুলনা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। শতাব্দীর পর তাব্দী গেছে, কতো কথা ও কাহিনী লুপ্তসুপ্ত হয়েছে তিহাসের অতিআপাত দৃষ্টিতে, তার পাতায় পাতায় াকাজোঁকা হয়েছে কতো লাস্যহাস্য, কতো কামক্লেশ ক্লেদ, তো বিদ্যাবুদ্ধির নৈবেদ্য। মানুষ, ন্যুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ াড়িয়ে, চারপা ছেড়ে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়েছে, বলেছে—আমি জানতে চাই, আমি বুঝতে পাই, হে পরম রহস্য, দেখা াও, দেখা দাও, নয়নপথগামী হও। সে হয়েছে অবিশ্বাসী, সে হয়েছে সংশয়বাদী, নিজেই নিজের বৈরী। জীবকোষের উন্মাদনায়, সে ছুটেছে পথে-প্রান্তরে, হিমমজ্জিত তুষার গিরিশীর্ষে, বনে অরণ্যে লবণাম্বুরাশির ধারে, সে জুটেছে গুরুর কাছে, জ্ঞানীর কাছে, ল্যাবোরেটারীতে করেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সে চলেছে দূরদূরান্তরে।

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
না, না, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়
জানেনা সে কাহারে চায়
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি।

নীল নদের তটে, পঞ্চনদীর তীরে, মহাচীনের প্রান্তরে, ইরাণ ইরাকের অভ্যন্তরে চিরকালের মানুষ এই প্রশ্ন করেছে—কে তুমি, কী তুমি—হয়তো মনগড়া উত্তর মিলেছে। পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে প্রশ্ন আজও ধ্বনিত—কে তুমি—মেলেনি উত্তর।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগেযুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর

কিন্তু জ্ঞানীযোগী ভক্তদের কাছে নিজ নিজ অধিকার ভেদে উত্তর যে আসে না তাও নয়—

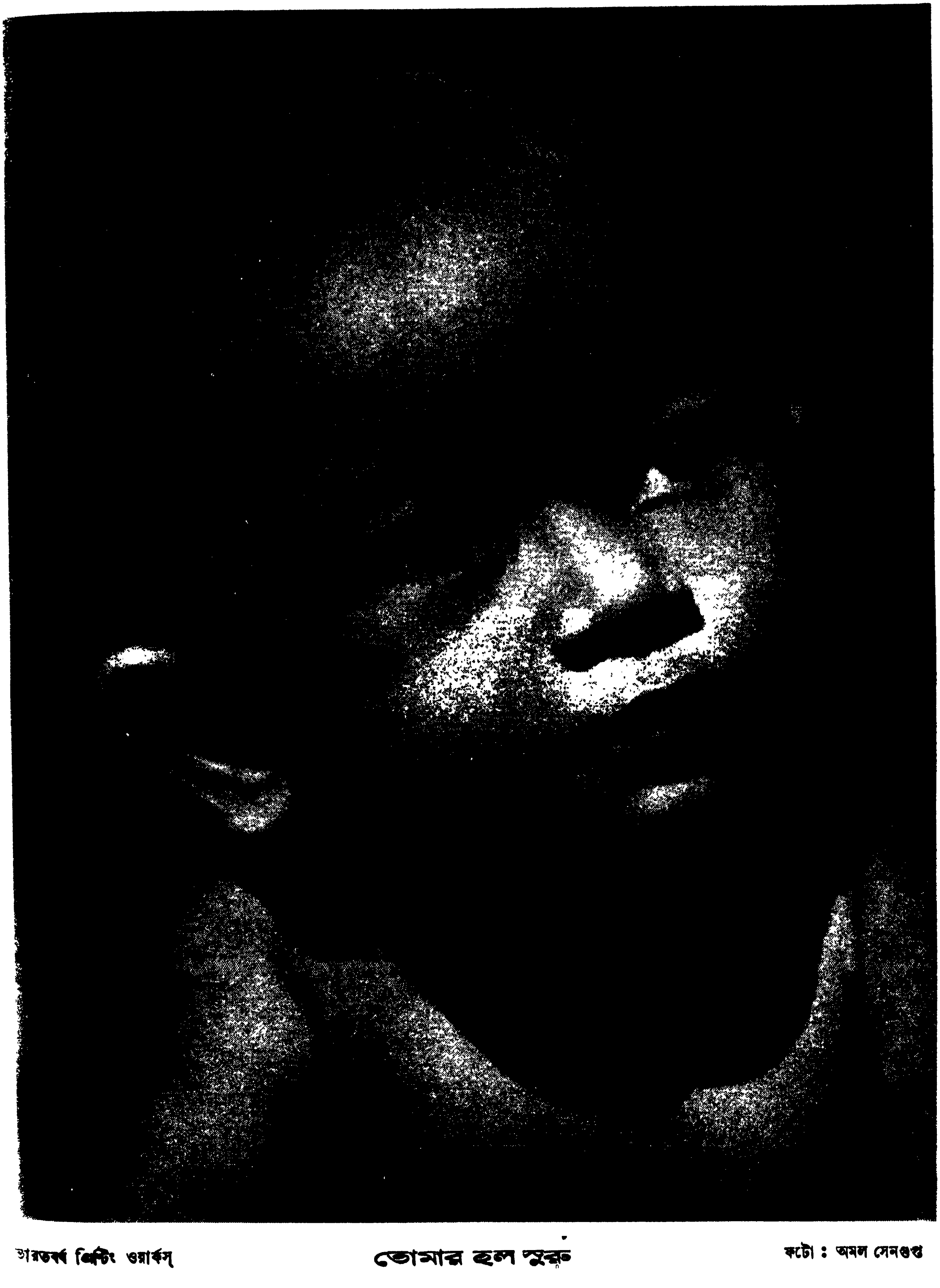
স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা কাতর

এই যে আস্পৃহা এটা একটা খণ্ড ঘটনা নয়—চলেছে জ্ঞানী-গুণী তপস্বী-মনস্বী যোগক্ষেম পুরুষদের একটি অবিচ্ছিন্ন মিছিল। মানস-সরসের অন্তহীন যাত্রীরা চলেছেন—হংসবলাকার দল।

হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে

বৈদিক ঋষির দিন থেকে আজকের শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরমণ পর্য্যন্ত সেই একই যাত্রা—অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।

আধুনিককালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব তার জাতীয় জীবনে এক নূতন সন্ধান, নূতন দিগ্‌দর্শন, নূতন রূপ এনে দিয়েছে—প্রায় সমসাময়িক না হয়েও তাঁরা সমকালীন—অপূর্ব তাঁদের জীবন গাথা, যৌবনের স্বপ্ন, মননের ইতিহাস, সাধনার সিদ্ধি। অনন্তের পরিক্রমায় এই দুই মহামানব বারে বারে একই পথে মিলেছেন—আবার ভিন্নমুখী হয়েছেন। পরম সত্যের রূপও প্রকাশ যে অনন্ত—তার সামগ্রিক বিভাসও অপূর্ব, তাই তাঁদের যোগপন্থা ও সিদ্ধিও অনুরূপ নেয়। কালের দিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ পরবর্ত্তী যুগের, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মত লোকোত্তর ভাগবতের মত ও পথ তাঁকে যে অভাবনীয়রূপে প্রভাবান্বিত করেছিল তার পরিচয় তাঁর নিজের বাণীতেই আছে। আজকের দিনের প্রচুর ঢক্কা নিনাদের ক্ষণে আমরা বুঝতে পারি না বা চাই না যে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

তোমার হল সুরু

ফটো : অমল সেনগুপ্ত



ফটো : বংশী দালাল

প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা কতখানি সুদূরস্পর্শী ও অবিচলিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পুনরাবৃত্তি (repeat) তিনি করতে চাননি এ কথা ঠিক—তিনি নিজের তপস্যার শক্তিতে আর এক অতি-মানবের জগত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এ কথাও সত্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ নিবেদনও ছিল—এই পরম সত্যটিই আমরা অতি উৎসাহের বশে ভুলে যাই।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ১৯০১ সালে বরোদার এক প্ল্যানচেটের বিবরণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। বারীন তখন সেখানে। একদিন তাঁদের খেয়াল হলো যে তাঁরা পরমহংসদেবকে ডাকবেন। তাঁর পুণ্য আবির্ভাবও নাকি হয়েছিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর নাকি তাঁর আদেশ বাঙ্ময় হয়ে দুটি কথা বলেছিল—মন্দির গড়ো, মন্দির গড়ো। অনেকে মনে করেন শ্রীঅরবিন্দের ভবানী-মন্দিরের কল্পনা রামকৃষ্ণদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বহুদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ নাকি বলেছিলেন যেন আমরা নিজেই এক একটি মন্দির হয়ে উঠি—এই দেহ দেউলেই যেন সেই পরমার অবতরণ হয়। শ্রীঅরবিন্দের মরদেহেই যে দিব্য-বিভা লোকে দেখেছেন, তার সাক্ষী ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৭ সালে পণ্ডিচারীতে কবির সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখনই তিনি তাঁর মুখশ্রীতে এক সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা দেখেছিলেন। শ্রীযুক্ত মহলানবীশের বইয়ে পড়ি যে সেই দর্শন কবিকে কি রকম ভাবে অভিভূত করেছিল—যাতে তিনি আর একবার তাঁকে দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায় সমাসীন সেই মহানকে বলে এলেন।

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার

ধীরে ধীরে ভবানী-মন্দিরের কল্পনা রূপ নিলে। প্রথমে হয়তো এটা বারীনের চিন্তায় ছিল কিন্তু একে সূক্ষ্মতর বিভূতিময় রূপ দিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বঙ্কিমের আনন্দমঠ, আর দেশাত্মবোধের প্রতীক 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র হয়ে উঠলো তাঁর কাছে।

শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—What was the message that radiated from the personality of Bhagavan Ramakrishna Paramhamsa ? What was it that formed the kernel of the eloquence with which the lion-like heart of Vivekananda sought to shake the world.

ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের ব্যক্তিত্ব থেকে কী বাণী বিচ্ছুরিত হলো? বিচিত্রবীর্য বিবেকানন্দের সিংহ-সম হৃদয় থেকে কি অগ্নিময়ী প্রত্যাশার সার বিশ্বকে করলে প্রকম্পিত, সে বাণী হচ্ছে—

India must be reborn. Her rebirth is demanded by the future of the world.

ভারতবর্ষের নবজন্ম চাই—এই পুনর্জাগৃতি সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য।

It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work, ever given to a race that Bhagawan Ramkrishna came and Vivekananda preached.

এই বিরাট বিচিত্র কর্মযজ্ঞের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান রামকৃষ্ণ, এরই জন্য প্রচারে বেরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

অনেকে মনে করতেন যে 'ভবানী-মন্দিরের' খসড়া শ্রীঅরবিন্দের নয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনীকার শ্রীযুক্ত পুরাণী (Life of Sri Aurobindo p 76) দেখিয়েছেন যে পুরাণো কাগজ-পত্রের মধ্যে সম্প্রতি এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তরুণ শ্রীঅরবিন্দের সামগ্রিক চেতনায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি এই মনোভাব একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। তা ছাড়া ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্‌' মূর্তি পেলে বিবেকানন্দের মুক্তি যজ্ঞে, যার বীজ ছিল রামকৃষ্ণের কালী সাধনায়। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এই ত্রয়ীর প্রভাব অসামান্য। অবশ্য অবিচলিত মহাসাধক, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আরো পূর্ণ সমাধানের জন্য—আরো বিচিত্রতম সমন্বয়ের জন্য এ কথাও সর্ববাদীসম্মত, অশ্বপতির যোগে যা তিনি নিজেই উদ্ঘাটিত করেছেন। অনন্তের পথে যাত্রার, অচিন্ত্যনীয়ের পথের সন্ধানের শেষ নেই, লোক থেকে লোকান্তরে, সাধকের এই মানস যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ভাষায় এ হচ্ছে—

অসীম আকাশে মহাতপস্বী—
মহাকাল আছে জাগি
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে

দেয়নি যে দেখা আজো কোনোখানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি

শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে দেখতে চেয়েছিলেন সেই পরমেরই বিবর্তনের একটি দিব্য প্রকাশরূপে (The vision of humanity as an evolutionary expression of the Divine.) যেখানে এক একটি মানসস্তরের এক একটি রূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

১৯০৪ সালে গুরুবরণ না করেই শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাস সুরু করেন। কয়েক বৎসর পরে মারাঠীযোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন—তাঁর আলিপুরের অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ দেখছেন বাসুদেবই সব—'তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতির উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে - তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী…লেলে আমাকে যখন দীক্ষা দিলে তখন আমি এই সত্যটা জানতাম না যে—জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হলে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্ব-সমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই অসামান্য হোক্ না কেন। বিশ্ব মানবকে হতে হবে অমৃতের অধিকারী। শুধু উপরের আলো নামতে রাজী হলেই হবেনা—সে নামেও,কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যদি না নীচের আধার, গ্রহীতার আধার তাকে ধারণ করতে পারে·· আমি চাই ঊর্দ্ধতর লোকের এমন কোন আলো এ জগতে আনতে, এমন শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানব প্রকৃতির মধ্যে হবে খুব একটা বড় রকমের অদল-বদল, ওলোট-পালট—এমন কোনো দিব্যশক্তি—যা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হয়নি।

এই আলিপুর জেলেই তিনি বিদেহী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ধ্যানমগ্ন থাকা কালে বিবেকানন্দের বাণী শুনতে পেতেন। এই সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি যা বলেছিলেন তা পুরাণী উদ্ধৃত করেছেন তাঁর পুস্তকে (১২১ পৃ:) "It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the Jail in my solitary meditation and felt his presence ……The voice spoke only on a special and limited but very important field of spiritual experience and it ceased as soon as it finished saying all that it had to say of the subject.

আজকের দিনে যদি কেউ সংশয় জানিয়েই বসেন যে, বিদেহী বিবেকানন্দ এসে শ্রীঅরবিন্দকে যোগের কোনো একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন, তাতে আমরা আশ্চর্য্য হবোনা। কিন্তু একটি জিনিষ প্রমাণিত হচ্ছে যে অবচেতনে বিবেকানন্দের বাণী শ্রীঅরবিন্দের মনে সেই সময়ে কী গভীর রেখাপাত করেছিল যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হতো, সে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়নি, নিত্য সত্য, মুক্ত শাশ্বত একটি আত্মা।

১৯২৬ সালের ১০ই জুলাইএর বৈকালিক আলোচনা সভায় তিনি আবার বললেন—"Vivekananda came and gave me the knowledge of intuitive mentality. I had not the least idea about it at that time. He too had not got it when he was in body. He gave me the detailed knowledge illustrating each point, the contact lasted for about three weeks and then he withdrew."

এতো স্পষ্ট ভাষায় বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার আর কোথাও দেখিনি।

১৯৩৯ সালের আর এক আলোচনায় (নীরদবরণের Evening talks with Sri Aurobindo) উদ্ধৃত দেখি যে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর দুই শিষ্য প্রশ্ন করছেন বিবেকানন্দের লেখা একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিটি ১৮ই এপ্রিল ১৯০০ সালে মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডকে লিখিত। চিঠিটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও আন্তরিকতাপূর্ণ।

স্বামিজী লিখছেন—জানো, জো, দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষতলে যখন অভিভূত শুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব কথাগুলো শুনতাম, তখন ত আমি বালক। সেই তো আমার সত্য সত্তা—আর যা কিছু সবই এহ বাহ্য। আজ আমার মৌনী মন আবার সেই কথাই শুনছে—সেই পুরোনো দিনের মন-মাতানো প্রাণ-ভোলানো কথা—কি মধুর, কি অপূর্ব—সব বাঁধন ভাঙছে, প্রেম মরছে, কাজে আর স্বাদ আসছে না, জীবনের দ্যুতি যেন নিভে আসছে—

এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

ডুবে যাবার সুখে আমার
ঘটের মত যেন অঙ্গ ওঠে ভরে

'হাঁ আমি আসছি—সামনে নির্বাণের মহাসমুদ্র, সম্মুখে সেই শান্তির পারাবার—বায়ুহীন তরঙ্গহীন শুদ্ধ……সেই স্রোতস্বতীর তপ্ত স্রোতে আমি ভেসে চলেছি—আমি যেন হাত-পা নাড়তে পারছি না—এমন একটা অপূর্ব শান্তি, এ কী মায়া, না মতিভ্রম, না ভ্রান্তি। আমার কাজের পিছনে ছিল উচ্চাভিলাষ, আমার ভালবাসার পিছনে ছিল ব্যক্তিত্বের প্রেরণা, আমার পবিত্রতার পিছনে ছিল ভীতি—আমার চালকগিরির পিছনে ছিল ক্ষমতার লিপ্সা—এখন সব ভেসে যাচ্ছে—মা, মা, আমি আসছি—এবারে শুধু দর্শক, আর অভিনয় নয়—

(Behind my work was ambition, behind my love was personality, behind my purity was fear, behind my guidance the thirst of power. Now they are vanishing and I drift. I come, Mother···a spectator, no more an actor).

এই প্রসঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে কতকগুলি আত্মা নিত্যমুক্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই ব্যবহার করতেন তাঁদের সম্পর্কে যাঁরা উপর থেকে নেমে এসেছেন বিশেষ কোন কাজের জন্য (There is a plane of liberation from which beings can come down here and perhaps that is what Ramakrishna meant by saying there are "Nityamukta" Souls—Souls who are eternally liberated—who can go up and down the ladder of existence.)

তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন যে বিবেকানন্দের এই অবস্থা নির্বাণের অবস্থা, তার সঙ্গে অনুভূতি আসছে যে অন্য সব কিছুই মায়া, শূন্য। প্রত্যেক সাধকেরই এই অনুভূতি আসে—

Nirvana is a passage for passing into a condition in which your true individuality can be attained.

কিন্তু আমাদের সাধনায় অনেকেই এই নির্বাণকেই মুক্তির চরম কথা বলে মেনে নেন। উচ্চাভিলাষ, ব্যক্তিত্ব-বাদ, পরিচালকের অভিমান, এই যে সব বৃত্তি এসে পড়ে বা মানবীয় সত্তায় সুপ্ত ভাবেও থেকে যায়—যার কথা বিবেকানন্দ বলছেন, তা থেকে মুক্তি পাবার দুটি পন্থা, একটি হচ্ছে—

One has the dynamic presence of the Divine all the time or readily available when needed—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বা অন্য সাধকদের সনাতন পন্থা—নিত্যযুক্ত হয়ে থাকা। আর একটি শ্রীঅরবিন্দের পথ—Establish peace, equality and calm right upto your physical consciousness, so that nothing in you stirs whatever happens.

তুমি শুদ্ধবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে সমতা লাভ করলেই হবে না, তোমার দৈব চেতনাকে ভাগবতী চেতনায় রাঙিয়ে নাও—সব কিছুকে দিব্যের ছন্দে রূপান্তরিত করে নাও, তখন তুমি হবে সব কিছুতেই অপ্রমত্ত।

সাধকের এই যে অবস্থা তারই প্রতি দৃষ্টি রেখে শ্রীঅরবিন্দ বললেন তাঁর সাবিত্রীতে (Book two, canto Six)

Then dawned a greater Seeking, broadened Sky
First came the Kingdom of the morning Star
A twilight beauty trembled under its spear
And the throb of promise of a wider life

Then slowly rose a great and doubting Sun
Yet something seemed to be achievêd atlast.

সকল চাওয়া পাওয়ার মাঝে চাওয়ার অনুভূতিটি আরো ঘনীভূত হয়ে উঠলো, প্রার্থনা আরো নিবেদিত—a greater seeking—আকাশের সীমা বৃহত্তর, মনের পরিধিও বেড়ে উঠলো—প্রেমপ্রোজ্জ্বল, কর্মদীপ্ত, প্রজ্ঞাঘন। ভোরের পাখী ডাক দিলে ভোরের শুকতারাকে—শুক-সারী বললে—রাই জাগো, রাইজাগো। আকাশ কাঁপতে লাগলো থর থর করে নতুন এক আবেগে উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে। এ এক দিব্য উন্মেষ—অন্ধকারের পার হতে আদিত্যবর্ণ মহাদ্যুতির আবির্ভাব হবে তারই আভাস—হিরণ্ময়ের ব্যঞ্জনা—জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রের মহৎস্বরূপের প্রতিচ্ছায়া

রবীন্দ্রনাথের কথায়

বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেলো তাহার বাণী
ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোকপানে তুলে দে

পূর্ব দিগলয়ে উদিত হলেন দিনমণি

প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ,

অন্য কবি বা সাধক যা পেয়ে সন্তুষ্ট, শ্রীঅরবিন্দ তাতে নন, তাঁর কাছে তখনও doubting Sun. তিমির বলয় পার হয়ে মেঘের দিগলয়ে এখনও সেই সূর্য অস্পষ্ট, তবে এটা তিনি স্বীকার করে নিলেন যে—কিছু পাওয়া গেলো, কিছু লাভ হলো

Something seem to be achieved
This realm inspires us with our vaster hopes

নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রেরণার জগতে এসে পৌছলেন। কবির কল্পনা এখানে সীমাহারা—শুনুন তাঁর উপমা—

Eternal in an unclosed Infinite
A mounting endless possibility
Climbs high in a topless ladder of dream.

সত্য সনাতন নিরঞ্জন অন্তরের মন্দিরে বসে—সে মন্দিরের দুয়ার খোলা—সে অনন্ত সত্যই ন-অন্ত। তার সম্ভাবনার সীমা নেই, অপরূপ দিব্যতর ভবিতব্য তার—নতুন করে হবার, দেখবার, বলবার, শোনবার সুযোগ প্রতি মুহূর্তে। প্রতিটি ক্ষণে আমরা যেমন বদলাচ্ছি, নতুন হচ্ছি, তেমনি এই অনন্তের নতুন নতুন রূপ, নতুন নতুন সংজ্ঞা, নতুন নতুন অভিব্যক্তি আমার চেতনায় জাগছে। এই অনন্তের মাঝেই আমরা ডুবে আছি, এই রস সাগরেই বিলীন হব। এরই মধ্যে আমার সান্ত রূপ রসে ছন্দে, গানে তালে যতিতে মাত্রায় পূর্ণ হয়ে উঠবে—অপূর্ব কল্পনা। এই হলো মহাপ্রকৃতির খেলা—ছড়িয়ে দেওয়া, গুটিয়ে নেওয়া। এই যুগে এই সত্যকে প্রথম বিশেষ-ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মকালী—কালী-ব্রহ্ম—পরম দিব্য—আর তাঁর চিদ্রূপা শক্তি দুইই যে অভিন্ন—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লেদুল্লেও জল। তাই তিনি বললেন—আমি দুটোই লই, তা না হলে ওজনে কম পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ আরো এগিয়ে দিলেন এই সত্যটিকে। সাধকের প্রতিটি অনুভূতিতে এই লীলা কি রকমভাবে ফুটে ওঠে তারই বিস্তৃত বিবরণ কাব্যের রূপকে প্রকাশ পেলো 'সাবিত্রী'তে। সেখানে ভাষা হার মেনেছে, উপমা স্তূপী-কৃত হয়েছে—পারম্পর্য দুর্বোধ্য হয়েছে। এ হচ্ছে কবি-মনীষির স্বতঃ উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কাব্যের গোমুখী নিঃসৃত সনাতন ছন্দের অমৃত ধারা, জীবনের স্বতঃ উৎসারিত সত্যদৃষ্টির বর্ণনা, মনকে অতিক্রম করে যে দৃষ্টি। এই যে ওঠা আর নামা, এর দুটি সুন্দর উপমা দেওয়া যায়। একটি শ্রীরামকৃষ্ণের, আর একটি শ্রীঅরবিন্দের কথা থেকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পড়ি যে ঠাকুর একদিন বলছেন যে ওরে বেদে যে সপ্তভূমির কথা আছে সে তো এই-খানেই, এই ভাণ্ডেই অর্থাৎ এই দেহেই। তিনটি ভূমি নীচের দিকে—কামিনী কাঞ্চনের দিকে মন—আসক্তিতে ভরা—গুহ্য, নাভি প্রভৃতি। মনের চতুর্থ ভূমি হলো হৃদয়। তখন চৈতন্য হচ্চে—আলো দেখছি, জ্যোতিঃদর্শন ইত্যাদি। অন্যত্র আর একটি সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে এ যেন চার বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে উঁচু জায়গায় একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ী দেখতে পেলে। ওদের


LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

ওদের ভেতর একজন দুঃসাহসী পাঁচিলে উঠে দেখলো, আরে কী চমৎকার, কী বাড়ী, কী ঘর, কী সাজ, কী রূপ, কী রং—তার মাথা ঘুরে গেলো, সে পাঁচিল থেকে পড়ে গেলো—ভিতরে যদি পড়লো ত বুঁদ হয়ে সেইখানেই রইলো, আর বাইরে পড়লেও আকুতি রয়ে গেলো আবার উঠবো। মনের পঞ্চমভূমি হচ্চে কণ্ঠ—তখন আর অন্য কথা ভাল লাগেনা, শুধু তাঁর কথা, তাঁর গান, গোপীদের যেমন কৃষ্ণ বিনা নাম নেই, কৃষ্ণ বিনা গীত নেই। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল তখন একাগ্র দৃষ্টি, সম্যক উপলব্ধি। তখনও একটু 'আমি' আছি—আলো দেখছি—লণ্ঠনের কাচের ভিতর দীপশিখা জ্বলচে—কিন্তু আমি নিজে ঐ আলোকে ছুঁতে পাচ্ছি না, আলো হতে পারছি না—এ যেন চিনি খাওয়া আর চিনি হওয়া। সেই আলো হতে হবে—অরবিন্দ সাধনার সেই ইঙ্গিত। মনের সপ্তমভূমি শিরোদেশ—সেইখানেই সমাধি—নির্বিকল্পই হোক, সবিকল্পই হোক। এরও উর্দ্ধে আর এক সমতার জগত কল্পনা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর গল্প মনে পড়ছে। অদ্বৈত সাধনের দরকার—সদ্‌গুরু এসে গেছেন, বৈদান্তিক তোতাপুরী উত্তম অধিকারীকে মন্ত্র দিচ্চেন—বিরজা হোম হয়ে গেলো—তোতাপুরীর নির্দেশে এক অখণ্ড অসীম জ্যোতির্ময় নিত্যবস্তুতে মন স্থির করতে উপদেশ দিলেন গুরু। কিন্তু বারে বারে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন তাঁর মাকে—অরূপ স্বরূপ নিরূপের মাঝে এক সাকারা অপরূপা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিলেন—ওরে আমার মায়ের মধ্যেই সব।

শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্তভূমির কথা বললেন, শ্রীঅরবিন্দ এর reverse processটির কথা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর একটি কবিতায়—The Golden Light—কনকোজ্জ্বলার প্রথমা অগ্নিশিখার পরশ লাগলো আমার মাথায়—পেয়ে গেলাম সকল প্রশ্নের উজ্জ্বলতর উত্তর। সেই আলো নামলো আমার নীরব কণ্ঠে, গানে গানে জেগে উঠলো দিব্যের বাণী কথায় কাহিনীতে কাব্যে। সেই স্পর্শ লাগলো আমার বুকে, কেঁপে উঠলো, দুলে উঠলো, আমার সত্তা, ধায় যেন তোমার পানে, তোমার পানে—মন্দির হয়ে উঠলো আমার মন। সেই দ্যুতি হিরণ্ময়—পৌঁছল আমার চরণযুগলে, স্পর্শ করলে মাটি, অপাবৃত হলো ভূমি, স্বর্গ আর মর্ত্ত্য এক হয়ে গেলো—মধুমৎ পৃথিবীর ধূলি আর স্বর্গের দেবতা, আমার ভবন আর তোমার ভুবন, আমার দৃষ্টি আর তোমার সৃষ্টি। এ যেন "তমো আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" তারপর "যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" পরমপ্রদীপ্ত হিরণ্ময় পাত্র।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ এতোই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে সেদিনেও (১৯৩২ সালে) তাঁর অত্যুৎসাহী কয়েকজন ভক্তদের বলতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝেন না। তিনি "Spiritual pigmy" ত ননই—বরং "A colossal spiritual capacity" যিনি বারে বারে বিভিন্ন যোগের পথ দিয়ে পরম ঐক্যের মতেই উপনীত হয়েছেন। তিনি লিখলেন—The passage you have quoted is my considered estimate of Shri Ramakrishna এবং আর্য্যে প্রকাশিত "The Synthesis of Yoga" "এ সেই কথাই লিপিবদ্ধ আছে"

"And in a recent unique example, in the life of Ramakrishna Paramhamsa we see a colossed spiritual capicity first driving straight to the divine realization, taking as it were the kingdom of Heaven by violence and then seizing upon yogic method one after another and extracting substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge".

স্বামিজী সম্বন্ধেও তিনি বললেন—We perceive his influence still working gigantically.

ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে এমন সব যোগক্ষেম মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল অদূর অতীতে। মাতৃপূজার দিনে তাঁদেরই স্মরণ করি, প্রণাম করি—কবি (নিশিকান্ত)র ভাষায় বলি—

হৃদয়ে আমার উদয় যদি না হতে মা
মাটিই শুধু মাটি থেকে যেতো, হতো না তোমার প্রতিমা-

বলি—যা দেবী সর্বভূতেষু।

গিরিশচন্দ্র নট ও নাট্যকার

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

গিরিশচন্দ্র নট এবং নাট্যকার দুটি ভাগেই বাঙ্গালীর থিয়েটার আর সাহিত্য ক্ষেত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল করে তুলেন। নাট্য সাহিত্যে মধুসূদন নবযুগের উদ্বোধন করেন, গিরিশ প্রতিভায় তা বিকশিত হয়ে উঠে—থিয়েটারে নাটকীয় চরিত্রের রূপায়নের নটরূপে এবং সাহিত্যে নাট্যসৃষ্টির পারদর্শিতার অতুলনীয় প্রতিভায় নাট্যকাররূপে গিরিশ উনবিংশতি শতাব্দির যুগন্ধর।

মানুষের জীবন বিকাশে পারিপার্শ্বিক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের অনুভূতি এই পারিপার্শ্বিক থেকেই আত্মবিকাশের রসগ্রহণ করে। গিরিশচন্দ্রের জীবনেও দেখতে পাই ভবিষ্যতের নট ও নাট্যকার বাল্যকালেই জাতীয় জীবনের পারিপার্শ্বিকতা থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করে নিচ্ছেন—দর্শনের ও চিন্তনের। নির্ঝর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে কথকের কথকতায়, হাপ-আখড়াইয়ের গানে, কবির লড়ায়ে, যাত্রার পালা এবং পাঁচালী কথা শুনে। গিরিশচন্দ্রের মনে বাঙ্গালী সমাজের এই রসানুভূতির বিশেষ দিকগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাট্যমঞ্চে এই সুর তুলে ধরেছেন বিচিত্র ভাবে ও ব্যঞ্জনায়। রসানুভূতির নামে আত্মবিস্মৃতির পথে স্বজাতির অতীত সম্পর্কে বর্জ্জনীয় এমন কিছু উচ্চারণ করেন নি। বাঙ্গালীর চিরকালের রঙ্গ-রস কৌতুক তাঁর প্রতিভায় বাঙ্গালীর প্রাণে নতুন করে রস সঞ্চার করে। তাই দেখতে পাই বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একজন বাঙ্গালী কথক যেন অভিনয়ে ও নাট্যরচনায় চিরদিনের সুরেই গান শুনালেন। আদর্শের দিক দিয়ে তিনি ভারতীয় চিন্তা ও সাধনাকে, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাতির সম্মুখে যেন তুলে ধরেছেন। অভিনেতা ও নাট্যকার রূপে তাঁর ভূমিকা তাই একদিকে রস স্রষ্টা—অন্যদিকে সত্যদ্রষ্টা এই দুইটি ভূমিকার সমন্বয়েই তিনি একদিকে সাধক অন্যদিকে প্রচারক। নাট্য সাহিত্যের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণে স্বধর্মচ্যুত না হয়ে তিনি ভারতীয় নাট্য চিন্তায় স্বধর্মে সর্ব্বদা নিজেকে সমারূঢ় রেখেছেন—নাটকীয় চরিত্রসমূহের বাচনিক রীতি এবং চারিত্রিক রূপ স্বাদেশিক করে তুলেছেন, এগুলি তাই জীবন্ত মানুষ রূপেই পরিণত হয়েছে।

বাঙ্গালার নাটকের ভাষা গিরিশচন্দ্রের হাতে নতুন রূপ গ্রহণ করল। পদ্যে এবং গদ্যে গৈরিশি ছন্দে তিনি একটি নতুন সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করলেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের নতুন প্রতিভাদি এই ছন্দে নবমূর্তি ধারণ করল। মাইকেলী ছন্দের রীতির মত গৈরিশি ছন্দের ও একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁর ছন্দের উদাহরণ দান এই প্রসঙ্গের আলোচনায় সমীচীন মনে করি। নলদময়ন্তী নাটকে বিদূষককে ভাব বলছেন—

> "সখা।
> সত্য কহিলাম রাজা নহি আমি আর।
> ছি—ছি—কত করি,
> মন বুঝাইতে নারি ;
> রাজ্য ধন মান—
> কিছু নাহি চাহে প্রাণ ;
> ক্ষত্রিয়ের প্রাণের প্রসার
> বীর্য্যবল কাজ নাহি আর ;
> প্রাণ তৃষিত আমার—
> দাবানল দহে সদা।
> সে প্রমদা আমারে কি চাবে ?"

অভিনেতা অভিনয় করতে গেলে বাক্য উচ্চারণ করিতে একটা ছন্দায়িত ধ্বনি তরঙ্গ তুলেন—গদ্যেও সেই সুর সৃষ্ট হয় বলে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনীত চরিত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে উঠে। গৈরিশি ছন্দের মধ্য দিয়ে শ্রুতিমধুর ভাব সৃষ্ট হয়। অমিত্রাক্ষরের দীর্ঘতা শ্রুতিকে পীড়িত করে—পাঠের আনন্দ শ্রবণে সৃষ্ট হয় না। অবশ্য শিক্ষিত মহলে চললেও জনসাধারণের মধ্যে চলে না। গৈরিশিছন্দের মধ্যে স্বাভাবিকতা অভিনয়কালে সুন্দরভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতেও এই ছন্দের অবদান অপরিসীম।

> "নাহি জানি ভাইরে লক্ষ্মণ !
> এই কিরে রাজ্য সুখ।
> ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে ভাই
> দণ্ডক অরণ্য মাঝে কুরঙ্গের সনে,
> ছিনু তিন জনে সুখে।"

এইরূপ আরও অজস্র উদাহরণ আছে—যেখানে ছন্দের স্বাভাবিক গতি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

নাটকের মধ্যদিয়ে নাট্যকার সৃষ্টি করেন বিভিন্ন চরিত্রের বিজয়াত্মক

রূপ—অভিনেতা নাট্য রূপায়নে তুলে ধরেন প্রিয়াচিত্রের উপলব্ধির আলোকে উজ্জ্বলকরে নাটকীয় ভূমিকা পাদপ্রদীপের সামনে।

কথোপকথনে গৈরিশিচ্ছন্দের আবৃত্তি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যে পরদায় প্রত্যেকটি কথার মধ্যদিয়ে অভিনেতা চরিত্রকে মূর্ত্তিমন্ত করে তুলতে পারে। বুদ্ধদেবচরিত্রে রাজা শুদ্ধোধন মহিষী মহামায়ার মৃত্যুতে আক্ষেপ—

"হায় ঋষি শূন্য দশদিশি
প্রেয়সী বিহনে হেরি,
ফুল্লকমলিনী জীবন সঙ্গিনী—
কোথা গেল অভাগিনী...

সিদ্ধার্থ— সর্ব্বশক্তিমান যদি ভগবান
দয়াবান কভু সেত নয়।"

অন্যত্র দেখতে পাই—"কিন্তু যদি থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।"

নমিত পদচ্ছন্দে বক্তব্য এমন সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে প্রত্যেকটি কথা কানের ভিতর দিয়া মনে প্রবেশ করে।

পাশ্চাত্য নাট্য চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় নাট্যচিন্তার সমন্বয় সাধন গিরিশ প্রতিভার আর একটি বিশেষ দিক। ইউরোপের অদ্ভুত ধরণের নাট্য রীতি অনুসরণ করে নাটকীয় আখ্যায়িকা-গঠনে এবং নাটকীয় চরিত্র—রূপায়নে তিনি কখনো ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেননি—তাঁর প্রণীত নাটকে তাই দেখতে পাই কাহিনীও বক্তব্যের স্বাভাবিক পরিণতি। কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্যাবলীর নাট্য-কলাসম্মত সন্নিবেশের দ্বারা নাটকের অন্তঃস্থিত ঘাত-প্রতিঘাত এমন একটা রসসৃষ্টি করে—মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত—সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখে মনে হয় যে, আদি ও অন্তের যোগাযোগে একটা সুর সৃষ্টি অতি স্বাভাবিক-ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। বঙ্গসাহিত্যে গিরিশ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানেই—কারিগরী কৌশল এবং শিল্পরসতাই গিরিশ প্রণীত নাটক-সমূহে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি—চরিত্রের ক্রমবিকাশ রক্তমাংসের শারীরী-রূপ ধারণ করে জীবনকে এবং জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতকে বিকশিত করে ধরে। গিরিশচন্দ্র অতুলনীয় চরিত্র-রচনা-কৌশলে মানুষের জীবনকে নাট্যাকারে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। পৌরাণিক সামাজিক অথবা ঐতিহাসিক যে কোন প্রকারের নাটক হোক চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারটাই মুখ্য। সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চরিত্র প্রস্ফুটনের কৃতিত্বের উপরেই নাটকের সাফল্য। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই বিশেষ কোন যুগও পরিবেশকে ভিত্তি করে উপস্থাপিত হলেও চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্বে নাটকীয় আবেদন চিরকালের। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাই সর্ব্বযুগের আবেদন নিয়েই চরিত্র সৃষ্টি করেন—জীবন্ত মনোগ্রাহী চরিত্রে নাটকে চিরদিনের কাহিনীকেই চিত্রিত করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর প্রধান ভূমিকা তাই বিষয়বস্তুর গভীরতায় এবং বিরাটত্বে একটি বিশেষ যুগের নাট্যশালায় তিনি যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টির ব্যাপ্তিতে নিজেকে বিকশিত করে তুলে ধরেছেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং মহাকবি গিরিশচন্দ্র রূপে।

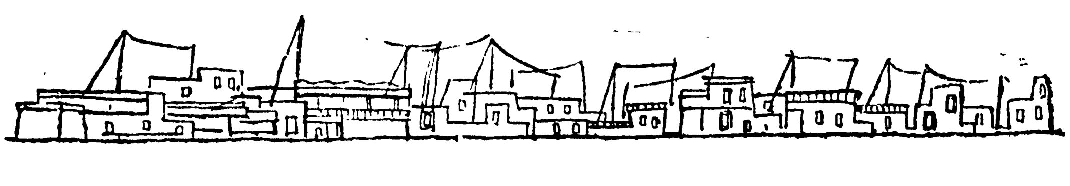
নাট্যকারের স্বাধীনতা কবিদের মত নিরঙ্কুশ নয়। Aristotle নাট্যকারদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন Not to construct a tragedy upon a epic plan! গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় পরিকল্পনায় জীবনের গতি প্রকৃত—এইজন্যই এমন একটি স্বাভাবিকতায় বিকাশ লাভ করেছে যেখানে চরিত্রগুলি মোটেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। চরিত্রগুলির নিজেদের কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়েই সংলাপ সৃষ্টি করে নাটকীয় রূপে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। এইজন্য গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখতে পাই—

(১) নাটকীয় কাহিনীর রূপায়নে স্বাভাবিকতা

(২) নাটকের সংলাপ স্বাভাবিকতা

এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবনদর্শন রূপায়নে স্বাভাবিকতা।

জীবনের সসীমতা নাটকে সংক্ষিপ্ত হয়েই ধরা পড়ে। নাটক উপন্যাস বা ইতিহাস নয়, জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে নাটকে রূপায়িত করা হয় বলেই বহুচরিত্রের সমবায়ে সৃষ্টি নাটকীয় কোরাস। গিরিশচন্দ্র সব সময় লক্ষ্য রাখতেন কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্যাবলী এবং সংলাপের স্বাভা-বিকতার পরিবেশের উপর। এইজন্য সার্থক নাট্যকাররূপে তিনি চরিত্রগুলির প্রস্ফুটনের পথে নাটককে স্বাভাবিক করে তুলে ধরেছেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত যে হয়েই সৃষ্টি করেছেন যখন যে নাটক—গিরিশ প্রতিভা সর্ব্বত্র সৃষ্টি করে তুলেছে মানবাত্মাকে আনন্দময় ও অমৃতময়। এখানে তাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের ঋষি দৃষ্টি! পার্থিবতা যেন এক দিব্য মাধুরীতে অনুরঞ্জিত করে তিনি তুলে ধরেছেন অসীমের সৌন্দর্য্যের আত্মোপলব্ধি। হৃদয় শুনেছে অনন্তের আনন্দ সঙ্গীত—সুরের তরঙ্গ ছুটে চলেছে গতিপূর্ণ হয়ে হৃদয়ের গভীরতায়—গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকসমূহ ইহার জীবন্ত সাক্ষী।





বিজয়ার সম্ভাষণ

উপানন্দ

তোমরা আমাদের বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ করো। আশীর্বাদ করি তোমরা শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞান বিজ্ঞানে শিল্পকলায় সমুন্নত হও। আনন্দ ময়ীর পূজা শেষ হোলো, এর সঙ্গে আনন্দময় শরতেরও হোলো তিরোধান। এখনও ভালো করে শরতের স্বচ্ছ নির্ম্মল দিনের সমাপ্তি ঘটেনি, আবার আসেনি এখনও শীতের হিমঝঞ্ঝার দিন। এরই মাঝে এসেছে হেমন্ত। এসেছে সেও আনন্দের উৎসবসমারোহ। দীপান্বিতা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসযাত্রা, কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে তিথিতে তিথিতে। জাতির মূল উৎস ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের প্রাণধারাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে আশ্রয় করেই আমাদের অতি প্রাচীন-জাতি আজও বেঁচে আছে। বারে বারে বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে, ভারতভূমি পরহস্তগত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগেও খণ্ড খণ্ড প্রলয় ঘটেছে তবুও এজাতির অস্তিত্ব লোপ হয়নি। এই সব উৎসবের পটভূমিকায় মিলনের মহামুক্তিতে জাগ্রত হয় ঐক্যবদ্ধ শক্তি, প্রাণরসের প্রস্রবণ ধারায় অবগাহন করে শত শত হৃদয়—আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে মানুষের অন্তর। এই সব কারণেই পালপার্ব্বণ পূজা-সমারোহের সার্থকতা। এমাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুরু নানক, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এঁরা সাধারণের মধ্যে জন্মেছিলেন অনন্যসাধারণ হয়ে। এঁরা জাতিকে দিয়ে গেছেন জীবনী শক্তি, তাই এঁদের জীবনী আমাদের কাছে পবিত্র। এঁরা ঐতিহাসিক পুরুষ, আমাদের নমস্য আর আমাদের জাতির আদর্শ। এঁদের আদর্শ হোক তোমাদের পাথেয়। এঁদের জন্মতিথি পালন তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। দেশ, জাতি ও সমাজ শ্রদ্ধায় এঁদের স্মরণ করে—এঁদের শক্তি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করে। এঁরাই প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা, জাতিকে সর্ব্ব-প্রকার বিপন্নতা থেকে উদ্ধার করেছেন। এঁরা কত বাধাবিপত্তি, কত নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তবু সত্যভ্রষ্ট হননি। দুঃখকে এড়িয়ে সুখের সাধনা এঁরা কোনদিন করেননি। মনুষ্যত্বের সাধনাই এঁরা করে গেছেন। উচ্চ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মৃত্যু হোক্‌ অথবা রণক্ষেত্রে গাড়ীর ওপরই মৃত্যু হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। যেখানে মানুষ মানুষের হিতের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, সেই স্থানই মৃত্যুর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এমন মৃত্যুতেই কীর্ত্তি সজীব থাকে—যেমন স্থান, তেমন মৃত্যুও গরীয়ান। কেবলমাত্র নিজের জীবনের জন্যে, নিজের সুখের জন্যে বেঁচে, যত সুখেই মৃত্যু হোক না কেন, জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরিয়ে যায়। পরহিতে প্রাণ উৎসর্গ করলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে বহুদর্শী না হোলে আধুনিক সমাজে ঠাঁই পাওয়া কঠিন—এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ, তোমরা একথাটা সব সময়ে মনে রাখ্‌বে। এজন্যে এখন থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করতে সচেষ্ট হবে। জ্ঞানই স্বর্গের মত স্থানে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষ স্বরূপ। জ্ঞান লিপ্সা থাকলেই বহু বিষয় শিক্ষার আবশ্যকতা বোধ হবে। হৃদয় মমতাশূন্য করবে না, করলে অশেষ অনিষ্ট ঘটতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঅভ্যাস একটু একটু করেই অতি ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বিন্দু বিন্দু বারি ক্ষুদ্র সরিৎ উৎপন্ন করে শেষে নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তেমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ কুঅভ্যাস সাংঘাতিক অবস্থায় টেনে নিয়ে গিয়ে মানুষকে মরণোন্মুখ করে তোলে। অনেক নির্ব্বোধ লোক উপদেশ অবহেলা করে ধ্বংসের অগাধ সলিলে ডুবে মরে। কুঅভ্যাস বিষ-বীজাণু, উপেক্ষা করলেই সর্ব্বনাশ। প্রবৃত্তির লোলুপতা আর স্বার্থের উত্তেজনা মানব সভ্যতাকে রক্তাক্ত করে। বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতির অভিমত হচ্ছে অসন্তোষই ব্যক্তি বা জাতির উন্নতির প্রধান কারণ। সব সময়েই মনে অভাব বোধ না থাক্‌লে, যা পাওয়া গিয়েছে তাতে যদি তৃপ্তি আসে তা হোলে কাজে আগ্রহ হয় না। অভাব না থাকলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঐ অভাবের তাড়নায়

কর্ম্মশক্তিকে বিশেষ ভাবে চালিত করা যায়। নিত্য নতুন নতুন অভাব বোধ এনে উত্তমকে নব নব সফলতার পথে নিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষের মতে সন্তোষই সুখ, ইউরোপের মতে সন্তোষই মৃত্যুর কারণ। সন্তোষ ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ নয়। ভারতে সন্তোষের বিকৃতি ঘটেছে জড়তায়, আলস্যে, ক্লৈব্যে, ও ধর্ম্মহীনতায়, ইদানীং এই বিকৃতির পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দুর্ণাড়ীর দলসর্ব্বস্ব কর্ম্মপদ্ধতিতে। এরা আহার্য্যের প্রাচুর্য্যকে বিনষ্ট করেছে, আদর্শকে বলি দিয়েছে আর উচ্চচিন্তা বা গবেষণার গতিরোধ করে এদের চাটুকারদেরই কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছে, পুরস্কৃত করেছে, ফলে জাতীয় চরিত্রাদর্শ হয়ে পড়েছে অবনত। তোমরা এদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে ন্যায় ধর্ম্ম সত্য মর্য্যাদার অবমাননা করো না। এরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হীরাকে কাচ আর কাচকে হীরা বলে, আর তাই দেশজননীও ভাবাজননীর কণ্ঠে পরিয়ে দেয়। ভক্তি কখন অপাত্রে দেখাবে না, বরং অপাত্রটীর প্রভাব দূর করবার জন্যে যুথবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চালিত করবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে, অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য।" যেখানে কোন মহৎ আদর্শের নিদর্শন প্রকাশ পায়, সেখানেই মানুষের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। মানুষের শির নত হয়। অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্রগুলি আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জীবন পথে অগ্রসর হবে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে। নবযুগের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত হবার শপথ গ্রহণ করতে হবে। দেশের যৌবনশক্তি বা প্রাণশক্তি তোমরা। মানসিক, চারিত্রিক ও আত্মিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে জীবন নীতিকে সুন্দর করে তোলো। তোমরা রাজনীতিচর্চা করবে না, একথা হয় না। কারণ, যথার্থ রাষ্ট্র চেতনা ভিন্ন আধুনিক যুগে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনীতিতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে না, এ রাজনীতি দেশের কল্যাণ ধর্ম্মকে অস্বীকৃত করেছে। এর আমূলপরিবর্ত্তনের জন্যে তোমাদের সংযম শৃঙ্খলা, ঐক্য ও বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত হবে নিজেদের তৈয়ারী করতে না পারলে এর পরিবর্ত্তন সহজে আনতে পারবে না, তাই উত্তমভাবে নানা বিষয়েজ্ঞানার্জ্জন করে তোমরা বাণীর বরপুত্র হয়ে ওঠো। তোমাদের অন্তর হয়ে উঠুক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। নরের মধ্যে নারায়ণ আছেন, নরনারায়ণের সেবাই পরম ধর্ম্ম। সকল সময়েই চিন্তার পরিমাণ অপেক্ষা কর্ম্মের পরিমাণ অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিভা বিনা অনুশীলনে ফুটে ওঠেনা, আর কোন প্রকার শৃঙ্খলা রক্ষা না করে অনুশীলনও অসম্ভব। একজন্যে তোমরা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে সুসংবদ্ধ ভাবে জীবন গড়ে তুলবে যাতে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে জ্ঞান অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়কে বশীভূত করে কাজে লাগতে পারে, সেই জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান আর তাই পূর্ণশক্তি। এই জ্ঞান অর্জ্জন করার দিকে তোমাদের লক্ষ্য হোক। হতাশাকে হৃদয়ে স্থান দিওনা, স্থান দিও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে। সর্ব্বদা শুভ আশা, শুভ সঙ্কল্প, আর শুভ চিন্তাতেই তোমাদের হৃদয় আলোকিত রাখবে, শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যশালী হও—এই টুকুই আজকের বিজয়া সম্মেলনে আমাদের প্রধানবক্তব্য। আশাকরি তোমরা পথনির্দ্দেশ গ্রহণ করে বাঙালী জাতিকে মহীয়ান করে তুলবে।

কৃপাদৃষ্টি

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

শশী কহে, "রবিভায় ধরণীর গায়ে
চেয়ে দেখ স্নিগ্ধ আলো দিয়েছি ছড়ায়ে।
তোমার প্রখর তাপ পীড়া দেয় প্রাণে,
মোর সার্থকতা বন্ধু শীতলতা দানে।"
"বৃথাদর্প কোরোনাকো"—কহিল তপন,
"তোমার আলোর গর্ব আমি যতক্ষণ;
মোর কৃপাদৃষ্টি তোমা করে আলো দান
আমি আছি, তাই আছে তোমার সম্মান।"

ভিক্টর হুগো

রচিত

'লে মিজারেবল্'

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আদালতে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে মাদলিন্ তাঁর আসল পরিচয় জানালেন—তিনিই জ্যাঁ ভালজ্যাঁ—জেল-ফেরৎ দাগী চোর ··এবং যে কোনো শাস্তির জন্য তিনি প্রস্তুত! আদালতে আসামীদের দলে ছিল জ্যাঁ ভালজ্যাঁর কয়েদী-জীবনের ক'জন পুরোনো সঙ্গী···তারা সাক্ষ্য দিলে যে কাদার মাদ্‌লিন্ই তাদের জেলখানার বন্ধু জ্যাঁ ভালজ্যাঁ! বিচারক সাজা দিলেন—জ্যাঁ ভালজ্যাঁ সারা জীবন জাহাজে কুলির খাটুনি খাটবে! দারোগা জ্যাভার্টের মহা উল্লাস—এতদিনে তার মনস্কামনা পূর্ণ হলো!

জেলের শান্ত্রীরা নির্ম্মমভাবে চাবুক মারতে মারতে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁকেও নিয়ে গেল কুলি-খাটার জাহাজে! সেখানকার ব্যবস্থা খুব নির্ম্মম…সামান্য কারণে অমানুষিক পীড়ন আর অত্যাচার চলে কয়েদীদের উপর। কুকুরের মতো লোহার বেড়ী আর শিকলে সারাক্ষণ বাঁধা থাকে কয়েদীদের হাত-পা—এই অবস্থাতেই তাদের অষ্টপ্রহর হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়…সে কাজে এতটুকু ত্রুটি বা গাফিলতী ঘটলেই শান্ত্রীরা নির্দ্দয়ভাবে চাবুক হাঁকরে বেয়াদপী শায়েস্তা করে দেয়।

এমনি দুর্ভোগ সয়ে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ কুলি-জাহাজে হাড়-ভাঙা-খাটুনি খাটে, আর মনে-মনে মতলব আঁটে—কি উপায়ে সে এ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে! এমন সময় আচমকা একদিন মিললো তার সুযোগ! জাহাজের মাস্তুলে পাল টাঙাতে গিয়ে এক জাহাজী-কুলির হঠাৎ পা গেল ফশ্‌কে…পালের দড়ি ধরে সে কোনোমতে শূন্যে ঝুলে রইলো—নীচে উত্তাল সমুদ্র…হাত ফশ্‌কালেই জীবন শেষ! জাহাজীর বিপদ দেখে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ শান্ত্রীকে বলে, হাতের বাঁধন খুলিয়ে ছুটে গিয়ে উঠলো মাস্তুলের উপরে। বহুকষ্টে বিপন্ন-কুলির প্রাণ বাঁচিয়ে, সে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হলো অতল-সাগরে—বহু সন্ধান চললো…কিন্তু তার কোনো পাত্তা মিললো না। শান্ত্রীরা ঠাওরালো—সে জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে!

জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ ওদিকে ডুব-সাঁতার কেটে পালিয়ে এসে উঠলো ডাঙায়…তারপর রাতের অন্ধকারে গা-ঢেকে সোজা এলো সহরে, নিজের বাড়ীতে!

পরের দিন সকালে, নিজের যা টাকাকড়ি ছিল, সব পকেটে পুরে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ সোজা গিয়ে হাজির হলো ভিন্-সহরে সরাইখানাওয়ালা থেনার্ডিয়ারদের বাড়ী—পালিতা-কন্যা কসেটের খোঁজে। মোটা টাকা মাসোহারা পেলেও ধড়িবাজ থেনার্ডিয়ার দম্পতী শিশু-কসেটকে মোটেই যত্ন করতো না…তাদের অবহেলায় কশেটের অবস্থা ছিল পথের ভিখারীর চেয়েও অধম…ভালো খাবার, ভালো পোষাক দূরের কথা, এক টুকরো ভাঙা পুতুল অবধি জুটতো না ছোট্ট মেয়েটির বরাতে! কশেটের দুর্দ্দশা দেখে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ তাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করবেন—স্থির করলেন। কিন্তু থেনার্ডিয়াররা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাকা ফন্দীবাজ…জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর দামী পোষাক আর পকেট-ভর্ত্তি নোটের তাড়া দেখে তারা বুঝে নিয়েছিল যে লোকটি রীতিমত শাঁসালো। তাই কশেটকে ছাড়তে তারা গোড়াতে খুব আপত্তি জানালো, শেষে একতাড়া নোট আদায় করে কশেটকে সঁপে দিলে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর হাতে।

ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে কশেটকে নিয়ে এসে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ আবার নতুন করে জীবন সুরু করলে বিরাট প্যারী সহরের এক জনাকীর্ণ অঞ্চলে। পাছে তাকে কেউ চিনতে পারে, এই ভয়ে দিনের আলোয় বাড়ী থেকে সে বেরুতো না… সারাদিন তার কাটতো বাড়ীতে ছোট্ট কশেটের সঙ্গে হাসি-গল্প-খেলা করে…সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে দুজনে বেড়াতে বেরুতো পথে। কশেট ছিল জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর নয়নের মণি…সে জানতো ভাল্‌জাঁই হলো তার [illegible]। দুজনে সব সময়ে একসঙ্গে থাকতো—বাইরে কারো সঙ্গে মিশতো না। তাদের এই অদ্ভুত আচরণে পাড়াপড়শীদের মনে কেমন সন্দেহ হতো…মাঝে মাঝে বাড়ীর বুড়ী দাই দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতো—জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ কোটের আস্তরণ কেটে নোটের তাড়া বার করছে। বুড়ীর মুখে খবর জেনে, ডাকাত সন্দেহ করে পড়শীরা পুলিশে খবর দিলে। দুঁদে-দারোগা জ্যাভার্ট তখন প্যারী-সহরের সেরা গোয়েন্দা-পুলিশ…খবর পেয়ে ছদ্মবেশে খোঁজ নিতে এসে সে চিনতে পারলো জ্যাঁ ভাল্‌জাঁকে! ওদিকে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁও আন্দাজ করেছিল যে পুলিশ তার সন্ধানে ঘুরছে। তাই নিশুতি-রাতে কশেটকে ঘুম থেকে তুলে সে দিলো চম্পট…সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রী-ফৌজ নিয়ে দারোগা জ্যাভার্ট এসে ঘরে ঢুকে দেখে—খাঁচা খালি…পাখী পালিয়েছে! এভাবে ঠকে গিয়ে জ্যাভার্ট আর শান্ত্রীরা চারিদিকে তল্লাস চালালো—ঘুমন্ত সহরের অলি-গলি সর্ব্বত্র! কশেটকে নিয়ে পালাবার পথে জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ হঠাৎ দেখে পুলিশের দল ছুটে আসছে তারই পিছনে। সে তাড়াতাড়ি কশেটকে বুকে নিয়ে এ-গলি ও-গলি ঘুরে, উঁচু পাচিল টপ্‌কে ছুটে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে এক কনভেণ্টের বাগানে। সারা রাত খুঁজে জ্যাভার্ট আর শান্ত্রীরা আসামীর কোনো হদিশ পেলো না!

ভোর হতেই কনভেণ্টের বুড়ো মালী এলো বাগানে… জ্যাঁ ভাল্‌জাঁকে দেখেই সে চিনতে পারলো। জ্যাঁ ভাল্‌জাঁও

জানতে পারলো যে এই মালীই সেই গাড়োয়ান ফোঁশলভা—একদিন সহরের পথে চাকা-ভাঙা গাড়ীর তলা থেকে যার প্রাণ বাঁচিয়েছিল···বুড়ো বয়সে সে এখন এই কনভেন্টে মালীর কাজ করছে! জ্যাঁ ভালজাঁ তার বিপদের কথা জানালো···ফোঁশলভা বন্ধুভাবে তাদের দুজনকে নিয়ে গেল কনভেন্টের কর্ত্রীর কাছে। সেদিন থেকেই কশেট লেখাপড়া শিখে কনভেন্টে মানুষ হতে লাগলো, আর জ্যাঁ ভালজাঁরও আশ্রয় এবং চাকরী জুটলো সেখানে। সারাদিন ফোঁশলভার সঙ্গে মিলে কনভেন্টের বাগানে কাজ করে ফুরসৎ মিললেই জ্যাঁ ভলজাঁ এসে কশেটের সঙ্গে হাসি-গল্প-খেলাধূলায় সময় কাটায়! এমনি করে পরম সুখে-শান্তিতে তাদের ক বছর কাটলো।

ইতিমধ্যে রাজ-শাসনের নির্ম্মম-অত্যাচারে ক্রমে জেগে উঠছে গণ-বিপ্লবের সূচনা। কশেট এখন সুন্দরী তরুণী, আর বার্দ্ধক্যের ছাপে জ্যাঁ ভালজাঁর মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে। ভালজাঁর মনে হলো, এবারে কনভেন্ট ছেড়ে বাইরে বাস করলে কেউ আর চিনতে পারবে না। তাই লুকোনো টাকাকড়ি আর কশেটকে নিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ প্যারী সহরের বস্তুমেৎ অঞ্চলে আবার নতুন করে বাসা বাঁধলো। কশেটকে নিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ রোজই বেড়াতে যায় লাক্সেমবুর্গ-বাগানে···সেখানে মারিয়াস নামে সহরের এক অভিজাত-বংশের তরুণ-বিপ্লবীর সঙ্গে কশেটের হলো পরিচয়। মারিয়াসের ইচ্ছা কশেটকে বিবাহ করে, কিন্তু তার বনেদী-অভিভাবক দাদামশাইয়ের প্রবল আপত্তি—ছোট-ঘরের মেয়েকে বাড়ীর বৌ করে আনলে মারিয়াসকে সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত করবেন। এ কথা শুনে মারিয়াস্ রাগে-অভিমানে বাড়ী ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে গিয়ে যোগ দিলে···রাজার ফৌজের বিরুদ্ধে সে দাঁড়ালো লড়াই করতে!

জ্যাঁ ভালজাঁও ছিল বিপ্লবীদের দলে। সে বুঝেছিল—কশেট মারিয়াসকে ভালবাসে। বিয়ে হলে কশেট তাকে ছেড়ে পরের ঘরে চলে যাবে···অথচ কশেটকে সুখী করতে হলে, তার নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া দরকার! তাই নিজের মনের ভাব গোপন রেখে জ্যাঁ ভালজাঁ সারাক্ষণ মারিয়াসকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। এমন সময় বিপ্লবীরা হঠাৎ একদিন সহরের দুর্দ্ধর্ষ দারোগা জ্যাভার্টকে বন্দী করে আনলো তাদের দলপতি মারিয়াসের সামনে। মারিয়াসের আদেশমত তারা জাভার্টকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে, তখন জ্যাঁ ভালজাঁ গিয়ে অনুরোধ জানালো—জ্যাভার্টের প্রাণ-নেবার ভার তার হাতে দেওয়া হোক। বিপ্লবীরা জ্যাঁ ভালজাঁকে খুবই মানতো, শ্রদ্ধা করতো···তারা সানন্দে তাতে সম্মতি দিলো। জ্যাঁ ভালজাঁ তখন পিস্তল দেখিয়ে বন্দী জ্যাভার্টকে নিয়ে গেল একটু আড়ালে পাশের এক নির্জ্জন গলিতে—কিন্তু প্রাণে না মেরে বন্দী জ্যাভার্টের দড়ির বাঁধন কেটে তাকে দিলে মুক্তি! জ্যাঁ ভালজাঁর এ-আচরণে দাম্ভিক জ্যাভার্ট স্তম্ভিত!

জ্যাভার্টকে মুক্তি দিয়ে, পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজে দলের লোকজনকে ধোঁকা দিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ আবার ফিরে এলো লড়াইয়ের জায়গায়। সেখানে রাজসৈন্যদের বন্দুকের গুলিতে বিপ্লবী মারিয়াস্ হঠাৎ গুরুতর আহত হলো। নিজের জীবন তুচ্ছ করে লড়াইয়ের গোলাগুলির মাঝে ছুটে গিয়ে জ্যাঁ ভালজাঁ মরণাপন্ন মারিয়াসকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথের নীচেকার নোংরা অন্ধকার কাদা-পাঁক-আবর্জ্জনাভরা সুড়ঙ্গ-নর্দ্দামার মধ্য দিয়ে চললো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে! রাজার ফৌজ সেখানেও তাড়া করলো তাদের পিছনে। শান্ত্রীদের নাগাল এড়িয়ে অচৈতন্য মারিয়াসকে কাঁধে বয়ে ভালজাঁ এসে হাজির হলো নর্দ্দামার মুখে···কিন্তু বেরুনোর উপায় নেই—নর্দ্দামার মুখে লোহার কপাট বন্ধ! কাজেই অনেক ঘুরে শেষে হাজির হলো—নর্দ্দামার শেষপ্রান্তে সীন্ নদীর ধারে। সেখানে অচেতন মারিয়াসের চোখে-মুখে জল দিয়ে তাকে সচেতন করবার সময় আচমকা দারোগা জ্যাভার্ট এসে দাঁড়ালো জ্যাঁ ভালজাঁর সামনে। ভালজাঁ জ্যাভার্টকে মিনতি জানালো—আহত মারিয়াসকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, সে নিজে এসে ধরা দেবে দারোগার হাতে! জ্যাভার্ট গাড়ীতে চড়িয়ে তাদের নিয়ে গেল মারিয়াসের দাদামশাইয়ের বাড়ী। সেখানে মারিয়াসের সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ভালজাঁ ফিরে এলো জ্যাভার্টের কাছে। জ্যাভার্ট কিন্তু ভালজাঁকে কয়েদখানায় বন্দী না করে, বাড়ী পৌঁছে দিলে। তার ব্যবহারে ভালজাঁ অবাক!

দাগী-কয়েদীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেবার জন্য দারোগা জ্যাভার্টের মনে জাগলো দারুণ অনুশোচনা। কর্ত্তব্য-অবহেলার গ্লানিতে সে আত্মহত্যা করলো সীন্ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে!

ওদিকে সেবা-চিকিৎসার গুণে সুস্থ হয়ে উঠেই মারিয়াস্ দাদামশাইকে আবার জানালো—কশেটকে সে বিবাহ করতে চায়। দাদামশাই এবার আপত্তি করলেন না, কারণ, মারিয়াসের সেবার কাজে তিনি কশেটের মায়া-মমতা আর সুন্দর স্বভাবের প্রচুর পরিচয় পেয়েছেন ইতিমধ্যে এবং মেয়েটিকে তাঁর পছন্দ হয়েছে খুব! কাজেই বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হলো। বৃদ্ধ জ্যাঁ ভালজাঁ তখন সবাইকে জানালো—কশেটের জন্ম-বৃত্তান্ত! কশেট্ আসলে ফ্যানটিন্ আর ফোঁশলভার কন্যা!…নিজের নাম গোপন রেখে জ্যাঁ ভালজাঁ তার স্বোপার্জ্জিত-সঞ্চিত অর্থ থেকে কশেটকে বিবাহে যৌতুক দিলো প্রায় লাখ ছয়েক টাকা!

বিয়ের পর, জ্যাঁ ভালজাঁ মারিয়াসকে জানালো তার জীবনের সব কথা! ভালজাঁ দাগী-কয়েদী…কশেটের কেউ নয়…জানতে পেরে মারিয়াস্ কোনো সম্পর্ক রাখলো না ভালজাঁর সঙ্গে…কশেটও স্বামীর সংসারে স্বামীকে নিয়ে মত্ত…ভালজাঁর কথা দুজনের মন থেকেই মুছে গেল।

ভালজাঁ নীরবে দূরে সরে গেল তার প্রিয়জনের অবহেলা সয়ে! তখন ঘটনাচক্রে মারিয়াস্ হঠাৎ একদিন জানতে পারলো যে এই ভালজাঁই বিপদের দিনে তার প্রাণরক্ষা করেছে! এ খবর কশেট আর তার কাছে এতদিন ছিল অজানা…কারণ, ভালজাঁ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি এ সব কথা। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে-লজ্জায় কশেট আর মারিয়াস্ ছুটে এলো ভালজাঁর নিরালা-ভবনে! নিঃসঙ্গ-বৃদ্ধ ভালজাঁ তখন সঙ্কট রোগে শয্যাশায়ী। কশেট আর মারিয়াস্ চোখের জল ফেলে বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলো…মৃত্যুপথযাত্রী ভালজাঁর মুখে ফুটে উঠলো হাসির ক্ষীণ রেখা! দুজনকে আশির্ব্বাদ করে ভালজাঁ চিরদিনের মতো ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

সোনাঝরা রোদে

স্থ-মো-দে

শ্যামলঅঙ্গ বঙ্গদেশের
অঙ্গন মাটি পরে,
শরৎ-বাতাসে শিউলি সুবাসে
মুকুতা শিশির ঝরে।
থেমেছে বরষা বারিবরিষণ
শরতে প্রকৃতি আঁখি-বিমোহন,
বহিছে তটিনী ভরা জলাধারে
কুলুকুলু মধুস্বরে;
উড়িছে বলাকা শাদা মেঘে মিশে
পরম আকুতি ভরে।
আউস আমলা সোনালী রঙে
কাশ ফুলে দুলে লুটায় চরণে,
অশোক অতসী কমল আকুল
শারদা পূজন তরে,
সোনাঝরা রোদে দোয়েলকোয়েল
হিল্লোলে গান করে।

ছুটির ঘন্টায়

চিত্রগুপ্ত বিরচিত

এবারে আরো ক'টি মজার খেলার কথা তোমাদের জানাচ্ছি—পূজার ছুটিতে এ সব খেলা ভালোভাবে আয়ত্ত করে, আর পাঁচজনকে দেখিয়ে তোমরা তাঁদের সহজেই তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

জলে বাঁশীর সুর:

প্রথমেই যে খেলাটির কথা বলছি, সেটি ভারী মজার!

শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না—বাঁশী কিম্বা কোনো বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন নেই···অথচ, জলে কি করে বিচিত্র সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করবে—সেই কথাই বলি!

দুধ-রাখবার কিম্বা ঐ ধরণের বড়-মুখওয়ালা একটি খালি বোতলে জল ভরো···বোতলটির বারো আনা ভাগ জলে ভরতে হবে। জল-ভরার পর, কাঁচের একটি লম্বা ও ফাঁপা নল বোতলের মধ্যে সাঁধ করিয়ে দিয়ে সেই নলের মুখের সামনে ঠোঁট দুটোকে ফুলিয়ে ফুঁ দাও—পাশের



ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে—ঠিক তেমনি ভাবে! ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাবে—বোতলের জলে সুর ফুটেছে। এবারে ঐ কাঁচের নলটিকে বোতলের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে যদি একটু কায়দা করে উপরে আর নীচে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে পারো তো শুনতে পাবে এ সুরে কত বৈচিত্র্য ফুটবে···অর্থাৎ, বাঁশীর মতো নানা পর্দ্দায় সুরের ঝঙ্কার উঠবে। মনে রেখো—কাঁচের নলটি যত গভীর জলে ডোবানো হবে, বাঁশীর সুর ততই বাজবে নীচু পর্দ্দায়। উঁচু পর্দ্দার সুর সৃষ্টি করতে হলে, কাঁচের নলটিকে অল্প জলে ডোবানো দরকার। এই হলো "বোতলের জলে বাঁশীর সুর সৃষ্টি তোলা" খেলাটির আসল রহস্য!

জলে কিছুই ভিজবে না:

এবারে যে খেলাটির বিষয় বলবো—সেটিও ভারী বিচিত্র মজার। এ খেলাটি দেখানোর জন্য প্রয়োজন—এক গামলা পরিষ্কার জল, খানিকটা 'লাইকোপোডিয়াম্ পাউডার (Lycopodium Powder) আর একটা টাকা কিম্বা পয়সা। 'লাইকোপোডিয়াম্ পাউডার' যে কোনো ভালো ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। এবারে শোনো, মজার খেলাটির কথা!

একটি গামলা কিম্বা এক বালতি জলে একটি টাকা বা পয়সা ফেলে দিয়ে বন্ধুদের বলো—জল থেকে এমনভাবে পারো ও পয়সা তুলতে, যে হাত ভিজবে না এতটুকু! বন্ধুরা বলবে, না! তুমি বলবে—আমি পারি! বন্ধুরা বলবে, হাতে রবারের দস্তানা এঁটে?···তুমি বলবে,—না, এমনি শুধু হাতে! এই বলে তুমি তখন হাত না ভিজিয়ে গামলার জল থেকে ও পয়সা তুলে বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।···কি করে পারবে, বলি!

ওষুধের দোকান থেকে খানিকটা 'লাইকোপোডিয়াম্ পাউডার' কিনে এনে, গামলা বা বালতির জলে দাও ছড়িয়ে। পাউডার-ছড়ানোর পর সেই জলে হাত ডুবিয়ে গামলা কিম্বা বালতির ভিতর থেকে পয়সা বা টাকা তোলো ···দেখবে, তোমার হাত বেমালুম শুক্‌নো থাকবে—ভিজবে না এতটুকু! শুধু টাকা-পয়সা কেন, পাথীর পালখ বা



চাবির রিং, ছুরি, কিম্বা যে কোনো ধাতু-দিয়ে-তৈরী সিগারেট কেস্, নস্য-দান বা জর্দ্দার কৌটো প্রভৃতি জিনিষ গামলা বা বালতির জলে ফেলে, সে জলে ঐ পাউডার ছড়িয়ে অনায়াসে তা তুলতে পারবে—হাত ভিজবে না! কেন এমন হয়, জানো?···'লাইকোপোডিয়াম্ পাউডারের' মস্ত গুণ—সে পাউডার জলে ভেজে না (Unwettable) কোনোমতেই···কাজেই 'লাইকোপোডিয়াম পাউডার' মেশানো জলে হাত ডুবুলে ঐ পাউডার তোমার হাতে লেগে থাকবে—তার দরুণ হাত ভিজবে না এতটুকু···বালতি বা গামলার ঐ জলে পা ডুবিয়ে দাও···দেখবে, পায়ে জলের

ছুটেফোঁটাও লাগবে না···পা ভিজবে না—শুকনো থাকবে আগাগোড়া!

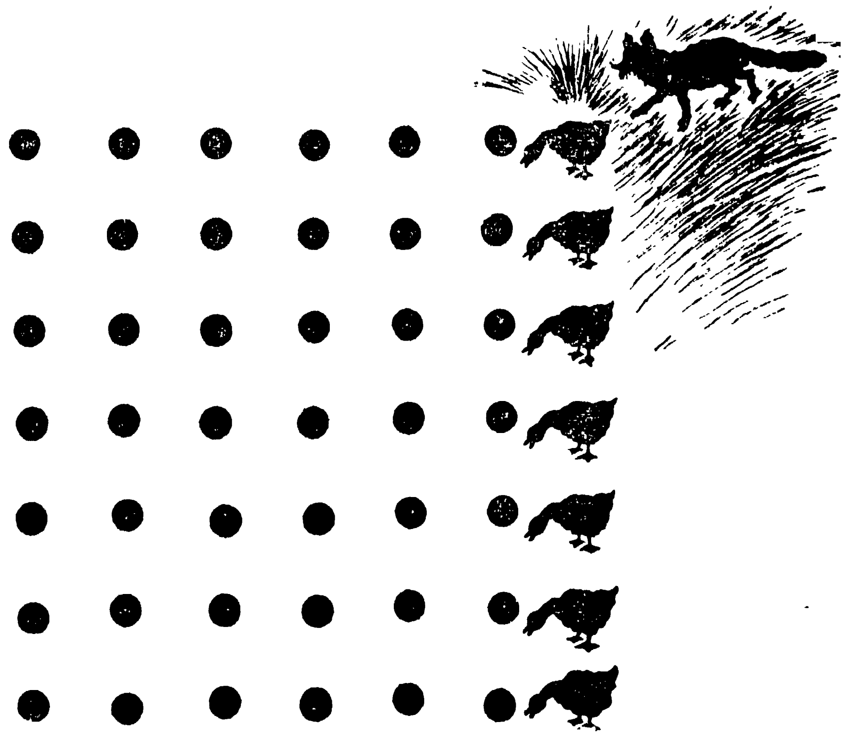
এই হলো মজার খেলাটির মোদ্দা কথা···এবার নিজেরা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখো—এ খেলা দেখিয়ে আর পাঁচজনকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো কি না!

ধাঁধা ও হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

শেয়াল আর হাঁসের ধাঁধা:

পাশের ছবিতে সাতটি হাঁস আর বিয়াল্লিশটি ফুট্‌কি দেখছো···এই বিয়াল্লিশটি ফুট্‌কিকে বিয়াল্লিশটি হাঁস বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ, উনপঞ্চাশটি নিরীহ হাঁস নিশ্চিন্ত মনে গ্রামের সীমান্তে নিরালা মাঠে পোকামাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে···তাদের এতটুকু হুঁশ নেই যে ডানদিকের ঐ বুনো ঘাসের ঝোপের আড়ালে শীকারের লোভে ওৎ পেতে লুকিয়ে রয়েছে ধূর্ত্ত শেয়াল! সামনে এতগুলি নধর শীকার দেখে শেয়াল আর লোভ সামলাতে পারলে না···সে তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়াল থেকে মাঠে বেরিয়ে এসে, মাত্র বারো বার বরাবর সোজাসুজি লাইনে চলে, একের পর এক উনপঞ্চাশটি হাঁসকে সাবাড় করে দিয়ে আবার ঐ ডানদিকের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো! এবারে বলো দেখি তোমরা—ধূর্ত্ত শেয়াল ঐ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কিভাবে বারো বার বরাবর সোজাসুজি লাইনে চলে উনপঞ্চাশটি নিরীহ হাঁসকে সাবাড় করে আবার ঐ বুনো ঘাসের জঙ্গলে ফিরে গেল?

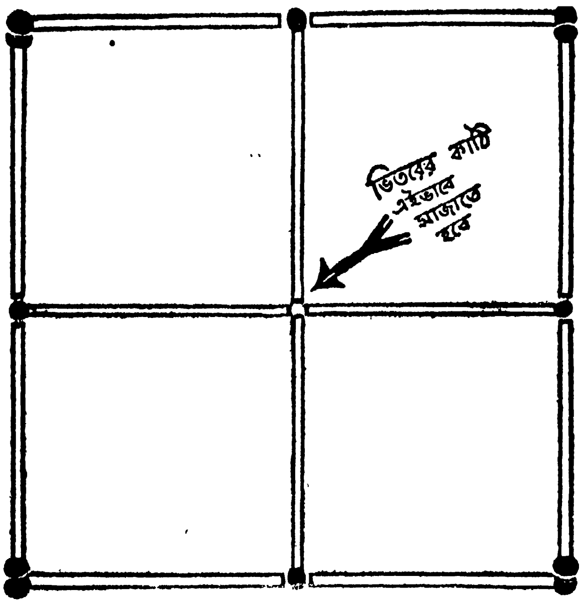


অঙ্কের হেঁয়ালী:

এক থেকে দশ অবধি সংখ্যা—অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০—এই দশটি সংখ্যাকে এমনভাবে কায়দা করে সাজিয়ে বসাও যে, ২ থেকে ১৮ অবধি প্রত্যেকটি সংখ্যা দিয়ে সেটিকে যেন আগাগোড়া ভাগ করা যায় এবং ভাগশেষে কিছুই অবশিষ্ট না থাকে! দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরো যদি উপরোক্ত দশটি সংখ্যাকে সাজানো হয়—১, ২, ৭, ৪, ৯, ৫, ৩, ৬, ৮, ০—এই ধরণে, তাহলে দেখা যায় যে এটিকে ২ থেকে সুরু করে ১৬ অবধি প্রত্যেকটি সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা সম্ভব এবং সে-ভাগের ফলে কোনো অবশিষ্টই নজরে পড়ে না। তবে ১৭ দিয়ে এ সংখ্যাটিকে ভাগ করতে গেলেই গণ্ডগোল বাধে। বলতে পারো—উপরের ঐ দশটি সংখ্যাকে পর-পর কিভাবে সাজালে অঙ্কের এই বিচিত্র হেঁয়ালির সঠিক উত্তর মিলতে পারে?

আশ্বিন মাসে ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর

১। দেশলাইয়ের কাঠির ধাঁধার উত্তর ঃ



পাশে যে ছবি দেওয়া হলো, তাতে দেখছো, ভিতরের চারটি কাঠির বারুদওয়ালা-মুখ কিভাবে সাজানো হয়েছে। এইভাবে সাজানোর ফলে—ভিতরে ছোট একটি চতুষ্কোণ ফাঁকা-ঘরের সৃষ্টি হয়েছে এবং এটিকে ধরলে—মোট পাঁচটী চতুষ্কোণ পেলে।

দেশলাইয়ের কাঠির ধাঁধার নির্ভুল উত্তর যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম ঃ—

১। পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। হাবলু, টাবলু, সুষমা ও পুতুল (মোগলসরাই)
৩। নন্দা, ছন্দা, বৃন্দা ও চন্দন গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৪। পাখী, পাটু, আবু ও বটুন সেনগুপ্ত (দেওঘর)
৫। রঞ্জনা, রজত, বিশাখা ও সুদর্শন চক্রবর্ত্তী (নিউ দিল্লী)
৬। বিজন, বিনয় ও ইন্দিরা সিংহ (হাজারীবাগ)
৭। পিন্টু, লাড্ডু, নিপু ও বুড়ো বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী)
৮। কুমকুম্ ও টুনটুন্ সান্যাল (পুরী)
৯। খোকন মুখোপাধ্যায় (ভিলাই)

২। **সিঁড়ির হেঁয়ালীর উত্তর ঃ**

ভদ্রলোক তিন তলা থেকে উঠেছেন।

সিঁড়ির হেঁয়ালির নির্ভুল উত্তর যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম ঃ—

১। পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। অরিন্দম দাস ও সুপ্রিয়া দাস (কৃষ্ণনগর)
৩। অসিতকুমার ঘোষ (বনগাঁ)
৪। বাপী, বাবলু, দীপু, শিপু, টুলু, হাসি, টুসু মিত্র (কলিকাতা)
৫। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৬। মমতাজ, শিউলি, বুলি, পুতুল, ইলা ও শেলী (কয়থা)
৭। দীপ্তিতোষ (চন্দননগর)
৮। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৯। মুক্তিপ্রিয়া চক্রবর্ত্তী (কামারপুকুর)
১০। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
১১। খোকন মুখোপাধ্যায় (ভিলাই)

কিশোর-জগতের সভ্যদের রচিত ধাঁধার উত্তর ঃ

প্রথমে দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে তিনটি তিনটি করে বল চাপানো হলো। যেদিকটি বেশী ভারী হলো, বোঝা গেল—সেদিকের তিনটি বলের মধ্যে একটি বেশী ভারী। এবারে এই তিনটি বলের মধ্যে যে কোন দুটিকে চাপানো হলো দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে, যদি এক দিক বেশী ভারী হয়, তাহলে ভারী বলটিকে তখুনি পেয়ে গেলুম। আর যদি দুদিক সমান হয়, তাহলে তৃতীয় বলটি—যেটিকে এবারে দাঁড়িপাল্লার চাপানো হয়নি, সেইটিই বেশী ভারী হবে।

আর দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা হলো—মাত্র দু'বার।

কিশোর-জগতের সভ্যদের রচিত ধাঁধার নির্ভুল উত্তর যারা পাঠিয়েছে তাদের নাম ঃ—

১। পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। অরিন্দম দাস ও সুপ্রিয়া দাস (কৃষ্ণনগর)
৩। বাপী, বাবলু, দীপু, শিপু, টুলু, হাসি, টুসু মিত্র (কলিকাতা)
৪। দীপ্তিতোষ (চন্দননগর)
৫। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৬। হাবলু, টাবলু, সুষমা ও পুতুল (মোগলসরাই)
৭। নন্দা, ছন্দা, বৃন্দা ও চন্দন গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৮। রিনি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৯। পারুল, পাপিয়া, পল্টু, শ্যামল গুপ্ত (রাণীগঞ্জ)
১০। মণীতোষ, চিত্ততোষ, দেবতোষ ও স্বপ্না চৌধুরী (ঘাটশীলা)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

ওকাপি: এরা হরিণের মতো তৃণ-ভোজী – জিরাফের জাত, বাস করে মধ্য-আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে। এদের গায়ের রঙ – কালচে বাদামী, পায়ের রঙ হলদে, তবে উপর-দিকে কালো ডোরা … এই রঙের দরুণ জঙ্গলের লতাপাতার মাঝে মিশ খেয়ে এমনভাবে থাকে যে চট করে এরা কারো নজরে পড়ে না। এরা খুব নিরীহ এবং ভীরু-প্রকৃতির। এ জাতের জীব ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে আসছে। জঙ্গল থেকে ধরে এনে যত যত্নেই রাখা হোক, বন্দী-জীবনে এরা বেশী দিন বাঁচে না।





শ্লথ: এরা বিচিত্র এক-জাতের জীব… সারা জীবন পা উঁচু আর মাথা নীচু করে অষ্টপ্রহর গাছের ডালে-ডালে ঝুলে বেড়ায়…এই অবস্থাতেই খাওয়া, বিশ্রাম আর ঘুম। গাছের ফুল, পাতা ও কুঁড়ি খেয়ে এবং জলের বদলে শিশির পান করে এরা জীবনধারণ করে। এদের মুখে 'ছেদন' আর 'শ্ব-দন্ত' থাকে না, তবে মাড়ীর উপর কষে দশটি ও নীচের কষে আটটি 'চর্ব্বণ-দন্ত' থাকে। এদের পায়ের নখ বড় ও বক্র… মাটিতে চলতে পারে না। দক্ষিণ-আমেরিকায় এদের বাস।

উড়ন্ত কাঠবেড়াল: এরাও এক ধরণের বিচিত্র জীব। জাতে কাঠবেড়াল হলেও এদের দেহের গঠন কতকটা বাদুড়ের মতো… এদের চারখানি পা আর ল্যাজের অংশ বাদুড়ের মতোই পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া – সেইজন্য এরা বাতাসে ভেসে সহজেই ৪০|৫০ হাত দূরে উড়ে যেতে পারে। সাধারণ কাঠবেড়ালের মতো এরা দিবাচর নয় – নিশাচর প্রাণী! নানা রকম শস্য; ফল, পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের 'শ্ব-দন্ত' নেই, 'চর্ব্বণ আর ছেদন দন্ত' আছে। দাঁত খুব তীক্ষ্ণ। আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে এদের বাস – গাছের কোটরে থাকে



ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও তাঁর কবিতা

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর "Thoughts of a Briton on the Subjugation of Switzerland" শীর্ষক বিখ্যাত সনেটে লিখেছিলেন,

Two Voices are there ; one is of the sea,
One of the mountains ; each a mighty Voice,
In both from age to age thou didst rejoice,
They were thy chosen music, Liberty !

জেমস্ স্টীফেন্ এর যে প্যারডি করেছেন, তাও কম বিখ্যাত নয়—

Two voices are there : one is of the deep ;
... ...
And one is of an old half-witted sheep
Which bleats articulate monotony,
... ...
And Wordsworth, both are thine.

স্টীফেন্ যে দুটি স্বরের উল্লেখ করেছেন, সে দুটি স্বরই যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুটি স্বরের বৈষম্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এমনকি, কথিত আছে, কবির দেশের এক চর্মকার একজন মার্কিন পর্যটককে বলেছিল, "Wordsworth is a great poet, sir, but sometimes he is damned childish." দুটি স্বর আছে সত্য, কিন্তু দুটি স্বরই আমাদের শোনা উচিত। যে দ্বিতীয় স্বরটি আমরা 'The Idiot Boy' প্রভৃতি কবিতায় ও অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার নিকৃষ্ট অংশগুলিতে পাই সে স্বরটি প্রথম স্বরের মতই ওয়ার্ডসোয়ার্থের ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই সব সত্ত্বেও তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল উত্তর ইংলণ্ডের কাম্বার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ককারমাউথে William Wordsworth এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা জন্ ওয়ার্ডসোয়ার্থ ছিলেন অ্যাটর্নি। তাঁর মা'র নাম অ্যান্। ওয়ার্ডসোয়ার্থদের আদি বাড়ী ছিল ইয়র্ক্শায়ারে।

১৭৭৮ খৃঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থের মার মৃত্যু হয়। এই বছরই তাঁকে হক্স্হেডের পুরাতন গ্রামার স্কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গ্রামে যে কুটীরে থাকতেন সেটিকে এখনও 'ওয়ার্ডসোয়ার্থের কুটীর' বলা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জন্ ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাঁচ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৮৭ খৃঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ কেম্ব্রিজের St. John's কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছেন ও কাব্যানুরাগী হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় তিনি লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে ছিলেন, বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রে। কলেজ-জীবনের প্রথম দিকে তাই তিনি নিজের ইচ্ছা মতন শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ার ও ইতালীয় কাব্যচর্চা করার অনেক সুযোগ পেতেন।

১৭৮৭ থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত ওয়ার্ডসোয়ার্থ কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করেন। ইতিমধ্যে ১৭৯০ খৃঃ তিনি ফ্রান্সে প্রথম বেড়াতে যান। আড়াই মাস ধ'রে তিনি ফ্রান্স ও সুইট্জারল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। এর কিছুদিন পরে ওয়ার্ডসোয়ার্থ দ্বিতীয় বার ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সে থাকার সময় তিনি Annette Vallon নামে একটি মহিলাকে ভালোবাসেন। তাঁদের একটি মেয়ে হয়। মেয়েটির নাম Caroline। ১৭৯৩ খৃঃ রাজা ষোড়শ লুই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কিছুদিন পরেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ফিরে আসেন। তখন তাঁর কিছুটা মোহভঙ্গ হলেও যে বৈপ্লবিক নব-

প্রভাতকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা একেবারে মন থেকে মুছে যায়নি। অভ্যুদয়ের উষালোকে বেঁচে থাকতে পারাকে তো তিনি একদিন বিশেষ সৌভাগ্য ব'লে মনে করেছিলেন। আর যৌবনাবস্থায় বেঁচে থাকা স্বর্গলাভের সমান।

১৭৯৩ খৃঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থের An Evening Walk ও Descriptive Sketches প্রকাশিত হয়। এর দু বছর পরে রেস্‌ডাউনে কোল্‌রিজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৭৯৭ খৃঃ দুই বন্ধুতে সমারসেট্‌শায়ারে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা দুজন আশপাশের পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন ও কাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বোন ডরোথি তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। দুই কবিহৃদয়ের মৈত্রীর প্রথম বহিঃপ্রকাশ Lyrical Ballads (১৭৯৮)। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইটীর স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিন পরে লুপ্তপ্রায় রোমান্টিক্ কাব্যের সুর আবার সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হ'ল এই গ্রন্থটিতে। ক্ল্যাসিক্যাল্ আদর্শ ঘেঁষা কৃত্রিম রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইতিপূর্বেই ইংরেজী কবিতায় দেখা গিয়েছিল। ছোট এই কবিতার বইটি সেই সফল বিদ্রোহের প্রথম জয়স্তম্ভ। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৯৮ খৃঃ নূতন রোমান্টিক্ যুগের সূচক ব'লে পরিচিত।

Lyrical Ballads প্রকাশিত হওয়ার পর ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর বোন ডরোথি ও বন্ধু কোলরিজের সঙ্গে জার্মানিতে যান। সেখানে তিনি যে কয়েক মাস ছিলেন সেই কয়েক মাসে তাঁর চিন্তাধারার কোন উল্লেখযোগ্য রূপান্তর বা তাঁর প্রতিভার কোন বিশেষ স্ফুরণ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে অবকাশের আনন্দ তিনি পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন। Lucy Gray, Ruth প্রভৃতি তাঁর এই সময়ের লেখা কবিতাগুলিতে সারল্য ও সৌন্দর্যের বিশেষ সমন্বয় দেখা যায়।

ফিরে আসার পর ওয়ার্ডসোয়ার্থ নয়নাভিরাম লেক ডিষ্ট্রিক্টে স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বোন ডরোথিও এখানে ছিলেন। প্রথমে ওয়ার্ডসোয়ার্থ Grasmere এর Dove Cottage এ ছিলেন (১৮০৮ খৃঃ পর্যন্ত), পরে আর্থিক উন্নতি হ'লে তিনি Lake Windermere এর কাছে Rydal Mount এ (প্রশস্ততর গৃহে) থাকেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এইখানেই ছিলেন। ১৮১৩ খৃঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ সরকারী চাকুরি পান। ১৮৪২ খৃঃ তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

১৮০২ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর ডরোথির বান্ধবী Mary Hutchinson এর সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিবাহ হয়। এঁর সম্বন্ধেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর সুপরিচিত 'She was a phantom of delight' কবিতাটি লিখেছেন। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল সুখশান্তিপূর্ণ। মেরি ছিলেন প্রিয় সঙ্গিনী ও সুগৃহিণী। তবে ডরোথি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বা কোল্‌রিজ ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, মেরি তা পারেন নি।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ ছিলেন সংযত ও সরল রুচির মানুষ। সাদাসিধা বহির্জীবনের সঙ্গে তিনি আদর্শবাদী অন্তর্জীবন পছন্দ করতেন। উদারহৃদয় কবির অবশ্য বন্ধুর সংখ্যা বেশী ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে Sir George Beaumont অন্যতম। নিজের কাব্য সম্বন্ধে অনেক চিঠি ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁকে লিখেছিলেন।

কবির অন্তর্জীবনের বিকাশের ইতিবৃত্ত The Prelude ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন ১৭৯৯ খৃঃ ও শেষ করেন ১৮০৫ খৃঃ (১৮৩৯ খৃঃ তিনি কাব্যটির সংশোধন করেন ও তাঁর মৃত্যুর পর এটী প্রকাশিত হয়)। এই কাব্যটি The Recluse কাব্যের মুখবন্ধ-রূপে ওয়ার্ডসোয়ার্থ রচনা করেছিলেন। The Recluse ওয়ার্ডসোয়ার্থ লিখে যেতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি 'পৃথিবীতে প্রথম যথার্থ দর্শনমূলক কাব্য' রচনা করবেন। এর সামান্য একটু অংশ মাত্র তিনি লিখতে পেরেছিলেন, সেটি The Excursion নামে পরিচিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের পরিচয়ের গণ্ডি বিস্তৃত হ'তে থাকে। কীটসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও কীটস্ তাঁর ভক্ত হন। তাঁর অন্যান্য অনুরাগীদের মধ্যে Samuel Rogers, Sir Henry Taylor ও Crabb Robinson ও অক্সফোর্ডের কাব্যের অধ্যাপক John Keble এর নাম করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন জনগণের উপেক্ষা লাভ করার পর তাঁর শেষ জীবনে ওয়ার্ডসোয়ার্থ খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাধারণের কাছে সুপরিচিত

ছিলেন না। তাই Francis Jeffrey তাঁর Edinburgh Review পত্রিকায় Excursion এর সমালোচনা লেখার সময় 'This will never do' দিয়ে আরম্ভ করতে দ্বিধা করেননি। ১৮৪৩ খৃ: Southeyর মৃত্যুর পর ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থকে রাজকবি পদে বরণ করা হয়। কিন্তু এর অনেক আগেই তাঁর কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা ফুরিয়ে গেছে। শেষ কয়েক বছরে তিনি ভালো কবিতা বিশেষ লিখতে পারেননি। ১৮৫০ খৃ: ২৩শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্ত যখন প্রথম প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রধান অনুভূতি হয়েছিল আশ্রমের শান্ত পরিবেশের। তাই প্রবেশের পর তাঁর প্রথম উক্তি হচ্ছে—'শান্তমিদমাশ্রমপদম্'। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্যজগতে প্রথম প্রবেশেই আমাদেরও প্রধান অনুভূতি হয় শান্তরসের ও দুষ্মন্তের উক্তির ব্যঙ্গ অর্থে প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছা হয়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই তাঁর Heart-Leap Well কবিতায় বলেছেন—

The moving accident is not my trade :
To freeze the blood I have no ready arts :
'Tis my delight, alone in summer shade,
To pipe a simple song for thinking hearts.

'সোনার তরী'তে 'পুরস্কার' কবিতার কবির মত ওয়ার্ডসোয়ার্থও যেন তাঁর জীবনদেবতাকে বলেছেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।

কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে Lyrical Balladsএর ভূমিকায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ লিখেছেন, ভাবাবেগ শান্তিতে সমাহিত হ'লে কাব্যের উৎপত্তি হয়। একথা অন্তত: তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে বেশ প্রযোজ্য।

প্রকৃতির পরিণত-কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে প্রকৃতির স্থির গম্ভীর ভাবের আবেদনের মত এত মর্মস্পর্শী আর কিছু নেই। একথা তিনি অনেক কবিতায় অনেক বার বলেছেন, তবে Lines Composed a few miles above Tintern Abbey কবিতায় যত সহজ ও সুললিতভাবে বলেছেন এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। বাল্যকালে তিনি অন্যান্য ছেলেদের মতই খেলাধুলা ও ছুটাছুটি ক'রে স্থূল আনন্দ পেয়েছেন। প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য সম্পর্কে কোন বিশেষ সচেতনতা তাঁর ছিল না। তারপর যৌবনোন্মেষে ওয়ার্ডসোয়ার্থ যখন প্রথম প্রকৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট হলেন তখন সে আকর্ষণের মূলে ছিল উদ্দামতা ও আবেগ। কারণ প্রকৃতি তখন তাঁর কাছে সর্বস্ব। ধ্বনিমুখর জলপ্রপাত কামনার ধনের মতো তাঁর হৃদয়কে উদ্বেল ক'রে তুলত। উঁচু পাহাড়, পর্বত, ঘন কালো বন, তাদের রঙ্, তাদের আকার, এই সবের জন্য তিনি ক্ষুধার্ত হ'য়ে উঠতেন। এই মনোভাবের পূর্ণতার জন্য কোন মানসমাধুরীর প্রয়োজন ছিল না, কিংবা কোন দৃষ্টিরাগশূন্য আকর্ষণের।

তার পর কালের গতিতে এই যন্ত্রণাময় আনন্দ ও এই বিভ্রান্তিকর উল্লাস একদিন হারিয়ে গেল। কিন্তু এর জন্য তাঁর কোন খেদ নেই, কোন অনুযোগ নেই। অন্যান্য সম্পদে লাভবান্ হ'য়ে এই ক্ষতির জন্য তিনি যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছেন। কারণ তিনি প্রকৃতিকে দেখতে শিখেছেন, যেভাবে অপরিণতবুদ্ধি যৌবনে দেখতেন সে ভাবে নয়; কিন্তু অনেক সময়ই তিনি মানবতার স্থির, বিষণ্ণ ঝর্ঝরসঙ্গীত শুনছেন, বেসুর নয়, কর্কশ নয়, যদিও প্রচুর শক্তি রয়েছে পবিত্র করার ও শান্ত করার। আর তিনি এমন এক উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন যা তাঁকে উন্নত চিন্তার আনন্দে চঞ্চল করে: আরও অনেক বেশী গভীরভাবে অনুস্যূত কোন জিনিসের মহতী অনুভূতি, যার আবাস হ'ল অস্তোন্মুখ রবির রশ্মি আভা, এবং বিশাল সমুদ্র আর প্রাণময় বাতাস, এবং সুনীল আকাশ আর মানুষের মনে: একটা গতি আর একটা চেতনা, যা সমস্ত চিন্তাশীল জিনিসকে, সমস্ত চিন্তার সমস্ত বিষয়বস্তুকে, অনুপ্রাণিত করে এবং সমস্ত জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই তিনি ভালোবাসেন প্রান্তর ও অরণ্যকে এবং পর্বতকে; আর শ্যামলা এ ধরণীতে থেকে যা কিছু দেখা যায় সে সমস্তকে—চক্ষু ও কর্ণের সমস্ত বিশাল জগৎকে যা তারা

অর্ধেকটা সৃষ্টি করে—আর যা তারা অনুভব করে দুইই। নিজের মনের পবিত্রতম চিন্তার প্রধান আশ্রয়, নিজের হৃদয়ের ধাত্রী, পরিচালক ও অভিভাবক এবং নিজের সমস্ত চিন্ময় প্রাণের অন্তরাত্মাকে প্রকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়ের ভাষার মধ্যে চিনে নিতে পেরে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠেছে।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে যে আনন্দ গান বেজে চলেছে তার ধ্বনি ওয়ার্ডসোয়ার্থের হৃদয়ে গভীর অনুরণন জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যসঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল।' প্রকৃতির মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে মানুষের মন একতানে বাঁধা যায়। মানুষের হৃদয়-তন্ত্রী যদি প্রকৃতির সুরে বাজে, তাহলে মানুষ জীবনের যথার্থ সার্থকতা খুঁজে পায়। তখন সেই পরম লগ্নে জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখের রহস্যকে আর অতটা ভার ব'লে মনে হয় না। তখন এই সমস্ত দুর্বোধ্য জগতের গুরু ও ক্লান্ত চাপ লঘু হ'য়ে আসে। সেই শান্ত ও পুণ্য অনুভূতির প্রভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অন্নময় প্রাণ প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যায়, আমাদের দেহ ঘুমিয়ে পড়ে, আমরা জাগ্রত আত্মায় রূপান্তরিত হই। সুরসঙ্গতির শক্তিতে ও আনন্দের গভীর শক্তিতে যে নয়ন স্থির ও অচপল হ'য়ে উঠেছে তাই দিয়ে আমরা সব কিছুর প্রাণকেন্দ্রে দৃষ্টিপাত করি।

প্রকৃতির মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ শান্তি, সৌন্দর্য ও ঐশী-শক্তির প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রকৃতির চেতন প্রাণ আনন্দ ও ভালোবাসা অনুভব করতে পারে ব'লে তিনি মনে করতেন। Lines Written in Early Spring কবিতায় তিনি লিখেছেন—

And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.

The Leech-Gatherer, or, Resolution and Independence কবিতাতেও আমরা দেখি—

All things that love the sun are out of doors;
The sky rejoices in the morning's birth.

নিসর্গ-শোভার নিছক নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সেটা ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার সম্পূর্ণ গৌণ অঙ্গ। এই দিক থেকে কীট্‌স্ বা টেনিসনের সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কীট্‌স্ বা টেনিসন্ যখন নিসর্গের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের বিশ্লেষণে ব্যস্ত, তখন ওয়ার্ডসোয়ার্থের সমস্ত মন ভাব ও কল্পনার সাহায্যে নিঃসর্গের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বাণীর সন্ধানে মগ্ন।

আর সে বাণী শুধু গিরিকন্দরে বা সমুদ্রবক্ষে লুকিয়ে নেই। সে বাণী ছড়িয়ে রয়েছে—ডেজি বা ড্যাফোডিল বা সেলান্‌ডাইনের মতো সাধারণ ফুলের হাসিতে, কোকিলের ডাকে, লিনেট্ পাখীর গানে, প্রজাপতির পাখায়। আকাশে রামধনু দেখে চিরদিন তাঁর হৃদয় নেচে উঠেছে। যা ক্ষুদ্র, যা তুচ্ছ, যা সাধারণ, যা প্রাত্যহিক পরিচয়ে ক্লিষ্ট, সে সব জিনিস্ ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় কল্পনার আলোয় অপরূপভাবে ফুটেছে। যা বিরাট্, যা বিশাল, যা অনন্ত শুধু সেইটাই ওয়ার্ডসোয়ার্থের উপাস্য নয়। ক্ষুদ্রের মধ্যে তিনি মহৎকে দেখেছেন, সীমার মাঝে ভূমার পূজা করেছেন। The Tables Turned কবিতায় বলেছেন—

Let Nature be your teacher.

She has a world of ready wealth
Our minds and hearts to bless—
Spontaneous wisdom breathed by health,
Truth breathed by cheerfulness.

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

ইংরেজী সাহিত্যের নিসর্গ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের স্থান পুরোভাগে। The Prelude, The Excursion Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey, Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood Lucy—সম্পর্কিত পাঁচটি খণ্ডকবিতা (যেগুলি বিশ্বের শ্রে

প্রেমের কবিতার মধ্যে স্থান পাবে), The world is too much with us এটিও (এটী চতুর্দশপদী কবিতা—সনেট লেখকরূপে ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিশিষ্ট স্থান আছে), Yarrow Visited প্রভৃতি কবিতা ওয়ার্ডসোয়ার্থের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ কবিতার মধ্যে পড়ে।

শুধুবিশ্ব-নিখিলের প্রাকৃতিক শোভা ও আধ্যাত্মিক বাণী নিয়ে ওয়ার্ডসোয়ার্থ জীবন কাটিয়ে দেন নি। মানুষের সুখ-দুঃখের ঢেউ তাঁর মনে বার বার আঘাত করেছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই তাঁর Prelude কাব্যে বলেছেন—

My theme
No other than the very heart of man.

সবার উপরে তিনি মানুষকে স্থান দেননি, সে স্থান প্রকৃতির জন্ম সংরক্ষিত। অবশ্য এক অর্থে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে মানুষও প্রকৃতির অঙ্গ, প্রাচীন আর্য ঋষির কাছে যেমন, এ যুগের রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছেও তেমন চেতন অচেতন পরিদৃশ্যমান সব কিছুই ঐশী লীলার প্রকাশ।

এক সময় তাঁর জীবনে এসেছিল—যখন ওয়ার্ডসোয়ার্থ মানুষকে প্রায় সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। তখন ফরাসী-বিপ্লবের সময়। স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যের বাণীতে পাশ্চাত্য জগৎ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। ওয়ার্ডসোয়ার্থ তখন মানুষের মহিমার উপলব্ধিতে আনন্দমগ্ন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন ফ্রান্সের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে নেপোলিয়নের মূল্য বেশী তখন তিনি মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন। পরে নিসর্গের মধ্যে তিনি আশাভঙ্গের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ওয়ার্ডসোয়ার্থ রক্ষণশীল হ'য়ে পড়েছিলেন এবং এই জন্য ব্রাউনিঙ তাঁকে উদার-নৈতিকদের 'ভ্রষ্ট নেতা' ব'লে অভিহিত করেন।

Michael, The Leech-Gatherer, or Resolution and Independence প্রভৃতি কবিতায় রোমান্টিক্ মানবতাবাদের প্রকাশ রয়েছে। Hazlitt তাঁর Spirit of the Age এ বলেছেন—'He sees nothing Loftier than human hopes, nothing deeper than the human heart." সাধারণ মানুষের সরল অনুভূতিগুলি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় নূতন রূপ পেয়েছে। মানুষকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা নর নারী, ধনী দরিদ্র, যুবক বৃদ্ধ, শিশু কিশোর নির্বিশেষে দিয়েছেন। একাকিনী যে সাধারণ মেয়ে শস্যক্ষেত্রে গান গেয়েছে, কিংবা শহরের পথে পাখীর গানে উতলা হ'য়ে দিবাস্বপ্নের জাল বুনেছে, কিংবা যে শিকারী বৃদ্ধ বয়সে অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছে, কিংবা যে জরাজীর্ণ ভিক্ষুক সঙ্গীহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সব সামান্য জনের কথা দরদ দিয়ে লিখে ওয়ার্ডসোয়ার্থ অসামান্য ক'রে তুলেছেন। মানুষের দুঃখের মূলে যে অনেক সময় মানুষের অবিচার, নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্টতা থাকে, সে কথা ভেবে বারংবার কবি ব্যথিত হয়েছেন—

To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran ;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man.

(Lines Written in Early Spring)

মানুষের শক্তি কম নয়। বহু কবিতায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ মানুষের অপরাজেয় মনের জয়গান গেয়েছেন। মেষপালক মাইকেলের যে চরিত্র তিনি Michael কবিতায় এঁকেছেন তাতে সত্যের সঙ্গে সারল্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় সমস্ত কবিতাটিতে ট্র্যাজিক্ সুর এনেছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে—

Farewell, farewell the heart that lives alone,
Housed,in a dream, at distance from the Kind
Such happiness, wherever it be known,
Is to be pitied ; for 'tis surely blind.

But welcome fortitude, and patient cheer,
And frequent sights of what is to be borne !
Such sights, or worse, as are before me here.—
Not without hope we suffer and we mourn.

(Elegiac Stanzas, Suggested by a Picture of Peel Castle, in a Storm, Paintedby Sir George Beaumont.)

আর নৈতিক বিধিও যে উপেক্ষা করলে চলবে না সে কথা Ode to Duty, Character of the Happy Warrior প্রভৃতি কবিতায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ উদাত্ত ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন।

Lyrical Ballads গ্রন্থে সংযোজিত ভূমিকা দুটিতে ওয়ার্ডসোয়ার্থ সেই সময়কার কবিতায় প্রচলিত বিশেষ ধরণের কাব্যিক ভাষার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর নিজের রচনাগুলির সত্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হল, প্রথমতঃ, ছকে বাঁধা, কেতাবী শব্দ-সমষ্টি কবিতায় পরিত্যাগ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষেরা, এমন কি কৃষকেরাও, যখন সজীবভাবে ও আবেগের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ভালো গদ্যের সঙ্গে ভালো কবিতার ভাষার কোন পার্থক্য নেই। কোন কোন দিক থেকে যদিও ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতবাদে আতিশয্য দোষ রয়েছে (এবং কোল্‌রিজ প্রমুখ সমালোচকেরা এইজন্য ওয়ার্ডসোয়ার্থের কঠোর সমালোচনা করেছেন), এই ভূমিকাগুলিতে যে অনেক মূল্যবান উক্তি রয়েছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

মিল্‌টন্ ও বার্নস্ ছিলেন ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রিয় লেখকদের অন্যতম। তাঁদের প্রভাব তাঁর লেখায় প্রায়ই চোখে পড়ে। তাঁর অনেক পঙ্‌ক্তিই আমাদের মিল্‌টনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মিল্‌টনের মতো তাঁর নিজস্ব কাব্যশৈলী নেই। নিজস্ব শৈলীর যেখানে চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে অনেক সময় ফল হয়েছে বাগাড়ম্বর। তাই বলা হয়েছে—'He has no style.' এটা ম্যাথিউ আর্নল্ডের কথা। তিনি নিজেই অবশ্য বলেছেন—

But Wordsworth's poetry, when he is at his best, is inevitable, 'as inevitable as Nature herself. It might seem that Nature not only gave him the matter for his poem, but wrote his poem for him.'

প্রথমেই বলা হয়েছে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব নেই। অহমিকার আতিশয্য তাঁর কবিতার অনেক স্থানে উদ্বেজক হয়ে উঠেছে। প্রেমের কবিতা তিনি লেখেননি বললেই চলে। হাস্যরসের অনুভূতির অভাবও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রকৃতির অনেক বিশাল বর্ণাঢ্য দিক্ তাঁর কবিতায় রূপ পায়নি। প্রকৃতির মঙ্গলরূপ নিয়ে তাঁর ব্যাকুলতা, প্রকৃতির রুদ্ররূপ তাঁর দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করেনি। অনেক কিছু ওয়ার্ডসোয়ার্থে নেই, কিন্তু যা আছে তা একান্তই অসামান্য ও দুর্লভ। William Watson-এর Wordsworth's Grave কবিতার কথা মনে পড়ে—

Not Milton's keen, translunar music thine ;
Not Shakespeare's cloudless, boundless human view ;
Not Shelley's flush of rose on peaks divine ;
Nor yet the wizard twilight Coleridge knew.

What hadst thou that could make so large amends
For all thou hadst not and thy peers possessed ?
Motion and fire, swift means to radiant ends ?—
Thou hadst, for weary feet, the gift of rest.

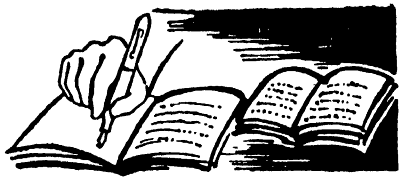
জ্যোতির্গময়

প্রসিত রায়চৌধুরী

খোল দ্বার,
দাও অমৃতের অধিকার,
শুধু আর একবার—
ফুটুক আলোক
কাটুক আঁধার,
শুধু আর একবার।

আরণ্যক আশ্রমের বাণী সঞ্জীবনী
করুক আলোকে ধৌত
মলিন হৃদয়—
শুধু আর একবার ॥
যাক্ দ্বেষ, যাক্ ভয়,
অবসান হোক তমসার ॥

অনুবাদ সাহিত্য



আধুনিক প্রেমকাহিনী

শান্তিসুধা ঘোষ

রুচিশীল পাঠকের কাছে আব্রে ভেয়ারের নাম অপরিচিত নয়। তাঁর সুকুমার গীতি-কবিতাগুলির তিনটি সংকলন বেরিয়েছে। 'ক্লাইম্যাক্স' পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাও অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বায়রণীয় চেহারার ফটো সমেত সাক্ষাৎকারের বিবরণও মহিলাদের কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মোটের উপর তিনি পরিচিত ব্যক্তি।

আব্রে ভেয়ার নিজেকে প্রতিভাশালী বলেই জানতেন, ভাবতেন জীবনে নিজের প্রতি কর্তব্য—আর নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য কখনও একপর্বে চলতে পারে না; ভাবতেন আমরা যাকে বলি নৈতিকগুণ, তার অপর নাম আবেগের দৈন্য। প্রকৃতপক্ষে আব্রে ভেয়ারের প্রতিভা ছিল মাঝারি ধরণের। বাইরের জগতের আবেগ-জটিল ঘটনা মনকে আমূল সাড়া না দিলে এই ধরণের লোকের পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব হয় না। আব্রে ভেয়ার এই আলোড়ন কামনা করছিলেন।

রেগেট গ্রামে সুন্দর একটি ছোট-খাট বাড়ীতে তিনি বাস করতেন। আয় মাঝারি, তাতেই চলে যেত। স্ত্রী সুন্দরী শান্ত, আর স্নেহশীলা স্ত্রীদের মত তাঁরও জীবনের প্রধান কাজ ছিল অসহায় স্বামীটির রক্ষণাবেক্ষণ। আব্রে যেন ডিনারের সময় নানা রকম ভাল রান্না পায়, আর তাঁদের বাড়ীটি যেন সব সময় ঝকঝকে তকতকে থাকে, এইটুকু দেখতে পেলেই তিনি খুশী থাকতেন। ভেয়ার স্ত্রীর রান্না উপভোগ করতেন, বাড়ীর পরিচ্ছন্নতাও তাঁর গর্বের বিষয় ছিল, তবুও এখন তাঁর মনে সুখ ছিল না। মনে হত তাঁর প্রতিভা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, দেহে মনে তিনি স্থূল হয়ে পড়ছেন।

গানে আমরা যেটুকু বলি, তার প্রতিটি বিন্দুই আমাদের দুঃখের মধ্য দিয়ে আগে পিছন করে নিতে হয়। আব্রে ভেয়ারও বুঝছিলেন—যতদিন না তাঁর কল্পনাভূমি তেমন কোনও বড় দুঃখের আঘাতে কর্ষিত না হবে ততদিন কোনও ফসল ফলবে না। কিন্তু সেই কর্ষণ কোন উপায়ে ঘটবে তাঁর জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত আলোকোন্মুখ লতার মত তাঁর মন যখন সতত-ব্যাকুল, সেই 'বিবশ দিন বিরস কাজ' এর মধ্যে তাঁর প্রত্যাশা পরিপূরণের সময় এল।

রেডাইলের এক টেনিস পার্টিতে আব্রে ভেয়ার সেই মেয়েটিকে প্রথম দেখলেন। তার বয়স কম। ভারতবর্ষ থেকে সে তখন সবেমাত্র এসেছে, টেনিস খেলতে জানত না তখনও। আব্রে ভেয়ারও টেনিস খেলতেন না। হলিসাকল্ ফুলে-ছাওয়া লনের মধ্যে ছোট ছোট বেতের চেয়ার পাতা। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বচ্ছন্দ কথোপকথনের কোন ব্যাঘাত ঘটল না।

মেয়েটির নাম নিতান্ত সাধারণ, মিস্ স্মিথ্। কিন্তু তার মুখভাব আর পোষাক পরিচ্ছেদের ভঙ্গী থেকে ধারণা করা যেত না—তার নাম এতটাই সাধারণ। তার মা ছিলেন হিন্দু, বাবা ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-কর্মচারী। এখন কেউই আর বেঁচে নেই। আব্রে ভেয়ারের নিজের রক্তেও কেল্ট আর টিউটনের মিশ্রণ আছে। একালের আর সব সাহিত্যিকের মত তিনিও রক্তমিশ্রণকে শুভ বলেই মনে করতেন।

মিস্ স্মিথের পোষাক আগাগোড়া সাদা, মুখের রেখাগুলি তীক্ষ্ণ অথচ সুকুমার, ভাবরহস্যে পরিপূর্ণ কালো চোখ, সেই চোখের সঙ্গে মিল রেখে মাথায় মেঘের মত কালো

ফুলের স্তবক। তার ঈষৎ সলজ্জ ভঙ্গীর দিকে চোখ পড়বামাত্রই ভেয়ারের মনে হল অন্যান্য প্রগল্‌ভ ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা মস্ত পার্থক্য আছে।

ভেয়ার বলছিলেন—"মনে হয় রেগেটের মধ্যে এই মাঠটিই সবচেয়ে ভাল, আর এত অজস্র ডেইজি ফুটে আছে বলেই আরও ভাল।"

মেয়েটি বলছিল—"যখন ভারতবর্ষে ছিলাম কোন একটা ছবি দেখে ইংলণ্ড আর ডেইজির মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছিলাম। ভাবতাম যখন ইংলণ্ডে যাব তখন ওদেশের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মিশে মাঠে মাঠে ঘুরব, আর ডেইজি তুলে তার মালা গাঁথব।...সেই ত শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে এলাম, কিন্তু এখন এত বড় হয়ে গিয়েছি যে আর ডেইজির মালা গাঁথা সম্ভব নয়।"

—"দেখুন, বয়স হলেই যে সব আমোদ-প্রমোদ বিসর্জন দিয়ে গম্ভীরভাবে থাকতে হবে এমন কি কথা আছে। আমার কথাই ধরুন না। ছোট ভাইপোর সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে ঘুড়ি ওড়াই, আর বলতে লজ্জা নেই—সে সময় আমি কম খুসী হই না।"

—"ও সব করলে আমার গভর্নেস ভীষণ বকুনি দেবেন।"

সাহিত্যিক আব্রে ভেয়ার ঈষৎ উত্তেজিত হলেন—"এই মানুষ বার্দ্ধক্য সঙ্গে করেই যেন জন্মেছে। প্রাণ যেখানে অঙ্কুরিত হয় না সেই মনুষ্যাকৃতি শূন্য ফুলের টবে কি প্রয়োজন। আমার ত মনে হয় সত্য, জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান মানব-মনের নিশ্চয়ই একটা শৈশবকাল থাকবে।"

—"থাকাই উচিত।"

—"সেই শৈশব অতিক্রম করে তবেই আমরা যৌবনের বিস্ময় বেদনার মাঝখানে এসে দাঁড়াব।"

—"যৌবনের শক্তি আর কাজের মধ্যে" বলতে বলতে সেই শ্যামবর্ণা মেয়েটির গভীর দৃষ্টি গভীরতর হল, মুখের ভাব হল আত্মবিস্মৃত উদাস।

—আব্রে ভেয়ার বলতে লাগলেন, "তারই পরে আসবে জীবনের চরম প্রাপ্তি"; একটু থেমে চকিতে সঙ্গিনীর দিকে একবার চেয়ে দ্রুত বলে ফেললেন, "আর জীবনের চরম প্রাপ্তি হল প্রেম।'

মুহূর্ত্তের জন্য একের দৃষ্টি অপরের মুখের উপর পড়ল। ভেয়ার নিজেকে আবেগের অতল জটিলতার মধ্যে নিমজ্জিত মনে করে ভাবছিলেন—আমাদের কথোপকথন এ কোন্ অভাবিত পথে বাঁক নিল।

সাময়িক নীরবতার পরে ভেয়ার আবার দার্শনিক কণ্ঠে আপন বক্তব্য আরম্ভ করলেন। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন। ডান হাতখানি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে সামনের দিকে একটু এগিয়ে রাখা—"আমি বিশ্বাস করি প্রেমই জীবনের মহত্তম সম্পদ। স্বার্থ, যুক্তি সব কিছুকে অতিক্রম করবার শক্তি এর আছে। অথচ প্রেমের মহিমা আমরা একালে যতটা ভুলতে বসেছি এমন আর কোনোকালে হয়নি। আইন এসে বলে—মদনদেব—এই পথে যাও, আমরা সেই পথেই চলি। ফলে আমাদের রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মন বিকৃত পথে চলতে আরম্ভ করে, অর্থোপার্জনের নেশা আমাদের গ্রাস করতে আসে, অসৎ হয়ে যাই, আর জীবনকে আস্বাদন না করে তারই অসন্তুষ্ট ক্রীতদাসে পরিণত হই।" সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ভেয়ারের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল—"মানুষ আমরা প্রত্যেকে যেন-আগুন-না ধরানো বাজি, এমনিতো মত। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন আমাদের স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ অসহ্য উত্তাপে ও অশেষ সৌন্দর্য্যে আমরা শতধারায় বিচ্ছুরিত হই। এরই নাম যৌবন।"

সেদিন বিদায় নেবার আগে মেয়েটি বলল "মিঃ ভেয়ার, আজ আপনার কাছ থেকে ভাববার মত অনেক কিছু পেলাম।"

মিস্ স্মিথের প্রতি অবাধ্য এক তীব্র আকর্ষণ কেমন করে ভেয়ারের মনকে সহস্র পাকে জড়িয়ে নিল—তা সূক্ষ্ম সমগ্রতায় বর্ণনা করবার শক্তি আমার কলমে নেই। এইটুকু দেখলাম ভেয়ার শান্ত বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। মিসেস ভেয়ার স্বামীর এই ভাবান্তরটুকু অনুভব করলেন, কিন্তু কোন কারণ বুঝতে পারলেন না।

সেই শ্যামবর্ণা রহস্যময়ীর সঙ্গে আব্রে ভেয়ারের কথোপকথনে বিষয়ের কোন নির্দিষ্টতা ছিল না। প্রেম, অদৃষ্ট কবি ও কবিতা সব কিছু নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। ভেয়ারের প্রতিভা সম্বন্ধেও কথোপকথন চলত এবং ভেয়ার নিজের মৃদুতর ও মধুরতর কবিতাগুলি মিস্ স্মিথকে পড়ে শোনাতেন।

এইভাবে চলতে চলতে গ্রীষ্মকাল এল। একদিন, হয়ত বা দৈবক্রমেই, হর্লির দিকে এক নির্জন রাস্তায় ভেয়ার মেয়েটিকে একা দেখতে পেলেন। দুধারে হনিসাক্‌ল্‌ ঝাড়, আর নাম-না-জানা হলুদ রঙের ফুলে ভর্ত্তি ঘন ঝোপ। ভেয়ার নিজের সাহিত্যিক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাকে জানাচ্ছিলেন। আলাপ রেখে "হবসন ম্যাগাজিন" থেকে তিনি তাঁর নতুন কবিতাগুলি পড়তে সুরু করলেন। তিনি ভালই পড়তেন, আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের আবেগ কণ্ঠে ধরা দিত। হাত নেড়ে ছন্দের ঝোঁকগুলি তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। শেষ কবিতার শেষ কথা ক'টি বোধহয় ছিল "প্রিয়ে, আমি চিরকাল তোমারই।" বাক্যটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেয়ার সোজা পার্শ্ববর্তিনীর মুখের দিকে চাইলেন।

এতক্ষণ তিনি নিজের কবিতার কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু এখন একমুহূর্ত্ত কবিতা-প্রসঙ্গ তিনি সমস্ত ভুলে গেলেন। সামনে সে বসে আছে, কোলের উপর বাহুদুটি শিথিলভাবে রাখা, চোখে অত্যন্ত কোমল দৃষ্টি। সে মৃদুস্বরে বলল—"আপনার কবিতা অন্তর স্পর্শ করে।"

আব্রে ভেয়ার তার তরুণ মুখাবয়বে আলোছায়ার খেলা দেখছিলেন। তিনি নিজের স্ত্রীর কথা ভুলে গেলেন; ভুলে গেলেন কবি বলে সমাজে তাঁর একটা স্থান আছে। একটি মুহূর্ত, মানুষের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় মুহূর্ত। জীবন তাঁকে সাধারণ সত্তা থেকে এক সুমহৎ চেতনাভূমিতে অধিষ্ঠিত করে দিল। কবিতার পাণ্ডুলিপি হাওয়ায় উড়তে লাগল। যুক্তিবুদ্ধি লুপ্ত হল, জগৎ আচ্ছন্ন করে জেগে রইল একটিমাত্র উপলব্ধির সুর। তিনি সহসা বলে উঠলেন—"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

মেয়েটির মুখে সভয় আনন্দের ছায়া খেলে গেল। মনে হল এক হাতে অপর হাতটিকে সে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। তার ঠোঁট দুটি কাঁপল শুধু, কোনও কথা ফুটল না। তারপর, অনেকক্ষণ পরে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—"তুমি আমাকে ভালবাস!"

নির্বাক আব্রে ভেয়ার সম্মুখে তখন যেন অদৃশ্য আলোকপুঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন, অন্তরের সমুদ্রগর্জন যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বিস্ময় ও বিষাদে মেশা এক অপূর্ব কান্নাভেজা গলায় মেয়েটি বলতে থাকল—"তাহলে আমি পেলাম, আমি তোমাকে পেলাম?" ...এরপর আব্রে ভেয়ার তাকে নিজের বাহুবন্ধনে টেনে না নিয়ে পারলেন না।

ঝোপের মধ্য দিয়ে একটি চঞ্চল বালক দৌড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এদের এই অবস্থায় দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তার চোখে তীব্র ঘৃণা ও তিরস্কার দেখে ভেয়ার সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ালেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরছিলেন। চায়ের টেবিলে মিসেস ভেয়ারের নিজের হাতে তৈরী তাঁর পছন্দমত কেক। যে ফুল তিনি ভালবাসেন ফুলদানিতে সেই সাদা চন্দ্রমল্লিকা। তাঁর হাস্যমুখী স্ত্রী আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী, ভাল না?" আর তখনই, চায়ের টেবিলের সামনে বসে, স্ত্রীর দ্বারা চুম্বিত হতে হতে আব্রে ভেয়ার আশ্চর্য্য স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করলেন জীবন বড় জটিল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। গাছের পাতা ঝরতে সুরু করছে। তখন সন্ধ্যা, উপত্যকার গায়ে মাঝে মাঝে অস্তগামী সূর্য্যের অলস বিসর্পিত দীর্ঘ রশ্মিরেখা। অপর প্রান্ত থেকে এক নীলাভ অন্ধকার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দূরে রেগেট শহরে একটি দুটি আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

এই উপত্যকারই এক নির্জন অংশে সেই মেয়েটি বসে আছে। তার নতনেত্র, মুখ ছায়াময়। কোলের উপর একটি বই অযত্নে ফেলে রাখা—চোখের দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার বেদনা।

ঝোপের মধ্যে একটু মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ, তারপর আব্রে ভেয়ার তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটি মুখ তুলল না। আস্তে জিজ্ঞাসা করল—"তারপর?"

—"পালাতে হবে কি?" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেয়ারকে বিবর্ণ দেখাল। সম্প্রতি তাঁর রাতগুলি দুঃস্বপ্নে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কখনও দেখা যায়—মিসেস ভেয়ার অশ্রুপূর্ণ চোখে চেয়ে রয়েছেন, কখনও দেখা যায়—কন্টিনেন্টের সুদীর্ঘ রেলপথ; স্থানীয় কাগজে বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে—"যুবতীর সহিত কবির পলায়ন।"

মেয়েটি তাঁর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বলল—"তুমি যা ভাল বোঝ?"

—শুকনো পাতার দিকে চেয়ে আন্দ্রে ভেয়ার আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—"তোমার নিজের কথা আরও একটু ভাল করে ভেবে দেখ অ্যানী। এই সব ব্যাপারে পুরুষের ক্ষতি সামান্যই, কিন্তু একজন মেয়ের কাছে এ এক প্রকাণ্ড সর্বনাশ; সামাজিক বা নৈতিক—যেদিক দিয়েই হোক।"

—"তাকে প্রেম বলে না।"

—"তুমি নিজের কথা ভাব, নিজের কথা ভাব।"

মেয়েটি অস্ফুট উচ্চারণ করল—"মূর্খ"।

—"কী বললে"?

—"কিছু না।"

"—আমরা যেমন আছি তেমনই কি থাকতে পারি না, শুধু পরস্পরকে ভালবেসেই সুখী থাকব। কোন লোক-নিন্দা, কোন সর্বনাশের ফাঁদে পা দেব না।"

মেয়েটি বাধা দিল—"তার মত ভয়ানক আর কি আছে?"

—"আমি বুঝি না, বুঝতে পারি না, জীবন এত জটিল, এত অসংখ্য বন্ধনে আমরা চারিদিকের সঙ্গে আবদ্ধ, কোনটা ঠিক আমাকে কে বলে দেবে?"

—"সে বন্ধন ছিঁড়তে পারবে, তবে ত' পুরুষ।"

হঠাৎ আন্দ্রে ভেয়ারের চোখে দীপ্তির সঞ্চার হল।

"অন্যায় করবার মধ্যে কি কোন পৌরুষ আছে, এ তুমিই বল?"

"আমরা ত এক সঙ্গে মরতেও পারি।"

"সে কী!" আন্দ্রে ভেয়ার যেন একটা ধাক্কা খেলেন—

"আমি বলছিলাম আমার স্ত্রী···।"

"এতকাল ত তুমি তাঁর কথা ভাবনি।"

—"আত্মহত্যা কাপুরুষের কাজ, সত্য কথা বলতে কি আমি মনে প্রাণে খাঁটি ইংরেজ, কোনো রকমের পলাতক-মনোবৃত্তি আমাকে পীড়া দেয়।"

মেয়েটির মুখে ধীরে ধীরে এক বিষাদ ম্লান হাসি ফুটে উঠল—"এতদিন যা আমি বুঝিনি, তা এখন বুঝলাম; তোমার ভালবাসা আর আমার ভালবাসা দুই ভিন্ন জগতের জিনিষ।"

কোনও কথা না বলে তারা পাশাপাশি বসে রইল। দূরে রেগেটের আলোকমালা দেখা যায়, মাথার উপরে স্তব্ধ নক্ষত্র জগৎ। মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠল। হাসতেই লাগল, আর নির্বাক শঙ্কিত আন্দ্রে ভেয়ার ভাবতে লাগলেন "এ কী সুস্থ লোকের হাসি।' কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, সে তখন আত্ম-সংবরণ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রায় চলতে চলতেই বলল, "বাড়ীর সবাই ভাবছে আমি কোথায় না কোথায় গেছি। চলি, কেমন?"

আন্দ্রে ভেয়ার নিঃশব্দে তার পিছন পিছন চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ যুক্তি ও অনুতাপমিশ্র এক আশ্চর্য গলায় তাঁকে বলতে শোনা গেল—"এই কি শেষ?"

—"হাঁ, এই শেষ।" মেয়েটি চলা থামাল না।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক অবর্ণনীয় ক্ষতির অনুভূতিতে ভেয়ারের সমস্ত দেহমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এমন করে কোনো প্রেয়সীকে তিনি কোন দিন অনুভব করেন নি, বোধ হয় এমন করে কোন দিন কাউকে হারিয়ে ফেলেন নি। আন্দ্রে ভেয়ার দুই বাহু প্রসারিত করে তার দিকে ছুটলেন—"অ্যানী থাম, অ্যানী এতক্ষণ আমি যা বলেছি তা মিথ্যা, তুমি চলে যেও না, তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না, অ্যানী থাম···" বলতে বলতে তিনি নিজেই থেমে গেলেন, তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

মেয়েটি ফিরল, কাছে এল, তারপর আশ্চর্য স্নেহপূর্ণ সদয় কণ্ঠে বলল—"তুমি কি বুঝতে পারনি, আমি ত' বললাম এই-ই শেষ।" তারপর সে এগিয়ে এল, দুই হাতে তাঁর সিক্ত মুখ তুলে ধরে, অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করে বার বার বলতে লাগল—"বিদায়, বিদায়, তোমার কাছ থেকে বিদায়, ভালবাসার এই নিষ্ঠুর খেলার কাছ থেকেও বিদায়।"

অনেকক্ষণ পরে নিজের দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে চমকিত হয়ে ভেয়ার যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। তখন সে চলে গেছে। অনিচ্ছার যন্ত্রের মত বাদাম বনের ঝরা পাতাগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে মাড়িয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

সেদিন ডিনারে মিসেস ভেয়ার জিজ্ঞাসা করছিলেন, "দেখ, এই আলুগুলো আমি নিজে রেঁধেছি, ভাল হয়নি?"

মেঘময় কল্পনা রাজ্য থেকে আন্দ্রে ভেয়ার যেন ধীরে ধীরে ভাজা আলুর বাস্তব ভূমিতে নেমে এলেন। চারি-

পাশের জগৎটা তাঁকে চেষ্টা করে ভেবে নিতে হল। স্মৃতি-শক্তির সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব শেষ হবার পরে তিনি আত্ম-বিস্মৃত ভাবে উত্তর দিলেন—"এই আলুর মধ্যে যেন বাদাম বনের ঝরা পাতার গন্ধ আছে।"

মিসেস্ ভেম্নার সস্নেহে হাসলেন—"কবি আর কাকে বলে!"

H. G. Wells-এর 'In the Modern vein : an unsympathetic love story' গল্পের অনুবাদ।

পত্রাঘাত !

অনুবাদক—শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

[জার্মান কবি হাইন্‌রিষ্ট হাইনের কাব্য হইতে অনূদিত]

সেই লিপিখানি যাহা তুমি রচিয়াছ'
মোরে তাহা এতটুকু করোনিকো ভীত
যদি আর না বাসিবে ভাল স্থির করিয়াছ
তবে অকারণ পত্র কেন স্ফীত।

দীঘল দ্বাদশ পাতায় ভরা
তব এই পাণ্ডুলিপিখানি
উচিত হয়নি এত বিস্তারিত করা
দিবে যদি বিচ্ছেদের যবনিকা টানি

ময়রা ভোলা

শ্রীজয়দেব রায়

'ময়রা ভোলা হরুর-চেলাকে আজ আর কেউ মনেরাখে নি, এককালে কিন্তু তাঁর খুব নাম ডাক ছিল এই শহর কলকাতাতেই। তাঁর রসের জিয়ানে তৃপ্ত হ'ত না এমন শ্রোতা কমই দেখা যেত। এমন রসিক ময়রা সে আমলে কেন, আজ একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কবিয়াল বা কবিওয়ালারা ছিল সেকালের বাঙালীর বড় আপনার লোক। তারা এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল শ্রোতা-সমাজের যে, তাদের প্রত্যেককে একটা ক'রে ঘরোয়া উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী হয়েছেন হরুঠাকুর, নীলমণি ঠাকুর হয়েছেন নীলুঠাকুর, নিত্যানন্দদাস হয়েছেন নিতাই বৈরাগী, হেন্‌সম্যান অ্যান্টনী হয়েছেন আন্‌টুনি সাহেব—আর ভোলানাথ দাস হয়েছেন ভোলা ময়রা। ময়রার কাজ তিনি করেছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু এত রস আর কোন কবিই পরিবেশন করতে পারেন নি।

কবির গানের তখন স্বর্ণযুগ—বাঙ্গালীর সেদিন আনন্দোপভোগের প্রধান উপকরণই ছিল কবির গান। এমন ক'রে সারা বাঙ্গলা আর কোনদিন মেতে ওঠে নি। উৎসব বললেই মনে হ'ত কবির গানের আসর বসছে।

সাধারণ লোকের গান ছিল এই কবির গান। এ গানের শ্রোতারাও ছিল যেমন জনসাধারণ, গায়করাও ছিল তাঁদেরই যোগ্য প্রতিনিধি। গান রচনায় যেমন যত্ন নেওয়া হ'ত না, সেগুলোর শ্রোতারাও তেমনই সেগুলির গুরুত্ব দিত না। গান শোনা বা ভাবরস সম্ভোগের উপরে ছিল হারজিতের প্রশ্ন। গান হ'ত প্রতিযোগিতার সূত্রে, যে কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না, সেই শেষ পর্য্যন্ত হেরে যেত।

ভোলা ময়রা কলকাতার সিমুলিয়া বা সিমলা অঞ্চলে বাস করতেন। হরুঠাকুরই তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেন, তার আগে পর্যন্ত ভোলানাথ কবির গান কেবল শুনেই এসেছিলেন। হরুঠাকুর ছিলেন সে আমলের একজন 'কবি-স্রষ্টা'—তাঁর কাছেই বহু কবিয়ালের প্রথম দীক্ষা হয়। তাঁর বাড়ীও ছিল ভোলা ময়রার পাড়াতেই।

ভোলা ময়রা যখন নিজে কবির দল গঠন করলেন তাঁর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল গানরচনার। আসরে নেমে তিনি শ্রোতাদের লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাতিয়ে দিতে পারতেন—কিন্তু গান রচনার মতো পাণ্ডিত্য আর কবিত্ব তাঁর ছিল না। গান রচনার জন্য বহু কবিয়ালেরই একজন ক'রে বাঁধা কবি বা 'বাঁধনদার' থাকতেন। ভোলা ময়রার বাঁধনদার ছিলেন সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি সে আমলের খ্যনামধন্য কবিগণ।

ভোলানাথের নামে প্রচলিত সবচেয়ে নাম-করা গানটিও তাঁর স্বরচিত নয়, কিন্তু খেউড় আর আসল লড়াই এর গানগুলি ভোলার নিজেরই রচনা। সেগুলোতে আসরে মুখে মুখে জবাব দিতে হ'ত, এগুলোতে যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত এই গানটি ভোলা ময়রা আসরে গেয়ে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করতেন—

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিনের পর
অন্তর জুড়াও গো কিশোরি -
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম-বিরহেতে কাতর ছিলে নিরন্তর,
সেই চিকণ কালো, হৃদে উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।

ভোলা ময়রা ছিলেন হরুঠাকুরের চেলা—সেই গর্বে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। আর সত্যিই সেদিন তা নিয়ে গর্ব করা সাজতো, হরু ঠাকুরের নাম-ডাক ছিল আরো দেশ জুড়ে। হরুঠাকুর শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের সভাসদ ছিলেন।

ভোলানাথ হরুঠাকুরের সঙ্গে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। নবকৃষ্ণ তাঁর রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতেন। ভোলানাথ খেতে ভাল বাসতেন, নবকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে খাওয়াতেন।

বাঙলা দেশের সেকালের লোকদের রসনাপ্রীতি সুবিদিত, খাওয়ানোর লোকেরও অভাব ছিল না—কলারেরাও এক ডাকে গিয়ে জুটত। আসরে বসে কবিয়ালদের খাদ্যের ফিরিস্তি দিতে হ'ত কথায় কথায়—আর বাহবা দিত শ্রোতারা। ভোলা ময়রার কাছে মিষ্টান্নের ফরমাইশ করাতো খুবই স্বাভাবিক।

ভোলানাথ ছিলেন সারা বাংলার আদরের কবিয়াল, তিনি গানের জন্য বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বারবার গিয়েছেন—আর প্রত্যেকটি জায়গায় অদ্ভুত সম্মান পেয়ে এসেছেন। তিনি বাঙলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ফিরিস্তি দিয়েছিলেন এই গানে—

ময়মনসিংহের 'মুগ' ভাল, খুলনার ভাল 'খই'
ঢাকার ভাল 'পাত-ক্ষীর' বাঁকুড়ার ভাল 'দই'।
কৃষ্ণনগরের 'ক্ষীরপুলী' ভাল, মালদহের ভাল 'আম',
উলোর ভাল 'বাঁদর বাবু, মুর্শিদাবাদের 'জাম'।
রংপুরের 'শ্বশুর' ভাল, রাজশাহীর 'জামাই'
নোয়াখালির 'নৌকা' ভাল, চট্টগ্রামের 'ধাই'।

শান্তিপুরের 'শালী' ভাল, গুপ্তিপাড়ার 'মেয়ে'
মাণিককুণ্ডর 'মুলো' ভাল, চন্দ্রকোণা 'ঘিয়ে'।
দিনাজপুরের 'কায়েত' ভাল, হাবড়ার ভাল 'শুড়ি',
পাবনা জেলার 'বৈষ্ণব' ভাল, ফরিদপুরের 'মুড়ি'।
বর্ধমানের 'চাষী' ভাল, চব্বিশপরগণার 'গোপ',
পদ্মানদীর 'ইলিস' ভাল,—কিন্তু বংশ লোপ।
হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভুমের ভাল 'ঘোল',

কিন্তু সব চাইতে ভাল তিনি বলেছেন সবশেষে—

ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল,—হরি হরি বল!

সেকালে এরকম জাত সম্পর্কে কটাক্ষ কারো খারাপ লাগত না, এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। ময়রা ভোলা ময়রা ব'লেই গর্ব ক'রে সভায় ঘোষণা করতেন।

ভোলা ময়রা ছিলেন 'প্রোলিটারিয়েট কবি'—
কবি গাওনা তাঁর আসল উপজীবিকা ছিল না,
মিষ্টান্নের দোকানই ছিল তাঁর জীবিকার অন্যতম সহায়ক।

যা হোক্, আগের গল্পেই ফিরে আসা যাক্। মহারাজা নবকৃষ্ণ রাজবাড়ীতে কোন উৎসব হলেই ভোলা ময়রাকে খাবারের অর্ডার পাঠাতেন। ভোলা ময়রা মহারাজার অর্ডার মত খাবার তৈরি ক'রে পাঠাতেন। সেবার কি একটা গোলমাল হয়ে গেলে মিষ্টান্নের অর্ডার অন্য ময়রার ওপর ন্যস্ত হ'ল, ভোলা পেল মুড়ি, মুড়কি, বাতাসার অর্ডার।

ভোলা তখনকার মতো চুপ ক'রে থাকল। সেবারই দুর্গাপূজার সময়ে রাজবাড়ীতে ভোলার কবির দলের আসর বসল। মহারাজা নবকৃষ্ণ সভায় বসে আছেন, ভোলানাথ গাইল—

লাগল ধুম গুড়ুম গুড়ুম দশভুজার পূজা,
বহু ব্যয়, লোকে কয়, করবেন শোভাবাজারের রাজা।
লুচিপুরী খাজাগজা আর সরভাজা,
বাবু ভায়ারা খাবেন নানা বস্তু তাজা তাজা।
কারো ভাগ্যে হ'ল ভুজা, কারো ভাগ্যে মজা,
এই সব দেখে ভোলার হাড় ভাজা ভাজা।
আসলে বুঝিয়া লব, কেন ভোলার সাজা,
বিচার করুন নবকৃষ্ণ মহারাজা॥

জাত তুলবার কথা হচ্ছিল—আসরে প্রতিপক্ষের জাত তুলে গান দেওয়ার ছিল রেওয়াজ। আজকের কথা তো নয়, সেদিন হিন্দু সমাজের জাত-বেজাতের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ বিবেচ্য। ভোলা ময়রা বলে প্রতিপক্ষের কাছে অবিরত অপদস্থ হতেন, তিনিও তাই কথায় কথায় জাতের কথা তুলতেন—

বামুন ব'লে আমি বড়, কায়েত বলে দাস,
বদ্যি বলে দ্বিজ আমি, ঢাকা জেলায় বাস।
যুগী বলে 'যোগী' আমি, চাষা বলে বৈশ্য,
শূদ্রও শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালিঘাটের দস্যু।
বলে উগ্র 'নহি শূদ্র, ধরি তলোয়ার,'
হলে রাত্রি, উগ্রক্ষত্রী, ভয়ে পগার পার।
সবাই বড় হতে চায়, কেউ কারো নয় বশ্য॥

মহারাজ নবকৃষ্ণই শুধু নন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভোলানাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলদর্পণ অভিনয় দেখতে গিয়ে কুদৃশ্য দেখবার ভয়ে জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন—তিনিই আবার ভোলাময়রার কবির গানের আসরে গিয়ে বসে থাকতেন!

ভোলা ময়রার সঙ্গে এণ্টনি ফিরিঙ্গির কয়েকবার লড়াই হয়েছিল হালসীবাগানে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে গিয়ে গান শুনেছিলেন। তিনি বলেছেন—"ভোলা ময়রার কবি-গাওনা শুনিতে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। একদিন হালসীবাগানে তাহার কবিগান শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, ভোলা ও এণ্টনি সাহেবের লড়াই হইবে। সেই আসরে লোকের এত ভিড় হইয়াছিল যে কি বলিব।"

এণ্টনি সাহেব ছিলেন ভোলানাথের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবাঙ্গালী কবিয়ালটি ভোলার মত সুরসিক কবিকেও নাস্তানাবুদ করতেন। এণ্টনি ফিরিঙ্গি এ দেশের কবির গানের আসরে একটি বিশেষ ব্যক্তি, এ দেশের সাংস্কৃতিক ভাবে এমন ভাবে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়েছিল যে, বাঘাবাঘা বাঙ্গালী কবিরা লড়ায়ে ঘায়েল হয়ে যেতেন।

ভোলা ময়রা এণ্টনি ফিরিঙ্গিকে প্রাণ খুলে গালাগালি করতেন। এই গালাগালিগুলো ছিল সেকালের শ্রোতাদের বিশেষ উপভোগ্য। এণ্টনিও গালাগালি দিতে কসুর করতেন না, কিন্তু তাঁর গালাগালিগুলো সে রকম চোখা চোখা হ'ত না।

বাগবাজারের বারুদখানায় একবার ভোলাময়রা আর এণ্টনি সাহেবের লড়াই হ'ল; এণ্টনি সাহেব স্বয়ং দুর্গাসেজে ভোলানাথকে শিবকল্পনা ক'রে একটি গূঢ় প্রশ্ন করলেন—

যে শক্তি হতে উৎপত্তি, সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ?
কহ দেখি, ভোলানাথ! এর বিশেষ বিবরণ
জান না কি শিব! আমি তোমার শিবানী,
তোমায় গর্ভে ধরে আমি এখন হলেম তোমার রমণী
সমুদ্র মন্থন কালে, বিষপান করেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে রক্ষা কর আপনি।
ঢলে ছিলে বিষ-প্যানে, বাঁচালেম স্তন্যদানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় ব'লেছিলে জননী?

তখন ভোলানাথ উত্তর দিলেন—

(ওরে) আমি সে ভোলানাথ নই,
(আমি যে সে ভোলানাথ নই)
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই,

চিন্তামণির চরণ চিন্তি
ভাঙনা-খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
সবাই পুজে তোমায়, আমায় পুজে কই;
সে যা আমার খই, নে যা ঘাঁটালের দই;
পেরিঙ-এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই।
(কাছে) বাগবাজারের খাল, আজতোর বিষম জঞ্জাল,
দড়ি কলসী নিয়ে ব্যাটা, হোলে জল সই॥

এ উত্তর কেমন জোলো-জোলো। এণ্টনি ফিরিঙ্গি হয়ে এমন চমৎকার প্রশ্ন করলেন, আর ভোলাময়রা সাবধানে এড়িয়ে গেলেন-এটা দুঃখের কথা। আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাধ্য ভোলার ছিল না বলতে হবে।

এণ্টনি ফিরিঙ্গির ঠাকুরদাদা বেহালা বরিষার সাবর্ণ চৌধুরীর জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন, আর নুনের ব্যবসা করতেন। জব চার্ণক যখন কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই সময়ে জমিজায়গার দখল নিয়ে তাঁর সঙ্গে এণ্টনিদের দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল।

ফিরিঙ্গি এণ্টনি বাড়ীর ছেলের কবিয়াল হয়ে দাঁড়ানোর ইতিহাস আছে। বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তিনি একবারে বাঙ্গালী বনে গিয়েছিলেন, তারপর গবিটির বাগান বাড়ীতে সৌদামিনীর সঙ্গ পেলেন—তখন তো একবারে বাঙ্গালী। সৌদামিনী ছিল এক ব্রাহ্মণ-বিধবা, সে এণ্টনির ঘরণী হয়ে বাস করত।

একজন অবাঙ্গালী নুনের-ব্যবসায়ীকে খাস বাঙ্গালী কবিয়াল তৈরী করার দুর্লভ কৃতিত্ব সৌদামিনী অর্জন করেছে। তার বাড়ীতে দেবদেবীর পুজাও হ'ত।

সৌদামিনীর রান্নার হাত ছিল বড়ই মিষ্টি, আর দেশী পাঁচরকম রান্না খেতে ফিরিঙ্গি এণ্টনির বড়ো ভালো লাগত।

কালক্রমে এমন দাঁড়ালো যে, এণ্টনি সেধে সেধে লোকের বাড়ীর শাক তরকারী খাবার নেমন্তন্ন যোগাড় করতেন। ভোলাময়রা এণ্টনিকে আক্রমণ করতে গিয়ে সেইসব শ্লেষ যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন—

পেদরু ফিরিঙ্গি ব্যাটা, পেরু কাটা,
ব্যাটা কি সাহেব ফলিয়েছে।
ব্যাটা ছিল ভালো, সাহেব ছিল
হ'ল বাঙ্গালী,
এখন কবির দলে, এসে মিশে
ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী।
জন্ম যেমন যার, কর্ম তেমন তার,
এ ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে, নিমক ছেড়ে
কবির ব্যবসা ধরেছে॥
কেউ বা কচ্ছেন ব্যারিষ্টারী, কেউ বা ম্যাজিষ্টারী,
এলেমের জোরে কেউ বা কচ্ছেন জজগিরি,
আর এ ব্যাটা পুজোর বাড়ী ভুজোর লোভে
নাচতে এসেছে॥

এণ্টনি কেবল বেশভূষা-খাওয়াপরায় না, মতিগতিতেও হিন্দু বনে গিয়েছিলেন। সেজন্যও ভোলাময়রা তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়তেন না। তেলেনীপাড়ায় এক কবির লড়াইয়ে এণ্টনি গাইলেন—

ও মা শিবে মাতঙ্গি,
ভজন সাধন জানি নে মা,
আমি জাতে ফিরিঙ্গি॥

ভোলাময়রা তাঁকে তীব্রভাবে কশাঘাত করলেন—

তুই জাত ফিরিঙ্গি, জবরজঙ্গী,
আমি পারব না কো তরাতে।
যিশু খৃষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥

এ-ও সদুত্তর হ'ল না; ভোলাময়রা সাধ্যপক্ষে যুক্তিতর্কের ধার ধারতেন না।

বলা বাহুল্য, এ উতোর দেওয়ার সময়ে ভোলাময়রা নিজেই ভগবতীর সাজ ধরেছিলেন। এই সব সাজ ধরার ব্যাপারে তাঁরা দুজনে কেউ কম যেতেন না।

এণ্টনি সাহেবকে ভোলাময়রা এমন সব গালমন্দ করতেন যে, কবিয়ালদের আসরে ব'লেই তা মানিয়ে যেত। এণ্টনি এতে ক্রুদ্ধ না হলেও শ্রোতারা কি করে চুপ ক'রে সব শুনতেন ভাবতে আজ আশ্চর্য লাগে। এ সব শ্লীলতা-বিরুদ্ধ গালমন্দে শ্রোতারা আনন্দই পেত। ভোলাময়রার মত সুরসিক কেন এমনভাবে মুখ খারাপ করতেন, এমনভাবে এণ্টনিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন—আজ আমরা তা আর বুঝতে পারব না। সেদিনকার রুচির কথা ভেবে হয়তো—ছি ছি করবেন পাঠকরা: কিন্তু সেদিনকার সংস্কৃতির আলোকবিহীন অর্ধশিক্ষিত বঙ্গবাসীর কথাও এখানে বিবেচনা করতে হবে।

ভোলাময়রা প্রকাশ্য আসরে এণ্টনিকে গালাগালি দিয়ে বললেন—

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি,
তোর কটা বাপ বল শুনি।
দেখবি আজ ভোলার কেমন শক্তখানি।
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা,
তোর মত হাবাগোবা, আমি আর দেখিনি॥
পথে ঘাটে দেখিস্ যারে, বলিস্ বাপ অমনি তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি।
শোনরে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বামনী॥
তোর রসবতী গুণবতী ঘরের শ্রীমতী,
জুটবে তার শতশত সুরসিক পতি,
কস্মিনে পা দিবি পুরে, ঢুকবি গিয়ে অমনি গোরে,
যিশু বলবি বদন ভরে, তার উপায় কি বল্ শুনি॥

না ভজিলে যিশু নাম, তোর গোরে ডাকবে ব্যাঙ,
ভেঙে দেবে তোর ঠ্যাঙ, যত মামদো ভূত আর পেত্নী॥

ভোলাময়রা এমন সব দুরূহ হেঁয়ালী-ভরা প্রশ্ন করতেন যে, এন্টনি ফিরিঙ্গি রীতিমত চোখের জল ফেলতেন। একবার প্রশ্ন করলেন—

নাটুর নীচে নাড়ু নড়ে, লাড্ডু নয় ভাই
বৃন্দাবনে বসে দেখ, বসুঘোষের রাই।
ঘোমটা খুলে, চোমটা মারে, কোনটা বড় ভারি,
তিন লম্ফে লঙ্কা পার, হাসছে শুকসারী।
বাঁজা মেয়ের ব্যাটা হ'ল, অমাবস্যায় চাঁদ,
এন্টনি জবাব দাও, নইলে বঁধবে বিষম ফাঁদ॥

এন্টনি নিশ্চয়ই এর উত্তর দিতে পারেননি, কিন্তু ভোলা নিজেও কি এর উত্তর দিতে পারতেন?

শুধু এন্টনি ফিরিঙ্গিই নয়, রামবসুকেও ভোলাময়রা যা খুসী গালাগাল করতেন। কবিয়ালদের মধ্যে সত্যিকার কবিত্বশক্তি ছিল একমাত্র রামবসুরই, তিনিও ছিলেন ভোলার মতো হরুঠাকুরের শিষ্য। প্রকৃতপক্ষে রামবসু বা এন্টনি ফিরিঙ্গির ওপর ভোলানাথের কোন রাগই ছিল না, এসব গালাগালি কেবল লড়াই-এর খাতিরে। তাছাড়া, রামবসুর নিজের তো কোন দল ছিল না, তিনি ছিলেন নীলুঠাকুরের দলের বাঁধনদার।

একমাত্র মেয়ে কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরীর দলেও গান রচনা ক'রে দিতেন রামবসু। সেবার শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণদেবের বাড়ীতে যে লড়াই হয়েছিল, তাতে ভোলানাথের হাতে রামবসু বিশেষ নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন—ভোলা ময়রা গাইলেন—

চিতান— রামবোস! তুই পাজি ছুঁচো, তুই বিষম বদমাস।
পরচিতান— এই আসরে, ভোলার করে, আজ তোর হবে সর্বনাশ।
ফুকা— তুই কি সেই অযোধ্যার রাম, তুই এক নেমকহারাম,
তুই হরুঠাকুরের চেলা হয়ে তাঁর প্রতি হলি বাম।
মেলতা— নীলু যজ্ঞেশ্বরী সনে চলে যা গোবিন্দপুরে।
মহড়া— আমার হরি এই হরুঠাকুর।
যিনি টিকি ধরে, শোভাবাজারে, তোর গর্ব করলেন চুর।

রামবসু তো এন্টনি ফিরিঙ্গি নন, তিনি উত্তর দিতে কসুর করতেন না। আর তাঁর উত্তরগুলোও খুব মিষ্টি-মধুর হ'ত না। রামবসু বললেন—

চিতান— সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
পরচিতান— ভজিস ঢেঁকি, বলিস কিনা গৌর অবতার।
ফুকা— কিসে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস না সূক্ষ্ম, ওরে মূর্খ! দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস।
মেলতা— তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে, মিছে করিস পচা ভুর।
মহড়া— সেই হরি কি তোর হরুঠাকুর,
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করলেন ব্রজপুর।

ভোলা ময়রার শুধু এই খেউড়গুলিই সম্বল ছিল না, তাঁর কণ্ঠে বহু সুন্দর সুন্দর গানও ছিল। কিন্তু সেগুলির রচনা তাঁর নিজের নয়, বেতনভোগী বাঁধনদারদের রচনা। সখীসংবাদগুলি তাঁর নিজের না হলেও খেউড় আর চাপানগুলো তাঁর আসরে বসেই তৈরি করা।

তাঁর আগে বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকলেও, পরে অভিজ্ঞতার সূত্রে বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর উর্দু ফার্সি জ্ঞানও হয়েছিল, কাশিমবাজারে মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবিয়াল হোসেন শেখকে তিনি শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমানী শব্দ-মিশ্রিত চাপান দিয়েছিলেন—

জরু জরু জমীন ক্যায়সে খত্‌রে আনে,
খুন মুন সুন ক্যায়সে পত্‌রে জানে।
জো-ওয়ালা মো-ওয়ালা কালা কেনে ভাই,
হিজরী পিজরী কেন হজের সঙ্গে নাই।
যবনে ব্রাহ্মণে বল কোন ভেদটা দেখি,
ভোলার টাকা সদাই খাঁটি (এবার)
হোসেনের মেকি॥

নর ও নারী

অশ্বিনীকুমার

স্থূল দেহে নারী এলো দাঁড়াইল ধরি বস্তু-রূপ
বস্তু রূপে বিশ্বময় জড়বৎ রহিল নিশ্চুপ,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বন্দী আছে সর্ব অংগে তার
বাহির হইতে চায় ভাঙি নারী-দেহ-কারাগার;
হায় সে যে কঠিন বন্ধন।
নারী প্রেম হেরি তাহা দিবানিশি করিছে ক্রন্দন।

অমনি আসিল নর দেহহীন সূক্ষ্ম দেহ ধরি,
গোপনে রহিল মিশি সুকঠিন নারী-দেহ ভরি।
নর-স্পর্শে নারী-দেহ থর থর উঠিল কাঁপিয়া,
সৃষ্টির প্রথম রাগ নারী-চিত্তে উঠে রোমাঞ্চিয়া।
জড়-নারী পেল বক্ষে প্রাণ;
পুরুষ-চেতনা রূপে রমণীরে করে কর দান।

নাগিনী

ধীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাতের পাখি ওরা। আফিমের নেশার মত রক্তে ওদের রাতের মৌতাত। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, ওদের স্নায়ুকেন্দ্র তত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আলোর ঝরণায় ডানা ঝাপটা দিয়ে ওরা নিঃশব্দে সরে যায় অন্ধকারে। হোটেলে, বাগানে, সরাইখানায় না হয় প্রান্তরের আলো-আঁধারিতে গিয়ে পাশাপাশি বসে। মৃত্যুাক্রান্ত জীবনের পান্থশালায় ওদের অমৃতের উৎসব ফেনিল হয়ে ওঠে। রাংতামোড়া মনের ডিক্যান্টার ছাপিয়ে দেহের কানায় কানায় উপচে পড়ে ফেনিল সুরা। কাচের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ওরা দেহের কিনারায় চুমুক দেয়। রক্ত টানে চীনে জোঁকের মত।

সুরেখা কনট্রাক্ট করেছে সিনেমা কোম্পানীতে। কল্পনা রহমানের নতুন কারবার জমে উঠেছে চোপরার সঙ্গে। চোপরার অংশীদার হয়ে সে অনেক টাকা লগ্নি করেছে ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রিতে। তারপর রাজনীতিতে নেমেছে বিভোর সেনের নয়া পার্টির টিকিট নিয়ে।

মাদাম্ ককটেহল !...প্রতিষ্ঠা পেতে দেরী হয়নি ওর। তরুণ কর্মীরা শ্রমিক-মৌমাছির মত রাত্রিদিন আনাগোনা করে রাণী মাছির দরবারে। অদ্ভুত পরিতৃপ্তি ওদের মনে। আকাঙ্ক্ষা মেটে না। তবুও আশা ছাড়তে পারে না।

হাওয়ায় খবর পেয়ে, ওরা এসে বিভোর সেনকে ঘিরে দাঁড়ায় : বিভোরদা কল্পনাদি নাকি দাঁড়াবেন না ইলেক্‌শানে ?

সে কথা তো তোমরাই ভালো জানো প্রবীর : বিভোর সেন স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে মুখ তুলে চায় ওদের মুখপানে।

আমরা !

হাঁ, তোমরা। তোমাদের কল্পনাদি কি করবেন না-করবেন, সে কথা আমার চেয়ে তোমরাই বুঝবে ভালো। উনি তো তোমাদেরই। তোমরাই পার্টির ভাইটাল ফোর্স।

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মৃদু গুঞ্জন ওঠে পরিতৃপ্তির। বিভোরের জ্বলন্ত চুরুটটা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে।

চোখ দুটো খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নামিয়ে বিভোর সেন অন্যমনস্ক হয়। হয়তো ইচ্ছা করেই মন দেয় নানা অকেজো সংবাদে।

ওরা তরতর করে সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠে যায়। ভিড় ক'রে এগিয়ে যায় কল্পনা রহমানের ঘরের দিকে।

ওদের পায়ের শব্দে কল্পনা চৌধুরী সজাগ হয়ে ওঠে। তড়িৎ দৃষ্টিতে একবার দেয়াল-আরশিতে মুখখানা দেখে নিয়ে, কপালের দু-পাশে চূর্ণ অলকগুচ্ছ ক্ষিপ্র আঙুলে ছড়িয়ে দেয়। নীচের ঠোঁটটা আঙুলের ডগায় মেজে নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে যায় দরজার সামনে। পর্যাপ্ত হাসির দীপ্তিতে মুখখানা উজ্জ্বল করে বলে : শুভমস্তু।

ওটা বিভোরের নতুন টেক্‌নিক। বড়দের সে অভ্যর্থনা করে—নমস্তে। ছোটদের বলে—শুভমস্তু।

ওরা খুসীতে ভরে ওঠে কল্পনার সহাস্য উষ্ণ আবাহনে।

কল্পনাদি !

বলো।

কি ভাবলেন ?

ঘুম থেকে উঠে ভাবছিলাম তোমাদেরই কথা। তোমাদের সঙ্গ না হলে মর্ণিংটি ভালো লাগে না।

ওরা পিলপিল করে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর। কেউ চেয়ারে, কেউ টেবিলে, কেউবা কল্পনার খাটে উঠে বসে হাত-পা ছড়িয়ে।

কল্পনাদি, আপনি নাকি দাঁড়াচ্ছেন না ইলেক্‌শানে ?

কে বললে ?

শুনলাম।

কৈ! আমি তো শুনিনি। তা ছাড়া, আমার মালিক তো আমি নিজে নই। মালিক তোমরা। তোমরা যা ঠিক করবে, তা-ই হবে।

অতর্কিত জোয়ারে পানসিগুলো যেমন করে দুলে ওঠে গঙ্গার বুকে, তেমনি একটা উল্লাসের স্রোতে ওদের দেহমন যেন দোল খায়।

ঘুম নামে না অতসীর চোখে। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে পড়ে বিছানায়। কিন্তু মনের উড়ন্ত পক্ষীরাজ থামে না। তোলপাড় করে ওর সারা অন্তর।

এর চেয়ে আতাবাগানের বস্তিও ছিল ভালো। খাপরা-খোলার বস্তি হলে কি হয়, দিনের পর দিন সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে অতসী। পদ্ম, পুঁটি-গয়লানি—ওরা তো ওর পর ছিল না। বস্তির সবাই ছিল ওর চেনা। নিবারণবাবু ছিল ওর মস্ত বড় সহায়। প্রথম প্রথম নিবারণবাবু ঘরে ঢুকলে ওর গা ছম্‌ছম্‌ করতো। কিন্তু পরে আর কোনো ভয় ছিল না ওর। নিবারণবাবু ওর অনেক উপকার করেছে। সেই ঋণ শোধ করতে পারেনি বলে মনে যে ক্ষোভ ছিল, সে ক্ষোভ ওর মিটেছে পদ্মকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে।...পদ্ম অনেক অত্যাচার করেছে। তা করুক। তবুও তো অচেনা মানুষের মাঝখানে পদ্মকে দেখলে মনে ওর অনেকখানি সাহস হতো। পদ্মর দোষ নাই। ওর স্বভাব হিংসুটে, তাই অত চেষ্টা করেও দীনুকে হাত করতে পারেনি, তারই বাক্যে পদ্মর আক্রোশ পড়েছিল অতসীর ওপর। তা ছাড়া তো আক্রোশের ছিল না কিছু।

দীনুকে যেদিন সে প্রথম সঙ্গে করে এসেছিল ওদের বস্তিতে, সেই দিন থেকেই যেন পদ্ম কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। ঘুরে-ফিরে না-হবে-তো হাজার বার এসে উঁকি মেরেছিল ওদের দরজায়। কতবার টিটকারি দিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে—গাঁটছড়া বেঁধে ঘরে এনেছে। কিন্তু ভিকিরীর কপালে সইলে হয়! অমন রাজার মতন রূপ—

সত্যি সইল না ওর কপালে।...পথের কাঙাল সে। অত ভাগ্য ওর সইবে কেন ?...দীনু পালিয়ে গেল। অত চোখে-চোখে রেখেও অতসী পারেনি তাকে আটকে রাখতে।...কিন্তু খোকা ?

পথ ভিকিরীর ছেঁড়া আঁচলে বাঁধা মানিক! সেও আঁচল ফস্‌কে কোথায় হারিয়ে গেল, অতসী তা জানতেও পারলে না।

আতাবাগানের বস্তিটা ছবির মত ভেসে বেড়ায় অতসীর চোখের সামনে। সেই ঘর! সেই উঠোন! সব যেন দীনু আর খোকার স্মৃতি মাখানো! ওই বস্তি ছেড়ে সে কোন দিনই আসতো না। কিন্তু না এসে ওর উপায় ছিল না। তাই বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে ও জোর করে নিজেকে টেনে এনেছে এই আস্তানায়।

কিন্তু এ কোথায় এসে পড়লো অতসী! একটা চেনা মানুষ নাই। এরা কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞেস করে না ওর নাম-ধাম। খোলার বস্তি হয়তো নয়। ক্ষান্তমণির মাটকোঠা পাকাবাড়ী না হলেও ঝক্‌ঝকে। দেয়ালগুলো চূণকাম করা! ঘরের মেঝে শান-বাঁধানো। তবুও যেন কি নাই! কিসের অভাব অতসীকে হতাশ করে তোলে।

ওপাশের ঘরগুলোয় থাকে কয়েকটা মেয়েমানুষ। দিনের বেলায় তাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। রাত প্রহরে তারা চনমন করে ওঠে। লোক-জনের আনাগোনা সুরু হয়। হাসি, কানাকানি, গল্প-গুজব, ব্যস্ততা! সারাটা বাড়ী যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। বাতাসটা ভারি হয়ে ওঠে দিশি-মদের ঝাঁজালো গন্ধে। পেটের দায়ে ওরা রাতভোর নিজেদের হাত-ফিরি করে। একদল যায়, আর একদল আসে।

অতসীর গা ছমছম করে। কেমন একটা আশঙ্কায় ওর হাত-পা জড়সড় হয়ে আসে। খিলটা বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়।

দেহ অসাড় হলেও মন অসাড় হয় না। উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে চিন্তার কুণ্ডলীগুলো।...এও কি পেটের দায়! এত আগুন মানুষের পেটে! নিজেকে পুড়িয়ে ছারখার করছে কয়েক গণ্ডা পয়সার লোভে ?

হাঁ।...তাই।...ঠিক তা-ই।

মনে পড়ে দীনুর কথাগুলো। তার সেই কথাগুলো যেন আজো রিমরিম করে ওর কানে: ভূত দেখেছো

অতসী, ভূত ?…হাড়ে হাড়ে গাঁট-ছড়া বাঁধা। চামড়া দিয়ে ঢাকা মানুষের কঙ্কাল !…সারি সারি চলেছে সব। পেটের ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুন জুগ-জুগ ক'রে উঁকি মারে চোখের ভিতর দিয়ে। আলাদান প্রেতাত্মা! ভাঙা শানকি হাতে ক'রে কেঁদে মরে অন্ধকার গলিতে গলিতে…ভাত! একমুঠো ভাত দেবে মা ?…বাসি রুটি !…একটু ফেন !

হামাগুড়ি দিয়ে চলে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে। হাড়ে হাড়ে ঠোক্কর লেগে খটখট শব্দ ওঠে। নর্দমার ঝাঁজরিতে ঝাঁজরিতে উবু হয়ে বসে ভাত খুঁজে বেড়ায়। পচা ভাত! ঝাঁজরির জালে আটকে যাওয়া কদর্য্য উচ্ছিষ্ট অন্ন !

দেখোনি ?…দেখোনি ভূত ?

দীনুর কথা শুনে অতসী সেদিন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছিল দীনুর বাহুটা।…সেদিন বোঝেনি তার কথা। কিন্তু আজ সে বোঝে। মর্মে-মর্মে বোঝে দীনুর কথাগুলো।

অতসী বলেছিল: আমি না-হয় মেয়েমানুষ। কোনো উপায় নাই আমার। কিন্তু তুমি ?…তুমি পুরুষ-মানুষ, তুমি পারো না তার বিহিত করতে ?

পারি—পারি। কিন্তু আগুন জ্বলে উঠবে অতসী। দাউ দাউ করে জ্বলবে ওদের ওই পালঙ্কের কাঠগুলো।…হাজার বাতির রোশনাই-জ্বালা স্যাণ্ডেলিয়ারের ঝাড়গুলো ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়বে মাটিতে।

কই! পারলে না তো কিছু করতে !…আজ আর একবার ফিরেও চাইলে না অতসীর পানে।

অতসী চোখ বন্ধ করে। বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটা যেন আটকে আসে। মগজের শিরাগুলো টনটন করে অসহ্য যন্ত্রণায়। মনে হয় মগজটা বুঝি ফেটে যাবে।

নতুন মানুষের ভিড় জমেছে শিয়ালদা স্টেশনের আশে-পাশে—ফুটপাতে—আনাচে-কানাচে।…মুখ দেখে মনে হয়—গেরস্ত সব। ভিকিরী নয়, তবুও ভিকিরীদের মতন সংসার পেতে বসেছে ফুটপাতে, অলিতে-গলিতে, গোসলখানার আশে-পাশে।…ছেলে, মেয়ে, ঘরের বউ !

কারখানায় যাওয়া-আসার পথে দু-বেলা অতসী তাকিয়ে থাকে ওদের মুখপানে। অজস্র প্রশ্ন জাগে ওর মনে।

আকুলকণ্ঠে অনেকবার পথচারীকে জিজ্ঞেস করেছে: কারা ওরা ?

কেউ কানে তোলেনি ওর কথা। আধা-বয়েসী এক ভদ্রলোক মুখপানে একবার চেয়ে বলেছে: রাজনীতির ফসল।

অতসী বোঝেনি। তবে একথা বুঝতে ওর অসুবিধা হয়নি যে, সেই সব বান-ভাসা লোকগুলোর মতই হয়েছে ওদের দশা। বাড়ী-ঘর সবই হয় তো ভেসে গিয়েছে বানে। না-হয় আগুন লেগে বা মহামারিতে ফৌত হয়েছে ওদের দেশ। তাই দল বেঁধে পালিয়ে এসেছে সব প্রাণের দায়ে।

তাই।…তার চেয়েও বেশী। যাদের ঘর পুড়েছে, তাদের ভিটে আছে। কিন্তু ওদের ভিটেটুকুও নাই আজ। তারা রিফিউজি: বাস্তুহারা।

একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে অতসীর বুকে।…শহরের ভিতরে ওই সাহেব পাড়ায়, বড় বড় বাড়ী-গুলোয় হোটেলে, নাচঘরে জ্বলে চাঁদনি-বাতির নীল আলো। নাচের ঘরে ঘরে তরুণীদের পায়ে ঘুঙুরের শব্দ। ফুটপাতের কিনারে কিনারে সারি সারি নানা রঙের মটর গাড়ী। গাড়ীর ভিতর গুনগুন স্বরে রেডিওর গান বাজে।

স্টেশনের পথ ছাড়িয়ে অতসী যখন বড় রাস্তার এ-পারে এসে দাঁড়ালো, তখন পথে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। পা চালিয়ে চলে।

শিস্। কে শিস্ দিতে দিতে আসে ওর পিছু পিছু।

অতসী একবার থমকে দাঁড়ায়। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছন ফিরে চেয়ে দেখে।…সেই ছোঁড়াটা কেমন করে আবার খুঁজে বের করেছে ওকে !

'ও তোর পান্‌সিখানা বাইতে দেনা, করিস্ না মানা': চাপা গলায় গান গাইতে গাইতে ছোঁড়াটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

রাজনীতির পাশাখেলায় যারা মরা ঘুঁটির মত এসে বসেছে পথের ধারে, তাদের পালা এখনো শেষ হয়নি। আবার সুরু হয়েছে নতুন পাশাখেলা। বুদ্ধিমান মানুষের হাতে তারা হয়ে উঠেছে হার-জিতের পাঞ্জা: ক্রীড়নক।

কদিন থেকে চলছিল আলোড়ন। আজ বিকেলে বেরিয়েছে ভুখা মিছিল। নানা ক্যাম্প থেকে ওদের টেনে এনে জমায়েৎ করেছে রাজনীতিক দলপতিরা। রকমারি পতাকা আর ফেস্টুন তুলে।

সকাল থেকে শরীরটা আজ ভালো ছিল না। সারাদিন মেহনতের পর অতসীরা যখন কারখানা থেকে বেরিয়ে পথে এসে নামলো, তখন সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমের বড় বড় প্রাসাদগুলোর আড়ালে।

পথে লোকজনের কেমন একটা ত্রস্ততা: ওদিকে যেও না। পথ বন্ধ। মিছিল বেরিয়েছে।

পা দুটো যেন আর চলে না। তবুও ফিরতে হলো অন্য পথে। দলে দলে লোকগুলো ফিরে চললো, সাঁকোর ওপাশ দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে অতসীও চললো ওদের পিছুপিছু।

অগণিত লোকের ভীড়। ফুটপাতে পা বাড়াবার জো নাই। মৌলালির মোড় ছাড়িয়ে, পথের কিনারা ধরে অতসী গা বাঁচিয়ে শঙ্কিত পদে এগিয়ে চলে। ডানে-বাঁয়ে লোক। পিছনে সারবন্দি মটর গাড়ীগুলো হর্ণ দিচ্ছে।

হপ্তা কাবারির দিন। কোঁচড়ে মাইনের টাকাগুলো বাঁধা। বারবার সতর্ক হয়ে অতসী ডানে বাঁয়ে তাকায়।

ঘনঘন মটরের হর্ণ শুনে অতসী একবার পিছু ফিরে দেখে।…সাহেব। ওদের কারখানার ম্যানেজার সাহেব আর মালিক! একবার থমকে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চলে।

শুনছো!

এ্যাঁ।

চারটে পয়সা দেবে?

…পয়সা!

হঠাৎ ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠলো।…লম্বা একটা লোক। খালি গা, পরণে ময়লা চিরকুট একখানা কাপড়। এক-মাথা রুক্ষ চুল! দাড়িগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছে। তাকিয়ে আছে, তবুও যেন দেখতে পায় না কিছু।

হাত পাতে! ওর বুকের কাছে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে: পয়সা দেবে?…চারটে পয়সা! তেলেভাজা কিনে খাবো।

কে! কে তুমি?…হাঁ, সেই চোখ! সেই নাকমুখ!… দীনু!…দীনু, বেঁচে আছো তুমি?…আমি অতসী।

মুখে কথা বেরোয় না। আর্তনাদ করে ওঠে অতসীর সারা অন্তর। পাগলের মত দুহাত বাড়িয়ে ধরতে যায় দীনুকে। পায়ের তলায় মাটিটা টলমল করে ওঠে। অতসী সামলাতে পারে না। ছিন্নমূল গাছের মত আছড়ে পড়ে ফুটপাতের কিনারায়।

কোথায় দীনু!

ঝড়ের বেগে দীনু আবার হারিয়ে গেল সেই জনতার ভিড়ে।

কপালটা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। কিন্তু অতসীর তখন সংজ্ঞা নাই।

পুলিশের তাড়া খেয়ে, ছত্রভঙ্গ মিছিল, আর উন্মত্ত জনতা বাঁধ-ভাঙা জলের মত বিপুল উচ্ছ্বাসে এগিয়ে আসে সেই পথে।

অতসীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে হাসপাতালে। ওর বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছেন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার চ্যাটার্জি সাহেব, আর মালিক মিস্ ব্রততী রায়।

ব্রততী সমবেদনার সুরে জিজ্ঞেস করে: কে ওই ভিকিরীটা, অমন ক'রে তোমায় ধাক্কা দিয়ে গেল?

অতসী একটু থেমে বলে: ভিকিরী নয়।

তবে?

ভদ্দরলোকের ছেলে, কপাল দোষে ভিকিরী হয়েছে। দীনু।…দীনু ওর নাম।

ব্রততী চমকে ওঠে: দীনু!…মিস্টার সেন?…চেরি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেই সত্যেন সেনকে চেনো তুমি?

ব্রততী জিজ্ঞেস করে। চোখে মুখে উথলে ওঠে উদ্বেগ—কৌতূহল।

অতসী কোন উত্তর দিতে পারে না। মুখে তার কথা সরে না। জলভরা চোখদুটো লজ্জায় বুঁজে আসে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভয়স্ত চেয়ে থাকে ব্রততীর মুখপানে।

শেষ

কবি কৃত্তিবাসের কাল

অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদকুমার ভট্টাচার্য্য বেদান্তরত্ন এম্, এ

কৃত্তিবাস বাংলার জনমনের কবি হইলেও, গণ-কবি কৃত্তিবাসের জন্ম কর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মধ্যে বড় বিশেষ কিছু জানা নাই। কোন্ সময়ই বা তাঁহার জন্ম এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহার রামায়ণ-রচনা ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'রামায়ণের ভূমিকায়' কৃত্তিবাস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথাই বলিয়াছেন এবং অনেক আলোচনার পর যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষ পাদেই যে কৃত্তিবাসের জন্ম এই মতের পৃষ্ঠ-পোষক। এই মত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া তিনি কয়েকটি জিনিষ ধরিয়া লইয়াছেন।

প্রথমতঃ, কবির আত্মপরিচয়ে যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে সে গৌড়েশ্বর হইতেছেন রাজা গণেশ। অথচ তাঁহার সত্যানুসন্ধী চিত্ত কথাটিকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতেও রাজী নয় বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে গণেশ গৌড়াধিপতি হইলেও তাঁহার রাজসভা মুসলমান প্রভাবমুক্ত কোনও কালেই ছিল না। অথচ কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের রাজসভা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুপ্রভাবসম্পন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস", কবির এই বাক্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। রায়বাহাদুর বলেন যে যদি লিপিকরপ্রমাদে পুণ্য কথাটার স্থানে "পূর্ণ" কথাটা বসিয়া থাকে তাহা হইলে কালনির্ণয় সম্বন্ধে অনেক গোলমালই মিটিয়া যায়। যতদূর বোঝা যায় তিনি "পুণ্য" এই পাঠের পক্ষপাতী।

তৃতীয়তঃ, তিনি দেখাইয়াছেন যে যখন মেলবন্ধন হয় তখন কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁর নামেই মেলবন্ধন হয়। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের গণনা অনুসারে ১৪৩২ খৃঃ তে কবির জন্ম ধরিতে হয়। সেন মহাশয়ের মতানুসারে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু অত অল্প বয়সে কবির মৃত্যু হইয়াছিল এইরূপ কল্পনার কোনও কারণ দেখা যায়না। কাজেই কৃত্তিবাস তখন জীবিত ছিলেন ইহাই মানিতে হয়। তাহা হইলে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে কি করিয়া মেলবন্ধন হইতে পারে? বংশের বয়োজ্যেষ্ঠের নামেই কুলক্রিয়া হয়। অতএব ধরিয়া হইতে হইবে কবি তখন জীবিত ছিলেন না। কাজে কাজেই তাঁহার জন্মসময় ১৪৩২ সালের বহুপূর্ব্বে হইয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে আমরা যতদূর জানি তাহাতে দেবীবর ঘটক ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় "পূর্ণ মাঘমাস" এই পাঠ ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে এরূপ তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের ১৩৩৭ সালে একটি এবং পঞ্চদশ শতকের ১৪৩২ সালে একটি মাত্র দেখা যায়। অধ্যাপক মহাশয় ১৪৩২ খৃঃ তে যে কবির জন্ম এই কথাই স্বীকার্য্য বলিয়া মানেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্যই পরিবেশন করিয়াছেন। তিনিও "পুণ্য মাঘমাস" এই পাঠই লইয়াছেন এবং গৌড়েশ্বর বলিতে রাজা গণেশকেই বুঝিয়াছেন। তাহাছাড়া "কাহার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস", আত্মপরিচয়ের এই পাঠ নাকি তাঁহার মতে হইবে, "কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস। "পণ্ডিত" কথাটি তাঁহার মতে কবির পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি, যাহাই হউক দীনেশবাবু কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্য অনুসারে কবির জন্ম সাল ১২৮০ খৃঃ ধরিয়াছেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি দুইটি প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে কৃত্তিবাসের শ্বশুর শঙ্করের এক ভাইয়ের নাম উৎসাহ। এই উৎসাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র কনাদ তর্কবাগীশ ছিলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র এবং রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক। ইহা নাকি জানা গিয়াছে—তাঁহার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তামণির অনুমান-খণ্ডের ব্যাখ্যার পুষ্পিকা হইতে। এই প্রমাণ হইতে তিনি কনাদের জন্ম সাল ধরিয়াছেন ১৪৭৫ খৃঃ এবং প্রতি পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়া নানারকম যোগবিয়োগ করিয়া কৃত্তিবাসের জন্মসাল ধরিয়াছেন ১৩৮০ খৃঃ। দ্বিতীয় প্রমাণ হইতেছে কাঞ্জিবিল্লীয় কুবের শর্ম্মার ভাস্বতীকরণ-বৃত্তি। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় সময় দেওয়া আছে "নবখিযুগেন্দু মিতে শকাব্দে"। অর্থাৎ ১২২৯ শকাব্দে অথবা ১৩০৭ খৃঃ তে এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। এই ভাস্বতীকরণবৃত্তিতে কুবের শর্ম্মার লেখা "সময়সার" নামে আর একটি পুস্তকেরও উল্লেখ আছে। এই কুবের শর্ম্মার উপাধি ছিল রাজপণ্ডিত। এ কথাটি জানা যায় বলভদ্র রচিত "অশৌচসার" এই গ্রন্থ হইতে। এই কুবের শর্ম্মার কথা শূলপাণি, হরিদাস তর্কাচার্য্য, গোবিন্দানন্দ এবং রঘুনন্দন সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। কুলপঞ্জিকায় দেখা যায় কুবের ছিলেন দুইজন। দুইজনেই কাঞ্জিবিল্ল। কুলীন কুতুহলের পুত্র কুবের হইতেছেন প্রথম এবং দ্বিতীয় কুবের কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝার সমসাময়িক

রবির পুত্র। এই দ্বিতীয় কুবের কুলপঞ্জিকাতে রাজপণ্ডিত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন ভাবতীকরণ বৃত্তিকার কুবের এবং কুলপঞ্জিকার রবির পুত্র একই ব্যক্তি। ইহা হইতে তিনি গণনা করিয়া কৃত্তিবাসের জন্মকাল ১৩৮০ খৃঃ নির্ণয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ ধরিয়া লইয়াই দীনেশবাবু এই সমস্ত গণনার অবতারণা করিয়াছেন। ভাবতীকরণবৃত্তিকার কুবের যে সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের নিম্নে ছিল ইহা খুব কষ্টকল্পনা। দীনেশবাবু এ সময় তাঁহার বয়স ধরিয়াছেন ২৭ বৎসর। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পুত্র দ্বাদশবর্ষ বয়সে যদি গুরুগৃহে গমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে পাঠ সমাপন হইতে তাঁহার বয়স হইবে ২৪ বৎসর। দ্বাদশবর্ষ কাটিবে গুরুগৃহে। তাহার পর অধীত বিদ্যার পরিপাক এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করিতে ১৫ বা ১৬ বর্ষ যে লাগিবে তাহা নিশ্চয়ই কষ্ট কল্পনা নহে। কাজেই 'ভাবতীকরণবৃত্তিকা' রচয়িতা জন্মলাভ করিয়াছিলেন ১৩০৭—৪০=১২৬৭ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্বেও জন্মাইতে পারেন। কাজেই এই কুবের কুতূহলপুত্র কুবের বলিয়াই আমরা অনুমান করি। রবিপুত্র কুবের মুরারি ওঝার সমসাময়িক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে কুবেরের জন্মকাল ১৩০৭—২৭=১২৮০ খৃঃ। মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী এবং তৎপুত্র কৃত্তিবাস। মুরারি ওঝার জন্ম সাল ১২৮০ খৃষ্টাব্দ বা তন্নিকট-বর্ত্তী ধরিতে হয়। মুরারি ওঝার জন্ম সাল হইতে কৃত্তিবাসের জন্মকাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিসাব অনুসারে এক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়া ৭০ বর্ষ পরে হইবে। ইহার বেশি হইবে না, কারণ কৃত্তিবাসের জন্মকাল মাত্রই কাম্য। তাহা হইলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল হয় ১২৮০×৭০= ১৩৫০ খৃঃ। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিসাবে ধরিয়াছেন ১৩৮০খৃঃ তে কৃত্তিবাস জন্মিয়াছেন। তাহার উপর আরও প্রশ্ন এই যে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বর্ষ কেন ধরিব? ব্রাহ্মণ সন্তানের সমাবর্ত্তন আনুমাণিক ২৪ বর্ষ বয়সে হইত। ঐ সময় বিবাহ এবং পুত্রলাভ উভয়ই ধরিয়া এক এক পুরুষে ২৫ বৎসরের বেশী ধরা বিহিত নয়। আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন ইহাই ছিল তৎকালীন প্রথা। এরূপ ক্ষেত্রে মুরারি ওঝার জন্মকাল ও কৃত্তিবাস ওঝার জন্মকালের অন্তর ৫০ বৎসর ধরিয়া আমরা পাই ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ। এসময় কৃত্তিবাসের জন্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কখনই স্বীকার করিবেন না। কারণ তাহা হইলে গণেশের রাজ সভায় যখন কৃত্তিবাস উপস্থিত হন তখন তাঁহার বয়স ৮৫।৮৬ বর্ষ হইবে। পূর্ব্বগণনাতেও তাঁহার বয়স তখন হইবে ৬৫ ৬৬ বর্ষ। অথচ তিনি এই হিসাব মিলাইবার জন্য কেন যে ১৩৮০ খৃঃ ধরিলেন তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। কাজেই বলিতে হয় ভাবতীকরণ বৃত্তিকার কুবের কুতূহলের পুত্র। রবির পুত্র নহেন।

কনাদ তর্কবাগীশ হইতে কৃত্তিবাস চারি পুরুষ উর্দ্ধে। এই হিসাবে প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল হয় ৩×২৫=৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৪৭৫ খৃঃ—৭৫=১৪০০ খৃঃ ধরা কষ্ট কল্পনা। তাহাছাড়া কনাদের জন্মসময় তিনি ধরিয়াছেন ১৪৭৫ খৃঃ। উহা ১২০০ খৃঃ ও হইতে পারে। কারণ রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। সে যাহাই হউক এই সমস্ত আলোচনা হইতে একটি বিষয় প্রতীত হয় যে কৃত্তিবাস ১৩৫০ খৃঃ হইতে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও একসময় জন্মলাভ করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র যে বলিয়াছেন মেল বন্ধনের সময় মালাধর খাঁর নাম মেল হওয়ায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে কৃত্তিবাস তখন জীবিত ছিলেন না এবং তিনি কখনও স্বল্পজীবী ছিলেন না এ যুক্তিও খণ্ডন হয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে। তিনিই দেখাইয়াছেন যে কৃত্তিবাসের জীবিত-পাতিত্যদোষ স্পর্শ করিয়াছিল। কাজেই কৃত্তিবাসের জীবিতকালেও তাঁহার নাম উল্লেখ না হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি আছে। আরও কথা এই যে এই সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত করিতে গিয়া আমরা পুঁথির পাঠে ভ্রম স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি পাঠে অভ্যস্ত তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে "পূর্ণ" এবং "পুণ্য" এই দুই পাঠের মধ্যে ভ্রম হওয়ার অবকাশ খুব কমই আছে। আমরা মনে করি "পূর্ণ" পাঠই অবিকৃত এবং অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনানুসারে ১৪ ২ খৃঃ র ২৯শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী) মাসে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করিতে চাই।

প্রথম যুক্তি রায়বাহাদুর স্বয়ংই দেখাইয়াছেন। কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের রাজসভা সম্পূর্ণ মুসলমানপ্রভাববিমুক্ত হিন্দু রাজসভা, ইহা কখনই রাজা গণেশের সভা হইতে পারে না। অন্য কথা দূরে থাকুক গণেশ তাঁহার নিজের পুত্র যদুকেও মুসলমান প্রভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন নাই। কোনও ইতিহাসের গ্রন্থই রাজা গণেশকে পরিপূর্ণ ভাবে মুসলমানপ্রভাবমুক্ত দেখানো হয় নাই বা দেখানো সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত ভাষায় রামায়ণ গান রচনা রাজার আদেশ। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবেন ইহা অতীব কষ্ট কল্পনা। রামায়ণ গ্রন্থ হিন্দুর পক্ষে একটি ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দু ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়াই রামায়ণ গান শোনে বা পাঠ করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতক হইতেই দেখা যাইতেছে শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের অন্যান্য স্থানেও রামচরিত্র আদর্শ বলিয়া গৃহীত। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" এবং ভোজবর্ম্মার বেলাবলিপি রামায়ণকেই উপমান ধরিয়া রচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের যে কলহ তাহার মিটমাট এবং সমাধান দেখা যায় রামায়ণে। এই কারণেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম উদ্দীপনার জন্য ব্যবহৃত এবং লুপ্তপ্রায় হিন্দু ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র উপকরণ এই রামায়ণ। প্রাকৃত ভাষায় রচনার উদ্দেশ্য যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে এক ধর্ম্ম, সাম্য, মৈত্রী, সংযম ও পবিত্রতা দেখা দেয় এবং সকলে আচারনিষ্ঠ হয়। কাজেই রাজাদেশ। কৃত্তিবাস-লিখিত গৌড়েশ্বর এমন একব্যক্তি যিনি হিন্দুধর্ম্মকে অটুট রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং তাহা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই করিতে সমুৎসুক। তাই কৃত্তিবাস তাঁহাকে "পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥" এইভাবে প্রচার করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় এবং উৎকল লইয়াই পঞ্চগৌড়। যে সময়কার কথা সে সময়ে কোনও এক ব্যক্তি এই পঞ্চপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন না। এমন কি ইহার পাঁচ ছয় শতক পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সেরূপ কেহ ছিলেন না। অথচ এই "পঞ্চগৌড়" বা পঞ্চগৌড়েশ্বর ইত্যাদি ব্রাহ্মণ সমাজের পরিচয় হিসাবে পঞ্চগৌড় শব্দটির ব্যবহার বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়। অনুরূপভাবে পঞ্চদ্রাবিড় ব্যবহৃত হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন ইহা সমাজবাচক। কাজেই এই গৌড়েশ্বর শুধু গৌড়দেশের রাজাই নহেন—সমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজের ধারক ছিলেন। কে এই রাজা ?

রাজা গণেশ কিছু দিনের জন্য গৌড়ের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোথাও গৌড়েশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন আমাদের জানা নাই। অর্থাৎ হিন্দু সমাজ তাঁহাকে সমাজের ধারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এরূপ কোথাও দেখা যায় নাই।

গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধিপতি শব্দটি সহজে কেহ ব্যবহার করেন নাই। আমরা দেখিতে পাই যে পালসম্রাটগণ গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধিপতি ছিলেন। তাহার পর তাম্রপট্টের সাক্ষ্যানুযায়ী দেখিতে পাই লক্ষ্মণ সেন গৌড়পতি। তদীয় পুত্র বিশ্বরূপও কেশব গৌড়পতি। তাহার পর কিংবদন্তি অনুসারে বল্লাল সেন। কিন্তু এই বল্লাল কে অথবা ইহার অস্তিত্ব বাস্তব কিনা তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। তাহার পর তাম্রপট্টানুসারে দেখি দনুজমাধব দশরথ দেব গৌড়পতি। তাহার পর মধু সেন গৌড়পতি। চোড়গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-৬৪ খৃঃ) গৌড় পর্য্যন্ত বিজয় অভিযান চালাইলেও এবং দীর্ঘকাল গৌড়ভূভাগের উপর তাঁহার আধিপত্য থাকিলেও তিনি গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে আমরা দেখিতে পাই উড়িষ্যার গজপতি সম্রাট কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৬৭ খৃঃ) গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালের ঊনবিংশ অঙ্কে অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তিনি গৌড় আক্রমণ করেন এবং গৌড়ের "মালিকা পারিসা" বা সুলতানকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন কিছুদিনের জন্য দখল করেন। বঙ্গদেশের অনেক অংশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের মধ্যে ছিল এবং তাঁহারই প্রভাবে বাংলায় হিন্দু-কৃষ্টির পুনরভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যে জ্ঞান গরিমা দেখা দিয়াছিল তাহা তাঁহারই রাজত্বের প্রভাবে। সম্ভবতঃ ইহার সহিত সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই কপিলেন্দ্রদেবেরই পুত্রের নাম প্রতাপরুদ্র, যিনি চৈতন্য দেবের পদাশ্রিত হইয়াছিলেন। আমরা মনে করি কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন সেই গৌড়েশ্বর এই কপিলেন্দ্র দেব অথবা তাঁহার কোনও প্রতিনিধি বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কথাই ঠিক। তাহা হইলে গন্ধর্ব্ব রায় নামটি লইয়া আর মুস্কিলে পড়িতে হয় না, আমরা মনে করি উত্তরে কোপাই, পূর্ব্বে অজয় ও ব্রহ্মাণী এবং দক্ষিণে কুয়ুব নদীর দ্বারা সীমায়িত যে ভূভাগ তাহাতে অনুসন্ধান চালাইলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত তমসাচ্ছন্ন বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক কিছু সামগ্রী আমরা পাইব। কৃত্তিবাস যোগীআদ্যা দেবীর যে স্তব বাংলায় লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া কথিত—তাহাও ইহাই প্রমাণ করে।

পূর্ব্বে আমরা যে হিসাব দিয়াছি তাহাতে সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের সহিত কপিলেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল ১৪৫০-৫১ খৃঃ তে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রের মতে আমরা যদি ধরিয়া লই যে কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃঃ তে জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহা হইলে তাঁহার ১১শ বর্ষে গুরুগৃহে গমন; সম্ভবতঃ ১২শ বর্ষ গুরুগৃহে অবস্থান এবং তাহার অব্যবহিত কাল পরেই রাজপণ্ডিত হইবার আশা লইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার কাল হয় ১৪৫৫ খৃঃ। সুলতান নাসিরুদ্দিনের যুদ্ধ পরাজয় কাল ধরিয়া অনুমান হয় ইহাই রামায়ণ রচনার সমীচীন কাল। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কবি কৃত্তিবাসের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি গৌড়েশ্বর শব্দটি আত্মপরিচয়ে সাতবার ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় তিনি এই গৌড়পতির বিস্তৃত ক্ষমতার প্রতি গৌরব বোধ করিয়াই এইরূপ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া এই গৌড়পতি পণ্ডিত এবং সুরসিক ব্যক্তি ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই রাজা গণেশ কোন প্রকারেই এই গৌড়েশ্বর হইতে পারে না।

ইহার আরও একটি দিক আছে। কৃত্তিবাসের ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে পঠিত হইয়া যেমন সমগ্র বাংলা দেশের কথিত ও লিখিত ভাষাকে প্রভাবিত করিয়াছে সেইরূপ মালঞ্চ দেশের অর্থাৎ শান্তিপুর নবদ্বীপের কথিত ভাষাও তাঁহার রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই দিক হইতে বিচার করিলে তিনি যে ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা পঞ্চদশ শতকের মধ্যযুগীয় ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে পারে না, কাজেই সমস্ত দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় কবি কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—রামায়ণ রচয়িতার যে যৌবন অতিক্রম হয় নাই তাহা বোধহয় তাঁহার রচনা বিশ্লেষণে পাওয়া যাইবে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে এই রচনার মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে। সমস্তই কৃত্তিবাসের রচনা নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তটি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। যে কবি আত্মপরিচয় বংশগরিমায় এত স্ফীত এবং ফুলিয়ার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ বলিলেই হয় তিনি গঙ্গাবতরণ উপাখ্যানে ফুলিয়ার উল্লেখ পরিত্যাগ করিবেন ইহা অবিশ্বাস্য।

শেষে আমরা বলিতে চাই কৃত্তিবাসের গুরুগৃহ বড়গঙ্গার পারে উত্তর দেশে বলিয়া যে তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা মিথিলা ব্যতীত অন্য কোনও দেশ নহে। মুসলমান-প্লাবিত উত্তর ভারতে তখন একমাত্র মিথিলাই ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি রক্ষা করিতেছিল এবং সেই স্থানে পড়িতে যাওয়া তখনকার প্রথাও ছিল। রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতিও মিথিলাতে পড়িতে গিয়াছিলেন। কাজেই বড়গঙ্গা বলিতে বুঝিতে হইবে ভাগীরথী ও পদ্মার উপরিভাগস্থ গঙ্গা।

"নবা.ষযু'গ্মন্দু মিতে শকাব্দে" যাহা আমরা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে উল্লেখ করিয়াছি তাহার আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে যুগ্ম শব্দটির অর্থ কি? অনেকে যুগ্ম শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন দুই। ইহা হইতে তাঁহারা যে অঙ্কপাত করিয়াছেন তাহাতে সমস্যা সরল না হইয়া জটিলই হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার বাঙ্গালীর ইতিহাসে কানাই বংশীবোয়ার উৎকীর্ণ শিলালিপি "শকে তুরগ যুগ্মেশে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন সময়টি হইতেছে ১২২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই ইহা বক্তিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযানেরই বিবরণ। কিন্তু ওই লিপিতে আছে "তুরুষ্কাঃ ক্ষয় ম.থযুঃ"। বক্তিয়ার খিলজির বিবরণ হইলে উহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু যদি "যুগ্ম" শব্দের চলিত অর্থ বাংলা প্রতিশব্দ "জোড়া" ধরি, অর্থাৎ যুগ্ম কথাটি যদি দ্বিত্বার্থক বলিয়া ধরি তাহা হইলে সমস্যা সরল হয়। কানাই বংশীপেয়ার "শাকে তুরগ যুগ্ম শ..." অর্থ তাহা হইলে হয় ১২৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে। সকলেই জানেন এই বৎসর গৌড়ের মুগীশউদ্দীন উজবেক কামরূপ জয় করিতে গিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হন। এই অর্থে "তুরুষ্কঃ ক্ষয় মাথযুঃ" বাক্যটিও সার্থক হয়।

ভাস্বতীকরণ বৃত্তির পুষ্পিকার "নবাশ্বি যু'গ্মন্দুমিতে শকাব্দে" বাক্যটিতে যুগ্ম শব্দটি আছে। এখন বিচার্য্য যুগ্ম শব্দটি কাহার প্রতি প্রযোজ্য যদি ইহা "অশ্বি" শব্দের প্রতি প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে সময় হয় ১২২৯ শকাব্দ অথবা ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু যদি উহা "ইন্দু" শব্দের প্রতি প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে সময় হয় ১১২৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৭ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য মনে হয় দীনেশবাবু যুগ্ম শব্দের অর্থ দুই ধরিয়াই ১২২৯ শকাব্দ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাস্বতীকরণবৃত্তিকার আমাদের মতে প্রথম কুলীন কুতূহলের পুত্র। যদি পুষ্পিকা লিখিতে সময় ১১২৯ শকাব্দ বা ১২০৭ খৃঃ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তনের একটা আনুমানিক সময়ও আমরা পাই—তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ পাদ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে। মনে হয় সামান্য চেষ্টা করিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সহজেই প্রমাণ হইতে পারে যে বাংলা দেশে দুইজন বল্লাল সেন ছিলেন। একজন কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলা দেশের কিয়দংশের উপর দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দানসাগর ও কালসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি গৌড়পতি ছিলেন না। কিন্তু তদানীন্তন গৌড়পতি কুমারপালের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন বিজয়সেনের পুত্র এবং লক্ষণসেনের পিতা। এই লক্ষণ সেনের পরবর্ত্তী কালে গৌড়পতি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বল্লাল—দ্বাদশ শতকের শেষ পাদ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক এবং অবিসম্বাদিতরূপে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়পতি ছিলেন। ইহারই বংশ সম্বন্ধে মীনহাজুদ্দীন লিখিয়াছেন যে তাহারা ১২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতে দুই বল্লালের ঘটনা বলিয়াই লিখিত। কুলপঞ্জিকাতে অনুরূপ ভ্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

সম্ভবতঃ এই বল্লাল সেনের বংশেই চন্দ্রসেন বা চন্দ্রকেতুসেন নামেই কোন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামের মসজিদ গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে যে চন্দ্রসেন এবং ওই জেলার রাইগ্রামের ধ্বংসস্তূপের যে প্রচলিত কিংবদন্তির রাজা চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ এবং চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা ও হাড়োয়ার প্রচলিত কিংবদন্তীর চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ একই ব্যক্তি বলিয়া আমরা মনে করি। আনন্দভট্ট তাঁহার "বল্লালচরিতে" বল্লাল সেন ও বায়দুম (বাবাআদম) সম্বন্ধে যে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই চন্দ্রকেতু-কিম্বদন্তীরই বিকৃত রূপ। কারণ ১২৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সোনারগাঁও মুসলমান শক্তির অধিকারে যায় নাই। সে সময় এই বল্লাল জীবিত ইহা বিকারগ্রস্তের কল্পনা মাত্র।

আশা করি এ বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করিলে বাংলার তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের অনেকটাই আলোকিত হইবে। গৌড়পতি শব্দটিই এ এ বিষয়ে দিক্‌দর্শনী হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেন বংশের রাজারা গৌড়পতি ছিলেন ইহা অবিসংবাদিত সত্য। তাহার পর ১২৮২ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় দনুজমর্দ্দন দশরথদেব গৌড়পতি। তাহার পর দেখা যায় ১২৮২ খৃষ্টাব্দে মধুসেন গৌড়পতি। তাহার পর দেখা যায় ১৪০২ অথবা ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে মিথিলার রাজা শিবসিংহ গৌড়পতি এবং তাহার পর আনুমানিক ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে গজপতি সম্রাট কপিলেন্দ্রদেব গৌড়পতি। কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি প্রায় সাত আট বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ না হওয়ায় ইহা এতকাল পড়িয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বভারতীর শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিত "কৃত্তিবাস—পরিচয়" নামক গ্রন্থটি আমাদের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় প্রবন্ধটি প্রকাশের উৎসাহ হইয়াছে।

সুখময়বাবুর গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্যই পরিবেশিত হইয়াছে। তিনি যে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যদি আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া আলোচনা করিতেন তাহা হইলে মনে হয় এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার থাকিত না। তাহার গ্রন্থে দেখিতে পাই তিনি তিনটি বিষয়ের কোন আলোচনাই করেন নাই।

(১) তিনি কবির আত্মপরিচয়ের "পুণ্যমাঘ মাস" পাঠের "পূর্ণ মাঘ মাস" পাঠ লইয়াছেন। অথচ এ বিষয়ে কোন ও আলোচনাই করেন নাই।

(২) "পঞ্চগৌড়" শব্দটি লইয়াও তিনি কোনও আলোচনা করেন নাই।

(৩) কবির আত্ম পরিচয়ের :—

> "গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
> রাজসভা পূজিতে তিঁহ গৌরব অপার॥"

এই শ্লোকটির কি অর্থ হইবে ইহা লইয়াও কোন ও আলোচনা করেন নাই।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে তাঁহার দৃষ্টি সব সময় উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তেই নিবদ্ধ। দক্ষিণে ফিরিয়াও চাহেন নাই।

অথচ তিনি গৌড়েশ্বর বলিতে বারবক শাহকে বুঝাইবে ইহাই স্থির করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় কৃত্তিবাসের "আত্ম-পরিচয়" যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণের আচার এবং গৌড়পতির সহিত কবির ভাব বিনিময়ের বৃত্তান্তটি অনুধাবন করিবেন তাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন না।

কাব্যে আদর্শবাদ ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বোধকরি ১৯৫০ সালে শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রাতঃস্মরণীয় বিপ্লবী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র) আমার কাছে এসে আমাকে একটি গান দেন "শ্রীঅরবিন্দায়"। আমি সে সময়ে পণ্ডিচেরী আশ্রমের বালকবালিকাদের নিয়ে একটি কোরাস চারণদল গড়তে ব্রতী। এ গানটি পরে তিনি তাঁর "আলোর চকোর" কাব্য-গ্রন্থে সান্নিবিষ্ট করেছেন। এর একটি স্তবকে ছিল:

জয় বিশ্বদীপন দীপ!
জয় ধ্যানকান্ত শিব!
ঘুচায়ে আলোর কালো পারাবার
উদিলে মহিমময়!

এ স্তবকটি আমাকে সত্যিই চমকে দিয়েছিল: একটি বারো তের বৎসরের কিশোরের লেখনীতে এমন অনবদ্যভাবে-ভরা সুন্দর মহিমা-কীর্তন এত সহজে ফুটে উঠতে পারে দেখে আনন্দও কম হয়নি—আরো এই জন্যে যে অরবিন্দের জ্যোতির্ময় কান্তি দেখলেই আমার সর্বপ্রথম মনে হত আলোর সঙ্গীতের কথা—যাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে লিখেছিলেন তাঁর অমর "অরবিন্দ-নমস্কার" কবিতায়

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত।..."

কিন্তু অল্পবয়সে উচ্ছ্বাসী কবিতায় সহজেই অবলম্বিত রঙের ছোঁয়াচ লাগে, অন্তরের অনাহত "আনন্দের গান" বেজে ওঠে। তবু আমার মনে হয়েছিল—সোনালি কবি নিশিকান্তের পরের যুগে পণ্ডিচেরী আশ্রমে বুঝি আর একটি স্বর্ণপ্রভ কবির উন্মেষ হ'তে চলল বা!

তারপরে আমি আমেরিকা ঘুরে পুণায় হরিকৃষ্ণ আশ্রমের পত্তন করি—পৃথ্বীন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্রও ছিন্ন হয়। হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি পাঠালেন তাঁর সদ্যোপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "আলোর চকোর"। তন্বী পুস্তিকা—কটাই বা কবিতা আছে? কিন্তু তবু কবিতাগুলির মধ্যে একটি দৃষ্টি সজাগ খাঁটি কবির বিকাশ লক্ষ্য ক'রে মন উল্লসিত হ'ল: আমি ভুল করিনি, সেই এক আঁচড়েই চিনেছিলাম এ কিশোর স্বধর্মে কবিই বটে।

আজকের দিনে যাঁরা কবি আখ্যা পেয়ে থাকেন—দেখতে পাই তাঁদের প্রায়ই বলবার বিশেষ কিছু থাকেনা। থাকবে কেমন ক'রে? তাঁদের কবিপ্রকৃতি কোনো শাশ্বত বাণীরই দিশা পায় না—মামুলি "যশের কাঙালী" হ'য়ে "কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি"-ই যেন তাঁদের অভ্যুদয়। তাছাড়া কবিতা লিখলে বড় কেউ পড়েও না—মাসিক পত্রিকাদিতে কবিতা শুধু নানা স্তম্ভের নিচেকার ফালতো শূন্যাংশ পূর্ণ করবারই কাজে লাগে। রবীন্দ্রনাথের ছাড়া আর কোনো কবির কাব্য নিয়ে আলোচনাও বড় একটা দেখা যায় না। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা নিজেরাই মন-মরা—কোনো ইষ্টার্থেই (Values) তাঁদের যেন আস্থা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে আলোচনা করবেই বা মানুষ কোন সত্যের মূল্যায়ন করতে? তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে আধ্যাত্মিক কবিতার প্রকৃত আদর করতে পারেন তাঁরাই—যাঁদের অধ্যাত্ম-অন্তর খানিকটা অন্তত জেগে উঠেছে। যাঁদের জাগেনি এবং এই শ্রেণীর ক্রিটিকই সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাঁরা প্রায়ই আধ্যাত্মিক (Spiritual) কবিতাকে নস্যাৎ ক'রে দেন—"ও কবিতাই নয়" ব'লে। এই জন্যেই কবি নিশিকান্তের মতন অসামান্য কবিরও এ-যুগে তেমন নাম হয়নি—নাম হ'ল যদু মধু বিধু সিধুর!

পৃথ্বীন্দ্রনাথকে আমি তাই সাদরে অভিনন্দন করি—নিশিকান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু সে তো ভালোই। গাছের শিকড়ের মতন মহৎ প্রভাব আমাদের মনের কাছে যেন আলো হাওয়া রস। স্বকীয়তার (Originality) সজাগ চেষ্টাই স্বকীয়তার বিকাশের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাই পৃথ্বীন্দ্রনাথ তাঁর "আলোর চকোর"-এ যেখানেই স্বকীয়তার জন্যে কবি-কল্পনা করতে চেয়েছেন—ছন্দে ও ভাবে নতুন পথ কাটতে বা আধুনিক বাহবার পথে চলতে, সেইখানেই তিনি নিজের অবিসংবাদিত কবি-স্বরূপকে দাবিয়ে দিয়েছেন। যেমন এ গুচ্ছে তাঁর অমিল মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতাগুলি বা "সাংবাদিকের চোখে"-র মতন অত্যাধুনিক কবিতা। এ-কোনো খাঁটি কবিরই স্বধর্ম নয়। পৃথ্বীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি ব'লেই তাঁকে আরো অনুরোধ করব শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠির কথা মনে রাখতে (যে চিঠিটি তিনি আমাকে লিখেছিলেন ২৩-৮-৩৩ তারিখে): * "মা—যদি ব'লে থাকে যে আদি বা শৃঙ্গার রসের গান গাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা তোমার সংকীর্ণতা বা অধোগতির সূচনা করে তাহ'লে আমাকে একটু ফাঁপরেই পড়তে হয় বৈ কি।...নিচের স্তরের থেকে উপরের স্তরের চিন্তা ভাবও কলাকারুর আত্মপ্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে অধোগতি বলি কী করে?

* মূল ইংরাজি পত্রটি শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লে এখানে বাংলা তর্জমাই দিলাম।

আমি নিজে একসময়ে প্রাণিক স্তরের প্রেমের কবিতা লিখতাম, কিন্তু এখন আমি কেবল আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধেই কবিতা লিখতে পারি—এ থেকে কি প্রমাণ হয় আমি সংকীর্ণ হ'য়ে পড়েছি, না বলব—আমি উচ্চতর চেতনায় অধিরূঢ় হয়েছি ব'লেই নিম্নতর প্রাণশক্তির প্রকাশে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে পারি না?" (পুরো চিঠি আমার "স্মৃতি-চারণ"এ ৩৬২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে)

পৃথ্বীন্দ্রনাথ যেখানেই উচ্চতর চেতনার ডাকে সাড়া দিয়েছেন—অত্যাধুনিক স্বকীয়তার ডাকে কান দিয়ে—সেখানেই তিনি সার্থক কবিতা লিখেছেন—যথা তাঁর প্রথম কবিতায়ই :

জানি না, জানি না কবে কোথা হবে শেষ
মোর এই উর্দ্ধমুখী মৌন অভিযান!
পূর্ণতার গান
কণ্ঠে মোর ধ্বনিবে কি?—বরাভয়
লভিব কি তুরীয়ের দুর্গম প্রান্তরে?
দেবোত্তর জ্যোতির বিজয়
পুলকিত পরাণের প্রেমোচ্ছ্বাস ভরে
কভু কি ঘোষিতে পাব ভুবনে বনে?

সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা হয়—এতই সুন্দর, সরল, আন্তরিক তাঁর বলবার ভঙ্গি, অভীপ্স শব্দ চয়ন—প্রবহমান মুক্তক ছন্দের নির্বাধ গতি। এই অভীপ্সার (aspiration) উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান প্রকাশই তাঁর কাব্যে আমরা কামনা করব। অত্যাধুনিক "সাংবাদিকের চোখে"র মতন কবিতা লেখার এ-বিড়ম্বনা কেন? কেন এ-কবিতা তিনি ছাপলেন "আলোর চকোর"-এ অমিল মাত্রাবৃত্তে ক্লান্তিকর বাস্তব দৃশ্যের ক্লেদ :

পণ্ডিচেরীর নিদাঘ-ক্লিষ্ট পীচ ঢালা পথ ঘামে।
চোলাই গুড়ের গন্ধে বাতাস হাঁপিয়ে ওঠে :
বাঁস ইটালর বাদামী বুকে লক্ষ মাছির মেলা……

একটু প'ড়েই মনও হাঁপিয়ে ওঠে ঐ বাতাসেরই মত। গন্ধের ঘর্ঘর, জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা. দারিদ্র্যের দুঃখ, কুরূপের ক্রন্দন, বীভৎসের প্রাণান্তিক জর্জরতা এ সব তো জীবনে আছেই—এদের নিয়ে কেন মাতামাতি এক অত্যাধুনিক দুঃসহ কবির অনুকরণে :

"বমন বিধুর
আমার অনাত্মা দেহ প'ড়ে আছে মৃণ্ময় নরকে…
মাথা ঠুকে রক্ত, পংকে পড়ি,
অগ্রজের মৃত দেহ যায় গড়াগড়ি
কৃমি ভোগ্য দুর্গন্ধে যেথানে
চরে যথা ক্ষর স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদ পুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর
বক্র নখ পেচক, বাদুড়—" (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

পৃথ্বীন্দ্রনাথকে আমাদের অনুরোধ : তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।" তিনি—আমাদের মতনই—শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য—যিনি তাঁর একটি পত্রে লিখেছেন যে অমুক : is under the grip af what I may call the illusion of realism, এই মোহ বড় সর্বনেশে মোহ, কারণ কুৎসিৎ বাস্তবতা তার বীভৎসতার দাপটেই আমাদের স্নায়ুর পরে চড়াও হ'য়ে এক ধরণের মিথ্যা নেশার সৃষ্টি করতে পারে—যার ফলে অনেকেই অভিভূত হ'য়ে বলে বসেন : "সাবাস্"! এরি তো নাম ওরিজিন্যাল! সুন্দর স্নিগ্ধ কবিতা—ও সব আর চলবে না দাদা! আমরা চাই এখন কুৎসিত ক্লিন্ন বাস্তবতা—অবোধ্য হ'লে তো আরো ভালো—সোনায় সোহাগা :"

আশ্রুত তারক
অদ্যত্রও অনাগত ; জাতি ভেদে বিবিক্ত মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র এক নায়কেরা।…
…পক্ষান্তরে……কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধংসাবশেষে ; স্বেদে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু।…… (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি মন্তব্য এ-জাতীয় অত্যাধুনিক কাব্যের ঘর্ঘরে কানে হাত দিয়ে : "এ সব কবিতা পড়লে সন্দেহ হয়—সত্যিই কি তবে আমরা কবিতার মর্ম কিছুই বুঝিনি? নৈলে এ শ্রেণীর কবিতারও এত নাম ডাক—যাতে আমাদের মনে জাগে শুধু বিস্ফারিত বিস্ময়!"

তাই ফের বলি—পৃথ্বীন্দ্রনাথ যেন নিজের তুঙ্গতম প্রেরণাকেই অনুসরণ করেন ম্লান ক্লিন্ন গন্ধময় অনুভূতির পদাঙ্ক ছেড়ে। যেন তিনি সুন্দর বাণীর, উজ্জ্বল আদর্শের দীপ্ত স্বপ্নেই জেগে গান গেয়ে চলেন :

প্রতিভা-অভয় সাথে নিয়ে যারা নেমেছে বিশ্বপথে,
কালের প্রবাহ তাদের চরণ তলে।

ঠিক কথা, তাই পৃথ্বীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠে স্বরিত হয়েছে তাদেরই ভাষা কবিত্বের সান্দ্র ঝংকারে :

শাশ্বত কোন্ ভাস্কর সেই জীবনের শিলা নিয়ে
গড়ে দিতে চায় সৌধ চিরন্তন,
জীবন শিল্পী মরণ ছন্দে ভেঙে দিয়ে ধরা মাঝে
করে সুমহান্ শক্তি সঞ্চারণ।

তাই তো বুকে জাগে ভরসা যে মহিমার মৃত্যু হবে না বাস্তবের ক্লিন্ন মুষ্টির চাপে—পৃথ্বীন্দ্রনাথের ভাষায় :

অবহেলা আর নির্দয় ব্যথা, উপেক্ষা, গ্লানি, বঞ্চ
জ্ব'লে যায় এক সর্বদানের উন্মুখ হোমানলে

পাষাণ বুকের অণু-পরমাণু বিজলি প্রভায় ভাসে
কাল ঝঞ্চায় সেই মহিমার বিগ্রহ নাহি টলে।

এখানে আরো একটি কথা বলাই চাই। আমাদের এ-যুগের খানিকটা অতি-বিশ্লেষণ ও জীবনের নানা স্তরের প্রকাশ—কাব্যে ও শিল্পে। এ-প্রচেষ্টা মূলতঃ মিথ্যাভিত্তিক নয়। আগের যুগে কাব্যে নাটক নভেলে রাজা রাণী অভিজাত সামন্ত এদেরই নিয়ে—শিল্পীদের কারবার ছিল। এখন আমরা নেমেছি মধ্যবিত্তে—শরৎচন্দ্র তারও নীচে নিম্ন-মধ্যবিত্ত (lower middle class), তার পরে আরো নিচে বস্তি জীবনে, গণিকা গৃহ চিত্রে বীভৎসতার নরক কুণ্ডে। এতেও আপত্তি করা চলে না—যদি এ-সব চিত্রকে আঁকা হয় কন্ট্রাস্ট সুন্দরকে উজ্জ্বলতর ক'রে দেখাতে। কিন্তু যেখানে সুন্দর মহৎ পবিত্র শুচি এ সব মূল্যকেই নস্যাৎ ক'রে শুধু জঘন্যতা, বীভৎসতা ও কামায়নই (pornography) হয় আর্টের লক্ষ্য সেখানে বলতেই হবে যে মানুষ মনুষ্যত্বে খানিকটা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছে ব'লেই এ-ধরণের চিত্রাঙ্কনে রস পেতে সুরু করেছে। এ নিয়ে অন্তহীন বিতণ্ডা হয়েছে—আর্ট কিসের জন্যে সৃষ্টি—ফর আর্ট, না আর্টের অতিরিক্ত কোনো অভীপ্সাকে রূপ দিতে? তর্ক ক'রে এ-সমস্যার নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হয় না। কালিদাসের কথা প্রামাণ্য বৈ কি—ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। তাই অপেক্ষা করতেই হবে কালের চরম ও পরম রায়ের জন্যে, কারণ সমসাময়িক রুচির রসদ-দাররা সত্যি শিল্পী কি না সে বিচার এখনি হ'তে পারে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, মনের সুন্দর মহৎ পবিত্র ও পুণ্য বৃত্তগুলির চিত্রণে যে-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে তা এখনো স্থায়ী—আনন্দ দিচ্ছে। সেদিন ফের মহাভারত পড়তে এই কথাই মনে হচ্ছিল। তাতে নীচতা, হীনতার চিত্রও আছে বটেই তো, কিন্তু সে সবকেই ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের বীর্য, তপস্, মহত্ব, ত্যাগ, ভক্তি, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা—কাব্যে বিশেষ করে আমাদের এই সব প্রবৃত্তিই সহজে ফুটে ওঠে যেমন ফুল সহজে ফুটে ওঠে খোলা হাওয়ায়।

এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন বহুদিন আগে "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" বুলিটিকে নাকচ ক'রে। তাতে শেষে যে-কথা লিখেছিলেন তা-ই চিরন্তন সত্য—কেন না মানুষের মহত্তম উপলব্ধি নিকষে সে-ই উত্তীর্ণ হয়েছে সার্থক ব'লে। তাই সেই উদ্ধৃতিটুকু দিয়েই এ-নিবন্ধের সমাপ্তি টানব। আমি এখানে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ দিচ্ছি। পুরো পত্রটি "সুন্দরের সীমানা"-য় প্রকাশিত হয়েছিল বহুদিন আগে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন :

"তিনটি জিনিষ নিয়ে তবে হ'ল শিল্পের সমগ্রতা। প্রথম, প্রকাশক্ষম রূপের অনবদ্যতা, সৌন্দর্যের আবিষ্কার ; দ্বিতীয়, বস্তুর যে-মূল সত্তা বা অন্তরাত্মা তার অভিব্যক্তি ; তৃতীয়, এই দুটি অঙ্গ যার বাহন সেই সৃষ্টি পটু—চৈতন্যের ও আনন্দের শক্তিরাজি। শিল্পেরই জন্য শিল্প—নিশ্চয় ; কারণ শিল্প হ'ল এক হিসাবে অনবদ্যরূপ, সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য, তার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য।....শিল্পকে... ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধতমের দিকে চলতে হবে - এই হ'ল আমাদের শিল্প-সাধনার, আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার—উভয়েরই প্রয়াস।"

("Art for Arts sake—certainly—Art as a perfect form and discovery of Beauty ; but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and the expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of Beauty. In that self-expression there are grades and hierarchies—widenings and steps that lead to the summits. And not only enlarge Art towards wideness—but to ascend with it to the heights climbing towards the Highest is and must be part both of our aesthetic and our spiritual endeavour.")



মেয়েদের কথা

নারী সমাজ

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্মা এক দেহ দুই ভাগ করেন—পূর্ব্বার্দ্ধ-ভাগ পতি, অপরার্দ্ধ ভাগ স্ত্রী। পুরুষ যে পর্য্যন্ত স্ত্রী লাভ না করতে পারে, সে পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। গৃহস্থাশ্রমের মূল স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ত্রী গার্হস্থ্য যজ্ঞ সম্পাদন করবে।—স্বামীর সঙ্গে মনে-প্রাণে একত্র হয়ে স্ত্রীর মিলন ভিন্ন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সুখের কারণ হয় না। ব্যাধি যেমন প্রথমে উপেক্ষিত হোলে পশ্চাতে বিশেষ ক্লেশ-দায়ক হয়ে ওঠে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটায়, তেম্নি স্ত্রীর যথেচ্ছাচার যদি স্বামী স্নেহাদি কারণে উপেক্ষা করেন তা হোলে সংসার দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে, সে সংসার জ্বলে যায়। যে স্ত্রী স্বামীর অণুকূলতাচরণ করে ও বাক্য-দোষ রহিত, সাধ্বী, কার্য্যদক্ষা ও প্রিয়বাদিনী, সে রমণী কুলভূষণা। মনু বলেছেন—'সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবং' অর্থাৎ যে কুলে স্বামী-স্ত্রীতে আর স্ত্রী-স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হয়ে থাকে।

বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' স্ত্রী-লোক কখন স্বাধীন হোতে পারে না। এ ক্ষেত্রে লোকাচারেও দোষ ঘটে। দক্ষ-সংহিতায় উক্ত হয়েছে—'গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্! সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী।' ঋষি বলছেন, গৃহস্থাশ্রমে বাস করা সুখের জন্যে। সেই সুখের মূল পত্নী। যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, মনোগত ভাব বুঝতে পারে আর বশীভূতা, সে স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দ বাচ্য।

পুরুষের স্ত্রী প্রতিকূল আচরণ করলে, দম্পতীর মধ্যে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য ঘটে, আর এ ফল ক্রমে বিষময় হয়। প্রতিকূলা স্ত্রী জলোকার মত। ক্ষুদ্র জোঁকেরা মানুষের কেবল রক্ত শোষণ করে। অনুরূপভাবে বিপরীত-গামী স্ত্রীকে উত্তম অলঙ্কার, যানবাহন, অন্ন-বস্ত্র ও ধন-সম্পদ দ্বারা উত্তমরূপে ঐশ্বর্য্যশালিনী করে রাখলেও সর্ব্বদাই স্বামীর রক্ত শোষণ করে—এক দণ্ডও স্বামীকে স্বচ্ছন্দে রাখে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন বয়স অল্প থাকে তখন স্ত্রী সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্তা থাকে। যৌবনকাল উপস্থিত হোলে স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে না, স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করে। স্বামী বৃদ্ধ হোলে ভৃত্যের মত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। এ ধরণের স্ত্রীলোক সমাজ সংসারের কোন দিন মঙ্গল করতে পারে না—শরীরবিধ্বংসী জরাস্বরূপিনী। অন্য পুরুষ লালসাশূন্যা স্ত্রীলোকই সংসারের শ্রী এবং শ্রীকে বজায় করতে পারে। বর্ত্তমান যুগে এরূপসংখ্যক স্ত্রী-লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে, এটী অত্যন্ত উদ্বেগের পরিচায়ক।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নারী-ধর্ম্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে স্বামীই স্ত্রীলোকদের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু। পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে ক্রূর দৃষ্টিতে দেখবে না, দুর্ব্বাক্যও শোনাবে না, অন্য পুরুষকে নিজের অঙ্গ দেখাবে না। সাধ্বী স্ত্রীগণকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রযোজক করা অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় জয় করতে বলেছেন। আরও বলেছেন—অতিরিক্ত কথা বলবে না, কারো প্রতি কটূক্তি করবে না, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না, কারো সঙ্গে বিবাদ করবে না, আর অপলাপ ত্যাগ করবে। ধর্ম্ম বিরোধিনী, অত্যন্ত ব্যয়শীলা ও বিলাস-ব্যসনানুরক্তা স্ত্রী পরিবারের অমঙ্গলই সৃষ্টি করে। প্রমাদ (অনবধানতা), উন্মাদ (চিত্ত-চাঞ্চল্য), রোষ (ক্রোধ), ঈর্ষ (পরগুণে দোষাবিষ্কার), বঞ্চন (লোককে-ঠকান) অভিমান, পৈশুন্য (খলতা), হিংসা, বিদ্বেষ অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, দুঃসাহস, অসন্তোষ ও দম্ভ এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ

কর্তে ঋষিরা বলেছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে সত্যভামা-দ্রৌপদী সংবাদে নারী-ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাঁদের সতীত্বের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত অথবা উদ্দীপিত, সেই অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা, পদ্মিনী বহুকাল মহাপ্রস্থান করেছেন, কিন্তু এঁদের চরিত্র চিন্তা করে আজও আমরা ধন্য হয়ে থাকি। উদার দাম্পত্য প্রণয়, অসাধারণ আত্মত্যাগ, অপরিমেয় প্রেম প্রসার ও একনিষ্ঠ স্বামীভক্তি ভারতবর্ষে বিরল নয়। বাল্যকালে পুরুষের চরিত্র জননীর দ্বারা গঠিত হয়, আর যৌবনকালে তা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং সংসার-সমুদ্রে ঝটিকাহত ব্যক্তির পক্ষে জননী ও ভার্য্যা উৎকৃষ্ট বন্দর। পুরুষ মস্তিষ্কের কার্য্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোক হৃদয়ের কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেখানে স্নেহময়ী জননী নেই, আদর্শ স্ত্রী নেই, সেখানে বিগ্রহশূন্য মন্দিরের মত সংসার শূন্যময়।

আমাদের বাংলা দেশের সামাজিক ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মকে মুসলমান-শাসকরা যত ক্ষতি না করেছেন তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করে গেছেন বল্লাল সেন। বল্লাল সেন জারজ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে—আদিশূরের বংশ ধ্বংস. সেন বংশ ত্যজ্য। বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।' বল্লাল যে জারজ ছিলেন, তার একটি প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়। জারজত্ব নিবন্ধন বল্লালকে সর্ব্বদাই নিষ্প্রভ থাক্‌তো হোতো। কিন্তু বল্লাল নিষ্প্রভ থাক্‌বার লোক ছিলেন না। যাতে জারজের প্রতি ঘৃণা না থাকে, তা কর্‌বার জন্যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। তারই ফলে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি। বল্লাল দেখলেন যদি সমাজ কৌলিন্য প্রথার সংবদ্ধ হয়, আর কৌলিন্যের বলে একই ব্যক্তি ২০।২৫ বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক বিয়ে কর্‌বার ক্ষমতা পায়, তা হোলে বহুসংখ্যক জারজের উৎপত্তি না হয়েই পারে না। কাজেই জারজের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে না হোক্‌, অন্তরে অন্তরে ঘৃণাভাব পোষণ করে, তা আর কর্‌বে না। কার্য্যতঃ হোলোও তা-ই। যে সময়ে বল্লাল কৌলিন্য দান করেন, তখন সকলেই তাঁর কূট-নীতিতে মুগ্ধ হয়ে অবাধে কৌলিন্য গ্রহণ কর্‌লেন, কেবল গৌড়ের আদি বৈদিকরা তাঁর কৌলিন্য স্বীকার কর্‌লেন না। কেননা কৌলিন্যদান ব্যাপারটি একটি প্রহসনের অভিনয় স্বরূপ হয়েছিল। এ জন্যে তাঁরা এতে বাধ্য হননি এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ প্রসঙ্গে বিশদ ভাবে বলে গেছেন। এই কৌলিন্য প্রথাই উচ্চ-বর্ণের হিন্দু-সমাজে রক্তের বিশুদ্ধি নষ্ট করে গুপ্তপ্রেম ও ব্যভিচারের পথিকৃৎ হয়েছে।

এই কৌলিন্য প্রথার মাধ্যমে বহু বিবাহের দরুণ বাংলার উচ্চ বর্ণের নারী মহলের মধ্যে যে ব্যভিচার প্রবেশ করে-ছিল তা থেকে নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে গেল। এর পর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলার নারী সমাজকে বহু ভাবে বিপন্ন হোতে হয়েছে! বর্ত্তমান সময়ে নারী সমাজকে যে অবস্থার মধ্যে এনে দেওয়া হয়েছে, তা'তে সত্যই নানাপ্রকার সুবিধা-সুযোগ ঘ'টছে কিন্তু সমাজ সংসার সংরক্ষণের পথ বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। ইউরোপে যেমন 'মরালিটি' শব্দটী অভিধানের মধ্যে রেখে নারী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছ বিহার চলেছে, আমাদের এখানেও প্রগতিশীলা আধুনিকাদের ভেতরও পাশ্চাত্যের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মুক্ত প্রেমকেই অবলম্বন করা হয়েছে।

মানুষ বৈচিত্র্যের অনুগামী। সুতরাং সমাজ বন্ধনে শৈথিল্য এনেই চারিত্রিক বিশুদ্ধি রক্ষা অসম্ভব। এই বিশুদ্ধি নষ্ট কর্‌তে বল্লাল যেমন সর্ব্বপ্রকার কূটনীতি অবলম্বন করেছিলেন অনুরূপ ভাবেই অবলম্বন করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপরিচালকধুরন্ধরদের দ্বারা। তাঁদের এ সম্পর্কে উৎসাহ, প্রশ্রয়, আইন-কানুন সৃষ্টি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, বিবাহবিচ্ছেদপদ্ধতি প্রচলন, কৃত্রিমভাবে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়-সৃষ্টি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমাজ-গর্হিত কর্ম্ম-পদ্ধতি লক্ষ্য করবার বিষয়। এর পরিণতি ইতিমধ্যেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পরিবারে ধরেছে ভাঙন। তা ছাড়া কতকগুলি নবজাত পত্রিকা আরও চলচ্চিত্রের বিভাগ খুলে সুরু করে দিয়েছে ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত কর্‌বার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার প্রসঙ্গ ও জীবনী পাঠকপাঠিকা সমাজের সাম্‌নে তুলে ধরতে। ব্যভিচার, যৌন-শিক্ষা ও অবাধ প্রেমই যেন একমাত্র কাম্য, জৈব আদিম প্রবৃত্তিকে সার্থক কর্‌বার জন্যে পরপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ করাই যেন আধুনিকতার প্রকৃষ্ট স্ফুরণ আর ধর্ম্ম এই সব—কথা বহু-বিঘোষিত কর্‌বার জন্যেই এরা আবির্ভূত হয়েছে পাটোয়ারী ব্যবসা-বুদ্ধি নিয়ে।

আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মানব সমাজ কোন নিয়মেরই অধীন নয়। সামাজিক নেতৃবর্গ ইচ্ছা করলে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপভাবেই সমাজকে গঠিত করতে পারেন। সামাজিকগণের ইচ্ছা ভিন্ন সমাজের অন্য কোন নিয়ন্তাই নেই। যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁরা নিতান্তই ভ্রান্ত। যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, সমাজ তার সর্ব্বব্যাপী পরিচালনাশক্তি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নয়। প্রাকৃতিক নিয়মবশে সমাজ পরিচালিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্যময় পদার্থগুলি যে বিবর্ত্তনের অধীনে বিকশিত ও পরিণত হয়, সমাজও বিশেষতঃ মানব সমাজও সেই নিয়মের শাসনে পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হয়ে থাকে। মানুষ ইচ্ছা করলে একটা জীবন্ত জীবের দেহস্থ সংগঠনী শক্তির ক্রিয়াকে বাধা দিতে পারে, দেহটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই সেই দেহস্থ ছিন্ন-ভিন্ন উপাদানগুলি নিয়েও অন্য রকম কান্তিমান আর একটি জীবকে নির্ম্মিত করতে পারে না। সমাজ-শরীর সম্বন্ধে মানুষের ক্ষমতাও ঠিক সেইরূপ। মানুষ ইচ্ছা করলে সমাজ-শরীরকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করতে পারে, কিন্তু সেই ছিন্ন-ভিন্ন, বিধ্বস্ত ও মৃত সমাজের উপাদান নিয়ে নূতন ছাঁচে পছন্দসই সমাজ গড়তে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমাজের ওপর মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নেই—এ কথা বলাও ভুল।

ব্যক্তিগত জীবদেহের ওপর মানুষের যতটুকু ক্ষমতা বর্ত্তমান, সমাজ শরীরের ওপর ও তার ততটুকুই ক্ষমতা বিদ্যমান। মানুষ যেমন শরীর সম্পর্কিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করলে দুর্ব্বল শরীরকে সবল ও অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করতে পারে, তেমনই সমাজ-শরীরকেও সে সবল সুস্থ করতে পারে। হিন্দু সমাজ চেষ্টা করলে তার শরীরস্থ সমস্ত দোষ ও ব্যাধি পরিহারপূর্ব্বক চরমোন্নতি লাভ করে পূর্ণ বলে বলীয়ান্ হোতে পারে, কিন্তু এই সমাজ কখনও চীন-রুশ, মার্কিণ বা ইংরেজ সমাজের ঠিক অনুরূপ হোতে পারে না। শরীরের সঙ্গে শরীরের যে এইরূপ একটা পার্থক্য আছে, তা প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝতেন। সেই জন্যে বেদাদি গ্রন্থে বর্ণাশ্রমিক সমাজই বিরাট পুরুষ নামে অভিহিত। এই পুরুষ শব্দটী ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক। ত্রিকাল দ্রষ্টা ঋষিরা অধ্যাত্ম শক্তি বলে ভারতবর্ষীয় সমাজকে যে ভাবে সংগঠিত করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সমাজ সংগঠন সম্পর্কে যে সব বাণী দিয়েছিলেন তার স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায় না।

বন্ধনই আধার। সুতরাং নারীকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে রাখা উচিত। জীব-দেহের মত সমাজ দেহ পূর্ব্বপুরুষের গুণ-সংক্রমণ নিয়মের অধীন। প্রত্যেক ব্যাধি যেমন তার পূর্ব্বপুরুষের কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক সমাজ বা জাতিও তার পূর্ব্বতন সমাজের কতকগুলি গুণ পেয়ে থাকে। এই কারণে নানা জাতির মধ্যে জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাতির চরিত্র আলোচনা করলে এই সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়ে থাকে। জীবদেহ যেমন ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন, মানব সমাজ ও সেইরকম ক্রমবিকাশ নিয়মের তুল্যভাবে অধীন। সমাজ সংস্কারকালে সংস্কারকগণের ঐ দিকে দৃষ্টি রেখে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নতুবা সংস্কারের পরিবর্ত্তে সংহারই সাধিত হবে, আর আমরা সংহারই প্রত্যক্ষ করছি।

এ দেশের নারী সমাজকে বিপথগামী করবার চেষ্টাই চলছে নতুন সংস্কারের দোহাই দিয়ে, তাই আজ আমাদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সমাজ-সংসার শুধু বিপন্ন নয়, ভগ্ন অবস্থায় এসে দাঁড়াচ্ছে। মধ্যযুগে বাংলার নারী সমাজ নানাভাবে ধর্ষিত, লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হয়েছে। বর্ত্তমান সভ্যযুগে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ব্বর যুগের আবির্ভাব হয়েছে, তাতে আর্য্য সভ্যতার আদর্শ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে পড়েছে, এসেছে ঘোর দুর্দ্দিন। মেয়েরা জীবিকা অর্জ্জনের পথ পেয়েছে বটে, কিন্তু নারীত্বের মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে বসেছে নানা প্রলোভনে পড়ে, ফলে তাদের অনেকেই স্বামীর ঘর করে না, বিবাহ করতে অনিচ্ছুক, মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে বিমুখ ও সমাজ গঠনে উদাসীন। বক্তৃতায় অনেককে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে দেখা যায়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে যখন আলোচনা করা যায় তখন মুখ হেঁট করতে হয়। এই সব সমাজবাতী উচ্চ-শিক্ষিতা নারীর প্রাদুর্ভাব সংক্রামক রোগের মত এদেশে দেখা যাচ্ছে। এরা সতীত্বকে কোন মর্য্যাদা দেয় না—এরা ইন্দ্রিয়-লোলুপ ও অর্থগৃধ্নু। অর্থের জন্য সব করতে পারে।

তাই আজ প্রশ্ন উঠেছে—এদেশের আধুনিক নারী সমাজ চলেছে কোন্ পথে ?

ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সে মেয়েদের জীবনযাত্রা যেরূপ আদর্শ-বিহীন হয়ে পড়েছে—আর নারী পুরুষের ভেতর বিবাহ করার রীতি অপ্রচলিত হয়ে উঠেছে, অনুরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে। এবিষয়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল সমাজ-কল্যাণী ব্যক্তি, তাঁরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। আমাদের নারী সমাজ যতদিন না পাশ্চাত্যের মোহ ত্যাগ করবে, আর অনুকরণ-প্রিয়তার বশবর্ত্তী হয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বর্জ্জন করবে, ততদিন সমাজ সংসার সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে না। এ বিষয়ে আমি এদেশের সমগ্র নারী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

হাতের কাজ

কাপড়ের উপর রঙীণ নক্সা-ছাপার কাজ

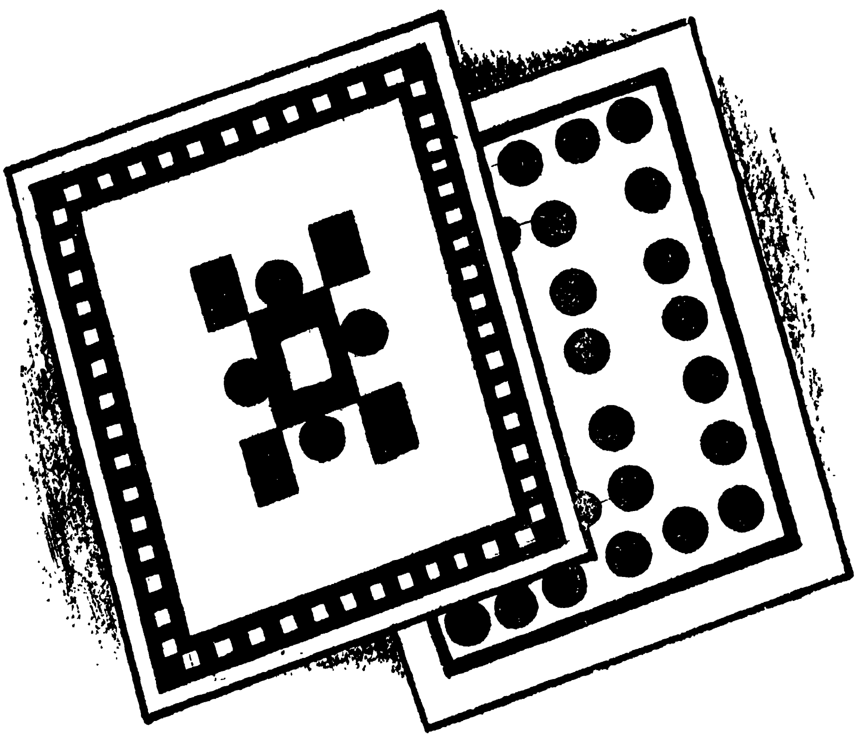
রমলা মুখোপাধ্যায়

নানা রকম কাপড়ের উপর ছুঁচ-সুতো দিয়ে বহু ধরণের সুন্দর-সুন্দর সৌখিন সূচী-শিল্পের নক্সা-কাজ ছোট-বড় প্রত্যেক সংসারের মেয়েরাই সচরাচর করে থাকেন। কিন্তু ছুঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে বিচিত্র সূচী-শিল্পের নক্সা-রচনা ছাড়াও, সুতি, রেশমী কিম্বা পশমী কাপড়ের উপর শুধু হরেক রকমের তেলের রঙ (Liquid oil colours) আর সরু-মোটা-মাঝারি ছাঁদের গোটা কতক রঙ-ফলানোর তুলি বা কাঠির সাহায্যে বিশেষ ধরণের একটি কারু-পদ্ধতিতে কত যে অভিনব-সুন্দর সব নক্সার ছাপ (Textile Pattern Printing) ফুটিয়ে তোলা যায়—সে কথা হয়তো অনেকেরই তেমন জানা নেই। আজ তাই, সূচী-শিল্পের অনুরূপ, বিচিত্র-অভিনব এই কারু-শিল্পটির বিষয়ে—অর্থাৎ, হরেক-রকমের তেলের রঙ আর সরু-মোটা-মাঝারি ছাঁদের রঙ-ফলানোর কাঠি বা তুলি ব্যবহার করে সুতি, রেশম বা পশমের কাপড়ের উপর কি পদ্ধতিতে নানা ধরণের সুন্দর-সুন্দর নক্সা ফুটিয়ে তোলা যায়—তারই কিছু মোটামুটি আভাস জানাচ্ছি। এ কাজে সূচী-শিল্পের মতো অতখানি সূক্ষ্ম শিল্প-নিপুণতা বা পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, তবে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, পরিচ্ছন্নতা আর ধৈর্য্য থাকা একান্ত আবশ্যক। আজকাল আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই মেয়েদের মধ্যে নানা-ধরণের বিচিত্র নক্সা-ছাপা শাড়ী ও জামা-কাপড় ব্যবহার করার রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এই আলোচ্য-কারুশিল্পকলাটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে ঘর-সজ্জা-শ্রী বাড়ানোর কাজে অনেকেরই হয়তো বিশেষ সুবিধা-সাশ্রয় হবে।

কাপড়ের উপর রঙের প্রলেপ দিয়ে নক্সার বিচিত্র-রঙীণ ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হলে প্রথমেই দরকার—গোটা কয়েক সরু, মোটা এবং মাঝারি ধরণের মুখওয়ালা ভালো তুলি কিম্বা মজবুত কাঠি! তুলি বা কাঠির মুখগুলি হওয়া চাই—বিশেষ দুটি ধরণের···অর্থাৎ সরু, মোটা এবং মাঝারি ছাঁদের তুলি বা কাঠি এক 'সেট' (One Set) হবে—'গোল' বা 'Round, এবং অন্য 'সেট' হবে—'চ্যাপটা' বা 'Flat'—সাধারণতঃ ছবি আঁকার কাজে চিত্রশিল্পী যে-ধরণের তুলি ব্যবহার করেন—সেই রকম ছাঁদের। তবে, এ কাজে যাঁরা বিশেষজ্ঞ—তাঁদের কারো-কারো মতে, কাপড়ের উপর নক্সা-রচনার সময় তুলি দিয়ে রঙের প্রলেপ লাগানোর চেয়ে কাঠির সাহায্যে রঙ-ফলানো ভালো। কাঠি দিয়ে রঙের প্রলেপ লাগালে কাপড়ের বুকে নক্সাটি ফোটে পারিপাটিভাবে—তুলির রঙ তেমন নিখুঁত হয় না! কিন্তু এ মতটি বিবেচনা-হীন···কারণ, এ ব্যাপারে যাঁর যেমনটি ব্যবহার করলে কাজের সুবিধা ঘটবে, তাঁর সেইমত তুলি বা কাঠি বেছে

নেওয়াই ভালো···কোনো কোনো শিল্পী তুলি বেশী পছন্দ করেন, আবার বা কারো নক্সার কারুকার্য্য কাঠির সাহায্যেই পরিপাটিভাবে ফোটে! কাজেই এ বিষয়ে কোনো ধরা-বাঁধা নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়—শিক্ষার্থীদের পক্ষে তুলি বা কাঠি দুটিই ব্যবহার করে দেখা দরকার—যাঁর যেটিতে কাজ করতে সুবিধা হবে, সেটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত! সাধারণতঃ সহরের বড়-বড় কারুশিল্প-সামগ্রী বিক্রেতার দোকানেই উপরোক্ত এইসব বিভিন্ন-ছাঁদের—তুলি বা কাঠি কিনতে পাওয়া যায়। তুলি সচরাচর পাওয়া যায়—'গোল' বা 'চ্যাপটা' ধরণের—সরু, মোটা এবং মাঝারি সব রকম ছাঁদেরই। বিশেষ এক ধরণের 'জাপানী' তুলি পাওয়া যায়—সেগুলি বাঁশের হাতল-বসানো—পেন্সিলের মতো ছুঁচালো তার মুখের দিক···সে তুলিগুলি দিয়েও অনেকে এ সব শিল্প-কাজ করেন—বিশেষ করে ছোট-ছোট 'বিন্দু-বসানো' আলঙ্কারিক নক্সার কাজ কিম্বা সমান-মাপে সুদীর্ঘ অংশে 'দাঁড়ি' (Line) রচনার কাজ! এছাড়া বাজারে রঙের প্রলেপ দেবার জন্য যে সরু, মোটা এবং মাঝারি ছাঁদের কাঠিগুলি পাওয়া যায়—সেগুলির মুখ হয় নানা ধরণের—গোল, চ্যাপটা, ত্রিভুজাকৃতি, চতুস্কোণ, অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রভৃতি! সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় বিভ্রাটের ফলে, বাজারে এ সব কাঠি দুষ্প্রাপ্য হলে, সামান্য পরিশ্রম করে প্রয়োজনমত আকারে নিজেরাই কিম্বা কোনো সূত্রধরের সাহায্যে বানিয়ে নিতে পারেন তো সেগুলির সাহায্যে অনায়াসেই কাপড়ের বুকে পরিপাটিভাবে রঙ-ফলিয়ে নক্সা-রচনা করা চলবে—কাজের কোনো অসুবিধা ঘটবে না এবং অর্থের সাশ্রয়ও হবে অনেকখানি।

সুতি, পশম কিম্বা রেশমী কাপড়ের উপর পছন্দমত ছাঁদে নক্সা-ফোটানোর জন্য প্রয়োজন—লাল, নীল, হলদে, শাদা, কালো প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের তেলের রঙ অর্থাৎ 'Liquid oil colours'! এ সব রঙও ছোট-বড় কৌটায় ভরে কিম্বা খুচরোভাবে কিনতে পাওয়া যায়। সহরের যে কোনো ভালো রঙের দোকানে কম-বেশী সব রকম দামের দেশী বিলাতী নানা প্রতিষ্ঠানের তৈরী তেলের রঙ মিলবে। এমন কি, প্রয়োজন হলে, রঙের দোকান থেকে বিভিন্ন বর্ণের গুঁড়ো রঙ কিনে এনে বাড়ীতে খানিকটা 'তিষির তেল' (Linseed Oil) ও 'তার্পিন তেল' মিশিয়ে সে-রঙ ভালো করে গুলে নিলে, তাই দিয়েও চমৎকার শিল্প-কাজ করা চলবে। তবে সে রঙের জৌলুষ হয়তো অনেক সময়ে দোকান-থেকে-কেনা ভালো দেশী-বিলাতী প্রতিষ্ঠানের তৈরী কৌটায় 'প্যাক্' (packing) করা রঙের মতো ততটা বেশী খুলবে না—এমন সম্ভাবনা আছে।



এ সব সরঞ্জাম ছাড়াও প্রয়োজন—পরিষ্কার কয়েকখানি 'ব্লটিং-কাগজ' (Blotting Paper), আর কয়েকটি বনাত, কম্বল কিম্বা 'ফেল্ট' (Felt) কাপড়ের টুকরো,

গোটাকতক 'আলপিন' (Paper-Pins) ও 'কাগজ-আঁটা ক্লিপ' (Paper-Clips) বা 'ড্রইং-পিন' (Drawing Pins) এবং বড় সাইজের কাঠের একটি পাটা (Wooden Board)।

এ কারু-শিল্পটি শেখবার সময়, গোড়ার দিকে সাদা-সিধা সহজ ধরণের নক্সা-রচনা করে হাত পাকানোর পর, শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই বড়-বড় কাপড়ের উপর জটিল ও সূক্ষ্ম ধরণের শিল্প-কাজ করতে পারবেন। এ কাজে খানিকটা দক্ষতা লাভ করলে, রুমাল, মেয়েদের ব্লাউজ ও চেলীর কাপড়, ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক-আশাক, জানলা-দরজার পর্দ্দা, বিছানা-ঢাকা, সোফা-কৌচের ঢাকা, টেবিল-ক্লথ, কুশন, টি-কোজি (Tea Cosy), হাত-ব্যাগ প্রভৃতি নানা ধরণের জিনিষপত্রের কাপড়ে নক্সা-চিত্রণের আলঙ্কারিক-শিল্পকাজ করে অল্প-আয়াসে ও সামান্য খরচেই ঘর-সংসারের শোভা বাড়ানো সম্ভব হবে।

সূতির 'ম্যাটী' (Matte), মার্কিন লংক্লথ, পপলিন, শালু প্রভৃতি কাপড়, আর রেশমী, জর্জ্জেট, ক্রেপ-ডি-সিন, গরদ, তসর, এণ্ডি, কেরেণ্ডী, বাফ্‌তা ধরণের খস্‌খসে কাপড় এবং পশমের তৈরী 'বনাত' (Felt), কম্বল, 'ফ্ল্যানেল' (Flannel) প্রভৃতি মোটা খসখসে ধরণের কাপড়ের উপরে এ সব নক্সা-ছাপার কাজ মোলায়েম-মিহিকাপড়ের চেয়ে ভালো ফোটে এবং আরো বেশী মানানসই হয়। তবে মিহি-ধরণের সূতি, রেশম বা পশমের কাপড়ের উপরে তেলের রঙ ছিয়ে নক্সা-রচনার কাজ যে অসম্ভব—এমন কথাও বলা চলে না। কাজেই কোন ধরণের কাপড়ের উপর তেলের রঙ দিয়ে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে নক্সা-ছাপা চলবে—সেটি বিচার করার বিশেষ একটি উপায় জানিয়ে রাখি। রঙ-তুলি নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করবার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার—যে-কাপড়ে নক্সা তুলছেন, সে-কাপড়ে ছাপা হলে নক্সাটি ধেবড়ে যাবে কিনা। খসখসে মোটা কাপড়ের উপরে



সাধরণতঃ মসৃণ-কাপড়ের চেয়ে খস্‌খসে ধরণের কাপড়ের উপরেই তেলের রঙ দিয়ে নক্সা-চিত্রণের কাজ ভালো হয়। সেজন্য খদ্দর বা ঐ ধরণের তাঁতের কাপড় কিম্বা মিলের তৈরী

ছাপ তোলাবার জন্য যে-নক্সা, সেটিকে ব্লটিং-কাগজে প্রথমে ছাপুন। ছাপবার পর যদি দেখেন ব্লটিং-কাগজে সে-নক্সাটি ধেবড়ে যায় নি, তাহলে বুঝবেন—মোটা

খসখসে কাপড়ের উপরেও এ ছাপ ধ্যাবড়াবে না। মিহি বা পাতলা কাপড়ের উপরে যে-নক্সা ছাপতে চান—সেটি পরখ করতে হবে ট্রেসিং-পেপার (Tracing paper) কিম্বা খুব পাতলা কাগজের উপর সে-নক্সার ছাপ তুলে। এ ক্ষেত্রেও যদি দেখেন—কাগজের বুকে নক্সার ছাপ ধ্যাবড়ায়নি, তাহলে নিরাপদে সে-কাপড়ে নক্সা ছাপুন। মোট কথা যে-কাপড়ের বুকে যে-নক্সাই ছাপুন, খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবেন—নক্সার ছাপ যেন আগাগোড়া পরিষ্কারভাবে ফোটে!

আপাততঃ, কাপড়ের উপর রঙীণ নক্সার ছাপ-তোলা অর্থাৎ Tèxtile Pattern Printing এর উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বললুম! বারান্তরে, এ কাজে রঙ-ফলানোর পদ্ধতি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবো।

—

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সেমিজ

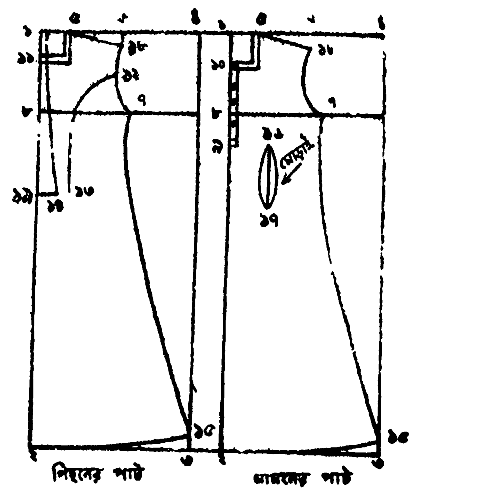
গৃহস্থ-ঘরে মেয়েদের নিত্য-প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ—সেমিজ …এবারে সেই সেমিজ-সেলাইয়ের ছাঁট-কাট সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করছি।

সেমিজ-বানানোর জন্য ভালো এবং খাপি-ধরণের মাকিন, লংক্লথ বা নয়ানসুখ কাপড় বাজার থেকে প্রয়োজন মত মাপ-মাফিক কিনতে হবে। এ সব কাপড় হয় নানা বহরের। তবে আমরা আলোচনা করছি—এক গজ (৩৬″) বহরের কাপড়ের হিসাবে—সেমিজের মাপ আর ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের কথা।

সাধারণতঃ সেমিজে 'আস্তিন' বা 'হাত' এবং গলায় 'কলার' হয় না, তবে অনেকে সল্প-হাতাওয়ালা সেমিজে গলার 'পটি' বসানো ছাঁদটি পছন্দ করেন। কেউ বা সেমিজের গলা বড় ছাঁদের করেন এবং কণ্ঠার নীচে পর্য্যন্ত 'ফ্রিল' (Frill) বা 'লেস' (Lace) দিতে চান। এগুলো অবশ্য বাহুল্য…ব্যক্তিগত পছন্দ-রুচির কথা…এ সব না দিলেও ক্ষতি নেই।

এবারে বলি—সেমিজের মাপ-জোখের কথা। সকলের শরীরের গড়ন সমান নয়—কারো শরীর দীর্ঘ, কারো বা খর্ব্ব, কারো দেহ স্থুল, কারো বা গড়ন রোগা। সেমিজের মাপ নিতে হলে আবশ্যক—'ঝুল' বা 'লম্বা', 'ছাতি', 'পুট', 'পুটহাতা', 'মুহুরী', এবং 'সেন্ত'। সেমিজ বানাতে হলে, কাপড় চাই দু-লম্বা…এইটি হলো সাধারণ নিয়ম। কাঁধ থেকে হাঁটুর খানিকটা নীচে পর্য্যন্ত মাপ হলো—'ঝুল' বা 'লম্বা'। ৪০″ ইঞ্চি + ৪″ ইঞ্চি = ৪৪″ ইঞ্চি + ২″ ইঞ্চি = ৮৮″ ইঞ্চি…অর্থাৎ ২″ গজ ১৬″ ইঞ্চি মাপের কাপড়।

থান থেকে সেমিজের জন্য কাপড় কাটবেন—৮৮″ ইঞ্চি…মাপ-অনুযায়ী কাপড় কেটে তার আড়াদিকে 'ছাতি' যতখানি হবে, ততখানি 'ঘের' রেখে পুরো 'লম্বাটুকু' মুড়ে ভাঁজ করে নেবেন। কাপড়টি আগাগোড়া ভাঁজ হয়ে যাবার পর, উপরোক্ত ঐ ৮৮″ ইঞ্চি 'লম্বা' কাপড়টিকে আবার আধাআধিভাবে ভাঁজ করবেন। তারপর পাশের ছবির



মতো ধরণে, রঙীণ খড়ি বা পেন্সিলের দাগ টেনে প্রয়োজনমত মাপে কাপড়ের উপরে নক্সা এঁকে নেবেন। নক্সা-রচনার পর, ভালো কাঁচির সাহায্যে পরিপাটিভাবে ঐ রঙীণ খড়ি বা পেন্সিলের দাগে-দাগে কাপড় কাটবেন। পাশের ছবিতে—বাঁ দিকে দেখানো হয়েছে সেমিজের পিছনের 'পাট' বা 'অংশ' ছাটাইয়ের নক্সা, এবং ডানদিকের নক্সাটিতে বোঝানো হয়েছে সেমিজের সামনের 'পাট' বা 'অংশ' ছাটাইয়ের পদ্ধতি। সেমিজের সামনের 'অংশ' অর্থাৎ ডানদিকের নক্সাতে ১৬ এবং ১৭চিহ্নিত যে জায়গাটি

দেখছেন—সেখানে 'মোড়াই' বা 'কোঁচ' সেলাই দিতে হবে। সেমিজের জন্য কাপড়-ছাঁটাইয়ের সময়, ফতুয়ার মতো পিছনের এবং সামনের 'পাটে' কম-বেশী ঢিলা রাখার আবশ্যক নেই। সেমিজের কাপড়-ছাঁটাইয়ের কাজে কাপড়ের সামনের ও পিছনের ছুটি 'পাটই' সমান রাখা প্রয়োজন। সামনের ও পিছনের 'পাটের' মধ্যে তফাৎটুকু হলো—উপরোক্ত ঐ 'কোঁচ' বা 'মোড়াই' রচনার ব্যবস্থা! আপাততঃ ছবিতে দেখানো মাপ-জোপের কথা বুঝিয়ে বলি।

কাপড়ের সামনের 'পাটে' ঃ

১ থেকে ২ হলো 'ঝুল' বা 'লম্বা' + ৪" ইঞ্চি = ৪৪" ইঞ্চি।

১ থেকে ৪ হলো 'ছাতির' অর্দ্ধেক = ১৬" ইঞ্চি ;

১ থেকে ৬ হলো 'পুট + $\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি = ৮$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি ;

১ থেকে ৮ হলো 'ছাতির' $\frac{১}{৪}$ = ৮" ইঞ্চি ;

১ থেকে ১৮ হলো 'সেস্ত' = ১৭" ইঞ্চি ;

১ থেকে ৫ হলো 'ছাতির' $\frac{১}{১২}$ = ২$\frac{২}{৩}$" ইঞ্চি ;

১ থেকে ১১ হলো 'ছাতির' = ২$\frac{২}{৩}$" ইঞ্চি ;

৮ থেকে ৭ হলো 'ছাতি' + ৭" ইঞ্চির $\frac{১}{৪}$ = ৩২ + ৭ = $\frac{৩৯}{৪}$ = ৯$\frac{৩}{৪}$" ইঞ্চি ;

৬ থেকে ১৮ = ১$\frac{১}{২}$" ইঞ্চি ;

৩ থেকে ১৫ = ১" ইঞ্চি ;

১২ থেকে— = ১৮ আর ৭এর মধ্যস্থান ;

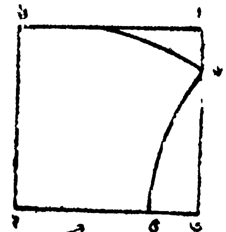
১৯ থেকে—১ = $\frac{১}{২}$" ইঞ্চি ;

কাপড়ের পিছন 'পাটে' ঃ

১ থেকে ১০ = ১ থেকে ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বেশী = ৪" ইঞ্চি ;

১ থেকে ৯ = ১০" বা ১১" ইঞ্চি ;

বাকী সব কাপড়ের পিছনের 'পাটের' অনুরূপ। কাপড় কাটবার সময় ছুটি 'পাটই' একসঙ্গে কাটতে হবে।



হাতা ছাঁটাই করার নমুনা

দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে—সেমিজের 'হাতা' (ঘটি-হাতা অর্থাৎ ঘটির আকারে হাতা) ছাঁটাই করবার পদ্ধতি। ১৭"—৮" ৯" ইঞ্চি লম্বা কাপড় নিয়ে সেটিকে আড়াভাবে চার ভাঁজ করে কাটুন…ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে।

এবারে মাপ-জোপের কথা বলি—

১ থেকে ২ = 'লম্বা' + $\frac{১}{২}$" ইঞ্চি = ৯$\frac{১}{২}$" ইঞ্চি ;

১ থেকে ৪ = 'ছাতির' $\frac{১}{৪}$ এবং 'মহড়ার' (মুখে) 'কোঁচ' দেবার জন্য ১$\frac{১}{২}$" ইঞ্চি = ৯$\frac{১}{২}$" ইঞ্চি ;

৪ থেকে ৬ = ২$\frac{১}{২}$" বা ৩" ইঞ্চি ;

২ থেকে ৫ = 'মুহুরীর' $\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$" ইঞ্চি এবং 'মুহুরীতে' 'কোঁচ' দেবার জন্য ২" ইঞ্চি = ৭" ইঞ্চি ;

কাপড় ছাঁটাইয়ের পর সেমিজ সেলাই…সেলাইয়ের কথা আসচে বারে বলবো।

ধনী কে ?

শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

সব থেকে যার কিছু নাই তা'র
সেই জেনো শুধু ধনী

বাকী আর যারা, শুধুই বেচারা
জোনাকীরে দেখে মণি!


Rexona
BLENDED WITH CADYL

সাময়িকী

বিজয়া অভিবাদন—

শ্রীশ্রী৺মহাপূজার পর আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকল বন্ধুকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা প্রভৃতি জ্ঞাপন করি ও ৺মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই, সকলের জীবন উজ্জ্বলতর ও মধুরতর হউক। এই শারদীয়া মহাপূজা বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে নূতন জীবন ও শক্তিদান করিয়া থাকে। বৎসরের সকল বিবাদ বিভেদ ভুলিয়া বাঙ্গালী নবোদ্যমে এই সময় কার্য্যারম্ভ করে। আজ বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি নানা ভাবে বিপন্ন—শক্তিময়ীর আশীর্বাদ যেন সকলকে সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণের শক্তি দান করে। বাঙ্গালী যেন আগামী বৎসরে তাহার পূর্ব-গৌরব পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হয়।

প্রধানতম ঘটনা—

ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু আমেরিকায় রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ অধিবেশন যোগদান করার পর গত ১১ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বহু আশা লইয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলি এখন দুই দলে বিভক্ত—(১) ইঙ্গ-আমেরিকা দল (২) চীন-সোভিয়েট দল। সোভিয়েট নেতা মঃ ক্রুশ্চেভ আমেরিকায় যাইলে তথায় আমেরিকান সরকার তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। শ্রীনেহরু দুইটি বড় শক্তির মিলন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি শক্তি লইয়া একটি তৃতীয় দল গঠন করিয়া—নূতন তৃতীয় দল কর্ত্তৃক উক্ত দুইটি শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত ছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি আমেরিকা বা সোভিয়েট-রুসিয়া কোনপক্ষের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার তৃতীয় দল-গঠন চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিন দল তাঁহার প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, তাহার পরিচয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছেন। তিনি ফিরিবার পথে যখন লণ্ডনে আসেন, তখন ইংরাজ সরকারের কোন মন্ত্রী বিমান-ঘাটিতে তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। আমেরিকায় শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন হইবে, কাজেই বর্ত্তমান সভাপতি আইসেনহাওয়ার পরবর্ত্তী সভাপতি হইবেন কি না তাহার স্থিরতা নাই—সেজন্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মার্কিণ প্রেসিডেন্টের ভূমিকা জোরালো ছিল না। শ্রীনেহরু ফিরিবার পূর্বে রুশ-নেতা শ্রীক্রুশ্চেভের সহিত তিনঘণ্টা আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। তথাপি দিল্লীতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন দেখা গিয়াছিল। অবশ্য তিনি সহজে কিছুতে অভিভূত বা ভীত হন না। তাঁহার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সমস্যায় ভারতকেই শান্তি-দূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। তিনি ফিরিয়াও সে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। তবে ইঙ্গ-মার্কিণ দল ত্যাগ করিলে যেমন পাকিস্তান হইতে ভারতের বিপদ আসা স্বাভাবিক, তেমনই রুসিয়াকে ত্যাগ করিলে রুসিয়ার পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া চীন ভারতকে আক্রমণ করিবে। নেহরুকে আজ সে কথাও চিন্তা করিতে হইতেছে। চীন কর্ত্তৃক তিব্বত দখলের পর চীনারা নেপাল, ভুটান ও সিকিম কুক্ষীগত করিয়াছে, ভারত সীমান্তে হানা দিয়া ভারতের একাংশ দখল করিয়া বসিয়া আছে—যে কোন মুহূর্তে সুযোগ পাইলে ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শ্রীনেহরুকে সর্বদা এই বিপদের কথা স্মরণ করিয়া চলিতে হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীনেহরুর পক্ষে নিরপেক্ষ-নীতি রক্ষা করা কতদিন সম্ভব হইবে, তাহা সকলের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আজ ভারত যে কোন একটি বিবদমান দলে যোগদান করিবামাত্র পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া স্বাভাবিক হইবে। শ্রীনেহরু কখনই তাহা হইতে দিবেন না—কাজেই তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিয়া এখন নানা অসুবিধা

কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। শ্রীনেহরুর, কার্য্যের সমালোচনা করার সময় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির এই অবস্থার কথা চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

ভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব—

স্বর্গত নেতা সর্দার বল্লভভাই পেটেলের সাহায্য লাভ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের নেতা শ্রীজহরলাল নেহরু সমগ্র ভারতকে এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু গত কিছুকাল যাবৎ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভারতকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। রাজ্যগুলির নানা কারণে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হওয়ায় ক্রমে ক্রমে সে বিভাগ সম্পাদিত হইয়াছে। মাদ্রাজে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বায়ে স্বতন্ত্র গুজরাট রাজ্য প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি ভাষা সমস্যা লইয়া আসামে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখনও শান্ত করা সম্ভব হয় নাই। উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কেরল প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা রক্ষা করা ক্রমে কঠিন হইতেছে। উড়িষ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ও উত্তরপ্রদেশের স্বামী সম্পূর্ণানন্দ মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। আসামেও শ্রীচালিহার পক্ষে মন্ত্রিসভা বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইয়াছে। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে কংগ্রেস-সভাপতি করিয়া শ্রীনেহরু তাঁহার উপর এ সকল সমস্যার সমাধানের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঢেবর ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের অন্যতম সুপণ্ডিত ও ধীরবুদ্ধি নেতা শ্রীমন্ নারায়ণ প্রভৃতি শ্রীরেড্ডীকে তাঁহার কার্য্যে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেছিলেন। কিন্তু সমগ্র ভারতের বহু স্থানে আজ কংগ্রেসের মধ্যে তথা মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ সকলকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতে কোন কংগ্রেস বিরোধী দল শক্তিশালী হইতে পারে নাই। কম্যুনিষ্ট দল এক কেরল ছাড়া আর কোন রাজ্যে দানা বাঁধিতে পারে নাই। পি-এস-পি দলে বহু শক্তিশালী কর্মী থাকিলেও সে দলকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নগণ্যই বলিতে হইবে। কাজেই কংগ্রেস আজও ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান দল থাকিয়া সকল অধিকার একচেটিয়াভাবে দখল করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ঘরোয়া বিবাদ না মিটিলে এ অবস্থা আর অধিক দিন স্থায়ী থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বাংলার মেয়ে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ও শ্রীমতী আভা মাইতি ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতমা সম্পাদক হইলেও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নিকট উপযুক্ত সমর্থন বা সাহায্য লাভ করেন না। কাজেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যও শ্রীনেহরুকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য অধিকতর শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। তাহা না হইলে ভারতের মধ্যে কংগ্রেস দলের বা মন্ত্রীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীনেহরুর মত শক্তিশালী লোক দেশ-শাসন অপেক্ষা কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি কিছুদিনের জন্য অধিক মনোযোগী হইলে দেশের অধিক উপকার হইবে। ভারতের শাসন ব্যবস্থার ভার বরং অপর কাহারও পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হইবে না।

আসামের সরকারী ভাষা—

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আসাম যাইয়া নির্দেশ দিয়া আসিয়াছেন যে হিন্দী ও আসামী উভয় ভাষাকেই আসামের সরকারী ভাষা করিতে হইবে—তদনুসারে আসাম মন্ত্রিসভা এক প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়া তাহা আসাম বিধান-সভায় পেশ করিয়াছেন। কিন্তু আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভায় গত ১২ই অক্টোবর স্থির হইয়াছে যে শুধু অসমীয়া ভাষাই আসামের সরকারী ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। ফলে আসামে এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বত্র হিন্দী ভাষাকে অহিন্দী-ভাষীদের উপর চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন—ফলে অহিন্দী-ভাষী ভারতীয়গণ আজ নিজেদের বিপন্ন মনে করিতেছেন। আসামকে এই ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দলাদলির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। চাকরীর খাতিরে আসাম মন্ত্রিসভা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন—কিন্তু কংগ্রেস নেতারা সে অন্যায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সে জন্য আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীকে অভিনন্দিত করি।

তুষার মানবের পদ-চিহ্ন—

নন্দাঘুন্‌টি হিমালয় অভিযাত্রী দলের সহগামী আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ১৬ই

অক্টোবর থারগাট্টা শিবির হইতে জানাইয়াছেন—প্রায় ১৪৮০০ ফিট উচ্চ বৃষ্টি হিমবাহের কাছে নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রী দলের কয়েকজন সদস্য রহস্যময় তুষার-মানবের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। দলের ১নং শিবির ১৫০০০ ফিট উচ্চে স্থাপন করা হইয়াছে। সেখান হইতে ৫০০ গজের মধ্যে ঐ পদচিহ্ন দেখা গিয়াছে। বহু দিন ধরিয়া ঐ পদ-চিহ্নের সন্ধান করা হইতেছিল। এখন তুষার-মানবের সন্ধান পাইলে হয়।

তৃতীয় যোজনায় শিক্ষা ব্যবস্থা—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে যে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহাতে ২টি নূতন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২৩টি পলিটেকনিক স্কুল, ৮৭২টি লাইব্রেরী, ১টি নূতন ধরণের যাদুঘর ও অন্ধদের জন্য আর একটি বিদ্যালয় হইবে। কলিকাতার বর্তমান মূক-বধির বিদ্যালয়কে সরকারের অধীনস্থ করা হইবে। ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইবে। ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ১৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। দ্বিতীয় যোজনায় শিক্ষা খাতে মোট ২৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ছিল। তাহার কত অংশ এ পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। শিক্ষার ধারা পরিবর্তিত না হইলে পুরাতন ধারায় শিক্ষাদান বর্তমানে আদৌ কার্যকরী হইতেছে না। শিক্ষা-বিভাগের পরিচালকগণের সর্বদা সে কথা স্মরণ করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

উত্তরপ্রদেশে বন্যা—

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে উত্তর প্রদেশের ৯টি জেলায় এক অভূতপূর্ব বন্যার ফলে ঐ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী দারুণ বিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ সহরে ১০।১৫ ফিট জল জমিয়া যাওয়ায় একতলা বাড়ী সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। ফরক্কাবাদ, মৈনপুরী, এটোয়া, হারদই, সাহাজাহানপুর, পিলিভিত ও সীতাপুর—এই ৭টি জেলা প্রথমে বিপন্ন হয়—ক্রমে জৌনপুর ও সুলতানপুর জেলাও জলমগ্ন হইয়াছে। ৮।১০ লক্ষ একর চাষের জমী জলমগ্ন হওয়ায় সে সকল স্থানের রবিশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও গোরক্ষপুরে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক—২ লক্ষের অধিক গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই দারুণ দৈব দুর্ঘটনায় উত্তরপ্রদেশবাসী সকলেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। অবশ্য কংগ্রেস সরকার সাহায্য দান ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে বহু অবাঙ্গালী আসিয়া বাস করিতেছে। বর্তমানে অধিকাংশ কারখানা অবাঙ্গালী-কর্মীতে পূর্ণ। অথচ বেকার বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কল-কারখানাগুলির অধিকাংশের মালিক অবাঙ্গালী—কাজেই সেখানে সর্বদা বাঙ্গালী তাড়ানো হয় ও অবাঙ্গালী যাইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করে। এ সমস্যা আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা। সে জন্য গত ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থায় মাসিক ৩৫০ টাকার কম বেতনের সকল পদে কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগ-কেন্দ্রগুলিতেও যাহাতে ঐ ব্যবস্থা চালু হয়, সে জন্য সরকার অগ্রসর হইবেন। ৩৫০ টাকার অধিক মাসিক বেতনের পদগুলিও যাহাতে বাঙ্গালীরা লাভ করে, সে জন্যও সরকার অবহিত থাকিবেন। সত্বর এই ব্যবস্থা বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে—অর্থাৎ অতঃপর কোন নূতন নিয়োগের সময় অবাঙ্গালী বাদ দিলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা কিছুটা কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী বলিতে যাহাতে অবাঙ্গালী না বুঝায়, সে জন্য সরকারের সত্বর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা দরকার।

কৃষির উন্নতিকল্পে ৬২৫ কোটি টাকা—

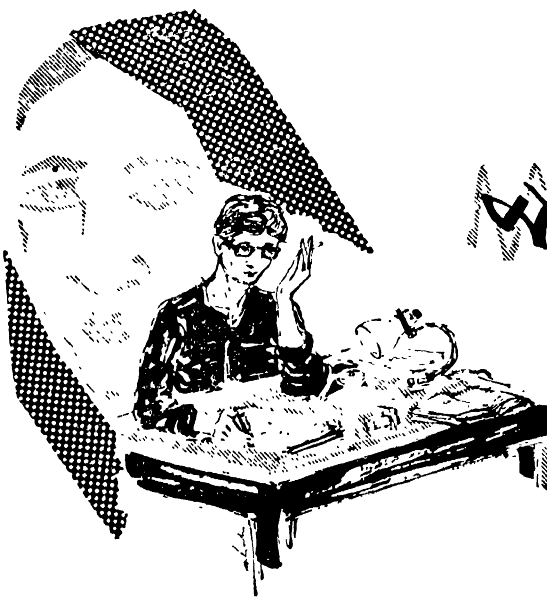
ভারতবর্ষের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য মোট ৬২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত ১৬ই অক্টোবর দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীশ্রীমন নারায়ণ এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে ভারতবাসীদের জন্য বিদেশ হইতে আর খাদ্য আমদানী করিতে না হয় ও ভারতবাসীরা যাহাতে ভারত-জাত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পায়, সে জন্যই এই ব্যবস্থা। দুঃখের কথা, আজও বিদেশ হইতে গম ও চাল আনিয়া আমাদের পেট ভরাইতে হয়। অন্যান্য খাদ্যের কথা না বলাই ভাল। দুধ, ফল প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য ৩২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল—তৃতীয় পরিকল্পনার পর যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, সে জন্য কমিশনের সদস্যরা উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু শুধু টাকা হইলেই হইবে না, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম করিয়া এই অর্থের সদ্ব্যয় ও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

॥ বনমানুষের খেদ ॥

·· আজকাল মানুষের এই ঝগড়া-মারামারি করে অশান্তি-সৃষ্টির লালচ্ দেখে, মানুষকে আমাদের বংশধর বলে পরিচয় দিতে লজ্জায় মরে যাই !···



—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা



সেতুর ওপারে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪

পরদিন উৎপল সকাল সকাল নাওয়া-খাওয়া সেরে নিল।

নীলিমা তার কাণ্ড দেখে একটু অবাক হয়ে বলল, 'ব্যাপার কি। এত তাড়া কিসের আজ। কোন ইণ্টারভিউ টিণ্টারভিউ আছে নাকি আজ?'

উৎপল ভেবেছিল বউদির কাছে সব কথা গোপন করবে। মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকেনা। তারা বড় মুখ-পাতলা। তাই এই ঠিকে কাজের কথা উৎপল বউদিকে মোটেই জানাবেনা। যদি বা জানায় কাজটা বেশ কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে জানাবে।

কিন্তু খেতে দেওয়ার সময় নীলিমা তাকে একটু বেশি তোয়াজ করল। বলা নেই কওয়া নেই—উৎপলের পাতে দু দুখানা মাছ তুলে দিল।

উৎপল বলল, 'একি। আমাকে আবার দুখানা মাছ দিচ্ছ কেন।'

নীলিমা বলল 'বাবারে বাবা। কৈফিয়ৎ দিয়ে দিয়ে আর পারিনে। একখানা মাছ বেশী হয়েছে তোমাকে দিলাম: তোমার তো অপর তরকারি-টরকারি চলেনা। সোনা বাঁধানো মুখ নিয়ে খাচ্ছো। পাতে কিন্তু ভাত রেখে যেতে পারবে না।'

মায়ের কথা মনে পড়ল উৎপলের। ছেলেবেলায় তিনিও এইভাবে জোর করে খাওয়াতেন। বলতেন, 'কী যে পাখির মত খাওয়াই শিখেছিস। পেট ভরে না খেলে দাঁড়াবি কিসের জোরে।'

বউদি তাঁর দুই মেয়েকেও এমনি জোর জবরদস্তি করে খাওয়াল। এক একদিন এই খাওয়ানো নিয়ে বকাবকি মারামারি কুরুক্ষেত্র বেঁধে যায়। কিন্তু সব রূঢ়তার মূলে আছে মাতৃস্নেহ।

বউদির এই আদরটুকু আজ বড় ভালো লাগল উৎপলের। এ রকম মেজাজ তো আর রোজই থাকে না ওর। অভাব অনটনে, স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যে—কি মেয়েদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে—বেশিরভাগ দিনই ওঁর মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে। আজকের এই স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য অপ্রত্যাশিত।

তাই উৎপলের বেরোবার সময় নীলিমা যখন ফের জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ, সত্যি করে বলোতো।' উৎপল আসল ব্যাপারটা আর গোপন করতে পারলনা। সামান্য তাপে যেমন মাখন গলে উৎপলও তেমনি। সামান্য সহৃদয়তায় সে গলে যায়। বড় বড় কঠিন সঙ্কল্প ভুলে যেতে তার দেরি হয়না।

নীলিমার কথার জবাবে তাই উৎপল একটু হেসে বলল,

যাচ্ছি একজায়গায়। যদি কাউকে না বলোতো বলি।'

নীলিমা বলল, 'আহা। বলব আবার কাকে। বলবার যেন কত মানুষ আছে আমার। অত গোপনের কী আছে শুনি। বলোই না কী ব্যাপার।'

উৎপল বলল, 'তাহলে শোন। এও একরকমের চাকরি। তবে পার্মানেন্ট না—ঠিকে,একসট্রা টেম্পোরারি। যেমন ঠিকে ঝি রাখো, আমিও তেমনি একজায়গায় ঠিকে লেখকের কাজ নিয়েছি।'

তারপর সতীশঙ্কর রায়ের জীবনী লেখার ব্যাপারটা উৎপল যথাসাধ্য নীলিমাকে বুঝিয়ে বলল। নীলিমা অবাক হয়ে বলল—'বড়লোকের কত খেয়ালই থাকে। আর টাকা থাকলে সব খেয়ালই মেটানো যায়। মানুষ মরে গেলে তার কীর্তি কাহিনী গাইবার জন্যে আবার লেখক ভাড়া করে নেয় এতো কখনো শুনিনি বাবা।' ভাড়াটে লেখক কথাটা নিজের কানেই একটু লাগল উৎপলের। কিন্তু খোঁচাটুকু গায়ে না মেখে হেসে বলল, 'ওরকম বেয়াড়া সখ কারো কারো থাকে বউদি। এই যেমন ভগবান না করুন —তুমি যদি আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যাও—

নীলিমা হেসে বলল, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক উৎপল। তেমন সুদিন কি আর তোমাদের হবে।'

উৎপল বলল, 'ধরো সেইরকম দুদিন যদি আসে চোখের জল মুছতে মুছতে দাদাই হয়তো আমাকে বলবে— তোর বউদির একখানা জীবনী লিখে দেতো।

নীলিমা বলল, 'ওরে বাবা! আমার জীবনী লিখবার ভার যদি তোমার হাতে পড়ে তুমি কী লিখবে তা আমার জানা আছে। আমার কী কী নিন্দা করবে শুনি।'

উৎপল হাসতে লাগল, 'সে যা একখানা গ্রন্থ হবে। প্রথমেই তো শুরু করব শ্রীমতী নীলিমা সেন একজন পরম কলহপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তাঁহার মেজাজ রুক্ষ এবং খিট্‌খিটে হইয়াই থাকিত। মুখের মধ্যে সদাসর্বদা এক-খণ্ড হরিতকি লইয়া কথা বলিতেন। তাই তাঁহার কথার মধ্যে তিক্ত ও কষায় রস থাকিত। তবে তিনি জীবনে একটি পুণ্য কর্ম করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার দেবরকে এক টুকরোর জায়গায় দুই টুকরো মাছ খাওয়াইয়াছিলেন।

নীলিমা বলল, 'ওরে নেমকহারাম মাত্র একদিন! নতুন বউদি এসে তোমাকে এক বেলার বেশি মাছ খেতে দেবে না। সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

উৎপল বলল, 'রক্ষে কর বউদি, নতুন বউদির এক্স-পেরিমেন্ট করে আর দরকার নেই। দুবেলা তোমার হাতের রান্না খেয়ে দিব্যি আছি, আর কোন পরিবর্তন টরিবর্তন পোষাবে না।' নীলিমা হেসে বলল, 'হুঁ। ওসো মুখের কথা। আসলে নতুন এক জোড়া হাতের জন্যে মনে মনে হা পিত্যেস করে বসে আছ, তা কি আর জানিনে? তোমার দাদাকে বললেই পারো।

উৎপল এইবার জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে বেরিয়ে এল। বউদির সঙ্গে সরস মধুর ব্যবহারটুকু তার সমগ্র অস্তিত্বকে যেন আজ সুষমায় ভরে দিয়েছে। রোজ তো এমন হয়না। রোদে ভরা রাজপথ—তার লোকজন যান-বাহনের স্রোত— যেন আজ নতুন করে চোখে পড়ল উৎপলের। দক্ষিণমুখী এইট, বি বাসে উঠে জানালার ধারে একটি সীট পেয়ে উৎপল আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মিসেস রায়ের বাড়িতেই যাচ্ছে উৎপল। আসলে সতীশঙ্কর রায়ের বাড়ি। কিন্তু তিনি তো আর নেই। তাঁর উত্তরাধিকার এখন তাঁর স্ত্রী পুত্রে এসে পৌঁচেছে। পাড়ার সবাই এখনও নিশ্চয়ই বাড়িটাকে সতীশঙ্কর রায়ের বাড়ি বলেই জানে এবং সেই নামেই পরিচয় দেয়। উৎপলের মনে পড়ল— তার বাবার মৃত্যুর বহুদিন পরেও তাদের চিঠিপত্র গাঁয়ের বাড়িতে C/o Late Umesh Chandra Sen এর ঠিকানায় আসত। অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস না করেও বলা যায়—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একটি মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। একজন সাধারণ মানুষও তার স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন কি আরো দুয়েকজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুর মধ্যে বেঁচে থাকে। মরবার সময় এইটুকু আশা নিয়ে মরে যে আর কেউ না রাখুক তার স্ত্রী পুত্র তাকে মনে রাখবে। যাদের সে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়েছে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ভালোবেসেছে এই কৃতজ্ঞতাটুকু তারা স্বীকার করবে। তার দোষের কথা মনে রাখবে না, শুধু গুণটুকু স্মরণ করবে। সমস্ত অপরাধের বোঝা গুণময় ভাস্বর হয়ে বেঁচে থাকতে ত চায়। বিপুল পৃথিবী উদাসীন নিষ্ঠুর। স্মৃতি-ভ্রংশতাই তার স্বভাব। শুধু কয়েকটি অন্তরঙ্গ মানব-মানবীর মধ্যে সে একটি কৃতজ্ঞচিত্ত সহৃদয়া পৃথিবীকে

দেখতে পায়। আর এই আশা নিয়ে চোখ বোঁজে—সেই মধুময়ী মমতাময়ী মৃণ্ময়ী পৃথিবী তার মৃত্যুর পরেও অবলুপ্ত হবে না।

উৎপলের মনে হল মিসেস রায়ের পক্ষে তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে নিষ্কলুষ করে রাখবার সাধ খুবই স্বাভাবিক। যে বউদির সঙ্গে সে এতক্ষণ ঠাট্টা তামাসা করে এল, তাঁর যদি সত্যিই অকাল-মৃত্যু হয় উৎপল কি তাঁর নিন্দা-মন্দ করে কিছু লিখতে পারবে? কিন্তু গড্ ফরবিড—তার দাদার যদি কিছু একটা হয় সে কি প্রকাশ্যে দাদার ক্ষুদ্রতা হীনতা নারী সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার কথা বলতে পারবে, কি লিখতে পারবে? সব দোষত্রুটি অপরাধ সে কি তখন একটি সিন্দুকে বন্ধ করে তার গুণ, তার স্নেহ-ভালোবাসারই প্রশস্তি করবে না? সে যা তার দাদার সম্বন্ধে করত, মিসেস রায় তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে ঠিক তাই করতে চাইছেন। স্বামীর একটি অক্ষরময় রূপ এমন করে ধরে রাখতে চাইছেন যা দেখে লোকে মুগ্ধ হবে, শ্রদ্ধান্বিত হবে। হোক তা মিথ্যা। কিন্তু তাকে অবলম্বন করে মানুষের যে শ্রদ্ধাপ্রীতি আর সৎকর্মের প্রেরণা উদ্রিক্ত হবে তাতো আর মিথ্যা নয়।

কিন্তু মিসেস রায়ের পক্ষে যা করাতে চাওয়া স্বাভাবিক, উৎপলের পক্ষে তা করা সঙ্গত কিনা এ সংশয় তার এখনো মিটছে না। সতীশঙ্কর রায় উৎপলের দাদা-বউদির মত অখ্যাত অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ নন। এই সহরের এবং সহরের বাইরেও বাংলাদেশের অনেকেই তাঁকে চেনে। তাঁর দোষগুণ সৎকর্ম-অপকর্মের খোঁজ খবর রাখে। উৎপলের দাদাই যেমন কাল কত কথা বললেন। এই সেদিন পর্যন্ত সতীশঙ্কর রায় বেঁচে ছিলেন। তিনি দূর-কালের মানুষ নন যে তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মের ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ পড়েছে। এই সতীশঙ্করকে সে যদি রাম কি যুধিষ্ঠির কি একালের রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় হিসাবে বর্ণনা করে লোকে কি হাসবে না? উৎপলকে ভাড়াটে লেখক বলে উপহাস করবে না? তার পরিচিত জগৎ মোটেই বৃহৎ নয়, তবু যে কজন পাঠকপাঠিকা তার আছে, যে কজন লেখক বন্ধু তার আছে, তারা কি মুখ টিপে হাসবেনা, মনে মনে উৎপলকে ধিক্কার দেবেনা? একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে খাদ্যে পানীয়ে ওষুধে ভেজাল দেওয়া যে ধরণের অপরাধ, একজন লেখকের পক্ষে ইতিহাসকে—হোক সে সমসাময়িক কালের একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস—তাতে বিকৃত করা, তথ্যকে অসত্যভাবে উপস্থিত করা—ঠিক সেই ধরণেরই নৈতিক অপরাধ। তার শাস্তি হোক আর না হোক, ধরা পড়ুক আর না পড়ুক। বইটি ইচ্ছা করলে ছদ্মনামের আড়ালে প্রকাশ করতে পারে উৎপল তাহলে হয়তো হাতে হাতে আর ধরা পড়বার ভয় থাকবেনা। কিন্তু বাইরে কারো কাছে ধরা না পড়লেও নিজের বিবেক যে তার চুলের মুঠি ধরে থাকবে উৎপল—তা এড়াবে কি করে! আর কেউ না জানুক, অন্তত একজন মহিলা—যিনি সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী তিনি—জেনে রাখবেন যে টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। দারোয়ান, ড্রাইভার, চাকরের মত টাকার দামে লেখকও বিক্রীত হয়। না, অন্তত একটি নারীর কাছে—যে নারীর সৌন্দর্যকে সে মনে মনে পুরুষ হিসেবে উপভোগ করেছে তাঁর কাছে—সে মাথাখানি অবনত হতে পারবে না, বরং তাঁর কাছ থেকে নেওয়া চেকখানা তাকে ফেরৎ দিয়ে বলবে, 'মাফ করুন, আমার দ্বারা ও কাজ হবেনা। আপনার ফরমায়েস মত আপনার স্বামীকে আমি গড়ে দিতে পারবনা।'

ভদ্রমহিলা হয়তো ওর কথা শুনে, তার ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হবেন, ভাববেন লেখকেরা—ছোটই হন আর বড়ই হন—এইরকম খামখেয়ালীই হয়ে থাকেন। তাঁরা যেমন লেখেন আর মোছেন, লেখেন আর ছেঁড়েন, তেমনি হাঁ কে না করেন, না কে হাঁ করেন। কোন লেখকই একক নন। সব সময় নিজের মধ্যে দুটি সত্তা নিয়ে তাঁর বাস। এক মুহূর্ত্তে সৃষ্টি—পরমুহূর্ত্তে বিনাশই এই তাঁর স্বভাব।

উৎপল আজ মিসেস রায়ের কাছে চলেছে বটে, কিন্তু কাল যে ব্যবস্থা করে এসেছিল আজ তাকে নস্যাৎ করে দিতে চলেছে। এই যুক্তির কথা ভাবতেও বেশ লাগছে। ওই সব জীবনীটিবনী লেখা কি তার কাজ? ওই সময় বসে বসে সে বরং একখানা উপন্যাস লিখতে পারবে। ইতিহাসের কাজে কোন দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব শুধু নিজের শিল্পগত সত্যের কাছে, নিজের শিল্পরীতির কাছে। আচ্ছা এমন হয় না, উৎপল যদি সতীশঙ্কর রায়ের

জীবনী না লিখে তাঁকে অবলম্বন করে উপন্যাস লেখে? তাঁর নাম থাকবে না, শুধু গন্ধটুকু থাকবে? একটি ফুলের গন্ধ নয়, চন্দনের গন্ধ নয়। গন্ধবহ বায়ু সবরকম গন্ধই বহন করে আনবে। জীবন যেমন আসে, উপন্যাস শিল্প যা আনতে চায়! কিন্তু চাইলেই কি পারে? খানিকটা পারে, খানিকটা পারেনা, তাই খানিকটা সে চায়, খানিকটা চায় না। জীবনের সে খানিকটা ধরে, খানিকটা ছাড়ে, খানিকটা নেয়, খানিকটা বানায়। তবু এই খানিকের মধ্যেই যে সবখানিকে ধরে দেয়। ভগ্নাংশের মধ্যে অখণ্ডতার স্বাদ আনে। রামের জীবনের ইতিহাস রামের জীবনের উপন্যাস। মহাভারত ও তাই। পাণ্ডব কৌরবের ইতিহাস নয়, তবু তাদের অপূর্ব জীবন কথা। উৎপল কি তাই করবে? মিসেস রায় তাকে কি সেই স্বাধীনতা দেবেন? এই প্রশ্নের আর একটা ভুল প্রশ্ন হল। এর বিশুদ্ধ জবাব স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না, তা কেড়ে নিতে হয়। কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কি ব্যক্তিগত মুক্তি কিছুই দাতব্য বস্তু নয়। সব নিতে হয়, নিতে জানতে হয়। প্রীতি প্রেম, বন্ধুত্ব সবই কি তাই? চেয়ে নিতে হয়, কেড়ে নিতে হয়? অমনিতে পাওয়া যায় না?

উৎপল নিজেই অবাক হল। এর মধ্যে প্রীতি প্রেম বন্ধুত্বের কথা আসে কোত্থেকে? কিন্তু সেই প্রীতিও কেউ কাউকে অমনিতে দেয় না। তার যোগ্য হলে তা আপনিই আসে। শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা সব কিছুর বেলায় প্রাপ্তির মধ্যে বাস করো। কিন্তু যোগ্যতার মানে কি? তার আদর্শ কি! মানদণ্ড কি? যোগ্য হওয়া মানে কি সৎ হওয়া? ন্যায়বান হওয়া আর হৃদয়বান হওয়া? সতীশঙ্করের বিচার কি এই নীতির কষ্টিপাথরে? কিন্তু সেই বিচারের অধিকার কি আছে? উৎপলের মত লেখক-যে সামান্য কটা টাকার জন্যে রাতকে দিন করতে যাচ্ছে, যে নিজেই প্রলোভনে লুব্ধ—সে কি অন্য লোকের কাম ক্রোধ মাৎসর্যের বিচার করতে পারে? কিন্তু সংসারে তাই করা হয়ে থাকে। যিনি বিচারক তিনি যে ন্যায়বান হৃদয়বান আদর্শবান পুরুষ হবেন, তার কোন অর্থ নেই। দেশের আইন আর তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা যদি তিনি জানেন তাহলেই যথেষ্ট, তিনি দেশের আইন দিয়ে শাসনতন্ত্র দিয়ে অপরাধীর বিচার করবেন। সেই আইনের সেই নীতি হল সামাজিক বিবেক। কারো ব্যক্তিগত আচরণ যতন—যতই অসামাজিক হোক না আর একজনের বিচারের বেলায় সে সামাজিক বিবেক বিচার নয়—সে যা হতে চায়, তার যা হওয়া উচিত তাই দিয়ে বিচার। আদর্শের মানদণ্ডে বিচার। লেখার বেলায় ও তাই। পাঠক কি সমালোচক নিজের লেখার ক্ষমতার কথা মনে রেখে একজন লেখকের রচনার বিচার করেন না। রসোত্তীর্ণতার যে মান তাঁর মনে রয়েছে সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচি—আর রসবোধের বাটখারা দিয়ে তিনি আর একজনের সাহিত্যকে ওজন করে নেন।

'এই যে বেগবাগান। এই এই বাঁধকে বাঁধকে।'

চিন্তাস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল—উৎপল নিজেকে কোন রকমে ডাঙ্গায় তুলে আনে। বাস থেকে নেমে সতীশঙ্করের বাড়ির পথ ধরল।

গেটের কাছে দারোয়ান সেলাম জানাল ভালোই লাগল উৎপলের। লম্বা-চওড়া মানুষটি এবার বুঝতে পেরেছে উৎপল একেবারে কেউ-কেটা নয়। মিসেস রায় তাকে সম্মান করেন। এটুকু বোধ হয় চৌবে কি তেওয়ারী যে উপাধিধারীই হোক সে লক্ষ্য করেছে।

সব পার হয়ে উৎপল ভিতরে গিয়ে ঢুকল। কালকের সেই বড় হল ঘর খানাতেই মিসেস রায়ের গৃহ-ভৃত্য তাকে নিয়ে বসাল। উৎপল লক্ষ্য করলে—মিসেস রায়ের গৃহসজ্জার একটু রূপান্তর হয়েছে। জানালার ধার ঘেঁষে একখানি টেবিল পাতা। সাদা সুন্দর একখানি ঢাকনিতে সেই টেবিল আবৃত। একদিকে একটিতে ফুলদানিতে নাম-না-জানা নীলরঙের মরশুমী ফুল। কাঁচের দোয়াতদানি। দুটি দোয়াত কালিতে ভরতি! মোটা একটি সবুজ রঙের হ্যাণ্ডেলে নতুন নিব পরানো। এক দিস্তা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ।

উৎপল অবাক হয়ে ভাবল এসব উপচার কার জন্যে? কে লিখবে, কী লিখবে? তবে কি মিসেস রায় অন্য কোন জীবনীকার ঠিক করেছেন?

উৎপলের বুক একবার দুরু দুরু করে উঠল।

টেবিলের সামনে যে চেয়ারটা আছে তাতে সে বসল না। অন্য একটা চেয়ারে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিসেস রায় আজ আর অন্দর থেকে উৎপলকে ডেকে পাঠালেন না। একটু পরে নিজেই এসে এই ঘরে উপস্থিত হলেন।

উৎপলের দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'নমস্কার'। এই যে আপনি এসে গেছেন।' (ক্রমশ)



অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্যোতিষালোচনা

উপাধ্যায়

লগ্নাধিপতি অষ্টম বা নিধনস্থানে থাক্‌লে অবশ্যই দুর্ব্বল হয়। কিন্তু গ্রহ বক্র হোলে এর শক্তির তারতম্য ঘটে অর্থাৎ গ্রহ বক্রী না হোলে এই স্থানে অবস্থিতি হেতু বিশেষ দুর্ব্বল হয়। বক্রগতি দ্বারা বৃহস্পতি তুলা থেকে কন্যায় এলে গোচরে তুলায় অবস্থানজনিত ফল দেবে কিন্তু জন্মকুণ্ডলীতে দেবে কন্যার ফল। শুভ অথবা পাপ গ্রহ বক্রী হোলেই বলী। কোন তুঙ্গস্থ গ্রহ অপর কোন তুঙ্গস্থ গ্রহের সঙ্গে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় কর্‌লে শুভ ফলের আধিক্য আশা করা যায়। অনেকের ধারণা এরূপ দৃষ্টি সম্বন্ধে অশুভফলই ঘটে পরস্পরের দুর্ব্বলতার জন্যে, কথাটী ঠিক নয়। লগ্নাধিপতি ষষ্ঠস্থানে অর্থাৎ দুঃস্থানে থাক্‌লে দেহভাবের ক্ষতি হয়, গ্রহ উচ্চস্থ হোলে দেহভাবের অনিষ্ট সাধন হয় না। লগ্নাধিপতি ধন ভাবে, ধনাধিপতি আয় স্থানে এবং আয়াধিপতি চতুর্থ স্থানে থাক্‌লে কোন প্রকার যোগ বলে গণ্য হয় না। মিথুনলগ্নের জাত ব্যক্তির রাশি চক্রে তুলায় রবি, বুধ, ও শনি থাক্‌লে রবির অবস্থিতির জন্য শনি বুধের সম্বন্ধ বিশিষ্ট রাজ যোগের ফল পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে না। কারণ এরা বলহীন হবে।

রাহু নবম স্থানে থাক্‌লে মানসিক শক্তির উন্নতি করে, আর বিদ্যার্জ্জনে বিশেষতঃ আইন ধর্ম্মসংক্রান্ত অধ্যয়নে সাফল্য দেয়, তা ছাড়া সমুদ্রযাত্রা ও বৈদেশিক ব্যাপারে অনুকূল হয়। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্বক্তা ও অলৌকিক স্বপ্ন দ্রষ্টা হওয়ার শক্তি লাভ হয়। চন্দ্র থেকে এই রাহু ষষ্ঠ থাক্‌লে স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় আর শরীর সুদৃঢ় করে। বিশ্বস্ত সাধু কর্ম্মচারী হ'য়ে জাতক কর্ম্মোন্নতি লাভ করে। পিতার আত্মীয় কুটুম্বদের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করে। কুম্ভে অবস্থিত মঙ্গলও বুধের ওপর ধনু রাশিতে পঞ্চমস্থানে অবস্থিত শনি পূর্ণ দৃষ্টি করলে জাতকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'বে,' একাধিক বিবাহ যোগ, দীর্ঘ ভ্রমণ বা সমুদ্র যাত্রায় বাধা বিপত্তি, ও ধন সঞ্চয়ে বাধা হ'বে। সন্তান সংখ্যা বেশী হবে না, তাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু ও ঘট্‌বে।

নীচস্থ গ্রহ বক্রী হোলে উচ্চস্থ ফলের প্রদাতা। তৃতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাক্‌লে মৃত যোগ হয়। এটী অশুভ। ষষ্ঠাধিপতি দ্বাদশে অবস্থিতি হোলে বিমলা যোগ হয়। এটী শুভ। অষ্টমে শুক্র ও মঙ্গল একত্র থাক্‌লে হাইড্রোসিল বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হয়। কুম্ভলগ্নে জাত ব্যক্তির দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি এবং দ্বাদশে শুক্র এবং লগ্নে রবি থাক্‌লে তার একশত-বর্ষ পরমায়ু হয়। এই লগ্নে জাতকের রাশিচক্রে মঙ্গল কর্কটে, চন্দ্র ধনুতে এবং শনি মীনে থাক্‌লে মঙ্গল নীচ ভঙ্গ হবে—কেন না মঙ্গলের উচ্চস্থান মকরের অধিপতি শনি চন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অবস্থিত। কোন ভাবে একাধিক গ্রহের সমাবেশ হোলে সেই ভাব সম্পর্কীয় ব্যাপারের আতিশয্য দেখা যায়। কেন্দ্রে অবস্থিত কোন ভাবে একাধিক গ্রহের সমাবেশ হোলে সেই ভাব সম্পর্কীয় ব্যাপারের আতিশয্য দেখা যায়। বুধ অষ্টমাধিপতি হয়ে বলী হোলে, শনি অষ্টমে থাক্‌লে আর বৃহস্পতি লগ্নস্থ হোলে জাতক সুচতুর গণিতজ্ঞ হয়।

বৃহস্পতি কেন্দ্রে বা কোণে, বুধ দ্বিতীয়ে বা দ্বিতীয়াধিপতি আর শুক্র বলী হলে জাতক গণিতবিদ্যায় পারদর্শী হয়। অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে হোলে দ্বিতীয়স্থান ও বুধের বলাবল দেখ্‌তে হয়। কন্যায় চন্দ্র বলী ও উত্তম ভাবে থাক্‌লে জাতক অঙ্ক, অঙ্কন ও লেখনে সুদক্ষ হয়। বিদেশযাত্রা গমন সম্পর্কে সপ্তম, নবম ও দ্বাদশস্থান বিচার্য্য। দ্বাদশে পাপ গ্রহ বিদেশ যাত্রার কারক, কিন্তু দ্বাদশস্থান বিদেশে আবাস বিষয়ে বিবেচ্য, বিশেষতঃ যেখানে লগ্নাধিপতি অবস্থিত সেখান থেকে দ্বাদশস্থানটী বিচার কর্‌লে বিদেশে আবাসিক বিষয়ের প্রশ্নোত্তর দেওয়া সহজ হবে। তৃতীয় স্থান থেকে ভ্রমণের গণনা হয় বটে কিন্তু সেটী বিদেশযাত্রা সম্পর্কে নয়। স্বদেশে ছোটখাটো ভ্রমণের ইঙ্গিত করে।

ভাগ্যাধিপতি তৃতীয় স্থানে এবং তৃতীয়াধিপতি ভাগ্যে থাক্‌লে খল যোগ হয়। এ যোগে জাতক ব্যক্তির উত্থানপতন ঘটে থাকে। ভাগ্যাধিপতি ষষ্ঠস্থানে এবং ষষ্ঠাধিপতি ভাগ্যে থাক্‌লে দৈন্য যোগ হয়। এই যোগে জাত ব্যক্তির সর্ব্বকার্য্যে বাধা ব্যর্থতা ঘট্‌বে, সে পাপ

কার্য্যে লিপ্ত হলে, মনের চঞ্চলতা ঘট্বে, আর নানাপ্রকারে কষ্ট পাবে। ভাগ্যাধিপতি লগ্নে দ্বিতীয়ে, চতুর্থে অথবা পঞ্চমে থাকলে নানাপ্রকারে কষ্ট পাবে। ভাগ্যাধিপতি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, চতুর্থে অথবা পঞ্চমে থাকলে আর এই অবস্থানের অধিপতিরা ভাগ্যে থাক্লে মহাযোগ হয়। এ যোগে জাত ব্যক্তি সর্ব্বজনপরিচিত ও সমাদৃত, ধনী ও নেতা হবে। ষষ্ঠাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি ষষ্ঠে থাক্লে দৈন্যযোগ হয়। স্ত্রীলোকের অষ্টমস্থান মাঙ্গল্যস্থান। কোন জাতিকার কোষ্ঠীতে শনি এখানে থাক্লে বিবাহে বিপত্তি, বাল-বৈধব্য, প্রণয়ভঙ্গ প্রভৃতি সূচিত করে।

যে সব ব্যক্তি ২১শে মার্চ্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল, ২৪শে অক্টোবর থেকে ২২শে নবেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর থেকে ১৯শে জানুয়ারী, আর ১৯শে জুলাই থেকে ২৩শে আগষ্টের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাদের ওপর মঙ্গলের আধিপত্য বিশেষ ভাবে দেখা যায়। মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন ও কর্কট মঙ্গলের প্রভাবজনিত দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থল। মকর ও কুম্ভ ব্যতীত যে কোন রাশিতে শনি মঙ্গলের সহাবস্থানে দেখাগেছে জাতককে চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, আর জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার কৌশলাভিজ্ঞ। জাতক কেবলই মামলা মোকর্দ্দমা, ঝগড়া ও ঝঞ্ঝাট এনে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে। জন্মকুণ্ডলীতে শনি মঙ্গল একত্র উত্তম ভাবে থাক্লে জাতক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গবেষক হয়। প্রখ্যাত রসায়নবিদ, খনি-সুদক্ষ এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় এরূপ শনি মঙ্গল যোগে। সাধারণতঃ শনি মঙ্গল ও রাহুর সংযোগেই জাতককে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হোতে হয়। চন্দ্র মঙ্গল রাহু ও শনি একত্র থাক্লে জাতক অত্যন্ত কামুক হয়ে পড়ে—তার মধ্যে দেখা যায় Oedipus Complex। পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট মঙ্গল অথবা শনি মিথুন থাক্লে আর্থিক অসাধুতা জাতকের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

চন্দ্র মঙ্গলের সহাবস্থান, দৃষ্টি বিনিময় বা পরস্পরের কেন্দ্রবর্ত্তিতা জন্মকুণ্ডলীতে থাক্লে মানসিক অবস্থার অস্বচ্ছন্দতা বা অবসন্নতা, রক্তপাত এবং শস্ত্রোপচার জীবনে হবেই। শনি-মঙ্গল এবং চন্দ্রের যোগাযোগে অপার্থিব লোকের রহস্য সন্ধানে জাতক অগ্রসর হোতে পারে—আবার পুলিশের কাজে, গোয়েন্দাগিরিতে, আর আইনে কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারে। মঙ্গল দুর্ঘটনা-কারক গ্রহ এবং শনি পঙ্গু (খোঁড়া)-কারক গ্রহ। এই দুইটী গ্রহের অশুভ সংযোগে মানুষ দুর্ঘটনায় অকর্ম্মণ্য হয়ে যেতে পারে, এমন কি তার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘট্তে পারে। শনি কারো কোষ্ঠীতে উন্নতিকারক হোলে প্রায়ই দেখা যায় ঐ জাতক বৃদ্ধ বয়সের আগে উন্নতি কর্তে পারেনা। রবি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অন্যান্য স্থানে থাক্লে যে ফল দেয়, শনিও অনুরূপ ফল দিয়ে থাকে। রবি এবং অন্যান্য গ্রহ একত্র থাক্লে রবি যশঃ সম্মান ও ধন-দাতা এবং অন্যান্য গ্রহগুলি সাধারণ ফলদাতা হয়।

চতুর্থ ও অষ্টমস্থানে মঙ্গলের, পঞ্চম ও নবমস্থানে বৃহস্পতির এবং তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির দৃষ্টি বিশেষ জোরালো। চন্দ্রের সপ্তমে অথবা তৃতীয়ে ও একাদশে শুক্র থাক্লে বাহনযোগ হয়। নবম, দশম ও একাদশ স্থানের অধিপতি চতুর্থস্থানে থাক্লে যান-বাহন হয়ে থাকে। কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অকালে অবসর গ্রহণ সম্পর্কে গণনায় গোচরের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশমস্থানে শনির অবস্থান বা দৃষ্টি অশুভব্যঞ্জক। গোচরে দশমস্থান পাপদৃষ্ট ও পাপ-পীড়িত হোলে কর্ম্মক্ষেত্রে গোলযোগ ও অসময়ে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ সূচিত হয়। অবশ্য দশা ও অন্তর্দ্দশা বিচারও করতে হবে।

মেষলগ্নের জাতকেরা স্ত্রীলোকের দ্বারা সমাদৃত হয়, জ্ঞাতিদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও পুত্রসন্তানদের জ্যেষ্ঠ হয়। এদের অল্পসংখ্যক সন্তান, অত্যন্ত ব্যয়প্রবণতার চাপে পড়ে কষ্ট পায়। বৃষ লগ্নের ব্যক্তিদের অগ্রজরা জীবিত থাকে না। একটি মাত্র মেয়ে আর অবশিষ্ট পুত্র সন্তান, মধ্য ও শেষ জীবনে সুখী হয়, স্ত্রীর অনুরক্ত। মিথুন লগ্নের জাতকের চেহারা সুন্দর। এরা অত্যন্ত কামুক, ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত হোতে পারে; জুয়া খেলার ঝোঁক, ঘর কুণো ও স্ত্রীপ্রিয়। কর্কট লগ্নের লোকেরা গর্ব্বিত, বহু স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসে, শিক্ষিত, বহুভাষাবিদ্ ও রাজ সরকারের অর্থলাভ করে। সিংহলগ্নের লোকেরা ক্ষুধায় কাতর, সামান্য ব্যাপারে অনেকক্ষণ চটে থাকে, মাতৃভক্ত ও উন্নতিশীল। কন্যালগ্নের জাতকেরা আত্মীয় কুটুম্ব বিরোধী, অল্পসংখ্যক সন্তান, চঞ্চল, দীর্ঘজীবী ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবনের সমাপ্তি। এরা ধর্ম্মপ্রবণ, শ্লেষ্মা ও বায়ুর দ্বারা পীড়িত হয়। তুলালগ্নের জাত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান, বিত্তশালী, ব্যবসায়ে পটু, ধর্ম্মপ্রবণ, উদার ও স্ফূর্ত্তিবাজ। বৃশ্চিকলগ্নের জাতকদের বাল্যকালে রোগাশরীর, দুঃখে জীবনের সমাপ্তি, মন মুখ এক নয়, ভণ্ড, ক্রুর-কার্য্যে পটু ও রাজা বা অনুরূপ ব্যক্তির প্রিয়। ধনুলগ্নের জাত ব্যক্তি সংযমী, বিদ্বান, ও বহুশত্রুবিশিষ্ট সন্তানদের ঘৃণা করবে, পণ্ডিতদের দ্বারা আদৃত হবে, নিজে কৃপণ হোলেও ঘটনাচক্রে তার ব্যয়াধিক্য ওক্ষতি ঘট্তে থাকে। এর মধ্যে ধর্ম্মপ্রবণতা আছে। মকরলগ্নের লোকেরা চতুর, মধ্যবয়সে অর্থ কষ্টভোগ করে, ভ্রমণ-প্রিয় কষ্টসহিষ্ণু, জনপ্রিয় ও বয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়। সন্তানদের জন্যে অশান্তি ভোগ করে। এরা স্ত্রীলোকর্ঘেঁষা। কুম্ভলগ্নের লোকেরা বেশী কথাবলে। এদের হৃদরোগের সম্ভাবনা। এদের পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হয়। মীনলগ্নের জাত ব্যক্তিরা শত্রুজয়ী, সম্মানিত, পণ্ডিত, রাজ-অনুগ্রহ ভাজন, সৌভাগ্যবান, কৃতজ্ঞ, যশস্বী, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।

মানব জীবনে ৩২ বর্ষটি সঙ্কটপূর্ণ, এই ভাবে ৮ বর্ষ ও ৫৯ বর্ষ আসে। এই সময়ে যদি পাপ গ্রহের দশা অন্তর্দ্দশা ও গোচর দোষ ঘটে, তাহোলে জাতকের মৃত্যু অনিবার্য্য, অন্যথা জীবন-মরণ সংশয় অবস্থায় পীড়া ভোগ করে শেষে আরোগ্য লাভ করে।

যে কোন লগ্নে জাত ব্যক্তির মেষ নবাংশ হোলে তার মধ্যে চৌর্য্য প্রবৃত্তি, দুর্ব্বল চক্ষু, পিত্ত প্রকোপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা ও নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২, ২৫, ৫০ এবং ৬৫ বর্ষে জাতককে পীড়া ভোগ করতে হবে। বৃষ নবাংশে জাতব্যক্তির কন্যাধিক্য, বৃহৎ ভুঁড়ি, বুদ্ধি ও ভোজনাভিলাষ লক্ষ্য করা যায়। ১০, ২২, ৩২ এবং ৭২ বর্ষ বয়সে বিশেষ পীড়া। মিথুন নবাংশ হোলে জাতক নম্র,

চঞ্চল, বক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, ভোগী, স্ত্রীলোকের প্রতি দৃঢ় আসক্তিশূন্য, স্ত্রীহীন ও মস্তিষ্কজীবী। ১৬, ২৪, ৩৪, ৪০ এবং ৬৩ বর্ষটি জাতকের পক্ষে মারাত্মক। কর্কট নবাংশের ব্যক্তিরা পিটুখিটে, ধনী বক্র দৃষ্টি, বিদেশ বাসে ইচ্ছুক, স্বজনপোষক ও নিজের ব্যক্তিদের দ্বারা উত্তেজিত হয়। এদের মারাত্মক বর্ষ ৮, ১৮, ২১, ২২, ৭২ ও ৮০। সিংহ নবাংশে জাত-ব্যক্তি নির্জ্জনবাসপ্রিয়, অত্যন্ত গর্ব্বিত, ক্ষীণ উদর, দুর্ব্বল দাঁত, জ্ঞানী ও মানসিক দুঃখ ভাবাপন্ন। এর ফাঁড়ার বছর ১০, ২০, ৩০, ৬০ এবং ৮২।

কন্যা নবাংশে জাত ব্যক্তিরা বাল্যে সুখী, শিল্পকলাভিজ্ঞ, যৌনসংসর্গ-শক্তি হীন, সুদর্শন, স্বল্পসংখ্যক সন্তান, পর কর্ম্মে পটু, দাতা ও বিদেশবাসী হয়। এদের দুর্ব্বৎসর ২০, ৫০ ও ৬০ তুলা নবাংশজাত ব্যক্তি দীর্ঘ-কাল একই বাড়ীতে বাস করবে না। পাতলা চেহারা, দুর্ব্বল দেহ, সন্তানের সংখ্যা অল্প, কৃপণ, শ্লেষ্মা-রোগী ও প্রায় কপর্দ্দকশূন্য হয়। এদের মারাত্মক বৎসর ৩, ২৩, ৩৮, ৫৪ ও ৭৬ বৃশ্চিক নবাংশ জাতকেরা পিতৃহীন বা অগ্রজসহোদরহীন, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর, গুপ্ত পাপকার্য্যে-রত হয়। এদের জীবন ১৩, ১৮, ২৩, ২৮, ৫৫ এবং ৭০ বর্ষে বিপন্ন হয়।

যে কোন লগ্নেজাত ব্যক্তির ধনুনবাংশ হোলে সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক, নিজের পরিশ্রমের দ্বারা বিত্তশালী, দীর্ঘ গ্রীবা, অল্পে সন্তুষ্ট, সুবক্তা ও ও ধনী হয়। এর জীবন ৪, ৫, ৯, ১৬, ৩৬, ৪৪ অথবা ৭২ বর্ষে বিপন্ন হবে। মকর নবাংশে জাতকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ্রস্ব, মন চঞ্চল, নিষ্ঠুর, দ্রুতপদচারণা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, স্ত্রীলোকের চোখে আকর্ষণীয় নয়, বায়ু প্রধান শরীর, শত্রুরা নানারকম নামকরণ করে একে অপদস্থ করে বা মনোব্যথা দেয়। ১৯, ২৭, ৩৪, ৪৯, ৫৪ অথবা ৬৮ বর্ষে এর জীবন সঙ্কট অবস্থা।

কুম্ভনবাংশে জাত ব্যক্তি নিষ্ঠুর, প্রতারক, দুর্ব্বল, দীর্ঘ অবয়ব, ভ্রমণ-শীল, পরিমিত ব্যয়ী ও দুঃখী হয়। ৭, ১৪, ২০, ২৮, ৩২ ও ৬১ বর্ষে এর জীবনের বিপন্নতা। মীননবাংশ জাত স্ত্রীলোকের পশ্চাতে ধাবিত হয়। পাতলা দেহ। জল বা জলজপদার্থ সম্পর্কীয় ব্যাপারে কর্ম্ম, পরগৃহবাসী, ধনী ও একাধিক স্ত্রীলোকে আসক্ত। এর জীবন সঙ্কট বর্ষ ১০, ১২, ২১, ২৬, ৫২ ও ৬১।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী ও কৃত্তিকানক্ষত্রাশ্রিতব্যক্তিগণই এ মাসে উৎকৃষ্ট ফললাভ করবে, অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে মাসটী মধ্যম। মাসের প্রথমার্দ্ধে উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রু জয়, লাভ, নূতন পদমর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা লাভ, সৎবন্ধু, কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখ ও সৌভাগ্য লাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সকল দিকে উত্তম পরিস্থিতি ঘটবে। সমগ্র মাসের মধ্যে ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানসিক উদ্বেগ ও অস্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মে কিছু কিছু সাময়িক বাধা, অসৎসংসর্গজনিত মনস্তাপ এলেও বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে না। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য আশা করা যায়, যদিও অল্প বিস্তর মনোমালিন্য ও কলহ সৃষ্টি হোতে পারে। মাসের শেষার্দ্ধে গুহ্য, উদর ও মূত্রাশয়ের পীড়ার সম্ভাবনা কিন্তু সতর্ক হোলে পীড়া গুরুতর হবে না। আর্থিক-ক্ষেত্রে সামান্যই কষ্ট হোতে পারে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উত্তম লাভ, আয়-বৃদ্ধি ও আর্থিক সাফল্য অবশ্যই ঘটবে। স্পেকুলেশনে না যাওয়াই ভালো, সাময়িকভাবে কিছুলাভ হোলেও শেষে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটা মোটামুটি যাবে। চাকুরিজীবীরা নানাভাবে সুখ সুবিধা পাবে, কর্ম্মোন্নতির যোগ আছে আর উপরওয়ালার সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী একভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল। ব্যক্তিগত বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ ও বস্ত্রালঙ্কারের জন্যে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা দেখা দেবে। সামাজিকক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। পিকনিক পার্টি, ভ্রমণ প্রভৃতি মাধ্যমে আনন্দ লাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ, অবৈধ প্রণয়েও সুবিধা সুযোগ। বিবাহ সম্পর্কে কোন প্রকার পাকা-পাকি বা কথাবার্ত্তা বর্জ্জনীয়। রেসখেলায় লাভ। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি আশানুরূপ নয়।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসটি উত্তম। রোহিনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। গ্রহগণের সমাবেশ এরূপ অবস্থায় দেখা যায় যে এ রাশির জাত ব্যক্তিদের পক্ষে কোন প্রকার আশানুরূপ অনুকূল আবহাওয়া দেখা যায় না। দুঃখ কষ্ট, স্বজন বিচ্ছেদ, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানি, উদ্বিগ্নতা, শত্রুদের অপপ্রচেষ্টাজনিত নানাপ্রকার দুর্ভোগ, অপমান, কর্ম্মেবাধাবিপত্তি, আশাভঙ্গ, কলহ, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি অবসাদ, দ্বন্দ্ব কলহ, মামলামোকর্দ্দমা, স্ত্রীলোকের দ্বারা নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হওয়ায় আশঙ্কা। এরূপ অশুভসংযোগ থাকা সত্ত্বেও কিছু সাফল্য, জনপ্রিয়তা ও লাভের আশা আছে। দেহের চেয়ে মনের ওপরই অসুস্থতার আধিক্য। পৌনঃপুনিক উদ্বেগ, অশান্তি ও মনোমালিন্য পরিলক্ষিত হয়। বায়ু ও পিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়াদি ভোগ। দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক, ভ্রমণ না করাই ভালো। ঘরে বাহিরে কলহ বিবাদ, বিশেষতঃ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এনে দেবে! আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়। কর্ম্ম বৃদ্ধি ঘটলেও লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশী হবে। অতিরিক্ত ব্যয়। ব্যবসায়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধি-কারীদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক। সরকারী চাকুরিজীবীদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক, অসদুপায়ে উপার্জ্জনকারীরা বিপদে পড়তে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-

...দের অবস্থা নৈরাশ্যজনক ও ক্ষতিকর। কোন প্রকার অসম-সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অশুভ, কোনপ্রকার রোমান্টিক আবহাওয়ার ভেতর প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। সঙ্গ নির্বাচনে সতর্ক না হোলে যথেষ্ট বিপত্তির কারণ আছে। অবৈধপ্রণয় বা গুপ্ত প্রেম সাংঘাতিক ঘটনার সৃষ্টি করবে। অপরিচিত ব্যক্তিকে আদৌ আমল দেওয়া উচিত নয়। পার্টি, পিক্‌নিক, ভ্রমণ বিশেষতঃ পরপুরুষের সঙ্গে যাতায়াত, ফ্লার্ট করা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। কেবল সাংসারিক কাজে মনোনিবেশ ও রুটিন মাফিক কাজ করাই ভালো। রেসে হার হবে।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র জাতগণের ভাগ্যে একই রকম ফল। এমাসে কেউই কোন প্রকার ভালো আশা করতে পারে না। আশঙ্কা, উদ্বেগ, আশাভঙ্গ, অর্থকৃচ্ছ্রতা, ব্যয়াধিক্য, স্বজনবিরোধ, শত্রুপীড়া, কর্ম্মে বাধা, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি, মামলামোকর্দ্দমা, অপমান, অপ্রত্যাশিত অশুভ পরিবর্তন, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি এ মাসের অশুভ ঘটনা। বৃহস্পতির প্রভাবহেতু কিছু দুঃখকষ্টের উপশম হোতে পারে। যদিও মাসটির সাধারণ অবস্থা কোন রূপেই ভালো বা সন্তোষ জনক নয়, তবু এইটুকু আশা যে, একেবারে দুর্গতির চরম সীমায় কেউ উপস্থিত হবে না। স্বাস্থ্যোন্নতি হবে না। ভুজনালীপ্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস, শ্লেষ্মাঘটিত পীড়া, রক্ত দুষ্টি, পিত্তপ্রকোপ, উত্তাপবৃদ্ধিজনিত অসুখের আশঙ্কা আছে। পরিবারবর্গের কেউ কেউ অসুখে পড়বে। স্ত্রী ও সন্তানগণ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বর্গের সঙ্গে কলহ বিবাদ ও মনোমালিন্যের আশঙ্কা আছে। সপ্তমে বৃহস্পতির অবস্থিতি হেতু মারাত্মক পরিস্থিত হবে না। পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হোতে হবে। আর্থিক সঙ্গতি আশা করা যায় না। বন্ধুদের সাহায্যে আর্থিক দুর্গতির কিছু উপশম হবে, কোনরকম কষ্টে সৃষ্টে অভাব অনাটনের মধ্য দিয়ে মাসটি অতিক্রান্ত হবে। স্পেকুলেশন বা কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর ভাগ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবার যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্র অনুকূল নয়। উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদ, কর্ম্মেবাধা ও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্ম্মচারীরাও নিম্নতর কর্ম্মচারীদের অপকৌশল প্রয়োগহেতু দুর্গতি ভোগ করবেন। সুতরাং এমাসে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি থেকে সুরু করে পেয়াদা চাপরাসি পর্য্যন্ত কর্ম্মীর লাঞ্ছনা ভোগ ও বিব্রত হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—আশাভঙ্গ, উদ্বেগ প্রভৃতি থাকবেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একেবারে খারাপ না হোলেও আদৌ অনুকূল নয়। ব্যয়াধিক্য, হিসাবের ভুলবশতঃ কষ্ট ভোগ, অপরের ওপর আস্থা স্থাপন হেতু প্রতারণা ভোগ ও যৌন উত্তেজনাবশতঃ মানসিক বিশৃঙ্খলতা। পরপুরুষের সহিত মিশবার দিকে প্রবল ঝোঁক হবে, এজন্য সতর্কতা ও আত্মসংযম একান্ত প্রয়োজন। নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে ভ্রমণ পরিহার্য্য। প্রণয়ের ক্ষেত্র শুভ নয়, পারিবারিকক্ষেত্র অশুভ-ব্যঞ্জক, সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান অপেক্ষা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশঙ্কা-পিকনিক পার্টি প্রভৃতিতে পুরুষের প্রগল্‌ভতা জনিত ব্যথা পাবার সম্ভাবনা। অবৈধপ্রণয়ে বিপন্নতা যোগ। পুরুষের সংস্পর্শ এমাসে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা বিশেষ দরকার। রেস খেলায় অর্থ ক্ষতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

কর্কট রাশি

অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যাজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো। প্রথমার্দ্ধটী অনেকটা ভালো, শেষার্দ্ধটী অশুভ ব্যঞ্জক। উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, সুখস্বচ্ছন্দতা, সদ্বন্ধুসঙ্গলাভ ও সৌভাগ্য, জনপ্রিয়তা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সুখকর ভ্রমণ ও বিহার, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বন্ধুর সাহায্যপ্রাপ্তি মাসের প্রথমার্দ্ধে আশা করা যায়। শেষার্দ্ধে আশঙ্কা করা যায় কিছু দুঃখকষ্ট, অপ্রসন্নতা, আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য, কাজে সাফল্যের অভাব, অসম্মান, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি। এমাসে রক্তস্রাব, পিত্তপ্রকোপ, চক্ষুপীড়া। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি উদ্বেগের কারণ হবে। যারা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা আশা করা যায়। স্ত্রীর সহিত অসদ্ভাব ও কলহ বিবাদ পারিবারিক ক্ষেত্রকে বিষময় করে তুলবে। প্রথম দিকে বেশ অর্থাগম হবে, বন্ধুদের সাহায্য পাওয়া যাবে, তাদের জন্যে কিছুকিছু ক্ষতিপূরণ ও হবে। দ্বাদশে মঙ্গল ক্ষতি ব্যয় দুর্ঘটনা প্রভৃতির কারক হয়ে উঠবে। মিথ্যা আশা ও প্রলোভনে বিপর্য্যয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। ক্রয়বিক্রয়ে লাভযোগ। মাসের শেষার্দ্ধে এসব কাজ ক্ষতিকর হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্রফলদাতা। প্রথম দিকে উপরওয়ালার আনুকূল্যে কিছুটা সুবিধা হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। সামাজিক ক্ষেত্রে যে সব মহিলা কর্ম্মে লিপ্ত, অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা তারা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করবে, উচ্চস্থানে উন্নীত হবে, আর সমাজ কল্যাণকর কার্য্যে সাফল্য প্রাপ্তিহেতু উল্লেখযোগ্য হবে। বন্ধু স্বজন বর্গের সাহায্য পাবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ, ফ্লার্টের দ্বারা রোমান্টিক পরিস্থিতির ভেতর যৌনস্পৃহার পরিপূর্ণতা লাভ, গুপ্তপ্রেমে আনন্দবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ। পারিবারিকক্ষেত্র সুখকর। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। রেসে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম, মঘাজাতগণের পক্ষে মধ্যম, আর পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসের প্রথম দিকে উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, সদ্বন্ধুলাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, প্রচেষ্টার সিদ্ধি, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পসার প্রতিপত্তি, প্রমোদ বিহার ও ভ্রমণ, সুসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সন্তানদের স্বাস্থ্যহানি হবে না। গৃহ ও পারিবারিক বিষয়ে যে সব সংস্কার, পরিকল্পনা বা সংগঠন সংশ্লিষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষা আছে তা

পূর্ণ হবে। বহুদিনের প্রত্যাশিত সাজ পোষাক, বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদ বিষয়ে সাফল্য প্রাপ্তি। বন্ধুদের সাহায্য লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর্থিকক্ষেত্র ভালোই যাবে, সামান্য ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। রেসে লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের কিছু কিছু কষ্ট ভোগ আছে। জলবায়ু ও আবহাওয়া প্রতিকূল হেতু জমি, গৃহ ও কৃষি কাজ বিষয়ে হস্তক্ষেপ সুবিধাজনক হবে না। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি সম্ভাবনা ও উত্তম পরিস্থিতি। উপরওয়ালার অনুগ্রহ, প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটবে চাকুরির ক্ষেত্রে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে উত্তম সময়। সর্ব্ব বিষয়েই এমাসটী স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। ধৈর্য্য অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা সংরক্ষণশীলতা ও অদম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠতে পারবে কিন্তু প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিপর্য্যয়, ভ্রমণে বিপত্তি, পরপুরুষের সান্নিধ্যে আশঙ্কা প্রভৃতি যোগ আছে। অবৈধ প্রণয়, গুপ্তপ্রেমে ও পরপুরুষের সংস্রব, ফ্লার্টকরা প্রভৃতি বহু দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য লাভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, হস্তাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট, আর চিত্রার পক্ষে মধ্যম। এমাসে কন্যারাশিজাতগণের আশাপ্রদ শুভ ঘটনা দেখা যায় না, বরং স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মে বাধা বিলম্ব, ভ্রমণে অবসাদ', কলহ, ক্ষতি, অপমান, দুর্ণাম রটাবার দিকে শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা স্বজন বিয়োগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, কিছু সুখ, লাভ ও উন্নতির যোগাযোগ দেখা দেবে। হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যহ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ বা ব্লাডপ্রেশার সম্পর্কে দেখে নিতে হবে—আর চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে চলতে হবে। হাঁপানি বা শ্বাস প্রশ্বাসে পীড়িত ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বাধাপ্রাপ্ত হবে নানাপ্রকার কলহ বিবাদের দরুণ। ঘরে আত্মীয় স্বজনের শত্রুতা চিত্তের উদ্বেগ সৃষ্টি করবে, পারিবারিক অশান্তি উপশম হবে না। শেষার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো যাবে না। ক্ষতি না হোলেও অপরিমিত ব্যয়ের দরুণ অর্থ আয়ত্তাধীনে রাখা সমস্যাজনক হয়ে উঠবে। আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থব্যয়ের চাপ, সম্পত্তি ভাগ সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি সূচিত হয়। কৃষকের হালের বলদ মারা যেতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। উপরওয়ালার সঙ্গে বিশেষ সতর্ক হয়ে কাজ করা দরকার—নতুবা বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। অসন্তোষের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু অর্থাগম আশানুরূপ হবেনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হোতে হবে। ভ্রমণ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, অপবাদ, নির্য্যাতন ও মিথ্যাসমাচার প্রাপ্তিযোগ আছে। শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি ঠিকমত কাজ না হওয়ার দরুণ অসুস্থতা। পুরুষের সহিত মেলামেশা বা লেনদেন, সামাজিক কর্ম্মসম্পাদন, চিঠি পত্র লেখা যতটা সম্ভব কম করা দরকার। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি ঘটবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটা মধ্যম। রেসে সাংঘাতিক ক্ষতি।

তুলা রাশি

চিত্রা স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের ফলাফল সমপর্য্যায় ভুক্ত। বিদ্যাক্ষেত্রে ও শিক্ষায়তনের সকল প্রকার কর্ম্মে সাফল্যলাভ, শুভ ঘটনা, আমোদ প্রমোদ, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন প্রভৃতি সূচিত হয়। মধ্যে কিছু উদ্বিগ্নতা, ক্ষতি, বন্ধু বিচ্ছেদ, কলহ, সম্মানহানি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুষ্টসংসর্গ, অনভীপ্সিত পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সংঘটিত হবে। যারা বহুদিন থেকে জটিল ব্যাধি ভোগ করছে বা ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হয়েছে তাদের সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। উদর, চক্ষু, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হবে। ধারালো অস্ত্র ব্যবহারে অসতর্কতা আবশ্যক। দুর্ঘটনা, ও আঘাতপ্রাপ্তি আশঙ্কা করা যায়। পারিবারিক শান্তি আশা করা যায় না। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনেরা নানাভাবে প্রতিকূলাচরণ করবে। অর্থক্ষতি অনিবার্য্য, টাকা লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা ও পকেট-মার থেকে সাবধান হওয়া আশু প্রয়োজন। নগদ টাকার টানাটানি থাকবেই, বাইরে থেকে বিশেষ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। বাধা বিপত্তি, নৈরাশ্য, ক্ষতি, আদায় ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট, ইনকমট্যাক্সের উৎপীড়ন প্রভৃতি আসতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ হোলেও মোটের উপর মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের ভাগ্যে উত্থান পতন জনিত চিত্তচাঞ্চল্য। রেসে হার হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। কোন প্রকার সমালোচনা, পরচর্চ্চা, পরপুরুষের সংস্রব, প্রণয় বা ফ্লার্ট করা বর্জ্জনীয়—বিবাহাদির দিকে অগ্রসর হওয়া ও বিধেয় নয়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম, বিশাখা ও অনুরাধাজাতগণের পক্ষে কিছুটা শুভ। দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ, আশাভঙ্গ, উদ্বেগ, স্বাস্থ্যের অবনতি, শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, স্বজন-বিরোধ, কুচক্রান্তকারীদের মতলব শোনার দরুণ বিপত্তি, পদমর্য্যাদা হানি প্রভৃতি আশঙ্কা আছে। শরীর কোনমতেই ভাল রাখা যাবে না। জ্বর, ক্ষত, রক্ত দুষ্টি, রক্ত স্বল্পতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা, দৈহিক ওজনের হ্রাস, স্বাস্থ্য হানি প্রভৃতি সূচিত হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে কলহবিবাদ দেখা দেবে, ক্ষতির কারণ ঘটবে না। কিছু কিছু বিলাস-ব্যসন সামগ্রী লাভ ও আমোদ প্রমোদে সময় যাপনও হবে। আর্থিকক্ষেত্রে

ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে, উপার্জ্জনের জন্যে রীতিমত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। বহু সুযোগ এলেও কোনটাকে ধরে ওঠা যাবেনা। অপরিমিত ব্যয় চিন্তার কারণ হবে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর ভাগ্যে বহু দুর্ভোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো। কর্ম্মদক্ষতার জন্য পুরস্কার বা পদকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। পদোন্নতি আশাকরা যায়, বেতন-বৃদ্ধি এর সঙ্গে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ, আয়বৃদ্ধি ও লাভ হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালই যাবে। পার্টি, ক্লাব, পিকনিক, ভ্রমণ, প্রভৃতিতে আনন্দ উপভোগ। অবৈধ প্রণয়, গুপ্তপ্রেম, ফ্লার্ট, ও পরিণয় প্রস্তাব সম্পর্কে আশাতীত সাফল্য। পুরুষের সংস্রবে লাভ। পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ভোগ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। রেসে কিছু লাভ।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম আর কষ্ট ভোগও খুব কম হবে, মূলানক্ষত্র জাতগণের পক্ষে মধ্যম, কিন্তু পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসের প্রথম দিকটা ভালো যাবে, শেষের দিক ভালো বলা যায় না। সাফল্য, লাভ, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সদ্বন্ধুলাভ, ও সম্মান প্রাপ্তি প্রভৃতি শুভ ফল—আর স্বাস্থ্য হানি, ভ্রমণ, অর্থক্ষতি, শত্রুবৃদ্ধি, স্বজন বিরোধ, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি অশুভ ফলের আশঙ্কা। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা।

চক্ষুপীড়া, বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য ও পারিবারিক অশান্তি ঘটতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম বৃদ্ধি ও তজ্জনিত পর্য্যাপ্ত অর্থাগম ও সাফল্য লাভ যোগ আছে। ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা। স্পেকুলেশনের পক্ষে মাসের প্রথম দিকে শুভ। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ঘটবে। আশানুরূপ শস্যপ্রাপ্তি হবে না। বেকার ব্যক্তিগণের চাকুরির সুযোগ আছে। চাকুরির স্থান শুভ। পদোন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অত্যন্ত শুভ,—বিশেষ রূপে আয়বৃদ্ধি হবে। যে সব মেয়েরা শিল্পকলা, রন্ধন নৃত্যগীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করছে, তারা সাফল্য লাভ করবে। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ বলা যায় না।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, শ্রবণাজাতগণের পক্ষে অধম, এবং ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অপেক্ষাকৃত ভালো, প্রথমার্দ্ধটী সেরূপ ভালো আশাকরা যায় না। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে, ধনলাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, প্রতিপত্তি-সম্পন্ন বন্ধু ও শত্রুজয়, আয়বৃদ্ধি সুখ ও সৌভাগ্যলাভ যোগ আছে। মামলা মোকর্দ্দমা, পারিবারিক কলহ, স্বাস্থ্যের অবনতি, স্বজন-বিয়োগ সম্পত্তি হানি, নানাপ্রকার উদ্বিগ্নতা, পদমর্য্যাদা হানি প্রভৃতি সম্ভব হোতে পারে। বিশেষ পীড়াদির সম্ভাবনা নেই। শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হবে। ভ্রমণে ক্লান্তি অবসাদ। গৃহে সুখশান্তি ও সন্তোষ প্রকাশ পাবে। জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধার্জ্জন হবে সামাজিক ক্ষেত্রে। আর্থিক ক্ষেত্র মোটামুটি ভালোই যাবে। ব্যয়বৃদ্ধি যোগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। মামলা মোকর্দ্দমা হোতে পারে। গৃহ-ভিত্তি স্থাপনার সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। সামাজিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্র মন্দ নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র উত্তম। নানাভাবে প্রাপ্তিযোগ আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতব্যক্তিরা ভালোমন্দ ফল এমাসে একভাবেই পাবে। স্বাস্থ্য হানি, বন্ধু বিরোধ, অগ্রজের সঙ্গে শত্রুতা, প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্রান্তে কষ্ট ভোগ, শত্রুবৃদ্ধি, উদ্বেগ, অশান্তি সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় বাধাবিপত্তি, মামলায় পরাজয় প্রভৃতি সম্ভব। সাফল্য, শত্রুজয়, লাভ, সৌভাগ্য, বিলাস-ব্যসন, সম্মান, সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভফলগুলিও আশাকরা যায়। যেভাবেই হোক পরিবার-বর্গের সকলেই কিছুনা কিছু শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে। প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। প্রথমার্দ্ধে এই রাশিজাতগণের রক্তের চাপবৃদ্ধি আর শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবে। সন্তানদের ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সম্ভব। স্ত্রীর শরীর ভালো বলা যায়না। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য আশাকরা যায়। গৃহে সন্তান জন্মলাভ বা অন্য কোন প্রকার শুভঘটনাজনিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হবে। আর্থিক ক্ষেত্র খুবই ভালো হ'বে, তবে মাঝে মাঝে টাকার টান ধরবে, ব্যয়াধিক্য থাকবেই। প্রথমার্দ্ধে টাকার ব্যাপারে শত্রুতা হোতে পারে। আর্থিকক্ষেত্রে এমাসে বন্ধুদের প্রভাব বিস্তৃত হবে। আকস্মিকভাবে ধনপ্রাপ্তি বা ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্যকর নয়। স্পেকুলেশনে দারুণ ক্ষতি। রেসে বিশেষ ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী এক ভাবেই যাবে, সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাইরে যাবার যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি মন্দ নয়, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টা উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে। সাংসারিক, পারিবারিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন হবে।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত অপেক্ষা অনেকটা ভালো। শারীরিক কষ্ট, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, নানা প্রকারে উদ্বিগ্নতা, পারিবারিক কলহ, বন্ধু বিচ্ছেদ, দুষ্ট সংসর্গ, নানা কার্য্যে বাধা, অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, সম্মান-হানি প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। লাভ, সুখ, সম্মান, উত্তম

ন্ধু, সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিও আশাকরা যায়। গৃহে সন্তান লাভ সূচিত হয়। নিজের ও সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্যহানি। এই াশির ব্যক্তিগণের জ্বর, হজমের গোলমাল, আমাশয় বা গুহ্যদ্বারে পীড়া যথা অর্শ) সম্ভব। সাধারণ সর্দ্দিশ্লেষ্মা, ঠাণ্ডালাগা বা জ্বর থেকে ন্তানসন্ততির যে কোন প্রকার সাংঘাতিক অসুখও হোতে পারে। শুধু শারীরিক নয়, মানসিক অবস্থা খারাপ হবে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও উদ্বিগ্নতা দেখা দেবে। গৃহে কলহ বিবাদ সামান্য রকমেই হবে। আর্থিকক্ষেত্রে ভালোমন্দ মিশ্রিত। অত্যধিক ব্যয়, প্রতারণাজনিত ক্ষতি, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় অসাফল্য প্রভৃতি হোতে পারে। সাধারণ ভাবে য উপার্জ্জন হয় তার ব্যতিক্রম হবে না, নব প্রচেষ্টায় অর্থলাভ। স্পেকুলেশনে সাফল্য লাভের যোগ নেই। রেসে লাভ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীরা পদে পদে অসুবিধা ভোগ করবে। আশানুরূপ শস্য পাওয়া যাবে না। চাকুরীর ক্ষেত্র ভালো বলা যায় না, নানা প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টী উত্তম হোলেও আকস্মিক ভাবে বাধা আসতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অশুভ। পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে। প্রণয় কোর্টসিপ প্রভৃতি এমাসে বর্জ্জনীয়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র আদৌ ভালো নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

সন্তানাদির অসুস্থতা। আয়বৃদ্ধি। সম্বন্ধলাভ। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সম্ভাবনা। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, উদর শূল, পীড়া, কলহ, ব্যয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ। মহিলার পক্ষে মধ্যম ফল।

বৃষলগ্ন

শিরঃপীড়া, সাময়িক ভাবে ঋণ, পিত্ত প্রকোপ, আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে বিলম্ব, নানাভাবে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। আকস্মিক দুর্ঘটনা হেতু শরীরের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা, উদ্বেগ ও ব্যয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যমফল। মহিলাদের পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

ব্রণ পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি, আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা স্বজন বিয়োগ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি। সাংসারিক অশান্তি। অপবাদ। বিদ্যার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মহিলাদের পক্ষে মোটা মুটি ভালো।

কর্কট লগ্ন

ব্যয়বাহুল্য হেতু মনশ্চাঞ্চল্য। আর্থিকোন্নতি। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে উত্তম সময়।

সিংহলগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি, উদর ও মস্তকে বায়ুবৃদ্ধিজনিত পীড়াদি কষ্ট। ধনাগম। সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর বিঘ্নযোগ। মাতুলের মারাত্মক পীড়া যোগ। মহিলাদের পক্ষে মানসিক আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা।

কন্যালগ্ন

আকস্মিক প্রাপ্তিযোগ। পুরাতন সমস্যায় বিব্রত হবার যোগ। আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি ও রক্ত পাতের আশঙ্কা। সন্তানাদির উন্নতি। চাকুরি স্থল শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ কিন্তু গণিতশাস্ত্রের ফল আশানুরূপ নয়। মহিলাদের পক্ষে শুভ।

তুলালগ্ন

অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থলাভ। পদোন্নতি। শত্রুদের চেষ্টা ব্যাহত হবে। পরাক্রম বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতা মূলক কার্য্যে সাফল্য। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। মহিলাদের পক্ষে অপুরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা।

বৃশ্চিকলগ্ন

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। শারীরিক দুর্ব্বলতা। আশাভঙ্গ। উদ্বেগ। আর্থিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা। বিক্রয় বাণিজ্যে লাভ। অসদুপায়ে উপার্জ্জনের যোগ। ভাগ্যোন্নতির পক্ষে অন্তরায়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম। মহিলাদের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

ধনুলগ্ন

নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। গুরু স্থানীয় ব্যক্তির রিষ্টিযোগ। অর্থোপার্জ্জনের নানা যোগাযোগ। অসদুপায়ে ধনলাভে প্রলুব্ধ হবার আশঙ্কা। অপহৃত দ্রব্যাদি প্রাপ্তিযোগ। ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধিলাভ। বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে উত্তম। মহিলাদের পক্ষে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা।

মকরলগ্ন

স্ত্রীর পাকযন্ত্রের পীড়া ও বায়ু প্রকোপ। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। অধ্যাপনায় খ্যাতিলাভ। আকস্মিক পীড়া। শ্লেষ্মা ও বক্ষঃস্থল সম্পর্কীয় রোগের উপসর্গ। বাতব্যাধি। মানসিক চাঞ্চল্য। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, সংস্কৃত শাস্ত্রের ফল আশাপ্রদ। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম সময়।

বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য। গৃহাদি সংস্কার বা নির্মাণের সম্ভাবনা। পিতার পীড়া। শারীরিক অশান্তি ভোগ। তীব্র মানসিক উদ্বেগ। আয় স্থান মন্দ নয়। চাকুরিতে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ ফল। মহিলাদের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ।

মীনলগ্ন

অপরের নিকট গচ্ছিত অর্থের ক্ষতি। রক্তের চাপবৃদ্ধি। অসদুপায়ে উপার্জ্জনের সুযোগ। বিক্রয় বাণিজ্যে লাভ। সন্তানের দেহপীড়া। আত্মীয়ের পীড়া হেতু অর্থব্যয় যোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়। মহিলাদের পক্ষে উত্তম সময়।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী 'শ'—

॥ ছোট ছবি ॥

ভারতীয় চিত্রকে, বিশেষ করে সঙ্গীত-নৃত্যবহুল হিন্দী চিত্রগুলির দৈর্ঘ্য কমিয়ে সময় সংক্ষেপ করবার আলোচনা এই বিভাগে আগেও করা হয়েছে। অধুনা অর্থনৈতিক কারণে ভারতীয় চিত্রের দৈর্ঘ্য কম করে বিদেশ থেকে কাঁচা ফিল্ম আমদানী কমিয়ে দেবার জন্ম ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী চলচ্চিত্র নির্ম্মাতাদের আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনে প্রথমে ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশন্ সাড়া দেননি। চলচ্চিত্র সংস্থার একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান যে ভারতীয় চিত্রের দর্শকদের মাত্র কুড়ি শতাংশ শহরাঞ্চলের লোক আর বাকি আশি শতাংশ লোক গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা এবং ভারতীয় চিত্রের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সঙ্গীত ও দৈর্ঘ্য, আর ভারতীয় চিত্র প্রস্তুত হয় ভারতীয়দের জন্যেই! অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন গ্রামাঞ্চলের এই বেশি সংখ্যক লোকে দীর্ঘ চিত্রই শুধু পছন্দ করে না—সঙ্গীতবহুল দীর্ঘ চিত্রই তারা দেখতে চায়। সুতরাং এই অধিকাংশের জন্যেই অর্থাৎ এই গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষদের পছন্দ অনুযায়ী চিত্রই নির্ম্মাণ করতে হবে, কারণ পয়সা তারাই বেশী দেয় বলে! মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশেও ভারতীয় চিত্রের সমাদর আছে এবং ঐ মুখপাত্র ভদ্রলোকের মতে তার কারণ ভারতীয় চিত্রের দৈর্ঘ্য ও সঙ্গীত বাহুল্যতাই। তাঁর মতে গান বাদ দিয়ে পশ্চিমী চিত্রের অনুরূপ ভারতীয় চিত্রনির্ম্মাণ নাকি ধারণার অতীত! অর্থাৎ সঙ্গীতবহুল চিত্র হলেই তা দীর্ঘ হবে, আর গান না থাকলে (একটি দুইটি নয়—অনেকগুলি!) ভারতীয় চিত্রের বিশেষত্বও থাকে না; সুতরাং গান বাদ দিয়ে ছবিকে ছোট করা উচিত হবে না!

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, গ্রামঞ্চলের কৃষিজীবী লোকেদের ও সহরাঞ্চলের কতিপয় বিকৃত রুচির লোকের পছন্দ অনুযায়ী ভাঙ্গাচোরা ও ধার করা বিদেশী সুরের গান ও তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য নৃত্যের ক্যারিকেচার রূপ নৃত্য সম্বলিত অতি দীর্ঘ চিত্রই কি ভারতীয় চিত্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে গণ্য হবে? না দেশের সাধারণ মানুষদের, বিশেষ করে বিকৃত রুচির লোকেদের রুচির পরিবর্ত্তন করে সমাজজীবনের উপকার সাধন ও সেই সঙ্গে চিত্রের মান বাড়িয়ে তোলা হবে। আজকালকার এই চলচ্চিত্রের যুগে চলচ্চিত্রের যে নৈতিক দায়িত্ব আছে মানসিক ও সামাজিক সংগঠনে তা অস্বীকার করা যায় না, আর জনপ্রিয়তার সঙ্গে জনসেবার দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এও অনস্বীকার্য্য। আর এই সাধারণ কথাটাও চিত্র নির্ম্মাতাদের মনে রাখা উচিত যে ছবির গুণাগুণ ছবির দৈর্ঘ্যের ওপর বা কতগুলি গান আছে তার ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে গল্প, অভিনয়, পরিচালনা, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি অন্যান্য গুণের ওপর। দীর্ঘ ও সঙ্গীত বহুল চিত্র অবশ্যই তৈরী হবে একথা ঠিক; কিন্তু সব ছবিতেই ডজনখানেক গান ও নৃত্য থাকবার যৌক্তিকতা কোথায়? চিত্রের শ্রেণীভেদ আছে—যেমন সামাজিক, সঙ্গীতবহুল, হাস্যরসাত্মক, রোমাঞ্চকর, এডভেঞ্চারমূলক, প্রভৃতি। কিন্তু হিন্দীচিত্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী সব কিছুই যদি একটি চিত্রের মধ্যে থাকে এবং ঐ ধরণের চিত্রই যদি অনবরত নির্ম্মিত হতে থাকে তাহলে ছবির মধ্যে পার্থক্য কোথায় থাকবে? আর এ রকম নীচু স্তরের একঘেয়ে চিত্র নির্ম্মাণের সার্থকতা কি? খালি এক শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন করে অর্থোপার্জ্জন? সুখের বিষয় বাংলা চিত্র এই সব দোষ থেকে কিছুটা মুক্ত। কিন্তু ভারতীয় ফিল্ম সংস্থার মুখপাত্রের উক্তিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ ও মানোন্নয়ন সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করতে পারা যায় না। আশা করি ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতারা এ এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং ছবির দৈর্ঘ্য ও সঙ্গীতনৃত্যের দিকেই শুধু লক্ষ্য না রেখে ছবির অন্যান্য দিকগুলিরও উন্নতি সাধনে তৎপর হবেন।

সুখের বিষয়, বিশেষ খবরে জানা গেল ভারতীয় ফিল্ম

ফেডারেসন্ বাণিজ্য মন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য কমিয়ে কাঁচা ফিল্মের ব্যবহারে সংকোচ সাধন করতে রাজী হয়েছেন। আমরা তাঁদের এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এতে করে কাঁচা ফিল্ম আমদানী কমে গিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধাই শুধু হবে না, দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ চিত্র দেখার বিরক্তি ও অসোয়াস্তির হাত থেকেও অনেকে রক্ষা পাবেন। শুধু তাই নয়, বাধ্য হয়ে ছোট ছবি নির্ম্মাণ করতে করতে ছোট ছবি তৈরীর অভ্যাস ও টেক্‌নিক্ ও চিত্র নির্ম্মাতারা আয়ত্ব করে ফেলবেন, আর দর্শকরাও কম দৈর্ঘ্যের চিত্র কিছুদিন দেখতে দেখতে ছোট ছবিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন আর কুড়ি হাজার ফিটের ছবিতে খান কুড়ি নাচ গান দেখবার ধৈর্য্য ও অভ্যাস তাদের থাকবে না—মনের পরিবর্ত্তণের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্ত্তণ ঘটবে। অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচন করতে গিয়ে ভারতীয় চিত্রের একটি দিকের বিশেষ উন্নতি সাধিত হবে বলেই মনে করি—সে জন্য বাণিজ্য দপ্তরকে ধন্যবাদ।

দেশে বিদেশে ঃ

গত ৪টা অক্টোবর হইতে শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রযোজিত "অপুর সংসার" বাংলা চিত্রটি নিউইয়র্ক-এ প্রদর্শিত হচ্ছে। Newsweek ও Time নামক দু'টি মার্কিণ পত্রিকা "অপুর সংসার"-এর বিশেষ প্রশংসা করে লিখেছেন। এর আগে নিউইয়র্ক-এ "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"ও প্রদর্শিত হয়েছে। বিশেষ করে "পথের পাঁচালী" নিউইয়র্ক-এর ফিফথ্ এভিন্যু সিনেমা গৃহে ৩২ সপ্তাহ চলে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। এর আগে আর কোনও চিত্রই অতদিন ঐ সিনেমা হলে চলে নি। ৩১ বৎসর আগে চলচ্চিত্রের নির্ব্বাক যুগে "দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ক্যালিগ্যারি" নামে একটী চিত্র ২২ সপ্তাহ ধরে ঐ হলে প্রদর্শিত হয়েছিল। "অপরাজিত"ও ফিফথ্ এভিন্যুতে ১৬ সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হবার পর অন্য একটি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয়। "অপুর সংসার" লণ্ডনের চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছে এবং পরিচালক শ্রীরায় অন্যান্য বহু পুরস্কারের সঙ্গে একটি বৃটিশ চলচ্চিত্র সংস্থার পুরস্কারও লাভ করেন।

সত্যজিৎ রায়ের "জলসা ঘর"ও চতুর্থ লণ্ডন চিত্রোৎসবের জন্যে নির্ব্বাচিত ১৪টি চিত্রের অন্যতম চিত্ররূপে নির্ব্বাচিত বলে জানা গেছে।

* * * *

বোম্বের "The Little Ballet Troupe" প্যারিসে আন্তর্জাতিক Drama Festival ও ব্রাসেলস্-এ Belgian Mondial Festival-এ অংশ গ্রহণ করবার পর এখন দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ করছেন। এই দলটি Brazil ও Chile-তে প্রভূত প্রশংসা লাভ করে Argentina-তে এসে অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। এখানকার National Theatre-এ "রামায়ণ" নৃত্য নাট্যের শেষে তিন হাজারের ওপর দর্শক এই দলকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। এখানকার প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলিও এই Little Ballet Troupe-এর বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

* * * *

নিউ ইয়র্ক-এ দু'টি ভারতীয় নৃত্য দল এখন নৃত্য দেখাচ্ছেন। একটি দল হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সুন্দরী (মিস্ ইণ্ডিয়া) শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমানের ও অন্যটি হচ্ছে উদীয়মান তরুণ নর্ত্তক ভাস্করের। এই দু'টি দলই বিশেষ প্রশংসা পাচ্ছে মার্কিণ দর্শকদের কাছ থেকে। New York Herald Tribune পত্রিকাও এঁদের বিশেষ প্রসংসা করেছেন।

* * * *

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্ম্মান চিত্রাভিনেতা Curt Jurgêns, যিনি ইউরোপেই শুধু নয় বৃটেনে ও আমেরিকাতেও বহু চিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন—তিনি শীঘ্রই ভারতে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করবেন বলে জানা গেছে। চিত্রটি "Aranda" নামে একটি অ্যাড্‌ভেঞ্চার গল্পরূপে প্রস্তুত হবে। প্রযোজনা, পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন Curt Jurgens, আর বৃটিশ অভিনেতা Trevor Howard সহ-ভূমিকায় থাকবেন।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

Paris Match নামক একটি ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত Raymond Cartier-এর বিশ্বসৃষ্টি, প্রাণীর

জন্ম প্রভৃতি নিয়ে লেখা একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধকে ভিত্তি করে "The Great Secret" নামক একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রঙ্গিণ চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিত্র নির্ম্মাণে পারদর্শী Gerard Calderon চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। কয়েকজন প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিকও এই চিত্রে কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আবার চিত্রে দেখতে পাওয়াও যাবে। চিত্রটির কিছু কিছু অংশ ফ্রান্স, জার্ম্মানী, বেল্‌জিয়াম্‌, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের পশুশালা ও ল্যাবরেটরীতে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া সমুদ্রের গভীর গর্ভে ক্যামেরা নামিয়েও Haroun Tazieff, Dr. Thevenard প্রভৃতি অভিজ্ঞদের দ্বারা ছবি তোলা হয়েছে।

"The Great Secret"-কে জীবন-রহস্য নিয়ে তোলা একটি আশ্চর্য্য ছবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

* * * *

Anthony Mann পরিচালিত বহু কোটি ডলার ব্যয়সাপেক্ষ "El Cid" চিত্রটি স্পেনে তোলা হবে এবং চিত্রটির সমস্ত দৃশ্যই ষ্টুডিওর বাইরে গৃহীত হবে, —একটি ফুট্‌ চিত্রও ষ্টুডিও মধ্যে গৃহীত হবে না বলে পরিচালক Mann জানিয়েছেন। চিত্রটির নায়ক El Cid-এর ভূমিকায় বিখ্যাত নট Charlton Heston অভিনয় করবেন। চিত্রটিতে বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় ছয় হাজার বর্ম্ম পরিহিত নাইট্‌ ও পদাতিক সৈন্যদলকে যুদ্ধরত দেখা যাবে। প্রযোজক Samuel Bronston মাদ্রিদে তাঁর "King of Kings" চিত্রটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। তিনিই Philp Yordan-এর সহযোগিতায় "El Cid"-এর প্রযোজনা করবেন। "El Cid"-এর খরচ "King of Kings"-এর 6,000,000 কোটি ডলার খরচকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে নির্ম্মাতারা মনে করেন।

* * * *



শ্রীরাজেন তরফদার প্রযোজিত আগতপ্রায় 'গঙ্গা' চিত্রে রুমা দেবী

১৯৫৯ সালের মার্চ্চ মাস থেকে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় চার শত বৃটিশ সিনেমা গৃহ দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এই বৎসরের প্রথম তিন মাসে সিনেমা গৃহগুলিতে দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩৬,০০০,০০০ অর্থাৎ গত বৎসরের এই সময়ের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ১৬ শতংশ কম।

১৯৪৬ সালে বৃটেনে প্রায় ৪৬০০টি সিনেমা ছিল। তারপর ১৩১০ টি বন্ধ হয়ে যায়, তার মধ্যে ১০০০ টি বন্ধ হয় ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে। এর মধ্যে অবশ্য পনেরটি পুনরায় খুলেছে এবং দু'টি নতুন তৈরী হয়েছে।

খেলাধুলা



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শীতের খেলা
ক্রিকেট

ঠাণ্ডা হাওয়ার রেশ, শীতের আগমনের সঙ্কেত জানায়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে খেলাধূলার আসরেও পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। ফুটবলের অবসানে আসর জমায় ক্রিকেট। শীতের সামান্য আমেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ক্রিকেট মহলে জেগেছে ব্যস্ততা। দীর্ঘ এক বৎসরের নিরবতার পর ক্রিকেট মহল হয়েছে প্রাণ চঞ্চল। স্থানীয় খেলোয়াড়দের দল পরিবর্ত্তনের বহর থেকেই তাঁদের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তার ওপর আবার সামনেই পাকিস্থান ক্রিকেট দলের ভারত সফর। অলিম্পিকের অবসানের পর ঝিমুনো ভাবটা কাটিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে সুরু হয়েছে জল্পনা কল্পনা এই পাকিস্থান দলের সফরকে কেন্দ্র করে। সকলেই নিজ নিজ মত ব্যক্ত করতে ব্যস্ত। ক্রিকেটের উর্দ্ধতনমহলেওহৈ-চৈ এর অবধি নেই। কোন্ কোন্ খেলোয়াড়কে নিয়ে দল গঠন করা উচিত। কাকে অধিনায়ক করা উচিত। এই সকল প্রশ্ন এখন মুখে মুখে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ভারতের অপেক্ষাকৃত ভাল ফল প্রদর্শনের পর ক্রিকেট মহলে আশার সঞ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যেই ক্রিকেটের উর্দ্ধতন মহলের কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয় দল পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 'রাবার' লাভ করবে। নিজেদের শক্তির উপর আস্থা থাকা ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলেই মুস্কিল। ভারতীয় দল গঠনে কর্তৃপক্ষগণ পাকিস্থান দলের শক্তির যথার্থতার উপর নজর দিয়ে দল গঠন করবেন বলে আশা করা যায়। পরিক্ষামূলক দল গঠন পদ্ধতি পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয়। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেষ্টে জয়লাভের ফলে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে তার সম্মান কিছুটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সম্মান তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

পাকিস্থান দলের আসন্ন সফর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কার উপর ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা হ'বে। এই বিষয় নিয়ে জল্পনা কল্পনাও চলেচে পুরা দমে। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় দল নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অধিনায়ক হবার সম্ভাবনা হচ্ছে সর্ব্বাধিক। একজন হচ্ছেন বোম্বাইয়ের রামচাঁদ আর অপরজন হচ্ছেন বাঙ্গলার পঙ্কজ রায়। তবে ভারতীয় দলের ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরের ন্যায় যদি পরিক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হ'লে অন্যকথা।

গত বৎসর রামচাঁদ অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে নৈপুন্য সহকারে পরিচালন করেছেন এবং তাঁরই অধিনায়কত্বে ভারতীয়দল শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে। তাঁর অধীনে ভারতীয় দলের মধ্যে সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তিনি ভারতীয় দলের মধ্যে

আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম হন। কিন্তু অধিনায়ক হিসাবে নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও তিনি খেলোয়াড় হিসাবে গত মরশুমে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফল প্রদর্শন করেছেন। কি ব্যাটিং, কি বোলিং, উভয় বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়েছেন। তাঁর এই ব্যর্থতা এতই প্রকট হয়ে পড়ে যে সময় সময় তাঁকে দলের ভার স্বরূপ বলে মনে হয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর খেলার ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পুনরোদ্ধার না হলে তাঁর ভারতীয় দলে স্থান লাভই যুক্তিসঙ্গত নয়।

অপর পক্ষে দলের অন্যতম প্রবীণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসাবে পঙ্কজ রায় অধিনায়কত্ব লাভ করতে পারেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণের মধ্যে অভিজ্ঞতা তাঁরই সব চেয়ে বেশী। ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরে তিনি ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন। এবং গত বৎসরও অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সহকারী অধিনায়ক হিসাবে তিনি রামচাঁদকে সাহায্য করেন। ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরে অধিনায়ক গায়কোয়াডের অসুস্থতার জন্য খেলতে না পারায়



জি, এস, রামচাঁদ

লর্ডস্ টেষ্টে পঙ্কজ রায় ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। তাঁর অধীনে ভারতীয় দলের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই টেষ্টে তাঁর পরিচালনা খুবই প্রশংসনীয় হয় এবং ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকগণও তাঁর অধিনায়কত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মধ্যে তাঁর খেলার মানের অবনতি হয়েছিল সত্য কিন্তু গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাট্সম্যান হিসাবে তাঁর প্রয়োজন ভারতীয় দলে যথেষ্ট আছে। 'ওপ্‌নার' হিসাবে যদি না



পঙ্কজ রায়

হয় ব্যাট্সম্যান হিসাবে তিনি ভারতীয় দলের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করবেন।

গত বৎসরের তুলনায় এবারকার ভারতীয় দল আরও শক্তিশালী হওয়া উচিৎ। অভিজ্ঞ এবং কৃতী ব্যাট্সম্যান মঞ্জরেকারের এবং খ্যাতিমান বোলার সুভাষ গুপ্তের সাহচর্য্য পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত আব্বাস আলি বেগ্‌কে টেষ্ট খেলায় আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। অনেক মহল থেকে স্বর্গতঃ পাতৌদির নবাবের পুত্র 'টাইগার'কে (ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত) নির্ব্বাচনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সে যাই হ'ক, এবারকার ভারত পাকিস্থান টেষ্ট খেলা যে খুবই চিত্তাকর্ষক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একদিকে ভারত চেষ্টা করবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তার সম্মান অটুট রাখতে—অপর দিকে পাকিস্থান চেষ্টা করবে তার পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে।



বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ

❊ ❊ আর্মিন হ্যারি

গত রোম অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন আর্মিন হ্যারি। সমস্ত ক্রীড়া জগৎ চমৎকৃত হয়েছে তাঁর সাফল্যে। রোম্ অলিম্পিকের পূর্ব্বে আমেরিকার হাল্‌কা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সভাপতি ডান ফেরিস আর্মিন হ্যারি সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা সত্য হয়েছে। হ্যারি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এবারে রোমে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় সেই জার্মান দৌড়বীরের ভাগ্যেই জুটবে স্বর্ণ পদক।' ডান ফেরিস ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে দৌড়ে, সবগুলো স্বর্ণ পদকই নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকায়। হ্যারি সম্বন্ধে সোভিয়েৎ সংবাদপত্র প্রাভ্‌দা ১০ সেকেণ্ড সময়ের এই বিশ্ব রেকর্ড সম্পর্কে লিখেছে, 'আর্মিন হ্যারি বারবার প্রমাণ করেছে যে, সে তুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগামী দৌড়বীরদের মধ্যে একজন। সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।'

১৯৩৭ সালের ২২শে মার্চ্চ, জারল্যাণ্ডের নিকট এক ক্ষুদ্র অঞ্চলে আর্মিন হ্যারি জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা জার্মাণীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ছিলেন। প্রথমে হ্যারি ফুটবল খেলা শুরু করেন। তারপর আরম্ভ করেন দৌড় আর জিম্‌ন্যাস্টিক। হ্যারির পিতামাতা তাঁকে সূক্ষ্ম কলকব্জার কাজ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পাঠান। এখান থেকেই শুরু হয় হ্যারির দৌড়জীবন। ১৬ বছর বয়স থেকে হ্যারি ক্রমাগত দৌড়ে উন্নতি করে চলেছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি ১০০ মিটার অতিক্রম করেন ১১.৯ সেকেণ্ডে। এর পরবৎসর ১৯৫৪ সালে তিনি সময় নেন ১১.৭ সেকেণ্ড, ১৯৫৫ সালে ১১.৩ সেকেণ্ড; ১৯৫৬ সালে ১৯ বৎসর বয়সে ১০.৮ সেকেণ্ড; ১৯৫৮ সালে ১০.৩ সেকেণ্ড এবং অবশেষে ১৯৬০ সালে তিনি ১০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন। প্রথম থেকেই তার দৌড়ের বিদ্যুৎগতির জন্য তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু তাঁর এই বিদ্যুৎগতিই তাঁকে অনেক খেলোয়াড়ের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। তাঁর বিশেষ দৌড় পদ্ধতির জন্য আর্মিন কোনদিন জার্মান হাল্‌কা ক্রীড়াসংঘে বা তাঁর নিজের দল 'বায়ার লেভার কুজেনে' বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেন নি। ধীরে ধীরে দলের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা যায়। অবশেষে চার সপ্তাহ ব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠানে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এরপর দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য তিনি আমেরিকায় চলে যান।

আমেরিকা থেকে আর্মিন ফিরে এলেন এক নূতন মানুষ হয়ে। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের এক সওদাগরী অফিসে একটা

করীও জুটে গেল। আর সেই সঙ্গে সংব পরিবর্ত্তনের সুযোগও এসে গেল। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর তাঁর সম্বন্ধে চারিদিকের পত্র পত্রিকায় আলোচনা চলতে লাগল বেশ জোরের সঙ্গেই। কিন্তু অল্প লোকই জানেন যে অলিম্পিকের পূর্ব্বে জুরিখের ক্রীড়া উৎসবে তাঁর কথা মোটেই ভেবে দেখা হয় নি। জার্মানীর সমস্ত শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়গণকে অলিম্পিকের জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে, তাই জার্মান ক্রীড়াসংঘ আর্মিন হ্যারির অংশ গ্রহণের আবেদন প্রত্যাখান করেন। কিন্তু ভাগ্য হ্যারির প্রতি প্রসন্ন। জুরিখে হঠাৎ প্রত্যাখানের হিড়িক পড়ে গেল, আহত হয়ে প্রায় সব নামদাদা প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। প্রতিযোগিতা শুরু হবার মাত্র ৮ ঘণ্টা আগে অংশ গ্রহণের অনুমতি লাভ করলেন আর্মিন হ্যারি।

জুরিখে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ যদি বা মিললো কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে জুরিখে পৌঁছাবেন কি করে সেই নিয়ে দেখা দিল গোলোযোগ। দেখা গেল বেলা ১টার সময় একটা বিমান আছে আর একমাত্র এই বিমানে করেই ঠিক সময় জুরিখে পৌঁছানো সম্ভব। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো হ্যারির হৃদয়। কিন্তু সেখানেও দেখা দিল মস্ত বাধা। বিমানের সমস্ত টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে। তাঁকে স্থান দেবার কোন উপায়ই নেই। হতাশ হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আশা ত্যাগ করলেন আর্মিন হ্যারি। এই সময় ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ক্রীড়াসংঘ এগিয়ে এলো হ্যারির সাহায্যে। বিমানের একজন আরোহীকে অনেক বুঝিয়ে অনুরোধ করা হলো তাঁর জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁকে জার্মান শেষ ফুটবল খেলার একটি দুর্মূল্য টিকিট উপহার দেওয়া হলো। আরোহী ভদ্রলোক আর্মিন হ্যারিকে ছেড়ে দিলেন তাঁর জায়গা। একদিন পরে বিমানটি যখন ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ফিরে এলো, দেখা গেল, হ্যারি জার্মানীর জন্য জয় করে নিয়ে এসেছে এক বিশ্ব রেকর্ড। হ্যারির দৌড়ের পদ্ধতি সম্পর্কে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জার্মানীর খ্যাতনামা এ্যাথলেট মার্টিন লাউয়ের বলেছেন, "যে আর্মিন হ্যারির দৌড়ের কোন খুঁত ধরবে, তার মুণ্ডটা ছিঁড়ে দেবো আমি।" এক বছর আগে জুরিখের এই একই প্রতিযোগিতার আমেরিকার কাছ-থেকে দু'টো বিশ্বরেকর্ড ছিনিয়ে এনেছিলো এই মার্টিন লাউয়ের।

জুরিখে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ পর্ব্ব তো সাফল্যমণ্ডিত হলো। কিন্তু দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই। বেচারা আর্মিন হ্যারি, বাধা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের এক সান্ধ্য-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সময় পায়ে আঘাত পেল হ্যারি। ডাক্তার বললেন, তাঁর ডান উরুর পেশীতে জোর টান লেগেছে এবং ১৪ দিন বিশ্রাম নেবার নির্দেশ দিলেন ডাক্তারবাবু। এই ব্যাপারটি ঘটলো অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সামান্য কিছুদিন আগে। কিন্তু কোন বাধা বিপত্তিই তাঁকে আটকে রাখতে পারলো না। ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে জার্মানীর জন্য আর্মিন নিয়ে এলো অলিম্পিক স্বর্ণপদক।

১০·০০ সেকেণ্ড সময়ের এই সীমা আরও কমানো যায় কিনা, এ সম্বন্ধে হ্যারিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছেন, "খুব বেশী আশা নেই। ১০·২ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভাঙ্গতে ৩০ বছর লেগেছিল। ১০·১ সেকেণ্ডের জন্য লেগেছে ৫ বছর। ৯·৯ সেকেণ্ডে দৌড়ানো আমার মতে অসম্ভব।"

৯·৯ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়ানো সম্ভব কিনা একমাত্র ভবিষ্যৎই তার উত্তর দেবে। যুগে যুগে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে এসেছে। আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে কাল হয়তো তা আর থাকবে না।

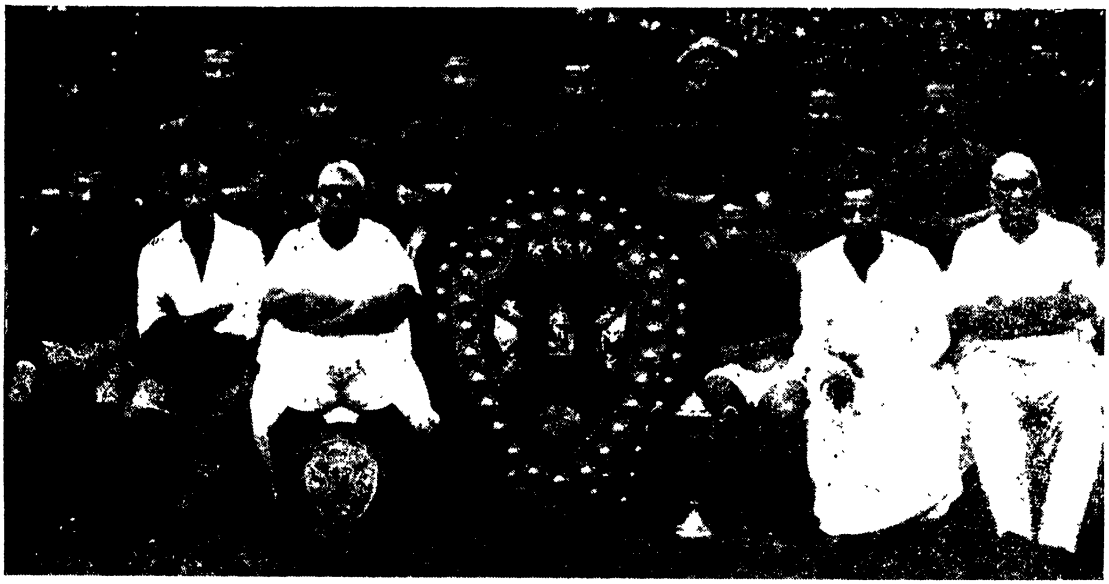
খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড :

১৯৬০ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত ক'রে একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

এই নিয়ে মোহনবাগান তিনবার (১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৬০) একই বছরে 'দ্বিমুকুট' (অর্থাৎ ফুটবল লীগ ও আই এফ এ শীল্ড) লাভ করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ করেছে ৬বার—১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, এবং ১৯৬০ সালে। ১৯৫২ ও ১৯৫৯ সালে মোহনবাগান যথাক্রমে রাজস্থান এবং ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি ; দু'বারই আই: এফ এ শীল্ড খেলা পরিত্যক্ত হয়। মোহনবাগান ৩-১ গোলে মহীশূর একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটি অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও গোলশূন্য ড্র যায়। মহীশূর একাদশ দলের গোলরক্ষক ভরদ্বাজ (১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ফুটবল দলের গোলরক্ষক এবং মোহনবাগান দলের ভূতপূর্ব্ব গোলরক্ষক) অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে নিজ দলকে শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে খেলাটি হয় ভরদ্বাজের সঙ্গে মোহনবাগান দলের।



১৯৬০ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় ও কর্ম্মকর্ত্তাবৃন্দ ফটো: ডি রতন

ভারতীয় ক্লাবগুলির মধ্যে আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ করেছে, মোহনবাগান ৬ বার, ইষ্টবেঙ্গল ৬ বার (১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫১ ও ১৯৫৮), মহমেডান স্পোর্টিং ৪ বার (১৯৩৬, ১৯৪১-৪২, ১৯৫৭), পুলিস—১ বার (১৯৩৯), এরিয়ান্স ১ বার (১৯৪০), ই বি রেলওয়ে ১ বার (১৯৪৪) আই সি এল—(বোম্বাই)—১ বার (১৯৫৩), রাজস্থান —১বার (১৯৫৫)।

আলোচ্য বছরে একদিকের সেমি-ফাইনাল খেলার অতিরিক্ত সময়ে ইণ্ডিয়ান নেভী ১-০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায়

আলোচ্য বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় অভাবনীয় ফলাফল—৪র্থ রাউণ্ডের খেলায় ইণ্ডিয়ান নেভী দল ৩-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ; অথচ এই ইণ্ডিয়ান নেভী দলই তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় ইণ্টার ন্যাশানাল দলের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় পর্য্যন্ত খেলে কোন গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনে নেভীদল মাত্র ১-০ গোলে ইণ্টার ন্যাশানাল দলকে পরাজিত করে।

৪র্থ রাউণ্ডের খেলায় মহীশূর একাদশ ৩-১ গোলে মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে এবং পরবর্ত্তী সেমি-ফাইনালের খেলার অতিরিক্ত সময়ে রাজস্থানকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

এই মহীশূর একাদশ দলই ১-১ গোলে ত্রিপুরা [স্]পোর্টিং দলের সঙ্গে প্রথম দিনে খেলা ড্র করে। অবিশ্যি [দ্বি]তীয় দিনে তারা ৪-১ গোলে জয়ী হয়। ত্রিপুরা স্পোর্টিং [ক্ল]াব ২য় রাউণ্ডে এরিয়ান্সকে পরাজিত ক'রে এ বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় প্রথম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। [ম]হীশূর একাদশের বিপক্ষে তারা প্রথম দিনের খেলাটি [দু]র্ভাগ্যের জন্যেই ড্র করেছিল; তারাই প্রথম গোল দেয় [এ]বং একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে। আই এফ এ [শী]ল্ড খেলায় আর এক অঘটন রাজস্থান দলের কাছে ১-০ গোলে ইস্টার্ণ রেলদলের পরাজয়।

মোহনবাগান দল ৩য় রাউণ্ডে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট দলকে ৪—০ গোলে, ৪র্থ রাউণ্ডে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে, সেমি-ফাইনালে মহীশূর একাদশ দলকে ২য়দিনের খেলায় ৩—১ গোলে এবং ফাইনালে ১—০ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভীদলকে পরাজিত করে।

অপরদিকে ইণ্ডিয়ান নেভীদল ৩য় রাউণ্ডের খেলায় ইণ্টার ন্যাশানাল দলের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময় খেলেও গোলশূন্যভাবে খেলাটি ড্র করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাত্র ১—০ গোলে জয়ী হয়। ৪র্থ রাউণ্ডে ৩—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে এবং সেমি-ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ১—০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ০—১ গোলে মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হয়।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার প্রথম দিকে আহত হয়ে মোহনবাগান দলের রাইট আউট দীপুদাস মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ন। পুনরায় খেলায় যোগদান করেই দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার ১২ মিনিটে দীপুদাস দলের জয়সূচক গোলটি দেন। খেলায় এই জয়সূচক গোল করা ছাড়া দীপুদাস ছিলেন দলের পক্ষে এই দিনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়; যদিও জয়লাভের মূলে ছিল মোহনবাগান দলের সম্মিলিত ক্রীড়া নৈপুণ্য। ১৯৬০ সালের ফুটবল খেলার ইতিহাসে মোহনবাগান দল একটানা ক্রীড়া-মান বজায় রেখেছে। লীগ খেলায় তারা মাত্র একটি খেলায় পরাজিত হয়েছে। দলের নামকরা ৬জন খেলোয়াড় ছাড়াই তারা তরুণ খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় লীগের বাকি খেলাগুলিতে একটানা জয়লাভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এ বছরের ফুটবল মরশুমে স্থানীয় নামকরা ক্লাবগুলির মধ্যে মোহনবাগান দলই খেলায় একটা Standard বজায় রেখে খেলেছে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালনায় সপ্তদশ বার্ষিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ক'লকাতার 'আজাদ হিন্দ বাগে' ৪দিন অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি রাজ্য এবং রেলওয়ে ও সার্ভিসেস দলের প্রায় আড়াই শত পুরুষ ও মহিলা সাঁতারু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পূর্ব্বের জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কোন 'জুনিয়র' বিভাগ ছিল না; এ বছরের থেকে ১৬ বছরের কম বয়সের সাঁতারুদের নিয়ে 'জুনিয়র' বিভাগ শুরু হ'ল।

বোম্বাইয়ের লালু বাজাজ, সুভাষ লাঠি ও কে পি ঠক্কর এবং সার্ভিসেস দলের রাম সিং প্রমুখ খ্যাতনামা সাঁতারুরা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি।

পুরুষদের বিভাগে মোট ১৩টি অনুষ্ঠানের (১০টি একক এবং ৩টি রিলে) মধ্যে কেবল ১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক এবং ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। মহিলাদের বিভাগে ২টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে—২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল এবং ৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে। পুরুষ বিভাগে নতুন রেকর্ড করেছেন সার্ভিসেস দলের রাম দেও সিং—১০০ মিটার (১ মিঃ ১৭ সেঃ) ও ২০০ মিটার বুক সাঁতারে (২ মিঃ ৪৫.৬ সেঃ) এবং শ্রীনিতাই পাল ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারে (১ মিঃ ১১.৫ সেঃ)।

মহিলা বিভাগে বাংলার কুমারী কল্যাণী বসু ২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে নতুন রেকর্ড করেছেন। সময় ৩ মিঃ ০.৫ সেঃ। এছাড়া ৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে বাংলা নতুন রেকর্ড স্থাপন করে (সময় ৫ মিঃ ৫৫.২ সেঃ)।

* পুরুষদের বিভাগে সার্ভিসেস দল সর্ব্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে এই নিয়ে উপর্যুপরি ৪র্থবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। সার্ভিসেস দল সিনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরস্কার ডাঃ হরিধন দত্ত ট্রফি পেয়েছে।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের মোট

১৩টি অনুষ্ঠানের মধ্যে সার্ভিসেস দল ১১টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। বাকি ২টি অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে এবং ৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে বাংলাদল বিজয়ী হয়। বোম্বাই কয়েক বছর ধরে জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছিল কিন্তু আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে একটা পয়েন্টও পায়নি। বোম্বাইয়ের কয়েকজন নাম করা সাঁতারু প্রতিযোগিতায় যোগদান না করার জন্যেও এ রকম হতে পারে। মহিলা বিভাগে বাংলা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ ক'রে শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া ২টি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড করে।

জুনিয়র বিভাগেও প্রথম স্থান পেয়েছে বাংলা; ফলে বাংলা জুনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরস্কার 'সনাতন বিশ্বাস' ট্রফি পেয়েছে। ডাইভিং-এর স্প্রিং-বোর্ড এবং হাইবোর্ডে বজরোঙ্গ প্রসাদ প্রথম স্থান লাভ করেন। হাইবোর্ডে ২য় স্থান পান বাংলার কান্তি দত্ত।

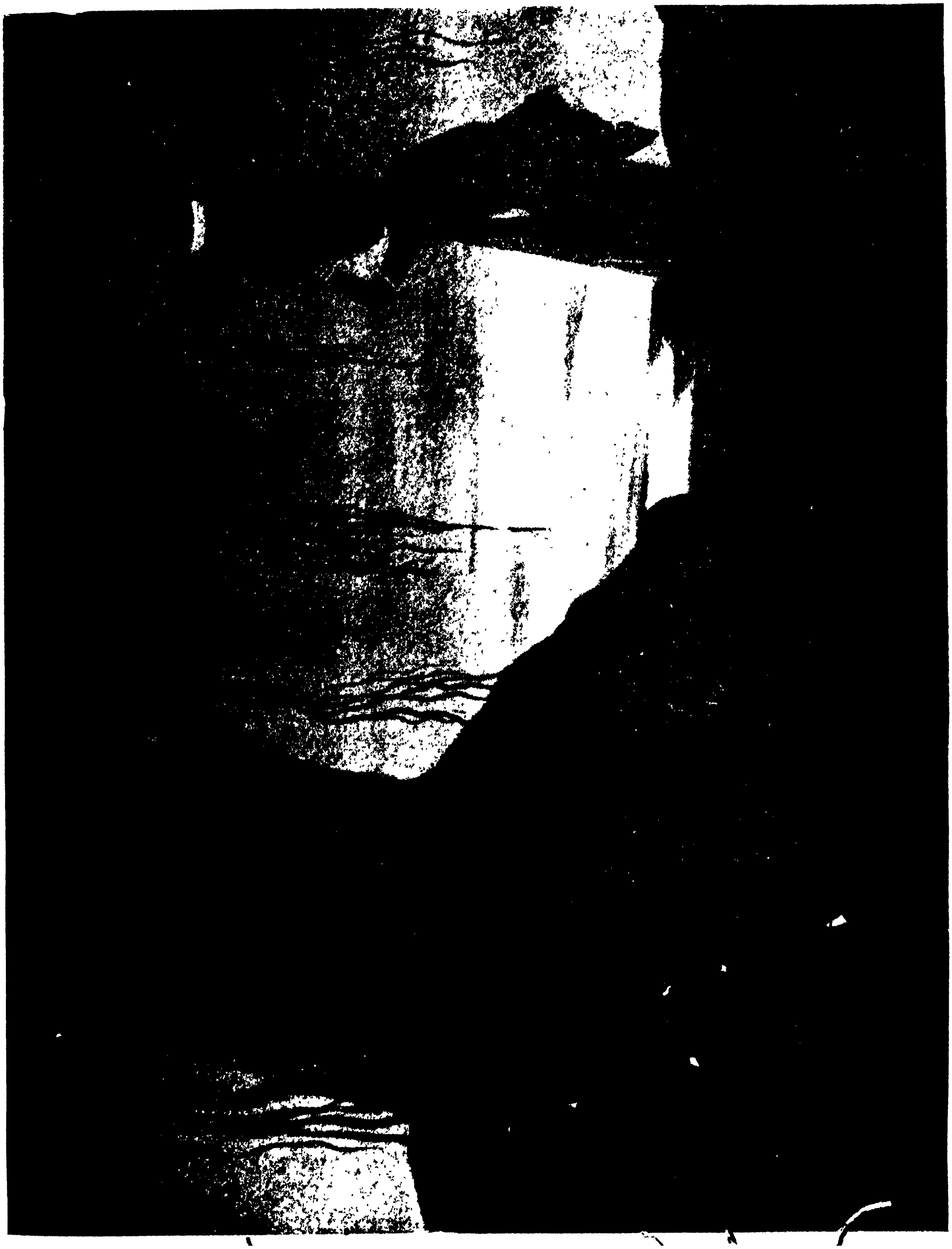
ওয়াটার পোলোর ফাইনাল খেলায় বাংলা ৬-৩ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

পয়েণ্টের তালিকা

	সিনিয়র	জুনিয়র	মহিলা
সার্ভিসেস	১০০	৪	—
বাঙ্গলা	৪১	৩১	৪৭
রেলওয়ে	১৭	—	—
বোম্বাই	—	৫	৯
দিল্লী	২	—	৪
ইউ পি	—	৪	—
মহারাষ্ট্র	—	—	৩
কেরেলা	২	—	—

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





ভারতবর্ষ





অগ্রহায়ণ—১৩৬৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আধুনিক কাব্যের গতি ও প্রকৃতি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তিরিশ শতকে বাংলা কাব্যের ধারা বদলের সূত্রপাত হয়ে আজ পর্যন্ত অনেক জল গঙ্গায় গড়িয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতার পরমায়ু বেশি দিন নয়, অপুষ্ট ও বিকলাঙ্গ দেহ, বহু প্রসবে স্তিমিত প্রাণ নিয়ে অসুস্থ ও ক্ষণস্থায়ী জীবন শুধু যে অশান্তি ও নিরানন্দের আকর হয়—তাই নয়, তা' পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকেও দূষিত ও সংক্রামিত করে ফেলে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত অনেক পেয়ে আসছি। তবু তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাহীন নই বলেই এ আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে। যাঁরা সত্যসত্যই জীবনের সাধনাকে আধুনিক কাব্যে রূপায়িত করছেন, তাঁরা তাঁদের কবি-কর্মে আমাদের বিস্মিত করেছেন, আনন্দ দিয়েছেন। ভাষার নূতনত্বে, আঙ্গিকের সৌকর্যে, ভাবের ঐশ্বর্যে তাঁরা নিশ্চয়ই কবিপদবাচ্য। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। জীবন-জিজ্ঞাসার অস্থির কৌতূহলে হয়ত বা সৃষ্টি-চেষ্টার অধীর আগ্রহে তাঁদের নব-প্রচেষ্টায় অতি-উৎসাহের পরিচয় দিয়ে তাঁরা অনেক সময় পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু যা যখন চিরন্তন, যা' অবিনশ্বর সেই ব্রহ্মস্বাদের সহোদর কাব্যরসের পরিবেশন করতে পেরেছেন তখনই আমরা তাঁদের অভিনন্দিত করেছি—কারণ তাঁদের কাব্য অবিসম্বাদিতভাবে চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে সমালোচকের দৃষ্টিতেও।

কিন্তু নৈরাশ্য ও দুঃখের কথা এই যে—তথাকথিত আধুনিক কবিদের কাব্যপাঠের সুযোগ যখন আমাদের

ঘটেছে—তখন এই কথাই বার বার মনে হয়েছে যে তার-কার আত্মহত্যায় আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে—হয়ত বা একদিন স্তূপীভূত খণ্ড খণ্ড নিস্প্রাণ শিলাখণ্ড নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা চলবে। কাব্য-বিচারের জন্য সেদিন কোনও সমালোচকের প্রয়োজনও হবে না। আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকে যখন কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন তাঁরা একই সুরকে টেনে বুনে ফেনিয়ে এবং কবিতাকে ভাসিয়ে দিয়ে যান অস্পষ্টতার অন্ধকারে। আবৃত্তি করে তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও শ্রোতা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাতে ছন্দ নেই, মিল সেই, ভাবের তরঙ্গ নেই, অকারণ নিরর্থক বাক্যের অবিন্যস্ত প্রসারে উপলব্ধির গভীরতা এবং বিন্যাসের সামঞ্জস্য থাকে না—যতিহীন,গতিহীন শ্রেণীবদ্ধ পঙ্‌ক্তিগুলি কষ্টকল্পিত কাঠামোর মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে স্বল্পায়ু জীবন ধারণ করে চলে। কিন্তু এঁদের মধ্যে ভাগ্যবানও আছেন—যাঁরা কারো কারো কাছ থেকে বাহোবা পান,আবার কেউ কেউ ঘন ঘন কর-তালি দিয়েও তাদের উৎসন্নে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করে দেন। এমনকি যারা নবীন নন, কাব্য-কৃতিতে যথেষ্ট প্রবীণত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও কেহ কেহ সপ্রশংস স্বীকৃতিতে এই সকল আধুনিক কবিদের অভিনন্দিত করে প্রকৃত বোদ্ধা রূপে এদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা লাভের চেষ্টা করে থাকেন। তাহলে দাঁড়ায় এই যে আধুনিকতার নামাবলী গায়ে দিয়ে যাও—হোক না কেন কূল-ভাঙ্গা ধ্রুপদী বা চতুষ্পদী, হোক না কেন গোপাল বা নিধুবাবুর টপ্পার বিকলাঙ্গ অনুকৃতি, হোক না কেন ঘন ঘন ঢোলক ও করতাল সংযোগে আকাশবিদীর্ণকারী "হোলি হায়"-এর চিত্তচমৎকারিণী বৃষভরাগিণী—সবই এ বাজারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিরোপা লাভ করবে।

আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আধুনিক কবিতা অবশ্যই নূতন পথের সন্ধানে চলেছে। প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন গণমানস সম্পর্কে অবহিত একাধিক কবিতা—সমাজ-সচেতনা ও কাব্য-উৎকর্ষের মানে উত্তীর্ণ হয়ে নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি করতে পারে। তবে অনেকে আঙ্গিক পরিচর্যায় অধিকতর মনোনিবেশ করাতে অনেক স্থলেই তাঁদের কবিতায় প্রসাদগুণের অভাব ঘটছে, এটাও স্বীকার করতে হয়। যাঁরা বলেন, আধুনিক কবিতার একেবারেই ভবিষ্যৎ নেই একদেশদর্শী আমরা তাদের দলে নই। ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে, তবে সে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষমতা থাকা চাই এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি আধুনিক কবিরা কাব্যের ব্যাকরণ-সম্মত রীতিপদ্ধতি থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে নিজেদের বেড়াজালে নিজেরাই বাঁধা পড়ে যান—তা হলে আধুনিক কবিতার ব্যাপক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের আশঙ্কা এইখানেই এবং আমরা আধুনিক কবিতার মঙ্গল কামনা করি বলেই বে-চাল দেখলে নিঃস্বার্থ ভাবে সতর্ক করে দিতে চাই। সে অধিকার আমাদের আছে, কারণ অনর্থক বিদূষণে আমরা কাব্যের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও প্রগতির পথে কাউকে নিরুৎসাহ করতে চাইনে।

আধুনিক কাব্যের উপজীব্য

আধুনিক কবিতার প্রধান উপজীব্য একালীন সমাজ ও রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে সুখেদুঃখেজড়িত মানবসম্প্রদায়। এটা খুব একটা নূতন ব্যাপার নয়—প্রাক্তন কবিকুল এদের দিকে কখনই মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি—তবে এটাও ঠিক যে, সেটাকে তাঁরা তাঁদের কবিকর্মের একমাত্র উদ্দীপনা বলে কখনই মনে করেন নি। প্রেম, মিলন, বিরহ—কামনা বাসনা থেকে উদ্ভূত দেহ-জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও স্বার্থকতা এবং তার উপরে অতি মানসের রহস্য-সন্ধানের দিকেও তাদের মনের গভীর আকর্ষণ ছিল। ভাববস্তু ও রসবস্তুর সমাবেশ সাধনের জন্য রচনা-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়—সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আধুনিক কবিতা পাঠকের দৃষ্টিতে যেমন নূতন, সমালোচকের দৃষ্টিতেও তেমনি নূতন বলে ঠেকছে। কিন্তু তাতে করে পাঠকের মনে কোনো স্থায়ীভাব জাগছে কি না—সেটা বিচার করলে বলতে হয় যে শুধু নূতনত্বের জন্যই কোনো কবিতা কবিতাপদবাচ্য হতে পারে না। স্বতস্ফূর্ত ভাববেগ নেই—শুধু মর্জি ও মেজাদের উপরে নির্ভরশীল কবিতা যুগ-চিহ্নিত হয়ে থাকলেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। কবিতা শুধু সালঙ্কারা বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্না হলেই চলবে না—তাকে একই সঙ্গে রূপবতী ও রসবতী হতে হবে। "চাপরাশের জোরে" বড় জোর হাল-খাজনা আদায় হতে

পারে, কিন্তু কায়েমী স্বত্বের দখলীকার হতে হলে ভাব-সম্পদে দখল থাকা দরকার। তবুও একথা বলতে হয় যে আধুনিক কবিতায় যুগের গতি-প্রকৃতি প্রতিফলিত হচ্ছে এবং নূতন পথ-পরিক্রমার পদক্ষেপ তাতে চিহ্নিত হয়ে থাকছে।

"আধুনিক কাব্য" কথাটিকে স্ববিরোধী উক্তি বলা যায়। প্রসঙ্গান্তরে আমরা তার আলোচনাও করেছি। কাব্য একবস্তু এবং আধুনিক-কাব্য আর এক বস্তু—কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোনও বিশেষ মূল্য নেই। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাঠকগণের কাছে রসোত্তীর্ণ কাব্যই প্রকৃত কাব্য। কাল নির্ধারণের জন্য "আধুনিক" বা "সাম্প্রতিক" আখ্যা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা কাব্যের ভাবার্থক বিশেষণ নয়—কালার্থক সঙ্কেত মাত্র। রসোত্তীর্ণ কাব্যই কেবল কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু বিশেষ একটি কাল যদি তার আয়ুষ্কাল নির্দেশ করে দেয়, তাহলে তার আনন্দ-দানের শক্তি এবং সার্থকতাও সেই কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। চিরকালের উপভোগ্য কাব্য-সম্পদ হয়ে থাকা তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। অতএব মানুষের কাছে কাব্যের যে সত্য চিরকাল শাশ্বত স্বীকৃতি পেয়েছে, তার যে রস সর্বকালের সর্বমানুষের কাছে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক হয়েছে—তার যে নির্মলতা ও প্রশান্তি যুগ হতে যুগান্তরে একটি পরিশুদ্ধ প্রাণময়তা বহন করে চলেছে—সে সকল গুণ যদি উপেক্ষিত হয় তাহলে বলব যে—কাব্য-সাহিত্যে আজ আকাল এসেছে। অতএব কাব্যের উপজীব্য বিষয় নিয়ে এক তরফা রায় দিলে বিচারবুদ্ধির তারিফ করা যায় না এবং পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তাহলে বাদ হয়ে থাকে।

কাল-নির্দেশ ছাড়াও কাব্যের পরিচিতির পক্ষে আধুনিক কথাটি অবান্তর বলেই মনে হয়—কেন না কোনও বিষয়কে চোখের সম্মুখে উঁচিয়ে ধরা দেখলে গোড়াতেই বুঝতে হয় যে—ভিতরকার বস্তু অপেক্ষা তার 'চাপরাশের দেমাকটাই' বেশি। জীবনের ব্যর্থতা ও দুঃখ বেদনাকে শুধু একালীন বলে জাহির করার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। কারণ মনুষ্যজন্ম থেকে তার সুখ ও আনন্দের সঙ্গে তার দুঃখ ও বেদনার সৃষ্টি হয়েছে—নিরবধিকাল তাদের অস্তিত্ব থাকবে—সুতরাং কোনো একটা বিশেষ রাষ্ট্র ও সমাজকে তারজন্য একমাত্র দায়ী করলে বিশ্ব-সংসারের শাশ্বত নিয়মকেই অস্বীকার করা হবে। কবি-কর্মের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি —অতএব এতে করে সম্পূর্ণ নূতন রচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল এবং নূতন রচনা-রীতিও উদ্ভাবিত হল—একথা বলাও অসঙ্গত। আসল কথা, যে যুগেরই কাব্য হোক—সে কাব্যের উপজীব্য বস্তু বা উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রকে সত্যকারের কবি-দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য।

প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম

আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই ছন্দ-বদ্ধ রীতি মানেন না, আন্তরিক মিল যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন—ছন্দ-পতন ও যতি-পাতও তাঁরা আমলে আনেন না—; চড়াই উৎরাই করে—যথেচ্ছ বিরতি-চিহ্ন প্রয়োগে তাঁরা অভ্যস্ত। গদ্যেরও যে ছন্দ আছে একথা তাঁরা ভুলে যান। বিরহমিলনের ছন্দ, উচ্চ ও গভীর ভাবাভিব্যক্তির ছন্দ, এমন কি হাসি-কান্নারও ছন্দ আছে। পশ্চিমা রমণী যখন 'মাটি লিবে গো' বলে ডাকে, ফেরিওলা যখন হেঁকে যায়—"বেলোয়ারী চুড়ি চাই, রঙীণ পুঁথির মালা চাই, নাকের নাকছাবি চাই, ঝুমকোলতা দুল চাই" তার মধ্যে আমরা ছন্দের অনুরণন শুনতে পাই, প্রকাশ-ভঙ্গীর সাবলীল গতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। লিখুন না তাঁরা অসম ছন্দের কবিতা, তাতে কাব্যে অনুসৃত প্রসাধন-রীতি উপেক্ষিত হবে কেন? ছন্দের বাঁধাইটুকুনাই বা থাকল, কিন্তু ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতনে পাঠকচিত্তে যে মধুর ঝঙ্কার উঠে, ভাবময়তার সৃষ্টি করে, রচনার সার্থকতা তো সেখানেই—এই কথাটাই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর একটাতে শুধু বলে—কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে, সে আপিস চালায়, তর্ক করে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক বিনতি ছন্দোহীন বাক্য, অব্যবসায়ীর সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময়

ছবিতে কাব্যে গানে।" তিনি আরো বলেছেন, "শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেন না তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি—তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলি আমরা রস। অর্থাৎ যে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই কাব্যের রস।"

বক্তব্যের নূতনত্ব

অবশ্য আধুনিক কবিদের মধ্যে ছন্দোবন্ধের প্রতি অনুরাগ অথবা সে সম্পর্কে পারদর্শিতা ও কুশলতার অভাব থাকলেও বক্তব্য বিষয়ের নূতনত্ব ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য আছে—কিন্তু আবেদনের স্পষ্টতা নেই, ভাবধারণায়ও গভীরতা নেই। তাঁরা স্বীকার করেন না যে যেখানে ছন্দের বাঁধুনি নেই, শুধু তার একটা আকার দানের চেষ্টা আছে—সেখানে রচনার অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। মিল বলতে আমরা শুধু আন্তরিক মিলের কথাই বলি না—কবিতার মধ্যে সুরের যে মিল আছে, সেই সুরের আরোহ-অবরোহের যে সমতা ও সামঞ্জস্য আছে বা থাকা উচিত, আমরা তারই কথা বলছি। অক্ষর কম পড়ে যাচ্ছে, যতি হারিয়ে যাচ্ছে, সুর-সঙ্গতি ব্যাহত হচ্ছে, অথচ কথার পর কথা টেনে-বুনে কোথাও কারণ-অকারণে হঠাৎ থেমে—কবিতা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—এটা কবিকর্মের সার্থকতার পরিচয় নয়। সঙ্গীতের সুর যেমন তালে লয়ে গমকে ঠমকে ক্রমশঃ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, কবিতাও তেমনি ছন্দের নিয়মিত গতিতেও সুসমভাব-সমন্বয়ে পদলালিত্যে ও রস-মাধুর্যে, ব্যঞ্জনায় ও আবেদনে রূপায়িত হয়ে মনকে আবিষ্ট করে—তার সুর-মূর্ছনা সঙ্গীতের মতই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। গদ্যাশ্রয়ী বা আঙ্গিক-সর্বস্ব কাব্যিক রচনার পক্ষে সেটা কখনই সম্ভব নয়।

বিখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেন যে "আধুনিক কাব্যের কবিরা এই রীতি প্রবর্তন করেছেন যে —কাব্যের চাল হবে গদ্যের চালের অনুরূপ—গদ্য অর্থে এখানে মুখের চলিত কথা। অবশ্য ভাষা চলিত হবে, সাধারণ কথা শব্দ ও অন্বয় যথাসম্ভব অনুগমন করবে; কাব্য রচনার এ সূত্র প্রাচীনতর কালেও একাধিক কবি দিয়েছেন এবং কার্যতঃ একে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে সাফল্যলাভও করেছেন। কিন্তু আধুনিক চেয়েছেন আরও বেশি কিছু। শুধু ভাষা বা কথা হলেই চলবে না, শুধু শব্দাবলী বা অন্বয়ই যথেষ্ট নয়—সাধারণের চলনটি অবলম্বন করতে হবে। গদ্য-পদ্য Poetic-prose বলে একটা রীতি আছে; সেটি সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এক বিশেষ অঙ্গ। গদ্য রচনা যখন থেকে সমৃদ্ধ হতে সুরু হয়েছে তখন থেকেই এই রচনা-রীতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া আছে পদ্য-পদ্য (prose-poem)। এটা গদ্য হতে পদ্য-কাব্যের দিকে উঠে চলবার আর এক ধাপ। তার পরের ধাপ হল মুক্ত (Free-verse) কিন্তু আধুনিকেরা বর্তমানে যা চাইছেন, তা থেকে এ রকম ধারা ভিন্ন ধরণের। আধুনিকদের এ-ধারাটি কি রকম? যথাসম্ভব পদ্যের বাঁধুনি থাকবে, কিন্তু চাল বা চলন হবে গদ্যের, তালমান পদ্যের দাবি অনুযায়ী থাকবে, কিন্তু সুর হবে গদ্যের।" এর উদাহরণ দিয়েছেন লেখক—

> "অনেক দিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
> কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গরু-খোঁজা করে—"

অথবা—

> "তবু তোমরা আজকের মত চুপ করো
> একটু চুপ করে থাকতে দাও আমাকে"

এ প্রকার কবিতা সম্পর্কে পরিহাস-রসিক রাজশেখর বসু বলেন "গদ্য লিখে দু'পাশ মুছে দিলেই তা আধুনিক কবিতা।"

আঙ্গিকের অভিনবত্ব

আঙ্গিক হিসেবে বলা হয়েছে "এসব কবিতা অনবদ্য।" জনৈক আধুনিক সমঝদার বলেন—"এ হল বাস্তবিকই গুরুগম্ভীর কাব্য।" এই আঙ্গিকের অভিনবত্ব সম্পর্কে "সবুজ-পত্র" গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট লেখক—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"কি দেশী কি বিদেশী বর্তমান সাহিত্যে

সাধারণ প্রতিজ্ঞায় আস্থার পরিবর্তে অবচেতনাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেজন্য অবশ্য অবচেতনাস্থিত দমিত প্রবৃত্তির মুক্তিতে সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সম্ভব এই ধারণাই দায়ী। অবচেতনা থেকে সাহিত্যিক দুটি জিনিষ প্রত্যাশা করেন, আঙ্গিকের দিক থেকে ইমেজ ও সীম্বল এবং রচনারীতির বেলা ভাবধারার একটি নতুন সম্পর্ক। ইমেজ অনেকটা বুদ্বুদের মতন—যার রঙের বাহার সত্যই চির-নূতন ও যার সারি-গাঁথা অন্তঃশীল জীবন-স্রোতের পরিচায়ক। সীম্বল আরো ঘন, আরো স্থায়ী—ও এতই দানা-বাঁধা যে তার সংহতির শক্তিতে প্রতিবেশী ভাসমান ভাবগুলি তার ছকের মধ্যে অতি সহজেই বিন্যস্ত হয়। জাতীয় সমগ্র অবচেতনা থেকেই সীম্বল আহরণ প্রশস্ত, * * * যে-কবির তার সঙ্গে যোগ বেশী তার সীম্বল ততই ভাবোত্তেজক। অতএব এখানেও সমাজবোধের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু সীম্বল-ইমেজ ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যিক বিপ্লব-সাধনা নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অবচেতনা বিপ্লবী সেনার শিবির নয়, তাকে চেতনা দিয়ে খোঁচালে তবে সে বিদ্রোহীর রসদ যোগায়। লোক-সংগ্রহ যেমন স্বভাবতঃ পুরাতন-পন্থী, তাকে প্রগতিশীল করবার জন্য তাকে সচেতন করা ছাড়া যেমন অন্য উপায় নেই, তেমনই অবচেতনাস্থিত ইমেজ ও সীম্বলগুলির মধ্যে একটা পূর্বজানুকরণবৃত্তি থাকে, যাকে খণ্ডন করতে এক সচেতন বুদ্ধিই সমর্থ। সচেতন বুদ্ধি অর্থে কেবল নির্বাচন-শক্তিই বলছি না, সমাজ-বোধ উল্লেখ করছি।" তারপর তিনি—আধুনিক কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—"ব্যর্থতাবোধ এ যুগে স্বাভাবিক; তাই বলে সেটা আধুনিকতার নিদর্শন হতে হবে, কিম্বা নঙর্থকই হতে হবে—এমন কোনো নিয়ম নেই। আধুনিক ও সদর্থক বিশ্বাসে তাকে পরিণত করবার জন্য দুটি জিনিষ সাহায্য করে—সামাজিক বিপ্লব কেবল Mobilityর গতিহার বৃদ্ধি নয়, ভীষণ প্রকারের দৃঢ় শিক্ষা ও সংযম। প্রথমটি আমাদের নেই, তাই কোনো কবিকে ব্যর্থতার জন্য দোষী করি না, কিন্তু ঠিক সেই জন্যই দ্বিতীয়টির প্রয়োজন বেশী···এই পরিবেশে আজকালকার সব কবিতারই তাগিদ অভিমান। অবশ্য কারুর কারুর বা মেয়েলী, কারুর বা পুরুষালী। কিন্তু সব অভিমানই অ-সামাজিক। কেউ অভিমানকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাসবোধে পরিণত করেন, কেউ বা তাকে মেজাজে বদলান। সর্বত্রই সেই সামাজিক বোধের অভাবে একটা ভীষণ অপূর্ণাকার ছায়া জ্বল জ্বল করছে। সে-অভাব যতদিন না ঘুচছে, ততদিন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সম্পদ আমার কাছে মোহন হলেও খুব মূল্যবান নয়।"

যে "ইমেজ" ও "সীম্বল" সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে—একদিক থেকে তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে, কিন্তু বহু-স্থানে তা' কষ্টকল্পনায় আড়ষ্ট; কথার চাতুর্য ও বিন্যাসের চমক আছে, কিন্তু মানসপটে প্রতিবিম্বিত হতে না হতেই তা জটিলতার মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আমরা এই "সীম্বল" ও "ইমেজ" গদ্যেও দেখছি—আধুনিক কালে তা' বাংলা কাব্যের অগ্রগতিকে কম সাহায্য করেনি। পাঠক কবিতা চায়, শুধু রূপকল্পে সে সন্তুষ্ট নয়—জটিলতার জটাজাল ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে সে নারাজ। সেজন্য এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে—কাব্য শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার। সেজন্য তার পক্ষে প্রয়োজন সচেতনতা, অনির্বচনীয়তা যে দুর্বোধ্যতা নয় সেটা উপলব্ধি করবার জন্য চাই বুদ্ধি ও চেতনা দুইই।

আধুনিক বনাম প্রাচীন কবি

আধুনিক কাব্যের স্বয়ম্ভু-প্রবক্তরা যা বলেন তাতে প্রাক্‌-তিরীশের কবিরা তো নস্যাৎ হয়ে যান—পরন্তু রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যে অপ্রমেয় ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর আকাশচুম্বী খ্যাতির অতখানির সত্যই অধিকারী কিনা সে সংশয়ের সৃষ্টি করারও অপচেষ্টা করে থাকেন। প্রাক্‌-তিরিশের এই কবিরা উত্তর-তিরিশেও মহৎকাব্যের সৃষ্টি করেছেন। কারু কারু লেখনী এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে। তাঁরা সকলেই প্রতিভাবান এমন কথা বলিনা, তবে পাঠক-সমাজে তাঁদের কবি-খ্যাতি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। "সবুজপত্র"-এর স্বনামধন্য সম্পাদক প্রমথ-চৌধুরী, সন ১৩২২ সালে (অর্থাৎ একালের প্রাচীন কবিরা যখন সেকালে নবীন বলে অভিহিত ছিলেন) "নব-কবি"দের রচনা সম্পর্কে বলেছিলেন—"এ সকল রচনা ভাষার পরিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছন্নতায় পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের

আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা' কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনা শক্তি। মনের ভাবকে গড়ে তুলতে না পারলে তা মূর্ত্তি ধারণ করেনা, আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদি গুণেই সে কায়ার রূপে ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দ-জ্ঞান থাকা চাই, ছন্দ-মিলের কান থাকা চাই। সে জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেন না সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নব-কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতা অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে—এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউসানের একধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয়ত পূর্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই কারিগরি জন্ম লাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। এলো-মেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দৈব-মূর্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্ন মূর্তি ও পরিচ্ছন্ন-মূর্তি একরূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোন দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তাঁর কাছে এসব তর্কের কোন মূল্য নেই। কবিতা রচনার আর্ট নবকবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে—একথা যদি সত্য হয়—তাহলে তাঁদের লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।"

অথচ আধুনিকেরা শুধু এঁদের কৃপার চক্ষে দেখেন তাই নয়, কিছুকাল আগে আধুনিকতার অশোভন আস্ফালনে কোন একজন তরুণ কবি তাঁদেরই গুরু "রবীন্দ্র-ঠাকুর"কে দূরে সরে দাঁড়াতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিকূল পরিবেশের অজুহাত

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। আধুনিক কাব্য বা সাহিত্যের প্রবক্তারা অনুকূল প্রতিকূল পরি-বেশের তর্ক তুলে যে সব কথা বলেন, তার আলোচনাও আমরা সংক্ষেপে অন্যত্র করেছি। তাঁরা বলেন, পরিবেশ যখন এইরূপ, তখন মহৎ কাব্য সৃষ্টির প্রত্যাশা করা ভুল। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে প্রাণ-শক্তির কাছে কোনও বাধাই অনতিক্রম্য নয়—সৃষ্টিধর্মী কাব্য অন্তর্নিহিত বিকাশ-বাসনায় আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, বিরুদ্ধ পরি-বেশের দ্বারা তা কখনই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁজে গঠিত হয়—সে রাষ্ট্রে যদি মানুষে সমাজ ও জীবন পূর্বকল্পিত বিধিব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়—তাহলেও আমাদের সাহিত্য কি সেই বাঁধাধরা পথেই চলবে? না, তা চলবে না। কারণ সাহিত্য কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না, কোনও "ইজম"-এরও তাঁবেদারি করে না। যা হোক বাংলা সাহিত্য সৌভাগ্য-ক্রমে এখনও তেমন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়নি—হলেও তা মহৎসাহিত্যসৃষ্টির পথে অন্তরায় ঘটাতে পারবে না। তার নজীর দিয়েছেন বিখ্যাত কবি ও সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য উদ্ভবের পরিবেশ বড় বিচিত্র; দেখা যাইবে যে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, গণ-তন্ত্র, কিছুই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিকূল নয়। রাণী এলিজাবেথের যুগে সেক্সপীয়র, রাজা চতুর্দশ লুইএর যুগে মলিয়ের, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাহ্নে ভল্‌তেয়ার, খণ্ডিত জার্মানীতে গ্যেটে. ইটালীর অরাজকতার যুগে দান্তে, বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাস, বহুনিন্দিত রুশিয়ার জারদের আমলেই শ্রেষ্ঠ রুশ সাহিত্য, এমন কি রাজনৈতিক পরাধীনতাও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় নয়—ইংরাজ আমলে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।" অর্থাৎ সাহিত্যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের অজুহাত অবান্তর।

কাব্যে জীবন-বোধ

আসল কথা হচ্ছে এই যে, কাব্য-বিচারের সময় দেখতে হবে—কবির জীবন-বোধ কতখানি গভীর—তার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি কতখানি এবং তার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠা ও

আন্তরিকতা আছে। আমরা "জীবন-জিজ্ঞাসা" কথাটি প্রায়ই শুনতে পাই—সেই জীবন-জিজ্ঞাসার মূলে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির নিবিষ্ট যোগাযোগ থাকলে কবির কাব্য সম্ভাব্য সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। কাব্য বা সাহিত্য নিজের পথ নিজেই করে নেয়, স্বকীয়তার শক্তিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে—তা সে কাব্য বা সাহিত্য—প্রাচীনই হোক, তার অর্বাচীনই হোক।

এটা ঠিক যে কবির জীবন-দর্শন গড়ে ওঠে পরিবেশকে নিয়ে, তার প্রাক্তন ও বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি নিয়ে। মানব-চরিত্র যেমন তার আধার, সমাজ-চরিত্রও তেমনি তার আশ্রয়। কোনও স্রষ্টার পক্ষেই জীবনকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—সমাজের অধোগতি বা সমুন্নতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। জীবন-বোধ ও জীবন-দর্শনের সমন্বয় ঘটলে রচনা সার্থক কাব্যে রূপায়িত হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে সুন্দরের সঙ্গে শিব অর্থাৎ কল্যাণের, জ্ঞানের সঙ্গে উপলব্ধির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কল্যাণবোধ চাই, সত্যদৃষ্টি চাই, বিশুদ্ধতম জ্ঞান চাই, নির্মলতম উপলব্ধি চাই। তাদের স্পর্শে ও প্রভাবে বিষয়বস্তু কাব্যে আনন্দময় হয়ে ওঠে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে অনেক সময় এসকল গুণের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। সে কাব্য বা সাহিত্যের রসগ্রহণে পাঠক সাধারণের তৃপ্তি কোথায়? আধুনিকদের অন্যতম মুখপত্র "উত্তরসূরী"র ১৩৬১ সালের প্রথম সংখ্যায় সুনীল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, পূর্বসূরীদের মধ্যে জীবন-বোধের যে অপ্রমেয় প্রাচুর্য ও অনুভূতির ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতা বিদ্যমান ছিল, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে তা কি দুর্লভ নয়? এর একটি কারণ অবশ্যই এই যে, বুদ্ধি বৃত্তির দিক থেকে, মননের গভীরতার দিক থেকে, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকরা তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। আর একটি কারণ এই যে সাম্প্রতিক বাংলায় সাহিত্যকর্মটিকে একটি সহজাত কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়, সাহিত্য বা কাব্য-সৃষ্টি যে একটি দুরূহ কাজ, এই কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য যে জীবনব্যাপী সাধনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, সে কথা যে কেবল সাম্প্রতিক সাহিত্যিকরা ভুলে যেতে বসেছেন তা নয়, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই বোধের অভাব সুপ্রকট। * * * কেবল লিপিচাতুর্য, ছন্দ অথবা অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্য, শব্দের ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সূক্ষ্মবোধ থাকলেই সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। * * * কাব্যসৃষ্টির সময় বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা, কল্পনা, অবচেতন অনুভূতি, সহজাত বৃত্তি প্রভৃতির বিচিত্র সমন্বয় ঘটে। * * * কাব্য রচনা Craftsmanship নয়।"

কাব্যের ধর্মান্তর গ্রহণ

আমাদের বলবার কথাও তাই—আশার কথা এই যে আধুনিক লেখকদের মনে আজ এ প্রকার মনোভাবের উন্মেষ ঘটেছে। কাব্য-রচনা নিছক কারিগরী-বিদ্যার কৌশল দেখান নয়—অবশ্য তার অলঙ্করণে কারুশিল্পের কাজ নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু সে কাজও প্রাণহীন নয়। দুঃখের বিষয় আধুনিক কবিতার মধ্যে অনেকস্থলে কারিগরীর বাহাদুরি দেখানর চেষ্টা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা পূর্বেই বলেছি যে কাব্যের ব্যাকরণ আছে। কাব্য-সমালোচক বলেন, যার ব্যাকরণ আছে তারই অর্থ আছে। আধুনিকরা সে ব্যাকরণের নিয়ম কানুন জানেন না—সেজন্য তাঁরা ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু "অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে রসবস্তু প্রভৃতি গালভরা নাম দেওয়া" ভাবের ঘরে চুরি করা এবং ওটা সুবিধাবাদীর কৌশল মাত্র।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আধুনিক কাব্যের গতি এই দিকে চলেছে—তার প্রকৃতিও এই ধরণের। এও দেখা যাচ্ছে যে "রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে তাঁরা আশ্রয় নিচ্ছেন—তাঁদের রূপকল্প ও প্রতীক ব্যবহার, প্রকরণ পদ্ধতি এবং ভাবানুসৃতি প্রভৃতি "পুরাতনেরই ভাঙ্গাগড়া"। এ সকল লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের কাব্য-প্রচেষ্টার যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কেও তাদের সাবধান করে দিয়েছেন।—তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁদের এই নূতন কালের "নব প্রচেষ্টার ভাল দিকটাও যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে বাংলার সাহিত্যিক সমাজে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণের উৎকট গোঁড়ামির দিকটাও।

গল্প

সেই মুখ

নিখিলসুর

প্রিয়তম,

কিছু বাকী নেই সব পেয়েছি। সব কিছু বিরাট সম্পূর্ণ। ইস্পার অতলও নাগাল পেয়েছি। কত আনন্দ। বুক একেবারে ভরে গেছে, সুর আসছে গলায়, তালে তালে পা দুটোও দুল্‌ছে। অবাস্তব, মনে হ'চ্ছে বুঝি আমার কথা? কিন্তু আমার তো মনে হ'চ্ছে এর থেকে বাস্তবও কিছু হতে পারে না। আমি বিদেশিনী। দেহ-মনে কত ব্যবধান, কত বিরোধিতা তোমার বধূর সঙ্গে। তবুও আমি গরবিনী; এক সময় আমিই তোমার ফ্যাকাশে কালো মণিতে আনতে পেরেছিলাম ঔজ্জ্বল্য। কথাগুলো কি প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে? ওগো না, এ প্রলাপ নয়।

একেবারে বেশী এগুতে পারলো না অনল। থামলো এখানে। চোখ তুলে নিল চিঠিটার ওপর থেকে। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধাগুলির দিকে প্রথমে নজর পড়লো। ওদেয় সময় এসেছে। প্রাণ ঢেলে তাই সুবাস ছড়াচ্ছে। লম্বা ফুলের মালা দিয়ে পালঙ্কের রেলিং সাজানো হয়েছে। নানান্ ফুলের গাঁথুনি। বৃন্তচ্যুত হয়েছে অনেকক্ষণ হ'লো, কিন্তু নেতিয়ে পড়ে নি এখনো। ফুলশয্যার রাত। এ রাত ওদের সজাগ রেখেছে। এ রাতে ওদের গুরুত্ব ওরা বোঝে। ব্যবধান রেখে নববধূ ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত ঘুমুচ্ছে না—ভাবছে কিছু। অনলের কথা? মধুর সম্ভাষণের অপেক্ষা করছে বুঝি? মুখ ঘুরিয়ে নিল অনল। তিক্ত প্রবৃত্তিতে মন ভরে গেল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো বিদ্রোহের শ্লোগান। অনল চিঠিতে আবার চোখ নামালো।

"তোমার ধারণা ভুল। তোমার মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠার আসন চির অম্লান। দুঃখ করছো? ভাবছো এখন আমার এ কথার কি মূল্য আছে? কেন নেই, অনেক আছে। আমি না থাকলে তুমি যে অপূর্ণ তা কি বলে দিতে হবে? আমি থাকবো। নিশ্চয় থাকবো। সংগোপনে। তোমার দেশের মেয়েরা আগে নুপুর পরতো। তোমার চেতনাকে নাড়া দেবার জন্য আজ চথ্‌কে না হয় নুপুর পরবো। যে সময়টিতে আমাদের দেখা হ'ত সেই সময়ে—চোখ বুজলেই অমনি শুনতে পাবে নুপুরের রিণিঝিণি শব্দ। কিন্তু সাবধান। শব্দ শুনবার জন্য শুধু চোখ বুজবে। অন্য আকাঙ্খার বশে নয়।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে গিয়ে অনল হাঁফিয়ে পড়ছে। পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—নতুন পালঙ্ক—ঠিক ফিট্ হয় নি। একটু দুলে উঠলো উঠবার সময়। নববধূর শিল্কের আঁচলটা জড় হয়ে গেল কাঁধে। ফরসা অনাবৃত বাহু—বাঁ হাতখানা সামনে প্রসারিত। ডানহাত বুকের কাছে জড় করা। কিছু যেন সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায়। এক মুঠো হাওয়া এল ঘরে। অনল এগিয়ে গেল জানলার ধারে। পর্দাটা হাওয়ায় ফুলে উঠেছে নৌকার পালের মত। সরিয়ে দিল অনল পর্দাটা। হু হু করে বাতাস ঢুকলো ঘরে। দেওয়ালে ঝুলান ক্যালেণ্ডার নড়ে উঠলো। পালঙ্কের রেলিং এর ফুলের মালাগুলো দুলতে লাগলো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বোধহয়। জলো হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগলো মুখে। অনল সরে এল। চেয়ারের ওপর বসে আবার চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরলো, চিঠিটার দিকে তাকাতে কষ্ট হ'চ্ছে অনলের। পড়তে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ছে। কতদিন ধরে কি দারুণ ঔৎসুক্য মনে চেপে রেখে নিজেকে সংযত করেছে তা কেবল অনলই জানে। নিজের মনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল মিমার কাছে। তাই খুলতে পারে নি এতদিন। নির্দেশ

ছিল, মিমার আজকের রাতে খুলবার। কিন্তু অধিকারের গণ্ডীতে এসেও যেন পূর্ণ আগ্রহে অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। মাত্র কয়েকটা লাইন পড়তেই যেন গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথায় জার্ম্মাণী—আর কোথায় মিমা। আর এ চিঠি? যেন এক সুখ-স্বপ্নের বিষাদময় বাস্তব পরিণতি।

জার্ম্মাণীর মাটিতে পা দিয়ে জার্ম্মাণীর ঐশ্বর্য্য, নতুন পরিবেশের অনুভূতি ভেদ করেও একটা বিশাল শূন্যতা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেদিন। কলকাতায় ইটালী থেকে শ্যামবাজার বড় জোর বেলগাছিয়া, ওদিকে হাওড়া আর এদিকে কালিঘাটের বন্ধুর বাড়ীতে পঁচিশটা বছরের গতিবিধি যার সীমাবদ্ধ ছিল, তার কাছে এই কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া এক কথায় দেশান্তর—একটা আকস্মিক বিস্ময়। তার জীবনে এই আকস্মিক ব্যতিক্রমের জন্যই সেদিন জার্ম্মাণীর আভরণে ঢাকা অবয়বখানিকেও কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়েছিল। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য ফুরিয়ে গেলে যে কোন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যকে হীন, তুচ্ছ বলে বোধহয়।

তবুও মরুভূমির বুকেও অনেক সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা যায় বনস্পতির পরিচিত রূপ, তার আবেগভরা হাতছানি। অনলও দেখা পেয়েছিল বনস্পতির এত দূরে এসেও মায়ের সেই স্নেহের আটপৌরে রূপ, নতুন অপরিচিত অনুভূতির রেশ, অজ্ঞাত কল্পনার পরিচয়—সব পেয়েছিল প্রবাস জীবনে। টুকরো টুকরো মেঘ এতদিন তার জীবনে কখনও কখনও জলভারানত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতে সরসতা ও রুক্ষতায় মেশান জীবনের রূপ দেখে সে ছিল অভ্যস্ত। কিন্তু এতদিন পরে সেই খণ্ড মেঘের মিলন এক আকাশে দেখতে পেল একই সময়ে। সে কী মিমা বিদেশিনী।

জন্মভূমির অদৃশ্য হাতছানিতে যখন হৃদয়ে উঠতো আবেগের তরঙ্গ, আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রবাস-জীবন যখন হাহাকার করে উঠতো, মাতৃ-স্নেহ-কাঙাল কালো-মণি যখন জলে ঝাপসা হয়ে যেত—তখনই প্রত্যাশিত, কল্পিত রূপ নিয়ে হাজির হ'তো মিমা। ভারতে জন্মেছিল। তাই বুঝি ভারতীয় আদর্শ ঐতিহ্যের সঙ্গে তার নাড়ীর একটা সূক্ষ্ম সংযোগ ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে বিদেশিনীর মুখোশ খুলে ফেলে হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছিল অনলের কাছে।

প্রথম হৃদয়ের আবরণ উন্মোচনের দিনটার কথা মনে পড়ে অনলের। বাইরে বেশ বরফ পড়ছিলো। ছুটির দিন ছিল। তাই এত বরফ পড়া সত্ত্বেও মিমা উপস্থিত হয়েছিলো ঠিক সময়টিতে! ছুটির দিনে মিমা ঠিকই আসত। সারা সকালটা কথা বলেই কেটে যেত। ও শোনাত তার দেশের কথা, সমাজের কথা—অনল শোনাত নিজের। আরো অনেককিছু। পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা থেকে শুরু করে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন পর্য্যন্ত সব। মিমা বার বছর বয়স পর্য্যন্ত কোলকাতায় ছিল। মোটামুটি বাঙ্গলা জানতো। বলতেও পারতো। কিন্তু তর্কের সময় লড়তে পারতো না বাঙ্গালা ভাষা দিয়ে। বেধে যেত। তাই মাঝপথে হঠাৎ বাঙ্গলা ছেড়ে দিয়ে ধরত ইংরেজী। তবুও কোন অসুবিধে হত না। আসলে তর্কই হ'ত কম, আলোচনা হত বেশী। মিমার মনটায় ভারতীয় ভাবধারার এমন গভীর প্রভাব ছিল যে প্রায় সব কিছুতেই মিমার সঙ্গে অনলের মতের মিল হয়ে যেত। অনল নিজেই অনেকদিন বলেছে, 'মিমা, তোমার ভারতীয়—বিশেষ করে বাঙ্গালী হওয়া উচিত ছিল।'

কিন্তু সেদিনটা কিছুতেই জমছিলো না। বাইরে অতিমাত্রায় তুষারপাতের ফলে ওদের মনটাও যেন জমে গিয়েছিল। অনল ক্লান্ত, বিমর্ষ মুখখানা নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় খাটের ওপর বসেছিল। মিমাও বসেছিল খুব স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে। তার মুখেও কোন কথা ছিল না। বার বার নিরীক্ষণ করছিলো অনলকে। এক সময় ঝাঁকড়া চুলগুলো দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো—কি ব্যাপার, আজ এত চুপ যে? তার পরেই একটু দুষ্টুমির মিঠে হাসি হেসে বলেছিলো—ডার্লিং এর চিঠি এসেছে বুঝি? তা সে তো সুখবর। ও—বুঝেছি, বিরহ-বেদনা-মাখান নিশ্চয় সে চিঠি?

অনল সামান্য মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মিমার দিকে। তখনও তার ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি বন্দী। চোখের নীল তারা তখনও নাচছে। কঠিন হিমের পরশে শ্বেত শুভ্র রং ফ্যাকাশে হয় নি। নীল তারার ঔজ্জ্বল্য তাকে দীপ্তি দান করেছে। এখানে এ সময় শ্যামল সুন্দরের দর্শন

পাওয়া ভার, অথচ অনল কোন সজীবতার অভাব বোধ করে না। মিমা যেন সজীব বনফুলের প্রাণস্পর্শ কুড়িয়ে এনে হাজির হয় অনলের সামনে। অনল তখনও সম্মোহিত। দৃষ্টি অনড়। রঙীণ পাতলা ঠোঁট দুটোর মাঝখানটা আবার একটু ফাঁক হলো। মিমা আস্তে—কি চুপ যে। বিগত ছ'টা মাসের নিঃসঙ্কোচ সাহচর্য্যে উভয়ের মনেই নতুন কিছুই অঙ্কুর সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু উভয়েই বুঝি একান্ত ব্যক্তিগত কোন স্থিতিশীল ধারণার বশীভূত হয়ে অনন্যোপায় ছিল সে অঙ্কুরের কচি জীবনকে পরমায়ু দিতে। অনল বাধা পেত—ফেলে-আসা আবেষ্টনীর সচেতন দৃষ্টির ভয়ে, আর মিমা সংকোচ করতো অজ্ঞাত কোন আশঙ্কার প্রভাবে। অনলের বুকের আগুন জ্বলে উঠতেই মায়ের কথা শ্রাবণের জলের মত নেমে এসে নিমেষে নির্ব্বাপিত করতো তাকে। "দেখ বাবা, তুই এ বংশের একমাত্র ছেলে। তোর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এ বংশের সুনাম কলঙ্ক সব।" আসবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের মায়ের এই কথাটা মনে পড়ত অনলের। অনল জানে—মা কি ইঙ্গিত করেছিলেন। মিমা জানতো তার নিজের দেশের মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচ্য দেশের লোকের ধারণার একরূপতা। তাই সাহস হয় নি। অনলের মনে কোন বিশ্বাস উৎপন্ন করবার উপায় ছিল না। কিছু প্রকাশ করবার অর্থই ছিল আদিখ্যেতা। তাই এতদিন তর্ক, আলোচনা, ঠাট্টা, মস্করা, রঙ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন-যেন—বদ্ধ পাগলামিকে যতখানি পারা যায়—ঢেকে কথা বলেছে কিন্তু সেদিন দু'জনই যেন সমস্ত কিছুর শেষ সীমান্তে উপস্থিত হয়ে ছিল। বুকের ভার বহন করার মত মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল। মিমা অজ্ঞাতেই যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির সংস্কারকে আলগা করে দিয়েছিল, আর অনল রুদ্ধ জলাধারের জলের প্রথম মুক্তির মত আছড়ে পড়বার উপক্রম করছিলো। সোজা হয়ে উঠে বসে মিমার দিকে একটু গিয়ে বলেছিলো—প্রবাসে অনেক মনোবেদনা মিমা। বিশেষ করে অনভ্যস্ত প্রথম প্রবাস-জীবনে যখন মানুষ ভালবাসে—

মিমা নিঃসঙ্কোচে একরকম অনলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঁ হাত অনলের মাথার পিছনে রেখে নরম ডান হাতখানা দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে বলেছিল—আমাকে হারিয়ে দিলে তুমি। কেন এই জয়ের গৌরবটুকু না পেলে হ'ত না? আমার অনেক আশা অন্তত: একটা কুঁড়িতেই ঝরে গেল। আমার ইচ্ছে ছিল আমি আগে বলব।

অনল না বুঝবার ভান করে জিজ্ঞেস করেছিল—কি?

—তোমাকে ভালবাসি।

একটি কথা, দুটি চাউনি। এতে দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়। সব পূর্ণতা লাভ করে।

মিমার ধারণা মিথ্যে ছিল না। মিমার ভেতরে যা সবচেয়ে অনলের কাছে আকৃষ্ট করছিল তা হ'চ্ছে মিমার অনাবিল, অকপট, অকৃত্রিম সারল্য; তার ভারতীয় আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। আর সে জন্য তাকে কোন মুহূর্ত্তের জন্য বিদেশিনী বলে মনে হয় নি। আজ অনলের মনে হয় এই ভারতীয় ভাবধারায় পরিপ্লুত মিমার মনের সুস্থতা তাকে দান করেছে অসামান্যতা—যা পাশ্চাত্যের কোন নারীর কাছে আশা করা বৃথা। অনেক সময় দেখা যায় আদর্শ যারা বংশ-পরম্পরানুযায়ী পেয়ে থাকে—তাদের থেকে আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যারা আদর্শকে গ্রহণ করে—তারা আদর্শের গুরুত্ব বোঝে বেশী। আদর্শের প্রভাব অবাস্তবকে বাস্তব করে, কল্পনাতীতকে প্রত্যক্ষ করবার মত রূপদান করে। তা না হলে দীর্ঘ তিন বছরের নির্ব্বিঘ্নে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের মাধ্যমে গড়ে-ওঠা ভালবাসাকে ভাল মন্দের মানদণ্ডে ফেলে মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় কি করে? প্রবাস-জীবনের শেষ দিনগুলোতে অনল জন্মভূমির স্মৃতিকে ভস্মসাৎ করেছিল। দেশে নিরেজ সংসারের কথা, মায়ের কথা, তাঁর সচেতন বাণীর কথা মনে পড়লেও তাতে গুরুত্ব দিত না। তবুও চূড়ান্তভাবে নিজেদের ব্যবস্থা পাকাপাকি করবার আগে মিমা যখন কথা প্রসঙ্গে এ সব জানতে চেয়েছিল তখন অনল নিতান্ত হেলাভরে, নিঃসঙ্কোচে সব বলেছিলো। অনল এখনও ভাবে—সেদিন সে ভুল করেছিল কি না। ঠিক পর মুহূর্ত্তেই মিমা সেই যে চলে গিয়েছিল আর কাছে আসে নি। অনল মিমার এ ভাবান্তরকে প্রথম দিকে আমল দেয় নি। বেশ কিছুদিনের ভেতরেও যখন মিমা দেখা করতে এল না তখন সে

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ওদিকে স্বদেশে ফিরবার সময় চলে এল। অবশেষে অনল একদিন বিনা সূচনায় উপস্থিত হল মিমার কাছে। মিমা একা ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলো। পদ শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ কিছুদিনের অদেখায় অনল অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সংযত করে রাখা ছিল সাধ্যাতীত। হঠাৎ ব্যাকুল আলিঙ্গনে বদ্ধ করতে গিয়েছিল মিমাকে—আর সেই মুহূর্তে মিমারকোমল হাতের চপেটাঘাত তার গালে পড়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠেছিল —'ভুলেও আর আসবে না কখনও। যদি এই চড়ের কথা মনে থাকে। অনল মর্মাহত, বিস্মিত, ছিন্নভিন্ন হয়ে ফিরে এসেছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল, কোন পাশ্চাত্য নারীর এই স্বরূপটা সে আগে বুঝতে পারে নি, এই ভেবে। কিন্তু না। অনলের এ ভাবনা, এ অনুমান ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল যখন স্বদেশে ফিরবার দিন তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিল। সঙ্গে ছিল আরও একটা খাম সেটা আজ খুলেছে। চিঠিতে কোন সম্বোধন ছিল না। লেখা ছিল—"ভেবে দেখলাম, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এ না করলে আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতাম। আজকের মিলন হয়ত সুখকর হ'ত। কিন্তু অতীত যখন ভবিষ্যতকে হয়রাণ করতো—তখন তোমার মনে হত আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি। গাল-ভরা আদর্শের কথা দিয়ে তোমার দুর্ব্বলতা-কে আশ্রয় করে তোমাকে সকল দিক থেকে নিঃস্ব করেছি। তোমাকে যে আমি সত্যি ভালবাসি তা প্রমাণ করবার এই একটা মাত্র রাস্তা ছাড়া আর কিছু দেখতে পারলাম না। তোমাকে না হারালে আমি সত্যিকারের প্রেয়সী হতে পারতাম না। অথচ দেখলাম তুমি পুড়েছ বেশী। বিদ্রোহের শক্তি তোমার অনেক বেশী আমার চেয়ে। প্রেমের অধিকার তুমি যে কোন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর। জননী, জন্মভূমি—এমন কি আমার অনুনয়-বিনয়ও তোমার শক্তি রুখতে পারবে না। তাই কোন উপায় না দেখে যাকে ভিত্তি করে তোমার শক্তি দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে—তার মুখে সাময়িকভাবে ঘৃণার মুখোশ এঁটে দিয়ে তোমাকে ভিত্তিচ্যুত করলাম। জানি না এ তুমি আশীর্ব্বাদ বলে মেনে নিতে পারবে কিনা। কিন্তু তোমার ওপর আমার অনেক বিশ্বাস। তুমি ভুল বুঝবে না। এখান থেকে গিয়েই বিয়ে করবে। চিঠির সঙ্গে যে খামটা দিলাম ওটা এখন খুলবে না। যদি বিয়ে না কর তাহলে এ খাম খুলবার অধিকার কোন দিন পাবে না। বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে খুলবে। আমার নির্দ্দেশ। মনে করলাম—তুমিও প্রতিজ্ঞা করলে। এখানে আমার খোঁজ কর না। কারণ যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি ইংল্যাণ্ডে।

বিদায়।

অনল চমকে উঠলো। বাইরের হাওয়ার বেগ বেড়েছে মনে হচ্ছে। দুম্ করে শব্দ করে জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। রাত অনেক হয়েছে। অনল আবার চিঠিতে মন দিলো।

"কেন রাঙা বউ তো তোমাদের দেশে কত মেলে। পারবে না খুঁজে নিতে আমার মত? সত্যি, আমিও বোকা। তোমার যে বউ হবে সে তো আমার মতই হবে। মিথ্যে বলছি না। শোন। তোমাদের তো বিয়ের সময় শুভদৃষ্টি হয়। সত্যি আমার খুব ভাল লাগে তোমাদের এ প্রথাটা। দুটো মণিতে দুটো বিপরীত ছায়া পড়লো, নতুন সৃষ্ট দারুণ তরঙ্গ-সঙ্কুল দুটো বুকের প্রবাহ পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উদ্দামতা হারিয়ে ফেলে শান্তগতিতে ছুটে চললো শুভলক্ষ্যের দিকে। এই শুভদৃষ্টির পরিণতি তো সার্থক সৃষ্টিতে। এ পোড়া দেশে এ জিনিষ দুর্মূল্যই নয়, একেবারে দুর্লভ। আর দেখ, এই মূল্যবান জিনিষটা তোমায় পাইয়ে দিলাম। ভাবছো, তোমার ভালবাসার অপমান করছি। তাই না? কিন্তু না।

তোমার অকৃত্রিম ভালবাসাকে রূপদান করতে চাই। তোমার ওপর আমার অনেক বিশ্বাস। তোমার দেশের মেয়ে হওয়া উচিত ছিল আমার। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা দুঃসাহসিকতা! অকৃত্রিমতা—মৌলিকতার অভাবে এতদিন মনটা শুকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম অনাবৃত মাটির সরসতা, দ্বিধাহীন আলিঙ্গন বুঝি মানুষের প্রেমে নেই। প্রভু যীশুর সারা জীবনের আকুতি যেন যুগ-বৈচিত্র্যের প্রখর আলোয় ভস্ম হয়ে গেছে। কিন্তু না, আমার খোঁজা বৃথা হয়নি।

তোমায় ভালবেসেছি, তুমি ভালবাসা দিয়েছ। তোমার দেওয়াতেই আমার প্রাণ রয়েছে। তাই আমার

নিজের ওপরও এত বিশ্বাস। আমার এত সান্ত্বনা। তোমায় মুক্তি দিয়েও ধরে রেখেছি বুকটার ভেতর, হৃৎপিণ্ডের মুখোমুখি। আমার একটা কথা রাখবে? যদি রাখ, তাহলে আমার সব আশা পূর্ণ হবে। তোমার দিক দিয়ে আমার কোন অভাব থাকবে না। তোমার সামনে বধূ আছে। প্রতি নববর্ষে তুমি আমার মুখটি তুলে যে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আমায়, ওই বধূর মুখ তুলে ধর তেমনি ভাবে। তুমি হিন্দু। মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাসী। ভগবানের রূপ কেউ জানে না। তবুও হিন্দুরা ভগবানের রূপ দিয়েছে আপন কল্পনায়। আর ওই রূপকে আশ্রয় করে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চায় তারা। এ তোমার হিন্দুশাস্ত্রের কথা। তোমার বিশ্বাসের কথা। তোমার মুখ দিয়ে শোনা কথা। তোমার বধূর রূপের মধ্য দিয়ে আমার প্রেমকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না? ওই রূপে নিজেকে বিলিয়ে দাও—ঠিক অনুভব করতে পারবে আমার প্রেমকে। সেতার বাজাও। আলাপ চেনো। আলাপ ফোটানর আগে মনের গহনে ডুব দিতে হয়। সেখানে থাকে সাতলক্ষ পদ্ম। সবাই আলাপকে দেয় একটা করে পাপড়ি। সাজিয়ে দেয় আপন করে। আর অমনি সে ফুটে ওঠে সেতারের তারে। আমি তোমার মনের সেই সাতলক্ষ পদ্মের রাণী। চোখ বুজলেই তোমার ভাবনাকে সাজিয়ে দেব সাতলক্ষ পদ্মের পাপড়িতে। ওই সাজানো রূপ নিয়ে যখন বধূর দিকে তাকাবে তখন তার মণিতে আমি ফুটে উঠবো। আমাকে দেখতে পাবে। তোমার—'মিমা'

দুচোখ ভরে জল এলো অনলের। চিঠিটা মুঠিতে চেপে ধরে সোজা হয়ে তাকাল সামনের দিকে। বধূ ধীরে ধীরে উঠে বসছে; আস্তে আস্তে নেমে এল পালঙ্কের ওপর থেকে। আশ্চর্য্য—চোখে তো ঘুমের জড়তা নেই। তা হলে বিনিদ্র অবস্থায় এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল অনলের জন্য? দরজার দিকে এগিয়ে গেল বধূ। অনল পিছন থেকে বলল—এক গ্লাস জল দাও তো।

থমকে দাঁড়ালো বধূ। ঘুরে এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এল। অনল উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে জল খেয়ে বধূর হাতে দিল না। টেবিলের ওপর রাখলো। আস্তে আস্তে বধূর পিঠে হাত দিয়ে আকর্ষণ করলো। মুখটা তুলে ধরলো নিজের মুখের সামনে। পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেললো তার মুখে। বধূ চোখ বুজলো।

অনল বললো—চোখ খোলো।

বধূ চোখ খুললো। অনল অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বধূ জিজ্ঞেস করলো—কি দেখছো এত?

—সেই মুখ।

বধূ রোমাঞ্চিত হলো। ঢলে পড়লো অনলের বুকে। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললো—ঝড় থেমে গেছে। জানলাটা খুলে দিই।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে জীবন আকূতি

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে যে-মানসানুভূতি সব চেয়ে বেশি আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মধ্যে জীবন-আকূতির আবেগই ছিল প্রবল। নব-যৌবনের উন্মেষ-পর্বে জীবন-অনুভবের শতদলগুলিকে হৃদয়াবেগের মায়ারঙে রাঙিয়ে নিয়ে বারবার তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন, আর প্রকাশভঙ্গীর অপরিপক্কতা থাকলেও মনের অনুভবকে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে আপন মনে গান গেয়েছেন। এই যে গান গাওয়া, এর মধ্যে প্রাণের সুর ছিল, হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের সঙ্গে অন্তরের প্রতিধ্বনির যোগ ছিল, কিন্তু সুরের মধ্যে ধ্রুপদী আবেশের অনুরণন ছিল না। কারণ সে কেবল বয়ঃসন্ধি, কৈশোর এবং যৌবনের মিলনাবেগে হৃদয় একটি উচ্ছলতা পেয়েছে বটে, কিন্তু সেই উচ্ছলতাকে রূপময় করার ভাবকল্পনায় স্পষ্টতার অভাব আছে।

এতদিন কাহিনী-কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে কবি তাঁর মানস যাত্রার তরঙ্গ-প্রবাহকে বইয়ে দিচ্ছিলেন, এবার নিজ আত্মার গভীর দৃষ্টি দিয়ে আত্মমুখীন হ'য়ে উঠেছেন। চিত্র এবং সুরের মধ্য

দিয়ে কবি তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও ভাবনাময় আত্মস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ ক'রে গেছেন। এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই কবি তাঁর আত্মিক বাসনা-কামনাকেও সকলের গোচরে এনে দিতে চেয়েছেন।

কৈশোরের ভাবস্বপ্ন নিয়ে 'বনফুল,' 'কবিকাহিনী', ভগ্নহৃদয়' প্রভৃতি যে কাব্যকাহিনীগুলি তিনি রচনা করেছিলেন, সেইগুলির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি কবিহৃদয়ের চিরকালীন একটি স্বাক্ষর পড়েছে; বিশ্ব-মানবতাবোধেরও একটি অপূর্ব পরিচয়-চিহ্ন বহন করছে সেই কাব্যগুলি। কিন্তু ভাবকল্পনার চমক দিয়ে সত্যকার নিজ স্বাতন্ত্র্যদ্বারা চিহ্নিত করলেন তিনি তাঁর প্রথম গীতিকাব্য সন্ধ্যাসংগীতকে। কাহিনীকাব্য-গুলির মাঝে কবির ঐ কৈশোরকালেই একটি সুগভীর জীবনদর্শনের ছায়াপাত ও ঘটেছে,. কিন্তু হাসি-অশ্রুর দোলা দেওয়া অন্তরের একান্ত কথাগুলি ধরা পড়েছে সর্বপ্রথম সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলিতে। রাত্রিশেষের পূর্বদিগন্তে আলোকের পরিপূর্ণ সংগীতধ্বনি জাগবার পূর্বে, ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে যেমন আলোক-প্রত্যাশার আভাষ জাগে, রবীন্দ্র-নাথের কাহিনী-কাব্যগুলির জীবনদর্শনের চকিত স্ফুরণও ঠিক তেমনি। কিন্তু আসল কবি-মনটির পরিচয় সন্ধ্যাসংগীতের নূতন জাগা সুরে।

কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে' কবি-মানসের যে-সুরটি প্রাধান্য পেয়েছে, তার-মধ্যে এমন একটি বিষাদের আচ্ছন্নতা আছে, যা' মনের মধ্যে এই একটি প্রশ্নই জাগিয়ে তোলে যে, ঐ বিষাদের ভাবঘন রূপ কৈশোর বেলার প্রান্তে দাঁড়িয়েই কবি-মনকে অধিকার করলো কি ক'রে? জীবনের মাঝে এমন কি একটা অভাববোধ কবির আছে, যা কবিকে এমনি ক'রে আকুল ক'রে তুলেছে?

জীবনের কাছে কবির চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে অনেক, এবং পাওয়ার পরিপূর্ণতা কবির কাছে কতটুকু আসবে তাও কবি জানেন না—যেমন জানে না প্রভাত বেলার রবি মধ্যাহ্নদীপ্তির তেজোময় ঐন্দ্রিক রূপকে। জীবনকে মানুষ দেখে ও অনুভব করতে চায় জগতের আলো ছায়ার মুক্ত প্রাংগণে নিজ হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছে ভৃত্যরাজতন্ত্রের বদ্ধ পরিবেশে—বাইরের সঙ্গে তখন তাঁর 'জীবনটার যোগ ছিল না; নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন তিনি। এই অবস্থার মধ্যে থেকেই এক উদ্দেশহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, তাঁর কিশোর মনের কল্পনা নানা ছদ্মবেশ নিয়ে ভ্রমণ করছিল। তিনি অন্তরের ঐ লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষা নিয়েই হৃদয়ের মধ্যে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন—তাই সেই পর্বটির 'প্রভাতসংগীতের' 'পুনর্মিলন' কবিতায় নাম দিয়েছিলেন 'হৃদয়-অরণ্য'। এই অরণ্যের জটিল লীলায়িত বাহু-গুলির মধ্যে অন্ধকার যেন ঘন গভীর হ'য়ে ছিল,—কবিও সেই অন্ধকারের জড়তার মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। বাইরের মুক্ত জীবনের কাকলির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিয়ে নিজ জীবনের অনাগত অনুভবগুলিকে একটি পূর্ণায়ত রূপে মনোজগতের চেতনায় স্থির উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিলেন না এবং এই জন্যই কবির মনের চারদিকে ছিল এই বিষাদের কুয়াশা। একটি সুগভীর জীবন-আকুতিই কবির কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নকে আবেগময় ক'রে তুলেছিল। সেই আবেগে নিজের অজ্ঞাত-সত্তাকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি। পারছিলেন না উপলব্ধির দ্বারে পৌঁছতে। কেবল সন্ধ্যার আলো-আঁধারী রহস্যময়তায় একটি অপরিসীম অতৃপ্তি তাঁর আবেগ কম্পিত কবি-মানসকে বেদনাতুর ক'রে তুলেছিল। এই বেদনাই ঝংকৃত হয়েছে সন্ধ্যাসংগীতের সুরে। জীবনের রহস্যকে জানার জন্য কিশোর কবিমনের ব্যাকুলতার সেদিন সীমা ছিল,—কিন্তু কবির ভাবকল্পনা অপরিস্ফুটতার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের কথা মনে ক'রে নিজেই বলেছেন—'সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।" [জীবনস্মৃতি—গঙ্গাতীর]

এই অস্পষ্টতার বেদনাকে নিয়েই তিনি সন্ধ্যাকে ডেকে বলেছেন—

প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজও তোর কথা
　　নারিনু বুঝিতে
প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজও তোর গান
　　নারিনু শিখিতে।
　　চোখে লাগে ঘুম ঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর। [সন্ধ্যা সন্ধ্যাসংগীত]

তাই তাঁর অন্তরের 'আশার নৈরাশ্য' কবিতার আকারে রূপ নিয়ে বলেছে—

বলো, আশা বল্লি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—

"তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবী করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন সুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে।" [জীবনস্মৃতি]

শিশুকাল থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির 'খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।' সকালে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে' তাঁর মনকে তার খেলার সঙ্গীর মতো ডেকে বের করে নিয়ে আসতো। এই আহ্বানের আবেশময়তা নিয়েই যৌবনের প্রথম

জাগে যখন হৃদয় নিজের বড় পাওনার দাবী জানিয়ে দিল, তখনই বাইরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগসূত্রের মধ্যে বাধা এসে দাঁড়ালো। এই বাধা পাওয়ার বেদনাই কবির মনে তখন বড় হ'য়ে উঠেছে। অন্তলীন বেদনার গভীরতাকে বুকে নিয়েই কবির মনে তখন জেগে উঠেছে এক পরাজয়, —সংগীত—ঃ

> সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হলো',
> তোরি শুধু হলো পরাজয়—
> প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
> জীবনের রাজ্য সমুদয়।
> * * *
> মনে হইতেছে আজি জীবন হারায়ে গেছে,
> মরণ হারায়ে গেছে হায় !
> কে জানে এ কী এ ভাবে ? শূন্য পানে চেয়ে আছি
> মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।

একটি রহস্যময় দুঃখের অস্পষ্ট অন্ধকারে কবি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।—'হারায়েছি আমার আমারে।' সংসারের অবিশ্রান্ত চলার তরঙ্গময় পথে কবি-মানসে তাই এই পরাজয় বোধ এসেছে। জীবনের চলার সঙ্গে মৃত্যুর ও একটি চলার ভঙ্গী আছে। প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে বরণ ক'রে আবার সেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মানুষ 'বাঁচার রাস্তায়' এগিয়ে চলেছে। কাজেই বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে না পেরে কবির মনে হয় জীবন, মৃত্যু দুইই যেন তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে,—সংসার যেন দেখা দিয়েছে 'বিজন বিদেশ'-রূপে, শূন্যতায় ভরে উঠেছে তাঁর সব কিছু। তাই আজ 'জীবনে মরণ'। কিন্তু তা' হলেও কবির মনে এই প্রশ্ন বারংবার জাগছে—

> কোন সুখ ফুরায় নি যার
> তার কেন জীবন ফুরায় ? (শিশির—সন্ধ্যাসংগীত)

কারণ কবির মতে মানব জীবনে 'একটি দ্বৈত আছে। বাইরের জীবনের 'গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসে আছে, তাকে ভালো করে না চিনলেও, তার কথা অনেক সময় ভুলে থাকলেও জীবনের মধ্যে তার সত্তাকে তো লোপ করা যায় না ! বাইরের সঙ্গে অন্তরের সুর কবি তাই বারবার মিলাতে চান, কিন্তু সে-সুর যখন সামঞ্জস্যে সৌন্দর্যে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না, তখনই তার অন্তর হয় পীড়িত, বেদনার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে না-পাওয়ার বেদনা থেকে কবি মুক্ত হতে চান বারংবার—কখনো বা একটু আধটু আশার আলোকও দেখেন—কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই বিষাদময়ী কবির কাছে এসে দাঁড়ায়। কবির কণ্ঠে জাগে কঠিন প্রশ্ন—

> তুমি কেন আসিলে হেথায়
> এ আমার সাধের আবাসে-?
> * * *
> যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না নিও না কেড়ে,
> নিও না নিও নাক মন মোর। (আবার-সন্ধ্যাসংগীত)

অস্পষ্টতা আর অপরিস্ফুটতার বেদনাভরা দিনগুলিকে কবি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। বাইরের জগতের আলোক ও আনন্দস্পর্শের জন্য তিনি বিষাদময়ীকে বিদায় দিতে চান। এই জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করতে চান হৃদয়ের সঙ্গে। আবেগ-আকুল কণ্ঠে তিনি প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন—

> হৃদয়ের সাথে আজি
> করিব রে করিব সংগ্রাম।
> এত দিন কিছু না করিনু,
> এতদিন বসে রহিলাম,
> আজি এই হৃদয়ে সাথে
> একবার করিব সংগ্রাম। (সংগ্রাম সংগীত—সন্ধ্যাসংগীত)

জীবন এবং জগতের অনুভবকে পরিপূর্ণভাবে অন্তরে গ্রহণ করেছেন বলেই কবি এই ভাবে হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কবির অন্তরসত্তা রহস্যময় বেদনার আলো-আঁধারে সন্ধ্যার মায়াকে বুকে নিয়ে হৃদয়ের নিভৃতে লুকানো অনেক বাসনাকেই আজ জানতে পেরেছে। সেই সৌন্দর্যপিয়াসী অন্তরবাসিনীর দৃষ্টি দিয়েই নিজের হৃদয়কে যেন দেখতে পেয়েছেন কবি। শূন্য হৃদয় নিয়ে আকাশের পানে চেয়ে একলা বসে' আজ তিনি যে-গান গাইছেন, সেই গানের—'একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায় আঁধারে পশিয়া।'

জীবন-অনুভবের একটি নূতন আলোককে কবি লাভ করলেন 'প্রভাত সংগীতে'। হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে যে-জীবনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছিল, সেই বিচ্ছেদের অন্তরালকে অতিক্রম করে তিনি তার সঙ্গে পূর্ণতর পরিচয়ের পথে অগ্রসর হলেন। কবি তখন শুনতে পেয়েছেন—'জগৎ বাহিরে যমুনা-পুলিনে কে যেন বাজায় বাঁশি।'

প্রকৃতিই যেন কবির মনে সর্বপ্রথম জীবন-অনুভবকে জাগিয়ে দিয়েছে। কাহিনী-কাব্যগুলিতে কিশোর কবিহৃদয়ের প্রকৃতি-প্রেমের স্বাক্ষর আছে, কিন্তু সেখানে আত্মিক যোগবন্ধনের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে গুঞ্জরিত হয়েছে কেবল দূর থেকে প্রকৃতির রূপকে দেখার প্রথম ইতি-কথা এবং তার মধ্যে ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে। অন্তর-উপলব্ধির কোন তত্ত্বরূপায়ন ঘটেনি সেখানে।

এই প্রভাত সংগীতের যুগেই কবির অপরিসীম জীবন-আকুতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে কবিমানসের একটি আন্তরিক প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই প্রেম সম্বন্ধের নিবিড়তাকে বুকে নিয়ে 'পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে কোটি কোটি মানুষ যে বিভিন্ন কাজে চঞ্চল হয়ে উঠছে, তাদের কাউকেই তিনি একান্ত তুচ্ছ বলে' মনে করতে পারলেন না ; বরং একটা বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক রূপের মধ্যে এক করে দেখে অপূর্ব এক আনন্দস্বাদ লাভ করলেন। সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হলো তাঁর কবি মানস, এবং এই বিশ্বসংসার অনাবিল আনন্দ-সৌন্দর্যে তরঙ্গিত হয়ে একটা অপরূপ মহিমায় তাঁর কাছে দেখা দিল। যে নির্ঝর অবরুদ্ধ অবস্থায় মনের গহনে আত্মগোপন করে ছিল এতদিন, স্বপ্নভঙ্গ হলো তার একটা সুমধুর আকস্মিকতায়। প্রভাত পাখির গান এসে প্রবেশ

করলো গুহার অন্ধকারে, পাষাণ কারা ভেঙে দিয়ে জগতে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার বিপুল আকুতি প্রকাশ পেলো তার কলসংগীতে। জীবনে যে 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে'—এ যেন কবির জানা ছিল না। এতদিনকার অবরুদ্ধ হৃদয়ের আনন্দধারা যৌবনের বেগে কার কাছে যে বয়ে যাবে, কবি তা জানেন না বটে, কিন্তু বিশ্বমুখী নির্ঝর ধারার প্রবহমানতায় সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে জেগে উঠলো এক সুগভীর বিশ্বানুভূতি। জগতকে তিনি যে-স্বরূপে দেখলেন, সে-স্বরূপ আনন্দময় সুন্দর। বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত লোককে তাঁর অন্তশ্চেতনার বহুব্যাপ্ত অন্তরঙ্গতা দিয়ে তিনি যতই অনুভব করতে লাগলেন, ততই প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলেন বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে-অনুরাগ রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই ঝর্ণা-ধারাকে। তাই সেদিন প্রাণের জগতে তাঁর প্রভাত-উৎসব। কবি যেন এই সঙ্গে তাঁর আত্মস্বরূপকেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ-উৎসবে হৃদয় তাঁর যেমন খুলে গিয়েছে—তেমনি সমগ্র জগত সেখানে এসে কোলাকুলি করে যাচ্ছে। জীবন-অঙ্গনে যেন তাঁর নতুন সাড়া জেগে উঠেছে। তাই কণ্ঠে গান জেগে উঠেছে পরিতৃপ্তির ছন্দিত রূপে—

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি। (প্রভাত-উৎসব)

এই হাস্যময় অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়েই কবির মনে এই বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবনের গভীরতর স্তরে যে-রহস্য যুগযুগান্তব্যাপী সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে, সেই সম্বন্ধেও একটি সজাগ প্রশ্ন জেগে উঠেছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে যে-মানব-জীবন বিশ্বের অন্তর্লীন প্রবাহ-ধারায় অনাদিকাল থেকে অনিবার্য বেগে বয়ে চলেছে, তার যেন কোনই শেষ নেই। কবির মনে হয়, এই জগতের মধ্যেই নিস্তব্ধ জলরাশি-ঘেরা একটি সাগর আছে, চারদিক থেকে অবিরাম ধারায় অনন্ত জীবনের স্রোত তাতে এসে মিশে যাচ্ছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে এ-কথাও মনে হয়—

সকলি মিশেছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা—
এই-যে যা-কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা। (অনন্ত জীবন—প্রভাতসংগীত)

এ অনন্ত জীবন যেন মহাদেশের মতো,—এর কি কোনো শেষ আছে? অবরুদ্ধ হৃদয়ের বিষাদময়তা থেকে বের হ'য়ে জীবনের যেন সত্যকার অর্থ খুঁজে পেয়েছেন কবি। প্রকৃতি এবং মানব-জীবনের সঙ্গে একটি চিরদিনকার সম্বন্ধসূত্রে কবি যেন বাঁধা পড়েছেন। এই জীবন চিন্তার সঙ্গে মৃত্যুভাবনাকেও তো বাদ দেওয়া যায় না। মৃত্যু তো জীবনেরই অন্যদিক। মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে জীবনকে দেখা চলে না। কবি তাই নিঃসংকোচে বলে' ওঠেন—'জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি, জানিনে মরণ কাকে বলে।' এই সত্যটিকেই কবি আরও স্বচ্ছ ক'রে দিয়ে বলেছেন—

'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল—জগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকায়ই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না দিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্ব চরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা-গাঁথা।" এই প্রসঙ্গেই কবিকে আরও বলতে হয়েছে—'জীবন সব কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে—গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান।' (সূচনা-প্রভাতসংগীত)

কবির ছন্দে তাই ভাষা জাগে এইরূপে—

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার—
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী—(অনন্ত মরণ—প্রভাতসংগীত)

এমনি করেই জীবন মরণের অনন্ত ভাবনায় মানব জীবন ও জগতের সঙ্গে কবির 'পুনর্মিলন' ঘটেছে। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য যেন কবিকে একটি অপূর্ব আনন্দের সাগর পারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কবির কণ্ঠে তাই গান—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে। (পুনর্মিলন—প্রভাতসংগীত)

এই আনন্দ-সমুদ্র আর কিছু নয়, 'জীবন-লোকের প্রসারিত ছবিখানি কবির চোখে শিশির-সিক্ত নবীনতায় মধুময় ও সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই জীবনানুভূতির প্রবলতাই কবির দৃষ্টিকে যখন জগতের দিকে নিবদ্ধ করিয়েছে,—তখনই তিনি অনুভব করলেন, বিশ্বের কেন্দ্রস্থল থেকে কি যেন এক গানের ধ্বনি জেগে উঠছে। শুধু তাই নয়, সেই ধ্বনি বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে প্রতিঘাত পেয়ে প্রতিধ্বনির রূপ নিয়ে আমাদের হৃদয়ের গভীরে যেয়ে প্রবেশ করছে। কবি মনে করেছেন, 'কোন বস্তুকে নয়—কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালবাসি। কারণ এ বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, একদিন যে-জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাইনি, আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাতে পেরেছে। অন্তরের এই ভাবকল্পনাই কবির 'প্রতিধ্বনি-কবিতার উপজীব্য। জগত-সম্বন্ধে গভীর অনুভবের মধ্য দিয়েই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি কবির কাছে একটি ধ্বনিস্বরূপে দেখা দিয়েছে,—আর প্রতিধ্বনিরূপে কবিকে তা মুগ্ধ করছে। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ সে-কেন্দ্রমূলে যেয়ে পড়ছে, সেখান থেকেই বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রতিধ্বনিরূপে কবির কাছে নির্ঝরের ধারার মতো ফিরে আসছে। আর কবি এই জগতের জীবন সৌন্দর্যভরা প্রতিধ্বনিকে বিমুগ্ধ হৃদয়ে শুনছেন।

'ছবি ও গানে আরও গভীর সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে কবির মনো-জগতে বিশ্বজীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এক ব্যাকুল আকুতি দেখা দিয়েছে। এ কাব্যে কবির যৌবন-চেতনা অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে জেগে

উঠেছে। 'ছবি ও গানের প্রথম কবিতাতেই সৌন্দর্য লক্ষ্মীয় ভাবনা এসে কবির মনকে চকিত করে তুলেছে। কবি বিহারীলালের সৌন্দর্য-চেতনা তাঁর অন্তরে এসে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র জাগিয়ে দিয়েছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতাটিতেই এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ভাবনা দানা বেঁধে উঠেছে,—

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত। [কে—ছবি ও গান]

সহজ একটি আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যেমন তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছেন, মানব জীবনের সৌন্দর্যের দিকেও দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ঠিক তেমনি। 'নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করে দেখবার একটি মানসিকতা কবির মধ্যে জেগে উঠেছে। প্রভাত সংগীতের সময় থেকেই কবি সব কিছুকে শুধু কেবল চোখ দিয়ে না দেখে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই দেখার রেশ তখনও তাঁর যৌবনময় সৌন্দর্যচেতনাকে প্রলুব্ধ করে তুলছে, আর তিনি অনন্ত রূপময়ী ধরিত্রীর দিকে চেয়ে ছন্দোময় কথার আঁচড় দিয়ে দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছেন। কবির কণ্ঠে গান জেগে উঠেছে—সৌন্দর্য চেতনার নূতন অভিজ্ঞতায়:

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম শয়নে আধেক মগনা,
বাকল বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাইছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা। (জাগ্রত স্বপ্ন)

জাগ্রত স্বপ্নের ধ্যান-কল্পনায় এই রূপসীবালাকে কবি প্রত্যক্ষ করে চিত্রময় করে তুলতে চান সব কিছুকে। পশ্চিম দিগন্ত সোনায় কেমন সোনাময় হয়ে উঠেছে, আর তার মাঝে মলিন একাকিনী মেয়েটিকে কে যেন এঁকে রেখে দিয়েছে, তাও কবির দেখতে ভুল হয় না। রক্ত-কমলের বুকে পঙ্কবিন্দুর ম্লানরেখাকে কবি যেন আর তুচ্ছ করে দেখতে পারছেন না,—সৌন্দর্যের বুকে এও যেন একটী লক্ষ্যণীয় রূপচিত্র। চেতনার দ্বার প্রান্তে তার সময়োপযোগী আনাগোনা।

কবির জীবন আকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ভাবচেতনা লুক্কায়িত ছিল, তা 'ছবি ও গানের রূপময়তা ও সুরময়তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে বেশ উজ্জ্বলভাবেই দেখা দিয়ে গেছে। কবি যখনই দেখতে পেয়েছেন, তখনই উষাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে প্রাণের আবেগ ঢেলেই আহ্বান জানিয়েছেন—

কে তুমি গো উষাম আপন কিরণয়ী, দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝ কোথা তুমি ডুবে আছ,

শুধু তাই নয়—কবির ইচ্ছা—

আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়। (আচ্ছন্ন)

এই জীবন-আকৃতির মধ্যে একটি স্বপ্নাচ্ছন্নতাও ছিল—রোমান্টিক কবি-মানসের পক্ষে এই স্বপ্নাচ্ছন্নতা না থেকে পারে না। কবির কাছে যে স্বপ্নমোহময়ী, সে কোথা দিয়ে আসছে আর কোথা দিয়ে যাচ্ছে তা' দেখবার জন্য মনের কোণে আকাঙ্খা সঞ্চিত রয়েছে বহুদিন থেকে। কবির ও সাধ হয় তিনি স্বপ্নবাসনাময় হ'য়ে যান। স্বপ্নকে নিয়েই তিনি জগত এবং 'মানুষের দল'কে দেখতে চান। 'নিশীথ চেতনা' এই স্বপ্নাচ্ছন্নতার কবিতা।

'ছবিও গান' রচনার সময় কবির ম বাইশ বছর। কবির তখন সেই বয়স, 'যখন কামনা কেবল ঘুরে খুঁ জিতেছে, কোথা খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু আলো আঁধারে রূপের আভাস পায় স্পষ্ট কিছু পায় না।' কিন্তু একটি বৃহত্তর জীবনের বিপুলতার মধ্যে সত্যকে মেনে নেওয়ার একটা দুর্নিবার আবেগ কবিকে যে আকুল ক'রে তুলছে, এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। টুকরো ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে তিনি যেন আর তৃপ্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। জীবনের একটা সামগ্রিক উপলব্ধিকে নিয়ে জগতের সত্যকে জেনে নিতে হ'বে তাঁর।

এই সময় বজ্রের নিদারুণ আঘাত নিয়ে কবির পরিবারে এসে গেল ভয়ংকর এক আকস্মিক মৃত্যু। পৃথিবী থেকে চলে গেলেন কবির ভ্রাতৃজায়া কাদম্বিনী দেবী,—যিনি কবির কাব্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন অজস্রভাবে। কবির কাছে পৃথিবী যেন অন্ধকার হ'য়ে গেল। একটি নিস্পৃহ বৈরাগ্যে কিছুদিন আচ্ছন্ন হয়ে রইল কবির মন। কবির নিজের ভাষায় বল্‌তে গেলে—'কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগতকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানি-লাম তাহা বড় মনোহর।' (জীবন স্মৃতি)

বিশ্বজগতের এই মনোহরত্বের উপলব্ধিই 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে' দেখবার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেল। কবির কাছে তখন 'যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখ-দুঃখের নিমন্ত্রণ' পাওয়ার জন্য একলা ঘরে প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। তাই কবির 'কড়ি ও কোমল' 'মানুষের জীবন নিকে-তনের সামনের রাস্তাটায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানবজীবনের বহুবিধ রহস্যলীলা কবি-মানসকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে বলেই মনের কথা ছন্দোময় ভাষায় নিঃসংকোচে ঝংকারিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই। (প্রাণ—কড়ি ও কোমল)

বিশ্বজীবনের কাছে কবিপ্রাণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তার চাওয়ার দাবীটিকে যেন জানিয়ে রাখল। জীবনের ভাঙ্গা-গড়া, জয়-পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাত ও সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার পথ গড়ে উঠেছে, সে-পথ লোকালয়ের ভেতর দিয়ে কবির প্রাণকে নিত্য সৌন্দর্যের পরশ, উপলব্ধির জন্য টেনে নেওয়ার এক নতুন পালা রচনা ক'রে দিল।

'ছবি ও গানে' কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী যেথানে স্বপ্নময়ী—বাতায়নবাসী মন নিয়ে কেবল তার দিকে চেয়ে থেকেছেন, আর বলেছেন—'হৃদয়ের দূর হ'তে সে যেন কথা কয়, তাই তার অতি মৃদু স্বর। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির অপরিসীম জীবন-আকুতির পথ ধ'রে 'কড়ি ও কোমলে' 'পঞ্চদশী' মানবীরূপে দেখা দিয়েছে। যৌবন চেতনাময় রূপ-কামনা এসে স্বপ্ন কামনাকে পরাজিত করেছে। প্রথম যৌবনের বাস্তব-ধর্ম্ম এখানে জয়ী হয়েছে। স্বপ্নময়ীর অস্পষ্টতা দেহময়ীর রূপলাবণ্যের সরোবরে পদ্ম হ'য়ে যেন ফুটে উঠেছে। কেননা 'এখন সেই বয়স, যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে।' 'ছবি ও গান' তাই কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা রচনা ক'রে দিয়েছে। সুর এসে রূপের ভূমিকায় হৃদয়ের ভাষাকে মূর্তিময়ী ক'রে তুলেছে। ছবি ও গানে' কবির গুহাচারী মন ঝুঁকেছে লোকালয়ের দিকে, আর 'কড়ি ও কোমলে' বৃহত্তর জগতের পটভূমিকায় প্রকৃতির রূপলীলা দেখতে দেখতে কবিমন জীবনাভিব্যক্তির সৌন্দর্যরূপকে ধ্যান করেছে। তাই তাঁর কাব্যজগতে 'নূতন' জেগে উঠেছে নতুনতর রূপে। তাঁর কবি ভাবনায় পুরাতনের আর কোন ঠাঁই নেই। নবজাগ্রত অবারিত 'গীতোচ্ছ্বাসে' হৃদয়ের সমস্ত বিস্মৃত বাসনা নবীন হ'য়ে জেগে উঠছে। এ যেন বসন্তের সুরের স্পর্শে নব পল্লবের জাগরণ। 'যৌবনস্বপ্নে' ছেয়ে গেছে এই বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত আকাশ। রবীন্দ্র কবি-জীবনে সে-গতির ভাব-বীজটি জড়িত ছিল, আমাদের মনে হয়, 'কড়ি ও কোমলেই তা' সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে—যেমন করেছে 'সংসার জীবনময়' এই অনুভূতি।

যৌবনের সে-সঞ্জীবনী স্পর্শে কবির হৃদয়ে বিপুল কামনার আবেগ জেগে উঠেছে, তা' কেন্দ্র ক'রে নিয়েছে নারীদেহের রূপমূর্তিকে। নারীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রশস্তি রচনা ক'রে তিনি জীবন আকাঙ্খার যে—নির্ঝর ধারা বইয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে আছে—

যেন কত শত পূর্ব জনমেরস্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি। (স্মৃতি)

শুধু তাই নয়, ওই দেহধারিণীর মুখের দিকে চেয়ে কবির 'জীবন সুদূরে লীন হতেছে বিলীন।' রোমান্টিক কবিমন জীবনকে বাস্তব জগতে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে চেয়ে ভাবের আবেশে মাঝে মাঝে স্বপ্নজগতে প্রয়াণ না ক'রে পারে না। সেখানে ভোগের চেয়ে হয় উপভোগ বেশি। এই উপভোগের জগতেই রবীন্দ্রনাথের দেহ কামনা দেহাতীত অরূপ-সুন্দরকে খুঁজে ফিরেছে। প্রথম যৌবনের মোহকামনা হৃদয়াবেগকে উদ্দাম ক'রে তুলে' নারী সৌন্দর্যের দিকে কবি মনকে টেনে নিয়ে গেছে বটে, মানবীয় জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্তার সুগভীরটিকে বুকে নিয়ে কবি সেই ভোগবন্ধনের ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত হ'তে চেয়েছেন। রবীন্দ্র কবি-মানসের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই মানব-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁকে বারংবার ডেকে নিয়েছে। সীমার খণ্ড আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি অসীমের রূপসঞ্চারকে সারাটি জীবন দেখতে চেয়েছেন; যখনই এই উপলব্ধির মধ্যে কোনরূপ কুয়াশার আবরণ এসে পড়েছে, তখনই মনে হয়েছে জীবন তার নিষ্ফলতার পথ ধরে যেন যাত্রা করেছে। তখনই তাঁর অতিকণ্ঠের সুর জেগে উঠেছে—

আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ-জগতের প্রকাণ্ড জীবন। (স্বপ্নরুদ্ধ)

তাই সকল যেন মনে হয় তখন শূন্যতায় ভার:

মানব জীবন যেন সকলি নিষ্ফল—
বিশ্ব যেন চিত্রপট আমি যেন আঁকা। (অক্ষমতা)

ক্ষুদ্র জীবন বোধের মধ্য থেকে বৃহত্তর জীবন-আকুতি জেগে উঠেছে বলেই কবির কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা জাগে—

ক্ষুদ্র আমি ঘিরিতেছে বড়ো অহংকার
ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ, অভিমান তার। (ক্ষুদ্র আমি)

এই ক্ষুদ্র আমির সত্তাটিকে বুঝতে পেরেই—এক আনন্দ বেদনাময় অনুভূতির সঙ্গে নিরবধিকালের পটভূমিতে অসীম বিশ্বজীবনের যোগ-সূত্রটি কবি আবিষ্কার করেছেন। তাই চিরদিন' নামক কবিতা চারটির আরম্ভ কবির নবলব্ধ জীবন জিজ্ঞাসা দিয়ে—

এ-প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রু করি ধার?
যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে নাই ত্রিভুবনে? (চিরদিন)

এই জীবন জিজ্ঞাসার যে-উত্তর এই কবিতাতেই পরিস্ফুট হয়েছে সেই উত্তরের মধ্যেই কবির প্রেমিক প্রাণের বাসনা বিশ্বসত্যের দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লো:

যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হ'য়ে ওঠে দীনহীন
অসীমে জগতে একি পিরীতির আদান প্রদান। (চিরদিন)

কবি মনে করেন, সীমার খণ্ডিত বুদ্ধি অসীমের বিপুল ছায়ায় যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি সীমিত দেহধর্মী জীবন এবং অসীম-মুখী জীবনের মধ্যে সে-প্রেমের আদান প্রদান ঘটে, তারই শাশ্বত স্বাক্ষরে সমস্ত কিছু উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্র কবি-জীবনের উন্মেষ-পর্বের প্রথম উচ্চারণে এই জীবনবোধই সর্বপ্রথম জেগে উঠেছে। আলোকোজ্জ্বল

বিশ্বপৃথিবীর সীমাহীন প্রেমের মধ্যে পরিস্ফুট সে—অনন্ত জীবন' সে—অন্তর জীবনের ভাবনা 'প্রভাত সংগীতে'র আলোক-পিপাসায় লগ্নে জেগে উঠেছিল, সেই সীমা অসীমের সত্যে ঘেরা 'অনন্ত জীবনে'র আকৃতি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ থেকে ভাবী-কালের পক্ষে পদক্ষেপ করলেন। এই ধারারই পথ বেয়ে বেয়ে 'মানসী'র মধ্যেও 'দুরন্ত আশা' 'ভৈরবীগান' প্রভৃতি কবিতায় বৃহত্তর জীবন-আকৃতির একটি বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ভাবনার সঙ্গে মৃত্যুভাবার সমন্বয়ী রূপে যে বিশিষ্ট এক ভাবলোক দৃষ্টিগোচর হয়, তাও গড়ে উঠেছিল এই জীবন-অনুভূতির বেদনাময় পরিবেশে; জীবনের প্রথম অধ্যায়ে 'মনের অন্দর মহলে' তখন একটা আধটা মননের কমল ফুটতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এই পর্বের কাব্যমূল্য যাই থাক, মানস মূল্যের প্রথম পরিচয়ের উষালগ্নের সুনীল আভায় এ সর্ব-ভাস্বর ও স্বতন্ত্র একটি মূল্যায়নে সুচিহ্নিত।

মেঘনাদবধ-কাব্যে সরমা

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীমধুসূদনের মহাকাব্যে রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ সরমা দিগন্ত-লীন গাঢ় তমিস্রায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার ন্যায় জাগিয়া রহিয়াছে। রামায়ণের ক্ষুদ্র চরিত্রটি মেঘনাদবধ-কাব্যে অপূর্ব মাধুর্য-গৌরব মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সার্থককথা কবি সরমাকে অবিস্মরণীয়া করিয়াছেন।

কবি তাঁহার সকল সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত এই অপরূপার চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

সরমা রাক্ষস-ললনা, কিন্তু সত্য, ন্যায়, দৈব ও ধর্মে অবিচল বিশ্বাসপরায়ণা তাহার অন্তর চিরশ্রদ্ধাশীল, সমবেদনা ব্যাকুল। অতুলনীয় ধর্মনিষ্ঠা, অকৃত্রিম ভাবাবেগ ও কোমলতায় সরমা বঙ্গনারীর ন্যায় গরীয়সী। অন্যায় ও অধর্মের প্রতি তাহার বিরাগ সহজাত।

সরমা রাঘব-সখা বিভীষণের যোগ্যা সহধর্মিণী। স্বামীর ধর্মই তাহার ধর্ম, স্বামীর আদর্শই তাহার আদর্শ। কিন্তু সে নারী, নারীর প্রতি সহানুভূতি তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা, মমতা তাহার উদার-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। অশোক-কাননে রাঘব-বাঞ্ছা বন্দিনী সীতার নিপীড়িত জীবনের বেদনা লাঘব করিয়াছিল এই "সরমা সখী।" কিন্তু সরমার নিকট সীতা আরাধ্যা দেবী, সে তাঁহার চরণে "চিরদাসী।" নারীধর্মের অবমাননায় তাহার অন্তর ব্যথাতুর। সীমন্তিনী সীতার সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু পরাইয়া দিয়া সে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করে। দেবীরূপা জানকীর অশ্রুবারি তাহার হৃদয়-সিন্ধুকে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল করিয়া তোলে, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়। সে তাঁহাকে বলে:

"হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"

সীতা এই 'পরমা হিতৈষিণী'র সাহচর্য লাভ করিয়াই তাঁহার দুর্বিষহ বেদনাময় জীবনে আশার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার মনের দুঃখভার সাময়িকভাবে লাঘব হইয়াছিল। সীতা আদর্শ নারী। সীতার জীবন কাহিনী সরমার কাছে পরম পবিত্র ও আকাঙ্ক্ষিত।

পঞ্চবটীবনে সীতার বনবাসজীবনের বর্ণনা শুনিয়া সরমা কহে—

ত্যজি রাজসুখ যাই চলি হেন বনবাসে।

আদর্শ রমণী নির্জন বনের মধ্যেও চিরন্তন সুখনীড় নির্মাণ করিতে পারে, কারণ—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

সীতাহরণের কাহিনী শুনিয়া সরমা বলিয়াছে:

"কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্বন্ধ?"

যে দুর্বার অদৃশ্য নিয়তি মেঘনাদবধ-কাব্যের চরম পরিণতি নির্দিষ্ট করিতেছে, সেই নিয়তির উপর সরমার বিশ্বাস অবিচল। সে জানে, অন্ধকার অমারাত্রির শেষে সীতার জীবনে আলোকোজ্জ্বল প্রভাত দেখা দিবে, নিয়তির বিধানে রাক্ষসরাজের ধ্বংস ও সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই সে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়াছে:

"আশু পোহাইবে
এ দুঃখ শর্বরী তব।"

সরমার নিকট সীতা মহামূল্য রত্ন—সে রত্ন সে ত্যাগ করিতে পারেনা। তাই সীতার সঙ্গ সে ছাড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার আশঙ্কা—

"রুষিলে লঙ্কার নাথ পড়িব সঙ্কটে।"

তাই তাহাকে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

দুষ্কৃতের শাস্তি অনিবার্য। রাক্ষসেরা অন্যায়ের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিবে। রক্ষোকুলবধূ হইলেও সে রাঘবকুলেরই মঙ্গলপ্রার্থিনী। তাহার কারণ, বিনা দোষে সীতাহরণজনিত অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি-বিধানই তাহার কাম্য, নিরপরাধা সীতার লাঞ্ছনার প্রতিফল রাক্ষসকুলের অবশ্য প্রাপ্য।

ইন্দ্রজিৎ-নিধনের পর সরমা সীতার উদ্ধারের আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর জানাইয়াছে:

"তব ভাগ্যে ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এতদিন গত বল, দেবি,
কর্বুর-ঈশ্বর বলি।"

স্বামীশোকাকুল পতিব্রতা প্রমীলার শোক-শায়ক তাহার বুকে স্বাভাবিকভাবে বিদ্ধ হয়। প্রমীলা নির্দোষ; তাহার সহমরণের কথা সীতাকে জানাইতে তাই সরমার দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সরমার বিশ্বাস ও একাত্রতা ছিল অবিচল। তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে মহাযুদ্ধের ভীষণ পরিণাম সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। রাক্ষসকুলের সর্বনাশের মূলে রহিয়াছে "নিয়তির লিখন।" নিয়তি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া রাবণ অন্যায় করিয়াছে, সেই পাপের ফল অবশ্যই তাহাকে ভোগ করিতে হইবে—

নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা অধিপতি।"

সীতার নিঃসঙ্গ নিরাসঙ্গ বন্দী-জীবনে সরমা তাহাকে নিয়ত সান্ত্বনা দিয়াছে, তাহার দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছে, আরাধ্যা-দেবীরূপে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া অন্তরের অন বিল ভক্তির পশরা উদ্ধার করিয়া তাহার পায়ে ঢালিয়া দিয়া পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, তপ্ত মরুবালুকা বেলায় স্নিগ্ধচ্ছায় মহীরুহের ন্যায় এই আদর্শ দেবদুর্লভ নারীকে ছায়া দান করিয়াছে। যখন সকলে মিলিয়া অত্যাচার ও প্রলোভনের দ্বারা সীতাকে রাবণের বশীভূতা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন একমাত্র সরমাই তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় ও আশার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, হতাশার তীব্রতায় যখন তাহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে এবং তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছেন, তখন সরমা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অবিচলচিত্তে বলিয়াছে—দুঃখনিশার অবসানে উদয়শিখরে জ্যোতির্ময় ভাস্কর দেখা দিবে।

শত্রুপুরীর মধ্যে যথার্থ মিত্ররূপিণী সরমা পাঠকপাঠিকার সকল সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারে।

সীতার প্রতি সরমার অনুরাগও বিস্মৃত হইবার নহে:

যতদিন বাঁচি
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা আইলে রজনী
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী ধনে।"

সরমা সত্যই আনন্দ-সরসী। শোকতাপজর্জর, বিচ্ছেদ-বিধুরা নিপীড়িতা জানকী এই সরসীনীরে অবগাহন করিয়া তাঁহার বেদনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধ-কাব্য পাঠকের চিত্ত-সরমা স্নিগ্ধ আনন্দে প্লাবিত করে।

শ্রীমধুসূদন সরমাকে মনের আনন্দে বঙ্গনারীর আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন। সরমা আমাদের "মনোমন্দিরে" পূজার দাবী করিতে পারে।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

অধ্যাপক জীবন চৌধুরী

'স্বভাব-কবি' নামে পরিচিত উনবিংশ শতকের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সার্থকনামা। রূপময়ী ভাষার যথাযথ অভিব্যক্তির কৃচ্ছ্রসাধন ছিল কবির অজ্ঞাত, মধ্যে মধ্যে ভাব ও কাব্যদেহের অসামঞ্জস্যও যে ছিল না তা নয়, তথাপি ভাবের সরলতায়, নিরাভরণ বিষয় নির্বাচনে, আর শব্দাবয়বের ঋজুতায় গোবিন্দ দাসের কবিতাগুলি জাত-গীতধর্মী। গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬১ সালে। কবি বড় দুঃখে একদিন বলিয়াছিলেন—

কথার বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদ কালে পাইনা কাছে
কেমন স্নেহ অকপট,
আমি মলে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী!

কবির শেষের কথা সত্য হয় নাই, কবির চিতায় মঠ নির্মাণ করার কল্পনাও কেউ করে নাই, কিন্তু অপ্রিয় হইলেও অন্ত অংশটি সত্যভাষণ। বাংলার সাহিত্য-দরবারে যাঁরা আসা-যাওয়া করিয়াছেন তাঁহাদেরই সমগোত্রীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের একদিন আবির্ভাব হইয়াছিল বৈতালিকের বেশে।

গোবিন্দদাস দুঃখের কবি, মানব-জীবনের সঙ্গে দুঃখের যে আজন্ম সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধটির আনুপূর্বিক ইতিকথা ছন্দের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায়। ইহার মূলে আছে কবির মর্মন্তুদ জীবন-ইতিহাস। স্বভাব-কবির কবিতাগুলি সেই কারণেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরই সহজ, সরল ও অকপট প্রতিচ্ছবি।

কিছুই চেয়োনাকো,
কেবলই দিতে থাকো,
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর প্রেম-ঋণ,
ছুঁয়োনা ভালোবাসা হইবে মলিন!

অথবা—

তোরা কে নিবি আয়,
আমি দিব ভালোবাসা যে যত চায়!
কার বুকে কত বল, কার চোখে কত জল,
দেখি কার প্রাণে আছে কত 'হায়, হায়',
পারিবি কে রে নিতে আয় আয় আয়!

কিংবা—

আমি হাসির চেয়ে ভালোবাসি কান্না অভিমান
আমার, চাঁদের হাসি জ্যোৎস্নারাশি দেখলে জলে প্রাণ।

কদম পাতার ফাঁকে ফাঁকে যখন অপরিচিত মুখখানির আভাস পাওয়া যায় কবির—

'শিরায় যেন হীরায় কাটে আঁখির বাঁকা বাণ,'

তাই কবির কাছে হাসি অপেক্ষা কান্নাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে কবির জন্ম, পিতার নাম নাথ, মাতা আনন্দময়ী। প্রথম বয়সে ভাওয়াল কর্তৃক তিনি নানাভাবে অনুগৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু ১২৯২-৯৩ সালে কবির প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু এবং সেই বৎসরেই কবির ভ্রাতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ভাওয়ালরাজের রোষে পড়িয়া কবি কোনওক্রমে পলাইয়া আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর নামক গ্রামে কোনও এক সহৃদয় জমিদারের আশ্রয় লাভ করেন। এই সময় হইতে দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়াই কবির বাকিজীবন অতিবাহিত হয়। কবির জীবন যখন একের পর এক ঘটনা-ভিঘাতে জর্জরিত, তখন অতি সহজ ও সরল কথায় তিনি লিখিতেছেন—

কে আছে আমার?
কে আছে এ পৃথিবীতে, এ দগ্ধ অলন্ত চিতে
একটু সান্ত্বনা দিতে কে আছে আমার?
ভাইহারা বন্ধুহারা 'দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়া,
এমন কপালপোড়া আছে নাকি আর?

আছে কি আমার মত, জগতে দুর্ভাগা এত !
"আমার" বলিতে যার নাহি অধিকার !

শুধু দুঃখের অসহ্য দাহই কবিকে উৎক্ষিপ্ত করে না, করুণা আর মমতার গুরুভারও যেন কবির অসহনীয়—

আর তো পারি না আমি নিতে !
করুণার মমতার   এই বোঝা এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে।

কবি এর পর আরো স্পষ্ট করিয়া অনুরোধের সুরে বলেন—

আমারে দিয়ো না কেহ   আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়,   কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারে না বুঝিতে।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের স্বদেশানুরাগও অত্যন্ত প্রবল ছিল।

স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে, এদেশ তোদের নয়,
এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?

এই অতি-প্রচলিত স্বদেশী গ্রাম্য-সংগীতটি যেমন ইচ্ছা যা'র তা'র নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই সংগীতের রচয়িতা স্বয়ং স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস। তদানীন্তন বাঙালীর ইংরেজপ্রীতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কবি লিখিতেছেন—

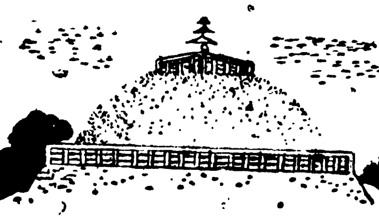
অধম পিশাচগুলি
গর্দ্দভের পদধুলি
মাথায় মাখিয়া ছি ছি বড়লোক হয়,
বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?

অন্যত্র কবি ভারতের অখণ্ড রূপটিকে কি অপূর্ব সংবেদনশীল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন—

আমরা হরিহর,
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক না মোদের সহস্র নাম,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই তো পর নহি কারো,
খড়্গী, বর্গী, গুর্খা, জাঠ আর পার্শী সওদাগর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্তমাংস আমরা পরস্পর।

রাজনৈতিক চেতনারহিত অনভিজ্ঞ জনসাধারণের চোখের সামনে দেশমাতৃকার যে বিরাট অখণ্ড রূপটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা যেন পল্লীর পথ-ঘাট, খাল-নদী, বাঁশ-ঝাড়—সমগ্রতার চালাঘরের মত একান্ত পরিচিত ; ছোট ছোট চিত্র হইলেও গৌরব বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গারো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, পদ্মা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পাড়ে পাড়ে, উজানিয়া 'নাও' 'আর খামখেয়ালি স্রোতের দাপাদাপির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাংলার যে একটা বাৎসল্য রূপ ধরা পড়ে, বাংলা মায়ের সেই অখণ্ড রূপটিকে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায় আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বারান্তরে কবি সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যতীর্থের সতীর্থ বন্ধুগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন যে কবির শতবার্ষিকীতেও তাঁহার আক্ষেপের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কর্ণপাত করিবার সময় আসিয়াছে কিনা।



গল্প

গদ্যকাব্য

উপমন্যু

সকালেই খাতাটা দিয়ে গেল বীতশোক। অশোকের ভাই বীতশোক। পরশু রাতে মারা গেছে অশোক। মৃত্যুর ঠিক আগে ছোটভাইকে না কি ব'লে গেছল অশোক, ডায়েরীর খাতাটা আমার হাতে পৌছে দেবার কথা। দাদার কথা রেখে মাথা নীচু ক'রে চ'লে গেল বীতশোক। বলবার কিছু ছিল না আর, থাকলেও বলার প্রয়োজন ছিল না। আমি জানতাম কেন খাতাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে অশোক। প্রত্যেক ইচ্ছার পেছনেই একটা ইতিহাস থাকে, অশোকের শেষ অনুরোধের পেছনেও ছিল।

সে ইতিহাসের শুরু আমার চাকরী শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। সে কথা এখন থাক। যা বলছিলাম, মানে ঐ খাতার কথা···

বাদুড়ের মত বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে গিয়ে পৌচেছিলাম। দেরী হ'য়েছিল, প্রায় প্রতিদিনই হ'ত এবং প্রতিদিনই দেরীর লজ্জাটাকে লুকোবার জন্যে একটা বেপরোয়া ভাব না দেখিয়ে গতি ছিল না। সেদিনও চেয়ারে এলিয়ে প'ড়ে, পাঞ্জাবীর চারটে বোতাম খুলে দিয়ে, রুমাল ঘ'ষে মুখের ঘাম মুছে ফেলছিলাম। ভঙ্গীটা, বাবু যেন বৈঠকখানায় সবে এসে ব'সেছেন, সেই মুহূর্তে কেউ বিরক্ত না করলেই খুশী হবেন।

অত ভেবে অবস্থা বুঝে কাজ করবার সময় অবশ্য অশোকের ছিল না। ধপ্ করে আমার পাশের চেয়ারটায় ব'সে একটা ছাপা ফর্ম সামনে ফেলে দিয়ে বলল—নে, তাড়াতাড়ি একটা সই দিয়ে দে।

আমার রুমাল-চালনা তখনও শেষ হয়নি। আড়চোখে একবার চাইলাম ফর্মটার পানে। ফর্মটার রঙ হলদে, তার গায়ে অশোকের নীল কালিতে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে উঠে দেখাচ্ছিল ঠিক নামাবলীর টুকরোর মত। ফর্মের রঙ দেখেই প্রয়োজনটা আন্দাজ করেছিলাম। তবু একবার বললাম—কো-অপারেটিভ? আবার?

—আবার মানে। ওর মহিমা অপার ব'লেই তো বার বার যেতে হবে ওর দরজায়। একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল অশোক।

সামনের টেবিলেই ব'সেছিলেন বিনোদদা। তখনও তাঁর চলছে কলমের নিবে শান্ দেওয়ার পর্ব—অর্থাৎ ঘড়ীতে বারোটা বাজার আগে কালিতে কলম ডুবলেই হ'ল—এই নিয়ম বিনোদদার। অশোকের কথা শুনে কাজে মন রেখে, মুখে একটা টিপ্পনি কাটলেন—মহিমা বলে মহিমা। কেরাণীর পীঠস্থান।

—কি রকম? হেসে বললাম আমি। রঙ কালো আর দেহ শুকনো হ'লে কি হবে, বাক্যে রস আর রসনার শান, দুটোরই অভাব ছিল না বিনোদদার।

—ইংরেজীতে তোমরা বল 'ডেটার', আমি বলি দেবতার, অর্থাৎ আমাদের মত দেব্‌তাদের মন্দির ওটা। আর ঐ দেবতার বাহন হচ্ছে নধর শুয়োরটি, মানে জামীনের ইংরেজীটার বাংলা রূপ আর কি।

—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন বিনোদদা—অশোক্ রসান্ দিল।

—অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে অধমর্ণ অশোক দেবতার বাহন, নধর শুয়োরটি হচ্ছে—কথা শেষ না ক'রে, ভ্রূর জঙ্গলে ঢাকা চোখ দুটো তুলে আমার দিকে মিট্‌মিট্ ক'রে চাইতে লাগলেন বিনোদদা। নিজের রসিকতায় নিজে হাসতেন না—বলতেন গুরুর নিষেধ।

সই করে দিলাম—অশোকের ঋণের আবেদনে জামীনের স্বীকৃতি। মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকার জরুরী প্রয়োজন ছিল অশোকের।

সেই ঋণের সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। দেবতার

অবর্তমানে তার বাহন নধর শুয়োরটিকে নিয়ে টানাটানি হবে, এ কথা অশোকের অজানা ছিল না এবং সেই সূত্রেই বন্ধুর শেষদান ডায়েরীটা এসেছিল আমার হাতে। কেরাণী অশোকের শেষসম্বল তার ডায়েরী, তার নীরব সাহিত্য সাধনার স্বাক্ষর। কত অতন্দ্র রাতে হয়তো স্বপ্ন দেখেছে অশোক, পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তার লেখা, বাড়তি কিছু অর্থ আসছে তার হাতে। অর্থ সমাগমের কত স্বপ্নই না দেখে কেরাণীরা!

এখন সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করার ভার আমার। অর্থাৎ সম্ভব হ'লে পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করে, কিছু টাকা এনে সেই টাকা দিয়ে শোধ করতে হবে ঋণের অবশিষ্টটুকু। হাসলাম মনে মনে। পত্রিকার অফিসের দেবতারা আছেন এবং তাঁদেরও বাহনের অভাব নেই। খাতাটা বরঞ্চ আমার কাছে থাক, টাকাটা আমিই দিয়ে দেব। খাতাটার সঙ্গে অনেক পুরোনো স্মৃতি জড়ানো আছে। পাতা ওল্টাতে মনে প'ড়ে গেল .....

অশোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল কলেজ ছেড়ে অফিসে পা দিয়েই। মামা ছিল না, তবু চাকরী জুটে গেল। কাকার নামের জোরে চাকরী পেলাম সরকারী অডিট্ অফিসে। প্রথম দিন—একটা চিঠির খসড়া সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। সদ্য-লেখা বাছা বাছা সব ভাষা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলাম খস্ড়াটা, আকুল আগ্রহে চেয়েছিলাম সাহেবের দরজার পানে, কখন 'বাহবা' ছাপ নিয়ে ফিরে আসবে সেটা। একটু পরেই ফিরে এলো। পাশে ছোট্ট একটু মন্তব্য, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—ভুষিমাল।

ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়েছিলাম কালির আঁচড়টার পানে। বুকে বিঁধে গিয়েছিল সাহেবের কলমের তীক্ষ্ণ টানটায়—কেরাণীর জীবনে ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের প্রথম আঘাত। আচমকা পাশে থেকে ভেসে এলো মন্তব্য—পছন্দ হয়নি তো! ইংরেজীর সাংঘাতিক সমজদার আমাদের সমজদার সাহেব। সেকালের এনট্রান্স পাশ—একেবারে খোদ জহুরী বাবা।

ফিরে চাইলাম, সেই প্রথম দেখলাম অশোককে। হাসছিল অশোক। কেন কে জানে আমিও হেসে ফেললাম। অশোকের পাশেই ব'সেছিলেন বিনোদদা। আমার সঙ্গে তাঁর তখনও পরিচয় হয়নি। তবে শুনেছিলাম সেক্‌শনের সবচেয়ে ভারী কাজটার ভার নাকি বিনোদদার। কাজ ভারী কি না বুঝতে পারিনি, তবে দেখেছিলাম ভারী ভারী আর বড় বড় খাতায় হিসেবের হরফ সাজিয়ে ব'সেছিলেন বিনোদদা। ওই ব'সেইছিলেন—আর দক্ষ সেনানীর মত শান দিচ্ছিলেন কলমের নিবে। ভাবটা যেন দিনের শেষে, তীক্ষ্ণতম অস্ত্রের এক খোঁচায় ফাঁস্ ক'রে দেবেন হিসাবের জটিল রহস্য।

—আপনি ইংরেজির এম-এ, না? প্রশ্ন করল অশোক।

আজ বলতে বাধা নেই, সত্যটা স্বীকার করতে লজ্জা হ'য়েছিল সেদিন।

—আজ থেকে ভাবতে আরম্ভ করুন যে চাইনিজ ভাষায় এম-এ পাশ করেছেন। তা হ'লেই দেখবেন পাকা কেরাণী হবার সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও চীনেদের মত ভাবলেশহীন হ'য়ে উঠেছে। অশোকের কথা শুনেই হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। বুঝলাম মনের ব্যথার রেশ মুখ থেকে মুছে ফেলা দরকার—অফিসে ও সব সস্তা সেন্টিমেণ্ট চলে না।

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলাম। সচকিত হ'ল মন অশোকের গলা শুনে—বিনোদদা, বেচারিকে তো বাঁচাতে হয়।

বিনোদদার ডান হাত ব্যস্ত ছিল। বাঁ হাতে একটা বাঁধানো খাতা তুলে আলগোছে ছুঁড়ে দিলেন আমার টেবিলে। মান্ধাতার আমলের সেই জীর্ণ খাতাটা কি কাজে লাগবে, তাই ভাবছিলাম। পাশে এসে ব'সল অশোক, আর তারপরেই আলিবাবার এক মন্ত্রে খুলে গেল রহস্যপুরীর দ্বার।

—এই নিন্ সাক্ষাৎ পাশুপত অস্ত্র, এর এক আঘাতেই সমজদার কেন—স্বয়ং বড় সাহেব পর্যন্ত ঘায়েল হবেন। বলতে বলতে হো হো ক'রে হেসে উঠল অশোক। তারপর বিনোদদার দিকে ফিরে বলল—কি বিনোদদা, চুপ ক'রে রইলেন কেন? বলুন না, আপনার সেই উটমুখো উল্‌থর্প সাহেবকে তাক লাগিয়ে দেবার গল্পটা।

ওষুধ কিন্তু ধরল না। বিনোদদা মুখ তুলে মুচকি একটু হাসি ছড়িয়েই কাজে মন দিলেন। তখন বলার

ভারটা অশোকই নিল। ছোট্ট একটা লেক্‌চার, যার মোদ্দা কথাটা হ'ল—মডেল খস্‌ড়ার ভাণ্ডার হ'ল ওই জীর্ণ খাতাটা। ১৮৯৭ সাল থেকে সংগ্রহ করা, অডিট অফিসে প্রয়োজন হয় এমন সব চিঠির উত্তরের খস্‌ড়া আছে ওই সাত রাজার ধন এক মাণিকে। সাত রাজার ধন ছাড়া আর কি! পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হ'য়ে আসছে ওই রত্ন, কেরাণীকণ্ঠের কোহিনুর।

অবাক হ'য়ে শুনছিলাম অশোকের কথা। বোধ হয় আমার বিব্রত অবস্থা দেখেই অশোক এবার হেসে বলল—হাঁ করে ভাবছেন কি অত। এবার আপনার ওই চিটিটার মডেল উত্তরটা খুঁজে বার ক'রে ফেলুন খাতা থেকে। আর তারপর নাম, নম্বর, তারিখ আর এটা—সেটা, মানে ছোট-খাটো অদল-বদল যা দরকার ক'রে…খস্‌ড়ার—মানে মডেল উত্তরের নকলটুকু পাঠিয়ে দিন সাহেবের কাছে—দেখবেন বাপের সুপুত্তুরের মত সই হ'য়ে চলে এসেছে।

সেদিনই ছুটির পর দু'জনে গিয়ে ব'সেছিলাম কার্জন পার্কে। চার পয়সার এক ঠোঙা চীনেবাদামকে কেন্দ্র করে জমে উঠল আলাপ। ঠোঙা থেকে বাদাম তুলতে গিয়ে ওর আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছিলাম আমার আঙুলে। আঙুলের এই ক্ষণিক স্পর্শ দেখি কখন দু'জনারই অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হ'য়েছে অন্তরে, সম্বোধনটা চলেছে তুমির পর্যায়ে।

—টিফিনের পর থেকে মোটা একটা বই নিয়ে ব'সেছিলে দেখলাম। কি পড়ছিলে অত মন দিয়ে? আলাপের মাঝখানে এক সময় বললাম আমি।

—পরীক্ষার পড়া। পাশ না করলে একটি পাও বাড়ানো যাবে না। অডিট অফিসে উন্নতির পথ ক্ষুরধার হে।

—খুব কঠিন পরীক্ষা না কি?

—এইবার হাসালে তুমি। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে স্রেফ গাধায় পরিণত করতে কত পরিশ্রমের দরকার হয়?

—গাধা?

—হ্যাঁ, গাধা। পরীক্ষাটার নাম এস, এ, এস—পাশ করলে সকলে বলবে এ, এস, এস অর্থাৎ আস্ত একটি গাধা। বলেই হো হো করে হেসে উঠল অশোক। তার প্রাণখোলা হাসির উত্তরে না হেসে উপায় ছিল না। হাসতে হাসতেই বললাম—অমন পরীক্ষায় পাশ না করলেই নয়।

হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল অশোক, একটু যেন অন্যমনস্কও। মনের গভীরে একটা চিন্তার আলোড়ন উঠেছিল, যেন সেটাকে সামলে নিয়ে বলল—

গাধায় মোট বয়, পাশ করলে তেমনি মাসের শেষে মোটা টাকা আসবে হাতে। টাকা চাই, মানুষের মত বাঁচতে হবে, বিয়ে-থা করতে হবে…

আরে, এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ কথা বলছে—এক চমকে ঠিক এই কথাটা মনে হ'য়েছিল সেদিন। তার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে ব'লেছিলাম—মানুষের মত বাঁচার প্রয়োজনে বিয়েটাই কি একমাত্র পথ? আমার কথার সুরে বিদ্রূপের রেশ নিজের কানেই কেমন বেসুরো মনে হ'ল। অশোক কিন্তু গ্রাহ্যও করল না। বেশ জোরের সঙ্গে বলল—একমাত্র কি না জানি না; কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার পথও ওটা নয়। যারা বিয়ে করে এসে ব'লে—মা বুড়ো হয়েছে, কি করি বল…আমি তাদের দলে নেই। আমার নিজস্ব সাধ আছে, স্বপ্ন আছে…।

—তা হ'লে বিয়ে করলেই তো পারো।

—পারছি না, কিছুতেই পারছি না। নৈরাশ্যের উষ্ণ নিশ্বাস একপলকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল তার দৃঢ়তার খোলসটাকে।—কি করে পারবো বল। মা আর ছোট ভাই নিয়ে তিনজনের সংসার। বাড়ীভাড়া দিয়ে, ভায়ের পড়ার খরচ চালিয়ে এই মাইনেতে—আর চলছে না সংসার, টিউশানির বাড়তি আয় যোগ দিয়েও যোগ দেওয়া যাচ্ছে না আয় আর ব্যয়ের দুই প্রান্তকে। হয়তো চ'লে যেতো, কিন্তু বিপদ বাধিয়েছে ওই কো-অপারেটিভ। বোনের বিয়ের জন্যে টাকা ধার নিয়েছিলাম, এখন মাসে মাসে ষাট টাকা শোধ দিতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছো, এই মাইনে থেকে ষাট টাকা চলে গেলে আর যাই চলুক—বিয়ে ক'রে সংসার পাতা চলে না।

কেমন আশ্চর্য লাগছিল অশোকের আন্তরিকতায় ভরা কথাগুলো। সুস্থ, শিক্ষিত একজন তরুণ সংসার পাততে চায়, বিয়ে করতে চায়, অথচ পারছে না আর্থিক অনটনের বাধায়, এর মধ্যেকার ট্রাজেডিতে অভিভূত হওয়ার কথা সেদিন মনে হয়নি। মনে হয়নি—তার কারণ অশোকের

কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ছিল না। মাঠের বুকে দুপুরের তপ্ত রোদের মত কাঁপছিল তার কণ্ঠ, মায়ায় ভরা—আর অন্তর উদাস করা। চমক ভাঙলো অশোকের কথায়।

—আমাদের জীবনের পথে চলা নয়। দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার কসরৎ দেখাচ্ছি আমরা, ব্যালান্স করতে করতেই প্রাণান্ত। একদিন ভরাপেটে দু'পয়সার জায়গায় পাঁচ পয়সার একটা সিগারেট একটু আরাম ক'রে খেলেই দু'ঘণ্টা বাদে অম্বল চাগাড় দেবে—বিবেকের বিদ্রোহের বার্তা। তিনটে পয়সা বাঁচলে…

—কি হয়? হেসে বললাম আমি, চেষ্টা করলাম আবহাওয়াটাকে হাল্কা করবার।

আমার মুখের ওপর একটা বিস্মিত দৃষ্টি ফেলে, এক পয়সার একটা সিগারেট ধরানোয় মন দিল অশোক। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—সরকারি নিয়মকানুনের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই পাওয়া যায়—এটা আর ওটা অর্থাৎ দুটো সম্ভাবনার মধ্যে যেটা আগে ঘটবে সেটাই হবে। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে মনে হেসে উঠি আমি। আমারও সামনে দুটো সম্ভাবনা, কো-অপারেটিভের দেনা-শোধ, আর পরীক্ষায় পাশ করা। যেটা আগে ঘটবে, সেটাই হবে আমার জীবনে দড়ির ওপর হাঁটায় দাঁড়িটানা।

শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, কোন্‌টা বিচলিত করেছে অশোককে—ঋণের ভার, না স্বপ্নভঙ্গের বেদনা? উত্তর পাইনি। শুধু অনুভব করেছিলাম যা একটু আগে ছিল শুধুই আলাপ—তাই কখন আশ্রয় নিয়েছে অন্তরে, হয়ে উঠেছে উপলব্ধির বস্তু।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল অশোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে কার্জন পার্কের কাঁকর-বিছানো পথে নীরবে হাঁটছিলাম দু'জনে। হঠাৎ আমার হাতটা ধরে অশোক বলল—রাতের চৌরঙ্গীটাকে ভারী কুৎসিত মনে হয় আমার—এ যেন মুখছোঁয়া আলোয় ঝলমলানির আড়ালে বুক-ভরা অন্ধকারের যন্ত্রণা। এমন নিওন আলোর বাইরে আমার প্রয়োজন নেই। আমার ছোট্ট ঘর যদি প্রদীপের মৃদু আলোয় ভরা থাকে তো সেই ভালো।

বছরখানেক কেটে যাবার পরও অবশ্য আকাঙ্ক্ষিত আলোর স্পর্শ পড়ল না অশোকের ছোট্ট ঘরে। অন্য সেকশনে কাজ করতো অশোক। তবু প্রায়ই দেখা হ'ত। প্রত্যহ হত না, কারণ ইতিমধ্যে কেরাণীর কৌলীন্য অর্জন করেছিলাম আমি, জড়িয়ে পড়েছিলাম অনেক কাজ আর কিছু অকাজের জালে।

হঠাৎ একদিন সারা অফিসময় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। প্রজাপতির মত অফিসের এ ঘরে উড়ে উড়ে বেড়াতো সুলেখা সরকার। রূপ তার ছিল না, তাই রূপচর্চার বাহার দিয়ে আমাদের ঘরে আসতে দেখতাম সুলেখা সরকারকে। নির্দিষ্ট কাজ কিছু তার ছিল তবে তা করতে হ'ত না, তাই সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোতেও বাধা ছিল না। সেই সুলেখা সরকার স্বয়ং গিয়ে নালিশ জানিয়েছে মেজ-সাহেবের দরবারে। পত্রাঘাতের অভি-যোগ। কি না কি কুৎসিত প্রস্তাব ছিল সেই কুখ্যাত পত্রে।

অফিসে একটা কথা চালু ছিল—মেয়েদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে ভাবতে না কি রাতে ঘুম হয় না মেজ-সাহেবের। সেই মেজসাহেবের কাছে এমন একটা মারাত্মক অভিযোগ! পত্রলেখকের না কি ডাক পড়েছিল মেজসাহেবের ঘরে। পত্রলেখক স্বয়ং শ্রীমান অশোক। তারপর?

তারপর যা হবার তাই হ'ল। ছুটির পর দেখা হ'ল তার সঙ্গে।

—এমন একটা নোংরামি করলি কি ব'লে? প্রায় ধমকে উঠলাম আমি।

—বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে নোংরামি কোথায়? বেশ সহজ সরল ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল অশোক। এমন একটা নির্বিকার ভাব আশা করিনি আমি। থতমত খেয়ে বললাম—বিয়ে? ওই সুলেখা সরকারকে?

—মিস্ সরকার মাসে মাসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কত জমা দেয় তা জানা আছে কি?

বিস্ময়বিমূঢ় আমি ঘাড় নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

—একশো টাকা। এখন মাথায় ঢুকলো কিছু?

আবার ঘাড় নাড়লাম।

—এবার—আর দুটোর মধ্যে যেটা আসে সেটা নয়। বিয়েও হত, আর সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভের দেনাটা শোধ হ'ত।

—আর তা যখন হ'ল না তখন? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

একমুখ হেসে বলল অশোক—এখন মেজসাহেবের হুকুমে এ জেলা, সে জেলার জল খেয়ে অডিট্ ক'রে বেড়াওগে। কালই চ'লে যাচ্ছি ক'লকাতা ছেড়ে।

তারপর কলকাতা ছেড়ে বাইরেই ছিল অশোক। মাঝে মাঝে চিঠি পেতাম। আমিও তখন পরমার্থলাভের জন্মে গাধা হবার সাধনায় মেতেছি। তাই চারপাশের খবর রাখবার বিশেষ অবসর ছিল না। তবু ওরই মধ্যে অবহিত হ'তে হ'ল অশোকের বিয়ের খবর পেয়ে। জলপাইগুড়িতে বিয়ে আর বৌভাত দুইই, কিন্তু দুটোই পড়েছিল আমার পরীক্ষার তারিখে। যেতে পারলাম না, উপহার একটা পাঠিয়ে দিলাম।

মাস তিনেক বাদে, পরীক্ষার খবরের জন্মে অপেক্ষা করছি, ঝড়ের মত এসে উদয় হ'ল অশোক। পাশে ব'সেই তার প্রথম কথা—কো-অপারেটিভের দেনা শোধ ক'রে দিয়ে এলাম।

—অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার গল্প না কি রে, অ্যাঁ। তা, বউ দেখাচ্ছিস্ কবে বল ?

—ফটো দেখাতে পারি।

—মানে ?

—সাতদিন হ'ল মারা গেছে, জলপাইগুড়িতে। কলেরা হ'য়েছিল।

সান্ত্বনার দু'একটা কথা মনে মনে সাজিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, হো হো করে হাসার একটা করুণ চেষ্টা ক'রে বলল অশোক—ভালই হ'ল, কি বলিস। গয়না গুলো বেচে কো-অপারেটিভের দেনাটা শোধ ক'রে দিলাম।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের পত্রাবলী

(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত)

---

(১)

Sisir Kumar Bhaduri Calcutta

বৃহস্পতিবার

৬।৪।৫০

জিতেন,

অনেকদিন হোলো চিঠির উত্তর পাওনা হয়েছে। রাগ কোরো না। শরীর খারাপ ত জানই। তাছাড়া নিছক Struggle for existenceএর জন্মে এক সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেছি—শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকের। তাতে একমাসকাল অর্থাৎ এপ্রিল মাসটা চালাতে পারবো। এরই Rehearsalএ এখনও ব্যস্ত।

তোমার নাটক (একাঙ্কিকা) কোন playর সঙ্গে লাগাবো—সেইটেই চিন্তা করছি। ১লা বৈশাখ হবেনা। ও week endএ 'বিজয়া' দিয়েই চালাবো।

আজকে এইখানেই লেখা সমাপ্ত করলাম। সোমবার দশ তারিখে খুব ধরে ধরে একখানা বড় চিঠি লিখবো। হ্যাঁ, ছাপরা কি বৈশাখ মাসে খুব গরম হয় ? খবরটা পত্রোত্তরে দিও। বউমা ছেলেপিলেদের মঙ্গলকামনাপূর্ণ স্নেহ জানিও।

ইতি তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

দাদা

(২)

Sisir Kumar Bhaduri Calcutta

শনিবার

জিতেন,

বড় করে চিঠি লেখা হয়ে উঠছে না। আমি একমাসকাল, শনি আর রবিবার কোলকাতায় রাসবিহারী এভেনিউতে থাকি। আর সোমবার থেকে শুক্রবার

বৈদ্যনাথধামে কাটাই। এই করে কোনরকমে খাড়া আছি। চোখ, শরীর ও মন বড়ই খারাপ। না হচ্ছে পড়াশুনো, না হচ্ছে কোন কাজ।

লক্ষ্মীটি অধৈর্য্য হোয়ো না। কোনরকমে শীঘ্র যাতে দেখা হয়, তার ব্যবস্থা কোরবো। আজ যাহোক করে নিজের খবরটা দিলাম। এই পর্য্যন্ত। তুমি, বউমা, ছেলেরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি
দাদা

(৩)

Sisir Kumar Bhaduri Calcutta

শ্রীরঙ্গম
শনিবার ২৫।৬।৫০

জিতেন,

সোমবার বলে শনিবার হয়ে গেল শরীর খুব খারাপ। বাঁ চোখটা প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়ে আসছে। মাঝখানে Influenza হয়েছিল। তারপর তোমার কাছে লিখবার এতকথা আছে—একটু অবকাশ না হলে সুবিধা হয় না। সমস্ত দিন নানা গোলমাল—অসুস্থতা-শরীরের ওপর লেগেই আছে। রাত্রে লেখা অসম্ভব, পড়া অতি কষ্টে। আজ সকল বাধা অগ্রাহ্য করে লিখতে বসেছি। বেলা এখন ১১টা। ৬ঘণ্টা পরে স্টেজে নামতে হবে।

এখন কথা, আমি সত্যই তোমাকে বড় নিরাশ করেছি। আমার দুর্ভাগ্য আমি নিজেও এত নিরাশ কখন হইনি। প্রতিশ্রুতি লোকের কাছে পেলেই তোমাকে আশা দিয়ে চিঠি দিই। কিন্তু ভাগ্য এমন মন্দ, দিন যায়, যাঁরা ভরসা দেন, আজ না কাল কোরতে থাকেন, কথায় কোনদিন নিরাশ করেন না, কিন্তু টাকা হাতে আসে না। এই হচ্ছে ভিতরকার ইতিহাস। এরই জন্যে মন খারাপ, শরীরও খারাপ আমার বিশ্বাস এই আশাভঙ্গের চাপে। 'বিজয়ার বিক্রী পড়ে এসেছে আজ পাঁচ সপ্তাহ। দিনগত পাপক্ষয় হয়, কিন্তু সত্যিকারের কিছুই কোরতে পারি না। এর জন্যও অন্তরে কম পীড়া পাই না। অতএব তোমাকে আর উদ্দীপ্ত কোরে তুলবো না। যখন একটা কিছু নিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে, তখনই তোমাকে জানাবো

দ্বিতীয় ও শেষ কথা এই যে, পূজা পর্য্যন্ত তুমি আমার ওপর নির্ভর কর। আমার সঙ্কল্প তোমার নাটকগুলি আমিই অভিনয় করবো আমার মঞ্চে! তোমার নাটক অতি প্রাণবন্ত, কিন্তু গড়ন বড় এলোমেলো। এই গড়নের দিকেই আমাকে তুমি পাবে। সেই গড়ে তোলার জন্যে দরকার চোরে ও কামারে দেখা। এই দেখা যাতে শীঘ্র হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এর বেশী কিছু বলব না।

এইখানেই আশীর্ব্বাণী দিয়ে চিঠি শেষ করবো মনে করেছিলাম। একটা কথা আরও বলবার আছে. সেটা না বললে নিজের ওপর ও তোমার ওপর অবিচার হবে? আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে, নিজে যখন এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বাহিরের বাধার চাপ দেখছি আস্তে আস্তে কমে আসছে, তখন হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

আশা করি তোমরা সকলে মিলে ভাল আছো। সবাই আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে!

ইতি
তোমার
দাদা



বিশেষ একজন

শ্রীশঙ্কর

আপনাদের মধ্যে যাঁরা মূঢ়মতিকে চেনেন তাঁদের এ লেখা পড়বার কোন দরকার করে না। কারণ একবার তার সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি জানেন কারো লেখায় তার রেখাঙ্কন কত ক্ষীণসম্ভব। গগন নহিলে তোমাকে ধরিবে কেবা'। এই আমার সঙ্গেই তার পরিচয় বোধহয় ছেচল্লিশের দাঙ্গার কিছু আগে। প্রথম আলাপের কদিন পর বললে, তিনটের শোতে সিনেমা দেখবেন না। আমার মুখের (জিজ্ঞাসার চিহ্ন জেবড়ে যাওয়া) অবস্থা দেখে বুঝিয়ে দিলে, তাতে জামাকাপড় ময়লা হয়। ছবি-ঘরগুলোর মেঝেয় ঝাঁট পাট পড়লেও চেয়ার গুলো নাকি দ্বিপ্রাহরিক দর্শকবৃন্দের পরিচ্ছদেই পরিচ্ছস্কৃত হয়। অতএব পরিচ্ছদ সম্পর্কে যাঁদের মমতা আছে, কিংবা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যাঁদের দুর্বলতা আছে, অথবা নিজের জামাকাপড়কে চিত্রগৃহের চেয়ার-ঝাড়ন করতে যাঁদের আপত্তি—তাঁদের নাকি ম্যাটিনী শোতে ছবি দেখা অবিধেয়। দেখতে দেখতে অনেক বছরই হয়ে গেল তার সঙ্গে আলাপ 'তবু যেন মনে হয় সেদিন সকালে' হল।

তারপর থেকে তার সঙ্গে কত জায়গায় কত বন্ধু গোষ্ঠীতে, কত চা-খানায়, কত সভাসমিতিতে গেলাম তার আর লেখাজোখা নেই। মাঝে মাঝে সে উধাও হয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, কাগজে কিছু বেরোয় নি ত? পিসীমার ওখানে গিয়েছিলাম রাঁচিতে; ফুটকি দিতে ভুলে গেলে বাঁচিতেও বলতে পার।

চেনা চা-খানায় মূঢ়মতিকে এবং তার সঙ্গে যারা থাকবে তাদেরকেও শতকরা এক্ষণভাগ খাঁটি খাবার দেবে রেষ্টুরেণ্টওলা। একশভাগ খাঁটি অর্থাৎ তৈরী মালের ব্যাপারে, কাঁচামাল খাঁটি আর রেষ্টুরেণ্টওলা পাবে কি করে—দেশেই যে সে দ্রব্য নেই। নতুন জায়গায় ঢুকেই বলে, কটলেট আছে নাকি। চটপটে বালক হয়ত জবাব দেয় আছে। তখন তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে ডেকে বলে, আমার ও আজকের জিনিস খাবার উপায় নেই ভাই—মামুলী আছে কি না—অন্তত একদিনের বাসী খেতেই হবে। এদেশের ছেলে মামুলী বোঝে না এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় একদিনের বাসী আবার বাসী নাকি—চান ত দুতিন দিনের বাসী ও আপনাকে দিতে পারি। হুঙ্কার দিয়ে উঠবে তখন মূঢ়মতি—চেয়ার ঠেলে টেবিল উল্টে গ্লাস ভেঙ্গে। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে ম্যানেজার বা মালিক বা উভয়ে বা একাধারে দুই। পরের অবস্থা এবং মূঢ়মতির বাকবিন্যাস সঠিক উদ্ধৃত করা এক টেপ রেকর্ডার ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই। কোন শ্রুতলিপিকের পক্ষেও নয়। কারণ শ্রুতলিপিক ভাষাটা হুবহু উদ্ধার করতে পারেন, কণ্ঠস্বর কি বাগভঙ্গি পারেন না। পরের দৃশ্যে দেখা যায়, মালিক বা ম্যানেজার বা ইত্যাদি ওর হাতে পায় ধরছে এবং মাঝে মাঝে জোড়হাত করছে। কলকাতার সব পাড়াতেই ওর শিক্ষাপ্রাপ্ত এক একটি চা-খানা আছে। যখন যে পাড়ায় ওর চা তেষ্টা পায়, ঐ চিহ্নিত দোকানেই ঢোকে।

এই শ্রুতলিপিক কথাটাই ওর কাছে শেখা। প্রায়ই আমরা বলি, আচ্ছা মতি, তুমি লেখ না কেন। তোমার কথা শুনলে আমাদের মনে হয়—আহা এ সব যদি আর পাঁচজনে শুনত। ও বলে, তাতে তোমাদের বুঝি ভোলবার সুবিধে হত। কি দুঃখে লিখতে যাব, কেনই বা যাব—যা বলি নতুন কিছু নয়, তবে কোন কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা লিখব মনে করি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর গল্পের মত থাকে না। আমরা বলি, গল্প লিখবে কেন, যা বলছ তাই লেখ। ও বলে, কোন ভদ্রলোকে তাই করে; বার্ক বক্তৃতা করে গেলেন, শ্রুতলিপিক সেটা লিখে নিলেন, ফরাসী বিপ্লবের উপর তাঁর বক্তৃতা ছেপে বেরোল—নেপোলিয়ন দিগ্বিজয় করতে লাগলেন, ঐতিহাসিক সে সব লিপিবদ্ধ করলেন—জনসন যা খুসী বলে যেতেন বসওয়েল সেগুলো টুকে রাখতেন—মায় তাকেই গালাগালি পর্যন্ত—কমলাকান্ত আফিঙের ঝোঁকে যা বলত বঙ্কিমচন্দ্র রাত জেগে তাই লিখতেন (এখানে বাধা দিতে গেলে মূঢ়মতি উচ্চে বাধা দিয়ে বলেছে—কমলাকান্ত কি লিখেছে?); তোমাদের যদি অত পরোপকার-প্রবৃত্তি চিড়বিড়িয়ে উঠছে তবে তোমরাই কেউ শ্রুতলিপিক হয়ে যখন যা বলি টুকে রাখতে পারো। কয়েকবার কথাটা কানে যেতে ওকে জিগ্যেস করলাম, পিপীলিকা না কি একটা বলছ? ও বললে, ইংরেজী তোমাদের মাতৃভাষা কি না—ষ্টেনোগ্রাফার বললে বেশ বুঝতে পার—এমানুয়েন্সিস বললে না বুঝে অভিধান ও দেখ না—শ্রুতলিপিক শুনে পিপীলিকার কথা মনে পড়ছে। চিনির বলদের পক্ষে পিপীলিকার কথা মনে পড়ার ভাবানুসঙ্গ আছে।

মূঢ়মতির কথা বলতে গেলে একটা বলতে আর একটা এসে পড়বেই। ওর নাম সংক্ষেপ করার জন্য শেষার্ধ গ্রহণ করতে ওই বলেছে। আলাপ হবার পর যখন আপনি থেকে তুমি হল, একদিন ও বললে, দেখ যাদের ডাকলাম কাছে—তারা ডাকাত; যাদের নেই তাদের কাজ চালাবার সুবিধের জন্য নামটা একটু ছেঁটে নিতে হয়। দীপেন্দ্রকুমার দিপু, মানবেন্দ্র চন্দ্র মানু, রবীন্দ্রনাথ রবি—এমনি করে নাম সংক্ষেপ করা হয়। ইংরেজদেরও তাই—উইলিয়াম শেক্সপীয়ার বিলি টমাস হার্ডি বা মান বা গ্রে টম। এমন কি যদি সময় করে কোন পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বল এবং তিনি যদি কালিদাসের কোন রচনা উল্লেখ করেন তবে শুনতে পাবে তিনি কুমার সম্ভবম বা রঘুবংশম না বলে শুধু কুমার বা রঘু বলছেন। এই নজীরগুলো থেকে বুঝবে নামকে সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে নামের গোড়া বা প্রথম জল দেবার যেমন কোন মানে হয় না—অনেকের নামের মানে তেমনি হচ্ছে না উলটে যাচ্ছে বা পালটে যাচ্ছে। যেমন

পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী নামটি জলটল খেয়ে বলতে আরম্ভ করতে হয়। নামটি ভাল। পার্থ মানে অর্জ্জুন, পার্থসারথি মানে কৃষ্ণ। আদতে দাদার অর্থছিল কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; প্রথম অংশটুকু কেটে নিয়ে ব্যবহার করার ফলে এখন অনেকে অর্জ্জুন চক্রবর্ত্তী হিসেবে বাজারে কাটছেন। তাদের সে কথা মনে করান সোজা নয়—হয় ত ফুঁসে উঠবেন, আমি কি নাম ভুলে গেছি! অতএব প্রচলিত প্রথায় আমার নামের সংক্ষেপ সুর করলে তোমাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে। বলা বাহুল্য এই প্রাণহানির আশঙ্কার কথাটা আমাদের একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। মতি মুখে এক এবং মনে আর পছন্দ করে না। তাই মনের কথাটা বলতে হল—প্রাণের আবার আশঙ্কা নামের সঙ্গে কি? ও বললে, আছে—পানিনি বলেছেন একাদিক্রমে পঞ্চকাল মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। ক গ চ জ এই অক্ষরগুলোর সঙ্গে হ যোগ করলে খ ঘ ছ ঝ ইত্যাদি হয় তোমরা জান এবং এও জান যে এই ল যুক্ত অক্ষর গুলোই মহাপ্রাণ বর্ণ। এখন যদি তোমরা মূঢ়মতি নামটা আধঘণ্টায় একবার ব্যবহার কর—সংক্ষেপ হয়ে গেলেই দেখবে মিনিটে আটবার করে মূঢ় সুর করতে লেগেছ। শ্বাসাঘাত কমে গেলে আবার সেটা মুড়োর মত শোনাবে। মাছের মুড়ো চোখের পক্ষে যতই ভাল হোক, চোখের মাথা খেয়ে আমার নামের মুড়ো তোমাদের চিবোতে দেখলে বড়ই অস্বস্তি বোধ করব। বার বার মূঢ় উচ্চারণের ফলে তোমাদের মৃত্যু আমার কাছে যতটা আনন্দের আমার—মুড়ো ভোজ্য হিসাবে তোমাদের কাছে উপাদেয় লাগা তার চেয়ে ঢের কম আনন্দের। সুতরাং উভয় সঙ্কট মোচন হয়, যদি তোমরা মতিটুকু গ্রহণ কর। ত মতি আর মুক্তো নয় যে তোমাদের কাছে ছড়াতে বাধা থাকবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তা ত বটেই।

ডাকনাম মতি স্থির হবার পরই জিজ্ঞেস করলাম, হাঁ মতি ডাকনাম থাকা লোকদের ডাকাত বললে কেন। ও বললে, ডাকাতির মামলায় দেখনি—কাগজে খবর বেরোয়—উত্তমসিং ওরফে মধ্যম পাঁড়ে ওরফে ওরফে জগা পুলিশের কালঘাম ছুটাইয়া অবশেষে ধরা পড়িয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে একশ সাঁইত্রিশটি ডাকাতি, উনসত্তরটি রাহাজানি, ছাপ্পান্নটি লুটতরাজ, একুশটি নরহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ ওরফে গুলো হয় ভুয়ো নাম, নয় ডাক নাম। কোন ডাকাতের আজ পর্যন্ত একটি নাম দেখেছ, গোটাকতক ওরফে আছেই।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর ওর সঙ্গে যখন দেখা হল তখন সাতচল্লিশের কাছাকাছি। দেখেই বললে, কি ব্যাপার বেঁচে? দাঙ্গায় আমার সাড়া না পড়ায় ওর নৈরাশ্যের কারণটা অনুমান করার চেষ্টা করছি—এমন সময় আবার ওই আমায় আশ্বস্ত করে—থাক, তাতে আর কি হয়েছে; পাজীদের অনেক সুযোগ পরেও আসবে, তবে অনেক ভাল লোক এই সুযোগে গেলেন কি না। তোমাকেও ভাল লোক বলেই জানতাম। তবে ই তোমার দোষ নেই—বাঁচতে বাঁচতে একটা বাঁচার অভ্যাস হয়ে গেছে! আর মানুষ যখন অভ্যাসের দাস। তুমি যখন চাকরী অর্থাৎ দাসত্ব কর তখন তোমায় মানুষ বলে গণ্য না করার ত কোন কারণই থাকতে পারে না।

ন্যায়শাস্ত্র-অনুমোদিত যুক্তি পরম্পরায় মতি যখন আমাকে নিয়ে ইয়ো ইয়ো খেলছে সেই সময় একটা ট্রাম এসে হাজির। আমায় বলল, উঠে পড়। বলে নিজেও উঠল। দুজনেই ট্রামে উঠলাম। খুব ভিড়; সবে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছে। চটকরে কেউ শৃঙ্খলা মানছে না। পরাধীনতার শৃঙ্খল কথাটা বহু বক্তৃতায় শুনে এবং কাগজে পড়ে লোকের একটা ধারণা হল—আর শৃঙ্খলা-ট স্কলা নয়—স্বাধীনতাটা এবার তারিয়ে তারিয়ে চাখা যাক। ফলে ট্রামের মধ্যে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। মতির স্বভাব হল ট্রামে উঠে ভিড় কাটিয়ে নিজে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। তার সাহচর্যে আমাদেরও সে অভ্যাস করতে হয়। ও বলে ট্রামে এগিয়ে যাওয়ায় মানুষের কোন বিপদ নেই, কেন না তা মরণের মুখে এগিয়ে যাওয়া নয়—তবু আমাদের নাগরিকতা নিয়ে কোনক্রমে ট্রামে-বাসে চড়তে পারলে সুবিধে মত অন্যের কথা ভুলতে চেষ্টা করেন। ওর মতে ড্রাইভারের পিঠোপিঠি না দাঁড়ালে যারা দু এক গজ জায়গা খালি থাকলেও এগোল না তাঁরা প্রবঞ্চক। ড্রাইভারের পিঠের কাছে কাঁচে লিলি বার্লি কিংবা সাধনা দর্শন বা ও জাতীয় কোন বিজ্ঞাপন থাকে। মতি সম্মুখস্থ যাত্রীদের অনুরোধ করে—মশাইরা লিলি বার্লি পর্যন্ত (যা যা থাকে) এগিয়ে যান। আমরা যে ট্রামটায় উঠলাম তাতেও একই অবস্থা। ঝুলন্ত পর্যায় থেকে প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়াতে পাবার পর যথারীতি সামনের দিকে গজখানেক জায়গা খালি থাকায় মূঢ়মতি বললে—সামনে মশাইরা কোলে বিস্কুট পর্যন্ত এগিয়ে যান। যিনি আর একপা এগোলে পিছনের সকলেই হাতখানেক এগোতে পারেন তিনি ছাড়া আর সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে—বক্তৃতা বা গান শোনার জন্য যেমন লোকে একটু নড়ে চড়ে বসে তেমনি নড়ে চড়ে—দাঁড়িয়ে রইলেন। এগোলেন না। মূঢ়মতি ছাড়বার পাত্র নয়। স্পষ্টগলায় বললে—ও মশারীজামা দাদা, ড্রাইভারের পিঠের কাছে, বা কোলে বিস্কুট পর্যন্ত না এগোলে বাইরে দুইজন হাত ফসকে পড়ে যাবেন। মতি সহযাত্রীদের এইভাবে কোলে-পিঠে করে নাগরিকত্বের উন্মেষ ঘটাচ্ছে, সে সময় আর এক দৃশ্য আধ-মিনিটের মধ্যে অভিনীত হল।

একটু ঝটকা—একটু কথা কাটাকাটি—এক ভদ্রলোক দু একজনের পা মাড়িয়ে মহিলাদের আসনের মাঝে জায়গাটি নিয়ে উপরে পাখার দিকে তাকালেন এবং বিরক্ত মুখে, হুঁ ট্যাক্সিতে যান,—আপনি যান মশাই, যদি একটু ভাপ সইতে না পারেন—বলে দম ছাড়লেন। যাকে বললেন তিনি উত্তর দেন, আমি ত কারো পা মাড়িয়ে পাখার নিচে জায়গা খুঁজিনি, আপনি ট্যাক্সিতে যান। মূঢ়মতি বললে, আ আপনারা সামান্য ব্যাপারে বড় একঘেয়েমি করেন—ট্যাক্সিতে ত আর লেডিজ সীট নেই! অথচ মূঢ়মতির পা মাড়িয়ে দিলে অন্য লোককে সে যা করে দেখেছি। কেউ হয়ত ওর পায়ের উপর নিজের পা (জুতো শুদ্ধই অবশ্য—পা মাড়িয়ে দেব বলে জুতো আর কে খোলে) রেখেছে—মতি তখন যে ভদ্রলোকের ভুঁড়িতে সেতারে ঝাজনা-বাজানর মত চার আঙুলে সুড়সুড়ি

দেবে। ভদ্রলোক হয়ত বিস্মিত হন, পকেটমার নাকি মশাই। মতি খুব সন্তর্পণে তাঁদের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলবে, আজ্ঞে না, আপনার পায়ের তলায় নরম নরম পাঁউরুটির মত যেটা ঠেকছে ওটা আসলে আমার পা। তিনি উক্ত ভদ্রলোকের হাঁ, না, মানে, ইয়ে, কি যে বলেন, ব্যাপারটা আসলে হল কি, ইত্যাদি লেজে-গোবরে অবস্থার দিকে দৃকপাত মাত্র না করে মতি বলে—লজ্জার কিছু নেই ; শুধু দয়া করে মনে রাখবেন আপনার পা, যারা মাড়িয়ে দেন—তাঁদেরও শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ অনিচ্ছাকৃত।

মতির মাথা ঠাণ্ডা এবং সব অবস্থাতেই পরিবেশটা যাচাই করে নিতে পারে—ফলে ওকে আমরা বিশেষ রাগতে কখন দেখিনি, ঝগড়া ত কখনই করতে দেখিনি। কথার ওজন সাধারণত অকাট্য যুক্তিতে মাপা। মোটেই রাগ হয় নি, কিন্তু খুব রেগে যাওয়ার মত তেড়ে উঠল হয়ত সেটা ভাণ ; আবার সত্যি যখন রাগে মুখ দেখে বা ভাষা শুনে বা কণ্ঠস্বরে কি অভিব্যক্তিতে বোঝার উপায় নেই। কথা বলার জন্য সে কখন মুখ খোলে না কিছু বলবার থাকলেই খোলে। অন্যের কথা শুনতে পারে বেশ নিবিষ্ট মনে। যা করে বা বলে, এত দৃঢ়ভাবে—যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাকে উপেক্ষা করা কঠিন। না হলে কলকাতা সহরে ট্যাক্সিওলাদের একবার টিট করেছে। গতি কমিয়েছে কি ট্যাক্সিওলা মরেছে। কোথায় যাবেন, একথার ও উত্তর দেবে ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে বসে, সঙ্গে কেউ থাকলে তারা বসে দরজা বন্ধ করে, তারপর। 'ট্যাক্সি' বলে ডাকলে যারা হুস করে হাত নাড়িয়ে চলে গেল, তাদের নম্বরটি নিয়ে লালবাজারে ট্রাফিক কমিশনারকে জানালো। আর গতি কমিয়ে কোথায় যাবেন এ জিজ্ঞাসার উত্তরে অমনোমত গন্তব্য হলে মূঢ়মতিকে সোয়ারী না করার সুযোগ ট্যাক্সিওলা পাবে না। চড়ে বসে দরজা বন্ধ করে বলে, আপনাকে ত বলতেই হবে—নইলে আমাকে সেখানে পৌঁছে দেবেন কি করে ; আপাতত যতক্ষণ কোন দিকে বেঁকতে না বলি—সোজা চালান দেখি। তারপর প্রয়োজন মত ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে সময় থাকলে অনেকসময় লালবাজার গিয়ে হাজির হয়েছে নয়ত গন্তব্যস্থলে। নামবার আগে বলেছে—আপনাদের এইটে জীবিকা, যাত্রীদের এটা প্রয়োজন ; কখনও কখনও ষ্টেশন কি হাসপাতালে যাবার জন্যও ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে ; কিসের জন্য খদ্দেরদের সঙ্গে আপনারা এমন করেন, অন্য সব ব্যবসায়ে খদ্দেরকে লক্ষ্মী বলে। চালক বাঙালী হলে বলে, পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের সঙ্গে আপনার অন্তত ভদ্রতার পার্থক্যটুকুও রাখুন।

যাঁরা মূঢ়মতিকে চেনেন তাঁদের কাছে এসব কথা বা ঘটনা ভাতজল। তাঁরা যদি এ লেখা পড়েন হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠবেন একটা অক্ষম এবং দুর্বল প্রয়াস লক্ষ্য ক'রে। সেই কারণেই আশঙ্কা হচ্ছে যাঁরা তাকে চেনেন না, কত অসম্পূর্ণ ছবি তাঁরা পাচ্ছেন। অসম্পূর্ণ মানে নেগেটিভ-টাও পাচ্ছেন না, প্রিন্ট-এর অসম্পূর্ণতা তবু ক্ষমার্হ। মূঢ়মতি যদি আকবর হত, তা হলে গোটা কতক যুদ্ধ হয়, রাজ্যশাসন, গুণীপালন গোছের তালিকা দিয়ে দিলেই পরীক্ষায় সত্তর আশি নম্বর পাওয়ার মত চরিত্র রচনা করা যেত। কিন্তু সে একজন অসাধারণ সাধারণ ব্যক্তি; সাধারণ পরিবেশে (ওর মতে) সাধারণ কথা বলে বা কাজ করে। আমাদের তাকে প্রতি সময়েই নতুন মনে হয়। অপঠিত একখানি সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থ কি গতমাসে প্রকাশিত গ্রন্থ—দুটিই প্রথমবার পড়ার সময় একই রকম নূতন। পড়া হয়ে গেলে দুটিই সমান পুরাতন। মূঢ়মতি প্রথম দিন ও যা, দশমিনিট আগে যখন এসেছিল তখন তা। প্রতিবারই নূতন।

যে সময়টা নয়া পয়সা নিয়ে রেলে ট্রামে বাসে বাজারে ঝগড়া হত, সেই সময় একদিন পাকপাড়ার একটি আড্ডায় চেতলা থেকে একজন আসেন তিনি ঐ ঝগড়ার বিষয় উল্লেখ করে বলছেন—নতুন পয়সার এক পয়সা দু পয়সা গুলো এমন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে যে ব্যবহার করতে হরদম পড়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তাতে লোকে কিছু নয় একটা নয়া পয়সা নিয়ে হুলুস্থুল বাধাচ্ছে পথে ঘাটে। যেন চালাকীর প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। মতি সে সময় রবিবারের কাগজে যে ব্রিজ-খেলার সমস্যা দেওয়া থাকে সে জায়গাটায় চোখ বোলাচ্ছে। অন্যরা, নয়া পয়সা নিয়ে কি ঝামেলায় পড়েছিলেন কিংবা কোন ট্রাম কণ্ডাক্টারকে একটি পয়সার জন্য কান কামড়ে রক্তারক্তি হতে দেখেছেন, কিংবা ভিক্ষুকরাও এক নয়া পয়সার ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করছে—ইত্যাদি নানা নয়া-পয়সা বিষয়ক আলাপ করতে করতে প্রায়—একটা নয়া পয়সার কোন দামই নেই, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন এমন সময় মূঢ়মতি মুখ খুললে।

মতি উবাচ : গত পুজার আগে বাংলা দেশে ঠিক যখন গ্রামবাসীরা মনে করছে অনেকদিন বাদে এ বছর আবাদ ভাল হয়েছে, সোনা ফলবে, তখন বন্যা এল। হাওড়া হুগলী নদীয়া বর্ধমান ইত্যাদি জেলার গ্রামগুলো সবুজ ধানগাছ সমেত বানের এবং অতিবৃষ্টির জলের তলায় চলে গেল। রাতারাতি পটভূমি বদলে গেল, সরকারী এবং বেসরকারী ত্রাণকার্য সমস্ত গ্রামে তাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বন্যার সময় মাছ ধরার সুবিধে হবে মনে করে আমি হওড়ার এক গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী চলে গেলাম গত পুজায়। তাদের কপাল ভাল ছিপ আছে, বাড়ীও পাকা ; অবস্থা ভাল, চারদিক জলে থৈ থৈ করছে, বহুকষ্টে সেখানে পৌঁছান গেল। মাছ ধরার সুবিধে হবে বলে তাদের বাড়ী বন্যার সময় গেলেও তারা আমার সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারলে না। খাতির করলে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি—তখনও ভাল করে আটটা বাজেনি, বাহিরে বাড়ীর উঠোনে অনেক লোক ভিড় করেছে। কি ব্যাপার ? না—সরকারী রিলিফ দেওয়া হবে এ গাঁয়ে, আজই হবে এবং এই বাড়ীটা জলে ডোবেনি, অধিকন্তু লোক সঙ্কুলান হবে—তাই এখান থেকেই সরকারী কর্মচারীরা রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ভাবলাম আর মাছ ধরতে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ী বসে কিছু রগড় দেখা যাক। যারা বন্যায় বিধ্বস্ত তাদের লিষ্ট হয়েছে—বাড়ীতে যে কজন লোক সেই অনুসারে গম দেওয়া হবে এবং সেই গম-ভাঙানো বাবদ পয়সা নগদ দেওয়া হবে। গমটা অবশ্য এখান থেকে নয়, দোকান থেকে তারা পাবে কুপন দেখালে। সেই কুপন ও পয়সা সরকারী

কর্মচারীরা এখান থেকে দেবেন। লোকদের নাম ডাকা হলে তারা লাইন করে দাঁড়িয়ে একে একে কুপন ও পয়সা নিয়ে যেতে লাগল। যে কর্মচারীটা দলপতি বলে মনে হল, সে নিজে হাতে টিপে টিপে পয়সা গুণে দিচ্ছে - আর যাকে দিচ্ছে তার নামের পাশে টিপসহি নিচ্ছে। সরকারী পয়সার পাছে এদিক ওদিক হয় বলে লোকটা দেখলাম—শকুনির মত আগলে রয়েছে। কথা বিশেষ বলছে না। কাউকে হয় ত বাপের নাম বা বাড়ীতে কজন আছে এমনি দু একটা প্রশ্ন করে—লিষ্টের লোক ঠিক পাচ্ছে কি না বাজিয়ে নিচ্ছে। যার আটচল্লিশ নয়া পয়সা হয়েছে, তাকে হয়ত বলছে, দুটো নয়া পয়সা ফেরত দিতে পারেন। পারলে তাকে একটা আধুলি দিচ্ছে, না পারলে আটচল্লিশ নয়া পয়সাই গুণে দিচ্ছে। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক দেওয়া চলেছে একজন লোক এল; খালি গা, ধুতিখানা যে শুধু শতচ্ছিন্ন তাই নয়, চামচিকুটি ময়লা। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে কর্মচারীটা বললে, আটানব্বুই নয়া পয়সা হচ্ছে—আপনার কাছে দুটো নয়া পয়সা হবে, তাহলে একটা টাকা দিই। লোকটি বললে দাঁড়ান মশায় দেখি। বলে ট্যাঁক খুঁজলে, কোঁচার খুঁট খুঁজলে, পেলে না। অবশেষে কাছার খুঁটে কি যেন একটা বাঁধা আছে দেখে খুললে—খুলে মাথা নাড়লে—না গো বাবু দুটো প"সা নেই একটা নয়া পয়সা আছে, হবে? কর্মচারীটা তার দিকে আর এক ঝলক দেখে আটানব্বুই নয়া পয়সা তাকে গুণে দিয়ে এবং যে পরিমাণ গম তার পরিবার পাবে তার কুপন কেটে দিলে। আপনারা গুঁড়ো গুঁড়ো নয়া পয়সাগুলো কোথায় যে হিসেবে হারিয়ে যায়—না কি বলছিলেন না, তাই ঘটনাটা মনে পড়ল। কৈ হে চল, তোমাদের পাড়ায় আজ নাকি দুপুরে ব্রিজের আসর বসবে। তোমাদের বাড়ী চারটি খেয়ে ওখানে যাব—বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসেই ওকে বললাম—গেল বন্যায় তুমি ও ভলাণ্টিয়ারী করতে গেছিলে, ওখানে মাছ ধরার গল্পটা বললে কেন। সে কথাটা এড়িয়ে গিয়ে ও বলল, আমায় যে গল্প লিখতে বল, ঘটনাগুলো যে গল্পের মত শেষ হয়। কাছার খুঁট থেকে লোকটার যদি গোটাকতক নোট বেরোত, তবে একটা গল্প ঐ ঘটনাটা নিয়ে লেখা যেত। তা নয়, যে গুঁড়ো পয়সা বাবুদের হাত থেকে ব্যাগ থেকে হরদম পড়ে হারিয়ে যায় ব্যাটা তার দুটোও এক সঙ্গে বার করতে পারলে না। আরে ছোঃ একটা নয়া পয়সা আবার অত যত্নে কাছার খুঁটে বেঁধে রাখার জিনিষ নাকি! ট্যাঁক, এখুঁট ওখুঁট খুঁজতে খুঁজতে ভদ্রলোকেদের পাঁচমিনিট সময়ই নষ্ট করে দিলে লোকটা।

স্বীকার করা ভাল যে খুব তলিয়ে সব কথা বোঝার মত বুদ্ধি সকলের যে থাকে না তা আমার নিজেকে দিয়েই জানা আছে। তাকে বহুদিন আমাদের ব্রিজের নতুন একটা আড্ডায় নিয়ে যেতে চেয়েছি ও যায় নি। অতএব আজ স্বয়ং যেতে চাওয়ায় আমি খুব খুসী হলাম।

আগেই বলেছি মূঢ়মতির কথা—যে কোন ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ করা কিংবা যে কোন ঘটনান্তে শেষ করা যায়। এবারের মত এখানে শেষ হল। মূঢ়মতি সম্পর্কে 'বিশেষ একজন' পর্যায়ের রচনা পাঠকরা যদি পড়তে ইচ্ছুক থাকেন ভারতবর্ষ সম্পাদককে পত্রযোগে জানাবেন। আমার অবশ্য আশা—মূঢ়মতির সঙ্গে পরিচিত যোগ্যতর কোন যথার্থ লেখক এই পর্যায়ের রচনা লিখলে পাঠকবৃন্দ সত্যই প্রীত হবেন—তেমন কেউ ওর কথা তেমন করে লিখুন॥

গোধূলি-বেলায়

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

আকাশ যখন সাগর-পারে সিঁদুর ছড়ায় নীলজলে
সেই গোধূলির অস্তরাগে দোয়েল ডাকে কোন্ ছলে?
ধূলি-ধূসর পথের বাঁকে
উজান-নদী বইতে থাকে
দখিন-হাওয়া দোল দিয়ে যায় কৃষ্ণ-ঘন কুন্তলে
অঝোর-ধারে বেদন ঝরে উদাস-চোখের কজ্জলে।

স্বপন-মায়া জড়িয়ে থাকে সবুজ-বনের কন্দরে
কিশলয়ের কচি বুকে পারিজাতের গন্ধ রে!
তরুর বুকে ঘুমায় লতা
পাগলা-অলি কয়না কথা
লাজুক তারা ঝিলিক্ মারে, শঙ্খ বাজে অন্দরে—
আলোর মালা উঠলো জ্বলে জাহাজে আর বন্দরে।

সারি দিয়ে সারসগুলি কোন্ সুদূরে যায় ভেসে
ছুটির পরে হল্লা ক'রে যায় ছেলেরা উল্লাসে।
ঘাসের বুকে মুক্তা ঝরে
সান্ধ্য-প্রসাধনের তরে
ধানের শীষের নৃত্যে বাতাস পাগল বুঝি হয় শেষে!
জোনাকিদের যাত্রা সুরু অন্ধকারের কোন্ দেশে?

ভাটিয়ালির সুরের টানে সবাই হোল উন্মনা
ঝিঙাফুলের হলদে-নিশান করছে কারে বন্দনা?
নোতুন-বধূ কলসী কাঁখে
থমকে দাঁড়ায় পথের বাঁকে
বুকে তাহার কত বেদন কেউ তো তাহা জানলো না
সমাজ আছে—শাসন আছে, নাই তো সোহাগ-সান্ত্বনা।

গল্প

অদ্ভুত

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

নবীনের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম সকাল বেলায়। যেমন রোজ খেয়ে থাকি। বাড়ীর মত কোন হাঙ্গামা নেই। ওঃ হরি! চা যে ফুরিয়ে গিয়েছে। যা যা শীগ্‌গির নিয়ে আয়। নয় ত, চিনি কম পড়েছে। নয়তো বা দুধ এসে পৌছায় নি। কিংবা আঁচ ধরেনি।

কোন হাঙ্গামা নেই। এসে বসলাম। নবীন এভার-রেডি। সব বাঁধা খদ্দের। নিজের হাতেই সব করে। মায় পেয়ালা ধোয়া পর্য্যন্ত। আমরাও সাহায্য করে থাকি।

সেদিন একটা লাল রংয়ের কুকুর এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াল। সবাই—কুকুরের ভাগ্যে যেমন ঘটে—যা যা করে উঠল। কিন্তু সে তাতে বিচলিত না হয়ে থাবাগুলি গুটিয়ে স্থির হয়ে বস্‌ল।

আমি বললাম—ওহে কৃষ্ণের জীব, তাড়িও না। বলে আমার প্লেট থেকে একখানা বিস্কুট নিয়ে ওকে দিলাম। ও নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে নিল। কোন ব্যস্ততা দেখাল না। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকালে। ভাবটা—বিস্কুট তো খাওয়ালেন, চা কই?

একটা মাটীর পাত্র নিয়ে নিজেয় পেয়ালা থেকে চা ঢেলে ওকে দিলাম। একটু জুড়িয়ে নিয়ে চা-টুকু খেয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

আমার মনে পড়ল মাসীমার বাড়ীর সেই কুকুরটির কথা।

একজন বললে—তোমার কুকুরের প্রতি এত প্রীতি তো কখনও দেখিনি।

বললাম—কারণ আছে হে। কিছুকাল আগে কুকুরের এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার দেখেছি যা কখনও ভুলব না।

কুতূহলী হয়ে সবাই জিজ্ঞাসা করলে—কি বল?

বলতে লাগলাম: সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এমন যে হয় বা হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না বা যায় না।

মাসীমার ছেলে নন্তু। রামকৃষ্ণপুর বাড়ী। যুবক। স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট। জুতোর ঘ্যাঁস লেগে লেগে কি রকম একটা ঘা হ'ল। সে ঘা আর সারে না! ক্রমশঃ ঘা উপরের দিকে এগুতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গও দেখা দিল।

মাসীমার অবস্থা ভালই ছিল। ডাক্তারের পর ডাক্তার দেখানো হল। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। শেষে ডাক্তারদের পরামর্শে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো হ'ল। কিছুদিন চিকিৎসা চলল। অন্যান্য উপসর্গ দূর হ'ল। কিন্তু ঘা আর কমতে চায় না। তখন হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ বললেন—এখানে রেখে আর কোন ফল নেই। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এই ভাবেরই চিকিৎসা চালান। যদি কমে দেখুন।

তাই করা হল। বাড়ীতে আনা হল। নার্স রাখা হ'ল। যথানিয়মে চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু ঘা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। শেষে এমন হ'ল সমগ্র ভাল পা-টা ঘায়ে ভরে গেল। দগদগে ঘা। দেখলে ভয় হয়, ঘৃণাও যে হয় না তা নয়। শেষে তাতে দুর্গন্ধও হল। কাছে যারা থাকত তাদের বেশ একটু কষ্ট হত।

আবার নূতন করে চিকিৎসা হ'ল, খানিকটা কমল। কিন্তু তারপর আর কমে না। শেষে ডাক্তারদের মত হ'ল ওষুধে এর বেশী ফল আর হবে না। পুরী নিয়ে যাও, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় হয়ত আরও কিছু কমতে পারে।

তাই করা হ'ল। সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী ভাড়া করা হ'ল। ২।১ জন ভৃত্য ও দাসী সঙ্গে নন্তকে নিয়ে মাসীমা পুরী এলেন। আমিও সঙ্গে এলাম।

পুরীর সেই বাড়ীর আশে-পাশে বড়ই কুকুরের আড্ডা

ছিল। দশ বারোটা কুকুর সেখানে থাকতই। আগে এই বাড়ীটা কিছুদিন খালি ছিল। সামনের বারান্দায় তাই অনেক কুকুর জমা হত। আমরা আসাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। তারা আগের মত মাঝে মাঝে বাড়ীর ভিতর আসতে চাইত; কেউ কেউ এসেও পড়ত। এক-দিন দুটো কুকুর উপরেই চলে এল। তখন আমাদের সতর্ক হতে হ'ল। কি জানি কখন কিসে মুখ দেয়। হঠাৎ কাউকে কামড়ানো বিচিত্র নয়। তখন চাকরদের হুকুম দেওয়া হল—ওরা অমনি তো যাবে না। মেরে তাড়াও।

২।৪ দিন মারধোর করতেই কুকুরের দল স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হল। তারা এক-এক করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে গেল। একটা কুকুর কেবল মার খেয়েও মাঝে মাঝে আসত। কাকে যেন খুঁজত। লোকজনের সাড়া পেলে নিঃশব্দে সরে যেত।

২

কিছুদিন থাকার পর দেখা গেল ঘায়ের অবস্থা একটু ভাল। ডাক্তারের নির্দিষ্ট ঔষধের গুণেই হোক, সমুদ্রের স্বাস্থ্যপ্রদ বাতাসের জন্যই হোক্ একটু উপশম হতে লাগল। তখন নন্তকে একটা রিক্সায় রোজ একটিবার করে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া হ'ত। সেখানে সে চুপ করে খানিক-ক্ষণ বসে থাকত। সমুদ্রের মুক্ত বাতাসে সে একটু সুস্থ বোধ করত। একদিন দেখা গেল যে কুকুরটি তাড়া খেয়েও রোজ একটিবার করে আসত, সেও সমুদ্রের ধারে আসত এবং যুবকটির কাছ থেকে একটু দূরে বসে থাকত। ঘণ্টা দুয়েক পরে নন্তকে আবার ফিরিয়ে আনা হ'ত। কুকুরটি স্বল্প দূরে পিছন পিছন এসে তাদের যেন বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেত।

ক্রমশ নন্ত বিনা সঙ্গীতেই সমুদ্রের ধারে গিয়ে একা বসত। কেবল কুকুরটি তার সঙ্গ ছাড়ত না। সেও তার পিছু পিছু গিয়ে একটু দূরে বসে থাকত। যখন দেখত কাছাকাছি কেউ নেই, তখন কুকুরটি এগিয়ে এসে নন্তর কাছে বসত এবং তার পায়ের সেই ক্ষতস্থান ধীরে ধীরে চাটতে থাকত। যুবকটি তাতে বেশ আরাম পেত। মাঝে মাঝে আরামে সমুদ্রের ধারে ঘুমিয়ে পড়ত। কুকুরটিও প্রহরীর মত তাকে আগলে থাকত এবং মাঝে মাঝে তার ক্ষতস্থান চেটে দিত। ঘুম ভাঙ্গলে কুকুরটিই তাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিত। কেউ না থাকলে যুবকের শোবার ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত যেত।

ক্রমশঃ সবাই এ কথা জানতে পারল। জানতে পারল আরও এই জন্য যে কুকুরের চাটার পর থেকে নন্তর ক্ষত স্থানের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কুকুরটির তখন বাড়ীর মধ্যেও অবাধগতি হয়ে উঠল। কিন্তু সে নন্তর কাছ ছাড়া কোথাও যেত না। ঘরের মধ্যে এসে কুকুরটি নন্তর ঘা চেটে দিত।

এইভাবে কুকুরের সঙ্গ ও সান্নিধ্য বাড়ীর সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেল। তখন কুকুরটা নন্তর প্রায় সর্ব-সময়ের সঙ্গী হল।

এমনি করে মাস ৩।৪ কেটে গেল। একে একে সবাই বাড়ী ফেরবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘায়ের তখন খুব উপকার হয়েছে—কতকটায় চামড়া দেখা দিয়েছে। বাকি অংশ সারবার মুখে এসেছে। তখন দেশে ফেরবার দিন স্থির করা হ'ল।

কুকুরটির কথা অনেকেরই মনে হল। কেউ কেউ বললে—ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেও তো হয়।

কেউ বললে—তা কি আর হয়? পুরী থেকে কলকাতা কুকুর নিয়ে যাবে, তাও আবার একটা দিশি কুকুর।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল কুকুরকে আর নিয়ে যাবার দরকার নেই। ওর যা করবার তা ও করে দিয়েছে। আর হাঙ্গামা বাড়িয়ে কি হবে?

রতন বলে যে মেয়েটি প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথের পোষ্ট-মাষ্টারকে সেবা করে এসেছিল সেই পোষ্টমাষ্টারের চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির মনে কি দারুণ আঘাত লেগেছিল রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন পাঠকের তা অজানা নয়। সেদিন অনুকূল বাতাস পেয়ে পোষ্টমাষ্টারের নৌকা যেমন ক্ষিপ্র-বেগে আগিয়ে গিয়েছিল এবং তাতে যেমন নদীর জলে ও আরোহীর মনে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ঢেউ উঠলেও মেয়েটির ভাগ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি, সে সেই নদী তীরে পরিত্যক্তাই হয়ে গিয়েছিল—তেমনি এই লালচে রংয়ের অত্যন্ত-সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত-উপকারী কুকুরের ভাগ্যেও কোন পরিবর্তন

আসেনি এবং এতে বিস্ময়ের এতটুকুও কারণ নেই। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে এ রকমের উদাহরণ পেতে বিলম্ব হবে না।

শেষে একদিন জিনিস-পত্র গোছানো সুরু হয়ে গেল। গাড়ীর "সিট" পর্য্যন্ত "রিজার্ভ" করা হল। টিকিট কাটা হয়ে রইল।

এবার এল বিদায়ের পালা।

৩

ষ্টেশনে এসে সবাই যথাস্থানে বসল। জিনিস-পত্তর ঠিক ঠিক রাখা হল। হঠাৎ দেখা গেল সেই কুকুরটা প্ল্যাটফরমে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। একবার এসে ছেলেটি যে কামরায় ছিল তার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ালো এবং উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাকে একবার চেয়ে দেখল। একবার মনে হল—এবার বুঝি লাফ দিয়ে কামরায় উঠে পড়বে। কিন্তু তা উঠল না। কি যেন মনে মনে ভেবে নিলে, তারপরে ধীরে ধীরে গাড়ীর শেষের দিকে চলে গেল। খানিকক্ষণ কাটল। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। মনে হল এবার বুঝি কুকুরটা ছুটে এসে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিন্তু এল না। গাড়ী ছেড়ে দিল।

ক্রমে গাড়ী খড়্গপুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। অনেক লোক ওঠা-নামা করল। অকস্মাৎ দেখা গেল পিছনের গার্ডের গাড়ীর দিক থেকে সেই কুকুরটা এসে আবার আমাদের কামরার সামনে দাঁড়াল। একবার দেখে নিল আমরা সব ঠিক আছি কিনা। নন্তর পানে স্থির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আবার যেদিক থেকে এসেছিল ধীরে ধীরে সেই দিকে চলে গেল।

সবাই আমরা বেশ একটু বিস্ময় বোধ করলাম। কি করে এল এই পর্য্যন্ত! হয় তো কোন কামরার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকবে, নয় তো গার্ডের গাড়ীতে, নয়ত বা পাদানীগোছের কিছুতে চড়ে এসে থাকবে। যাই হোক্, এসেছে যে তাতে সন্দেহ নেই। মোট কথা কুকুরটার বুদ্ধি আছে, মনের জোরও আছে। কুকুরের পক্ষে বিনা টিকিটে আসাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এই চড়ে আসাটাই কঠিন। পৃথিবীতে কত কি ঘটে, কি করে ঘটে, কেন ঘটে—কেই বা জানে!

বেলা ৮টা আন্দাজ গাড়ী হাওড়া পৌছুলো। প্ল্যাটফরম বেয়ে জনস্রোত চলতে লাগল। আমরা একটু দেরী করে কামরা থেকে নামলাম। নন্তকে নামিয়ে নিলাম। একটু পরেই দেখলাম কুকুরটি পিছনের দিক থেকে ভিড়ের মধ্যে থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো। তারপর মুখটা উঁচু করে, নেজটা ঈষৎ নাড়িয়ে নন্তকে সম্বর্দ্ধনা করল।

এখন কুকুরটিকে নিয়ে কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে সেই দিক থেকে গার্ড এসে সেখানে দাঁড়ালেন। গার্ড বাঙ্গালী। জিজ্ঞাসা করলেন—"কুকুরটি কার মশায়?"

আমি সংক্ষেপে তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন—আশ্চর্য্য মশাই! কুকুরটা বেশীর ভাগ পথ আমার গাড়ীর পিছনের লোহার অংশটা আঁকড়ে ধরে এসেছে। শুধু তাই নয়। গাড়ী বড় বড় ষ্টেশনে থামতে স্বচ্ছন্দে নেমে এসে আপনাদের লক্ষ্য করে এসেছে। আবার গাড়ী ছাড়বার ঠিক আগে এসে নিজের স্থানটুক অধিকার করেছে। আপনার মুখে যা শুনলাম এবং এই ছেলেটিকে দেখে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় ওর বোধহয় আরও একটু দরকার আছে, তাই ভগবান ওকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওকে আর ফেলে যাবার চেষ্টা করবেন না। সঙ্গে নিয়ে জান। তবে প্ল্যাটফরম্ থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার একটু বিপদ আছে। চলুন আমি পার করে দিচ্ছি!

বলে গার্ড সাহেব এগিয়ে এগিয়ে চললেন। আমরাও সকুকুর ওঁর অনুসরণ করলাম।

গার্ড সাহেব টিকিট কালেক্টারের কাছে গিয়ে বললেন —ওহে ওই লালরংয়ের জামা গায় ভদ্রলোককে কিছু বলো না। ওটি আমার সঙ্গে এসেছে। ওর টিকিট আমার কাছে আছে।

বলে, সেখানে একপাশে দাঁড়ালেন। আমরা ধীরে ধীরে কুকুরটিকে নিয়ে গেট পার হয়ে এলাম।

তারপর একখানা ট্যাক্সি করে রামকৃষ্ণপুর এলাম। এবার অবশ্য কুকুরটিকে উঠিয়ে নিলাম। সেও এর জন্য প্রস্তুত ছিল। যেন জানত—এবার আর কোন বাধা ঘটবে না।

এবার বাড়ী পৌছানো গেল।

"বাড়ী এসে কুকুরটি কি করলে?" একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

কি করল? নিজের কাজ—প্র্যাকটিস্। বাড়ী ফিরে আর কোন ওষুধ-বিষুধ নয়, শুধু ওই কুকুরটিরই চিকিৎসা চলেছিল। নিয়ম করে কুকুরটি নস্তুর অবশিষ্ট ঘাটুকু চেটে দিত। ক্রমে ঘা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কুকুরটির তখন সমাদর দেখে কে।

নস্তুর পাশে দাঁড় করিয়ে তার একটা ফটো নিয়ে নেওয়া হল। সসম্মানে তার একটা বৃত্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল।

"বৃত্তি?"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বৃত্তি বই কি। কাজ করবে না, নিয়ম মত কিছু পাবে—এই হল বৃত্তি।

"এখনও সে বেঁচে আছে?"

"না। পুরী থেকে এসে ৩।৪ বছর বেঁচে ছিল। এই বছরখানেক হল সে স্বর্গলাভ করেছে। সবাই আমরা এক সঙ্গে তাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে আসি।"

"মুখাগ্নি বোধ হয় ছেলেটিই করেছিল?"

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

রোগ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কাম্য বটে স্বাস্থ্য এবং আয়ু ও আরোগ্য
কিন্তু মাঝে মাঝে তবু ভালই আসা রোগ গো।
জানায় ধরা পান্থশালা,
আছে ফিরে যাবার পালা;
ব্যাকুল প্রাণে ভগবানে ডাকার করে যোগ্য।

২

দেয় ভাঙিয়া অভাঙা তেজ অহঙ্কার ও গর্ব্ব—
অতি বড় দর্পী—সেও সহসা হয় খর্ব্ব।
এক দিনেতেই করে সে দীন,
অসহায় আর শক্তিবিহীন,
সোনার ইন্দ্রপ্রস্থে আনে হঠাৎ বনপর্ব্ব।

৩

সেই তো জানায় মহাসিন্ধুর অপর পারের বার্ত্তা
জানিয়ে দেয় এ দেহটার নওকো তুমি কর্ত্তা।
পাট্টা তোমায় দিলে যে রে
কেড়ে নেবে গাঁট্টা মেরে
চরম পরম সুহৃদ তো সেই শরণ এবং ভর্ত্তা।

৪

নূতন করে জানিয়ে দেয় স্নেহ প্রেমের মূল্য
গরিব যে সব আপন জনের আত্মীয়তা ভুললো
কয় দীনতার কি মহিমা।
গৌরবের শেষ কোথায় সীমা,
শক্তিমান এক শ্রীভগবান—কে আছে তাঁর তুল্য?

৫

অবিবেকী বিবেক লভে—প্রচণ্ড হয় শান্ত—
চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখায় কি করেছে ভ্রান্ত।
নভস্পর্শী অভিমানে—
সেই তো ধরার ধুলায় টানে,
বহু পাপের পন্থা থেকে পায়ে করে ক্ষান্ত।

৬

শত্রু এবং মিত্র সবল অবাক তাহার কাণ্ড—
দয়াল সে দেয় বর ও অভয়, ভয়াল সে দেয় দণ্ড।
পুণ্য এবং পাপ ও স্মরায়
তপ ও প্রায়শ্চিত্ত করায়,
এক হাতে তার গরল এবং অন্যে সুধা-ভাণ্ড।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

রাতের নমাজের সময় আমরা জাকানন্দী পার হয়ে তাঁবু গাড়লাম। ভোর হওয়ার আগে আমার সেনারা আরামে ঘুমোচ্ছে। কামবার আলি সেই সময় ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে চীৎকার করছে—'দুষমণরা এসে পড়েছে, ওঠ, ওঠ।' কিন্তু সে এই কথা বলার পর এক মুহূর্ত্তও না থেমে পালিয়ে গেল। আমার কোর্ত্তা গায়ে দিয়ে শোয়া বরাবরই অভ্যাস—। তাড়াতাড়ি তরবারি ও তীরপূর্ণ তুনীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। আমার পতাকাবাহী সৈনিক ঘোড়ার লেজের সঙ্গে পতাকাদণ্ড বাঁধবার সময় না পেয়ে সেটা হাতে নিয়েই ঘোড়ায় চাপ্‌লো। শত্রু যে দিক দিয়ে আসছে আমরা সেই দিকেই ধাওয়া করলাম। যখন আমি ঘোড়ায় উঠি তখন আমার সঙ্গে মাত্র দশপনরো জন সৈনিক ছিল। কিছুদূর এগিয়েই আমরা শত্রু-সৈন্যের দেখা পেলাম। আমরা তীর নিক্ষেপ করতে করতে অগ্রগামী শত্রু-সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলাম। তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে শত্রুর প্রধান সৈন্যদলের সামনে এসে পড়লাম। শ'খানেক সৈন্য নিয়ে সুলতান আমেদ তামবল অপেক্ষা করছিল। তামবল চীৎকার করে তার সামনের সৈন্যদের বল্‌ছে—মার্, মার্ ওদের। কিন্তু তার লোকদের তখন দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ভাব্‌ছে—পালাবো নাকি? চল্ পালিয়েই যাই। কিন্তু তারা দাঁড়িয়েই ছিল। এই সময় দেখলাম—আমার সঙ্গে মাত্র তিন জন সৈনিক। যে তীরটা আমার ধনুকে লাগানো ছিল—সেইটা তামবলের শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। তারপর তুনীর থেকে আর একটি তীর বের করলাম। সবুজ রঙের ফলা করে তীরটা আমার মামা খাঁ সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন। এটাকে ছুঁড়তে দ্বিধা করে আবার তুনীরে রেখে দিলাম। আমার এই দ্বিধার জন্য যে সময় নষ্ট হলো তাতে ইচ্ছে করলে দুই দুইটা তীর নিক্ষেপ করতে পারতাম। আর একটা তীর ধনুকে জুড়ে অগ্রসর হলাম। তিনজন সঙ্গী আমার কিছু পেছনে ছিল। দুইজন লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল—প্রথম জন তামবল। আমাদের মাঝে উঁচু রাস্তা। এক পাশ দিয়ে তামবল আসছে ঘোড়ায় চড়ে, আর আমি এক পাশ দিয়ে। রাস্তার ওপর আমরা এমন ভাবে মুখোমুখি হলাম যে আমার ডান হাত ছিল শত্রুর দিকে—আর তামবলের ডান হাত ছিল আমার দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে। তামবল পুরোপুরি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিল। আর আমার সম্বল শুধু তলোয়ার আর তীর ধনুক। যে তীরটি ধনুকে লাগানো ছিল—ছিলা আকর্ণ টেনে সেই তীরটা ছুঁড়লাম। আর ঠিক একই সময়ে আমার জানুতে গভীর ভাবে বিদ্ধ হলো একটা তীর—যে তীরকে বলা হয় 'সিবা' তীর। আমার মাথায় ছিল ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ। তামবল ছুটে এসে আমার শিরস্ত্রাণের ওপর এমন তরবারের আঘাত করলো যে আমার জ্ঞান লোপ হওয়ার মত হ'লো। সে আঘাত আমার শিরস্ত্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি।—কিন্তু আমার মাথায় গুরুতর ধাক্কা লাগে।

তরবারিতে শান্ দিয়ে ধারালো করে রাখতে অবহেলা করেছি। সেটাতে মরচে ধরে গিয়েছে। তাছাড়া, ওটা কোষ থেকে টেনে বের করতেও দেরীকরে ফেলেছি। অগণিত শত্রুর মধ্যে আমি একা সঙ্গীহীন। সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকারও কোনও অর্থ হয় না। ঘোড়ার বল্গা ঘুরিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর এক তরবারির আঘাত পড়লো আমার তুনীরে বোঝাই তীরগুলীর ওপর। সাত আট পা পিছিয়ে যেতেই আমার তিনজন পদাতিক সেনা আমার কাছে এসে গেছে দেখতে পাই। তামবল্ তখন তরবারি হাতে নিয়ে দোস্ত নাসিরকে আক্রমণ করলো। যাহোক, তারা কিছুদূর আমাদের অনুসরণ করেছিল।

আরিখ্—জাকান—সা একটা বড় নদী। জলও খুব গভীর। যেখান সেখান দিয়ে পার হওয়া যায়না। কিন্তু আল্লা আমাদের ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ, যেখানে আমরা উপস্থিত হলাম সেখানে জল অগভীর, পার হওয়ার উপায় আছে। নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত নাসিরের ঘোড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত দুর্ব্বলতায় পড়ে গেল। দোস্ত নাসিরের জন্য আর একটা ঘোড়া জোগাড় করতে আমাদের সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।—তার পর পাহাড়ের মধ্যে নানা পথ দিয়ে আমরা উসের দিকে অগ্রসর হই। যখন আমরা পাহাড় অতিক্রম করে আসি তখন মজিদ তেঘাই আমাদের দেখা পেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে ডান্ হাঁটুর নীচে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তীরটি অবশ্য হাঁটুকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করতে পারেনি। কিন্তু সে অনেক কষ্টে উসে পৌঁছুতে পারে। শত্রু আমার অনেক ভাল ভাল লোককে হত্যা করেছে। এই সময়ে অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যও শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

তাম্‌বলের পিছু পিছু অনুসরণ করে দুহু খাঁ আন্দেজানের কাছাকাছি এসে ঘাঁটি পাতেন। আমি এগিয়ে আসতে ছোটমামাকে দেখতে পাই। প্রথম সাক্ষাতের সময় অতর্কিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং সরাসরি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ছিলাম বলে তিনি ঘোড়ায় পিঠ থেকে নামবার সময় পান নি। আমাদের সাক্ষাৎ সামাজিক রীতি অনুযায়ী হওয়া সেবার সম্ভব হয়নি। এইবার আমি, কাছাকাছি যেতেই তিনি তাঁর তাঁবুর সীমানার বাইরে তাড়াতাড়ি চলে এলেন। উরুতে শরবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণায় লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাকে আসতে দেখে তিনি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—সাবাস্, বীরের মত কাজ করেছো। আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি তাঁর তাঁবুর মধ্যে

নিয়ে গেলেন। তাঁর তাঁবুটা ছিল ছোট। তিনি মানুষ হয়েছিলেন সুন্দর পল্লীতে, যেখানে শৃঙ্খলার অভাব আছে। এখানে তাঁর বসবার জায়গাও মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়—দেখে মনে হয় যেন লুটেরেদের আস্তানা। নানা ফল, তরমুজ, আঙ্গুর এবং আস্তাবলের জিনিষ পত্র তাঁর তাঁবুর চারপাশে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে।

ছোটমামার কাছ থেকে চলে এলাম নিজের তাঁবুতে। তিনি তাঁর শস্ত্র-চিকিৎসককে আমার ক্ষত পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। অস্ত্রোপচার বিদ্যায় তিনি অত্যন্ত কুশলী। কারও মাথার ঘিলুও যদি বেরিয়ে আসে তিনি ওষুধ দিয়ে তাকে নিরাময় করতে পারেন। রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে গেলে তিনি তাও খুব সুন্দরভাবে তাড়াতাড়ি সারাতে পারতেন। কোনও কোনও ক্ষতে এক রকমের প্রলেপ লাগিয়ে দিতেন এবং কোনও কোনও আহত ব্যক্তিকে শুধু খাওয়ার ওষুধ দিতেন। আমার উরুর ক্ষতে তিনি কোনও শুকনো ফলের ছাল লাগিয়ে দিলেন, যা তিনি আগেই তৈরী করে রেখেছিলেন। আমার ক্ষতে তিনি কোনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন না। একবার মাত্র সরু শিরার মত কি একটা জিনিষ খেতে দিয়ে বল্লেন—একবার একটা লোকের পায়ের হাড় এমন ভাবে ভেঙ্গে যায় যে এক হাত পরিমাণ হাড় একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। আমি সেই জায়গার উপরের চামড়া কেটে ফেলে সেই চূর্ণ হাড় সবটাই বের করে ফেলি, তারপর সেইখানে এক রকম গুঁড়ো জিনিষ পুরে দিই। সেই গুঁড়ো ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং শেষটায় হাড়ে পরিণত হয়। তার পা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলো। একরাত্রে তাম্বল প্রায় দুশো জন বাছাই করা সৈন্যের একটা দল—কয়েকজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে অতর্কিতে 'পাপ্' দুর্গ অধিকার করার জন্য পাঠায়। এই দুর্গ পাহারা দেওয়ার কোনও রকম সতর্কতা না নিয়েই সৈয়দ কাসিম ঘুমোতে চলে যায়। শত্রুপক্ষ দুর্গের কাছে উপস্থিত হয়ে মই লাগিয়ে দুর্গ প্রাচীরে ওঠে এবং ফটক অধিকার করে। তারপর পরিখার ওপর ঝোলানো সেতু নামিয়ে দিয়ে সৈয়দ কাসিম কি ব্যাপার ঘটছে জানবার আগেই সত্তর আশি জন লোক পরিখা পার হয়ে আসে। আধা-জাগ্রত হয়ে সে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবেই কেবল মাত্র একটা কোর্ত্তা গায়ে দিয়ে পাঁচ ছয় জন লোক সঙ্গে নিয়ে এসে পাখাড়ি তীর ছুঁড়তে থাকে। উপর্য্যুপরি শরাঘাতে শত্রুপক্ষের লোকদের নিপীড়িত করে তাদের দুর্গের বাইরে বের করে দেয় এবং কয়েকজনের মাথা কেটে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। একজন সেনাপতির এমন অরক্ষিত অবস্থায় দুর্গ রেখে ঘুমোতে যাওয়া অন্যায় হয়ে ছিল ঠিকই। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অতগুলি শত্রুসৈন্যকে হাতাহাতি লড়াইয়ে বিপর্য্যস্ত করে তাড়িয়ে দেওয়াও একটা অসমসাহসিক কার্য্য বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

এই সময় খাঁয়েরা দুই ভাই আন্দেজান দুর্গ অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

শেখ বেজিদ তখন ছিল আখসিতে, সে যেন আমার স্বার্থ রক্ষার জন্য কতই না ব্যস্ত—এই ভাব দেখিয়ে আমাকে আখসিতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে একজন দূতকে গোপনে আমার কাছে পাঠায়। এই আমন্ত্রণের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল আমাকে কোনও ছলে খাঁদের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত করা। কারণ তার ধারণা হয়েছিল যে যদি আমি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করি—তাহলে এ দেশে কেউ আর তাঁদের সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাঁরাও এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন। এই মতলব সে ঠিক করেছিল তার বড় ভাই তাম্বলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে। খাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেব এটা আমার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। আমার মাতুল খাঁদের এই আমন্ত্রণের কথা জানালাম। তাঁরা আমাকে যে কোনও উপায়ে আখসিতে যাওয়ারই উপদেশ দিলেন এবং যেমন করে হোক শেখ বেজিদকে বন্দী করার কথা বল্লেন। কিন্তু কোনও রকম ছলনার আশ্রয় নিয়ে কাজ করা আমার স্বভাবের বিরোধী। আমাকে যেতে হলে একটা সন্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করতে পারিনা। কিন্তু আমি একবার আখসিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যদি কোনও উপায়ে শেখ বেজিদকে তার ভাই তাম্বলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে সুযোগ এলে সম্মানের সঙ্গেই সে সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই জন্য আমি একজন লোককে আখসিতে পাঠাই। সে বেজিদের সঙ্গে একটা সন্ধিচুক্তি করলে বেজিদ আমাকে আখসিতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে। আমিও আখসির দিকে রওনা হই। শেখ বেজিদ আমার সঙ্গে দেখা করে। আমার ভাই নাসির মির্জ্জাকেও সে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমাকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে এসে সে চলে যায়। প্রস্তর দুর্গে আমার বাবার প্রাসাদে আমার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি সেইখানেই চলে আসি।

একদিন সকালে জাহাঙ্গির মির্জ্জা তামবলের কাছ থেকে পালিয়ে আমার কাছে চলে আসেন এবং আমার দলে যোগ দেন। প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের অলিন্দে বসে আমরা আলোচনা করতে থাকি। জাহাঙ্গির মির্জ্জা আমার কানে কানে বল্লেন—শেখ বেজিদকে এখনই বন্দী করা দরকার।

আমি উত্তর দিই—তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত হবে না। বেজিদকে বন্দী করার সময় চলে গিয়েছে। আপোষে কোনও মীমাংসা করা যায় কিনা তারই এখন চেষ্টা করা উচিত। এইটাই উচিত হবে—কারণ ওর দলে অনেক লোক আর আমাদের সামান্য কয়েক জন। তাছাড়া, ওদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী দুর্গ অধিকার করে আছে আর আমরা সামান্য কয়েকজন সেনা নিয়ে বহির্দুর্গ প্রাসাদ শুধু অধিকার করে আছি।

আমি জানিনা তিনি আমার কথার ভুল অর্থ করলেন—না জেনেশুনে গোঁয়ারতুমি দেখালেন। সে যাই হোক, শেখ বেজিদকে তিনি বন্দী করলেন। ও পক্ষের যে সব লোক কাছাকাছি ছিল তারা চারিদি

ঘিয়ে ফেলে বেজিদকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—সন্ধিচুক্তি খতম হলো। সুতরাং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমি নগরের এক অংশের ভার জাহাঙ্গির মির্জ্জার উপর দিলাম। মির্জ্জার লোকবল খুব কম ছিল দেখে আমরা কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি প্রথমে নগরের এই অংশ পর্য্যবেক্ষণ করে শৃঙ্খলা আনি এবং কোন ঘাঁটিতে কাকে থাকতে হবে তা ঠিক করে দিই। তারপর নগরের অন্য অংশে চলে আসি।

নগরের মাঝখানে খোলা ময়দান। সেখানে আমার কয়েকজন সেনাকে মোতায়েন রেখে এগিয়ে আসি। আমার সৈন্যরা শত্রুপক্ষের অগণিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। শত্রু সৈন্যরা তাদের একটা সরু গলির মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হই এবং ঘোড়ার পিঠে বসে তাদের দ্রুত আক্রমণ করি। শত্রুপক্ষ সে আক্রমণে স্থির থাকতে পারে না। পালাতে সুরু করে। সরু-গলি থেকে তাদের খেদিয়ে তরবারি হাতে লড়াই করতে করতে ময়দানের দিকে নিয়ে আসি। এই সময় আমার ঘোড়ার পায়ে তীরবিদ্ধ হয়। ঘোড়া আহত হয়ে লাফিয়ে উঠে আমাকে শত্রুর মাঝখানে ফেলে দেয়। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিতল থেকে উঠে একটি তীর নিক্ষেপ করি। খলিল নামে আমার এক সহচর তার নিজের শীর্ণকায় ঘোড়া থেকে নেমে সেই ঘোড়া আমাকে চড়তে দেয়।

ময়দানের ঘাঁটিতে কয়েকজন সৈন্য রেখে আর একটা রাস্তার দিকে এগিয়ে যাই। মহম্মদ ওয়াইস আমার ঘোড়ার দুর্দ্দশা দেখে তার নিজের ঘোড়াটি আমাকে দেয়। আমি সেই ঘোড়ার চড়ে বসি। এই সময় আহত কামবার আলি জাহাঙ্গির মির্জ্জার কাছ থেকে ফিরে এসে আমাকে জানায় যে মির্জ্জা কিছুক্ষণ আগে অগণিত শত্রুসৈন্য দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে উপায়ান্তর না দেখে নগর ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ইব্রাহিম বেগকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি করা যায় এখন?

সেও আহত হয়েছিল। কি জানি কি কারণে, ক্ষতস্থানের বেদনার জন্যই হোক, অথবা আতঙ্কে তার বুকের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রমের জন্যই হোক, সে কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলনা। এই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগালো। সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে ওপারে গিয়ে সেই সেতু ভেঙ্গে ফেলে আমরা অনায়াসেই আন্দেজানের দিকে অগ্রসর হতে পারি। এই বিপর্য্যয়কর অবস্থায় বাবা সারজিদ্ খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। সে বললো আমরা যে ফটক নিকটে পাব সেইখানেই আক্রমণ চালিয়ে বাইরে বেরোবার পথ করে নেব। এই পরামর্শ মত আমরা ফটকের দিকে এগিয়ে চললাম। সেখ বেজিদ বর্ম্ম-আচ্ছাদিত হয়ে সেই সময় তিন চার জন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে ফটক দিয়ে ঢুকে নগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ তূনীর থেকে একটি শর বের করে তার মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লাম। শরটি তার ঘাড় ছুঁয়ে ভাবে একটা ছোট রাস্তার ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। কুলি গোকুল তাস তার ডাণ্ডা দিয়ে একজন পদাতিক সৈন্যকে ধরাশায়ী করে। আর একজন লোককে পাশ কাটিয়ে যেতেই দেখা গেল সেই লোকটি ইব্রাহিম বেগকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে। তখনই ইব্রাহিম খুব জোরে 'হাই' 'হাই' করে চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা হকচকিয়ে গেল। তার পর সেই লোকটি খুব কাছে থেকে আমার দিকে একটি শর নিক্ষেপ করলো। আমার গায়ে ছিল 'কালমুক বর্ম্ম'। শরাঘাতে আমার বর্ম্মের দুইটি স্তর বিদ্ধ হয় এবং ভেঙ্গে যায়। তীর নিক্ষেপকারীকে পালিয়ে যেতে দেখে তার দিকে আমি একটা তীর ছুঁড়ি। এই সময় একজন পদাতিক সৈন্য দুর্গ-প্রাচীর ঘেঁষে পালাচ্ছিল। আমার তীরটি তার মাথায় টুপিতে লেগে ছিট্‌কে এসে তীর সমেত দুর্গের দেওয়ালে বিঁধে যায়। সেটা দেওয়ালে সেই অবস্থাতেই ঝুলতে থাকে। সৈন্যটি তার মাথার পাগড়িটি হাতে নিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়। একজন অশ্বারোহী আমারই পাশ দিয়ে যে গলির মধ্যে সেখ বেজিদ পালিয়েছে সেই দিকে ছুটে যায়। তার মাথায় আমি এমন জোরে তরবারির আঘাত করি যে সে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু পাশের দেওয়ালে ভর দিয়ে সে ঝোঁকটা সামলিয়ে নিয়ে কোনও রকমে পালিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের যে কয়জন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ফটকের কাছাকাছি ছিল তাদের সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ফটকটি দখল করি।

আমাদের জয়ী হওয়ার কোনও রকম সম্ভাবনাই ছিলনা। দুর্গমধ্যে শত্রুপক্ষের সশস্ত্র সৈন্যবল দুই তিন হাজার—আমার দুর্গের এক প্রান্তে আছে মাত্র একশ কিংবা বড় জোর দু শ সৈন্য। তা ছাড়া, আগুনের ওপর দুধ চড়ালে দুধ ফুটতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জাহাঙ্গির মির্জ্জা শত্রুপক্ষের হাতে পর্য্যুদস্ত হয়ে পালিয়েছে—আর তার সঙ্গে আছে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য। এ সব সত্ত্বেও আমার দারুণ অনভিজ্ঞতার দরুণ আমি নিজে দুর্গফটকে অপেক্ষা করে এক জনকে জাহাঙ্গির মির্জ্জার কাছে পাঠালাম এই অনুরোধ করে যে—যদি তিনি কাছাকাছি থাকেন, তা হলে যেন তাঁর সঙ্গের লোকনিয়ে আমাকে সাহায্য করতে আসেন—যাতে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইব্রাহিম বেগের ঘোড়া সত্যই দুর্ব্বল ছিল অথবা সে নিজেই আহত হওয়ায় মন-মরা হয়েছিল কিনা জানিনে—কিন্তু সে আমাকে বললো যে তার ঘোড়াটা একেবারে অপদার্থ। এই কথা শোনামাত্র সুলেমান নামে আমার একজন ভৃত্য কারও কাছ থেকে কোনও ইঙ্গিত না পেয়েই তার ঘোড়াটি ইব্রাহিমকে দিয়ে দিল। লোকটির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করলাম। যতক্ষণ আমরা ফটকে অপেক্ষা করেছিলাম কোয়েলের রাজস্ব-আদায়কারী কুচুক আলি খুব বীরের মত কাজ দেখিয়েছিলেন।

যে লোককে আমি মির্জ্জার কাছে পাঠিয়েছিলাম তার প্রত্যাবর্ত্তনের

আমাকে জানায় যে জাহাঙ্গির মির্জা কিছুক্ষণ আগেই স্থানত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে। আর অপেক্ষা করার সময় ছিলনা। আমরাও তাড়াতাড়ি ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মোটকথা, আমার অতক্ষণ অপেক্ষা করাই অত্যন্ত অনুচিত হয়েছিল। আমার সঙ্গে মাত্র দশ জন লোক ছিল। যে মুহূর্ত্তে আমরা রওনা হলাম আমাদের পিছন পিছন শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য আমাদের পিছু ধাওয়া করলো। আমরা যখন টামা সেতু পেরিয়েছি, তখন তারা নগরের দিকের অংশে এসে পৌছিয়েছে। বেন্দ আলি চীৎকার করে ইব্রাহিম বেগকে বলছে—তোর অহঙ্কার বড় বেশী, বড় বড় কথা বলা তোর খুব অভ্যাস। একবার থাম দেখি, তরোয়াল নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে। দেখা যাক—কে হারে কে জেতে।

ইব্রাহিম বেগ আমার কাছেই ছিল, সে জবাবে বললো—আয় চলে আয় তা হ'লে। কে আর বাধা দিচ্ছে?

ওরা নির্বোধ, উন্মাদ। বাহাদুরি দেখিয়ে পরস্পরের দাবী মেটানোর উপযুক্ত সময়ই এটা বটে! তরবারির খেলা-নৈপুণ্য দেখানোর অবসর কোথায়। এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করবার মত সময় নাই। তীব্রবেগে আমরা ছুটে চল্লাম, আর পেছন পেছন এগিয়ে আসতে লাগলো শত্রুসৈন্য। এগিয়ে আসতে আসতে তারা একের পর এক আমাদের সৈন্য ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেললো।

ইব্রাহিম বেগ সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠলো। পিছন ফিরে দেখি, সেখ বেজিদের একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তার লড়াই হচ্ছে। আমি পিছিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ফিরালাম। জান্ কুলি আমার কাছেই ছিল। সে বলে উঠলো—এ কি ফিরে দাঁড়ানোর সময়? তারপর আমার ঘোড়ার বল্গা ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে বললো। আমরা স্যাং এ পৌছানোর আগেই শত্রুপক্ষ আমার সৈন্যদের অনেককেই ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেলেছে। স্যাং অতিক্রম করবার পর আর পেছনে শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছিল না। স্যাংএর নদীর দিকে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের দলে তখন আমরা মাত্র আট জন। কোনও রকমের একটা ভাঙ্গা-চোরা পাথুরে রাস্তা নদীর দিকে গিয়েছে। এ রাস্তায় লোক চলাচল নাই। এই নির্জন পথ ধরে নদীর কাছে পৌছালাম। তারপর নদীকে ডান দিকে রেখে আবার একটা সরু পথ ধরলাম। বিকেল বেলার নমাজের সময় আমরা পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে সমতল ভুমির কাছে এসে পড়লাম। দূরে সমতল ভূমির ওপর তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের আড়ালে রেখে আমি পায়ে হেঁটে একটা উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল আমাদের পিছনের এক পাহাড়ের ওপর একদল অশ্বারোহী উঠে আসছে। তারা কতজন এই দলে আছে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না ভেবে আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে ছুটে পালাতে লাগলাম। যে অশ্বারোহী সৈন্যের দল আমাদের অনুসরণ করছিল তারা বিশ-পঁচিশ জনের বেশী হবে না মনে হয়—কিন্তু আমরা ছিলাম মাত্র আটজন—তা আগেই বলেছি। যখন তারা আমাদের পেছনে ধাওয়া করে, তখন যদি তাদের সংলাপের কথা জানতে পারা যেত, তাদের তাহলে ভালভাবেই শিক্ষা দেওয়া যেত। কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম তাদের পেছন পেছন আরও সৈন্য আসছে পলায়নপর আমাদের দলকে ধরবার জন্য। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা দ্রুত ছুটে পালাতে লাগলাম। ব্যাপার হচ্ছে এই যে—যারা পালানোর মত পরাজিত মনোভাবের কবলে পড়েছে, তারা সংখ্যায় অধিক হলেও অল্পসংখ্যক পশ্চাৎধাবনকারীর মুখোমুখি হতে সাহস করেনা। কথায় বলে লুই বনে একটা চীৎকারই পরাজিত দলের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

জানকুলি বল্লে, আমরা এই পথে গেলে শত্রুপক্ষ আমাদের সকলকেই ধরে ফেলবে। তার চেয়ে আপনি এবং কুলি গোকুলতাস্ দুইটি ভাল ঘোড়া বেছে নিয়ে এক সঙ্গে জোর কদমে অন্যপথ দিয়ে চলে যান। তাহলে হয়তো আপনারা পালিয়ে যেতে পারবেন।

পরামর্শটা মন্দ ছিলনা। কারণ, আমরা যখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে পারছিনে, তখন মুক্তির সম্ভাবনাটা যাতে বেশী হয় সেই পন্থাই গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু এতে আমার মন সায় দিলনা। শত্রুর মধ্যে আমার অনুগামীদের ফেলে রেখে আমি চলে যেতে সম্মত হলাম না। অবশেষে আমাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে আগু পিছু চলতে লাগলো। আমি যে ঘোড়ার পিঠে ছিলাম—সেটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল, তার ছুটে চলবার শক্তি ছিলনা। জান্‌কুলি তার ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে সেই ঘোড়ায় চড়তে বল্‌লো। আমি তার ঘোড়ায় চড়লাম—আর সে চড়লো আমার ঘোড়ায়। এই সময়ে সাহিম নাসির আর আব্দুল কাদুস, যারা পিছিয়ে পড়েছিল, তাদের শত্রুপক্ষ ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেল্‌লো। জানকুলিও পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তাকে রক্ষা বা সাহায্যের চেষ্টা করার কোনও উপায়ই ছিলনা। সুতরাং আমরা কয়েকজন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু ঘোড়াগুলোর দম যেন ফুরিয়ে আসছিল। তারা আর ছুটতে পারছিল না। দোস্ত বেগের ঘোড়া পিছিয়ে পড়লো, আমার ঘোড়াটার অবস্থাও সেই রকম। কামবার আলি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়া আমাকে চড়তে দিল। সে আমার ঘোড়ায় চড়লো এবং অবিলম্বে পিছিয়ে গেল। খোঁড়া খাজা হুসেনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। কুলি গোকুলতাসের সঙ্গে শুধু আমি রইলাম। আমাদের ঘোড়াও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, তাদের ছুটে চলার ক্ষমতা ছিলনা। আমরা ধীর কদমে চলতে লাগলাম। কুলি গোকুলতাসের ঘোড়ার গতি একেবারে কমে গেল। তাকে বল্লাম—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? এসো, মৃত্যু কিংবা জীবন যেটাই হোক এক সাথেই বরণ করে নিই। আমি যেতে যেতে কুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে দেখছিলাম। অবশেষে কুলি বল্‌লো—আমার ঘোড়া সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, তার নড়বার ক্ষমতা নাই। আমার সঙ্গে আপনার ভাগ্য জড়িয়ে ফেললে আপনার পক্ষে পালানো অসম্ভব হবে। একটু এগিয়ে যদি হয় তো এখনও আপনার নিরাপদ স্থানে পৌছানোর উপায় হতে পারে।

আমি অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়লাম। কুলি পিছিয়ে পড়লো। আমি তখন একেবারে নিঃসঙ্গ। পক্ষপক্ষের দুইজন লোককে দেখা গেল। একজনের নাম—সিয়ামি, আর একজন—বন্দে আলি। তারা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার ঘোড়ার গতিও একেবারে কমে গেল। দুই মাইল দূরে একটা পাহাড়। পথে পাথরের স্তূপ ছড়ানো আছে। চিন্তা করতে লাগলাম—পাথরের ওপর চলতে চলতে যদি ঘোড়ার পা পিছলিয়ে যায় তাহলে কি হবে? পাহাড়টা তো এখনও অনেক দূরে। আমার তুনীরে তখনও গোটা কুড়ি তীর ছিল। ঘোড়াথেকে নেমে পাথরের স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে তীর দেখলে কেমন হয়? যতক্ষণ তীর আছে ততক্ষণ তো যুদ্ধ করা যেতে পারে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে হয়তো আমি পাহাড় পর্য্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবো। যদি তা পারি, তা হলে কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপর চড়তেও পারি। তীর চালনায় আমার নিপুণতা সম্বন্ধে আমার খুবই আস্থা ছিল। এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার ঘোড়ার গতি খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অনুসরণকারী দুইজন আমার এমন কাছে এসে পড়েছিল যে তারা তীরের আওতার মধ্যে পড়ে। আমি কিন্তু তীর খরচ করবো না এই সঙ্কল্প স্থির করেই তীর নিক্ষেপ করিনি। অনুসরণকারীরাও কিছুটা শঙ্কিত হয়ে খুব কাছে না এসে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই আমার অনুসরণ করছিল।

সূর্য্যাস্তের সময় আমি পাহাড়ের কাছে পৌঁছাই। তখন তারা চীৎকার করে বল্লো—তুমি কোথায় যাওয়ার মতলব করে এমনভাবে ছুটছো? জাহাঙ্গির মির্জ্জা ধরা পড়েছে, আর তোমার ভাই নাসির মির্জ্জাও বন্দী।

তাদের কথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। যদি আমরা তিনজনই এই ভাবে ধরা পড়ি তাহলে সব দিক দিয়েই আতঙ্কিত হওয়ার কথা। যখন আরও কিছুদূর এগিয়েছি, আবার তারা আমাকে ডাকলো। এবার তাদের স্বর আগেকার চেয়ে কিছুটা মোলায়েম মনে হলো। ঘোড়া থেকে নেমে তারা আমাকে সম্বোধন করে কি সব বলতে লাগলো। তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আমি এগিয়ে চল্লাম।—পাহাড়ের মধ্যে একটা সুঁড়ি পথ পেয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম। এই ভাবে এগোতে এগোতে রাত্রির নমাজের সময় একটা বাড়ীর আয়তনের মত পাথরের কাছে পৌঁছে যাই। পাথরটার পেছনে একটা খাড়াই দেখতে পাই। এই খাড়াইয়ে ওঠা ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুসরণকারীরা ঘোড়া থেকে নেমে আরও মোলায়েম ও ভদ্রভাবে আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো—এই ভাবে চললে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে? একে রাত্রি, তাতে সম্মুখে কোনও পথ নাই। এখন কোথায় আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব?……তারা শফৎ করে বল্লে, সুলতান আহমদের ইচ্ছা যে আপনিই সিংহাসনে বসুন।

আমি উত্তরে বল্লাম—এ সব কথায় আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার পক্ষে সুলতান আমেদের সঙ্গে যোগ দেওয়া অসম্ভব। যদি তোমরা আমার কোনও উপকার করারই সদিচ্ছা পোষণ করে থাক, তাহলে এমন একটা কাজ আমার জন্য এখন করতে পার যে কাজের সুযোগ সহসা আসেনা। এমন একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দাও—যে রাস্তা ধরে গেলে আমি যাঁদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারি। এই উপকারটুকু করলে তোমরা যা কল্পনায়ও আনতে পারনা এমন পুরস্কার তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে। যদি তোমরা এ কাজ করতে অস্বীকার কর তাহলে তোমরা যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই আমাকে থাকতে দাও। এটুকু করলেও আমার কম উপকার করা হবে না।

তারা বল্লো—আমাদের এখানে না এলেই ভাল হতো। আল্লার দোহাই, যখন এসেই পড়েছি তখন আপনাকে এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে কি কখনও চলে যেতে পারি। যখন আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে অসম্মত—তখন আপনারই খেজমত করার জন্য আপনি যেখানে আমরাও সেখানেই আপনার সঙ্গে যাতে যেতে পারি সেই আদেশ দিন।

আমি উত্তরে বল্লাম—তাহলে কোরাণের নামে শফৎ কর যে তোমাদের প্রস্তাব আন্তরিক। তারা গুরুত্বপূর্ণ শফৎ করলো।

আমি তখন তাদের ওপর কিছুটা বিশ্বাসস্থাপন করলাম। বল্লাম, এই উপত্যকার কাছ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। তোমরা কি সেই রাস্তা দিয়েই চলতে চাও?

যদিও তারা শফৎ করেছে তবু তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই জন্য তাদের আগে আগে যেতে বলে আমি পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। এক মাইল কি দুই মাইল যাওয়ার পর আমরা একটা ছোট নদী পেলাম। বল্লাম—উপত্যকার ধারের যে রাস্তার কথা বলছিলাম এটা তো সে রাস্তা বলে মনে হচ্ছে না।

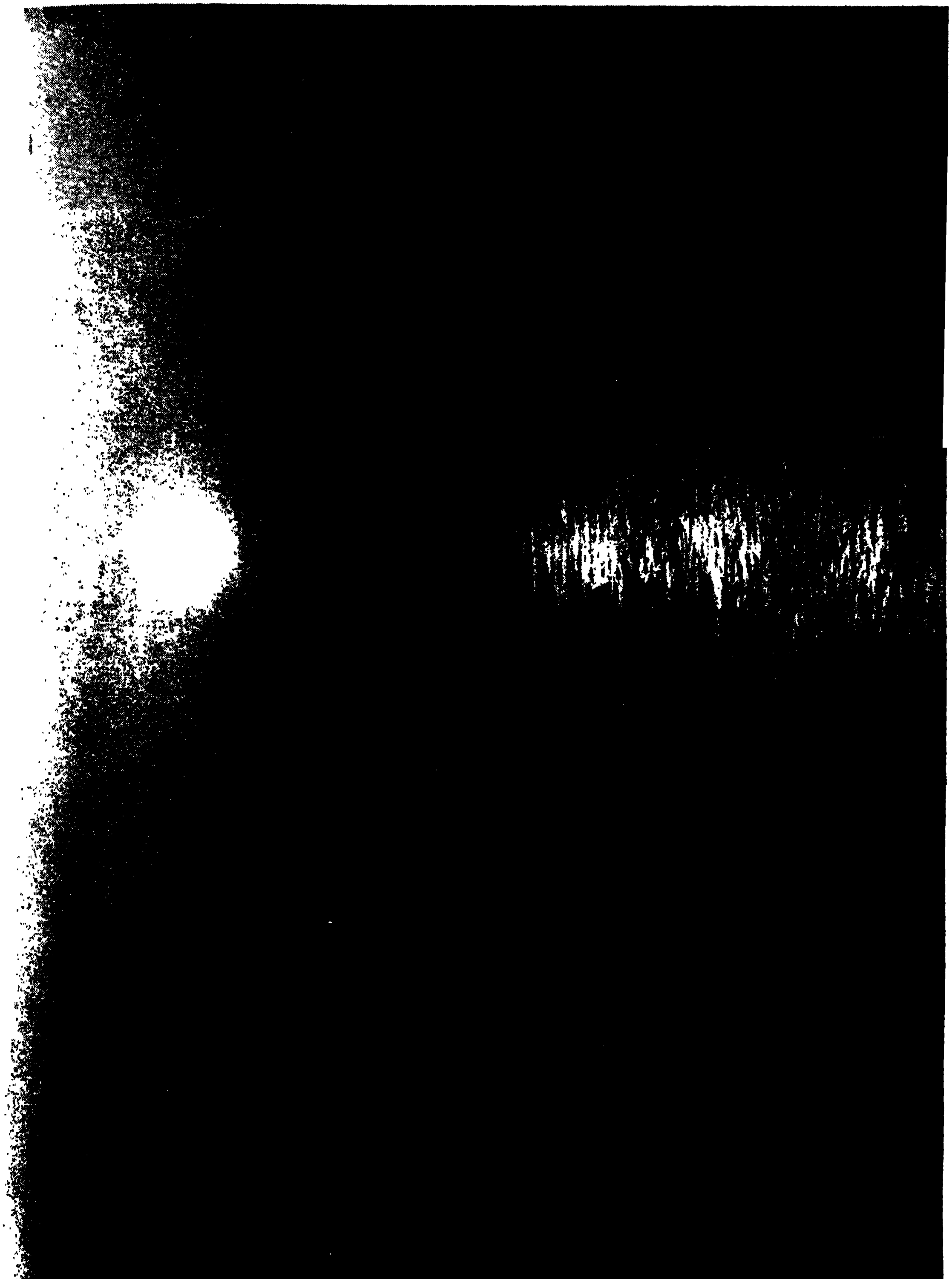
তারা কেমন একটা দ্বিধার ভাব দেখিয়ে বল্লো—রাস্তাটা আরও কিছু আগে পাওয়া যাবে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে আমরা সেই উপত্যকার রাস্তার উপরেই রয়েছি। কিন্তু আমার মনে হলো, ওরা সত্য গোপন করে আমাকে ঠকাচ্ছে।

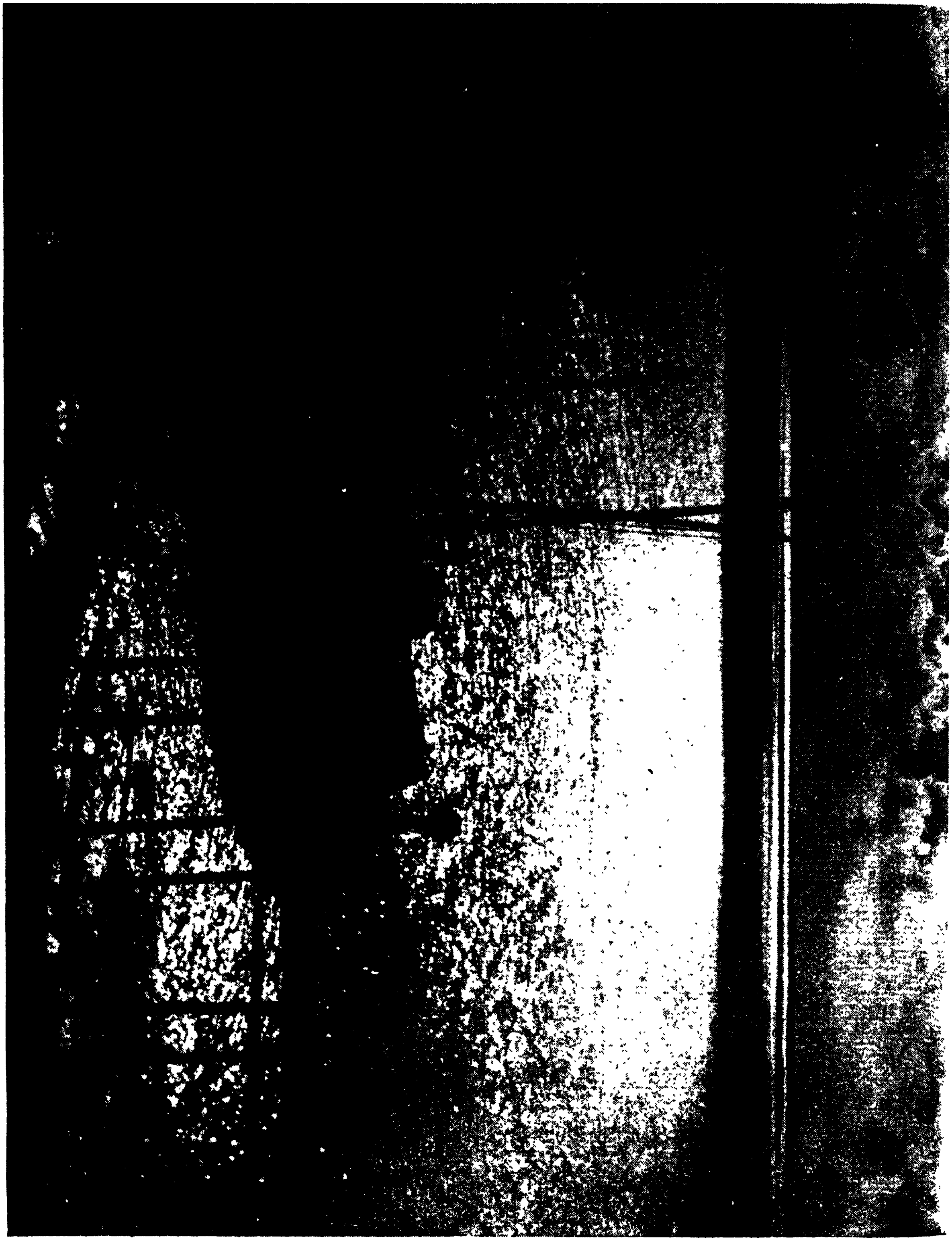
মাঝ রাত্রে আমরা একটা নদীর কাছে এসে পড়লাম। তারা বল্লো—আমরা হয়ত ভুল করে ঠিক পথ ধরতে পারিনি। উপত্যকার রাস্তাটা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি।

বল্লাম—তাহলে এখন উপায়?

তারা বল্লো—ঘিবার রাস্তাটা কিছু আগেই পাওয়া যাবে। সেই রাস্তা ধরে গেলে আপনি ফারকটে যেতে পারবেন। আমরা পথ চলতে লাগলাম এবং রাত্রি তিন প্রহরের শেষে কারনানের নদীর ধারে এসে পৌঁছিলাম। 'ঘিবা' থেকে এই নদীটা এসেছে। বাবা সিরামি বল্লো—এখানেই থামা যাক। আমি 'ঘিবার' রাস্তাটা একবার দেখে আসি!

সে একটু পরেই ফিরে এসে বল্লো—এ রাস্তা দিয়ে এখন অনেক লোক চলাচল করছে। সুতরাং এ পথে আমাদের যাওয়া অসম্ভব।





এই সংবাদে আমি আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এখন আমি শত্রুর এলাকার মধ্যে আছি। আমি যেখানে যেতে চাই—সে জায়গা এখনও বহু দূরে। বললাম—তাহলে এমন একটা জায়গার খোঁজ কর যেখানে আমরা দিনটা লুকিয়ে থাকতে পারি।

ওরা বললো—কাছেই একটা পাহাড় আছে—সেখানে আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবো।

বন্দে আলি কারনানের দারোগা। সে বললো—আমাদের ঘোড়াদেরও আর চলবার শক্তি থাকবে না—যদিনা কিছু খাবার সংগ্রহ করা যায়। আমি কারনানে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে কিছু খাওয়ার জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টা দেখি।

কারনানের রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কারনান থেকে দুই মাইল দূরে আমরা থামলাম; বন্দেআলি চলে গেল। অনেকক্ষণ সে ফিরলো না। ভোর হয়ে গেল—তবু তার কোনও পাত্তা নেই। আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সকাল হয়ে গিয়েছে। বন্দেআলি তিনখানা রুটি হাতে নিয়ে ফিরলো। ঘোড়ার খাদ্য কিছুই আনেনি। আমরা এই কখানি রুটি নিয়ে কালক্ষেপণ না করে চলতে লাগলাম। যে পাহাড়ে আমরা লুকিয়ে থাকবো ঠিক করেছিলাম সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছিলাম। ঘোড়া কয়েকটিকে নীচে পাথর ছড়ানো জলাভূমিতে রেখে আমরা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম এবং সেখান থেকে চারদিকে নজর রাখছিলাম।

দুপুর হয়ে এসেছে। দেখলাম—শিকারী বাজপাখী-পালক কোস্‌চি চারজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘিবার দিক থেকে আখসির দিকে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম ঐ লোকটাকে ডেকে মিষ্টি কথায় ভবিষ্যতে তার ভাগ্য পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে তাদের ঘোড়াগুলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। কারণ, আমাদের ঘোড়াগুলো দিনরাত অনবরত পরিশ্রম করে এবং এক কণাও শস্য না পেয়ে দুর্ব্বল চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার মনের দ্বিধা ঘুচলো না। ঠিক করতে পারলাম না যে ওদের ওপর আস্থা স্থাপন করা চলে কিনা। আমি ও আমার সঙ্গীরা স্থির করলাম যে লোকগুলো সম্ভবতঃ রাত্রে কারনানেই থেকে যাবে, তাহলে ওদের ঘোড়া গোপনে সরিয়ে নিয়ে আমরা কোনও নিরাপদস্থানে চলে যাব।

প্রায় দুপুর বেলা চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিচ্ছিলাম। দূরে একটা ঘোড়ার ওপর কি যেন চকচক করছে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও বুঝতে পারছিলাম না যে জিনিষটা কি। পরে ঠিক পেলাম—ঘোড়ার ওপর মহম্মদ বাকির। সে আখসিতে আমার সঙ্গেই ছিল। যখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমার সঙ্গীরা ছুটে পালাতে থাকে সেই সময় মহম্মদ বাকির চলে আসছিল। সম্ভবতঃ গোপনতা অবলম্বন করে এই দিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্দেআলি ও বাবা সেরানি বললো—আমাদের ঘোড়া দুদিন ধরে একটা দানাও খেতে পায়নি। পাহাড় থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে মাঠে চরানোর ব্যবস্থা করা ভাল, যদি কিছু ঘাস ওরা খেতে পারে। আমরা নীচে নেমে এলাম এবং ঘোড়াদের ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। বিকেলের সময়ের কাছাকাছি দেখা গেল যে একজন লোক আমরা যে পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলাম সেই খান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তাকে দেখেই চিনলাম যে সে 'ঘিবার' মোড়ল কাদির বার্দি। সঙ্গীদের বললাম, কাদির বার্দিকে ডাকা যাক্।

সে আমাদের কাছে এলো। ভাল ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করলাম। খুব মোলায়েম ভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করে ভবিষ্যত তার খুব ভাল এই আশ্বাস দিয়ে, যাতে যে আমার দিকে আকৃষ্ট হয় সাধ্যমত সেই চেষ্টা করে তাকে কিছু দড়ি, লুক, একটা কুড়োল এই রকম নদী পার হওয়ার কতকগুলো উপকরণ, ঘোড়ার জন্য কিছু খাদ্য, আমাদের জন্যও কিছু খাবার এবং সম্ভব হলে একটা ঘোড়াও যোগাড় করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বলে দিলাম যে রাত্তের নমাজের সময় যেন সে এই জায়গাতেই দেখা করে।

সন্ধ্যা-নমাজ শেষ হবার পর একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল কারনান থেকে ঘিবার দিকে যাচ্ছে। আমরা হাঁক দিলাম—কে যায়? সে সাড়া দিল। যাকে দুপুর বেলায় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম—এ সেই মহম্মদ বাকির। তার দিনের লুকোনো স্থান থেকে এখন কোনও নিরাপদ স্থানের দিকে চলেছে। তার স্বর এমন বদলে গিয়েছে যে সে আমাদের কাছে কয়েক বছর থাকলেও তার গলার স্বরে তাকে চেনা গেল না। যদি তাতে চেনা যেত, আর তাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারতাম, তা'হলে আমার পক্ষে ভাল হতো। এই লোকটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল দেখে খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। 'ঘিবার কাদির বার্দির ওপর যে সব কাজের ভার দিয়ে এখানে অপেক্ষা করছিলাম এবং তাকে যে সময়ে ফিরে আসবার কথা বলেছিলাম সে সময় পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবার ও সাহস হলো না।

বন্দে আলি বললো—কারনানের সীমান্তে অনেকগুলো পোড়ো বাগান আছে। সেখানে আমরা যদি যাই, তা'হলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। সেই দিকেই যাওয়া যাক। সেখান থেকে কাউকে পাঠিয়ে কাদির বার্দিকে আমাদের কাছে নিয়ে এলেই চলবে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ঘোড়ায় চড়লাম এবং কারনানের প্রান্ত সীমার দিকে এগিয়ে চললাম।

তখন শীতকাল এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা—ওরা আমার জন্য একটা পুরনো ভেড়ার চামড়ার চাদর নিয়ে এলো। চাদরের ভিতরের দিকটা পশম, আর বাইরের দিকটা মোটা কাপড়ে মোড়া। সেটা গায়ে দিলাম। আমার জন্য তারা আরও জোগাড় করে নিয়ে এলো—এক পো সিদ্ধ-করা গরম গরম জোয়ারের ময়দা। সেটা খেয়ে মনে হলো যেন শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

বন্দে আলিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাউকে কি কাদির বার্দিকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? সে জবাব দিল—হাঁ পাঠিয়েছি।

কিন্তু এই দুইজন দুষ্টবুদ্ধি নীচ সয়তান কাদির বার্দির সঙ্গে সত্যি

দেখা করেছিল এবং তাকে তামবলকে খবর দেওয়ার জন্য আখসিতে পাঠিয়েছিল।

পাথরের দেওয়ালে ঘেরা একটা বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে আগুন জ্বালিয়ে আমি চোখ বুজলাম এবং তখুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই ধূর্ত্ত লোকদুটি আমার কাছে যেন খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে—এই রকম ভান করতে লাগলো। তারা বললো—কাদির বার্দি না ফেরা পর্য্যন্ত আমাদের এ এলাকাটা ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এ বাড়ীটা অবশ্য মাঝামাঝি জায়গায়। সীমান্তের এক পাশে একটা জায়গা আছে, সেখানে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে আর কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।

মাঝ রাতে আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠলাম এবং সীমান্তের এক পাশে একটা বাগান লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্‌লাম। সেই বাগান-বাড়ীর অলিন্দে উঠে বাবা সিয়ানি চার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। প্রায় দুপুর বেলায় সে নেমে এসে বল্‌লো—ইউসুফ দারোগা এই দিকে আসছে।

আমি খুবই শঙ্কিতহয়ে বল্লাম—জেনে এসো, সেকি আমার এখানে আসার কথা জানতে পেরে আমার সন্ধানে এসেছে?

বাবা সিয়ানি বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পর ফিরে এসে জানালো—ইউসুফ দারোগা বলছে আখসির ফটকের কাছে একজন পদাতিকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তার কাছ থেকে সে শুনতে পায় যে দেশের রাজা কারনানের এই দিকটায় আছেন। এই সংবাদটা আর কারও কাছে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে জন্য সে লোকটাকে নজরবন্দী করে রেখেছে। কোষাধ্যক্ষ ওয়ালি যে তার হাতে ধরা পড়েছিল তাকেও বন্দী করেছে। তার পর সে তাড়াতাড়ি ছুটে এখানে চলে এসেছে। কোনও বেগদের সে একথা জানায়নি।

বাবা সিয়ানিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কথা শুনে তোমার কি মনে হয়?

সে উত্তর দিল—সকলেই আপনার ভৃত্য। একথা বলতে দ্বিধা নাই যে সকলেই আপনার সঙ্গে যোগ দিতে চায়। আপনি আবার রাজ-সিংহাসনে বসুন।

এত যুদ্ধবিগ্রহ আর দ্বন্দের পর—আমি বল্লাম—'কোন বিশ্বাস নিয়ে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আবার যেতে পারি?

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম; ইউসুফ হঠাৎ আমার সামনে উপস্থিত হয়ে নতজানু হয়ে বললো—আপনার কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে চাইনে। এ ব্যাপারে সুলতান আমেদ কিছুই জানে না। সুলতান বেজিদ সংবাদ পেয়েছেন—আপনি কোথায় আছেন। তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

তার কথা শুনে আমি ভয়ে উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। মৃত্যু খুব কাছে এসে পড়েছে এটা জানতে পারার মত যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি মানুষের জীবনে আর কিছুতেই হয় না।

আমি চীৎকার করে বল্লাম—সত্য করে বল, তোমার উদ্দেশ্য কি। প্রকৃতই যদি আমার যা ইচ্ছা তার বিপরীতই ঘটে থাকে, তা হলে এইটুকু সময় দিও যাতে আমার শেষ প্রার্থনা আল্লাকে জানাতে পারি।

ইউসুফ বারংবার শপথ করতে লাগলো, কিন্তু তার কথায় আমি আস্থা স্থাপন করতে পারলাম না। আমি সেখান থেকে উঠে বাগানের একটা স্থানে চলে এলাম। নিজের মনেই চিন্তা করতে লাগলাম। মনে মনে বল্লাম—একজন মানুষ একশো কেন, যদি হাজার বছরও বাঁচে, তবুও অবশেষে তাকে—

(এই খানেই ১৫০২ সালের ডিসেম্বরে আত্মকথার সূত্র ছিন্ন হয়েছে এবং ১৫০৪ সালের জুনে পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। মধ্যবর্ত্তী অংশগুলি আর আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি।)

বাবরের বিপদসঙ্কুল সঙ্গীহীন অবস্থা থেকে তাঁর শুভানুধ্যায়ীগণই তাঁকে নিশ্চয় উদ্ধার করেছে তিনি যে কারগনে ছিলেন সে কথা আকসির অনেকেরই জানার সম্ভাবনা ছিল। বাদির বেগ হয়তো কাছেই ছিল। তাঁর সঙ্গীগণ যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারা হয়তো তাদের ঘোড়াগুলোকে কিছু বিশ্রাম দিয়ে তাদের সবল করে তুলে তাঁরই সন্ধান করে ফিরছিল। জাহাঙ্গির মির্জ্জা বাবরের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে হয়তো আখসির কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। তাঁর মাতুল খাঁরাও হয়তো তাঁদের সৈন্যদের নিয়ে কারনানের সড়ক দিয়ে এগুচ্ছিলেন। যদি ইউসুফ বাবরকে বন্দী করে আখসির রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে, ত'হলে ঐ ভাবে বাবরের হিতৈষীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং তারাই বাবরকে ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। বাবরের আত্মচরিতের কতকগুলি পাতা হারিয়ে যাওয়ায় এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও এটুকু বোঝা যায় যে তিনি বিপদমুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর মামা খাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় অবশ্য পরে সেবানি খাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলেন—তাঁদের পরাজয়ের পর বাবর পালিয়েছিলেন মোগলিস্থানের দিকে। মোগলিস্থান বলতে কোন দিক বুঝায় তা অবশ্য ঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা যায় সেটা তাসকেন্দ। কিন্তু সিবাকের আদেশে তাসকেন্দের দিকের রাস্তা অবরুদ্ধ ছিল। হুকুম জারি করা হয়েছিল যে বাবর ও আবুল মকারামকে বন্দী করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে বাবর দুর্গম রাস্তা ধরে সাখ্ এবং হিসারের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়েছিলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে তিনি অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে প্রায় বৎসর খানেক ছিলেন। শুধু যে তিনি গৃহহীন, রাজ্যহীন, ভবঘুরের জীবন যাপন করছিলেন তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। পার্ব্বত্য জাতিদের আনুগত্য ও সহৃদয়তাই তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন অনুচরকে এ সময় রক্ষা করেছিল। বাবরের মা এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর অনুচরদের পরিবারবর্গও তাদের সঙ্গে ছিল।

তারপর বাবর তাঁর ভাগ্যাহত, বুভুক্ষু, ছিন্নবাস অনুচরদের নিয়ে এ দেশ ছাড়লেন শেষবারের মত ১৫০৪ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যাত্রা। কারগানা প্রদেশে দক্ষিণ প্রান্তের সুউচ্চ

পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করার অভিযান সুরু হলো। এই অভিযানের শেষ পরিণতি হিন্দুস্থানে তাইমুর বংশের সাম্রাজ্য স্থাপন। রাজ্যচ্যুত বাবরের এই দুঃসাহসিক যাত্রাই তাইমুরের বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে হিন্দুস্থানে। বাবরের অদম্যসাহসিকতা, উচ্চাভিলাষ, প্রাণ-চাঞ্চল্যের ফলেই ভারত সাম্রাজ্যের মুকুট পরিধান করতে পেরেছেন—তাঁর বংশধর হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, সাজাহান, ঔরংজেব।

বাবরের বয়স তখনও বাইশ পূর্ণ হয়নি। বয়স্কলোকেদের তাকে নিয়ে অবিরাম ষড়যন্ত্র, তাঁর ব্যর্থতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা, অবিরাম বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা তাঁর মনোবল হ্রাস করতে পারেনি, বরং তাঁর উচ্চাভিলাষকে সান্ দিয়ে আরো ধারালো করে তুলেছিল।

তাঁর প্রথম ইচ্ছা ছিল যে তিনি খোরাসানে যাবেন সুলতান হোসেন মির্জ্জার কাছে। সে অভিপ্রায় ত্যাগ করে কাবুলের দিকে যাত্রা করলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাইমুরের বংশধর হিসাবে কাবুলের সিংহাসন দাবী করে আরঘুনদের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবেন। তাঁর খুল্লতাত উলুখ বেগ মির্জ্জা কাবুলির মৃত্যুর পর মাত্র বছর তিনেক আগে কাবুল আরঘুনদের হাতে চলে গিয়েছিল।

যখন বাবর তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিযানের ইতিহাস আবার লিখতে সুরু করেন তখন সেবানি খাঁ সমরকন্দ, বোখারা ও ফারগানা জয় করেছে। সুলতান হোসেন তখন খোরাসানে এবং খসরু সা হিসার ও বাদাকশানের শাসক। জুননান্ বেগ কান্দাহার, সিস্তান এবং হাজারাসদের দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

শরীর গঠন

'বিশ্বশ্রী' মনোতোষ রায়

এই প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হোল শরীর গঠনের কথা—মানে শরীর কি ভাবে তৈরী করতে হয়। অনেকের ধারণা যে ব্যায়াম-চর্চ্চা করলেই শরীর ভাল হবে। ব্যায়াম-চর্চ্চা শরীর গঠনের একটি মাধ্যম হলেও এটাই শরীর গঠনের পক্ষে সব কিছু নয়। এই ব্যায়াম চর্চ্চার সুফল পেতে হলে আমাদের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে ছন্দ মিলিয়ে চলতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ থাওয়া, শোওয়া, খুব ভোরে শয্যা-ত্যাগ করা, বিশ্রাম, রৌদ্র-স্নান, এমনিতে স্নান মালিশ ইত্যাদি বিষয়ে কোন রকম অত্যাচার বা অবিচার না করে আপনার আমার—যার যেমন প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের চাহিদা সুন্দরভাবে মিটিয়ে জীবনে ছন্দ আনতে হবে—আর জীবনের এই ছন্দ আমাদের শরীরকেও করে তুলবে ছন্দময়। কাজেই শরীর-গঠনের ব্যবস্থাটা শুধু ঐ ব্যায়াম-চর্চ্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে—এ ধারণা করলে খুবই ভুল হবে। এমনও অনেক ছেলে-মেয়ে দেখেছি যারা প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অবহেলা করে শুধুমাত্র ব্যায়ামের উপর ভরসা রেখে শরীর ভাল করতে পারেন নি। যারা শুধুমাত্র ব্যায়ামে ভরসা রেখে শরীর গড়তে চেয়েছিলেন—আর আমাদের দেওয়া নিয়ম-নির্দ্দেশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই বলে মনে করেছিলেন, তাঁরা শুধু এই পবিত্র ব্যায়াম-জগৎ থেকেই বিদায় নেন নি, নানা রকম রোগে নিজেও ভুগেছেন, বাড়ীর আর সকলকেও ভুগিয়েছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে মিতালী না করে শুধু ব্যায়াম-চর্চ্চা করলে শরীর ভেঙ্গেই যায়, গড়ে না। এমন কি ধীরে ধীরে অল্প থেকে মারাত্মক রকমের রোগ পর্য্যন্ত আসতে পারে। মোটর গাড়ী কি এমনিতেই চলে? দস্তুর মত তেল জল আরও কত কি দিতে হয়, ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়, বিশ্রাম দিতে হয়—নচেৎ কমজোরী হয়ে যাবে, মরচে ধরে যাবে। ফসলও কি অমনি ফলে? ক্ষেতে চাষী শুধু ফসলের বীজ লাগিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। আগে লাঙ্গল দিয়ে মাটি সরস করে জল ছড়িয়ে অঙ্কুর বের করে, তারপর দরকার মত আগাছা তুলে ফেলে জল-সেচ দেয়—এমন কত কি করে তবে সে আসল শস্য পায়। আমাদের শরীরটাও সেই রকম; শরীরের আর কোন যত্ন না করে যদি খালি ব্যায়াম করে যান, তবে শরীর কেন কম-জোরী হয়ে যাবে না?

ব্যায়ামে মাংসপেশী এবং শিরা-উপশিরাগুলিকে উত্তেজিত ও পরিশ্রান্ত করানো হয় - আর পরিশ্রান্ত

হয় বলেই তখন তাদের খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। খাদ্য পাওয়ার পর এরা বেশ করে বিশ্রাম নিতে চায়। যেমন আপনার আমার বেলায় প্রয়োজন হয়। আমাদের ক্ষিধের সময় যদি আমরা খাবার না পাই তবে মেজাজ যায় বিগড়ে, শক্তি যায় কমে। আবার খাওয়ার পর যদি আপনাকে দৌড়তে বলা হয় বা ২।৩ মাইল হেঁটে কোথাও যেতে হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনার পেটে ব্যথা হবে, হাঁপ ধরবে, এমন কি বমিও হতে পারে। আমাদের শরীরের ভেতরের পেশী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু ও অন্যান্য যন্ত্রাদির বেলায়ও ঠিক তাই। ব্যায়াম করলে সমস্ত শরীরে জোরে রক্ত চলাচল করে, ফলে শরীরের প্রত্যেকটি মাংস-পেশী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু তাদের প্রয়োজনমত খাদ্য বা রক্তরস পায়। এই খাদ্য পাওয়ার পর তাদের মধ্যে বিশ্রামের চাহিদা আসে। এই সময় তারা যদি বিশ্রাম না পায় তবে তারা খাদ্যের সারবস্তু কেমন করে গ্রহণ করবে? ফলে আপনার আমার বেলায় যেমন হয়, সেই জাতীয় ব্যাপার পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির বেলায় হবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সময় মত খাদ্য খাওয়া নেই, উপযুক্ত বিশ্রাম নেই, অথচ ব্যায়াম করে চলেছেন শরীরের উন্নতি-কল্পে, ব্যাস! আর দেখতে হবে না। শরীরের অবনতি খুব শীঘ্রই আসবে। পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি তাদের চাহিদামত খাবার ও বিশ্রাম না পাওয়ার ফলে শরীরে একটা রুক্ষ ভাব দেখা দেয়, মুখ বসে যায়, গলার স্বরে জড়তা আসতে পারে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হতে পারে, রাত্রে ঘুম ভাল হবে না, মেজাজ সব সময় খিটখিটে হবে, আর কেবলই হাই উঠতে থাকবে—এমন আরও কত-কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

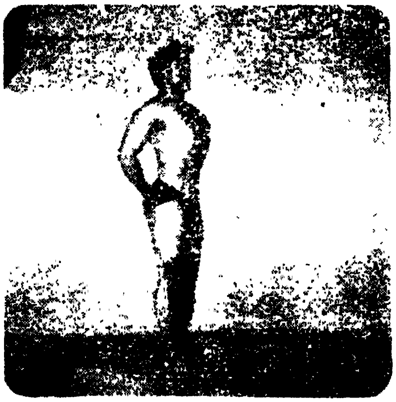
ব্যায়ামের সাথে খাদ্য ও বিশ্রামের আরও একটি বিশেষ যুক্তি আছে। ব্যায়াম করলে শরীরের ভেতর একটা বিষাক্ত বায়ু—যাকে আমরা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বলি, তার সৃষ্টি হয়; এই জন্য আমাদের উচিত খোলামেলা



বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়

জায়গায় ব্যায়াম অভ্যাস করা—যাতে ঐ বিষাক্ত বায়ুর পরিমাণের চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করতে পারি—যা রক্তের সাথে মিশে ঐ বিষাক্ত বায়ুর সাথে লড়াই করে শরীর থেকে তাকে বার করে দেবে। রক্তের এই লড়াই করার জোরটা আসবে পুষ্টিকর খাদ্য থেকে। কাজেই এখন বুঝতে পাচ্ছেন পুষ্টিকর খাদ্যের সাথে সহযোগিতা না রেখে ব্যায়াম করলে কেমন ক্ষতি হতে পারে।

আজকের দিনে পুষ্টিকর খাদ্য প্রসঙ্গে আপনারা অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলবেন জানি। আচ্ছা কম পয়সায়



১নং চিত্র

কি করে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ আনন্দ, খুব ভোরে শয্যাত্যাগ, রৌদ্র-স্নান, তেল-মালিশ ও স্নান ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে নিচ্ছি। শরীরকে ভালভাবে গড়তে হলে এদের সাহায্য চাই-ই চা-ই। ধরুন আনন্দ—ওটার একান্তই দরকার। মনে আনন্দ না থাকলে, স্ফূর্ত্তি না থাকলে ব্যায়ামে একাগ্র-ভাব এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা আসতে পারে না। ব্যায়ামের দ্বারা বা খেলা-ধূলার দ্বারা পরিশ্রম অনুযায়ী যে বিজ্ঞান মতে রক্ত-চলাচল করা উচিত তা হতে পারে না, আবার যে সব পুষ্টিকর খাদ্য খাবেন সেগুলিও ঐ আনন্দহীনতার ফলে শরীরের ভেতরের কতকগুলি যন্ত্রের বিশিষ্ট রসের অভাবে ঠিক মত হজম হবে না। নিরানন্দ মন নিয়ে ব্যায়াম বা খেলা-ধুলার চর্চ্চা করলে শরীরে বেশী করে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই অনেক সময় দেখবেন—অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অশান্তির মধ্যে থেকে ব্যায়াম অভ্যাস করার পর অবসাদ, অস্বস্তি, অশান্তি, উদ্বেগ আরও কত কি দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ অকাল-বার্দ্ধক্যের কবলে পড়তে হয়। আনন্দ এমনই একটা জিনিষ ওটা নিজেই শরীরের এবং মনের পক্ষে একটা পুষ্টিকর খাদ্য। এই আনন্দ বস্তুটি শরীরের সমস্ত স্নায়ু ও গ্রন্থিকে সজীব রাখে। কাজেই সব সময় এর সাথে বন্ধুত্বটা বজায় রাখতে চেষ্টা করবেন।

তারপর ধরুন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার মধ্যে শরীর ও মনের নিঃঝঞ্ঝাটের একটা ইঙ্গিত আছে। আলস্য বস্তুটি শরীর গঠনের পক্ষে খুব অনিষ্টকর। এই আলস্যকে পরাস্ত করে প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়ালে পেশী স্নায়ু প্রভৃতি সবল ও কর্ম্মক্ষম হয়। আর ভোরের বায়ুতে এমন একটা বিশুদ্ধতা থাকে যা সারা দিনে রাত্তিরেও পাওয়া যায় না—অথচ শরীর গঠনের পক্ষে এই বায়ু একান্তই দরকার।

এরপর ধরুন রৌদ্র-স্নান। ওটাও খুব দরকার স্বাস্থ্যের পক্ষে। বাতাস থেকে খাদ্য থেকে কত রোগের বীজাণু প্রতিনিয়ত শরীরের ভেতর ঢুকে যায়, তার ছায়া প্রকাশ পায় গায়ের চামড়ার ওপর। সকালে যদি তেল মাখবার আগে ১৫।২০ মিনিট খালি গায়ে রোদে থাকতে পারেন তবে অনেক উপকার পাবেন। মাথায় রোদটা লাগাবেন না, মাথা ঢেকে রাখবেন। এর ফলে চামড়া মসৃণ হবে, অনেক রোগের বীজাণু ধ্বংস হবে এবং শরীরে ভাইটামিন 'ডি'এর প্রাচুর্য্য বাড়বে। যে কোন চর্ম্মরোগে এই রৌদ্র-স্নান খুব উপকারী।

এবার আসুন "মালিশ" প্রসঙ্গে। অনেকেই স্নানের সময় তাড়াতাড়ি করে গায়ে কোন রকমে একটু তেল লাগিয়ে বা না লাগিয়ে স্নান করেন। এটা কিন্তু খুব খারাপ অভ্যাস। শরীরকে যাঁরা সুন্দর করে গড়তে চান



২নং চিত্র

তাঁরা প্রত্যেক দিন অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট বেশ করে সরষের তেল মোটামুটি প্রথা মত ঘষে কাঁপিয়ে, টিপে

টিপে বেশ করে মালিশ করে তবে স্নান করবেন। এতে ব্যায়ামের ফলে সে সব মাংসপেশী বা শিরা ইত্যাদি কোন কারণে কম রক্ত-রস পেয়েছিল—ঐ মালিশের ফলে তারা বাকীটুকু পেয়ে পুষ্টি লাভ করে। তা



৩নং চিত্র

ছাড়া এতে চামড়া ও পেশী মসৃণ ও নরম হয়ে ওদের জীবনী শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়, আর দেখতেও সুশ্রী হয়। শীতকালে কাঁচা হলুদ বেটে সরষের তেলে মিশিয়ে একটু গরম করে গায়ে মালিশ করে তারপর সাবান দিয়ে স্নান করে নিয়ে, পরে সারা গায়ে ১০ ভাগ জল আর ৩০ ভাগ গ্লিসারিণ খুব করে মিশিয়ে নিয়ে মাখবেন। দেখবেন গায়ের চামড়া কি অদ্ভুত চকচকে থাকবে, কখনো খসখসে হবে না, ফাটবে না বা খোস-পাঁচড়াও হবে না।

এবারে খাদ্যের কথা বলছি। ধরুন সকালে বা বিকালে ঘোনের সাথে নিজের রুচিমত টমাটোর রস, একটু আদার রস ও একটু নুন মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় পান করবেন—এটা খুব পুষ্টিকর খাদ্য। পরিমাণ মত খাবেন—দাস্ত পরিস্কার থাকবে, গায়ে বল আসবে।

এরপর ধরুন, পাঁচমিশালী শাকসব্জি—মাত্র বেগুন, কুমড়ো, মূলো বাদ দিয়ে—বিট, গাজর, আলু, পিঁয়াজ, কপি ইত্যাদি টুকরো করে কেটে, বাড়ীতে একটু ঘি, মাখন বা তেল দিয়ে একটু বেশীপরিমাণ আদাবাটা দিয়ে সাঁতলে নিয়ে সব্জিগুলি ঢেলে দিয়ে মাথা পিছু ১ পোয়া জল দিয়ে বাড়তী ১½ পোয়া জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। বাড়তী জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নেবেন। সেদ্ধ করার সময় নুন দেবেন না, কারণ ভিটামিন 'বি' এর ভাগ নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই নামিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় একটু নুন মিশিয়ে সেই জল—মানে সুপটা খাবারের আগে খেলে হজমের রস পরিমাণমত পাকস্থলীতে এসে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যগুলিকে হজম করতে সাহায্য করবে, আর শরীরও খুব ভাল হবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকলে রুচিমত ঐ সব্জীগুলিও খেতে পারেন কোষ্ঠ পরিস্কার থাকবে।

তারপর বিকেলে গাজর নারকেলের মত কুরে নিয়ে দুধ দিয়ে বা জল দিয়ে হালুয়া করে খেতে পারেন। এই হালুয়া করবার প্রক্রিয়া সুজির হালুয়ার মতই। এই খাদ্য-টিও আপনাকে প্রচুর পুষ্টি দেবে।

আর ব্যায়ামের সময় ½ গ্লাস অল্প গরম জলে ২।৩ চামচ মধু মিশিয়ে একটু একটু করে খাবেন। এতে ব্যায়াম করার সময় সতেজতা আসবে—অবসাদ দূর হবে।

আবার কোন কোন দিন বিকালে দই-টমেটো একত্রে বেশ করে চটকিয়ে পরিমাণমত জলে গুলে ছেঁকে নেবেন। এবার পরিমাণ মত ২।৩ চামচ মধু মিশিয়ে সরবৎ করে খেতে পারেন। এতে পেট ঠাণ্ডা রাখবে এবং পেশী শিরা উপশিরা সব বেশ মজবুত থাকবে।

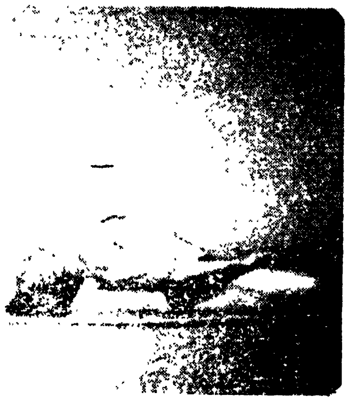
তাহলে এবার আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে এই রক্ত-মাংসে গড়া শরীরটাকে গড়তে কেবল ব্যায়ামচর্চ্চা বা খেলাধুলা বা খাদ্যখাওয়াই একমাত্র বন্ধু নয়—সবার সাথেই সবার একটা যোগাযোগ রয়েছে, কোন কিছুকেই বাদ



৪ং চিত্র

দেওয়া চলবেনা—তবেই শরীরচর্চ্চা করলে শরীর গড়ে উঠবে—নচেৎ অসম্ভব।

সুতরাং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কয়েকটি



৫নং চিত্র

ব্যায়ামের নির্দেশ দিচ্ছি। নিয়মিত অভ্যাস করলে সুফল পাবেন।

1. Breathing—10 times
2. Sidecrossing—(8 × 2) 2 to 3 sets.
3. Hands up Squat—2 to 3 sets
4 সর্ব্বাঙ্গাসন
5. মৎস্যাসন　(30—30) 3 sets
6. অর্দ্ধকুর্ম্মাসন
7 ভুজঙ্গাসন
8. Legrising—(5 × 2) 3 sets
9. শবাসন—10 minmtes

উল্লিখিত ব্যায়ামের কয়েকটি সাঙ্কেতিক কথা আছে, প্রথমে সেগুলির ব্যাখ্যা করে নিয়ে সংক্ষেপে ব্যায়ামগুলির বিবরণ দিচ্ছি।

প্রথমতঃ জেনে রাখুন 'Set' মানে বার বা দফে এবং এক এক সেটে নিজের সাধ্যানুযায়ী যতবার আপনি করতে পারেন তাকে বলা হয় বা পুনরাবৃত্তি। আর ৪, ৫, ৬, ৭ নম্বর ব্যায়ামগুলির পাশে (৩০—৩০) ৩ বলে যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে তার অর্থ হোল ৩০ সেকেণ্ড সহজ স্বাভাবিক ভাবে দম ছাড়া-নেওয়া করে আসল অভ্যাসের পর ৩০ সেকেণ্ড শবাসনে বিশ্রাম নেবেন। এভাবে প্রতিটি আসন ৩ বার করে অভ্যাস করবেন।

1. Breathing—চিত্রানুযায়ী দাঁড়ান। প্রথমে দম ছেড়ে দিয়ে, তারপর চিত্রানুযায়ী পেট টেনে বুক উঁচু করতে করতে খুব ধীরে ধীরে নাক ফুলিয়ে দম নিন এবং ধীরে ধীরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে পেট ও বুক শিথিল করুন। মনে রাখুন প্রতি ব্যায়ামেই এভাবে নাক দিয়ে দম নিন ও ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছাড়ুন—১০ বার করুন। এতে বুকের খাঁচা ও ফুসফুসের উপকার হয়।

2. Side Crossing—চিত্রানুযায়ী পা ফাঁক করে দাঁড়ান এবং হাত কাঁধের সমান্তরালে পাশাপাশি লম্বা করে রাখুন। প্রথমে দম নিন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে চিত্রানুরূপ ভঙ্গীতে আসুন এবং আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যান। অপর পার্শ্বেও ঐ একই ভাবে করুন—এভাবে ১৬



৬নং চিত্র

বার করে ৩ সেট করবেন এতে মেরুদণ্ড ও কিডনী ভাল থাকে।

3. Hands up squat—১ হাত ফাঁক করে



৭নং চিত্র

দাঁড়ান। মুঠো করে—দম নিতে নিতে চিত্রানুরূপ হাত মাথার উপর তুলে শিরদাঁড়া সোজা রেখে গোড়ালির



৮নং চিত্র

উপর বসুন। দম ছাড়তে ছাড়তে—হাত নামাতে নামাতে উঠে দাঁড়ান। এতে পায়ের জোর ও পুষ্টি আসে, বুকের খাঁচা, শিরদাঁড়া ও হাতের উন্নতি হয়।

4. বিপরীতকরণী—চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। চিত্রানুযায়ী পা তুলে হাত দিয়ে কোমরে ভর রাখুন এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত সময় থেকে শবাসনে বিশ্রাম করুন। এতে থাইরয়েড ও টনসিলের যথেষ্ট উপকার হয় এবং এছাড়া সর্ব্ব অঙ্গেরই ব্যায়াম হয়।

5. মৎস্যাসন—পদ্মাসন করে হাতের উপর ভর রেখে চিত্রানুরূপ মাথা উল্টিয়ে বুক উঁচু করে শুয়ে পড়ুন—হাত দিয়ে পায়ের বুড়া আঙুল ধরুন বা হাত মাটিতে রাখুন। নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে শবাসনে বিশ্রাম নিন। এতে বুকের খাঁচার যাবতীয় ত্রুটি দূর করে এবং ফুসফুসের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।

6. অর্দ্ধকূর্ম্মাসন—হাঁটু মুড়ে বসে চিত্রানুরূপ হাত লম্বা করে নমস্কারের ভঙ্গীতে থাকুন। নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে শবাসনে বিশ্রাম নিন।

এতে কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটে বায়ু, বুক ধড়ফড়ানি দূর হতে সাহায্য করে।

7. ভুজঙ্গাসন—উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের কাছে হাত রেখে চিত্রানুযায়ী শরীরের উপর-অংশ তুলে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকার পর শবাসনে বিশ্রাম নিন।

এতে বিভিন্ন ধরণের স্ত্রীরোগ দূর হয় এবং হাতের ও কোমরের শক্তি বাড়ে ও বুকের সৌন্দর্য্য বজায় থাকে।

8. Leg-rising—কোন একটি উঁচু কিছুর উপর চিত্রানুরূপ শুয়ে পড়ুন। এবার দম নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে মাথা তুলে হাঁটুতে লাগান, আবার দম নিতে নিতে চিত্রানুরূপ শুয়ে হাত দিয়ে বেঞ্চিটিকে ধরে দম ছাড়তে ছাড়তে পা দুটোকে যথাসম্ভব মাথার উপর তুলুন। আবার চিত্রের অবস্থায় ফিরে আসুন। এই ভাবে দুবার হোল। এতে পেটের চর্ব্বি কমতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

দ্রঃ—সব ব্যায়ামের শেষে ১০ মিঃ বিশ্রাম নিন।

আবার ডাকলে কেন ?

মায়া বসু

আবার ডাকলে কেন ? বৈশাখের তাপদগ্ধ ভরা
ছায়াহীন মধ্য দিনে ? বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পত্র ঝরা
অশান্ত সময়ে ? ধূলি-ওড়া উত্তপ্ত হাওয়ার
সেতারে কী সুর বাজে ? যেন এক তীব্র যন্ত্রণার
তীর-বেঁধা স্পর্শ এনে ছুঁয়ে যায় ব্যথাদীর্ণ মনে
প্রতীক্ষার ক্ষীণদীপ নিভে আসা অন্ধ বাতায়নে !

আষাঢ়ের বারি-ঝরা মায়া রাতে মল্লারের সুর—
কখন গিয়েছে থেমে। শরতের স্বপ্ন ভারাতুর
শেফালীও ঝরে গেছে। হেমন্তের উদাসীন মন,
বৈরাগ্যের দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীকে করেছে উন্মন
তার পর বসন্তের মুকুলিত মল্লিকার বনে
মঞ্জরীর সমারোহ ! কৃষ্ণচূড়া শিরীষে রঙ্গণে
কী যে প্রাণ চঞ্চলতা। কী আকুলতায়
বসন্তের মত্ত বায়ু উদ্বেলিত অরণ্য শাখায়
দোলা দিয়ে চলে যায়। শুধু সে আমার তরে নয়—
প্রত্যাশার দীর্ঘরাত জাগে বৃথা ব্যাকুল হৃদয়।
দূর হতে ভেসে আসে নিখিল বিরহী বক্ষ জুড়ে,
বসন্ত পঞ্চমে বাঁশী বেজে ওঠে বিলম্বিত সুরে।

আমি তো ছিলাম কাছে। বুকে ভরে সুতীব্র তৃষ্ণার
অনির্বাণ পিপাসিত জীবনের ব্যর্থ হাহাকার।
আজ এই রৌদ্রখর দীপ্তোজ্জ্বল বৈশাখের দিনে
সান্ত্বনার মেঘস্পর্শ কেন রাখো এ মরু জীবনে ?
মরীচিকা হয়ে থাক আকাঙ্ক্ষার তীব্র যন্ত্রণাও—
তবু আমি সে তো নই !
—আজ তুমি যাকে ফিরে চাও।

গল্প

ব্যবসা

চারুলতা রায়চৌধুরী

সংসারে তারা তিনটি মানুষ। বাপ, মা ও মেয়ে। ধনী নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, স্বচ্ছল অবস্থা। মেয়ের বয়স ১৮র বেশী হ'বে না। দেখতে সুন্দরী। কোন একটি কলেজে আই-এ পড়ে। সারাদিনের পর গৃহে ফিরে মার কাছে গৃহ-কর্ম্ম শেখে ও মায়ের কাজে সাহায্য করে। নাম শর্ম্মিলা। বাপ মায়ের একটি মাত্র সন্তান, বিশেষ আদরের পাত্রী। সন্ধ্যেবেলা বাপ অফিস থেকে ফিরলে গল্প-গুজব হয়। কোন দিন সবাই মিলে ভ্রমণে বার হন অথবা সিনেমা দেখতে যান। সবশুদ্ধ মিলে বেশ একটি আনন্দপূর্ণ স্নিগ্ধ পরিবেশ।

কোন একজন মানুষকে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস কোরতে দেখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—অন্য আর একজন সেটা সহ্য কোরতে পারে না। তার মনে হিংসার উদয় হয়, সে ভাবে আমার কেন এমনটি হল না। এটা হ'ল সংসারের নিয়ম, সুতরাং এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু ভাগ্যদেবী যখন বিশেষ ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য কোরতে না পেরে তার প্রতি বিরূপ হন, তখনই হয় সর্ব্বনাশের গোড়া-পত্তন।

এই ক্ষুদ্র পরিবারটির ওপর ভাগ্যের কুদৃষ্টি এসে পড়ল হঠাৎ একদিন। কর্ত্তা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। রোগ কার ঘরে বা নেই, তাই প্রথম কয়েক-দিন কেহই বিশেষ বিচলিত হননি। সেবা যত্ন যা করবার মায়ে ও মেয়েতে মিলে কোরছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও রোগের প্রকোপকে যখন কমান গেল না তখন তাঁরা ভয় পেলেন। বদ্যি এল বাড়ীতে। মত প্রকাশ কোরলেন রোগ সাধারণ জাতের নয়। অতি মাত্রায় শুশ্রূষার প্রয়োজন।

বাড়ীর সামনেই ছিল এক দোকান ঘর। তার ওপর তলায় বাস কোরতেন কোন একটি যুবক। এ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে শর্ম্মিলাদের বাড়ীর কোন যোগাযোগ ঘটেনি। পথে যেতে আসতে দেখা হত মাত্র। অসুখের সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূচনা হ'ল। তিনি নিজে থেকে সাহায্য কোরতে এগিয়ে এলেন। বোললেন, "আমি আপনাদের বাড়ীর সামনেই থাকি। যখন যা প্রয়োজন হবে বোলতে দ্বিধা কোরবেন না। পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে এইটুকু সৌহার্দ্দ্য না থাকলে আমরা মানুষ কিসের।"

শর্ম্মিলাদের বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আসতেন তাঁরা সহানুভূতি দেখিয়ে চলে যেতেন। তাঁদের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যেত না। তাই এই যুবকের অযাচিত প্রস্তাব শর্ম্মিলার মা সাগ্রহে গ্রহণ কোরলেন। দিনের বেলা ভদ্রলোক কাজে থাকতেন, সন্ধ্যাবেলা এসে রোগীর পথ্য ও সেবার সমস্ত ভার গ্রহণ কোরতেন। শর্ম্মিলার মা বোলতেন, "তুমি যা কোরলে বাবা, তা চিরদিন মনে থাকবে। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর চেয়ে বেশী কোরতে পারত না এ আমি ঠিক বোলতে পারি। যুবক কুণ্ঠা প্রকাশ কোরে বোলত, "আপনি কি যে বলেন, বিপদের দিনে মানুষের জন্য মানুষ এটুকু কোরেই থাকে।"

তিনটি প্রাণীর অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও শর্ম্মিলার বাবার রোগের কোন উপশম হ'ল না এবং একদিন তিনি আনন্দপূর্ণ গৃহকে নিরানন্দময় কোরে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। প্রথম ধাক্কাটা লাগল বড় বেশী—মা ও মেয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। যা কিছু করণীয় কোরলেন পাড়ার ঐ যুবক।

একটু সুস্থ হ'লে শর্ম্মিলার মার মনে হ'ল—এটা অপরের প্রতি অন্যায় জুলুম। একদিন তিনি তাকে কাছে ডেকে বোললেন, "বাবা তোমার ঋণ শোধ হ'বার নয়। তোমার কাজ-কর্ম্মে বাধা হয়ে আর ঋণ বাড়াতে ইচ্ছা করি না। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা হবে, কিন্তু আমাদের জন্য তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়।"

যুবক উত্তর কোরলে, "আপনি তাড়িয়ে দিলেও আমি যাচ্ছি না। মা-হারা মানুষ, মা যখন পেয়েছি ছাড়তে কি মন চায় ?"

"কিন্তু তুমি যে কাজ কর বাবা। আমাদের জন্য কিছু সময় তো নষ্ট হয় তোমার, তাই ভয় পাই"—বোললেন শর্ম্মিলার মা।

তার উত্তরে যুবক বোললে, "ওঃ, ব্যবসার কথা বোলছেন ? সে ঠিক চলে যাবে, আপনি কিছু চিন্তা কোরবেন না।"

ভদ্রলোকের নামের পরিচয় হ'ল সুবোধ। ধীর গতিতে এই সুবোধ গৃহমধ্যে নিজের বেশ একটি স্থান কোরে নিলে। শর্ম্মিলাদের অভিভাবক বোলতে এখন সেই। পারিবারিক কোন কাজই সুবোধের পরামর্শ ব্যতিরেকে হয় না। প্রতিদিন দুবেলা শর্ম্মিলাদের বাড়ী আসা সুবোধের কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অকস্মাৎ সেই সুবোধ যখন আসা একেবারে কমিয়ে দিলে শর্ম্মিলার মা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল—হয়তো তাঁদের কোন ব্যবহারে সে ব্যথা পেয়েছে। সুবোধ এখন এমন সময়টি বেছে নিয়ে আসে যখন শর্ম্মিলা বাড়ীতে থাকে না। এটিও তাঁর লক্ষ্য এড়ায় নি। একদিন সুবোধ এলে তিনি তাকে বোললেন—"বাবা সুবোধ, কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আমাদের কাছে থেকে দূরে চলে যেতে চাইছ। অজান্তে আমরা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় কোরে ফেলেছি ?"

সুবোধ বোললেন, "ছি, ছি, আপনি কি যে বলেন। আসি না যে বেশী, তার অন্য কারণ আছে।"

মা বোললেন, "বোলতে যদি বাধা না থাকে তবে আমার কাছে কারণটি খুলে বলো।"

সুবোধ বোললে, "বলা যে কঠিন, তাই তো এতদিন আপনার কাছে মুখ খুলতে সাহস পাই নি। ব্যাপার কি জানেন ? আমাদের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য জন্মেছে লোকে সেটা সইতে পারছে না। শর্ম্মিলাকে নিয়ে বাইরে নানা বিশ্রী আলোচনা চলেছে। সেটা শুনতে আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। তাই দূরে থাকাই শ্রেয় মনে কোরছি।"

শর্ম্মিলার মা খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে থেকে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বোললেন, "এখন উপায় ? বিপদের দিনে যাকে বড় আপন কোরে পেলাম, লোক-নিন্দার ভয়ে তাকে কি দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ?"

সুবোধ একটু চুপ কোরে থেকে বোললে, "উপায় একটা আছে মা, কিন্তু বলি কি কোরে তাই ভাবছি।"

মা বোললেন—"লোকে যাই বলুক, আমার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ তাতে বোলতে বাধা কি বাবা ?"

সুবোধ বোললে, "ভরসা যখন পেলাম তখন বোলব। সব গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হয় শর্ম্মিলাকে যদি আমি স্ত্রীরূপে পাই।"

মা উৎফুল্ল হয়ে বোললেন, "সে তো শর্ম্মিলার সৌভাগ্য। আমায় এ কথা এতদিন মনে হয়নি কেন তাই ভাবছি।"

শুক্ল-বৎসর কেটে গেলেই সুবোধের হাতে মেয়েকে সমর্পণ কোরে মা নিশ্চিন্ত হলেন। মনে মনে সঙ্কল্প কোরলেন—মেয়েকে গৃহস্থালীর কাজে আর একটু পাকা কোরে দিয়ে তিনি কিছু দিনের মত তীর্থভ্রমণে বার হবেন। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার পূর্ব্বেই জামাই এসে জানালেন—ব্যবসার খাতিরে তাঁকে দমদমার দিকে বাড়ী নিতে হয়েছে, উপস্থিতের মত স্ত্রীকে নিয়ে তিনি সেখানে গিয়ে থাকবেন। না বলবার অধিকার নেই, সুতরাং মত দিতে হ'ল। অগত্যা তখনকার মত তীর্থ-যাত্রার ইচ্ছা স্থগিত রইল। স্বামীর স্মৃতিপূর্ণ গৃহকে শূন্য রেখে যেতে তাঁর মন চাইল না।

প্রকাণ্ড একটা বাগান-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সুবোধ শর্ম্মিলাকে বোললে, "এই তোমার বাড়ী, এইখানে তুমি থাকবে।"

শর্ম্মিলা প্রশ্ন কোরলে, "শুধু আমারই, তোমার নয় ?"

সুবোধ একটু কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে উত্তর কোরলে, "হ্যাঁ, তোমার যখন তখন আমারও বৈকি।"

বাড়ীতে তৈজস-পত্রের অভাব ছিল না। বেশ সাজান-গোছান জমকাল আবেষ্টনী। শর্ম্মিলার কেমন যেন একটু ধাঁধা লেগে গেল। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বোললে, "এ সবই কি তোমার ?"

সুবোধ মুচকি হেসে পাল্টি জবাব দিলে, "হ্যাঁ সবই তোমার।"

শর্ম্মিলা অনুযোগের সুরে বোললে, "তোমার এত সব সামগ্রী, এতবড় কারবার—তা তো কই তুমি আমাদের বলনি? আমি গরীবের ঘরের মেয়ে, এসব জাঁক-জমকের মধ্যে আমাকে মানাবে কেন?"

এর উত্তরে সুবোধ বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ কোরে বোললে, "সে ভাবনা আমার, তোমার ভাবতে হবে না। এত সব সৌখীন জিনিস-পত্র দেখে কোথায় খুসী হবে, তা না এসেই ভ্যানর-ভ্যানর সুরু কোরলে।"

এর পূর্ব্বে সুবোধ কখন শর্ম্মিলার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলেনি, তাই তার সবই কেমন বেসুর বাজল। সে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তারপর অন্যত্র চলে গেল।

অধিকাংশ দিনই সুবোধ দুপুরেরি আহার শেষ কোরে বেরিয়ে যায়, বাড়ী ফেরে বেশ রাত কোরে। প্রশ্ন কোরলে বলে "কোরব কি? কাজের ধান্ধায় ঘুরতে হয় যে। তোমাদের মত গদিয়ান হয়ে বসে থাকলে দুনিয়া চলবে কি কোরে?"

কথার ঝাঁজ শুনে শর্ম্মিলা আর কথা বাড়ায় না, চুপ কোরে যায়। কিন্তু স্বামীর এই নতুন ব্যবহারে মনে তার কেমন একটা খট্‌কা লেগে রইল। কোন মতেই যখন শান্তি খুঁজে পেলে না, তখন নিজেকে স্তোক দিলে এই ব'লে, "হয় তো পরিশ্রম বেড়েছে তাই মেজাজ খারাপ।"

নতুন বাড়ীতে আসার মাসখানেক বাদে সুবোধ একদিন স্ত্রীকে এসে বোললে, "দেখ হঠাৎ একটা জরুরী কাজে পড়ে গেছি, ফিরতে কত দেরী হবে বোলতে পারি না। এদিকে আমার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে। আমি খাদ্যসামগ্রী সব পাঠিয়ে দেব। তুমি তাঁকে আদর-আপ্যায়ন কোরো। মানী লোক, আমার ব্যবসার সঙ্গে তাঁর যোগ আছে, তাঁকে খুসী করা দরকার।"

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে প্রকাণ্ড একখানি মোটর গাড়ী শর্ম্মিলাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নামলেন মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ। বেশ-ভূষায় বেশ একটু পারিপাট্য। ফিনফিনে কোঁচান ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী এবং আনুসঙ্গিক আরও অনেক কিছু। অন্তরে বাহিরে রসের প্রকাশ। আতরের সুবাসও তার উগ্র গন্ধকে চাপা দিতে পারেনি। তিনি যখন মিষ্টি হেসে শর্ম্মিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বোললেন—"বাঃ", শর্ম্মিলার সমস্ত অন্তরাত্মা তখন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। সে পিছিয়ে ঘরে প্রবেশ কোরে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি অতি-পরিচিতের মত এগিয়ে এসে তার হাতটি ধরে ফেলে বোললে, "লুকোচুরি খেলছ কেন বিবিজান? অমন যে প্রাণ-মাতান রূপ, একটু ভাল কোরে দেখবার অবসর দাও।" তারপর চোখের ভঙ্গীতে এমন একটি কুৎসিত ইসারা কোরলে—যাতে শর্ম্মিলা সমস্ত শরীরে বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব কোরলে। সে গর্জ্জে উঠে বোললে, "হাত ছেড়ে দিন বোলছি, তা নইলে ভাল হ'বে না।"

লোকটি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বোললে, "ওরে বাবা, এ যে দেখি একেবারে ফণীনী! কুছ পারওয়া নেহি, আমিও সাপ খেলাতে জানি।" পরক্ষণে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা; নিবিড় আলিঙ্গনে সে তাকে জড়িয়ে ধরলে। শর্ম্মিলার তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। বহু চেষ্টাতেও নিজেকে মুক্ত কোরতে না পেরে "মাগো" বোলে চীৎকার কোরে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তার মাথা লোকটির কাঁধে হেলে পড়ায় সে বোললে, "এই তো বাবা, তবে নাকি তুমি প্রেম কোরতে জান না। এতক্ষণ কি খেলিয়ে দেখছিলে?" কিন্তু শর্ম্মিলার দিক থেকে কোন সাড়া না আসায় সন্দিগ্ধ চিত্তে সে তাকে ফরাসে শুইয়ে ফেললে এবং তার ঐ চেতনাহীন অবস্থা দেখে বিরক্তভাবে "ধেৎ" বোলে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

গভীর রাত্রে অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে স্বামী যখন বাড়ী ফিরলেন—শর্ম্মিলা তখনও বালিশে মুখ গুঁজে চুপ কোরে শুয়ে আছে। সুবোধ তার মক্কেলের কাছে সবই শুনেছে। রুক্ষ স্বরে স্ত্রীকে উদ্দেশ কোরে বোললে, "খুব কীর্ত্তি তো কোরেছ। এখন আর ন্যাকামি কোরতে হবে না, ঢের হয়েছে।" স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে শর্ম্মিলা উঠে বসল এবং উত্তপ্ত সুরে জবাব কোরলে, "যে লোক পর-স্ত্রীর সম্মান রাখতে জানে না, তাকে তুমি বাড়ীতে আসতে দাও কি বোলে?"

স্বামী ব্যাঙ্গ কোরে বোললে. "ওরে বাসরে, ভারি মানীনী এসেছ দেখছি যে। বন্ধু লোক—একটু হাত ধরেছে তো হয়েছে কি? অমন একটি জাঁদরেল মক্কেল তাড়িয়ে এখন. আবার কথা বলা হচ্ছে। শর্ম্মিলার চোখে-মুখে

তখন আগুন জলছে। সে ক্ষিপ্তের মত দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন কোরলে, "কি বোললে।"

সুবোধ আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। স্ত্রীকে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে বোললে—"এই বোললাম।"

এর পর শর্ম্মিলা আর কোন কথা বলা প্রয়োজন বোধ কোরলে না। সে বুঝলে তার স্বামীর ব্যবসা কি? কেমন কোরে এই নরক থেকে উদ্ধার পাবে এই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা।

স্বামী তার স্ত্রীর মনের অবস্থা কতক পরিমাণে আন্দাজ কোরতে পারলে। এরপর থেকে তাই বাহিরে বার হ'তে হলেই স্ত্রীকে তালা-চাবির মধ্যে রেখে পালাবার পথ বন্ধ কোরে যেত। কিন্তু একদিন সুযোগ জুটে গেল এবং সে সুযোগ শর্ম্মিলার স্বামীই এনে দিলে। স্বরটা নরম কোরে বোললে এসে স্ত্রীকে—"দেখ বড় বিপদে পড়ে গেছি। আজ আমার কাছে কয়েকজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসবার কথা আছে। তাঁরা আমার কাজে বহু রকম সাহায্য কোরে থাকেন। অথচ এমনি কপাল, আজকেই আমার বিশেষ দরকারে বাইরে যেতে হচ্ছে। যদি আমার অনুপস্থিতি কালে তাঁরা এসে পড়েন তুমি রইলে—তাঁদের তত্ত্বাবধান কোরতে। ঠাট্টার সম্পর্ক, সুতরাং তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা মস্করা কোরলে তুমি যেন রেগে যেও না। আজকের যুগে ওসব চল্‌তি হয়ে গেছে, ওতে কেউ কিছু মনে করে না। কথা বোলছ না যে? যা বোললাম বুঝলে তো?

শর্ম্মিলা শুধু ঘাড় নাড়লে, কোন কথা কইলে না। স্বামী বাহিরে যাবার পূর্ব্বে সে বেশ পরিবর্ত্তন কোরে এল। তার সাজের পারিপাট্য দেখে সুবোধ মনে মনে মহা খুশী হয়ে ভাবলে, "প্রহারে কাজ হয়েছে দেখছি" এবং অভ্যাগতরা আসবার কিছু আগে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

শর্ম্মিলা আজ প্রস্তুত ছিল। ফটকে গাড়ী প্রবেশ করা মাত্র সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। অদৃষ্টগুণে সামনেই একটি খালি ট্যাক্সি দেখতে পেলে। তাতে চড়ে বসে পৈত্রিক বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে বোললে "চলো।"

বাড়ী পৌঁছে মাকে জড়িয়ে ধরে তার সে কি কান্না। মা তো তাকে একা ঐ অবস্থায় দেখে অবাক। তিনি তাকে যত জিজ্ঞাসা করেন, "কি হয়েছে বল" সে শুধু কাঁদে, কিছু বোলতে পারে না। মা বুঝলেন—এখন প্রশ্ন করা বৃথা, তাই মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ কোরে বসে রইলেন। কান্নার বেগ রোধ কোরতে যখন পারলে—শর্ম্মিলা তাঁকে সব কথা জানিয়ে বোললে, "আবার যদি এসে তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহ'লে আমি যে মরে যাব মাগো।"

মার চক্ষু দিয়ে তখন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে। আহত সিংহিনীর মত গর্জ্জন কোরে উঠে তিনি বোললেন, "কি? ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? কে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? আসুক না দেখি কে আসে!"

নিলর্জ্জের মত এল সে ঠিকই। বোললে, "আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি।"

বিকৃত কণ্ঠে মা উত্তর কোরলেন, "তোমার স্ত্রী? কে তোমার স্ত্রী? তোমার স্ত্রী এখানে কেউ নেই। ভদ্রবেশী লম্পট কোথাকার! সাধু সেজে আমার ঘরে সিঁদ্ কাটতে এসেছিলে? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।"

জবাব এল—"শর্ম্মিলাকে পেলেই চলে যাব, তার আগে নয়।"

মা জোর দিয়েই বোললেন, "তাকে পাবে না।"

সুবোধ প্রশ্ন কোরলে, "শর্ম্মিলা এখানে নেই?"

মা উত্তর দিলেন, "আছে, কিন্তু তোমার সঙ্গে সে যাবে না।"

সে বোললে, "আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব, আপনি বাধা দেবার কে?"

মার আর সহ্য হ'ল না। তিনি উত্তেজিত স্বরে উত্তর কোরলেন, "দেখ বাপু, ভাল চাও তো গোল না কোরে বেরিয়ে যাও। তা নইলে আমায় রাম সিংকে ডাকতে হবে।" রাম সিং তাঁর স্বামীর আমলের পুরাতন ভৃত্য।

সুবোধ বোললে, "বেশ এমনি না ছাড়েন আমি আইনের সাহায্য নেব।"

"তাই নিও" বোলে উন্মুক্ত দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে তিনি বোললেন, "আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়, যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।" তারপর উচ্চ কণ্ঠে, 'রামসিং' বোলে ডাক দিতেই সুবোধ আর দ্বিরুক্তি না কোরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল এবং তিনিও সশব্দে কবাট বন্ধ কোরলেন।

বিভূতিভূষণ-স্রষ্টা ও 'পথেরপাঁচালী'

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর তিরিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব এক বিস্ময়। এই বিস্ময়ের কারণ দুটি—প্রথমতঃ তিনি মধ্যাহ্নের তপ্ত-উত্তেজনার মধ্যেও গান ধরেছেন গোধূলির শান্ত সুরে; আর দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এই গানের নেপথ্য-প্রেরণ ছিল বিস্ময় ও রহস্যের সহজ-অনুভূতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালী পাঠক-সমাজকেও সকলে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছেন তাঁর সৃষ্ট বিস্ময় আর রহস্যে-ভরা জগতের–নিবিড় লোকে।

স্রষ্টার সৃষ্টির অভিনবত্ব বা বিস্ময় উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন সৃষ্টিকালের পটভূমিকা বিশ্লেষণ। সাধনার তপস্যা—পর্ব্বের আলোচনা বা সন্ধান-প্রচেষ্টাকে সতর্কতার সঙ্গে বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে, বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত;—"পথের পাঁচালীতে" এর যাত্রা সুরু, আর "কুশল পাহাড়ীতে" এর বিরতি। এই কাল পরিধির অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ-রূপটির দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে এই এ'কুশ বছরে বাংলা দেশকে অগ্রসর হ'তে হয়েছে বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে। দেশ-কালের পূর্ব্বসূত্র ধ'রার চেষ্টায় ১৯২৯এর আগে আরও কিছুটা উজিয়ে গেলে দেখা যাবে উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পবিবর্ত্তিত হয়েছে বিশ-শতকের প্রথম দশকে—আপোষবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদে। আবার পরিবর্ত্তন ১৯২১ সালে—অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে। এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে মূলতঃ বাংলা-দেশ থেকে, আর সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের তটে—তটে। আবার এরই মধ্যে ইউরোপের পূর্ব্ব-প্রান্তিক দেশে ঘটে গেছে এক অভূত-পূর্ব্ব, অচিন্ত্যনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা, সে ঘটনা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭)। স্পর্শকাতর বাংলাদেশের গণসমাজে আঘাত করল তার ঢেউ, সাম্যবাদের নূতন চেতনা ও নূতন সুর লাগল বাঙ্গালীর হৃদয়ে। এই নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক শৃঙ্খল-মুক্তির প্রয়াসে নয়—তা' নিত্য নূতন পথে রূপ পেয়েছে; ক্ষেতখামার, কারখানা, রাজপথ, বিদ্যায়তন মুখরিত হয়ে উঠেছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর নীচের তলার নিপীড়িত মানুষের উর্দ্ধাভিযানের সঙ্কল্পে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর—মৃত্যুর বন্যা আর অন্তহীন দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা—অবমাননা। যুগমানসে এসেছে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের চেতনা, চিন্তাধারায় ঘূর্ণি লেগেছে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের। তারপর আরও আছে—দেশমাতার দ্বিখণ্ডিত শবদেহের উপর বাস্তুহারা মানুষের অসহায় ব্যাকুল কান্না। এক কথায় বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকালের ইতিহাস এক ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যাবিজড়িত ইতিহাস। সমস্যাকে এড়িয়ে চলবার অবকাশ নেই জাতির জীবনে। তাই এই যুগের সাহিত্যেও এই যুগসমস্যারই প্রতিফলন; তা' মানবাত্মার অবক্ষয়ের আর্ত্তনাদ, আর দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত অথবা প্রতিবাদ-বিপ্লবের ঘোষণায় মুখরিত। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্যই তার সাক্ষ্য, অপরদিকে শরৎ-সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সমকালে রচিত "ঐক্যতান" কবিতায় রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন—

> "প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
> অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
> রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"—

অর্থাৎ সমাজের নিচের মহলের "প্রাণহীন" ও "গানহীন" "সেই মরুভূমিকে" সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য আগামী-কালের কবিকে আহ্বান।

কিন্তু বিস্ময় এই যে সমস্যাবিজড়িত বিংশশতকের এই মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণের তপস্যা একক এবং নিভৃত। যুগ সমস্যাকে প্রায় এড়িয়ে গিয়ে বিভূতিভূষণ জয়গান করেছেন শাশ্বত প্রকৃতি প্রেমের, আর তাঁর এই গানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে প্রকৃতিদেবী নিজে।

তাই তাঁর সৃষ্টিতে অনায়াসেই শোনা যায় নদীর কলধ্বনি, পাখীর কাকলী, পত্রপল্লবের মর্ম্মর সঙ্গীত, বৃষ্টির ঝরঝরাণি গান, এক কথায় সব মিলিয়ে সমগ্র প্রকৃতির অন্তরের বাণীকে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলে এ'ও দেখা যাবে যে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে এই প্রকৃতি কোন আরোপিত (Transferred) নয়; বরং তা' অঙ্গীভূত বা আত্মকৃত (Intrinsic)। বিভূতিভূষণের স্রষ্টাসত্তা আর প্রকৃতির প্রাণসত্তার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, নেই কোন ভেদ; এখানে স্রষ্টা আর প্রকৃতি দুইয়ে মিলে একসত্তা।

সেইজন্যই বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়। যুগসমস্যার সকল আলোড়ন-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক স্বতন্ত্র নূতন জগত। এই জগতের স্বরূপ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের নিজের ভাষাতেই বলা যাক "এই জগতে সাদা সাদা বক চরছে ঘন সবুজ কচুরীপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ।" (হে অরণ্য কথা কও) সেই জগতে নিরন্তর ধ্বনিত জীব-জগত ও প্রকৃতি-জগতের ঐকতান সঙ্গীত।

কিন্তু বিভূতিভূষণের স্রষ্টা-মানসের এই বৈশিষ্ট্যকে বাস্তব-বিমুখ শুধুমাত্র রোমান্টিক স্বপ্নজগতের বিলাস কিংবা কোন প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি বলে অভিহিত করলেও বোধহয় ভুল হবে। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির দারিদ্র্যপীড়িত অভিশপ্ত জীবনের দুঃখভোগের প্রকাশ বা অনেক-কিছু-চাওয়া আর কিছুই-না-পাওয়ার রূপায়ণ যে নেই এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না।

"সর্ব্বজয়া একবাটি দুধভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর, তোমার কপালখানা, মণ্ডা না, মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেয়ে, বাঁচতে কি এসেছে?" পয়সার অভাবে ছেলেকে সে কোনদিনই ভালোমন্দ খাওয়াতে পারে না, মাতৃ-অন্তরের এই বেদনা বিভূতিভূষণের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিংবা টুনুর পুঁথির মালা এবং সোনামুখী আমের গুটি চুরি করার জন্য মেজ-বৌ-এর বাক্যবান প্রয়োগের দৃশ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—"অপমানে দুঃখে সর্ব্বজয়ার চোখে জল আসিল"—। মায়ের অপমান দুঃখ ও দুর্গাকে নির্ম্মম প্রহারের মধ্যে ছেলেমেয়েকে দু-একটা আম খাওয়ানোর অক্ষমতা এবং বেদনা বুঝে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। কিংবা সামান্য ঝাড়লণ্ঠনের বেলোয়ারী কাচ পেয়ে সর্ব্বজয়ার মনে কত আনন্দ, কত স্বপ্ন, কত আশা—"বাঁধিতে বাঁধিতে সর্ব্বজয়া বারবার মনে মনে বলিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর।" কিন্তু সর্ব্বজয়া জানেনা দারিদ্র্যের অভিশাপে দরিদ্রের হাতের হীরাও কাচ হয়ে যায়। "পথের পাঁচালীর" বিভিন্ন অংশে এমন শত শত দৃষ্টান্ত ছড়ানো আছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে—নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও কোন বিক্ষোভ বা জ্বালা নেই বা দ্বন্দ্ব নেই। এখানে দারিদ্র্য মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ ও প্রকৃতি প্রেমের আকর্ষণকে অবদমিত করতে পারেনি। একথা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও যেমন সত্য, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। এই দরিদ্র-চিত্রগুলিকে দেখে মনে হয় যেন বিভূতিভূষণের লেখনী-তুলিকার রঞ্জনে এই দারিদ্র্য মাটির ঘরের দুঃখের প্রদীপ হয়ে উঠেছে, আর সেই প্রদীপের স্বল্প আলোর কোন তেজ বা জ্বালা নেই, আছে আলোর সঙ্গে ছায়ার স্নিগ্ধ-মিতালি। এক কথায় বিভূতিভূষণের শিল্পীমানস ও শিল্পরীতি বৈশিষ্ট্য সমকালীন যুগসমস্যার কোলাহলের অনেকদূরে নিভৃতে প্রকৃতি প্রেমরসে মুগ্ধ ও বিভোর হয়ে আকণ্ঠ পান করেছেন সেই রস, আর আমাদের মুখেও তুলে ধরেছেন সেই পূর্ণপানপাত্র।

বিভূতিভূষণের সৃষ্টির মূল উপাদান প্রকৃতি, আর এরই সঙ্গে এসে মিলেছে মানবজগত। পল্লী-বাংলার দারিদ্র্য-পীড়িত ছোট ছোট নীড়গুলি থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর হরিহর, সর্ব্বজয়া, ইন্দির-ঠাকরুণ, প্রসন্ন গুরু-মহাশয়, দীনু পালিত, সান্যাল মহাশয়, গোকুল, গোকুলের স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্রের সুখদুঃখ হাসিকান্না, ঈর্ষা-দ্বেষ লোভ, অন্তরের সকল পরিচয়ই তুলির দু-একটি আঁচড়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর একদিকে—অপু যেমন টেলিগ্রাফের পোষ্টে কান পেতে এক ঝরঝরানি গান শুনেছে আর বিস্মিত হয়েছে, ঠিক আমরাও তেমনি তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় কান পেতে শুনেছি প্রকৃতির সঙ্গীত—

অন্তর ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি জীবন্ত-প্রকৃতির স্পর্শ ও প্রভাব। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিস্ময় যে, এখানে মানুষের টানে প্রকৃতি আসেনি, বরং প্রকৃতির টানেই মানুষ এসেছে, যেন প্রকৃতির সমস্ত রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়োজনেই মানুষ চিত্রিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতির রূপায়ন সাধারণতঃ মানুষের জীবনায়নের পটভূমিরূপে। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি জড় বা মৃত নয়—সে এক জীবন্ত সত্তা। ব্যক্তিগত জীবনেও বিভূতিভূষণ প্রকৃতিচারী, বনেজঙ্গলে বিস্তর ঘুরেছেন, পুষ্পিত বনলতার গন্ধে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যের পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে প্রকৃতির গন্ধ আর সৌরভ ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই তাঁর কাছে ছিল প্রকৃত "art of living." এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কালিদাসের শকুন্তলা, কথমুনির আশ্রমের প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যার কোন অস্তিত্ব নেই, প্রকৃতির জীবন্ত প্রাণসত্তার অমৃতরস সিঞ্চনেই শকুন্তলার দেহ-মন সঞ্জীবিত। আবার এই একই রকম প্রকাশ দেখি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানসকন্যা—"Lucy"-এর সৃষ্টিতে। Lucy মানবকন্যা হলেও, সে মূলতঃ প্রকৃতিকন্যা—কারণ সেখানে "Thus nature spake···Ioll make her a lady of my own."Lucy-এর দেহের প্রতি ধমনীতে যে রক্ত সঞ্চালিত —তাতে শোনা যায় প্রকৃতির আত্মার স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথও শুনেছেন এই জীবন্ত সত্তা প্রকৃতির আহ্বান—

" ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন, সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলায়
পরিচিত রব।— (বসুন্ধরা)

অথবা—

"······যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে াস্তে দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি।" (ছিন্নপত্র)

ঠিক একই কথা বলেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক—"বাংলা দেশের মর্মকাহিনী লুকানো আছে এই সব নিভৃত পল্লীপ্রান্তের আম-বকুল বাঁশবনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই শান্ত-উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর অখ্যাত গ্রাম্য-জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে।" (উৎকর্ণ)

প্রকৃতি যেন বিভূতিভূষণের বাল্যের সঙ্গিনী, যৌবনের প্রেয়সী, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাদায়িনী, জীবনের মোক্ষ।

প্রকৃতি-প্রেমিক রোমান্টিক কবিস্বভাব ছাড়াও বিভূতিভূষণের আরও দু'টি মহৎ পরিচয় আছে—একটি 'স্বপ্নাঞ্জন মাখানো' অন্তহীন চির-কৌতূহলী শিশু মন,—অপরটি, রস তীর্থের পথের আনন্দ-সন্ধানী। শিশু চিত্তের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি বিস্ময় ও রহস্যের ভাণ্ডার। বিভূতিভূষণ এক চির-কৌতূহলী পথিক (অপু), কেবল চোখ মেলে দেখে বেড়িয়েছেন, আর সেই দেখার সম্পদে পূর্ণ করেছেন তাঁর সাহিত্যের ভাণ্ডার।

এই দেখা আর অনুভব করা—এ'ও যেন এক সাধনা। বিভূতিভূষণ ছিলেন চির-সাধন। রসতীর্থের আনন্দ-পথিক তিনি—প্রকৃতির মধ্য দিয়েই তিনি অনন্ত ও সত্য দর্শনের চেষ্টা করেছিলেন, এই আনন্দের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তি। এইখানেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেমের মূল রহস্য উদ্ধারের চাবিকাঠি। এই শক্তিতেই তিনি সমকালীন জীবনের কোলাহল, সমস্যাকণ্টকিত জীবনের আর্তনাদ—রিক্ততাকে অতিক্রম করে প্রকৃতি প্রেমের একতারার সুরে গান ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ বাংলাসাহিত্যে যে সম্পদ নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তা "পথের পাঁচালী" (১৯২৯)। সেদিন বাঙ্গালী পাঠক সমাজের মনে জেগেছিল এক বিস্ময়। এমনি করেই আর একদিন চমক জাগিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু পার্থক্য আছে দুজনের মনে আর মননে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মূল উপাদান মানুষ, অপর পক্ষে বিভূতিভূষণের

সাহিত্যের মূল উপাদান প্রকৃতি। এই সুরেরই আর এক বৈচিত্র্যের প্রকাশ—"অপরাজিত" (১৯৩২)। 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' যেন একই রাগের দুই বিচিত্র সুরের অপূর্ব্ব সিম্‌ফনি;—প্রথমটির সুর প্রাকৃতিক, দ্বিতীয়টির অতিপ্রাকৃত। প্রাকৃতিক আর অতিপ্রাকৃতিক—এই দু'য়ের উর্ম্মিমুখর সফেন সমুদ্রের আলোড়িত বেলা-ভূমিতে প্রকৃতি, মানুষ আর মনুষ্যেতর জীবজগত—এই তিনের সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা।

বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলোকের চিরপথিক বিভূতি-ভূষণেরই কথা শোনা যায় 'পথের পাঁচালীর' শেষ ক'য়েক ছত্রে—"পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি ··পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ··দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে······

দিন-রাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মরণ পার হয়ে, মাস-বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়······তোমাদের মর্ম্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না···চলে···চলে · চলে—এগিয়েই চলে··· অনির্ব্বাণ তার বীণা বাদন শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ······

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘর ছাড়া করে এনেছি···চল এগিয়ে যাই···।"

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখে বিভূতিভূষণ বলে-ছিলেন—"···দেখে একটা অনুপ্রেরণা জাগলো—বিশ্বের মহা-শিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়েই এ দেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীলকুঠির পুল থেকে সুরু করবো।"—বোধ হয় সেই এপিক্ উপন্যাসই—"পথের পাঁচালী।" "পথের পাঁচালীতে" আকাশের ঘন নীলিমা, বনানীর শ্যামল লতা-পল্লব, আর মানুষের তপ্ত নিশ্বাস এক হয়ে মিশে আছে। আর সকলকে অতিক্রম করে যে সুর উঠেছে তা' এক ধ্যান-গম্ভীর—প্রশান্ত সাধকের প্রকৃতি-প্রেমের চিরন্তন সুর।

ঝরাপাতা ও পিপীলিকা

ডাঃ সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি. এস্. সি

শীতের পরশ লাগি বনে উপবনে
বৃক্ষ হ'তে শুষ্ক পত্র ঝরে ক্ষণে ক্ষণে।
ধরণীর 'পরে ছিল এক পিপীলিকা
গাত্রে তার পড়ে এসে ঐ পত্রালিকা।
বৃক্ষে ডাকি কহে সে যে অতি ক্রোধভরে,
"ঝরা পাতা দিয়ে কেন ব্যথা দিলি মোরে?
দেখিতে পেলি না তুই আমি হেথা রই?—
সাবধানে চল্ এবে—শেষ কথা কই।"

বৃক্ষ বলে, "মিতা, শোন, দোষ মম নাই
জানিনাকো পাতা মোর পড়ে কোন্ ঠাঁই
ঋতুর চক্রেতে পাতা ঝরে আর আসে,
যখন ঝরে সে পাতা—ঝরে তা বাতাসে।
তাই বলি, ক্রোধ করা শোভা নাহি পায়,
ভেবে দেখ, বাসা বাঁধ আমারি যে গায়।
দিবা-রাতি নীরবেতে তখন তোমার
দংশন সহি আমি, সহি অত্যাচার।

স্বার্থ শুধু নাহি দেখো—অন্যেরেও দেখো,
পরের দুঃখে একটুখানি কাঁদতে ভায়া শেখো।"



জীবনে সিদ্ধিলাভের উপায়

উপানন্দ

সাধারণের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তির অভাব হয়না। একটু সাহসের অভাবেই, এদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ হবার সুযোগ ঘটে না। এরা আসে, এরা চলে যায়, পৃথিবী এদের জানতে বা চিনতে পারেনা। প্রতি-দিনই অসংখ্য মানুষ মহাপ্রস্থান করছে অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায়—কে-ই বা তার খোঁজ রাখে। এর কারণ প্রথম প্রচেষ্টাতেই তাদের ভীরুতা প্রকাশ পায়, আর তারা কর্ম্মে অগ্রসর হোতে সাহসী হয় না। কিন্তু যারা নির্ভীকভাবে অদম্য উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গেছে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, তারা উঠেছে প্রসিদ্ধির বহু উর্দ্ধস্তরে। তাদের জীবনী পাঠ্য। তাদের জীবন হয়েছে গৌরবান্বিত। হোতে পারে জীবননদী খর-স্রোতা, আর হোতে পারে তার স্রোত তুহিন শীতল, কিন্তু জলে নামবার ভয়ে তার উপকূলে দাঁড়িয়ে ভাবলে চলবেনা। নামতে হবে জলে সাহস করে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে স্রোতের বুকে, আর যতদূর সম্ভব সাঁতরে এগিয়ে যেতে হবে। বিপন্নতার আশঙ্কা বা সুন্দর জীবনের আশা, দুটি নিয়ে মনটাকে দুলিয়ে রাখলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে এসব মনোভাব অপ্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গ হচ্ছে চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে চলো। কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করবার সময় এলে, তাকে অবহেলা না করে অপেক্ষাকৃত সন্দেহ সংশয়ভাবাপন্ন আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের বারম্বার পরামর্শ গ্রহণে তৎপর হোলে সময় ও সুযোগ ফিরে আসবে না; শেষ পর্য্যন্ত সে কাজ থেকে যাবে অসম্পন্ন অবস্থায়। দেখা গেছে যে কাজটা এ বছরে শেষ করার দিকে মন গেলনা, সেটা পরের বছরেও সমাধা হওয়া অসম্ভব। বহু সময়েই দুটো কাজ সামনে এসে দাঁড়ায়। কোনটা আগে করা যাবে এই ভাবনায়, যে মানুষ দিন-দিনের অপব্যয় করে, তার পক্ষে দুটো কাজের কোনটা করা হয়ে ওঠে না। তার আশার প্রতিমার বিসর্জ্জন ঢাকিসমেতই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দুটোর মধ্যে একটা কাজ হাতে নিয়ে করতে সঙ্কল্প করলো, সে যখন বন্ধুবান্ধবের বিরুদ্ধ মত শুনে তাদের পরামর্শানুসারে অপরটাকে ধরতে সচেষ্ট হয়, আর ক্রমাগত মতের পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, তখন তার পক্ষে কোন বড় বা প্রয়োজনীয় কাজ করে ওঠা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে ওঠে। সর্ব্বপ্রথম বিবেক-বিবেচনাসঙ্গত পরামর্শ অনুযায়ী দৃঢ় ভাবে এগিয়ে যাওয়া মানুষটী কেবল মাত্র সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা বিপত্তি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে দূর করতে সে সাহসী হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না—যত রকম পরামর্শ বা মন্তব্যই তার কানে আসুক না কেন। যে কোন দিকেই সে যাক্ না কেন, কর্ম্ম সাফল্যের জন্যে তার নাছোড়-বান্দা ভাবই তাকে অসাধারণ ব্যক্তি রূপে প্রতিপন্ন করে। সে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে সমাজ সংসারে কৃতীপুরুষ হয়ে ওঠে। কোন্ পথটী ধরে চলবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জ্জনের দিকে কোন্ অংশ গ্রহণ করে তার মাধ্যমে শিক্ষা সমাপ্তি করবে বা স্নাতকোত্তর হবে, কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করবে, এসম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিয়ে চলতে সুরু করবে। ভীষ্মের মত অচল অটল প্রতিজ্ঞা থাকলে উত্তুঙ্গ বাধা বিপত্তির শৈলমালাও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এটা সব সময়ে মনে রাখবে। জীবন প্রভাতই ভাবী জীবনের কাল। উত্তম ভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বুনে না দিলে পরবর্ত্তীকালে সুন্দর ফসল হবে না। বয়োবৃদ্ধি হবে, কিন্তু শস্যের অভাব হেতু অন্তরের কঙ্কাল দুর্ভিক্ষ ছায়া কাতর করে তুলবে। তখন অনুশোচনা হবে, ব্যর্থজীবন সর্ব্বহারার মত পথে পথে বেড়াবে কেঁদে। পরিশ্রমের দ্বারা হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হয়, অধ্যয়নের দ্বারা হৃতজ্ঞান ফিরিয়ে পাওয়া যায়, মিতাচার বা ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা হৃতস্বাস্থ্য আবার লাভ লাভ করা যায় কিন্তু হারানো সময় চিরদিনের মত চলে যায়। অনেকেই সর্ব্বদা আত্মপ্রতারণা করে বলে থাকেন, সময় পেলে এ কাজ সে কাজ

করতে পারতেন, সময়ের অভাবে কাজ করা হোলো না। স্বার্থপর অলস ব্যক্তিরা এইসব কথা বলতে অভ্যস্ত। বিবেকসম্মত তাদের হাজার হাজার কর্ত্তব্য বিষয় তারা এমনিভাবে এড়িয়ে নিজেরা ভালো মানুষ সাজতে চায়। সর্ব্বদা এই কথা মনে থাকা দরকার, যে সব মানুষ নিজেদের ও সাধারণের কল্যাণ করেছে, তাদের কেউই অলস, নিষ্কর্ম্মা বা প্রচুর অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি নয়। তারা সেইসব মানুষ—যারা সহস্র বিচিত্র কর্ম্মে ভারাক্রান্ত হয়ে সারাটি বছর ধরে প্রত্যেকটি কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে, কোন কর্ম্মভারই তাদের কাছে বিরক্তিকর নয়, আর সকল কর্ম্ম করেও আরও কিছু করবার জন্যে উৎসুক। তোমরা তাদের ওপর আস্থাবান হ'য়ে লক্ষ্য করতে পারো, তাদের অসাধারণ শক্তি ও কর্ম্মঠ জীবন। তাদের কাছ থেকে অলস ব্যক্তিদের অনুরূপ কথা শুনতে পাবে না। তারা কোনদিন বলবে না সময়ের অভাবে এটা ওটা হোলো না। জীবনের প্রারম্ভে তোমরা যারা কিশোর কিশোরী, উপযুক্ত কাজ নির্ব্বাচিত করে নেবে। সব সময়েই কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কোন কাজটা তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হবে তা ঠিক করা। এ ক্ষেত্রে যে কর্ত্তব্য কর্ম্মটা তোমরা সম্পাদন করতে পারো সেইটে গ্রহণ করবে।

প্রকৃত গুণী পুরুষ বা স্ত্রীলোক কখন অলসভাবে থাকে না, কোন কাজটা সবচেয়ে উপযোগী তা নির্ব্বাচন করা গেল না, এরূপ ওজর এরা কেউ দেয় না। এরা শুধু দেখে কোন্ কাজটা তাদের পক্ষে উপযুক্ত আর কোনটা অনুপযুক্ত। এক্ষেত্রে নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা বলে এর চেয়ে হাল্কা কিছু পাওয়া যাবে না? অথবা এটার চেয়ে আর একটু কিছু কাজ নেই? সহজে করে ওঠা যায় এরকম কাজ কি হোতে পারে না? জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে কাজটা খুব ভালো ভাবে করা যাবে তো? আমার পক্ষে উত্তমভাবে করা সম্ভব হবে তো! এভাবে যারা প্রশ্ন করে সেই মত কাজ করতে নিযুক্ত করেছে, তারাই প্রকৃত কর্ম্মী, তারাই নিজেদের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে ধন্য হয়।

তোমরা সমবয়স্কদের দলে স্বভাবতঃ মিশে থাকো। যে দলে যোগদান করো সে দলের প্রভাব তোমাদের জীবনের ওপর অনেকটা পড়ে থাকে। সুতরাং সঙ্গ বা সঙ্গীদল নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্ক হবে। অশ্লীল প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা বা ইতর লোকের সঙ্গপ্রিয়তা যাদের আচার বা আচরণে প্রত্যক্ষ করা যায়, তারা তরুণই হোক বা বয়স্কই হোক বন্ধু সম্বোধন যোগ্য নয়। এরা কুরুচিসম্পন্ন, এদের অন্তরও কলুষ। এদের মনের স্থিরতা নেই, এরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এদের লক্ষ্য মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে যাওয়া। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এইটুকু উপলব্ধি হয়েছে, যে সব বালক বালিকা, তরুণ তরুণী এইসব কদর্য্য আচার ও আচরণে লিপ্ত, তারা কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে না। সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বা ভাগ্য গঠনে যতই অনুকূল আবহাওয়া এরা লাভ করুক না কেন, যতই ভালো ভালো সুযোগ সুবিধা এদের আসুক না কেন, কখনই জীবনে সুখী ও উন্নতিশীল হবে না। স্নেহের আতিশয্যে পিতামাতারা এইসব দোষী ব্যক্তিদের দোষ অপরাধ ঢেকে নিয়ে উদারভাবাপন্ন হন, তাদের কুকর্ম্মগুলিও তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় লাভ করে। যতদিন যৌবন থাকে আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ততদিন তাদের শাস্তি স্থগিত থাকে কিন্তু অবশেষে শাস্তিভোগ করতেই হয়। আমুদে ও লম্পট তরুণ বিমর্ষ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষ হয়ে দুঃখে কালাতিপাত করে। এজন্যে তোমরা এখন থেকেই শ্রমশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অধ্যবসায়ী, অধ্যয়নপ্রিয় ও সৎসংসর্গী হবে।

পড়তে বসার দাম

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হাঁদু পড়ে কথামালা, দ্বিতীয় ভাগ বুড়ো—
বুড়ী পড়ে হাসি-খুসী মাথায় ঝোঁটন চূড়ো ;
তিন জনে সকাল বেলা বাধায় যা গোলমাল,
জমতো ভাল তার সাথে থাকতো যদি ঢোল।
বই ছেঁড়াটাই বেশী হয় পড়া-শোনার চেয়ে
বলবো তবু তারা তিনটি লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ে।
সকাল হলে আপন মনে বসে তিনজন
বই নিয়ে রোজ পড়ার তরে ভোলে না কখন।
নিয়ম করে পড়তে-বসা ভাল বলেই মেনো,
সময় যত কম বেশী হোক দাম আছে তার জেনো।

রবার্ট লুই ষ্টীভেনসন্

রচিত

দি বট্‌ল্ ইম্প

(বোতলের শয়তান)

সৌম্য গুপ্ত

শয়তানের হাতে নিজেকে বিকিয়ে তার অনুকম্পায় মানুষ নিজের পার্থিব সব কামনা পূর্ণ করতে পারে—কিন্তু শয়তানের সংস্পর্শে তার মনে নরকের যে তীব্র জ্বালা থাকে, সে জ্বালা থেকে তার পলকের জন্য নিষ্কৃতি মেলে না!

এমনিভাবে, এক ভদ্রলোক শয়তানের হাতে নিজেকে বিকিয়ে ধনজন-সম্পদ লাভ করে মনে নরকের অসহ্য জ্বালা

নিয়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন—এ জ্বালা থেকে মুক্তি-লাভের জন্য তিনি যা করলেন—তাই নিয়ে এ কাহিনীর আরম্ভ!

১৮৯০ সাল···সানফ্রান্সিস্‌কো সহরে তার বিরাট প্রাসাদ-ভবনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক শয়তানের প্রভাব এবং নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে উপায় সন্ধান করছেন। তিনি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় খোলা জানলা দিয়ে দেখলেন—বাড়ীর সামনে পথে এক তরুণ নাবিক···যুবককে দেখে ভাবলেন, হয়তো একে দিয়েই তিনি মুক্তি পেতে পারেন। যুবককে তিনি সাদর আহ্বান জানালেন।

যুবকটি শান্তস্বভাব—শিষ্টাচার পালনে অভ্যস্ত···সে এগিয়ে এলো ভদ্রলোকের কাছে···বললে—আপনার কোনো কাজে সহায় হতে পারি?···

ভদ্রলোক বললেন—তুমি বাড়ীর ভিতরে এলে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝবো—তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো কিনা!

যুবক এলো ভদ্রলোকের গৃহে! জাহাজে কাজ করে সে বহু দেশ ঘুরেছে···বিদ্যাবুদ্ধিও কোনো পণ্ডিত-মানুষের চেয়ে কম নয়···কিন্তু বৃদ্ধের গৃহ যে রকম সমৃদ্ধ আর কাচ-খচিত বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, এমন গৃহ সে আগে কখনো দেখেনি—যেন রাজার প্রাসাদ!

বৃদ্ধ বললেন—তোমার নাম কি?···বাড়ী কোথায়?

যুবক বললে—আমার নাম কিয়···আমার বাড়ী হলো হাওয়াই দ্বীপে!···

তারপর আরো কথাবার্ত্তা···কিয় দিলে নিজের পরিচয়—সে জাহাজে নাবিকের কাজ করে···নানা দেশ ঘুরেছে ইত্যাদি!

তার কথা শুনে—ভদ্রলোকের সামনে টেবিলে ছিল বড় একটি বোতল—সেই বোতলটি নিয়ে তিনি দেখালেন কিয়কে···বললেন—এত দেশ ঘুরেছো এ বয়সে···এটা অদ্ভুত বোতল—তোমার এত দেশ দেখে বেড়ানোর জন্য তারিফ করে যদি এই বোতলটি তোমাকে দিই?···

বোতলটা দেখলো কিয়···সত্যই অদ্ভুত—এমন বোতল এর পূর্ব্বে কখনো দেখেনি···বোতলের মধ্যে কি যেন রয়েছে—কি, তা বোঝা যায় না, তবে বোতলের ভিতরে ক্ষণেক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে—মাঝে মাঝে আগুনের হল্কাও বেরুচ্ছে—তাছাড়া বোতলের মধ্যে কালো একটা ছায়া ঘুরছে!

বোতল দেখে সে অবাক! ভদ্রলোক বললেন—এই যে বোতল দেখছো—আশ্চর্য্য এ বোতলের শক্তি!···

এ কথা বলে তিনি বোতলটা মেঝেয় আছড়ে ফেললেন···রবারের বলের মতো বোতলটা লাফিয়ে উঠলো।

বোতলটা হাতে নিয়ে কিয় লক্ষ্য করলো···সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মধ্যে যেন প্রচণ্ড একটা শক্তির আবির্ভাব··· দেখলো, বোতলের মধ্যের সেই কালো ছায়াটুকু সজীব প্রাণীর মতো সচল হয়ে উঠলো। কিয় বললে—বোতলের মধ্যে নড়ছে ওটা কি?···

ভদ্রলোক বললেন—ও হলো ক্ষুদে শয়তান। এই বোতলের মধ্যে ওর বাস···অসাধারণ ওর শক্তি!···

শুনে কিয় হতভম্ব! শয়তানের পরিচয় নেবার বা তার সঙ্গে মিতালী করবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই! বোতলটা সে দিলে ভদ্রলোকের হাতে ফিরিয়ে।

ভদ্রলোক বললেন—তুমি যে কামনা জানাবে এই ক্ষুদে শয়তানের উদ্দেশে, তোমার সেই কামনাই পূর্ণ হবে! জানো, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট···এ বোতল তিনি পেয়ে-ছিলেন···এই বোতলের ক্ষুদে শয়তানের দৌলতেই তিনি অসাধারণ শক্তিশালী হয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন···তারপর তাঁর মনে জাগলো অহঙ্কার! তিনি ভাবলেন, বোতলের এ ক্ষুদে শয়তান কিছু না—তিনি নিজের শক্তিতে দিগ্বিজয় করেছেন···তখন তিনি এ বোতলটি বেচে দেন—সঙ্গে সঙ্গে হলো তাঁর পতন!···

কিয়র মনে বিদ্যুতের চমক! সে বললে—পারে এ বোতল দিতে, আমি যদি চাই আপনার এই বাড়ীর মতো এমনি সাজানো-গুছানো প্রকাণ্ড বাড়ী?···

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয়! শুধু এমন বাড়ী কেন···তুমি যদি ওর কাছে খ্যাতি চাও, ধরণীর ঐশ্বর্য্য চাও অর্থাৎ, যা চাইবে, তাই তুমি পাবে। তবে, তার আগে তোমাকে বলতে হবে—হে বোতলের অধীশ্বর···আমি নিজেকে তোমার হাতে একান্তভাবে সমর্পণ করলুম···এ বোতলটি আমি বেচতে চাই!

কিয় বললে—যে বোতলের এমন শক্তি—নিশ্চয় তার

অনেক দাম। আমার আছে শুধু পঞ্চাশটি ডলার··তাতে কি করে এ বোতল কেনা হবে?

বৃদ্ধ বললেন—ঐ দামেই আমি বেচবো!

এত শস্তায় এমন বোতল ভদ্রলোক বেচতে চান!·· কিয়র মনে ধোঁকা লাগলো! সে ভাবলো, পরখ করে তবে কেনা!

কিয় বললে—আপনি প্রমাণ দেখাতে পারেন, বোতলের কাছে আমি যে কামনা জানাবো, সেই কামনাই সে পূর্ণ করতে পারবে?

ভদ্রলোক বললেন—পারি! তুমি আমাকে দাও তোমার ঐ পঞ্চাশ ডলার—বোতলের দাম···বোতল তখন হবে তোমার! তখন তুমি বোতলকে বলবে—ঐ পঞ্চাশ ডলার ফেরত এনে দাও···যদি পঞ্চাশ ডলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পকেটে না ফিরে আসে, তাহলে বিক্রী হবে নাকচ···বাতিল!···এ বোতল আবার আমি নেবো!···

তাই হলো। কিয় দিলে পঞ্চাশ ডলার ভদ্রলোকের হাতে···ভদ্রলোক দিলেন কিয়র হাতে বোতল···দিয়ে বললেন—বেচা-কেনা শেষ···এ বোতল এখন তোমার—এ বোতলের মালিক তুমি।

বোতল হাতে নিয়ে কিয় বললে—ওগো বোতলের ক্ষুদে শয়তান, আবার ঐ পঞ্চাশটি ডলার আমাকে ফেরত এনে দাও!

মুখ থেকে এ কথা খশ্‌বামাত্র সে পঞ্চাশ ডলার ফেরত এসে কিয়র পকেটে ঝনঝনিয়ে উঠলো!

দেখে বিস্ময়ে কিয়র দু'চোখ বিস্ফারিত। সে বলে উঠলো—বাঃ, এ তো ভারী মজার বোতল!···

ভদ্রলোক বললেন—এখন রাজী, এ বোতল কিনতে?

কিয় বললে—তার আগে আমি জানতে চাই—এ বোতল বেচবার জন্য আপনি এতখানি আকুল কেন? তাছাড়া এত শস্তায় বেচতে চান!

ভদ্রলোক বললেন—তার কারণ, আমার বয়স হয়েছে ···কদিন বা আর বাঁচবো! বোতলটা নিয়ে মরতে চাই না—তাহলে আমার সঙ্গে সঙ্গে বোতলও গেল! তাই এটা বেচে দিতে চাই···কত মানুষ এ বোতল কিনে এর দৌলতে কত কামনা পূর্ণ করতে পারবে!···তবে হ্যাঁ, কেনবার সময় বোতলকে উদ্দেশ করে খদ্দেরকে বলতে হবে—হে বোতলের অধীশ্বর···নিজেকে আমি তোমার কাছে বিকিয়ে দিলুম! এ বোতল না বেচে যদি বোতলের মালিক মরে যায়, তাহলে তখন মৃত্যুর পর তার অসহ্য নরক-যাতনা ভোগ হবে!

কিয় বললে—বলেন কি? তাহলে আমি যদি বোতল কেনবার পর মরে যাই তো মৃত্যুর পরেও আমার ভাগ্যে অসহ্য নরক-যাতনা ভোগ হবে!···

ভদ্রলোক বললেন—তুমি তোমার কামনা পূর্ণ করে বোতল বেচে দেবে! তবে হ্যাঁ···যে দামে তুমি কিনবে, তার চেয়ে কম দামে এ বোতল বেচতে হবে—সেই দাম বা তার চেয়ে চড়া দামে বেচা চলবে না···এ হলো এই বোতলের ব্যাপারে প্রধান সর্ত্ত।

কিয় বললে—আমার এখন একটি কামনা—আপনার বাড়ীর মতো এমনি একটি বাড়ী আমি চাই। বোতলের দৌলতে সে কামনা পূর্ণ করেই আমি এ বোতল বেচে দিতে পারি?···

—নিশ্চয়।···

কিয় তখন তার সম্বল পঞ্চাশটি ডলার ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বোতল কিনলো!

ভদ্রলোক নিশ্বাস ফেলে বললেন—আঃ···এতদিনে শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেলুম!···

ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে পথে বেরিয়ে কিয় হায়-হায় করতে লাগলো··শয়তানের সঙ্গে কারবার···তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া কিয়র বুকে কাঁপন জাগলো! কিয় ভাবলো—যত শীঘ্র পারি—এটা বেচে দিতে হবে!

সে এলো একটা 'কিউরিয়োর' (Curio-Shop) অর্থাৎ সৌখিন জিনিষপত্রের দোকানে···দোকানীকে বোতল দেখালো···বললে—বেচবো, কত দাম দেবে?···

দোকানদার বোতলটা নেড়ে-চেড়ে দেখলো···কিয় বোতলের সঙ্গে শয়তানের ব্যাপার জড়িত আছে, কিয় তাকে তা বললো না! বোতলটা অদ্ভুত···দেখে দোকানদার বললে—আমি ষাট ডলার দাম দিতে পারি!

কিয় ভাবলো—ভালোই হলো · দশ ডলার লাভ হবে আমার···তাছাড়া শয়তানের হাত থেকে মুক্তি!···

টাকা নিয়ে কিয় বেরুলো দোকান থেকে—বেরিয়ে

সে এলো সোজা বন্দরে⋯এসে হাওয়াই-গামী সে যে জাহাজে কাজ করে, তাইতে চড়ে বসলো। ভাবলো—যা ঘটেছে, সে কথা কাকেও বলা হবে না।

জাহাজে দেখা বন্ধু লোপাকার সঙ্গে। লোপাকা জাহাজে 'মেটের' (Mate) কাজ করে। লোপাকা বললে—এখানে নেমে ঘুরে সহর দেখে আনন্দ হলো?

কিয় বললে—না, হতভাগা দেশ!

জাহাজ বন্দর ছেড়ে সাগরের বুকে ভেসে চলেছে⋯ কিয় তার তোরঙ্গ খুললো⋯তোরঙ্গ খুলতেই দেখে—তোরঙ্গের মধ্যে পোষাক-আষাকের সঙ্গে সেই বোতল! কিয় ভয়ে চমকে উঠলো⋯শয়তানকে সে ছাড়লেও, শয়তান তাকে ছাড়েনি—সঙ্গে সঙ্গে এসেছে!

লোপাকাকে সে বললে—এ বোতল কে আমার তোরঙ্গের মধ্যে রাখলো, জানো?

লোপাকা বললে—না! কে আবার তোমার তোরঙ্গ খুলবে?

কিয়র মনে পড়লো—ভদ্রলোক বলেছিলেন—কম দামে বেচতে হবে⋯সে এ বোতল বেচেছে, যে দামে কিনেছিল তার চেয়ে বেশী দামে—তাই সে বেচা বাতিল হয়েছে এবং শয়তান তাকে ত্যাগ করেনি।⋯কেন মরতে এ শয়তানী ব্যাপারে নেমেছিল!⋯

কিন্তু উপায় নেই! কিয় ভাবলো—শয়তানকে দিয়ে যতখানি কামনা এখন আদায় করা যায়! তারপর দেখা যাবে, ব্যাপার কি দাঁড়ায়! বাড়ী তো আগে চাই, তারপর⋯

লোপাকাকে সে বললে সব কথা⋯শুনে লোপাকা বললে—বেশ, আগে তুমি বাড়ী পাও, তারপর এ বোতল আমি কিনবো তোমার কাছ থেকে! আমার চিরদিনের সাধ, একখানা পাল-তোলা জাহাজ। বোতলের কাছে আমি চাইবো—নিজের জন্য একখানি সুন্দর পাল-তোলা জাহাজ তাহলে দিব্যি মজাসে দেশে দেশে কারবার করে বহু টাকা রোজগার করা যাবে।

অবশেষে নিজের দেশ, হাওয়াই দ্বীপ⋯তিন হপ্তা পরে জাহাজ সেখানে পৌঁছুলো⋯পৌঁছুবামাত্র একজন এটর্নি এসে কিয়র সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন—দুঃসংবাদ আছে⋯কিয়র পিতৃব্য এবং পিতৃব্যের একমাত্র পুত্র মারা গিয়েছেন! তিনি তার পিতৃব্যের এটর্নি⋯পিতৃব্য এবং পিতৃব্য-পুত্রের মৃত্যুর পর কিয় এখন তাঁদের অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী।

কিয় ভাবলো—হায় রে⋯বোতলের কাছে প্রাসাদ-ভবনের কামনা যখন জানিয়েছিল, তখন সে কল্পনা করেনি যে তারই আপন-জনের রক্তে সে ভবন তৈরী হবে!

কিছুদিন পরে শোক প্রশমিত হলে, সহরের সব চেয়ে বড় এঞ্জিনীয়ার-কণ্ট্রাকটরকে দিয়ে কিয় তৈরী করলে প্রকাণ্ড প্রাসাদ-ভবন⋯সে ভবন সুসজ্জিত হলো দামী-দামী আসবাবপত্রে! দেখা গেল বাড়ী তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ৮৯৫৫৮ ডলার—ঠিক এই এত টাকাই কিয় পেয়েছে পিতৃব্যের ধনসম্পত্তি, উত্তরাধিকার-সূত্রে!

কিয় ভাবলো—যা হয়েছে, তা হয়েছে⋯ভবিষ্যতে বোতলের ক্ষুদে শয়তানের কাছে আর কোনো কামনা জানাবে না!

প্রাসাদ-ভবনে বাস করে কিয় প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায়⋯হঠাৎ একদিন লোপাকা এসে উপস্থিত। লোপাকা বললে—ইতিমধ্যে সে জাহাজের 'মেট' হিসাবে বহু দেশ ঘুরে এসেছে⋯সে এখন চায় কিয়র কাছ থেকে ঐ বোতল কিনতে—কিয়র বাড়ীর কামনা পূর্ণ হয়েছে⋯ তার তো আর এখন বোতলের প্রয়োজন নেই!

সুসজ্জিত বাড়ী-ঘর দেখে লোপাকা বললে—সত্যই, বোতলের ক্ষুদে শয়তানের দৌলতে বেশ সুখে আছো, কিয়!

কিয় বললে—যদি বলো, বড় বাড়ীর মালিক হলেই মানুষ সুখী হয়, তাহলে আমি সুখী! তবে এ বাড়ী হয়েছে, হঠাৎ আমার খুড়ো আর খুড়তুতো ভাইয়ের মৃত্যুতে—তাঁদের সম্পত্তি পেয়ে। এতে বোতলের শয়-তানের কতখানি হাত আছে—বুঝতে পারি না!

লোপাকা বললে—বটেই তো! একে দৈব বলতে পারি!

লোপাকার মনে দ্বিধা⋯সে বললে—আচ্ছা, তুমি দেখাতে পারো বোতলের শয়তানকে?

কিয় বললে—ওর কাছে কোনো কামনা করতে আর চাই না!

লোপাকা বললে—এ তো আর লাভের জন্য কামনা করা নয়!···যা কিনছি, তা কেনবার আগে আমি চাই সেটা পরখ করতে!

—যদি ত্থাখো, সে ভয়ানক কুৎসিত, তাহলে এ বোতল কিনবে না?···

লোপাকার মনে পাল-তোলা-জাহাজের লোভ · সে বললে—হোক কুৎসিত, হোক্ ভয়ঙ্কর···বোতল আমি কিনবো—পাকা কথা দিচ্ছি!

বোতলটা সামনের টেবিলে রেখে কিয় বললে—তোমার মূর্ত্তি একবার আমরা দেখতে চাই!

সঙ্গে সঙ্গে বোতলের বাইরে অগ্নিবর্ণ বিভীষিকার বিরাট মূর্ত্তি! লোপাকা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো··· কিয় বললে—যাও,চলে যাও!

চকিতে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হলো!···

লোপাকা বললে—বোতল আমি কিনবো···পাল-তোলা জাহাজ পাবামাত্র এ বোতল থেকে মুক্তি নেবো!

বোতল নিয়ে লোপাকা চলে গেল · কিয়র মনে মুক্তির উল্লাস!···

লোপাকাকে জাহাজ-ঘাটে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে কিয় ফিরলো বাড়ীর দিকে···পথে দেখলে এক রূপসী কিশোরী—যেন সাগর-কন্যা···সদ্য সাগর থেকে উঠে এসেছে! মনে হলো—একে যদি বিবাহ করতে পারে, তবেই জীবন হবে সার্থক!

কিশোরীর সঙ্গে কিয় আলাপ করলো···মেয়েটির স্বভাব ভালো···কথাবার্ত্তাও সুন্দর! মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো কিয়···কিশোরী বললে—আমার নাম কোকুয়া···আমার বাবার নাম, কিয়ানো!

কোকুয়ার মা আর বাবার সঙ্গে কিয়র হলো পরিচয়··· কিয়কে দেখে তাঁদের খুব পছন্দ হলো। কোকুয়ারও খুব ভালো লাগে কিয়কে, কিয়রও পছন্দ কোকুয়াকে···দুজনের বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় পাকা···এমন সময় ঘটলো এক অঘটন!

একদিন রাত্রে ঘুমুতে যাবার সময় পোষাক বদলাতে গিয়ে কিয় হঠাৎ লক্ষ্য করলে, তার গায়ে কিসের যেন লাল-লাল দাগ ফুটে উঠেছে···তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে এগিয়ে এসে সে দাগ পরীক্ষা করে দেখে, সে চমকে উঠলো! এ কি!···এ যে দুরারোগ্য কুষ্ঠ-ব্যাধির চিহ্ন!

মন তার হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো···এ কাল-ব্যাধির ফলে, কোকুয়াকে বিবাহ করা অসম্ভব! · দারুণ দুর্দ্দিনে কিয়র হঠাৎ মনে পড়লো—সেই বোতলের শয়তানের কথা! বোতলের সেই ক্ষুদে শয়তান যদি তাকে সারিয়ে তুলতে পারে আবার!···

কিন্তু, কোথায় পাবে সে বোতল?···কদিন আগেই তো সে বোতল বেচে দিয়েছে লোপাকার কাছে! তাছাড়া লোপাকাও এখন এখানে নেই···বোতলের শয়তানের দৌলতে প্রকাণ্ড পাল-তোলা জাহাজ পেয়ে, সেই জাহাজে চড়ে মহানন্দে পাড়ি জমিয়েছে দূর-দুরান্তে সাগর-পারের দেশে-দেশে।

···কাজেই, এখন উপায়?···

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টুলটুলির প্রিয় রঙ

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

টুলটুলি মোর জড়িয়ে গলা বললো হেসে: বলো—
রামধনুকের সাতটিই রঙ কেমন ক'রে হলো?
বলো মামা, একটিও কী হারিয়ে যেতে নেই
যখন দেখি, রামধনুকের সাতটিই রঙ সেই।

হাওয়ার জাহাজ ওড়াই যদি রামধনুকের দেশে
পৌছুতে কী পারবো মামা, আকাশপথে ভেসে?
যাওয়ার কথা থাক্‌গে দূরে ভাবতে পুলক জাগে
কাছেতে নয়, অতদূরে—রয়েছে কোন রাগে?

প্রজাপতির পাখায় দেখি সেও তো ওরি মত
সাতটি রঙের কেমন বাহার ফুলের বনে যত!
দর্জ্জিদাদার দোকানে কী নেইকো এমন জামা?
এবার পূজোয় ফ্রকটি আমার অমনি দিও মামা।

এই না শুনে টুলটুলিকে জড়িয়ে কোলে নিয়ে—
দর্জ্জিবাড়ী মনের মত এলাম অর্ডার দিয়ে ;
দু'দিন পরে ফুলের হাসি যায় যে মনে এঁকে,—
রামধনুকের রঙের ফ্রকে মানায় কেমন দেখে।

ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত বিরচিত

এবারে তোমাদের আরো দুটি মজার খেলার কথা বলি। এ খেলা দুটি ভালভাবে রপ্ত করে নিয়ে, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সামনে ঠিক মতো দেখাতে পারলে, তোমরা তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

কাঁচের দুটি গ্লাস মুখোমুখি জোড়া দেওয়া ঃ

কাঁচের দুটি গ্লাস মুখোমুখি জুড়তে পারো ?···আঠা দিয়ে নয়—বাতাস দিয়ে···পারো ?···জবাবে, নিশ্চয় বলবে—না, তা কখনো হয় !

আমরা বলবো—হয় ! কি করে হয়—বলি !

এক মাপের দুটি খালি কাঁচের গ্লাস নাও···আর এই



সঙ্গে চাই—কাঁচের 'বোয়েম' বা 'জারের' (Jar) গলায়, 'জ্যাম্ আর জেলীর' (Jam and Jelly) বোতলের গলায় রবারের ফিতার যে 'রিং' (Ring) বা 'চাকৃতি' থাকে, সেই রিং' একটি। দুটি খালি কাঁচের গ্লাসের একটিকে টেবিলে রাখো···তারপর ঐ যে রবারের 'রিং' —সেই 'রিংটিকে' জলে ভিজিয়ে সেই গ্লাসের মুখে এঁটে দাও—উপরের ছবির ভঙ্গীতে। এবারে এক টুকরো পাতলা-মিহি কাগজ নিয়ে, সে কাগজে আগুন লাগিয়ে ঐ খেলি গ্লাসের মধ্যে ফেলে দাও। জ্বলন্ত কাগজ গ্লাসের মধ্যে ফেলেই ঐ গ্লাসের মুখে উবুড় করে অন্য খালি গ্লাসটা চেপে ধরো—কাগজের আগুন যতক্ষণ না নেভে, উবুড়-করা-গ্লাসটি চেপে ধরে থাকো—যেমন ঐ উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে ! তারপর কাগজের আগুন নিভলে খুব সাবধানে উপরকার উবুড় করা গ্লাসটি ধরে উঁচু করে তোলো···দেখবে—দুটি গ্লাস এঁটে জুড়ে এমন হয়েছে যে, নীচেকার গ্লাসটিও বেমালুম জোড়া লেগে উপরে উঠে আসবে···টেবিলের বুকে খসে পড়বে না।

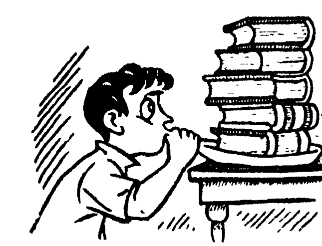
এর কারণ হলো—গ্লাসের ভিতরকার বাতাসের চেয়ে বাইরের বাতাসের চাপ (Pressure) অনেক বেশী—তাই এই বাইরের বাতাসের চাপে দুটি গ্লাস একত্রে মুখো-মুখি এমন এঁটে থাকে—খশে পড়ে না !

ফুঁয়ের জোরে দশ সের ভারী ওজনের বই তোলা ঃ

তোমরা হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছো—কাঁর এমন ফুঁয়ের জোর ?···দানবের ?···না, মানবের ?···মানব হয় যদি তো নিশ্চয় সে খুব জাঁদরেল পালোয়ান !···না, তা নয় !

তোমরা যে-কেউ মনে করলে এ কাজ করতে পারো ! ···কি করে—তাই বলি !

এ খেলাটি দেখাতে হলে বেশ মজবুত-ধরণের কাগজ বা প্লাষ্টিকের তৈরী একটি ঠোঙা বা থলি কিম্বা রবারের বেলুন জোগাড় করতে হবে। সে থলির মুখ হবে বোতলের মুখের মতো সরু ! এই থলিটি টেবিলে পাতো···পেতে তার উপর মোটা-মোটা বাঁধানো কতকগুলো বই রাখো··· সব বইগুলি মিলিয়ে দশ সের ওজন হয় যেন। থলির উপর বইগুলি সাজিয়ে রাখবে—পাশের এই ছবির ভঙ্গীতে। তারপর ঐ কাগজ, প্লাষ্টিক বা রবারের থলির



মুখের ফুটো দিয়ে ফুঁ দাও—যেমন করে ফুটবলের 'ব্লাডার' (Bladder) 'পাম্প' (Pump) করো—তেমনিভাবে। বইয়ের ওজন এক সের থেকে পাঁচ সের পর্য্যন্ত হলে, দশ সের পর্য্যন্ত ওজনের ভারী বই—টেবিলের উপর উঁচু হয়ে উঠবে ! খুব জোরে ফুঁ দেবার দরকার

নেই—আস্তে আস্তে ফুঁ দিলেও, তোমার ঐ ফুঁয়ের জোরে বইয়ের গোছা ক্রমশঃ টেবিলের বুকে উঁচু হয়ে উঠবে!

এর কারণ—তোমার ঐ ফুঁয়ের বাতাস ঠোঙা বা থলির মধ্যে ঢুকে বাতাসে যে-চাপ সৃষ্টি করবে, সেই চাপেই বইগুলো একে-একে উঁচু হয়ে উঠবে!

আপাততঃ এ দুটি মজার খেলা রপ্ত করে নাও—পরের বারে আরো কয়েকটি বিচিত্র খেলার পরিচয় দেবো।

ধাঁধা ও হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

অঙ্কের ধাঁধা ঃ

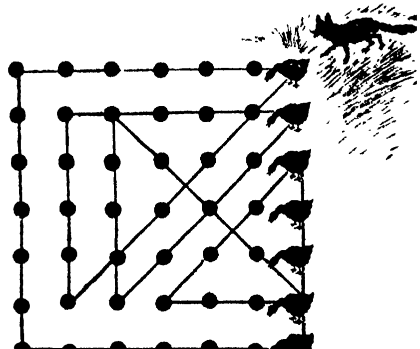
গ্রামের স্কুলে পড়ে ২০০ জন ছেলে…এ সব ছেলে আসে গ্রামের ১০০টি বাড়ী থেকে। কোনো বাড়ী থেকে আসে ১টি করে, কোনো বাড়ী থেকে ২টি করে, কোনো বাড়ী থেকে ৩টি করে ছেলে। বলতে পারো—ক'টি বাড়ী থেকে আসে ১টি করে, ক'টি বাড়ী থেকে ২টি করে, আর ক'টি বাড়ী থেকে ৩টি করে ছেলে ?…

হেঁয়ালির ছড়া ঃ—

একখানা মুখ—তার পিছে বুক-পিঠ—
এই নিয়ে সব—মেদ, মজ্জা, প্রাণপীঠ!
তিলেক বিরাম নাই—চলি দিন-রাত—
থামি যদি, তোমাদের ছেড়ে যবে ধাত্!

কার্ত্তিকমাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির" উত্তর ঃ

১। শেয়াল আর হাঁসের ধাঁধার উত্তর ঃ



উপরে যে ছবি দেওয়া হলো, তাতে দেখছো যে ধূর্ত্ত শেয়াল কিভাবে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মাত্র বারো বার বরাবর সোজাসুজি লাইনে চলে একের পর এক উনপঞ্চাশটি নিরীহ হাঁসকে সাবাড় করেছিল।

২। অঙ্কের হেঁয়ালীর উত্তর ঃ

এমনিভাবে চার রকমে অঙ্কগুলিকে সাজানো যাবে—২৪৩৮১৯৭৬০; ৩৭৮৫৯৪২১৬০; ৭৮৭০৩৯১৫২০; ৪৭৫৩৮৬৯১২০। এচারটি রকমের প্রত্যেকটিতেই শেষ সংখ্যা হওয়া চাই ০! যেভাবেই সাজাও না কেন, শেষ সংখ্যা ০-র আগে জোড়-সংখ্যা থাকলে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫ এবং ১৮ দিয়ে ভাগ করা চলবে…ভাগশেষ কিছুই থাকবে না। উপরোক্ত সংখ্যাগুলির সমস্যা মিটে গেল—কিন্তু বাকী রইলো ৭, ১১, ১৩, ১৬ এবং ১৭। এ সংখ্যাগুলির মধ্যে ১১ দিয়ে ভাগ করতে হলে বেজোড়-সংখ্যার যোগফল হওয়া চাই ২৮, এমন কি ১৭ কিম্বা তার বিপরীত! ৭×১১×১৩=১০০১, দিয়ে ভাগ করতে হলে, যদি ০-কে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে গোড়ার দিকের পর-পর তিনটি সংখ্যা এবং শেষের দিকের পর-পর তিনটি সংখ্যা যোগ দিলে মাঝখানের পর-পর তিনটি সংখ্যার সমান হয়। এ প্রসঙ্গে উপরে চার রকমে অঙ্কগুলি যেমন সাজানো রয়েছে তার মধ্যে চতুর্থ বা শেষ ধরণটি অর্থাৎ ৪৭৫৩৮৬৯১২০ ধরণটি লক্ষ্য করলেই, ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবে। চতুর্থ ধরণের ৪৭৫৩৮৬৯১২০কে যদি ৪৭৪—১৩৮৬-৯১২, এভাবে ভেঙে সাজানো হয় এবং মাঝের পংক্তির গোড়ার সংখ্যা ১-কে গোড়ার পংক্তির শেষ-সংখ্যা ৪-এর সঙ্গে যোগ দেওয়া হয় আর ০-কে বাদ দেওয়া যায়, তাহলেই অঙ্কের হেঁয়ালির উত্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এমনিভাবে হিসাব করে দেখলে—১৯৯ গুণকের সাহায্যে প্রথম রকমে, ৩৯৮ গুণকের সাহায্যে তৃতীয়-রকমে এবং ৩৮৮ গুণকের সাহায্যে চতুর্থ-রকমে সাজানো অঙ্কগুলির সঠিক উত্তর মিলবে।

'শেয়াল আর হাঁসের ধাঁধার' সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ—

১। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৩। কুলু মিত্র (কলিকাতা)

'অঙ্কের হেঁয়ালির' সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ—

১। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
২। রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৩। পুষ্পিতা, মণিতা, কনকাংশু ও রজতাংশু সেন (নিউ দিল্লী)
৪। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা

শ্রীকৃষ্ণা দাশগুপ্ত

ভারতের পরিকল্পনা যুগের প্রথম অধ্যায়েই পরিকল্পনা কমিশন বলেছিলেন যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির ইতিহাসে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করে স্থাপন করবে আর তৃতীয় পরিকল্পনা অর্থনীতিকে এমন এক পর্য্যায়ে নিয়ে যাবে ("take off stage") যেখানে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রগতির পথ বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকেই সুগম হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সমাপ্তি যখন নিকটেই স্বভাবত: প্রশ্ন আসে যে উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্য দুইটি কতদুর সফল হতে পারে। বলা বাহুল্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একটি ক্রমবাহিক প্রক্রিয়া (Continuous Process)। একটি পরিকল্পনা আর একটি পরিকল্পনারই ভুমি তৈয়ার করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী রূপায়নের পথে আমরা অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি—তৃতীয় পরিকল্পনার আলোচনায় স্বভাবত:ই তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কথা এসে যায়, মূল্যমানবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, কর্ম্মসংস্থানের দ্রুত অবনতি এবং সর্ব্বোপরি কৃষির অনুন্নত অবস্থা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন না করার মূল কারণ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাই এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্টে আশা করা হয়েছিল যে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় আয় দ্বিগুণ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যেই আমাদের মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হবে। এই পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ৬২০০ কোটি টাকা (সরকারী এবং বেসরকারী sector মিলিয়ে) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। একথা এখন আমরা সকলেই জানি যে বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্গতির (resource) অভাবের জন্য এবং ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হবে না। ঠিক করা হয়েছে যে ৪৫০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে এবং সঙ্গতি বা resource সংগ্রহ হলে বাকী ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কিন্তু এই ৪৫০০ কোটি টাকার মধ্যেও প্রায় ২৪০ কোটি টাকা ঘাটতি রয়ে গেছে এই ঘাটতি পুরণের জন্য নতুন কর বসানো, ব্যয় সংকোচ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির প্রয়োজন। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই অত্যধিক ভারগ্রস্ত জনসাধারণের উপর নতুন কর না বসালে এবং আরও অন্যান্য উপায়ে resource সংগ্রহ করতে না পারলে ৪৫০০ কোটি টাকাও খরচ করা সম্ভব হবে না। একটি বিশেষ কারণে এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন কারণটি হল ২৫ বছরের পরিকল্পনার ফলে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণও বৃদ্ধি পাবেনা। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য কিছু মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হবে না এবং আরও মনে রাখতে হবে যে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় আমাদের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার একেবারেই আশানুরূপ নয়। দ্বিতীয় যোজনার গোড়াতে আমরা আশা করে ছিলাম আমাদের জনসংখ্যা ১·২৫% এই হারে বৃদ্ধি পাবে। এখন দেখা যাচ্ছে এই হার বর্ত্তমানে প্রায় ১·৭৫%। তাছাড়া ১৯৫২-৫৩ সালের পর এ পর্য্যন্ত মূল্যমান প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধির হিসাব করতে গেলে মূল্যমান বৃদ্ধির হিসাব আমাদের রাখতেই হবে।

জাতীয় আয়ের বিনিয়োজিত অংশের অনুপাতই অর্থনৈতিক উন্নতির মুল নির্দ্ধারক, (Ratio of total investment to national income) আবার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় জাতীয় সঞ্চয়ের দ্বারা। মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চয় প্রবৃত্তির উপর যে গুরুতর প্রভাব পড়েছে একথা অনস্বীকার্য্য। আরও বড় কথা যে বিনিয়োজিত সঞ্চয়ের সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম অধ্যায়ে যে ধরণের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা (বিশেষ করে ভারী শিল্প) আজ ভারতে রূপায়িত হচ্ছে তার ফলে জনসাধারণ পরিকল্পনার সুফল সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারছে না। এ অভিজ্ঞতা শুধু ভারতবর্ষের নয় পরিকল্পনারত অনেক দেশেরই। এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণ পরিকল্পনা সচেতনতা (Planning conciousness) এবং দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বর্ত্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জ্জন দেওয়ার মনোবৃত্তি ভারতবর্ষে এখনও গড়ে উঠতে পারেনি। জাতীয় সঞ্চয়ের হার দ্রুত বৃদ্ধি করার পথে এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের উন্নতির জন্য বরাদ্দ resource-এর কিছু অংশ যদি ভোগ্য পণ্য উৎপাদন, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হত তাহলে পরিকল্পনার সুফল জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত, জনসাধারণের বর্ত্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল তাদের পরিকল্পনার জন্য স্বার্থত্যাগ করতে বলা ভারতীয় জনসাধারণের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। অবশ্য আমাদের বক্তব্য এই না

বর্ত্তমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে খানিকটা বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রবৃত্তি অর্থনৈতিক ...তির পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনসাধারণকে ...তের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে প্রবৃত্ত করান যায় সেটা ...ই পরিকল্পনার প্রগতির পথে একটি limiting factor. সাধারণ ...ন এই কথা বলে যে পরিকল্পনা থেকে আমরা যে লাভ পাচ্ছি তা যদি ...রিকল্পনার মূল্য অপেক্ষা বেশী না হয় তাহলে সেই পরিকল্পনা অর্থহীন। সাধারণ পরিকল্পনা চায়, কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ত্যাগস্বীকার-...র বিনিময়ে, সরকারের কাছে পরিকল্পনার জন্য ত্যাগ স্বীকারের কোন ...মা নাই, জনসাধারণ চায় পরিকল্পনার resourceএর সংগ্রহ, প্রশাসন-...ক ব্যয় সংকোচের সাহায্যে, দুর্নীতি বন্ধ করে এবং non-development খরচ হ্রাস করে, কিন্তু সরকার সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছে ...নে কর বসানোর উপর। সরকারের এই নীতি আমাদের সেই কৃষক স্বর্ণপ্রসূ হাঁসের গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকে তাই সফল করতে হলে কর বসানো ছাড়া অন্যান্য উপায়ে resource সংগ্রহের উপরে বিশেষ জোর দিতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নতুন কর বসানো, Public enterprice এবং state trading এর লাভ ইত্যাদির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বলা বাহুল্য এই নতুন কর দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে পরিকল্পনার জন্য ত্যাগ স্বীকার। পরিকল্পনার জন্য এই ত্যাগ স্বীকার যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে নামিয়ে আনে তবে পরিকল্পনার থেকে লাভও অনুপাতে কমিয়া যায়। এই ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ এমন এক সীমায় পৌঁছুতে পারে যখন জনসাধারণের কাছে পরিকল্পনালব্ধ সুবিধাবলী ঋণাত্মক পরিমাণে দাঁড়াতে পারে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে একজন শহরবাসী নাগরিকের বাজেট থেকে অতিরিক্ত ১০% যাবে কেন্দ্রীয় কর দিতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মাথা পিচু আয় বাড়বে ২০%। (অবশ্য হিসাবটা ১৯৫২ ৫৩ সালের এবং তার পরে প্রায় ১৮% এর মত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ; এছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হবে না এটাও আজ স্পষ্ট, ফলে মাথা পিছু আয় ২০% বৃদ্ধি পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।) এই ২০% এর মধ্যে যদি ১০% যায় কেন্দ্রীয় কর প্রদানে এবং আরও কিছুটা যায় রাজ্যকর প্রদানে, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির তাহলে কতটা অবশিষ্ট থাকে ? আর দ্রুতহারে মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অবশিষ্টটুকুরই বা প্রকৃত মূল্য কতটুকু ? উচুহারে কর বসানো (high taxation) তাই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেবে। শুধু তাই নয় উৎপাদন শুল্ক এবং বিক্রয় করের মত কয়েকটি কর মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর দুদিক থেকে আক্রমণ চলেছে, প্রথমতঃ কর এবং দ্বিতীয়ত মূল্যবৃদ্ধি, তৃতীয় পরিকল্পনা যদি বাস্তবিকই জনসাধারণের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহের বাণী নিয়ে আসতে চায় তবে এই দুটি বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। উপরন্তু মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে দেশের শিল্পগত উৎপাদন বৃদ্ধির পথে তা পরিপন্থী না হয়ে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে যেমন বেতন বৃদ্ধির কথা সরকার অসঙ্গত বলে ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য অথবা বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাবার অধিকারও শ্রমিক সম্প্রদায়ের রয়েছে।

বিগত দশ বছরে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের দেশে কৃষির অনুন্নত অবস্থাই মূল্য বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। মূল্যবৃদ্ধির পৌনঃপুণ্য সূচি (frequency index) থেকে দেখা গেছে যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যই বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সেই তুলনায় শিল্পদ্রব্য ও কাঁচামালের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়নি। শিল্পোন্নতির অব্যাহত গতির জন্য যে খাদ্যোৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা দরকার, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের অভিজ্ঞতা সেকথা ভালভাবেই প্রমাণ করেছে। শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই নয়, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও শিল্প বিপ্লবের আগে সেই বিপ্লবের ভূমি তৈরী করেছে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন। স্বাধীনতার পর থেকেই এবিষয়ে সচেতনতার অভাব আমাদের লক্ষিত হয়নি, অভাব হয়েছে কাজের। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে যখন দেশ বিভাগের ফলে দেশ গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতির সম্মুখীন,তখন কৃষিকার্য্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় আমরা খাদ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ উন্নতি লক্ষ্য করলাম তার অধিকাংশই,সরকার নিজেই স্বীকার করলেন, অনুকূল আবহাওয়ার ফলে, মানুষের কৃতিত্ব তার পিছনে খুব বেশী ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার যে সৌধ দুর্ব্বল কৃষির চোরাবালির উপর রচিত হল তাতে ভাঙন ধর্ত্তেও তাই দেরী হয়নি। আকাশচুম্বী মূল্যমান, Ford foundation এর উপদেশ বর্ষণ এবং আরও অনেক কারণে সরকার তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের কৃষিকে তার পূর্ব্বের গৌরবে আবার স্থাপিত করেছে এবং এটা খুবই আনন্দের কথা।

Ford foundation অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে যদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১১০ মিলিয়ন টনে গিয়ে না পৌঁছয়, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং সে দুর্ভিক্ষ Rationing এবং বহির্ভারত থেকে আমদানীকৃত চাউলের সাহায্যেও প্রতিরোধ করা যাবে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য (target) ছিল ৮০ মিলিয়ন টন—যদিও গত কয়েক বৎসর ভারতের কৃষিজউৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে,কিন্তু সেই বৃদ্ধির হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় এবং শিল্পোন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য মন্থর। প্রথম পরিকল্পনায় সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৮ মিলিয়ন টন, যদিও প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকেই এই পরিমাণের অধোগতি ঘটে, এ পর্যন্ত ভারতের কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধির হার থেকে একথা আজ প্রায় স্পষ্ট ভারত তার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ মিলিয়ন টনএর স্বীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

এই অবস্থার মূল কারণ সেচ ব্যবস্থার উন্নতির অভাব। শুনতে আশ্চর্য

লাগে যে দুটি পরিকল্পনার প্রায় সমাপ্তির পরও আজও ভারতের মোট কর্ষিত ভূমির মাত্র ২৩% সেচের সুবিধা পায়। বাকী ৭৭% জমিতে সেচের প্রায় কোন ব্যবস্থাই নেই। অর্থাৎ খামখেয়ালী প্রকৃতির উপর আজও ভারতবর্ষের কৃষককুল নির্ভরশীল। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের বৃদ্ধির পিছনে ছিল উপযুক্ত বৃষ্টি এবং পরবর্ত্তী যে বৎসরেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়েছে উৎপাদনও কমে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে যে কৃষি এবং কৃষির উন্নতির মূলে যে সন্তোষজনক সেচ ব্যবস্থা একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। বড় বড় "Grandiose" সেচ পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে আজ প্রয়োজন মাঝারী এবং ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার (medium and small irrigation Projects)। বড় পরিকল্পনার অর্থ এবং সময় দুই-ই লাগে প্রচুর। অথচ বেশী অপেক্ষা করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই দুটি প্রকারের সেচব্যবস্থার উপরই জোর দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। যদি বাস্তবে এটা কার্য্যকরী হয় সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। যেখানে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে না সেখানে নলকূপ বসিয়ে সত্বর সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার কিছু সংখ্যক সদস্য বহু পূর্ব্বেই বড় বড় পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য কর্তৃপক্ষ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মত কয়েকটি "Grandiose scheme"এর মোহে এতই আচ্ছন্ন হয়েছিলেন যে এই সাবধান বাণীটির প্রতি কর্ণপাত করাও প্রয়োজন মনে করেন নি। তারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ আজ জনসাধারণের মনেও এই সমস্ত পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে সব উপায় স্বভাবতঃই মনে আসে সেগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত সমস্যা হল দুটি প্রথম সমস্যা সাংগঠনিক, দ্বিতীয়, গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত Social milien তৈরী করা। এই দুটি সমস্যাই পরিকল্পনার বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা প্রয়োজন—কেননা শুধু কৃষি সমস্যা প্রসঙ্গে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই দুটি সমস্যার গুরুত্ব সবিশেষ। তথাপি কৃষির ক্ষেত্রে এই দুটি সমস্যাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাংগঠনিক সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীঅশোক মেহতার উক্তি উল্লেখযোগ্য—"...The success of the third plan is determined by our organisational ability. Organisation means efficiency in work and the discipline of Co-operation. These qualities donot emerge from creating forms. Success depends upon the enlivening Spirit without which forms tend to be oppressive. The enlivening Spirit comes from education and demonstration but above all from persons determined to set the pace. Such pace-setters are either men filled ith missionery Zeal or at a form of an in doctrinated party cadre."

ভাল বীজ ও সার সরবরাহ, উপযুক্ত সেচব্যবস্থা, এবং সন্তোষজনক ঋণদানের ব্যবস্থা—ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য এই তিনটি হল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। [The secret of rapid agricultural progress in the under developed Countries is to be found much more in agricultural extension, in fertilisers, in good seeds, and in water supplies than in altering the size of the farm"—Prof. Lewis.] কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে উপায় সরল হলেও সত্যিকারের কাজের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া সত্বেও কৃষিব্যবস্থার উন্নতি লক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় প্রয়োজনের বিষয়ে সাংগঠনিক সামর্থ্যের অভাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। Reserve Bank কৃষির উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করছে এবং আরো করবে কিন্তু সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative credit socity) গুলির সংগঠন যদি আরো উন্নত করতে না পারা যায়, তাহলে সেই টাকার অধিকাংশই সত্যিকারের অভাবী লোকের হাতে পৌঁছুবে না। বীজ ও সার সরবরাহ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। Rural agency-গুলি যদি যথাযথ ভাবে পরিচালিত না হয়, তবে সরকারের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় সমস্যার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উন্নত ও অনুন্নত দেশের কৃষকের মানসিক গঠনের পার্থক্য প্রচুর। প্রধানত শিক্ষার অভাবে মান্ধাতা-আমলের যে কৃষি পদ্ধতিকে আমাদের দেশের কৃষকেরা আজও আঁকড়ে বসে আছে, তার বন্ধন থেকে ভারতীয় কৃষককে মুক্ত করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার অভাবে ভারতীয় কৃষকের নতুন কৃষি পদ্ধতিকে বরণ করে নেওয়ার আগ্রহ আজ প্রায় শূন্য। অথচ অল্প জমিতেই যে উন্নত প্রণালীর কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একর প্রতি কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়—তার উজ্জ্বল উদাহরণ জাপান। কৃষকদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করতে না পারলে একক ভিত্তিতেই হোক কিংবা সমবায় ভিত্তিতেই হোক্ কিছুতেই কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইস্রায়েলে সমবায় চাষের (Co-operative farming এর) সাফল্যের মূল কারণ কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। আমাদের দেশেও কৃষকদের মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া দরকার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং তার সঙ্গে চাই সরকারের সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এটা সময় সাপেক্ষ, তবু এ বিষয়ে কাজ আগেই আরম্ভ হয়েছে—এটাকে ত্বরান্বিত করা আজ প্রয়োজন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে।

কৃষকদের মনোভাব পরিবর্ত্তন সাধনে সবচেয়ে সাহায্য করতে পারে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development project) এবং জাতীয় সম্প্রসারণসংস্থা (National extension Service). জনগণের শক্তি যে অসীম, সরকারী সাহায্য পেলে তারা যে গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতে পারে এই বোধ যদি সমষ্টি উন্নয়ন পরি-

কল্পনাও জাতীয়সম্প্রসারণ সংস্থা জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে গ্রামোন্নয়নের প্রথম সোপান। তবে দেখতে হবে গ্রামীণ জনসাধারণের এই আত্মনির্ভরশীলতা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়; গ্রামাঞ্চল থেকে সরকারী অফিসারদের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আবার পূর্ব্বাবস্থা না ফিরে আসে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development এর) গত পাঁচবছরে নাতি-উজ্জল ইতিহাসে একথা প্রমাণ হয়েছে যে জনসাধারণ এখনও এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হয়নি এবং তার ফলে তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেক সময়েই তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না। কৃষকদের মন জয় করার চেষ্টা না করে তারা অনেক সময় অতিরিক্ত কর্তৃত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যার ফলে গ্রামের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা একেবারেই গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন কৃষিপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের জন্য কৃষকদের মন জয় করার প্রয়োজন যে সর্ব্বাধিক একথা আমাদের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু কিছুদিন আগেও রাজ্য কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনে বলেছেন।

কৃষি প্রসঙ্গ থেকে আমাদের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক্। কিছুদিন আগেও আমরা শুনেছি তৃতীয় যোজনাকালেই ভারতীয় অর্থনীতি "take off stage"এ পৌছুবে। এই বক্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণ যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (উদাহরণ Dr. A. K. Das Gupta Economic weekly, June 60। অধ্যাপক Rostowএর হিসাবমত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ে ১০% এ পৌছলে, "take off stage"এ আসা সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০% যদিও ছাড়িয়ে গেছে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করলে অধ্যাপক Rostowএর হিসাব আমাদের দেশে প্রয়োগ করা চলে না। (এখানেও মনে রাখা দরকার রাশিয়ার দুটি পরিকল্পনার পরই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৫%, চীনে চার বৎসর পরিকল্পনার পরেই মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২% কাছাকাছি—দুটিই ভারতের বিনিয়োগের চেয়ে অনেক বেশী)। অধ্যাপক Rostowএর হিসাবে ভারতে প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রধান কারণ কর্ম্মসংস্থান অবস্থার শোচনীয় অবনতি। বহুদিন আগে গান্ধীজী যে হিসাব দেখিয়েছিলেন—দিনে চার ঘন্টার কাজ পায় এমন লোকের সংখ্যা ৫ কোটির বেশী নয়—বর্ত্তমানের কর্ম্মসংস্থান তার চেয়ে খুব উন্নত নয়। প্রথম পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থান সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। মোট কর্ম্মসংস্থানের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনায় ছিল প্রায় চার মিলিয়নের কাছাকাছি। দ্বিতীয় যোজনার এতাবধি ইতিহাস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে আট মিলিয়ন কর্ম্মসংস্থান ১৯৬১ সালের মধ্যে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় যোজনায় হিসাব করা হয়েছিল যে, ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে কর্ম্মপ্রার্থী লোকের সংখ্যা বাড়বে দশ মিলিয়নের কাছাকাছি। এছাড়া প্রথম পরিকল্পনা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন বেকার লাভ করেছি। এই পনের মিলিয়নের মধ্যে মাত্র ছয় মিলিয়ন লোক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ পেতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা আরো বেশী বেকার উপহার পাবে। এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার গ্রামাঞ্চলে যে বিরাট জনসংখ্যা আজও under employed তাদের হিসাব আমাদের হিসাবের বাইরে। ক্ষুদ্র শিল্পের আশাতীত সাফল্য ব্যতীত এই underempoyedদের কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় যোজনায় যারা কাজ পাবে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সাময়িকভাবে (যেমন construction এর কাজে) বেকারত্বকে এড়াবার সুযোগ পাবে মাত্র। অর্থাৎ Mr. Robinsonএর ভাষায় এদের employment rotating employ-ment, sedimented employment নয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই দুটি দিকেই নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের লক্ষ্য হচ্ছে ১৩ মিলিয়ন। যদি আমরা আশাও করে যে এই লক্ষ্যে আমরা পৌছতে পারব, আগের হিসাব থেকে একথা স্পষ্ট যে বেকার সমস্যা তৃতীয় যোজনায় কিছুতেই দূরীভূত হতে পারে না। তৃতীয় যোজনা থেকে চতুর্থ যোজনা প্রায় সাত মিলিয়ন এর বেশী বেকার লাভ করবে যদি ১৩ মিলিয়ন কর্ম্ম সংস্থান তৃতীয় পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়। আরো একটি সোজা হিসাব থেকে দেখান যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা আরও বাড়বে বই কমবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে দেখা গেছে প্রতি লোকের কর্ম্মসংস্থানের জন্য প্রায় ৬০০-৭০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয় যদি ১০,০০০ কোটি টাকা হয়, এ সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হতে বাধ্য যে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্য আমাদের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে। এবম্বিধ অবস্থায় "take off" এর প্রশ্ন অবান্তর।

পরিশেষে তৃতীয় পরিকল্পনার রিপোর্টের কয়েকটি অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়গুলি দ্বিতীয় যোজনার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। (১) দ্বিতীয় পরিকল্পনার সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে তৃতীয় পরিকল্পনার রিপোর্টে মূল্যমান বৃদ্ধির উপর যে অধ্যায়টি পরিকল্পনা কমিশন রচনা করেছেন, সেটি একমাত্র স্নাতক পরীক্ষার্থী ছাড়া আর কারো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। বিশেষ উপযোগী কোন উপায়ের কথা বলা হয়নি এ অধ্যায়ে। কৃষি-ব্যবস্থার সত্বর উন্নতি, মুনাফাবাজী বন্ধ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিহত করা এই তিনটি ব্যবস্থাই অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। (২) কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধন—তৃতীয় পরিকল্পনার অধিকাংশই "labour intensive basis" এ রূপায়িত করা উচিত। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য শিল্পে "labour intensive technique"এর সাহায্য গ্রহণ আশু কর্ত্তব্য। ভারতের কর্ম্মহীনের বিরাট সংখ্যা সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার একটি প্রধান কারণ। এইদিকে দৃষ্টি রেখে employment policy বা কর্ম্ম নিয়োগ নীতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। (৩) আশ্চর্য্যের বিষয় "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"

সম্বন্ধে এবার আর পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ কিছু বলেন নি। "Socialist" অথবা "Socialistic" এই দুটি কথার মধ্যে সংতাত্ত্বিক যুদ্ধে জনসাধারণের আগ্রহ নেই, তাদের আগ্রহ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বাস্তব রূপায়নে এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন নীরব। কিছুদিন আগেই আমাদের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু স্বীকার করেছেন যে এযাবৎ যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটেছে তার মোটা অংশ গেছে ধনীকে আরো স্ফীত করতে। শ্রীমন নারায়ণও বলেছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতের ধনবৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। Oxford Instute of Statisticsএর অধ্যাপক সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে ভারতের ধনবৈষম্য অনেক পাশ্চাত্য দেশের ধনবৈষম্য অপেক্ষাও গুরুতর। ইস্পাত শিল্পের মত ভারী শিল্পেও ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়ছে বই কমছে না। অসামঞ্জস্যপূর্ণ করনীতি ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে ধনিক সম্প্রদায়ই লাভবান হয়েছে বেশী। চাপ পড়েছে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের উপর। (৪) সবশেষে জনসাধারণের সহযোগিতার কথা। বর্ত্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটলে জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের পরে মন্ত্রবলে আমলাতন্ত্র জনসেবী এবং অর্থ নৈতিক উন্নতিকে সমাজতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।* এই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথমেই চাই রাজনৈতিক নেতাদের কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ক্ষমতা প্রয়োগের লোভ পরিত্যাগ করা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতখানি ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে পারবেন কি?

* [জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রসঙ্গে আমলাতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীকৃত করার কথা বলেছেন]

"রাঙামাটির দেশে"

অধীর দত্ত

হঠাৎ একদিন রতনপুরের জমিদার ডেকে পাঠালেন রামপুজনকে। রামপুজন ভাবে হঠাৎ আবার তার সাথে কি দরকার পড়ল। তবে কি কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছে সে! মনে মনে একবার পুরনো ইতিহাসের বিবর্ণ পাতাগুলো উল্টে নিল। না। তেমনকিছু নয়ত। তবে? একরাশ সন্দেহে আর কৌতূহলে কাঁপছে মনটা! ঠিক সময়মত পৌছাল রামপুজন। একরাশ লোক জমিদার কিরণশঙ্করকে ঘিরে দাবা খেলার নেশায় মত্ত। কারুকে কিছু না বলে এককোণে চুপ করে বসে পড়ল। কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। হঠাৎ তারপর দৃষ্টি পড়ল কিরণশঙ্করএর। মুখের ওপর থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে কিরণশঙ্কর বললেন:—এই যে রামপুজন তুমি এসে গেছ। তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম একটু। হাত দুটো জোড় করে রামপুজন বলল:—বলুন আপনার আমি কি উপকারে আসতে পারি। কিরণশঙ্কর বললেন:—কাজটা এমন কিছু কঠিন নয় তোমার পক্ষে। একটা হরিণ আমায় শিকার করে দিতে হবে। যা লাগে দেব আমি। এতক্ষণে দুর্ভাবনায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কি জানি আবার কি হোল। জমিদার কিরণশঙ্কর-এর কথা শুনে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার শ্বাস ফেলল। একটু দম নিয়ে রামপুজন বলল:—বেশ তো। এ আর এমন কি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পরের দিনই জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাঙামাটির দেশে গেলে পাওয়া যেতে পারে অনেক হরিণ। মনে মনে পথ ঠিক করে হাঁটতে সুরু করল। শীতের বেলা। যেতে যেতে সন্ধ্যা নামল নোতুন গ্রামে। বৈকালীন স্নান সেরে ফিরছিল একজন কৃষাণ-বধূ! একটু দূর থেকে রাজপুজন জিজ্ঞাসা করল:—রাঙা মাটির দেশ এখান থেকে কতদূর বলতে পার? ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে কৃষাণ বধূ বলে উঠে: বেশী দূর নয়। ক্রোশ তিনেক হবে। না, তা হলে আর রাতে পথ ভাঙা নয়। রাতটা এখানে কাটিয়ে আবার সকাল থেকেই হাঁটা সুরু করলে হবে। হোল্ডল থেকে তাঁবুটা বের করে একটা বুড়ো বটগাছের তলায় রাতের মত একটা ছোট্ট আস্তানা করে নিল। ব্যাগ থেকে একটুকরো রুটি বের করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

সকাল থেকেই আবার হাঁটা সুরু করল রামপুজন। একভাবে পা চালিয়ে যখন রাঙা মাটির দেশে এসে পৌছল তখন বেলা প্রায় বারটা!

দূরে একটা জলা। সূর্যের সোনালী প্রতিফলন পড়েছে তার 'পর। আশপাশের গাছের দোলনের প্রতিবিম্ব পড়ে জলার জল কাঁপছে, দুলছে। রোদ পড়ে এলে জলায় আসতে সুরু করে হরেক রকমের পাখী। যেখানে যত কাজ থাক—এসময়টা তারা এখানে এসে মিলবেই। এটা যেন তাদের মিলনতীর্থ! শালিক আর শ্যাম পাখী একই ডালে বসে কূজন গাইতে সুরু করে। বনটিয়া, গাংশালিকের দল উড়ে উড়ে বেড়ায় জলার চার পাশ দিয়ে। মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করে ডেকে ওঠে শালিকপাখী। প্রশস্ত জলাটার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। দূরের সারি সারি পাহাড়গুলো যেন নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। একঝাঁক লাল হাঁস নামল জলাটায়। তোলপাড় হয়ে উঠল আবার শুদ্ধ জলার জল। ময়ুরপঙ্খীর মত ওরা ভেসে চলেছে সার বেঁধে। বসন্তের যেন নেশা লেগেছে ওদের দেহমনে। একটা লালহংসীকে ঘিরে জনকয়েক পুরুষ হাঁসের সে কি সোরগোল। সবারই লক্ষ্য ঐ হংসীটার 'পর! হংসীটা আবার ডেকে উঠল পেয়াক্, পেয়াক্। যেন একটা প্রতিযোগিতার ডাক। কে আমায় ধরতে পার? যেমনি ছুটে আসে ওরা, অমনি কাছ থেকে দূরে সরে যায়। রামপুজন যত দেখে তত অবাক হয়। একটা রাত কেটে গেল রাঙামাটির দেশে। অথচ আজও

সন্ধান মিলল না কোন হরিণের। পরদিন সকালে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সব দেখতে এল রামপূজনকে। ছোট ছোট ছেলেরা তো বন্দুক, লাঠি, সড়কি দেখে আর তার ত্রিসীমানা মাড়াল না। দূর থেকে দেখল তাকে। রাঙা মাটির দেশের মানুষের মুখে শুনল রামপূজন। হরিণ শিকার করতে হলে যেতে হবে আরও গভীর বনে। একেবারে চোখে চোখে না রাখলে হরিণ শিকার করা যাবে না। কতদিন চেষ্টা করেছে ভারী তীরের পাল্লায় আনতে। পারিনি। একটু হাসল রামপূজন। অবিশ্বাসের হাসি। তীরের পাল্লায় যাকে ওরা আনতে পারেনি, দেখা যাক বন্দুকের পাল্লায় তাকে আনা যায় কিনা? ওরা তো জানেনা। রামপূজনের শিকারী জীবনের কথা। জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় কেটে গেল বনে বনে। আজ পর্য্যন্ত কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। এতটুকু কাঁপেনি হাত। কত সুচতুর হিংস্র বাঘের গর্জন সারা জনমের মত থামিয়ে দিয়েছে ঐ হাত। আকাশে উড়ন্ত কত পাখীকে নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে। আরও কত কি। সে কথা যদি জানত তাহলে অমন কথা বলতনা রাঙামাটির দেশের লোকেরা।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে আস্তানা উঠিয়ে নিয়ে রওনা দিল রামপূজন। যতই এগোতে লাগল বন ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর হতে লাগল। কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না। চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বনের পাঁচিল। যেতে যেতে কতবার লতায় পাতায় জড়িয়ে গিয়ে যাত্রা মন্থর হয়ে গেছে রামপূজনের। যেন কোন আপনজন, মনের মানুষকে ওরা হৃদয়ের পাকে পাকে জড়িয়ে নিতে চায়। দু'হাতে বনের সমুদ্র সরিয়ে চুপি চুপি পায়ে এগোতে লাগল। পথের পর একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র বনটাকে এক নজরে দেখে নিল। কি বিশাল প্রকাণ্ড বন। দিনের পর দিন হাঁটলেও বোধকরি এর শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ যেন প্রকৃতির নিজে-হাতে গড়া সাম্রাজ্য। গাছে গাছে ফুটেছে রং বেরঙের মরশুমি ফুল। ফুলের গন্ধ নিয়ে ভেসে আসছে বসন্তের বাতাস। কি সুগন্ধী সুবাস। যদি আরও একটু যত্ন লওয়া যেত তা'হলে হয়ত আরও ভাল দেখাত। পূর্ণাঙ্গ হ'ত ওদের বিকাশ? না অযত্নের মধ্যে বেড়ে উঠেছে বলে অমন সুন্দর দেখাচ্ছে কে জানে? ঐ অনেক দূর এগিয়েও কিছু দেখতে পেল না রামপূজন। মাথার উপর জ্বলছে মধ্যাহ্ন সূর্য। ও তো সূর্য নয়। যেন বিসুবিয়াস। গায়ের গরম জামা-কাপড়গুলো খুলল রামপূজন। তারপর ব্যাগ থেকে চিড়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিল। মাথার উপর ব্যাগটা দিয়ে ওখানেই একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। ঘুমটা যখন বেশ একটু ধরে এসেছে, ঠিক এমনি সময়ে শুকনো পাতার মড়মড়ানির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল রামপূজনের। তারপর যা দেখল তাতে ঘুমের নেশা ছুটে গেল। এক মস্তবড় শিঙাল হরিণ তার দলবল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বন দিয়ে। পায়ে তাদের বিদ্যুৎগতি। এমন হরিণ পেলে খুশীই হবেন কিরণশঙ্কর। বিশ্রামের নেশা ছুটে গেল। আর বিলম্ব নয়। দু'কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে, বুকে ম্যাগাজিন বেল্টটা এঁটে নিয়ে হরিণের পায়ের ছাপ দেখে দেখে নিঃশব্দে চলতে লাগল। পায়ে পায়ে—হেঁটে হেঁটে শিকারের এ আর এক আনন্দ। তাই রামপূজনের ক্লান্তি নেই—শ্রান্তি নেই। রক্তে যেন নোতুন করে যৌবনের নেশা লেগেছে। চড়াই আর উৎরাইয়ের পথ ডিঙ্গিয়ে চলতে থাকে রামপূজন। তিনক্রোশ হাঁটার পর পায়ের ছাপ আর পাওয়া যায় না। আবার কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে যাওয়া চিহ্নটা দেখতে পেল। এ যেন মেঘের লুকোচুরি খেলা। এই দেখা গেল রোদ্রে ঝলমল করছে সব। পরক্ষণে আবার মেঘে মেঘাকার সব।

আরও খানিকটা পথ চলার পর রামপূজন থমকে দাঁড়াল। ওধারে যাবার আর রাস্তা নেই। পথ শেষ হয়ে গেছে। একটা টিলায় উঠে ভাল করে বনটা দেখে নিল। না, কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। এ পথের তো বাঁক নেয় নি। একেবারে সোজা বেরিয়ে এসেছে। তবে গেল কোথায় ওরা। একেবারে চোখের পলকে তেপান্তরের মাঠে। শক্তিতে সবচেয়ে নিরীহ জীব ওরা, অথচ বুদ্ধিতে সবার সেরা। বাতাসে ওরা গন্ধ পায় পেছনে শত্রু লেগেছে কিনা। কি করবে রামপূজন—ফিরে যাবে না। আদিম অরণ্যের মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দেবে। পশ্চিম দিগন্তে লাল সূর্য্য ঢলে পড়েছে। পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলোর আভা পিছলে, পিছলে পড়ছে শাওন পাতার কোল বেয়ে। সারা দিনের পর ফিরে চলেছে

তারা পাতার নীড়ে। রামপূজন তাঁদের একটা লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। ঝনঝন করে উঠল আকাশ, মাটি, বন। উড়ন্ত বকটা প্রবল একটা ঝটপটানির সঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। মাটি থেকে তুলে নিল রামপূজন ওটা। তখন ঝটপটানির শেষ হয় নি। রামপূজন ব্যাগ থেকে একটা তিনমুখো শাণিত ছুরি বের করল। তা' দিয়ে ওর ডানা দুটো কেটে দিল। স্তব্ধ হয়ে গেল সারা জনমের মত ওর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া। রাত্রিটা ভাল ভাবেই যাবে। আশ পাশ থেকে শুকনো পাতা জড় করে উনুন ধরাল। সস্‌পেন-এ সিদ্ধ করে নিল বকটা। একটু রাত হলে রুটি দিয়ে ওটার সদগতি করল। সমস্ত আকাশ আলোয় আলো হয়ে আছে। কারা যেন অজস্র হীরে কুচি ছিটিয়ে দিয়েছে রাতের আকাশে। দূরান্তের পাহাড়ের নীচে জ্বলছে জোনাকির মুক্তোর মালা। মাঝে মাঝে আশ্চর্য তন্ময় হয়ে যায় রামপূজন। হিংস্র কুটিল মনটা যেন কার অদৃশ্য ঈংগীতে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পৃথিবীর কত রূপ। কত রং। অথচ সেই পৃথিবীর মানুষ রামপূজন কত কুশ্রী, কত বীভৎস। কি জঘন্য তার মনোবৃত্তি। জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় কেটে গেল। অথচ কোন মানুষের উপকারে আসতে পারল না। শুধু কারণে-অকারণে মানুষের খেয়াল-খুশীর যোগান দিয়ে এসেছে। জিঘাংসার প্রবৃত্তি তাতে বেড়ে গেছে অনেক বেশী। শিকার ছাড়া আজ একটা দিনও কাটে না। হঠাৎ চিন্তার তন্ময়তার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। একি ভাবছে রামপূজন। শিকারী জীবনে আবার ভাবপ্রবণতা কিসের? ওর জন্যে তো হাজার হাজার চিন্তাশীল মানুষ রয়েছে। তারা ভাববে ওসব।

রামপূজন একটা Challenge নিয়ে এসেছে এখানে। সে Challenge রাখতে না পারলে রামপূজনের শিকারী জীবনে একটা মস্ত বড় কলঙ্ক। একটা দুর্নাম। এতদিন যে অপরাজিতের আখ্যা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে এ বন থেকে সে বনে। সে আজ পরাস্ত হয়ে ফিরে এল রাঙা-মাটির দেশ থেকে। না! না!! না!!! এ কিছুতেই হতে দেবে না। বন্দুকের পাল্লায় যেমন করেই হোক আনতে হবে ধূর্ত্ত শিঙাল হরিণটাকে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা মোমবাতি জ্বালান। চারিদিক জুড়ে স্তব্ধতা। আশ-পাশে কোথাও বসতি নেই। চারিদিকে শুধু বন আর বন। বিশাল গহন অরণ্যের আজ একক অধিবাসী রামপূজন। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় কোন জন্তু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাকে। তবে? কে আসবে তাকে সাহায্য করতে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না তার গগনভেদী আর্ত্ত ক্রন্দন। সে কান্নার ভাঙা ভাঙা সুর বনের চার পাশ দিয়ে বেজে বেজে চলবে। শেষ রাত। তখনও আকাশে জ্বলছে দু' একটা হীরে কুচি। একটু সজাগই ছিল রামপূজন। একেবারে বেহুঁস হয়ে ঘুমোলে আবার বিপদ আছে। শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কাছাকাছি থেকে একটা দলের ভীত পদধ্বনি শোনা গেল। হরিণেরা ছুটছে। শিঙাল হরিণটা রাতের অন্ধকারে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে দল। সবদিক লক্ষ্য রেখে পেছনে চলেছে ঝিকমিক। পেছন পেছন ধেয়ে আসছে মস্ত বড় কড়গরির দল। হরিণদের পরমশত্রু। একক ভাবে ওদের শক্তি বনের সবচেয়ে নিরীহ জীব হরিণের চেয়েও কম। কিন্তু দলগত সংহতি ওদের বড় শক্তি। কোন সময়ে ওদের একা দেখা যায় না। ওরা আক্রমণ করে দলগতভাবে। শিকার ভোগ করে দলগতভাবে। আবার মরেও দলগত ভাবে। সারারাত ধরে হরিণেরা এ বনে রয়েছে—অথচ এতটুক টের পাইনি রামপূজন। তন্ন তন্ন করে ফেলেছে বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কিন্তু দেখা পায়নি ওদের। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হাত ছাড়া হয়ে গেল শিকার। বুদ্ধির লড়াইয়ে রামপূজন যেন কেবলই হেরে যাচ্ছে। ভগবানের কাছ থেকে সম্বল বলতে তো ওরা ঐটুকু পেয়েছে। তা' যদি না পেত তাহলে পদে পদে ওদের যাত্রা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠত। শালগাছের মাথা ছুঁয়ে উঠছে প্রভাত সূর্য। মহুল ফুলের লোভে লোভে ভোর থেকে আসতে সুরু করেছে ভল্লুকের দল। মহুল ফুলে ওদের জীবন কাটে। কখন ওরা উইয়ের ঢিবির সন্ধান পেলে ছুটে যায় সেখানে। উইপোকা ওদের প্রিয় খাদ্য। বড় বড় শক্ত উই ঢিবি ওরা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেঙ্গে ফেলে। নখে ওদের প্রচণ্ড ধার, আর খাবার অসাধারণ শক্তি।

রামপূজন আবার পায়ের ছাপ ধরে এগোতে থাকে।

দু ক্রোশ গিয়ে দেখে চড়াইয়ের রাস্তায় বাঁক নিয়েছে সে ছাপ। রামপূজন চলতে থাকে। খানিকটা দূরে গিয়ে দেখে একটা জলায় নেমেছে হরিণের দল। পারে দাঁড়িয়ে শিঙাল হরিণটা নেতৃত্ব করছে। চোখে তার তীব্র দৃষ্টি। কার সাধ্যি সে দৃষ্টি এড়িয়ে শিকারকে বন্দুকের পাল্লায় নিয়ে আসবার—রামপূজন ঘন বন দিয়ে সরীসৃপের মত চলতে থাকে। অনেকটা এসে গেছে। প্রায় বন্দুকের পাল্লায় এসে গেছে শিঙাল হরিণটা। ঘোড়া টিপে দিলেই হয়। কিন্তু ঠিক ঘোড়াটা টেপার মুখে রামপূজন মুখোমুখী হোল একজন বাগ্দীর মেয়ের সাথে। বনেই থাকে। আশ্চর্য্য—বাগ্দীর ঘরের মেয়ের এত রূপ, এত জৌলুষ। টানাটানা চোখের দিকে চাইলে চোখ্ ঘোরান যায় না। কবরীতে বাঁধা একটা বন ফুলের গুচ্ছ। সারা অঙ্গে ওর সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য ঝলমল করছে। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ছিল রামপূজন। কতক্ষণ চোখের পাতা ফেলতে পারিনি কে জানে? লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেছে রামপূজন। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেছে। ঘোড়া আর গর্জে উঠেনি। ওদের উপর ভগবানের অসীম দয়াই বলতে হবে। তিনি যেন ওপর থেকে ওদের পথ দেখিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। একটু পরেই মেয়েটার উপর একটা কঠিন আক্রোশে রিরি করে উঠল রামপূজনের দাঁতের মাড়িটা। এমন হাতের মধ্যে পড়ে কি কেউ রেহাই পায়। ঐ মেয়েটাই যত সর্বনাশার মূল। একবার মনে করল দিই ওই গুলি দিয়ে মেয়েটাকে সারা জনমের মত এ মাটির পৃথিবী থেকে সরিয়ে। কিন্তু কি ভেবে নিশ্চেষ্ট হোল রামপূজন।

আবার পথ ভাঙা, যাত্রা সুরু। কতদিনে—পথ চলার শেষ হবে কে জানে—? এ যেন মরীচিকার পেছন পেছন খালি ব্যর্থ পরিক্রমণ। জলার পাশ দিয়ে একটা বরফ ধোয়া আল পথ বেরিয়ে গেছে। সেই পায়ের ছাপ ধরে নিঃশব্দে চল্‌তে লাগল রামপূজন। নিচে বড় বড় খাদ। একটু বেসামাল হলেই একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু। কোন শক্তি নেই তাকে রোধ করার। রামপূজন চলতে থাকে। চোখ ওর সব সময় সজাগ, সন্ধানী দৃষ্টি—দূরে কিসের একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল রামপূজন। চারিদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। দূরান্তের খানিকটা যায়গা গোলাকার। ধব ধব করছে সাদা। রামপূজনের বুঝে নিতে কষ্ট হোল না এখানে বাঘ থাকে। ধারণাটাকে আরও একটু নিশ্চিত করার জন্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। একটা সরু সুড়ঙ্গ পথ অনেক দূর বেরিয়ে গেছে। রাতে শিকার শেষে বাঘেরা এখানে ফিরে আসে।

ঠিক নালাটার পাশেই একটা মৃত গরুর হাড়-গোড়ের পর শকুনি-চঞ্চুর সেকি লোলুপ ব্যস্ততা। বেলা পড়ে এসেছে। রামপূজন থামল। একটু বিশ্রাম করে আবার উত্তরের পথ দিয়ে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে কাঁটা বন, চড়াই উত্তরাইয়ের রাস্তা। পথ চলতে গিয়ে কতবার পায়ে কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরেছে। কতবার পাথরে হোঁচট্ খেয়ে আঙ্গুল জখম হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে আজ কোন লক্ষ্য নেই রামপূজনের। লক্ষ্য তার ঐ শুধু। শিঙাল হরিণটাকে যেমন করেই হোক বধ করতেই হবে। ঘুমের নেশায় যেন মাথার রক্ত চলকে চলকে উঠছে। পথ চলতে চলতে দিনের বেলা শেষ হয়ে এল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মাঝে মাঝে গাছের পাতাগুলো চিক চিক করে উঠছে। একটা ভাল টিলা দেখে তার উপর উঠে পড়ল রামপূজন। সর্বত্র যেন ক্লান্তি। অপূর্ণতার বেদনায় মনটা বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ব্যাগ থেকে শিগারেটের টিনটা বের করে পর পর কয়েকটা শেষ করে ফেলল। এতদিনের শক্ত মনটা কে যেন বড় বেশী দুর্বল করে দিয়েছে। মুখের ভাজে ভাজে বিরক্তির ছাপগুলো ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে। অনেকদিন হয়ে গেল বনে। সরমাকে বলে এসেছিল দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু ফিরবে কি নিয়ে। শিকার কোথায়। দরজায় পা দিতেই যখন স্মিত হাসি নিয়ে বেরিয়ে এসে বলবে দেখি, দেখি কেমন হোল? কি জবাব দেবে রামপূজন? না মা—শিকার তাকে করতেই হবে। তাতে যদি আরও কিছুদিন থাকতে হয়—প্রস্তুত আছে সে। শিকার তার চাই। একটু শুতেই চোখটা ধরে এল রাজপূজনের। সারাদিন পরিশ্রম গেছে। তন্দ্রা আসবার কথা বই কি! মাঝরাতে হঠাৎ পায়ের কাছে তপ্ত শ্বাস লাগতেই উঠে বসল রামপূজন। টর্চটা মারতেই প্রায় চীৎকার করে উঠল, সর্বনাশ পাঁচ ছটা ময়াল সাপ, তার সাথে অহিরাজ শঙ্খচুড়, গোক্ষুর। কি করবে রামপূজন

ভেবে পেল না। তল্পি-তল্পা নিয়ে উঁচুটিলা থেকে গভীর বনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্তব্ধ বনটা আবার কেঁপে কেঁপে উঠল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে রামপূজন। আর একটু বেহুঁস হলেই আর রক্ষে ছিল না। অজ্ঞান্তে বেরিয়ে যেত প্রাণটা। শেষ হয়ে যেত সারা জনমের মত শিকার-করা। পরদিন সকাল বেলায় আবার রওনা হোল রামপূজন। সেদিন হয়ত ভাগ্য সুপ্রসন্নই ছিল। বেশী দূর আর এগোতে হোল না। দূরন্তের একটা বড় শাল গাছ ঘিরে হরিণের দল যাচ্ছিল। বন্দুকটা একবার নেড়ে চেড়ে দেখে নিল রামপূজন—ঠিক আছে—চুপি চুপি পায়ে এগোতে লাগল ওদের দিকে।

সবার খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর শিঙাল হরিণটা সবে খেতে বসেছে। ঠিক এমনি সময়ে দুড়ুম দুড়ুম করে শিঙাল হরিণটাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল রামপূজনের দুনলা বন্দুক। বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে নায়ক-হারা হরিণের দল দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। পায়ে যেন ওদের বিদ্যুৎ লাগাল। এক নিমেষে সমস্ত বনের কোলাহল থামিয়ে দিয়ে ওরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এতদিন যার নেতৃত্বে ওরা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় চলাফেরা করেছে, যে শিখিয়েছে চিনতে ওদের বনের বন্য জন্তুদের পায়ের পদধ্বনি, সমস্ত বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে যে আর সবাইকে রেহাই দিত, সে আর কোনদিন ফিরবে না। কোনদিন আর ওর সফল নেতৃত্ব পাবে না ওরা। কতদিনে আবার ওদের মধ্যে থেকে অমন নায়ক গড়ে উঠবে কে জানে? মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে শিঙাল হরিণটার। রক্তাক্ত দেহটাকে কাঁধের উপর ফেলে চলতে লাগল রামপূজন। এতদিনের পায়ে হাঁটার ক্লান্তি নিরলস তপস্যার সিদ্ধ বস্তু মিলেছে আজ। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির লড়াইয়ে জিত হয়েছে রামপূজনের। স্বামীর পথের দিকে চেয়ে হয়ত কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেছে সরমার। এতদিনের পথ চাওয়া আজ শেষ হোল। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে হয়ত সব কাজ ফেলে ছুটে আসছে সে। মাথার উপর থেকে সরে যাওয়া কবরীটা ঠিক করতে করতে একগাল হাসি হেসে বলবে—দেখি দেখি কেমন হোল। সরমা জানে রামপূজনের কথাটা কোনদিন বিফল হয়ে খালি হাতে ফেরেনি রামপূজন। মনে আছে সরমাকে বিয়ে-করার পর যেদিন ও বাঘ শিকার করে নিয়ে এল সেদিনও ঠিক এমনি কথাই বলেছিল সরমা। 'দেখি দেখি কেমন শিকার?' সরমার পায়ের কাছে বাঘটা ফেলতেই একেবারে চীৎকার করে উঠেছিল সরমা। তারপর থেকে সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন আর ভয় লাগে না। রামপূজন ফিরে চলেছে দেশের মাটিতে। এতদিন পথে হেঁটে হেঁটে রোদ-জলে পুড়ে যে শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছিল—আজ যেন সে শরীরে দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এসেছে। কিরণশঙ্করকে অবাক করে দিবার মতই শিকার পেয়েছে রামপূজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাত্রা শেষে যে এমন একটা মর্মান্তিক পরিণতির মুখে মুখোমুখী হতে হবে একথা সে ভাবতেও পারিনি। দেশের মাটিতে পা দিতেই পাড়া প্রতিবেশীর মুখে যে কথা শুনল, তাতে একেবারে পাথর হয়ে গেল রামপূজন। দুপুরবেলায় ছাদে কাপড় দিতে এসেছিল সরমা। ছাদের গা লাগান আমগাছটায় বসে পরম নিশ্চিন্তে সদ্য-আনা রায়বাহাদুর গিন্নীর হাতে দেওয়া কাপড়ে লাগান বড়িগুলোর সদ্গতি করছিল বানরটা। ঠিক এমন সময় বানরকে লক্ষ্য করে রায়বাহাদুরের দুনলা বন্দুক গর্জে উঠল। আশ্চর্য ভগবানের বিধান। গুলিটা বানরের গায়ে না লেগে একেবারে সুরমার বুকে।

এতদিন পথে-ঘাটে প্রান্তরে যে নিরন্তর শিকার করে বেরিয়েছে আজ শিকারীর ঘরে মস্তবড় শিকার হয়ে গেল। রাঙামাটির দেশ ছেড়ে চলে আসার পর আর কোনদিন বন্দুক ধরেনি রামপূজন। একদিন যে হাতে নিপুণতার কারিগরি ছিল অজস্র—আজ সে হাতে ধরেছে কাঁপন। এক একদিন কোন মেঘমেদুর শ্রাবণ সন্ধ্যায় দেওয়ালে ঝুলান বন্দুকটার দিকে চেয়ে রামপূজনের মনটা চলে যায় অনেক দূরে। মনে আছে গাছের মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে বসে আছে। পাতা বেয়ে টুপ টুপ করে পড়ছে কুয়াসা। বৃষ্টি হিমেল বাতাসের শিরশিরানি সূচের মত বিঁধছে। সমস্ত শরীর ঢেকে শুধু মুখটা বের করে বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে রামপূজন। মনে পড়ে রাঙা মাটির দেশে কতদিন শিঙাল হরিণের পেছনে পেছনে ছুটেছে। মাঝরাতে কোন পিঁপড়ে কামড়ালে ধড়মড় করে উঠে বসে রামপূজন। মনে হয় বুঝি ঐ ময়াল সাপে ধরেছে। জীবন-সায়াহ্নে এসে আজ যেন ভাবতে অবাক লাগে রামপূজনের—এক কালে সে শিকার করত।


দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার ফেনা সারাদিন
আপনাকে সতেজ এবং সজীব রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
RP 164-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

বৃন্দাবনের স্মৃতি

শ্রীরাধাবল্লভ দে

বহু বৎসর আগের কথা। আমার পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল একবার বৃন্দাবন যাবার স্বর্ণ সুযোগ। বৃন্দাবন হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। তার আকাশ বাতাসে, বৃক্ষ-লতায়, জলে, স্থলে, এমন কি প্রতিটি ধূলিকণায় ভক্ত ও ভগবানের অপরূপ প্রেম-লীলার স্মৃতি জড়ানো। ভগবৎ প্রেমের চিরন্তন সুরটি একদিন বেজেছিল এই বৃন্দাবনে। নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর, যে সুর শোনামাত্র সংসারী বৃন্দাবনবাসীদের সংসারবোধ লুপ্ত হ'ত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তর নেচে উঠতো এই সুরে। তাই বহু-কথিত, বহু-বর্ণিত ভগবৎ লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বৃন্দাবন দেখবার আশায় মন নেচে উঠলো। আমি তখন হাজারিবাগ জিলা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করি। শ্রীগুরু শ্রীভগবানের কৃপায় ছুটি মঞ্জুর এবং পাথেয়র ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। সেই দিনেই রওনা হয়ে পরদিন সেখানে পৌছে গেলাম। একটি পাণ্ডার সাহায্যে এক ধর্মশালায় আশ্রয় পেলাম। তারপর আরম্ভ করলাম লীলা-প্রসঙ্গের অচ্ছেদ্য সম্পর্কীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে। প্রথমেই গেলাম যমুনাতটে। বহু স্মৃতি জড়ানো এই যমুনা। মনে ভেসে উঠলো বহুবার শোনা বঙ্গবিখ্যাত গানটি।

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী।
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে,
বিকাত নীলকান্তমণি।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে যমুনাকে দেখলাম প্রবাহহীন। দুকূল-ছাপানো, মনভুলানো যমুনার রূপ দেখতে পেলাম না। যমুনা বিস্তৃত বালুকারাশির মধ্যে একটি চিকচিকে ক্ষীণ জলের রেখা মাত্র। বহু স্মৃতি-জড়িত শ্রীকৃষ্ণলীলার নীরব সাক্ষী এই যমুনার পবিত্র জল স্পর্শ করলাম এবং মাথায় নিলাম। তারপর পরের পর দেখলাম শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়িত কয়েকটি বাঁধানো ঘাট। এইখানেরই এক ঘাটের কেলি-কদম্ব গাছ হ'তে শ্রীকৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাল-নাগকে ধ্বংস করতে। এইজন্যই ঘাটের নাম কলিয়া-দমন ঘাট। লীলায় ছাওয়া বৃন্দাবন। শুনি নাকি এই কদম্বের ডালে ডালে রাধাকৃষ্ণ নাম আপনা হতে ফুটে উঠে। জ্ঞান-চক্ষু যাদের উন্মীলন হয়েছে তাঁরাই দেখতে পান। দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দেখেছিলেন প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দেখেছিলেন মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী। তারপর দেখলাম চীর ঘাট। গোপিনীদের সর্ব্বার্পণ পরীক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ তাদের পরিধানের বস্ত্রগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন এই ঘাটের কদম্ববৃক্ষের ডালে, তারা যখন বিবস্ত্র হয়ে স্নানে নেমেছিলেন। কল্পনার ছবিতে ভেসে উঠলো গোপিনীদের লজ্জা নিবারণের কঠিন পরীক্ষা। এই সেই গাছ, এই সেই ঘাট, আর এই সেই যমুনাতীর। তারপর এলাম বংশীবট। এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনমোহন বাঁশি বাজিয়ে বৃন্দাবনবাসীদের মুগ্ধ করতেন। কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে তারা ভুলে যেত তাদের পার্থিব সম্পর্ক। ছুটে আসতো এই মধুর বাঁশির সুর শুনে। বংশীধরের মনমোহনী বাঁশীর নীরব সাক্ষী এই বংশীবট। এইবার এক বিশাল দরজা দিয়ে বৃক্ষ-লতা ঝোপ-ঝাড়ে পূর্ণ এক নিকুঞ্জবনে ঢুকলাম। এ কুঞ্জবন রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। সাপের মত জড়ান গাছের গুঁড়িগুলি কোমর বাঁকা ক'রে যেন ঝুঁকে রয়েছে। যাঁকে উদ্দেশ ক'রে বৃক্ষ-লতা এই আভূমি প্রণতি জানাচ্ছে, চক্ষু যেন ব্যগ্র হয়ে তাঁকেই দর্শনের জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বড় সুন্দর একটা অনুভূতি যেন হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলল। পুরোহিত ঠাকুর বল্লেন, বিদেহী কৃষ্ণ রাধা এখনও এখানে নিত্যলীলা করেন। তারপর এলাম নিধুবনে। নিকুঞ্জবনের মতই দেওয়ালে ঘেরা নিধুবন। এখানেও ঐ আশ্চর্য্য মহিমা। বৃক্ষগুলি যেন লতা হইয়া ব্রজের ধূলাতে লুটাচ্ছে। সেই ঝোপ-ঝাড়, সেই বৃক্ষ-লতা। এখানে কয়েকটি সুন্দর সমাধি দেখলাম। চারিদিকে শান্ত, মনোরম পরিস্থিতি। অন্তিম-শয়নে শান্তিতে বিশ্রাম

নেবার উপযুক্ত স্থান বটে। এইবার মন্দির দেখবার পালা। প্রথমে ঢুকলাম গোবিন্দের মন্দির। শুনি নাকি এ মন্দিরের সৃষ্টি-কর্ত্তা রূপগোস্বামী। জনশ্রুতি আছে এ মন্দিরটি সাততলা ছিল! সর্ব্বোচ্চ তলার গুম্বুজে বিরাট ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হতো। সম্রাট ঔরঙ্গজেব দিল্লী থেকে এই আলো দেখতে পান এবং উপরার্ধ চারটি তলা নষ্ট করে ফেলেন। তারপর যাই রঙ্গনাথের মন্দির। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বিশাল স্বর্ণস্তম্ভ আছে। সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। এইটিকেই সোনার তালগাছ বলা হয়। বড় সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমি বৃন্দাবন ছাড়লাম। আসবার পথে বাসের দ্রুতগতির মধ্যে বায়ু-কম্পনে শুনলাম বৃন্দাবনের আহ্বান। কানের কাছে চুপি চুপি যেন বললে "আবার আবার।" জীবন এখন সমাপ্তির দিকে, উদ্যম ক্লান্ত, প্রেরণা ক্ষীণ। কল্পিত আহ্বান বুকের মধ্যে শুধু বেদনার সঞ্চার করে। এই অবহেলিত জীবনের নিষ্ফলতার সান্ত্বনা আজ কোন দিক দিয়েই আমার চোখে পড়ে না। এই জীবন সায়াহ্নে কর্মশক্তি এখন নিঃশেষিত প্রায়। বৃন্দাবন যাবার কোন আশা-ভরসা আর দেখি না। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—হে বৃন্দাবনবিহারী, আমার শেষ কাতর প্রার্থনা তোমায় জানিয়ে রাখি।

"যদি কোন দিন তব আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেওনা প্রভু।"

নীড় ও আকাশ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভালবাসো যদি এই শ্যামা ধরণীকে,
আলোয় আলোয় ভাল করে চেয়ে দেখ চারিদিকে।
উপভোগ্যের ক'রে কত আয়োজন
তোমা নিতি নিতি তাহার প্রকৃতি জানায় আমন্ত্রণ।
দুদিনের এই মধুপ জীবন খধূপ যাতে না হয়
প্রতিখন তার ক'রে তোলো মধুময়।
চেয়োনা কখনো নিশীথ আকাশ পানে
উদাসী করার সে মায়ামন্ত্র জানে।
অসীম আকাশ লয়ে অগণ্য তারা
সহজ মানুষে ফানুস বানায়ে করে দেয় দিশেহারা।
ইঙ্গিত হানে কী যে কানে কানে কয়,
এ ভোগভূমির সকলি তুচ্ছ হয়।
তুচ্ছ হয় এ গৃহ সংসার করে সে অন্যমনা
হয়ে যায় এই বিরাট বিশ্ব একটি সরিষাকণা।
ঢোকোনাকো নীলাকাশে,
অট্টহাস্য হাসে সে দিবসে, রাতে মৃদু মৃদু হাসে।
আভাসে জানায় ভবসংসার সুতসুতা মিতা জায়া।
সব ঝুটা, সব মায়া।
সহজ হবে না মনের স্বস্তি রাখা,
উড়িবার সাধ জাগাবে পরাণে দিতে পারিবে না পাখা।
অনেক আয়াসে গড়া শাখিশিরে নীড়
যেথা কচি কাঁচা শাবকেরা করে ভিড়
পাবে নাক তাকে খুঁজি,
মনে হবে তার মমতায় হলো জীবন ব্যর্থ বুঝি।
শুনোনা শুনোনা ঐ আকাশের গান
বলে সে মিথ্যা—সবই অনিত্য, নেই এ বর্তমান।
আছে শুধু দূর অসীম ভবিষ্যৎ
যাইতে সেথায় নেই কোন ছায়াপথ।
অবিরত মনে প্রশ্ন জাগায়ে অধীর করে সে প্রাণ,
দেয় সে সমাধান।
ব্যোমে ব্যোম কেশ বিষাণে তোলে যে তান,
কানে গেলে তা যে রবে না নীড়ের টান।
সারা অম্বরে নাচে যে দিগম্বর
হেরি তা বিষম হবে দিগভ্রম, ভুলাবে আপন পর।
চেয়োনা চেয়োনা নিশীথ আকাশ পানে
আকাশ সবারে কাজ হতে শুধু অকাজেরই পানে টানে।

সত্যিকারের-ঘটনা

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

আমাদের চরিত্রের গঠন, বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা লাভের পক্ষে যে যে উপাদানের প্রয়োজন, তার সমস্তই আমরা মহাপুরুষদের জীবনী থেকে পেয়ে থাকি। নিজের জীবনের নানাবিধ কাজের মধ্যে তাঁরা তাঁদের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে থাকেন। বিদ্যা, বিনয়, সদাচার, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি বিবিধ গুণ তাঁদের চরিত্রে রূপায়িত হয়—সাধারণ মানুষ লাভ করে অসাধারণত্ব। অনেকে জন্মগতভাবে এই সব মহৎ গুণ লাভ করেন, আবার অনেকে তা' লাভ করেন অনুশীলনের সাহায্যে। আজ তেজস্বিতা সম্বন্ধে তোমাদের একটি সত্যি-ঘটনা বলব। আশাকরি তোমাদের চরিত্র-গঠনের উপাদান হিসেবে এটি কাজে লাগবে।

আমাদের এই বাংলা দেশ তখন বিদেশীদের পদানত। বন্ধনের শৃঙ্খল দেশমাতার আষ্টে-পৃষ্ঠে অক্টোপাশের মতো জড়িয়েছিল। আর আমরা, তাঁর সন্তানেরা বৃটিশ প্রভুদের অত্যাচারের ভয়ে থরহরি কাঁপছি। ঠিক এমনি-দিনেই, আমাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশীদের অত্যাচারের কৈফিয়ৎ চাইলেন—এগিয়ে এলেন দৃঢ়পদক্ষেপে, সত্যের উপর আস্থা রেখে, অবিচলিত নিষ্ঠা আর অপরাজেয় বিদ্রোহের ধ্বজা ধরে। এখানে তাঁদের একজনের কথা বলা হচ্ছে।

তখন মেদিনীপুর জেলার সুজামুটা পরগণায় সেটলমেণ্ট অফিসার ছিলেন এক তরুণ বাঙ্গালী। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী জমিদারেরা আন্দাজে মোটামুটি জমির একটা পরিমাণ ঠিক করে সেই জমি প্রজাকে বন্দোবস্ত দিতেন। কিন্তু পরে জমি-জরীপের সময় পরিমাণে বেশী হলে অফিসারগণ অতিরিক্ত খাজনা দাবী করতেন। এই বেশী খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে দরিদ্র প্রজাদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। বাঙ্গালী অফিসার দেখলেন এই প্রথা অতিশয় ত্রুটপূর্ণ। প্রজা কতটা পরিমাণ জমি বেশী দখল করেছে সেটা তাকে না দেখান পর্য্যন্ত খাজনার হার বাড়ান উচিত নয়। তিনি প্রজাদের খাজনা দিলেন কমিয়ে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে জজের কাছে আপীল পেশ করা হোল আর খাজনার হারও গেল বেড়ে। সমস্ত বিষয়ের তদন্তের জন্য ছোটলাট স্যার ইলিয়ট্ ঘটনাস্থলে এলেন। বাঙ্গালী অফিসারের সঙ্গে তাঁর সুরু হোল তর্ক-যুদ্ধ। বাঙ্গালী অফিসার সাহেবের ভুল ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু সাহেব তা' ভুল বলে মেনে নিলেন না। হুমকি দিয়ে তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"আমি নিজে সেটলমেণ্ট অফিসার ছিলাম, ও কাজ আমি ভালই বুঝি।"

বাঙ্গালী অফিসারও উপযুক্ত জবাব দিতে পিছু-পা হলেন না। বজ্র-দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আপনি পাঞ্জাবে সেটলমেণ্ট অফিসারের কাজ করেছেন, পাঞ্জাব আর বাংলার সেটলমেণ্ট আইন এক নয়—উভয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক।"

এই ভাবে সুরু হোল বাক-বিতণ্ডা, কথা-কাটাকাটি। শেষে ব্যাপারটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত অগ্রসর হোল। হাইকোর্টের জজের রায় আর বাঙ্গালী অফিসারের মন্তব্য এক হওয়ায় ছোটলাট গেলেন হেরে। সেই থেকে আইন পাস হোল যে, জরীপে জমির পরিমাণ বেশী হলেও প্রজাদের খাজনা বাড়ানো চলবে না।

প্রজারা বাঙ্গালী অফিসারের জয়-জয়কার করে উঠল—আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরল বুকের মাঝে, বিস্ময়ে চেয়ে রইল তারা এই দেশপ্রেমিক, নির্ভীক, তেজস্বী বাঙ্গালী বীরের অশ্রুসজল চোখের দিকে। কিন্তু প্রজাদের যথেষ্ট মঙ্গল হলেও এই ঝগড়ার ফল আমাদের অফিসারটির পক্ষে মোটেই কল্যাণকর হয়নি। চাকুরীতে উন্নতির পথ তাঁর জন্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু নিজের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি তুচ্ছ করে, দেশবাসীর হিতের জন্য, সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করার উদগ্র আগ্রহে তিনি সেদিন যে সৎ সাহসের, যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজকের স্বাধীন বাঙ্গালীও তা' আদর্শ বলে গ্রহণ করবে, নিজেদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তাকে কাজে লাগাবে, আর শ্রদ্ধানত-চিত্তে স্মরণ করবে সেই বাঙ্গালী বীরকে—যিনি এই আদর্শের স্থাপনা করে যাত্রা করেছেন অমরলোকের সন্ধানে।

নিশ্চয় এই বাঙ্গালী বীরের নাম জানতে তোমরা খুব ব্যগ্র হয়ে উঠেছ। ইনি স্বনামধন্য কবি, "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারি 'অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা সব চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ছিল ; তার আগে পৃথিবীর আরো বেশি এলাকা বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। সারা উনিশ শতক ধরে ইউরোপীয় বিশেষত পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিসমূহ এবং জারশাসিত রুশিয়ার ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলে পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের মধ্যে এশিয়া আর আফ্রিকার দু একটি রাজ্য বাদে অবশিষ্ট সমস্ত জগৎ ইউরামেরিকান ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে আসে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যে বিস্তীর্ণ ভূভাগকে লাতিন আমেরিকা বলা হয়, বিখ্যাত যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক সিমন বলিভার (১৭৮৩-১৮৩০) তার বৃহদংশের স্বাধীনতা উদ্ধার করেন এবং অবশিষ্ট অংশে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা জাগিয়ে দেন। কিন্তু সে-স্বাধীনতা লাতিন আমেরিকার স্পেনীয়, পোর্তুগীজ আর অন্যান্য শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা ; স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো আর মেস্তিসো (বর্ণসঙ্কর) জনগণের স্বাধীনতা আজও সে-অঞ্চলে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; তবে, লাতিন আমেরিকার বিশটি (স্পেনীয়ভাষী এলাকার আঠারোটি) রাজ্যে ইউরামেরিকান বাদে বাকি অধিবাসীদের অধিকার ও সম্মান মার্কিন মুল্লুকের অশ্বেতকায়দের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ফ্রান্সে যেমন সব ফরাসি নাগরিকের সমান অধিকার, লাতিন আমেরিকার সব রাজ্যে সব অধিবাসীর তেমন সমান অধিকার মোটেই নেই। সুতরাং লাতিন আমেরিকাও বিংশ শতকের প্রথম প্রভাতে সাম্রাজ্যবাদের কবলভুক্ত ছিল। ঐ ১৯০১ সালেই তথাকথিত "অখণ্ড" ব্রিটিশ ভারতের আয়তনবৃদ্ধি শেষ ও সম্পূর্ণ করা হয়, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ লর্ড কার্জনের উদ্যোগে গঠন করার পর। বিশ্বে তখন এই কটি সাম্রাজ্য বর্তমান :—

(১) ব্রিটিশ (২) ফরাসি (৩) রুশ (৪) ডাচ (৫) বেলজীয় (৬) পোর্তুগীজ (৭) স্পেনীয় (৮) দিনেমার (৯) মার্কিন (১০) চৈনিক (১১) জাপ (১২) অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় (১৩) তুর্কি (১৪) ইতালীয় (১৫) হাবসি (১৬) ইরানীয়। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাজ্য তিনটিও (নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক) তখন পুরোপুরি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় নি।

পৃথিবীতে স্বাধীন রাজ্য তখন সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ; অনেক স্বাধীন রাজ্যে তখন নাগরিকদের বা অধিবাসীবর্গের একাংশ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে, অন্যেরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকমর্যাদামাত্র পেয়েছে। লাতিন আমেরিকার রাজ্যগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। তারা স্পেন, পোর্তুগাল ও ফ্রান্সের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে বটে, যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাজ্য ব্রিটেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে। কিন্তু মার্কিন এলাকার অশ্বেতকায় অধিবাসীরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, লাতিন আমেরিকার অবস্থাও কতকটা সেইরকম। লাতিন আমেরিকার শতকরা মাত্র ২০ জন খাঁটি শ্বেতকায় ; বাকি ৮০ জন কৃষ্ণকায়, রক্তকায়, পীতকায় ও মিশ্রকায়। এদের মুক্তির কথা আপাতত শিকেয় তুলে রেখে দেওয়া গেল ; নতুন আর এক সাম্রাজ্যবাদ লাতিন আমেরিকার কাঁধে কিভাবে চেপে বসেছে, তা দেখা যাক।

লাতিন আমেরিকার বিশটি রাজ্যের মধ্যে আঠারোটি স্পেনীয়ভাষী, আগে এরা স্পেনের অধীনে স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল ; হাইতি ফরাসিভাষী নিগ্রো রাজ্য এবং ব্রাজিল পর্তুগীজভাষী এলাকা। এই রাজ্যগুলি একসঙ্গে স্বাধীনতা পায় নি, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে এরা উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা পায়—স্পেন, ফ্রান্স ও পোর্তুগালের দখল থেকে। কিন্তু এদের জন্মলগ্নেই মার্কিন রাহুর দৃষ্টি এদের উপর এসে পড়ে। ১৮২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাজ্য মনরো নীতি যেভাবে ঘোষণা করে, তার অর্থ দাঁড়াল এই যে, দুই আমেরিকার বাইরের কোন শক্তি পশ্চিম গোলার্ধে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারবে না। মার্কিনদের ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় লাতিন আমেরিকার রাজ্যগুলি একে একে স্বাধীনতা পেয়ে গেল, একথাও অবশ্য মানতে হবে। কিন্তু ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে এই রাজ্যগুলি পড়ে গেল মার্কিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের খপ্পরে। ১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাজ্য স্পেনকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবার পর স্পেনের নাগপাশমুক্ত স্বাধীন ফিলিপাইন ও কিউবা রাজ্যের উপর চড়াও হয় এই পররাজ্য লোলুপতাকে "বদান্য অভিযান" (benevolent aggression), এই গালভরা নাম দিয়ে। সাধে কি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ?—

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয় !

মার্কিনেরা ফিলিপাইন ও কুবা আক্রমণের মতো জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও খুব কমই আছে। সদ্য স্বাধীনতা-পাওয়া দুটি দেশই আবার মার্কিন রাহুগ্রাসে নিপতিত হল। লাতিন আমেরিকার সব রাজ্যকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে সামরিক, কূট-নৈতিক ও অর্থবিষয়ক চাপ দিয়ে স্বাধীন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে একেবারে নিরস্ত করে রাখে রুজভেল্টের "সৎ প্রতিবেশী নীতি" কার্যকরী হবার আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লাতিন আমেরিকার

বৈদেশিক ব্যাপারে তো বটেই, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও মার্কিন হস্তক্ষেপ চরমে পৌঁছোয়। কাজেই রুজভেল্টের সৎ প্রতিবেশী হবার সঙ্কল্প তেমন বাস্তব রূপ লাভ করেনি। "মরিয়ার মুখে মারণের বাণী" শোনা যাবেই; কাজে কাজেই লাতিন আমেরিকায় নাৎসি ও ফাশিস্ত প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। তার জন্যে মার্কিন দুর্ব্যবহার মুখ্যত দায়ী। এ সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা খাস লাতিন আমেরিকার অধিবাসী German Arciniegas (উচ্চারণ, খেরমান-আরথিনি এগাস্) মহাশয়-লিখিত he State of Latin America বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জর্মন, ইতালীয় ও জাপ প্রভাব তথা অক্ষ-শক্তির অনুকূল আদর্শবাদ লাতিন আমেরিকায় প্রবলতা লাভ করলেও মার্কিনবিরোধী মনোভাব খুব প্রবল ছিল না। পশ্চিম গোলার্ধে সমস্ত লাতিন আমেরিকাকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করতে পারলে সেখানেই আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এক শক্তি গড়ে তুলে মার্কিনকে চিরবিব্রত রাখা যায়। এটা হিটলারের জর্মনি প্রথম বুঝতে পারে এবং হিটলার নিজেও তাঁর Mein Kampf এ উত্তর আমেরিকার ইঙ্গ-মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সতর্ক করে লিখেছিলেন যে, জাতীয় শোণিত ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা বজায় থাকতে মার্কিনদের লাতিন আমেরিকার উপর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার নয়, কারণ, অতিরিক্ত মিশ্র জাতি লাতিন আমেরিকানরা ইংরেজিভাষী শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে জীবনের কঠোর সংগ্রামে পেরে উঠবে না। মার্কিন যুক্তরাজ্যকে বিব্রত করার মতলবে জর্মনির টাকায় লাতিন আমেরিকায় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। লাতিন আমেরিকার লোকেরা বাস্তববাদী; তাদের বুঝতে দেরি হয়নি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হবে। তারা কোন সময়েই আমেরিকাকে চটিয়ে অক্ষশক্তিদের তোয়াজ করতে সাহস পায় নি। কিন্তু জর্মনির প্রতি তাদের প্রবল সহানুভূতি বরাবর ছিল। রুজভেল্টের ভাঁওতায় তারা যে ভোলে নি—তার মস্ত প্রমাণ এই যে, কয়েক বছর আগে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড নিক্সনের লাতিন আমেরিকা পরিভ্রমণের সময় তাঁকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয় এবং নিক্সনকে পরিদর্শন-কার্য বাতিল করে ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশেই একনায়কতন্ত্র বহাল হয়েছে। তার জন্যে আর্থিনিএগাস্ও মার্কিনদের নির্বুদ্ধিতাকে দায়ী করেছেন। রুশরা এটা লক্ষ্য করেছে যে, সমগ্র লাতিন আমেরিকা না হোক, অন্তত স্পেনীয়ভাষী আঠারোটি রাজ্যকে একত্র করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গড়তে পারলে মার্কিনরা পূর্ব গোলার্ধে মাতব্বরি করার খুব বেশি সময় পাবে না এবং "আমেরিকা-দুর্গ" (Fortress America) গঠনের স্বপ্নও অচিরে মিলিয়ে যাবে। সেই জন্যে কিউবার তরুণ বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে বিশেষভাবে খাতির করা হয়েছে ক্রুশ্চেফের তরফ থেকে। লাতিন আমেরিকায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কমিউনিজম্ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও দীর্ঘকাল পারবে না। সেখানে এখন জর্মনপন্থী জাতীয়তাবাদীদেরই জয়জয়কার এবং নিজেদের স্বার্থেই রুশরা এটাকে পরিপুষ্ট করবে আর মার্কিনরা প্রাণপণে লাতিন আমেরিকার ঐক্যসাধনে বাধা দিয়ে যাবে।

লাতিন আমেরিকার জাতীয় ঐক্য কিছু আছে কি?—এবং থাকলে তার ভিত্তি কি?—এই প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে। এ-সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পুর্তুগেলভাষী ব্রাজিল ও ফরাসিভাষী হাইতি রাজ্যদুটি বাদে বাকি আঠারোটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঐক্য চীন ও ভারতের অভ্যন্তরের জাতীয় ঐক্যের চেয়ে ঢের বেশি প্রবল এবং সুদৃঢ়। তা সত্ত্বেও যে ঐ আঠারোটি রাজ্য এক হতে পারছে না, তার কারণ, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রনৈপুণ্য এবং প্রবল বিরোধিতা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে, মার্কিন স্বার্থপরিপোষক দলগুলিকে অর্থদান করে, ঐক্যবিরোধী সেনাপতিদের বশীভূত করে মার্কিনরা নিষ্ঠার সঙ্গে বাধা না দিয়ে গেলে স্পেনীয় আমেরিকা বহুদিন আগেই গড়ে উঠত, যা বিশ্বের প্রথম চার-পাঁচটি শক্তির অন্যতম হবার সম্ভাবনাময়। অবশ্য, এই বাধাদানপ্রক্রিয়া সম্পর্কে লাতিন আমেরিকা ক্রমশ বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। যাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান না, তাঁরা যেন মন দিয়ে ফিলিপাইন ও লাতিন আমেরিকার ইতিহাস পড়েন, তাঁদের সংশয় দূর হতে সময় লাগবে না। এখনও স্পেনীয়ভাষী পুএর্তো রিকো মার্কিনের সাম্রাজ্যভুক্ত।

সমস্ত লাতিন আমেরিকা কখনও এক রাষ্ট্রে পরিণত হবে না; কিন্তু ১৮টি রাজ্যে এক রোমান ক্যাথলিক ধর্ম, এক স্পেনীয় ভাষা, এক স্পেনীয় মেস্তিসো জনগোষ্ঠীর বাস, এক অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—এতগুলি প্রবল মিল থাকার জন্যে এদের এক জাতি ও এক রাষ্ট্রে পরিণত হতে কোন বাধা নেই; কৃত্রিম প্রতিবন্ধকগুলি প্রায়ই কায়েমি আঞ্চলিক স্বার্থ ও মার্কিনদের সৃষ্ট। রুশরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য দিয়ে ঐ বিঘ্নগুলি দূর করিয়ে দিতে পারে, তাহলে এই শতাব্দীর মধ্যে স্পেনীয় আমেরিকার ঐক্য অনিবার্য। বাংলা-পাঞ্জাব-তামিলনাড-গুজরাতের পারস্পরিক ঐক্যের চেয়ে ঐ রাজ্য-গুলির ঐক্য অনেক বেশি এক ধর্ম ও এক ভাষার জোরে। আসলে, একটি বৃহৎ জাতি অনাবশ্যকভাবে ১৮টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে থেকে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে মার্কিন তরফে ভোট বৃদ্ধি করছে।

বিখ্যাত পেরুবাসী নেতা আইয়া দেলা তরেরের মতে" Argentina and Mexico are no more different than Vermont and Arizona (দুটি মার্কিন রাজ্য)।" তাঁর এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবু যে সেখানে এক রাষ্ট্র আজও গড়ে ওঠে নি, তার কারণ, হিটলারি জাতিতত্ত্বটা একেবারে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার মতো ভুয়ো ব্যাপার নয়। হিটলারের তীব্রবিরোধী John Gunther লিখেছেন, "In Chemistry we learned that a mixture was an unstable compound. A key to such that happens in Latin America is the psychological instability that derives from a complex racial heritage" লাতিন আমেরিকার অসুবিধা এই মিশ্র জাতিসুলভ চরিত্র দৌর্বল্যে; সেখানকার অর্ধেকেরও

বেশি লোক মেস্তিসো বা আমাদের ট্যাস-ফিরিঙ্গিদের মতো মিশ্র জাতি। তার উপর, রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় গোঁড়ামি তো আছেই। জলবায়ুর প্রভাবও কম নয়। মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রচণ্ড গরম ও দারুণ শীত, দুই-ই আছে; মোটের উপর, বাতাসে জলীয় ভাগ বা আর্দ্রতা, শীতপ্রধান পশ্চিমোত্তর ইউরোপের মতো কম না হলেও কমের দিকে। কিন্তু লাতিন আমেরিকার গড়পড়তা উত্তাপ ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর আর্দ্রতা ৯০। এমন অবস্থায় মার্কিনদের অর্থাৎ মুখ্যত ইউরোপের শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে পেরে-ওঠা কঠিন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাস্ত্রো যে ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য। রুশরা তাঁকে বিশেষ কিছু সাহায্য দিতে না পারলেও মার্কিনি গণতন্ত্রের গালভরা আদর্শবাদের ফাঁপা হাঁড়ি বিশ্বের হাটে ভেঙে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়েছে; সে-সুযোগ তারা ছাড়বে না। হাঙ্গেরি ও তিব্বতের ব্যাপারের পর মার্কিনরা কিউবাতে সরাসরি আক্রমণ করে বদনাম কিনবে না; কিন্তু কোন এক অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দ্বারা ফিদেল কাস্ত্রোকে সরাবার চূড়ান্ত প্রয়াস নিশ্চয় আসন্ন।

ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বে কোথাও খুব শক্তিশালী বড় রাষ্ট্র গঠন করা পছন্দ করে না, নিজেদের জন্যে ছাড়া। নিখিল আরব ও নিখিল স্পেনীয় আমেরিকা রাজ্য গঠিত হওয়া রুশস্বার্থবিরোধী নয়; কিন্তু ইঙ্গমার্কিন দুই ক্ষেত্রেই বাধা দিয়ে যাবে। কাইরো আর বুএনস্ আইরেস দুটি পয়লা নম্বরের শক্তির উদ্ভব বিশ্ববিধানে হবেই; কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আগে নয়।

জাপানে আসানুমা হত্যাকাণ্ডের পর মার্কিনবিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পাবে; আগামী নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা না পেলেও জাপানে মার্কিনদের অবস্থা ভালো করতে হলে জাপানকে আরো সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ইতিমধ্যে মার্কিন নির্বাচন সমাপ্ত হয়ে গেলে পরিবর্তনের স্রোত কোন্ দিকে যাবে, তা বোঝার সুবিধা হবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে ১৯৬২ সালে যুদ্ধ বাধার কোন সম্ভাবনা নেই। এখনও জাপান ও জর্মনিকে প্রস্তুত করা হয় নি, তার জন্যে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে। জর্মনি ও জাপানকে বাদ দিয়ে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল রকেটের সাহায্যে রুশ ও চীনকে বধ করতে পারবে, এ কেবল পাগলে ভাবতে পারে। আগামী যুদ্ধে হাউইবাজি কিছু হলেও শেষ পর্যন্ত স্থলযুদ্ধ অনিবার্য, অন্তত চীনের সঙ্গে তো বটেই; রকেট দিয়ে চীনকে কাবু করা যাবে না। আর, মার্কিন বাহিনী স্থলযুদ্ধে চীনা বাহিনীকে স্থায়ীভাবে কাবু করতে কখনও পারবে না। সুতরাং জাপানের আসরে আবাহন আসন্ন। আগামী যুদ্ধে জাপান যদি সত্যই নিরপেক্ষ থাকতে পারে, তাহলে খোদ মার্কিন বাহিনীকেই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চীনের দিকে এগোতে হবে। জাপান মার্কিনপক্ষ ত্যাগ করবে কি না, তা জাপ নির্বাচনের পর বোঝা যাবে।

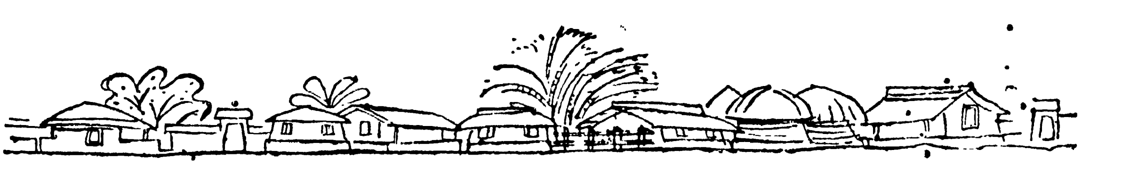
ভারতের প্রতিবেশী লাওজাতির রাজ্যে তুমুল গৃহযুদ্ধ চলেছে। এই দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন গোলমেলে যে, মার্কিনরাও কোন্ পক্ষ জয়ী হবে, তা বুঝতে না পেরে কিছু দিনের জন্যে লাওসে সাহায্য পাঠানো বন্ধ করে দেয়। এখানেও জাতীয়তাবাদের জয় হবে এবং কমিউনিষ্টরা কোন সরকার গঠন করতে পারবে না। পৃথিবীর অবস্থাই এখন এমন যে, পরাধীন দেশগুলি ক্রমশ স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু রুশ বা মার্কিন শিবির বিনা যুদ্ধে একে অন্যের এলাকা দখল করতে বা সেখানে অনুকূলভাবাপন্ন সরকার স্থাপন করতে পারবে না। অর্থাৎ মার্কিনরা তিব্বত বা হাঙ্গেরি বিনা যুদ্ধে উদ্ধার করতে পারবে না, কিম্বা রুশরাও হুসেনের জর্ডনকে দলে টানতে পারবে না। এই সময়ে বিভিন্ন দেশে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা চলার কথা; জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, তুরস্ক, কঙ্গো—সর্বত্র সেই চেষ্টাই চলার লক্ষণ পরিস্ফুট।

কঙ্গোতে যারা লুমুম্বার সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার চেষ্টা করছে, তারা সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অচিরে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠবে। ভূতপূর্ব বেলজীয় কঙ্গো এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে; রাজেশ্বর দয়াল প্রভৃতির শত চেষ্টাতেও লিওপোল্ডভিলের পার্লামেণ্ট আর কখনও সমস্ত কঙ্গোর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে না।

আফ্রিকায় মোরেতানিয়া এবং রুআন্দা-উরুন্দি নামে আরো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র অচিরে আত্মপ্রকাশ করবে। আগামী বারে এদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাবে। মোরেতানিয়ার ইসলামি প্রজাতন্ত্র মাত্র ছ লাখ চব্বিশ হাজার লোকের বাসভূমি; তাতে তাদের স্বাধীনতা লাভের বিঘ্ন হয় নি। এই সব নতুন নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভারতের লব্ধ স্বীকৃতির চেয়ে তুলনায় কম নয়।

হিসেব করলে দেখা যায় যে, ষাট বছর আগের তুলনায় বর্তমানে সাম্রাজ্যগুলির সংখ্যা সামান্যই কমলেও সাম্রাজ্যগুলির মোট আয়তন অনেক কমে গেছে। এখনও অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হবার অনুমতি পায়নি; দুই জর্মনি, দুই কোরিয়া, দুই ভিএতনাম চীন, মঙ্গোলিয়া তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত বিশ্ব স্বাধীন ও সুগঠিত রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ হোক, এ কামনা সবাই করবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি, প্রসার ও বিলয়ের পদ্ধতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

৭।১১।৬০



বাঙলাভাষার শব্দৈশ্বর্য

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বাঙলাভাষায় এমন অসংখ্য শব্দ আছে যাদের গঠন প্রণালী যেমন বিচিত্র প্রয়োগবিধি তেমনি জটিল, আর অন্তর্নিহিত অর্থও তেমনি গম্ভীর এবং পদও লালিত্যপূর্ণ। এইসব শব্দ আমাদের মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ 'তৎসম' অর্থাৎ অবিকল সংস্কৃত, কেহ বা 'তদ্ভব' অর্থাৎ সংস্কৃতের কিঞ্চিৎ অপভ্রংশ, আবার কেহ বা 'দেশী' অর্থাৎ বাঙলার ঘরে বাঙালীর দ্বারা প্রস্তুত। আবার এমন সব শব্দ আছে, যারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে গঠিত হলেও বাঙালী লেখকের মনীষা হতেই উদ্ভূত এবং বাঙলাভাষাতেই কেবল ব্যবহৃত। এই শেষোক্ত ধরণের অর্থাৎ বাঙালীর হাতে-তৈরী সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টি এখনো অবিরাম গতিতে চলেছে এবং বাংলাভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছে। এইসব ধরণের গোটাকতক শব্দ নিয়ে এই প্রবন্ধ রচনা।

পরায়ণ—এই শব্দটি কখনো অ-দোসর ব্যবহৃত হয় না। এর সঙ্গে এবং পিছনে আর একটি শব্দ থাকবে তবে এটি আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু শব্দটির মানে কি? অনেকেই জানে না। 'ধর্মপরায়ণ', 'সেবাপরায়ণ', লিখলে মোটামুটি ভাবটা বোঝা যাবে বটে, কিন্তু 'পরায়ণ' ব্যবহারের সার্থকতা ত প্রকাশ পাবে না। কিন্তু শব্দটি একটি গভীর অর্থ প্রকাশ করে, সেটি না জানলে 'ধর্মপরায়ণ' বা 'সেবা-পরায়ণা'-র আসল মানে জানাই যাবে না। 'পরায়ণের' প্রকৃতিগত মানে হচ্ছে এই পরম অর্থাৎ একমাত্র অয়নম্ অর্থাৎ আশ্রয় বা অভিলষিত বস্তু। তাহলে 'ধর্মপরায়ণের' মানে হবে, 'ধর্মই যার একমাত্র আশ্রয় বা অভিলষিত বস্তু'। তেমনি 'সেবাপরায়ণার মানে হবে, 'সেবাই যে নারীর একমাত্র আকর্ষণের বস্তু'। এই সুন্দর গালভরা শব্দটিকে কি নিঃসঙ্গভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা চলে না? কোন শক্তিশালী লেখক যেদিন শব্দটিকে একা একা ব্যবহার করবে তার পরদিন হতেই এটি বাজারে চালু হয়ে যাবে। যদি কেহ লেখেন, "কাশীই বার্ধক্যের একমাত্র পরায়ণ" তবে কোনই ভুল হয় না।

ব্যঞ্জক—এই শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহৃত হয় না। পিছনে আর একটি শব্দ থাকা চাই, তবেই একে লোকে দেখতে পাবে—যেমন আশাব্যঞ্জক, শোকব্যঞ্জক ইত্যাদি। তাহলে 'ব্যঞ্জকের' মানে কি? অনেকেই বলতে পারবে না। 'ব্যঞ্জকের' গূঢ় অর্থ জানতে হলে অলঙ্কার শাস্ত্রের একটু জ্ঞান থাকা চাই। সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শব্দের বা শব্দসমষ্টির তিন ধরণের শক্তি, যাকে অলংকার শাস্ত্রে বলে বৃত্তি। প্রথম শক্তির দ্বারা মৌলিক অর্থ প্রকাশ পায়, যার নাম হচ্ছে অভিধা বৃত্তি। দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা কোন অনুক্তি পূরণ করা হয়, যার নাম হচ্ছে লক্ষণা বৃত্তি। দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা এক নূতন মানে আমদানী করা হয়, যার নাম হচ্ছে ব্যঞ্জনাবৃত্তি। এই ব্যঞ্জনা শব্দ হতে ব্যঞ্জক শব্দ গঠিত হয়েছে। একটা বাক্য ধরা যাক্। "এতদিন ছেলের পড়ানোর জন্যে যা খরচ করলাম সব 'ভস্মে ঘী ঢালা' হল। এই পদসমষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে, অভিধা শক্তির দ্বারা মানে হয় 'খানিকটা ঘী নিয়ে কোন একটা ভস্মের উপর ঢেলে দেওয়া।' লক্ষণা শক্তি বুঝিয়ে দেবে, 'যা-তা ঘী হলে চলবে না বা যা-তা ভস্ম হলে চলবে না। হোমের ঘী হওয়া চাই, আর হোমাগ্নির ভস্ম হওয়া চাই।' আর ব্যঞ্জনাশক্তি বলে দেবে, 'সত্যিসত্যি আগুনে যা ঢালা নয়, ছেলের পড়ানর জন্য বৃথা কতকগুলো টাকা অপচয় করা।

এবারে আশাব্যঞ্জক বা শোকব্যঞ্জক শব্দগুলির মানে বেশ পরিষ্কার হবে। "তিনি আমার দরখাস্ত পড়ে আশাব্যঞ্জক স্বরে কথা বলতে লাগলেন।" এখানে মানে হচ্ছে, "চাকরী হবেই" বলে তিনি আমার কোন কথা বললেন না বটে, কিন্তু এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যে মনে আশা করা যেতে পারে। আবার "রাষ্ট্রপুঞ্জ হতে ফিরে এসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শোকব্যঞ্জক স্বরে কথা বলতে লাগলেন।" মানে, তিনি যে সত্য সত্যই শোকপ্রকাশ করতে লাগলেন তা নয়, তবে তাঁর হাবভাব কথাবার্তার বোধ হলো, তিনি অন্তরে খুব শোক পেয়েছেন। এই কথাটিকেও যদি কোন সাহিত্যিক নিঃসঙ্গভাবে ব্যবহার করতে চান অবশ্যই করতে পারেন। যেমন, "ছাত্রদের অরাজকতা তাদের অন্তর্নিহিত হতাশার ব্যঞ্জক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দেশাত্মবোধ—শব্দটা যেমন লালিত্যভরা তেমনি গূঢ়ার্থ প্রকাশক। এটা সাধু শব্দ হলেও তৎসম শব্দ নয় এবং সংস্কৃত সাহিত্যে একে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেনা। ব্যাকরণ অনুযায়ী এই শব্দটির মোটামুটি দু'টি অর্থ করা যেতে পারে।

১। দেশের আত্মার বোধ।

আমাদের জন্মভূমি, ভারতভূমি যে নদনদী পাহাড়পর্বতের একটা জড়পিণ্ডমাত্র নয়, এই জন্মভূমিরও যে আত্মা আছে, এবং তাঁকে দেবীরূপে কল্পনা করে, 'অয়ি, ভুবনমনোমোহিনী' বলে স্তব করা যায়, এরূপ একটা নিশ্চয়াত্মক বোধই হচ্ছে—দেশাত্মবোধ।

২। দেশ ও আত্মা অর্থাৎ তুমি নিজে যে এক ও অভিন্ন এরূপ একটা অনুভূতি।

আমাদের জন্মভূমির জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, দিয়েই যে আমাদের শরীর গঠিত, আমরা জন্মভূমির একটা অংশ, একটা প্রতীকমাত্র, জন্মভূমির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের দেহমনকে গঠিত ও পুষ্ট করেছে, এই জন্মভূমিই আমাদের 'যৌবনের উপবন, ও বার্দ্ধক্যের বারাণসী', এইভাবে দেশ ও নিজেকে অভিন্নরূপে কল্পনা করার যে বোধ বা জ্ঞান তারই নাম হচ্ছে দেশাত্মবোধ।

তারতম্য—এই রসাত্মক শব্দটির মানে হচ্ছে ন্যূনাধিক্য বা কম বেশীর ভাব। শব্দটার গঠন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মত। 'তর' ও 'তম' বলে দু'টো প্রত্যয় আছে যারা বিশেষণের গায়ে বসে। 'কিছু বেশী বা কিছু কম, বোঝাতে হলে 'তর' ব্যবহার করতে হয়। আর সবচেয়ে বেশী বা সবচেয়ে কম', বোঝাতে হলে 'তম' ব্যবহার করতে হয়। যেমন বৃহত্তর, বৃহত্তম।

কোন শক্তিশালী লেখক তর ও তমকে গায়ে গায়ে বসিয়ে, ব্যাকরণের বিধিবহির্ভূত একটা বিচিত্র শব্দ গঠন করে ফেললেন, যথা তরতম,' অর্থাৎ একটু বেশী বা খুব বেশী। এই তরতমের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগ করে আলোচ্য তারতম্য শব্দটি গঠিত হয়েছে—যার মানে উপরে লিখেছি। গোটাকতক প্রত্যয়কে গায়ে গায়ে বসিয়ে এরূপ গূঢ়ার্থক শব্দ গঠন করা এবং সাহিত্যের বাজারে চালিয়ে দেওয়া—এ খুব কমই দেখা যায়। তাই বলেছি এর গঠন প্রণালী অতি বিচিত্র।

অনেকটা এই ধরণের আর একটা শব্দ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—যেমন, 'প্রতিটি'। আগে যেখানে 'প্রত্যেকটি' বলা হত এখন সেখানে 'প্রতিটি' বলা হয়। একটি উপসর্গ ও একটি প্রত্যয়ের মিলন। কিন্তু বর্তমানে 'প্রত্যেকটি' না বলে 'প্রতিটি' বললে আরো জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ বক্তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

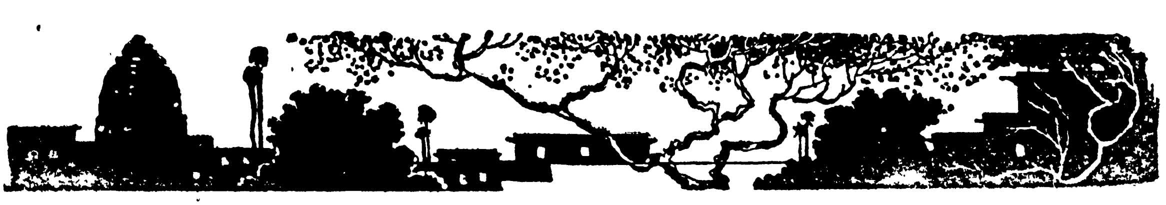
কিছু—এই তুচ্ছ শব্দটি এতদিন আমাদের ভাষার এক অনাহত কোণে পড়ে থাকত এবং এর পদমর্যাদা আছে কেহই বিশ্বাস করত না। কথাটা হিন্দী 'কুছ' শব্দ হতে এসেছে, কিম্বা সংস্কৃত 'কিঞ্চিৎ' শব্দের অপভ্রংশ। অতি 'অল্প পরিমাণ' বা 'অল্প সংখ্যা' বোঝাতে হলে কিছুকে' ব্যবহার করা হত, যেমন, কিছু টাকা, কিছু লোক, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এই অতি অপ্রয়োজনীয় শব্দটা সাহিত্যের আসরে বেশ পাকা হয়ে বসেছে। এটার মধ্যে যে এরূপ সৃজনী শক্তি ছিল তা আগে কেউ ভাবেনি। একে নিয়ে যে কত ধরণের যৌগিক পদ তৈরী হয়েছে তা সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রের পাতা খুললেই জানা যায়।

অনেক কিছু, সব কিছু, কিছু-না-কিছু, তেমন-কিছু, এমন কিছু, যা-কিছু, আরো-কিছু, সবাই-কিছু, ইত্যাদি—এই সব যৌগিক শব্দের মোটামুটি অর্থ সবাই বোঝে, নচেৎ প্রয়োগ করে কি করে? কিন্তু এদের মৌলিক অর্থ বাহির করা, পণ্ডিতেরও দুঃসাধ্য। "সে আমাকে অনেক কিছু বললে।" এখানে অনেক ও কিছু পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ। যা 'অনেক' তা 'কিছু' হতে পারে না, যা 'কিছু' তা 'অনেক' হতে পারে না। কিন্তু 'অনেক-কিছু' বেশ একটা সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ করে। "তার কিছু আছে", আর "তার কিছুনা কিছু আছে,"—উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বোঝান শক্ত।

স্ব—এই ছোট্ট 'তৎসম' শব্দটি বাঙলাভাষার উৎকর্ষ সাধনে বড় কম সহায়তা করছে না। শব্দটি আকারে ক্ষুদ্র বলে কখনো অন্য নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না—কখনো একটি শব্দের পিছনে, বসে তখন 'স্ব' শব্দের মানে হয়, 'নিজের'—যেমন, স্বদেশ। আর যখন সুমুখে বসে তখন উহার মানে হয়, ধন সম্পত্তি—যেমন, সর্বস্ব, পরস্ব, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষা হতে বাঙলা ভাষায় যখন তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ চলতে থাকে তখন প্রাচীনকালের সাহিত্যিকগণ বেশ একটা বিচার-বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে চলতেন। তাঁরা অনেক শব্দের দু'চারটা করে প্রতিশব্দ গ্রহণ করেছেন। আবার অনেক শব্দকে বিশেষতঃ স্বল্পাক্ষর শব্দাবলিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে গেছেন। এই সব একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর শব্দে বাঙলাভাষায় যে আমদানী হয়নি তা নয়, তবে যৌগিকপদের মধ্যেই এদের সচরাচর দেখা যায়। কি 'পরাস্ব' প্রভৃতি শব্দ আর কি স্ব প্রভৃতি শব্দ—এদের মানে অস্পষ্ট থাকায় স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ মুস্কিলে পড়ে যান। তাঁরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা করে অনেক সময় ছাত্রদের বিপথে চালিত করেন।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, এই নিয়ে আর বেশীদূর এগোনা যায় না। আমি কেবল পাঠকদের দেখালাম বাংলাভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাদের অর্থগৌরব ও পদলালিত্য ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষা হতে কম নয়। এই সব বিষয়ে গবেষণা চালাবার মত উৎসাহী লোকের আবশ্যক।



শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বিদগ্ধজনের, পরমজ্ঞানীজনের এবং পরম-ভক্তজনের আলোচনার বিষয় বস্তু। এঁদের কোন-টিই নই, তবুও শ্রীভগবানের আলোচনায় যা কিছু বলি, অন্তত তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন করা হবে, তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমি বিশ্বাস করি শ্রীকৃষ্ণলীলা ভগবৎ সাধনার রূপক আখ্যান। ছন্দোগ্য উপনিষদে আছে—এ সমস্তই ব্রহ্মে, বিশ্বজগতই ব্রহ্ম, ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়াছে এবং ব্রহ্মেই লীন হইবে। আমাদের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মেরই অবিধা।

মহাভারতের বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর ভাগবতের নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, আমিও বিশ্বাস করি। হরিবংশে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলায় বহু অলৌকিক কার্য্যের সমাবেশ আছে। যেমন শৈশবে পুতনা রাক্ষসী বধ, অকাসুর বধ, পদাঘাতে গোশকট নিক্ষেপ, বন্ধনাবস্থায় উদূখল আকর্ষণ, অর্জ্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, পঞ্চম বর্ষে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত উত্তোলন, বামহস্তের অঙ্গুলি কনিষ্ঠায় তাহা ধারণ, ইত্যাদি……

কিন্তু মহাভারতে ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের কোন রূপ অলৌকিক অমানুষিক কার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৃহন্নারদীর পুরাণে আছে—

> বাসুদেব পৃথক কৃষ্ণ যস্ত শ্রীনন্দ-নন্দনঃ
> বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি!

বাসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ পৃথক ব্যক্তি। যিনি শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে এক পাও কোথাও যান নি।

শ্রীজীব গোস্বামীও লঘু ভাগবতামৃতে বলেছেন,

> কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূত যস্ত গোপেন্দ্র নন্দনঃ
> বৃন্দারণ্যং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে মথুরায় যান, পরে দ্বারকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ চির-কালই বৃন্দাবনেই আছেন, কখনো অন্যত্র গমন করেন নি, করবেন না-ও কখনো।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, ভাগবতের রাধাকৃষ্ণলীলা ভগ-বানের নিত্য লীলা, অর্থাৎ চিরকাল চলছে। কোনো-কোনো ভাগ্যবান তা দেখতে পান। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন; তাঁর লীলাস্থল বৃন্দাবনও পৃথিবীর কোন স্থান নয়; আর শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরী গোপিনীগণও পার্থিব নারী নন।

তবে এই ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ কে? শ্রীরাধা এবং গোপবালারা বা কাহারা? সাধক জেনেছেন—

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্ম। তিনি সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ প্রভৃতি অন্তহীন রসের মূলাধার। তিনি অসীম, তবু তিনি যেন এই অসীমত্বে পরিতৃপ্ত নন, তাই বুঝি আত্ম-অসীমের মধ্যে, তিনি অনন্ত সীমারেখা টেনে টেনে অনন্ত সীমাবদ্ধ বিশ্বের সৃষ্টির পর, সেই অনন্তকে খণ্ড খণ্ড ক'রে বহু রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এক বহু হ'য়ে, এই বহুর মধ্যেই তাঁর লীলা চলছে।

সন্ত দাদু বলেছেন—(বাংলা তরজমা)

> সুবাস বলে, আমি যেন ফুলকে পাই,
> ফুল বলে, আমি যেন সুবাসকে পাই।
> ভাষাবলে, আমি যেন সত্যকে পাই,
> সত্য বলে, ভাষাকে আমার চাই।
> রূপ বলে, আমি ভাবকে পেতে চাই।
> ভাব বলে, আমি যেন রূপকে পাই।

ঐ একই ধারায় এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বহুখণ্ডিত বিশ্বের দিকে, আর বহু খণ্ড বিশ্ব ঐ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দিকে পর-স্পর আকর্ষিত হচ্ছেন। এই আকর্ষণের মূলমন্ত্র প্রেম।

সন্ত দাদুর সুরে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রেই এই 'বন্ধন।' আর ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মরূপে ওই 'মুক্তি'। বন্ধন ও মুক্তির এই পরম লীলাই ব্রহ্মাণ্ড প্রকরণের আদি কথা।

তাঁহার যে ইচ্ছাশক্তিতে সকল রসের বিচিত্র প্রকাশ তাহাই পরমা-প্রকৃতি। এই রসময়ী পরমা-প্রকৃতিই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা। এই শ্রীরাধাই সচ্চিদানন্দের আনন্দ-ঘন রস। এই ঘনীভূত আনন্দরসই চিন্ময়ীনারীপ্রকৃতির রূপে শ্রীভগবানেরই অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

ভক্তের এই ভাবই ভাবরূপ ধারণ করেছে যুগল-মিলনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এই যুগলের পরম অভিব্যক্তিই সৃষ্টি প্রবাহ। যখন এক, তখন সৃষ্টি নাই, যখন দুই, তখন সৃষ্টির অবাধ গতি ধর্ম্ম। আবার এই আনন্দঘন রস সমুদ্রে কোটি ঊর্মিমালা ফেনপুঞ্জই শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্ময়ী নিত্যসঙ্গিনী সখীবৃন্দ, মঞ্জরী বৃন্দ—ললিতা বিশাখা বৃন্দা প্রভৃতি।

মহাভারতীয় বৃন্দাবন, ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক বৃন্দাবন হ'তে পারে, ভক্তজনের বাহ্য প্রকাশ বৃন্দাবনও হতে পারে, আপত্তি নেই। তবু সাধকের বৃন্দাবন, ভাগবতের বৃন্দাবন, সাধকের হৃদয় অভ্যন্তরে সর্ব্ব যুগে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে হৃদয় বৃন্দাবন হয়েই বিরাজ করবে। সেখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণে ফাগুয়া দোল উৎসব, সেখানে শ্রীগোপীজনবল্লভের শ্রীরাসলীলা। প্রতি অণুপরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণের রূপকে—মিলনে বিরহে কোটি কোটি কৃষ্ণ গোপীর লীলা মাধুর্য্য।

শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে সাধক দিব্য অনুভূতি পেয়েছেন,—অন্তরের মধ্যে এক নিভৃত সুরম্য জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশ—ধ্যানের রাজ্য। সে স্থান স্থূল জগতের সঙ্গে একীভূত থেকেও, তা হ'তে অতীব, অতীব সূক্ষ্ম চিন্ময় ধাম সেখানে কেবল চেতন, কেবল সুন্দর, কেবল আনন্দ বিশ্বের যত কিছু মাধুর্য্য, প্রেম ও আনন্দের নিদর্শন আছে, সকলই সেখানে জীবন্ত রূপে যুগপৎ প্রকাশিত।

এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম ও পরমাপ্রকৃতি লীলামগ্ন। আর তাঁদেরই বিক্ষিপ্ত আনন্দ-ঘন রস-কণিকাসমষ্টি অসংখ্য দিব্য সুন্দরী লীলাসঙ্গিনী—গোপীবৃন্দ! ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের সম্পূর্ণ রূপ! সর্ব্ব বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্তনীয় সুন্দর লীলা অনন্ত যুগ ধ'রে চলে আসছে, চলবে। ধ্যান যোগে দর্শন করা ছাড়া, অন্য উপায় নেই। তাই ভক্ত হৃদয়েই অবস্থিত এই হৃদয়-বৃন্দাবন। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণই এই সম্মোহানন্দ—হৃদয়-বৃন্দাবনের একচ্ছত্র পরমেশ্বর। জীব সাধন বলে তার দেহ-মন্দিরেই এই বৃন্দাবন আর তার শ্রীরাধা—কৃষ্ণ—গোপীগণের সন্ধান পান। নমস্তে গোপী-জনবল্লভায়।

অন্য অস্ত্র

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

এ-জন্মে কুণ্ঠিত। থাকি সবার আড়ালে আবডালে।
নিজেরি কার্পণ্যে যেন শশকের মতন গুটিয়ে
সংকোচের ঘেরাটোপে সংগোপনে নিভৃতে লুকিয়ে।
আসি না সভায় কিংবা গানের আসরে তালে তালে
যেখানে অন্যেরা আনে—নানা রং দীপশিখা জ্বালে।
নিজেরি দৈন্যের দায়ে মুখ ঢাকি। অন্ধকার নিয়ে
একরাশ একাকীত্বে ক্লান্তি আর নৈঃশব্দ কুড়িয়ে।
কারণ, বিদগ্ধজন যে-উচ্চ মার্গের বেড়াজালে
সমাহিত, সেখানে আমার দৌড় অপাংক্তেয়, পাশে।
অবশ্য এমন বিত্ত নেই যাতে দম্ভের প্রকাশে
দাঁড়াই। উদ্ধত বুক উজ্জীবিত সোজা সগৌরবে।
তাই নত মাথা আমি সশঙ্কিত তোমার নিকটে
হতবাক। অন্য অস্ত্র তূণে নেই—শুধু এ-সংকটে
কবিত্ব কৃতিত্ব ছাড়া, তাতে কী ও-মন দ্রব হবে?



এখানে ওখানে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মিসেস রায়কে দেখে উৎপল সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ, ...াম।'

অনুরাধা মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানতাম আপনি ...সবেন, বসুন।'

উৎপল এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করল। তার মানে ...? মিসেস রায় কি বুঝতে পেরেছেন না এসে উৎ-...লের উপায় নেই? ওই কটা টাকা তার পক্ষে এতই ...শি যে তাকে আসতেই হবে? ওই কটি টাকার জোরে ...সেস রায় তাকে দিয়ে যা খুসি তাই করাতে পারবেন? ...খুসি তাই লেখাতে পারবেন তাকে দিয়ে? কিন্তু ...ৎপল যদি এই মুহূর্তে বলে দেয় মিসেস রায়ের ফরমায়েস ...ত লেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়—তাহলে কী হয়?

অনুরাধা বললেন, 'আমি জানতাম লেখার বিষয়-...ও আপনার ভালো লেগেছে। আপনারা নিজেরা চুপ-...প থাকলে কি হয়, যে সব জীবন খুব সক্রিয় কর্মব্যস্ত, ...দের জীবনে বৈচিত্র্য বেশি, ঘাতসংঘাত বেশি, তাঁদের ...য়ে লিখতেইতো আপনারা ভালোবাসেন! কী বলুন, ...ক বলিনি?'

যদিও সব লেখকের পক্ষে এ কথা প্রয়োগযোগ্য ...য় তবু উৎপল হেসেই জবাব দিল 'তা সত্যি?'

মিসেস রায়ের কথা বলবার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি, তাঁর হাসবার ধরনটি উৎপলের বড় মনোরম লাগছে। কালো পেড়ে সাদা খোলের শাড়িতেও অপূর্ব দেখাচ্ছে তাঁকে। উৎপল যে না এসে পারবে না মিসেস রায়ের এই কথাটি তাহলে কি দ্ব্যর্থক? তাঁর অর্থগৌরবে নয়, তাঁর রূপে তাঁর পরিশীলিত রুচিতেই যে উৎপল অভিভূত একথা কি তিনি এরই মধ্যে টের পেয়েছেন? উৎপল একটু আশ্বস্ত হল। 'রূপের আকর্ষণ' যেন অর্থের আকর্ষণের মত স্থূল নয়, রূপের কাছে পরাভবে যেন অতখানি অগৌরব নেই।

অনুরাধা ততক্ষণে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছেন। উৎপলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই ঘরে বসেই আপনি লিখবেন। দেখুন লিখবার টেবিলটা ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে কিনা, ঠিক-মত সাজানো হয়েছে কিনা। আমরা তো আর লেখকের টেবিল দেখিনি।'

উৎপল এবার বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। হেসে বলল, 'আপনি না দেখেও যথেষ্ট দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বরং এর চেয়ে কম সাজানো-গোছানো হলেই আমার অসুবিধে হয়।'

অনুরাধা হেসে উঠলেন, 'বেশতো আপনার সুবিধে মত যত খুসি দু-হাতে এলোমেলো আর অগোছালো করে নেবেন। দেখুন, সাজানো জিনিস অগোছালো করতে

তো দেরি লাগে না, কিন্তু অগোছালো কিছুকে গুছিয়ে তোলাই বড় শক্ত। সে ঘরদোরই হোক আর অন্য কিছুই হোক।'

উৎপল যাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হঠাৎ অনুরাধা থেমে গেলেন। তারপর প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বললেন, 'এ ঘরে বসে লিখতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?' উৎপল বলল, 'অসুবিধে কিসের?'

অনুরাধা বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম ওপরের একখানা ঘরেই আপনার লেখার ব্যবস্থা করে দেব। তারপর ভাবলাম আপনার হয়তো তাতে অসুবিধে হবে। আমি তো আর সব সময় বাড়ি থাকব না। পদ্মাও একটা স্কুলে পড়ায়। ওর পক্ষেও আপনাকে সব সময় অ্যাটেণ্ড করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এক চাকর দারোয়ান ভরসা। ওপর থেকে তাদের ডাকাডাকি করে সব সময় কি আর আপনি পাবেন? আমি নিজেই পাইনে। তাই ভাবলাম এই নিচের ঘরেই সুবিধে হবে। এ ঘরে জায়গাও অনেকখানি, সামনে লন আছে। ইচ্ছে করলে আপনি বাইরে নেমে একটু ঘুরে-টুরেও আসতে পারবেন। আর বই-পত্রের যখন যা দরকার হয় চেয়ে পাঠাবেন। কোন সংকোচ করবেন না।'

উৎপল হেসে বলল, 'ঠিক আছে।' আমার কোন অসুবিধে হবে না। লেখার মধ্যে একবার যদি ডুবে যেতে পারি তাহলে কোথায় বসে লিখছি কোন আবহাওয়ায় কোন পরিবেশে, দিন কি রাত্রির কোন প্রহরে কিছুই আমার খেয়াল থাকে না।'

অনুরাধা খুসি হয়ে বললেন, 'সেই ধরনের মগ্নতাই তো চাই। কাজ করতে বসে যদি মুহূর্তে মুহূর্তে আপনি মনে করেন পরের কাজ করছি তাহলে তাতে কষ্ট হয় বেশি। আর যদি মনে করেন আমি যখন করছি, আমি যতক্ষণ করছি ততক্ষণ আমিই কর্তা, এ কাজ আমারই কাজ তাহলে বোধ হয় কাজও ভালো হয়, যিনি করেন তাঁর কষ্টও কম হয়। কী বলুন?" উৎপল স্মিতমুখে বলল, 'ঠিক কথা। কিন্তু আপনি এসব কী করে জানলেন বলুনতো?'

অনুরাধা হাসলেন, 'আমাকে কি এমনই অকেজো মেয়ে বলে আপনার মনে হয়? কোন কাজের রহস্যই আমি জানতে পারিনে?' উৎপল বলল, 'তা কেন। বরং কাজের রহস্য আপনারাই তো ভালো করে জানেন। আমরা তো একান্তই কথার মানুষ। অকাজের কাজে যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয় শত শত আনন্দের আয়োজন।'

অনুরাধা একটু কান পেতে শুনে বললেন, 'বাঃ বেশ তো! রবীন্দ্রনাথের? না?'

উৎপল স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ। আর কার হবে?'

'কোন্ কবিতাটা বলুনতো। ঠিক মনে পড়ছে না।'

অনুরাধা ভ্রূ কুঁচকে একটু যেন ভাবতে চেষ্টা করলেন। সেই অপূর্ব কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগলের দিকে তাকিয়ে উৎপল বলল, 'কবিতাটির নাম আবেদন। সেই রাণীর কাছে ভৃত্যের আবেদন। 'জয় হোক মহারাণী দীনভৃত্যে কর দয়া।' বলে যে কবিতাটির আরম্ভ। মনে পড়ছে আপনার?'

অনুরাধা বললেন 'হ্যাঁ পড়ছে।'

উৎপল লক্ষ্য করল, অনুরাধার মুখখানা যেন আরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আপনি একটু বসুন। আমি আসছি। ও ঘরে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন।

পাশের দরজা দিয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন অনুরাধা। উৎপলের মন এবার আশঙ্কা আর অনুশোচনায় ভরে উঠল। ছি ছি ছি। উনি কিছু মনে করলেন না তো, মাত্র দুদিনের আলাপে কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করা উৎপলের পক্ষে কি উচিত হয়েছে, তাছাড়া রূপমুগ্ধ ভৃত্যের ভূমিকাই বা সে কেন নেবে। যদিও সাময়িক ভাবে একটি ফরমায়েসী কাজ সে নিয়েছে তবু সে আসলে একজন লেখক এ কথা উৎপল ভুলে গেল কী করে? নিজেই যদি সে নিজের মর্যাদা রাখতে না পারে অন্যের শ্রদ্ধা সম্মান সে কিছুতেই আকর্ষণ করতে পারবে না। মিসেস রায় নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। উৎপলের এই প্রগলভতায় তিনি ফিরে এসে কী বলবেন কে জানে। হয়তো শিগগির ফিরে না আসতেও পারেন।

উৎপল শঙ্কিত হয়ে উঠল।

কিন্তু একটু বাদেই অনুরাধা ফিরে এলেন। উৎপল দেখে আশ্বস্ত হল, তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। তিনি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। হয়তো ভেবেছেন যারা শিল্পী তারা ও-ধরণের একটু স্তবস্তুতি

করবেই। শুবন ওদের জিবের ডগায় এসে থাকে। কিংবা নিবের ডগায়।

অনুরাধা বললেন, 'কবিতাটি সত্যিই ভালো। একদিন পুরো কবিতাটি আপনার মুখ থেকে শুনে নেব! আজ তো আর সে সময় নেই।'

সময়ের কেন অভাব উৎপল তা জিজ্ঞাসা না করে চুপ করে রইল।

অনুরাধা বললেন, 'আপনাকে এখানে বসেই রোজ লিখতে হবে, অফিসের মত রোজ এসে হাজিরা দিতে হবে তা যেন ভাববেন না। যেদিন এখানে এসে লিখতে ভালো লাগে লিখবেন যেদিন মনে হবে বাড়িতে বসে লেখাই ভালো সেদিন আর বাইরে বেরোবেন না। আপনার স্বাধীনতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হোক তা আমার ইচ্ছে নয়।'

উৎপল স্মিতমুখে চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়ে শুধু একটি বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে বেঁধে রেখেছেন। সে বন্ধন বিষয়বস্তুর বন্ধন। আপনার স্বামী সতীশঙ্কর রায়কে নিয়েই আমাকে লিখতে হবে। তাঁর জীবনের পরিধির মধ্যেই আমাকে ঘুরপাক খেতে হবে। হোক তা ব্যাপক তবু তাঁর জীবনের যে নকশা সে তাঁরই নকশা। তাঁর গুণযোগ্যতা ভুল ভ্রান্তি একান্তই তাঁর। সেখানে আমার কল্পনার স্ফূর্তি নেই। অবাধ স্বাধীনতা আমি একান্ত ভাবেই বাস্তবের হাত ধরা। যখন হাত ছেড়ে দিই তখনো তার পায়ে পায়ে হাঁটতে হয়। এই জন্যেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমার স্পৃহা নেই। ছেলেবেলায় যা পড়েছিলাম, আর কোনদিন পড়িনি। আমি পুরোপুরি অনৈতিহাসিক প্রাগৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার সাধ আর সাধ্য যাদের আছে তাঁরা লিখুন আমি ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ভক্ত। যা সন তারিখের শাসনে সীমাবদ্ধ নয় যা কোন দিন ঘটেনি অথচ যা ঘটলেও ঘটতে পারত।'

অনুরাধা বললেন, স্বাধীনতার কথায় আপনি অমন চুপ করে রইলেন যে? লেখার ব্যাপারে আপনি কি স্বাধীনতা চান না? আপনি কি আমাদের বিশুর মত শাসন-টাসনই বেশি পছন্দ করেন?'

উৎপল হেসে বলল, 'কি রকম?'

অনুরাধা বললেন, 'আমার ছেলে বিশুর কথা বলছি। ওকে আচ্ছা করে বকুনি না লাগালে ও কিছুতেই পড়তে বসে না। কী দুষ্টুই যে হয়েছে।'

উৎপল হেসে বলল, 'ও।'

মনে পড়ল বলেই তো মা আর ছেলেকে একসঙ্গে দেখে গেছে।

'বিশু এখন কোথায়? ওপরের ঘরে আছে নাকি?

অনুরাধা স্মিতমুখে বললেন, তাহলে কি এখানে এমন চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন? পদধ্বনি আর কণ্ঠধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। স্কুলে পাঠিয়েছি। মিশনারি স্কুল। নটা বাজতে না বাজতেই গাড়ি আসে।

উৎপল জিজ্ঞাসা করল, 'পদ্মা—পদ্মা দেবী কোথায়?'

অনুরাধা হাসলেন, ওকে আর আপনার দেবী বলতে হবে না। নাম ধরেই ডাকবেন। ও কাছেই একটা স্কুলে কাজ করে। ফেরার সময় হয়েছে। এখনই ফিরবে। খুবই ভালো মেয়ে। আপনার যখন যা দরকার হয় ওকে ডেকে বলবেন। ও সব করে দেবে। খুবই শান্তশিষ্ট আর বাধ্য। আজকাল এমন বড় একটা দেখা যায় না।'

উৎপল বলল, 'শুনেছি আপনাদের কাছ থেকে ও উপকারও যথেষ্ট পেয়েছে।'

অনুরাধা বিস্মিত হয়ে বললেন, এরই মধ্যে সে কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?

উৎপল একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'পদ্মা নিজেই কাল বলছিল।'

অনুরাধা বললেন, 'ওমা! কখন? ও কালই বুঝি আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছেন। আপনাদের লেখকদের অসাধ্য কাজ নেই আর পরের কথা জানতে কী কৌতূহল আপনাদের। আপনারা গোয়েন্দা কাহিনী লিখুন আর নাই লিখুন ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকেই এক একজন গোয়েন্দা।'

উৎপলের মনে হল মিসেস রায় কি তাহলে পদ্মার সঙ্গে তার আলাপটা পছন্দ করেননি? কিন্তু উৎপল তো আর নিজে যেচে আলাপ করতে যায়নি! খেতে দিতে দিতে পদ্মা নিজেই তার সঙ্গে কথা বলেছিল। মিসেস রায় বোধ হয় জানেন না লেখক আর গোয়েন্দা ছাড়াও আরও এক জাতের প্রাণীর কৌতূহল আছে। সে কৌতূহল

মেয়েদের। তীব্রতায় সেই কৌতূহলই বোধ হয় সবচেয়ে সেরা। পদ্মা কি সতীশঙ্করের জীবনরহস্যের এমন কোন তথ্য জানে যা অনুরাধা অনুদ্ঘাটিত রাখতে চান? তাই যদি হয় তা হলে পদ্মার দুই ঠোঁট সূচ সুতোয় গাঁথা হল বলে। সে আর কোনদিন উৎপলের সামনে মুখ খুলতে পারবে না।

অনুরাধা বললেন, 'হ্যাঁ উপকার পেয়েছে বইকি। খুবই দুঃস্থ গরীবের ঘরের মেয়ে। বলতে নেই আমার স্বামী ওদের না দেখলে পড়াশুনো তো দূরের কথা টিকে থাকাই ওর পক্ষে কঠিন হত। বাপ মা নেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও আর কেউ নেই। আমার এখানেই আছে। বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও কি আর এড়াতে পারব? অবশ্য নিজে যদি পছন্দ-টছন্দ করে কাউকে বিয়ে করে সে কথা আলাদা।

অনুরাধা একটু হাসলেন।

উৎপল কোন মন্তব্য না করে চুপ করে রইল।

অনুরাধা বলতে লাগলেন, 'অবশ্য শুধু পদ্মাদের কেন এমন আরো অনেকে অনেক পরিবারকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সবাইর নাম ঠিকানা আমি জানিনে। তিনিও জানতে দেননি। দুর্ভিক্ষে দাঙ্গায় পার্টিশনে যারা চরম দুর্দশায় পড়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তাঁর সাহায্য চেয়েছে তাদের সবাইর দুঃখ তিনি দূর করতে পারেন নি, তা কারো একার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু অনেকের জন্যেই তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। তবে সব মানুষ তো আর কৃতজ্ঞ নয়, সবাই তো আর উপকারের কথা মনে রাখে না। বরং এমন চরিত্রের মানুষও আছে যারা ইচ্ছে করেই সেই উপকারের কথা ভুলে যায়। দরকারের সময় যার কাছে একদিন হাত পেতেছিল পরে তার আর মুখ দেখে না। সেই যে গল্পে আছে দেখুন অমুকে আপনার বড় নিন্দা করে। জবাব এল 'কেন আমি তো তার কোন উপকার করিনি।'

উৎপল বলল, 'কিন্তু সামান্য উপকারের কথাও মনে করে রেখেছে এমন মানুষও তো আছে সংসারে।'

অনুরাধা সায় দিয়ে বললেন, 'আছে বইকি। না হলে এই দুনিয়া তো জঙ্গলে ভরে যেত। সাপ আর বাঘের মত হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বাস হত এই সংসারে। সৎমানুষ-ভালো মানুষও আছে বইকি। একটু খোঁজখবর করলেই আপনি তাঁদের সন্ধান পাবেন। যারা আমার স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ, শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা তাঁকে মনে করে রেখেছে এমন কারো কারো কাছে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তাদের নিজেদের মুখ থেকে সেই সব ঘটনার কথা আপনার সোনা দরকার। নইলে শুধু আমার কথা আপনার কাছে যথেষ্ট convincing মনে নাও হতে পারে।

উৎপল লজ্জিত হয়ে বলল, ছি ছি, এ কী আপনি বলছেন মিসেস রায়। আপনার কাজ কেন আমি অবিশ্বাস করতে যাব। আর কারো কাছে গিয়ে আমার দরকারই বা কি। আপনার স্বামীর জীবনের কথা আপনি যত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন আর কারো পক্ষেই তো তা জানা সম্ভব নয়।

অনুরাধা এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তা অবশ্য ঠিক। আমি যতখানি জানি তার সব খুঁটিনাটি শুদ্ধই জানি। কিন্তু সেইটুকুই তো সব নয়। আমি তাঁর স্ত্রী। আমার জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যেই তো আর তার সব জীবন সীমাবদ্ধ ছিল না, কারোরই তা থাকে না। আমি ছাড়াও তাঁর জীবন অনেকখানি ছড়ানো ছিল, সেখানে অনেকে ছিল।'

উৎপল কথাটার পুনরাবৃত্তি করল 'অনেকে!'

অনুরাধা হঠাৎ থেমে গেলেন। একটু বাদে উৎপলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'অনেকে বইকি। এতে অবাক হবার কী আছে? আচ্ছা আপনি কি বিয়ে করেছেন?

মিসেস রায়ের হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে উৎপল বিস্মিত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না করিনি। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন যে।'

অনুরাধা বললেন, করেননি। তাই কল্পনায় ভাবতে পারছেন একজন পুরুষের জীবনে স্ত্রাই সবখানি। কিন্তু তা হতে পারে না। কথায় বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। ও শুধু কথার কথা। আজকে সিকির সিকি সঙ্গিনীও নয়।'

উৎপল অবাক হয়ে চুপ করে রইল। মিসেস রায় এ সব কা বলছেন। এ সব কথার জন্যে তিনি পরে লজ্জা পাবেন না তো? অনুতপ্ত হবেন না তো? আত্মবিস্মৃত

কোন মহিলার এমন অসতর্ক স্বীকার উক্তি কি উৎপলের শোনা উচিত ? তাঁকে কি থামিয়ে দেওয়া উচিত নয় ?

কিন্তু পরমুহূর্তে অনুরাধা নিজেই সচেতন হয়ে উঠলেন। একটু হেসে বললেন, 'আমার এসব কথা শুনে আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো সবই হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে আপনার। কিন্তু আসলে হেঁয়ালীর কিছু নেই। দেখুন একজন সাধারণ কেরানীর জীবনে ও তার স্ত্রী সবখানি জুড়ে থাকতে পারে না। তারও ঘর সংসারের বাইরে আফিস আছে কলীগরা আছে, তাদের মধ্যে শত্রু-মিত্র আছে, বন্ধু-বান্ধব আমোদ-প্রমোদ কত কি রয়েছে যার সঙ্গে স্ত্রীর ঠিক সরাসরি যোগাযোগ নেই। মিষ্টার রায়ের মত মানুষের পক্ষে এই ব্যাপকতা তো আরো বেশি হওয়া স্বাভাবিক। শুধু আমার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে আপনি কেন তাঁর পুরো জীবনের কথা লিখতে যাবেন। আমি আপনাকে তা করতে বলিওনে।

উৎপল বলল, 'কিন্তু মিসেস রায় এতো জজ ম্যাজিষ্ট্রের এজলাস নয়, কোন আসামী নেই কোন মামলা-মোকদ্দমাও নেই যে অনেক সাক্ষী প্রমাণ জড়ো করতে হবে। আপনাদের কাছ থেকে যে সব তথ্য আমি পাব তাঁর চিঠিপত্র ডায়েরী বক্তৃতার বিবরণ যা কিছু পড়ব তাতেই তো মোটামুটি তাঁর সম্বন্ধে আমার একটা ইমপ্রেশন হবে। তার ওপরই একখানা বই বেশ লেখা যায়।'

বাইরে থেকে তথ্য আহরণের ইচ্ছা উৎপলের তেমন নেই জেনে অনুরাধা যেন একটু আশ্বস্তই হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, বেশ, আপনার যাতে সুবিধে হয় আপনি সেই ভাবেই লিখবেন। সকলের মেথডও তো আর একরকমের নয়। নিজের পথে চলবার নিজের ধরণে লিখবার স্বাধীনতা আপনার আছে। সে কথা তো আগেই বলেছি।

উৎপল চুপ করে রইল।

অনুরাধাও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হল কারোরই যেন আর কিছু বলবার নেই। এখনকার মত দুজনের সব বক্তব্যই যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

উৎপল ভাবল ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু বলে ফেলেছেন বলে কি অনুরাধা এখন মনে মনে অনুশোচনা বোধ করছেন ?

কিন্তু হঠাৎ তিনিই ফের কথা শুরু করলেন, 'আচ্ছা, কোন টেকনিকে আপনি লিখবেন কিছু কি ঠিক করেছেন ?'

উৎপল বলল, 'না। তবে একটি প্যাটার্ণের কথা আমার মনে এসেছে।'

'কি রকম ?'

উৎপল বলল, 'ধরুন, আপনার জবানীতে যদি লেখা যায়। আপনার চোখ দিয়ে আপনার স্বামীকে দেখা। নিবেদিতা যেমন লিখেছিলেন 'My Master. as I saw him". ধরুন যেন আপনিও তেমনি লিখছেন, 'আমি আমার স্বামীকে যেমন দেখেছি চিনেছি অনুভব করেছি উপলব্ধি করেছি। আমি আমার আদর্শের সঙ্গে কল্পনার সঙ্গে তিলে তিলে যেমন করে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি।'

অনুরাধা মুহূর্তকাল যেন স্তব্ধ আর বিবর্ণ হয়ে রইলেন। তারপর প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'না না উৎপলবাবু, ওভাবে লিখতে যাবেন না, ওভাবে লিখে দরকার নেই।

উৎপল বলল, 'কেন ? আমার তো মনে হয় তাতেই বইটির সুখপাঠ্যতা বাড়বে। সতীশঙ্করবাবুর একটি অন্তরঙ্গ চিত্রও আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারব।'

অনুরাধা বললেন, 'না না না। আপনি আমার জবানীতে কিছু লিখতে যাবেন না। বরং বাইরের কোন বন্ধু কি গুণগ্রাহী—কিংবা তারই বা দরকার কি—একজন নিরপেক্ষ নিরাসক্ত দর্শকের চোখ দিয়েই আপনি দেখুন তাঁকে। 'সেই ভালো।'

উৎপল ভাবল, নিরপেক্ষ দর্শক! কাল কিন্তু মিসেস রায় একথা বলেননি। এতখানি স্বাধীনতা দেননি লেখককে। আজ যে দিচ্ছেন ওঁর এই দান কি স্থায়ী ? না কি কালই ফের দণ্ডাপহারিণী হবেন ? তিনি কি জানেন নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি কী বস্তু ? সেই দৃষ্টির আলোয় শুধু গুণই দেখা যায় না, বহু দোষ ত্রুটি আর স্ববিরোধও ধরা পড়ে। মিসেস রায় কি সে সব সহ্য করতে পারবেন ? একটু চুপ করে থেকে অনুরাধা ফের বললেন, 'আমার জবানীতে লিখলে যদি হত তাহলে তো আমি নিজেই লিখতে পারতাম। অহংকার করছি বলে মনে করবেন না। নিজেদের জীবন নিয়ে একখানা বই—

একটু চেষ্টা করলে আর খানিকটা ধৈর্য আর সময় থাকলে আর একেবারে নিরক্ষরা না হলে বোধহয় সবাই লিখতে পারে। কিন্তু আমি লিখতে চাইনি বলেই লিখিনি। আর তাই আপনার সাহায্য চেয়েছি।'

উৎপল বলল, 'আচ্ছা সতীশঙ্করবাবু কি ডায়েরি-টায়েরি রাখতেন ?'

অনুরাধা বললেন, 'জেলে যখন ছিলেন তখন রাখতেন। তাও নিয়মিত নয়। জেলের বাইরে বিশেষ কিছু লিখতে দেখিনি।'

উৎপল বলল, 'আর আপনি ?'

অনুরাধা একটু লজ্জিত হলেন, 'আমি ? আমি আগে আগে রাখতাম। ঠিক ডায়েরি নয়। দিনের পর দিনের ঘটনা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে রাখবার ধৈর্য আমার ছিল না। কোন কোন দিন লিখতাম। খানিকটা রাগ খানিকটা দুঃখ, কি খানিকটা অহেতুক খুসির কথা একটি কি দুটি প্যারাগ্রাফে ধরে রাখতে চেষ্টা করতাম। যেদিন না লিখে পারতাম না শুধু সেইদিনই লিখতাম।'

উৎপল বলল, বাঃ বেশ তো বলেছেন। যেদিন না লিখে পারতেন না—লেখকদের জীবনেও এমন দিন খুব কমই আসে যেদিন তাঁরা না লিখে পারেন না। বেশির ভাগ দিনই তাঁরা লেখেন কারণ না লিখলে চলে না। তাই এমন সব লেখা তাঁদের বেরোয় যা না লিখলেও চলে। আপনি কিন্তু আমাকে সেই সব না-লিখে থাকতে না পারা লেখাগুলি দেখাবেন।'

অনুরাধা তেমনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কী বা বলেন। সে সব কি আর আছে। কবে কোথায় সব হারিয়ে-টারিয়ে গেছে তার কিছু ঠিক নেই। তাছাড়া সে সব লেখা আপনার কোন কাজেও আসবে না। বরং হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়ল। বরং সেই জিনিসটা আপনার কিছু কাজে আসবে। ওঁর একবার ইলেকসনে দাঁড়াবার কথা হয়েছিল। সেই সময় আমরা ওঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা দিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পত্রের মত তৈরি করেছিলাম। দেখি সেটা আছে কিনা। সেটা হয়তো আপনার কিছু কাজে লাগবে।'

অনুরাধা উঠতে যাচ্ছেন পদ্মা এসে ঘরে ঢুকল।

কাল যাকে পরিচারিকা আর পরিবেশিকার বেশে দেখেছিল আজ সে শিক্ষিতা। পরণে কমলা রঙের একখানা শাড়ি। বাঁ হাতে সস্তা দামের একটি ঘড়ি। মোটা সুতোয় বাঁধা এক রাশ খাতা। মুখখানা ঈষৎ বিষণ্ণ আর গম্ভীর ছিল কিন্তু উৎপলকে দেখে সে মুখের রঙ বদলালো, দুটি চোখ পরিচয়ের আলোয় উজ্জ্বল হল।

পদ্মা অস্ফুটস্বরে বলল, 'এই যে আপনি।'

উৎপল স্মিতমুখে তার দিকে তাকাল। কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু 'তুমি-আপনির' সমস্যায় বিব্রত হয়ে চুপ করে রইল।

অনুরাধা বললেন, 'এতক্ষণে ছুটি হল !'

পদ্মা বলল, 'হ্যাঁ, বউদি।'

অনুরাধা বললেন, 'আচ্ছা, তোর মনে আছে বোধ হয় আমরা ওঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী তৈরি করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাপা হয়েছিল। একটা বুকলেটের মত করেছিলাম। নিয়ে আয় তো তার একখানা কপি। আচ্ছা থাক থাক। আমিই যাচ্ছি। তুই হয়তো খুঁজে পাবিনে। উৎপলবাবু বসুন। আমি ওটা পদ্মার হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমরা ওপরেই আছি। আপনার যখন যা দরকার হয় চেয়ে পাঠাবেন খবর দেবেন। কোন সংকোচ করবেন না।

পদ্মাকে নিয়ে অনুরাধা দোতলায় উঠতে লাগলেন। আস্তে আস্তে ওঁদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

উৎপল বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল, সংক্ষেপে গ্রথিত তথ্যপূর্ণ সেই জীবনীর যা অবলম্বন করে সে এক বিপুলায়তন বই লিখবে, সে আয়তন কতখানি হবে এই মুহূর্তে সে সম্বন্ধে উৎপলের কোন ধারণা নেই। তবে এটুকু নিশ্চিন্ত সে বোধ হয় এখন আর পিছিয়ে যেতে পারবে না। এত সব আলাপ-আলোচনার পর ও কথা আর বলা চলে না। তাকে অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে। সে চেষ্টা সফল হোক আর না হোক, তার লেখা মিসেস রায় পছন্দ করুন আর নাই করুন। যদি অপছন্দ করেন তাহলে সহজেই ঝামেলা মিটে যায়। বিদায় নমস্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কী চায় উৎপল ? মিসেস রায়ের মনোনীত হতে চায় না অমনোনীত ? এই মুহূর্তে এক কথায় জবাব দেওয়া বড় কঠিন।

তার চেয়ে পরবর্তী মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা সহজ।

(ক্রমশ)

মেয়েদের কথা

স্বল্পবিত্ত মেয়ের জীবন দর্শন

রেবা চট্টোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারলাম না। শুধু লড়াই করতে করতেই বয়সটা পার হয়ে গেল—হাসলেন আমার এককালের অতি প্রিয়-বান্ধবী। বাস স্টপে দেখা। চুলে এর মধ্যেই রূপালী আভায। আর হাসিতে শুধুই তিক্ততা আর জ্বালা।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি করছ?' 'কেমন আছ' টা বোধহয় আর সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন না। আমাকেও হাসতে হল। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—'মারটাকে কোনও মতে ঠেকিয়ে যাচ্ছি।' খানিক পরে যে যার পথে চলে গেলাম।

হ্যাঁ, আমার বান্ধবী, আপনি বা আমি একলা নয়, আজকের স্বল্পবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বহু মেয়েরই এই অবস্থা। জীবনটাকে কোনও মতে শুধু টিকিয়ে রাখা।

তেরো বছরের স্বাধীনতা যেমন আমাদের খোকা-রাষ্ট্রের 'হাঁটি হাঁটি পা-পা' ঘোচাতে পারি নি—পারে নি তেমনি দেশব্যাপী দুর্দ্দশার কোনও উল্লেখযোগ্য উপশম ঘটাতে।

দীর্ঘ তেরো বছর পরেও আমরা পেয়েছি কি? অর্দ্ধাশন আর দারিদ্র্য, আর আশার অকালমৃত্যুর ইতিহাস শুধু লেখা হয়েছে এই দীর্ঘকাল ধরে।

প্রাচ্যের অন্য স্বাধীন দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের মেয়েদের চোখে প্রাণের উজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে আশার আর সার্থকতার হাসি,দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য।

ওদের দেশে ঘরে বাইরে জীবনের সাড়া, এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ। আর আমরা? সংবিধানে আমাদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু, দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা ভারতের নারী সমাজের উন্নতি আর অগ্রগতির জন্যে সমানাধিকার-ই কি যথেষ্ট?

অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের উন্নতির জন্যে আমাদের সরকার নানারকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু, যে দেশের নারীসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে গৃহকোণে আবদ্ধ ছিল—তাদের সুস্থ ও উন্নতিশীল জীবন গড়ে তোলার জন্যে সরকার উল্লেখযোগ্য কিছু করেন নি।

কর্ম্মক্ষেত্র

স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রের কথাই প্রথমে ধরা যাক্। কোনও কোনও কর্মক্ষেত্রে লিখিত ভাবেই মেয়েদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ; অনেক ক্ষেত্রে, অলিখিত বিধানবলে (সমানাধিকার স্বীকার করা সত্ত্বেও) মেয়েদের প্রবেশের দরজা বন্ধ।

স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েরা বহু আয়াসে বহু অর্থব্যয় করে যখন পড়াশোনা, ইত্যাদি সমাপ্ত করেন—আশা থাকে যে, এবার হয়তো একটু সুরাহা হবে।

কিন্তু, বাস্তব অনেক রূঢ়। সেখানে, শুধু গুণগত যোগ্যতাই মেয়েদের ক্ষেত্রে সব জায়গায় যথেষ্ট নয়—মেয়ে হিসেবে তার যোগ্যতা কতটুকু—সেটাও বিবেচনাযোগ্য। সুশ্রী, স্মার্ট, এবং একটু গায়ে পড়া হলে এবং তরুণী হলে তবে অনেক জায়গায় সহজে কর্মসংস্থান করা সম্ভব। আর চাকরী বজায় রাখতে গেলে অনেকক্ষেত্রে যে 'মেয়েলিপনার' মায়াজাল ছড়িয়ে 'বস্'এর মনোরঞ্জন করতে হয় একথা তো সকলেরই জানা।

অনেক মেয়ের অনেক সদ্‌গুণ এই একটি বিশেষ গুণের অভাবে মাটি হয়ে যায়।

এ ছাড়া, মেয়েরা যেখানে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ-প্রার্থী—সেখানে তাদের যোগ্যতাকে ব্যক্তিগত বিচার

করা হয় না। 'মেয়ে' হিসেবে তাদের যোগ্যতার বিচার করা হয়—কঠিন বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে।

কাজে অযোগ্যতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পুরুষের যেমন ঘটে, মেয়েদেরও তেমনি ঘটতে পারে। কিন্তু, মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে শ্রেণীগত ভাবে দেখা হয়। অর্থাৎ, 'আগেই জানাছিল, মেয়েরা এসব কাজের উপযুক্ত নয়।' এক্ষেত্রে একটি মেয়ের কাজের অযোগ্যতাকে সমগ্র নারী সমাজের অযোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়।

সুতরাং, বাইরের কর্মক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েরা যোগ্যতা ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলেও পরিবেশ তাদের উন্নতির পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে।

অবশ্য, যে সামান্য ক'জন মেয়ে উঁচুদরের সরকারী বা বেসরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন—তাঁদের বেলায় এসব সমস্যা হয়তো সব ক্ষেত্রে মাথা তোলে না।

অনেকে এখনও বলেন, স্কুলের চাকরীতে পয়সা না থাকলেও সম্মান আছে। কিন্তু, এখনকার দিনে এই সম্মানের মধ্যেও অনেক ভেজাল।

আশ-পাশের সকলের কাছে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনি 'মাষ্টারণী'। সামনা-সামনি বলতেও কুণ্ঠিত হন না অনেকেই। আর, স্কুল টীচারের মাইনে কত সবাই জানেন। সুতরাং, আপনি 'বেচারার' দলে। লোকের সহানুভূতির পাত্রী।

সারাদিন ধরে গলা চিরে ফেলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি ছাত্রী নিয়ে এক একটা ক্লাশ নিয়ে যাচ্ছেন আপনি। সেটের পর সেট খাতা 'অফ্ পিরিয়ডে' দেখছেন ঘাড় নীচু করে। অজস্র ভুল-ভ্রান্তির জট ছাড়িয়ে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করতে চাইছেন। এতেও শেষ করতে না পেরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে খাতার বোঝা নিয়ে বাড়ী চল্লেন—স্কুল আপনার বাড়িতেও এসেছে আপনার কাঁধে চেপে। হয়তো, আপনি যে সব বিষয় পড়াতে ভালবাসেন—তার বদলে যেগুলিতে আপনার রুচি নেই—সেগুলিই পড়াচ্ছেন দিনের পর দিন। কিন্তু, অল্প মাইনের এত হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বদলে কোনও দিন কি আপনার কাজের জন্যে ওপরওয়ালা বা সহকর্মিদের কাছ থেকে একটু মূল্যোপলব্ধির দৃষ্টিও লাভ করতে পেরেছেন?

বরং, অনেক সময়, পান থেকে চুণ খসলেই, কিংবা আপনি যে ক্লাশে পড়ান তার পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে (চল্লিশ মিনিটে চল্লিশটি মেয়ের কত বেশী উন্নতি বিধান সম্ভব?) ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণান্ত-মানান্ত দুই-ই হচ্ছে আপনার।

এর ওপরে আছে—সহকর্মিদের ঈর্ষ্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্রী হবার চেষ্টায় আপনার অজ্ঞাতে আপনার নামে রিপোর্ট পেশ, ইত্যাদি মামুলি ব্যাপার। আর, স্কুলের চাকরীতে যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বিবাহ

স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েদের বিবাহও এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের একটা কঠিন সমস্যা। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে বিবাহ মানুষের জীবনের একটা প্রধান পর্ব।

আমাদের দেশে পুরুষের বিয়ের ব্যাপারটা কোনও দিনই সমস্যা ছিল না। এখন, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে পুরুষের বিয়েতে ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কট দেখা দিলেও—সমস্যার তীব্রতার দিক থেকে মেয়েদের বিয়ের সঙ্গে তুলনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আগেকার দিনেও মেয়েদের বিয়ে ছিল এক কঠিন সমস্যা। তার আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলো ছিল বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য ইত্যাদি।

এখন, দেশ স্বাধীন হয়েছে—শিক্ষার প্রসার হচ্ছে—শিল্প-বাণিজ্য সবদিকেই উন্নতির অভিযান চলছে। কিন্তু স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েদের বিয়ের সমস্যা একতিলও কমেনি।

পাত্রী শিক্ষিত বা রূপবতী না হলে তো বিয়ে হওয়াই মুস্কিল। আবার, রূপবতী, কিন্তু শিক্ষিত নয়, এমন মেয়ের পাত্র পাওয়া গেলেও, গুণবতী, শিক্ষিত, কিন্তু রূপহীনার পাত্র জোটে খুব কমই। তবে, মেয়ের অভিভাবক যদি সর্বস্বান্ত হতে রাজী হন—তাহলে আলাদা কথা।

মেয়েদের বিয়ের সমস্যা এখানেই শেষ নয়। বর্ণভেদের বাছ-বিচার, ঠিকুজিকুষ্ঠীর মিল-অমিল ইত্যাদি বহু বিষয় আমাদের দেশের মেয়েদের বিবাহ ব্যবস্থাকে জটিল করে রেখেছে এখনও।

অভিভাবকবর্গের প্রাচীনপন্থী মনোভাবও অনেক

ক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ের পথে বাধা। ছেলেমেয়েদের সহজ-স্বাধীন মেলামেশা এবং স্বয়ং নির্ব্বাচনের প্রতি বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের অনমনীয় মনোভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা এবং ছেলেরাও স্বয়ং নির্ব্বাচিত বিবাহে পেছিয়ে যায়।

স্বল্পবিত্ত শিক্ষিত মেয়েদের বিবাহটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরও একটা কারণে। মনে করা যাক্, কোনও পরিবারের ছটি কি সাতটি সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রথম দুটি মেয়ে। আধুনিক পিতা স্বল্পবিত্ত হলেও মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলেছেন যথানিয়মে। হয়তো আশা ছিল, শিক্ষিত মেয়ের বিয়েতে পণপ্রথার ভূতটা উপদ্রব করবে না তত।

কিন্তু, তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে যথারীতি। দেখেছেন, শিক্ষিত মেয়ের বিয়েতে উপযুক্ত পাত্রের জন্য বরং আরো মোটা অঙ্কের বরপণ দিতে হবে। নিরাশায় ভেঙে পড়েছেন তিনি।

এদিকে, মেয়ে হয়তো বিয়ের অপেক্ষায় না থেকে কোনও অফিসে কি স্কুলে কাজ নিয়েছে। তারপর, বাবা-মা ধীরে ধীরে মেয়ের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। পাত্র খোঁজার উৎসাহও ঝিমিয়ে পড়ে ক্রমশঃ।

আর, স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়ে—রক্ষণশীল আবহাওয়ায় মানুষ, স্বয়ং নির্ব্বাচনের সুযোগ বা ক্ষমতা কজনেরই বা থাকে? এর ওপরে আছে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ। সুতরাং, বিয়ের ব্যাপারটা এ সব ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে চাপা পড়ে যায়।

তারপর, ধীরে ধীরে প্রৌঢ়ত্ব এসে হাজির হয় তার একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতার বোঝা নিয়ে। জীবনের মধ্যপথেই তাই অনেকে হয়ে পড়ে হতাশাদগ্ধ আর ক্লান্ত, রুক্ষ।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাবা মার স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য ও মেয়েদের বিয়ের সমস্যাটাকে জীইয়ে রাখে। হয়তো, মেয়ের উপার্জনের ওপরে নির্ভর করার প্রয়োজন তত জরুরী নয়। তবুও, সংসারের সুবিধে যা'তে ব্যাহত না হয়, সেজন্য, মেয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি [illegible] ঔদাসীন্য প্রকাশ। উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

এমন মেয়ের দেখা হয়তো আপনার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই পাবেন।

পারিবারিক জীবন

কিন্তু, এ তো শুধু একদিকের কথা। স্বল্পবিত্ত ঘরের বিবাহিত মেয়েদের সঙ্কটও কিছুমাত্র কম নয়। বরং, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

পারিবারিক বাজেটে প্রতিমাসেই ঘাটতির অঙ্কটা মোটা হয়ে চলেছে। দিন দিন জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে—বাড়ছে সেগুলি সংগ্রহ করার অসুবিধে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চিনির অভাব আমাদের দেশে নেই। কিন্তু, তার দামটার লক্ষ্য হচ্ছে—"উঁচু, উঁচুতে"—।

কাপড়ের দাম, চালের দাম, কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা, দুধের বাজারে জলের রাজত্ব—এসব দীর্ঘদিন সয়ে সয়ে এত অসাড় হয়ে পড়েছে আমাদের মন যে, এগুলো যে এককালে সহজলভ্য ছিল বা খাঁটি আকারেই মিলত—তার স্মৃতিও লুপ্ত হয়েছে।

আর মাছ, ডিম ইত্যাদির নাম না করাই ভাল। আর কিছুদিন পরে ওগুলো শুধু স্বপ্নরাজ্যের বস্তু হয়েই আমাদের আনন্দ দেবে।

এরপরে আছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, আধুনিক রুচিসম্মত জামাকাপড়ের খরচ, লৌকিকতার কর (এখনও আমরা এর মোহ ত্যাগ করতে পারিনি। দেওয়ার বেলাতেও নেওয়ার বেলাতেও) এবং সংসারযাত্রার আরও বহুবিধ দায় ঝামেলার খরচ।

দেশের ভেঙেপড়া অর্থনৈতিক কাঠামোর মাঝে শুধু ঘর আর পরিজন নিয়ে থাকলেই মেয়েদের আর চলছে না। বর্ত্তমান যুগে তাই, বিবাহিত মেয়েরাও অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

কিন্তু, স্বল্পবিত্ত ঘরের বিবাহিত মেয়েদের বাইরের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পথেও অনেক অসুবিধে ও দুর্ভোগ। যতক্ষণ ঘরে থাকেন—তাঁদের খুব কমই বিশ্রাম থাকে। ছেলেমেয়ে, স্বামী ও অন্যান্য পরিজনদের তদারক করতেই, তার বেশীর ভাগ সময় কাটে। তারপরে, কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে ছোটা। সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘরে ফেরেন অবসন্ন দেহে—তখনও হয়তো ঘরে তার জন্যে ছোট বড় নানারকম কাজও দায়িত্ব অপেক্ষা করছে।

একটু শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের সুযোগ মেলে কমজনেরই ভাগ্যে। আর, সারা দিনের ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলো তিনি সব সময় যে সুচারুভাবে পালন করতে পারবেন না—এটাও মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এই অবস্থায়, শিশুদের এবং স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত তদ্বির দেখাশোনাও যে অনিচ্ছাকৃতভাবেই খানিকটা অবহেলিত হয়ে ওঠে—সে কথা বলা বাহুল্য।

আর, কর্মী বধূর সংসারের প্রতি ও ছেলে-মেয়ে বা স্বামীর প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে না পারাটা যখন অন্যান্য পরিজনদের কাছে সমালোচনা ও নিন্দের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে—তখনই পূর্ণ হয় তাঁদের দুর্ভোগের পাত্রখানি।

নিজেকে এক দণ্ড বিশ্রাম না দিয়ে, পরিবারেরই আর্থিক সমস্যার সুরাহা করতে তিনি বাইরের কর্মক্ষেত্রে পা দেন—। বিনিময়ে হয়তো লাভ করেন নিজেরই প্রিয় পরিজনদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনা বা মন্তব্য। স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবনের রঙ আজ একই রকম—ফ্যাকাশে।—বিবাহিত অবিবাহিত, শিক্ষিত-অর্দ্ধ-শিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের জীবনই সমস্যার কাঁটায় আকীর্ণ।

তবুও, আমরা স্বল্পবিত্ত ঘরের মেয়েরা হাসি—পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবে যোগ দিই যথাসাধ্য বেশভূষা করে, আর হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখি প্রচলিত ভদ্রতা বা শিষ্টাচার বাঁচাবার জন্যে।

এই হাসি দিয়েই আমরা গোপন করি আমাদের প্রতিদিনের মৃত্যুকে।



হাতের কাজ

কাপড়ের উপর রঙীন নক্সা-ছাপার কাজ

রমলা মুখোপাধ্যায়

গতবার সুতী, রেশমী বা পশমী প্রভৃতি কাপড়ের উপর রঙীন নক্সার ছাপ-তোলা অর্থাৎ 'Textile Pattern Printing'এর শিল্প-কাজে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনা করেছি—এবারে এ কাজে রঙ-ফলানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস জানাচ্ছি।

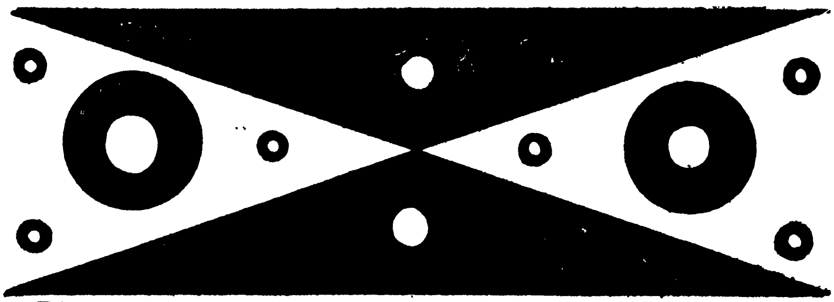
নিম্নের ছবিতে কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ-তোলার কয়েকটি বিভিন্ন 'নমুনা-চিত্র' দেওয়া হলো। এ নক্সাগুলিকে সহজেই প্রয়োজনমত-ধরণে সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপরে অলঙ্কার-রচনার কাজে ব্যবহার করা চলবে। শিক্ষার্থীরা একটু চেষ্টা করলেই এমনি ধরণের আরো নানা রকমের সুন্দর-সুন্দর বিচিত্র নক্সা-কারু অনায়াসেই রচনা করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। গতবারে যে নক্সার নমুনা দেওয়া হয়েছিল, সেটি রুমাল, ন্যাপ্‌কিন, টেবিলক্লথের উপযোগী।

যাই হোক, আপাততঃ কাপড়ের উপর এ সব বিচিত্র নক্সার রঙীন ছাপ-তোলার পদ্ধতির কথা বলি।

. শিল্প-কাজ সুরু করবার আগে, হাতের কাছে দরকারী সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজিয়ে রাখলে কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি। তাছাড়া এ সব নক্সার ছাপ-তোলার সময়, খোলা জানলার ধারে কিম্বা উন্মুক্ত ছাদে, দালানে বা বারান্দায় ছায়া-শীতল উজ্জ্বল আলোকময় জায়গায় বসে কাজ করাই ভালো!

. কোনো জিনিষের উপরে নক্সার ছাপ-তোলার সময়,

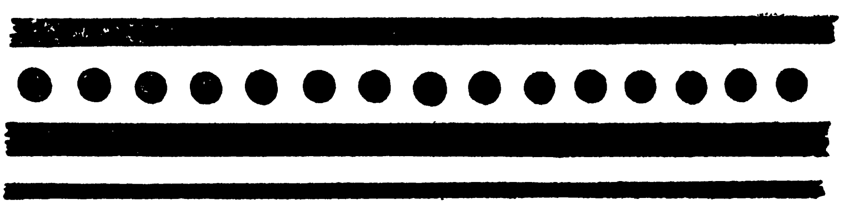
গোড়াতেই কাপড়টিকে 'আলপিন' (Paper-pins), 'ড্রইং-পিন' (Drawing-Pins) অথবা 'কাগজ-আঁটা



১ পাড়ের নক্সার নমুনা

ক্লিপ' (Paper-clips) দিয়ে, সমতল কাঠের পাটার (Wooden Board) বুকে বিছানো 'ব্লটিং-কাগজের' (Blotting-Paper) উপর বেশ পরিপাটিভাবে এঁটে নিতে হবে। তাছাড়া কাপড়ের বুকে যে জায়গাতে রঙীন নক্সার ছাপ তুলবেন, তার কোণে-কোণে আগাগোড়া পেন্সিলের মৃদু দাগ দিয়ে সোজা লাইন টেনে নিশানা চিহ্নিত করে নেবেন—তাহলে কাজের সময় নক্সার ছাপ বাঁকাচোরা হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে না এবং নক্সাটিও বরাবর সমান এবং সুন্দর ছাঁদের হবে।

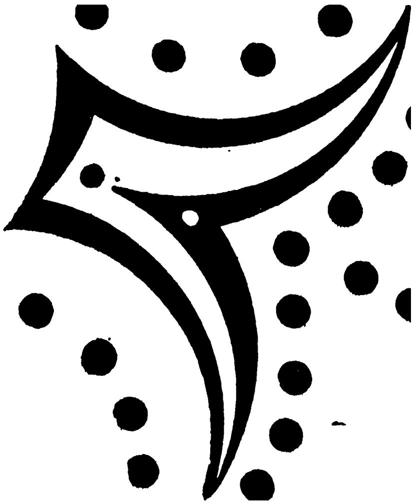
'ব্লটিং-কাগজের' উপর কাপড়টিকে ভালো করে এঁটে নেবার পর, কাঠি বা তুলির সাহায্যে বিভিন্ন তেল-রঙের (Oil-colours) প্রলেপ দিয়ে নক্সার ছাপ তুলতে হবে।



২ পাড়ের নক্সার নমুনা

তবে তেল-রঙ ব্যবহার করতে হবে রীতিমত হুঁশিয়ার হয়ে। কারণ, তেল-রঙ পাতলা···বাটিতে বা কৌটোতে এই পাতলা-রঙ ঢেলে, কাঠিতে তুলতে গেলে, রঙ অসমান-ভাবে ওঠবার সম্ভাবনা। সুতরাং কাঠি দিয়ে নক্সার ছাপ-তোলার কাজ করতে হলে, এভাবে রঙ ব্যবহার না করে, বরং, রবার-ষ্ট্যাম্প (Rubber-Stamp) ছাপার মতো ধরণে, এক-এক টুকরো পরিষ্কার বনাত (Felt) বা কম্বলের (Woolen Rug) উপরে সমানভাবে বিভিন্ন তেল-রঙের ফোঁটা ফেলে 'ছাপার কালির প্যাড্' (Stamping Ink Pad) বানিয়ে, সেই 'প্যাড' থেকে কাঠি দিয়ে রঙ তুলে নিয়ে কাজ করাই ভালো। পাতলা তেল-রঙে ভেজানো এই সব বনাত বা কম্বলের টুকরোয় রঙ লাগানোর কাঠি বেশ করে চাপ দিয়ে ধরে রাখলেই, কাঠির ডগায় সমান ভাবে রঙ লেগে যাবে। তখন সেই রঙ-মাখানো কাঠি দিয়ে পরিপাটিভাবে কাপড়ের বুকে রঙীন নক্সা-রচনা করা চলবে। তবে যাঁরা তুলি দিয়ে রঙ-ফলানোর কাজ করবেন, তাঁদের পক্ষে এ-ধরণের ছাপার-রঙের 'প্যাড' ব্যবহার করার তেমন প্রয়োজন নেই—তাঁরা অনায়াসেই তুলির সাহায্যে বাটি বা কৌটো থেকে পাতলা তেল-রঙ তুলে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে নক্সার কাজ করতে পারেন। কাপড়ের উপর তেল-রঙ দিয়ে নক্সা-রচনার সময় সর্ব্বদা নজর রাখা দরকার—রঙের ছাপ যেন সমানভাবে পড়ে···অনেক সময় কম রঙের ফলে, কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফোটে না; আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বেশী রঙ-লাগার দরুণ নক্সার ছাপ ধ্যাবড়া-ছাঁদের হয়! তবে এ সব দোষ ত্রুটি এমন কিছু মারাত্মক নয়—গোড়ার দিকে শিক্ষার্থীদের এ ধরণের ভুল-চুক হওয়াই স্বাভাবিক, সেজন্য হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ তুলতে গিয়ে বেশী রঙ লেগে ধেবড়ে গেলে, কাপড়টিকে ভালো করে কেচে নিলে, এ-রঙ সহজেই উঠে যাবে। তারপর কাপড়টিকে ভালো করে শুকিয়ে, ইস্ত্রি করে নিলেই আবার কাজ করা চলবে। কম রঙের ফলে, কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ অস্পষ্ট হলে,

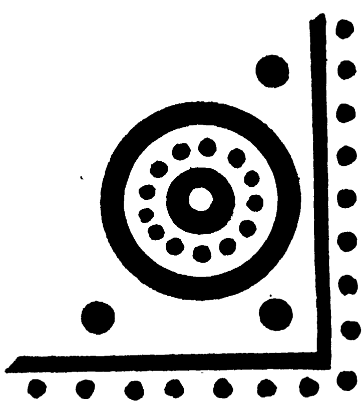
কাঠি বা তুলিটিকে আবার সেই রঙের বাটিতে বা 'প্যাডে' ডুবিয়ে নিয়ে আগেকার ঐ অস্পষ্ট ছাপের উপর দাগে-



৩ কোনার নক্সা

দাগে বেমালুম মিলিয়ে চেপে ধরলেই, অস্পষ্ট-নক্সা রীতিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে, এভাবে নক্সার ছাপ-তোলার সময় বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন, ছাপ দুটি যেন হুবহু মিলে যায়, নাহলে পাশাপাশি দুটি ছাপ পড়ে নক্সার সৌন্দর্য্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

বাজারে কৌটোয়-ভরা বিভিন্ন দেশী-বিলাতী কোম্পানীর তৈরী যে সব তেল-রঙ সাধারণতঃ কিনতে পাওয়া যায়, সে-সব রঙকে ফিকে-ধরণের বানাতে হলে,



৪ কোনার নক্সা

অনেকে 'জিঙ্ক-হোয়াইট'' (Zinc White) শাদা-রঙ মিশিয়ে গাঢ়-রঙকে হালকা করে নেন। প্রয়োজন হলে, এ পদ্ধতিটিকেও কাজে লাগানো ভালো। তবে মনে রাখতে হবে এই 'জিঙ্ক-হোয়াইট' রঙ সাধারণ 'Zinc White' নয়—এটির আসল নাম হলো—'প্যাটার্ণ-প্রিন্টিং জিঙ্ক-হোয়াইট' (Pattern-Printing Zinc White) এবং নক্সার ছাপ-তোলার জন্যই বিশেষভাবে ব্যবহার হয়।

যাই হোক, উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ করে কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ-তোলা শেষ হয়ে গেলে, কাপড়টি সাবধানে বাতাসে মেলে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন। কাপড়ের উপরে ছাপা নক্সার রঙ শুকিয়ে যাবার পর, কাপড়টিকে স্যাঁতসেঁতে-ভিজে মিহি-ধরণের কাপড়ের টুকরোর নীচে সমান-ভাবে বিছিয়ে রেখে সাবধানে মাঝারি-গরম তাপওয়ালা ইস্ত্রি চালিয়ে পাট করে নেবেন। ইস্ত্রি করবার সময় নজর রাখবেন, অসাবধানভাবে বেশী গরম তাপ লেগে কাপড়ের উপরকার নক্সার রঙ যেন গলে না যায়—তাহলেই পরিশ্রম পণ্ড হবে! তবে এজন্য আশঙ্কিত হবার কারণ নেই—কারণ, খুব বেশী গরম তাপ না লাগলে ভালো তেল-রঙ সহজে গলবে না। যে কাপড়ে এ-ধরণের নক্সার ছাপ তুলবেন সে কাপড় ঘন-ঘন ধোপার বাড়ীতে না পাঠিয়ে, বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজের হাতে সযত্নে কেচে নেওয়াই ভালো!

সূতী, রেশম বা পশমী কাপড়ের উপর তেল-রঙ দিয়ে নক্সার ছাপ তোলা কারু-শিল্পের এই হলো মোটামুটি হদিশ!

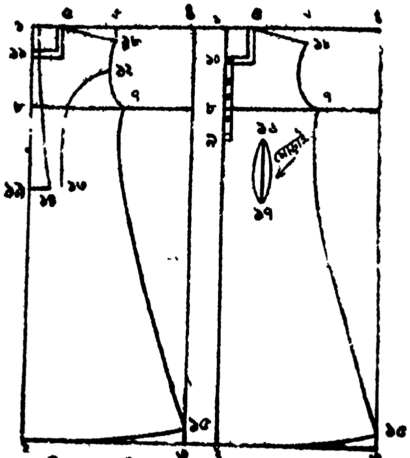
ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

স্থলতা মুখোপাধ্যায়

সেমিজ

(২)

গত সংখ্যায় সেমিজের কাট-ছাট কিভাবে করতে হয়, নক্সা-চিত্রের সাহায্যে সে কথা বুঝিয়ে বলেছি—এবারে জানাচ্ছি, সেমিজ সেলাই করার পদ্ধতি।

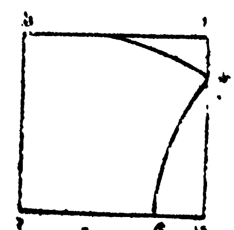


পিছনের পাট সামনের পাট

উপরের ছবিতে দেখানো নক্সা-অনুসারে—প্রথমেই ছাঁটাই-করা কাপড়ের পিছনের পাট অর্থাৎ সেমিজের পিঠের দিকের অংশটি নিয়ে '১' থেকে '৮'—এই লাইন-টিকে লম্বালম্বি সেলাই করবেন। এটি হলো অন্দর বা ভিতরের দিক। এ লাইনটি সেলাই হলে, সামনের দিকে '৮' থেকে '১৯' যেটুকু ফুলে থাকবে, সেটুকু 'বডি'র (Body) সঙ্গে সেঁটে সেলাই করবেন। এবারে এই কাপড়টিকে বিছিয়ে রাখলে, '১২' ও '১৩' অংশ '১' ও '২' অংশের ডাইনে আর বাঁয়ে দুদিকেই থাকবে। এই দু'দিকেই '১২' এবং '১৩' ঠিক যেমন 'ছাঁদে' (Shape) দাগ দেওয়া রয়েছে, অবিকল সেই 'ছাঁদে' ½" ইঞ্চি 'মেরে' (কমিয়ে) রেখে সেলাই করুন। এভাবে সেলাইয়ের সময়, আবার নতুন করে '১২' আর '১৩' চিহ্নিত লাইন-টির নক্সা আঁকার প্রয়োজন নেই···শুধু খানিকটা কাপড় কমিয়ে সেলাই করে পিঠের দু পাশে হুবহু ঐ ছাঁদে লাইন রচনা করতে হবে।

তারপর কাপড়ের সামনের 'পাটে', অবিকল পাঞ্জাবীর বোতাম-পটির মতো ছাঁদে '১০' থেকে '৯' পর্য্যন্ত অংশে বোতামের ঘরের পটি সেলাই করতে হবে। এ কাজের পর, কোমরের কাছে—'১২' থেকে '১৩' জায়গাটুকু যে রকম সেলাই দেওয়া হলো, '১৬' আর '১৭' চিহ্নিত অংশ-টিও ঠিক সেইভাবে সেলাই করতে হবে, যাতে কাপড়ের সামনের 'পাটে' বরাবর কোমরের কাছে ঐ সেলাই দু'টি যেন পরিপাটি-ছাঁদের দেখায়। এ রকম সেলাইয়ের উদ্দেশ্য হলো—জামার কোমরকে একটু কমানো···এবং এভাবে কোমর-কমানোর ফলে, জামাটিও অনেকটা জ্যাকেটের (Jacket) ছাঁদের আর দেখতেও বেশ সুশ্রী-সুন্দর হয়; এজন্য অনেকে এ-ধরণের সেমিজের নাম দিয়েছেন—'জ্যাকেট-সেমিজ'!

তারপর '৭' থেকে '১৫' আর '৬' থেকে '১৮' অংশ পাঞ্জাবীর মতো ধরণে ডবল সেলাই করলেই সেমিজের 'বডি' (Body) বা 'দেহাবরণ' জোড়া দেওয়া যাবে। এবারে চৌকো ছাঁদে-ছাটা জামার গলার চারিধারে আরেক টুকরো কাপড়, 'লেস্' (Lace), কিম্বা রঙীন ফিতা বসিয়ে সেলাই করলেই সেমিজের চৌকো-ছাঁদের গলা তৈরী হয়ে যাবে! যাঁরা গোল-ছাঁদের গলাওয়ালা সেমিজ বানাতে চান, তাঁরা, কাপড়-ছাঁটাইয়ের সময় গলার নক্সাটি চৌকো-ছাঁদের না করে, গোল-আকারে কাটলেই, নিজেদের পছন্দমত ছাঁটের জামা তৈরী করতে পারবেন। 'বডি' সেলাইয়ের পর, সেমিজের 'হাতা'—সেলাইয়ের কাজ! সে-কাজের জন্য '১' থেকে '৪' অর্থাৎ 'হাতার মহড়া' (মুখ), 'কোঁচ' বা 'মোড়াই' দিয়ে, জামার 'বডি' বা 'দেহাবরণের' 'মহড়ার' সঙ্গে 'কাঁচা' অর্থাৎ সাধারণ সেলাই করে 'টেঁকে' দিলেই 'হাতার' কাজ শেষ হয়ে দিব্যি সুন্দর সেমিজ বানানো যাবে! প্রসঙ্গক্রমে, এখানে আরো একটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন—সেমিজের 'হাতার' 'মুহুরীতে' অর্থাৎ পাশের ছবিতে '২' আর '৬' চিহ্নিত



হাতা ছাঁটাই করার নমুনা

অংশে একটি ১০" ইঞ্চি কাপড়ের 'পটি', 'গিলা' (কুঁচি দিয়ে) করে সেলাই করতে হবে। একাজ করতে হলে '২' আর '৬' চিহ্নিত অংশে ১৪"ইঞ্চি কাপড়টিকে 'কোঁচ' দিয়ে ১০" ইঞ্চিতে দাঁড় করাতে হবে···ফলে 'হাতার' 'মহড়াতে' আর 'মুহুরীতে' পরিপাটিভাবে 'কোঁচ' দেওয়া চলবে

এবং সেলাই করবার পর সেমিজের হাতাটি বেশ নিটোল-গোল সুন্দর একটি ঘটির আকার ধারণ করবে। সূচী-শিল্পে জামার এই রকম ফুলো-ফুলো নিটোল-গোল 'হাতার নাম—'ঘটি-হাতা'! 'হাতার' কাপড়টিকে সুষ্ঠুভাবে কুঞ্চিত করে নেবার পর ২নং নক্সা অনুসারে '৫' ও '৬' চিহ্নিত অংশটুকুতে ডবল সেলাই দিতে হবে। এবার বোতাম আর বোতামের ঘর শেষ করে নিন—তাহলেই সেমিজ তৈরী হলো! তারপর, লম্বা যে ৪" ইঞ্চি কাপড় বেশী নেওয়া হয়েছে, সেই কাপড় দিয়ে সেমিজের নীচে 'মোড়াই' দেবেন এবং যদি পছন্দ করেন, তাহলে ঐ 'মোড়াই'-রচনার সময় কায়দা করে 'কুঁচি' দিয়ে দু'চারটি 'ফ্রিল' (Frill) বা 'কোঁচ-গিলা'র নক্সা-কাজও বানাতে পারবেন!

'জ্যাকেট-সেমিজ' সেলাইয়ের কাজের এই হলো মোটামুটি নিয়ম।

সাময়িকী

নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রী দল—

এতদিন বিদেশী উৎসাহিত তরুণের দল বার বার হিমালয় গিরিশৃঙ্গের আরোহণের চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুবার বহু ইউরোপীয় পর্ব্বত আরোহণকারীর দল গৌরী-শঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি সুউচ্চ পর্ব্বত শিখরে পৌঁছিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। সম্প্রতি একদল বাঙালী যুবক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীঅশোক কুমার সরকারের নিকট হইতে প্রেরণা, উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া হিমালয়ের নন্দাঘুন্টি নামক একটি দুরারূহ শৃঙ্গে অভিযান করিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তাহারা গত ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে ট্রেণে হরিদ্বার গমন করেন ও ১৩ই নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐ দলে ছিলেন—(১) শ্রীসুকুমার রায় (নেতা) (২) শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস (সহ-নেতা) (৩) শ্রীনিমাই বসু (কোয়ার্টার মাষ্টার) (৪) শ্রীধ্রুব মজুমদার (ম্যানেজার) (৫) শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফটোগ্রাফার) (৬) শ্রীঅরুণকর (ডাক্তার)। ঐ সঙ্গে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার গৌরকিশোর ঘোষ ও ফটোগ্রাফার বীরেন্দ্রনাথ সিংহ।

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার, হরিদ্বার থেকে বাসে বিপুলকোটি, সেখান থেকে পায়ে পায়ে যোশী মঠ, ধবল গঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, রুন্টিগড়—পাকা ১৩ দিনের হাঁটা পথ। ৮ই অক্টোবর রুন্টি হিমবাহে প্রাথমিক বেস্‌ক্যাম্প স্থাপন। পথ অজানা, নূতন পথের নূতন নাম হইল আনন্দগিরি পথ—তাহা পনের হাজার ফুট উঁচুতে। পর পর আরও তিনটে শিবির এবং পায়ে হেঁটে সাতাশ দিন পরে নন্দা-ঘুন্টির শীর্ষ। সেখানে বাঙালীর বিজয় পতাকা পোঁতা হইয়াছে। ফিরিবার পথে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্র মন্ত্রী তাহাদের অভিনন্দিত করিয়াছেন। ১৩ই নবেম্বর সকালে দলটি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে কলিকাতাবাসী তাহাদের বিপুল অভ্যর্থনা করে। বাঙালী অভিযাত্রী দলের হিমালয় অভিযান এই প্রথম। তারপর প্রতিদিন কলি-কাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন চলিতেছে। তাহারা বাঙালীর জীবনে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরাও তাহাদের অভিনন্দন জানাই।

নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হওয়ায় তাহার স্থানে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ মিত্র বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একাধারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও অসাধারণ কর্ম্মী। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, আর, জি, কর, মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সেনেট সভার সদস্যদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটে ঐ পদ লাভ করিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের উন্নতির জন্য এবং শাসন ব্যবস্থার সকল প্রকার দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই পদলাভে অভিনন্দিত করি এবং বিশ্বাস করি তাঁহার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় নূতন রূপ ধারণ করিয়া দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।

চন্দ্রশেখরের সম্বর্দ্ধনা—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার ও তাহার সংশ্লিষ্ট প্রসূতিসদন ও যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি কলিকাতাবাসী জন-সাধারণের বহুপ্রকার কল্যাণসাধন করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। যে নিরলস ত্যাগব্রতী কর্ম্মীর আজীবন

চেষ্টায় দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি সম্ভব হইয়াছে গত ১৭ই নভেম্বর ভাণ্ডার সম্পাদক সেই কর্ম্মী শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্তের বাষট্টিতম জন্মদিবসে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ বন্ধুগণ ভাণ্ডারের ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ হাসপাতাল গৃহে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে। সভায় ঐ অঞ্চলের বহু সমাজসেবক কর্ম্মী ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চন্দ্রশেখরকে মাল্য, পুষ্প স্তবক ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর অবিবাহিত ও দিবারাত্র এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত। গত সাঁইত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি সকলের পিছনে থাকিয়া সকলকে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত ও উৎসাহিত করিয়া চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে অন্তরের প্রীতি জানাই ও প্রার্থনা করি তাঁহার আদর্শ বর্ত্তমান যুগের তরুণদল কর্ত্তৃক অনুসৃত হউক।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়—

ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় গত ৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার গভীর রাত্রিতে জাপানের টোকিও সহরে এক বিখ্যাত রেঁস্তোরায় ভোজের সময় মারা গিয়াছেন। তাঁহার শ্বাসনালীর মধ্যে হঠাৎ একখণ্ড মাংস প্রবেশ করে ও মাত্র ৪৯ বৎসর বয়স্ক তরুণ সেনাপতি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মারা যান। এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশানালের দিল্লী-টোকিও বিমান যাত্রা উপলক্ষে প্রথম বোয়িং বিমানে ঐ দিনই (মঙ্গলবার) তিনি টোকিও পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার শব কলিকাতা ও দিল্লীতে আনিয়া উপযুক্ত মর্যাদার সহিত যমুনাতটে দাহ করা হইয়াছে। ১৯১১ সালের ৫ই মার্চ কলিকাতায় সুব্রত জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান—কিন্তু বিমান পরিচালনায় আকৃষ্ট হইয়া সৈন্য বিভাগে সেই কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি পাইলটরূপে কাজে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারতে বিমানবাহিনী গঠিত হইলে সুব্রত তাহাতে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে সুব্রত বৃটেনে ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে যোগদান করিয়া শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৪ সালের ১লা এপ্রিল তাঁহাকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধিনায়করূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণে সুব্রত রুশ বিমান বাহিনী দেখিবার জন্য মস্কো গিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার এক খ্যাতিমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—পিতা শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আই-সি-এস এখনও জীবিত, তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর এবং মাতা শ্রীমতী চারুলতা দেবীর বয়স ৮০ বৎসর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেলে বড় কাজ করিতেন। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে অপরিণত বয়সে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাজ করিবার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। সুব্রতের ভগিনী শ্রীমতী রেণুকা রায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন ও বর্তমানে এম-পি। ভগিনীপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় আই-সি-এস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ সেক্রেটারী ছিলেন। সুব্রতের পত্নী বোম্বাই এর মেয়ে—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের আত্মীয়া—তাঁহার এক মাত্র পুত্র সঞ্জয়ের বয়স মাত্র ২০ বৎসর। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রই শোকার্ত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা ভারত-সরকার তথা ভারতবাসীবৃন্দ কত উপকৃত হইতে পারিত, তাহার হিসাব নাই। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

হেমচন্দ্র নস্কর—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় গত ১২ই নভেম্বর শনিবার রাত্রি ৩টা ২০ মিনিটের সময় (রবিবার ভোরে) ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার বেলিয়াঘাটা মেন রোডস্থ বাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হন এবং পরে ডেপুটি মেয়র ও মেয়র হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৭ সাল হইতে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক, সহৃদয়, ও বিনয় নম্র ব্যবহার তাঁহাকে চিরদিন সর্বজনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন, পত্নী জীবিত আছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর পশ্চিমবঙ্গে এবং শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নস্কর কেন্দ্রে উপমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতায় একজন সামাজিক ব্যক্তির অভাব হইল।

কুমারী অনীতা বসু—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা কুমারী অনীতা বসু আগামী ডিসেম্বর মাসের ২১শে তারিখে ভারত-দর্শনে আসিবেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ভিয়েনা হইতে দিল্লীতে আসিয়া ৩ দিন তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর গৃহে বাস করিবেন ও পরে কলিকাতা ও কটক দর্শন করিবেন। তিনি ৩ মাস এদেশে থাকিবেন ও ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী উৎসব দর্শন করিবেন। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসু ভিয়েনা যাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। অনীতা ভিয়েনায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাঁহার মাতা শ্রীমতী এমিলি বসুকেও ভারতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে—তিনি আসিবেন কিনা, তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

নূতন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী প্রাক্তন সহ-সভাপতি শ্রীরিচার্ড নিক্সনকে পরাজিত করিয়া ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী শ্রীজন কেনেডি নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন—গত ৯ই নভেম্বর ভোটের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ৮ বৎসর পরে ডেমোক্রাট দল পুনরায় মার্কিণ দেশে রাজ্যশাসন ভারপ্রাপ্ত হইল। আগামী জানুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন—তাঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর। ইতিপূর্বে এত কম বয়সে কেহ প্রেসিডেণ্ট হন নাই—তিনি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান—পূর্বে কোন রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট হন নাই। তিনি মার্কিণ নৌবহরে কাজ করিয়াছেন—ঐ কাজের অন্য কেহও প্রেসিডেণ্ট হন নাই। তিনি নির্বাচনের পরই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইবেন ও আনবিক বোমার পরীক্ষাকার্য্য মুলতুবী রাখার চেষ্টা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি—

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পতিত জমি আছে এবং কি ভাবে ঐ জমির সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের জুন মাসে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব কৃষি কমিশনার ডাঃ বি এন উপ্পলের সভাপতিত্বে যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বড় বড় খণ্ডে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ শত ৪০ একর পতিত জমি আছে। এই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া চাষ-আবাদ করা যাইতে পারে। এই কার্য্যে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ একর পিছু ১১৬ টাকা ব্যয় হইবে। ভারতে যেরূপ খাদ্যাভাব, তাহাতে সত্বর এ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করা প্রয়োজন।

সহরতলীর ৪টি থানা—

শিয়ালদহ ষ্টেশন ও তাহার চারি পাশের কিয়দংশ লইয়া কলিকাতা পুলিসের পৃথক একটি থানা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহা ছাড়া টালীগঞ্জ, বেহালা, বরাহনগর ও দমদম—সহরতলীর ৪টি থানাকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অধীনে আনিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। সহরতলী গুলির সমস্যা এত বাড়িয়াছে যে সেই অঞ্চলের থানাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য কলিকাতা পুলিশের অধীন করার দরকার। বরাহনগর ও দমদম সহরের অন্তর্গত হইতেছে—বেহালা ও টালীগঞ্জ অধিকতর উন্নত হইয়াছে—কিন্তু পুলিসী ব্যবস্থা কোথাও পর্য্যাপ্ত নহে।

পাকিস্থানে ঘূর্ণিবাত্যা—গত ১১ই অক্টোবর রাত্রি হইতে ২ দিন পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যার ফলে খুলনা, যশোহর, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও বহু লোক মারা গিয়াছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ফলে বহু ফসল নষ্ট হইয়াছে—কত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। আমরা পাকিস্তানবাসীদের এই দৈবদুর্বিপাকে দুঃখিত এবং তাঁহাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি! সরকারী সাহায্যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতায় জাপান যুবরাজ—

জাপানের যুবরাজ আকিহিতো এবং তাঁহার পত্নী মিচিকো সোদা গত ১২ই নভেম্বর শনিবার রাত্রিতে কলিকাতায় আসিয়া ৩৫ ঘণ্টা কাটাইয়া গিয়াছেন রবিবার তাঁহারা কলিকাতা মিউজিয়াম ও জোড়াসাঁকোতে

রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সোমবার ভোরে তেহরাণের পথে তাঁহারা করাচী যাত্রা করেন। ফিরিবার পথে তাঁহারা কয়েকদিন ভারতে থাকিয়া যাইবেন। ইহার ফলে জাপ-ভারত সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারত-ব্রহ্ম সৌহার্দ্য—

ব্রহ্মদেশীয় প্রধান মন্ত্রী উ-নু ও তাঁহার পত্নী ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। গত ১৩ই নভেম্বর দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উ-নুকে এক ভোজ সভায় সম্বর্ধনা করেন। সভায় উভয়ে বলেন—এসিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রাজনীতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকায় কাজ করিতে হইবে। শ্রীনেহরু উ-নুকে ভারতের একজন মহান বন্ধু বলিয়া অভিহিত করেন এবং ভারত-ব্রহ্ম মৈত্রী যে সুদৃঢ় এ কথা ঘোষণা করেন।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন মিণ্টো অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ই নভেম্বর ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বিলাত যান ও লণ্ডন স্কুলের অর্থনীতির ডি-এস-সি পাশ করার সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। কিন্তু জীবনে কখনও ব্যারিষ্টারী করেন নাই। প্রথম জীবনে রিপন কলেজে, পরে কোচবিহার কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ সালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও দীর্ঘকাল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তরূপে কাজ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সদস্য রূপে, ভারতসভার পরিচালক, রামমোহন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি রূপে তিনি সমাজসেবায় ব্রতী ছিলেন। বহু বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার সন্তান ছিল না—ভ্রাতুষ্পুত্রদের লইয়া ৪।১ বিদ্যা-সাগর ষ্ট্রীটে নিজ বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য্য তাঁহার বাসগৃহের নিকট ফেডারেশন হল বা মিলনমন্দির নির্মাণ। বৃদ্ধ বয়সে ট্রামে বাসে চড়িয়া সর্বত্র যাতায়াত করিয়া তিনি মিলন মন্দিরের গৃহ নির্মাণের অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন স্বর্গত নেতা আনন্দমোহন বসু মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল পূর্বে ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রমথনাথের অগাধ পাণ্ডিত্য, চমৎকার ভাষণ শক্তি ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্বজন প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—যে যুগে ভারতীয়দের লেখা অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক দুষ্প্রাপ্য ছিল। সে যুগে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় ছাত্রদের জন্য অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিরভিমান, দেশ-হিতব্রতী, পণ্ডিত ও কর্মীর অভাব হইল।

কাশ্মীর ও ভারত—

পাকিস্তান নেতা আয়ুব খাঁ কিছু দিন পূর্বে সমগ্র কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্গত করার প্রস্তাব করায় তাহার উত্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে তাহার ফলে বহু প্রকারের অমঙ্গল দেখা দিবে। পাকিস্তানের সহিত খালের জল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়ায় শ্রীনেহরু আনন্দ প্রকাশ করেন—কিন্তু সেই সঙ্গে বলেন, কাশ্মীর সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সমস্যা হইল এই—পাকিস্তান ভারতের একটি অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সেখানে বসিয়া আছে—পাকিস্তানের মত ভিন্ন রূপ। গত ১৩ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান ভারতের যে অংশ জোর করিয়া দখল করিয়া আছে, তাহা উদ্ধার করার জন্য ভারতের চেষ্টা কোথায়? যে কোন উপায়েই হউক ঐ স্থান হইতে পাকিস্তানকে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

নূতন চেষ্ট ক্লিনিক উদ্বোধন—

গত ১২ই অক্টোবর শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) জি-কে খেমকা চেষ্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার ১৯৫২ সাল হইতে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটি যক্ষা হাসপাতাল চালাইতেছেন। উহার সঙ্গে শ্রীখেমকার দানে একটি নূতন ৫ তলা বাটী নির্মিত হইবে। ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত সভায় বলেন—নূতন গৃহ নির্মিত হইলে অধিক সংখ্যক রোগীকে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতি হইয়া দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের কার্য্যের প্রশংসা করেন ও ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

আগামী সাধারণ নির্বাচন—

১৯৬২ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে সমগ্র ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ৫ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ শেষ হইবে এবং পরবর্ত্তী ৩ দিনে ভোট গণনা শেষ করা হইবে। একটি রবিবার হইতে পরবর্ত্তী রবিবার পর্য্যন্ত ৮ দিনে নির্বাচন পর্ব শেষ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-পরিকল্পনা—

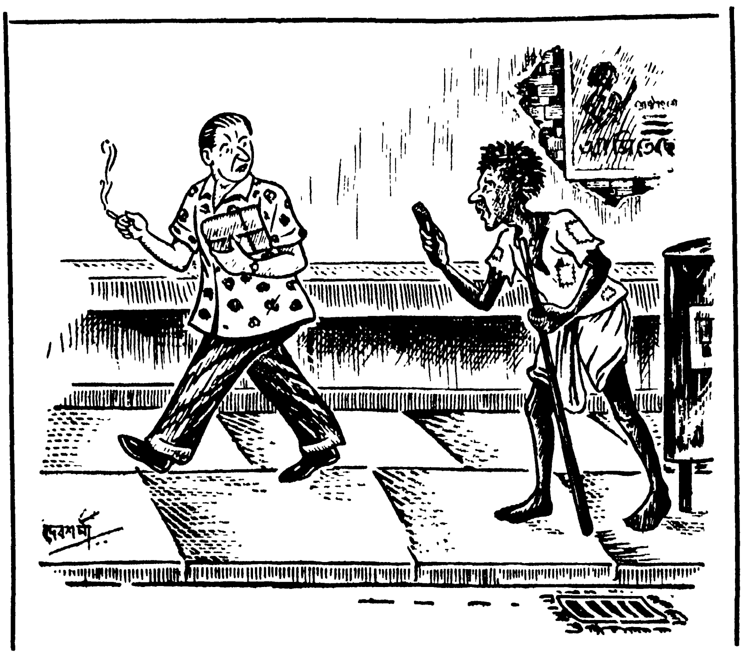
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪টি প্রধান প্রধান শিল্প পরিকল্পনাকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন—(১) ব্যাণ্ডেলে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২) দুর্গাপুরের

একটি সার উৎপাদন কারখানা ও (৩) সেখানে একটি গ্যাস গ্রিড স্থাপন ও (৪) দুর্গাপুরে কোকচুল্লী কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা। এই গুলির জন্য মোট ব্যয় হইবে ৫০ কোটি টাকা। একা তাপবিদ্যুৎ কারখানার জন্য ব্যয় হইবে ২১ কোটি টাকা। সার কারখানার জন্য ১৮ কোটি টাকা ও গ্যাস গ্রিডের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ৪টি কারখানায় কত বেকার লোকের কর্মসংস্থান হইবে তাহা জানা প্রয়োজন।

"আনন্দ-রাধমের" অভিনয়—

বিগত মহালয়া দিবস ২০শে সেপ্টেম্বর ও ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০ যথাক্রমে প্রাচ্যবাণীর বার্ষিক অধিবেশন ও আগরপাড়াস্থ শ্রীআনন্দময়ী মায়ের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর নবতম সংস্কৃত নাটক "আনন্দ-রাধম" প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে যথাক্রমে মহাজাতিসদনে ও মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনীত হয়। মহাজাতিসদনে ত্রিসহস্রাধিক সুধীবৃন্দ ও আনন্দময়ী মন্দিরে সহস্রাধিক নানা দেশের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীআনন্দময়ী মা স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করেন। সীতা-রাধা-যশোধরা—বিষ্ণুপ্রিয়া—সারদামণি—এই পঞ্চ মহামাতৃকার পুণ্য লীলাবলম্বনে ডক্টর চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক সমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই নাটকটি ভাষার সারল্য, ভাবের গাম্ভীর্য, সঙ্গীতের মাধুর্য, ও অভিনয়ের উৎকর্ষে সকলেরই মনোরঞ্জন করে। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী গৌরী কেদার ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অমর পাল, পূর্ণ দাস বাউল, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ।

॥ মুখের মতন ॥



-আঃ !…তবু পিছনে ধাওয়া করছো !
বলেছি, ভিক্ষে দেবো না…

-আজ্ঞে না, বাবু, ভিক্ষে নয় ! আপনার
টাকার ব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল…তাই…

পৃথ্বী দেবশর্মা

৩০ বছর ধরে ... লক্ষ মানুষের তুষ্টি ও বিশ্বাস
ডাল্‌ডার উৎকৃষ্টতায়
আপনার পরিবারইবা বঞ্চিত হবে কেন?



ডাল্‌ডা একটি খাঁটি জিনিষ, কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এবং ডাল্‌ডা পুষ্টিকরও বটে, কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে।

তাই মাছ-মাংস, শাকসব্জী, তরি-তরকারী ডাল্‌ডায় রাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিণীও তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডাল্‌ডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

ব ন স্প তি

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

DL.54-X52 BG

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারপরে আরো মনে পড়ল অভয়ের। পাড়ার সকল মেয়ে-পুরুষ এসেছে, সুবালা একদিনও আসে নি। এ সব কথাগুলিই মনে পড়ল, গিনির সঙ্গে বিয়ের কথায়। কেন আসেনি সুবালা? নিমি মরেছে, তাই কি সুবালার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? মনে যা-ই থাক, লোক-দেখানো-ভাবের দেখে যাওয়ার কথাটুকুও সুবালার মনে পড়েনি নিশ্চয়। বারো বাসরে দেহ শুধু নয়, মন বিকিয়ে বসে আছে সে। মানুষের সব হারায়। নিজের বলতে তার সব শেষের ধন, মনটুকুই থাকে।

সুবালা সেটুকুও বিকিয়েছে। নিমির দুর্দশায় সবাই এসেছিল। সুবালা খোঁজও করেনি। সে খবরও শুনেছে অভয়। তাকেও দেখতে এল না। তাকে দেখতে আসাটা মালীপাড়ার সংসারে কোনো নিয়মের অঙ্গ নয়। কিন্তু সবাই এল। একজন এল না, এটা চোখে পড়ে। ভাবায়।

নিমির কি সবটুকুই ভুল ছিল। সুবালার ওপরে তার যত রাগ, যত আক্রোশ এবং ঘৃণা ছিল, সে-সবই কি একেবারে মিথ্যে? সুবালার কি কোনো দায় ছিল না?

না থাকলে, সুবালা সেটা প্রমাণ করত। করা উচিত ছিল।

এতগুলি কথা যে কেন মনে হল, অভয় বিচার ক'রে দেখল না। শুধু সুবালার ওপর তার একটি বিদ্বেষ বেড়ে উঠল। অত্যন্ত হীন মনে হল। এ সমাজে দেহ বিকানো দিয়ে ভাল মন্দ বিচার হয় না। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার দিয়ে সেটা যাচাই হয়।

কিসের এত অহঙ্কার তার? নিমির মত রূপ নেই তার। গুণ? থাকলেও তার পরিচয় পাওয়া যায় নি। এখন তো মদ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। বাড়ি এবং পাড়ার প্রায় সব মেয়ের সঙ্গেই ঝগড়া। ঘরে লোক এলে নাকি দুর্ব্যবহার করে। গলা ফাটিয়ে মুখ খারাপ করে। সুবালার মাতলামি নাকি পাড়ার সকলের আলোচ্য। লোকে বলে রাজুবালার মত ডাকসাঁইটে বাড়িওয়ালীর ভীমরতি না হ'লে, কবেই ওকে তাড়িয়ে দিত। একটা মেয়ের জন্য গোটা বাড়ির দুর্নাম। ব্যবসায় ক্ষতি। কিন্তু আশ্চর্য! রাজুবালার শাণিত শাসন সুবালার বেলায় যেন কেমন ভোঁতা। কেন? বাড়ির মেয়েদের বেচাল দেখলে রাজুবালা নিষ্ঠুরের মত প্রহার পর্যন্ত করে। সুবালার বেলায় তার নিশ্চুপ অসহায় ভাব অন্য মেয়েদের বিক্ষুব্ধ করে। বিদ্বেষ বাড়ায়। এ কথা রাজুবালার চেয়ে আর কে বেশী জানে।

জেনেও সে অন্য মেয়েদের পরোয়া করে না, এইটি আশ্চর্য। কারণ রাজুবালা ডাকসাঁইটে বাড়িওয়ালী বটে। কিন্তু তার দেহোপজীবিনী-জীবনের শেষ বয়সের পারানি কোনো একটি মেয়ের হাতে নয়। তার নির্ভরতা সকলের ওপর। রাজুবালার নাম করা হাটে নিজেকে বিকিয়ে খাজনা দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো সম্পর্ক নেই। বাড়িওয়ালীর হাতে আইন নেই।

তবে? রাজুবালার থেকেও আর একটি বড় শক্তি তা হলে আছে সুবালার মধ্যে। আর সুবালার শক্তি, সে কখনো শুভ শক্তি নয়। পাপের। যে-শক্তি রাজুবালাকে তার শেষ বয়সে ভয় ধরিয়েছে। অভয় যেন দিব্য চো

দেখতে পেল, কুটিল খপিস হিংস্র শক্তির সামনে রাজুবালা নিয়ত সন্তর্পণে চলেছে পা টিপে টিপে।

সুবালাকে সে দেখল অজানা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক সয়তানের প্রতিমূর্তি। যার জেদ ক্ষমতা হিংস্রতা উচ্ছৃঙ্খলতা কোনো বারণ মানে না। কাউকে মানে না।

আরো লক্ষ্যণীয়, ভামিনী খুড়ি একবারও সুবালার নাম করেনি তার কাছে। অথচ সুবালার প্রতি তার কত টান, কত ভাব ভালবাসা ছিল।

ঘৃণার মধ্যেও বিবাগী হয়ে উঠল অভয়। সে কেন ভাবে সুবালার কথা। তার সামনের জীবনে, তার চলার পথে সুবালা কোনো তুচ্ছতার মধ্যেও পড়বে না। নিমিকে সুবালা হিংসা করত, সেকথা মনে রাখলেও নিমিকে আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

তার চেয়ে সুরু হোক জীবন। এই তো, আর এক বেশে নিমি তার কাছে রয়েছে। তার ছেলে। নিমির প্রতিমূর্তি। আঃ! ও যদি মেয়ে হত? যাকে যুবতী দেখেছিল, সেই নিমির শৈশব দেখতে পেত অভয়। নিজের হাতে মানুষ করত। বড় করত। তারপর একদিন বিয়ের কথা উঠত। তখন আসত এই অভয়েরই মত কেউ। যার হৃদয়ের অধীশ্বরী হত অভয়ের মেয়ে।

সহসা বুকে বড় ঘা লাগে। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। না, তেমন নয়। তেমনটি নয়, যেমন ক'রে নিমি জেদ ক'রে কেঁদে মাথা কুটে মরেছে। অমন ক'রে মরতে শেখাতো না অভয়। যে-ঘরের মালিকানার চাবিকাটি মেয়ের হাতে থাকত, সেই ঘরটিতে একটু উঁকি দিতে শেখাত। যদি অধীশ্বরী, তবে সেই বশম্বদের মন চেনার উদার দায়টুকু বোঝাত। নইলে আর একজনকে অভয়ের মত, সুরুতেই, অকারণ অপরাধের দায়ে চমকে অপ্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হত।

কারণ, এ বাড়িতে রোদ-বাতাস পরস্পর মাখামাখি ক'রে যখন নিঃশব্দ ঘোর দুপুরগুলি উতলা হ'য়ে ওঠে, ঝিঁঝিঁ ডাকা'র সাড়া দিয়ে অন্ধকার নামে কিংবা উঠোনের শজনে গাছের ওপারে।

মালীপাড়া বস্তির চালা ডিঙিয়ে কপালে চাঁদের টিপ পরে আকাশ রহস্য ক'রে হাসে, তখন সেই ক্ষুব্ধ আশাহত বিস্মিত গলার ফিসফিস শব্দ এখনো শোনা যায়। 'আমাকে একটু ভালবাসনিক?...একটু ভালবাসনিক।'

এ কি আশ্চর্য অপরাধে এমন অসহায় মূঢ় ক'রে রেখে গেছে নিমি! তখন মনে হয়, দু'হাত বাড়ালে বুঝি নিমিকে ধরা যায়। ধরে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তোমার ভালবাসার রীতি কেমন? সে রীতি কেমন?

শব্দ শোনা যায়। কিন্তু শূন্যতা ঘোচে না। শূন্যতাটুকু শুধু এক বিচিত্র ব্যাকুলতায় আবর্তিত হতে থাকে।

তখন ছেলেকে বুকের কাছে নিয়ে, মুখটি ধরে দেখতে ইচ্ছে করে। না-ই-বা হল মেয়ে। এ ছেলেও নিমি-ই। বসানো নিমির মুখ। নিমির চোখ, নিমির ঠোঁট। এখনই ওর কচি গলার স্বরে, নিমির স্বর চেনা যায়। দুর্জয় রাগ, বর্বরের মত পা দাপানি, আর ঠোঁট ফুলিয়ে মাথা দোলানি দেখলেই চেনা যায়, ও নিমির ছেলে।

অভয়ের সঙ্গে অপরিচয়ের আড়ষ্টতা গেছে। ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ভামিনী স্বরীন গিনি ছাড়িয়ে, তার জগৎ আর একটি মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। যে-মানুষটির বিশাল কালো চেহারাটিকে ক্ষুদ্র জীবটি একটুও ভয় করে না আর। বরং অনেক বেশী আধিপত্য খাটায়। কারণ, কেমন করে যেন ও বুঝেছে, ওই বিরাট দেহ শুধু ওর চটকানো ধামসানোতে ধন্য হবার জন্যই আছে। কেমন ক'রে যেন টের পেয়েছে, ওর রাগ সামলে আদর করার জন্য, ওর মনস্তুষ্টির জন্যই বিরাটকায় অভয় বুভুক্ষুর মত হাত বাড়িয়ে আছে। থাকতেও হবে। না থাকলে কুরুক্ষেত্র। তখন দেখা দেবে দুর্জয় অভিমান। ওইটুকু শিশু, কোনো ছলাকলা ওর আবত্তে নেই। কিন্তু এমন ক'রে, উপুড় হয়ে মুখ গুঁজবে মাটিতে, দেহের সব শক্তি দিয়ে এমন শক্ত হয়ে থাকবে আর জেদ করে ফুলে ফুলে কাঁদবে, তখন ওকে চিনতে একটুও কষ্ট হয় না।

ভামিনী খুড়ি অসহায় রাগে তখন অবুঝ ছেলেকে তার মায়ের খোটা দেয়, মায়ের ছাঁচ নয় খালি, গুণও গিজগিজ করছে ছেলের।

শিশু কী বোঝে কে জানে। মুখের দিকে তাকিয়ে সে-কথা শোনে। শুনে, হাত দিয়ে মাটি খামচে দিয়ে কচি গলায় গর্জন করে, ভগ্‌দা! ভগ্‌দা!...

ওই শব্দের অর্থ কী, কে জানে। কিন্তু সেটা যে প্রতিবাদসূচক, তাতে সন্দেহ নেই।

ভামিনী খুড়ি বলে, দেখ, দেখ, দেখেছ?

অভয়ের বুকের মধ্যে, ব্যথা ও আনন্দের এক উত্তাল

ঢেউ ওঠে। ভাবে, এইটা ওর রীতি। দশ মাস ধরে মাতৃগর্ভে প্রতিটি রক্ত বিন্দুর সঙ্গে এই রীতি ও সঞ্চয় করেছে। অভয় বুকে তুলে নেয় শিশুকে। ও শান্ত হয়। তখন শিশুর রীতিগুলির অন্তর্নিহিত প্রকাশ পেতে থাকে। ওর মান ভাঙে। যে-বিষয়ে তার সবচেয়ে আপত্তি ছিল, সেটাই নিজে নিজে ক'রে দেখাবে। তার পশ্চাতে চলতে হবে। তখন সে হবে গোলামের গোলাম, অতি বশম্বদ। যেটা খেতে আপত্তি ছিল, সেটাই হেসে খাবে। ঘুম না পেলেও তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে পড়ে থাকবে।

আসলে এ শিশু ভালোবাসার দাস। এ দাসত্ব ওর নিজের রীতি অনুযায়ী। ভবিষ্যতে এটা কতখানি বদলাবে, কি অপেক্ষা করে আছে এ ছেলের জীবনে কে জানে। আপাতত এ ছেলে-নিমি অনেকখানি। অনেক বড় আশ্রয়।

অভয় বলেছে, খুড়ি এ ছেলের নাম হবে নিরমল।

নামটা নানানভাবে শোনা থাকলেও, এ ক্ষেত্রে ভামিনী না জিজ্ঞেস করে পারে না।

কেন, এটা কি নাম?

কোনো ঠাকুর দেবতার নাম কি না, সেটাই ভামিনীর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা।

—এটা? এটা হল তোমার একটা ভাল নাম। মানে যাতে ময়লা নেইকো। পবিত্র।

ভামিনীর কুঞ্চিত কপালের রেখায় একটি স্মৃতি হাতড়ানো জাল কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঠোঁট টিপে এক মুহূর্ত ভেবে বলে, হ্যাঁ, ওর মা'র নামও তো নিরমলা ছিল। তা' অতবড় নাম আর কে ডাকবে। সবাই নিমি নিমি করত।

একটি দীর্ঘশ্বাসের ঢেউয়ে, পুরনো স্মৃতির জোয়ারে অকস্মাৎ টাবুটুবু হয়ে ডুবে যায় ভামিনী। দৃষ্টি হারিয়ে যায় শূন্যে।

অভয় জিজ্ঞেস করে, কী হল খুড়ি?

ভামিনীর স্বর শোনা যায় অনেক বছরের পিছন থেকে, নিমির নামের কথা মনে পড়ছে। তোমার কথা শুনে মনে পড়ছে। গঙ্গার ওপার থেকে এক হাড়জ্বালানে বামুন আসত এ পাড়ায়। শৈলদিদি তো মেয়ে পেয়ে যেন চাঁদ হাতে পেয়েছিল। তবে, লোকে ভুল করেছিল। জান তো বাবা, এ মালীপাড়াতে শরীলবেচুনী মেয়েমানুষের কলঙ্ক আছে পেটের ছেলে নাকি খুন করে ফেলে। তা' সে তো মিছে নয়। নিজের ছেলে, কোল থেকে পাশে ফেলে দিয়েছে, এমনও হয়েছে। সদ্য জন্মানো ছেলে, বাঁচেনি। লোকে শুনেছে কোল থেকে পড়ে মরেছে।

অভয় শিউরে উঠে বলে, কেন খুড়ি?

—এমনিই তো জীবনটা অভয়। ছেলে দিয়ে কী হবে। পুষে, শত্তুর তৈয়ের করা। বড় হয়ে দশটা কথা বলবে। কাছে থেকে মাতাল হবে কি বদমাইস হবে, ডাকাত হবে কি চোর হবে কে জানে? আর আখের? তাতেও কোনো কাজ দেবে না ছেলে। এখানে একটি মেয়ে থাকলেই সব চেয়ে বড় আখের। ডাকঘরে জমা রাখা টাকার মতন। মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে সময়মত কাজে লাগালেই হল। সব সময় চোখে চোখে থাকবে। এখানে তাই মেয়ের কদর বেশী।

অভয় চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

ভামিনী বলে, এখন দিন কাল বদলেছে। সবই যেন খোলাখুলি। লোকে পাপ করে। বে-আইনি কাজ করে। তাও খোলাখুলি। ছেলে বিক্রী আইনে নেই। তা দেখগে, হাসপাতালে, হাতে হাতেই ছেলে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এখন আর মেরে ফেলে না বড় একটা। বিশ পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে বরং ফিরে আসে। কিন্তু মেয়ে কেউ বেচবে না এ লাইনে। তাই বলছিলুম, শৈলদিদিকে সকলে ভুল বুঝেছেন। ভেবেছেল, অমন একটি টুকটুকে মেয়ে, বড় জবর আখের পেয়ে শৈলবালার খুশী আর ধরে না। লোকে যে কত মিছিমিছি জিনিস ভাবে। শৈলদিদি মেয়েকে মালীপাড়ার ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইত না। যা চেয়েছেল, তাই করে গেছল। মুখে ভাতের দিনে, সেও শৈলদিদি ঘটা করেই করেছেল, শৈলদিদির তখনকার বর নাম রেখেছেল, নিরমলা। ওপারের সেই বামুনটাকে শৈলদিদি পাকা খাবার খাইয়েছেল। মিনসেটা বিটকেল হেসে বলেছেল, খাসা নাম রেখেছ শৈল। তোমার মেয়ের নাম নিরমলা হবে না তো আর কার মেয়ের নাম হবে? বড় হলে, মালীপাড়ায় এ মেয়ে নামের মজ্জাদা রাখবে বটে।' মিনসের হাসিটা খারাপ লেগেছেল, কথাগুলোনের মানে বুঝতে

পারিনিক। তোমার কথায় আজ বুঝতে পারলুম, মিনসে ঠাট্টা করেছেল। করলে কী হবে। বামুনের কথা মিথ্যে হয়েছে।

বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলে ভামিনী, বেশ নাম রেখেছো অভয়। ওটাকে এবার থেকে আমি নিমে বলে ডাকব।

—নিমে বলে ডাকবে ?

অভয় অস্বাভাবিক গলায় হেসে ওঠে।

নাঃ, সুবালার কথা মনে পড়ে লাভ কি? সে ভেসে যাক তার আপন স্রোতে। তাকে ঘৃণা করে অষ্টপ্রহর নিজের বুকে কাঁটা জাগিয়ে রেখে শুধু নিজেকে ছোট করা। বিশ্বসংসারে ঘৃণা করবার মত কত বড় পাপ এবং অনিয়ম মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সুবালাকে সে তার মনের কোনো তুচ্ছতার মধ্যেই রাখবে না।

জীবনের টানা পোড়েনে তার বৃহৎ জগৎ রয়েছে বাইরে। যেখানে তার শত শত বন্ধু, অনাথ, গণেশবাবুরা রয়েছেন। গানের জন্য ডাক আসবে তার। কত বড় কাজ বাকী। এখানে রয়েছে প্রতিবেশীরা। খুড়ো খুড়ি আর নির্মল নিমে।

আর দেরী নয়। আর অনিশ্চিত ধান্ধা নয়। নিশ্চিত পদক্ষেপে প্রত্যক্ষ কিছু চাই। সুরীন কাকার ঘাড় থেকে নামাটা সবার আগে দরকার। পুরুষের ওটা সবচেয়ে বড় লজ্জা।

তাই হাতের কাছে যেটা সবচেয়ে সহজ, সেটাই তুলে নিল অভয়। সে দোকান খুলে বসল। মালীপাড়ার অভ্যন্তরে। বারোবাসরের তল্লাটে নয়। বিপরীত দিকে, মালীপাড়ার গৃহস্থ অংশের রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়ে, জুমুখী হয়েছে গঙ্গার ঘাট ও বাজারের দিকে, সেখানেই ঘর পাওয়া গেল।

অল্প-স্বল্প জিনিসপত্র এনে মুদীদোকান খোলা হল। পূজো পার্বণের কোনো ত্রুটি রইল না। দিন ক্ষণ ফাঁকি গেল না ভামিনীর চোখ থেকে। আর অভয়ের মনে হল, এ দোকানটি খুলে বসার জন্যই সে যেন একদিন মুখিয়ে ছিল। তার অত্যোৎসাহে বাকী সকলের উৎসাহ চাপা প'ড়ে গেল প্রায়।

কেবল নবপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধিদাতাই, বোধহয় তার শুঁড় বাঁকাল। ভ্রূ কোঁচকালো। ছোট ছোট চোখে অদ্ভুত হেসে বসে রইল টাটে।

জীবনচৌধুরীও হাসলেন। বললেন, তা' মন্দ করনি। দেখি, কে টানে আর কার টান বেশী ?

কথাটা অভয় বুঝল না। কিন্তু এটা বুঝল, অনাথ খুড়োর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে।　　　　ক্রমশঃ

প্রার্থনা

শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেন

জীবনদেবতা, কোথা তুমি আজ,
　কোথা সে আশার বাণী ?
অমৃতের পথ-যাত্রী—আমাকে
　বিপথে ফেলিছে টানি।

তুমি থেকো মোর হৃদয় ভরিয়া
　নব সংসার মাঝে,
তোমার অমিয়-আশিস-সুধায়
　নির্ভয় হ'বো কাজে।

তোমার বাণীর তড়িৎ প্রভাবে
　সত্যেরে ল'বো চিনে,
সহনশীলতা প্রীতির পরশে
　সবাকেই ল'বো জিনে।

অতীতের সব স্মৃতি জোগাইবে
　সব কাজে উৎসাহ ;
মধুর বিধুর হইয়া উঠিবে
　না রহিবে আর দাহ।

শতদলসম বিকশিত হবে
　পরাণকোরক মম,
তুমি প্রকাশিবে আমার জীবনে
　ওগো অন্তরতম।



অতীতের গ্রহসম্মেলনের ইতিহাস

উপাধ্যায়

ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা আর গবেষণা করে যাঁরা জীবন কাটিয়ে দিলেন তাঁদের অনেকেই জানেন যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল বেলা ৩টা ১৩ মিনিটের সময় মীন রাশিতে সাতটী গ্রহের সঞ্চার হয়। পাশ্চাত্য-মতে প্লুটো অর্থাৎ রুদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করলে আটটী গ্রহের সমাবেশ হয়েছিল বলা যেতে পারে। মীন রাশিটী অবশ্য অশুভ নয়। আগামী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কেতুকে নিয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারী ভোর পাঁচটায় মকর রাশিতে অষ্টগ্রহ কূট সুরু হবে। উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই তিনটী নক্ষত্র গ্রহণের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। রাহু কর্কটে অবস্থিত হয়ে এদের ওপর পূর্ণদৃষ্টি দেবে। মকর রাশি শুভ নয়—এটী শনির ক্ষেত্র। ১৯৬২ সাল ভবিষ্যতের গর্ভে—এই সালে গ্রহগণের তাণ্ডব নৃত্য আর পৃথিবীর বুকে নটরাজের প্রলয় নাচনের কথা বিশ্বের অধিকাংশ জ্যোতিষী বলেছেন। কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বিশ্বের সঙ্কট দুর্যোগ সম্পর্কে সকলে একমত।

'আমেরিকান এষ্ট্রোলজি' পত্রিকার বিগত জুলাই সংখ্যায় মার্কিণ জ্যোতিষী মিষ্টার সিরিল ফেগান বিগত শতাব্দীর গোড়ার পাতাখানি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি কিছুটা আশ্বাস বাণী দিয়েছেন বটে কিন্তু গোড়ায় গলদ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রহগণের উপরোক্ত ভাবে সঞ্চারের ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয় নি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে কোন ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়নি (যা মীনরাশির কারকত্বানুসারে হওয়া উচিত ছিল) সে হেতু আগামী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেও পৃথিবীতে একটা আঁচড়ও লাগবে না। যে কোন রাশিতে এরূপ গ্রহগণের সঞ্চারে একত্র সম্মেলন হোলেই যে জলপ্লাবন হবে আর কোন না কোন ভূখণ্ড সমুদ্রের ভেতর প্রবেশ করবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিষ্টার ফেগানের মত জ্যোতিষীর কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারিনে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের গ্রহসমাবেশ মীনরাশিতে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে হওয়ায় পৃথিবীর নানা উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কোন উন্নয়নের লক্ষণ দেখি না বরং দেখি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে বহুলোকের পলায়ন।

মীন রাশি কালচক্রের অপোক্লিম স্থান। রাশিটী উভয়োদয়। দ্বাদশস্থানে গ্রহরা থেকে দ্রুত ও সাংঘাতিক কিছু ঘটনা ঘটায় না। এখানে গ্রহরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে মাত্র। অপর পক্ষে মকররাশি চর ও দশমস্থান। সুতরাং মকরে গ্রহগণের সঞ্চারজনিত সমাবেশ অত্যন্ত অশুভপ্রদ ও সাংঘাতিক হোতে বাধ্য। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সাংঘাতিক ঘটনা কিছু না ঘটাতে মিষ্টার ফেগানের মত জ্যোতিষীর হতবাক্ হবার কোন কারণই নেই।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে নৈসর্গিক শুভগ্রহগুলি বেশ জোরালো ছিল। বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে, শুক্র তুঙ্গস্থ আর বৃহস্পতির সঙ্গে যেটি সমান্তরাল অবস্থায় ছিল। বুধ নীচস্থ থাকলেও পূর্ণ নীচভঙ্গ হেতু শক্তি সম্পন্ন ছিল। পাপগ্রহেরা ছিল দুর্ব্বল, শনি পরাজিত আর মঙ্গল নিজরাশি মেষ থেকে দ্বাদশে থাকায় শক্তিহীন ছিল। কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পাপগ্রহেরাই সবল হবে। শনি স্বক্ষেত্রে আর মঙ্গল তুঙ্গস্থ থাকবে। শুভগ্রহরা দুর্ব্বল হবে। বৃহস্পতি হবে নীচস্থ আর অন্যান্য শুভগ্রহেরা হবে পরাজিত। এর দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে ফেগানের মতবাদ কার্য্যকরী নয়, কেননা ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাশি ও গ্রহদের শুভাবস্থাই তদানীন্তন কালের শুভ ঘটনাগুলিকে সক্রিয় করেছিল কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রাশি ও গ্রহদের অশুভ অবস্থান আর সংযোগ অশুভ ঘটনাগুলিকে সক্রিয় করে তুলবে তীব্রভাবে। তথাকথিত সভ্য শিক্ষিত নর-পশুদের ধ্বংসের সঙ্গে ঘটনাগুলির সমাবেশ হবে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাহু বা কেতু দলের মধ্যে ছিল না ফলে গ্রহ সম্মেলনের পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক হোতে পারেনি কোন মতেই কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রাহু সমগ্র দলটার ওপর পূর্ণদৃষ্টি দেবে আর সূর্য্যগ্রহণ ঘটাবে। প্রাচীনকাল থেকে জ্যোতিষীরা এরূপ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে অশুভ ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত সময়ে অমাবস্যা ছিল না।

রাহু ঘটনাগুলির অশুভত্ব অবশ্যই বৃদ্ধি করে তুলবে। বিশিষ্টগ্রহ-

গুলির সহাবস্থানফলে কতকগুলি ঘটনার জের বিশ বছর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে সমর-বিধ্বস্ত ইউরোপে শান্তি আসে। সাড়ে পাঁচবছর আগে পর্য্যন্ত নেপোলিয়নের আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক নীতি ইউরোপের সর্ব্বনাশ সাধন করে এসেছে। শান্তি ও সৌভাগ্যের নব যুগের সূচনা হোলো এ সময় থেকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ১৮২১ খৃঃাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ে তাঁর যুগপ্রবর্ত্তক পরীক্ষা সুরু করেছিলেন। আট বছর পরে তা উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল। ফ্যারাডের তদানীন্তন আকস্মিক আবিষ্কার সম্ভব না হোলে আমাদের সভ্যতার রূপ অপূর্ব্ব হয়ে উঠতে পারতো না। এই অন্যতম গুরুতর আবিষ্কারটিকে রাজনৈতিক জুয়াড়ীরা মানবজাতির উচ্ছেদ ও ধ্বংস সাধনে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেননি। এই বছরে বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রখ্যাত আবিষ্কারক ষ্টিফেনসন পৃথিবীতে প্রথম প্রকাশ্যভাবে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। যাত্রীও মাল নিয়ে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রথম ট্রেণ চলাচল সুরু হয়। হিটলার, ষ্ট্যালিন, মাও প্রভৃতি ব্যক্তির সমবেত নৃশংসতায় যে ধ্বংস সাধিত হয়েছে, তার বহু গুণ মানব জীবনরক্ষায়, যে মানুষটি গবেষণার দ্বারা ঔষধ আবিষ্কার করে পৃথিবীকে চিরঋণী করে গেছেন সেই মহামতি লুই পাস্তুর ঐ বছরে জন্মগ্রহণ করেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেল এসময়ে গৌরবের উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন আর তিনি তাঁর দর্শনের চিন্তাধারার পরিশিষ্টগুলিকে একত্র করে পৃথিবীকে আর একবার বিস্মিত করবার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁরই চিন্তাধারার শেষের দিকের সূত্রগুলিই কার্ল মার্কসকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছিল,—শুধু তাই নয়, নাৎসিরা পর্য্যন্ত হেগেলের মতবাদ সাদরে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। বৃহস্পতি এবং শুক্রের শুভ মীন রাশিতে একত্র সমাবেশই সঙ্গীত ও কাব্য জগতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও শোভা এনে দিয়েছিল। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীত ও কাব্যজগতের নারকীয় দুর্দ্দশার অভিব্যক্তি তথাকথিত উদ্ভট প্রগতিবাহক বেতার কেন্দ্র থেকে শ্রোতাদের কর্ণ উৎপীড়িত করে তুলবে যার সূচনা কালসর্প যোগ প্রভাবে এখন থেকেই সুরু হয়েছে'।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্যুবার্ট, মেনডেলসোন্‌ম প্রভৃতি জার্ম্মাণ গীতিকারদের সমুজ্জ্বল প্রতিভা অত্যন্ত স্ফুরিত হয়েছিল। বধির বেঠোফেন তাঁর শেষ সোনাটা আর সিম্ফনি রচনা করে চলেছিলেন। তখন কাব্যজগতে রোমাণ্টিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে, পরবর্ত্তীকালে বছর দশকের ভেতর ফ্রান্সে লামার্টিন, মুসে, হুগো প্রভৃতির অনবদ্য গীতি কবিতার মাধুর্য্যে ভরপুর হয়ে উঠলো সমগ্র পৃথিবী। এসময়েই জার্ম্মানীতে গ্যয়েথে আর হাইন এলেন জ্যোতিষ্কের মত।

বোম্বাই অঞ্চলে স্যার জামসেদজী জিজিভাইয়ের বিরাট জনহিতকর কার্য্যগুলি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেও কেউ ভাবতে পারেনি ফ্যারাডের ছোট্ট খেলনাটী হবে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় শক্তির উৎস। অনুরূপ ভাবে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের গ্রহসমাবেশে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে মানুষ ভেবেই ঠিক করতে পারবে না কোনটা কতখানি নবযুগ প্রবর্ত্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। আগামী শতাব্দীর মানুষই করবে এর পর্য্যালোচনা যেমন আমরা করছি ফ্যারাডেকে নিয়ে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর গায়ে আঁচড় লাগেনি একথা সত্য নয়। মীনরাশিতে ইউরেনাস ও নেপচুনের স্কোয়ার দৃষ্টিতে দুটী পাপ গ্রহের অবস্থিতি হেতু পৌনঃপুনিক ভূমিকম্পযোগ ঘটেছে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে চারটি মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটেছিল, পরবর্ত্তী বৎসরে অনুরূপ ভাবে নয়বার ভূমিকম্প হয়ে বহুলোকের মৃত্যু ও ধন সম্পত্তির হানি হয়েছিল। এরপর পঁচিশ বছর ধরে এগারো বার মারাত্মক ভূমিকম্প পৃথিবীতে ঘটে গেছে, অবশ্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পন হয়নি।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতের এসময় থেকে নবযুগের জাগরণ সুরু হয়।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের সাংঘাতিক বৎসরের কথা ভেবে বহু পাশ্চাত্যবাসীর ধারণা হয়েছে আমেরিকার বৃহত্তম অংশটী সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। অনেকে এমন কথাও বলেছেন যুদ্ধ সুরু হোলে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতির বিলুপ্তি সাধন হবে। এরূপ নানা প্রকার আশঙ্কা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্তানায়ক ও জ্যোতিষীরা। কিন্তু আমাদের দেশের রাষ্ট্র চালকেরা পরমানন্দে কালাতিপাত করছেন। তাঁদের ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। তাঁরা ভারতবর্ষকে শস্ত্রোপচার কক্ষে এনেছেন। তাঁদের তালিম ঠুকছে কর্ত্তাভজার দল।

এদেশের পরিচালকদের শুধু আছে বৃহৎ পরিকল্পনা আর পৃথিবীর লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে টাকা ধার করা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিংহরাশিতে ছয়টী গ্রহের সমাবেশ হয়। এই রাশি রাজা ও সংগ্রামকারক। চার বছর ধরে চলেছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। ইটালীর গৃহযুদ্ধের কারণ এরূপ সংযোগে সম্ভব হয়েছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ধনুরাশিতে পাঁচটী গ্রহের সমাবেশের ফলে ভিক্টোরিয়া যুগের অবসান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কন্যারাশিতে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, চন্দ্র ও রাহুর একত্র সমাবেশে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সমগ্র ভারত জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে মকরে সাতটী গ্রহ একত্র হয়েছিল, রাহু ছিল সন্ধিস্থ। এসময়ে উত্তর ভারত আর নেপালের বৃহত্তর অংশ বিহার ভূমিকম্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কর্কটরাশিতে পাঁচটী গ্রহের সমাবেশ হয়েছিল, বৃহস্পতি ব্যতীত সবগ্রহই ৯০ ডিগ্রির মধ্যে ছিল, শনি ও মঙ্গল ছিল ১২ ডিগ্রি মধ্যে। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া অবস্থা হয় আর স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। এই সুযোগে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ১১ই অক্টোবর তারিখে ছয়টী গ্রহের একত্র সমাবেশ হয় কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ ব্যাপারে জড়িত ছিলনা। যাহোক অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আগামী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত গ্রহই রাহু ও কেতু দ্বারা পীড়িত হয়ে যে বলিষ্ঠ কালসর্প যোগকে সুদৃঢ় করবে তার পরিণতি হয়ে উঠবে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে শোকাবহ

সে সময়ে আটটী গ্রহের একত্র সমাবেশের মধ্যে তুঙ্গস্থ মঙ্গল বিশেষ প্রবল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। শনির সঙ্গে সহাবস্থান এখানে গুরুত্ব-ব্যঞ্জক। এবৎসরে ইংলণ্ড ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেরূপ ভীষণ শীত পড়্‌বে তেম্নি গ্রীষ্মের প্রখরতা বৃদ্ধি পাবে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচন বাধ্য হয়েই স্থগিত রাখ্‌তে হবে। চৈনিকভীতি ও আক্রমণ ভারতবর্ষকে উৎপীড়িত করে তুল্‌বে। চীনের সাম্রাজ্যবাদ নীতির কবলে পড়ে ভারতবর্ষ সঙ্কটাপন্ন হবে।

মকর স্ত্রীরাশি। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ অশুভ হবে। এই রাশিতে সূর্য্য গ্রহণহেতু মৎস্য কুলের ধ্বংস, মন্ত্রীগণের ও তাঁদের পরিবার-বর্গের সংহার, সরকারী দপ্তরের উপরওয়ালারা নিম্নশ্রেণীর লোক ও যোদ্ধৃগণের অনেকেরই জীবন হানি হবে। ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগগুলি ঘটবে। পৃথিবীর চরম সঙ্কট অবস্থা হবে ১৯৬২ সালের জুন জুলাইকে ঘিরে। চিরদিনের জন্যে কমিউনিষ্ট শাসনের কাঠামোর পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। কমিউনিজমের সমাধিক্ষেত্র রচিত হবে।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে সবচেয়ে ভালো ফল। অশ্বিনী বা ভরণী নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে কিছু নিকৃষ্ট ফল। এমাসে মেষরাশি জাতগণ মিশ্রফল পাবে। সাফল্য, সুখ, লাভ, বিলাসিতা, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সৌভাগ্য, আয়বৃদ্ধি, পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, বন্ধু স্বজন মিলন, খ্যাতি ও সম্মান, শুভঘটনা, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি সূচিত হয়। শত্রু পীড়া, ক্লেশ প্রদ ভ্রমণ, বন্ধুস্বজন বিয়োগ, দুঃখকষ্ট, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ক্ষতি, লোভ, বাধাবিপত্তি আর সর্ব্ববিষয়ে বিঘ্ন, শারীরিক অসুস্থতা, কলহ বিবাদ, অসৎ সংসর্গ প্রভৃতিও সম্ভব হবে। স্বাস্থ্যো-ন্নতি আশা করা যায়। উদর ও প্রস্রাবের পীড়া আর রক্তের চাপবৃদ্ধিতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের পথ্য সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সন্তানদের শারীরিক অসুস্থতা যোগ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভালো, সামান্য কলহ বিবাদ ঘট্‌তে পারে মাত্র। স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে সদ্ভাবের অভাব। সাধারণ আর্থিক অবস্থার উন্নতি, আয়বৃদ্ধি সাফল্য যোগ। উত্তরাধিকার সূত্রে ধন সম্পত্তিলাভ। সাহিত্য বা গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে হার হবে। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ। কর্ম্মদক্ষতার জন্যে পদোন্নতি বা নূতন পদে অধিষ্ঠান। এমন কি যশ ও সম্মান লাভ হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপরওয়ালার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। নানা প্রকার বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষের দিকে স্ত্রীলোকের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ তদ্ভিন্ন মাসটী মোটামুটি ভালো। সামাজিক, প্রণয় ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। অবিবাহিতাগণের মধ্যে অনেকেরই বিবাহ হবার যোগ আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম সময়। মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে অধম। রোহিনী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। বেশীর ভাগ গ্রহই অশুভ অবস্থায় আছে। সুতরাং অশুভফলেরই আধিক্য। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, গৃহ-বিবাদ, মানসিক অপকর্ষ, উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য, ক্ষতি, অপমান, দুর্ঘটনা, দুঃখবেদনা, অসৎসংসর্গ, স্বজন ও শত্রু দ্বারা পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থলাভ, সম্পত্তিসুখ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা জনপ্রিয়তা প্রভৃতি শুভ ফলের আশা করা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধে শরীর তেমন খারাপ না হোলেও শেষার্দ্ধে অসুস্থতার সম্ভাবনা। হজমের গোলমাল হবে। প্রস্রাবের দোষ ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা আশা করা যায়। আয় ও কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি। ব্যয়াধিক্য ঘটবে। সাফল্য আর ব্যর্থতা, লাভ আর ক্ষতি দুই-ই ঘট্‌বে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালো নয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি এক প্রকার যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ সতর্কের সঙ্গে করা দরকার। অবৈধপ্রণয়ের পক্ষে বিপত্তির কারণ আছে। আমোদ প্রমোদ, নাচগান, পার্টি, সামাজিক সংসর্গ প্রভৃতি এমাসে বর্জ্জন করলেই ভালো হয়। নূতন ভাবে বন্ধুত্ব করা কারো সঙ্গে চল্‌বে না। পারিবারিক ক্ষেত্র উত্তম বলা যায় না। রেস খেল্‌লেই হার হ'বে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিদ্যা-র্থীর পক্ষে অশুভ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা নিগ্রহভোগ, উদ্বেগ ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুঃখ, স্বজন বিচ্ছেদ, কর্ম্মে বাধা, শারীরিক কষ্ট, কলহ ও অপমান, পদ-মর্য্যাদার ক্ষতি, মামলায় পরাজয়, মনোমালিন্য ইত্যাদি সূচিত হয়। মাসের মধ্যম সময়টী বিশেষ ভাবে ভালো। প্রথমার্দ্ধে নিজের ও সন্তান-সন্ততি-দের স্বাস্থ্যহানি ও পীড়া, নানাপ্রকারে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার যোগ। বায়ু-পিত্ত ও রক্ত ঘটিত পীড়ার কষ্ট। স্বজন ও বন্ধুবর্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ। স্ত্রীর সহিত কলহ বিবাদ। অর্থসঙ্কট। ব্যয়াধিক্য ও ক্ষতি। স্ত্রী-লোকের জন্যে ব্যয় ও অর্থক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। গভর্ণমেণ্ট বা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অসন্তোষ উৎপাদন জনিত অশুভজনক পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ। আয় হ্রাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন কার্য্যেই সুযোগ

সুবিধা বা সাফল্য লাভ হবে না। কোন প্রকার দুঃসংবাদ প্রাপ্তির যোগ আছে। কোন পত্রে মারাত্মক ঘটনার কথা উল্লিখিত থাকবে। শিক্ষাও সুবিধাজনক হবে না। অপবাদ ও মিথ্যা গুজবে আক্রান্ত হ'বার যোগ। প্রণয় ক্ষেত্রটী আনন্দপ্রদ নয়, ভীতিজনক হয়ে উঠ্‌বে। সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্ভোগ ও অখ্যাতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাতগণের পক্ষে উত্তম, এর পরেই অশ্লেষাজাতদের অবস্থা। পুনর্বসুজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। অশুভ ঘটনাগুলিই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠ্‌বে। নানাপ্রকার কষ্টভোগ, দুশ্চিন্তা, বন্ধুস্বজন বিরোধ, স্ত্রীলোকের নিগ্রহভোগ, স্বাস্থ্যের অবনতি, অসম্মান ও অপবাদ যোগ আছে। শত্রুজয়, লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও নানা প্রকার সুযোগও আসবে। স্বাস্থ্য, মোটামুটি যাবে। দ্বাদশে মঙ্গল পিত্তপ্রকোপ ও চক্ষু-পীড়াকারক হবে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হবে। ঘরের বাহিরেও কলহ বিবাদ চল্‌বে। আর্থিক সচ্ছলতা। তবু ব্যয়ের প্রকোপ হ্রাস পাবে না। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলা বর্জ্জনীয়। রেসে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে দুঃসময়। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ ভালো বলা যায় না। নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও উপদ্রব। এতদ্‌সত্ত্বেও মাসের শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার ফলে পদোন্নতি ঘটতে পারে। গ্রন্থপ্রকাশক ও বিজ্ঞাপনদাতারা লাভবান হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। প্রণয় ও কোর্টসিপের পক্ষে মাসটী ভালো নয়। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তির কারণ আছে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্র মোটামুটি মন্দ নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্‌গুনীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। মঘা ও পূর্ব্বফল্‌গুনীর পক্ষে মধ্যম। মাসটী সকলের পক্ষে মিশ্রফলদাতা। সুখ, উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রু জয়, উত্তম বন্ধুলাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, গুরুজনের প্রীতি উৎপাদন প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে দেখা যায়। স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত মনোমালিন্য, ক্ষতি, স্বজনবিয়োগ, মামলা মকর্দ্দমা ও নানা অসুবিধা ভোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কোন ব্যক্তির সহিত কলহ বর্জ্জনীয়। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালো যাবে। সন্তান-সন্ততির পীড়াদিযোগ। পারিবারিক শান্তি ও উৎসব। বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। ব্যয় বৃদ্ধি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য—উপরওয়ালার প্রীতিলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ। যে কোন কার্য্যে সাফল্যলাভ। চাকুরির জন্যে যে সব মহিলা চেষ্টা করেছেন তাঁদের পক্ষে পাওয়ার যোগ আছে। সামাজিক, প্রণয়ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও সন্তোষজনক পরিস্থিতি। অবৈধ প্রণয়ে ও আনন্দলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট, হস্তাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটা সকলের পক্ষে মিশ্রফলদাতা, অশুভফলগুলিই বিশেষভাবে দেখা দেবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধেই কিছু ভালো। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা ও সংশয়, স্বজন বিরোধ, কর্ম্মে ব্যর্থতা, অপমান ও অহেতুক অপবাদ, জিনিষ পত্র হারানো, ক্ষতি বা চুরি যাওয়ার ভয় আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও শত্রুজয়। স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ। মানসিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। ছোটখাটো দুর্ঘটনা বা আঘাত আর ভ্রমণে বিপত্তি। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা লাভ। গ্রন্থ প্রকাশে, নানাপ্রকার ব্যবসায়ে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আর্থিকোন্নতি। টাকা লগ্নীতে আশঙ্কা আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীরা নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করবে। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। প্রথমদিকে অপবাদজনিত মানসিক কষ্ট ভোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কর্ম্মোন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম সময়। রেসে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ লিপি প্রাপ্তি, বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতি সূচিত হয়। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। পারিবারিক প্রণয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুভ পরিস্থিতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

স্বাতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রা ও বিশাখার পক্ষে মধ্যম সময়। মাসটী সকলের পক্ষেই শুভ অপেক্ষা অশুভ ভাগই বেশী। মর্য্যাদাহানি, কর্ম্মে বাধা, উদ্দেশ্যবিহীন ক্লান্তিপ্রদ ভ্রমণ, উদ্বেগ, স্বজন বিরোধ, অর্থক্ষতি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া প্রভৃতি যোগ আছে। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব, উপঢৌকন প্রাপ্তি, দান গ্রহণ, পারিবারিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। প্রভাব প্রতিপত্তি, বিলাসব্যসন। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি। যাদের পেটের গোলযোগ আছে অথবা ফুস্‌ ফুস্‌ বা হৃৎপ্রদেশে কষ্ট বোধ হয়, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য আর গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অবনতি ঘট্‌বে, ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে কষ্টভোগ। পাওনাদারের তাগাদার জন্যে বিব্রত হবে। ভ্রমণে বা প্রণয়ে বিপত্তি। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, রেসে হার। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হোলে পরাজয় অনিবার্য্য। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। অফিসের মধ্যে সতর্ক হয়ে চলা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটের উপর মাসটী মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো বলা যায় না। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বর্জ্জনীয়। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। অতিরিক্ত আহার, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিণতি অশুভজনক। পারি-

বারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার মধ্যম আর বিশাখার অধম। সাধারণভাবে দেখ্‌লে কারো পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য শুভ-ঘটনার সমাবেশ হবে না। উদ্বেগ, সন্তাপ, স্বজনবন্ধু বিরোধ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অপমান, ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতি সূচিত হয়। বিলাসব্যসন, সুখস্বচ্ছন্দতা, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্যলাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, অর্থাগম প্রভৃতি যোগ আছে। জ্বররোগে যারা প্রায়ই আক্রান্ত হয় তাদের সাবধানতা আবশ্যক। রক্তের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দৈহিক আঘাত। রক্তদুষ্টি প্রভৃতির আশঙ্কা করা যায়। লাভ ক্ষতি দুই ই হবে। দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দরকার। প্রতারণা, ঠগ্‌বাজি প্রভৃতি মাধ্যমে ক্ষতি। এ মাসে অপরের প্রতি আস্থা স্থাপনে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। যে পরিমাণে পরিশ্রম হবে তদনুপাতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখি না। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীরা বিশেষ লাভবান হবে না, বরং বহু ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হবে। বাড়ীর কেনা বেচায় সুযোগ সুবিধা ও লাভ ঘট্‌বে। চাকুরির ক্ষেত্রে মন্দের ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো। রেসে ও স্পেকুলেশনে কিঞ্চিৎ লাভ। অবৈধ প্রণয়ে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ সাফল্য লাভ কর্‌বে। পারিবারিক প্রণয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সন্তোষ-জনক পরিস্থিতি। পুরুষের সাহচর্য্যে কোন প্রকার ব্যবসায়ে যোগদান বিপত্তিজনক হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া জাত-গণের পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। বন্ধুবিচ্ছেদ, উদ্বেগ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আশঙ্কা, ক্ষতি, কর্ম্মে কিঞ্চিৎ বাধা প্রাপ্তি, আত্মীয়ের মৃত্যু বা জীবন সংশয় প্রভৃতি সম্ভব। সাফল্য, লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সুখ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস-ব্যসন লাভ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য প্রভৃতি যোগ আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি, উদরশূল, চক্ষু-পীড়া, জ্বর ভাব। কখন পরিবারবর্গের সহিত প্রীতি, কখন বা কলহ। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসবের যোগ আছে। কোন প্রকার বেদনাদায়ক সংবাদ পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। নগদ টাকার কিছু কিছু অভাব বোধ হবে। অর্থোন্নতির উদ্দেশ্যে কোন প্রকার নব প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয়। রেসে হার। লাভক্ষতি সম পর্য্যায় ভুক্ত হয়ে দাঁড়াবে, ফলে বিশেষ সঞ্চয় হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম, চাকুরিজীবীর পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক নয়। অফিসের কাজে বিশৃঙ্খলতার জন্যে উদ্বেগ ও অশান্তি। সহকর্ম্মীরা সহযোগে সময়ে সময়ে অন্তরায় ঘটাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। স্ত্রীলোকের প্রণয়ের পথে অগ্রসর হওয়া বিপত্তিজনক, কোন পুরুষের সহিত অবৈধ সংসর্গের পরিণতি শোচনীয় ঘটনার সূচনা করবে। অধ্যাত্ম পথের যাত্রী সাফল্যলাভ কর্‌বে। দাম্পত্য-প্রণয় ভঙ্গ হোতে পারে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অবজ্ঞাই পাবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম। শ্রবণার পক্ষে মধ্যম, দ্বাদশে বৃহস্পতি ভালোই বলা যায়। শুভ ফলগুলি বিশেষভাবে ফলবে। উদ্দেশ্যেসিদ্ধি, উত্তম বন্ধু, লাভ, সাফল্য, বিলাসব্যসন দ্রব্যলাভ, শত্রুজয়, সম্পত্তি লাভ, সৌভাগ্য ও সম্মানলাভ প্রভৃতি যোগ আছে। মামলা-মোকর্দ্দমা, কলহ, গুরুজনের বিরাগভাজন হওয়া, আত্মীয়ের মৃত্যু, উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য আশঙ্কা করা যায়। ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের অবনতি। পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দতা লাভ। সামাজিক ক্ষেত্রে নাম ও যশ, প্রতিষ্ঠাগৌরব। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। আশাপ্রদ অর্থলাভ দেখিনা। তবে কিছু আয়বৃদ্ধি যোগ আছে। অল্পবিস্তর ক্ষতি লেগেই থাক্‌বে। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় বিশেষ অর্থ লাভ ঘট্‌বে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষেও উত্তম মাস। সম্মান, প্রতিপত্তি ও পদোন্নতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অর্থাগমে প্রচুর সুযোগ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য ও অনুগ্রহের আবশ্যক হোলে তাও পেতে পারবে। বেকার মেয়েরা কাজ পাবে। যারা চাকুরিতে আছে, তাদের পদোন্নতি যোগ। অবৈধ-প্রণয়ে সাফল্য ও সুখলাভ। সময়ে সময়ে যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। উপহার লাভ, দানে ও গ্রহণে প্রচুর আনন্দ। কোর্টসিপ, পিকনিক্‌-পার্টি ও নৃত্যগীতে সাফল্য অর্জ্জন। দাম্পত্য প্রণয় প্রগাঢ় হবে, পারিবারিক, প্রণয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। কতিপয় পুরুষের বান্ধবতা অন্তরে আনন্দ সঞ্চার কর্‌বে। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। রেসে প্রচুর লাভ।

কুম্ভ রাশি

শতভিষানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধে অশুভ ঘটনাগুলির প্রাধান্য বিস্তৃত হবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ শুভঘটনাবহুল। নানাপ্রকার লাভ, পদমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব, বাসনার পূর্ণতা, উত্তম স্বাস্থ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, অপরের নিকট সম্মান প্রাপ্তি, সৌভাগ্য লাভ, বিলাসব্যসন, সম্পত্তি লাভ, সম্মান বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন প্রভৃতি যোগ আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুচক্রান্ত, স্বজনবিরোধ, কার্য্যে বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতিও সূচিত হয়। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এলেও কোনপ্রকার পীড়ার ভয় নেই। ঋতু পরিবর্ত্তনজনিত পীড়াদিতে সন্তান-সন্ততিরা আক্রান্ত হোতে পারে, এজন্যে সতর্কতা আবশ্যক। কলহ, শত্রুতা, মনোমালিন্য আর পারিবারিক অশান্তি সূচিত হয়। এ মাসে বহু রকমের লাভ হবে। অর্থ, সম্পত্তি, অনাদায়ী টাকা প্রাপ্তি, উপঢৌকন প্রভৃতি যোগ আছে। গড়পড়্‌তা আয়ের অপেক্ষা বেশী আয় আশা করা

যায়। এই অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেই কলহাদি সম্ভব। এ মাসটী অর্থাগমের পক্ষে অতীব উত্তম। স্পেকুলেশনে ভীষণ ক্ষতি। রেসে হার। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। সম্পত্তি বিক্রয়ে বিশেষ লাভ। চাকুরির ক্ষেত্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি, উপরওয়ালার প্রীতি অর্জ্জন, প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সাহায্যলাভ। বেকার ব্যক্তির চাকুরি হবে, অস্থায়ী কর্ম্মচারী স্থায়ীপদে নিযুক্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করবে আর আশাতীত লাভ করবে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অবৈধ প্রণয়ে অত্যন্ত সুযোগ ও উপঢৌকন প্রাপ্তি। আনন্দসম্ভোগ। সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধি। স্বামী বশীভূত থাকবে। অন্যায় কার্য্যে ও স্বামীর প্রশ্রয় দেওয়াও লক্ষ্য করবার বিষয়। পরপুরুষের সান্নিধ্যে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ-সুবিধা লাভ। বেকার নারীর চাকুরি হবে, অস্থায়ীগণ স্থায়ীভাবে পদে নিযুক্ত হবে। এ মাসটী স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় যে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি লাভ করতে পারবে। কোর্টসিপ, পিক্‌নিক-পার্টি প্রভৃতি মাধ্যমে আনন্দলাভ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সম্মান প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার্জ্জন। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্র পদনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, রেবতী মধ্যম আর পূর্ব্ব ভাদ্রপদজাতগণের নিকৃষ্ট ফল। এ মাসে অশুভ ফলেরই আধিক্য। বন্ধু বিচ্ছেদ, কলহ, ব্যয়ের আধিক্য ও অর্থ অপচয় আশঙ্কা, বয়োজ্যেষ্ঠ-দের সঙ্গে শত্রুতা, বিষণ্ণতা, স্বাস্থ্যের অবনতি, মর্য্যাদাহানি, কুসংসর্গ, স্বজন ও বন্ধুবিয়োগ, মামলায় পরাজয় প্রভৃতি অশুভজনক ঘটনা। বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ, বন্ধুদের সাহায্য, জ্ঞানবৃদ্ধি সুখ ও ক্ষমতালাভ—এ মাসে যোগ আছে। নানাপ্রকার অসুখ হবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হবে। হজমের গোলযোগ, গুহ্যদেশে পীড়া প্রভৃতি সূচিত হয়। আত্মীয় স্বজনেরাই পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি করবে, শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা হবেই। অর্থের জন্য কলহ-বিবাদ, মনান্তর প্রভৃতি ঘটবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে লাভ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। চাকুরীর ক্ষেত্রে চলনসই, গুপ্ত শত্রুতার প্রচেষ্টা চলবে। সামান্য দোষ ক্রটির জন্যেও উপরওয়ালার কাছে অপমানিত হবার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের দরুণ কর্ম্মের গতিবিধি ও লাভ ক্ষতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে না, তবুও সময়টী মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ উত্তম নয়। সামান্য কারণে বহু মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ভ্রমণ, স্থান পরিবর্ত্তন, পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি সম্ভব। দাম্পত্য প্রীতির অভাব। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে জটিল অবস্থার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

মনোকষ্ট, শত্রু ভয়, শ্রীবৃদ্ধি, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, সম্মান বৃদ্ধি; ফুসফুসের ওপর রোগাধিকার, স্বজন বিরোধ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ মহিলাদের শুভ।

বৃষলগ্ন

তীর্থপর্য্যটন, ভ্রমণ, পদোন্নতি, যৌনপরায়ণতা, আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি, উদ্বেগ ও ব্যয়, বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম, প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য।

মিথুনলগ্ন

আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, সাংসারিক অশান্তি, বায়ু প্রকোপ, পুস্তক রচনায় সিদ্ধি, অপবাদ, কলহ, দুর্ঘটনায় ভয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মহিলাদের পক্ষে অশুভ।

কর্কটলগ্ন

কিঞ্চিৎ দেহ পীড়া, আর্থিকোন্নতি, অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য, সন্তান ভাব শুভ। অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠা, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

সিংহলগ্ন

অর্থাগম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, মিত্র লাভ, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মহিলাদের পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো, ধনভাবের ফল শুভ, সন্তানলাভ, চাকুরিস্থল সন্তোষজনক, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম, মাতার উত্তম স্বাস্থ্য, মহিলাদের পক্ষে শুভ।

তুলালগ্ন

ধনাগম ও আয় বৃদ্ধি, পদমর্য্যাদা লাভ, সন্তানের দেহ পীড়া, শত্রু বৃদ্ধি, শুভ কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ, মহিলাদের পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিকলগ্ন

ধন ও আয় বৃদ্ধি, নানাভাবে ব্যয়ের পথ উন্মুক্ত, পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকাশয়ের দোষ, শারীরিক বিষয়ের ফল ভালো, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, মহিলাদের পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনুলগ্ন

শারীরিক সুস্থতা, আর্থিকোন্নতিযোগ, ব্যয় বৃদ্ধি, পত্নীর শরীর ভালো বলা যায়, অপহৃতদ্রব্যের পুনরুদ্ধার, অর্থোপার্জ্জনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি, অপরের নিকট গচ্ছিত ধনের পুনঃপ্রাপ্তি, অসদুপায়ে অর্থলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়, স্ত্রীলোকের পক্ষে অধম।

মকরলগ্ন

ভ্রাতৃবধূর মারাত্মক পীড়া। বাসস্থান সংক্রান্ত-ব্যাপারে গোলযোগ, প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যে খ্যাতি, সন্তান ও মাতৃস্থানীয়ার পীড়া, উচ্চ স্থান থেকে পতন ও রক্তপাত, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম। মহিলাদের পক্ষে মধ্যম সময়।

কুম্ভলগ্ন

আয় স্থান শুভ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সম্পত্তিলাভ বা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা, নূতন কর্ম্মপ্রাপ্তিযোগ, সম্বন্ধলাভ, শত্রু বৃদ্ধিযোগ। চাকুরির স্থল শুভ, পিতার স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, মহিলাদের পক্ষে উত্তম সময়।

মীনলগ্ন

সন্তান লাভ বা সন্তানের বিবাহ সূচনা, ঋণযোগ, পাকযন্ত্রের পীড়া, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি, বন্ধু বিচ্ছেদ, আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তমসময়, মহিলাদের পক্ষে নানা অশান্তি ও প্রণয় ভঙ্গ।

অনাহূত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

১

বলার কথা অনেক ছিল,—
তবু বলা হয়নি,
ভাঙা তরীর পালে আমার
চলার বাতাস বয়নি।
মনের কোণের স্বপন-আশা
ছন্দে তাদের দিচ্ছি ভাষা ;—
নিজের কথা নিজেই বলি,—
ব'ল্‌তে কেহ কয়নি !

২

কোকিলকে কেউ আকুল সুরে
ডাকে কি গান গাইতে ?
কেউ কি কহে রাজহংসকে
দীঘির জলে নাইতে ?
ফুলের স্বভাব তাই সে ফুটে,
হাওয়ার খুশী তাই সে ছুটে,
গুঞ্জরিয়া অলির পুলক—
গুঞ্জরে যে তাইতে !

৩

পথ চলি আর পাঁচালি গাই
তেম্নি আমি হায়রে,—
হাটের ভিড়ের মাঝে বিভোল
ক্ষ্যাপা বাউল প্রায়রে !
কেউ শোনে ভাই, কেউ না শোনে,
হিসাব নাহি,—কেইবা গোণে ?
বনের পাখী রাজার সভার
খাতির সে কি চায়রে ?

৪

ভাবের ভাঙের ঘোরে আমার
মনের আঁখি লাল্‌চে,
যতই দাগা পাচ্ছে হৃদয়—
সুরের সুধা ঢাল্‌ছে !
দুঃখ আমার অস্থি-পাঁজর
করছে ক্রমে যতই ঝাঁঝর,—
কোন্ সে মহাসরস্বতীর
আরতি-দীপ জ্বাল্‌ছে !

খেলা ধুলা



সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত সফরকারী পাকিস্থান ক্রিকেট দল

ক্রিকেট খেলার আসর ক্রমশঃ জমে উঠছে। ভারত সফরকারী পাকিস্থান ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে তাদের খেলা শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্থান দলের ভারত সফর যে আর্থিক দিক দিয়ে খুবই সাফল্যমণ্ডিত হবে তা প্রথম টেষ্ট ম্যাচ দেখার আগ্রহাতিশায্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না। ইতিমধ্যেই বোম্বাইতে ভারত—পাকিস্থানের প্রথম টেষ্ট খেলার সকল টিকিটই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্ত্তি টেষ্ট খেলাগুলিতেও যে অনুরূপ ঔৎসুক্য দেখা যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতায় তৃতীয় টেষ্ট অনুষ্ঠিত হবে, এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে টিকিট সংগ্রহের পালা—'এবার যেন একটা টিকিট অন্তত পাই, টাকাটা কি দিয়ে দেবো।'

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান উভয় দলই ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ন্যায় শক্তিশালী নয়। দু'দলের খেলার মান প্রায় সমান সমান, সেজন্য এই দু'দেশের খেলার মধ্যে সত্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা লক্ষ করা যাবে। আট বৎসর আগে পাকিস্থান দল যখন ভারতে এসেছিল তখন তাদের টেষ্ট ক্রিকেট খেলার সবেমাত্র সুচনা হয়েছে। ১৯৫২-৫৩ সালের সেই সফরে ভারত ২—১ টেষ্টে বিজয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে। এর পর ভারতীয় দল ভিনু মানকাদের অধিনায়কত্বে ১৯৫৪-৫৫ সাল পাকিস্থান সফরে যায়। এই সফরের পাঁচটি টেষ্ট খেলাই কিন্তু অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। অবশ্য এগুলি ছিল চার দিনের টেষ্ট খেলা। ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত দশটি টেষ্ট খেলা হয়েছে। ভারত জিতেছে ২টি টেষ্টে, আর পাকিস্থান ১টি টেষ্টে। বাকি ৮টি টেষ্ট অমিমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ভারত এখনও একটি টেষ্টে এগিয়ে আছে।

এবার ভারত সফরে যে পাকিস্থান দল এসেছে ১৯৫২-৫৩ সালের দল অপেক্ষা এই দল অনেক শক্তিশালী। ১৯৫২-৫৩ সালের দলের মাত্র তিনজন খেলোয়াড় বর্ত্তমান দলে আছেন। তাঁরা হলেন, পাকিস্থান দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ, ওপ্‌নিং ব্যাটসমান হানিফ্‌ মহম্মদ এবং উইকেট কিপার—ব্যাটসমান, ইম্‌তিয়াজ আমেদ। পাকিস্থান দল ভারত সফরে মোট ১৪টি ম্যাচ খেলবে, তারমধ্যে ৫টি হবে টেষ্ট ম্যাচ। বোম্বাই, কানপুর, কল্‌কাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম টেষ্ট অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬০, এই সফর আরম্ভ হয়েছে, আর ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ সালে দিল্লীতে পঞ্চম টেষ্টের শেষে এই সফর সমাপ্ত হবে।

বর্ত্তমান পাকিস্থান দলে আছেন, চার জন 'ফাষ্ট বোলার'—মামুদ হোসেন, মহম্মদ মুনাফ্‌ এবং মহম্মদ ফারুক। মহম্মদ ফারুক সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছে। দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ এঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে ফারুকের ভবিষ্যৎে ভারতের



প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়কদ্বয়



ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর গুজরাটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। ন্যাটা খেলোয়াড় হিসাবে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন। ১৯৫২ সালে রঞ্জী ট্রফিতে তাঁর প্রথম আবির্ভাবে গুজরাটের পক্ষে খেলে তিনি বরোদার বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন। উচ্চ শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এরূপ নৈপুণ্য খুব কমই দেখা যায়। ১৯৫৪-৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে নরী কণ্ট্রাক্টর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় দলে স্থান লাভ করেন। এই টেষ্টে তিনি ৬২ রাণ করেন। চার ইনিংসে তিনি মোট ১৪৫ রাণ করেন। তাঁর রাণের গড়পড়তা হয় ৩৬.২৫। এর পরবৎসর অষ্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে আসে। এই বৎসর তিনি মোটেই সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ২টি ম্যাচে তিনি মোট ৪২ রাণ করেন। ১৯৫৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফরের সময় পঞ্চম টেষ্টে কণ্ট্রাক্টর ৯২ রাণ করেন। মোট ১০টি ইনিংসে তাঁর রাণের গড়পড়তা দাঁড়ায় ২২.৮০।

ভারতীয় দলের ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরে নরী কণ্ট্রাক্টর প্রমাণ করেন যে ভারতীয় দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। এই সফরে তিনি চারটি টেষ্টে মোট ৮ ইনিংসে ২৩৩ রাণ সংগ্রহ করেন। তাঁর রাণের গড়পড়তা দাঁড়ায় ৩৩.২৮।

গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে কণ্ট্রাক্টর আবার প্রমাণ করেন যে তিনিই ভারতের সবচেয়ে নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। মোট ৫টি টেষ্টে তিনি ৪৩৮ রাণ সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন।

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ ১৯২৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বছর বয়স থেকেই তিনি ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক খেলাগুলিতে খেলে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় দলে মনোনীত হন। কিন্তু সেই সময় তিনি পুলিস বিভাগে যোগদান করায় ভারতীয় দলের সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাকিস্থান দলের গোড়াপত্তন থেকেই তিনি এই দলে খেলে আসছেন। ১৯৫১ সালে এম,সি,সি দল পাকিস্থান সফরে এলে করাচী টেষ্টে পাকিস্থানের জয়লাভের মূলে ছিল তাঁরই বোলিং নৈপুণ্য। ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্থান দলের ভারত সফরেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। লক্ষ্ণৌ টেষ্টে ফজল মামুদ দু' ইনিংসে ৯৪ রাণে ১২টি উইকেট দখল করেন। এরপর ১৯৫৪ সালে, ওভাল মাঠে পঞ্চম টেষ্টে পাকিস্থান একমাত্র ফজল মামুদের দুর্দ্ধর্ষ বোলিং-এর জন্যই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। এই টেষ্টে তিনি ২ ইনিংসে ৯৯ রাণে ১২টি উইকেট লাভ করেন। ১৯৫৬ সালের অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধেও তিনি বোলিং নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি ১১৪ রাণে ১৩টি উইকেট দখল করেন। ১৯৫৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনি সর্ব্বপ্রথম পাকিস্থান দলের অধিনায়কত্ব করেন। বোলিং ছাড়া ব্যাটিং-এও তিনি বেশ পিটিয়ে খেলতে পারেন। ফজল মামুদ বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্থান পুলিসের 'ডিরেক্টর অফ স্পোর্টস' পদে অধিষ্ঠ আছেন।

খ্যাতনামা 'ফাষ্ট বোলার' মহম্মদ নিসারের সম-পর্য্যায়ভুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আর আছেন মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার ফজল মামুদ নিজে। এঁরা ছাড়া ১ জন বাম হাতে 'লেগ্ স্পিনার' এক জন 'অফ্ স্পিনার' এবং একজন ডান হাতে 'লেগস্পিনার' ও 'গুগ্লি' বোলারও আছেন। ব্যাটিং-এর দিক দিয়েও দলটি বেশ শক্তিশালী। ওপ্নিং ব্যাট হানিফ মহম্মদ ও ইম্তিয়াজ আমেদের পরিচয় নূতন করে দেবার নেই। এঁরা ছাড়া হানিফের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাক মহম্মদ, সৈয়দ আমেদ, ওয়ালিস মাথিয়াস, আলিমুদ্দিন, এঁরা আছেন। অক্সফোর্ডের খেলোয়াড় জাভেদ বুর্কিকে ব্যাট্সম্যান হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে। তিনিই পাকিস্থান দলের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি এখন পর্য্যন্ত কোন টেষ্ট ম্যাচ খেলেন নি। পাকিস্থান দলের কয়েজন খেলোয়াড় বেশ দ্রুত রাণ তুলতে সক্ষম, হানিফের ভ্রাতা মুস্তাক মহম্মদ তার মধ্যে অন্যতম। ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে এই দল গঠিত হয়েছে। পাকিস্থান দলের খেলোয়াড়গণের গড়পড়তা বয়স হচ্ছে ২২ বৎসর। এঁদের ফিল্ডিংও ভাল হবে বলেই আশা করা যায়। পাকিস্থান দলের ম্যানেজার হিসাবে এসেছেন প্রাক্তন ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্লু" ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ফজল মামুদের নেতৃত্বে পাকিস্থান দল যে উত্তম ফল প্রদর্শন করবে তাদের খেলার সূচনা থেকেই তা অনুমান করা যায়।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ দ্বারা পাকিস্থান দল গঠিত হয়েছে,

ফজল মামুদ (অধিনায়ক)
ইম্তিয়াজ আমেদ
হানিফ্ মহম্মদ
সৈয়দ আমেদ
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস
আলিমুদ্দিন
হাসিব আসান
ইজাজ বাট্
সুজাউদ্দিন
ইন্তেকাব আলাম্
মামুদ হোসেন
মুস্তাক মহম্মদ
মহম্মদ মুনাফ্
জাভেদ বুর্কি
মহম্মদ ফারুক
নাসিমুল ঘানি
আফার আল্তাফ

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

ত্রিবান্দ্রামে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে প্রতিযোগিতায় নবাগত মহীশূর দল ২-০ গোলে গত দু বছরের রানার্স-আপ পাঞ্জাবকে পরাজিত ক'রে লেডী রতন টাটা ট্রফি জয়লাভ করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোল শূন্যভাবে অমীমাংসিত থাকে। মহীশূর দল গত তিন বছরের লেডী রতন টাটা ট্রফি বিজয়ী শক্তিশালী বোম্বাই দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দু'বছরের রানার্স-আপ পাঞ্জাব দল ৪-০ গোলে কেরালা দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। প্রতিযোগিতায় মোট ১৩টি প্রাদেশিক দল যোগদান করে। এই ১৩টি দলের মধ্যে মহীশূর এবং মাদ্রাজ দলের যোগদান এই প্রথম। অল্-ইণ্ডিয়া উইমেন্স হকি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সার্ভিসেস ফুটবল ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সার্ভিসেস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সাউদার্ন কম্যাণ্ড লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

সার্ভিসেস বাস্কেট বল ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ভিসেস বাস্কেট বল লীগ প্রতি-

যোগিতায় সাউদার্ণ কম্যাণ্ড ৮ পয়েণ্ট লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় সাউদার্ন কম্যাণ্ড, এয়ার ফোর্স, ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ড, ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড এবং নেভী দল যোগদান করে। এয়ার ফোর্স দল রানার্স-আপ হয়েছে।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল টুর্নামেণ্ট ঃ

১৯৬০ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চার-বার (১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬০) ফাইনালে জয়লাভ করলো। সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-১ গোলে দিল্লীর ইয়ঙস্টার্স দলকে পরাজিত করে। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সৌভাগ্যক্রমে ১-০ গোলে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলকে পরাজিত করে।

এশিয়ান ফুটবল কাপ ঃ

গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় এশিয়ান ফুটবল কাপ জয়লাভ করেছে।

জাতীয় স্কুল গেমস ঃ

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক জাতীয় স্কুল গেমস প্রতিযোগিতায় ১৬টী প্রদেশ যোগদান করে।

ফুটবল ঃ ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ২—১ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে ফুটবল খেতাব পেয়েছে। মধ্য-প্রদেশ সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে গতবারের বিজয়ী মনিপুরকে পরাজিত করে। অপরদিকের সেমি ফাইনালে পাঞ্জাব ৫—০ গোলে পশ্চিমবাংলাকে পরাজিত করে।

সাঁতার ঃ সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতি-নিধিরা সর্ব্বাধিক অনুষ্ঠানে জয় লাভ করে।

হকি ঃ ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ১—০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতি-যোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ২য় স্থান পেয়েছে বোম্বাই (৩২ পয়েণ্ট), ৩য় স্থান পুণা (১০ পয়েণ্ট), ৪র্থ স্থান দিল্লী (৭ পয়েণ্ট) এবং ৫ম বিক্রম (১ পয়েণ্ট)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের বি তালুকদার এই তিনটী অনুষ্ঠানে জয় লাভ করেন—১৮০ ও ২৮০ মিটার বুক সাঁতার এবং ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে। বি ঘোষ জয় লাভ করেন ১০০ ও ২০০ মিটার পীঠ সাঁতারে। ওয়াটার পোলোর ফাইনালে গতবারের বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০—১ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা ঃ

পূর্ব্ব-জার্ম্মানীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব দাবা খেলা প্রতিযোগি-তার ফাইনাল পুলে রাশিয়া সম্ভাব্য ৪৪ পয়েণ্টের মধ্যে ৩৪ পয়েণ্ট পেয়ে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছে। ভারতবর্ষ "বি গ্রুপে ১২ পয়েণ্ট পেয়ে সর্ব্বনিম্ন স্থান লাভ করে।

রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : হ্যারি অ ২১-১৯, ২১-১৪ ও ২১-১৫ পয়েণ্টে ৩নং ভারতীয় খেলোয়াড় জে এম ব্যানর্জিকে পরাজিত করেন। এই নিয়ে হ্যারি অ-এর কাছে জে, এম ব্যানার্জি তিনবার পরাজিত হলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : গতবারের বিজয়িণী উষা আয়েঙ্গার ২১-১৫, ২১-১৫, ২১-২৩, ২১-১২ পয়েণ্টে শকুন্তলা দত্তকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দিলীপ মুখার্জি ২১-১৩, ২১-১৭, ২২-২০ পয়েণ্টে এস এ আলীকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনবার খেতাব পেলেন।

পুরুষদের ডবলস : সমীর মুখার্জি এবং সরোজ ঘোষ ১৭-২১, ২১-১২, ২১-১০, ১৮-২১ ও ২৩-২১ পয়েণ্টে জহর ব্যানার্জি এবং বি এন লাহিড়ীকে পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত মহিলাদের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলি-বল প্রতিযোগিতায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ৩-২ খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

১২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

হাটখোলা ক্লাবের সভ্য নিমাই দাস হুগলীর জুবলী ব্রীজ থেকে শ্রীরামপুরের হরোবাবুর ঘাট পর্য্যন্ত ১২ মাইল পথ সন্তরণে অতিক্রম করে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে—৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড।

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা ঃ

রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বভলিবল প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়া অপরাজিত অবস্থান বিশ্বখেতাব পেয়েছে।

পুরুষ বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	হার	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৯	৯	০	১৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	৯	৮	১	১৬
ম্যানিলা	৯	৭	২	১৪
পোল্যাণ্ড	৯	৬	৩	১২
ব্রেজিল	৯	৪	৫	৮
হাঙ্গেরী	৯	৪	৫	৮
আমেরিকা	৯	৪	৫	৮
জাপান	৯	২	৭	৪
ফ্রান্স	৯	১	৮	২

ভেনীজুলা ৯টি খেলায় কোন পয়েণ্ট লাভ করতে পারেনি।

মহিলা বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	হার	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৫	৫	০	১০
জাপান	৫	৪	১	৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫	৩	২	৬
পোল্যাণ্ড	৫	২	৩	৪
ব্রেজিল	৫	২	৩	৪
আমেরিকা	৫	০	৫	০

জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং সেণ্টাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের সভ্য হরিচরণ সাউ উপর্য্যুপরি চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। তিনি মোট ১৯টি স্বর্ণপদক পেয়ে জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন শ্রীমতী গীতা রায়।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস ঃ

১৯৬০ সালের বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের হার্বার্ট বিথাম অপরাজিত অবস্থায় বিশ্বখেতাব লাভ করেছেন। ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান উইলসন জোন্স (ভারতবর্ষ) ৩য় স্থান পেয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার জিম লং পেয়েছেন ২য় স্থান। সাতটা খেলার মধ্যে উইলসন জোন্স ৫টা খেলায় জয়ী হ'ন এবং ২টো খেলায় পরাজিত হ'ন। প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান পেলেও জোন্স প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ ব্রেক, সর্ব্বোচ্চ aggregate এবং সর্ব্বোচ্চ পয়েণ্ট লাভের গৌরব লাভ করেন। এই কৃতিত্বের দরুণ জোন্স "A Ross Hewitt" কাপ পেয়েছেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত প্রণীত সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী "মানবতার সাগর-সঙ্গমে"—৬৲

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় প্রণীত "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" (২য় খণ্ড)—১২৲

প্রতিমা ঘোষ প্রণীত জাপান ও রাশিয়া ভ্রমণ "চেরী ফুল ও লাল তারা"—২৲

দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত "অপরূপা"—৫৲, "ফুলের ডালি" ৩৲, "কত গান তো হোলো গাওয়া"—৩৲, "হিপ, হিপ, হুররে"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অষ্টাচত্বারিংশ বর্ষ প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক